Barcode - 4990010202355
Title - Masik Basumati (Year11, vol.1)
Subject - LITERATURE
Author - Mukhopadhyay, Satishchandra, ed.
Language - bengali
Pages - 1134
Publication Year - 1932
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13
4 990010 202355

মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৩৯ সাল—বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচিপত্র

১৩৩৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

বিষয়ের নামানুক্রমিক সূচী

বিষয়		লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
অকূল ও কূল	(কবিতা)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৯১০
অনভ্যাসের ফোঁটা	(গল্প)	শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)	৬১৬
অনুতপ্ত	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৫৯
অপরাজিতা	ঐ	শ্রীগোপাললাল দে বি, এ,	৬৫১
অবতরণিকা	ঐ	শ্রীবিমল মিত্র	১৪৯
অর্থহীনের বন্ধু	(গল্প)	শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য	৬৭৬
আদৃতা	(কবিতা)	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার	৯৫
আধুনিক সামাজিক সমস্যা ও তাহার সমাধান—	(প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা)	শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত	৩০৭
আমার গ্রাম	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৯৭৩
আমার পূর্ব্বস্মৃতি	(প্রবন্ধ)	শ্রীতারকনাথ সাধু— (রায় বাহাদুর)	৩০১,৮৩০
আমার বিয়ে	(খণ্ড কাব্য)	শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৬১১
আশুতোষ	(কবিতা)	ঐ	১৯০
আষাঢ়ের উদাস দিবসে	ঐ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম, এ	৩৯২
এক বৎসর	(গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৯৫০
ওহিও	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৪৮১
কনে দেখা	(গল্প)	শ্রীমতিলাল দাশ— এম-এ-বি-এল,	৯৬৭
কবি	(কবিতা)	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার	১৯৬
কানাডা	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৮৬৪
কামনার শেষ	(কবিতা)	শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৮২৯
কাব্য দশভুজা	ঐ	শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৫৯
কাল বৈশাখী	ঐ	শ্রীজগৎমোহন সেন বি, এ,	৬৬
কাল বৈশাখীর সন্ধ্যা বেলায়	ঐ	শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৩৯
কালিদাস-গীতি	(কবিতা)	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য এম-এ	৮১৫
কৃষি-শিল্প	(প্রবন্ধ)	শ্রীআশুতোষ দত্ত বি,এস-সি	২৬২
কৃষ্ণা তিথির চাঁদের আলোয়—	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৭
কে এলে	ঐ	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	১০৬১
ক্রথনকের জীবন-কথা	(প্রবন্ধ)	শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু বি, এ	৪৪৮
খেয়া-ঘাটে	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৯৯৪
গিরিধিতে	ঐ	ঐ	৫১৮
গীতার তত্ত্বোপদেশ	(প্রবন্ধ)	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮১৬
গোপন গাথা	(কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৩৮১
গোত্র ও প্রবর	(প্রবন্ধ)	শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ	১৫০
ঘরে ফিরে চল	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৮৫৫
ঘরের টান	(গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৩৭৩
চতুরে চতুরে	ঐ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১০২৪
চয়ন—			১৪০,১৯৭,৫২৪,৫৮৬,৭৩১
চাঁদের মরণ	(কবিতা)	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৫৯২
ছাগলাদ্য ঘৃত	(গল্প)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	৪৭৩
জড় ও চৈতন্য	(প্রবন্ধ)	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	২৯৭
জন্মাষ্টমী	(কবিতা)	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য এম-এ	৮৮৯
জাগরণী	ঐ	শ্রীকালিদাস রায়	৯৪৮
জাতের নামে	ঐ	শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ	৫৪০
জাপ রাজধানী	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৫
জীবন মরণ	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	
জীবন-যজ্ঞ	(গল্প)	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৪০
তিব্বতের বিভীষিকা	(উপন্যাস)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৬
তুষার তীর্থ—অমরনাথ	(ভ্রমণ)	শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪,২৫২,৭৬
ত্রিমূর্ত্তি	(গল্প)	শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণ	২৯০
দপ্তর—			১০৬,২২৫,৬৫১
দানের প্রতিদান	(গল্প)	চারু চন্দোপাধ্যায় এম-এ	১৪৩
দাবী	(কবিতা)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৭৭৬
দিগ্বিজয়ী গান্ধী	ঐ	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	৫৫৫
দুর্গাপূজা	(প্রবন্ধ)	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	১০৬২
দুর্গোৎসবে স্বপ্ন	ঐ	শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন	৮৯৭
দ্রষ্টা লরেন্স	(আলোচনা)	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৮০৫
ধরার মেয়ে	(কবিতা)	শ্রীরামেন্দু দত্ত	৫২৩
ধুরন্ধর শর্ম্মা	(নক্সা)	শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত	৭৩৩
ধূমকেতু	(নাটিকা)	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	৫৯৮
নদীর গান	(কবিতা)	খোন্দেকার আবুল কাসেম	৫২৮
নিদর্শন	(গল্প)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	২৬৮
নীচ জাতীয়া	ঐ	সতীশচন্দ্র ঘটক	৪০৬
পথের ডাক	(কবিতা)	শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী	৭৯৮

বিষয়		লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
পরিণতি	(কবিতা)	শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য এম-এ	৯১৮
পত্নীব্রত	(গল্প)	শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ-বি-এল	৬৪৩
পাল সাম্রাজ্য ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—	(প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	৭৬৪
পিশাচের নাগপাশ	(উপন্যাস)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৩১,২৮২,৫১৩,৬৫৯,৭২৪,৯৮৮
পুরস্কার	(গল্প)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	১১৫
পুরাতনের বাণী	(কবিতা)	শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী	৮৮
পুরবী	(গল্প)	শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী	৭৭৭
প্রকৃতি	(কবিতা)	শ্রীজগৎনারায়ণ সেন বি-এ	১০১৫
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ	(গল্প)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৯৪৯
প্রণয়ী	(কবিতা)	শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত	৬৮১
প্রত্নশালায়	ঐ	শ্রীকালিদাস রায়	৬৭৫
প্রত্যাগত	ঐ	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৪৭
প্রত্যাবর্ত্তন	ঐ	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩৯৯
প্রভাতী	ঐ	শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার	২২৯
প্রিয়তমা	ঐ	শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ-বি-এল	৯৮৭
প্রেমে বিপত্তি	(গল্প)	শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ-বি-এল	৩৭
বড় ঘর	(উপন্যাস)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩৩,৩৪৫,৪৪০,৬৯৫,৮৫৬
বনদুর্গা	(কবিতা)	মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	১০৩৯
বনবাণী	ঐ	শ্রীকালিদাস রায়	৬২০
বরষা	ঐ	শ্রীমনু চট্টোপাধ্যায়	৫৭২
বরষায়	ঐ	শ্রীবিনায়ক সান্যাল এম-এ	৬৯৪
বর্ষার বিরহ	ঐ	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৭০১
বসন্তের বিদায়	ঐ	শ্রীকালিদাস রায়	২৫৭
বঙ্কিম-বন্দনা	ঐ	শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন	৬৫৮
বঙ্গনারী	(গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ দত্ত	২৪৩
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯,২১১,৩৮২,৬৬৫
বামুনডাঙ্গার মাঠ	(গল্প)	শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	১০০৮
বাল্য প্রণয়	(গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৯১৫
বাঙ্গালীর বীরত্ব	(মন্তব্য)	সম্পাদক	১৫৪
বিজ্ঞানে ধর্ম্ম	(প্রবন্ধ)	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৮৫
বিস্তি	(গল্প)	শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৯২৫
বিবর্ত্তন	(উপন্যাস)	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	১৭,২৫৮,৫২৬,৭৪৪
বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বকবি	(প্রবন্ধ)	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (রায় বাহাদুর)	৮৪৯
বিস্মৃতির পথে	(আলোচনা)	শ্রীহরিহর শেঠ	৭৮৭
বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ	(প্রবন্ধ)	শ্রীআশুতোষ দত্ত বি, এস-সি	৬০
বৈদেশিক	(মন্তব্য)	সম্পাদক	১২৬,২৮৮,৫১৯,৭০২,৮৪৩

বিষয়		লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
বৈদেশিক সাহিত্য	(প্রবন্ধ)	চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	৮,৯১,৪৬০,৫৬৬
বৈশাখী	(কবিতা)	শ্রীজগৎমোহন সেন বি,এস-সি	৫২
ব্যাঘ্র-কবলে চা-কর	(শিকার)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৫৯৩
ব্রাহ্মণ	(গল্প)	শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণ	৯১১
ভাগ্য-পরিবর্ত্তন	(সত্য ঘটনা)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৭৫২
ভারতীয় নৃত্যকলা	(প্রবন্ধ)	শ্রীশিবসুন্দর শর্ম্মা	৮২০
ভুল ভাঙ্গা	(গল্প)	শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী	৯৭৪
ভুলে যদি কারে আমি ভালবেসে থাকি—	(কবিতা)	শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	২৩৪
ভুলের বোঝা	(গল্প)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়	৪২৮
ভূতের গল্প	ঐ	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	[illegible]
মহাত্মা গান্ধীর আত্মদান	(মন্তব্য)	সম্পাদক	১০৬০
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	(জীবনী)	শ্রীদুর্গাপদ মিত্র	৩৪১,৪২২
মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজা			৫৪০
মাণিক জোড়	(গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৫৭৩
মানব-মন	(কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার	৮১৯
মায়ের প্রাণ	(গল্প)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়	১০১৬
মিলনে	(কবিতা)	শ্রীকালীপদ ঘোষ	৪০৫
মুকুটমণি	(উপন্যাস)	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	৫৩,২৩০,৪৬৮,৫৮৮,৭৬৯,৯১৯
মুক্তিমন্ত্রের পুরোহিত বিপিনচন্দ্র	(মন্তব্য)	সম্পাদক	৩৩৮
মুসলমানের মনোবৃত্তি	(প্রবন্ধ)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত	৫৮১
যাত্রা-বদল	(গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	১০৫০
রমাণি বীক্ষ্য	(কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	২৭৮
রস-রূপ	ঐ	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	৫১২
রূপনারায়ণে জোয়ার	ঐ	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বি-এ	৪০৯
ল্যাংড়ার কলমে আমড়া	(নক্সা)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	১১৮
লিটারারি কনফারেন্স	(গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৯৬
লেডিজ রিষ্ট ওয়াচ	ঐ	শ্রীরামেন্দু দত্ত	১০২১
শরতের মেঘে	(কবিতা)	শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল বি-এ	৭৮৬
শিল্পীর সংসার	(গল্প)	শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী	৫৫৬
শিহ্লন আদিত্য	(চরিত্র চিত্র)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	১০৩৩
শ্রাবণ-সঙ্গীত	(কবিতা)	শ্রীজগৎমোহন সেন বি, এস-সি	৬৩৪
শ্রীকৃষ্ণ	(প্রবন্ধ)	শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ	৮৮৭
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা	(প্রবন্ধ)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	৭১৭
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব	(কবিতা)	শ্রীজগৎমোহন সেন বি, এস-সি	১৮৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও মহেন্দ্রনাথ	ঐ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫৪১
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত-অনুশীলন	ঐ	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল	[illegible]
সনেট	(কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার	৮০
সন্ধ্যায়	ঐ	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	২২৪
সমাজ-চিন্তা	(প্রবন্ধ)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ	২০৫
সহোদর	(পল্লী-চিত্র)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৪৫৩

বিষয়		লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
সানফ্রান্সিস্কো	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৩২৬
সাময়িক—			১৭৬,৩৫১,৫৬০,৭০৭,৮৯০
সাক দ্বীপ	ঐ	ঐ	৬৮২
সাহিত্যের গতি প্রকৃতি (অভিভাষণ)		শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)	৫০২
সিংহলের পোবাহেরা শোভাযাত্রা—	(প্রবন্ধ)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৬৩৫
সিরাজ ও ইস্পাহান	(প্রবন্ধ)	শ্রীনিখিলনাথ রায়	৪৮,৪০০
সুখের স্মৃতি	(কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৮৬৩
সুন্দর	(গল্প)	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৮০৯
সুপ্রভা	(গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৬
সেই আর এই	(প্রবন্ধ)	শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬১
সোনার গাঁ	(ভ্রমণ)	শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ বি-এ	৬২১
স্পর্শের প্রভাব	(উপন্যাস)	শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)	১৭০,২০১,৩৬৮,৫৪৮,৮৩৫,৯০১
স্বজাতি প্রেম	(প্রবন্ধ)	শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)	২৮
স্বর্ণ-মৃগ	(গল্প)	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৩১১
স্মৃতির মূল্য	(উপন্যাস)	শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য	৮১,৩৯৩ ৬২৯,৭৯৯,৯৪৩

লেখকগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী—ধূমকেতু	(নাটিকা)	৫৯৮
বিবর্দ্ধন	(উপন্যাস)	১৭,২৫৮,৫২৬,৭৪৪
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—গোপন গাথা	(কবিতা)	৩১৮
শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত—আধুনিক সামাজিক সমস্যা ও তাহার সমাধান	(প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা)	৩০৭
৺ধুবন্ধর শর্ম্মা	(নক্সা)	৭৩৩
শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী (বি এল)—		
পথের ডাক	(কবিতা)	৭১৮
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত—বঙ্গনারী	(গল্প)	২৪৩
শ্রীঅশেষকুমার বসু (বি-এ)—		
ক্রপনিকের জীবন-কথা	(প্রবন্ধ)	৪৪৮
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—এক বৎসর	(গল্প)	৯৫০
ঘরের টান	ঐ	৩৭৩
মাণিক জোড়	ঐ	৫৭৩
যাত্রা-বদল	ঐ	১০৫০
শ্রীআশুতোষ দত্ত—কর্পূর	(প্রবন্ধ)	৬০
শর্করা-শিল্প	ঐ	২৬২
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী—কে এলে ?	(কবিতা)	১০৬১
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ	(গল্প)	৯৪৯
শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী (বি-এ-এম-আর-এস)—		
সোণার গাঁ	(ভ্রমণ)	৬২১
শ্রীকালিদাস রায়—অনুতপ্ত	(কবিতা)	৫৯
খেয়া ঘাটে	ঐ	৯৯৪
গিরিধিতে ৫১৮ ঘরে ফিরে চল	ঐ	৮৫৫
জাগরণী	ঐ	৯৪৮
জীবন-মরণ	ঐ	৭৩
প্রভুশালায়	ঐ	৬৭৫
বনবাণী	ঐ	৬২০
বসন্তের বিদায়	ঐ	২৫৭
রমাণি বীক্ষা	ঐ	২৭৮
শ্রীকালীপদ ঘোষ—মিলনে	ঐ	৪০৫
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক—সুখের স্মৃতি	ঐ	৮৬৩
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—		
সেই আর এই	(প্রবন্ধ)	৩৬১
খোন্দেকার আবুল কাশেম—নদীর গান	(কবিতা)	৫২৮
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী—মুকুটমণি	(উপন্যাস)	৫৩,২৩০, ৪৬৮,৫৮৮,৭৬৯,৯১৯
শ্রীগোপাললাল দে (বি-এ) অপরাজিতা	(কবিতা)	৬৫০
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ)—		
অতি আধুনিক বিদ্যালয়	(প্রবন্ধ)	১৯৫
আমেরিকার একটি বিদ্যালয়	ঐ	৫৬৬
উপন্যাস-প্রতিযোগিতা	ঐ	৪৬৩
জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বাল্যজীবন	ঐ	৪৬০
দানের প্রতিদান	(গল্প)	১৪৩
বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ	(প্রবন্ধ)	১৩
মহাকবি গেটে	ঐ	৮
মৃত্যু তীর্থযাত্রীর শেষ কথা	ঐ	১৯১
ক্ষুদ্রতম পাঠশালা	ঐ	৪৬৫
ক্ষীণদৃষ্টি শিশুদের বিদ্যালয়	ঐ	৪৬৬
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্নি)—		
পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে নারী	(প্রবন্ধ)	১১০,২২৫,৬৫১
শ্রীজগৎমোহন সেন বি-এস-সি-বি-এল—		
কালবৈশাখী	(কবিতা)	৬৬
প্রকৃতি	ঐ	১০১৫
বৈশাখী	ঐ	৫২
শ্রাবণ-সঙ্গীত	ঐ	৬৩৪
শ্রীরামকৃষ্ণ দেব	ঐ	১৮৫
শ্রীজগদীশ রায়গুপ্ত—প্রণয়ী	(কবিতা)	৬৮১
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—আমার গ্রাম	(কবিতা)	৯৭৩
কৃষ্ণাতিথির চাঁদের আলোয়	ঐ	২৭
চাঁদের কিরণ	ঐ	৫৯২
প্রত্যাবর্ত্তন	ঐ	৩৯৯
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম-এ)—		
আষাঢ়ের উদাস দিবসে	ঐ	৩৯২
শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)—		
অনভ্যাসের ফোঁটা	(গল্প)	৬১৬
আমার পূর্ব্বস্মৃতি	(প্রবন্ধ)	৩০১,৮৩০
স্বজাতিপ্রেম	ঐ	২৮

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীদিলীপকুমার রায়—দ্রষ্টা লরেন্স	(আলোচনা)	৮০৫
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়—		
তিব্বতের বিভীষিকা	(উপন্যাস)	৬৭
পিশাচের নাগপাশ	(উপন্যাস)	৩১,২৮২, ৫১৩,৬৫৯,৭২৪,৯৮৮
ব্যাঘ্রকবলে চাকর	(শিকার)	৫১৩
ভাগ্য-পরিবর্ত্তন	(সত্য ঘটনা)	৭৫২
লাক্ষার কলমে আমড়া	(গল্প)	২১৮
সহোদর	(পল্লী-চরিত্র)	৪৫৩
শ্রীদুর্গাপদ মিত্র—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—"শ্রীম"	(প্রবন্ধ)	৩৮১,৪২২
শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ-বি-এল—		
প্রিয়তমা	(কবিতা)	৯৭৮
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু—ডাগলাদা গুপ্ত	(গল্প)	৪৭৬
নিদর্শন	ঐ	২৬৮
পুরস্কার	ঐ	১১৫
শিল্পীর আদিতা	ঐ	১০৩৩
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা	(প্রবন্ধ)	৭১৭
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)—		
স্পর্শের প্রভাব	(উপন্যাস)	১৭০, ২০১,৩৬৮,৫৪৮,৮৩৫,৯০১
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—চতুরে চতুরে	(গল্প)	১০২৪
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও মহেন্দ্রনাথ	(প্রবন্ধ)	৫৪১
শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (বি-এ)—		
রূপনারায়ণে জোয়ার	(কবিতা)	৪৩৯
শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—আমার বিয়ে	(খণ্ড কাব্য)	৬১১
আশুতোষ	(কবিতা)	১৯০
শ্রীনিখিলনাথ রায়—সিরাজ ও ইংরাজ	(প্রবন্ধ)	৪৮,৪৫০
শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য (এম-এ কাব্যসাংখ্যতীর্থ)—		
পরিণতি	(কবিতা)	৯১৮
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—		
তুষারতীর্থ—অমরনাথ	(ভ্রমণ)	৭৪,২৫২,৭৩৯
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন—দুর্গোৎসবে স্বপ্ন	(প্রবন্ধ)	৮৯৭
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়—		
বামুনডাঙ্গার মাঠ	(গল্প)	১০০৮
শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী—পুরবী	(গল্প)	৭৭৭
ভুলভাঙ্গা	ঐ	৯৭৪
শিল্পীর সংসার	ঐ	৫৫৬
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত—দিগ্বিজয়ী গান্ধী	(কবিতা)	৫৫৫
শ্রীপ্রফুল্ল সরকার—আদৃতা	(কবিতা)	৯৫
কবি	ঐ	১৯৬
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়—ভুলের বোঝা	(গল্প)	৪২৮
মায়ের প্রাণ	ঐ	১০১৬
শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—		
কাব্য-দশভুজা	(কবিতা)	১০৫৯
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—ভূতের গল্প	(গল্প)	১৮৬
শ্রীপ্রমথনাথ কুমার—প্রভাতী	(কবিতা)	২২৬
মানব-মন	ঐ	৮১৯
সনেট	ঐ	৮০
শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা—		
বাঙ্গালীর রসানুভূতি	(প্রবন্ধ)	১০৬

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—		
গীতার তত্ত্বোপদেশ	(প্রবন্ধ)	৮১
স্বরাজ ও বর্ণাশ্রম	ঐ	৬৫
শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি-এ)—শরতের মেঘে	(কবিতা)	৭৮
শ্রীবিনায়ক সান্যাল (এম-এ)—বরষায়	ঐ	৬৯
শ্রীবিমল মিত্র—অবতরণিকা	ঐ	১৪
শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—		
কামনার শেষ	ঐ	৮২
কালবোশেখীর সন্ধ্যাবেলায়	ঐ	২৬
ভুলে যদি কারে আমি ভালবেসে থাকি	ঐ	২৩৪
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল—		
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত ও অনুশীলন	ঐ	[illegible]
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—		
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	৮৯,২১১,৩৮২,৬৬৫
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—জীবন-যজ্ঞ	(গল্প)	১০৪০
শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ বি-এল)—		
কনে দেখা	(গল্প)	৯৬৭
পত্নীব্রত	ঐ	৬৪৩
প্রেমে বিপত্তি	ঐ	৩৭
শ্রীমনু চট্টোপাধ্যায়—বরষা	(কবিতা)	৫৭১
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য—অর্থহীনের বন্ধু	(গল্প)	৬৭৬
স্মৃতির মূল্য	(উপন্যাস)	৮১, ১৯৩,৬২৯,৭৯৯,৯৪৬
মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ—বনদুর্গা	(কবিতা)	১০৩৯
শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী—পুরাতনের বাণী	(কবিতা)	৮৮
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য (এম-এ)—		
কালিদাস-গীতি	ঐ	৮১৫
জন্মাষ্টমী	ঐ	৮৮৯
শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত—		
মুসলমানের মনোবৃত্তি	(প্রবন্ধ)	৫৮২
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ—		
মন্দিরের দেবতা ও মানুষের দেবতা	(প্রবন্ধ)	২২৮
সমাজ-চিন্তা	ঐ	২০৫
শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (বি-এ রায় বাহাদুর)—		
বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বকবি	(প্রবন্ধ)	৮৪৯
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—অকূল ও কূল	(কবিতা)	৯১০
দাবী	ঐ	৭৭৬
প্রত্যাগত	ঐ	৪৭
বর্ষার বিরহ	ঐ	৭০১
রস-রূপ	ঐ	৫১২
সন্ধ্যায়	ঐ	২২৪
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়—সুন্দর	(গল্প)	৮০৯
স্বর্ণমৃগ	ঐ	৩১১
শ্রীরামেন্দু দত্ত—ধরার মেয়ে	(কবিতা)	৫২৩
লেডিজ রিষ্ট ওয়াচ	(গল্প)	১০২১
শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিস্তি	(গল্প)	৯২৫
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)—		
জড় ও চৈতন্য	(প্রবন্ধ)	২৭৯
দুর্গাপূজা	ঐ	১০৬২
বিজ্ঞানে ধর্ম্ম	ঐ	৮৫

কগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
বসুন্দর শর্ম্মা—		
ভারতীয় নৃত্যকলা	(প্রবন্ধ)	৮২০
ীব ন্যায়তীর্থ (এম-এ)—		
গাত্র ও প্রবর	(প্রবন্ধ)	১৫০
াতের নামে	(কবিতা)	৫৪০
ীকৃষ্ণ	(প্রবন্ধ)	৮৮৭
াপতি বিদ্যাভূষণ—		
ব্রমূর্ত্তি	(গল্প)	২৯২
াহ্মণ	ঐ	৯১১
চন্দ্র ঘটক—		
চজাতীয়া	ঐ	৪০৩
ক—বাঙ্গালীর বীরত্ব		১৫৪
দেশিক		১২৬,২৮৮,৫১৯,৭০২,৮৪০
াত্মা গান্ধীর আত্মদান		১০৬০
কুমন্থের পুরোহিত বিপিনচন্দ্র		৩৩৮
সাময়িক		১৭৬,৩৫১,৫৩০,৭০৭,৮৯০
দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)—		
হিত্যের গতি-প্রকৃতি	(অভিভাষণ)	৫০২

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ—		
ওহিও	(প্রবন্ধ)	৪৮১
কানাডা	ঐ	৮৬৪
জাপ-রাজধানী	ঐ	১৫৫
সার্কদ্বীপ	ঐ	৬৮২
সান্‌ফ্রান্সিস্কো	ঐ	৬১৫
শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন—		
বঙ্কিম-বন্দনা	(কবিতা)	৬৫৮
শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী—		
পাল সাম্রাজ্য ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান	(প্রবন্ধ)	৭৬৪
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—		
সুপ্রভা	(গল্প)	৭৫৬
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—বড় ঘর	(উপন্যাস)	১৩৩, ৩৪৫,৪৪০,৬৯৫,৮৫৬
বালা-প্রণয়	(গল্প)	৯৯৫
লিটারারি কনফারেন্স	ঐ	
শ্রীহরিহর শেঠ—		
বিস্মৃতির পথে	(আলোচনা)	৭৮৭

চিত্র-সূচী

	পৃষ্ঠা
াগে আবর্ত্তিত নল	৫৮৬
কমন্স সভা	৮৬৭
কুকুর-দৌড়	৮৭৩
পার্লামেণ্ট গৃহ	৮৬৫
সিনেট গৃহ	৮৬৬
স্মৃতিদিবসে সম্মিলিত সেনাগণ ও গ	৮৬৮
গণ্ডার	৫২৬
বুদ্ধমূর্ত্তি	১৪২
সাভিয়েট প্রাসাদ	১১৮
চস্তার	৫২৫
ার (বিবাহ-নৃত্য)	৮২৪
হ্রদে মাছ ধরা	৮৮৬
হ্রদে নব-খনিত ওয়েসল্যাণ্ড খাল	৮৭১
তামাক-পাতার ক্ষেত্র	৮৭৯
শৃগাল-পালক	৮৭৬
শ্যামলতামনোহরো (ত্রিবর্ণ)	৮৫
রায়	৮৯৫
(ত্রিবর্ণ)	১৪৫
	৮৭৩
ধানুকীর দল	২০০
ল হইতে নদীর দৃশ্য	২৫৩
ডুল্লা	৮৪৭
দ্বীপ—সাময়িক বন্দিনিবাস	৩৩৬
ইন অরণ্য—নির্ভীক ভল্লুক	৮৮৪
ান	৬৬৪
কপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য	৩৫৯

চিত্র	পৃষ্ঠা
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ—সর্দ্দার লোমান ইহারই তলে বক্তৃতা দিয়াছিল	৪৮৮
শ্রীমতী ইন্দুমতী বক্সী	৫৮৫
ইষ্ট লিভারপুলের নদীতীরের দৃশ্য	৪৯৪
উইলিয়ম হাউয়ার্ড টাফটের জন্মস্থান	৫০০
উচ্চতম অট্টালিকা শ্রেণী	৩২৪
উড্ডীয়মান স্থিচক্রযান	১১৮
উৎসবে শোভাযাত্রা	১৫৯
উৎস	৭৫৫
উদয়শঙ্কর	৮২০
উদ্যান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ম্যাকলারেঞ্জের পুষ্প-রচিত মূর্ত্তি	৩৩৩
উল্কি-ধারণ	৩৩৪
উষ্ট্রের পাকস্থলী	৪৪৯
উনবিংশ প্রেসিডেণ্টের জন্মস্থান	৪৮৬
"উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা" (ত্রিবর্ণ)	জৈষ্ঠ প্রথম
এই নাও তার আগে চুড়ির সেটটা	১০৫৮
এই রঙ্গচিত্রে চীন দৈত্য বোতল হইতে বাহির হইয়া বিরাট আকার ধারণ করিয়া শত্রুসম্মুখীন হইয়াছে	১৩০
এককুকুদবিশিষ্ট আরবীয় উষ্ট্র বা ড্রোমিডারি	৪৫০
একটি সেতু	৪৮৫
একে বহু	৬৯৬
এণ্টনিওয়েল স্মৃতিসৌধ	৪৯৫
এডওয়ার্ড হিরিয়ট	৭০৪

চিত্র	পৃষ্ঠা
ওসাগায় স্নানের দৃশ্য	৮৮০
ওহিও নদের প্রকাশ	৪৯০
ওহিওর ফুটবল খেলার দৃশ্য	৪৯৬
ওহিওর স্থাপয়িতা জেনারেল পুটনামের বাসগৃহ	৪৯৮
ওহিও এবং এরিয়ালের দৃশ্য	৫০০
শ্রীমতী কমলরাণী সিংহ এম, এ	৭৩০
কবিপ্রিয়া (ত্রিবর্ণ)	১০২৯
কাচ-নির্ম্মিত সুদৃঢ় ও স্বচ্ছ ইষ্টক	১৪১
কাঠের অগ্নিচালিত সান্‌ফ্রান্সিস্কোর প্রথম ইঞ্জিন	৩২৪
কর্ণেল লিণ্ডবার্গের শিশুপুত্র	১৩০
কর্ণেল লিণ্ডবার্গ-দম্পতির অভ্যর্থনায় জাপানী সরকার	১৫৮
কলম্বস নগরের প্রাসাদ	৪৮৮
কলম্বস সহরের প্রমোদ-পরিচ্ছদ	৪৯০
কসরৎ (ত্রিবর্ণ)	৪৭৬
কানাডা প্রদর্শনী	৮৭০
কানাডার পাতি হাঁস	৮৭৬
কানাডার মুস মৃগ	৮৮২
কানাডার স্মারক বেদী	৮৬৪
কানাডা নদীর উপরিস্থিত সেতু	১৬৬
কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	৩৩৭
কালীবাড়ীর এক দিকের দৃশ্য	৩৬২
কালীবাড়ীর অপর দিকের দৃশ্য	৭২২
কালীমন্দিরে প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার	৩৬৫
কাশ্মীরী বালিকা ধান কুটিতেছে	২৫৫

চিত্র — পৃষ্ঠা

কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে (ত্রিবর্ণ) ৫:৬
কুকুর-বাহিত স্লেড গাড়ী ৮৭৪
কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র ৮৪২
কেনেরো কাগজমণ্ড প্রস্তুত কেন্দ্র ৮৮১
কেলি দ্বীপের আদিম নিবাসীদিগের
শিলালেখ ৪৮৪
কেশবচন্দ্র সেন ৫৪২
ক্লেভল্যাণ্ড সহরের একাংশ ৪৮১
ক্লেভলাণ্ডের বন্দর ৪৯২
খাসনগরের দীঘি ৬২৬
গগনচুম্বী অট্টালিকা ৪৯৩
গঙ্গাবক্ষ হইতে দক্ষিণেশ্বরের দৃশ্য ৩৬৭
গঙ্গার উপর দ্বাদশ শিবমন্দিরের একাংশ ৩৬৫
গন্ধর্ব নৃত্য ৮২২ গন্ধর্ব বল ৭৩৯
গুডবাই ফাদার (ত্রিবর্ণ) ৭৯৩
গুলীপ্রতিরোধক ইস্পাত-নির্ম্মিত দুর্গ ৫২৪
গৃহপালিত পশুর বাজার ৪৮৬
গেট দ্বীপ ৩২৮
গোয়ালন্দীর ভগ্ন মসজিদ ৬২৩
গোয়ালন্দীর মসজিদ ৬২৪
গ্রাম্য নারীদিগের উৎস হইতে জল গ্রহণ ৭৫৪
গ্রাম্য বালক-বালিকারা গাড়ী-স্কুলে পড়িতে
আসিতেছে ৮৮০
ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার আলোক-স্নান ৫২৫
চন্দনরামের মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল ১০৫৪
চল চল যুগলে যুগলে যাই (ত্রিবর্ণ) ৫৭৬
চলচ্চিত্র সাহায্যে আসামী গ্রেপ্তার ৭৩২
চলচ্চিত্র সাহায্যে পুলিসের শিক্ষা ৭৩১
চন্দ্রাভিমুখী হাউই-পোত ১৯৯
চিকিৎসায় চলচ্চিত্র ১৪০
চীনা বালিকা বিদ্যালয় ৩৩২
চীনা পল্লীর পথে দৈনিক সংবাদলিপি ৩৩২
চীনা সহর ৩২৫ চেরী বৃক্ষমূলে জাপানী ১৬৭
ছায়া ৯৮১
ছেলে বুড়া নারী সকলেই সংবাদপত্র
পড়িতেছে ১৬৫
জর্জ্জ ওয়াসিংটন ৪৬০ জর্জ্জ ডেভিস ৪৬৩
জলযানে গৃহস্থ-জীবন ৪৯৯
জহরলাল নেহরু ১৮০
জাপ পুলিসের সম্রাটকে অভিবাদন ১৬৯
জাপানী ছাত্রের বেসবল ক্রীড়া ১৫৫
জাপানী তীর্থযাত্রী ১৬৪
জাপানী নাট্যশালা—কাবুকী ১৫৮
জাপানী বাট্টার বাজার ১৬৮
জাপানী মল্ল ১৬৩ জাপানী রেস্তরাঁ ১৬০
জাপানীরা পাখীর ভোজ দিতেছে ১৬৩
জাপানের অগ্নিনির্ব্বাণকারী দল ১৬৪
জাপানের আধুনিক অট্টালিকা ১৫৯
জাপানের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক মিটসুবিসি ১৬১
জাপানের সিমেণ্টরাজের গৃহসংলগ্ন উদ্যান ১৬২

চিত্র — পৃষ্ঠা

জাহাজে গম বোঝাই হইতেছে ৮৬৯
জাহানারা বেগম চৌধুরী ৭৩০
জীবন-মধ্যাহ্নে বিপিনচন্দ্র ৩৪০
জুতার মধ্যে উকা ও করাত ৭৩২
জোজোজি মন্দিরের বাহিরে নারীদিগের
পরিত্যক্ত জুতা ১৬৫
ঝিএর হাত হইতে পোষ্টকার্ড লইয়া পড়িতে
লাগিল ১০৫৫
টমাস এডিসনের জন্মস্থান ৪৯৭
টরণ্টো পার্লামেণ্ট ৮৭০
টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয় ৮৭২
টরণ্টো বালক ও সৈনিক ৮৮৫
টরণ্টোর বে-ষ্ট্রীট ৮৭৫
টরণ্টোর শিকারীদের ক্লাব ৮৭২
টোকিও নগরের ব্যবসায় কেন্দ্র ১৫৫
টোকিও সহরে গ্রীষ্মের উৎসব ১৬৫
টোকিওর পুরাতন রাজপথ ১৫৭
টোকিওর রেল ষ্টেশন ১৫৭
টোকিওর সমাপ্তপ্রায় ডাকঘর ১৬৮
ডাক্তার আন্সারী ১৮০
ডাল হ্রদে যাইবার জলপ্রণালীর তীরের দৃশ্য ৭৮
ডায়েগো বিভারার প্রতিমূর্ত্তি ৩২৬
ডি, ভেলেরা ১১৩
ঢক্কানিনাদসহ শোভাযাত্রা ৬৩৬
তরঙ্গাহত দ্বীপের একাংশ ৬৮৯
তার-বিলম্বিত যান ৭৩২
তিমি মৎস্যবাহী অতিকায় জাহাজ ১৪২
ত্রিপত্রবিশিষ্ট পুষ্পিত তৃণক্ষেত্র ৪৯২
দন্ত-মন্দির ৬৪০
দন্ত-মন্দিরের সান্নিধ্যে নৃত্য ৬৩৮
দর্পণ সাহায্যে দাঁড়টানা শিক্ষা ১৪০
দহ্যমান অট্টালিকা ৩৫৮
দক্ষিণ আফ্রিকার লামা ৪৪৯
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ৭২০
দক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানা ৭২১
দক্ষিণেশ্বরের কালীমাতার মন্দির ৩৬৪
দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দৃশ্য ৭২৩
দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের উত্তর দিকের দৃশ্য ৩৬৭
দারুনির্ম্মিত প্রসিদ্ধ মন্দির ১৯৭
২ শত ৫৭ বৎসরের পুরাতন অগ্নিকুণ্ড ৬৯২
দৃষ্টিরক্ষণ গ্লাস ৪৬৭
দেহি পদপল্লবমুদারম্ (ত্রিবর্ণ) ২৯৩
দোঁহে দোঁহা দরশনে (ত্রিবর্ণ) ভাদ্র প্রথম
দ্বিককুদবিশিষ্ট বক্ট্রিয়ার উষ্ট্র ৪৫১
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ৫৩৮ দ্বীপবাসীর গৃহ ৬৯০
দ্বীপের অব্যবহৃত কারাগার ৬৯১
দ্বীপের একাংশের দৃশ্য ৬৯০
দ্রাক্ষাস্তূপ ৪৯১ দ্রাক্ষাক্ষেত্র ৮৮৩
দ্রুতগামী মোটর ৫২৬ ধর্ম্মমন্দির ৬৮৯
ধর্ম্মমন্দিরের সম্মুখ ৬৯০

চিত্র — পৃষ্ঠা

নব-গঠিত উৎসবে জাপ জনতা ১৬৭
নববর্ষের স্নানার্থী অলিম্পিক ক্লাব সদস্যগণ ৩৩৪
নবীন আর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না ১০৫০
নবীন বলিল, এবার ব্যতিক্রম হবে ১০৫৬
নব্য সাহিত্যের রূপশিখা ১০৩২
নয়নে বাদল (ত্রিবর্ণ) শ্রাবণ প্রথম
নায়েগ্রার অশ্বখুর-প্রপাত ৮৭১
নিরাভরণা কাশ্মীর কন্যা ২৫৪
নিশাদবাগ হইতে ডাল হ্রদ ৮০
নিশাদবাগের অভ্যন্তরের দৃশ্য ৭৪১
নিশাদবাগের কিয়দংশ ৭৯
নৌবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ৫২৫
পথ-পরিষ্কারক যন্ত্র ৫২৬
পথিপার্শ্বস্থ রমণীয় দৃশ্য ৬৯১
পথের উপর নিহত হিন্দুর মৃতদেহ ৩৫৯
পরমহংসদেব ও হৃদয় ৫৪৩
পরমহংসদেবের ঘর ৭২১
পরমহংসদেবের ঘরের সম্মুখে গঙ্গার দৃশ্য ৩৬৪
পঞ্চবটী ৩৬৬
পারাবত গৃহ ও হ্যাথাওয়ে-দম্পতি ৬৮৮
পার্ব্বত্যপথবাহী গাড়ী ৩৩০
পাহাড়ের কোলে ভাল রাস্তা ৭৪৩
পাঁচ পীরের দরগা ৬২৫
পুরাতন যুগের ছাত্র ও জাপানী নারী ১৬৪
পুলিসের পিস্তল শিক্ষার স্থান ৪৮৬
পৃষ্ঠবাহিত মোটর যন্ত্র ৫৮৭
পোর্ট আর্থার বন্দরের দৃশ্য ৮৮১
প্যারাসুট অবতরণ-দৃশ্য ৪৯১
প্রথম মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস ৮২১
প্রদোষে (ত্রিবর্ণ) ৩৪৯
প্রসিদ্ধ রাজপথ ৩৩৩
প্রাচীনকালের ককুদহীন উষ্ট্র ৪৪৮
প্রাচীন কীর্ত্তি ৫২৬ স্বামী প্রেমানন্দ ৫৪৫
প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্টের জন্মস্থান ৪৮৫
প্রেসিডেণ্ট ম্যাক বিচানের সমাধিসৌধ ৫০১
প্রেসিডেণ্ট লেব্রান ৭০৫
ফলবাহী ট্রেণে ফল বোঝাই ৮৭৮
ফোলজার সেক্সপীয়র লাইব্রেরী ৭০৩
ফ্রাঙ্কফোর্টে গেটের জন্মস্থান ১০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫০৩
বন্দর মধ্যে ষ্টীমার প্রবেশ করিতেছে ৬৮৪
বন্দর—সমুদ্রগামী মৎস্য ধরিবার নৌকা ৩৩৫
বন্দরের অপরাংশ ৬৯৩
বন্ধনমুক্ত আরণ্য হাঁস ৮৮২
বরাহনগর মঠে মহেন্দ্রনাথ ৪২৫
বর্ণের সাহায্যে বেহালা শিক্ষা ৫২৪
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ (ত্রিবর্ণ) ৬৯৬
বাবাসাফি তোরণ সান্নিধ্যে জনতা ১৬০
বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩
বায়ু-চালিত সমুদ্রপোত ৫৮৭

চিত্র	পৃষ্ঠা
বারাণসী (ত্রিবর্ণ)	৯২৪
বাসদ্বীপ পেরীজায়ের স্মৃতিসৌধ	৪৯৬
বিচিত্র যুগ্ম বিমান	৭৩২
বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১৫৪
বিদ্যুৎচালিত পালের জাহাজ	১৪১
বিদ্যুৎ-নেত্র সাহায্যে অন্ধের গ্রন্থপাঠ	১৪২
বিপিনচন্দ্র পাল	৩৩৮
স্বামী বিবেকানন্দ	৫৪৫
বিভিন্ন ওজনের সোনার ইট	৮৮৪
বিমানযোগে ক্লেভল্যাণ্ডের দৃশ্য	৪৮২
বীরপূজা ৫২৫ বুধুই মোড়লের শ্মশান	৬
বৃহত্তম ক্যামেরা	৫৮৬
বেঞ্জামিন হ্যারিসনের জন্মক্ষেত্র	৪৮৭
বেলা যে পড়ে এল—(ত্রিবর্ণ)	বৈশাখ প্রথম
ব্যাঘ্রকবলে চা-কর	৫৯৬
ব্যাভেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী	৭০৫
ব্যায়ামনিপুণা জাপ তরুণী	১৬৬
ব্যারণ ভন ব্রণ, ভন পেপেন, ভন নিচার	৭০৪
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	৫৪২
ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব (দ্বিবর্ণ)	৩
ভারতীয় তরুণী ব্যারিষ্টার	১৮৯
ভিতর হইতে দ্বাদশ মন্দিরের দৃশ্য	৭২২
মৎস্য-শিকারী-ঝুড়ি	৫৮৭
মদনমোহন মালব্য	১৭৬
মন্দিরের ঘাটে	৯৮০
মৎস্য-দানবের দ্বন্দ্বযুদ্ধ	১৪১
মধ্যযুগের লৌহ মুখোস	১৪২
মহাকবি গেটে ৯ মহাত্মা গান্ধী	১০৬৪,১৭৯
মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজা	৫৪০
মার্টিন ফোরি	৪৮৯
মানসবল হ্রদ ২৫৩ মাদ্রাজী	৬৬৫
মাষ্টার মহাশয়—মধ্য বয়সে	৪২৩
মষ্টার মহাশয়	৫৪২
মিঃ ম্যাকডোনাল্ড	৬২২
মিলন-পূর্ণিমা (ত্রিবর্ণ)	আশ্বিন প্রথম
মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়	৪০০
মিস মার্থা ও ছাত্রীগণ	৫৬৭
মিসেস ষ্ট্রাটন ৪৬৫ মুন নদীতে ডোঙ্গা	৮৭৮
মুসলমান ৬৪৪ মুসোলিনী	৮৪৫
মৃত্যুর করালমূর্ত্তি	১৯৭
মেলাক্ষেত্রে ঘোড়ার বোঝা বহিবার শক্তি-পরীক্ষা ৪৯৮ মোঙ্গোলিয়ান	৬৬৫
ম্যারিয়েটায় জাঁতার স্তূপ	৪৮৭
যন্ত্রে সাবান কাটা	৪৯৪
যাত্রিবাহী বিরাট বিমান	২০০
যোগোদ্যানে মাষ্টার মহাশয়	৩৪১
রক্তকমল (ত্রিবর্ণ)	আষাঢ় প্রথম
রণকামী ঘুড়ী	২০০
রবারের ঘরচুলা-টুপী	৭১৬
রবার্ট রেণল্ডস	৪৬২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭১২
রাজপথের দৃশ্য (সানফ্রান্সিস্কো)	৩২৩
রাজপথের একটি দৃশ্য ঐ	৬৮৬
রাণী বেস-প্রদত্ত কামানের সম্মুখে	৬৮৯
রাণী রাসমণির জানবাজারের বাড়ী	৭১৮
রাধাকান্তজীর মন্দির সম্মুখের দৃশ্য	৭২০
রাধাকান্ত মন্দির ইত্যাদি	৩৬৫
রাধা কৃষ্ণ ৮২৭ রাধা নৃত্য	৮২২
রায় বাহাদুর বেহার সিং	৩০
রাসিয়ার জেনানা পল্টন	২৯১
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মস্থান	৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব	৭১৯
রেল গাড়ীর মধ্যে ছাত্রদের অধ্যয়ন	৮৭৭
লঘুভার ইষ্টক ১৪০ লর্ড আরউইন	১৭৭
লেখক (শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)	৭৪২
লেখক ও সহযাত্রী পুত্রদ্বয়	৬২১
শম্ভুনাথের দরগা	৬২৭
শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪
শরমুখে বিস্ফোরক	১৯৭
শারদ-প্রদোষে (ত্রিবর্ণ)	৮৫৭
শালিমার বাগ উদ্যানের কিয়দংশ	৭৯
শিব-দুর্গা ৮২৮ শিবনৃত্য	৮২৫
স্বামী শিবানন্দ	৫৪৬
শোভাযাত্রার দৃশ্য	৬৪১
শোভাযাত্রার অপর দৃশ্য	৬৪২
শোভাযাত্রার পুরোবর্ত্তী হাতী	৬৩৫
শোভাযাত্রার নর্ত্তকবৃন্দ	৬৩৭
শোভাযাত্রায় কান্দীর নর্ত্তকবৃন্দ	৬৩৮
শ্যামদেশের রাজা প্রজাধিপক	৫২২
শ্যামশঙ্কর ও উদয়	৮২৩
শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ৮৯৪ শ্রীনগরের পথে	৭৬
শ্রীনগরের কাছে ঝিলাম নদী	৭৭
শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের ঘর	৩৬২
শ্রীশ্রীভবতারিণী (দ্বিবর্ণ)	৩৬৩
'শ্রীম'	৩৪২
'শ্রীম' কাশীপুর বাগানে	৪২৭
শ্রীরাধা	৮২৭
ষোড়শ শতাব্দীর বায়ুচালিত কল	৬৮৯
সতীশচন্দ্র ঘটক	৫৩৯
১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ওহিও নগরের অবস্থা	৪৮৭
সন্তরণে বায়ুপূর্ণ দস্তানা	৫৮৭
সন্ধ্যায় ডালহ্রদের কিয়দংশ	২২৫
সন্ধ্যায় ডাল হ্রদের একাংশ	ঐ
সমুদ্র-উপকূল	৩২৭
সমুদ্রগর্ভস্থ জেটী	৩৩৫
সমুদ্রে মাছ ধরা	৪৯১
সম্বল পুল ২৫৬ সম্মুখে সমুদ্র	৩২৯
সরোজিনী নাইডু	১৭৬
সর্পাকৃতি মৃত্তিকাস্তূপ	৪৮৯
সম্রাট-মহিষীর জন্য ছাত্রীরা ফুল তুলিতেছে	১৬৯
সম্রাট সম্মুখে জাপানী ছাত্রদের ড্রিল	১৬২
সম্রাট হিয়োহিটোর নবগঠিত টোকিও নগরের উদ্বোধন	১৫৬
সম্রাটের সিংহাসনারোহণে ছাত্রবৃন্দের আলোকোৎসব	১৬১
৭ শত বৎসরের পুরাতন বৃক্ষ	৮৭৯
৬৭ বৎসর পূর্ব্বের সান্‌ফ্রান্সিস্কোর বন্দর-দৃশ্য	৩২৫
সাদিপুরে আমাদের নৌকা	২৫৬
সান্‌ফ্রান্সিস্কোর উপসাগর	৩২৩
সান্‌ফ্রান্সিস্কোর টেলিফোন ও টেলিগ্রাম অফিস	৩৩৩
সান্‌ফ্রান্সিস্কোর জেটীর একাংশ	৩৩৬
সান্‌ফ্রান্সিস্কোর প্রাচীনতম ধর্ম্মমন্দির	৩৩১
সান্‌ফ্রান্সিস্কোর পুরাতন কামান	৩২৯
সাবানের স্তূপ ৪৯৪ সারদানন্দ	৫৪৪
সার দোরাব টাটা	১৮৪
সার সামুয়েল হোর	১৭৭
সার্ক দ্বীপের উদ্যান	৬৯২
সার্ক দ্বীপের ডাকঘর	৬৯৩
সার্ক দ্বীপের প্রাসাদ	৬৮[illegible]
সার্ক দ্বীপের রাজপথ ৬৭২ সার্ক বন্দর	৬৮৩
সিটি হল ও লিগ স্মৃতি-সৌধ	৩৩০
সিন্‌সিনিটের বিরাট সেতু	৪৯৭
সিল মৎস্য ৮৭৭ সুড়ঙ্গ-মুখ	৬৮৫
সুদীর্ঘ সেতু ৮৮৩ সুবহৎ নগর	১৯৯
সুবৃহৎ হস্তিপৃষ্ঠে কান্দি সর্দ্দার	৬৩৯
সুলতান গিয়াসুদ্দীনের সমাধি	৬২৫
সেণ্ট মেগলেয়ার মঠের একাংশ	৬৯১
সোদপুরের ব্রিজ	৭৪০
সোপুরের একটি মুসলমান রমণী	২৫৪
স্বর্ণকুমারী দেবী (যৌবনে)	৫৩৭
স্বর্ণকুমারী দেবী (শেষ বয়সে)	৫৩৮
স্বর্ণতোরণ উদ্যান	৩২৬
স্বর্ণতোরণ উদ্যান—সারভেনটেজ ও অনুচর	৩২৭
স্মৃতি (ত্রিবর্ণ)	১০০৪
স্নানার্থী তরুণ-তরুণীদের ক্রীড়া	৪৮৪
স্বাস্থ্যে সূর্য্যোত্তাপ	২০০
হর-পার্ব্বতী	৮২৬
হাউস বোট	৭৭
হাঁটা চলা শিখাইবার যন্ত্র	১৪১
হ্রদতীরবর্ত্তী স্নানের একটি দৃশ্য	৪৮০
হ্বাইমারে গেটের জন্মস্থান	১১
ক্ষীর-ভবানী	৭৩৯

—"বেলা যে প'ড়ে এল : জলকে চল !"—

সচিত্র মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৯ [১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত অনুশীলন

প্রথম অধ্যায়—অবতারণা

ধর্ম্ম

ভগবদংশ মানবকে যিনি পুনরায় ভগবৎসকাশে মিলিত করিয়া দেন, তাঁহার নাম ধর্ম্ম। দেশ-কাল-পাত্র, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এবং ধারণাশক্তি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে মানবকল্যাণ জন্য প্রচারিত হন বলিয়াই, ধর্ম্ম এক হইলেও যে বহু মুখ ধারণ করেন, তাহাই যুগধর্ম্ম নামে আখ্যাত। এই যুগধর্ম্ম দুই অংশে বিভক্ত ;—সকাম ও নিষ্কাম। স্বার্থসিদ্ধি—ফললাভের প্রত্যাশায় যাহা আচরিত হয়, তাহা সকাম ; আর পুরস্কারের কামনা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র পরার্থে বা ভগবৎপ্রীত্যর্থে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নিষ্কাম। ফলতঃ পাত্র এবং অবস্থাভেদে উভয়ই শ্রেয়স্কর। যাঁহারা এই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা ঋষি—সিদ্ধপুরুষ—অবতার।

ধর্ম্মগ্লানি

কালবশে, উপযুক্ত অধিকারী অভাবে, ধর্ম্মেরও গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বার্থসিদ্ধির আত্যন্তিক অনুসরণে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানব, যখন ইহ-সুখ-সর্ব্বস্ব জ্ঞানে সত্য, ধর্ম্ম, পরকাল, এমন কি, জগৎকর্ত্তা জগদীশ সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়,—ধর্ম্মের নামমাত্র ভাণ করিয়া, প্রভুত্বলালসায়, জিগীষাপূর্ণ অন্তরে আপন অনুকূল মতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করে ; পরস্পরবিদ্বেষী হইয়া এক পক্ষ অপর পক্ষকে ছল বা বল দ্বারা পরাভব করিতে প্রয়াস পায়, ইহাই ধর্ম্মগ্লানি। ঊনবিংশ

শতাব্দীতে এই ধর্ম্মগ্লানি কেবল যে ভারতেই প্রকাশ পাইয়াছিল, এমনও নহে, জগতের সকল দেশেই ঘটিয়া ছল। ইহার ফলে, নাস্তিকতারূপ কুজ্ঝটিকায় সমগ্র জগৎ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

সচ্চিদানন্দের ঘনরূপ

জনকল্যাণকারী, আপ্তভাবব্যঞ্জক এই ধর্ম্মকে মলিনতা হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ আপনাকে যুগে যুগে প্রকটিত করিয়া থাকেন। যে জাতির কল্যাণের জন্য তিনি আবির্ভূত হন, সেই জাতির অনুরূপ দেহ এবং আচরণ গ্রহণ করেন। বিধেয় বোধে, অন্য প্রকার মহিমা বা বিভূতি প্রকাশ না করিয়া, কেবলমাত্র কল্যাণ-কামনায়, অসীম হইয়াও সসীম মানব-কলেবরে তিনি মানব-সমাজে অবতীর্ণ হন। কারণ, তাঁহার বিরাট সমরূপের সমীপবর্ত্তী হওয়া, ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। সম-জাতীয়বোধ না হইলে মানব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে কিরূপে? আকৃষ্ট না হইলে, তাঁহার সকরুণ লীলামাধুরী তাহাদের বোধগম্য ও কল্যাণ-কর হইবে না। বোধ হয়, এই কারণেই সচ্চিদানন্দ-ঘন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারত চিরদিনই ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত—শ্রীভগবান্ ইহারই শুভার্থে একাধিকবার প্রকট হইয়াছেন, সেই জন্য প্রাচীন ভারত পুণ্যভূমি নামে প্রখ্যাত।

আবির্ভাব

তাই বুঝি বিভিন্ন ধর্ম্মমতকে সেই একেশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ দেখাইয়া একত্র সম্মিলন-বাসনায়, এবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ-আচরিত বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া এক অচিন্ত্য অভিনব সাম্যভাব অবলম্বনে—সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং জনতাপূর্ণ স্থানসমূহ উপেক্ষা করিয়া—ইতিহাসে অপরিচিত স্থানে—হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর জেলার সম্মিলন-ক্ষেত্রে, যেন দ্বিতীয় ত্রিবেণীসঙ্গমে রাঢ়দেশের ক্ষুদ্র অথচ শোভা ও শান্তিপূর্ণ কামারপুকুর পল্লীতে গোপনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন।

পুণ্য তিথি

অশেষকরুণাময় শ্রীভগবান্ মানবকে আলস্যের জড়িমা—অজ্ঞান-অমানিশা হইতে উদ্ধার করিবার অভিলাষে, নব-জীবন ও উদ্যমপ্রদ সুখময় বসন্তসমাগমে ফাল্গুন মাসে, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া বসুন্ধরাকে সনাথ করিলেন।

দারিদ্র্য-বরণ

অর্থই অনর্থের মূল, অর্থের প্রভাবে মানবমস্তিষ্ক চঞ্চল হয়, বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিলাসিতার যুগে। বোধ হয় যেন ইহা বুঝিয়াই জগদীশ দারিদ্র্যকে বরণ করিলেন। কারণ, দারিদ্র্য অপেক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা ভূতলে আর দ্বিতীয় নাই। এই নিমিত্ত ঋষি ও সাধককুল সকলেই দারিদ্র্যকে সমাদর করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণকুলে

আবার প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে ভগবৎসন্নিধানে লইয়া যাইবেন বলিয়াই সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, অতি দরিদ্র, ঋষিকল্প বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে, ঈশমহিমা-সুপ্রকাশক শুভ ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিলেন।

পিতৃ-পরিচয়

ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। তিনি শান্তস্বভাব—তপঃপ্রভাব জন্য গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে এতই শ্রদ্ধা করিতেন যে, তিনি স্নান বা ভ্রমণেচ্ছায় পুষ্করিণী বা পথে গমন করিলে, পাছে তাঁহার কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করা হয়, এই আশঙ্কায় সকলেই সসম্ভ্রমে স্থান দান করিতেন। উচ্চ শাখা হইতে পুষ্প-চয়নে অসমর্থ দেখিয়া, কুলদেবতা শ্রীশীতলা দেবী বালিকা-বেশে বৃক্ষশাখা অবনমিত করিয়া দিতেন। তিনি এতই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, বিচারালয়ে যাইয়া, জমীদারপক্ষে সাক্ষ্যদানে পাছে মিথ্যা বলা সম্ভব হয়, এই নিমিত্ত পৈতৃক ভদ্রাসন ও সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কামারপুকুর গ্রামে এক বন্ধু-প্রদত্ত অল্পপরিসর ভূমিতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সানন্দে বসবাস করেন।

চক্রধারীর মায়ায়, বিষধর ফণীর আবেষ্টন হইতে অভীষ্ট-দেবতার কৃপায়, তিনি রঘুবীর-লক্ষণসম্পন্ন শালগ্রাম-শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঘুবীরের নামোচ্চারণ করিয়া অল্পপরিসর ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করিতেন, তাহা হইতে প্রচুর ধান্যলাভ হইত, তাহাতেই সপরিবারে প্রাণধারণ ও অতিথিসেবা নির্ব্বাহ করিতেন। আবার তিনি এতই শিব-ভক্ত ছিলেন যে, একদা কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

গমনকালে, অধিক দূর যাইয়াও, পথিমধ্যে নব বিল্বদল দর্শনে আনন্দিত হইয়া, উহা সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা সেতুবন্ধ-রামেশ্বর তীর্থ হইতে আনীত বাণলিঙ্গকে অর্চ্চনা করিয়া, পুনরায় গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

মাতৃ-পরিচয়

ঠাকুরের মাতার নাম শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী; নিরতিশয় কোমলস্বভাব বশতঃ চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়িনী—করুণা ও সরলতার মূর্ত্তপ্রতীক ছিলেন। :অতিশয় সরলা বলিয়া প্রতিবেশিনীরা আদর করিয়া তাঁহাকে পাগলী বলিত। দিব্য চক্ষুতে এই দেবী নানা দেবদেবীকে দর্শন করিতেন, এবং তাঁহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ খাওয়াইবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

নামকরণ

কেবলমাত্র বিভূতি অবলম্বনে মানবকল্যাণ-সাধন তাদৃশ ফলপ্রদ হইবে না জানিয়া, গদাধারী নারায়ণ পিতৃলোকের মুক্তিকামনায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার পাদপদ্মে পিণ্ডদান মানসে সমাগত দেখিয়া, কৃপাদেশ করেন যে, তিনি তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিবেন। এই জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইবার পর পুত্র জন্মিলে গদাধর নাম রাখেন।

দিব্য আবির্ভাব

বহু লোকহিত এবং বহুজনসুখ নিমিত্ত ঠাকুরের দিব্য-আবির্ভাব অনুধ্যান করিয়া নাট্য-কবি গিরিশচন্দ্র গাহিয়াছেন:—

"দুখিনী ব্রাহ্মণী-কোলে, কে শুয়েছ আলো ক'রে!
কে রে ওরে দিগম্বর, এসেছ কুটীর-ঘরে।
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরি অবনী, এসেছ কি সকাতরে॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয় সন্তাপহারী, সাধ ধরি হৃদিপরে॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥"

অবতার-তত্ত্ব

শ্রীভগবান্ যদি কৃপা করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান না করেন, অজ্ঞ মানব কিরূপে তাঁহার অসীম মহিমা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে? তাই বোধ হয়, ভক্তকে অনুকম্পা করিয়া ঠাকুর এক দিন কহেন যে, রাজা যখন তাঁহার বিশ্বস্ত প্রিয় অমাত্যকে প্রতিনিধিরূপে শাসন বা সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য রাজ্যের কোন প্রদেশে পাঠান, তখন রাজোচিত বিবিধ আড়ম্বরও পাঠাইয়া দেন, নচেৎ প্রজাবর্গ কিরূপে তাহার বশতাপন্ন হইবে ও তাহার আজ্ঞা পালন করিবে? কিন্তু প্রজাদিগের অবস্থা পরিদর্শন মানসে রাজা যখন স্বয়ং আগমন করেন, তখন অতি গোপনে—কোন জাঁকজমক নাই, বরং তাঁহার উপস্থিতি সম্বন্ধে জনরব হইবার উপক্রম হইলেই তথা হইতে অপসৃত হন।

অবতার পুরুষ সেইরূপ ঈশ্বরের অংশ বা প্রতিনিধিস্বরূপ। বিশেষ ক্ষমতা অর্থাৎ বিভূতি প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে ধরাধামে প্রেরিত হন। কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) তিনি যখন স্বয়ং আগমন করেন, তখন অতি গোপনে—কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্যবিকাশ থাকে না—কেবল মাধুর্য্য। আবার দু'পাঁচ জন ভক্ত ভিন্ন সাধারণে জানাজানি হইবার পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইতে বাসনা করেন। এই জন্য এবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে শুভাগমনে ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র নাই—কেবল মাধুর্য্য। শ্রদ্ধাবান্ পাঠক, ইহাই অবধারণ করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বাল্যলীলা

অল্পে তুষ্ট

বিবিধ উপচারবিশিষ্ট অন্নাদি ভোজন—মূল্যবান্ বসন-ভূষণে অঙ্গশোভনস্পৃহা, ভগবান্‌লাভের অন্তরায় বুঝিয়া, পিতার অযাচিত বৃত্তিলব্ধ শরীরধারণোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনে পরিতৃপ্ত থাকিয়া, ধর্ম্মসাধনের অনুকূল সুদৃঢ় দেহ ও বাসনা-বর্জ্জিত শান্তিপূর্ণ চিত্ত গঠন অভিপ্রায়ে, ঠাকুর মাঠের অবরোধশূন্য স্থানে বয়স্যগণ সঙ্গে আপনভাবে বিভোর হইয়া ক্রীড়া করিতেন।

বিদ্যার্জ্জন

বিদ্যার্জ্জন বিনা ভবিষ্যতে আত্মোন্নতি, সংসারোন্নতি করিতে পারিবেন না ভাবিয়া, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুভদিনে বিদ্যারম্ভ করাইয়া, গদাধরকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অপূর্ব্ব বালক বিদ্যাশিক্ষায় আস্থা প্রদর্শন না করিয়া, যেন পূর্ব্বলীলার স্মৃতি-স্মরণে বয়স্যগণ সহ মাঠে বা মাণিক রাজার আম্রকাননে যাইয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী

অবতারগণের লীলাবিলাস অভিনয় করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেন। গয়াধামে শ্রীগদাধরের আদেশ স্মরণ করিয়া পিতা তাঁহাকে কিছু না বলিলেও, অগ্রজরা মধুর তাড়না করিলে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিতেন,—এ বিদ্যাতে কি হয়?—

নিরক্ষর

ঠাকুর হয় ত' ভাবিলেন, বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলে, বিদ্যার কুহকে মোহিত হইয়া, ঈশ্বর-লাভ-রূপ পরাবিদ্যা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আবার উত্তরকালে লোকেও বলিতে পারে, গদাধর এক জন মহা-পণ্ডিত, অখণ্ড যুক্তি-তর্ক সহিত একটা নূতন মত প্রবর্ত্তন করিলেন। বোধ হয়, এই নিমিত্তই বিদ্যা-চর্চ্চায় ঠাকুর আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। অথবা একমাত্র পুরুষোত্তমের চিন্তা, এবং তদানুষঙ্গিক সাধন দ্বারা ভবিষ্যতে সকল অক্ষর—সকল শাস্ত্রকে যথাযথভাবে উদ্ভাসিত করিবেন; যে সরল সত্যের অনুসরণে লোক নিজ নিজ ধর্ম্মমতে নিষ্ঠাবান্ হইয়া ঈশ-আরাধনায় আত্মোৎসর্গ করিবে। হয় ত' এই কারণেই তিনি নিরক্ষর হইলেন। কিম্বা মাধুর্য্যময় বালক-ভাবের অপকর্ষ হয়, এই আশঙ্কায় বিদ্যাশিক্ষায় আস্থা করিলেন না। তিনি স্বয়ং অক্ষর—ব্রহ্ম; অক্ষর-বিজ্ঞান তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ নহে, এ জন্যই তিনি নিরক্ষর।

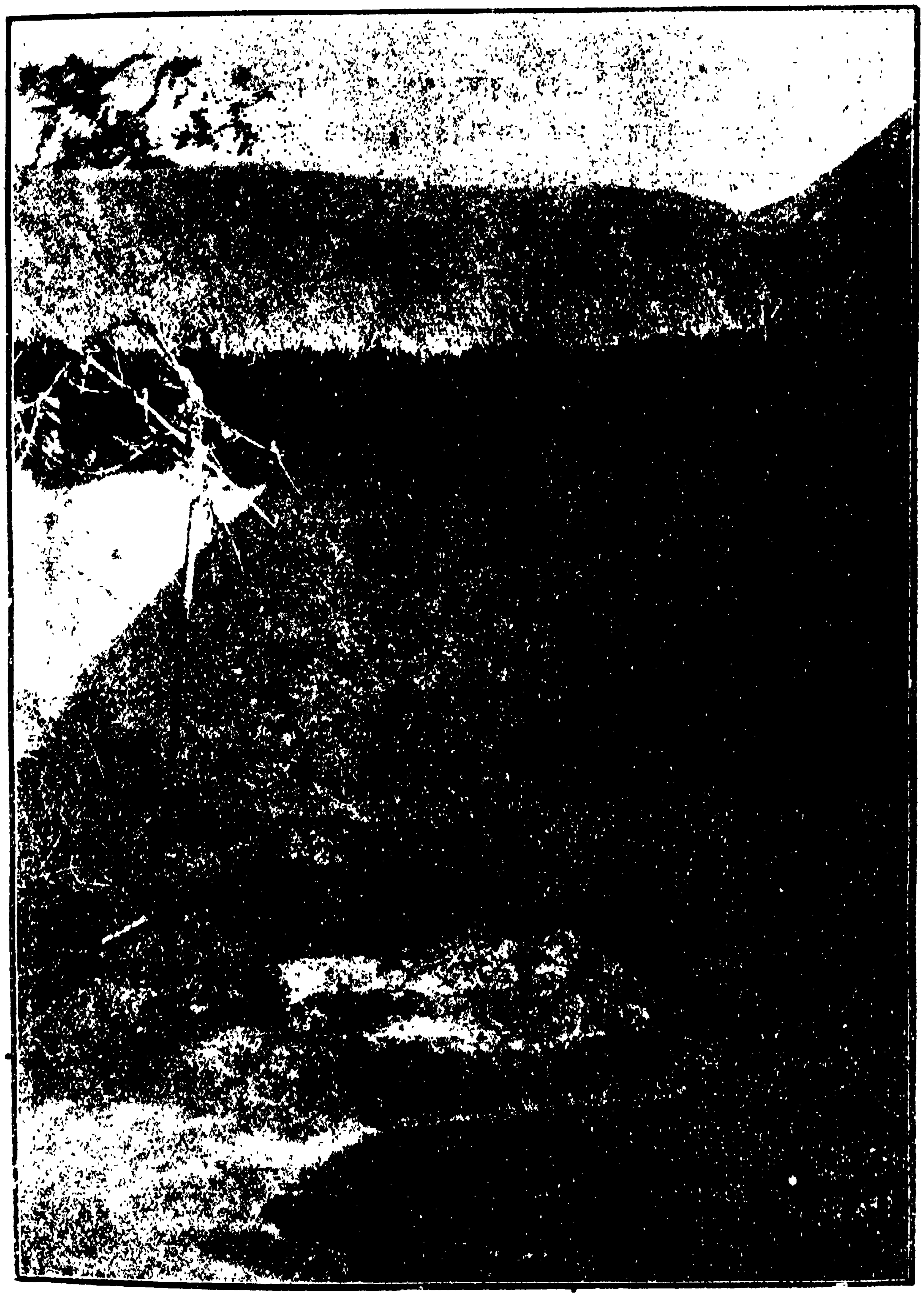

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান

চালকলা হয়, টাকা হয়, মান-যশ হয়; কিন্তু ভগবান্‌লাভ ত' হয় না;—সুতরাং এরূপ বিদ্যা শিখিতে আমার অভিলাষ নাই।

মেধাশক্তি

দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় হইতে প্রকৃত তথ্য নিরাকরণের নাম মেধা। অসাধারণ মেধাশক্তি প্রভাবে এই আশ্চর্য্য বালক

পণ্ডিতোক্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা—কথকমুখে পুরাণ-ভারতাদি—যাত্রা-পাচালীতে সঙ্গীত অভিনয়াদি, যাহা একবার শুনিতেন বা দেখিতেন, তৎসমুদয়ই তাঁহার নির্ম্মল চিত্তপটে চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া যাইত। শাস্ত্র ইহাকে শ্রুতিধর-শক্তি কহেন ;—এই দেববালক অদ্বিতীয় শ্রুতিধর।

প্রকৃতিদেবীর শিক্ষা

আবার মহিমময়ী প্রকৃতি দেবীও তাঁহার অনন্তদৃশ্য-লীলার বৈভবরাশি বিকসিত করিয়া, যেন এই শুদ্ধ সত্ব বালকের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানরাশি পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। শস্য-শ্যামল প্রান্তর—অনন্ত আকাশের নীলিমা—বর্ণবৈচিত্র্যময় পাখীর সুমধুর সঙ্গীত—মন্দির-শ্মশানের পবিত্র গাম্ভীর্য্য—বিভিন্ন মানবের আচরণ—স্বভাব-বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই এক মহান্ অদ্বিতীয়ের বিকাশ উপলব্ধি করিয়া ঠাকুর সর্ব্বদা অপার আনন্দ অনুভব করিতেন—ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া থাকিতেন।

প্রকৃতির প্রেরণায় কলাবিদ্যা—নৃত্য, গীত, চিত্রলিখন—মানবমূর্ত্তি-প্রতিমা-গঠনাদিতে ঠাকুর এমন পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, বিচক্ষণ শিল্পীরাও তাঁহাকে মিষ্টান্নদানে তুষ্ট করিয়া, স্বস্ব শিল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করাইয়া লইত।

অনুকরণ

প্রখর বুদ্ধি কখনও স্থির থাকিতে পারে না, ভাল মন্দ একটা কিছু করিবার জন্য সদাই ব্যগ্র হয়। লোকচরিত্র অবধারণে—বিভিন্নপ্রকৃতির মানবের আচরণাদির অনুকরণে কৌতুকপ্রিয় বালক গদাধর অদ্বিতীয় ছিলেন। পল্লীর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চলন-বলন প্রভৃতির তিনি এমন অবিকল অনুকরণ করিতেন, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হইত। যাঁহাদের অনুকরণ করিতেন, তাঁহারাও ইহাতে বিস্মিত হইতেন। এক দিন গৃহমধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে স্বামীর হস্তে হুঁকা দিতে দেখিয়া তাঁহাদের রঙ্গচিত্র আঁকিয়া ঠাকুর ব্যঙ্গ-কৌতুকে কতই না আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বুধুই মোড়লের শ্মশান

বহুরূপী

কামারপুকুরের এক সম্পন্ন গৃহস্থের বিশেষ গর্ব্ব ছিল যে, তাঁহার অন্তঃপুরে অপর পুরুষ, এমন কি, বালকও কখন প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, তাম্রতে রসায়নের ন্যায় বহুরূপী গদাধর এক দিন সন্ধ্যাকালে নারীবেশে বাড়ীর কর্ত্তাকে ভুলাইয়া, পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মহিলাগণের সহিত বহুক্ষণ এরূপ কথাবার্ত্তা ও আচরণ করেন, যাহাতে তাঁহারাও তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। পরিশেষে বাহির হইতে দাদার আহ্বান শুনিয়া 'যাচ্ছি গো দাদা' বলিয়া ঠাকুর উত্তর দিলে সকলেই অবাক্ হইয়া যান;—কর্ত্তাও তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় লজ্জিত হন।

গীত

গদাধরের যেমন মন-ভুলান রূপ ছিল, কণ্ঠস্বরও তেমনই বীণা-ঝঙ্কারের ন্যায় সুমধুর ছিল; আবার ভাবাবেশে এমন গান করিতেন, যাহা শুনিয়া সকলে মোহিত হইতেন। এজন্য প্রতিবেশিনীরা মিষ্টান্নদানে তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে স্ব স্ব আলয়ে লইয়া যাইতেন; তাঁহার সম্মোহন রূপ দেখিয়া ও সুমধুর গীত শুনিয়া অতুল্য আনন্দ লাভ করিতেন।

ভূত সঙ্গে আনন্দ

দয়াল ঠাকুর কেবল যে গোঠে মাঠে খেলা করিয়া নিরস্ত হইতেন, এমত নহে। কি জানি, কি উদ্দেশ্যে, এই নির্ভীক বালক কখন কখন রজনীযোগে গ্রামের প্রান্তরে ভূতির শ্মশানে যাইয়া, ভূতগণের আচরণ নিরীক্ষণ করিতেন;—মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া দেখিতেন, মিষ্টান্নের পাত্রটি কেমন শূন্যপথে উঠিয়া যাইতেছে। তিনি কি ভূতনাথ, তাই ভূত লইয়া এ আনন্দ-রঙ্গ!

শাস্ত্র-মীমাংসা

জীবনরহস্য সমাধান করিতে যাঁহার আগমন, স্বভাব-সিদ্ধ প্রজ্ঞানবলে তিনি যে শাস্ত্রের কূট তর্ক মীমাংসা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। কোন এক পর্ব্বোপলক্ষে জমীদার লাহা বাবুদের আলয়ে পণ্ডিতগণ সমাগত হইয়া, 'রাম বড় না শিব বড়' প্রসঙ্গে এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বহু বাদানুবাদেও কিছুই সিদ্ধান্ত হইল না দেখিয়া, বালক গদাধর বলেন, শিব বা রামকে আমরা কেহই দেখি নাই, শাস্ত্রে শুনিয়াছি মাত্র;—যিনি যে মতের উপাসক, তিনি তাঁহার সেই অভীষ্ট-দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানেন; এই কারণে কেহ শিবকে বড় বলেন, কেহ বা রামকে বড় বলেন। বালকের এই অদ্ভুত সামঞ্জস্যে পণ্ডিতগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রাপ্ত মিষ্টান্নেরও অংশ তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

ভাব-সাধনা

সৌন্দর্য্যপ্রিয় এই দিব্য বালকের মহান্ হৃদয় মেঘের কোলে সৌদামিনী—সান্ধ্য আকাশে নানা বর্ণ বৈচিত্র্যের সমাবেশ—নীল মেঘের কাছে শুভ্র বকশ্রেণী—অন্ধকার-সমাগমে চঞ্চল পক্ষিগণের কাকলী—মধু-আহরণ-ব্যস্ত মধুমক্ষিকাগণের গুঞ্জরণে সম্মোহিত—আত্মহারা হইত। এক দিন যাত্রাতে শিবের অভিনয় কালে আপনাকে শিব ভাবিয়া ঠাকুর এতই বাহ্যজ্ঞান-হারা হন যে, তাঁহার জীবনের আশঙ্কায় যাত্রা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

শিক্ষাদান

গ্রন্থরাশি পাঠ করিয়া বাহ্যবস্তু-জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে;—অন্তরের ভাব-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া, শ্রীভগবানের করুণা উপলব্ধিই এ ভাবসাধনার সিদ্ধি—এই জ্ঞানই কি তিনি বিশ্ববাসীকে দিয়া গেলেন?

উপনয়ন

ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসনায় সমাহিত হইবেন বলিয়া, উপযুক্ত কালে শুভদিনে ঠাকুর বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। এখন হইতে তাঁহার সাধনার সময় আরম্ভ হইল। ত্রিকালীন সন্ধ্যা-বন্দনা, বেদমাতা গায়ত্রীর আরাধনায়—পরব্রহ্মভাবব্যঞ্জক বাণলিঙ্গ শালগ্রামপূজায়—কুলদেবতা শ্রীশীতলাদেবীর অর্চ্চনায়, নবীন ব্রহ্মচারী সানন্দে আত্মনিয়োগ করিলেন।

তন্ময়তা

পূজাকালে ঠাকুর এতই তন্ময় হইতেন যে, সময়ের নির্দ্দিষ্টতা থাকিত না। যথাসময়ে দেবতাকে অন্ন-ভোগ নিবেদন করিতে হইবে, তাহারও চিন্তা আসিত না। তন্ময়তাবিহীন উপাসনা—ভক্তিবিহীন দেবার্চ্চনা যে মুক্তির সোপান নহে, ইহাই কি তিনি আত্মজীবন-সাধনায় দেখাইলেন?

[ক্রমশঃ।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।

মহাকবি গেটে

মহাকবি গেটের শতবার্ষিক শ্রাদ্ধদিবস পড়িয়াছিল এই বৎসরের ২২এ মার্চ্চ তারিখে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২২এ মার্চ্চ তারিখে জার্ম্মাণীর হ্বাইমার সহরে গেটের মৃত্যু হয়। সেই জন্য এ বৎসর নানা দেশের নানা স্থানে গেটের শতবার্ষিক শ্রাদ্ধদিবসে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে। বহু অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি, বক্তৃতা, পাঠব্যাখ্যা ইত্যাদির দ্বারা তাঁহার প্রতি লোক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। গেটের ইহা ন্যায্য প্রাপ্য। তিনি সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের মধ্যে যত বড় বড় কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও চেয়ে কম নহেন।

জোহান্ হ্বুল্ফ্গাঙ্ ফন্ গ্যয়টে৷ জার্ম্মাণীর ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৮এ আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। সদ্বংশে জন্মলাভ করিয়া তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং এই সময়ে তিনি জার্ম্মাণ গ্রাম্যসঙ্গীত, শেক্স্পীয়র, আর গথিক স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া আপনার প্রতিভার বিকাশ করিয়া তুলেন; এবং ফ্রিয়েড্রিকে ব্রিয়ঁ নাম্নী একটি তরুণীর প্রেমে পড়িয়া তাহার প্রভাবে তাঁহার কবিত্বশক্তি উন্মেষিত হয়। গেটে ইহার পরে নাটক, নভেল, কবিতা রচনা করিয়া জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি য়ুরোপের এক জন প্রধান সাহিত্যিক বলিয়া সম্মানের আসন অধিকার করেন।

গেটে ওকালতী করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় হ্বাইমারের জমীদার তাঁহার জমীদারীর ম্যানেজার করিয়া তাঁহাকে হ্বাইমারে আহ্বান করেন। সেই [illegible]

মহাতীর্থ হইয়া পড়িল। এখানে আসিয়া জমীদারীর শুষ্ক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় প্রথম প্রথম তিনি বিশেষ কিছু সাহিত্যসৃষ্টি করিতে পারেন নাই, কিন্তু শার্লট্ ফন্ ষ্টাইনের প্রেমাসক্ত হইয়া আবার তাঁহার গীতিকবিতার উৎসমুখ খুলিয়া যায় এবং ইঁহারই প্রভাবে তিনি তাঁহার জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির সূত্রপাত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারই পরে তাঁহার সহিত তরুণতর কবি শিলারের পরিচয় হয়, এবং পরস্পরের প্রভাবে উভয়েই বহু সুন্দর সুন্দর গাথা রচনা করিয়া বিশ্বসাহিত্য অলঙ্কৃত করেন। গেটে কেবলমাত্র সাহিত্যরসিক ছিলেন না, তিনি এই সময়ে বিজ্ঞানচর্চ্চাতেও আত্মনিয়োগ করেন এবং এখানেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তিনি পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ফাউষ্ট রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হন।

গেটের সাহিত্যপ্রতিভার বিশেষত্ব তাঁহার সার্ব্বজনীন আর সার্ব্বভৌমিকত্বে। তাঁহার মনের দরদ আর সহানুভূতি বিশ্বব্যাপক এবং মনুষ্য ও বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার বিচার সূক্ষ্ম ও বিচক্ষণ। কেবলমাত্র বুদ্ধিবিচারে পরিচালিত হইবার যে ঝোঁক তাঁহার সময়ে য়ুরোপে প্রবল হইয়াছিল, তাহাতে তিনি আপনাকে একবারে হারাইয়া ফেলিতে দেন নাই, অথবা কেবলমাত্র দার্শনিক চিন্তার লূতাজাল বয়ন করিয়াও তিনি আপনাকে জড়িত করেন নাই। তাঁহার জীবনযাপনের প্রণালীতেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-রচনাকে তিনি জীবনেরই [illegible] বলিয়াছেন। তাঁহার রচনার এই ব্যক্তিগত

সম্পর্কই তাঁহার রচনাগুলিকে এমন সরস এবং মনোহর করিয়াছে। তিনি মানুষের চরিত্র ও স্বভাব সম্বন্ধে মনোযোগী ছিলেন বলিয়া তাঁহার রচনায় যে সব পাত্র-পাত্রী চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেন শেক্সপীয়রের মত নিপুণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের মনের দ্বন্দ্ব তিনি শেক্সপীয়রের মতই চুলচেরা রকমে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন। গীতিকবিরূপে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। মনুষ্য-জীবনের সকল প্রকার সমস্যা-সমাধানের যে ধারা তিনি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকালীন বলিয়া সর্ব্বদাই অতি আধুনিক ধরণের বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। গেটে এই সকল কারণে তাঁহার দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যমণি।

গেটের চারিদিকে যে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন খুব অল্প দেশের অল্প সাহিত্যিকেরই ভাগ্যে ঘটে। গেটের সকল রচনা ১৪২ ভলুমে প্রকাশ করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার জীবনচরিত, তাঁহার নিজের লেখা ডায়ারী, পত্রাবলী এবং কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। গেটের প্রধান সকল বই নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনচরিতও নানা ভাষায় রচিত হইয়াছে। তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সমালোচনা-পুস্তকেরও কোনও ভাষায় অসদ্ভাব নাই। গেটে গত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান সম্মানের আসন লাভ করিয়াছেন।

মনস্বী এমার্শন গেটের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, গেটে ছিলেন উনবিংশ শতকের জনগণের দার্শনিক, শতবাহু, সহস্রলোচন; এক শতাব্দীর প্রবহমান তত্ত্ব-তথ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে আলোচনা করিতে সমর্থ, এমন তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা। ধর্ম্ম, সমাজ, আবেগ, বিবাহ, রীতিনীতি, বৈষয়িক ব্যাপার, অর্থনীতি, বিশ্বাস, অদৃষ্ট, শাকুনতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার পড়িলে আর ভুলিতে পারা কঠিন। গেটেকে অপর সমস্ত লেখক হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে তাঁহার স্বাভাবিক আন্তরিক সত্য নিরন্তর নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা। তিনি কাল্‌চারের খাতিরে সত্যসন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাহার চেয়ে বড় তাঁহারা—যাহারা সর্ব্বদেশ-কাল-নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্যের উপাসক হইয়া গিয়াছেন। তবু গেটে এত বড় যে, তিনি কোনও লোকের প্রিয় কস্মিন্-কালেও হইতে পারিবেন না। শিলার স্বয়ং এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন যে, "আমি লোকটাকে ঘৃণা করি—তাহার বিরাট মনস্বিতার জন্য, তাহার কাছে গেলে তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া ও নিজেকে ক্ষুদ্র না ভাবিয়া থাকা যায় না।"

মহাকবি গেটে

সম্প্রতি গেটের শতবার্ষিক শ্রাদ্ধ-দিবস উপলক্ষে প্যারিসের প্রধান সংবাদপত্র 'ল্য তাঁ' এবং ইংলণ্ড আমেরিকা ভারতবর্ষের বহু পত্রিকা গেটে সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

গেটের স্মৃতির পূজা করিবার জন্য নানা দেশে নানা সভা-সমিতি ও উৎসব হইবে। এই সব অনুষ্ঠান আয়োজনে ও সমারোহে ঐরূপ অপর সকল উৎসবকে পরাভূত করিয়া দিবে; কারণ, গেটে ত কেবলমাত্র কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রতীচ্য দেশের মূর্ত্তিমান অন্তরাত্মা, এবং সেই জন্য তাঁহার আবির্ভাবে সমস্ত য়ুরোপ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আগে আর কেহ যাহা সাহস করিয়া করিতে পারেন নাই, সেই সাহস সহজে তিনি অবলম্বন করিয়া সমগ্র মহাদেশের সমসাময়িক

বুদ্ধিবিকাশের গুরুভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যুগযুগান্তের সভ্যতার ধারা ও চিন্তাস্রোত যে চৌমোহনাতে আসিয়া মিলিত হয়, সেই বহু ত্রিবেণীসঙ্গমে তিনি দাঁড়াইয়া সেই যুক্তবেণীকে পরম তীর্থে পরিণত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার মধ্যে অসমান অংশে প্রাচীন নিয়মানুগত্য ক্লাসিক্যাল রচনার ও নব্য মানবমনের সকল প্রবৃত্তির পূর্ণ-পরিচয়কামী রোম্যান্টিক রচনার মিলন দেখিতে পাই। তিনি অংশতঃ সেকেলে মধ্যযুগের এল্‌কেমী-সাধক, আর অংশতঃ এ যুগের বিজ্ঞান-সাধক। তিনি একাধারে গ্রীক ও লাতিন সভ্যতা ও কৃষ্টির এবং বিশ্বদেববাদী জার্ম্মাণ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তিনি যেন ফরাসী প্রথায় ফরাসী আদবকায়দায় সোহবতে শিক্ষিত আমীর, আবার তিনি সেই সঙ্গে জার্ম্মাণ পাঠশালার গুরুমহাশয়। তিনি আরও হাজার রকমের কত কি। ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন যে, এক জন লোক কেমন করিয়া এত বিভিন্ন বিরোধী বিষয়ে তালিম হইয়াও সমস্ত কিছুকে তাল-গোল পাকাইয়া বিশৃঙ্খল করিয়া তুলেন নাই, এবং তাহার ফলে পাগল হইয়া যান নাই, যেমন হইয়াছিলেন ফরাসী লেখক জেরার্ড দ্য নের্ভাল, এবং জার্ম্মাণ লেখক হোয়েল্‌ডের্‌লিন ও নীট্‌শে।

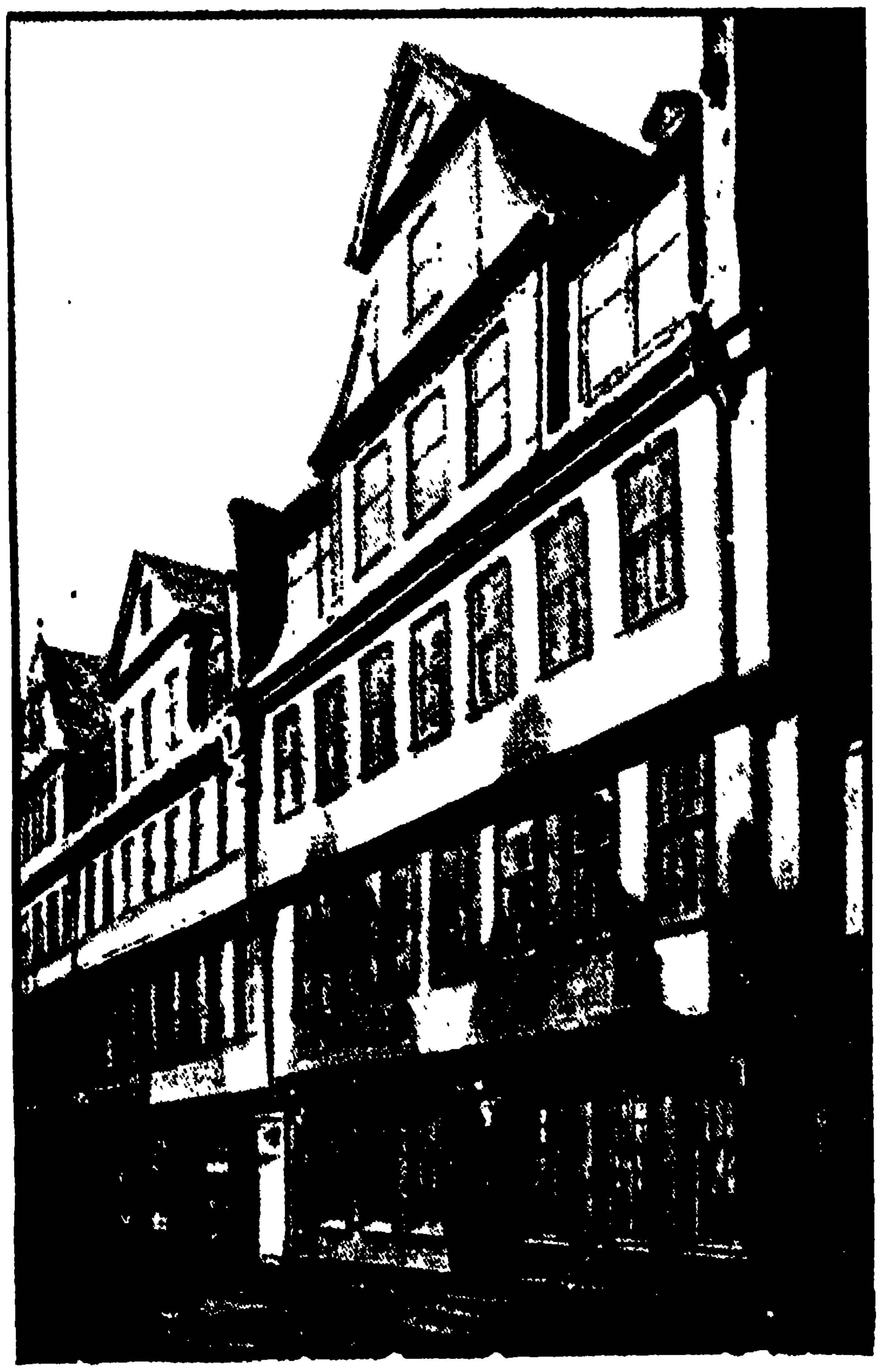

ফ্রাঙ্কফোর্টে গেটের জন্মভবন

গেটের সম্বন্ধে প্রকাণ্ড বিস্ময়ের বিষয়ই এই যে, তিনি একাধারে একই সময়ে নিজের মধ্যে এত অগণ্য লোকের সমাবেশ করিতে পারিয়াছিলেন কেমন করিয়া। তাঁহার অন্তরবিহারী সেই অগণ্য লোক সকলে মিলিয়া যে বিরাট সংস্কৃতি রাখিয়া গিয়াছে, তাহারই উত্তরাধিকারী হইয়াছি আমরা আধুনিক কালের সকলে—যাহারা কাল্‌চারের কিছুও দাবী রাখি। সেই সব বিভিন্ন চরিত্রের ও জ্ঞানের সমষ্টিই হইতেছে আমাদের বর্ত্তমান কাল্‌চার। গেটের সেই সব অন্তরবিহারী বহু ব্যক্তিত্ব কিন্তু একই জাতির অন্তর্গত বিচিত্র উপজাতির লোক, যে ধরণের লোকরা এখনকার নব্য কালের জীবন-গতির স্বতন্ত্র রকমের ধারণার ফলে লোপ পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে, যাহারা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সৃষ্টির জন্য পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছে। এইখানেই গেটের শতবার্ষিক শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের সার্থকতা। যাহা কল্পনামাত্র বলিয়া মনে হয়, সেই বহু বিচিত্র ভাবসম্পদের আধার বিরাট ব্যক্তিত্বকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে, এই কথাই আজ এই শতবার্ষিক উৎসব আমাদিগকে মনে করাইয়া দিতেছে। গেটে এত বিভিন্ন বিচিত্র ভাব ও চিন্তার আধার ছিলেন যে, নেপোলিয়ান তাঁহাকে বলিয়াছিলেন পূর্ণ মানুষ। কিন্তু আজ আমরা আধুনিকরা তাঁহাকে নৈতিক নিয়মের গণ্ডী বাঁধিয়া খর্ব্ব ক্ষুদ্র করিতে উদ্যত হইয়াছি; কারণ, সামাজিক নীতির গণ্ডী দিয়া ঘিরিলে মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লোপ পাইয়া সকল লোক একশা একাকার হইয়া যায়।

ইহা খুবই আশ্চর্য্য যে, অনেক মহৎ ব্যক্তিই—যাঁহারা বিশেষত্বে স্বতন্ত্র, তাঁহারা এক একটি ক্ষুদ্র আবেষ্টনের মধ্যেই আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভিক্টর হিউগো তাঁহার বাসস্থানটুকুর বাহিরে গেলে আর তেমন উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। তেমনি ফ্লোবেয়ার, মিস্ত্রাল, এবং নীটশে

নিজের নিজের বাসভূমির চৌহদ্দীর মধ্যেই প্রতিভা বিকাশ করিয়াছেন। ডিকেন্‌স্ লণ্ডন ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ভালবাসিতেন না, তাই লোক বলে যে, লণ্ডনই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, যেমন প্যারিস হত্যা করিয়াছিল বাল্‌জাক্‌কে। প্রায়নির্জ্জনতার মধ্যেই মনঃসংযোগ আর মনঃস্থির হওয়ার অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়। গেটেও তাই বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া ও বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া মফঃস্বল সহর হ্বাইমার নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সেখানে ৩০ বৎসর বয়সে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং ৮৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু অবধি তিনি সেই ছোট সহরটি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান নাই। তাই সেই ছোট সহরটির অণুপরমাণুতে গেটের স্মৃতি জড়াইয়া আছে, সেই সহরটি গেটেময় হইয়া গিয়াছে। তাই এই তীর্থে গমন করিলেই গেটের একটি পূর্ণ পরিচয় তীর্থযাত্রীর মনে আপনি উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। তাঁহার গেরুয়া রঙের বাড়ীটিতে উপনীত হইলে গেটের ভাবমূর্ত্তি মানসনেত্রের সম্মুখে উদিত হয়। যখন আমরা দেখি যে, বিলাসী গেটে চর্ব্বির বাতি না জ্বালাইয়া মোমের বাতি জ্বালাইতেন, তাঁহার কলম দোয়াত হইতে আরম্ভ করিয়া ছুতারকামার প্রভৃতি নানা শিল্পীর হাতিয়ার ও নানা জন্তুর কঙ্কাল, খুলী আর নানাবিধ পাথর ও পুরাতন চিত্র ও দ্রব্যাদির সংগ্রহ এখনও তেমনই সজ্জিত আছে, তখন আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, কিসে গেটের বিশেষত্ব ছিল, আর কেমন করিয়া তাঁহার বুদ্ধি-বিদ্যা এমন অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছিল।

গেটের পাঠাগারের মধ্যে বিশেষ কোনও আস্‌বাব ছিল না, একটা খুব বড় গোল টেবিল আর গোটা কতক বই-রাখার শেল্‌ফ্ এখনও আগের মতই ঘরে সাজানো আছে, ঘরটি গাছের আওতায় অল্প অন্ধকার হইয়া রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘরের পাশের ঘরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সেই ঘরটিও সেই মৃত্যুদিবসের ন্যায়ই এখনও অপরিবর্ত্তিত হইয়া বিরাজ করিতেছে, সেই বিছানা, সেই চাদর, সেই পর্দ্দা—যদিও পর্দ্দা গুঁড়া হইয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর বিছানার পাশে আছে একটি হাতা-ওয়ালা আরাম-কেদারা, তাহার উপরে আছে একটি কুশন, আর তাহার সাম্‌নে একটা পা-রাখার ছোট টুল; এই চেয়ারে বসিয়াই গেটের মহাপ্রাণ দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তিন দিন হইতে এই চেয়ারে বসিয়াই কাটাইয়াছিলেন, তাঁহার ব্যাধির যন্ত্রণা এত অসহ্য হইয়াছিল যে, তিনি বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। বুকের বেদনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি ছটফট করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্বস্তির সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন। মৃত্যুর দুই দিন আগে তাঁহার একটু ভালো বোধ হইতে লাগিল, এবং শেষদিনে ব্যথা খুবই কমিয়া গেল। তিনি তাঁহার ভৃত্যকে সেই দিনের তারিখ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে, মার্চ্চ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সে দিন ২২এ, তখন তিনি আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন—ও! বসন্ত তাহা হইলে আসিয়া পড়িয়াছে! এইবার আমি সত্বর রোগমুক্ত হইতে পারিব।

হ্বাইমারে মহাকবি গেটে

গেটের জীবন ত ছিল তিরাশীটি বসন্তের আনন্দে গাঁথা একগাছি মালা, তাই মানব-মনের চিরন্তন আশা বসন্তের আনন্দের রূপ ধরিয়া তাঁহার অন্তরে উদয় হইল।

সেই আনন্দের নেশায় শেষবারের মত মগ্ন হইয়া গেটে অর্দ্ধ-অচেতন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। সারা জীবন তাঁহাকে যাহা আনন্দ দান করিয়াছে, যাহা তাঁহার স্বপ্নের কল্পনার সহচরী ছিল, সেই জীবনসঙ্গিনী রমণীর ছবিই তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল, চিরজীবনের আনন্দদাত্রী রমণী আবার শেষ আনন্দদানের জন্য তাঁহার জন্য স্বপ্নে উদয় হইয়া তাঁহাকে ধরণী হইতে শেষ বিদায় লইবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া তুলিতে আসিল। তিনি স্বপ্নের ঘোরে মৃদু স্বরে একটি রমণীর মুখের কথা ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন। অন্ধকার পটভূমিকার উপর সেই মুখখানি অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার অঙ্গের বর্ণলাবণ্য আনন্দময় আশ্চর্য্যজনক, আর তাহার মাথা ঘিরিয়া কালো কালো অলকগুচ্ছ দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই মুখখানি কাহার? তাঁহার প্রথম প্রণয়িনীর, না দ্বিতীয়ার, না তৃতীয়ার, না চতুর্থার, না অন্যতমার, না তাহাদের সকলের সম্মিলিত সুষমার আনন্দমূর্ত্তি? ইহার মধ্যে তাঁহার সৃষ্ট যত নারী-চরিত্রও বুঝি বা উঁকি মারিতেছিল। ইহার পরে তিনি সেই বিখ্যাত বাণী উচ্চারণ করিলেন—আরো আলো, আরো আলো! তমসো মা জ্যোতির্গময়! এই তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি। তাহার পরে তিনি হাতের নাগালের বাহিরে অবস্থিত একটা ছবির আদ্‌রা-আঁকা খাতা চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু সে রকম খাতা ত সেখানে বাস্তবিক ছিল না। ইহা তাঁহাকে বলা হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। এই স্বপ্নই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সকল স্বপ্নের সমষ্টি, তিনি যত চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহারা সকলে মিলিয়া এখন তাঁহার নব-জীবনের ছবি অঙ্কিত করিতেছিল। ইহার পরে তিনি তাঁহার পুত্রবধূর হাতখানি ধারণ করিয়া শূন্যে কয়েকটা কি ছবি আঙুল দিয়া অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। তাহার পর দুই প্রহর বেলার সময় তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

এই সমস্ত ঘটনা আর অন্য আরও কিছু সমস্তই গেটের পূর্ণ পরিচয় পাওয়ার জন্য জানা আবশ্যক। যে মহান্ অতিবৃদ্ধ প্রতিভা এক শত বৎসর পূর্ব্বে তিরোহিত হইয়াছেন, তিনি যেন আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়া উঠেন।

গেটের প্রধান বিজয়ক্ষেত্র হইতেছে দক্ষিণের গ্রীক-লাতিন রাজ্য। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনের মুখ ঐ দিকেই ফিরানো ছিল, রোমের স্থাপত্য ও গ্রীসের ভাস্কর্য্য তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পাছে চোখে দেখিলে মানসচিত্র ক্ষুণ্ণ খর্ব্ব হইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি সেই নেবুফুলের দেশের দ্বারে দুই দুইবার গিয়াও ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দক্ষিণের চিরবসন্তের ঐশ্বর্য্য ও আলোকের উজ্জ্বলতা দেখিবার জন্য তিনি কি মনের পরিণতির অপেক্ষা করিতেছিলেন? গেটের মধ্যে মধ্যযুগের এলকেমিষ্ট মানুষটি অর্থাৎ স্বয়ং ফাউষ্ট বিদ্যমান ছিল। ইহার সঙ্গে তিনি নিজের জীবনে গ্রীসের সৌন্দর্য্য-উপাসনার সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সফলতা সম্পূর্ণ লাভ করেন নাই। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই উন্নততর কিছু ধরিতে, নূতন রাজ্য অধিকার করিতে চাহিয়াছে, এবং প্রতিভার অঘটন-ঘটনপটু পক্ষে ভর করিয়া তিনি আকাশের অনন্ত বিস্তার আচ্ছাদন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সদ্যোজাত গরুড়ের ন্যায় সূর্য্যতেজে দগ্ধপক্ষ হইয়া আবার ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। গেটে প্রাচীন আলঙ্কারিক নিয়মানুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন, কারণ, তাঁহার মনের গঠন ছিল তাহার উল্টা—মানবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষ-পাতী রোম্যান্টিক ধাঁচের। এই উভয়ের দোটানায় তাঁহার মনের ভার-সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল, তিনি কদাচিৎ আতিশয্যের দোষে দোষী হইয়াছেন। যুবা বয়সেও সেই জন্য তিনি আবেগ অপেক্ষা বিচার-বিবেচনারই পরিচয় দিয়াছেন অধিক। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে একটা প্রবল দানব সর্ব্বদা দাপাদাপি করিত, কাযেই তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিক নিয়মানুগত্য পালন করিতে চাহিলেও, তাঁহার মনে কল্পনা, স্বপ্ন, অসম্ভব-কাহিনী, রহস্য আর আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা আগ্নেয়গিরির উদ্‌গমের মত প্রচণ্ড ছিল।

গেটের চিন্তার এই দ্বিধা আর দোদুল্যমানতা তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। তিনি নীট্‌শের বহু পূর্ব্বেই প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ক্রাইষ্টের আদর্শ হইতেছে কেবল-মাত্র দুঃখভোগ, অবমাননা আর নতি-স্বীকারের কদর্য্যতার গৌরব ও মহিমা স্বীকার; অতএব ইহা মানবের অনুষ্ঠেয় নহে। তিনি চাহেন সুন্দর বিজয়ী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শন করিতে। কিন্তু তাঁহার নিজের যে শিক্ষা, তাহা ক্রাইষ্টের শিক্ষার ন্যায়ই অবশেষে ত্যাগেরই মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করার শিক্ষাই গেটে দিয়াছেন। অবশেষে তিনি বুদ্ধদেব আর ক্রাইষ্টের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ এই মনে হয় যে, মানুষের গন্তব্য পথ একটি-মাত্র, তা যে যে-ভাবে যখনই সেই পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করুন না কেন, দু হাজার বৎসর আগেই কি আর পরেই কি, সকলে সেই একই পথ নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হন।

গেটের অন্তরাত্মার মধ্যে যে অসংখ্য বিচিত্র চরিত্রের সমবায় ছিল, সেইগুলিকে ফুটাইয়া তুলিয়া মহিমান্বিত করিয়া তোলার মধ্যেই তাঁহার আর্টের ও শিল্পকলার নিপুণতা নিহিত রহিয়াছে। ফাউষ্ট, এগ্‌মণ্ট্, ট্যাসো, ইফিজেনী বা উইল্‌হেল্‌ম্ মেইষ্টার মানব-মনের নিরন্তর বহুবিধ সংগ্রামেরই প্রতিমূর্ত্তি মাত্র। গেটে গ্রীক-লাতিন কাল্‌চারের ও মধ্যযুগের য়ুরোপের রোম্যাণ্টিক ভাবের উত্তরাধিকারী ছিলেন বলিয়া তিনি আমাদের কাছে সমগ্র য়ুরোপের মূর্ত্তিমান্ চিন্তারাশি-রূপে প্রতিভাত হন। গেটের চিত্তের মর্য্যাদা ও মূল্য আমরা আরও অধিক করিয়া এখন অনুভব করিতেছি এই জন্য যে, ক্রিশ্চান শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থায় যেমন প্রাচ্য শিক্ষার চাপে য়ুরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লোপ পাইয়া যাইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, এখনও আবার সেই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। য়ুরোপের দেশে দেশে যে বিরোধ-বিসম্বাদ, তাহা হইতে য়ুরোপের ভয় অধিক নয়, যত ভয় তাহার প্রাচ্য দেশের ভাবমধুর মিষ্টিসিজম্ বা মরমিয়া-বাদের আক্রমণ হইতে। যদি এই মিষ্টিক সাধনা য়ুরোপকে জয় করে, তবে তাহাকে য়ুরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া য়ুরোপকে দখল করিতে হইবে, কিন্তু তাহাকে য়ুরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে হয় ত কয়েক শতাব্দী সময় লাগিয়া যাইবে, ভয়ঙ্কর দুঃখভরা কয়েক শতাব্দী। অতএব এই ভাববিলাসিতার আবল্য হইতে পরিত্রাণের পথ দেখা বুদ্ধিমানের ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রধান কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত ছাড়াইয়া আরও একটু দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি নজর রাখিতেই আজ গেটে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

জার্ম্মাণীর এক জন প্রধান লেখক হের্ ওয়াল্‌টার ফন্ হল্যাণ্ডার জার্ম্মাণীর ফোসিশ্ ৎসাইটুং পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন আমরা তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

বুদ্ধির প্রাধান্যলাভের একমাত্র কারণ এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে যে, কেবলমাত্র যাহা তথ্য, তাহাই অনুভব করা সম্ভব এবং তাহাই প্রমাণ করিতে পারা যায়; যাহা অনুধাবনযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য এবং যাহা কার্য্যকারণ-পর্য্যায়ে ফেলা যায়, তাহাই মানব-জীবনের অঙ্গ বলিয়া সম্মাননীয়; আর তাহা ছাড়া আর যাহা কিছু আছে, যাহাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। বুদ্ধি-নির্দ্দিষ্ট তথ্যসর্ব্বস্ব বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া টিকিয়া থাকে; তাহার নির্ভর ষ্টেটের সীমা সরহদ্দ চৌহদ্দী দলাদলির উপর, সিভিল সার্ভিসের আর যুদ্ধবিভাগের কর্ম্মচারীদের উপর; তাহার নির্ভর কঠোর সত্যের উপর, জীবন-সংগ্রামের উপর, যে জীবন-সংগ্রামের মূল কারণ হইতেছে ক্ষুধার তাড়না আর প্রণয়লালসা।

বুদ্ধির দার্শনিক তত্ত্ব হইতেছে নিছক বৈষয়িকতা, বস্তুতান্ত্রিকতা; ইহার প্রভাবে জীবন অনেক সরল ও সহজবহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, ইহার দ্বারা অনেক বাজে শব্দাড়ম্বর, মিথ্যা আদর্শ, বিচারহীন ধারণা লোপ পাইয়াছে, এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারলাভ করিয়াছে, মানুষ বস্তুজগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধি বেচারা আতিশয্যের অত্যাচারেই মারা যাইতে বসিয়াছে—যখন সে প্রচার করিতে চাহিতেছে যে, সাধারণ সামান্য মানবের অপটু অনুভবের দ্বারা যাহা বোধগম্য হয়, তাহাই কেবল সত্য। এই করিয়া বুদ্ধি নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে।

বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিতে কেহ যেন ইহা না মনে করেন যে, বুদ্ধিমানের ও জ্ঞানীর বিরুদ্ধে জ্ঞানহীন নির্ব্বোধ মূর্খ আহাম্মকদের বিদ্রোহ। প্রত্যেক বিদ্রোহের মত ইহাতেও অনেক অকেজো বাজে মস্তিষ্কহীন ব্যক্তির পিছটান ও ভার আছে—যাহারা এই বিদ্রোহের অগ্রগতিকে

প্রতি পদে প্রতিহত করিয়া পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে। যদিও কোনও কোনও দলের লোক আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বুদ্ধিমানের বিরুদ্ধে মূঢ়দের লেলাইয়া দিয়া পরীক্ষিত মানসিক নিষ্পাদনের বদলে কেবল শূন্য ভাবুকতারই প্রশ্রয় দিতেছে, তথাপি মোটের উপর এই বিদ্রোহ কৃত্রিম আয়োজন নহে, ইহা একটা প্রাণবান্ আন্দোলন।

এই বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানে বিচার-বিবেচনা করিতে করিতে যে নৈষ্কর্ম্য ও জড়ত্ব আসে, তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ইহা আগামী আদর্শবাদের জন্য চেষ্টা নহে, ইহা আগামী বাস্তবতার বিরাট্ রাজ্য আবিষ্কারের অভিলাষ মাত্র। এই বিদ্রোহ হইতেছে প্রাণের যে সৃজনীশক্তি আছে, তাহাকে সক্রিয় করিয়া তোলা, কেবলমাত্র যাহা আছে, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকার বিরুদ্ধে প্রাণের অনন্ত আকাঙ্ক্ষার যুদ্ধ-ঘোষণা। ইহা মানুষের মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধ চিন্তার বিরুদ্ধতা, বর্ত্তমান পোলিটিক্যাল ও আর্থিক অবস্থার বিরুদ্ধতা, মানুষের দাসত্বের বিরুদ্ধতা। যে কিছু মানুষের প্রাণকে খর্ব্ব করে, এই বিদ্রোহ তাহার বিরুদ্ধে। অতএব ইহা যেমন এক দিকে প্রতিষ্ঠিত গভর্মেণ্ট, সমাজ-ব্যবস্থা, বিধি-নিষেধ, রীতি-প্রথা, মত-বিশ্বাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অপর পক্ষে আবার বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। মানুষের প্রাণ তো কেবলমাত্র যাহা পরীক্ষাযোগ্য, যাহা স্থূল, যাহা ধারণাগম্য, যাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তাহা এই সকল ছাড়াইয়া অনায়ত্ত অসীমার অপরিমেয় বিস্তারের মধ্যে বহু বহু দূরে প্রসারিত হইয়া যায়। সেই অন্ধকার অজ্ঞাত অনিশ্চিতের ভিতর হইতেই জীবন তাহার জীবনীশক্তি আহরণ করিয়া আনে, এবং তাহাতেই সে বাঁচে, বর্দ্ধিত হয়, আর আনন্দ লাভ করে।

অতি-বিবেচনার বিরুদ্ধে প্রধান নালিশ এই যে, তাহাতে মানুষের প্রাণশক্তি খর্ব্ব ও পঙ্গু হইয়াছে, মানুষের আনন্দ ক্ষীণ হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্ধি প্রধান হইয়া শাসন করে, ততক্ষণ মানুষের অপর সকল ক্ষমতাই নিষ্ক্রিয় হইয়া প্রসুপ্ত থাকিতে বাধ্য হয়। যখন প্রাণের শক্তি স্ফুর্ত্তি পায় না, দমন করিয়া রাখা হয়, ব্যবহার করা হয় না, পরিণতি লাভ করে না, তখন প্রাণের পীড়া হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই পীড়ার নাম নিরানন্দ ও দুঃখ। বুদ্ধিজীবী লোকেদের প্রকৃত ক্ষমতা অবচেতন অবস্থায় সুপ্ত থাকে, তাহা অন্ধকারে সঙ্কুচিত হইতে থাকে, আলোকের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তাহার বিচার-বিবেচনার জালে জড়াইয়া আপনার গতি অবরুদ্ধ করিয়া রাখে।

বুদ্ধির প্রাধান্য মানুষের দৈহিক শক্তির সৃষ্টিসামর্থ্য খর্ব্ব করিয়া ছাড়িয়াছে। এখন কেবলমাত্র বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টায় মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া সুন্দর সুদৃশ্য শরীর লাভ করা যাইতে পারে, কেমন করিয়া দৈহিক পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করা যাইতে পারে। এই বুদ্ধির আতিশয্যেই এখন মানুষের যৌন মিলনে দেহ অপেক্ষা মনের ব্যাপারই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, মদন-ভস্মের পূর্ব্বে ও পরের অবস্থার মত, তাহাতে সমাজে মনুষ্যসৃষ্টি এখন গৌণ উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছে, সন্তান উৎপাদন এখন অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন মানুষের অবলম্বন হইয়াছে মানসিক ব্যভিচার এবং হিংসা, ঈর্ষা, অসহিষ্ণুতা। পারিবারিক দুর্ঘটনা অধিকাংশ স্থলেই বুদ্ধিরই ছলনায় সংঘটিত হইতেছে।

বুদ্ধি মানুষের কামনা সংবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে, অথচ ভোগের বস্তু হইতে সে মানুষকে দূর হইতে দূরান্তরে সরাইয়া লইয়া চলিয়া তাহাকে দুঃখ দিতেছে।

মানুষের দেহ যখন মনের কারাগার ও শাসন হইতে অব্যাহতিলাভের চেষ্টা করিয়া জিম্‌ন্যাষ্টিক, কুস্তি, ব্যায়াম, খেলা, দৌড়-ঝাঁপ, নৃত্য ইত্যাদির ভিতরে নিজের প্রকাশের ভাষা খুঁজিতে থাকে, সে একটি অবাধ মুক্তির আস্বাদ পায়, একটা বিস্তৃত ও শক্তিশালী ক্ষেত্রে ছাড়া পায়, এবং তাহার তাহাতে আনন্দ আশ্চর্য্যভাবে ব্যক্ত হয়। কিন্তু যেই বুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল, অমনি মানুষ বলিতে লাগিল, সুস্থ দেহে সুস্থ মনের আবাস, অতএব দেহকে সুস্থ কর, খেলা অমনি প্রতিযোগিতার ক্ষুদ্রতায় আত্মহত্যা করিয়া বসিল, এবং নৃত্য দেহের অবলীল গতিভঙ্গী ভুলিয়া মনেরই ভাব-প্রকাশের বাহন হইয়া পড়িল। এইরূপে দেহ এখন মনের দাসত্বে নিয়োজিত হইয়া আপনার মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

অতএব ইহা স্পষ্ট যে, যতক্ষণ আমাদের ধর্ম্মমত বুদ্ধির দাসত্ব করিবে, ততক্ষণ উহা মানবের মুক্তির জন্য একটুও

চেষ্টা করিতে পারিবে না। যে ধর্ম্মমন্দির আর পুরোহিতরা নিজেদের ভাণ্ডার অনিত্য পদার্থে পূর্ণ করিয়া তুলিতে বিব্রত, তাহারা আবার নিত্য পদার্থের পথ দেখাইবার স্পর্দ্ধা করে কি করিয়া? নিত্য শাশ্বত ধর্ম্ম বিশ্বের সকল প্রাণের ও সৃষ্ট পদার্থের একত্ববোধে, তাহা তো প্রচলিত ধর্ম্মমত প্রত্যহ আপনাদের আচরণের দ্বারা খণ্ডন করিতেছে।

পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিরুদ্ধতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গণতন্ত্র, শ্রমিকসঙ্ঘ, ব্যবসায়-সমবায় প্রভৃতি মানে তো বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধতা ছাড়া আর কিছু নহে। এই বিদ্রোহী দলের অনুযাত্রী অনেক লোক আছে বটে, কিন্তু তাহারা এক কৃত্রিম মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মপ্রতারণা করিতেছে। যাহারা শক্তিমানের অত্যাচার ও খামখেয়ালি হইতে আত্মত্রাণের জন্য চীৎকার করিতেছে, তাহারা নিজেরাই কম অত্যাচারী খামখেয়ালি নহে। পাশব শক্তির বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া সেই পাশব শক্তিরই উপাসনা যদি করা হয়, তবে বিমুক্তি কোথায়? মানুষে বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা নিজেরা পর-দলনের ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে চাহিতেছে—যে ক্ষমতা ব্যক্তির দেহ-মন হইতে আপনি উৎসারিত হইয়া বাহির হয়—সে ক্ষমতা নহে, যে ক্ষমতা আত্মার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণতার সুসঙ্গতি দান করে, তাহা নহে, এ ক্ষমতা কেবল পরকে বাধ্য বশীভূত করিয়া নিজের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালন করিবার উপায় মাত্র। পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে যাহারা বিদ্রোহী, তাহারা বুঝিতে চাহিতেছে যে, রক্তের টান, ভাষার বন্ধন, এক দেশের সীমার আবেষ্টনের আত্মীয়তা, ষ্টেটের চেয়ে অনেক বড় জিনিষ, কিন্তু সেই আত্মীয়তা একত্ব তাহারা অস্ত্র-শস্ত্রে বাধ্য করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়া আত্মবিরোধী আত্মবিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।

লোকে বেশ জানে যে, বুদ্ধিমানের বিচার-বিতণ্ডায় ফল কিছুই হয় না, তবু তাহারা বিতর্ক-সভায় পার্লামেণ্টে সমবেত হয়, আর যখন তাহাদের নিজের মতবিরোধী দলের লোকেরা কথা বলিতে আরম্ভ করে, তখন অসহিষ্ণুভাবে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। মানুষে মানুষে বিভেদ রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা মূঢ়ের মত মনে করে যে, বুদ্ধি খরচ করিয়া বিচার-বিতর্কের দ্বারা তাহারা নিজেদের বিভেদ দূর করিতে পারিবে।

কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে একটি স্বাভাবিক বোধ আছে যে, মানুষ যাহা পড়াশুনা করিয়া শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া প্রচার করিতে চায়, তাহার মূল্য তত নহে, যত সেই মানুষটি নিজে কি, নিজে ব্যক্তি-রূপে সে কি হইয়া উঠিয়াছে ও কি করিতে পারে, তাহার উপরে নির্ভর করে। এই জন্য জনগণের মধ্যে সেই নেতাই অধিক দিন প্রভাব রাখিয়া চলিতে পারে—যে নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে পারে। এই জন্যই সাধারণ পার্থিব ব্যাপারের বৈষয়িক নেতা অপেক্ষা ধর্ম্মনেতারা অধিক ক্ষমতাশালী হয় এবং কোনও নেতাই সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুকূল না হইলে অধিক দিন আপনার নেতৃত্ব বজায় রাখিতে পারে না। সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলমন্ত্র হইতেছে যে, "মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে তাহার প্রতিবেশীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর", যে কথা ক্রাইষ্ট বলিয়া গিয়াছিলেন। সাধারণের মনে দুইটি ধারণা তাহাদের অবচেতনার মধ্যে সুপ্ত হইয়া আছে যে, "মানুষকে সম্পূর্ণ হইতে হইবে, আর তাহাকে সুখী হইতে হইবে।" যে কেহ সম্পূর্ণ ও সুখী হইতে চাহে, তাহাকে আত্মসংযম আর আত্মত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে। এই সাধনা সকলের আয়ত্তগম্য, সকলেরই অনায়াসলভ্য, এই কথা যিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারেন, তিনি জনগণমন-অধিনায়ক হইয়া উঠিতে সহজেই পারেন। তাঁহারা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দেন যে, দৈহিক, মানসিক আর আত্মিক পথ ভিন্ন ভিন্ন নহে, তাহারা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎ নহে, তাহারা একত্র পাশাপাশি চলিয়াছে, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে জীবনের অঙ্গস্বরূপ হইয়া উহারা ক্রিয়া করে। যখনই আমরা দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনও ব্যাপারের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলি, তখন এই বুঝিতে হইবে যে, ঐ ত্রিবিধ ব্যাপারের মধ্যে একতম অপর দুইটি অপেক্ষা একটু প্রবলতর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র, নতুবা ঐ ত্রিশক্তি একত্র হইয়াই কায করিতেছে। আধুনিক কালের সকল কর্ম্মে মানসিক প্রাধান্য এত বেশি হইয়াছে যে, অপর দুইটি শক্তি যেন চাপা পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

মানসিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এই যে বিদ্রোহ, তাহা জীবনের সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যসাধনেরই চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নহে, একের প্রাধান্যে অপর দুই শক্তি যাহাতে খর্ব্ব, নষ্ট হইয়া না যায়, তাহারই ইচ্ছায় এই বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের দ্বারা মানুষ তাহাদের জীবনের মূল ত্রিশক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া জীবনকে পূর্ণাঙ্গ পরিণত করিয়া তুলিতে চাহিতেছে; এবং তাহার দ্বারা আপনার ও অপর সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ সংরক্ষণ করিতে চাহিতেছে। কেবলমাত্র বুদ্ধি নহে, কেবলমাত্র মন নহে, মানুষের যে মনন ব্যতীত দেহ আর আত্মা আছে, এই বিদ্রোহ তাহাই ঘোষণা করিতে চাহিতেছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"গোঁয়ার"

'মূর্খ গোঁয়ার' বলিয়া আমার দুর্নাম দেশে দেশে,
'গোঁয়ার' বলিয়া সে কথাও আমি হেলায় উড়াই হেসে।
'জীবন গুরু'র পাঠশালাতে যে যাই নি এমন নয়,
পড়ুয়া-মহলে সকলেই মোরে করিত বিশেষ ভয়।
লুকায়ে বাগানে ফলটি ছিঁড়িয়া পুকুরে ধরিয়া মাছ,
কলম ভাঙিয়া কেতাব ছিঁড়িয়া ঘুরিনু বছর পাঁচ।
বিদ্যা সে তাই বিদায় মাগিল, হ'ল না কোনই ফল,
'গোঁয়ারে'র পেটে গেল নাক তাই দুফোঁটা 'কালীর জল'
বড় ভাইটির মাথা ভাল খুব, সুখ্যাতি পাড়াময়,—
'যত্ন লইলে মানুষ হইবে এ কথা সুনিশ্চয়।'
সে কথা শুনিতে বুকখানা মোর গরবে উঠিত ভরি,
দাদাই মোদের বংশ-গরিমা তুলিবে উজল করি।
বাড়ীতে সবার বড়ই ইচ্ছা, যেমন করিয়া হোক্,
বংশের ছেলে মানুষ করিব—দেখিবে সকল লোক।
হঠাৎ একদা কলেরায় মোর বাবার পড়িল ডাক,
সংসারখানা চারিদিক্ থেকে হ'য়ে গেল যেন ফাঁক!
পাড়া-প্রতিবেশী সমবেদনায় ফেলি গেল নিশ্বাস—
'ছেলেটির আহা গেল পরকাল—নাহি আর কোন আশ।'
আমি যে মূর্খ—চোখের জলেতে হারানু সে দিন পথ,
পিতৃশোকে নয়,—ভাবিয়া শুধুই ভায়ের ভবিষ্যৎ!
ক'টি কুপোষ্য—তাদের পালন—শিক্ষার ব্যয়ভার,—
কোথা হ'তে হবে! চারিদিকে চাহি—কেবল অন্ধকার।
সম্বল শুধু পাঁচ বিঘা জমি, হেলে গরু দুটি আর,
অসুরের মত গায়ের ক্ষমতা—দিনরাত খাটিবার।
সেই ভরসায় বাঁধিয়া এ বুক দাদারে কহিনু ডেকে,
যত কিছু ভার রহিল আমার মস্তকে আজ থেকে।
মূর্খ আমার ঘৃণ্য জীবন কাটিবে উপেক্ষায়—
মানুষ তোমায় হ'তে হবে ভাই—প্রাণ শুধু এই চায়।
সেই হ'তে বুকে নব উদ্যমে বহিয়া বজ্রবল,
মাঠেতে খেটেছি উপেখি হেলায় রৌদ্র, বৃষ্টিজল!
'এগ্‌জামিনের' সময়ে দাদার সঙ্গে জেগেছি রাত,
কষ্ট বুঝিলে পিঠে-গায়ে পায়ে বুলায়ে দিয়েছি হাত।
পাশের খবর আসিলে সে দিন ঘুম না আসিত চোখে
কল্পনা-ভরে উড়িয়া যেতাম সে কোন্ কল্পলোকে!
অভাবের জ্বালা সয়েছি হাসিয়া, জানে নাই তাহা কেহ,
ডাকিতাম শুধু—ভগবান্! মোর সুস্থ রাখিও দেহ।

* * * * *

সফল হয়েছে বাবার কামনা, আমার পরিশ্রম,
দাদা আজ মোর দশের একটি;—সম্মানে নয় কম।
সকলি সফল, কেবল আমারি ভেঙ্গে গেছে দেহ খান,
আগের মতন খাটিতে পারি না, ধরেছে হাঁপের টান।
অভ্যাস মত এখন দাদার সহরে থাকিতে হয়,
তা ছাড়া এখানে অনেক রকম অসুবিধা পাড়াগাঁয়!
বৃদ্ধা জননী, ক'টি ছেলেমেয়ে, নিজে আর পরিবার,
এই নিয়ে মোর কাটিছে এখন পাড়াগাঁর সংসার!
আজিকে দাদার দেশ-জোড়া নাম, সম্মান সব ঠাঁই—
গর্ব্ব আমার আমি যে তাঁহার মূর্খ গোঁয়ার ভাই।

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।

বিবর্ত্তন

(উপন্যাস)

১

শরৎকালের এক সকালবেলায় কাশের গুচ্ছ যখন মন্দ পবনে আন্দোলিত হইয়া আগতপ্রায় শারদার উদ্দেশ্যে চামর বীজন করিতেছিল, খালের জলে নৌকা ভাসাইয়া মহাজনরা পূজা-বাড়ীর ফর্দ্দের চালান দিতে ব্যস্ত; পুকুরে পুকুরে পানার সঙ্গে শালুক-ফুলের রাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে; ভিড়ন গাঁয়ের নেড়া বৈরাগী পদা বোষ্টম তার হাতের একতারার তারে ঘা দিতে দিতে অনুচ্চকণ্ঠে গাহিয়া চলিয়াছে,—

"সে যে এক নবীন পাগল বাঁধালো গোল নদেয় এসে।"

তখন সকালবেলার সেই অনতিখর রৌদ্রে ইতিমধ্যেই দুই পা ধূলা মাখিয়া একটি বলিষ্ঠকায় উন্নতশরীর কর্ম্মঠ চেহারার যুবক—কাঁধে তার প্রকাণ্ড একটা ঝোলা, সঙ্গে তার এক জন পশ্চিমা ঝাঁকা-মুটে, ঝাঁকার উপর কয়েক গণ্ডা মাটীর হাঁড়ি, খালধারের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেটির হাতে মোটা একটা বেশ মজবুত রকমের লাঠি, মাথায় তার একটা মোটা কাপড়ের চাদরকে পাগড়ী করিয়া জড়ানো, পরিধেয় মোটা ধুতী মল্লের মত করিয়া পরা, সতেজ তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি কষ্টোদ্দীপনায় ভরা, পা ফেলার ভঙ্গীতে তার এতটুকু কোথাও কুণ্ঠা বা জড়তা নাই। সে যা করিতে আসিয়াছে, তা'তে যে তার সম্পূর্ণরূপেই অধিকার আছে, তার ভাব-ভঙ্গী চাল-চলন সব দিক্ দিয়াই সেটা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সর্ব্বপ্রথম যে বাড়ীখানা পথে পড়িল, সেই-খানার সামনে গিয়া সে দাঁড়াইল এবং আধখোলা দরজার মধ্য দিয়া ভিতরে তাকাইয়া ডাক দিল,—

"এ বাড়ীর লোকজনেরা কোথায় গা? এ বাড়ীর লোকজনেরা কোথায়?"

বার দুই-তিন ডাকার পর একটি বছর সাতেকের ছেলে, তার লাল ঘুন্‌সী পরা সরু কোমরে একখানা আধময়লা ছেঁড়া কাপড় জড়াইতে জড়াইতে খোলা গায়ে আসিয়া ঘুমভরা চোখের বিরক্ত দৃষ্টি হানিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কে গা, সক্কাল বেলায় চেঁচামেচি লাগিয়েছ?"

আগন্তুক ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং নরম মোলায়েম সুরে ছেলেটিকে বলিল, "তোমাদের বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়, খোকা?"

ছেলেটি ততক্ষণে নিজের লজ্জা-সম্ভ্রম কতকটা রক্ষা করিয়া ফেলিয়াছে, কোঁচার কাপড়টাকে কোমরে জড়াইয়া তাতে একটা ফাঁস দিতে দিতে সে তীব্রভাবে মাথা নাড়া দিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—"কর্ত্তা-ফর্ত্তা আমাদের বাড়ীতে নেই বাবু, তুমি অন্য যায়গায় গিয়ে কর্ত্তা খুঁজে দেখো"—এই বলিয়া সে গমনোদ্যত হইলে আগন্তুক ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া তার হাত ধরিতে গেল, ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

"আহা হা, পালাচ্ছো কেন, শোনই না একটু, তা তোমাদের বাড়ীর কর্ত্তা কোথাও গেছেন কি? কখন্ আসবেন? আজই আসবেন ত, না দেরি হবে?"

ছেলেটি এক ঝটকা দিয়া নিজের হাতখানি টানিয়া লইল, বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল—"বলছি তোমাকে যে, আমাদের বাড়ীর কর্ত্তা-ফর্ত্তা নেই, ছিল না; ছিল না ত আবার কোথায় যাবে? কোথাও যায় নি, কর্ত্তা নেই। হয়েছে?"

লোকটি ভাবিল, হয় ত গৃহস্বামী মৃত। একটু দরদে-ভরা কোমল সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাড়ীতে তা হ'লে কে আছেন, খোকা? মা আছেন বোধ হয়?"

ছেলেটি মুখে বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া উত্তর করিল, "আছে বৈ কি! সে আর নেই? সেই মুখপুড়ীই ত আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তোমার কাছে ঠেলে পাঠিয়ে দিলে। যাচ্ছি কি না, গিয়ে একবার মজা দেখিয়ে দিচ্ছি! বের করছি আমার ঘুম ভাঙ্গানো। বললে কি না, কি বেচতে এয়েছে বোধ হয়, এই বুঝি ওঁর বেচতে আসা?"

ছেলেটিকে আর ধরিয়া রাখা যায় না, তথাপি কোনমতে পথ আটকাইয়া আগন্তুক প্রশ্ন করিল,—"বাবা আছেন তোমার? তাঁকে একবারটি পাঠিয়ে দাও গে ত।"

ছেলে আর কোন বাধা না মানিয়াই ছুটিয়া ভিতরে

ফিরিয়া গেল, যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, "সে এখন ঘুম থেকে উঠে তামাক খাচ্ছে, এখন কেউ মাথা-মুড় খুঁড়লেও সে আসবে না।"

"তুমি তাঁকে গিয়ে বলো, বিশেষ একটু কথা আছে, একবারটি পাঁচটা মিনিটের জন্যে যদি এই দোরের গোড়াটায় একটু আসেন"

কাহারও কোন সাড়া-শব্দ নাই, আগন্তুকও নাছোড়-বান্দা, প্রায় আধ ঘণ্টা সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিল, বোধ করি, গৃহস্বামীর তামাক খাওয়া শেষ হওয়ারই জন্য। তার পর আবার সেই আধখোলা দরজার সামনে আসিয়া ডাকিল—"মশাই! বাড়ীতে কেউ আছেন? বাড়ীতে কেউ আছেন? বাড়ীতে কেউ—"

ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠের স্বর শোনা গেল, "হ্যাঁগা! সেই তখন থেকে যে মানুষটো হত্যে হচ্ছে, যাওই না, একবার দেখেই এসো না, কি বলে, কি চায়?"

পুরুষ-কণ্ঠের পরুষকণ্ঠ এর জবাব দিল,—"কি চায়? চায় আমার মুণ্ডু! চায় অদ্ধেক রাজত্বি, দেবে? ভাল জ্বালায় পড়েছি, নিজের ঘরে ব'সে একটু প্রাণভরে তামাক খাবো, তার যোটি নেই! সকাল হ'তে তর সয় না, যেন ওদের সাত গুষ্টীর কাছে ধার ক'রে খেয়েছি!"

খট্‌খট্‌ করিয়া খড়ম বাজিয়া উঠিল, শব্দটা ক্রমশঃই এ দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া আগন্তুক একটু আগাইয়া আসিল।

নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিযুক্ত কলিকা-বসান একটি বেঁটে ছোট হুঁকা হস্তে বোধ করি প্রথম আসা সেই ছোট ছেলেটিরই একটি পুরাতন ধুতী হাঁটুর অনেক উপরে পরা একটি সাড়ে ছ'ফুট মাপের লম্বা আধাবয়সী লোক ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। আকারটি তার পাতলা ডিগ্‌ডিগে, রংটি কখনও ফরসা ছিল, এখন রোদপোড়া তামাটে, নাকটা খুব উঁচু, দাঁত দুপাটি খিঁচানোর ভাবে প্রায় বাহিরের দিকেই থাকে, রুক্ষ স্বভাবকে তারা আরও রুক্ষতর প্রমাণ করে।

আসিয়াই কর্কশ স্বরে কৈফিয়ৎ কাটিলেন,—"কি মশাই! কি করেছি বলতে পারেন? ডাকাতিও করিনি, চুরির মধ্যেও নেই, রাত না ভোর হ'তে হতেই এত জোর-জুলুম কিসের আপনার?"

আগন্তুক এই অভ্যর্থনায় বিশেষ বিস্মিত হইল, তা মনে হয় না, বোধ করি, এ রকম সব সম্ভাষণ তার পাওয়া অভ্যাস আছে, সে বরং নম্রকণ্ঠে সসম্ভ্রমে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে না, জোর-জুলুম ত কিছুরি নয়! করেনওনি আপনি কিচ্ছুই, তবে আপনার কাছে আমাদেরই একটা Request অর্থাৎ কি না আমাদেরই একটুখানি অনুরোধ আছে। আমরাই একটা মস্ত কায করবার জন্যে একটা সমিতি করেছি, পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে স্বর্গীয় সি, আর দাশের যে মতলবটা ছিল, যেটা তিনি তাঁর অকালমৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই Accept করেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে যেটা এত দিন কোন্ কালে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা নিয়ে আরম্ভ হয়ে যেত, আমরা সেই উদ্দেশ্যটাকেই কার্য্যে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছি। তাতে সমস্ত দেশবাসীরই সহায়তা পাওয়া চাই—"

সব কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই গৃহস্বামী যেন বিশেষ আতঙ্কিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের ঐ এক সংস্কারের ধুয়ো উঠে মানুষকে ত বাপু অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে; পেটে ভাত জোটে না, চাঁদা দিতে দিতে মাথার চাঁদি ফেটে গেল! এই সে দিনে—এখনও দু'মাস যায় নি, কিসের একটা সভার জন্যে এক দঙ্গল চ্যাংড়া ছোঁড়া এসে ধস্তাধস্তি ক'রে একটা সিকি নিয়ে চ'লে গেল! কিছুতে ছাড়াতে পারলুম না! না বাবু! অন্য যায়গায় যাও, আমার হাতে আজ একটা পয়সা নেই, দিতে পারবো না।"

যুবক কহিল, "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমি আপনার কাছে পয়সা চাইছি না, শুধু—"

ভস্মীভূত তামাকুর কলিকায় বৃথা আশায় একটা দীর্ঘ টান দিয়া বিকৃত মুখে গৃহস্থ কর্ত্তাটি কহিয়া উঠিলেন, "ওঃ, তোমার আশা বেশী! পয়সা চাও না, টাকা চাও, যাও বাপু! কথায় কথা বাড়ে, যেখানে মস্ত বড় সিং-দরজা দেখবে, সেইখানে ঢুকো, আমার মতন হতচ্ছাড়ার দোর টাকা ছড়াবার যায়গা নয়।"

ছেলেটি বলিল, "না শুনেই আপনি গলাধাক্কা দিচ্ছেন কেন? টাকাও না, পয়সাও না,—"

পিছনে ফিরিয়া অদূরে নামাইয়া রাখা ঝাঁকাটার দিকে দেখাইয়া দিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "ঐ হাঁড়িগুলি দেখছেন, ওরই একটি আপনার ভাঁড়ার ঘরে থাক,

রোজ ভাঁড়ার বার করবার সময় একটি মুঠো ক'রে চাল—মনে করবেন, আপনার পাঁচ ছেলে-মেয়ের বদলে যেন আর একটি বেড়েছে, তারই ভাগ ঐ মুঠোটি—এই মনে ক'রে ঐ হাঁড়িতে ফেলতে বলবেন, মাসে এক ক্ষেপ এসে আমি বা আমার লোক চালগুলি নিয়ে যাব, এতে আপনারও গায়ে লাগবে না, আর দেশেরও কায হবে।"

"কেমন ক'রে জানবো যে, সেই চালগুলি নিয়ে গিয়ে তুমি ভাত রেঁধে খাবে না?"

শ্রোতার এই উচিত প্রশ্নে বক্তা কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা বিরক্ত না হইয়াই উত্তর করিল—"ভাত রেঁধে নিশ্চয়ই খাওয়া হবে, তবে শুধুই ভাতটি খেয়ে হজম করা যাবে না, তার বদলে কিছু কায করা হবে, এই আমাদের হচ্ছে প্ল্যান, আচ্ছা, সবটা খুলে বলি, শুনুন—"

বাড়ীর কর্ত্তাটি ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল; বলিল, "থামো, বাবু, এই সকালবেলায়, এখনও হাত-মুখ ধুই নি, গোয়াল-ঘরের ঝাঁপ পর্য্যন্ত খুলতে বাকি, এই সময় যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা দুত্তিন ধ'রে তোমার বক্তিতে শুনতে পারবো, তা' ত ভরসা হয় না, তুমি বরং তার চাইতে অন্য কারুকে তোমার প্যালান শোনাও গে, আমি—"

আগন্তুক নাছোড়বান্দা, মিনতি করিয়া বলিল, "দু'কথায় আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, পাঁচটা মিনিট সময় আর তামাক খেতে খেতে দিতে পারবেন না? আমরা পল্লী-সংস্কার করবার জন্য একটি সমিতি করেছি, তা থেকে প্রত্যেক গ্রামে একটি ক'রে লোক রাখবো, লোক অর্থে এক জন লোক নয়, একটি ক'রে পরিবার। পুরুষটি গ্রামের ছেলেদের পড়াবেন, এক আনা থেকে দু' আনা পর্য্যন্ত যার যা ইচ্ছে মাইনে দেবে, যে এও পারবে না, সে পড়বে অমনি, ওঁর স্ত্রী পড়াবেন মেয়েদের। তার পর সঙ্গে থাকবে হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স, কুইনিন, টিঞ্চার, লেক্সিন আর সকালবেলা দাতব্যভাবে ওষুধ তিনিই দেবেন। লেখাপড়া শেখানর সঙ্গে অর্থাৎ বাংলা নামতা, কিছু অঙ্ক, সামান্য ভূগোল, ইতিহাস আর তার সঙ্গে সুতো কাটা ও তাঁত বোনা এই থাকবে শিক্ষার বিষয়, অথচ ঐ পরিবার-টির ভরণ-পোষণ হবে ঐ সামান্য মাইনে থেকে এবং প্রধানতঃ এই মুষ্টিভিক্ষা থেকে। দেখুন, কত সহজে কতটা কায পল্লীগ্রামের মধ্যে থেকেই অনায়াসে হ'তে পারে।"

ভদ্রলোকটি শুনিতে শুনিতে হয় ত বা একটুখানি অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাই শোনা শেষ হইলেও উপহাসে উড়াইয়া না দিয়া ঈষৎ যেন সদয়-কণ্ঠে কহিল,—"হ্যাঁ, যা বলছো, তা' ভাল কথাই, তবে গাঁয়ের লোকে সবাই যদি মেনে নেয়, তা হলে না? দু'চার জনের দ্বারা কি এ সব কায হয়?"

আগন্তুক একটি হাঁড়ি আনিয়া ভদ্রলোকটির সামনে রাখিয়া বলিল, "এক জন আরম্ভ করলেই দশ জন, দশ জন করলেই বিশ জন করবেন। আপনি আরম্ভ করুন, আর আশীর্ব্বাদ করুন, সবারই যেন আপনার মতন ভাল কাযের সহায়তা করবার মত মতিবুদ্ধি হয়।"

এই বলিয়া দু'হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া সে ফিরিবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

গৃহস্থ ব্যক্তিটির যদিও সৎকর্ম্মপরায়ণতার উদাহরণস্বরূপ হইয়া উঠিবার আগ্রহ আদৌ ছিল না, কিন্তু ছেলেটির কথার চটকে সে নাকি কেমন হতভম্ব হইয়া গেল, আর সেই সুযোগে আগন্তুক তার ঝাঁকামুটেকে সঙ্গে লইয়া তার লম্বা লাঠির তালে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া গ্রামের পথ ধরিল। সূর্য্য তখন পূবদিকের একটা ঝাঁকড়ামাথা বটগাছের ভিতর দিয়া উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কৃষাণরা কোদাল ঘাড়ে, জনমজুররা কোদালের সঙ্গে মাটীমাখা ঝুড়ি লইয়া পথ চলিতেছে। সে দিন বোধ করি হাটবার, পশারী ও পশারিণীরা ঝাঁকা পেতে হাতে মাথায় লইয়া দ্রুতচরণক্ষেপে একটা দিকেই ছুটিতেছিল, কারও কাছে মিঠা পাণ, কারু কাছে তাজা ইলিশ, আবার কারু সঙ্গে তাজা শাকসব্জী, কুমড়া, কচু, লাউ, ঝিঙ্গে, পটোল, কাঁচাকলা, পাকাকলা, নূতন ওঠা কালো কালো মুক্তকেশী বেগুন এবং সরু সরু মূলো।

ছেলেটি গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ী ঘুরিল। কোথাও সে পাইল সহানুভূতি ও সমাদর, আবার কোনখানে পাইল তীব্র বিতৃষ্ণাপূর্ণ প্রত্যাখ্যান, এমন কি, উপহাস ও অপমান; কিন্তু তুল্য নিন্দাস্তুতি মানিয়া লইয়া সে প্রায় সর্ব্বত্রই বিজয়ী হইতে পারিল, দু'বেলা দু'মুঠা না হোক, একবেলা একমুঠা, অন্ততঃ হপ্তায় একটি মুঠাও চাউলএর পল্লীকল্যাণের জন্য স্বীকার না করাইয়া শেষ পর্য্যন্ত সে কাহাকেও ছাড়ান দিল না; কেহ তুষ্ট, কেহ রুষ্ট হইয়া 'ভাল জ্বালা এক জুটেছে

বাপু” বলিয়াও শেষটা একটা হাঁড়ি রাখিতে রাজী হইলেন।

এই গ্রামের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ ষাট ঘর আধাভদ্র অর্থাৎ অর্দ্ধশিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য এবং নবশাখের বাস, একপাশে একটা অভদ্র পল্লী অর্থাৎ জল-অচল শ্রেণীর লোকদের একটা পাড়া আছে। এই ছেলেটি এইবার সেই দিকের পথ ধরিতেছে দেখিয়া এক জন ভদ্রশ্রেণীর গ্রামিক তাহাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিল,—“ওহে ছোকরা! স্থানাস্থান দেখে চলো, ও কোথায় যাচ্ছো? ওদিকে ভদ্দরলোকের বাস নেই।”

বলিষ্ঠ যুবকের মনের বলটাও বোধ করি তার দেহের বলের চাইতে খুব বেশী কম নয়! সে একটুখানি মুখ ফিরাইয়া সেই আধ-ফিরানো মুখে একটুখানি মৃদুহাস্যের সহিত জবাব দিল,

“সেই জন্যেই ত যাচ্ছি মশাই! আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যই ত ওই দিকে।”

উপদেষ্টা বিস্ময়-মিশ্রিত ঘৃণাভরে উচ্চারণ করিয়া উঠিল, “ওঃ, ইনিও এক জন পতিতপাবন দেখছি যে! পতিতোদ্ধার করতে এয়েছেন। না বাপু! ও সব মেলেচ্ছ কাওর সঙ্গে আমার কোন সহানুভূতি নেই, আমার ঘরের চাল অত সস্তা নয়।”

এই বলিয়া হাঁড়িটা হাতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে ঢুকিতে নিজের মনকে শুনাইয়া এই যুক্তি স্থির করিয়া লইল,—“হাঁড়িটে রাখতে দিলে, রেখে দিই গে, এর পর তখন সময় অসময়ে কাযে লাগবে। সকাল বেলাটায় যে এতক্ষণ সময় নষ্ট করালে, তার কি একটা পয়সাও দাম নেই, হ্যাঁঃ, তুমিও যেমন!”

ঝাঁকাটার তিন ভাগ খালি হইয়া গিয়াছিল, এক ভাগ বাকি, সেই এক ভাগের হাঁড়ির মধ্য হইতে তিনটা হাঁড়ি হাতে লইয়া ঝাঁকাশুদ্ধ মুটেটাকে পাশের একটা অশ্বত্থতলায় তার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রোৎসাহিতচিত্তে দ্রুত-পাদক্ষেপে সে গিয়া প্রবেশ করিল,—অপরিচ্ছন্ন কুটীরের শ্রেণীর ধারে একটা নোংরা আবর্জ্জনায় ভরা শুধু মানুষের পায়ে চলার দাগে দাগে আঁকাবাঁকাভাবে দাগ টানা টানা পথে। রাস্তাটার স্থানে স্থানে পাঁকে ভরা, গত বর্ষণের জলধারা তার দু'এক যায়গায় মাটী ধ্বসাইয়া গর্ত্ত কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে, একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে হইতে বাহির হইয়া একটা ছোট্ট ছেলে ঐ গর্ত্তকাটা যায়গায় আছাড় খাইয়া পড়িল। ছেলেটির তারস্বরের চীৎকারে, তার মা বোধ করি গোবরনাদি দিতে ব্যস্ত ছিল, আলুথালু-বেশে দু'হাত গোবর মাখা, ছেলের গলার উপর আরও দেড় কি দুই গ্রাম স্বর চড়াইয়া দুরন্ত দামাল ছেলেকে, তার ছেলে আগলাইতে অসমর্থ বাপকে এবং পোড়ামুখ বর্ষাকে, তাদেরই দোরের গোড়ায় পথে এই ভাঙ্গন ধরাইয়া গিয়াছে, তাহাকে অশেষ বিশেষ গালাগালি দিতে দিতে আসিল। সেই গোবরমাখা হাতের হেঁচকা দিয়াই সেই স্নেহশীলা ছেলে তুলিতেও উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তারই মধ্যে হাতের হাঁড়ি মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া আগন্তুক ত্রস্তে-ব্যস্তে আসিয়া ছেলেটিকে দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া তাকে কোলে লইল। উগ্রচণ্ডা রণরঙ্গিণী হঠাৎ স্তম্ভিতবিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইল, এর চেয়ে ঐ অপরিচিত ভদ্রলোকটি ছুটিয়া আসিয়া তাকে তার হাতের মোটা লাঠিটার এক ঘা সজোরে কশাইয়া দিলেও সে হয় ত অধিক বিস্মিত হইতে পারিত না।

আগন্তুক ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটিকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোকটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

“এটি আপনার ছেলে? বড্ড বেশী ব্যথা লেগে থাকবে, একটু কোলে নিন, আহা, গর্ত্তটার মধ্যে প'ড়ে গেছে! কি ভাগ্যি, কোথাও কাটে কুটে নি।”

আপনি! ছেলের মা'র বিস্ময় বোধ করি বা সীমা অতিক্রম করিয়া গেল! আপনি! এই গোবর-মাখা দু'হাত, ন্যেতা-ক্যাঁতা ট্যানা পরা দুলেবৌ সে, তাকে এ বলে কি না আপনি! পাগল নয় ত?

প্রকাশ্যে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সে বিনীতকণ্ঠে কহিল, “ওটারে নামায়ে দেন, আপনারে আমি ছোঁব ক্যামন কর্যা? ভূঁয়ে নামায়ে ধরেন।”

লোকটি কহিল, “নামাবার দরকার নেই, আপনার বাড়ী চলুন, হাত ধুয়ে ছেলে নেবেন, ও রকম নোংরা হাত কি ছেলের গায়ে দিতে আছে, ছেলে যে ভগবান্।”

মেয়েটি অধিকতর বিস্মিত হইল, বক্তার বলার ধরণে, শিশুটিকে কোলে করার ভঙ্গীতে, কথার গাম্ভীর্য্যে সে যেন কেমন এক ধারা হইয়া গেল। একটুক্ষণ পরে হঠাৎ যেন চটকাভাঙ্গা হইয়া সে গোময়লিপ্ত হস্তে নিজের স্খলিতপ্রায়

অঙ্গাবরণ যথাসংযুক্ত করিতে করিতে বিব্রত বিপন্নতার সহিত সে সবিনয়ে কহিয়া উঠিল,—

"ও কথা ক'য়ে আর অপরাধ বাড়াবেন নি, আপুনিরা বামন কায়েত, আপুনারাই আমাদের কাছে ভগবানের তুল্যি-মূল্যি, ওটা গরীব দুলে ঘরের ছ্যালে, ওরে কন আপুনি ভগবান্? আপনার ছিরি অঙ্গে ছোঁড়াটার চরণ নাগচে, কত মন্নি হচ্চে, ওরে ছেড়ে দ্যান বাবু, ডরে আমার শরীর কাঁপচে।"

ততক্ষণে অপরিচিতব্যবহারে উচ্চচীৎকারে ক্রন্দনশীল শিশু সহসা বিস্ময়ভরে স্তব্ধ হইয়াছিল, উল্‌টিয়া সে অজানা আদরকারীকে তার বিস্মিত দৃষ্টি দিয়া বেশ খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিল, আগন্তুক তাকে তার সবল বাহু দিয়া সস্নেহে নাচাইয়া উচ্চে লুফিয়া খানিকটা খেলা করিয়া তার পর তার মায়ের দিকে ফিরিয়া উত্তর দিল—

"মা! ভগবান্‌কে তোমরা ভুল বুঝেছ, তিনি যেমন বামুন-কায়েত, তেমনই দুলে-বাগ্দীর ভেতরেও রয়েছেন, শুধু ওরা সেটা কতক মতক টের পেয়েছে, তোমরা তা' পাও নি। তাই ছাই-চাপা আগুনের মতনই সেটা ঢাকা প'ড়ে গ্যাছে, ফুঁ দিয়ে ছাই উড়িয়ে দিলেই ভেতর থেকে ঘুঁটে বেরুবে না, আগুনই বেরুবে।"

ইতিমধ্যে পাশের ঘরের কার্ত্তিক দুলে এবং কার্ত্তিকের কাকা আন্দু দুলে দু'জনে ঘরামীর কাযে যাওয়ার পথে এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। আগন্তুকের কথা শেষ হইলে আগাইয়া আসিয়া কার্ত্তিক বলিল,—

"এ সব বক্তিমে মেয়েছেলের সামনে দেবার লেগে এদ্দূর না এসে সহরের টৌন হলে দিলেই ত হতো! ভেগে পড়ুন, ও রকম অনেক ভদ্দর লোকের নাকি সুরের ঘ্যান-ঘ্যানানি ঢের শোনা গেচে, ফুঁ দিয়ে ছাই উড়িয়ে গরীবের চালে আগুন জ্বালবার মতলবেই তোমাদের মতন ভদ্দর লোকরা আজকাল তয়ের হয়ে উঠচে, তা' জানি; কিন্তু সে হবে না, এই বেলা ভেগে পড়ো, বুঝলে?—"

বলিয়া কার্ত্তিক হাতের কোদালখানা লাঠির মতন করিয়া হাতে লইল।

কার্ত্তিকের কাকা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "হুঁ, ভেগে পড়ো।"

কিন্তু সেই ছেলের মা, যাকে আগন্তুক এই একটু আগেই 'মা' সম্বোধন করিয়াছিল, সে একবার তার পদের উপযুক্ততা প্রমাণ করিল, সম্পর্কে সে আন্দুর ভাজ এবং কার্ত্তিকের খুড়ী হয়, দু'জনকার দিকেই মুখ ঘুরাইয়া চাহিয়া সে চোখ রাঙ্গাইয়া ভর্ৎসনা করিল,—"কেন রে কার্ত্তিকে! অমন ক'রে ওঁয়ারে কড়া কথা কইচিস্? বাবা ঠাকুরের আমার দ্যাবতার মতন দয়ার শরীল, তাই না ক্ষুদে ছোঁড়াটারে নালা থেকে উঠ্‌য়ে কাঁখ করেছ্যান, অপরাধের ভয়ে অ্যাকেই আমি ম'রে রইচি, তার উপর তুই এলি কেঁড়েলি করতে! অ-মা! আমি কুথাকে যাবো, তা' জানি নি!"

কার্ত্তিক ও আন্দু অপ্রতিভ হইল। আন্দু বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, জানি নি ত ও সব কথা, যাক্—যাক্—যেতে দাও, যেতে দাও, আপুনি বুঝি এ গাঁয়ে নতুন এয়েচ? কা'দের ঘরে এয়েচ গা? কলকেতা সহরে থাকা হয় নাকি?"

অসৌজন্যটাকে মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াসে সে অপরিচিতের সহিত আলাপ সুরু করিল।

"এয়েচ, তা' বেশ করেচ, কুটুম-কুটুম্বিতে আচে বোধ হয়? তা' সে সব সেরে সুরে চটপট স'রে পড়ো। আপনি ত জানো নি, এ সময়ে এ সব গাঁয় ম্যালেরিতে ঘর ঘর লোক শুয়ে পড়ছে, দু'দিন যদি উঠবে ত'দশ দিন শোবে!"

আগন্তুক সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "ওঃ, এখানে বুঝি খুব বেশী ম্যালেরিয়া?"

আন্দু কহিল, "তা বাবু নেহাৎ মন্দ কেমন ক'রে বলি? সুরু হবো হবো হচ্চেন, আমার ত দুক্ষেপ হয়েই গেল, কাল পথ্যি ক'রে আজ এই কাযে বার হচ্ছি।"

আগন্তুক কহিল, "তা হ'লে চারিদিকে এত ঝোড়-জঙ্গল পচা ডোবা থাকতে দিয়েছ কেন? নর্দ্দামা নেই, জল নিকাশ হয় না, ময়লা সব জ'মে জ'মে ঘরের পাশে গাদা হয়ে রয়েছে, তাইতেই ত এত রোগ হয়।"

কার্ত্তিক ও আন্দু সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "সে দিন এক জন ডাক্তার বাবু কলকেতা থেকে এসেছিল, সে-ও তাই বল্লেক, কিন্তু এ সব জঙ্গল কাটে কে, পানা তোলে কে, নর্দ্দমা বানায় কে?"

আগন্তুক তৎক্ষণাৎ প্রোৎসাহিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "কেন, আমি এবং তুমি!"

আন্দু ও কার্তিক দু'জনেই হেঃ হেঃ করিয়া একটু হাসিল, অর্থাৎ কথাটা যেন বেশ রসিকজনোচিতই হইয়াছে।

যুবা কহিল, "দেখ ভাই, হেসো না, আমি ঠাট্টা করি নি, সত্যি করেই বলছি, তোমার বিশ্বাস না হয়, আমায় ঐ কোদালখানা দাও ত, এই যে খানাটায় এই ছেলেটি গড়িয়ে প'ড়ে গেল, এটা ত তোমাদের বস্তির চলন পথ? এইখানটাকে আমি এক্ষুণি চাটি মাটী এনে পিটিয়ে ঠিক ক'রে দিতে চাই।"

ছেলেটি কোদালের জন্য হাত বাড়াইতেই খুড়া-ভাইপো যত বিস্মিত তত অপ্রতিভ হইল এবং সেই সঙ্গে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের সহিত "আমরা থাকতে আপুনি!" এই বলিয়া কোদাল হাতে মাটী আনিতে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে তিন জনের সমবেত চেষ্টায় সেখানকার খানা-খন্দো সব বুজাইয়া, ঘাস আগাছা কাটিয়া, বেশ একটি সরল সুন্দর চলন পথ তৈরি হইয়া গেল। রাস্তাটি চলনসই করিতে ঘণ্টাখানেকের বেশী সময়ও লাগিল না।

কার্য্য-শেষে আন্দু ও কার্ত্তিক ছেলেটিকে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তিনটি হাঁড়ি তখনই তখনই আন্দুর বাড়ীতে গিয়া ঢুকিয়া বসিল। স্থির হইল, হপ্তায় এক দিন করিয়া দুলেপাড়ার প্রত্যেক পরিবার এক মুঠা করিয়া চাল ঐ হাঁড়িতে দিবে। মাসে একবার করিয়া লোক আসিয়া ঐ চালগুলি লইয়া যাইবে। আরও স্থির হইল যে, দুলে-পাড়ার চলন পথ, ওঁচলা ফেলার ব্যবস্থা এবং আশপাশের ঝোপ-ঝাড় তারা নিজেরাই সাফ করিয়া ব্যবস্থা করিয়া লইবে এবং যদি গ্রামের মধ্যে পাঠশালা বসে, তবে অবৈতনিকভাবে তাদের ছেলে-মেয়েরা তাহাতে লেখাপড়া শিখিতে যাইবে। বেতন বাবদ প্রতি গৃহস্থ তখন প্রতি হপ্তায় তিন মুঠা করিয়া চাউল হাঁড়িতে ফেলিবে।

যুবক তার ঝাঁকা-মুটেকে ডাকিয়া লইয়া স্ফূর্ত্তিযুক্ত সতেজ চলনে বড় রাস্তা ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইল, এই দিক্‌টাকে লোক বাবুপাড়া বলিয়া থাকে, অর্থাৎ এই অঞ্চলেই গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকদের কোঠা-দালান, বাগান এবং পুষ্করিণী। বলা বাহুল্য, সেগুলির অধিকাংশেরই এক্ষণে পতনোন্মুখ অবস্থা। গৃহস্বামীদের নগরবাসের কল্যাণে সে সব গৃহ শ্রীভ্রষ্ট, জনহীন; পুষ্করিণী পঙ্কিল আবিল জলে ম্যালেরিয়া-বিষ বিতরণে তৎপর এবং উদ্যান জঙ্গলে পরিবর্ত্তিত। কদাচিৎ দুই এক ঘর ইহারই মধ্যে টিকিয়া গিয়াছে, ইহাদেরই বাসগৃহ এখনও বাবুপাড়ার পূর্ব্বগৌরবের কিছু কিছু সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

শরতের সূর্য্য তখন তাঁর প্রতপ্ত কিরণে চারিদিক্ আতপ্ত করিয়া তুলিতে ব্যস্ত ছিলেন। বাঁড়ী বাড়ী রান্নাঘরের ধুঁয়া এবং গৃহকর্ম্মের সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতে-ছিল। ঝাঁপ-খোলা দোকানে বসিয়া নিধু ময়রার বড় ছেলে শালপাতার ঠোঙ্গায় করিয়া মুড়কি, মুড়ি এবং গুড়ে বাতাসা বিক্রয় করিতেছিল।

ভিনগাঁয়ের সেই নেড়া বৈরাগী তখন তার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া ঘরে ফিরিতে ফিরিতে একতারায় ঘা মারিতেছিল—

"পাগলের সঙ্গে যাবো, পাগল হবো, হেরবো রসের নবগোরা।"

২

বাবুপাড়ার পথ-ঘাট এক সময়ে তার নামের উপযুক্ত ছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, পথের অনেক যায়গায় এবং অধুনা পঙ্ক ও পঙ্কজে ভরা আধমজা পুষ্করিণীর ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন বাঁধা ঘাটে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন ঘাটের উপর দেবায়তনের ও তৎসহিত অতিথিশালার ধ্বংসচিহ্ন প্রতিষ্ঠাতার ধর্ম্মানুরাগ, কোন এক স্থানে পথের উপর ছায়াবিস্তারকারী একটি প্রশস্তভাবে বাঁধান অশ্বত্থ-বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাকারীর কর্ম্মানুরাগ বা জনমঙ্গলচিন্তার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। এক দিন গ্রামে বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিল এবং তাঁদের প্রাণ ছিল, জনকল্যাণের জন্য তখন হাঁড়ি হাতে চাল কুড়াইতে হইত না, অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্যবোধেই এ সব জনহিতকর পূর্ত্তকার্য্য ও সেবায়োজন অবস্থাপন্নরা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই করিতেন। নিষ্কামভাবে না হইলেও সকামভাবে স্বর্গকামী হইয়াও করিতেন। এখনকার মত তখন এ দেশের লোক গীতা পাঠ করিয়া মোক্ষার্থী হয় নাই। তাহারা জীবনকে নশ্বর বোধে পরলোকের পাথেয়-সঞ্চয়ে তৎপর হইয়া উঠিত, উপনিষদ পড়া তখন সহজ ছিল না, নিজেকে "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিত না।

এ গ্রামের নূতন আগন্তুক এই কথাগুলি এবং এই ধরণের আরও দুই চারি কথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল, হঠাৎ তাহার কাণে গেল, তাহার পিছনে নারীকণ্ঠে কে কাহাকে বলিতেছে,—

"এই দেখ, এই আবার এক নতুন ঢঙের ভিক্ষাওলা এয়েছে! জোয়ান্‌জোয়ান, এই অত্তো বড় যার বুকের ছাতি, তার খেটে খেলে হয় না?"

যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছিল, বোধ করি, সেই জবাব দিল, "ওরা দিদি, ঠিক ভিক্ষেওলা নয়, ভাই! দেখছো না, সঙ্গে একটা ঝাঁকা-মুটে, ওতে হাঁড়ি রয়েছে। আমার বাপের বাড়ীর ওখানে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে অম্‌নি হাঁড়ি রেখে যায়, তাতে রোজ দু'বেলা দু'মুঠো চাল ফেলে রাখে, তার পর হপ্তায় এক দিন ক'রে এসে সেই চাল নিয়ে গিয়ে তাইতে গরীবদের খাওয়ায়, রোগীর পথ্য দেয়, কত ভাল কায করে। এও হয় ত সেই রকমই কিছু করতে চায়।"

উত্তর হইল, "রামকৃষ্ণ মিশনের খবর আমিও শুনেছি, কিন্তু এর গেরুয়া কৈ? গেরুয়া পরলে বুঝতুম, না হয় তাদেরই। সব এক ঢঙ হয়েছে লো, এক ঢং হয়েছে, একজনরা করলেই দশ জনের সখ যায়।"

অন্য মেয়েটি অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "গেরুয়া পরাই যে সব সময়ে ভাল, দিদি, তা বলতে পারি নে। সব্বাই গেরুয়া নিলে গেরুয়ার অপমান করা হয়, আর নিজেদেরও পায়ে বেড়ী দেওয়া হয়। তার চাইতে সাদাই ভাল, যত দিন পারলে করলে, যখন অক্ষম হলো, ফিরে গেল। গেরুয়ার এ দেশে কত মান্য ছিল, আজকালের ত বেশীর ভাগই হয়েছে, ওটা যেন ভিতরকার—"

দাঁড়াইয়া মেয়েদের কথা শোনা সঙ্গতও নয়, সমীচীনও নয়; আর এ সব কথা এ পথে পা দিয়া সে ঢের শুনিয়াছে এবং যদি টিকিয়া থাকিতে পারে, ঢের শুনিবেও, এ শুনিয়া সময় নষ্ট করার মত সময় তাহার শস্তা নয়। সে যেমন জোরে পা ফেলিয়া চলিতেছিল, তাই চলিল। পৌঁছিল গিয়া একখানা ভাঙ্গা-চোরা বাড়ীর সাম্‌নে। ঠিক পাশেই তার একটা এঁদো পুকুরে বসিয়া একটি কম-বয়সী মেয়ে বাসন মাজিতেছিল, ধোয়া বাসন গোছা করিয়া সাজাইয়া লইয়া ঠিক সেই সময়েই অপরিচিতের সম্মুখীন হইয়া আসিল। আগন্তুক সসম্ভ্রমে মেয়েটিকে পথ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু তাহার সঙ্গ ছাড়িল না, একটুখানি দূর হইতে তাহাকে অনুসরণ পূর্ব্বক বাড়ীর একখানা কবাটহীন দরজার কাছে পৌঁছিতেই কথা কহিল,—

"আপনাদের বাড়ীতে কোন বাবু যদি থাকেন, অথবা গিন্নী-মা যদি থাকেন, একটিবারের জন্যে ডেকে দেবেন ত, বলবেন, বিশেষ কোন দরকারে এক জন লোক দেখা করতে চাচ্ছে, বেশীক্ষণ না, দু'মিনিটে আমার কায শেষ হয়ে যাবে।"

বাসন হাতে করিয়া মেয়েটি দাঁড়াইল। চলনোদ্যত চরণের গতি রুদ্ধ করিয়া অনুরোধকারীর দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার মনের ভিতরটায় কেমন যেন একটা স্নিগ্ধতার স্পর্শ লাগার মতই অনুভব হইল। অদ্ভুত কিছু নয়; কিন্তু ভাল-লাগার মতই পরম একটি গন্ধভরা যুঁইফুলের মতই মুখখানি।

মেয়েটি তাহার ডাগর চোখে স্মিতদৃষ্টি ভরিয়া কোমল সুরে কহিল, "আপনি যদি হাঁড়ি বেচতে এসে থাকেন, তা হ'লে আমি জানি, আমাদের এখন হাঁড়ির দরকার নেই। তা ছাড়া ও হাঁড়ি টেঁকে না, ঘাটালের হাঁড়ি না হ'লে দু'দিনেই ভেঙ্গে যায়।"

যুবকের ঠোঁটের কোলে ঈষৎ একটুখানি হাসির আভাস দেখা দিয়াই গোপনে মিলাইয়া গেল। সংযত কণ্ঠেই সে উত্তর দিল, "হাঁড়ি বেচতে আসি নি, খুকী! আপনাদের ভাঁড়ার ঘরে এর একটি রেখে যাব, তা'তে দু'বেলা দু'মুঠো চাল ফেলে দেবেন, আমি বা আমার লোক এসে ফি হপ্তায় ঐগুলি ঢেলে নিয়ে যাব, আর সেই চাল দিয়ে অনেক ভাল কায হবে—"

মেয়েটির কালো চোখ বিস্ময়ের রেখায় ভরিয়া উঠিল। সে সংক্ষেপে শুধু বলিল, "ওঃ"—তার পর একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাযে? ভিখিরী খাওয়াবেন?"

যুবা কহিল, "উঁহুঃ, দেশে ভিখারী রাখবোই না, ঐ চাল থেকে অন্য কাযও হবে, আবার গরীবদের মজুরী দিয়ে ওদের দ্বারা জঙ্গল সাফ, পুকুর সাফ, রাস্তা—"

মেয়েটি কথার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "আমাদের এই পচা

পুকুরটা সঙ্গে 'করা যায় না? কি যে এটা বিশ্রী হয়ে গ্যাছে! এখন ত ঢের ভালো, শীতকালে, গরমকালে জল থাকে না, শুধুই পাঁক। কাপড় কাচলে কাপড়ে গন্ধ হয়, বাসন মাজলে বাসনে দাগ ধরে।"

আগন্তুক এই কিশোরীর বর্ণিত পুষ্করিণী-নামধেয়, আধমজা, শৈবালদামে আচ্ছাদিত, সদ্যোবিগত বর্ষাপ্রসাদাৎ কথঞ্চিন্মাত্র জলবিশিষ্ট কুণ্ডটার দিকে চাহিয়া মেয়েটির কথার উত্তর দিল,—"কেন যাবে না? ঠিক যাবে। ছোট পুকুর, খুব শীঘ্রই হ'তে পারবে।"

মেয়েটি দরজার মধ্য দিয়া উঠানে বাসন ক'খানা রাখিল এবং একটু আগাইয়া আসিয়া আগন্তুকের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া, ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তা হ'লে আমায় একটি হাঁড়ি দিন, আমি আপনার জন্যে চাল রেখে দেব। হপ্তায় হপ্তায় আপনি বা আর কেউ এসে নিয়ে যাবেন।"

আগন্তুক তৎক্ষণাৎ একটি হাঁড়ি লইয়া মেয়েটির হাতে দিল, ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু বাড়ীর লোকে কি আপনার কথা মানবেন?"

মেয়েটি তার সেই দুটি সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল শান্ত চক্ষু বক্তার প্রতি সন্নিবেশিত করিয়া বিস্ময়াশ্চর্য্য-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কেন?"

যুবক একটুখানি ইতস্ততঃ করিল। নিজেকে উত্তর দিতে গিয়া ঈষৎ বিপন্ন বোধ করিল, তার পর একবার কাসিয়া লইয়া বলিয়া ফেলিল, "এই আপনি ছেলেমানুষ কি না, তাই—"

মেয়েটির চোখ দুটি হাসির ছটায় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সে স্মিতমুখে উত্তর করিল, "না, আমায় যতটা ছেলেমানুষ দেখায়, আমি তা' নই। আমার বয়স বারো তেরো বৎসর পূর্ণ হয়ে গ্যাছে।" এই বলিয়া সন্নতভাবে মুখ তুলিয়া অভয়পূর্ণ স্বরে কহিল, "কেউ মানা করবে না, চাল আপনি ঠিক পাবেন, আসবেন নিশ্চয়।" দরজার মধ্যে পা গলাইয়া আবার ফিরিল, "কি বারে আসবেন? আজ ত রবিবার, আসছে রবিবারেই বোধ হয়?"

যুবা মেয়েটির ধরণ-ধারণে বিস্মিত ও প্রীত হইতেছিল, সাগ্রহেই উত্তর দিল, "বেশ, তাই হবে, রবিবারেই আসবার দিন রইলো।"

মেয়েটি ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল, আবার ফিরিয়া আসিল। ভিক্ষা-সংগ্রহকারী যাত্রারম্ভ করিতেছে, সে পিছন হইতে ডাকিল, "শুনুন।"

যুবক মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে কাছে আসিল। মেয়েটি বলিল, "দেখুন, একটা কথা মনে হলো। আপনি তখন বলছিলেন না যে, আপনি কিম্বা 'আর কেউ এসে নিয়ে যাবেন? তা' যদি আপনি আসেন, চুকেই গেল, যদি আসতে না পারেন, আর কেউ আসে, তা হ'লে সে ত আমাদের বাড়ী চিনবে না, কেমন ক'রে নেবে? আপনার কি খাতা আছে? তাতে কি সব বাড়ীর বাবুদের নাম লিখে নেন? তা হ'লে তা'তে না হয় ঠাকুরদাদার নামটাও লিখে নিন, না হ'লে ভুল হয়ে যেতে পারে।"

যুবক এবার চমৎকৃত হইল। গভীর বিস্ময়ে তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, "বাঃ!"

তার পর সে তৎক্ষণাৎ সহজভাবেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, "এটা আপনি খুব প্রয়োজনীয় কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন! এ ত আমার কৈ মনে পড়ে নি! আচ্ছা, এর পরের বারে এসে তাই করবো, খুব সহজ হবে তা হ'লে! আচ্ছা, আপনার ঠাকুরদাদার নামটি কি, বলুন ত? ধরুন, যদিই এর ঠিক পরের বারটিই না আসতে পারি। অন্ততঃ আপনাদেরটাও জানা থাক।"

মেয়েটি তার শান্ত নরম সুরে উত্তর করিল, "জীবনবন্ধু গড়গড়ি। যদি সাম্‌নে কারুকে দেখতে পান আমাকে ডেকে দিতে বলবেন।"

কথা শেষ করিয়াই মেয়েটি চঞ্চল পায়ে চলিয়া গেল। একটুখানি দাঁড়াইয়া তার চলিয়া-যাওয়া পথের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকার পর আগন্তুক রাস্তায় উঠিয়া পুনর্যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল। তখন প্রায় মধ্যাহ্নের রৌদ্র চারিদিকে খরতর করজাল বিস্তৃত করিয়া সমস্ত জগদ্বাসীকে তাদের মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামকৃত্যের জন্য প্রযোজিত করিতেছিল, কৃষাণ মাঠের ধারের গাছতলায় জলপান চিবাইতেছে, রান্নাঘরের ধূম আর দেখা যায় না, গ্রামের পাঠশালা হইতে—"সাত নম তেষট্টি, সাত দশে সোত্তর—" ইত্যাদির কলরব শুনা যাইতেছিল।

এবার সে যে বাড়ীখানায় আসিল, তাহা এককালে বেশ অবস্থাপন্নেরই বাড়ী ছিল। মধ্যে কি জানি কেন, কিছুদিন

এর প্রতি গৃহস্বামীর নেকনজর ছিল না, সেই অবসরে এর অধুনা-লুপ্ত উদ্যানের চারিদিক্‌কার বেষ্টনী প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন এবং মূল বাড়ীখানারও শ্রীভ্রষ্ট দশা ঘটিয়াছিল, সম্প্রতি বোধ করি, এর শনির দশা শেষ হইয়া কোন শুভ গ্রহের উদয় হইয়া থাকিবে, তাই বিস্তর জন-মজুর লাগাইয়া খুব ক্ষিপ্রভাবেই এটাকে যে মেরামত করা হইতেছে, তার প্রমাণ এ বাড়ীর গায়ের দাগরাজী, রং এবং স্থানে স্থানে ভারা বাঁধা হইতেই পাওয়া যাইতেছে। সাম্‌নের খানিকটা যায়গা কোদাল দিয়া চৌরস করা হইতেছিল, বাগান হইবে কি টেনিস কোর্ট হইবে, এখনও বলা যায় না। দুইও হইতে পারে। রাজমজুররা দুপুর-বেলার ছুটীতে ঘরে চলিয়া গিয়া থাকিবে। যুবক সাম্‌নের জনশূন্য খালি দালানটায় উঠিয়া, বড় হলের সম্মুখীন হইয়া ডাকিল, "কে আছেন? বাড়ীতে কেউ আছেন? বাড়ীতে কেউ—"

বাড়ীতে যে লোক আছে, তাহা জানিতে পারা গিয়াছিল। হলঘরের একটা দরজার খড়খড়ি খোলা—সার্সি দেওয়া, তাতে লাগানো পর্দ্দাটা শরৎ-মধ্যাহ্নের আতপ্ত বায়ুভরে কাঁপিয়া উঠিতেছিল এবং ভিতরকার সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম মধ্যে মধ্যে চোখে পড়িতেছিল। সেই যত্নসজ্জিত কক্ষে ছোট টিপয়ের উপর বিদ্রীর কায করা মুরাদাবাদী ফুলদানীতে টাট্‌কা তোলা লাল পদ্ম শোভা পাইতেছে।

বিস্তর ডাকাডাকির পর এক জন বেনিয়ান-পরা টেড়ী-কাটা সহুরে চাকর ঘোরতর অপ্রসন্নমুখে প্রায় মারমূর্ত্তি হইয়া বাহিরে আসিল। দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া সে আরম্ভ করিয়াছিল,—"এই, তুই চিল্লাচিল্লি ক'রে মরছিস্ কেন, এই ভরদুপুরে" বলিতে বলিতে আগন্তুক ঠিক জাত-ভিখারীর মত অবস্থার লোক কি না দেখিয়া অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে শেষ করিল, "এখনও যাও, এখনও যাও, বাপু! এখন সব খেয়ে দেয়ে বিচ্ছাম করছেন, এখন কি ভিক্ষে দেবার সোমায়? তোমাদের কি ঘটে একটুক্ আক্কেল বলেও কিচ্ছুটি নেই? তোমাদেরকে আর ব'লে ব'লে পারলাম না, বাপু।"

লোকটি বলিল, "আমার সামান্য কায, তাতে বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত হবে না। দু মিনিট—দু মিনিট মাত্র। আমি বলেই চ'লে যাব, বাড়ীর যিনি কর্ত্তা বা গিন্নী, তাঁকে একবারটি ডেকে দাও।"

ভৃত্যটি মুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল, "কর্ত্তা-গিন্নীর ত খেয়ে-দেয়ে কায নেই, তাই তোমার বাক্যি শুন্‌তে হয়ে হয়ে এক্ষুণি ছুটে আসবেক! কেন বল দেখি? ওঁনারা কি তোমার ঠেঁয়ে ধার ক'রে খেয়েচেক? ও সকল বায়নাক্কা হবেক নি বাবু, ওর চাইতে রাস্তা দেখ যে—"

যে দরজাটার পর্দ্দা দেখা যাইতেছিল, সেইখানের সার্সি খোলার শব্দ হইল, ভিতর হইতে কে এক জন ডাকিয়া বলিল, "নিমাই! কাকে তাড়াচ্ছিস? ভিখিরী বুঝি?"

নিমাই অতর্কিতে এমন ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বোধ করি খুব বেশী খুসী হইতে পারে নাই। সে মুখখানা গোম্‌শা করিয়া জবাব দিল, "এজ্ঞে, তানারা নৈলে আর এই দিন দুকুরে কে আসবেক, ছোড়দিমণি?"

যে কথা কহিয়াছিল, সে নিতান্তই কমবয়সী একটি মেয়ে, তা তার গলার সুরেই জানা গিয়াছিল। নিমাইএর কৈফিয়তে সে হাসিয়া ফেলিল, হাসিয়া বলিল, "তাই জন্যেই বেচারাকে লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে গেছিস্, না? এই রোদ্দুরে দুপুরবেলা যারা তোদের দোরে চাইতে এসেছে, তারা বড্ডই অপরাধী, না? দে হতভাগা! ওকে চারটি চাল দে।"

মেয়েটি এই বলিয়া বোধ হয় চলিয়া যাইতেছিল, আগন্তুক কি বলিল, তাই শুনিয়া নিমাই ডাকিল, "ছোড়দি-মণি! শোনেন কথা! এনার চালে শুধু হবে না, আপনাকে কি বলতে চায়।"

কোন জবাব না দিয়াই দরজার পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরের মেয়েটি বাহির হইয়া আসিল। যেন একখানি ভাস্কর-নির্ম্মিত প্রতিমা! একটি বীণা হাতে দিলে সরস্বতী সাজাইয়া বসানো চলে। সাজ-সজ্জা সাদাসিধার মধ্যেও যথেষ্ট পারিপাট্যপূর্ণ; পায়ে হাতের কায-করা রেশমী চটি জুতা। মেয়েটি আগন্তুককে দেখিয়া একটু যেন বিস্মিত চলচ্চিত্ত হইয়া উঠিল। এ যে মামুলী ভিখারী নয়, তা সেও প্রথম দৃষ্টিতে বুঝিয়াছিল।

ভিখারী যে অনেক শ্রেণীরই আছে, সে কথাও সে জানে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে এক জন দুঃখদগ্ধ, বিকলাঙ্গ বা দুর্ব্বলাঙ্গ যথার্থ ভিক্ষাজীবীকেই প্রত্যাশা করিয়াছিল।

আগন্তুক তার বক্তব্য যথাপূর্ব্ব বলিয়া গেল, একটি

হাঁড়ি নামাইয়া মেয়েটির সামনের দিকে একটুখানি অগ্রসর করিয়া রাখিয়া বলিল, "পল্লীগ্রামের কত অভাব, পল্লীবাসীর কত দুর্দ্দশা, তা বোধ করি আপনাদের অবিদিত নেই। এই সামান্যভাবেও যদি সকলে মিলিত হয়ে কায আরম্ভ করা যায়, কারু গায়ে লাগে না, অথচ কত কায কত সহজেই হয়ে যেতে পারে। আশা করি, এতে আপনার কোন আপত্তি হ'তে পারে না ?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "না ;" কিন্তু তার পর সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, "কিন্তু অত কটি ক'রে চাল দিয়ে এদের এত সব অভাব কখন কি মিটাতে পারা যেতে পারে ? কতটুকুই বা কায হবে ?"

আগন্তুক এই প্রশ্নে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে উত্তর করিল, "দেখুন, অভাব যদি মেটার কথা বলেন, তা হ'লে স্বীকার করতেই হয় যে, না, তা মিটবে না। অভাব এ দেশের, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশের পল্লীবাসীর আজকালের দিনের যে অভাব, সে বড় সামান্য অভাব নয়। এক ত ধরুন, অন্নাভাব, তার পর ম্যালেরিয়া, তার পর শিক্ষাহীনতা—এ সমস্তই এ দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের জন্য পেতে হ'লে যত চাই ধনবল, তত চাই জনবল। যার কিছুমাত্রই আমাদের নেই, কিন্তু তা যখন নেই, তখন যে ক'রে যতটুকু পারি, যে ক'জনের দ্বারা যা হয়, তাও করবো না কেন ? করতে ভয় পাব কেন ? সবটা না হয়, কতকটাও ত হবে ? দুশো জনকে বাঁচাতে না পারি, দশ জনকেও ত পারবো ?"

সুন্দরী মেয়েটি এই প্রবল ও অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না ; এ সব বিষয়ে সে কখনও মাথা ঘামাইয়া দেখেও নাই। ম্যালেরিয়ায় কখনও তাহাকে ভুগিতে হয় নাই, থাকে তারা সুদূর পশ্চিমের একটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মস্ত বড় সহরে। জেলার সেটা সদর। বাড়ী সেইখানকার যে পল্লীতে, সেখানের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের বাড়ী সেইখানে। জলের কল, ইলেক্ট্রিক লাইট, ফ্যান সবই তাদের আছে, তবু সে জল ফুটাইয়া ফিল্‌টার করিয়া খায়। বাপ বিস্তর রোজগার করিয়াছেন, খরচ করারও কার্পণ্য ছিল না। শিক্ষার জন্য শিক্ষক এবং শিল্পের জন্য শিক্ষয়িত্রী ও সঙ্গীতশিক্ষার্থ ওস্তাদ—কিছুরই তার কোন দিন অভাব হয় নাই ; অভাবের কথা বইয়ে পড়িয়াছিল, আর এই সখ করিয়া পৈতৃক বাড়ীতে আজ দিন দশ বারো হইতে যায় আসিয়া পড়িয়াই যা জন্মের মধ্যে প্রথমবার পল্লীগ্রামের চেহারা এবং তার অভাব-অভিযোগ প্রচুরতরভাবে কাণে ঢুকিয়া তার কচি মনকে চমকিত ও ভয়ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। সে চারিদিকের বন-জঙ্গল, এঁদো পুকুর এবং ভীষণ ম্যালেরিয়ার কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া এ সকলকে অনিবার্য্যরূপেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল, এঁর আশ্বাসে সে তাই খুব বেশী ভরসা পাইল না, অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে শুধু বলিল—"আপনারা শুধু চালই নেন, টাকা নেন না ?"

যুবক এবার সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিল, একটুখানি রঙ্গ করিবার প্রলোভন সে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না, বলিল, "নিই নে কি ক'রে বলি, পাই নে, বিশেষ এইটুকুই বলতে পারি, পেলেই নিই।"

মেয়েটি বলিল, "আচ্ছা দাঁড়ান, আমি আসছি," বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার হাঁড়িটা কুড়াইয়া লইল। নিমাই ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়াছে।

ভিতরে কিছুক্ষণ দুই তিন জনের কথা বলাবলির সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক জন পুরুষের গলা, সেই গলার সুরেই উচ্চহাস্য, আবার মেয়েলী গলার শব্দসম্ভার ক্ষুৎপিপাসাতুর আতপতাপ-তপ্ত পর্য্যটকের বলীয়ান্ চিত্তের দ্বারা সচেষ্টায় রক্ষিত ধৈর্য্যের বাঁধকে যেন ক্রমশঃই আল্‌গা করিয়া দিতে লাগিল। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল, মেয়েটি যে টাকা আনিতে গেল, এই সব গোলযোগের উদ্ভব সেইখান হইতেই হইতেছে। হয় ত তার পরিজনরা তাহাকে বিবিধ ছন্দে উপদেশ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, সে একটা জুয়াচোরের পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছে। টাকা যে সে আনিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত। একবার সে ভাবিল, যাক, হাঁড়ি দেওয়া ত হইয়া গিয়াছে, চলিয়া যাই। তখনই তার অপর কথা মনে পড়িয়া গেল, এ বাড়ীর অধিকারী কে, তাহা ত তার জিজ্ঞাসা করা হয় নাই! অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় ছিল না। যে উপদেশ বালিকা হইয়াও তাহাকে দিল, তার পরও আর সে কথা অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে সঙ্গত নয়।

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ সময় গেল, বলা যায় না, ঘড়ী দেখিলেও হয় ত আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টারেরও বেশী হইতে

পারিত। তার পর জানা গেল, একটা দল কোন একটা তার অজানা উদ্দেশ্যে এই দিকেই আসিতেছে, ড্রয়িং-রুমের বড় কাছেই তাদের কথার শব্দ, হাসির তাল এবং নরম চটি-জুতার মৃদুমন্দ চরণক্ষেপধ্বনি অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল এবং তার পরক্ষণেই এই কথা কটা তার উৎসুক কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল—

"যত সব জোচ্চোরের কাল পড়েছে! আশ্রম, সমিতি, সম্মিলন এর কি একটা কোন সীমা আছে? যদি বুঝতুম, কায হতো, একটা কেন সহস্রটা হোক, বারণ ছিল না, কিন্তু যদি খবর রাখেন, দেখবেন, শতকরা পাচটা ভিন্ন বাকী সমস্তই প্রায় একটা সম্পূর্ণ বৎসর টেঁকে থাকে না।"

নারীকণ্ঠে কেহ প্রশ্ন করিল, "কিন্তু কেন থাকে না?"

যে ব্যক্তি আশ্রম-সমিতির অত্যধিক আবির্ভাবে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই-ই উত্তর দিল, "কেন, চলা বড় শক্ত! এর অনেকগুলি কারণ আছে। তার ভিতর একটি কারণ—আমাদের দেশের লোক সমবায়-সমিতিতে কায করতে এখনও শেখে নি; একতা নেই, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হয়ে উঠতে চায়, তার উপর স্বার্থপরতা আছে পূর্ণ-মাত্রায়; কর্ম্মশৃঙ্খলা শিক্ষা হয় নি, ভড়ং শিক্ষাটিই হয়েছে আঠারো আনা। চার পয়সার কায যদি করতে গেলুম, আট পয়সা খরচ ক'রে বসলুম। দেখুন, আমাদের দেশে যে যৌথ-কারবার বেশী হচ্ছে না, হলেও দাঁড়াতে পারছে না, এরও সেই কারণ, এই জনসেবার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও সেই একই গলদ! আচ্ছা, এখন আসুন, দেখা যাক, আমাদের সুরুচি দেবীর মন ভুলালে যে, কোথা আছে সে"—

অতিসুশিক্ষিত কণ্ঠের সুরভরা ঝঙ্কারে ঐ গানের ঐ একটি চরণ গাহিয়াই একটুখানি গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়া গায়ক আসিয়া সেই খোলা দরজার পর্দ্দা তুলিল। আর—তার পিছনে "আ—আ—ষা—ন্ সুচারু বাবু! আপনি কি ভয়ানক লোক!—" বলিয়া যে মেয়েটি টাকা আনিতে গিয়াছিল, নিশ্চয়ই সেই মেয়েটিই ঘোর অসন্তোষের সঙ্গে তর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং অপর কোন এক কলঝঙ্কারী নারীকণ্ঠ মুক্তস্বরে হাসিয়া উঠিল।

পর্দ্দা সরাইয়া যেই ভদ্রলোকটি দরজার উপর পা দিয়াছে, অমনি আগ্রহব্যাকুল পল্লীসংস্কারক এবং সে একই সঙ্গে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া প্রায় একইরূপ বিস্ময়ের স্বরে বলিয়া উঠিল, "এ কি! সুচারু! তুমি এখানে?

"এ কি! অনিমেষ যে! তুমি কোত্থেকে?"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

কৃষ্ণা তিথির চাঁদের আলোয়

নিবিড় তিমির পাথার সাঁতারি আলোক হংস ধীরে
উজল করিয়া দিগ্‌দিগন্ত নামিছে ধরায় কি রে?

দুঃখের অন্তে সুখের মতন
কালোর বুকের আলোর প্লাবন
করিতেছে যেন সুধা বরিষণ
নিখিল ভুবন-গায়।
রূপালী রূপের নির্ঝর ধারায়
যতেক আঁধার ধুয়ে মুছে যায়,
বিশ্ব হয়েছে বিকচ একটি
শ্বেত শতদল প্রায়।

চল চঞ্চল তটিনীর জল
হীরকের মত করে ঝলমল,
কাননের তলে আলো ও ছায়ায়
আল্‌পনা শোভা পায়।
জোছনা গাহনে ধূলিময়ী ধরা
হ'ল ত্রিদিবের যেন অপ্সরা,
সে রূপ নেহারি হৃদয়েরও তমো
চ'লে গেল লহমায়!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

"স্বজাতি-প্রেম"

প্রত্যেক মনুষ্যের অনেকগুলি করিয়া কর্ত্তব্য আছে। প্রথম কর্ত্তব্য তাহার নিজের প্রতি; দ্বিতীয় কর্ত্তব্য তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি; তৃতীয় আত্মীয়স্বজনের প্রতি; চতুর্থ প্রতিবাসীর প্রতি; পঞ্চম স্বজাতির প্রতি; ষষ্ঠ দেশবাসীর প্রতি। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবাসীর নিকট হইতে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ অনেক সাহায্য পাইয়াছ; সেই সাহায্যের জন্য তুমি তাহাদের কাছে ঋণী; সেই ঋণ শোধ করিতে তুমি বাধ্য; সেই ঋণ শোধ না করিলে, তোমার নিজের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়। স্বজাতির সম্বন্ধেও তাহাই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহাদের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছ। তুমি সেই জাতির বালক অবস্থায় কি যুবা অবস্থায় তাহাদের সাহায্য, সহানুভূতি ও ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনায়, তাহাদের মঙ্গল ইচ্ছা, এই সব আশীর্ব্বাদ উপভোগ করিয়াছ; কাযেই তাঁহাদের প্রতি, তোমার একটু কর্ত্তব্য আছে। আর দেশবাসীর নিকট তুমি বিশেষ ঋণী; কেন না, এক দেশেই নদ, নদী, অধিত্যকা, উপত্যকা, আকাশ, বাতাস, সমতল ভূমি, পাহাড়, স্বভাবের শোভা ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছ; সেইটিই সর্ব্বদা মনে রাখিয়া যতদূর সম্ভব দেশের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিবে। ভগবানের ইচ্ছাও তাই। তুমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের জন্য ভাব, ভারতবর্ষের উপকারে প্রবৃত্ত হও, অন্ততঃ যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই বাঙ্গালা-দেশের জন্য, বাঙ্গালাদেশের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ কর।

পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্যের কথা তোমায় বলিয়া দিতে হইবে না। কারণ, তাঁহাদের প্রাণ-ঢালা সাহায্য না পাইলে তুমি আজ যে অবস্থায় আসিয়াছ, সেই অবস্থায় আসিতে পারিতে না। তোমাকে মানুষ করিয়া তাঁহাদিগকে যাহাতে মর্ম্মাহত না হইতে হয়, তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। আর তোমার নিজের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য আছেই; তোমাকে সর্ব্বদাই নিজ উন্নতিকল্পে কার্য্য করিতে হইবে। সরোবরে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে অনেকগুলি গোলাকার বৃত্ত উৎপন্ন হয়। প্রথমটি ছোট; তাহার পর তদপেক্ষা বড়, এই রকম করিয়া সর্ব্বশেষেরটি অত্যন্ত বৃহৎ হয়। তোমার প্রথম কর্ত্তব্য সর্ব্বক্ষুদ্র বৃত্তটির উন্নতিকল্পে, তার পর তদপেক্ষা বৃহৎ, তার পর তদপেক্ষা বৃহৎ ইত্যাদি। কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত বাঙ্গালা-দেশটির উন্নতিকল্পে তোমার কার্য্য করা উচিত। তুমি যদি মাডাগাস্কার বা অন্য কোন স্থানের বিষয়ে মাথা ঘামাও, তাহা হইলে তোমায় দোষ দিবার কোন কথা থাকিবে না, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের জন্য মন না দিলে তোমার নিজের প্রতি অন্যায় করা হয়।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে যেটিকে Clannish বলে। Scotlandবাসীদিগকে লোক সচরাচর Clannish বলে। Clannishএর তর্জ্জমা করিব জাতির প্রীতি। আমার মতে এই Clannish কথাটি যদি গুণ বলিয়া ব্যবহার হয়, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার নাই, কিন্তু দোষ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইলে ইহাতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তিনি যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যদি তাঁহার ক্ষমতায় কুলায়, তাহা হইলে নিজের পরিবারবর্গের, আত্মীয়স্বজনের এবং দেশের, যে অবস্থায় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় দেখিয়া যাওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়; আমার মতে কর্ত্তব্য।

মাদ্রাজ Precidencyতে "সেটী" বলিয়া একটি জাতি আছে। তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসাদার আর ব্যবসাদার হিসাবে পরস্পরের অগাধ বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকিলে ব্যবসা চলিতে পারে না। যে সকল লোক তোমার সহকর্ম্মী হইবে, যাহাদের লইয়া তুমি ব্যবসা করিবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করা তোমার উচিত। অনেক ইংরাজ ইংলণ্ডে থাকিয়া কর্ম্মচারীর দ্বারা কলিকাতায় ও অন্যান্য দেশে কার্য্য করিতেছে। লোকজনের উপর বিশ্বাস আছে; তাহার নিয়োজিত লোকের উপর বিশ্বাস আছে বলিয়া এইরূপ করা সম্ভব। দূরদেশে গিয়া কম-বেশী কেহই অন্যায় ব্যবহার করে না, এইরূপ বলা যায় না; যেটুকু অন্যায় করে, তাহা মারাত্মক নহে এবং যাহারা অন্যায় করে, তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক নহে। আঁসটী, কাঁটাটা খাইতে পারে, কিন্তু মাছের মাসটি মনিবের জন্য রাখিয়া দেয়। এই "সেটী" জাতির কলিকাতায় অনেকগুলি ব্যবসা আছে; ধনীরা মাদ্রাজে থাকেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা কলিকাতায় কায চালায়। কলিকাতায় তাহাদের এমন অনেক গদি আছে, যেখানে মালিক জীবনে কখনও পদার্পণ করেন নাই; নিয়োজিত লোকজনের দ্বারাই কার্য্য চলিতেছে। প্রথম যখন লোক নিযুক্ত করে, মালিক নিজের আত্মীয়-স্বজন বা নিজ পাড়ার লোকই নিযুক্ত করে। সেখানে বসুধৈব কুটুম্ব হিসাবে লোক নিযুক্ত হয় না। নিয়োজিত লোকটি কলিকাতায় আসিবার সময় তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়। দেশ হইতে আসিবার পূর্ব্বে তিন বৎসরের অর্দ্ধেক বেতন গ্রহণ করে এবং সেই টাকাটা স্ত্রীর বা অন্য অভিভাবকের হস্তে দিয়া আসে; ঐ টাকায় তিন বৎসর তাহার সংসার চলিবে। সে ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়া মালিকের কার্য্য করিতে লাগিল। তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসর পরে হিসাবপত্র লইয়া মালিকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। আবার এক জন নূতন লোক আসিল—হয় অল্প দিনের জন্য, না হয় বেশী দিনের জন্য। পরে পূর্ব্ব-নিয়োজিত ব্যক্তি দেশে গিয়া মালিককে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া দিল। হিসাব বুঝান হইলে বাকী অর্দ্ধেক বেতন একত্র বাহির করিয়া লইল। এইরূপে কলিকাতায় "সেটী" Firmগুলি চালিত হয়।

এ "সেটীরা" কাহারা? ইহারা ব্যবসাদারের জাতি। পশ্চিম-বাঙ্গালায় গন্ধবণিক বলিলে যাহা বুঝায়, বেহারে বেণিয়া বলিলে যাহা বুঝায়, U. P. তে আগরওয়ালা বলিলে যাহা বুঝায়, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় বণিক বলিলে যাহা বুঝায়, এই সেটীরাও দক্ষিণ-ভারতে Madras Presidencyতে সেই ব্যবসাদারের জাতি। এই জাতির লোক অন্য অন্য কাযও করে, চাকরী ইত্যাদিও করে। কিন্তু ইহাদের প্রধান অবলম্বন ব্যবসা। পারতপক্ষে

ইহারা ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য কায করে না। "সেটী" বলিলে ব্যবসাদারও বুঝায়, আর এক জাতির নামও বুঝায়। এই জাতি পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করে, সেই জন্য ব্যবসাদার হইতে পারিয়াছে। ব্যবসাদার হইতে গেলে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা চাই :—

(১) অগাধ পরিশ্রম।
(২) সত্যনিষ্ঠা।
(৩) ধর্ম্মনিষ্ঠা।
(৪) সত্যবাদিতা।
(৫) ভগবানে বিশ্বাস।
(৬) সততা।
(৭) পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস।

যে জাতি ব্যবসাদার হিসাবে বড় হইয়াছে, তাহার এই গুণগুলি থাকা অবশ্যম্ভাবী। এগুলি না থাকিলে ব্যবসায় বড় হইতে পারে না। সততাই সর্ব্বপ্রধান গুণ। ইহা ব্যবসাতে সম্পূর্ণরূপে খাটে। আর একটি প্রধান গুণ দেখা যায়, ব্যবসাদার জাতির বালক কখনও বোকা হয় না। সে খুব উচ্চশিক্ষিত না হইতে পারে, কারণ, উচ্চশিক্ষা প্রকৃত ব্যবসাদারের অন্তরায় হয়। কিন্তু সে মেধাবী, হুঁসিয়ার, ধার্ম্মিক ও পরিশ্রমী। কোডাক্ কেমেরা আবিষ্কারক Mr. Eastman আট বৎসর বয়সে পিতৃহারা হন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মাতার সাহায্যার্থে চাকুরী গ্রহণ করেন। কলেজে উচ্চশিক্ষার সুবিধা একবারেই হয় নাই। কিন্তু তথাপি তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া কোডাক্ কেমেরা প্রবর্ত্তন করেন। জীবনে দেড় কোটি পাউণ্ড পরহিতকর কার্য্যে দান করিয়া যান। ৭২ বৎসর বয়সে তিনি নিজ হস্তে জীবন শেষ করিয়াছিলেন। বলেন, তাঁহার মতে তাঁহার আর বাঁচিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। Croogএর জীবনকাহিনীও একই প্রকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পান নাই অথচ বিজ্ঞানের উচ্চ স্তরের জ্ঞান থাকিলে যে সব কার্য্য করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে বিজ্ঞান বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ কৃতী হইয়াছেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন। নিজের মেধাবলে কষ্টের জীবন যাপন করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ জাতির কৃতী সন্তান।

সেটীরা নিজের জাতিকে এত ভালবাসে যে, তাহা এই লেখা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

শ্যামসুন্দর সেটীর আনা, রানা, পিনা, সিনা, সেটীর এক জন কর্ম্মচারী। এই Firmটি Madrasএ স্থাপিত। কলিকাতায় উঁহাদের Branch আছে। সেই Branchএ শ্যামসুন্দর চাকুরী করিতে আসেন—তিন বৎসরের contract করিয়া। অর্দ্ধেক বেতন স্ত্রীর হাতে দিয়া আসেন। তিন বৎসর থাকিবার পর শ্যামসুন্দর মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন না, হিসাবও দিলেন না, অর্দ্ধেক মাহিনাও চাহিলেন না। কাযেই মাদ্রাজের মালিকদের সন্দেহ হইল। তাঁহারা চিঠি লিখিলেন, শ্যামসুন্দর ফিরিয়া গেলেন না। তাঁহার স্ত্রী চিঠি লিখিলে শ্যামসুন্দর কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে 'তার' আসিল, তাহারও উত্তর নাই। তখন মালিক গদিয়ান কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া দিলেন; লোক আসিয়া খাতা দেখিতে সুরু করিল, অনেক ধস্তাধস্তির পর সে খাতা দেখিতে পাইল। তখন মালিককে লিখিল—আর এক জন লোককে পাঠাইতে। কারণ, খাতায় অনেক গণ্ডগোল আছে। লোক আসিল, হিসাব দেখা গেল। হিসাব করিয়া দেখা গেল, শ্যামসুন্দর তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তহবিল তছরূপ করিয়াছেন। শ্যামসুন্দরের কলিকাতার বাসা-খরচ বেশী হইতে পারে না, এমন কি, না কামাইয়া নাপিতের পয়সা বাঁচাইয়াছেন, তবে চন্দনের চর্চ্চা ইদানীন্তন খুব বাড়িয়াছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, টাকা কি হইল? তিনি বলিলেন, ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে। কি ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় তাহার সদুত্তর দিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় কারণ বলিলেন, স্বজাতির লোককে সাহায্য করিতে গিয়া এই বিপদে পড়িয়াছেন। সেই লোকটি তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া এই বিপদে ফেলিয়া গিয়াছে।

বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, এই লোকটি শ্যামসুন্দরের কপোলকল্পিত। খুব বেশী পরিমাণে লোকসান হইলেই বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, তাহার নিম্নলিখিত কারণ চারটির একটি। (১) জুয়া যে রকমের হউক, (২) স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি, যেরূপ স্ত্রীলোকই হউক, (৩) পানে আসক্তি, যেরূপ পানীয় হউক, (৪) বিনা পরিশ্রমে রাতারাতি ধনকুবের হইবার কার্য্যে লিপ্ত হওয়া। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা গেল, শ্যামসুন্দর একটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়িয়া এই টাকাটি নষ্ট করিয়াছেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকটি উঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, তিনি বড় ঘরের শিক্ষিতা রমণী, স্বামীর প্রতি বিরক্তি হেতু সংসার ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—মনের মানুষ খুঁজিতে। এমন সময় শ্যামসুন্দরের শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি বলিলেন, তিনি বাটী ছাড়িয়াছেন, স্বামী ছাড়িয়াছেন, সংসার ছাড়িয়াছেন; কিন্তু শ্যামসুন্দরকে ছাড়িতে পারিবেন না। শ্যামসুন্দর তাঁহার মন-প্রাণ দিয়া এই প্রিয়তমার তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। আর অর্থ—সে ত হাতের ময়লা, তাহার নিজের পূর্ব্বসঞ্চিত নহে, পৈতৃকও নহে, প্রিয়তমার তুষ্টিসাধনের জন্য তাহার ব্যয় কর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কাযেই দুই বৎসরের মধ্যে মালিকের সাড়ে তিন লক্ষ টাকা উপিয়া গেল। সন্ধানের পর জানা গিয়াছিল, এই প্রিয়তমাটির ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ (অবশ্য স্ত্রীলোক) শরীর বিক্রয়ের দ্বারা সংসার চালাইয়াছে।

যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তিনি টাকার কি করিবেন? তিনি বলিলেন, গহনা, নগদ টাকা ইত্যাদিতে কুড়ি পঁচিশ হাজার আছে, তাহাই দিতে পারেন। তাহার অধিক দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। মাদ্রাজে খবর গেল। মালিক লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে পুলিসে দাও। বিশ্বাসঘাতকতার নালিস কর। তবে পুলিসের মারফৎ চালান দিও না। হাকিমের কাছে দরখাস্ত করিয়া case চালাও। তাঁহারা আরও লিখিয়া পাঠাইলেন, ব্যারিষ্টারপ্রবর আশুতোষ চৌধুরী—ইনি পরে স্যার আশুতোষ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ও উকীল তারক সাধুকে নিযুক্ত করা হউক। হুকুমমত তাহাই করা হইল। আশুতোষ চৌধুরী ও আমি-দুই জনে মিলিয়া দরখাস্ত করিলাম। ওয়ারেণ্ট বাহির হইল,

মাদ্রাজ হইতে এক জন উকীলও আসিয়াছিলেন। শুধু পা, মাথা কামান, গলায় উত্তরীয়, শ্বেত ও লাল চন্দনের ফোঁটা, গলায় হার, নাম ধরিওয়ালা জাক্ পুরন্দর। মামলা খুব জোর চলিতে লাগিল। আসামী জামিনদারের সুবিধা করিতে পারিলেন না; কাযেই হাজতে রহিয়া গেলেন। পাঁচ সাত দিন মামলা শুনানীর পর মাদ্রাজ হইতে তাঁহাদের স্বজাতীয় কয়টি ভদ্রলোক আসিলেন, তাঁহারা পদস্থ লোক। আসিবার পর তাঁহারা আসামীর জামিনের বন্দোবস্ত করিলেন এবং বলিলেন, আসামীর মুখ হইতে জবাব না শুনিলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিবেন না। আসামী জামিনে খালাস পাইলে তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, তাঁহার যা কিছু টাকা-কড়ি সমস্তই অযাচিত প্রেমের দায়ে নষ্ট হইয়াছে। যে ভদ্রলোকদ্বয় মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মালিককে টেলিগ্রাম করিলেন, "কলিকাতায় আইস।" তিনি আসিলে তাঁহাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

মালিক চারিগোপাল। (প্রথম ভদ্রলোককে উদ্দেশ করিয়া) দেখুন ত, লোকটা কি নেমকহারাম। আমার এতগুলি টাকা নষ্ট করিয়া দিল। তাহার ধর্ম্মপত্নী আমার বাড়ীতে আসিয়া বিশেষ কান্নাকাটি করিয়া গেল। তাহার স্বামীর পাপের জন্য তাকে যেন সাজা দেওয়া না হয়। কারণ, সে নিজে ও তাহার শাশুড়ী সর্ব্বসমেত ছেলে-মেয়ে লইয়া চারটি প্রাণী। সে জেলে গেলে এতগুলি লোক না খাইয়া মরিবে। কিন্তু ইহাকে এই রকম ছাড়িয়া দিলে আমাদের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে।

প্রথম ভদ্রলোক। চারিগোপাল বাবু! এ রকম অন্যায় ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। অকৃতজ্ঞ মানুষ পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে এক জন ধরা পড়ে। বাকী অকৃতজ্ঞ লোক সাধু সাজিয়া চলিয়া যায়।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ইহাকে জেল খাটাইয়া কি সুবিধা হইবে? ইহার স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও মাতাকে নির্য্যাতন করা হইবে।

চারিগোপাল। এইরূপ ভাবিলে ত চোরের সাজা হয় না।

প্রথম ভদ্রলোক। চারিগোপাল বাবু! আপনি কত দিন ব্যবসা করিতেছেন, কত টাকা এই কর্ম্মচারীর হাত হইতে উপার্জ্জন করিয়াছেন। একটি কর্ম্মচারী যদি অন্যায় করিয়া থাকে তাহাকে মাপ করিলে ভগবান্ আপনার মঙ্গল করিবেন। ইহাকে ছাড়িয়া দিলে অন্ততঃ এক জন দেশী সেটী জেলের বাহিরে রহিয়া গেল। চুরি করিয়া মানুষ নষ্ট হয়, দয়া করিলে কেহ কখনও নষ্ট হয় না। আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, সেটী জাতির মঙ্গলের জন্য ইহাকে ছাড়িয়া দিন।

সেই সময় প্রথম ভদ্রলোকটি শ্যামসুন্দরকে সেই স্থানে ডাকিলেন। শ্যামসুন্দর আসিয়া চারিগোপালের পা দুটি ধরিয়া বলিলেন যে, সাজা ইচ্ছামত আমাকে দিন, মারুন, কাটুন, রাখুন, যা ইচ্ছা তাই করুন, আমাকে জেলে দিয়া আমার পুত্রকন্যাদিগকে অনাথ করিবেন না।

অনেক বাগবিতণ্ডার পর শ্যামসুন্দর গহনা, নগদ টাকা ইত্যাদিতে ২৫০০০৲ টাকা আনিয়া দিলেন। ঐ টাকা পাইয়া চারিগোপাল তাঁহাকে মাপ করিলেন। তার পরদিন আদালতে আসিয়া মামলা তুলিয়া লওয়া হইল। আসামী অব্যাহতি পাইল। তাঁহারা সকলে মাদ্রাজে চলিয়া গেলেন। শ্যামসুন্দরের যাইবার গাড়ীভাড়া নাই, তাহাও চারিগোপাল বাবু দিলেন এবং ইহাও স্থির হইল যে, এক বৎসর শ্যামসুন্দর মাদ্রাজে কায করিবে; পেটে খাইতে পাইবে; পরনে কাপড় পাইবে; আর স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য কিঞ্চিৎ মাসহারা পাইবে।

আমরা সচরাচর অনেক সময় বড় বড় কথা শুনিতে পাই। ন্যায়বিচার, চুল চিরিয়া বিচার, পাপীর সাজা, অকৃতজ্ঞের সাজা ইত্যাদি। কিন্তু ক্ষমার গুণ অনেক সময় আমরা বুঝি না; ক্ষমার স্থান এইগুলির অপেক্ষা অনেক উচ্চে; যখন প্রত্যেকেই আমরা ক্ষমার ভিখারী, তখন অপরকে ক্ষমা করিতে কখনও কার্পণ্য করা উচিত নহে।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

ভারতীয় প্রথম রেল এজেণ্ট

রায় বাহাদুর বেহার সিং

পিশাচের নাগপাশ

তৃতীয় প্রবাহ

অন্ধকারে ছায়ামূর্ত্তি

বয়েলের চেতনা-সঞ্চার হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে পড়িয়া আছেন ; তাঁহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাতেও বন্ধন মোচন করিতে পারিলেন না। তিনি মৃদু দীপালোকে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন, সেই কক্ষটি কোন নদীর তীরবর্ত্তী গুদাম-ঘর। মিথ্যাবাদী মাজাডো কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এই গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল এবং কোন্ সুযোগে মাজাডোকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন, এই চিন্তায় তিনি অধীর হইলেন। কিছুকাল পরে সেই কক্ষের অন্ধকার তাঁহার চক্ষুতে সহিয়া গেল, তিনি তাঁহার অদূরে আর একটি লোককে তাঁহার ন্যায় রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। তাহার কণ্ঠনিঃসৃত যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সেই লোকটি সহসা মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "কে ওখানে পড়িয়া আছ ? জন বয়েল কি ?" বয়েল তাহার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি। আমি জন বয়েল ; কিন্তু তুমি কে ?"

মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "আমি ? আমি মাজাডো।"

মাজাডোর কথা শুনিয়া জন বয়েল স্তম্ভিত হইলেন ; তিনি মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মাজাডো ? তুমিও এখানে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছ ! ব্যাপার কি ?"

মাজাডো বলিল, "আমাকেও উহারা বাঁধিয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে !"

বয়েল বলিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় বটে ! তাহা হইলে আমার এই দুর্দ্দশার জন্য তুমিই দায়ী নহ ?"

"না মহাশয়, আমি আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতাম ; কিন্তু এখন—" কথা শেষ না করিয়া সে সহসা যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিয়া নীরব হইল।

জন বয়েল বলিলেন, "কাহারা আমাদিগকে এভাবে রজ্জুবদ্ধ করিয়া এখানে ফেলিয়া রাখিয়াছে ? তাহাদের উদ্দেশ্য কি ? তাহারা কি তোমার পরিচিত ?"

মাজাডো বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমি তাহাদের চিনি ; তাহারা আমারই স্বদেশবাসী। তাহারা আপনাকেও চেনে। অপহৃত ধনরত্নাদি উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই তাহারা আমাদের দুই জনকেই বন্দী করিয়াছে। তাহাদের কবল হইতে আমাদের উদ্ধারের কোন আশা আছে বলিয়া মনে হয় না।"

জন বয়েল বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া প্রকৃত ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিলাম। তুমি তাহাদের প্রতারিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলে, এখন তাহাদের ফাঁদে ধরা পড়িয়াছ ; সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ ও মুখ বিবর্ণ হইল। উদ্বেগে ও আশঙ্কায় তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল। মাজাডোর সকল কথাই তাঁহার স্মরণ হইল। তাঁহার মনে পড়িল, যদি তিনি সেই দিন প্রভাতে মুক্তিলাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অতীত জীবনের সকল গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, মাজাডোর ব্যবস্থা অনুসারে তাহাকে আততায়ীদের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব-কলঙ্ককাহিনী প্রচারিত হইলে ইংলণ্ডের জনসমাজে তিনি কি করিয়া মুখ দেখাইবেন ?

তিনি তীব্রস্বরে মাজাডোকে বলিলেন, "মূর্খ ! তুমি বুদ্ধিদোষে নিজের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে আমারও কি অনিষ্ট করিলে, তাহা কি এখনও বুঝিতে পার নাই ? তোমার বন্ধুটি আজই প্রভাতের দৈনিকে সকল কথা প্রকাশ করিবে। আমি কে এবং কি, তাহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সকলেই জানিতে পারিবে। আমার মান-সম্ভ্রম-রক্ষার কোন উপায়ই দেখিতেছি না !"

মাজাডো বলিল, "আমার সে কথা সত্য নয় ; আমি আপনার সঙ্গে একটু চালাকি করিয়াছিলাম। আমি কিছুই লিখিয়া পুলিসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করি নাই এবং আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতেরও বন্দোবস্ত করি নাই।"

ইহা শুনিয়া জন বয়েল কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোন কোন পাটানিয়াবাসী তাঁহার প্রতারণার কথা জানিত। তাহারা হীরকরত্নাদিপূর্ণ সেই সিন্দুকটি উদ্ধারের চেষ্টায় দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু মাজাডো সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সন্ধান পাইয়া ধনরত্নগুলি স্বয়ং আত্মসাৎ করিবার সঙ্কল্প

করিয়াছিল, এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাও করিয়াছিল, এখন সে ধরা পড়িয়া প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে।

বয়েল যখন এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় দুই জন লোক আলো লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বয়েল তাহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাহারা পাটানিয়াবাসী। আগন্তুকদ্বয়ের এক জন তাহার সঙ্গীকে বলিল, "সেনাপতি, কয়েদীরা চেতনা লাভ করিয়াছে; উহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল।"

আগন্তুকদ্বয়ের এক জনের বেশ-ভূষার পারিপাট্য দেখিয়া তাঁহাকে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়াই মনে হইল। তাঁহাকেই তাঁহার সঙ্গী 'সেনাপতি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। তিনি বন্দিদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্রূপভরে বলিলেন, "কাপ্তেন বিম্ম যে! কে জানিত, তোমার সঙ্গে এখানে আমাদের এ ভাবে দেখা হইবে?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বয়েল চমকাইয়া উঠিলেন, তাঁহার নির্ভীক হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইল। তিনি শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলভেটী—তুমি এখানে?"

সেনাপতি বলিলেন, "হাঁ, আমিই সেনাপতি—কলভেটী; সন্দেহের কোন কারণ আছে কি?"

বহুপূর্ব্বের নানা অপ্রীতিকর ঘটনার কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, তাঁহার আত্মসংবরণ করা কঠিন হইল। বিদ্রোহের সময় এই কলভেটীর পৈশাচিক অত্যাচারের কথা তাঁহার মনে পড়িল। এই নরপশুর আদেশে অসংখ্য অসহায়, অনশনক্লিষ্ট রমণী ও বালক-বালিকা সশস্ত্র সৈনিকবর্গ দ্বারা উৎপীড়িত ও নিহত হইয়াছিল। তরুণ যুবক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধরা ইহারই নিষ্ঠুর আদেশে দলে দলে মৃত্যুকবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই পিশাচের কবলে পড়িয়া তাঁহাকে কিরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভয়ে আড়ষ্ট হইলেন।

তাঁহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া কলভেটী ক্রূরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কাপ্তেন, নীরব রহিলে কেন? এ নির্ব্বোধটার সাহায্যে আমরা তোমাকে হাতে পাইয়াছি, তোমার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ?"

"কি আর হইবে? আমার হাত-পা শৃঙ্খলিত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ নিরুপায় ব্যক্তির কণ্ঠচ্ছেদন করিবে। তোমার মত নিষ্ঠুর কাপুরুষের নিকট ইহার অধিক আর কি আশা করিতে পারি?"

কলভেটী বলিলেন, "তোমার কণ্ঠচ্ছেদন আমার পক্ষে যতই প্রীতিকর হউক, তাহাতে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না। এই জন্য প্রথমে তোমার সঙ্গে কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে বুঝাপড়া করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।"

বয়েল বলিলেন, "এখন তুমি কি করিতে চাও? স্মরণ রাখিও, এ দেশের পুলিসকে তোমাদের দেশের পুলিসের মত সহজে বশীভূত করা যায় না।"

কলভেটী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ঐরূপ ধারণা সত্য নহে। নরহন্তাকে বাঁধিয়াছি, ইহাতেও পুলিসকে ভয় করিতে হইবে? তোমার চিন্তার ধারা অদ্ভুত বটে!"

"তোমার মতলব—এখন তুমি কি করিবে?"

কলভেটী একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "উহা শুনিবার জন্য তোমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে, আমারও তাহা বলিতে আপত্তি নাই। প্রথমতঃ তোমাকে এই অস্থায়ী কারাকক্ষ হইতে আমাদের মানোয়ারী জাহাজে লইয়া যাইব, সেই জাহাজখানি এই রাজ্যের অধিকার-সীমার বাহিরে সাগরবক্ষে অপেক্ষা করিতেছে। আমরা যে ধনরত্নাদি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, তাহা তুমি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহার আমূল বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করা হইবে। তুমি নিশ্চিতই আনন্দের সহিত সেই সকল কথা প্রকাশ করিবে; কিন্তু যদি তুমি কোন কারণে তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হও, তাহা লইলে কি উপায়ে সেই কথা বাহির করিয়া লইতে হয়, তাহা আমরা ভালই জানি, এবং সেই উপায় যে বেশ মোলায়েম নহে—ইহাও তোমার সুবিদিত। যে মূর্খ বাটপাড় আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া আমাদের স্থাপ্যধন সমস্তই আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে। তাহার পর তোমার দ্বারা আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইলে তোমার ইচ্ছা হইবে, গুলী করিয়া তোমাকেও আমরা হত্যা করি; কারণ, এইরূপ মৃত্যুই তোমার তখন প্রার্থনীয় মনে হইবে।"

বয়েল সরোষে উত্তর দিলেন, "ওরে নরপশু! তোরা যত খুসী আমাকে পীড়ন কর্, তাহাতে একটা কথাও

আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না। শপথ করিয়া বলিতেছি, কোন কথা আমি বলিব না।”

কলভেটী সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার ওষ্ঠ পৈশাচিক হাস্যে রঞ্জিত হইল; তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “সত্য না কি? কাপ্তেন, জানি, তোমার সাহসের অভাব নাই, তুমি সকল নির্য্যাতন নির্ব্বাক্‌ভাবে সহ্য করিতে পারিবে; কিন্তু কোন একটি রমণী যখন নিদারুণ উৎপীড়নে, অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিবে, তখন তাহার সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া তুমি বোধ হয় নির্ব্বাক্ থাকিতে পারিবে না।”

কলভেটীর যে অনুচরটি অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি তাহাকে সংক্ষিপ্ত আদেশ জ্ঞাপন করিলে সে লণ্ঠনটি তুলিয়া লইয়া, সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে সহসা সেই দিকে নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল।

সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া বয়েলের মুখ ক্রোধে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, তিনি বিকৃতস্বরে বলিলেন, “ওরে নরাধম! এ যে আমার কন্যার আর্ত্তনাদ! শোন্ ছুঁচো, শীঘ্র তাহাকে ছাড়িয়া দে! নিরপরাধ বালিকাকে কেন পীড়ন করিতেছিস্, কাপুরুষ!”—তিনি বন্ধনমোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

কলভেটী বিদ্রূপহাস্যে বলিলেন, “আমাদের কোন কাযে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।”

বয়েল বলিলেন, “ওরে শয়তান! উহাকে তোরা কি কৌশলে আয়ত্ত করিয়াছিস্? উহাকে ধরিবার উদ্দেশ্য কি?”

কলভেটী বলিলেন, “কি কৌশলে উহাকে ধরিলাম?—অত্যন্ত সহজে। আমি তোমার বাড়ীতে একটা আরদালী পাঠাইয়াছিলাম; সে তোমার সুন্দরী কন্যাকে জানাইল, ডকে তোমার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এ জন্য তাহার সেখানে অবিলম্বে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। মাজাডো যে মোটরে তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছিল, সেই গাড়ীতেই তোমার কন্যা নির্ব্বিঘ্নে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তবে তোমাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য এইমাত্র বলিতে পারি যে, তুমি আমার আদেশ পালন করিলে তোমার কন্যার কোন অনিষ্ট হইবে না। আমি নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করিতে জানি, বিশেষতঃ তোমার কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি যে, তাহার অনিষ্ট করি, এ ইচ্ছা আমার মনে স্থান পায় নাই। বস্তুতঃ তাহার শুভাশুভ তোমারই ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে, কাপ্তেন!”

বয়েল বলিলেন, “কিন্তু আমি যে তাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম? তুমি তাহাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াই তাহার প্রতি পীড়ন আরম্ভ করিয়াছ,—ইহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার?”

কলভেটী কোন কথা না বলিয়া বয়েলকে বিদ্রূপসূচক অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

কলভেটীর মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইল। তিনি পূর্ব্বে এরূপ সাফল্যলাভের আশা করেন নাই। এক সময় তাঁহার সহযোগী মাজাডোর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অনন্যসাধারণ দক্ষতার সহিত সকল অসুবিধা দূর করিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে কাপ্তেন বয়েল ও তাঁহার কন্যা উভয়েই তাঁহার করকবলিত। কাপ্তেনের সুদৃঢ় সঙ্কল্প বিচলিত হইবে, তাহারও লক্ষণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন; তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতাও তাঁহার ব্যবহারে পরিস্ফুট হইয়াছে। কলভেটী জানিতেন, কাপ্তেন তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ—সেই সকল ধনরত্ন কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনি কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও প্রকাশ করিতেন না। তিনি সকল উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কিন্তু বয়েল তাঁহার একমাত্র কন্যাকে প্রাণাধিক স্নেহের পাত্রী মনে করিতেন; তাহার অপমানে বা উৎপীড়নে তিনি অধীর হইবেন এবং তাহার উদ্ধারসাধনের জন্য তিনি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাঁহাকে মুখ খুলিতেই হইবে, ইহা বুঝিতে পারায় কলভেটীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল; তাঁহার ধারণা হইল, বয়েলের কন্যাকে কৌশলে ধরিয়া আনা অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কার্য্য হইয়াছে। তাঁহার আশা অতি সহজেই পূর্ণ হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ রহিল না। তাঁহার অধিকতর আনন্দের কারণ এই যে, বয়েলের যুবতী কন্যা অপরূপ সুন্দরী, সকলে একবাক্যে তাহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিত। কলভেটী নারীর রূপের অসাধারণ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ‘বীর বিনা রমণী-রতন কারে আর শোভা পায় রে!’ নিজেকে তিনি অসামান্য বীরপুরুষ মনে

করিতেন। তাঁহার স্বদেশে শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে হস্তচ্যুত হীরকরত্নগুলি তাঁহার হস্তগত হইবে এবং চাতুর্য্যবলে বয়েলের সুন্দরী কন্যাকে তিনি বশীভূত করিতে পারিবেন।

—

চতুর্থ প্রবাহ

ডিটেক্‌টিভ-সকাশে

কলভেটী গুদাম-ঘর ত্যাগ করিয়া গলির ভিতর অগ্রসর হইবার সময় এই সকল প্রীতিকর চিন্তায় এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিবার সময় কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেরূপ অবসর ছিল না; তিনি তখন স্বার্থচিন্তায় বিভোর। যদি তিনি চলিতে চলিতে চারিদিকে দৃষ্টিপাতের অবসর পাইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, একটি ছায়াবৎ মূর্ত্তি সহসা দেওয়ালের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। লোকটির আকার ও পরিচ্ছদ দেখিলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যাইত—সে ইংরাজ নাবিক। কলভেটী যখন পথে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় ইংরাজ নাবিকটি তাঁহার অনুসরণে বিরত হইয়া কিছু দূরে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে কি ভাবিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে সে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে অন্য একটি পথে চলিতে আরম্ভ করিল।

নাবিকটি অস্ফুটস্বরে বলিতেছিল, "তাই ত, এখন করি কি? কোন্ পথে চলিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যদি এই ব্যাপারে বয়েল একাকী বিজড়িত থাকিত, তাহা হইলে কলভেটী তাহার গলায় ছুরী দিলেও আমি তাহাতে বাধা দিতাম না, বরং বিশ্বাসঘাতক বয়েল সেই দুর্দ্দিনে আমার কি দুর্দ্দশা করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তাহার মুণ্ডপাতে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতাম। কিন্তু লম্পট কলভেটী বয়েলের ঐ সুন্দরী সরলা যুবতী কন্যাকে প্রতারণার সাহায্যে এখানে ধরিয়া আনায় আমি—না, না, সার্টি লাইটওয়ে কোন কুমারীকে বিপন্ন দেখিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টায় বিরত হইয়াছে, তাহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে, কেহ কোন দিন তাহার এরূপ দুর্নাম প্রচার করিতে পারে নাই। না, তাহা হইতেই পারে না। ঐ মেয়েটির ত কোন অপরাধ নাই; নিরপরাধ নারীর নির্য্যাতন আমার অসহ্য। কিন্তু এখন করি কি? কি উপায়ে উহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব? কলভেটী প্রবল পরাক্রান্ত, ধনবান্, তাহার জনবলেরও অভাব নাই, আর আমি দরিদ্র নাবিক; কিন্তু আমি অকম্পিত হস্তে ক্ষুর চালাইতে পারি, বন্দুক-পিস্তল অপেক্ষা আমার হাতের ক্ষুর অব্যর্থ, তাহাতে নিঃশব্দে কায শেষ হয়; তবে কি ক্ষুরই চালাইব? কিন্তু তাহাতে আমার স্বার্থের হানি হইবে। মেয়েটার চাঁদ-মুখের দিকে চাহিয়া সেই বিপুল ধন-রত্ন উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিব? আমার এত কালের কামনা বিসর্জ্জন করিব?"

মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে সেই নাবিক দূরবর্ত্তী একটি জনাকীর্ণ রাজপথে প্রবেশ করিল এবং ঘুরিতে ঘুরিতে একটা মদের আড্ডায় উপস্থিত হইল। সেখানে সে এক গ্লাস বিয়ার লইয়া গলায় ঢালিল এবং একখানা চেয়ারে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। সে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কলভেটী ও জন্ বয়েলের যে সকল কথা শুনিয়াছিল, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর সে লণ্ডনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ মিঃ ফেরার লকের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার সোহো পল্লীর ভবনে উপস্থিত হইল।

ডিটেক্‌টিভ ফেরার লক তাহার নামের কার্ডখানিতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, আগন্তুকের নাম সার্টি লাইটওয়ে। নামটি অপরিচিত, তথাপি তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তাঁহার আদেশে তাঁহার আরদালী তাহাকে উপবেশনকক্ষে রাখিয়া প্রস্থান করিলে তিনি তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

মিঃ লক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি পূর্ব্বেই আগন্তুকের নাম জানিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পরিচয় শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইল, সে বহুদর্শী ও কর্ম্মঠ নাবিক। কিন্তু সে তাঁহার নিকট যে সকল কথা প্রকাশ করিল, তাহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। মিঃ লক বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ডিটেক্‌টিভ হইলেও এই শ্রেণীর অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা পূর্ব্বে দুই একবার প্রতারিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বিপন্নের

কথা জানাইয়া তাঁহার নিকট অনেক টাকা ধার লইয়াছিল, তাহার পর পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা বা ঋণ পরিশোধ করা প্রয়োজন মনে করে নাই। এই জন্য তিনি এই শ্রেণীর লোকের কথা সহজে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি উহাদের সহিত সতর্কভাবেই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এই নাবিকের কাহিনী অত্যন্ত বিস্ময়কর ও বিচিত্র বলিয়াই তাঁহার মনে হইল।

মিঃ লক নাবিকের সকল কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার মতে মাজাডো কেবল তোমার সঙ্গেই নহে, তাহার স্বদেশবাসীদের সহিতও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল ?"

লাইটওয়ে বলিল, "হাঁ মহাশয়, আপনার কথা সত্য। আমরা উভয়ে লণ্ডনে আসিবার পর তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, আমাকে প্রতারিত করাই তাহার উদ্দেশ্য। এই জন্য আমি তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম; অবশেষে তাহার দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলাম। বয়েল যে মোটর-গাড়ীতে মাজাডোর আড্ডায় নীত হইয়াছিল, আমি সেই গাড়ীর পশ্চাতে উঠিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার পর মাজাডো যখন বয়েলের সঙ্গে তাহার অতীত জীবনের অপকীর্ত্তির আলোচনা করিতেছিল, তখন আমি সেই কক্ষের দ্বারের এক পাশে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম। উঃ, মাজাডো কি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী! সে ক্যাপ্টেন বয়েলকে অকুণ্ঠিতভাবে বলিল, প্রিন্সিপেসা জাহাজ ডুবিবার সময় সে সেই জাহাজে ছিল, এবং বয়েল তাহাকেই গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে মনে করিয়া তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়াছিল! কিন্তু বয়েল যাহাকে গুলী করিয়াছিল—প্রকৃতপক্ষে আমিই সেই নাবিক। সে আমাকেই গুলী করিয়া, মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া গিয়াছিল, কারণ, সেই দুঃসময়ে আমিই তাহার সঙ্গে ছিলাম। আমার কথা যে সত্য, ইহার প্রমাণ—বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনাকে দেখাইতেছি; তাহা দেখিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, মাজাডো কি ভাবে আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে।"

লাইটওয়ে তাহার জ্যাকেটের বোতাম খুলিয়া সার্টের কিয়দংশ বুকের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিল, এবং তাহার প্রশস্ত বক্ষে গুলীর যে পুরাতন ক্ষতচিহ্ন ছিল, তাহাতে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিল। তাহার পর সে উত্তেজিতস্বরে বলিল, "বয়েল আমার পিঠে যে গুলী মারিয়াছিল, তাহা আমার বুক ফুটা করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। সেই গুলী আর একটু নীচে বিঁধিলে আমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইত; তাহা হইলে আজ আমাকে এখানে আসিয়া তাহার সেই পৈশাচিক অত্যাচারের কথা আপনাকে শুনাইতে হইত না।"

ডিটেক্টিভ মিঃ লক এই চাক্ষুষ প্রমাণ হঠাৎ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল ? তুমি কি মাজাডো ও বয়েলকে আক্রান্ত হইতে দেখিলে এবং আততায়ীদের অনুসরণ করিলে ?"

লাইটওয়ে বলিল, "হাঁ মহাশয়, এবারও আমি পূর্ব্বের মত মোটরের পিছনে লগেজ বহিবার আধারের উপর বসিয়া চলিতে লাগিলাম; কিছুকাল পরে তাহারা ওয়াপিংএর বন্দরের অদূরবর্ত্তী একটি গুদাম-ঘরে নীত হইল। সেখানেও আমি লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, শীঘ্রই তাহারা জাহাজ লইয়া পাটানিয়ায় যাত্রা করিবে। সেখানে সেনাপতি কলভেটী বয়েলকে ভয় দেখাইয়া সকল কথা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে যখন বয়েলের মুখ হইতে তাহার গুপ্ত কথা বাহির করিতে পারিল না, বয়েল তাহার তর্জ্জন-গর্জ্জনে ও ভয়-প্রদর্শনে নির্ব্বাক্ রহিল, তখন সেই কাপুরুষ, সেনাপতি নামের কলঙ্ক কলভেটী বয়েলের সুন্দরী মেয়েটির অপমান ও পীড়ন আরম্ভ করিল। সেই নিরপরাধ, সরলা তরুণীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমার রক্ত গরম হইয়া উঠিল; আমার হাত নিশ্‌পিশ্‌ করিতে লাগিল।"

মিঃ লক বলিলেন, "কলভেটীকে যখন এই রকম বে-আইনী কায করিতে দেখিলে, তখন তুমি পুলিসে সংবাদ দিলে না কেন ? কলভেটীর কবল হইতে মাজাডো, বয়েল ও তাহার তরুণী কন্যার উদ্ধারের জন্য পুলিসের সাহায্য লওয়াই ত তোমার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হওয়া উচিত ছিল।"

লাইটওয়ে মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "সে কথা আমার মনে হইলেও, কাযটি আমার পক্ষে কিরূপ দুরূহ, তাহাও আমি ভুলিতে পারি নাই। পুলিসের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র ঘনিষ্ঠতা নাই, এবং কোন বিষয়ে তাহাদের

সাহায্য গ্রহণ করিতেও আমার আগ্রহ হয় না। আমি কখন কোন অন্যায় কায করিয়া পুলিসের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম, এরূপ সন্দেহ আপনার মনে স্থান পাইলে আমার প্রতি অবিচার করা হইবে; তবে আমি আপনার নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, অনেক দিন পূর্ব্বে রাটক্লিফের সদর রাস্তায় পুলিসের একটা অন্যায় জুলুম দেখিয়া আমাকে তাহাদের সঙ্গে মুখোমুখী ছাড়িয়া শেষে হাতাহাতি করিতে হইয়াছিল; আমার দুই একটা ঘুসিতে কাহারও নাক ফাটিয়াছিল, কাহারও ঠোঁট ফাটিয়াছিল। তাহার পর আমি অবস্থা বুঝিয়া সরিয়া পড়ি, এবং সেই সময় হইতে পুলিসের কাছে ঘেঁসিতে ভয় পাই; কিন্তু আপনাদের আইনে যাহাকে অপরাধ বলে, সে রকম কোন কায এ দেশে আমি কোন দিন করি নাই। যাহা হউক, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে অভিযোগ করিব, এ ইচ্ছাও আমার নাই; অথচ আমার মনে হইল, মিস্ বয়েলকে কোনরূপে সাহায্য করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু কাহার সাহায্যে এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিব, কে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে দুই এক পাঁইট আরোক আমার পেটে পড়িতেই বুদ্ধি খুলিয়া গেল, মনে মনে বলিলাম, "মিঃ ফেরার লকই এই ভার গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি; তিনি সদাশয়, পরদুঃখকাতর, দয়ালু, এ কাযে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আপনার নিকট আসিলাম।"

মিঃ লক তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "দেখ লাইটওয়ে, তোমার এই কাহিনী যতই অদ্ভুত হউক, আমি তোমার কথাগুলি বিশ্বাস করিয়াছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারিব কি না, তাহা তোমাকে কয়েক মিনিট পরে বলিতেছি, ততক্ষণ তুমি ঐ চুরুটের বাক্স হইতে একটা চুরুট লইয়া ধূমপান কর। আমি তাড়াতাড়ি একটা কায শেষ করিয়া আসি।"

মিঃ লক কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া বয়েলের বাড়ীতে টেলিফোন করিয়া জানিতে পারিলেন, বয়েল বা তাঁহার কন্যা বাড়ীতে নাই। মিস্ বয়েল তাহার পিতার কোন আকস্মিক দুঃসংবাদ পাইয়া একখানি অপরিচিত মোটরকারে গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার পর তাঁহাদের কাহারও কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মিঃ লক এইভাবে লাইটওয়ের উক্তির যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া তাহার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি সেই গুদামঘর চেন? আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিবে?"

লাইটওয়ে বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমি আপনাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিব। আপনি আসুন।"

মিঃ লক তাঁহার সহকারী জ্যাককে বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া একখানি মোটরকারে লাইটওয়ে সহ ওয়াপিংএ যাত্রা করিলেন। মিঃ লক চলিতে চলিতে লাইটওয়ের বিবৃত কাহিনী মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বয়েলের গুলী খাইয়াও যে জীবিত ছিল এবং তাহার পর ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে মাজাডো নহে, লাইটওয়ে। লাইটওয়েকেই বয়েল তাহার গুলার আঘাতে মৃত মনে করিয়াছিল। লাইটওয়ে যে দীর্ঘকালের মধ্যে বয়েলকে বিচারালয়ে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করে নাই বা গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানে সেই দূরদেশে যাত্রা করে নাই, তাহার কারণ, সে বলিয়াছিল, সে তখন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল; তাহার পর তাহার ক্ষত শুষ্ক হইলে সে তিমি শিকারের জাহাজে তিন বৎসরের জন্য দূরদেশে গমন করিয়াছিল। তাহার পর সে কেলিসোতে প্রত্যাগমন করিলে সেখানে কোন ব্যক্তির সহিত দাঙ্গা করিয়া তিন বৎসরের জন্য তাহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে সে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বয়েলের বিশ্বাসঘাতকতার কথা কর্তৃপক্ষের গোচর করিলে তাঁহারা তাহার অভিযোগে কর্ণপাত করেন নাই; অবশেষে মাজাডোর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছিল এবং তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বয়েলের সন্ধানে ইংলণ্ডে আসিয়াছিল। গুপ্ত ধনরত্নগুলি সে স্বয়ং আত্মসাৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বদেশীয় সহকর্ম্মীরা তাহার গতিবিধি কিরূপ সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রেমে বিপত্তি

১

কৌতুকের পাত্র যখন আর কেহ হয়, তখনই আমরা আনন্দ অনুভব করি, তথাপি এই কাহিনী কেন বলিতেছি, ভাবিয়া পাই না। হয় ত প্রেমের যে বিদ্যুৎস্পর্শ পাইয়াছি, তাহার বিচিত্র মোহ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।

আসন্ন সন্ধ্যার মৌন মাধুরীর মাঝে বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরের দ্বিতলে দাঁড়াইয়া অতীতের ভাব-গরিমা মুগ্ধচিত্তে অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। তথাগতের সাধনায় উজ্জ্বল বজ্রাসনের দিকে চাহিতেই চলচ্চিত্রের ছবির মত সমস্ত বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাস মনের আয়নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছিল।

পশ্চাতে তরল হাস্যের কল-ঝঙ্কার আমার স্বপ্ন দূর করিয়া দিল। চাহিয়া দেখিলাম, তন্বী যুবতী পিঁয়াজ-রঙা শাড়ী পরিয়া সুন্দর গতিভঙ্গে আসিতেছে। যুবতীর শালীনতা ও সৌম্যমূর্তি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কোথাও কোনও জড়িমা নাই। সহস্রদল স্বর্ণ-কমলের ন্যায় যৌবনের বিকচ লাবণ্য তাহার সারা অঙ্গে খেলিয়া যাইতেছিল। সজ্জায় বিলাস-ভঙ্গিমা নাই অথবা রুচি-সৌষ্ঠবে তাহা অতুলনীয়। পলকমাত্র দেখিয়া দৃষ্টি ফিরাইতেছিলাম, এমন সময় রমণী মধুর কণ্ঠে কহিল, "কি নিশীথদা! আমায় চিনতে পারছ না?"

আরক্ত অধরে কৌতুক-রেখা বিজলী-লেখার মত চমকিয়া গেল।

বিস্ময়ে ফিরিয়া দেখিলাম, সে সুনন্দা!

নিমেষমধ্যে অন্তরে গত জীবনের এক পর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। হাস্য-চপল, ভাব-করুণ সেই দিনগুলি যেন সুদূর আকাশের কোলে অদৃশ্য পটুয়ার হাতে আঁকা নানা বিচিত্র-বর্ণবহুল ছবির রাশি।

চমকিত কণ্ঠ হইতে অজ্ঞাতেই বাহির হইল, "কে, সুনন্দা? তুমি এখানে?"

"কেন, এখানে কি পুরুষদেরই একচেটিয়া অধিকার?"

নব্য নারীর সুর। পুরুষের সেবাকেই নারী সারা জীবনের কাম্য মনে করে না। গৃহিণী ও জননীর কোমল স্নেহমধুর সম্বন্ধেই শুধু যাহারা তৃপ্ত নহে, জীবনের পথে বিপথে যাহারা চলিতে চাহে, এ যেন তাহাদেরই বাণী!

ক্রোধ-মিশ্রিত বিস্ময়ে উত্তর দিলাম, "না, সুনন্দা, তোমার রাগের কারণ ত কিছুই হয় নি। পুরুষ নারীর অধিকার-সমস্যার জটিল তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করবার দুঃসাহস আজ আমার মোটেই নেই!—"

আমার কথায় বাধা দিয়া, কৃষ্ণতার বড় বড় চক্ষু দুইটি আমার মুখে নিবদ্ধ করিয়া উৎসুক স্বরে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন? আর্য্য রমণীরা যে গৃহদীপ্তি, পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা সমাজ তোমার হিন্দু সমাজ, যেখানে নারী কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি, তোমার সে সব উঁচু উঁচু থিওরিগুলি কি হ'ল, নিশীথদা? তোমার বক্তৃতায় যে আমাদের কাণ দিনরাত ঝালাপালা হ'ত? সে সব কি হ'ল?"

মনে হইল, প্রতাপের মত বলি—তুমি কি বুঝিবে নারী? যাহারা এ জীবনে বৃহতের পশ্চাতে ছুটিয়াছে, কি নিষ্ঠুর ব্যর্থতা তাহাদের, অন্তরে ও বাহিরে কত বড় আঘাত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে পিষ্ট, দলিত, মথিত করিতেছে! কিন্তু কণ্ঠে ভাষা যোগাইল না।

আমাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া সুনন্দা এবার কোমল কণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ কর, নিশীথদা। অনেক দিন পরে হঠাৎ দেখা, কুশলপ্রশ্নের বদলে এ সব ছাই-ভস্ম ব'লে তোমায় ব্যথা দিলুম না ত?"

"না, সুনন্দা, মানুষের জীবন একটানা স্রোত নয়—"

"তা ত নয়ই। আচ্ছা, ও তর্ক থাক এখন। ভাল, তোমার সব দেখা হয়েছে?"

"হাঁ, চল তোমাকে সব দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

দ্বিতল হইতে নামিয়া তাহাকে বজ্রাসন, চৈত্য ও স্তূপগুলি দেখাইলাম। ফিরিবার পথে মল্লিকা-ফুল তুলিয়া একটা তোড়া করিয়া সুনন্দার হাতে দিলাম।

সুনন্দা স্মিত-হাস্যে গ্রহণ করিয়া বলিল, "দাদা কি এখনও কবিতা লেখ?"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, 'না'।

এ কথায় উত্তর না দিয়া সুনন্দা বলিল, "তোমার টম্‌টম্‌ওয়ালাকে ছেড়ে দাও, আমার মোটরেই যাবে।"

"না, তার আর দরকার কি? কষ্ট আমার কিছুই হবে না।"

"কষ্ট আমারই হবে, তোমার না হোক।"

নিরুত্তরে আমি সুনন্দার আদেশ পালন করিলাম।

জ্যোৎস্নাধারায় সারা পথ প্লাবিত, আলোকিত। ফল্গুর চিক্কণ বালুবক্ষে লক্ষ লক্ষ হীরকচূর্ণ যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল। ছায়াশ্যাম পথ দিয়া মটর ধীরে ধীরে চলিল।

সুনন্দার অলোকসামান্য রূপ ও যৌবন আমাকে কিছু বিহ্বল করিতেছিল, কিন্তু সে নির্ব্বিকারভাবে গল্প করিয়া চলিয়াছে।

নানা কথা হইল। জানিলাম, সুনন্দা নানা দেশ-হিতকর কাযে ব্যাপৃত আছে। সহরতলীর এক নারী-বিদ্যাপীঠের শিক্ষয়িত্রী সে। নারী-মঙ্গলসমিতি নামক এক সমিতির স্থাপয়িত্রী। রক্ত-জবাসংঘ নামক সেবা সমিতির নেত্রী।

নিজের কাযের পরিচয় শেষ করিয়া সুনন্দা হাস্যচটুল বাক্যে প্রশ্ন করিল, "তার পর আজকাল কি করছ, নিশীথদা? তোমার পল্লী-সংস্কারের আয়োজনের কি হ'ল?"

"সে সব ছেড়ে দিয়েছি। বিবেচনা ক'রে দেখলুম, ভগবান্ আমায় নেতৃত্বের যোগ্যতা দেন নাই, তাই শক্তির বিফল ব্যয় না ক'রে যে কায পারি, তাই করছি।"

"কি সে কায?"

"লোককে আনন্দ-দান। তুমি কি আমার উপন্যাস পড় নি?"

তাহার বৃহৎ চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। পরুষ ভাষে সে বলিল, "ছিঃ দাদা, আজ ভারতবর্ষের যখন বড় দুর্দ্দিন, কি ধর্ম্মে, কি রাষ্ট্রে, কি স্বাস্থ্যে, কি ধনে—সকল রকমেই যখন আমরা পঙ্গু, অচল, অকর্ম্মা হয়ে পড়েছি, তখন কি এ সব ন্যাকামি করা সাজে? প্রেমের নামে তোমরা যে এই সব কামায়ন রচনা করছ, কি তার সার্থকতা? কি তার উদ্দেশ্য? কি তার লভ্য?"

আমি উত্তর দিলাম, "রূপদক্ষ যে, সে রস-রচনা করে। ফলের দিকে লোভ রেখে তা করে না,—"

"চুপ কর, দাদা, বাজে বকুনী ব'কে আমায় জ্বালিও না। আজ কি আমাদের দেশ চেয়ে আছে না যে, সমস্ত আমোদ-প্রমোদ হাস্য-লাস্য বন্ধ ক'রে সমস্ত ভারতবাসী, ভারতের যত নর-নারী সমবেত হয়ে ভারতের দুঃখ দূর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে? আধ আধ ভাষা আর মিঠা মিঠা বুলি শুনবার দিন নেই, আজ বজ্রধর বীর্য্যবান্ স্বার্থত্যাগী যুবক চাই, যারা দেশমাতৃকার চরণতলে সমস্ত উৎসর্গ করতে পারে।"

গাড়ী আসিয়া গয়ার উপকণ্ঠে পৌছিল। সহসা উচ্ছ্বাস থামাইয়া সহজ সুরে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় উঠেছ?"

"ধর্ম্মশালায়।"

"ধর্ম্মশালায় তুমি থাকতে পারবে না। বাসা কর, আমার বাসার ধারেই একটি ছোট বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাবে, কালই সেখানে তোমায় যেতে হবে ব'লে রাখছি।"

"এক নিঃশ্বাসে ত সমস্ত সমস্যার সমাধান করলে, কিন্তু—"

"না, ওজর, আপত্তি তোমার শুনতে চাই না। তোমায় অমন লক্ষ্মীছাড়ার মত থাকতে দিতে পারবো না।"

খানিক থামিয়া বলিল, "ভাল, এখানে খাওয়া-দাওয়ার তোমার কষ্ট হচ্ছে, চল, আজ আমার ওখান থেকে খেয়ে আসবে।"

"আজ না।"

গাড়ী আসিয়া ধর্ম্মশালায় থামিল। আমি হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিলাম।

"দাঁড়াও দাদা! তোমায় প্রণাম করা হয় নি," এই বলিয়া সে আমার পায়ের ধূলি লইল।

ধর্ম্মশালায় আমার কক্ষে যখন পৌছিলাম, মনে হইল, যেন পূর্ণচন্দ্রকে অকস্মাৎ কালোমেঘে ঢাকিয়া ফেলিল।

২

বৌদ্ধ-যুগের ঘটনা লইয়া একখানি উপন্যাস লিখিতেছিলাম। বৌদ্ধ জাতক ঘাঁটিয়া ঘটনা-সংস্থানের মাল-মসল্লা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু গল্পের বর্ণনায় দেশকালোচিত আব-হাওয়া দিবার জন্য সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। সুনন্দার অনুরোধে তাই ভাবিলাম, গয়ায় কিছু দিন কাটাইয়া পুস্তকখানি শেষ করিয়াই যাই।

সুনন্দার সহিত প্রথম পরিচয় যখন হয়, তখন সে কিশোরী ছিল। আমাদের বাসার পাশেই তাহার পিতা পরেশ বাবু বাসা করিলেন। পরেশ বাবু নব্যভাবাপন্ন

হিন্দু ছিলেন। তিনি মুক্ত আলোক ও বাতাস হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করেন নাই। সুতরাং আমাদের স্থানীয় তর্ক-সভার মজলিসে সুনন্দা ও তাহার পিতা মধ্যে মধ্যে আসিতেন। সুনন্দার বেশভূষা চালচলন পছন্দ করিলেও, আমার মন তখন অতীত আর্য্য-সভ্যতার মাহাত্ম্য ও গৌরব-প্রকটনে ব্যস্ত ছিল। হিন্দুজাতির অতীত যাহা কিছু ছিল, সকলই সুন্দর, সকলই মধুর। আমি শাস্ত্র পড়িয়া, বিলাতী নজীর তুলিয়া আর সর্ব্বাপেক্ষা নিজের বিশ্বাসের জোরে উহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতাম। পরেশ বাবু হাসিতেন। সেই প্রসন্নচিত্ত নির্ব্বিকার বৃদ্ধের হাসি আমাদিগকে কোথাও আহত করিত না। কিন্তু হরিণীর ন্যায় চঞ্চল, আপনার গুণরাজির গর্ব্বে উদ্ধতা, ম্যাট্রিক-পড়া তরুণীর হাসি বরদাস্ত করা কঠিন হইয়া পড়িত। সুনন্দার মা ও আমার মায়ের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। আমি যখন হিন্দু-রমণীর লজ্জাশীলতা, সতীত্ব, ধর্ম্মবোধ, কর্ম্মপটুতা প্রভৃতি গুণের বিরাট তালিকা বাহির করিয়া অলক্ষ্যে নব্যাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেছিলাম, তখন এই দুইটি সখী আমাদের প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন।

বক্তৃতায় যাহাই বলি না কেন, সুনন্দাকে আমার বেশ লাগিত। সেবা ও প্রীতি, যেখানে সহজে পাওয়া যায়, সেখানে জয়ের উন্মাদনা থাকে না। কিন্তু এই ভারতীয় সাফ্রেজিষ্টকে জয় করিবার উল্লাস আমার ছিল। তাহার উপর সুনন্দার গুণগ্রামও আমায় মুগ্ধ করিয়াছিল। অতএব মায়ের প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে হয় ত যাহা কখনও হয় নাই, এখানে তাহাই হইল। আমার মত হইলেও এ বিবাহে সুনন্দা কিংবা তাহার পিতা রাজী হইলেন না। পরেশ বাবু বলিলেন, আমাকে বিলাতে যাইতে হইবে। পশ্চিমের সংস্কৃতির নবজীবনের স্পর্শ না পাইলে আমি সুনন্দার যোগ্য বর হইব না। সুনন্দা যে কেন অসম্মত হইয়াছিল, তাহা জানি না। সুনন্দার মা আমার জন্য ওকালতী করিয়াছিলেন। কিন্তু পরেশ বাবুর দৃঢ়পণ অটুট রহিল। আমিও কালাপাণি পার হইয়া সুনন্দার মত অতুলনীয় রত্ন লাভ করিতে পারিলেও, যাইতে কিছুতেই রাজী হইলাম না। পশ্চিমের সংস্কৃতি-লাভে ধন্য হইবার লোভ আমার ছিল না। কাযেই বয়ঃসন্ধি কালের এই স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পরে সুনন্দার মা সাধ্বী-সতীর ন্যায় পতির চরণে মাথা রাখিয়া তাঁহার কাম্য স্বর্গলোকে গেলেন। সংযতপ্রকৃতি ও ধীর হইলেও, পরেশ বাবুর পক্ষে এ শোক সহ্য করা অসাধ্য হইল। কাযেই তিনি আমাদের সহর ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

বসন্ত-প্রভাতের রক্তগোলাপ যেমন সায়াহ্নে ঝরিয়া পড়িয়া আপনার অস্তিত্বকে ভুলাইয়া দেয়, গোলাপের মত লালিম এই কিশোরীও আমার অন্তর হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

তাহার পর জীবনে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পিতা ও মাতা ইহলোকের মায়া কাটাইলেন, কিন্তু আমাকে মায়ার বন্ধনে বাঁধিতে ভুল করেন নাই। বন্ধুরা একে একে তুচ্ছ রুটীর লোভে কেহ বর্ম্মায় চলিল, কেহ হিল্লি-দিল্লী লাহোরে ছুটিল, অতএব সহরে আমাদের সে আনন্দের মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। নূতন যাহারা বড় হইয়া উঠিল, শিং ভাঙ্গিয়া সেই সব বাছুরের দলে প্রবেশ করা আমার শক্তিতে কুলাইল না। কাযেই সংস্কার করিবার মত যে সব উচ্চ কল্পনা গাঁথিয়াছিলাম, একে একে সে সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে হইল। হয় ত মানবজীবনের ধারাই এই।

তখন মা যে বোঝা স্কন্ধে চাপাইয়াছিলেন, তাহা ঘরে আনিয়া প্রেমচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। শেলী, বায়রণ, কালিদাস, বার্ণস্, হাফিজ, রবীন্দ্র ও বৈষ্ণবপদাবলী পড়িয়া মনটিকে প্রেমিকের ভাবসম্পদে সম্পন্ন করিয়া তুলিলাম, কিন্তু কল্পনা ও সত্যের মধ্যে কি হিমালয়-পর্ব্বতের ব্যবধান! এ সব কবিরা কি কখন তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? এই সব অপ্রকৃত প্রেমের পিপাসা জাগাইয়া কত যে সুন্দর জীবন কবিরা শ্মশান করিয়া দিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? আমার মনে হয়, যদি আমার হাতে রাজ্যভার থাকিত, তাহা হইলে এক দিন প্রেম-ব্যাধির এই ডিপোগুলিকে একত্র সাজাইয়া অগ্নিসাৎ করিতাম।

নববধূ আমার প্রাচীন আদর্শে আদর্শ-বধূ, কর্ম্মে অশ্রান্তা, লজ্জায় বেপথুমতী, পূজায় ভক্তিমতী, সংসারের লক্ষ্মী-স্বরূপা। কিন্তু হইলে কি হয়, আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রকৃত মনের পরশ ছিল না। আমি বধূর কাছে যে প্রেমাভিনয় চাহিতাম, সে তাহা করিতে জানিত না।

এক দিন অন্ধকার পথ বাহিয়া, ঝড়-জল মাথায় করিয়া অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিলাম। ভাবিলাম, বধূ যাওয়ামাত্র কত তৃপ্ত হইবে, বলিবে, "তোমার পথ চেয়ে চেয়ে, আমার নয়নে ঘুম আসছিল না, অথচ তুমি আসবে এটা আমার মন ব'লে দিয়েছিল," এমনই কত কি। কিন্তু ঘরে ফিরিলে সদ্যোজাগরিতা বধূ বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, "এত রাত্রে তোমায় কে বাড়ী আসতে বলে?" পিসীমার কাছ হইতে উঠিয়া আসার দরুণ এ অভিযোগ। তাহার পর আর কিছু না বলিয়া বধূ আপন মনে বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিসীমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! কিছু খাবে?" ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলাম,—"না"। বুড়ী পিসীমা এই অহেতুক ক্রোধে হতভম্ব হইয়া গেলেন। অন্য একদিন কয়েকটি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বধূকে শুনাইতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, শুনিয়া বধূ গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে, "ওগো, তুমি কত ভালবাসো!" কিন্তু প্রিয়তমা প্রিয়ভাষে বলিল,"তোমার খেয়ে-দেয়ে কায নেই, যাও, এ সব আমার ভাল লাগে না!" আমি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম।

স্বামীর কর্ত্তব্য ভাবিয়া বধূকে পড়াইবার জন্য পুথিপত্র কিনিয়া আনিলাম। আয়োজনের কোনই ত্রুটি হইল না। কিন্তু "যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম কামাই," বধূ উত্তর দিল, "যাও, পড়াশুনা ক'রে কি হবে, আমায় ত আর চাকুরী করতে হবে না?"

এই সব তুচ্ছ কাহিনীর ইতিহাস জড় করিয়া বিরক্তিভাজন বা ব্যঙ্গের পাত্র হইতে অভিলাষ নাই। কিন্তু যে সব পাঠিকা আমার দুঃখের গল্প শুনিয়া হাসিতেছেন, তাঁহারা কি জানেন না যে, সামান্য মিষ্ট কথার অভাবে কত সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে, কত ব্যক্তি পথ-হারা হইয়াছে, কত ঘরে কত ট্রাজেডি সুরু হইয়াছে?

তাই ঘরের নিবিড় মোহে যখন বঞ্চিত হইলাম, তখন দীর্ঘকালের অব্যবহৃত লেখনী তুলিয়া লইলাম, যে উদ্বেল প্রেমধারা জীবনে সার্থক হইল না, তাহারই প্রকাশ আমার লেখার মাঝে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় বহিয়া চলিল। তবে আমার বই পড়িয়া কাহাকেও অভিশাপ দিতে হইবে না। কারণ, আমার উপন্যাসগুলিতে আমি মানুষের জীবনের সত্য রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে ত্রুটি করি নাই। সংসারের এই প্রেমহীন জীবনের মধ্যে আমি যেন নিশ্বাসবদ্ধ হইয়া মারা পড়িতেছিলাম। তাই বধূকে পিত্রালয় পাঠাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ এখানে, কাল সেখানে, এমনই করিয়া দিন কাটিতেছিল। সুনন্দা আজ বেড়া বাঁধিয়া এই স্রোতের ফুলকে ঘাটে রাখিতে চাহিল। কে জানে, কত দিন সে থাকিতে পারিবে?

৩

সুনন্দার বাংলোয় বসিয়া কথা হইতেছিল। সাহেবগঞ্জের ফাঁকা মাঠের মাঝে অতি সুন্দর ছোট-খাটো বাংলোটি। সুনন্দার সজ্জা সে দিন অপূর্ব্ব হইয়াছিল। খদ্দরের শাড়ী ও সেমিজে তাহাকে বেহেস্তের পরীর মত দেখা যাইতেছিল। আমি তাহার সৌন্দর্য্যচ্ছটার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, বিধাতা বোধ হয়, সমস্ত সুষমা একত্র করিয়া এই তরুণীর অতুলনীয় কান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমার চিন্তায় বাধা দিয়া সুনন্দা বলিল, "মিস্ মেয়োর মাদার ইণ্ডিয়া বই পড়েছ, নিশীথদা?"

"পড়েছি, কেন?"

"প'ড়ে কি তোমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠে নি? আমি ভেবে পাই না যে, একটা জাতি কেমন ক'রে এত দুর্ব্বল হ'তে পারে, সে এমন ঘৃণ্য অপবাদ সব নির্ব্বিবাদে হজম ক'রে নিচ্ছে?"

"কিন্তু মিস্ মেয়ো অনেক সত্য বলেছেন। খাঁটি কথাই অপ্রিয় লাগে—"

মুখের কথা কাড়িয়া সিংহীর ন্যায় গ্রীবা বক্র করিয়া সুনন্দা বলিল, "সত্য? একে তুমি সত্য বলিতে চাও? কোন্ সাহসে সে এত বড় একটা প্রাচীন গৌরবান্বিত জাতির অঙ্গে মসীলেপন করতে ভয় পাচ্ছে না? আমরা এতই দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ হয়ে পড়েছি যে—"

"কিন্তু কি করতে চাও তুমি?"

"কি করতে চাই আমি? দুর্গার মত শক্তিময়ী হয়ে আমি এই সব নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করতে চাই। আমার মনে হয়, সংস্কার চাই, আমাদের জাতীয় জীবনে যত সব গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়েছে, তাদের সমূলে উৎপাটন করতে হবে। দৈন্য যখন থাকবে না, তখনই জাতি সামর্থ্য লাভ করবে। তখনই স্বরাজ আসবে।"

"না, ঐটে তোমার মস্ত ভুল। ও বাঁধা বুলীর কোন মূল্য নেই। স্বাধীন জাতির জীবনধারা যেন তাজা নদী, আপন প্রয়োজনে সে খাত কেটে উল্লাসে বয়ে যায়। আবর্জ্জনা জম্‌তে পায় না। পরাধীন যারা, তারা মরা নদীর মত; তাদের কোনও আশা আছে কি?"

উত্তেজনার মধ্যে আনন্দ আছে, কিন্তু নীরবে দিনের পর দিন গড়িয়া তোলা সহজ নহে। সুনন্দাকে সে কথা বুঝাইব ভাবিলাম; কিন্তু তাহার মন গ্রহণোৎসুক নহে বলিয়া কি করিব, ভাবিয়া পাইতেছিলাম না।

খানিক পরে বলিলাম, "কিন্তু সুনন্দা, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, বৃটিশ জাতি এসেই ভারতের শতধা বিচ্ছিন্ন রূপকে ঐক্যের সুষমায় পূর্ণ করেছে, তারাই ভারতবাসীর মনে আত্মবোধের দীপশিখা জাগিয়েছে, তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই—"

সুনন্দা সহসা সোজা হইয়া বসিল। তাহার দীর্ঘায়ত নয়নযুগলের দীপ্তি যেন উগ্র ও প্রখর হইয়া উঠিল। তাহার সমগ্র আননে রক্তোচ্ছ্বাস দেখিয়া আমি অস্বস্তি বোধ করিলাম।

তাহার কঠোর নির্ম্মম বাক্যের ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, এমন সময় ভৃত্য একখানি চিঠি আনিয়া সুনন্দার হাতে দিল। খামটির বিশেষত্ব আমাকে আকৃষ্ট করিল। রক্তজবার গাঢ় লাল বর্ণের খাম—উপরে লেখার চিহ্নমাত্র ছিল না।

চিঠি পাইয়া সুনন্দা মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আমার দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্যে বলিল, "নিশীথদা, তুমি আজ এসো, আমার একটি বিশেষ জরুরী কাষ আছে।"

বিদায় লইয়া চলিলাম। হেনার ঝাড়ে তখন হাওয়া মাতামাতি লাগাইয়াছিল, কিন্তু সে মিষ্ট সুরভি উপভোগ করিবার মত মন ছিল না। সুনন্দার কথা-বার্ত্তায় আমার মনে অস্বস্তি জাগিতেছিল। এই কুসুমপেলব তরুণীর অন্তর লৌহের মত দৃঢ় ছিল। কিশোরকালে ইহার দৃঢ়তার কতই না পরিচয় পাইয়াছি। সত্যই বলিব, সুনন্দার জন্য একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

সে দিন বাড়ী হইতে পিসীমার চিঠি আসিয়াছিল। পিসীমা লিখিয়াছেন যে, বধূ সুপ্রিয়া পিতৃগৃহ হইতে তাহার মাতুলভগিনীর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছে। নিকটেই পাটনায় তাহার ভগিনীপতি থাকেন। আমি যেন সেখানে যাইয়া সুপ্রিয়াকে লইয়া শীঘ্রই বাড়ীতে ফিরি। একা একা তাঁহার ঘরে মন টিকিতেছে না। হায় অন্ধ বৃদ্ধা! যেখানে মনের টান নাই, সেই গৃহে জোড়াতালি দিয়া প্রেমের ব্যবসা ফাঁদা কত কষ্টকর, তুমি ত তাহা জান না। গৃহে ফেরার মতলব তাই কিছুতেই মনে জাগিতেছিল না।

সুনন্দার সহিত দিন যতই কাটিতেছিল, ততই তাহার সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না। বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিময়ী সুনন্দা তাহার মনের তাড়িতস্পর্শে আমাকে যেন যাদু করিয়া ফেলিতেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে কি পরিপূর্ণ জ্ঞান, যখনই যে কোনও বিষয়ে কথা উঠে, সুনন্দা তখনই সে বিষয়ে এমনই বিশদ আলোচনা করে, মনে হয়, যেন সে সেই বিষয় সারাজীবন পাঠ করিয়াছে। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস, কাব্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিদ্যা কত আন্তরিকতার সহিত সে অধ্যয়ন করিয়াছে। আমি তাহাকে সে দিন বলিতেছিলাম, তাহার এই প্রগাঢ় জ্ঞান সে যেন পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে। সে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "কাদের জন্য লিখিব? মেরুদণ্ডহীন এ জাতির আগে মেরুদণ্ড চাই, এদের মাথায় যদি ভারই চাপাই, শরীর যে বইবে না।"

৪

পরদিন ভোরে উঠিয়াই সুনন্দার বাসায় গেলাম। সদ্যস্নাতা সুনন্দা তখন আলুলায়িতকুন্তলা হইয়া উপনিষৎ পড়িতেছিল। আমি দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার আনন্দ-ভাস্বর মুখকান্তি দেখিতেছিলাম। নিবিষ্টচিত্ত সুনন্দা আমাকে দেখিতে পায় নাই।

পাঠশেষে আমাকে দেখিয়া সে হাস্যবিভাত-কণ্ঠে বলিল, "বাঃ, তুমি ওখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন, নিশীথদা?"

"আমি তোমায় দেখছিলুম, কি সুন্দর তুমি!"

ভুবনমোহন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "যাও, অমন যদি কর, তা হ'লে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচবে।

তুমি বাইরে চল, আমি আসছি, চল, আকাশগঙ্গায় বেড়িয়ে আসা যাবে—"

মিনিট দশেক পরে সুনন্দা আসিল। আলপাকার বেগুনী রঙ্গের শাড়ী ও জ্যাকেট পরিয়া, তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল। কপালে সিন্দুর-টীপ সন্ধ্যাতারার ন্যায় জ্বল-জ্বল করিতেছিল, কাশ্মীরী শাল গায় ফেলিয়া সে বাহির হইল।

শীঘ্রই আমাদের মোটর আসিয়া আকাশগঙ্গার পাদদেশে থামিল। সুনন্দার চম্পকাঙ্গুলীর স্পর্শলোভে বলিলাম, "তুমি আমার হাত ধ'রে ওঠ—নইলে প'ড়ে যাবে।"

স্বাভাবিক ব্যঙ্গের সহিত সে বলিয়া উঠিল—"আমাদের যথেষ্ট অবলা করেছ, দাদা, আর কেন? আমাদের মানুষ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাও।"

"কিন্তু তোমাদের জন্য ত জীবনের কাঁটার পথ নয়, পুরুষ আপন শক্ত বাহুর বলে নারীর জীবনপথ কুসুম-কোমল ক'রে তুলবে, জননী ও গৃহিণী যাঁরা, তাঁদের পদ কুশাঙ্কুরেও বিদ্ধ হতে দিতে চাইলে বা আমরা—"

"তুমি কি মনে কর যে, জননী ও গৃহিণী হওয়াই নারী-জীবনের চরম সার্থকতা? আমি তা মনে করি না। এই বিচিত্র নাট্যক্ষেত্রে কত যে চরিত্র অভিনয় করা যেতে পারে, তার ঠিক নেই; তবে শুধু আগল দিয়ে নারীকে কেন আট্‌কে রাখতে চাও তোমরা?"

আমি সভয়ে উত্তর দিলাম, "তা হ'লে গৃহজীবনের শান্তি ও তৃপ্তি দূর হয়ে যাবে—"

"না, তা কেন? যারা স্থিতির আরাম চায়—তারা তা বেছে নিক্, কিন্তু যারা উড়তে চায়, তাদের ডানা তোমরা কেটো না।"

সুনন্দাকে কি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি? মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যে গুহায় দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহার কাছে পৌছিলাম। সুনন্দাকে বলিলাম, "চল, গুহার সম্মুখের বেদীর উপর বসি গে।" সুনন্দা উত্তর না দিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। বেদীর উপরে বসিয়া গয়া সহরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। প্রভাতসূর্য্যকরোজ্জ্বল সেই শোভার মাঝখানে তরুশ্যাম নগরীটিকে বড়ই মোহন দেখা যাইতেছিল।

সুনন্দার মন হয় ত এ দিকে ছিল না। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "এই স্থানকে তোমার পরম তীর্থ ব'লে মনে হচ্ছে, কি বল, নিশীথদা? কিন্তু আমি ভাবি, কি পণ্ডশ্রম! আমাদের দেশের লোক ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে এত যে ক্ষেপে যায়, তার মূলে সত্য কিছুই নেই—এটা দুর্ব্বলতার প্রকাশ!"

আমি অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, "বল কি সুনন্দা! ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ যদি কোনও সত্য জেনে থাকে, সে শুধু ধর্ম্মকেই। এই ধর্ম্মের জন্যই ত সে সব ত্যাগ করেছে—"

সুনন্দা উত্তর দিল, "হাঁ, এই জন্য সে জীবনে একেবারে বঞ্চিত হয়েছে। যারা এপারে ভুয়ো হয়ে রইল, ওপার তাদের ঝরঝরে হয়ে যাবে, এটা তোমায় ঠিক বল্‌ছি—"

তাহার কোমল চম্পকাঙ্গুলীর মধ্যে আপন হস্ত চালনা করিতে করিতে বলিলাম, "না সুনন্দা, ভারতবর্ষকে তুমি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসো, এ কথা কখনই তোমার অন্তরের নয়—"

"না, আমি ঠিকই বলছি, এই মিথ্যে আলেয়ার পিছনে ছুটেই আমরা মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়ছি। কিন্তু চল, আজ আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রয়েছে, খাওয়ার আয়োজন করতে হবে।"

পাহাড়ের ঢালু পথ বাহিয়া নামিলাম। প্রভাতের আলো সুনন্দার মুখে পড়িয়া যেন লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুটাইয়া তুলিতেছিল। আমি বলিলাম, "সুনন্দা! তুমি ভুল বুঝছ, ভগবান্ আছেন, এ কথাটা কখনও ভুলো না। বিধাতার আশীর্ব্বাদ নইলে—"

কথা কাড়িয়া লইয়া সে বলিল, "ঈশ্বর থাকেন থাকুন। কিন্তু তাঁর থাকা না থাকায় কিছু আসে যায় না। যদি কর্ত্তা কেউ থাকতেন, তা হ'লে কি জগৎ ভ'রে এত আর্ত্ত-পীড়িতের আর্ত্তনাদ চল্‌তে পারত?"

কথা না বাড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম।

স্নান শেষ করিয়া যখন সুনন্দার বাসায় গেলাম, তখন সে গান করিতেছিল। উন্মাদনাময়ী সুরে সে ভাবী কল্যাণময় জীবনের কথা লইয়া গান করিতেছিল। গান শেষ হইল। কিন্তু যেন গানের ঝঙ্কার চারিদিকের আকাশ-বাতাস ভরাইয়া তুলিল। গান থামাইয়া সহজ হাস্যে সুনন্দা বলিল, "চল, তোমার খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

খাবারের যথেষ্ট আয়োজন ছিল। সুনন্দা স্বহস্তে

সমস্ত পাক করিয়াছিল। পাশে বসিয়া, 'এটা খাও, ওটা খাও' বলিয়া ভূরিভোজন করাইল! খাওয়া-দাওয়ার পর ওখানে খানিক ঘুমাইলাম।

অপরাহ্ণের দিকে হাত-মুখ ধুইয়া বারান্দায় ইজি-চেয়ার টানিয়া পশ্চিমাকাশের রঙ্গের খেলা দেখিতেছিলাম। সুনন্দা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিল, "কি কবি, কোন্ স্বপ্নে ভোর আছ?"

"রঙের চাতুরী দেখছিলাম, ঐ দেখ, কেমন একটি নীল রঙের জল—ছল-ছল সরোবর তৈরী হয়েছে, ঐ পাশে যেন দেবকুমারীরা সোনালী ওড়না বিছিয়ে দিয়েছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ওদের আভা পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে।"

সুনন্দা পাশে আসিয়া বসিল, আমার দিকে মোহন দৃষ্টি মেলিয়া পাপিয়ার মত মধুভরা কণ্ঠে বলিল, "নিশীথদা, তুমি আমায় ভালবাসো?"

"সে কথা কেন, সুনন্দা! তোমায় আমি—"

কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আচ্ছা যাক্, তোমার বাক্যের ছটা শোনবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই, তোমার ভালবাসার পরখ করতে চাই।"

আনন্দে আমার বুক নাচিয়া উঠিল। মনে হইল, আমার ভালবাসার পরীক্ষা লইতে চাহিতেছে, ইহার অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? প্রিয়ার জন্য কত বীর কত মরুসমুদ্র পার হইয়াছে, কত ঝঞ্ঝা মাথায় ধরিয়াছে! আমি কি তাহাদের অপেক্ষা হীন?

উপন্যাসে এত দিন যে সব কাল্পনিক ঘটনা সংস্থান করিয়া নিজের মনেই আনন্দ পাইয়াছি, তেমনই সুযোগ আমার জীবনে উপস্থিত। হাস্যোজ্জ্বল-মুখে তাই বলিলাম, "কি পরীক্ষা চাও তুমি, সুনন্দা?"

সুনন্দা অবিচলভাবে উত্তর দিল, "সহজ নয়, কঠোর পরীক্ষা। বিপদের মুখে পড়তে হ'তে পারে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হ'তে পারে।"

"হোক সুনন্দা, তোমার জন্য আমি সব করতে পারি।"

আবেগে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল। সুনন্দা গম্ভীর হইয়া বলিল, "শোন, নিশীথদা! পাটনায় যে গোলঘর আছে, তা বোধ হয় জান। তার পাশে একটা বড় নিমগাছ আছে। সেখানে আজ রাত বারোটায় একটি লোককে একখানি চিঠি ও একটি জিনিষ দিতে হবে। যে লোক এই কাযের ভার পেয়েছিল, সে কেন জানি না পৌঁছে নি। কাযেই তোমায় অনুরোধ করতে হচ্ছে।"

"কাযটি অন্যায় নয় ত, সুনন্দা?"

সংশয়ের আভাস মনে জাগিতেছিল। সুনন্দা তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ক'রে যদি কায করতে চাও, নিশীথদা, তবে এইখানেই এ আলাপের যবনিকাপাত হোক্। তোমার ন্যায়-অন্যায়ের ধারা আমি জানি না। তবে আমি জানি, যা আমি করছি, তা কখনই অন্যায় নয়।"

সত্যই লাবণ্যললিতা এই অগ্নিদীপ্তা নারীর অগ্নির মত শুচিতা আছে, আমি জানি। আমার মনে হইতেছিল, ইহার যে আদেশ, ইহার যে কর্ম্মপ্রণালী, তাহা বিধাতার দেওয়া কল্যাণে ভরপুর। আমি তাই উত্তর দিলাম, "না সুনন্দা, আমি বিচার করতে চাই না। তুমি যা বলবে, তাই আমার বেদবাণী—"

"না, এটাও ঠিক নয়, নিশীথদা! নিজের মনের জোর যদি তোমার সহায় না হয়, তবে এই উত্তেজনায় তোমায় কায করতে বলি না।"

এ যেন অক্টোপাসের বেড়াজাল! উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল। আমি শুধু ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলাম, "সুনন্দা, তুমি এত নিষ্ঠুর!"

মনে হইল, তাহার কণ্ঠ কিছু কোমল হইল। হাস্য-বিভাত মুখে সে বলিল, "তবে শোন, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে তুমি গয়া থেকে পাটনায় যাবে। সেখানে রাত দশটায় পৌঁছে একখানি ট্যাক্সি ক'রে গোলঘরে যাবে। যাওয়ার সময় তোমার বোতামে আমি একটা গোলাপফুল পরিয়ে দেব, সেই গোলাপফুল দেখে তোমায় আমার লোক চিনে নেবে। রাত বারোটার সময় সে এসে তোমায় জিজ্ঞাসা করবে, আজ রাত্রে কি জ্যোৎস্না উঠবে? তুমি উত্তর দেবে, হ্যাঁ, ঐ ত চেয়েই দেখ না, পূব আলো হয়ে উঠছে।"

আমি অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলাম,—"তখন সে জিজ্ঞাসা করবে, কিছু সন্দেশ আছে? তখন তুমি আমার চিঠি ও জিনিষ তাকে দেবে। রাজী?"

"হাঁ।"

"বেশ, তা হ'লে তৈরী হয়ে নাও।"

"বাসায় একবার যেতে হবে।"

"আচ্ছা, এখন তুমি বাসায় যাও ; তোমার কালো আলপাকার কোটটি প'রে সন্ধ্যার সময় এসো। আমি মোটরে ক'রে তোমায় ষ্টেশনে দিয়ে আসবো।"

সন্ধ্যার সময় সুবেশে সজ্জিত হইয়া সুনন্দার নিকট উপস্থিত হইলাম। সুনন্দা আমাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, তার পর টেবলের উপর হইতে একটি অতি সুন্দর রক্ত-গোলাপ লইয়া আমার বুকপকেটের কাছে বোতাম লাগাইবার ছিদ্রে পরাইয়া দিল। সুনন্দার কম্পিত হাতটি ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম, "সুনন্দা !"

আমার হৃদয়ের উদ্বেল আতিশয্য কিন্তু সুনন্দাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল না। সে সহজভাবেই বলিল, "নিশীথদা, সময় হচ্ছে, আমায় ছাড়ো, জিনিষটি নিয়ে আসি।"

সুনন্দা একটি ছোট মেহগনিকাষ্ঠের বাক্স আমার হাতে আনিয়া দিল। উহা রেশমী কাপড়ের পর্দ্দায় ঢাকা ছিল। আমি হাতে করিয়া দেখিলাম, বাক্সটি ভারী। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এতে কি আছে ?"

দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "অনাবশ্যক কৌতূহলী হয়ো না।"

মোটরে করিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সুনন্দা নিজে যাইয়া একখানি ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনিয়া আনিল। যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন বিদায়সূচক রুমাল উড়াইতে উড়াইতে তাহার স্বভাবসুন্দর সুরে সে বলিল—"শিবায় সন্তু পন্থানঃ।"

আমার এই অনিশ্চিত বিপৎসঙ্কুল যাত্রাপথে কল্যাণের ঐ বাণী অন্তরে যেন অনেক আশ্বাস আনিয়া দিল। যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ মুখ বাড়াইয়া সুনন্দাকে দেখিতেছিলাম, অবশেষে অন্ধকারের মধ্যে তাহার সুন্দর মুখ মিলাইয়া গেল।

সাড়ে দশটায় গোলঘরে উপস্থিত হইলাম। সেই জনহীন নিম্ববৃক্ষের ছায়ায়—রাত্রিকালে সত্যই আমার ভয়-ভয় করিতেছিল। তাহার পর রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল, অস্বস্তি ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনিশ্চিত আশঙ্কার কম্পনপ্রবাহ যেন চারিদিকে বহিয়া যাইতেছিল।

ঘড়ীতে যখন ঠিক বারোটা বাজিল, তখন একখানি মোটর আসিয়া থামিল। দীর্ঘদেহ, সুবেশ, এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক নামিয়া আসিয়া চারিদিকে ত্রস্তদৃষ্টি মেলিয়া আমার নিকট আসিলেন। তাহার পর পকেট হইতে বিজলী-মশাল বাহির করিয়া আমার মুখের দিকে খানিক তাকাইয়া বলিলেন,—"আজ রাত্রে কি জ্যোৎস্না উঠবে ?"

আমিও পূর্ব্বের শিক্ষার মত উত্তর দিলাম। প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে আমি ভাবিলাম, এই-ই ঠিক লোক, তাই তাঁহার হাতে আমার সেই রক্ত-জবার মত লাল খামের চিঠি ও মেহগনিকাঠের ছোট বাক্সটি দিলাম।

ভদ্রলোকটি অতি সন্তর্পণে বাক্সটি লইলেন। তার পরে বলিলেন, "দেখুন, এ স্থান নিরাপদ নয়, আপনি আমার মোটরে চলুন, কয়েকটি দরকারী সংবাদ আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।"

এই অপরিচিতের সহিত যাইতে দ্বিধা বোধ হইল। বলিলাম, "এরূপ কথা ত নেই।"

ভদ্রলোক অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর দিলেন,—"ছিল না, কিন্তু হঠাৎ হয়েছে, আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলুন।"

কাযেই মোটরে উঠিলাম, বায়ুবেগে মোটর ছুটিল। বাঁকীপুরে এক দ্বিতল গৃহের সম্মুখে গাড়ী থামিল। ভদ্রলোকটি আমাকে লইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি চেয়ারে বসিলে ভদ্রলোক টেবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে অলক্ষ্যে রিভলবার বাহির করিয়া আমার চোখের সম্মুখে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার বন্দী, অস্ত্র-শস্ত্র কিছু থাকে ত বের ক'রে ফেলুন।"

বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হায়, সুনন্দার কার্য্যে আসিয়া শেষে যে এরূপ বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা কখনই ভাবিতে পারি নাই। ভাবিলাম, ডিটেক্‌টিভ পুলিসের হাতে যখন পড়িয়াছি, তখন নাস্তানাবুদ হইতে হইবে। তথাপি কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম, "আপনি আমায় পরীক্ষা করছেন কি না, জানি না ; কিন্তু আমি এ জীবনে মারণাস্ত্রের ধার ধারিনি, অতএব অনুগ্রহ ক'রে পিস্তলটি সরিয়ে নিন্।"

এই বলিয়া আমার কোট খুলিয়া শার্টের পকেট ঝাড়িয়া আপন নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দাখিল করিলাম। ভদ্রলোকটি আশ্বস্ত হইয়া রিভলবার পকেটে পুরিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে প্রসন্নতার চিহ্ন দেখিলাম না। তবুও নির্ভয়-চিত্তে বলিলাম, "দেখুন, রাত অনেক হয়ে চলছে, এখন আমি আসি, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে ত বলুন।"

ভদ্রলোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "আপনাকে

আর ফিরে যেতে হবে না, এ রাত্রে এ গরীবখানায় যাপন করুন, কা'ল হ'তে শ্রীঘরে মনের সুখে কাল কাটাতে পারিবেন।"

"কেন, কি অপরাধে ?"

"অপরাধ ষড়যন্ত্র, বিপ্লবের চেষ্টা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লুকোচুরি খেলা—"

"আপনি বিদ্রূপ করছেন কি না, জানি না, কিন্তু আমি এর কিছুতেই সংস্রুক্ত নই—"

"সংস্রুক্ত নন ? আপনার সাহসকে ধন্যবাদ, রক্তজবা-সংঘের চিঠি নিয়ে এসেছেন, বোমা নিয়ে এসেছেন অথচ আপনার কোন সম্পর্কই নেই এর সাথে ?—বেশ, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কাল এ কথা বলবেন—"

ভদ্রলোকের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "বোমা ! বলেন কি ?"

"আজ্ঞে, আপনার মেহগনি-বাক্সে বোমা আছে।"

নিরপরাধ আমার স্কন্ধে রাজশক্তির বিপুল শাস্তি আসিয়া পড়িবে, অথচ নিজেকে মুক্ত করিবার কোন উপায়ই নাই! ভবিষ্যতের একটা বিরাট বেদনার চিত্র আমার মনে জাগিতে লাগিল। তাই নীরব হইয়া রহিলাম।

ভদ্রলোকটি তখন পকেট হইতে সেই রক্তজবার মত লাল খাম বাহির করিয়া খামের এক কোণ ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলেন। একখানি সুন্দর আইভরি ফিনিস চিঠির কাগজ, কিন্তু তাহাতে কিছুই লেখা ছিল না।

পকেট হইতে দীপশলাকা বাহির করিয়া ভদ্রলোকটি চিঠির কাগজের এক অংশে অগ্নি ধরাইলেন, তথাপি কিছু হইল না। তখন পকেট হইতে এক শিশি ঔষধ বাহির করিয়া তাহা চিঠির সর্ব্বত্র লেপন করিলেন। খানিক পরে আলোর উপর উহা ধরিলেন, তখন লেখাগুলি পড়া যাইতে লাগিল। লেখা পড়িতে পড়িতে ভদ্রলোকের মুখে নানাভাবের ক্রীড়া চলিতে লাগিল। যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া আপন কায করিতে থাকিলেও মনে হইল, মধ্যে মধ্যে হাস্য-কৌতুকের ভঙ্গিমা ভদ্রলোকের মুখে খেলিয়া যাইতেছে।

খানিক পরে মেহগনিকাঠের বাক্সটি লইয়া, তলদেশে টিপ দিলেন। টিপ দিতেই পাশের একটি তক্তা সরিয়া গেল। কাপবোর্ড হইতে একখানি ঝকঝকে চীনের বাসন বাহির করিয়া তাহাতে বাক্সের মধ্য হইতে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য বাহির করিলেন। আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

ভাবিলাম, সমস্ত ব্যাপারটি কি ইন্দ্রজাল ? বিপ্লব, বোমা ও ষড়যন্ত্র সবই মিথ্যা, সুনন্দা আমাকে লইয়া নিশ্চয়ই কোনও কৌতুক-খেলা খেলিতেছে। আমার দিকে চাহিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তা হ'লে নিশীথবাবু, আপনি বোমা না এনে বাক্স ভ'রে যে মিষ্টান্ন এনেছেন, আসুন, এর সদ্ব্যবহার করা যাক। আপনার হয় ত ক্ষিধে পেয়েছে।"

"না, আমার মোটেই ক্ষিধে পায় নি।"

"তা হ'লে আপনাকে আর সেধে লাভ নেই। আমিই আরম্ভ করি।"

এই বলিয়া ভদ্রলোক আহারে মনোনিবেশ করিলেন, খানিক পরে আমার কাতর দৃষ্টি দেখিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই ভয়ানক সংশয়-দোলায় দুলছেন। যাক্, আপনাকে আর বেশী কষ্ট দেওয়ায় লাভ নেই, সুনন্দা দেবীর চিঠিটা পড়ুন, আমি ততক্ষণ দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি সমাধা ক'রে নি।"

আমি আগ্রহে হাত বাড়াইয়া চিঠি লইলাম। চিঠিতে লেখা ছিল :—

"সৌরেন বাবু !

আপনি আজ গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন যে, হয় ত দ্বিতীয় ওয়াটার্লু জয় করেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা হয় নি, এ জন্য সত্যই বিশেষ দুঃখিত। বিপ্লব বিভীষিকা আমাদের কাম্য নয়। আমাদের সঙ্ঘ শুধু সেবায় ব্যাপৃত। বিপ্লব করিবার জন্য আমরা তৈরী হই নাই। আমার এ কথা যদি আপনার বিশ্বাস হয়, তবে আপনার ভূতপ্রেতগুলির দৌরাত্ম্য হইতে আমাদের রক্ষা করিবেন। নিশীথদাকে নিয়ে একটু কৌতুক করা হ'ল। সে জন্য তার ক্ষমা পাব, কিন্তু নিশীথদার শ্যালীপতি ব'লে আপনিও হয় ত আমায় ক্ষমা করিতে পারেন। এরূপ অনিশ্চিতের পিছনে ছুটাছুটি করা আপনার ব্যবসা, কিন্তু এ যাত্রা আপনাকে একেবারে নিষ্ফল হ'তে হয় নাই। ঘর-ছাড়া আপনার শ্যালীপতিকে পেয়ে আপনার কয়েক দিন বেশ সুখেই কাটিবে মনে হয়। আপনার স্ত্রী ও সুপ্রিয়া বৌদিকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবেন। সুপ্রিয়া দিদিকে

বলবেন, তিনি যেন শক্ত গিরা দিয়ে নিশীথদার উত্তপ্ত মনকে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেন। ইতি

সুনন্দা"

"পুনশ্চ, মেহগনিকাষ্ঠে আপনার বোমা-টোমা কিছুই নাই, আমার নিজের হাতে তৈরী কিছু খাবার আছে। বাক্সের তলে যে কালো কৌটা আছে, সেখানে টিপ দিলেই বাক্স খুলিবে। অনর্থক হয়রাণ করেছি ব'লে ক্ষমা করিবেন। ইতি।"

সমস্ত ব্যাপারটি এখন জলের মত আমার বোঝা হইয়া গেল। সুনন্দা আমার পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিনে দিনে বর্দ্ধমান আমার লালসাকে নিঃশেষ করিবার জন্য এই কৌতুকের আয়োজন করিয়াছে। সুনন্দার প্রতি আমার যে আকর্ষণ বন্ধুত্বের মাত্রা ছাড়াইয়া প্রেমে ও কামনায় পঙ্কিল হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, সুনন্দা দূরদৃষ্টি ও স্বাভাবিক চতুরতায় তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে আপন ঘরে ফিরাইয়া পাঠাইয়াছে।

জলযোগ সমাপন করিয়া সৌরেন বাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "বেশ নাজেহাল হ'তে হ'ল, নিশীথ বাবু! যাক্, Alls well that ends well এনার্কিষ্ট ধরতে না পেরে ভায়রাভাই ধ'রে এনেছি, এটা নেহাৎ লোকসান হয় নি। শ্যালিকার কাছে কিছু বকশিস মিলবে, তার আর সন্দেহ নাই।"

সৌরেন বাবু পুলিসের লোক, আমার ভয় ছিল, তাঁহার জীবনে সর্ব্বদা বেসুরা বাজিতেছে, কিন্তু এখন দেখিলাম, চোর, ঘাতক, গুণ্ডা, ডাকাত লইয়া কারবার হইলেও তাঁহার জীবনের তার ছিঁড়িয়া যায় নাই। হাসি থামাইয়া গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু ভায়া যদি আপনাকে বাঁচাতে চাও, তবে সুনন্দা দেবীর সংস্পর্শ ত্যাগ করতে হবে। ওঁর সম্বন্ধে পুলিস রিপোর্ট সুবিধের নয়।

"কেন ?"

"বাঃ, উনি যে শুধু বাইরের আগুন নন, তাঁর অন্তরও আগুনে ভরা। ওঁর রক্তজবা-সংঘের কার্য্যকলাপের যতই সন্ধান পাচ্ছি, ততই ভয় হচ্ছে ; কবে না জানি, এই সুন্দরী বিদুষীকে এনে হাজতে পুরতে হয়। অবশ্য ওঁরা এখনও অন্যায় কিছু করেন নি, তবু আমাদের তরফ থেকে নজর রাখতে হয়, নইলে চলে না, ভায়া !"

"আচ্ছা, ওঁকে বাঁচাবার পথ কি কিছুই নেই ?"

"না, ওঁর মনের শক্তি অসীম, কিন্তু সে কথা কেন ? ভায়ার অন্তরে কি আগুনের ছোঁয়াচ লেগেছে ?"

কি বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না, সুনন্দার প্রতি আমার প্রগাঢ় প্রেম লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনিবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। তাই কথা ঘুরাইয়া বলিলাম, "রাত হয়ে যাচ্ছে, এখন ঘুমোবার একটু বন্দোবস্ত ক'রে দিলে—"

কথা কাড়িয়া লইয়া সৌরেন বাবু বলিলেন, "ওঃ, আমি ভুলেই যাচ্ছি, কশ্চিৎ কান্তা বিরহ-বিধুরা—"

হাত যোড় করিয়া বলিলাম, "আজকের মত আমায় মাপ করুন।"

"সে কি হয় ভায়া ! আমি মাপ করলেও ললিত-লবঙ্গ-লতাপরিশীলন-মলয়-সমীর-কোমলা সুপ্রিয়া দেবী যে আমায় জ্যান্ত রাখবেন না। তাঁকে এবার জ্যান্ত এনার্কিষ্টের সাথে মোলাকাৎ না করালে আমার তৃপ্তি হবে না, ভায়া ! ভয় নেই, কাণমলা বেশী না খাও, তার বন্দোবস্ত করা যাবে।"

সৌরেন বাবু চলিয়া গেলেন। আমার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সুপ্রিয়ার সহিত এই ভাবে দেখা হইবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। মিনিটে মিনিটে যেন বিভীষিকা জাগিতে লাগিল, কিন্তু নিরুপায় ঔদাস্যে বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

বিদায়-বেলা সুনন্দার মুখোচ্চারিত শিববাণী এমনই করিয়া গরল ছড়াইয়া দেখা দিবে, তাহা কে জানিত ?

সৌরেন বাবু ফিরিয়া আসিলেন—সঙ্গে দুইটি নারী। এক পাশে লজ্জাবনতা সুপ্রিয়া, অপর পাশে সৌরেন বাবুর স্ত্রী। বিবাহের সময় তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। সৌরেন বাবুকে পূর্ব্বে দেখি নাই ; বিবাহে অনুপস্থিত ছিলেন। সৌরেন বাবুর স্ত্রী আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার দাদা যে এনার্কিষ্ট ধ'রে এনেছে, তার বিচারের ভার গভর্ণমেণ্টের হাতে দিয়ে আমরা তোমার অভিশাপ নিতে চাই না, কোমলহৃদয়া সুপ্রিয়ার হাতেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। এতে তোর কোন অমত নেই ত, সুপ্রিয়া ?"

ঠোঁট বাঁকাইয়া সুপ্রিয়া উত্তর দিল, "না দিদি ! আমি কারও বিচার-ভার নিতে চাই না।"

"না চাইলেও ত চলে না, সংসারে অনেক কায বাধ্য

হয়ে করতে হয়, এই বিদ্রোহীকে শাসন করবার ভার তোর হাতে দিনুম, এ তোর দিদির আদেশ বলেই তোকে মানতে হবে।"

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া, চঞ্চল দীপশিখার মত জ্যোতির্ম্ময়ী এই নারী কৌতুকোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, রাত বাড়ছে, আজ আর আলাপ ক'রে তোমাদের রুদ্ধ হৃদয়ের প্রেম-স্রোতকে আট্‌কে রাখতে চাই না। আমরা এখন আসি।"

সৌরেন বাবু ফিরিয়া বলিলেন, "যো হুকুম, খোদাবন্দ!" পরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভায়া, গীত-গোবিন্দ পড়েছেন ত, নতজানু হয়ে, রক্তালকরঞ্জিত ঐ পদযুগ ধ'রে বলুন—দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

সুপ্রিয়া রাগের ভাবে উত্তর দিল, "যান্?"

"যাচ্ছি, হে বরাঙ্গনা, তোমার অপাঙ্গের অগ্নিতে এ গরীব বেচারীকে ভস্ম ক'রে ফেল না।"

সৌরেন বাবু ও তাঁহার স্ত্রী চলিয়া গেলেন। ঘরে রহিলাম আমি ও সুপ্রিয়া—স্বামী ও স্ত্রী, প্রিয় ও প্রিয়া; কিন্তু মধ্যে এ কি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান! উভয়ের মনে কত ভাব দোলা দিয়া যাইতেছিল, কত স্মৃতি ফুল ফুটাইতেছিল, কিন্তু কণ্ঠে কাহারও ভাষা যোগাইতেছিল না।

বাহিরে একটা ঘড়ী টিক্‌টিক্ করিতেছিল। তাহার শব্দই ঘরের প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। মধুর বেদনা তাহার মোহ ছড়াইতে চাহিতেছিল। কিন্তু অভি-মান, রুদ্ধ অভিমান আক্রোশে গর্জ্জিতেছিল।

মনে হইল, এমনই যুগযুগান্ত কাটিয়া যাইবে। ব্যব-ধানের দুস্তর বারিধি অনতিক্রম্য বাধাই রহিয়া যাইবে। সন্ধ্যার অন্ধকার যেন চক্রবাক এবং চক্রবাকীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবে।

সুপ্রিয়া এ সমস্যায় সমাধান করিল। আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিল। সমস্ত অভিমান নিঃশেষ হইয়া গেল। আবেগ ও আগ্রহে সুপ্রিয়াকে বক্ষে টানিয়া লইলাম।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্, এ, বি, এল)।

প্রত্যাগত

দ্বার তব মুক্ত ছিল; যাইতে আসিতে
দেখেছি দাঁড়িয়ে পথে—চিরমুক্ত দ্বার।
দেখেছি, চলিয়া গেছি; তবু একবার
যাইনি প্রাসাদে তব—এ উদ্‌ভ্রান্ত চিতে
কোন দিনো সে বাসনা আসেনি তখন;—
আপনার মনে ছিনু আপনি মগন।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণতলে দেখেছি তোমার
অযাচিত বিতরণ করুণা প্রসাদ,—
অমৃতের মহোৎসব—অকুণ্ঠ, অবাধ;
দেখেছি, ভুলিয়া তবু ফিরিনিকো আর।
মোহ-মদে টলমল—অন্ধ বোধ-হারা
ভ্রান্ত পথে ছুটে গেছি পাগলের পারা।

দ্বার তব মুক্ত ছিল—সদাব্রত দ্বার;
কোন্ পথে কোথা নিল কামনা আমার!

আজি এই জীবনের আসন্ন সন্ধ্যায়,
তৃষা-জর্জ্জরিত প্রাণে, প্রাণের ক্ষুধায়
দাঁড়াইনু ক্লান্ত আসি' দুয়ারে আবার;—
কিন্তু আজি রুদ্ধ তব চিরমুক্ত দ্বার।
সম্মুখে সরসী ছিল—প্রতপ্ত পরাণী
মিছা মরীচিকা পিছে মরিনু ছুটিয়া;
আজি যদি ভ্রান্তি গেল,—হায় কাঁদে হিয়া,
ঘন কণ্টকাবরিত সরতীরখানি!

ওষ্ঠ কাঁপে—শুষ্ক কণ্ঠে বাণী নাহি সরে;
বিচল চরণ টলে—পড়ি বুঝি হায়;
সঙ্কেত-আঘাত করি—শক্তি নাই করে;
ক্ষমা কর—ধরে লহ, ধর গো আমায়!

দ্বার তব মুক্ত ছিল—সদাব্রত দ্বার,
দয়া করে' খোল দ্বার আবার, উদার!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

সিরাজ ও ইংরাজ

২

মোগলে ইংরাজে

নবাব সায়েস্তা খাঁ ও ইংরাজ কোম্পানীর মধ্যে ক্রমেই যখন মনোমালিন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন কয়েকটি ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল। বিহারেও এইরূপ বিবাদ আরম্ভ হইল, পাটনার নিকট সিঙ্গি কুঠীর অধ্যক্ষ পিকক সাহেব অবাধে সোরার বাণিজ্য পরিচালনা করায়, সুবেদার সৈফ খাঁ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অবশেষে মুক্তি প্রদান করেন। বাঙ্গালায় কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ জব চার্ণকও নবাব সায়েস্তা খাঁর কোপে পতিত হইলেন। কাশীমবাজার দেশীয় ব্যবসায়ী ও ইংরাজ কুঠীর সরবরাহ-কারগণ চার্ণক ও তাঁহার সহযোগিদের নামে অনেক টাকার দাবী করেন। কাশীমবাজারের ফৌজদার তাঁহাদের দাবীর সমর্থন করিলে, নবাব সায়েস্তা খাঁও তাহা অনুমোদন করেন। কিন্তু চার্ণক তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, নবাব তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। কেহ কেহ বলেন যে, চার্ণককে কারারুদ্ধ করিয়া কশাঘাতও করা হইয়াছিল। * নবাব কাশীমবাজার কুঠীর সহিত অন্যান্য স্থানের চলাচল বন্ধ করিয়া দেন। এই সময়ে হুগলীর অধ্যক্ষ বিয়ার্ড সাহেবের মৃত্যু হইলে, যাহাতে চার্ণক হুগলীতে যাইতে না পারেন, নবাব সেইরূপ আদেশও প্রদান করেন। কিন্তু চার্ণক পলায়ন করিয়া হুগলীতে উপস্থিত হন ও তথাকার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। কোম্পানী যখন দেখিলেন যে, মোগলদিগের সহিত কিছুতেই মীমাংসার সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহারা হয় বাঙ্গালার বাণিজ্য পরিত্যাগ করা, না হয় যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হওয়ার অভিপ্রায় করিলেন। শেষে যুদ্ধ আরম্ভ করাই স্থির হইল। সেই জন্য কোম্পানীর বিলাতস্থ অধ্যক্ষগণ ইংলণ্ডাধিপ দ্বিতীয় জেম্সের আদেশ গ্রহণ করিয়া, মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। *

এই আয়োজনের ফলে আডমিরাল নিকলসন ও ভাইস আডমিরাল স্বামন জাহাজ লইয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হন। প্রথমে নিকলসনের জাহাজ উপস্থিত হয়, স্বামনের জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। নিকলসনের জাহাজে প্রায় চারি শত সৈন্য ও কতকগুলি কামান ছিল, চার্ণকের নিকটও প্রায় চারি শত সৈন্য ছিল, এই কিছু কম আট শত সৈন্যের সাহায্যে ইংরাজ কোম্পানী বিপুল নবাব-বাহিনীর সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। নবাবের আদেশে তিন সহস্র পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী হুগলী বন্দর রক্ষার জন্য উপস্থিত হয়। হুগলীর ফৌজদার আবদুল গণি ১১টি কামান লইয়া প্রস্তুত হন। এইরূপে উভয় পক্ষের যুদ্ধের সূচনা হয়। একটি সামান্য ব্যাপারে সত্য সত্যই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষে তিন জন ইংরাজ সৈন্য হুগলীর বাজারে উপস্থিত হইলে কয়েক জন নবাব-সৈন্য তাহাদের সহিত

---

* "The conduct of this war was entrusted, to Job Charnack, the company's principal agent at Hughley, a man of courage, without military experience, but impatient to take revenge of a government from which he had personally received the most ignominious treatment, having not long before been imprisoned and scourged by the Nabob."—Orme.

* "But as it was highly improbable that such a proposition would be acceded to the Company obtained the sanction of King James II to retaliate the injuries they had sustained, and to reimburse themselves for the loss of their privileges in Bengal, by hostilities against the Nawab, and his master the Great Aurungzebe."—Stewart.

At length, finding these impositions extravagantly increased, because they had only been opposed by embassies and petitions, and having the same causes of complaint against the Mogul's governmment at Surat, the company, in the year 1685, determined to try what condescensions the effect of arms might produce; and with the approbation of King James the second, fitted out two fleets, one of which was ordered to cruise at the bar of Surat, on all vessels belonging to the Mogul's subjects; the other was designed not only to commit hostilities by sea at the mouths of the Ganges, but carried likewise 600 regular troops, in order to attack the Nabob of Bengal by land."—Orme.

বিবাদ আরম্ভ করে। ইংরাজ সৈন্য তিনটি আহত হইয়া ফৌজদারের নিকট নীত হয়। কাপ্তেন লেস্‌লি সৈন্য তিনটির উদ্ধারের জন্য এক দল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন। মোগল সৈন্যরা ইংরাজ সৈন্যের নিকট পরাভূত হওয়ার আশঙ্কায়, নগরমধ্যে অগ্নি লাগাইয়া দেয়, ইংরাজ কুঠীর চারিদিকে ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিতে থাকে। মোগল সৈন্যরা ইংরাজদিগের নৌকা ও জাহাজের উপর গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন মোগল বুরুজ দখল করিতে গিয়া পরাভূত হন, পরে চন্দননগরস্থিত ইংরাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ আরবুথনট আসিয়া মোগল বুরুজ অধিকার করিয়া লন। ফৌজদার আবদুল গণি খাঁ পলায়ন করেন। নদীবক্ষ হইতেও ইংরাজ সৈন্য হুগলী বন্দরে গোলাবৃষ্টি করে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ফৌজদার আবদুল গণি ওলন্দাজদিগের মধ্যস্থতায় শেষে ইংরাজদিগের সহিত একটা মিটমাট করিয়া লন।

নবাব সায়েস্তা খাঁ কিন্তু হুগলীর ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশীমবাজারের ইংরাজ কুঠী অধিকারের আদেশ দিয়া অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য হুগলী বন্দরে পাঠাইয়া দেন। চার্ণক নবাবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সমস্ত দ্রব্য ও লোকজন সহ হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সুতানটীতে উপস্থিত হন। হুগলীর বিবাদ হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরাজ কোম্পানী এ দেশে বাণিজ্যের জন্য কিরূপ সাহস অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনুনয়-বিনয়ে ফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, তাঁহারা তখন অস্ত্রধারণেই প্রবৃত্ত হইলেন। বিলাতের অধ্যক্ষগণ সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে আদেশ দিতে লাগিলেন, এমন কি, ইংলণ্ডাধিপও তাহাতে অনুমোদন করিতে ত্রুটি করেন নাই। অবশ্য সে সময়ে আরঙ্গজেব বাদশাহ্‌ ভারতে একচ্ছত্র সম্রাট্‌, আর নবাব সায়েস্তা খাঁর ন্যায় সুবেদার বাঙ্গালার মসনদে আসীন। ইহা জানিয়াও তাঁহারা মোগলের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা যে কিরূপ সাহসী হইয়া উঠিতেছিলেন, এ সকল ব্যাপারে সকলে তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন।

সুতানটীতে থাকিয়া চার্ণক আবার নবাবের সহিত মিটমাটের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি একটি টাঁকশাল নির্ম্মাণ ও বিনা শুল্কে বাণিজ্যের জন্য আবেদন করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু নবাব কোন আশাজনক উত্তর দিলেন না। তখন আবার তাঁহারা মোগলদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। আডমিরাল নিকলসন হিজলী দ্বীপ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। হিজলী হইতে তাঁহারা উলুবেড়িয়া, পরে আবার সুতানটীতে আসিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহাদিগকে সুতানটী পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতে আসিতে আদেশ দেন। কিন্তু চার্ণক সুতানটী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিয়া, আয়ার ও ব্রাডিল নামে দুই জন প্রতিনিধিকে নবাবের নিকট পাঠাইয়া সুতানটীকে সুরক্ষিত ও বিনা শুল্কে বাণিজ্যের আবেদন করিয়া পাঠান। * সেই সময়ে মালাবার উপকূলেও মোগলদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়।

বাঙ্গালার দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া বিলাতের কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁহারা মনস্থ করেন যে, যদি বাদশাহ্‌ তাঁহাদিগকে কোন একটি স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে ও মুদ্রা অঙ্কন করিতে না দেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর এ দেশে বাণিজ্য পরিচালনা করিবেন না। কিন্তু বাদশাহ ও তাঁহার প্রজাবর্গকে যেরূপে হউক, উৎপীড়িত করিতে চেষ্টা করিবেন। † এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা কাপ্তেন হীথকে জাহাজ ও সৈন্য সহ বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। হীথ সুতানটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ে সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালা হইতে চলিয়া যাওয়ায় বাহাদুর খাঁ সুবেদার হইয়া আসেন। তিনি ইংরাজদিগকে

*Old Fort William.—Wilson.

†"When intelligence of the total failure of the expedition, and the disastrous consequences which ensued, reached England, the company were much dissatisfied with the conduct of their servants abroad, and resolved, that unless a fortification, with a district round it, in Bengal, to be held as an independent sovereignty, should be ceded to them by the emperor of Hindustan, with permission to coin money which should be current throughout all his dominions, they would no longer carry on any commerce with that country, but annoy him and his subjects by every means in their power."—Stewart.

মোগলের শত্রু আরাকানরাজের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে বলেন। কাপ্তেন হীথ কিন্তু সুতানটী হইতে ইংরাজদিগকে লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে গমন করেন এবং আরাকানরাজকে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। আরাকানরাজের কোন উত্তর না পাইয়া হীথ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ইংরাজকে লইয়া মাদ্রাজে উপস্থিত হন। আয়ার ও ব্রাডিল বন্দিরূপে ঢাকায় অবস্থিতি করিতে থাকেন।

ইহার পরই নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আসেন। সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর প্রতি বাদশাহের ক্রোধের উপশম হইলে, সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ বাদশাহের আদেশক্রমে ইংরাজদিগকে আবার বাঙ্গালায় আহ্বান করিয়া পাঠান এবং আয়ার ও ব্রাডিলকে মুক্ত করিয়া দেন। চার্ণক বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দলাভের প্রার্থনা করেন। নবাব সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে, চার্ণক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ও ৩০ জন ইংরাজ সৈন্য লইয়া সুতানটীতে উপস্থিত হন। এই সুতানটী ও তাহার সংলগ্ন কলিকাতা ও গোবিন্দপুর লইয়া কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। যাহা এককালে সামান্য গ্রামমাত্র ছিল, তাহা নানারূপে সুসজ্জিত হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়া উঠে। তাই কবির কথায় বলিতেছি,—

> "ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথী-তীরে
> কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী,
> আবৃত এখন যাহা দরিদ্র কুটীরে,
> শোভিবে অমরাবতীরূপে পরিম্লানি
> রাজ-হর্ম্ম্যে, দৃঢ় দুর্গে আলোকমালায়।"

সুতানটীতে আসিয়া ১৬৯১ খৃঃ অব্দে নবাব ইব্রাহিম খাঁর চেষ্টায় ইংরাজরা বাদশাহের সনন্দলাভ করেন। তাহাতে তাঁহাদের বার্ষিক ৩ হাজার টাকা পেশ্‌কশ দিবার আদেশই থাকে। ইহার দুই বৎসর পরে চার্ণকের মৃত্যু হয়। আবার ইংরাজদের উপর বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, কিন্তু নবাব ইব্রাহিম খাঁর জন্য বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই।

এই সময়ে বাঙ্গালায় এক ভয়াবহ বিপ্লব উপস্থিত হয়। বর্দ্ধমান প্রদেশের চেতোয়া ও বর্দার জমীদার সভাসিংহ ও উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁ এক ভয়াবহ বিদ্রোহের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসিত করিয়া তুলে। বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায় তাহাদের হস্তে নিহত হন, তাহারা হুগলী বন্দর ও অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করে। বর্দ্ধমানের রাজকুমারী সত্যবতীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া সভাসিংহ তাঁহার হস্তে নিহত হয়। রহিম খাঁ বিদ্রোহীদের সর্দ্দার হইয়া উঠে। বাদশাহ আরঙ্গজেব, পৌত্র আজিম-ওশ্বানকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীদের ভয়ে চুঁচুঁড়ার ওলন্দাজগণ, চন্দননগরের ফরাসী-গণ ও সুতানটীর ইংরাজগণ কতকগুলি দেশীয় সিপাহী নিযুক্ত করিয়া সম্পত্তি-রক্ষায় সচেষ্ট হন। তাঁহারা নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট হইতে আদেশ লইয়া আপনাদের কুঠীর চারিদিক্ প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া চারি কোণে মিনার নির্ম্মাণ করেন। ইহাই য়ুরোপীয়গণের দুর্গ-নির্ম্মাণের সূচনা, ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা দুর্গনির্ম্মাণে সমর্থ হন নাই।* ইংরাজরা বহু দিন হইতে যে চেষ্টা করিতেছিলেন, এত দিনে তাহা ফলবতী হইতে চলিল। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজরা প্রাচীর ও বুরুজাদির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজ হইতে দশটি কামান চাহিয়া পাঠান।†

ইব্রাহিম খাঁর স্থলে আজিমওশ্বান বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিলেন, ওলন্দাজ ও ইংরাজগণ তাঁহার নিকট আপনাদের বাণিজ্যের জন্য আবেদন করেন। ওলন্দাজরা ইংরাজদিগের ন্যায় বার্ষিক ৩ হাজার টাকা পেশ্‌কশ প্রদানের আবেদন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরাজরা পূর্ব্ব-সুবেদারগণের আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রার্থনা করেন। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে শাহজাদা আজিমওশ্বানকে ১৬ হাজার টাকা নজর প্রদান করিয়া ইংরাজরা সুতানটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের ভূমি ক্রয়ের আদেশপ্রাপ্ত হন। অবশেষে ১৭০০ খৃঃ অব্দে আজিমওশ্বানের নিকট হইতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করেন। বাঙ্গালা আবার কিছুদিন মাদ্রাজের অধীন ছিল, এখন তাহা পুনর্ব্বার স্বতন্ত্র হইল। মিষ্টার আয়ার বাঙ্গালার প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষ হইলেন। কলিকাতার দুর্গ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ইংলণ্ডাধিপ তৃতীয় উইলিয়মের নামে 'ফোর্ট উইলিয়ম'

---

* Stewart.

† Wilson.

আখ্যা ধারণ করিল। ক্রমে বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধিও হইতে লাগিল।

আবার দুই এক বৎসর পরে সুরাট অঞ্চলে ইংরাজ জলদস্যুগণের মোগল জাহাজের উপর অত্যাচারে বাদশাহ আরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া সাম্রাজ্যমধ্যে সমস্ত য়ুরোপীয়কে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। তাঁহাদের বাণিজ্য-কার্য্যও বন্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালায় কাশীমবাজার, রাজমহল প্রভৃতি কুঠীর কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়া কলিকাতা অধিকারেও আদেশ প্রদত্ত হয়। কলিকাতার অধ্যক্ষ বিয়ার্ড সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া তথায় অধিক পরিমাণে কামান ও সৈন্য স্থাপন করেন। তিনি মোগল জাহাজ আটক করিয়া হুগলীর ফৌজদারকে ভয়প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরাজরা সুযোগ পাইলেই সাহস অবলম্বন করিতেন। অবশেষে আজিমওশ্বানের চেষ্টায় মোগল কর্ম্মচারীরা শান্ত হয় ও বাদশাহ ইংরাজদিগের বাণিজ্য-পরিচালনার আদেশ দেন। সেই সময়ে ইংলিস্ কোম্পানী লণ্ডন কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাদশাহের আদেশে তাঁহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে এই উভয় কোম্পানী মিলিত হইয়া যুক্ত কোম্পানী হইয়া উঠে। আজিমওশ্বানের সুবেদারী সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া আসেন, রাজস্ব সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের ভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল। আজিমওশ্বানের সহিত মুর্শিদকুলীর মনোমালিন্য হওয়ায় দেওয়ান ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া ১৭০৩ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসেন। মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব-নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার নামানুসারে তাহার মুর্শিদাবাদ নামকরণ হয়। আজিমওশ্বানও বাঙ্গালা হইতে বিহারে চলিয়া যান। দেওয়ান মুর্শিদকুলীর সহিত ইংরাজ কোম্পানীর বনিবনাও হইতেছিল না। তাঁহাদের বাণিজ্যপরিচালনার জন্য দেওয়ান অনেক টাকা দাবী করিয়া বসেন। কোম্পানী তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া কাশীমবাজারে আবার কুঠীস্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন।

এই সময়ে বাদশাহ আরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটিল। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল। আজিমওশ্বান তাঁহার পুত্র ফরখ্‌শেরকে বাঙ্গালার প্রতিনিধি রাখিয়া দিল্লী অভিমুখে চলিয়া গেলেন। শাজাদা ও দেওয়ান ইংরাজদিগের বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক টাকা দাবী করিতে লাগিলেন। শাজাদা কোম্পানীর কোন কোন কর্ম্মচারীকে আটক করিয়া রাখিলে, কোম্পানীর লোকরাও তাঁহাদের নৌকা আটক করার জন্য খিদিরপুরের কয়েক জন চৌকী-দারের উপর বেত্রাঘাত করিতে ছাড়িলেন না। সুযোগ পাইলেই তাঁহারা মোগল কর্ম্মচারীদের উপর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিতেন।

এই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ কিছু দিনের জন্য বাঙ্গালা হইতে চলিয়া যান, তাঁহার অনুপস্থিতিতে শের বলন্দ খাঁ বাঙ্গালার কার্য্য পরিচালনা করেন। ইংরাজরা তাঁহাকেও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা হুগলীর নূতন ফৌজদার জিয়াউদ্দীন খাঁকে সন্তুষ্ট করিয়া কতক কতক বিষয়ের সুবিধা করিয়া লন। মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার নায়েব নাজিম ও দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া আবার বাঙ্গালায় আসেন। আবার আজিমওশ্বানের উপর বাঙ্গালার ভার অর্পিত হয়। কোম্পানী তাঁহাকে ও দেওয়ানকে সন্তুষ্ট করিয়া আবার কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিবাদ চলিতে চলিতে অবশেষে ফরক্‌শের বাদশাহ হইলেন। মুর্শিদকুলী তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবেদারী এবং বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করিলেন। কোম্পানী ফরক্‌শেরের দরবার হইতে আবার সনন্দলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা সনন্দলাভের সময় পর্য্যন্ত বাদশাহ আরঙ্গজেবের আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নবাবের উপর হুকুমনামা আনাইলেন। কিন্তু তাহাতেও ফললাভ হইল না। তখন তাঁহারা নবাব দেওয়ান প্রভৃতিকে ২৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়া আপাততঃ নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও যখন গোলযোগের নিবৃত্তি হইল না, তখন কোম্পানী দিল্লীতে বাদশাহ ফরক্‌শেরের দরবারে দূত প্রেরণ করিবেন স্থির করিলেন। জন সর্ম্মান প্রমুখ তিন জন কর্ম্মচারী ডাক্তার হ্যামিলটন ও আরমেনীর সদাগর খোজা সরহদ্দ দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। দিল্লীতে তাঁহারা যেমন কোম্পানীর বাণিজ্যের সুবিধার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, নবাব মুর্শিদকুলীও

সেখানে আপনার পক্ষীয় লোক দ্বারা তাহার বাধা জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে মাড়ওয়াররাজ অজিত সিংহের কন্যার সহিত বাদশাহ ফরক্‌শেরের বিবাহসময়ে তাঁহার একটি ব্রণ হওয়ায়, ডাক্তার হ্যামিলটনের অস্ত্রচিকিৎসায় তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করায়, বাদশাহ হ্যামিলটনের অনুরোধে ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যের সনন্দ প্রদান করেন। সনন্দে এইরূপ আদেশ ছিল যে, কলিকাতার অধ্যক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত দস্তক দেখিলে, বাঙ্গালার সরকারী কর্ম্মচারিগণ কোন দ্রব্য আটক করিতে পারিবে না। মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে কোম্পানীকে সপ্তাহে তিন দিন মুদ্রা অঙ্কন করিতে দিতে হইবে। কোম্পানীর নিকট ঋণী বা দায়ী লোককে কলিকাতার অধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। আর স্থতানটী প্রভৃতির ন্যায় ৩৮ খানি গ্রামের জমীদারী ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। সনন্দ আসিলে, মুর্শিকুলী খাঁ তাহার কূট অর্থ করিয়া ও অন্যান্য কারণ দেখাইয়া, সমস্ত দফা মানিয়া না লইয়া কতকগুলি স্বীকার করিলেন। ইংরাজরা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সায়েস্তা খাঁর সময় অর্থাৎ বাঙ্গালার স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা হইতে মুর্শিদকুলী খাঁর সময় পর্য্যন্ত ইংরাজ কোম্পানীর সহিত মোগল কর্ম্মচারিগণের কিরূপ গোলযোগ ঘটিয়া আসিতেছিল, তাহা অবশ্য সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইংরাজদিগের অধ্যবসায়ের গুণে শেষে যে তাঁহারা কার্য্যোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাদের দুর্জ্জয় সাহস তাঁহাদিগকে কার্য্যোদ্ধারে যে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহস ও অধ্যবসায়ে ইংরাজ সর্ব্বত্রই অজেয়। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন ভারত-সাম্রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাঁহারা যে আরও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। অবশেষে ইংরাজ কোম্পানী যে ভারত-সাম্রাজ্য করতলগত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব হইতে আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ কেমন আপনাদের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছিলেন। প্রথম হইতে তাঁহাদের সাহস ও অধ্যবসায় দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে যে একটা বিরাট ব্যাপার সংসাধন করিবেন, তাহারই সূচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা যে পথ ধরিয়াছিলেন, সে পথে যাহারা বাধা দিয়াছিল, তাঁহারা তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনা হইতেও তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

বৈশাখী

এসো বৈশাখ, পাবক-শিখার পাবনের উৎসবে,
ধূসর ভূষায় ধূলোট লীলার তাণ্ডবে,—ভৈরবে।
বিশাখা রশ্মি বিশিখে কালের কার্ম্মুক টঙ্কার,
মুক্ত করেছে নব বরষের আজিকে তোরণ-দ্বার ;—
জরায় জীর্ণ পুরাতন আজি জড়তায় ম্রিয়মাণ,
শুনাও জগতে ঝঞ্ঝা বিষাণে নবীনের আহ্বান।
প্রলয়-বিলাসী বৈশাখ, আলো অনল-বরষী বায়,
মরণের শেষে মহা জীবনের সুবিপুল সূচনায়।
এসো ঈশানের মেঘ জটাজুটে পাটল গগন ঘিরে
বজ্র ডমরু কর সম্পুটে গরজিবে গম্ভীরে ;—
সারা বরষের সঞ্চিত যত গ্লানি, যত আবিলতা,
ক্রূর বিদ্বেষ কালিমা, মনের হীন দৈন্যের ব্যথা—
পবনে উড়াও চিতারেণু তার কোরো না করুণা-লেশ,
মনের পীড়িত 'মানুষ' বাঁচুক, 'পশু' হোক নিঃশেষ।
মার সংহারী, হর-আঁখি-চারী, জ্বল প্রদীপ্ত শিখা,
চেতনের জয় কেতনের ভাতি অম্বরে হোক লিখা।
সগর-বংশ মদে উদ্ধত জ্ঞানহীন বিহ্বল,
জাগো কপিলের ক্রুদ্ধ নয়নে জ্বালাময় কালানল।
কুৎসিত যাহা, মিথ্যা যা' কিছু, দহি কর নিঃশেষ,
পাবন পাবক-শিখায় শুদ্ধ হউক দূষিত দেশ।
জাগো ভগীরথ পূর্ণ প্রাণের সুষমায় সুন্দর ;
ভাগীরথীধারা স্নিগ্ধ হউক শাপহত অন্তর।
জরাতুর মনে যৌবন সনে আনো শাশ্বত প্রাণ,
গগনে পবনে চির-নবীনের বাজুক বিজয় গান।

শ্রীজগৎমোহন সেন, (বি, এস-সি, বি, ই, ডি)।

২৬

ভাঙ্গা মন্দিরে দুই সখী মিলিত হইতেই রাজু নন্দার গলা জড়াইয়া বলিল, "আজ তোর সুপ্রভাত, নন্দা! মা'র কাছে খবর পেয়ে কি আনন্দই যে হ'ল, তা বল্‌তে পারি নে!"

নন্দা স্নিগ্ধ হাস্যে কহিল, "তুই নিরানন্দে খুন হয়ে মরছিলি, তবু যা হোক আনন্দ পেলি, ওইটাই মস্ত লাভ মনে করি।"

"আমার আনন্দই বুঝি তোর লাভ, তা ছাড়া আনন্দ নেই? সত্যি নন্দা, তুই আমার লোহাপ্রাণে সোণার পরশ দিয়ে সোণা ক'রে দিয়েছিস্‌। যে অশান্তির আগুনে জ্ব'লেপুড়ে মরছিলাম, এই দুই মাসেই ঠাকুরকে ডাকতে শিখে হৃদয় আমার জুড়িয়ে গেছে।"

"দিনে দিনে আরও জুড়িয়ে যাবে। আমাদের অখিল বাবু যে দিন এসে রাজরাজেশ্বরীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বেন, সে দিন মনের কোণেও আর অন্ধকার থাকবে না। এখনকার দারুণ অভিমান তখনকার নির্ম্মল প্রীতির ধারায় ধুয়ে যাবে।"

"সে আর এ জন্মে নয়, নন্দা, আমি আর নির্ম্মল প্রীতি চাই না। আমার সব সাধ মিটে গেছে। যে ক'দিন আছি, সে ক'দিন আমার ঠাকুরকে নিয়েই আমি স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারবো, তিনি থাকুন তাঁর নূপুরকে নিয়ে।"

"ছিঃ রাজু, এখনও অভিমান? মানুষের ভুলভ্রান্তি যে পদে পদে। সর্ব্বদা সেগুলো মনে রাখলে কি চলে? ঠাকুর নিয়ে পূজো নিয়ে থাকবি থাক্ না, কিন্তু অন্যকে অপরাধী ভেবে থাকা ভাল নয়।"

"সে অপরাধ করবে, তবু তাকে অপরাধী ভাববো না? অত পরমহংস আমি নই। এইবার তোরও পরীক্ষার দিন আস্‌ছে, দেখা যাবে—অভিমান হয় কি না। তোর ছুটীর দিন যে সংক্ষিপ্ত হয়ে এল, কখন্ যেন প্রজাপতির দূত এসে উপস্থিত হয়।" বলিয়া রাজু মন্দিরের প্রাঙ্গণে সুনন্দাকে কি যেন দেখাইতে লাগিল।

দিবাব্যাপী বর্ষণের পর ক্ষান্তবর্ষণ আকাশের কোলে সবে এতটুকু একটু তারকার হাসি ফুটিতে না ফুটিতেই নীলাম্বরতলে সন্ধ্যার আসন্ন আগমনের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল। দূরের বনানীশীর্ষ হইতে একখানি অতি সূক্ষ্ম নীল যবনিকা বৃষ্টিধৌত ধরণীর বক্ষে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল। রজনী সমাগত জানিয়াও একটি বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতি প্রস্ফুটিত নির্ম্মল যূথিকার ঝাড় ছাড়িয়া দূরে যাইতে পারিতেছিল না। বর্ষাপ্লাবিত উন্মুক্ত মাঠের মধ্য হইতে রহিয়া রহিয়া বর্ষার সজল, শীতল বাতাস এক একবার ছুটিয়া আসিয়া বনশ্রেণী আন্দোলিত করিয়া ডোবার জলে মৃদু মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে।

বায়ুর তাড়নে প্রজাপতিটা ফুলের উপর স্থির না থাকিয়া উড়িয়া উড়িয়া ফুলে ফুলে বিচরণ করিতেছে। সেই দিকে অঙ্গুলী তুলিয়া রাজু কৌতুক-হাস্যে বলিল, "দেখ নন্দা, কি আশ্চর্য্য, প্রজাপতি দূত হয়ে আসবে বলতে না বলতেই এসে হাজির। আর দেরী নেই, এইবার তোর বিয়ের ফুল সত্যি সত্যিই ফুটলো রে। বাড়ী গিয়ে বরণডালা সাজা গে, সত্যপ্রিয় তোর প্রাণপ্রিয় হয়ে আস্‌ছেন।"

"তাঁকে যে আমারই প্রাণপ্রিয় হয়ে আসতে হবে, এর ত কোন মানে নেই। অন্যের প্রাণপ্রিয় হ'লে কে ঠেকায়? প্রজাপতি আমাদের মন্দিরের পাশেই দূত হয়ে আসে না, যেখানে যাদের বাগানে ফুল ফোটে, সেইখানেই দূত হয়ে যায়। আমার বিয়ের ফুল ফোটার কথা বলছিস্‌—ওটা যখন এত দিন ফোটে নি, এখনও ফুটবে না।"

দেশশুদ্ধ লোক জানে, সত্যর সহিত নন্দার বিবাহ পাকা হইয়া গিয়াছে। কয়েকটা মন্ত্রোচ্চারণ, একটা অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই বাকী নাই। একমাত্র বিবাহের অন্তরায় ছিল সত্যর পরীক্ষা, সে অন্তরায়ও দূরে সরিয়া গিয়া আজ সফলতার বার্ত্তা চারিদিকে প্রচার করিয়া তাহাদের পরিণয়ের মধুর চিত্রখানি আত্মীয়-বান্ধবের নেত্র-পথে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এমন সময় বিবাহের পাত্রীর মুখে এমন নির্লিপ্ত ভাবের কথা শুনিয়া রাজু বিস্মিত হইল।

শৈশব হইতে রাজু সুনন্দা পরস্পর পরস্পরকে ভাল-রূপেই জানে, নন্দার সহজ সরল পরিহাসও রাজুর অজানা নাই। নন্দা যে কৌতুক করিয়াও মিথ্যা বলিতে পারে না, এইখানেই অপরের সহিত তাহার মিল নাই। অনেক

বিষয়ে সে এত স্বতন্ত্র সুদূর যে, রাজু আজ পর্য্যন্ত তাহার নাগাল পাইয়া উঠে না। নাগাল না পাইলেও আজ নাগালের আশায় রাজু উৎসুক-লোচনে নন্দার পানে চাহিতেছিল।

নন্দা অদূরের বর্ষাস্নাত শ্যামচিক্কণ বনরাজির মধ্যে স্বপ্নভারাকুল নেত্রদ্বয় মেলিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। মুখে ভাবনার রেখা নাই, আনন্দের দীপ্তি নাই, ভাবের উচ্ছ্বাস নাই। এ মুখ কি বিবাহের ক'নের? না ঐ পাষাণ-দেবতার পাষাণহৃদয়া সেবিকার?

সেই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রাজু নন্দার একখানি হাত হাতের মধ্যে বন্দী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বনের বুকে আজ কি ভাবের গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, ভাই! হাঁ ক'রে যে চেয়ে রয়েছিস্? কিন্তু তোর মনের গঙ্গায় কি জোয়ার-ভাটা খেলবে না? এখন বিয়ের ফুল ফুটবে না কিসে, তা কি শুন্‌তে পাবো? যে ফুল ফুটেছে, তোর গম্ভীর মুখের ভয়ে তা কি আবার ঝরে যাবে?"

নন্দা বনের উপর হইতে চোখ দুইটা সখীর মুখের উপর আনিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে কহিল, "যার মনে গঙ্গা নেই, তার আবার জোয়ার-ভাটা আস্‌বে কোথা থেকে, রাজু? সে বিষয়ে আমাদের রাজেশ্বরীকেই মহাজন বলতে হবে। গঙ্গা-টঙ্গা ও সব ছোট-খাট কিছু নয়, একেবারে ভাবের উদার সমুদ্র। বিয়ের ফুল বিয়ের ফুল করছিস কেন রে? ফুল কি মানুষে ফোটাতে পারে? ঈশ্বর যে তার সৃষ্টিকর্ত্তা, মানুষ যেটা গড়তে চায়, তিনি সেটা ভেঙ্গে দেন। থাক, এ সব আলোচনা আর এক দিন হবে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ঠাকুরকে ধূপ-দীপ দেখাই গে।" বলিয়া নন্দা উঠিয়া পড়িল। রাজু মনের অদম্য কৌতূহল মনের মধ্যে দমন করিয়া নন্দার অনুসরণ করিল।

২৭

রাজুকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া নন্দা যখন ঘরে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রজনীর অন্ধকারের সহিত মেঘের অন্ধকার মিশিয়া ধরণী রোমে রোমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভেকদল ডোবা হইতে কলরব তুলিয়াছে। নিস্তব্ধ বনপথ ঝিল্লীর ঐক্যতানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই টুনুটুনু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মায়ের কঠোর শাসনে সুজলা ম্লান প্রদীপের সম্মুখে 'বর্ণ-পরিচয়'-খানা লইয়া ঢুলিতেছিল।

সুনন্দার সাড়া পাইয়া সুজলা যেন বাঁচিয়া গেল। পড়া বলিতে গেলে মায়ের কাছে কেবলই ভুল হয়, শাস্তির অন্ত থাকে না। আর পিসীমণি কেমন আদর করিয়া পড়া বুঝাইয়া দেন, ভুল হইলে ধীরে ধীরে ভুল সারিয়া দেন।

জীর্ণপ্রায় বইখানি বক্ষে জড়াইয়া সুজলা লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল, "পিসীমণি এসেছ, তুমি এখন রান্না চড়াবে না? চল, রান্নাঘরে তোমার কাছে বোসে পড়ি গে।"

রাত্রিকালে ছেলে-মেয়েদের একলা রাখা হয় না বলিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী শয়নকক্ষে জপের আসনে বসিয়া হরিনামের মালা জপিতেছিলেন। নাতনীর ব্যস্ততায় বিরক্ত হইয়া রুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "কি ধিঙ্গী-মেয়ে মা গো, বোসে পড়ছিস, পড় না। পিসী রাত দুপুর অবধি পাড়ায় পাড়ায় চড়াবড়া ক'রে এলেন, মেয়ে এখন গেলেন পিসীর সাকরেদ হ'তে। এখন থেকে মেয়েকে শায়েস্তা না কল্লে পরে মেয়ে নিয়ে আমার তরীর ললাটে অনেক দুঃখু আছে।"

মোক্ষদার এ সব মুখরোচক মন্তব্যে সুনন্দা কোন দিনই কাণ দিত না। এখনও কাণ না দিয়া সুজলার হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

তরঙ্গিণী উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া ঝোলের তরকারী কুটিতেছিল। দ্বারে সমাগত ননদকে দেখিয়া বলিল, "তোমার সাত তাড়াতাড়ি পা ধুয়ে রান্না চড়াতে আসতে হবে না, ঠাকুরঝি, আমিই চড়িয়ে দিয়েছি। তুমি বরং সুজলাকে একটু পড়াও। হতচ্ছাড়া মেয়েটার পড়াশুনার নামে গায়ে জ্বর আসে। যত স্ফূর্ত্তি খেলার সময়।"

"এখন যে খেলার বয়েস বৌদি, কাযেই খেলতে ভালবাসে। তুমি পরে দেখে নিও, সুজলা কত লেখাপড়া শিখবে। আমিই ত আসছি ভাই, তুমি এত তাড়াতাড়ি রান্না চড়ালে কেন?" বলিয়া নন্দা একখানা পিঁড়ি টানিয়া তরঙ্গিণীর পাশে বসিয়া সুজলাকে কোলের উপর বসাইল।

তরঙ্গিণী আলুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কহিল, "বারোমাস তুমিই ত রাঁধ ছ, ঠাকুরঝি, এর আগে কি জানি, আমার একেবারেই আগুনের তাপ সইত না। এই গেল

কয়েক মাস তুমি এখানে না থাকাতেই রান্না আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আর এখন অভ্যাস না হলেও চলবে না, তুমি ত আপন রাজত্বে চল্লে, ভাইয়ের কুঁড়েবাসের কাল শেষ হয়ে গেল।”

সুনন্দা নিরুত্তরে একটু হাসিল। সকলেই তাহার সম্বন্ধে কত জল্পনা-কল্পনা করিতেছে, আকাশ-কুসুমের মালা গাথিতেছে। সেই কেবল তাহার বিষয়ে কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই। ভাগ্যবিধাতার অলক্ষ্য হস্তের ইঙ্গিতে তাহার ছায়াময় কুসুমাবৃত সরল জীবনপথে শত বাধা—শত উপলখণ্ড আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ বাধা সরাইয়া সুন্দর সহজ পথে আর কি সে চলিতে পারিবে? তাহার নির্ম্মল হৃদয়াকাশ যে ঘন কালমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, শরতের প্রফুল্ল বায়ুহিল্লোলে সে মেঘ কি অপসারিত হইবে?

তাহার অভাবনীয় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাতেই না ভ্রাতৃ-জায়ার এত আদর—সহানুভূতি। এ পটপরিবর্ত্তন হইলেই সংসারের এ চিত্র অন্য রূপ ধারণ করিবে না কি?

সুনন্দা বেশী ভাবিতে পারিল না। মনের সমস্ত চিন্তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া কেরোসিনের ডিবার কাছে সরিয়া গিয়া সুজলাকে পড়াইতে লাগিল।

বস্তুতঃ লেখাপড়া নামক পদার্থটি ইতিপূর্ব্বে এ গৃহে তেমন সমাদৃত হয় নাই। বাড়ীর প্রধান এবং প্রথম ছেলে বংশী দেবী সরস্বতীর পূর্ণ প্রসাদলাভে কৃতার্থ হইতে পারে নাই। সুনন্দা প্রথমতঃ দাদার নিকট হইতে কিছু বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া নিজের চেষ্টায় গ্রামের বৃদ্ধ পণ্ডিতমহাশয়কে ধরিয়া তাঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিদ্যা সযত্নে আদায় করিয়া লইয়াছিল। ইংরাজী ভাষার সহিতও তাহার মন্দ জানা-শুনা ছিল না।

পণ্ডিতগণ বলেন, “চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।” তাহার অকাট্য প্রমাণ সুনন্দা। সুনন্দার যত্নে চেষ্টায় অল্পদিন হইল তরঙ্গিণী ‘বর্ণপরিচয়’ দুইখানি কোনরূপে শেষ করিয়া নিজের নাম লেখা শিখিয়াছিল, চিঠিপত্র সে লিখিতেও পারিত না, পড়িতেও পারিত না। বানান করিয়া আস্তে আস্তে ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিত মাত্র।

মোক্ষদা ঠাকুরাণী মেয়েমানুষের লেখাপড়ার নামে চটিয়া আগুন হইতেন। “ভদ্দরনোকের বৌ-ঝির কেতাব কোরাণ কি? তারা মুখ বুজে ঘরকন্নার কায্ শিখবে, রান্না শিখবে, এর বাড়া আবার কায আছে না কি?”

নন্দার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইবার পর মোক্ষদার কিন্তু মতপরিবর্ত্তন করিতে দেখা গেল। কালো ঢেঙ্গা থুবড়ো মেয়েটার কেতাব জানার গুণেই অমন চাঁদপানা ছেলেটা পাগল হইয়া গেল। ছেলের পাগলামীর জন্যেই না সত্যর মা অগত্যা বাধ্য হইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, নহিলে মেয়ের শরীরে আবার কিসের গুণ?

ইদানীং মোক্ষদা ঠাকুরাণীর আগ্রহে তরঙ্গিণী উঠিয়া পড়িয়া মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আশা, গোড়া হইতে তাড়না করিলে কালে সে পিসীকেও ছাড়াইয়া যাইবে এবং পিসীর অপেক্ষা তাহার ভাল বিবাহ হইবে। নহিলে মেয়েমানুষের আবার শিক্ষা-দীক্ষা, অকেযো বিদ্যা ধুইয়া মেয়েরা কি জল খাইবে?

সুনন্দা সুজলাকে পড়াইতে পড়াইতে মাঝে মাঝে বাহিরের দিকে চাহিতেছিল। সন্ধ্যায় একটু ধরণ হইয়া আবার আকাশে মেঘ জমিতেছে। গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জনের সহিত বৃষ্টিকে সহচর করিয়া দূর হইতে ঝড় আসিতেছে। বৃক্ষচ্যুত বকুলের স্নিগ্ধ সুবাসের সহিত ভিজা মাটীর গন্ধ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, এই অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ বনপথ বাহিয়া জল-কাদার ভিতর বংশীকে আসিতে হইবে। সুনন্দা বার বার সচকিত হইয়া বংশীর কথাই ভাবিতেছিল।

কিয়ৎকাল পর প্রাঙ্গণে পরিচিত পদশব্দের সহিত বাঘা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

নন্দা কেরোসিনের ডিবা হাতের আড়ালে ঢাকিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া কহিল, “দাদা এলে, এতক্ষণে সময় হ'ল? ঝড়-বৃষ্টি দেখেও একটু সকাল সকাল ঘরে ফেরো না, এক দিন সাপেই তোমায় ঠাণ্ডা ক'রে দেবে।”

বংশী রন্ধনশালায় ঢুকিয়া উত্তর করিল, “আমিই কত গণ্ডা সাপ-বাঘকে ঠাণ্ডা করতে পারি, সাপ আবার আমায় ঠাণ্ডা করবে! তোরা ভারী ভীরু, মেঘের ডাক শুনে ভয়ে দিশেহারা হয়ে ভাবিস্, ‘দাদা কেন আমাদের আঁচলের নীচে আসে না।’ তোদের মত চুপ ক'রে বোসে থাকলেই আমার চলে কি না, আর ত কায নেই। সত্য যা পাশ করেছে, এমন পাশ বাঙ্গালীর ভেতর কেউ করতে

পারে না। এ খবর পেয়ে আমি কি চুপ ক'রে থাকতে পারি? ভগবান্ পয়সাই যেন দেন নি, তাই ব'লে কি মানুষও করেন নি?"

রান্না হইয়া গিয়াছিল, পোড়া কাঠ দুইখানা উনানের মুখ হইতে তুলিয়া তাহার উপর জল ঢালিয়া দিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "হাঁ, পয়সা না দিয়ে ভগবান্ মস্ত মানুষ করেছেন, তা মানুষের মত কি কায ক'রে আসা হ'ল, শুন্‌তে পাব কি?"

"শুন্‌তে পাবে কেন, দেখ্‌তেই পাবে। আমি গরীব, আমার কি সাধ্যি। দাদা ঠাকুরের কাছ থেকে একটা টাকা ধার ক'রে বারোয়ারীতলায় এক টাকার 'হরির লুট' দিয়েছি। ভয় নেই, টাকাটা অপব্যয় হয় নি, তোমাদের জন্যেও প্রসাদ এনেছি।" বলিয়া বংশী কোঁচার খুঁট খুলিয়া কতকগুলি বাতাসা নন্দার অঞ্চলে ঢালিয়া দিতে লাগিল।

২৮

কয়েক দিন পর চিঠি লইয়া বিশু বংশীর কাছে আসিল, অন্নপূর্ণা বিবাহের দিন স্থির করিয়া বংশীর সম্মতির জন্য লিখিয়াছেন। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিবাহের ভাল দিন আছে, উক্ত দিবস তিনি মনোনীত করিয়াছেন।

বংশী চিঠি পড়িয়া আনন্দে অভিভূত হইয়া বিশুকে কহিল, "দেখ ত বিশুদা, মা'র কি অন্যায়, তিনি আমায় আদেশ করবেন, না অনুমতি চেয়েছেন, আমি আবার তাঁকে মতামত দেব। নন্দা যে তাঁদেরি, যে দিন হুকুম করবেন, সেই দিনই পাঠিয়ে দেব।"

বিবাহের প্রসঙ্গের পর সত্যর প্রসঙ্গ উঠিল। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর সত্য বাড়ী আসিয়াছে। বিশু সানন্দে সাগ্রহে দাদাবাবুর বিষয়ের অবতারণা করিতে লাগিল। "সত্য পাশ হইবার সাথে সাথে মস্ত চাকুরী পাইয়াছিল, কিন্তু চাকুরীতে তাহার মন নাই। সতু বলে, এক হাজার টাকার চাকুরীও যা, এক টাকার চাকুরীও তাই। গোলামীর ছোট বড় কি? ছেলের মতেই মা'র মত। মা'র লোভ ব'লে কোন জিনিষ নাই, অহঙ্কার ব'লে কোন জিনিষ নাই। অমন মা না হ'লে কি অমন ভাল ছেলে হয়? দাদাবাবু বলেন, তিনি দেশের কায করবেন। গাঁয়ে ধান-চালের কল-কারখানা করবেন। কলেই হাল-লাঙ্গল হবে। মা বলেন, 'কয়েকটা দিন বিশ্রাম কর সতু, বড় খাটুনী খেটেছিস, শরীর রোগা হয়ে গেছে। আমার মা লক্ষ্মী আগে ঘরে আসুক, তার পর কায, মা'র পয়ে তোর সুখ-সৌভাগ্য উথলে উঠবে।' দাদাবাবু হেসে কুটি-কুটি; বলে, 'তাই হবে মা, এর পর তোমার বৌয়ের পয় দেখে নেব। কল-কারখানায় যদি লোকসান হয়, তা হ'লে এখন যাকে লক্ষ্মী ব'লে আদর করছো, তখন আবার তাকেই অলক্ষ্মী বলতে হবে।' মা বলেন, 'আমার লক্ষ্মী কোন দিনই অলক্ষ্মী হবে না, সে ভয় নেই'।"

বর্ষার মেঘমেদুর অপরাহ্নে খুঁটিনাটি তুচ্ছ কথাগুলি সুনন্দার প্রাণে যেন সুধার ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল একখানি শান্তিপূর্ণ কুটীর, অন্নপূর্ণার মাতৃমূর্ত্তি। একান্ত নির্ভরশীলা হৈমর ছোট মুখখানি, জ্ঞানে দীপ্ত, বুদ্ধিসমুজ্জ্বল, সৌম্য সহাস্য আর একখানি মুখ। সেই কবেকার একটি কথা, একটু হাসি, একটুকু কটাক্ষ। তাহার মধ্যে কি যাদুমন্ত্র আছে, কি অমৃত লুকান আছে! বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া রুদ্ধ মর্ম্মদ্বারে সেইগুলি আঘাত করে কেন? কোন দুর্ল্লভ ভূলোকের স্বপ্নাবেশে হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া উঠে কেন? তাহা তুচ্ছ বলিয়া সরাইয়া ফেলিবার উপায় নাই। তুচ্ছ ভাবিতে গেলে এ সুষমায় মণ্ডিত সুন্দর শোভাময় বসুধা, আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা জীবন সমস্তই যে তুচ্ছ হইয়া যায়!

বেগবান্ হৃদয়কে বেশী প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, একবার ছাড়িয়া দিলে সে চাপিয়া বসে। কাযেই বিশুর নিকট হইতে নানা কাযকর্ম্মে নন্দা দূরে দূরেই রহিল।

বিশু বিবাহের পাকা সংবাদ আনিয়াছে, বংশী তাহাকে পাকা ফলার করাইল। তরঙ্গিণীরও মুখ খুলিয়া গিয়াছিল। গৃহে শাশুড়ী নাই, সেই কর্ত্রী, নূতন কুটুম্বের কাছে পাছে তাহার নিন্দা হয় ভাবিয়া তরঙ্গিণী মিষ্টান্নের সহিত মুখের মিষ্টি মিশাইয়া বিশুকে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। কেবল যাহার বিশুর সহিত বেশী কথা কহিবার কথা, সেই নীরবে সরিয়া রহিল। নন্দা দূরে থাকিলেও বিশু অল্পে তাহাকে ছাড়িল না। কাছে গিয়া অনুযোগ করিয়া কহিল, "হাঁ দিদি, বিশু বুড়ো ছিচরণে কি দোষ করেছে? ভাল ক'রে

যে কথাই কইলে না। এত দিন পর দেখা, এক দণ্ড কাছে বস্‌লে না, কেবল কায নিয়েই রইলে।”

অপরাধিনী নন্দা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “না বিশুদা, দোষ কিসের? তুমি দাদাদের সাথে কথা বলছিলে, তাই আমি এ দিকের কায সেরে রাখলাম। তাড়াতাড়ি কায সারলাম, তোমার কাঁছে বসবো ব'লে। এইবার সব হ'য়ে গেছে, তোমার কাছে বস্‌ছি।”

প্রাঙ্গণের ছায়াশীতল বকুলগাছের তলায় একটা মাদুর টানিয়া লইয়া নন্দা বিশুকে বসাইয়া নিজে কাছে বসিল। নন্দা প্রথমেই হিমুর কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বিশু সোৎসাহে বলিল, “হিমুদির শরীর ত ভালই আছে, দিদি, কি জানি, মনটা ভাল নেই। মা বলেন, হিমু ভাল ক'রে খায় না, কথা বলে না, মনমরা হ'য়ে থাকে। মা'র শোক হিমুদি এখনও ভুলতে পারে নি, থেকে থেকে কান্না-কাটা করে। ক'দিন হ'ল মা রঙ্গকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন।”

নন্দা উদ্বেল-হৃদয়ে কহিল, “রঙ্গদিকে পেয়ে হিমু বোধ হয় ভাল আছে, আহা, ছেলেমানুষ বড্ড আঘাত পেয়েছে।”

“সত্যি দিদি, মা'র মত জিনিষ কি আর জগতে আছে? যে মা'র ভালবাসার স্বাদ জেনে হারিয়েছে, তার মত দুঃখী কে? রঙ্গ এসে কি করবে, হিমুদি তখনও যেমন চুপচাপ—এখনও তেমনি। তুমি কাছে না গেলে কিছুতেই ওর মন ভাল হবে না।”

“মন ত ওর অনেক শান্ত হয়েছিল, বিশুদা! আবার এত অস্থির হ'ল কেন? মা ওর বিয়ের কথা ত কিছু বলেন নি?”

“বলেছিলেন বৈ কি! মা'র ইচ্ছা ছিল, দুই বিয়ে এক সাথে হয়, রঙ্গরও সেই সাধ। সতুদা এলে মা এক দিন সতুদাকেও তাই বল্লেন, সতুদা রাজি হ'ল না, বল্লে, ‘হিমুর বিয়ে আমি পরে দেব মা, এখন নয়।’ বিয়ে এখন হবে না, তবু বিয়ের নামে হিমুদির কি কান্না। মা কোলে টেনে কত আদর কল্লেন। হিমুদি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে, ‘আমায় কোথাও পাঠিও না, মা, আমার ভয় করে, আমি ম'রে যাব।’ ওর এখনও বুদ্ধি হয় নি, বুদ্ধি হ'লে কি কেউ অম্‌নি করতে পারে?”

নন্দা নিরুত্তরে বকুলের শাখা-প্রশাখার পানে তাকাইয়া রহিল। স্নিগ্ধ বায়ু-হিল্লোলে কয়েকটা বকুল ঝুর-ঝুর করিয়া তাহার মাথার উপর ঝরিয়া পড়িল। দূরের তালী-বনের শীর্ষদেশ হইতে সোণার বরণ তপনদেব ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেলেন।

বিশু আপনার মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বকিয়া বংশীর পত্র লইয়া সে দিনের মত বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

২৯

বংশী সকালে শুইতে পারিত না। আহারাদির পর কিয়ৎ-কাল সঙ্গীত আলাপন করিয়া ‘রামকৃষ্ণের’ কথামৃত পড়িয়া গভীর রাত্রিতে বিছানায় আশ্রয় লইত। সুনন্দা অধি-কাংশ দিন দাদার পার্শ্বে বসিয়া ঠাকুরের অমৃতগাথা শুনিয়া বেহালায় নূতন গদ্ বাজাইয়া অনেক রাত্রি জাগিয়া কাটাইত।

ভাই-বোনের নৈশ আলাপনে মোক্ষদা রাগে আগুন হইয়া থাকিতেন। এ মেয়ের সবই যে অদ্ভুত, ব্যাটাছেলে গান গাহিবে, বাজনা বাজাইবে, তাতেও মেয়ের কারদানি, মেয়ে নয় ত সিংহবাহিনী। তরঙ্গিণীও ইহাতে সন্তুষ্ট ছিল না, সমস্ত দিন স্বামী পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া যদি বা রাত্রিতে ঘরে ফেরেন, তখনও বেচারী তাহার নাগাল পায় না। ইহার নিমিত্ত সে এক দিন অনুযোগ করিলে বংশী তাহার বড় সাধের বেহালাটা পত্নীর হস্তে দিয়া বলিয়াছিল, “তোমাকে বাজনা শেখাচ্ছি, তরি, অন্ততঃ বেহালার ভেতর দিয়েও আমাদের মিল হোক্।” বলিয়াই গান ধরিয়াছিল—

“বাঁধো না তরীখানি আমার এই নদীকূলে।
একাকী দাঁড়ায়ে আছি, লহ না আমারে তুলে।”

বাজনার মধ্য দিয়া মিলন, অমন মিলের মুখের ছাই। গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে হইয়া—বধূ হইয়া সে নাচওয়ালীদের ন্যায় বাজনা শিখিবে! স্বামীর প্রস্তাবে রাগে ঘৃণায় সেই দিন হইতে তরঙ্গিণী আর গান-বাজনার নাম মুখেও আনিত না। খাওয়া-দাওয়া মিটাইয়া সাত তাড়াতাড়ি সে বিছানায় গিয়া শুইয়া থাকিত।

নিত্যকার মত তরঙ্গিণী দরজা ভেজাইয়া প্রদীপ নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোৎস্না-প্লাবিত বারান্দায়

বংশী মনের আনন্দে বেহালার সহিত আপনার সুধাময় কণ্ঠ মিলাইয়া গান ধরিয়াছিল। বেহাগের পর মল্লার, মল্লারের পর ভৈরবী শেষ না হইতে হইতেই ইমন-কল্যাণের তানে পার্শ্বোপবিষ্টা নন্দা হাসিয়া বলিল, "আজ কি তোমার গান থামবে না, দাদা? এ যে শেষ রাতজাগানি গান আরম্ভ করলে, থামবার নামও নেই। রাত ঢের হয়েছে, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।"

কাহার কথা কে শোনে, একেই সঙ্গীতপ্রিয় বংশী সঙ্গীত পাইলে তন্ময় হইয়া যায়, তাহার পর আজ সে যে উল্লাসের মদিরা পান করিয়াছে! তাহার পক্ষে এ মদিরা ত সহজলভ্য নহে। মাত্র এক পক্ষকাল পর সুনন্দার বিবাহ। এ বিবাহে আনন্দ ব্যতীত চিন্তা নাই, চিন্তার মেঘাড়ম্বরে পুলকের চন্দ্রমাকে ঢাকিয়া ফেলিবে না! অন্নপূর্ণা লিখিয়াছেন, "শাঁখা, শাড়ী, সিন্দুর ছাড়া বংশী যেন আর কিছু ভগিনীসম্প্রদানকালে না দেয়, দিলে সত্য তাহা লইতে পারিবে না। সত্যর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে। গুরু, পুরোহিত ও বিশুকে লইয়া সত্য বিবাহ করিতে যাইবে। এই কয়েকটি লোকের খাওয়া-দাওয়া লইয়া বংশী যেন হাঙ্গাম না করে।"

এই যে নিশ্চিন্ত আনন্দ, ইহা বাঙ্গালার কয়টা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে দিতে পারিয়াছে? যে এ শান্তি লাভ করিয়াছে, সে যে হৃদয়-মন দিয়া এটুকু লাভ করিতে চাহে। তাই নন্দার বাক্যে বংশীর গান থামিল না, অনেকক্ষণ ধরিয়া সে ইমন-কল্যাণ গাহিয়াই চলিল।

আকাশের চাঁদ মধ্য-গগন হইতে পশ্চিমের দিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল। নীরব নিস্তব্ধ ধরিত্রীর বক্ষে শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না এক অপরূপ মায়ালোক সৃষ্টি করিতে লাগিল। কোন্ মায়াকুমারী মায়ার ফুলদণ্ডের স্পর্শে বিশ্বের সহিত বিশ্ববাসীকেও মায়ায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল!

অনেকক্ষণ পর বংশীর গান থামিল। কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া বেহালাখানা বাক্সে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে বংশী বলিল, "গানের সময় তুই যেন আমায় কি বলেছিলি, নন্দা? রাত অনেক হয়েছে ব'লে আমায় বুঝি ঘুমাবার তাগিদ দিয়েছিলি? কিন্তু আমায় তাগিদ দিয়ে নিজেই দিব্যি ব'সে রয়েছিস।"

নন্দা কুণ্ঠার সহিত উত্তর দিল, "না দাদা, তোমায় আমি ঘুমাতে বলি নি, আমারও ঘুম পায় নি। আমি বলেছিলাম কি, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, শুনবে?"

"একটা কথা কেন, দিন-রাত ত তোর হাজার কথাই শুনছি, নন্দা। এত ভূমিকা কেন, কি বলবি, বল না। —তবু চুপ ক'রে রয়েছে, মেয়ের মুখে যেন কথা ফোটে না। আর যার কাছে হোক, দাদার কাছে ত নন্দা বোনটি কোন দিন মুখচোরা নয়, বরং অত্যধিক মুখরাই বলতে হবে।"

এত বড় অভিযোগের বিরুদ্ধে নন্দা একবারও আপত্তি বা অনুযোগ করিল না। ভ্রাতার সমস্ত অপবাদ মাথায় তুলিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, "তখন বিশুদার কাছে চিঠি লিখে দিলে, দাদা, কিন্তু সে বিষয়ে আমারও কিছু বলবার আছে।"

বংশী বিস্মিত হইল, নন্দা এ কি বলিতেছে! তাহারই বিবাহ সম্বন্ধে সে আজ আলোচনা চালাইতে প্রবৃত্ত হইতেছে! বয়সে ঢের ছোট হইলেও বংশীর অনেক ভুল-ত্রুটি নন্দা সংশোধন করিয়া দেয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটির ত কোনই সম্ভাবনা হয় নাই, এ বিষয়ে নন্দা ভ্রমেও দাদার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই।

বংশী সকৌতুকে হাসিয়া কহিল, "যা বলেছিস, নন্দা, ঠিক। 'যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম কামাই', তোরও যে বলবার কিছু থাকতে পারে, তা আমার মনেই ছিল না। কোন্ বিষয়ে কি বলতে চাস, বল, ইতস্ততঃ করছিস কেন রে? তোর ভেড়াকান্ত ভাইটি ত চিরকালই দিদির হুকুম শিরোধার্য্য ক'রে এসেছে, আজও অগ্রাহ্য করবে না।"

নন্দা বংশীর আরও নিকটস্থ হইয়া, একবার কাসিয়া, বার দুই ঢোক গিলিয়া বলিল, "তাঁদের সাথে সেখানে তুমি যে কুটুম্ব-সূত্রে আবদ্ধ হ'তে চাচ্ছ, দাদা, তা আমাকে দিয়ে হবে না। সে কাযটা আমাদের হিমু বোন্‌কে দিয়ে করতে হবে। তুমি কালই তাঁদের জানিয়ে দাও, নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁরা যেন হিমুকেই আপনার ক'রে নেন। আমাকে দিয়ে ও সব হবে না। মা নেই ব'লে তোমাকেই সব বলতে হ'ল।"

বংশী চমকিয়া উঠিল। একসঙ্গে শত বজ্রপাত হইলেও সে বোধ হয় ইহার বেশী স্তম্ভিত হইত না। নন্দা এ কি বলিতেছে, এ যে অভাবিত অপ্রত্যাশিত ঘটনা! সুখ-নদী পার হইয়া কূলে পৌঁছিয়া নন্দা কি এমনই ভাবে নৌকা ডুবাইতে পারে? শান্তির কুঞ্জ-কাননে নন্দা স্বেচ্ছায় কি অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করিতে পারে? না না, নন্দা উপহাস করিতেছে, দাদাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তামাসা দেখিবে। নহিলে নন্দার হৃদয়ের সংবাদ ত বংশীর অগোচর নহে, সত্যর নাম উল্লেখমাত্র নন্দার মুখের অপূর্ব্ব রক্তিমাভা বংশী যে সহস্র-বার নিরীক্ষণ করিয়াছে। সমীরণ-স্পর্শে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় সত্যর সংস্পর্শে নন্দার হৃদয়-কুসুমকে বিকশিত প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়াছে। সেই গহনা পরাইয়া, শাড়ী পরাইয়া, নন্দাকে অন্নপূর্ণার বধূপদে প্রতিষ্ঠিত—সে কি ভুলিবার? নির্জ্জন লতাবিতানে দুই তরুণ-তরুণীর বাক্যালাপ, তাহা কি ভ্রম না মরীচিকা?

সত্য সকলের যতই লোভনীয় হউক না কেন, কিন্তু নন্দার হৃদয় না জানিয়া বংশী কিছুতেই যে অগ্রসর হইত না। সে যে অনেক দূর আসিয়াছে, সম্মুখেই বসন্তের কুঞ্জ-তোরণ, এখন ফিরিবার পথ নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী

অনুতপ্ত

বেদীপাশে গিয়া তোমার চরণে না সঁপিয়া অঞ্জলি,
মন্দির-রথে শিল্প-চাতুরী হেরিয়াছি কুতূহলী।
তোমার মহিমা হেরি নি ভুবনে, হেরিছি জড়ের লীলা,
তব বিগ্রহে হেরেছি কেবল প্রাণহীন দারু-শিলা।
অপরাধী ক্ষমা চায়,
যে নয়ন তুমি দিয়াছ দয়াল, বিফল করেছি তায়।

তব কীর্ত্তন তব গুণগান শ্রবণ করি নি কভু,
নিজ স্তুতিবাদ পর-পরিবাদ কেবলি শুনেছি প্রভু,
অবগীত তুমি হয়েছ যেখানে সেথায় পেতেছি কাণ,
দিবা-অবসানে তব আহ্বানে করি নি'ক অবধান।
অপরাধী ক্ষমা চায়,
যে শ্রুতি দিয়াছ মর্য্যাদা তার রাখিতে পারি নি হায়।

তোমার প্রসাদ-শ্রীচরণামৃতে লুব্ধ নহে এ মন,
তোমা না নিবেদি দিনের পিণ্ড করেছি আস্বাদন,
তব বন্দনা গাহিয়া ধন্য করি নি'ক রসনারে,
মিথ্যাকথায় দাম্ভিকতায় অশুচি করেছি তারে।
অপরাধী ক্ষমা চায়,
যে রসনা দিলে ওগো রসময়, দূষিত করেছি তায়।

তব মন্দিরে ধূপ-সৌরভে ধন্য হয় নি নাসা
পূতি-পঙ্কিল অশুচি গন্ধে যত তার ভালবাসা।
নাসার লালসা করেছে কেবল সহায়তা রসনার,
তোমার চরণে না সঁপি পুষ্প গাঁথিয়া পরেছি হার।
অপরাধী ক্ষমা চায়,
যে নাসা দিয়াছ কৃপা ক'রে, হ'ল সর্ব্বনাশা সে হায়।

পতিতপাবন, ঘুরিছ পতিত অনাথ দীনের দলে
ঘৃণায় তাদেরে ছুঁই না, ছুঁইলে স্নানে নামি নদীজলে।
যা কিছু অশুচি বুকে চাপি ধরি পুলকিত সুখ পাই,
তব নামগান আছে যে গ্রন্থে ছুঁই নে কেবল তাই।
অপরাধী ক্ষমা চায়,
স্পর্শন-বোধ দিয়েছ যা প্রভু ব্যর্থ করেছি তায়।

দিয়াছ ললাট তব উদ্দেশে ভূতলে হ'ল না নত,
এ পাণিযুগল হলো না তোমার সেবাচর্য্যায় রত,
দিয়াছ চিত্ত বোঝাই করেছি অসার মিথ্যাজ্ঞানে,
পাপকল্পনা-পঙ্কিল মনে জাগিলে না তুমি ধ্যানে।
ক্ষমিবে কি কভু হায়
দিলে দুর্ল্লভ মানব-জীবন, বিফল করিনু তায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

কর্পূর

কর্পূর ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি না হইলেও অতি প্রাচীন-কাল হইতে এখানে উহা ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি ও সুগন্ধি-রচনায় কর্পূরের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়; কিন্তু কোন্ স্মরণাতীতকালে ভারতে উহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, তাহার যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ ভারতবাসিগণ ব্যবসায়সূত্রে যখন জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অর্ণবযানযোগে গতায়াত করিতেন, সেই সময় তাঁহারা ইহার সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া উহা ভারতে আনয়ন করিয়াছিলেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে—"ভীমসেনি" কর্পূরের উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতমালায় সমুদ্রতল হইতে ৬ সহস্র ফুট উচ্চে কন্কান্ হইতে আরও দক্ষিণতর প্রদেশে সিনামন্ জেলেনিকাম্ (Cinnamon Zeylenicum) নামক এক প্রকার স্বভাবজ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষের কাষ্ঠে ও পত্রে কর্পূরের গন্ধ উপলব্ধি হয়। আবুল ফজল দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর বৃক্ষকে ভারতীয় কর্পূর-বৃক্ষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আরব্য উপন্যাসেও কর্পূরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধাবাদের দ্বিতীয়বার সমুদ্রাভিযান বর্ণনাপাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি রিহা উপদ্বীপে উপনীত হইয়া এক জাতীয় বৃক্ষ হইতে শুভ্র, সুগন্ধময় কর্পূর প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছিলেন। ব্যারণ ওয়াকনার বলেন যে, আরব্য উপন্যাসের উপাখ্যান নবম শতাব্দীর প্রাক্কালে প্রসিদ্ধ বণিক্ সলোমানের সময়ে লিখিত এবং তাঁহার বিবেচনায় মালয় উপদ্বীপকে রিহা উপদ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উল্লিখিত মতবাদের উপর নির্ভর করিলে অনুমান হয় যে, নবম শতাব্দীর পূর্ব্বেও কর্পূরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীক লেখক গ্রেসিয়া-ডি-অর্চা সিংহল ও মালাবারের শিল্পবর্ণনাকালে দুই প্রকার কর্পূরের উল্লেখ করিয়াছেন

কর্পূরের নামকরণে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে কর্পূর পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় সেখানকার নামানুসারে সর্ব্বদেশে উহা পরিচিত। ইহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নাম কর্পূর; সংস্কৃত ভাষায় কর্পূরের অপর নাম সিতাভ্র। হিন্দী ভাষায় ইহাকে কপূর, আরবী, পারসীক, জাভা ও মালয়ান ভাষায় কাফুর, ইটালীতে কন্ফেরা, জার্ম্মাণীতে কম্ফার, ফ্রান্সে ক্যাম্ফের ও ইংরাজী ভাষায় ক্যাম্ফর বলে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে দুই প্রকার কর্পূরের বর্ণনা আছে—অপক্ক ও পক্ক কর্পূর। যে কর্পূর স্বাভাবিক অবস্থায় বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায়, তাহাকে অপক্ক কর্পূর আর যাহা তাপসহযোগে বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে পক্ক কর্পূর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ বোর্ণিও-দেশীয় কর্পূরকে অপক্ক কর্পূর বলে। রাজনির্ঘণ্টুতে কর্পূর-তৈলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ উহা বোর্ণিও দেশের কর্পূর-তৈল। অপক্ক কর্পূর সিনামন্ জেলেনিকাম (cinnamon jeylenicum) ও পক্ক কর্পূর সিনামন্ ক্যাম্ফোরা (cinnamon camphora) নামক বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত করা হয়। সংস্কৃত গ্রন্থে যদিও দুই প্রকার কর্পূরের উল্লেখ আছে, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে চারি প্রকার কর্পূরের প্রচলন আছে। উহারা চীনা কর্পূর, বাটাই কর্পূর, সুরাটী কর্পূর ও কর্পূর কামুরী নামে অভিহিত হয়।

রসায়ন-মতে যে কোন শুভ্র, উদ্বায়ু, সুগন্ধি, কঠিন দ্রব্য উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই কর্পূর নামে অভিহিত হয়। কর্পূর সুগন্ধি তৈলের (Essential oil) অবস্থান্তরমাত্র।

কর্পূরবৃক্ষ চীন, জাপান, ফরমোসা, কোচিন, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মরিসস্, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা, এলজিরিয়া, ইটালী, ফ্লোরিদা, কালিফর্ণিয়া, ব্রেজিল ও পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রকৃতির ক্রোড়ে ও চাষের সাহায্যে উৎপন্ন হইতেছে। এই বৃক্ষ সাধারণতঃ ১০।১২ হাত হইতে ৬০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ ও ১৬ হাত বিস্তৃত হয়। উহার কাণ্ডের ব্যাস ২০ ইঞ্চি হইতে ৪০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা যায়। কর্পূর-গাছ যদিও পূর্ব্বে ভারতীয় সকল দ্বীপ, চীন, জাপান ও ফরমোসায় অতি প্রাচীনকাল হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপন্ন হইতেছে, তথাপি চীন, জাপান ও ফরমোসা ব্যতীত অন্য কোথাও উহা হইতে কর্পূর প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন চীন-জাপানের যুদ্ধে ফরমোসা দ্বীপ জাপানের অধিকারভুক্ত হয়, তখন জাপান সরকার সর্ব্বপ্রথমে ফরমোসার কর্পূর-বাগিচা ও কারখানাগুলি আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য যত্নবান্ হয়। ইহাতে ফরমোসা-বাসিগণ বিশেষ আপত্তি করে ও তাহাদের অধিকার ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হয়। কিন্তু জাপান সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কারখানাগুলি দখল করিয়া জাপানী ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণের হস্তে অর্পণ করায় ফরমোসাবাসিগণের সহিত তাহাদের বিরোধ হয়। ফরমোসাবাসিগণ সুযোগ পাইলেই দলবদ্ধ হইয়া জাপানাধিকৃত কারখানাগুলি আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করিত।

জাপানের কর্পূরবৃক্ষগুলি ফরমোসার বৃক্ষগুলি অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট। জাপানের মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-শক্তি যদিও অধিক, কিন্তু এখানে ছায়াবহুল আর্দ্র জমীতে কর্পূর-বৃক্ষ উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাতে কর্পূরের ভাগ কম থাকে; পরন্তু ফরমোসায় অপেক্ষাকৃত উষর, উচ্চ অথচ উন্মুক্ত ভূমিতে উৎপন্ন বৃক্ষগুলি সেরূপ বর্দ্ধনশীল না হইলেও উহাতে কর্পূরের অংশ অধিক থাকে। ফরমোসার কর্পূর-শিল্প হইতে জাতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় জাপানের ফরমোসা অধিকার করিবার অন্যতম কারণ। ফরমোসার কর্পূর-শিল্প আয়ত্তগত করিয়া জাপান অত্যধিক লাভবান্ হইয়াছে এবং এক্ষণে জাপানবাসীরা পৃথিবীর উৎপন্ন সমগ্র কর্পূরের শতকরা ৭০ ভাগ প্রস্তুত করিতেছেন।

চীনের কর্পূর-শিল্পের অবনতির পর একমাত্র জাপানই এই শিল্পের অনুষ্ঠাতা ছিল ও ফরমোসা অধিকার করিবার অব্যবহিত পর হইতে কর্পূর-ব্যবসায়ে জাপান একাধিপত্য করিতেছিল। এককালে চীনদেশ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রায় ত্রিশ হাজার মণ কর্পূর রপ্তানী হইত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দেও চীনের কেবলমাত্র ফুকিন্ সহরের উপকণ্ঠে যত কর্পূরের আবাদ ছিল, সমগ্র ফরমোসাতেও তত ছিল না। ফুকিন্ ব্যতীত কিয়াংসী, সেচওয়ান ও ইউনানের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কর্পূর উৎপন্ন হইত। এই সময় হইতে কয়েক বৎসরকাল চীনের কর্পূর-শিল্পের অধঃপতন হয়। কিন্তু চীনের কর্পূর-শিল্পের দুরবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে চীনের কিয়াংসী হইতে প্রায় ৬ হাজার মণ কর্পূর রপ্তানী হয়। এই সময় হইতে ধীরে ধীরে তাহাদের কর্পূর-শিল্পের পুনরুত্থান হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাহারা পূর্ণ উদ্যমে কর্পূর-ব্যবসায় পরিচালনা করিতে থাকে ও তখন হইতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৫০ হাজার মণ কর্পূর বিদেশে রপ্তানী করিতেছে। এই কর্পূরের অধিকাংশ আমেরিকা ক্রয় করিয়া থাকে।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় কর্পূর-গাছ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় বৃক্ষ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত।

১। Camphora officinarum, Laurus Camphor বা Cinnamon Camphora;—চীন, ফরমোসা ও জাপানে এই জাতীয় কর্পূর-বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চীনদেশে এই বৃক্ষ চাং নামে অভিহিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে কিয়াংসীর সন্নিকটে এই শ্রেণীর বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। কিয়াংসীর প্রাচীন নাম ইউ-চাং এবং উহার অপভ্রংশ চাং হইতেই উহার চীনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। চীনা ভাষায় অপরিপক্ক (crude) কর্পূরকে চাংনাও ও শোধিত কর্পূরকে চাং-নাও-পিন বা শাও-নাও বলে।

২। Dryobalanops camphora বা D. aromatica;—সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই জাতীয় বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বৃক্ষগুলি শালবৃক্ষের ন্যায় অত্যুন্নত ও সুদৃশ্য। সুমাত্রার পর্ব্বতশ্রেণীর ঢালু প্রদেশস্থ ছোট ছোট পাহাড়ের উপর সমুদ্রতল হইতে ৩০০-৫০০ ফুট উচ্চে, লৌহবহুল, আর্দ্র পলি মৃত্তিকায় উহা ভাল জন্মে। আর্দ্র জলবায়ু ইহার বৃদ্ধির বিশেষ অনুকূল। চারা গাছের সকল অংশ হইতেই কর্পূরের গন্ধতৈল (essential oil of camphor) পাওয়া যায়; এই জাতীয় গাছের কচি ডালপালা ও পত্রে গন্ধতৈলের পরিমাণ অধিক থাকে। বড় গাছের গুঁড়ির মধ্যস্থ মজ্জার ফাটলে দানাদার কর্পূর বা বোর্ণিওল উৎপন্ন হয়। বৃক্ষকাণ্ডনিঃসৃত তরলসার মজ্জার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া স্ফটিকে (crystallise) পরিণত হয় ও সেই স্ফটিকের চাপে মজ্জার কোমল অংশ বিদীর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, একজাতীয় কীট বৃক্ষকাণ্ডের মধ্যে ছিদ্র করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। সেই ছিদ্রপথে কাণ্ড-নিঃসৃত তৈল সঞ্চিত হইয়া কর্পূরের স্ফটিক গঠিত হয়। এই শ্রেণীর বৃক্ষের কর্পূর সংগ্রহ করিবার জন্য বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলা হয় ও উহার অভ্যন্তরস্থ ফাটল হইতে কর্পূরের দানা সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর উহার কাষ্ঠ, ডালপালা, ছাল ও পাতা হইতে উর্দ্ধপাতন দ্বারা অবশিষ্ট কর্পূর ও কর্পূর-তৈল সংগ্রহ করা হয়। এই কর্পূর বেরাস কর্পূর (barus camphor), বোর্ণিওল বা মালয়দেশীয় কর্পূর নামে কথিত হয়। ভারতবর্ষে ইহাকে ভীমসেনী কর্পূর বলে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উহা অপক্ক কর্পূর বলিয়া পরিচিত। এসিয়ার সর্ব্বত্রই এই কর্পূরের ব্যবহার অধিক। মিঃ জন ম্যাক্‌ডোনাল্ড ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সুমাত্রা দ্বীপে কর্পূর সংগ্রহের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, সুমাত্রার আদিম অধিবাসিগণ কর্পূর সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে বনদেবীর পূজার অনুষ্ঠান করিয়া যাত্রা করিত। কর্পূর-বৃক্ষের বনে গমন করিয়া তাহারা প্রাচীন গাছ বাছিয়া উহার কাণ্ডে ছিদ্র করিত। যদি ছিদ্রপথে অধিক পরিমাণে তৈল নিঃসৃত হইত, তবে সেই বৃক্ষে কর্পূরের দানা আছে বুঝিত। পরে ঐ গাছটি কাটিয়া চিরিয়া ফেলিয়া কর্পূর সংগ্রহ করিত। ঐ কর্পূর বারংবার জলে ধৌত করিয়া যখন পরিষ্কার হয়, তখন উহা শুভ্র, উজ্জ্বল ও অর্দ্ধ-স্বচ্ছ হইয়া থাকে এবং জলে ডুবিয়া যায়। এক্ষণে ঐ শোধিত কর্পূর তিনটি বিভিন্ন প্রকারের চালুনী দ্বারা ছাঁকিয়া তিন শ্রেণীর কর্পূরে বিভক্ত করা হইত। খুব মিহি অংশটি "শিরঃশ্রেণী," মধ্যমাংশ "উদরশ্রেণী" ও মোটা অংশ "পদশ্রেণী" নামে অভিহিত করিত।

৩। Blumea Balsamifera—ভারতে (হিন্দী ভাষায়) এই বৃক্ষকে ককরন্দা বৃক্ষ বলে। খাসিয়া পর্ব্বত, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদেশে ইহা এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে, সেই সকল বৃক্ষ হইতে পৃথিবীর কর্পূরের প্রয়োজনের অর্দ্ধেকাংশ প্রস্তুত করা সম্ভব।

ভারতে আরও কয়েক জাতীয় কর্পূর-গাছ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে Blumea lacera, (সংস্কৃত নাম "কুকুরদ্রু," বাঙ্গালা নাম "কুকুরশুঁখা" বা বড় সুকসঙ্গ, হিন্দী নাম "জংলী মুলী"), Blumea densiflora (ব্রহ্মদেশীয় নাম "পুং-মা-থিং") ও Dryobolanops Camphora বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বৃক্ষ হিমালয়ের অনত্যুন্নত পাদদেশে, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নতম প্রদেশে, নীলগিরি, নেপাল, সিকিম, খাসিয়া পর্ব্বত ও ব্রহ্মদেশের উপত্যকায় সতেজে বর্দ্ধিত হয়। জার্ম্মানের পশ্চিমাঞ্চলে Thymus Serpillum নামক এক জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; উহা হইতে যে কর্পূর উৎপন্ন হয়, তাহাকে

Thyme কর্পূর বলে। বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত কর্পূর ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়; যেমন Plcbtranthus Patchouli ও Pogostemon Patchouli বৃক্ষের কর্পূর প্যাচোলি কর্পূর, তিত লেবু হইতে নিরোলি কর্পূর, বার্গামট হইতে বার্গামট কর্পূর, অরিস হইতে অরিস কর্পূর ও সাসাফ্রস্ হইতে সাসাফ্রস কর্পূর পাওয়া যায়।

কর্পূরের ব্যবসায়ে চীন ও জাপানের সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকায় উহার মূল্য হ্রাস হয় নাই। এ জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইহার আবাদের চেষ্টা হইতেছে। প্রকৃতির ক্রোড়ে অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কর্পূর-গাছ উৎপন্ন হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৃষির সাহায্যে আবাদ করিলে উহা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশেই জন্মান যাইতে পারে। যে সকল স্থানের স্বাভাবিক শৈত্য ফারেনহীট তাপমান যন্ত্রের ২৫ ডিগ্রীর অনধিক বা যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চির কম, সেখানে কর্পূর-গাছ ভাল জন্মায় না। যে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক অবস্থা এবং আবহাওয়া যেমন শৈত্য ও তাপের সামঞ্জস্য, বার্ষিক বৃষ্টিপাত, সমুদ্রতল হইতে উচ্চতা কর্পূর-বৃক্ষের বৃদ্ধির অনুকূল, ভারতের কোনও না কোনও অঞ্চলে সেরূপ অনুকূল অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর আরও অনেক প্রদেশে সেরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান আছে।

সিংহলে কর্পূর :—সিংহল দ্বীপ বিষুবরেখার সন্নিকটে অবস্থিত থাকায় সেখানে তাপের আতিশয্য ও বৃষ্টিপাতের আধিক্য দেখা যায়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখানে কর্পূর-গাছ উৎপন্ন হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সিংহলে সর্ব্বপ্রথম কর্পূর-গাছের আবাদ হয়। এখানে সমুদ্রতল হইতে ৩০০০—৫০০০ ফুট উচ্চ উপত্যকায় উহা ভাল জন্মায়; কিন্তু ২০০০ ফুটের নিম্নতর প্রদেশ উহার বৃদ্ধির প্রতিকূল।

মাটীতে চূণ ও পটাশের অংশ কিঞ্চিৎ অধিক থাকিলে গাছগুলি তেজস্বী হয়। সিংহলের কর্পূরগাছগুলি চারি হইতে ছয় ফুট উচ্চ হইলেই কাটিয়া ফেলিয়া উহা হইতে কর্পূর প্রস্তুত করা হইত। ঐরূপ একটি চারা গাছ হইতে তিন চারি ছটাক কর্পূর-তৈল পাওয়া যায় এবং সেই তৈলে শতকরা ০·৭৫ হইতে ১ ভাগ কর্পূর থাকে। সুতরাং এক সের কর্পূর প্রস্তুত করিতে হইলে চারিশত কর্পূরগাছের সকল অংশই গ্রহণ করিতে হইবে। কর্পূরের পরিমাণ নিতান্ত অল্প থাকায় এখানে কর্পূর-চাষ সন্তোষজনক হয় নাই ও সেই জন্য উহার আবাদ বিস্তার-লাভ করে নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সিংহলে প্রায় ত্রিশ বিঘা জমীতে কর্পূর-বৃক্ষ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং ঐ জমীতে উৎপন্ন কর্পূর-গাছ হইতে মাত্র ১।০ সওয়া মণ কর্পূর পাওয়া গিয়াছিল। এখনও সিংহলে কর্পূর-গাছ রোপণ করা হয়, কিন্তু কর্পূর-শিল্পে লাভ না থাকায় কেহ উহাতে হস্তক্ষেপ করে না।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কর্পূর ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা চীন-জাপানের একচেটিয়া ব্যবসায়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম কর্পূর-চাষের পরীক্ষা করেন। কালিফর্ণিয়া, ফ্লোরিদা, ট্যাক্সাস্, লুসিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চলে কমলালেবুর ক্ষেত্রের আবেষ্টনীর জন্য কর্পূর-বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বৃক্ষগুলি ছয় ফুট উচ্চ হইলেই নূতন উদ্ভাবিত গাছ-ছাঁটাকলসাহায্যে অতি অল্পসময়ের মধ্যে দৈনিক প্রায় ১৮ বিঘা জমীর বেষ্টনীর গাছ ছাঁটিবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপে প্রতি একর জমী হইতে প্রায় ৫ টন ছাঁটা ডাল-পালা ও তাহা হইতে প্রায় ১৫০ পাউণ্ড কর্পূর-তৈল উৎপন্ন হয়। কিন্তু চীন-জাপান ও ফরমোসার তুলনায় আমেরিকার কর্পূর-চাষ সেরূপ লাভজনক হয় নাই। সরকারী কৃষিবিভাগের সাহায্যে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রায় ৬০ হাজার বিঘা জমীতে কর্পূর-চাষের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদবধি উন্নত কৃষিবিজ্ঞানের সাহায্যে কর্পূর-বৃক্ষে কর্পূরের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বরাটসন, হাওয়ার্ড ও সাইমনসন উত্তরভারতে কর্পূর-চাষ সম্বন্ধে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রতি এক বিঘা জমীতে ৪½ হাত অন্তর চারা রোপণ করিয়া প্রায় ৩ শত গাছ জন্মান যায় এবং উহা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৭ সের কর্পূর-তৈল ও ৭ সের কর্পূর প্রস্তুত করা যায়। তাঁহাদের অভিমত এই যে, যদিও উত্তর-ভারতে কর্পূরের চাষ সন্তোষজনক হইতে পারে, কিন্তু উহাতে অধিক লাভ থাকিবে না; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য উপত্যকায় যেখানে বার্ষিক বারিপাত ৪০ ইঞ্চি হইতে ৫০ ইঞ্চি, সেখানে কর্পূর-চাষ লাভপ্রদ হইতে পারে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উটাকামণ্ডের একটি কর্পূর-গাছ হইতে ডাক্তার হুপার (Dr. Hooper) শতকরা এক ভাগ কর্পূর-তৈল ও সেই তৈল হইতে শতকরা ১০-১৫ ভাগ দানাদার কর্পূর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এক্ষণে উত্তর-ভারতে দেরাডুন, দাক্ষিণাত্যে নীলগিরির উপত্যকায় সমুদ্রতল হইতে ৭ হাজার ফুট উচ্চপ্রদেশে, ব্রহ্মদেশের সানষ্টেটের উপত্যকায় ৩ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চে ও লক্সক্এ ৩ হাজার ২ শত ৭০ ফুট উচ্চস্থানে কর্পূরের চাষ হইতেছে; শেষোক্ত স্থানে প্রায় ২ হাজার বিঘা জমীতে কর্পূরের চাষ হয়।

রাও, সজ্‌বরো ও ওয়াটসন সাহেব ব্যাঙ্গালোরের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে মহীশূর বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটি প্রায় ৪০ বৎসরের বৃদ্ধ কর্পূর-গাছ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বৃক্ষটি প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ ও ১০ ফুট পরিধিবিশিষ্ট ছিল। ঐ বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা নিম্নলিখিত ফলাফল জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

বৃক্ষের অংশ	কর্পূর-তৈলের অংশ শতকরা	তৈলে কর্পূরের অংশ শতকরা	শুষ্ক অংশে কর্পূর শতকরা
১। কাঁচাপাতা	০·৮২	৪০·৬	০·৩৩
২। অর্দ্ধশুষ্ক পাতা	২·১	৪৩·৬	০·৯
৩। শুষ্ক পাতা	১·৪৩	৩০·৫	০·৪৪
৪ প্রশাখা	০·৮৮—১·২৭	২০—৩৫	০·১৭—০·৪৪
৫ শাখা	১·১৭—২·৩	৫·৯—১২	০·০৬৯—০·২৮
৬ শিকড়	৭·৯৫	২৪·২	১·৯১
৭ কাণ্ড	৫·৪—৬·১	১৭·৫—২৫	১·৪৪

ইণ্ডোচীনে কর্পূর-চাষ বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছে। এখানকার বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ হইতে যে পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৃক্ষের অংশ	কর্পূর-তৈলের অংশ শতকরা
১। শাখা ও প্রশাখা	৩·৯
২। শিকড়	৪·৬
৩। কাণ্ড	২·৭

চীন ও জাপানের কর্পূর-গাছ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ কর্পূর-তৈল পাওয়া যায় :—

বৃক্ষের অংশ	তৈলের অংশ, শতকরা
১। পল্লব	২·২১
২। প্রশাখা	৩·৭০
৩। শাখার উর্দ্ধাংশ	৩·৮৪
৪। " অধোভাগ	৪·২৩
৫। কাণ্ডের উর্দ্ধাংশ	৫·৪৯
৬। " অধোভাগ	৫·৪৯
৭। শিকড	৪·৪৬

উপরে লিখিত তালিকাগুলি তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতের মহীশূরজাত কর্পূরগাছ চীন ও জাপানের গাছের সহিত সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। জাপানের বৃক্ষের পল্লবে ও শাখায় যদিও ভারতের গাছ অপেক্ষা অধিক কর্পূর-তৈল থাকে, কিন্তু উভয় দেশেরই বৃক্ষকাণ্ডে তৈলের পরিমাণ প্রায় সমান, বরং এ দেশের বৃক্ষকাণ্ডে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে তৈল থাকে। জাপানের গাছের শিকড় অপেক্ষা ভারতীয় গাছের শিকড়ে তৈলের অংশ অধিক থাকে। এ জন্য মনে হয় যে, যদি ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে রীতিমত কর্পূরের চাষ করা যায়, তবে বোধ হয়, কালে উহা বেশ লাভজনক হইতে পারে। ইদানীং বোর্ণিও, সুমাত্রা ও জাভায় কর্পূরের বিস্তীর্ণ আবাদ হইতেছে ; এখানে প্রতি ১০০ মণ কাঁচা পাতা হইতে প্রায় ৩৫।৩৬ সের কর্পূর ও ১৫।১৬ সের কর্পূর-তৈল পাওয়া যায় অর্থাৎ কাঁচা পাতায় শতকরা ০·৯ ভাগ কর্পূর ও ০·৪ ভাগ কর্পূর-তৈল আছে।

যে জমীতে কর্পূরের চারা তৈয়ারী করিতে হইবে, উহা তিন চারিবার হলকর্ষণ করিয়া মাটী তৈয়ারী করিতে হয়। উপযুক্ত-রূপ মাটীর পাট হইলে ১০ ইঞ্চি হইতে ১ ফুট অন্তর একটি বাঁধিয়া ভিলি করিতে হয়। ভিলির উপর ৩।৪ ইঞ্চি অন্তর ও অর্দ্ধ ফুট মাটীর নীচে একটি করিয়া বীজ বসাইতে হয়। বীজ-বপনের পক্ষে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসই প্রশস্ত। বীজ-বপনের সময় হইতে প্রায় কুড়ি মাস পরে যখন গাছগুলি বড় হয়, তখন উহার গোড়া হইতে ৩।৪ ইঞ্চি ও শিকড়ের ৬ ইঞ্চি রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ ছাঁটিয়া উত্তমরূপে কর্ষিত জমীতে দশ ফুট অন্তর দুই ফুট গভীর ও দুই ফুট ব্যাসের গর্ত্তের মধ্যে বসাইতে হয়। গাছগুলি বড় হইলে মধ্যে মধ্যে উহার ডালপালা ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং কর্ত্তিত অংশ ফেলিয়া না দিয়া উহা হইতে তৈল বাহির করা হয়। যে বীজ বপন করা হইবে, তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত ; কারণ, যদি বীজের গাত্রে শাঁস লাগিয়া থাকে, তবে সেই বীজ হইতে চারা বাহির হইবার সম্ভাবনা অল্প ; সুতরাং রোপণ করিবার পূর্ব্বে বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। কর্পূর-গাছের চাষ করিবার পক্ষে ফরমোসা ও জাপানের বীজই প্রশস্ত।

প্রায় অধিকাংশ গন্ধতৈল বাষ্প সহযোগে উর্দ্ধপাতন দ্বারা প্রস্তুত হয়। কর্পূরও গন্ধ-তৈলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কর্পূর-গাছের সকল অংশই বাষ্প সাহায্যে উর্দ্ধপাতন করিলে (steam distillation) কর্পূরের গন্ধতৈল (essential oil of camphor) পাওয়া যায় এবং ঐ তৈল হইতে দানা জমিয়া কর্পূর উৎপন্ন হয়। শাখা, কাণ্ড ও শিকড় হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহাতে স্যাফ্রল (saffrol) নামক অপর একটি গন্ধতৈল থাকায় অধিক মূল্যবান্। কর্পূরের দানা পৃথক্ করিবার পর যে তৈল অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে স্যাফ্রলের পরিমাণানুসারে উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। স্যাফ্রল-বিহীন তৈল নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হয়। বৈজ্ঞানিক কৃষির ফলে কর্পূর-গাছের পাতা হইতে যদিও অধিক পরিমাণে দানাদার কর্পূর পাওয়া যায়, কিন্তু উহার তৈলে স্যাফ্রলের ভাগ অতি অল্প থাকে।

কর্পূর উর্দ্ধপাতনকালে সময় সময় বাষ্পবাহী নলে কর্পূরের দানা জমিয়া বাষ্প বহির্গমনের পথ রুদ্ধ হয়। এ জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। জাপান, ফরমোসা, ফুকিন প্রভৃতি স্থানের কারখানায় যে উপায়ে কর্পূরতৈল ও কর্পূর প্রস্তুত করা হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সাড়ে তিন ফুট উচ্চ মোচাকৃতি (conical) একটি কাঠের টবের তলদেশ ২০ ইঞ্চি ব্যাসের একটি সছিদ্র (perforated) তক্তা দ্বারা নির্ম্মিত হয় ; উক্ত টবের সূক্ষ্মাগ্র দিকের ব্যাস সাধারণতঃ ৪।৫ ইঞ্চি থাকে। এইরূপ একটি টবের মধ্যে টাট্‌কা কর্পূর-কাঠের টুকরা অথবা পাতা ও ডাল-পালার টুকরা ভরিয়া দেওয়া হয়। একটি ২২ ইঞ্চি ব্যাসের লোহার কড়ায় অর্দ্ধাংশ জলপূর্ণ করিয়া কড়াটি একটি চুল্লীর উপর বসাইয়া টবটি উহার মধ্যে এরূপে বসান হয় যে, কড়া ও টবের মধ্যে কোনও ফাঁক না থাকে। টবের অভ্যন্তরস্থ তাপ সমভাবে রাখিবার জন্য উহার পৃষ্ঠে প্রায় ৬ ইঞ্চি পুরু মাটীর প্রলেপ দেওয়া হয়। টবের উর্দ্ধাংশে অর্থাৎ সূক্ষ্মাগ্র ভাগের খোলা মুখে একটি বাঁশের নল সংযুক্ত করা হয়। নলের অপর মুখ বাষ্পঘনীকরণ যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকে। বাষ্পঘনীকরণ যন্ত্রটিই (Condensing Chamber) একটি বড় ও আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ডালাবিহীন কাঠের বাক্স দ্বারা নির্ম্মাণ করা হয়। ছোট বাক্সটির তলদেশ হইতে প্রায় ⅓ অংশ উপরে একটি ছিদ্র থাকে এবং বাক্সের মধ্যে আড়ভাবে কতকগুলি তক্তার পর্দ্দা এরূপ ভাবে সংযুক্ত থাকে যে, বাক্সের মধ্যে বাষ্প প্রবেশ করিলে উহা আঁকিয়া বাঁকিয়া গমন করিতে পারে। এই বাক্সের তলদেশের কতক অংশ খড় দিয়া পূর্ণ করা হয়। ছোট বাক্সের ন্যায় বড় বাক্সের গাত্রে তলদেশ হইতে প্রায় ⅓ অংশ উপরে একটি ছিদ্র করিয়া উহার সহিত একটি ছোট নল সংযুক্ত করা হয়। এক্ষণে ছোট বাক্সটি বড় বাক্সের মধ্যে উল্টাইয়া রাখিয়া বড় বাক্সটি জলপূর্ণ করিলে ছোট বাক্সের কিয়দংশ জলে নিমজ্জিত থাকিয়া বায়ুরুদ্ধ কামরায় (Airtight Chamber) পরিণত হয়। বড় বাক্সের অতিরিক্ত জল উহার গাত্রস্থ নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। এক্ষণে ছোট বাক্সের গাত্রস্থ ছিদ্রের সহিত টব-সংলগ্ন বাঁশের নলের অপর মুখ সংযুক্ত

করিয়া কড়ায় অগ্নি-সংযোগ করিলে জল ফুটিয়া বাষ্প হয় ও ঐ বাষ্প টবের সচ্ছিদ্র তলদেশের ভিতর দিয়া টবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কর্পূর-কাঠ ও ডালপালার কর্পূর-তৈল বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া বাঁশের নলের মধ্য দিয়া কাঠের বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করে। ছোট বাক্সটির উপর অনবরত শীতল জল ঢালিয়া বাক্সটি সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখা হয়। জলীয় বাষ্পের সহিত কর্পূর-তৈল বাক্সের শীতল গাত্রস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। কখন কখন বাষ্পের অভ্যন্তরস্থ খড়ের মধ্যে কর্পূরের দানা জমিয়া যায়। উর্দ্ধপাতন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে বাক্সটি উল্টাইয়া উহার মধ্যস্থ খড়গুলি বাহির করিয়া একটি ফুঁতুলের মধ্যে রাখা হয়। জলের উপর ভাসমান কর্পূর-তৈল ধীরে ধীরে জল হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া কর্পূর-সংলগ্ন খড়ের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলে খড়ের সহিত সংলগ্ন কর্পূরও তৈলের সহিত দ্রবীভূত হয়। অতঃপর এই তৈল শীতল হইলে জমিয়া দানাদার কর্পূরে পরিণত হয়। এইরূপ একটি যন্ত্র-সাহায্যে প্রতি দুই ঘণ্টায় দশ সের হইতে অর্দ্ধ মণ কাঠ একবার সম্পূর্ণ উর্দ্ধপাতন করা যায় এবং ঐ পরিমাণ কাঠ হইতে প্রায় অর্দ্ধ সের অবধি অপরিষ্কার (Crude) কর্পূর পাওয়া যায়। উর্দ্ধপাতন শেষ হইলে টবের মধ্যস্থ কাঠগুলি বাহির করিয়া পুনরায় টাটকা কাঠ ভরিয়া উল্লিখিত প্রকারে উর্দ্ধপাতন করা হয়। কর্পূর-তৈল নিষ্কাষণ করিবার পর ভিজা কাঠগুলি শুকাইয়া জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ভাল কর্পূর-তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে তাপের সমতা রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন; অন্যথা তাপের আধিক্যে কর্পূরের কতকাংশ বিনষ্ট হয়। উল্লিখিত উপায়ে প্রাপ্ত কর্পূর-তৈল "কর্পূর-পূরিত" (Saturated with Camphor) থাকে। সুতরাং উহা শীতল হইলেই ধীরে ধীরে কর্পূরের দানা উদ্গত হয়। দানাগুলি তৈল হইতে পৃথক্ করিয়া চাপ দিলে দানার মধ্যস্থ তৈল বাহির হইয়া যায় ও জমাট কর্পূর পিষ্টকাকারে (Camphr Cake) পাওয়া যায়।

অপরিষ্কৃত কর্পূর (Crude Camphor) হইতে শোধিত কর্পূর (Refined Camphor) প্রস্তুত করিবার জন্য জাপানের কোব সহরে কয়েকটি বড় বড় কারখানা আছে। ফরমোসা প্রভৃতি স্থানের কারখানা হইতে অপরিষ্কার কর্পূর কোবের কারখানায় আনীত হয়। কোবের কারখানায় কর্পূর পরিশোধনের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইল। ২৪ ফুট লম্বা, ১২ ফুট চওড়া ও ৫ ফুট উচ্চ একটি ধাতু-নির্ম্মিত কামরা (Chamber) বড় উচ্চ চুল্লীর উপর স্থাপিত করা হয়। এই কামরার দুইটি পথ থাকে—একটি পথ জলীয় বাষ্প নির্গমনের জন্য ও অপরটি কর্পূরের বাষ্প বহির্গমনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কামরার তলদেশে অপরিষ্কৃত কর্পূর বিছাইয়া দিয়া চুল্লীতে অগ্নি-সংযোগ করিতে হয়। উল্লিখিত প্রকারের একটি শোধন-যন্ত্রের (Sublimation Chamber) মধ্যে এককালীন ১ হাজার পাউণ্ড অপরিষ্কৃত কর্পূর রাখিয়া প্রথমে কয়েক ঘণ্টা অল্প তাপ-সহযোগে কর্পূরস্থ জল ও তৈল উড়াইয়া দেওয়া হয়; পরে ধীরে ধীরে তাপবৃদ্ধি করিয়া জলীয় বাষ্প বহির্গমনের পথটি রুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় পথটি খুলিয়া দেওয়া হয়; দ্বিতীয় পথটি আর একটি বৃহৎ কামরার সহিত সংযুক্ত করিয়া উভয় কামরার উপরিভাগে সর্ব্বদা শীতল জল ঢালিয়া ঠাণ্ডা রাখা হয়। প্রথম কামরা হইতে কর্পূরের বাষ্প দ্বিতীয় কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কামরার শীতল গাত্র স্পর্শে জমিয়া দানাদার শুভ্র কর্পূরে পরিণত হয়। এইরূপে প্রাপ্ত কর্পূরকে ফ্লাওয়ার্স অফ ক্যাম্ফর (Flowers of Comphor) বলে। এক্ষণে পয়োবাহী চাপে (Hydraulic Prcssure) উহা কাঠের ফ্রেমের মধ্যে জমাইয়া কর্পূরের ইষ্টক প্রস্তুত করা হয়।

জাপান ব্যতীত ভারতবর্ষের বোম্বাই, দিল্লী ও আরও কয়েকটি সহরে কর্পূর পরিশোধিত হয়। বড়, তাম্রনির্ম্মিত রাংএর কলাই-করা এক মুখ খোলা পিপার মধ্যে ১৪ ভাগ কর্পূর ও ২।৩ ভাগ জল রাখিয়া ঢাকনী দিয়া পিপার মুখ বন্ধ করিয়া ঢাকনীর মুখে কাদার প্রলেপ দিয়া পিপাটি বায়ুরুদ্ধ করা হয়। এইরূপ চারিটি করিয়া পিপা চারিটি চুল্লীর উপর বসাইয়া একত্রে তাপ দেওয়া হয় ও পিপার উপরে মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া শীতল করা হয়। তিন চারি ঘণ্টাকাল উত্তপ্ত করিবার পর পিপার ঢাকনী খুলিলে দেখা যায় যে, পিপার উপরদিকে ও ঢাকনীর গাত্রে কর্পূরের পাতলা স্তর জমিয়াছে। অনতিবিলম্বে কর্পূরের স্তর চাঁচিয়া লইয়া অপর একটি পাত্রে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে পরিশোধিত কর্পূরে জলীয় অংশ অধিক থাকে; সুতরাং কর্পূর-শোধন-শিল্পিগণ তাহাদের শোধিত কর্পূর সঞ্চয় করিয়া না রাখিয়া সত্বর বিক্রয় করিয়া ফেলে। সাধারণতঃ অপরিশোধিত কর্পূরের মূল্যে এই শোধিত কর্পূর বিক্রয় হয়। কর্পূরের মধ্যে যে জল প্রবেশ করান হয়, তাহার ওজনের অনুরূপ মূল্যই শিল্পিগণের লাভ থাকে। কিন্তু এই প্রকারে প্রস্তুত কর্পূর শীঘ্রই নষ্ট হয়।

য়ুরোপেও বহু দিবসাবধি কর্পূর পরিশোধিত হইতেছে। সেখানে যে উপায়ে কর্পূর পরিশোধিত হয়, তাহা এককালে বহুদিবসাবধি হলাণ্ডের কয়েক জন শিল্পীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপের সকল দেশের কর্পূর-ব্যবসায়িগণ কর্পূর-শোধন করাইবার জন্য হলাণ্ডের মুখাপেক্ষী থাকিত। তৎপরে ভিনিসও কিছু দিন এই শিল্পে অগ্রণী হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে হলাণ্ড ও ইটালী ব্যতীত হামবুর্গ, প্যারিস, ইংলণ্ড, ফিলাডালফিয়া ও নিউইয়র্কে কর্পূরশোধন-শিল্প অনুষ্ঠিত হয়। কর্পূর-শোধনের জন্য ইংলণ্ডে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়।—

অপক্ব বা অপরিশোধিত কর্পূর গুঁড়া করিয়া উহার সহিত শতকরা তিন হইতে পাঁচ ভাগ চূণ ও দুই ভাগ লৌহচূর মিশাইয়া চালুনী দিয়া ছাঁকিয়া ভাল করিয়া মিশান হয়। এক্ষণে এই মিশ্রিত পদার্থ কতকগুলি ১০।১২ ইঞ্চি ব্যাসের কাচের ভাণ্ডের (flask) মধ্যে পূরিয়া ভাণ্ডগুলি বালুকাপূর্ণ কড়ার মধ্যে বসাইয়া ভাণ্ডের গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। কর্পূরের বাষ্প অত্যধিক দাহ্য এবং উহাতে সহজেই আগুন লাগিবার সম্ভাবনা থাকায় যে গৃহে কর্পূর শোধিত হয়, উহার মেজের তলদেশে চুল্লী প্রস্তুত করিয়া চুল্লীর উপর আর একটি লোহার কড়ায় লঘুদ্রাব ধাতু (fusible metal) রাখিয়া তাহার উপর কাচভাণ্ড সমেত বালুকাপূর্ণ কড়া বসান হয়। চুল্লীতে

অগ্নিসংযোগ করিয়া ভাণ্ডের তাপ ১২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত উঠাইয়া পরে দ্রুত তাপ বৃদ্ধি করিয়া ১৯০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলে কর্পূর গলিয়া যায় ও কর্পূরস্থ জলীয় অংশ উপিয়া যায়। তখন ভাণ্ডের গাত্রস্থ বালুকা সরাইয়া দিয়া, উহার মুখ একটি কাগজের ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া, ২০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপবৃদ্ধি করিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল উত্তপ্ত করা হয়। এইরূপে ভাণ্ডের মধ্যস্থ কর্পূর তাপসংস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয় ও ঐ বাষ্প ভাণ্ডের উপরিভাগের অপেক্ষাকৃত শীতল পাত্রে ঘনীভূত হইয়া জমিয়া যায় ও কর্পূরের সমস্ত ময়লা ভাণ্ডের তলদেশে পড়িয়া থাকে। কর্পূর-শোধন-কালে উহার বাষ্পের সহিত বায়ু মিশ্রিত হইলে যে কর্পূর উৎপন্ন হয়, তাহা অস্বচ্ছ (opaque) হয় বলিয়া ভাণ্ডের মুখ একটি Belljar দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কর্পূর-শোধন সমাপ্ত হয় ও কড়ার ভিতর হইতে কাচ-ভাণ্ডটি উঠাইয়া উহার গাত্রে সামান্য জল ছিটাইয়া দিলে ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া যায়। তখন উহার মধ্য হইতে একটি ১০।১২ ইঞ্চি ব্যাসের ও তিন ইঞ্চি পুরু কর্পূরের পিষ্টক পাওয়া যায় এবং উহার ওজন প্রায় ৫।৬ সের পর্য্যন্ত হয়। কর্পূরস্থ রজন ও অন্যান্য তৈলময় পদার্থ দূর করিবার জন্য চূণ এবং গন্ধক বিতাড়িত করিবার জন্য লৌহচূর ব্যবহার করা হয়। কর্পূরকে অতিশয় শুভ্র করিবার জন্য কখন কখন উর্দ্ধপাতনের (sublimation) পূর্ব্বে উহার সহিত কাঠ-কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। কর্পূরশোধনকালে যাহাতে তাপাধিক্য বশতঃ কাচ-ভাণ্ডের মধ্যে দুম্‌দাম্‌ শব্দ না হয় ও বাষ্প দ্রুত উদ্গত হইতে না পারে, তজ্জন্য শোধনের পূর্ব্বে উহার সহিত বালুকা মিশ্রিত করা হয়।

অপ্রাকৃতিক বা সাংযোজিক কর্পূর (synthetic camphor):—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চীন ও জাপানের কর্পূর-শিল্পে একাধিপত্য থাকায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কর্পূর প্রস্তুতের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইতেছিল। কিরূপে সুলভে ভাল কর্পূর প্রস্তুত করা যাইতে পারে, সে জন্য বহু দিবসাবধি গবেষণা চলিতেছিল। কর্পূর বিশ্লেষণ করিয়া উহা যে যে মৌলিক পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া অবশেষে উহার সংশ্লেষণ (synthesis) হইয়াছে। প্রথমে সুমাত্রা ও বোর্ণিওর কর্পূর-তৈল লইয়া এই পরীক্ষা হয়, পরে তার্পিণ তৈল হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে কর্পূর প্রস্তুত হইতেছে:—

শুষ্ক বা নির্জ্জলা তার্পিণ তৈল উত্তমরূপে শীতল করিয়া উহার মধ্যে নির্জ্জলা লবণকাম্ল বাষ্প (Anhydrons gaseous Hydrochlone acid) প্রবিষ্ট করাইলে পিনিন্‌ হাই-ড্রোক্লোরাইডের (Pinene Hydro Chloride) শুভ্র দানা উৎপন্ন হয়। পিনিন্‌ হাইড্রোক্লোরাইড দেখিতে ঠিক কর্পূরের মত এবং এক কালে উহা কৃত্রিম কর্পূর বলিয়া ব্যবহৃত হইত। পিনিন্‌ হাইড্রোক্লোরাইড হইতে লবণকাম্ল বিতাড়িত করিয়া এ্যাসাম্ল (Acetic acid) সংযোগ করিলে আইসো-বোর্ণিওল-এসিটেট (Iso borneol Acetate) উৎপন্ন হয়। পিনিন্‌ হাইড্রোক্লোরাইড, গাঢ় ধাক্সাম্ল (Glacial Acetie Acid) ও শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ জিঙ্ক ক্লোরাইড (zinc chloride) সহযোগে উত্তপ্ত করিলে আইসো-বোর্ণিওল এসিটেট হয় এবং উহা সুরাসারসংযুক্ত কষ্টিক পটাশের (Alcoholic Potash) সহিত ফুটাইলে বোর্ণিওলের শুভ্র দানা উৎপন্ন হয়। অতঃপর বোর্ণিওলকে যবক্ষার-দ্রাবক (Nitric Acid) বা ক্রমিক এ্যাসিড (Chromic Acid) দ্বারা অম্লজানযুক্ত করিলে (Oxidise) কর্পূর উৎপন্ন হয়। ভালরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে নকল কর্পূর প্রায় সর্ব্ববিষয়ে আসল কর্পূরের সমকক্ষ হইতে পারে।

কর্পূর-তৈল:—বহু প্রাচীন কাল হইতে কর্পূর-তৈলের ব্যবহার দেখা যায়। সিনামন ক্যাম্ফোরা বৃক্ষের সকল অংশ হইতেই উহা পাওয়া যায়। কর্পূর-তৈলে মোটামুটি প্রায় ২৪টি বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে; তন্মধ্যে এসিট্যাল্ডিহাইড (Acetaldehylde), ক্যাম্ফিন, (Camphene), ফেলান্‌ড্রিন্‌ (Phellandrine), তার্পিনিয়ল (Terpeniol), সিট্রোনিলল, স্যাফ্রল, ইউজিনল, ডাইপেন্টিন্‌, বোর্ণিওল ও কর্পূর উল্লেখযোগ্য। বাজার চলতি কর্পূর-তৈল সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর দেখা যায়। (১) লাল তৈল—কর্পূর পৃথক্‌ করিয়া লইবার পর যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০'৯৫ হইতে ০'৯৯। এই তৈল তির্য্যক্‌পাতন করিলে দুইটি ভিন্ন প্রকারের তৈল পাওয়া যায়—একটি বর্ণহীন ও অপরটি পিঙ্গল। (২) বর্ণহীন তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০'৮৭ হইতে ০'৯; ইহাতে কর্পূরের গন্ধ বিদ্যমান থাকে এবং তার্পিণ তৈলের পরিবর্ত্তে ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (৩) পিঙ্গল বর্ণের তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'০১৪ হইতে ১'০২৬ এবং ইহাতে শতকরা ২৫ হইতে ৩৫ ভাগ স্যাফ্রল থাকে। পিঙ্গল বর্ণের তৈল তির্য্যক্‌পাতন করিলে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্যাফ্রল প্রস্তুত করা হয়। স্যাফ্রল পৃথক্‌ করিবার পর যে তৈল অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে আর একটি অংশ পৃথক্‌ করা হয় এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'০৭; এই তৈল নকল স্যাসাফ্রাস তৈল বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয় এবং উহাতে শতকরা ৮০ ভাগ স্যাফ্রল থাকে।

কর্পূর অর্দ্ধস্বচ্ছ, শুভ্র, দানাদার ও উদ্বায়ু পদার্থ অর্থাৎ উহা হাওয়ায় খুলিয়া রাখিলে ধীরে ধীরে উপিয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা চূর্ণ করা যায় না; কিন্তু সামান্য সুরাসার, ইথার, ক্লোরোফর্ম্ম বা শর্করা সহযোগে উহা অতি অল্পায়াসে চূর্ণ করা যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০'৯৯ এবং সেন্টিগ্রেডের ১৭৫ ডিগ্রী তাপে দ্রবীভূত হয় ও ২০৫ ডিগ্রী তাপে ফুটিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়। ইহার গন্ধ মিষ্ট অথচ উগ্র ও তীক্ষ্ণ এবং আস্বাদন কটু। অগ্নিসংযোগ করিলে উহা হইতে উজ্জ্বল ধূমময় শিখা বাহির হইয়া জ্বলিতে থাকে। পরিষ্কার জলের উপর এক টুকরা কর্পূর ফেলিলে উহা ভাসিয়া ঘুরিতে থাকে, কিন্তু সামান্য তৈল সংস্পর্শে উহার ঘূর্ণায়মান গতি বন্ধ হয়। কর্পূর জলে অতি সামান্য পরিমাণে দ্রব হয়; প্রতি ১০০০ ভাগ জলে মাত্র ১ ভাগ কর্পূর দ্রবীভূত হইতে পারে, কিন্তু প্রতি ১০০ ভাগ সুরাসারে ১২০ ভাগ কর্পূর দ্রব হয়। কর্পূরের সংক্রামকনাশক, পচননিবারক ও দুর্গন্ধনাশক শক্তি যদিও প্রখর

নহে, তথাপি এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কীট-পতঙ্গ বিনাশ করিবার জন্য পৃথিবীর সমগ্র কর্পূরের শতকরা ১৫ ভাগ ব্যয়িত হয়। ঔষধে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে, এবং এ জন্য শতকরা ১৩ ভাগ কর্পূর ব্যয়িত হয়। ঔষধ ব্যতীত সেলুলয়েড, জাইলোনাইট (xy'onite), পাইরালিন্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং এ জন্য শতকরা ৭০ ভাগ কর্পূর ব্যয়িত হয়। কর্পূর ও কর্পূরঘটিত সকল দ্রব্যই অত্যধিক দাহ্য। বীজ হইতে সহজে অঙ্কুর বাহির করিবার জন্য কর্পূরের জল ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধাজনক। যে সকল বীজের বহিরাবরণ কঠিন—যেমন রেড়ী, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি, সেই সকল বীজ কয়েক ঘণ্টাকাল কর্পূরের জলে ভিজাইয়া বপন করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যে অঙ্কুর বাহির হয়। সকল বীজই কর্পূরের জলে ভিজাইয়া বপন করার সুবিধা আছে। কোনও ডালের কলম কর্পূরের জলে ভিজাইয়া মাটীতে রোপণ করিলে শীঘ্র শিকড় লাগিবে।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে কর্পূর ও কর্পূর-তৈলের বহুল প্রচারের কতক আভাস পাওয়া যাইবে :—

	সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন কর্পূর		সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন কর্পূর-তৈল	
১৯১৬ খৃঃ	৮৬৮৯৬৪০	পাউণ্ড	১৪৬৮০০৮০	পাউণ্ড
১৯২০ "	৪০৮৫২৫২	"	৯৬৭৬০৭৬	"
১৯২১ "	৩৩৮০০৬৩	"	৯৬৩২৮০০	"

	জাপানে উৎপন্ন কর্পূর		জাপানে উৎপন্ন কর্পূর-তৈল	
১৯২০ খৃঃ	১৩৭৮১৩৩	পাউণ্ড	৬১২৩২০০	পাউণ্ড
১৯২১ "	১৯২২৪০০	"	১০৭৫৩৩৩	"
১৯২২ "	৪৮৬১৩৩৩	"	২২৩২৬৬৬	"

উপরি-উক্ত পরিমাণ কর্পূরের মধ্যে পৃথিবীর যে যে দেশে যে পরিমাণ কর্পূর প্রতি বৎসর ব্যবহৃত হয়, তাহার তালিকা—

আমেরিকা	২০৯২৬৭৪	পাউণ্ড
ইংলণ্ড	২৩৪১৫৬	"
ফ্রান্স	১৯৪৯৬২	"
ভারতবর্ষ	৯০০২৮	"
অষ্ট্রেলিয়া	২৭০১	"

শ্রীআশুতোষ দত্ত (বি, এস-সি)।

কাল-বৈশাখী

বাসন্ত ফুলশরের ঘায়ে কাঁপল কি অন্তর ?
রুদ্র, রোষে তাই জাগালে কাল-বোশেখীর ঝড়।
ধ্যান সমাধি ভুল্‌লে ভোলা,
লাগ্‌ল বুকে কিসের দোলা ?
ললাট-আঁখির তারায় জ্বলে জ্বলন ভয়ঙ্কর।
রুদ্র, তোমার রোষের শ্বসন কাল-বোশেখীর ঝড়।

ক্রুদ্ধ নাসারন্ধ্রপথে রুদ্ধ প্রভঞ্জন
মুক্তি লভে ছিন্ন করি সমাধি-বন্ধন।
কণায় শ্বসে পিঙ্গ জটা
গগন ঢাকে জলদ-ঘটা,
পড়ছে খ'সে কটির দ্বীপি-চর্ম্ম আবরণ,
বিষাণ তোমার ঈশান কোণে তুল্‌ছে গরজন।

বিল্ব-শাখায় ফলে ফলে বাজছে খটাখট
পাতায় পাতায় হাততালি দেয় শাল নারিকেল বট।
চম্পকবন ধূলায় ভরে,
ভস্ম করি পঞ্চশরে
জয়ের নেশায় মাতলে কি আজ মৃত্যুঞ্জয়ী নট ?
ত্রাহি ত্রাহি, মা ভৈঃ কহি সম্বরো সঙ্কট।

নাচ নাচ হে নটরাজ, ডম্বরু বিষাণ
উঠুক হেঁকে, জ্বলুক চোখে দীপ্তি খরশাণ,
খুলুক জটা, বাঁধন-হারা
ভুলুক তাহে মুক্ত ধারা,
আকাশ বেয়ে চলুক ধেয়ে গঙ্গা কলতান,
পঞ্চশরের ভস্ম তাহে হউক লীয়মান।

মঞ্জরিত অশোক চ্যূত লুটাক ধূলির পর
কর্ণিকারের কর্ণভূষার ঘুচুক আড়ম্বর।
লতাবধূর স্বর্ণছটা
প্রলোভনের বর্ণ-ঘটা
ব্যর্থ করে নিশান জটা উড়াও দিগম্বর।
নূতন ক'রে গড়ুক ভুবন কাল-বোশেখীর ঝড়।

শ্রীজগৎমোহন সেন (বি, এস-সি, বি, ই, ডি)

তিব্বতের বিভীষিকা

দ্বাবিংশ প্রবাহ

কার্য্যোদ্ধার

মোহান্তের ছদ্মবেশধারী মিঃ লকের প্রচণ্ড ঘুসি খাইয়া শ্রমণটি ঘুরিয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। মিঃ লক আর তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। তিনি হিরণ্ময় গ্রন্থের আধারটি তুলিয়া লইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। তিনি দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে কিছু দূরে আর একটি ফটকের খিলান দেখিতে পাইলেন, তাহা পার হইয়া তাঁহাকে আর একটি আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে হইল। সেই আঙ্গিনার অন্যপ্রান্তে যে বৃহৎ দেউড়ী ছিল, তাহা অতিক্রম করিতে না পারিলে তাঁহার মুক্তিলাভের উপায় ছিল না।

মিঃ লক্ সেই ভারী আধারটি আলখেল্লা দ্বারা আবৃত করিয়া বগলে পুরিয়াছিলেন, তাহা বহন করিতে তাঁহার কষ্ট হইতেছিল; কিন্তু তিনি সেই কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে বাহিরের আঙ্গিনার অধিকাংশ অতিক্রম করিয়াছেন, সেই সময় নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা মঠের কোন একটি দেউড়ীতে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টাধ্বনি হইল। সেই ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া মিঃ লকের মনে হইল, ইহা তাহার স্বদেশীয় কারাগারের ঘণ্টাধ্বনির অনুরূপ। কারাগার হইতে কোন বন্দী গোপনে পলায়ন করিবার পর সেই সংবাদ প্রকাশিত হইলে কারা-প্রাকারের অন্তরাল হইতে এইরূপ সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। ইহা কি উচ্চ নিনাদে তাঁহারই পলায়ন-সংবাদ বিঘোষিত করিল? কিন্তু তখনও যে তিনি মঠের বহিঃপ্রাকার অতিক্রম করিতে পারেন নাই!

যাহা হউক, মিঃ লক প্রায় ২০ মিনিট পরে মঠের বাহিরের দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া হিরণ্ময় গ্রন্থের আধারটি নামাইয়া রাখিলেন এবং যে সুদৃঢ় স্থূল লৌহশৃঙ্খল দ্বারা দ্বার রুদ্ধ ছিল, সেই শৃঙ্খলটি অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকর্ষণে শৃঙ্খল হইতে ঝন্ ঝন্ ধ্বনি উত্থিত হইল। দেউড়ীর বাহির্দ্দেশ হইতে সেই শব্দ শুনিতে পাইয়া তাঁহার বিশ্বস্ত সহকারী জ্যাক উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি আসিলেন কি?"

মিঃ লক ভগ্নস্বরে জ্যাককে সাড়া দিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও আশঙ্কা পরিস্ফুট হইল। তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকবার চেষ্টা করিবার পর সেই দেউড়ীর স্থূল অর্গল শৃঙ্খল সহ খসিয়া পড়িল, এবং তাহার ঝন্‌ঝনা শব্দ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। সেই শব্দ শূন্যে বিলীন হইলে দূরে সমাগত অনেকগুলি লোকের পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। মিঃ লক তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিতে পাইলেন, সেই দৃশ্যে তাঁহার বক্ষঃস্থল মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। তিনি শ্রেণীবদ্ধ আলখেল্লাধারী সন্ন্যাসিগণকে দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি মশাল। তাহাদের গতিবেগে মশালের আলোকজিহ্বা আন্দোলিত হইতেছিল।

ঐ সকল সন্ন্যাসী অল্পকাল পূর্ব্বেও প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তাহারা রাত্রিশেষে যখন সেই দীর্ঘদেহ পুরুষটিকে একাকী দেউড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া ফটক উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতে দেখিল, তখন তাহাদের মন সন্দেহে পূর্ণ হইল। তাহারা তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য সেই দেউড়ীর দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল।

মিঃ লক তাহাদিগকে ঐ ভাবে দৌড়াইতে দেখিয়া তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তাহারা সকলে একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তাঁহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে, তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার মনে সংশয়ের অবকাশমাত্র রহিল না। কিন্তু তিনি সেই সঙ্কটজনক অবস্থাতেও মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি বা হতাশ হইলেন না; তিনি দুই হাতে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেউড়ীর সুবৃহৎ কপাট আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; জ্যাকও দেউড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া কপাটে কাঁধ বাধাইয়া তাহা ঠেলিতে লাগিল। এইরূপে উভয়ের যথাসাধ্য চেষ্টায় একখানি কপাট দুই ইঞ্চি মাত্র উন্মুক্ত হইল। তখন তাঁহারা অধিকতর উৎসাহে সেই কপাট ধরিয়া টানটানি ও ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন। এইরূপ চেষ্টার ফলে কপাট আরও কয়েক ইঞ্চি উদ্ঘাটিত হইল। তাহা দেখিয়া মিঃ লক্ তাড়াতাড়ি হিরণ্ময় গ্রন্থের আধারটি তুলিয়া লইলেন এবং দ্বারের ফাঁক দিয়া তাহা দেউড়ীর বাহিরে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহার অনুচরকে

ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "ধর জ্যাক, শীঘ্র তুই হাতে তুলিয়া লও। পরে এক মুহূর্ত্ত ওখানে বিলম্ব না করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সাম্পানে আশ্রয় গ্রহণ কর। যদি আমি এখানে বাধা পাই, তোমার অনুসরণ করিতে না পারি, তাহা হইলে তুমি মুহূর্ত্তমাত্র আমার প্রতীক্ষা না করিয়া সাম্পান ভাসাইয়া দিবে, এবং যত শীঘ্র সম্ভব নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিবে—যাও।"

অতঃপর ফেরার লক্ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটি লোহার গরাদে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার আততায়িগণকে লক্ষ্য করিয়া তাহা সবেগে নিক্ষেপ করিলেন· সেই গরাদে দ্বারা কয়েক জন সন্ন্যাসী আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিল।. অন্যান্য সন্ন্যাসীরা আর তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, তাহারা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সুযোগে মিঃ লক্ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আরও দুইটি গরাদে নিক্ষেপ করিলেন।

সন্ন্যাসীরা এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া প্রাণভয়ে পশ্চাতে হঠিয়া গেল। কারণ, তিনবার তিনটি গরাদে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহাদের দলের কয়েক জনকে অল্পাধিক আহত হইতে হইয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে আরও তিনটি মূর্ত্তি খিলানের নিম্নস্থিত পথ দিয়া দ্রুতবেগে মিঃ লকের দিকে ধাবিত হইল। সেই মঠের ভারপ্রাপ্ত মোহান্ত তাঁহার দুই জন চেলা সঙ্গে লইয়া মিঃ লকের অদূরে উপস্থিত হইলেন। তখনও সেই মঠের এক অংশ হইতে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল; মঠধারী মোহান্ত জলদগম্ভীর স্বরে তাঁহার অনুচরবর্গকে যে আদেশ করিলেন, তাহা মিঃ লকেরও কর্ণগোচর হইল।

তাঁহাদিগকে অদূরে সমাগত দেখিয়া মিঃ লক্ ক্ষিপ্রহস্তে আর একটি লৌহদণ্ড তুলিয়া লইয়া সবেগে সন্ন্যাসীদের দলের ভিতর নিক্ষেপ করিলেন। দেউড়ীর দ্বার যে পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মঠের বাহিরে পলায়ন করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি দেউড়ীর বাহিরে পদার্পণ করিবামাত্র সন্ন্যাসীরা তাঁহার অনুসরণ করিবে, তখন তাঁহার পলায়নের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইবে। এই অবস্থায় যদি তিনি পলায়ন না করিয়া দ্বারের সম্মুখে অবস্থিতি করেন এবং সন্ন্যাসীদের গতিরোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই অবসরে জ্যাক তাঁহার প্রদত্ত বহুমূল্য সামগ্রী লইয়া নদীপথে বহুদূরে পলায়ন করিতে পারিবে; কিন্তু তাঁহার এই অনুমান সঙ্গত হয় নাই; কারণ, জ্যাক তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিবে না, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইল, জ্যাক তাঁহার অদর্শনে সাম্পান না ভাসাইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিবে, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া দেউড়ীর বাহিরে প্রস্থান করিলেন; তিনি দেউড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া দেউড়ী বন্ধ করিবার অবসর বা সুযোগ পাইলেন না, তিনি পশ্চাতে না চাহিয়া দ্রুতবেগে সোপানশ্রেণী দিয়া অবতরণ করিতে লাগিলেন; সোপান-শ্রেণীর নিম্নতম সোপান-প্রান্তে সংরক্ষিত সাম্পানই তখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি এক একবারে তিন চারি ধাপ লাফাইয়া পড়িতে লাগিলেন। অন্ধকারে পদস্খলন হইলে প্রস্তর-সোপানে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতে পারে, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু দৈবানুকম্পায় তাঁহার সেরূপ কোন বিপদ ঘটিল না, তিনি দ্রুতপদে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার সাম্পানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যাহাতে অতি সহজে সাম্পানে উঠিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে জ্যাক সাম্পানখানি নিম্নতম সোপানে ভিড়াইয়া রাখিয়াছিল।

মিঃ লক যে মুহূর্ত্তে সাম্পানে লাফাইয়া পড়িলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই জ্যাক সাম্পানখানি ঠেলিয়া অগাধ জলে লইয়া গেল এবং নদীর যে কূলে ফেঙ্গি-আন-কানির উদ্যান ছিল, সবেগে নৌকা বাহিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিল। মিঃ লক জ্যাককে সাহায্য করিবার জন্য স্বয়ং দাঁড় ধরিলেন। তাঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় সাম্পানখানি যেন উড়িয়া চলিল।

কিন্তু মিঃ লক এই ভাবে মঠ হইতে পলায়ন করিয়া দ্রুতগামী সাম্পানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও নিরাপদ হইতে পারিলেন না। মঠ হইতে অসময়ে বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইতেছিল; দীর্ঘকালেও সে ঘণ্টাধ্বনির বিরাম না হওয়ায় নগরের অধিকাংশ অধিবাসী জাগিয়া উঠিয়াছিল; তাহারা ঐরূপ ঘণ্টাধ্বনির কারণ বুঝিতে না পারিয়া দলে দলে মঠের দিকে ধাবিত হইল।

সাম্পানখানি দ্রুতগতি পূর্ব্বোক্ত উদ্যানের নীচে আসিয়া এরূপ বেগে কূলে ভিড়িল যে, তাহার মাথা কর্দ্দমের ভিতর

প্রায় আধ হাত বসিয়া গেল। জ্যাক ড্রেক তৎক্ষণাৎ সেই হিরণ্ময় গ্রন্থের আধারটি স্কন্ধে লইয়া নদীতীরে লাফাইয়া পড়িল। মিঃ লক মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার অনুসরণ করিলেন, তিনি জ্যাককে সঙ্গে লইয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইবামাত্র ফেঙ্গির দীর্ঘদেহ শুভ্রজ্যোতি নক্ষত্র-নিকরের অস্ফুট আলোকে তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। কয়েক মিনিট পরে কয়েকটি রঙ্গীন কাগজের ফানুসের ভিতর বাতি জ্বলিয়া উঠিলে অন্ধকারাচ্ছন্ন বনপথ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

ফেঙ্গি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ লকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারা ফিরিয়াছেন দেখিতেছি ; আপনার চেষ্টা সফল হইয়াছে কি ?"

মিঃ লক বলিলেন, "হাঁ, চেষ্টা সফল হইয়াছে, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিব কি না, জানি না। কারণ, নগরের সকল অধিবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা অবিলম্বে সকল সংবাদ জানিতে পারিবে, আমাকে সনাক্ত করাও হয় ত মঠের সন্ন্যাসীদের অসাধ্য হইবে না, তাহার কি ফল হইবে, বলিতে পারি না।"

ফেঙ্গি বলিল, "আপনি অসাধ্যসাধন করিয়াছেন। আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য আমার যাহা সাধ্য, তাহার ত্রুটি করিব না। আমার আশ্রয়ে আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই—এ কথা আমি কি করিয়া বলি ? এ অবস্থায় আপনার কি কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিয়া একটিমাত্র পথ মুক্ত দেখিতেছি। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।"

ফেঙ্গি নদীর কূলে কূলে কিছু দূর গমন করিয়া মিঃ লককে একখানি মোটর-বোট দেখাইল। বোটখানির নির্ম্মাণ-কৌশল এবং কলকব্জা সম্পূর্ণ আধুনিক, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা সুসজ্জিত। ফেঙ্গি বলিল, "আপনারা এই মোটর-বোটে অবিলম্বে এই নগর ত্যাগ করুন। উহাতে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীই যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত আছে। আমার মত সামান্য লোক ইহার অধিক আর কি আপনাকে সাহায্য করিতে পারে ? করুণাময় খোদাতালা আপনাকে রক্ষা করুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। যদি ভবিষ্যতে কোন দিন আমার ভ্রাতার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে আপনি তাহাকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইবেন।"

মিঃ লক বলিলেন, "আপনি যে তাঁহার ভ্রাতা হইবার অযোগ্য নহেন, এবং তাঁহার আতিথেয়তার সম্মান রক্ষার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র, ইহা তিনি জানিতে পারিবেন।"

মিঃ লক ও তাঁহার সহকারী জ্যাক আর সময় নষ্ট না করিয়া হিরণ্ময় গ্রন্থ সহ মোটর-বোটে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সেই সময় সেই স্থানে ঐরূপ একখানি মোটর-বোট পাইয়া আপনাদিগকে দৈবানুগৃহীত মনে করিলেন। ফেঙ্গির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল। সেই সঙ্কটকালে ঐরূপ একখানি দ্রুতগামী মোটর-বোট ভিন্ন আর কোন দ্রব্যই তাঁহাদের প্রার্থনীয় ছিল না।

ড্রেক অভিজ্ঞ এঞ্জিন-পরিচালক, সে মোটর-বোটের এঞ্জিন চালাইতে আরম্ভ করিল, মিঃ লক তাহার হাল ধরিলেন। মোটর-বোটখানি ইয়াংসির সলিলরাশি বিদীর্ণ করিয়া তীরবেগে গন্তব্যপথে ধাবিত হইল। নদীর অনুকূল স্রোতে তাঁহারা পূর্ণ উৎসাহে চলিতে লাগিলেন। চেং-তু মঠের ঘণ্টাধ্বনি ক্রমশঃ শূন্যে বিলীন হইল। চেং-তু হইতে চং-কিংএর দূরত্ব ৫ শত মাইল, কিন্তু তাঁহারা যত অল্পসময়ে এই ৫ শত মাইল অতিক্রম করিলেন, অন্য কোন মোটর-বোট ঐরূপ অল্পসময়ে আর কখন এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা মুহূর্ত্তকালের জন্য মোটর-বোটের এঞ্জিনকে বিশ্রাম দান করেন নাই ; মিঃ লক্ এক হাতে আহার করিতে করিতে অন্য হাতে এঞ্জিন চালাইয়াছিলেন। ফেঙ্গির অনুগ্রহে কোন বিষয়েই তাঁহাদিগকে অভাব অনুভব করিতে হইল না। দীর্ঘপথ-পর্য্যটনের জন্য মোটর-বোটে যে সকল সামগ্রী অপরিহার্য্য, এই বোটে সেই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। মিঃ লক্ মোটর-বোটের কেবিনের কোন গুপ্তস্থানে হিরণ্ময় গ্রন্থখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

অনন্তর মোটর-বোটখানি দুর্গম গিরিসঙ্কুল ঘূর্ণাবর্ত্তময় স্থানে উপস্থিত হইলে মিঃ লক্ সেই পথে চলিবার উপযুক্ত আর একখানি সুদৃঢ় মোটর-বোট দেখিতে পাইলেন। কান-সি-ওয়েনের আদেশে সেই বোটখানি সেই স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে নদীবক্ষে প্রপাতের জলরাশি প্রচণ্ডবেগে ঢলিয়া পড়িতেছিল, কোন সাধারণ মোটর-বোট সেই স্থান অতিক্রম করিতে পারিত না।

কান-সি-ওয়েনের এই নূতন ব্যবস্থায় তিনি নির্ব্বিঘ্নে সেই বিপৎসঙ্কুল দুর্গম স্থান অতিক্রম করিলেন।

মিঃ লক্ চং-কিংএ উপস্থিত হইলে কান-সি-ওয়েনের কাপ্তেন একখানি ক্ষুদ্র অথচ সুদৃঢ় মোটর-বোটে আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কান-সি-ওয়েনের আদেশেই মিঃ লক্ মেঙ্গি-প্রদত্ত-মোটর বোটখানি সচল অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সুন্দর মূল্যবান্ মোটর-বোটখানি সবেগে চলিতে চলিতে একটি পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ হইল। এরূপ করিবার অন্য কারণও বর্ত্তমান ছিল। শক্তিশালী শত্রুপক্ষ হিরণ্ময় গ্রন্থ উদ্ধারের আশায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণে বিরত হইত না, যদি তাহারা এই দুর্গম অংশে আসিয়া মোটর-বোটখানির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তাহাদের ধারণা হইত, সেই স্থানে আসিয়া বোটখানি চূর্ণ হইয়াছিল এবং তাহার আরোহিদ্বয় ইয়াংসি-গর্ভে প্রাণ হারাইয়াছিল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অতঃপর হিরণ্ময় গ্রন্থের অনুসন্ধানে বিরত হইবে।

ইচাংএ উপস্থিত হইয়া মিঃ লক্ কান-সি-ওয়েনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু সেই অজেয় জলদস্যুর নিকট তিনি বাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, এই বোম্বেটের সহায়তা ব্যতীত তিনি এইরূপ অসমসাহসিক বাটপাড়িতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। কান্-সি-ওয়েন চীন সাম্রাজ্যের প্রধান জননায়ক মাঞ্চুরাজবংশধর আউ-লিংকে চ্যাংচায় লইয়া গিয়া অদ্ভুত কৌশলে তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। সে জানিত, মিঃ লক্‌কে প্রাণ হাতে করিয়া চেং-তুর দুর্ভেদ্য মঠে প্রবেশ করিতে হইবে। সেখানে তাঁহার ছদ্মবেশ ধরা পড়িতে পারে এবং মঠধারী মোহান্ত কোন কারণে তাঁহাকে সন্দেহ করিলে সেই মঠ হইতে পলায়ন করা তাঁহার অসাধ্য হইবে। ধরা পড়িলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কান-সি-ওয়েন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, চেং-তু মঠে তাহার বিদেশী বন্ধু বাঘ মহাশয়ের জীবন বিপন্ন হইলে সে আউ-লিংকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু মিঃ লক্ তাহার সহায়তায় কার্য্যোদ্ধার করিয়া নিরাপদে প্রত্যাগমন করায় সে হৃষ্টচিত্তে আউ-লিংকে মুক্তিদান করিল। মিঃ লক্ প্রাচ্য জলদস্যুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন।

য়ুরোপের অনেক শক্তিশালী পুরুষ প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিয়া প্রতিষ্ঠা স্থাপন ও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, অনেকে বিপুল ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া কোটিপতি হইয়াছেন, কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডের শক্তিশালী নেতৃবৃন্দের সহায়তা ব্যতীত কখন অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেন না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুখ-সৌভাগ্যের দিনে সে কথা তাঁহাদের অনেকেরই স্মরণ থাকে না, তাঁহারা মনে করেন, কেবল পুরুষকারের সাহায্যেই তাঁহারা অসাধ্যসাধন করিয়াছেন।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ

দালাই লামার কৃতজ্ঞতা

মিঃ লক ও তাঁহার সহকারী ড্রেক চ্যাংচা নগরে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন; সেই সময় আউ-লিং জলদস্যু কান-সি-ওয়েনের জাহাজে তাহার অতিথিরূপে বাস করিলেও তিনি সেখানে নজরবন্দী ছিলেন। মিঃ লক সেখানে অনায়াসেই আউ-লিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। বিশেষতঃ তিনি যে অমূল্য সামগ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া তিনি তাড়াতাড়ি চীনদেশ-পরিত্যাগের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যত দিন সাংহাই বন্দরে উপস্থিত হইতে না পারিবেন, তত দিন তিনি নিরাপদ্ নহেন। তিনি চেংতুর জ্যোতির্ম্ময় মঠের গুপ্ত কক্ষ হইতে যে দুর্লভ সামগ্রী অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, মঠের মোহান্ত ও সন্ন্যাসীরা শীঘ্রই তাহার অভাব বুঝিতে পারিবে, তাহার পর সন্ন্যাসীর দল দ্রুতগামী জলযান-সমূহে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবে। তাহারা তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। তাহার শেষফল কি হইবে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। কিন্তু যত দিন সেই হিরণ্ময় গ্রন্থ তিব্বতে দালাই লামার নিকট প্রেরিত না হয়, তত দিন শঙ্কা ও দুশ্চিন্তার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। চীনের উপকূল ত্যাগ করিতে না পারিলে তিনি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে পারিবেন না, ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

মিঃ লক ও তাঁহার সহকারী, চাংচায় তিন দিন বিশ্রামের পর কান-সি-ওয়েনকে তাঁহাদের আশঙ্কার কথা বলিলেন।

ভবিষ্যতে তাঁহাদের বিপদের আশঙ্কা ছিল, ইহা কান-সি-ওয়েন অস্বীকার করিতে পারিল না। কান-সি-ওয়েন অতঃপর কি ভাবে লককে সাহায্য করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

কান-সি-ওয়েন চতুর্থ দিন প্রভাতে মিঃ লক ও জ্যাককে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইল। তাঁহারা তিন জনে একত্র ঘুরিতে ঘুরিতে নগরের বাহিরে একটি সুপ্রশস্ত প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। সেই প্রান্তরের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ বস্ত্রাবাস ছিল। কান-সি-ওয়েন লককে বলিল, সেই বস্ত্রাবাসের ভিতর যে সকল সামগ্রী সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সে একখানি জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিল।

কান-সি-ওয়েন কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্স খুলিয়া মিঃ লককে কতকগুলি কলকব্জা দেখাইল, সেগুলি একখানি সামরিক এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশ।

কান-সি-ওয়েন বলিল, "অনেক দিন পূর্ব্বে আপনি কথায় কথায় আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনি এরোপ্লেনে অনেকবার আকাশে উড়িয়াছিলেন, এবং তাহা কিরূপে চালাইতে হয়, তাহাও আপনি জানেন। আমি একখানি এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশ লুঠ করিয়া আনিয়াছি; আপনি যদি সেই অংশগুলি সংযোজিত করিয়া এরোপ্লেনখানি ব্যবহারযোগ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহার সাহায্যে আপনি গগনপথে সাংহাইএ উপস্থিত হইতে পারিবেন, স্থলপথে আক্রান্ত হইবার সকল আশঙ্কা বিলুপ্ত হইবে। এরোপ্লেনখানি কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য লোকজনের বা ভাল মিস্ত্রীর প্রয়োজন হইলে আমি অবিলম্বে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব।"

মিঃ লক তাঁহার বন্ধু কান-সি-ওয়েনের প্রস্তাবে আনন্দাভিভূত হইলেন। কান-সি-ওয়েন এ ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে—ইহা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাঁহার অনুরোধে কান-সি-ওয়েন দশ বারো জন লোক আনাইয়া দিল, তাহাদের মধ্যে তিন জন সুদক্ষ চীনা মিস্ত্রী ছিল, মিঃ লক তাহাদের সাহায্যে এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশ সংযোজিত করিয়া তাহা ব্যবহারোপযোগী করিলেন।

আরও তিন দিন পরে মিঃ লক সেই এরোপ্লেন লইয়া একবার আকাশে উড়িয়া আসিলেন, এই পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য্য হইয়া পরদিন জ্যাক সহ গগনপথে সাংহাই যাত্রা করিলেন। গগনপথে উধাও হওয়ায় এন-কিং বা নান্‌কিংএ তাঁহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা রহিল না। মিঃ লক সেই সকল জনপূর্ণ নগর অতিক্রম করিয়া সবেগে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই এরোপ্লেনখানি চীনের রাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হইয়া প্যাকবন্দী অবস্থায় যথাস্থানে প্রেরিত হইবার সময় লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

মিঃ লক বেলা ১০টার সময় চ্যাংচা হইতে গগনপথে উধাও হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৪টার সময় তিনি জ্যাক সহ সাংহাই আসিয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে নির্ব্বিঘ্নে অবতরণ করিলেন।

আধ ঘণ্টা পরে তিনি তাঁহার প্রাচীন বন্ধু সাংহাই-প্রবাসী স্যুইফ-সির বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। মিঃ লক জ্যাককে সঙ্গে লইয়া স্যুইফ-সির দোতলার বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। স্যুইফ্-সি তাঁহাদিগকে দেখিয়া গভীর বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিলেন এবং সম্মুখে যেন ভূত দেখিয়াছেন, এই ভাবে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি প্রায় দুই মিনিট নির্ব্বাক্ থাকিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তো—তোমরা আসিয়াছ? আ—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তোমরা কি ত—তবে সত্যই জীবিত আছ? আমি ত তোমাদিগকে খরচ লিখিয়া বসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, তোমরা দুই জনেই নিহত হইয়াছ।"

মিঃ লক হাসিয়া বলিলেন, "না, সার গর্ডন, আমরা একাধিকবার মরিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এমন কি, মৃত্যুকবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করা অসাধ্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল; কিন্তু পরমেশ্বরের দয়ায় অদ্ভুত উপায়ে আমাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, আউ-লিং আমাদিগকে কয়েদ করিয়া, অশেষ যন্ত্রণা দিয়া আমাদিগকে হত্যা করিবার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিল। আমাদের সেই বিপদের কাহিনী আপাততঃ না বলিলেও ক্ষতি নাই। একটা জরুরী প্রয়োজনে আমাকে আপনার নিকট আসিতে হইল; আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে এবং যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, অবিলম্বে তাহা নিরাপদ স্থানে সুরক্ষিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কের কোষাগারই তাহা নিরাপদে

রাখিবার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। তাহা সেখানে না পাঠাইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আপনি দয়া করিয়া অবিলম্বে ইহার ব্যবস্থা করুন।"

মিঃ লকের ইঙ্গিতে জ্যাক একটি অনতিবৃহৎ কাঠের বাক্স সার গর্ডনের সম্মুখে রাখিলে সার গর্ডন স্তব্ধভাবে কয়েক মিনিট সেই বাক্সটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "সেই অমূল্য সামগ্রী কি এই কাঠের বাক্সে সঞ্চিত আছে? তুমি তাহা সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় এখানে লইয়া আসিয়াছ? কি সর্ব্বনাশ!"

মিঃ লক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "হাঁ, তাহা এই বাক্সেই রাখিয়াছি। আমি চেংতুর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় মঠে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের হিরণ্ময় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি; চুরি করিয়াছিলাম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, অথবা 'চোরের উপর বাটপাড়ি'ও বলিতে পারেন; কিন্তু সেই বিস্ময়কর কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বলিবার অবসর নাই। আজ রাত্রিতে যদি আপনি ক্লাবে আমাদের সহিত ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই সময় সকল কথা আপনাকে বলিব মনে করিতেছি। রুচিকর খাদ্যদ্রব্যের জন্য আমাদের দুই জনেরই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।"

তখন অসময় অর্থাৎ আফিসের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সাংহাইয়ের ছোট বড় সকল লোকই সার গর্ডনকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত; তাঁহার অনুরোধে হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ব্যাঙ্কের দ্বার খুলিয়া তাঁহাদের সকলের অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তাঁহারা ব্যাঙ্কের কোষাগারে প্রবেশ করিয়া যখন সেই কাঠের বাক্সের ডালা খুলিলেন, তখন তাহার ভিতর হইতে একটি সুদৃশ্য আবরণ উন্মোচিত হইল। ভগবান্ বুদ্ধদেবের অমূল্য হিরণ্ময় গ্রন্থ সন্দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। সার গর্ডন ও ব্যাঙ্কের ম্যানেজার স্তম্ভিত-হৃদয়ে নির্নিমেষ-নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হিরণ্ময় গ্রন্থ ব্যাঙ্কের সুদৃঢ় সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া মিঃ লক্ ও জ্যাক সার গর্ডনের সহিত তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা সার গর্ডনের অতিথিরূপে তাঁহার গৃহে বাস করিতে সম্মত হইলেন।

সেই রাত্রিতে মিঃ লক্ সার গর্ডনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—তাঁহারা জার্ডিন ম্যাথিসন কোম্পানীর জাহাজে হংকং যাত্রা করিবেন এবং হংকং হইতে বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীমার কোম্পানীর জাহাজে কলম্বো গমন করিবেন। তাঁহারা হিরণ্ময় গ্রন্থ লইয়া এই পথেই তিব্বত গমন করা সঙ্গত মনে করিলেন।

সেই রাত্রিতে মিঃ লক্ সাংহাই ক্লাবে ভোজন করিতে বসিয়া তাঁহার অদ্ভুত অভিযানকাহিনী সার গর্ডনের নিকট বিবৃত করিয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত করিলেন। সার গর্ডনকে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, বহুবার তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এরূপ লোমহর্ষণ কাহিনী আর কখন তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। মিঃ লক্ ভিন্ন অন্য কেহ এই ভীষণ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি করিতে পারিত না বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। জ্যাক যে ভাবে লকের সাহায্য করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া সার গর্ডন মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিলেন।

পরদিন মিঃ লক্ জ্যাক সহ 'কাওয়াই-সাং' জাহাজে হংকং যাত্রা করিলেন, হিরণ্ময় গ্রন্থ জাহাজের কোষাগারে সংরক্ষিত হইল।

সার গর্ডনের উপদেশে দালাই লামা কলম্বো নগরে তাঁহার কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর পাঠাইলে মিঃ লক্ হিরণ্ময় গ্রন্থখানি তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিত হইলেন; এই স্থানে তাঁহার সকল দায়িত্বের অবসান হইল। মিঃ লক্ ও জ্যাক কলম্বো হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

* * * *

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার এক বৎসর পরে মিঃ লক্ দালাই লামা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিব্বতে যাত্রা করিলেন। ভারতে তাঁহার কিছু কায ছিল, তাহা শেষ করিয়া তিব্বতে যাইতে তাঁহার কয়েক মাস বিলম্ব হইয়াছিল। ভারত সরকারের সাহায্যে তিনি ও জ্যাক অল্পায়াসেই তিব্বতে উপস্থিত হইতে পারিলেন। প্রাতঃসূর্য্যকরোজ্জ্বল তুষারমুকুটিত হিমালয়ের অভ্রভেদী শুভ্র শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া যে দিন প্রভাতে তাঁহারা তিব্বত রাজধানী লাসা নগরে দালাই লামার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দরবার-কক্ষে উপস্থিত হইলেন, সে দিন তাঁহাদের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

দালাই লামা মিঃ লক্‌কে পুরস্কৃত করিবার জন্য তাঁহার কণ্ঠে একটি মহামূল্য হীরক-তারকা ঝুলাইয়া দিলেন। জ্যাকও একটি মূল্যবান্ হীরকাঙ্গুরী উপহার পাইল। দালাই

লামা বলিলেন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া, অসংখ্য বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া যে সুমহান্ কার্য্য সংসাধিত করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মজগতে দালাই লামার সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিব্বতের যে অভাব পূরণ করিয়াছেন, এই তুচ্ছ উপহার তাহার স্মৃতিচিহ্নমাত্র; তাঁহাদিগকে 'যথাযোগ্যরূপে পুরস্কৃত করিবার সামর্থ্য তাহার নাই।

ধর্ম্মজগতে চীনের যাহা সর্ব্বপ্রধান গৌরবের সামগ্রী ছিল, এইভাবে তাহা তিব্বতের অধিকারভুক্ত হইল এবং এই অধিকারবলে তিব্বত চীনের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিবার শক্তি লাভ করিল।

সমাপ্ত *

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

* মিঃ লকের অদ্ভুত শক্তি ও কৌশলের পরিচয়স্বরূপ 'পিশাচের নাগপাশ' নামক অপূর্ব্বরহস্যপূর্ণ কাহিনী 'মাসিক বসুমতী' বিগত চৈত্রসংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

জীবন-মরণ

মরণ মোদের আপন হয়েও
রইলো রে হায় পর হয়ে,
সবাই যেন এলাম হেথায়
অমরতার বর লয়ে।

আলোয় আলোয় হেসেই চলি
মরণমুখী পথ ধরি',
জীবনমুখী পথটি আঁধার,
কেবল তারেই ভয় করি।

লক্ষ সাপের ডেরায় রহি
নিরুদ্বেগে সংসারে
তাদের মাথায় মাণিক জ্বলে,
ভাবি, আবার ভয় কারে?

জীবন-মরণ গায়ে গায়েই
পৃথক্ হয়ে নেই কেহ,
চারি পাশে চাও দেখি ভাই,
থাক্‌বেনাক সন্দেহ।

তারার যেথায় বিলয় তথায়
উদয়ও তার নিত্য হয়,
মেঘের শ্মশান সূতিকাগার
এক ছাড়া আর দুই ত নয়।

সাগরবুকে আছাড় খেয়ে
মরছে যেথায় ঢেউগুলি
সেইখানেতেই উঠছে না কি
নতুন ঢেউএর বুক ফুলি?

ফলফুলের শ্মশান হোথা
বৃক্ষশিশু তার মাঝে
হাজার হাজার, সবুজ আশায়
মাথা তুলে ঐ রাজে।

জীবন-মরণ বিরোধ ভেবে
হারাই মোরা আধখানা,
দিনের আলোয় দিব্বি চলি,
সাঁজের ভয়েই রাতকাণা।

শ্রীকালিদাস রায়

তুষারতীর্থ—অমরনাথ

পরদিন আন্দাজ ৯টার সময় যাত্রা করিয়া সাড়ে ১২টায় রাওলপিণ্ডি পৌঁছিলাম। এখানেও কালীবাড়ীতে উঠিলাম—উহা ষ্টেশন হইতে বেশী দূর নহে। এখানকার পুরোহিত মহাশয় বেশ সাদামাটা এবং অমায়িক লোক। আমাদিগকে অতি যত্নের সহিত ঘর দিলেন। সারা দ্বিপ্রহর তাঁহার সহিত গল্পে কাটাইলাম। তাঁহার সহিত কথায় কথায় আমাদের এক জন সঙ্গিনী (ইঁহাকে "বুড়ীমা" বলিব, কারণ, তাঁহাকে তাহাই বলিতাম। অপর জন গেরুয়া ধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে "সাধুমা" বলিতাম) এখানে তাঁহার এক নিকট-আত্মীয়ার সন্ধান বাহির করিলেন। পরদিন আমরা সকলেই তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম।

বৈকালে সহরটা দেখিতে বাহির হইলাম। বেশ সাজান সহর। বড় বড় রাস্তা, দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দোকানপাট। সহরটি দেখিয়াই মনে হয়, ইহা সযত্নে সাজাইয়া তৈয়ারী করা। অনেক শ্বেতাঙ্গ ও বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে এখানে বাস করেন। কাযে কাযেই বায়োস্কোপ, হোটেল ইত্যাদিরও অভাব নাই। এখানে সৈন্য-বিভাগের একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টের হেড আফিস আছে শুনিলাম। এ দিকে ক্রমশঃই ভূগোলের সাধারণ নিয়মানুসারে সন্ধ্যা দেরীতে হইতে লাগিল। আটকে প্রায় ৮টায় সন্ধ্যা। সন্ধ্যার সময় কালীবাড়ী ফিরিলাম, তখন সেখানে বহু বাঙ্গালীর সমাবেশ হইয়াছে—টেনিশ, ক্যারম বোর্ড ইত্যাদি চলিতেছে, লাইব্রেরীটিও জনপূর্ণ। বহু দিন হিন্দী বাৎ বলিয়া এত দিন পর এতগুলি বাঙ্গালীর সহিত মাতৃভাষায় কথা বলিয়া সত্যই বড় আনন্দ হইল। কালীবাড়ীতে একটি পাকা ষ্টেজও আছে; পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীরা এখানে অভিনয় করিয়া থাকেন। বিদেশে স্বভাষীদের এরূপ একটি মিলনক্ষেত্র যে কত প্রয়োজনীয় ও আনন্দদায়ক, তাহা যাঁহারা ঐ অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝেন। সন্ধ্যার কিছু পর সকলে চলিয়া গেলেন, আমরাও বাজার হইতে কিছু খাবার আনিয়া উদরপূর্ত্তি করিলাম। বুড়ীমা কিছুই খাইলেন না, কিছুই না খাওয়াটা যেন তাঁহার স্বভাবগত একটা অভ্যাস ছিল। তিনি স্বপাকে খাইতেন, সাধুমা (ব্রাহ্মণ-বিধবা) রাঁধিয়া দিলেও খাইতেন না। কিন্তু স্থানে স্থানে আমরা মাত্র একটি ঘর ও একটি উনান পাইয়াছি, অথচ সময়ও হয় ত কম, কাযেই সেই সকল ক্ষেত্রে যেটুকু অসুবিধা, তাহা বুড়ী-মাই ভোগ করিতেন। বহু দিন তাঁহার স্বপাক সংস্কারের জন্য তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। সাধুমা সে দিন রুটী পাকাইলেন। বৈকালবেলা ষ্টেশনে গিয়া কোথায় কাশ্মীর-গামী মোটরবাস ভাড়া পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করায় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জনৈক মোটর-ব্যবসায়ীকে ফোণ করিলেন। অগোণে ব্যবসায়ী আসিয়া জনপ্রতি দশ টাকা বাস ভাড়া ও দুই টাকা টোল—মোট ১২ টাকায় রাজী হইয়া অগ্রিম কিছু টাকা লইয়া গেলেন। ইহাতে আমরা ঠকিয়াছিলাম, কারণ, পরে দেখিয়াছিলাম যে, বহু লোক (এমন কি, আমরা যে বাসে গিয়াছিলাম, সেই বাসেই) মাত্র ৬৲ হইতে ৮৲ টাকায় গিয়াছিল। আমার ধারণা ছিল যে, মোটরের ভাড়া সর্ব্বত্রই বাঁধা (fixed), তাহা লইয়া দর-দস্তুর করা অনুচিত ও অভদ্রতা; কিন্তু এখানে বুঝিলাম, মোটরের ভাড়া যাচাই করিয়া তবে বাস ঠিক করা উচিত। ইচ্ছা করিলে এখানে মোটরকার ভাড়া করা যায়। একটি পূরা মোটরের ভাড়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত ১ শত ২৫ টাকার কম কেহ বলিলেন না। মোটরে এক দিনেই শ্রীনগর (১৯৬ মাইল) আসা যায়। কেহ কেহ টঙ্গাতেও যায়। টঙ্গায় যাইতে সময় বেশী লাগে। বাসের সঙ্গে চুক্তি ছিল, ঠিক এগারোটার সময় আমাদিগকে কালীবাড়ী হইতে তুলিয়া লইবে। কথামত বাস আসিল, আমরাও বাসের মাথায় মাল দিয়া চড়িয়া বসিলাম। এ দিকে বাসেও প্রত্যেক মাল ওজন করিয়া লয় ও তাহার পৃথক্ ভাড়া লয়। কেবল মাথা পিছু আধ মণ বাদ দেয়। আমাদিগকে লইয়া ঘণ্টা দুই এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া আরও দুই চারি জন যাত্রী লইয়া একটার সময় বাস রাওলপিণ্ডি ছাড়িল।

চারি দিকের দৃশ্য বেশ ভালই। বারকাও. (১৩।০ মাইল) ছত্তর প্রভৃতি ছোট ছোট গ্রাম ছাড়াইয়া মোটর 'এট'এ আসিয়া এঞ্জিনে জল লইবার জন্য থামিল। কিছু দূর আসিয়াই চড়াই উঠিতে হয়। এই চড়াই অধিকাংশই সেকেণ্ড গিয়ার (2nd gear) দিয়া করিতে হয়, ফলে এঞ্জিন খুব গরম হয়, তাই মধ্যে মধ্যে জল পাল্টাইতে ও ভরিতে হয়। 'ছত্তরে' টোল আদায় করিল। আমাদের সহিত মায় টোল ভাড়া চুক্তি থাকায় বাসওয়ালারাই টোল দিল। প্রায় ২৬।২৭ মাইল আসিয়া বেশ শীত করিতে লাগিল। সে দিনটা একটু মেঘলাও ছিল। মোটর ক্রমশঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া চড়াই চড়িতে লাগিল।

প্রায় ৩৫। মাইল আসিয়া অল্পদূরে মারী (Meree), ৭০০০ ফুট উচ্চ, দেখিতে পাইলাম। আলমোড়া, নৈনিতাল, প্রভৃতি পর্ব্বত সহরের মতই দূর হইতে দেখিতে। 'মারীকে' বাঁয়ে রাখিয়া আমরা চলিলাম। কিছু দূর আসিয়া আমাদের বাসের ড্রাইভার বদল হইল। পথে আর একটি সাহেববহুল সাজান সহর চোখে পড়িল। ইহার নাম সানি ব্যাঙ্ক (Sunny Bank)। ক্রমাগত মোটরে ঝাঁকানি ও ঘুরপাক খাইয়া মারীর পর অনবরত উতরাই করিয়া বৈকালে কোহালা পৌঁছিলাম। শুনিয়াছিলাম, মারীর পর হইতে অনেকগুলি তুষারমণ্ডিত পাহাড় চোখে পড়ে, কিন্তু বাদলা থাকায় আমরা তাহার দর্শনসৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। কোহালা বৃটিশ রাজত্বের শেষ সীমা। এই পর্য্যন্ত দুইবার টোল আদায় করে। কোহালায় মালপত্র পরীক্ষা করিবে বলিয়া আমা-দিগকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। পরীক্ষার দেরী দেখিয়া ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাস এইখানেই আজ থাকিবে না যাইবে। সে বলিল, শীঘ্র পরীক্ষা হইলে আগে যাইব, নচেৎ এইখানেই আজ রাত্রিবাস করিতে হইবে। রাত্রিবাসের জোগাড় করিয়া রাখিবার জন্য একটা বাসা ঠিক করিয়া আসিলাম। একটি নূতন কাঠের বাড়ী তৈয়ারী হইতে-ছিল, মিস্ত্রীরা কাঠ চিরিতেছিল, তাহাদের কাছেই যায়গা ভিক্ষা

করিলাম। তাহারা ঐ বাড়ীতে রাত্রিবাস করিতে দিতে রাজী হইল। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই ড্রাইভার কহিল যে, আজ আরও কিছুদূর সে যাইবে। কারণ, তাহার গাড়ী পরীক্ষা করিতে বেশী সময় লাগিবে না। কোহালা 'পিণ্ডি' হইতে ৬৪ মাইল এবং ১৮৮০ ফুট উচ্চ। ৭০০০ ফুট মারী হইতে ১৮৮০ ফুট কোহালা আগাগোড়া উতরাই।

পরীক্ষান্তে গাড়ী ছাড়িল। এইবার রাস্তা ক্রমশঃই সরু ও বেশী বাঁকপূর্ণ। এক একটি বাঁক বড় সাংঘাতিক। কোনটি ইংরাজী Vএর মত (যাহাকে hair pin bend বলে) কোনটি ইংরাজী Sএর মত। কোহালায় আমরা ঝেলাম নদী ঝোলাপুলে পার হইলাম। রাস্তায় কুলী সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে, কারণ, কখন্ যে পাহাড়ের ধস্ পড়িয়া রাস্তা বন্ধ করিবে, ঠিক নাই। এই ধস্গুলি বড় সাংঘাতিক ও অভদ্র, বলাকহা নাই, হঠাৎ হুড়-মুড় করিয়া ঘাড়ে পড়িয়া কাঁচা প্রাণটি খাইয়া বসিল। শুনিলাম, গতবারে এই ভাবে ধস্ পড়িয়া একটি যাত্রিপূর্ণ মোটর-বাসকে রাস্তা হইতে ছিটকাইয়া পাশের অতল খাদে তাহাদের সমাধি দিয়া দিয়াছে। শুধু ধস্ ছাড়াও এই সংকীর্ণ অথচ বাঁকপূর্ণ পথে যাত্রিবাহী বাসগুলি যে অসমসাহসিকতার সহিত যাওয়া আসা করে, তাহাতে যাত্রীদিগকে প্রাণের মায়া ড্রাইভারের হাতেই সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে হয়। যাহা হউক, আমাদের যাইবার সময় কেবল এক যায়গায় পাথর পড়িয়া রাস্তা বন্ধ হওয়া ছাড়া আর কিছু হয় নাই। অবশ্য পহেলগামে—ড্রাইভারের দোষে আমাদের বাস যে ভীষণভাবে রাস্তাচ্যুত হইয়াছিল, সে কথা যথাস্থানে বলিব।

ক্রমশঃ রাত্রি হইয়া গেল, সেই আঁকাবাঁকা পথে কেবল হেড লাইটের উপর নির্ভর করিয়া যাইতে সত্যই ভয় করিতে লাগিল। রাত্রি সওয়া ৯টার সময়—"দোমেল" নামে একটি যায়গায় আসিয়া সেদিনকার মত গাড়ী থামিল। সেই রাত্রিতে অপরিচিত যায়গায় যাত্রীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টাররা দিব্য নিজেদের ঠিকানায় চলিয়া গেল। আমি ভাড়ায় কোন ঘর পাওয়া যায় কি না, খোঁজ করিতে লাগিলাম। একটি দোকানী বলিল, "আপ তো হিন্দু হ্যায় ?" বলিলাম, হাঁ। সে কহিল, "তব্ গুরু-দোয়ারা মে চলা যাইয়ে না।" আমি তাহাকে গুরু-দোয়ারা দেখাইয়া দিবার অনুরোধ জানাইতে সে একটি লোক সঙ্গে দিল। সেই রাত্রিতে অপরিচিত বিদেশে এই গুরু-দোয়ারা (শিখদের ধর্ম্মমন্দির ও অতিথিশালা) আমাদের যে উপকারে লাগিয়াছিল, তাহা ভুলিব না। "দোমেলে" মিঠাই ও রুটীর দোকান আছে। আমরা কিছু মিষ্টি খাইয়া সেদিনকার মত যাত্রা থামাইলাম। দোমেলে মুসলমানই বেশী। এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। দোমেলে দই কিনিয়া তাহা চিনিপাতা কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া দোকানীর কাছে খুব বিদ্রূপ লাভ করিয়াছিলাম। দই যে চিনি দিয়া পাতা চলে, তাহা ইহাদের বুদ্ধিতে আসে না—আমি বুঝাইতে গিয়া "উল্টা বুঝিলি রাম" হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই বিছানাপত্র বাঁধিয়া গাড়ীতে মাল তুলিয়া দিলাম। উষার আলো একটি নূতন দৃশ্যের অবগুণ্ঠন মোচন করিল। রাত্রির অন্ধকারে কা'ল একটি নদীর গর্জ্জন-মাত্র শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিবার ভাগ্য হয় নাই। সকালে উঠিয়াই দেখিলাম, সম্মুখে একটি ঝোলা পুল (Suspension Bridge) আর তাহার একটু দূরেই ঝিলাম ও কিষণগঙ্গা মিলিয়াছে, তাই বোধ হয়, ইহার নাম "দোমেল" (দো—দুই, মেল—মিলন)। ঝেলামের অপর পার 'মজঃফরাবাদে' যাইবার জন্য এখানে একটি মানুষ চলিবার ঝোলা পুল আছে। দোমেলে জলের কল নাই এবং নদীর উদ্দাম ঘোলা জলও খাওয়া চলে না। এখানে 'চশমা' অর্থাৎ ঝরণার জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। রৌদ্র উঠিতেই বাস ছাড়িল, কিন্তু সামান্য কিছু দূর আসিয়াই আবার থামিল। ইহা "দোমেল কাষ্টমস্ হাউস"। এখানে প্রত্যেক গাড়ীর সকল মাল খোলাইয়া দেখে ও ওজন করিয়া টোল আদায় করে। প্রতি দলের প্রধানকে যাইয়া কাষ্টমস্ হাউসে তাহার বাড়ী কোথায়, কেন কাশ্মীর যাইবে, সঙ্গে বন্দুকাদি আছে কি না, ব্যবসার উপযুক্ত কোনও জিনিষ আছে কি না ইত্যাদি লিখাইয়া আসিতে হয়। প্রত্যেক মাল ওজন করে ও সন্দেহ হইলে খোলাইয়া দেখে যে, ব্যবসা করিবার মত কোনও জিনিষ আছে কি না। আফিসে "ডিউটী" অর্থাৎ কর আদায় করে। এখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরী হইল।

তার পর আবার গাড়ী ছাড়িল, বেলা প্রায় একটার সময় "উড়িতে" আসিয়া থামিল। এখানে সকলে দোকানে জলযোগ করিল। সাধুমা ও বুড়ীমার এ দিন উপবাসে গেল। জলযোগের পর আবার যাত্রা করিলাম। পথে মাহুরা নামে একটি স্থানে ইলেক্‌ট্রিকের কারখানা আছে—বিরাট জলস্রোতকে কাযে লাগাইয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। এইখান হইতেই কাশ্মীরের ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই হয়। পথে দুইটি ভগ্ন মন্দির দেখিলাম—বাস অপেক্ষা না করায় ইহা ভালভাবে দেখিতে পাই নাই। বহু পাহাড়-পর্ব্বত ঘুরিয়া অপরাহ্ণের দিকে "বারামুল্লায়" আসিলাম। এইখানেই পাহাড়গুলির শেষ—সমতল ভূমি আবার আরম্ভ হইয়াছে এবং রুদ্রমূর্ত্তি ঝেলাম শান্ত হইয়াছে। "বারামুল্লা" বেশ সুন্দর গ্রাম। কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের দীন ও লাবণ্যহীন পেট-মোটা চেহারাগুলি দেখিয়া ভূস্বর্গের অধিবাসীদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিল। এখানে মিনিট কয়েকের জন্য আমাদের বাস থামিল। এইখান হইতেই কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ভূস্বর্গের সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের অফুরন্ত সম্পদ্ ততই আমাদের চোখে বাড়িতে লাগিল। রাস্তার দুই ধারে থামের মত সরল, সমান্তর সবুজ সফেদা গাছ, তাহার পর দুই ধারে পরিষ্কার জলের ঝরণা, তার পর আবার সমতল সবুজ শস্যক্ষেত্র। সবুজ ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে স্বচ্ছ জলের কল্লোলগুলি রূপার পাতের মত চকচক্ করিতেছে ; তাহার উপর নীল আকাশের কোলে কোলে ধূম্রবর্ণের অস্পষ্ট পর্ব্বতমালা—মাঝে মাঝে সমতলের বুকে সরল সফেদা গাছগুলি সতর্ক প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া—কোথাও লাইনবন্দী, কোথাও সমকোণ হইয়া। দেখিয়াই মনে পড়ে :—

কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে—

সত্যই সে সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ বোধ করি অসম্ভব—ফটোতে ধরাও সম্ভব নহে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ৫১৯৩ ফুট পাহাড়ের উপর এই পৃথিবীর উদ্যানকে দেখিতে লাগিলাম। আর মনে পড়িতে লাগিল, ঠিক এমনই 'সুজলাং সুফলাং শস্য-শ্যামলাং বঙ্গভূমিকে।' অনেকের ধারণা 'বরাহ মূল হইতেই বরাহ-মুল্লার সৃষ্টি'। হিন্দুরা মনে করেন যে, বরাহ অবতাররূপে ভগবান্ এইখানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। বরাহমুল্লা জিলার এইটি প্রধান সহর। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস

শ্রীনগরের পথে

ইংরাজী স্কুল, কাঠের বড় বড় কারখানা ও দুতিন-তলা পাকা বাড়ী-সমূহ স্থানটির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই সহরটি খুব প্রাচীন। রাজা অবন্তীবর্ম্মার সময়কার, ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে সহরটি ভূমিকম্পে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুনিলাম, এখানে মোগল আমলের একটি সরাইখানা, শিখ আমলের একটি দুর্গ, বিতস্তার পূর্ব্বতীরে একটি পুরাতন নগর-তোরণ, একটি প্রাচীন শিবমন্দির প্রভৃতি ঐতিহাসিক অবশিষ্ট দেখিবার আছে। বরাহমুল্লা হইতে গুলমার্গ যাইবার একটি রাস্তা আছে, জলবাণিজ্যেও বরাহমুল্লা একটি বিশিষ্ট স্থান। কাশ্মীরে বাণিজ্য প্রধানতঃ জলযানেই চলে। কিছু দূর আসিয়া আবার বাস থামিল। ড্রাইভার রাস্তার ধারে একটি প্রকাণ্ড গাছ দেখাইয়া বলিল, "এইখানে একটু বিশ্রাম কর।" গাছটি সম্পূর্ণ অপরিচিত, নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, 'চেনার।' এই চেনার গাছ না কি কাশ্মীরের নিজস্ব। আমাদের বট গাছের মতই ছায়ার শীতলতার জন্য ইহার প্রসিদ্ধি। কিছুক্ষণ শুইয়া, দাঁড়াইয়া, কোমর ছাড়াইয়া লইয়া আবার বাসে চড়িয়া বসিলাম। কিছু দূর আসিয়া আবার একটি টোল অফিসে বাসওয়ালাদিগকে দোমেলার ছাড়পত্র দেখাইতে হইল। কিছুক্ষণ পর প্রায় সন্ধ্যার সময় একটি সহর গোছের যায়গায় আসিলাম। প্রথমে এইটিকেই শ্রীনগর ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু পরে শুনিলাম, ইহা একটি সহরতলী, কয়েক জন ব্যবসায়ী যাত্রী এইখানেই নামিয়া গেল। ঠিক সন্ধ্যায় বাস শ্রীনগর পৌছিল। বাস যখন নিজেদের আড্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বিরাট খাতাপত্র সহ পাণ্ডার দল এবং নৌকার ফটো ও সার্টিফিকেট সহ হাউস বোটের মাঝির দল আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। আমাদের পাণ্ডা থাকায় (নারায়ণ মঠের পাণ্ডা) ও উপস্থিত হাউস বোটে থাকিব না বলিয়া বহু কষ্টে উহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। পূর্ব্বকথামত আমাদিগকে বাস নারায়ণ মঠে পৌছিয়া দিল। নারায়ণ মঠে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীরা থাকেন। স্বামী শঙ্করনাথ ও বিশ্বনাথ নামে দুই জন স্বামীজীর সহিত আমরা যখন—'কৈলাস মানস' যাই, তখন পরিচিত হইয়াছিলাম—তাঁহারা এ সময় নারায়ণ মঠেই ছিলেন। পূর্ব্বে পত্র দ্বারা আমাদের জন্য একটু বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ইহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহারা এই মঠেরই অধীনে একটি বাগানে আমাদের বাসের জন্য একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। আমাদের চারি জনের ও মালপত্রের পক্ষে ঘরটি ছোটই হইয়াছিল, তবু বিদেশে এই অসময়ে এইটুকু আশ্রয়ের জন্যই আমরা উক্ত স্বামীজীদের ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট অশেষ ঋণী। নারায়ণ মঠের ঠিকানা পূর্ব্বেই আত্মীয়স্বজনকে জানান ছিল।

পরদিন সকালবেলা ঐ ঠিকানায় যে সমস্ত চিঠিপত্র জমিয়াছিল, তাহার উত্তর ও পৌছান সংবাদ দিতেই কাটিয়া গেল। বেলা দুইটার সময় কথামত বিশ্বনাথজী ও শঙ্করনাথজী আমাদিগকে এদিকের বিখ্যাত উদ্যান—শালিমারবাগ ও নিশাৎবাগ দেখাইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। ঐ বাগান দুইটি স্থলপথে টঙ্গা বা ট্যাক্সীতে যাওয়া চলে এবং জলপথে শীকারাতে যাওয়া চলে। জলপথে যাওয়াই বেশী আরামপ্রদ ও উপভোগ্য বলিয়া আমরা একটি শীকারা ভাড়া করিলাম। বলিয়া রাখা ভাল, এদিক্‌কার শীকারা অর্থাৎ নৌকার মাঝিরা অত্যন্ত ব্যবসাদার। যে যায়গা তাহারা ১৲ এক টাকায় যাইবে, বিদেশীর কাছে সেখানে যাওয়ার পারিশ্রমিক ৫৲ পাঁচ টাকা বলিবে। বিদেশী সাধারণতঃই ৩।৪৲ টাকা বলিয়া থাকে। কাশ্মীরে প্রথম প্রথম বাজার-হাট করিতে বা বেড়াইতে গেলে এক জন তদ্দেশীয় বিশ্বাসী পরিচিত লোক সঙ্গে লইতে পারিলে অনেক অনর্থক ব্যয় বাঁচিয়া যায়। ছয় টাকা হইতে স্বামীজীরা বহু কষ্টে দুই টাকা বারো আনায় একটি শীকারা ঠিক করিলেন। রবিবার ছিল বলিয়া আজ ২৸০ আনায় হইল, অন্যদিন ১৷০ টাকাতেই যায়, স্বামীজীরা এইরূপ বলিলেন।

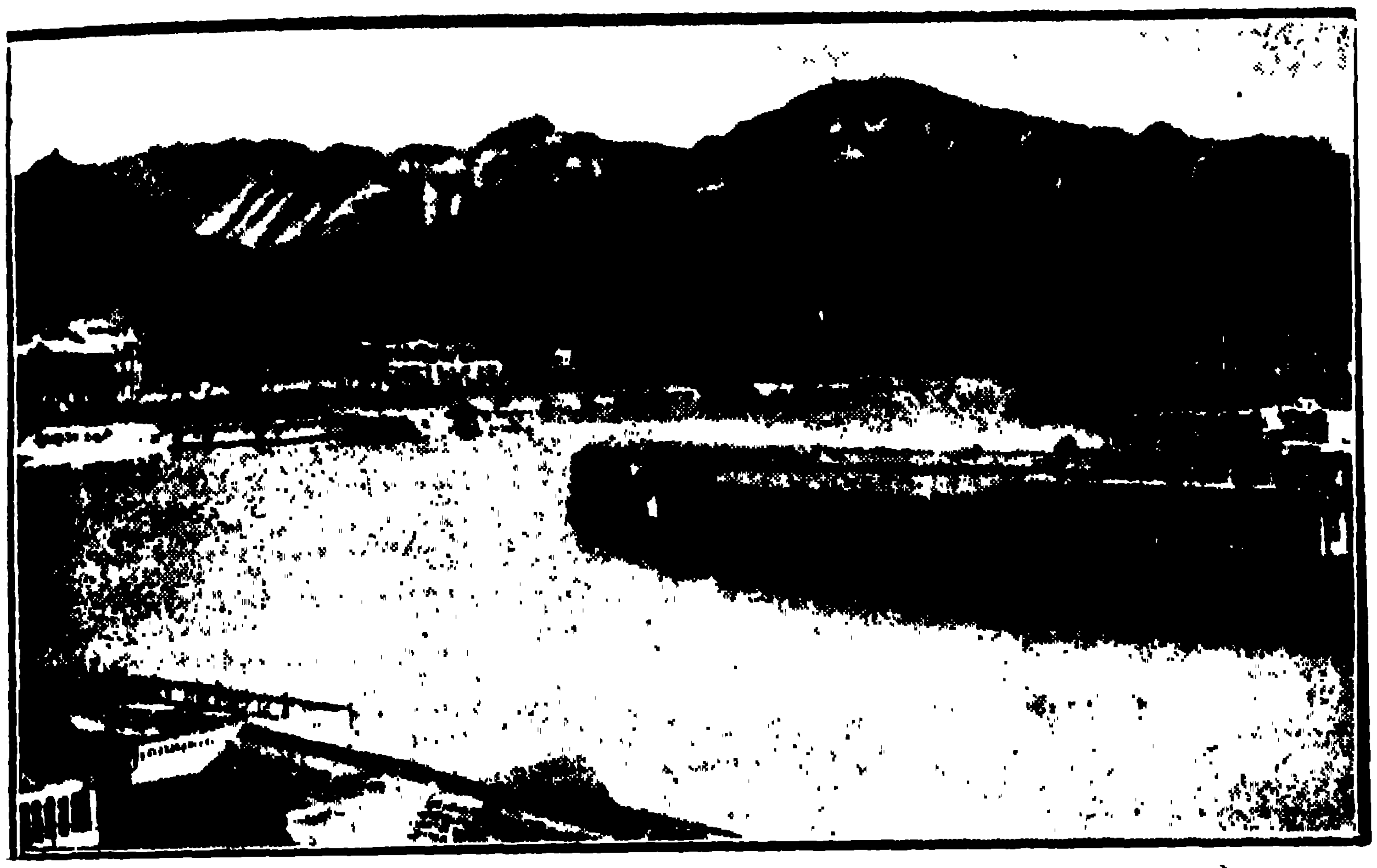

শ্রীনগরের কাছে 'ঝিলাম' নদী (নদীবক্ষে হাউসবোট)

রবিবারে বাগানের সব ফোয়ারা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং সাধারণতঃ লোক সেই দিনই বাগান দেখিতে যায়। তা ছাড়া সে দিন 'ডাল দরওয়াজা' (Dull gate) বন্ধ থাকায় ঐ মাঝিকে আবার দরওয়াজার ওপার হইতে অন্য লোকের নৌকা করিয়া দিতে হইবে বলিয়া মাঝি বেশী লইয়াছিল। প্রায় ২॥০টার সময় শীকারা ছাড়িল। এই শীকারাগুলি বড় চমৎকার ও আরামপ্রদ। এই নৌকাগুলি কতকটা পান্‌সীর মত লম্বা গোছের; তলাকার কাঠ আমাদের দেশের নৌকার মত গোল নহে—সমান অর্থাৎ নীচেকার অংশ চেপ্টা (Flat) ইহার কিনারা জল হইতে বড় জোর আধ হাত উপরে থাকে—কাশ্মীরের নদী এবং খালগুলির জল খুবই শান্তপ্রকৃতির বলিয়া এগুলি চলা সম্ভব—সামান্য একটু ঝড় বা একটু বেশী স্রোত হইলেই শীকারার মাঝিরা ব্যস্ত হইয়া উঠে। শীতকালে কাশ্মীরের জলপথগুলি বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেই সময় শ্লেজ (Sledge) গাড়ীর মত এইগুলি বরফের উপর পিছলাইয়া পিছলাইয়া চলে, তলা গোল হইলে তাহা চলা সম্ভবপর হইবে না বলিয়াই এ গুলির গঠনকৌশল এমনি। শীকারার দেখিবার জিনিষ—ইহার সজ্জা। এক একটি শীকারা যেন কোন ধনীর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছোট্ট সাজান ড্রয়িং-রুম। শীকারার উপরের ছাউনি হইতে চারিধারে ছোট ছোট কাশ্মীরী কাযকরা পর্দ্দা; নীচেও পরিষ্কার কাশ্মীরী কায-করা গদি ও বালিস বিছান—যেন বরাসন পাতা। প্রত্যেক মাঝিই নিজের নিজের শীকারাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার ও ঝক্‌ঝকে রাখিতে চেষ্টা করে। কারণ, তাহাদের অন্নদাতা ঐ শীকারাই।

ঝিলাম নদী হইতে শীকারা একটি খালে পড়িল। ঠিক ইহার সম্মুখে রাজপ্রাসাদ। এই খালের তীরে তীরে বহু হাউস-বোট বা জলঘর বাঁধা আছে। এগুলিও কাশ্মীরের নিজস্ব বিশেষত্ব। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকা—তাহাতে সাধারণতঃ তিনটি হইতে ছয়টি ঘর, দুই তিনটি বাথরুম, ছাদে বসিবার জন্য চেয়ার পাতা। কোনটির আবার ছাদের উপর হোগ্‌লা বা কাপড়ের ছাউনী দিয়া ঘেরা, কোনটির উপরে ছাউনী ও রেলিং; টব হইতে লতান ফুলগাছ উঠিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বেশ একটি বাগান রচনা করিয়াছে। প্রত্যেকটি হাউস-বোটেরই এক একটি নাম ও নম্বর আছে। ডাক-পিয়ন নৌকায় নৌকায় ডাক বিলি করিয়া যায়। হাউস-বোটের কোনটিতে সাহেব-মেম চা খাইতে বসিয়াছে, কোনটিতে বাইজীর গানের আসর বসিয়াছে; কোনটির পাশে ফেরীওয়ালা নিজের শীকারা লাগাইয়া জিনিষ কিনিবার জন্য মালিককে সাধাসাধি করিতেছে। হাউস-বোটগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল ও সাজান সমস্ত সাহেবী কায়দায়। ঘরগুলির নামও ড্রয়িং-রুম, ডাইনিং রুম (Dining Room), বেড রুম (Bed Room), বাথ রুম (Bath Room) ইত্যাদি। হাউস-বোটে কমোডের (Comode) ব্যবস্থা আছে ও বাথ-টবে স্নান করিতে হয়। এই সব হইতে মনে হয় এবং শুনিলামও যে, এগুলি পাশ্চাত্য-দেরই খেয়ালে জন্মলাভ করিয়াছে। কাশ্মীরীদের সৌন্দর্য্য-পিপাসা বা বিলাসিতা যে এই হাউস-বোটগুলির জন্মদাতা নহে,

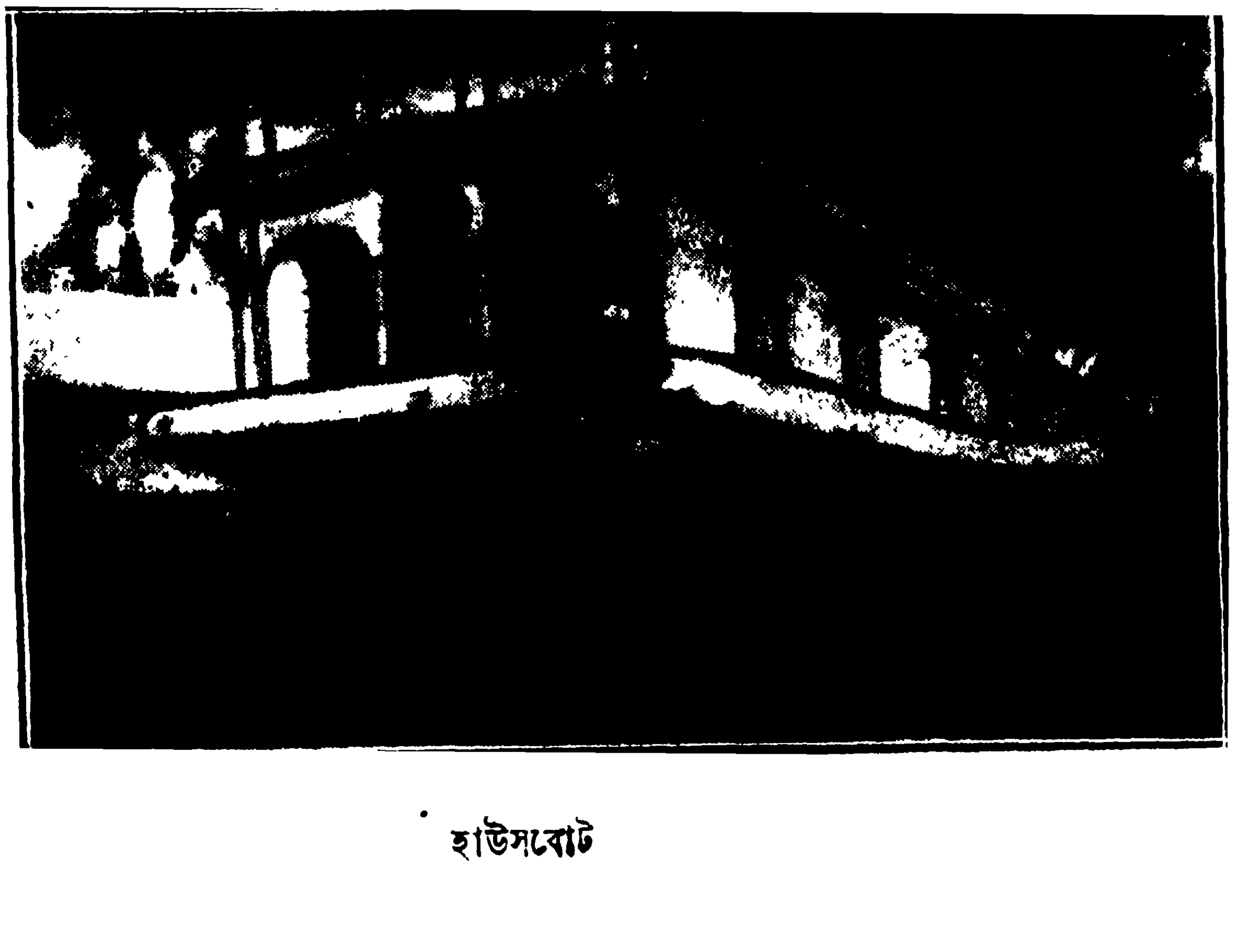

হাউসবোট

তাহার আর একটি প্রমাণ—ইহার কোনও কাশ্মীরী নাম নাই। ইহা ছাড়া এই বোটগুলির আনুষঙ্গিক বোটগুলিরও ইংরাজী নাম। যেটিতে রান্না হয়, তাহার নাম কিচেন বোট। কিচেন বোটেও সাহেবী বাসনপত্র রাখিবার যায়গা ও সাহেবী কায়দায় রান্না করিবার ব্যবস্থা আছে। ক্রমশঃ আমাদের নৌকা বিখ্যাত "চেনার বাগের" কাছে আসিল। ইহা আর কিছুই নহে, জলের ধারে কতকগুলি প্রকাণ্ড চেনার গাছের বাগান। এই বাগানটির শীতলতা ও সহর হইতে দূর বলিয়া নির্জ্জনতার জন্য সাহেবদের কাছে খুব প্রিয়; তাই ইহার এত নাম। কিন্তু ইহা খুব স্বাস্থ্যকর নহে। ধীরে ধীরে আমরা 'ডালগেটে' আসিলাম। ডালগেট বন্ধ থাকায় শীকারা আর যাইতে পারিল না। অগত্যা শীকারাওয়ালা আমাদিগকে সেইখানে নামাইয়া গেটের অপর দিকে আর একটি শীকারায়

ডাল হ্রদে যাইবার জল-প্রণালীর তীরের একটি দৃশ্য

চড়াইয়া দিল। আমাদের দুই জন মাঝির এক জন নিজের শীকারায় আমাদের অপেক্ষায় রহিল আর এক জন আমাদের সঙ্গে চলিল। এই ডাল গেট হইতেই ডাল হ্রদ আরম্ভ। কাশ্মীরে জলপ্রণালী অসংখ্য এবং ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই পরস্পরের সহিত যুক্ত। এই প্রণালীগুলির জল কম-বেশী করিবার জন্য কতকগুলি গেট বা ফটক আছে। রাজ-সরকার হইতে ফটকগুলি খুলিয়া বা বন্ধ করিয়া প্রণালী ও নদীর জল কমান ও বাড়ান হয়। এই গেটগুলির মধ্যে ডাল গেট উল্লেখযোগ্য। ডাল হ্রদ ও ঝেলাম নদীর জলরাশির সংযোজন বা বিয়োজন এইটি দ্বারাই করা হয়। ৺মহারাজা গোলাবসিং ইহা প্রস্তুত করান।

শীকারা ক্রমশঃ সহর ছাড়াইয়া হ্রদে পড়িল। সাধারণ হ্রদ হইতে ডাল হ্রদটির একটু বৈচিত্র্য আছে। জলে জলে চলিয়াছি—চারি দিকেই জল, আবার মাঝে মাঝে সামান্য একটু যায়গা জল হইতে উঠিয়া আছে। সেখানে একটি ছোট-খাট গ্রাম। নৌকা হইতে সিঁড়ি বাহিয়া ঘরে উঠিতে হয়। আবার কোথাও জলের মাঝে 'উইলো' গাছ জল হইতে দাঁড়াইয়া বিদেশী অতিথিকে ঘাড় নাড়িয়া দুলিয়া দুলিয়া অভিনন্দন জানাইতেছে। কোথাও চারিদিকে স্থলের কোন চিহ্ন নাই, স্বচ্ছ জলের উপর নৌকার ছায়াটি কেবল কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে আর সেই স্বচ্ছ জলের নীচে শেওলার মত একরকম জল-উদ্ভিদ মিটমিট করিয়া তাকাইয়া আছে। (এই শেওলাগুলি অনেক ক্ষেত্রে "ডালের" সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে) সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ও নূতন জিনিষ ডালের উপর ভাসা বাগান। চারিদিকে জল, নীচেও জল, অথচ জলের উপর তরকারীর বাগান—শসা, লাউ, বেগুন অজস্র ফলিয়া আছে! নৌকা হইতেই এই বাগানগুলির চাষ, বীজবপন ও শস্য সংগ্রহ করা হয়, আবার ইচ্ছামত বাগানের মালিক নৌকা হইতে ইহাকে ঠেলিয়া বা টানিয়া নিজের ইচ্ছামত যায়গায় লইয়া যাইতে পারে। হ্রদের মাঝে যে আগাছা জন্মায়, স্থানে স্থানে তাহা এত ঘন হয় যে, তাহার উপর মাটী ফেলিয়া দিলেই বেশ বাগান হয়। এই আগাছাগুলির শিকড় মাটীতে পোতা থাকে না, কাযেই ইহাকে ইচ্ছামত সরান চলে। বাগান তৈয়ারী করিবার জন্য মাটী ফেলা হইতেছে, এইরূপ যায়গাও চোখে পড়িল। এক জন চাষা তাহার ক্ষেত হইতে ফল সংগ্রহ করিয়া নৌকায় যাইতেছিল, আমরা তাহার কাছ হইতে কয়েকটি কিনিয়া বৈকালিক জলযোগ সারিলাম।

এখানে একটি নূতন জিনিষ দেখিলাম;—মেয়েদের কর্ম্মক্ষমতা ও পর্দ্দাহীনতা। মেয়েরাই নৌকা বাহিতেছে, জিনিষ বেচিতেছে, রাস্তায় ঘাটে বেড়াইতেছে। প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল, কাশ্মীরে ইহাই বুঝি প্রথা। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম যে, দরিদ্র ও মুসলমান রমণীরাই অধিকাংশ পেটের দায়ে এইরূপ করিতে বাধ্য হয়; ধনী ও হিন্দু রমণীরা পর্দ্দানশীন। এমন কি, কাশ্মীরে কোনও হিন্দু রমণীর ফটো কোনও দোকানদার সাধারণকে বেচিতে পায় না। শ্রীনগরে সাধারণ দরিদ্র রমণীদিগকে দেখিয়াই বিশ্ববিশ্রুত কাশ্মীর-সুন্দরীর খ্যাতি যে অমূলক নহে, তাহা বুঝিলাম, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ একবারে মিটিল, সালেমায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই। একখানি নৌকায় একটি ব্রাহ্মণ-পরিবার ছিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া মনে হইল, সাক্ষাৎ দুর্গা বা লক্ষ্মী স্বর্গ ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়াছেন। পাহাড়ী দেশে সাধারণতঃই নাক চেপ্টা হয়, দার্জিলিং, নেপাল, তিব্বত সর্ব্বত্রই এই দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। এমন চমৎকার নাক সাধারণতঃ দেখা যায় না। মুখের ডৌলও চমৎকার, আর রংএর তুলনা বোধ হয় নাই। চেহারা হইতেই ব্রাহ্মণ মুসলমান অনেকটা চেনা যায়। ব্রাহ্মণ-রমণীরা মুসলমান-রমণীদের মতই গলা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা গরম

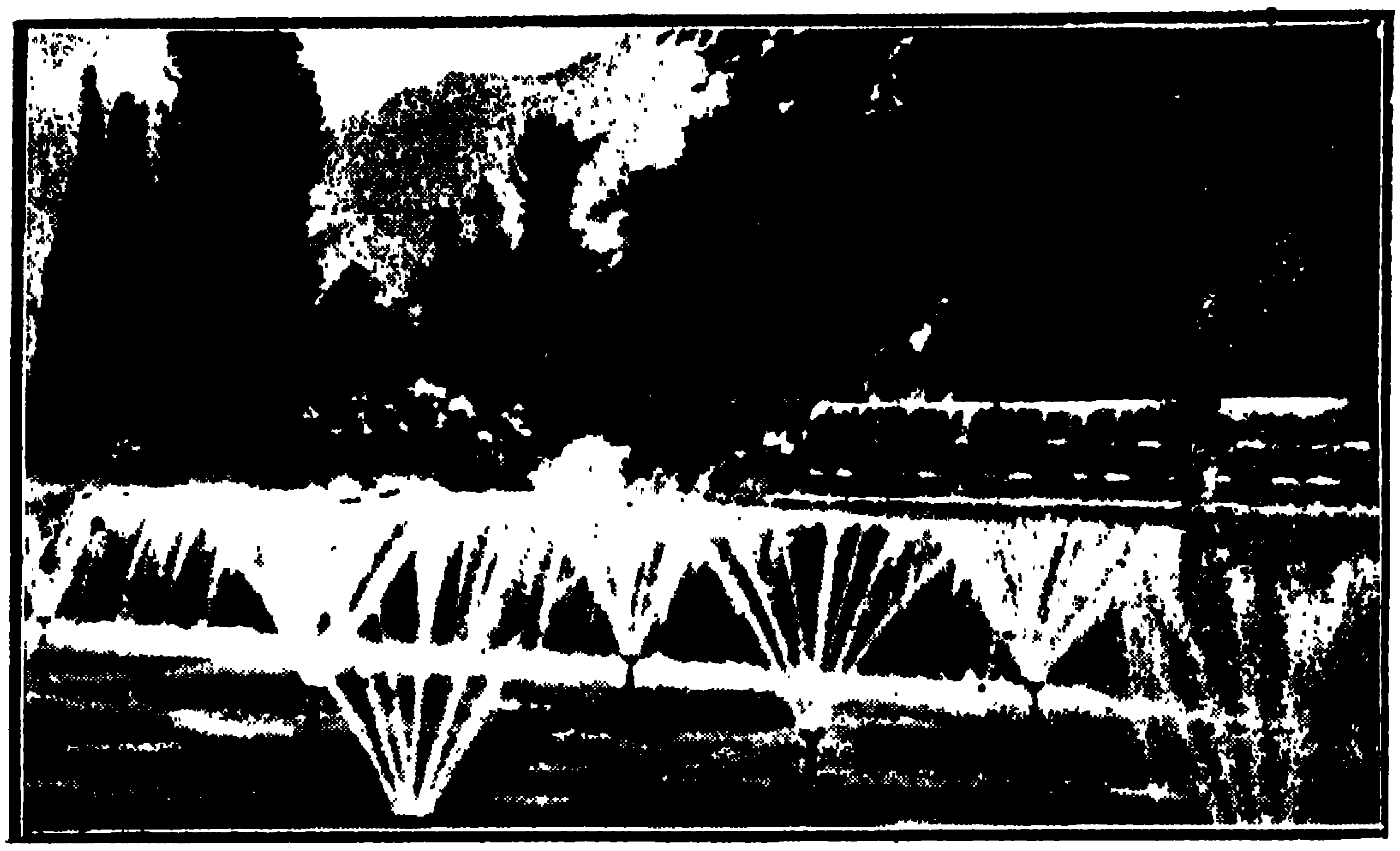

সালিমারবাগ উদ্যানের কিয়দংশ

আলখাল্লা পরেন, তবু মাথার ওড়না, কোমরবন্ধ প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য বোঝা যায়। প্রথমটা অবশ্য একরকমই মনে হয়, কিন্তু কিছু দিন থাকিলেই প্রভেদ বেশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে মুসলমান-রমণীরাও সীমন্তে সিন্দুর দেয়।

কিছু দূর আসিয়া একটি দ্বীপ চোখে পড়িল, ইহার নাম "সোনা-লঙ্কা," কাছেই কোথায় রূপালঙ্কাও আছে শুনিলাম। সোনা-লঙ্কাকে দক্ষিণে রাখিয়া চলিলাম—কিছুক্ষণ হ্রদের নিথর স্বচ্ছ জল লইয়া খেলা করিতে করিতে আগাইয়া চলিবার পর একটি বাঁধান সেতুর নীচে দিয়া আমাদের নৌকা পার হইল। সম্ভবতঃ ইহা মোগল আমলে রাস্তা ছিল, কালের কোপে রাস্তা ক্রমশঃ ডালের জলের গর্ভে গিয়াছে, সেতুটুকু আজও অতীত স্মৃতি আঁকড়াইয়া সাক্ষীর মত দাঁড়াইয়া আছে। মাঝির কাছ হইতে দাঁড় লইয়া দাঁড় টানিতে চেষ্টা করিলাম। কিছুক্ষণ টানিবার পরই অনভ্যস্ত হাত জ্বালা করিয়া নোটিশ দিল, "অব্যাপারেষু ব্যাপারম্" অনুচিত, কাযেই ছাড়িয়া দিলাম।

আন্দাজ বেলা ৬টার সময় আমাদের শীকারা সালেমার বাগে পৌঁছিল। নৌকা হইতে নামিয়া দেখিলাম, বাগ অর্থাৎ বাগানটির সম্মুখে অনেক মোটর প্রভৃতি দাঁড়াইয়া। পূর্ব্বে এই বাগানগুলি কেবল জলপথেই আসা যাইত এবং তখন বর্ত্তমান বাগানের সম্মুখে রাস্তাটিও বাগানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি প্রকাণ্ড জলস্রোত বেশ শব্দ করিয়া বাগানের মধ্য হইতে বাহির হইয়া ডাল হ্রদের জলে মিশিতেছে। বাগানে প্রবেশ করিয়া আমরা আনন্দে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এই শোক-দুঃখময় পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য্য, এত উপভোগ্য স্থানও কি সম্ভব? মর্ত্ত্যবাসী আমরা, আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের কল্পনা—স্বর্গের, এই বাগানগুলি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এগুলি পৃথিবীর জিনিষ নহে। স্বর্গোদ্যান সালেমার বাগে তিনটি ধাপ বা পর পর পাহাড়ের গা কাটিয়া তিনটি সমতল ক্ষেত্র তৈয়ারী করা আছে। ইহা সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৯ খৃঃ অব্দে তৈয়ারী করান। সম্মুখে শান্ত স্বচ্ছ সলিলরাশি, পশ্চাতে প্রকাণ্ড কালো পাহাড়; আর এই নীল-কালোর কোলে এই স্বর্গোদ্যান—বিভিন্ন বিচিত্র রংএর মেলা। বাগানের মাঝ দিয়া একটি জলস্রোত নৃত্যচপল গতিভঙ্গে চলিয়াছে আর মাঝে মাঝে মানুষের বুদ্ধি-প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি পাতাইয়া এই জলস্রোতকে ফোয়ারার আকার দিয়াছে। দুই ধারে ছোট বড় নানা রংএর ফুলের মজলিস—যেন এক একখানা বহু মূল্যবান্ কার্পেট বিছানো। আবার একবারে শেষের দিকে বড় বড় আপেলের গাছ—গাছে লাল, হরিদ্রাবর্ণের আপেল ধরিয়াছে—উপরে নীচে রংএর ছড়াছড়ি। সে দৃশ্য নিপুণ শিল্পীর তুলিকাও ফুটাইয়া তুলিতে পারে কি না সন্দেহ। একে একে তিনটি চত্বরই দেখিয়া আমরা আবার নৌকায় উঠিলাম—নিষাদ-বাগ দেখিব বলিয়া। আবার শীকারা চলিল—পাহাড়ের প্রায় কাছ দিয়া। স্বচ্ছ জলে পাহাড়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়া আর একটি নূতন দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। উপরেও পাহাড় আকাশ, জলের নীচেও তাই। এই সব দৃশ্য লিখিয়া বুঝান শক্ত। নৌকার ধারে

নিষাদবাগের কিয়দংশ

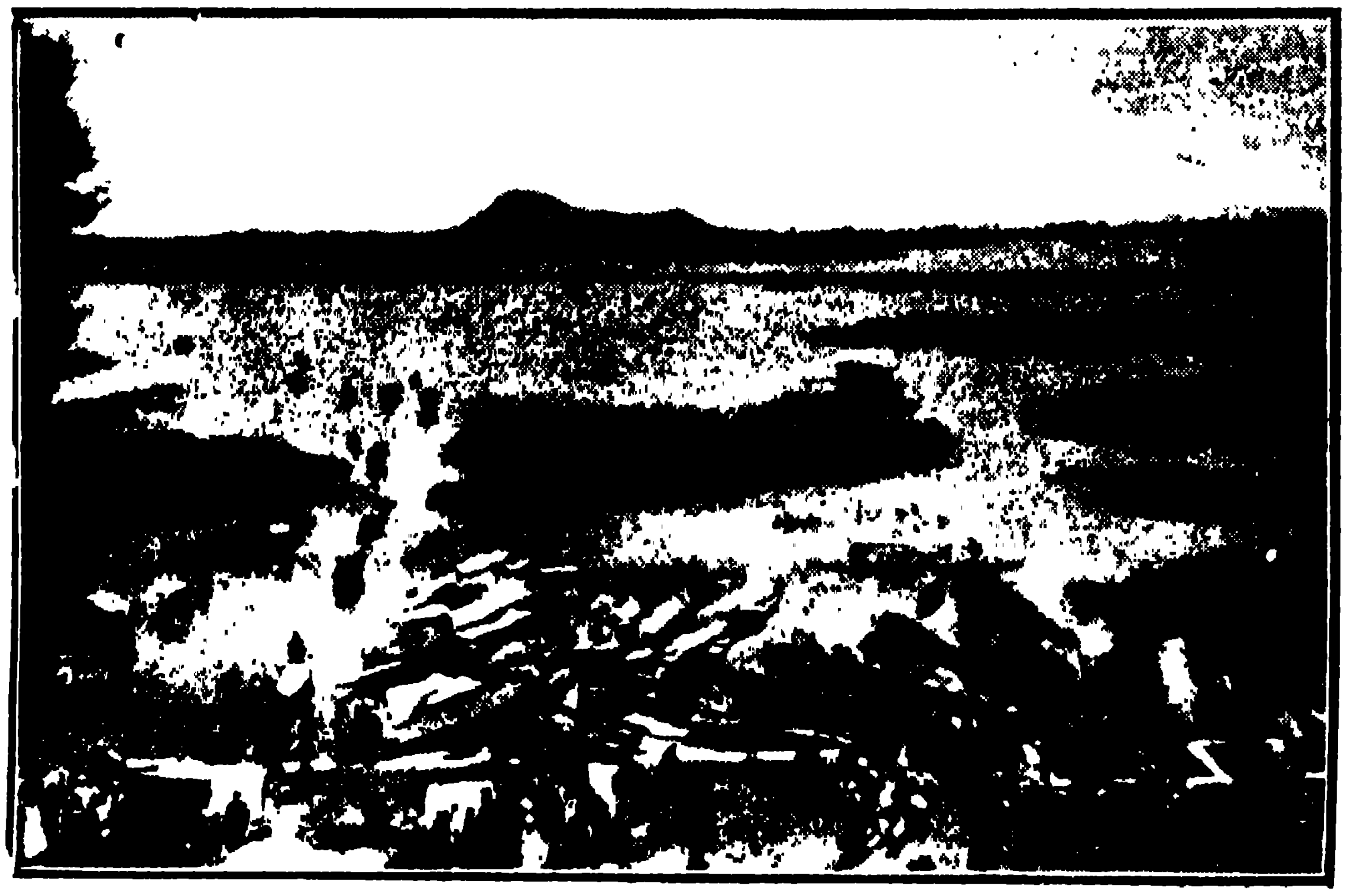

নিষাদবাগ হইতে ডাল হ্রদ (তীরে শীকারা-সমূহ বাঁধা রহিয়াছে)

রাজ-উদ্যানরূপে ব্যবহৃত হইত, (ইহার একটি চত্বরে রাজ-সভাসদ্, অপরটিতে সম্রাট ও তৃতীয়টিতে রাণীরা আনন্দ উপভোগ করিতেন) তবু এই বাগানটির সৌন্দর্য্যের কাছে সালেমার বাগকেও লজ্জায় ম্লান হইতে হয়। ইহার পর পর সাতটি চত্বর ও ইহার গাছ বসাইবার কায়দা এবং ফোয়ারাগুলির অপূর্ব্ব সমাবেশ বাগানটির সৌন্দর্য্যকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। শেষ চত্বরে (ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু চত্বর) দাঁড়াইয়া সমস্ত বাগটি দেখিলে আনন্দে ভাব উপযুক্ত ভাষা না পাইয়া মূক হইয়া যায়। পশ্চাতে ছায়া-শীতল বিরাট কৃষ্ণকায় পর্ব্বত-প্রহরী, সম্মুখে অসংখ্য অবর্ণনীয় প্রকৃতি দেবীর খেয়াল-খুশীতে ভরা

ধারে অনেক পদ্মপাতা। আমরা কতকগুলি নৌকা হইতেই ছিঁড়িয়া লইলাম—পরে এগুলি কায দিয়াছিল। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ডাল হ্রদের অধিকাংশ স্থানই পদ্মে ঢাকিয়া যায়। উলারের পদ্মমধু বিখ্যাত। যথাসময়ে নৌকা আসিয়া 'নিসাদবাগে' পৌঁছিল। এখানেও সম্মুখে জলধারা এবং সম্ভবতঃ ইহার বর্ত্তমান রাস্তাও পূর্ব্বে উদ্যানের অন্তর্গত ছিল। এই বাগানটি জাহাঙ্গীরের প্রধান মন্ত্রী ও শ্বশুর আসফ খাঁন তৈয়ারী করান—নিসাদ নামীয় কোনও এক ভৃত্যের নামে। যদিও সালেমার বাগ বেগমের নামানুসারে তৈয়ারী এবং ইহা

অজস্র ছোট বড় ফুলের ক্ষেত্র পারম্পর্য্য রাখিয়া সাজান। মাঝ দিয়া কলকল ছলছল করিয়া অবিরাম স্বচ্ছ জলধারা এক চত্বর হইতে আর এক চত্বরে লাফাইয়া লাফাইয়া করতালি দিয়া অশান্ত বালকের মত ছুটিয়াছে—মাঝে মাঝে ফোয়ারার ভিতর দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া আবার নিজের দলেই মিশিতেছে। তাহার পর নিথর নীল ডালের জল। ভাষায় এই বাগগুলির বর্ণনা করিতে যাওয়া ব্যর্থ প্রয়াস হইবে। কারণ, এ সব অন্তরের অনুভূতির জিনিষ, ভাষায় ইহার ঠিক স্বরূপ দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। [ক্রমশঃ।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সনেট

স-সীমের মাঝে তুমি কে তন্বী সুন্দরী
অসীমের বাণী ল'য়ে অঞ্চল মেলিয়া
ব'সে আছ উদাসিনী—আঁখিপাতে পরি'
রহস্য-কাজল,—মুখে মায়া-হাসি নিয়া ?

মুগ্ধ পথিকের দল,—অন্তর চঞ্চল,
বিহ্বল নয়ন হ'তে মর্ম্মস্থল-বাণী
নীরবে উঠিল ফুটে,—যেন তারাদল
দিবসের কথা কহে,—শোনে সন্ধ্যা-রাণী !

স্বয়ম্বরা তুমি যেন কল্পনা-দুলালী,
ঘিরেছে চৌদিকে তব লক্ষ শত জন
লভিতে বিজয়-লক্ষ্মী। চিত্তে বাজে খালি
তোমার চরণ-ধ্বনি,—মত্ত মুগ্ধ মন।

শাশ্বত কালের তরে আছ তুমি বসি'
লহ মোর নমস্কার,—বিশ্বের প্রেয়সী।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

১২

হিমাদ্রি পরম স্নেহভরে পুষ্পিতার পৃষ্ঠে কিছুক্ষণের জন্য হাত রাখিল। তার পর বলিল, "তুমি এর জন্য এত বিচলিত হবে, এ আশা করি নি। তোমার হাতে পিস্তল ছিল কিসের জন্য? যে লোক বন্ধুর স্ত্রীকে নির্জ্জনে পেয়ে তাকে অপমান করতে সাহস করে, তার পা দু'খানিকে পিস্তলের গুলীতে অচল ক'রে দিলেই ত এর উপযুক্ত প্রতিফল হ'ত।"

তার পর দুয়ার হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "যান—আর কখনও এমুখো হবেন না।"

নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সুন্দর সুপুরুষ সে—মিষ্ট ও সরস করিয়া কথা কহিতে জানে। নির্জ্জনে যৌবনোচ্ছ্বসিত বন্ধুজায়াকে বন্ধুর অসাক্ষাতে মিষ্ট প্রেমের বাণী শুনাইতে গিয়া সে এত বিপদে পড়িবে, তাহা সে ভাবে নাই। পুষ্পিতা যদি তাহাকে মিষ্ট কথায় প্রত্যাখ্যান করিত, যদি বলিত—কি করিবে, সে যে অপরেরই; এ জন্মে আর উপায় নাই। তুমি যাও, আর এ কথা মুখে আনিও না। যাহা থাক্ মনে থাক্, বাহিরে প্রকাশ করিয়া আর তাহাকে ম্লান করিও না, তাহা হইলে সে নীরবে চলিয়া যাইত। হয় ত বা দুই এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিতে পারিত। নিত্য এই কথা মনে করিয়া দুঃখের সঙ্গে একটু আনন্দও হয় ত পাইত। নিত্য পুষ্পিতাকে দেখিতে পাইত—কাব্য করিবারও কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। কিন্তু এ কি হইল?

হিমাদ্রির মুখের দৃঢ় অথচ অনুচ্চ ও তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনাবাক্য শুনিয়া ও তাঁহার প্রসারিত হস্তের কঠিন ইঙ্গিত দেখিয়া নরেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। সে কোন দিকে না চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

হিমাদ্রি দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া দুই হাত দিয়া বেড়িয়া পুষ্পিতাকে বুকের উপর উঠাইয়া লইয়া শয্যায় আনিয়া শোয়াইয়া দিল ও নিজে শিয়রের কাছে বসিয়া নীরবে তাহার ললাটে কেশে হাত বুলাইতে লাগিল। পুষ্পিতার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। তার পর পাশ ফিরিয়া একখানি হাত হিমাদ্রির কোলের উপর রাখিয়া অপরখানি তাহার কটিদেশ বেড়িয়া দিয়া জড়াইয়া রহিল। মাঝে মাঝে শরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। পুষ্পিতার মনে যে অকস্মাৎ ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা বুঝিতে হিমাদ্রির আর বাকী রহিল না। সে এক হাত তাহার ললাটে ও অপর হাত পৃষ্ঠে রাখিয়া দেহখানি স্নেহভরে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া প্রশান্ত-মুখে বসিয়া রহিল। ক্লান্তমন ক্লান্তদেহ পুষ্পিতা ধীরে ধীরে হিমাদ্রির কোলের কাছে ঘুমাইয়া পড়িল। হিমাদ্রি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবে পুষ্পিতাকে মৃদু আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বসিয়া রহিল।

একটা কথা তাহার বেশী করিয়া মনে হইতে লাগিল। পুরুষেরই লালসার হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই বোধ হয় নারীকে পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কঠোর পরিশ্রম, কঠিন দুঃখ সব সহিবার জন্য সে প্রস্তুত; কিন্তু শেষে নির্ভর করিবার জন্য এক জনকে তাহার চাই। না হইলে তাহার যেন অন্তরের তৃপ্তি নাই। পুষ্পিতাকে সবলা আত্মনির্ভরশীলা করিবার জন্য চেষ্টা ত কম হয় নাই; তাহাতে হিমাদ্রি যে সফলও হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু তবু আজ সে কেন এত কাতর হইয়া পড়িয়াছে? আপনাকে বাঁচাইয়া ও শেষে সে স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া এত কান্না কেন কাঁদিল? তাহার মনে রাগের পরিবর্ত্তে দুঃখ কেন আসিল? পুষ্পিতা ব্যায়াম শিখিয়াছে, পিস্তল ছুড়িতে জানে, কেহ আক্রমণ করিলে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার শিক্ষাও সে অবগত; কিন্তু কৈ, আপনার শক্তিতে আত্মরক্ষা করিয়াও সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিল না কেন?

স্বামী বর্ত্তমানে নারীর যদি এই অবস্থা ও এই মনোভাব হয়, বিধবার অবস্থা তাহা হইলে যে আরও কত অসহায় হয়। এই জন্যই বোধ হয়, অনেক সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন হইয়াছে। উপযুক্ত পুত্র থাকিলে পুত্রই মায়ের রক্ষাভার লইতে পারে; কিন্তু যেখানে বিধবা যুবতী, তদুপরি সন্তানহীনা, সেখানে উপায় কি? সামান্য ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। নারী রত্নের মঞ্জুষা, তাহাকে রক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না?

আহার প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। পাচক বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া করিয়া উঠিয়া আসিয়া দুয়ারের বাহির

হইতে সংবাদ দিন। হিমাদ্রি উঠিয়া আসিয়া বলিল, আজ এখন দুজনের কেহই খাইবে না। তাহাদের জন্য খাবার ঘরে আনিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া নিজেরা যেন খাইয়া লয়। পাচক চলিয়া গেল। হিমাদ্রি তাহার স্ত্রীর পাশে আবার তেমনই ভাবে বসিল।

৩।৪ ঘণ্টা গভীর নিদ্রার পর পুষ্পিতা জাগিল। স্বামীকে জাগরিত ও তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "তুমি সেই থেকে ব'সে আছ? তুমিও শোও।"

হিমাদ্রি বলিল,—"তা হোক্, তুমি ঘুমাও।"

পুষ্পিতা ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি আর এখন ঘুমাব না। তোমাকে সব কথা এখনও বলা হয় নি। বলব।"

হিমাদ্রি বলিল,—"তা এখন থাক্ না কেন? আজ তুমি বড় দুর্ব্বল। কা'ল শুন্‌ব।"

পুষ্পিতা বলিল,—"তোমাকে না ব'লে আমি আর তৃপ্তি পাচ্ছি না। আমায় বল্‌তে দাও।"

হিমাদ্রি বলিল,—"আচ্ছা বেশ, বল। কিন্তু তুমি না বল্‌লেও আমার ও সব কথা শোনবার জন্য কোন ঔৎসুক্য হ'ত না।"

পুষ্পিতা তখন পিত্রালয়ে যাওয়া, ভাড়া ট্যাক্সিতে হিমাদ্রিকে আগাইয়া আনিবার জন্য সেখান হইতে হাওড়া ষ্টেশন যাওয়া, ড্রাইভারের কীর্ত্তি ও আত্মরক্ষা ইত্যাদি সব কথা সবিস্তারে বলিল। তার পর বাড়ী ফিরিয়া যখন সে নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল, তখন সে চাহিয়া দেখিল, ঘরের ভিতরও বন্ধুরূপী শয়তান। এমনই নারীর জীবন যে, কোথাও তাহার বিপদ হইতে পরিত্রাণ নাই। তার পর কি করিয়া নরেন্দ্র সাধু, কোমল ও কবিত্বের ভাষায় আপনার মনের পাপকথা প্রকাশ করিয়াছিল, সে সমস্ত বলিয়া শেষ করিল।

হিমাদ্রি পুষ্পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—"আর আমি তোমাকে একলা রেখে কোথাও যাব না।"

পুষ্পিতা শুধু বলিল,—"না, আর কোন দিন তুমি এমন ক'রে যেও না।" তার পর সে হিমাদ্রিকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া বাকি রাত্রিটুকু জাগিয়া কাটাইল।

১৩

নরেন্দ্র হিমাদ্রির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অনির্দ্দিষ্টভাবে উত্তরদিকে চলিতে লাগিল। তাহার বাসায় যাইতে হইলে বীডন ষ্ট্রীটে বেঁকিতে হয়। কিন্তু বাড়ীর দিকে এত শীঘ্র ফিরিতে ইচ্ছা করিল না; সোজা হাঁটিয়াই চলিল। অন্য দিন যে সব স্থানে সে যাইত, সে সব স্থানে যাইতেও আজ মন চাহিল না। নিজের কাছেই সে আজ অনেকখানি ছোট হইয়া গিয়াছে, ইহাই কেবল অনুভব করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, অন্তরে গুপ্ত অবস্থায় যাহা কাব্যের আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বাহিরে প্রকাশ করিবামাত্র কি নিদারুণ হইয়া উঠিল! যাহাকে ভালবাসি. তাহাকে সে কথা বলিবার অধিকার কেন নাই? কেন মানুষ মানুষের উপর এতখানি অধিকার বজায় রাখিতে চাহে? নর-নারীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ—যাহা স্মরণাতীত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার কি কোন দিন অবসান হইবে না? দাসত্ব-প্রথা আর কাহাকে বলে? টাকা দিয়া মানুষকে কেনা হইত—তাই না তাহার উপর পূর্ণ অধিকার রাখিতে চাহিত! এও কেবল গোটা কয়েক মন্ত্র পড়াইয়া লওয়া হইয়াছে, সে জন্য আর জগতের কাহারও তাহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ হইতে পারিবে না? সম্বন্ধ হইলেই তাহা দোষের হইবে? মানুষ মানুষের উপর যত অত্যাচার করিয়াছে ও করিতেছে, অত অত্যাচার বোধ হয় বাঘ-ভালুকেও করে না।

ভাবিতে ভাবিতে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড় পার হইয়া নরেন্দ্র কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সিনেমার সম্মুখে পৌঁছিল। তখন সাড়ে ৯টায় অভিনয় আরম্ভ হয় হয় হইয়াছে। সম্মুখে অত্যন্ত ভিড়। প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপনে লেখা 'দর্পণ।' নীচে লেখা—"আসুন আসুন, সকলে নিজের নিজের ছবি দেখিয়া নয়ন সার্থক করুন।"

বাড়ী ফিরিবার কোন তাড়া ছিল না; আর ঘণ্টা দুই কাটাইতে পারিলে তাহার বাড়ী ফিরিবার নির্দ্দিষ্ট সময় হইবে; অন্ততঃপক্ষে খানিক সময় ত কাটিয়া যাইবে;—এই ভাবিয়া নরেন্দ্র ১৲ টাকা দিয়া একখানা টিকিট কিনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। একটু পরেই টুং-টুং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকল আলোক নিবিয়া গেল। দর্শকরা আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। পিয়ানো মধুর সুরে বাজিতে লাগিল। অভিনয় আরম্ভ হইল।

গল্পের নায়ক এক পুরা-দস্তর প্রেমিক মানুষ। প্রেমচর্চ্চার পাছে ব্যাঘাত ঘটে, সেই ভয়ে সে স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে নাই। কারণ. স্বকীয়ায় সংসার চলে, কিন্তু আধুনিক

যুগের প্রেম চলে না। যেখানে সুযোগ পায়, সেইখানেই অল্পবিস্তর প্রেম করিয়া লয়। তাহার প্রথম লীলাভূমি হইল—বন্ধুর বাড়ী। বন্ধু তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিত; তাহার বাড়ীতে বন্ধুর অবারিতদ্বার ছিল। সে জন্য নায়ক সেখানেই প্রথম প্রেমের আয়োজন করিয়া ফেলিল। সে বন্ধুপত্নীর নিকট যে দিন প্রথম প্রেম নিবেদন করিল, বন্ধুপত্নী থর থর কাঁপিতে লাগিল। মুখ দিয়া কথা সরিল না। নায়ক আগাইয়া গেল, হাত দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল। বন্ধুর স্ত্রী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে নায়কের পৃষ্ঠে দুই ঘা তীক্ষ্ণ চাবুক পড়িল। নায়ক দেখিল, সশরীরে বন্ধু হাজির। আরও ঘা কয়েক দিয়া বন্ধু ছাড়িয়া দিল। নায়ক সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। নায়ক যখন বাড়ী পৌছিল, তখন সেখানে তাহার জন্য এক অপূর্ব্ব বিস্ময় অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারই এক দুর-আত্মীয় গৃহমধ্যে নায়কের উপেক্ষিতা স্ত্রীকে হাতে ধরিয়া বলিতেছিল, 'কেন তুমি কষ্ট পাইতেছ? যে তোমাকে এত কষ্ট দিয়াছে, তোমাকে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে, কেন তুমি তাহার কথা ভাবিয়া কষ্ট পাও? তুমি যতখানি পার—ততখানি কষ্ট কেন দাও না? যে তোমার মুখপানে তাকায় না, কখনও তাকায় নাই, কেন তুমি তাহার মুখ চাহিয়া থাক? কেন তাহার মুখে কালি দাও না?'

তাহার স্ত্রী আর্ত্তস্বরে বলিল, 'আমায় ছেড়ে দাও—তোমার পায়ে পড়ি। তার কর্ত্তব্য সে যদি না করে, তার জন্য আমার কর্ত্তব্য আমি কেন ছাড়ব? আমার হাত ছাড়। এ অবস্থায় কেউ যদি দেখে ফেলে, এখনই আমার সর্ব্বনাশ হবে।'

এমন সময় নায়ক হৃদয়ে অনুতাপ বহিয়া সেখানে পৌছিল। আত্মীয় পলাইল। তাহার স্ত্রী হাতে মুখ ঢাকিয়া সেখানে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নায়ক স্ত্রীর কাছে অপরাধীর মত গিয়া দাঁড়াইল। তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল—অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিল। পশু মানুষ হইল। দুঃখিনীর দুঃখ দূরে গেল।

নরেন্দ্রের অন্তর নায়কের ব্যাপার ও নায়কের দুর-আত্মীয়ের ব্যাপার দেখিয়া ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পরনারীর সহিত প্রেম করার যে একটা অপর দিক্ আছে, তাহা অতি সহজে তাহার অনুভবগম্য হইল। দর্পণে সে যেন আপনার প্রকৃত ছবি দেখিল; দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। যাহাকে সে এত দিন কাব্যমণ্ডিত ও অপরূপ শ্রীসম্পন্ন মনে করিয়াছিল, তাহা যে এত বীভৎস, এত হেয়, তাহার ধারণাও সে কোন দিন করিতে পারে নাই।

অভিনয় ভঙ্গ হইল। আলো জ্বলিয়া উঠিল। সকলে আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সর্ব্বশেষে বিহ্বলের মত নরেন্দ্রও উঠিল ও ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল।

বাহিরে তখন বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সাথীদের পরস্পরকে আহ্বান, দর্শকদের মন্তব্য, মোটরের বাঁশীর শব্দ ইত্যাদি কোলাহলে সিনেমার সম্মুখভাগ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমস্ত পার হইয়া নরেন্দ্র বাসার দিকে চলিল। রাত্রি তখন সাড়ে বারোটা হইয়া গিয়াছিল। সদাজাগ্রত কলিকাতা সহরও কথঞ্চিৎ স্থির হইতে চলিয়াছিল। নরেন্দ্র বাসার সম্মুখে আসিয়া ধীরে ধীরে কড়া নাড়িল। একবার মৃদু পদশব্দ শুনা গেল; পরক্ষণে দুয়ার খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিল। স্বল্পাবগুণ্ঠিতা সুরমা পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্বামী ভিতরে প্রবেশ করিতে সে দুয়ার বন্ধ করিয়া রান্নাঘরের দিকে ফিরিল। নরেন্দ্র ততক্ষণ আপনার কক্ষে উঠিয়া গিয়াছিল।

নরেন্দ্র দুয়ারটা অর্দ্ধেক বন্ধ করিয়া আপনার শয্যার উপর নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল। পুষ্পিতার সহিত তাহার আজিকার ব্যবহারটাই মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছিল। অন্তরের যে অগ্নিকে মনে মনে এত দিন সে ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছিল, আজ একটু জোর বাতাস পাইয়া তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আরও কি সে আগুন জ্বালিয়া রাখিয়া তাহার হৃদয়টুকু ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে, না আজ অনাদর অপমানের জলে যাহা নিভিয়া আসিয়াছে, তাহাকে নিভিতেই দিবে?

তাহার হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। সুরমা শয্যা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া মুখ নীচু করিয়া বলিতেছে,—"মা'র আজ বড় জ্বর হয়েছে। বিকেল থেকে আর উঠ্‌তে পারেন নি—তাই আমি খাবার এনেছি।"

ইহা যে খাবার আনিবার অপরাধের কৈফিয়ৎ, তাহা বুঝিতে নরেন্দ্রের বিলম্ব হইল না। কিন্তু আজ সে কৈফিয়ৎ অত্যন্ত অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। আনমনে বলিল, "আচ্ছা থাক্।"

স্বামী তাহার কথার উত্তরে কথা কহিল, ইহাতে সুরমা বড়ই বিস্মিত হইয়া একবার তাহার দিকে চাহিল। দেখিল, নরেন্দ্র বাঁ-হাত দিয়া মাথা টিপিয়া ক্লিষ্টমুখে শুইয়া আছে।

হঠাৎ সুরমা একটু সরিয়া আসিয়া বলিয়া ফেলিল, "অসুখ করেছে ?"

সুরমা 'তোমার' কথাটা পূর্ব্বে বসাইতে যেন সাহস করিল না ; তাহা হইলে বুঝি স্বামীর উপর অধিকার দেখানো হইবে।

নরেন্দ্র অত্যন্ত ক্লান্তভাবে "হাঁ" বলিয়া চক্ষু মেলিল। মেলিয়াই দেখিল, সুরমা চোখ ও মুখে প্রচুর উদ্বেগ ও পরিপূর্ণ অনুরাগ লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

বহুকাল নরেন্দ্র সুরমার মুখের পানে ভাল করিয়া চাহে নাই। আজ তাহার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। এত কাল ক্লান্তিহীন স্তবস্তুতি করিয়াও পর-নারীর নয়নে যে অনুরাগের একটি শীর্ণ বর্ত্তিও ফুটাইতে পারে নাই, আপনার অবজ্ঞাতা ও উপেক্ষিতা স্ত্রীর দৃষ্টিতে সে অনুরাগের অপূর্ব্ব ও পরিপূর্ণ বিকাশ কি করিয়া সম্ভব হইল ?

সুরমার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে, কি অসুখ ? সাধ হইল, মাথাব্যথা যদি করে ত পাশে বসিয়া যত্ন করিয়া মাথা টিপিয়া দেয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলেও, সাধ হইলেও, লজ্জা ত্যাগ করিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, সাহস করিয়া সে সাধ পূর্ণ করিতে পারিল না। শুধু ম্লানমুখে সেই স্থানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। না পারিল চলিয়া যাইতে, না পারিল কাছে আসিয়া বসিতে।

নরেন্দ্র ভাবিল, একবার বলে, তুমি একটু কাছে ব'স। কিন্তু চিরকাল এত অনাদর ও অবহেলার পরে এই সামান্য কথাটা মুখের কাছে আসিয়াও মিলাইয়া গেল।

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সুরমা ভাবিল, মাকে গিয়া অসুখের কথা বলিবে। মা যদি কষ্ট করিয়া একবার আসিতে পারেন। সে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

নরেন্দ্রের কাণে সে দীর্ঘনিশ্বাস ও সেই মৃদু পদশব্দ পৌছিল। সুরমাকে ডাকিবার জন্য একবার চেষ্টা করিল। মুখ দিয়া একটা অর্থহীন শব্দ বাহির হইল মাত্র। সুরমা তাহা শুনিবামাত্র মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডাকছ ?"

নরেন্দ্র সুবিধা পাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এস।"

সুরমা ধীরপদে কম্পিতবক্ষে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

নরেন্দ্র বহু চেষ্টায় লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঠে এসে আমার মাথাটা একটু টিপে দেবে ?"

সুরমা এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া কি করিবে, ঠিক করিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন বাহির হইতে চাহিতেছিল, ক্রন্দন রোধ করিয়া সে একটু ভাবিয়া লইল ; তার পর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর ঈষত্তপ্ত ললাটের উপর হাত রাখিল।

নানাবিধ চিন্তার তাপে নরেন্দ্রের ললাট যেন জ্বলিয়া যাইতেছিল। সুরমার হাতের কোমল ও শীতল স্পর্শে তাহার ললাট যেন জুড়াইয়া গেল। নরেন্দ্র চোখ বুজিয়া একবার বলিল, "আঃ!" তার পর বলিয়া ফেলিল, "উঠে এস।"

সুরমা এবার আর দেরী করিল না। পাপোষে বেশ করিয়া পা মুছিয়া সাবধানে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল ও অতি যত্নে কপাল টিপিয়া দিতে লাগিল।

সুরমার অপর হাতখানি ঠিক বালিসের সম্মুখে পড়িয়াছিল। নরেন্দ্র কি ভাবিয়া সে হাতখানির উপর আপনার ঈষত্তপ্ত হাতখানি রাখিয়া বলিল, "তোমায় অনাদর করেছি, তার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছি। আমার আজ জ্ঞান হয়েছে।"

সুরমার হাতখানি একবার কাঁপিয়া উঠিল। অত্যাচার ও অনাদরে যে অশ্রু ঝরে নাই, আজ সামান্য আদরে সেই অশ্রু বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে নরেন্দ্রের মা রোগশয্যা হইতে উঠিয়া, পুত্র আসিল কি না ও পুত্রবধূ কোথায়, জানিবার জন্য অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুরমা ব্যস্ত হইয়া নামিতে যাইতেছিল ; শাশুড়ী অগ্রসর হইয়া বেদনাভরা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "বৌমা ! লজ্জা কোরো না। নরেনের পাশে যে তোমার চিরকালকার স্থান, মা ! ভগবান্ তোমার স্থান তোমায় ফিরিয়ে দিলেন— মনের সুখে ঐখানেই থাক, মা !"

বলিয়া পরম স্নেহভরে পুত্র ও পুত্রবধূর মাথায় হাত রাখিলেন। তাঁহার দুইটি চক্ষু দিয়া ও গণ্ড বাহিয়া বুঝি আশীর্ব্বাদের অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

অয়ং স তে শ্যামলতামনোহরো বিশেষশোভার্থমিবোজ্ঝিতাম্বরঃ ।
মৃণালরূপেণ নবো নিশাকরঃ করং সমেত্যোভয়কোটিমাশ্রিতঃ ॥

বিজ্ঞানে ধর্ম্ম

আমি ইতঃপূর্ব্বে বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছি যে, ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের লক্ষ্য একই, তবে মানুষ এই বিশ্ব-প্রহেলিকা দুই দিক্ দিয়া গ্রহণ করে বলিয়া দুইটি বিষয়ের পার্থক্য ঘটিয়াছে। অর্থাৎ মানুষ ভাবের দিক দিয়া যেটা গ্রহণ করিয়াছে, সেইটি হইয়াছে ধর্ম্ম আর জ্ঞানের দিক্ দিয়া যেটা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেইটি হইয়াছে বিজ্ঞান। জগতের সকল ব্যাপারের তিনটা করিয়া দিক্ আছে। গুণ তিন প্রকার: যথা—সত্ত্ব, রজঃ, আর তমঃ। এই তিনটি গুণই মানুষকে আশ্রয় করিয়া আছে। তেমনই আর এক দিক্ দিয়া দেখিলেও তিনটি ভাব আছে। বিধাতা বা প্রকৃতি তিন দিক দিয়া মানুষকে ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রচালিত করেন। প্রথম কর্ম্মের দিক্ দিয়া, দ্বিতীয় ভাবের দিক্ দিয়া, তৃতীয় জ্ঞানের দিক্ দিয়া। * তন্মধ্যে গ্রহণ করিবার দিক্ বা সিদ্ধান্ত করিবার দিক দুইটি;—একটি ভাবের দিক্ আর একটি জ্ঞানের দিক। সেই জন্য আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধে ঐ দুই দিক্ দিয়া সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছি। গীতা কিন্তু তিন দিক্ দিয়াই সিদ্ধিলাভের কথা বলিয়াছেন। যথা—কর্ম্মযোগ দ্বারা, জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং ভক্তিযোগ দ্বারা। সে কথা পরে বলা যাইবে।

ভাবের দিক দিয়া মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি বিকাশলাভ করে, জ্ঞানের দিক্ দিয়া মানুষের বিচারবুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি স্ফুট পায়। গতবার আমি ভাবের দিক্ দিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিবিকাশের কথা কিঞ্চিৎ বলিয়াছিলাম, কিন্তু জ্ঞানের দিক্ দিয়া,—বিচারবুদ্ধির ভিতর দিয়া বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের কথা অধিক বলি নাই। আজকাল বিজ্ঞানের নামে অনেকেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। আমার এক মুসলমান বন্ধু আমাকে একবার বলিয়াছিলেন,—"ইহা যে বিজ্ঞানের কথা, ইহাতে কি সন্দেহ করিবার উপায় আছে?" তিনি মনে করেন, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তমাত্রই অভ্রান্ত। তাঁহার সেই ধারণাই বিষম ভুল। কিন্তু যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, সর্ব্ববিধ ভ্রান্তি পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে সাবধানতার সহিত পরিচালিত সাধারণ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। * তবে একটা কথা এই যে, সাধারণ জ্ঞান দ্বারা মানুষ দুই একটা তথ্য দেখিয়াই ত্বরিতগতিতে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে; বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ততটা হঠকারিতার সহিত কোন সিদ্ধান্তই করে না। সাধারণ লোক তাহাদের নয়নসমক্ষে যাহা উপস্থিত হয়, তাহা কি, তাহার সন্ধান না করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে; কিন্তু বিজ্ঞান তাহা করে না। বিজ্ঞান নয়ন-সমক্ষে যাহা আসিল, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই না করিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিয়া বসে না। নয়নের ভুল হইতে পারে,—আচম্বিতে একটা সিদ্ধান্ত করিলে সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইতেও পারে,—বৈজ্ঞানিকরা তাহা বেশ বুঝেন। তাঁহারা একটিমাত্র তথ্য দেখিয়া কোন সিদ্ধান্ত করেন না। জড়-বিজ্ঞান প্রত্যেক তথ্য বিশেষভাবে বাছাই করিয়া তাহার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব পর্য্যবেক্ষণ (Observation) এবং পরীক্ষণ (Experiment) করিয়া তবে একটা সিদ্ধান্ত করেন। বৈজ্ঞানিকরা একটা তথ্য পাইলে সেই তথ্যকে বিশেষভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন, সকল দিক্ দিয়াই তাহার বিচার করিয়া থাকেন, এবং সেইরূপ অন্য তথ্যের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সহসা সেই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করেন না বা পূর্ব্ব-গঠিত কোন সংস্কার কিম্বা সিদ্ধান্ত দ্বারা চালিত হইতে চাহেন না। সেই জন্য সাধারণ লোকের সিদ্ধান্তে যত ভুল হয়, বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ভুল হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ এই উভয় কার্য্যই অবাধে চালান যাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভুল অত্যন্ত অল্পই হইয়া থাকে। সেই বিজ্ঞানগুলিকে যথাযথ বিজ্ঞান (Exact science) বলা হয়। যথা—পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি। অন্য অনেক বিজ্ঞানে ঐরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, বিশেষতঃ পরীক্ষণ কার্য্য করা যায় না। সেই জন্য উহার সিদ্ধান্তে সন্দেহের অবকাশ থাকে। ঐ সকল বিজ্ঞানকে হাতুড়িয়া বিজ্ঞান (Empirical science) বলে। এই বিজ্ঞানে কতকটা কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। কারণ, এখানে পরীক্ষা চলে না। উদাহরণস্বরূপ বিবর্ত্তনবাদের কথা বলা যাইতে পারে। এই বিবর্ত্তনবাদটা একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বটে,

---

* There are three voices in Nature. She joins hands with us and says *Struggle, Endeavour*. She comes close to us, we can hear her heart beating, she says *Wonder, Enjoy, Revere.* She whispers secrets to us, we cannot always catch her words, she says *Search, Inquire.* These then are the three voices of Nature, appealing to *Hand*, and *Heart* and *Head* to the Trinity of our Being.---Prof J Arthur Thomson.

ইহার মর্ম্মার্থ—প্রকৃতির তিনটি কণ্ঠস্বর বা কথা আছে। তিনি আমাদের সহিত একযোগে মিলিত হইয়া বলেন,—সংগ্রাম কর, চেষ্টা কর। তিনি আবার আমাদের অতি নিকটে আসিয়া বলেন, এত নিকটে আসিয়া সেই কথাগুলি বলেন যে, আমরা তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি শুনিতে পাই। বিস্মিত হও, উপভোগ কর, ভক্তি কর। তিনি অস্ফুটস্বরে তাঁহার গূঢ় কথা আমাদিগকে বলেন,—এত মৃদুস্বরে ঐ কথাগুলি বলেন যে, আমরা তাঁহার সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারি না—অনুসন্ধান কর, খোঁজ কর। ইহাই প্রকৃতির তিনটি স্বর, হস্ত ও হৃদয় এবং বুদ্ধিকে প্রেরণা দিতেছেন।

* Science is, I believe, but trained and organised common sense—Huxley. The work of science is to substitute facts for appearances and demonstration for impressions.—Ruskin

Theology and science are both theories of things' – the one the natural product of imagination, the other of reason.—John Wilson.

পর্য্যবেক্ষণ (observation) দ্বারা উহা অনেকটা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা বিশেষভাবে পরীক্ষা (experiment) করিয়া দেখা হয় নাই। দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন জীবশ্রেণীর দেহের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা রীতিমত সাজাইয়া দেখিলে যেন মনে হয় যে, ঐ পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে। এই জীবশ্রেণী সমুচ্চয়ের ধাপের পর ধাপে অতি সামান্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। আরও দেখা গিয়াছে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার (Environment) চাপে এবং জীবের জীবনযোনিযত্নের ফলে দেহের পরিবর্ত্তন ঘটে। যথা—যে ব্যক্তি নৌকায় মাঝিগিরি করে, দাঁড় টানে, তাহার হাতের মাংসপেশীগুলি দৃঢ় এবং পুষ্ট হয়। তাহার ভ্রাতা যদি পোষ্ট-আপিসের পিয়নগিরি করে, তাহা হইলে তাহার চরণের মাংসপেশীগুলি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। কাযেই অবস্থার এবং চেষ্টার ফলে জীবদেহের ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটে, এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। এই দুইটি সিদ্ধান্তই ভূয়োদর্শন বা বহু পর্য্যবেক্ষণসিদ্ধ। ইহার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। এখন বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কালসহকারে অবস্থার চাপে এবং জীবের জীবনরক্ষাদির জন্য চেষ্টার ফলে তাহাদের দেহের একটা স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই পরিবর্ত্তন তাহারা সন্তানে সংক্রমিত করিতে পারে। ফলে কালসহকারে পার্থিব অবস্থার প্রাকৃতিক আবেষ্টনের (environments) এবং জীবের জীবনরক্ষাদির জন্য যে দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে,—তাহা হইতেই জৈব উৎসেযে এক জাতীয় জীব হইতে তাহারই পরবর্ত্তী অন্য জাতীয় জীবের আবির্ভাব হয়। এই যে সিদ্ধান্ত, ইহা দর্শন দ্বারা সিদ্ধ হইলেও পরীক্ষণ (Experiment) দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। ঘরের বিড়াল বনে যাইলে বন-বিড়াল হয়, আর বন-বিড়ালবংশেই কালসহকারে চিতাবাঘ বা গুলবাঘা জন্মে,—পরীক্ষা করিয়া কেহ কখনই তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। আর সেই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে হইয়াছে কিম্বা কোন আকস্মিক কারণে আচম্বিতে ঘটিয়াছে,—তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কাযেই এই সিদ্ধান্তে একটা ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সেই জন্য এই বিবর্ত্তনবাদ সিদ্ধান্তকে নির্ব্যূঢ় সিদ্ধান্ত বা Law না বলিয়া আনুমানিক সিদ্ধান্ত বা theory বলা হয়। যে বিজ্ঞানে এই প্রকার আনুমানিক সিদ্ধান্ত কতকগুলি মানিয়া লইতে হয়, তাহাকে হাতুড়িয়া বিজ্ঞান বা Empirical Science বলে।

বিজ্ঞান অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। বিজ্ঞান একটিমাত্র কথা মানিয়া লয়। সে কথাটি এই—এই জগৎ সুশৃঙ্খলে নিয়মিত এবং সুগঠিত। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার সকল ব্যাপারই কার্য্যকারণরূপ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। সেই কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করাই বিজ্ঞানের কার্য্য। বিজ্ঞান যে কোন কথা মানিয়া লয়, এ কথা শুনিলে অনেকে হয় ত হাসিবেন। কারণ, পাথুরে প্রমাণ ব্যতীত বিজ্ঞান কিছুই মানিতে চাহে না,—ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এ ধারণা অত্যন্ত ভুল এবং গোঁড়ামিপ্রসূত। কারণ, জ্ঞানের রাজ্যে কতক কিছু মানিয়া না লইলে চলিতেই পারে না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমরা যেরূপ দেখিতেছি, তাহা সত্য কি না? বিজ্ঞান মানিয়া লইতেছে যে, তাহা সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইতেছে,—আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহার মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি আছে। আমার সম্মুখস্থ এই বিস্তৃত গগনমণ্ডলে ঐ যে দূরস্থ নক্ষত্রটিকে আমি অতি ক্ষুদ্র মিটিমিটি জ্বলিতে দেখিতেছি, বাস্তবিক উহা অত ক্ষুদ্রও নহে, অত জ্যোতির্হীনও নহে। উহা আমাদের এই ভাস্কর অপেক্ষা শতগুণ বড় এবং অধিকতর ভাস্বর। যে ভাস্করের সাহায্যে আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাই, সেই ভাস্করকেও ত আমরা সকল সময় সমান দেখি না। পুরীতে বারিধির বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া যখন উদীয়মান ভাস্করকে দেখি, তখন দেখিতে পাই, তিনি প্রায় জবাকুসুমসম লোহিতবর্ণ এবং একটি গোলাকার কোলার মত বৃহৎ। আবার যখন তাঁহাকে মাধ্যন্দিন গগনে দেখি, তখন দেখিতে পাই, তাঁহার মধ্যস্থল ঈষৎ নীলাভ, উদীয়মান সূর্য্য অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং তাঁহার গাত্র হইতে শ্বেতবর্ণ কিরণ বাহির হইতেছে। শেষকালে আবার যখন বোম্বাইয়ের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া অস্তগমনোন্মুখ ভাস্করকে দেখি, তখন আবার তাঁহাকে প্রায় উদীয়মান ভাস্করের ন্যায় দেখিতে পাই। সুতরাং যাহা দেখিতেছি, তাহা যে ভুল হয়, তাহা অস্বীকার করিবার সাধ্য বিজ্ঞানের নাই। তবে বিজ্ঞান সেই দূরস্থ তারকার এবং বহুরূপ ভাস্করের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। বিজ্ঞান আমাদের সেই দৃষ্টি-বিভ্রমের বা দৃষ্টির ভিন্নতার কারণ কি, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়া থাকে, সে যুক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বায়ুস্তরের ঘনত্বের পার্থক্য নিবন্ধন আলোকরশ্মির সরল গতিভঙ্গ হেতু আমরা যেখানে যাহা দেখিতেছি, সেখানে তাহা নাই, বিজ্ঞান তাহাও বলিয়া দিতেছে। সুতরাং বিজ্ঞান আমাদের কর্ত্তৃক এই দৃশ্যমান বিশ্বের স্বরূপ দর্শনে ভ্রান্তি ঘটিতেছে, ইহা স্বীকার করিলেও এই দৃশ্যমান বিশ্বের অস্তিত্ব এবং বৈচিত্র্য অস্বীকার করিতে চাহে না। কারণ, এই পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে বিজ্ঞানেরও অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভবে না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝিতে হইলে কথাটা আর একটু পরিষ্কাররূপে বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। বিজ্ঞান এ কথা অস্বীকার করে না যে, প্রত্যেক সত্যের দুইটি করিয়া দিক্ আছে। একটা দিক্ আত্মগত (Subjective), আর একটা বস্তুগত (Objective)। আমার অন্তর্নিহিত চৈতন্যে উপলব্ধিগত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকেই আত্মগত জ্ঞান বলা যায়। আমি আমার ঘরে বসিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছি। এমন সময় হঠাৎ যেন একটা আলোক চমকিল। আমি বাতায়নপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, একটা আলোক দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধদিকে উঠিল, তাহার পর সেটা ফাটিয়া গেল এবং তাহা হইতে শ্বেত, লোহিত, নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের গোলাকার আলোকময় বস্তু বাহির হইয়া পরে বিলয়-দশা পাইতে থাকিল। আমি তখন বুঝিলাম, কেহ আতসবাজী (হাউই) ছুড়িতেছে। এক্ষণে প্রকৃত বস্তুর (হাউইয়ের) সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা একবারেই হয়

নাই। আমার নয়নের মারফতে একটা অনুভূতি মাত্র হইল। সেই অনুভূতি হইতে আমার ঐ বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিল। বাহিরের চাউই আলোক বিকীর্ণ করিয়া আমার নয়নমণিতে একটা ক্ষণিক ক্রিয়া করিল। অনুভূতিবাহিকা নাড়ীর দ্বারা সেই ক্রিয়াফল আমার মস্তিষ্কে নীত হইয়া আমার স্থায়ী সম্বিতের বা আত্মচৈতন্যের (Consciousness) একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইল। সেই সম্বিতের বা সংবিত্তির পরিবর্ত্তনফলে আমি ঐ চাউইয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইলাম। এখন এই সংবিত্তি ও তাহার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ব্যক্তিগত। উহা আমিই অনুভব করি, অন্য কেহ অনুভব করে না, সেই জন্য ঐ জ্ঞানকে আত্মগত (Subjective) জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করি। বস্তুগত জ্ঞান সেই বস্তুবিষয়ক। ঐ চাউইতে কত ভাগ কয়লা, কত ভাগ সোরা, কত ভাগ গন্ধক আছে ইত্যাদি সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাই বস্তুগত জ্ঞান। এখন বিজ্ঞান এমন কথা বলিতে পারে না যে, আমরা সরাসরিভাবে বস্তুগত জ্ঞান লাভ করিতে পারি। বিজ্ঞানকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে, আমার বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞানই অনুমানসিদ্ধ (inferential)। বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই ঐরূপ অনুমানসিদ্ধ। একটা জিনিষ লবণ কি চিনি, তাহা আমি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমি তাহা চিনি কি লবণ, তাহা বুঝিবার জন্য একটু মুখে ফেলিয়া দিই। তখন রসনার সহিত ঐ বস্তুর সংযোগফলে যেরূপ রসের উপলব্ধি হয়, তদনুসারে আমরা উহা লুণ কি চিনি, তাহা ঠিক করি। ইন্দ্রিয়দিগের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়াফল যখন আমাদের সম্বিতের বা সম্বিত্তির নিকট অনুভূতিবাহিকা নাড়ীর দ্বারা নীত হয়, তখন উহা আমার আত্মচৈতন্যের একটা ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তন বা বিকার ঘটায়। সেই বিকারের অনুভূতি হইতে আমার আত্মচৈতন্য সেই বস্তুকে অনুমান করিয়া লয়। উহাই হইল আমাদের অর্থাৎ সমস্ত জীবজগতের বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ঐ জ্ঞান গোড়াতেই অনুমানমূলক।

কিন্তু তাহা হইলেও বিজ্ঞান বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, আমার এই আত্মসংবিত্তির (Self-consciousness) যে পরিবর্ত্তন ঘটায়, তাহার অস্তিত্ব কখনই অস্বীকার করা যায় না। বাতায়নপথে দূর-আকাশে আমি যাহা দেখিলাম, যাহা আমার অন্তঃসংবিত্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইল, সেইটি একটি বাহ্যবস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উহাই কারণরূপে আমার অন্তঃসংবিত্তির পরিবর্ত্তনরূপ কার্য্য ঘটাইয়াছে। আমি বাহ্যবস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারি বা আমার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ভিতর দিয়া উহার যে রূপ উপলব্ধি করি, তাহাই উহার প্রকৃত রূপ বলিয়া মানিয়া লই, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। বাহ্য জগতের প্রত্যেক পদার্থই যে আমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। আমার সমক্ষে তাহার যে রূপ প্রতিভাত রহিয়াছে, তাহা তাহার স্বরূপই হউক বা বিকৃত রূপই হউক, তাহাই আমার নিকট উহার প্রকৃত রূপ। কারণ, উহার প্রকৃত রূপ যদি আমার নিকট অপ্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সে কথা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। যখন আমার পক্ষে এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞানলাভের উপায় নাই, তখন সেই অজ্ঞেয় জ্ঞানের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া মরুকান্তারবিহারী মৃগের ন্যায় মরীচিকায় জলপ্রাপ্তির আশায় ছুটিয়া লাভ কি? এইখানে বৈদান্তিক ধর্ম্মের সহিত বৈজ্ঞানিক মতের ছাড়াছাড়ি হইল।

বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,—আমি বাহ্য জগৎকে যে আকারে দেখিতেছি, তাহা উহার স্বরূপ অথবা তাহাই উহার স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইবার যোগ্য। উহার যদি কোন অতীন্দ্রিয় রূপ থাকে, তাহা হইলে যখন আমার সে রূপ জানিবার উপায় নাই, তখন উহা লইয়া আমার বৃথা মস্তিষ্কসঞ্চালন অবিধেয় এবং নির্ব্বোধের কার্য্য। বৈদান্তিক বলেন,—যেমন এক জনের সহিত অন্য জনের আকৃতি এবং প্রকৃতির পার্থক্য বিদ্যমান, সেইরূপ এক জনের ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্য জনের ইন্দ্রিয়ের ও গঠনাদিগত পার্থক্য বিদ্যমান। আবার এক জনেরই ইন্দ্রিয় সকল সময় সমান কার্য্যকারী থাকে না। যথা—চক্ষু বাল্যে যেরূপ থাকে, যৌবনে সেরূপ থাকে না, যৌবনে যেরূপ থাকে, বার্দ্ধক্যে সেরূপ থাকে না। মুহুর্মুহুঃ তিলে তিলে উহার কার্য্যকরী শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সুতরাং মানুষের ইন্দ্রিয়মাত্রই ত্রুটিযুক্ত (defective)। সেই ত্রুটিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কখনই বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে স্বরূপজ্ঞান বা সত্যজ্ঞান হয় না—হইতে পারে না। এই প্রকার যুক্তিপরম্পরা অবলম্বন করিয়া বৈদান্তিকরা বলেন,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সে সমস্ত যুক্তি এ স্থানে উদ্ধৃত করা সম্ভবে না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৈজ্ঞানিকরা বৈদান্তিকের যুক্তি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিতে একান্তই অসমর্থ। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকরা বর্ত্তমান কালে বড় একটা নাস্তিক (Atheist) হন না। তাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) হইয়া থাকেন। ফলে বিজ্ঞান এবং বেদান্ত উভয়ে একসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পরস্পরে পরস্পরের সহিত প্রভিন্ন হইয়াছেন।

এখন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, এই বিশ্বে অনাদিকাল হইতে এবং অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে একটা নিয়মিত ব্যবস্থা বা বিন্যাস বিদ্যমান রহিয়াছে। কি মানস ব্যাপারে, কি ভৌতিক ব্যাপারে সীমাহীন কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের বহির্ভূত কোন তথ্যই দেখিতে পাওয়া যায় না; উহা যেন একটি সীমাহীন শৃঙ্খলের বলয়গুলির ন্যায় কার্য্যকারণ-সম্বন্ধেই অনন্তধারায় গ্রথিত রহিয়াছে। পূর্ব্বগামী ঘটনা অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে ঠিক পরবর্ত্তী ব্যাপার প্রসব করিবে। * এখন ধর্ম্মবাদীরা প্রশ্ন করেন যে, এই বিশ্বের সমস্ত ব্যাপার বা তথ্য যদি কার্য্যকারণসম্বন্ধক্রমে অনাদি ও অনন্তক্রমে বিন্যস্ত, শৃঙ্খলায় গ্রথিত থাকে, তাহা হইলে সেই শৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল কে? যেখানে নিয়ম এবং শৃঙ্খলা বিরাজিত, সেইখানেই তাহার এক জন নিয়ামক বা

---

* The assumption of science is that eternal invariable order reigns over the whole Universe; that no fact, mental or material, exists except as a link in an endless chain of cause and effect, the same antecedents being invariably followed by the same consequents.—Wilson,

শৃঙ্খলাস্থাপক দেখা যায়। নিয়ম এবং শৃঙ্খলাস্থাপন বুদ্ধির কার্য্য। এত বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু এবং প্রত্যেক বিরাট এবং বিশাল বস্তু যে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেছে, এবং সেই নিয়ম যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সাকল্যে একটা নির্দ্দিষ্ট পথে রাখিয়া উহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, সেই নিয়ম কোন্ বুদ্ধিপ্রসূত? সে বুদ্ধি কাহার বুদ্ধি? বিজ্ঞান বলেন, অত বড় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার অধিকারবহির্ভূত। কারণ, ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে যদি এক জন বিশ্বস্রষ্টার কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই বিশ্বস্রষ্টাকেই বা কে সৃষ্টি করিল,—তাহারও মীমাংসা করিতে হয়। সুতরাং ঐ সকল ঝকমারিতে কায নাই। উহার মীমাংসা করা সীমবুদ্ধি মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত। ধার্ম্মিকরা বলেন, বিজ্ঞানের কোন কথাই চরম নহে, চরম হইতে পারে না, ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশ্বাসে একটা স্থিরতা আনিয়া দেয়।* বৈজ্ঞানিকরা জীবের সংবিত্তি সম্বন্ধেও কোন কথা বলিতে চাহেন না। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহাদের ঐ বিষয়টির মীমাংসা করিবার অক্ষমতাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাঁহারা বলেন যে, এই সৌরজগৎ শীতল হইবার ফলে তাহাতে জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং উহাতে স্বতন্ত্র মৃত্যুরূপ চৈতন্য আসিবে কোথা হইতে? অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী ভীষণ উত্তপ্ত সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এখন শীতল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলেই আমিবা হইতে মানুষ পর্য্যন্ত আত্মসংবিত্তি-সম্পন্ন (self-conscious) জীবশ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডল বা নীহারিকা জড়পদার্থ-রচিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে এই চৈতন্য আসিল কোথা হইতে? অতএব এই যে চৈতন্য, ইহা জড়ের বিকার বা অবস্থাবিশেষ-সম্পর্কিত পরিণাম মাত্র। বর্ত্তমান যুগের য়ুরোপে বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন মূর বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণুর এবং শক্তির অস্তিত্ব অবস্থামত পাওয়া যায়, তাহা হইলে জীবনের বা চৈতন্যের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হইবে।* কিন্তু তবে কি বিজ্ঞান জড়েরই একটা ক্ষণস্থায়ী বিকার-বিজৃম্ভিত অবস্থার খেয়াল মাত্র? তাহাই যদি হয়, তবে উহার সার্থকতা কোথায়? বৈজ্ঞানিক ত তাহার চৈতন্যশক্তির প্রভাবে তথ্যাদি হইতে যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

পক্ষান্তরে, ধর্ম্মবাদী বৈজ্ঞানিকরা এবং প্রায় সমস্ত হিন্দু দার্শনিক একবাক্যে বলেন, পরমাত্মা হইতে বা ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের আবির্ভাব। তুমি যাহাকে জড় বলিতেছ, তাহা মায়া-উপহত চৈতন্য মাত্র। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। চৈতন্য হইতেই শক্তি, শক্তি হইতে পরমাণু, পরমাণু হইতে এই জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। কা'ল তুমি বলিয়াছ যে, পরমাণুর ধ্বংস নাই, আজ তুমিই বৈজ্ঞানিক বলিতেছ, পরমাণুর ধ্বংস হইয়া শক্তিতে বিলীন হয়। ফলে প্রকৃত বিজ্ঞান ধর্ম্মকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। সে বিচার পরে হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

* Science abhors finality in belief, but that is just what theologians like.—Dr. Magee.

* Given the preserve of matter and energy forms under proper conditions, life must come inevitably.

পুরাতনের বাণী

গত বছরের জীর্ণ জড়তা
ধরার ধূলির 'পরে
হয়ে গেল ম্লান, চির-নিঃশেষে
সময়ের বালুচরে।

কালের ললাটে দিয়ে গেল এঁকে
সুনিবিড় স্নেহ-ভরে—
স্মৃতি তার যত শুভ্র তিলকে
বাণী-হারা সমাদরে।

মুখপানে চেয়ে চির-নবীনের
ধীরে ধীরে অতি ধীরে
ভাষাহীন চোখে বিদায়ের বাণী
ব'লে গেল ফিরে ফিরে;—

সেই মোর বাণী দিবে তোরে আনি
সৃজন ব্যথার গান
শ্লথগতি-হারা জীবনের কূলে
উৎসাহ অবদান।

ওরে সুন্দর, নবীন, সবুজ,
কালের সাগর-তীরে
ব্যর্থ আমার জীবনের বাণী
থাক্ থাক্ তোরে ঘিরে।

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

প্রথম পর্য্যায়

বাঙ্গালা নাটক ও নাট্যশালার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদির অভাব নাই, দু-একখানি পূর্ণাবয়ব গ্রন্থও আছে। কিন্তু একটি কারণে সেগুলির কোনটিই ঠিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। সে কারণ আর কিছুই নয়, নাট্যশালার ইতিহাসের মৌলিক উপাদানের সহিত লেখকগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গালা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় কিংবদন্তী, স্মৃতিকথা অথবা পরবর্ত্তী কালের রচনার উপর নির্ভর করিয়াছেন,—সমসাময়িক বিবরণ উদ্ধার করিবার বিশেষ প্রয়াস পান নাই। সেজন্য তাঁহাদের রচনায় প্রচুর ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে এবং তারিখের বেলা এই সকল ভুল অনেক সময়েই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমসাময়িক সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিবরণ হইতে বাঙ্গালা নাটকের ও নাট্যশালার ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া। বঙ্গীয় নাট্যশালার বয়ঃক্রম প্রায় এক শত চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল। যখন উহার সূত্রপাত হয়, তখন এ দেশে বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছিল না, পরবর্ত্তী কালে অবশ্য বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষারই অনেক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। এই সকল পত্রিকায় বাঙ্গালা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসের এত উপাদান নিহিত রহিয়াছে যে, শুধু এগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র গ্রথিত করিয়া দিলেই বঙ্গীয় নাট্যশালার একটি সুন্দর ইতিহাস হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুরাতন বাঙ্গালা পত্রিকাদি ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের জলবায়ুর জন্য এবং আমাদের নিজেদের যত্নের অভাবেও বটে, বহু পুরাতন পুস্তক ও সংবাদপত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা অযত্নে অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হইতেছে। যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিরও সম্পূর্ণ ফাইল পাইবার উপায় নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া যে-সকল পত্রিকা ও পুস্তকের খোঁজ পাইয়াছি, তাহা হইতে নাট্যশালার ইতিহাসের একটি কাঠামো গড়িয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। ইহাকে আমি পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস বলিতে পারি না এবং অপরেও যেন তাহা মনে না করেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার কোন ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক এই প্রবন্ধগুলিকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

হেরাসিম লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাঙ্গালা নাট্যশালা

প্রথম বাঙ্গালা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। ইহার সহিত পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গলা নাট্যশালার কোন যোগ নাই। কারণ, এই নাট্যশালায় বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা বাঙ্গালা নাটক প্রদর্শিত হইলেও, ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালী নহেন,—এক জন রুশদেশবাসী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশদেশবাসী নানা দেশ ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়েন এবং ২৫নং ডুমতলাতে (বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীটে) এক নাট্যশালা স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তিনি বিলাত চলিয়া যান এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সেখানে একখানা হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় লেবেডেফ কি করিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার একটি বিবরণ আছে। এই বিবরণ এতদিন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ারসনের দ্বারা 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে (অক্টোবর সংখ্যা, পৃঃ ৮৪-৮৬) উহা প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা নাট্যশালা সম্বন্ধে লেবেডেফ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল;—

> [ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে] এই সকল গবেষণার পর আমি **The Disguise** ও **Love is the Best Doctor** নামে দুইখানা ইংরাজী নাটক বাঙ্গালাতে অনুবাদ করি। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা—সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক না কেন—অনুকরণ ও হাসিতামাসা বেশী পছন্দ করে। সেজন্যই আমি চৌকীদার, চোর, উকীল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুইখানি নাটকই নির্ব্বাচন করিয়াছিলাম।
>
> আমার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে পর আমি কয়েক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত ডাকিয়া আনিলাম এবং তাঁহারা খুব মন

দিয়া আমার নাটক দুইখানি পড়িলেন। পড়িবার সময়ে কোন্ কোন্ যায়গা তাঁহাদের কাছে খুব ভাল লাগিল এবং কোন্ কোন্ যায়গায় তাঁহারা খুব মুগ্ধ ও বিচলিত হইলেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া রাখিলাম। এই উপায়ে আমার অনূদিত নাটক দুইখানির হাস্য-রসাত্মক ও গম্ভীর উভয় প্রকার দৃশ্য-গুলিরই যে অনেক উৎকর্ষ হইল, এ কথা বলিলে নিজের সম্বন্ধে অযথা প্রশংসাবাদ হইবে না। নিজের জন্য সৌভাগ্য-ক্রমে যে শিক্ষক জোগাড় করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা না পাইলে অন্য কোন য়ুরোপীয়ের পক্ষে আমি যাহা করিতে পারিয়াছিলাম, তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে।

পণ্ডিতরা অনুমোদন করিয়া গেলে পর আমার ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার নিকট এক প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আমি এই নাটক সর্ব্বসমক্ষে অভিনয় করিতে প্রস্তুত থাকি, তবে তিনি আমাকে এ-দেশী অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনিয়া দিতে পারেন। তাঁহার এই প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং য়ুরোপীয়দিগের চিত্তবিনোদনের জন্য আমার নাট্যশালার সঙ্কল্প অবিলম্বে সফল করিবার উদ্দেশ্যে, গবর্ণর-জেনারেল স্যর জন্ শোরের নিকট যথারীতি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিলাম। তিনিও বিনা দ্বিধায় তাহা মঞ্জুর করিলেন।

এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা আশ্বস্ত এবং প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি নিজে নক্সা করিয়া কলিকাতার কেন্দ্রস্থল ডোম (ডোম-লেন) টোলায় একটি বিস্তৃত নাট্যশালা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলাম। ইত্যবসরে আমার ভাষা-শিক্ষক গোলোককে আমি দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিবার কাযে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তিন মাসে **The Disguise** নাটকটির অভিনয়ের জন্য অভিনেতা সংগ্রহ ও নাট্যশালা প্রস্তুত হইয়া গেল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭এ নভেম্বর আমি বাঙ্গালা ভাষায় এই নাটক প্রকাশ্যে অভিনয় করাইলাম। পর বৎসর (১৭৯৬) ২১এ মার্চ্চ তারিখেও এই নাটকটি আবার অভিনীত হয়।

এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে'ও প্রকাশিত হয় ;—

By Permission of the Honorable the Governor General.

MR. LEBEDEFF'S

New Theatre in the Doomtullah,

DECORATED IN THE BENGALLEE STYLE

Will be opened very shortly, with a Play

CALLED

THE DISGUISE,

The Characters to be supported by Performers of both Sexes.

To commence with Vocal and Instrumental Music, called

THE INDIAN SERENADE.

To those Musical Instruments which are held in esteem by the Bengallees, will be added European. The words of the much admired Poet Shree Bharot Chondro Ray, are set to Music.

Between the Acts,

Some amusing Curiosities will be introduced.

The Day for Exhibition, together with a particular detail of the Performance, will be notified in the course of the next week.

এই প্রথম বিজ্ঞপ্তির তিন সপ্তাহ পরে আর একটি বিজ্ঞাপনে প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও স্থান সর্ব্বসাধারণকে জানানো হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৬এ নভেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' দেখিতে পাই,—

BENGALLY THEATRE.

NO. 25, DOOMTULLAH.

MR. LEBEDEFF

Has the honor to acquaint the Ladies and Gentlemen of the Settlement,

THAT HIS

THEATRE,

WILL BE OPENED

To-Morrow, FRIDAY, 27th Inst.

WITH A COMEDY,

CALLED

THE DISGUISE.

The Play to commence at 8 o'Clock precisely.

Tickets to be had at his Theatre.

Boxes and Pit,	...	...	Sa.	**Rs. 8**
Gallery,	...	...	,,	,, **4**

২৭এ নভেম্বর তারিখের অভিনয়ের পর আর একবার অভিনয় হয় ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ২১এ মার্চ্চ তারিখে। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' এই অভিনয়েরও একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল ;—

BENGALLIE THEATRE.

NO. 25, DOOMTULLAH.

Mr. Lebedeff presents his respectful compliments to the Subscribers to his Bengallie Play, informs them his second representation is fixed for Monday the 21st instant, and requests they will send for Tickets, and the account of the plot and scenes of the Dramas, on or before Saturday the 19th Instant.

For the better accommodation of the audience, the number of Subscribers is limited to two hundred, which is nearly completed, the proposals for the subscription may be had on application to **Mr. Lebedeff,** by whom subscription at One Gold Mohur a Ticket will be received till the subscription is full.

Calcutta, March 10, 1796.

লেবেডেফ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, তুইটি অভিনয়েই নাট্যশালা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ১৭৯৬, ২৪এ মার্চ্চ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত আর একটি বিজ্ঞাপনে লেবেডেফ সর্ব্বসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সেই বিজ্ঞাপনটি এইরূপ,—

BENGALLY THEATRE.

Mr. Lebedeff, respectfully acknowledges the very distinguished Patronage, the Ladies and Gentlemen of this Settlement Subscribers to his Second **BENGALLY PLAY,** honoured him with, and begs leave to assure them, he has the most grateful sense of the very liberal support afforded him on this occasion, and entreats they will be pleased to accept his warmest thanks. March 24, 1796.*

বাঙ্গালী কর্ত্তৃক নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত

প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীর কীর্ত্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোন যোগ ছিল না। তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না। লেবেডেফের ইংলণ্ড-প্রয়াণের পরই উহা লুপ্ত হইল। বিদেশী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা ও বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকার দেশী নাট্যশালার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। এই চল্লিশ বৎসর বাঙ্গালী-জীবনে একটা যুগ-পরিবর্ত্তনের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙ্গালী-জীবনের উপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ছিল। তখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালীরা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচালী, কবি, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, নূতন য়ুরোপীয় ধরণের কোন আমোদ-প্রমোদের অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করে নাই। এই অভাব তাহারা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল—ইংরাজী শিক্ষা এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহারা এই কলেজে ইংরাজী কাব্য-নাটকের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, যাত্রা প্রভৃতি গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ তাঁহাদের নিকট রুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে হইতে লাগিল। ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া বাঙ্গালীরা যাত্রা প্রভৃতিকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহের' একটি স্থল হইতে আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণ তাহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে লিখিত। কিন্তু তবুও এই বিবরণ প্রথম যুগের ইংরাজী শিক্ষালব্ধ বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও সুপ্রযোজ্য। রাজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন—

> ...খেঁউড় ও কবি যে কি পর্য্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই।... ...
>
> ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্র-সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি-হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।......
>
> গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্ম্মল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—

---

* লেবেডেফের নাট্যশালার কথা শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায়ই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় প্রকাশ করেন। তাহার পর শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই নাট্যশালা সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ১৩৩১ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখের 'নাচ-ঘর' পত্রে (পৃঃ ৩-৬) প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড় প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্ম্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি। (বিবিধার্থ-সংগ্রহ, মাঘ ১৭৮০ শক, পৃ ২৩৪-৩৫)।

রাজেন্দ্রলালের কালে বাঙ্গালা দেশে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বাঙ্গালা দেশে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সবেমাত্র বাঙ্গালীরা নাটকের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীদের জন্য ইংরাজী ধরণের একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামক বাঙ্গালা সংবাদপত্রে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই মন্তব্যটি অনূদিত হইয়া 'এশিয়াটিক জর্ণালে'ও প্রকাশিত হইয়াছিল। মূল মন্তব্যটি সংগ্রহ করিতে না পারায় নিম্নে সেই ইংরাজী মন্তব্যটির অনুবাদ দেওয়া হইল।—

এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরাজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সভায় নটনটী থাকিত, তাহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং সুললিত কাব্য, সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রতি আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু সখের যাত্রাও কদাচিৎ হয়। সুতরাং ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরাজদের মত 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে বেতনভোগী ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষের নির্দ্দেশমত লিখিত নাটক অনুযায়ী মাসে একবার কাব্য আবৃত্তি করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে। *

'সমাচার চন্দ্রিকা' যে-কথা প্রকাশ্যভাবে লিখিয়াছিলেন, সে-যুগের সকল বাঙ্গালীই তাহা অনুভব করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনেকেই কলিকাতার ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী অভিনয় দেখিতে যাইতেন এবং সকলেই ইংরাজী ধরণে বাঙ্গালা নাটক অভিনয় করাইবার জন্য উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু এই উৎসাহের ফলে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক একবারেই বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় প্রদর্শন আরম্ভ হইল না। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা নিজেদের বাড়ীতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে নাট্যকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন, বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার সূত্রপাত হইল শেক্‌সপীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ লইয়া। বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে, এ-কথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রার সহিত বাঙ্গালা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবে যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল। এই প্রবন্ধ নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে হইলেও এখানে যাত্রা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া লওয়া বোধ করি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যাত্রার যে রূপান্তরের কথা বলিলাম, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই আরম্ভ হয়। এইরূপ ধরণের যাত্রার একটি দৃষ্টান্ত ১৮২১ সনে রচিত ও প্রকাশিত "কলিরাজার যাত্রা"। অনেকে বলিয়া থাকেন, এই যাত্রাটিই প্রথম বাঙ্গালা নাটক ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যে 'পেণ্টোমাইম' মাত্র, তাহা ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী (১৪ই মাঘ ১২২৮) তারিখের 'সমাচার দর্পণ' নামক বাঙ্গালা সমাচারপত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে :—

নূতন যাত্রা।—এইক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক২ প্রকার ছদ্ম বেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রামহইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাস দাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর শুকৃকৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।

**Asiatic Journal* for August 1826 (Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 214).

কলিরাজার যাত্রার কথা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য নূতন ধরণের যাত্রার উল্লেখও আমরা পাই। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই (৩০ আষাঢ় ১২২৯) তারিখের 'সমাচার দর্পণে' আমরা দেখিতে পাই,—

নূতন যাত্রা।—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান্ বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয় এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্ব্বত্র জ্ঞাত করিতেছি ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতি চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।

এই 'নলদময়ন্তী' যাত্রার গানগুলি রাম বসুর রচিত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে প্রকাশিত "৺রাম বসু" প্রবন্ধে আছে,—

কলিকাতার নিজ্ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন।···

এইরূপে বাঙ্গালা দেশে একটা নূতন ধরণের যাত্রার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন,—

গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত দেশের বিনোদনব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ্সিত ব্যাপারের সূত্র হইয়াছে। (বিবিধার্থ-সংগ্রহ, মাঘ ১৭৮০ শক, পৃ, ২৩৫)

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অভিনীত একটি নূতন ধরণের যাত্রার বিবরণ দিয়া যাত্রার কথা শেষ করিব। এই নূতন যাত্রাটি নন্দবিদায় যাত্রা। উহার প্রথম অভিনয় হয় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে তাহার উল্লেখ আছে। ১৮৪৯, ৩০এ মার্চ্চ (১৮ চৈত্র ১২৫৫) শুক্রবার তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' নন্দবিদায় যাত্রার প্রথম দুই অভিনয় সম্বন্ধে "বাহির শিমলা নিবাসিনঃ" যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি—

···যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় নন্দবিদায় নামক এক নূতন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন···। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা মহানগরে যাত্রার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং যদ্যপিও তাহাতে অনেকে সর্ব্ব-সাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছে তথাচ পেসাদারিত্বা প্রযুক্ত ভদ্র বিদ্বান লোক তাহারদের মধ্যে না থাকাতে কোন সম্প্রদায় যথার্থরূপে উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই এবং বোধ করি শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিবেচনাতেই সঙ্গীতবিদ্যায় গুণান্বিত কয়েক জন ভদ্র সন্তান লইয়া যাত্রা করিতে মানস করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এ বিষয় সুকঠিন নহে, যেহেতুক তিনি যোড়াসাঁকোর হাফ আখড়াই দলের প্রথমাবস্থাবধি সম্পাদকতা করিতেছেন, এবং কবি ও নিজেও সুরসিক, ধনাঢ্য, কবিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার প্রচুর ব্যুৎপত্তি আছে, এবং ঐ পাড়ার তাবতে তাঁহার অতিশয় সম্মান করেন। জ্ঞাত হইলাম এক বৎসর হইল ঐ হাফ আখড়াই দলের প্রধান লোক লইয়া এবং ৪।৫ হাজার টাকাব্যয়ে নন্দবিদায় যাত্রার সূত্র করেন এবং পূর্ব্বগত তৃতীয় শনিবার রাত্রে ঐ যাত্রার প্রথম বৈঠক হয়,···গত পূর্ব্ব শনিবারে যাত্রার দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী বড় নহে, তন্নিমিত্ত অনেক দর্শকের সমাগমে অতিশয় জনতা হইয়াছিল···।

সমস্ত রাত্রি এবং বেলা চারি দণ্ড পর্য্যন্ত যাত্রা হইয়াছিল, যাত্রা যে অতি উত্তম তাহার কোন সন্দেহ নাই,···। যে সকল ব্যক্তিরা সাজিয়াছিলেন, তাহারদের বস্ত্রালঙ্কারাদি অতি উত্তম হইয়াছে, বেহালা তবলা এবং ঢোলক-বাদকেরা অতিশয় গুণান্বিত এবং গীত সকলের মধ্যে প্রচুর কবিতাশক্তি প্রকাশ আছে, বোধ করি বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে মহাকবি নিধুবাবুর টপ্পার সমান অনেক হইবে, প্রায় তাবৎ গীত হাফ-আখড়াইর খেয়াল, কীর্ত্তনের এবং টপ্পার সুরেতে গাহনা হইবাতে অতিশয় মিষ্ট এবং সুশ্রাব্য হইয়াছিল, শ্রীযুত বাবু তিতুরাম বড়াল, রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র (কি উপাধি তাহা জানি না) প্রভৃতি যাঁহারা নন্দ মন্ত্রী এবং উপানন্দ সাজিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যাঁহারা আসরে বসিয়াছিলেন তাঁহারা যে গান করিলেন, বোধ করি এপ্রকার গান সচরাচর শুনা যায় নাই।

তাঁহারদের হাফ আখড়াইর স্বরে পয়ার কাটান বড় চমৎকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বোপরি ছিদাম নাম্নী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং চমৎকৃত করিয়াছে, ছিদামের বয়স উর্দ্ধ ১৩ বৎসর,...তাহার স্বরের ন্যায় মিষ্ট স্বর আমি আর কখন শ্রবণ করি নাই,...। অন্যান্য বালকেরা এবং আর একটা বালিকাও অতি উত্তম গান করিয়াছিল।

এই 'নন্দবিদায়' যাত্রা উপলক্ষে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। এই যাত্রা গতানুগতিক যাত্রা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে স্ত্রীচরিত্র মেয়েরা অভিনয় করিত। ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাটীতে নন্দবিদায় যাত্রার তৃতীয় অভিনয় সম্বন্ধে ১৭ই এপ্রিল 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন,—

'এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এ যাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার। *

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার

এখন নাট্যশালার কথায় ফিরিয়া যাওয়া যাক। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতে পাই :—

এতদ্দেশীয় নর্ত্তনাগার।—কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্ত্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মসকল নির্ব্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন।—শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। ঐ নর্ত্তনশালা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮এ ডিসেম্বর এই নাট্যশালার দ্বার উন্মোচিত হয়। শেক্‌সপীয়রের জুলিয়াস সিজর নাটকের অংশ-বিশেষ ও উইলসন কর্ত্তৃক অনূদিত ভবভূতির উত্তর-রামচরিত এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। স্যর এডওয়ার্ড রায়ান্, কর্ণেল ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অভিনয়কালে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

হিন্দু নাট্যশালা।—হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্ব্ব২ বুধবারে নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আরম্ভ হয় এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনবিষয়োৎসুক এক মহাশয়কর্তৃক রচিত অনুষ্ঠান পত্রের পাঠ হইল।

তৎপরে শ্রীযুত ডাক্তার উইলসন সাহেবকর্তৃক সংস্কৃত রামচরিত্রবিষয়ক ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত স্বসজ্জ যাত্রানুষ্ঠায়ি কর্তৃক উচ্চারিত হইল। এতাদৃশ অন্যান্য কাব্যও তৎসময়ে পঠিত হইল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক কাব্যের শেষ প্রকরণ পাঠ হইল। দিদৃক্ষু ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রীযুত সর এডবার্ড রৈয়ন সাহেব এবং অন্যান্য মান্য বিবি ও সাহেবেরা ছিলেন তদ্দৃষ্টে তাঁহারা পরমাপ্যায়িত হইলেন। অপর হরকরা পত্রে লেখে শ্রুত হওয়া গেল যে ইহা হইতেও এক বৃহন্নাট্যশালা প্রস্তুত হইবে এবং তৎকর্ম্ম সম্পাদনার্থ যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষমধ্যে প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। *

এক পত্রপ্রেরক 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় এই অভিনয়েরই আর একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন,—

মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।

...গত ১৪ পৌষ বুধবার [২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১] রজনীযোগে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি একট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। আমি চক্ষে দেখি নাই আমার অনেক আত্মীয় ঐ রামযাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অবগত হইলাম ...রামলীলা নাটকের মত যাহা ২ ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকেরা তরজমা ভাসাভ্যাস করিয়া

* প্রচলিত যাত্রায় তখন ভদ্রসমাজ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জুন তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—

"এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদপ্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষবিধান হয় না,...।"

এই কারণে প্রচলিত যাত্রা তখন মার্জ্জিত রূপ ধারণ করিতেছিল।

* এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী তারিখের কাগজেও এই নাট্যশালার কথা আছে।

সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ সীতাইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন তাহাতে কে কোন্ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে লিখিব।...এদেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক গ্রন্থসকল বর্ত্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইঁহারা ধনিলোকের সন্তান ইঁহারদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিদমুনের ছোঁড়াগুলা সর্ব্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আহুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক, কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ্ নাই।

ইঁহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশ-ভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এক জন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলিন বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি, তাঁহারা যেং সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা। ...১৫ পৌষ। কস্যচিৎ পাঠকস্য। (১৮৩২, ৭ই জানুয়ারী তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

এই নাট্যশালাতেই কয়েক মাস পরে **NOTHING SUPERFLUOUS** নামে একটি নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মার্চ্চ তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ্চ বহু সম্ভ্রান্ত ও ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকের সমক্ষে এই নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে পাত্রপাত্রীর বেশভূষা অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। দৃশ্যপটাদি প্রধান ইউরোপীয় নাট্যশালাগুলির সমকক্ষ না হইলেও বেশ রুচিসম্মত হইয়াছিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদৃতা

আলোকের রক্তপদ্ম-লালাঙ্কিত রথে হেরিলাম অস্তাচলযাত্রী সে রবিরে
গোধূলির আধ-ছায়ে মিশে যায় সুবিস্তীর্ণ ধরণীর সীমা;
সন্ধ্যা নামে বিশ্বরমা কল্যাণীর মত সুমঙ্গল স্নিগ্ধ-শিখা-কম্প্র দীপ করে,
যেন কার ধ্যান-মুগ্ধ হেরিলাম অচঞ্চল অপার নীলিমা!
আমার অন্তর-প্রান্তে ছন্দের আহ্বান বহিয়া আনিল কোন্ সুদূর বারতা—
শ্যাম তৃণাঞ্চল আঁকা অন্ধকার পথ বাহি চ'লেছিনু একা;
সন্ধ্যার প্রথম তারা দেখেছিল শুধু সুনির্জ্জনে সেই মোর একা পথ-চলা,
মনে যেন ছিল আশা কোথা আজ কার সাথে হবে মোর দেখা!
শুক্লা চতুর্দ্দশী রাত ছিল মেঘে ঢাকা-নিষ্প্রভ দিগন্তে কোথা চাঁদের আভাস!
বিবাগী বায়ুর গানে সকরুণ হ'ল মোর অন্তরের কবি;—
আমার পথের পার্শ্বে ভীরু বনফুল ধূলিক্লিষ্ট ম্লান গন্ধ তা'রে নিনু তুলি
হাসিল সে অবজ্ঞায় ফুল্লদল কুরুবক কাঞ্চন করবী।
বসন্তের আমন্ত্রণে দক্ষিণ-বাতাসে এলো যারা সৌগন্ধ্যের স্বর্ণচূড় রথে
তা'দের বিজয়-গানে উৎসবের সভাতল পূর্ণ চারি ধারে,
দীপ্তচ্ছটা প্রমোদের মুখর বাসর—সেথায় হারায় মোর সঙ্গীতের ভাষা,
নম্র-ভীরু শূন্যতাবে তাই যে বেসেছি ভালো গোপনে আঁধারে!
যুগ যুগান্তর ধরি যে রহিল একা উপেক্ষার ক্লান্তি ভরা ছায়ার আড়ালে
জনতার উদাসীন চিত্ত হ'তে চিরদিন অতি দূরে দূরে,
আমি তারে লব' ডাকি' নিভৃতে গোপনে, আমার গানের ছন্দে সে রহিবে গাঁথা
মনের বরণ-মাল্য আমি দিব—সে রহিবে বাঁধা মোর সুরে!

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার।

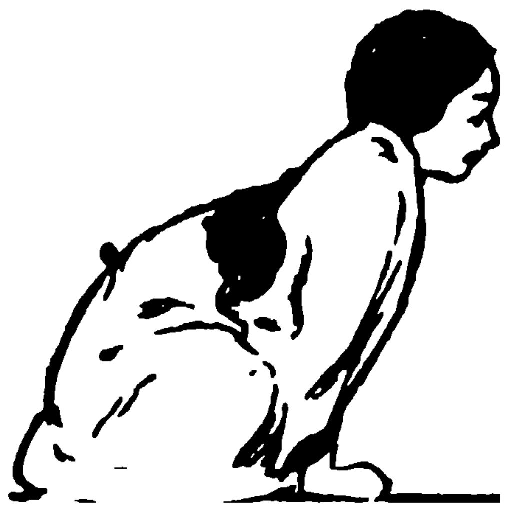

লিটারারি কনফারেন্স

(গল্প)

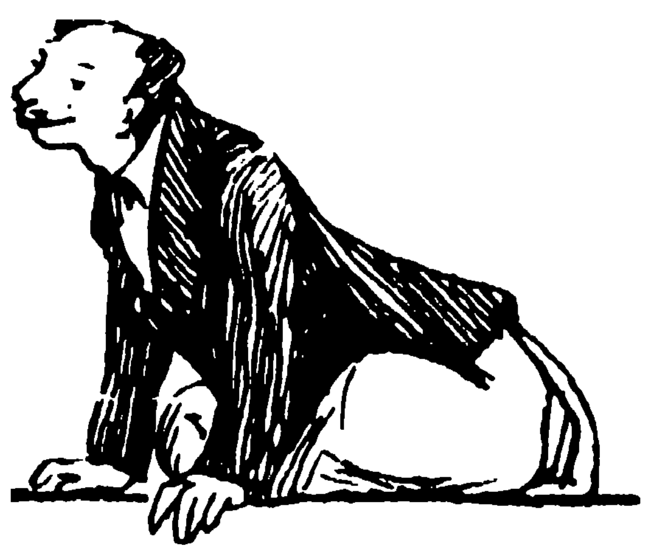

চুঁচুড়ায় লিটারারি কনফারেন্সে এবার খুব ভিড় হইয়াছিল। কলিকাতার কাছে; প্রত্যহ যাতায়াত চলে; এদিক্‌কার ডেলিগেটরা অল্প-ব্যয়ে পিক্‌নিকের লোভ ছাড়িতে পারিলেন না! আর ওদিক্ হইতে যাঁরা আসিলেন, তাঁরা বিরাট গম্ভীর মুখে, বহু চিন্তায় বুক ভারী করিয়া চুঁচুড়ায় আসিলেন, বাঙলা সাহিত্যকে তিন দিনের বক্তৃতায় বৈকুণ্ঠের কাছাকাছি তুলিয়া ধরিবেন—সেই সঙ্গে একটু স্বার্থ—গঙ্গার তীরে চুঁচুড়া; কাছে কলিকাতা; দু'চারিটা দরকারী জিনিষও কেনা যাইবে; তার উপর হুগলীর প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত লালবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বদান্যতা এবং দাক্ষিণ্য এমন বহু-দূর-বিশ্রুত, এবং তিনিই যখন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, তখন তাঁর আতিথ্য ··

কিন্তু আমরা চুঁচুড়া লিটারারি কন্‌ফারেন্সের রিপোর্ট লিখিতে বসি নাই। লালবিহারী বাবুর আতিথ্যের পরিচয় যাঁরা জানিতে চান, তাঁরা ১০ই তারিখের 'দৈনিক বসুমতী', কিম্বা ১১ই তারিখের 'বঙ্গবাসী' বা 'হিতবাদী' পড়িবেন। আমরা ঐ কন্‌ফারেন্সের পরের কথা বলিতেছি।

মাঠে কন্‌ফারেন্সের তাঁবু ভাঙ্গিয়া দলিত বিশুষ্ক তৃণশয্যা আবার উঁকি দিল, ডেলিগেটের দল বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের বিজয়া-দশমী সারিয়া শান্তি-জল লইয়া যে যার কাজে আবার প্রত্যাবৃত্ত হইলেন—শুধু উকিল শ্রীযুক্ত লালবিহারী চক্রবর্ত্তীর গৃহে দুটি বিশিষ্ট অতিথি স্থাণুবৎ রহিয়া গেলেন।

বাঙলা সাহিত্যের যারা একটু সংবাদও রাখেন, এ দুই অতিথির নাম তাঁদের অবিদিত নয়। প্রথম ও প্রধান অতিথি মদনগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন! দি ট্রান্স গ্যাঞ্জেটিক পাব্লিশিং সিণ্ডিকেটের তিনি স্বত্বাধিকারী। দ্বিতীয় অতিথি শ্রীযুক্ত কাশীপদ ঘোষাল—যার লেখা স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ পড়িয়া বাঙলার ছাত্রের দল উজ্জ্বল বর্ণে বাঙলার ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতেছে। কাশীপদর ব্যাকরণ, কাশীপদর ভূগোল, ইতিহাস, পাটীগণিত, সাহিত্য-সংগ্রহ, ট্রান্সলেশন-রী-ট্রান্সলেশন—কি নাই? সর্ব্ব বিভাগে সকল দিকে তাঁর প্রতিভার আলো একেবারে আলোক-চক্রপাল সূর্য্যের মত জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। ছেলের দল অবাক্ হইয়া ভাবে, এমন লোককে সাইডিংয়ে রাখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিন্ত আছে কি করিয়া! অর্থাৎ কাশীপদর নাম ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডারের গ্রাজুয়েট-তালিকায় তারা বহু প্রয়াসে খুঁজিয়া পায় নাই! এবং···কিন্তু পরচর্চ্চায় কাজ নাই!

এই কাশীপদ ঘোষালটি পাব্লিশার মদনগোপালের বন্ধু ও মন্ত্রী অর্থাৎ ব্যাকরণকে দু'পায়ে দলিত করিয়া মদনগোপালকে যদি আমরা লক্ষ্মী বলি তো এই কাশীপদ ঘোষাল তাঁর প্যাঁচা বাহন! যেহেতু মদনগোপাল-লক্ষ্মী এই প্যাঁচা-বাহনটি নহিলে কখনই এমন উচ্চে উড়িতে বা উঠিতে পারিতেন না—আমাদের অন্ততঃ বিশ্বাস তাই!

উকিল লালবিহারী বাবুর বাড়ীখানি গঙ্গার ধারে। মস্ত বাড়ী। তার সঙ্গে বাগান; বাগানে ফল-ফুলের গাছ, প্রকাণ্ড ঝিল। এক কালে কোন্ সৌখীন ডচের বাগান-বাড়ী ছিল, কালে দু'তিন হাত ঘুরিয়া লালবিহারী বাবুর হাতে আসিয়াছে। লালবিহারী বাবুর অঢেল পয়সা, সখ প্রচুর, কাজেই তিনি ইন্দ্রপুরী গড়িয়া তুলিয়াছেন।

কন্‌ফারেন্সে আসিয়া মদনগোপাল বাবু তাঁর বাহন-সমেত এই গৃহেই আতিথ্য লন,—লালবিহারী বাবুর সঙ্গে তিনি এক ক্লাশে পড়িয়াছিলেন, তাই খুব ভাব।

এখন কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিলে তিনি কহিলেন,—মাসখানেক এখানে থেকে যাই লালু। বেজায় খাটুনি চলে বারো মাস। একটু rest—মানে, একটু holiday কখনো মেলে না। বয়স হয়েছে তো···

মোটা ব্রিফের মধ্য হইতে মুখ তুলিয়া লালবিহারী বাবু বলিলেন—খুব ভালো কথা!

মদনগোপাল বাহনের পানে চাহিলেন, কহিলেন—তুমি কি করবে হে কাশী?

কাশীপদ কহিল,—আমারো থাকা ছাড়া তা হ'লে উপায় দেখছি নে! ঐ "যুবা-স্বাস্থ্য" বইখানা সুরু করেছি; তা ছাড়া আপনার কথায় "মানুষ মরে কেন?" বইখানা

ধরতে হবে। আপনার কাছ-ছাড়া হয়ে থাকলে কাজ এগুবে না তো···

মদনগোপাল কহিলেন—তা হ'লে তুমিও থেকে যাও—কখনো দরকার পড়ে, এক বেলার জন্য না হয় কলকাতায় যাবে! ঘরে তো স্ত্রী নেই।

কাশীপদ কহিল,—না!

স্ত্রী না থাকার কারণ, কাশীপদ বিবাহ করে নাই, তা নয়। বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রী মারা গিয়াছেন, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রাখিয়া। তারা ডাগর হইয়াছে। মেয়েটির বিবাহ দিলেই হয়, ছেলে ম্যাট্রিক পড়িয়া ট্রান্স গ্যাঞ্জেটিক পাব্লিশিং সিণ্ডিকেটে ঢুকিয়াছে; প্রুফ-রীডারের কাজ করে। তবে কাশীপদর বাসনা, তাকেও স্কুলপাঠ্য বই লেখায় পোক্ত করিয়া লইবে, যাহাতে বংশ-পরম্পরা-ক্রমে এই সিণ্ডিকেটটিকে করায়ত্ত বা কবলিত রাখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে।

২

মদনগোপাল থাকিয়া যাওয়ায় লালবিহারীর গৃহিণী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর আনন্দ হইল। না মশায়,—Eternal Triangleএর এতটুকু আভাস ইহাতে নাই! এ আনন্দের অন্য কারণ আছে।

লালবিহারীর পশার এবং পয়সা প্রচুর, কিন্তু ছেলে-মেয়ে নাই। গৃহিণী সাবিত্রীর বয়স হইয়াছে; এ বয়সে ছেলে-মেয়ে হইবে, সে আশাও বিলুপ্ত-প্রায়। গৃহিণী এক দূর-সম্পর্কের ভাইঝীকে কাছে রাখিয়া মানুষ করিতেছেন। ভাইঝীর নাম মলিনা। মলিনার মা নাই, বাপ নাই···নেহাৎ আশ্রয়-হীনা। তবে ভাগ্য ভালো, নহিলে সাবিত্রী দেবী কন্যার আদরে তাকে গৃহে রাখিবেন কেন!

সাবিত্রী দেবী সাতাশখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন—আটাশ নম্বরেরটি লিখিতে সুরু করিয়াছেন। আপনাদের বিশ্বাস হইতেছে না? সাতাশখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন যে-মহিলা, তাঁর নাম আপনারা জানেন না!

কিন্তু নাম না জানার কারণ আছে। অর্থাৎ সাবিত্রী দেবীর কোনো উপন্যাসই ছাপিয়া বাহির হয় নাই; না মাসিক পত্রে, না সাপ্তাহিকে—গ্রন্থাকারে তো নয়ই! পয়সা থাকিলেও ছাপার তদ্বির, বা মাসিকের দ্বারে ঘোরা—এ-সব কে করে? লোকাভাব! মুহুরি? তারা মকর্দ্দমার আর্জ্জী-জবাবের মুসাবিদা ও নকল করিতেই জানে, এ-সব আর্টের ব্যাপারে তাদের কি মাথা আছে! না, তারা কিছু বোঝে! স্বামীর এ-দিকে ঔদাস্য নাই, সত্য। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বামীর উৎসাহ তেমন কৈ? অবসর-কালে সাবিত্রী দেবীকে উপন্যাস লেখায় তন্ময় দেখিয়া কতবার বলিয়াছেন,—তাই তো, এত বই লিখেচো—ছাপালে বেশ হয়। সে কথা শুনিয়া সাবিত্রী দেবী আনন্দে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়াছেন—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! তোড়জোড় করিয়া ছাপাখানার সঙ্গে ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই; তাই আজ এত বড় পাব্লিশার গৃহে আসিয়া বসিলে সাবিত্রী দেবীর মনে বহু কালের সযত্ন-বর্দ্ধিত আশা-তরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

লালবিহারী বাবুর গৃহে পর্দ্দার কড়াক্কড় নাই—সাহেব-সুবার পার্টিতে স্ত্রীকে তিনি লইয়া যান, সুতরাং মদন-গোপালের সঙ্গে তাঁর আলাপে ব্যাঘাত ঘটিবার হেতু ছিল না।

সকালে বাগানের এক ধারে চেয়ারে বসিয়া মদন-গোপাল বাবু কাশীপদর লেখা প্রাইমারী ভূগোলের পাণ্ডুলিপি পড়িতেছিলেন, মলিনা আসিয়া দাঁড়াইল; তার হাতে ডিশ, ডিশে মোহনভোগ।

মদনগোপাল কহিলেন,—কি ও মা-লক্ষ্মি?

মলিনা কহিল,—মোহনভোগ—পিশিমা পাঠালে।

মদনগোপাল কহিলেন,—রাখো।

তিনি লেখা পড়িতেছিলেন নিবিষ্ট মনে। মলিনা কহিল,—ও কি পড়চেন? খপরের কাগজ নয় তো—

—না।

—তবে?

—একটা লেখা। এ থেকে বই ছাপা হবে।

—ও! মলিনা একটু থামিয়া কহিল,—আচ্ছা, আপনি তো বই ছাপেন,—পাব্লিশার—পিশিমা অনেক বই লিখেছে—সাতাশখানা—সেগুলো পিশিমা ছাপতে চায়—তার ব্যবস্থা হয় না?

মদনগোপাল মলিনার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—বটে!

ঘাড় নাড়িয়া মলিনা জানাইল—হাঁ।

মদনগোপাল কহিলেন—কি বই?

—উপন্যাস।

—উপন্যাস আমি বড় ছাপি না। শুধু দু'খানি ছেপে-ছিলুম একবার···নেহাৎ দায়ে পড়ে।

—কেন? উপন্যাস বিক্রী হয় না?

—হয়। তবে উপন্যাস ছাপার জন্য অন্য পারিশার আছে।

মলিনা কহিল,—বা রে! এ তো দোকানদারী নয় যে, যে আলু বেচবে, সে মাছ বেচবে না···

অদূরে কাশীপদ বসিয়াছিল তৃণ-শয্যায়; একান্তে বসিয়া "মানুষ মরে কেন?" গ্রন্থ কি বলিয়া আরম্ভ করিবে, তাহারি চিন্তায় নিমগ্ন। মলিনা আসিতে তার মন মলিনার উপর পরম আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মলিনাকে তার দেখিতে বেশ লাগে, তরুণী, কিশোরী···রূপের শিখার মত! কথা-বার্ত্তাতেও বেশ একটি দীপ্তি আছে! মলিনার কথা শুনিয়া কাশীপদ হাসিয়া উঠিল। সে-হাসিতে চমকিয়া মলিনা চাহিয়া দেখে, রঙ্গন ফুলের ঝোপের কাছে বসিয়া কাশীপদ—সামনে মোটা খাতা, হাতে ফাউণ্টেন পেন্।

মলিনা কহিল,—ওখানে ব'সে কি করচেন?

কাশীপদ কহিল,—বই লিখচি।

মলিনা কহিল,—কি বই? পাটীগণিত?

কাশীপদ কহিল,—আমি বুঝি কেবল ঐ সবই লিখি? মতি গেল বাজারে এক টাকা নিয়ে—তিন পয়সার সীম, পাঁচ পয়সার ঝিঙে, আর স'তিন আনার আলু কিনলে; তার পর পাণ কিনে বাড়ী ফিরলো; ফিরে দেখে, হাতে বাকী আছে পাঁচ আনা তিন পয়সা;—তা হ'লে ক'পয়সার পাণ সে কিনেছিল, বলো তো? এই লিখে বেড়াই। বটে?

হাসিয়া মলিনা কহিল,—বা রে, আপনার পাটীগণিত থেকেই তো আমরা অঙ্ক শিখেচি।

কাশীপদ কহিল,—না, না—দু'খানা উপন্যাস এক দিন লিখেছিলুম—সে আজ বিশ বছরের কথা। তার পর এই মদন বাবুর পাল্লায় পড়লুম।···ভাগ্যে পড়েছিলুম, তাই খেতে-পরতে পাচ্ছি এবং বেশ ভালো রকমই। না হ'লে সে উপন্যাস-লেখা ধ'রে থাকলে আজ দোরে-দোরে ভিক্ষা চেয়ে ফিরতে হতো।

মলিনা কহিল,—উপন্যাস বুঝি বিক্রী হয় না?

কাশীপদ কহিল,—হয়, তবে কম। জানো, তোমাদের কবি-সম্রাট···অর্থাৎ রবি ঠাকুর মশায়—তিনিও 'পাঠ-সঞ্চয়' ব'লে স্কুলের বই লেখা সুরু করেচেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেন? এ হলো আলাদা জিনিষ, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপার—ভারী জটিল কাজ! এর ধারাই স্বতন্ত্র।

মলিনা কোনো কথা বলিল না, মদনগোপালের পানে চাহিল, চাহিয়া বলিল,—মোহনভোগ যে জুড়িয়ে কাই হয়ে গেল আপনার।

—এই যে মা-লক্ষ্মি, খাই!

খাতা রাখিয়া মদনগোপাল ডিশ্ হাতে লইলেন; এবং এক ড্যালা মোহনভোগ মুখে পুরিয়া তিনি কহিলেন,—তোমার পিশিমা উপন্যাস লিখেচেন—বটে!

মলিনা কহিল,—সাতাশখানা। আবার একখানা আরম্ভ করেচে। আমি কত বলি যে পিশিমা, বই ছাপাও। তা পিশিমা বলে, দূর! কোথায় ছাপা হবে—কে ছাপিয়ে দেবে? এই জন্য হয় না! পিশেমশাই বলে, দাও না ছাপতে, যা খরচ হয় দেবো। তবু ছাপতে দেওয়া আর হয় না!···এখন তো সুবিধা হয়েছে, আপনি আছেন, আপনি ব্যবস্থা করুন না ছাপাবার···

মদনগোপাল গম্ভীর মুখে কহিলেন—হুঁ।

রাত্রে আহারের সময় কথাটা আবার উঠিল। মলিনাই কথা তুলিল। সাবিত্রী দেবীর পানে চাহিয়া মদনগোপাল কহিলেন—সত্যি আপনি উপন্যাস লিখেচেন, বৌঠাকরুণ?

লালবিহারী কহিলেন—হ্যাঁ হে, তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলুম—উনি বই লেখেন—খাশা সব গল্প! আমি দেখে অবাক্ হই। বাঙালীর মেয়ে—আলু-পটলের হিসাব আর রান্নাঘর তদ্বির করার মধ্যে মাথায় আসেও তো! সত্যি হে, তুমি ছাখো—আমি ছাপাবার খরচ দেবো—তুমি শুধু দেখে-শুনে ছেপে দাও, ভাই!

মদনগোপাল কহিলেন—বেশ।

কাশীপদ উৎসাহিত হইল প্রবল রকম। সে কহিল—আমায় দেবেন বৌঠাকরুণ, আমি হলুম ট্রান্সগ্যাঞ্জেটিক সিণ্ডিকেটের এডিটার—আপনার উপন্যাস নিয়েই আমরা

উপন্যাস ছাপতে সুরু করি! মেয়েদের লেখা উপন্যাস বাজারে পড়তে পাবে না।

লালবিহারী কহিলেন—মেয়েরা আজ-কাল লিখচেন বুঝি খুব?

কাশীপদ কহিল—খু-উ-ব। বোধ হয়, এই বাঙলা দেশেই আজ তিনশো বাঙালী মেয়ে-নভেলিষ্ট আছেন—কবির তো সংখ্যা নেই!

লালবিহারী বাবুর দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন—বাঃ! ভালো তো! পর-চর্চ্চা ছেড়ে বাঙালীর মেয়ে এমন মহৎ কাজে সময়ক্ষেপ করচেন…

হাসিয়া মদনগোপাল কহিলেন—এও তো পর-চর্চ্চা, ভাই! পাড়ার বগলা চাটুয্যের স্ত্রীর নিন্দা না ক'রে উপন্যাসে-বানানো শ্যামল মুখুয্যের স্ত্রীর চরিত্র জঘন্য ক'রে ফুটিয়ে তোলা—দুয়ে প্রভেদ কোথায়, বলো?

লালবিহারী হাসিয়া কহিলেন—এ তোমার অন্যায় কথা। বঙ্কিমবাবু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস লিখে গেছেন—শৈবলিনীর অন্যায় আসক্তি প্রতাপের উপর…তুমি কি বলবে, এ উপন্যাস লিখে বঙ্কিমবাবু যা করেচেন, ঠিক সেই কাজই তিনি করতেন যদি বৈঠকখানায় ব'সে রটনা করতেন, ঘুঁটে-বাজারের বনমালী হালদারের পরিবার কুঞ্জকামিনী তার পাশের বাড়ীর বনোয়ারী পালের সঙ্গে প্রণয়-চর্চ্চা করে? খাশা logic তোমার!…

মদনগোপাল হাসিয়া কহিলেন—হরে-দরে এক বৈ কি। এ কথা লিখে কি ফল? কার কাজে লাগবে? কার উপকার? চন্দ্রশেখরের স্ত্রী শৈবলিনী প্রতাপকে ভালোবেসেছিল—এ সংবাদের জন্য কার মাথা-ব্যথা ধরেছিল? তার চেয়ে লিখতেই যদি চাও তো লেখো, হ্যাঁ, কি দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত ভালো থাকবে, রাত্রে ঘরের জানলা খুলে রাখবে, না, জানলা বন্ধ রাখবে—কিম্বা Battle of Hastings হয়েছিল কোন্ সালে? কিম্বা পর্টুগালের রাজধানী লিসবন, নিউকাশলে কয়লা প্রচুর! বুঝি, এ সব যত লিখবে, ততই সমাজের মঙ্গল, এতে সকলে শিক্ষা পাবে, জ্ঞান বাড়বে, এগজামিন পাশ করবে।

হাসির একটা হো-হো উচ্চ রব উঠিল। লালবিহারী কহিলেন,—তোমার মঙ্গল সব চেয়ে বেশী—তাই বলো! কিন্তু এ কথারও জবাব আছে,…

—কি জবাব?

লালবিহারী কহিলেন,—আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ পড়েই বিদ্যারম্ভ করেচি—এবং কোথাও সংসার-পথে সেজন্য ঠোক্কর খাইনি বা কোথাও কিছু বাধে নি। আচ্ছা, সে বই থাকতে তোমরা পঁচিশখানা বর্ণপরিচয় ছাপচো কেন? সে কেতাবেও তো সেই অ-আ, আর ক-খ-গ! নতুন দুটো অক্ষর তৈরী করো নি, বা শিক্ষার নতুন দিক্ আবিষ্কার করো নি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে সে বিদ্যার নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না!…সে যা হোক, আমি তোমার বৌঠাকরুণের কখানা বই ছাপিয়ে দিতে চাই…তুমি ভাই সে ভারটুকু নাও। এতে লোক-সমাজের কোনো উপকার হবে, কি হবে না, বুঝচি না; তবে তোমার কম্পোজিটার-সমাজ, দপ্তরী-সমাজ কিছু profited হবে!

হাসিয়া মদনগোপাল কহিলেন,—বেশ!

৩

এ-কাজে সব-চেয়ে উৎসাহ কিন্তু মলিনার। তার দু'বেলা প্রচণ্ড তাগিদ। অগত্যা মদনগোপাল ডাকিলেন—ওহে কাশী…

কাশীপদ কহিল—হ্যাঁ, বৌঠাকরুণ আমায় বলছিলেন, একটু দেখে দিতে। আমার দেখা হ'লে তবে তিনি ছাপতে দেবেন, না হ'লে ভুলটুল থাকলে সমালোচকের দল গালাগাল দেবে!

মদনগোপাল কহিলেন—ঠিক কথা বলেচেন। তুমি দেখে দিয়ো…ভালো করেই ছাপবো'খন। নালুর সখ…খরচ করতে সে নারাজ নয়…দেখা যাক, যদি লেগে যায়, উপন্যাস-বিভাগ স্বতন্ত্র খুললেই হবে!

কাশীপদ সংক্ষেপে কহিল—হ্যাঁ।

সাবিত্রী দেবীর কিন্তু সঙ্কোচের সীমা নাই! সাতাশখানি উপন্যাস একেবারে ছাপিতে দেওয়া যায় না। কোন্‌খানা আগে দেন? "কাঁঠালপাড়ার ঘাট"? না, "চিরায়ুষ্মতী"? না, "সহরের মেয়ে"? না, "গ্রামের বৌ"?

মলিনা বলিল—ক'খানাই নিয়ে যাই পিশিমা! কাশীবাবু দেখে যেটা আগে ছাপতে বলেন…

সাবিত্রী দেবী কহিলেন—'সহরের মেয়ে'টাই ভালো হয়েছে—না রে? ও-বাড়ীর কমলা পড়তে নিয়ে গেছলো; সে বললে,—প'ড়ে চোখের জল রাখতে পারি নি, খুড়ীমা···

—বেশ, সেইটেই দাও···

সাবিত্রী দেবী খাতাগুলার দু'এক পাতা উল্টাইলেন, তার পর কহিলেন—কিন্তু ছাখ মলু···

মলু ওরফে মলিনা কহিল—কি?

সাবিত্রী দেবী কহিলেন—"গ্রামের বৌ"টাও মন্দ নয়! সেই যেখানটায় হৈমবতী অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে চলেছে স্বামীর জন্য ওষুধ আনতে—সেই নিগমানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা—সে তো সত্য সন্ন্যাসী নয়—দুষ্টু জমিদার ইন্দ্রনাথ! ···সে জায়গায় হৈমবতীর তেজ আর সাহস···সত্যি মলু, লেখার সময় আমার গায়েই কাঁটা দিয়েছিল··আমি তো জানি, সব মিথ্যা, আমার মন-গড়া! তবু···

মলিনা পিশিমার পানে চাহিল, কহিল—বেশ, সেটাও দাও।

সাবিত্রী দেবী বারোখানি খাতা মলিনার হাতে দিলেন—ছ'খানা করিয়া খাতায় একখানি উপন্যাস—দিয়া কহিলেন,—গুলিয়ে ফেলিসনে যেন! সব খাতার মলাটে বইয়ের নাম মিলিয়ে দিস্···

মলিনা কহিল,—তাই দেবো।

সে গমনোদ্যত হইল। সাবিত্রী দেবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; মলিনা দ্বারের বাহিরে গেলে ডাকিলেন,—ওরে মলু···

মলিনা ফিরিল, কহিল,—আবার কি?

সাবিত্রী দেবী কহিলেন,—আচ্ছা, এগুলোর চেয়ে প্রথমেই "কাঞ্চনগড়ের কুন্দনসিংহ" খানা দিলে কি হয়? ঐ রহস্য-লহরী সিরিজে যেমন বেরুচ্ছে, সেই ধরণের লেখা—

মলিনা স্থির দৃষ্টিতে পিশিমার পানে চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী দেবী কহিলেন,—তোর মনে পড়ছে না? সেই যেটায় হলদীঘাটের যুদ্ধ শেষ হ'লে প্রতাপসিংহের দলের কুন্দনসিংহ বন্দী হলো···সেই যে রে, শাহজাদী পিরোজ বানুর প্রাণ রক্ষা করলে···

মলিনা কহিল,—বেশ তো, সেটাও দাও···

মলিনা ক'খানা খাতা লইয়া কাশীপদর কাছে আসিল; কাশী বাগানের একাংশে সতরঞ্চ বিছাইয়া খাতা-পত্র লইয়া বসিয়াছিল; মলিনা আসিয়া দেখে, খাতা-পত্র পড়িয়া আছে, কাশীপদ ঘাস ছেঁচিয়া ডান হাতের বুড়া আঙুলে তাহা লেপন করিতেছে।

মলিনা কহিল,—কি করচেন?

কাশীপদ কহিল,—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, ডান হাত নিয়ে কাজ—আর সেই ডান হাতের আঙুল কেটেছি!

মলিনা কহিল,—লিখচেন তো ফাউণ্টেন পেনে, আঙুল কাটলেন কি ক'রে, শুনি?

কাশীপদ কহিল,—কালী ফুরিয়ে গেছলো, কলমে কালী ভরবো। তা, প্যাঁচ এমন শক্ত হয়ে গেছে যে, ছুরির সাহায্য নিলুম—তার পরে ছুরি দিয়ে প্যাঁচ খুলতে গেচি, অমনি ফ্যাঁশ্ ক'রে এই এতখানি···এই ছাখো··

বুড়া আঙুলটা চিতাইয়া কাশীপদ দেখাইল। সত্য, অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে! মলিনা কহিল,—লেখা বন্ধ দু'দিন···?

কাশীপদ কহিল,—কিন্তু বন্ধ দিলে তো চলবে না—খুব ভাব এসেছে···এখনি না লিখতে পারলে খেই হারাবো।

—উপায়?

কাশীপদ কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—তোমার হাতে ও কি?

—পিশিমার লেখা তিনখানা উপন্যাস। পিশিমা আপনাকে দেখে দিতে বলেছে।

—আচ্ছা দেখবো, রাখো।

মলিনা খাতা রাখিল।

কাশীপদ কহিল,—তোমার হাতের লেখা কেমন?

—আমার? মলিনা মৃদু হাসিল। কহিল,—ভারী বিশ্রী—কাগের ছা, বগের ছা!

—দেখি। একটু লেখো তো—

মলিনা কহিল,—কেন?

কাশীপদ কহিল,—লেখো না, দেখি। তা হ'লে তোমায় একটু খাটাবো·· ভূমিকায় তোমার নাম ছাপিয়ে দেবো অবশ্য যে,—এ বই লেখায় শ্রীমতী মলিনা দেবী আমায় বহু সাহায্য করিয়াছেন!

মলিনার আনন্দ ধরে না! সে কহিল,—সত্যি?

—হ্যাঁ।···তা হ'লে মানে, আমি ব'লে যাই, আর তুমি লেখো।

মলিনা কহিল,—বেশ, লিখবো।

উৎসাহ-ভরে মলিনা বসিল,—আঙুলে ঘাস লেপিয়া সেটিকে উর্দ্ধমুখী করিয়া কাশীপদ কহিল,—ঐ পর্য্যন্ত লেখা হয়েছে—তার পর থেকে ধরো···বিলেতে বড় বড় লেখক কেউ নিজের হাতে লেখেন না, তা জানো? সবার একটি ক'রে সেক্রেটারী আছে—আর এই সেক্রেটারী পুরুষ নয়, নারী!

পরম আগ্রহে মলিনা কথাগুলা শুনিল।

কাশীপদ কহিল,—তোমায় দু'দিন সেক্রেটারী করি, কি বলো?

হাসিয়া মলিনা মাথা নাড়িল, অর্থ,—বেশ! সে রাজী আছে সেক্রেটারীগিরি করিতে!

লেখা চলিল। কাশীপদ বলিতে লাগিল—

'মানুষ মরে কেন? ইহাই আমাদের প্রশ্ন। লঘু প্রবৃত্তির ব্যক্তি বলিবেন, মানুষের পরমায়ু ফুরাইলেই মানুষ মরে! বিজ্ঞেরা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তুলিবেন, বলিবেন,—বিধিলিপি! কিন্তু আমরা বলি,—বিধিলিপির অর্থ কি? বিধাতা জন্ম-মৃত্যুর তারিখ কি লিখিয়া রাখেন আগে হইতে? তিনি কি গোরস্থানের Sculptor writer? তাঁর আর কাজ নাই? এত বড় পৃথিবীর এত লোক, শুধু লোক কেন? পশু-পক্ষী—এমন কি কীট-পতঙ্গ—কেঁচো, মশা, মাছি, পচা ফলের পোকা, রোগের ব্যাসিলি, ইহাদের সকলের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ কি তিনি কুঁদিয়া সকলের কপালে লিখিয়া দিয়াছেন? গঞ্জিকা-সেবী ছাড়া এ কথা কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মুখে আনিতে ঘৃণা বোধ করিবেন!

আর তর্কের খাতিরে তাহাই যদি মানিয়া লই, তবে আমাদের একটি অতি-সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিন তো। রোগের ব্যাসিলির কথা ধরি। বিধাতা তাদের কপালেও মৃত্যুর তারিখ লিখিয়া দিয়াছেন নিশ্চয়! তাই যদি তো আজ একগাদা ব্যাসিলি বৈজ্ঞানিকের কবলে প্রাণ হারাইতেছে। বিধাতা কি তাদের কপালে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রের চাপে তাদের মৃত্যু ঘটিবে? এ উন্মাদের যুক্তি! তা ছাড়া ব্যাসিলি কত ছোট—অণুবীক্ষণের সাহায্যে তার অস্তিত্ব বুঝিতে হয়। এত ছোট যে-জীব, তার আবার কপাল আছে নাকি? গড়ের মাঠের মত কপাল? অর্দ্ধচন্দ্রের মত কপাল? ইহার চেয়ে হাস্যকর উদ্ভট কথা আমরা জীবনে শুনি নাই।

এইটুকু লিখিতে আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। বেলা পড়িয়া আসিতেছিল। মলিনার বিরক্তি ধরিল। মানুষ মরে কেন? এ প্রশ্নের সমাধানের ব্যাপারে সে ভাবিয়াছিল, বেশ নূতন একটা কিছু তথ্য জানিবে! তা নয়···

কাশীপদ বরাবর তাকে লক্ষ্য করিতেছিল, গাছে দু'একটা পাখীর গান, ভারী মিঠা· কাশীপদ কহিল,—ভালো লাগচে না?

মলিনা কহিল,—এ কি, ছাই লেখা!···

কাশীপদ স্তব্ধ বসিয়া রহিল, তার দৃষ্টি মলিনার মুখে। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কাশীপদ কহিল,—উপন্যাস, গল্প—এই সবই তোমার ভালো লাগে—না?

ঘাড় নাড়িয়া মলিনা জানাইল, হাঁ।

কাশীপদ আবার চুপ। মলিনা কহিল,—হয়েছে তো লেখা? কথাটা বলিয়া সে নিজের অঙ্গুলির অগ্রভাগ লক্ষ্য করিল।

কাশীপদ ডাকিল,—মলিনা—

সে ডাকে বিস্মিত হইয়া মলিনা কাশীপদর পানে চাহিল।

কাশীপদ কহিল,—আমিও উপন্যাস লিখেচি একদিন···

মলিনা কহিল,—বলছিলেন তো···আবার লিখুন না! এ সব কি যে লেখেন! কে বা পড়বে?

কাশীপদ কহিল,—হুঁ!···কেউ পড়বে না—না?

মলিনা দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল,—আমি তো পড়বো না···

কাশীপদ গম্ভীর। মলিনা কহিল,—পিশিমার খাতা রেখে গেলুম। প'ড়ে ফেলবেন শীগ্‌গির। আমি যাই। গা ধুতে হবে—চুল বাঁধতে হবে—না হ'লে পিশিমার কাছে বকুনি খাবো!···

মলিনা চকিতে চলিয়া গেল। কাশীপদ তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাছের ডালে পাখীগুলা ততক্ষণে আনন্দের কলরব তুলিয়া দিয়াছে, যেন সুরের জলসা বসাইয়াছে!

৪

সাবিত্রী দেবীর কাছে তাঁর লেখার সুখ্যাতিতে কাশীপদ একেবারে সহস্র-মুখ হইয়া উঠিল। এ লেখা ছাপিয়া বাহির করিলেই সাবিত্রী দেবী যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিকার করিবেন, কাশীপদর মনে তাহাতে এতটুকু সংশয় নাই। তবে সকলের বুদ্ধি তো তীক্ষ্ণ নয়—তাই বই ছাপিয়া বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে চাই দীর্ঘ,

সুদীর্ঘ সমালোচনা! সে কাজের ভার লইবে কাশীপদ নিজে! ট্রান্স গ্যাজেটিকের বিজ্ঞাপনের দৌলতে কলিকাতার যত মাসিক আর সাপ্তাহিকের টিকি সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, অতএব ওদিকে কোনো গোলযোগ নাই, শুধু ছাপিয়া বাহির করা!

কি কাগজে বই ছাপা হইবে, কেমন বাঁধাই, মলাটের ডিজাইন কি হইবে—সারাক্ষণ সেই আলোচনা চলে। কাশীপদর আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পড়িয়া রহিল; 'যুবা-খাদ্য' প্রেসে গিয়াছে; তার প্রুফ দেখায় বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। সাবিত্রী দেবী কাশীপদকে এক মুহূর্ত ছাড়িয়া দেন না!

মদনগোপাল কহিলেন,—বই ছাপতে দেবে, দাও—তার এত পরামর্শ কিসের?

কাশীপদ কহিলেন,—লেখা যা—আঃ! বঙ্কিমের পর এমন লেখা পড়ি নি।

মদনগোপাল কহিলেন,—ঘরোয়া কথা তো! স্ত্রীকে স্বামী প্রহার করে আর স্ত্রী তার পা টিপে দেয়—নয় তো ভায়ে ভায়ে মামলা-মকর্দ্দমা? জায়ে জায়ে খুনোখুনি? এই ব্যাপার? আমি ভাবি, এ সব তো নিত্য চোখে দেখছি; উপন্যাস খুললেও তাই! ঐ জন্যই আমি উপন্যাস পড়ি না। আমার মতে উপন্যাস যদি লিখতে চাও তো এমন সব ব্যাপার লেখো, যা সংসারে ঘটে না, সমাজে ঘটে না···

হাসিয়া মলিনা কহিল,—কি লিখবে সব? মানুষে আগুন খাচ্ছে, লোহা চিবুচ্ছে, এক জন মারা গেল, ছেলে-পিলে আছে, উইল ক'রে ছেলেদের বিষয় দিয়ে গেল, তারা ভোগ করবে—তা না কোন্ জঙ্গল থেকে কে এসে সব দখল ক'রে বসলো···এমনি?

মদনগোপাল কহিলেন,—হাঁ, অর্থাৎ নতুন কিছু। তবেই তো তার commercial value! তুমি কি বলো হে, নালু?

লালবিহারী কহিলেন,—যা-খুশী লেখো ভাই, আমি কোনো কথা তুলবো না।

সেই দিনই আরো ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর স্থির হইয়া গেল, 'গ্রামের বৌ' বই আগে ছাপা হইবে। তার পর যেমন একখানি শেষ, অমনি আর একখানি··· কাশীপদ সমালোচনা লিখিতে সুরু করিয়া দিল। সমালোচনায় লিখিল, এত দিনের সাধনায় দেবী বীণাপাণি কমল-বন ছাড়িয়া মরালের পুচ্ছগুলি খুলিয়া লইয়া বাঙলা উপন্যাসে মন দিয়াছেন, নহিলে এমন পবিত্রতা, এমন দীপ্তি, এমন শ্রী, এমন শ্যামলতা, এমন স্নিগ্ধতা, এমন আরাম, এমন আনন্দ, এমন···ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাত্রি দশটার পর একান্তে বসিয়া কাশীপদ এই সমালোচনা সাবিত্রী দেবীকে পড়িয়া শুনাইল। শুনাইয়া বলিল,—Ready রাখলুম। যেমন বই বেরুবে, অমনি এক হপ্তা বাদে এই সমালোচনা এবং আরো বহু···কাগজে-কাগজে। দাঁড়ান না, আপনাকে বাঙলার George Elliot কি Browning-গোছ একটা কিছু বানিয়ে দেবো। তখন নানা পার্টি, নানা সভা-সমিতি থেকে President হবার appeal আসবে। আপনি সময় পাবেন না, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা attend করবেন! এই তো জীবন! না হ'লে তরকারী আর মাছের হিসাব, এর জন্যই কি নারীর সৃষ্টি হয়েছিল?

সাবিত্রী দেবী মানস-নয়নে এই দৃশ্যই দেখিতেছিলেন, তাঁর দুই চোখে সুগভীর আবেশ!

কাশীপদ তাহা লক্ষ্য করিল, ডাকিল,—বৌঠাকরুণ···

কাশীপদর স্বর গাঢ়। সাবিত্রী দেবী তার পানে চাহিলেন।

কাশীপদ কহিল—আমার একটি নিবেদন আছে, প্রাণের অতি দীন নিবেদন···

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে সাবিত্রী দেবী কাশীপদর পানে চাহিলেন।

কাশীপদ কহিল,—আমার জীবন মরুভূমি! আপনার উপন্যাস প'ড়ে যে শ্যামল শোভার আভাস পেয়েচি, সংসারের যে কল্যাণময় দৃশ্য, তাতে আমার মন প্রলুব্ধ হয়েছে। তাই···

কাশীপদ সাবিত্রী দেবীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, গদ্গদ কণ্ঠে কহিল,—ঐ মলিনা···আমারই মানসী যেন মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে ফিরচে! মলিনাকে বিবাহ ক'রে সংসার-সুখ উপভোগ করি, জীবন সফল করি, আমার একান্ত সাধ! আমি চিরদিন আপনার চরণাশ্রয়ে থেকে আপনার সাহিত্য-সেবায়···

পাশে ঝন্‌ঝন শব্দ! সাবিত্রী দেবী চমকিয়া চাহিলেন, কেহ না! বাতাসের দোলায় ঘরের পর্দ্দাটা কেমন···

তিনি বুঝিলেন না, পাশের অন্ধকার ঘরে ছিল মলিনা। কাশীপদর স্পর্দ্ধিত প্রস্তাব সহসা অসহ্য বোধ হওয়ায় নিঃশব্দে পলাইতে গিয়া টেবিলের ধাক্কা খাইয়াছে, তাহাতে কাচের ফুলদানিটা পড়িয়া চুরমার……

কিন্তু এখন ওদিকে দেখিবার অবসর নাই। নূতন সাহিত্যিক—রচনার এমন স্তুতি…মানুষ তাহাতে বিশ্ব হারাইয়া ফেলে। এ তো…

৫

নিত্য মিনতি আর অনুরোধ-উপরোধ! সাবিত্রী দেবী এক দিন মলিনাকে ধরিয়া কথাটা পাড়িলেন, কহিলেন,—আমি বললে তোর পিশেমশায়ের আপত্তি হবে না! কাশীবাবু অযোগ্য নন্! অমন পণ্ডিত। টাকা-কড়ি? আমরা যা দেবো, তাতে কোনো কষ্ট হবে না! শুধু বয়স! পুরুষ-মানুষের বয়স বয়সই নয়—তোর পিশেমশায়ের চেয়ে ছোট!

মলিনা কোনো আপত্তি তুলিল না। কার কাছে তুলিবে? পিশিমা কাশীপদকে দেবতার আসনে বসাইয়াছে—কাশীপদ অত বড় স্তাবক!

যে মা-বাপের অভাব সে এত দিন ভুলিয়াছিল, আজ আবার সে অভাব কাঁটার মত তীক্ষ্ণ হইয়া বুকে বাজিল। বাগানে গিয়া সে একান্তে মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলিয়া আসে—বুকের ব্যথা কতক হাল্‌কা হয়! তা ছাড়া উপায়? কি উপায় বা আছে?

নিজের বিবাহের সম্বন্ধে কথা কহিবে, এতখানি প্রগল্‌ভতা তার একালের এত শিক্ষাতেও মনে জাগে নাই!…কিন্তু তার এ অশ্রু বুঝি আর কে দেখিয়াছিল, অলক্ষ্যে…দেখিয়া তার মনে হয় তো…

সহসা সুষেণ আসিয়া উপস্থিত। সুষেণ লালবিহারীর ভাগিনেয়; এবারে সে ফাইনাল ল এগজামিন দিবে।

সুষেণের পিতা থাকেন রাজসাহীতে, এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। সুষেণ আসিয়াছে মামার কাছে, আইনের কতক-গুলা কূট প্রশ্নের সমাধান করিয়া লইতে!

মলিনাকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, কহিল,—তোর কি অসুখ করেছে?

মৃদু হাসিয়া মলিনা কহিল,—না।

—তবে?

—কি তবে?

—শুকো মুখ—চোখ ব'সে গেছে! তোর এমন শ্রী তো কখনো দেখিনি…

মলিনা হাসিতে গেল, কিন্তু হাসির সঙ্গে দুই চোখে অশ্রু-বিন্দু দেখা দিল। সেটুকুকে সে রোধ করিতে পারিল না।

সুষেণ কহিল,—কি হয়েছে, ভাই মলু?

সে-স্বরে দরদ, স্নেহ, মমতা, মায়া!

মলিনা সংক্ষেপে কথাটা বলিল। শুনিয়া সুষেণ স্তব্ধ; কিছুক্ষণ পরে কহিল,—ও, তাই মামীমা লোকটার অত সুখ্যাতি করলে! আমায় বললে, ভারী পণ্ডিত লোক! কি সব ছাপা কাগজ দেখাচ্ছে, মামীমাও সে কাগজে তন্ময়!

মলিনা কহিল,—মামীমার উপন্যাস ছাপা হচ্ছে—ও তার প্রুফ দেখে দিচ্ছে!

সুষেণ কহিল,—হুঁ…মামীমার এই weakness…

তার গম্ভীর ভাব। নিমেষের জন্য! তার পরই সে গমনোদ্যত হইল। মলিনা কহিল,—কোথায় যাচ্ছ?

হাসিয়া সুষেণ কহিল,—লোকটাকে মারবো না…

সুষেণের গায়ে বেশ জোর। একালের লম্বা-চুল রাখা, দোদুল, এলায়িত-দেহ তরুণের মত নয়—ঠিক তার বিপরীত!

মলিনা কহিল,—তোমার অসাধ্য কিছু নেই…

সুষেণ কহিল,—দূর! ফাইনাল ল' এগজামিন দিচ্ছি…আইন হবে পেশা! আর বে-আইনী কাজ করবো!…আমি যাচ্ছি গঙ্গার ঘাটে—ব'সে ব'সে একটা প্ল্যান ঠাওরাই।

সুষেণ হাসিল,—মলিনাও হাসিল।

মলিনা কহিল,—আমি যাই সঙ্গে…

সুষেণ কহিল,—না, না, না!—সব ভেস্তে যাবে!

… … … …

দুপুর বেলা। বাগানে সেই রঙ্গন-ফুলের ঝোপের কাছে সতরঞ্চে বসিয়া কাশীপদ প্রুফ দেখিতেছিল; 'যুবা স্বাস্থ্য' ও 'নূতন ব্যাকরণে'র প্রুফ।

সুষেণ আসিয়া নিঃশব্দে পাশে বসিল—বসিয়া গাছের পাতা ছিঁড়িতে লাগিল।

কাশীপদ প্রুফের মধ্যে নিমগ্ন। সুষেণ কহিল,—একটা কথা ছিল।

কাশীপদ কহিল,—আমার সঙ্গে ?···

কাশীপদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। এই তরুণটিকে দেখিয়া অবধি তার মনে বিরূপতা জাগিয়াছে। বিবাহের কথা পাকিয়া উঠিতেছে, এ সময় এক তরুণ ছোকরা···'দুর্গেশনন্দিনী'র সেই ওসমানের মত···

সুষেণ কহিল,—মলিনার সঙ্গে আপনার বিয়ে তো ঠিক···! কিন্তু···

কাশীপদ সংশয়িত দৃষ্টিতে সুষেণের পানে চাহিল।

সুষেণ কহিল,—মলিনার একটা দুর্ব্বলতা আছে।

—দুর্ব্বলতা!

—তাই। আপনার ঐ দাড়ি-গোঁফ তার পছন্দ নয়। আমায় সে বলছিল, দাড়ি-গোঁফে আপনাকে একদম প্রৌঢ় দেখায় কি না, একালের মেয়ে সে···আর একালে দাড়ি গোঁফ রাখা রেওয়াজ নয়···

—বেশ। দাড়ি-গোঁফ ফেলতে কতক্ষণ! কাশীপদ একবার দাড়ি-গোঁফে হাত বুলাইল।

সুষেণ কহিল,—এখন কামাতে পারেন না? ও তা হ'লে দেখে, মুখখানা···

—বেশ!

—আপনি রাজী থাকেন তো আমি কামিয়ে দি···

—দাও···। আমি রাজী···

—ক্ষুর আনি!···

সুষেণ চলিয়া গেল। কাশীপদ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। গুণের আদর নারী করিবেই—বয়সে কি আসিয়া যায়! হর-পার্ব্বতী, রাণা রাজসিংহ, বীরভূমের রাজা নয়নসেন—হরচোলের লেনের কৈলাস স্মৃতিতীর্থের পঞ্চমপক্ষীয়া তরুণী ঘরণী···কে না গুণের আদর করিয়াছে? মলিনাও বুদ্ধিমতী···তার উপর কাশীপদ কাল স্পষ্ট ভাষায় জোরালো যুক্তিতে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছে, চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পুরুষের উচিত নয় বিবাহ করা, জীবনের কোনো experience থাকে না; তার ফলে প্রেমটুকু নানা বয়সের ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়!···

পনেরো মিনিট পরে সুষেণ ফিরিল। তার হাতে কাঁচি ও ক্ষুর।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাশীপদর মুখ শ্মশ্রু-গুম্ফ-বর্জ্জিত! সুষেণ আয়না বাহির করিয়া সামনে ধরিল, কহিল,—চিন্‌তে পারেন?

গালে হাত বুলাইয়া কাশীপদ কহিল,—মন্দ নয় তো! বাঃ! মুখখানা এক দম নষ্ট হয়ে যায় নি বয়স হলেও! মুখখানা ভালো—দাড়ি-গোঁফে একটু বিশ্রী ক'রে রেখেছিল!

সুষেণ কহিল,—এর কাঠামোয় তারুণ্য—নষ্ট হবার নয়! আমরা চেহারা রাখতে জানি না বলেই···

খুশী-মনে কাশীপদ কহিল,—হুঁ। এবার থেকে যত্ন নেবো!

সুষেণ কহিল,—কত ক্রীম, পাউডার, ওয়াশ্ যে আছে। ইউরোপে, আমেরিকায় ষাট বছর বয়সের বুড়ো ঐ-সবের জোরে চেহারা রাখে ঠিক বিশ-বাইশ বছরের ছোকরার মত!

কাশীপদর দুই চোখ আনন্দে বিহ্বল হইল!

সুষেণ দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। কাশীপদ আয়না লইয়া মুখের সামনে ধরিল—বেশ! কিন্তু মদনগোপালের সামনে এ মুখ লইয়া দাঁড়াইবে কি বলিয়া? যখন প্রশ্ন করিবে—হঠাৎ?···

সুষেণ আবার ফিরিল; ফিরিয়া কহিল,—চলুন না, একটু rowing করি···ঐ ঝিলে···মলিনা আসচে! তার ভারী সখ···লজ্জায় আসছিল না—অনেক কষ্টে সে লজ্জা ভাঙ্গিয়েছি।···ভালো কথা, তার গান শুনেচেন?

কাশীপদ কহিল,—না।

সুষেণ কহিল,—গানও শোনাবো। যাবেন বোটে?

মস্ত প্রলোভন! সুষেণের কথায় 'না' বলা গেল না। নবীনা প্রণয়িনীর সঙ্গ···rowing···অলস মধ্যাহ্ন···

ছোট জলি-বোট···সুষেণ উঠিল; কাশীপদও। ওদিক হইতে একটা গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল···মলিনা গাহিতেছে? তাই! ঐ যে!

সুষেণ ডাকিল—এসো মলু···

মলিনা আসিল,—সঙ্কোচে ব্রীড়া-ভরে···সে-ব্রীড়ায় তার সৌন্দর্য্য চতুর্গুণ বাড়িয়াছে? না, কাশীপদর মনের আনন্দ মলিনাকে এমন রাঙাইয়া তুলিয়াছে?

বোটে তিন জন···সুষেণ দাঁড় টানিতেছিল। মলিনা এক ধারে বসিয়া···কাশীপদ মাঝখানে···

ঝিলের মাঝামাঝি···শ্যাওলায় নৌকা আটকাইয়া গেল—সুষেণের দাঁড়ের ঠেলায় নৌকা দুলিল।

মলিনা দুই হাত তুলিয়া কহিল,—গেলুম ! আমায় ধরো…

কাশীপদ উঠিয়া দাঁড়াইল। মলিনা ভয় পাইয়াছে…ঠিক সেই মুহূর্ত্তে…দাঁড়ের ক্ষেপ…প্রচণ্ড দোলা…

কাশীপদ টাল রাখিতে না পারিয়া জলে পড়িয়া গেল।

এক গা কাদা—ভিজা কাপড়…মলিনা ছুটিয়া একেবারে দোতলার ঘরে। ভীত, কম্পিত স্বরে সে বলিতেছিল,—পাগল ! পাগল ! নিশ্চয় পাগল…দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছে, নৌকোয় উঠে নাচ ! আমায় ধরতে এসেছিল…উঃ…

লালবিহারী কহিলেন—সে কি ! এর মানে ?

মদনগোপাল কি ভাবিতেছিলেন, সহসা কহিলেন—ওর এক জ্যাঠা পাগল ছিল বটে ! কিন্তু কাশীপদ…?

লালবিহারী কহিলেন—দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়েচে ?…

সুষেণ আসিল। তার সিক্ত বেশ ! সুষেণ কহিল—বদ্ধ পাগল ! হঠাৎ নৌকোয় নাচ—মলিনার সঙ্গে কবিতায় কথা কয়…যে কষ্টে রাগ সামলেছি। আবার গান ! রবিবাবুর গানের শ্রাদ্ধ করছিল। সেই গান…কোন্‌টা রে মলু ?

মলিনা কহিল—যাও, আমার লজ্জা করে !

লালবিহারী কহিলেন—এর সঙ্গে মলুর বিয়ের কথা তুলেছিলে…

সাবিত্রী দেবী কহিলেন—তাই তো ! এমন ! কে জানে, বলো ! প্রথমে ভেবেছিলুম, বুড়ো মানুষ…বুঝি তামাসা করছে…মলুর সঙ্গে একটা সম্পর্কও বেরিয়েছিল। সে দিন কথায় কথায় বললেন। মানে জিতুদা, অর্থাৎ মলুর বাবার পিশশ্বশুর ওর ভাগনে…তার পর এই বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি…ভাবলুম, হলোই বা বয়স ! তবে এ-সব পাগলামি…তাই তো ! তাঁর দুই চোখে একরাশ বিস্ময় !

সুষেণ কহিল,—সত্যি পাগল, মামীমা ! আমার কাছে কত কথা বলেছে,—মলুকে বিয়ে ক'রে ফিরে-ফিরতি সংসার পাতবে—মলুর নামে কবিতা লিখচে, গান বেঁধেচে…শুনে আমি অবাক্ ! আজ বললে, দাড়ি-গোঁফে মুখখানা বিশ্রী দেখায়—আমার মুখ মলুর যদি পছন্দ না হয় ? আমায় কি পীড়াপীড়ি—দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দাও, কামিয়ে দাও, না হ'লে ঐ পুকুরে ডুবে মরবো ! কি করি ? অগত্যা ! দেখবে এসো সে-মূর্ত্তি…

সাবিত্রী কহিলেন,—বলিস কি সুষেণ…

সকলে বাগানে আসিলেন,—ঝিলের ধারে।

সুষেণ কহিল,—গান গাইছে—লুকোও। লুকিয়ে গানটা শোনো…

কয়জনে বড় বকুল গাছের আড়ালে দাঁড়াইলেন—শুনিলেন, সত্যই বিশ্রী কর্কশ কণ্ঠে কাশীপদ গানের কশরৎ সুরু করিয়াছে—

তোমায় যত দেখচি সখি,
তত আমার জাগচে যে সাধ—
মলু আমার মলিন-রাণী,
আমার হৃদয়-গগনের চাঁদ !

সাবিত্রী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন—লালবিহারী ও মদনগোপাল স্তম্ভিত…

সুষেণ কহিল,—ও হলো গজল। নিজে লিখেচে মলুর নামে…বলছিলেন !

বিরক্তি, ঘৃণা…সাবিত্রী দেবী চলিয়া গেলেন ; সঙ্গে সঙ্গে লালবিহারী, মদনগোপাল।

মদনগোপাল কহিলেন,—জ্যাঠার রোগে পেলে না কি ! মুস্কিল বাধাবে, দেখচি !

সুষেণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—মুখে হাসি, চোখে দুষ্টামি !

মলিনা হাসিয়া চুপি চুপি কহিল,—তোমার বদমায়েসী ধরা পড়বে না, ভাবচো ? যা-তা লিখে ওকে দিয়েচো, আর পরামর্শ দিয়েচো, এ গজলটা খুঁজে বার করেছো ভারী appropriate ব'লে ! ও বুঝি সে কথা ব'লে দেবে না ?

হাসিয়া সুষেণ কহিল,—এখন বললে কে বিশ্বাস করবে ওর কথা ? শোন্ না—কি গাইছে…

মনের আনন্দে সিক্ত বেশে বড় কাঁঠালগাছটার তলায় বসিয়া কাশীপদ গাহিতেছিল—

কত দুঃখ-ভাবনা-মেঘ এ-মনের আকাশ যাচ্ছে ছুঁয়ে,
থিতোবে না, বুঝেচি গো-আমার চাঁদের জোসনা-ফুঁয়ে।…

হাসিয়া মলিনা কহিল,—তোমায় গজল-রাজ উপাধি দেবো। কি গজলই লিখেচো ! আহা ! মরি ! মরি !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর রসানুভূতি

রস—তরল পদার্থ নহে। রস আনন্দের আলম্বন। যাহাতে তৃপ্তিবোধ হয়, আনন্দ উদ্রিক্ত হইয়া উঠে, তাহাই রসঘন। সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, চিত্র নানা আলম্বকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্যচিত্ত রসভোগ করিতে চাহে। রসপিপাসা এবং রসানুভূতি জীবমাত্রেরই স্বভাবধর্ম্ম। তবে সর্ব্বত্র ইহা সুপরিস্ফুট নহে। একটু নিম্নস্তরের রসতৃষ্ণা প্রায়ই ভোগমুখী হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের স্তরেই বিলাস। এই জন্যই রস সর্ব্বত্রই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল নহে। কোথাও কোথাও রসে একটা ক্লেদ জন্মিয়া যায়। চিত্র হউক, শিল্প হউক, সঙ্গীত হউক—রসানুভূতি মর্ত্ত্যের উর্দ্ধে যে অমর্ত্ত্য লোক রহিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান-প্রয়াস। যেখানে এই অমৃতের এষণা মর্ত্ত্যের প্রতিই ঝুঁকিয়া পড়ে, সেখানেই রসানুভূতি অসার্থক হইয়া উঠে।

রস-সাধনায় একটা নিতান্ত নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ আছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় শুদ্ধ চিত্ত রসকে গোড়া হইতে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। রস—মর্ত্ত্যে নাই। নাই—চিত্রে, শিল্পে, গন্ধে, গানে। নাই উষার রক্তিমরাগে, বরষা-সন্ধ্যার বিচিত্র আবির্ভাবে। রস নাই শরতে বসন্তে, নাই যৌবনমাধুর্য্যে। সর্ব্বরসের গোমুখী নির্ঝর তিনি—রসো বৈ সঃ। রস একমাত্র ঈশ্বর। যে চিত্রখানি, সঙ্গীতের যে সুরলহরী, ভাস্কর্য্যের যে ভঙ্গিমা ভাগবত এষণাতৎপর নহে, রসবিচারে তাহার মূল্য নাই। তাহার বাহ্য সৌষ্ঠব যতই গৌরবশালী হউক, তাহা অনর্থক। বরং উহা একান্ত বিপথগামী বস্তু। জগৎকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া যে রসবুদ্ধি, তাহার সার্থকতা পাইতে চাহে, তাহা ভুল করিয়া বসে আপনার ক্ষেত্রে, ভুল করে অপরের পক্ষে। তাই রসের বিচার করিতে গিয়া—সাহিত্য, শিল্প অথবা চিত্র যাহাই হউক না কেন,—দেখিব, তাহা উর্দ্ধগ কি না, রসের উৎসাভিমুখে তাহা অভিগমন করিয়াছে কি না।

নব্যযুগের বাঙ্গালায় আত্মোপলব্ধির একটা প্রচেষ্টা জাগিয়াছে। সর্ব্বদিক্ দিয়াই বাঙ্গালী চাহিতেছে—তাহার নিজস্বতাকে। ইহা রাষ্ট্র-স্বাধীনতার যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতেও দীপ্যমান, আবার সাহিত্য-শিল্পেও ইহার আবির্ভাব দেখা দিয়াছে। বঙ্কিম যুগের সাহিত্যপ্রচেষ্টা নিছক সাহিত্য-সাধনা নহে; তাহার একটা অন্তর্গূঢ় এষণা ছিল। ঐ সাহিত্যের আশ্রয়ে বাঙ্গালী তাহার নিজস্বতাকে পাইতে চাহিয়াছিল। আবার স্বদেশী যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালার মঞ্চে ভারতীয় শিল্পকলা এক অনুপম আবেগ সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন উহা নিছক রসপরায়ণতা ছিল না। ভারতীয় শিল্পকলা যে ভারতীয়, ইহাই ছিল তাহার সার বস্তু। অভারতীয় নহে, শুদ্ধ ভারতীয়। কেবল যে কলার দিক্ দিয়াই ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা নহে। ভারত-মস্তিষ্কের পরিকল্পনাই ইহাকে একটা মহিমা দান করিয়াছিল। অজন্তা, ইলোরা অথবা বাঘগুম্ফার চিত্র ও ভাস্কর্য্যই যে ভারতীয় কলা-লালিত্যের পরমোৎকর্ষ, ইহা হয় ত সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না। লতায়িত দেহলতা, নিমীলিত নয়ন—তাহার মাঝে চোখ দিয়া দেখিবার স্বাদ হয় ত বা নাই। কিন্তু ঐ রূপবিলাসেই বাঙ্গালা মাতিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালা কেন?—সারা ভারত।

যে চিত্রকলা ভারতীয় চারুকলা বলিয়া আজ পরিচিত হইয়াছে এবং আদর পাইয়াছে, তাহাই যে একবারে আদি ও অকৃত্রিম ভারত-শিল্প, তাহাও বলা যায় না। ইহার পূর্ব্বে ভারত-শিল্প কোন্ আবির্ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারও সুপ্রচারিত ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে না। আর যেগুলিকে ভারতীয় শিল্পকলা বলা হইতেছে, বাঙ্গালা দেশে তাহার কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল কি না, থাকিলেই বা তাহার পরিচয় কি, তাহাও ভাল করিয়া জানা যায় নাই।

ভারত-শিল্প তাহার সুপ্রাচীন জন্মদিবস হইতে কোন্ আবির্ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার গতি-পদ্ধতি এবং ভঙ্গিমা সম্বন্ধে একটা আলোচনা করা প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালার শিল্প-শোভনীয়তার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে ইহার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ উপস্থিত হইতে পারে না; কিন্তু অতদূর যাইবার প্রয়োজন হইবে না, পঞ্চ শত বৎসরের শিল্পেতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই বাঙ্গালার রসকলার মর্ম্মকথা উপলব্ধি করা যাইবে এবং তাহা যে একান্তই অভারতীয় হইবে, তাহাও নহে।

চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে চিত্রও একটা কলা। এই কলাও বেদ-অনুশাসিত। বেদ-অনুশাসিত কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। বেদ চাহিয়াছেন—বিদ্যা। এই বিদ্যা লেখা-পড়া নহে। যে জ্ঞানের সাহায্যে মৃত্যুকে পার হইতে পারা যায়—বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে। যে বিদ্যায় অমৃতত্ব দান করে, সেই বিদ্যা, অর্থাৎ রসের আদিতে উপস্থিত হইবার এষণা। রসস্বরূপ যিনি, তাঁহারই জাগ্রত অনুভব। সর্ব্ববিধ কলার এই মূলধারা, ইহা প্রায় অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া রহিয়াছে। অন্ততঃ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই ভাগবত-অভিমুখনীতা অপরিবর্ত্তনীয় ছিল।

বাঙ্গালার চিত্রকলার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকাল হইতে আলোচনাটা আরম্ভ করিতে হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস পরিগ্রহের পর ভারতের অন্যান্য তীর্থ

পরিভ্রমণ করিয়া যখন শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইলেন, তখন জগন্নাথ-দর্শন তাঁহার এক নিত্যকর্ম্ম ছিল। জগন্নাথদর্শন করিলে মহাপ্রভু ভাবাবেশে আপ্লুত হইতেন। নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া জগন্নাথ দেখিতে দেখিতে শ্রীমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিতেন। এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু কতকটা দূর হইতে জগন্নাথ দেখিতেন। যেমন তেমন করিয়া দেখিতেন না; দেখিতে দেখিতে ভাবাবেশে অভিভূত হইতেন, ভাবাবেশে নয়নাশ্রু বিগলিত হইত। জগন্নাথ-মূর্ত্তিকে চৈতন্যদেব শ্রীমূর্ত্তি বলিতেন।

জগন্নাথ-মূর্ত্তি বৌদ্ধমূর্ত্তি কি না, হিন্দুযুগের পুনরভ্যুত্থান-দিনে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন হিন্দু দেবতায় পরিণত হইলেন কি না, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উৎকলে যে জগন্নাথ-মূর্ত্তি সম্পূজিত হইতেছেন, তাঁহার আকারভঙ্গিমা মোটেই সুষ্ঠু নহে। এমন কি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থে যে দেবপ্রতিমাগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন কিম্বা বাঙ্গালা দেশের ভাস্কর, পূজার জন্য যে সকল মূর্ত্তি গঠন করেন, তাহার সহিত শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমূর্ত্তির কোন সৌসাদৃশ্যই নাই। শিল্প-দৃষ্টিতে দেখিলে ঐ মূর্ত্তির কোন সৌষ্ঠব দেখিতে পাওয়া যাইবে না। অথচ মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিলেই ভাববিহ্বল হইতেন। এখনও বাঙ্গালার নর-নারী জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভক্তিবিগলিত-কণ্ঠে বলিয়া থাকেন—'শ্রীমুখ দেখিয়া আসিলাম।'

ভারতবর্ষ অথবা বাঙ্গালার শিল্পচাতুর্য্য যে অপরিণত শিল্প-জ্ঞানের পরিচায়ক, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। ভুবনেশ্বর অথবা কোনার্কের মন্দির-স্থাপত্য বিশ্বজনসমাজে সমাদৃত। আবার জানিতে পারা যায় যে, বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাট গ্রামের মৃৎশিল্প এমনই অপূর্ব্বতায় পরিপূর্ণ যে, অনেক য়ুরোপীয় ঐ সকল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। ঐ সব মৃৎপুত্তলিকার গঠন-চাতুর্য্য দেখিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ঐ সব মূর্ত্তি-প্রস্তুত-কারক ভাস্কর শারীর বিদ্যায় (Anatomy) অভিজ্ঞ। যে সব প্রস্তরমূর্ত্তি দেববিগ্রহরূপে মন্দিরে মন্দিরে সম্পূজিত হইতেছেন, তাহার গঠন-চাতুর্য্য আধুনিক দিনের যে কোনও কলাবিদের অনুকরণযোগ্য। কাযেই জগন্নাথ-মূর্ত্তিই যে শিল্প-কলার চরম অভিব্যক্তি, তাহা বলিতে পারা যায় না।

প্রতীচ্য চিত্র-শিল্প বস্তুতান্ত্রিক। উহা সংক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে একখানি অর্ণবপোতের নিমজ্জনব্যাপার ফুটাইয়া তুলিতে য়ুরোপীয় শিল্পী বিশেষ তৎপর। অবশ্য র‍্যাফেল মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া একটা ঐশ্বরিক উল্লাসকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এই শ্রেণীর চিত্রশিল্পী নিতান্তই মুষ্টিমেয়। য়ুরোপীয় ভোগাসক্তচিত্ত ভোগের উপাদান জড়-জগৎ নিঙ্গড়াইয়া আনন্দ পাইতে চায়। তাই তাহার চিত্রকলায় একটা ফুলের বর্ণবিকাশটি পর্য্যন্ত বাস্তবের সার্থক অনুকারী হয়। প্রতীচ্য শিল্পীর অঙ্কিত একটি পুষ্পকে দেখিলে তাহাকে একটি বৃক্ষের সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্প বলিয়াই বোধ হয়। চিত্রের মানুষ যেন জীবন্ত মানুষ। বাস্তবতায় প্রতীচ্য শিল্পী এই বিষয়ে তাহার কৃতিত্বের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। অন্য দিকে ভারতচিত্ত চলিয়াছে ইহ হইতে অসৌএর দিকে। ইহ হইতেছে জগৎ, অসৌ হইতেছে ঈশ্বর। তাই ভারতীয় শিল্পকলায় রূপভঙ্গিমার অবকাশ নাই। উহা স্বরূপপিপাসী। রূপ রসাভাস, অর্দ্ধ রূপ, উহা পঙ্গু, ছায়া, অর্দ্ধ আবৃত। স্বরূপ হইতে রূপের দিকে আসিলে উহার সম্পূর্ণতাটি অনুভবগম্য হয়।

বাঙ্গালার চিত্রশিল্পীর এষণা ভাগবত। সহস্র বৎসরের কথা দূরে থাক, পাঁচ শত বৎসরের কোন প্রাচীন চিত্র বাঙ্গালার কোথাও অবশিষ্ট নাই। সুপ্রাচীন দিনের প্রতিমূর্ত্তি এখনও নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ছবি কোথাও একখানিও নাই। আবার মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই বৌদ্ধ-প্রভাবের পরিচায়ক। অথচ শিল্প বলিয়া একটা বস্তু বাঙ্গালার ছিল এবং প্রাচীন দিন হইতে সেই ধারার একটি অবশেষ এখনও বর্ত্তমান। এই চিত্রকলায় সেই গৌরাঙ্গ যুগের আদর্শই দীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ চাহিয়াছিলেন—ভগবান্‌কে। বাঙ্গালার রেখা-শিল্পও তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিল।

পটুয়ার পট এবং আলিম্পন প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্প-পরিচয়। দুই হাজার বৎসরের না হউক, অন্ততঃ চারি পাঁচ শত বৎসর হইতে এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। পটুয়া বলিয়া বাঙ্গালার এক শ্রেণীর চিত্রশিল্পী ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। বস্ত্রের উপরে বর্ণ-প্রলেপে চিত্র অঙ্কিত করাই উহাদের কায এবং উহাই উহাদের বৃত্তি। পটুয়ার চিত্রগুলিতে গাছ, পাতা, নদী, পর্ব্বত, সিংহ, ব্যাঘ্র অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের মূর্ত্তি নাই, আছে দেব-দেবীর প্রকাশ। রাধাকৃষ্ণ, যশোদা-গোপাল, সীতারাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ, কালী-দুর্গা এমনই সব মূর্ত্তি। দুর্গাপূজায় যে "চালচিত্র" অঙ্কিত করিবার রীতি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়াও প্রাচীন বাঙ্গালার চিত্রকলার একটা আভাস পাওয়া যায়। চালচিত্রে দশাবতার, সমুদ্রমন্থন, দেবাসুরের যুদ্ধ, অন্নপূর্ণা এই সব চিত্রই বর্ণ-রেখায় অভিব্যক্ত হইয়া উঠে।

আলিম্পনের অন্য নাম আলিপনা। আলিম্পন বঙ্গ-শিল্পের দ্বিতীয় পর্য্যায়। পূজায়, উৎসবে আলিপনা দিবার রীতি হিন্দুজীবনের চিরন্তন রীতি। পূজায় যেথায় ঘটস্থাপনা হয়, সেখানেও আলিপনা আঁকিতে হয়। বিবাহে শ্রী বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। শ্রী একটি ঘট। ঐ ঘটটি আলিম্পন-চিত্রিত। যে আসনে উপবেশন করিয়া বিবাহকার্য্য সাধিত হয়, তাহাও আলিম্পন-শোভিত। বাঙ্গালার প্রায় প্রতি পল্লী-তেই অন্ততঃ রাঢ়প্রদেশে লক্ষ্মীপূজায় সারা আঙ্গিনায় আলিম্পন দিবার রীতি আছে। ঐ আলিম্পন শুধু রেখাচিত্র নহে; শুধু সৌন্দর্য্যসৃষ্টিও নহে। উহা আবাহন, উহা অনুসন্ধান। আলিপনার রেখাগুলি যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, ঐগুলি চরণরেখা এবং পদ্ম। বিশ্ব-মাতৃত্বকে আবাহনের অভিব্যঞ্জনা।

গৃহকুট্টিমে এবং গৃহগাত্রেও আলিপনা আঁকিবার রীতি আছে। ঐ চিত্রণ সর্ব্বসাময়িক নহে, নৈমিত্তিক; উহা কখন কখন করিতে হয়। পূজাপার্ব্বণকে উপলক্ষ করিয়া আলিপনা আঁকিবার রীতি আছে, এবং ঐ আলিম্পন-চিত্র—আধুনিক দিনে যাহাকে চিত্র বলা হয়, ঠিক তেমন নহে। অর্থাৎ তাহাতে রূপের অভিব্যঞ্জনা নাই, মূর্ত্তির পরিস্ফুটন নাই; আছে কতকগুলি রেখা-সম্পদ্। রেখাগুলি যেন কিছু অনু-সন্ধান করিয়া চলিয়াছে, এবং চলিতে চলিতে আঁকিতেছে

চরণারবিন্দ। এই সব একান্তই কাল্পনিকতা নহে। একান্তই বাস্তব। যাঁহারা আলিপনা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, আলিম্পন হইতেছে—ভাগবত এষণা।

বঙ্গশিল্পের মর্ম্মকথা কিন্তু এইখানেই পর্য্যবসিত নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জগন্নাথদর্শন লইয়া যে আলোচনাটা আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতেই বঙ্গশিল্পের মর্ম্মবাণী উপলব্ধি করিতে পারিব। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রের দারুব্রহ্ম দর্শন করিয়া ভাববিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ইহা বাস্তব অপেক্ষাও সত্য। এমন সত্য বাস্তবেও ক্বচিৎ রহিয়াছে। মহাপ্রভুর এই যে ভাববিহ্বলতা, ইহা রস-বিভোরতারই রূপান্তর। আমি, তুমি এবং আমরা একখানি প্রথম শ্রেণীর চিত্র দেখিয়া বড় যদি বেশী পুলকিত হই, তাহা হইলে একটা মৌখিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া সেই আনন্দকে পরিব্যক্ত করি এবং তাহা নিতান্তই সাময়িক—যাহাকে কহে ক্ষণিকের। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই ভাবাভিভূত হইয়া পড়িতেন এবং সে ভাবে অভিব্যক্ত হইত—স্বেদ, অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি সুগভীর ভাবের প্রকাশভঙ্গিমা লইয়া।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ-মূর্ত্তির বাহ্য যে ভঙ্গিমা, তাহার প্রতি দৃষ্টি দান করিতেন না। করিলে হয় ত ভাবের কোন প্রেরণাই পাইতেন না। তিনি দর্শন করিতেন—রস-স্বরূপ। যাহা হইতে এই মর্ত্ত্যের রূপ, রস, গন্ধ, গানের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রভাত-সবিতার কনকরশ্মি, পুষ্পের প্রস্ফুটন, বসন্ত-মাধুর্য্য এই সব রসাভাস—খণ্ড, অর্দ্ধ, ছায়া। ইহাতে সুখ হয়,—আনন্দ পাওয়া যায় না। সুখ বস্তুটি আপেক্ষিক। সুখ থাকিলেই দুঃখ থাকিবে। সেই জন্যই সুখপিপাসু জগতে সুখের অপেক্ষা দুঃখই অধিক পরিমাণে দেখা দেয়। ভূমায়—আনন্দের উৎপত্তি। ভূমা হইতেছে অনন্ত। এই অনন্ত একটা পরিমাণ নহে, সংখ্যা নহে, দার্শনিক সংজ্ঞাও নহে। এই ভূমা হইতেছেন রসস্বরূপ। চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ দেখিতেন না, দেখিতেন স্বরূপ।

বাঙ্গালার রস-সাধনার গোড়ার কথা এই স্বরূপ উপলব্ধি। ভূমার অনুসন্ধানে বাহ্য আলম্বের কোন সুষ্ঠু প্রয়োজন হয় না। প্রতীক যেমন-তেমন হইলেই হইল। তাই দেখিতে পাই, ভক্ত উপাসক এক খণ্ড প্রস্তর অবলম্বন করিয়া সেই রস-স্বরূপের উপাসনা করেন। তিনি দেখেন না সেই কৃষ্ণ প্রস্তর-খণ্ডকে। দেখেন—জলের মাঝে যে মহতো মহীয়ান্ রহিয়াছেন, সেই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ—যাঁহার রূপে এই বিশ্ব বিম্বিত। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ রহিয়াছে—

'ঢেঁকি ভজে যদি এই ভবনদী
পার হতে পার বঁধু'

প্রতীকের যে কোন বিশিষ্ট প্রয়োজন, তাহা নহে, একটা কিছু হইলেই হইল। ঢেঁকি ভজিয়াও এই ভবনদী পার হইতে পারা যায়। ইহার জন্য সুঠাম, সুবলয়িত আলম্বনের প্রয়োজনীয়তা নাই। বরং প্রতীক যেখানে প্রতিষ্ঠাপন্ন, সেখানে এষণার যাহা মূল বস্তু, তাহার প্রতি লক্ষ্য পড়ে না। বাহ্য জিনিষেই চিত্ত আকৃষ্ট থাকিয়া যায়। তাই, চিত্র যখন শুধু সুষমায় পরিপ্লুত হয়, তখন চিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বাঙ্গালার যেখানে সেখানে দেব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, সেই বিগ্রহমূর্ত্তি সর্ব্বত্রই শিল্পকলার উচ্চ আদর্শে পরিকল্পিত, এমন নহে; বরং হয় একটা নুড়ি বা একখণ্ড প্রস্তর। কোথাও হয় ত একটা অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষই কোন দেবতারূপে পূজা পাইয়া থাকে।

স্থাপত্যে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের সুপ্রাচীন পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু চিত্রশিল্পের প্রাচীনতার কোন পরিচয়ই নাই। বৌদ্ধ যুগের শিল্পী ধীমান্ এবং বিতাপলের নাম শিল্পের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহাও ঠিক চিত্রকলা নহে, ভাস্কর্য্য। ভাস্কর্য্যে বাঙ্গালী মনীষার অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিলেও চিত্রে তাহা একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে নাই। পটুয়ার পট ছাড়া বাঙ্গালার চিত্রের আর পরিচয় নাই বলিলে সম্ভবতঃ তাহা অনৈতিহাসিক হইবে না, এবং ভাস্কর্য্যে যাহারা অনুপমতার পরিচয় দিয়াছে, চিত্রে তাহারা কোন পরিচয় রাখে নাই বা রাখিবার চেষ্টা করে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে বঙ্গ-শিল্পের মর্ম্মকথা প্রকাশ পাইবে।

বাঙ্গালার স্থাপত্য শিল্পী যে দেব-দেউল গড়িয়াছে, তাহা কারুতায় উদ্ভাসিত। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে যে দেবতা রহিয়াছেন, তিনি তাঁহার বাহ্য-প্রতিমায় সুন্দর নহেন, বরং অসুন্দরের কাছাকাছি। বাঙ্গালীর বহির্দ্বারে আলিপনা আছে; কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে প্রাচীরগাত্রে কোনও চিত্র নাই। যদিও বা থাকে, তাহা একখানি কালী বা দুর্গার পট। আর সে পটের শ্রীছাঁদ শিল্প নামের যোগ্যই নহে। এমন কেন হইল? যাহাদের জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত রুচির, শোভনীয়, যাহাদের হস্তাক্ষর মুক্তার মত, তাহাদের চিত্র বলিয়া একটা কোন রসপরিচয় ছিল না বা যাহা ছিল, তাহা চিত্র নামের অযোগ্য কেন?

একখানি প্রাচীন রাজপুত-চিত্র দেখিয়াছি। উহা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের। চিত্রখানির প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে নিম্বার্ক স্বামীর তপোবীর্য্যের বিশেষত্ব। এই রাজপুত-চিত্রকলার সহিত বাঙ্গালার চিত্র-শিল্পের একটা নিগূঢ় যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায়ও একখানি প্রাচীন চিত্র আছে, অবশ্য সুপ্রাচীন নহে। ঐ চিত্রখানি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কীর্ত্তনানন্দ লইয়া। শোনা যায়, উক্ত চিত্রখানি প্রায় আড়াই শত বৎসরের। দুই শত অথবা আড়াই শত, ইহা লইয়া কোন বিতণ্ডা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে ইহা ঠিক যে, উহা ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে। এই চিত্রখানি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, চিত্রখানির প্রকাশভঙ্গিমা যেন অনির্দ্দেশ-যাত্রা করিয়াছে। জগৎ হইতে জগদাতীত লোকে, অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে।

দেবতা ছাড়া বাঙ্গালায় চিত্র নাই। ইহা হইতেও বাকী চিত্রকলার মর্ম্মকথা বুঝিতে পারা যাইবে। সেই পূর্ব্বকথা—রসো বৈ সঃ। দেবতা ছাড়া যে রস নাই! দেবতা সেই পরম দেবতা পরমেশ্বর। তাই বাঙ্গালার শিল্পকলা দেবমূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য কোন মূর্ত্তি, রেখা, রং লইয়া তাহার রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে নাই। দেবতা ছাড়িয়া যে রসের উপাসনা, তাহা রসাভাসের পরিসেবন। উহাকে অলীকের উপাসনা বলিলেই

ভাল হয়। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ-মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের আর্য্যজাতির সহিত বাঙ্গালীও তাহার রসবুদ্ধিকে সার্থক করিতে চাহিয়াছে, তাহারও মর্ম্মকথা ঐ রসো বৈ সঃ।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টি চিত্রশিল্পের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা সংসারে যে কিছু সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহা ত সেই পরম সুন্দরের ছায়া। আর্য্য-সিদ্ধান্ত—নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে সুখ নাই। ছায়ায় যথার্থ সৌন্দর্য্য নাই। তাই রূপ ছাড়িয়া স্বরূপের অনুসন্ধান। বাঙ্গালার শিল্পে এই স্বরূপসাধনাই চলিয়াছে। তাই শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ-মূর্ত্তিই শ্রীমূর্ত্তি, এবং পটের কালীকৃষ্ণমূর্ত্তিই চিত্র-শিল্পের শেষ অধ্যায়।

শিল্পের একটা ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উহা শুধু রসবিলাস নহে, জীবনকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিতে; এবং এই যে সৌন্দর্য্যযুক্ত জীবন, ইহাও শুধু উপভোগাত্মক নহে। এই ব্যবহারিকতারও একটা তাত্ত্বিকতা রহিয়াছে। বাস্তব জীবনে যে অসুন্দর, অধ্যাত্মজীবনে সে সত্য সুন্দরের অনুগামী হইতে পারে না। আবার বিলাস-ব্যসন—চলিত কথায় যাহাকে বলে সৌখীনতা, তাহাও সৌন্দর্য্য-সেবা নহে। সৌন্দর্য্য—শুচি, সৌন্দর্য্য—সত্য। তাত্ত্বিক ভাষায় সত্য শিব সুন্দর। সুন্দর শেষের কথা; যাহা সত্য এবং শিব, তাহাই সুন্দর। শুধু সত্য হইলেই চলিবে না, তাহা শিবময় হওয়া প্রয়োজন। যুগপৎ এমন হইলেই তবে তাহা সুন্দর।

বাঙ্গালার জীবনধারা ঠিক এই পথে চলিয়াছে। বাঙ্গালী রসবিলাসে মাতে নাই। শুচিতার সেবা করিয়াছে। আর্য্য-সিদ্ধান্ত—আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ। আচারই প্রথম ধর্ম্ম। এই যে আচার, ইহা কতকগুলা অনুষ্ঠানমাত্র নহে, ইহা শুচিতার অনুশীলন। ইহাতে জীবন ছন্দোময় হইয়া উঠে। এই ছন্দের নাম একটা সঙ্গতি, একটা শৃঙ্খলা, একটা শান্তি এবং তৃপ্তিপূর্ণ অবস্থা। শুচিতা ও সৌখীনতা এক নহে। যাহা সৌখীন, তাহাতে একটা বাহ্য চাকচিক্য আছে; উহার অন্তর্দেশ আবিলতা-পূর্ণ। সৌখীন শীঘ্রই বিমলিন হইয়া পড়ে। শুচিতা চলে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া। সুন্দরের শাশ্বত-প্রকাশের প্রতি গূঢ় অনুরাগ থাকায়—বাঙ্গালীর ব্যবহারিক জীবনে আচারনিষ্ঠ পবিত্রতা আসিয়াছে। ইহার ফলে বাঙ্গালীর নিত্যকার জীবনে বিলাসবাহুল্য ঘটে নাই, কিন্তু একটা নিষ্ঠাপূর্ণ শুচিতার উদ্ভব হইয়াছে। যাহার সংস্পর্শে আসিলে চিত্ত-মন গ্লানিশূন্য হইয়া শুদ্ধতায় প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বাঙ্গালীর ঘরদ্বার ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করে। তাহার আঙ্গিনায় দুইটি গাঁদা ও দোপাটি ফুটিয়া থাকে। আর মঞ্চোপরি সম্পূজিত হয়—একটি তুলসীতরু। তুলসীর লতা নাই, পল্লবের মাধুর্য্য নাই; ফুল যাহা, তাহাকে পুষ্প না বলাই ভাল। রূপ-বিলাসীর নিকট একটি চন্দ্র-মল্লিকার যত আদর, বাঙ্গালার আচারী গৃহীর নিকট একটি তুলসীতরু তদপেক্ষা অনেক অধিক সমাদৃত।

সেই গোড়ার কথার নির্দ্দেশ রূপ ছাড়িয়া অরূপের অনুসন্ধান। পরিদৃশ্যমান জগতে রূপ আছে বটে! রূপের জোয়ার উছলিয়া উথলিয়া বহিয়া যায়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এই রূপ কিন্তু একটা বিকট পরিণামকে উপহার দিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। বসন্তের মাধুর্য্য শীতের জড়িমায় কঙ্কালসার হইয়া উঠে, এবং তাহা দিয়া যায় একটা হাহাকার। শুধুই একটা হতাশ্বাস নহে, উহা আবার একটা দুর্দ্দমনীয় ক্ষুধা জ্বালাইয়া দেয়। এই ক্ষুধার্ত্ত কামনা ক্রমশঃ কদর্য্যতার পরিসেবনে মাতিয়া উঠে। ইতিহাস ইহার জীবন্ত সাক্ষী। যাউক, এ কথা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

বাঙ্গালার রস-বোধের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই লক্ষ্য পড়ে যে, বাঙ্গালী অনুপম বৈকুণ্ঠের গীতি গাহিয়াছে। মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্য্য-কলাকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, ব্যবহারিক জীবনেও আনিয়াছে একটা ছন্দোযুক্ত সুষমা। কিন্তু চিত্রে ঐ আলিপনা ও পট ছাড়া আর বেশী কিছু হয় নাই। ইহাকে অপটুতা বলা চলে না; কেন না, তক্ষণ-শিল্প এবং মৃৎ-শিল্পে বাঙ্গালী শিল্পী তাহার কুশলতার চরম প্রকাশ পরিব্যক্ত করিয়াছে। প্রস্তরে এবং মৃত্তিকায় যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহা যে রেখায় ও রঙ্গে হইতে পারিত না, ইহার কোনও যুক্তি নাই। বাঙ্গালী স্বর্ণকার স্বর্ণ-আস্তরণে যে অনুপম শিল্প-নৈপুণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা তুলিকার অনুলিখনে তেমনই সুন্দর হইত; কিন্তু এইখানে যেন রসিক বাঙ্গালী একটু কুণ্ঠিত।

ইহার মর্ম্মকথাটিও অনুধাবনযোগ্য। ইহা বুঝিতে পারিলে বঙ্গ-শিল্পের মর্ম্মকথা বুঝিবার বিলম্ব ঘটিবে না। আর্য্য-জাতির তত্ত্বসিদ্ধান্ত—গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরুষ অপরোক্ষানুভূতিগম্য। এ দিকে আত্মপুরুষ ব্যতীতও অবিচ্ছিন্ন রসলাভ হয় না। বাহিরের রূপ রসমাত্রেই রসাভাস। এই পরম রসের উপলব্ধি করিতে সত্যের সম্মুখীন হইতে হয়। যেমন তেমন করিয়া ইহা হয় না। যাহা অপরোক্ষানুভূতিগম্য, তাহাকে প্রত্যক্ষের জগতে, ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে টানিয়া আনিলে লাভ নাই; বরং ক্ষতিই আছে। ইন্দ্রিয় তাহার অবলম্বন ও আশ্রয় পাইয়া মাতিয়া উঠে। রেখায় ও রঙ্গে মাতিয়া উঠে। গন্ধে গানে মজিয়া থাকে। যাহা অসত্য, যাহা ক্ষণিক, যাহা তুচ্ছতায় বিমলিন, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রসের শুদ্ধতর প্রকাশের প্রতি আর অনুরাগ থাকে না। মানব-চিত্ত মৃত্তিকাতেই মাথা খুঁড়িয়া মরে। তাই দেখিতে পাই, অভ্রচুম্বী মন্দিরের অভ্যন্তরে যে দেবতা সম্পূজিত হইতেছেন, তিনি গর্ভগৃহের অন্ধকারে আচ্ছাদিত। তাঁহার মূর্ত্তি হয় সামান্য একখণ্ড প্রস্তর অথবা যেমন তেমন একটি প্রতিমা।

মন্দিরের যিনি সর্ব্বস্ব, এই রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণময়ী ধরণী যাঁহার রূপাভাস, তাঁহাকে নয়ন দিয়া দেখিলে দেখা হয় না। নয়নের যিনি নয়ন, তাঁহাকে অন্তশ্চক্ষু দিয়া দেখিতে হয়। মন্দিরের গর্ভ-গৃহে তাই অন্ধকার। বিশ্বরূপ তাই একটি পাথরের নুড়ি। বাহ্য-রূপেই যদি প্রলুব্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে আর স্বরূপদর্শনের প্রবৃত্তি জাগে না। যিনি দুর্লক্ষ্য, তিনি একবারেই অলক্ষ্য অনধিগম্য হইয়া পড়েন।

বাঙ্গালায় চিত্রকলার এই রীতি বলিয়া বঙ্গ-জীবনে সৌষ্ঠব নাই, এমন বলিতে পারা যায় না। এই যে সৌষ্ঠব, ইহা সৌন্দর্য্য নহে, শুচিতা—পবিত্রতা। পবিত্রতা একটা আচারমাত্র নহে। উহা একটা তপস্যা। মেঘ সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে। অশুচিতা আবরিত করিয়া রাখে—স্বরূপের এষণাকে।

শুচিতা চিত্তমালিন্য ঘুচাইয়া দেয়। তখন রসের শুদ্ধ স্বরূপ-সম্বন্ধে অনুরাগ এবং ধারণা জন্মে। রসের যে পরম স্বরূপ, তাহা ঠিক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে; ধ্যানগোচর। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ-মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেন। তিনি যে মূর্ত্তি দেখিয়াই অমনই ভাববিহ্বল হইয়া পড়িতেন, তাহা নহে। তিনি ঐ রূপের মধ্যে স্বরূপের দর্শনলাভ করিতেন। 'তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ-স্ফুরে।' সর্ব্বত্রে এবং সর্ব্বস্বে যখন কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয়, তখন মূর্ত্তির আর অপেক্ষা থাকে না। রেখা ও রঙ্গের আর প্রয়োজনীয়তা রহে না। ছন্দ ও ভঙ্গিমার যে বাহ্য আবশ্যকতা, তাহা ঘুচিয়া যায়। তখন যাহা কিছু চোখে পড়ে, তাহাই মনে হয় রূপঘন। সেই বৈদিক মন্ত্র এই অমৃত অনুভূতিকে সুস্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছে—মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—পৃথিবীর ধূলিকণা পর্য্যন্ত মধুময়। ইহারই নাম বিশ্বরূপদর্শন। যে সভ্যতা ও সাধনার এই দৃষ্টি, তাহার আর বাহ্যরূপে মুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না।

বাঙ্গালার রূপানুভূতির কথা কহিতে গিয়া তাহার স্বরূপ-সাধনার কথা কহিলাম। ইহা নহিলে বাঙ্গালার চিত্র-শিল্পের মর্ম্মকথা ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে না। আলিম্পন এবং পটুয়ার পটই যে জাতির চিত্র-শিল্পের চরম প্রকাশ, তাহাদের চিত্রকলা ও রসানুভূতি একান্তই অস্পষ্ট অথবা বিকলাঙ্গ, এমনই বোধ হয়; বস্তুতঃ তাহা নহে। বাঙ্গালী কঙ্কালের মাঝে কমনীয়তার উপাসনা করে নাই। চাহিয়াছে প্রাণ দিয়া কঙ্কালকে পরিশোভিত করিতে। অবশ্য, মূর্ত্তি-শিল্পে, স্থাপত্যে, তক্ষণ-কলায় বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব মনীষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে অন্য কথা আছে। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় তাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। কারুকলার কথা কহিতে গিয়া সে কথাও কহিতে হইবে; কিন্তু রসের কথায় আজ এই পর্য্যন্ত যে, বাঙ্গালার রসানুভূতি চলিয়াছে—স্বরূপের অনুসন্ধানে।

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু-সমাজে নারী

অনেকে বলিতে পারেন যে, সদ্য আইনে ত কেবল ১৫ বৎসর বয়সের অনধিকবয়স্কা কন্যাদিগের বিবাহ দণ্ডার্হ করা হইয়াছে, তাহার মন্দ ফল নগণ্য মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রধানতঃ গরীবদিগের প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদিগের সামান্য অর্থের বা অন্য কোন আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের প্রলোভনে দুষ্টমতি লোকদের দ্বারা প্রতারিতা হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক; অভিভাবকরা তাহাদিগের সম্যক্ তত্ত্বাবধারণ করিতে পারে না। অনেকে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনই দিতে পারে না। কন্যাদিগকে তজ্জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে যাইতে হইবে, সেই স্থলে ঐরূপে প্রলোভিতা ও প্রতারিতা হইবার সম্ভাবনা সকল দেশেই অধিক। দুষ্টমতি লোকদিগকে দণ্ড দেওয়াইবার ক্ষমতা অনেকের নাই। এইরূপে হৃতসতীত্ব কন্যাদিগের পরবর্ত্তী জীবন কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই এই আইন কত অমঙ্গলজনক, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। দ্বিতীয়তঃ—আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি দুর্ঘটনা এখন নিত্য হইতেছে, কোন না কোন প্রদেশে ঐরূপ দুর্ঘটনা প্রতি বৎসরেই হয়, তখন ঐরূপ অবিবাহিতা তরুণীদের প্রতিপালন করা অভিভাবকদিগের অসম্ভব হয়। সেই জন্য কন্যাদিগের পূর্ব্ব হইতে বিবাহ দিয়া রাখে, যাহাতে তাহারা সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে অন্য গ্রামস্থ স্বামীর পিতৃ-মাতৃ-কুলের কোন না কোন স্থলে আশ্রয় পাইতে পারে। ইহা জীবন-বীমারই অনুরূপ ও তদপেক্ষা আমাদের দেশের অবস্থার উপযোগী ও বহু গুণ অধিক মঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠান। গরীবদিগের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, চিন্তার ধারা বিষয়ে অনভিজ্ঞতার জন্য অবস্থাপন্ন সংস্কারকরা তাহা দেখেন না; সেই জন্য আইন করিয়া তাহাদিগকে সেই ভীষণ বিপদের সময়ে আশ্রয়চ্যুত করিয়া তাহাদের মঙ্গলসাধন করিতে চাহিতেছেন, কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা প্রতীচ্যের মোহে বিমূঢ় হইয়া দেখিতে পান না; তখন যে সেই সকল তরুণীকে একখানি ছেঁড়া বস্ত্রের নিমিত্ত—সামান্য একমুঠা চাউলের নিমিত্তও শরীর বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়, পরবর্ত্তী জীবনে ভীষণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, সে দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। তৃতীয়তঃ—দেশের পূর্ব্ব-আচরিত প্রথার পাকা বাঁধ একবার আইন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিলে বিবাহের বয়স ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইবে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। আইন করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে ত সংস্কারকরা বিবাহ দেওয়াইয়া দিতে পারিবেন না। তাঁহারা ত প্রকাশ্যেই বলিতেছেন, কন্যাদিগের বিবাহের বয়স আরও বাড়াইয়া দেওয়া উচিত ও যত দিন না স্ত্রী ও অপত্যদিগকে সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারেন, তত দিন তরুণদিগের বিবাহ করা উচিত নহে। সংস্কারকরা প্রায় সকলেই ইংরাজী-শিক্ষিত, পাশ্চাত্য-ভাবগ্রস্ত, তজ্জন্যও নিজেদের ভোগেচ্ছা-পূরণের জন্য, যৌথপরিবার-প্রথা হইতে বিচ্যুত, তাঁহাদেরই অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। তথাপি তাঁহাদের পুত্ররাও বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। কারণ, তাহারা পৈতৃক অর্থস্বচ্ছলতাসুলভ আরামে ও বিলাসে অভ্যস্ত, কিন্তু তাহারা দেখিতেছে যে, তাহারা পিতার ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতে এখন আর অধিক উপার্জ্জন করিবার সুবিধা হয় না। সেই জন্য স্ত্রী ও অপত্যদিগকে প্রতিপালনক্ষম পাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প—তজ্জন্য বিবাহের বয়স ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে, বরপণও বাড়িয়া চলিয়াছে। এ জন্য বিবাহ করিলে কন্যাসন্তান জন্মিতে পারে; তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে; সুতরাং তরুণরা ভবিষ্য দুর্ভাবনায় আরও বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইতেছে, বিবাহের বয়স আরও তজ্জন্য বাড়িতেছে। কন্যার পিতামাতাদের জীবনও দুর্ব্বিষহ হইতেছে। অল্পদিনেই সে কালের ব্রাহ্মণ-কুলীন-কন্যাদের ন্যায় অধিকাংশ তরুণীকেও বহুকাল—অনেককে অবিবাহিতা থাকিতে হইবে, এবং তাহার কুফলও ফলিবে। আমরা পাশ্চাত্য ধরণের সভা-সমিতি করিয়া, ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া, হিন্দু-সমাজকে ও বরের পিতাদিগকে গালি দিয়া তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইতেছে না, হইতেও পারে না, তাহা আমরা দেখি না। এখানে Law at demand and supplyএর কার্য্য চলিতেছে।

বক্তৃতাতে তাহার কার্য্যের গতিরোধ হইতে পারে না। একমাত্র উপায়ে এই সর্ব্বনাশিনী কুপ্রথার নিবারণ হইতে পারে, তাহা আমাদের পাশ্চাত্যের পদাঙ্ক অনুসারিণী গতির মুখ ফিরাইয়া দেশের প্রাচীন আদর্শের দিকে দেখিয়া যৌথ পরিবারপ্রথার পুনর্গঠন করিয়া ও তদ্দ্বারা পরস্পরের সাহায্য সহানুভূতি ভালবাসা পাওয়ায়, স্ত্রী-পুত্রাদিপালনক্ষম পাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া। যখন হইতে যৌথ পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই বরপণপ্রথা আরম্ভ হইল এবং যত ইহার প্রভাব হ্রাস হইতেছে, ততই বরপণ-প্রথা বাড়িয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্যের সমবায়-প্রথার ন্যায় ইহা দারিদ্র্য-মোচনের উপযোগী ও তাহার উপর ইহা ভালবাসা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সৎবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তদপেক্ষা অধিক উপযোগী ও প্রীতিদায়ী। তরুণরা যে রুসিয়ার তুল্যাধিকারবাদীদের কার্য্যের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া আছেন, তাহাদের মতবাদের মূল ভিত্তি যাহা, তাহাই আমাদের যৌথ পরিবার-প্রথার মূল ভিত্তি, সকলেই পরিবারস্থ সকলের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, সকলেই যাহা তাহার আবশ্যক, তাহা পাইবে (From each according to his ability to each according to his need.) প্রভেদের ভিতর তাঁহারা দেশটাকে দুই চারিটি communeএ বিভাগ করিয়াছেন। আমাদের দেশ অসংখ্য communeএ বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক যৌথ-পরিবারই এক একটি পৃথক্ commune এবং ইহার ভিতর রক্তের টান ও একত্র বাসের নিমিত্ত ব্যক্তিগত ভালবাসার—শুধু সকাম ভালবাসা নহে—সকলের নিকট আন্তরিক সাহায্য পাওয়া যায়, ইহা সমস্ত দেশের জন্য সম্ভব হয় না। রুসিয়াতে এক বা দুই চারি জন লোকের আধিপত্য-বিস্তারে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা, (Individuality), ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (individual), ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী শক্তি ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি (initiative) ক্ষীণ হইয়া যাইতে বাধ্য, সকলেই একঘেয়ে রকমের হইয়া যায়, তাহাও হইতে পায় নাই। যৌথপরিবার-প্রথা তুল্যাধিকারবাদের মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহারই প্রভাবে এত কাল অতিশয় দীন-দুঃখীরও জীবন উপভোগ্য ছিল। তাহারা পশুত্বে নীত হয় নাই। সকল নারীই বিবাহ হইত, নারীরা পুরুষদিগের সহিত বি-সমপ্রতিযোগিতায় তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুপযোগী, অস্বাস্থ্যকর, অপত্যদিগেরও বিশেষ ক্ষতিজনক, অর্থকর কর্ম্মকরার নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। নারীর স্ব-ত্ব যে মাতৃত্ব, তাহা উপভোগ করিতে পাইয়াছিলেন, অপত্যপ্রতিপালনে যৌথ-পরিবারস্থ অন্য সকলের, সময়ে সাহায্য পাওয়ায় অনেকগুলি অপত্য থাকিলেও মাতাদিগের জীবন অতিশয় কষ্টকর বা স্বাস্থ্যহানিকর বা অধিক দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত হয় নাই। বিবাহিতা নারীদিগকেও পাশ্চাত্যদের মত মাতৃত্বনিরোধকারী উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয় নাই, ভ্রূণ-হত্যা করিতে হয় নাই, পুরুষদিগের কামসহচরী হইয়া পুরুষদিগের প্রীতিকর আমোদে, খেলায়, গল্পে, কর্ম্মে যোগদান করিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য ক্ষীণ করিয়া নকল পুরুষ সাজিয়া নারী-জীবন ধন্য হইল বলিয়া মনকে বুঝাইতে হয় নাই ; প্রবীণাদিগকে নবীনা সাজিতে হয় নাই, বহুকাল মাতৃত্বনিরোধে বিকৃতস্নায়ু হওয়ায়, বহু কাল একা একা থাকার নিমিত্ত তাহাতে অভ্যস্ত হওয়ায়, পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অর্থকর কর্ম্ম করিতে হওয়ায়, বিবাহিত জীবনে পরস্পরের জন্য যে ত্যাগশীলতা আবশ্যক, তাহা ক্ষীণ হয় নাই, বিবাহিত জীবন অশান্তিকর হয় নাই, বিবাহ-বিচ্ছেদের আবশ্যক হয় নাই, অসুস্থ অবস্থা ও বার্দ্ধক্য নির্জ্জন-কারাবাসতুল্য হয় নাই, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ চিরকালই মধুর, ও সম্মানযুক্ত ছিল।

এই যৌথ পরিবারপ্রথা ভঙ্গ হওয়ার নিমিত্তই সকলেরই জীবন অতিশয় কষ্টকর ও দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত হইয়াছে, নারীদিগের দুর্দ্দশাও ভয়ানক হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর নারীদিগকেও পেটের দায়ে লালায়িত হইয়া পরের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কখনও এরূপ পরের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই, অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা হয় নাই, আত্মীয়দের দ্বারাই তাঁহারা প্রতিপালিতা হইতেন। অতি অল্পদিনেরই ভিতর দেখিব, অধিকাংশ নারীদিগের বহুকাল বিবাহ হইবে না এবং তজ্জন্য পাশ্চাত্যদেশে যে সকল বিষময় ফল হইয়াছে, তদপেক্ষা বহু অধিক পরিমাণে তাহা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ দেশের নারীদিগের দুর্দ্দশা ভীষণ হইতে বাধ্য ; দুঃখের বিষয়, কেহই তাহা দেখিতেছেন না। যৌথ পরিবারপ্রথার অঙ্গীভূত আত্মীয়দের সাহায্য করিবার বাধ্যতা জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, তথাপি যাহারা অবস্থাপন্ন ছিল এবং যাহাদের আত্মীয়রা এখনও অবস্থাপন্ন আছে, সেই শ্রেণীভুক্ত নারীদিগেরও দুর্গতি হইয়াছে এবং ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে, অন্য শ্রেণীভুক্তদিগের কিরূপ দুর্গতি হইতে বাধ্য, সকলকেই, বিশেষতঃ নারীদিগকে ভাবিতে অনুরোধ করি। যৌথ পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া যাওয়াই নারীদিগের দুর্দ্দশার মূল কারণ, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সকলেই সবিশেষ চেষ্টা না করিলে, শিক্ষা-পদ্ধতিও তদুপযোগী না করিলে এ গরীব দেশে কোন উপায়ই হইতে পারে না। অনাবৃষ্টির কালে গণ্ডূষ করিয়া জলসেচন দ্বারা ক্ষেত্রের শস্য সজীব রাখিবার চেষ্টার ন্যায় সহৃদয় গুরুসদয় বাবুর মত সহস্র সহস্র ব্যক্তির ও [সেরূপ অতি অল্প লোকই আছে] এ দেশের নারীদিগের ভীষণ অবশ্যম্ভাবী দুর্গতি মোচন-চেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য। বহু ধনী ইংলণ্ডেই দেখিয়াছি যে, ২৫ বৎসরবয়স্কা তরুণীদিগের শতকরা ৭·৫৭, ত্রিশ বৎসর-বয়স্কাদের শতকরা ৪৩·৫, ৩৫ বৎসরবয়স্কাদের শতকরা ২৭টি, ৪০ বৎসর বয়স্কাদের শতকরা ২১টিকে অবিবাহিতা থাকিতে হয়। আমরা অত্যধিক গরীব বলিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক-সংখ্যক নারীর বহু দিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকা অবশ্যম্ভাবী। প্রথম যৌবনেই ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে, প্রাণ, মন, অঙ্গ ঢালিয়া ভালবাসিবার প্রবৃত্তি প্রকৃতি হইতেই আইসে, তাহাই রুদ্ধ করিতে তরুণীরা বাধ্য হন, উপেক্ষিতার অপমান নীরবে সহ্য করিতে হয়, তজ্জন্য হৃদয় বিষাক্ত হয়, তৎপরে বিবাহ হইলেও তাহা তৃপ্তিপ্রদ হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে কৌলীন্যপ্রথা অনুসরণের নিমিত্ত আমাদের দেশের ১০ বা ১৫ সহস্র ব্রাহ্মণ-কন্যারা যে দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন, যাহার নিমিত্ত সহৃদয় শিক্ষিত-সম্প্রদায় ঐ সামাজিক প্রথার অজস্র নিন্দা করিতেন,

এখন তাঁহারাই পাশ্চাত্য সমাজ গঠন ও বিবাহপ্রথা অনুসরণ করিয়া দেশের সকল নারীকে সেই দুর্দ্দশা ভোগ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা দেখেন না। প্রভেদের ভিতর দেখা যায় যে, সেই কুলীনকন্যাদের অনেকের নামমাত্র বিবাহ হইত, অনেক সপত্নী ছিল, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় নাই; কারণ, কাহারও কপালে স্বামিসহবাসসুখ ছিল না। আর প্রভেদ দেখা যায় যে, তৎকালে কুলীনকন্যারা তাহাদের মাতুলালয়ে মাতুলকন্যাদেরই ন্যায় চির-জীবনই সযত্নে প্রতিপালিতা হইতেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া অন্য শ্রেণীভুক্তদের নিকট সসম্মান ব্যবহার ও সাহায্য পাইতেন। একালের তরুণীদিগকে পিতামাতার মৃত্যুর পর জীবিকার জন্য পরের গোলামী করিতে হইবে, অধিকাংশ স্থলে তাহা দাসীবৃত্তি বা রাঁধুনীগিরি ছাড়া বড় বেশী কিছু নহে; কারণ, এ দেশের অন্য উপায়ে উপার্জ্জনের পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তাহার উপর শতকরা ৯৭টি নিরক্ষর। পাশ্চাত্য দেশে যাহাদের অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ আবশ্যক আছে, তাহাদিগকেও ঐরূপ গোলামী করিতে হয় (কলের মজুরণী) আর করিতে হয় পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি। এই পরের গোলামীগিরি করিতে পাওয়াই নারী-স্বত্বাধিকারপ্রসার, আমাদের সংস্কারকরা আমাদের তরুণীদিগকে বুঝাইতেছেন!

বহুকাল অবিবাহিত অবস্থায় তরুণীদিগকে বিধবাদেরই ন্যায় হৃদয়ের শূন্যতা ভোগ করিতে হইবে, তাহাদিগের মত সঙ্গিহীন জীবন যাপন করিতে হইবে; না হয়, গুপ্তভাবে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইবে। উচ্চশ্রেণীভুক্তদিগের বালবিধবারা বৈধব্যদশা ভোগ করে বলিয়া হিন্দু সমাজের এত নিন্দা, হিন্দু সমাজকে নারীনিগ্রহী বলা হয়। বীরাঙ্গনা কাব্যে কৈকেয়ী যেমন শুক-সারীকে 'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি' এই বুলি শিখাইবার মানস করিয়াছিলেন, আমাদের স্বদেশভক্ত সংস্কারকরা কিশোর-কিশোরীদিগকে "হিন্দু সমাজ পরম নারীনিগ্রহ" এই বুলি বলিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহারা নারী-নিগ্রহের নিবৃত্তি উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য বিবাহপ্রথা অনুসরণ করিতেছেন, সেইরূপ সমাজ গঠন করিতেছেন। এখন দেখা যাউক, এই বিধবাদের সংখ্যা কত। ১০ হইতে ১৫ বৎসরবয়স্কা বালিকাদের ভিতর সমস্ত হিন্দু ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা ২টি বালবিধবা আছে; বাঙ্গালায় শতকরা ৩·৮, বিহারে শতকরা ২·৬টি (বিহারে ও বাঙ্গালায় বাল্যবিবাহের অধিক প্রচলন)। ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কাদিগের ভিতর সমস্ত হিন্দু ভারতবর্ষে শতকরা ১৩·৮টি, বিহারেও ১০·৮টি, বাঙ্গালায় শতকরা ২৩·২টি বিধবা আছে। (Census Report 1921, vol PI67) আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, ইংলণ্ডে ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কাদের ভিতর শতকরা ৯৮·৮টি, ২০ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্কাদের ভিতর শতকরা ৭৫·৭টি, ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কাদের ৪৩·৫টি, ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্কাদের ভিতর শতকরা ২৭টি, ৩৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কাদের ভিতর শতকরা ২১টি অবিবাহিতা। এখন ইংলণ্ডের এই বহুকাল অবিবাহিতা নারীদিগের ও আমাদের দেশের বিধবাদের সংখ্যার তুলনা করিয়া দেখুন, বালবিধবাদের সংখ্যার সহিত চিরকুমারীদের সংখ্যার তুলনা করুন, দেখিবেন, সকল বয়সেই ইংলণ্ডের কুমারীর সংখ্যা আমাদের বিধবাদের অপেক্ষাও অধিক। ইহা হইতে দেখা যায় যে, প্রায় সকল সমাজেই নানা কারণে কতক নারীকে স্বামিসহবাসসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। হিন্দু সমাজে সেই সকল নারীর সংখ্যা ইংলণ্ডাদি দেশ অপেক্ষা অনেক অল্প। হিন্দু সমাজ সকল পুরুষকে বিবাহ করিতে বাধ্য করায় ও যৌথ পরিবার-প্রথা জাতিভেদ প্রথার দ্বারা বিবাহ করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়ায় সকল নারীরা যাহাতে স্বামিসহবাসসুখ হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। তবে হিন্দু সমাজ উচ্চ শ্রেণীর ভিতর বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করায় অতি অল্পসংখ্যক নারী বালবিধবা রহিয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় যে, প্রায় সকল দেশেই উচ্চ শ্রেণীর ভিতর নীচ শ্রেণীর অপেক্ষা নারীসংখ্যা অধিক হয়। বিধবাবিবাহ না থাকায় সকল পুরুষকেই—বিপত্নীকদিগকেও কুমারী-বিবাহই করিতে হয়; সুতরাং তাহাতে কুমারীর সংখ্যা কম হয়। এখন দেখা যাউক, বালবিধবা অপেক্ষা চিরকুমারী থাকা সমাজের পক্ষে ও নারীসমষ্টির পক্ষে শ্রেয় কি না। প্রথম দৃষ্টিতে ত প্রাপ্তবয়স্কাদের অবিবাহিতা অবস্থা বৈধব্যেরই নামান্তর মাত্র। প্রভেদের ভিতর পাশ্চাত্য দেশের কুমারীদের বিবাহিতা হইবার আশা আছে, তাহাদের বিলাসভোগের কোন বাধা নাই; হিন্দু উচ্চশ্রেণীভুক্তা বিধবাদের সে আশা নাই, তাহাদিগের বিলাসিতা ত্যাগ করিতে হয়। অনেকে এই প্রভেদের জন্য কুমারীত্ব বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের সেই সকল কুমারীর কতক অংশ যাহা আমাদের বালবিধবাদের সংখ্যার অপেক্ষা অনেক অধিক, চিরজীবনই অবিবাহিতা থাকিয়া যাইতে হয়। তাহারা নিত্য আশা করে—নিত্য তাহা ভঙ্গ হয়, অবশেষে ত সেই আশাই ত্যাগ করিতে হয়। উপরন্তু উপেক্ষার অপমান চিরজীবনই সহ্য করিতে হয়, হৃদয় বিষাক্ত করা হয়। তখন তাহাদের পক্ষে ত সে আশা তাহাদের কষ্টের বৃদ্ধিই করে—তাহাদের গ্রীক পুরাণোক্ত টেণ্টেলাসের যন্ত্রণাভোগ-ই হয়। তাহার উপর যখন কতক অংশকে অবিবাহিতা থাকিতে-ই হয়, তখন অপর নারীরা দুই বা ততোধিকবার বিবাহিতা হইবে—স্বামিসহবাসসুখ পাইবে আর তাহারা একবারও তাহা পাইবে না, তাহা কিরূপে ন্যায়-সঙ্গত, তাহা আমাদের সংস্কারকরা ভাবিবেন কি? সুতরাং বলিতে হইবে, নারীসমষ্টির মঙ্গলের জন্য-ই ন্যায়বিচার করিয়া-ই উচ্চশ্রেণীভুক্তদিগের—যাহাদের ভিতর নারী-সংখ্যা অধিক হয়, তাহাদের বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহাতে সকল নারী-ই একবার বিবাহিত হইতে পায়। সেরূপ না করিলে তাহার ফল এই হয় দেখা যায় যে, ধনী বিধবাদের বিবাহ হয়, কিন্তু গরীব কুমারীরা একবারও বিবাহিত হইতে পায় না। তাহাতে গরীবদের উপর অত্যাচার হয়। এখন আবার বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীভুক্তদিগের বরপণপ্রথা যেমন ভয়ানক হইয়াছে, তখন তাহাদের বিধবা-বিবাহ কুমারীদের মঙ্গলের জন্য কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। পাশ্চাত্য-কুমারীদের এই বিবাহের আশা থাকার নিমিত্তই তাহাদিগকে পুরুষদিগের সহিত মিশিতে হয়—

আমোদে, খেলায়, গল্পে যোগদান করিতে হয়, কাম উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাহা রুদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইতে হয়। অনেক সময়ে তজ্জন্য অনেক উৎকট ব্যাধি হয়। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণকারীরা তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। অনেক সময়ে পদস্খলন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, অনেক সময়ে ভোগলোলুপতার জন্য আত্ম-বিক্রয় করিতে হয়, আবার তজ্জন্য অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। অনেক সময়ে তজ্জন্য ভ্রূণহত্যা করিতে বাধ্য হয়, জারজ সন্তান পালন করিতে হয়, বারবনিতার শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইতে হয়। হিন্দু-সমাজে উচ্চশ্রেণীর বিধবাদের এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত, তাহাদিগকে সেই অবস্থার উপযোগী করিবার নিমিত্ত, সংযমশিক্ষা দেওয়া বিধি আছে, এবং সেই সংযমশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলী করিয়াছিলেন। এইরূপ সংযমশিক্ষা শুধু তাহাদের পক্ষেই মঙ্গলজনক নহে—অন্য নারীদের ও সমাজের পক্ষেও মঙ্গলজনক, তাহা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই নিয়মগুলি পালন করা অত্যন্ত কঠিন—অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু কামজয় করাও অতিশয় দুরূহ কার্য্য; বিশেষতঃ মানসিক। তাহার অন্য সহজ উপায় এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। এই সংযমশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত আহারাদি বিষয়ে অনেক নিষেধ;—উপবাসাদি করা, বিলাসিতা ত্যাগ করা, পুরুষদিগের সহিত সচরাচর না মেশা, ব্রত-পূজা করা। এই সকল নিয়মের কঠোরতার জন্যও আবার হিন্দু-সমাজকে নারীনিগ্রহী বলা হয়—বিশেষতঃ উপবাসাদির নিয়মের জন্য। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, হিন্দু-বিধবারা এই সকল নিয়ম পালন করিয়া, নিন্দাকারীদের কথায় নির্য্যাতন সহিয়া তাহাদের দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার জন্য Cencus Reportএ প্রকাশ, তখন এই সকল নিয়মের শুভফল দেখিয়া নিয়মগুলিকে শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই বুঝা উচিত—তাহা অত্যাচারের নিদর্শন নহে। রোমান ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনীরা (monks & nuns) স্বইচ্ছায় প্রায় সেই সকল নিয়ম পালনই করেন। যাঁহারা কোন উচ্চ আদর্শের জীবন যাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই উপযোগী। সুতরাং সেগুলিকে নারীনিগ্রহের নিদর্শন বলা অত্যন্ত অন্যায়। এখন ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রে এই উপবাসের উপকারিতা স্বীকৃত। ব্রতাদি পালন করা ইচ্ছাশক্তির বিকাশ-সহায়ক (Training & devolopment of with) এবং রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা কতকটা সেইরূপ নিয়মাদি পালন করিয়া থাকেন। কামজয় বড়ই কঠিন। পুরুষদিগের সহিত অবাধ মেলামেশা থাকিলে অনেক সময়ে ক্ষণিক মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য অনেক সধবাদেরও, কুমারী বা বিধবাদের কা কথা, পদস্খলন হয়; পাশ্চাত্য উপন্যাসে তাহার বর্ণনা যথেষ্ট আছে। তাহার ফলও বিষময় হয়; সুতরাং তাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। আজকাল পাশ্চাত্যদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া চরিত্রহীন লোকরাও অবাধ মেলামেশা করিতে না দেওয়াই হিন্দুসমাজের নারীনিগ্রহের নিদর্শন বলিতে শুনা যায়। এই অবাধ মেলামেশায় যদি পদস্খলন হয়—অনেক স্থলেই হইয়া থাকে—কি ইংরাজী কি আজকালের বাঙ্গালা উপন্যাসে তাহার বর্ণনা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতে অনেক গৃহদাহ হয় এবং তাহার মন্দফল যখন নারীরাই ভোগ করে, তখন এইরূপ মেলামেশা বন্ধ করা নারীর মঙ্গলেচ্ছায় হিন্দুরা করিয়াছিলেন বলা উচিত। * যাহারা দোষ দেন, হয় তাঁহাদের মনুষ্য-চরিত্রের ও মনের বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই—না হয় তাঁহারা দেবতার অপেক্ষা মহৎ অথবা তাঁহারা সেইরূপ সুযোগপ্রয়াসী। কোন জ্ঞানী লোককে ত কখন বাড়ীতে বিষ যত্র তত্র ফেলিয়া রাখিতে দেখি না—এরূপ অবাধ মেলামেশা যখন নারীদের পক্ষে বিষের মত অশুভ-ফলদায়ক হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা কেবল পাশ্চাত্য অনুচিকীর্ষু লোকরাই দোষাবহ বলিতে পারেন। পাশ্চাত্য সমাজ-গঠনে যে নারীরা এরূপ মিশিতে বাধ্য হয়—আমাদের তাহা হয় না—তাহা তাঁহারা দেখেন না। আবার যখন দেখা যায় যে, অপত্যবৎসল হিন্দু সমাজশাসনকর্ত্তারা—যাঁহারা উচ্চশ্রেণীভুক্ত, তাঁহাদেরই কন্যাদের পক্ষেই বিধবার পালনীয় নিয়মাবলী কঠোরতম। নিম্নশ্রেণীভুক্তদিগের জন্য সেরূপ কঠোর নিয়ম ছিল না। তখন সে নিয়মাবলী ঐরূপ কন্যাদিগের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাহা না হইলে নিজেদের কন্যাদের নিয়মগুলি অতি সহজ করা হইত—অপরের কন্যাদের নিয়ম কঠোরতর হইত।

বিধবাদের বিলাসিতাত্যাগের নিয়মও অত্যন্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ বিলাসিতাত্যাগে অভ্যস্ত না হইলে তাহা পাইবার জন্য অনেককে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়—অনেক পাশ্চাত্য উপন্যাসে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু সমাজগঠনে সকল নারীই পুরুষদিগের প্রতিপাল্য। প্রধান পালনকর্ত্তা ভর্ত্তার অভাবে তাহার উপার্জ্জনে যৌথ-পরিবারে না থাকায়—যৌথ-পরিবারস্থ অন্য যাহারা তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে উহা কষ্টসাধ্য হয়, অধিকাংশ গরীব, তাহা যেন মনে থাকে। অপরিহার্য্য ব্যয় করাও অনেক সময়ে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যাহার আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, সে কখনও একান্ত আবশ্যক দ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু জোগাইবার ভার অন্য কাহাকেও দিতে চাহে না। যাহাদের আত্মীয়রা সঙ্গতিপন্ন, তাহারা যদি কোনরূপ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার বা অন্য বিলাসিতা ভোগ করেন, তাহা হইলে যাহাদের আত্মীয়রা সেরূপ সঙ্গতিপন্ন নয়—অধিকাংশই নয়, তাহারাও সেরূপ পাইতে চাহিবে—না পাইলে ক্ষুণ্ণ হইবে। তাহাদের মর্য্যাদা-হানি হইবে—চাহিলে আত্মীয়দের অত্যন্ত কষ্টকর হইবে, তজ্জন্য মনোমালিন্য হইবে। সকল বিধবার পক্ষে একই নিয়ম থাকিলে কাহারও কষ্টকর হয় না—সম্মান-হানিজনক হয় না। এই কারণেই মহাত্মা গান্ধি ধনীদিগকেও মোটা খদ্দর পরিতে বলেন। আমাদের বিধবাদের বেশ পাশ্চাত্যের Sisteres of Mercyদের শ্বেত বসনের মত নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ (Uniform)। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ—যেমন পাশ্চাত্যদেশে সম্মানসূচক; আমরা

---

* Shakspereএর ন্যায় মনুষ্য-চরিত্রাভিজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত Balzac তাই লিখিয়াছেন—"The santity of woman is incompatible with the duties and liberties of society. To emancipate woman is to corrupt them". see "A woman of thirty."

যদি ত্যাগধর্ম্মের প্রকৃত সম্মান করিতাম, তাহা হইলে আমাদের বিধবাদের বেশেরও সেইরূপ সম্মান করিতাম। তাহার উপর মনে রাখিতে হইবে, যাহাদিগকে কামজয় করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে বিলাসিতাত্যাগ অতি তুচ্ছ কথা।

এইরূপ সংযমে ও ত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া বিধবারা উচ্চ আদর্শে জীবন যাপন করিবার উপযুক্ত হন। হিন্দুসমাজ বিধবাদের পক্ষে পূজা-ব্রতাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কামকে ভগবানাভিমুখ করিবার উদ্দেশ্যে। একালের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণকারীদিগের কথায় Sublimate করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহা করাইয়া যাহাতে সর্ব্বভূতহিতার্থে তাঁহারা জীবন যাপন করিতে পারেন ও হিন্দুজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষয়িত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে তাহাতে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে। হিন্দুরা বিধবাদের দুর্ভাগ্যকেই তাহাদিগকে উচ্চতম, মহত্তম জীবনে লইয়া যাইবার প্রথম সোপানে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন—মহত্তম জীবনের সুখ ও শান্তির অধিকারিণী করিতে চাহিয়াছিলেন—সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। ত্যাগশীলতা, সেবাপরায়ণতা, পরার্থপরতা নারীদিগের মাতৃত্বের অঙ্গীভূত প্রকৃতিপ্রদত্ত গুণ। সেই সকল গুণ অর্জ্জন করিবার তাহাদের সহজ পটুতা আছে; নারীহৃদয়ের সেই উর্ব্বর ক্ষেত্রেই সেই সকল গুণের প্রকৃষ্ট বিকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; সেই জন্যই সাফল্যলাভও হইয়াছিল। যৌথ পরিবার-প্রথা জাতিভেদ-প্রথার দ্বারা সকল নারী সকল সময়েই পুরুষদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিল অর্থাৎ All Women Were endowed for all Times—কেবল গর্ভের শেষ মাসে ও প্রসবের পর কিছু দিনের জন্য নয়—এ কালের পাশ্চাত্যের নারীস্বত্বাধিকার প্রসারক বা যাহা পাইলেই বর্ত্তিয়া যায়—সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের স্বার্থসংঘর্ষে আসিতে হয় নাই, তাঁহাদের প্রকৃতি-প্রদত্ত পরার্থপরতা কলুষিত হইতে পায় নাই; সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা তাহার পূর্ণ বিকাশ সহজেই হইতে পাইয়াছিল। এই জন্যই এ দেশে একাধারে কর্ম্ম ও ধর্ম্মশীলা নারীর কোন কালেই অভাব হয় নাই। এই জন্যই কেবল ভারত-ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, "অশিক্ষিতা" বা সামান্য প্রাথমিক শিক্ষামাত্রপ্রাপ্তা বিধবারা বিপদের সময়েও রাজ্যভার লইয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন—তাঁহাদের সুখ্যাতি ও কীর্ত্তিতে ভারত-ইতিহাস সমুজ্জ্বল। পুণ্যশীলা অহল্যাবাই, রাণী কর্ম্মদেবী, রাণী দুর্গাবতীর জীবনকথা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই বিদিত। তদপেক্ষা সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে রাণী ভবানী, লক্ষ্মীবাঈ ও শরৎসুন্দরীর নামও উল্লেখযোগ্য।

এইরূপ প্রকৃত মহত্ত্বের অধিকারিণী হইতেন বলিয়াই গার্হস্থ্য জীবনে ত্যাগশীলা, সেবাপরায়ণা, পরোপকাররতা বিধবারা এখনও গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে বিরাজিতা। তাঁহাদেরই প্রভাবে এখনও গ্রামে গ্রামে জলাশয় আছে, তাহাতেই সাধারণের জলকষ্ট নিবারিত হয়, মানুষ মৎস্য খাইতে পায়। ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা আছে—অনাথ, ভিক্ষুক, পরিব্রাজকরা আশ্রয় পায়। রোগশোকক্লিষ্টরা কাহার কাছে প্রধানতঃ সেবা পায়? কে তাহাদের জন্য রাত্রিজাগরণ করে?—কে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেয়? কে মাতৃহীনদিগের মাতার স্থান অধিকার করে? কে অপত্য-প্রতিপালনে তাহাদিগকে সাহায্য করে? সেই একবসনা, একাহারা, পরসেবাব্রতরতা, প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি, মহীয়সী হিন্দু-বিধবা। (আবার এইরূপ পরের অপত্যপালন করিয়া মাতৃত্বের সুখও উপভোগ করিতে পান, তাহাদিগের ভক্তিশ্রদ্ধাও পান।) এই বিধবাদের জীবনের দৃষ্টান্তপ্রভাবেই এবং স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহাদিগকে এইরূপ সর্ব্বত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া সকল নারীই বিলাসাসক্তি ত্যাগ করিতে শিখেন, সর্ব্বত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়, ত্যাগ করিবার উপযুক্ত কার্য্যকাল দূরীভূত হয়—অন্যের দুর্ব্ব্যবহারে তাহা শিথিল হয় না—হৃদয়ের বল পান। এইরূপ সকলেই ত্যাগশীলতার—পরার্থপরতার প্রকৃত মহত্ত্বের অধিকারিণী হয়েন—প্রকৃত মহত্ত্বের অনুসরণ করিতে কোন ত্যাগস্বীকারে কুণ্ঠিত হন না—সকলের উপর সে প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই জন্য তাঁহারা মহারাণা প্রতাপের সহিত আরাবল্লী পর্ব্বতের জঙ্গলময় প্রদেশে ঘাসের রুটী খাইয়া জীবনধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এ কালে কুলীরমণীরাও মহাত্মা গন্ধির সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকায় অসহযোগে যোগদান করিতে পারিয়াছিল—তদ্দেশবাসীদের সকল অত্যাচার অকুণ্ঠিতভাবে সহিয়াছিল। এই মহত্ত্বের—পরার্থপরতার প্রভাব এখনও আমাদের পতিতা, বারবনিতাতেও প্রসারিত আছে দেখিয়া তাহাদের দুঃখময় জীবনের সহিত সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া প্রতিভাশালী শরৎবাবু লোকের দৃষ্টি, সহানুভূতি তাহাদের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহা পড়িয়া তরুণ-তরুণীরা বিভ্রান্ত হইয়া অনেকে মনে করিতেছেন যে, বারবনিতার জীবন হেয় নয় এবং সচরাচর তাহা কত নীচতার দিকে লইয়া যায়, তাহা দেখিতে ভুলিয়া যান। [ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)।

পুরস্কার

১

ও মালী, ও মালী, শোন না, আমাকে একটা ফুল দেবে?

মালী মাটী কোপাইতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।

আ মর্, মিন্‌ষে! কালা নাকি? ও মালী!

এতক্ষণে মালী চাহিল, এবং কিশোরী মেয়েটিকে দেখিয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিল। কিশোরীও তাহার মুখের প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিল।

কি বল্‌ছিলে?

তোমার মাথা!

আমার মাথা ত এই—বলিয়া মালী ঘাড় নীচু করিল।

ওঃ, মালীর আবার টেরি!

হ'লই বা টেরি! মালীর কি টেরি কাট্‌তে নেই? মালীর কি সখ হয় না?

না। তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারি নি।

হ্যাঁ, বক্‌তে হবে। মালী টেরি কাটবে না কেন, বল।

না, বল্‌ব না।

বলতেই হবে।

দেখ না, দাদা, আমার সঙ্গে খালি খালি ঝগড়া করছে!

কিশোরীর চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। যুবা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, ফুল বাস্তবিক এরই যোগ্য। ফুলের মত কোমল প্রাণ! বলিল, কেঁদ না। কাঁদছ কেন?

তুমি যে ধম্‌কালে।

আর ধম্‌কাব না। কি বলছিলে, বল।

অশ্রুর ভিতর দিয়া কিশোরী হাসিল। মালীর মনে হইল, বাগান শুদ্ধ ফুল যেন আজ এরই জন্য ফুটিয়াছে! এমন ফুলের মত হাসি! বলিল, ফুল চাইছিলে? চল, দিচ্ছি। এস আমার সঙ্গে।

মালী ভাবিতে লাগিল, এই হাসে, এই কাঁদে! এ কি উন্মাদিনী? কুমারী কে? কিন্তু মালীকে কে বলিল যে, কিশোরী কুমারী? গহন বনে গোপনে ফুল ফুটিলে যিনি ভ্রমরকে সন্ধান দেন, তিনি।

মালী তাহার গোলাপ-ক্ষেতে কিশোরীকে লইয়া গেল। নাতিবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র; বিবিধ বর্ণের ফুলে ভরা। তাহার মনে হইল, যেন কিশোরীকে দেখিয়া সমগ্র গোলাপ-ক্ষেত্র উল্লাসে হাসিয়া উঠিল। যুবা একবার কুমারীর পানে চাহিল; দেখিল, এ ক্ষেতে এমন একটিও ফুল নাই, যা ঐ স্ফুটনোন্মুখ ফুলের সমতুল। বাছিয়া বাছিয়া একটা স্বর্ণ-বর্ণের ফুল কাটিয়া মালী কিশোরীর হাতে দিল।

অতিশয় আগ্রহে কিশোরী ফুলটি গ্রহণ করিল। উঃ! কিশোরীর হাতে কাঁটা ফুটিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে।

এ-এ-রে! তুমি ত ভারি বদ্‌লোক!

কি হ'ল?

আমার আঙ্গুলে কাঁটা ফুটিয়ে দিলে!

কুমারীর চক্ষু আবার সজল হইয়া উঠিয়াছে।

যুবা মনে মনে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আমি দিলুম?

তবে কে? এখানে আর কে আছে? আমায় বল্‌লে না কেন, ফুলে কাঁটা আছে।

তুমিই বা দেখে নিলে না কেন?

বা রে! আবার ধম্‌কাচ্ছে!

আচ্ছা বেশ, আমি ভাল ক'রে দিচ্ছি—বলিয়া মালী তাহার কোঁচার কাপড় ছিঁড়িয়া কিশোরীর আঙ্গুল বাঁধিয়া দিল।

তুমি মালী, এমন ভাল কাপড় কোথা পাও? বাবুরা দেয় বুঝি? তোমায় খুব ভালবাসে, না?

হ্যাঁ। তুমি কাকে ভালবাস?

ছিরুকে?

ছিরুকে! মালীর মুখ সহসা অন্ধকার হইয়া গেল।

কুমারী বলিল, আর একটা দাও না।

কি করবে?

ছিরুকে দেব।

তবে দেব না।

কেন?

তুমি পর ত দি।

আমি? না, না, ছিরু পরবে। আহা, সে ছেলেমানুষ! দাও না একটা।

না, তুমি ছেলেমানুষ! তোমার আঙ্গুলে কাঁটা ফুটবে।

তা হ'ক! একবার ত ফুটেছে। তুমি দাও। দাও না একটা।

একটা না, দু'ট দেব। একটা ছিরুকে দিয়ো, একটি তুমি পোরো? পরবে ত?

ও মা, কি যে বল! আমি গিন্নী-বান্নী মানুষ! আমার কি এখন ফুল পরা সাজে?

খুব সাজে। এস, আমি পরিয়ে দি।

কিন্তু মালীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এই সময় এক প্রৌঢ় আসিয়া বলিলেন, অসি, হেথা তুই! আমি হিল্লি দিল্লী সাত মুল্লুক খুঁজে খুঁজে হাল্লাক!

ও মা, তুমি এর মধ্যে দিল্লী বেড়িয়ে এলে? আমাকে নিয়ে গেলে না? আচ্ছা, আচ্ছা, তবে তোমার সঙ্গে আড়ি।

ওরে পাগলী! তুই দিল্লী গেলে ছিরু কার কাছে থাক্‌বে?

কেন, আমার সঙ্গে যাবে।

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে যাবে! তার পর রেলে চ'ড়ে তার অসুখ করুক, মাথা ধরুক—

না, না, তবে বেশ করেছ। তুমি একলা গেছ। দেখ, দাদা! ঐ মালীটা আমায় কত ফুল দিয়েছে দেখ। কিন্তু আমার আঙ্গুলে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে।

কৈ দেখি, দেখি।

সেও নতুন কাপড়খানা ফড় ফড় ক'রে ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছে।

নিজের কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছে! এই নাও, ওকে দু'ট টাকা দাও।

কিন্তু মালীকে আর সেখানে দেখা গেল না।

২

মেয়েটির মনোবিজ্ঞান একটি নিবিড় রহস্য।

দুই বন্ধুতে আলোচনা হইতেছিল। তন্মধ্যে একটি আমাদের পরিচিত—সেই মালী। ইহার প্রকৃত নাম সিতেশ। অপরটির নাম দিনেশ।

দিনেশ বলিল, রহস্য কেন?

নয়? কথায় কথায় হাসে কাঁদে—যেন উন্মাদিনী। কিন্তু দৃষ্টি উন্মাদিনী নয়। আমি ত ইংলণ্ডে, য়ুরোপে বড় বড় পাগলা-গারদ সব দেখেছি। এমন একটা পাগল দেখি নি, যার চোখ তার পরিচয় না দেয়। এর চোখে সে পরিচয় পাই নি। ও-দেশে এর চেয়ে অনেক সুন্দরী দেখেছি; কিন্তু এমন স্বচ্ছ, সরল চোখ কখন দেখি নি। যেন শরতের নীল আকাশ, এই মেঘ ঘনিয়ে আসে, এই হাসে।

দিনেশ একটু হাসিয়া বলিল, কি হে, প্রেমে প'ড়ে গেলে না কি?

এখনও ঠিক পড়ি নি বটে, কিন্তু পড়াও আশ্চর্য্য নয়।

বয়স কত জানো?

বয়স? সেও এক আশ্চর্য্য! শরীর দেখলে মনে হয়, ষোল কি সতের। কিন্তু হাব-ভাব, স্বভাব, সব বালিকার। দেখলে মনে হয়, যৌবন যেন মুসড়ে রয়েছে, ফুটে উঠতে পারছে না। কোন যুবতী কোন যুবা পুরুষের কাছ থেকে অমন ক'রে ফুল চাইতে পারত না।

তোমার কাছে এসে ফুল চাইলে বুঝি?

সে কি চাওয়া? জোর ক'রে নেওয়া। সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি; কিন্তু কথা কইলে যেন কতকালের পরিচয়! লজ্জার লেশমাত্র নেই। মুখে মনোবিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনেছি—

শেষ ঘরে এসে দেখছ, নিবিড় রহস্য? এতগুলা টাকা খরচ, এত দিনের গবেষণা, সব বৃথা হয়েছে, বল! একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মন বিশ্লেষণ করতে পারছ না, যা হোক, ফুল দিয়েছ-দিয়েছ, খাম্‌কা প্রাণটি যেন দিও না।

প্রাণ কি সাধ ক'রে কেউ দেয়! সেও ঐ ফুলের মত কেড়ে নেয়। কিন্তু সে ভয় নেই। তার ভালবাসার পাত্র আছে।

সে খবর তুমি কোথায় পেলে?

তারই মুখে, বললে, ছিরুকে ভালবাসি।

ওঃ, তাই বল! আমাদের অসি পাগলী।

হ্যাঁ হ্যাঁ, অসি। তুমি চেন না কি?

খুব চিনি। আমার পিস্‌তুতো বোন্—আপন পিসীর মেয়ে। ভাল নাম অসিতা। আমরা 'অসি' ব'লে ডাকি।

ছিরু কে?

আরে রাম-রাম! সে একটা পুতুল—তাও বিকৃত। কিন্তু অসি সেটাকে দেখে যেন কার্ত্তিক। ডাক্তাররা বলে—মনোম্যানিয়াক্। তার লক্ষণ কি, জানি না। তুমিও ত ডাক্তার, তুমি কি বল?

একবারমাত্র দেখেছি, নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি নে। তবে লক্ষণ কতকটা তাই বটে। একটা বিষয় নিয়ে যে পাগল হয়, তাকেই মনোম্যানিয়াক্ বলে।

দিনেশ হাসিয়া বলিল, তা যদি বল, তা হ'লে মনোম্যানিয়া যে কার নেই, তা ত বলতে পারি নি। একটু আধটু বায়ের ছিট সবারই আছে। আমাদের অঘোর সব দিকে বেশ। কিন্তু তার কাছে কাব্য-সাহিত্যের কথা কও দিকি, ক্ষেপে উঠবে। উত্তেজনায় তখন তার চোখ দুটো যেন জ্বল্‌তে থাকে, তুমিও ত ফুল নিয়ে পাগল। বল—ফুল তোমার সঙ্গে কথা কয়!

সিতেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, সত্যি কথা কয়। কখন তার অসুখ হয়েছে বলে, তৃষ্ণা পেলে জল চায়; কিন্তু তার ভাষা আলাদা। সে ভাষা শিখতে হয়।

এও হয় ত সেই পুতুলের ভাষা শিখেছে। অতি চমৎকার রাঁধে। কিন্তু রাঁধতে রাঁধতে ব'লে উঠল, ছিরু কাঁদছে; অমনি ছুটে চল্‌ল। তখন ডালই ধ'রে যাক, আর ভাতই চোঁয়াক, সব ফেলে পাগলের মত ছুটে যাবে।

আচ্ছা, এদের বংশে কেউ কখন পাগল ছিল?

আমার ত জানা নেই। তবে, এর যেমন ছেলে, এর মাতামহের ধ্যান-জ্ঞান ছিল তেমনি টাকা। যখন তাঁর আয় ছিল মাসে প্রায় হাজার টাকা, তখন চার গণ্ডা পয়সা রোজগার করবার জন্যে একবার এক ভদ্রলোকের মোট বয়েছিলেন। অসির মা, আমার পিসীমার শুনেছি ছেলে হবার জন্য এমন ক্লেশ নেই, যা তিনি করেন নি। কবচ-মাদুলীতে তাঁর সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়ে থাক্‌ত। তাঁর বাপ, ঐ টাকার কাঙ্গাল, পয়সা খরচ হবে ব'লে মেয়ের বে দিতে চান নি। আমার পিসীমার পণ—বে করবেনই, নইলে ছেলে হবে না। স্বামীর প্রয়োজন ঐ ছেলের জন্য। দিন-রাত তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল মাতৃত্ব। পনের বছর বয়সে বে করলেন বাপকে লুকিয়ে।

সিতেশ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, বাপকে লুকিয়ে? এ দেশে এমন হয়? কন্যা সম্প্রদান করলে কে?

মামা। তার পর যখন সীঁতেয় সিঁদুর প'রে এসে বাপকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন, তখন বাপ হিসেব করতে বস্‌লেন, রাঁধুনী রাখতে বেশী খরচ পড়ে, কি পেটভাতায় মেয়েকে পুষতে বেশী খরচ। যাক্, নিখরচায় যখন তাঁহার কলঙ্ক, মেয়ের আইবুড় দশা সব ঘুচে গেল, তার উপর মেয়ে তাঁর কাছে থেকে রেঁধে বেড়ে দেবে, বুঝলেন, তখন আর আপত্তি রইল না।

সিতেশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, তার পর? অসির বাপ বিবাহ করলেন, কিন্তু স্ত্রীকে কাছে রাখলেন না? স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়—

সময় কোথা? তিনিও ছিলেন মস্ত খেয়ালী।

খেয়ালী কি? খেয়াল-গান করতেন?

দিনেশ হাসিয়া বলিল, না। তাঁর খেয়াল ছিল তোমার মত—ফুলের। দিনরাত ভাবতেন, কেমন ক'রে খোদার ওপর খোদকারি করবেন একটা নূতন কিছু সৃষ্টি ক'রে। এই পরীক্ষা নিয়েই দিন-রাত মত্ত। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবেন কখন্? পিসীমা যে দিন প্রথম স্বামি-সন্দর্শনে গেলেন, তাঁকে দেখে পিসেমশাই খানিক অবাক হয়ে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে গা? তার একটু পরেই নিরীক্ষণ ক'রে বল্‌লেন, ওহো, তোমায় বে করেছি, না? এস, এস। বাঃ, তুমিও ঠিক ফুলের মত সুন্দর।

তোমার পিসীমা কি বললেন?

ও কথায় বাঙ্গালীর মেয়ে কোন উত্তর দেয় না। লাল হয়ে ওঠে। যে ঝি সঙ্গে গেছল, সে বলেছিল, পিসীমাও ঠিক তাই হয়েছিলেন।

তা বটে। কিন্তু তোমার পিসীমার বাপ মেয়েকে জামাইয়ের কাছে পাঠালেন যে?

তিনি তখন জীবিত ছিলেন না। সামান্য জ্বরে হঠাৎ এক দিন তিনি মারা যান। বৃদ্ধ টাকাগুল যদি সঙ্গে ক'রে

নিয়ে যেতে পারতেন, বোধ করি, পিসীমা এক কপর্দ্দকও পেতেন না। কিন্তু তা আর হ'ল না। পিসীমা হলেন উত্তরাধিকারিণী। এ দিকে যত বয়স বাড়ছে, পিসীমার চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ততই দূরে স'রে যাচ্ছে। ক্রমে মাদুলী-কবচে তাঁর গা ভ'রে উঠল। যত দিন যায়, আশা ততই বাড়ে। ক্রমে অনেক বয়সে আশার ধন তাঁর জঠরে এল। তখন ভয়, পাছে জঠরেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু পিসীমা সমস্ত প্রাণ একাগ্র ক'রে গর্ভস্থ শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখলেন।

সিতেশ বলিল, তোমার পিসেমশাই নিশ্চয় খুব আহ্লাদিত হয়েছিলেন ?

জানি না। তবে, শুনেছি, তিনি পিসীমাকে এক'দিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ সব কেন পরেছ ? তাতে পিসীমা বলেছিলেন, তুমি নূতন ফুল সৃষ্টি করবে ব'লে।

পিসেমশাই কি বল্লেন ?

শুনেছি, বলেছিলেন, আমি ত পারছি নি। তুমি যদি পার, তাতেও আমার গৌরব। পিসীমা বলেছিলেন, সে ত তোমারই সৃষ্টি।

তার পর ?

তার পর অসি হ'ল। পিসেমশাইকে ডেকে পিসীমা বল্লেন, এই দেখ, তোমার সৃষ্ট ফুল। পিসেমশাই অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বল্লেন, হাঁ, ফুল বটে! বাঃ! সবুজ গোলাপ আছে; আমি ইচ্ছা করেছিলুম, কালো গোলাপ সৃষ্টি করব। নাম দেব—অসিতা। এও ত দেখছি একটু কালো। এরও নাম রইল অসিতা।

কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সিতেশ বলিল, মেয়েকে নিশ্চয় পিসেমশাই খুব ভালবাস্তেন ?

ভালবাসতে আর পেলেন কৈ ? অসি হবার অল্পদিন পরেই তিনি আমেরিকা যান। সেখানে কি একটা বিষাক্ত ফুলের কাঁটা ফুটে তাঁর মৃত্যু হয়।

অসির মা অবশ্য খুব কাতর হয়েছিলেন ?

হয়েছিলেন। তবে অসিই ছিল তাঁর সর্ব্বস্ব। ক্রমে সে হামাগুড়ি দিতে, চলতে, মা ব'লে ডাক্তে, আবদার করতে শিখলে। বায়না করলে পিসীমা মেয়েকে ঐ পুতুলটা দিয়ে ভোলাতেন, কাঁদ্‌লে বল্‌তেন, বুড়ো মাগী, ছেলের মা, আবার কাঁদ্‌ছিস্ ? এই নে ছেলেকে কোলে কর। মেয়ে জিজ্ঞাসা করত, ও কে ? পিসীমা বল্‌তেন, ও তোর ছেলে ছিরু। কাদ্‌ছে, ভোলা। সেই যে ছেলে হ'ল ছিরু, আজও তাই।

তোমার পিসীমা ত নেই ?

না। প্রায় বছর এগার বারো হ'ল, অসিকে আর বিষয়সম্পত্তি সব শ্বশুরকে দিয়ে মারা গেছেন। পোড়ারমুখী দাদামশাইকে বল্‌ত—মা। তার পর অনেক ক'রে ছিরুকে কেড়ে নেবার ভয় দেখিয়ে "দাদা" বল্‌তে শেখানো হয়েছে।

সিতেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিনেশ জিজ্ঞাসা করিল, কি, ভাবছ কি ?

অসিতাকে কেউ আরাম করতে পারে নি ?

তুমি চেষ্টা ক'রে দেখ না। তোমার সঙ্গে দাদামশায়ের আলাপ ক'রে দেব।

৩

দাদামহাশয় বলিলেন, আপনি যে এত বড় ডাক্তার, সিতেশবাবু—

আমাকে সিতেশ ব'লেই ডাক্‌বেন; আর 'তুমি' বল্‌বেন।

বেশ, তাই হবে! বয়োজ্যেষ্ঠ ত বটে।

শুধু বয়সে কেন, সম্পর্কেও তাই! দিনেশের দাদামশাই আমার ত আর পর হ'তে পারেন না। চেষ্টা করেও নয়।

হা-হা হা, চেষ্টা করেও নয়।

দিনেশ কহিল, দাদামশাই, এই লোকটির গায়ে-পড়া আত্মীয়তায় এর পর গাঁ-ছাড়া না হ'তে হয়। আগে থেকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি কিন্তু।

কি বলিস্, দিনেশ! গাঁ-ছাড়া ? সিতেশকে পেলে আমি ভাগ্য ব'লে মনে কর্‌ব। চিরদিন সহরে কাটিয়েছি। তার পর পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ—স্বেচ্ছায় নয়, দায়ে প'ড়ে। সঙ্গী বল, সাথী বল, ঐ পাগল নাতনী। ওঃ, কি কুক্ষণেই ঐ পুতুলটা এসেছিল!

একটা পুতুল আস্‌বে, তার আর আশ্চর্য্য কি, দাদামশাই ?

না, দিনেশ, ওর একটু ইতিহাস আছে।

কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সিতেশ প্রশ্ন করিল, ইতিহাস কি, কি রকম ?

দাদামহাশয় বলিলেন, অসির মাতামহ ভারী কৃপণ ছিলেন। নিজেকে মনে করতেন, ভারি চতুর। কিন্তু আমি দেখেছি, সংসারে যে আপনাকে যত চতুর ঠাওরায়, সে তত ঠকে। কাক বড় সিয়ান্, কিন্তু বিষ্ঠা খায়। মাতামহ এক জনকে টাকা ধার দিলেন। আদায় হ'ল না।

সিতেশ জিজ্ঞাসা করিল, লেখাপড়া কিছু ছিল না ?

থাক্‌বে না কেন ? সে লিখে দিয়েছিল, আমার স্থাবর, অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি, সব রেহাল্ রইল। মাতামহ শীল ক'রে পেলেন ঐ পুতুলটি। মাতামহ তাই নিয়ে বাড়ী এলেন।

দিনেশ বলিল, এ সব কথা আমি শুনি নি। পাওনাদারকে জেলে দিলেন না ?

সে তখন ফেরার !

সিতেশ বলিল, ওঃ, তার পর ?

অসির মা ছেলেবেলা পুতুল পুতুল ক'রে কাঁদতেন। ঐ কাচের পুতুলটা মেয়েকে দিয়ে তাঁর বাপ বল্‌লেন, এই নে পুতুল। এ তোর ছেলে। দেখিস্ যেন ভাঙ্গে না। অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি। মেয়ের ছেলেবেলা থেকেই খোকা কোলে পাবার সাধ। পুতুলটি ছিল তার প্রাণ। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার খোকার সাধ জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু তবু এ পুতুলটিকে ফেলেন নি। কত রকম সাজগোজ ক'রে তুলে রেখে দিতেন তার পর অসি হ'ল। ছেলেবেলায় এক দিন মাকে জিজ্ঞাসা করলে, মা, আমি তোর কে ? বৌমা হেসে বল্‌লেন, তুই আমার খোকা। মেয়ে বল্‌লে, আমার খোকা কৈ, মা। বৌমা পুতুলটা দিয়ে বল্‌লেন, এই তোর খোকা। অসি জিজ্ঞাসা করলে, এ আমার খোকা ? ওর নাম কি ? বৌমা বল্‌লেন—ছিরু। মেয়েটার এমনি সরল বিশ্বাস, মা বলেছে খোকা ত ষোল আনা খোকা। আজও সেই বিশ্বাস। বরং দিন দিন বাড়ছে। আমার ত অবস্থা এই, কবে আছি, কবে নেই। কিশোরী মেয়ে, টাকা-কড়ি অনেক, তার ওপর পাগল।

বৃদ্ধের চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। গাঢ় স্বরে বলিলেন, বে' দিয়ে যেতে পার্‌লে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম। কিন্তু বে' কি, ও তা বোঝে না। বল্‌লে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে এ দিকে শাস্ত্র বল্‌ছেন—অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদাম্—পতিমর্য্যাদা যত দিনে না বুঝবে, তত দিন কন্যার বে' দেওয়া উচিত নয়! আর এ পাগল মেয়েকে বিবাহ কর্‌বেই বা কে ? পয়সা-কড়ি আছে শুনে কেউ কেউ ঝোঁকে। তাদের মতলব মনে হয়, সম্পত্তিটি হস্তগত ক'রে দুদিন পরে পাগ্‌লা-গারদে ঠেল্‌বে।

সিতেশ বলিল, ঠিক কথা।

বৃদ্ধ বলিলেন, কথা ত ঠিক, কিন্তু উপায় কি ? যদি বে' করতে ইচ্ছা হয় ভেবে, অনেক বিবাহ-সভায় অসিকে নিয়ে গিয়েছি। পাড়ার দু'চারজন মেয়ে আসে—বিবাহিতা। তারা স্বামীর কথা, স্বামীর আদরের কথা বলে, ও তার কিছুই বুঝে না।

যাকে যৌন ভাব বলে, দাদামশাই, আপনার নাত্‌নীর মনে তা এখনও জাগে নি।

দাদামশাই হতাশের স্বরে কহিলেন, আর কবে জাগবে ? বয়স ত হয়েছে !

হয়েছে সত্য, কিন্তু আপনার বৌমা 'এই তোর খোকা' ব'লে একটা কাচের পুতুল কোলে দিয়ে অসিতার মনকে যে ভাবে (suggestions) অভিভাবিত করেছিলেন, তার ক্রিয়া এখনও চলছে।

দিনেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, এমন ত অনেক কথা আমরা শুনি, সিতেশ, যা এ-কাণ দিয়ে ঢোকে, ও-কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

তা যায়, দিনেশ ! Suggestion দিতে, মনকে অভিভাবিত করতে জানা চাই। কখন কি শোন নি, শক্তিশালী মহাপুরুষের একটা কথায় একটা লোকের জীবনের ধারা বদলে গেছে ? সরল বিশ্বাসী মন হ'লে সেই বিশ্বাসের ফলে শীঘ্র কার্য্য হয়। তা না হলেও শক্তিশালী অভিভাব উদ্দীপন কখন ব্যর্থ হয় না। এ ক্ষেত্রে অসিতার মাতৃবাক্য লগ্নমাফিক লেগে গেছে। তার পর সেই হ'তে অসিতা নিজের মনকে নিজে নিজে অভিভাবিত করেছে—এই আমার ছেলে। আপনার মনকে আপনি পুনঃ পুনঃ suggestion দিয়েছে। শোন নি কি, অসুখ হ'ল, অসুখ হ'ল করতে করতে সত্যই অসুস্থ হয়ে পড়ে ?

দাদামহাশয় কহিলেন, তা শুনেছি। কিন্তু একটা কাচের পুতুলকে সত্যিকার চেতন ছেলে ব'লে মনে করা—

সিতেশ উত্তর দিল, যে বয়সে ছেলে ব'লে কাচের পুতুল দেওয়া হয়েছিল, সে বয়সে জড়-চেতনে পার্থক্যজ্ঞান বড় থাকে না। তা ছাড়া, পাথর বা অষ্টধাতুর বিগ্রহ নিয়ে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে বাৎসল্যভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকার কথা কে না শুনেছে? গোপাল তার ভক্তের সঙ্গে কথা কয়। হাসে, কাঁদে, আবদার-অভিমান করে, এ দেশে ত এ ঘটনা বিরল নয়। সাধকের নিজের ভাব বিগ্রহকে আশ্রয় ক'রে ঐ রকম খেলা করে। সে ক্ষেত্রে ভক্তের ভক্তি তাকে আবিষ্ট ক'রে রাখে, এ ক্ষেত্রে মাতৃত্ব। গোপালের ভক্তকে কে পাগল বলে? এই মাতৃভাব মাতৃস্তন্যের সঙ্গে অসিতার অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সন্তানলাভের জন্য আপনার বৌমার উৎকট আগ্রহও মনে ক'রে দেখুন। তার উপর আবার বাপ ছিলেন বিষম খেয়ালী। বাপের খেয়াল, মায়ের মাতৃভাব, অসিতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। অবশ্য অসিতার ভাব কতকটা অপ্রাকৃত—abnormal বলা যেতে পারে। কিন্তু তাই ব'লে পাগল বলব কেন? যার মন দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, সেই পাগল। ছিরুর সম্বন্ধে অসিতার দায়িত্বজ্ঞান ত যথেষ্ট আছে। পাগল হ'লে হয় ত ছিরুকেই কোন্ দিন গলা টিপে মারত।

দাদামহাশয় বলিলেন, কথা ত সঙ্গত, কিন্তু—

সিতেশ হাসিয়া বলিল, ওতে আর কিন্তু নেই। এ দেশে একটা কথা আছে, "তদ্ভাবে ভাবিতা," ভাবে মোহ আনে—কখন স্থায়ী, কখন ক্ষণিক। ধরুন, যাত্রা হচ্ছে, খুব জমেছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার তীব্র বেদনায় শ্রোতা কেঁদে আকুল। তার সাময়িক মোহ এসেছে। সে তখন ভুলে গেছে, এ স্থানও বৃন্দাবন নয়, এ কালও সে কাল নয়, আর ঐ শ্রীরাধা বলাই বষ্টমের বওয়াটে ছেলে বঙ্কা। শ্রোতার মন তখন এ সংসারের নিত্য তরঙ্গ-হিল্লোলের বহু উর্দ্ধে—ভাবজগতে। বৈষ্ণব সাধকরা অতি কৌশলে সংসারের ক'টা নিত্যভাবকে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে ভগবৎসাধনার সোপান করেছেন। সাধকের ভাব স্থায়ী আর গাঢ় হ'লে রসে পরিণত হয়—দুধ ম'রে যেমন ক্ষীর।

এই সময় অসিতা ব্যস্ত-সমস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, মালী, তুমি এখানে ব'সে গল্প করছ, আর ছিরু ফুল নেবে ব'লে বায়না করছে। আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

খুঁজে বেড়াচ্ছ?

নয়? তোমার বাগানে গেলুম। তারা কেউ বল্‌তেই পারলে না। চল, আমায় ফুল দেবে।

আচ্ছা, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

না, আমার সঙ্গে চল। ও দাদা, মালীকে আমার সঙ্গে আসতে বল না!

দাদা বলিলেন, তুই মালী বলছিস কাকে?

কেন, ঐ ওকে। সে দিন দেখলুম, মাটী কোপাচ্ছে।

দিনেশ বলিল, মাটী কোপালেই বুঝি মালী হয়? তোর ত বেশ বুদ্ধি! তুই এই যে দাদামশায়ের জন্য, ছিরুর জন্য রাঁধিস্। তা হ'লে তুই রাঁধুনী।

দূর! তা কেন? ও মালী নয়, তবে কে?

উনি ডাক্তার।

ফুলের ডাক্তার?

সিতেশ বলিল, হঁ্যা, আমি ফুলের ডাক্তার, ছোট ছেলের ডাক্তার।

তা হ'ক, তুমি এস, আমায় ফুল দেবে।

আচ্ছা, তুমি এখন থাক। আমি তোমার দাদার সঙ্গে কথা কই। বাগানে গিয়েই ফুল পাঠিয়ে দেব।

তা হবে না। আমি বেছে বেছে ফুল নেব। ছিরুকে যাতে মানাবে।

বেশ, তা হ'লে বিকালে যেয়ো, তুমি যে ফুল পছন্দ করবে, তাই দেব।

না। এখনি চল। চল না। বলিয়া অসিতা সিতেশের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

দিনেশ বলিল, লজ্জাও নেই, সরমও নেই।

সে লজ্জা-সরম যখন আস্‌বে, তখন আর কোন ভাবনার কারণ থাক্‌বে না। যৌনভাব থেকে এই লজ্জা-সরমের উৎপত্তি।

দাদামহাশয় অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন। অসিতাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কহিলেন, আচ্ছা, দিদি, তুই এখন যা। সিতেশ আমার সঙ্গে কথা কয়ে বাগানে গেলেই তোতে আমাতে যাব। বেছে বেছে ফুল নিয়ে আস্‌ব। ঐ ছিরু কাঁদ্‌ছে না?

ও মা, সত্যিই ত! বাবা! এক দণ্ড যদি আমাকে ছেড়ে থাক্‌বে! বলিয়া অসিতা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

দাদামহাশয় বলিলেন, সিতেশ, এ কি আর সারবে?

চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি? সাজেশ্চনের ক্রিয়া দেখুন! সত্যি ত ছিরু কাঁদে না, কাঁদেও নি। কিন্তু যেই আপনি সাজেশ্চন্ দিয়েছেন, অমনি ও কান্না শুন্তে পেলে! বালিকার সরল মন ভাবপ্রবণ। মনের ধর্ম্ম হচ্ছে সংকল্প-বিকল্প। একবার বলে—হাঁ, একবার বলে—না। এমনি বিপরীত ভাব-তরঙ্গ মনের ভিতর নিরন্তর রঙ্গ করছে, তাকে ঘোলা ক'রে দিচ্ছে। আপনার নাত্নীর মন স্থির, স্বচ্ছনীর। যে রঙ্গে রঙ্গিয়ে দেবেন, সেই রঙ ধরবে। এর মনের এখনও বয়সোচিত বিকাশ হয় নি।

দিনেশ বলিল, তুমি যা-ই বল, সিতেশ! অসির আর আরাম হওয়া সম্ভব নয়।

চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়।

বেশ ত, ক'রে দেখ না।

কিন্তু আমার ওপর বিশ্বাস ক'রে সম্পূর্ণ ভার দিতে হবে।

দাদামহাশয় বলিলেন, নিশ্চয়। সিতেশ ও দিনেশ চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই অসিতা আসিয়া প্রশ্ন করিল, দাদা, মালী চ'লে গেল?

দাদা হাসিয়া কহিলেন, আবার মালী বল্‌ছিস্?

মালী নয়, তবে ও কে?

ও তোর বর।

আমার বর? আমাকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে?

তা যাবে বৈ কি।

ও মা, ছিরুকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না!

ছিরুকে ছাড়বি কেন? ছিরুকেও নিয়ে যাবি। তোর বর হ'লে ত ছিরুর বাপ হ'ল।

ছিরুর বাপ? তবে ত ছিরুকে অনেক—অনেক ফুল দেবে? চল দাদা, আমরা যাই। গিয়ে, বেছে বেছে ফুল আনি গে।

যেতে হবে কেন রে? সেই ত ব'লে গেছে, পাঠিয়ে দেবে।

তা দেয় দেবে। তবু চল, আমরা যাই।

কেন বল্ দিকি? ওর বাগানে যেতে তোর খুব ভাল লাগে, না?

হ্যাঁ, দাদা, চল! আমাকে আদর ক'রে ফুল দিয়েছে।

অগত্যা দাদামহাশয়কে যাইতে হইল।

৪

যে সম্মোহন প্রক্রিয়া (Hypnotism) পাশ্চাত্য জগতে নিত্য নিত্য বহুল প্রসার লাভ করিতেছে, প্রাচীভূমে বহু পূর্ব্বে তাহা সম্মোহন নামে প্রচলিত ছিল। উত্তর-গোগৃহ-যুদ্ধবর্ণনায় মহাকবি কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন—

"তবে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র হইল স্মরণ।
সম্মোহন নাম অস্ত্র মোহে রিপুগণ॥
মন্ত্রে অভিষেকি পার্থ মারিলেন বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কারু জ্ঞান॥"

কিন্তু তখনকার এবং এখনকার প্রক্রিয়ায় প্রভেদ আছে। এখন নানা ভাবে হস্তসঞ্চালন করিয়া এ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়।

সম্মোহন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগপারদর্শী সিতেশ স্থির করিল, সর্ব্বপ্রথমে এই চিকিৎসাই অবলম্বন করিবে। কিন্তু তাহার সুযোগ-সুবিধা চাই। অসিতা খাম্‌কা চিকিৎসাধীন হইতে রাজী না হইতে পারে। সে সুযোগ দাদামহাশয় করিয়া দিলেন। এক দিন অসিতাকে বলিলেন, অসি, আজকাল ছোট ছেলেদের বড় লিভার হচ্ছে। দুধের দোষ। ছিরুকে যে সে দুধ দিস্ নি।

দুই এক দিন পরেই অসিতা আসিয়া কহিল, কি হবে, দাদা, ছিরুর অসুখ করেছে।

তার জন্য ভয় কি? অত বড় ডাক্তার রয়েছে তোর হাত-ধরা!

কে? সেই বর?

হ্যাঁ, তাকে বল না।

কি বলব?

বলবি, বর, ছিরুকে ভাল ক'রে দাও।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অসিতা বলিল, কিন্তু ছিরু ত অষুধ খেতে পারে না, দাদা! কি হবে?

তবে আর তার বাহাদুরী কি? সে জল-পড়া জানে, ঝাড়ফুঁক করতে জানে।

তাতে কি ভাল হবে?

কেন হবে না? বামুন-মেয়ের ছেলের যখন অসুখ হ'ল, তুই ত নিজের চোখে দেখেছিস্, রোজা এসে ঝেড়ে আরাম ক'রে দিলে।

বর কি রোজা?

খুকুবড় রোজা। ও ত কাউকে অষুধ দেয় না। ঝাঁড়ফুঁক করেই ভাল ক'রে দেয়।

তবে তুমি বল, দাদা!

আমি কেন রে, তুই বল্ না।

না, দাদা, আমাকে সে অত ভাল ভাল ফুল দেয়।

তোকে দেয়, না ছিরুকে?

ছিরুকেও দেয়, আমাকেও দেয়।

কেন দেয়?

তা জানি নি। কেন দেয়, দাদা?

দাদা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সে তোকে ভালবাসে।

কথাটিতে অসিতার যেন একটু ধাঁধা লাগিল। বলিল, ভালবাসে, ভালবাসে?

নিশ্চয়। নইলে অমন বাছা বাছা ফুল তোকে দেয়? তুই যেমন ছিরুকে ভালবাসিস্, সেও তেমনি তার ফুলগুলি ভালবাসে। জানিস্ ত, কাউকে ছুঁতে পর্য্যন্ত দেয় না। তুই ছিরুকে যেমন সাবধানে রাখিস্, সেও ফুলগুলিকে তেমনি সাবধানে রাখে; কত যত্ন ক'রে পালন করে।

তবে আমাকে দেয় কেন?

তোকে ভালবাসে, তাই ভালবাসার জিনিষ তোর হাতে তুলে দেয়।

ভালবাসে, ভালবাসে, তাই ভালবাসার জিনিষ আমাকে দেয়? তবে চল, দাদা, যাই।

সিতেশের কাছে গিয়া অসিতা বলিল, মালী, তুমি ছিরুকে ভাল ক'রে দাও।

সিতেশ জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে তার?

দাদা বল্ছে, লিভার হয়েছে।

সিতেশ অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া বলিল, ওঃ, এই! আমি কাল যাব। ঝেড়ে দিলে তখনই আরাম হবে।

না, তুমি এখনি চল।

বেশ, চল!

দাদামহাশয়ের বাটীতে আসিয়া সিতেশ বলিল, ছিরুকে এই বিছানায় শুইয়ে দাও। তুমিও তার কাছে শোও।

বিস্মিত হইয়া অসিতা বলিল, আমি শোব কেন? আমার ত রোগ হয় নি!

না। কিন্তু তোমাকেও ঝাড়ফুঁক করতে হবে। ও ত কোথাও যায় না যে, রোগ নিয়ে আস্বে। তুমি সর্ব্বদাই ওর কাছে কাছে থাক। তোমাকে ঝাড়ফুঁক করলে ছিরুর আর কখন অসুখ হবে না।

সত্যি বল্ছ, আর কখন অসুখ হবে না?

সিতেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, না, আর কখনও অসুখ হবে না।

বেশ, বেশ বলিয়া অসিতা ছিরুর পার্শ্বে শয়ন করিল।

চোখ বোজ, বলিয়া সিতেশ নিয়মানুসারে শরীর স্পর্শ না করিয়া হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল।

অল্লায়াসেই অসিতা ঘুমাইয়া পড়িল।

ভীত-কণ্ঠে দাদামহাশয় ডাকিলেন, অসি!

উত্তর নাই। নিদ্রা যখন ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইল, সিতেশ ডাকিল, অসিতা!

অসিতা উত্তর দিল, কি?

স্বর যেন কোন সুদূর-প্রদেশ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। সিতেশ বুঝিল, অসিতা এখন সম্পূর্ণভাবে তাহার প্রক্রিয়ার অধীন। কহিল, অসিতা, ছিরুর অসুখ হয়েছে?

হ্যাঁ।

ছিরুকে স্নান করাতে হবে। অবগাহন-স্নান।

কোথায়?

পুকুরে।

পুকুর কোথা?

এই যে তোমার সাম্নে দেখ।

দেখছি।

স্নান করাও।

অসিতা স্নান করাইবার অভিনয় করিতে লাগিল।

সিতেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, ছেড়ে দাও, ছিরু একটু সাঁতার দিক। দিয়েছ?

ছেলেমানুষ, যদি ডুবে যায়!

যায় যাবে। তুমি ছেড়ে দাও বলছি।

দিয়েছি।

অসিতা ছিরুকে ছাড়িয়া দিতেই সিতেশ তাহাকে দাদামহাশয়ের হাতে দিয়া লুকাইয়া রাখিতে ইঙ্গিত করিল।

তুমি কি কখন ওকে সাঁতার কাটতে শেখাও নি?

না।

কেন?

ছেলেমানুষ, যদি ডুবে যায়!

ঐ যে ডুবে গেল।

ও মা, কি হবে! বলিয়া অসিতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দাদামহাশয় তাড়াতাড়ি ছিরুকে অসিতার হস্তে দিতে যাইতেছিলেন, সিতেশ ইঙ্গিতে নিবারণ করিল। পরে পুনরায় ডাকিলেন, অসিতা!

কি?

ছিরু ডুবে গেছে?

হ্যাঁ—বলিয়া অসিতা পুনরায় মর্ম্মভেদী রোল তুলিল।

সিতেশ আজ্ঞা দিল, চুপ! ছিরুর কথা ভুলে যাও।

না, বড় কষ্ট হবে। পারব না, আমি পারব না, বলিয়া অসিতা আবার কাঁদিতে লাগিল।

সিতেশ বলিল, অসিতা, কেঁদ না। পারবে। নিশ্চয় পারবে। শোন! এখন শান্ত হয়ে সারারাত ঘুমোও। কাল ঘুম থেকে উঠে ছিরুর কোন কথা আর তোমার মনে থাকবে না।

তা কি হয়?

সিতেশ বলিল, হবে। আমি বল্‌ছি, হবে।

অসিতা অতি মৃদু কণ্ঠে কহিল, তাই হবে।

ছিরু ব'লে কিছু ছিল, তা পর্য্যন্ত আর কখন মনে হবে না।

হবে না।

পরদিন দিনেশ কহিল, কাল ত খুব ভোজবাজি দেখিয়েছ শুন্‌লুম, তা হ'ক! কিন্তু আমার একটা ভয় হয়।

কি?

ছিরুর ওপর অসির এত দিনের টান, ওর অজ্ঞাতসারে কায করবে না, ওর মনের ত আর কোন অবলম্বন রইল না। দিন-রাত মন হু হু করবে। অঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

হাসিয়া সিতেশ বলিল, তা হবে না, বন্ধু! যে ভাবে ওর মন এত দিন আচ্ছন্ন, আবিষ্ট হয়েছিল, সে ঘোর কাটলেই ওর মনে বয়সোচিত ভাব ফুটে উঠবে।

যদি হেদিয়ে না মারা যায়।

বেশ ত, এক কায কর না কেন?

কি?

স্থান আর দৃশ্য পরিবর্ত্তন। এমন কোন স্থানে যাও, যেখানে স্বভাবের শোভা দেখে ওর মন ভুলে থাক্‌বে।

এ কথা মন্দ বল নি। সাঁওতাল পরগণার একেবারে শেষ সীমায় দাদামশায়ের একখানি বাড়ী আছে। সেইখানে যেতে বলি।

বেশ কথা।

দিনেশ হাসিয়া বলিল, কিন্তু রোজাকেও ছাড়ছি নি, বন্ধু!

আমি! আমি গিয়ে কি কর্‌ব?

এই স্বভাবের শোভা দেখবে। বলিয়া হাসিতে হাসিতে দিনেশ চলিয়া গেল।

অসির পরিবর্ত্তন দেখিয়া দাদামহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। ছিরুর কথা আর মুখেও আনে না। কিন্তু কেমন যেন আনমনা হইয়া বেড়ায়। ভয়—শেষ কি পাগল হয়ে যাবে?

দিনেশের পরামর্শমত কয়েক দিন পরে অসিকে লইয়া তিনি সাঁওতাল পরগণায় গেলেন। সিতেশও সঙ্গে গেল।

৫

সুস্বাদু আসবের ন্যায় সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু পান করিয়া শৈল-মালিনী মেদিনী আরাম-শয্যায় ক্লান্তকায় ঢালিয়া দিয়াছেন। চারিদিকে স্তব্ধ শান্তি। কেবল দূরে নির্ঝরের ঝরঝর, বনভূমির মরমর, ক্ষীণাঙ্গিনী গিরি-তরঙ্গিণীর তরতর ও ঝিল্লীর ঝঙ্কার-ধ্বনি একতানে তন্দ্রা আহ্বান করিতেছে। বাতাসে মন্দ মন্দ বন-ফুলের গন্ধ।

দাদামহাশয় বিশাল এক বনস্পতিমূলে বসিয়া সেই সুমিষ্ট সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতেছিলেন।

অদূরে অসিতা ও সিতেশ বনফুল তুলিতেছিল। বনফুল-ভূষণা একদল পার্ব্বত্য যুবতী গাহিতে গাহিতে গৃহে ফিরিতেছে—

মিন্‌ষে এল কৈ?
বেলা গেল, আঁধার এল,
কত পথ পানে আর চেয়ে রই।
ভোরকে উঠে যায় সে ছুটে,
তীর-ধনুক লিয়ে—
বোলে বুলবুলি টিয়ে,
ঘরকে এলে জুড়াবে হিয়ে;

'ময়না বোলে, ঝুম্‌কা দোলে—
দোলে মাথার উপর পাতার ছৈ।
আমার চাঁদ কৈ লো এল—
আকাশে চাঁদ উঠল ঐ ॥

গানের সঙ্গে সঙ্গে বনের বিহঙ্গকুলও যেন মাতিয়া উঠিল। অতি করুণ স্বরে একটা পাপিয়া ডাকিল—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা।

অসিতা কাণ পাতিয়া শুনিল। পাখী কি যেন বলিতেছে। জিজ্ঞাসিল, দাদা, ও পাখীটা কি বল্‌ছে?

দাদা মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় অসুধ বুঝি ধরেছে। সত্য, সে অসিতা আর নাই। ছিরুর কথা ত মুখে আনে না, সিতেশ বলে, মনেও করে না। কিন্তু এখনও কেমন আন্‌মনা ভাব!

অসিতা বলিল, চুপ ক'রে রইলে কেন? বল না, দাদা!

কি বল্‌ব?

বাঃ, তুমি আমার চেয়েও ভুলো। ঐ শোন! পাখীটা কি বল্‌ছে, বল!

আমি কি জানি! তুই সিতেশকে জিজ্ঞাসা কর্‌ না।

তুমি বল্‌বে না। বেশ, তাই করছি। বলিয়া অসিতা সিতেশের পানে চাহিল। কিন্তু পুনরায় চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, না, দাদা, তুমি বল!

দিদি, এক দিন ছিল, ও পাখীর গান শুন্‌তুম, বুঝতুম। কিন্তু তোর দিদিকে যে দিন হারিয়েছি, সে দিন থেকে ও পাখীর গানের মানেও ভুলে গেছি।

তা বৈ কি! মানুষ না কি আবার ভোলে! তুমি বল্‌বে না, তাই বল। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করছি।

দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কাকে? মালীকে?

মাটী কোপাচ্ছিল ব'লে মালী বলেছিলুম।

এখন কি বলিস্‌? বর?

না, তাও বলি না।

তবে কি বলিস্‌?

আমি বক্‌তে পারি নি। পাখী কি বল্‌ছিল, বল।

আমি ভুলে গেছি। সিতেশকে জিজ্ঞাসা কর।

বেশ, তাই করছি, বলিয়া অসিতা কয়েক পদ অগ্রসর হইল। তার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, না, দাদা, তুমি বল।

সিতেশকে জিজ্ঞাসা করবি নি?

কেন করব? আমার মাষ্টার না কি? তুমি আমাকে পড়িয়েছ, পড়াচ্ছ, তুমি বল। তোমার পায় পড়ি, বল।

দাদা অগত্যা বলিলেন, ও বল্‌ছে কি জানিস্‌? পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা।

তার মানে?

ওর মানে, প্রিয় কোথায়?

কেন, দাদা, ও কথা বল্‌ছে?

পাখী ওর ভালবাসার লোককে খুঁজছে।

দাদা যেন কি! পাখীর বুঝি আবার ভালবাসার লোক থাকে?

বেশ ভাই, না হয় ভালবাসার পাখীকেই খুঁজছে।

তাই বল! আচ্ছা, দাদা, কে ওকে ও-কথা শেখালে?

শেখালে?

হ্যাঁ গো! আমাদের সেই ময়নাটাকে তুমি শেখাতে না? রাধা-কৃষ্ণ, শিব শিব, রাম রাম। ও পাখীটাকে কে শেখালে?

ওঃ! সে একটা গয়লানী।

তার বাড়ী বুঝি এই দেশে?

না, বৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনে? রাধা? সে ত অনেক—অনেক দিনের কথা। আচ্ছা, দাদা, তিনি এখনও বেঁচে আছেন?

আছেন বৈ কি।

কোথা?

ভক্তের মনে আছে তাঁর রূপ, মুখে আছে তাঁর নাম।

তা, তিনি কেন পাখীকে পিউ কাঁহা বল্‌তে শেখালেন?

তিনি শেখান নি। পাখী শুনে শুনে শিখেছে। রাধাকৃষ্ণের কথা শুনেছিস্‌? কৃষ্ণ যখন রাধিকাকে ত্যাগ ক'রে মথুরায় চ'লে গেলেন, তোকে বলেছি, রাধা তখন কেবলই কেঁদে কেঁদে বেড়াতেন। কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর মনে আগুন জ্বল্‌ত। দিনরাত চোখের জল ঢেলেও তা নেবাতে পারতেন না। বরং চোখের জলে সে আগুন দ্বিগুণ হ'ত—হুহু ক'রে জ্বল্‌ত। তাঁর অন্তর যখন দারুণ হাহাকার ক'রে উঠত, রাধা অতি করুণ স্বরে চীৎকার ক'রে উঠতেন—পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা। ঐ পাখী তাই শুনে শুনে শিখেছে।

দাদার কণ্ঠস্বর ক্রমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া হাওয়ায় মিলাইয়া গেল। তখন শৈল-শিখরে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। অসিতার মুখ জ্যোৎস্নাস্নাত। দাদা দেখিলেন, অসির চক্ষুও অশ্রুসিক্ত। ডাকিলেন, সিতেশ, এস, আমি সন্ধ্যা করতে যাই।

রুমাল ভরিয়া ফুল লইয়া সিতেশ আসিল।

অসিতা বলিল, দাদা, চল, তোমার সঙ্গে আমিও যাই।

কেন, কোশা-কুশি নাড়তে? তার সময় আছে, দিদি! এমন চাঁদিনী রাত, বনফুলের গন্ধে বিভোর। হাওয়া খেতে এনেছি পয়সা খরচ ক'রে। একটু ভাল ক'রে খাও।

অসি হাসিয়া বলিল, খালি চুপ ক'রে ব'সে ব'সে হাওয়া খাব?

কেন? মুখ আছে, কথা কও, হাত আছে, মালা গাঁথ না।

দাদামহাশয় চলিয়া গেলেন। সিতেশ বলিল, আঁচল পাত। অর্দ্ধেক ফুল তোমাকে দি, মালা গাঁথ।

অসিতা বলিল, ছুঁচ-সুতা কৈ?

কেন? তোমার আঁচল থেকে তুমি এক খেই সুতা বার ক'রে নাও। আমার কোঁচা থেকে আমি নি।

ছুঁচ?

কেন? তোমার মাথায় ত কাঁটা আছে। তুমি একটা নাও, আমায় একটা দাও। কিন্তু আমার হাতে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ো না যেন!

কেন?

শোধ তুল্‌তে। যে দিন তোমাকে প্রথম দেখি, সে দিনের কথা মনে কর।

অসিতা হাসিল। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি—

তুমি কেন? মালী?

অসি আবার হাসিয়া বলিল, তুমি ভারী ছল ধর। আচ্ছা, তুমি রাধা-কৃষ্ণ বিশ্বাস কর?

করি।

অমন ভালবাসা পৃথিবীতে হয়?

তাঁরাও ত এই পৃথিবীর লোক। আর না হ'লে বনের পাখী ব্যাকুল হয়ে পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা ব'লে ডাকবে কেন?

মানুষে মানুষে হয়?

না হ'লে অসভ্য সাঁওতালের মেয়ে আমার চাঁদ কৈ লো এল আকাশে চাঁদ উঠল ঐ, ব'লে মনের ভাব গানে ব্যক্ত করবে কেন?

উভয়েই নীরব। অসিতা জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছ?

চোখের সামনে ভাববার জিনিষ থাকতে আকাশ-পাতাল ভাবতে যাব কেন?

কি ফুল?

রাম কহো! ফুলের চেয়ে ভাল জিনিষ।

অসিতা হাসিল। সিতেশ প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভাবছ?

অসিতার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সিতেশ বলিল, বল, বল্‌তে হবে।

তোমার হুকুম?

তাই।

আমি ত আর সাঁওতালদের মেয়ে নই যে, মনের কথা পথে ঘাটে ব'লে বেড়াব।

ক্রমে মালা গাঁথা শেষ হইল। সিতেশ বলিল, শোন, অসি! যে দিন প্রথম দেখা, তোমায় একটি ফুল পরাতে চেয়েছিলুম, পর নি। সেই একটির বদলে আজ তোমায় এই মালা পরিয়ে তার শোধ নেব। আকাশের ঐ চিরদিনের চাঁদ, পৃথিবীর এই সব প্রবীণ পর্ব্বত তার সাক্ষী রইল।

সিতেশের সুখস্পর্শে অসিতা শিহরিয়া উঠিল। অবশ হস্তে সিতেশের গলায় মালা দিয়া বলিল, আর এই সেই কাঁটা ফোটার পুরস্কার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

জনন-নিয়ন্ত্রণ

প্রতীচ্যে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির অবাধ গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানারূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইতেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে,—প্রায় সর্ব্ববিষয়ে কৃত্রিম উপায় অবলম্বনই সভ্যতার পরিচায়ক। অতি তুচ্ছ বিষয়েও কৃত্রিমতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানুষের সাজসজ্জার কথাই ধরা যাউক। গ্রীবা কলার-নেকটাই দ্বারা আবদ্ধ, কটিতে কটিবন্ধ, পদযুগলে মোজা, বক্ষে কোট, কেবলই বন্ধন, স্বভাবকে যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার আয়োজন! কলের যুগে মানুষ কলের সাহায্যে ভ্রমণ করে, কলের সাহায্যে স্নান করে, কলের সাহায্যে নিদ্রা যায়, বিশ্রাম করে। কলের সাহায্যে কায হয় না, মানুষের এমন কায অতি অল্পই আছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকদিগের মহাচিন্তার কারণ হইয়াছে। খৃষ্টানদের বাই-বেলে উক্ত Go and multiply কথাটা এখন নিতান্ত অসভ্য যুগের বলিয়া গৃহীত। বৈজ্ঞানিকরা অতিরিক্ত লোকসংখ্যা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, স্বাভাবিক উপায়ে লোকসংখ্যা হ্রাস হইবার দুইটি উপায় আছে, যথা,—(১) আধিব্যাধি, (২) প্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি। প্রাকৃতিক নিয়মে এই সকল কারণে প্রলয় বা খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত হইলে লোকসংখ্যা হ্রাস হয় এবং তাহার ফলে জগতের স্থান ও খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির পরিমাপে লোকসংখ্যার সামঞ্জস্য বিহিত হয়।

কিন্তু তাঁহারা বলেন, এখন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চিকিৎসা-সেবাদির কল্যাণে আধিব্যাধিতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে; প্রলয়ের ত দেখাই নাই, খণ্ড-প্রলয়ও কচিৎ কখনও দেখা যায়। সুতরাং তাঁহারা সংখ্যার সামঞ্জস্যবিধানের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিতেছেন। কৃত্রিম উপায় যে এখনই নাই, এমন নহে। ইহার মধ্যে যুদ্ধে লোকসংখ্যা-হ্রাস অন্যতম। এই যে চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ,—জাপানের ভূমি ও খাদ্যের পরিমাপে লোকসংখ্যার অসম্ভব বৃদ্ধি। এ সম্বন্ধে একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। যুরোপের মধ্যে ইটালীর ভূমির পরিমাপে লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু সেখানেও প্রত্যেক কৃষকের অংশে ৩ একার কৃষির উপযোগী উর্ব্বর ভূমি আছে। কিন্তু জাপানে প্রত্যেক কৃষকের অংশে মাত্র এক একার কৃষির উপযোগী ভূমিও আছে কি না সন্দেহ। এই হেতু জাপান রাজ্যবিস্তারে ও উপনিবেশস্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছে।

অবস্থা যখন এইরূপ, তখন হয় দুর্ভিক্ষ মহামারী, না হয় যুদ্ধ ভিন্ন গতি নাই। এই হেতু প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জনন-নিয়ন্ত্রণের জন্য উপদেশ দিতেছেন। তাঁহারা বলেন, "Ladies Home Journal জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠা, বল-সঙ্কোচ ও অস্ত্রসংবরণের উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধের মূল কারণের (লোকবৃদ্ধি এবং ভূমি ও খাদ্যের প্রয়োজন) কথা বিস্মৃত হন কেন? শান্তিপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে এই শ্রেণীর ভাবুকের কৃত্রিম উপায়ে লোকহ্রাসের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।"

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের রাজধানী নিউইয়র্ক সহরের Maternity Centre Association এর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। এই মাতৃমঙ্গল সমিতি সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা ভাবী সন্তানজননীদিগকে গর্ভ-ধারণ ও সন্তানজনন বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মার্কিণের Medical Journal and Record নামক মাসিক পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ডাক্তার এডলফাস নফ একখানি খোলা চিঠিতে অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"নারীরা যেন অতি দ্রুত (অর্থাৎ বৎসরে বৎসরে) গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব না করেন। দুইটি সন্তান-জননের মধ্যবর্ত্তী কাল অন্ততঃ দুই বৎসর হওয়া প্রয়োজন। নতুবা জরায়ুর বিশ্রামলাভের বা প্রসবের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে।"

বৈজ্ঞানিকরা আরও বলেন যে, সন্তানদের থাকিবার স্থান-সঙ্কুলান হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন। ছাগ-মেষ বা হাঁস-মুরগীর মত অতি স্বল্পপরিসর অস্বাস্থ্যকর স্থানে শিশুদের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হওয়া জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পরিপন্থী।

মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের শ্রমবিভাগের Children's Bureau বা সন্তানরক্ষণপ্রতিষ্ঠান শিশুজন্মের একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া হিসাবে দেখাইয়াছেন যে,—

(১) দুইটি সন্তান-জননের মধ্যবর্ত্তী কাল এক বৎসর হইলে শিশু-মৃত্যুর হার হাজারকরা ১ শত ৪৭টি হয়,

(২) দুই বৎসর হইলে শতকরা ৯৮টি হয়।

(৩) তিন বৎসর হইলে শতকরা ৮৬টি হয়।

(৪) চারি বৎসর হইলে শতকরা ৮৫টি হয়।

এই হেতু প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকরা জনক ও প্রসূতিদিগকে Contraceptive উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহাতে সন্তানজনন কৃত্রিম উপায়ে নিরুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম ঔষধ ও যন্ত্রাদি ব্যবহারেরও

পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। ইহাতে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচের স্থান নাই। অবশ্যকরণীয় প্রয়োজন হিসাবে এই বিদ্যা এখন প্রতীচ্যের দ্বারে দ্বারে প্রচার করা হইতেছে। ইহার ফলে নারীদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব উদ্ভট রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহা দেখিবার বা বুঝিবার বোধ হয় কাহারও প্রবৃত্তি বা অবসর নাই!

এ দেশে অনুকরণপ্রিয় শ্রেণীর লোক অধুনা এই বিদ্যা আমদানী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। ইহার ফলও অনেক ক্ষেত্রে বিষম হইতেছে। কোনও নারী বন্ধ্যা, কেহ বা উন্মাদরোগগ্রস্তা, আবার কেহ বা কর্কট-রোগগ্রস্তা হইতেছেন। ঋতুবিপর্য্যয় রোগও যেন সংক্রামক ব্যাধিতেই পরিণত হইয়াছে। কিন্তু 'সেকেলে বুড়া' ঋষিরা স্ত্রীপুরুষের যৌন-মিলন বা সহবাসসম্বন্ধে যে সকল নিয়মকানুন বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহারা একবারও পড়িয়া দেখিয়াছেন কি? ঋতুমতী নারীকে কেন "বিষ-নারী" বলে, ঋতুমতী নারীকে কেন স্বতন্ত্র রাখিতে হয়, প্রসূতির জন্য সূতিকাগারের ব্যবস্থায় কেন কড়াকড়ি করা হয়, ঋতুমতী হইবার পর একটা নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে কেন সহবাস করিতে নাই, সহবাসের যুগ্ম ও অযুগ্মদিবস পালন, বার তিথি নক্ষত্র পালন কেন করিতে হয়,—তাহারও তত্ত্ব কি তাঁহারা কোনকালে রাখিয়াছেন? সে সকল নিয়মকানুন পালন করিলে যে লোকসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, সন্তান বলবান্ ও দীর্ঘজীবী হয়, সমাজ ও জাতির মঙ্গল হয়, তাহা কয় জন বিচার করিয়া দেখিয়া থাকেন?

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর শুভ মিলন

বাঙ্গালী কবি গাহিয়াছেন,—যে জন সেবিবে তোমার চরণ, সেই সে দরিদ্র হবে। বাণীর চরণ-সেবারত লেখক দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া থাকেন, ইহাই প্রবাদ। এই হেতু সাধারণ লোক বলিয়া থাকে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে বিবাদ আছে। প্রাচীন যুগের পক্ষে প্রবাদ সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু আধুনিক যুগে প্রতীচ্যের বাণীর সেবকগণের সম্পর্কে এ প্রবাদের সার্থকতা নাই।

সম্প্রতি প্রতীচ্যে লেখক ও গ্রন্থকারগণের বাৎসরিক আয়ের একটা আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল লেখকের রচনার প্রত্যেক শব্দের মূল্য ১০ শিলিং, তাঁহাদের কথাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিখ্যাত লেখক এডগার ওয়ালেস যে দিন হইতে যশঃশিখরে আরোহণ করেন, সেই দিন হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বার্ষিক ১০ লক্ষ পাউণ্ড রচনার দ্বারা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই আয়ের সহিত অপরাপর লেখকের আয়ের তুলনা করিতে গিয়া যে হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে ইংলিশ লেখক নোয়েল কাওয়ার্ডের বাৎসরিক আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নোয়েল কাওয়ার্ডের বয়ঃক্রম মাত্র ৩২ বৎসর, অথচ এই বয়সেই তিনি তাঁহার নাটক, নাটিকা, প্রবন্ধ এবং চলচ্চিত্রের গল্পের দৌলতে গত ৪ বৎসরে বার্ষিক ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা অর্জ্জন করিয়াছেন! সমালোচকরা বলেন, আগামী ১০ বৎসরও তাঁহার এই আয় অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বাঙ্গালার লেখক কথাটা একবার ভাবিয়া দেখুন।

চারি বৎসর পূর্ব্বে রচনা দ্বারা যাঁহারা প্রভূত অর্থার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ', রাডিয়ার্ড কিপলিং, এইচ্ জি ওয়েলস এবং সার জেমস বারীর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্ত্তমানে যাঁহারা লেখনীর সাহায্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থার্জ্জন করেন, তাঁহাদের মধ্যে পর পর এই কয় জনের নাম করা যায়:—

নাম		বার্ষিক আয়
নোয়েল কাওয়ার্ড	...	৫০ লক্ষ পাউণ্ড
বার্ণার্ড শ'	...	৩৫ " "
এ, মিলনি	...	৩০ " "
রাডিয়ার্ড কিপলিং	...	৩০ " "
এইচ, জি, ওয়েলস	...	২৫ " "
সার জেমস বারী	...	২৫ " "

মিলনি লেখক হিসাবে যে খুব বড়, তাহা নহেন; কিন্তু তিনি মার্কিণ মুলুকে 'ছেলেদের বই' ও ছড়া রচনা করিয়া প্রভূত অর্থার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার "উইনি-দি-পু" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। এই গ্রন্থের যে কত সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এখন আমাদের দেশেও কেহ কেহ এই ভাবের গ্রন্থের হ্যাট কোট নামাইয়া ধুতি-শাটী পরাইয়া 'ছেলেদের বই' নাম দিয়া বাজারে দিতেছেন এবং তাহা হইতে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। এক সময়ে এ দেশের এক শ্রেণীর লেখক প্রতীচ্যের গোয়েন্দা-কাহিনীকেও ঐ ভাবে রূপান্তরিত করিয়া বাঙ্গালায় চালাইয়া হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে 'ছেলেদের বই,' রূপকথা,' 'পরীর কথা' শ্রেণীর গ্রন্থ প্রচারের ফলে কত লোক যে করিয়া খাইতেছে, তাহা বলা যায় না। পুতুল-খেলানাওয়ালা, রুমাল-ওয়ালা, পাঞ্জাবীওয়ালা, নিকার-বোকারওয়ালা, মুখোসওয়ালা, দস্তানাওয়ালা, গৃহসজ্জাকারক, ছোট-খাট বিছানাওয়ালা, ফুলওয়ালা, নকল বা গিল্টির অলঙ্কারওয়ালা,—কত লোক যে বৎসরে হাজার হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতেছে, তাহা কে বলিবে? 'উইনি-দি-পু' নামক কেতাবখানির নায়ক-নায়িকা-সমূহের সাজসজ্জাদি করিয়া কত পয়সাই কত লোকই না অর্জ্জন করিতেছে!

ইহার পরের শ্রেণীর গ্রন্থকারদের আয় কত দেখুন। তাঁহারা বার্ষিক ১৫ হাজার হইতে ২০ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া পাইয়া থাকেন:—সমার্শেট মমাম, পি জি উডহাউস, এ এস হাচিনসন, মাইকেল আর্লেন, ফিলিপস ওপেনহিম ও ওয়ারিক ডিপিং। ইহাদের নিম্নে যাঁহারা বার্ষিক ১০ হাজার পাউণ্ডের উপরে এবং ১৫ হাজার পাউণ্ডের নীচে অর্থার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম—জন গলসওয়ার্দ্দি, গিলবার্ট ফ্র্যাঙ্কো, বেন ট্রাভার্স ও সার ফিলিপ গিবস।

"Journey's End" নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা আর সি সেরিফ ৫০ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা পাইয়াছিলেন। বোধ হয়, জে, বি, প্রিষ্টলি তাঁহার "The Good

Companions" বেচিয়া ইহারও অধিক টাকা পাইবেন। নোয়েল কাওয়ার্ড তাঁহার "Bitter Sweet" গ্রন্থ বেচিয়া ৩০ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছিলেন। তাহার পরে যখন তাঁহার এই নাটিকা চলচ্চিত্রে অভিনীত হইয়াছিল, তখন তিনি ১ লক্ষ পাউণ্ড পাইয়াছিলেন! সম্ভবতঃ তাঁহার এই নাটিকা হইতে তিনি মোটের উপর আড়াই লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন! হাচিনসন তাঁহার "If Winter Comes" নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস বিক্রয় করিয়া ৭০ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছিলেন। এইচ জি ওয়েলস তাঁহার "Outline of History" বেচিয়া ৮০ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছেন। পি জি উডহাউস মার্কিণ দেশের হলিউডে গল্প দিয়া সপ্তাহে ৪ শত পাউণ্ড মুদ্রা অর্জ্জন করেন। লিউ ওয়ালেস তাঁহার "বেণ হুর" বেচিয়া ৮০ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছেন। রেমার্কে তাঁহার "All quiet on the Western Front" লিখিয়া প্রথমে চলচ্চিত্রে অভিনয় করিতে দিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই, তথাপি তিনি মোটের উপর ৬০ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছেন।

নারী লেখিকাদিগের গ্রন্থবিক্রয়লব্ধ অর্থ এত অধিক নহে। ইংলণ্ডে অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জনক্ষম নারী লেখিকার নাম রোজ মেকলে, শিলা কে-স্মিথ, এনি সোয়ান, এথেল ম্যানিন, ও ক্লেমেন্স ডেন। কিন্তু মার্কিণ দেশের লেখিকা এডনা ফারবার ও ফ্যানি হার্ষ্ট যাহা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা তাহার নিকটেও যান না। শেষোক্ত লেখিকাদ্বয় বার্ষিক ২০ হাজার পাউণ্ড পাইয়া থাকেন।

অবশ্য সকল লেখকের ভাগ্যলক্ষ্মীই যে সুপ্রসন্ন হয়, তাহা নহে। গ্রন্থ-প্রকাশক মিঃ মাইকেল জোসেফ বলেন যে, "সাধারণতঃ উপন্যাসকার তাঁহার প্রথম উপন্যাসের রয়্যালটি পাইয়া থাকেন ২৫ পাউণ্ড। দশখানি নভেল দিবার পর একখানি গৃহীত হয়, অন্যগুলি প্রকাশক প্রায়ই গ্রহণ করেন না। পরন্তু প্রকাশকরা প্রায়ই প্রথম উপন্যাস বিক্রয় করিতে গিয়া ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকেন।"

যাহাই হউক, প্রতীচ্যে তবুও গ্রন্থকার প্রথম গ্রন্থেও এক বৎসরে ২৫ পাউণ্ড পাইয়া থাকেন। এ দেশে গ্রন্থকার বহু সাধ্য-সাধনার পর যদি গ্রন্থ ছাপাইতে সমর্থ হন, তাহা হইলে হয় ত ৬।৭ বৎসরে এক হাজার কাপি বহু কষ্টে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহাও লাভের বহুলাংশ দপ্তরী, প্রকাশক ও বিজ্ঞাপনদাতার হস্তে অর্পণ করিয়া! যদি এই ভাবে গ্রন্থ কাটাইতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিতান্ত সৌভাগ্য বলিতে হইবে, নতুবা গ্রন্থ পোকায় কাটে। তাহার উপর সরকার ভিঃ পিঃ ট্যাক্স এরূপ অসম্ভব উচ্চহারে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে সাহিত্যরস-স্বরসিক মফঃস্বলের পাঠকরা ইচ্ছা করিলেও ভিঃ পিঃ যোগে পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন না। তবে বাঙ্গালীর উপন্যাসের পাঠকমাত্র বাঙ্গালাভাষাবিদ্, ইংরাজী উপন্যাসের পাঠক জগদ্ব্যাপী,—এই প্রভেদের কথা অবশ্য ধরিতে হইবে। কিন্তু তেমনই আর একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালীর একটি লাইব্রেরীতে বা একটি পাড়ায় যদি একখানি গ্রন্থের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সে পল্লীর লোকের ঘরে ঘরে উহা ঘুরিতে থাকিবে, পয়সা দিয়া তাহা আর কেহ কিনিবে না। কিন্তু এমন শুনা যায় যে, প্রতীচ্যের একটি ঘরে একখানা কাগজ বা বই কর্ত্তা কিনিলে তাঁহার পুত্র স্বতন্ত্রভাবে সেই কাগজ বা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া লেখককে উৎসাহিত করেন!

সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতা

প্রতীচ্যে নারীদের সৌন্দর্য্যের পাল্লাপাল্লি হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের May Queen ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। অঞ্চলের মধ্যে যে যুবতী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাঁহাকেই রাণী সাজান হয়। যুরোপেও প্রতি বৎসর সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে পারিতোষিক বিতরিত হইয়া থাকে।

সম্প্রতি ইটালীর ভাগ্যনিয়ন্তা সিনর মাসোলিনি ইটালী দেশে সৌন্দর্য্যপ্রতিযোগিতা-পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই আদেশের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দুই প্রকার অভিমতই ব্যক্ত হইতেছে। যাঁহারা স্বপক্ষে, তাঁহারা বলিতেছেন, এমন সুন্দর নির্দ্দোষ আমোদ বন্ধ করিয়া দেওয়া স্বেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক। এই দুঃখের আগার মানুষের সংসারে সৌন্দর্য্য-দর্শনে ও উপভোগে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, মন বিমল আনন্দে পূর্ণ হয়। অথচ যাঁহাদের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া এই আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাঁহাদেরও কোন ক্ষতি হয় না, তাঁহারা বরং জগতে এমন যশঃ অর্জ্জন করেন, যাহার ফলে তাঁহারা জগতে মনোমত বর লাভ করিতে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে পারেন।

যাঁহারা বিপক্ষে, তাঁহারা বলিতেছেন, মাসোলিনি এই প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়া খুব ভাল কাযই করিয়াছেন। নৈতিক হিসাবে নারীর সৌন্দর্য্যের বেসাতি করা পাপ, মাসোলিনি এই হেতুবাদ দেখাইয়াছেন। তিনি নিশ্চিতই ন্যায্য কথা বলিয়াছেন। সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা দ্বারা নারীজাতির নারীত্বের অবমাননা করা হয়। যাঁহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের নৈতিক মঙ্গল ব্যাহত হয়, পরন্তু যাঁহারা এই পরীক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, অথচ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, তাঁহাদেরও মনোভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক মঙ্গল ক্ষুণ্ণ হয়। হয় ত তিনটি নারী পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিলেন, কিন্তু যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, তাঁহাদের সংখ্যা যে অগণ্য! তাঁহাদের ক্ষোভ, দুঃখ ও অপমানের যে সীমা থাকে না! এক জন সুখী হন, কিন্তু শত জন যে জীবনে তিক্ততা অনুভব করেন, তাহার কি? যে সকল যুবতী দোকানে, ব্যাঙ্কে বা অন্যান্য কার্য্যালয়ে কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করে, তাহারা পরীক্ষায় নাম দিতে না পারিয়া মনে মনে কিরূপ অসন্তোষ উপভোগ করে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবতীদের চিত্র ও জীবনকথা সাময়িক ও দৈনিক পত্রসমূহে দেখিয়া আপনাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, জীবন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করে। এরূপ জীবন-যাপনে কি সুখ থাকিতে পারে?

কিন্তু যদি তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণ প্রার্থিনী-দিগের সাংসারিক জীবনের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সাফল্যগৌরবে গৌরবান্বিতা কত

তরুণীর জীবন পরে বিষময় হইয়াছে, কত তরুণী আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সাংসারিক সুখ না পাইয়া আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছে।

সম্প্রতি একটি বৃটিশ নারী-সৌন্দর্য্য-পরীক্ষক ও প্রচারক-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহারা একটি বৃটিশ 'Venus' খুঁজিতেছেন! মহাকবি Shakespere সুন্দর ও সুন্দরীর চরম আদর্শ তাঁহার Venus and Adonis কবিতায় অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারই দেশবাসী সেই আদর্শ বাস্তবজীবনে জনসাধারণের সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিবার আশা করিতেছেন! ইংলণ্ডের প্রত্যেক সহর হইতে বাছাই করিয়া একটি Venus সুন্দরী লওয়া হইবে এবং পরিশেষে তাহাদের মধ্যে বাছাই করিয়া মোটের উপর ৩০টি Venus রাইল নামক সহরে প্রেরণ করিতে হইবে, তাহাদের যাতাযাতের সমস্ত ব্যয় প্রচারক-সমিতি বহন করিবেন। সেখানে সমুদ্রতটে ৩০টি Venus উপস্থিত হইয়া, স্নানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, পরীক্ষকদিগের সম্মুখ দিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে পর পর সমুদ্রস্নানে যাত্রা করিবেন। গ্রীষ্মকালে সেখানে বহু সমুদ্র-স্নানার্থী ও বায়ুসেবী সমবেত হইয়া থাকেন। মূলতঃ অত্যধিক পরিমাণে স্নানার্থী ও বায়ুসেবার্থীকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এই সৌন্দর্য্যপ্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপে লোকলোচনের লোলুপ কামান্ধ দৃষ্টির যূপকাষ্ঠে নারীত্বের পবিত্রতা বলি দিবার ব্যবস্থা হইতেছে!

এই ভাবের পরীক্ষা দিবার প্রলোভন নানারূপ। জগতে নাম জাহির করা তাহার মধ্যে একটি। হাজার হাজার লোক সৌন্দর্য্য দেখিবে, দেখিয়া আকৃষ্ট হইবে, কাগজে নাম ও ছবি উঠিবে, ভাল বর জুটিবে,—ইহা কি কম প্রলোভন? তাহার উপর ভবিষ্যতে থিয়েটার সিনেমায় মোটা মাহিনার চাকুরী—সে ত এক মস্ত প্রলোভন! কিন্তু শতকরা দুই জনের সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় কি?

আর যদিও বা চাকুরী হয়, তাহারই বা পরিণাম কি? লণ্ডন সহরে Bobbie Storey নাম্নী একটি Barmaid ছিল। সে দেখিতে পরমা সুন্দরী ছিল, এক সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় সে পারিতোষিকও পাইয়াছিল। পরে সে Ziegfeld Follies নামক থিয়েটারে Chorus girlএর চাকুরী পাইয়াছিল। কিন্তু ক্রমাগত রাত্রিজাগরণের ফলে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল, পরিশেষে সে আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইল।

গত বৎসর Peggy Davies নাম্নী তরুণী প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল। সে মার্কিণ মুল্লুকের এক ধনকুবেরকে বিবাহ করে। পরে Revieraর প্রসিদ্ধ জুয়াখেলার আড্ডার নিকটে তাহার ধ্বংসপ্রাপ্ত মোটরগাড়ীর পার্শ্বে তাহাকে বিগতজীবনা হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার স্বহস্তলিখিত একখানি পত্রে এইটুকু লেখা ছিল,—"আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।" ইহাই পরিণাম!

আর একটি সৌন্দর্য্য-রাণীর নাম Dulcie Barclay. সে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কুইনসল্যাণ্ডের সৌন্দর্য্যপ্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল। কিন্তু পুরস্কার পাইবার অল্পক্ষণ পরেই সে আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিল। পোলাণ্ডের ওয়ার্শা সহরের গত বৎসরের সৌন্দর্য্যপ্রতিযোগিতায় Irene Wierzbicus প্রথমে বহু প্রার্থিনীকে পরাজিত করিয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বশেষে পরাজিত হইয়া সে পাগল হইয়া গিয়াছিল। আহা, সে ফুলের মত সুন্দর ছিল, বয়সও তাহার মাত্র ২২ বৎসর। পরে সেও আত্মহত্যা করিয়াছিল!

এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মার্কিণ যুক্তরাজ্যে যিনি সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় প্রধান বিচারক বা মধ্যস্থ, তিনি স্বয়ং সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতার ঘোর বিরোধী। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? তিনিই বিচারক, অথচ তিনিই প্রতিযোগিতার বিরোধী,—ইহার নিশ্চিতই বিশেষ কোন কারণ আছে। কারণ, দুই একটি তরুণী মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সমর্থ হইলেও অধিকাংশেরই মাথা টলিয়া যায়। অনেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না, অনেকের জীবনে বিতৃষ্ণা হয়, বিরক্তি ও অসন্তোষময় জীবন তাহাদের পক্ষে তিক্ত ও দুর্ব্বহ হয়, অনেকে সাধারণ গৃহস্থের গৃহিণী হইয়া জীবন যাপন করিতে চাহে না, তেমন জীবন তাহারা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হয়। কাযেই অহঙ্কারে পরিপূর্ণ আহ্লাদী পুতুলে পরিণত হয়, আর পরিণামে যখন বাস্তব জগৎ ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসে, তখন আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করা ভিন্ন তাহাদের কি উপায়ান্তর থাকে? পুরাকালের Slave Market এর তরুণীদের রূপ-যাচাইএর প্রথা এই সভ্য যুগেও প্রতীচ্যে অনুসৃত হয়, ইহা কি লজ্জার কথা নহে? ইহারই অনুকরণে প্রাচ্যের এক শ্রেণীর তরুণ ব্যস্ত, ইহাই আশ্চর্য্য!

ছেলে ধরা

মার্কিণ মুল্লুকের সবই অদ্ভুত। মার্কিণ জাতি যেমন আপনাদিগকে সভ্যতার মুকুটমণি বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন, তেমনই যতপ্রকার পাপাচার আছে, তাহারও রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিহিত করা যায়। শুনা যায়, অসভ্য বর্ব্বর দেশেই মানুষকে ধরিয়া বদমায়েস দস্যুরা টাকা আদায় করে। চীনা দস্যু অথবা মূর দস্যুদের এই অখ্যাতি জগদ্‌ব্যাপী। এ জন্য প্রতীচ্যের সভ্যজাতিরা চীনার মত প্রাচীন সভ্য জাতিকেও অসভ্য পীত শয়তান বলিয়া গালি পাড়িয়া থাকেন।

কিন্তু মার্কিণ জাতির মত আধুনিক সভ্যতাভিমানী উন্নত জাতির মধ্যে মানুষ ধরিয়া টাকা আদায় করার কথা শুনিলে কি বলিতে ইচ্ছা করে? বেশী দিনের কথা নহে, গত ১লা মার্চ্চ তারিখে কর্ণেল লিণ্ডবার্গের শিশু-শয়নাগার হইতে তাঁহার প্রায় দুই বৎসরের পুত্রকে মার্কিণ ছেলে-ধরার দল উধাও করিয়া লইয়া গিয়াছে। কর্ণেল লিণ্ডবার্গ অল্পবয়স্ক যুবক, অতি অল্পদিন হইল, তিনি বিবাহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রথম পুত্র। কাযেই পুত্রের জন্য পিতামাতা পাগলের মত হইয়াছেন, তাঁহারা ছেলে ফিরাইয়া পাইবার জন্য এ যাবৎ অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু

নিষ্ঠুর পাষণ্ড দস্যুরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের মারফতে লোভ দেখাইতেছে বটে, কিন্তু ছেলে ফিরাইয়া দিতেছে না। লিণ্ডবার্গ সাহসী, অধ্যবসায়ী যুবক, তিনি একাকী বিমানযোগে দুস্তর আটলাণ্টিক পার হইয়া ফ্রান্সে অবতরণ করিয়া জগদ্বাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ। তাঁহার যশঃসৌরভে মার্কিণ মুল্লুক সুরভিত। এমন জনপ্রিয় লোক জগতে বিরল। তিনি অল্পবয়সেই কর্ণেল উপাধি পাইয়াছেন, ইহা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। সুতরাং তাঁহার মনঃকষ্টে জগদ্বাসী আন্তরিক দুঃখিত।

কর্ণেল লিণ্ডবার্গের শিশুপুত্র

কিন্তু মানুষ-চুরি মার্কিণ মুল্লুকে এই প্রথম ও শেষ নহে। মার্কিণের সরকারী হিসাবে প্রকাশ, গত দুই বৎসরে দুই হাজারের উপর মানুষ চুরি হইয়াছে এবং টাকা আদায় করিয়া দস্যুরা মানুষ ফিরাইয়া দিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, মার্কিণে Kidnapping Syndicate সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দস্যুদল একটি নহে, অনেকগুলি। উহারা লক্ষ লক্ষ ডলার মুদ্রা মানুষ ফিরাইয়া দিয়া আদায় করিয়াছে। কি ভীষণ কথা! এখন মার্কিণ জাতি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে। তাহারা একবাক্যে সরকারের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছে।

মহাচীনের নিদ্রাভঙ্গ

পূর্ব্বসংখ্যায় আমরা সাংহাইয়ের রণক্ষেত্রে চীন সেনাপতি জেনারল সাই টিংকাইএর অদ্ভুত রণকৌশল, শৌর্য্যবীর্য্য এবং ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছি। ইহার পর জেনারল সাইএর বীরত্বের ও কৌশলের আরও অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। মাসাধিককাল তাঁহার দেশপ্রেমিক সৈন্যদল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, রণদক্ষ জাপ-বাহিনীকে বাধা প্রদান করিয়া নিস্তেজ করিবার পর ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধভাবে পশ্চিমমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, জাপ-বাহিনী তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। নিরপেক্ষ সমরাভিজ্ঞ সমালোচকরা বলিতেছেন, "জেনারল সাই জাপানকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা জাপান ইহজীবনে ভুলিবে না। কেবল ইহাই নহে, চীন আপনিও শিক্ষালাভ করিয়াছে যে, ইচ্ছা থাকিলে—দেশপ্রেম থাকিলে চীন যুদ্ধ করিতে পারে। এই জাগরণ সামান্য জাগরণ নহে। ৪০ কোটি মানুষ (চীনদেশের লোকসংখ্যা) যদি আত্মবিস্মৃতি হইতে জাগরিত হইয়া বুঝিতে পারে যে, তাহারা যুদ্ধ করিতে পারে, যদি তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ও

এই রঙ্গচিত্রে চীন দৈত্য বোতল হইতে বাহির হইয়া বিরাট আকার ধারণ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছে

শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে শিখে, তাহা হইলে তাহারা কি না করিতে পারে?"

সাংহাইএর যুদ্ধের ফলে জাপানের স্থল ও নৌসেনার অদম্য যুদ্ধ করিবার শক্তির উপরে যে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ৩৪ দিন ধীর স্থির অবিচলিতভাবে জাপানী সেনার ভীষণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া জেনারল সাইএর চীনসেনা দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছিল দেখিয়া বিস্ময়ে প্রতীচ্যের শক্তিপুঞ্জ স্তম্ভিত হইয়াছেন। প্রথমে ২৮শে জানুয়ারীর রাত্রিকালে ১৮ শত জাপানী নৌসেনা সাংহাইএর চীনা হুন্দার উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। তাহাতে কোন ফল হইল না। কাযেই ৬ হাজার জাপানী নৌসেনাকে তাহাদের কার্য্যে যোগদান করিতে দেওয়া হইল। তাহাতেও যখন ফলোদয় হইল না, তখন জাপান হইতে জাপানী বাহিনীর Ninth Division টিকে সাংহাইএ আনয়ন করা হইল। তাহাতেও কিছু হইল না। শেষে আরও দুইটি ডিভিসন্ আনয়ন করিবার পর জেনারল সাই পশ্চাদাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

জেনারল সাই এমন সুন্দর কৌশলে পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়াছিলেন

যে, তাঁহার বাহিনী বহুদূর চলিয়া যাইবার পরেও কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া জাপানী সেনারা 'চাপেই' অঞ্চলের উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছিল !

নিরপেক্ষ দর্শকরা জেনারেল সাইএর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "চাপেই, উসাং এবং কিয়াংওয়ান অঞ্চলের যুদ্ধে জাপানের মাথার চিরুণী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ইহা জাপানের জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। যে চীনকে তাহারা নগণ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, সেই অবজ্ঞাত চীনই তাহাদের মাথার চিরুণী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ! ধ্বংসপ্রাপ্ত চাপেই এবং কিয়াংওয়ানের গড়খাই হইতে চীন নবীন জাতিরূপে উদ্ভূত হইতেছে। জাতিবর্গের মধ্যে শিশু চীন অকস্মাৎ বয়স্ক বীর্য্যবান্ জাতিরূপে উত্থিত হইয়াছে। জগতের মঙ্গলের জন্য—চীনের মঙ্গলের জন্য চীন মানুষের মত দণ্ডায়মান হইতেছে।"

ভারতের প্রাচীন বন্ধু মহাচীনের জয়যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহা ভারতবাসিমাত্রেরই কামনা।

জাপান ও সোভিয়েট রাসিয়া

মাঞ্চুরিয়ায় হঠাৎ এক 'স্বাধীন' সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে এবং ভূতপূর্ব্ব চীনসম্রাটকে এই সাধারণতন্ত্রের নিয়ামক পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অবস্থাভিজ্ঞরা বলিতেছেন, এই খেলার মূলে আছেন জাপান। তিনিই এই নিয়ামককে ক্রীড়নকরূপে রাখিয়া মাঞ্চুরিয়ার প্রকৃত শাসনকর্তৃত্বের মূল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

কিন্তু ইহাতে চীন বা রাসিয়া কেহই সন্তুষ্ট নহেন। রাসিয়ার সোভিয়েট সরকারের সহিত ইতিমধ্যেই জাপানের মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। জাপান বলিতেছেন, "হারবিন সহরের সান্নিধ্যে জাপসেনাবাহী রেলগাড়ী-ধ্বংসের মূলে সোভিয়েট সরকার রহিয়াছেন; পরন্তু তাঁহারা মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে গোপনে সৈন্য-সমাবেশ করিতেছেন।" রাসিয়ার সোভিয়েট সরকার বলিতেছেন, "এ সকল কথা মিথ্যা। জাপান গোপনে রাসিয়ার White Russians দিগকে সজ্ঘবদ্ধ করিয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। জাপান পোলাণ্ড ও য়ুক্রেণ দেশের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতেছেন কেন? রাসিয়াকে শত্রুদের সহিত এই মিতালীর ভাব প্রকাশ করার অর্থ কি?" উভয়পক্ষে এইরূপ কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। পরিণাম বড় শুভ নহে। ইহার ফলে প্রশান্তের ও প্রশান্তবক্ষে আবার কালানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

আনুগত্যের শপথ

আয়ারল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে (ডেল) রাজানুগত্য শপথের পাণ্ডুলিপির প্রথম শুনানী পাশ হইয়া গিয়াছে। নব-নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিলেন। তিনি আয়ারল্যাণ্ডকে বৃটেনের রাজার নিকট অধীনতা স্বীকার করার বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আইন-প্রণয়নের সূত্রপাত করিলেন।

পাণ্ডুলিপির মর্ম্ম এইরূপ যে, আইরিশ Constitution অথবা শাসননীতির অঙ্গ হইতে ১৭ সংখ্যক ধারাটি (Article 17) তুলিয়া দেওয়া হইবে। ঐ ধারা অনুসারে আয়ারল্যাণ্ডকে বৃটেনের রাজার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হয়। ইহার সহিত একটি সংশোধন প্রস্তাবও আছে। ঐ প্রস্তাব অনুসারে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আইরিশ ফ্রি ষ্টেট আইনের (Act) শাসননীতির ২নং অংশও প্রত্যাহার করিবার কথা।

ডি ভ্যালেরা

এই পাণ্ডুলিপির সম্পর্কে তুমুল তর্কযুদ্ধ হইতেছে। আয়ারল্যাণ্ডের ফ্রি ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট কসগ্রেভ ও তাঁহার মতানুবর্ত্তীরা ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের সংশোধন প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, যেহেতু এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের সহিত সন্ধির ফলে আয়ারল্যাণ্ডবাসীরা যে সকল অধিকার, স্বাধীনতা, আর্থিক সুবিধা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই হেতু এই পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় শুনানী এখন মুলতুবি রাখা হউক। বৃটিশ সরকার ও ফ্রি ষ্টেটের শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে এ সম্বন্ধে যতক্ষণ একটা চুক্তি না হয়, ততক্ষণ মুলতুবির সময় নির্দ্দিষ্ট রহিল।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে, আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে যে দুই ভাগ আছে, সেই দক্ষিণ ভাগের ফ্রি ষ্টেটের রাজনীতিকদের মধ্যেও এই বিষয়ে মত-বিরোধ আছে, আলষ্টার ত স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিলেও হয়, উহার কথা না ধরাই উচিত। যেখানে এত মতভেদ, সেখানে স্বায়ত্তশাসনাধিকারলাভে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না, বৃটিশ সরকারের পক্ষে তাহাকে স্বায়ত্তশাসন দিতে কোন আপত্তি থাকে না! আর ভারতে? বাপ রে! সেখানে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ-জুজুর বিষম ভয়!

যাউক সে কথা। যিনি বৃটেনের সহিত আয়ারল্যাণ্ডের

বর্ত্তমান মনোমালিন্যের মূল কারণ, সেই প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরার মতামত কিরূপ, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। ডাণ্ডি সহরের অধিবাসী পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ডিঙ্গল ফুট সম্প্রতি এই বিষয়ে মিঃ ডি ভ্যালেরার সহিত কথা কহিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "বৃটেনের ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ টমাস যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার উত্তরে তাঁহার কি বলিবার আছে?"

মিঃ ডি ভ্যালেরা বলেন, "উহা এক পক্ষের কথা। পার্লামেণ্টের সদস্যদের স্বভাবতঃ ঐ দিকেই ঝোঁক, কাযেই তাঁহারা মিঃ টমাসের যুক্তিকে অকাট্য বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি আমাদের পক্ষের কথা শুনেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইবে।

"আচ্ছা, রাজানুগত্যের শপথের কথাই ধরা যাউক। বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার সর্ত্তানুসারে এই শপথ অনুজ্ঞাসূচক নহে। লর্ড বার্কেনহেড এই সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি কি এতই নির্ব্বোধ ছিলেন যে, না বুঝিয়া এমন সন্ধি করিয়াছেন, যাহার মধ্যে ছিদ্র থাকিয়া যাইতে পাবে? তিনি ত শপথ অনুজ্ঞাসূচক করিয়া যাইতে পারিতেন

"সুতরাং বুঝিতে হইবে, তিনি রাজনীতিক কারণে ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ত্তের মধ্যে এই ফাঁক রাখিয়া গিয়াছেন। আইরিশ জাতির দিক্ হইতে শপথকে অনুজ্ঞাসূচক বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। হইলে তিন তিনবার তিনটি স্বতন্ত্র কমিটী শাসনতন্ত্রের তিনটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেন না। প্রথম দুইটি আইরিশ জাতির মনঃপূত হয় নাই বলিয়াই ত তৃতীয় কমিটী গঠন করিতে হইয়াছিল। কমিটীসমূহে ছিলেন অতি উচ্চদরের আইনজ্ঞ ব্যবহারাজীব সকল। শেষ যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আয়ারল্যাণ্ডের সামরিক গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ মন্ত্রি-সভার সকাশে পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে শপথের সর্ত্ত ছিল না।

"আসল সন্ধিপত্রে শপথকে বাধ্যবাধকতার মধ্যে ধরিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। তবে শাসনতন্ত্রে একটি ধারা বসান হইয়াছিল, যাহার ফলে পার্লামেণ্টে আইরিশ সদস্যদিগকে বলিতে হইলে রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা এক্ষণে শাসনতন্ত্র হইতে সেই ধারাটি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছি। এ অধিকার আমাদের নিশ্চিতই আছে। আমরা সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিতে চাহিতেছি না।"

বিলাতের "টাইমস' পত্র Statute of Westminister হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, আইরিশ ফ্রি-ষ্টেট শপথ তুলিয়া দিতে পারেন না,—

"The Crown is the symbol of free association of members of the British Commonwealth of Nations and they are united by common allegiance to the Crown."

"টাইমস" বলিতেছেন, যখন আয়ারল্যাণ্ড এই চুক্তির এক পক্ষ, তখন উহা ভঙ্গ করিলে আইনতঃ ও ধর্ম্মতঃ অপরাধী হইবেন। কিন্তু আইরিশ পক্ষ বলিতেছেন, free association অর্থে বাধ্যবাধকতা বুঝায় না; সুতরাং যখন আয়ারল্যাণ্ডের এই বন্ধন দূর করিবার বাসনা হইয়াছে, তখন স্বেচ্ছামত সে তাহা করিতে পারে।

বৃটিশ সরকাব আয়ারল্যাণ্ডকে সন্ধি মান্য করিতে বাধ্য করিবার জন্য যুদ্ধ করিবার ভয় দেখাইতেছেন না, তবে বলিতেছেন, যদি আয়ারল্যাণ্ড সর্ত্ত ভঙ্গ করে, তাহা হইলে (১) সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আইরিশ জাতিকে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে, (২) বৃটেনের কোন বন্দর আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষে উন্মুক্ত থাকিবে না, (৩) বৃটিশ নৌবহর আয়ারল্যাণ্ডের উপকূল শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে না।

আয়ারল্যাণ্ড বলিতেছেন, "যদি পার্লামেণ্টের সদস্যদের নিকট নির্দ্দিষ্ট অনুজ্ঞা গ্রহণ না করিয়াও বৃটেন অবাধ বাণিজ্যনীতির পরিবর্ত্তে বাণিজ্য-সংরক্ষণ নীতি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে, তবে আয়ারল্যাণ্ড তাহার নির্ব্বাচকদের ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে তাহার অনভিলষিত ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে পারিবে না কেন?"

এইরূপে উভয়পক্ষে এখন বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে। পরে কি হইবে, তাহা আয়ারল্যাণ্ডের ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

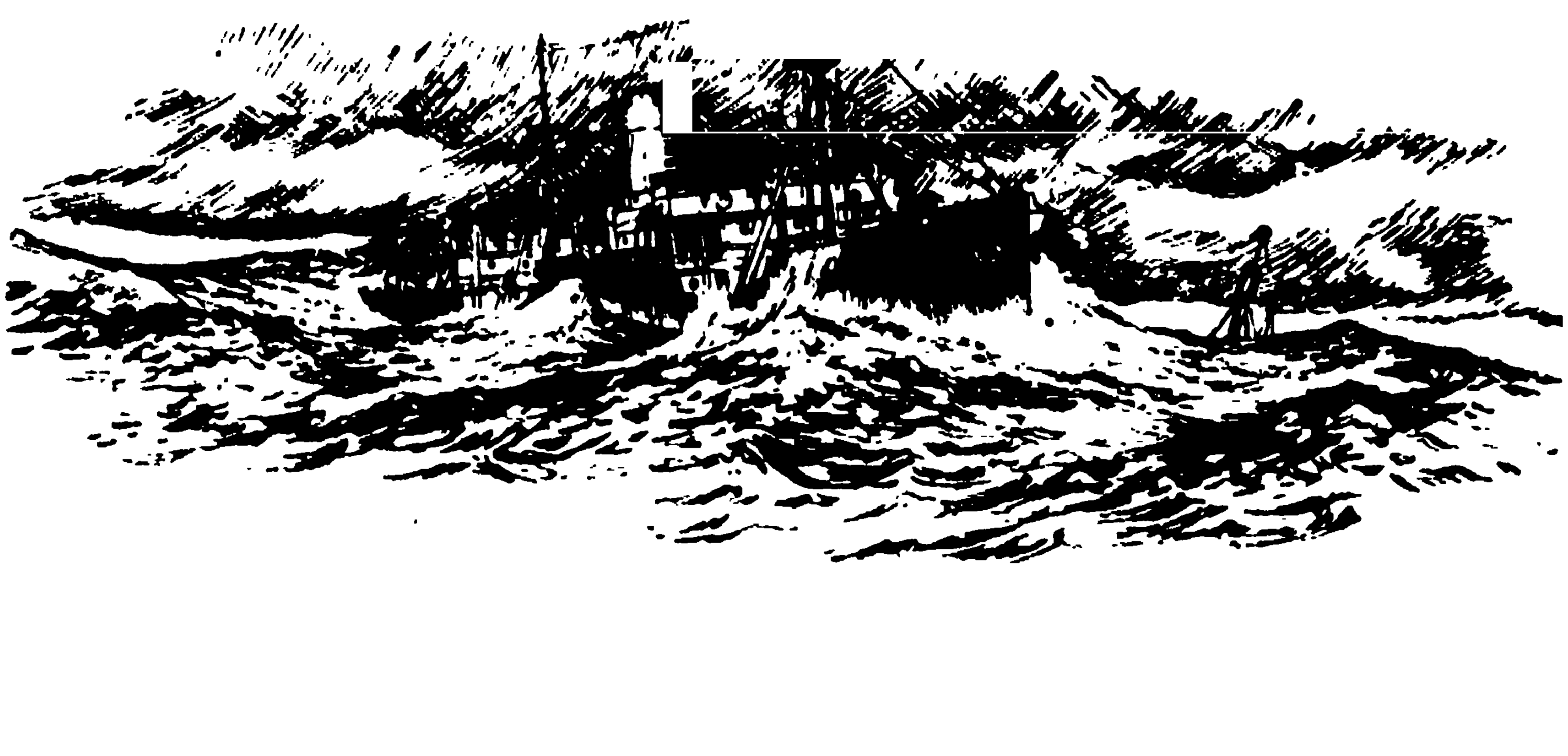

বড় ঘর

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলিপুরের চিড়িয়াখানা

কোন্ প্রফেশর মারা গিয়াছেন, এগারোটা বাজিতেই কলেজের ছুটী হইয়া গেল। ছেলের দল হল্লা করিয়া বাহির হইল। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া স্বর্গগত প্রফেশরের আত্মা শিহরিয়া উঠিয়াছিল কি না, সে সংবাদ স্বর্গের বাহিরে পাইবার উপায় নাই!

প্রভাত থার্ড ইয়ারে বি, এস-সি পড়ে। বড় লোকের ছেলে; পাবনা অঞ্চলে বাপের কিছু জমীদারী আছে। সে থাকে ভবানীপুরে, মামার বাড়ীতে। সেখান হইতে কলেজ করে।

ছুটী হইলে প্রভাত আসিয়া ওয়াই, এম্, সি,এর ধারে দাঁড়াইয়াছিল। ট্রাম ধরিবে বলিয়া এইখানে আসিয়াই সে দাঁড়ায়; আজও দাঁড়াইয়াছিল। দু' তিনটা ট্রাম চলিয়া গেল, প্রভাত তবু ট্রামে চড়িল না। মনটা এখনি গৃহে ফিরিতে চাহিতেছিল না—সেই মামুলি বন্ধন! আসন্ন দুপুরে আকাশে-বাতাসে এমন মুক্তির হিল্লোল! ঘরের বদ্ধ কোণের কথা মনে পড়িলে মন বিরূপতায় ভরিয়া ওঠে।

অনন্ত আসিয়া তার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল,—বাড়ী ফিরচো?

প্রভাত কহিল,—না,—কি করি বলো তো?

হাসিয়া অনন্ত কহিল,—ভাবনার কথা। নিত্যকার বাঁধা রুটীন এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, এ সময় কলেজের কায়েমি বেঞ্চটুকুতেই যা-কিছু আরাম বোধ হয়। এমন সময় কলেজ থেকে গলাধাক্কা দিয়ে পথে বার ক'রে দিলে অবস্থা হয় যেন Aish out of water!

প্রভাত হাসিল, হাসিয়া কহিল,—কি করবে, ঠাওরাচ্ছ? বাড়ী···

মুখখানা বিকৃত করিয়া বিরক্তি-ভরা স্বরে অনন্ত কহিল,—না। বাড়ীতে সেই কিচিকিচি, কলরব! কাকিমার নিত্য লাগানি-ভাঙ্গানি···মা বেচারী মুখ চুণ ক'রে থাকেন! উপায় কি! কাকার পয়সায় মানুষ হচ্ছি—কাকিমার তম্বির অন্ত নেই! যতক্ষণ পালিয়ে থাকতে পারি···

কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেদনা!

প্রভাত কহিল,—তোমার মা তো সহ্য করেন···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত কহিল,—উপায় নেই, কাজেই। বি, এ-টা পাশ ক'রে মাষ্টারী-ফাষ্টারী যা হোক নিয়ে মফঃস্বলে পালাতে পারলে হাড়ে বাতাস লাগবে! অনুগ্রহ-ভিখারী হয়ে থাকার মত দুর্ভাগ্য আর নেই!

কথাটা বলিয়া অনন্ত উদাস-নেত্রে এক দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রভাত কহিল—কিন্তু তোমার কাকা বাবু তো তোমায় প্রেসিডেন্সিতেই পড়াচ্ছেন···

অনন্ত কহিল,—বাবার উইলের এক্সিকিউটার তিনি। বাবা নেহাৎ নিঃসম্বল মারা যান নি! তা ছাড়া কাকা বাবু লোক মন্দ নন্…তবে ঐ কাকিমার দাপটে চুপ ক'রে তাঁকে সয়ে থাকতে হয়।

সে চুপ করিল; ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিল,—ছোট-খাট ব্যাপারে কথা কইতে গেলে উল্টে ফল হয়। তবে মোটামুটি ব্যাপারে কাকা বাবুর একটা প্রিন্সিপ্‌ল্ আছে—কাকিমার সহস্র আঘাতেও কাকা বাবু সেখানে অটল থাকেন। আমাদের উপর দরদও জাগে, কিন্তু প্রকাশ্যে সে দরদ দেখাবার উপায় নেই!…

অনন্ত আর একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাসান্তে কহিল,—কলেজ থেকে ফিরে মুখে একটু কিছু গুঁজে স'রে পড়ি… বাড়ী ফিরি সন্ধ্যার পর। ফিরে পড়াশুনা করি; তার পর রাত্রে ভোজন আর শয়ন! মা শুতে আসেন রাত একটা-দেড়টায় সকল কাজ সেরে। মা'র এ কষ্ট শুধু feel করি… আর কিছু করবার উপায় নেই! মা কিন্তু দেবী ধরিত্রীর মত নীরবে সব সহ্য করেন…

প্রভাত কহিল,—শরীরের কষ্ট আমাদের মেয়েরা গ্রাহ্য করেন না। মনের ব্যথাই…

অনন্ত কহিল,—হুঁ!

প্রভাত তার পানেই চাহিয়াছিল, অনন্তর মুখে-চোখে বেদনার গভীর ছায়া!

প্রভাত কহিল,—এখন তা হ'লে বাড়ী ফিরচো না?

অনন্ত কহিল,—ফিরতে মন চাইছে না।

প্রভাত কহিল,—চলো, Zooএ যাবে?

অনন্ত কহিল,—বেশ!

প্রভাত কহিল,—বইগুলো দরোয়ানের কাছে রেখে যাওয়া যাক। It will be so nice…

অনন্ত উৎসাহ-ভরে কহিল,—O. K.

দরোয়ানের কাছে বই-খাতা রাখিয়া দুই সহপাঠীতে ট্রামে চড়িয়া বসিল এবং যথাকালে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ফটকের কাছে সেই ভিড়! জানোয়ার দেখিবার এমন স্পৃহা লোকের নিত্য লাগিয়া আছে!

হাসিয়া অনন্ত কহিল,—ঐ খোট্টাগুলো…কি study করতে আসে, বলো তো! যখনই আসি, ওরা ঠিক ভিড় জমিয়ে রেখেচে; দেখি।

প্রভাত কহিল,—Curiosity! বাঘ, ভালুক, পাখী—এ সবের দেখা তো মেলে না, just to enjoy a holiday. আমরা এসেছি তো ঐ একই উদ্দেশ্যে…just for a change · তবে কাছাকাছি এতখানি মুক্ত জায়গা পাওয়া যায় না—শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডনস্ যদি এপারে হতো, তা হ'লে কি আর জুয়ে আসতুম!…

দু'জনে বাগানে ঢুকিল। নানা বেশে নানা লোক আসিয়াছে। তাদের কৌতূহল, কৌতুক জীব-জন্তুর চেয়ে কম উপভোগ্য নয়!

মস্ত পুকুর—পুকুরে কালো রাজ-হাঁস নিজের মর্য্যাদা-জ্ঞান অটুট রাখিয়া জলের বুকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

প্রভাত কহিল,—যেন মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা! গর্ব্বের ভঙ্গীখানা ছাখো!

অনন্ত কহিল,—A thing of beauty! সত্যি, কালোর সৌন্দর্য্য ফেল্‌না নয়!

হাসিয়া প্রভাত কহিল,—কালোর সৌন্দর্য্য আমরা এদেশের লোক যতখানি appreciate করেচি, এমন আর কোনো দেশ করে নি! আমাদের কবেকার সেই শ্রীকৃষ্ণ—কত যুগ ধ'রে কি lyricএর সৃষ্টি ক'রে আসচেন, বলো তো! 'আমার তমাল কালো, কৃষ্ণ কালো, তাই কালো আমি ভালোবাসি!' অতএব কালোর সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে এদেশে অপূর্ব্বত্ব নেই!

হাসিয়া অনন্ত কহিল—যা বলেছো!…

ছায়া-ভরা গাছের নীচে একখানা বেঞ্চ। দু'জনে গিয়া বেঞ্চে বসিল। অনন্ত কহিল,—তেষ্টায় ছাতি ফাটচে!

প্রভাত কহিল—লিমনেড খাবে?

অনন্ত কহিল—না। ও দ্রব্যে আমার মোটে রুচি নেই। তা ছাড়া আমার জল-পিপাসা লিমনেডে মেটে না, ভাই! দেখি, ওধারে একটা hydrant আছে, জল পাই কি না! তুমি বসো।

অনন্ত উঠিয়া গেল জলের সন্ধানে। প্রভাত বেঞ্চে বসিয়া রহিল। স্নিগ্ধ বাতাস…পুকুরের কালো জল, গাছের ছায়া, পাখীর গান…নিত্যকার বাঁধা রুটীনের বিরসতার পর এ-সবের স্পর্শ তার চিত্তে যেন মায়ার তুলি বুলাইয়া দিল।

অজানা কল্প-লোকের কি সুরেই বুক ভরিয়া উঠিল! তার মন কঠিন বাস্তব ছাড়িয়া কোন্ ছায়াময়ী অমরার পানে উধাও গতিতে ভাসিয়া চলিল…

অনন্ত ডাকিল—ওহে প্রভাত…

প্রভাত আকাশের পানে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল—চোখের দৃষ্টিতে আবেশ! অনন্তর আহ্বানে তার চমক ভাঙ্গিল। সে কহিল—কি—জল পেলে?

অনন্ত কহিল—হ্যাঁ।

অনন্ত বেঞ্চে বসিল, বসিয়া কহিল—এক চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। ঐতিহাসিক চরিত্র বলতে পারো। সত্যি carries a history with him…তাই ভাবছিলুম, চিড়িয়াখানায় এসেচি—এখানে কত রকমের জন্তু-জানোয়ার! কিন্তু আমাদের সংসার-ক্ষেত্রেও কি বিচিত্র চরিত্রের লোকের সঙ্গে দেখাশুনা হয় আমাদের নিত্য। যদি কেউ ষ্টাডি করতে চায়—মানুষের মনের মত study করার বস্তু আর নেই!

প্রভাত কহিল—কথাটা নতুন নয়।…সত্যযুগ থেকে দার্শনিকের দল সে-কাজে লিপ্ত আছেন।

অনন্ত কহিল—ভদ্রলোকের নাম লাটু বাবু…পুরা নাম লুটবিহারী চাটুয্যে। লুটবিহারী থেকে লাটু হলো কি ক'রে—এটা special studyর যোগ্য! তবে মনে হয়, বড়লোক ছাতুবাবু লাটুবাবু ছিলেন—সেই হিসেবে বড়র সঙ্গে পাল্লা রাখতে লুটবিহারী বাবু লাটুবাবুতে রূপান্তরিত হয়েছেন!

প্রভাত কহিল—পরচর্চ্চায় কেন এ মধুর মধ্যাহ্ন-অবকাশকে খণ্ডিত করো, অনন্ত!

অনন্ত কহিল—পরচর্চ্চা নয়, character study! শুধু বিচিত্র চরিত্রের প্রতি special মনোযোগ অর্পণ করানো! টেক্সটবুকে important passageএ লাল-নীল পেন্সিলে দাগ দাও না? এ তাই!

প্রভাত কহিল—উপমায় তোমার একটু চাতুর্য্যের পরিচয় পাচ্ছি।

অনন্ত কহিল—ভদ্রলোক আমাদের পাড়ায় থাকতেন—হঠাৎ খুব সাহেবী চাল ধরেন। খানা, পার্টি, নাচ-গান, মোটর—পাঁচ বছরে চাল বাড়ন্ত হলো। বাজারে বহুৎ দেনা—তবু চালে খাটো হতে চান্ না। এখন মোটর নেই, তবু pleasure trip চাই। পায়ে হেঁটে যান—আমরা বুঝি, মোটরের ক্ষমতা নেই! দেখা হলেই তবু বলবেন, ডাক্তার বলে, মোটর চ'ড়ে চ'ড়ে বাতে মারা যাবেন, walk, walk as much as you can…কাজেই কষে বেড়াই। সঙ্গে থাকেন স্ত্রী, আর একটিমাত্র কন্যা…

প্রভাত কহিল,—তুমি ও আলোচনা থামাও, ভাই। আমার ভারী ভালো লাগচে…শুধু চুপ ক'রে আকাশের পানে চেয়ে থাকতে। এ সময় পরের কুৎসা মোটে ভালো লাগচে না, বিশেষ এই রকম একটা dark picture…

অনন্ত চুপ করিল; পরক্ষণেই দূরে স্বর্ণময়ী হাউসের পানে চাহিয়া কহিল,—ঐ যে, ভদ্রলোক এই দিকেই আসচেন। সঙ্গে স্থূলাঙ্গী মহিলাটি দেখচো—ওঁর স্ত্রী, আর তরুণীটি কন্যা!

প্রভাত ফিরিয়া দেখিল,—কালো রঙ, প্যাণ্ট-কোট-পরা, সাহেবী সাজে সজ্জিত এক প্রৌঢ় বাঙালী; তাঁর সঙ্গে দুটি মহিলা; একটি প্রৌঢ়া, অপরটি তরুণী। তরুণীর মুখে-চোখে রৌদ্র পড়িয়াছে, রৌদ্র-কিরণে মুখে এমন দীপ্তি ফুটিয়াছে…চমৎকার!…

তাঁরা এই দিকেই আসিতেছিলেন। বাঙালী সাহেব কহিলেন,—এই যে অনন্ত…

দুজনে উঠিয়া দাড়াইল। বাঙালী সাহেব ওরফে লাটুবাবু কহিলেন,—তোমরা বসো গো…তিনি অনন্তর পানে চাহিলেন, কহিলেন,—এঁরা একটু জিরুতে চান, ঘুরেচেন কি না…হাঃ হাঃ হাঃ—

অনন্ত ও প্রভাত সরিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। লাটু বাবু বসিলেন, পরে তাঁর স্ত্রী—মেয়েটি দাঁড়াইয়া রহিল।

লাটু বাবু কহিলেন,—বোস্ না পরি…

পরি ওরফে পরিমল বসিল।

প্রভাত চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, অনন্তকেও ইঙ্গিত করিল।

লাটু বাবু কহিলেন,—তোমরা বসো…কথাটা বলিয়া বেঞ্চের চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন,—জায়গা নেই! তা তোমরা young man! না হয় একটু দাঁড়িয়েই রইলে। গল্প-স্বল্প করা যাক, কি বলো? হাঃ হাঃ হাঃ!

——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লাটু সাহেব

লাটু বাবুর যেটুকু পরিচয় অনন্তর মুখে প্রভাত এইমাত্র পাইয়াছে, সেই সঙ্গে তার যে ভদ্রতা·· লাটু বাবুর প্রতি বিরূপতায় প্রভাতের মন ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কি করে? অপরিচিত ভদ্রলোক, বয়স হইয়াছে, তিনি আলাপ করিতে চাহিলেন, কাজেই চলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়, অগত্যা সে আর অনন্ত দাঁড়াইয়া রহিল।

লাটু বাবু চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তোর মনে আছে পরি, এখানে সেই ব্লকহেড সাহেবকে পার্টি দিয়েছিলুম···ঐখানে চাঁদোয়া খাটানো হয়েছিল। সেই যে এক মেম-সাহেব মিস্ হার্ডকাশ্‌ল্ নেচেছিল। ওঃ, ব্যাটারা কি মদটা না খেয়েছিল! বাবাঃ, পিপে, পিপে · সাতটি হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। তোর বোধ হয় মনে থাকবে না···তুই তখন একেবারে বাচ্ছা! দশ বছর বয়েস···না গা? লাটু বাবু স্ত্রীর পানে চাহিলেন।

প্রৌঢ়া লাটু-গৃহিণী সংক্ষেপে শুধু কহিলেন—হুঁ্যা···

প্রভাত ও অনন্তকে গৃহিণী লক্ষ্য করিতেছিলেন, কহিলেন,—এ ছেলেটি কে, অনন্ত? কখনো দেখি নি তো···

অনন্ত কহিল—আমরা একসঙ্গে পড়ি। ওর নাম প্রভাত। থাকে ভবানীপুরে—বাসা। ওর বাপ পাবনায় থাকেন। ওরা জমীদার।

গৃহিণী কহিলেন—বটে! তাঁর অধরে স্নেহ-দরদের মৃদু হাসি বহিয়া গেল। তিনি কহিলেন—বেশ ছেলেটি!···তা বসো না বাবা···ঐ ঘাসের ওপর—ধুলো নেই তো! মন্দ কি!

প্রভাতের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল—আহা, কি উদার স্নেহ গো! ঐ ঘাসের উপর বসো···ধূলা নাই!···স্বামী সাহেবী পোষাক পরিয়াছে বলিয়া তুমিও বাঙালী মায়েদের আদর-যত্নের মাথা খাইয়া বসিয়াছ!

লাটু বাবু কহিলেন—হ্যাঁ—ও তো দিব্যি জায়গা··· কম্বলের মত নরম ঘাস···

মৃদু হাসিয়া প্রভাত কহিল—না, আমরা বেশ আছি।

কথাটা বলিয়া সে সকলের উপর দিয়া দৃষ্টি বুলাইয়া লইল—যেমন কর্ত্তা, তেমনি তাঁর গৃহিণী···নিজের স্বার্থ বেশ বোঝেন! মেয়ে পরি? বেচারী জড়োসড়ো হইয়া আছে ···বুঝি, মা-বাপের অসীম নির্লজ্জতায়!···

লাটু বাবু কহিলেন—এখানকার মেম্বর হবার জন্য উপরোধ চলেছে বড্ড। আমায় টানাটানি করচে নিত্য!··· তাই এক-একবার ভাবি, দূর হোক্ ছাই, দি কিছু ফেলে— নিত্যি এ জ্বালাতন বরদাস্ত হয় না! আবার ভাবি, কি ফল! আমাদের বাঙালীদের জন্য special privilege কিছু দেবে কি? · হাঃ হাঃ হাঃ···

কথার শেষে উচ্চ দীর্ঘ হাস্য যোগ করা লাটু বাবুর স্বভাব! প্রভাত সেটুকু লক্ষ্য করিল।

অনন্ত কহিল—তা হ'লে এক কাজ করুন না···

লাটু বাবু কহিলেন,—কি,—বলো তো···

অনন্ত কহিল—আপনি মোটা চাঁদা দিয়ে বলুন,—মাসে একটা দিন শুধু Indiansদের ফ্রী ঢুকতে দেওয়া হোক··· আর কেউ না।

লাটু বাবু কহিলেন—হুঁ্যা···তা হ'লে দেশের একটা মস্ত কাজ করা হয় বটে!···যা বলেছো!···আচ্ছা, এবারে এলে ঐ কথা বলবো!···তুই আমায় মনে করিয়ে দিস্ তো মা পরি···যদি ভুলে যাই···! বয়স্ হয়েচে তো···আরো পাঁচটা কাজ রয়েছে—হাঃ হাঃ হাঃ···

মেয়ে পরি এ কথায় কোনো সাড়া দিল না। প্রভাত সেটুকুও লক্ষ্য করিল।

গৃহিণী কহিলেন—এখানটায় একটু ঠাণ্ডা আছে···হাওয়া পাচ্ছি। তোমাদের যেমন কাজ, ঠিক দুপুর বেলায় আলিপুরের বাগান·· তার চেয়ে শিবপুরে গেলেই ঠিক হতো!

লাটু বাবু কহিলেন—তা হতো। তবে এখানে এক জনকে দেখা করতে আসতে বলেছি কি না···! কি জানো, একটু outing না হ'লে মেজাজটা কেমন ভালো থাকে না!···তা, ···বেশ, কাল না হয় শিবপুরে যাবো। কি বলো অনন্ত— তোমরা যাবে?···

অনন্ত কহিল—আজ্ঞে, আমাদের কলেজ আছে···

—ও···! তা আজও তো কলেজ ছিল···French leave নিয়েছো না কি! হাঃ হাঃ হাঃ···

অনন্ত কহিল—আজ্ঞে না, French leave নয়। এক জন প্রফেশার মারা গেছেন ব'লে কলেজের ছুটী হয়ে গেল কি না, তাই দুপুর বেলাটা কি করি···এধারে আসাও হয় না··

তার কথা লুফিয়া লাটু বাবু কহিলেন,—একটু outing…? হাঃ হাঃ হাঃ…

এই কথা আর হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্যে মেয়েটিকে নীরব নত-মুখ দেখিয়া এ-দলের প্রতি প্রভাতের যে বিরূপতা জাগিয়াছিল, তাহা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল। তা ছাড়া কেমন একটু মজা…অনন্ত ঠিক বলিয়াছে, ভদ্রলোকের চরিত্রে একটা বৈচিত্র্য আছে! নিত্য পথে-ঘাটে যে-সব লোকের সঙ্গে দেখা হয়, ইনি ঠিক তাদের মত নন্! প্রহসনে, কৌতুক-নাট্যে এমনি দু' একটা চরিত্র দেখা যায় বটে! কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন লোকের দেখা প্রভাত কখনো পায় নাই!

যা-তা তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া কথা চলিতে লাগিল। সে সব কথায় লাটু বাবুর নির্লজ্জতা যে-পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছিল, এই বাক্‌হারা মেয়েটিকে ঘিরিয়া ঠিক ততখানি রহস্য প্রভাতের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল; এবং এই রহস্যের সঙ্গেই আলাপের একটু বাসনা…দুটা কথা কহিবার লোভ দুর্ব্বার হইতেছিল।

সহসা প্রভাতের মাথায় কি খেয়াল চাপিল। সে কহিল,—আপনারা কিছু খাবেন? চা? লিমনেড?

লাটু বাবু একেবারে সম্মিত মুখে কহিলেন,—এঁ্যা—তা মন্দ কি!…তবে বলি, কি জানো, বড় ভুল হয়ে গেছে। বেয়ারাটাকে সঙ্গে আনা হয় নি। তাকে বললুম, তুই চায়ের সরঞ্জামটাম নিয়ে মার্কেট থেকে কিছু কেক-রুটী-মাখন কিনে সটান্ চ'লে আস্‌বি। নিশ্চয় বেটা holiday rollicking করছে…বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর · বন্ধু-বান্ধব ডেকে আসর জমাচ্ছে…! আজই গিয়ে ব্যবস্থা করবো…তখন তোমরা বারণ করো না, বলচি…খবর্দ্দার!

কথার শেষে এই যে শাসন, তাহা অবশ্য গৃহিণী ও কন্যার উদ্দেশ্যে!

প্রভাত কহিল—তা হ'লে বসুন…আমি অর্ডার দিয়ে আসি। কি বলবো? চা? না, লিমনেড?

লাটু বাবু কহিলেন—কোনোটাতেই আপত্তি নেই। তেষ্টা খুবই পেয়েছে…আর এটা আমাদের tea-timeও · হাঃ হাঃ হাঃ…

সেই হাসি!…প্রভাত চলিয়া গেল, অনন্ত তার অনুসরণ করিল।…

দূরে গিয়া প্রভাত কহিল—একটা একের নম্বর fool!

অনন্ত কহিল—খাবে—তবু চাল ছাড়বে না। বেয়ারা, মার্কেট, রুটী-মাখন—কত কথাই বললে…

প্রভাত কহিল,—অথচ কি লাভ…? আমরা কিছু বলবো না যে, মশায়, আপনার রুটী-মাখন খাবো…

অনন্ত কহিল—ঐ জন্যই বলছিলুম, historical character ··মানুষ জীবন-চরিত লেখে কাদের? না,…আশু বাবুর, মনোমোহন ঘোষের, বিদ্যাসাগরের। আরে, তাঁরা বড়লোক, তাঁদের কথা তো আমরা জানি। তার চেয়ে এঁদের জীবন-চরিত যদি কেউ লেখে তো মানুষ অভিশপ্ত নিরানন্দ জীবনে একটু আনন্দের স্বাদ পায়!…

চা, রুটী, লিমনেড প্রভৃতির ফরমাস করিয়া প্রভাত ও অনন্ত যখন ফিরিল, তখন কর্ত্তা-গৃহিণীতে কি তর্ক বাধিয়া গিয়াছে এবং পরিমল তাঁদের মৃদুভাবে ভর্ৎসনা করিতেছে…পরিমলের মুখে চোখে বিরক্তির বহ্নি-কণা! প্রভাত ও অনন্ত আসিতে সহসা ভাব-পরিবর্ত্তন—কর্ত্তার মুখে সেই বিরাট হাসি, গৃহিণীর মুখ সস্মিত…পরিমল তেমনি গম্ভীর, নীরব।

প্রভাত কহিল,—চা-রুটী আনচে।

চা-রুটী প্রভৃতি তখনি আসিল। একটা চায়ের পেয়ালা লইয়া গৃহিণী মেয়ের হাতে দিলেন—মেয়ে লইবে না। গৃহিণী ধমক দিলেন, কহিলেন,—ভদ্দর লোককে অপমান করিস নে—যত্ন ক'রে আনলে—নে, ধর্, খা।

মেয়ে পেয়ালা লইল। কর্ত্তা আগেই এক টুক্‌রা রুটী ও চায়ের পেয়ালা করগত করিয়াছিলেন।

গৃহিণী কহিলেন,—তোমরা খাবে না? বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই একটা পেয়ালা তুলিয়া মুখে ধরিলেন।

কর্ত্তা কহিলেন,—তোমরা খাও…সে কি কথা! তোমাদের পয়সা, তোমরা খাওয়াচ্ছ। আর তোমরা নিরম্বু থাকবে! হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রভাত মেয়েটির পানে চাহিল,—পরিমল পেয়ালার অন্তরাল হইতে চোখের দৃষ্টি তাদের পানেই উদ্যত রাখিয়াছে। সে কহিল,—এই যে এক বোতল লিমনেড নিচ্ছি…

গল্প চলিল। লাটু বাবুকে কবে কোন্ সাহেব চায়ের ওস্তাদ বলিয়াছিলেন। চা মুখে ঢালিয়াই তিনি বলিয়া দিতে পারেন, কোন্ বাগান হইতে কবে তোলা…এমনি বিবিধ

পরিচয়ে তিনি প্রভাত ও অনন্তর তাক লাগাইয়া দিতেছিলেন। আরো বলিলেন,—তুমি বোধ হয় দেখেচো অনন্ত, আমার সেই পুরোনো বাড়ীর পিছন দিকে পাঁচ কাঠা বাগান ছিল? তাতে বেড়া দিই নি, বেড়ার বদলে চায়ের চাষ লাগিয়েছিলুম! জমীতে স্রেফ খানিকটা ক্লোরেট অফ পটাশ মিশিয়ে দিয়েছিলুম, চায়ের পক্ষে খাশা সার! ক'জন জানে! আমায় সে খপর দিয়েছিল, সেবার সেই লিপটন সাহেবের এক ভাগনে এসেছিল না, সেই লিপটন হে, যে Lipton's Tea বাজার গরম ক'রে রেখেছে। তাদের মস্ত চায়ের বাগিচা কি না, বললে, Mr. Lattoo, চা লাগিয়েছ যদি তো জমিতে ক্লোরেট অফ পটাশ ছড়াও, চা যা হবে ফার্ষ্ট ক্লাশ! আর quantityতে চতুর্গুণ মাল পাবে! হলোও তাই। সেই চা···আমি চার বছর ধ'রে খেয়েছি—কি flavour! ঐ চা হাইকোর্টের জজ ছিলেন—কি সেই সাহেব—আহা, নামটা মনে পড়ছে না, সেই যে ভারী একবগ্‌গা···লাট সাহেবকেও কেয়ার করতো না, আইনের জাহাজ বললে চলে—সেই জজ সাহেবের মেম বারো পাউণ্ড নিয়ে গেল; তবে গে নেপালের প্রাইম-মিনিষ্টার; গাইকোয়ার নিজে—সে চা খেয়ে কি তারিফ করেছিলেন···

প্রভাতের আবার বিরক্তি ধরিল। সে কহিল,—এমন চা··চায়ের চাষ ছাড়লেন কেন?···

লাটু বাবু কহিলেন,—ছাড়লুম কি—ছাড়ালে! এই ইনি···

লাটু বাবু গৃহিণীর দিকে ইঙ্গিত করিলেন, করিয়া আবার কহিলেন,—ঐ রকম বড় বড় লোক নিত্য চা চাইতে লাগলেন—কাউকে দিতে পারলুম, কাউকে পারলুম না। উনি রেগে বললেন, এ ঠিক হচ্ছে না—কেউ পাবে, কেউ পাবে না, চুলোর চা চুলোয় যাক! এই না ব'লে ঝগড়া ক'রে যত চারা গজিয়েছিল, সব উপড়ে ফেলে দিলেন। ওঁর ঐ তো রোগ···আছেন তো বেশ আছেন, আর মেজাজ যদি বিগড়ুলো, তখন একেবারে··· হাঃ হাঃ হাঃ—

না, পারা দায়! প্রভাত হাল ছাড়িয়া দিল। এ রকম নির্লজ্জ লোকের কথায় বাদ-প্রতিবাদ চলে না! এ লোকটির কথা শুধু নীরবে উপভোগ করিতে হয়! কাজেই সে আর কোনো প্রতিবাদ তুলিল না; পরম কৌতুকে নির্ব্বিচারে তাঁর সকল কথায় সায় দিয়া চলিল।

এমনি বহু কৌতুকে ঘণ্টা দুই কাটাইবার পর লাটু বাবু কহিলেন,—তোমরা বাড়ী যাবে না?

অনন্ত কহিল,—যাবো বৈ কি! আপনি?

লাটু বাবু কহিলেন,—আমার গাড়ী গেছে এক সাহেবকে আনতে। তার সঙ্গে এখানে দেখা হবার কথা। একটা বড় জমীদারী বন্ধকীর কথা আছে—negotiation সে এখানে আসবে কি না!···

অনন্ত কহিল,—তা হ'লে walking হবে না আজ?

লাটু বাবু একবার নিমেষের জন্য অনন্তর পানে চাহিলেন, পরে কহিলেন—নিশ্চয়!···তবে এঁরা আছেন। আমি তাই বলছিলুম, এখান থেকে ধর্ম্মতলা অবধি হেঁটে যাই, চলো···মাঠের উপর দিয়ে···চমৎকার হবে। তার পর নয় গাড়ী···ডাক্তার যখন অত ক'রে বলে···

অনন্ত কহিল,—তা এখানে চুপ ক'রে আর ব'সে আছেন কেন? একটু বেড়ানো—

স্ত্রী ও কন্যার পানে বারেক চাহিয়া লাটু বাবু খুশী-মনে কহিলেন,—বেশ, বেশ কথা! ওগো···

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভাত কহিল,—আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি! লাটু বাবু কহিলেন,—সহরের গোলমাল ভালো লাগে না, অসহ্য ঠেকে। তাই সহর ছেড়ে এখন বাসা বেঁধেছি সেই বাগমারির ওধারে। মাণিকতলার পুল আছে না? তার আরো পূবে বাগমারি সেই বাগমারির একটেরে রেল-লাইন—লাইন পেরিয়ে আমার বাগান-বাড়ী! আর এখন retired life···কি বলো? হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রভাতের মাথায় সহসা দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। দুষ্টা সরস্বতী পরামর্শ দিলেন,—থাকিয়া যাও! লাটু বাবুর সাহেব বন্ধু এবং মোটরখানা দেখিয়া যাও! সে পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া সে রহিয়া গেল।

তার পর সন্ধ্যা···বাগানে থাকিবার উপায় নাই বাহির হওয়া চাই!

ফটকের ধারে আসিয়া লাটু বাবু কহিলেন,—

বেটাদের আক্কেল দেখলে গা ?…চলো, আমার কথাই থাক—ধর্ম্মতলা অবধি হেঁটেই না হয়…

প্রভাত কহিল,—তার চেয়ে আমি ট্যাক্সিতে যাচ্ছি তো…সেই ট্যাক্সিতেই…মানে, একসঙ্গে যেতুম…

লাটু বাবু কহিলেন,—তুমি কতদূর যাবে ?

প্রভাত কহিল,—শ্যামবাজার। আপনাদের মাণিকতলার পুলের কাছে নামিয়ে দি যদি…

লাটু বাবু কহিলেন,—চলো। তুমি যখন বলচো, তোমার অনুরোধ…শেষে না বলো, বুড়োটা ভারী এক-গুঁয়ে… হাঃ হাঃ হাঃ…

প্রভাত ট্যাক্সি ডাকিল। সকলে ট্যাক্সিতে উঠিল।…

মাণিকতলার পুলের কাছে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া লাটু বাবু কহিলেন—এক দিন আমার ওখানে যাবে ? চলো না…রবিবারে…ছুটী আছে…কি বলো ?

প্রভাত পরিমলের পানে চাহিল। সেই ব্রীড়াময়ী তেমনি নত-মুখী…তবু মুখে একটা রক্তিম আভা ! তার তরুণ প্রাণ…এতক্ষণ এই সাহচর্য্য…সে সাহচর্য্য টুটিতেছে, এ দুঃখ কাঁটার মত প্রভাতের প্রাণে বিঁধিল !

প্রভাত কহিল,—বেশ। যাবো। এই রবিবারে…

লাটু বাবু কহিলেন,—বাগমারির রাস্তা ধ'রে বরাবর রেল-লাইনের দিকে ! লাইন পেরিয়েই মস্ত বাগান, বাগানের ফটকে ইংরেজী অক্ষরে লেখা আছে—ARAM. সেই বাড়ী। এসো তা হ'লে…

গৃহিণী কহিলেন,—সন্ধ্যার আগেই আসচো…কেমন ? অনন্তও এসো…তোমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে…বুঝলে !

ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল। লাটু সাহেব সপরিবারে তখনো দাঁড়াইয়া আছেন—প্রভাত ফিরিয়া তাকাইল, পরিমল এই দিকেই চাহিয়াছিল, দু'জনের দৃষ্টি মিলিল চকিতের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে পুলকের একটা শিহরণ ! তার পর ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

অনন্ত কহিল,—যা বলেছিলুম—নয় ?

প্রভাত কহিল,—বেচারী ! দারিদ্র্য তো পাপ নয়—তবু তা গোপন করার এ ব্যর্থ চেষ্টায় কেন যে হাস্যাস্পদ হন্ ভদ্রলোক !

অনন্ত কহিল,—এটুকু বোঝেন না যে, আমরা কথার আড়ম্বর ভেদ ক'রে ভিতরটা সাফ্ দেখতে পাচ্ছি !

প্রভাত কহিল,—I pity the poor fool.

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কাল-বোশেখীর সন্ধ্যাবেলায়

কাল-বোশেখীর সন্ধ্যাবেলায়
　　নাচলো বিরাট বনস্থলী,
হাস্নুহেনার ফুট্‌লো হাসি—
　　ফুট্‌লো লাজুক কৃষ্ণকলি।

লজ্জাবতীর আলিঙ্গনে
　ভুঁই-চাঁপা আজ হাস্‌লো মনে
　দিক্-হারানো পিক্-বৌয়েরা
　　আধ' পথেই পড়লো ঢলি'।
কাল-বোশেখীর সন্ধ্যাবেলায়
　　নাচ্‌লো বিরাট বনস্থলী।

বেল টগরের নাচন সুরু,
　　বক্ষে দুরু দুরু কাঁপা—
ঝরার নেশায় নাচ্‌লো বকুল
　　দোল-বিলাসী দোলন-চাঁপা।

　পাগ্‌লা কোকিল হাতছানি দেয়
　আয় না কবি মাতবো হেথায়,
　মনের সুখেই বনের বুকে
　　গান গেয়ে আজ আয় না চলি'।
কাল-বোশেখীর সন্ধ্যাবেলায়
　　নাচ্‌লো বিরাট বনস্থলী।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

চিকিৎসায় চলচ্চিত্র

বোষ্টনের কোনও দন্তচিকিৎসক রোগীদিগকে আনন্দদানের জন্য তাঁহার চিকিৎসাগারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিকিৎসায় চলচ্চিত্র

তিনি যখন রোগীর দন্তের চিকিৎসা করিতে থাকেন, তখন চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ তিনি বালক-বালিকাদিগকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শেষে বয়স্কগণের জন্যও এই ব্যবস্থা করায় তিনি বিশেষ সুফল পাইয়াছেন। প্রত্যেক রোগীর জন্যই এখন তিনি চলচ্চিত্র দেখাইয়া থাকেন। চিত্রগুলি মাথার উপরে ছাদে প্রদর্শিত হয়। রোগী চেয়ারের উপর মাথা হেলাইয়া থাকে, ডাক্তার তাহার দন্তচিকিৎসাকালে রোগী উপরের ছবি দেখিতে থাকে। প্রত্যেক ছবি ২০ মিনিটকাল অভিনীত হয়। ইহারই মধ্যে রোগীর চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রহসনাত্মক চিত্রগুলিই রোগীকে অধিক অন্যমনস্ক করিয়া দেয়।

দাঁড়টানা শিক্ষা

অক্সফোর্ড বাচখেলা ক্লাবের সদস্যগণ দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়টানা অভ্যাস করেন। ইহার বিশিষ্ট সার্থকতা আছে। এই ভাবে দাঁড় টানিলে, বসিবার ভঙ্গী এবং টানিবার পদ্ধতিতে যে ত্রুটি থাকে, তাহার সংশোধন ঘটে। নৌকায় বসিয়া দাঁড়ী সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া, দাঁড় টানিবার সময় চাহিয়া দেখে। ভুল-ভ্রান্তি হইলে প্রতিবিম্বে তাহা প্রতিফলিত হয়। তখন সে নিজের ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে।

দর্পণ-সাহায্যে দাঁড়টানা শিক্ষা

লঘুভার ইষ্টক

প্রতীচ্যের বাজারে লঘুভার এক প্রকার ইষ্টক বাহির হইয়াছে। উহা এত লঘু যে, দারু-নির্ম্মিত ইষ্টকের ন্যায় জলের উপর ভাসিয়া থাকে। ১২ ঘণ্টার মধ্যে এই ইষ্টক নির্ম্মিত হয়—৩ সপ্তাহ লাগে না। উহা অগ্নিতে পুড়ে না, জল শোষণ করে না। সুতরাং অগ্নি ও জল হইতে উহার কোন অনিষ্ট হয় না। অত্যন্ত লঘুভার বলিয়া সাধারণ ইষ্টকের তুলনায়, গৃহ-নির্ম্মাণে অল্পসময় লাগে, খরচও অপেক্ষাকৃত অল্প। মৃত্তিকা হইতেই উহার জন্ম। যে কোন আকারের ইষ্টক নির্ম্মাণ করা যায়। অর্থাৎ খুব মসৃণ

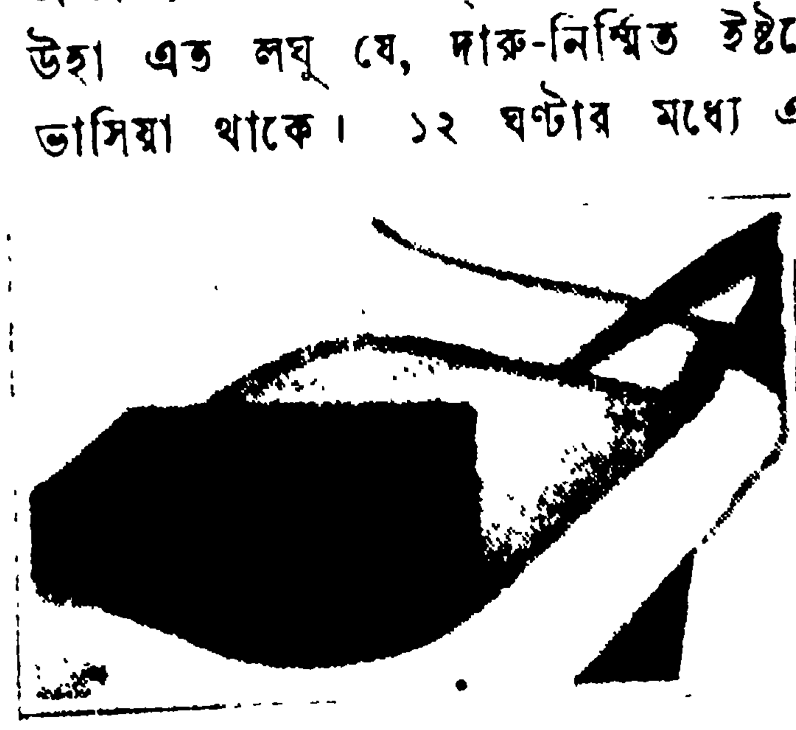

লঘুভার ইষ্টক

অথবা রুক্ষ উভয় প্রকার ইষ্টকই নির্ম্মিত হইতে পারে। এই ইষ্টক করাতের সাহায্যে চিরিয়া ফেলা চলে। বিশেষজ্ঞগণ বলিতে-ছেন, এই ইষ্টক কখনও ধ্বংস হইবে না।

মৎস্য-দানবের যুদ্ধ

সমুদ্রগর্ভে নানাজাতীয় ভীষণকায় জলজন্তু ও মৎস্য আছে।

মৎস্য-দানবের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

দানবাকার মৎস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান চিত্রে দেখা যাইতেছে, দুইটি মৎস্য আহার্য্য লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শিল্পী অর্দ্ধ-মাইল জলের নিম্নে এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া, তুলিকার সাহায্যে পরে উহা অঙ্কিত করিয়াছেন।

স্ফটিক-ইষ্টক

কাচনির্ম্মিত সুদৃঢ় ও স্বচ্ছ ইষ্টক

নিউইয়র্ক, সিরাফিউজে একটি সরকারী অট্টালিকা স্ফটিক-ইষ্টকের সাহায্যে নির্ম্মিত হইতেছে। এই নিরেট কাচময় ইট ইস্পাতের ন্যায় সুদৃঢ় এবং স্বচ্ছ। বিবিধ আলোক-সম্পাতের উদ্দেশ্যেই এইরূপ ইষ্টক ব্যবহৃত হইতেছে। গৃহের অভ্যন্তরভাগেই ঐ প্রকার ইষ্টক অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে। স্ফটিক-ইষ্টক না হইলে ইচ্ছানুরূপ আলোক উৎপাদন অসম্ভব।

বিদ্যুৎ-চালিত পালের জাহাজ

জনৈক মার্কিণ ধনীর জন্য জার্ম্মাণীতে একখানি চারি মাস্তুল-বিশিষ্ট পোত সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার পালের বিস্তৃতি

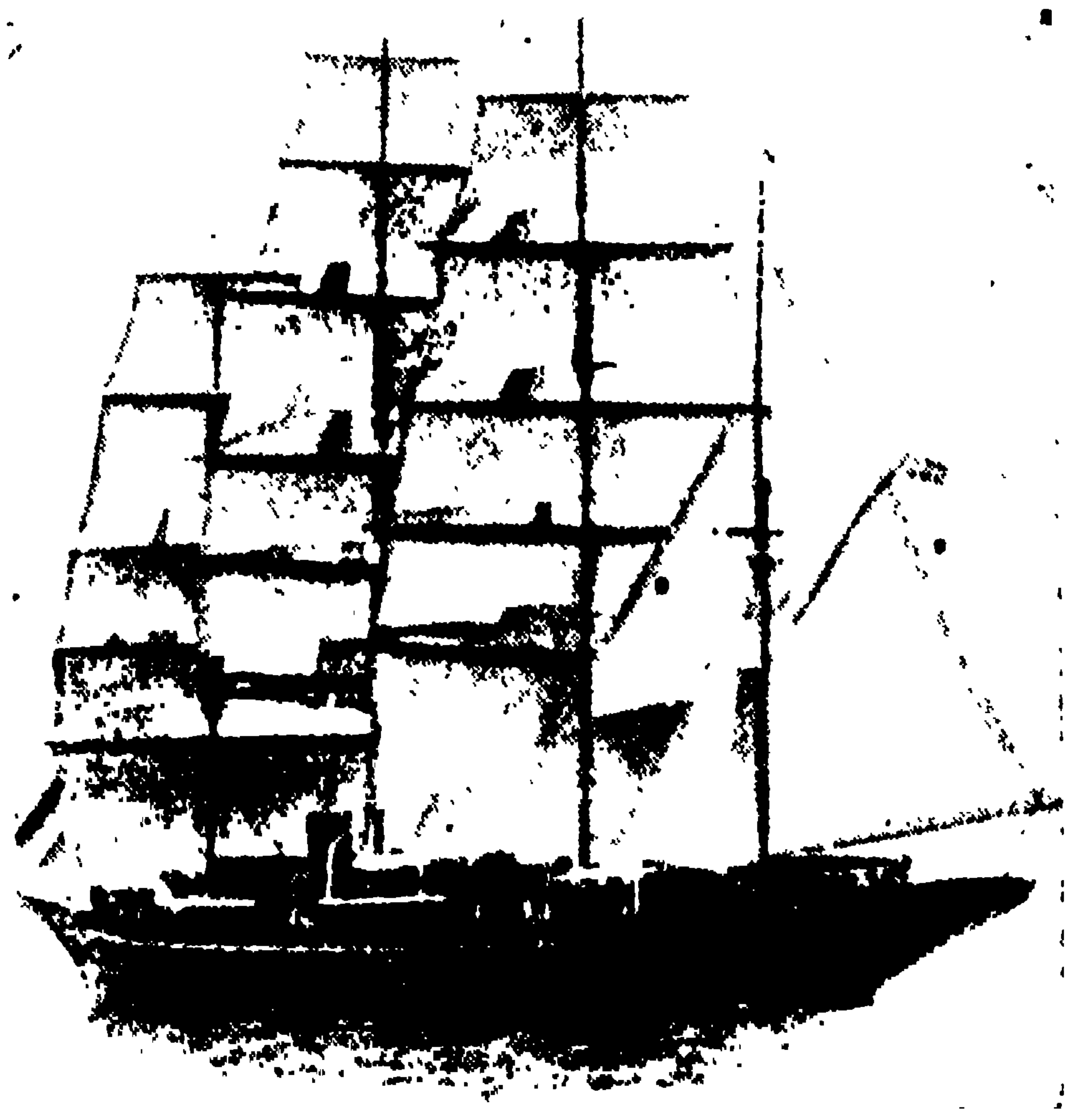

বিদ্যুৎ-চালিত পালের জাহাজ

৩৫ হাজার বর্গ-ফুট। পালগুলি বিদ্যুতের সাহায্যে চালিত হয়। পোতে ৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র আছে। প্রত্যেক যন্ত্রে ৮ শত ঘোড়ার শক্তি-বিশিষ্ট এঞ্জিন আছে। বিদ্যুতের সাহায্যে পালগুলি বায়ুভরে ফুলিয়া উঠিয়া পোতটিকে চালিত করে। এইরূপ পোত পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নূতন।

চলা শিখাইবার যন্ত্র

শিশুকে চলিতে হাঁটিতে শিক্ষা দিবার জন্য বস্তুতান্ত্রিক প্রতীচ্য-দেশে অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। চিত্রে বর্ণিত যন্ত্রের উপর শিশুকে বসাইয়া দেওয়া হয়। শিশুর আসনের চারিদিকে এমনভাবে তারের ঘেরা আছে যে, শিশু কোনমতেই টলিয়া পড়িবে না। ইচ্ছা করিলে আসন ত্যাগ করিবারও উপায় নাই। মাটী হইতে কোন জিনিষ

হাঁটা-চলা শিখাইবার যন্ত্র

তুলিয়া লইবে, তাহারও উপায় নাই। কেমন করিয়া হাঁটিতে হয়, শুধু সেই শিক্ষাই উহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তিমি-মৎস্যবাহী অতিকায় জাহাজ

"সার জেমস্ ক্লার্ক রস্" নামক একখানি জাহাজ কিছুদিন পূর্ব্বে নিউইয়র্ক সহরে পৌঁছিয়াছিল। এই জাহাজ অসংখ্য তিমি মৎস্য

তিমি-মৎস্যবাহী অতিকায় জাহাজ

বহন করিয়া আনিয়াছিল। গত বৎসর আগষ্ট মাসে ইহা নরওয়ে হইতে যাত্রা করে। ৮ মাসের মধ্যে ১ হাজার ৪ শত ৪৪টি তিমি মৎস্য ধরা পড়িয়া এই জাহাজের কুক্ষিগত হয়। উহার মূল্য ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। জাহাজখানি সমুদ্রবক্ষে ২৫ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছিল।

৮০ ফুট দীর্ঘ বুদ্ধ-মূর্ত্তি

ব্রহ্মদেশের পেগুতে একটি অতিকায় বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তি অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় স্থাপিত। এই মূর্ত্তি ৮০ ফুট দীর্ঘ। বুদ্ধের নির্দ্দেশ ব্রহ্মদেশবাসীরা যথা-যথ-ভাবে পালন করিলে তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত না,

অতিকায় বুদ্ধমূর্ত্তি

প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ এই বলিয়া ব্রহ্মবাসীকে অভিযুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষ চিরদিনই তাহার অভীষ্ট-দেবতার প্রতীক গড়িয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহা মূর্ত্তিপূজা নহে; ভাবের পূজা।

মধ্যযুগের লৌহ-মুখোস

মধ্যযুগে অপরাধীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য এক-প্রকার মুখোস ব্যবহৃত হইত। ভিয়েনা যাদুঘরে যন্ত্রণা-উৎপাদক অনেকপ্রকার মুখোস রক্ষিত হইয়াছে। মধ্যযুগে উহা শাস্তিদানের জন্য ব্যবহৃত

মধ্যযুগের লৌহ-মুখোস

হইত। কোন কোন মুখোসের অভ্যন্তরভাগে তীক্ষ্ণ লৌহকীলক-সমূহ বিদ্যমান। কোন কোন মুখোস এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, তাহা পরাইয়া দিলে মুখমণ্ডলে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। মানুষকে শাস্তি দিবার জন্য মধ্যযুগে ব্যবস্থার অন্ত ছিল না।

বিদ্যুৎ-চক্ষুর সাহায্যে অন্ধের গ্রন্থপাঠ

জনৈক অন্ধ ফরাসী এঞ্জিনিয়ার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছেন। উহার সাহায্যে অন্ধ যে কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে। "ফটো ইলেকট্রিক্" নামক যন্ত্র 'ফটো ইলেকট্রিক্ সেল' ব্যবহার করে। ইহাকে বিদ্যুৎনেত্র বলা যাইতে পারে। অন্ধ ব্যক্তি বোর্ডের উপর হাত রাখিয়া অঙ্গুলীর সাহায্যে পাঠ করিয়া থাকে। যে কোন গ্রন্থের যে অক্ষর বিদ্যুৎনেত্র স্পৃষ্ট হইবে, তাহা সুকৌশলে বিন্যস্ত যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধের অঙ্গুলিস্পৃষ্ট হইলেই সে উহা পড়িতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক যুগের এ কীর্ত্তি অতুলনীয় নহে কি?

বিদ্যুৎনেত্র-সাহায্যে অন্ধের গ্রন্থপাঠ

দানের প্রতিদান

যত জোরে সম্ভব, তত জোরে সে হন্‌হন্‌ করিয়া হাঁটিতেছিল, মাঝে মাঝে দৌড়াইতেছিল, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই সুবিধা হইতেছিল না। সে শীতে ক্রমশঃ জড়সড় হইয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যার সময় হইতেই বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই সকাল-সকাল রাস্তার আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে এখন কি করিতে পারে? সে যে একটু কিছু গরম পানীয় পান করিয়া দেহটাকে গরম করিয়া লইবে, তাহারও কোনও সম্ভাবনা নাই, সে ত তাহার শেষ সম্বল দুটি পয়সা খরচ করিয়া বিকালবেলাই এক পেয়ালা কফি কিনিয়া একেবারে ফতুর হইয়া গিয়াছে। তাহার ক্ষুধাও পাইয়াছিল বিষম, কতক্ষণ ধরিয়া সে পথে পথে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে তাহার দেহ গরম হয় নাই, কিন্তু পেটে ত আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এক হপ্তা আগে বসন্তের বাতাস বহিয়া যখন তাহাকে প্রতারণা করিয়া গিয়াছিল, তখনই তাহার প্ররোচনায় ভুলিয়া সে তাহার গায়ের মোটা ওভারকোটটা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এখন আবার দারুণ কন্‌কনে শীত আর বরফ পড়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং তাহার শতেক দুঃখের সঙ্গে এই শীতের দুঃখ আসিয়া যোগ দিয়াছে।

সে গলি ছাড়িয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। সে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গিয়া এক বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই বাড়ীটার বাহিরটা আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছে, তাহার বড় বড় জানালার ভিতর হইতে কাচের সাসি দিয়া আলোকের উজ্জ্বল আভা বাহিরে আসিয়া পথের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে। সেই সৌধের সম্মুখ দিয়া অনবচ্ছিন্ন গাড়ীর সারি ধীর-মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইয়া যাইতেছিল। এক একখানা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর বড় দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইতেছিল, আর তাহার দরজা খুলিয়া কত লোক নামিয়া নামিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল। পায়ে হাঁটিয়াও কত লোক আসিতে-ছিল। শীত হইতে আপনাদের বাঁচাইবার জন্য তাহারা তাহাদের মোটা ভারী কোটের কলার উল্‌টাইয়া কাণ ঢাকিয়া চলিতেছিল। ফ্রানৎস বুঝিল যে, সেই বাড়ীতে কোনও একটা সমারোহ-উৎসব আছে। এক জন লম্বা-চওড়া জোয়ান লোক বাড়ীর দরজার সাম্‌নে এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিয়া আগন্তুক গাড়ীগুলির দরজা খুলিয়া খুলিয়া ধরিতেছিল, আর গাড়ীর মালিকদের নিকট হইতে কিছু কিছু বক্‌সিস লাভ করিতেছিল।

ইহা দেখিয়া ফ্রানৎসের মন সেই লোকটার প্রতি হিংসায় ভরিয়া উঠিল। যদি সেও উহারই মত করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া খুলিয়া লোকদের কাছ হইতে কিছু কিছু বক্‌সিস আদায় করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু উহা ত ভিক্ষারই নামান্তর। আর সে যে ইউনিভার্সিটীর এক জন ছাত্র। কয়েক মাস আগের একটা ব্যাপার তাহার মনে পড়িতেই তাহার মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। তখন তাহার অবস্থা আজকারই মত নিঃসম্বলতার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। নিরাশার তাড়নায় মোরিয়া হইয়া সে এক ছাত্র-সাহায্য-সমিতির দ্বারস্থ হইয়াছিল। সে আরও ত্রিশ চল্লিশ জন ছাত্রের সঙ্গে সারি দিয়া একটা পাশের কাম্‌রায় অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর তাহার পালা আসিলে সে একটা সবুজ-বনাত-মোড়া টেবিলের ধারে গিয়া এক জন চশমা-পরা লোকের হাত হইতে কয়েকটা টাকা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সে যখন সেই সাহায্যলাভের জন্য সেই ভদ্রলোকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইতেছিল, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে, হয়েছে, এখন এগোও। পরের জন এগিয়ে এসো।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে দরজা দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

এক জন যুবক আর এক জন যুবতী তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা গরম-গরম চীনাবাদাম ছাড়াইয়া খাইতে খাইতে চলিতেছিল, আর খুব হাসিতেছিল। যেন ক্ষুধার্ত্ত লোকের চোখের সাম্‌নে খাওয়ার আনন্দে তাহারা মজা পাইয়া রঙ্গ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

গরম চীনাবাদামের গন্ধ তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাহাদের হাত হইতে সেই গরম-গরম চীনা-বাদাম ছিনাইয়া লইয়া খাইবার কি দুর্দ্দমনীয় বাসনাই না তাহার মনে উদয় হইল। কিন্তু সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার মত সাহস

তাহার নাই; সে যে ইউনিভার্সিটীর পড়ুয়া হইয়া নির্জীব ভদ্রলোক বনিয়া গিয়াছে। এই কথা মনে হইতেই সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভাবিতে লাগিল যে, ক্ষুধার জ্বালায় তাহাকে কি কাপুরুষই না করিয়া ছাড়িয়াছে, দুদিন আগে ত সে এমন অপদার্থ ভীরু ছিল না। তাহার দেশে গ্রামে বাড়ীতে থাকাই ছিল ভালো। সেখানে থাকিয়া সে কোনও ব্যবসায় করিতে পারিত, অথবা তাহার ক্ষেত-খামারের কায করিতে পারিত, কিম্বা পরের ক্ষেতে দিনমজুরী খাটিয়াও খাইতে পারিত। তাহাতে তাহার খাওয়া-পরা ত কোনও রকমে চলিয়া যাইত। সে ছেলেবেলায় যখন তাহাদের দেশে গ্রামে ছিল, তখন সে যেমন সুস্থ সবল দেহে আনন্দিত-মনে বনে বনে বা পাহাড়ে পাহাড়ে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, অথবা মাঠের খোলা বুকে চিত হইয়া শুইয়া আকাশের সঙ্গে চোখোচোখি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিত, এখনও যদি সে দেশে গ্রামে থাকিত, তবে তেমনই ভাবে তাহার জীবন কাটিয়া যাইবার পথে কোনই বাধা থাকিত না। নিজের গ্রামে সে সহজেই সম্মানের সঙ্গে আপনার জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত। আজ এখানে সে যে রকম অপমান বোধ করিতেছে, নিজেকে ছোট আর খাটো বোধ করিতেছে, এমন অসম্মান তাহাকে ভোগ করিতে হইত না। এ তাহার কি হইল?

ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসের ভিতর দিয়া নাচগানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। এমন সময় সে দেখিল যে, এক জন লোক তাহার দিকে তাকাইয়া তাহাকেই দেখিতেছে। সে একটা পথের আলোর থাম্বার গায়ে হেলান দিয়া কোটের পকেটে হাত দুটা ভরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শীতের চোটে তাহার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হইয়া মুখের মধ্যে ঝুম্‌ঝুমি বাজিতেছিল। সেই লোকটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহাই দেখিতেছিল। সে যুবা, তাহার গায়ে দামী পশমী ফার-দেওয়া ওভারকোট, তাহার ছোট্ট একটু গোঁফ আছে। সে বরফের ভিতর দিয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। হঠাৎ সে তাহার সাম্‌নে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, ওভারকোটের আবরণ সরাইয়া ফেলিল, সাদা-দস্তানাপরা একখানা হাত তাহার ভিতরের কোটের পকেটের মধ্যে চালাইয়া দিয়া একটা টাকার ব্যাগ বাহির করিল। ফ্রান্‌জ সেই যুবকের চোখে চোখে পরম আগ্রহের সহিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তাহার সাম্‌নে নিজের দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া ধরিল,—কিছু পাইবার প্রত্যাশায়। সে নিজের অনিচ্ছাতেই এবং নিজের আচরণে বিস্মিত হইয়া এই কায করিয়া ফেলিল। সেই যুবক আপনার ব্যাগের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল, সে দিবার জন্য যে মুদ্রা খুঁজিতেছিল, তাহা সে পাইল না, বেশ বুঝা গেল। সে তখন মাথা একটু নাড়িয়া নিজের মনেই বলিল, "আচ্ছা", আর তার পর একটা দশ টাকা দামের সোনার মোহর বাহির করিয়া ফ্রান্‌জের হাতে দিল।

ফ্রান্‌জ নিজের অজান্‌তেই অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া সেই যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা অজানা অনুভূতি তাহাকে যেন চাপিয়া ধরিল। তাহার মনে হইল যে, সে আর এক মিনিট পরেই খাইতে পারিবে। সে গরম-গরম মাংসের আর টাট্‌কা সেঁকা রুটীর গন্ধ পাইতেছিল। সে পরম আগ্রহের সহিত সেই যুবকের হাত ধরিল, চাপিয়া ধরিয়া সেই হাত তাহার মত মুখের নীচে তুলিয়া ধরিয়া অধরের উপর চাপিয়া ধরিল। সেই লোকটি আশ্চর্য্য হইয়া একটু পিছু হটিয়া গেল, তাহার দিকে তাকাইয়া কিছু যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু তখনই নিজের ভাব দমন করিয়া সে তাড়াতাড়ি রাস্তার অন্য দিকে চলিয়া গেল, এবং দুখানি গাড়ীর মধ্যেকার ফাঁক দিয়া সে সেই উৎসবের বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ ফ্রান্‌জ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে অনির্দ্দিষ্ট একটা ইচ্ছা জাগিয়াছিল যে, সে তাহার উপকারকের চেহারা আর তাহার চলন মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিবে। তাহার পরে, সেই দাতা অদৃশ্য হইয়া গেলে, ফ্রান্‌জ হঠাৎ অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত তাহার হাতের তেলোয় সেই সোনার মোহরটির দিকে দৃষ্টিপাত করিল, এবং সেটা যে বাস্তবিকই সোনার, খাঁটি মোহর, তাহা দেখিয়া একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। যাক, তাহা হইলে সেই লোকটা তাহাকে ঠকায় নাই। তখন সে হঠাৎ দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়া অনেক দূর চলিয়া গেল, তখন তাহার মনে আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ঠাণ্ডার চিন্তা ছিল না। অবশেষে তাহার সম্মুখে একটা পরিচিত রেষ্টোর াঁর উজ্জ্বল-আলোক-বিভাসিত

জানালা দেখিয়া সে চেতনা লাভ করিল, এবং সেই রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করিল।

সেখানে অতিথির সমাগম অধিক ছিল না কয়েক জন বুড়া লোক একটা লম্বা টেবিলের ধারে বসিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া কথা বলিতেছিল। তাহারা তাহার আগমন লক্ষ্যই করিল না। ফ্রান্জ অন্য দিকের এক কোণে একটা বড় গোল টেবিলের ধারে গিয়া বসিল এবং খানা আনিতে আদেশ করিল। খাবার আসিল। সে তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল, পান করিতে লাগিল। উঃ, কি বিস্বাদ মধুর আনন্দ! যখন তাহার খাওয়া শেষ হইয়া গেল, তখন সে তাহার সাম্‌নে হইতে খাবারের থালা-প্লেট সরাইয়া ঠেলিয়া দিয়া চেয়ারের পিঠের দিকে হেলিয়া বসিল। যাক, এখন তাহার আর কোনও ত্বরা নাই। সে গত কয়েক দিন ধরিয়া যে হতভাগা বিশ্রী বাড়ীটায় আস্তানা গাড়িয়া আছে, সেখানে যাইবার জন্য এত আর কিসের তাড়াতাড়ি। তা ছাড়া বাহিরে গেলেই ত বরফের সম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত হইতে হইবে। এখন আর তাহার এখানে বসিয়া থাকিবারও ত কোনও কারণ নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, ঘরের অপর লোকগুলা সকলে তাহাকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, সে চেয়ারের উপর উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। এখন সে পেট ভরিয়া খাইয়া গরম ঘরে বসিয়াছিল, তাহার হুঁশ ফিরিয়া আসিতে লাগিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, সে গত কয়েক ঘণ্টা যেন বেহুঁশ হইয়া, ইন্দ্রিয়ের অনুভবের শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে পরম বিরক্ত হইয়া উঠিল—যখন তাহার মনে পড়িল যে, সেই যুবকটির হাত চুম্বন করিয়াছে। তাহার পরের সময়ের কথা মনে করিয়াও তাহার কোনও সুখবোধ হইল না, সে ভিক্ষান্নে উদরপূর্ত্তি করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল যে, সে সেই উৎসব-গৃহের সম্মুখে ফিরিয়া যাইবে, এবং সেখানে তাহার দাতার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, যতক্ষণ না সে বাহিরে আসে, কেবল সে বুঝাইয়া বলিতে চায়, সে ভিক্ষুক নয়।

ফ্রান্জ খাবারের দাম চুকাইয়া দিল, এবং সেখান হইতে বাহির হইল। রাস্তায় আসিয়া তাহার মনে হইল, তাহার মাথা অল্প ঘুরিতেছে। যখন সে একটা হতচ্ছাড়া গোছের হোটেলের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার মনে হইল, তাহার মাথার অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। তখন সে সেই হোটেলের কাফেতে প্রবেশ করিল, এক গেলাস মদ পান করিয়া নিজেকে চাঙ্গা করিয়া লওয়া দরকার। সেখানকার বাতাস এঁদো, বদ্ধ, ধোঁয়ায় ভরা। লম্বা বড় ঘরটার ছাদটা খুব নীচু, মাথায় ঠেকোঠেকো, ঘরটায় অনেক লোক ছিল বোধ হয়। তাহারা হাসিতেছিল, চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া কথা বলিতেছিল, খটাখট্‌ করিয়া বিলিয়ার্ড খেলিতেছিল। ফ্রান্জ এক টেরে একটা জানালার ধারে একটা ছোট টেবিল পাইল। তাহার টেবিল হইতে অল্প দূরে দুজন যুবক উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া একটি যুবতীকে লইয়া বসিয়াছিল। যুবতীটি সুন্দরী, তাহার চোখ দুটি কালো আর চঞ্চল। সেই যুবক দুজনের মধ্যে এক জন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফ্রান্জের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। ফ্রান্জ পিছু হটিয়া গেল, তাহার মনে হইল, ঐ যুবকটিই সেই পশমী ফার্‌-দেওয়া ওভারকোট-পরা দাতা। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল, কেন সে এমন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে, যেন তাহার প্রতি যে দয়া করিয়া তাহাকে দান করিয়াছে, তাহার সহিত সে এক হোটেলে খানা খাইতে আসিতে পারে না। সেই লোকটি এখন রূপসী রমণীদের সঙ্গে উৎসব-বাড়ীতে নৃত্যে মশগুল হইয়া আছে, তাহার মন এখন উৎসবক্ষেত্রের ন্যায়ই আলোকোজ্জ্বল ও গর্ব্বিত যে, সে একটা হতভাগাকে সুখী করিয়া তাহার কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্জ তাহার ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া ধরিল। বাস্তবিক যদি সেই লোকটা তাহাকে যাহা দিয়াছে, তাহার দশগুণ বা শতগুণ অর্থ দান করিত, তাহা হইলে তাহার হাতে সে চুম্বন মুদ্রিত করিতে পারিত, কারণ, তাহাতে তাহার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিত এবং সে তাহার জীবনটাকে নূতন ভাবে চালনা করিয়া লইতে পারিত, তাহার সেই দান তাহাকে অপর দশ জনের ন্যায় মানুষ করিয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু ঐ এক টুক্‌রা ছোট্ট সোনার মোহর! উহাতে কেবল তাহার দারিদ্র্যই অধিকতর তিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার চিত্তকে আগের চেয়ে অধিক দমাইয়া দিয়াছে। যে ব্যাপারটা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতেই তাহার লজ্জা করিতেছে, তাহার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছে। সে তাহ

দাতাকে দেখিতে চায়, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার দেওয়া বাকী টাকা কয়টা তাহার পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে ঋণের দায় হইতে আর ভিক্ষার লজ্জা হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়।

ফ্রান্‌জ দেখিল, ঘরের লোকগুলা তাহার দিকে একদৃষ্টে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। হয় ত সে মনের উত্তেজনার বশে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া চিন্তা করিয়াছে, হয় ত সে মনের আবেগে চঞ্চল হইয়া কোনোরকম অদ্ভুত আচরণ করিয়াছে। দুজন যুবকের সঙ্গিনী যুবতীটি মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে দেখিতেছে। তাহার মাথার চুলগুলি একটু আলুথালু হইয়া গিয়াছে, কয়েকটি অলকগুচ্ছ তাহার কাঁধের উপর লম্বিত হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে। ফ্রান্‌জের মনে পড়িল, এক দিন বসন্তের সন্ধ্যাকালে তাহার গ্রামে সে নদীর ধারে বসিয়াছিল, আর "সবুজ আঙ্গুর" নামের হোটেলের পরিচারিকা কেমন আগ্রহে দ্রুতপদে মাঠ পার হইয়া তাহার কাছে আসিয়াছিল। চাঁদের আলোতে তাহার চলা দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন সবুজ তাজা ঘাসের উপর দিয়া উড়িয়া আসিতেছে, তাহার লঘু ক্ষিপ্র পদতল যেন কেবল ঘাসের ডগাগুলিতে বুলাইয়া লইতে লইতে সে আসিতেছে। সে যে দিন সহরে চলিয়া আসে, তাহারই আগের দিনের সন্ধ্যার ঘটনা। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত আর তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই, সে আর তাহাকে বাহুপাশে আলিঙ্গনবদ্ধ করিতে পায় নাই। সহসা তাহার মনে সেই সুকেশী যুবতীর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল, তাহার উষ্ণ কোমল কপোলের কথা মনে পড়িয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এত দিন ত সে তাহার কথা একবারও মনে করে নাই, কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার ইচ্ছা এমন অদম্য হইয়া উঠিল যে, সে স্থির করিল যে, সে কালই প্রত্যুষে পায়ে হাঁটিয়া বরফঢাকা পথ ভাঙ্গিয়া নিজের গ্রামের দিকে রওনা হইয়া যাইবে।

অকস্মাৎ ফ্রান্‌জ দেখিল, একটি মলিনমুখী যুবতী এক টুকরী ফুল লইয়া তাহার সম্মুখে স্থাণুর মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ পাণ্ডুর, বিবর্ণ, ফেঁকাশে। সে ফ্রান্‌জের দিকে না চাহিয়া, নত-নেত্রে একগুচ্ছ লাল ফুল তুলিয়া ধরিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে সে উহার হাত হইতে ফুল লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। সে যখন তাহার পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিতে ব্যাপৃত, তখন সেই তরুণীটি পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া উহার কোটের বোতামের বিঁধে পরাইয়া দিল, কিন্তু তখনও সে কিছু বলিল না, তাহার মুখের ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না, চোখের দৃষ্টি যেন দূরের কিছু দেখিতেছে, তাহার মন যেন আর-কিছুর চিন্তায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। অবশেষে ফ্রান্‌জ্ একটা টাকা তুলিল। সে আর তাহা বদলাইয়া তাহার চেয়ে কোনও ছোট মুদ্রা বাহির করিতে লজ্জা বোধ করিল। সে সেই টাকাটাই সেই মেয়েটিকে ফুলের দাম বলিয়া দিয়া দিল। সেই মেয়েটি এবার একটু মৃদু হাস্য করিল। ফ্রান্‌জ্ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, সে তাহাকে যত কম-বয়সী মনে করিয়াছিল, সে তাহা নয়, তাহার বয়স হইয়াছে। সে চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল—মহাশয়, দাতার হস্ত আমি চুম্বন করিলাম। সেই মেয়েটির কথা কয়টি তাহার অন্তরের মধ্যে অনুরণিত হইয়া উঠিল। সে তাহার দৃষ্টি যখন অপর টেবিলের দিকে ফিরাইয়া দেখিল, তাহার মনে হইল, যেন সেখানকার লোকরা আগের চেয়ে অধিক সম্ভ্রমের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেকখানি স্বচ্ছন্দতা ও স্বস্তি বোধ করিল। তখন সে হোটেলের খান্‌সামাকে ডাকিয়া কিছু সিগারেট আনিতে হুকুম করিল। সে একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল। তাহার পর সে হোটেল ছাড়িয়া চলিল। তখনও বাহিরে বরফ পড়িতেছিল, আর পথ জনমানবশূন্য। তখন আর তাহার আগের মত ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল না, তবে তাহার পায়ের তলার মাটীটা একটু যেন ঈষৎ দুলিতেছিল।

চলিতে চলিতে তাহার মনে একটা প্রলোভনের চিন্তা উদয় হইল। কিন্তু তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, সে স্তব্ধ হইয়া এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে বরফে আচ্ছন্ন পথের উপর পা ঠুকিতে ঠুকিতে চলিতে লাগিল। সে তাহার প্রতি বদান্য সেই ফার্-দেওয়া পশমী কোট-পরা লোকটির চলার ভঙ্গী নকল করিতে বেশ আমোদ অনুভব করিতেছিল।

একটা গলির ভিতর আসিতেই তাহার সাম্‌নে দুজন

মেয়ে-লোককে যাইতে দেখিল। তাহারা মুখ ঢাকিয়া চলিতেছিল। যখন ফ্রান্‌জ্‌ তাহাদের কাছে আসিল, তখন একটি মেয়ে তাহার মুখের ঢাকা সরাইয়া একখানি হাসিভরা মুখ দেখাইল। ফ্রান্‌জ্‌ তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। অপর মেয়েটি তাহাদের দিকে না চাহিয়া আপন মনেই চলিতেছিল, তাহার যেন ফ্রান্‌জের মনোহরণ করিবার কোনই আশা ছিল না। কিন্তু যে মেয়েটি তাহার মুখের ঢাকা খুলিয়া হাসিমুখে ফ্রান্‌জের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, সে তাহার কোটের বোতাম-ঘরের পুষ্পগুচ্ছের দিকে হাত বাড়াইয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া আসিল। ফ্রান্‌জ্‌ ইহাতে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি বলিল—না, না, আমার এখন সময় নেই।

সেই রমণী বলিল—নাও, নাও, হয়েছে। এত রাত্রে তোমার আবার এমন কি কায আছে? এস, এস, এই ত আমার বাসার দরজা।

সে জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া নিজের বাড়ীর দরজার আলোকের কাছে লইয়া আসিল। সে একটা চলতি গানের এক কলি গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে হাসিমুখে তাহার মুখের দিকে চাহিল। প্রথমটায় ফ্রান্‌জ্‌ আড়ষ্ট অচল হইয়াই ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ বাড়ীর দরজা খুলিয়া গেল আর পরক্ষণেই তাহা উভয়কে নিজের ভিতরে লইয়া বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা যে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, তাহা অত্যন্ত ছোট আর হতশ্রী কদর্য্য। একটা তেলের ল্যাম্প্‌ জানালার উপর জ্বলিতেছিল, তাহার আলো মিটমিট করিতেছিল, আর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়াছিল। আবার ফ্রান্‌জের মনে পড়িল, সে গত বসন্ত-কালে দেশে ছিল, সেখানে কেমন খোলা মেঠো হাওয়া, কেমন বন নিবিড় ছায়াশীতল বন। সে এখান হইতে পলায়নের জন্য উৎসুক হইয়া পড়িল। কিন্তু সে তথাপি রহিয়াই গেল। অবশেষে সে সেই রমণীর পাশে তাহারই বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, যেন সে প্রথম যখন ভিয়েনা সহরে আসিয়াছিল, তখন ইউনিভারসিটীর যে হলে একটা বক্তৃতা শুনিয়াছিল, সেই হলের সুদীর্ঘ সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠিতেছে। সেই সিঁড়ির মাথায় অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহাদের কেহই তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেছিল না। হঠাৎ সে শুনিল, তাহার পিছন হইতে কাহার একটা কড়া স্বরের হুকুম, আর অমনি দুজন লোক তাহাকে লাথি মারিয়া সেই সিঁড়ি হইতে নীচে গড়াইয়া ফেলিয়া দিল। সেই সিঁড়ির নীচে একটা খুব দামী গদী-আঁটা সোফার উপর বসিয়া আছে সেই যুবক—যাহাকে সে ফার-কোট পরিয়া সেই উৎসব-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। যে রমণীটি তাহাকে ফুলের তোড়া বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল, সে উহার কোলের উপর বসিয়া আছে। উহারা উভয়ে একত্রে চীনাবাদাম-ভাজা ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া খাইতেছে। তাহাদের কেহই ফ্রান্‌জ্‌কে চিনিতেই পারিল না, আর তাহার দুর্দ্দশায় ভ্রূক্ষেপও করিল না। ইহাতে ফ্রান্‌জ্‌ চটিয়া আগুন হইল। সে চীৎকার করিয়া উহাদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা তাহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। ইহা দেখিয়া পথের হাজার হাজার পথিক বিদ্রূপের হাসিতে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। সে উহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু সে ত একটুও নড়িতে পারিল না।

সে চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল, একেবারে বিছানা ছাড়িয়া মাটীতে দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই রমণীও বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, তাহার গভীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, সে ত চটিয়া আগুন। সে তাড়াতাড়ি একটু সামান্য বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দেহ আবৃত করিয়া সারা ঘরময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফ্রান্‌জ্‌ অবশিষ্ট প্রায় সব কয়টি টাকাই তাহাকে দিয়া তাহার ঘর ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।

ফ্রান্‌জের পিছনে সেই কুৎসিত বাড়ীর দরজা যখন সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল, তখন নিকটের গির্জ্জার ঘড়ীতে তিনটা বাজিল। ফ্রান্‌জ্‌ সিধা একেবারে সেই উৎসব-গৃহের দিকে চলিল। সেই ফার-দেওয়া পশমী-পোষাক-পরা যুবকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই ত হইবে। উহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যদি ফ্রান্‌জ্‌কে সহরের অলি-গলি আনাচ-কানাচ পাতি পাতি করিয়া ঘুরিতে হয়, তাহাও স্বীকার। ব্যাপারটা যথোচিত নিষ্পত্তি হয় নাই এবং তাহা নিষ্পত্তি করিতেই হইবে। তাহার অধরোষ্ঠ একটা বেদনাময় জ্বালায় চিড়িক মারিয়া উঠিতে লাগিল, যেন সে

এইমাত্র সেই যুবকটির হাতে চুম্বন করিয়াছে। এই যে বেদনাকর জ্বালা, তাহা সেই হাত হইতে একটা মোহর দান পাওয়ার জন্য নহে, কিন্তু সে যে অসৎ কদর্য্যভাবে সেই টাকাগুলা অপব্যয় করিয়া আসিল, তাহারই জন্য। সেই রাত্রির অভিজ্ঞতা তাহার মনের সমস্তটা জুড়িয়া যেন গড়াইয়া ফিরিতেছে, সে যে দিকেই মন ফিরায়, সেই দিকেই সেই ভাবনা গড়াইয়া আসে; এবং এখন আবার তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে যে, সে আবার নিদারুণ নিঃসম্বল নিঃস্ব হইয়াছে, কাল প্রভাতে সে যে কিসে জীবন ধারণ করিবে, তাহার কোনো সম্বল বা উপায় তাহার জানা নাই।

রাস্তা জনমানবশূন্য। ভোরাই ঠাণ্ডা হাওয়া বরফের উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া বহিতেছিল। একটা মদের দোকান তখনও খোলা আছে যে। একটা মোটা ইহুদী মেয়ে আলু-থালু চুলে ঘুমভরা চোখে টেবিল ধুইয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ফ্রান্‌জ্ সেখানে গেল। যেন নিজের আর সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সে আর এক গ্লাস মদ গলায় ঢালিয়া দিল। তার পর সে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের পরেই সে তাহার গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। সে সেই উৎসব-গৃহের দরজার কাছে গিয়া খাড়া হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। নাচের বাজনা তখনও সেই জানালার সার্সি কাঁপাইয়া মৃদু ঝন্‌ঝন্ শব্দ তুলিয়া বাহিরে ভাসিয়া আসিতেছে। এ কি সত্যই একই রাত্রির ঘটনা? খালি গাড়ী আগাইয়া আসিয়া আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেছিল। পুরুষ ও মহিলারা বাহির হইয়া হইয়া সেই সব গাড়ীতে চড়িয়া চড়িয়া বিদায় হইয়া যাইতেছিল। কেহ কেহ বা পায়ে হাঁটিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল। কত লোক ফ্রান্‌জের উপকারক দাতার মত ফার-দেওয়া পশমী ওভারকোট গায়ে দিয়া ফ্রান্‌জের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল; তাহাদের কি রকম শান্তভাবে দেখিয়া লইতে পারিতেছে ভাবিয়া ফ্রান্‌জ আপনার আচরণে আপনি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিল। সে সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, যতক্ষণ না শেষ লোকটি সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ সে সেখানে নিশ্চল স্থাণু হইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিবে। সে স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতেই লাগিল।

সহসা তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। ঐ ত সে। কোটের বোতাম লাগাইতে লাগাইতে দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। সে তাহার কোটের কলার রাত্রির মত এখনও উল্টাইয়া দিয়াছে। ফ্রান্‌জের ভাগ্য ভালো যে, সে উহার মুখ না দেখিয়াও তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহার মুখ ত জামার কলার দিয়া এখন একেবারে ঢাকা। ফ্রান্‌জ কোটের দুই পকেটে দুই হাত ভরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই ভদ্রলোকটি বরফের উপর জোরে পদক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। ফ্রান্‌জের মন তিক্ত-রসে ভরিয়া উঠিল। সে সেই ভদ্রলোকের পথ আগলাইয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভদ্রলোকটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ কি? তখন সে ফ্রান্‌জকে চিনিতে পারিল এবং একটু মৃদু হাসিল।

ফ্রান্‌জ বলিতে গেল—মহাশয়...কিন্তু তাহার কণ্ঠনালী যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। সেই লোকটির শ্রেষ্ঠত্ব-বোধের ভঙ্গী, গত রাত্রিতে সে যে অসাধারণ দানশীলতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার স্মৃতির গর্ব্বিত আভাস, এবং তাহার সম্মুখে উপস্থিত ভিক্ষুকের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার ভাব দেখিয়া ফ্রান্‌জের মেজাজ বিগড়াইয়া গেল, সে যেন পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল, তাহার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিয়া ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। অপরিমেয় ও অনির্ব্বচনীয় ক্রোধ তাহাকে চাপিয়া ধরিল। সে হঠাৎ হাত তুলিয়া তাহার উপকারক দাতাকে কষিয়া এক চড় মারিল, আর সেই ধাক্কায় তাহার মাথা হইতে লম্বা উঁচু টুপিটা গড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

সেই ভদ্রলোক প্রথমে অতিমাত্র আশ্চর্য্য হইয়া কিছু বলিবার জন্য মুখ হাঁ করিয়াছিল, কিন্তু সে কিছু না বলিয়া ভিক্ষুকের উত্তোলিত হাত ধরিয়া "পুলিস, পুলিস" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই বাড়ী হইতে যে সব লোক তখন বাহির হইয়া আসিতেছিল, তাহারা আসিয়া উহাদের ঘিরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল, এক জন কোচম্যান তাহাদের কাছে দৌড়াইয়া আসিল, আর তার একটু পরেই এক জন পুলিসম্যানও আসিয়া পৌঁছিল।

দাতা লোকটি তখন ভিক্ষুকের হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজের টুপিটা কুড়াইয়া লইতে লইতে বলিল—"লোকটা কি পাগল না কি?" এখন আর সে আগের সেই শ্রেষ্ঠত্বের ভাব বজায়

বসুমতী চিত্র বিভাগ] অশোক [শিল্পী—মণিমোহন রায়চৌধুরী ।

রাখিতে পারিল না, সে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—"আমি একে চিন্‌তে পেরেছি, একে আমি সন্ধ্যারাত্রে অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম।"

দশ দশটা টাকা, হ্যাঁ, দশ টাকার সোনার মোহর! হ্যাঁ, আচ্ছা, পুলিস-সাহেব—এই সময়ে সে তাহার টুপিটা মাথায় দিয়া আবার বলিল—এ রকম ব্যাপার আমার আর কখনো ঘটে নি।

ফ্রান্‌জ সেই ভদ্রলোককে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বকিতে দিতেছিল। ইহাতে তাহার খুব ভালো লাগিতেছিল। সে একটি কথাও বলিল না। ব্যাপার ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ শোধ করা হইয়াছে। সে একেবারে নিশ্চিন্ত আরাম অনুভব করিতেছিল। পুলিস যখন তাহাকে ধরিয়া থানার দিকে লইয়া চলিল, তখন সে একটুও বাধা দিল না বা আপত্তি প্রকাশ করিল না। তাহার ঠোঁটের উপর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। *

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ)।

* ভিয়েনা সহরের নামজাদা গল্পলেখক ছিলেন আর্থার শ্নিট্‌জ্‌লার। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একটি গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত ছাপা হয় নাই, এত দিনে ভিয়েনার একখানি কাগজে এই গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহারই অনুবাদ করিয়া দিলাম।

অবতরণিকা

বাহিরে কখন্ রোদ উঠে গেছে—ঘুম ভাঙে নাই আজ।
দোর-দেওয়া ঘরে অচেতন ছিনু—কিছু করি নাই কাজ।
ভিতরে আলোর আভাস এসেছে ভাঙা দুয়ারের ফাঁকে;
কাণ পেতে শুনি বন্ধু আমার, আমায় বাহিরে ডাকে!
নূতন বছর পরোয়ানা লয়ে হাজির হয়েছে দ্বারে;
এই অসময়ে কাজের হিসাব, এখন কে দিতে পারে!
এখন এখানে আবার জমেছে, গত বছরের কালি;
আমি শুয়ে শুয়ে দু'জনের দিকে চেয়ে দেখি খালি খালি।
বাহিরের আলো ভিতরের কালো আমি যে দু'য়ের মাঝে,
আসে এক জন আর জন যায়, আমি রহি কোন কাজে!
নূতনের আসা আছে প্রয়োজন, প্রাচীন বিদায় নিক।
আমি মাঝখানে কেন বারে বারে হারাই পথের দিক!
চুপি চুপি শুয়ে থাকি—
নূতন নহিক পুরাতন নহি—অথচ কি কাজ বাকি!

কবে এক দিন আসিয়াছিলাম পুরান এ পৃথিবীতে;
নূতনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর দাবী-দাওয়া মিটাইতে!
ইচ্ছামতীর কালো জলে কত স্রোত বয়ে' গেল চলে'—
বরষার ঝড় এল আর গেল কত না অট্ট-রোলে।
কত বাসনার বাসা গেল খসে' কত কিছু গেল রয়ে'—
কত অঙ্কুর মাথা তুলি তা'র দাঁড়াইল নির্ভয়ে!
আমি দেখিয়াছি সেই দিন হ'তে আজিকার এই প্রাতে
এক হাতে কত সঞ্চয় এল, হারাল অন্য হাতে!
কেহ থাকে নাই, কেহ যায় নাই, সব আছে ভাবিয়াছি—
ফুলের পাপড়ি খ'সে যায় শুধু—গন্ধ যে রহে বাচি!
আজ ভাবিলাম কিছু দাম নাই—কাজের মূল্য নাই;
যা' হারাই তাহা পাইনাক'আর, যা পাই না তাহা চাই!
এ দাবী মিটিবে না কি?
সবি বার বার হারাই কেবল, যাহা ভাবি হাতে রাখি।

দোর গেল খুলে, রৌদ্র আসিল আমার ঘরের মাঝে;
কোথা গেল কালি? গত বৎসর কোথায় লুকায়ে আছে!
'জীর্ণ' ঘরের দশা আর ধোঁয়া বাঁচিল আলোক লভি'—
ফুটো মশারির ফাঁক দিয়ে দেখি পুরোন ঘরের ছবি।
নব বছরের প্রভাত আসিয়া নেমেছে কুঞ্জবীথে;
বদ্ধ বাতাস সোনা-মাখা হয়ে মাতিছে গন্ধ গীতে!
মাটীর দেয়ালে আলোকাঙ্গুলি আলিপনা দিল আঁকি'
ছেঁড়া বিছানার চার কোণগুলি ভরে' গেল থাকি থাকি।
চাহিয়া দেখিনু চালের বাতায় ছেঁড়া কবিতার খাতা;
নূতন আখরে কে ভরিয়া দিল তা'র সবগুলি পাতা।
উঠানের কোণে শেওলা-ধরান ভাঙা পৈঠার বারে,
ছোট অশথের চারাগুলি ভরা পল্লব-সম্ভারে।
উঠিয়া বসিনু ধীরে;
মনে হ'ল যেন যাহা হারায়েছি সব আজ পাব ফিরে!

শ্রীবিমল মিত্র।

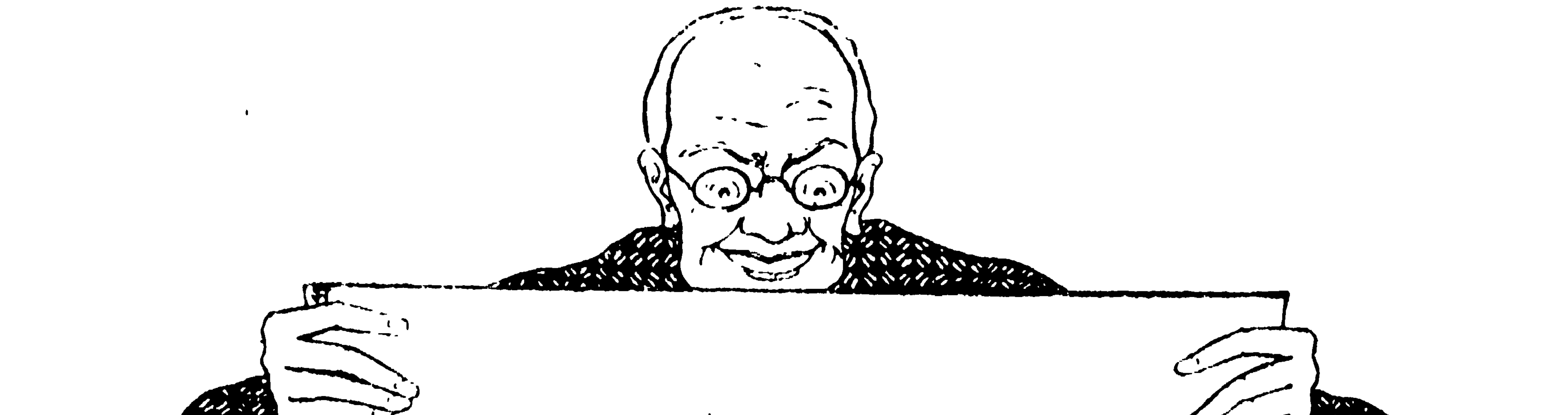

গোত্র ও প্রবর

(প্রতিবাদের প্রতিবাদ খণ্ডন)

পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার কি করিয়াছেন—তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী আদর্শ ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় না হইলে ধর্ম্মজগতে বাঙ্গালার কি দশা হইত—এই সকল চিন্তা না করিয়াই শিক্ষাভিমানী এক সম্প্রদায় সময়ে অসময়ে তাঁহাদের শাণিত-লেখনী দিব্যধামস্থ মহাপুরুষ রঘুনন্দনের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত করিয়া, সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। বড়ই দুঃখের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের রক্ষাকর্ত্তা আদর্শ স্বব্রাহ্মণ রঘুনন্দনের অবমাননা না করিয়া কি 'গোত্র ও প্রবর' প্রবন্ধ লেখা যাইত না? প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ ব্যবহারাজীবের এক জন স্বর্গত মহাপুরুষের উদ্দেশে এরূপভাবে লেখনী সঞ্চালন আশা করিতে পারি নাই। কোন অপরিণতমতি তরুণের লেখা হইলে মৌন ভঙ্গ করিতাম না।

উক্ত মূল প্রবন্ধে যে ভাবে রঘুনন্দনকে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদে অন্য কথা অবতারণার পূর্ব্বে—ইহাই লিখিয়াছিলাম যে,—তিনি কত বড়, তাহা বুঝিতে হইলে সকল দেশের স্মৃতিনিবন্ধ ও মূলগ্রন্থ পাঠ করা প্রথম কর্ত্তব্য...... শেষ কর্ত্তব্য.... মিথ্যা অহঙ্কার-পরিহার। এই সত্য কথাটুকু 'নিছক গালাগালি' বলিয়া প্রবন্ধলেখক ধরিয়া লইয়াছেন। সত্য কথা অনেক সময়ে মনোমত হয় না জানি;—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" ইহা কবির উক্তি। প্রবন্ধলেখক আমাকে বোলাই পণ্ডিতের আসনে বসাইলেও তাঁহার সহিত বালক শ্রীমন্তের কোন সাদৃশ্যই ত দেখিতে পাইলাম না!

দেশের যিনি মাথার মণি—দৈনন্দিন কর্ম্মধারায় যাঁহার সিদ্ধান্ত সৌরালোকের মত আজও পর্য্যন্ত পথিপ্রদর্শক, সেই মহাপ্রাণ রঘুনন্দনের বিরুদ্ধে মিথ্যা আক্রমণ দেখিলে স্বতঃই হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে—প্রতিবাদের ভাষায় যদি কোন কর্কশতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা মনে হয় অপরিহরণীয়। আমার লেখায় কটূক্তির আরোপ করা হইয়াছে, অথচ প্রবীণ প্রবন্ধলেখক স্বয়ং সে দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই—ইহাই দুঃখ। Abuse is no argument. ইহা কি শুধু পরোপদেশে পাণ্ডিত্যম্?

গোত্র ও প্রবর প্রবন্ধের প্রতিবাদে পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপ,—প্রবন্ধ-লেখক স্মৃতিশাস্ত্রের সংস্কৃত না বুঝিয়া পরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—"স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও ঋষি বৌধায়নের গোত্রকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে।" কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা নাই। বৌধায়ন আট জন গোত্রকার ঋষির উল্লেখ করিয়াছেন—স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও তাহাই করিয়াছেন, ইহা আমি দেখাইয়াছি। অতএব ইহা তাঁহার ১নং মতের খণ্ডন।

উক্ত লেখক জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—গোত্র অনেক। আট গোত্র বলা রঘুনন্দনের উচিত হয় নাই। আমি দেখাইয়াছি, এই আট জন গোত্রকারের বংশেই বহু গোত্রকার জন্মিলেও গোত্রপ্রবর্ত্তক বংশের মূল ঋষি আট জন। ইহা তাঁহার ২নং মতের খণ্ডন।

কাশ্যপগোত্র ও শাণ্ডিল্যগোত্রে বিবাহ নিষেধ,—ব্রাহ্মণমধ্যে তাহা চলে, কিন্তু বৈশ্য জাতির বেলা তাহা না চালান রঘুনন্দনের চাতুরী, ইহা লেখকের লিখনভঙ্গী।

আমি দেখাইয়াছি,—মৎস্যপুরাণ প্রমাণে দেখা যায়—কাশ্যপগোত্র ও শাণ্ডিল্যগোত্রের বিবাহ হইতে পারে। তদনুসারে ব্রাহ্মণমধ্যে এইরূপ বিবাহ চলিত। বৌধায়ন-মতে যে শাণ্ডিল্য ও কাশ্যপ গোত্রের বিবাহ নিষেধ,—তাহার কারণ প্রবরের একতা। বাঙ্গালার কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য প্রবরের একতা নাই, তাহা দেশে প্রচলিত প্রবরসম্বন্ধে জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন বলিয়া তাহার বিশেষ উল্লেখ করি নাই। অতএব লেখকের ৩ নং মতের খণ্ডন এই স্থানে।

ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণের গোত্র নাই; কারণ, পুরোহিত-গোত্র তাঁহাদের; মূল পুরুষের রক্তধারা গোত্ররূপে তাঁহাদের দেহে নাই, প্রবন্ধলেখক এই যুক্তিই দিয়াছেন। প্রবরকর্ত্তার রক্ত কিন্তু ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেও আছে, এই তথ্য প্রবর-নাম যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন। অতএব এই যে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের গোত্র জুটান—ইহা রঘুনন্দনের চাতুরীমাত্র, প্রবন্ধলেখক এই সিদ্ধান্ত দিয়াছেন।

আমি দেখাইয়াছি—রঘুনন্দনের কারসাজি নহে—ভীষ্মের যে গোত্র ছিল, তর্পণমন্ত্রেই তাহা প্রমাণিত। এই মন্ত্র যে রঘুনন্দনের বহু পূর্ব্বকালের, তাহা সমগ্র ভারতের নিবন্ধ-গ্রন্থাবলী ও ব্যবহারে নির্ণীত হইয়া আছে। ইহা ৪নং খণ্ডন।

অতঃপর সংখ্যা নির্দ্দেশ না করিয়াই খণ্ডন ধারা জ্ঞাপন করিতেছি—গন্ধবণিক্ যে বৈশ্য, ইহার কোন প্রমাণ না দিয়াই গন্ধবণিক্কে বৈশ্য ধরিয়া লইয়া তাহার সগোত্র বিবাহের সমর্থন লেখক করিয়াছেন। আমি দেখাইয়াছি—শূদ্র বলিয়া সগোত্র বিবাহ সমর্থন হয় ত হউক—অন্যরূপে হয় না। গন্ধবণিকের বৈশ্যত্ব প্রমাণিত হয় নাই। বাণিজ্যজীবী ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভোদ্ভব পুত্রও ত গন্ধবণিক্ হইতে পারে। আমার অভিপ্রায় এই যে, কেবল বৃত্তি দ্বারা জাতি-নির্ণয় হয় না। প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা

জাতি নির্ণয় করিতে হয়। যে জাতি সমাজে যেরূপভাবে ব্যবহৃত, তদনুসারেই ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বের নির্ণয় হইয়া আসিতেছে। আর ঐরূপ জন্ম যদি গন্ধবণিকের হয় ত' পূর্ব্বপুরুষগোত্রও হইতে পারে। অতএব "গোত্র ও প্রবর"-লেখকের যে কয়টা কল্পনা ছিল, তাহা যুক্তি ও প্রমাণ সহ সবিচার খণ্ডন আমি প্রতিবাদে করিয়াছি।

রঘুনন্দনের স্পষ্ট উক্তি না থাকাতেই অন্য নিবন্ধের অনুসরণে আমরা কলিকালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, ইহা বলি এবং মানি, কিন্তু রঘুনন্দনধৃতবচনে যে "সমুদ্রযাত্রা-স্বীকার" আছে, তাহার যখন অন্যবিধ অর্থও হয়, রঘুনন্দন তৎপ্রতিবাদে একটি অক্ষরও অবতারণা করেন নাই, তথাপি তাঁহাকে সমুদ্রযাত্রানিষেধক বলিয়া দোষ দেওয়া যে অসত্যমূলক, তাহা লেখকের এবারের প্রতিবাদের প্রতিবাদে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ, এবারে—তাঁহার লেখায় আছে—টীকাকারের মতে—"মরণমুদ্দিশ্য সমুদ্রগমনম্", উহা যে টীকাকারের স্বীয় উদ্ভাবিত মত, রঘুনন্দনের মত নহে, এমন কথা লেখক কোথায় পাইলেন ?

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয় বড় আগ্রহের সহিত এক প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"জিজ্ঞাস্য এই, তিনি (রঘুনন্দন) উদ্বাহতত্ত্বে লিখিতেছিলেন ত—'কলিতে অসবর্ণাবিবাহ নিষেধ," হঠাৎ "সমুদ্রযাত্রা-স্বীকার:···মনীষিণ:" উদ্ধৃত করিবেন কেন ?

এত বড় প্রশ্নের উত্তরের জন্য কাহাকেও দুই মিনিটের অধিক কাল চিন্তিত হইতে হইবে না। কেন না,—অসবর্ণা বিবাহ-নিষেধক শ্লোকটি সম্পূর্ণ উঠাইতে হইলেই—"সমুদ্রযাত্রাস্বীকার: কমণ্ডলুবিধারণম্' এটুকু বলিতেই হইবে, যেহেতু ইহাই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ। কোন মতলবে ঐ অংশ উদ্ধৃত করিলে উহার অর্থান্তর নিরাস করিয়া এবং আরও অনেক সমুদ্রযাত্রা-নিষেধক শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া 'সমুদ্রযাত্রা'র অকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতেন। এই প্রসঙ্গে আমরাও প্রশ্ন করিতে পারি কি—গোত্র ও প্রবর প্রবন্ধের সহিত সহমরণ-প্রথা ও সমুদ্রযাত্রার কি সঙ্গতি আছে ? কেবলমাত্র রঘুনন্দনকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য নহে কি ? আর এক স্থানে রঘুনন্দনকে হীনভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে—তিনি যে অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ছিলেন—তাহার কারণ, তিনি নাকি শূদ্রের নিকট হইতে দান পাইতেন না বলিয়া! শ্রীচৈতন্যদেব যে শূদ্রগৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেন না, ইহা চৈতন্য-চরিতামৃতে বহু স্থানে উল্লিখিত আছে। তখনকার সমাজের আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্রের প্রতিও কটাক্ষপাত! ইহা কি হীন কটূক্তি নহে ?

লেখক বড় ব্যবহারাজীব—আইন ও নজীরের ভেদ তাঁহার অবশ্যই জানা আছে। আইন হইল দ্বিজাতির উপনয়ন-সংস্কার থাকালে প্রদান করিতে হয়, কাল অতীত হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলা যায়। ব্রাত্যগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট অব্যবহার্য্য—(মনু ২য়, ৩৯।৪০)।

"অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতা:।
সাবিত্রী-পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতা:॥
নৈতৈরপূতৈর্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ ব্রাহ্মণৈ: সহ॥"

তাহাদিগের বংশ অপর জাতিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা, ব্রাত্য-ব্রাহ্মণবংশ — ভূর্জ্জকণ্টক, ব্রাত্যক্ষত্রিয়বংশ — ঝল্লমল্ল, ব্রাত্যবৈশ্যবংশ—সুধন্বাচার্য্য ইত্যাদি (মনু ১০অ: ২০—২৪) বিভিন্ন জাতিরূপে পরিগণিত হয়। দ্বিজাতি বা তত্তুল্য জাতির নাম মনুসংহিতায় আছে (মনু ১০ অ: ৪১)। ভূর্জ্জকণ্টকাদি জাতির নাম দ্বিজাতিমধ্যে পরিগণিত হয় নাই, সঙ্করজাতিমধ্যে গণিত। (মনু ১০।১৮—৪০)।

এই আইনের পর নজীর হইল—"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি। (মনু ১০ অ: ৪০) নজীরে যদি বৈশ্যের নাম না থাকে ত' আইনের ধারাটা বৈশ্যে খাটিবে না—এমন অপূর্ব্ব যুক্তি এই প্রথম শুনিলাম।

নরহত্যা করিলে প্রাণদণ্ডের বিধান আইনে আছে! কোন একটা নরহত্যার ঘটনা যদি নজীরে উল্লিখিত থাকে, আর সেই দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেতর কোন ব্যক্তি নরহত্যা করিলে, সরকারী উকীল উল্লিখিত নজীর দেখাইয়া নিশ্চয়ই তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য আদালতকে অনুরোধ করিবেন। রঘুনন্দন কিন্তু সেরূপ না করায় সরকারী উকীল তাঁহাকে বলিলেন—"বৈশ্যাদীনামপি তথা, ইহা গায়ের জোর।" ফলে গায়ের জোর নহে—মনুর আইন,—'তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥ ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টক:॥' (মনু: ১০ম অ: ২০ ২৪ পর্য্যন্ত) ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ। স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করা:॥ অর্থাৎ স্বধর্ম্মত্যাগহেতু ইহারা সঙ্কর জাতিতে পরিণত হয়। ভগবান্ মনু ক্রিয়ালোপ-যুক্ত ব্রাত্যদ্বিজাতি-বংশকে যে সকল সঙ্করজাতির পঙ্‌ক্তিমধ্যে বসাইয়াছেন, তাহাতে তাহারা চাণ্ডালাদিসদৃশ হইবে, এমন ভাবও লোকের মনে আসিতে পারে। তাহার নিবারণার্থ করুণাময় রঘুনন্দন মনুর নজীরের বলে দেখাইলেন—তাহারা শূদ্রতুল্য ; চণ্ডালাদিতুল্য নহে।

যে অপরাধে ক্ষত্রিয় শূদ্রতুল্য হইল, সেই অপরাধে বৈশ্যাদি যে চণ্ডাল সদৃশ হইবে, এমন শাস্ত্রবিধান হইতে পারে না, তাই পূজ্যপাদ রঘুনন্দন বলিলেন, "বৈশ্যাদীনাপি তথা॥" রঘুনন্দন সেই করুণার পুরস্কার এত দিনে প্রাপ্ত হইতেছেন !!

উকীলবাবু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহাতে শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান দেখাইয়াছেন ; ভাল, কোন্ অধ্যায়ে সে উপাখ্যান আছে, তাহা এবং দুই একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন না কেন ?—চাতুরীটা কাহার প্রকাশ হইয়া পড়িত ! যাহা হউক, তাঁহার প্রমাণস্বরূপে স্বীকৃত বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের উত্তরখণ্ড ত্রয়োদশাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, বেণরাজা দুরাত্মা ছিল, জোর করিয়া সে অপর জাতির পুরুষের দ্বারা অপর জাতীয় পরদারে পুত্র উৎপাদন করাইতে লাগিল। বৈশ্যস্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণ দ্বারা যে সন্তান উৎপাদন করাইল, তাহারা অম্বষ্ঠ ও গন্ধবণিক্। পরে অম্বষ্ঠের সংস্কারবিধান থাকায় বুঝা যায়—অম্বষ্ঠমাতা বৈশ্যস্ত্রী—বৈশ্যজাতীয়া কুমারী। শূদ্ররূপে যাহারা গৃহীত, তাহারা উৎপাদয়িতা ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্যা বৈশ্যস্ত্রী নহে। প্রমাণ যথা,—

"বলাৎকারেণ ব্রাহ্মণ্যাং সঙ্গময্য তু ক্ষত্রিয়ম্।
পুত্রমুৎপাদয়ামাস বেণো নাস্তিকসত্তম:।

দ্বিজং ক্ষত্রিয়পত্ন্যাঞ্চ বৈশ্যপত্ন্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ম্।
দ্বিজং বৈশ্যস্ত্রিয়াঞ্চাপি ব্রাহ্মণ্যাং বৈশ্যমপ্যুত।
এবমন্যং তথান্যস্যাং সঙ্গময্য স ভূপতিঃ।
পুত্রান্ বৈ জনয়ামাস বর্ণসঙ্করকারকঃ॥"

(বৃঃ ধঃ পুঃ উত্তরখণ্ড ১৩ অঃ ২৯-৩১)

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠো গন্ধিকো বণিক্॥৩৩॥
বিংশতিঃ সঙ্করা এতে * * * ৩৮,৩৯

এই সঙ্করজাতিসমূহ—

ষট্‌ত্রিংশজ্জাতয়ঃ শূদ্রা যূয়ং ভূতাস্তু সঙ্করাঃ।
কঃ কিং করিষ্যতে কর্ম স তদ্‌ব্রূতাং স্বশক্তিতঃ॥
কর্ম্মানুরূপনামানো যূয়ং সর্ব্বে ভবিষ্যথ॥

(বৃঃ ধঃ উত্তরখণ্ড ১৪ অঃ ২৬)

বেণ যে সঙ্করসৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা মনুও বলিয়াছেন।

সঃ (বেণঃ) * * *
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ। মনু ৯ অঃ ৬৭।
তস্মাদম্বষ্ঠনামা তু সঙ্করোঽয়ং ধরাপতে।
অস্যাপি বস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ॥

বৃঃ ধঃ উত্তরখণ্ড ১৪ অঃ ৩৯

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় (১ অঃ ৯০)—"বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" থাকায় এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত সঙ্করপ্রকরণে একমাত্র অম্বষ্ঠের সংস্কার কথিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, এ স্থলে সঙ্কর শব্দ দম্পতির বর্ণ-বৈষম্যজ্ঞাপক মাত্র। এই বিশেষস্থল ব্যতীত সাধারণ নিয়মে পূর্ব্বকথিত "ষট্‌ত্রিংশজ্জাতয়ঃ শূদ্রা যূয়ং ভূতাস্তু সঙ্করাঃ"—এই বিধানে সকলেই শূদ্র। এই শূদ্রগণের বৃত্তির প্রমাণ যথা,—

"তন্তুবায়ে বস্ত্রসৃষ্টিং বণিজাং গন্ধবিক্রয়ম্।
নাপিতে ক্ষৌরকর্ম্মাদাদ্ গোপে লিখনমেব চ॥"

—উত্তরখণ্ড ১৪ অঃ ৫৮।

অতএব উকীল বাবুর authority—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের প্রমাণানুসারে গন্ধবণিক সঙ্কর-জাতি এবং শূদ্র। পিতা ব্রাহ্মণ বলিয়া পিতৃগোত্র ইহাতে হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং গন্ধবণিকের সগোত্রাবিবাহ উকীল বাবুর স্বীকৃত প্রমাণবলে ও যুক্তিমতে হইতে পারে না।

রঘুনন্দন যে সহমরণপ্রথার প্রবর্ত্তক নহেন, তাহা আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি। যে পরাশরসংহিতা বিধবা-বিবাহের বিধায়ক বলিয়া নবীনগণের বিশেষ মান্য, তাহাতে সহমরণের ব্যবস্থা আছে। রঘুনন্দনের বহুপূর্ব্বে মাধবাচার্য্য প্রভৃতি তাহার ব্যাখ্যা ও বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি অন্যান্য বহু ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, তাহাও দেখাইয়াছি।

অনুমরণ ও সহমরণ এক নহে. পতির মৃত্যুর পর পৃথক্ চিতায় আত্মাহুতিই অনুমরণ আর এক চিতায় আত্মাহুতি সহমরণ। ব্রাহ্মণীর পক্ষে অনুমরণ নিষিদ্ধ, ইহা অতিসংক্ষেপে 'দিস্তা খানেক কাগজ নষ্ট' না করিয়াই রঘুনন্দন প্রকাশ করিয়াছেন—ব্রাহ্মণীর সহমরণ নিষেধ রঘুনন্দন করেন নাই। রঘুনন্দনের পদ্ধতিমতেই আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহী ও আমার জ্যেষ্ঠপিতামহী সহমৃতা। কোন বিধর্ম্মী রাজপুরুষ নিজের অনভিজ্ঞতায় যদি মহাপুরুষকে গালি দিয়া থাকে ত' তাহা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রীয় বিচারের সমর্থন করা যে কতটা যুক্তি-যুক্ত, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। যেখানে যেখানে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব, সেখানে রিজলি সাহেব, রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জী সাহেব, প্রয়োজন হইলে কাউয়েল সাহেব, বর্ডিলন সাহেবের দোহাই দিয়া শাস্ত্রীয় বিচারের যে পরাকাষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহা সুধীগণ বেশ বুঝিয়াছেন!

এবারকার প্রবন্ধে—রঘুনন্দনকে সহমরণের "প্রবর্ত্তক" পদ হইতে "উত্তেজক" পদে অবনীত করা হইয়াছে। লেখক মহাশয় অনুরোধ করিয়াছেন—বেদের সময় সহমরণ ছিল কি না, সহমরণ হিন্দুশাস্ত্র অনুমোদিত কি না—জানিবার জন্য রামমোহন রায় মহাশয়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে। লেখক মহাশয় নিজে-দের স্বরূপ পরিচয় দিতে অন্যত্র বলিয়াছেন—"অন্য দিকে বৈশ্যগণ চিরদিনই ধর্ম্মে কর্ম্মে আত্মসম্পন্ন, কি শ্রাদ্ধাদি প্রেতকর্ম্মে, কি বিবাহাদি শুভকর্ম্মে ব্রাহ্মণ ভিন্ন গতি নাই"—বৈশ্যগণের অনুষ্ঠিত প্রেতকর্ম্ম বা বিবাহাদি শুভকর্ম্ম কি রামমোহন রায়ের ব্যবস্থামত হিন্দু সমাজে চলিয়া আসিতেছে? তাহা ত' আমরা জানি না, কাজেই বেদে বা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে কি আছে না আছে, তাহা জানিবার জন্য আমাদিগকে রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। এখনও নিজ গৃহে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন-ধারা আমাদিগের বিলুপ্ত হয় নাই।

"ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী"—শুদ্ধিতত্ত্বের এই অংশে লেখক সাধু মহাশয় সাধুবাদ দিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বেদের কোথায় আছে? শুদ্ধিতত্ত্বের ঐ প্রসঙ্গেই রঘুনন্দন উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—"ইমা নারীরবিধবা" ইত্যাদি।—এটা যে ঋগ্বেদীয় মন্ত্র, তাহা সাধু মহাশয় লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাদের অনধিকার—সীমায় প্রবেশ করেন নাই। মহাভারত, স্মৃতি ও পুরাণপ্রমাণে সহমরণপ্রথা যে অতি প্রাচীন, তাহা মাদ্রী প্রভৃতির দৃষ্টান্তে পূর্ব্ব-প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

শাস্ত্রের কথায় আজকাল অনেকের প্রত্যয় হয় না, প্রবন্ধ-লেখকের পদ্ধতি অনুসারে একটি প্রসিদ্ধ পাদরী সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি,—শুধু ভারতে নহে—অন্যান্য সভ্যদেশেও এই বিলাতী দৃষ্টিতে নিন্দিত প্রথা বর্ত্তমান ছিল—

India is not the only nation in which the abominable practice of sacrificing the wife on the pile of her husband has been adopted. Ancient authors speak of it as not an unknown in early times amongst other civilized nations. (A description of Hindu manners customs and ceremonies by Abbe Duboa).

দাক্ষিণাত্যে সতীদাহপ্রথা কিছু কম পরিমাণে প্রচলিত থাকিলেও সমগ্র উত্তর-ভারতে ইহার প্রভাব কম ছিল না—তাই উক্ত মিশনারী Abbe Duboa লিখিতেছেন—

It is also more rare in the peninsula than in the northern parts of India, where it is by no means uncommon; It is confined to the countries under the government of the idolatrous princes; for the Mahammedan

rulers do not permit the barbarous practice in the provinces subject to them.

হিন্দু রাজগণের অধীন প্রদেশসমূহে অধিক মাত্রায় সতীদাহ হইত, মুসলমানগণের অধীন রাজ্যসমূহে কম পরিমাণে হইত —ইহা প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বের এক য়ুরোপীয়ের বিবৃতি।

রঘুনন্দনের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও তিরোভাবের পরে বাঙ্গালা দেশ যে মুসলমান-শাসনাধীনে ছিল, তাহা সকলেরই সুবিদিত।

বাঙ্গালার বাহিরে তৎকালে যে রঘুনন্দনের স্মৃতির বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই, ইহা সকলেই জানেন, অথচ সমগ্র উত্তরভারতে যে সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত য়ুরোপীয় ধর্ম্মযাজকের বিবরণ হইতে পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, যদি শাস্ত্রপ্রমাণে সমর্থিত এবং পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথাকে শাস্ত্রবিশ্বাসী রঘুনন্দন নিজ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সহমরণপ্রথার প্রবর্ত্তক বা উত্তেজক বলিয়া লোকচক্ষুতে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা "Give him a bad name and hang him." নীতির অনুসরণ মাত্র নহে কি ?

পুরাকালে ভারতের বাণিজ্যপোত যে সমুদ্রে ভাসিত, তাহা ত কেহ অস্বীকার করে না ; তথাপি লেখকমহাশয় মনুর অর্দ্ধশ্লোক ও ঋগ্বেদের অর্দ্ধমন্ত্র উদ্ধারের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদের 'সমুদ্র' শব্দে কি বুঝায়, এবং অর্ণবপর্য্যায়স্থ সমুদ্রমধ্যে যাত্রা করিয়া ভুজ্যুর যে পরিণাম হইয়াছিল, তাহাতে সমুদ্রযাত্রা কালবিশেষে বেদ দ্বারাই প্রতিসিদ্ধ হইতেছে কি না—এ সব বিচারের অবসর না দিয়াই লেখক মহোদয় ঋগ্বেদের সিদ্ধান্তবিষয়ে নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পুরাণবচনের উপর কঠোর কটাক্ষপাত করিয়াছেন। অথচ তাঁহার প্রয়োজনে 'বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের' দোহাই দিতে তিনি একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। বেদবিষয়ে তাঁহার কোন কথা না বলাই শোভন হইত, কেন না, যাঁর যে বিষয়ে অধিকার নাই, সে বিষয়ে চর্চ্চা না করাই মঙ্গল।

সমুদ্রযাত্রার যে সকল গুরুতর নিষেধ শাস্ত্রে আছে, রঘুনন্দন তাহা উদ্ধৃত করেন নাই, বাঙ্গালার একটা অঞ্চলে জাতিবিশেষের সমুদ্রযাত্রার প্রচলন ছিল বলিয়া। আমার এ কথার উত্তর প্রতিবাদে নাই। হেমাদ্রিতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকে অপাঙ্‌ক্তের বলা হইলেও, বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশ সবটা বঙ্গ নহে। বাচস্পতি মিশ্র, কমলাকর ভট্ট প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকারগণের মতে গৌড়দেশ বলিয়া কথিত। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদেশ যে বাঙ্গালা নহে, তাহার প্রমাণ শক্তি-সঙ্গমতন্ত্র ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত।

রঘুর দিগ্বিজয়ে 'স্থলবর্ত্মনার' ব্যাখ্যা-সমালোচনা যাহা প্রবন্ধলেখক করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বিস্মিত হই নাই, একটা কিছু ত বলিতে হইবে—সমুদ্রপথে যাইলে বীরত্বের লাঘব হইত না, নৌ-যুদ্ধ পটুতা বর্ণনায় বীরত্ব অধিক প্রদর্শিত হইত, তাহা একবার চিন্তা করা উচিত ছিল না কি ? কাব্যরসজ্ঞ মল্লিনাথ যাহা সত্য, তাহাই ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন, নতুবা রঘুকে জলপথগমনে অসমর্থ বা জলযুদ্ধে ভীরু বলিয়া মনে হইত না কি ? এই সঙ্গে আবার ত্রেতাযুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রযাত্রার দৃষ্টান্ত ! এবার সাধুমহাশয়কে আমরাই সাধুবাদ প্রদান করি !

রঘুনন্দন রাজা ছিলেন না, সে সময়ে দেশ স্বাধীন ছিল না, তাঁহার মত যে দেশে সর্ব্বজনমান্য হইল, তাহার কারণ—দেশের প্রসিদ্ধ আচারের তিনি সমর্থক ছিলেন। পূর্ব্বপ্রবন্ধেই বলিয়াছি—রঘুনন্দন দেশাচারকে শাস্ত্রপ্রমাণে মান্য করিবার যত্ন করিয়াছেন। রঘুনন্দনের দ্বারা কোন জাতির উপবীতচ্ছেদনের ইতিহাস বা সমুদ্রপথ অবরোধের বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুকে যিনি সদাচারভ্রষ্ট হইতে দেন নাই, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর সদাচার-সংরক্ষক সেই রঘুনন্দনও প্রবন্ধলেখকের দৃষ্টিতে 'মেকি' হইয়াছেন !

'জগাই'-মাধাই'এর দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি অনাচারী ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব হয় না কেন—এই প্রশ্ন করিয়াছেন। জীবনের একাংশে অনাচারী হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কেহই সে জীবনে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইহাই মনুবচনে আছে, ক্রমে ক্রমে—বংশানুক্রমে ক্রিয়ালোপ হইলে তবে জাত্যন্তরপ্রাপ্তি ঘটে ; সংস্কারভ্রষ্ট দ্বিজাতির তিনপুরুষমধ্যে প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় সংস্কার হইতে পারে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। সুতরাং জগাই-মাধাইএর সেই জীবনেই অনুতাপ ও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান দ্বারা পাপখণ্ডন হওয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বিরোধী নহে।

উপনয়নসংস্কার ও গায়ত্রীজপ দ্বারা ব্রাহ্মণ্যরক্ষা বিষয়ে লেখক মহাশয় যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার বিজ্ঞতাই উপহসিত হইয়াছে। কেন না, মনুর এই কয়টি শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে সকলেরই ভ্রান্তি অপনীত হইবে।

"সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ॥ ২য় অঃ ১১৮
অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥ ৮ ॥
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
* * * *
এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্ বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥
* * * *
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে ॥
জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥"

সাধু মহাশয় যে বিদ্রোহ চান না, ইহা উত্তম কথা, কিন্তু সংস্কার দ্বারা যদি খোল ও নলচে দুই বাদ দিবার চেষ্টা থাকে, তবে আর বিদ্রোহের বাকী থাকে কি ? রঘুনন্দনের মত ব্রাহ্মণও যদি লেখকের নিকট খাঁটি ব্রাহ্মণমধ্যে গণিত না হন—তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণভক্তির উক্তি অভিনয় মাত্র বলিয়াই মনে হয়।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব মহোদয় উপসংহারে যে সত্যের দোহাই দিয়াছেন, তাহার উত্তরে সেই দুষ্মন্তের সম্মুখে

ঋষিকুমার শার্ঙ্গরবের কথা মনে পড়িল—"পরাভিসন্ধানমধীয়তে-র্যৈর্বিদ্যেতি" সত্য তাঁহাদেরই প্রাণের প্রাণ! তথাপি বলিব—কল্পিত সত্যের নহে, প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করিলে লেখকের মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অবশ্যই সত্যের স্বরূপ এক দিন উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

পরিশেষে নিবেদন—হিন্দুসমাজে প্রত্যেক জাতির একটা 'বৈশিষ্ট্য' আছে। সেই বৈশিষ্ট্যই মর্য্যাদা বা প্রতিষ্ঠা নামে পরিচিত। যে জাতি যে ভাবে বহুকাল হইতে সমাজে পরিচিত—'শূদ্র' হইলেও সেই জাতিকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করা ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক। বিষ্ণুপুরাণে কলিতে শূদ্রজাতিকে ধন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বস্তুতঃ শূদ্রজাতির মধ্যে নিরভিমানিতা ও ভগবদ্‌ভক্তির পরিচয় হিন্দুসমাজে বহুলভাবে পাওয়া যায়। আজ যাঁহারা পরের কথায় ভুলিয়া শূদ্রত্ব পরিহার করিবার ইচ্ছায় ব্রাত্য 'ক্ষত্রিয়' বা 'বৈশ্য' সাজিতে চাহিতেছেন—তাঁহারা নিজেদের কলঙ্ক নিজেরাই প্রচার করিতে ইচ্ছুক; কেন না, পুরুষানুক্রমে কর্ম্মহীন পতিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপেক্ষা স্বকর্ম্ম-নিরত শূদ্র প্রশংসার্হ। এ প্রবন্ধে জাতি-সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও প্রতিবাদী মহোদয় দ্বারা আহূত হইয়া তাঁহারই সমর্থিত শাস্ত্রের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি, কাহারও চিত্তে দুঃখ দিবার ইচ্ছায় নহে।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম, এ)।

আলোচনা ক্রমেই অপ্রীতিকর হইতেছে—সাধু মহাশয় তাঁহাদের সমাজের যে সমস্যার জন্য—সত্য-নিরূপণের জন্য যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন, আশা করি, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর তিনি অনুগ্রহ করিয়া শাস্ত্র-বিচারের বাদানুবাদে ক্ষান্ত হইলেই যেন শোভন ও সঙ্গত হয়।

—মাসিক বসুমতী-সম্পাদক।

বাঙ্গালীর বীরত্ব

শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বিপন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সম্প্রতি তিনি বালিগঞ্জ রেল-ষ্টেশনের সান্নিধ্যে

একটি বিপন্না বাঙ্গালী তরুণীকে তিন জন মুসলমান গুণ্ডার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া যে সাহস ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী তরুণদের সর্ব্বথা অনুকরণ-যোগ্য। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর তিনি বালিগঞ্জে বন্ধুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে জনবিরল স্থানে গুণ্ডাদিগকে বিপন্না তরুণীর পশ্চাদনুসরণ করিতে ও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া শীলতা ও শালীনতাবিরুদ্ধ জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করিতে দেখিয়া একাকী তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, শীঘ্র তাহারা বিস্মৃত হইবে না। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত তরুণগণকে এখন 'আলালের ঘরের দুলাল' রূপে ঘরের আওতায় 'পুতু পুতু' করিয়া 'ভাল ছেলে' করিয়া গড়িয়া তুলিবার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন না করিলে কোন জাতিই যে আত্মনিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয় না, এ কথাটা আমাদিগকে অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। দেশে যখন নিরক্ষর গুণ্ডা-শ্রেণীর অসদ্ভাব নাই—পরন্তু তাহারা যখন নারীত্বের মর্য্যাদা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তখন ভদ্রমহিলাগণের পক্ষেও অরক্ষিত ও অসহায় অবস্থায় নিশাকালে জনবিরল পল্লীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে দেওয়া বিধেয় নহে।

জাপ-রাজধানী

জাপানী ছাত্রদের বেস্‌বল ক্রীড়া

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে জাপানের রাজধানী টোকিওর পুনঃ-সংস্কার-জনিত উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে সমগ্র রাজধানী শ্বেত ও রক্তবর্ণে যেন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ জাপান-সম্রাট্ যে পথ দিয়া গমন করিবেন, তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। প্রভাতেই উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল।

রাজপ্রাসাদের চতুষ্পার্শ্ব-স্থান সুসজ্জিত হইয়াছিল। এক স্থানে একটি সুদৃশ্য, বৃহৎ বস্ত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৈদেশিক দূত-নিচয় এবং সম্রাটের সচিবগণ বেলা ১০ টায় উক্ত শিবিরে সমবেত হইয়াছিলেন। সম্মুখে মুক্ত প্রান্তরে ৬০ হাজার বীর পুরুষ সুসজ্জিতবেশে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়াছিল। কাহারও মুখে কথা নাই—তাম্রকূট-ধূমের সে স্থানে সম্পূর্ণ অভাব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সহস্র সহস্র মানুষ নীরব প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া—কাহারও মুখে সামান্য একটি শব্দমাত্র নাই। সম্রাট্ আসিবেন, তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইবে, এই প্রত্যাশায় তাহারা নীরবে অপেক্ষা করিতেছে। সম্রাট্ যে বংশের সন্তান, সেই বংশ আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে জাপানের

টোকিও নগরের ব্যবসায় কেন্দ্র

শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এমন দৃষ্টান্ত জগতে দুর্ল্লভ।

সম্রাট্ আসিলেন। সম্মুখের জন-সমুদ্র শুধু আন্দোলিত হইল—প্রচণ্ড বাতাসে যেমন শস্যক্ষেত্র বার বার আনমিত হয়, ঠিক তেমনই ভাবে জনসমুদ্র আনমিত হইল, কিন্তু একটি শব্দ উত্থিত হইল না। প্রধান মন্ত্রী অভিনন্দন পাঠ করিলেন, সম্রাট্ তাহার উত্তর দিলেন। তখনও চারিদিকে গভীর নীরবতা। অবশেষে প্রধান মন্ত্রী শিবিরের সোপান-পথে দাঁড়াইয়া তাঁহার টুপী তুলিয়া ধরিলেন। অমনই ষষ্টি সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইল—বান্‌জাই! বান্‌জাই! বান্‌জাই!

এই উৎসব উপলক্ষে মেয়র প্রায় লক্ষ লোককে পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। যাহারা আহার্য্যদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ভোজন করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারা উত্তমরূপে রুমালে বাঁধিয়া বাকী খাদ্যদ্রব্য গৃহে লইয়া গিয়াছিল। ইহা জাপানে সভ্যতাবিরোধী নহে। বাঙ্গালা দেশে ছাঁদা-বাঁধার নিয়ম এক সময়ে ভালরূপই ছিল, এখন প্রতীচ্য সভ্যতার আদর্শে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। তবে অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকে—যাহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া ভোজন করেন না, তাঁহাদের মোটর বা গাড়ীতে হাঁড়িভর্ত্তি আহার্য্য এখনও স্থান পাইয়া থাকে। মার্কিণ দর্শকরা জাপানীদিগের এইরূপ ছাঁদা-বাঁধার অর্থনীতিক দিক্ সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন, ইহাতে খাদ্যের অপচয় হয় না, সবই মানুষের কাযে লাগে। জাপান স্বাধীন জাতি, কাযেই তাহাদের এই ছাঁদা-বাঁধা আজ গুণ বলিয়া গৃহীত। কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিতগণ এই ব্যবস্থার প্রতি বক্র-কটাক্ষ করিয়া উহা অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষা এবং অবস্থাভেদে গুণও দোষে পরিণত হয়।

সম্রাট হিরোহিটো নবগঠিত টোকিও নগরের উৎসবের উদ্বোধন করিতেছেন

রাজপথে অসম্ভব জনতা হইয়াছিল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে অন্ততঃ ২০ লক্ষ নর-নারী এই উৎসব দর্শনের জন্য নগরে সমাগত হইয়াছিল। পুরাতন টোকিও সুসংস্কৃত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রথায় প্রাচ্যের এই রাজধানী সুগঠিত হইয়াছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ধ্বংসস্তূপ হইতে টোকিও মনোমোহন রূপ ধারণ করিয়া সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে প্রায় ১২টার সময় ভীষণ ভূমিকম্পে জাপানের দক্ষিণপূর্ব্ব অংশ বিভীষণভাবে আলোড়িত হইয়াছিল। এরূপ সাংঘাতিক ভূমিকম্প পৃথিবীতে অল্পই দেখা গিয়াছে। জাপানের রাজধানী এবং প্রসিদ্ধ বন্দর ইয়োকোহামা (টোকিও হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী) প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। টোকিওর শতকরা ৪৪ অংশ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে

ীভূত হয়। ২০ হাজার ৬৫ একর রমাণ ভূমিতে কিছুই ছিল না বলে হয়। ২৭৫ কোটি ডলার মুদ্রা-রমিত বস্তু নষ্ট হইয়াছিল। নিহত নরুদ্দিষ্টের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। বসাবাণিজ্যের যাবতীয় কেন্দ্র ধূলিসাৎ য়াছিল—মাঝে মাঝে দুই একটি ট্টালিকা দৈবদুর্ব্বিপাক হইতে কোন মে রক্ষা পাইয়াছিল। নগরবাসী-গের অনেকেই গৃহহীন হইয়া ড়িয়াছিল।

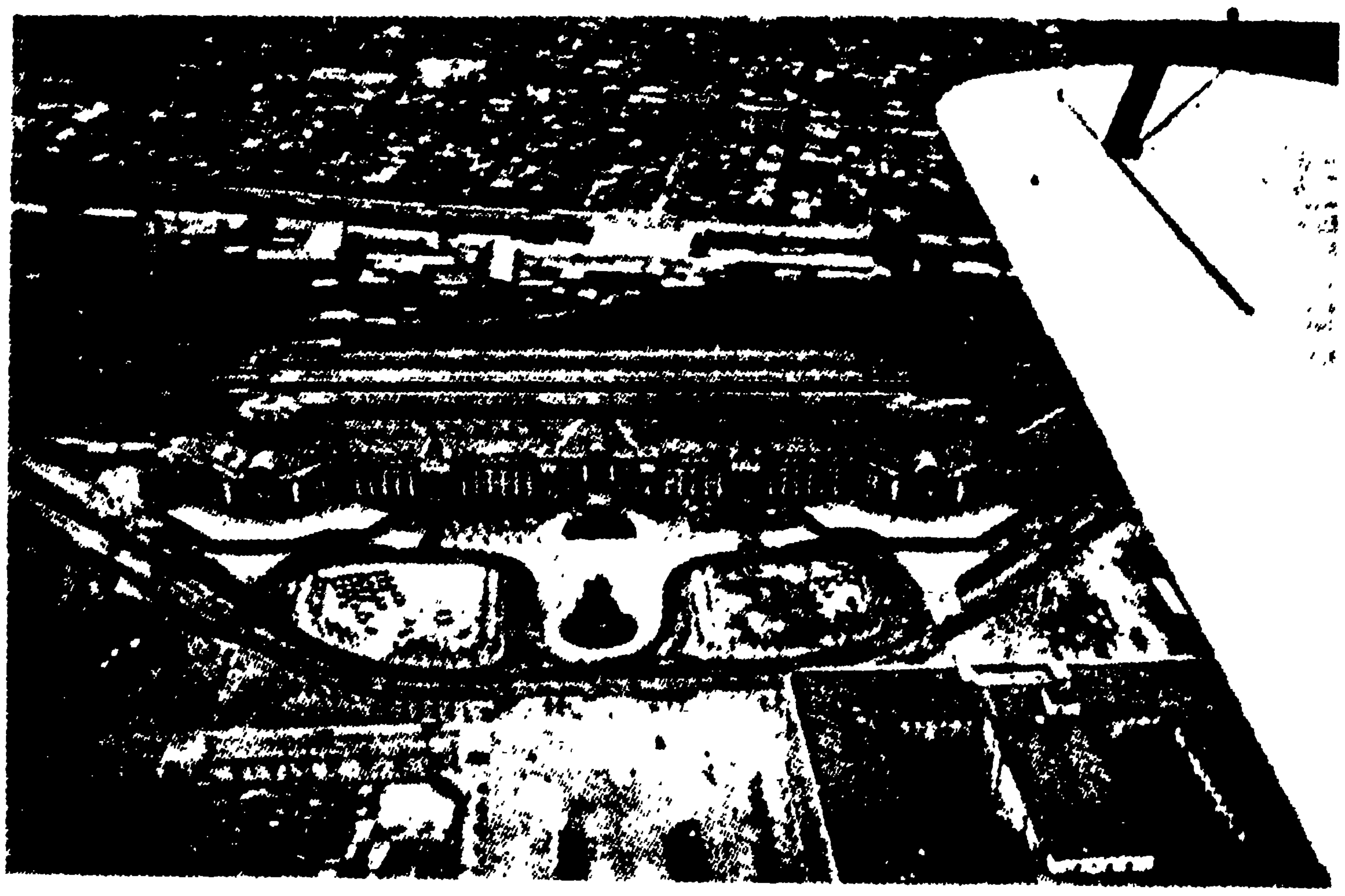

টোকিওর রেলষ্টেশন

সমগ্র জাতি এই ভীষণ দুর্বিপাকে আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিল। ন্তু সেই সঙ্গেই সমগ্র নগরকে পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে নর্গঠিত করিবার কল্পনা সকলের মনে জাগিয়া উঠিয়াল। জাপানীরা অদ্ভুতকর্ম্মা জাতি, তাহারা প্রবল াহস ও উদ্যম সহকারে সেই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত রিয়াছে।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর জাপান সমগ্র সভ্যসমাজ হইতে াপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। এক শতাব্দী পূর্ব্বেও াপানের প্রতিষ্ঠার কথা কেহ জানিত না বলিলেই হয়। কিঞ্চিদধিক শতাব্দীর ৩ পাদ মাত্র সময় পূর্ব্ব হইতে জাপান সভ্যসমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছে। এই অল্পকালের ধ্যে প্রাচ্য ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া জাপান পাশ্চাত্যপ্রথায় আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রতীচ্য দেশে এখনও এমন অনেক লোক জীবিত আছেন, যাহারা কমোডোর পেরী এবং াঁহার অনুযাত্রিবর্গকে, অসভ্য দেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল বলিয়া াল্যকালে শ্রবণ করিয়াছিলেন। তখন জাপানের রাজধানীর নাম জেডো ছিল। উহা তখন মোগনদিগের রাজধানী ছিল। পেরী জাপানে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় জন্য একটি বন্দর প্রতিষ্ঠার দাবী লইয়া জাপানে গিয়াছিলেন। টোকিওতে সর্ব্বপ্রথম মার্কিণ জাহাজ পণ্যসম্ভার সহ উপস্থিত হয়।

ইয়োকোহামা বন্দরের প্রতিষ্ঠা পরে হয়। এই বন্দরে জগতের সর্ব্বস্থান হইতে বাণিজ্যপোতসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র—সকল স্থানের জাহাজই এই বন্দরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। জাপানের বাণিজ্যপোতসমূহও আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। জাপানের মৎস্যবাহী পোতসমূহ কোব প্রভৃতি বন্দরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। টোকিও উপসাগরে তাহাদের স্থান নাই। জগতের সর্ব্বস্থানের লোকই এখানে সমাগত হইয়া থাকে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে পুরাতন নগরের রাজপথ আঁকাবাঁকা

টোকিওর পুরাতন রাজপথ

জাপানী নাট্যশালা কাবুকি

ছিল, বহু পর্ণ-কুটীরও পথের উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যাইত। পথে পথে জিনরিক্স্রই আধিক্য ছিল। অপ্রশস্ত পথে মোটর-যান চলিতে পারিত না। তখন ব্যবসায়ীরা নগরের যে অংশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন, তথায় আধুনিক ধরণের কতিপয় অট্টালিকামাত্র বিদ্যমান ছিল। বড় বড় রাস্তায় বিদ্যুদ্‌বাহিত যানসমূহ চলাফেরা করিত, সকল লোক বিদ্যুৎ ব্যবহার করিত না। তবে রাজপথ-সমূহ প্রধানতঃ বিদ্যুদালোক দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। সে সময় টোকিওকে প্রাচ্যদেশীয় নগর বলিয়াই অনুমিত হইত। শুধু মাঝে মাঝে প্রতীচ্য সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত। পীয়ের লোটীর বর্ণনায় তাহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমানের টোকিও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। প্রশস্ত, দীর্ঘ রাজপথসমূহের দুই পার্শ্বে গগনস্পর্শী অট্টালিকা-সমূহ বিদ্যমান। মাঝে মাঝে প্রমোদোদ্যান। ভ্রমণকারীর পক্ষে প্রাচ্য-সৌন্দর্য্য উপভোগের অবকাশ আর নাই, তাহা সত্য; কিন্তু সহরটি জাপানী-দিগেরই; তাহা ভুলিলে চলিবে না। জাপানীরা এখন বুঝিয়াছে, প্রশস্ত রাজ-পথ অগ্নিভয় নিবারণ করে, স্বাস্থ্যের পক্ষে মুক্ত বায়ু ও আলোকের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বর্ত্তমান সহরের অট্টালিকাগুলি সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত। ভূমিকম্প ও অগ্নি যাহাতে সহজে অট্টালিকার ধ্বংসসাধন করিতে না পারে, এমনভাবে নির্ম্মিত। বড় বড় প্রমোদোদ্যানে তরুণগণ ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকে। প্রমোদোদ্যানগুলি বৃহৎ করিবার আরও একটা উদ্দেশ্য দেখা যায়। বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ব্বিপাকে সহরের ৩০ সহস্র নর-নারী দ্রব্যসম্ভার সহ অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুক্তস্থানের অভাবে স্বল্পপরিসর স্থানে সমবেত হইয়া আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছিল। জাপানীরা সে দুর্দ্দিনের স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই।

খালগুলির উপর পূর্ব্বে দারুময় সেতু বিরাজিত ছিল। অধুনা সুদৃঢ় প্রস্তর ও লৌহনির্ম্মিত সেতুসমূহ সে স্থানে বিরাজ করিতেছে। এখন গুরুভার বাস ও লরী-সমূহ তাহাদের উপর দিয়া নির্ভয়ে গমনাগমন করে। এখন সহরে আগুন লাগিলে পলায়নের অসুবিধা নাই।

প্রমোদোদ্যানে বালকগণ "বেস্‌বল" ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকে। ক্ষেত্রসমূহের পার্শ্বে কৃত্রিম পাহাড় নির্ম্মিত হইয়াছে।

কর্ণেল লিণ্ডবার্গ-দম্পতির অভ্যর্থনায় জাপানী সরকার

উৎসবে শোভাযাত্রা

যাহাতে বিভিন্ন প্রকারের কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হয়। উদ্যানে মাঠে সকলপ্রকার ক্রীড়া—টেনিস্, ফুটবল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

জাপানী তরুণরা সাধারণতঃ প্রতীচ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। প্রবীণ-গণের দেহে কিমোনো এবং ভারী পরি-চ্ছদ। বালিকারাও কোন কোন ক্রীড়ায় যোগ দিয়া থাকে। তাহারা সাধারণতঃ না[illegible] পরিচ্ছদেই ভূষিত। জাপানে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। স্কুলের বালিকারা সুদর্শন কালো [illegible]পাকার ছত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

সন্তানবতীরা জাপানী পরিচ্ছদে ভূষিতা থাকেন। তাঁহাদের হাতে কাগজের ছত্র। সেই সকল ছত্র বিচিত্র বর্ণের। বৃষ্টির সময় দেখা যাইবে, রক্ত, নীল, হরিদ্রা, নানাজাতীয় পুষ্প যেন রাজপথে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

টোকিওর পোষাক-পরিচ্ছদ কৌতূ-হলোদ্দীপক। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে সকল ব্যক্তিই য়ুরোপীয় বেশে ভূষিত, তরুণ জাপানীদিগের অধিকাংশই য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু এ বিষয়ে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ-ভূষিত জাপানী ধনী-দিগের য়ুরোপীয় প্রথায় নির্ম্মিত অট্টা-লিকায় জাপানী সাজসজ্জা দেখিতে পাওয়া যাইবে। চেয়ার-টেবলের পরিবর্ত্তে ভূমি-তলে মাদুর বিস্তৃত। সাজসজ্জার আড়-ম্বর, চিত্রের আতিশয্য কোথাও নাই। হয় ত একখানি চিত্র, একটি ফুলদানিতে একতোড়া ফুল। অতি সাধারণভাবের সজ্জা, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বত্র বিরাজিত। জাপানীরা পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত ব্যবস্থায় জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

জাপানীরা কাঠের ও ঘাসের জুতা

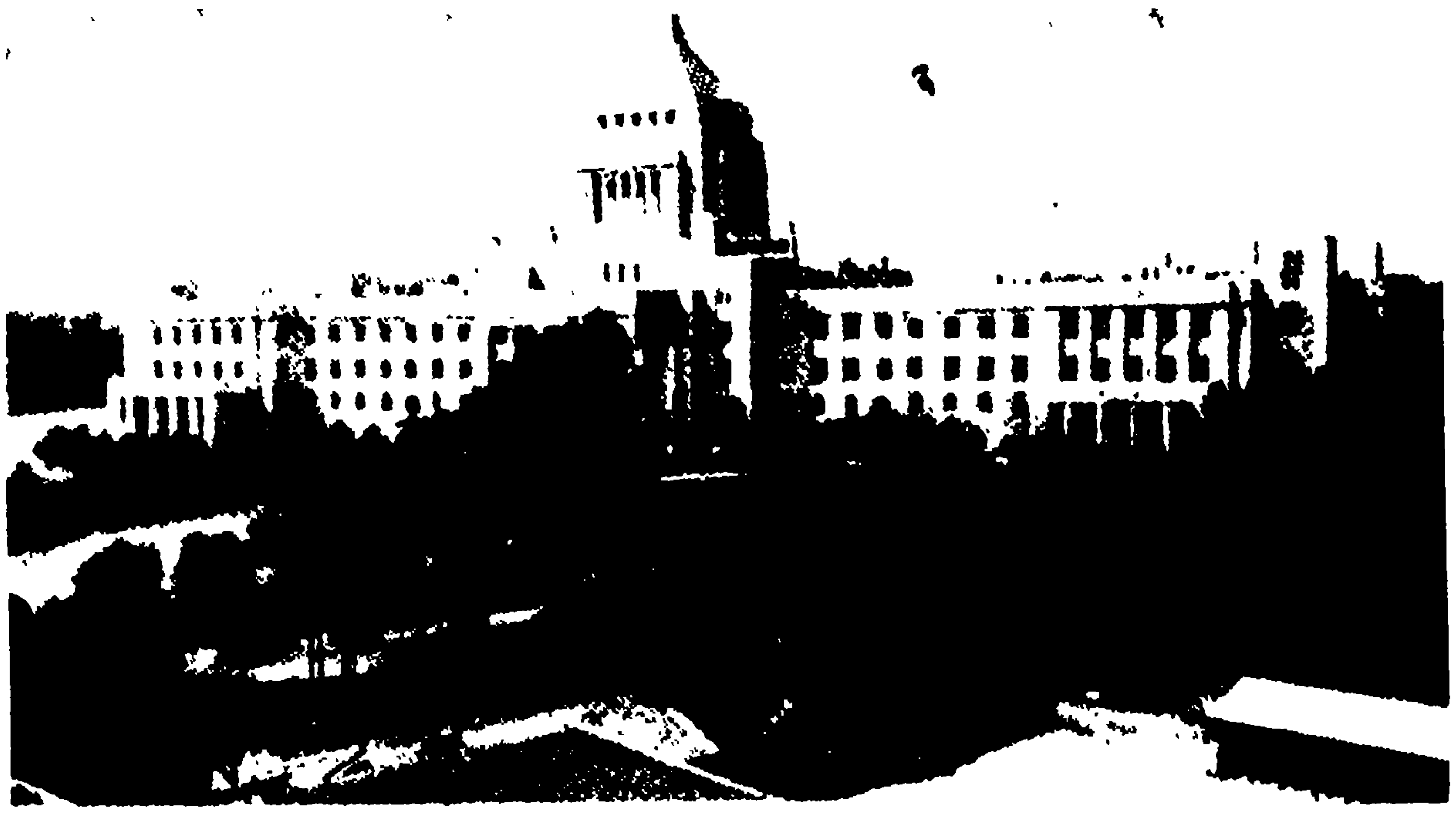

জাপানের আধুনিক অট্টালিকা

বাবাসাকি তোরণ-সান্নিধ্যে জনতা

ব্যবহার করিয়া থাকে। সহরে অসংখ্য জুতার দোকান। পুরুষের জন্য একপ্রকার জুতা, নারীর জন্য অন্যবিধ। বয়স্কদিগের জন্য একপ্রকার জুতা, তরুণ-তরুণীদিগের জন্য অন্যবিধ। বয়সের তারতম্য অনুসারে জুতারও বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। জাপানে কোন প্যারী বা লণ্ডনের পরিচ্ছদ-নির্ম্মাতা নাই। নূতন ফ্যাশন সৃষ্টি করিয়া মন ভুলাইবার চেষ্টা জাপানে ব্যর্থ। এ দেশে ফ্যাশন পরিবর্ত্তিত হয় না। শুধু যৌবন ও বার্দ্ধক্যের উপযোগী বেশ-ভূষাই জাপানে প্রচলিত। ছোট ছোট ছেলেরা সাধারণ রঙ্গের পরিচ্ছদ ধারণ করে, বালিকারা নানা বর্ণের বেশ পরিধান করিয়া থাকে। কিন্তু বালিকারা যখন যৌবন প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা সাধাসিধা বস্ত্রই পছন্দ করে। কোনও সুন্দরী ভদ্রমহিলা কখনই নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করিবেন না।

মর্ম্মর-প্রস্তরের উপর সহস্র চরণের কাষ্ঠ-পাদুকার শব্দ যেন শাশ্বত গতির কথাই স্মরণ কর ইয়া দেয়। ইহাতে সঙ্গীতের মাধুর্য্য পাওয়া যায় যে একবার শুনিয়াছে, সে কখনও তাহা ভুলিতে পারি না। ফুলের দোকানে ভীড় যথেষ্ট হয়, কিন্তু উচ্চ কণ্ঠ রবের বালাই নাই। জাপান য়ুরোপীয় বেশভূষা আয়

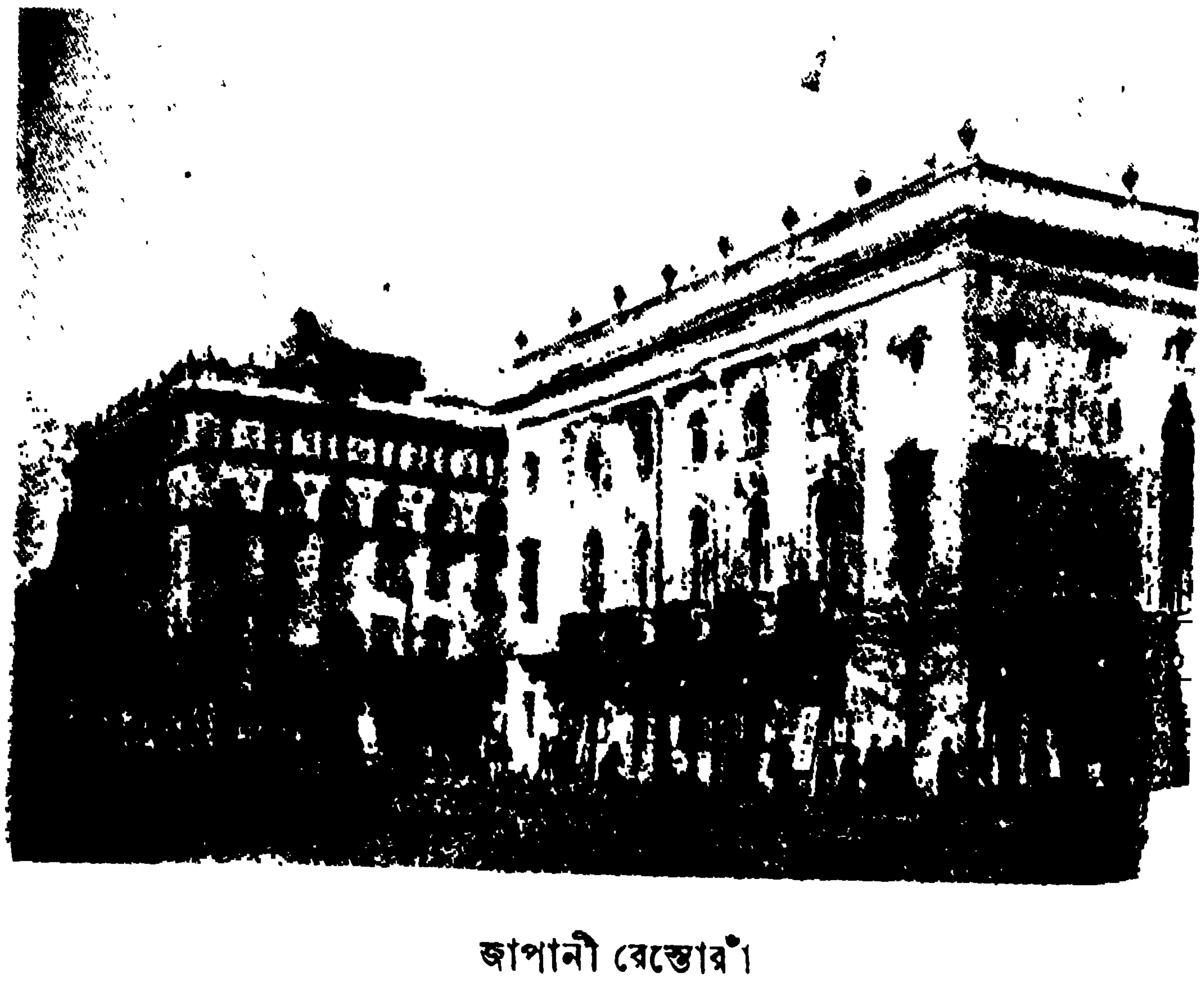

জাপানী রেস্তোরাঁ

সম্রাটের সিংহাসনাধিরোহণ উৎসবে ছাত্রবৃন্দের আলোকোৎসব

করিলেও প্রাচ্যের প্রভাব তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

টোকিও সহরে দ্বিচক্রযানের বহুল প্রচলন আছে। দ্বিচক্রযানে চড়িয়া পাত্রপূর্ণ তরল পানীয় সহ আরোহী অবলীলাক্রমে দ্রুত ধাবিত হইয়া থাকে। দ্বিচক্রযানে সোফাও বাহিত হইয়া থাকে। গিন্‌জা নামক রাজপথেই জাপানের যাবতীয় দোকান অবস্থিত। ফল-মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছত্র পর্য্যন্ত সমস্তই গিন্‌জায় পাওয়া যাইবে।

টোকিও সহরের হৃদ্‌যন্ত্র—রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটি প্রাচীরবেষ্টিত বিস্তৃত ভূমির উপর অবস্থিত। সোগনদিগের রাজত্বকালে এইখানেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। যুদ্ধ করিতে হইত বলিয়া রাজপ্রাসাদকে প্রথম হইতেই সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। প্রাসাদের চারিদিকে অত্যুচ্চ স্তূপ দুই মাইলব্যাপী স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রথম স্তূপের পর দ্বিতীয় স্তূপের প্রাচীর অবস্থিত। এই উভয় বেষ্টনীর মধ্যস্থ স্থান ফাঁকা—তথায় কেহ গৃহনির্ম্মাণের অধিকার পায় না। বাহিরের বেষ্টনী ইদানীং হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ অক্ষত-দেহে বিদ্যমান। এই স্তূপের উচ্চতা সর্ব্বত্র সমান নহে—২০ ফুট হইতে ১ শত ফুট। সুদৃঢ় প্রস্তরের দ্বারা উহা নির্ম্মিত। ভূমিকম্পে উহার কোন ক্ষতি হয় নাই। জাপানের এই প্রাচীর অতি সুদৃশ্য। ইহার ধারে ধারে জাপানী পাইন-গাছ সজ্জিত।

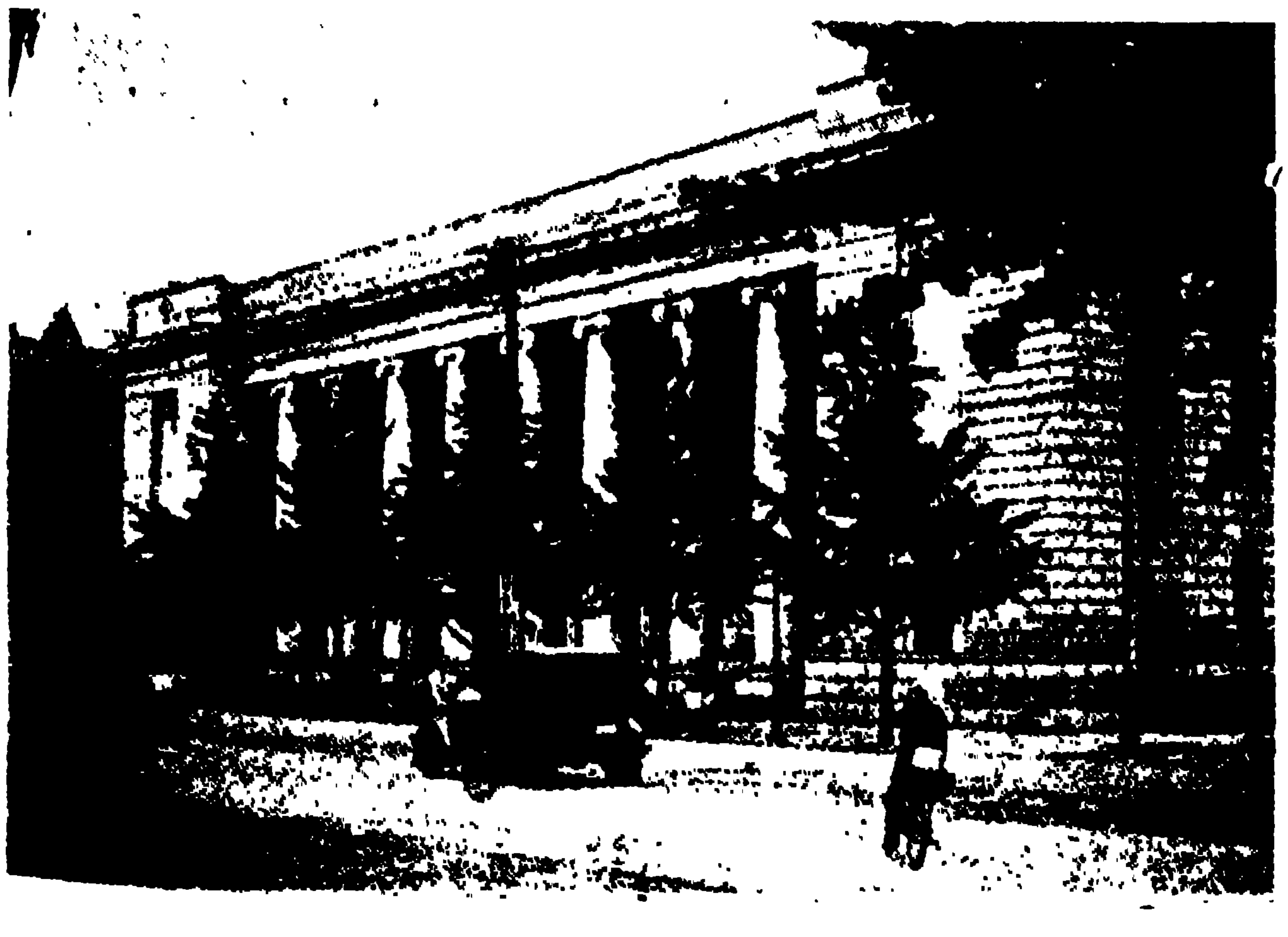

জাপানের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক মিটসুবিশি

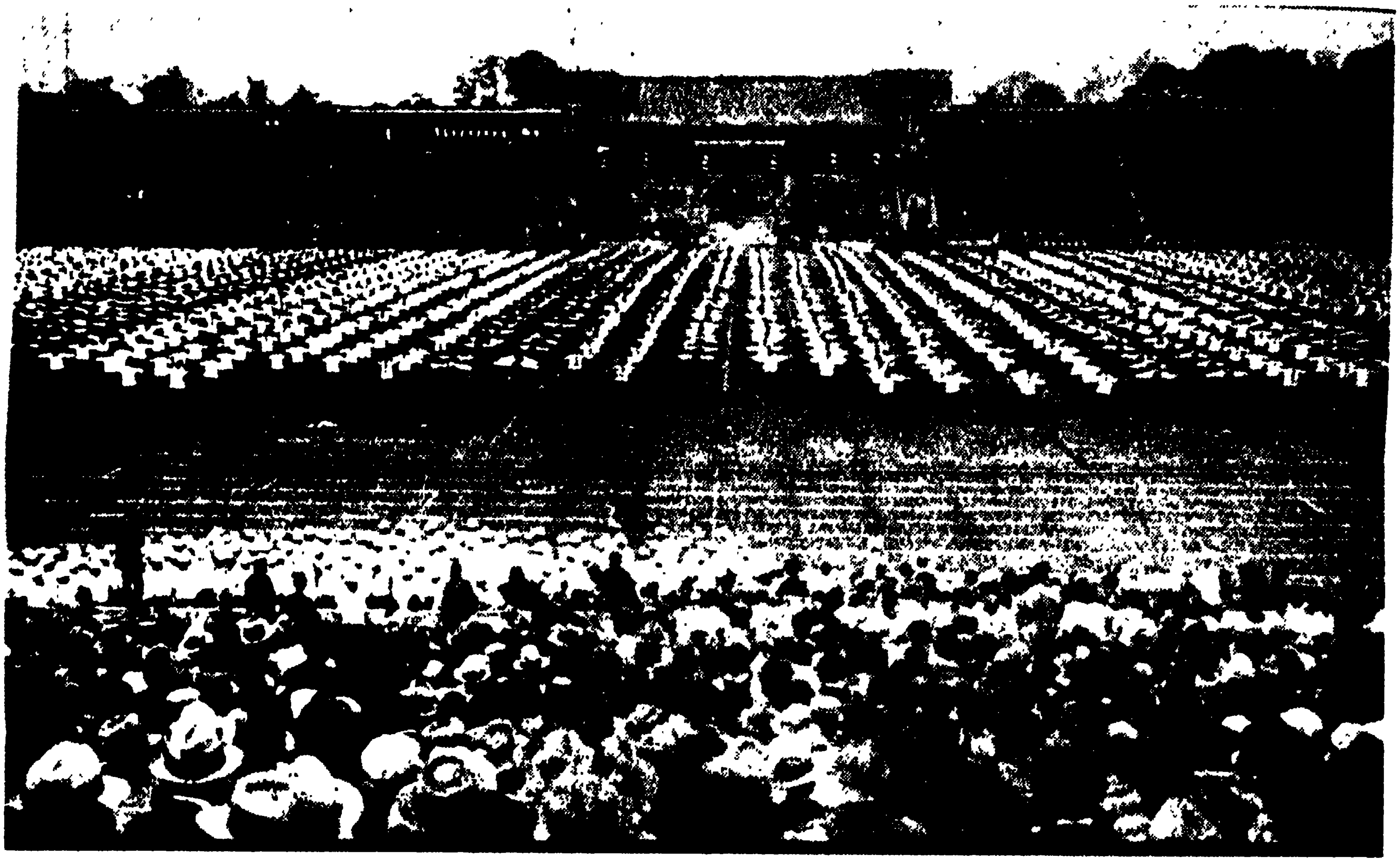

সম্রাট-সম্মুখে জাপানী ছাত্রীদিগের ড্রিল

জাপানের সিমেণ্টরাজ মিঃ আসানোর গৃহসংলগ্ন উদ্যান

জাপানীরা পাখীর ভোজ দিতেছে

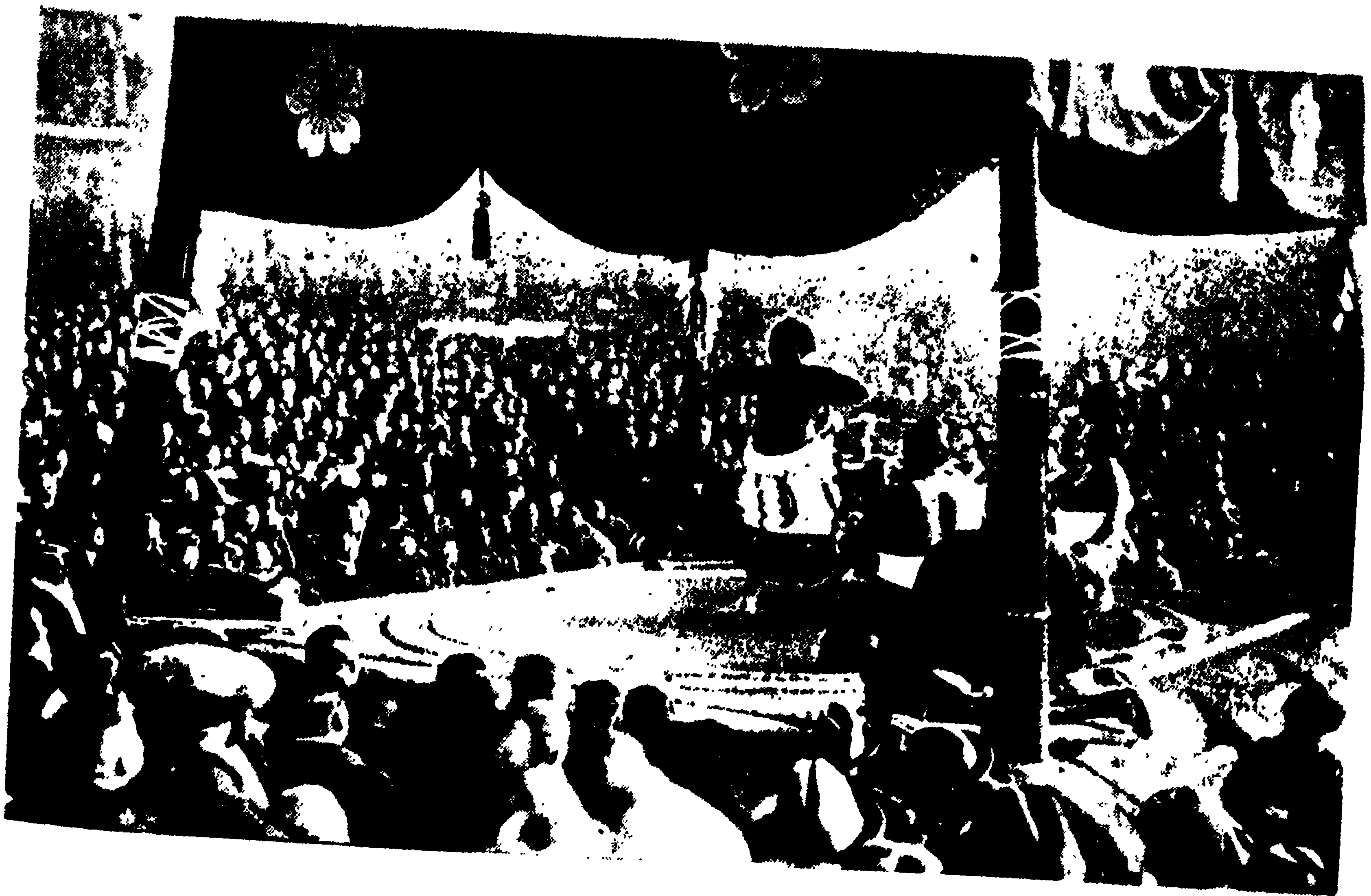

জাপানী মল্ল

পুরাতন যুগের ছাত্র ও জাপানী নারী

জাপানী তীর্থযাত্রী

জাপ-সম্রাটের প্রাসাদের প্রাচীর ও উদ্যানের আলোক-চিত্র-গ্রহণ নিষিদ্ধ। সম্রাট্ যখন রাজপথে বাহির হন, তখন তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকাও নিষিদ্ধ। তিনি যে পথে যাত্রা করেন, তাহার পার্শ্বস্থ অট্টালিকা-সমূহের দরজা-জানালা রুদ্ধ থাকে। জাপানীরা সম্রাট্‌কে প্রজাদিগের পিতা, সর্ব্বময় কর্ত্তা হিসাবে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাঁহার প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি প্রকাশ করিতে প্রত্যেক জাপানী বাধ্য। প্রতীচ্য জাতির কাছে ইহা অদ্ভুত বলিয়া অনুভূত হইলেও তাঁহারা যেন মনে রাখেন, টোকিও জাপানের রাজধানী।

জাপানের ব্যাঙ্কগুলিতে জাপানীরাই প্রধানতঃ কায করে। চীনারা যোগ-বিয়োগে সিদ্ধ-হস্ত বলিয়া কোন কোন স্থানে দুই চারি জন চীনা নিযুক্ত হইয়া থাকেন। প্রতীচ্য দেশে একটা জনশ্রুতি আছে যে, জাপানীরা অর্থ-সম্বন্ধে বিশ্বাস-ভাজন নহে—অর্থাৎ ব্যাঙ্কে কায করিতে গেলে, তাহারা অর্থের অপব্যবহার করে; কিন্তু মিঃ উইলিয়াম্ আর, ক্যাসল নামক অভিজ্ঞ মার্কিণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, জাপানীদিগের চরিত্রে এরূপ অপবাদ আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে।

টোকিও সহর সর্ব্বত্রই নিরাপদ। দিবাভাগে বা রাত্রিতে সহরের যে কোনও অংশে যে কেহ নিরাপদে ভ্রমণ করিতে পারে—কোথাও কোনরূপ বিপদের আশঙ্কামাত্র

জাপানের অগ্নিনির্ব্বাণকারী দল

জোজোজি মন্দিরের বাহিরে নারীদিগের পরিত্যক্ত জুতা

টোকিও সহরে গ্রীষ্মের উৎসব

নাই। জাপানী বা বিদেশী বলিয়া কোনও পার্থক্য কোথাও নাই। জাপানীদিগের আতিথেয়তা সুপ্রসিদ্ধ।

আকাসাকা প্রাসাদ-উদ্যান ব্যতীত টোকিও সহরে বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যবৈচিত্র্য নাই। কিন্তু প্রাসাদের উদ্যান কদাচিৎ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। এই উদ্যানে রমণীয়তার প্রচুর সমাবেশ আছে। টোকিওর সরকারী প্রমোদোদ্যানগুলিতে শান্তিলাভ ঘটে না। মনের উপর শান্ত, নির্জ্জনতার মাধুর্য্যরসধারা কোনও সময়ে অনুভূত হইবার অবকাশ পায় না।

টোকিওর সর্ব্বত্রই সিন্টো ও বৌদ্ধ দেবস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক গৃহেই এই প্রকার দেবস্থান দৃষ্ট হইবে। তথায় পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিপূজাও চলে।

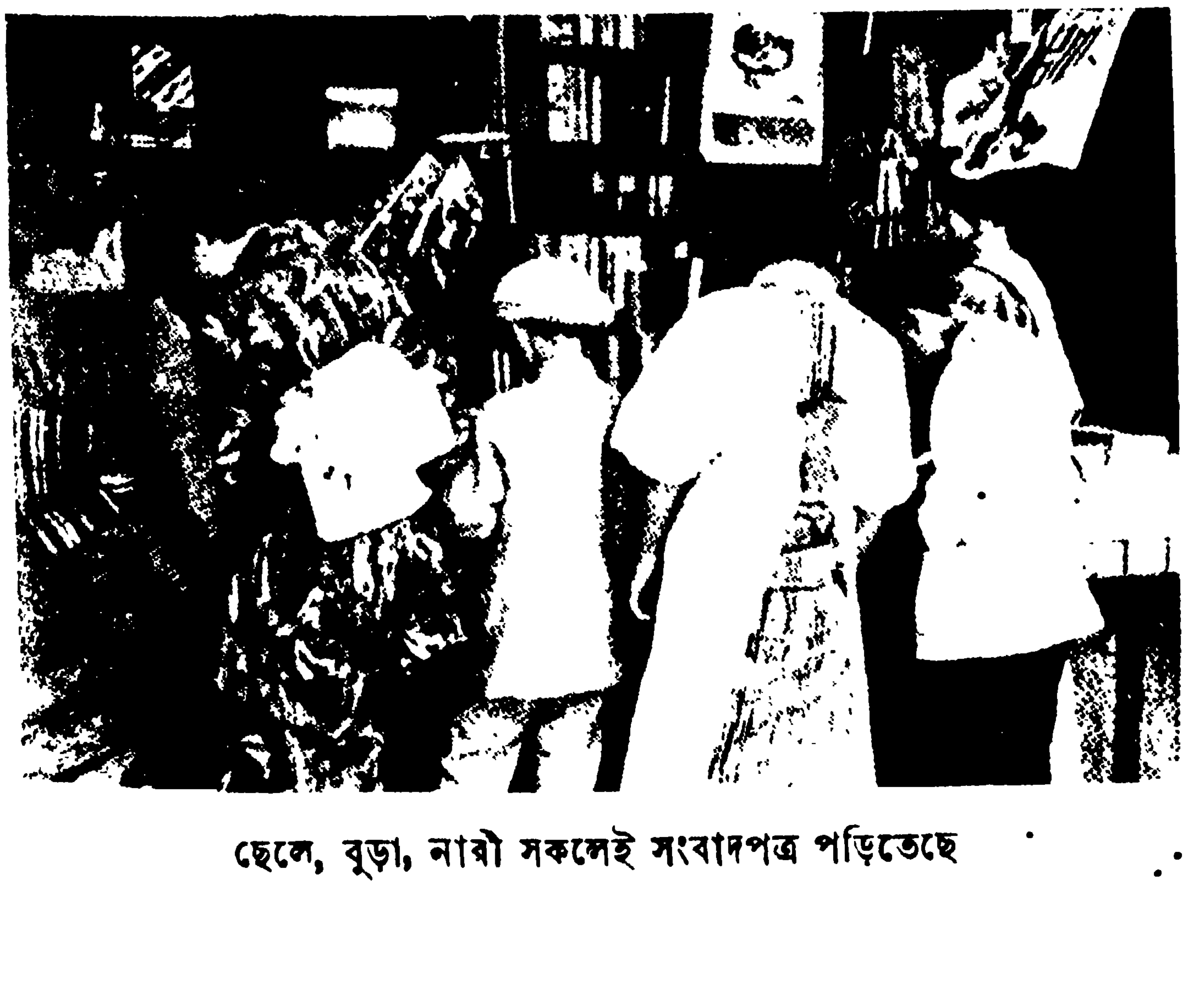

ছেলে, বুড়া, নারী সকলেই সংবাদপত্র পড়িতেছে

টোকিও ত্যাগ করিয়া কোনও জাপানী ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইবার জন্য অন্যত্র যাইতে হয় না। রাজকীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ৮ হাজার ছাত্র বিদ্যমান। বিশ্ব-বিদ্যালয় আধুনিকভাবে গঠিত। জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, গণিত —অর্থাৎ কোন বিষয়েই জাপান কোনও দেশের তুলনায় হীন নহে। জাপানী ছাত্ররা বুদ্ধিমান্ এবং পরিশ্রমী।

মিক্বোতে প্রথম তৃতীয় সোগম সমাহিত আছেন। উহা দেবস্থানে পরিগণিত। স্মৃতিসৌধগুলিতে ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্য বিশেষভাবে

দেখিতে পাওয়া যাইবে। শিবার কতিপয় দেবস্থানের সৌন্দর্য্য চমৎকার। বর্ণবিন্যাস দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। জাপান এক কালে সন্ন্যাসী জাতির আবাসস্থান ছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সে বস্তুতান্ত্রিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

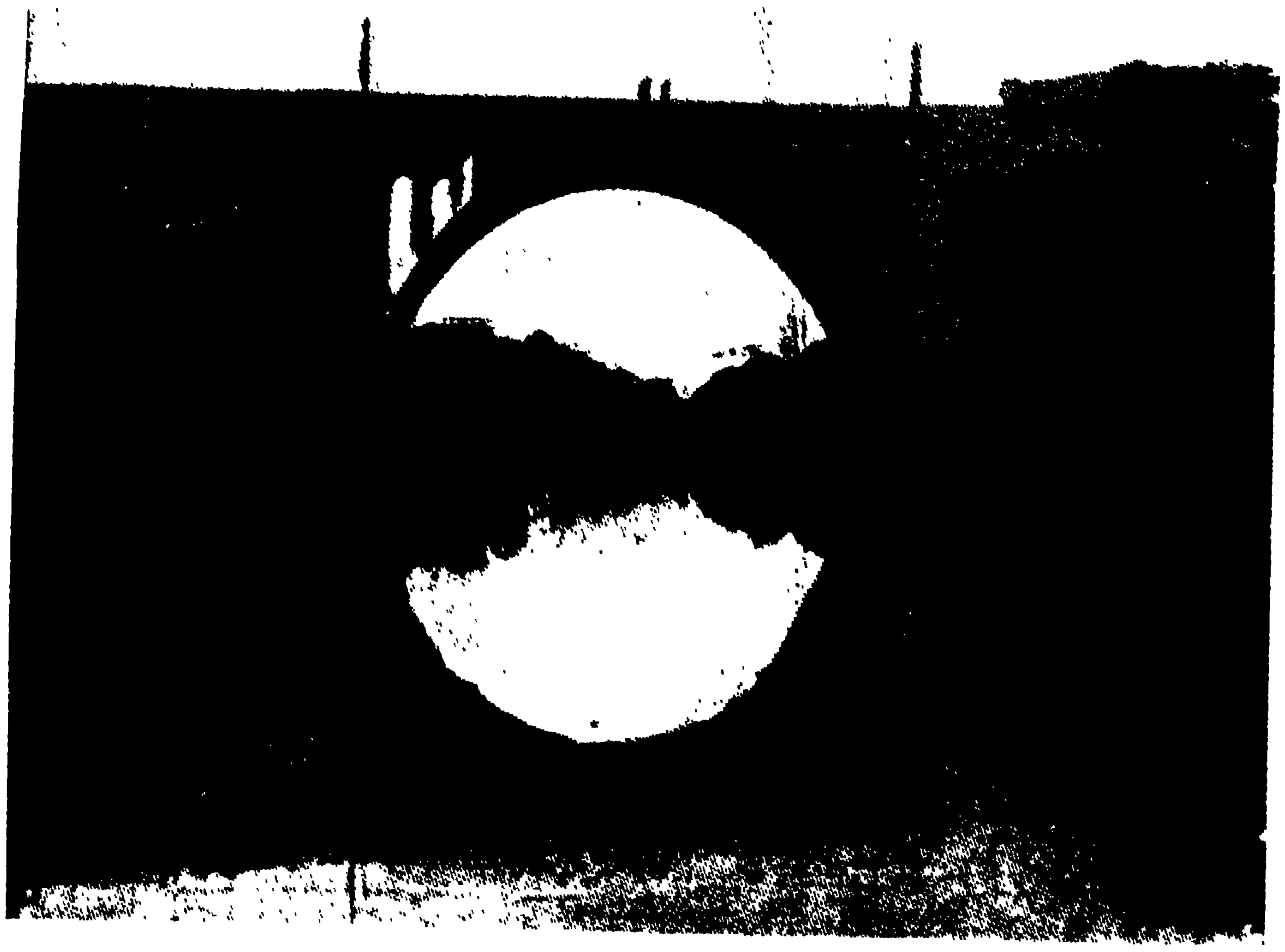

কানডা নদীর উপরিস্থিত সেতু

টোকিওর আর একটা বৈশিষ্ট্য তাহার ব্যায়ামক্ষেত্রগুলি। তরুণ জাপান সুগঠিত ও শক্তিশালী দেহ-গঠনে তপস্যা করিতেছে। জনসাধারণ ক্রীড়াক্ষেত্রে ভীড় করিয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে জাপানীরা বুঝিতে পারিয়াছে যে, শক্তিশালী না হইতে পারিলে কেহ তাহাদিগকে মানিবে না। সেই সময় হইতে জাপানীরা বলচর্চ্চায় অবহিত হইয়াছে।

ইদানীং টোকিও সহরে দুইটি ক্রীড়াক্ষেত্রে দর্শকদিগের প্রকাণ্ড বসিবার স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। একটিতে ৮০ হাজার দর্শক অনায়াসে বসিতে পারে; অপরটিতে ৩০ হাজার দর্শকের বসিবার স্থান আছে। কোন আসনই শূন্য থাকে না।

মল্ল ব্যতীত জাপানে আর কোনপ্রকার ব্যায়ামে লোক অর্থ লইয়া ব্যবসা করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া খেলা করে। সেই খেলা দেখিবার জন্য অধিক জনসমাগম হইয়া থাকে। রাগবী ফুটবল সর্ব্বত্রই খেলা হইয়া থাকে। সেনাদলের মধ্যে এই খেলার বিশেষ প্রচলন আছে। বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ তরুণ সামরিক শিক্ষা পাইয়া থাকে। তাহারা এই খেলায় বিশেষ দক্ষ। হকি এবং এসোসিয়েশন ফুটবলও জাপানে বিশেষ আদৃত হইতেছে। সন্তরণেও বহু ছাত্র দক্ষতা লাভ করিয়া বিশ্বের দরবারে নাম কিনিয়াছে।

গল্‌ফ্‌ ক্রীড়ারও ক্রমে সমাদর ঘটিতেছে। টোকিওতে ব্যায়াম ও ক্রীড়া যেরূপ সমাদৃত, এমন আর কোথাও নাই। আধুনিক ক্রীড়ায় জাপানীরা অনুরাগী হইলেও, পুরাতন ব্যায়ামক্রীড়ার সমাদরও যায় নাই। মল্লক্ষেত্রে অসংখ্য দর্শক সমবেত হইয়া থাকে। ধনুর্ব্বেদও জাপানীদিগের প্রিয় ব্যায়াম।

ব্যায়াম-প্রচেষ্টার ফলে জাপানীরা পূর্ব্বাপেক্ষা আকারে দীর্ঘতা অর্জ্জন করিতেছে। ইহা কোন্ ব্যায়ামের ফলে ঘটিতেছে, তাহা বলা কঠিন। জাপানীরা সাধারণতঃ ইদানীং এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে বাড়িয়াছে।

ব্যায়াম-নিপুণা জাপ-তরুণী

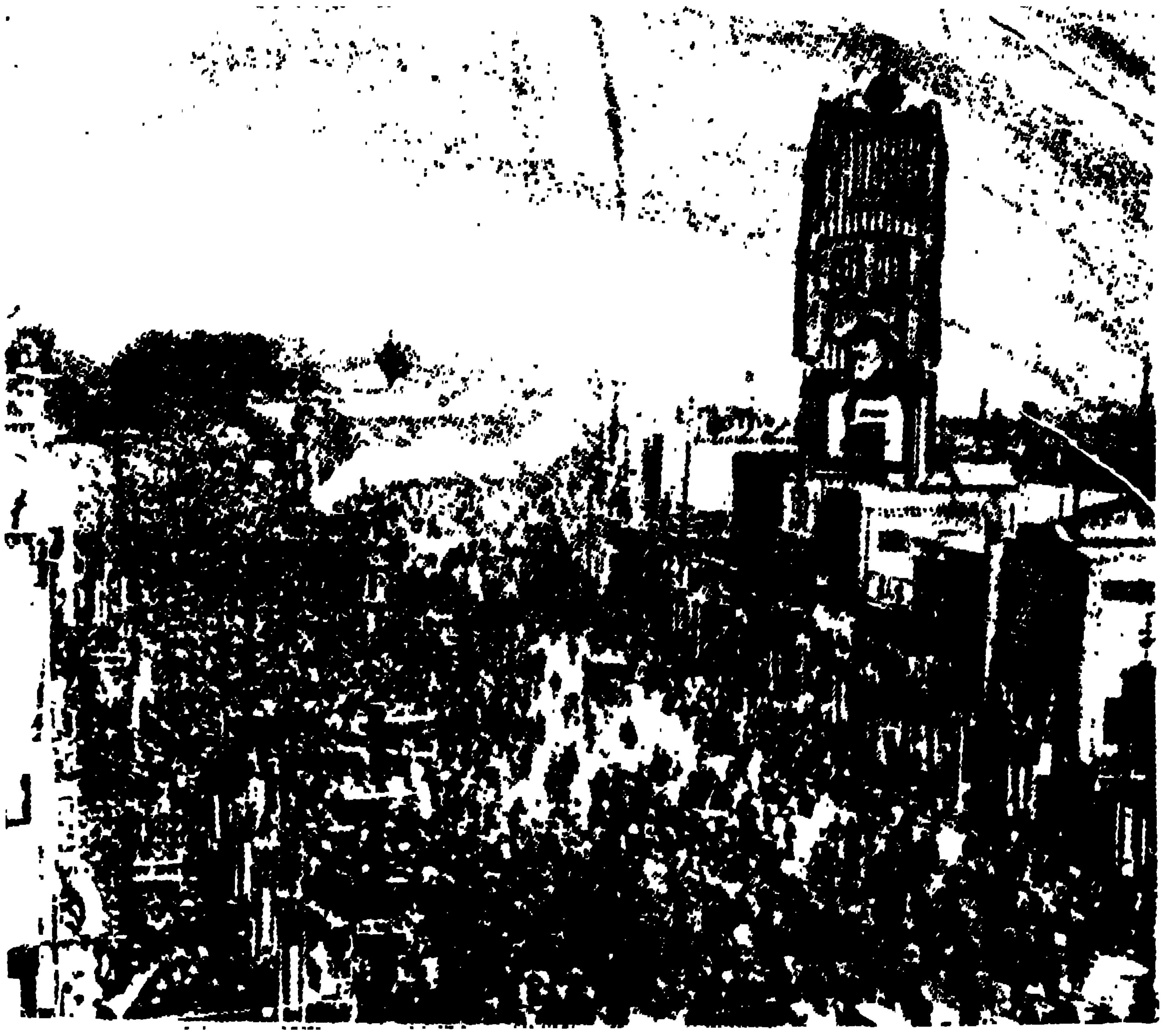

নব-গঠিত উৎসবে জাপ-জনতা

চেরি বৃক্ষমূলে জাপানী

নূতন ও পুরাতনের পার্থক্য জাপানী থিয়েটারগুলিতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাতন পদ্ধতিতে নবগঠিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়াদি হইয়া থাকে। তাহাতে দর্শকের সমাবেশ কম হয় না। আবার যেখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, সেখানে আধুনিক হলিউড সমাদৃত। জনসাধারণ নূতন ও পুরাতন উভয় ব্যাপারেই সমান আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

জাপানীরা সংবাদপত্র পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসে। তাহারা গোগ্রাস ভক্ষণের ন্যায় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে। সংবাদপত্র লইয়া বিক্রেতারা পদব্রজে বা দ্বিচক্রযানে চড়িয়া সহরের সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিতে থাকে। দোকানে দোকানে সংবাদপত্র বিলি করিয়া যায়। রাজপথের কোনও প্রসিদ্ধ অংশে নারী ঘণ্টাধ্বনি করিতে থাকে। তাহাতে জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে, সেইখানে শেষ-সংবাদপূর্ণ সংবাদপত্র আছে। যে পার, ক্রয় কর।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না, সেইখানে সংবাদপত্র পাঠে জনসাধারণের বিপুল আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দুইখানি জাপানী সংবাদপত্রের এত গ্রাহক যে, মার্কিণযুক্তরাজ্যের কোন সংবাদপত্রের তত সংখ্যক গ্রাহক নাই।

উল্লিখিত দুইখানি জাপানী সংবাদপত্র আধুনিক ভাবে গঠিত। এই দুইখানি কাগজ হইতে যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহার দ্বারা

জাপানী বাট্টার বাজার

অনেকগুলি হাঁসপাতাল এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

টোকিও সহরে কাফিখানার আধিক্য আছে। সেই সকল পানালয়ে সর্ব্বদা ক্রেতার ভিড় হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই সকল কাফিখানায় নর্ত্তকীরা নৃত্য করিত। কিন্তু ঐরূপ নৃত্যের ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া জাপানীরা

টোকিওর সমাপ্তপ্রায় ডাকঘর

সম্রাট-মহিষীর জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রেশমী বস্ত্রের উপর ফুল তুলিতেছে

হৈচৈ করিয়াই আনন্দ উপভোগ করিতে চাহিত। ইদানীং সেই সকল কাফিখানায় "মোবো" ও "মোনার" ভিড়।

"মোবো" অর্থে আধুনিক তরুণ এবং "মোনা" অর্থে আধুনিকা তরুণী। ইহারা য়ুরোপীয় প্রথায় বেশ-ভূষা করিয়া থাকে। প্রতীচ্য সভ্যতার ইহারা প্রতীক বলিলেও চলে।

জাপানের পুরাতন ও নবীনের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার। জাপান প্রতীচ্য সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইলেও প্রাচ্য ভাবধারাকে বর্জ্জন করে নাই। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে জাপানীদের উত্তেজনার সীমা নাই। তাহাদের ক্ষাত্রশক্তির উত্তেজনা টোকিওতে বেশ দেখা যাইবে। সেনাদল যখন নগরের মধ্য দিয়া গমন করে, তখন সামুরাই জাতির রক্ত জাপানীদিগের দেহে রুদ্রতালে নৃত্য করিতে থাকে। এ দৃশ্য কিন্তু য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে দেখা যাইবে না। কিপলিং বলিয়াছিলেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মেলন অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা জাপান দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মেলন এখানে সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার ফলে নূতন একটা সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে কি না, তাহা অনেকের বিবেচ্য হইয়া পড়িয়াছে।

জাপ পুলিসের সম্রাটকে অভিনন্দন

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

স্পর্শের প্রভাব

(উপন্যাস)

১

কোকিল-কাকলীর মত কমনীয় কণ্ঠনিঃসৃত স্বরলহরী বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া গেল, "ছি সুধা, অমন ক'রে দৌড়িও না। দেখ দেখি, বাবা কত পেছিয়ে পড়েছেন!"

সুধাংশু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিল, "কেমন ছুটে এইছি! জান দিদি, হানড্রেড ইয়ার্ড রেসে এবার ফাষ্ট প্রাইজ পেয়েছি?"

কমনীয়কান্ত কিশোর, দ্রুত ধাবনের পরিশ্রমে তাহার যুগল কপোলে পদ্ম প্রস্ফুটিত, স্বেদবিন্দু মুক্তাপাতির মত ললাটে শোভিত, ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহে তাহার ক্ষুদ্র কমনীয় তনুখানি কম্পিত। আজ তাহার পিতা তাহার দিদি ও তাহাকে লইয়া শিবপুরের কোম্পানীর বাগান দেখিতে আসিয়াছেন—এমন আনন্দের দিনে সে কি নিরানন্দ থাকিতে পারে?

সুধাংশু হঠাৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নযুগল দিদির মুখ-মণ্ডলের উপর স্থাপিত করিয়া সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ও দিদি, দেখ, দেখ, কি প্রকাণ্ড গাছ! উঃ, কত বড় বড় ডাল—কি ঝুরিই নেমেছে! ইস্!"

তাহার দিদি তাহাকে ছুটিতে নিষেধ করিলেও স্বয়ং গতির বেগ বিশেষ পরিমাণেই বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল—ভ্রাতার অনুসরণ করিয়া সেও বন-কুরঙ্গীর মত মুক্ত আকাশতলে মুক্ত বাতাসে ছুটিয়া চলিয়াছিল—আজ যেন তাহার সুন্দর মধুর শৈশব ফিরিয়া আসিয়াছিল! অনন্ত, অপরিমেয়, সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোক, হু হু বায়ুর স্বনন—কি সুন্দর, মুক্ত প্রকৃতির অনন্ত অফুরন্ত শোভা! অদূরে ভাগীরথীর অনন্ত অবিশ্রান্ত কুল্-কুল্ প্রবাহ, ক্ষণেক পূর্ব্বে সে ষ্টীমারে বসিয়া সেই অনন্ত ধারার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কতই না তন্ময় হইয়া গিয়াছিল! আনন্দ চারিদিকেই উচ্ছ্বসিত হইয়া যাইতেছিল। জলে, স্থলে, বাতাসে সে আনন্দের যেন সীমা নাই—উর্দ্ধে, অধে, আশে-পাশে আনন্দের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। আজ যেন সমগ্র বিশ্ব সেই আনন্দধারায় স্নাত, প্লাবিত হইতেছিল!

অকস্মাৎ শান্ত সুন্দর প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করিয়া, নারীর ভয়ভীত আর্ত্তনাদ বায়ুমণ্ডল আলোড়ন করিয়া সমগ্র আকাশ ছাইয়া ফেলিল। নিমেষে কোথা হইতে প্রকাণ্ড বাঘের মত একটা কুক্কুর ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখের পদদ্বয় একবারে দ্রুতগামিনী তরুণীর বক্ষোপরি রক্ষা করিয়া ভয়াল, আরক্ত, ক্রূর দৃষ্টিপাত করিল। তাহার ভীষণ গর্জ্জনে বনভূমি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার তীক্ষ্ণ নখাগ্র-সংস্পর্শে তরুণীর বহুমূল্য সূক্ষ্ম ওড়নার প্রান্তদেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বালক সুধাংশুও ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"প্রতাপ!"—

গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে যেন ভর্ৎসনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুক্কুর উৎকর্ণ হইয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তোলিত পদদ্বয় স্বতঃ তরুণীর দেহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভূমিসংলগ্ন হইল।

আগন্তুক দ্রুতপাদবিক্ষেপে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অশান্ত পশুকে শান্ত করিতে লাগিল। কুকুর নবাগতের পাদমূলে মাথাটি লুটাইয়া আনন্দে লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে

লাগিল, তাহার প্রভুও স্নেহবশে তাহার মস্তকের উপর ধীরে ধীরে করাঘাত করিয়া মৃদু গুঞ্জনে তাহাকে আদর করিতে লাগিল।

আকস্মিক বিপৎপাত হইতে মুক্ত ভ্রাতা ও ভগিনী বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল। আপনাদের অবস্থার কথা তখন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। যুবক সহসা সম্মুখে দৃষ্টি উন্নীত করিয়া মুগ্ধ অপলক-নেত্রে অপরিচিত তরুণীর নবকিসলয়প্রফুল্ল লাবণ্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। রূপবহ্নিতে আকৃষ্ট হয় না, এমন পতঙ্গ কোথায় আছে ?

মুহূর্ত্তেই কিন্তু যুবক আত্মসংবরণ করিয়া উদ্বেগ ও আতঙ্কজড়িত স্বরে বলিল, "এ কি রক্ত ? রক্ত কেন ? দেখি—"

আগন্তুক যুবক ত্বরিতগতিতে উঠিয়া অসঙ্কোচে তরুণীর কোমল করপল্লব পরীক্ষা করিতে লাগিল।

"ইস্! হাতে কি হতভাগাটা নখের আঁচড় দিয়েছে ? অনুগ্রহ ক'রে আসুন, কাছেই কল রয়েছে, জল দিয়ে ধুয়ে দিই—রাস্কেল!"

বালক সুধাংশু জ্যেষ্ঠা ভগিনীর হস্ত রক্তাক্ত দেখিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তরুণীর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাহার আকস্মিক বিপদ, ভয়, আতঙ্ক,—ভ্রাতার ক্রন্দন, ক্রুদ্ধ পশুর জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ঘূর্ণিত আরক্ত লোচন—এ সবই যেন ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত ঘটনা-বলীর মত কোন অতীতের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে বিলীন হইয়া গিয়াছিল! তাহার সমস্ত অনুভূতি দৃষ্টিমধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া দীর্ঘোন্নত শালতরুনিভ এই অপরিচিত যুবকের প্রতি ধাবিত হইল। বিস্ময় ও লজ্জার সংমিশ্রণে তরুণীর দীর্ঘায়ত কৃষ্ণতার নয়নে তখন এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল। নখরাঘাতের বেদনা তখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল! আর—আর তাহার আশা-আনন্দ-মুকুলিত নবীন জীবনে এ কি অননুভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব শিহরণ! অপরিচিত তরুণ আগন্তুকের স্পর্শে—এ কি বিচিত্র মোহ! তরুণী লজ্জা-সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া দৃষ্টি অবনমিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে কোমল করপল্লব আগন্তুকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লইল।

"এ কি অন্যায় মশাই—আপনি কুকুর সামলাতেই যদি না পারেন, তা হ'লে কুকুর পোষেন কেন; তাকে না বেঁধে বাইরেই বা আনেন কেন ?" প্রৌঢ় রাজেশ্বর বাবু তখনও দ্রুত-ধাবনজনিত পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিলেন। কন্যার দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি উৎকণ্ঠাভরে বলিলেন, "দেখি মা জ্যোৎস্না, হাতখানা। ইস্! রক্ত যে ঝুঁঝিয়ে পড়ছে!—আপনাকে কি বলতে ইচ্ছে করে বলুন দেখি!"

যাহার উদ্দেশে এই অনুযোগ, সে তখনও যেন তন্ময় হইয়া তরুণীর লজ্জানত অনিন্দ্যসুন্দর আননের দিকে নির্লজ্জের মত নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিল। অকস্মাৎ সে চমকিয়া উঠিল। সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু! ছিঃ ছিঃ, সে কি পরস্ত্রীর প্রতি এতক্ষণ নির্লজ্জের মত লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল ?

"আয় মা জ্যোৎস্না—ওখানটায় একটু বরফ দিই গে! সুধা, দৌড়ে যা, ঐ যে ঐ গাছতলাটায় বরফ-লেমনেডের দোকান—যা, যা। আপনাকে আর কি বলবো—"

হঠাৎ রাজেশ্বর বাবুর বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। পুঞ্জীভূত বিস্ময়, ক্রোধ ও ঘৃণা তাঁহার ললাটে রেখাপাত করিল। তিনি একদৃষ্টে অপরিচিত আগন্তুকের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আগন্তুক অপরিচিত যুবকও তাঁহার দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন স্থাপন করিল।

মুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করিয়া রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "চল, আমরা ঐ দিকেই যাই, সুধা এতক্ষণ বরফ কিনেছে বোধ হয়।" অপরিচিতের সহিত কোনওরূপ সম্ভাষণ না করিয়াই তিনি দ্রুতগতি অন্যদিকে অগ্রসর হইলেন। আগন্তুক তরুণীর দিকে এক পদ অগ্রসর হইল—তাহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল, "হাতের আঁচড়টা," —অমনই সে আত্মবিস্মৃতি হইতে জাগ্রত হইয়া আপনার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিকে সংযত করিয়া লইল। ছিঃ ছিঃ, এই তাহার শিক্ষা ? এই তাহার বংশের প্রভাব ?

তরুণীও বিস্মিত হইল। তাহার পিতা মৃদুভাষী সদালাপী পুরুষ,—তাঁহার বিনয় ও সৌজন্য সর্ব্বজনবিদিত। তবে ? তবে আজ তিনি এই অপরিচিতের প্রতি এমন ব্যবহার করিলেন কেন ? তাহারা ভ্রাতাভগিনী ছুটিতেছিল বলিয়া কুক্কুর তাহাদের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল। সে

মূল্যবান্ ওড়নাখানি বাঁচাইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল বলিয়া কুক্কুরের নখরাঘাত তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার জন্য কুক্কুরের প্রভু দায়ী হইবেন কেন? তিনি ত মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্রতুল্য বলবান্ অশান্ত কুক্কুরকে শান্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র দংষ্ট্রা-করাল-ভীষণ কুক্কুর একবারে শান্ত, সংযত হইয়াছিল, তাঁহার স্পর্শমাত্র একবারে তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সময়ে উপস্থিত না হইলে তাহাদের আজ কি বিপদই না সংঘটিত হইত! তুচ্ছ দুই একটা নখররেখাপাত—ইহার জন্য এত ক্রোধ, এত ঘৃণা! ভদ্রলোক কতই না অপদস্থ, অপমানিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন!

তরুণী চলিতে চলিতে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইল—তাহার দৃষ্টি স্নেহ, করুণা ও সহানুভূতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মুহূর্ত্তমাত্র—তাহার পরেই সে দ্রুতগমনে পিতার অনুসরণ করিল। কিন্তু তাহার সেই স্নিগ্ধ শান্ত আয়ত নয়নের দৃষ্টি অপরিচিত আগন্তুককে বিচলিত, অভিভূত করিয়াছিল।

যুবক তাহাদের চলন্ত মূর্ত্তির দিকে নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিয়া রহিল।

সহসা তাহার হাস্যপ্রফুল্ল সুন্দর আনন কঠোর গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, বিশাল ললাট চিন্তা-রেখাঙ্কিত হইল। দূর হইতে প্রীতিভোজনের উদ্যোগে ব্যাপৃত যুনানী বালক-বালিকার চিন্তালেশহীন উদার হাস্যধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল সমগ্র উদ্যান ব্যাপিয়া হর্ষ-কোলাহলের প্রবাহ বায়ুতরঙ্গে আকাশে উত্থিত হইতেছিল। আনন্দ—জীবনস্পন্দন—গতি—নিত্যনূতন। কিন্তু—কিন্তু—তাহার এই ব্যর্থ জীবনে এ সকলের কি আকর্ষণ আছে?

ক্ষণপরেই যুবকের ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যরেখায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, অপ্রসন্নতার ভাব যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইল। তাহার সঙ্কেতমাত্র শিক্ষিত কুক্কুর লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুবক শিস দিতে দিতে দীর্ঘ দীর্ঘ চরণবিন্যাস করিয়া উদ্যানের অপর প্রান্তের অভিমুখে চলিয়া গেল।

২

লুপ্তশ্রী, শোভাহীন, সম্পদহীন, বিস্তৃতায়তন বিশাল উদ্যান। মধ্যস্থলে প্রাসাদোপম বিরাট সৌধ, আশেপাশে একাধিক বিস্তৃত জলাশয়। আছে সবই, কিন্তু তাহাদের উপর যেন কাহার মঙ্গল হস্তস্পর্শের অভাব! ফুলফল, শাকশব্জী, আছে সবই, কিন্তু তথাপি কিছুই যেন নাই। যেন দেহ আছে, প্রাণ নাই, ছায়া আছে, কায়া নাই! এই উদ্যান যেন হাস্যকোলাহলে মুখরিত হইতে জানে না—যেন রিক্ততার করাল ছায়া ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, যেন নিবিড় নীরবতা এই বনভূমিতে শ্মশান জাগাইয়া রাখিয়াছে।

সোনা মালী বাগানের রক্ষক, মালিক সবই। সনাতন পালরা বংশানুক্রমে মালঞ্চের জমীদার বাবুদের এই বাগান-বাড়ীর রক্ষকতা করিয়া আসিতেছে। বাবুরা তাহাদের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। কর্ত্তাদের আমলে এই উদ্যান-বাটিকার সৌষ্ঠব ও গৌরব দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করিত। আর আজ?

সোনা আজ বড় বিপদে পড়িয়াছে। জমীদার বাবুর নামে সে এক মামলার 'নুটিশ' পাইয়াছে, অথচ আজ ছয় মাসেরও অধিককাল জমীদারের সহিত তাহার দেখা নাই! এ যেন, 'যার বিয়ে তার মনে নাই—পাড়া-পড়শীর ঘুম নাই!' এই সঙ্কটে সে নিরক্ষর চাষী কি করিবে? নায়েব মহাশয় মফঃস্বলে গিয়াছেন, ম্যানেজার বাবুও আলিপুরে এক মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে ব্যস্ত, এখানে আর কেহ নাই। বাবুকে কলিকাতার বাসায় পত্রের উপর পত্র দিয়াও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

বাগানের চারিদিকে আগাছায় ভরিয়া গিয়াছিল। প্রভুভক্ত মালী জঙ্গল পরিষ্কার করাইবার সময় দীঘির ভাঙ্গা ঘাটে বসিয়া ভাবিতেছিল, কি উপায়ে সে বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে? হস্তধৃত ছিলিমে টানের উপর টান দিয়াও সে মগজ ঠিক করিতে পারিতেছিল না। উদ্বিগ্নচিত্তে সে দেবতাদের চরণোদ্দেশে মানত করিতেছিল। দোহাই মা কালী! তাহার সর্ব্বগুণোপেত বাবুর মতিগতি ফিরাইয়া দাও!

হঠাৎ অপরিচিত বালকের কোমল কমনীয় কণ্ঠের হর্ষধ্বনির তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুনিয়া সনাতন চমকিত হইয়া উঠিল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? তাহার আরাধ্য প্রিয় দাদাবাবুর মধুর বাল্যের হাস্যকলোচ্ছ্বাস কি অতীতের যবনিকা তুলিয়া মুখরিত হইয়া উঠিতেছে? দীর্ঘকাল পরে উদ্যানশ্রী কি আবার ফিরিয়া আসিল? সনাতন বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কে এই দেবকুমারের মত অনিন্দ্যসুন্দর বালক নৃত্য-চপলচরণে দীঘির দিকে ছুটিয়া আসিতেছে? সনাতন দেখিল, তাহার তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ কি সুন্দর! তাহার পশ্চাতে তাহারই মত হাসির লহর তুলিয়া মন্থরগমনে অগ্রসর হইতেছে কে এই ভুবনসুন্দরী কিশোরী? কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ইহাদের মুখশ্রীতে! ইহারা কি ভ্রাতাভগিনী? পল্লীর নিভৃত বনভবনে ইহাদের অতর্কিত সমাগম কেন হইল, বৃদ্ধ সনাতন কিছুতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

জনমানবশূন্য, বনাকীর্ণ দীঘির পাড়ে বৃদ্ধকে দেখিয়া বালক থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্ভবতঃ সে ভাবিতেছিল, অন্যের অগোচরে ভাঙ্গা বেড়া দিয়া তাহারা পরের বাগানে প্রবেশ করিয়াছে, হয় ত সে জন্য এই বাগানের মানুষ তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে, লাঞ্ছিত হইতে হইবে। ভয়চকিত-নয়নে সে পশ্চাতে তাহার দিদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন তাহার পক্ষপুটে আত্মগোপন করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

ততক্ষণ তাহার দিদি দীঘির তটপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে। সনাতনকে দেখিয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ম্লানমুখে সে বলিল, "পোড়ো বাগান দেখে দুজনে ভিতরটা দেখতে এসেছিলুম। গাঁয়ে আমরা নতুন এসেছি কি না, তাই জানতুম না যে, বাগানে লোক আছে। আয় সুধা, বাড়ী যাই।"

সুধার হস্তধারণ করিয়া জ্যোৎস্না প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইল। সোনা বাধা দিয়া হাসিমুখে বলিল, "সে কি মা লক্ষ্মি, বাগান দেখতে এসেছ, দেখে যাও। বাবুদের ত মানা নেই। চল, আমি তোমাদের বাগান দেখিয়ে আনি গিয়ে। আর কি সে ছিরিছাঁদ আছে, মা? তোমাদের ত এ গ্রামে কখন দেখি নি। তোমরা কোন্ বাড়ীতে থাক?"

সোনার শিষ্ট আচরণে, মিষ্ট কথায় বালকের ভয় ভাঙ্গিল, জ্যোৎস্নাও আশ্বস্ত হইল। চাঁদমুখের জয় সর্ব্বত্র। সোনা ভাবিতেছিল, এমন রূপ সে কখনও দেখে নাই। ঠিক যেন দুর্গা-প্রতিমা। জ্যোৎস্না ভাবিতেছিল,—কি ফাঁড়াই কেটে গেল! দুষ্ট সুধার কথায় মাতিয়া পরের বাগানে—তা ভাঙ্গাই হউক আর নাই হউক—ফুল চুরি করিতে আসিয়া তাহাদের কি অন্যায়ই হইয়াছিল! রক্ষা, লোকটি বড় ভাল।

সে সনাতনের প্রদর্শিত পথে চলিতে চলিতে কথার জবাবে বলিল, "ঐ যে রাস্তার ওপারে ঐ ঝাউগাছওলা বাড়ী, ঐটে আমাদের। আমরা অনেক দিন পশ্চিমে ছিলুম কি না, তাই ওটাও পোড়ো বাড়ী হয়েছিল। এত দিন পরে বাবা আমাদের নিয়ে দেশে বাস করতে এসেছেন। তাঁর পেন্সন হয়েছে কি না, তাই আর হিল্লী-দিল্লী ক'রে বেড়াবার দরকারও নেই। দেশে ফিরে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া ক'রে ছিলুম আমরা। বাবা সেখান থেকে জঙ্গল সাফ করিয়ে বাড়ী মেরামত করিয়ে এইবার আমাদের এনেছেন।—বাঃ, কত বড় পুকুর!"

সুধাও উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদি, ওপারে দেখ না, কত রাঙ্গা রাঙ্গা ফুল ফুটে রয়েছে! কি চমৎকার!"

নিঃসন্তান বৃদ্ধ সনাতনের হৃদয় যেন আনন্দে দোলা দিয়া উঠিল। সে সুধার বাল-সুলভ আগ্রহ ও আনন্দের অভিব্যক্তিতে পরম প্রীতিলাভ করিল, বলিল, "ফুল নেবে, খোকাবাবু? ওখানে কত ফুল—জবার জঙ্গলই হয়ে গেছে। ঐ দেখ, লাল, নীল, সাদা, হলদে,—কত ফুল ফুটে রয়েছে। দাঁড়াও, আনিয়ে দিচ্ছি। ওরে খাতের আলি, হ্যানে আয়, হ্যানে আয়, দৌড় দে, দৌড় দে।"

জ্যোৎস্না বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ক্ষণপরে বলিল, "এত বড় বাগান, তা এমন বিশ্রী হয়ে রয়েছে কেন? চারদিকেই কাঁটাবন আর জঙ্গল, এত বড় বড় পুকুর, পানায় বোঝাই—"

সোনা বিষাদাভিমানজড়িত স্বরে বলিল, "হবে না, মা? যার ধন, সে যদি না দেখে, তা হ'লে কার সাধ্যি বাগান রক্ষে করতে পারে?"

জ্যোৎস্না বলিল, "কেন, তুমি? তুমি দেখ না কেন? বাবুদের তুমি কে হও?"

সোনা বলিল, "আমি? আমি তাঁদের চাকর। তা মা, মালিক না দেখলে চাকরে কি দেখবে বল দিকি? শুধু কি এই বাগান? বাবু যে আমাদের এ তল্লাটের রাজা। এই গাঁয়েই—পাশের গাঁয়েই তাঁদের ভিটে-বাড়ী দেখ যদি, মা! তা ছাড়া, কত জমী, কত খামার। আর জমীদারীর ত কূল-কিনেরা নেই। এই দেখ না, মা, এই মামলাটা বেধেছে, তা কেই বা দেখে, কেই বা শোনে! যা করে চাকর-বাকরে।"

জ্যোৎস্নার কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমার বাবুরা কি গাঁয়ে থাকেন না ?"

সোনা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হ'লে আর ভাবনা কি, মা! কর্ত্তাবাবু মারা গেলেন—সে আজ ছ' সাত বছরের কথা। গেল তিন বছর গিন্নীমাও দেহ রাখলেন। বস্! খোকা বাবু সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এক রকম বিবাগী হয়েই বেরুলেন।"

জ্যোৎস্নার মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "খোকা বাবু? তা, খোকাবয়সে বিবাগী হলেন কেন? গেরুয়া রুদ্রাক্ষি নিয়েছেন না কি ?"

সুধাও তাহার হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, "আর চিমটে? না দিদি, হরিদ্বারের মেলায় সেবার কত সন্ন্যিসী এসেছিল? উঃ, কত বড় বড় জটা—"

সোনা বলিল, "তামাসা না, মা, সত্যিই খোকা বাবু। তার বয়েস আর কত? এই কোলে পিঠে কত চড়েছে আমার বাবু—"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, নয়ন ছল-ছল করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বলিল, "থাক ও কথা। আচ্ছা, দীঘির ওপাড়ে ঐ যে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মন্দিরের ভাঙ্গা চূড়ো দেখা যাচ্ছে, ওটা কি মন্দির ?"

সোনা বলিল, "ওটা? ওটা মা, রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। কর্ত্তা বাবুর আমলে ওরই নাটমন্দিরে নাকারীতে সদাব্রত হত, অতিথ-ভিখিরী ত এখান থেকে ফিরে যেতো না।"

সুধা দিদির হাত ধরিয়া বলিল, "চল না দিদি, ঐটে দেখে আসি।"

জ্যোৎস্না দেখিল, বৃদ্ধ অনেকখানি পথ ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে সে বাধা দিয়া বলিল, "না, না, আয়, এই শাণের উপর খানিক বসি। এটা বুঝি উত্তরের ঘাট?"

সোনা কৃতজ্ঞ-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ মা, আর ওপাশে পশ্চিমের ঘাট, ওদিক্‌টায় না গেলেই ভাল। ঝোপ-জঙ্গলে ভ'রে গেছে, পোকা-মাকড়েরও ভয়ও যে নেই, তা নয়।"

সকলে ঘাটের শাণের উপর আসন গ্রহণ করিল। সুধা বলিল, "পোকা-মাকড়? ওঃ, তবে ত বড্ড ভয়!"

জ্যোৎস্না ধমক দিয়া বলিল, "তুই থাম, সব কথায় কথা কস্‌নি বলছি। আচ্ছা, তোমার খোকা বাবু সে সব তুলে দিলেন কেন?"

সোনা জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব, মা?"

জ্যোৎস্না বলিল, "এই সদাব্রত। ঠাকুরের সেবাও বুঝি আর হয় না?"

সোনা বলিল, "না মা, ঠাকুরের নিত্য-সেবার বন্দোবস্ত আছে, এই জন্যে মন্দিরটে কোন রকমে ঠেকো-ঠুকো দিয়ে রেখে দিইছি, পূজুরী রোজ সকাল-সন্ধ্যে পূজো দেয়, ভোগ আরতি দেয়। তবে সদাব্রত আর হয় না। বাবু কলকাতায় থাকে, দেশ-ঘর মাড়ায় না।"

এই সময় খাতের আলি এক রাশি ফুল আনিয়া ফেলিল। লাল, নীল, শ্বেত, পীত—কত বিভিন্ন বর্ণের সুগন্ধি ও গন্ধহীন ফুল। সুধা আনন্দে করতালি দিয়া ফুলের মালা গাঁথিতে বসিয়া গেল। সনাতনের হুকুমে সুমিষ্ট সুপেয় ডাব আসিল। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ভ্রাতা-ভগিনী ডাবের জল পান করিল। সোনা পরম তৃপ্তি বোধ করিল। বলিল, "দেখ ত মা, বাবুর কিসের অভাব? তবু নিজের জিনিষ কিছুই দেখবে না। পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খাচ্ছে। দুঃখু হয় না, মা?"

সোনার চক্ষু আবার জলভারাক্রান্ত হইল। জ্যোৎস্না বলিল, "কেন, তার লোকজন আছে ত? উকীল-মোক্তার?"

সোনা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "লোক-জন নেই, মা? সব আছে মা, সব আছে। উকীল, মোক্তার, নায়েব, গোমস্তা, বেলদার, বরকন্দাজ—কি নেই মা আমার বাবুর? কিন্তু মা, তারা যে মাইনে-করা চাকর, কার এত মাথাব্যথা? আমি তিন পুরুষের বাবুদের খেয়ে মানুষ বটে, কিন্তু মা, মুরুখ্‌খু চাষা লোক, আমি বড় জোর চিঠিটা আসটা লিখিয়ে বাবুকে জানাতে পারি, তার বেশী আমি কি করতে পারি, মা?"

জ্যোৎস্না এই সময়ে উচ্চস্বরে বলিল, "ওরে, ও দিকে কি করতে গেলি আবার সুধা, যে বিশ্রী জঙ্গল। চল, আমরাও উঠি, ঐ দিক্ দিয়েই বাড়ী ফিরে যাব।"

সোনাও ফুলের রাশি বহিয়া লইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। যাইতে যাইতে জ্যোৎস্না বলিল, "তা তুমি যাই বল বাপু, তোমার বাবুকে ত ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। বাপ-মা

ত চিরদিন কারও থাকে না, তা ব'লে আপনার কাযকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কে বল বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যায় কম বয়েসে?"

সোনা সখেদে বলিল, "ঐখেনেই ত রোগ, মা লক্ষ্মি? থাক্‌ত ঘরের লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ! তা হ'লে বাবুও গাঁ ছেড়ে চ'লে যেতো না, বিষয়-আশয়ও গোল্লায় যেতো না। থাক্ গে মা, আপনার কথা নিয়েই পাঁচ কাহন করলুম! তোমাদের কথা কও দিকি এখন। ঐ যে সামনের বাড়ীর কথা বল্‌লে, ওটা ত ছিল গিয়ে বোসেদের ভিটে। তেনারা ত আজ আট দশ বছর বিষয় আশয় বেচে কিনে কোথায় চ'লে গেছে। শুনেছি, তেনারা ত আর কেউ বেঁচেও নেই। তোমরা বুঝি তেনাদের ঠেঙ্গে কিনে নিয়েছ?"

জ্যোৎস্না বলিল, "তা ঠিক বল্‌তে পারি নে। তবে আমার বাবাও বোস, এ কথা শুনিছি। তাদের সঙ্গে বাবার কি সম্পর্ক, তা জানি নে—সে সব তিনিই বলতে পারেন। আমরা এত দিন পশ্চিমেই ছিলুম। উঃ, দুষ্টু, কত ফুল তুলিছিস বল দিকি?" ভ্রাতাকে অনুযোগ করিয়া জ্যোৎস্না সোনার মুখের দিকে তাকাইল। যেন সে ভ্রাতার অপরাধের জন্য লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চাহিতেছে!

সোনা বলিল, "আহা, নিক্ মা নিক্, কত ফুল নেবে আর খোকা বাবু!"

ভাঙ্গা ফটকের বাহিরে পদার্পণ করিয়া সোনা মিনতি-ভরা সুরে বলিল, "আবার এসো মা এই ভাঙ্গা বাগানে, আমি ছাড়া ত কেউ থাকে না এখানে। তোমাদের আমার বড্ড ভাল লেগেছে, মা।"

জ্যোৎস্না বলিল, "আসব বৈ কি। আমরা গাছপালা বড্ড ভালবাসি। দেখছ না, আমার ভাইটি কেমন ফুল-পাগ্‌লা?"

সোনা বলিল, "তার ভাবনা কি, মা? রাশ রাশ ফুল দেবো খোকা বাবুকে।"

বৃহৎ ঝুড়ি স্কন্ধে করিয়া রাশি রাশি তরি-তরকারী ফুল-ফল লইয়া এক ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। জ্যোৎস্না বলিল, "এ সব আবার কি?"

সোনা বলিল, "ও যৎকিঞ্চিৎ দিলুম—ছেলে কি মাকে দেয় না? এক দিনেই যে তোমায় চিনেছি মা—আমি যে সোনা, তোমার বুড়ো-হাবড়া ছেলে।"

বৃদ্ধের সরল উদার হাস্যে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বৃদ্ধেরই মত গম্ভীর স্বরে বালক সুধা এই সময়ে বলিল, "তা সোনা, তুমি যে বড় তোমার বাবুকে না জানিয়ে আমাদের এত সব জিনিষ বিলিয়ে দিলে?"

সোনা হাসিয়া বলিল, "ভাবছ বুঝি খোকা বাবু, সোনা চুরি ক'রে বাবুর মাল বিলিয়ে দিচ্ছে? না বাবু, সোনা আর যা হোক, চোর নয়। এ বাগানের ফল-ফুলুরি বাবু আমারে ভোগ করতে দিয়ে গেছে যে। বাড়ী আমার সদ্‌গোপ-পাড়ায় বটে, কিন্তু বাবুর হুকুমে ইচ্ছে হ'লে আমি এই বাগানবাড়ীতেও বাস করতে পারি। তা হ'লে আজ আসি, মা লক্ষ্মি! আবার এস মা!"

সনাতন ফিরিয়া গেল।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জ্যোৎস্নার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতেছিল—"এ কেমন বাবু যে, এত বড় মনোরম ও মূল্যবান্ সম্পত্তি অরণ্যে পরিণত হইবার অবকাশ দিয়া সহরের সুখ ও আরাম ভোগ করিতেছে!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

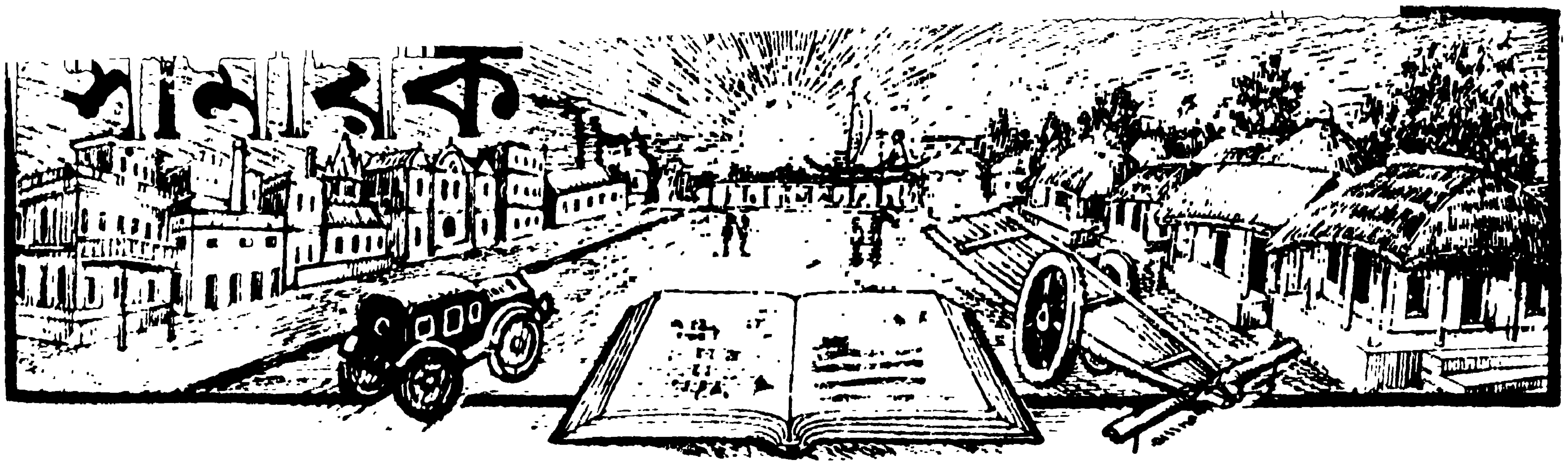

কংগ্রেস

এবার কংগ্রেসের সপ্তচত্বারিংশৎ অধিবেশনের কথা। পুরীতে অধিবেশনের কথা স্থির হইয়াছিল; কিন্তু যখন অধিবেশনের উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছিল, তখন বর্ত্তমান কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে পুরীকংগ্রেসের প্রায় তাবৎ উদ্যোক্তা ও কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়া দণ্ডিত হন। এই হেতু পুরীর অধিবেশন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

প্রথমে কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মনে অন্যত্র কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্কল্প উদিত হয়। তিনি দিল্লীকেই অধিবেশনের প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। তাঁহার ও অন্য কয় জন কংগ্রেসকর্ম্মীর অনুরোধে জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেসের এই অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। এপ্রেল মাসের শেষ-ভাগে অধিবেশনের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

মদনমোহন মালব্য

এ দিকে দিল্লীর চিফ কমিশনার এক অতিরিক্ত গেজেটে ২১শে এপ্রেল তারিখে ঘোষণা করিলেন যে, "১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৪নং অর্ডিনান্সের ৩ (ক) ধারা অনুসারে খাড়িবাওলি পল্লীতে অবস্থিত কংগ্রেস অভ্যর্থনা-সমিতির আফিসটি বিজ্ঞাপিত স্থান অর্থাৎ বে-আইনী বলিয়া বিঘোষিত হইল। কংগ্রেসের সপ্তচত্বারিংশৎ অধিবেশনকে ইতিপূর্ব্বে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যেহেতু ঐ সমিতির আফিস-গৃহ অবৈধ সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই হেতু এই ব্যবস্থা করা হইল।" ভারত সরকার নীরব নিশ্চেষ্ট থাকিলেও যখন তাঁহাদের অধীনস্থ দিল্লীর চিফ কমিশনার প্রথমে কংগ্রেস অধিবেশনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া পরে কংগ্রেস অভ্যর্থনা-সমিতির আফিস-গৃহকে বিজ্ঞাপিত স্থান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অন্যদিকে যখন শ্রীমতী সরোজিনী দেবী বিবৃতিতে বলিলেন যে, সরকার যে ব্যবস্থা করুন, দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবেই, তখন কি কাণ্ড ঘটিবে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেসের অধিবেশনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার সময় গুরুগম্ভীর স্বরে জানাইয়াছিলেন যে, এই কয় মাসে কংগ্রেসের আন্দোলনের বিপক্ষে অতিরিক্ত আইন ব্যবহার করিয়া যে শুভ ফল পাওয়া গিয়াছে, কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে দিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে এবং কংগ্রেসের নষ্টপ্রায় প্রভাব পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইবে।

সুতরাং সরোজিনী দেবীর কংগ্রেস অধিবেশনের চেষ্টার বিরুদ্ধে সরকারের ইজ্জৎ-রক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকি ছিল না। প্রথমেই সরোজিনী দেবীর পালা, বোম্বাই হইতে দিল্লীযাত্রার কালে সহরের আট মাইল দূরে বান্দ্রা ষ্টেশনে তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার বিচার ও কারাদণ্ড হইতেও বিলম্ব হয় নাই। তাহার পর পণ্ডিত মদনমোহন। তিনি প্রেসিডেণ্টপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দিল্লী-প্রবেশের পূর্ব্বে যমুনা-সেতুর সান্নিধ্যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করা হইয়াছিল

দিল্লী, লাহোর, কাশী, কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ সর্ব্বত্র সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছিল, সর্ব্বত্র পুলিসের কড়া পাহারা বসিয়াছিল, রেলষ্টেশনে পাহারার কড়াকড়ি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পাছে কেহ ফাঁকি দিয়া দিল্লী গিয়া পড়ে! এমনও হইয়াছে যে, পুলিসের পরিচিত কোন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী ঐ সময়ে কোন রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পুলিসের পাল্লায় পড়িতে হইয়াছে, দিল্লী যাইবার উদ্দেশ্য না থাকিলেও তাঁহাকে আটক পড়িতে হইয়াছে। বাঙ্গালার মৌলবী জালালুদ্দীন হাসেমীর দৃষ্টান্তই এ বিষয়ে জলন্ত। মানিনী রাই যেমন মান করিয়া কালোবরণ হেরিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া কালোচুল বাঁধেন নাই, কালোজলে স্নান করেন নাই, কালো অঞ্জন চোখে দেন নাই, পুলিসও তেমনই দিল্লী নাম শুনিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্দেহ হইলেই যাত্রীকে ধরিয়া আটক করিয়াছে!

কেন এই আতঙ্ক? কেন এই সাজ সাজ রব? এ দেশে কি সত্যই ভীষণ যুদ্ধ বা বিপ্লবের বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল? যুদ্ধের সময় সুপ্রতিষ্ঠ সরকার সাধারণ আইনের অতিরিক্ত অনেক অধিক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাই যথার্থ সঙ্কটশক্তি প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত সময়। এ দেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথায় কি সেই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল?

ভ্রান্ত পথ

ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোর পার্লামেণ্টে ও পার্লামেণ্টের বাহিরে একাধিক ঘোষণায় ভারতের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ত ইহার বিপরীত ধারণাই মনে উদয় হয়। সরকার পক্ষ যখন মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় প্রবর্ত্তন করিয়া দিল্লীর চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন, এই হেতু সরকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং শাসন-সংস্কার সফল করিবার উদ্দেশ্যে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য সাধ্যমত শক্তি ব্যবহার করিবেন। তাহার পর তিন মাস অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকার সাধ্যমত শক্তি-প্রয়োগে কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। কংগ্রেসের এই শক্তি-পরীক্ষায় সরকার জয়লাভ করিয়াছেন, ইহাও ভারত-সচিব ও বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন সরকারী কর্ম্মচারীর কথায় ও ঘোষণা বহু বারই প্রকাশ পাইয়াছে। মডারেট-শিরোমণি সার শিবস্বামী আয়ার বিলাতের এক পত্রে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই তিন মাসে সরকারের বিরাট শক্তির জয় স্বীকৃত হইয়াছে। দেশের অন্যান্য শ্রেণীর রাজনীতিকরাও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রবলপ্রতাপ সরকারের শক্তির বিপক্ষে নিরস্ত্র ও অহিংসাপন্থী কংগ্রেস কখনই দাঁড়াইতে পারিবে না; উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেসপন্থীরা গ্রেপ্তার হইয়া কারারুদ্ধ হইবেই। স্বয়ং ভারত-সচিব তাঁহার একাধিক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, তিন মাসে দেশের আবহাওয়া ফিরিয়াছে, কংগ্রেসের প্রভাব চূর্ণ হইয়াছে। তিনি যে সময়ে টেনিস খেলায় মনোযোগ না দেন, সে সময়ে সুযোগ পাইলেই প্রচার করেন যে, ভারত সরকার যে শাসননীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। পার্লামেণ্ট মহাসভা মুলতুবী রাখিবার প্রস্তাবকালে তিনি এই মর্ম্মেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে দিল্লীর কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য এত উদ্বেগ, এত চিন্তার কারণ কি? যেহেতু প্রচণ্ড-চণ্ডনীতির দূরবিসারী বাহুর বেড়াজাল কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে ও কর্ম্মিগণকে কারারুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তাহার ফলে কংগ্রেসের সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিশীর্ণ ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, সেই হেতু সরকারের বিপক্ষে সকল অসন্তোষ ও অশান্তির উৎস রুদ্ধ হইয়াছে, সরকারের ইহাই ধারণা হইয়াছিল।

সার স্যামুয়েল হোর

উদ্দেশ্য কি?

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, যদি সকল অসন্তোষ ও অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত হইত, তাহা হইলে কি দিল্লীর কংগ্রেস অধিবেশন বন্ধ করিবার জন্য দেশব্যাপী এই বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হইত? চারিদিকে পুলিসের এত কড়া পাহারা সত্ত্বেও দিল্লীর ক্লকটাওয়ারে ২৪শে এপ্রেল তারিখে দেড় শত প্রতিনিধি মিলিত হইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির ৫টি প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ দিন আমেদাবাদের বিখ্যাত ধনকুবের শেঠ রণছোড়দাস অমৃতলাল মহাশয়ের সভানেতৃত্বে কংগ্রেসের সপ্তচত্বারিংশৎ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, কংগ্রেসপন্থীদের মুখে এই কথাই প্রকাশ। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, কংগ্রেসের রিপোর্ট এবং গৃহীত প্রস্তাব-সমূহের মুদ্রিত বিবরণ জনতার নিকটে বিতরিত হইয়াছিল, ইহা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রের রিপোর্টেও জানা যায়। এক হাজার এক শত লোক কংগ্রেসের অধিবেশন, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে গ্রেপ্তার হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

ইহা হইতে কি বুঝা যায়? এই ব্যাপারে কংগ্রেসের যেরূপ উৎসাহ ও নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখা গিয়াছে, তাহাতে সরকারের অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগের ফল যে বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে, তাহা ত কোন নিরপেক্ষ দর্শকই স্বীকার করিবেন না। বস্তুতঃ কংগ্রেসকর্ম্মীরা যে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইয়াছেন, তাহার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। দিল্লীর ব্যাপারের পর কোন নিরপেক্ষ দর্শকই ভারতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় আকুল না হইয়া থাকিতে পারেন না।

উদ্বেগের কি কারণ নাই? উভয় পক্ষেই যখন শক্তি-পরীক্ষার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয্য, তখন অচির-ভবিষ্যতে শান্তির আশা কোথায়? উভয়ের মধ্যে তৎপরিবর্ত্তে বিরক্তি ও তিক্ততা ঘনীভূত হইতেছে। ইহা কি ভাল? তবে সরকার জানিয়া-শুনিয়া এই ধনুর্ভঙ্গপণ ত্যাগ করিতেছেন না কেন বুঝা যাইতেছে না। "ষ্টেটসম্যানের" মত সরকারের দমননীতির সমর্থনকারী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানপত্রও কি জানি কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন,—"শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মালব্যের গ্রেপ্তার সম্পর্কে ইহার অধিক আর কিছুই বলা যায় না যে, এ গ্রেপ্তার হইবে বলিয়া তাঁহারাও জানিতেন, আর যাঁহারা অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারাও জানিতেন। সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কংগ্রেসপন্থীরা কংগ্রেসের অধিবেশন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সুতরাং সরকার বলিতে যদি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সরকারকে বুঝা যায়, তাহা হইলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার আয়োজন সরকারকে দমন করিতেই হইত। এক পক্ষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিপক্ষে অপর পক্ষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করা ভিন্ন অন্য কি উপায় ছিল? কিন্তু তাঁহাদের গ্রেপ্তারে জনসাধারণের উৎকণ্ঠা পূর্ব্বাপেক্ষা

আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, ইহাতে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইতেছে যে, ভারতবর্ষ যে জলাভূমিতে অবতরণ করিতেছে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার পন্থা কেহই প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। এই প্রকৃতির অবাধ্যতা দমন করিয়া সরকার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু এই প্রকৃতির ভারতবর্ষের কল্পনা করাও কি সুখকর?" অবশ্য "ষ্টেটসম্যান" পরে ইহাতে থুড়ি করিয়া সামলাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু যাহাই করুন, তাঁহার প্রকৃত মনের কথা ইহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে।

এই প্রকৃতির ভারতবর্ষ বোধ হয় সরকারও পছন্দ করেন না। ওডয়ার সিডেনহ্যামের মত জনকয়েক ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্ত বুরোক্রাট এবং এদেশের কতক প্রবাসী য়ুরোপীয় ছাড়া কেহই পছন্দ করেন না, তাহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। কেবল কয় জন স্বার্থান্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষক প্রবাসী য়ুরোপীয় ব্যতীত ভারতবাসীদের মধ্যে কোন বে-সরকারী লোকই এই ধর্ষণ-নীতির পক্ষপাতী নহে। একাধিক মডারেট বা লিবারল এসোসিয়েশনই ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সরকারকে শাসননীতি পরিবর্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতের একাধিক ব্যবসায়ী সমিতি ইহা রদ করিতে বলিয়াছেন। অবশ্য খাঁ বাহাদুর, রায় বাহাদুর শ্রেণীর খেতাবধারী ও পেন্সন-ভোগী, জমাদার ও রাজন্য শ্রেণী,—অর্থাৎ যাঁহাদের 'খোঁটা' আছে, তাঁহারাই এই নীতি দ্বারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইবার আশায় সরকারের দমনকার্য্য সমর্থন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বিশেষ অধিকার ও ইজ্জৎকামী এদেশের প্রবাসী য়ুরোপীয়রা স্বার্থান্ধ মুষ্টিমেয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের সহিত একযোগে সরকারকে বুঝাইয়াছেন যে, কংগ্রেস অতি অল্প-সংখ্যক লোকের প্রতিষ্ঠান, দেশের অন্যান্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান-গণের সমবায় গঠিত হইলেই কংগ্রেসের আহ্বান বা উত্তেজনা বন্ধ হইবেই। সরকার দেশের লোকের ভাতের হাঁড়ীর খবর রাখিলেও এ ক্ষেত্রে যে এ সকল চক্রান্তের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাহা বলিলে বিশেষ অপরাধে অপরাধী হইতে হয় না। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কি এই ভাবে কার্য্য করিতেন, না এই ভাবে শাসনকার্য্য চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন? পশ্চিম-ভারতের লিবারল এসোসিয়েশানের আবেদনের উত্তরে বড়লাট লর্ড উইলিংডন বলিয়াছেন, "যত দিন কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যপন্থা বলবৎ থাকিবে, তত দিন অর্ডিনান্সের দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালনা করার কঠোরতা কোন-মতেই হ্রাস করা চলিবে না।" ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোর রক্ষণশীল দলের ইণ্ডিয়া কমিটীর সমক্ষে এক অভিভাষণ-পাঠকালে বলিয়াছিলেন—"আইরিশ ন্যাশানালিষ্টরা ও তাহাদের পরে সিনফিনরা আয়ার্ল্যাণ্ডে যে অবস্থা আনয়ন করিয়াছিল, ভারতে ঠিক সেই অবস্থাই উপনীত হইয়াছে। তখনকার আয়ার্ল্যাণ্ডের মত এখন ভারতে যাহারা গুপ্ত চক্রান্ত করিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিতেছে, তাহাদের বিপক্ষে আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষাকারীদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।"

অর্থাৎ সাধারণ আইনের দ্বারা শাসন করা যখন অসম্ভব (তা উহা প্রকাশ্য আইনভঙ্গকারীদের দ্বারাই হউক, বা গুপ্ত চক্রান্তকারী বিপ্লবাদের দ্বারাই হউক, যাহারই দ্বারা হইয়া থাকুক) তখন অসাধারণ আইন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শাসন করিতেই হইবে। সরকার আরও একটা কথা যখন তখন বলিয়া থাকেন যে, শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের উপযোগী শান্তি ও সন্তোষের আবহাওয়া সৃষ্টি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে; এই জন্যই অশান্তির মূল কংগ্রেসকে, তাহার কর্ম্মিগণকে এবং কার্য্যপন্থাকে দমন করার প্রয়োজন হইয়াছে। সরকারের ধর্ষণনীতি প্রবর্ত্তন ও পরিচালনা করার ইহাই উদ্দেশ্য।

উহা সফল হইবে কি?

অসাধারণ আইন ও অপরিমিত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া চারি মাসকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার পর সরকার কি তাঁহাদের শাসননীতিকে সাফল্যমণ্ডিত হইতে দেখিলেন? আর দুই মাসকালমাত্র সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্সের মেয়াদ আছে। ধরা যাউক, এই দুই মাসকালও অর্ডিনান্স দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে। কিন্তু তাহার পর? দুইটি উপায় আছে:—(১) অর্ডিনান্সের ধারাগুলি সাধারণ আইনের অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া, (২) আবার নূতন করিয়া অর্ডিনান্স জারী করা। অর্ডিনান্সগুলি পুনঃপ্রবর্ত্তন করাই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কি উহা নিয়মানুবর্ত্তিতার সম্পূর্ণ বিরোধী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না? আইন-সভার আইন-গঠনের ক্ষমতার বিকল্পে অর্ডিনান্স জারী করার ক্ষমতা বড়লাটের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে, এ কথা কেহ বলিতে পারেন কি? তাঁহাকে সাময়িক সঙ্কট নিবারণার্থে এই ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং অর্ডিনান্স অনুসারে শাসন করার যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সময় অতীত হইবার পর আর তিনি সেই অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন না। ঐ সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিবার ফলে সঙ্কটের কারণ দূর হইবে, এই আশায় তাঁহাকে অর্ডিনান্স জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। যদি ছয় মাসকাল অর্ডিনান্স ব্যবহার করিবার পরেও সঙ্কটের কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য? আবার নূতন করিয়া ছয় মাসের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করা যুক্তি-সঙ্গত, না বুঝা উচিত যে, অর্ডিনান্স যখন কার্য্যকর হয় নাই, তখন অন্য পন্থা অনুসরণ করিয়া দেশের অশান্তি ও অসন্তোষ দূর করা সঙ্গত। পার্লামেণ্টের "ষ্ট্যাটিউটে" আছে, "অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতে ছয় মাসের অধিককাল জারী করা চলিবে না"। যদি অর্ডিনান্স পুনঃপ্রবর্ত্তন করা পার্লামেণ্টের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে ষ্ট্যাটিউটে সে কথা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিত। সুতরাং পার্লামেণ্টের নির্দ্দিষ্ট নিয়মকানুন উল্লঙ্ঘন না করিয়া কিরূপে নূতন করিয়া অর্ডিনান্স জারী করা হইবে? ব্যবস্থা-পরিষদের সাহায্যে অর্ডিনান্স সমূহকে সাধারণ আইনের অঙ্গ করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু তাহা কি সম্ভব হইবে? বাঙ্গালার সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্সের একাংশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এ কথা সত্য। কিন্তু সকল প্রকার সঙ্কটশক্তি আইনই যে

আইন সভায় পাশ করিয়া লওয়া সহজ হইবে, এমন কথা কেহ বলিবে না। যদি পরিষদে উহা অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে বড়লাট সার্টিফিকেশান ক্ষমতাবলে উহা বলবৎ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু এই কার্য্যও কি আইনানুবর্ত্তী হইবে? উহা কি স্বেচ্ছাচারের নামান্তর নহে? এই দুই পন্থার কোন পন্থাই যখন গণ-তন্ত্রের যুগে বাঞ্ছনীয় নহে, বিশেষতঃ যখন ভারতবর্ষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে বলিয়া জগতে প্রচারিত করা হইয়াছে ও হইতেছে,—তখন এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য?

জাতীয়তার প্রবল উন্মেষ ও উত্তেজনা

দেশের লোকের মনে যে একটা প্রবল জাতীয়তার ও দেশ-প্রেমের অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে, উটপক্ষীর মত সাইমুন ঝড়ের সময় মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখিলে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না। এখন লর্ড আরউইন বর্ত্তমান সরকারের ধর্ষণনীতি সমর্থন করিলেও এবং মার্কিণ দেশের টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাত্মা গান্ধীর ও কংগ্রেসের দোষ কীর্ত্তন করিলেও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে চেমসফোর্ড ক্লাবে বলিয়াছিলেন, "এমন লোক আছেন, যাঁহারা ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলনে ও চিন্তাশক্তির উদ্বোধনে নগণ্য মুষ্টিমেয় লোকের আন্দোলনের আভাস দেখিতে পান। তাঁহাদের মতে এই আন্দোলন রাজদ্রোহ মূলক, উহা কঠোর শাসনের দ্বারা সহজেই দমন করা সম্ভব, সুতরাং উহাকে বর্ত্তমানের বিরাট আকার ধারণ করিতে দেওয়া কখনই উচিত হয় নাই। আমার মনে হয়, এই রোগনির্ণয় বাস্তু, উহা বিকৃত ভাবের পরিচায়ক এবং উহা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ভারতের বহু সম্প্রদায়, বহুশ্রেণী ও বহু সামাজিক

লর্ড আরউইন

অবস্থার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অথচ ক্রমবর্দ্ধমান যে আত্মানুভূতি বিদ্যমান আছে, তাহা আমরা যাহাকে জাতীয়তা বলিয়া অভিহিত করি, তাহারই নামান্তর। গ্রেট বৃটেন যদি ইহা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইবেন। আমি যাহা একাধিকবার বলিয়াছি, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, যদি আমরা কিছুমাত্র নমনীয়তা স্বীকার না করিয়া এই আত্মানুভূতিকে কঠোর ধর্ষণনীতির দ্বারা দমন করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে রাজা কেনিউটের মত নির্ব্বুদ্ধিতামূলক ভ্রমের পরিচয় প্রদান করিব।"

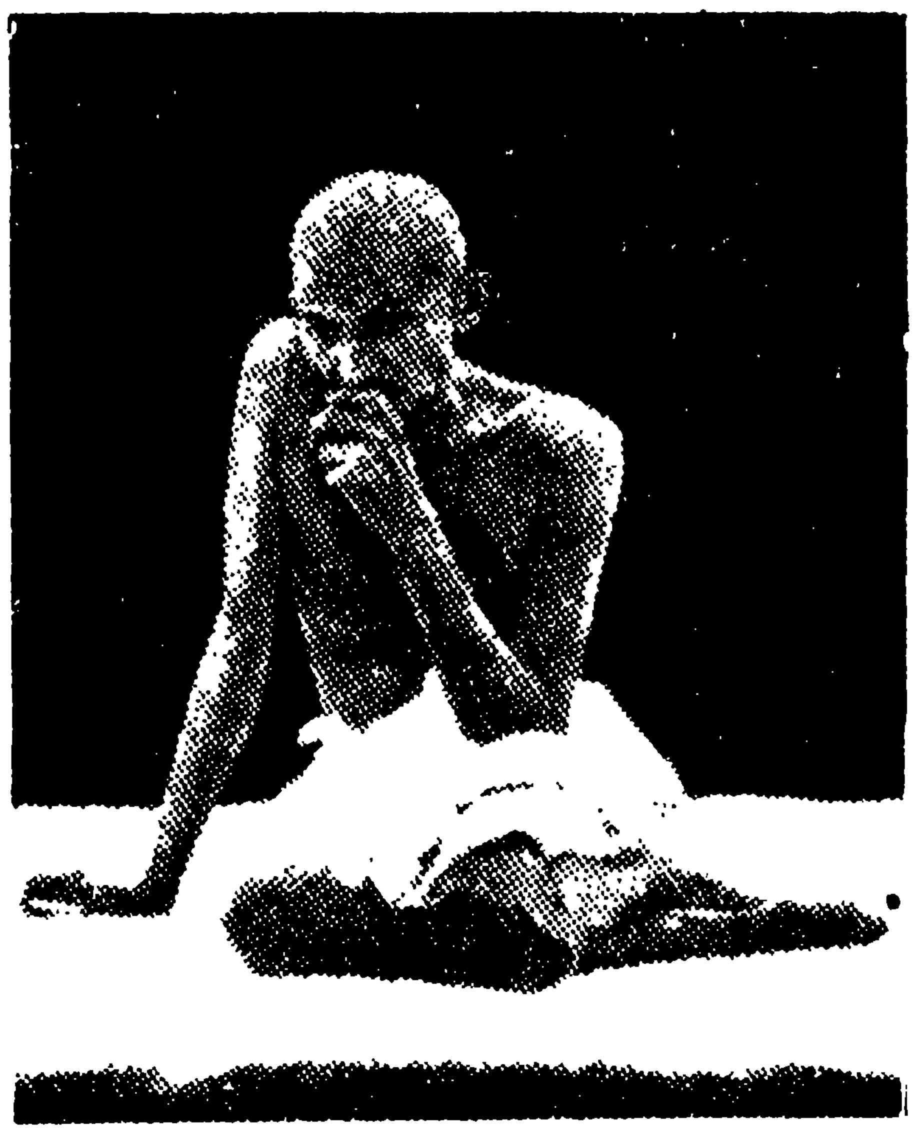

মহাত্মা গান্ধী

আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে রাজা কেনিউট সৈকতভূমি ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অরণ্যে রোদনই সার হইয়াছিল। তাঁহার চাটুকারগণের চৈতন্য উৎপাদনের জন্যই তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। আজ সেই ভাবে ভারতীয়ের জাতীয়তার প্রবল উন্মেষ ও উত্তেজনাকে কঠোর ধর্ষণনীতির দ্বারা দমন করিবার চেষ্টা করা হইলে তাহার ফল সন্তোষজনক হইবে না, ইহাই লর্ড আরউইনের অভিমত।

কংগ্রেসের দাবী

কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন অথবা সরাসরি কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, এই অভিযোগে তাঁহারা আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক ও পোষকগণের দৃষ্টিতে অপরাধী ও দণ্ডনীয় হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস যে এই জাতীয়তার উন্মেষ ও উত্তেজনার উদ্ভবের মূল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আজ কংগ্রেসের নেতা ও কর্ম্মীরা সরকারের বিচারে কারারুদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু এ যাবৎ যাঁহারা কংগ্রেসে যোগদান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই দেশের শীর্ষস্থানীয় এবং সুপণ্ডিত, মনীষী, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কংগ্রেসের মতের সহিত সকল শ্রেণীর বা সকল সম্প্রদায়ের লোকের মতেরই যে ঐক্য থাকিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। কংগ্রেস যে পথ অবলম্বন করিয়া শাসকজাতির সহিত জাতির জন্মগত দাবীর সম্বন্ধে একটা আপোষ বন্দোবস্তে উপনীত

হইতে চাহে, সে পথ সকলেই প্রশস্ত পথ বলিয়া মনে করিবেন, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু কংগ্রেস দেশবাসীর জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে যে দাবী করিয়া থাকে, তাহা কোন ভারতবাসীই সমর্থন না করিয়া পারেন না। তাই কথা, এই দাবী পূর্ণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি ?

অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি "ইণ্ডিয়া রিভিউ" পত্রে দীর্ঘ প্রবন্ধে অন্য কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"সার স্যামুয়েল হোর মিঃ গান্ধী, ডাক্তার আনসারী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত শাসনসংস্কারের বিষয়ে পরামর্শ করিতে চাহেন নাই। তবে যখন শাসনসংস্কারের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবে, তখন তিনি কাহার সহিত পরামর্শ করিতে চাহেন ? সার তেজবাহাদুর ও বন্ধুরা খুবই যোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভারতের জনসাধারণের উপর তাঁহাদের প্রভাব নাই। কংগ্রেসের বুদ্ধির যতই দোষ

ডাঃ আন্সারী

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

থাকুক, কংগ্রেস যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছে, তাহার যতই ত্রুটি থাকুক, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের পক্ষ হইতে কথা কহিবার অধিকার কংগ্রেসের মত আর কাহারও নাই। সার স্যামুয়েল বিলক্ষণ জানেন যে, কারারুদ্ধ কংগ্রেস-নেতারা যে বন্দোবস্ত সমর্থন করেন না, সে বন্দোবস্ত কিছুতেই সফল হইতে পারে না। তাঁহাদের কারাগারে অবস্থানের প্রতি দিন ক্রোধ ও বিরক্তি বৃদ্ধি করিতেছে ; ফলে আপোষ বন্দোবস্ত করা ইহার পর অত্যন্ত কঠিন হইবে। সরকার যে প্রকৃতির অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন, ইহা কখনই ন্যায়পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইতে পারে না। যেহেতু অর্ডিনান্স বল ও ভয় প্রদর্শন করে, সেই হেতু জনমত উহার প্রতি বিরূপ হইবেই। বর্ত্তমান শাসকরা ভারতবাসীর মুক্তির আকুল আকাঙ্ক্ষা শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা দমন করিতে চাহেন। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য নিশ্চিতই ব্যর্থ হইবে।"

বন্ধুর মত যাঁহারা এইরূপ পরামর্শ দিতেছেন, তাঁহাদের পরামর্শ এখন বিষবৎ বোধ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। বিলাতের 'নিউ ষ্টেটশম্যান' পত্রও মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "যদি মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ভারতে কণামাত্র প্রভাব বজায় রাখিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রয়োজন হইলে তাঁহার কয় জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। দমননীতি প্রত্যহ বহু মডারেটকেও চরমপন্থীতে পরিণত করিতেছে। যাহাই বলা হউক, কংগ্রেস যে বহুসংখ্যক ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর প্রতিভূ, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যদি ইতিহাসে যশঃ অর্জ্জন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার সরকারের আমলে উভয় পক্ষের সম্মতিসূচক চুক্তিও অসম্ভব করিয়া তুলিবেন না। বর্ত্তমানে যাহার অভিমতকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার মনস্তুষ্টি বিধান করাই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য।" এ পরামর্শও কি এ যাবৎ গৃহীত হইয়াছে ?

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

শেষ কথা

কিন্তু বর্ত্তমানে শান্তির আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হইতেছে। ভারতসচিব সার স্যামুয়েল হোর পার্লামেণ্টে ইণ্ডিয়া আফিস ভোটের তর্কবিতর্ককালে বলিয়াছেন,—"দ্বৈত-নীতি (দমন ও শাসন-সংস্কার গঠন) ভারতে অতি শুভফল আনয়ন করিয়াছে। অশান্তি উপদ্রব অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং দেশ একবারে সুখসমৃদ্ধিতে উথলিয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস আন্দোলন মরিয়া গিয়াছে, কৃষাণেরা খাজনা দিতেছে, সরকারী রাজস্ব বেশ আদায় হইতেছে, প্রজারা স্বচ্ছন্দে আছে, আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাজার ক্রমে ভাল হইতেছে, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যও ক্রমশঃ বাড়িতেছে।" ভারতের অবস্থা সোনার চশমা পরিয়া এই ভাবে দেখিবার পর তিনি ভবিষ্যৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কেহ কেহ বলিতেছেন, একটা মিটমাট করিয়া বর্ত্তমান দমননীতির অবসান করা উচিত, কেন না, তাহা হইলে শাসন-সংস্কার গঠনে সকল পক্ষের সহায়তা পাওয়া যাইবে। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত রফারফির কথা উঠিতেই পারে না। যত দিন সঙ্কটশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন থাকিবে, তত দিন অর্ডিনান্সগুলি বলবৎ রাখা হইবে।"

ইহাই যদি সার স্যামুয়েলের সুবিবেচিত অভিমত হয়, তাহা হইলে অচির-ভবিষ্যতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার কোন আশা নাই বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। সার স্যামুয়েল ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে একমত ; সুতরাং অধ্যাপক

আরল্ড ল্যাস্কি, ফ্রিম্যান, প্রাইভা, মিঃ বার্ট্রাণ্ড রাসেল, মিঃ ল্যান্সবারি প্রমুখ মনীষীরা রফারফির যতই সুপরামর্শ দিন, বর্ত্তমান ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠ থাকিতে এবং সার স্যামুয়েল ভারতের ভাগ্যবিধাতৃপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে তাঁহারা যে মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের সহিত কোন মিটমাট করিবেন না, ইহা নিশ্চিত। বোধ হয়, তাঁহাদের ধারণা, ইহাতে বৃটিশ-রাজের ইজ্জৎ নষ্ট হইবে, উচ্চশির নত হইবে! এ ধারণা কিসে হইল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এ দেশে দারুণ অর্থসঙ্কট, দ্রব্যসামগ্রীর দর নাই, কৃষক বা জমীদার সকলেরই ঘরে অন্নাভাব অর্থাভাব, ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা অতীব মন্দ, বহু প্রজা অর্থ ও অন্নাভাবে ভিক্ষা করিতেছে, বহু মধ্যবিত্ত লোক চাকরী হারাইয়া অথবা বেতন কম পাইয়া একরূপ বেকার বসিয়া আছে, কেহ কেহ পুত্র-পরিবারকে অন্ন যোগাইতে না পারিয়া পাপানুষ্ঠান করিতেছে, জমীদারের জমীদারী নীলামে উঠিতেছে, আইনের কড়াকড়ির ফলে অশান্তি উপদ্রব ও অনাচারের সংবাদ প্রকাশ না পাইলেও দেশের সর্ব্বত্র যে অশান্তি ও অসন্তোষানল ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে,—এ সকল কথা সত্য হইলেও সার স্যামুয়েল এ সম্বন্ধে হয় সত্য সংবাদ পান নাই, না হয় তাঁহার সাধের দ্বৈতনীতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এইরূপ প্রচার দ্বারা তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে ও দেশবাসীকে ভারতের সুখসমৃদ্ধির উচ্ছ্বসিত সুখতরঙ্গের সংবাদ দিয়া নিশ্চিন্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

তবে সার স্যামুয়েল রফার আভাস যে একবারে দেন নাই, এমন কথা বলা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, "যে কেহ আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, সরকার তাহার সহিত সহযোগ করিতে পারেন না। গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, যদি মিঃ গান্ধীর সেই সম্বন্ধ পুনরুজ্জীবিত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কোনও মধ্যস্থের সাহায্য না লইয়াও তিনি অনায়াসে সরকারকে সে কথা জানাইলে পারেন। সরকারও তাহা হইলে আন্তরিকতার সহিত তাঁহার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।"

কিন্তু এই অনুগ্রহ-প্রদর্শনেরও একটা সর্ত্ত আছে। সার স্যামুয়েল স্পষ্ট ভাষায় উহা ব্যক্ত করিয়াছেন,—"তবে আমি একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহি যে, মিঃ গান্ধীর সহযোগ-লাভের জন্য সরকার কোনও সর্ত্ত করিয়া সহযোগ লাভ করিতে প্রস্তুত নহেন।"

কেমন, নগদ বিদায় ত? অস্য সরলার্থ,—সরকার পক্ষ ইচ্ছামত সর্ত্ত দিবেন বটে, কিন্তু অপর পক্ষে মহাত্মা গান্ধী ও তথা কংগ্রেসকে বিনা সর্ত্তে সরকারের সহিত সহযোগ করিতে হইবে! কোনও আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এমন সর্ত্তে সম্মত হইতে পারেন বলিয়া ত মনে হয় না। বিশেষতঃ যাঁহারা একটা মূলনীতির জন্য কষ্ট-বিপদ বরণ করেন, কঠোর ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা যে বিনা সর্ত্তে পদানত হইবেন, এমন ত মনে হয় না। তবে কি উভয় পক্ষে এই ভাবেই সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে?

রক্ষণশীলদের এখন যেরূপ প্রাধান্য, তাহাতে সার স্যামুয়েলের এই প্রস্তাবও যে তাঁহাদের মনঃপূত হইবে না, ইহা জানা কথা। পূর্ব্বে সাম্রাজ্যবাদিশ্রেষ্ঠ উইনষ্টন চার্চ্চিল সার স্যামুয়েল ও তাঁহার ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের পিঠ চাপড়াইয়া বাহবা দিয়া বলিয়াছিলেন, "বা ভাই সব, বেশ করিয়াছ। গান্ধী ও তাঁহার দলবলকে জেলে পুরিয়া খুবই রাজনীতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছ। তোমরা ভারতের জন্য শাসন-সংস্কার করিতেছ, কর, কিন্তু দেখিও, যেন ভারতের মূক জনসাধারণকে বেঘোরে ফেলিও না। আর ভারতবাসীকে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করিও না। যতটুকু দিবে, তাহার কম কথা দিও।" সার স্যামুয়েল যে ইহা হইতে পূর্ণ প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাহার পরও কিন্তু তাঁহার নিস্তার নাই! "মর্ণিং পোষ্ট" পত্র তাঁহার বক্তৃতার পর বলিয়াছেন, "এ সব কি কথা? পালের গোদাকে কারামুক্ত করিয়া রফার কথা কি বলিতেছ? আরে! ভারতের কাছে আবার আমাদের শাসনের কৈফিয়ৎ কি? আমরা ভারত ছাড়িলেই যখন ভারতের সর্ব্বনাশ, তখন আমাদিগকে ভারতে থাকিতেই হইবে, ইহা যেন তোমরা কখনও ভুলিও না।" "ডেলি টেলিগ্রাফ" পত্র উপদেশ দিয়াছেন, "মিঃ গান্ধীর সহযোগ পাইবার জন্য যেন তাঁহার সহিত কোনও রূপ লেনদেনের সর্ত্তের কথা তোলা না হয়।"

এই সব দেখিয়া শুনিয়া কি বলিতে ইচ্ছা করে? বিধাতা যাহা মাপিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই হইবে, কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত অমঙ্গলের মেঘে ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিয়া ভারতের হিতকামিমাত্রেরই মন আতঙ্কিত হইতেছে।

কাশ্মীর ও হাইড্রাবাদ

কাশ্মীর দরবার গ্লান্সি কমিটী বসাইয়াছিলেন। সেই কমিশন কাশ্মীর জম্মুর প্রজাবর্গের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বহুদিনব্যাপী এবং দূরবিসারী তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন এবং সেই রিপোর্টের অনুযায়ী যে সকল প্রতীকার-ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কাশ্মীরের মহারাজা বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া সেই রিপোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতীকারব্যবস্থার আদেশ দিয়াছেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারাজা গ্লান্সি কমিশন বসাইয়াছিলেন। কমিশন কাশ্মীর ও জম্মুর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক প্রজা কমিশন বর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট প্রজা যথাসাধ্য কমিশনের সহিত সহযোগ করিয়াছিল এবং কমিশনের সমক্ষে বহুল পরিমাণে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছিল। এত অধিক সাক্ষ্য গ্রহণ এবং তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশে ৬ মাসের অধিককাল ব্যয়িত হয় নাই, ইহা কমিশনের পক্ষে কৃতিত্বের কথা।

অভাব অভিযোগ বিস্তর। তন্মধ্যে অধিকাংশই তুচ্ছ, যথা,—(১) মন্দির বা মসজিদের সীমানা নির্ণয়, (২) কোন এক অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা বর্জ্জন, (৩) শ্রীনগরবাসীদের নৌকা ঘাটে বাঁধিবার স্থান ও অধিকার নির্ণয়, (৪) লাদাক প্রদেশের

অধিবাসীদের 'ছং' নামক মাদকদ্রব্য সেবন। এগুলিও কমিশন বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রধান অভিযোগ দুইটি :—(১) শিক্ষার অসুবিধা, (২) সরকারী চাকুরীর অসুবিধা। বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ অভিযোগ দুইটি মুসলমান প্রজাদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু কমিশনের রিপোর্টের কোথাও এমন কথা নাই, যাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, দরবারের শিক্ষানীতিতে হিন্দু ও মুসলমান প্রজার মধ্যে কোনও রূপ তারতম্য করা হয়, অথবা যে ভাবে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়, তাহাতে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রজার মধ্যে তারতম্য করা হয়। তবে কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন যে, গত ১৬ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাদান সম্পর্কে দরবার যখন বিশেষ কোন উন্নতিসাধন করেন নাই, তখন শিক্ষাদানের ব্যবস্থার উন্নতি করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করা বিশেষ প্রয়োজন।

চাকুরীর নিয়োগ সম্বন্ধে কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন যে, যত দিন রাজ্যে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার ব্যবস্থা না হইবে, তত দিন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের হস্তে অধস্তন চাকুরী দানের ক্ষমতার উপর তীক্ষ্ণ নজর আবশ্যক। কমিশন চাকুরী নিয়োগের যোগ্যতা-পরিচায়ক কয়টি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই নির্দ্দেশমত প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়া উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন করিতে হইবে এবং যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি এ বিষয়ে কোনও রূপ অবিচার করা না হয়, তাহা দেখিতে হইবে।

কমিশন বলিয়াছেন, "যে সকল বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, মুসলমানরা সেই সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া সরকারী চাকুরীতে আপনাদের সমাজের প্রতিনিধিসংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন, এই আশা করা যায়।"

দরবার যে এ যাবৎ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করেন নাই, তাহা রিপোর্টেই প্রকাশ। তবে দরবারের হিন্দু রাজপুরুষরা কোন কোন স্থলে যে দরবারের অগোচরে এবং বিনা অনুমতিতে মুসলমান প্রজাদের ন্যায্য বা প্রাপ্য অধিকার দেন নাই, এমন হইতে পারে। মহারাজা কমিশনের পরামর্শ অনুসারে প্রজার অভাব অভিযোগ দূর করিতে অবহিত হইয়াছেন এবং তদনুরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছেন। মুসলমান পক্ষ হইতে ইহাতে বিশেষ আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু পক্ষে কিছু অসন্তোষ লক্ষিত হইবেই। যাহাতে যোগ্যতাই রাজকার্য্যে নিয়োগের মাপকাঠি হয়, সে দিকে খরদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

মহারাজা সুব্যবস্থা করিতে কালবিলম্ব না করিলেও তাঁহার বিপক্ষে বিলাতে প্রচারকার্য্যের বিরাম নাই। 'ইণ্ডিয়া এম্পায়ার সোসাইটী' নামে লণ্ডনে এক খুনা সাম্রাজ্যবাদী সমিতি আছে। এই সমিতির সার মাইকেল ওডয়ার, লর্ড সিডেনহাম, সার লুই ষ্টুয়ার্ট প্রমুখ নামজাদা সদস্যগণ 'টাইমস' পত্রে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, "সংবাদপত্রের খবর পড়িয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে ভারত হইতে সংবাদ পাইয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, কাশ্মীরে অবিলম্বে এক নিরপেক্ষ এবং কার্য্যদক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। যাহাতে কাশ্মীরের প্রজা শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিতে পারে, তাহা বৃটিশ সরকারের দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

এই শ্রেণীর ধুরন্ধরদের হিন্দুর বিপক্ষে এই জেহাদের উৎস কোথায়, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহারা হিন্দু নামেই ক্ষেপিয়া যায়। ইহারা এতই 'নিরপেক্ষ' যে, ভারতের হাইদ্রাবাদ, জুনাগড়, ভূপাল, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি রাজ্যের প্রজার নানা অভাব অভিযোগের কারণ থাকিলেও সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে না; কারণ, সেগুলি মুসলিম রাজ্য! অন্য পরে কা কথা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান রাজ্য হাইদ্রাবাদে হিন্দু প্রজার কি দুরবস্থা, তাহার কিছু পরিচয় দিতেছি।

নিজাম-রাজ্যের লোকসংখ্যার অধিকাংশই হিন্দু, অথচ নিজাম-রাজ্যের রাজা মুসলমান। কাশ্মীরের রাজা হিন্দু, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। এরূপ অবস্থা হইলে প্রজাদের মনে সদাই সন্দেহ হয় যে, তাহাদের প্রতি রাজা অবিচার করিতেছেন। নিজাম-রাজ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার প্রজার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অত্যধিক হইলেও হিন্দু প্রজা সরকারী চাকুরী, শিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার উপভোগের ব্যাপারে অতিমাত্রায় অসুবিধা ভোগ করে, এইরূপ অভিযোগ সংবাদপত্রে একাধিকবার প্রকাশ পাইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, নিজাম-রাজ্যের হিন্দু প্রজার সংখ্যা শতকরা ৮৫ জন হইলেও উক্ত রাজ্যের ১৩৪১ ফসলী বৎসরের বাজেট হিসাবে জানা যায়, মুসলমান সমিতি-সমূহের জন্য ৫০ হাজার টাকা সরকারী ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে এবং মুসলিম সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ হইয়াছে ১৭ হাজার ৫ শত টাকা। ইহা ছাড়া মুসলমান প্রতিষ্ঠান-সমূহের জন্য সরকারী তহবিল হইতে প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সরকার যে বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে শতকরা ৯৫ টাকা মুসলমান-ধর্ম্মের পুষ্টি ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। বায়তি দানের মধ্যে মুসলমান প্রজাগণকে এই বৎসরে দেওয়া হইয়াছে ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৮ শত ৩০ টাকা। আর হিন্দু প্রজাকে? এই বাবদে দেওয়া হইয়াছে মাত্র ১৩ হাজার ৮ শত ৮৪ টাকা!

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশেষ ব্যাপারে এই বৎসরে মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে ২ লক্ষ টাকারও উপর, আর হিন্দুদিগকে মাত্র ১৩ হাজার টাকা। নেজ্দ্ মুসলমান রাজ্যের প্রজাদের সাহায্যার্থে গত ৫ বৎসরের মধ্যে ৯ লক্ষ টাকা, লণ্ডনের মসজিদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা, আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ লক্ষ টাকা, দিল্লীর জামি-ই-মিলিয়ার জন্য ২০ হাজার টাকা এবং পানিপথ মুসলিম স্কুলের জন্য ২০ হাজার টাকা। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর মুসলমান প্রতিষ্ঠান-সমূহের জন্য এ যাবৎ ২ লক্ষ টাকা দিয়া আসা হইতেছে!

নিজাম-রাজ্যের সরকারী শীর্ষস্থানীয় চাকুরীগুলি প্রায় মুসলমানের একচেটিয়া। ইহা ছাড়া অন্যান্য চাকুরীও সংখ্যাধিক হিন্দুর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। ইহা ছাড়া অন্য নানারূপ অধিকার-ভোগের ব্যাপারেও হিন্দুর ভাগ্যে অতি সামান্য অংশই বন্টিত হইয়াছে।

এ সকল অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও নিজাম-রাজ্যের হিন্দু প্রজা দরবারের বিপক্ষে কখনও কোনও রূপ বিদ্রোহের ভাব পোষণ করিয়াছে অথবা এ জন্য কোনও রূপ বিরুদ্ধ আন্দোলন

করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তাহারা তাহাদের রাজার দরবারে হয় ত আবেদন-নিবেদন করিয়াছে, এইটুকুমাত্র হইতে পারে। ইহাই কর্ত্তব্য। রাজন্য-রাজ্যের রাজা প্রজার মধ্যে পরস্পর আপোসে সংস্কারের বা অবস্থা-প্রতীকারের কথা হইতে পারে, কিন্তু যদি বাহিরের লোক ক্রমাগত রাজন্যদের অনাচার ও কুশাসনের কথা তুলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগাইবার চেষ্টা করে এবং বৃটিশ সরকারকে তাঁহাদের বিপক্ষে উত্তেজিত করে, তাহা হইলে উহার ফল ভাল হয় কি? রাজন্য রাজ্য-সমূহে অনেক সংস্কার করিবার আছে, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু উহার জন্য মিথ্যা প্রচারকার্য্য চালাইবার সার্থকতা কি? ইহা কি দুরভিসন্ধিপ্রসূত নহে?

বিভীষিকা

মেদিনীপুরে আবার নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাহিত হইয়াছে। এই মেদিনীপুরেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডি আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছিলেন। এবারও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডাগলাস আততায়ীর গুলীতে নিহত হইলেন। জেলা বোর্ডের সভায় নেতৃত্ব করিবার কালে তাঁহার প্রতি এই নিষ্ঠুর নৃশংস কাণ্ড আচরিত হইয়াছে। পুলিস যাহাকে হত্যাকারী সন্দেহে আটক করিয়া রাখিয়াছে, প্রকাশ, তাহার নিকট হইতে একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছে, উহাতে লিখিত আছে, "হিজলির কার্য্যের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিশোধ।" যদি বিচারে এ কথা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, এই হত্যাকাণ্ডের মূল বিপ্লবীর বিভীষিকা। এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সহিত অন্য কেহ সংশ্লিষ্ট হইতে পারে, এ বিশ্বাস হয় না। তবে যদি এ বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণ থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, মিঃ ডাগলাসের প্রতি কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণ ছিল না। বিশেষতঃ হিজলির ব্যাপারের সম্পর্কে কাগজে লিখিত রচনার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই কাণ্ড যে বিপ্লবীর বিভীষিকার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এরূপ হত্যাকাণ্ড নূতন নহে, ইহার বিরুদ্ধে দেশের জনমত বার বার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। এরূপ জঘন্য ও নৃশংস প্রতি প্রকৃত দেশহিতকামীর কোনও সহানুভূতি ইহাতে বরং দেশের ও জাতির সমূহ ক্ষতি হইতেছে, দেশের অগ্রগতির সময় পিছাইয়া যাইতেছে। এ বার বার বলিলেও অপরিণামদর্শী, বিচারবুদ্ধিহীন নির্ম্মম বিভীষিকাবাদী বিপ্লবীরা তাহাতে কর্ণপাত করে সরকারও এই পাপকার্য্যের বিরুদ্ধে আইনের অতিরিক্ত প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের সাধ্যমত উহা দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। এক শ্রেণীর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলিয়া থাকেন, দেশের লোক যদি এ বিষয়ে পুলিসকে সহায়তা করে, তাহা হইলে বিপ্লববাদ দমন হইতে পারে। কিন্তু সরকারের শক্তিমান এবং অর্থসম্পদসম্পন্ন গোয়েন্দারা যখন চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াও এই ব্যাপারের উচ্ছেদসাধন করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন জনসাধারণ কি করিতে পারে? বিপ্লবীরা গোপনে কার্য্য করে, তাহাদের আপনার জন কেহ নাই, বাপ মা ভাই ভগিনী—এ সকল সম্বন্ধ তাহারা রাখে না,—একাধিক বোমা বা বিপ্লবীর ষড়যন্ত্রের মামলার বিচারকালে এ সকল কথা জানা গিয়াছে। এ দিকে প্রত্যক্ষ দেখাও যাইতেছে যে, বিপ্লবীরা দেশী বিদেশী বাছে না—তাহাদের প্রয়োজন হইলেই বিপক্ষদলের লোককে (পুলিস বা শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে) হত্যা করে, আবার দেশের লোকের বাড়ীতেই ডাকাতী করে।

তাহারা যে আপনাদের সন্ধান দেশের লোককে দিবে, এমন সম্ভব হয় না। সরকারও কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। মুখে তাঁহারা যতই দৃঢ় ও কঠোর শাসনের দ্বারা ইহা দমন করিবার ঘোষণা করুন, কিন্তু অন্তরে তাঁহারা কি মুষ্টিমেয় লোকের অপরাধে সমাজের সমগ্র নরনারীকে অতিরিক্ত কড়া শাসনের আমলে অধিক দিন রাখিতে চাহেন?

বিমানে রবীন্দ্রনাথ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পারস্যের শাহ রেজা খাঁ পেলভির আমন্ত্রণে পারস্যদেশে গমন করিয়াছেন। হাফেজ, সাদি, ওমর খৈয়মের দেশে, সিরাজী ও বুলবুলের দেশে জগদ্বরেণ্য বাঙ্গালী কবির এই আমন্ত্রণ যোগ্য ও শোভনই হইয়াছে।

এমন আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথের বহু দেশ হইতেই হইয়াছে। তবে এবার নিমন্ত্রণ-রক্ষার ব্যাপারে অভিনবত্ব আছে। কবীন্দ্র এবার বিমানযোগে পারস্যযাত্রা করিয়াছেন। সপ্ততিবর্ষ বয়সে কবির এই উদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয়। এ উদ্যম এই ভয়ভীত জাতির তরুণগণেরও অনুকরণীয়।

কবি বোধ হয় বিমানযাত্রাকালে অমর কবি কালিদাসের সেই জগদ্বিখ্যাত শ্লোকটি একাধিকবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন:—

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে।

পরলোকে চিত্রশিল্পী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপ্রবীণ চিত্র-শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৩শে চৈত্র, ৭৪ বয়সে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। বামাপদ বাবু যে যুগে চিত্রশিল্প-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, সে যুগে চিত্রশিল্পের এত সমাদর ছিল না। কোন বাঙ্গালী চিত্রশিল্পীও সে সময়ে সম্মান গৌরব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। বামাপদ বাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান—পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি চিত্রকলার

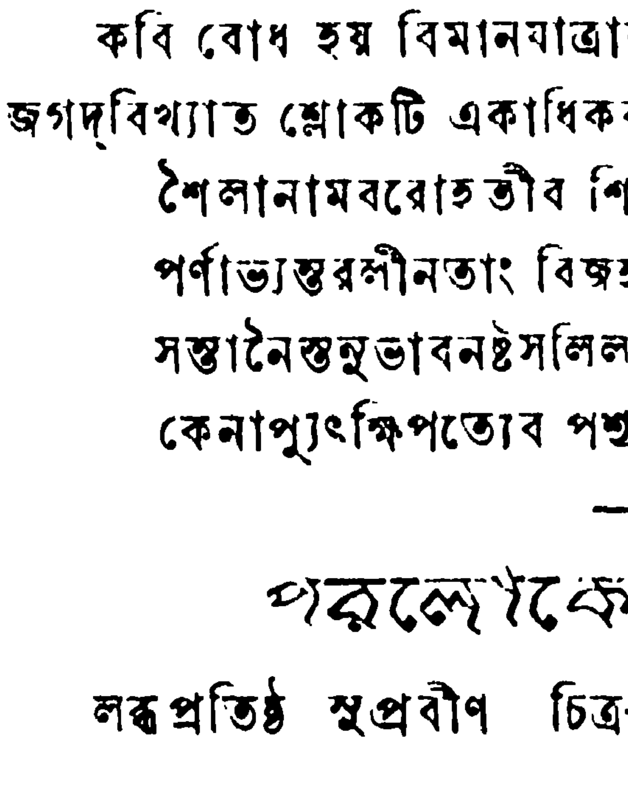

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগী ছিলেন। সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভের পর তিনি বেকার নামক এক জন জার্ম্মাণ চিত্রকরের নিকট চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র বড় লাট লর্ড লিটন ও ছোট লাট সার এস্‌লি ইডেন কর্ত্তৃক প্রশংসিত হয়; তিনি সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি ভারতের বহু প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, রাজা মহারাজা স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের এবং ভারতমাতার সুসন্তানগণের তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া যশোলাভ করেন। বসুমতীর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি 'অর্জ্জুন উর্ব্বশী', 'উত্তরা অভিমন্যু' প্রভৃতি চিত্রগুলি জার্ম্মাণী হইতে মুদ্রিত করাইয়া আনিয়া গৃহ-শোভা সম্বর্দ্ধনার—চিত্র-ব্যবসায় প্রসারের অভিনব পন্থা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার পৌরাণিক চিত্রগুলি রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণে সাদরে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি কেবল চিত্র-কলার উপাসক ছিলেন না, হাস্যরস-সুরসিক—রস-সাহিত্যের পরম ভক্ত ছিলেন।

পরলোকে শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশপূজ্য মনীষী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য দ্বিতীয় পুত্র রায় শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সি, আই, ই বাহাদুর

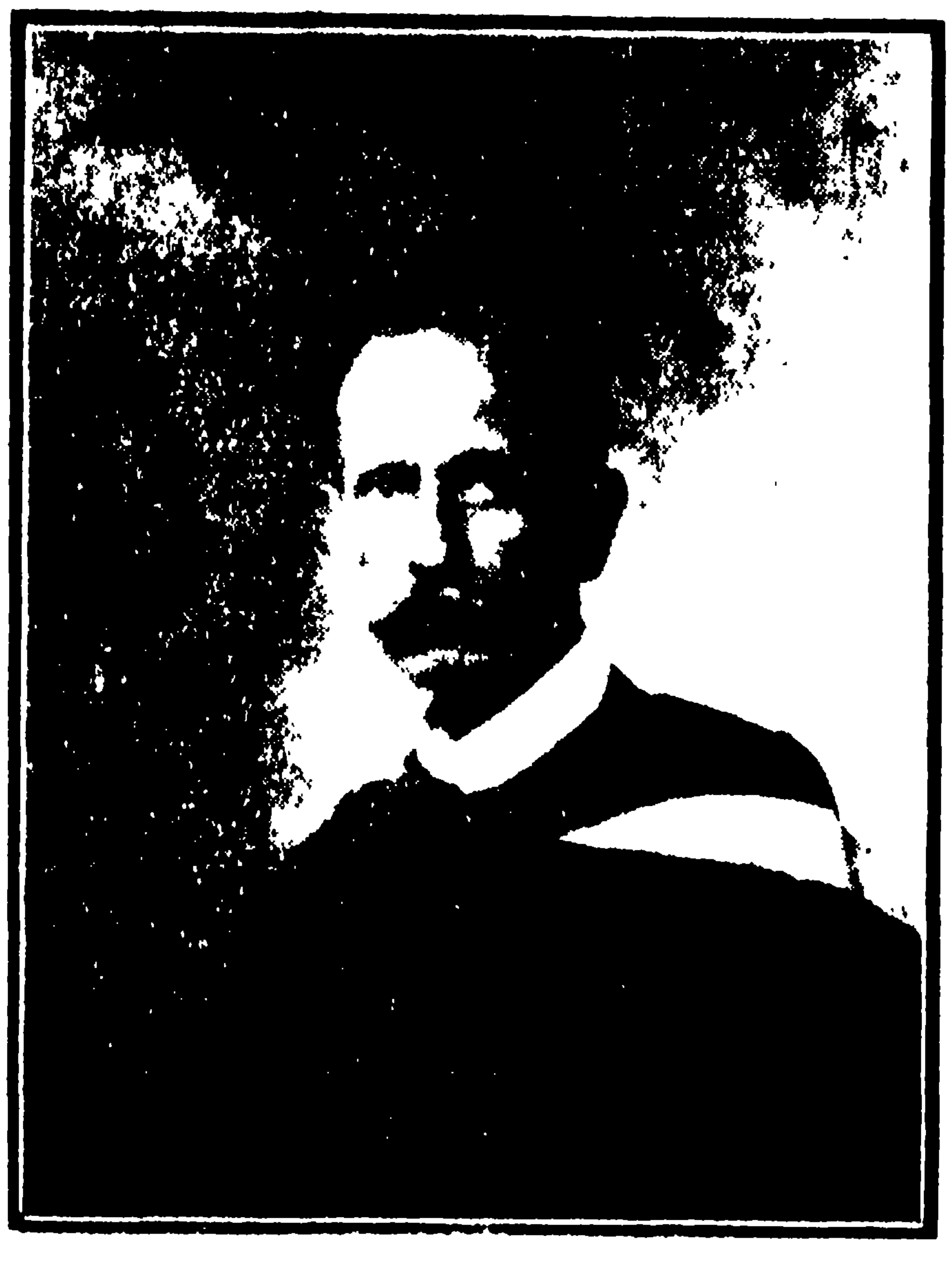

শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৩শে বৈশাখ সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। শরৎ বাবু প্রথম জীবনে হোম-মেম্বারের সহযোগিরূপে ভারত সরকারের কার্য্য করিয়া যশ লাভ করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ট্রাইবুনালের অন্যতম বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে অবসর গ্রহণ করিয়া হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। আদর্শ ব্রাহ্মণ-পরিবারে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—সদাচার-নিষ্ঠা ঐ বংশের বৈশিষ্ট্য। শরৎবাবু আজীবন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গৌরব-রক্ষায়—স্বধর্ম্মনিষ্ঠায়—শাস্ত্রানু-শীলনে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। উচ্চস্তরের ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াও তাঁহার মত বিনয়ী—নিরভিমান—সামাজিক—সহৃদয়—আদর্শ ব্রাহ্মণ বর্ত্তমানযুগে বিরল। সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই তিনি বাঙ্গালীর মনীষার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

দানবীর টাটা

বোম্বাই সহরের পার্শী সম্প্রদায়ের বদান্যতা দেশবিশ্রুত। তন্মধ্যে ধনকুবের টাটা-বংশ অন্যতম। তাঁহারা দেশের ও দশের উপকারার্থে নানাভাবে নানাদিকে সাহায্যার্থ মুক্তহস্ত। সার দোরাব টাটা সম্প্রতি ৩ কোটি টাকা পরার্থে দান করিতে মনস্থ করিয়া একটি ট্রাষ্ট ডীড প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া

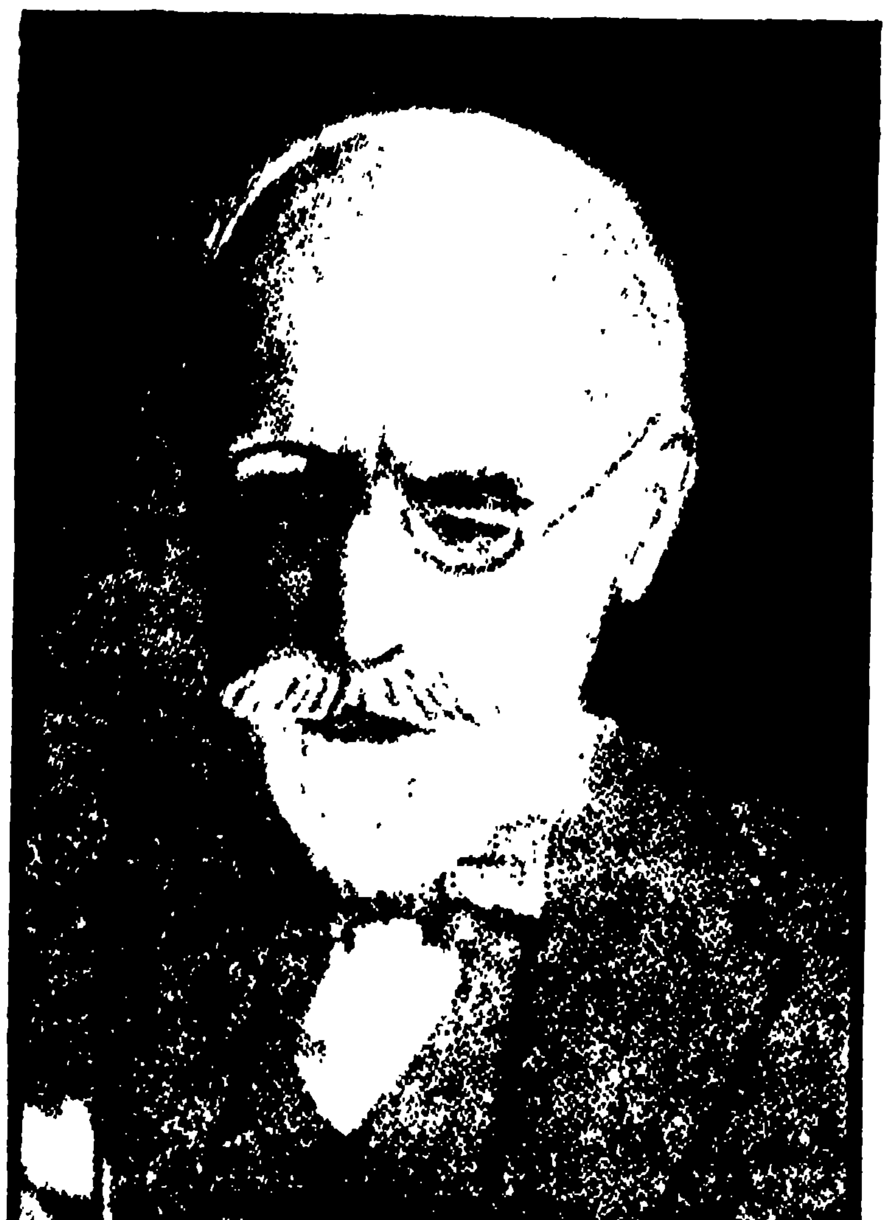

সার দোরাব টাটা

তিনি জনমঙ্গলে স্বতন্ত্র ভাবে ২৫ লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাকেই অর্থের সদ্ব্যবহার বলিয়া অভিহিত করা যায়। দাতা চিরং জীবতু।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

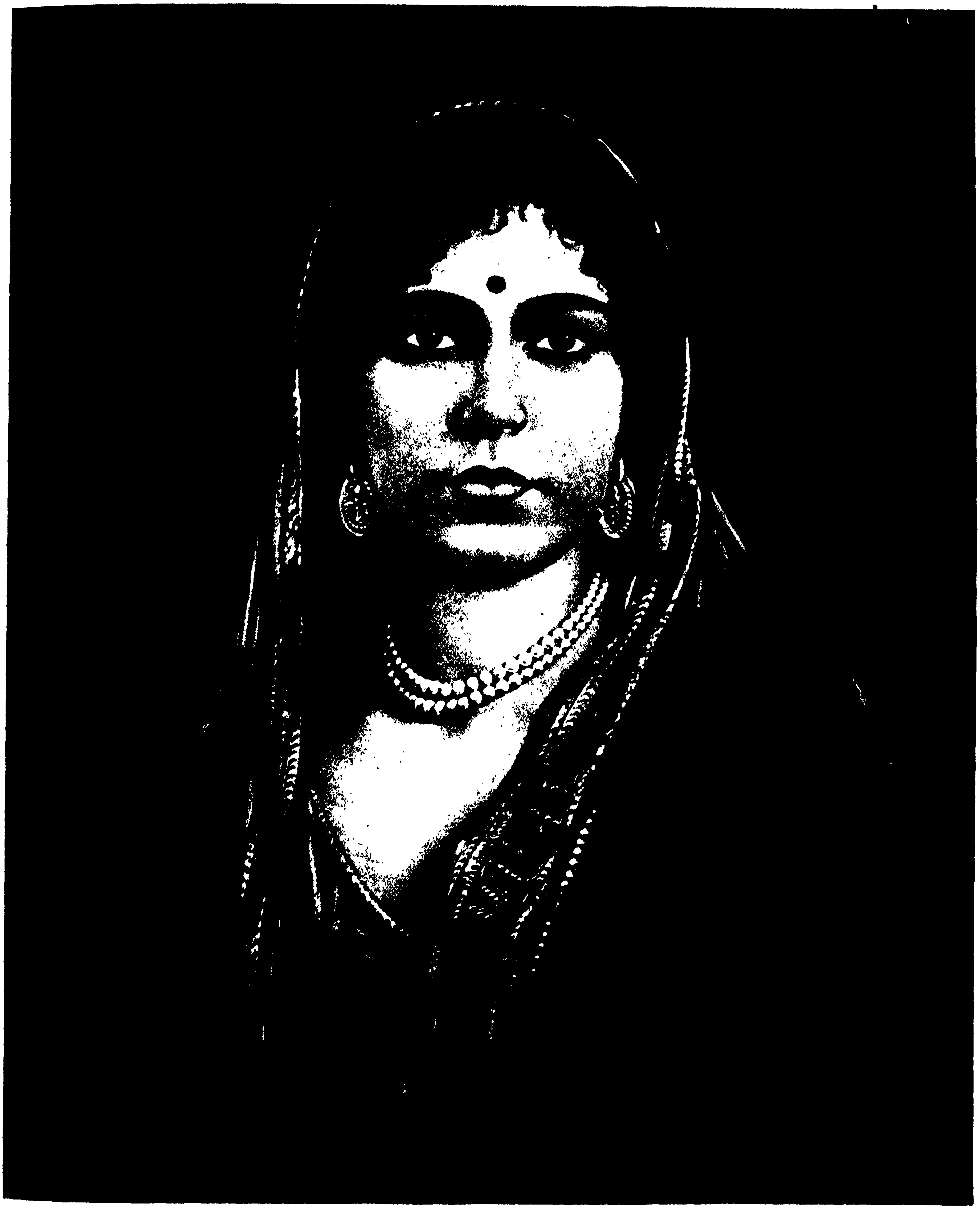

"ঊষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।" — রবীন্দ্রনাথ।

বসুমতী চিত্র-বিভাগ। শিল্পী—মিঃ টমাস।

সচিত্র মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ]　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯　　[২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

উন্মত্ত জনতাসিন্ধু কল্লোলিয়া তুলে চারিধার,
সংশয়ের ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত মানব-হৃদয়,
কত মত, অত তন্ত্র শতকণ্ঠ করিছে উদ্গার,
সাকার ও নিরাকারে ভেদদ্বন্দ্ব নাহি পায় লয়।

কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, ব্রহ্ম, মোহাম্মদ্ রহিম, শ্রীরাম
কে বড় কে ছোট, কার উক্তিপুটে মুক্তা কতখানি,
তরঙ্গের আলোড়নে বিতর্কের নাহিক বিরাম,
সত্যের সন্ধান নামে বাড়ে শুধু অসত্যের গ্লানি।

হেলায় ভেলাটি বাহি বেলাভূমে সুদক্ষ নাবিক
এলে কে গো, ক্ষুব্ধ ঊর্ম্মি স্নেহ বর্মে করি শান্ত স্থির ?
সমন্বয় ঐক্যতানে ধ্বনিয়া উঠিল চারিদিক,
মিলিল একটি মন্ত্রে কোলাহল প্রাচী-প্রতীচীর।

পৌরদ্বন্দ্ব হ'তে দূরে নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ,
অক্ষর লোকের বাণী শঙ্খনাদে করিতে প্রচার,—
"অহি-নকুলের মত বৃথা কেন দ্বন্দ্ব অকারণ ?
শ্যামাশ্যামে নাই ভেদ নাহি ভেদ শিব-জিহোবার।"

গরজিল পাঞ্চজন্য—"কেন দ্বেষ কেন বিসংবাদ ?
সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এক শুধু তিনি বর্ত্তমান,
তাঁহার শরণে আয় সব ছাড়ি, পূর্ণ হবে সাধ,
কোলে আয় জুড়াইবি তাপক্লিষ্ট মানব পরাণ।"

শ্রীজগৎমোহন সেন।

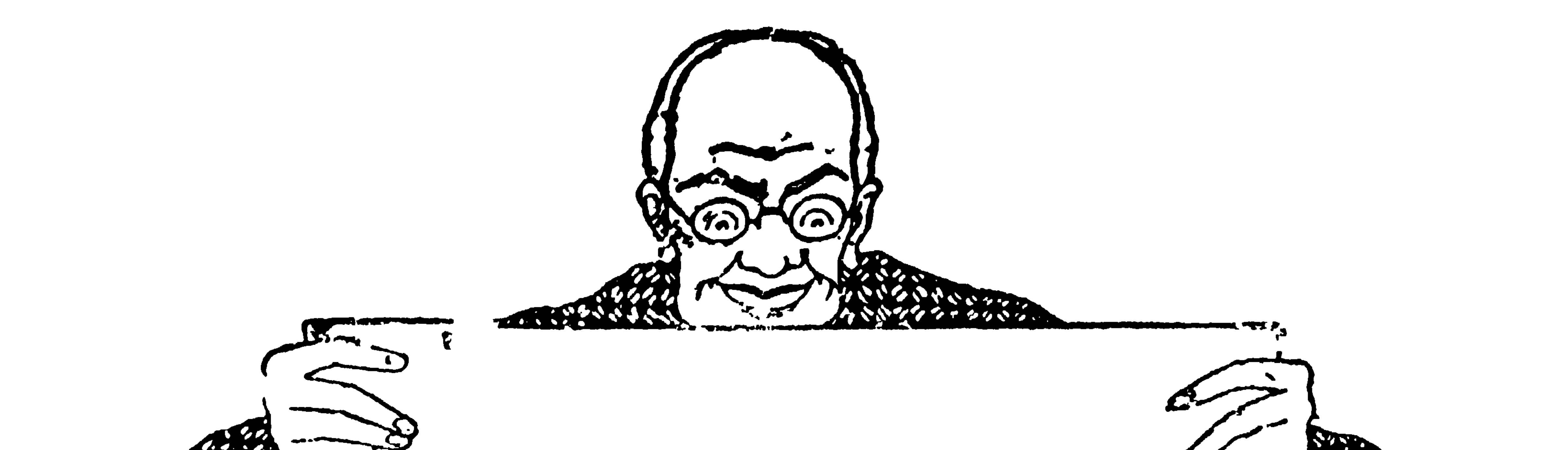

ভূতের গল্প

আমি কখনও ভুত দেখিনি, আর যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কি যে দেখেছেন, তা বল্‌তে পারেন না। তাঁদের কথা প্রায়ই অস্পষ্ট, তার কারণ, ভুত হচ্ছে অন্ধকারের জীব—তার কোনই কাটাছাঁটা রূপ নেই।

আমি একটি ভদ্রলোকের মুখে দিনদুপুরে রেলগাড়ীতে যে অদ্ভুত গল্প শুনেছি, তার প্রধান গুণ এই যে, ব্যাপার যা ঘটেছিল, তার একটা স্পষ্ট রূপ আছে।

আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে রেলরাস্তায় কন্‌ট্রাক্‌টরি কাযে ভর্ত্তি হই। ঐ ছিল আমার পৈতৃক ব্যবসা। আমি একবার Parlakimedi যাচ্ছিলুম। পারলাকিমেডি কোথায় জানেন?—গঞ্জাম জিলায়। B. N. Rএর বড় লাইন থেকে Parlakimedi পর্য্যন্ত যে কেঁক্‌ড়া-লাইন বেরিয়েছে, সে লাইন তৈরীর কন্‌ট্রাক্ট আমরাই নিই। আর তারই হিসেব-নিকেশ করতে সেখানকার রাজার ওখানে যাই।

গাড়ী যখন বিরহামপুর ষ্টেশনে পৌছল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা। ঐ এগারোটা বেলাতেই মাথার উপরে আর চারপাশে রোদ এমনি খাঁ খাঁ করছিল যে, কলকাতায় বেলা দুটো তিনটেতেও অমন চোখ-ঝল্‌সানো রোদ দেখা যায় না। সে ত আলো নয়, আগুন। এ রকম আলোয় পৃথিবীতে অন্ধকার বলেও যে একটা জিনিষ আছে, তা ভুলে যেতে হয়।

গাড়ী ষ্টেশনে পৌছতেই একটি হৃষ্টপুষ্ট বেঁটেখাটো সাহেব এসে কাম্‌রায় ঢুকলেন। তিনি যে একজন বড় সাহেব, তা বুঝলুম তাঁর উর্দ্দি-পরা চাপরাশীদের দেখে। দু'টি একটি বাবুও সঙ্গে ছিলেন, মাদ্রাজী কি উড়ে—চিন্‌তে পারলুম না; কিন্তু তাঁদের ধরণ-ধারণ দেখে বুঝলুম যে, তাঁরা হচ্ছেন সাহেবের আফিসের কেরাণী। কারণ, তাঁরা সাহেবের জিনিষ-পত্র সব গাড়ীতে উঠল কি না দেখতে প্লাটফর্‌ম্‌ময় ছুটোছুটি করছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে কুলীদের পিঠে ও মাথায় চড়টা-চাপড়টা লাগাচ্ছিলেন। অবশেষে গাড়ী ছাড়ল। প্রথমে সঙ্গীটিকে দেখে আমার একটু অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। কারণ, তাঁর চেহারা ঠিক bull-dogএর মত—তার উপর তাঁর মুখটি ছিল আগাগোড়া সিঁদুরে লেপা। আমি ভাবলুম, রোদে তেতে মুখ এ রকম লাল হয়েছে।

পাঁচ মিনিট পরেই তিনি একটি হুইস্কির বোতল খুলে একটি গেলাসে প্রায় আট আউন্স ঢেলে, তার সঙ্গে নামমাত্র সোডা সংযোগ ক'রে এক চুমুকে তা গলাধঃকরণ করলেন।

তারপর ঠোঁট চেটে আমাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন যে, "Will you have some?" আমি বল্লুম, "No, thank you." এ কথা শুনে তিনি বল্‌লেন, "There is not a drop. of headache in a gallon of that. It is pucca Perth,—my native plaee."

আমি ও-হুইস্কি এত নিরীহ শুনেও যখন তাঁর অমৃতে ভাগ বসাতে রাজি হলুম না, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "Dont you drink?"

আমি বল্লুম, "I do, but I drink brandy."

এ মিথ্যে কথা না বল্‌লে, আমাকে তাঁর এক গেলাসের ইয়ার হ'তে হ'ত। আমার উত্তর শুনে তিনি বল্‌লেন, "Damned constipating stuff, bad for one's liver. However dont drink too much."

এর পর তিনি আমাকে pucca Perthএর রসাস্বাদ করতে আর পীড়াপীড়ি করেন নি। নিজেই তাঁর মেজাজ ঝালিয়ে নিতে যখন-তখন ঢুক্‌ঢাক আরম্ভ করলেন। আমি যখন বেলা দু'টোয় গাড়ী থেকে নেমে যাই, তখন

তিনিও তাঁর খালি বোতল গাড়ীর জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন। আর একটি নতুন বোতলের মাথার রাঙতার পাগড়ী খুলতে ব'সে গেলেন।

লোকটা দেখলুম বেজায় মদ খায় বটে, কিন্তু বে-এক্তিয়ার হয় না। হুইস্কির প্রসাদেই হোক্, আর যে কারণেই হোক্, তিনি ক্রমে মহা বাচাল হয়ে উঠলেন ও আমার সঙ্গে গল্প সুরু করলেন; অর্থাৎ সে গল্পের আমি হলুম শ্রোতা মাত্র, আর তিনি হলেন বক্তা।

আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বল্লেন যে, তিনিও এ অঞ্চলের একজন বড় সরকারী এঞ্জিনিয়ার। আর কার্য্যসূত্রে তিনি ওদেশে কি কি দেখেছেন আর তাঁর জীবনে কি কি অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে নানারকম খাপছাড়া ও এলোমেলো বক্তৃতা করলেন। দেখলুম, লোকটা শুধু মধুরসের নয়, মধুর রসেরও রসিক।

গঞ্জাম ছাড়িয়েই মাদ্রাজ। আর মাদ্রাজে নাকি দেদার অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে আছে। যদিচ পথে-ঘাটে যাদের দেখা যায়, তারা সব যেমন কালো, তেমনই কুৎসিত। তবে যারা A. I. সুন্দরী, তারা সব অসূর্য্যম্পশ্যা। আর এই সব গুপ্তরত্নদের সন্ধান দিতে পারে, আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে শুধু P. W. D.র বড় বড় মাদ্রাজী কন্‌ট্রাক্টাররা। সেই সঙ্গে তিনি বল্লেন যে, তুমি যখন একজন বাঙ্গালী কন্‌ট্রাক্টর, তখন তুমি যদি এ দেশে প্রেম করতে চাও ত তোমার তা করতে হবে ঐ সব কালো কুলী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে—সে প্রেমের ভিতর কোনও romance নেই, আর আছে নানারকম বিপদ। তার পর তাঁর অনেক প্রেমের কাহিনী শুনলুম। দেখলুম, ভদ্রলোকের জীবনে যা যা ঘটেছে, সবই romantic। কিন্তু তার বর্ণনা বিষম realistic। সেই সব মাদ্রাজী Helen Cleopatraদের কথা সত্য কিম্বা সাহেবের সুরাস্বপ্ন, তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু তার একটি গল্প সত্য বলেই মনে হ'ল, আর সেইটেই আজ বলব। গল্প সাহেব বলেছিলেন ইংরাজীতে, আর আমি বলব বাংলায়। আমি ত আর Kipling নই যে, মাতালের মুখের ভূতের গল্প দা-কাটা ইংরাজীতে আপনাদের কাছে বলতে পারব।

এঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা

আমি যখন বিলেত থেকে চাকরী পেয়ে প্রথম এ দেশে আসি, তখন এ অঞ্চলের একটি জঙ্গুলে জায়গায় হ'ল আমার প্রথম কর্ম্মস্থল।

কাজ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি পাকা রাস্তা তৈরী করা, আর সেই সঙ্গে আমার পূর্ব্বে যিনি এ কাজে ছিলেন, অর্থাৎ Mr. Rogers—তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতি-মন্দির খাড়া করা। এখানে চাকরী করতে এসে নাকি অনেক এঞ্জিনিয়ার আর বাড়ী ফেরে নি—কবরের ভিতর চ'লে গেছে।

আমি কতক হেঁটে, কতক ঘোড়ায়, বহু কষ্টে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি, চারপাশে শুধু ঘোর জঙ্গল, আর মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট নেড়া পাহাড়। আর যেখানে একটু সমান জমী আছে, সেখানেই দু'চার ঘর লোকের বসতি। আর এই সব স্থানীয় লোকরাই জঙ্গল কাটে, মাটী খোঁড়ে, রাস্তায় কাঁকর ফেলে, আর দুরমুস দিয়ে পিটিয়ে তা দুরস্ত করে।

একটি দু'শ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর ছিল একটি P. W. D. বাংলো। সে বাংলোটির তিনকাল গেছে আর এককাল আছে। শুনলুম, সেখানেই আমাকে থাকতে হবে। সঙ্গে থাকবে আমার আদি-দ্রাবিড় চাকর-বাকর আর দু'জন স্থানীয় চৌকীদার। আমার বাসস্থান দেখে মন দ'মে গেল। কোথায় Perth আর কোথায় এই ভূতপ্রেতের শ্মশান!

সে যাই হোক, ঘরে সব জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাত্তিরে ডিনারের পর শুতে যাচ্ছি, এমন সময় একজন চৌকীদার এসে বল্লে যে, "শোবার আগে নাবার ঘরের দুয়োরটা ভাল ক'রে বন্ধ করবেন, ও ঘরে একটি বাতি রাখবেন। এখানে কত-কিছুর ভয় আছে। আর রাত্তিরে কেউ যদি আপনার ঘরে ঢোকে ত আমাদের ডাকবেন। আমরা এই বারান্দাতেই শুয়ে থাকব।" শোবার ঘরে ঢোকবার আগে এমনিতেই আমার গা ছম্-ছম্ করছিল, তার উপর চৌকীদারের কথা শুনে গা আরও ভারি হয়ে উঠল। পা যেন আর চলে না। শেষটা ঘরে ঢুকে প্রথমে নাবার ঘরের দুয়োর বন্ধ করলুম, তারপর

বিছানার পাশে টেবিলের উপর একটি ছোট্ট ল্যাম্প ও revolver রেখে শুয়ে পড়লুম।

রাত দু'টো পর্য্যন্ত ঘুম হলো না, নানারকম ভাবনা-চিন্তায় —যে ভাবনা-চিন্তার কোনরূপ মাথা-মুণ্ডু নেই। তারপর যেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, অমনই একটা খট্‌খট্ আওয়াজ শুনে জেগে উঠলুম। প্রথমে মনে হ'ল, নাবার ঘরের কবাট হয় বাতাসে নড়ছে, নয় ইঁদুরে ঠেলছে। এ দেশে এক একটা ইঁদুর এক একটা বেড়ালের মত।

তারপর যখন দেখলুম শব্দ আর থামে না, তখন বিছানা থেকে উঠে revolverটা হাতে নিয়ে নাবার ঘরের দরজা খুলে দিলুম।

খুলেই দেখি, একটি স্ত্রীলোক। চমৎকার দেখতে। একেবারে নীল-পাথরের Venus। তার গলায় ছিল লাল রঙের পুঁথির মালা, দু'কাণে দু'টি বড় বড় প্রবাল গোঁজা, আর ডান হাতের কব্জায় একটি পুরো শাঁখের বালা। মাথার বাঁ দিকে চুড়ো বাঁধা ছিল, আর পরণে এক হাত চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ী। এ মূর্ত্তি দেখে আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সে আমাকে দেখে হেসে বললে, "তোমার ও পিস্তল দেখে আমি ভয় পাই নে। গুলী আমার গায়ে লাগবে না। আমি কেন এখানে এসেছি জানো? তুমি যার বদলী এসেছ, আমি ছিলুম সেই রাজা সাহেবের রাজরাণী। এই হচ্ছে আমার ঘর, এই হচ্ছে আমার বাড়ী। আমি ঐ খাটে শুতুম, আর ঐ চৌকীতে ব'সে কাচের গেলাসে বিলিতী আরক খেতুম। এক কথায় আমি রাণীর হালে ছিলুম। তারপর রাজা সাহেব একবার ছুটী নিয়ে বিলেত গেল, আর ফিরে এল মোমের পুতুলের মত একটি বিলিতী মেম নিয়ে। আর আমাকে দিলে সরিয়ে। সাহেব কিন্তু আমাকে মাস মাস খরচার টাকা পাঠিয়ে দিত।

তার মাসখানেক পর সে মেমটি একদিন হঠাৎ মারা গেল, অথচ তার কোনরকম ব্যারাম হয় নি। রাজা সাহেব তাঁর স্ত্রী কিসে মারা গেল, ভেবে পেলেন না। তারপর তাঁর চৌকীদার তাঁর কাণে কি মন্তর দিলে। তাতেই ঘটল সর্ব্বনাশ। ও বেটা ছিল আমার দুষমণ।

মেমটি মারা যাবার কিছুদিন পরে যখন দেখলুম সাহেব আর আমাকে ডেকে পাঠালে না, তখন আমি মনে করলুম, সাহেবের কাছে নিজেই ফিরে যাই। সে আমাকে আবার নিশ্চয়ই ফিরে নেবে। রাজা সাহেবকে আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমি ত জানতুম। দিনটে কুলী-মজুর নিয়ে কাটাতে পারলেও, রাত্তিরে আমাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

যে রাত্তিরে ফিরে এলুম এই নাবার ঘর দিয়ে, রাজা সাহেব তোমারই মত পিস্তল হাতে ক'রে এসে আমাকে দেখবামাত্রই গুলী করলে। আর ঐ দু'বেটা চৌকীদার আমার লাস জঙ্গলে ফেলে দিলে।"

এই কথা ব'লে সে ঘরের ভিতর তাকিয়ে বললে, "ঐ দেখ, রাজা সাহেব আস্‌ছে।" আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, খাটের পাশে ছ' ফুট লম্বা একটি ইংরাজ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। মরা মানুষের মত তার ফ্যাকাশে রঙ, আর শরীরে আছে শুধু হাড় আর চামড়া। আর খাটে ধব-ধবে কাপড়ের মত সাদা একটি ইংরেজ মেয়ে মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আছে।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি আমাকে দেখে বললে, "ও পিশাচী এখনও মরে নি। ও এখনও বেঁচে আছে। ওই আমার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। নতুন সাহেব এসেছে শুনে এখানে এসেছে—আবার তার স্কন্ধে ভর করতে। আর ভর ও নির্ঘাত করবে; কারণ, ও যাদু জানে। ওর হুইস্কির চাইতেও শাদা চামড়ার উপর টান বেশী। আর তুমি যদি ওর রূপের আগুনে পুড়ে মরতে না চাও—যেমন আমি মরেছি,—তবে এখনই ওকে গুলী কর।

এ কথা শুনে blue Venus উত্তর করলে, "মিথ্যা কথা। আমি ওর স্ত্রীকে মারি নি। ওই আমাকে মেরেছে, তারপর নিজে মদ খেয়ে মরেছে।"...সাহেবটি আমাকে বললেন, "আমার কথা শোনো, ছোঁড়ো তোমার revolver—আর দেরী নয়।"

এই সব দেখেশুনে ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল, আর আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলুম। তাই আমি না ভেবেচিন্তে revolver ছুঁড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কির বোতল মেঝেয় প'ড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, আর বাতিও নিভে গেল।

গোলমাল শুনে চৌকীদাররা লণ্ঠন হাতে ক'রে হুড়মুড় ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। আমি তাদের

বল্লুম যে, ঘরে চোর ঢুকেছিল—তাই আমি পিস্তল ছুঁড়েছি। তারা একটু হাসলে, তারপর সমস্ত বাড়ী আর তার চারপাশ খুঁজে কাউকেও দেখতে পেলে না। তখন বুঝলুম যে, রাত্তিরে আমার ঘরে যা হয়েছিল, সে ভূতের কাণ্ড। তারপর থেকেই আমি আর একা শুতে পারি নে, শুলেই ঐ blue Venus চোখের সুমুখে এসে খাড়া হয়, আর আমি অমনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাই। অবশ্য এখন আর সে আসে না, কিন্তু তার স্মৃতিই আসে তার রূপ ধ'রে।

এর পর সাহেব এই ব'লে তাঁর গল্প শেষ করলেন যে—"শেষটা যাতে একা না শুতে হয়, তার জন্য বিয়ে করলুম। আমার স্ত্রী Pucca Perth, ঘোর খৃষ্টান ও সম্পূর্ণ নির্ভীক। সে ভূতে বিশ্বাস করে না, করে শুধু ভগবানে। আর আমি ভগবানে বিশ্বাস করি নে, কিন্তু ভূতে করি। আমরা এঞ্জিনিয়াররা সব scientific man. ধর্ম্মের রূপকথা হেসে উড়িয়ে দিই, আর শুধু তাই বিশ্বাস করি, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। এই সব কারণে এ গল্প আমি মুখ ফুটে আমার স্ত্রীর কাছে বলতে পারি নি এই ভয়ে যে, আমার কথা সে হেসে উড়িয়ে দেবে।"

এঞ্জিনিয়ার সাহেবের গল্প শুনে আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে—তুমি যা দেখেছ, তা হচ্ছে blue devil, D. T.র প্রসাদে; কিন্তু তাঁর মুখে ভীষণ আতঙ্কের চেহারা দেখে চুপ ক'রে রইলুম। তার পরেই গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম।

আমি অবশ্য এই সাদা-কালো ভূতের মারাত্মক প্রণয়-কলহের রোমান্টিক কাহিনী বিশ্বাস করি নি; কিন্তু সে রাত্তিরে Parlakimedi.র ডাক-বাংলোর চৌকীদারকে আমার ঘরে শুইয়েছিলুম।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ভারতীয়া তরুণী ব্যারিষ্টার

কুমারী ভিকু বাটলিওয়ালা বোম্বাইএর পার্শী সম্প্রদায়ের শিক্ষিতা নারী। তিনি এইবার আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই জুন মাসেই তিনি আদালতে যোগদান করিবেন। তাঁহার বয়স ২১ বৎসর। ব্যায়ামাদি ক্রীড়ায়ও তিনি যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আশুতোষ

বর্ষ পরে বর্ষ গত—আজি সেই দিন,
যে দিন ধ্বনিল তূর্য্য, বঙ্গের মানব-সূর্য্য
মহাদেব-মহাদেহে হইলা বিলীন।
বিনা মহাজ্যোতি তাঁর বঙ্গভূমি অন্ধকার,
সমগ্র ভারত অন্ধতমসে মলিন।

গঠিতে জ্যোতিষ্ক নিজ মহাজ্যোতি দিয়া,
যে মানব-সূর্য্য কায়-মন সমর্পিয়া
অনুদিন ছিলা রত, তাঁর সেই মহাব্রত
কে করিবে উদ্‌যাপন না পাই ভাবিয়া—
সে শক্তি, সে সাধনা কি আসিবে ফিরিয়া ?

কর্ম্ম—কর্ম্ম—শুধু কর্ম্ম—কর্ম্মের জীবন,
জাগ্রতে নিদ্রায় কর্ম্ম, কর্ম্মের স্বপন ;
সমগ্র এ পৃথিবীর মাঝে যত কর্ম্মবীর,
তাঁদেরি সমাজে তিনি ছিলা এক জন—
বাঙ্গালী হারালো তাঁরে বিধি-বিড়ম্বন।

সে যে গো ছিল না শুধু বিদ্বান্ ধীমান্,
আদর্শ-চরিত্র মর্ত্ত্যভূমে মূর্ত্তিমান্ ;
কর্ত্তব্যের কঠোরতা, পরদুঃখ-কাতরতা,
সে দেহে অপূর্ব্বভাবে লভেছিলা স্থান,
যেন সেথা দুই-ই মুখ্য, দুই-ই প্রধান।

ছিলা নিজে অনন্ত সে গুণের সাগর,
গুণ-গ্রহণেতে ছিলা তেমনি তৎপর ;
অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র গুণ- আবিষ্কারে সুনিপুণ
হেন জন সুদুর্লভ সংসার-ভিতর—
আকর্ষিতে লৌহ যেন চুম্বক-প্রস্তর।

শত্রু-মিত্রে অভেদে করিতে ব্যবহার,
মনে দ্বিধা-বোধ কিছু ছিল না তাঁহার ;
সত্য ন্যায় তাঁর কাছে, উচ্চ মান পাইয়াছে,
অন্যায়ের কাছে কিন্তু ব্যাঘ্র-অবতার,
'বাঙ্গালার বাঘ' খ্যাতি তারি পুরস্কার।

পাশ্চাত্য বিদ্যায় লভি অখণ্ড সম্মান,
বেছে নিয়েছিলা নিজে প্রাচ্যের যে দান ;
আচার-ব্যভার বেশ, স্বদেশীর একশেষ,
স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি তরে প্রাণ
কেঁদেছিল—করিয়াছে তাহারো বিধান।

নরদেহধারী মাত্রে ত্রুটি কিংবা ভুল,
কে ছিল, কে আছে যার নাহি একচুল ;
তাঁহারো থাকিতে পারে, কিন্তু কে গণিবে তারে,
হাসে চন্দ্র যবে নভে শোভায় অতুল,
কৃষ্ণচিহ্ন খুঁজি তার কে হয় আকুল ?

নমি আজি তাই কর্ম্মিকুলের তিলক,
বিচার-আসনে সূক্ষ্ম ন্যায়-বিচারক ;
নবীনের অনুরক্ত প্রবীণের প্রিয় ভক্ত,
নমি বঙ্গ-বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রসাধক,
স্বরাজের একনিষ্ঠ প্রচ্ছন্ন সাধক।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

মৃত্যু-তীর্থ-যাত্রীর শেষ বাণী

ফরাসী দেশের এক জন শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ছিলেন ডক্টর গুস্তাভ্ ল্য বঁ। তিনি ৯০ বৎসর জীবিত থাকিয়া মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন, অন্বেষণ আর প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ৯০ বৎসর বয়সে মৃত্যুর দিবস প্রভাতে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাবধান-বাক্য আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই প্রবন্ধের নাম রাখিয়াছিলেন "শেষ বাণী"। উহা প্যারিসের 'রিভিউ ব্লু' নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

বৈজ্ঞানিকরা কেমন করিয়া কোনও বিষয়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন, তাহা জানিবার কৌতূহল মানুষের হইয়া থাকে। আমারও জীবনে আমি কেমন করিয়া বিবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছি, কেমন করিয়া তামাকের ধোঁয়ার বিশ্লেষণ, ঘোড়ার চাল-চলন আর শিক্ষা, পদার্থের ক্রমপরিণতি প্রভৃতি বিষয়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলিতে ইচ্ছা আমার প্রবল হইতেছে। কিন্তু তাহাতে সাধারণের আগ্রহ হইবে না মনে করিয়া এমন একটি বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতার শেষ কথা বলিয়া যাইতে চাই—যাহাতে সকলেরই কিঞ্চিৎ আগ্রহ আছে।

প্রাণের প্রধান লক্ষণ কি, তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা সহজ, কিন্তু যে মূল গুণে জঙ্গম ও জড়ে প্রভেদ ঘটে, তাহা নির্ণয় করিয়া বুঝানো সহজ নহে। জড় ও জঙ্গমের বিভেদ স্থির করা অল্পদিন আগেও সহজ ব্যাপার বলিয়া গণ্য ছিল, যখন লোক মনে করিত, জড় বস্তু হইতেছে তাহাই—যাহা নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দ নিশ্চেষ্ট, যাহা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু আজ আমরা জানি যে, বাহ্যতঃ অতি স্থাবর বস্তুও স্থাবর মোটেই নহে, জড়ের অন্তরে অসংখ্য বিদ্যুৎকণা প্রচণ্ড গতিতে কেবলই ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া মাতামাতি ও হট্টগোল করিতেছে। এই-সব কণিকার অনুভবন-শক্তিও অসাধারণ রকমের সূক্ষ্ম, তাপের এতটুকু তারতম্য ও বৈষম্য ঘটিলেই, এমন কি, এক ডিগ্রির হাজার ভাগের এক ভাগ তাপ কম-বেশী হইলেই, তাহাদের মধ্যে কি বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, যাহার ফলে বস্তুর প্রকৃতি, আকার, অবস্থা সব বদ্‌লাইয়া যায়, তাহাদের গতির বিপর্য্যয় ঘটে এবং বিদ্যুৎ-প্রবহনের শক্তির ব্যত্যয় ঘটে। অতএব পাথরের পিণ্ডটাও এক প্রকারের প্রাণশক্তিসম্পন্ন পদার্থ। সকল বস্তুই প্রাণবান্। কেবল বস্তু যখন বিবর্ত্তনে বহু উন্নত হইয়া উঠে, তখনই তাহার প্রজনন-শক্তিলাভ হয়।

প্রজনন-শক্তিকে যদি প্রাণের প্রধানতম লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের জগতে সেই দিন প্রথম প্রাণোৎপত্তি হইয়াছিল—যে দিন আদিম পদার্থ কোনও অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে নিজেকে কোষরূপে পরিণত করিয়া তুলিল, এবং এক কোষ অপর কোষকে জন্ম দিতে সমর্থ হইল। সহস্র সহস্র শতাব্দী ধরিয়া এই কোষ-সমূহ ধীরে ধীরে বিবর্ত্তিত হইতে হইতে বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আজকার নানা জীবে ক্রমপরিণত হইয়া উঠিয়াছে।

যে-সকল শক্তি সমগ্র-ভাবে মিলিয়া প্রাণ-রূপে প্রকাশ পায়, তাহা মোটামুটি সকলেরই জানা ব্যাপার; কিন্তু বিজ্ঞান আর দর্শন কেবলমাত্র একটা অনির্দ্দিষ্ট ও অনিশ্চিত অস্পষ্ট তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে পারে যে, কেমন করিয়া প্রাণের

ক্রিয়াশীলতা প্রথম আবির্ভূত হইল। মস্তিষ্ক-কোষ-সমূহ কেমন করিয়া চিন্তা ভাবনা ধারণা করে, তাহা বলিতে পারা দূরে থাক, আমরা জানি না যে, কেমন করিয়া প্রাণের একটি সামান্যতম ক্রিয়া সংঘটিত হয়। আমরা জানি না যে, মাকড়সা যখন তাহার সূক্ষ্ম জালের সূতা বুনে, তখন তাহার সেই শক্তির উদ্ভব কোথা হইতে কেমন করিয়া হয় আর তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ। এইরূপ আর একটি অপরিজ্ঞেয় ব্যাপার হইতেছে—কেমন করিয়া শুঁয়াপোকা সুন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হয়।

আমাদের বুদ্ধির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। অতএব আমরা মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়া যাহা হাতের কাছে সহজে পাওয়া যায়, তাহা লইয়া সন্ধান করিতে বাধ্য হই। কিন্তু জীবনের যে অভিব্যক্তি আমরা চোখের সামনে নিত্য নিরন্তর দেখিতেছি, তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে। জীবন-মন্দিরের গঠনের কার্য্যে বহু মজুর বহু ইষ্টক সংযোজনা করিয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমিও আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় যাহা লাভ করিয়াছি, সেই-সব তত্ত্ব সংযোজনা করিয়া যাইতে চাই।

মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া আমি দেখিয়াছি —কি রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে, কি ইতিহাসের ক্ষেত্রে আর কি দৈনিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিত্ব এক প্রবল শক্তি। পূর্ব্বে আত্মিক শক্তির আতিশয্যের উপরই ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য নির্ভর করে মনে করা হইত, আত্মাকে যেন দেহ হইতে স্বতন্ত্র একটি পদার্থ মনে করা হইত। কিন্তু আজ আমরা দেখিতেছি যে, আত্মা একটি স্বতন্ত্র বস্তু নহে। মন, হৃদয়, যকৃৎ প্রভৃতি প্রত্যেক দেহযন্ত্রের ক্রিয়া এক একটি বিভিন্ন জীবনী-শক্তি, কোনওটি অপরটির সঙ্গে এক নহে বা অপরের অধীন বা অনুষঙ্গী নহে। এই বিবিধ জীবনের ও অস্তিত্বের সমষ্টিই হইতেছে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব, এবং এই প্রত্যেক দেহযন্ত্র বাহিরের বিবিধ প্রভাবের অনুভূতির প্রতিক্রিয়ার ফলে নিজেরা সক্রিয় ও জীবন্ত থাকে। বাহিরের প্রভাব সকলের দেহে সমান নহে, তাহা ছাড়া পৈতৃক উত্তরাধিকার, আবেষ্টন, শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য কারণ অনুসারে মানুষের দেহে প্রভাবের প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হয়। এই ক্রিয়াবৈষম্যেই মানুষের চরিত্রের পার্থক্য ও শক্তির তারতম্য ঘটে। কিন্তু কিছুই মানুষকে অপরিবর্ত্তিতভাবে বা নিশ্চিত-ভাবে সীমাবদ্ধ করে না। তাহার প্রতি পদে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে। যে লোকটি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তোমার বাড়ীর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়াছে, সে যখন নিজের বাড়ী হইতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল, তখন যেরূপ মানুষ ছিল, তাহা হইতে এখন এক জন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আবার সে যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইয়াছিল, তখন সে যেরূপ মানুষ ছিল, তাহা হইতে অপরবিধ মানুষ সে অন্য সময়ে ছিল। এইরূপে মানুষের নৈতিক ও দৈহিক ব্যক্তিত্ব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অবশ্য এই-সব পরিবর্ত্তন অত্যন্ত সামান্য, এবং এ যেন কোনও মানুষের বাড়ীর বিভিন্ন তলায় ওজনের তারতম্য; যখন সে মাটীর উপরে দাঁড়াইয়া আছে, আর যখন সে একতলা বাড়ীর উপরে বা দোতলায় বা তেতলায় বা চারতলায় উঠিয়াছে, তখন যেমন তাহার ওজনের তারতম্য ঘটে, তেমনই আর কি; কিন্তু সেই সূক্ষ্ম তারতম্য ধরা পড়ে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যেই।

বাস্তবিক আমরা সেই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতার রাজ্যে বিরাজ করিতেছি, যে তারতম্য এত দিন বিজ্ঞান উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র মৌলিক পদার্থের সমাবেশেই এই অতি আশ্চর্য্য মহিমময় জগৎ গঠিত হইয়াছে। আমরা এখনও পদার্থ-সৃষ্টির আদি কারণ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। অতএব আমাদের বিজ্ঞান দৈনন্দিন সামান্য ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য। কেমন করিয়া অতি নগণ্য ক্ষুদ্র অণুকণা মিলিয়া এক একটি উজ্জ্বল দীপ্তিশালী নক্ষত্রে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে অথবা চিন্তাশীল মানবে পরিণত হইয়াছে, তাহা যখন আমরা এখনও জানিতে পারি নাই, তখন আমাদের কেবলমাত্র জাগতিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

তাপ, সূর্য্যকিরণের বর্ণচ্ছত্রের বেগুনে রঙের বাহিরের বেগুনেবর্ণাতীত রশ্মি, পার্ব্বত্য অথবা সামুদ্রিক বাতাস, এবং প্রতপ্ত জল মানুষের দেহযন্ত্রকে উত্তেজিত করে। এজন্য বহু দিন হইতে চিকিৎসকরা এই-সকল বস্তুর সম্বন্ধে

তত্ত্ব অন্বেষণ ও সন্ধান করিতেছেন। কিন্তু যেমন জানা যায় নাই যে, কি কারণে ইহাদের দ্বারা মনুষ্যদেহের যন্ত্ররাজি উত্তেজিত ও সক্রিয় হইয়া উঠে, তেমনই জানা যায় নাই যে, কেনই বা অতি শীঘ্র উহাদের প্রভাব দেহের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। অনেক উষ্ণপ্রস্রবণের জল অতি উপকারী ও রোগ-প্রশমক, কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা তাহাদের কোনই বিশেষ গুণের সন্ধান আবিষ্কার করা যায় নাই।

দেহযন্ত্রের উত্তেজনার জন্য যত প্রকারের উপায় আছে, তাহাদের মধ্যে তাপ-তারতম্যই (টেম্পারেচারই) সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমি বহু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, ১৪০ ডিগ্রি তাপের জলে স্নানের দ্বারা দেহযন্ত্র ও দেহের জীবনকেন্দ্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুনর্জ্জীবন লাভ করে। এই উপায়ে জলে-ডোবা মৃতকল্প মানুষকেও সঞ্জীবিত করা সম্ভব হইয়াছে। যদি অতি-উষ্ণ-জল গরম করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তবে জলে-ডোবা মৃতকল্প মানুষকে খুব গরম আগুনে সেঁকিয়াও উত্তম ফল পাওয়া যাইবে। কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন করার চেয়ে এই উপায় ঢের বেশি ফলদায়ক ও উৎকৃষ্ট। তবে যদি কোনও প্রাণী অনেকক্ষণ জলের তলায় ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার শারীরিক তাপ কমিয়া ৯৭ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট হইয়া যায়, আর তাহার ফলে তাহার রক্ত ফুস্‌ফুসে গিয়া জমাট বাঁধিয়া যায়, রক্ত আর প্রবাহিত ও দেহে সঞ্চালিত হয় না, এবং তখন আর তাহাকে উষ্ণজলে অথবা আগুনে সেঁকিয়া বাঁচানো সম্ভব হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, প্রাণীর প্রাণসম্ভাবনা তাহার দেহের তাপের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

এইরূপে পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা অনেক আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে এমন অনেক আবিষ্কার হইয়াছে, যাহাতে অনেক রোগ এখন নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া কেবলমাত্র চিকিৎসাগ্রন্থেই আবদ্ধ হইয়া আছে। কলেরা আর প্লেগ এখন কেবলমাত্র পুরাতন কিম্বদন্তীতে পরিগণিত হইয়াছে; আশা করা যাইতেছে যে, অতি অল্পদিনের মধ্যে যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগ এবং বংশপরম্পরাগত উপদংশ রোগ প্রভৃতিও কেবলমাত্র চিকিৎসাগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আরোগ্যবিজ্ঞান পীড়িত জীবদের পীড়া হইতে মুক্তি দিতে সমর্থ হইয়াছে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয় হইলেও তাহা যে পীড়িত জীবদের রোগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে ও রোগের আক্রমণের সহিত অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিতে শক্তি দিতে পারিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত।

উত্তেজক ঔষধ নানা প্রকারে দেহের উপর ক্রিয়া করে, এবং ভিন্ন বস্তুর ক্রিয়া ভিন্ন প্রকারের হয়। তামাক, আফিং, আর কোকেন তিনটিরই উত্তেজক শক্তি আছে, কিন্তু তিনের শক্তি তিন প্রকারের।

আগে লোক মনে করিত যে, তামাকের মধ্যে যে নিকোটিন বিষ আছে, তাহারই প্রক্রিয়াতে তামাকের কার্য্য হয়, এবং সেই নিকোটিন নিষ্কাশিত করিয়া তামাক বিশোধিত করিলে তাহাতে আর বিষক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমি পরীক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি যে, তামাকের মধ্যে কতকগুলি ক্ষারধর্ম্মী পদার্থ (এলুক্যালয়েড্) থাকে, তাহাতেই বিষক্রিয়া নিহিত আছে। তামাকের সেই-সকল ক্ষারের মধ্যে কোনও কোনটি এমন বিষাক্ত যে, উহার একটি ফোঁটা মাত্র যদি একটা ব্যাঙের পিঠে ফেলা যায়, তবে সেই ব্যাঙ তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়! কিন্তু সেই প্রাণীকে যদি সেই পরিমাণ নিকোটিন প্রয়োগ করা হয়, তবে তাহা কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। তামাকের ধোঁয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ার উপর মৃদু উত্তেজনা সঞ্চার করিতে পারে। প্রথমে ইহাতে মস্তিষ্কের শক্তি অল্প উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অধিক অবসাদ আসে। এই জন্য অনেকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়া লইতে চাহে, এবং তাহার ফলে যখন অবসাদ আসে, তখন আবার ধোঁয়া দেওয়া আবশ্যক হয়, ফলে সে ব্যক্তি তামাকখোর হইয়া ধোঁয়া বিনা ধোঁয়া দেখিতে থাকে। এইরূপে তামাকখোর লোকরা বৃদ্ধ হইবার বহু পূর্ব্বেই স্মরণশক্তি হারাইয়া ফেলে।

তামাকের ধোঁয়ার চেয়ে আফিঙের ধোঁয়ার প্রকোপ মস্তিষ্কের উপর আরও বেশী অধিক। লোকে ভাবে যে, আফিং খাইলে কামপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সে ধারণা নিতান্ত ভুল। তবে আফিং খাইলে জীবনের দুঃখ অশান্তি সহ্য করিবার ও উপেক্ষা করিবার শক্তি কিছু বাড়ে। কারণ, মন তাহাতে নির্জীব নিষ্ক্রিয় অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং

দুঃখবোধ অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়া আসে। এক জন লোককে আমি জানি যে, তাহার প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহার এক বন্ধু তাহাকে বলিল যে, তুমি অল্পদিন সবুর কর, আর সেই কয় দিন আমি যাহা বলি, তাহা কর, এবং তাহার পর যাহা ইচ্ছা, তাহা করিও। সেই বন্ধু তাহাকে একটু একটু আফিঙের ধূমপান করিতে উপদেশ দিল। ইহার পরে তিন দিনে সেই লোকটির এমন মতি-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যে, সে যে স্ত্রী-বিয়োগে অত অধীর হইয়াছিল, তাহা আর মনেই রহিল না, সে ঐ ব্যাপার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া নিদারুণ বিরহ অগ্রাহ্যই করিয়া দিল।

সকল প্রকার উত্তেজক পদার্থ,—মর্ফিয়া, আফিং, কোকেন, ইথার,—যে-দেহকোষগুলিকে উত্তেজিত করে, পরে আবার তাহাদিগকেই অবসাদে আচ্ছন্ন করে। কোনও কোনও উত্তেজক পদার্থ মানুষের অবচেতন মনের উপর ক্রিয়া করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বদল করিয়া দেয়। আমি আমার অনেক পুস্তকে ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, মানুষের চিন্তা ও কার্য্য একটি অবচেতন অস্তিত্বেরই বাহ্যবিকাশ মাত্র, আর সেই অবচেতন জীবন সে অতি-অতীত বংশপরম্পরাক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া তাহার সঙ্গে তাহার নিজের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের প্রভাব ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব যোগ করিয়া লইয়াছে।

চেতন মন অবশ্য বাহ্যতঃ অবচেতন চিত্তের উপর আধিপত্য করে, এবং বর্ব্বর মানবকে সভ্য মানবে পরিবর্ত্তিত করে। কিন্তু এই সভ্যতার প্রলেপ খুব গভীর পুরু নহে, এবং কোনও রকম উৎপাতের সময় সেই প্রলেপটুকু অতি সহজেই ঘষিয়া উঠিয়া যায় এবং যে বর্ব্বরতা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আবার প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা দেখি যে, কোনও বিপ্লবের সময় শান্ত নিরীহ মধ্যশ্রেণীর লোকে রাজারাজ্ড়ার কবর খুঁড়িয়া যে-সব শব মহাকালের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের বাহির করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া মনে করে, সেই-সব লোককে তাহারা দণ্ড দিতেছে। মাদকের প্রভাবেও মানুষের বর্ব্বরতা প্রকাশ পায়, এই জন্য অতি সভ্য-ভব্য ব্যক্তিও মাতাল হইলে মনের কপাট খুলিয়া যা-তা বলিতে থাকে, তখন তাহার চেতন মন আর বশে থাকে না, তাহার অবচেতন অস্তিত্ব প্রবল হইয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই জন্য মাদকসেবী লোকদের একটা সুখ্যাতি শোনা যায় যে, তাহারা বড় মনখোলা লোক হয়। ইহা যে তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা-ভব্যতা ভুলাইয়া পশু বর্ব্বর করিয়া মনের আবরণ সরাইয়া দেয়, তাহা লোকে তলাইয়া দেখে না। মাদকের প্রভাবে কত লোক কত গুপ্তপ্রণয়ের ও খুনের খবর ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া নেশা ছুটিলে অনুতাপ করিয়াছে, তাহার তালিকা আমার ও অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদ্দের পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

বস্তুগত উত্তেজনা যদি এমন প্রবল হয়, তবে মানসিক উত্তেজনা প্রবলতর বলিতেই হইবে। তাহাতে আমাদের ইচ্ছা ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়। যিনি মনকে জয় করিতে পারেন, তিনি আত্মজয়ী হন, লোকের মন জয় করিয়া লোকনেতা হন, লোকের আত্মার উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন এবং তাহাদের চালচলন কার্য্য সব পরিচালনা করিতে সমর্থ হন। এই মানসিক প্রভাবের ফলেই আমাদের মানবসমাজে যত কিছু সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং সেই মানসিক প্রভাবেই সেই-সমস্ত সভ্যতার বিনাশ ঘটিয়াছে। মানবতার বড় বড় অধিনেতৃগণ সাধারণ মানবের মতিগতি কিরূপ, তাহা বিশেষভাবে জানিতেন বলিয়া তাঁহারা মানুষের অধিনায়ক হইয়া তাহাদের বাসনা-কামনা নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, এবং নিজেরা মহামানব মহাপুরুষ বলিয়া আজও পূজিত হইতেছেন। লোকের মন জয় করিবার যত রকম উপায় আছে,—যেমন জোর দিয়া কিছু প্রচার করা, পুনঃপুনঃ কিছু বলা, মানস সংসর্গ ইত্যাদি,—তাহার মধ্যে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, মানুষের কোনও বিষয়ে কৃতকার্য্যতাজনিত প্রতিপত্তি, গৌরব ও ইজ্জত, যাহাকে ইংরাজীতে প্রেষ্টিজ বলে তাহাই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এই মাহাত্ম্য বা প্রেষ্টিজই হইতেছে দৈব বা রাজকীয় প্রভাবের ভিত্তি।

এই প্রেষ্টিজ এখন শিথিলভিত্তি হইয়া পড়িয়াছে। তাই এখন দেবতা ও রাজার প্রতি লোকের বিশ্বাস ও নির্ভর অনেক কমিয়া গিয়াছে, আর দিন দিন আরও লোপ পাইতেছে।

এখনও লোকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, দশে মিলে করি কায, হারি জিতি নাহি লাজ,—যেন অনেক

লোক মিলিয়া কোনও কাষ করিলে সকলে সুবুদ্ধি ও সৎ-প্রবৃত্তিরই বশীভূত হইয়া কাষ করিবে, যাহা তাহারা ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র হইয়া করিলে করিত না। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতি সৎ লোকও সংসর্গ-দোষে অসৎ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়ে, দলে ভিড়িয়া সৎ সাধু লোকও অসৎকর্ম্মে সায় দিতে বাধ্য হয়। বোকা লোকের মনের ছোঁয়াচ লাগিয়া বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। অতএব ব্যক্তির মন আর জনতার মন দুই স্বতন্ত্র ব্যাপার। যদি আমরা এই স্বাতন্ত্র্য না বুঝি, তাহা হইলে ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা রাষ্ট্রবিপ্লবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না।

জনতার মানস-প্রবৃত্তি অন্য দেশের সভ্যতা, ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতি অদ্ভুত রকমে বদল করিয়া তবে গ্রহণ করে। চীনের বৌদ্ধধর্ম্ম আর মুসলমান-ধর্ম্ম যে আদিম ধর্ম্মের নাম-মাত্র বজায় রাখিয়া তাহাদের খোল-নলচে দুই বদ্‌লাইয়া লইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়।

মনস্তত্ত্ব হইতেছে এমন একটি দুর্লভ আলোকশিখা—যাহার প্রভায় নেশানের চরিত্র স্পষ্ট দেখা যায়, আর তাহার ভবিষ্যৎই বা কি হইবে, তাহা বুঝা সহজ হয়। আগে লোক মনে করিত, কাষ করিলেই ধন উপার্জ্জন করা সহজ হইবে, তাহার ফলে বহু লোক এখন কাযের উমেদার হইয়া বেকার-সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে এবং যে জাতির মধ্যে বেকারের সংখ্যা যত অধিক, সে জাতি তত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। অতএব যে কাষ ছিল ধনোপার্জ্জনের উপায়, তাহাই এখন নির্দ্ধনতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগে অভাব উপস্থিত হইত ফসলের অল্পতায়, এখন ফসলের প্রাচুর্য্যেই অভাবের উৎপত্তি হইতেছে। কারণ, ফসল অধিক উৎপন্ন হইলেই অধিক রপ্তানী হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে আর নিজের দেশে অভাব ও দৈন্য উপস্থিত করিতেছে। ব্রেজিলে কফির চাষীরা নিজেদের উদ্বৃত্ত কফি পোড়াইয়া ধনসাম্য রক্ষা করিতেছে, আমেরিকায় চাষীরা সেইরূপে গম-ভুট্টা পুড়াইতেছে, আর মজুররা বেকার হইয়া দারুণ অভাবে অনশনে মরিতেছে। আর জার্ম্মাণী ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা কৌশল করিয়া এমন করিয়াছে যে, সে তাহার মহাজনদের দিয়াই তাহার অগাধ ঋণ শোধ করাইয়া লইবার ফন্দি করিয়াছে।• এই সমস্তই মনস্তত্ত্বের খেলা।

আমি আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় এই জানিয়াছি যে, বস্তুজগতে পদার্থ আর শক্তি একই জিনিষ, পদার্থ মানে কেবলমাত্র শক্তিপুঞ্জ বৈ আর কিছু নয়। নৈতিক জগতে দেখিয়াছি যে, নির্ব্বাচিত কয়েক জনের প্রভাবে নেশান বর্ব্বরতা ত্যাগ করিয়া সভ্য হইয়া উঠে, আবার জনতার প্রভাব প্রবল হইলে নেশান সভ্যতা হারাইয়া বর্ব্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। আধুনিক জগৎ সভ্যতা ও বর্ব্বরতার মধ্যস্থলে সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। এমন ঘটনা ইতিহাসে আরও অনেকবার ঘটিয়াছে দেখিয়াছি।

অতি-আধুনিক বিদ্যালয়

আমেরিকা অতি-আধুনিক নব্য দেশ। সেখানকার সব কারবারই অতি-আধুনিকধরণের। সেখানে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কলেজ সমস্তই অতি-আধুনিক প্রণালী অবলম্বন করিতে ব্যগ্র। সকল বিদ্যালয়ে নিত্য নব নব পন্থা অবলম্বিত ও পুরাতনের পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমেরিকার ৫ শত উচ্চ শ্রেণীর স্কুল-পরিদর্শনের এক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে সেই-সব স্কুলে কি পড়ানো হয়, তাহার একটু আভাস দেওয়া হইয়াছে।

ষ্টেট দ্বারা পরিচালিত অথবা বে-সরকারী সকল বিদ্যালয়েই নূতন পদ্ধতির শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হইতেছে।

ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থাতেই পুরাতন পদ্ধতির বিষম ও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ইংরাজীভাষী নানা দেশের সাহিত্য ত তুলনামূলকভাবে পড়ানো হইতেছেই, তাহার সঙ্গে আবার প্রাচীন সাহিত্যও পড়ানো হইতেছে। ইংলণ্ডের প্রাচীন লেখকদের রচনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক লেখকদের রচনা, আমেরিকার লেখকদের রচনা, ক্যানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়া যেখানে যেখানে ইংরাজীতে পুস্তক রচনা হয়, সে-সবও পড়ানো হইতেছে। ইহাতে সকল দেশের ভাষার বাক্‌ভঙ্গী আয়ত্ত করা সহজ হইতেছে।

ছাত্র যে বিষয় পড়িতে ভালো বাসে, অথবা যে বিষয়ে পরে সে বিশেষ অধ্যয়ন করিবে, সেই বিষয়েই তাহাকে রচনা করানো হয়।

অনেক স্কুলে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা একেবারে খুব কমাইয়া লঘুতম করিয়া আনা হইয়াছে; ছাত্ররা কেবল নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক পড়ে না, তাহারা সকল পুস্তকই পড়িতে বাধ্য হয়, কোন্ পুস্তক হইতে কি প্রশ্ন হইবে, তাহা কে বলিবে?

অনেক ক্লাসে সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির বিলক্ষণ চর্চ্চা হয়—যুদ্ধ, শান্তি, নিরস্ত্র-সমস্যা, মাদকসেবা-নিবারণ, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও অন্যান্য সমাজসমস্যা ক্লাসে আলোচিত হয়।

স্কুলে চল্‌তি খবরের ক্লাস আছে, যাহা নিত্য ঘটিতেছে, তাহার সম্বন্ধে নিত্য আলোচনা ও বিতর্ক হয়। ইহা এখন ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিষয় বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

আগে মেয়ে-স্কুলে গৃহস্থালীর কায শিক্ষা দেওয়াই প্রধান বিষয় ছিল। এখন মেয়ে-স্কুলে দোকান রাখিবার, দোকান সাজাইবার, রেস্তঁরায় পরিবেষণ করিবার নানাবিধ কায মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণ, মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র এখন গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি

আকাশ তোমায় স্বপ্ন-গহন স্তব্ধ নয়ন ঠারি'
পাগল করে কবি,
মল্লিকা-যূঁই-কদম্বফুল সৌরভ সঞ্চারি'
তোমায় ডাকে সবি!
বেণু-বনের গোপনা সেই সুর-সোহাগী মেয়ে
ভৈরবীতে বাঁশী বাজায় পথটি তোমার চেয়ে,
রঙের ধারায় বকুল-বনের মনখানি যায় ছেয়ে—
হ'ল সে চঞ্চলা;
দিগন্তে অই ডাকে তোমায় মায়াপুরীর মেয়ে
সুনীল অঞ্চলা!

বসন্তে যে উড়িয়ে তাহার সবুজ উত্তরীয়
দুলিয়ে দিল কবি,
দখিণ হাওয়ার চপল চরণ নৃত্যে কমনীয়
তরুরে পল্লবি'!
তোমায় শুনায় বৈশাখে যে ঝড়েরি জয়-গান
আষাঢ়ে যে মেঘ-মৃদঙের শুনায় গভীর তান
সেই ত' তোমায় জাগিয়ে দিল'—জাগ্‌ল' রসের বান
উচ্ছল উল্লাসে,
তাহার বাণী মর্ম্মে তোমার ছন্দে বেপমান
নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাসে!

মাটীর ভুবন স্পর্শে তোমার বিভোর হ'ল কবি,
হেথায় সুরে সুরে
ফুটিয়ে দিলে আনন্দ-লোক নন্দনের-ই ছবি
অমর অঙ্কুরে!
তোমার মনের অমৃতে যে অমর হবে ধূলি,
এই ভুবনের দুঃখ-সুখের সকল কথাগুলি
গেঁথে চলে ছন্দোমালায় তোমার-ই অঙ্গুলি
বর্ণে অনুপম;
কবি, তুমি মায়া-লোকের দাও যে দুয়ার খুলি—
তোমায় নমো নম!

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার।

চয়ন

সতর্কতার সঙ্কেত

জার্ম্মাণীতে বার্লিন ও পটস্‌ডামের মধ্যবর্ত্তী রাজপথের উপর পুরাতন চাকা ফাটিয়া মোটর গাড়ী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।

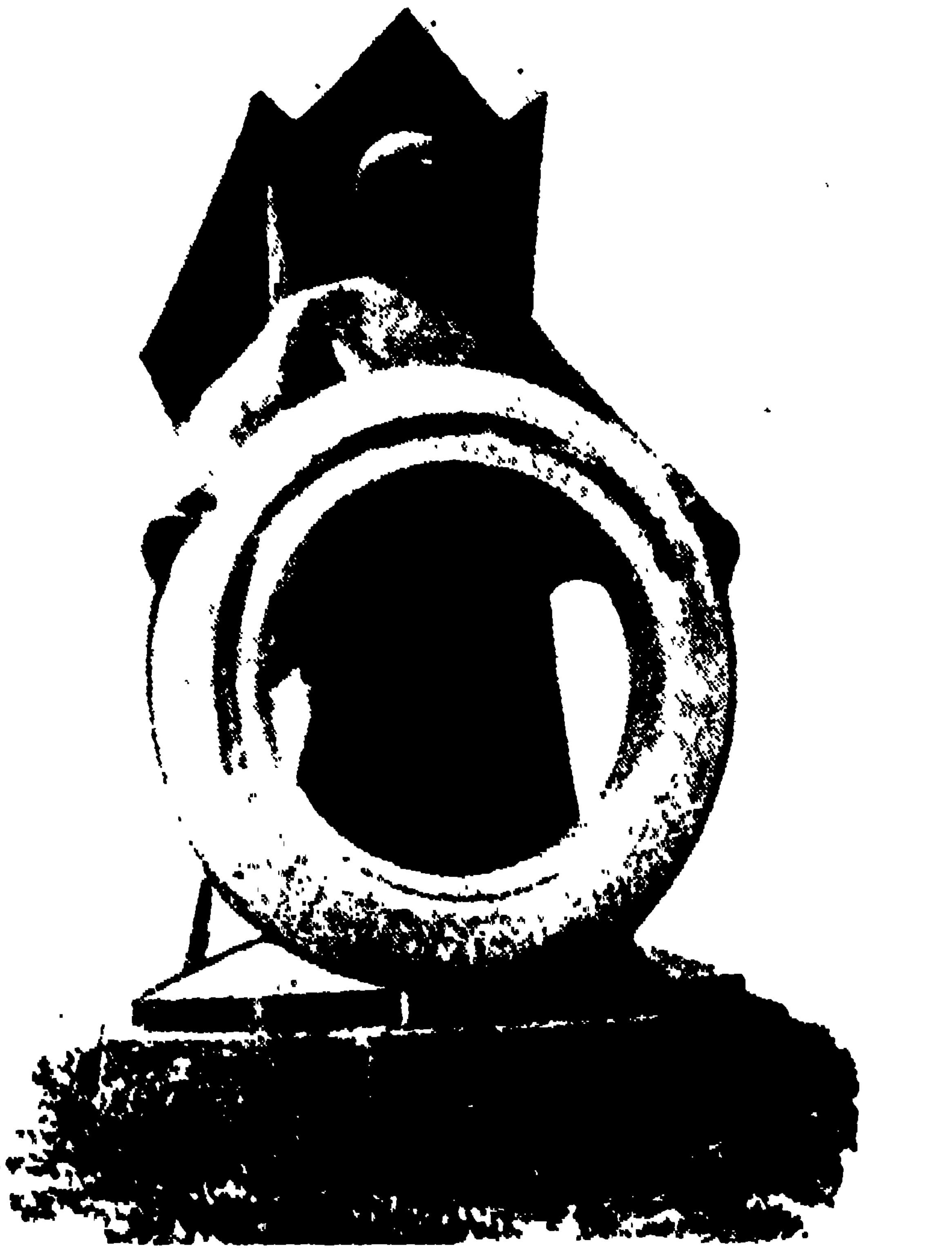

মৃত্যুর করালমূর্ত্তি—হস্তে পুরাতন চাকা

যেখানে এইরূপ বিপদ পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইয়াছে, তথায় একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। উহা মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি, তাহার হস্তে পুরাতন চাকা। মোটর-চালকগণ এই স্থানে আসিয়া সতর্কভাবে গাড়ী চালাইয়া থাকে।

কাষ্ঠনির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দির

ইটালীর প্রসিদ্ধ মিলান ধর্ম্ম-মন্দিরটিতে যেরূপ নক্সা ও কারুকার্য্য আছে, তাহা অত্যন্ত জটিল। এক জন শিল্পী এই দেশ-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমন্দিরটির আদর্শে একটা ক্ষুদ্রাকার দারুময় ধর্ম্মমন্দির রচনা করিয়াছেন। ১ হাজার ৭ শত ৯৭ খণ্ড কাঠের টুকরা ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিন বৎসরের অধিককাল ধরিয়া শিল্পী উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরটিতে ১ শত ৫৩টি চূড়া আছে। প্রত্যেক স্তম্ভ ও প্রাচীর কারুকার্য্য-

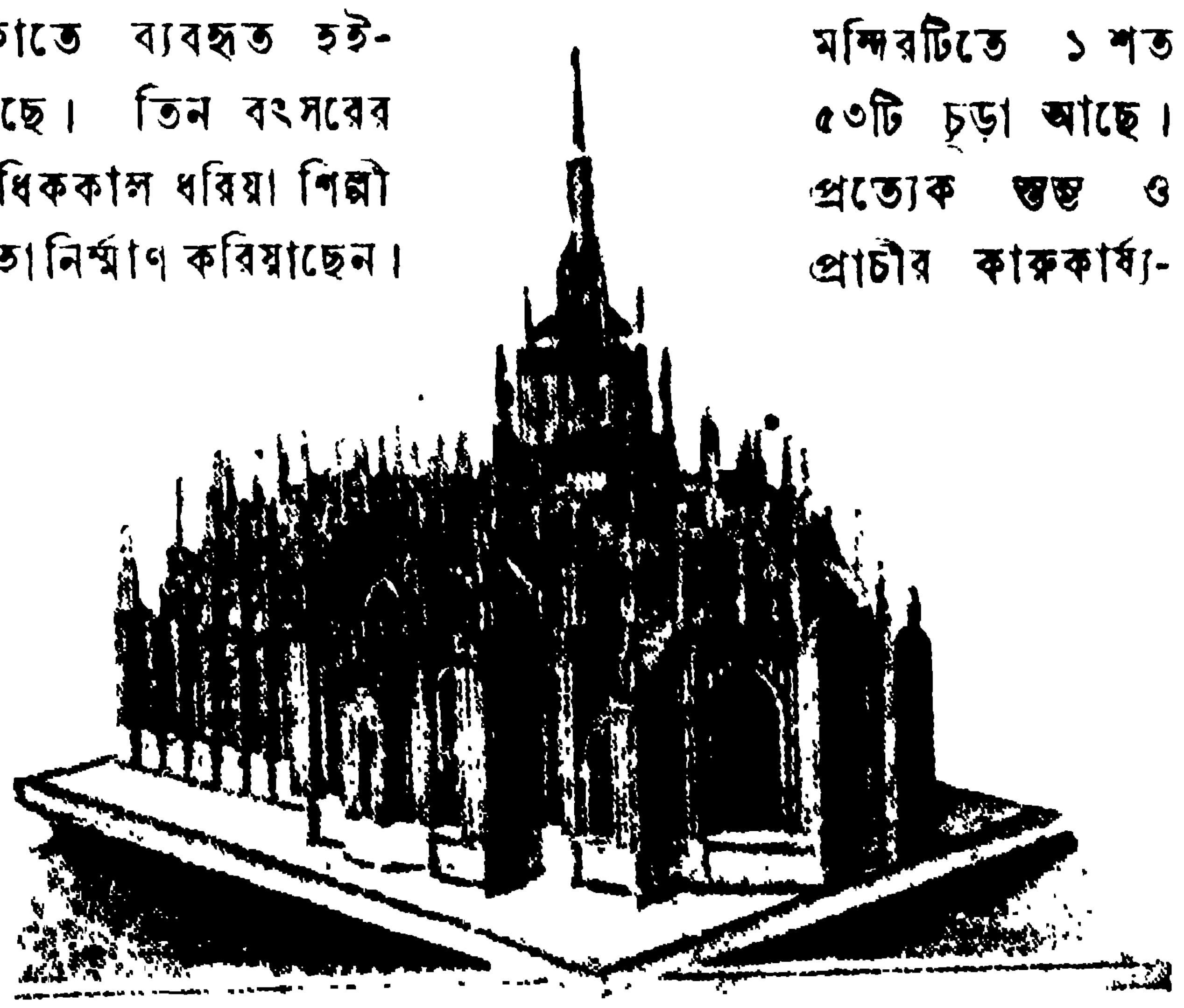

দারুনির্ম্মিত প্রসিদ্ধ মন্দির

সমন্বিত। সমগ্র মন্দিরটিতে দেড় শত বাতায়ন আছে, তাহাতেও নানাবিধ নক্সা। শিল্পী রঙ্গীন কাচের পরিবর্ত্তে রঙ্গীন কাগজ ব্যবহার করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র মন্দিরটি বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হয়। আলো জ্বালিয়া দিলে ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে। মন্দিরটি ৫২ ইঞ্চি দীর্ঘ। সর্ব্বোচ্চ চূড়াটির উচ্চতা ৩৯ ইঞ্চি।

শরমুখে বিস্ফোরক

কালিফোর্ণিয়ার জনৈক ধনুর্ব্বিদ্‌ শরমুখে বিস্ফোরক পদার্থ সংযোজিত করিয়াছেন। এই শরের দ্বারা কোনও জন্তুকে শিকার করিলে, সে শুধু আহত হইয়া অনর্থক যন্ত্রণা ভোগ করে না, তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মারণাস্ত্র হিসাবে ইহার মূল্য অধিক। বন্দুকের গুলীতে অনেকক্ষণ যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে, উহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। শিকারী

শরমুখে বিস্ফোরক

শিকার করিবে, কিন্তু আহত জীবকে অনর্থক যন্ত্রণা দিবে কেন? ধনুর্বিদ্যা 'ইদানীং প্রতীচ্য জগতে আদরণীয় হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মৃগয়া-ব্যাপারে ইহার এতাদৃশ সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এখন হইতে তীরধনুকের সম্মান আরও বাড়িয়া যাইবে। আবার ত্রেতা ও দ্বাপর ফিরিয়া আসিতেছে না কি?

উড্ডীয়মান দ্বিচক্রযান

দুই জন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক একই সময়ে সম্প্রতি দুইখানি উড্ডীয়মান দ্বিচক্রযান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একখানির শুধু ডানা আছে, অপরখানির ডানাও আছে, আবার হাউই সন্নিবিষ্টও হইয়াছে। প্রথমখানির ডানা আরোহীর মাথার উপর বিস্তৃত। পাদতাড়ন-যন্ত্রের কাছে 'প্রপেলার' বিদ্যমান। আরোহী উহার সাহায্যে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারেন। হাউইযুক্ত দ্বিচক্রযানের ডানা আরোহীর মাথার উপর, হাউই পশ্চাতের চাকার কাছে অবস্থিত। আরোহী পাদতাড়ন-যন্ত্র ব্যবহার করিলে গাড়ী চলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাউই-যন্ত্র উহাকে আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত করে। পরীক্ষাকালে এই দ্বিচক্রযান উড্ডয়নের পূর্ব্বে ঘণ্টায় ১ শত ৮ মাইল বেগে ধাবিত হইয়াছিল।

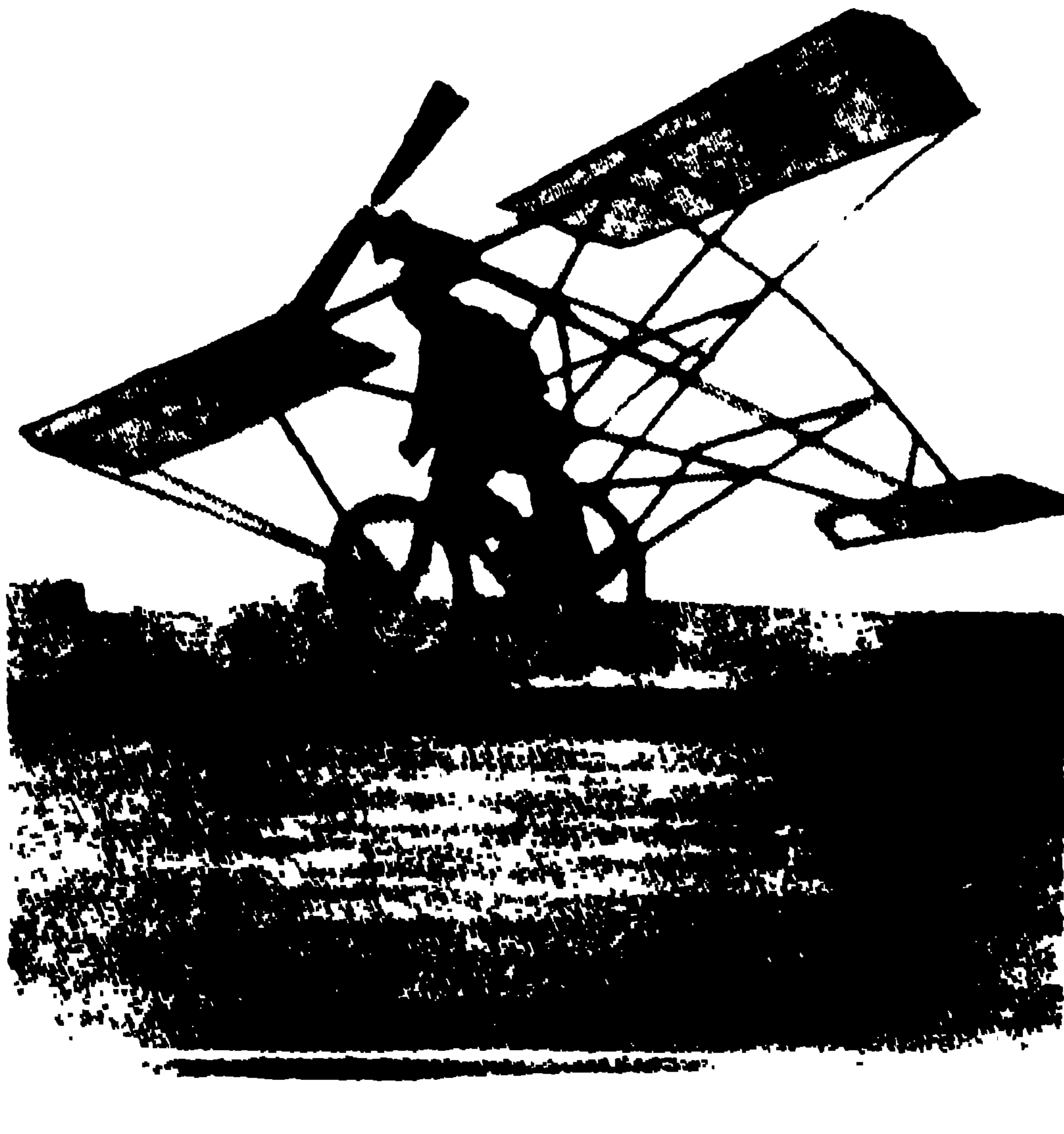

উড্ডীয়মান দ্বিচক্রযান

বাড়ীর ছাদের উপরেই পরীক্ষা আরব্ধ হয়। যখন গতিবেগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন উহাকে ছাদ হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়।

উচ্চতর সোভিয়েট প্রাসাদ

সোভিয়েট রুসিয়ার জন্য একটি প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। নিউইয়র্কের এক জন ভাস্কর উহার গঠনকার্য্যের ভার লইয়াছেন। মার্কিণ গগনচুম্বী অট্টালিকার ন্যায় এই প্রাসাদও আকাশচুম্বী হইবে। মস্কো সহরে যখন এই প্রাসাদের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইবে, তখন উহা জগতের বৃহত্তম অট্টালিকাগুলির অন্যতম

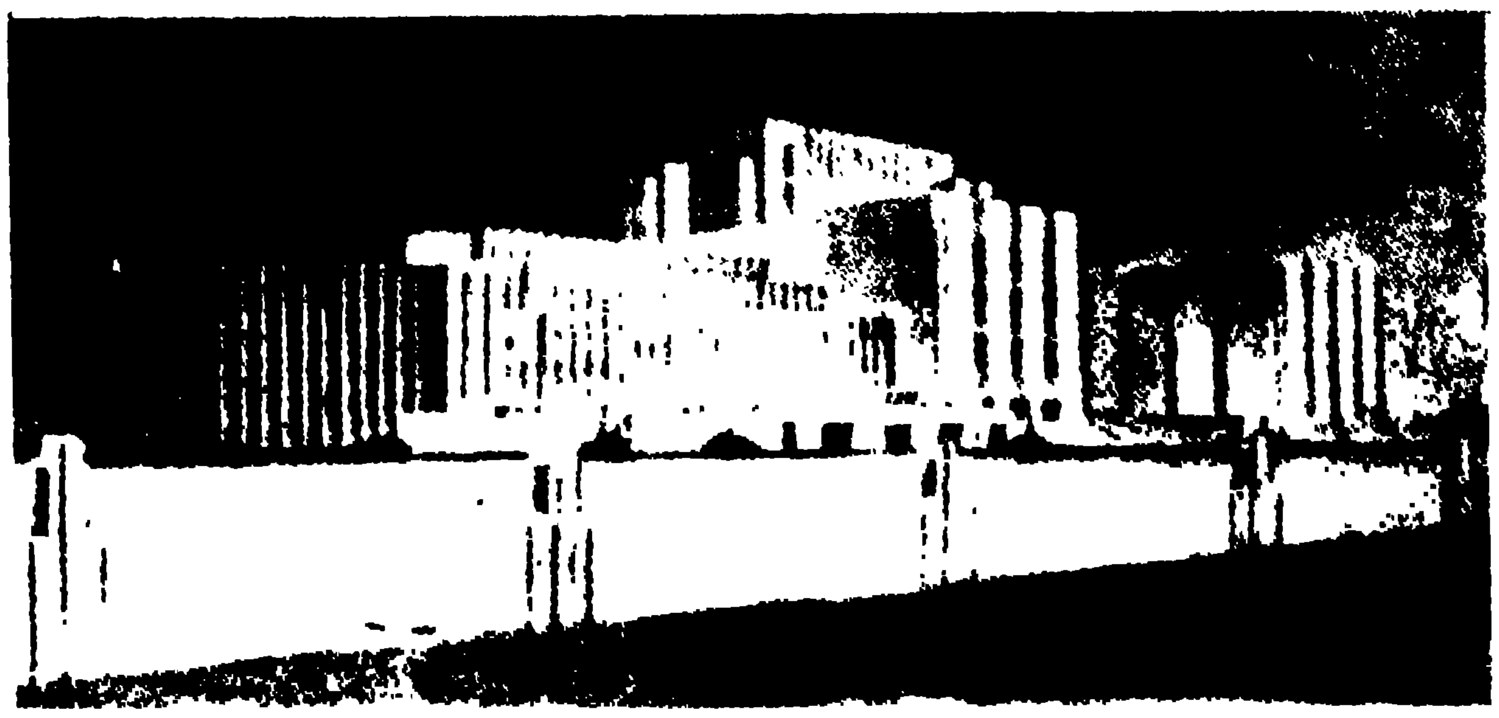

অত্যুন্নত সোভিয়েট প্রাসাদ

বলিয়া পরিগণিত হইবে। মন্ত্রণাগারে ২১ হাজার লোক বসিতে পারিবে। মার্কিণ শিল্পী নক্সা-রচনার জন্য প্রথম পুরস্কার ৬ হাজার ডলার মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চন্দ্রাভিমুখী হাউইপোত

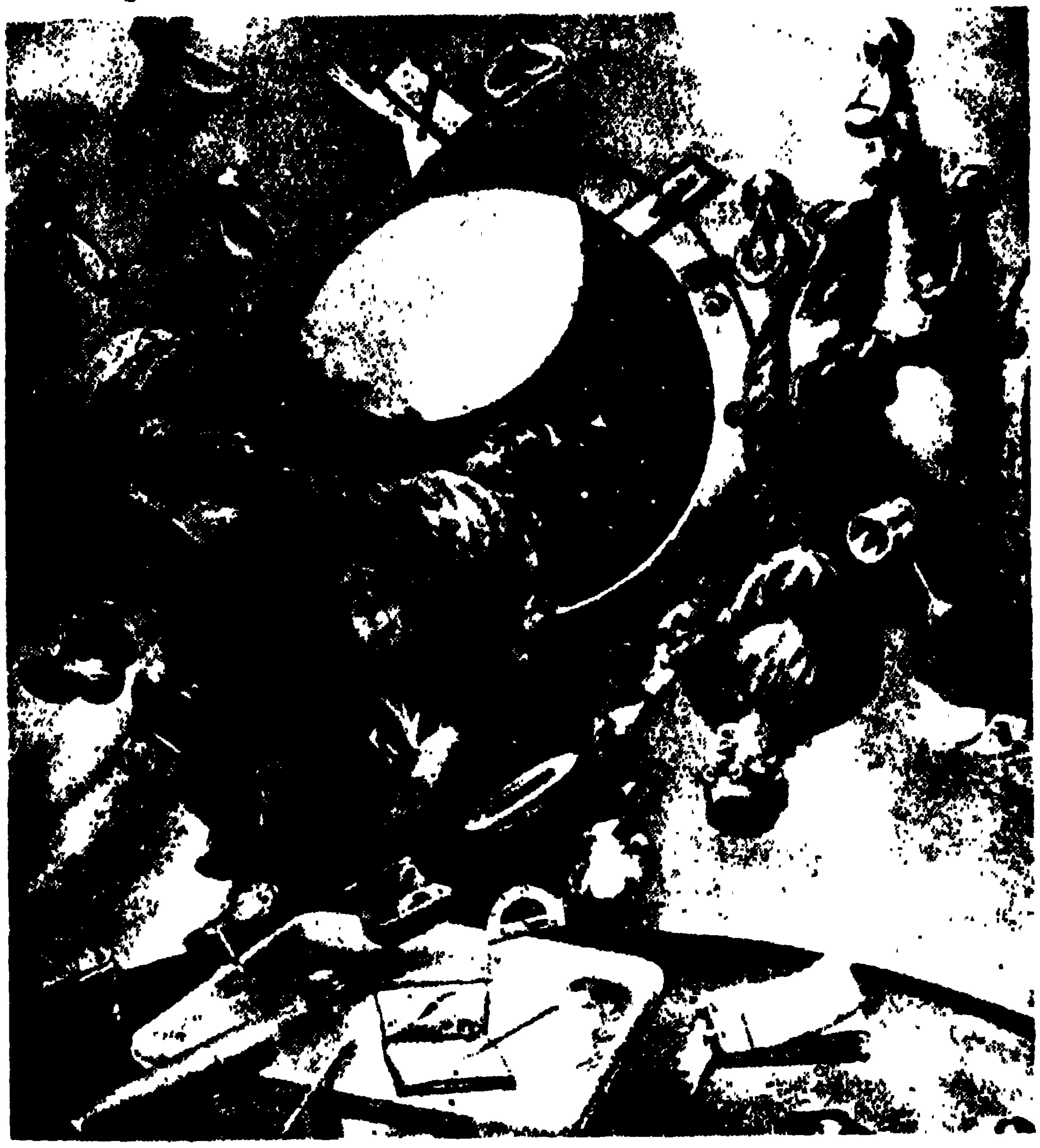

চন্দ্রাভিমুখী হাউইপোত

বর্ত্তমান চিত্র এক জন শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত। যদি হাউইএর সাহায্যে কোনও বিমান চন্দ্রমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে, তখন বিমানের অভ্যন্তরস্থ মানুষ ও বস্তুসমূহের কি অবস্থা হইবে, শিল্পী কল্পনাবলে তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। অবশ্য কল্পনাটি বর্ত্তমানে উদ্ভট বলিয়াই বিবেচিত হইবে; কারণ, মনুষ্যের জ্ঞান ও বিদ্যা যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ব্যাপার অসম্ভব। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক নির্দ্ধারণ অসত্য নহে। চিত্র হইতে দেখা যাইতেছে, যখন পোতের গতিবেগ স্তব্ধ হইবে—অর্থাৎ উপরেও উঠিবে না, নীচেও নামিবে না, 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা হইবে, তখন বস্তুনিচয় কোন্ অবস্থায় থাকিবে? মাধ্যাকর্ষণবেগ হইতে মুক্ত হইলে, প্রত্যেক বস্তুরই কোনও গুরুত্ব অর্থাৎ ভার থাকিবে না। সে অবস্থায় যে যেখানে আছে, সে সেইখানেই থাকিবে, অথবা শূন্যে ভাসিতে থাকিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যাইতেছে, হস্তচ্যুত পুস্তকখানি শূন্যে ভাসিতে থাকিবে—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তখন অন্তর্হিত হইয়াছে। দক্ষিণদিকে যে মানুষটিকে দেখা যাইতেছে, সে জলপাত্র হইতে পুনঃ পুনঃ জল গ্লাসে ঢালিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-কাম হইয়াছে—তখন সে একটা রবার বলের নলের সাহায্যে জল টানিয়া তুলিয়া গ্লাসের মধ্যে জোর করিয়া ঢালিতেছে। আরোহীরা শূন্যে ভাসিতেছে, এইরূপে চিত্রিত হইয়াছে। পোতের প্রাচীরে যে সকল ধরিবার অবলম্বন আছে, তাহার সাহায্যে তাহারা স্ব স্ব অবস্থাকে অবিচলিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

সুবহ নগর

লস্ এঞ্জেলেসে ৩ হাজার পুরুষ ব্যায়াম-বীর অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বাসের জন্য ৮ শত সুবহ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতাকালে তাঁহারা এইখানেই থাকিবেন। এই অস্থায়ী সহরটি দেড়বর্গ-মাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। গৃহগুলি একই প্রথায় নির্ম্মিত নহে। প্রত্যেক কুটীর ২৪ ফুট দীর্ঘ এবং দশ ফুট প্রশস্ত। দুইটি কুঠরীতে ৪ জন থাকিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক কুটীরের স্বতন্ত্র আগম-নিগম পথ, বারান্দা প্রভৃতি বিদ্যমান। স্নানেরও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। মধ্যস্থানে চিকিৎসাগার। আহারের জন্য ৭টি বড় বড় ঘর নির্দ্দিষ্ট। সবই অস্থায়িভাবে নির্ম্মিত, প্রত্যেক গৃহের জন্য ১৫ শত কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রীড়া শেষ হইয়া গেলে এই গৃহগুলি বিক্রীত হইবে। অনেকে

সুবহ নগর

গ্রীষ্মাবাসের জন্য উহা ক্রয় করিবেন। গৃহগুলি সহজেই অবিকৃত অবস্থায় স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া চলিবে।

যাত্রিবাহী বিরাট বিমান

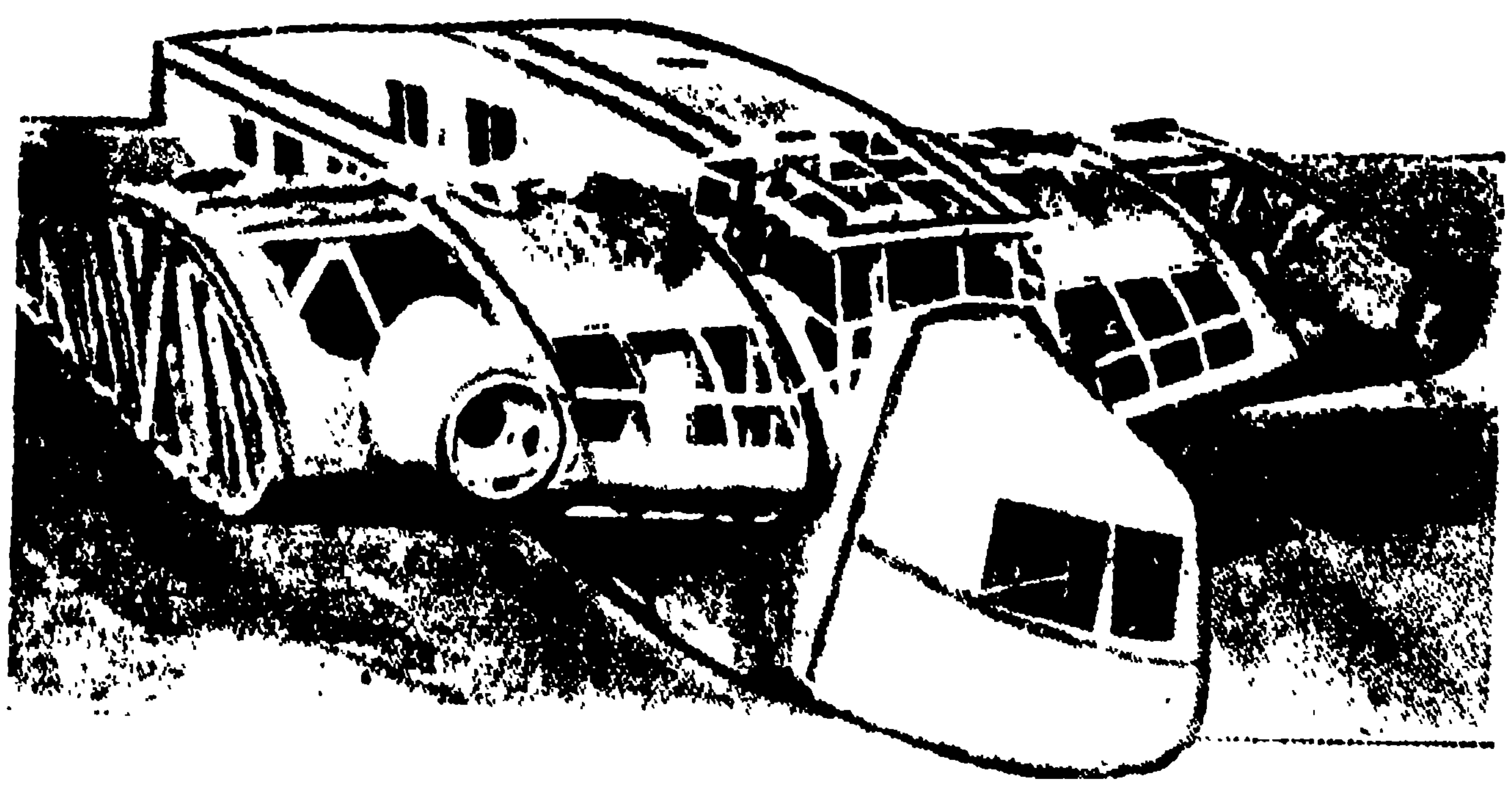

যাত্রিবাহী বিরাট বিমান

একটি জার্ম্মাণ বিমানকে নূতনভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উহার ডানায় আরোহীদিগের জন্য বাসকক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ৩০ জন যাত্রী উহাতে যাইতে পারে। ঘরগুলিতে বাতায়নও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আহারের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষও নির্ম্মিত হইয়াছে। ধূমপান এবং প্রসাধনকক্ষও স্বতন্ত্র আছে।

অশ্বারোহী ধানুকী দল

পুরাতন পদ্ধতিতে কালিফোর্ণিয়ার মরুভূমিতে ধানুকীরা ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেছেন। অশ্বে আরোহণ করিয়া ধানুকীরা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া থাকেন। অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়ায় না। ধাবমান অশ্ব হইতে ধানুকীরা তীর ত্যাগ করিয়া থাকেন।

অশ্বারোহী ধানুকীর দল

রণকামী ঘুঁড়ি

কোরিয়ায় ঘুঁড়ির লড়াই প্রসিদ্ধ। ঘুঁড়ি উড়াইয়া যুবক ও বালক পরস্পরের ঘুঁড়ির সূতা কাটিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কোরিয়ার ঘুঁড়ি কিন্তু আমাদের দেশের ঘুঁড়ির মত নহে। উহার দীর্ঘ দুইটি শেষ প্রান্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং শিরীষের আঠার দ্বারা ভাঙ্গা কাচ উহাতে সংলগ্ন থাকে। তাহাতে তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার ন্যায় কায করিয়া থাকে। ঘুঁড়ির দেহ বাঁশের বাঁখারি এবং ভারী কাগজে নির্ম্মিত।

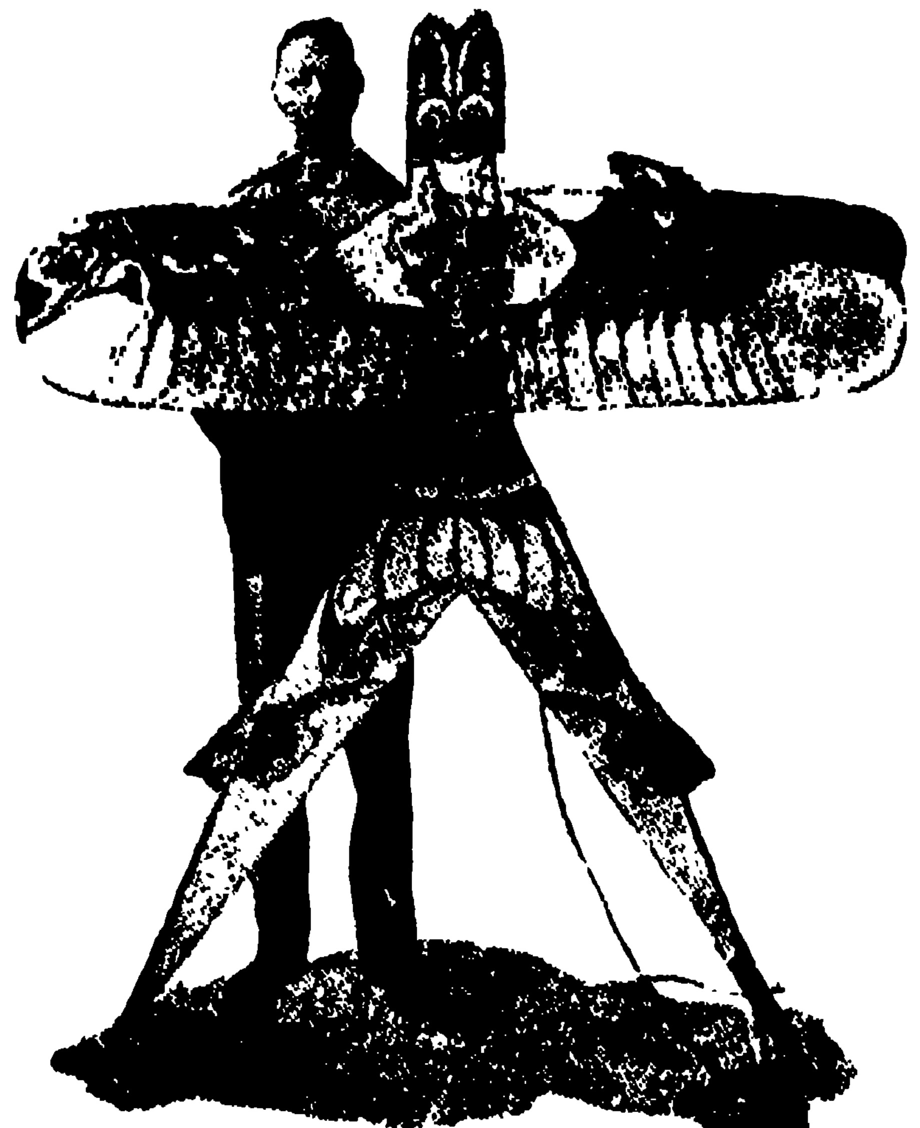

রণকামী ঘুঁড়ি

স্বাস্থ্যে সূর্য্যোত্তাপ

একখানি মসৃণ ধাতুপাত্র গলদেশে কলারের মত ধারণ করিলে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব মুখমণ্ডলে পতিত হইবে। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ বলেন, ইহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। সূর্য্যকিরণ মুখমণ্ডলে পতিত হইলে বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু এই ব্যবস্থায় তাহা হয় না। শীতকালই এইরূপ সূর্য্যরশ্মি ব্যবহারের প্রকৃত সময়।

স্বাস্থ্যে সূর্য্যোত্তাপ

স্পর্শের প্রভাব

(উপন্যাস)

৩

শ্যামপুকুরের একটি বাটীর দ্বিতলের হলে কয়েক জন যুবকের মধ্যে কোন বিষয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সমস্ত সহর আলোকসজ্জায় হাসিতেছে। সুচিত্রিত সুসজ্জিত কার্পেটমণ্ডিত বিস্তৃত হল-ঘরে বৈদ্যুতিক ঝাড়ের নিম্নে মর্ম্মর-টেবলের চারিপার্শ্বে সুদৃশ্য মূল্যবান্ কাষ্ঠাসনে তরুণ তার্কিকরা উপবিষ্ট ছিল এবং তর্কের সঙ্গে সঙ্গে চা-বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করিতেছিল।

এক জন বলিতেছিল, "তা তুই যা বলিস, হরিশ, আমাদের বৈষ্ণব কবিদের নখের যোগ্যও ওরা কেউ নয়। ওদের এক জন যদি চণ্ডীদাসের এক কণা রচনা-শক্তি পেতো, তা হ'লে হাসতে হাসতে নোবেল-প্রাইজ পেতো।"

হরিশ উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, "তোর স্বভাবই হচ্ছে বাড়িয়ে বলা। তুই যখন যাকে বাড়াবি, তখন তাকে একেবারে আকাশে তুলে দিবি! এটা কি বিশ্রী স্বভাব না? কেন, সেলি কিট্স্ কি কম কবি?"

বরেন বলিল, "কেন, বাইরণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ?"

ভবেন চীৎকার করিয়া বলিল, "রাখ তোর বাইরণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ! কিসে আর কিসে! 'চলে নীলসাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর',—বার কর দিকি এই রকম একটা ছত্র ওদের লেখা থেকে!"

হরিশ সমান ওজনে বলিল, "আলবৎ বার করবো! ইঃ, ভারী দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে!" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে টেবলের উপরে যে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল, তাহাতে চায়ের কাপ সসারগুলা ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি নবাগত সুদর্শন যুবক হলঘরে পদার্পণ করিয়া হাতের ছড়িগাছটা র‍্যাকের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "কি হলো তোদের আবার? একটা না একটা লেগেই আছে!"

বরেন লাফাইয়া উঠিয়া সুর করিয়া বলিল, "হে—এ—ল হেভন্লি লাইট—হে—এ—ল! বড্ড সময়েই এসে পড়িছিস, রণা! বল্ ত, সেলি বড় কি চণ্ডীদাস বড়—"

রণেন্দ্র আসনে উপবেশনান্তে বলিল, "আগে কথাটাই কি, শুনি। তর্কটা কি নিয়ে? কোন্ কবি বড়? তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে বল্ ত?"

হরিশ বলিল, "না, তা কেন? তোর মত 'কোথায় মা কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি' ব'লে বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করলেই চতুর্ব্বর্গ-ফল হস্তগত হবে, আর কি! তোর ও বাঁদরামী রোগ আর গেল না ইহজন্মে।"

ততক্ষণ চাকর-খানসামা-মহলে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। কেহ নবাগতের জুতা-মোজা খুলিয়া লইতেছে, কেহ গরম চায়ের কাপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেহ তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

রণেন্দ্র সকলকে কক্ষ ত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিল। তখন সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া হাসিয়া বলিল, "রোগ যে কার নেই, তা ত বলতে পারি নে। আমার এক রোগ, তোর এক রোগ, ভগবানের চিড়িয়াখানায় রকম রকম জানোয়ারের রকম রকম রোগ লেগেই আছে।"

হরিশ ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "তোর ত আবার একটা রোগ নয়, একলাই তুই একশো রোগ পুষে রেখেছিস্, নইলে হঠাৎ আজ খেয়াল চাপলো, আর কাউকে কিছু না ব'লে না কয়ে শিবপুরের বাগানে পালালি কেন? বিকেলে যে আজ আমাদের এইখানে ভ্যাগাবণ্ডস ক্লাবের মিটিং বসবে, তা বেমালুম ভুলে গেলি? বাঃ—"

রণেন্দ্রনাথের মুখখানা হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে অবস্থান করিবার পর বলিল, "তা সত্যি বটে। খেয়াল—রোগ—যা বলিস, তাই।" সেই অগ্রহায়ণের শীতেও সে পাখার সুইচটা টিপিয়া দিল। বন্ধুবর্গের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রণেন্দ্র পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "কিছু মনে করিস নে তোরা। বাইরের ঠাণ্ডা থেকে হঠাৎ ঘরের বন্ধ হাওয়ায় এসে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠলো।"

ভবেন বলিল, "তা হোক গিয়ে, ওতে কিছু আসে যায় না কিন্তু আজকে হঠাৎ এ খেয়ালটা হলো কেন? তুই ত রেগুলার, মিটিং ফাঁক দিস্ না।"

রণেন্দ্র বলিল, "খেয়াল! বলেছি ত রোগ সবারই আছে। মাথার পোকাটা নড়ে উঠলো, অমনই ছুটে বেরুলুম। দুপুরবেলা 'থেয়িস'খানা পড়তে পড়তে চোখ ঢুলে এলো, অমনই বেরিয়ে পড়লুম। তখন কে জানে মিটিং—কে জানে সিটিং! ওরে, তোরা জলটল কিছু খেইছিস্, না কেবল চা-ই চুমুক দিচ্ছিস্? বাঃ!—বেহারী!"

ভৃত্য-পরিজনকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া রণেন্দ্র বলিল, "ভাগ্যে গেছলুম আজ খেয়ালের ঝোঁকে, তাই জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল।"

বরেন বলিল, "তার মানে?"

রণেন্দ্র চায়ের পেয়ালায় আর এক চুমুক দিয়া সহাস্যে বলিল, "সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! লোকটার ভাই বয়েস হয়েছে, পশ্চিমে পশ্চিমে দেখতে, কিন্তু বাঙ্গালী। বোধ হয়, অনেক দিন ওদেশে বাস করেছে। মুখখানা যেন চেনা চেনা ঠেক্‌লো বটে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলুম না, কোথায় দেখেছি।"

হরিশ বলিল, "বটে? তা বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে কি অদ্ভুত কাণ্ড হলো?"

রণেন বলিল, "বলছি, শোন্ না। সঙ্গে ছিল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটি কি চমৎকার সুন্দরী!"

বন্ধুবর্গ সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। ভবেন বলিল, "তা হ'লে একবারে রোমান্স! তার পর আমাদের বন্ধুটি উপন্যাসের নায়কের মত সুন্দরীকে কোন বিপদ্ থেকে উদ্ধার করলেন ত?"

রণেন তাহাদের হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল, "কতকটা বটে। তবে বিপদটা আমার এই প্রতাপই ঘটিয়েছিল। রাস্কেল একবারে মেয়েটির বুকের উপর দুপা তুলে বিশ্রী দাঁত বার ক'রে যেন কামড়াবার যোগাড় করেছিল।"

কথাটি বলিয়া সে পার্শ্বে উপবিষ্ট বিশালকায় কুকুরের মস্তক চাপড়াইতে লাগিল। প্রভুভক্ত কুকুরও সোহাগে আদরে গলিয়া গিয়া লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল।

ভবেন হাসিয়া বলিল, "প্রতাপটা সমজদার লোক—আমাদের আয়রণ কার্ত্তিকের চেয়ে ত বটেই।"

বন্ধুবর্গের হাস্যধ্বনিতে কক্ষতল মুখরিত হইয়া উঠিল।

রণেন্দ্রের মুখমণ্ডল অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার সুগৌর আননে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস দেখিয়া বন্ধুবর্গের উল্লাস অন্তর্হিত হইয়া গেল। উদ্যত ক্রোধকে প্রচণ্ড আয়াসে দমন করিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত পরে কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভাবছিস্, খুব একটা রসিকতা ক'রে ফেল্‌লি, না? ভদ্র পরিবারের মেয়ে-ছেলে নিয়ে এমন ইতরের মত তামাসা আমি মোটেই পছন্দ করি নে, জেনে রাখিস্।"

হরিশ বলিল, "ঠিক কথা। ও সব চেঙ্গড়ামি, যারা দেশজননীর সেবা করে, তাদের মুখে মোটেই মানায় না। যাক্ গে ও কথা, তার পর তুই কি করলি?"

রণেন বলিল, "কিছুই না। প্রতাপকে ডাকবামাত্রই সে ঠাণ্ডা হয়ে আমার দিকে ছুটে এসে লেজ নাড়তে লাগলো—যেন সে প্রতাপ আর নেই! মেয়েটি যতটা ভয় পেয়েছিল, বোধ হয়, তার চেয়েও বেশী ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে তার বাবাকে ডেকেছিল। তিনি বুড়োমানুষ হলেও বিপদ্ দেখে যতটুকু পারেন দৌড়ে আসছিলেন! ছেলেটি বোধ হয় মেয়েটির ভাই, মুখ-চোখ একই রকমের, দিব্যি ফুটফুটে সুন্দর!"

হরিশ বলিল, "তার পর বাপ এসে কি বল্‌লেন ? বোধ হয়, কি ব'লে ধন্যবাদ দেবেন, ভাষাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না ?"

রণেন বাহিরের বাতায়নের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া বলিল, "না ভাই, ঐখানেই গোল। তাঁর ব্যবহারে ভদ্রতার অভাবটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমায় দেখে চোখ দুটো বড় বড় ক'রে পাকিয়ে একটা কথাও না ব'লে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে চ'লে গেলেন। এমনি ভাবটা প্রকাশ পেল, যেন আমি বাঘ, হয় ত ওদের খেয়েই ফেল্‌তুম !"

ভবেন রসিকতার সুযোগ ছাড়িল না, বলিল, "তোর চোখে যে বিজলী খেলে, বুড়োর ভয় পাবারই কথা—বিশেষ সঙ্গে—"

কথা শেষ করিতে হইল না, হরিশ রণেন্দ্রের মুখের ভাব দেখিয়াই শঙ্কিত হইয়া কথাটা চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "ওরে রণা, এ দিকে এক কাণ্ড হয়েছে জানিস্ ? সেই কথাটা বলবার জন্যেই আমরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছি। দেখ, অতীন বলছিল, ওকে কে বলেছে, সমিতিতে যে লোকটা নতুন ভর্ত্তি হয়েছে, ও ভাল লোক নয় ।"

রণেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের ব্যায়াম-সমিতির অতীন ? কার কথা বল্‌ছিল ? কে সেই লোকটা, মনে ত পড়ছে না ।"

হরিশ বলিল, "আরে, যে লোকটা সে দিন তোর লাইব্রেরী থেকে গ্যারিবল্ডিখানা চাইতে এসেছিল, সেই যে গ্যাঁটাগোটা গুণ্ডার মত—"

রণেন্দ্র বলিল, "ওহোঃ, গুপে গুণ্ডা ? পাড়ার সেই মাতালটা ? তোরা যেমন ছেলেমানুষ। ও আমাদের কি করবে ?"

হরিশ বলিল, "তবু কি জানিস, সময়কাল যেমন পড়েছে—"

বাধা দিয়া রণেন বলিল, "সে ভাবনা তোদের ভাবতে হবে না। এখন খা দিকি পেটটা ভ'রে—ও কি ভবা, ফেলে রাখলি যে কাটলেটখানা ?"

যুবকের দল ততক্ষণ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। পাণ মুখে দিয়া চুরুট ধরাইয়া হরিশ বলিল, "আর খায় না। রাক্ষস না কি ? দেখ, কালকের ষ্টীমারের পার্টির কথা মনে আছে ত ? ভবেনের ভায়ের বৌভাতের দরুণ ?—বোটানিকেল গার্ডেন—বেলা ১১টা—মনে থাকে যেন ।"

ভবেন বলিল, "যেন আজকের মিটিংয়ের মত করিস্ নি ।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। সোপানে অবতরণ করিতে করিতে ভবেন বলিল, "হাঁ, ভাল কথা—মালতীর কি করলি ? টালার আশ্রমে কিছু সুবিধে করতে পারলি কি ? না হ'লে আর্য্যসমাজী বা তাঞ্জিমওয়ালারা হয় ত একটা কাণ্ড ক'রে বসবে ।"

রণেন্দ্র অপ্রসন্ন-মুখে বলিল, "না, তারা বলে, সিট খালি নেই। আমি ত খরচা সবই দিতে চাইছি, কি যে করি ।"

হরিশ বলিল, "শেষে না হয় তোরই এখানে এনে দিন কতক রাখা যাবে। এত বড় দো-মহল বাড়ী, তাতে কি এসে যাবে ?"

রণেন্দ্র বলিল, "সে তখন দেখা যাবে ।"

বন্ধুর দল নামিয়া গেল, তাহাদের হাস্য-কোলাহলে স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

রণেন্দ্র আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় এলাইয়া পড়িয়া চুরুট টানিতে লাগিল। দূর হইতে তাহার বন্ধুবর্গের হাস্যকলরব বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া সে পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই বিরক্ত হইয়া সেখানা টেবলের উপর ফেলিয়া দিল। ছিঃ ছিঃ, এ কি তাহার মানসিক দৌর্ব্বল্য ! সীমন্তে তাহার সিন্দূরশ্রী—সে তরুণী ত বিবাহিতা, পরের ঘরণী—তাহার চিন্তা ? অন্যায়, তাহা সে জানে, কিন্তু তথাপি সে চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করে না কেন ? সে না শিক্ষিত, ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের রক্ত না তাহার ধমনীতে প্রবাহিত ?

রণেন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল।

না, না, অপরিচিতা পরস্ত্রীর চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে—অন্য চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু, কিন্তু, কি সুন্দর সে তরুণী ! এত রূপ ? মানুষের এত রূপ ? আর—আর—সে কি কোমল মধুর স্পর্শ ! চম্পকনিন্দিত করাঙ্গুলীর স্পর্শ কি এত মধুর হয় ? ভয়ভীতা চকিতা কুরঙ্গীর মত সে কি দৃষ্টি ! মন্মথের ফুলধনু কি

সে ভ্রূভঙ্গে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয় নাই? মুহূর্ত্তস্থায়ী—সে মাধুর্য্যপূর্ণদৃষ্টি—সে কুসুমপেলব চম্পকাঙ্গুলীর স্পর্শের প্রভাব তাহার অন্তরে কি প্রাণস্পন্দন—কি আনন্দ-শিহরণ আনয়ন করিয়াছিল!

যুবক সহসা চমকিত হইয়া উঠিল।

ছিঃ ছিঃ! এ কি ভাবিতেছে সে? রণেন্দ্র অস্থির হইয়া কক্ষমধ্যে দ্রুততরবেগে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন ত কত নারী সে দেখিয়াছে, আজ তাহার মন চিরাভ্যস্ত পথ হইতে বিচ্যুত হইতে চাহে কেন?

"নীচে এক জন বাবু অপেক্ষা করছেন, নিয়ে আসবো কি?" ভৃত্যের অতর্কিত প্রশ্নে রণেন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিল। সে অন্যমনস্কভাবে বলিল, "এ্যাঁ, কি বলছিলে?" ভৃত্য প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল। রণেন্দ্রের মুখে বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল। ভৃত্য সভয়ে কক্ষত্যাগ করিতেছিল, হস্ত-সঙ্কেতে রণেন্দ্র নিষেধ করিয়া বলিল, "তাঁকে নিয়ে আসতে পার।" ভৃত্য প্রস্থান করিল।

কে এ অপরিচিত? বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর? আজ কি তাহার জীবনে কেবল অপরিচিতেরই সহিত পরিচয়ের সূত্র বিধাতা গ্রথিত করিয়াছেন? তাহার জীবনে কি কোনও পরিবর্ত্তন অনুসূচিত হইতেছে?

সোপানে পদধ্বনি হইল।

নবাগতকে দেখিয়া "আরে, কে ও, কালীদা? তুমি? তুমি কোত্থেকে?" উল্লাসে হর্ষধ্বনি করিয়া একলম্ফে অগ্রসর হইয়া রণেন্দ্র আগন্তুককে বাহুপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই বলিয়া চলিল, "এস, এস, বোসো, অনেক দিন পরে যে। ওরে বেহারী, চা।"

উপবেশনানন্তর আগন্তুক বলিল, "তোদের মত লেখক হ'লে বঙ্কিমের সাগর-বৌএর মত বলতুম—লক্ষ্মী নয়, সরস্বতী নয়, দুর্গা নয়,—একবারে সাক্ষাৎ কালী। সত্যিই তোর মত বরাত ক'রে ত আসি নি যে, বাপের পোতা গাছ নাড়লেই টাকা। স্রোতের শেওলার মত ভাসতে ভাসতে যে দিক্ দিয়েই হোক এসে পড়েছি। তার পর তোর সেই ক্লাবের কি হলো? 'মাধবিকা' কাগজখানা?"

একরাশি ধূম উদ্গিরণ করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে রণেন্দ্র বলিল, "সে সব ঠিকই চলছে, কিন্তু বাপের পোতা গাছের ফল ত আমি একাই ভোগ করতে চাই নি, সবাইকে ত দিতেই চাই। কিন্তু লোকে যদি নিজের দোষে পেয়েও তা হারায়, তার জন্যও কি আমি দায়ী?"

কালীনাথ দেখিল, কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সে সাপ বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তখনই খেলিয়া গেল তাহার অতীত জীবনের লজ্জাকর কাহিনীর কলঙ্কময় চিত্র। মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে সে তাহার এই সরল-বিশ্বাসী মাতুলপুত্রের অতিথিরূপে এই প্রাসাদে কি সুখেই না দিনাতিপাত করিয়াছিল! আর আজ? আপন চরিত্রগুণে সে আপনিই আপনাকে বেত্রাহত কুক্কুরের মত এই আশ্রয় হইতে বিতাড়িত করিয়া পথে পথে উদরান্ন-সংস্থানের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে। দুই একবার রাজার পাষাণ-প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করিতে করিতে বাঁচিয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর নাই দেখিয়াই ত সে আবার অধম-তারণ মাতুলপুত্রের আশ্রয়-ভিখারিরূপে কলঙ্কীর কালিমালিপ্ত মুখ দেখাইতে আসিয়াছে। তাহার সর্ব্বংসহ বুদ্ধিহীন মাতুলপুত্র তাহার অতীত কীর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া আবার তাহাকে কোল দিবে, এই আশায় নহে কি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে স্বয়ং অসংযত বাসনার প্রভাবে অতীতের পূতিগন্ধময় কুকীর্ত্তির স্মৃতি কেন তাহার মনে জাগাইয়া তুলিল? ইহা কি বিধাতার অভিসম্পাত?

বিষণ্ণ-ম্লান-মুখে কালীনাথ বলিল, "আজও তা ভুলতে পারিস নি, ভাই? তার জন্য অবশ্য তোকে দোষ দিতে পারি নে। তবে একটা কথা, দোষ কি মানুষের হয় না? তা ব'লে আপনার রক্তের সম্বন্ধ যেখানে—যাক্, এবার থেকে ঐ ছাই টাকার সংস্পর্শেই আর রেখো না। টাকা! টাকা! কি শয়তানই ঐ জিনিষটা! সাধে কি বুড়োরা ব'লে গেছে—বরং বনং ব্যাঘ্রগজাদি—"

রণেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "থাক, আমি কিছুই মনে ক'রে তোমায় ও কথা বলি নি। কথার পিঠে কথা, তাই বলেছিলুম। তার পর, যাচ্ছ এখন কোথায়?"

অভিনয়ে সুদক্ষ কালীনাথ চোখে সাঁতারপানি বহাইয়া বলিল, "বেশ! এক দিন থাকার কথাও বল্লে না, একবারে ধুলো-পায়েই বিদায়। আমি—"

রণেন্দ্র বলিল, "না, তা বলছি না—তোমার যদ্দিন ইচ্ছা, এখানেই থাক। তবে তুমি ত কোথাও দু'চারদিনের বেশী

স্থির হয়ে থাকতে পার না—ভেবেই দেখ না, আগে এখানে থাকতেই মাসে কবার ক'রে দেশে ছুটতে, জমীদারীতে যেতে, সেথা সেথা ঘুরে বেড়াতে—তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম ও কথাটা।"

কথাটা বলিবার সময়ে রণেন্দ্রের মনে পড়িল, তাহার স্নেহময়ী পিতৃষসাকে। তাঁহার জীবদ্দশায় এই পুত্র তাঁহার কিরূপ অস্বস্তির কারণ হইয়াছিল, তাহা সে দূরে থাকিয়াও সমস্তই শুনিয়াছিল। কিন্তু তবুও পিতৃষসার পুত্র, সংসারে তাহার নিকটাত্মীয় বলিবার মধ্যে মাত্র এক জন। অতি সন্তর্পণে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রণেন্দ্র প্রকাশ্যে বলিল, "যাও কালীদা, কাপড়-চোপড় ছেড়ে এসো, একসঙ্গেই খাওয়া দাওয়া হবে'খন। তোমার ঘর যেমন, তেমনই আছে, কাপড়-চোপড় সবই পাবে'খন, বেহারীকে ডেকো।" সে যে চোরের মত এক কাপড়ে এই গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা রণেন্দ্রের মনে ক্ষণ-তরেও উদয় হইল না।

কালীনাথের মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তখন বোধ হয় ভাবিতেছিল, এই সহজবিশ্বাসী সরল মানুষটাকে করায়ত্ত করিতে কত অল্প সময় ও কত অল্প বাক্-চাতুরীই প্রয়োজন হয়!

সে উঠিতেছে, এমন সময় বৃদ্ধ সরকার মহাশয় দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্রকণ্ঠে বলিলেন, "বাবু কি এখন আহারে বসতে যাচ্ছেন? না হ'লে—"

রণেন্দ্র বলিল, "কেন, কিছু দরকার আছে কি, মুখুয্যে মশাই?"

সরকার মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আজ্ঞে না, তেমন জরুরী কিছু নেই, তবে দুপুরবেলা থেকে চিঠিখানা এসে প'ড়ে রয়েছে—"

"চিঠি? কার চিঠি? কোত্থেকে এসেছে?"

"আজ্ঞে, চাঁপাপুকুর থেকে, সোনা মালী লিখছে। কি এক আদালতের নোটিশ এসেছে—"

রণেন্দ্র বিরক্তিভরে বলিল, "আমি ত বলেই দিইছি, ও সব ভার আমি নিতে পারবো না, আমার সময় কোথায়? ও আপনারা যা হয় করবেন।"

"আজ্ঞে, আমাদের দ্বারা এ কায হবে না। বাবুর নিজের উপস্থিতি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন।"

কালীনাথ বলিল, "কি, ব্যাপারখানা কি?"

"আজ্ঞে বাবু, পড়েই দেখুন না। আমাদের নামে স্বত্ব-সাব্যস্তের নালিশ হয়েছে। দলীল-দস্তাবেজ দেশের রাজ-বাড়ীতে কর্ত্তা বাবুর সিন্দুকে আছে। বাবু নিজে গিয়ে সে সব বার ক'রে না দিলে মামলায় দাখিল করা হবে না।"

রণেন্দ্র ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিল, "চুলোয় যাক গে স্বত্ব-সাব্যস্ত! আমায় কি আপনারা একটু শান্তিতেও থাকতে দেবেন না? দেখি চিঠিখানা।"

সরকার মহাশয় সসম্ভ্রমে পত্রখানি টেবলের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। রণেন্দ্র বলিল, "আপনি এখন যেতে পারেন, কাল যা হয় করবো।"

সরকার মহাশয় প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রণেন্দ্র হঠাৎ বলিল, "শুনুন মুখুয্যে মশাই, কালীদা এসেছে, আপনি ওকে নিয়ে কাল দেশে রওনা হন। দু'দিন পরে আমি হয় ত যেতেও পারি।"

কালীনাথ বিস্মিত হইয়া রণেন্দ্রের দিকে চাহিল। এই তরুণ যুবকের প্রতি ব্যবহারে সে আত্মীয়তার পবিত্র সম্বন্ধ বজায় রাখিতে পারে নাই, ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়া সে এত দিন আত্মগোপন করিয়াছিল। আজ প্রথম সাক্ষাৎকারের পরই সে আবার তাহাকে আপনার বিশ্বাসভাজন আত্মীয়ের মতই গ্রহণ করিতেছে। এ কি খেয়াল!

কালীনাথ বলিয়া উঠিল, "তোমার আবার এ কি খেয়াল হ'ল, ভাই?"

রণেন্দ্র বলিল, "খেয়াল নয়। তুমি যখন ফিরে এসেছ, তখন ওসব ঝঞ্চাট আবার তোমার ঘাড়ে ফেলেই নিশ্চিন্ত হব। হাঙ্গামা আমার ভাল লাগে না। তোমার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা তুমি এষ্টেট থেকেই পাবে, কালীদা।"

কালীনাথের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। কিন্তু সহসা সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল। তার পর সে কক্ষ ত্যাগ করিবার কালে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি ভাল লাগে তোমার, কবিতা গল্প লেখা?"

নিমীলিত-নয়নে রণেন্দ্র বলিল, "হবেও বা!"

৪

রাজেশ্বর বাবু পিতৃপিতামহের প্রাচীন ভিটায় পুত্রকন্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া দূরসম্পর্কীয়া জ্ঞাতি-বিধবার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন। পিতা বিষয়কর্ম্ম সম্পর্কে ব্যস্ত, মাত্র এই তত্ত্বটুকু জ্যোৎস্নাময়ীর পরিজ্ঞাত ছিল। বাল্যে মাতৃহারা, পিতাও এ যাবৎ বিপত্নীক, তরুণীর মনের চিন্তা মনেই উদয় হইয়া বিলীন হইয়া যাইত, আনন্দ বা ব্যথার বোঝা আপনাকেই বহিতে হইত, আপনার মধ্যেই নামাইয়া লইতে হইত। আজ যদি তাহার মা থাকিতেন!

কিন্তু পিতাও ত তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য কখনও প্রদর্শন করেন না। তাঁহার আর কে আছে? পুত্রকন্যাকে লালন-পালন করাই এখন তাঁহার একমাত্র ব্রত—একমাত্র লক্ষ্য। বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার গল্পে রাক্ষসীর প্রাণ যেমন সুবর্ণ-সম্পুটকের অভ্যন্তরস্থ ভ্রমর-ভ্রমরীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, এই মাতৃহারা সন্তানযুগলের মধ্যেও যেন বৃদ্ধের সমস্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তথাপি বিষয়সম্পর্কিত কোন যুক্তি-পরামর্শ তিনি বুদ্ধিমতী বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার সহিত করিতেন না; হয় ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন না সম্ভবতঃ তিনি এখনও জ্যোৎস্নাকে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা বলিয়াই মনে করিতেন।

কলিকাতার কার্য্য সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি শুনিলেন, পুত্র ও কন্যা গ্রামপরিদর্শন করিতে বহির্গত হইয়াছে। তাঁহার মনে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের উদয় হইল। আনন্দ এই হেতু যে, এই ভাবে প্রকৃতির অযাচিত দানের সদ্ব্যবহার না করিলে—মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বাতাসে মনের আনন্দে নিত্য ভ্রমণ না করিলে দেহ-মন সুস্থ থাকে না, গৃহের বদ্ধ হাওয়ায় অহোরাত্র কালযাপন করিলে পুরুষ ও নারী কাহারও দেহ ও মন সুগঠিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুঃখ-ভয়েরও যে কারণ ছিল না, তাহা নহে। বাঙ্গালার পল্লীর নানা গুণ সত্ত্বেও সঙ্কীর্ণতার কথা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; সুতরাং বয়ঃস্থা কন্যার এইরূপ অবাধ-ভ্রমণে যে আলোচনার সৃষ্টি হইতে পারে, সে আশঙ্কা তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল।

কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণ করিবার পর তিনি সঙ্গে আনীত একখানি সংবাদপত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ উহাতে নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারিলেন না। সংবাদপত্র ফেলিয়া দিয়া ডাকিলেন, "রামাবতার!"

রামাবতার তাঁহার পশ্চিমের পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য। তাহাকে তাঁহার দিদিমণিদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, দিদিমণিরা বেড়াইতে গিয়াছে জানে, কিন্তু কোথায় গিয়াছে, তাহা জানে না। রাজেশ্বর বাবু ভর্ৎসনা করিলেন;—"তবে তুই কি করতে রয়েছিস? তোর জরুই বা কি করছিল, সঙ্গে যায় নি কেন? তোরা দুজনেই কি এমন কাযে ব্যস্ত ছিলি যে, কেউ সঙ্গে যেতে পারিস্ নি? এমন ক'রে—"

তাঁহার কথা সাঙ্গ হইল না। "ও মা, এই যে বাবা! বাবা, তুমি কখন্ এলে?"—বলিতে বলিতে জ্যোৎস্না আনন্দের আতিশয্যে রীতিমত ছুটিয়াই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে সুধা। রামাবতার সুযোগ বুঝিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

জ্যোৎস্না পিতার স্কন্ধের উপর একখানি হস্ত রক্ষা করিয়া বলিল, "হাঁ বাবা, আজ আসবে ব'লে ত লেখনি। তোমার কায হয়ে গেছে, বাবা?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "না মা, কায কি সামান্য? তবে কতকটা ভিত্তিপত্তন ক'রে এলুম বটে। তোমরা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে, মা?"

সুধা তাহার দিদিকে উত্তরের অবসর না দিয়া স্বয়ং হর্ষভরে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, সে কত বড় বাগান, তোমায় কি বোলবো, বাবা! কত বড় পুকুর, কত ফুল!"

রাজেশ্বর বাবু তাহার মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "কোন্ বাগান রে, পাগ্‌লা?"

জ্যোৎস্না বলিল, "ঐ যে রাস্তার ওপারে ঐ দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গা বাগান, ঐটে। আহা, বাগানটার কি ছিরিই ক'রে রেখেছে! যেন ওর মা-বাপ নেই, বাবা। সনাতন কত আদর ক'রে সমস্ত বাগানটা আমাদের দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালো। বল্লে, ওর মনিবরা বাড়ীঘরে আসে না। হাঁ বাবা, এমন সুন্দর বাগান থাকতে বিদেশে যারা কাল কাটায়, তারা কি রকম মানুষ?"

রাজেশ্বর বাবুর মুখমণ্ডল অকস্মাৎ গম্ভীর আকার ধারণ করিল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "কে, সোনা মালী? এখনও বেঁচে আছে বুড়ো?"

জ্যোৎস্না বিস্মিত হইল, বলিল, "হাঁ, সোনা মালী। তুমি ওকে জানলে কি ক'রে বাবা? বড় ভাল মানুষ। জান বাবা, আমায় মা ব'লে কথা কইলে।" জ্যোৎস্নার হাসির লহরে কক্ষটি যেন শুভ্র নির্ম্মল জ্যোৎস্নাধারাতেই স্নাত হইল।

রাজেশ্বর বাবু কোন কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "এ কদিন কি গাঁয়ে এমনই ক'রে বেড়িয়েছ, মা?"

জ্যোৎস্না বলিল, "না বাবা, রোজ না, এর আগে আর এক দিন গিয়েছিলুম। কদিন থেকে সুধা বলছিল, বাগানটা দেখবে, ও ফুল বড্ড ভালবাসে কি না!"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "তা বেশ করেছ, মা। তবে বলছিলুম কি, এটা পশ্চিমের খোট্টার দেশ নয়, এখানে পথে ঘাটে বেরুলে নিন্দা হ'তে পারে। ছেলেবেলা থেকে নিজের জন্মভূমি ত কখনও দেখ নি, এখানকার রেওয়াজও তোমার জানা নেই। না হ'লে—"

জ্যোৎস্না ক্ষুব্ধ অভিমানাহত সুরে বলিল, "কেন বাবা, বেড়ালে আবার নিন্দে কি?" সুধাও বলিয়া উঠিল, "বা রে, বেড়ালে বুঝি আবার দোষ হয়? দূর!"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "না রে পাগলা, দোষ কিছু হয় না। তুই যা দিকি, চট ক'রে—আমার নাইবার যোগাড় করতে ব'লে আয় দিকি। আর দেখ্, তোদের জন্যে কলকাতা থেকে কত কি খেলনা এনেছি, দেখ্ গে যা তোর পিসীমার কাছে—"

সুধা তাঁহার সমস্ত কথা সাঙ্গ করিতে দিল না, এক-লম্ফে ছুট দিল। তাহার ডাকাত-পড়ার মত বিকট উল্লাস-চীৎকারে কক্ষ ছাইয়া গেল। তাহার দিদিও তাহার অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু রাজেশ্বর বাবু সঙ্কেতে তাহাকে নিষেধ করিলেন। জ্যোৎস্না বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

রাজেশ্বর বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ব'স মা এইখানে, তোমার সঙ্গে কিছু দরকারী কথা আছে।"

জ্যোৎস্নার বক্ষঃস্থল গুরু গুরু করিয়া উঠিল—কি এমন গোপনীয় কথা? সে ধীরে ধীরে কম্পিতহৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করিল।

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "দেখ জ্যোৎস্না, কথাগুলো অনেক দিন থেকেই তোমায় বলবো বলেও বলবার সময় ক'রে উঠতে পারি নি। কিন্তু আর না বললেও চলে না। তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নও, বড় হয়েছ। এখন দেশে ঘরে এসে বাস করেছি, বিদেশের মত আর তোমার এখানে পথে ঘাটে বেরুনো উচিত নয়। বেরুলে কথা উঠবে। অবশ্য আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কি জান, যারা আমাদের আপনার লোক, তারাই তোমার নিন্দে করবে, হয় ত আমাদের সঙ্গে মিশবে না, হয় ত আমাদের নিয়ে সমাজে চলবে না। কিন্তু যখন সমাজের মধ্যে বাস করতেই হবে, তখন ওদের সঙ্গে মিলেমিশে না চললেও ত চলবে না।"

জ্যোৎস্নার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এমন কথা ত সে পিতার মুখে কখনও শুনে নাই। সে ক্ষুণ্ণ-মনে বলিল, "তা হ'লে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবো না?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "না, তা বলছি নি। তবে যেখানে যাও, তোমার পিসীর সঙ্গে যেও, অন্ততঃ পক্ষে রামাবতারের বউকে সঙ্গে নিয়ে যেও।"

জ্যোৎস্না সাভিমানে বলিল, "না, বেড়াতেই যাব না।"

রাজেশ্বর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, পাগলী মেয়ে রাগ করলে! ইচ্ছে হ'লে বেড়াতে যাবে বৈ কি। বিশেষ, সামনের বাগান-বাড়ীতে গেলে কথা হবে না। ওটা পোড়ো বাড়ী, কেউ থাকে না, ওখানে তোমরা রোজ যেতে পার। মালীটা কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল?"

জ্যোৎস্না বলিল,"না, কেবল জিজ্ঞাসা করেছিল এটা কি বোসেদের বাড়ী নয়? আমি বলেছিলুম, তা জানি নি, তবে আমরা বোস, বাবার কাছে শুনেছি। সে তাতে বলেছিল, বোসেরা বহুকাল আগে এ বাড়ীর মালিক ছিল, সব বেচে-কিনে কলকাতায় না কোথায় চ'লে গেছে। হাঁ বাবা, তোমরা বুঝি ছেলেবেলায় এখানে থাকতে?"

রাজেশ্বর বাবুর মুখমণ্ডল অকস্মাৎ অমাবস্যার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর বলিলেন, "সে ঢের কথা। দেখ মা, কটা কথা বোলবো তাড়াতাড়ি! সুধা এসে পড়্লে হয় ত সময় পাব না। লাহোরে থাকতে এক দিন তোমায় বলেছিলুম, মনে আছে যে, তোমার বিবাহ হয়েছে?"

জ্যোৎস্না মুখখানি অবনত করিয়া কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে কথা তাহার মনে আছে, কিন্তু মুখে কোন কথা কহিল না।

রাজেশ্বর বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "যখন তোমার বিবাহ হয়, তখন তুমি সাত বছরের, তখন তোমার গর্ভধারিণী জীবিত। পাশের গ্রামের জমীদার তোমায় দেখে একবারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর আদরের বালক নাতির সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করেন। আমার বাবা এতে গৌরব মনে ক'রে সম্মতি দেন। সে বিবাহে কি ধূমধাম আর খরচ-খরচাই না হয়েছিল! মস্ত জমীদারের পিতৃহীন একমাত্র আদরের নাতি! কিন্তু অত উৎসব আনন্দ সবই ব্যর্থ হ'ল।"

রাজেশ্বর বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জ্যোৎস্না অবনত-মস্তকে বেত্রাসন খুঁটিতে লাগিল। তিনি আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন,"বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যেই জমীজমা নিয়ে আমার বাবার সঙ্গে জমীদারের বিবাদ বাধলো। আমার বাবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। সেই বিবাদ ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে মুখ দেখা-দেখিও বন্ধ ক'রে দিলে। তার পর মামলা বাধলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে জমীদার-ঘরের নামে এক কলঙ্ক রট্‌লো। তুমি ত জান না মা, বাঙ্গালার পাড়াগাঁ এক এক যায়গায় কি ভয়ানক স্থান!"

রাজেশ্বর বাবু আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন, "এ সব কথা তোমার শোনা উচিত নয় জানি। কিন্তু সবটা খুলে না বল্‌লে তুমি অবস্থাটা বুঝবে না, তাই অপ্রিয় হলেও বলতে হচ্ছে। যে ছেলের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল, তার বাপ অর্থাৎ জমীদারের ছেলে অল্প-বয়সেই মারা যান। তাঁর পত্নী তখন অন্তঃসত্ত্বা। লোকে বলে, মদ খেয়েই মারা গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়, এই কথা নিয়েই ছেলের মা'র নামে কলঙ্ক রটে। অবশ্য কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যে। কিন্তু সে যা হোক, এই কলঙ্করটনাই কাল হ'লো। জমীদার মনে করলেন, আমার বাবাই ঐ কথা রটিয়েছেন।"

জ্যোৎস্না এইবার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "তা জানি নি। কিন্তু ফল হ'ল বড় বিষম। এক দিকে মস্ত ধনী জমীদার, অন্য দিকে সামান্য গৃহস্থ আমরা—জমীদার আমার বাবার নামে মিথ্যে ফৌজদারী মামলা সাজিয়ে মিথ্যে সাক্ষী যোগাড় ক'রে আমার বাবাকে জেলে দিলেন!" রাজেশ্বর বাবুর চক্ষু ধক্‌ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল।

জ্যোৎস্না চমকিত হইয়া বলিল, "জেলে দিলেন?"

রাজেশ্বর বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তিন মাসের জন্য বাবার জেল হলো। সেই জেলই তাঁর কাল হলো। জেল থেকে বেরিয়েই বাবার দেহ ভেঙ্গে পড়লো। সেই যে বাবা শয্যা নিলেন, তা থেকে আর উঠ্‌লেন না, আমাদের সোনার সংসারে কালো ছায়া পড়লো!"

জ্যোৎস্না বলিল, "তার পর?"

রাজেশ্বর বলিলেন, "তার পর ভাঙ্গন যখন ধরলো', তখন তা খুব ছুটেই চল্‌লো। বাবা গেলেন যে মাসে, তার দু মাস পরেই তোমার গর্ভধারিণী আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলেন। আমারও এ গাঁয়ের বাস উঠলো। মামলার দায়ে যা কিছু পৈতৃক জমীজমা ছিল, সব নষ্ট হলো। গাঁয়ে বাস করাও অসম্ভব হয়ে উঠলো। পাশের গাঁয়ের জমীদার শত্রু, সেখানে কি বাস করা যায়? শেষে আর অপমান নির্য্যাতন সহ্য করতে না পেরে ভদ্রাসনখানাও বেচেকিনে আমি তোমাদের ভাই-বোনকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে চ'লে গেলুম।"

জ্যোৎস্না বলিল, "আমার যেন স্বপ্নের মত একটু একটু মনে পড়ে, বাবা!"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "সেই থেকেই আমরা আজ প্রায় দশ বছর দেশ-ছাড়া। বেরালে যেমন ছানা মুখে নিয়ে এ বাসা সে বাসা ক'রে ঘোরে, দশ বছর তেমনই ক'রে আমি তোমাদের নিয়ে হিল্লী-দিল্লী ক'রে বেড়িয়েছি।"

রাজেশ্বর বাবু মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "হাঁ শেষে লাহোরে গেলুম, আর সেখানেই স্থিতভিত হয়ে তোমাদের লেখাপড়া শেখালুম; লাহোরেই তুমি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলে। কাণপুরে আমার এক মামাত ভাই চাকরী করতেন, তাঁরই ওখানে গিয়ে প্রথমে উঠি আর তাঁরই সুপারিসে সেখানে এক কলের অফিসে চাকরী জোটে। তার পর মীরাটে যাই,—কিছু বেশী মাইনেতে শেষে লাহোরের মোটা মাইনের চাকরী জোটে।"

জ্যোৎস্না বলিল, 'হুঁ, সেখানে ত চারশ টাকা পেতে না বাবা?"

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, "হুঁ, তাই দু'পয়সা জমিয়ে ছিলুম, কিছু চালানী কারবারও সঙ্গে সঙ্গে করেছি তাতেও কিছু জমিয়েছি। জান ত মা, রাই কুড়িয়ে বে

হয়? তাইতেই ত আবার পৈতৃক ভিটে উদ্ধার করতে পেরেছি। তবে এখনও জমী-জমার সব উদ্ধার হয় নি, মামলা চলছে।”

জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল, “ভিটে ত বেচেই গিয়েছিলে, তবে আবার ফিরে পেলে কি ক'রে?”

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, “বলছি সব, শোন না। দেশ-ঘর ছেড়েছিলুম ব'লে যে দেশের খবর রাখি নি, তা নয়। তোমার যে পিসী এখানে রয়েছেন, ওঁর ভাই হলেন আমার জ্ঞাতি-ভাই—ঐ যে নতুন বাড়ীর ব্রজদা? তোমাদের জ্যেঠামশাই, ওঁর সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি ছিল, অন্য বন্দোবস্তও ছিল। ওঁর কাছ থেকেই জেনেছিলুম, জমীদার রোগে শোকে নানা কষ্ট ভুগে এক রকম নরক ঘেঁটেই মারা গেছেন,—তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বের কদিনের আর্ত্তনাদ পাড়াপড়শী এখনও ভুলতে পারে নি।”

জ্যোৎস্না বলিল, “কেন বাবা, নরক ঘেঁটেছিলেন কেন?”

রাজেশ্বর বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “কেন? জিজ্ঞাসা করছ কেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত!”

সে সময়ে জ্যোৎস্না পিতার মুখ-চক্ষুতে যে বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল, জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে কি? সে সভয়ে দৃষ্টি অবনত করিল।

রাজেশ্বর বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “ভাবছ, বাবা একটা দানাদত্যি, শত্রু ম'রে গেলেও তাকে ক্ষমা করে না? হাঁ মা, এ বিষয়ে তোমার বাবা রাক্ষস পিশাচ যা বল, তাই। আমি ত বাবার অপমান নির্য্যাতন ভুলতে পারি নি! এ জীবনে পারবোও না বোধ হয়। আর তার জ্বালা, অপমানের কণামাত্রও শোধ দিতে পারি,—তারই আশায় আবার এখানে এসে বাস করছি। আমার পিতৃ-ঋণ ত শোধ হয় নি!”

বৃদ্ধের নিস্তেজ নিষ্প্রভ নয়নদ্বয় ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। জ্যোৎস্না বিস্মিত হইল—সে তাহার পিতার এমন ভাবান্তর কখনও দেখে নাই! সে নতমস্তকে মৃদুস্বরে বলিল, “কিন্তু বাবা, যাঁর উপর এই রাগ, তিনি ত নেই।”

রাজেশ্বর বাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “নেই? সে নেই—তার বীজ রয়েছে! বড় আপনার জন সে—যার বাড়া নেই আদরের—আমার সেই জামাই! কিন্তু সেও শত্রু, শত্রুর বীজ ত শত্রু! তার মাথায় বাবার অপমান-লাঞ্ছনার বোঝা ফিরেয়ে দেবো, নিকটে থেকেও তাকে দেখাবো—তাকে আমরা কুকুরের চেয়েও অধম মনে করি—তবে ত আমার জ্বালা দূর হবে! প্রতিহিংসা!” রাজেশ্বর বাবুর দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ, যেন তিনি তখন অপরের অবস্থিতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন।

জ্যোৎস্না দেখিল, তাহার পিতার দেহ উত্তেজনার আতিশয্যে কম্পিত হইতেছে। সে কোনও দিন তাহার পিতাকে এত বিচলিত হইতে দেখে নাই। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতার অংসোপরে মৃণাল-বাহুযুগল স্থাপন করিয়া উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, “বাবা, বাবা!”

রাজেশ্বর বাবুর আত্মচেতনা ফিরিয়া আসিল। ক্ষণ-পরে দারুণ লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি অপরাধীর মত আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টায় বলিলেন, “কি বলছিলে জ্যোৎস্না, আমার রাগের কথা? পারি নি মা, পারি নি, রাগ চেপে রাখতে পারি নি, আমার হাড়ে হাড়ে—মজ্জায় মজ্জায় সে অপমানের বিষের জ্বালা যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানি সব, বুঝি সব—যে অপরাধ করেছে, সে চ'লে গেছে, যে আছে, সে কিছু জানে না। কিন্তু তবু—তবুও সে যে সেই বংশেরই এক জন! যাক্। যে কথাটা তোমায় বলা বিশেষ দরকার, সেইটে বলছি—মন দিয়ে শোন—তোমার উপরেই মীমাংসার ভার দিচ্ছি। দেখ, জেনে শুনেই প্রলোভনের মুখেই তোমায় এনেছি। আশা, আমি যে ভাবে তোমায় গ'ড়ে তুলেছি, তাতে এ প্রলোভনকে তুমি অনায়াসে এড়াতে পারবে।”

জ্যোৎস্না সবিস্ময়ে বলিল, “আমি মীমাংসা করব? প্রলোভন? এ সব কি বলছ বাবা, বুঝতে পারছি না।”

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, “সবই বুঝিয়ে দিচ্ছি, আজ আর কিছু লুকিয়ে রাখবো না। যার হাতে আমার বাবা তোমায় স'পে দিয়েছিলেন, সেই এখন এই বিশাল জমীদারীর মালিক—বংশের একমাত্র সন্তান। শুনেছি, সে খুব লেখাপড়াও শিখেছে, এম, এ পাশ করেছে, কিন্তু তার পিতামহের মৃত্যুর পর থেকে তার মা তাকে নিয়ে তাদের কলকাতার বাড়ীতেই বাস করেছিলেন। শুনেছি, তিনিও আজ তিন চার বছর গত হয়েছেন। ছেলে দেশে ঘরে কচিৎ কখনও

আসে; নইলে কল্‌কাতাতেই থাকে। এখন বুঝছো, প্রলোভন কি ?”

জ্যোৎস্না মুখখানি অবনত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রাজেশ্বর বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “ইচ্ছে করলে তুমি রাজরাণী হ'তে পার। যথেষ্ট পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে এখনও অবিবাহিত আছে, কেন তা জানি নে। সে যে এই ক'বছর ক্রমাগত তোমার খোঁজ নিয়েছে, সে খবর আমি ব্রজদার চিঠিতে অনেকবার পেয়েছি। কিন্তু ব্রজদা ছাড়া কেউ আমার ঠিকানা জান্‌তো না ব'লে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। ব্রজদাকে আমার একবারেই নিষেধ ক'রে দেওয়া ছিল, যেন ঘুণাক্ষরে আমার কথা কেউ জান্‌তে না পারে, যেন আমরা সবাই ম'রে গেছি বা নিরুদ্দেশ হয়েছি, এই কথাই রটে যায়। যা হোক, সে যখন তোমায় অনেকবার খুঁজেছে, তখন অনুমান ক'রে নেওয়া যায়, এখন তুমি দেখা দিলে সে তোমায় নিতে পারে। তোমার পক্ষে এটা কম আকর্ষণ নয়, তা আমি বুঝি। আমিও হিন্দু, জানি, হিন্দুর মেয়ের বিবাহ ইহ-পরকালের, কিন্তু তার উপরেও কর্ত্তব্য আছে ব'লে আমি মনে করি। যে রক্তে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সেই রক্তের অপমান, বংশের অপমান, এ ত ভুলতে পারা যায় না। যে পারে, সে পারে, আমি পারি না।”

উত্তেজনার আতিশয্যে রাজেশ্বর বাবুর শ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। জ্যোৎস্না পাষাণ-প্রতিমার মত কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। ঘড়ীর টিক্-টিক্ ধ্বনি যেন বজ্র-নির্ঘোষে তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল !

রাজেশ্বর বাবু আবার বলিলেন, “যার পিতামহ আমার আরাধ্য পিতৃদেবকে সর্ব্বস্বান্ত করেছে—জেল দিয়েছে—শেষে তাঁকে এক রকম হত্যা করেছে, তার সঙ্গে—তার বংশের কারও সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকলেও নেই, থাকতে পারে না। তাদের সঙ্গে তোমারই সম্পর্ক থাকা কি উচিত ? না, বরং ঘৃণার সঙ্গে পদাঘাতে সে সম্পর্ক ভেঙ্গে দেওয়া উচিত ! দেশঘরে ফিরে এসেছি। এখানে এখন থেকে বসবাসও করতে হবে। কাযেই হয় ত তার সঙ্গে দেখা-শুনোও হয়ে যেতে পারে—হয় ত সে যেচে আলাপ-পরিচয় করতেও চেষ্টা করতে পারে। সে সময়ে আমাদের কি করা উচিত ? এ কথার মীমাংসা এখনই হয়ে যাওয়া দরকার ব'লে আমি মনে করি। বিশেষ ভেবে চিন্তে কথার জবাব দিও।”

জ্যোৎস্না অবনত আরক্ত মুখখানি একবারে পিতার চেয়ারের অঙ্গে লুকাইয়া ফেলিল, কোনও উত্তর দিল না।

রাজেশ্বর বাবু বলিলেন, “লজ্জা কি মা ? এতে লজ্জার কথা কিছুই নেই। আমি তোমায় যে ভাবে গ'ড়ে তুলেছি, তাতে আমি তোমার কাছে স্পষ্ট জবাবেরই প্রত্যাশা করি। আমার পথ আমি ঠিক ক'রে নিয়েছি। এখন এ ক্ষেত্রে তোমার কি করা উচিত, তা তুমিই ঠিক ক'রে নেবে, এতে আমার মতামতের বা প্রসন্নতা অপ্রসন্নতার মুখ চেয়ো না। যদি তুমি নিজের ঘরে ফিরে যেতে চাও, স্পষ্ট ক'রে বল, আমি একটুকু দুঃখিত হব না। আমিই উদ্যোগ ক'রে তোমায় তোমার ঘরে দিয়ে আসবো। আমি যতটা শুনেছি, তাতে বিশ্বাস হয়, সে তোমায় আদর ক'রে ঘরের লক্ষ্মী ক'রে নেবে। তবে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঐ পর্য্যন্ত—চিঠিপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আর যদি আমার মেয়ে হয়ে আমার ঘরে থাকতে চাও, তা হ'লে ওর সঙ্গে কোন সংস্রব—কোন সম্বন্ধ রাখতে পারবে না। তুমি বড় হয়েছ, এখন সব বোঝ, তাই সব খুলে বললুম। এখন তোমার জবাব কি ? মনে রেখো, এই জবাবের সঙ্গে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল অমঙ্গল জড়ানো রয়েছে। আজ তোমার গর্ভধারিণী বেঁচে থাকলে আমায় আজ এ কথা পাড়তে হতো না। কি ঠিক করলে ? ছিঃ মা, লজ্জা কি ? আচ্ছা, আজ না। পার, পরে বোলো, মুখে বলতে না পার, লিখে জানিও, কিন্তু যা হয় ঠিক ক'রে ফেলো। বুঝছি, কি সমস্যায় তোমায় ফেললুম মা, কিন্তু কি করবো, উপায় নেই। ঐ সুধার আওয়াজ পাচ্ছি, আর না। আমি নাইতে চললুম, তুমিও যাও মা।”

রাজেশ্বর বাবু বাহিরে প্রস্থান করিলেন। জ্যোৎস্না তখনও ঠিক প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর, ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত; ললাট গভীর চিন্তারেখাঙ্কিত। তখন তাহার মানস-সমুদ্রে কি ভাবতরঙ্গ খেলিতেছিল, তাহা সে ভিন্ন কে বলিতে পারে ?

[ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অভিনয়

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার স্কুল অথবা কলেজের 'ড্র্যাম্যাটিক ক্লাবে'র বৃহত্তর সংস্করণের মত একটা জিনিষ ছিল। ইংরাজী ভাষায় অভিনীত হওয়ায় এই থিয়েটারে প্রদর্শিত নাটকগুলি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য বা মনোরঞ্জক হইতে পারে নাই। সেজন্য নাট্যশালাটিও খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই কলিকাতায় যে-নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে ইংরাজী নাটকের অভিনয় না করাইয়া বাঙ্গালা নাটক অভিনয় করান হইল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় এই নাট্যশালাতেই সর্ব্বপ্রথম হয়। এই নাট্যশালাটির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামবাজারের বাবু নবীনচন্দ্র বসু। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো অবস্থিত, সেইখানেই নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ী ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালায় বৎসরে চার-পাঁচটি করিয়া বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হইত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২২এ অক্টোবর তারিখের 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' নামক পাক্ষিক পত্রে * আমরা পাই :—

> দেশীয় নাট্যশালা।—বৎসর দুই পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালাটি এখনও বাবু নবীনচন্দ্র বসুর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এটি শ্যামবাজারে স্বত্বাধিকারীর বাড়ীতেই অবস্থিত। ইহাতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচটি নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয় দেশীয়, ইংরাজী ধরণে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে। ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা যায় যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নতিকামী বন্ধুমাত্রেরই নিকট অতিশয় আনন্দের বিষয়—এই নাট্যশালায় বাঙ্গালী রমণীরা সর্ব্বদাই দেখা দিয়া থাকেন, কারণ, স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।

এই নাট্যশালায় প্রথম দুই বৎসর কোন্ কোন্ নাটকের অভিনয় হয়, তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইহাতে বিখ্যাত বাঙ্গালা উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দর নাট্যাকারে অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের খুব প্রশংসাসূচক একটি বিবরণ 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' পত্রে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' লিখিতেছেন,—

> গত পূর্ণিমা দিবস সন্ধ্যায় আমাদের একটি নাট্যাভিনয় দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই অভিনয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। অভিনয়কালে বাড়ীতে এব হাজারের

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা সকলেই 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'কে "মাসিক" পত্র বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা "পাক্ষিক" পত্র ছিল; কারণ, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৪এ অক্টোবর তারিখের 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারি ক্রনিক্‌ল্' পত্রে পাইতেছি,—

"We unintentionally omitted to notice the first number of the *Hindoo Pioneer*, a new bi-monthly periodical, when it came to us from the Editor."

এই কাগজখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৭এ আগষ্ট তারিখে। ১৮৩৫ সালের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্নালে'র ৩২৭ পৃষ্ঠায় আছে :—

"*New Publications.*—A periodical called the *Hindu Pioneer*, closely resembling in exterior the *Literary Gazette* and entirely the production of the students of the Hindoo College, has been published. The first number of the work was issued on the 27th August and on the whole reflects great credit on the contributors and editors."

'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' অল্পদিনই জীবিত ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনঃপ্রকাশের আয়োজন হয়। ১৮৪০, ৮ই জুন তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়র' লিখিয়াছিলেন :—

"*The Hindu Pioneer.*—The report that D. L. R. and Mr. Middleton are about to edit conjointly a periodical entitled the *Hindu Pioneer*, for the reception of contributions by the students of the Hindu College is not quite correct. A work of the same kind was once before established by the alumni of the College, but it was not countenanced by the authorities of that institution, and it had but a brief existence. Some of the youths of the first and second classes were lately very much disposed to revive the work, but there were some difficulties in the way; and, though they had got D. L. R. to write an introduction, all idea of the publication was abandoned.—*Ibid.* [*Hurkaru*]."

উপর হিন্দু, মুসলমান, কয়েক জন য়ুরোপীয় ও অন্যান্য নানা-জাতীয় দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। ইঁহাদের সকলেই অভিনয় দেখিয়া সমভাবে আনন্দিত হইয়াছেন। রাত্রি বারোটার কিছু পূর্ব্বে অভিনয় আরম্ভ হয় এবং পরদিন ভোর সাড়ে ছয়টায় অভিনয় শেষ হয়। আমরা প্রথম হইতে এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম এবং শেষ দুইটি দৃশ্য ভিন্ন প্রায় সমগ্র অভিনয়ই দেখিয়াছিলাম। অভিনয়ের বিষয় ছিল বিদ্যা-সুন্দর।...সুমধুর ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আবার ব্রাহ্মণ। এই বাদকদের মধ্যে বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার সহিত বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং চারিদিকের শ্রোতাদের নিকট হইতে ঘন ঘন করতালি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী ভাল করিয়া তাঁহার বাদ্য শুনিতে পান নাই। যবনিকা উত্তোলনের পূর্ব্বে হিন্দু-প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ করা হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্ব্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দৃশ্যাঙ্কন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির 'পারস্পেক্টিভ,' মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান, উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে পারিত। ইহাদের মধ্যে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাঁহার কন্যার কক্ষ অঙ্কন একটু ভাল হইয়াছিল। এই নাটকে সুন্দরের ভূমিকা বরানগরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি কিশোর যুবক কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। প্রশংসার্হ উদ্যম সত্ত্বেও সে এই ভূমিকার সমুচিত উৎকর্ষ দেখাইতে পারে নাই। এই চরিত্রের অভিনয়ে বার-বার ও হঠাৎ ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা নায়িকার পিতা যাহাতে প্রণয়ের খেলা না ধরিয়া ফেলিতে পারেন, এইরূপ কৌশল দেখাইয়া অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যুবা শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছে সত্য, কিন্তু অঙ্গসঞ্চালন ও ভঙ্গী যেন ইচ্ছাকৃত ও আড়ষ্ট বলিয়া মনে হইল। রাজা এবং অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্তোষজনক হইয়াছিল।

এই নাটকে বিশেষ করিয়া স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় খুব চমৎকার হইয়াছিল। রাজা বীরসিংহের কন্যা ও সুন্দরের প্রণয়িনী বিদ্যার ভূমিকা রাধামণি বা মণি নামে একটি বৎসর ষোল বয়সের বালিকা অভিনয় করিয়াছিল। সে আগাগোড়া খুব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহার সুললিত অঙ্গভঙ্গী, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রতি প্রণয়সূচক হাবভাব দর্শকমণ্ডলীকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। অভিনয়কালে সে একবারও নৈপুণ্যের অভাব দেখায় নাই। আনন্দে ও দুঃখে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন, প্রণয়ীকে বাঁধিয়া পিতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ উক্তি ও ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী, তাহার নিজের এবং নাট্যশালা উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। সুন্দরের বধের আদেশ হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিবার পর তাহার সখীরা তাহাকে প্রবোধ দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভূমিতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সখীদের যত্নে একবার জ্ঞানলাভ করিয়া আবার সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলী সভয়ে নীরব হইয়া রহিল। রাধামণির মত অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার সূক্ষ্ম অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ একটি বালিকা যে এরূপ কঠিন একটি অংশ এরূপ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারিবে এবং সকলকে তৃপ্ত করিয়া ঘন ঘন করতালি লাভ করিতে পারিবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। অন্যান্য স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়ও খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রাণীর ও মালিনীর অভিনয়ের উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। জয়দুর্গা নামে একটি প্রৌঢ়া রমণী এই দুইটি ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া উভয় অংশেই সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে তাহার অভিনয় লক্ষ্য করিবার মত হইয়াছিল। সে সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রাজকুমারী বা রাজু নামে আর একটি স্ত্রীলোকও বিদ্যার সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জয়দুর্গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।

এই লেখকের নিকট বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের দ্বারা স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল, তাহা তাঁহার লেখার ভঙ্গী হইতেই বোঝা যায়। তিনি কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই অভিনয়ের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের একটা ধারা যে সূচিত হইতেছে, সে অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অভিনয়-বর্ণনার পরই দেখিতে পাই, তিনি লিখিতেছেন,—

> দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার ঘটিতে পারিয়াছে, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এই সকল বালিকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না? হিন্দু-হিসাবে আমি এই কথাটা আমার দেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—এই যে বালিকা, যে নাট্যশালায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সে যদি মাতৃভাষায় শিক্ষিতা হইত, তবে কি তাহার প্রতিভার আরও স্ফূর্ত্তি হইত না? এই বালিকাটি শুধু কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিয়া গিয়াছে মাত্র। পুরুষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়া যাঁহারা প্রকৃতিকে দোষী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই কি প্রতীয়মান হইবে না যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের স্বামীদের ন্যায় শিক্ষালাভের উপযুক্ত? এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হিন্দু দর্শকদের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, যত দিন পর্য্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, তত দিন তাহারা সমাজে অবর্ত্তমান

বলিলেই চলে ? আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের মানসিক শক্তির এই মহান্ ও নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হৃদয় কঠিন ও চিত্ত আবেগহীন বলিতে হইবে।

দেশীয় রঙ্গমঞ্চ এবং তাহার পরিচালন-পদ্ধতি এইরূপ। আমাদের প্রশংসার্হ কিন্তু ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র। এই সকল অভিনয় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও উক্ত বাবু নিজের চেষ্টা ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা ইহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। এক জন ধনী দেশীয় ভদ্রলোক যে এইরূপে আমাদের দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। ধনি-সম্প্রদায় কি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন না ? আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই—যাহা দ্বারা কালে ভারতবর্ষের প্রাপ্য খ্যাতি লাভ ঘটিবে।

এই প্রশংসার্হ উদ্যম যাহাতে সফল হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা কামনা করি। এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী যত দিন পর্য্যন্ত সচেষ্ট থাকিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত যে এই নাট্যশালা বর্ত্তমান থাকিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে হিন্দু স্ত্রীলোকের অবনতির কারণ-স্বরূপ যে-সকল কুপ্রথা আছে, সে সকল দূর করিবার জন্য যেন তিনি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন,—উন্নতির নূতন উপায় যেন আবিষ্কার করেন, এবং সর্ব্বোপরি, 'হিন্দু থিয়েটার'এর ন্যায় এই নাট্যশালা যাহাতে প্রথম অবস্থাতেই লোপ না পাইয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহার চেষ্টা যেন করেন। ইহা দ্বারাই তিনি সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন। এই সকল কার্য্যের কোন প্রশংসার আবশ্যক নাই। এগুলি সকল দিক হইতেই গৌরব আহরণ করে—ইহাদের দ্বারা সজ্জনেরা অনন্ত যশ অর্জ্জন করেন।

'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'-এর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সত্ত্বেও সকল পত্রিকা এই অভিনয়ের ও নাটকের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। 'ইংলিশম্যান্ এণ্ড মিলিটারি ক্রনিকল্' পত্রে আমরা দেখিতে পাই :—

হিন্দু নাট্যাভিনয়।—পাইয়োনিয়র হইতে কোন এক বিশেষ হিন্দু নাট্যাভিনয়ের যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহার সম্বন্ধে আমরা একটি পত্র সন্নিবেশিত করিতেছি। আমাদের পত্রপ্রেরক এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ রাখেন, তাহা আমরা জানি। তিনি প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে, এই সকল নাট্যাভিনয়ে হিন্দুদিগের মানসিক বা নৈতিক কোন প্রকার উন্নতি ত হয়ই না বরং লোকহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত। এই সকল অভিনয়ে কোন নূতনত্ব, উপকার, এমন কি, শালীনতাও নাই। বিবরণ-লেখক যে-যবনিকার অন্তরালে এই অভিনয়ের প্রকৃত রূপ গোপন করিতে গিয়াছিলেন, আমাদের পত্র-প্রেরক তাহা উত্তোলিত করিয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যতে এক নিন্দা ভিন্ন এই সকল অভিনয়ের কোন উল্লেখ হিন্দু পাইয়োনিয়রে দেখিতে পাইব না, ইহা আমরা আশা করি। *

ইংলিশম্যানের এই উক্তি আমাদিগকে বাঙ্গালা দেশের পরবর্ত্তী এক যুগের অভিনয়-বিদ্বেষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

স্কুল-কলেজে নাট্যাভিনয়

নবীন বসুর নাট্যশালা আরও কিছু দিন থাকিয়া কখন্ যে লুপ্ত হইয়া গেল, তাহার তারিখ সঠিক জানিতে পারি নাই। ইহার পর অনেককাল বাঙ্গালীদের দ্বারা নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠা কিংবা নাট্যাভিনয়ের কথা শোনা যায় না। † প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার পর বাঙ্গালীদের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে যে উৎসাহ দেখা দিয়াছিল, তাহা অবশ্য লোপ পাইবার নয়। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এই উৎসাহ স্কুল-কলেজে ইংরাজী কবিতা-আবৃত্তি ও নাটকের অংশ-বিশেষ অভিনয়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ইহা

---

* এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ :—

The *Calcutta Courier* for October 28, 1835; *Asiatic Journal*, for April 1836 (Asiatic Intelligence--Calcutta, pp. 252-53). এই অভিনয়ের বিবরণ যে ১৮৩৫, "২২এ অক্টোবর" তারিখের 'হিন্দু পাইয়োনিয়র' হইতে গৃহীত, তাহার উল্লেখ 'এশিয়াটিক জর্ণালে' আছে।

† 'ক্যালকাটা কুরিয়র' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে মনে হয়, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাট্যশালার মত আর একটি নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয়। কিন্তু এই উদ্যোগের কোন ফল হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ এখনও আমি কোন সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই নাই।

"A Prospectus for the establishment of a Hindoo Theatre, is now in course of circulation amongst the friends of native improvement. If we mistake not, we believe there was a Theatre of this description, established about nine or ten years ago, by an enlightened Hindoo...... the theatre in question was given up, one or two years after its establishment...... The plan has again revived, but what degree of public encouragement it is likely to meet with, so as to impart stability and permanency to

ছাড়া সেই যুগে বাঙ্গালীরা অনেকেই কলিকাতার ইংরাজী নাট্যশালায় যাইতেন, এমন কি, কেহ কেহ ইংরাজী নাট্যশালার অভিনয়েও যোগ দিতেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাঁসুসি নাট্যশালায় এক জন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অভিনয়-প্রদর্শনের সংবাদ আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই। ১৮৪৮, ২১এ আগষ্ট [সোমবার] তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা দেখিতে পাই,—

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে সান্সশি নামক থিয়েটরে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল বহু দিবস হইল ঐরূপ সমারোহ হয় নাই, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাহেব ও বিবি এবং এতদ্দেশীয় বাবু ও রাজাদিগের সমাগম দ্বারা নৃত্যাগারের শোভা অতিমনোরম হইয়াছিল, মেং বেরি সাহেবের অনুষ্ঠানেরও কোন ত্রুটি হয় নাই, তিনি সকল বিষয় অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় নর্ত্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোনরূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দ্দিগ হইতে ধন্য ধন্য শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উৎসাহ এবং সাহসও বদ্ধমূল হইয়াছে, যে বিবি ডেসডেমনা হইয়াছিলেন, তিনিও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন…।

এক জন বাঙ্গালীর পক্ষে শেক্স্পীয়রের সৃষ্ট ওথেলো চরিত্র অভিনয় করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রশংসাসূচক বিবরণ সত্ত্বেও মনে হয়, বৈষ্ণবচরণের অভিনয় একেবারে নির্দ্দোষ হয় নাই, কারণ, প্রথম অভিনয়ের কয়েক দিন পরেই 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮) আমরা নীচের সংবাদটি পাই :—

"অদ্য রজনীযোগে সান্সশি থিয়েটরে সেক্সপিয়ার কৃত ওথেলোর নাটক পুনর্ব্বার হইবেক, এবং বাবু বৈষ্ণবচরণ আঢ্য পুনর্ব্বার সাধারণ সমীপে প্রকাশমান হইবেন, গত নাটকের রজনীযোগে যাঁহারা থিয়েটরে গমন করিতে পারেন নাই অদ্য তাঁহারা গমন করণে কদাচ বিরত হইবেন না, বিশেষতঃ যে সকল মহাশয়েরা বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের বক্তৃতা ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় দোষ দর্শন করিয়াছিলেন এবারে তাঁহারদিগের পক্ষেও নৃত্যাগারে উপস্থিত হওয়া উচিত, কারণ অদ্য তিনি সুচারুরূপে সমুদয় বিষয় সম্পন্ন করিবেন তাহার কোন সংশয় নাই, প্রথমতঃ সকল লোকেই কঠিনতর কার্য্যবিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, কিন্তু ক্রমে ব্যুৎপত্তি সহকারে তাঁহারদিগের বিলক্ষণ নিপুণতা হয়, যাহা হউক, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য প্রথমোদ্যমে যে প্রকার সাহসের সহিত স্বীয় পারগতা দেখাইয়াছেন তাহাতে ভাবিকালে তিনি যে একজন বিখ্যাত আমিটর হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই…!

ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতার স্কুল-কলেজে ইংরাজী অভিনয় আরম্ভ হওয়ার কথা আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই। ১৮৫১, ৭ই আগষ্ট বটতলায় ডেবিড হেয়ার একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে শেক্স্পীয়রের 'মার্চ্চেণ্ট অফ ভেনিস' নামক নাটক অভিনীত হয়। ইহার পূর্ব্বেও ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে নাটকের অংশ-বিশেষ বা কবিতা প্রভৃতি আবৃত্তি করিত সত্য, কিন্তু ডেবিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদের পূর্ব্বে নাটকের প্রায় সমগ্র অংশ ছাত্ররা কখনও অভিনয় করে নাই। এই ব্যাপারে তখনকার সমাজে যে কিরূপ উত্তেজনা হয়, তাহা 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণ হইতে জানা যাইবে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিতেছেন :—

…পারিতোষিক বিতরণের দিবসে রজনীযোগে 'ডেবিড হেয়ার একাডিমি' বিদ্যালয়ে এক নূতন ব্যাপার হইবেক, এই বঙ্গদেশ মধ্যে কোন স্থানেই তদনুরূপ আনন্দজনক কার্য্য হয় নাই, বিদ্যাগারের মধ্যভাগে এক অতি উৎকৃষ্ট নাচঘর প্রস্তুত হইতেছে, কয়েক জন সুনিপুণ ইংরাজ অতি মনোহররূপে তাহা সাজাইতেছেন, সেই নাট্যশালায় ছাত্রেরা সেক্সপিয়ার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 'Merchant of Venice' 'মারচেণ্ট ভিনিস' নামক নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়া বিদ্যা বিষয়ে আপনাপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবেক। মলঙ্গা নিবাসি পরম বদান্যবর শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষানুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, এই নাটক বিষয়ে ছাত্রগণ পারদর্শিতা প্রকাশ করিলে তাহারদিগের সম্মানের সীমা থাকিবেক না, বিদ্যালয়ের গৌরব যদিও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাচ তাহার সুখ্যাতি সৌরভে এই বঙ্গদেশ আমোদিত করিবেক। *

---

the undertaking, we cannot at present calculate upon, but as the individual (an Englishman) with whom it has originated was for sometime connected with the Drury Lane Theatre, and who, we hear, is much esteemed for his histrionic attainments, we can reasonably entertain a hope that it would not altogether prove unsuccessful."
—The *Calcutta Courier*, 28 Jany., 1840.

---

* ১৮৫৩, ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'বেঙ্গল হরকরা' লিখিয়াছিলেন—
"We are requested to mention that the first public examination of the pupils of the David Hare Academy will take place this

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ডেভিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদের দ্বারা এই নাটকের প্রথম অভিনয়, ও সেই মাসেরই ২৪এ তারিখে দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই দুইটি অভিনয়ের বিবরণই আমরা 'সংবাদ প্রভাকরে' পাই,—

> অদ্য রজনীতে 'ডেভিড হেয়ার একাডিমির' ছাত্রেরা স্কুল বাটীতে ইংরাজী থিয়েটর অর্থাৎ নাটক করিবেক, তজ্জন্য যথানিয়মে সুশিক্ষিত হইয়া নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়াছে। (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩)

> গত গুরুবার সন্ধ্যার পরে 'হেয়ার একাডিমি' নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্সপিয়ার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মারচেণ্ট অফ ভিনিস নামক নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া বহু লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের গৃহে প্রায় ৬০০।৭০০ এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগি, কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য লোক এবং সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত ছাত্রগণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন···বিচারাগারের অনুরূপ শোভা দর্শন ও তাহার প্রশ্ন, বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া অনেকে হেয়ার একাডিমিকে সান্সসাস থিয়েটর বোধ করিয়াছিলেন। (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩, শনিবার)

এই অভিনয়ের বিবরণ ১৮৫৩, ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'বেঙ্গল হরকরাতে'ও প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিঙ্গার ডেভিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্রদিগকে শেক্স্পীয়রের নাটক অভিনয়ে শিক্ষা দেন। *

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "হাটখোলার দত্ত-বংশ-সম্ভূত গুরুচরণ দত্ত মহাশয়···'মেট্রোপলিটান্ একাডেমি' † নামে এক স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া···উক্ত বিদ্যামন্দিরের গৃহে ও প্রাঙ্গণে 'ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারি' প্রভৃতির ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ কর্তৃক··· 'জুলিয়স্ সীজরের' নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল।" তাঁহার মতে, এই অভিনয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। বিদ্যানিধি মহাশয় ভুলক্রমে 'ডেভিড হেয়ার একাডেমী'র * স্থলে 'মেট্রোপলিটান্ একাডেমী'র নাম করিয়াছেন। এখানে জুলিয়াস সীজরের অভিনয়ের কথা ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়।

ডেভিড হেয়ার একাডেমীর দৃষ্টান্তে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীও অভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। এই স্কুলে একটি পুরাদস্তর নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহার নাম দেওয়া হয়—ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার। ডেভিড হেয়ার একাডেমীর মত এই বিদ্যালয়েও শেক্স্পীয়রের ইংরাজী নাটকই অভিনীত হইত। অভিনয় শিক্ষা দিতেন মিঃ ক্লিঙ্গার; ইনি পূর্ব্বে সাঁসুসি থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫৩ সনের ৭ই এপ্রিল তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' হইতে আমরা জানিতে পারি,—

> আমরা শুনিতে পাইলাম যে, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া আট শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং এই টাকা দ্বারা শেক্স্পীয়রের নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে।

'বেঙ্গল হরকরা'য় এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পাঁচ মাস পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর এই নাট্যশালায় শেক্স্পীয়রের 'ওথেলো' প্রদর্শিত হয়। ১৮৫৩, ২৮এ সেপ্টেম্বর (বুধবার) তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় দেখিতে পাই,—

---

morning at the Town Hall,...... Instead of the customary display of pyrotechnics, the pupils have resolved to celebrate the examination by enacting at the school premises, a few scenes from the **Merchant of Venice.**"

*"We understand that Mr. Clinger, Head Master of the English Department of the Calcutta Madrissa, is now giving instructions on Shakespear's Dramatic plays to the alumnis of the David Hare Academy, and has succeeded in training some boys to the competent performance of the plays taught them;........."

† মেট্রোপলিটন একাডেমী ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে বটতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৯, ১৫ই মে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন,—"নূতন বিদ্যালয়।—এপ্রেল মাসের প্রথম দিবসে কলিকাতা নগরীয় বটতলায় বড় রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ৺চন্দ্র মিত্রের বাটীতে 'মেট্রোপোলিট্যান একাডেমিনামক এক বিদ্যালয় হইয়াছে,······।"

* "আমারদিগের সদ্বিদ্বান্ বন্ধু বাবু গুরুচরণ দত্ত মহাশয় সংপ্রতি বটতলার মধ্যে 'ডেভিড হেয়ার একাডেমি' নামক এক অভিনব ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন···। সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত মেং মেণ্টেগু সাহেব কথিত স্কুলের অংশি হইয়াছেন···।" (সংবাদ প্রভাকর, ২৭ আগষ্ট ১৮৫১)

ডেভিড হেয়ার একাডেমী যে ৭ই আগষ্ট ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়,—১৮৫৩, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তাহার উল্লেখ আছে।

দি ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার

[নিজস্ব সংবাদ-দাতার বিবরণ]

সোমবার রাত্রিতে বহু দর্শকের সম্মুখে উপরি-উক্ত নাট্যশালায় ওথেলো নাটকের অভিনয় হয়। দর্শকেরা প্রধানতঃ দেশীয় লোক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজা প্রতাপচাঁদ, বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। য়ুরোপীয় দর্শকদের মধ্যে আমরা মিঃ চার্লস্ অ্যালেন (সিবিল সারভেণ্ট), মিঃ লাশিংটন, মিঃ সিটন কার ও দেশীয় লোকদের শিক্ষার অন্যান্য গণ্যমান্য উৎসাহদাতারা ছিলেন দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি।

অভিনেতারা সকলেই কিশোর যুবক। ইঁহারা সকলেই পরলোকগত গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি।...এই যুবকেরা মিঃ ক্লিঙ্গারের শিক্ষায় * নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করেন। মিঃ ক্লিঙ্গার কলিকাতা মাদ্রাসার এবং বোধ করি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীরও এক জন অধ্যাপক।

কেবল হিন্দু যুবকদের লইয়া সংগঠিত অভিনেতৃবর্গের দ্বারা একটি ইংরাজী নাটকের অভিনয় এই প্রথম...।

যে-চরিত্র অত্যন্ত খারাপভাবে অভিনীত হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। বাবু প্রিয়নাথ দে যে-ভাবে ইয়াগোর ভূমিকা অভিনয় করেন, তাহাতে এই চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল।...এই যুবকেরা যে-ভাবে তাঁহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে,তাহাতে এদেশীয় জনগণের মানসিক উৎকর্ষাভিলাষী দর্শকমাত্রই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর ওথেলোর দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। †

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার শেক্স্‌পীয়রের আর একখানি নাটক অভিনয় করে। এবার 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' প্রদর্শিত হয়, এবং প্রথম অভিনয় হয়—২রা মার্চ্চ। ১৮৫৪, ২৭এ ফেব্রুয়ারি এবং ২রা মার্চ্চ তারিখের 'মর্ণিং ক্রনিক্‌ল্' ও 'সিটিজেন', এই দুই পত্রিকাতেই আমরা নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাই,—

THE

ORIENTAL THEATRE,

No. 268, Curranhatta, Chitpore Road.

THE

MERCHANT OF VENICE

will be performed

AT THE ABOVE THEATRE

On Thursday, the 2nd March, 1854,

By Hindu Amateurs.

DOORS OPEN AT 8 P.M.

Performance to commence at 8½ P.M.

Tickets to be had of Messrs. F. W. Brown & Co. and Baboo Womesh Chunder Banerjee, Cashier, Spence's Hotel.

Price of Tickets, **Rs. 2,** each.

The Tickets distributed will avail on the above evening.

১৮৫৪, ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মার্চ্চেণ্ট অফ ভেনিস দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। এবারে মিসেস গ্রীগ্ নাম্নী এক জন ইংরাজ মহিলা পোর্শিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করেন। *

এই অভিনয়ের পর কোন কারণে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার প্রায় এক বৎসরকাল বন্ধ থাকে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শেক্সপীয়রের 'চতুর্থ হেন্‌রী' নাটকের ও হেন্‌রী মেরিডিথ পার্কারের 'আমাটোর' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় দেখাইবার জন্য উহার দ্বার আবার উন্মোচিত হয়। ১৮৫৫, ২২এ ফেব্রুয়ারী তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আমাদের মনে হয়, ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার বন্ধ থাকিবার প্রধান কারণ এ দেশীয় লোকের উৎসাহের

* ১৮৫৩ সনে এলিস নাম্নী এক জন ইংরেজ মহিলাও ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে শিক্ষাদান করেন। ১৮৫৩, ৬ই আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" পাইতেছি :—"অবগতি হইল, ওরিএন্টেলি ছাত্রেরা এক প্রকাণ্ড ভাণ্ড কাণ্ড ফাঁদিয়াছেন, এতদিন মেং ক্লিঙ্গর সাহেব একাকী অধিকারী হইয়া বিলিতি যাত্রার উপদেশ দিতেছিলেন, এইক্ষণে এক শ্বেতাঙ্গী শ্রীমতী তাহার অধিকারিণী হইয়াছেন, ইহার নাম ইলিস, ইনি আসিয়া ভাব ভঙ্গির শিক্ষাপ্রদান করিলে নাটকের আরো চটক্ পড়িবেক,...।"

গড়ের মাঠে বোধ হয় ইঁহারই নৃত্যাগার ছিল। "মিস্ ইলিসের গড়ের মাঠের নৃত্যাগার পবন ঠাকুরের কৃপায় পতিত হইয়াছে"—সংবাদ প্রভাকর, ২৬ এপ্রিল ১৮৫১।

† ১৮৫৩, ৫ই অক্টোবর তারিখের *Citizen* দ্রষ্টব্য।

*"We observe that Mrs. Greig is going to perform the part of Portia in the **Merchant of Venice** at the Oriental Theatre tomorrow evening, which will be her last performance and indeed the close of her last day's sojourn in Bengal."—The *Bengal Hurkaru* for March 16, 1854.

অভাব। সম্পাদক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, কলিকাতার ধনী লোকেরা ইতর তামাসা—বুলবুলি পাখীর লড়াই ও নাচওয়ালীর জন্য অর্থব্যয় করিতে কার্পণ্য করেন না, অথচ নাটকের মত বিশুদ্ধ ও উন্নত স্তরের আমোদের সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' চতুর্থ হেন্‌রীর অভিনয় মোটামুটি ভালই হইয়াছিল বলিয়াছেন। এই মন্তব্য হইতে আমরা এ সংবাদটিও জানিতে পারি যে, সেই সময়ে বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট রোড থিয়েটারে দেশীয় ভাষায় অভিনয় হইতেছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক কলিকাতাতেও যাহাতে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হয়, সেজন্য ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

প্যারীমোহন বসুর যোড়াসাঁকো নাট্যশালা

ইহার পর যে-নাট্যশালায় শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেটি যোড়াসাঁকো থিয়েটার। এই নাট্যশালাটি কোন স্কুল বা কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল না। ইহার আয়োজন উদ্যোগও আরও একটু বড় হইয়াছিল। যে নবীনচন্দ্র বসু 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় করান, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু প্যারীমোহন বসুর যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এই নাট্যশালাটি অবস্থিত ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে এই নাট্যশালায় শেক্‌স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সীজর' অভিনীত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' (৫ মে ১৮৫৪, শুক্রবার) লেখেন :—

> গত বুধবার সন্ধ্যার পরে যোড়াসাঁকো নিবাসি গুণ-রাশি শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য হিন্দু যুবকগণ মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত নাটকের জুলিয়াস সিজরের মৃত্যুবিষয়ক নাট্য-কাণ্ডের পঞ্চম প্রকরণ যাহা খেদোক্তি প্রণয়োক্তি স্বদেশ-প্রীতি ইত্যাদি নানা রসে মিশ্রিত, তত্তাবৎ অতি উত্তমরূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক সংপূর্ণরূপে সুখ্যাতি সংগ্রহ করিয়াছেন, প্যারীমোহন বাবুর ভবন আলোকাধার ছবি ও অন্যান্য মনোহর ও নয়নপ্রফুল্লকর দ্রব্যাদির দ্বারা বিশেষ রমণীয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ নাট্যশালার শোভা বর্ণনা করা যায় না, উক্ত হৃদয়বিদীর্ণকর নাট্যকাণ্ড প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত যে বারে যে যে দ্রব্যাদির আবশ্যক সেই বারেই সেই সেই দ্রব্যাদির দ্বারা তাহা শোভিত হইয়াছিল। ঐ নাটক দর্শনার্থ প্রায় ৪০০ শত অতি সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়, ইংরাজ ও বিবি অনেক আসিয়াছিলেন, যদ্যপি ঝড়-বৃষ্টি না হইত তবে দর্শকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইত, বাবু মহেন্দ্র-নাথ বসু জুলিয়াস সিজারের বেশ ধারণ পূর্ব্বক যথার্থ নাটকের বর্ণনানুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাবু কৃষ্ণধন দত্ত. সারকম ব্রুটসের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আপন কার্য্য সাধনের সামান্য পারদর্শিতা প্রকাশ করেন নাই, বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কেসিয়াসের রূপ ধারণ করিয়া ব্রুটসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সুশিক্ষার বিলক্ষণ পরীক্ষা প্রকাশ হইয়াছে বিশেষতঃ রামচন্দ্র বর্দ্ধনের অস্ত্রপ্রহার সিজারের মৃত্যু ও তাঁহার আত্মীয়গণের ক্রন্দন ব্রুটসের বিকট মূর্ত্তিধারণ ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ই সুন্দররূপে সুনির্ব্বাহ হইয়াছে, এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা জুলিয়াস সিজারের মৃত্যু সম্বন্ধী কঠিন নাটকের অনুরূপ এতদ্রূপে দর্শাইবেন ইহা কেহই বিবেচনা করেন নাই, দর্শকমাত্রেই তাঁহারদিগের প্রশংসা করিয়াছেন এবং নাট্যকাণ্ড দেখিয়া অনেকের শরীর শীর্ণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে, আমরা যোড়াসাঁকো থিয়েটরের বন্ধুদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, যদিও হেয়ার একাডিমিতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা ইংরাজী নাটক দেখাইবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় এবং তৎপরে ওরিএণ্টেল থিয়েটরের ছাত্রেরাও নাটককাণ্ড করিয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারাও উত্তমরূপে সকল ব্যাপার সমাধা হইয়াছে, তথাচ এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পাদন হয় নাই, অতএব আমরা নাট্যশালার অধ্যক্ষ-দিগের নিকটে প্রার্থনা করি তাঁহারা টিকিটের মূল্য ন্যূন করিয়া ঐ নাট্যকাণ্ড পুনর্ব্বার সাধারণকে দেখাইবেন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১১ মে ১৮৫৪) কিন্তু এই অভিনয় সম্বন্ধে একবারে বিপরীত অভিমত প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মতে সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্চের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইলেও অধিকাংশ অভিনেতার অভিনয়ই ভাল হয় নাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবারও বাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গালা নাটক অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

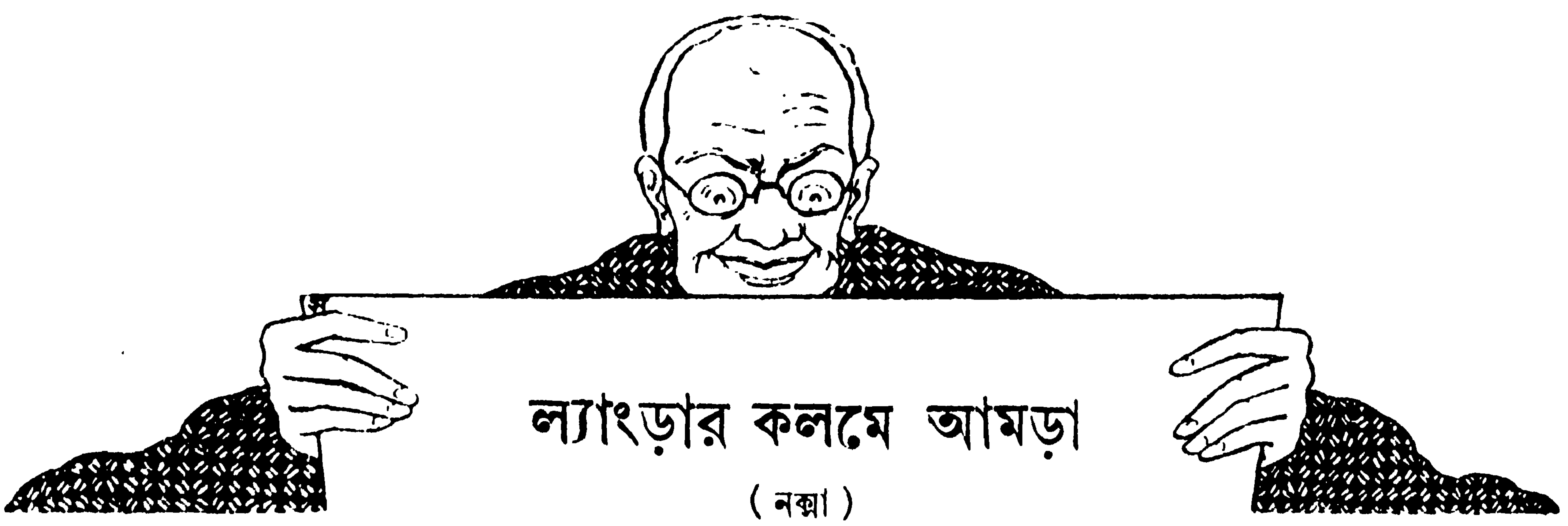

ল্যাংড়ার কলমে আমড়া

(নক্সা)

নৃত্যগোপাল খাঁজা ফরিদসাহী জেলার সদর ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী বেগারেমারি নামক গ্রামের জমীদার লালগোপাল খাঁজার দত্তকপুত্র। বঙ্কিম বাবু বহু দিন পূর্ব্বে 'প্রচারে' একটি অম্লমধুর নক্সা লিখিয়া পাঠক-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, পরে তাহা 'লোকরহস্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই নক্সাটিতে আমরা একটি শ্লোক পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা মনুসংহিতার যে কোন শ্লোকের সহিত তুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে ও মনুষ্যচরিত্রজ্ঞানে বঙ্গীয় লেখক-সমাজে অদ্বিতীয় ছিলেন, ইহা আজকাল কেহ কেহ অস্বীকার করিতেও পারেন, কারণ, এখন তিনি জীবিত নাই এবং তাঁহার মতামতে নির্ভর করিয়া একালে কাহারও স্বার্থসিদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই শ্লোকটির মাধুর্য্য ও সারবত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"কৃপণানাং ধনঞ্চৈব পোষ্যকুষ্মাণ্ডপালিনাম্।
ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ॥"

আমরা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের কথা আবাল্য শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু সেই শ্রাদ্ধক্রিয়া কিরূপে সুসম্পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। বঙ্কিম বাবুর এই শ্লোকটি আমাদের সন্দেহভঞ্জন করিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে ইহার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আমাদের সাহিত্যরসিক বন্ধু হারাধন সরকারের বৈবাহিক নৃত্যগোপাল খাঁজার চরিত্র-মাধুর্য্য যতবার উপভোগ করিয়াছি, ততবারই আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে সেই রস আস্বাদন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। আজ সেই দীর্ঘকালের কামনা পূর্ণ করিতেছি।

বেগারেমারির জমীদার লালগোপাল খাঁজা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা তাঁহার জমীদারীর মুনফা ছিল। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন ফরিদসাহী জেলার অধিকাংশ স্থলে এক মণ চাউলের মূল্য দশ আনা ছিল, টাকায় তিন সের খাঁটি গাওয়া ঘি ও ষোল সের সরিষার তৈল পাওয়া যাইত, অন্যান্য সামগ্রীও সেই অনুপাতে সুলভ ছিল; অথচ একালের মত খাজনা আদায়ের অভাবে কোন জমীদারের জমীদারী নীলামে উঠিত না। সেই সময়ের ৫০ হাজার টাকা বার্ষিক আয়, একালের কত হাজার টাকা আয়ের সমান, ত্রৈরাশিক জানা না থাকিলেও তাহা "মূর্খেতে বুঝিতে নারে—পণ্ডিতে লাগে ধন্দ!"

লালগোপাল খাঁজা 'একপুরুষে' জমীদার ছিলেন না। তাঁহার ঊর্দ্ধতন ত্রয়োদশ পুরুষ বেগারেমারি ও অন্যান্য বহু তালুকের মালিক ছিলেন। শুনিয়াছি, 'খাঁজা' তাঁহাদের কৌলিক উপাধি নহে, ইহা নবাবী আমলের খেতাব। বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে উঠিয়া আসিবার পর লালগোপালের কোন পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বাহাদুরকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটি কিংবদন্তী এই যে, বেগারেমারির অরণ্য বহুকাল হইতে বহুসংখ্যক নরভুক্ ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ প্রভৃতি ভীষণপ্রকৃতি হিংস্র শ্বাপদের লীলাকুঞ্জ। এই অরণ্য ব্যাঘ্রশিকারের উপযুক্ত স্থান বলিয়া এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, বহুকাল হইতে বহু শিকারী এই অরণ্যে আসিয়া শিকারের সখ মিটাইতেন। এই সংবাদ শুনিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরও একবার এই জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। বেগারেমারির জমীদার যথাসময়ে নবাব সরকারের পেস্কারের নিকট হইতে পরোয়ানা পাইয়া নবাব বাহাদুরের অভ্যর্থনার যথাযোগ্য আয়োজন করিয়াছিলেন।

লালগোপালের পূর্ব্বপুরুষরা সুদক্ষ শিকারী ছিলেন;

জমীদার মহাশয় নবাব বাহাদুরের সহিত শিকারে যোগদান করিলেন। দুই দিন শিকারের পর তৃতীয় দিন অপরাহ্নে প্রায় তিন ক্রোশব্যাপী বিশাল অরণ্যের এক প্রান্তে শিকার করিবার সময় একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র নবাব বাহাদুরের হস্তীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার হাওদায় উঠিয়া পড়িল। নবাব সাহেব দেখিলেন, সম্মুখেই বাঘ! তাহার মুখ-বিবর উন্মুক্ত, মুখে সুদীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ দন্তশ্রেণী! নবাব সাহেবের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল, সেই সঙ্কটকালে তিনি এরূপ হতবুদ্ধি হইলেন যে, তিনি তাঁহার হাতের বন্দুকের যে ঘোড়া পূর্ব্বে টিপিয়া 'ফায়ার' করিয়াছিলেন, ভ্রমক্রমে সেই ঘোড়াই পুনর্ব্বার টিপিয়া শার্দ্দূল-রাজকে নিহত করিবার চেষ্টা করিলেন। বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষের পরিবর্ত্তে খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, এবং পর-মুহূর্ত্তেই ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের দন্তশ্রেণী নবাব সাহেবের হীরকখচিত শিরস্ত্রাণের তিন ইঞ্চি ঊর্দ্ধে শুভ্র মহিমা বিকাশ করিল। নবাব সাহেব পুনর্ব্বার বন্দুক উদ্যত করিবেন, তাহারও অবসর পাইলেন না। কিন্তু নবাব সাহেবের হাতীর পশ্চাদ্‌বর্ত্তী অন্য একটি হাওদা হইতে যে গুলী বর্ষিত হইল, সেই গুলীতে ব্যাঘ্রের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হওয়ায় তাহার মৃতদেহ নবাব সাহেবের সম্মুখে পড়িল।

বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবরা কোন কালেই অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। নবাব বাহাদুর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া লালগোপালের সেই পূর্ব্ব-পুরুষকে ফরিদসাহী জেলায় বহু ভূসম্পত্তি পুরস্কার দান করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন খেলাৎ সহ 'খান্‌জা খাঁ' খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন। কালে সেই খেতাব 'খাঁজা'য় পরিণত হইয়াছিল।

ইহাই লালগোপালের 'খাঁজা' উপাধির আদি কারণ। তাঁহার বংশধররা খাঁজা নামে পরিচিত হইলেও ফরিদসাহী জেলার জনসাধারণ এখন লালগোপালের বংশধর নৃত্যগোপালকে 'খাজা মশায়' বলিয়া সম্বোধন করে।

লালগোপাল খাঁজা ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়কালে ফরিদসাহী জেলার সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত এবং এই জেলার অনেক লোক রেশমের ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত। সে সময় বাঙ্গালায় নীলের ব্যবসায় সবে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু রেশমের ব্যবসায়ের তখন পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হইতেছিল। ফরিদসাহী জেলার বহু স্থানে বড় বড় রেশমের কুঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অনেক সমৃদ্ধ ইংরাজ কোম্পানী এই সকল কুঠীর মালিক ছিলেন। লালগোপাল স্বয়ং রেশম-কুঠী স্থাপিত করিয়া ইংরাজ কুঠীয়ালদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় রেশমের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, এবং কলিকাতার হৌস-ওয়ালাদিগের সংস্রবে আসিতে হইত বলিয়া তাঁহাকে এক জন ইংরাজ ম্যানেজার রাখিতে হইয়াছিল। সেই সময় ব্যবসায়ি-সমাজে তাঁহার মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি কোন ইংরাজ কুঠীয়ালের অপেক্ষা অল্প ছিল না।

লালগোপাল প্রাসাদ তুল্য সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকায় বাস করিতেন। রেশমের ব্যবসায়ে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও তাঁহার প্রচুর সদ্ব্যয় ছিল। যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইত, তাহা তিনি কোথায় সঞ্চয় করিতেন, তাহা কেহ জানিত না। নিত্য প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি 'ঝাঁপিতে' রাখিতেন। এই ঝাঁপিগুলি বেত্রনির্ম্মিত গোলাকার সুদৃঢ় 'বাস্‌কেট'। তাহা চর্ম্ম দ্বারা আবৃত। তাহাতে একটি বৃহৎ তালা থাকিত। এতদ্ভিন্ন তিনি যে 'মাইপোষে' শয়ন করিতেন, এ কালে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই মাইপোষের তক্তার নীচে গুপ্ত বাক্স থাকিত, তাহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, সেই মাইপোষের উপরের অংশ দেখিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থিত গুপ্ত প্রকোষ্ঠের অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় ছিল না। সেই প্রকোষ্ঠে তিনি অলঙ্কারাদি লুকাইয়া রাখিতেন। লোহার সিন্দুক তাঁহার বিশাল অট্টালিকার চোর-কুঠুরীর ভিতর অনেকগুলি ছিল; কিন্তু রূপার বাসন প্রভৃতি ভিন্ন টাকা, মোহর ও বন্ধকী স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি তাহার ভিতর রাখিতেন না। চোর-কুঠুরীর এক কোণে রূপার ছাতি, আড়ানী, খাসের দণ্ড প্রভৃতি সঞ্চিত থাকিত। সে কালে ফরিদসাহী জেলায় দস্যুভয় প্রবল ছিল; কিন্তু লালগোপালের বেতনভোগী তীরন্দাজগণের ভয়ে তাহারা তাঁহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইত না। তিনি সুদক্ষ শিকারী ছিলেন, তাঁহার বন্দুকের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল, এ সংবাদ সকলেই জানিত। পল্লী অঞ্চলের বাগ্দী লাঠিয়ালরা তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করিত।

লালগোপাল যে সময়ের লোক, সে সময় এ দেশ 'কোম্পানীর মুলুক' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এ কালের মত সে কালে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; এ জন্য তিনি

তাঁহার সঞ্চিত অর্থ পরের হাতে রাখিতেন না। উদ্বৃত্ত অর্থে সোনা কিনিয়া সেই স্বর্ণ গলাইয়া তালে পরিণত করিতেন, এবং সেই সকল সোনার তাল তাঁহার অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে মেঝের নীচে পুতিয়া রাখিতেন।

একবার রেশমের ব্যবসায়ে লালগোপাল এক লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিলেন। সেইবার চতুর্দ্দিকে জনরব প্রচারিত হইল, সুপ্রসিদ্ধ দস্যুরাজ বিশ্বনাথ বাবু পদ্মা-পার হইয়া ফরিদসাহী জেলায় সদলে প্রবেশ করিবে এবং লালগোপালের অট্টালিকার অদূরবর্ত্তী বেগারেমারির জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিবে। জনরব শুনিতে পাওয়া যায়, বিশ্বনাথ বাবু লাল-গোপাল বাবুকে পত্র লিখিয়া তাঁহার বাড়ী লুঠ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। এই সংবাদে লালগোপালের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না, তাঁহার জনবলের অভাব ছিল না বটে, তাঁহার কোষাগারও সুরক্ষিত ছিল, কিন্তু বিশ্ব-নাথ বাবুর নামে তখন বাঙ্গালার বড় বড় জমীদার ভয়ে কাঁপিত, কোন প্রতাপশালী জমীদারের সাধ্য ছিল না— তিনি বিশ্বনাথ বাবুর গতিরোধ করিবেন। বিশ্বনাথ বাবু যে জমীদারের বাড়ী লুঠ করিবার সঙ্কল্প করিত, সেই জমীদারের নিষ্কৃতিলাভের উপায় ছিল না।

গণপতি সান্যাল সেই সময় ফরিদসাহীর এক জন প্রসিদ্ধ জমীদার ছিলেন। ফরিদসাহীতে তখন নূতন ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই আদালতে তিনি মোক্তারী করিতেন, এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক জমীদারের আম-মোক্তারের কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সজ্জন ছিলেন, বহু নিরন্ন ব্যক্তিকে তিনি অন্নদান করিতেন, অনেক দরিদ্র বিধবা তাঁহার গোপন দানে উদরান্নের সংস্থান করিত। গণপতি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত না হইলেও ইংরাজী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন। ফরিদসাহী জেলায় তখন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দুই একটি মধ্য-শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে স্থানীয় ছাত্ররা যৎসামান্য ইংরাজী শিখিয়া নীলকরদের কুঠীতে বা রেশমের কুঠীতে মুহুরীগিরী করিত। যাহারা 'উডেনচর্চ্চ' রথ, 'কোকোম্বর' শশা, 'ওয়া-টার মেলন' তরমুজ, 'আইরণ চেষ্ট' লোহার সিন্দুক প্রভৃতি দুই তিন শত ইংরাজী শব্দ ও তাহাদের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ মুখস্থ বলিতে পারিত, কুঠীয়াল সাহেবরা পরম সমাদরে তাহাদিগকে কুঠীতে চাকরী দিতেন, এবং জনসাধারণ তাহাদিগকে ইংরাজী ভাষায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মনে করিত।

লালগোপাল বাবু জানিতেন, গণপতি সান্যালের মত ইংরাজীনবিশ সেই জেলায় দ্বিতীয় কেহ নাই। গণপতির বাড়ী লালগোপাল বাবুর বাসভবন হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে লাল-গোপাল বেহারা-চতুষ্টয়-বাহিত তান্‌জামে চড়িয়া প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে গণপতির গৃহে উপস্থিত হইতেন এবং গণপতির বৈঠকখানার পাশার আড্ডায় যোগদান করি-তেন। তাঁহার বেহারারা তান্‌জামখানি বৈঠকখানার বারান্দায় রাখিয়া, গণপতির ভৃত্যগণের দলে মিশিয়া গাঁজা টিপিত। অধিক রাত্রিতে খেলাধূলা শেষ হইলে লালগোপাল সেই তান্‌জামে চড়িয়া বাহকস্কন্ধে বাড়ী ফিরিতেন। এ কালের পাঠক-পাঠিকাগণ তান্‌জামের সহিত পরিচিত নহেন, উহা কাঠের চেয়ারের আকারবিশিষ্ট যান, পাল্কীর দণ্ডের মত তাহার দুই দিকে দুইটি দীর্ঘ দণ্ড থাকিত; চারি জন বেহারা সেই দণ্ড কাঁধে তুলিয়া লইয়া আরোহী সহ তান্‌জাম বহন করিত। লালগোপাল সৌখীন লোক ছিলেন, তাঁহার এক জন ভৃত্য তান্‌জামের পাশে পাশে তাঁহার গড়গড়া লইয়া বেহারাদের সঙ্গে দ্রুতপদে চলিত, গড়গড়ার নল বাবুর হাতে থাকিত; তিনি ধূমপান করিতে করিতে চলিতেন। কলিকাস্থিত অম্বুরী তামাকের সৌরভে বায়ুস্তর সুরভিত হইত।

গণপতি সান্যালের সহিত লালগোপালের বন্ধুত্ববন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। এক দিন সন্ধ্যার পর লালগোপাল গণপতির পাশার আড্ডা হইতে বিদায় লইবার সময় গণ-পতিকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখ গণপতি দাদা, জনরব শুন্‌ছি, বিশে ডাকাত পদ্মাপার হয়ে আমাদের ফরিদসাহী জেলায় ডাকাতী করতে আস্‌ছে। সে না কি শুনেছে, আমি খুব টাকার মানুষ, আমার বাড়ী লুঠ করলে বিলক্ষণ দশ টাকা পাওয়া যাবে। তোমার আশীর্ব্বাদে ও মা. কমলার কৃপায় এবার আমি রেশমের কারবারে লাখখানেক টাকা পেয়েছি। টাকাটা আমার ঘরেই আছে; কিন্তু তুমি ত জান, আমি সহরের বাইরে বাস করি, আমার বাড়ীর চারদিকে গহন বন। বিশে ডাকাতের

শুনেছি ক্ষমতা অসাধারণ, সে মা কালীর পূজো ক'রে দলবল নিয়ে ডাকাতী করতে বেরোয়। যে বাড়ী আক্রমণ করে, সেখান থেকে সে শুধু হাতে ফেরে না। তার আক্রমণে বাধা দিতে পারে, এ রকম প্রবল জমীদার এ মুলুকে নেই। টাকাগুলা যদি সে লুঠ করে, এ জন্যে আমার ভারী ভয় হয়েছে, টাকাগুলা আমি ঘরে রাখ্‌তে সাহস করছি নে। অথচ এই সহরের অন্য কোন বড় লোকের কাছে তা গচ্ছিত রাখ্‌তেও ভরসা হয় না। পরচিত্ত অন্ধকার, লাখ টাকার লোভ সংবরণ করা সকলের সাধ্য নয়; এ অবস্থায় টাকাগুলা যদি তোমার কাছে কিছু কাল গচ্ছিত রাখ, তা হ'লে আমি একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। পরে যখন দরকার হবে, আমি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাব। তোমাকে ভিন্ন আর কাউকে আমার বিশ্বাস হয় না, দাদা! এ সঙ্কটে তুমি আমাকে এই সাহায্যটুকু কর। নৈলে টাকাগুলা আমি রাখ্‌তে পারব না।"

গণপতি বলিলেন, "সহরে থানা-পুলিস আছে, ডাকাত বেটা দলবল নিয়ে সহরে ঢুকতে সাহস করবে না। কিন্তু পরের টাকা গচ্ছিত রাখা বিষম ফ্যাঁসাদের কায; মানুষের পরমায়ুর কথা বলা যায় না, আজ আছে, কাল নেই। আমার 'অবিদ্যিমানে' তোমার টাকাগুলা মারা যাবে না, এ কথা কি ক'রে বলি? তা, তোমারও বিস্তর টাকা, মোহর, সোনাদানা তুমি ঘরেই রেখেছ, ও লাখ টাকাও কোথাও লুকিয়ে রাখ; যদিস্যাৎ ডাকাতের দল লুঠ করতেই আসে—তারা সন্ধান না পায়, এ রকম যায়গায় পুতে-টুতে রাখ। আমাকে আর ও ফ্যাঁসাদে জড়িও না, ভাই!"

কিন্তু গণপতির এইরূপ অসম্মতিতে কোন ফল হইল না। লালগোপাল তাঁহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া এরূপ কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, গণপতি বন্ধুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। লালগোপালের লক্ষ-টাকা নিজের নিকট গচ্ছিত রাখিতে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

লালগোপাল পরদিন দশ বাক্স টাকা বাগ্দী পাইকের মারফৎ গণপতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এক একটা বাক্সে দশ হাজার টাকা, প্রত্যেক বাক্স প্রায় সাড়ে তিন মণ ভারী। দুইখানি গরুর গাড়ীতে টাকার বাক্সগুলি গণপতির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। পল্লীবাসীরা সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, প্যাকিং বাক্সগুলিতে কোন কোন মক্কেলের জমীদারী সেরেস্তার মামলার দলীলপত্র ও হিসাবের খাতা প্রভৃতি সঞ্চিত আছে।

যথাকালে গণপতি লালগোপাল-প্রেরিত লক্ষ টাকা-প্রাপ্তির রসীদ দিতে চাহিলে লালগোপাল তাহা লইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "রসীদ লওয়ার প্রয়োজন কি? ভবিষ্যতে আপনি টাকা পাওয়া অস্বীকার করলে, আপনাকে টাকা দেওয়া হয়েছে, তারই নিদর্শনের জন্যই ত এই রসীদ? তা আপনি যদি অস্বীকার করতে পারেন, তা হ'লে আমি ও টাকার দাবী করবো না, দাদা! মানুষের কথা বড়, না টাকা বড়?"

লালগোপাল যে ভয়ে টাকাগুলি গণপতির নিকট গচ্ছিত রাখিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহা অমূলক হইল। বিশ্বনাথ বাবু পদ্মাপার হইয়া দস্যুবৃত্তি করিতে ফরিদসাহী জেলায় যাইতে পারে নাই। মুরশিদাবাদ জেলায় জলঙ্গী নামক গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ পাল বাবুদের বাড়ী লুঠ করিয়াই সে সদলে তাহার আড্ডায় ফিরিয়া গিয়াছিল। জলঙ্গীর কেশব পাল সে সময় বিখ্যাত লোক ছিলেন।

লালগোপাল বাবুর রেশমের কারবারের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল; প্রতিবৎসর তিনি প্রচুর লাভ করিতে লাগিলেন, এজন্য গণপতি সান্যালের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লইবার প্রয়োজন হইল না। "টাকাটা আছে, থাক, দরকার হইলেই লইব! গণপতি দাদার কাছে টাকা মারা যাবে না।"—এই ধারণায় তিনি টাকা ফেরত লইলেন না। কোন দিন টাকার কথা মুখেও আনিলেন না।

দীর্ঘ ৩ বৎসর পরে ব্যবসায় উপলক্ষে লালগোপাল বাবু টাকাগুলি ফেরত লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া গণপতি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "টাকা! লাখ টাকা তুমি আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলে? তোমার কোন সাক্ষী আছে? রসীদপত্র কিছু দেখাতে পার?"

লালগোপাল গণপতি মোক্তারের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার পদতল হইতে

পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে! তাঁহার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীতে এখনও ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের অভাব হয় নাই, সত্যের মহিমা বিলুপ্ত হয় নাই; কিন্তু গণপতির কথা শুনিয়া তাঁহার সেই ধারণা অন্তর্হিত হইল। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "না দাদা, তুমি ভিন্ন আমার দ্বিতীয় কোন সাক্ষী নেই; রসীদও নেই। তুমি রসীদ দিতে চেয়েছিলে, আমি বলেছিলাম, যদি তুমি টাকা গচ্ছিত রাখা অস্বীকার কর, তবে আমি তার দাবী করবো না। কিন্তু তুমি অস্বীকার করবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নি।"

গণপতি মোক্তার হাসিয়া বলিলেন, "আমি স্বীকার করছি, টাকা আমি নিয়েছিলাম, আমি তোমার কাছে লক্ষ টাকা কর্জ্জ করেছিলাম। কিন্তু তিন বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, সে টাকা তামাদি হয়ে গিয়েছে; এখন তোমার দাবী অগ্রাহ্য।"

লালগোপাল বলিলেন, "বেশ, তাই হোক। আমি ও টাকার দাবী ত্যাগ করছি, ভগবান্ আপনাকে সুখী করুন। আপনাকে যেন এ জন্য কখন অশান্তি বা মনস্তাপ ভোগ করতে না হয়। আপনি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র। শূদ্রের লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণের সেবায় ব্যয় হোক, তাতেই ও টাকার সার্থকতা। আর কদিনই বা বাঁচবো? তার পর সে টাকা আপনার ছেলের ভোগে লাগুক, আর আমার ছেলের ভোগে লাগুক, আমার পক্ষে সে সমান কথা হবে।"

গণপতি বলিলেন, "সত্য কথাই বলেছ, ভাই! তোমার আমার দু'জনেরই সংসারের দোকানপাট বন্ধ করবার সময় হয়েছে। টাকাগুলা কার ভোগে লাগ্‌বে, তা আমরা দেখ্‌তে আস্‌ব না। কিন্তু টাকাগুলার সদ্ব্যয় হ'লে আমাদের পরলোকগত আত্মা পরিতৃপ্ত হবে। দেখ লালগোপাল, আমাদের এই ফরিদসাহী জেলা উচ্চশিক্ষায় বড় পিছিয়ে পড়েছে, আমরা দু'জনেই দীন-দুঃখীদের সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করেছি, তাদের অন্নবস্ত্র দান করেছি; জলাশয় প্রতিষ্ঠিত ক'রে জলদান করেছি। কিন্তু ভবিষ্যৎবংশীয়দের মানুষ ক'রে তুলবার জন্যে কিছুই করি নি। আজ দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। জেলায় জেলায় স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছে, তাতে ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে। আর আমাদের এই ফরিদসাহী জেলায় একটা ভাল ইংরাজী স্কুল নেই। বিদ্যাদানের জন্য এখানে এ পর্য্যন্ত কেউ কোন চেষ্টা করে নি। আমাদের জেলার ছেলেরা মূর্খ থেকে যাচ্ছে। তোমার বা আমার ছেলে টাকাগুলা হাতে পেলে উড়োবে। তার সদ্ব্যয় হবে না। তোমার গচ্ছিত টাকা আমি কোন কোন জমীদারকে কর্জ্জ দিয়েছি, তাদের কালেক্‌টারীর খাজনা দাখিল ক'রে জমীদারী রক্ষা করেছি। কিন্তু বিনা সুদে কর্জ্জ দিই নি। এই তিন বৎসরে সেই টাকা সুদে আসলে এক লক্ষ ত্রিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। আমি প্রস্তাব করছি, এই টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাগজ কেনা হোক। সিপাই-যুদ্ধের পর কোম্পানীর কাগজের দর কি রকম নেমে গিয়েছে, তা তুমি জান। এই টাকার সুদ থেকে একটা ভাল এণ্ট্রেন্স স্কুল ভালই চল্‌বে। সেই স্কুলে লেখাপড়া শিখে এ জেলার ছেলেরা মানুষ হবে। টাকাগুলা তুমি নিজের ছেলেকে না দিয়ে দেশের ছেলেদের দান কর, তারা মানুষ হোক। এর চেয়ে ও টাকার সদ্ব্যবহার আর কি রকমে হ'তে পারে? তোমার এই অর্থে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও, ভাই!"

এই প্রস্তাবে লালগোপালের মন আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি গণপতির পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দাদা, আপনার এই প্রস্তাব এতই সঙ্গত, এতই সুন্দর যে, আমি অন্তরের সঙ্গে এই প্রস্তাবের সমর্থন করছি। ঐ টাকা এই জেলার ছেলেদের বিদ্যাদানে ব্যয় হোক। আপনি কোম্পানীর কাগজ কিনে তার সুদ থেকে একটা ইংরাজী স্কুল চালানোর ব্যবস্থা করুন। টাকাগুলার ব্যয় সার্থক হোক, দাদা!"

গণপতি বলিলেন, "তোমার কথা শুনে বড় আনন্দ হ'লো, ভাই! তুমি লক্ষ্মীর বরপুত্র, কিন্তু মা সরস্বতীর কৃপা লাভ করতে পার নি; তবু যে তাঁর পূজোয় এ টাকা ব্যয় করছ, এতে তোমার হৃদয়ের মহত্ব সূর্য্যের কিরণধারার মত বিমল প্রভায় ফুটে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি প্রস্তাব করছি—এই স্কুলের নাম হোক—'লালগোপাল হাই ইংলিস্ স্কুল'।"

লালগোপাল ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না দাদা, তা হবে না। তোমারই চেষ্টায়, উদ্যোগ-আয়োজনে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমি প্রস্তাব করছি, স্কুলের নাম হোক 'গণপতি হাই ইংলিস্ স্কুল।' তুমি থাকতে স্কুলের সঙ্গে

আমার নাম যোগ হবে, এ হ'তেই পারে না। টাকা আমার, তাতে কি যায় আসে? তুমি যোগ্য লোক, স্কুল চালাবে তুমি, স্কুলের সঙ্গে তোমার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাক, আমার অর্থের সদ্ব্যবহার হোক; কিন্তু আমার তুচ্ছ নাম গোপন থাক।"

তাহাই হইল। এই ঘটনার পর বহুদিন অতীত হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'ফরিদসাহী গণপতি হাই ইংলিশ স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণপতি সান্যাল ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালে সহস্র সহস্র ছাত্র 'গণপতি হাই ইংলিস স্কুল' হইতে যোগ্যতার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে সুবিদ্বান্ বলিয়া যশস্বী হইয়াছে; তাহাদের অনেকে এখন নানা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছে। ফরিদসাহী জেলার সকলেই জানে, উহা 'গণপতি সান্যালের স্কুল।' কিন্তু উহার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে, তাহা এ যুগের অধিকাংশ লোকের অজ্ঞাত।

লালগোপাল খাঁজার পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র লাটুগোপাল তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ও তাঁহার পিতার হৃদয়ের ন্যায় উচ্চ ছিল। কিন্তু বিলাসে ও ব্যসনে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট করিয়াছিলেন। রেশমের কারবার তাঁহার শৈশবকালেই বন্ধ হইয়াছিল। ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভের জন্য তিনি তাঁহার নষ্টপ্রায় জমীদারী সুবিখ্যাত নীলকর জন ওয়াটসন কোম্পানীকে পত্তনী দিয়াছিলেন। তাঁহার শিকারের ও বাগানের সখ ছিল। তিনি আম, কাঁটাল ও সুপারী নারিকেলের যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান এবং তিনটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আয় হইতে তাঁহার পুত্র নৃত্যগোপালের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। তাঁহার সেই বৃহৎ অট্টালিকা, পূজামণ্ডপ, কাছারীবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা, সদর ও অন্দর মহল, নাটমন্দির— একসময় যাহা সুবিশাল রাজপ্রাসাদের ন্যায় শোভাবিস্তার করিত, তাহা ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ বিরাজিত। নৃত্যগোপাল আম-কাঁটাল, সুপারী-নারিকেল, এবং পুষ্করিণীর রুই-কাতলা মাছ বিক্রয় করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। সংসারে কোনও অভাব নাই, কার্পণ্যেরও সীমা নাই; সেই সকল পূর্ব্বকথা এখন যেন স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। নৃত্যগোপাল পিতামহের অর্থের সন্ধানে ইষ্টক-স্তূপ খুঁড়িয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়াছেন; কিন্তু ভূগর্ভ-প্রোথিত টাকা-মোহর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই! অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে, অপরিতৃপ্ত অর্থলালসায় বেচারা মৃতকল্প!

নৃত্যগোপাল লাটুগোপালের পত্নীর গর্ভজাত পুত্র নহেন। লাটুগোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী একটি গরীব মুদীর চতুর্থ পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন, লাটুগোপাল জীবিত থাকিলে এ দুষ্কর্ম্ম কখন করিতেন না। সামান্য মুদীখানার দোকান নৃত্যগোপালের জন্মদাতা পিতার একমাত্র সম্বল ছিল। নৃত্যগোপাল পোষ্যকুষ্মাণ্ডরূপে লালগোপাল ও লাটুগোপালের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও তাহার জন্মদাতা পিতার ইতর মনোবৃত্তি, ছোট নজর প্রভৃতি চরিত্রগত বিশিষ্টতা ত্যাগ করিতে পারে নাই। পথিকরা তাহার বাসগৃহের পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পায়—ডাবের বোঁটা ও ডাব ধরিয়া ক্রেতার সহিত নৃত্যগোপালের 'টগ্ অফ্ ওয়ার' আরম্ভ হইয়াছে। নৃত্যগোপাল পাঁচ পয়সার কমে ডাবের অধিকার ত্যাগ করিবে না, ক্রেতা চারি পয়সার বেশী দিবে না। পাকা কাঁটাল ধরিয়া ঐ ভাবে টানাটানি করিতে গিয়া কাঁটালের মুষল ক্রেতার হাতে থাকে, ভূতি ও কোষগুলি নৃত্যগোপালের করবন্ধন হইতে স্খলিত হইয়া মাটীতে ছড়াইয়া পড়ে।—এই দৃশ্য দেখিয়া স্বর্গগত লালগোপালের অশরীরী চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয় সন্দেহ কি?

নৃত্যগোপালের কন্যা চন্দ্রকলা বিবাহযোগ্যা হইলে নৃত্যগোপাল অর্থব্যয়ের ভয়ে একটি ধনবান্ খঞ্জ বৃদ্ধের হস্তে কন্যা-সম্প্রদানের সঙ্কল্প করে। সেই বৃদ্ধ দুইটি পত্নীর মৃত্যুর পর নৃত্যগোপালকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার আশায় একটি মোহর দিয়া তাহার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়; কিন্তু খোঁড়া বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে শুনিয়া নৃত্যগোপালের বৃদ্ধা জননী ও পত্নী এরূপ প্রচণ্ড কোলাহল আরম্ভ করিলেন যে, নৃত্যগোপালের শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। এই সময় 'বনিয়াদী ঘরের মেয়ে' আনিবার লোভে হারাধন সরকার তাহার

পুত্রের সহিত চন্দ্রকলার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিল। হারাধন পুত্রের বিবাহ দিয়া বৈবাহিকের ঘাড় ভাঙ্গিবে, তাহার এরূপ দুরভিসন্ধি ছিল না; এজন্য পুত্রের বিবাহে সে কিছুই দাবী করে নাই। কিন্তু বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে নৃত্যগোপাল হারাধনকে লিখিল, "দশ জনের অধিক বরযাত্রী আনিবেন না, এবং তাহাদের জন্য লেপ, তোষক ও বালিস সঙ্গে আনিবেন।" এইরূপ পত্র পাইয়াও মর্ম্মাহত হারাধন কুটুম্বের মনঃক্ষুণ্ণ করিবার ভয়ে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিল না। সে বরযাত্রীদের লইয়া নৃত্যগোপালের গৃহে উপস্থিত হইলে, কন্যাকর্ত্তা মেঝের উপর বিচিলি বিছাইয়া তাহার উপর 'চ্যাটাই' পাতিল এবং বরযাত্রীদের শয়ন করিতে দিল। বরযাত্রীদের মধ্যে দুই তিন জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, এই ব্যবহারে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া স্থানান্তরে আশ্রয় লইলেন। নৃত্যগোপাল কর-যোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শাঁখা-সাড়ী দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধারলাভ করিল।

পূজার সময় নৃত্যগোপাল কন্যা-জামাতাকে পূজার তত্ত্ব পাঠাইল একটি ক্ষুদ্র ডাকের পার্শেল। পার্শেল খুলিয়া দেখা গেল—৯ হাতি একখানি সাড়ী ও একখানি ধুতি; মিলের মোটা কাপড় দুই একবার ব্যবহারের পর তাহাই ধোয়াইয়া কন্যা-জামাতাকে পূজার তত্ত্ব প্রেরণ করা হইয়াছে!

পাড়ার পঞ্চু খুড়ো রসিক পুরুষ, তিনি নৃত্যগোপাল-প্রেরিত পূজার তত্ত্ব দেখিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না হবে কেন, বনিয়াদী ঘর! কিন্তু ল্যাংড়ার কলমে আমড়া ফলিয়াছে! মুদীর পুত্রের সাধ্য কি সে লালগোপালের বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে?"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সন্ধ্যায়

রক্ত-দিগ্ধ দেহখানি বহিয়া আনত
যুদ্ধশ্রান্ত মূর্চ্ছমান সৈনিকের মত
ধীরে ধীরে ম্লান-রবি ওই ডুবে যায়;
শোণিত-প্লাবিত শেষ-যুদ্ধক্ষেত্র প্রায়
প'ড়ে আছে প্রদোষের নিস্তব্ধ আকাশ;
নেমে আসে নিদারুণ মৃত্যুর প্রকাশ
সন্ধ্যা-অন্ধকার সারা ধরণীরে ঘিরে'—
নিভে' আসে দিবার সে দীপ্তি সমুজ্জ্বল,
থেমে আসে সংসারের ক্ষিপ্ত কোলাহল
মহাবিস্মৃতির মত ধীরে ধীরে ধীরে।

এইরূপ এক দিন এমনি সন্ধ্যায়
আমারো জীবন-দিবা হবে শেষ হায়!—
সংসার-সংগ্রাম-ক্লিষ্ট প্রাণখানি লয়ে
কালগর্ভে ডুবে যাব ক্লান্ত ম্লান হ'য়ে

আমার চেতনা-লোক রাঙিয়া দাপিয়া
সব হাসি-গাথা যাবে এমনি নিভিয়া
মরণ আসিবে গাঢ় অন্ধকার সম
সারাটি স্মৃতির তট আবরিয়া মম।

আবার, আবার যায় ধীরে ধীরে টুটে'
ওই যে তমসারাশি; ধীরে উঠে ফুটে'
দিগন্তের বৃন্তপুটে উদ্ভিন্নপ্রচ্ছদ
দ্বিতীয়ার দিব্যজ্যোতি শশী সুকুমার
অপরূপ রাশি রাশি বক্ষে বসুধার
ঝরে ঝর্ণা—জ্যোৎস্না-হাসি গলিত-রজত।

আমারো বিক্ষত ভালে পরাবে না টীকা
মরণ—অমৃতরূপ শশি-ললাটিকা?

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পাশ্চাত্য ও হিন্দু-সমাজে নারী

আমাদের সকল নারীর জীবন এইরূপে পরার্থপরতায়, ত্যাগশীলতায় প্রকৃত মহত্ত্বে প্রভাবিত হয় বলিয়াই স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁহারা স্বামী ও অন্যের সম্বন্ধে অকুণ্ঠিতচিত্তে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে পারেন এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, কিছুদিন পরেই সেই স্বামীই তাঁহাদের মহত্ত্বের পদতলে নতশির হইয়া পড়ে, নিজের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়, তাঁহাদের প্রীতিসম্পাদনে যত্নবান্ হয়। আমাদের নারীদিগের এই গুণেই আমাদের গৃহে শান্তি, প্রীতি ও তৃপ্তি আছে, সামান্য কলহে—পরস্পরের সামান্য ত্রুটিতে পাশ্চাত্যের মত গৃহদাহে পরিণত হয় না। এই জন্য আমাদের নারীরা গৃহের লক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা। আমাদের নারীরা সেবাধর্ম্মে অনুপ্রাণিতা বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে 'দাসী' বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত হইতেন। রাজপুত্রের জীবনাদর্শ যেমন Ich Dien (I Serve আমি দাস) শব্দে প্রকাশ, তাঁহাদের জীবনাদর্শও তেমনই 'দাসী' এই আখ্যায় প্রকাশ এবং তাঁহাদেরই প্রভাবে—

> "গৃহীরা শিখিল গৃহ করিতে বিস্তার
> প্রতিবেশী—আত্মবন্ধু—অতিথি—অনাথে
> ভোগেরে বাঁধিতে সদা সংযমেরই সাথে।"

বিধবাদের ত্যাগের প্রভাবেই আমাদের সমাজ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাঁহারা আমাদের দেশের নিষ্কাম কর্ম্মের ও ত্যাগধর্ম্মের প্রধান শিক্ষয়িত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এই কথা যাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন, তাঁহাদিগকে দেখিতে বলি যে, আমাদের এই শিক্ষা দিবার অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই ত্যাগধর্ম্মের শিক্ষা বক্তৃতা দিয়া, বই লিখিয়া হয় না; তাহা যদি হইত, খৃষ্টান য়ুরোপ এত দিনে সর্ব্বপ্রকার সংহারকারী শস্ত্রসমন্বিত সেনানিবাসের পরিবর্ত্তে বৈরাগীর আশ্রমে পরিণত হইত। লোকের উপর ত্যাগধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—কেবল ত্যাগধর্ম্মের, নিষ্কাম কর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া—তাহাদের আদর্শ-জীবন প্রত্যক্ষ করিয়া। নিষ্কাম কর্ম্মের—সেবাধর্ম্মের—রিপুজয়ের কোমল মাধুরী আমরা (চক্ষুহীন না হইলে) প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, আত্মীয়দের তাহাতেই কামনাবহ্নি প্রশমিত হয়। ভোগেচ্ছা সংযত হয়—সহানুভূতি, সহৃদয়তার বিকাশ হয়—অহমিকা শিথিলমূল হয়—ধনগর্ব্ব লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে—গৃহ পবিত্র হয়। তাহাদিগের জীবনের মহত্ত্বের অলক্ষ্য প্রভাবে আমাদিগের গৃহে শান্তি আছে, তাহা দেখি না। আমরা এখন পাশ্চাত্য প্রভাবে বিধবাদিগকে সেই সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখি না বলিয়া, তাহারা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হয় মনে করি বলিয়াই তাহাদেরও মহদাদর্শে জীবন যাপন করিবার উপযুক্ত হৃদয়বলও নষ্ট করিয়া দিতেছি, তাহাদের জীবনের প্রভাব বিস্তার হইতে পাইতেছে না। এই বিধবাদিগকে আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা উচিত।

আমার কোন বিশেষ মাননীয় ধনী আত্মীয় তাঁহার এক অল্পবয়স্কা কন্যা বিধবা হইলে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যান, তাহাকে তিনি তৎকালীন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রকৃত হিন্দুভাবাপন্ন লোকের মনের ভাব প্রকাশ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—"ভগবান্ যে আমার কন্যাকে এই অল্পবয়সেই বিধবার রাজমুকুট (Crown of Widow Whood) পরিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিজেকেও ধন্য বোধ করিতেছি।" আবার কি আমরা সেই দৃষ্টিতে বিধবাদের দেখিতে শিখিব? মহাত্মা গান্ধী ইংলণ্ডের দারুণ শীতেও কৌপীনবাসধারী নগ্নপদ ছিলেন বলিয়া বিগলিতচক্ষু হওয়া যত সঙ্গত, হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর বিধবাদের ভোগহীনতার জন্য তাহাদের দুঃখ ও কষ্টের জীবনের জন্য বিগলিতচক্ষু হওয়া ততটাই সঙ্গত।'

আমরা যদি স্মরণ করি যে, যে কালে এই বৈধব্যের নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল, তখন আমরা সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলাম, আমরা সকল জ্ঞানবিজ্ঞান-শিল্পের আবিষ্কর্ত্তা ছিলাম, এখান হইতেই ধর্ম্মের ও নীতির উৎস প্রবাহিত হইত। আমরা যেমন আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, তারার গতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করিতাম, পৃথিবীর অভ্যন্তর ও সমুদ্রগর্ভও তেমনই করিয়া দেখিয়াছিলাম। সুদূর আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোজ দেশে অর্ণবপোতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপনা করিয়াছিলাম, তথায় সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলাম। আমাদের সমৃদ্ধি জগৎপ্রসিদ্ধ, তখন আমরা সকল লোকের সকল দুঃখ-কষ্টের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে প্রয়াসী ছিলাম, রাজারা রাজমুকুট তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতগুহায় ফলমূলাহারী হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন। সেকালে বিলাসলালিতা রাজকন্যা উমা ভস্মাচ্ছাদিতদেহ বাঘাম্বর সন্ন্যাসী শিবকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য উগ্রতপস্যা করিয়াছিলেন। সেই কালের বীর পুরুষরা সেই প্রকৃত মহত্ত্বের অনুসরণপ্রয়াসী যুগে যে তাঁহাদেরই বীর কন্যা বীর ভগিনীদিগকে বিধবা হইলে সর্ব্বভূতহিতার্থে নিয়োগ করিবেন, তাঁহারাও সেই আদর্শের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে প্রয়াসিনী হইবেন, তদুপযোগিনী হইবার নিয়মাবলীর কঠিনতা অগ্রাহ্য করিবেন, তাঁহাদের আদর্শ-জীবন দেখিয়া সকল লোকই নিষ্কামধর্ম্মে প্রভাবিত হইবে, ভোগাসক্তি ত্যাগ করিতে শিখিবে, তাহাই সম্ভব। যাঁহারা সকল লোকের সকল দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি

করিতে প্রয়াসী ছিলেন, যাঁহারা সকল প্রাণীদের প্রতি করুণার জন্য প্রসিদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদের কন্যাদিগকে অসীম নিগ্রহ সহ্য করিবার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা স্বদেশভক্ত সংস্কারকদিগের বিশ্বাস করা কত সঙ্গত, তাহা একবার বিবেচনা করিবেন কি ?

ইংলণ্ডের প্রাপ্তবয়স্কা নারীদিগের ভিতর কত অংশ কুমারী দেখুন এবং তাহাদিগের সহিত আমাদের যাহারা তৎকালে বিধবা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার ও অবস্থার তুলনা করুন, বিবাহিতাদেরও অবস্থার তুলনা করুন। প্রথমেই দেখা যায় যে, সেখানকার কুমারীদের সংখ্যা আমাদের বিধবাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহার উপর যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে, প্রাণ-মন, অঙ্গ ঢালিয়া ভালবাসিবার, পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইবার প্রবৃত্তি ও শক্তি থাকে, তখন তাহারা সেই সকাম ভালবাসা, কাম ও মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিত থাকেন, ভালবাসা কুকুর বিড়ালে ফেলিতে হয়, হৃদয়ের শূন্যতা আমোদ ও বিলাসিতা উপভোগেই পূরণ করিতে হয়, পুরুষদিগের সহিত নানা আমোদ ও খেলায় যোগদান করেন, থিয়েটার-বায়স্কোপে উদ্দাম উপভোগ দেখেন, কাম ও ভোগেচ্ছা উদ্দীপিত করা হয়, তাহাই রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে হয়, তাহা অতিশয় স্বাস্থ্যহানিকর, অনেক উৎকট ব্যাধিজনক, ইহা সকল ডাক্তার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণকারীই স্বীকার করেন। মাতৃত্বের অঙ্গ সকলের স্নায়ু ও স্নায়ুগ্রন্থি সকল শুষ্ক হয়, ক্রমেই নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে, তাহাতেই বিতৃষ্ণ হইয়া পড়েন। বিলাসিতায় একমাত্র উপভোগ থাকে, সুতরাং ভোগলোলুপা হইয়া পড়েন, তজ্জন্য নানারূপ বিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া পড়েন, আত্মবিক্রয় করিতে হয়, ইহা Havelock Ellis প্রভৃতি হইতে দেখাইয়াছি। অনেকে কামজয় করিতে পারেন না, সুতরাং কাম উপভোগ করিতে গিয়া মাতৃত্বনিরোধকারী উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা সত্ত্বেও অনেক সময়ে গর্ভবতী হইয়া পড়েন, ভ্রূণহত্যা করিতে হয়, জারজ সন্তান একা পালন অথবা ত্যাগ করিতে হয়। অনেককেই পেটের দায়ে ও ভোগবাসনার পরিতৃপ্তির জন্য পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্য-হানিকর ও মাতৃত্বের অনুপযুক্ত অর্থকর কর্ম্মের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, অপ্রাপ্তব্য স্থানে প্রেম উদ্দীপিত হয়, বহু অভীপ্সিত স্থানে প্রত্যাখ্যানের বা অবজ্ঞার অপমান নীরবে সহ্য করিতে হয়, হৃদয় বিষাক্ত করা হয়, তাহার পর অর্থের বা অন্য সুবিধা খতাইয়া অমনঃপূত বহু নারীকে সম্ভোগকলুষিত-হৃদয় লোকের সহিত বিবাহিতা হইতে হয়, তাহারও আবার অনেকেই যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ এত অধিক হইতেছে, এরূপ বিবাহ হইতে মুক্তি পাওয়াই নারীস্বত্বাধিকার-প্রসার পাশ্চাত্য দেশে গণ্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? যে পাশ্চাত্য দেশে বিবাহিতা নারীরাও নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে, তাহাই রুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়, তাহা উপভোগ করা একান্ত কষ্টকর, যাহাদের অধিকাংশের যৌবন কাটিয়া যায় মনের মানুষ খুঁজিতে, বহু অভীপ্সিত পুরুষদিগের দ্বারা প্রত্যাখ্যানের অপমানে হৃদয় বিষাক্ত, তৎপরে অমনঃপূত স্থানে বিবাহিতা হইতে বাধ্য হয়, বৃদ্ধবয়স প্রায় সকলেরই নির্জ্জন কারাবাসতুল্য, তাহারাই নারীস্বত্বাধিকারপ্রসারক। সেইরূপ সমাজ গঠন করিতে আমাদের পাশ্চাত্যের অনুচিকীর্ষু স্বদেশ-প্রেমিক সংস্কারকরা চাহিতেছেন, আর আমরা—যাহারা সকল নারীকে সকল কালে প্রতিপালন করিয়া (endowed) তাহা-দিগকে অর্থোপার্জ্জনের নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলাম, সকলকেই কাম ও মাতৃত্ব উপভোগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া-ছিলাম, আমরাই নারী-নিগ্রহী, তরুণদিগকে ইহাই বুঝাইতে-ছেন ! অপরস্বা কিম্ ভবিষ্যতি !

আমাদের প্রাপ্তবয়স্কা বিধবারা প্রথম-যৌবনে পূর্ণভাবে কাম ও প্রেম উপভোগ করিতে পাইয়াছিলেন, প্রায় সকলেই মাতা হইতে পাইয়াছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর সেই ভালবাসা অপত্যে পুঞ্জীভূত হইয়া পড়ে, তাহাদের মুখ চাহিয়া সকল দুঃখ-কষ্ট সহিবার দৃঢ়তা আইসে, আত্মীয়দের সাহায্যে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি চলিয়া যায়, অপত্যরা বড় হইলে তাহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা পাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে পারেন।

উচ্চশ্রেণীভুক্তদের ভিতর বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর আত্মীয়দের বিধবা ও তাহার অপত্যদের প্রতিপালনের বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই শিথিল করা হয়। বিধবার প্রতিপাল্য ত্যাগের নিয়মাবলিও শিথিল হইয়া যায়, অনেকেরই পুনরায় বিবাহিত হইবার বৃথা আশা উদ্দীপিত করা হয়, সংযম-শিক্ষার বিঘ্নকারক হয়, আত্মীয়দের তজ্জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তিরও অভাব হয়, সেরূপ সাহায্য করাও হইয়া উঠে না। সকল সমাজেই দেখা যায় যে, অতি অল্পসংখ্যক বিধবা বিবাহিতা হয়। তাহারা প্রায় সকলেই ধনী কিম্বা বিশেষ রূপবতী বা কোন বিশেষ পুরুষ-আকর্ষণকারী গুণযুক্ত। সুতরাং অধিকাংশ বিধবার তাহাতে কোন লাভ হয় না, বরং অতিশয় অশুভফলদায়ক হয়, অনেককেই আত্মীয়দের সাহায্যাভাবে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহাতে চরিত্রহীন হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা পুনরায় বিবাহিতা হয়, তাহারা অন্য কুমারীর বিবাহিতা হইবার আশা নির্ম্মূল করিয়া দেয়, সেই বিবাহিতা বিধবাদের সুখ কুমারীদের সুখের বিনিময়েই হয়, সুতরাং নারীসমষ্টির মঙ্গল করা হয় না, নারীস্বত্বাধিকার বৃদ্ধি করা হয় না, ধনের প্রভাবই বৃদ্ধি করা হয়, ভোগলোলুপতারই বৃদ্ধি করা হয়, সংযমের অভাবের বৃদ্ধি করা হয়, তজ্জন্য নারীদিগের ও সমাজেরই অমঙ্গল করা হয়, আমাদের মত গরীব পরাধীন দেশের পক্ষে ইহা অতীব অমঙ্গলজনক।

এখন আমরা সকলেই বিধবাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশে সমুৎসুখ, কিন্তু আমাদের সামাজিক নিয়মে তাহাদিগকে প্রতি-পালন করিতে আমরা বাধ্য, আমরা তাহা মানি না—তাহাদিগকে গৃহে স্থান দিই না—যদি বা দিই, তাহাদের সহিত দাসীর অপেক্ষা অনেক সময়ে মন্দ ব্যবহার করি, তাহাদিগকে তাহা-দের মহত্তর আদর্শে জীবনযাপন করিবার অবকাশ দিই না ; তাহাদিগকে লাঞ্ছিতা বলিয়া—লাঞ্ছনা দিয়া সেই আদর্শ-জীবনোপযোগী হৃদয়বলই নষ্ট করিয়া দিই। বিধবাদের সর্ব্বত্যাগ আমাদের বর্দ্ধিত ভোগাসক্তির সহিত অতিশয় অসমঞ্জস, তাহাকে প্রতিক্ষণেই মূক তিরস্কার করে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেও কুণ্ঠিত, সেই জন্যই কি আমরা

তাহাদিগকে ভিন্নভাষী লোকের সহিতও বিবাহ দিয়া নিজেদের বাধ্যতা হইতে অব্যাহতি পাইতে চাই ? আমরা মুখে আমাদের ত্যাগধর্ম্মের—নিষ্কামকর্ম্মের (Spirltualityর) বড়াই করি—তাহা কেবল পাশ্চাত্যদের কাছে মান্য পাইবার জন্য। যাহারা সেই নিষ্কাম কর্ম্মময় জীবনযাপন করিতে চায়, তাহাদিগকে লাঞ্ছিতা বলি, তাহাদিগকে লাঞ্ছনা দিই। আমরা পাশ্চাত্যদের কোন গুণ অর্জ্জন করিয়াছি কি না, জানি না। তাহাদের বিলাসিতা, বিলাসভোগেচ্ছা তাহাদের দোষগুলিও গুণ বলিয়া লইতেছি। যে শিক্ষা আমাদিগকে গোলামীগিরিতে পটু করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যাহা পাইয়া আমরা প্রথমে গোলামীগিরি খুঁজি, সুবিধাজনক না পাইলে তবে অর্দ্ধগোলামীগিরির (ওকালতি প্রভৃতি) চেষ্টা পাই, তদভাবে বাধ্য হইয়া স্বাধীন ব্যবসা করিতে চাই, সেই শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্যরা যাহা ভাল বলে, আমরাও তাহাকে নির্ব্বিচারে ভাল বলি; তাহারা যাহা করে, আমরা তাহাই করি; তাহাতে মান্য পাই—তাহাতেই আমরা উন্নতিকামী স্বদেশহিতৈষী সংস্কারক হইয়াছি বলিয়া স্ফীতবক্ষ হই। তাহারা যে পরিচ্ছদ যখন পরে—যেরূপ গোঁফ-দাড়ী কামায়—চুল ছাঁটে, সেইরূপই করি; তাহারা যে খেলা যখন খেলে, আমরা তখন সেই খেলা খেলি; যেরূপ আমোদ যখন উপভোগ করে, আমরা তাহাই করিতে চেষ্টা পাই। পাশ্চাত্যদের খেলার আমোদের বিবরণে—তাহাতে যাহারা কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাদের গুণগান করি। আমরা পুরুষানুক্রমে 'শতহস্তেন বাজিনাম্' এই উপদেশবাণী মানিয়া আসিয়াছি। বেটো ঘোড়া ছাড়া এ দেশে অন্য কোন ঘোড়া জন্মায় না। আমাদের পিতামহ, প্রপিতামহের নাম কি ছিল—তাঁহারা কি করিতেন—তাহা জানা এখন আর আবশ্যক বিবেচনা করি না; কিন্তু ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার pedigree আমরা মুখস্থ করি, কোন্ ঘোড়া কোন্ race জিতিয়াছে, সেই সকল অত্যাবশ্যক সংবাদ আমাদের কাম্য। আমাদের উচ্চশ্রেণীভুক্তরা—ঐ শ্রেণীভুক্ত হইবার প্রয়াসীরা স্ত্রী-কন্যা সমভিব্যাহারে raceএ যান—জুয়া খেলেন—তাহাতে সাহেবদের কাছে সম্মান পান। তাঁহাদের দেখাদেখি গরীব কেরাণীরা—অন্তঃপুরের নারীরা পর্য্যন্ত অতি সহজ পন্থায় বড় মানুষ হইতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। পাশ্চাত্যের বিলাসিতার সুলভ অনুকরণে সকলেই ব্যগ্র। কি আহারে, কি পরিচ্ছদে, কি খেলায়, কি আমোদে, কি গৃহনির্ম্মাণে কি গৃহসজ্জার উপকরণে সাহেবদের অনুকরণ করি, তাহা করিতে গিয়া রাজা-রাজড়া হইতে চুনো-পুঁটি ধনীরা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, দেশের দারিদ্র্যবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন, তাহা করিয়াই স্ফীতবক্ষা হইতেছেন, তাহার জন্য তাঁহারা অধিক মান্য পান। দেশের এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনেও পাশ্চাত্যে দেশী খেলোয়াড় পাঠাইতেছি। বায়স্কোপের উদ্দাম উপভোগ-চিত্র আমরা আমাদের প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীদের—বিধবাদেরও দেখিতে লইয়া যাইতেছি; তাহার ও ক্রিকেট ফুটবল খেলার টিকিট কিনিতে কাঙ্গালী-বিদায়ের সসম্ভ্রম ব্যবহার হজম করিতেছি। আমাদের মফঃস্বলস্থ নারীদিগকে আমরা রক্ষা করিতে পারি না বলিয়া সহরের নারীদিগকে লাঠি-ছোরা-খেলা শিখাইতেছি—আমরা পাশ্চাত্যের বিলাসিতালোলুপ হইয়াছি—তাহার সুলভ অনুকরণেই স্ফীতবক্ষ হই—আমরা আমাদের বিধবাদের ত্যাগধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিব কেমন করিয়া ?

আমরা যেরূপ ভোগলোলুপ হইয়াছি, আমাদের নারীদিগকেও সেইরূপ ভোগাসক্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছি। বিলাসভোগই সভ্যতার চিহ্ন—মাপকাঠী, ইহাই আমরা শিখিয়াছি। সেই ভোগলোলুপতার জন্য আমরা হিন্দু সামাজিক অনুশাসন অবজ্ঞা করিতেছি—দুঃস্থ আত্মীয়দিগকে নিজের মত করিয়া প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছি—তজ্জন্য তাহারাও কৃতজ্ঞ হয় না। যৌথ পরিবারের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি না; সুতরাং নারীদিগের দুর্দ্দশা হইতেছে—অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যক হইতেছে। যাহার অর্থ নাই, তাহাকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে পরের দাসত্বই করিতে হয়, সেই জন্য পরের দাসত্ব করিতে পাওয়াই নারীস্বত্বাধিকার-প্রসার বলিয়া গণ্য হইতেছে। লক্ষের ভিতর দুই একটি ছাড়া নারীদিগের অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হওয়ায় পরের গোলামীগিরি করার কত নির্য্যাতন, কত লাঞ্ছনা, কত অপমান, কত চরিত্রহীনকারক, তাহা আমরা দেখি না। হিন্দু-সমাজ যে তাহাদিগকে ঐরূপ নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি দিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে সকল কালেই প্রতিপাল্য করিয়াছিল, তাহা যে তাহাদিগের পক্ষে কত অধিক ভাল, তাহা দেখি না। হিন্দু-সমাজকে নারীনিগ্রহী বলি। আমাদেরই মত শিক্ষিতা মহিলারা—যাঁহাদিগকে প্রায় কাহাকে পরের গোলামীগিরি করিতে হয় না, অথবা উচ্চপদস্থ, যাহা লক্ষের ভিতর একটিও হইতে পারে না, তাঁহারাও যে ঐরূপ বলিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? তাঁহারা দেখেন না যে, আমাদের সকল শিল্পই ধ্বংসপ্রাপ্ত, সকল ব্যবসাই পরহস্তগত, শতকরা ৯৭টি নিরক্ষর, আমাদের হিন্দু আদর্শ ত্যাগ করিয়া যৌথ-পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিলে আমাদিগের নারীদিগের কি দুর্দ্দশা হইবে ! পরের দাসীগিরি, কলের মজুরণী, আর প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিই করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাহাই নারী-স্বত্বাধিকারপ্রসার ! আমরা তাহাতেই নারীদিগের উন্নতি হইবে, দেশের উন্নতি হইবে, স্থির করিয়াছি, তাহাই করিতে আমরা সকলেই প্রয়াসী। আমাদের শিক্ষিত উর্ব্বর-মস্তিষ্কে দেশের উন্নতির সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি, দেশের সকল পুরাতন আদর্শ—সকল অভিজ্ঞতা ত্যাগ করিতে হইবে—তাহারই অভিব্যক্তি যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, তাহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহার পর পাশ্চাত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চল, তাহাতেই কেবল আমাদের দেশের উন্নতি হইতে পারে। 'নান্যঃ পন্থা অয়নায়' ইহা আমাদের কাছে প্রমাণিত সত্য হইয়াছে।

যদিও আমরা মুখে পাশ্চাত্যবিতৃষ্ণ, কিন্তু সকল কার্য্যেই আমরা পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিয়াই কৃতার্থ হই। যাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্মালোকে এখনও পৃথিবী উদ্ভাসিত, যাঁহার সমৃদ্ধির কথা এখনও পুরাকালের কাহিনীতে রহিয়াছে, যাঁহার কালজয়ী সভ্যতার জীবনীশক্তি সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতের আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই জীবনীশক্তি যে তাঁহার সমাজগঠনে অন্তর্নিহিত

রহিয়াছে,' তাহা আমরা দেখি না। তাঁহার সকল আদর্শ, সকল প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করিতে তাঁহার সুসন্তানদিগেরও কুণ্ঠাবোধ নাই ; তাঁহার উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিবার চেষ্টাও নাই। নিজেরা সেই সকল প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গার নিমিত্ত যে সকল মন্দ ফল হইতেছে, তাহারই জন্য আবার সেই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের দোষ দিতেছি। সকলেই পাশ্চাত্যের ক্ষণস্থায়ী সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ ; সকলেই সমৃদ্ধিশালী পাশ্চাত্যের পদাঙ্ক অনুসরণপ্রয়াসী। ভারত-মাতা এখন পরাধীনা দুঃখিনী বলিয়া তাঁহার সকল নিজস্ব ত্যাগ করিয়া সমৃদ্ধিশালী পাশ্চাত্যের অনুগামিনী সখী হইয়া ধন্যা হইবেন, আমরা মনে করিতেছি—তাঁহাকে সেই অবস্থায় লইয়া যাইতে সকলেই বদ্ধপরিকর! ভগবান্ ভারতের ভাগ্যে আরও কি লিখিয়াছেন, তিনিই জানেন!

এত কাল আমরা অবরোধ-প্রথার দ্বারা নারীদিগকে পরাধীনতার লাঞ্ছনা ও তাহার আবেষ্টনীর প্রভাবের নিম্নাভিমুখী গতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম। তজ্জন্য তাঁহারা ভারতের পুরাতন আদর্শে চলিতে পারিয়াছিলেন, সেই আদর্শও কতক পরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এখন আমরা স্বাধীনতার নামে—স্বত্বাধিকারপ্রসারের নামে—মুক্ত বায়ুসেবনের অধিকারের নামে তাঁহাদিগকে পরাধীনতার পূর্ণ প্রভাব উপভোগ করিতে টানিয়া আনিতেছি। যে শিক্ষায় আমাদিগকে পাশ্চাত্যের সখের গোলাম তৈয়ার করিয়াছে, দেশের সকল পুরাতন আদর্শ অবজ্ঞা করিতে শিখাইয়াছে, সুলভ বিলাস-লোলুপ করিয়াছে, আমরা এখন সেই শিক্ষাই তাঁহাদিগকে দিতেই উদ্‌গ্রীব। ভারতের সকল পুরাতন আদর্শ ত্যাগ করিয়া ভারত-সভ্যতার বিকাশ হইবে, আমাদের উন্নতি হইবে আশা করিতেছি। সেই জন্য মনে হয়—"এ কি শেষ নিবেশ রসাতল বে?"

[ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)।

"মন্দিরের দেবতা ও মানুষের দেবতা"

কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি মহিলাকে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা "পত্রধারা" নামে 'প্রবাসীতে' বাহির হইতেছে। ইহার একখানি পত্র সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসীতে' ৩১শে জ্যৈষ্ঠের যে পত্র বাহির হইয়াছে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"ঠাকুরের সেবায় যে বর্ণনা করেচ, তা'তে স্পষ্টই দেখতে পাই, সেই মাতৃহৃদয়েরই সেবার আকাঙ্ক্ষাকে পূজাচ্ছলে পরিতৃপ্তি দেবার এই উপায়। ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোলা, কাপড় পরানো, পাছে তাঁর পিত্তি পড়ে, এই ভয়ে যথাসময়ে আদর ক'রে খাওয়ানো, ইত্যাদি ব্যাপারের বাস্তবতা আমার মত লোকের কাছে নেই, তোমাদের কাছে আছে। তোমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির নিরতিশয় প্রয়োজনের মধ্যে—যেমন ক'রে হোক, সেই প্রকৃতিকে চরিতার্থতা দেবার মধ্যে। প্রাণের বেদনা যে আমারও প্রাণে বাজে না, তা নয়, কিন্তু সে বেদনা যথাস্থানেই কাজ খোঁজে, কাল্পনিক সেবায় নিজেকে তৃপ্তি করবার চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। মন্দিরে ত আমার ঠাকুর নয়, প্রতিমাতেও নয়—আমার ঠাকুর মনুষ্যের মধ্যে,—সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে, যে দেবতা স্বর্গের, তার মধ্যে এ সব কিছু সত্য নয়।

"মানুষের মধ্যে যে দেবতা ক্ষুধিত, তৃষিত, রোগার্ত্ত, শোকাতুর, তাঁর জন্য মহাপুরুষেরা সর্ব্বস্ব দেন, প্রাণ নিবেদন করেন, সেবাকে ভাববিলাসিতায় সমাপ্ত না ক'রে তাকে বুদ্ধিতে, বীর্য্যে, ত্যাগে সার্থক ক'রে তোলেন। তোমার লেখায় তোমার পূজার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয়, এ সমস্তই অবরুদ্ধ অতৃপ্ত অসম্পূর্ণ জীবনের আত্মবিড়ম্বনা। আবার মানুষরূপী ভগবানের পূজাকে এত সহজ ক'রে তুলে তাঁকে যারা বঞ্চিত করে, তারা প্রত্যহ নিজে বঞ্চিত হয়। তাদের দেশে মানুষ একান্ত উপেক্ষিত। তাই উপেক্ষিত মানুষের দৈন্যে ও দুঃখে সে দেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পৃথিবীর সকল দেশের পিছনে প'ড়ে আছে। এ সব কথা ব'লে তোমাকে ব্যথা দিতে আমার ইচ্ছা করে না, কিন্তু যেখানে মন্দিরের দেবতা মানুষের দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষ প্রবঞ্চিত, সেখানে আমার মন ধৈর্য্য মানে না। গয়াতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন পশ্চিমের কোন্ এক পূজামুগ্ধা রাণী পাণ্ডার পা মোহরে ঢেকে দিয়েছিলেন, ক্ষুধিত মানুষের অন্নের থালি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নের মূল্যে এই মোহর তৈরি।"

রবীন্দ্রনাথের এই সকল কথা পড়িতে পড়িতে অনেক কথাই মনে আসে, তাহার মধ্যে সংক্ষেপে দুই একটি কথা লিখিতেছি।

গয়ায় সেই পশ্চিমের রাণী মোহর দিয়া তাঁহার পাণ্ডার পা ঢাকিয়া দিয়াছিলেন, সে পাণ্ডার প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাসে, না পাণ্ডার জুলুমে? আর মন্দিরের দেবতারই বা সেই মোহরের স্তূপে কতটা অংশ ছিল? আমি একখানা পুস্তকে পড়িয়াছি, বাঙ্গালার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী যখন গয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়াছিলেন, (গয়ায় সকলেই পিণ্ড দিতে যায়, মন্দিরের দেবতার পূজা দিতে কেহ যায় না), তখন গয়ালী পাণ্ডারা তাঁহার নিকট এক লক্ষ টাকা চাহিয়াছিল। এই টাকা না দিলে তাহারা তাঁহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবে না বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। অবশেষে রাণী কোন নিকটবর্ত্তী রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সেই রাজা সৈন্য পাঠাইলে তবে গয়ালীরা মন্দিরের দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে পিণ্ড দিতে দিয়াছিল। অবশ্য পরে তিনি পাণ্ডাদিগকে যথোচিত দান করিয়াছিলেন। গয়ালী পাণ্ডাদের "সুফল দেওয়া" লইয়া অত্যাচার করিয়া নিরীহ যাত্রীদের নিকট হইতে টাকা আদায় করা চিরপ্রসিদ্ধ। ইহাতে "মন্দিরের দেবতা" "মানুষ দেবতার" মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাওয়ার কোন প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।

মানুষের মধ্যে ক্ষুধিত তৃষিত দেবতার তৃপ্তিসাধন করা খুব মহৎ কায, সন্দেহ নাই। যিনি তাহা করেন, তাঁহার অন্তঃকরণের দয়াবৃত্তির অনুশীলন ও চরিতার্থতা হয়। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন পৃথক্ জিনিষ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শম্ভু মল্লিককে বলিয়াছিলেন, "তুমি কতগুলি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া কয় জন লোকের রোগযন্ত্রণা দূর করিতে পার? তার চেয়ে ভগবান্‌কে ডাক,

তিনিই সকলের মালিক, তিনি সব করিতে পারেন, তাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া হইবে। এক জন ভক্ত যদি তাঁহার আহৃত তণ্ডুলকণা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া দিয়া প্রার্থনা করেন, 'প্রভু! তুমি বিশ্বাত্মা, তোমার তৃপ্তিতে বিশ্বের তৃপ্তি হয়, তুমি আমার এই ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণা গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা বিশ্বলোকের তৃপ্তি হউক'—তাঁহার এই প্রার্থনায় অবশ্যই একটা ফল আছে।"

আবার কোন অর্থশালী ভক্ত এই ভাব হইতেই তাঁহার বিপুল সম্পত্তি—কেহ বা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ভগবানের সেবায় সমর্পণ করিয়া তাহা দ্বারা ছত্র, মঠ, দেবালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মধ্যে "ভাববিলাসিতার" সঙ্গে মানবসেবাও আছে। এই কাশীতে অনেক রাজা-জমীদারের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও ছত্র আছে, তাহাতে প্রত্যহ যে ভোগের বরাদ্দ আছে, সেই ভোগের প্রসাদ দ্বারা শত শত দুঃস্থ ব্রাহ্মণ, বিদ্যার্থী, কাঙ্গাল, ভিক্ষুক প্রতিপালিত হইতেছে। এই সকল "মন্দিরের দেবতা" সেই সকল "নরদেবতার" কি প্রতিদ্বন্দ্বী? পুরীধামে ৺জগন্নাথ মহাপ্রভুকে প্রত্যহ যে ভোগ দেওয়া হয়, তাহাও সেই মন্দিরের দেবতা নিজে খান না অথবা বৈকুণ্ঠে চালান করেন না; সেই ভোগের প্রসাদ দিয়া শত সহস্র নরদেবতার সেবা হইয়া থাকে। এইরূপ দান কি "ভাববিলাসিতা" বলিব, না ইহাও "বুদ্ধিতে, বীর্য্যে ও ত্যাগে মহৎ?"

আবার এরূপ অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা সমস্ত ভোগ্যবস্তু "ব্রহ্মার্পণ" মন্ত্রে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া দিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করেন, অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করেন না। অনেক পরিবারে প্রত্যহ আহার্য্য অন্নব্যঞ্জনাদি আগে গৃহদেবতাকে নিবেদন করিয়া দিয়া পরে বাড়ীর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। দুর্গোৎসবাদি পূজাতেও অনেক বাড়ীতে অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা প্রথমে দেবতার ভোগ দেওয়া হয়, পরে সেই ভোগের প্রসাদ দিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে ও দরিদ্রনারায়ণদিগকে খাওয়ান হয়। এই সব স্থানে গৃহদেবতা বা মন্দিরের দেবতার সঙ্গে মানব-দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে কি?

আমাদের দেশের লোক দুঃখে-দৈন্যে ভারাক্রান্ত; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সকল মহাত্মা এই প্রকার দেবসেবার উপলক্ষ করিয়া সেই দুঃখ-দৈন্যের কতকটা লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নিন্দার পাত্র নহেন, বরং ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এমন অনেক রাজা জমীদার আছেন, যাঁহারা গরীব প্রজার রক্তশোষণ করিয়া লইয়া স্বদেশে বা বিদেশে বসিয়া নিজ নিজ বিলাস-ব্যসন অথবা কোন খেয়াল চরিতার্থ করিতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, তাঁহারা কি যথার্থ নিন্দার পাত্র নহেন?

যে মহিলা রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোলা, কাপড় পরানো, যথাসময়ে তাঁহাকে আদর করিয়া খাওয়ানো ইত্যাদি প্রকারে সেবা করেন। তাঁহার এই ভক্তিপ্রণোদিত আরাধনা ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেরই উৎসাহ দেওয়ার উপযুক্ত। বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলে এরূপ ভগবৎনিষ্ঠা জন্মে। রবীন্দ্রনাথের নিকট এই প্রকার সেবায় কোন সার্থকতা নাই সত্য; কারণ, তিনি বিশ্বাত্মার তৃপ্তিসাধনের দ্বারা চরিতার্থতা লাভ করেন। কিন্তু এই প্রকার সেবা দ্বারা সেবক বা সেবিকার হৃদয়ে যে ভগবৎপ্রীতির অনুশীলন হয়, তাহার কি কোন মূল্য নাই?

ভগবানের ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই সত্য, কিন্তু ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভক্তের হৃদয়ের ভাবই গ্রহণ করেন। আমাদের স্তুতিনিন্দা তাঁহার নিকট সমান, তবুও আমরা শ্লোক বা সঙ্গীত রচনা করিয়া, বক্তৃতাদি করিয়া ও গান গাইয়া তাঁহার স্তব করি কেন? এই প্রকারে হৃদয়ের ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন দ্বারাই ত মানুষ তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করে এবং ক্রমে তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হয়। মীরাবাঈ প্রভৃতি কত কত সাধক-সাধিকা এইভাবেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সেবাকে "অসম্পূর্ণ জীবনের আত্মবিড়ম্বনা" বলা যায় না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

প্রভাতী

চম�ৎকারিণী—চিত্তহারিণী
ছন্দচকিত চরণ-গতি,
মরতের কূলে এসেছ কি ভুলে
স্বর্গ-শোভনা নবজ্যোতি!

কস্তুরীবাস অলকগুচ্ছে
গোলাপী অধরে গোধূলি মূর্চ্ছে
নম্র-নয়নে জাগে ক্ষণে ক্ষণে
বুকের বারতা সলাজ অতি।

আশমানী-ডোরা সোনালী নিচোল
প্রকাশ করিছে দেহের রূপ,
দুধালি কপোলে বলো কে বুলালে
রাগের তুলিকা ও অপরূপ!

দেহ-বন্ধনে এসো না ঊষসি,
দু'হাত মেলিয়া কত রব বসি,
করিতে বরণ করিলাম পণ,
মানিব আমার সকল ক্ষতি।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

৩০

স্তব্ধ, অভিভূত ভ্রাতার পায় একটা মৃদু ঠেলা দিয়া নন্দা বড় স্নিগ্ধ, বড় করুণ স্বরে ডাকিল, "দাদা, আমি কি তোমায় দুঃখ দিলাম, কথা বলছ না কেন ? আমার অপরাধ মাপ ক'রে কথা বল।"

"কি কথা বলবো, নন্দা। তুই যে আমায় অবাক্ ক'রে দিলি। এ সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করলেও আমার ভাল লাগে না।"

তুচ্ছ উপহাস বলিয়া নন্দা এখনই তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবে, এমনই আশাপূর্ণ নেত্রে বংশী নন্দার দিকে তাকাইল। নন্দা সে দৃষ্টি সহিতে পারিল না। উন্নীত দৃষ্টি ভূমিতলে নামাইয়া বলিল, "আমি তোমায় যখন তখন যা-তা বলি না কেন, দাদা, তাই ব'লে রাত দুপুরে নিজের বিয়ের কথা নিয়ে এমন ঠাট্টা করতে পারি না। আমি যা বলেছি, তা ধ্রুব সত্য। আর দেরী না ক'রে হিমুর সাথেই—তাঁদের লিখে দাও।"

"লিখে দেওয়া খুব কি সোজা ? এটা ছেলেখেলা নয়। পাকা কথা দিয়েছি, দিনস্থির হয়ে গেছে। তোমার খেয়ালের জন্যে সকলের কাছে মিথ্যাবাদী জুয়াচোর কিছুতেই আমি হ'তে পারবো না। যাদের কাছে মা'র স্নেহ পেয়েছি, ছোট ভাইয়ের ভালবাসা নিয়েছি, প্রাণান্তেও তাদের সাথে আমি এ ব্যবহার করতে পারবো না। যদি সত্যকে অনুপযুক্ত বুঝতাম, কোন একটা কারণ থাকতো, তা হ'লে বিবেচনা করা যেতো, কিন্তু কোন কারণই যে ঘটে নি। কি উপলক্ষ নিয়ে আমি আমার কথার খেলাপ করবো ?"

"আমার মত নেই, এই উপলক্ষ। দাদা ! সংসারের সব ছেলেখেলা নয় বলেই তোমায় এত কষ্ট দিচ্ছি। তোমার মাতৃস্নেহের—ভ্রাতৃস্নেহের কিছু ক্ষতি হবে না। হিমুর শ্বশুর-বাড়ী যেতে তোমার কিসের লজ্জা, দাদা ? আমি তোমার যেমন বোন্, হিমু কি তার চেয়ে কম ? কাকীমার অন্তিম সাধ মনে কর, তাঁর প্রাণের শেষ কামনা কি ভুলে যাচ্ছ ?"

"ভুলি নি, সে কামনার অন্তরায় ত তিনি জেনে গেছেন, তাঁর আশার মূলে তখনই যে কুঠারাঘাত হয়েছিল।"

"না দাদা, তা হয় নি। তুমি ভুল করছ, তা হ'লে কাকীমা আমার হাতে হিমুকে তুলে দিতেন না। কাকীমা আমাদের মাতৃতুল্য, তাঁর শেষসময় বুড়ো শিবের নাম নিয়ে হিমুকে ঐ ঘরে প্রতিষ্ঠিত করতে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মানুষের মনের অগোচর কিছুই নাই, কাকীমা আমার মনের খবর জানতে পেরেই শান্তিতে চোখ বুজতে পেরেছিলেন। দাদা, রাগ ক'রে থেকো না, বিচার ক'রে দেখ, আমার দিকে চাও।"

কে নন্দার বিচার করে, কে তাহার দিকে চাহিয়া দেখে ? বিমূঢ় বংশী আকাশের প্রতি চাহিয়া নীরবে রহিল।

আকাশের জ্যোৎস্না নীরবে বসুধাবক্ষে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নক্ষত্র-বধূরা ক্ষুদ্র মানবীর নীরব ত্যাগের নীরব সাক্ষী হইয়া রহিল। ফুলকুল আঁখি মেলিয়া পরস্পরকে নীরবে কি যেন ইঙ্গিত করিল। নিশার নির্ম্মল বাতাস রহিয়া রহিয়া ধরিত্রীর কর্ণে নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নন্দা কহিল, "দাদা, কি ক'রে তোমায় আমি সব কথা বলবো, হিমুর মনোভাব এখনও কি তুমি বুঝতে পার নি ? বিশুদার কাছে শুন্‌লে না, বিয়ের নামে হিমু অন্ন-জল পরিত্যাগ করে কেন ? হিমু দুর্ভাগিনী, একবার তার কথা ভেবে দেখ, দাদা।"

"ভেবে দেখলাম, নন্দা ! এক জনের জীবন সফল করতে গিয়ে আর এক জনকে আমি ব্যর্থ করতে দিতে পারবো না। হিমু আমার যত আদরের—যত স্নেহের হোক না কেন—তাই ব'লে নন্দার কাছে নয়। কি করলে ভাল হবে, আমি বুঝতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরে গেছে। একটা কথা মনে হচ্ছে, কাকীমা মৃত্যুকালে সতুর কৌলীন্যের উল্লেখ করেছিলেন, সতুর হাতে হিমুকে না দিয়ে তোর হাতেই দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়—"

বংশীর বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুনন্দা সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না দাদা, ও সব কথা বলো না। কাকীমা নিরুপায় হয়ে যা-ই করুন না কেন, তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। যে সংকল্পে তিনি হিমুকে আমায় দিয়ে গেছেন, আমি তাঁর সেই সাধ পূর্ণ করতে চাই। জগতে হিমুর আপনার বলতে কেউ নেই, আমার ত সবি আছে, দাদা। আমার সুজলা, টুনটুন আছে, বৌদি আছে, সবার ওপরে তুমি রয়েছ, এত থাকতে কেউ ব্যর্থ হয় না।"

বংশী মৌন হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিল, "স্ত্রী-জাতির জীবনের সার্থকতা বিবাহে, উপযুক্ত পাত্রে না পড়লে তাদের সার্থকতা নাই, নন্দা, সত্যর মত রত্ন আর মিলবে? কি দিয়ে আমি তোর জীবন সফল করবো রে?"

"সুজলা-টুনটুনকে ভালবেসে—তোমার স্নেহ পেয়ে—ঠাকুরের পূজোতেই আমার জন্ম ধন্য হবে, দাদা। আর কিছু করতে হবে না। তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে, আমি চির-কুমারী-ব্রত নেব। যদি কোন দিন সমাজের শাসনে বিব্রত হও, সে দিন আমার শিবের সঙ্গে মালা-বদল ক'রে দিও। মানুষের সঙ্গে নয়।"

সুস্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় সুনন্দার অন্তস্তল আজ বংশীর নেত্রপথে উদ্ঘাটিত হইল। এ কি সেই দিনকার সেই সুনন্দা! সে আজ ধূপের ন্যায় নিজে দগ্ধ হইয়া হৃদয়ের সৌরভরাশি অপরকে বিলাইয়া দিতেছে। শীতল চন্দনের ন্যায় নিজে ক্ষয় হইয়া অন্যকে স্নিগ্ধ করিতেছে। এ উচ্ছ্বসিত বন্যার মুখে একটি বাঁধও যে টিকিবে না, তর্কের একটি বাক্যও ফুটিবে না। রাণী আপনার স্বর্ণাসনে ভিখারীকে বসাইয়া পথের ধূলায় ভিখারীর আসন পাতিতেছে। ইহাই যে উহার বিধিলিপি, কিন্তু এই বিধিলিপিই কি বংশী প্রত্যক্ষ করিবে? পিতৃমাতৃহীনা সে দিনকার সেই এতটুকু মেয়েটিকে বংশী কোন্ প্রাণে কামনা-বাসনা-বর্জ্জিত সন্ন্যাসিনী-রূপে নিরীক্ষণ করিবে?

এ দুর্দ্দিনে মা নাই, মা থাকিলে বোধ হয় নন্দার সুখ-নদীর গতি এমন বাঁকা পথে বহিতে পারিত না। নন্দার নিভৃত হৃদয়ের বিবরণ জানিয়া স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে বংশীর চোখে জল আসিল। বংশী নন্দার মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "তোকে সুখী করতে না পারলেও তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু করবো না, নন্দা। সে বিশ্বাসটুকু তুই আমার ওপর রাখতে পারিস।"

৩৮

পরদিন বংশী অন্নপূর্ণাকে লিখিল, "মা, তোমার অধম সন্তানদের শতকোটি অপরাধ মার্জ্জনা করিও। তুমি আমাদের যে স্নেহ করিয়াছিলে, আমরা তাহার উপযুক্ত নই, যে বিশ্বাস করিয়াছিলে, তাহারও যোগ্য নই। দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বিশুদার সহিত তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, সে পত্রের মতপরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে। নন্দার পরিবর্ত্তে সত্যর হস্তে আমরা হিমুকে দিতে চাই। আমাদের স্নেহের ধন হিমু সত্যর অনুপযুক্ত হইবে না। নন্দার এখন বিবাহে অভিরুচি নাই জানিয়াই আমাকে এত বড় ধৃষ্টতার কায করিতে হইল।"

চিঠি ডাকে দিয়া বংশীর আশঙ্কা হইতে লাগিল, কখন্ বা অন্নপূর্ণা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। যে সুখের সৌধ তিনি দিনে দিনে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, দূর হইতে বংশী তাহা বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল; কিন্তু দূর বলিয়াই পারিল, সম্মুখে মুখোমুখি হইলে ইহা তাহার অসাধ্য হইত।

বংশী ভয়ে ভয়ে থাকিলেও অন্নপূর্ণা আসিলেন না। কয়েক দিন পর লেফাফায় আবদ্ধ হইয়া নন্দার নামে এক-খানা ভারী চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল। চিঠিখানি যে সত্যর, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নন্দা স্পন্দিত-বক্ষে নিভৃতে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। সত্য লিখিয়াছে—

"সুচরিতাসু

তোমাকে কি লিখিব, কি বলিয়া সম্বোধন করিব, জানি না। তোমার আমার মধ্যে ভগবান্ যে সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—বালিকার পুতুলখেলার ন্যায় তুমি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে! এ কি খেলা না খেয়াল? মানুষের হৃদয় লইয়া এ খেলা কি ভাল? যাহাতে তোমার আনন্দ, তাহা যে অপরের পক্ষে জীবনসংশয় ব্যাপার, ইহাও কি ভাবিয়া দেখিলে না? আমি বংশীদাকে চিনি, তিনি নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই তোমার আদেশে ভাঙ্গন-ব্যাপারে হাত দিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভাঙ্গিবার কি কোন প্রয়োজন ছিল? রেখাঙ্কিত পাষাণ-ফলক ভাঙ্গিলেই কি রেখা মুছিয়া যায়? না, যায় না, তবে এ সব কেন?

"হয় ত আমার ভিতর অনেক দীনতা আছে, সদর্পে যোগ্যতার আসন অধিকার করিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু অযোগ্যকে কি যোগ্য করিয়া লওয়া যাইত না? যে মহৎ, সে অনায়াসেই ক্ষুদ্রকে মহৎ করিয়া লইতে পারে। জগতের প্রাণস্বরূপ সূর্য্যের প্রভাতেই যে চন্দ্র প্রভান্বিত।

"তুমি জান না, তোমার এতটুকু 'না'-তে আমাদের শান্তির সংসারে কত বড় বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। বংশীদার পত্র পাইয়া মা মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমার মধ্যে অপূর্ণতা

বা ত্রুটি থাকিতে পারে ; কিন্তু, আমার দেবী মায়ের স্নেহ, তাহা কি সংসারে দুর্ল্লভ নয়? সে স্নেহের প্রতিও কি লোভ হয় না? মা'র হৃদয় এখনও কি তোমার জানিতে বাকী আছে?

"তোমাকে জানিতে পারিয়াছি বলিয়া এক দিন আমার অহঙ্কার হইয়াছিল, আজ সে অহঙ্কার আর নাই। না থাকুক, তবু আমার বলিবার আছে। বিধাতার বিধানে আমি যাহার অধিকারী হইয়াছিলাম, সে অধিকার কাড়িয়া লইবার তোমার ক্ষমতা নাই, কাহারও ক্ষমতা নাই। আমার কাঙ্গালপনায় তোমার বিরক্তি বোধ হয় আরও বাড়িয়া যাইবে। আমার পৌরুষের হীনতায় তুমি মনে মনে হাসিবে, কিন্তু ইহাও জানিও, বিশ্বের দেবতা বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারী ছাড়া কিছুই নহেন।

আর কিছু লিখিতে চাই না, হয় ত লেখাও সঙ্গত হইবে না। তুমি ইচ্ছা করিলে এ চিঠিখানি বংশীদাকে দেখাইতে পার। বংশীদার সহিত একবার আমার দেখা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ইতি

সত্যপ্রিয়"

সুনন্দা পত্রখানার প্রতি দুই বিহ্বল নেত্র নিবদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পত্রের প্রতি রেখা—প্রতি শব্দ তাহার হৃদয়ে আগুনের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তে তাহার সংকল্পের তেজ—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ম্লান হইল। সুনন্দার জগতে সত্যর হস্তাক্ষর ছাড়া আর যেন কিছুই রহিল না। সেই অক্ষর, সেই বাক্যবিন্যাস, সেই ছন্দ প্রলয়ের বিষাণ-ধ্বনির ন্যায়—বজ্রের সুতীব্র হুহুঙ্কারের ন্যায় ধরণীর প্রতি রোমে রোমে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় রাজু আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিল,"নন্দা!"

নন্দা সচকিতে মুখ তুলিল।

রাজু জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কি অসুখ করেছে, নন্দা? মুখ অত শুকনো কেন? সারা যায়গা তোকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়ে এখানে আবিষ্কার করলুম। ও কি রে, হাতে তোর কার চিঠি দেখছি যে?"

নন্দা রাজুর দিকে চিঠিখানা আগাইয়া দিয়া নিরুত্তরে রহিল।

রাজু কৌতুকভরে চিঠিখানা লইয়া আদ্যোপান্ত পড়িয়া সবিষাদে কহিল, "এখনও সময় আছে, এখনও ভেবে দেখ, কেবল নিজের জীবনটাই ব্যর্থ করছিস না, সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনকেও যে আঘাত দিচ্ছিস। আশাভঙ্গের এত বড় ব্যথা সত্য বাবু কি সইতে পারবেন? বাইরের লোকের কাছে তোদের বিয়ের মন্তর বাকী থাকলেও আসল বিয়ে যে হয়ে গেছে, এখন ত ফেরার পথ নেই, নন্দা। লক্ষ্মী বোনটি, পাগলামী করিস নে, আগে তুই সত্য বাবুর ঘরে যা, তার পর দুজনে পরামর্শ ক'রে হিমুর যা হয় করিস। চিঠিখানা বংশীদাকে দেখাই গে, দেখি বংশীদা কি বলেন?"

নন্দা রাজুর হাত হইতে একটানে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া বুকের সেমিজের ভিতর লুকাইয়া মাথা হেলাইয়া বলিল, "না রাজু, দাদাকে এখন চিঠি দেখান হবে না, পরে দেখাবো। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দাদা গণ্ডগোল করতে অদ্বিতীয়। তুই যে আমার দিকে আর তাঁর দিকেই দেখছিস, হিমুর কথা ভাবিস নে। সে অনাথার যে আপনার বলতে কেউ নেই। কাকীমা বড় আশা করেই অন্তিমকালে তাকে সুখী করবার ভার আমায় দিয়েছিলেন। আমি আর যা করি না কেন, কিন্তু কিছুতেই তার সুখের অন্তরায় হ'তে পারবো না।"

রাজু রাগিয়া বলিল, "হিমুর সুখ কি সব চেয়ে বেশী, সত্য বাবুর সুখ ব'লে বুঝি কিছু থাকতে নেই? ছিঃ নন্দা, তুই ভারী নিষ্ঠুর!"

নন্দা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি জানি, হিমু তাঁকে সুখী করতে পারবে। হিমুকে পেলে কেউ অসুখী থাকতে পারে না, তিনিও থাকবেন না। আমি কেবলই নিষ্ঠুর নয় রাজু, পাষাণী।"

নন্দার কণ্ঠস্বরে কি ছিল—রাজু তাহা সহিতে পারিল না। তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল। সেদিনকার সন্ধ্যাকাশ অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটিয়া উঠিল।

৩২

অভাবনীয় গোলমালে বংশী কেমন যেন দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে সুনন্দার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থাকায় এ ক্ষেত্রে সুনন্দার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার কিছুই করিবার ক্ষমতা রহিল না।

কখন্ বা অন্নপূর্ণার আহ্বান আসে, বিশু আসিয়া অতর্কিতভাবে পাকড়াও করিয়া লইয়া যায়, এই ভয়েই বংশী দূরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

সুযোগ মিলিয়া গেল। আসাম অঞ্চলের এক নব্য জমীদার এ দিকে মহল-পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন মাতা যোগমায়া, আর দাস-দাসী-পূর্ণ এক বৃহৎ বজরা।

সে দিন প্রভাতে নদীর বাঁকে বজরা বাঁধিয়া জমীদার সুরেশ্বর বাবুর ভৃত্যাদি রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল। বুড়া শিবতলার ঘাটে বজরা এক অভিনব ঘটনা। তীরে একপাল বালক-বালিকা সমবেত হইয়া অনিমেষ-লোচনে বজরা ও বজরার অধিবাসীদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। গ্রাম্য-বধূরা জল লইতে আসিয়া ঘোমটার ফাঁকে তৃষ্ণাতুর দৃষ্টিতে বজরার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া গুরুজনের শাসনের ভয়ে তাড়াতাড়ি কলসীতে জল ভরিতেছিল।

সুরেশ্বর ভৃত্যকে লইয়া বাজার দেখিতে গিয়াছিলেন। যোগমায়া গবাক্ষের সূক্ষ্ম পর্দা তুলিয়া কূলের লোকসংখ্যা নির্ণয় করিতেছিলেন, এমন সময় বংশীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণকুমারটিকে প্রথম-দর্শনেই তাঁহার ভাল লাগিল। বয়সে সন্তান তুল্য ছেলেটিকে কাছে ডাকিয়া দু'টি কথা কহিতে তাঁহার মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইল।

দাসী পাঠাইয়া বজরার নিভৃত কামরায় যোগমায়া বংশীকে ডাকিয়া আনাইলেন।

স্বহস্তে বংশীকে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়া যোগমায়া বংশীর পায়ের কাছে নত হইতেই বংশী সচমকে কয়েক পদ পিছাইয়া গিয়া বলিল, "মা, আমি যে আপনার ছেলে, মাতৃচরণ দর্শনে এসেছি, এমন ক'রে আমার অপরাধ বাড়াবেন না।"

যোগমায়া কায়স্থকন্যা, সংস্কার বশতঃ হউক, ভক্তি-বিশ্বাসে হউক, ছোট বড় অনেক ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রথম সাক্ষাতে মধুর মা ডাকিয়া এতখানি সম্মান দিতে পারে নাই। একে তরুণ তাপসতুল্য ব্রাহ্মণকুমার, তায় মাতৃ-সম্বোধন, যোগমায়া একবারে গলিয়া গেলেন।

বংশীকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার পরিচয় জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বংশীর সকল কথার মধ্যে তাহার মাতৃহীনতার ব্যথা তাঁহার হৃদয়ে বেশী বেদনা দিল। আহা, মা নাই, তাই মা ডাকিয়া সকলকে মা করিয়া লইতে চায়।

বংশীর কথা জানিয়া যোগমায়া আপনার কথা পাড়িলেন। বিধাতা তাঁহাকে একটিমাত্র সন্তানের জননী করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। সুরেশ্বর বড় ভাল ছেলে, মা'র প্রতি যেমন ভক্তি, ধর্ম্মে তেমনই বিশ্বাস, কিন্তু হইলে কি হইবে, আজ দুইটি বৎসর হইল, একটি খোকা রাখিয়া গৃহলক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছে। পত্নী-বিয়োগের পর হইতে সুরেশ্বর যেন কেমন হইয়াছে, কোন কিছুতেই স্পৃহা নাই, আমোদ-আহ্লাদ নাই, সর্ব্বদাই মনমরা হইয়া থাকে। মা কত করিলেন, কত বুঝাইলেন, কিছুতেই ছেলের মন ভাল হইল না। এই তরুণবয়সেই সে সন্ন্যাসী হইয়া রহিল। ছেলের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই মাকে রোগে ধরিয়াছে, সুরেশ্বর কত ডাক্তার দেখাইয়াছে, কবিরাজ দেখাইয়াছে, তার পর জলের হাওয়া ভাল বলিয়া আপনার সঙ্গে আনিয়াছে।

সুরেশ্বরের শ্বশুররা বিশেষ ধনী। তাঁহাদের দরজায় পাঁচ পাঁচটা হাতী, দরজায় দিবারাত্রি ডঙ্কা পড়িতেছে, নিশান উড়িতেছে। মেয়ে বাপ-মায়ের কাছেই মারা যায়, সুরেশ্বরের গুঁড়াটুকু সেখানেই আছে। মা যাইবার পর ঠাকুরদাদা আনিতে গিয়াছিলেন, সে দুধের বাছা কিছুই জানে না, দিদিমার কান্নায় কাঁদিয়া অস্থির। তাই দেখিয়াই কর্ত্তা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারও যে শূন্যঘর, আপনাদের শূন্যঘর শূন্য রাখিয়া আর কত কাল ঘরের মাণিক পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিবেন! সুরেশ্বর বলে, "আজ হোক্ কাল হোক্, খোকা যে তোমাদের কাছেই আসবে, মা! তোমাদের জান্‌লে চিন্‌লে আর সেখানে থাক্‌বে না, যে দু'দিন থাকে থাকুক।" মা কি করিবেন, ছেলের অমতে কিছু করিতে পারেন না, তাই চুপ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বছরখানেক হইল, কর্ত্তাও জমীদারী ছেলেকে বুঝাইয়া দিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। বাপ তীর্থে গেলেন, মা'র গেলে ত চলে না। মা না থাকিলে সুরেশ্বরকে কে দেখিবে, কে শুনিবে? এইরূপ নানা আলোচনার মধ্যে বংশীর কামাখ্যাদর্শন হয় নাই জানিয়া যোগমায়া ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কামাখ্যা যে তাঁহাদেরই দ্বারপ্রান্তে, সেইখানেই তাঁহাদের জমীদারী—ঘরবাড়ী।

দীর্ঘ জলপথে বংশীকে সঙ্গী পাইলে যোগমায়া দুইটা কথা বলিয়া বাঁচিবেন, সুরেশ্বরও খুসী হইবে। সর্ব্বোপরি একটি ব্রাহ্মণকে এক মহাতীর্থ দর্শন করাইয়া তিনি মহা পুণ্যের অধিকারিণী হইবেন।

এত বড় পুণ্যলাভের প্রলোভন কি সহজে পরিত্যাগ করা যায়? তাহাকে সঙ্গে লইবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বংশী সম্মত না হইয়া পারিল না। সে দূরে যাইতেই চাহিতেছিল, দূরই তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহাকে দূরের বাঁশী শুনাইতে লাগিল।

যোগমায়া বংশীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, দরকার হইলে তিনি দুই এক দিন ঘাটে বজরা বাঁধিয়া থাকিবেন, কিন্তু বংশীর যাওয়া চাই, তাহাকে না লইয়া তিনি কিছুতেই যাইবেন না।

যোগমায়ার নিকটে স্বীকৃত হইয়া বংশী গৃহে ফিরিয়া মুস্কিলে পড়িল। এই বিবাহ ভাঙ্গা ব্যাপারে তরঙ্গিণী স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সে ভিতরের কোন সংবাদই রাখিত না, নন্দার এখন বিবাহে অভিরুচি নাই, তাই বংশী পত্র লিখিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, ইহাই সে বিশ্বাস করিয়াছিল। ভাইটি আধপাগ্লা, বোনটিও ততোধিক। এত বড় মেয়ের এখন বিবাহের ইচ্ছা নাই বলিয়া এমন বিবাহের সম্বন্ধ কেহ না কি হাত-ছাড়া করে?

তরঙ্গিণী কোন দিনই ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বামীর সহিত আলাপ আলোচনা করিত না। ক্রোধের বশীভূত হইয়া সে দিন সে নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। ননদিনীর বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়া বংশীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কার কথায় তুমি বিয়ে ভেঙ্গে দিলে, ও থুবড়ো মেয়ের কখনো বিয়ে হবে না।"

বংশী ম্লান-মুখে জবাব দিয়াছিল, "কি জন্যে ভেঙ্গে দিলাম, তা কি তুমি বুঝবে? কোন দিন ত বুঝতে চেষ্টা করো না। নন্দা কুলীনের মেয়ে, যদি বিয়ে না হয়, না-ই হবে।"

তরঙ্গিণী সরোষে বলিয়াছিল, "কুলীনের দোহাই দিয়ে চালকুম্ড়ো ঘরে রাখা। বুড়ো মেয়ের ঢঙ্গে ভুলে গেলে, নিজের মেয়ের কথাটা কি ভেবে দেখেছ? ঘাটের মড়া পিসী যদি ঘর আগলে ব'সে থাকেন, তা হ'লে ভাইঝিকে নেবে কে? যেমন তোমার পাগুলে বুদ্ধি, তেমনি বোনটির ছাগুলে বুদ্ধি! আমাকে জব্দ করবার ফিকির-ফন্দী আমি বেশ বুঝেছি।"

"তুমি বড় হীন, তোমার সাথে কোন কথাই চলে না।" বলিয়া বংশী উঠিয়া গিয়াছিল।

তাহার পর এ কয়েক দিন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে আর কোন বাক্যালাপ হয় নাই। আজ দূরে যাইবার সময় আসিয়াছে, তাহার পরিণীতা পত্নীকে—সন্তানের জননীকে বংশী না বলিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু বলিতে গেলে ঢিলের পরিবর্ত্তে পাটকেল খাইবার ভয় হইতেছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

ভুলে যদি কারে আমি ভালবেসে থাকি

ভুলে যদি কারে আমি ভালবেসে থাকি,
মোরে ভালবাসিও না তবু;
বুক-ভরা ব্যথা দেখে যদি কেঁদে থাকি,
মোর তরে কাঁদিও না কভু।

প্রেমের বাঁধন ছিঁড়ে যদি আমি মরি,
মোর তরে কাঁদিও না কেহ;
কুসুম চন্দন আদি সমারোহ করি'
বৃথা মোর সাজায়ো না গেহ।

স্মৃতির শ্মশান খুঁজে পাবে নাক মোর,
অতীতের হাসি এতটুক্;
ভুলে যাও ভালবাসা—মোছ আঁখিলোর
মমতার এই মহা সুখ।

ললাটের লিপি মোর বিধাতার দান—
বাসিয়াছে ভাল যত দূর;
তার চেয়ে আরো ভাল অন্তঃ অভিমান
ভালবাসে মরমের সুর।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সমাজ-চিন্তা

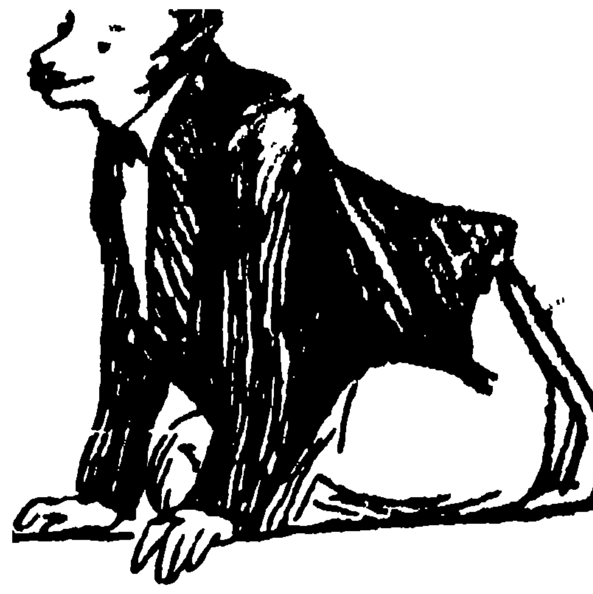

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম মানেন এবং হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যের সংস্কার বশতঃ ইহজন্মে দেহধারণ করিতে হয়। শ্রুতি বলেন,—

"যথাকামী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি,
পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি,
পাপঃ পাপেন"—ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৫

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করে, যে যেরূপ আচরণ করে, সে সেইরূপ হয়। যিনি সাধুকর্ম্ম করেন, তিনি পরজন্মে সাধু হন, যিনি পাপকর্ম্ম করেন, তিনি পাপী হন, পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা লোকে পুণ্যবান্ হন, পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপযোনি প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, —"গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বোপসর্জ্জন-রজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য সৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি, তম-উপসর্জ্জনস্য রজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি, রজ-উপসর্জ্জনস্য তমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্মেত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হেতু ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ও তাহাদের কর্ম্মবিভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণের শমদম-তপস্যাদি কর্ম্ম, সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য-বীর্য্যাদিযুক্ত যুদ্ধাদি কর্ম্ম, তমোগুণমিশ্রিত রজোগুণপ্রধান বৈশ্যের কৃষিকার্য্যাদি কর্ম্ম, এবং রজোগুণ-মিশ্রিত তমোগুণ-প্রধান শূদ্রের অন্যের সেবা করা এই কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গীতার অন্যত্র ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥" ১৮।১১

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্বভাবজ গুণের দ্বারা তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥" ১৮।১২

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য অর্থাৎ ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস এই সকল হইতেছে ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম।

"শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥"—১৮।১৩

শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান, ঈশ্বরভাব অর্থাৎ প্রভুত্ব—এই সকল হইতেছে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

"কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"—১৮।১৪

কৃষিকার্য্য, গোপালন, বাণিজ্য এই সকল হইতেছে বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম, এবং অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করা হইতেছে শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

মানুষ সকলই সমান, কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-ভাব সকল জীবাত্মার মধ্যে সংস্কাররূপে ফুটিয়া উঠে; সেই সংস্কারের জন্য জীবাত্মা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মগ্রহণের পর সেই সকল গুণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মানুষের স্বভাব গঠন করে ও সেই স্বভাব হইতেই তাহাদের কর্ম্মের বিভিন্নতা নিরূপিত হয়, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। তবে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইয়াও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাই তাঁহার কর্ম্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও আজীবন তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

এই সকল Hereditary গুণ জন্মগ্রহণের পরে শিক্ষা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, আবার শিক্ষার অভাবে অথবা কুশিক্ষার দ্বারা তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্রেই আছে,

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না।

"তপঃ শ্রুতং জনিশ্চৈব ত্রয়ং ব্রাহ্মণকারণম্।

তপঃ-শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ॥"

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব)

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, তপস্যা ও বেদজ্ঞান এই তিনটি হইতেছে ব্রাহ্মণত্বের কারণ, যাঁহার তপস্যা নাই, বেদজ্ঞান নাই, তিনি "জাতিব্রাহ্মণ।"

আবার অত্রি-সংহিতায় "শূদ্র-ব্রাহ্মণ," "চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ," "পশু-ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি নানা জাতীয় পতিত ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণের যেরূপ অধোগতি হয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি অন্য শ্রেষ্ঠ জাতিরও সেইরূপ অধোগতি হয়। আবার শূদ্রাদি নীচ জাতির লোকও আপন কর্ম্মের উৎকর্ষবলে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে। মহাভারতে এইরূপ এক ব্যাধের উপাখ্যান আছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার উপযোগিতা বোধ করিয়া, সেই ব্যাধের কথা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিতেছি।

কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এক দিন এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় একটি বক বৃক্ষ হইতে তাঁহার গাত্রে পুরীষ ত্যাগ করিল। তিনি ক্রোধে অভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে খুব অনুতাপ হইল, আবার নিজের তপোবল দেখিয়া একটু গর্ব্বও হইল। আর এক দিন তিনি ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থপত্নী বলিলেন—"আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা লইয়া আসিতেছি।" ইতিমধ্যে তাঁহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থপত্নী স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের কথা ভুলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বাহিরে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেই কোপন-স্বভাব ব্রাহ্মণ বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, তুমি ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া মান না, তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে সাহস কর? স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া থাকেন।"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সেই গৃহস্থপত্নী বলিলেন,—"হে তপোধন! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমি ইচ্ছা করিয়া আপনার অবমাননা করি নাই। আমি পতিকে পরম দেবতা বলিয়া মনে করি। তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সেবাই আমার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আপনি ক্রোধদৃষ্টি দ্বারা আমার কি করিবেন? আমি বলাকা নহি, পতিব্রতা নারী। আমি ব্রাহ্মণের প্রভাব অবগত আছি। তাঁহাদের যেমন ক্রোধ আছে, তেমন দয়াও অসীম। ক্রোধ মনুষ্যের পরম শত্রু। ব্রাহ্মণগণ ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন,—বেদাধ্যয়ন, দান, আর্জ্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য এই কয়টি ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম্ম। আপনি স্বাধ্যায়নিরত, শুচি ও ধর্ম্মজ্ঞ, কিন্তু আমার বোধ হয়, আপনি যথার্থ ধর্ম্ম জানেন না। যদি যথার্থ ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে মিথিলা নগরে যে ধর্ম্ম-ব্যাধ আছেন, আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন।"

পতিব্রতার এই সকল কথা শুনিয়া কৌশিকের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন করিলেন। তিনি মিথিলা নগরীতে যাইয়া দেখিলেন, ব্যাধ তাহার দোকানে বসিয়া মাংস বিক্রয় করিতেছে। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সে বলিল—"আমি পূর্ব্বেই আপনার আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি, আপনি আমার গৃহে চলুন।" এই বলিয়া ব্যাধ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্ভ্রম সহকারে আপন আলয়ে লইয়া আসিল এবং তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া যত্নপূর্ব্বক বসাইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এই মাংস-বিক্রয় কর্ম্ম তোমার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির অযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে।" ব্যাধ তাঁহাকে যে সকল কথা কহিল, তাহার সার মর্ম্ম এই—

"হে দ্বিজবর! আমি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত কুলোচিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমি পশু বধ করি না, অন্যের দ্বারা হত পশুর মাংস বিক্রয় করি। আমি নিজে মাংস ভোজন করি না। শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে স্ত্রী-সহবাস ও সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রিতে ভোজন করি। আমি বিধি-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বৃদ্ধ পিতামাতা ও গুরুজনদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করি, সত্যবাক্য ব্যবহার করি, কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না, যথাসাধ্য দান করি, দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করি, কাহারও কখন কিঞ্চিন্মাত্র কুৎসা বা নিন্দা করি না। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান করে, সে কদাচার হইলেও ক্রমে ক্রমে সদাচার হইয়া উঠে।

"হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করে। তদনুসারে কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি, ত্রয়ী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের হইয়া থাকে। আমি স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করি না, প্রত্যুত আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া উহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। হে ব্রাহ্মণ! স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্ম হয়। যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মনিরত, তাহাকে ধার্ম্মিক বলা হয়। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, বিধাতা কর্ম্ম-নির্ণয়ে এইরূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মবীজ-সম্ভার সঞ্চয় করত পুনঃ পুনঃ সঞ্জাত হয়। পুণ্যকর্ম্মকারী পুণ্য যোনি ও পাপকর্ম্মকারী পাপ যোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।……আমি পূর্ব্বজন্মে বেদবেদাঙ্গপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলাম, আপন দোষেই এই ব্যাধজন্ম লাভ করিয়াছি। আমার এক রাজার সহিত বন্ধুতা হওয়ায় আমি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম, এবং দৈবাৎ

মৃগ ভ্রমে এক মুনিকে বাণ মারিয়াছিলাম। তাঁহার শাপে আমি ব্যাধজন্ম লাভ করিয়াছি, কিন্তু মুনির কৃপায় আমি জাতিস্মর হইয়াছি এবং স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও পিতৃমাতৃসেবা দ্বারা শাপমুক্ত হইয়া পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিব, এরূপ তিনি আশ্বাস দিয়াছেন।"

ব্যাধের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সম্প্রতি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বোধ হইতেছে। পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দান ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ মনে করি।"

ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান হইতে আমরা সেই পূর্ব্বকথিত শাস্ত্রসিদ্ধান্তই পাইতেছি। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলেই মানুষ হীনজন্ম প্রাপ্ত হয়, আবার এই জন্মের সুকৃতিবলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরজন্মে শুভযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সে জন্য কাহারও অধীর বা অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্মব্যাধের মত তাহাকে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরজন্মের জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। আর ভোগের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়, কর্ম্মকে ফাঁকি দেওয়ার কোন সোজা পথ নাই। এই জন্যই গীতা বলিয়াছেন,—

"সহজমপি কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ"—নিজের প্রকৃতি বা স্বভাবজাত যে কর্ম্ম, তাহা দোষযুক্ত অর্থাৎ হীন হইলেও কদাচ ত্যাগ করিবে না।

দ্বিতীয় কথা;—এক জন হীনকুলোদ্ভব ব্যক্তি যদি জ্ঞানী ও সাধু হয়, তবে সে ব্রাহ্মণেরও সম্মানার্হ, আবার এক জন ব্রাহ্মণ যদি দুষ্কৃতিপরায়ণ হন, তবে তিনি শূদ্রতুল্য হন।

তৃতীয় কথা এই—বিদ্যাবল, তপোবল, ইহার কোনটাই কর্ত্তব্য কর্ম্মের (duty) সমতুল্য নহে। পতিব্রতার স্বামিসেবারূপ কর্ত্তব্যের নিকট ব্রাহ্মণের তপোবল খাটে নাই, আবার ব্যাধও আপন কর্ত্তব্যপালনের জন্য সেই ব্রাহ্মণের পূজার্হ হইয়াছিল। সুতরাং নীচজাতীয় লোকও যতক্ষণ আপন কর্ত্তব্যপথে দৃঢ় থাকে, ততক্ষণ তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই।

জাতিবিচার সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারিলাম। এখন আমাদের বর্ত্তমান সমাজে জাতিভেদ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখা যাক।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ছিল, কালক্রমে সেই চারি বর্ণ অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের যে সকল কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবসায় ছিল, এখন তাহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ অন্য জাতির ন্যায় বিষয়কর্ম্ম করেন, অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়দের—বিশেষতঃ বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধবৃত্তি আর নাই। এখন অধিকাংশ জাতিরই বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি, আর কতকাংশ লোক পরসেবা ও চাকুরী বা দাসত্ব করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। এতদ্ভিন্ন বিষয়সম্পত্তির আয় হইতেও কতক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। আর বারুই, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, জেলে প্রভৃতি জাতি নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসা চালাইয়া থাকে। ইহার মধ্যেও এখন অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কোন কোন লোক আপন জাতিগত ব্যবসা দ্বারা অন্ন জোটাইতে না পারিয়া কৃষিকার্য্য বা অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা লেখাপড়া জানে, তাহারা প্রায়ই চাকুরী করিতে চেষ্টা করে।

এই সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই অবশ্য সকলের শীর্ষস্থানীয়। যদিও সকল ব্রাহ্মণের সেই পূর্ব্বের ন্যায় সাত্ত্বিকতা ও ধর্ম্মভাব নাই, তথাচ ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে যে সকল ব্রাহ্মণসন্তান কর্ম্মের দ্বারা হীন হইয়াছেন, তাঁহাদের আর সে সম্মান নাই। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক, তাঁহাদের সম্মানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ব্রাহ্মণের অন্ন সকল জাতিই গ্রহণ করে। অন্যান্য জাতি-সকলের মধ্যে প্রায়ই পরস্পর অন্নচল নাই। এমন কি, কায়স্থ-বৈদ্যাদি শ্রেষ্ঠ জাতির অন্নও নিম্নতর জাতিরা আহার করিতে কুণ্ঠিত। আজকাল নিম্ন শ্রেণীর জাতিদিগের মধ্যেও একটা আত্মাভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে। কোন জাতিই এখন আর 'শূদ্র' বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চায় না। এই জন্য কৈবর্ত্ত জাতি 'মাহিষ্য' নাম ধারণ করিয়াছে, 'সাহা' ও 'শুঁড়ী' জাতি 'বৈশ্য সাহা' বলিয়া পরিচয় দেয়, 'যুগী' হইয়াছে "যোগী" ইত্যাদি। বিগত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার (census) সময় রিজলী (Mrs. Risley) সাহেব কোন্ জাতি বড়, কোন্ জাতি ছোট, এই প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করার পর হইতেই এই প্রকার ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা আর্য্যজাতি এবং শূদ্র অনার্য্য। এই

মত প্রকাশ হওয়ার পর হইতেই কোন জাতি আর শূদ্র হইতে চায় না। কিন্তু আমাদের বেদ বিশ্বাস করিলে, এই মত টিকিতে পারে না। কারণ, ঋগ্‌বেদীয় "পুরুষসূক্ত"-মতে ব্রাহ্মণ যে পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় যাঁহার বাহু, বৈশ্য যাঁহার উরু, শূদ্র তাঁহারই পদরূপে কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ যদি আর্য্য হন, তবে শূদ্রও আর্য্য জাতি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ফলাফল এখনও বাহির হয় নাই) বাঙ্গালাদেশবাসী বিভিন্ন জাতির সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, বঙ্গদেশে মোট হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ৯১ লক্ষ ; তন্মধ্যে—

	শতকরা
(১) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও বৈশ্য— (ব্রাহ্মণ শতকরা ৬ জন, মোট সংখ্যা ১১ লক্ষ)	২৪ লক্ষ—১২·৮
(২) নবশাখ, বারুজীবী, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, মালাকর, মোদক, নাপিত, সদ্‌গোপ, তাম্বূলী, তেলী, তন্তুবায়।	৩১ লক্ষ—১৬·৪
(৩) চাষী কৈবর্ত্ত, (২০ লক্ষ) ও গোয়ালা	২৬ লক্ষ—১৩·৪
	শতকরা
(৪) বৈষ্ণব, যুগী, সরাক, সুবর্ণ-বণিক, সাহা, শুঁড়ী, সূত্রধর।	১৩ লক্ষ—৮·৮
(৫) বাগ্দী, জেলে, কৈবর্ত্ত, মালো, ধোপা, কলু, কাপালী, নমঃশূদ্র, পাটনী, পোদ, রাজবংশী, তেওর— (রাজবংশী ২০ লক্ষ, নমঃশূদ্র ১৮ লক্ষ, বাগ্দী ১১ লক্ষ)।	৭৬ লক্ষ—২৯·৭
(৬) ডোম, চামার, বাউরী, ভূঁইমালী, হাড়ী, মুচি, মাল, কাওরা, কোড়া।	১৭ লক্ষ—৮·৯
	৯০·০

[১৩৩৫ সনের কলিকাতা হিন্দু সমাজ-সম্মেলন-সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে এই সকল সংখ্যা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা ভুল আছে,—শতকরা মোট ৯০·০ হইয়াছে, ১০০ হয় নাই]

এই সকল জাতির মধ্যে (১), (২) ও (৩) চিহ্নিত জাতি সকল জল-আচরণীয়, অর্থাৎ সকলে ইহাদের ছোঁয়া জল খায়, ইহাদের মোট সংখ্যা ৮১ লক্ষ। বাকী (৪), (৫) ও (৬) চিহ্নিত জাতি-সকল অনাচরণীয়, অর্থাৎ (১), (২), (৩) চিহ্নিত জাতিরা ইহাদের জল খায় না। (৬) চিহ্নিত জাতি সকলকে অন্ত্যজও বলা যায়। প্রথম তিন শ্রেণীর জাতি ভিন্ন অন্য জাতি সকল সংপ্রতি depressed class নামে অভিহিত হইতেছে।

যাহা হউক, এই সকল বিভিন্ন জাতি লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহে আদান-প্রদান এবং একত্র পান-ভোজনাদি না চলিলেও ইহারা সকলেই "হিন্দু" নামে পরিচিত। ইহারা সকলেই বিরাট হিন্দু-সমাজের অঙ্গ। এই সকল জাতির মধ্যেই বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণ্যসভ্যতা (Brahmanic culture) অল্পাধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার ফলে, প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের আদর্শে ইহারা অল্পাধিক পরিমাণে নিজ নিজ গার্হস্থ্যধর্ম্ম নিয়মিত করিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উচ্চতর জাতিদিগের ত কথাই নাই, নিম্নতর জাতিদিগের মধ্যেও সকলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও পরকালে বিশ্বাস করে, দেব-দ্বিজে ভক্তি করে, সাধ্যানুসারে অতিথিসেবা করে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করে, যথাসাধ্য বারব্রত-নিয়মাদি পালন করে, তীর্থাদি দর্শন করে। সকল জাতিই গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করে, প্রায় সকলের মধ্যেই দাম্পত্য-প্রেম আছে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক সতীত্বধর্ম্ম পালন করে, প্রায় সকল বিধবাই পুনর্ব্বার বিবাহ করে না। সর্ব্বোপরি, ইহাদের স্বভাব শান্ত, হিংস্র নহে। চুরি, ডাকাতী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পরস্ত্রীহরণ, নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে যত লোক জেল খাটে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ইহাদের মধ্যে নেশা করিয়া অন্যের উপর অত্যাচার ও পয়সা নষ্ট খুব কম লোকেই করিয়া থাকে। অন্যজাতির তুলনায় ইহাদের মধ্যে জীবে দয়া, পরস্পর প্রীতি ও সামাজিকতা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য জাতির তুলনায় ব্রাহ্মণজাতি নিতান্ত মুষ্টিমেয় হইলেও সেই ব্রাহ্মণের প্রভাব নিম্নতম স্তরেও পরিব্যাপ্ত (filtered down) হইয়াছে, ইহা ব্রাহ্মণ্য কালচারের (culture) কম সার্থকতা (achievement) নহে। শাস্ত্রশিক্ষা অবশ্য এক সময়ে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অন্য জাতির বেদে অধিকার

নাই, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কিন্তু মূল বেদে অধিকার না দিলেও ব্রাহ্মণরাই পুরাণ-তন্ত্রাদি রচনা দ্বারা সেই বেদের সিদ্ধান্ত সকল সর্ব্বজনের গ্রহণোপযোগী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। যে সকল লোক সংস্কৃত জানে না, তাহাদের জন্যও বাঙ্গালা ভাষায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কথকতা, যাত্রাগান, রামায়ণগান, পাঁচালী, কীর্ত্তন ইত্যাদি লোক-শিক্ষার প্রচুর সরস ও সর্ব্বজনপ্রিয় উপায় সকল আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহা দ্বারাও সর্ব্বশ্রেণীর ধর্ম্মশিক্ষার পথ সুগম হইয়াছে।

সমাজে এইরূপ জাতিভেদ ও বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে উচ্চনীচভেদ থাকিলেও উচ্চ জাতি-সকল কখনও নীচ জাতিদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে নাই। এক জনের হাতের জল না খাইলেই তাহাকে ঘৃণা করা হয় না, ইহা সকলেই জানে। এক জন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ যেমন নমঃশূদ্রের ছোঁয়া জল খান না, সেইরূপ সময়বিশেষে তাঁহার অনুপবীত নাতির হাতের জলও খান না বা সে জল দিয়া ঠাকুর-পূজাও করেন না। আবার ব্রাহ্মণ যেমন নমঃশূদ্রের জল খান না, সেইরূপ নমঃশূদ্রও মুচির জল খায় না। ফল কথা, এই কারণে যে পরস্পর ঘৃণা প্রকাশ পায়, এত দিন তাহা কেহ জানিত না। বরং যে ব্রাহ্মণ সকল জাতির ছোঁয়া জল বা অন্ন খান, অনাচরণীয় জাতির লোকরাও তাঁহাকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে এবং তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করে। ফল কথা, পল্লীগ্রামে এত দিন উচ্চ নীচ সকল জাতির মধ্যেই বিলক্ষণ প্রীতি ও সদ্ভাব বিদ্যমান ছিল এবং এখনও অনেক স্থানে আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টায় পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ ও কলহ জাগিয়া উঠিতেছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

বিগত ১৩৩৫ সনে কলিকাতায় যে বিরাট হিন্দুসমাজ-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, সমগ্র বঙ্গদেশে ১ কোটি ৯১ লক্ষ হিন্দু বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক শতে ১৩ জন মাত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতি, ১৬ জন নবশাখ ও সচ্ছূদ্র, ১৩ জন করিয়া তদধম জাতি, ১০ জন করিয়া এমন জাতি আছে—যাহাদের জল পর্য্যন্ত আচরণীয় নহে। বাকী ৪৮ জন এমন নীচ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে, তাহাদের জল পর্য্যন্ত স্পৃশ্য নহে।… আমাদের মধ্যে শতকরা ৪৮ জন যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত, তাহারা কিন্তু হিন্দুর গৌরবাবহ সকল প্রকার অধিকার হইতে দূরে বিতাড়িত। তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য আমাদের মধ্যে উচ্চ জাতিগণ প্রস্তুত নহেন। তাহাদের দারিদ্র্যপীড়িত মলিন পল্লীর মধ্যে আমাদের সমাজের নেতা ভূদেবগণ কখনও প্রবেশ করেন না। (ব্রাহ্মণগণ ত মিশনারী নহেন, প্রবেশ করিবেন কেন ?) তাহারা কি খায়, কি করে, রোগে শোকে অন্নাভাবে কু-সংস্কারে কিরূপ লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিতভাবে জীবনভার বহন করে, তাহার খবর লইলে, তাহাদের সুখ-দুঃখের খবর লইবার জন্য অবশ্য মেশামিশি করিলে আমাদের সমাজের জাত্যভিমানে স্ফীত নেতৃবর্গের ধর্ম্ম রসাতলে যায়, জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয় ইত্যাদি। ……উচ্চজাতির পায়ের জুতা সেলাই করিয়া, পায়খানার ময়লা পরিষ্কার করিয়া, গমনাগমনের পথে প্রত্যহ ঝাড়ু দিয়া, উদরান্নের সংস্থানের জন্য শীত, বর্ষা ও আতপে জীবনান্ত করিয়া, ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালাইয়া ইহারা সেবা করিতেছে, শুধু এখনই করিতেছে, তাহা নহে, শত শত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদের ঐহিক অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা এমন কিছু করি নাই, যাহার জন্য ইহারা আমাদের সম্মান করিতে পারে বা করিয়া থাকে ইত্যাদি।"

পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহাশয়ের চরণে শত শত প্রণাম করিয়া আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তিনি এ কালে যে সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইহা সহরের চিত্র হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা অন্যরূপ সাক্ষ্য দিবেন।

প্রথমতঃ, এই যে শতকরা ৪৮ জন অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি লোক, মাত্র ১১ লক্ষ ব্রাহ্মণের শাসন অম্লানচিত্তে এত দিন মানিয়া আসিয়াছে, ইহার কারণ কি ? এই সকল ব্রাহ্মণের অধিকাংশই দরিদ্র, কেহ কেহ ভিক্ষোপজীবী ; ইহাদের কোন লোকবল বা শস্ত্রবল ছিল না। ইহাদের একমাত্র বল ছিল বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল। এই সকল গুণ থাকাতেই ইহারা এক সময়ে সর্ব্বশ্রেণীর উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতেন। ইহারা যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত সকল জাতি মানিয়া চলিতেছে। এই কারণেই বাঙ্গালার শতকরা ৪৮ জন নিম্ন জাতি ইহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেছে। এই সকল নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মভীরু ও আস্তিক ; ইহারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল মানিয়া চলে। সে জন্য যাহারা

নিতান্ত অন্ত্যজ জাতি, তাহারাও সেই ধর্ম্মব্যাধের মত পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলে বিশ্বাস করে, এবং সে জন্য উচ্চ জাতির প্রতি বিদ্রোহ করে না, আর বিদ্রোহের কোন কারণও এত দিন উপস্থিত হয় নাই। যদি বল, সেই যে শাস্ত্র, তাহাও ত ব্রাহ্মণের রচিত; ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণরা আপন আধিপত্য ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য সেই সকল গল্প রচনা করিয়াছে। যাহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের গোড়ার কথাই অস্বীকার করেন, তাঁহাদের কথার কোন উত্তর নাই।

হিন্দু সমাজের শতকরা ৮০ জন লোক পল্লীগ্রামে বাস করে। যাহাদের পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন, ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি উচ্চজাতীয় সমাজের নেতারা নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের সহিত যথেষ্ট মেলামেশা করেন। এমন কি, ব্রাহ্মণসন্তানগণ প্রতিবেশী নমঃশূদ্রকেও দাদা, কাকা বলিয়া আদর-আপ্যায়ন করিতে লজ্জা বোধ করে না। এইরূপ গ্রাম্য সম্পর্ক সকল জাতির মধ্যেই আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিতে পড়িয়াছি, তিনি বাল্যকালে একটি কামারজাতীয়া বিধবাকে পিসী বলিয়া ডাকিতেন। তাহার আবার নিজেরও এক নাপিত পিসী ছিল। মেহারের সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দের জীবনচরিতে পড়িয়াছি, তাঁহার এক জন নমঃশূদ্র চাকর ছিল, তাহাকে "পুণা দাদা" বলিয়া ডাকিতেন। এই পুণা দাদাই স্বহস্তে নিজ মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাঁহার শবাসন প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাঁহার সিদ্ধিলাভের সহায় হইয়াছিলেন। অতি গভীর আনুগত্য ও আত্মীয়তা না থাকিলে কেহ এরূপ করিতে পারে না। এগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম, কিন্তু এখনও প্রতি পল্লীতে উচ্চ জাতির সহিত নিম্নতর জাতি-সকলের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে, অন্নকষ্টে সকল শ্রেণীর লোকই পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর ধনীরা দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রামের সকল শ্রেণীর লোককেই ধান কিম্বা টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করেন। যাহার অর্থ-সামর্থ্য আছে, তিনি সকল শ্রেণীর লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পুষ্করিণী কিম্বা ইঁদারা খনন করাইয়া দেন। প্রায় প্রতি গ্রামেই কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাড়ীতে পাঠশালা আছে, তাহাতে গ্রামের বালকরা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে পাশাপাশি বসিয়া বিদ্যা শিক্ষা করে।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি উচ্চ জাতির বাড়ীতে পূজা-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদিতে সকল জাতির লোককেই শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া একই রকম আহার্য্য দিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হয়। খাওয়া শেষ হইলে যে গৃহস্থের চাকরের অভাব, তাহাকে নিজ হস্তে নিম্নজাতির উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছি। সত্যনারায়ণপূজা ও হরির লুট সর্ব্বজাতির একটা মিলনকেন্দ্র। সকল জাতি বসিয়া সত্যনারায়ণের পাঁচালী শোনে এবং ভক্তি পূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করে। যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি গানে সকল শ্রেণীর লোকই এক আসরে বসিয়া আমোদ উপভোগ করে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শিক্ষাও লাভ করে। ইহা বোধ হয় অনেকে জানেন, এই সকল আসরে 'সাদা হুঁকায়' তামাক দেওয়া হয়। কারণ, যে সকল জাতির জল চলে না, তাহারাও একসঙ্গে বসিয়া থাকে। যখন কোন গ্রামে বারোয়ারী-পূজা হয়, তখন সকল শ্রেণীর হিন্দু (এমন কি, মুসলমান পর্য্যন্ত) সেই বারোয়ারীর চাঁদা দিয়া থাকে; তাহারা পূজা দেখে, প্রসাদ পায় ও গানবাদ্যাদির আমোদ উপভোগ করে।

কেহ কেহ বলেন, অনাচরণীয় জাতিরা বারোয়ারী-পূজার চাঁদা দেয় অথচ তাহাদিগকে পূজার মণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, ইহা ঘোরতর অন্যায়। সংপ্রতি পূজাগৃহে প্রবেশ লইয়া এই শ্রেণীর লোকের উত্তেজনায় স্থানে স্থানে 'সত্যাগ্রহ' হইতেছে। কিন্তু পূজামণ্ডপে প্রবেশ করার সার্থকতা কি, তাহা বুঝা কঠিন। সকল জাতিই বাহিরে দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতে ও দেবতাকে প্রণাম করিতে পারে; যাহারা ফল ও মিষ্টাদি দিয়া ভোগ দিতে চায়, তাহাও পুরোহিতকে দিলে তিনি নিবেদন করিয়া দেন। এই ভাবেই সর্ব্বসাধারণের পূজা চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও মণ্ডপে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা বোধ ও তাহার দাবী উত্থাপন করে নাই।

আসল পূজার কার্য্য ত সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতই করেন, এবং তিনিই সকলের পক্ষ হইতে দেবতার কৃপাভিক্ষা এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলকামনা করেন। আপন হাতে অঞ্জলি খুব অল্প লোকেই দিয়া থাকে।

সুতরাং মন্দিরে প্রবেশ লইয়াই একটা গোলযোগ-সৃষ্টির সার্থকতা কি, বুঝি না। মন্দিরে প্রবেশ করিলেই যে দেবতার অধিকতর সান্নিধ্যলাভ করা যায়, এরূপ কোন কথা নাই। বরং এক জন প্রকৃত ভক্ত নিজের মলিনতা স্মরণ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া নিতান্ত সম্ভ্রমের সহিত দেবতার দর্শন করেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ভক্তির অবতার কলিযুগপাবন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পুরীধামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইয়া, রত্নবেদীর সন্নিকটে যাইতেন না—দূরে, গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেন এবং দর্শন করিতে করিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া, অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া, মেঝের পাষাণের উপর পড়িয়া একটি গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিল!

প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা অপরের সম্মান রক্ষা করিয়া চলেন; কখনও অন্যের ধর্ম্মাচরণের বাধা জন্মান না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"হরিদাসকে সকলের সঙ্গে একত্র ভোজন করতে মহাপ্রভু কত অনুরোধ করেছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা করেন নাই। বরং নিজেকে অত্যন্ত নীচু মনে ক'রে সর্ব্বদা তফাৎ তফাৎ থাকতেন। রূপসনাতন যদিও ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন, তথাপি সমাজের ও সকলের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চলতেন। কখনও সাধারণের সঙ্গে একত্র ভোজনাদি করেন নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক কি না, স্বভাব দিয়েই ধরা যায়। ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদাই বিনয়ী।"

(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—৩য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ)।

"আমি নীচ জাতি হইলেও আমি মানুষ, তুমি ব্রাহ্মণও মানুষ; অতএব তুমি আমাকে তোমার কাছে বসিয়া পূজা করিতে দিবে না কেন?" এই প্রকার মনোভাব লইয়া দেবতার পূজা করিতে যাওয়া শুভপ্রদ নহে। ইহাতে অন্য জাতির প্রতি দ্বেষ ও হিংসা প্রকাশ পায়, আর সেই পূজকের দম্ভ, অহঙ্কার, বল ও দর্পের সূচনা করে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—"যাহারা এই প্রকার মনোভাব লইয়া পূজা করে, তাহারা পরদেহস্থিত পরমাত্মস্বরূপী আমাকে দ্বেষ করে, আমি সেই নরাধমদিগকে আসুরযোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।"

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥—১৬।১৯।

যাঁহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্পর্শদোষ (untouchability) নিবারণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলি, ধর্ম্মকে রাজনৈতিক ব্যাপারে খাটাইতে গেলে কোনটারই সফলতা হয় না। স্পর্শদোষ যে একটা কুসংস্কার নহে, ইহা যাঁহারা সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। সাদা চোখে যে সকল অতি সূক্ষ্ম বীজাণু দেখা যায় না, অণুবীক্ষণের দ্বারা দেখিলে তাহা ধরা পড়ে। সাধনপথে অগ্রসর হইলে সেই সকল সূক্ষ্ম দোষ-গুণ ধরা পড়ে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রথমজীবনে এক জন গোঁড়া ব্রাহ্ম ও সমাজসংস্কারক ছিলেন এবং জাতিভেদ মানিতেন না। কিন্তু তিনি সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিয়া শেষ-জীবনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। জাতিভেদ ও স্পর্শদোষ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"জাতিভেদ-প্রথা শুধু আমাদের দেশে কেন, সে ত সর্ব্বত্রই রয়েছে। প্রকৃতিগত জাতিভেদ শুধু মনুষ্যসমাজে নয়, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি সকলের ভিতরেই আছে, দেখতে পাই। এই জাতি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডভরা। কোথায়ও কেহ ইহা অতিক্রম করতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে জাতিভেদ এ দেশে প্রচলিত রয়েছে, তাহা সমাজগত। কোনও দেশে বা বংশগত, আবার কোথায়ও বা মর্য্যাদাগত বা অবস্থাগত দেখতে পাওয়া যায়। যে ভাবেই হউক না কেন, জাতিভেদ সকল দেশেই, মনুষ্যসমাজে সকল জাতির ভিতরেই আছে। কিন্তু ঋষিরা যে জাতিভেদের উল্লেখ ক'রে গেছেন, তাহা অন্যপ্রকার, তাহা গুণগত। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণভেদে যে জাতিভেদ, তাই ঋষিরা স্বীকার করেছেন, তাহাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে, এখন শূদ্রজাতির ভিতরে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণজাতির ভিতরেও বিস্তর শূদ্র দেখা যায়। সামাজিক জাতি এক প্রকার, প্রকৃতিগত জাতি অন্যপ্রকার। পরমহংস অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই এ জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারে না। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বুদ্ধি থাকলেই সেখানে জাতিবুদ্ধি থাকবে। হিংসা, লজ্জা, মান, অপমান, ভাল মন্দ বুদ্ধি যত কাল আছে, মানুষ তত কাল কোন প্রকারেই জাতিভেদ অতিক্রম করতে পারে না। যার তার হাতে খেলেই জাতিবুদ্ধি যায় না; বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হয়ে থাকে। যার পাক করা অন্ন আহার করা হয়, তার শারীরিক ও মানসিক সমস্ত ভাব আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হয়ে থাকে। সাধারণ চক্ষে মানুষ তা' দেখতে পায় না বটে, কিন্তু এ অতি সত্য; এ সকল এক বিষম সমস্যা।"—
(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ—৩য় খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ)

এখন জাতিভেদ আমাদের দেশে সমাজগত হইয়াছে, এখন ব্রাহ্মণমাত্রেই সত্ত্বগুণপ্রধান নহেন, এখন কৃষিবাণিজ্যাদি যাঁহারা করেন, তাঁহারা সকলেই রজোগুণ-প্রধান বৈশ্য নহেন, এখন ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও অনেক সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের সেই আখ্যায়িকায় কৌশিক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে এখন ব্রাহ্মণ বলিয়াই বোধ হইতেছে,…যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে অনুরক্ত,

তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ মনে করি।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সেই ব্যাধের গলায় তখনই যজ্ঞোপবীত ঝুলাইয়া দেন নাই। ব্যাধ নিজেই বলিয়াছিল, "আমি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও পিতৃমাতৃসেবা দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিব, এরূপ আশা করি।" হিন্দুমহাসভার যে সকল সভ্য এই জন্মেই তাঁহাদের বিবেচনামত অনেক লোককে ব্রাহ্মণ বানাইয়া তাহাদের গলায় পৈতা ঝুলাইয়া দিতেছেন, তাঁহাদিগকে এই ব্যাধের উক্তি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বলি।

সংস্কারকগণ যাহাই বলুন, বাঙ্গালার উচ্চজাতিসকল নীচজাতিদিগকে তাহাদের জন্মগত মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই, সমাজে তাহাদিগকে দাবাইয়াও রাখে নাই, বরং তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা (culture) বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। যদি হিন্দুশাস্ত্র মানিতে হয়, তবে নীচজাতীয় লোকসকল তাহাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে নীচকুলে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাদের এই প্রকার জন্মলাভের জন্য উচ্চজাতি-সকল দায়ী নহে। উচ্চজাতীয় লোকরা বরং নানা প্রকারে তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সুবিধা ও উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। তবে উচ্চজাতিরা তাহাদের নিজ ধর্ম্মরক্ষার জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক, সেইরূপ কতকগুলি আচার-ব্যবহার দ্বারা নিজদিগকে কিছু স্বতন্ত্র রাখিয়াছে। সে কেবল আত্মরক্ষার জন্য, পরকে ঘৃণা করিবার জন্য নহে। হিন্দুসমাজে উচ্চ নীচ প্রত্যেক জাতিই self contained—আত্মসংস্থ, তাহাদের আহার-বিহার বিবাহাদি নিজ নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যজন যাজনাদিও নিজ নিজ ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দ্বারা করাইয়া থাকে; সে জন্য নীচজাতিরা উচ্চজাতির মুখাপেক্ষী নহে। সমাজে নীচজাতিদিগের মধ্যেও যথেষ্ট আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে। বিনা নিমন্ত্রণে কেহ কাহারও বাড়ীতে খাইতে যায় না। এক জন নমঃশূদ্র বা বাগ্দী মনে করে না যে, উচ্চজাতীয় কোন লোক তাহার ছোঁয়া জল খাইলে তাহাকে স্বর্গে তুলিয়া দেওয়া হইবে। সে জানে, তাহার স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া তাহার ইহজন্মের স্বকৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। যদি সে ধার্ম্মিক হয়, তবে সে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও ইহলোকে যথোচিত সম্মানলাভ করিবে ও পরকালে তাহার সদ্গতি হইবে। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ" ইহা সকলেই জানে। ইহা অবশ্য প্রশংসাবাক্য, ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সেই চণ্ডালকে শুদ্ধি দ্বারা এখনই ব্রাহ্মণ বানানো যায়। যাঁহারা জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া সকল জাতিকে একাকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। সকল জাতি একত্র মিলিয়া পানভোজন করিলেও সমাজে উচ্চনীচভেদ চিরদিন থাকিবে। যদি কালক্রমে সেই উচ্চনীচভেদ বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে শতকরা ৪৮ জন নীচজাতির মধ্যে শতকরা ৬ জন ব্রাহ্মণ কোথায় যাইবে, তাহার খোঁজও থাকিবে না। ব্রাহ্মণ্যসভ্যতা যদি এইরূপে বিলুপ্ত হয়, তবে তাহাকে জাতীয় উন্নতি বলিব না অবনতি বলিব ? আজ যে রাজনৈতিক আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এই জাতিনাশের চেষ্টা হইতেছে, তাহা ত ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছে। শুদ্ধি-আন্দোলন দ্বারা হিন্দুর সংখ্যা বাড়াইবার বৃথা চেষ্টায় যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়াছে। শুদ্ধি দ্বারা হিন্দুর সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, বঙ্গদেশে মুসলমানের আধিক্য কিছুতেই কমিবে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের (depressed class) সংখ্যার পরিমাণে যদি তাহারা কাউন্সিলে মেম্বর পায়, তাহাতে উচ্চশ্রেণীর কোন আপত্তির কারণ দেখি না। তাহারা উচ্চশ্রেণীর সহিত একসঙ্গে মিশিয়া (joint electiorate) ভোট দিলেও তাহাদের মধ্য হইতেই মেম্বর নির্ব্বাচন করিবে, সন্দেহ নাই। উচ্চশ্রেণীর বরং সে বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা উচিত। অতএব রাজনৈতিক সুবিধার দিক্ দিয়া দেখিলেও জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়ার কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বঙ্গনারী

১

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ব্রজেন্দ্র লাহা দিলদরিয়া লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অন্ধ, আতুর, প্রার্থী কেহ সঙ্কোচ, ভয় বা উদ্বেগ লইয়া কোন দিন তাঁহার কাছে আসে নাই। সকলকেই তিনি সস্নেহে আহ্বান করিতেন,—'এস !'

আদরের কন্যা প্রভাকে সম্মুখে রাখিয়া পাঁচ, পঞ্চাশ, হাজার সবই তিনি মেয়ের হাত দিয়াই প্রার্থীকে অকাতরে দান করিতেন। ভিক্ষুকরা অপর বাড়ীর দরজায় হাঁক দিত,—'ভিক্ষে পাই, মা !' এখানে আসিয়া ডাকিয়া উঠিত,—'মা লক্ষ্মী কোথায় ?' সত্য এবং ত্যাগের আব-হাওয়ার মধ্যে পরিবর্দ্ধিতা এই প্রভা মেয়েটি এক দিন কক্ষ-ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত এমন এক অচিন্তিতপূর্ব্ব সংসারে আসিয়া পড়িল, যেখানে আপন আপন স্বার্থসাধনের ফন্দি এবং যুক্তিই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। এই নিষ্ঠুর সংসারে পিতৃ-পরিবারের পুণ্যপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কিরূপে যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতেই সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে কলিকাতার এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সমস্ত জাতিকে আপনার ভাবিয়া ভাল-বাসিবার ও শ্রদ্ধা করিবার পরম অধিকার এই পরিবারটি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্র কন্যা পাত্রস্থ করার বেলা ভুল করিলেন। জামাতার সম্পদের ছবিটাই কাজলের মত ইঁহার চোখে ধরিয়া গেল, মনের ছবিটার কোন সন্ধানই লইলেন না। মুস্কিল এই,—মিলনের যায়গাটা টাকার ঘরে নহে—মনেরই ঘরে।

অনেক সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অবশেষে টাকার স্তূপ দেখিয়াই তিনি এই সম্বন্ধটি গড়িয়া তুলিলেন। ছেলের নাম নিকুঞ্জ। মাথায় কোঁকড়া চুল, বাঁকা টেড়ী, গৌর বর্ণ, নধর দেহ, সবই ভাল। পেটে বিদ্যাও কিছু ছিল, বুদ্ধি আর ব্যবহারটা কেবল পিতৃপুরুষের। ইহারা বুদ্ধির জোরে টাকা ঘরে আনিতে জানে—কিন্তু বাহির করিবার পথ অজ্ঞাত ছিল। ব্রজেন্দ্র দেখিলেন, বালীগঞ্জে ইহাদের দ্বিতল বাড়ীঘর, জমী-যায়গা, পুকুর-বাগিচা ; তাহা ছাড়া কলিকাতাতেও রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। মেয়েটি কাছে এবং সুখে থাকিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু পেটের ক্ষুধা আর মনের ক্ষুধা এক বস্তু নহে ! বাহিরের মিলনে নহে—মনের মিলনে যে স্বাক্ষর হয়, তাহাই আসল দলীল। ঐ দলীলের উপরই সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। ব্রজেন্দ্র এ দলীলের বিশেষত্ব যদি অনুধাবন করিয়া বুঝিতেন, সুদূরপ্রসারী বাড়ীঘর, বাগান-বাগিচা, জমী-যায়গায় দৃষ্টিকে কেন্দ্রস্থ না করিয়া নিকুঞ্জকেই সংক্ষেপে দেখিয়া লইতেন !

নারীর অন্তঃপুরবিভাগ পর্দ্দা দিয়া ঢাকা যায়—অন্তঃ-করণটি কিন্তু পাঁচীলের অন্তরালে অবরুদ্ধ করা যায় না। ইহারা সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল। একটা পয়সা কি

এক-মুষ্টি অন্ন অন্ধ আতুরকে দিতে গেলে বাড়ীশুদ্ধ লোক ঘাড়ের উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়ে,—গৃহস্থঘরের বৌ, হাতে আঁট-সাঁট নাই—এমন হইলে কুবেরের ভাণ্ডারও যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়!

প্রভা হাঁপাইয়া উঠে। পিতল, কাঁসা, সোনাদানা কোন্‌টার অভাব ইহাদের আছে? একটা তামার পয়সার ব্যয় দেখিয়া যাহারা মূর্চ্ছা যায়, এক মুষ্টি অন্ন-দানে যাহাদের প্রাণ কাতর হয়, সেখানে কি করিয়া প্রাণ বাঁচে?

সে দিন মধ্যাহ্নে লোলচর্ম্ম শীর্ণদেহ একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক দ্বারে দাঁড়াইয়া অন্ন প্রার্থনা করিতেছিল। প্রভার ননদিনী রুক্মিণী ঘরের ভিতর হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"ভিক্ষেরও একটা সময় আছে, বাপু! ঘরে সদাব্রত খুলে রাখা হয় নি, অন্য যায়গায় দেখ।"

রুক্মিণীর প্রথম কথাটায় যুক্তি ছিল। সময়টা 'খাই' 'খাই' বটে ত! কিন্তু গৃহের লোকের ভুক্তাবশিষ্ট দুটি অন্নই সে এই অসময়ে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল। অদৃষ্ট-দেবতা যে উঁহাদের যুক্তি মানিয়া চলার পথগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন!

নিকুঞ্জ তখন সবে আহারে বসিয়াছিল। পাটের বাজার এবার বড় সুবিধার নহে। এ পর্য্যন্ত পাট কেনা বন্ধ আছে। সময়ও আর নাই; এ সময় কিনিয়া না রাখিলে বছরটা মাটী হয়। নিকুঞ্জ সেই চিন্তায় বিভোর ছিল। ভিক্ষুকটি দুই এক পা করিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "বাবুজী, দু'দিন আমি কিছুই খাই নি, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

এ রকমের প্রার্থনায় সমতুল্য এক জন ভিক্ষুকের প্রাণেও সাড়া দেয়। সে-ও খুঁজিয়া দেখে, ঝুলিতে কি আছে! চিন্তার ধারায় বাধা পাইয়া নিকুঞ্জর মেজাজ কিন্তু চড়িয়া উঠিল! চোখ রাঙ্গাইয়া সে বলিল, "কি বেকুব রে! সারা সকালটা খেটে খুটে খেতে বসেছি, সেখানেও এসে হাত পাতবি তোরা? জ্বালালে! বের হ বল্‌ছি!"

ভিক্ষুকটি নিশ্বাস ছাড়িয়া শুষ্ক-মুখে পশ্চাতে হটিয়া গিয়া চলিতে সুরু করিল।

নরজন্ম যে লাভ করিয়াছে, যত দরিদ্র, যত হীন, যত ছোটই সে হউক, তাহারও একটা মর্য্যাদা আছে। ঘরের ভিতরে প্রভার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এতখানি বেলায় শুধু দুইটি ভাতের কাঙ্গাল হইয়া বৃদ্ধ আসিয়াছিল! প্রার্থী হইয়া সে নিজেকে খর্ব্ব করিল; তাহার দুঃখের পরিমাণ যে অতি বিপুল!

প্রভা আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঐ যায়—চলিয়া গেল বুঝি! গৃহের সকল কল্যাণই বুঝি হরণ করিয়া লইয়া চলিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া অপর একটি ঘরের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মনে জাগিতেছিল, বাক্স খুলিয়া দুইটি টাকা আনিয়া বৃদ্ধকে দিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু স্বামী ও ননদিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হইল না।

ভিক্ষুকটি বাড়ীর পশ্চাতের পথ ধরিয়া চলিতেছিল। এমন সময় প্রভা তাহার বাম হাতের বালাগাছটি খুলিয়া রাস্তার উপর তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। ভিক্ষুকটি উহা তুলিয়া লইয়া জানালার দিকে চাহিল। তরুণী নারীর জ্যোতির্ম্ময়, সমবেদনায় সমৃদ্ধ, অপলক নেত্রযুগল তাহার ক্ষুধিত ক্লান্ত অন্তরে যেন একটা স্নেহের প্রলেপ প্রদান করিল।

বালাগাছটি তুলিয়া ধরিয়া সে বলিল, "মা, আপনার বোধ করি, নিন্।"

প্রভা মৃদুস্বরে বলিল, "বাসী মুখে ফিরে চললে—স্বয়ং নারায়ণকে হাতে পেয়ে আমরা পরিতৃপ্ত করতে পারলুম না। তুমি লও, বাপধন! গৃহের কিছু অকল্যাণ মনে করো না।"

সে বলিল, "না মা! আমি ভাতেরই কাঙ্গাল, এ সকল আমার দরকার কি? ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখুন।"

সে বালাগাছটি জানালার গোড়ায় রাখিয়া দিয়া ধীর-গতিতে চলিয়া গেল।

প্রভা দীর্ঘনিশ্বাসকে রোধ করিতে পারিল না। ব্যথিত-চিত্তে সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। শরীর ভাল নহে বলিয়া সে কিছুই মুখে দিল না। ইহারা প্রতিদিন এই রকমের এক একটি কার্য্য করে এবং সেগুলি অতি তুচ্ছ বলিয়াই মনে করে, প্রভার কাছে তাহা ইহাদের জীবন-ইতিহাসের এক একটি বড় পরিচ্ছেদ—প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ!

রাত্রিবেলা স্বামীর পার্শ্বেই প্রভা শয়ন করিল। অল্পক্ষণ পরেই স্বামীর নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ হইল। প্রভার

নয়নে ঘুম আসিল না। অন্ন প্রার্থনা করিয়া প্রার্থী বিমুখ হইয়াছে, এমন দৃশ্য পিতৃগৃহে সে কোন দিন দেখে নাই। সে ধারণাও করিতে পারে না যে, ক্ষুধিতকে দুইটি অন্নের দানা হইতে কিরূপে মানুষ বঞ্চিত করিতে পারে!

শয্যায় পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। নূতন যায়গায় আসিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিবার পথ সে নিত্যই খোঁজে—রাস্তা পায় না। প্রাণের বৃদ্ধি নাই যেখানে—সেখানে বসিয়া বসিয়া পরমায়ুর বৃদ্ধি করার মূল্য কি? জীবন কি এমনই হেলা-ফেলার জিনিষ?

প্রভা পাশ ফিরিয়া দেখিল, স্বামী গভীর-নিদ্রাচ্ছন্ন। খানিক অসাড়ে পড়িয়া থাকিয়া সে আর চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিল না। ভাল এবং মন্দ সবই স্বামীর হাতে দিয়া সে দায় এড়াইতে চাহিল। নিদ্রিত স্বামীর বুকের উপর হাত রাখিয়া সে কি জানিতে চেষ্টা করিল, সেই জানে। তার পর মৃদু মৃদু হস্তঘর্ষণে স্বামীকে সে ঠেলা দিতে লাগিল। নিকুঞ্জ জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্‌ছ কেন?"

কিন্তু সে ডাকে নাই, এমনই ভাণ করিয়া নির্জীবভাবে সে পড়িয়া রহিল। তন্দ্রাঘোরে নিকুঞ্জর নাসিকা পূর্ব্বের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রভা আবার তাহাকে পূর্ব্বের মত ঠেলিতে লাগিল। নিকুঞ্জ বলিল, "এমন পাগল ত দেখি নি, সমস্ত রাতটা কি এমনি ঠেলাঠেলি ক'রে কাটাবে?"

এবার প্রভা স্বামীর একখানা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া চাপ্ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীতে আমি কি চল্‌তে ফির্‌তে পার্‌ব?"

নিকুঞ্জ ঘুমচোখে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আজ নূতন এসেছ না কি তুমি? এত দিন চ'লে ফিরে বেড়াও নি?" তার পর কিছু গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেউ কিছু বলেছে না কি?"

"না।"

"তবে?"

প্রভা কথা বলিল না। নিকুঞ্জও আর প্রশ্ন করিল না। জানিবার চেষ্টার অপেক্ষা ঘুমের ঝোঁকই ছিল তাহার বেশী। সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

২

প্রভা শান্তির রূপ ধরিয়া রহিল বটে, কিন্তু অন্তর দিন দিন অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল। মানুষের স্বভাবের বেগ মন্দ পথে যেমন দ্রুত চলে, ভাল পথেও ঠিক তেমনই তাহার গতি। প্রভার পিতা উদার চিন্তা ও ভাব লইয়া মেয়ের মন শুধু বড় করিয়া গড়িয়া তুলেন নাই, তাহাকে পুড়াইয়া ঘাতসহ করিয়াও দিয়াছিলেন। এখন ইহারা তাহাকে নিজেদের দরকারমত সঙ্কীর্ণ সীমার ভিতরে চাপিয়া ধরিতে চাহে; কিন্তু পোড়ের জিনিষটায় চাপ দিতে গেলেই সে ফাটিয়া যায়।

প্রভার অদৃষ্ট যখন স্বামীর ঘরে এইরূপ দিনক্ষণের মধ্য দিয়া চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় দিবারাত্রির নিয়ন্তাটির বিধানবশে পূর্ব্ববঙ্গে বন্যা-প্লাবনের আর্ত্তনাদ সমগ্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রভা ছিল কলিকাতার বালীগঞ্জে—প্লাবন হইতে অনেক দূরে। কিন্তু বন্যার একটি অসংযত গুপ্ত প্রবাহ মেয়েটির ললাটের সঙ্গে যুক্ত হইল।

পূর্ব্ববঙ্গে যে বান ডাকিল, তাহার ধ্বংস-প্রবাহের মুখে গ্রাম, পল্লী ও শত শত নর-নারী ভাসিয়া চলিল। সে বিপদের বার্ত্তা শুনিয়া মানুষের প্রাণ অস্থির হয়—অনেকেই ছুটিয়া যায়—বিপন্নকে যে কোনও উপায়ে ত বাঁচাইতে হইবে। দেশে দেশে সাহায্যভাণ্ডারের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। এই রকমের একটি কেন্দ্রের এক দল স্ত্রীসদস্য ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য এক দিন প্রভাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নিকুঞ্জ বাড়ীতে ছিল না। সেবিকারা যখন প্রভাদের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া গাহিয়া উঠিলেন,—"আয় রে জননী, আয় রে তোরা, লক্ষ প্রাণী মরণে ঘেরা"—তখন কোন মেয়েই আর ঘরের কাযে স্থির থাকিতে পারিলেন না। হাতের কায ফেলিয়া চারিদিক্ হইতে তাঁহারা উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিলেন। প্রভাও দ্বারের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। রুক্মিণীও আসিল; কিন্তু ইঁহাদের পাগল-করা উদাস সুরে সে পাগল হইল না। ইঁহাদের অকুণ্ঠিত কর্ম্মতৎপরতায়, অসাধারণ পরসুখপ্রচেষ্টায় তাহার হৃদয়ে সহানুভূতির উন্মেষ হইল না—এ পথের সন্ধান ত সে কোন দিন রাখে নাই। এতগুলি নারীর সম্মিলিত

কণ্ঠগীতি এবং সম্মিলিত হাবভাবের উপর বাহিরে বাহিরে সে বিচরণ করিতে লাগিল।

গীত শেষ হইলে সেবিকারা ভিক্ষাপাত্র বিস্তৃত করিয়া ধরিলেন। রুক্মিণীর মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। সে বলিল, "বাড়ীঘরে কেউ নেই, মেয়েমানুষ আমরা—আমরা কি করব বলুন!"

সেবিকারা বলিলেন, "অন্যের দরকার কি মা! সন্তানের দুঃখে মায়ের চেয়ে কার প্রাণ অধিক কাতর হবে? তাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখবেন না, মা?"

রুক্মিণী বলিল, "তা কি আর জানি নে। আমার এক বোনের বাড়ীও ঐ দেশে। তাদেরও বাড়ী-ঘর সমস্ত ভেসে গেছে। কি দুঃখের হালই যে হয়েছে, কে জানে! এখন প্রাণ ক'টি বেঁচে থাক্‌লে হয়।"

রমণীরা বলিলেন, "তবে ত মা আপনার অজানা কিছুই নেই। আপনাকে আর অধিক কি বুঝাব?"

রুক্মিণী ঢোক গিলিল। বলিল, "কি কর্‌ব, বাড়ীঘরে কেউ নেই, একবার বল্‌লে আপনারা বুঝতে পারেন না?"

এই বলিয়া সে এক পা দুই পা করিয়া গা-ঢাকা দিল।

বিদ্যুতের মত দুইটি চকিত চক্ষু গৃহের সমস্ত অগৌরবকে ঢাকিয়া দিবার জন্য স্নিগ্ধতায় উজ্জ্বল হইয়া দ্বারপথে যেন উৎসুক হইয়া আছে, ইহা ভিক্ষার্থিনীরা লক্ষ্য করিলেন। এক জন বলিলেন, "মা, আপনি কি কিছু দেবেন?"

প্রভার চোখে জল আসিল। সে ছুটিয়া আসিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গলার হারছড়াটা খুলিয়া ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে ফেলিয়া দিল। তবুও তাহার তৃপ্তি হইল না। একটি দুটি প্রাণী নহে—লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনরক্ষায় কত লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন! সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু কাপড়?—"

"হাঁ মা, জলই তাদের লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র হয়েছে। গৃহ নেই, আশ্রয় নেই, বিবস্ত্র দেহ নিয়ে জল ছেড়ে উঠ্‌তে পারে না, কি আর বল্‌ব, মা!"

প্রভা আর দাঁড়াইল না। ত্বরিত-পদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। বাক্স খুলিয়া পাঁচ সাতখানা ধৌত বস্ত্র হাতে লইয়া যেমন সে ঘরের দ্বারে পা দিয়াছে, অমনই বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "এ সকল নিয়ে বড়মানুষের মেয়ের কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

ছোট লোকের মেয়ে হইলেও নিষ্কৃতি ছিল না। গালিটার একটু প্রকারভেদ হইত মাত্র।

হঠাৎ বাধা পাইয়া প্রভা থামিয়া গেল। বলিল, "দিতে।"

"আর নবাবী ফলাতে হবে না। সিরাজউদ্দৌলার বেটী এসেছেন ঘরে!"

এক ধাক্কা দিয়া রুক্মিণী মেঝের উপর প্রভাকে ফেলিয়া দিল। প্রভা মূর্চ্ছাহতের মত ভূমিতলে লুটাইতে লাগিল।

গৃহস্থ-ঘরের মহিমা রুক্মিণীর জানা ছিল না। সে রাখিয়া ঢাকিয়া গলা খাটো করিয়া কিছু বলিল না। যাহা বলিল, সমস্তই সেবিকাদের শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহারা তখন সে অতিরিক্ত বস্ত্রাদির আশা ত্যাগ করিয়া মেয়েটির এই জঘন্য হিংস্র সংঘর্ষপ্রিয়তার কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু এ দৃশ্যের এইখানেই শেষ নহে।

রুক্মিণী নীচে নামিয়া গেলে তাহার ছোট ভাইটি কাছে আসিয়া বলিল, "দেখলে দিদি, বৌঠাকরুণ তাঁর গলার হারছড়া খুলে মাগীদের দিয়ে দিয়েছে!"

রুক্মিণী অবাক্ হইয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিল; বলিল, "সত্যি? হতচ্ছাড়ী গলার হারও খুলে দিয়েছে? সে যে সাত আটশো টাকার গহনা?"

বালকের মুখে আর অধিক কিছু শুনিবার প্রত্যাশা না রাখিয়া রুক্মিণী দুপ-দাপ শব্দে সিঁড়ি কাঁপাইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। প্রভা তখনও পর্য্যন্ত সেইখানে বসিয়া চোখের জলে মাটী ভিজাইতেছিল।

রুক্মিণী ঘরে আসিয়া দেখিল, সত্যিই তাই। প্রভার গলা শূন্য। রুক্মিণীর দেহে উষ্ণ রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। প্রভার মাথাটায় দুই চারিটা ঝাঁকানি দিয়া শেষ ধাক্কায় সে আর এক দফা তাহাকে ভূতলশায়িনী করিল। তার পর সেই ঘরে তাহার দাদার খাটের উপর উঠিয়া দুই হাতের বেষ্টনে দুই হাঁটু রক্ষা করিয়া চাপিয়া বসিল। বলিল, "আসুক আগে বাড়ীতে সেই ভেড়ুয়াটা, এমন সাউগাড় কত দিন হয়েছিস্, দেখব, তবে উঠব। দুই পায়ে থেঁতলে যদি আজ তোকে ঘর থেকে তাড়াতে না পারি ত তোর ননদ হয়ে জন্মাই নি।"

এ দিকে সঙ্গে সঙ্গে নিকুঞ্জও আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া ঘরের চিত্রটি দেখিয়া সে অনুভব করিল, গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে। ব্যস্তভাবে ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল আবার?"

রুক্মিণী বিকৃতমুখে বলিল, "হবে কি! বেছে বেছে বৌ ঘরে এনেছ, সংসারের উপর মায়া নেই, মমতা নেই, তোমাকে পথের ভিখিরী ক'রে তবে ছাড়বে।"

তার পর সে ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

নিকুঞ্জ বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া ভগিনীর মুখের অনর্গল কাহিনী স্থিরভাবে শুনিতেছিল।

রুক্মিণী যদিও অতি নিকটে—যাহার পায়ের তলায় নারীর পরাভব সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া লোকের গৌরবে ঘটিতেছে, সেই চরণ দুইখানির দিকে অগ্রসর হইতে প্রভার বাধিল না। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া নিকুঞ্জর পায়ের উপর দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "দিদির অভিযোগ সত্য। যে অগ্নি-পরীক্ষা আজ সম্মুখে এসেছিল, তোমার শক্তিকে আমি ক্ষীণ ক'রে দিই নি। আর গহনা প'রে যে সুখ হ'ত, তার চেয়ে আজ আমি অধিক সুখী হ'তে পেরেছি। বল, তুমি রাগ কর নি?"

নিকুঞ্জর অন্তর স্পর্শ করিল কি না, বলা যায় না। সে কিন্তু গায়ের জামা ছাড়িয়া পাখাটা খুলিয়া দিয়া আরাম-কেদারার উপর বসিয়া পড়িল।

এ ক্ষেত্রে নিকুঞ্জর পক্ষে ধৈর্য্য ধরা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু প্রভার সম্বন্ধে তাহার একটু ধৈর্য্যই ছিল। মেয়েটি অপচয় করে সত্য—চাপ দিলে আবার পূরণ করিবার পথও উহার পশ্চাতে বিস্তৃত আছে। পূর্ব্বে অনেক সময় এমন হইয়াছেও। বাবাকে শুধু মুখের কথাটা জানানর অপেক্ষা। কিন্তু এবারকার ইহার দানের মাত্রা এত বেশী এবং এত অধিক ইচ্ছাকৃত যে, উহার মিষ্ট কথায় প্রাণের জ্বালার 'রি-রি' ভাবটা কাটিতেছিল না।

রুক্মিণীর পক্ষেও এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন ছিল না। কিন্তু তাহার আগুন জ্বলিতেছিল আর এক যায়গায়। যেখানে সে নিজে একটা তামার পয়সা দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করে নাই, সেখানে তাহাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া চোখের আড়ালে একখানা দামী গহনা খুলিয়া দিল। মেয়েটির এ উদারতা সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার পশু-প্রকৃতি তখন প্রভার অন্যবিধ দণ্ড কামনা করিতেছিল। তাই সে এ উত্তেজনার মুহূর্ত্ত আর থামিয়া যাইতে দিল না। সেইখানে বসিয়া বসিয়া সহজ চতুরতার দ্বারা ভ্রাতার অন্তরে হিংস্র-ভাব সে আবার জাগাইয়া তুলিল।

নিকুঞ্জ এবার উঁচু হইয়া বসিয়া গহনার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিল। প্রভা এতক্ষণে বুঝিল, যে কৈফিয়ৎ সে ইতিপূর্ব্বে দিয়াছে, স্বামী তাহা মানিয়া লন নাই। কিন্তু কথার মারপেঁচে একই বক্তব্য পুনঃ পুনঃ বলিতেও তাহার বিরক্তি লাগে। তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

নিকুঞ্জ ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইল। দুই একবার তাড়না করিয়াও যখন জবাব পাইল না, তখন উত্তেজনার আধিক্যে এক সময় চৌকী ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া প্রভার পিঠের উপর তাহার বলিষ্ঠ বাহু ও করতালুর বল পরীক্ষা করিল। ঠিক এই সময়ে প্রতিবেশী একটি রমণী—নয়নতারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ইতর কাণ্ড দেখিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! নিকুঞ্জ, তুই হলি কি? পশুকেও যে লোকে এত মারতে দরদ করে?"

প্রভার পিঠের কাপড়খানা তুলিয়া ধরিয়া নয়নতারা দেখিতে পাইলেন, হতভাগা পাঁচটি আঙ্গুলের ছাপই সে নবনীত-দেহের উপর মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। তিনি আরও কিছু রুষ্টভাবে বলিলেন, "এমন যদি করবি, আমরা ওর বাপকে খবর দিয়ে পাঠাব। এসে নিয়ে যাক্—হাড়টা ত জুড়ুক—এমন ঘর-সংসারে কায নেই।"

রুক্মিণী মুখঝাড়া দিয়া বলিল, "তোমাদের আর দরদ দেখাতে হবে না। টাকাটা—সিকিটা—কাপড়খানা—গুঁজে গুঁজে দেয় কি না! আমরা কি না দেখেও দেখি না।"

নয়নতারা ঘৃণায় আর জবাব দিলেন না; ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মৃতের ন্যায় বিবর্ণ মুখে প্রভা মাটীর উপর শুইয়া পড়িল। স্বামীর কঠিন হস্তের অঙ্গুলিগুলি তখনও পর্য্যস্ত পৃষ্ঠদেশে বাজিয়া উঠিতেছিল। দুঃসহ লজ্জায় রক্তিম মুখখানা সে অবগুণ্ঠিত করিয়া দিল। সংসারের লোক নারীর উপর এত অধিক বেশী অত্যাচারের দাবী করে, ভাবিতে গিয়া ভিতরের অশ্রুধারা তাহার বুক ফাটিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল। অনেকক্ষণ সে সেই অবস্থায় পড়িয়া ছিল। এই ত মৃত্যু! আর মৃত্যু কি?

যখন হুঁস হইল, পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া দেখিতেই স্বামীর পাঁচটি আঙ্গুলের দাগের স্পর্শ প্রতিবারই যখন স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল, তখন প্রবল উত্তেজনায় সে উঠিয়া বসিল। ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন কালি-কলম লইয়া পিতাকে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নলিখিত কথা কয়টি সে লিখিয়া ফেলিল,—

"বাবা, বড় অসুখ, একবার এসে দেখে যাবেন।"

তার পর চিঠিখানা বাড়ীর ঝিকে দিয়া সে অন্যের অগোচরে ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। ঝি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। সে ফিরিয়া আসিলে প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকে দিলে?"

"হুঁ।"

একটু চিন্তা করিয়া সে বলিল, "ফিরিয়ে আনা যায় না?"

"আর কি আনা যায়? ডাক তখন বাঁধছিল—এতক্ষণ চ'লে গেছে।"

প্রভা অত্যন্ত বিচলিত হইল। ভাবিল,—পিতা আসিলে কি সদুত্তর তাঁহাকে দেওয়া যাইবে? যে কথা শুনাইবার জন্য সে পিতাকে আহ্বান করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলে তাহার কতখানি আত্মপ্রসাদ জন্মিবে? নিজে হেয় না হইলে কি স্বামীকে ঘৃণ্য করিয়া দেখাইতে পারা যায়? ঝোঁকের মাথায় এ কি দুষ্কার্য্য সে করিয়া বসিল!

প্রভার কপাল বহিয়া জলধারা ভূমিতল সিক্ত করিতে লাগিল।

৩

প্রভার স্বামী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালীগঞ্জের বাড়ীতেই বাস করিত। কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দেওয়া ছিল। ব্রজেন্দ্র লাহা ইহাদের আচার-ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া আসা-যাওয়া একরকম বন্ধই করিয়াছিলেন। কিন্তু মেয়ের এরূপ অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

তিনি যখন জামাতার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, নিকুঞ্জ তখন বৈঠকখানা-ঘরে ছিল। ব্রজেন্দ্র তথায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভার কি খুবই অসুখ? কি অসুখ?"

নিকুঞ্জ আশ্চর্য্য হইয়া শ্বশুরের দিকে চাহিল। মুখে একটু ত্রাসের ভাবও যেন পরিলক্ষিত হইল। সে বলিল, "বসুন। কৈ—না। কে এ সংবাদ দিলে?"

নিকুঞ্জর মনে সংশয় জন্মিল যে, তাহার সেদিনকার নৃশংস ব্যবহারটা বাহিরে ছড়াইয়া দিবার জন্য প্রভাই বুঝি ভিতরে ভিতরে একটা আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে।

জামাতার বাক্যে প্রভার এরূপ চিঠি লিখিবার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ ব্রজেন্দ্র বাবু কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পরে কিছু সংযত হইয়া বলিলেন, "মা-বাপের প্রাণ—কত কথাই মনে ওঠে। বাড়ীর আর সব ভাল ত?"

নিকুঞ্জ বলিল, "হাঁ।"

তিনি সেখানে আর বিলম্ব না করিয়া সরাসরি উপরে প্রভার ঘরে গিয়া হাজির হইলেন। প্রভা তখন রান্না-ঘরে ছিল। দেখিল, বাবা আসিয়াছেন। লজ্জা ও ত্রাসে তাহার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। সে উনুনের কাছে কিছুক্ষণ বিরসমুখে বসিয়া রহিল। গাত্রবস্ত্র ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া গেল। কিন্তু পিতা যখন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠেন, তখন তিনি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এখন আর বিলম্ব করাও চলে না। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়া সে আপনাকে কতকটা সুসংস্কৃত করিয়া লইল, তার পর পিতার কাছে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল, বুকের কাছে মাথা রাখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া সে দাঁড়াইল। ব্রজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এস মা, অসুখের কথা লিখেছ—কি অসুখ?"

প্রভা সেইরূপ মাথা নীচু করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, "ও কিছু না। ভুলক্রমেও ত একবার এ পথে পা দেন না।"

ব্রজেন্দ্র বলিলেন, "ওঃ! এই বুঝি সিদ্ধান্ত করেছ?" কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইলেন, আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু ইহাদের আচরণটা স্মরণ করিয়া সে কথাটা আর বলিলেন না। তিনি কেন যে আসেন না, তাহা কন্যাও জানে, তিনিও জানেন; শুধু মুখ দিয়া বাহির হয় না।

ব্রজেন্দ্র বাবু মেয়েকে আরও একটু বুকের কাছে সরাইয়া লইয়া মস্তকে হস্তচালনার দ্বারা জানাইয়া দিতে লাগিলেন, নিজকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিয়া যাহাকে পাঠাইতে হয়,

াকে কি কখনও ভোলা চলে? বাহিরে শুধু বলিলেন, এই রকম ক'রে টেনে আন্‌তে হয় বুঝি—বাড়ীর সবাই যে ন্ন-জল ত্যাগ করেছে!"

প্রভা ঘাড় উঁচু করিয়া বলিল, "আমার জন্যে?" পুনর্ব্বার মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমি এমন কি, বাবা?"

বৃদ্ধ পিতাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্রজেন্দ্রের চক্ষু দুইটিও ঝাপসা হইয়া আসিল। মনে হইল, এই ত সংসার—আর এই ত সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমন্ত্রণ—আর ইহাই ত সংসারের নিরবচ্ছিন্ন সুখ!

এ স্নেহের স্পর্শে প্রভার অবরুদ্ধ নয়নাশ্রু শতধারায় ইহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পিতা অন্তরে অন্তরে কতটা কাঁদিলেন, সে তাহা দেখিতে পাইল না। পিতা বলিলেন, "এমন ক'রে কেঁদে কেটে আমাকে ব্যথা দাও। সদাসর্ব্বদা খবর পাই, তাই ত আসি নে।"

রুক্মিণী রান্নাঘর হইতে প্রভাকে অনবরত তাগিদ পাঠাইতেছিল। কি জানি, ভ্রাতাটির পাশবিক অত্যাচারের অবশেষ মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কাহিনীর মত ইহার পৃষ্ঠদেশে যাহা বিচিত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে, অপত্য-স্নেহের মধ্য দিয়া যদি সমস্তটা ফাঁস হইয়া যায়?

প্রভা অগত্যা পিতাকে একাকী বসাইয়া রাখিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ব্রজেন্দ্র একলাটি আর চুপচাপ বসিয়া না থাকিয়া একবার নয়নতারাদের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলেন। নয়নতারা সম্পর্কে শ্যালিকা হয়—খুব নিকটের নহে। সে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। কুশলাদি প্রশ্নের পর সে বলিল, "আপনি এসেছেন, ভালই হ'ল। মেয়েটাকে মেরে মেরে হাড়ে কালি পাড়িয়ে দিলে।"

ব্রজেন্দ্র তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন। সমস্ত হৃদয়টা দগ্ধ করিয়া একটা তীব্র জ্বালা যেন বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বল কি?—মারে?"

"মারে না আবার? এই ত দিন পাঁচেক আগে কি মারই মেরেছে; পিঠের কাপড়খানা তুল্‌লে দেখতে পাবেন। এমন ষণ্ডামার্কের হাতেও মেয়েটি দিয়েছিলেন! ননদটি আবার ভায়ের আগে আগে যায়।"

জানালা খোলাই ছিল। ঠাণ্ডা বাতাস 'হু' 'হু' করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। ব্রজেন্দ্রের বুকে ইহা তীরের মত বাজিতে লাগিল তিনি গাঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি শেষটা জেনেছিলাম, প্রভা সুখী হ'তে পারে নি। কিন্তু ভদ্র-সন্তান যে মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলে, আমি কখনও শুনি নি—আর প্রভার সম্বন্ধে এ একরকম কল্পনাতীতই ছিল। এমন হ'লে এখানে সে টিকবে কি ক'রে?"

নয়নতারা বলিল, "তাই নিয়ে যান আপনি যে, আমরাও বাঁচি। রোজ রোজ চোখের উপর আর এ খুনখারাপি ব্যাপার দেখা যায় না।"

ব্রজেন্দ্র নিশ্বাস ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভাব অনটন ত ওদের সংসারে কিছুই নেই, আমার মেয়েকেও অবশ্য তুমি ভালরকমই জান। তবে কি জন্য এ সকল ঘটনা হয়?"

নয়নতারা বলিল, "কাকেও হাতে ক'রে যদি একটা পয়সা কি একখানা কাপড় দিলে, তবেই কুরুক্ষেত্তর বেধে যায়। নচেৎ সে ত 'টু'-শব্দটি করে না। তার দোষ পেলে ত? ভগবান্ তাকে এমনই হাতে তুলে দিয়েছেন যে, তার গুণই দোষ হয়ে পড়েছে।"

তার পর সে সেদিনকার ব্যাপারটা সব খুলিয়া বলিল।

ব্রজেন্দ্র নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, আর কাল-বিলম্ব করিলেন না। ত্বরিতপদে জামাতার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া একবারে কন্যার ঘরে উপরে আসিয়া হাঁক দিলেন, "প্রভা! মা! একবার এ দিকে এস ত!"

সে তাড়াতাড়ি হাত মুক্ত করিয়া স্নানের সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া লইয়া উপরে পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রজেন্দ্র সোজাসুজি একবারেই জিজ্ঞাসা করলেন, "এরা না কি তোমাকে মারে?"

প্রভার হাতের গামছাখানা মাটীতে পড়িয়া গেল। ব্যস্তভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে বললে?" সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিবর্ণ মুখখানা মাটীর দিকে নত হইল।

ব্রজেন্দ্র বলিলেন, "এই ত নয়নতারা বললে। সে দিনও না কি এমনিতর কি একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। অসুখের কথা লিখেছিলে—মিথ্যা কিছু লেখ নাই —তবে পিছনে যে আরও অনেকখানি নিবিড় অন্ধকার অপেক্ষা করেছিল, সেখানটায় নয়নতারাই আলো জ্বেলে দেখালেন।"

প্রভার মুখ কালো হইয়া গেল। জোর করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে

একটু হাসি টানিয়া আনিয়া মৃদুস্বরে সে বলিল, "আপনি যেমন শোনেন সকলের কথা!"

"না মা, এ মিথ্যা নয়।"

তিনি মেয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রভার গায়ে সেমিজ ছিল না। পিতার আসিবার আগেই সে তেল মাখিয়া স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ব্রজেন্দ্র নিজের হস্তে কন্যার পৃষ্ঠের শিথিল বস্ত্র চকিতে অল্প অপসৃত করিয়া যে লাঞ্ছনার চিত্র তিনি দেখিলেন, মনে হইল, চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন রূপান্তরিত হইয়া গেল! তিনি সেই অবস্থাতেই নীচে নামিয়া জামাতার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "প্রভাকে আমি আজই নিয়ে যেতে চাই। এখনই—এই মুহূর্ত্তে।"

শ্বশুরের উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া নিকুঞ্জ কিছু দমিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

ব্রজেন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেন—নিজের কাছে জিজ্ঞাসা কর, আর নিজেই তার উত্তর শোন; যেন বাতাসে বেজে না ওঠে। আমি পিতৃস্থানীয়, আমার মুখখানা আর অপবিত্র না করলে!"

নিকুঞ্জ এবার কতকটা বুঝিতে পারিল। মুখখানা হাঁড়িপানা করিয়া সে বলিল, "এখন তার কি ক'রে যাওয়া হবে? এখন গেলে আমাদের সংসার চল্‌বে না।"

ব্রজেন্দ্র বলিলেন, "সে দেখবার দরকার করে না। মেয়েরও না, আমারও না। এখনই পাঠানর ব্যবস্থা কর ভালই, নচেৎ পুলিসে খবর পাঠাব। গায়ের দাগ তার এখনও মিলিয়ে যায় নি।"

শ্বশুরের বাক্যে এবার সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, প্রভাই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে।

টাকা-পয়সা থাকিলে কি হয়, লাল পাগ্‌ড়ীকে নিকুঞ্জ অত্যন্ত ভয় করিত। শ্বশুরের তেজস্বিতা সম্বন্ধেও তাহার ধারণা ছিল। তবুও কিছু ঝাঁঝ রাখিয়া বলিল, "তা' নিয়ে যেতে পারেন আপনি। কিন্তু এ সংসারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ উঠে গেল জান্‌বেন।"

ব্রজেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "সে আমি জেনে শুনেই বলেছি, বাবাজী! সুখের চিন্তা তার আর করি নে—প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনই এখন অধিক হয়েছে। কি অপরাধ করেছে সে? বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য গায়ের গহনা খুলে দিয়েছে, এই ত! তার গর্ভধারিণী কত দিয়েছেন জান? বিশ হাজার টাকা। যে মায়ের মেয়ে সে—লোকের আপদ-বিপদে গায়ের গহনা খুলেই ত দিতে পারে সে।"

নিকুঞ্জ আর বাদ-প্রতিবাদ করিল না।

প্রভা দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। পিতার আলোচনা এই পর্য্যন্ত শেষ বুঝিতে পারিয়া সে আবার দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র মেয়ের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এস মা, এ পাপ-পুরীতে আর থেকে কায নাই। আমার সঙ্গে চ'লে এস।"

এত দ্রুততার মধ্যে কোন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে প্রভা তাড়াতাড়ি তাহার পিতার বাহুবেষ্টনের মধ্যে ধরা দিল। তার পর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বাবা! এত বেলায় খাওয়া হ'ল না যে তোমার?"

ব্রজেন্দ্র তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "মাথায় তেল দিয়ে রেখেছ—তোমার নাওয়াটাও ত হ'ল না! লক্ষ্মীর হাত দুখানাই ত সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ—আমার জন্য ভাবনা করো না। এদের ঘরে আর খেয়ে কায কি? তোমাকে প্রাণে প্রাণে কাছে পেলাম, সে জন্য সত্যই মা, আমি ভগবানের কাছে ওদের মঙ্গলকামনাই ক'রে গেলাম।"

৪

ব্রজেন্দ্র এ কলঙ্ক-কাহিনী কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। পিতৃগৃহে আসিয়া প্রভার বৎসর পূর্ণ হইল। কাক-মুখেও শ্বশুরের ঘরের কোন সংবাদই সে পায় না। স্বামীর অত্যাচারজর্জ্জরিত গৃহের দরজা খুলিয়া হঠাৎ দৌড়িয়া আসিতে পারিয়া প্রথমটা সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল, কিন্তু যখন হইতে সে ভাবিবার মত মনঃস্থির করিতে পারিয়াছে, নিয়ত তাহার মনে এই কথাটাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল,—কেন সে ধরা দিতে পারিল না আত্মদানের মধ্য দিয়া? এমন আত্মবিস্মৃতির দরজা দিয়া কেন সে পলাইয়া আসিল? আপনাকে যেন সে অনেকখানি খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে। পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ—স্বেচ্ছায় মাথা নত হয়। কোন কিছুরই অভাব এখানে নাই; কিন্তু তৃষ্ণা মেটে কৈ? তৃষ্ণার বস্তু যেন

সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে। সে গৃহে বায়ু যে স্পর্শ দেয়, পাখীরা যে ঝঙ্কার তুলে, পুষ্পরা যে সুবাস বিলায়, আকাশে যে গ্রহ-তারকা উঠে, এখানে যেন তাহারা মৃত্যুর মত ব্যর্থতা লইয়া কাছে আসে। সে গৃহে সর্ব্বদা যেন কাহার অঙ্গের সুবাস প্রাণকে পাগল ও একান্ত করিয়া রাখে। কি ভ্রমই সে করিয়াছে। লোক কত কি কাণাকাণি করে,—মেয়ে কেন যায় না—স্বামী কেন আসে না—সে পলাইয়া আসিয়া প্রাণ বাঁচাইতে চাহিল; কিন্তু তাহার যৌবনের দৃপ্ত শ্রী এখানেই অপমানে অধিক সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। বাক্সের খোপে খোপে অলঙ্কারগুলি পড়িয়া আছে। জামা, কাপড়, সাড়ী, সেমিজ আলনার উপরই পড়িয়া থাকে—একখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিতে পর্য্যন্ত তাহার লজ্জা হয়। সংসারের ক্ষেত্রে এমন নিষ্ঠুরভাবে পরাজিত হইবার লাঞ্ছনা যেন তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তেই পীড়া দিতেছে। সুখ দুঃখ দুই-ই ভগবানের লীলা। দুঃখই যদি অদৃষ্টে থাকে, স্রষ্টার রাজত্বের ভিতরে কোথায় গিয়া সে রক্ষা পাইবে? পিতার সুখ-সম্পদের গৃহে এখন যে নূতন জ্বালা প্রাণে জ্বলিতেছে, স্বামীর উপদ্রবের গৃহ যেন ইহা অপেক্ষা লক্ষ গুণে ভাল ছিল। এ দুঃসহ বেদনা আর তাহার সহ্য হয় না।

এক দিন সময় বুঝিয়া হঠাৎ সে পিতার নিকটে এই প্রশ্নই তুলিল। বলিল, "এ যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হ'ল, বাবা?"

কথার কোন সূত্রপাত ছিল না। ব্রজেন্দ্র কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না; ব্যস্তভাবে কন্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

কিছুদিন হইতে তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন, প্রভা অন্তরে যেন কি একটা অসহ্য বেদনা সঞ্চিত রাখিয়া বাহিরে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিম্লান চক্ষু দুইটি কোন কিছু দিয়া ঢাকা দিতে সমর্থ হয় না। তিনি ক্ষণকাল কন্যার বিষণ্ণ মুখখানার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গুরুদণ্ড, মা?"

বাল্যের চপলতা এখন আর প্রভার ভিতরে কিছুই ছিল না। স্থির অথচ বেশ দৃঢ়তার সহিতই সে বলিল, "আমি ত আপনার কাছে কোন নালিশ তুলি নি, বাবা! যদি পিঠের কাপড়খানা সে দিন দেহের উপর গাঢ় ক'রে ধ'রে রাখতে পারতাম, আজ এ দণ্ড আমার হবে কেন? তা পারি নি ব'লে সেই লঘু পাপে কি এই গুরু দণ্ড?"

ব্রজেন্দ্র চমকিত হইলেন। তাই ত! কি মর্ম্মন্তুদ যাতনার ফল্গুস্রোত নীরবে বহিয়া চলিয়াছে ইহার বুকের আর একটা অংশে—এবং বৃহৎ অংশে। ইহা ত পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা হয় নাই। তিনি নিষ্পলক-নেত্রে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালীগঞ্জে যাবে কি একবার?"

প্রভা আরও মাথা হেঁট করিয়া স্খলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "গেলে যেন ভাল হ'ত, বাবা!"

"কিন্তু মা, তারা যে বড় নিষ্ঠুর আচরণ করে?"

"সে খরচ-পত্র নিয়ে করে।"

ব্রজেন্দ্র কিছুকাল কেদারার উপর স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যদি তোমার খরচপত্রের জন্যে কিছু বেশী ক'রে টাকা জমা রেখে দি ব্যাঙ্কে তোমার নামে, তা হ'লে কেমন হয়?"

"তা হ'লে বোধ হয় গোল হয় না। কিন্তু অত টাকা—"

মেয়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পিতা বলিলেন, "তুমি পুত্র-সন্তান নও, অত টাকা তোমার পিছনে কি ক'রে খরচ করি—এই না? আরে পাগ্‌লী, সন্তান—সন্তানই, কি পুত্র—কি কন্যা। আর গোড়ায় আমার একটু পাপ ছিল, সেটারও প্রায়শ্চিত্ত কিছু হবে। মেয়ের সম্বন্ধ কি দেখে স্থির করতে হয়, আমার বেশ জ্ঞান হয়েছে।" একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যেন মুখ আঁধার ক'রে রেখে বেশী তাড়না করো না, মা! একটা ভাল দিন-টিন দেখে নি।"

প্রভা বলিল, "আমাকে পাঠানর বেলায় তোমার ত আবার দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছ'মাস কাটে।"

ব্রজেন্দ্র বামহস্তখানা সস্নেহে তাহার স্কন্ধদেশে রাখিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "এবার তা কাটবে না, মা! আমি বুঝেছি। ওঁদের হাত থেকে যখন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এলাম, তখন তোমার একটা দিকের পীড়াই দেখ্‌লাম—কিন্তু তুমি যে এই বাঙ্গালা দেশেরই মেয়ে, সে কথাটি স্মরণ ছিল না।"

প্রভা নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত।

তুষারতীর্থ—অমরনাথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। হঠাৎ বেশ মেঘ করিয়া আসিল। মাঝিরা ভীত হইয়া উঠিল; প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম, এই শীকারা লইয়াই তথা হইতে যে আর একটি খাল সেনানিবাস, নূতন রাজবাড়ী ইত্যাদির কাছ দিয়া শ্রীনগরের অপর প্রান্ত বেড়িয়া গিয়াছে, সেই খালটি দিয়া বাড়ী ফিরিব,

সন্ধ্যায় 'ডাল হ্রদের' কিয়দংশ

কিন্তু মেঘের জন্য ঐ ঘুর-পথে যাইতে সাহস করিলাম না। যখন শ্রীনগরের সহরতলীর মধ্যে আসিয়াছি, তখন বেশ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভিজিতে ভিজিতে কিছু দূর আসিয়া একটি পুলের তলায় নৌকা রাখা হইল। বৃষ্টি ক্রমশঃ জোরে আরম্ভ হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বৃষ্টি একটু কমিলে আবার আধা-আধা ভিজিতে ভিজিতেই যাত্রা করিলাম। ডালগেটে আসিয়া পূর্ব্বের নৌকায় চড়িলাম।

যখন 'আমবা-কদল' বা 'পহেলা পুলে' আসিলাম, তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। একটা টাঙ্গা ডাকিয়া বাসায় আসিলাম।

শীকারার প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠিল যে, বুড়ীমা যেরূপ শীর্ণ, তাহাতে তিনি অমরনাথের পথে পাহাড় হাঁটিয়া চড়াই করিতে পারিবেন না; তিনি কিন্তু সহজে এ অক্ষমতা মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা, ঐ যে পাহাড়টি দেখা যাইতেছে—কাল সকালে উহাতে উঠা যাক্, কে বেশী চলিতে পারে দেখা যাইবে।" তাঁহার কথামত এবং দ্রষ্টব্য হিসাবেও স্থির হইল যে, আগামী কল্য "শঙ্করাচারিয়া'য়" উঠা যাইবে। পরদিন খুব ভোরেই স্বামীজীরা আসিয়া ডাকিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে এক জন নূতন স্বামীকেও দেখিলাম, ইঁহার নাম "সদানন্দজী"। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম—শঙ্করাচারিয়ার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। নারায়ণ মঠ ও শঙ্করাচারিয়া শ্রীনগরের ঠিক দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত।

সমস্ত সহরটি অতিক্রম করিয়া চলিলাম। তখনও সহর নিদ্রামগ্ন—কাযের কলরব সুরু হয় নাই। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় দোকানপাট, রাস্তাটিও বেশ প্রশস্ত ও পীচ্ দেওয়া। কিছু দূর আসিয়া প্রকাণ্ড একটি পার্ক ও পোলো গ্রাউণ্ড চোখে পড়িল। এগুলি সবই বর্ত্তমান রাজা মহারাজ হরিসিং বাহাদুরের আমলের। শ্রীনগরের পুরাতন বাজার "মহারাজগঞ্জ" নোংরা, রাস্তাঘাট অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; আঁকা-বাঁকা বাড়ীগুলিও শ্রীহীন। শ্রীনগর সহরের সত্য পরিচয় যাহা, তাহাতে ইহার নাম 'বিশ্রীনগর' রাখাই উচিত ছিল।

সোনার বাগ, মুন্সীবাগ, কুঠীবাগ, সেখবাগ প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট ছোট পাড়ার মধ্য দিয়া চলিলাম। এ দিকে

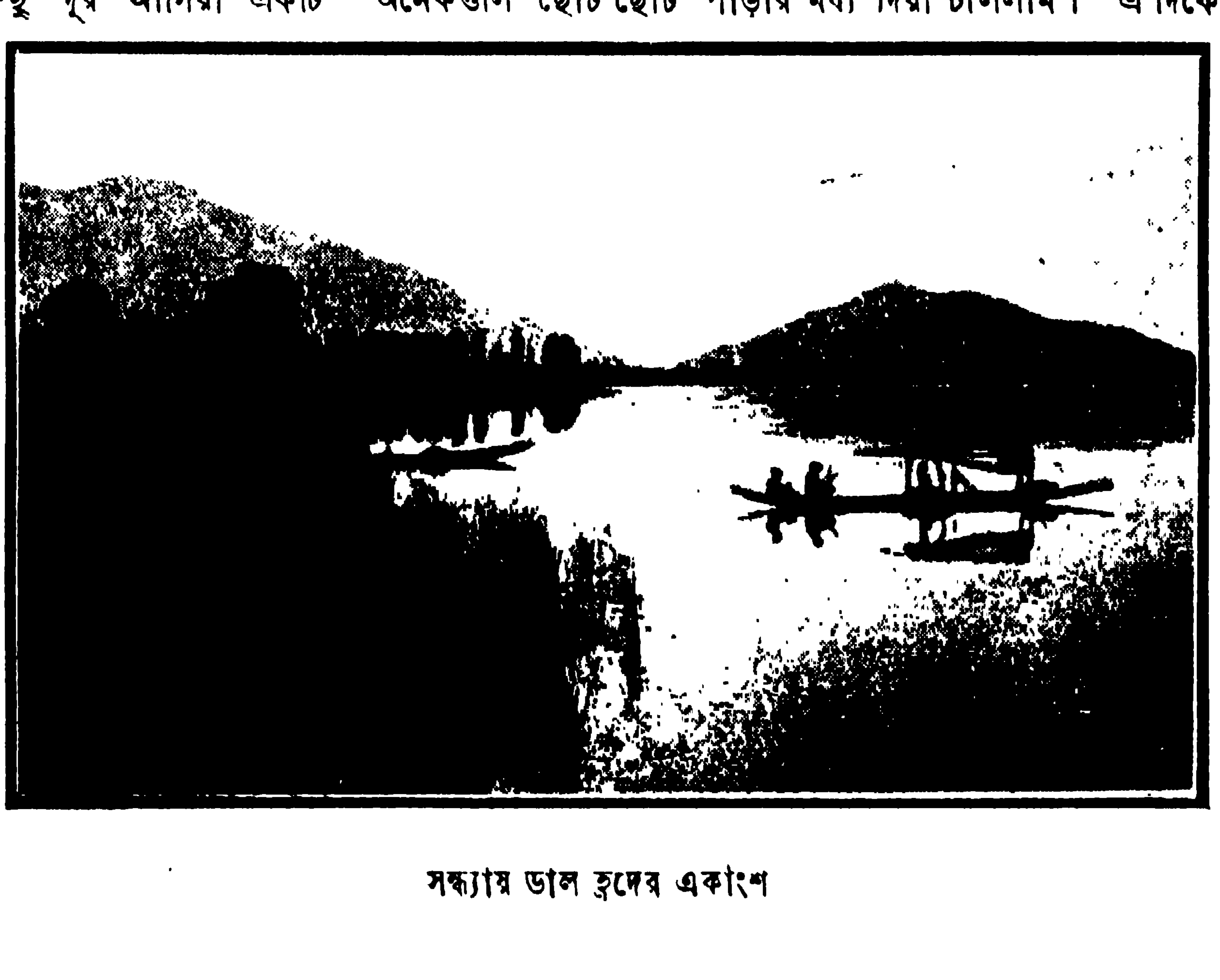

সন্ধ্যায় ডাল হ্রদের একাংশ

একটি গির্জ্জা, কবরস্থান এবং কয়েকটি বড় অট্টালিকা দেখিলাম। সম্ভবতঃ সেগুলি দোকান বা বাসগৃহ হইবে; ভোরের ও কুয়াসার অন্ধকারে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আন্দাজ ৭টার সময় শঙ্করাচারিয়ায় উঠিতে লাগিলাম। গোড়ায় পাহাড়টিকে খুব ছোটই মনে হইয়াছিল, কিন্তু চড়াই শেষ করিতে এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল। অবশ্য রাস্তা তেমন খাড়াই নহে। শঙ্করাচারিয়া শ্রীনগরের মুকুটস্বরূপ, রাত্রিকালে এই মুকুট হইতে ঠিক হীরার মতই জ্বল জ্বল করে একটি তীব্র বৈদ্যুতিক আলো।

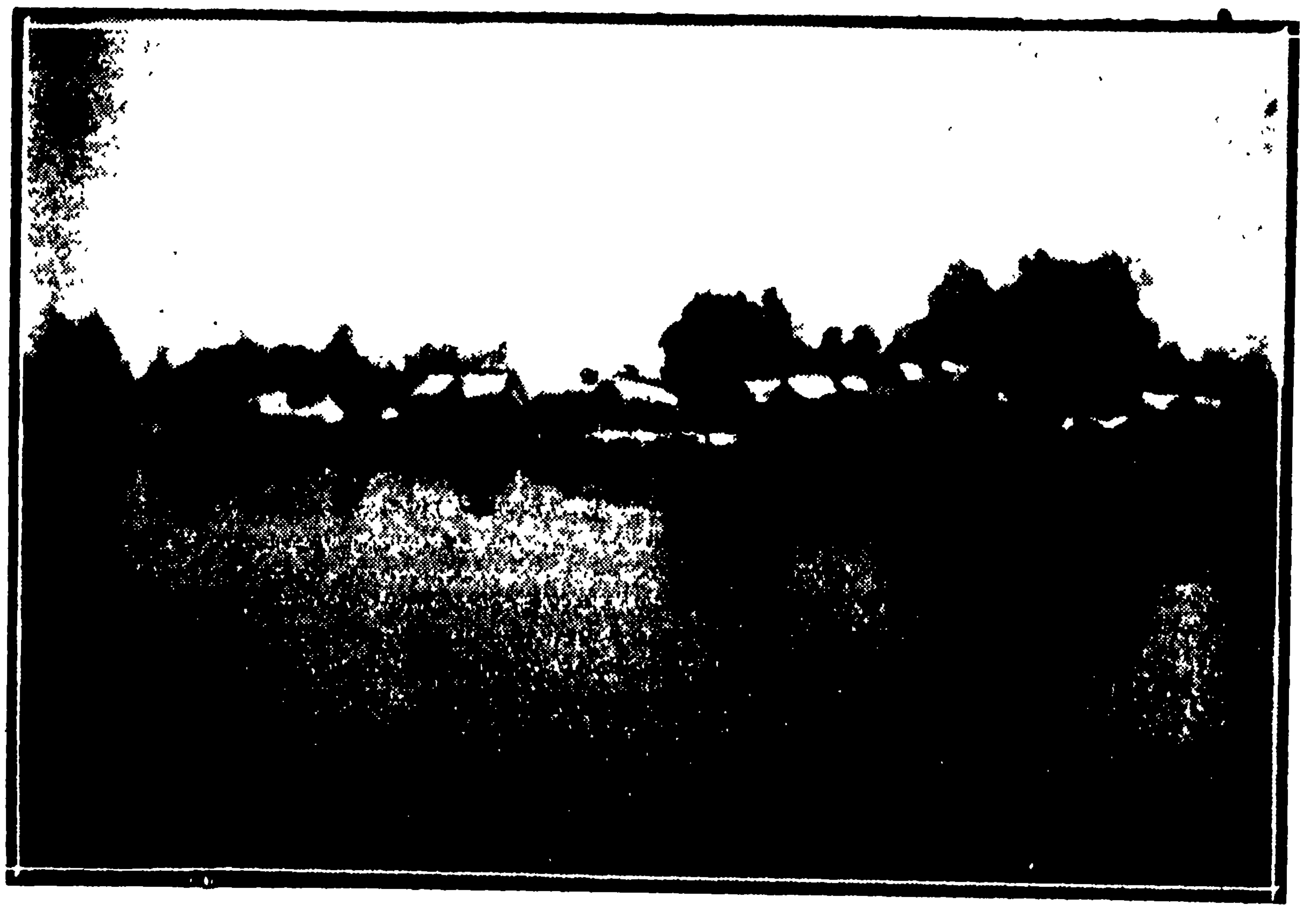

'আমিরাকদল' হইতে নদীর দৃশ্য (শ্রীনগর)

পাহাড়ের মাথায় স্বামী শঙ্করাচার্য্যের স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত শিব ও মন্দির আছে। প্রথম এই মন্দির মহারাজ অশোকের পুত্র জলৌকা খৃঃ পূর্ব্ব ২০০ শতাব্দীতে নির্ম্মাণ করান; সম্ভবতঃ সে সময়কার মন্দিরের কিছুই এখন নাই। তাহার পর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ গোপাদিত্য এই মন্দির পুনর্গঠন করেন। অবশ্য মন্দিরের বর্ত্তমান রূপ দেখিয়া ইহাকে আরও আধুনিক বলিয়া মনে হয়। কেবল মন্দিরের ভিতটি (Plinth) ও কম্পাউণ্ডের দেওয়ালটিও নূতন করিয়া গাঁথা হইতেছে দেখিলাম। মন্দিরের মধ্যে প্রকাণ্ড বাণলিঙ্গ শিব আছেন। মন্দিরের মধ্যে ধূপ-ধুনার সুগন্ধে বেশ একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। শঙ্করাচারিয়ার উপর হইতে (৬২০০ ফুট উচ্চ) সমগ্র শ্রীনগর ও ডাল হ্রদটিকে একখানি ছবির মত দেখায়। এক দিকে ডাল হ্রদের নীল জল আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়া দূরে কালো পাহাড়ের কোলে মিশিয়াছে, অন্য দিকে শ্রীনগরের সোজা সরল রাস্তা দুধারে ছোট ছোট বাড়ী আর সবুজ সফেদা গাছের সারি সমকোণ করিয়া বাগান সাজানর মত বসান। আবার তাহার মাঝ দিয়া রূপার তরবারির মত ঝেলামের শুভ্র ধারা চলিয়াছে। জলের উপর হাউসবোট ও শীকারার মেলা। কোথাও পাহাড়ের কোলে লাল সাদা বাড়ী। কা'ল হইতেই মেঘ করিয়াছিল। ঘন কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া খুব বেশী দূর দৃষ্টি চলিল না। ফটো লইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বাদলার ও কুয়াসার জন্য একটাও উঠিল না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও বন্দনাদি করিয়া আমরা আবার ফিরিলাম। বুড়ীমা পরীক্ষায় বেশ ভালভাবেই পাশ হইলেন। আসিবার সময় দেখি, একটি সাহেব ছুটিয়া উপরে উঠিতেছে; যখন পাহাড়ের পাদদেশে আসিলাম, তখন দেখি, সে আবার ছুটিয়া নামিয়া আসিতেছে। জানিলাম, ব্যায়াম করাই তাহার এই দৌড়াদৌড়ির উদ্দেশ্য এবং সে নিয়মিত এই ব্যায়াম করে। বুঝিলাম, কেন চল্লিশোর্দ্ধেও এই জাতি ল্যাড্ (lad) ও আমরা বিশোর্দ্ধেই বুড়া।

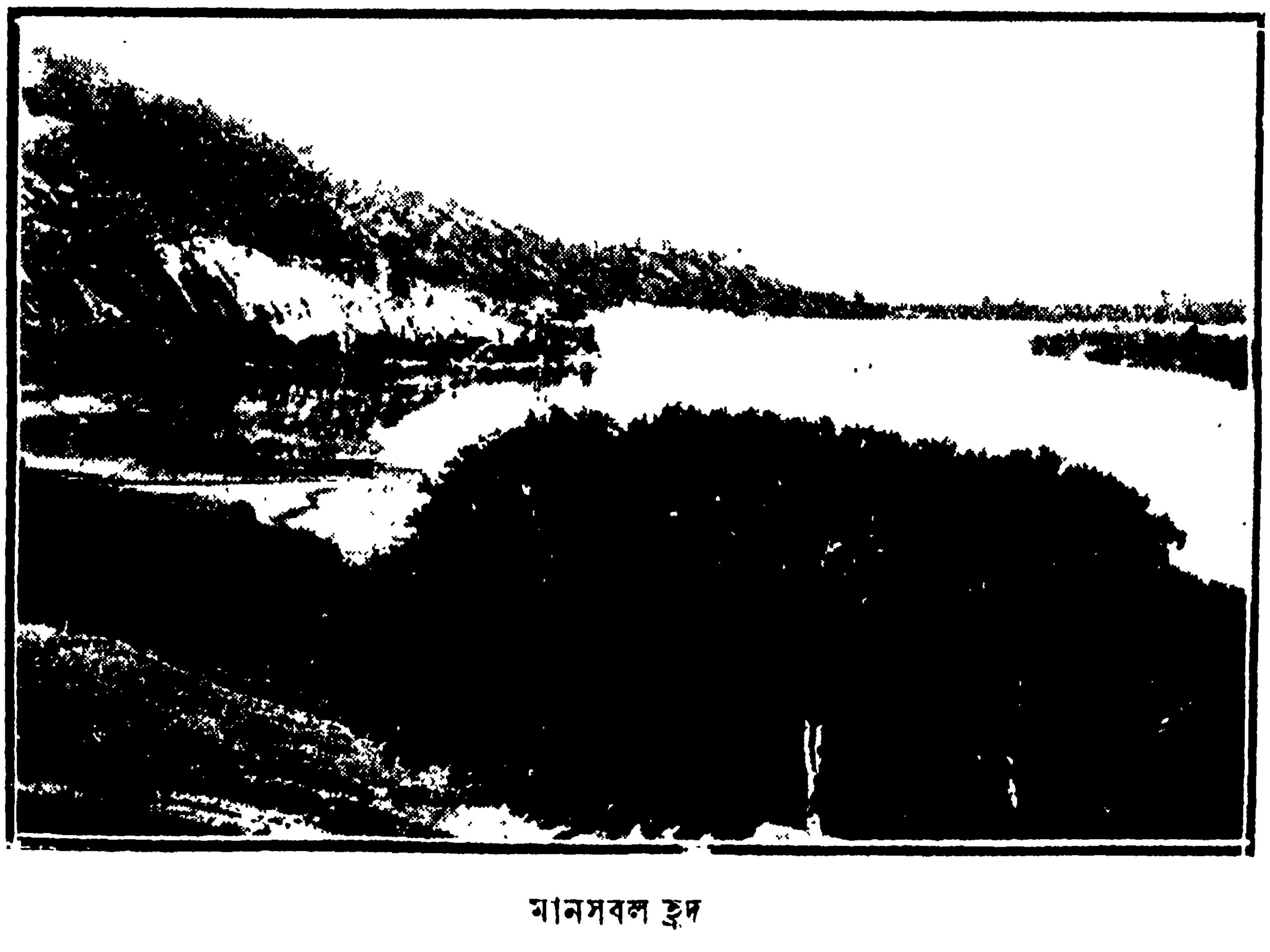

মানসবল হ্রদ

পাহাড় হইতে নামিয়া কিছু দূর আসিয়াই "দুর্গানা" নামে একটি মন্দির দেখিতে গেলাম। মন্দিরটির মধ্যে সিংহাসনের উপর কাচের বাক্সয় ঢাকা একটি দেবী-মূর্ত্তি রহিয়াছেন। অনেকেই পূজা-পাঠ করিতেছেন। এই সব মন্দিরের বড় চমৎকার শক্তি আছে; ভক্ত ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ

নাস্তিকের মনকেও কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য করে। মন্দিরটি দেখিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। পথে টিপি টিপি বৃষ্টি সুরু হওয়ায় বেশী শীত করিতে লাগিল। বাড়ী ফিরিয়া আহারাদি করিয়া বাদলার জন্য আজ মায়েরা আর কোথাও গেলেন না। আমি বায়োস্কোপ দেখিতে গেলাম। এই সময়ে বাজারটিও ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, আমার তোলা ফটোগুলি ডেভোলাপ করিতে দিলাম।

আমিরাকদলের বাজারটি শ্রীনগরের মধ্যে সাজান ও আধুনিক বাজার। ঝেলাম নদী শ্রীনগরের বুক চিরিয়া নগরটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ধীরমন্থরগতিতে চলিয়াছে। ইহার উপর

শাল-আলোয়ানের কারখানা ও দেশীয় লোকদের বসবাস বেশী। জিনা হইতে সফয়ার কদলের মধ্যবর্তী যায়গায় লোকের বসবাস অল্প।

কিছু দূর গিয়া একটি বেশ বড় পার্ক দেখিলাম। পার্কটি অবশ্য উদ্যানের উপযোগী হয় নাই। ইহার উন্নতি বর্ত্তমান মহারাজা হরিসিংই করিয়াছেন। অন্যান্য রাস্তাগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও বাঁকাচোরা, পাশের বাড়ীগুলিও জীর্ণ এবং জানালা-বিহীন। এখানে বাড়ীগুলি তৈয়ার করিবার একটা বিশেষত্ব চোখে পড়িল। প্রথমে বাড়ীটির একটি কাঠের তৈয়ারী কাঠামো বা ফ্রেম তৈয়ারী করা হয়। পরে তাহার

সোপুরের একটি মুসলমান রমণী

নিরাভরণা কাশ্মীর কন্যা

সাতটি সেতু আছে, এক একটির আলাদা আলাদা নাম, সেই নামানুসারে নিকটবর্ত্তী বাজারগুলিরও নামকরণ হইয়াছে—আমিরা, আলি, নয়া সাফয়ার, হাওয়া, জিনা, ফতে; 'কদল' সেতুগুলির নাম। আমিরাকদলটি বড়বাজারের মধ্যে বলিয়া লোক ও যানাদি যাইবার পথ ভিন্ন অপর দিক্ দিয়া জনসাধারণ পুলের উপর যাইতে পারে না। প্রত্যেককেই বাম দিকে যাইতে হয়; লোকের গতিনির্দ্দেশের জন্যও কড়া পুলিস পাহারা আছে। এই বাজারের রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত ও পিচ দেওয়া। চারিপাশের বাড়ীগুলিও আধুনিকভাবে তৈয়ারী। আমিরা ও হাওয়া কদলের মধ্যবর্ত্তী যায়গাই শ্রীনগরের শ্রেষ্ঠ অংশ। হাওয়া হইতে জিনাকদলের মধ্যবর্ত্তী স্থান মধ্যম অংশ। এই অংশে

মধ্যের ফাঁকগুলি ইট দিয়া গাঁথনী করিয়া বুজাইয়া দেওয়া হয়। এ দিকে ভূমিকম্পের দৌরাত্ম্যের জন্যই এ ব্যবস্থা। আমিরা কদল বাজারটিতে ২১৩টি বড় বড় ধর্ম্মশালা, শিখদের অর্থাৎ হিন্দুদের হোটেল, হাউস বোট, বোর্ডিং, সাহেবদের জন্য প্রকাণ্ড নিডোজ হোটেল (ইহা চেনার বাগের কাছে) প্রভৃতি আছে। তা ছাড়া রেষ্টুরেন্ট, কাপড়-জামার, সোনা-রূপার, পেট্রোলের, ফটোর ও অন্যান্য বহু জিনিষের দোকান, পোষ্ট ও টেলিগ্রাম আফিস, বায়োস্কোপ ইত্যাদি আছে। ধর্ম্মশালাগুলিতে নিয়মবিশেষে ৩ হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে দেয়। ধর্ম্মশালায় উঠিয়া বাড়ী, হাউস বোট ভাড়া করা সুবিধাজনক।

ঝেলামের বুকে একটি Hindu Hotel নামে হাউস বোট

আছে। এখানে থাকিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ কামরা পাওয়া যায় এবং চাহিলে খাবার পাওয়া যায়। ঘর হিসাবে দৈনিক ১৷৹ হইতে ২৲ দুই টাকা চার্জ্জ (Charge)। তা ছাড়া খাবারের দাম আলাদা। হাউস বোট এক একটি পুরা ভাড়া করিলে দৈনিক ২৲ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়ায় পাওয়া যায়। কাযেই এখানে থাকা সুবিধাজনক নহে। তবে যাঁহারা একা যান, তাঁহাদের পক্ষে সহরের বুকে থাকা সুবিধাজনক। বড় ভালো হাউস বোট ছাড়াও এখানে ডোঙ্গা নামে এক প্রকার নৌকা পাওয়া যায়। তাহার ভাড়া দৈনিক ১৲ হইতে ১৷৹ টাকার মধ্যে। এগুলিও বেশ বাসোপযোগী। তবে তেমন সাজান নহে। যে কোনও ধর্ম্মশালায় উঠিয়া ২।১ দিন সবগুলিই দেখিয়া একটা ভাড়া করা ভাল। হাউস বোট চাই

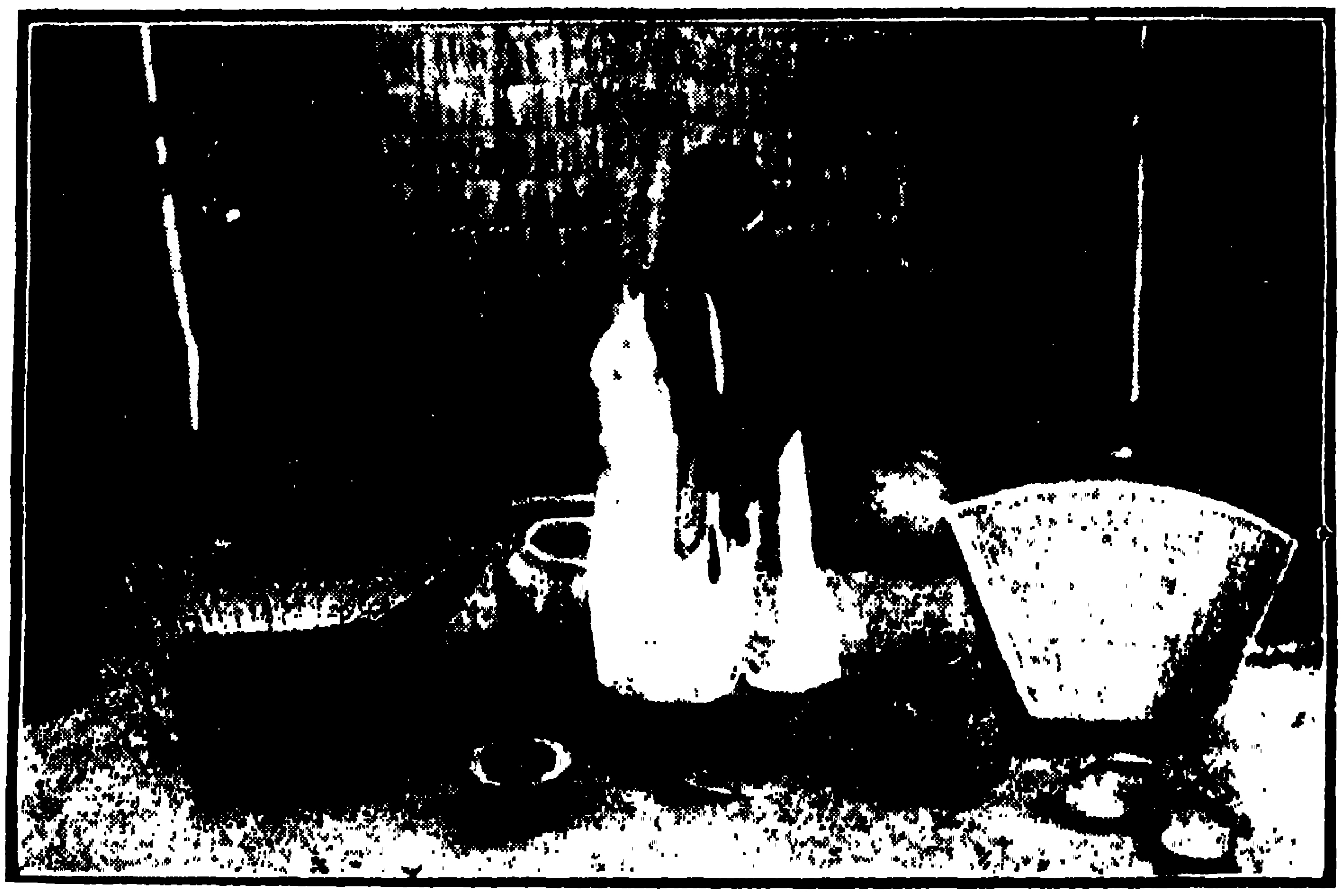

কাশ্মীরী বালিকা ধান কুটিতেছে

বলিয়া আমিরাকদলে দাঁড়াইলেই হইল, মাছির মত অসংখ্য মাঝি আসিয়া মহাসমাদরে বোট দেখাইতে লইয়া যাইবে। ইহাদের সহিত খুব দর-কষাকষি করিতে হয়; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখানকার পুরাতন বাজার মহারাজগঞ্জ। এখানে কেবল পশমী কাপড়াদিই পাওয়া যায়, অন্যান্য জিনিষ মেলে না। সহরটি সন্ধ্যায় দেখিতে বেশ ভালই লাগিল। পূর্ব্বে শঙ্করাচারিয়ার বিরাট ধূম্রদেহ—সহরের সরল রাস্তাগুলি তাহার পায়ে গিয়া মাথা ঠেকাইয়াছে। রাস্তার দুই ধারে সবুজ সফেদার শ্রেণী। কোথাও বিশাল সৌধগুলি আভিজাত্যের গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া; কোথাও চেনার-শ্রেণী তপোবনের স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্য বুকে লইয়া হাসিতেছে—আর এই প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের অধিকারীর দল তাহাদের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য লইয়া আনাগোনা করিয়া বিদেশীর মনে বিস্ময় জাগাইতেছে। শীতের তীব্রতা নাই, গ্রীষ্মের কঠোরতা নাই, মধু-মাসের প্রীতি-মাখা আবহাওয়া—সে দিন—সে সন্ধ্যাটি আজও মনে পড়িলে মনের কোণে তৃপ্তির বীণা বাজিয়া উঠে।

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বায়োস্কোপ দেখিয়া বাড়ী ফিরিলাম। আমাদের দেশের মত এখানে গরীবদের মধ্যে এখনও বায়োস্কোপ দেখার রোগ প্রবেশ করে নাই। দর্শকরা সকলেই ধনী এবং তাঁহাদের বেশ-ভূষা, কথাবার্ত্তা, হাবভাবের মধ্যেই পাশ্চাত্যের অনুকরণের একটি তীব্র প্রচেষ্টা আছে। ফিরিবার পথে কিছু খাবার কিনিয়া লইলাম। এখানে খাবার ভেজাল-বিহীন এবং সস্তা। তাহার প্রধান কারণ—এ বিষয়ে রাজ-সরকারের তীব্র দৃষ্টি। কোনও খাদ্যদ্রব্যই কাশ্মীর হইতে রপ্তানী হয় না—অবশ্য রপ্তানী করা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু রপ্তানী জিনিষের উপর এত উচ্চহারে কর দিতে হয় যে, কেহ রপ্তানী করে না। ফলে দেশের জিনিষ দেশেই থাকে। জিনিষ আপনিই সস্তা হয়। তাহা ছাড়া যদি কেহ ভেজাল জিনিষ বা দুধে জল ধবাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সেই দোকানদারের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। দুই ধারেই ফলের দোকান, রং-বেরংএর নানা প্রকার ফল রহিয়াছে দেখিলাম। বহু ফলের নাম জানি না, ফলগুলি সস্তাও। আখরোট ।৵৹ আনা সের, বাদাম ।৹ আনা সের। আপেল বাগুগোলা (ন্যাসপাতির মত অনেকটা), খোবানী, আরু প্রভৃতি টাটকা অবস্থায় বিক্রয় হয়, শুষ্ক ফল বিক্রয় হয় না। শ্রীনগরে ঔষধ প্রভৃতির দাম অত্যন্ত চড়া। কারণ, তাহার উপর ডিউটি লাগে বেশী। এখানকার একটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে—গরুর বদলে মানুষে গাড়ী টানে। সমস্ত শ্রীনগরের মধ্যে কোথাও গরু দ্বারা গাড়ী টানিতে দেখিলাম না। প্রথমটা শুনিলাম যে, হিন্দু রাজা বলিয়া গরুর প্রতি শ্রদ্ধার বশেই এ ব্যবস্থা, কিন্তু শ্রীনগরের বাহিরে কাশ্মীররাজ্যের মধ্যে অন্যান্য যায়গায় গরুর গাড়ী দেখিলাম, কাযেই এ ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হইল। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, রাস্তা খারাপ হইবার ভয়েই এ ব্যবস্থা।

বাসায় ফিরিয়া শুনিলাম যে, পরদিনই সারদাপীঠ যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অমরনাথ যাইবার দিন ক্রমশঃ আগাইয়া আসায় স্বামীজীরা এত তাড়াতাড়ি 'সারদা' যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীনগর হইতে নৌকায় যাত্রা করিয়া পথে ক্ষীরভবানী, মানসবল প্রভৃতি দেখিয়া সোপুরে মোটর ধরিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানকার নৌকাওয়ালাদের গতিক দেখিয়া আমি স্বামী শঙ্করনাথজীকে নৌকা ভাড়া করিতে অনুরোধ করিলাম। কারণ, দরদস্তুরে তিনি বেশ পাকা লোক। তিনিও একা এ হেন কঠিন কাযে হাত দিতে সাহস করিলেন না, বিশ্বনাথজী এবং তাঁহার পরিচিত নারায়ণ মঠের এক জন ভক্ত পুলিস কনেষ্টবলকে

সঙ্গে লইয়া পরদিনই প্রাতে নৌকার দর করিতে গেলেন। আমি দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বহু ঘোরাঘুরি, বকাবকি করিয়া ৯৲ টাকায় সোপুর পর্য্যন্ত ভাড়া ঠিক হইল। বলিয়া রাখা ভাল, শ্রীনগর হইতে সোপুর পর্য্যন্ত মোটরবাসও আছে, কাশ্মীরের ভাল, সৌন্দর্য্যদর্শন লোভে এবং বিশেষ করিয়া উলার হ্রদের দৃশ্য ও ক্ষীরভবানীর পুণ্য এই দুইটির লোভই আমাদিগকে জলপথে যাইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

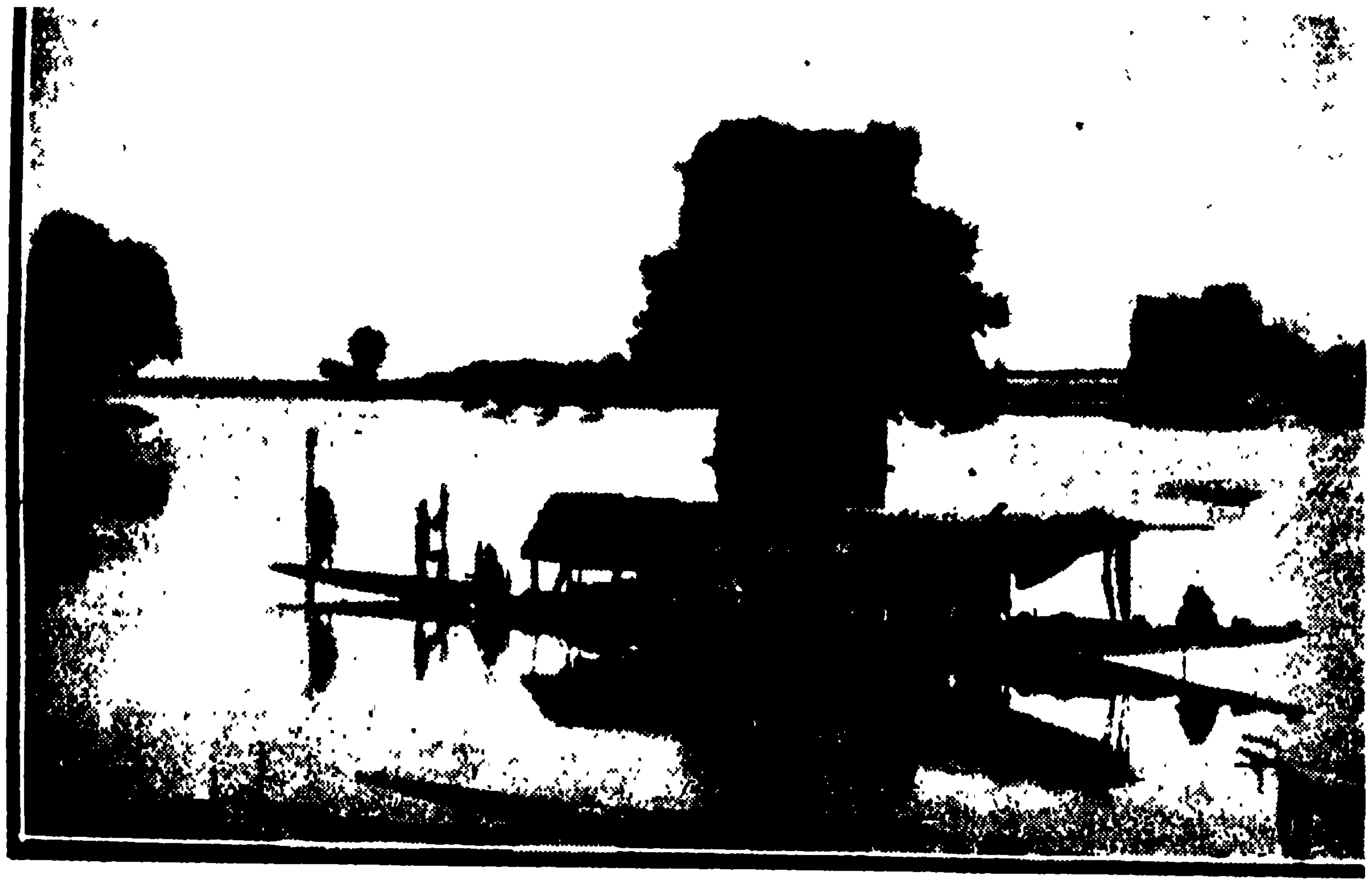

সাদিপুরে আমাদের নৌকা

সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া লইলাম। বাড়তি বাক্সপত্র নারায়ণমঠের একটি ঘরে বন্ধ করিয়া দিয়া সঙ্গে বাসনের একটি বস্তা, বিছানা ও গরম কাপড়জামাপূর্ণ একটি ক্যাম্বিশের লম্বা ব্যাগ লইলাম। যাত্রী হইলাম আমরা চারি জন,—স্বামী বিশ্বনাথজী, শঙ্করনাথজী ও সর্ব্বদানন্দজী। বেলা দুইটার সময় শ্রীসারদা দেবীর চরণ স্মরণ করিয়া নৌকায় চাপিলাম। বৈকালিক জলযোগের জন্য কিছু দুধ, মিষ্ট ও আখরোট কিনিয়া লইলাম।

সারদা দেবীর সন্ধানদাতা শঙ্করনাথজী—কাযেই পথিপ্রদর্শক তিনি হইলেন। অনেকেই কাশ্মীর বা অমরনাথ গিয়াছেন, কিন্তু সারদা যান নাই। কারণ, ইহার সন্ধান জানেন না। ইহা সাধারণ যাত্রিসমাজে পরিচিত নহে—সাধুরাই এখানে দর্শনার্থ আসেন। শঙ্করনাথজী পূর্ব্বে এখানে একবার আসিয়াছিলেন। মায়েদের পূর্ব্বে কোনও বঙ্গমহিলা এ তীর্থে আসেন নাই। কোন বাঙ্গালী গৃহস্থও গিয়াছিলেন বলিয়া শুনিলাম না। ইহা একান্ন মহাপীঠের একটি।

আমাদের নৌকাখানি বেশ একটি ছোট-খাট বাড়ীবিশেষ। অবশ্য হাউস বোটের মত ইহার মধ্যে চেয়ার, টেবল বা খাট নাই এবং হাউস বোটের মত হাত-পা ছড়াইয়া থাকা চলে না, কিন্তু তবু নৌকায় আছি বলিয়া বিশেষ কোনও অসুবিধাও হয় না। ছোট বড় ছয়খানি কুঠরী—আমরা বড় তিনটি কুঠরী পাইলাম, আর মাঝিরা সপরিবারে ছোট তিনটি কুঠরী দখল করিল। আমাদের কুঠরী তিনটির মধ্যে একটি বেশ বড়—সকলে সেই ঘরে শুইতাম—একটি রান্না-ঘর, উনুন, তাক সবই আছে। অন্যটিতে জুতা, কাঠ ইত্যাদি রাখিতাম। এই নৌকাগুলি হাউস বোটের রান্না-নৌকা (Kichen Boat হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাঝিদের পারিবারিক জীবন এই বোটেই কাটে। নৌকায় আমরা ছাড়াও মাঝিদের দলে রহিল—মাঝি, তাহার এক ভাই, স্ত্রী, বছর বারো বয়সের একটি কন্যা আর একটি বছর পাঁচেকের কন্যা। নৌকা ক্রমশঃ শ্রীনগর ছাড়াইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অতি চমৎকার যান এই নৌকা, চলিতেছে মনেই হয় না, এতটুকু শরীর দোলে না অথচ ক্রমশঃ একটার পর একটা দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। কাণের কাছে কেবল জলের কলকল ছলছল আর দাঁড়ের ঝুপঝাপ একটানা শব্দ। কম্বল বিছাইয়া যে যাহার

সম্বল পুল (সোপুরের পথে)

নিজের মত একটু একটু যায়গা করিয়া লইলাম ; আমি একখানা বই লইয়া বসিলাম, আর সকলে গল্পে মন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বই হইতে এক একবার মুখ তুলি আর দেখি, দৃশ্য পাল্টাইয়া গিয়াছে—শ্যামল শস্যক্ষেত্র ছিল, গ্রাম আসিয়াছে, গ্রাম ছিল, বাগান আসিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন আর জলের মিষ্ট হাওয়া সে দিন বড় মধুর লাগিয়াছিল, থাকিয়া থাকিয়া বাঙ্গালা মায়ের মধুর স্মৃতি মনকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। সন্ধ্যার দিকে একটু জোর বাতাস আরম্ভ হইল,তাহাকে ঝড় বলা চলে না ; কিন্তু সেই বাতাস দেখিয়াই মাঝিরা ভীত হইয়া উঠিল ; আর যাইতে চাহিল না। এ বাতাসকে আমাদের দেশের মাঝিরা গ্রাহ্য করে না, কিন্তু ইহারা সামান্য বাতাসকেও ভয় করে। কারণ, এ দিকের নৌকার তলা সমান (flat), গোল নহে, সামান্য বাতাসেই উহা উল্টাইবার সম্ভাবনা আছে। একটি গাছের আড়ালে নৌকা কিছুক্ষণের জন্য বাঁধা হইল—আমরা নৌকা হইতে নামিয়া পা ছড়াইলাম, কেহ কেহ শৌচক্রিয়াও সারিয়া লইলেন। পরে আবার নৌকা চলিল। কিছু দূর যাইয়া ঝেলাম নদী ছাড়িয়া দক্ষিণে সিন্ধু-নদে নৌকা পড়িল। উপরে বৃষ্টি হওয়ায় এবং কয়েক দিন হইতে গরম বেশী পড়িয়াছিল বলিয়া আর পাহাড়ে বরফ গলায় নদীর জল অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছিল। বহু গ্রাম জলে বেষ্টিত। অনেক ঘর পড়িয়াও গিয়াছে, বহু জমী শস্য শুদ্ধ জলে ভাসিতেছে। নদীর ধারে ধারে এই প্লাবনের জন্য অনেক আশ্রয়হীন সাপও দেখা গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও সাদিপুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ধারে নোঙ্গর ফেলিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসন্তের বিদায়

এসেছিলাম, যাবার বেলায় যাচ্ছি ব'লে তাই,
প্রথম দেখা বিদায় নেওয়া এক সাথে হোক ভাই।
ভেবেছিলাম প্রীতির লেখা
পাব তোমার, করব দেখা,
নগরপথে প্রবেশ নিষেধ কেমন ক'রে যাই ?

ভাগ্যে তুমি এসেছিলে আজকে নদীর কূলে।
বিদায় নেওয়া হয়ে গেল তাই এ অশথমূলে।
আমার কথা পড়ত মনে ?
ভাবতে বুঝি অকারণে
মাঘের পরে বোশেখ এলো কালপুরুষের ভুলে ?

কি সাধনায় মগ্ন ছিলে এইটে শুধু ভাবি,
মনের দ্বারে কেন এমন দিলে কুলুপ-চাবি ?
পুরাতন এই বন্ধুজনে
রইলে ভুলে হায় কেমনে ?
বৎসরান্তের অতিথিটির নেই কি কিছুই দাবি ?

একটি কুহু-স্বরও তোমার পশল না কি কানে ?
চাইলে না ঐ নগর-শেষের দিগন্তেরো পানে ?
দ্বার বাতায়ন বন্ধ ক'রে
রাখলে কি ভাই সন্ধ্যাভোরে ?
দখিণারে পাঠিয়েছিলাম তোমারি সন্ধানে।

বিদায়কালে এ সব কথা যাক্ গে এখন তবে,
চিরকালই আমায় এমন আসতে যেতে হবে।
তোমার যে এই ধরার মধু
সাঙ্গ হয়ে আসছে বঁধু,
তোমার সাথে ক'বার দেখা হবে বা এই ভবে।

ভালবাসি বলেই এটা মনে পড়াই ভাই,
তোমার ব্যথায় আমার ব্যথায় প্রভেদ কিছুই নাই :
এবার তোমার অভাবটি হায়,
চির-দিনের অভাব স্মরায়,
এই ব্যথাটি জানাই শুধু, বিদায় বঁধু, যাই।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিবর্ত্তন

৩

একসঙ্গেই সমস্বরে ঐ যে পরস্পরের প্রতি গভীর বিস্ময়-সূচক সম্বোধন দুজনকারই মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, তার পর কিছুক্ষণ দুজনকার মধ্যের এক জনও এই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর-প্রয়োগের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না; পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া যেখানকার ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এ দিকে ভিক্ষা দিতে যে বা যাহারা আসিয়াছিল তারা আর আত্মপ্রকাশ করিল না। কিন্তু বোধ করি, পর্দ্দার পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেও বিরত থাকে নাই এবং খুব বেশী রকম চাপাসুরে তাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর-বিনিময় হইতেও শোনা গেল।

একটুক্ষণ পরেই গভীর বিস্ময়বেগকে প্রশমিত করিয়া লইয়া এই বাড়ীরই যে ছেলেটি আগন্তুককে দেখিতে আসিয়াছিল, সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল এবং একটুখানি সুর করিয়া গানের ভাবেই বলিয়া উঠিল,—

"চলে মুসাফির বাজে একতারা—

কৈ, একটা গোপীযন্ত্র-টন্ত্র নাও নি কেন? একটুখানি অঙ্গহানি থেকে গেছে যে!"

অপর ছেলেটি—যে ভিক্ষা মাগিতে আসিয়াছিল, সে এই কথায় একটুখানি মৃদু হাসিয়া তার হাতে ধরা মাটীর হাঁড়িটি দেখাইয়া বলিল, "সব ভিখিরীর কি একই ভোল হয়? আমার যন্ত্র-তন্ত্রের বদলে এই আছে।"

"বাঃ, তুমি আমার কল্পনাকেও কিন্তু পরাস্ত করেছ! তুমি যে নিশ্চয়ই কোন সহজসাধ্য সাধারণ-বোধ্য সোজা-সুজি কিছু করছো না, এ আমি তোমার কোন খবর অনেক দিন ধ'রে না পেলেও একরকম মোটামুটিভাবে জানতুম। তবে সে যে এতটাই অসাধারণে গিয়ে প্রমোটেড্ হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই ধারণা ছিল না। যাক্, এখন এই ঠিক দুপুর-বেলা, এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধ'রে এক হাঁড়ি হাতে মুষ্টিভিক্ষায় বার হয়েছ কিসের দুঃখে শুনি? কি দেশোদ্ধার হবে তোমায় ঐ মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে? ওর জোরে স্বরাজ লাভ করবে, না সাম্রাজ্য গঠন করবে শুনি?"

আগন্তুক—নাম তার অনিমেষ। সে এই কথার জবাবে হাসিল না, মন তার এ বিদ্রূপে ঈষন্মাত্রও উত্তেজিত হইল না। সে এতক্ষণ অজানা, অচেনা, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত আরও দশ জনের সঙ্গে যেভাবে আলোচনা করিয়া আত্মপক্ষসমর্থন করিয়া আসিয়াছে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিতে চেষ্টা করিল' সহিষ্ণু ও সংযতভাবেই উত্তর করিল,—"এই মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে দেশোদ্ধার ঠিক যে হবেও না, তাও নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি নে। কোন দেশ ত হঠাৎ একবারে এক দিনে সমগ্রভাবে উদ্ধার হয়ে ব'সে থাকে না, আর সমাজগঠন করবার জন্যেও সেই একই পথ নিতে হবে, একটি পল্লী-গঠন করবার জন্যেও সে পথ গ্রহণ করবার দরকার। শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং বাক্যটা নেহাৎ নিরর্থক নয়।"

সুচারু কহিল, "ঠিক বোঝা গেল না কিন্তু ব্যাপারটা। তোমার ঐ মুষ্টিভিক্ষার হাঁড়ি পূর্ণ হ'লে তুমি এসে নিয়ে যাবে শুনলুম, তা হ'লে কি তুমি এই গাঁয়েরই বাসিন্দা হয়েছ? কত দিন আছ?"

অনিমেষ এ কথার জবাব না দিয়া সেই পর্দ্দাফেলা দ্বারের দিকে সহজভাবেই চাহিয়া অবশ্য সুচারুকেই উপলক্ষ করিয়া বলিল,—"কিন্তু এখনও ত আমার আবেদন পূর্ণ হয় নি!"

"ওঃ, হ্যাঁ, ঠিক কথা! তোমার আবেদন পূর্ণ হয় নি" এই বলিয়া সুচারু সহাস্য-স্মিতমুখে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া সেই যবনিকার অন্তরালবাসিনীদের মধ্যের একতমাকে লক্ষ্য করিয়া ডাক দিয়া বলিল,—"শ্রীমতী রুচিদেবি! আপনার নাম অসার্থক হয় নি! যদিও আমি মধ্যে মধ্যে সংক্ষিপ্তকরণোদ্দেশ্যে আপনার নাম থেকে প্রথমাংশটুকু বাদ দিয়ে থাকি, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, ঐ পদপ্রয়োগটুকুতে আমার আপত্তি বা অনিচ্ছা আছে, অথবা আপনার ঐ বিশেষ শব্দটুকুতে অধিকার নেই। নাঃ,

কে বলে? আপনার রুচির আমি সম্পূর্ণরূপেই প্রশংসা করি, মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি, তা বাস্তবিকই সুরুচি! এখন আসুন, ভিক্ষার্থীকে আর প্রতীক্ষায় রাখবেন না, যা দেবেন, দিয়ে যান।"

কেহ আসিল না। ভিতরে সরু চুড়ির ঝুনুঝুনু এবং সমুত্তেজিত কোমল কণ্ঠের অর্দ্ধস্ফুট চাপা তর্জ্জন শোনা গেল, আবার একটুখানি কলঝঙ্কারী ব্যঙ্গ-হাস্যও সেই সঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া যখন জানা গেল, ভিতর হইতে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই, তখন অগত্যা সুচারুকেই ভিতরে যাইতে হইল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়াই ঘরের মধ্যে একটা আধচাপা সুরের বাগ বিতণ্ডা চলাচলির পর অবশেষে অনিচ্ছামন্থরপদে বাহির হইয়া আসিল সেই আগেকার সেই মেয়েটি—যাকে অনিমেষ এ বাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই দেখিয়াছিল, আর খুব সম্ভব যাহার উদ্দেশ্যে সুচারু এতক্ষণ ঐ সুরুচির সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া উপহাস করিতেছিল, এবং যাহাকে রুচি দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল, ইনি সেই তিনিই।

মুখখানি ঈষৎ রাঙা, চোখদুটি অল্প আনত, সর্ব্বশরীরে লজ্জা-সঙ্কোচের একটুখানি ব্রীড়া বিজড়িত; মেয়েটি আসিয়া অনিমেষের সাম্‌নে দাঁড়াইল, ডান হাতটা অনিমেষের দিকে বাড়াইয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এই নিন।"

অনিমেষ হাত পাতিল, তার হাতে পড়িল দশ টাকার একখানি নোট। সে সকৃতজ্ঞ-চোখে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সুচারু বাহির হইয়া আসিয়া ব্যস্ত-ভাবে বলিয়া উঠিল,—"এ কি বেল্লিকপণা! বল, 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি! না বল্লে দিও না, সুরুচি!"

ততক্ষণে নোটখানি অনিমেষের হাতে পৌছিয়া গিয়াছে, অনিমেষ তাহা সুচারুকে দেখাইয়া সহাস্যমুখে পকেটে পুরিল।

সুরুচি ঈষৎ দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সুচারু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এঃ, প্ল্যানটা মাটী হয়ে গেল! তার পর অনিমেষ! তোমায় যা জিজ্ঞেস করলুম, তার ত কোন জবাব দিলে না। ভিক্ষা ত মিলেছে, এই-বার তোমার খবর সব বল দেখি?"

অনিমেষ বোধ করি বসিয়া পড়িবারই জন্য ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল; বসিবার মত স্থান কোনখানেই না পাইয়া শেষকালে যেমন ছিল, তেম্‌নই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল,—"আমার খবর বলবার মত কি আছে? এই যা দেখতে পাচ্ছো, এই-ই আমার পথ, এই পথ ধরেই চ'লে যাচ্ছি। ফল? ওখানে আমি গীতার ভগবান্‌কেই আদর্শ করেছি, অনাশ্রিতং কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্ম করোতি যঃ। এই হলো আমার মটো। ফল পাবার হয় পাব, না পাবার হয়, পাব না, তার জন্যে কায করবো কেন?"

সুচারু ঐ একটি কথার মধ্য দিয়াই তার পূর্ব্ববন্ধুর উদ্দেশ্যটা যেন দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল। নিজেদের কলেজের জীবন মনে পড়িল। তখনও সুচারুর সঙ্গে অনিমেষের রুচিভেদ ও মতভেদ একটুও কম ছিল না, অনেকানেক জটিল বিষয় লইয়া তাদের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক চলিয়াছে, কেহই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। হোষ্টেলশুদ্ধ ছেলে এক এক দিন প্রবৃত্তিমত দুই দলে যোগ দিয়া সে কি তুমুল তর্কযুদ্ধ! আজও যে অনিমেষ তার নিজের মতকে পূর্ণরূপেই সমর্থন করিয়া প্রতিপক্ষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান জানাইতে কিছুমাত্র অপ্রস্তুত নয়, এই কথাই সে তার ঐ দৃঢ়োক্তির দ্বারা ঘোষণা করিয়া দিল! অস্ত্রযুদ্ধ সম্বন্ধে যা-ই থাক্, তর্ক-যুদ্ধে আপত্তি সুচারুরও কিছুমাত্র ছিল না। সে এতক্ষণ পর্য্যন্ত অনন্যো-পায় হইয়া, ঐ যে মেয়েটি শরতের শিশিরসিক্ত প্রভাতপুষ্পের মতই ঢলঢলে মুখখানি, সন্ধ্যাশুকতারার মতই যার স্নিগ্ধোজ্জ্বল চোখদুটি, ললিতলতার মত সুকুমার যার তনুদেহ, ঐ সুরুচিকে লইয়াই যথাসাধ্য বাদবিবাদের প্রচেষ্টায় নিরত ছিল, কিন্তু সকল সময় এমন আত্মপক্ষ-সমর্থনে অসমর্থ প্রায় অসহায় প্রতিপক্ষ লইয়া তর্কযুদ্ধের আনন্দাস্বাদ লাভ করা যায় না। বেশী বাড়াবাড়ি হইয়া গেলে অপরপক্ষ হয় ত বা অশ্রুবন্যা বহিয়া আনিয়া তর্ক-মেঘকে উড়াইয়া দেয়। তখন আবার তোষামোদে বিপরীত বাতাস সৃষ্টি করিয়া বৃষ্টি বন্ধ করিতে হয় এবং অনেকক্ষণই আর সুযোগ যুটিলেও—তর্কস্পৃহা উদ্দাম হইয়া উঠিতে থাকিলেও তাহাদের দমন করিয়া রাখিতে হয়, ভরসা হয় না।

আজ প্রথম-যৌবনের প্রিয় বান্ধব এবং তর্ক-সংগ্রামের মহারথকে বহুকাল পরে এমন অতর্কিতভাবে ফিরিয়া

পাইয়া সুচারু একেই একান্তভাবেই আনন্দিত হইয়াছিল, তার উপর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে একটা বড় রকম তর্কযুদ্ধের সূচনা দিয়া কথারম্ভ করিতে দেখিয়া তার যেন আনন্দের আর অবধি রহিল না।

সেও সঙ্গে সঙ্গেই অনিমেষের কোট-করা গীতা-শ্লোকের অপরার্দ্ধ সংযুক্ত করিয়া দিয়া উচ্চারণ করিল, 'স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ'; তা হ'লে অনিমেষ! তুমি আর অনিমেষ নেই; গুড়াকেশ ইত্যাদি কোন একটা নাম দিয়ে তোমায় ডাকা চলতে পারে! সন্ন্যাসীজীও বলতে পারি; কিন্তু গেরুয়া ধর নি কেন?"

অনিমেষ আর একবার চারিদিকে চাহিয়া হয় ত বা নিজেরও অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা খুঁজিল, তার পর কাপড়ের খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া হাসিয়া উত্তর দিল এবং প্রশ্নও করিল,—"কে বল্লে আমি সন্ন্যাস নিয়েছি?"

সুচারু কহিল, "বাঃ, তুমিই ত বল্লে 'অনাশ্রিত্য কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্ম করোতি যঃ' আর তা হলেই 'স সন্ন্যাসী চ যোগী চ' ইত্যাদি ওর সঙ্গে ত সংযুক্ত হবেই। যোগী বা সন্ন্যাসী না হ'লে কর্ম্মফলত্যাগী কর্ম্মীর পদকে তুমি কি বলতে চাও?"

অনিমেষ কহিল,—"কিছু না, শুধুই সে কর্ম্মী, সে সন্ন্যাসীও না, যোগীও না, অর্থাৎ সে নিজেকে ওসব কিছুই জানবে না, তার কর্ম্ম করাই ব্রত, সে তাই ক'রে যাবে।"

অনিমেষ এবারও সেই চূণ-সুরকি ছড়াছড়ি ভারাবাঁধা দালানটার মেজের দিকে চোখ নামাইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাবধি সে ঘুরিতেছে, দ্বিপ্রহর অতীত, একবারও প্রায় বসে নাই, বোধ করি, একটু বিশ্রামের নিতান্তই প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।

সুচারু সহাস্যে কহিল, "সে না জানতে পারে, কিন্তু লোকে ত জানবে? লোকে তাকে কোন্ পদবী দেবে? আচ্ছা—"

ঝুনু-ঝুনু সরু চুড়ির মৃদুরোল, খুব একটুখানি অতিমৃদু কেশসৌরভ, তার পরই তেমনই মৃদু শান্ত একটি শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর,—"সুচারু বাবু! ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিন না, খাওয়াও হয় ত হয় নি, তর্ক একটু পরে করুলে হতো না?"

"ওঃ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ সুরুচি! সাধ ক'রে কি তোমার নাম সুরুচি রাখা হয়েছিল! মদালসার ছেলেরা যেমন নামের মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন, তুমিই ঠিক তাই করছো দেখছি! আচ্ছা, এই আমি তর্ক বন্ধ করলুম। অনিমেষ! ভেতরে এসো।"

সুচারু অগ্রসর হইতে গেল, কিন্তু আবার তাহাকে ফিরিতে হইল। তার পিছনে অনিমেষ তখন একটু কুণ্ঠিত-কণ্ঠে আপত্তি তুলিয়াছে—"না না, থাক,—শোন সুচারু! শোন, শোন, ও সব নিয়ে তোমাদের বিব্রত হবার দরকার নেই। আজ না হয় চল্লুম, আর এক দিন অন্য সময় এসে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে। আচ্ছা, তা হ'লে"— অনিমেষ গমনোদ্যত হইল।

সুচারু তার কাছে আসিয়া দৃঢ়ভাবে বলিল, "তাও কি হয়? তুমি হ'লে আমায় এমন সময় এ ভাবে ছেড়ে দিতে? না না, আপত্তি করো না, বলবে হয় ত, যে দিতে, কেমন না? তারও উত্তর আমার কাছে আছে। ঐ গীতাকেই কোট করবো। থাক্, করবো না, তা হলেই আবার আমাদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয়ে, আমাদের খুব নিকটেই অথচ একটু অন্তরালে অবস্থিত শ্রোত্রীবৃন্দের কর্ণশূল উৎপাদন করবে। তা ছাড়া ভাল কথা, এই গৃহের গৃহস্বামিনীরাই যখন তোমায় আতিথ্যের আমন্ত্রণ করছেন, তখন তাঁরা তাঁদের অতিথি-নারায়ণকে অসৎকৃত অবজ্ঞাত অবস্থায় ফিরতে দেবেনই বা কেন? তুমি কি ভাবো, তুমিই শুধু গীতাতত্ত্ব সার করেছ, আর কেউ কিছুই জানে না? ভাস্করানন্দ স্বামী যেটা ইংরেজদের সম্পর্কে কোন ভারতীয় মনীষীকে একদা বলেছিলেন, সেই কথাটাই বলি, 'তোম্ গীতা পড়তেহো, উসব্ গীতা করতে হেঁ।' এর উত্তর তিনিও খুঁজে পান্ নি, তুমিও পাবে না।"

অনিমেষ ঈষৎ হাসিল। হাসিলে তাহাকে আর একরকম দেখায়। মেঘাবৃত সূর্য্য হঠাৎ মেঘস্তর ভেদ করিয়া একবার চকিতের মত দেখা দিলে যেমন দেখায়, অনেকটা যেন সেই রকম। আর বাহিরের গাম্ভীর্য্যের মস্ত মোটা বর্ম্মটা তখন বারেক খসিয়া গিয়া তার ভিতরকার আসল রূপটুকু যেন দেখা যায়। হাসিয়া সে বলিল,—

"তা হয় ত পাবো না; কিন্তু তাঁদেরই বা অনর্থক বিব্রত করা কেন? আমার এরকম ত অভ্যাসই আছে। তা ছাড়া আরও দুটো হাঁড়ি দুটো বাড়ীতে গছাতে হবে, সে না সেরে ত আর বিশ্রাম করা চলে না, তাই—"

সুচারু অসহিষ্ণু হইয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "খুব চলে, ওবেলা বরং ওদুটো ঢু বাড়ীতে দিয়ে দিও।"

অনিমেষ সুচারুর ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া আবার তেমনই করিয়া ঈষৎ হাসিল, তার সেই হাসি তার হইয়া উত্তর করিল, বলিল, "তা ত হয় না, সুচারু! সে ত আমার নিয়ম নয়।"

সুচারু ইহা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "না না, হাসি নয়, অনিমেষ! এস, এস, অনেক বেলা হয়েছে, আর এই শরৎকালের রোদ! শরীর-টাও ত বাঁচানো চাই, ভাই। অন্ততঃ ধর্ম্মসাধনের জন্যেও ত শরীররক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবে?"

অনিমেষ এবার আর হাসিল না, সহজ শান্তকণ্ঠেই স্পষ্ট কথা দিয়াই এ বাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "নিয়ম আমি ভাঙ্গবো, সুচারু? অনর্থক তুমি কষ্ট পেয়ো না, লক্ষ্মীটি ভাই। আমায় ক্ষমা করো, আমি আর এক দিন আসবো—ঠিক আসবো।"—অনিমেষ দালানের উঠা-নামার সিঁড়িটার প্রথম ধাপে পা দিয়া মুখ ফিরাইয়া সুচারুর বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিল, "রাগ করো না, সুচারু! আমি—"

দরজার পর্দ্দা সরাইয়া সেই মেয়েটি আবার বাহির হইয়া আসিল। এবার সে আর সলজ্জ কুণ্ঠিতভাবে নয়, বেশ সহজ সঙ্গতভাবেই অগ্রসর হইয়া অনিমেষের কাছে গেল, এবং তার হাতে ধরা হাঁড়ি দুটা নিজের দুই হাত দিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এ হাঁড়ি দুটোর ভার আমিই নিলুম, এ দুটোর হিসাব আমার কাছ থেকেই আপনি পাবেন। আসুন, এখানে চান ক'রে খেয়ে তবে যেতে পাবেন।"

অনিমেষ একান্ত বিস্ময়ে মেয়েটির মুখের দিকে বারেক চাহিয়া দেখিয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। আর কোন আপত্তির ভাষাই সে খুঁজিয়া পাইল না এবং তার দরকার বোধও করিতে পারিল না।

সুচারু প্রথমটা একটুখানি থমকিয়া থাকিয়া পরক্ষণে উচ্চহাস্যে স্তব্ধ মধ্যাহ্নের বিশ্রামশীলা প্রকৃতিকে যেন উচ্চকিত করিয়া তুলিল। তার হাসির শব্দে এই পুরাতন পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত গৃহের একটা ফাটলে একটা যে ঘুঘু ডাকিতে-ছিল—ঘুঘু ঘু, ঘুঘু ঘু, সেটা হঠাৎ থামিয়া গেল; একটা বিড়াল উচ্ছিষ্ট-ভোজন সমাধা করিয়া আসিয়া অতিভোজনের আলস্যবিলাসে গা ভাঙ্গিতেছিল, চকিতে সোজা হইয়া সেটা ছুটিয়া পলাইল।

হাসিয়া সে বলিল, "সুরুচি! নাঃ, তোমার কাছে হার মানতেও সুখ আছে! আমার হিংসে হচ্ছে, অনিমেষ! যদিই আমি প্রথমাবধি ওঁদের উদার পদপল্লবের কাছে পরাভব মেনে নিয়ে ব'সে না থাকতুম, আজ হয় ত তোমার মতই পরাজয়ের গৌরবটুকু অর্জ্জন ক'রে নিয়ে ধন্য হ'তে পারা যেত! যাক্, বৃথা ক্ষোভে কোন ফল নেই। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই বিজয়িনীর গৌরবটুকু যেন অটুট থাকে, সুরুচি!"

ঘরের মধ্যে সকলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সুচারুর কথার ভিতর যেন কিছু একটা দ্ব্যর্থভাব অনুভব করিয়া একসঙ্গেই অনিমেষ এবং সুরুচি ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল, অনিমেষ একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল, সুরুচি একটু লজ্জা।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। ঘরের চারিধারে চঞ্চল দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সুচারু ঈষৎ বিস্ময়ে সুরুচিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি?"

সুরুচি টানা-পাখার দড়িটা একটা চাকরকে ডাকিয়া তার হাতে দিতে দিতে অন্য দিকে মুখ করিয়াই উত্তর করিল, "নিজের ঘরে গেছে।"

মুহূর্ত্তমধ্যে অনিমেষ শশব্যস্তে তিন পা পিছাইয়া গিয়া হাত তুলিয়া বারণ করার ভাবে বলিয়া উঠিল—"মাপ করবেন! অন্যের হাতের হাওয়া আমি খাই না। দরকার ছিল না, তবে যদি নিতান্ত না হ'লে দুঃখিত হন, একখানা হাত-পাখা দিলেই যথেষ্ট হবে।"

এই কথায় সুরুচি থমকিয়া দাঁড়াইয়া তার পর দ্রুত-পদে পাখা আনিতে চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

শর্করা-শিল্প

ভারতে শর্করা-শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য যখন সমগ্র দেশে একটা সাড়া পড়িয়াছে, দেশের সর্ব্বত্রই শর্করা শিল্পবিশারদগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতার আলোক-সম্পাতে ধনী, শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে একটা জাগরণের প্রেরণা দিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তখন এই শিল্প সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া আমরা শর্করা-বিজ্ঞানের বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সম্প্রতি বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্কের (Import duty) হার সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে প্রতি মণ চিনির উপর ৩।১৫ টাকা শুল্ক ধার্য্য ছিল; গত বর্ষ অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে এই শুল্কের হার ৫৸১০ টাকা হিসাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই অতিরিক্ত শুল্কবৃদ্ধি ভারতে শর্করা-শিল্প-প্রতিষ্ঠার বিশেষ অনুকূল। এই সুযোগে যদি ভারতবাসিগণ ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে না পারেন, তবে হয়ত অদূর-ভবিষ্যতে এ দেশে এই শিল্প বিদেশীয়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাদেরই একাধিপত্যে পরিচালিত হইবে ও সেই সকল প্রতিষ্ঠানে এ দেশের ধনি-সম্প্রদায় অংশ বা সেয়ার গ্রহণ করিয়া তাহাদের মূলধনের অভাব মোচন করিবেন।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয় এবং সেই ইক্ষুর অধিকাংশই গুড় ও অতি সামান্য অংশ চিনি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইক্ষু ব্যতীত নারিকেল, খর্জ্জুর ও তালের গুড়ের উৎপাদন নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু তত্রাচ প্রতিবৎসর প্রায় ১৪।১৫ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী চিনি ভারতে আমদানী হইতেছে। এক সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেশীয় প্রথায় প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইত, কিন্তু ক্রমে জাভা, মরিসস্ প্রভৃতি দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের শর্করা-শিল্প হঠিয়া গিয়াছে। কি কি কারণে ভারত এই শিল্পে অন্যান্য দেশের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে নাই, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

অন্যান্য দেশে ইক্ষুদণ্ড হইতে শর্করা প্রস্তুত করিবার জন্য যে প্রথা অবলম্বিত হয়, আমরা সর্ব্বপ্রথম তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া, পরে প্রচলিত দেশীয় প্রথায় ও তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া আরও উন্নত প্রণালীতে ইক্ষুরস বা গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার বিষয় আলোচনা করিব। পাশ্চাত্য দেশে এবং জাভা, মরিসস্ প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুদণ্ড হইতে রস নিষ্কাশনের জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনটি প্রথা অবলম্বিত হয়:—

প্রথম—বাষ্পপরিচালিত পেষণযন্ত্র (Horizental Roller Mill); এই পেষণযন্ত্র-সাহায্যে ইক্ষুদণ্ডের সমস্ত রস নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় না। কারণ, কলের কার্য্যক্ষমতা যতই অধিক হউক, ইক্ষুর কৌষিক ঝিল্লী (Cell walls) সম্পূর্ণ ছিন্ন না হইলে কোষের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত রস কেবল নিষ্কাশনে বাহির হইতে পারে না। এ জন্য এই কলের সাহায্যে ইক্ষুদণ্ডের শতকরা ৭০ ভাগ মাত্র রস বাহির করা যায়; অবশিষ্ট রস কতক কৌষিক ঝিল্লীর মধ্যে ও কতক 'ছিবড়ার' মধ্যে থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয়—প্রথম প্রথার কতক সংস্কার বা উন্নতিসাধন করিয়া এই প্রথার প্রচলন হইয়াছে। অর্দ্ধপিষ্ট ইক্ষুদণ্ড গরম জলে ভিজাইয়া পেষণ করিলে প্রথম পন্থা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রস পাওয়া যায় এবং এই প্রকারে ইক্ষুদণ্ডের শতকরা ৭৫ ভাগ রস নিষ্কাশন করা সম্ভব।

তৃতীয়—ইক্ষুদণ্ড হইতে ব্যাপকভাবে (Diffusion) বা দ্রাবণ প্রক্রিয়ায় রস-নিষ্কাশনের প্রথাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এ জন্য ইক্ষুদণ্ডগুলি না পিষিয়া যন্ত্র-সাহায্যে প্রায় ১/১৬ ইঞ্চি পাতলা করিয়া কাটা হয়। আখ পেষাই করিতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, ঐরূপ পাতলা করিয়া কাটিতে তদপেক্ষা অনেক অল্পপরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। অতঃপর আখের টুকরাগুলি ব্যাপিকা-যন্ত্রের মধ্যে (Diffusion battery) রাখিয়া ফুটন্ত জলে উহার শর্করার অংশ দ্রব করা হয়। ব্যাপিকা-যন্ত্রটি পরস্পর নল দ্বারা সংযুক্ত কয়েকটা লৌহনির্ম্মিত একমুখবন্ধ বড় চোঙ্গ (Cylinders) দ্বারা নির্ম্মিত হয়। আখের টুকরাগুলি ইহার প্রথম চোঙ্গের মধ্যে রাখিয়া গরম জলের মধ্যে আলোড়িত করিলে অধিকাংশ শর্করা গরম জলে দ্রবীভূত হয়। অতঃপর টুকরাগুলি প্রথম চোঙ্গ হইতে দ্বিতীয় চোঙ্গে পরিচালিত করিয়া সেখানেও ফুটন্ত জলের মধ্যে আলোড়িত করা হয় এবং তাহাতে দ্বিতীয় চোঙ্গের গরম জলে অবশিষ্ট শর্করা দ্রব হয়। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ৩।৪টি চোঙ্গের গরম জলে আখের টুকরাগুলি আলোড়িত করিয়া যখন উহা বাহির করা হয়, তখন উহাতে শর্করার অংশ কিছুই থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইক্ষুদণ্ডে সাধারণতঃ শতকরা ৯০।৯১ ভাগ রস থাকে এবং উল্লিখিত প্রথায় ইক্ষু হইতে শতকরা ৮৫।৮৬ ভাগ রস জলে দ্রব হয়। এই প্রক্রিয়ায় রসনিষ্কাশনের আর একটি সুবিধা এই যে, গরম জলে রস দ্রব হওয়ায় ইক্ষুরসস্থ অণ্ডলালবৎ (Albuminoids) পদার্থ ও অপরাপর জৈব পদার্থ তাপ-সংস্পর্শে জমিয়া চোঙ্গের তলদেশে সঞ্চিত হয়। সুতরাং এই উপায়ে যে রস সংগৃহীত হয়, তাহা অনেকটা বিশুদ্ধ শর্করার দ্রব। পেষাই কল অপেক্ষা এই প্রথায় শতকরা প্রায় ২০ ভাগ অধিক রস পাওয়া যায়। অতঃপর নলের মধ্যস্থ জলের সহিত মিশ্রিত রস বাহির করিয়া মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইলে ঈষৎ হরিদ্রাভ পরিষ্কার রস পাওয়া যায়। এই রসে দ্রাক্ষা-শর্করা (Glucose) থাকে না। যে রসে দ্রাক্ষা-শর্করার অংশ যত অধিক থাকে, সেই রস হইতে উৎপন্ন গুড়ে তত অধিক "মাত গুড়" থাকে এবং তাহা হইতে দানাদার চিনি প্রস্তুত করা বিশেষ অসুবিধাজনক।

রসশোধন-প্রণালী—তৃতীয় পদ্ধতি ব্যতীত উল্লিখিত যে কোনও উপায়ে নিষ্কাশিত রস হইতে শর্করা ভিন্ন অপর সকল জৈব ও অজৈব পদার্থ বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন; নতুবা উহা হইতে যে শর্করা উৎপন্ন হইবে, তাহা পরিষ্কার ও উত্তম দানাদার হইবে না; কিন্তু পেষাই কলের সাহায্যে রস বাহির করিলে সেই রস বিশোধন করা একান্ত আবশ্যক। ৪০।৬০ ছিদ্রবিশিষ্ট তারের জাল-নির্ম্মিত ছাকনী দ্বারা রস ছাঁকিয়া পরে উহাকে উত্তপ্ত করিয়া অথবা উহার সহিত রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া লইলে, উহা অনেকটা শোধিত হয়। উত্তাপ দ্বারা রস শোধন করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ, রসের মধ্যে কতকগুলি উচ্ছলনক্ষম (Fermentive) জীবাণু বা উদ্ভিদাণু (Fungus) থাকে। এই সকল জীবাণু বায়ুর অম্লজান (Oxygen) সংস্পর্শে রসের মধ্যে উচ্ছলন-ক্রিয়ার প্রবর্ত্তন করিয়া সত্বর উহাতে শির্কাম্ল (Acetic acid) উৎপাদন করে, এবং রসের মধ্যে যদি অধিক পরিমাণে শির্কাম্ল উৎপন্ন হয়, তবে উহার দানাদার শর্করার (Crystallisable sugar) অংশ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। অম্ল সহযোগে উত্তপ্ত করিলে দানাদার শর্করা বিশ্লিষ্ট হইয়া নিরবয়ব দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত হয়। সেই জন্য জীবাণু-গুলিকে উচ্ছলন-ক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিনষ্ট করিতে হয়। রস উত্তপ্ত করিয়া উহার কতকটা জলীয় অংশ উড়াইয়া দিলে জীবাণু সহজেই নষ্ট হয়। রস উত্তপ্ত করার আর একটি সুবিধা এই যে, রসের মধ্যে সামান্যপরিমাণে শির্কাম্ল থাকায় তাহা তপ্ত রসের অণ্ডলালবৎ পদার্থগুলিকে জমাইয়া দেয়। বিশেষ সাবধানতার সহিত রস উত্তপ্ত করা প্রয়োজন, অন্যথা তাপের আধিক্যে ও বায়ুর অম্লজান-সংস্পর্শে দানাদার শর্করার অংশ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

ইক্ষুরস শোধন করিবার জন্য সাধারণতঃ উহাকে সেন্টি-গ্রেডের ৮০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া উহার সহিত গোলা চূণ (Milk of lime) মিশ্রিত করিয়া রসের অম্লত্ব সমীকরণ (neutralize) করা হয়। অম্লসমীকরণার্থ অতি সতর্কতার সহিত রসে চূণের গোলা মিশাইতে হয়। কারণ, অম্ল-বিনাশের প্রয়োজনাতিরিক্ত চূণের গোলা মিশাইলে রস ক্ষারভাবাপন্ন (alkaline) হয় ও অণ্ডলালবৎ পদার্থ পুনরায় দ্রবীভূত হইয়া রসের মধ্যে সংস্থিত থাকে। সমীকরণকালে যাহাতে রস অতিরিক্ত উত্তপ্ত না হয়, তজ্জন্য বাষ্প-সাহায্যে রসের পাত্র তপ্ত করা হয়। ১০।১৫ মিনিটকাল উত্তপ্ত করিবার পর তাপ বিমুক্ত করিয়া প্রায় ২০ মিনিটকাল রসকে থিতাইতে দিলে রসের উপরিভাগে কতক ময়লা বা গাদ ভাসিয়া উঠে ও অবশিষ্ট ময়লা পাত্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। গাদ ও পাত্রের তলদেশস্থ ময়লার মধ্যভাগে অতি স্বচ্ছ ও ঈষৎ পীতাভ রস থাকে। অতঃপর বক্র নল (syphon) সাহায্যে স্বচ্ছ রস বাহির করিয়া পৃথক্ পাত্রে সঞ্চয় করা হয়। তলদেশের ময়লা ও গাদ ফেলিয়া না দিয়া মোটা জিন-কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইলে কতকটা পরিষ্কার রস পাওয়া যায়। এক্ষণে ঐ পরিষ্কার রস পুনরায় মোটা কাপড় অথবা (Felt) ফেল্টের থলে বা অঙ্গারের শোধন যন্ত্র (Carbon Felter) দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া হয়। কোনও কোনও কারখানায় কৈশিকী (Capillary) প্রণালীতে রস ছাঁকিবার ব্যবস্থা আছে। একগাছা সূতার একপ্রান্ত রসের মধ্যে ডুবাইয়া অপর প্রান্ত একটি পরিষ্কার পাত্রের মধ্যে রাখিলে কৈশিকী প্রক্রিয়ায় সূতার মধ্য দিয়া পরিষ্কার রস দ্বিতীয় পাত্রে সঞ্চিত হয়। অতঃপর রসের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত করিয়া বিতাড়িত করিলে গাঢ় হয় ও তখন উহাতে চিনির দানা উৎপন্ন হয়। রস গাঢ় করিবার সময় যাহাতে শর্করার কোনও পরিবর্ত্তন না হয়, তজ্জন্য উহার সহিত Super phosphate of lime অথবা চূণ ও প্রস্ফুরক দ্রাবক (Phosphoric acid) সংযোগ করিতে হয়। সাধারণতঃ রস পরিশোধন করিবার জন্য চূণ সংযোগ করিবার পূর্ব্বে প্রস্ফুরক দ্রাবক সংযোগ করিয়া পরে চূণ দিয়া অম্লত্ব নষ্ট করা হয়। রস গাঢ় করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার যে কোনওটি অনুসরণ করা হয়:—

১।—(Direct boiling) বা সোজাসুজি অগ্নির উত্তাপে কড়ার রস ফুটাইয়া গাঢ় করা হয়। অধুনা এই প্রণালীতে রস গাঢ় করিবার প্রথা প্রচলিত নাই; কিন্তু বাষ্প-সাহায্যে রস গাঢ় করিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্র এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ৭।৮ টি টিনের কলাই-করা তাম্রনির্ম্মিত কড়া সিঁড়ির ধাপের আকারের চুল্লীশ্রেণীর (Cscaadc arrangement) উপর স্থাপিত করা হয়। সর্ব্বোচ্চ কড়ায় যেখানে তাপের পরিমাণ অল্প থাকে—রস রাখিয়া প্রস্ফুরক দ্রাবক ও চূণের গোলা দ্বারা শোধন করিয়া তথা হইতে পরিষ্কার রস দ্বিতীয় কড়ায় গ্রহণ করা হয়। প্রথম কড়া অপেক্ষা দ্বিতীয় কড়ার তাপ কিঞ্চিৎ অধিক থাকে। সে জন্য উহার কতকটা জলীয় অংশ উবিয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় কড়া হইতে তৃতীয় কড়ায় ও তৃতীয় হইতে চতুর্থ কড়ায় এইরূপ ক্রমান্বয়ে উপরের কড়া হইতে নিম্নতর কড়ায় রস পরিচালিত হয়; নিম্নতর কড়ার তাপের ক্রমাধিক্য থাকে ও সর্ব্বনিম্ন কড়ায় রস বাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার অধিকাংশ জলীয় ভাগ অন্তর্হিত হয় এবং তখন উহা যথেষ্ট পরিমাণে গাঢ় হয়। এই অবস্থায় সর্ব্বনিম্ন কড়ার রস একটি অগভীর কাঠের চৌবাচ্ছার মধ্যে ঢালিয়া আলোড়িত করিলে, অতি অল্পকালের মধ্যে চিনির দানা উৎপন্ন হয়।

এই প্রথায় চিনি প্রস্তুত করিবার কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ ঠিক কোন্ সময়ে রসের পাক সম্পূর্ণ হয়, তাহা বিশেষ

অভিজ্ঞব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ কারিকর অনুমান করিতে পারে না। দ্বিতীয়, তাপের আতিশয্যে চিনির পরিবর্ত্তে মাত-গুড়ের অংশ অধিক হওয়া সম্ভব এবং রস যদি অধিক গাঢ় হয়, তবে চিনির দানা অত্যন্ত মিহি হয় এবং উহা মাত-গুড়ের সহিত এরূপ ভাবে মিশিয়া থাকে যে, দানা পৃথক্ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। তৃতীয়, যদি অপেক্ষাকৃত পাতলা অবস্থায় দানা জমিতে দেওয়া হয়, তবে অতি অল্পপরিমাণ মোটা দানা উৎপন্ন হয় ও তরল অংশে অধিকাংশ শর্করা থাকিয়া যায়। সুতরাং এই সকল কারণে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত চিনি প্রস্তুত করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ শিল্পিগণ নিম্নলিখিত উপায়ে রসের পাক বা দানা জমিবার উপযুক্ত গাঢ়ত্ব নিরূপণ করিয়া থাকে। এক গ্লাস পরিষ্কার জলে এক চামচ আন্দাজ গাঢ় রস ঢালিয়া দিলে যদি উহা এক মিনিটের মধ্যে জমিয়া ভাঁটা-প্রস্তুতোপযোগী হয় এবং হাতে লাগিয়া না যায়, তবেই বুঝিতে হইবে যে, রসের পাক ঠিক হইয়াছে। উল্লিখিত উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিবার আরও কয়েকটি অসুবিধা আছে। (১) রস গাঢ় করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জ্বালানী কাষ্ঠ বা কয়লার প্রয়োজন; (২) উহা অধিক সময়সাপেক্ষ ও তজ্জন্য অধিক-মজুরী লাগে; (৩) এক কড়া হইতে অন্য কড়ায় রস-সঞ্চালনকালে রস পড়িয়া নষ্ট হয়; (৪) উহাতে মাত-গুড়ের পরিমাণ অধিক হয় ও সে জন্য দানাদার চিনির পরিমাণ কমিয়া যায়, (৫) এইরূপে প্রস্তুত চিনির কোনও বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিশুদ্ধতা (Standard of Purity) রক্ষা করা সম্ভব নহে; কারণ, তাপের অল্পাধিক্যে চিনির বর্ণ ও বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। কড়া অত্যধিক তপ্ত হইলে রস কড়ার গাত্রে লাগিয়া পুড়িয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে চিনির রং পিঙ্গলাভ হওয়া সম্ভব।

বাষ্প-সাহায্যে রস গাঢ় করিবার জন্য পেটা লোহার চতুষ্কোণ কড়া ব্যবহার করা হয়। কড়ার তলদেশে কতকগুলি তাম্রনির্ম্মিত বাষ্পবাহী নল সংযুক্ত করা হয়; নলগুলি পরস্পর এরূপভাবে সংযুক্ত করা হয় যে, নলের মধ্যে বাষ্প প্রবেশ করিয়া উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল অংশই উত্তপ্ত হইয়া সমগ্র কড়া তপ্ত করিতে পারে। তাম্র-নলের এক প্রান্ত বাষ্পযন্ত্র বা Boiler-এর সহিত ও অপর প্রান্ত কড়ার বহির্ভাগে অবস্থিত একটি বাষ্পঘনীকরণ কক্ষের (Steam Condensing chamber) সহিত সংযুক্ত করা হয়। নলের মধ্যে বাষ্পপরিচালন বন্ধ করিবার জন্য কড়ার বহির্ভাগে বাষ্প যন্ত্রের দিকে একটি চাবি বা valve সংযুক্ত করা হয়। বাষ্প দ্বারা গাঢ় করিলে রস ফুটন্ত জলের তাপের অধিক উত্তপ্ত হয় না; সুতরাং উহা পুড়িয়া বিবর্ণ হইতে পারে না এবং এই প্রকারে প্রস্তুত চিনি অপেক্ষকৃত শুভ্র হয়।

Film evaporator—বা সূক্ষ্ম ঝিল্লীবৎ আকারে রস শুষ্ক করিবার পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় একটি তপ্ত লোহার চোঙ্গ (Cylinder) রসের মধ্যে আংশিক নিমগ্ন রাখিয়া ধীরে ধীরে আবর্ত্তিত করা হয় ও চোঙ্গটি সর্ব্বদা উত্তপ্ত রাখিবার জন্য উহার মধ্যে বাষ্প পরিচালন করা হয়। চোঙ্গের গাত্রের সহিত একটি একটি চাঁচিবার ছুরি (Scraper) সংলগ্ন থাকে। রসে নিমজ্জিত থাকায় চোঙ্গের গাত্রে সামান্য রস লাগিয়া যায় ও তপ্ত চোঙ্গের আবর্ত্তনের সঙ্গে রসের জলীয় অংশ সত্বর শুকাইয়া যায়। চোঙ্গের গাত্র-সংলগ্ন ছুরি শুষ্ক চিনি চাঁচিয়া লইয়া একটি পৃথক্ পাত্রে সঞ্চয় করে। এইরূপে চোঙ্গটি যতই ঘুরিতে থাকে, ততই ছুরির সাহায্যে শুষ্ক চিনি সংগৃহীত হয়। শর্করা-শিল্পে বিভিন্ন প্রকারের Film evaporator ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে Wetzel, Schroeder ও Bour প্রবর্ত্তিত যন্ত্রগুলির প্রচলন অধিক। মিঃ আইচ্‌সন্ Film evaporator যন্ত্র সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি একটি নিরেট লোহার গোলাকার চোঙ্গ ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা অত্যধিক ভারী হওয়ায় মিঃ ওয়েজেল উহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ফাঁপা নল ব্যবহার করেন। ফাঁপা নল ব্যবহারে আর একটি সুবিধা এই যে, উহার মধ্যে বাষ্প পরিচালন করিয়া সর্ব্বদা অধিক তপ্ত রাখা সম্ভব।

বায়ুশূন্য কটাহে (Vacuum Pan) রস গাঢ় করিবার প্রথা এক্ষণে প্রায় সকল চিনির কারখানায় প্রচলিত আছে। একটি রুদ্ধ বায়ু (airtight) বাষ্পাঙ্গরাখা (Steamjackeled) ঢালাই লোহার কড়ার তলদেশে একটি বাষ্পবাহী নল সংযুক্ত থাকে ও উহার অপর পার্শ্বে আর একটি নল দিয়া ঘনীভূত বাষ্পের জল বহির্গত হয়। একটি তৃতীয় নল কটাহের তলদেশে সংযুক্ত থাকে ও উহার অপর প্রান্ত পরিষ্কৃত রসের মধ্যে নিমজ্জিত রাখা হয়। কড়ার ঢাকনীর উপর আর একটি নল সংযুক্ত থাকে ও এই নলটি একটি বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের (airpump) সহিত সংযুক্ত করা হয়। কড়ার অভ্যন্তর পরিদর্শনের জন্য ঢাকনীর উপর আর দুইটি গোলাকার ছিদ্র থাকে; এই ছিদ্র দুইটি মোটা কাচের চাকতী দ্বারা এরূপ ভাবে বন্ধ করা হয়—যাহাতে কড়ার মধ্যে কোনওরূপে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এক্ষণে বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র-সাহায্যে কড়াটি আংশিক বায়ুশূন্য করিলে পরিষ্কৃত রসে নিমজ্জিত নালীর মধ্য দিয়া রস কড়ার মধ্যে প্রবেশ করে। যখন কড়ার অর্দ্ধেকাংশ রস দ্বারা পূর্ণ হয়, তখন রসবাহী নলটি একটি চাবি বা Valve দ্বারা বন্ধ করা হয় ও কড়ার বহিরাবরণের মধ্যে বাষ্পপরিচালনা করিয়া কড়াটি উত্তপ্ত করা হয়।

এক্ষণে বায়ু-নিষ্কাশন-যন্ত্র পরিচালনা করিলে অল্প তাপেই রসের জলীয় অংশ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বাহির হয়। এইরূপে যখন রসের অধিকাংশ জলীয় ভাগ বাহির হইয়া যায়, তখন রসবাহী নলের চাবি পুনরায় খুলিয়া দিয়া, আরও কতক রস কড়ার মধ্যে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গাঢ় করা হয়। এইরূপে বারংবার কড়ার মধ্যে রস গ্রহণ করিয়া ও বায়ু-নিষ্কাশন-যন্ত্র দ্বারা গাঢ় করিয়া যখন যথেষ্ট পরিমাণে গাঢ় রস কড়ার মধ্যে সঞ্চিত হয় ও চিনির দানা জমিবার সূত্রপাত হয়, তখন উহা কড়ার তলদেশস্থ আর একটি বড় ছিদ্র দ্বারা বাহির করিয়া কোনও অগভীর পাত্রে দানা জমান হয়। ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে রস ঠাণ্ডা হইয়া দানা উৎপন্ন হয়। চিনির দানা ছাঁকিয়া লইবার পর যে মাত-গুড় অবশিষ্ট থাকে, তাহা পুনরায় গাঢ় করিলে আরও কিছু চিনির দানা পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় ফারেণ-হীটের ১৬০ ডিগ্রী তাপে রস গাঢ় করা যায় ও রুদ্ধ পাত্রে রস

গাঢ় করার জন্য উহার সহিত বাহিরের কোনওরূপ ময়লা মিশ্রিত হইয়া বিবর্ণ করিতে পারে না; সুতরাং চিনির বর্ণও পরিষ্কার হয়। অতি অল্পতাপে ও অল্পসময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে রস গাঢ় করিয়া পরিষ্কার দানাদার চিনি উৎপন্ন হয় বলিয়া এই প্রথায় ব্যয়াধিক্য হয় না। সুতরাং লাভের পরিমাণ অধিক থাকে। এ ভাবে কার্য্য করিতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন।

শর্করা-শোধন।—চিনির দানার সহিত মাতগুড় ও রঞ্জন পদার্থ (Colouring matter) সংশ্লিষ্ট থাকে। পরিষ্কার চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে এগুলি অপসারিত করা প্রয়োজন। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে curing of sugar বলে। নিম্নলিখিত উপায়ে চিনি শোধন করা হয়:—

১।—একটি সচ্ছিদ্র পিপার মধ্যে যে কোনও উপায়ে প্রস্তুত মাত সমেত চিনির দানা ভরিয়া পিপাটি ঝুলাইয়া রাখা হয়। কয়েক দিবস পরে উহার মাত অংশ ঝরিয়া গেলে পিপার মধ্যস্থ চিনি বাহির করিয়া আতপতাপে শুষ্ক করা হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত চিনি পিঙ্গলবর্ণের হয় ও উহা তত পরিষ্কার নহে; এ জন্য উহা Brown sugar বা Muscovado চিনি নামে অভিহিত হয়। অধুনা বড় বড় চিনির কারখানায় এই প্রাচীন প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২। প্রাচীনকালে সাদা মাটী বা চীনা মাটীর দ্বারা চিনি পরিষ্কার করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। একটি মোচার আকারের (Conical) পাত্রের তলদেশে একটি ছোট ছিদ্র থাকে। পাত্রের মধ্যে গুড় বা অপরিষ্কার চিনি ভরিয়া উহার উপর সাদা মাটী বিছাইয়া জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়। চিনির মধ্যস্থ মাত ও নিরবয়ব অংশ জলে দ্রব হইয়া ছিদ্রপথে নির্গত হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত চিনি মাস্কোভ্যাডো চিনি অপেক্ষা পরিষ্কার হয়। মাস্কোভ্যাডো চিনিও অল্প জল দিয়া ধৌত করিলে এই প্রকারের চিনি পাওয়া যায়।

৩। সুরাসারে চিনি অতি সামান্য পরিমাণে দ্রব হয়। কিন্তু চিনির মধ্যস্থ রঞ্জন পদার্থ ও অন্যান্য অপরিষ্কার জৈব পদার্থ সুরাসারে সহজেই দ্রব হয়। সুতরাং জলের পরিবর্ত্তে সুরাসার দ্বারা ধৌত করিলে চিনি বেশ পরিষ্কার হয়। সুরাসার দ্বারা চিনি পরিষ্কার করা আদৌ লাভজনক নহে। সুতরাং ব্যবসায়ীর পক্ষে এ প্রথা অবলম্বন করা একবারেই অযৌক্তিক।

৪। একটি রুদ্ধবায়ু (Airtight) লোহার সিন্দুকের মধ্যে জালের ন্যায় সচ্ছিদ্রপাত্রে বা রেকাবে (Tray) মাত সমেত চিনি রাখিয়া রেকাবের নিম্নদিক্ হইতে সিন্দুকের মধ্যস্থ বায়ু বাহির করিয়া লইলে চিনির মাত ঝরিয়া সিন্দুকের মধ্যে সঞ্চিত হয়। পরে সামান্য জলের ছিটা দিয়া পুনরায় বায়ু নিষ্কাশন করিলে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার চিনি পাওয়া যায়।

৫। উপরে যে কয়টি উপায় বর্ণিত হইল, তাহাতে তেমন পরিষ্কার চিনি পাওয়া যায় না। এ জন্য অধুনা সকল কারখানাতেই কেন্দ্রাপসারিণী জলনিষ্কাশনযন্ত্র (Centrifugal hydroextractor) সাহায্যে চিনি পরিষ্কার করা হয়। একটি লৌহদণ্ডের উপর একটা চোঙ্গের আকারের টিনের কলাইকরা সচ্ছিদ্র পাত্র এরূপে সংলগ্ন থাকে যে, দন্তযুক্ত চক্র দ্বারা (Toothed wheel) লৌহদণ্ডটি প্রবলবেগে ঘুরাইলে পাত্রটিও অধিকতর বেগে ঘুরিতে থাকে। এই সচ্ছিদ্র পাত্রের বহির্ভাগে আর একটি নিশ্চল পাত্র সংস্থাপিত থাকে। নিশ্চল পাত্রটির তলদেশে একটি নল সংযুক্ত থাকে। সচ্ছিদ্র পাত্রমধ্যে মাত সমেত চিনির দানা রাখিয়া এত প্রবলবেগে সঞ্চালিত করা হয় যে, উহা প্রতি মিনিটে ১ হাজার হইতে ১ হাজার ৮ শত বার ঘুরিয়া থাকে। এই প্রবল ঘূর্ণ্যমান গতিতে চিনির মাত সবেগে ছিদ্রপথে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে ও তথা হইতে নলের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া অপর একটি পাত্রে সঞ্চিত হয়। অতঃপর চিনির উপরিভাগে সামান্য জল ছিটাইয়া পুনরায় পূর্ণবেগে ঘুরাইলে অতি শুভ্র চিনি পাওয়া যায়। এই উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিলে উহা আর শুকাইবার প্রয়োজন হয় না। হস্তচালিত এরূপ একটি যন্ত্রের মূল্য প্রায় সাড়ে ৫ শত টাকা। তিন অশ্বশক্তি-(Horse power) বিশিষ্ট কেরোসিন তৈল দ্বারা পরিচালিত এঞ্জিন সমেত উহার মূল্য প্রায় ৮শত টাকা।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে যে উপায়ে শর্করা প্রস্তুত হইত এবং এখনও কোনও কোনও স্থানে হইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিয়া আমরা কুটীর-শিল্প হিসাবে চিনি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি বর্ণনা করিব। যদিও অধুনা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপন্ন শর্করার সহিত প্রতিযোগিতায় কুটীর-শিল্পজাত শর্করা টিকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান যুগে আমাদের মনে হয় যে, দেশবাসিগণ দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিলে হয় ত অচিরে এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে। কুটীরশিল্পজাত চিনি হইতে বিশুদ্ধ চিনি প্রস্তুত করা সম্ভব। অবশ্য তাহাতে লাভের পরিমাণ নিতান্ত অল্প থাকে, কিন্তু তবুও অল্প লাভের বিনিময়ে এই শিল্পের প্রবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। সমবায়-প্রথায় কুটীরশিল্পজাত চিনি হইতে শুভ্র চিনি প্রস্তুত করা বিশেষ অসুবিধা হইবে না, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাঙ্গালা দেশে সাধারণতঃ আখ ও খেজুর-গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। যশোহর জেলায় কোটচাঁদপুর, গোবরডাঙ্গা, সুখচর, ঢাকা, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে বড় বড় চিনির কারখানা ছিল। এতদ্ভিন্ন অনেক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে কুটীরশিল্প হিসাবে চিনি প্রস্তুত হইত। এই সকল স্থানে খেজুর-গুড় হইতেই চিনি প্রস্তুত হইত। মোটা চটের থলের মধ্যে গুড় রাখিয়া থলের মুখ উত্তমরূপে বাঁধিয়া উহার উপর ভার চাপাইয়া গুড়ের মাত বাহির করা হয়। এই উপায়ে পিঙ্গলবর্ণের অপরিষ্কার চিনি পাওয়া যায় ও উহা Muscavado চিনির অনুরূপ। আর এক উপায়ে দেশী চিনি প্রস্তুত করা হয়; এজন্য বড় লোহার কড়ায় অল্প জলের সহিত গুড় মিশাইয়া ফুটান হয় এবং উহাতে মধ্যে মধ্যে জলমিশ্রিত দুগ্ধ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে গুড়ের ময়লা ভাসিয়া উঠে ও তখন ময়লা বা গাদ তুলিয়া ফেলিয়া গাঢ় করিয়া চওড়া মুখ ও সূক্ষ্মতলবিশিষ্ট মাটীর ভাঁড়ের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। মাটীর ভাঁড়ের সূক্ষ্মাংশে একটি ছোট ছিদ্র থাকে, গুড় ঢালিবার পূর্ব্বে ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গুড় সমেত ভাঁড়টি কোনও শীতল স্থানে দুই

তিন দিবস রাখিলে দানাদার গুড় উৎপন্ন হয়; তখন তলদেশের ছিদ্রটি খুলিয়া দিয়া ও উহার নীচে একটি গামলা বসাইয়া ৭।৮ দিবস রাখিলে গুড়ের অধিকাংশ মাত ছিদ্রপথে বাহির হইয়া গামলায় সঞ্চিত হয়। অতঃপর উহা বাঁশের মাচার উপর সজ্জিত ঝুড়ীর মধ্যে ঢালিয়া প্রত্যেক ঝুড়ীর তলদেশে একটি করিয়া গামলা বসান হয়। শীঘ্র মাত ঝরাইবার জন্য ঝুড়ীর উপর পাটা শেওলা বিছাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে ২।৩ দিনের মধ্যে ঝুড়ীর উপরের ২।৩ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার চিনিতে পরিণত হয়। এই অংশের চিনি চাঁচিয়া লইয়া পুনরায় টাটকা শেওলা দেওয়া হয় ও এইরূপে ঝুড়ীর সমস্ত গুড় চিনিতে পরিণত করা হয়। গুড় হইতে যে মাত বাহির হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হওয়ায় মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ভাবে প্রস্তুত চিনি ভিজা থাকে, সুতরাং উহা ঢেঁকিতে কুটিয়া রৌদ্রে শুকান হয়। রৌদ্রে শুকাইলে উহার বর্ণ আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হয়। এই চিনি দলুয়া চিনি নামে অভিহিত হয়; প্রতি মণ গুড় হইতে ১৪।১৫ সের মাত্র দলুয়া চিনি পাওয়া যায়।

পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমে বাঁশের মঞ্চের বা পাটার উপর গুড় বিছাইয়া দিয়া উহার মাত অংশ ঝরাইয়া দেওয়া হয়। ৪।৫ দিবস মাত ঝরিবার পর উহা থলের মধ্যে ভরিয়া নিংড়াইয়া বা চাপ দিয়া আরও কতক মাত বাহির করা হয়। অতঃপর থলের মধ্যস্থ অপরিষ্কার দানাদার চিনি জলের সহিত ফুটাইয়া দুগ্ধ সহযোগে গাদ তুলিয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া মৃদু তাপে গাঢ় করা হয় ও উহা অগভীর পাত্রে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিলে পরিষ্কার দানা জন্মে। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাটা শেওলা দিয়া পরিষ্কার চিনি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু এ ভাবে প্রস্তুত করিলে প্রতি মণ গুড় হইতে ১২।১৩ সেরের অধিক চিনি পাওয়া যায় না।

বহুদিন পূর্ব্বে শিবপুর কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষাগারে ইক্ষুরস হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার যে পরীক্ষা হইয়াছিল, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে আমাদের দেশের গরীব কৃষকরা অতি সহজে পরিষ্কার চিনি প্রস্তুত করিতে পারিবে ও এইরূপে প্রত্যেক পল্লীতেই শর্করার কুটীরশিল্পের প্রবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। সাধারণতঃ কৃষকগণ যে উপায়ে ইক্ষুরস হইতে গুড় প্রস্তুত করে, তাহাতে মাতগুড়ের পরিমাণ অধিক হয় ও দানাদার বা সার গুড় তদনুপাতে কমিয়া যায়। সুতরাং গুড়ের সারভাগ বৃদ্ধি করিতে পারিলে সেই গুড় হইতে অধিক পরিমাণে চিনি পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আখের রস বায়ু-সংস্পর্শে অধিকক্ষণ থাকিলে উহার অভ্যন্তরস্থ জীবাণু বা উদ্ভিদণু (Enzyme) রসের মধ্যে শির্কায় উৎপাদন করে এবং সেই শির্কায় রসের দানাদার শর্করাকে দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত করিয়া মাতগুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কৃষকগণ যে ভাবে রস প্রস্তুত করে, তাহাতে রসের অম্লত্ব বর্দ্ধিত হয় ও সেই অম্লরস ফুটাইয়া গাঢ় করিয়া যখন গুড় উৎপন্ন হয়, তখন তাহার দানাদার শর্করার কতকাংশ বিশ্লিষ্ট হয়। কিন্তু যদি আখ মাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রস মাটীর গামলা বা নাদের মধ্যে রাখিয়া উত্তপ্ত করা হয়, তবে উদ্ভিদণুগুলি নির্জ্জীব হইয়া শির্কায় উৎপাদনে অক্ষম হয়। অধিকন্তু প্রতি মণ রসের সহিত ২০।২২ ফোঁটা প্রস্ফুরক দ্রাবক (Phosphoric acid) সামান্য জলে দ্রব করিয়া মিশাইয়া মৃদু তাপে উত্তপ্ত করিয়া পরে উহার সহিত এক ছটাক টাটকা ফোটান পাথুরে চূণের গোলা মিশাইতে হয়।

যদি এই পরিমাণ চূণে উহার অম্লত্ব সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়, তবে অল্প অল্প করিয়া আরও চূণের গোলা মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে লিটমাস (Litmus paper) কাগজ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। যখন নীল বা লাল লিটমাস কাগজের বর্ণ-পরিবর্ত্তন হইবে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, রসের অম্লত্ব নষ্ট হইয়া সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে রসের তাপ বর্দ্ধিত করিয়া সেন্টিগ্রেডের প্রায় ৯০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া গাদ তুলিতে হইবে। পরে উহা চুল্লী হইতে নামাইয়া এক ঘণ্টাকাল থিতাইতে দিলে অপরিষ্কার জৈব ও অজৈব পদার্থ পাত্রের তলায় সঞ্চিত হয়। উপরের পরিষ্কার রস ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইয়া একটি মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া মৃদু তাপে গুড় প্রস্তুত করিয়া কলসীর মধ্যে ঢালিতে হয়। ১০।১২ দিন পরে দেখা যায় যে, কলসীর তলায় কয়েকটি ছিদ্র করিয়া দিলে উহার মাত বাহির হইয়া যাইবে। ২০।২৫ দিন পরে কলসীটি ভাঙ্গিয়া চিনি সংগ্রহ করিয়া সূর্য্যকিরণে শুকাইলে ফিকে পিঙ্গলবর্ণের চিনি পাওয়া যায়। ইহা হইতে যে মাতগুড় পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ মাতগুড় অপেক্ষা অনেক ভাল এবং উহা মোরব্বা প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাটা শেওলা দিয়া ঐ চিনি আরও শুভ্র করিতে পারা যায়। উল্লিখিত উপায়ে গুড় প্রস্তুত করিলে প্রতি মণ গুড় হইতে প্রায় ২৫।২৬ সের চিনি পাওয়া যায় ও সেই চিনি সাধারণ দেশী প্রথায় প্রস্তুত চিনি অপেক্ষা অনেক ভাল হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভিন্নপ্রকার চিনি প্রস্তুত হয়; কিন্তু মোটের উপর মূল প্রথা সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। সুতরাং সে সকল প্রথার উল্লেখ করিয়া আমরা অযথা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

আমাদের দেশে ইক্ষুদণ্ড হইতে রস বাহির করিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার কতকটা সংশোধন করা প্রয়োজন। যে কল-সাহায্যে ইক্ষু পিষ্ট হয়, তাহাতে ইক্ষুর মধ্যস্থ শতকরা ৯০ ভাগ রসের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ মাত্র বাহির করা সম্ভব; অবশিষ্ট শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ রস উহার ছিবড়ার মধ্যে থাকিয়া নষ্ট হয়। এ জন্য কৃষকগণের লাভের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। ভারতে আখের চাষ খণ্ড-চাষের মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ নিতান্ত অবস্থাপন্ন কৃষকও প্রতি বৎসর ১০।১২ বিঘা জমীর অধিক আখের চাষ করিতে পারে না। সুতরাং ঐ পরিমাণ জমীর উৎপন্ন আখ হইতে রস বাহির করিবার জন্য অধিক মূল্যে উন্নত প্রণালীর পেষাই কল ক্রয় করার কোনও সার্থকতা নাই।

জাভা, মরিসস, কিউবা প্রভৃতি দেশে যেখানে একত্রে হাজার হাজার বিঘা জমীতে আখের চাষ হয়, সেখানে উন্নত কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্পব্যয়ে ও অল্পসময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে রস বাহির করিয়া তাহা হইতে একবারে চিনি প্রস্তুত করা সম্ভব। রসকে গুড়ে পরিণত না করিয়া

একবারে চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে অধিক লাভ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আখ মাড়িবার পর যে 'ছিবড়া' থাকে, তাহাতে প্রায় ২০।২৫ ভাগ রস নষ্ট হয়; কিন্তু ঐ রস কোনও উপায়ে বাহির করিতে পারিলে প্রতি মণ 'ছিবড়া' হইতে অন্ততঃ ১ সের চিনি পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে 'ছিবড়া' হইতে রস সংগ্রহ করা যায়। 'ছিবড়া'গুলি ফুটন্ত জলের মধ্যে অর্দ্ধঘণ্টাকাল রাখিয়া নিংড়াইয়া লইলে গরম জলের মধ্যে অধিকাংশ রস দ্রব হয়। পরে ছিবড়াগুলি আর একবার পিষিয়া লইলে আরও অনেকটা রস পাওয়া যায়। এই রস খুব পাতলা হয়, এজন্য একই পাতলা রসের মধ্যে উপর্য্যুপরি কয়েকবার ছিবড়া ফুটাইলে অপেক্ষাকৃত গাঢ় রস পাওয়া যায়। এই রস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্ফুরক দ্রাবক ও চূণের গোলা মিশাইয়া শোধিত করিয়া চিনি প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহাতে যে পরিমাণ পরিশ্রম হয়, তাহার তুলনায় লাভের অংশ অনেক বেশী।

প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত প্রায় ৮৫ লক্ষ বিঘা জমীতে আখের চাষ হয় ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ প্রায় ১ শত কোটি মণ। এ দেশে প্রতি বিঘা জমীতে ৯০ মণ হইতে ২ শত ২৫ মণ পর্য্যন্ত— (গড়ে বিঘাপ্রতি ১২০।১২২ মণ) ইক্ষু জন্মে; জাভায় প্রতি বিঘা জমীতে ৪ শত হইতে ৫ শত মণ পর্য্যন্ত ইক্ষু হয় এবং সেখানে প্রতিমণ চিনি প্রস্তুত করিতে প্রায় ১০ মণ ইক্ষুর প্রয়োজন হয়। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিউবা দ্বীপে প্রতি বিঘা জমীতে ৪ শত ৫০ মণ ইক্ষু জন্মে। ঐ সকল দেশের তুলনায় ভারতের উৎপন্ন কত অল্প, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতের উৎপন্ন ইক্ষুর এক-চতুর্থাংশ (প্রায় ২৭ কোটি মণ) বীজ ও খাইবার জন্য ব্যয়িত হয়, অবশিষ্ট ৮২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার মণ ইক্ষু হইতে ৮ কোটি ১১ লক্ষ ৩৫ হাজার মণ গুড় প্রস্তুত হয়। এই গুড়ের ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৫ হাজার মণ খাইবার জন্য ও অবশিষ্ট ১ কোটি ২৪ লক্ষ ২০ হাজার মণ চিনি প্রস্তুতের জন্য ব্যয়িত হয়। ভারতীয় ইক্ষুতে শতকরা ১০।১২ ভাগ ও ইক্ষুর রসে শতকরা ১২।১৪ ভাগ দানাদার শর্করা থাকে; কিন্তু জাভা, মরিসস প্রভৃতি দেশের ইক্ষুতে শতকরা ১৬ হইতে ১৮ ভাগ ও ইক্ষুরসে ১৮ হইতে ২১ ভাগ দানাদার শর্করা থাকে। এই সকল কারণে ভারতবর্ষ শর্করা-শিল্পে অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় হঠিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে এক্ষণে সর্ব্বসমেত ২৯টি চিনির কারখানা আছে। এই সকল কারখানা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মণ অর্থাৎ গড়ে প্রতি কারখানা হইতে ১ লক্ষ ৮ হাজার মণ করিয়া চিনি প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন প্রতি বৎসর দেশীয় প্রথায় প্রায় ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার মণ চিনি প্রস্তুত হইতেছে। এ দেশে প্রস্তুত চিনি ব্যতীত প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটি ৭৩ লক্ষ মণ বিদেশী চিনি ভারতে আমদানী হইতেছে ও তাহার মূল্যস্বরূপ প্রায় ১৪।১৫ কোটি টাকা বিদেশীর হস্তে অর্পণ করিতে হইতেছে। ভারতে উৎপন্ন সমগ্র ইক্ষু হইতে যদি চিনি প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে এ দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রায় কোটি টাকার চিনি বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হইত।

ভারতবর্ষে এক্ষণে মাত্র কয়েকটি কারখানায় ইক্ষু-রস হইতে সোজাসুজি চিনি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে; অবশিষ্ট কারখানাগুলিতে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। যে সকল কারখানায় রস হইতে চিনি প্রস্তুত করে, তাহাদের বৎসরের মধ্যে ৪।৫ মাস কাল কারখানার কার্য্য চলিতে পারে। এই সকল কারখানার কোনও কোনটা অবশিষ্ট কয় মাস গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করে। কিন্তু গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করায় বিশেষ লাভ থাকে না বলিয়া কোনও কোনও কারখানা প্রায় ৭।৮ মাস-কাল বন্ধ থাকে।

বাঙ্গালাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নূতন নূতন চিনির কারখানা স্থাপিত হইতেছে। সম্প্রতি বিহার ও যুক্ত-প্রদেশে কয়েকটি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ এ বিষয়ে বড়ই উদাসীন। ভারতের যে সকল চিনির কারখানার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বিহার, বালিয়া, গোরক্ষপুর, কাণপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি সহরে স্থাপিত এবং অধিকাংশ কারখানা বিদেশীয় দ্বারা পরিচালিত।

শর্করা-রসায়নজ্ঞ ডাক্তার এস, সি, দাশগুপ্ত সম্প্রতি অল্প মূলধন লইয়া এই শিল্প-প্রতিষ্ঠার একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; ৭।৮ হাজার টাকা মূলধন লইয়া এই শিল্পপ্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তিন রোলার-বিশিষ্ট ইক্ষুপেষাই কল ১টি	৮০০৲
১৮ ব্যাসের কেন্দ্রাপসারিণী যন্ত্র ১টি	৬০০৲
১২।১৩ অশ্বশক্তির তৈল-চালিত এঞ্জিন ১টি	১৮০০৲
জলের চৌবাচ্চা, পাইপ, বেল্ট, রস গাঢ় করিবার কড়া প্রভৃতি	১৮০০৲
কার্য্যপরিচালনব্যয়	৩০০০৲
	৮০০০৲

উল্লিখিত সরঞ্জামে প্রতিদিন ২ শত মণ ইক্ষু হইতে প্রায় ১৪।১৫ মণ চিনি প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা হইতে প্রতি মাসে ৭।৮ শত টাকা লাভ হওয়া সম্ভব। তাঁহার মতে প্রতি বৎসর ৫।৬ মাস কার্য্য করিলে সমস্ত খরচ বাদে প্রায় ৪ হাজার টাকা লাভ হইতে পারে। তিনি আর একটি হিসাবে দেখাইয়াছেন যে, ১৩ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কার্য্যারম্ভ করিলে প্রতি বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা লাভ হইতে পারে।

ইক্ষুরস হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিবার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল এবং সেই সঙ্গে তাল, নারিকেল ও খেজুর-রস হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিবার বিষয় বর্ণনা করা যাইবে।

শ্রীআশুতোষ দত্ত (বি, এস-সি)

নিদর্শন

স্থান—বাসু বোসের বৃহৎ বাটীর দর-দালান।

সময়—নির্দ্দিষ্ট নয়।

পাত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-প্রাপ্ত কয়েক জন ছাত্র।

সমিতির নাম—সত্যধাম।

স্থাপনের কারণ—মাসিক পত্রিকার আজগুবি গল্পপাঠে হজমের ব্যাঘাত এবং ডিস্‌পেপসিয়ার সূত্রপাত।

উদ্দেশ্য—ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শিব-চতুর্দ্দশীর দিন যখন সমিতির অধিবেশন হইল, তখন দিনের আলো নিবিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার দীপ জ্বলে নাই। আমাদের নিয়ম ছিল, প্রতিদিন এক এক জন সভ্য তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এক একটি ঘটনার আলোচনা করিবেন। আজ আমার পালা।

সন্ধ্যার রং এখনও ফিকা। আমি মনে মনে ঘটনাগুলি গুছাইয়া লইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সে তরল অন্ধকার ক্রমে গাঢ় ও অতি নিবিড় হইয়া উঠিল। বোসেদের বড় প্রাচীন দালান হইতে আমাদের মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক বাদুড় উড়িয়া গেল এবং তুমুল কোলাহল তুলিয়া শৃগালকুল যামিনীর প্রথম প্রহর ঘোষণা করিল।

আমি আরম্ভ করিলাম—

গোড়াতেই ব'লে রাখি, আমি কোন কৈফিয়ৎ দেব না।

আমার প্রথম পক্ষ ছিলেন প্রগাঢ় বস্তুতান্ত্রিক। সর্ব্বদা যে সব বস্তু তাঁর চোখের উপর থাক্‌ত, সেইগুলিই ছিল তাঁর কাছে সংশয়শূন্য সত্য, আর সব ছায়া, মায়া! এই বাস্তবের ভিতর আবার সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তব ছিলাম আমি আর আমাদের নিভৃত শয়নকক্ষ। তার পর রান্নাঘর, চারদিকে ফুলের টব সাজানো, তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত, একটি ছোট উঠান, আর বাড়ীর পিছনে উঁচু পাঁচীল-ঘেরা একটুক্‌রো বাগান। এ সকলের বাইরে যা কিছু, সে সব ছিল তাঁর কাছে অস্পষ্ট, আব ছা, ধোঁয়ার মত। আমাদের পাকশালার বাইরে যে একটা বৃহৎ কর্ম্মশালা আছে, ষড়রিপুর সংঘর্ষে নিয়ত বিক্ষোভিত, আশা-নিরাশা-হতাশের দীর্ঘশ্বাসে হাসি-কান্নায় নিরন্তর তরঙ্গসঙ্কুল, তা তিনি ধারণা করতে পারতেন না। আমাদের সেই শয়নকক্ষের চেয়ে আর যে কোথাও কোন্ বেশী স্বর্গ আছে—যেখানে অপ্সরা নাচে, কিন্নর গায়, পারিজাত-পুষ্পের গন্ধভারে মন্দ-গতি মলয়-মারুত-মন্দারমালিনী মন্দাকিনীর সঙ্গে জলকেলি করে,—তাঁর কাছে এ সবের কোন সার্থকতাই ছিল না। দেব-দম্পতির নির্জ্জন প্রেমালাপের জন্য নন্দন-বনে যে নিভৃত নিকুঞ্জ আছে, তার চেয়ে আমাদের প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চটি তাঁর কাছে অধিক আদরের ছিল। অপ্সরার কাল্পনিক নূপুর-নিক্কণ আর কঙ্কণ-শিঞ্জিতের চেয়ে পাকশালায় হাতা-বেড়ীর বাস্তব ঠুন্‌ঠান্ তাঁর প্রাণ একান্তভাবে কামনা কর্‌ত। মন্দার-পারিজাত-সন্তান-পুষ্প অপেক্ষা তাঁর কাছে বেল, যুঁই, রজনীগন্ধা, আর স্বর্গের কল্পবৃক্ষ হ'তে আমাদের বাগানের সজনেখাড়া আমড়াগাছের মূল্য ছিল অনেক—অনেক বেশী। এঁদের কুলপ্রথা ছিল—ক'নে নিজের হাতে মালা গেঁথে বরকে পরিয়ে দেবে, তা যে যেমন পারে। এই মালাগাঁথা মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তাতে এঁর কারিকুরি দেখে মালীর মেয়ে চেয়ে থাক্‌ত। এঁর হাতের সজনেখাড়া-চচ্চড়ি, বিলাতী আমড়ার চাট্‌নী আমার সে আমলের বন্ধুরা কাড়াকাড়ি ক'রে খেতেন।

সুন্দরী? তা ছিলেন বৈ কি! অবশ্য সাকারা নয়। সুন্দরী-সমাজে পাল্লা দেবার জন্য না হ'ক, ভদ্রসমাজে বা'র করা যেত। রংটি মাজা মাজা, যেন প্রখর গৌর-বর্ণের উপর কে একটি স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘকাল অতীত হয়েছে; বিস্মৃতির অতল জলে কত ছবি ডুবে গিয়েছে; কত মুখ মনে হয় স্বপ্নে দেখা; কিন্তু প্রথম-যৌবনের সে চিত্র আমার মানসপটে যেন রেখায় রেখায় অঙ্কিত। এখনও যেন চোখের সামনে

ভাসছে! হাত দু'খানি নিটোল। আমাদের ঘরে অলঙ্কারের অভাব ছিল না। কিন্তু শাঁখা, রুলি, লোহা ভিন্ন অন্য গয়না তিনি পরতেন না। বল্‌তেন, মেয়েমানুষের এর বড় অলঙ্কার আর নেই। কণ্ঠে কেবল একগাছি সরু হার। ঠোঁট দুখানি পাতলা, ধনুর মত ঈষৎ বঙ্কিম। কিন্তু তা থেকে তীক্ষ্ণ বাণ কখন ছুটত না—যেন মিষ্ট হাসি, মিষ্ট কথার জন্য তারা সৃষ্ট হয়েছে। নাক, কাণ, কপোল, কপাল, সব মানানসই। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য ছিল তাঁর চোখ। তারা দু'টি প্রশান্ত গম্ভীর অথচ চঞ্চল। দেখে মনে হ'ত, যেন প্রভাত ও প্রদোষের শুকতারা নীলাম্বরের নীল সরোবরে সাঁতার দিচ্ছে। তার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখা যেত—স্বচ্ছ, সরল, নির্ম্মল মনের উপর কোন আব্রু বা পর্দ্দা নেই। সে চোখ যেন কথা কইত। তাঁর চাউনি দেখে মনে হ'ত, মানবের ভাষা-সৃষ্টি একটা অনাবশ্যক বাহুল্য। কোন কবি বলেছিলেন, চোখের ভাষা ছাড়া নারীর অন্য ভাষা শেখার দরকার নেই। সে ভাষা তিনি ভাল করেই শিখেছিলেন। দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ স্নানের পর যখন মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌ত, মনে হ'ত, ছোট ছোট মেঘশিশু পর্ব্বতের সানুদেশে নেমে এসে বাতাসের সঙ্গে খেলা করছে।

তাঁর স্বভাব ছিল যেমন শান্তশিষ্ট, চলন-বলন প্রকৃতিও তেমনই ধীর। নামটিও ধীরা।

আমার প্রথম পক্ষের নাম বলিতেই আমাদের রাসবিহারী প্রশ্ন করিল, ধীরার বাপের নামটা কি ছিল, মশাই?

এক একটি লোক যেন গল্পের রসভঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকে। দাশরথি ধমক দিল—ফের!

পেটুক ব্রাহ্মণ বলিলেন, ধমক দিলে কি হবে, দাশু? না শুনলে ও হয় ত সারারাত ঘুমুবে না।

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘুমুবে না কি রকম?

রকম আর কি, গ্রহের ফের, মশাই! এক বাড়ীতে ব'সে বলেছিলুম, পরাণ ময়রার দোকানের লেডিগেণ্ডি (লেডিকেনি) অতি উৎকৃষ্ট মিষ্ট। গৃহস্বামী বললেন, ক'টা খেতে পারেন? আমি বল্‌লাম, খেয়ে বলতে পারি। বেশ। লেডিগেণ্ডি এলো। উনি সেখানে ছিলেন। গোটা পঁচিশেক সাবাড় করবার পর গা-টা কেমন ইড়-বিড় করতে লাগল। গোটা কয়েক উগরে ফেলে বাকি ক'টা সাবড়াবো ভাবছি, এমন সময় পাকিট থেকে খাতা-প্যানসিল বার ক'রে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কার দোকান, মশাই? আমার ত ভয় হ'ল, টিক্‌টিকি পুলিস না কি? জিজ্ঞ্যেস্‌লাম, কেন বল দিকি? খালি বল্‌লে, বলুন। আমার গা তখন বড্ড গোলাচ্ছে। বল্‌লাম, কা'ল সকালে আমার বাড়ী যেও। পরদিন ভোর না হ'তে হ'তে, মশাই, দোর ঠেলা-ঠেলি। দোর খুলে দেখি, মূর্ত্তিমান রাসু খাতা-প্যানসিল হাতে। কি বাপু? বল্‌লেন, এইবার বাপের নাম বলুন। কার? লেডিগেণ্ডির? কাতর হয়ে রাসু বল্‌লেন, আহা, ঠাট্টা করেন কেন, মশাই! আমি কা'ল সারারাত ছটফট করেছি, ঘুমুই নি। নামটা ব'লে ফেলুন। বল্‌লাম, পরাণ ময়রা। খাতায় টুকে নিয়ে বল্‌লেন, বাপের নাম? রাত্রে গুরু-ভোজনে আমার তখন ভীষণ শৌচের চেষ্টা হয়েছে। ছুটতে ছুটতে বল্‌লাম, পরাণ ময়রার বাপের নাম, লোকে বলে, হারাণ কাওরা, তার বাপ নারাণ বাওরা, আর যদি জানতে চাও, যে তাদের শ্রাদ্ধ-শান্তি করায়, সেই পুরুতকে জিজ্ঞাসা কর গে। বলেই ছুট্‌।

দাশরথি বলিলেন, বলেন কেন, মশাই! আমাদের 'কেলো' কুকুরটা ক্ষেপ্‌ল। ও বলে, কেলোর বাপের নাম কি বল? কি রকম? বল্‌লে, ওর যখন নাম আছে, ওর বাপের নামও নিশ্চয় একটা কিছু আছে। বল্‌লুম, রাসু, এ বিলিতি কুকুরও নয়, আর রেসের ঘোড়াও নয় যে, পেডিগ্রি (pedigree) থাকবে। মশাই, আমার বাড়ীতে দুপুর অবধি ধন্না দিলে। তখন কি করি। বল্‌লুম, কেলোর বাপের নাম ভেলো। তখন খাতায় টুকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী গেল। এমন পাগল!

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হে রাসবিহারী, বাঙ্গালার ইতিহাস লেখবার চেষ্টায় আছ না কি?

রাসবিহারী একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? এখন প্রথম পক্ষের বাপের নামটি বলুন।

উঃ, কি জেদ! ভাবিলাম, এর রচিত বাঙ্গালার ইতিহাস নেহাতই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। যাহা হউক, আপাততঃ ইহাকে না থামাইলে গল্প অগ্রসর হয় না। বলিলাম, প্রথম পক্ষের বাপের নাম জিজ্ঞাসা করছিলে? তাঁর নাম বড়

জমকালো ছিল না, সাদাসিধে—শীতলপ্রসাদ। নোট-বহিতে নাম টোকা হইল। আমিও পুনরায় সুরু করিলাম।

আমার প্রথম পক্ষ ছিলেন অত্যন্ত সেকেলে। তিনি বাঁকা সিঁথে কাটতেন না, জুতো-মোজাও পরতেন না। পায়ের চেটো দুখানি ছিল নবোদ্ভিন্ন-কিশলয়-কোমল, গতি অতি লঘু—লীলায়িত। প্রতি পদক্ষেপে মনে হ'ত, শ্যাম তৃণদল যেন রোমাঞ্চিত হয়ে বল্‌ছে—"দেহি পদপল্লব-মুদারম্।"

তিনি ছিলেন যেমন সুহাসিনী, তেমনই স্বল্পভাষিণী আর তেমনই প্রিয়বাদিনী। বড় সুখেই দশটা বছর কেটে গেল। দশ বৎসর পরে এক দিন শুন্‌লাম, শরীরের ভিতর কেমন ঝিম্-ঝিম্ করে, মনে হয়, যেন শিরায় শিরায় সার-সার পিঁপ্‌ড়ে চল্‌ছে। হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আসে। বসিয়ে দিলে বসেন, আর শুতে পারেন না; শুইয়ে দিলে নিজে হ'তে আর উঠে বসতে পারেন না।

বাপের আমলের বৃদ্ধ ভৃত্য রামচরণ বল্‌লে, খোকাবাবু, তুমি ভাব্‌বে ব'লে বৌমা কিছু বলেন না। ওঁর দেহ ভাল নয়।

কেমন ক'রে জান্‌লি?

রাঁধতে রাঁধতে শুয়ে পড়েন। তরকারি চুঁইয়ে যায়, উঠ্‌তে পারেন না।

শুনে আমি চিন্তিত হলাম। বারণ করলাম, আগুন-তাতে যেয়ো না।

একটু হেসে বল্‌লেন, পাগল। তাঁর চোখ বল্‌লে, কত ভাগ্যে তোমার রাঁধবার অধিকারটুকু পেয়েছি, তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

চরণ বল্‌লে, বৌমা, খুব ভাল রাঁধ্‌তে পারে, আমি এমন বামুনের মেয়ে এনে দেব।

তিনি বল্‌লেন, ক্ষেপেছ! তাঁর চোখ বল্‌লে, এ সংসারে রাঁধুনী কখন ঢুকেছে?

আমি হেসে বল্‌লাম, এক জন পাগল, এক জন ক্ষেপেছে!

তিনিও হেসে বল্‌লেন, তাই ত দেখছি!

আমি বল্‌লাম, পাগলামি ছাড়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় অবস্থা অস্বচ্ছল নয়, দিন কতকের জন্য এক জন রাঁধুনী রাখতে দোষ কি?

তুমি তার হাতে খেতে পারবে? সত্যি কথা বল?

না খেয়ে কেমন ক'রে বলি?

চরণও পারবে না।

খুব পারব, বৌমা।

পার্‌বে?

চরণ মাথা নীচু করলে।

এই সত্যভাষিণীর কাছে মিথ্যা টেঁক্‌ত না।

আমি বল্‌লাম, আচ্ছা, তবে ওষুধ খাও।

তিনি তুলসীমঞ্চ দেখিয়ে বল্‌লেন, উনি আমার ডাক্তার, ওষুধ।

কি বিপদ্!

তিনি হেসে বল্‌লেন, আমাকে যখন ঘরে এনেছ, তখন বিপদ্ ত পদে পদে। এখন বাজে কথা ছাড়, নেয়ে নাও।

তুমি হ'লে বাজে! আচ্ছা বেশ! বাজে কাযেই চল, দিন কতক বেড়িয়ে আসি।

না। এখান ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না, যাবও না।

স্বর্গেও না?

না—না—না।

আমি অবাক্ হয়ে তাঁর মুখ পানে চেয়ে রইলাম! কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নি যে, স্বর্গ তাঁর কাছে এত ঘনিয়ে এসেছে। তিন দিন পরে এক দিন তিনি শয্যা ত্যাগ করতে পারলেন না। একখানি পা অবশ অসাড় হয়ে গেছে। ডাক্তার বল্‌লেন, পক্ষাঘাত। প্রাণপাত সেবা করেও তাঁকে ধ'রে রাখতে পার্‌লাম না। অজগর সাপ যেমন ধীরে ধীরে শিকার গ্রাস করে, এই দুরন্ত ব্যাধি তেমনই ক'রে তাঁকে কবলিত করতে লাগল। এ দিকে জীবনের আশা যতই কমে আস্‌ছে, বাঁচবার আশা ততই বেড়ে উঠছে। আমাকে সাহস দিতেন, তোমার ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে আমাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাকে ছেড়ে, এখান ছেড়ে আমি কোথাও টিঁক্‌তে পারব না।

হায়, শুনেছি, ভালবাসার অতি দৃঢ় বন্ধন, কিন্তু দয়িতাকে ধ'রে রাখবার মত এতটুকু শক্তিও কি তার নেই? তিনি যখন বল্‌ছেন, এখান ছেড়ে, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও টিঁকতে পারব না, তখন শমন তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে!

যে দিন থেকে মানুষ বুঝেছে যে, জন্মিলেই মৃত্যু, সে দিন হ'তে যমকে ফাঁকি দিতে যুগ-যুগান্তর ধ'রে সে কত রকম ফন্দি করেছে আর করছে! ঐ সূর্য্য-শশি-শোভিত, উজ্জ্বল, আলোকিত নীল আকাশ; মদির-সুরভি-বিলসিত বাতাস; বিহঙ্গ-কূজিত এই মৃন্ময় জীব-নিবাস; সর্ব্বোপরে পুত্র-কন্যা, প্রিয় পরিজনের দুর্ভেদ্য, দুশ্ছেদ্য মোহপাশ; আর তা চিরস্থায়ী করবার জন্য কি করুণ, উদ্‌ভ্রান্ত প্রয়াস! কিন্তু এ সকল প্রাণান্তিক প্রচেষ্টার পরিণাম কেবল শমনের অট্টহাস! তিনি চ'লে যেতে মনে হ'ল, কত কথাই বলবার ছিল, কিছুই বলা হ'ল না।

শুনেছিলুম, দীর্ঘ ভোগে এ রোগের পরিসমাপ্তি। কিন্তু সতী লক্ষ্মী এক বৎসরেই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত শেষ করলেন। ফুলশয্যায় যে চিত্র দেখেছিলাম, চিতা-শয্যায় দেখলাম, সেই চিত্র শ্মশান আলো ক'রে হাস্‌ছে! চিতা যখন নিব্‌ল, তখন উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন, কিন্তু আমার চোখে গাঢ় সন্ধ্যা। জল ঢেলে শ্মশানের চিতা নেবালাম, কিন্তু চোখের জলে বুকের চিতা নিব্‌ল না।

আমি প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলাম, আর বাড়ী ফিরলাম না। রামচরণকে বল্‌লাম, আমি ঘরে টিঁকতে পারব না। দিন কতক বেড়িয়ে আসি।

কৈশোরে পদার্পণ ক'রে অবধি আজ পর্য্যন্ত আমি সেই স্ত্রী, আমার শয়নকক্ষ, উদ্যান ও অধ্যয়ন-গ্রন্থ ব্যতীত এই রমণীয় সংসারের আর কিছুই দেখি নি। কত উন্মত্ত জলপ্রপাত প্রমত্ত সংঘাতে পাষাণ ভেদ ক'রে ছুটে চলেছে, কোথায়? কি উদ্দেশ্য? কার জন্যে? তুষার-মুকুট-মণ্ডিত কত উন্নত গিরি-শিখর নিরন্তর গভীর ধ্যানরত—কার? কত দুর্গম কান্তার সমীরস্পর্শে ঘুম ভাঙ্গলেই মর্ম্মরিয়া উঠে—কি বেদনায়? কি ক্ষোভে সাগর অনুক্ষণ বিক্ষুব্ধ? বিশাল মরুভূমির বুকে কি জ্বালা? মানুষের সঙ্গে এদের কি কোন সমবেদনা আছে? হায় রে, ক্ষুদ্র এক মানবীকে দেখেই সর্ব্বদা মনে হ'ত—'যে প্রগাঢ় কাব্য পড়ি, আননে তোমার'—বুঝাইতে ব্যগ্র হয় মন! তা সে সব বিশাল, বিপুল সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝ্‌ব কি? যাই হ'ক, তবু যাব—দেখ্‌ব, তারা এত দিন ধ'রে কি বাণী বুকে ক'রে ব'সে আছে। আমি সরাসরি সেই ক্ষুদ্র শ্মশান হ'তে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ শ্মশানে রওনা হয়ে গেলাম।

অশান্ত প্রেতের প্রায়, দুরন্ত দৈত্যের মত, কক্ষচ্যুত উল্কার ন্যায় দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লাম। কত মহিমময় প্রাকৃতিক দৃশ্য, কত মনোলোভা শোভা দেখলাম, সে সব বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যত দূরে স'রে যাই, ততই যেন গৃহের পানে আমাকে টানে। নগরে নগরে কত নৃত্যকলা দেখলাম, কিন্তু গৃহে যে স্বচ্ছন্দ-সুন্দর সহজ গতি দেখেছি, তার কাছে সবই অলবণ ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ। কত রমণীয় কটাক্ষাঘাত—মিষ্ট হাসির পুষ্পপাত দেখলাম, কিন্তু তার দৃষ্টি, তার হাসিবৃষ্টির সাদৃশ্য কোথাও পেলাম না।

অবশেষে কে যেন দুর্নিবার আকর্ষণে গৃহের দিকে আমার গতি ফেরালে।

যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা। গেটের সামনে এসে দাঁড়াতেই মনে হ'ল, যেন কার অশরীরী সত্তায় বাড়ীখানি পরিপূর্ণ, আর একটা স্তব্ধ ক্রন্দন যেন তার বুক চেপে ব'সে রয়েছে।

রামচরণ দেশে। দরোয়ান আলো দিয়ে গেল। সে চ'লে যেতেই আমি সেটা নিবিয়ে দিয়ে শূন্য শয্যায় ক্লান্ত কায় ঢেলে দিলাম। অনাহূত স্মৃতির উচ্ছ্বাস আশু আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লে। আমি জড়ের মত প'ড়ে রইলাম। কতক্ষণ পরে জানি না, আমার মনে হ'ল, কে যেন কাঁদ্‌ছে! জান্‌লার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে দিন অমাবস্যা। জান্‌লার ধারে আসতেই বোধ হ'ল, নিবিড় অন্ধকার যেন রোদনে মুখর হয়ে উঠেছে। ঘুমাবার জন্য আবার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। কিন্তু কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল, কে কোথায় অতি অশান্তভাবে রোদন করছে। এমন ক'রে কে কাঁদে? সুস্পষ্ট বামাকণ্ঠ। তার দিক্ নাই, দেশ নাই, আশা নাই, মানবীয় ভাষা নাই। আছে শুধু একটা নিরবচ্ছিন্ন বুক-ফাটা সুর!

আমার শয়ন-কক্ষের পাশেই একখানা ছোট ঘর ছিল, আমার অধ্যয়ন-কক্ষ - তার পাশেই ওপরে উঠ্‌বার সিঁড়ি। মনে হ'ল, কান্নার শব্দ সেই ঘর থেকেই আস্‌ছে। আলো জ্বেলে সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম, কেউ কোথাও নাই। না—না, আমার ভুল হয়েছে। কান্না ঐ কোণের ঘর থেকে আস্‌ছে। সেখানে গিয়ে মনে হ'ল, ঐ ও-দিকের ঘরে। দ্রুতপদে দেখতে গেলাম। কৈ, কোথায় কে! এমনি

ক'রে এ-ঘর, ও-ঘর, এ-দিক্, সে-দিক্, এখান-সেখান ঘুরে এসে বিছানায় পুনরায় শুয়ে পড়্লাম। নিদ্রা হ'ল না। কেবলই ভাব্ছি, কার এ অশান্ত আকুল রোদন—অবকাশ-বিরল, সান্ত্বনা-বিহীন! অনেকক্ষণ প'ড়ে প'ড়ে ভাব্তে ভাব্তে মনে হ'ল, এ আর কিছুই নয়, হৃদ্-যন্ত্রের শব্দ যেমন কখন কখন মনে হয়, বহির্দ্দেশীয়, এ কান্না তেমনই আমার অন্তরে, মনে হচ্ছে বাইরে। মীমাংসা করলাম বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তে মন সায় দিলে না। ক্রমে অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রন্দনও বাড়্তে লাগল। রাতও ফুরয় না, কান্নাও ফুরয় না! কিন্তু সকল দুর্নিশারই অবসান আছে, এরও শেষ হ'ল।

ভোর হ'ল। বাগান থেকে কে আমাকে ডাকলে—কিষণজী!

আমি চম্‌কে উঠ্লাম। এ স্বর যে আমার সুপরিচিত। আবার আওয়াজ এল—কিষণজী! এ স্বর সেই ধীরার সেই পালিত শালিক আদরিণীর। এখান হ'তে যাবার সময় রামচরণকে ব'লে গিয়েছিলাম, তুমি দেশে যাবার সময় পাখীটাকে ছেড়ে দিও। সে কি দেয় নি?

তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে ডাকলাম—আহ্লরী, কৈ রে তুই?

পাখীটা উড়ে এসে আমার কাঁধে বস্‌ল। বুঝলাম, ধীরারই স্বহস্ত-রোপিত আমড়া-গাছে বাসা বেঁধে আছে। এও কি এখান ছেড়ে কোথাও টিঁকতে পারবে না ব'লে যায় নি?

বাগানে এসে দেখলাম, তার সময়ে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল, তেমনই আছে। কোথাও একটি শুক্‌নো পাতা প'ড়ে নাই। বারো-মেসে বিলাতী আমড়া-গাছে তেমনই আমড়া ফলে রয়েছে। বারো-মেসে সজনে-গাছে তেমনই ডাঁটা ঝুলছে। আর যার স্নেহস্পর্শে গাছ ভ'রে ফুল ফুটত, সে নাই, তবু ত গাছ ভ'রে ফুল ফুটছে। মনে হ'ল, কি অকৃতজ্ঞ এরা! মানুষের সঙ্গে বাহ্য প্রকৃতির কোন সহানুভূতি নাই। যত্নের অভাব, তবু স্বভাবের সমান ভাব। কিন্তু আমার জীবন আর মুঞ্জরিত হবে না। চেষ্টাও করব না। ছি! তার শূন্য শয্যায় আর এক জনকে স্থান দেব? কখন না। গাছগুলোকে বল্‌লাম, হাসছ কি? দেখো! আমি মলে ধীরা যা করত, তার জন্যে আমি তাই করব। কেমন আহ্লরী?

আহ্লরী আমাকে একটা ঠোকর মারলে।

কিষণজী, ওর বাপের নামটা?

দাশরথি বলিল, লিখে নে—বাহাদুরী। কৃষ্ণলালবাবু, আপনি বলুন, মশাই।

বাগান থেকে উপরে উঠে এলাম। ঘরগুলি সব তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। কোথাও একটু ময়লা নেই। আমার অধ্যয়ন-কক্ষের দেওয়ালে আমার একখানা তৈল-চিত্র প্রলম্বিত ছিল। মনে করেছিলাম, তাতে দেখ্‌ব ঝুলের ঝালর ঝুল্‌ছে। কিন্তু কৈ? দেখ্‌লাম, বেশ পরিষ্কার। তার পাশে ধীরার একখানি ফটো ছিল। সেখানার কাচ বরং ধূলি-ধূসর হয়ে রয়েছে। ফটো-খানি পরিষ্কার করলাম। যা হ'ক, ভাব্‌লাম, দরোয়ানজী কেবল ভাঙ আর তুলসীদাস নিয়ে দিন কাটান নি, ঘর-দোরের উপরও একটু দৃষ্টি রেখেছিলেন।

একটা হোটেল থেকে কিছু খেয়ে এসে সারাদিন ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, এ বাড়ীতে একা বাস করব কেমন ক'রে? একটা নিস্তব্ধ নির্জ্জনতায় সমস্ত বাড়ীটা যেন ছম্‌ছম্ করছে। তার পর রাত্রিকালের সেই কান্না!

ক্রমে বেলা যত সন্ধ্যায় গড়িয়ে এল, আমার মন ততই অস্থির হ'তে লাগল। কেবলই মনে হচ্ছে, যেন কার নিষ্ফল প্রতীক্ষায় ব'সে আছি। সে আস্‌বে না, তবু তার আশাও ছাড়্‌তে পারছি না। মনে হচ্ছে এল ব'লে। সন্ধ্যার সময় ছাদে দেখ্‌লাম, পশ্চিম আকাশ একটা গোলাপী নেশায় রঙ্গিন হয়ে উঠেছে। মেঘের আড়াল থেকে একচক্ষু শুক্রদেব আমার পানে নিষ্পলক-নয়নে চেয়ে আছেন। সেই আমড়াগাছ থেকে আহ্লরী কিষণজী কিষণজী ব'লে বার কয়েক ডাক্‌লে। আমি নেমে এলাম। একটু পরেই ঘরে ঘরে সন্ধ্যার শঙ্খ বেজে উঠ্‌লো, তার সঙ্গে সঙ্গে সেই কান্না। দরোয়ানজী আলো নিয়ে এলেন। মনে করলাম, জিজ্ঞাসা করি, সে কিছু শুন্‌ছে কি না। কিন্তু লজ্জা করতে লাগল।

সে বোধ হয় আমার ভাবগতিক দেখে কতকটা বুঝ্‌তে পারলে, আমি একটু ছম্‌ছমে হয়েছি। একটু ইতস্ততঃ ক'রে অতি বিনীত স্বরে বল্‌লে, মহারাজ, বহুজী আস্‌বেন না?

আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। কে বহুজী? তখনি বুঝ্‌লাম, আমাকে আবার বিয়ে করতে অনুরোধ করছে। বল্‌লাম,

না, দরোয়ানজী ; আর বহুজী আস্‌বেন না। আমি আজই আবার পশ্চিম যাব। বাড়ী তোমার জিম্মায় রইল।

এবার যাবার আগে ধীরার ফটোখানি সঙ্গে নিলাম। ভাবলাম, এ দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ; এ ভেদ ক'রে কোন অপ্সরার কটাক্ষ-বাণ আর আমার অঙ্গে বিঁধবে না।

কিন্তু কি অবিশ্বাসী এই মানুষের মন! ছি! মানুষের এই পরম শত্রু যে তার দেহের ভিতর নির্ব্বিঘ্নে বাস করছে, তা সে আত্মপ্রকাশ না করলে বোঝা যায় না। কোথায় ভেসে গেল আমার সত্যধর্ম্ম, দুর্ভেদ্য বর্ম্ম! আমি আবার বিবাহ করলাম—পশ্চিমে চপলকুমারের কন্যা চঞ্চলাকে। নব বধূকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আমার দু'চার জন বন্ধুকে লিখে দিলাম—সপরিবার উপস্থিত থাক্‌তে।

নূতন সঙ্গিনী নিয়ে আমি যখন বাড়ী এলাম, তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

পিছন ছাঁটা, বাঁকা সীঁথে কাটা, বুকে ব্রুচ, ফুল-মোজার উপর হাই হীল (High heel) টাই (tie) আঁটা শু (shoe) প'রে আমার গৃহলক্ষ্মী যখন প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন, তখন আবার সেই মর্ম্মভেদী রোদন! বাড়ী শুদ্ধ লোক চকিত হ'য়ে পরস্পরের মুখ চাইতে লাগল। নব বধূর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। যেতেই পারে।

ঘণ্টা দুই পরে জলযোগ ও আমাদের শুভকামনা ক'রে বান্ধব-বান্ধবীরা যে যার গৃহে চ'লে যাবার পর চঞ্চলা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ গা, আমি বাড়ী ঢুকতেই অমন ক'রে ককিয়ে কেঁদে উঠল কে?

আমার মুখ শুকিয়ে গেল। আমিই জানি নি, কি উত্তর দেব! বললাম, কি জানি!

চঞ্চলা একটু অবিশ্বাসের সুরে বল্‌লেন, তোমার বাড়ীতে কে কাঁদছে, তুমি জান না?

কেমন ক'রে জানব? আমি ত তোমার সঙ্গেই বাড়ী ঢুকলাম।

আর কখন এ রকম কান্না শুনেছ?

মিছে কথা সহসা আমার মুখ দিয়ে বেরয় না, চুপ ক'রে রইলাম।

কে বল, তোমায় বল্‌তে হবে।

সত্য বলছি, জানি নি।

'ও:' বলে চঞ্চলা একটু বাঁকা হাসি হাস্‌লেন। বুঝলাম, মধু-মিলনের প্রথম রাত্রিতেই তাঁর অন্তরে সংশয়ের বীজ রোপিত হ'ল। হায় রে, যমের মত নিয়তিকেও কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে রোদনরোল আর উঠ্‌ল না। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পেলেন না! সংশয় বোধ হয়, দৃঢ়তর হ'ল।

আমার দ্বিতীয় পক্ষ ছিলেন ঘোরতর ভাব-তান্ত্রিক। চোখের সামনের জিনিষকে যত না বিশ্বাস করতেন, অদেখা বস্তুকে বিশ্বাস করতেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

নারী সাধারণতঃ স্বামীর কাছে প্রেম ও অর্থের ভিখারী। আমার দ্বিতীয় পক্ষের সে প্রয়োজন ছিল না। প্রেম নয়, তাঁর পরম অবলম্বন ছিল সাহিত্য আর সভা-সমিতি। তিনি বিবাহের বর্ম্ম পরেছিলেন কুলোকের কুটিল রসনা হ'তে আত্মরক্ষা করবার নিমিত্ত। তার পর ধনী পিতার আদরিণী কন্যা, প্রচুর মাসোহারা ব্যতীত তিনি বাপের কাছ থেকে অজস্র অর্থ চাইলেই পেতেন।

কলকেতায় এসে তাঁর প্রথম কার্য্য হ'ল একটি নারী-সমিতি গঠন করা। দ্বিতীয়, ঐ সমিতির মুখপত্রস্বরূপ একখানি মাসিক প্রচার। এখানি বিনা মূল্যে বিতরিত হ'ত। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে হয়, তিনি পুরুষ জাতির উপর কখন মিথ্যা দোষারোপ করেন নি। মহিলার যেটুকু সঙ্গত অধিকার, তিনি তারই পক্ষপাতিনী ছিলেন।

আমি কখন কারুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করি নি। কখন তার চিত্তাকর্ষণেরও প্রয়াস পাই নি। আমার বিশ্বাস, ফলকে জাঁকিয়ে পাকালে সুতার হয় না; আর কুঁড়িকে জোর ক'রে ফোটালে তার সৌরভ-সৌষ্ঠব সব নষ্ট হয়ে যায়। কালের কায কাল করে, আমরা মাঝে প'ড়ে বাধা দি মাত্র। তা ছাড়া, যিনি ছাপার কালীতে, সীসের অক্ষরে মাসিকে প্রচার করেন,—প্রেম যতই গভীর হ'ক, দেহের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়। কিন্তু জনকল্যাণ-সাধন চিরস্থায়ী। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।—তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষা-শৈলমূলে গিরি-নদীর মাথা কোটা। সে সম্বন্ধে সময়ের উপর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত-মনে পড়া-শুনা নিয়ে রইলাম। তিনি আমার উপর সংশয়, আর সভা-সমিতি, সাহিত্য নিয়ে রইলেন। আমি সে সংশয় দূর করবার চেষ্টা কখন করি নি। কালের উপর ভার। কিন্তু কাল তা দৃঢ়তর ক'রে তুল্‌লে।

একদিন আমার এক বন্ধু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করলেন, কবিতায় একখানি প্রেমলিপি লিখে দিতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন হে, খামকা প্রেমে প'ড়ে গেলে না কি ?

ভাই, প্রেমে ত লোক খামকাই পড়ে। ও একেবারে ভিনি, ভিডি, ভিসি—(veni, vidi, vici)—এল, চোখে দেখ্‌লে আর জয় করলে।

তা পদ্য কেন, গদ্য লেখনী!

বন্ধু বল্‌লেন, ছি! যে ভাষায় 'ঝি, উনুনটা ধরিয়ে দে, বামুনঠাকুর ভাত বাড়ো' বলা যায়, সেই ভাষায়? যে ভাষায় বাসন মাজা, কাপড় কাচা যায়, তাতে প্রেম হয়?

আমি হেসে বল্‌লাম, এগুলো বুঝি নিতান্ত অনাবশ্যক? প্রেম খায় না?

কে বল্‌লে? খাবে না কেন? খালি হাওয়া।

উহুঁ, শুধু তাই নয়।

আবার কি?

আর প্রেমপাত্রের মাথা।

ঠাট্টা করছিস! রাঁধা-বাড়া, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, পাণ-সাজা এ-সব প্রেমের স্বধর্ম্ম নয়।

তার স্বধর্ম্মটা কি?

খালি দীর্ঘশ্বাস, হা-হুতাশ, চোখের জল, এই সব!

প্রেম পাণও খায় না?

একটু ভেবে বন্ধু বল্‌লেন, খায়—জর্দ্দা কিম্বা তাম্বূল-বিলাস দিয়ে। লেখ, ভাই।

রোস। তুমি যে প্রেমের কথা বল্‌ছ, তা বর্ণনা করতে গেলে একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হয়। আচ্ছা, তুমি যখন প্রেমে প'ড়ে গেলে, তখন চাঁদের আলো ছিল?

না। কাঠফাটা রৌদ্র।

মলয়-বায়ু?

না। সে দিন অসহ্য গুমট।

ফুলের বাস?

না। পচা নর্দ্দমার গন্ধ।

কোকিলের ডাক?

না। এক জন মাথায় ঝুড়ি নিয়ে হাঁক্‌ছিল,—তাজা হাঁসের ডিম।

তবে তোরও ঘোড়ার ডিমের প্রেম।

ঠাট্টা নয়, ভাই! লেখ, আমার প্রাণ যায়। তোর পায় পড়ি।

আ-হা-হা, করিস কি!

আমি জানি, বন্ধুটি ভাবুক,—কিছু অতিরিক্ত মাত্রায়। বল্‌লাম, বেশ। অবস্থাটা শুনি। তুই যখন হোঁচট্ খেলি—

হোঁচট্ আবার কবে খেলুম?

ঐ হ'ল! এ ত প্রেম পড়া নয়, প্রেমের খোঁচায় হোঁচট্ খাওয়া, তা তখনকার অবস্থা কি?

অবস্থা? তিনি ছাদে দাঁড়িয়ে, আমি রাস্তায়। চার চক্ষুর মিলন হ'ল। প্রচণ্ড রদ্দুর, তিনিও ঘামতে লাগলেন, আমিও ঘাম্‌তে লাগলুম। বাইরে আগুনের হল্‌কা, আমার বুকের ভিতর প্রেমের ফিন্‌কি—

হয়েছে, ভাই! আমি লিখে রাখব, তুমি পরশু এসে নিয়ে যেয়ো!

মনে ক'রে লিখিস্, ভাই! সম্পাদক বলেছেন, দিন তিন চারেকের ভিতর দিতে পারলে এই মাসেই বেরুবে!

কাগজে ছাপাবি না কি? কি কাগজ?

ঐ যে, কি বলে! নামটা মনে আসছে, মুখে আস্‌ছে না —ঐ যে রে! রং-বেরঙের ডানা, ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, মধু খায়—

কি? হোঁদল্‌-কুৎকুতে?

হাঁ-হাঁ, অমনি যা হয় একটা হবে।

বুঝলাম, বন্ধুবর একে ভাবুক, তার উপর প্রেমে পড়েছেন। মাথার ঠিক নাই। 'প্রজাপতি' নামটা মনে আন্‌তে পারছেন না। বললাম, আচ্ছা, নিশ্চয় পাবে।

বন্ধু বললেন, এখনই লেখ না।

না। অনেক দিন অভ্যাস নাই।

কেন, প্রথম বৌদির আমলে ত অনেক লিখেছ?

সে দিন গেছে, বন্ধু!

ওঃ, প্রথম বৌদির নাম করতেই তোমার ভাব লাগল, দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। তুমি যথার্থ প্রেমিক। কবিতা যা হবে!

তা মা গঙ্গাই জানেন! ব'লে হেসে মনের ভাব হাল্‌কা ক'রে নিলাম। বন্ধু চ'লে গেলেন। পরদিন কবিতাটি রচনা ক'রে কাগজ-চাপার তলে রেখে দিলাম।

চঞ্চলা ঘরে ঢুকে এ-কি ব'লে সেটা পড়তে লাগলেন।

বাহ্যপ্রকৃতির মত প্রত্যেক নর-নারীর অন্তঃপ্রকৃতিও চিত্র-বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত। চঞ্চলা এক দিকে যেমন সরল, তেমনই কুটিল; যেমন উদার, তেমনই সংশয়ী। এমন সংবেদনা-বিহীন নির্ব্বিকার, স্ব-প্রতিষ্ঠ, অথচ বিষ বিষে জর্জ্জরিতচিত্ত সচরাচর বিরল। চঞ্চলা কবিতাটি দু'তিনবার পাঠ ক'রে কিছুক্ষণ কঠোর দৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। দৃষ্টি যেন শাণিত ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ। তার পর অতি রুক্ষ স্বরে বল্‌লেন, ওঃ, তোমার পেটে পেটে এত শয়তানী! ডুবেডুবে জল খাওয়া!

আমি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলাম।

ওঃ, যেন কিছুই জানেন না!

কি বল্‌ছ, চঞ্চল?

আমি জিজ্ঞাসা করি, এ প্রেমপত্রখানি কাকে লেখা হয়েছে?

আঘাত করলেই মানুষের মন প্রতিঘাত করতে চায়। বল্‌লাম, যাকেই লিখি না, তোমার তাতে মাথাব্যথা কি? তুমি ত আমার ভালবাসা চাও না?

কে বল্‌লে?

আমি বল্‌ছি।

তোমার মত কপট, শঠ, লম্পটের ভালবাসা অপমান।

আমারও মেজাজ তখন গরম হয়ে উঠেছে। আমি একটা শ্লেষের হাসি হেসে বল্‌লাম, তুমি যে রুক্ষলীলা আরম্ভ করলে দেখছি।

সে আমি নয়, তুমি। এত যদি মনে ছিল, আমাকে বিবাহ ক'রে অপমান করলে কেন?

কিছু না। বে করেছিলাম তোমার বাবার সাধাসাধি, জেদাজেদিতে।

সাধাসাধি, জেদাজেদিতে?

নিশ্চয়। তিনি আমার হাতে ধ'রে বলেছিলেন, যুবতী কন্যা, অগাধ সম্পত্তি, অভিভাবকশূন্য, কত বিপদ্ বুঝ্‌তে পারছ ত? তাঁর কাতরতা দেখে।

চঞ্চলা অধীর হয়ে বল্‌লেন, থাক্ থাক্, বুঝ্‌তে পেরেছি। বাবার দুর্ব্বলতার সুযোগ পেয়ে সেই সম্পত্তির লোভে তুমি একটা নিরীহ নিরপরাধ স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করলে! বাবাকে কি আমাকে তোমার সব কথা খুলে বলেছিলে?

আমার যে পূর্ব্বে বিবাহ হয়েছিল, তা তিনি জান্‌তেন।

দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহতে আবার কি বাধা? ছলের আশ্রয় নিয়ো না। তোমার চরিত্রদোষের কথা বলেছিলে?

চরিত্রদোষ? এ বলে কি! যাক্, স্ত্রীলোক—বল-প্রয়োগ করবার যো নেই। আর জঘন্য কথা নিয়ে বিবাদ করতেও ঘৃণা বোধ হয়। বল্‌লাম, দেখ চঞ্চল, এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির কি দরকার?

তোমার না থাক্‌তে পারে, আমার আছে।

কি?

সে তুমি বুঝবে না।

বোঝবার দরকারও নেই। স্বামি-স্ত্রীতে যেখানে ভালবাসার সম্বন্ধ, সেইখানেই রাগ-বিরাগ, মান-অভিমান চলে। তা যখন নেই, তখন তুমি তোমার পথে চল, আমিও আমার পথে চলি।

তা তোমায় চল্‌তে দেব না। ভালবাসা নেই, কর্ত্তব্য আছে। সেটা তার চেয়েও বড়। স্বামীর কর্ত্তব্য যেমন স্ত্রীকে রক্ষা করা, স্ত্রীর কর্ত্তব্য তেমনই কুপথগামী স্বামীকে রক্ষা করা। সে কর্ত্তব্য আমি পালন করবই।

ঠিক এই সময় আমার সেই ভাবুক বন্ধু হাঁক্‌লেন, কিষণজী!

আত্মীর অনুকরণে বন্ধুরা প্রায়ই আমায় ঐ ব'লে ডাক্‌তেন। অপ্রিয় আলোচনা-নিবৃত্তি করবার এই সুযোগ। ডাক্‌লাম, এস।

বন্ধু তিন লাফে ঘরে ঢুকেই চঞ্চলাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে বল্‌লেন, এই যে বৌদি!

তাঁর সেই থতমত ভাব লক্ষ্য ক'রে চঞ্চলা একটু হেসে বল্‌লেন, আসুন, নমস্কার।

নমস্কার, বৌদি! দাদা, সেটা লেখা হয়েছে?

হয়েছে।

কৈ, কৈ?

ঐ তোমার বৌদির হাতে।

দিন, বৌদি! আমায় এখনই যেতে হবে।

চঞ্চলা বল্‌লেন, তা হবে বৈ কি। কিন্তু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? এ প্রেমলিপিখানি কাকে দেওয়া হবে?

বন্ধুর গোলগাল নিটোল মুখখানি একেবারে পাকা

বিলাতী বেগুনের মত টক্‌টকে হ'য়ে উঠ্‌ল। আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌লেন, এটা ? তা—হ্যাঁ—একটি বান্ধবীকে।

বুঝেছি। এই নিন্‌, দিন্ গে। দেরি করবেন না।

রামঃ! দেরি! আমি এখনই চল্‌লাম। ব'লে আবার তিন লাফে সিঁড়ি পার।

চঞ্চলা বল্‌লেন, ইনিই বুঝি বড়াই ?

বড়াই কি ?

দূতী গো, কৃষ্ণলীলার দূতী। বৃন্দাবনের বৃন্দা সতী। ব'লে চঞ্চলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভেবেছিলাম, বন্ধু আসাতে হাওয়াটা একটু হাল্‌কা হবে। উল্টো হ'ল। চঞ্চলার মনে সন্দেহমূল দৃঢ়তর হ'য়ে বস্‌ল।।

এ সম্বন্ধে আর কোন কথা ওঠে নি। কিন্তু এর পর থেকে আমার কোন চিঠি না প'ড়ে তিনি আমাকে দিতেন না। যাক্ গে! যাতে ঠাণ্ডা থাকে, তাই করুক। আমার এমন কিছু গোপনীয় নেই, যাতে স্ত্রীর কাছে লজ্জা পেতে হবে।

এই ঘটনার দিন কতক পরে আমার কয়েক জন বন্ধু এসে চঞ্চলাকে বল্‌লেন, বৌদি! আমরা বে'র দিন বর-কনে ঘরে তুল্‌লুম, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এখনও বৌ-ভাত জুটল না।

চঞ্চলা হেসে বল্‌লেন, বেশ ত! কবে খাবেন, বলুন।

আপনি যবে বল্‌বেন। কিন্তু, এক সর্ত্ত।

কি ?

আপনাকে বেশী কিছু রাঁধতে হবে না। মাছের ঝোল, আপনাদের বাগানের সজ্‌নে-ডাঁটা চচ্চড়ি, বিলিতী আমড়ার চাট্‌নী। কিন্তু আপনাকে স্বহস্তে রাঁধতে হবে।

বেশ ত! সভা-সমিতি করি ব'লে কি রান্নাটাও শিখি নি। আমার বাবার ওতে ভারি ঝোঁক। ভাল লোক রেখে শিখিয়েছিলেন। একটা দু'ট তরকারি তাঁকে রোজ রেঁধে দিতে হ'ত। আচ্ছা, কালই আপনাদের নিন্দা করবার সুযোগ দেব। কিন্তু সজ্‌নে-ডাঁটা চচ্চড়ি, বিলাতী আমড়ার চাটনীর ওপর এত ঝোঁক কেন ?

এক জন বললেন, সে বৌদি রাঁধতেন। মনে হ'লে এখনও মুখে লাল পড়ে। লাখ টাকা তোলা, বৌদি।

চঞ্চলা একটু হেসে একটু শ্লেষের স্বরে বললেন, তবেই ত মুস্কিলে'ফেল্‌লেন, তাঁর সংসারটি অধিকার করেছি ব'লে কি শ্রীহস্ত দু'খানিও পেয়েছি! আমি যেমন জানি, তেমনই রেঁধে দেব। তার পর পাস্ ফেল্ পরীক্ষকদের মর্জ্জি। তা হ'লে কালই সন্ধ্যার পর ঠিক রইল।

বেশ বেশ, ব'লে বন্ধুরা চ'লে গেলেন। আমার কিন্তু একটু ভয় হ'ল। চঞ্চলা বেশীক্ষণ এক যায়গায় স্থির হ'য়ে বস্‌তে পারতেন না। নিবিষ্ট হ'য়ে রাঁধতে পারবেন কি ? ধীরা চ'লে যাবার পর আমাদের রান্নাঘরে পাচক ঢুকেছে। যা হয় হবে।

হ'ল কিন্তু অসম্ভব—আশার অতীত। সকল তরকারি ছেড়ে টান ধরলে চচ্চড়ি আর চাট্‌নী। চঞ্চলাও এ দুটি রেঁধেছিলেন অপর্য্যাপ্ত। বন্ধুরা বল্‌লেন, বৌদি, আপনি না বল্‌লেন, সে বৌদির হাত দুখানি পান নি ?

চঞ্চলার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। বল্‌লেন, এগ্‌জামিন্ পাস্ ? কত টাকা তোলা ?

এ-ও লাখ টাকা তোলা। কি বলিস্ রে, কিষণজী ? ইস্, তোর যে ভাব লেগে গেল।

সত্যই আমার তখন ভাব লেগে গিয়েছিল। এ যে বজায় ধীরা। অল্পে অল্পে চাট্‌নী খেতে খেতে চরম বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এ কি তোমার রান্না ?

চঞ্চলার মুখে সে আনন্দের শিখা হঠাৎ যেন একটা দম্‌কা হাওয়ার ঝট্‌কায় নিবে গেল। সেও বল্‌লে, না, আমরা কি আর রাঁধতে জানি ? যা জান্‌তেন তিনি।

কিন্তু আশ্চর্য্য! এক দিন চঞ্চলা এসে বল্‌লেন, দেখ গা, তোমাকে অপদস্থ করব ব'লে লুকিয়ে লুকিয়ে তিন চার দিন আমি সে চচ্চড়ি আর চাট্‌নী রেঁধেছিলুম। সে রকম ত এক দিনও ওৎরালো না। সে দিন কি ক'রে সে রকম হ'ল ?

চঞ্চলা মধ্যে মধ্যে সহসা আমার অধ্যয়ন-কক্ষে এসে উপস্থিত হতেন, আমি বেশ বুঝ্‌তে পারতাম—সন্দিগ্ধচিত্তে। এক দিন এসেই চকিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, কে—কে ?

পড়্‌তে পড়্‌তে আমার বোধ হয়, একটু তন্দ্রাবেশ হয়েছিল। আমিও চম্‌কে উঠে চারদিক্ চাইলাম। চঞ্চলা কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন, ঘরে কে এসেছিল, বল ? বল্‌তেই হবে।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে তাঁর মুখপানে চেয়ে বল্‌লাম, কে ?

কে? যে তোমার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। ইল্লৎ যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না ম'লে। নির্লজ্জ! কে এসেছিল, বল।

আমার পিছনে ত দু'ট চোখ নেই যে দেখব? কে দাঁড়িয়েছিল, কেমন ক'রে বল্‌ব?

চঞ্চলাও ক্রুদ্ধা হয়ে বল্‌লেন, পিছনে চোখ নেই, তা জানি। আহাম্মুক যারা, তাদের থাকেও না। যারা বুদ্ধিমান্, তাদের চারদিকে চোখ থাকে। বেশ ত, পিছনে চোখ ছিল না, শরীরে ত সাড় ছিল। মড়া ত নয় যে, অসাড়। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, সেটাও কি টের পাও নি?

তার স্বর পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠ্‌ছে। রাগের মুখে শিক্ষা-সহবৎ কোথায় ভেসে যায়। বাড়ীতে চাকর-বাকর রয়েছে। আমি খুব সহজ স্বরে বল্‌লাম, বিশ্বাস কর, আমি এর বিন্দুবাষ্প কিছুই জানি নি।

উঃ, হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে এখনও লুকোচুরি? তুমি ছোট লোক।

হ'তে পারে। কিন্তু তোমার যা আচরণ, হাড়ী-ডোম-কাওরাদেরও হার মানিয়েছে। চেঁচামেচি করলে কি হবে? আমি যদি সত্যই কু-চরিত্র হই, তুমি কি মনে কর, আমি কবুল করব?

চঞ্চলা একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে হাত-পা ছুড়তে লাগল। মুখ বিবর্ণ। এ ত হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ। আমি ভীত হয়ে তার শুশ্রূষা করতে লাগলাম। চঞ্চলা ক্রমে অসাড় হয়ে পড়ল। তাকে সেই অবস্থায় দেখতে দেখতে ক্রোধ, করুণা, দুঃখ আমার মনকে যুগপৎ আলোড়িত ক'রে তুললে। আমার কথায় না বিশ্বাস করতে পেরে নিরর্থক কি যন্ত্রণাই না পাচ্ছে! আমার হৃদয় যে অবিশ্বাসী নয়, তার কি প্রমাণ দেব! হায়, ধীরা! আমার উপর তার কি বিশ্বাসই ছিল। আমার চোখে দেখত, আমার কাণে শুনত। হায়, এত ভালবাসা, এত বিশ্বাস—সবই সে ভুলে রয়েছে! শুনেছি, পরলোকগত অশরীরী আত্মা কত রকমে স্মৃতির নিদর্শন দেয়। কখন ছায়া-দেহ ধ'রে এসে প্রিয় জনকে সান্ত্বনা দেয়। আমার অন্তর যে তার জন্য নিরন্তর কাঁদছে, সে কি তা জানতে পারছে? বলেছিল, তোমাকে ছেড়ে, এখান ছেড়ে আমি কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারব না। তবে চঞ্চলা যা বলে—ভালবাসার বন্ধন যতই দৃঢ় দুশ্ছেদ্য হোক, মৃত্যুতে ছিন্ন হয়—তাই কি ঠিক? এই যে অসীম বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়? তবে কেন বলে মহাদেব মহাপ্রেমে মৃত্যুঞ্জয়? ধীরা, ধীরা, কোথায় তুমি? আমি তোমার কাছে অবিশ্বাসী হয়েছি ব'লে কি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছ? কিন্তু সত্যই কি আমি অবিশ্বাসী? সত্য। আমি ধীরার কাছে অবিশ্বাসী—তার স্থানে চঞ্চলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি ব'লে। চঞ্চলার কাছে অবিশ্বাসী—আমার অন্যগত চিত্ত ব'লে।

চঞ্চলা ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠ্‌লেন। তার পর আমার উপর একটা তীব্র দৃষ্টিপাত ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন।

সেই দিন অপরাহ্নেই চঞ্চলা একখানি প্রজাপতি পত্রিকা আর একখানি পত্র হাতে ক'রে এসে বল্‌লেন, আমাকে মাপ কর।

পূর্ব্বেই বলেছি, চঞ্চলা নিজে না প'ড়ে আমার কোন পত্রই আমাকে দিতেন না। সেই খোলা চিঠি আমার হাতে দিয়ে আবার মিনতি-স্বরে বল্‌লেন, আমায় ক্ষমা কর, আমি অকারণ তোমায় সন্দেহ করেছি।

চিঠি পড়্‌লাম। আমার সেই ভাবুক বন্ধুর লেখা—কিষণজী, কেল্লা ফতে—এক কবিতায়। সার্থক কলম ধরেছিলে! কিন্তু পত্রিকার নাম ঢোঁদল-মাদল নয়—প'ড়ে দেখ, ছাপা এক কপি পাঠালুম। কবিতা পড়েই কমলিনী (তাঁর নাম) কুপোকাৎ। হবে না! একেবারে নির্ঘাত আঘাত কি না! প্রেমে পপাত। আগামী ১৪ই ফাল্গুন—আসুন। নিমন্ত্রণ—আসা চাই, বৌদিদিকে সঙ্গে নিয়ে। চাট্‌নী রাঁধবেন।

যাবে না কি?

সে রকম চাট্‌নী ত রাঁধতে পারব না। সে রান্না নিশ্চয় অলৌকিক।

তুমি ও-সব মানো না কি?

নইলে আর কি বলি, বল?

আমি আসার দিন সেই কান্না, তার পর সেই রান্না—আশ্চর্য্য বটে!

খুবই আশ্চর্য্য! আমার বিশ্বাস, ভালবাসা শরীরের সঙ্গে শেষ হয়। ম'ল—এখানকার সম্বন্ধ সব ফুরুল। কিন্তু অলিভার লজ (Oliver Lodge), ষ্টেড (Stead),

কোনান ডয়েল (Conan Doyle), ক্রুক্স (Crooks) প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ মনীষীরা বলেন, জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ ফুরায় না। ভালবাসার আকর্ষণে অশরীরী আত্মা প্রিয়তমের কাছে কখন কখন সান্ত্বনা দিতে আসে।

আমার অন্তর হাহাকার ক'রে উঠল—হায় ধীরা, সকলই ভুলেছ ?

চঞ্চলা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তোমার বিশ্বাস হয় না ?

কোন নিদর্শন ত পাই নি।

তার পর চঞ্চলা উঠে আমার তৈলচিত্রখানি দেখতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ গা, তোমার ছবির পাশে দেয়ালে পেরেক মারা রয়েছে, ছবি নেই কেন? কার ছবি ছিল ?

ধীরার ফটো।

টাঙ্গিয়ে রাখ নি কেন ?

পশ্চিম যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। সুটকেসের ভিতর আছে।

চল না, একবার বাবাকে দেখে আসি।

তথাস্তু। চঞ্চলার গয়নাপাতি অনেক ছিল। টাকা-কড়ির ত কথাই নাই। তাই আমার শয়নকক্ষ ও অধ্যয়ন-কক্ষ বেশ ক'রে দেখে শুনে চাবি বন্ধ ক'রে পরদিনই আমরা পশ্চিমে গেলাম।

যে দিন ফিরে এলাম, সে দিন আমার জন্মদিন। মনে পড়ল, এই দিন ধীরা স্বহস্তে মালা গেঁথে আমায় উপহার দিত। আজ সে কোথা ?

তার পর অধ্যয়নকক্ষের চাবি খুলেই চঞ্চলা চকিত হয়ে বললে, ওগো, দেখ, তোমার ছবি এমন চমৎকার মালা দিয়ে সাজালে কে ? ঘর বন্ধ। অথচ টাট্‌কা মালা। আশ্চর্য্য !

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লাম, আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য—মালা টাট্‌কা, ধীরার হাতে গাঁথা !

কক্ষে প্রবেশ ক'রে চঞ্চলা আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, কৈ, তোমার ছবির পাশে ত কোন ফটো ছিল না ?

তার পর কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, ফটো কার ?

আমি জড়িত স্বরে উত্তর দিলাম, ধীরার।

চঞ্চলা একখানা চেয়ারে ব'সে পড়লেন। তাঁর মুখ তখন নীলবর্ণ হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হ'ল ?

চঞ্চলা বল্‌লেন, সে দিন এঁকেই দেখেছিলুম, তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

রম্যাণি বীক্ষ্য

কৌমুদী-ধারা, শানায়ের সুর, মন্দ মলয়া পরশন,
কেতকীগন্ধ, ইন্দ্রধনুটি অম্বরে,
ইন্দ্রিয় মোর নন্দিত করে, অঙ্গে জাগায় হরষণ,
বিরহ-বিধুর করে কেন মোর অন্তরে ?

জীবন চুঁড়িয়া পাই না ভাবিয়া কিসের লাগিয়া এ বেদন
গুমরি মরিছে মরমে কিসের ব্যর্থতা,
কার দূত হয়ে করিছে ইহারা গোপনে কাতর নিবেদন,
পরাণে জাগায় রহস্যময় আর্ত্ততা।

কারে সাথে ক'রে লঘু পাখা-ভরে করেছি গগনে বিচরণ,
বাঁধিয়াছি কারে পল্লবমালা-বন্ধনে,
এরা তারি তরে থেকে থেকে করে আমার পরাণ উচাটন,
তারি লাগি ভরে অন্তরাত্মা ক্রন্দনে।

যুগে যুগে আমি কাহার সঙ্গে ভুঞ্জেছি সুখ অনুখন,
হ্রদনদ-বুকে পাশাপাশি সুখে সন্তরি,
একটি কুসুমে কার সাথে চুমি করিয়াছি মধু নিষেবণ,
কণ্ঠ মিলায়ে গান ধরিয়াছি বন ভরি' ?

এ জীবনে তারে রয়েছি পাসরি, এ জীবনে সে যে হারাধন
সকল বাঁশরী এই কথা বলে গুঞ্জনে,
সব সুখ উপভোগের মাঝে কি অভাব করে বিলাপন
জ্বালা কেন পাই সকল মাধুরী ভুঞ্জনে।

শ্রীকালিদাস রায়।

জড় ও চৈতন্য

গতবার 'বিজ্ঞানে ধর্ম্ম' শীর্ষক সন্দর্ভে আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিজ্ঞান ধর্ম্মকে একেবারে পরিহার করিয়া চলিতে পারে নাই। কতকটা পথ তাহারা একসঙ্গে অগ্রসর হইয়া পরে পৃথক্ হইয়াছে। অবশ্য এ ধর্ম্ম আমি হিন্দুর ধর্ম্ম বা বেদান্তের ধর্ম্ম বলিতেছি। আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, বিজ্ঞান চৈতন্যের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন না। আমি লিখিয়াছিলাম যে, "এই পৃথিবী শীতল হইবার ফলে ইহাতে জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং উহাতে স্বতন্ত্র সত্তারূপে চৈতন্য আসিবে কোথা হইতে? * আমাদের এই পৃথিবী ভীষণ উত্তপ্ত সূর্য্য-মণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এখন শীতল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারই ফলে এমিবা হইতে মানুষ পর্য্যন্ত আত্মসংবিত্তিসম্পন্ন জীবশ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে।" * * * অতএব এই যে চৈতন্য, ইহা জড়ের বিকার বা অবস্থাবিশেষসম্পর্কিত পরিণাম মাত্র।"—ইহাই বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের সিদ্ধান্ত। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায়,—"যাহা নাই, তাহা হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না, উৎপন্ন করা যাইতেও পারে না। যাহা আছে, তাহা হইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের এই পৃথিবী যখন অতি তেজোময় জলন্ত একটা মহাকায় বস্তুর মত সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, তখন তাহা এতই প্রতপ্ত ছিল যে, তাহাতে কোন জীব বা চেতন পদার্থ থাকিতেই পারিত না। তাহাতে জীবের কল্পনা অত্যন্ত অসম্ভব। কাযেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, তাহাতে জড় পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। ক্রমে সেই পৃথিবী শীতল হইতে আরম্ভ হইল। উহার পৃষ্ঠদেশ কঠিন হইয়া পড়িল। উহাতে জল, স্থল, পর্ব্বত প্রভৃতি দেখা দিল। ক্রমে উহাতে শৈবাল, উদ্ভিদ এবং জীবজন্তু আবির্ভূত হইল। জীবজন্তুর মধ্যে চৈতন্যও জন্মিল। এই চৈতন্য জীব কোথায় পাইল? সুতরাং ধরাপৃষ্ঠে যেমন বাতাস, জল, পর্ব্বত, মৃত্তিকা, ধাতুপদার্থ প্রভৃতি অবস্থাবিশেষের ফলে আবির্ভূত হইয়াছে,—সেইরূপ জীবদিগের শরীরে চৈতন্য সেই জড়পদার্থেরই একটা অজ্ঞাত সম্মেলনফল বা রাসায়নিক ফল। আমরা এখনও প্রকৃতির সেই রহস্য জানিতে পারি নাই। যখন উহা আমরা জানিতে পারিব, তখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নানাপ্রকার জীবজন্তু এবং মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে।" জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। এই কথায় মুগ্ধ হইয়া অনেকেই জড়বাদী হইয়া পড়িতেছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, জড় পদার্থ বলিলে আমরা কি বুঝি? জড় পদার্থে কোনরূপ চৈতন্য-শক্তি,—সুতরাং কোনরূপ বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনা-শক্তি, হিতাহিত-চিন্তা, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে চিন্তা ইহা কিছু থাকিতে পারে না। উহাতে কোনরূপ চেষ্টা বা বাসনা থাকিতে পারে না। আমার সম্মুখে যে উপলখণ্ড রহিয়াছে, উহা কোন সমস্যার বিচার করিতে, ভবিষ্যৎ ভাবিতে অথবা প্রকৃতির এই অনন্ত লীলার কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে,—ইহা বোধ হয় কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই মনে করেন না। তবে উহাতে সেই শক্তি সুপ্ত আছে কি না, তাহা বলা বড় কঠিন। বৈজ্ঞানিক যতক্ষণ তাহা সপ্রমাণ করিতে না পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার সে কথা জোর করিয়া বলিবার অধিকার নাই। কারণ, বৈজ্ঞানিক বিনা প্রমাণে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারেন না। নেতিমূলক (Negative) সিদ্ধান্তেরও প্রমাণ চাই। আর যদি চৈতন্য জড় পদার্থের রাসায়নিক সংশ্লেষণের (Physico-chemical) ফল হয়, তাহা হইলে সেই জড় পদার্থের সিদ্ধান্তের মূল্যই বা কি হইতে পারে?

এ ক্ষেত্রে হিন্দুরা যাহা বলেন, তাহার খণ্ডন জড়বাদীরা অদ্যাপি করিতে পারেন নাই। হিন্দুরা আবার অন্য সকলের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে বলেন যে, চৈতন্যশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, বিচারবুদ্ধি, পরিণাম-চিন্তা, হিতাহিত-জ্ঞান প্রভৃতি জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। উহা চৈতন্যেরই নিজস্ব। উহা জড়ের গর্ভিত শক্তি নহে যে, রাসায়নিক সংযোগফলে উহা জড় হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। যাহাতে যে শক্তি গর্ভিত থাকে, তাহা হইতে সেই শক্তি অনুকূল অবস্থায় এবং অনুকূল সংযোগফলে প্রকাশ হইয়া পড়ে। যদি বল, জড় পদার্থে ঐ শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা জড় পদার্থ নহে, উহা মায়া-উপহত চৈতন্য পদার্থ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই ব্রহ্মেরই বিকার। হিন্দু বলেন যে, ভগবানের মনে যখন সিসৃক্ষার উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, এক আমি বহু হইব। তখন তিনি তাঁহার অঙ্গ হইতে মহদ্‌ব্রহ্ম বা প্রকৃতির সৃষ্টি করেন। সেই প্রকৃতি শক্তিরূপিণী হইয়া অণু পরমাণু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহারই সাহায্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। সেই লীলাময়ী প্রকৃতির ভিতর দিয়া পরব্রহ্ম উহাতে চৈতন্যশক্তির সঞ্চার করিয়া দেন। সেই জন্য ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—

> "মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
> সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
> সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
> তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

হে ভারত অর্থাৎ অর্জ্জুন! মহদ্‌ব্রহ্ম বা মহা প্রকৃতিই আমার গর্ভাধানস্থান। তাহাতে আমি সমস্ত জগতের বীজ (পরমাণু ও চৈতন্যরাশি) নিক্ষেপ করি। সেই জন্য উহাতে সর্ব্বজীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে কুন্তীনন্দন! সমুদয় যোনিতে যত প্রকার জীবমূর্ত্তি উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃতিই সেই সকলের মাতা অর্থাৎ তাহার গর্ভধারিণী, আর আমিই (অর্থাৎ পরব্রহ্মই) তাহাতে চৈতন্যশক্তিসঞ্চারক পিতা। ইহার অর্থ এই যে, যেখানে যে জীবই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সকলেই অণু-পরমাণু লইয়া ক্রীড়াশীলা প্রকৃতির কুক্ষি হইতে আবির্ভূত হইলেও তাহাতে প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া দেই আমি।

জড়বাদীরা অবশ্য বলিবেন যে, গোটা কতক সংস্কৃত শ্লোক

* এখানে মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ 'স্বতন্ত্র সত্তারূপ' স্থানে 'স্বতন্ত্র মৃত্যুরূপ' ছাপা হইয়াছিল।

উদ্ধৃত করিয়া দিলেই তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উহার যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আমরা চাই। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহার প্রমাণ, মানুষের আত্মজ্ঞান (Self-consciousness)। আমার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ প্রভৃতি অনুভূতি লইয়া আমি যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা, এই বুদ্ধি প্রত্যেক মানুষেরই আছে। মানুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বাহ্যবস্তুকে স্বীয় জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারে বা বুঝিবার চেষ্টা করে; কিন্তু সে স্বয়ং যে কি, তাহার সেই আত্মসংবিত্তি কোথা হইতে গজাইয়া উঠিল, তাহা সে বুঝিতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, মানুষের ন্যায় পশ্বাদি জঙ্গম জীবেরও এই প্রকার একটা আত্মিক স্বাতন্ত্র্য-বোধ আছে। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত উহা নিঃসংশয়ে বুঝাইতে পারে নাই। অন্ততঃ তাহাদের সেই ব্যাখ্যা বিচারসহ নহে। * সুতরাং চৈতন্যকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার না করিয়া লইলে আর উপায় নাই। কারণ, জড় ও চৈতন্য উভয় সত্তার মধ্যে পার্থক্য এবং স্বাতন্ত্র্য এত অধিক যে, উভয়কে ঠিক একই শ্রেণী-ভুক্ত বলা যাইতে পারে না। জড়বস্তুমাত্রই কোন না কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবেই, উহা যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, উহা মানুষের ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না; অন্ততঃ যন্ত্রের সাহায্যে উহা ধরা পড়ে। কিন্তু চৈতন্যকে ঐরূপ কোন ইন্দ্রিয়ের আমলে আনা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাণিমাত্রেরই জ্ঞান আছে। সেই জ্ঞান জন্মে কোথা হইতে? দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে তবে জ্ঞান জন্মে। একটি জ্ঞাতা আর একটি জ্ঞেয়। আমি ঐ উপলখণ্ডকে দেখিতেছি। সেই দর্শন এবং হয় ত বা স্পর্শন দ্বারা আমার ঐ উপলখণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিতেছে। এ ক্ষেত্রে জ্ঞাতা আমি এবং জ্ঞেয় উপলখণ্ড। এই উভয়ের সমবায়ফলেই জ্ঞানের (এখানে উপলখণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞানের) উদ্ভব হইল। এখানে জ্ঞাতা আমার চৈতন্য বা আত্মা আর জ্ঞেয় ঐ জড় পদার্থ উপলখণ্ড। এইরূপ গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, মানুষ প্রভৃতির জড়াংশ সম্বন্ধে (অর্থাৎ দেহ প্রভৃতি) আমার জ্ঞান জন্মে, এমন কি, আমার স্বীয় এই স্থূল দেহ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান জন্মে এবং আছে,—কিন্তু আমার স্বীয় চৈতন্য সম্বন্ধে আমার উহার অস্তিত্ব-জ্ঞান ভিন্ন ঐ সম্বন্ধে আর কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কাযেই জড়ে এবং চৈতন্যে পার্থক্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। যাঁহারা চৈতন্যের বা আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করেন, তাঁহারা ভাবের ঘরে চুরি করিয়া থাকেন। কারণ, মানুষ যতই তর্ক উপস্থিত করুক, সার জগদীশচন্দ্র বসু এবং এক-খানি ইট দুই-ই সমান, ইহা কখনই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। তাহার যুক্তি তাহাকে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার মন, প্রাণ বা অন্তরাত্মা তাহা বুঝিতে চাহে না। সে যে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে, তাহার দৈনন্দিন ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং ঐ ধারণা বৃথা।

এখন দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে, অর্থাৎ পরীক্ষাত্মক বিজ্ঞান (Practical science) যে পথে চলিয়াছে—সে পথে তাহার পক্ষে এই চৈতন্য-তত্ত্বের বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মীমাংসা করা সম্ভব হইবে না। কারণ, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কখনই মানবের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচর হইবে না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, বিজ্ঞানকেও—পদার্থবিজ্ঞানকেও (Physical science) সময় সময় কতকগুলি ব্যাপার বুঝিতে হইলে একটা কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইতে হয়। আলোক এবং বিদ্যুৎ বুঝিতে জড়বিজ্ঞানকে ঈথারের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। অথচ পরবর্ত্তী কালে সেই ঈথারের অস্তিত্ব মাত্র অনেকটা সপ্রমাণ হইয়াছে। আলোক-তরঙ্গ এবং বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এই ঈথারের অস্তিত্বেরই সমর্থন করে। কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান ব্যাপিয়া আছে। তাহা না থাকিলে ঐ কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী নক্ষত্র হইতে আলোক-তরঙ্গ পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে কি করিয়া? এক একটি আলোক-তরঙ্গের (Light wave) দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগ হইতে ষাট হাজার ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু বৈতারিক বার্ত্তাবহ যে তরঙ্গ ব্যবহার করে, তাহার দৈর্ঘ্য এক ফুট হইতে হাজার ফুট পর্য্যন্ত হইতে পারে। ঈথারকে যে তোমরা জড়বিজ্ঞানবাদী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড় পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতেছ, তোমরা উহার প্রকৃতি এবং স্বরূপ জান না। উহার অন্তরালে কোন মহত্তর চৈতন্য-সমুদ্র বিদ্যমান আছে কি না, এবং সেই চৈতন্যসমুদ্র হইতে তাহার কিয়দংশ বিকার-দশা প্রাপ্ত হইয়া কালবক্ষে ভাসমান অনন্ত বিস্তারে ঈথার হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পর্য্যন্ত সমস্ত জড়রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, ইহা মনে করা কি অধিক সঙ্গত নহে? আলোকতরঙ্গ হইতে যেমন ঈথারের অস্তিত্ব ধরা গিয়াছে বা অনুমিত হইয়াছে, বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের নির্গমন হইতে যেমন উহার অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র চৈতন্য-নামধেয় একটা স্বতন্ত্র কিছুর অস্তিত্ব দেখিয়া উহা যে এই চরাচর বিশ্বে সর্ব্বত্র প্রকট বা অপ্রকট-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে হয়। কার্য্য দেখিয়া যদি কারণের অস্তিত্ব অনুমান কর, পর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে দেখিয়া যদি উহার ভিতরে অগ্নি আছে, ইহা সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞান-বিরোধী না হয়, তাহা হইলে এই চরাচর বিশ্বে সর্ব্বত্র নানা ভাবে, নানা মূর্ত্তিতে চৈতন্যের বিকাশ দেখিয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক চৈতন্য-সমুদ্রের অস্তিত্ব অনুমান করা কোন-মতেই অসঙ্গত হইতে পারে না। অনুকূল অবস্থা পাইলেই সেই চৈতন্য জড়ের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে।

---

* All of these movements have, however, ignored the fact that we only know of Natural Laws because of the peculiar structure of our minds. While, therefore, it is possible to express or describe Nature in terms which we ourselves provide, it is impossible to express or describe ourselves in these terms. The thinker is always thrown back upon his own mind as the primary and inexplicable mystery.—Singer.

অবশ্য জড়বাদীরা ইহাতে আপত্তি করিবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, "চৈতন্য প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক (Physico chemical) ব্যাপার কি না, তাহা ত চূড়ান্তভাবে দেখা হইল না। বিজ্ঞানের এখন প্রাথমিক অবস্থা। উহা ক্রমশ: উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং সকল তথ্য উহা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে পারে নাই। যখন দেখা যাইতেছে যে, চূণ এবং হলুদ একত্র মিশ্রিত করিলে, সেই মিশ্রিত পদার্থের বর্ণ লাল হয়। সেই লালবর্ণ চূণেও ছিল না, হরিদ্রাতেও ছিল না। উহা স্বতন্ত্র বর্ণরূপ সত্তা হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল কিরূপে? উহা যখন হইতে পারে, তখন কতকগুলি জড় ভৌতিক পদার্থের (Elements) সম্মেলনে চৈতন্যরূপ একটা স্বতন্ত্র সত্তার আবির্ভাব না হইবে কেন? আমরা সে রহস্য জানিতে পারি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া উহা ত মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। সেনেকা বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি একসঙ্গে বা একেবারে তাঁহার সমস্ত গূঢ়তত্ত্ব জানিতে দেন না,—তিনি ধীরে ধীরে মানুষের নিকট তাঁহার গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করেন। * আজ যে রহস্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, কা'ল তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।"

কিন্তু জড়বাদীদিগের এই কথা বিচারসহ নহে। হরিদ্রা এবং চূণ একসঙ্গে মিশাইলে তাহাতে যে বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেই বর্ণ একটা নূতন বর্ণ নহে। সোজা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যে বর্ণ ঐ দুই বস্তুর মধ্যে গর্ভিত বা লুক্কায়িত ছিল, মিশ্রণ দ্বারা তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কথাটা যদি বৈজ্ঞানিক হিসাবে বলিতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত বর্ণ-বিজ্ঞানটি বুঝাইতে হয়। যাহারা বর্ণ-বিজ্ঞান জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে মোটামুটি উহা বুঝা কঠিন। চূণ এবং হলুদ মিশাইলে যে বর্ণটি উৎপন্ন হয়, তাহা ঠিক রক্তবর্ণ নহে, তাহাও একটা গাঢ় মিশ্রবর্ণ। পূর্ব্বে লোক মনে করিত যে, ত্রিশির কাচের কলমের ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি বিশ্লিষ্ট করিলে যে সাতটি বর্ণ দেখা যায়, সেই সাতটিই মৌলিক বর্ণ। পরে ইয়ং প্রভৃতির গবেষণায় সে মত বদলাইয়া গিয়াছে। এখন মৌলিক বর্ণ হইয়াছে মোট তিনটি, যথা—রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ এবং পীতবর্ণ। আর সমস্ত বর্ণই এই তিনটি অথবা উহার মধ্যে দুইটি বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। বস্তুমাত্রের বর্ণ প্রতিভাত হয় আলোকের সাহায্যে। প্রত্যেক বস্তু সূর্য্য-রশ্মির কতকগুলি বর্ণ শুষিয়া (Absorb) লয় আর কতকগুলি বর্ণ প্রতিফলিত (Reflect) করে। যে যে বর্ণ সেই বস্তু প্রতিফলিত করে, সেই সেই বর্ণের সংমিশ্রণ-ফলে তাহার বর্ণ প্রকাশ পায়। চূণ শ্বেতবর্ণ; সুতরাং উহার কোন আদি বর্ণই শুষিয়া লইবার ক্ষমতা নাই। উহা সূর্য্যালোকের সমস্ত মূলবর্ণই প্রতিফলিত করে। হরিদ্রা পীতবর্ণ এবং আর কিছু কিছু বর্ণ অতি সামান্যভাবে প্রতিফলিত করে। এখন চূণের সহিত মিশ্রিত হইলে যে মিশ্র পদার্থ জন্মে, সে চূণের সাহচর্য্য হেতু হরিদ্রা বর্ণের সহিত আরও দুই একটি বর্ণ—বিশেষত: লালবর্ণ প্রতিফলিত করে। সেই জন্য উহাকে অনেকটা লালবর্ণ দেখায়। প্রকৃতপক্ষে উহা কোন নূতন বর্ণের সৃষ্টি করে না।

কিন্তু সচেতন পদার্থে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ বা ধর্ম্ম দেখা যায়, যাহা জড় পদার্থ বলিয়া পরিজ্ঞাত কোন বস্তুতে নাই। যথা:—

(১) আপনার অস্তিত্বের অনুভূতি (Self-consciousness) সকল সজীব পদার্থে ইহা অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। কারণ, তাহারা সকলেই আত্মরক্ষার্থ অল্প বা অধিক পরিমাণে যত্ন করে। স্থাবর জীব (উদ্ভিদ) স্বস্থানে থাকিয়া যতটা পারে, ততটা করে।

(২) দেহের অন্তর্নিহিত বর্দ্ধনের ও ক্ষয়ের শক্তি। উহা বাহির হইতে কতকগুলি দ্রব্য আহার করিয়া বৃদ্ধি পায় এবং কাল সহকারে সেই শক্তির অপচয় ঘটিলে ক্ষয় পায়। অর্থাৎ ভিতরকার শক্তিবলে জীবের (স্থাবর এবং জঙ্গম উভয়বিধ) দৈহিক বৃদ্ধি এবং ক্ষয় ঘটে। উহাকে জীবনীশক্তি বলা যায়।

(৩) প্রজনন-শক্তি। অর্থাৎ আপনার সদৃশ সন্তান প্রসবের শক্তি। প্রত্যেক জীবই তাহার সদৃশ সন্তান প্রজনন করিতে পারে। হাতী হইতে হাতী জন্মে। মানুষ মানুষ প্রজনন ও প্রসব করে। বৃক্ষ তাহার সদৃশ বৃক্ষ উৎপাদন করে। কিন্তু পাথর পাথর উৎপাদন করিতে পারে না। সুবর্ণ-বলয়ের গর্ভে আর একটা ছোট্ট সুবর্ণ-বলয় দেখা দেয় না।

ইহার মধ্যে (১) দফায় যে আত্মসংবিত্তি বা আপনার অস্তিত্বের অনুভূতির (Self-conciousness) কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত জীবের আত্মরক্ষায় প্রবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি, হর্ষ এবং বিষাদের অনুভূতি প্রভৃতিও গণনীয়। জেলিফিস এবং এমিবা প্রভৃতি অতি নিম্নস্তরের জীবেও ঐ শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, ইহা হিন্দুর সিদ্ধান্ত। য়ুরোপীয়রা পশ্বাদির জ্ঞানকে instinct বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই বিশিষ্ট গুণ বা ধর্ম্মবিশিষ্ট চৈতন্য আসিল কোথা হইতে? যদি বল, উহা জড়ে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, রাসায়নিক ক্রিয়াফলে উহা জীবে ব্যক্ত অবস্থায় দেখা দিয়াছে, তাহা হইলে জড়বাদীকে স্বীকার করিতে হইল যে, আত্মানুভূতি প্রভৃতি গুণ জড়ে সুপ্ত বা অব্যক্ত অবস্থায় আছে। উহা যখন চৈতন্যের গুণ, ঐ গুণ দেখিয়া যখন চৈতন্যকে জড় হইতে প্রভিন্ন করা হয়, তখন জড়বাদীকে স্বীকার করিতে হইল যে, জড় চৈতন্যেরই বিকার। সুতরাং জড়বাদী এখন হিন্দুর আদি সিদ্ধান্ত সেই "একোঽহং বহু স্যাম" এই সিদ্ধান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যান্য কথা পরে বলিব।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

*Nature does not allow us to explore her sanctuaries all at once. We think we are initiated, but we are still only on the threshold.

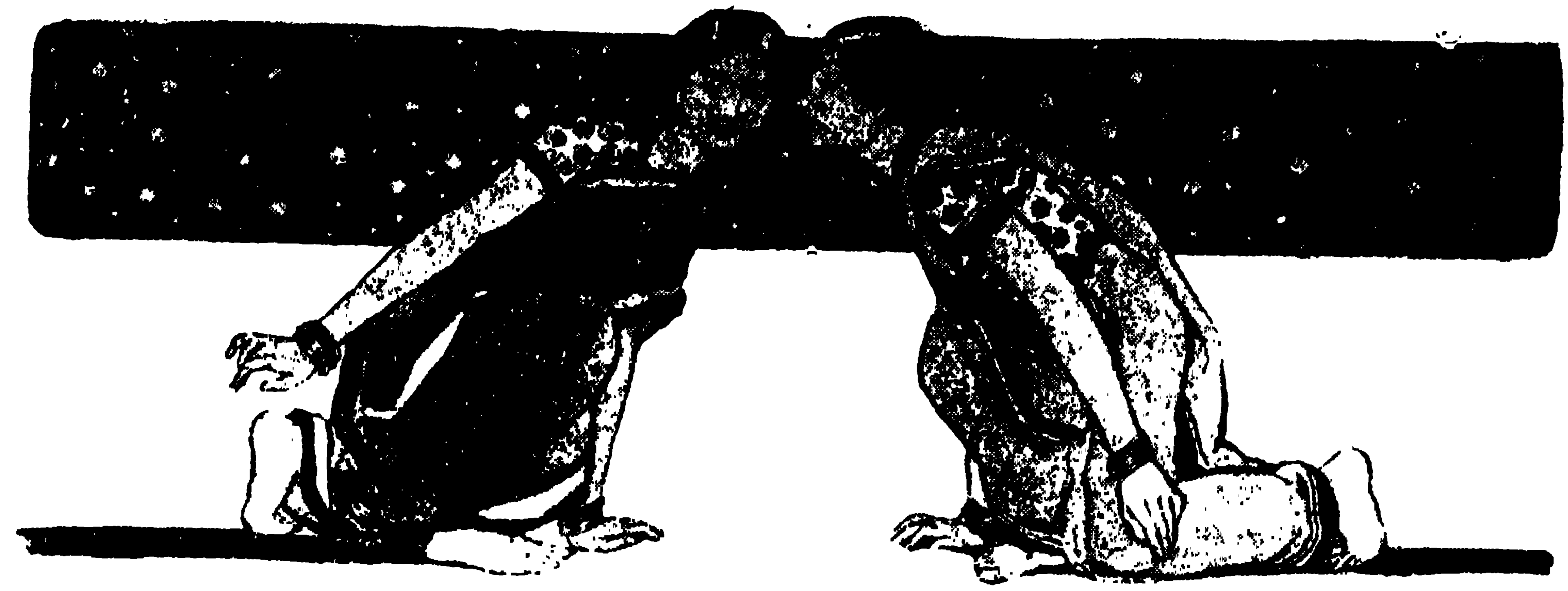

পিশাচের নাগপাশ

পঞ্চম প্রবাহ

খানাতল্লাসের ফল

কিছু কাল পরে মিঃ লকের মোটর-কার ওয়াপিংএ উপস্থিত হইল। মিঃ লক লাইটওয়ের ইঙ্গিতে নদীতীরস্থ একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়ী থামাইলেন। সেই গলির শেষ মুড়ায় একটি গুদামঘর ছিল, লাইটওয়ে সেই দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "এই সেই গুদাম, এই গুদামে প্রবেশ করিবার জন্য নদীর দিকেও একটা পথ আছে।"

মিঃ লক বলিলেন, "বেশ, তুমি গলির মোড়ে গিয়া নদীর দিকে নজর রাখ। তোমার কাছে হুইশ্ল আছে ত? যদি কেহ গুদাম হইতে বাহির হইয়া বোটের সাহায্যে নদী দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে তুমি সজোরে হুইশ্ল দিবে।"

গুদামের দ্বার রুদ্ধ ছিল; মিঃ লক দ্বারে কাণ পাতিয়া, ভিতরে কাহারও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু গুদাম সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, একটা ইঁদুরের কিচকিচিও তিনি শুনিতে পাইলেন না। তথাপি তিনি দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিলেন, কিন্তু কেহই সাড়া দিল না। মিঃ লক ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া দ্বারে পুনর্ব্বার করাঘাত করিলেন। প্রায় দুই মিনিট পরে তিনি কাহারও পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে একটা চৌকীদার দরজাটা ঈষৎ উদ্ঘাটিত করিল এবং সেই ফাঁকের ভিতর মাথা বাড়াইয়া নিদ্রাবিজড়িত-নেত্রে মিঃ লকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মিঃ লক দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করায় সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল, এ জন্য সে কর্কশ স্বরে সেখানে তাঁহার উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মিঃ লক বলিলেন, "আমি ডিটেক্‌টিভ, এই গুদামে কাহারা আছে, তাহাই জানিতে চাই।"

চৌকীদার তাঁহার মুখের দিকে মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিয়া বলিল, "আপনি গোয়েন্দা? এখানে কেন আসিয়াছেন? আমি এখানে আছি, তাহা দেখিতেই পাইতেছেন। আমাকে গ্রেপ্তার করিবেন না কি? কি অপরাধে গ্রেপ্তার করিবেন, শুনি।"

মিঃ লক বলিলেন, "তুমি অপরাধ করিয়াছ, সে কথা ত বলি নাই। আমি কোন কারণে এই গুদামঘর খানাতল্লাস করিতে আসিয়াছি।"

চৌকীদার বলিল, "এই গুদামঘর সম্বন্ধে কোন কথা আমার জানা নাই, আজ সকালে আমি এখানে পাহারা দিতে আসিয়াছি।"

মিঃ লক তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া দ্বার ঠেলিয়া, তাহার পাশ দিয়া গুদামে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই গুদামের সকল অংশ পরীক্ষা করিয়া অন্য কোন লোকের সন্ধান পাইলেন না। অতঃপর তিনি চৌকীদারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গুদামে গত রাত্রিতে কোন লোকজন আসিয়া আড্ডা লইয়াছিল কি? তোমার কোন সঙ্গী?"

চৌকীদার বলিল, "রাত্রিকালে আমি সঙ্গী জুটাইয়া এই গুদামে আড্ডা দিতে আসিব? আপনি কি যে বলেন! আমি আজ সকালে এই গুদাম পাহারা দিতে আসিয়াছি, এখানে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। কর্ত্তা আমাকে আজ সকালে এই গুদামের ভার লইতে পাঠাইয়াছিলেন। কোন কোন বিদেশী ভদ্র লোককে এই গুদাম দুই সপ্তাহের জন্য ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল।"

মিঃ লক বলিলেন, "গুদাম ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল বিদেশী লোককে? তাহারা এখন কোথায়?"

চৌকীদার বলিল, "তাহা জানি না, মহাশয়! কাল রাত্রিতে তাঁহারা হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আজ সকালে আমাদের কর্ত্তা তাঁহাদের যে চিঠি পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন, এই গুদামে তাঁহাদের আর কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহারা ইহা ছাড়িয়া দিলেন।"

মিঃ লক চৌকীদারের কৈফিয়ৎ শুনিয়া তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, লাইটওয়ের কথাগুলি বিশ্বাসের অযোগ্য নহে। তিনি গুদামের ভিতর আর না ঘুরিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং লাইটওয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তাহারা গুদাম হইতে চলিয়া গিয়াছে, এক জন পাহারাওয়ালা ভিন্ন অন্য কেহ সেখানে নাই।"

লাইটওয়ে বলিল, "হাঁ, তাহারা তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছে—ইহা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি গুদাম খানাতল্লাস করিয়া কিছু পাইলেন কি? কোন রকম কিছু?"

মিঃ লক বলিলেন, "কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি কি না, তাহাই জানিতে চাও?"

লাইটওয়ে বলিল, "হাঁ, সূত্র, রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলেন কি?"

মিঃ লক কয়েক টুকরা শক্ত দড়ি ও চর্ম্মনির্ম্মিত একটি থলি লাইটওয়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এইগুলি আমি গুদামের ভিতর হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছি। এই দড়িগুলি নূতন, ইহাদের মুড়া দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, অল্পকাল পূর্ব্বে এগুলি কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে। এই দড়ি দিয়া কাহারও হাত-পা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। এই চামড়ার থলিটা গুদামের মেঝের উপর পড়িয়া ছিল। আমার অনুমান, মিস্ বয়েলই ইহার মালিক। সে যখন তাহার আততায়ীর সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছিল, সেই সময় বোধ হয়, ইহা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। দেখ লাইটওয়ে, আমাদের আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এই মুহূর্ত্তেই আমার সঙ্গে আমার গাড়ীতে এস, আমাদিগকে অবিলম্বে হোয়াইট হলে উপস্থিত হইয়া নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

মিঃ লক যথাসময়ে হোয়াইট হলে উপস্থিত হইয়া যে সংবাদ জানিতে পারিলেন, তাহা লাইটওয়ের উক্তির সমর্থন করিল। নৌবাহিনীর কার্য্যসংক্রান্ত আফিসের কোনও পদস্থ আমলার নিকট তিনি জানিতে পারিলেন, পাটানিয়া রাজ্যের একখানি মানোয়ারী জাহাজ কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে ইংলিস উপসাগরে অবস্থিতি করিতেছিল, কিন্তু অল্পকাল পূর্ব্বে তাহা উপসাগর ত্যাগ করিয়াছিল। মিঃ লকের অনুরোধে সেই আমলাটি বে-তারে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন, সেই জাহাজখানি তখন উপসাগরের সীমা অতিক্রম করিয়া আটলান্টিক মহাসাগর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল।

মিঃ লক এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নৌ-বাহিনীর কার্য্যালয়ের বাহিরে আসিলেন। লাইটওয়ে সেখানে তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সংবাদ জানিতে পারিলেন, মিঃ লক?"

মিঃ লক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নৌবাহিনী সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর নিকট যাহা জানিতে পারিলাম, তাহা আশাপ্রদ নহে; তাঁহাদের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, সেনাপতি কলভেটি বন্দিদ্বয়কে তাহাদের জাহাজে তুলিয়া লইয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছে। সম্ভবতঃ কলভেটি তাহার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে।"

লাইটওয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। ব্যাপারটি ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিল; এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, মিঃ লক!"

মিঃ লক গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিলেন, তাহার পর লাইটওয়েকে বলিলেন, "আমি এখন পররাষ্ট্র-বিভাগের আফিসে যাইব। আমাদের গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন না করিলে কোন ফললাভের আশা নাই। আমার বিশ্বাস, এই আবেদনের ফলে বৃটিশ কন্সল কাপ্তেন বয়েল ও তাহার কন্যাকে পাটানিয়া রাজ্যের সেই মানোয়ারী জাহাজ হইতে মুক্তিদানের জন্য পাটানিয়া গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন। তদনুসারে জাহাজখানি পাটানিয়ার রাজধানী কানেশের বন্দরে উপস্থিত হইলেই তাহাদিগকে মুক্তিদান করা হইবে।"

পররাষ্ট্র-বিভাগের আফিসে প্রবেশ করিবার জন্য মিঃ লককে অধিক তৈলব্যয় করিতে হইল না, 'অপেক্ষা করিবার

কষ্টে তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরণা দিয়া বসিয়া থাকিতেও হইল না। সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ দহরম-মহরম ছিল। তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থী, এই সংবাদ পাইবামাত্র পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কিন্তু তিনি মিঃ লকের প্রার্থনা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন।

সেক্রেটারী ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "দেখুন, মিঃ লক, আমাদের গভর্ণমেণ্ট আপনার অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ। আপনি মনে করিবেন না, বাজে কাযে সময় নষ্ট হইবে ও আফিসের 'ফাইল' ভারী হইবে, এই ভয়ে আপনার অনুরোধ উপেক্ষিত হইতেছে; আপনার সহযোগিতায় ও কার্য্যতৎপরতায় সরকার অনেকবার উপকৃত হইয়াছেন, এ অবস্থায় আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারা সরকারের পক্ষে ক্ষোভের বিষয়; কিন্তু পাটানিয়া রাজ্যের অধিবাসীরা কিছু দিন হইতে অন্তর্বিপ্লবে শক্তিক্ষয় করিতেছে। এখন এ দেশে অশান্তি ও অরাজকতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। এই সকল কারণে সে দেশে এখন গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব নাই; এ অবস্থায় বৃটিশ সরকার সে দেশের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে অসম্মত। এই জন্য সে দেশে এখন আমাদের কোন রাজদূত, কন্সল বা এজেণ্ট নাই।"

মিঃ লক ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"তাহা হইলে কি আমাদের দুই জন স্বদেশবাসীকে এই সকল নরপিশাচের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত মনে করিব? তাহাদের এই বিপদে আমাদের কি কিছুই কর্ত্তব্য নাই? যদি বয়েল তাহার অতীত অপকর্ম্মের জন্য তাহাদের দ্বারা উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হয় এবং তাহার পক্ষসমর্থন করা আমাদের অসাধ্য হয়, তাহা হইলেও তাহার বালিকা কন্যার অপরাধ কি? আমরা এই নিরপরাধ বিপন্না বৃটিশ মহিলাকে সেই সকল নিষ্ঠুর বিদেশীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কি? এই নরপিশাচরা একটি বৃটিশ মহিলাকে প্রতারণার সাহায্যে এ দেশ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, সম্ভবতঃ তাহার প্রতি কঠোর নির্য্যাতন চলিবে; এ সম্বন্ধে কি আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই?"

পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী বলিলেন, "ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, মিঃ লক! কিন্তু বৃটিশ সরকার সেই বিপন্না বালিকার বা তাহার পিতার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ। পাটানিয়ার লোকগুলি গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া চাতুরীর সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছে; তাহারা তাহাদের গুপ্ত সঙ্কল্পসিদ্ধির পর এ দেশ ত্যাগ করিয়াছে এবং আমাদের অধিকার-সীমার বাহিরে প্রস্থান করিয়াছে। এখন আপনি সরকারের সহায়তাপ্রার্থী হইলে সরকার কি করিতে পারেন? আপনাকে যে সকল কথা বলিলাম, তাহা সরকার পক্ষের অভিমত। তবে আপনি আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, বে-সরকারীভাবে আপনাকে যতটুকু সাহায্য করা যাইতে পারে, আমরা তাহার ত্রুটি করিব না। আমার এ কথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক, তাহা আপনি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি আপনি তাহাদের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কোনরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আপনাকে বে-সরকারীভাবে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করা যাইতে পারে। কিন্তু আপনাকে এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ব্যক্তিগতভাবে কোন বিপন্ন স্বদেশবাসী ও তাহার অসহায়া উৎপীড়িতা কন্যার প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতির অভাব নাই, এ কথার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।"

অতঃপর মিঃ লক তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শটা বে-সরকারীভাবেই চলিতে লাগিল।

উভয়ের পরামর্শ শেষ হইলে মিঃ লক কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু তিনি মানসিক প্রফুল্লতা গোপন করিয়া যখন লাইটওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন সে তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া কতকটা নিরুৎসাহ হইল, কোন রকম আশা-ভরসা তাহার মনে স্থান পাইল না। মিঃ লক তাহার নিকট গম্ভীরভাবে সরকারের অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া লাইটওয়ে হতাশভাবে মিঃ লকের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল।

মিঃ লক লাইটওয়ের হতাশভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সরকারের তরফের কথা তোমাকে বলিলাম। কিন্তু আমাদের সরকার পাটানিয়ার বর্ত্তমান অরাজক গভর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করিলেও যাঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্য-তরণীর কর্ণধার, তাঁহারা কোন বৃটিশ প্রজার নির্য্যাতনে উদাসীন থাকিতে পারিবেন, এরূপ মনে করিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত সদাশয়তায় ও

মনুষ্যত্বে সন্দেহ করিলে সমগ্র বৃটিশ জাতির অগৌরব হইবে ; অতএব তোমার হতাশ হইবার কারণ নাই। বৃটিশ জাতি তাহার স্বদেশীয়া বিপন্না নারীর উদ্ধারের চেষ্টায় বিমুখ, তাহার এত বড় দুর্নাম এ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই, এবং আশা করি, তাহার সেরূপ অধঃপতনের এখনও বহু বিলম্ব আছে। পরমেশ্বর না করুন, যদি কখন সেরূপ দুর্দ্দিন আসে, বৃটিশ জাতি যদি কোন দিন তাহার স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীর নির্য্যাতন প্রত্যক্ষ করিয়া পৃথিবীর দুর্দ্দশাগ্রস্ত, হীনতাপূর্ণ, অধম, জড়ের জাতির মত নিরুদ্যম-ভাবে নির্লিপ্ত থাকিয়া প্রাণ ধারণ করাকেই জীবনের পরম ও চরম সার্থকতা মনে করে, তাহা হইলে সেই কলঙ্কের মহাপঙ্কে এই দেশ নিমজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই যেন বৃটেনিয়ার অস্তিত্ব মহাসাগরগর্ভে বিলীন হয়। এখন বল, তুমি সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত কি না ?”

লাইটওয়ে উৎসাহভরে বলিল, “আমি ? আমি নিশ্চিতই প্রস্তুত আছি। কিন্তু জাহাজ কোথায় ? আর আমাকে কোন্ ভারই বা গ্রহণ করিতে হইবে ?”

মিঃ লক বলিলেন, “আমি পাটানিয়ায় যাত্রা করিতেছি, তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে পার। সেই দেশ সম্বন্ধে তোমার যে অভিজ্ঞতা আছে, আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিব। সরকারের সাহায্যে প্রকাশ্যে যে কার্য্যের ব্যবস্থা হইল না, বে-সরকারীভাবে তাহা শেষ করা আমা-দের অসাধ্য হইবে না। আমি বয়েলের বিপন্না কন্যাকে কলভেটির কবল হইতে উদ্ধার করিব। বৃটিশ-নন্দিনী সেই পিশাচের লালসার অনলে ভস্মীভূত হইবে, জীবন থাকিতে তাহার এই অপমান সহ্য করিব না। বয়েলকেও তাহার শত্রু-হস্তে রাখিয়া আসিব না। যদি সত্যই তাহার কোন অপরাধ থাকে, তাহার সেই অপরাধের বিচারের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না ; কিন্তু সে পরের কথা !”

ষষ্ঠ প্রবাহ

পাটানিয়ার পান্থ-নিবাস

পাটানিয়া রাজ্যের রাজধানী কানেশ নগরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল ‘হোটেল পিজারো’ তখন মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে সমুদ্ভাসিত, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ শুভ্র অট্টালিকাশ্রেণীও প্রচণ্ড রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করিতেছিল। বায়ু-প্রবাহহীন রবিকর-প্রদীপ্ত প্রকৃতি স্তম্ভিত। মন্দির, মিনার প্রভৃতির উচ্চ চূড়ার অন্তরাল হইতে বন্দরস্থিত জাহাজগুলি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ‘বলিভার’ ঐ সকল জাহাজের অন্যতম। তাহার চিমনী হইতে ধূমরাশি উদ্গত হইতেছিল। রৌদ্রোদ্ভা-সিত স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কানেশের অধিবাসিবৃন্দ মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সুখসুপ্তি উপভোগ করিতেছিল। যাহারা ‘হোটেল পিজারো’তে চক্ষু মুদিয়া আরাম-কেদারায় পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জনের মুখের বর্ণ ঈষৎ মলিন, কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদটি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র। তাঁহাকে দেখিলে অন্য সকলের অপেক্ষা চতুর ও চটপটে বলিয়াই মনে হইত। তাঁহার দেহের বর্ণ পাটানিয়াবাসীদের বর্ণ অপেক্ষা শুভ্র।

এই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া সকলেরই মনে হইত, হোটেলের অধিবাসিগণের মধ্যে তিনি সকল বিষয়েই স্বতন্ত্র। এ জন্য হোটেলের অধ্যক্ষকে অনেকেই এই নবাগত ভদ্র-লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। হোটেলের অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে বলিতেন, “ভদ্রলোকটি জাতিতে ‘ইংরেজ,’ নাম কার্টরাইট। লোকটি কিঞ্চিৎ বাতিকগ্রস্ত, তবে তখন পর্য্যন্ত ‘বাতুলাশ্রমে’ আশ্রয়-গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে না পারায় হোটেলেই তাঁহাকে স্থান দিতে হইয়াছে। তিনি কাহার নিকট শুনিয়াছেন, পাটানিয়া প্রাচীন যুগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, ইহার বহু পুরাকীর্ত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণার প্রতীক্ষা করিতেছে ; কালে ইহার বহু রহস্য ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইলে পাটানিয়ার নাম মিসর, বাবিলন প্রভৃতির সমশ্রেণীতে স্থান লাভ করিবে। এই জন্য ভদ্রলোকটি এখানে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা করিতে আসিয়াছেন। উনি বিস্তর কেতাব লইয়া আসিয়াছেন, ঐ সকল কেতাবে প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষের, ভজনালয়ের ও বহু পুরাকীর্ত্তির পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। উনি অতীত যুগের বহু বিস্মৃত কাহিনীর আলোচনা করেন। ভদ্রলোকটি এখন কেতাবে মস্‌গুল, চেয়ারে পড়িয়া মুদিত-নেত্রে অতীত যুগের স্বপ্ন দেখিতেছেন আর উঁহার চাকর বেটা এই সহরের সকল মোসাফিরখানায় মজা লুঠিয়া বেড়াইতেছে।”

হোটেলের অধ্যক্ষকে একাধিকবার তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনিয়া কার্টরাইট মনে মনে হাসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এখানে আসিয়া তিনি

প্রত্নতাত্ত্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁহাকে কোন বিপদ বা অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। জেনারেল কলভেট ও পাটনিয়ারাজ্যের কর্ণধারগণ যদি কোন উপায়ে জানিতে পারিতেন, তাঁহাদের কবল হইতে দুই জন বন্দীকে উদ্ধার করিবার জন্য মিঃ লক লণ্ডন হইতে কানেশ নগরে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে, ইহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

হোটেলের সকল লোক যখন তাঁহাকে নিদ্রিত মনে করিয়াছিল, সেই সময় মিঃ লক সেই কক্ষে বসিয়া বন্দরের জেঠী লক্ষ্য করিতেছিলেন। যে জাহাজে বয়েল, তাঁহার কন্যা ও মাজাড়ো বন্দিভাবে সেই বন্দরে নীত হইয়াছিল, সেই জাহাজখানিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। পাটানিয়ার নব-নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রনায়ক যে বহু প্রাচীন সুদৃঢ় দুর্গে বাস করিতেন, সেই হোটেল হইতে তাহাও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। মিঃ লক সেই দুর্গের দেউড়ীর দিকেও পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

মিঃ লক যে দিন সেই নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার দুই দিন পরে তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে তাঁহার আরাম-কেদারায় বসিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে দেখিলেন, একখানি পান্‌সী সেই জাহাজের পাশ হইতে সরিয়া আসিয়া জেঠীতে ভিড়িল। সহসা জেঠীর উপর কয়েকটা উর্দ্ধমুখ সুতীক্ষ্ণ সঙীনে উজ্জ্বল সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইল। তাহা দেখিয়া মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, বন্দিগণ জাহাজ হইতে সেই পান্‌সীতে জেঠীর উপর আনীত হইলে তাহারা সশস্ত্র প্রহরি-পরিবেষ্টিত হইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রেরিত হইতেছিল। মিঃ লক আহারাদির পর বিশ্রামকালে দেখিতে পাইলেন, সেনাপতি কলভেট কাফের টেবিলে বসিয়া পানীয় পান করিতেছিলেন; তিনি গ্লাসটি টেবলে নামাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর তিনি পথে আসিয়া দুর্গ-প্রাকারের ছায়ায় ছায়ায় তাহার দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া দুর্গ-দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কারণ, কয়েদীরা তাঁহার অজ্ঞাতসারে দুর্গ হইতে স্থানান্তরিত না হইতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখাই একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। তিনি কাপ্তেন বয়েলের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের সুযোগের প্রতীক্ষা করিলেও তখন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ সান এন্‌জেলো দুর্গ-চূড়ার ছায়া ধীরে ধীরে হোটেলের প্রাঙ্গণভূমি স্পর্শ করিলে হোটেলবাসিগণের দিবানিদ্রার অবসান হইল। ঠিক এই সময়েই সাধারণতঃ তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র নগর জাগিয়া উঠিয়া অপরাহ্নের দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করিল। নগরের বিভিন্ন অংশের কর্ম্মশালাগুলিতে ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে কর্ম্ম-কোলাহল আরম্ভ হইল।

মিঃ লক দুর্গদ্বার হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া পথের দিকে চাহিলেন; সহসা একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। চতুর্দ্দিকের মিশ্র শব্দ-কল্লোল ডুবাইয়া দিয়া একটি সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিল। গায়কের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট না হইলেও তাহা মিঃ লকের কর্ণে যেন মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। মিঃ লক উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, কিছু দূরে কে মেঠো সুরে গাহিতেছিল,—

"আমি প্রেম-ভোলা এক পথিক এসেছি
তাকে দেখেছি—যাকে ভালবেসেছি;
আমি যে তার ভালবাসা
পাবার লাগি ক'রে আশা,
শেষে দেখি যে বাস্‌লো ভাল—"

হঠাৎ গান বন্ধ হইল; মিঃ লক আগ্রহভরে তাহার গান শুনিতেছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতের শেষ ঝঙ্কার শূন্যে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই একটা তীব্র কণ্ঠস্বর মিঃ লকের কর্ণে প্রবেশ করিল। এক জন লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আপনি এখানে? আমি এই দুপুর-রৌদ্রে সারা নগরে আপনাকে খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়াছি!"

আগন্তুক লাইটওয়ে; কিন্তু পাটানিয়ায় সে মিঃ 'কার্টরাইটের ভৃত্য' বলিয়া সুপরিচিত ছিল। মিঃ লক তাহাকে সঙ্গে লইয়া পাটানিয়ায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে ভৃত্যের ব্যবহারযোগ্য পরিচ্ছদ কিনিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভৃত্যের পরিচ্ছদের ভিতর হইতে নাবিকের বিশাল কাঠামো ও পরিপুষ্ট মাংসপেশী যেন ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল। লাইটওয়ে নাবিকের নীরস কর্কশ কণ্ঠস্বর গোপন করিতে পারিত না। তাহার দরাজ আওয়াজে তেজস্বিতা ও আত্মনির্ভরের ভাব ফুটিয়া বাহির হইত।

তাহার দোষ—সে তাহার স্বভাব গোপন করিতে পারিত না, এ জন্য মিঃ লক সময়ে সময়ে তাহাকে সামলাইয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার আশঙ্কা হইত, লাইটওয়ের অসতর্কতায় হয় ত তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইবে। কিন্তু লাইটওয়ে লোকটি খাঁটি, এবং সে নানা ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিত। মিঃ লক তাহাকে যখন যে কাযের ভার দিতেন, সে দক্ষতার সহিত তাহা সুসম্পন্ন করিত।

লাইটওয়ে মিঃ লকের সম্মুখে আসিয়া, একখান চেয়ার তাহার পাশে টানিয়া লইয়া তাহাতে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। প্রভুর পাশে এ ভাবে উপবেশন যে ভৃত্যের পক্ষে অত্যন্ত বেয়াদপি, সে চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইল না। সে বসিয়া মিঃ লকের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "সমস্তই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি মহাশয়, আপনার যাহাকে প্রয়োজন, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। কিন্তু সে জন্য কি আমাকে অল্প বেগ পাইতে হইয়াছে? আমার আট বালতি লাল পানি, আর বড় বাক্সের এক বাক্স বিষের বোঁদলা খরচ করিতে হইয়াছে, তবে তাহাকে রাজি করিতে পারিয়াছি, কর্ত্তা!"

মিঃ লক সবিস্ময়ে বলিলেন,"এক বাক্স বিষের বোঁদলা?"

লাইটওয়ে বলিল, "হাঁ মহাশয়, এ দেশে যেগুলাকে লোকে চুরুট বলে। যেমন চেহারা, তেমনই গুণ! আগুন ধরাইয়া তাহার লেজে একটি দম্ কষিয়াছেন কি, বুকের ভিতর আগ্নেয় গিরির 'লাভা' স্রোত ছুটিতে আরম্ভ করিবে! আমি যে জাহাজী গোরা—"

মিঃ লক তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "চুপ চুপ! তোমার এই রকম বাচালতাতেই আমাদের কখন্ কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে!"

লাইটওয়ে বলিল, "ওঃ, ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কর্ত্তা, মাফ করুন। আর ও রকম ভুল হইবে না।"

মিঃ লক বলিলেন, "আমাদের কাযের জন্য সে কি সকল অসুবিধা ও বিপদ সহ্য করিতে সম্মত হইবে?"

লাইটওয়ে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল,"তাহাতে আর সন্দেহ কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এই পাটানিয়ানগুলা কি ছোট কি বড় সকলেই চোর। এ দেশে এ রকম লোক একজনও নাই—যাহাকে ঘুস দিয়া বশীভূত করিতে কষ্ট হয়। কম ও বেশী টাকা, এই মাত্র প্রভেদ! আমি যে লোকটাকে মুঠায় পুরিয়াছি, তাহাকে যদি আর এক শ টাকা বেশী দিতে রাজী হই, তাহা হইলে সে এই রাজ্যের প্রেসিডেন্টের বাড়ী পর্য্যন্ত ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিতে আপত্তি করিবে না।"

মিঃ লক বলিলেন, "না, তাহাকে প্রেসিডেন্টের বাড়ী উড়াইতে হইবে না। সে যদি কাপ্তেন বয়েলের কাছে একখান চিঠি লইয়া যায় ও গোপনে তাহার হাতে দিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে এ দেশের এক শ টাকা বকশিস্ দিতে রাজী আছি।"

লাইটওয়ে বলিল, "হাত অত দরাজ করিবেন না, কর্ত্তা! যদি সে বুঝিতে পারে, আপনি পকেট ভরিয়া টাকা আনিয়াছেন, আর সে একটু মাথা নাড়িলেই তাহাকে পোষ মানাইবার জন্য মুঠা মুঠা টাকা তাহার মুঠায় গুঁজিয়া দিবেন, তাহা হইলে সে একদম্ আপনাকে পাইয়া বসিবে। শেষে আপনি তাহার খাঁই মিটাইতে না পারিয়া একটু বাঁকিয়া বসিলেই সে আপনার পিঠে ছোরা মারিয়া আপনাকে সোজা করিবে। এ বড় কঠিন স্থান—এই পাটানিয়া রাজ্য।"

মিঃ লক হাসিয়া বলিলেন, "এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করিয়া তাহাদের স্বভাবচরিত্র ও চালচলন সম্বন্ধে তুমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছ, তাহার উপর আমি অনায়াসে নির্ভর করিতে পারি। আমি তোমার পরামর্শেই চলিব, বেশী টাকা খরচ করিব না। কোথায় কখন্ তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইবে?"

লাইটওয়ে বলিল, "আজ রাত্রিতেই পিড্রোর আড্ডায় আসিয়া সে আমাদের সঙ্গে দেখা করিবে। তবে সেই আড্ডাটি একটু কঠিন স্থান, সেখানে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না, কর্ত্তা! কিন্তু সেখানে যে কোন আকর্ষণের বস্তু নাই, ইহাই বা কি করিয়া বলি? হাঁ, আজ রাত্রিতে সেই আড্ডায় একটা নর্ত্তকীর নাচিবার কথা আছে, শুনিয়াছি, তাহার চেহারা-খানা খুব মিঠা। আপনি আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিবেন, আর কোন কারণে না হউক, সেই নাচওয়ালীটাকে এক নজর দেখিবার জন্য আমাকে সেই আড্ডায় হাজির থাকিতে হইবে। আমি সুন্দরী যুবতীদের একটু পক্ষপাতী, ইহা কি করিয়া অস্বীকার করি বলুন।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

স্বর্ণমান

জগতের সর্ব্বত্র এখন অর্থসঙ্কট উপস্থিত, এ কথা সকলেই জানেন। মার্কিণ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স যে পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সহিত অন্যান্য দেশের সঞ্চয় অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ এই দুই দেশ সঞ্চিত স্বর্ণ বাহির করিয়া দিয়া জগতের অর্থসঙ্কট ঘুচাইবার প্রয়াস পাইতেছেন না, একাধিক অর্থনীতিক এইরূপ অভিযোগ করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের ধনুর্ভঙ্গপণ জগতের আর্থিক অনিষ্টের মূল, এমন কথা বলিতেও কেহ কেহ পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। তাঁহাদের মতে স্বর্ণমান বিফল হইয়াছে ; স্বর্ণমান যে দোষাবহ, তাহা নহে, তবে স্বর্ণমান ব্যবহার করার পদ্ধতিই দোষজনক ! ফরাসী ও মার্কিণ তাঁহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ চাপিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া জগতের বাজারে যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হওয়া উচিত ছিল, তাহার এক-চতুর্থাংশমাত্র চলিতেছে। ইহাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে !

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ফ্রান্স ও মার্কিণ দেশ যদি স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে দেনদার দেশ-সমূহের নিকট হইতে উৎপন্ন মাল গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে জগতের বাজার প্রচলিত মুদ্রা-সম্পর্কে দেউলিয়া হইত না। ইহার ফলে সত্যই জগতের বাজারে পণ্যের দর একবারে নামিয়া গিয়াছে, আর তাহাতেই কষ্টের একশেষ হইয়াছে। পণ্যের মূল্য-হ্রাস হওয়ায় কৃষক, কারখানাওয়ালা ও ব্যবসাদারদের পণ্য উৎপাদনের খরচা, যন্ত্রপাতির খরচা ও মাল-বহনের খরচা বাবদে বর্ত্তমানে ঘরের মূলধন পর্য্যন্ত খাটাইতে হইতেছে। এ জন্য অনেককে অলঙ্কার-পত্রাদি বিক্রয় করিতে হইতেছে। অপর দিকে শ্রমিকদিগের মধ্যে অনেকে কায না পাইয়া বেকার বসিয়া থাকিতেছে, আবার অনেককে কষ্ট ও অভাবের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই হেতু ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে সদ্ভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করার পথে অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে, মনোমালিন্যও বৃদ্ধি পাইতেছে। জগতে লক্ষ লক্ষ বেকার কায চাহিতেছে, কিন্তু কারখানার বা কৃষির যন্ত্রপাতি কিনিবারই মূলধন নাই, কায দিবে কে ? এই ভাবে আর কিছু দিন চলিলে জগতের ধ্বংস অনিবার্য্য।

অতএব যাহাতে আর দ্রব্যাদির মূল্য-হ্রাস না হয়, তাহারই জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে জগতের সমস্ত জাতিকে চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা সর্ব্বনাশ হইবেই। কিন্তু সে জন্য যথেচ্ছা মুদ্রার প্রচলন অযথা ফাঁপাইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই, তবে মুদ্রার প্রচলনের বিস্তারসাধন অন্য উপায়ে করিতে হইবে। যদি জগতের সকল জাতি পরামর্শ করিয়া সেই উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। মার্কিণ ও ফরাসী যদি এ বিষয়ে সাহায্যদান না করে, তবে উঁহাদিগকে বাদ দিয়া অন্যান্য জাতি একযোগে নূতন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে পারেন। গ্রেট বৃটেন এ বিষয়ে পথিপ্রদর্শক হইতে পারেন। এই নূতন উপায়,—স্বর্ণমানের সহিত রৌপ্যমানও গ্রহণ করা। অবশ্য সেই মান গ্রহণ করিতে হইলে রৌপ্য-মুদ্রারও একটা হার (Rates) বাঁধিয়া দিতে হইবে। এইরূপে যদি দুইটি ধাতুমুদ্রার মান গহণ করা হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে। রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রার সহিত জগতের সর্ব্বত্র লেনদেনের মধ্যস্থ বলিয়া গৃহীত হইলে রৌপ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে, আর দ্রব্যাদির মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে।

এক জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ বলিয়াছেন,—

"The value of gold is to-day contained in the mere recognition of it as the only international medium of exchange. As soon as that recognition by a large part of the world ceases, its value dwindles considerably."

অর্থাৎ জগতের জাতিসমূহ স্বর্ণকে লেনদেনের মধ্যস্থ বলিয়া মানে বলিয়াই স্বর্ণের মূল্য আছে। যে মুহূর্ত্তে জগতের অধিকাংশ জাতি উহা মানিতে চাহিবে না, সেই মুহূর্ত্তেই স্বর্ণের মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

জগতের আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে যে এই পরামর্শ অচির-ভবিষ্যতে গৃহীত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ?

—

মার্কিণের বেকার

আধুনিক জগতে মার্কিণ যুক্তরাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অর্থসম্পদ্‌সম্পন্ন, এই কথাই জানা ছিল। মার্কিণ সরকার ফরাসী সরকারের মত সঞ্চিত স্বর্ণ বাজারে ছাড়িতেছেন না বলিয়াই জগতের সর্ব্বত্র অর্থসঙ্কট উপস্থিত, এ কথাও শুনা যায়। বৃটেন জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী বলিয়া বিদিত ছিলেন বটে, কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার অর্থসঙ্কটের কথা শুনা গিয়াছিল ; এমন কি, তিনি মার্কিণের পাওনা ঋণের আসল বা সুদ দিতে পারিতেছেন না, এমন কথাও রটিয়াছিল। তাহার পর হঠাৎ সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, বৃটেন তাঁহার ঘরের স্বর্ণ বাহির করিয়া বাজেটের সামঞ্জস্যসাধন করিয়াছেন, ফরাসী ও মার্কিণের প্রাপ্য ঋণের অর্দ্ধেক টাকা দেয় দিনের ৬ মাস পূর্ব্বেই পরিশোধ করিয়া

দিয়াছেন এবং বৎসরের শেষে আয়ব্যয় হিসাব শেষ হইলে তাঁহার তহবিলে ৪ কোটি ডলার মুদ্রা উদ্বৃত্ত থাকিবে ও সম্ভবতঃ তিনি আয়কর কমাইতে সমর্থ হইবেন, এইরূপ আশা করিতেছেন।

মার্কিণ জাতি বৃটেনের মত স্বচ্ছল অবস্থার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার তহবিলে ১ শত কোটি ডলার মুদ্রা ঘাটতি পড়িবে, এই আশঙ্কায় মার্কিণ সরকার আগামী বৎসরে Sales Tax নামক এক নূতন কর ধার্য্য করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। মার্ক সালিভ্যান বলিয়াছেন, মার্কিণ সরকারের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এ যাবৎ এত ভীষণ চাপের ট্যাক্স কখনও প্রজাবর্গের উপর চাপান হয় নাই, বস্তুতঃ Federal Income Tax ধার্য্য করার পর মার্কিণ সরকার এত অধিক কর কখনও ধার্য্য করেন নাই। শুনা যায়, এই ব্যবস্থার ফলে মার্কিণের যে সকল অধিবাসী বৎসরে ২ হাজার ডলার মুদ্রা ব্যয় করেন, তাঁহাদিগকে ফেডরাল গভর্ণমেণ্টের হস্তে বৎসরে পৌনে ১৬ ডলার মুদ্রা কর তুলিয়া দিতে হইবে।

সরকারী তহবিলের এই অবস্থা, এ দিকে দেশে বেকারের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, মার্কিণের পেনসিলভ্যানিয়া প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও বেকার-কষ্টের কথা শুনা যায় না। তথায় অন্ততঃ ১০ লক্ষ লোক বেকার বসিয়া আছে। ফিলাডেলফিয়া সহরের কর্ত্তৃপক্ষকে প্রতি সংসারের জন্য সপ্তাহে ৪ ডলারের উপরে সাহায্য-দান করিতে হইতেছে। সেনেটার বিংহাম বলিয়াছেন যে, "সমগ্র যুক্তরাজ্যে বেকারের সংখ্যা ৮০ লক্ষের কম নহে।" ইহা হইল গত এপ্রিল মাসের কথা। তাহার পর আরও কত বাড়িয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

বেকাররা অন্নের জন্য কোন কোন স্থানে আইন ভঙ্গ করিতেছে, এমন সংবাদ পাওয়া যায়। ডিট্রয় নামক স্থানের সান্নিধ্যে ডিয়ারবোর্ণ সহরে বিখ্যাত ফোর্ড কোম্পানীর কারখানা আছে। ন্যূনাধিক ৩ হাজার বেকার মেরী গ্রসম্যান নাম্নী এক তরুণীর নেতৃত্বে ডিট্রয় সহরে বেলা ২টার সময় সমবেত হয়। ধ্বজাপতাকা লইয়া "আমরা কায চাই", "কাযের সময় আসিয়াছে," "শ্রমিকরা ভয় পাইও না, অগ্রসর হও," এই ভাবের প্ল্যাকার্ড ধারণ করিয়া তাহারা ডিয়ারবোর্ণের দিকে অগ্রসর হয়। ডিট্রয়ের পুলিস বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। ৩ ক্রোশ অগ্রসর হইবার পর যখন জনতা ডিয়ারবোর্ণের সীমানায় উপস্থিত হইল, তখন এক দল পুলিস তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল। তাহারা ডিয়ারবোর্ণ সহরের পুলিস। মেরী গ্রসম্যান মৃণাল-বাহুলতা আন্দোলিত করিয়া চীৎকার করিয়া জনতাকে আহ্বান করিল, "কাপুরুষগণ! এস, অগ্রসর হও, আমি সর্ব্বাগ্রে যাইতেছি।" জনতাও অমনই উৎসাহের সহিত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। পুলিস প্রথমে অশ্রু-উৎপাদক গ্যাস-পূর্ণ বোমা নিক্ষেপ করিল, তাহার পর লাঠি লইয়া তাড়া করিল, কিন্তু জনতার ভীষণ লোষ্ট্রাঘাতে পশ্চাতে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। তাহার পর দমকলওয়ালারা জলের হোস দিয়া জনতার উপর জলধারা বর্ষণ করিল। কিন্তু তাহাতেও জনতা নিবৃত্ত হইল না।

তখন ফোর্ডের কারখানার পুলিস ও দমকলওয়ালারা আসিয়া ডিয়ারবোর্ণের ৫০ জন পুলিসের সহিত যোগদান করিল এবং ডিট্রয় হইতেও ১ শত ২১ জন পুলিস তাহাদের দল পুষ্ট করিল।

কারখানার রক্ষীরা জনতাকে ফিরিয়া যাইতে বলিল, জনতা একবার ইতস্ততঃ করিল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আবার মেরী গ্রসম্যান চীৎকার করিয়া বলিল, "অগ্রসর হও, কাপুরুষরা! অগ্রসর হও।" জনতাও অমনই উন্মত্তের মত কারখানার ফটকের দিকে ছুটিয়া চলিল।

সঙ্গে সঙ্গে পর পর দুইবার পুলিসের বন্দুকের আওয়াজ হইল। জনতার দুই জন আহত হইল, জনতা থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে আবার উৎসাহিত হইয়া তাহারা ফটকের দিকে অগ্রসর হইল, সঙ্গে সঙ্গে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া পুলিস ও প্রহরীদিগকে আহত করিতে লাগিল। অমনই আবার পুলিসের বন্দুকের গুলী ছুটিল। জনতা এইবার ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। এই ব্যাপারে জনতার ৪ জন নিহত, ২৯ জন আহত এবং অনেক জন গ্রেপ্তার হইল।

মেরী গ্রসম্যানকে গ্রেপ্তার করা হইলে সে বিন্দুমাত্র বাধা দিল না। তাহার পরিহিত নীলাভ ব্লাউজ ও পেটিকোট তাহার নিহত প্রণয়ীর রক্তে রঞ্জিত, তাহার দৃষ্টি অকম্পিত, দৃঢ়, অটল। সে নির্ভীকভাবে বলিল, "হাঁ, আমি জনতার মধ্যে ছিলাম, সে জন্য দুঃখিত নহি। আমি শত শত বুভুক্ষু বেকারের জন্য এই কার্য্য করিয়াছি!"

নিউ ইয়র্ক সহরের "World Telegram" পত্র ঘটনা সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—"কয়েক মাস যাবৎ বেকাররা বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও ধৈর্য্যহারা হয় নাই, শান্তিভঙ্গ করে নাই। ৮০ লক্ষ শান্তিকামী নাগরিককে ক্রুদ্ধ ধ্বংসকামী জনতায় পরিণত করা হইতেছে;—যেমন ডিয়ারবোর্ণের পুলিস জনতার উপর গুলীবর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসকামীতে পরিণত করিয়াছে। এই সঙ্কটকালে মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ বন্দুকের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার করিয়া অবস্থার প্রতীকারোপায় চিন্তা করুন।"

এক দিন ফরাসী দেশের ভার্শাইলের পথে বুভুক্ষু ফরাসী জনতা এইভাবেই 'রুটী' চাহিয়াছিল, আর তাহা হইতেই ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। মার্কিণের কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য তৎকালীন ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের মত হৃদয়হীন বা দরিদ্রের দুঃখে উদাসীন নহেন। জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কট ও বেকারসমস্যার সমাধান করিতে হইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনবান্ জাতিসমূহকে মস্তিষ্ক শীতল রাখিয়া একসঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। অন্যথা উপায় নাই।

মাঞ্চুরিয়া

মস্কো সহরের সরকারী সংবাদপত্র "ইসভায়েষ্টিয়া" লিখিয়াছেন,—"আজ (এপ্রেল মাস) ৫ মাস হইল, জাপান মুকডেন সহর অধিকার করিয়াছেন, অথচ সেই স্থান ত্যাগ করিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিতেছেন না। মুকডেন মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী। এই সহর অধিকার করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য কি? মাঞ্চুরিয়াটি গ্রহণ করা নয় কি?

"যে দিন হইতে চীন ও জাপানে মাঞ্চুরিয়া-যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে সোভিয়েট সরকার পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। সোভিয়েট রাজ্যের সীমানার সান্নিধ্যেও উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হইতেছে, সুতরাং রাসিয়ার উদ্বিগ্ন হইবার কথা। তবে এ কথা সত্য যে, বেচারী চীন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ দ্বারা বিধ্বস্ত হইতেছে বলিয়া চীনের প্রতি সোভিয়েট সরকারের ও জনগণের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু তথাপি চীনের দুর্ব্বল শ্রমিক ও কৃষক প্রবল জাপানের দ্বারা বিধ্বস্ত হইতেছে দেখিয়াও রাসিয়া এই সংঘর্ষে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই। সোভিয়েট যুনিয়নের শান্তিকামনার ইহা প্রকৃষ্ট পরিচয়।

"রাসিয়া শান্তিকামী হইলে কি হয়, মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট সরকারের বিপক্ষে কিন্তু বিষম ষড়যন্ত্র ও প্রচারকার্য্য চলিতেছে। পদে পদে সোভিয়েট সরকারকে অপমানিত করিয়া উত্তেজিত করা হইতেছে। রাসিয়ার পূর্ব্বসীমানায় এইরূপে এক সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থার সৃষ্টি করা হইতেছে। সোভিয়েট সরকার শান্তিকামী বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া শক্তিমান্ সোভিয়েট সরকার কখনও তাহার সীমানা বা রাজ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিজিত হইতে দিবে না, এ কথাটা যেন অন্যান্য জাতির স্মরণ থাকে। সোভিয়েট সরকার অপরের রাজ্য গ্রহণ করিতে চাহে না, কিন্তু অপরের দ্বারা তাহার সূচ্যগ্রভূমিও অধিকৃত হইতে দিবে না।"

এই মনস্তত্ত্বের উৎস কি? নিউইয়র্ক "টাইমস" পত্রের মস্কো সহরস্থ সংবাদদাতা মিঃ ওয়ালটার ডুর‍্যান্টি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সোভিয়েট সরকারের বিশ্বাস, জাপান ফ্রান্সের অনুমোদন ও সাহায্য এবং বৃটেনের অনুমোদন পাইয়া চীনদেশে দলে দলে সৈন্যসমাবেশ করিতেছে। এই তিন শক্তিরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই জন্য জাপান চীন-দেশে নানা ছলছুতায় বলপ্রয়োগ করিয়া চীনকে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে। সাংহাই বা খাস চীন লইয়া সোভিয়েটের বিশেষ মাথাব্যথা নাই, কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার কথা স্বতন্ত্র। কারণ, ঐ প্রদেশ রাসিয়ার সাম্রাজ্যের পার্শ্বে অবস্থিত। সোভিয়েটের বিশ্বাস,জাপান ইহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়ায় রাসিয়ার White Guard-দিগকে ক্ষেপাইতেছে। সোভিয়েটের আরও বিশ্বাস যে, মার্কিণ যুক্তরাজ্য জাপানের এই অত্যাচারে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা জাপানকে কড়া চিঠি দিতেছেন, ফ্রান্সকে ও বৃটেনকেও দিতেছেন এবং জাতিসঙ্ঘের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু জাপান তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিতেছে না, চিঠির নামমাত্র জবাব দিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে চীনদেশে সেনা-দলের পর সেনাদল প্রেরণ করিতেছে। এ দিকে ফ্রান্স ও বৃটেন নীরবে বসিয়া মজা দেখিতেছেন।"

রাসিয়ান সোভিয়েটের এই মনোভাব জগতের শান্তির পক্ষে বড় শুভ নহে। মনের মধ্যে যে ভাব গুমরিয়া উঠে, অতি সামান্যমাত্র উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই তাহা শতমুখে জ্বলিয়া উঠিবে। তখন যে প্রলয়বিষাণ প্রশান্ততটে বাজিয়া উঠিবে, তাহা সমগ্র সভ্যজগৎ ধ্বংস না করিয়া নীরব হইবে না।

কম্যুনিজমের বিস্তার

জগতে যে সকল জাতি মূলতঃ রক্ষণশীল বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহাদের মধ্যে কম্যুনিজম দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে। গ্রেট বৃটেন ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কথাটা প্রথমে ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বৃটেনের গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পর হইতে কম্যুনিষ্ট দল অতি দ্রুত সৃষ্ট হইতেছে বলিয়া জানা যায়। লণ্ডনের 'Saturday Review' পত্র বলেন,"সম্প্রতি কম্যুনিষ্টদের যে সকল সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে ন্যূনাধিক ১ শত নূতন সদস্য নাম লিখাইয়াছে। ডাক বিভাগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই অধিকসংখ্যায় কায করে, কিন্তু এই বিভাগেও কম্যুনিজম ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। শ্রমিক দল বর্ত্তমান যুগে সোসালিজমের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবে না, সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসেই বহু শ্রমিক কম্যুনিষ্ট দলে ভর্ত্তি হইতেছে। বৃটিশ শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহারা নিযুক্ত আছে, তাহারাই অধিক সংখ্যায় কম্যুনিষ্ট হইয়া যাইতেছে। এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহেও কম্যুনিজমের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। খেলোয়াড় তরুণদের মধ্যে এবং বেকারদের মধ্যেও কম্যুনিষ্টদের মন্ত্র ফলপ্রদ হইতেছে।

অর্থসঙ্কট হেতু জার্ম্মাণদের মত সামরিক শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত রক্ষণশীল জাতিও সোসালিজমের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে। এ জলতরঙ্গ রোধ করিবে কে?

জাপানের ফ্যাসিজম

সাংহাই-বন্দরে সম্প্রতি যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং খাস জাপানেও পর পর কয়টি প্রধান রাজপুরুষ-হত্যার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে মনে করা আশ্চর্য্য নহে যে, জাপানে ক্রমে ফ্যাসিজম্ প্রবেশ করিতেছে। ইহার ফলে জাপানের মন্ত্রি-সভার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নিহত প্রধান মন্ত্রীর পদে যিনি বৃত হইয়াছেন, তিনি অতঃপর আপনার বিশিষ্ট দলভুক্ত রাজনীতিক লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন না, তৎপরিবর্ত্তে ন্যাশনাল গভর্ণ-মেণ্ট গঠন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

পূর্ব্বে জাপানের অভিজাতগর্ব্বে গর্ব্বিত সামরিক সামুরাই সম্প্রদায় স্বদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন,কিন্তু দেশপ্রেমে ও রাজভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা এক দিনে আপনাদের বিশেষ অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সামরিক প্রবৃত্তি একবারে অন্তর্ধান করে নাই, জাপানের আধুনিক সমরকর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে তাহা ভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। এই War-Lordদের বিশ্বাস, আধুনিক জাপ গভর্ণমেণ্টের (একটি বিশিষ্ট রাজনীতিক দলের লোক লইয়া যাহার মন্ত্রিসভা গঠিত হয়) কাপুরুষতার জন্য জাপানের সুনাম নষ্ট হইতেছে, জাপান মাঞ্চুরিয়া ও সাংহাইএ রাজনীতিক পাশাখেলায় হারিয়াছে, পরন্তু সামরিক খেলায় সাংহাইএ পরাজিত হইয়াছে। এই হেতু ইটালীতে যেমন মাসোলিনি তাঁহার Black shirt Facismএর প্রবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বল ইটালীয়ান গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই ভাবে এই জাপানী সামরিক Fascistরা

যেখানে সুবিধা পাইতেছে, সেখানে তাহাদের মতবিরোধী রাজপুরুষগণকে হত্যা করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই Facismএর পরিণাম কোথায়, তাহা এখন কেহ বলিতে পারে না।

জাপ Facistদের এক অসুবিধা এই যে, তাহাদের ইটালীর মাসোলিনির অথবা জার্ম্মাণীর হিটলারের মত শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব-প্রভাববিশিষ্ট নেতা নাই। সুতরাং নিয়মানুগ গভর্ণমেণ্টের জয় হইবে কি সামরিক গভর্ণমেণ্ট ও Fascismএর জয় হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। এখনই জাপানে ৮টি স্বতন্ত্র Fascist-মণ্ডলীর (Group) সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের সদস্যসংখ্যাও লক্ষ লক্ষ। বড় বড় মণ্ডলের সদস্যসংখ্যা ৮০ হাজারের কম নহে। জাপানী Fascismএর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে Socialismএর সহিত Militarism ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াছে।

জাপানের সোসালিষ্ট দলের নাম Nippon Kokunim Shakaito। এই দলের মধ্যে জাপানের সামরিক নেতারাও ভিড়িয়া যাইতেছেন। ইহাতেই চিন্তার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

রাসিয়ার নারীসেনা

এযাবৎ নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল গৃহ, মাতৃত্বেই নারীত্বের চরম বিকাশ, ইহাই ছিল ধারণা। আধুনিক প্রতীচ্যে এ ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া যুগের নারী এ যুগে অচল। যাহাতে সাহস, শক্তি, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার প্রয়োজন, তাহাতেও নারী আত্মনিয়োগ করিতেছেন। তাঁহারা ব্যায়ামক্রীড়ায়, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সন্তরণ, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। এমন কি, বিমান-বিদ্যার প্রতিযোগিতায় তাঁহারা সাহসে ও কৌশলে পুরুষের অপেক্ষা হীন নহেন, ইহাও বহু ক্ষেত্রে সপ্রমাণ করিয়াছেন। কুমারী এমি জনসন অথবা শ্রীমতী পুটনামের নাম এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কুমারী এমি একাকিনী বৃটেন হইতে বিমানযোগে অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন, শ্রীমতী পুটনাম একাকিনী বিমানে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়াছেন।

অন্যান্য প্রতীচ্য নারীর অপেক্ষা রাসিয়ার নারীরা পুরুষোচিত কার্য্য-সম্পাদনে বিশেষ তৎপরতা লাভ করিয়াছেন। চাষ-আবাদে, কলকারখানায়, পুলিসে, কাঠের কারবারে, আপিসে-দপ্তরে, রেলে-ষ্টীমারে, বিজ্ঞানাগারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিচারালয়ের বিচারকের আসনে,—কোথাও নারীর গতি ব্যাহত নাই। বিশেষতঃ রাসিয়ার সোভিয়েট সরকারের Five years plan অর্থাৎ পাঁচ বৎসর গঠনকার্য্যের পরিকল্পনা অনুসারে রাসিয়ার লক্ষ লক্ষ নারী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সেনাপতি ও সেনানীর পদে বৃত হইয়াছেন।

রাসিয়ার নেতা লেনিনের বিধবা ক্রুপ্‌স্কায়া স্বয়ং নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। বহু রাসিয়ান নারী স্থানীয় সোভিয়েট কেন্দ্র-সমূহের প্রেসিডেণ্ট-পদে বৃত হইয়াছেন।

রাসিয়ার নারী-সেনা নূতন নহে। রাসিয়া বহু প্রাচীনকালে যখন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, তখনও রাসিয়ার বীরনারী "পোলিয়ানিটজাদের" গাথা প্রাচীন শ্লাভ কাব্যসমূহে গীত হইয়াছিল। বলশেভিক বিপ্লবীদের বিপক্ষে রাসিয়ায় যাহারা শেষ অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদের নাম Battalion of Death, মরণবাহিনী। এই বাহিনীর সমস্ত সেনা ও সেনানী ছিল নারী।

রাসিয়ার জেনানা-পল্টন

রাসিয়ার বর্ত্তমান 'পোলিয়ানিট্‌জা' বা নারী-বাহিনীর অনেকে সরকারী সেনাদলে ভর্ত্তি হইয়া সমরশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা Military Academy বা সমর-শিক্ষালয়ে সেনানীবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশই শ্রমিক ও কৃষক অথবা কেরাণী লেখকশ্রেণীর নারী হইতেই গৃহীত হইয়াছেন।

রাসিয়ার Active Army ও Regular Reserves সেনার সঙ্গে সঙ্গে ২ কোটি ১০ লক্ষ অর্দ্ধশিক্ষিত Reserve সেনা গঠিত হইয়াছে। ইহার একার্দ্ধ নারী-সেনা! প্রথমে Trade Union Rifle Clubs অর্থাৎ শ্রমিক-সঙ্ঘের বন্দুকসভার সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই নারীরা Reserve সেনাদলে প্রবেশলাভ করিয়াছেন। সরকার এই সকল Rifle Clubকে কুচকাওয়াজ, বিষবাষ্পপ্রয়োগ এবং বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাবিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

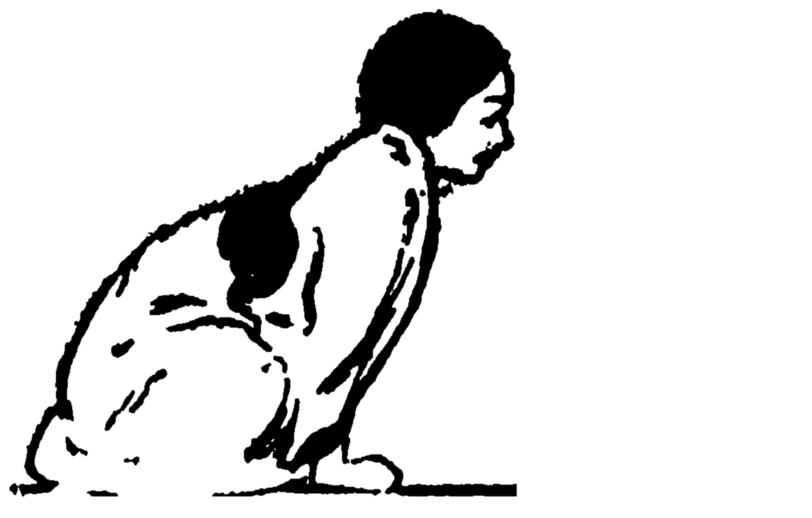

ত্রিমূর্ত্তি

(গল্প)

সে দিন 'আর্য্য-সুহৃদ্ সাহিত্য-নাট্যসমাজে'র 'রিহার্সাল রুমে' বিরাট উত্তেজনা চলিতেছিল। উত্তেজনার কারণ ঘটিয়াছিল—নব-নির্ব্বাচিত নাটকের ভূমিকা-নির্ব্বাচন লইয়া। নির্ব্বাচিত নাটকখানি রাজকৃষ্ণ রায়ের 'তরণীসেন-বধ'; কিন্তু এত বড় নাম এ যুগে অচল বলিয়া সভ্যমণ্ডলীর মনঃপূত না হওয়ায় তাহারা ইহার নামকরণ করিয়াছিল 'দয়াযুদ্ধ'। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, তরণীসেন, রাবণ—সব ভূমিকা সহজেই নির্ব্বাচিত হইয়া গেল; কিন্তু গোল বাধিল হনুমানের ভূমিকা লইয়া। কে এই ভূমিকা লইবে? কেহই রাজি হয় না।

এই দলের কর্ত্তা ছিল তিন জন—প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও ম্যানেজার। রামেশ, সতীশ ও অশ্বিনী যথাক্রমে উক্ত তিনটি পদের অবিসংবাদী অধিকারী। পাড়ার লোক বলিত—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এক কথায় ত্রিমূর্ত্তি। কিন্তু ব্রহ্মা ও মহেশ্বরে যেন অহি-নকুল-সম্বন্ধ ছিল; এমন দিন যাইত না, যে দিন অহি-নকুলে বিবাদ না বাধিত। বিষ্ণুকেই সে অবস্থায় উভয়ের বাক্যবাণ সহ্য করিয়া বিরোধের অবসান করিয়া দিতে হইত। যাক্ সে কথা। ভূমিকা-নির্ব্বাচনপালা যখন মধ্য-পথেই শেষ হইয়া যায় যায়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে চোখে চোখে যেন কি একটা পরামর্শ হইয়া গেল।

বিষ্ণু, সতীশ—সেক্রেটারী বেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "নরেশ-দা, তুমি ভাই, হনুমানের পার্টটা নাও, নইলে এ আর কেউ-ই পারবে না।"

নরেশ-দা লাফাইয়া উঠিল,—"কি, আমি নেবো হনুমানের পার্ট, আর তোমরা নেবে রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ—এই সব। আমাকে বোকা পেলে?"

করুণার দৃষ্টিতে নরেশ-দার দিকে চাহিয়া বিষ্ণু বলিল, "বোকা তোমাকে পাই নি, তবে এখন বুঝতে পারলুম—সত্যিই তুমি বোকা!"

"কিসে আমি বোকা?"

"যাক ভাই, সে কথা। তা হ'লে ব্রহ্মা, কি করা যায় বল দিকি?"

ব্রহ্মা—রামেশ—প্রেসিডেন্ট বলিল, "কি করব, উপায় নেই। তোমরা সকলে আমাকে ব্রহ্মা বল, কাযেই আমি ব্রহ্মা ছাড়া অন্য পার্ট নিতে পারি নে; কেন না, এ বইতে ব্রহ্মার পার্ট আছে। পরে এ সুযোগ না আসতেও পারে।"

মহেশ্বর—অশ্বিনী—ম্যানেজার বলিল, "তা ত বটেই। তবে কি না, তুমি করলেই ঠিক হ'ত। কিন্তু উপায় ত নেই।"

বিষ্ণু বলিল, "আমার অবশ্য ও রকম কারণ নেই, তবে আমি তিনটে পার্ট নিয়েছি—ভগ্নদূত,—বিভীষণ আর ইন্দ্রজিৎ। এ তিনটে পার্ট যদি তোমরা ম্যানেজ করতে পার, তা হ'লে আমি হনুমানের পার্ট প্লে ক'রে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতুম।"

সকলে সাগ্রহে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কেন—কেন?"

বিষ্ণু গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, "এ পার্টটি এত কঠিন যে, স্বয়ং গিরিশ বাবু নিজে প্লে করতেন। সে পার্ট প্লে করাকে আমি শ্লাঘার কথা মনে করি। অপরে করে কি না, জানি না।" বলিয়া সে আড়চোখে নরেশ-দার দিকে চাহিল।

ব্রহ্মা ও মহেশ্বর একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আমরাও মনে করি; বিষ্ণু, ভাই, তুমি আমাদের পার্টের জন্য অন্য লোক দেখ, আমরা হনুমানের পার্ট প্লে করব।"

তার পর কে হনুমানের পার্ট অভিনয় করিবে, এই লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা যখন হাতাহাতিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইল, তখন বিষ্ণু সকলকে থামাইয়া নরেশ-দাকে বলিল, "নরেশ-দা, দলটা কি ভেঙ্গে যাবে? তুমি আমার পার্টগুলো নাও। আমি নিজে হনুমানের পার্ট প্লে ক'রে এই নট-জীবন সার্থক করি। আমি নিলে এদের ঝগড়া এখনই থেমে যাবে। ব্রহ্মা-মহেশ্বরের ব্যাপার জান ত?"

নরেশ-দা আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "তিনটা পার্ট নিতে পারি, আমার সে ক্ষমতা নেই। তবে—তবে—আমি কি পারব—আমি কি পারব—"

—'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্'—

বসুমতী চিত্রবিভাগ] [শিল্পী—চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষ্ণু বুঝিল, টোপ ধরিয়াছে, এখন একটু খেলাইয়া লইতে পারিলেই হয়। ভাল মানুষের মত বলিল, "কি পারবে ?"

"এই—এই—হনুমানের পার্ট ; তবে তুমি যদি সাহায্য কর—"

"দোহাই নরেশ-দা, তুমি আমার এ সাধে বাদ সেধো না। আমিই হনুমানের পার্টটা নিই।"

নরেশ-দা একটু আশাহতভাবে বলিল, "তা হবে না, দাদা, আমিই নেব। তবে তোমরা দেখিয়ে দিও।"

বিষ্ণু হতাশভাবে বলিল, "তোমাকে দাদা বলি, আর সত্যকথা বলতে কি, তোমাকে দাদার মতই শ্রদ্ধা করি। কাযেই তোমার কথাতে 'না' বলতে পারি নে। তবে নিজকে খুব গৌরবান্বিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলুম, তা যাক গে। ওহে ব্রহ্মা, নরেশ-দার নামেই হনুমানের পার্টটা লেখ।"

একটা অস্ফুট হাস্যরেখা তিন জনের চোখেই নরেশ-দার অজ্ঞাতসারে খেলিয়া গেল !

এমন সময় একটি ষোল সতেরো বছরের ছেলে—সে ও এই দলের—দ্রুতগতিতে আসিয়া বলিল, "এই যে ত্রিমূর্ত্তিই আছ। কাকা ত কোন কথাই শুনছে না, সেই বুড়োর সঙ্গে বীণার বিয়ে দেবেই। তোমরা এর একটা বিহিত কর।"

ব্রহ্মা একেবারে লাফাইয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বলিল, "কি, আমাদের কথা শুনলে না ? স্বয়ং বিষ্ণু গিয়ে বারণ ক'রে এলো, সুপাত্র জোগাড় ক'রে দেব বললুম, তবুও হ'ল না ? জানে না, ত্রিমূর্ত্তি এখনও মরে নি !"

মহেশ্বর বলিল, "কেন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ। চেঁচালেই কি কার্য্য-সিদ্ধি হবে ?"

ধনুকের মত বাঁকিয়া ব্রহ্মা বলিল, "কি, আমি ষাঁড় !"

"আমার একটু ভুল হয়েছে, বলীবর্দ্দ বললেই ঠিক হ'ত।"

"দেখ অশে, মুখ সামলে কথা ক'স বলছি !"

তার পরই হাতা-হাতির উপক্রম !

বিষ্ণু এতক্ষণ বিরোধের রসটুকু উপভোগ করিতেছিল। এখন ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া শান্তস্বরে বলিল, "আচ্ছা, রামেশ খুড়ো, তুমি কি ভাই, ক্ষেপলে ? ওটা তোমাকে ক্ষেপায়, তা কি তুমি জান না ?"

"ওর ক্ষেপাবার আমি কি ধার ধারি ?"

মহেশ্বর মুখ ভেঙচাইয়া বলিল, "ক্ষেপাবার কি ধার ধারি ! ভারি মুরোদ !"

"তুই দেখে নিস। এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি, যদি না এ বিয়ে ভাঙ্গতে পারি ত আমি অব্রাহ্মণ।"

বিষ্ণু বলিল, "ও তোমাকে বরাবরই ক্ষেপায়, এটা তুমি বুঝেও বোঝ না !"

"ও ক্ষেপাবে কি জন্যে ?"

মহেশ্বর হাসিয়া বলিল, "আক না চিবুলে কি রস পাওয়া যায় ? তোমাকে উত্তেজিত ক'রে একটু শাণ দিয়ে নিলুম। তার পর তোমার ধারে সেই বুড়ো ছাগলটাকে জবাই করব।"

ব্রহ্মা এক গাল হাসিয়া ফেলিল।

তার পর বিবাহ-নিরোধের কাউন্সিল বসিল। গভীর গবেষণার পর একটা সিদ্ধান্তে তাহারা উপনীত হইল। এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে অর্থের প্রয়োজন, কাউন্সিলে সে কথাও উঠিল। সে সমস্যার সমাধানও অতি সহজে হইয়া গেল। স্থির হইল, 'দয়াযজ্ঞ' অভিনয় করা হইবে টিকিট বিক্রয় করিয়া কোন প্রকাশ্য রঙ্গ-মঞ্চে।

২

"খুড়ো মশাই, প্রমাণ হই।"

"কে সতীশ—বেঁচে থাক—বেঁচে থাক।"

"খুড়ো মশাই, আমিও—"

"অশ্বিনী—মঙ্গল হ'ক—মঙ্গল হ'ক।"

"খুড়ো—ডিটো।"

"রামেশ বাবাজী—ভাল ভাল। ত্রিমূর্ত্তি একসঙ্গে যে ?"

"আজ্ঞে, আমরা তোমাকে প্রমাণ করতে এসেছি।"

"প্রমাণ কি ?"

"ও হো হো, ভুল হয়ে গেছে—প্রণাম—প্রণাম !"

"হঠাৎ প্রণামের কি করলুম রে বাবা ?"

"আমরা বড় খুসী হয়েছি কি না, তাই। ওঃ! কি ভাগ্য তোমার খুড়ো মশাই ! নইলে এমন মেয়ে—"

বিষ্ণুকে বাধা দিয়া ব্রহ্মা বলিল, "কি পাগলের মত খুড়োর ভাগ্য বলছ ! যদি ভাগ্য বলতে হয় ত বল বীণার ! অনেক তপস্যা না করলে কি কেউ খুড়োর গলায় মালা দিতে পারে !

মহেশ্বর বলিল, "যা বলছ, তা ঠিক ; তবে যদি খুড়োর বয়স একটু কম হ'ত—"

খুড়ো চটিয়া উঠিল। বলিল, "কি, তুমি বয়েসের কথা বলছ ! কিসের বয়েস আমার !"

বিষ্ণু বলিল, "ঠিকই ত। খুড়োর বাড়ন্ত গড়ন, তাই একটু বড় দেখায়। নইলে খুড়োর ত এখন ছেল-ডিগি-ডিগি খেলে বেড়াবার কথা !"

খুড়ো মহা খুসী—হাসি আর ধরে না। সতীশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "সতীশের মত সুবোধ ছেলে এ তল্লাটে আর একটিও নেই।"

"যা বলেন—নিজ গুণেই বলেন। আমরা কিন্তু খুড়ো, শুনে পর্য্যন্ত তোমাকে কন্‌গ্রাচুলেট করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলুম। তুমি সংসারী হও, এ আমাদের সকলেরই ইচ্ছে। বয়স ত তোমার বেশী নয়—বোধ হয়, আমাদের বয়সীই হবে—কি দু এক বছরের ছোটই হবে। আমরা আদর ক'রে খুড়ো বলি বৈ ত নয়। ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল, তাই আজ তেজ-বরে বলতে হচ্ছে !"

খুড়ো উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল, "ঠিকই ত—ঠিকই ত। প্রথম পক্ষেরটি মোটে তের বছর ঘর করেছিলেন, দ্বিতীয় পক্ষেরটি সতেরো। প্রথম পক্ষেরটি গত হবার এগার দিনের দিনই দ্বিতীয় পক্ষটির গলায় মালা দি।"

ব্রহ্মা বলিল, "আচ্ছা খুড়ো, পাড়ার পাঁচ বেটা বদমাস কি বলে জান ?—অবশ্য আমরা তা বিশ্বাস করি নে, তবে শুনেছি যা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"কি বলে ?"

"বলে, তোমার প্রথম পক্ষটি যখন মারা যায়, তখন না কি তুমি তার সঙ্গে পুড়ে মরতে চেয়েছিলে। কেউ তোমায় ধ'রে রাখতে পারে না—তুমি পুড়ে মরবেই। তার পর মহাদেব কাকা না কি সকলকে বলে, ছেড়ে দাও, কেমন পুড়ে মরে দেখি—আমরা সবাই ত আছি। তখন তোমাকে ছেড়ে দিলে না কি তুমি 'এই পুড়ে মলুম—পুড়ে মলুম' ব'লে চেঁচাতে লাগলে। অথচ কাযে কিছুই করতে পারলে না ; তখন মহাদেব কাকার ধমক খেয়ে চুপটি ক'রে এক পাশে ব'সে রইলে ?"

"কে বলে—কোন্—"

"অনেকে বলে কিন্তু এই কথা।"

"বেশ করেছিলুম—সেই বেটাদের জন্যেই ত রাগ ক'রে এগার দিনের দিন বিয়ে ক'রে ফেলেছিলুম।"

"ঠিক কায করেছিলে, পুরুষের লক্ষণই ত এই, আর লোককে শিক্ষা দেওয়াও দরকার। তা যাক্, এবার বীণাকে তুমি কৃপা করবে শুনে আমরা আনন্দ-সলিলে ভাসছি। তা কবে শুভ অনুগ্রহটা হবে ?"

এক গাল হাসিয়া খুড়ো বলিল, "এই জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতাশে।"

বিষ্ণু একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু খুড়ো, আমাদের একটা কথা আছে।"

"কি কথা বাবা, কি কথা ?"

"আচ্ছা, এই যে তুমি বীণাকে বিয়ে করবে, কিন্তু তার মন জেনেছ কি ?"

"কি রকম ?"

"তার তোমাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে আছে কি না। সে আজকালকার প্রগতি-সম্পন্না তরুণী—তাই এ কথা জিজ্ঞাসা করছি। অবশ্য তোমার এই কাঁচা বয়েস, চেহারা একেবারে কন্দর্পের নিউ এডিসন, অত টাকা ! আমারই মনে আপশোষ হচ্ছে, কেন আমি মেয়ে হয়ে জন্মাই নি। তা বীণা ত বীণা ! তবে এটা প্রগতির যুগ কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

খুড়ো একটু ভাবিয়া বলিল, "তুমি বলেছ মন্দ নয়। কিন্তু নির্জ্জনে কোথায় তাকে পাব ?"

আপশোষের সুরে বিষ্ণু বলিল, "আহা হা ! খুড়ো, একটু আগে যদি জানতে পারতুম, তা হ'লে আমরা এর ভাল রকম বন্দোবস্ত করতে পারতুম।"

"কি ক'রে বাবা ?"

"এই আমরা এক জনের কন্যাদায়ের জন্য একটা চ্যারিটি পারফরমেন্স করছি। তাতে যদি তুমি একটা বক্স নিতে, তা হ'লে সেই বক্সে তুমি আর বীণা একসঙ্গে ব'সে থিয়েটার দেখতে দেখতে প্রেম নিবেদন করতে। চারি দিকে আলোর মালা—সুরের ঝঙ্কার—প্রেম-নিবেদনটা জমত ভাল !"

"বীণা আমার সঙ্গে একলা থিয়েটার দেখতে যেতো কেন ?"

"বীণা কি একলা যেতো, তা নয়। রবি—বীণার দাদা আমাদের দলে আছে কি না—সে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসত, সঙ্গে তার ছোট ভাই থাকত। তার পর সাজঘর দেখাবার ছুতোয় তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতুম।"

খুড়ো হায় হায় করিয়া উঠিল। মিনতির সুরে বলিল, "এখন হয় না ?"

"না, আর কোনো উপায় নেই। বক্স সব বিক্রী হয়ে গেছে। অন্য টিকিট আছে বটে, কিন্তু তাতে ত সুবিধা হবে না।"

খুড়ো সতীশের দুই হাত জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "তোমরা একটা উপায় কর, আমি ডবল দাম দেব।"

সতীশ রামেশ ও অশ্বিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "একটা বক্সও খালি নেই ?"

ভাল মানুষের মত অশ্বিনী বলিল, "না, তবে—"

আশান্বিত হইয়া খুড়ো বলিল, "তবে কি ?"

অশ্বিনী বলিল, "তবে একটা ব্যবস্থা হয় ত করতে পারি, কিন্তু—"

আর্ত্তস্বরে খুড়ো বলিল, "পারিস যদি বাবা, তবে আর 'কিন্তু' করিস নে।"

"একটু অভদ্রতা হবে, তাই ভাবছি।"

খুড়ো ব্যাকুল হইয়া বলিল, "ও ভাবা-ভাবি ছেড়ে দে, বাবা! ও বাবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তোমরা একটা ব্যবস্থা কর।"

"দেখুন, ও ম্যানেজার। ব্যবস্থা যা কিছু, তা সে সব ওরি হাতে। আচ্ছা মহেশ্বর, ব্যাপারটা কি ? কি করতে পার ?"

"দেখ, রয়েল বক্সটার টিকিট এখনও আমার হাতে আছে। তবে হরদমগঞ্জের রাজার লোক এসেছিল। কথা দিয়ে টাকা আনতে গেছে।"

খুড়ো মহেশ্বরের দুই হাত ধরিয়া বলিল, "তবে বাবা, তাকে আর দিস্‌ নি, এ বুড়ো—" বলিয়াই খুড়ো নিজের নাক ও কাণ মলিল। "বুড়ো নয় রে বাবা, খুড়োর প্রাণ রাখ। আমি দশ টাকা বেশী দেব।"

বিষ্ণুও অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, "টাকা যখন দেয় নি, তখন বুড়োকেই—খুড়োকেই দাও। কিন্তু খুড়ো, রয়েল বক্সের দাম পঞ্চাশ টাকা, আর আমাদের দশ টাকা দেবে বলেছ।"

"তা এখুনি দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা, বীণাকে সেখানে নিরিবিলি পাওয়া চাই।"

"নিশ্চয় পাবে। ত্রিমূর্ত্তির কথার নড়চড় হয় না, এ কথা সবাই জানে। টাকা দাও।"

খুড়ো বাক্স খুলিয়া ৬ খানা ১০ টাকার নোট দিয়া বলিল, "দেখো বাবা, এ বুড়োর—খুড়ি—খুড়োর সঙ্গে প্রতারণা করো না।"

"রাধামাধব! বুড়োর—খুড়ি—খুড়োর সঙ্গে কি প্রতারণা চলে। ন্যায্য কাযই করব, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

রাস্তায় আসিয়া ব্রহ্মা বলিল, "যাক বাবা, অর্দ্ধেক খরচের টাকা ত উসুল হ'ল। 'যেন তেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ং'।"

বিষ্ণু বলিল, "এখনই হয়েছে কি। একখানা এমন দলিল বুড়োর ঘরে পেয়েছি, যাতে আমাদের কাযের অর্দ্ধেক সুরাহা হবে।" বলিয়া একখানা চিঠি দেখাইল।

ব্রহ্মা ও মহেশ্বর চিঠি পড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। "কি সর্ব্বনাশ! বেটার ওপর যেটুকু সহানুভূতি আসছিল, তাও শেষ হয়ে গেল।"

"এ চিঠির জবাব, আমরাই বেনামীতে দেব তবে ত মজা হবে।"

মহোৎসাহে তাহারা টিকিট বিক্রয়ের চেষ্টায় চলিল।

৩

রঙ্গমঞ্চের সাজঘর। অভিনয় আরম্ভ হইতে বিলম্ব নাই, তৃতীয় ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে—কনসার্ট বাজিতেছে। অভিনেতাদের কাহারও পোষাক পরা শেষ হইয়াছে, কেহ কেহ বা পোষাক পরিতে ব্যস্ত। সকলেরই পরিধানে 'আণ্ডারওয়ার'; বেশ অনেকেরই অদ্ভুত,—যে সীতার ভূমিকা লইয়াছে, তাহার সর্ব্বাংশেই স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ, কিন্তু মাথায় চুল নাই—রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্ব্বে পরিবে; কেন না, অনর্থক গরম ও দুর্গন্ধ ভোগ করিয়া লাভ নাই; মুখে বিড়ি, হাতে পার্ট লেখা কাগজ,—পড়িতেছে, বোধ হয়, ভাল মুখস্থ হয় নাই। মন্ত্রী সারণের ভূমিকা যাহার—সে 'স্পিরিট গম' দিয়া পাকা চুলে গোঁপ-দাড়ি আঁটিয়াছে—মাথায় কালো চুল, সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত—পরিধানে মাত্র 'আণ্ডারওয়ার'—সে

এক অদ্ভুত মূর্ত্তি। ব্রহ্মা ব্রহ্মার পোষাক পরিয়া চারিদিকে কর্ত্তামি করিয়া বেড়াইতেছে আর কারণে অকারণে চীৎকার করিয়া সাজঘর সরগরম করিতেছে। নরেশ-দা হনুমানের পোষাক পরিয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখিতেছে আর আড় চোখে তরণীসেনের বিচিত্রোজ্জ্বল-পোষাক-পরিহিত ইন্দুকে দেখিয়া মনের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করিতেছে। মহেশ্বরের রামের ভূমিকা, সে নিজে সাজিয়া অপরকে সাজিবার সহায়তা করিতেছে। বিষ্ণু এইমাত্র সাজিতে বসিয়াছে, অথচ সর্ব্বপ্রথমেই তাহার ভগ্নদূতের পার্ট। সে এতক্ষণ খুড়োকে লইয়া ব্যস্ত ছিল—তাহাকে যথাস্থানে বসাইয়া, মিষ্ট কথায় আশ্বাস দিয়া এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ দিকে কনসার্ট জলদ ধরিয়াছে—ষ্টেজ-ম্যানেজারের ওয়ার্ণিং পড়িয়াছে। ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওহে বিষ্ণু, আজ দেখছি, তোমার জন্যেই অপমানিত হ'তে হবে। আজকের অডিয়েন্স অমনি আসে নি—পয়সা দিয়ে এসেছে, এ কথা মনে রেখো।"

"মনে আমার খুব আছে। তুমি এক কায কর দেখি। ষ্টেজ-ম্যানেজারকে বল, সে তার ওয়ার্ণিং থামাক, আর কনসার্টের দলকে ব'লে পাঠাও, তারা একটু 'টেনে' বাজাক। তা হ'লেই সব ঠিক হবে এখন।"

গজ-গজ করিতে করিতে ব্রহ্মা চলিয়া গেল এবং একটু পরেই তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "ওহে, অনুকূলের বাপ অনুকূলকে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছে।"

চীৎকার করিয়া বিষ্ণু বলিল, "রেখে দে তোর অনুকূলের বাপ! ইয়ারকি মারবার আর যায়গা পায় নি!"

ব্রহ্মা ইঙ্গিত করিয়া জানাইতেছিল যে, তিনি তোমার পিছনেই দাঁড়াইয়া আছেন; কিন্তু বিষ্ণু ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে বলিয়া চলিল, "এখান থেকে যেতে বল। নইলে—"

ব্রহ্মা বিষ্ণুর মুখ চাপিয়া ধরিল। তাহার পর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, ভদ্রলোক প্রস্থান করিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিল, "করলে কি বিষ্ণু, ভদ্রলোক যে তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে-ছিলেন!"

বিষ্ণুও এখন অপ্রস্তুত হইয়াছিল। বলিল, "আমি কি জানি ছাই, তিনি একেবারে সাজঘরে এসে ঢুকেছেন। কাল তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেই হবে। কিন্তু দেখ, অনুকূল আছে ত'?"

"সে ভয় নেই, সে ঠিক আছে। ঐ দেখ না, সে নির্ব্বিকার ভাবে ব'সে বিড়ি টানছে। আমি চললুম, তুমি চটপট নাও।"

ব্রহ্মা চলিয়া গেল।

বিষ্ণুর সাজা হইয়া আসিয়াছিল। কারণ, ভগ্নদূতের বিশেষ সাজিবার কিছু ছিল না, তবে ঐ দৃশ্যেই তাহাকে আবার বিভীষণের মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিতে হইবে, মধ্যে মাত্র রাম-লক্ষ্মণের গোটাকয়েক কথা। তাই বিভীষণের পোষাক—মায় চুল পর্য্যন্ত এক জনের হাতে দিয়া বিষ্ণু উঠিয়া দাঁড়াইল। কারণ, তাহার এমন সময় থাকিবে না যে, সে সাজঘরে আসিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া যায়, তাহাকে 'উইংসের' পাশে দাঁড়াইয়াই পোষাক বদলাইতে হইবে। বিষ্ণু পা বাড়াইয়াছে—অমনই পুনরায় ব্রহ্মার প্রবেশ। "ওহে, খুড়ো বেটা যে ভারি জ্বালালে; বলে, বীণা কৈ? বীণাকে না পেলে সে এমন গণ্ডগোল করবে বলেছে যে, তাতে ভারি একটা কেলেঙ্কারী হবে।"

"না বাবা, আজ আর আমাকে প্লে করতে দেবে না। প্রথমেই ভয়ের অভিনয় করতে হবে, না—ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠছে। এতে কি প্লে হয়? তোমরা কি কোনমতে তাকে একটুখানি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না?"

এমন সময় প্রেক্ষাগৃহে প্রবল হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট শিস্—

বিষ্ণু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আর না, খুড়ো ব্যাটা যা হয় করুক—আমি ষ্টেজে চললুম। ওহে ষ্টেজ-ম্যানেজার, ওয়ার্ণিং দিয়ে কনসার্ট থামাও। কৈ হে, তোমার সমুদ্দুর কৈ? প্রথমেই ত সমুদ্রে ভগ্নদূত ভাসছে—দেখাতে হবে।"

"এই যে মশাই, সমুদ্দুর। আপনি এই বেঞ্চিখানায় লম্বা হয়ে হাত-পা ছুড়ুন—লোক দেখবে, আপনি ঠিক সমুদ্রে ভাসছেন। সামনে সমুদ্দুর আঁকা 'সিন' রয়েছে দেখছেন না?"

"বোকা বোঝাতে যেও না বাবা, যে রকম ইন্‌স্ট্রাক্‌সন দিয়েছিলুম, তা হয় নি। ভেবেছিলুম, কিছু বক্‌সিস্ দেবো, তা তোমার অদৃষ্টে নেই।"

"আপনি দেখুন, কেউ নিন্দে করবে না। যদি করে, তখন বলবেন। আপনি বিলম্ব করবেন না—কনসার্ট থামল। এই অপারেটর, নীল আলো।"

অপারেটর নীল আলো দিল—বিষ্ণু সেই বেঞ্চিখানার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া হাত-পা ছুড়িতে লাগিল—ড্রপ উঠিল—অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল।

৪

প্রথম অঙ্ক শেষ হইয়াছে। আবার সাজঘরে জটলা। ইন্দু বলিতেছে, "দেখেছ মহেশ্বর, আমি কি রকম সামলে নিলুম, প্রমটার সব মাটী করেছিল আর কি!" তাহার জবাবে মহেশ্বর বলিল, "আমি যদি ঠিক সময় চুপি চুপি ব'লে না দিতুম, তা হ'লে তুমি একটা বেহদ্দ কেলেঙ্কারী করতে।" তেজু বলিল, "পঞ্চাটা কি গাধা, আমি এত ক'রে বললুম, তবু হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল—কিছুতেই সরল না, তাইতেই ত চারদিকে হাসির রোল উঠল।" এই ভাবে যে যাহার নিজের বাহাদুরী করিতেছে, আর অপরের বোকামী প্রকট করিতেছে, এমন সময় রুদ্রমূর্ত্তিতে খুড়ো সেখানে আসিয়া বলিল, "এই যে ত্রিমূর্ত্তি! আমার সঙ্গে চালাকী—বীণা কৈ?"

বিষ্ণু যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "প্রণাম হই।"

খুড়ো চীৎকার করিয়া বলিল, "আবার?"

"ভুল হয়ে গেছে বাবা!"

"চুলোয় যাক প্রণাম, বীণা কৈ?"

"সবুরে মেওয়া ফলে খুড়ো, সবুরে মেওয়া ফলে।"

খুড়ো কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া বলিল, "ছেঁদো কথা রেখে দে—আমাকে কি বোকা পেলি?"

"তোমাকে যে বোকা মনে করে, সে মাতৃগর্ভে। শোন, একটু গোল বেধেছে। বীণার কাকা এক বেটা বুড়োর কাছে বেশী টাকা খেয়ে সেইখানে বীণার সম্বন্ধ করেছে। আজ তারা বীণাকে দেখতে এসেছে।"

"কি, অমরুতর এত দূর স্পর্দ্ধা! আমি পাঁচশো টাকার নোটটা ফিরে দিতে চাইলুম—বিয়ের খরচা ব'লে আরও পাঁচশো দিতে রাজী হলুম, এতেও তার হ'ল না! তাকে ভিটেস্থ ঘুঘু ক'রে তবে ছাড়ব।"

"তুমি নিরাশ হয়ো না খুড়ো, এখনও আশা আছে।"

খুড়ো আকুল আগ্রহে বলিল, "আছে বাবা, আছে? দোহাই তোর, বুড়ো—থুড়ি খুড়োর প্রাণ বাঁচা।"

বিষ্ণু গম্ভীরভাবে বলিল, "দেখ, এখন বেশী কথা বলবার সময় নয়, ঐ দেখ কনসার্ট থামবার সময় হয়েছে। চট ক'রে বলি শোন, তুমি জেনো, বীণার অভিভাবক তার কাকা নয়—তার ভাই রবি। রবি আমাদের দলের লোক, তা ত' জান। আমরা তাকে যা বলব, সে তাই শুনবে। তোমার সঙ্গে বীণার বিয়ে আমরা দেবই। তবে কথা এই যে, বিয়েতে খরচ-পত্তর আছে, সে জন্য তোমাকে হাজারখানেক টাকা দিতে হবে। আর—"

"রেখে দাও তোমার টাকা—সে ত' হাতের ময়লা। এখন বীণার সঙ্গে কথা কবার কি হবে?"

"সে আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। এইবার ড্রপ পড়লেই আমি বীণাকে তোমার কাছে দিয়ে আসছি। এর মধ্যে রবির ছোট ভাই তাকে এখানে আনবে। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এক অঙ্ক বীণা তোমার সঙ্গে থাকবে। তার পর তাকে ফিমেল সিটে পাঠিয়ে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। ঐ যা—ড্রপ উঠে গেল।"

বিষ্ণু ষ্টেজের দিকে চলিয়া গেল, আশা-উৎফুল্ল খুড়োও তাহার সিটে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

৫

দ্বিতীয় অঙ্কের ড্রপ পড়িবার পূর্ব্বেই বিষ্ণু একটি তরুণীকে লইয়া বীণা-মিলন-ব্যাকুল খুড়োর কাছে রয়েল বক্সের ভিতর প্রবেশ করিল। খুড়ো আধ-আলো আধ-অন্ধকারে তরুণীকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও, সে যে বীণা, তাহাতে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না। বিষ্ণু বলিল, "এস বীণা, লজ্জা কি? ইনিই আমাদের রসিক-কুল-শেখর খুড়ো, তোমার গলায় মালা দিয়ে ইনি তোমার পিতৃকুল পবিত্র করবেন। ভয় কি, এই চেয়ারে ব'স।"

লজ্জাবিজড়িতচরণে তরুণী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিল। তরুণীর সর্ব্বাঙ্গ এসেন্স-সিক্ত। সেই গন্ধে খুড়োর প্রাণও কেমন এক অজানা পুলকে নাচিয়া উঠিল, ঠিক এই সময় ড্রপ পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকে খুড়ো তরুণীর মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। প্রথম বিস্ময় অপনীত হইলে খুড়ো অন্য কোন কথা কহিবার না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

তরুণী উত্তর দিল, "শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী।"

খুড়ো বলিল, "বাঃ, বেশ নামটি ত' তোমার। আচ্ছা বিষ্ণু, হঠাৎ একটা বিশ্রী গন্ধ এলো কোত্থেকে? খুব বেশী তামাক আর বিড়ি খেলে যেমন গন্ধ বেরোয়, ঠিক সেই রকম। বীণার গায়ের এসেন্সের গন্ধও যেন চাপা প'ড়ে গেছে।"

বিষ্ণু বলিল, "কিছুই ত বুঝতে পারছি নে। বোধ হয়, পাশেই কেউ খাচ্ছে। তোমাদের জীবন মধুময় হোক, আমি কিছু পুষ্পমধু বর্ষণ ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করি।" বলিয়া সে এক শিশি এসেন্স তরুণীর মুখে ঢালিয়া দিল। তার পর "তুমি বীণার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও, আমি চললুম, ড্রপ উঠলেই আমাকে ইন্দ্রজিতের পার্ট প্লে করতে হবে।" বলিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেল।

বিষ্ণু চলিয়া যাইতেই খুড়ো তরুণীর ডান হাতটি নিজের হাতে লইয়া ভাবাবেশে একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তরুণীও ব্রীড়াসঙ্কুচিত অপাঙ্গদৃষ্টিতে খুড়োর দিকে এক একবার চাহে, আবার দৃষ্টি নত করে। তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে খুড়োর মনে কি হইল, সেই জানে; সে প্রশ্ন করিল, "তুমি কি থিয়েটার কর?"

লজ্জাবিনম্রমুখী তরুণী বলিল, "এ কথা আপনার মনে হ'ল কেন?"

"আমার যেন মনে হচ্ছে, তুমি সীতা সেজেছিলে।"

চঞ্চল চাহনীতে খুড়োর মুণ্ড ঘুরাইয়া দিয়া তরুণী বলিল, "সীতা সেজেছে আমার দাদা—রবি। আমরা দেখতে প্রায় এক রকমই কি না।"

সন্দেহের মেঘজাল তরুণীর এক কথাতেই উড়িয়া গেল। এমন সময় আলোক নিবিয়া গেল—ড্রপ উঠিল। তরুণীর হাত খুড়োর মুষ্টির মধ্যেই দিল, খুড়ো মধ্যে মধ্যে সেই হাত মৃদু মৃদু ভাবে টিপিতেছিল। এখন অন্ধকার হইতেই খুড়ো সেই হাত টানিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "এস না বীণা, আমরা এক চেয়ারে বসি।"

"ধ্যেৎ!" বলিয়া তরুণী মুহূর্ত্তমধ্যে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। খুড়ো হতভম্ব হইয়া তরুণীর গতিশীল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

৬

ত্রিমূর্ত্তিদের পাড়ায় এক সুবৃহৎ ত্রিতল বাটী। বাটীটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগই স্বতন্ত্র অথচ মধ্যের দরজাটি খুলিয়া রাখিলে দুইটি অংশই এক হইয়া যায়। বাটীটি খালি ছিল। হঠাৎ এক প্রাতঃকালে পাড়ার সকলে দেখিল, সেই বাড়ীর দুইটি অংশই জনসমাগমমুখর এবং উভয় অংশের দ্বারে রৌশন-চৌকী বাজিতেছে। সকলে বুঝিল, বিবাহের জন্য কাহারা বাটীটি ভাড়া লইয়াছে।

আজ খুড়োর বিবাহ; বীণার সহিতই তাহার বিবাহ হইবে, ইহাই প্রচারিত। সন্ধ্যার পরই লগ্ন। যথাসময়ে খুড়ো নটবর-বেশে সজ্জিত হইয়া সাড়ম্বরে সসমারোহে বিপুল বাদ্যোদ্যম সহকারে সেই ত্রিতল বাটীর দক্ষিণ অংশের দ্বারে আসিয়া পৌছিল। বর পৌছতেই কয়েক জন যুবতী বাহির হইয়া আসিয়া প্রবল শঙ্খধ্বনির সহিত বররূপী খুড়োকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

খুড়ো অন্দরে নীত হইবার পর-মুহূর্ত্তে ট্যাক্সি করিয়া এক কমনীয়-কান্তি প্রিয়দর্শন চন্দনচর্চ্চিত পট্টবস্ত্র-পরিহিত মাল্যশোভিত যুবক কয়েকটি বন্ধুর সহিত সেই বাটীর উত্তর অংশের দ্বারে পৌছিল। কন্যাকর্ত্তা ত্রস্ত হইয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। রৌশনচৌকীর দুইটি দলই একসঙ্গে আলাপ সুরু করিল।

বাসর-ঘর। বরবেশী খুড়ো যুবতীশতবৃত হইয়া শোভমান। বোধ হইতেছে, প্রস্ফুটিত শতদলের মধ্যে দ্বিরেফ মহানন্দে বসিয়া গুন্ গুন্ করিতেছে। খুড়োর পার্শ্বে নবপরিণীতা তরুণী। তরুণীর মুখে মৃদুহাস্যরেখা। বাসর-সঙ্গিনীরা সকলেই সুবেশা—সুরূপা—যুবতী। বালিকা, প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা কেহই নাই। খুড়ো কাহাকে রাখিয়া কাহার দিকে চাহিবে, কি কথা কহিবে—ভাবিয়া ঠিক পাইতেছে না। এমন সময় সেখানে ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব। ত্রিমূর্ত্তিকে দেখিয়া খুড়ো যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল।

ব্রহ্মা বলিল, "কি বাবা খুড়ো, একেবারে আমাদের ফাঁকি। বেড়ে বাবা!"

"ফাঁকি কি বাবা! তোদের দৌলতেই এ বৃদ্ধ—দূর ছাই, কি অভ্যেসই হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে কেমন এই বুড়ো সাজবার সখ, এ যুবাবয়সেও সেটা গেল না।"

"আচ্ছা খুড়ো, তুমি বাবা, বৌ-ও নেবে—আবার ফুলের মালাও নেবে, সে হবে না।" বলিয়া মহেশ্বর খুড়োর গলা হইতে এক ছড়া মালা খুলিয়া লইয়া বাসর-সঙ্গিনী এক যুবতীর কবরীতে পরাইয়া দিল।

বিষ্ণু সহাস্যে বলিল, "খুড়ো, একেই বলে, যখন বিধি মাপায়—উপরি উপরি চাপায়। মহেশ্বর এটার সঙ্গেও তোমার বিয়ে দিলে।" বলিয়া সে সেই যুবতীটিকে ধরিয়া খুড়োর দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চহাস্য-রোলে বাসরগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

ব্রহ্মা বলিল, "খুড়ো, বাসর-ঘরে গান গাইতে হয়। একটা গান গাও বাবা!"

খুড়ো বিব্রত হইয়া উঠিল, বলিল, "আমি কেন—আমি কেন, এই এঁরা রয়েছেন, এঁদেরই গাইতে বল।"

"ওঁরা ত গাইবেন বলেই সেজেগুজে এসেছেন। তুমি আগে পালা সুরু ক'রে দাও; তার পর এঁরা ত সারারাতই গাইবেন।"

খুড়োর মুখ শুকাইয়া গেল, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "সারারাত কেন—সারারাত কেন। সারারাত জাগলে ওঁদের যে অসুখ করবে। একটু আমোদ-আহ্লাদ ক'রে ওঁরা যে যার বাড়ী যান—নইলে কষ্ট হবে যে!"

এক যুবতী বলিয়া উঠিল, "সে কি কথা! আপনারই না হয় তৃতীয়পক্ষ, বীণার ত' তা নয়; তার ত সাধ-আহ্লাদ আছে।"

খুড়ো বিপন্ন হইয়া পড়িল। বলিল, "তা ওঁরা পাশের ঘরে গিয়ে আমোদ করুন না। আমার শরীরটা ভাল নয়, একটু না ঘুমুলে অসুখ করতে পারে।"

সেই যুবতী বলিয়া উঠিল, "সে বেশ কথা, উনি এখানে ঘুমোন, আমরা বীণাকে নিয়ে ও ঘরে গিয়ে সারারাত নাচ-গান ক'রে কাটিয়ে দি।"

খুড়ো আর্ত্তস্বরে বলিল, "সে কি কথা—সে কি কথা! তোমরা এখানেই নাচ-গান কর। আমি না হয় মাঝে মাঝে গা গড়িয়ে নেব।"

মহেশ্বর বলিল, "সে ব্যবস্থা মন্দ নয়।"

এমন সময় নরেশ-দা সেখানে আসিয়া ত্রিমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমরা আচ্ছা লোক ত!"

ব্রহ্মা বলিল, "কেন বাবা, নরেশ-দা?"

নরেশ-দা উত্তর দিল, "আবার কেন বলছ? আর খুড়ো, তোমাকেও বলি, তুমি কেবল নিজের সুখেই বিভোর। আর এই যে তিন তিনটে ভদ্দরলোকের ছেলে আজ তোমাকে সুখ-সাগরে ভাসালে, তারা যে এখনও দাঁতে কুটোটি কাটে নি, সে খবরটাও একবার নিলে না!"

খুড়ো মহা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; বলিল, "ত্রিমূর্ত্তি! এটা ত' তোমরা ভাল কর নি, ভাই! আমার মনে যে ভারি কষ্ট হচ্ছে।"

ব্রহ্মা বলিল, "আগে নাচ-গান হ'ক, তার পর খাব অখন।"

নরেশ-দা বলিল, "এক কায কর না কেন, আমি এই ঘরেই তোমাদের খাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। তোমরা খাও আর নাচ-গান উপভোগ কর।"

এ প্রস্তাব এক খুড়ো ছাড়া সকলেরই মনঃপূত হইল।

তার পর হারমোনিয়ম, ক্লারিওনিয়েট, ডুগী, তবলা আসিল। যুবতীরা পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচ-গান আরম্ভ করিল।

আসর যখন খুব সর-গরম হইয়া উঠিয়াছে, যুবতীদের শিক্ষিত কণ্ঠের সহিত খুড়ো নিজের রাসভনিন্দিত কণ্ঠস্বর নিজের অজ্ঞাতসারেই মিলাইয়া ফেলিয়া কোমরে হাত দিয়া নাচ সুরু করিয়াছে, তখন নিম্নতলে একটা কোলাহল এবং সঙ্গে সঙ্গে চামুণ্ডারূপিণী এক নারীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—"কোথায় সেই অলপ্পেয়ে ড্যাকরা! তার শ্রাদ্ধের চাল যদি না আজ চড়াই ত' আমি গদাই চক্কোত্তির মেয়েই নই।"

গায়ে ব্যাটারী দিলে যেমন জড়ভাবাপন্ন দেহের জড়তা মুহূর্ত্তমধ্যে দূর হইয়া যায়, সেই কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই খুড়োও তেমনই সেই মুহূর্ত্তে সম্বিৎ পাইল এবং পার্শ্বস্থিত এক যুবতীর ওড়নার ভিতর নিজের মুখ লুকাইল।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা যেমন চারিদিক্ ওলট-পালট করিতে করিতে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নিজের গতিপথেই ধাবিত হয়, সেই চণ্ডীও তেমনই কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সটান সেই বাসর-ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"কৈ, কোথায় সে পোড়ার মুখ! এই যে, আ মরি—মরি! ওরে ও হতভাগা! তুই মুখ লুকোলেই কি আমার চোখে ধূলো দিতে পারবি?" বলিয়া সেই উগ্রচণ্ডা খুড়োর হাত ধরিয়া টানিয়া সম্মুখে দাঁড় করাইল। খুড়োর সর্ব্বাঙ্গ তখন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে!

"ওরে ও সর্ব্বনেশে! কথা কচ্ছিস্ নে যে! বাক্যি যে একেবারে হরে গেছে!"

"আমি—আমি—আমি এই গান শুনতে এসেছিলুম!"

'গান শুন্‌তে এসেছিস্! তাই যদি হয়, তবে এ চেলির কাপড় পরেছিস কেন—টোপর কেন—হাতে সুতো বাঁধা কেন—কপালে চন্দন কেন—চুলে কলোপ কেন—কেন—কেন—কেন ?"

"আমার কোন দোষ নেই। ওই ত্রিমূর্ত্তি আমাকে ভুলিয়ে এনে বিয়ে দিয়েছে !"

"কচি খোকাটি! ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না! তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে, গঙ্গার দিকে পা বাড়িয়েছিস্! লজ্জা করে না বেহায়া! বুঝেছি, ওই তিনটে ছোঁড়াই এই বিয়ের জোগাড় ক'রে দিয়েছে। দাঁড়া ছোঁড়ারা, তোদের কপালেও মুড়ো ঝাঁটা দিচ্ছি।" বলিয়া সেই রণরঙ্গিণী গাছ-কোমর বাঁধিয়া তাহাদের দিকে ফিরিয়া চারিদিকে বোধ করি ঝাঁটারই অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

নরেশ-দা তখন সেই প্রচণ্ডার দিকে চাহিয়া বলিল, "খুড়ী—তুমি! তবে যে খুড়ো বললে, তুমি ম'রে গেছ, তাই আবার বিয়ে করবে!"

"ওরে ও হেনচ্ছ! আমি ম'রে গেছি? তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি? তাই বুঝি আমাকে পেশোরে আমার ভাইপোর কাছে রেখে তোর জমীদারীর বিলি-ব্যবস্থা করছিস! ভাগ্যে একখানা উড়ো চিঠি পেয়েছিলুম!"

"এটা ভূত—ভূত। একে তাড়িয়ে দাও। ও বাবা ত্রিমূর্ত্তি! এত করলি, এইবার শেষ রক্ষা কর। এ ডাকিনী যে সব ভণ্ডুল করলে!"

ভোজননিরত ত্রিমূর্ত্তি উত্তর দিল, "ভয় কি খুড়ো, আমরা আছি।"

তখন সেই অতি প্রচণ্ডার মুখ ছুটিল—সেই মুখ দিয়া তীব্র কটূক্তি সকল বাহির হইতে লাগিল; কিন্তু কি দুর্ভেদ্য কবচে ত্রিমূর্ত্তির কর্ণদ্বয় আবৃত ছিল, তা বলা যায় না! সে কটুবর্ষণে স্বয়ং সর্ব্বংসহাও বোধ করি বিচলিত হন; কিন্তু ত্রিমূর্ত্তি নির্ব্বিকার—যেন সাংখ্যের পুরুষ।

ভাল মানুষ নরেশ-দা কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিল না। সে সম্মুখস্থ এক যুবতীর চুল ধরিয়া টান দিল—সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পমালাসমন্বিত কবরী নরেশ-দার হাতে চলিয়া আসিল। এই ব্যাপার দেখিয়া খুড়ী হতভম্ব হইয়া গেল। কিন্তু খুড়ো চীৎকার করিয়া বলিল, "ওরে, বীণার চুল খ'সে পড়বে না ত' রে!"

কে তখন খুড়োর কথায় কাণ দেয়। নরেশ-দা বলিয়া চলিল, "খুড়ো ত এখানে রটালে যে, তুমি ম'রে গিয়েছ। তার পর সে রবির বোন্ বীণাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠল। তখন ঐ ত্রিমূর্ত্তিই চেষ্টা ক'রে—"

"শতেকখোয়ারীর বেটারা! সরকারের ঘাটে যাবেন!"

"আহা, শোনই না শেষ পর্য্যন্ত।"

"শুনব আবার কি, বুঝতেই ত' পাচ্ছি।"

"ছাই বুঝেছ—তবে এই দেখ।" বলিয়া নরেশ-দা ক'নের চুল ধরিয়া টান দিতেই তাহা খসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সকল যুবতীই নিজের নিজের মাথার চুল—বুকের কাঁচুলি একে একে খুলিয়া ফেলিল।

"বেঁচে থাক বাবা, ত্রিমূর্ত্তি, একশ' বছর পরমায়ু হ'ক।" আশীর্ব্বচন ধারায় ধারায় খুড়ীর মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল।

খুড়ো চীৎকার করিয়া বলিল, "সব জুচ্চুরি—সব জুচ্চুরি! আমি দেখে নেবো—সব বেটাকে জেল খাটাব! আমার কাছে হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে, আর এই সব খরচ করিয়েছে!"

"বেশ করেছে—খুব করেছে! আমি আরও একশো টাকা ওদের সন্দেশ খেতে দেবো।"

"ওরে বাবা রে, আমার বুক ফেটে গেল রে! এ বীণা নয় ত' তবে কে?"

"আমি বীণার দাদা রবি, চিনতে পারছেন না? সেই গিয়েটারে যাকে কোলে করতে চেয়েছিলেন?"

"এ্যাঁ, তুই রবি! তবে বীণা কোথায়?"

"সে এই পাশের বাড়ীতেই বাসর-ঘরে। তার আজ বিয়ে হয়ে গেল কি না। মামা সম্প্রদান করলেন।"

"কি, আমাকে নিয়ে মসকরা ক'রে বীণার বিয়ে দেওয়া হ'ল! ওই ত্রিমূর্ত্তিকে খুন করব, তবে ছাড়ব!"

"বড় মুরোদ! এখন চল, প্যাঁজ-পয়জার দুই-ই ত হয়েছে!" বলিয়া খুড়ী খুড়োর হাত ধরিল।

খুড়ো চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাফাইতে বলিতে লাগিল—"খুন করেঙ্গে—ত্রিমূর্ত্তিকে খুন করেঙ্গে!"

ত্রিমূর্ত্তি কিন্তু তখন নির্লিপ্তভাবে রাবড়ীর খুরীতে চুমুক দিতেছে!

শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণ।

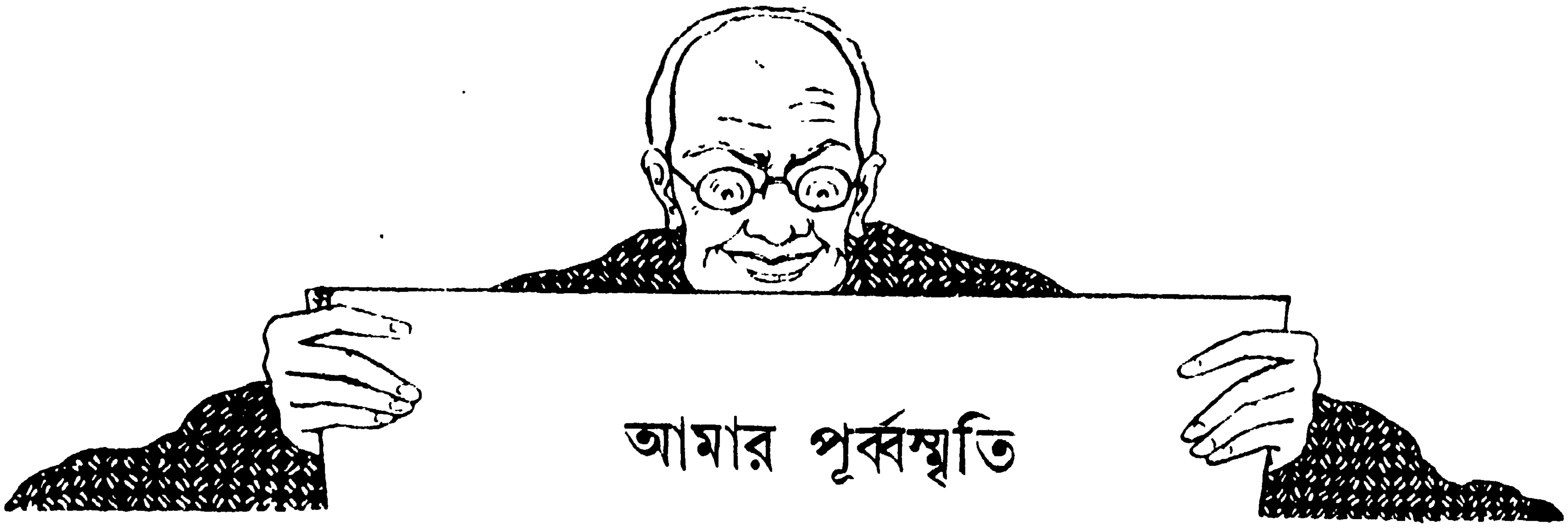

আমার পূর্ব্বস্মৃতি

অবৈধ উপায়ে অর্থসংগ্রহের পরিণাম

বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য অবৈধ ধনলিপ্সা। 'যেন তেন প্রকারেণ' অর্থ সংগ্রহ করা চাই; অল্পসময়ের মধ্যে বিনা পরিশ্রমে অথবা স্বল্পপরিশ্রমে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ এ যুগের আদর্শ। অবৈধ ধন-লিপ্সার জন্য বর্ত্তমান যুগের মানুষের এত দুঃখ। অল্পসময়ের মধ্যে ধনকুবের হইবার যে সব উপায় আছে, তাহাদের মধ্যে এই কয়টি উপায় উল্লেখযোগ্য :—

(১) জুয়া। ইহা বেদের সময় ছিল, মহাভারতের সময় ছিল ও এখনও আছে। বেদের ও মহাভারতের সময় অক্ষ-ক্রীড়ার কথা জানা যায়। এই অক্ষ-ক্রীড়ার জন্যই কুরুদিগের নিকট শকুনি মামার এত প্রতিপত্তি ছিল। অক্ষ-ক্রীড়ায় জিতিয়া কুরু-কুলের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহা প্রত্যেক হিন্দুই জানেন। এখনও অক্ষ-ক্রীড়া আছে, অর্থপণ যথেষ্ট আছে, তবে স্ত্রীপণের প্রথা এখন আর শোনা যায় না।

(২) ঘোড়দৌড়ের খেলা। ইহাতে মানুষের কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা ঘোড়দৌড় ক্ষেত্রের ইতিহাস জানিলেই বুঝিতে পারা যায়।

অল্পদিন হইল, ভবানীপুর অঞ্চলের একজন যুবক বাড়ী বন্ধক দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঘোড়দৌড়ে বাজি খেলিতে যান; অল্প সময়ের মধ্যে ধনী হইবার আশায় অনেক অর্থ বাজি ধরেন। কিন্তু সে ঘোড়া জয়ী হইল না। তিনি যত টাকা পণ ধরিয়া-ছিলেন, তাহা সমস্তই গেল। যখন এই কথা শুনিতে পাইলেন, তখন একটি বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন এবং সেই স্থানেই প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। ডাক্তার বলিলেন যে, তাঁহার ফুসফুসের কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল।

(৩) লটারীতে টাকা দেওয়া। কখনও কখনও শুনা যায় যে, দুই একটি লোক লটারীতে টাকা দিয়া অনেক টাকা পাইয়াছে। অল্পসময়ে ধনী হইবার লোভ মানুষের আছে বলিয়া এই লটারীর কার্য্য বেশ চলিতেছে! এক এক লোক পাঁচশ' বা সহস্র টিকিট কেনেন। দশ টাকা হিসাবে টিকিট হইলে সহস্র টিকিটের দাম দশ হাজার টাকা।

(৪) কোম্পানীর কাগজের হাটে সেয়ার কেনা-বেচা। সত্য বটে, দুই একটি লোক এই কার্য্যে অর্থ করিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে, অর্থ-সংগ্রহের আশায় অর্থ নষ্ট করা হইয়াছে। অনেকে অবৈধ উপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়া নামটি গ্লানিশূন্য, নির্ম্মল রাখিবার জন্য কোম্পানীর কাগজের হাটে যান। কিছুদিন বাদে রটনা করিয়া দেন যে, কোম্পানীর কাগজের হাটে ব্যবসা করিয়া ধন অর্জ্জন করিয়াছেন।

অতি অল্পসময়ের মধ্যে অবৈধ উপায়ে অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য মানুষ অনেক রকম জুয়াচুরি করিতেছে, তাহার মধ্যে মোটামুটি কতকগুলি উপায়ের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) অনেক রকম জুয়া খেলার আড্ডা রাখা।

(২) মিথ্যা Insurance, জুয়াচুরি Insurance।

(৩) হাত গুণিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা।

(৪) জ্যোতিষ-গণনার ভান করা।

(৫) কবচ বিক্রয়।

(৬) ধর্ম্মধ্বজীর ব্যবসা।

(৭) স্বনামে, বেনামে ও মিথ্যা নামে অনেকগুলি বিবাহ করিয়া যৌতুক সংগ্রহ করা।

(৮) পরোপকারের নামে লটারী খেলা চালাইবার চেষ্টা।

(৯) ভুয়া Insuranceএর আফিস খোলা।

(১০) যৌথ কারবারের নামে সাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করা।

(১১) দানের নামে লোক ঠকান।

(১২) মেকি Insurance ও অন্য অন্য ভুয়া কোম্পানী সৃষ্টি করা।

অনেক সময় দেখা যায়, নৈতিক অধোগতি হইতে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা শিক্ষিত লোককে রক্ষা করিতে পারে না। এবং বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার মাপকাঠীতে যে যত শিক্ষিত, তাহার নৈতিক অধোগতি তত বেশী। অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে যে সকল লোক সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তথাকথিত শিক্ষিত লোক। বিলাতে শিক্ষিত ব্যবহারাজীব Receiver হইয়া মাসে তিন চারি হাজার টাকা রোজগার করিতেছিলেন। তাহাতে খুসী না হইয়া যে সমস্ত টাকা Receiver হিসাবে তাঁহার কাছে গচ্ছিত ছিল, তাহা বাড়াইবার নিমিত্ত, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক ঘোড়দৌড়ে বেট যোগাইলেন, ফলে ক্রমে ক্রমে গচ্ছিত টাকা অপহরণ করিয়া যখন মক্কেলকে ফেরত দিবার ক্ষমতা রহিল না, তখন পলাতক হইলেন। অতঃপর আমাদের দেশে যেরূপ সন্ন্যাসী দেখা যায়, সেরূপ সন্ন্যাসীর বেশে সুদূর গোরক্ষপুরে গিয়া আস্তানা পাতিলেন। অনেক দিন পরে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইলেন এবং আদালতের বিচারে অনেক বৎসরের জন্য জেল খাটার হুকুম হইল। ঘোড়দৌড়ের মাঠে

জাতিবিচার, ধর্ম্মবিচার নাই। জুয়া দেশী হউক, বিদেশী হউক, সবই এক।

জুয়াতে ও বেশ্যালয়ে জাতিবিচার নাই। আমি আর একটি ঘটনা জানি যে, এ ক্ষেত্রে এক জন য়ুরোপীয় এটর্ণীকে জীবনের শেষ অংশটুকু জেলে কাটাইতে হইয়াছিল। তিনি এটর্ণী হিসাবে খুব বিখ্যাত ছিলেন এবং নামডাকও বেশ ছিল। অল্পপরিশ্রমে সঞ্চিত অর্থকে অধিক করিতে গিয়া তিনি অর্থও হারাইলেন এবং পরিশেষে জীবন হারাইলেন। ইঁহার কাছেও মক্কেলের অনেক টাকা গচ্ছিত ছিল। মনে করিলেন, সেইগুলি আরও অনেক বাড়াইয়া লাভের অংশ নিজে লইয়া মক্কেলের টাকা মক্কেলকে ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু ফলে হইল বিপরীত। যে টাকা জুয়াতে লাগান, সেই সমস্ত হারেন, ক্রমে যখন মক্কেলের টাকা একবারে শেষ হইল, তখন ধরা পড়িবার ভয়ে ফেরার হইলেন।

এই য়ুরোপীয় এটর্ণীটি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং যশে সুবিখ্যাত ছিলেন। কেবল অবৈধ ধনলিপ্সার দ্বারা নিজের মক্কেলের সর্ব্বনাশ করিলেন। অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, শিক্ষিত লোক যখন পরের টাকা লইয়া ব্যবহার করেন, প্রথমতঃ তাঁহাদের মনে টাকা মারিবার অসদভিপ্রায় থাকে না। মক্কেলের টাকা খাটাইয়া বাড়াইব, লাভের অংশটি নিজে লইব এবং বাকীটি মক্কেলকে ফিরাইয়া দিব, এইরূপ অভিপ্রায়ই থাকে। কিন্তু ফলে লাভ ত' হয় না, গচ্ছিত টাকাও চলিয়া যায়। প্রথমে অসৎ উদ্দেশ্য না থাকিলেও শেষে চোর হইয়া পড়ে। ইহার জন্য দায়ী কে? দায়ী ধর্ম্মহীন শিক্ষা, অবৈধ ধনলিপ্সা। নিজের প্রতি অতিশয় আত্মনির্ভরতা, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তির অভাব। ঐ লোকটি বিচারের সময় দোষ স্বীকার করিলেন। যখন জজ সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এ মতিভ্রম কেন হইল? তাহার জবাবে তিনি বলেন, "It is the slow horses and fast women that have brought me here." এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। ভোগলোলুপা রমণী ও মন্দগামী তুরঙ্গম লোকের সর্ব্বনাশ করে।

এখন যে দিন-কাল পড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক কার্য্যেই দোকানদারী চাই। বিজলী বাতি, বিজলী পাখা, সুদৃশ্য টেবল, চেয়ার, আপিসে মহিলা টাইপিষ্ট, ভাল পোষাক, মোটর-গাড়ী প্রভৃতি অত্যাবশ্যক। এখন 'ভেক' না হইলে 'ভিখ' মিলে না। তুমি ফালওয়াভাবে গুরুগিরি করিতে চাও, তবে সিল্কের পাঞ্জাবী পরিতে হইবে, হাতে রূপার বা সোনার কমণ্ডলু চাই আর আলখাল্লাটি ভাল কাপড়ের হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে আলুথালু ভাব থাকা চাই, যাহাকে ইংরাজীতে 'Studied negligence' বলে। যদি মাথার চুলটি ভাল ভাবে আঁচড়ান না থাকে, তাহা হইলেও যেন উস্ক-খুস্ক না হয়।

তুমি ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, সর্ব্বদাই মুখে বলিতে হইবে, সাধারণের উপকারের জন্য, আমার নিজের জন্য কিছুই নয়। এই স্থানে এক জন নিরীহ মানুষ কেন গণৎকার হইয়াছিল, তাহার বিষয় বলিব। এই গণৎকার ঠাকুর পূর্ব্বে জুয়াচোর বা ফেরেববাজ ছিলেন না। তাঁহার অবস্থা খারাপ হইলে পর তিনি অনেকের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। প্রত্যেককে তাঁহার দুঃখ নিবেদন করিয়াছিলেন। সাহায্য না পাইলে তিনি অনাহারে মারা যাইবেন, এই সব কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহার প্রতি মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়াছিল, কেহ কেহ সংকিঞ্চিৎ সাহায্যও করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখের অবসান হয় নাই।

দীর্ঘকাল ধরিয়া আবেদন-নিবেদনে কোনও ফল না পাইয়া অবশেষে এক দিন তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন যে, জ্যোতিষী হইয়া তিনি অপরের দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিবেন। নিজের দুঃখ আর কাহাকেও জানাইবেন না। তিনি দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী হইলেন, ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন, পরের কষ্টের লাঘব করিবার জন্য অনেক ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি দৈবজ্ঞ ও গণৎকার ঠাকুর বলিয়া বিশেষ পরিচিত হইলেন। লোক তাঁহার কাছে তাহাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করাইতে আসে। তাহাদের দুর্ভাগ্য যাহাতে চলিয়া যায়, আর সৌভাগ্যের উদয় হয়, সেজন্য যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কলাপ তাঁহার দ্বারা করায়।

এই গণৎকার ঠাকুরের এখন কতকগুলি নূতন চাল হইয়াছে। যে ঘরে গণনা করেন, সেই ঘরটি বেশ ফিট্‌ফাট্; বাটীর ভিতরে দেবীমূর্ত্তি; দেবীপূজার অনেক রকম সরঞ্জাম আছে। কপালে লাল সিঁদূরের ফোঁটা, গলায় সোনা ও রূপা-মিশ্রিত রুদ্রাক্ষের মালা; সর্ব্বদাই চোখ বুজিয়া থাকেন। তাঁহার এখন অনেকগুলি দালাল জুটিয়াছে। এই দালালগুলিকে তিনি শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। তাহাদের বিশেষ চেষ্টা, এই গণৎকার ঠাকুরের দ্বারা তাহাদের অবস্থা ফিরাইবে। গণৎকার ঠাকুরেরও সেই অভিলাষ—এই শিষ্যদের সহায়তায় তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবেন।

গণৎকার ঠাকুর শিষ্যপরিবেষ্টিত হইয়া দুঃস্থ লোকের হাত দেখেন, দুঃখের কথা শুনেন—অবশ্য অর্থের বিনিময়ে। আমি এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ হে, তুমি এখন দেবতা হয়েছ। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, যা ছিলে, তাই আছ; তবে এ ভণ্ডামী কেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "ভাই, এ যুগে সিদে আঙ্গুলে ঘি বাহির হয় না। আঙ্গুল বাঁকাইতে হয়। আমি কত লোকের কাছে গিয়া দুঃখের পসরা নামাইয়া তাহাদের সাহায্য চাহিয়াছি; অধিকাংশ সময়ই আমি তিরস্কৃত ও বহিষ্কৃত হইয়াছি। আর আজ আমি এই ভণ্ডামী ধরিয়াছি, ইহাতে আহার ঔষধ দুই-ই হইতেছে। আমি তাহাদের দ্বারস্থ না হইয়া, লোক এখন আমার দ্বারস্থ হইতেছে। যেখানে লোক আমাকে আগে একটি পয়সা দেয় নাই, এখন এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশত টাকা দিতেছে। তার পর এই অধর্ম্মের জন্য ভগবানের সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইতে হইবে। আমি বলি ভগবান্, তুমি দয়াময়, যখন আমি সৎপথে ছিলাম, তখন লোকের নিকট হইতে কোনও সাহায্য পাই নাই, কিন্তু এখন এ সময়ে নিজের চালাকিতে, সুবিধা করিয়া লইয়াছি। এখন দেখিতেছি, তুমি আমাকে দয়া করিতেছ। এ অবস্থায় আমার এই অধর্ম্মের জন্য কিছু ক্ষমা কি পাইব না?"

"উৎকৃষ্টের সমন্বয়"

মাড়োয়ারীজাতি পাথরের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ-বিদেশে সোনা কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। যেখানে যাহা কিছু ভাল, তাহারা সেই সমস্তই একত্র করিতেছে। কলিকাতায় সেণ্ট্রাল-এভেনিউএর

দুই ধারের বাড়ীগুলি সবই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সম্পত্তি ও বাসভূমি। ইংরেজটোলায় ভাল ভাল বাড়ীগুলিতে ভাল ভাল মাড়োয়ারী বাস করিতেছে। কলিকাতায় হেষ্টিংসের কতকগুলি সুরম্য অট্টালিকা মাড়োয়ারীর দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, ইহারা ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের লোক। দক্ষিণপ্রদেশের মাদ্রাজী ভদ্রলোকগুলি কলিকাতায় আসিয়া, অধিকাংশ সরকারী আফিস দখল করিয়া লইয়াছে। Accountant General ও Controller Generalএর ভাল ভাল চাকুরীগুলি মাদ্রাজের ভাল ভাল লোকের অধিকৃত। বাঙ্গালা দেশেই বাঙ্গালী এখন বিদেশী হইয়া পড়িয়াছে। এখন বাঙ্গালা আর বাঙ্গালীর ভোগ্য নহে, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারীর ভোগ্য। এই উত্তর দক্ষিণ ভারতবর্ষের লোকগুলি যখন একত্র হয়, তখন সোনায় সোহাগা। 'দুধে চিনি', 'দ'য়ে মণ্ডা', এগুলি হয় কাহাদের জন্য? বাঙ্গালীর জন্য নহে, মাড়োয়ারী ও মাদ্রাজীর জন্য।

এক সময়ে ১ জন মাড়োয়ারী ও ১ জন মাদ্রাজী একমত হইয়া একটি ব্যবসা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। দুই জনেরই পুঁজি অতি অল্প; মাড়োয়ারীর পুঁজি একটি বাঁটলো ও মাদ্রাজীর পুঁজি এক জোড়া পেণ্টালুন। উভয়ে মিলিয়া আমদানী, রপ্তানী, চালানী, অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসা আরম্ভ করিল। তাহারা খেলিতে লাগিল ভাল, কিন্তু বিধি বিমুখ, ফলে বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। তবে তাহারা ছাড়িবার পাত্র নহে। বাঙ্গালীর মত অধ্যবসায়হীন তাহারা নহে। তাহাদের অধ্যবসায় অদম্য, অপরিসীম। বিফলমনোরথ হইয়া কখনও পশ্চাৎপদ হইতে জানে না। প্রবাদ আছে, একজন ধর্ম্মযাজকের পুত্র স্বদেশ ছাড়িয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য যখন বিদেশে যাইতেছিলেন, তখন পিতার কাছে আশীর্ব্বাদের জন্য আগমন করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিবার সময় গদ্‌গদস্বরে ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন কর। অর্থ উপার্জ্জন তোমাকে করিতেই হইবে। পার ত সৎপথে থাকিয়া করিবে।" মাড়োয়ারী ও মাদ্রাজী যখন দেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালায় আসে, তখন এইরূপ কতকটা মনোবৃত্তি লইয়া আসে।

রতনচাঁদ, তাহার পুত্র রামলগন ও পৌত্র হরকচাঁদ, ঘনশ্যাম পিলে ও রামচাঁদ মাদ্রাজী এই কয়জনে মিলিয়া একটি ব্যবসা করিল। ব্যবসায় আমদানী, রপ্তানী অনেক কায হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু সুবিধা হইল না। কেনাও হয়, বেচাও হয়, কিন্তু টাকা হয় না। মাদ্রাজী দুই জন আর মাড়োয়ারী তিন জন নিজের নিজের ব্যবসা করিয়াছিল; সে সব ব্যবসায়ে কিছু সুবিধা হইল না। অতঃপর মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। এই পাঁচ জনে মিলিয়া একটি ব্যবসা খুলিল; তাহাতেও প্রথম প্রথম কিছু সুবিধা হইল না। শেষে সকলে মিলিয়া পরামর্শের পর তাহাদের মাথা খুলিয়া গেল।

তাহারা এক স্থানে দেখিল, একটা ভাঙ্গা পুরাতন লোহার চিম্‌নী আর কতকগুলি পুরাতন কলের ভাঙ্গা লোহা কতকটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মালিক এক জন উদ্যমশীল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। অনেক চেষ্টা করিয়া সেই কলকব্জা ও কারখানাটি সে কিছুতেই বেচিতে পারিতেছে না। শেষে এই পাঁচ উদ্যমশীল লোকের সেই কারখানাটির প্রতি নজর পড়িল এবং অনেক দরদস্তুরির পর ১ হাজার ৫ শত টাকায় এই কারখানাটি Machine সহ ক্রয় করা হইল; ক্রয় করিবার পর অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই ইহার সদ্‌গতি করিতে পারিল না! অর্থাৎ কিছু লাভে বেচিতে পারিল না।

এই পাঁচ জন লোকের গঠিত Company Domain & Co. নামে উল্লেখ করা গেল। যন্ত্রপাতি কিনিবার পর তাহারা দেখিল যে, এই সব পুরাতন কলকব্জা বেচিয়া টাকা তোলা, তাহার উপর লাভ করা একবারেই অসম্ভব। প্রথম মালিকটি তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া এই কারখানা বিক্রয় করিয়াছে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল। এখন তাহাদের অপেক্ষা স্বল্পবুদ্ধিমান্ লোক না যোগাড় করিতে পারিলে, লাভের কোন আশাই নাই। তাহারা উহার সন্ধানে রহিল। এইরূপ শ্রেণীর লোকসংখ্যা কম নহে, কিন্তু খুঁজিলেই ত পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লোকটির নিকট হইতে Domain Company কল-কব্জা ক্রয় করিয়াছিল, সে যায়গা খালি করিয়া দিতে নোটিশ দিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উঠাইয়া না লইয়া গেলে খুব বেশী ভাড়া দিতে হইবে। একে লোকসানে কেনা মাল, তাহার পর অত্যধিক ভাড়া দেওয়া বিশেষ কষ্টদায়ক ও ক্ষতিজনক। এই অবস্থায় একটি দক্ষিণদেশবাসী মুসলমান ঘাটমাঝির সহিত তাহাদের আলাপ হইল এবং অনেক কথাবার্ত্তার পর একটা ব্যবস্থা স্থির হইল।

ব্যবস্থাটি এইরূপ:—একটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে এইরূপ একটি বীমার বন্দোবস্ত হইল যে, কতকগুলি Machinary আদিগঙ্গার নিকট হইতে ইনসিওর করিয়া পশ্চিমে এক স্থানে পাঠান হইবে। যদি পথিমধ্যে মাল ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে ২০৲ হাজার টাকা দিতে হইবে; কেন না, ২০৲ হাজার টাকা মূল্যে এই মালগুলি Insure করা হইল। প্রথমে ডোমেন কোম্পানী প্রস্তাব করিয়াছিল যে, এই মালগুলি রহমৎপুরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বিমা করা হইবে। কিন্তু কোনও কোম্পানী রাজি হইল না। শেষে টালিসনালা হইতে জগন্নাথ ঘাট পর্য্যন্ত আসিবে, এই জন্য জল-বীমা হইল। সব মাল বেলেঘাটা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য রেল-পথে বীমা হইল।

এই কার্য্যে মস্ত বখরাদার করিম্ উদ্দীন নস্করের একখানা ভাঙ্গা ডিঙ্গায় কতক মাল বোঝাই করা হইল। একটা বোঝাই-কোম্পানীকে দিয়া যে স্থানে এই সমস্ত মাল ছিল, সেই স্থান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া জলপথে আনা হইল; তাহার হিসাব সমস্ত ঠিক করিয়া রাখা হইল। শেষে সেই জলপথ দিয়া করিম উদ্দীনের ভাঙ্গা নৌকা টালিসনালা হইয়া জগন্নাথ ঘাটে আসিবে, এইরূপ ইন্সিওর কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত হইল। ২০৲ হাজার টাকার উপর প্রিমিয়াম দেওয়া হইল, ইন্সিওর কোম্পানীর এজেণ্ট মহা খুসী—একটি ভাল কায জোগাড় করিয়াছে। ২০৲ হাজার টাকার কমিশনও অনেক।

তিন দিন পরে ইন্সিওর কোম্পানী চিঠি পাইল, যে নৌকায় মাল আসিতেছিল, তাহা ডুবিয়া গিয়াছে, মাল সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব দাবীর টাকা দেওয়া হউক। ইন্সিওর

কোম্পানী খবর পাইয়া কেমন একটু সন্দিহান হইল; কিন্তু প্রত্যেক ইন্সিওর কোম্পানীর এই একটি অসুবিধা, যদি দাবী পাইবামাত্রই টাকা না দেয়, তাহা হইলে বাজারে সেই কোম্পানীর বদনাম হইবে। সেই কারণে অনেক সময় সন্দিগ্ধচিত্তে, Claim, ইন্সিওর কোম্পানীর সুনামের জন্য পাস করিতে হয়। আর দুষ্টবুদ্ধি লোকই সামান্য দ্রব্যটি বেশী মূল্য ধরিয়া, বেশী প্রিমিয়াম দিয়া বীমার বন্দোবস্ত করে।

এই ডোমেন কোম্পানী দ্রব্যগুলির জল-বীমা ও পথ-চালানী বীমা করিয়াছিল। উক্ত কোম্পানী যখন প্রাপ্য টাকার দাবী করিল, তখন Insurance Company এ বিষয়ে তদারক করিতে লাগিল; তদারকের সময় ইহাদের মনে সন্দেহ আরও বেশী ঘনীভূত হইল; সন্দেহের পর আরও তদারক করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভুয়াবাজী। গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী কমিশনারের কাছে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী তদারকের জন্য অনুরোধ করিল। তদারক হইল, সব জাল ধরা পড়িল। মামলা Sessionsএ সোপর্দ্দ হইল; এক জন ছাড়া প্রত্যেকের সাজা হইল। খালি বৃদ্ধপিতামহের সাজা হইল না। তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, পুত্র ও পৌত্রের জুয়াচুরির পরামর্শের ভিতর তিনি ছিলেন না। তাহাদের অনুরোধে তিনি দুইটি কাগজে সহি করিয়াছিলেন, এই অজুহাতে তাঁহাকে "সন্দেহের সুবিধায়" ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এই মামলায় রতনচাঁদ, তাহার পুত্র রামলগন ও তাহার পৌত্র হরকচাঁদ, ঘনশ্যাম পিলে, রামচাঁদ মাদ্রাজী, করিম উদ্দীন নস্কর ও তিন জন দাঁড়ি ও হরিহর বসু রতনচাঁদের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আসামীর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। কলিকাতার উকীল সরকার তিন জন দাঁড়িকে আসামীশ্রেণীভুক্ত হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য হাকিমকে অনুরোধ করেন। আর Magistrate সেই অনুরোধ গ্রাহ্য করিয়া সেই তিন জনকে ছাড়িয়া দেন। হরিহর বসুর সাক্ষ্য বিনা মামলার প্রমাণ সংগ্রহের অসুবিধা হইতে পারে, এই জন্য সরকারী উকীল হরিহরকে আসামীশ্রেণী হইতে ছাড়িয়া দিয়া, সাক্ষী করিবার জন্য হাকিমকে অনুরোধ করেন। Magistrate উকীল সরকারের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন ও সাক্ষি-শ্রেণীভুক্ত করেন।

হরিহর বসু যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। সেই সাক্ষ্য হইতে Insurance জুয়াচুরিটি যে কিরূপ ভাবে সাজান হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে:—

"আমি পূর্ব্বে ডোমেন এণ্ড কোম্পানীতে চাকরী করিতাম। ডোমেন এবং রামলগন ঐ যৌথ-কারবারের অংশীদার ছিল। তাহাদের ঐ যৌথ কার্য্যটি ৭২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে চলিত। তাহারা লরীর কারবার করিত, কিস্তিবন্দিতে টাকা লইত, পেট্রোল ও কেরোসিনেরও কারবার চালাইত। আমি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সেখানে ছিলাম। আমি যাদবপুর স্থানটি চিনি। ডোমেন এণ্ড কোম্পানীর ডায়মণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীটি সেইখানে। রামলগনের পুত্র হরকচাঁদকে আমি চিনি। আসামী রতনচাঁদ যে রামলগনের পিতা, তাহাকেও আমি চিনি। আসামী ঘনশ্যাম পিলেকেও চিনি। আসামী রামচাঁদ মাদ্রাজীকেও জানি। সে ঘনশ্যাম পিলের ঘাটমাঝি। আমি ৭ নং আসামী করিম উদ্দীন (ঘনশ্যাম পিলের নৌকার মাঝি)—তাহাকেও জানি ও অন্যান্য আসামীদের জানি, তাহারা করিম উদ্দীনের দাঁড়ি।

রামলগনকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে চিনি। তাহার কিছু কয়লার খনি ছিল। আমি সেখানে কায করিতাম। কয়লার বাজার খারাপ হইলে আমি অন্য স্থানে চলিয়া যাইলাম। তাহার পর রামলগনের অনুরোধে আমি তাহার নিকট চাকরী লইলাম। ডায়মণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ডোমেন এণ্ড কোম্পানীর ভূমিতে অবস্থিত। ঐ কোম্পানী আমাদের হাতে আসিবার পূর্ব্বে লৌমেন কোম্পানীরই ছিল। এই কোম্পানীতে আমি যত দিন ছিলাম, তত দিন কোন কার্য্যই হয় নাই। এই কোম্পানীতে একটা পেটাই কল, চারটা তুরপুন কল, একটা সমতল করিবার কল, একটা লোহার চাদরের কল, একটা ছোট লেদ, একটা স্ক্রু প্রেস ও অন্যান্য কলও ছিল। ঐ কলগুলি কার্য্য চালাইবার মত অবস্থায় ছিল কি না, বলিতে পারি না, তবে কোম্পানীতে কোন কার্য্যই চলে নাই।

আমি জানি যে, লোমেন, ডোমেন কোম্পানীকে স্থান ছাড়িয়া দিবার জন্য নোটিশ জারি করিয়াছিল, ঐ স্থানটির ভাড়া মাসিক ৫০৲ টাকা। ১৮৲ টাকার মাহিনায় একটি দরোয়ানও ছিল। এক বৎসরে কোন কার্য্যই কোম্পানীতে হয় নাই। কতকগুলি লৌহ-চেয়ার মাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। আমি সেখানে থাকিতাম না। কলিকাতার অফিসেই থাকিতাম। যখন প্রয়োজন পড়িত, আমি সেখানে যাইতাম। ঐ কল লইয়া আলিপুরে দুইটি মামলা হইয়াছিল। ঐ মামলায় আমি ফরিয়াদী ছিলাম। এই আদালতেও একটি মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতেও আমি ডোমেন এণ্ড কোম্পানীর তরফ হইতে ফরিয়াদী ছিলাম।

তাহারা কলগুলি বিক্রয় করিবার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল এবং সেই জন্য খরিদ্দারের চেষ্টা করিতে লাগিল। ঐ কলগুলির মূল্য দুই হাজার, আড়াই হাজার এবং তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ডোমেন এবং রামলগন দুই জনই আমাকে ক্রেতা ঠিক করিয়া দিতে বলিত। লোমেন ছয়টি ব্রাকেট লইয়া গিয়াছিল এবং সেই কারণে আলিপুরে একটি মামলা হইয়াছিল। ডোমেন জর্জ্জ বলিয়া এক ব্যক্তির একটি তৈলের কল লইতে আসিয়াছিল, কারণ, এই কলটি ডোমেনকে বিক্রীত হইবার পূর্ব্বেই সে ক্রয় করিয়াছিল বলিয়া তাহার দাবী ছিল।

আগষ্ট মাসের শেষে রামলগন ছাপরা হইতে বড়ই পীড়িত অবস্থায় আসিল। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমাকে বলিল যে, তাহারা কলগুলি বিক্রয় করিবার কোন খরিদ্দারের জোগাড় করিতে পারে নাই এবং জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমি এমন কোন যুক্তি দিতে পারি, যাহাতে তাহারা ঐ কলগুলি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। তখন আমি কোন কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। ইহার ২।৩ দিন পরে এক দিন অফিসে ডোমেন বলিল, "বোস বাবু, আপনি কোন পথই বাহির করিতে পারিলেন না?" আমি বলিলাম, "না, পারি নাই।" তখন সে বলিল, "দেখ, যদি আমাদের মালগুলি ২০ হাজার টাকার ইন্সিওর (বীমা) করিয়া নৌকা বোঝাই করা যায়, এবং সেই নৌকা জলডুবী হয়, তাহা হইলে আমাদের টাকা উঠান যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়া এই মতলব কার্য্যে পরিণত করা যায়, এবং আরো বলিলাম, "ভাই, ইন্সিওর কোম্পানী কি এত মূর্খ যে, তাহারা এইরূপে তাহাদের অর্থ ছড়াইয়া ফেলিয়া দিবে, এবং ঐ ইন্সিওর কোম্পানী নদী হইতে মাল তুলিয়া দেখিবে।"

তখন সে বলিল, "কোন চিন্তা নাই, কার্য্য ঠিকই হইবে। তাহারা ডুবুরীদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া মালগুলি একেবারে জলের অনেক নীচে মাটীতে নামাইয়া দিবে।"

তখন আমি বলিলাম, "তোমার এ মতলবটি আমার প্রাণে লাগিল না, যদি তোমরা ভাল মনে কর, করিতে পার; তোমাদের এ মতলব ঠিক কেলোর কীর্ত্তির মতই ব্যঙ্গপূর্ণ।"

যখন এ সব কথা চলিতেছিল, ডোমেন এবং রামলগন অফিসে উপস্থিত ছিল। তখন ডোমেন বলিল যে, তাহার সহিত রামলগনের কথা হইয়া গিয়াছে, আমার চিন্তার কারণ নাই।

দুই তিন দিন পরে, সন্ধ্যার সময় আমি রামলগনের বাটীতে যাইলাম; ডোমেনও আসিয়া পড়িল। রামলগন বলিল, "তোমরা কি মনে কর যে, আমাদের কামনা সিদ্ধ হইবে না?" তখন রামলগন আমাকে দ্রব্যসামগ্রীগুলি একত্র করিয়া ঠিক করিয়া রাখিতে বলিল এবং আরও বলিল যে, আমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, সে সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমাকে দ্রব্যসামগ্রীগুলি তুলিয়া গো-যানে উঠাইবার ভার দিল এবং সে জন্য এক জন ঠিকাদারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিয়া ঠিক করিয়া রাখিতে বলিল। আমি তখন যাবদপুর স্কুলের রামচরণ মুখুর্জ্জ্যের সহিত বন্দোবস্ত করিলাম। একদিন রামচরণ আমাদের আফিসে আসিলেন, কথাবার্ত্তার পর তিনি ৮০ টাকায় আমাদের কথায় এই কার্য্য করিতে রাজী হইলেন। তখন আমি রামলগনকে বলিলাম যে, আমাদের মালগুলি কোথায় যাইবে? তখন ডোমেন এবং রামলগন বলিল যে, ছাপরায় বুক করিতে হইবে—তখন আমি নাথুনী চৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত করিলাম,—কালীঘাটে চৌধুরীর গো-যানে লইয়া যাইবার জন্য।

ডোমেন আমাকে বলিল যে, সে ঘনশ্যাম পিলের সহিত সমস্তই ঠিক করিয়াছে—করিম উদ্দীনের নৌকায় কালীঘাট হইতে জগন্নাথ ঘাটে আসিবে এবং করিম উদ্দীন নস্কর আসিবার সময় জলপথেই নৌকাডুবী করিবে। আমি কারণ জানিতে চাহিলে সে বলিল যে, আমাকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে না। আমি আফিসে আসিয়া করিম উদ্দীন, ডোমেন, হরকচাঁদ প্রত্যেককে বলিলাম, "ভাই, তোমাদের মতলব ফললাভ করিবে না, জলে ডুবাইয়া কোম্পানীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারিবে না। কোম্পানী এত মূর্খ নয় যে, টাকা তোমাদের হাতে তুলিয়া দিবে।" ইহাতে তাহারা আমাকে বলিতে লাগিল, "তুমি চিন্তা করিও না; আমরা আছি; সব ঠিক করিয়া লইব।"

রামলগন বলিল যে, করিম উদ্দীন খুব বুদ্ধিমান, সে সমস্তই সুন্দররূপে সমাধা করিয়া লইবে এবং টাকা কোম্পানীর নিকট হইতে পাইলেই আমি দরিদ্র বলিয়া আমার কন্যার বিবাহে দুই সহস্র টাকা সাহায্য করিবে।

আমি ইহার পর কিলবরণ কোম্পানীতে ছাপরার ভাড়া জানিতে যাইলাম; সেখানে যাইয়া শুনিলাম যে, ছাপরার বুকিং করা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; রিভেলগঞ্জ খোলা আছে, তথা হইতে মাল ছাপরায় লইয়া যাওয়া যায়। রামলগনকে সমস্তই বলিলাম; রামলগন রেভেলগঞ্জে মাল বুকিং করিতে বলিল—গগনচাঁদ রতনচাঁদের নামে; রতনচাঁদ আসামী রামলগনের পিতা। তিনি ব্যবসা হইতে অবসর লইয়াছেন।

কিলবরণ কোম্পানীতে যাইবার উদ্দেশ্য ভাড়া জানা, এবং মাল জলে ডুবিয়া যাইলে যদি ইন্সিওর কোম্পানী জিজ্ঞাসা করে যে, রেলে না পাঠাইয়া ষ্টীমারে পাঠাইবার কারণ কি, তখন বলিতে পারিব যে, ষ্টীমারে যাইলে মাসুলের সুবিধা হয়।

আমাদের মালগুলি জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বেই ইহা লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল যে—মালগুলি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। ৫ই, ৬ই তারিখ আন্দাজ মাল বিক্রয় লেখা হইয়াছিল—যদিও তাহা সত্য নহে।

বাহিরের লোকের নামে মালগুলির বিক্রয় না দেখাইলে ২০৲ হাজার টাকার ইন্সিওর করা সুবিধা হইবে না, অথচ সমস্ত কথাই বাহিরের লোককে খুলিয়া বলিতে হইবে। সেই কারণে আমাদের ছাপরা ফার্ম্মের নামে মাল বিক্রয় লেখা হইল। ২০৲ হাজার টাকায় মাল বিক্রয় দেখান হইল, একখানি ১৯৲ হাজার টাকার Hand-note করা হইল এবং গগনচাঁদ রতনচাঁদের নামে হাজার টাকার রসীদ হইল যে, তাহাদের নিকট হইতে মাল বাবদে হাজার টাকা পাইয়াছে।

করিম উদ্দীন এই কার্য্য করিবার জন্য ১ হাজার টাকা পূর্ব্বে চাহিয়াছিল, আর ১ হাজার টাকা পরে দিবার কথা ছিল। টাকা না পাওয়ার দরুণ তিন চার রোজ মাল বোঝাই করিল না। পরে মাল বোঝাই করিল।

তার পর সকল নৌকা বোঝাই হইল; আমার সাক্ষাতে মাল নৌকায় উঠিতে লাগিল; মাঝিকে আমি বলিলাম, যেন মাল কোন প্রকারে হারাইয়া না যায় এবং তাহারা যেন নজর রাখে। মাঝি বলিল যে, "দুই একটি মাল হারাইলে কোন ক্ষতি নাই, যখন কাল প্রাতে নৌকা ডুবিয়া যাইবে।" আমি তাহাকে ও সব কথা কহিতে মানা করিলাম। ৯ই তারিখে আমি পুনরায় যাদবপুরে যাইলাম………মাল যাহা গাড়ীতে বোঝাই হইত এবং নৌকায় বোঝাই হইত, তাহার তালিকাও আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। এখানে যে তালিকাটি রহিয়াছে, ইহা ঠিক নহে। কারণ, যে মাল পাঠান হইত, ইহাতে তদপেক্ষা অনেক অধিক দ্রব্যের নাম আছে। যথাযথ তালিকাগুলি ডোমেন বাবু ভস্ম করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এইগুলি প্রস্তুত করিয়াছে।

নৌকা জলডুবি হইবার পর ইন্সিওর কোম্পানী আমাদের নিকট হইতে মালের তালিকা চাহিল। তখন ডোমেন বাবু খাঁটী তালিকাটি লইলেন, লইয়া সেইটি দেখিয়া দেখিয়া অপর একটি নকল তালিকা প্রস্তুত করিলেন। তালিকা প্রস্তুত হইবার পর ডোমেন বাবু টাইপ করিয়া ইন্সিওর কোম্পানীতে পাঠাইয়া

দিলেন। এই তালিকাটিতে যে মালের নাম রহিয়াছে, ইহার অপেক্ষা অনেক অল্প মাল আমাদের ছিল এবং কতকগুলি একবারেই আদৌ ছিল না।······পরদিন ১১ই তারিখে আমি বেলা ১২টার সময় কালীঘাটে আসিলাম; আসিয়া দেখিলাম যে, মাল বোঝাই দেওয়া হইতেছে। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'করিম উদ্দীন, আমি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মাল উঠাইতেছ কেন?' তাহাতে করিম উদ্দীন বলিয়া উঠিল, 'আপনি উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া যে আমরা মাল আত্মসাৎ করিয়াছি, ভাবিবেন না; উপরন্তু এই মালের উপর আপনার এত কি মায়া, ইহা ত দুই এক দিনের মধ্যে জলগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে! আমরা যাহা করিয়াছি, ঠিকই করিয়াছি।'

ইহার কথা শুনিয়া আমি ঘাটমাঝিকে ৪৩৲ টাকা দিয়াছিলাম। ১১ই তারিখে নৌকার বোঝাই মালের তালিকাটি করিম উদ্দিনকে দিলাম; আমাদের আফিসে উহা Type করা হইয়াছিল; মালগুলি প্যাক করা হয় নাই; আমি প্যাক করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু অপরাপর সকলেই বলিল, 'প্যাক্ করিবার কি প্রয়োজন, উহাতে বৃথা অর্থ নষ্ট হইবে।'

১৪ই তারিখে বেলা ১০টার সময় শুনিলাম যে, নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। ডোমেন বাবু বলিল, পূর্ব্বের দিন রাত্রিতেই ডুবিয়াছে। তখন রামলগন এবং করিম উদ্দীন দুই জনেই উপস্থিত ছিল। ডোমেন বাবু বলিলেন যে, করিম উদ্দীন এবং রামলগন প্রাতে আসিয়াছে এবং থানায় ডায়রী করিতে গিয়াছে। তার পর আমি পিউ কোম্পানীতে ঘাটমাঝিকে লইয়া গিয়াছিলাম। ডোমেন বাবু আমাকে নোটারী পাবলিকের কাছে মাঝির সহিত যাইতে বলিলেন।

এক ভদ্রলোক সেখানে আপত্তি উঠাইলেন, ডোমেন বাবু আমাকে একখানি দশ টাকার নোট দিলেন, আমি নোটখানি দিলাম; তাহারা আট টাকা লইয়া দুই টাকা ফেরত দিল। নোটারী আমাদের সমস্ত ঘটনাটি লিখিয়া লইল। তাহার পরে আমি করিম উদ্দীনকে নোটারী আফিসে ছাড়িয়া, আফিসে ফিরিয়া আসিলাম। করিম উদ্দিন রসিদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। আফিসে আসিয়া দেখিলাম, রামলগন, ডোমেন বাবু এবং হরকচাঁদ বসিয়া আছে। কিয়ৎক্ষণ পরে করিম উদ্দীন ফিরিয়া আসিল এবং বলিল যে, নৌকা ত ডুবিয়া গিয়াছে। ৩৪ শত টাকার হাণ্ডনোট দুইখানি ছিন্ন করিয়া ফেলাই যুক্তিসঙ্গত; অবশেষে হাণ্ডনোট দুইখানি করিম উদ্দীন আমার সাক্ষাতে ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

১৪ই তারিখে নৌকাডুবির কথা ইন্সিওর কোম্পানীকে জ্ঞাত করা হইল।

আমি পিউ কোম্পানীতে যাইলাম—পলিসি এসাইনমেণ্ট করিবার জন্য। তাহার কারণ এই যে, গগনচাঁদ রতনচাঁদ তাহাদেরই দাবী ডোমেন এণ্ড কোম্পানীকে হস্তান্তরিত করিয়াছিল। রামলগনই প্রথমে স্বাক্ষর করিয়াছে। পিউ কোম্পানীর আফিসে এক জন উকীল রামলগনকে "গগনচাঁদ, রতনচাঁদ এণ্ড কোম্পানীর" মালিক বলিয়া সনাক্ত করিলেন। উকীলটি বলিলেন যে, তিনি রামলগনকে জানেন, কিন্তু রামলগন কোম্পানীর মালিক কি না, তাহা তাঁহার জানা নাই। সে জন্য সে দিন এই সম্বন্ধে আর কোনও কার্য্যই হইল না। পরদিন রতনচাদ ছাপরা হইতে কলিকাতায় আসিল এবং তাহাকে নোটারী পাবলিক আফিসে যাইয়া এসাইন্‌মেণ্টখানি সহি করিয়া দিতে অনুরোধ করা হইল। তিনি Mr—বলিয়া এক জন এটর্ণীর সহিত পিউ কোম্পানীর আফিসে আসিলেন। তিনি এসাইন্‌মেণ্টখানি আমার সাক্ষাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পিউ কোম্পানী এই সব কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিল এবং বলিল, তাহারা এ কার্য্য করিবে না। তাহারা ফি ফেরত দিল, আমরা এক জন অবৈতনিক হাকিমের নিকট গিয়া সে কার্য্য শেষ করিলাম।

অনেক দিন পূর্ব্বে আমি আমেরিকার একখানি কাগজে পড়িয়াছিলাম যে, আমেরিকার চোর ডাকাত চুরি করিয়া কৃতকার্য্য হইলে অনেক উপায় করে বটে, কিন্তু খরচ-খরচা বাদ দিয়া দেখিলে দৈনিক এক শিলিঙের বেশী প্রত্যেকের থাকে না। তাহাদের চৌর্য্যবৃত্তিলব্ধ মালের জন্য যাহারা চোরাই মাল গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কমিশন দিতে হয়, পুলিসকে দিতে হয়, আদালতের উকীলকে, আদালতের 'ত'-খরচা আর অন্যান্য খরচা দিয়া যাহা থাকে, তাহাতে এক শিলিঙের বেশী থাকে না। আর যদি অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে হয় জেল, না হয় হায়রাণ তাহাদের কপালে থাকে।

এখানে স্পষ্টভাবে বলা যাইতে পারে যে, চুরি-জুয়াচুরি করিয়া ভোগের পথে বিশেষ সুবিধা হয় না, ফলে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মভোগ।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

আধুনিক সামাজিক সমস্যা ও তাহার সমাধান

(প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা)

এই যে চারিধারে দাস-মনোভাব (slave-mentality), অবরোধ-মুক্তি প্রভৃতি বড় বড় কথা লইয়া তুমুল গবেষণা চলিয়াছে, গবেষণায় সমস্যা ঘনীভূত হইতেছে এবং সে সমস্যার সমাধান মিলিতেছে না, ইহার কারণ কেহ অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন কি ?

কখনই না। তা দেখিলে এমন putting the cart before the horseএর মত হাস্যকর ব্যাপার ঘটিত না। এ ভাবে সমস্যা-সমাধানের প্রয়াসে মস্ত logical fallacy বর্ত্তমান—যে fallacyটিকে বিজ্ঞ প্রফেশরের দল বলেন, petitio principii. অর্থাৎ…

এ সমস্যা-সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে। সে উপায়, মানব-সৃষ্টির কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা। যেহেতু আজ যে দাস-মনোভাব, অবরোধ-মুক্তি প্রভৃতি কথা উঠিয়াছে, এ সবের অন্তরালে প্রকাণ্ড সমাজটুকুকে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। এ সমাজ বিধাতার সৃষ্টি নয়। মানুষ এ সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে—নিজের সুখ-সুবিধা-স্বার্থ প্রভৃতি লইয়া যাহাতে স্বচ্ছন্দ মনে অক্ষত দেহে সকলে বাস করিতে পারে ! কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রথম যে দিন আদি মানব-মানবী আসিয়া মর্ত্ত্যে দেখা দিলেন, সে দিন এ সমাজের অস্তিত্বও ছিল না ; এবং সমাজ না থাকার দরুণ ঐ দাস মনোভাব, অবরোধ বা মুক্তির কোনো বালাই কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। অতএব, আজিকার এ সমস্যা-সমাধানের উপায়-নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইতে গেলে আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, মানবের প্রথম অভ্যুদয় এবং মানবের ইঙ্গিতে বা বুদ্ধি-কৌশলে এই সমাজ বস্তুটির সৃষ্টির ইতিহাস ও উক্ত সমাজের ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারা আলোচনা করা।

সৃষ্টি-তত্ত্ব

যাঁরা বুদ্ধিমান্—অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকাবর্গের মধ্যে যাদের বুদ্ধি আছে—অন্ততঃ যে সব পাঠক-পাঠিকার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁদের বুদ্ধি প্রচুর—তাঁহাদিগকে এ কথা প্রমাণ-প্রয়োগে বুঝাইতে হইবে না যে, বিধাতা একসঙ্গে একযোগে এই প্রকাণ্ড নর-নারীর বিরাট মেলা গড়িয়া তুলেন নাই ! আজিকার এই নর-নারীর বিশাল অক্ষৌহিণী আচম্বিতে কাহারো দ্বারা গড়িয়া তোলা কখনই সম্ভব হইতে পারে না ! কেন সম্ভব হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ আমাদের নিত্যকার জীবনে প্রচুর পাই। যথা :—

১। সদনুষ্ঠান-কল্পে আমরা যদি সাধারণের কাছে চাঁদা চাহি, সে চাঁদার মোট টাকা আদায় করা কেমন কঠিন, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

২। কোনো মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিলে তার পাঁচশো গ্রাহক সংগ্রহ করা কতখানি দুঃসাধ্য !

৩। একশোখানি টাকা জমাইব বাসনা করিলে কি সে টাকা জমানো যায় ?

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুতরাং এ কথা ভালো করিয়াই বুঝিলাম, এই বিশ্ব-জোড়া নর-নারীর সৃষ্টি চট করিয়া ঘটে নাই। ইহাতে বহু বহু যুগ সময় লাগিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি মাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। যেহেতু আপনারা জানেন, আমার প্রবন্ধাদি মূর্খ বা নিরেট পাঠক-পাঠিকার জন্য আমি কস্মিন্‌কালে লিখি না। আমার পাঠক-পাঠিকার বুদ্ধি চিরদিন প্রখর—নচেৎ কলম ধরিবার প্রবৃত্তি আমি বহু কাল পূর্ব্বে সমূলে বিনষ্ট করিতাম।

যে শাস্ত্রীয় প্রমাণের কথা বলিতেছিলাম—পৃথিবীর নর-নারী যে বহু বহু যুগ ধরিয়া মর্ত্ত্যধামে বর্ত্তমান থাকিয়া আসিতেছে, তাহা নিমেষে প্রতীতি হইবে পঞ্জিকার পৃষ্ঠা খুলিলে। পঞ্জিকার গোড়ার দিকে "হর-পার্ব্বতী সংবাদ" অধ্যায়ে দেখিবেন, "অথ সত্যযুগোৎপত্তিঃ,"—"তৎপরিমাণ-বর্ষাণি ১৭২৮০০০" ; তার পর অথ "ত্রেতাযুগোৎপত্তিঃ" "তৎপরিমাণ-বর্ষাণি ১২৯৬০০০" ; তার পর দ্বাপর যুগ—৮৬৪০০০ বৎসর এবং এই কলিযুগে বর্ষ-পরিমাণ, ৪৩২০০০। অঙ্ক-শাস্ত্রে যারা অতীব অজ্ঞ, তারাও এই সংখ্যাগুলির যোগ-ফল-নির্ণয়ে রসনা মেলিবেন না, নিশ্চয় ! অতএব দেখা যাইতেছে, এত দীর্ঘ দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া এই পৃথিবী টিঁকিয়া আসিতেছে—এবং এখন সেন্‌সাশে এই যে বিরাট জনসংখ্যার পরিমাণ আমরা পাইতেছি, তাহা গড়িয়া তুলিতে বেচারী ভগবানের কত বৎসর সময় লাগিয়াছিল, হিসাব করুন !

তাহা হইলে প্রথমেই বক্তব্য—ভগবান্ প্রথমে ক'জন নর-নারীর স্বষ্টি করিয়া মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছিলেন? এ বিষয়ে গবেষণা দ্বারা আমরা জানিয়াছি, দু'জন। এক জন পুরুষ ও এক জন নারী। যদি বলেন, প্রমাণ? আমি বলিব, আদম ও ঈভ। মানিবেন না? না মানেন, কেহ আপনাকে মাথার দিব্য দিতেছে না! আর কেনই বা মানিবেন না, বুঝি না। আদম ও ঈভ যদি সত্য না হয়, তবে শয়তান মিথ্যা? সাপ মিথ্যা? আপেল মিথ্যা?

অসম্ভব! শয়তান মিথ্যা নয়, যেহেতু যে আপনার দুশমণ, তাকে আপনি কখনো 'শয়তান' বলেন নাই? গোয়ালা দুধে জল মিশাইলে, স্যাকরা পাণ দিয়া গহনার বাণী বেশী ধরিলে, বৈবাহিক তত্ত্ব ফাঁকি দিলে, আপনি বলেন নাই, ব্যাটা শয়তানী করিয়াছে? দুনিয়ায় যখন এত শয়তানী, তখন প্রমাণ পাইলাম, শয়তান মিথ্যা নয়, কবির কল্পনা নয়।

সাপ? সাপ যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ আর কোথাও সংগ্রহ করিয়া কাজ নাই—প্রাণঘাতী ব্যাপার ঘটিতে পারে। সোজা চলিয়া যান আলিপুরের চিড়িয়াখানায় Reptile Houseএ; তা ছাড়া পথে সাপুড়ের খেলা দেখেন নাই? শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পড়েন নাই? অতএব সাপের অস্তিত্বও প্রমাণ হইয়া গেল।

ইডন গার্ডন যে আছে, তার প্রমাণ কলিকাতায় ষ্ট্রাণ্ড। ঐ কেল্লার (Fort william) উত্তরে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড, তার কাছে…সেই যে ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড, বর্ম্মীজ প্যাগোডা—মনে পড়িয়াছে? প্রমাণ পাইলেন তো!

আর আপেল ফল? যদি নগদ পয়সা ব্যয় করিবার শক্তি থাকে তো এক বার হগ সাহেবের বাজারে যান্, নয় কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে, নয় শেয়ালদা ষ্টেশনের পশ্চিম ফুটপাথে! কত চান—আপেল পাইবেন।

কাজেই দেখা গেল, শয়তান আছে, সাপ আছে, ইডন্ গার্ডেন আছে, আপেল আছে। এতগুলি যদি সত্য হয়, আদম ঈভকেও সত্য হইতে হইবে, তাদের মিথ্যা বলিয়া উড়াইবার উপায় নাই।

কাজেই দেখা যাইতেছে, স্বষ্টির আদি যুগে ছিলেন একটি মাত্র নর এবং একটি মাত্র নারী! হাট ছিল না, বাজার ছিল না, সমাজ ছিল না, আইন ছিল না, আদালত ছিল না, ঘর ছিল না, বাড়ী ছিল না—মনের সুখে আদম বেড়াইত এক দিকে, ঈভ বেড়াইত আর-এক দিকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দাস-মনোভাব কিম্বা ঐ অবরোধ বা মুক্তি কিছুই ছিল না। ও-অবস্থায় থাকিতে পারে না! কার জন্য থাকিবে? স্কুলে যদি একটিমাত্র ছাত্র থাকে—তবে পরীক্ষায় ফার্ষ্ট-সেকেণ্ডের বালাই থাকে না—থাকিতে পারে না।

এখন কথা এই, আদম আর ঈভ খাইত কি? গাছের ফল, নদীর জল, আর অবাধ হাওয়া। নিত্য এক জিনিষ খাইলে মানুষের অরুচি ধরে, এ কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। তার পর কাজ-কর্ম্ম না থাকিলে মানুষ শুধু হাই তোলে আর ঘুমায়। হরদম ঘুমাইলে শরীর খারাপ হয়, মাথা ধরে এবং বিবিধ উপসর্গ ঘটে। এক দিন আদমের মাথা ধরিয়াছিল; ধরা মাথা লইয়া বেচারী পড়িয়াছিল নদীর ধারে। ঈভ আসিয়া দেখিল, লোকটা পড়িয়া আছে।

ঈভ কহিল,—শুয়ে কেন?

আদম কহিল,—মাথাটায় বড় লাগছে।

ঈভ কহিল,—হুঁ!

ঈভের মাথাও দপ্‌দপ করিতেছিল, সে কি মনে করিয়া নদীর জলে গিয়া নামিল, আঁজলা ভরিয়া জল লইয়া মাথায় দিল। মাথাটা একটু যেন জুড়াইল। কি খেয়াল হইল, একটু জল লইয়া আদমের কাছে আসিল, আঙুলের ফাঁক দিয়া জল পড়িয়া গেল, সেই ভিজা হাতে আদমের কপাল চাপড়াইল। অমনি আদম উঠিয়া বসিল, কহিল,—বাঃ, মাথাটায় আরাম বোধ হচ্ছে!

এমনি করিয়া দু'জনে পরিচয়।

আর এক দিনের কথা বলি। পথ চলিতে ঈভ দেখে, একটা গাছে থোলো থোলো ফল পাকিয়া টস্‌টস্ করিতেছে। সে হাত বাড়াইল, নাগাল পাইল না। অথচ বড় সাধ, ঐ ফল খায়। সে পথে আদম আসিতেছিল

আদম কহিল,—কি হচ্ছে?

ঈভ কহিল,—কেমন ফল!

আদম কহিল,—খাবে?

ঈভ কহিল,—খাবো।

আদম কহিল,—খাও।

ঈভ কহিল,—নাগাল পাচ্ছি না…

আদম ঈভের পানে চাহিল, বেচারী! আদম চ

করিয়া গাছে চড়িল, ফল পাড়িয়া নিজে খাইল, ঈভকে দিল।

দ্বিতীয় দিন এমনি পরিচয়!

আদম বুঝিল, তার গায়ে শক্তি আছে; ঈভ যা পারে না, সে তা পারে। আরো বুঝিল, ঈভ দেখিতে বেশ—মুখের কথাগুলি খাসা। আর ঈভ? ঈভ বুঝিল, আদমের সঙ্গে ভাব করিলে উঁচু ডাল হইতে ফল পাড়িয়া খাওয়াইবে! আদম ভাবিতেছিল সে-দিনকার সেই ভিজা হাতে মাথা চাপড়ানোর কথা। সেবায় আরাম পাইয়াছিল।

আদম কহিল, -অত দূরে থাকো কেন?

ঈভ কহিল,—তাই ভাবছিলুম, কাছাকাছি আসবো।

পরস্পরের স্বার্থ, সাহায্য—এটুকু যেমন বুঝা, অমনি বন্ধুত্ব! ভগবান্ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক নন্, তাঁর মাথায় ফন্দী খেলিতেছে সেই কোন্ সত্য যুগেরও বহু পূর্ব্ব যুগ হইতে! প্রমাণ? নারদ-সংহিতা পড়ুন। কিম্বা মহাভারতীয় যুগে ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, চক্রী তুমি। * মনে আছে?

এক বার দুটি নর-নারী গড়িয়াছেন, গড়ার নেশা! ভগবান্ আরো গড়িতে লাগিলেন। কাজেই একটি দুটি করিয়া মর্ত্ত্যধামে লোক জমিতে লাগিল। তখন তো মোহন-বাগানের ম্যাচ ছিল না যে, এক-দম ট্রাম ভরিয়া, বাস ভরিয়া, পায়ে হাঁটিয়া কিল-বিল করিয়া লোক আসিবে! একটি দু'টি করিয়া ক্রমে লোক-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। মাথা সকলের এক রকম নয়। † কেহ মাঠ চষিতে লাগিল; কেহ চাল বেচিতে লাগিল; কেহ ধার চাহিতে লাগিল; কেহ ধার দিয়া সুদের সুদ গণিয়া বাক্স ভরিতে থাকিল; কেহ বই লিখিতে লাগিল; কেহ কাণা কড়ি দিয়া সে লেখা কিনিয়া বই ছাপিয়া বড় পাব্লিশার বনিয়া উঠিল—এমনি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত! ঠিক এমনি সূত্র ধরিয়া পুরুষের দল ব্যবসায় যায়, ফিরিয়া আসিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া আহার করে। তাহাতে আরাম নাই। মেয়েদের ডাকিয়া তারা কহিল,—তোমরা তো মাঠে লাঙ্গল ঠেলিতে পারিবে না, আমাদের রাঁধিয়া দাও, ভাতের বখরা দিব।

এমনি করিয়া নারী শারীরিক শক্তির অভাবে পুরুষের দাস্য প্রথম স্বীকার করিল। ক্রমে এই প্রভুত্ব ও দাস্য-ভাব নর-নারীর অভ্যাস হইয়া গেল।

কিন্তু সকল যুগেই চিরকাল এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাদের দৃষ্টি শুধু বর্ত্তমানে নিবদ্ধ থাকে না, ভবিষ্যতের সন্ধান পায়। এইরূপ একদল দূরদর্শী দেখিল, নারীর দল আরামে খাইয়া গায়ে বেশ শক্তি সংগ্রহ করিতেছে। যদি কোনো দিন এ দাস্যে অতৃপ্ত হইয়া বিদ্রোহ করিয়া বসে? গোপনে এই দূরদর্শীর দল মিলিয়া একটা মিটিং ডাকিল এবং আরো গোপনে পরামর্শ আঁটিয়া স্থির করিল—নারীগুলাকে বাঁধিয়া এমন ভাবে রাখা চাই, যাহাতে উহারা মুখ তুলিবার কল্পনা না করিতে পারে!

তখন শাস্ত্র তৈয়ার হইয়া গেল। অনুস্বার-বিসর্গের প্রলেপ দিয়া এমন বহু হিত-কথা রচিত হইল, যার অর্থ—স্ত্রীলোক অতি নির্ব্বোধ, অতি মূঢ়, অতি বেচারা, অতি অসহায়—তাই পুরুষ প্রবল দাক্ষিণ্যগুণে তাদের পক্ষপুটাশ্রয়ে চিরদিন রক্ষা করিবে। নারী সেই আশ্রয়টুকু যদি সম্পূর্ণ নিঃশব্দে মানিয়া চলিতে পারে, তবেই জীবনে তার পরম সৌভাগ্য, এবং জীবনান্তে অক্ষয় স্বর্গ।

তার পর এক দল লোককে গহনা গড়ানোর কাজে নিযুক্ত করা হইল; এমনি ভাবে গহনা, বেনারসী বস্ত্রাদি ও শাস্ত্র-বাক্য—এই ত্রিবিধ শৃঙ্খলে নারীকে আবদ্ধ রাখা হইল

যুগ যুগ ধরিয়া এই ব্যবস্থা চলিল। পুরুষ যথা-ইচ্ছা প্রভুত্ব খাটাইয়া চলে, যা-খুশী করিয়া বেড়ায়, নারী নত-শিরে সে-প্রভুত্ব মানিয়া নারী-জন্ম সার্থক করে।

কিন্তু এমন ব্যবস্থা না কি কোথাও টিঁকে নাই। সর্ব্ব-দেশের ইতিহাস একবাক্যে বলিয়া আসিতেছে—absolute monarchy ক্ষয় পায়, ব্যাঙকে ক্রমাগত খোঁচাইলে সেও গর্জ্জন তোলে।

তবু সেকালের বিধি-ব্যবস্থা একালে অটুট থাকিতে পারিত। কিন্তু পুরুষ অত্যধিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া সে স্বাধীনতা রক্ষায় দৃষ্টি শিথিল করিল, এই সময় কতকগুলা কুলাঙ্গারের সৃষ্টি হইল। তাদের নাম ইতিহাসে খুব ছোট অক্ষরে লেখা আছে। স্ত্রৈণ, অতি-দরদী, ফাজিল

---

* পাণ্ডব-গৌরব—৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

† তা যে নয়, তার প্রমাণ, কেহ সম্পাদক, কেহ প্রিণ্টার; কেহ লেখক, কেহ সমালোচক; কেহ নাট্যকার, কেহ নট। তখন ভুঁইফোড়ী মায়ার প্রভাব ছিল কম, কাজেই একাধারে সর্ব্ব-বিদ্যাদিগ্‌গজ ব্যক্তি সেকালে একটিও ছিল না। এখন অবশ্য বহু গজাইয়াছে।

সাহিত্যিক আর দুশ্চরিত্র। স্ত্রৈণ স্ত্রীর রূপ-যৌবনে এমন বিহ্বল হইল যে, স্ত্রী যা চায় তাই দেয়।

স্ত্রী বলিল,—থিয়েটার দেখিতে যাইব।

সে বলিল,—তথাস্তু!

স্ত্রী বলিল,—বামুন রাখো, আমি রাঁধবো না।

সে কহিল,—যথা আজ্ঞা।

স্ত্রী বলিল,—তোমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক্ হও।

সে কহিল,—এখনি!

স্ত্রী বলিল,—বাড়ী বেচিয়া আমার মা-বাপ ভাই-বোনকে পোষো।

সে কহিল,—তথাস্তু!

স্ত্রী বলিল,—জানালার পর্দ্দা ছেঁড়ো, আমায় মাঠের হাওয়া খাওয়াইয়া আনো, মিটিং করিতে দাও।

স্ত্রৈণ কহিল,—ওঁ শিবমস্তু।

অতি-দরদীর দল ব্যথায় গলিয়া কহিল,— আহা,তাই তো গা—দখিণ হাওয়ায় আমাদের বুক ভরিল, ভুঁড়ি ফুলিল—আর ও-বেচারীরা রান্নাঘরে ভ্যাপসা গরমে মরিল যে! এসো, এসো, স্কুলে এসো, কলেজে এসো!

ফাজিল সাহিত্যিকের দল বই ছাপিতে লাগিল—পুরুষ যদি কালো বৌ দেখিয়া পর নারীর প্রেমে মজিতে পারে তো তুমি নারী চাকুরে স্বামী ছাড়িয়া তরুণের হৃদয়-হরণের ব্রত গ্রহণ করো! স্বামী আহার জোগাইবে, বস্ত্র জোগাইবে, মোটর জোগাইবে—আর তুমি সেগুলির সদ্ব্যবহার-সূত্রে তরুণ প্রণয়ীর তৃষিত অধরে সুধার পাত্র ধরো!

দুশ্চরিত্রের দল মাতাল হইয়া স্ত্রীকে ঠ্যাঙায়, দিবা-রাত্রির মধ্যে বাড়ী আসে না, স্ত্রী গর্জ্জিয়া উঠিল,— তবে রে হতভাগা!

ইতিমধ্যে পুরুষের দল বহু যুগের স্বাধীনতা ভোগ করিয়া স্বাধীনতা-সম্বন্ধে এমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, দৃষ্টি-শৈথিল্যে ওদিকে স্বাধীনতা খর্ব্ব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে তাদের চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই শৈথিল্যের অন্তরালে ঐ হতভাগা স্ত্রৈণ, অতি-দরদী, ফাজিল সাহিত্যিক আর দুশ্চরিত্রের দল যেন সেই ভবানন্দ মজুমদার হইয়া দাঁড়াইল। পুরুষ প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে নর-নারীর দল মোগল-বাহিনীর মত আসিয়া রণাঙ্গণে হানা দিল। তার ফলে গৃহে বাধিল দারুণ কলহ-কলরব। স্ত্রী রাঁধিয়া ভাত দিতে নারাজ, নয় তো ঘরে চাবি দিয়া পিত্রালয়ে কিম্বা মিটিং করিতে ছোটে—ছেলে-মেয়ে পালন করিতে চায় না—সর্ব্বদা বিরক্তির ঝাঁজে ঝাঁজিয়া আছে! বেচারী পুরুষ অফিস হইতে ফিরিয়া অন্দরে প্রবেশ করিতে ভয়ে শিহরিয়া ওঠে, অন্দরে গেলে দাসী-চাকরের সামনেই এমন তাড়া খায় যে, তার সকল প্রভুত্ব লোনা-ধরা দেওয়ালের ঝরা বালির মত খসিয়া পড়ে! মাস-মাহিনাটি পাইবা মাত্র পুরুষ দেখে, সে টাকা স্যাকরার গৃহে, নয় বেনারসী বস্ত্রালয়ে অদৃশ্য হইয়াছে। অশান্তি, উৎপাত, উপদ্রবে একেবারে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ওঠে!

অন্ধকারে পথে বসিয়া পুরুষ বিশ্ব-পৃথিবীর ইতিহাস আওড়াইতে থাকে—যখন পুরুষ অপ্রতিহত স্বাধীনতার গর্ব্বে হুহুঙ্কার তুলিয়া বেড়াইত, নারী তার ভয়ে কাঁপিতে থাকিত! সাধ করিয়া এমন সোনার স্বাধীনতা তাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে! বাড়ীর দলিল এখন স্ত্রীর নামে, ছেলে-পিলের উপর কোনো অধিকার নাই, শুধু পয়সা ছাড়ো, পয়সা ছাড়ো! ব্যস! চাহিবা মাত্র পয়সা দিতে না পারিলে…

শুনিতেছি, মহিলা-সভা ইস্তাহার জারী করিতেছে, সর্ব্ব-দেশের সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়া ঐ ডিভোর্সটাও নারীর করতলগত করিয়া দেওয়া চাই। নারী যখন রুদ্র মূর্ত্তি ধরিতে পাইতেছে—স্বামীকে যা-ইচ্ছা ভর্ৎসনা করিতে পাইতেছে, প্রভুত্বে স্বামীকে পরাভূত করিতে পাইতেছে, তখন ও অধিকারটুকুও…

তাই বলি, পুরুষ জাগো, জাগো, প্রেমের কবিতায় নারীর অহেতুক স্তুতি ছাড়িয়া মাভৈঃ রবে আবার নিজ-মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াও! নহিলে…

কিন্তু এ কথা কেন? কি সমাজের ইতিহাস আলো-চনার কথা পড়িয়াছিলাম? বহু গবেষণা? সেই যে কোন্ লেখক বলিয়া গিয়াছেন, সেই কথাটাই মনে পড়িতেছে, Bachelors live like men and die like dogs, while married men live like dogs and die like men—এ কথার আসল অর্থের সন্ধান করিতেছিলাম।

কিন্তু তার স্থান কৈ? সম্পাদক মহাশয় রাগ করিতেছেন, এই সবে বর্ষারম্ভ! কত রকমারী লেখা তিনি ছাপিবেন, স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব…আমার ভাগ্যে চিরদিন যাহা ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ অর্দ্ধ-পথে বিদায়-চন্দ্র…অর্থাৎ অর্দ্ধ-চন্দ্র!

শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত।

স্বর্ণ-মৃগ

১

রামের হাতে মরিয়া অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হইবার কামনাটুকু মারীচের পূর্ণ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার ইতিহাস ত্রেতার রামায়ণে ও দ্বাপরের মহাভারতে আছে এবং কলির অলিখিত পুরাণেও নিত্য লিখিত হইতেছে।

মারীচকে আমরা ভুলিয়াছি, কিন্তু তাহার বর্ণের বিচিত্র মায়াজাল, মৃগদেহের মাধুরী ভুলিতে পারি নাই।

সোনার দেহ ছিল লঙ্কা—তাহার অধীশ্বর ছিলেন রাবণ। সত্যসন্ধের ব্রতভঙ্গ-বাসনায় মারীচকে তিনি মন-ভুলানো মৃগরূপে আশ্রমের প্রান্তসীমায় পাঠাইয়াছিলেন। সত্যাশ্রয়ীর চোখেও সোনার বরণ ধরিয়া গেল। সীতার অনুরোধে রাম মৃগের অনুসরণ করিলেন। সেই অনুসরণে যে আগুন জ্বলিল, তাহার করুণ পরিসমাপ্তি উত্তরকাণ্ডে আমাদের অন্তরকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলে। মাটীর মেয়ে মাটী-মায়ের কোলে আশ্রয় পাইলেন, রামের অন্তরের দাহ শীতল হইল না। সে সব আজ কাহিনী।

কিন্তু সোনার অভিশাপ প্রতিনিয়ত দণ্ডকারণ্যের কুটীর-প্রান্তে বিদ্যুদ্‌বিলাসে ঝলকিত হইয়া পৃথিবীকে তাহার মায়াক্ষেত্রে টানিয়া লইয়াছে। এ মায়ামৃগের অনুসরণে সভ্যতার উন্নতগামী সত্যসন্ধরা (?) প্রতিদিন ও প্রতি রাত্রি অশান্তমনে ছুটাছুটি করিতেছেন। শরসন্ধান তাঁহাদের যদিও অব্যর্থ হয় নাই, তাই মায়া-হরিণ সোনার হইয়াই মায়ামরীচিকায় চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে।

বিবাহের পর অর্দ্ধেন্দু সস্ত্রীক হনিমুনে যাইবার আয়োজন করিল।

পিতা নাই—ঘরের লক্ষ্মী অচঞ্চলা। গ্রীষ্মকালে কলিকাতার উপর সূর্য্যদেব প্রখর কটাক্ষ হানিয়া তাহাকে শাসন করেন। অর্দ্ধেন্দু সে শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া একদা দার্জ্জিলিং চলিয়া গেল।

পাহাড়ের গায়ে ছবির মত ভিলাখানি, একবারে কাঞ্চনজঙ্ঘার নগ্ন সৌন্দর্য্যের মুখামুখি। প্রভাত-সন্ধ্যায় কাচ-ঘেরা বারান্দায় বসিয়া কাব্যালোচনার সঙ্গে এই তুষার-বিগলিত সৌন্দর্য্য উপভোগ, মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনারই একটা মূল্যবান্ অংশ।

নিম্নে বিসর্পিত মার্জ্জিতদেহ কার্ট রোড, নিম্নে তরঙ্গায়িত ঢালু পাহাড়—ঊর্দ্ধশীর্ষ ঝাউবৃক্ষের চূড়া সাজাইয়া—কত দূরে কত কুটীরের পাশ দিয়া—চায়ের শ্যামল ক্ষেত্র ভেদ করিয়া নামিয়া গিয়াছে। এই গুহা-গহ্বর-কুটীর-ক্ষেত্রবাহিনী উপত্যকা ঊর্দ্ধমুখে এই আলোকিত জগতের কৃপাবিন্দু ভিক্ষা করিয়াই বোধ হয় বাঁচিয়া আছে।

দুইখানি চেয়ার টানিয়া পাশাপাশি তরুণ-তরুণী প্রত্যহ বসিয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দু কোনও দিন ঐ সব অজ্ঞাত দেশের অনভিজ্ঞ লোকের কৌতুকময় কাহিনী পত্নীর কাছে গল্প করে; শুনিতে শুনিতে রেবার চক্ষুতে অপরিসীম বিস্ময়ের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। উহারা পাহাড় কাটিয়া, লাঙ্গল ধরিয়া ফসল ফলায় এবং মাথায় মোট বহিয়া উঠিয়া আসে এই

আলোকের দেশে। সভ্য মানুষ রজত-মূল্যে ভোগ করে সেই সব কষ্ট-অর্জ্জিত হীরা-মাণিক। মূল্য তাহারা পায় যৎ-সামান্য; তাহাদের শীত-বর্ষার নিত্য সঙ্গী এই ছেঁড়া জামা, ফুটা মোজা ও শত তালিযুক্ত বুট-জুতার পানে চাহিলে সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কুটীর একখানি আছে—ঐ ঝাউগাছেরই আড়ালে। দুয়ার এতটুকু—হেঁট হইয়া ঢুকিতে হয় তাহার মধ্যে। গৃহের উপকরণ—ভাঙ্গা খাটিয়া, ছেড়া কম্বল ও হাঁড়ি-কুঁড়ি গোটা-কতক। ঝড়ের রাত্রিতে মাটী আলিঙ্গন করিয়া প্রভাতের অপেক্ষায় পরিত্রাহি চীৎকারে দেবতাকে ডাকিতে হয়। হয় ত বাত্যাবেগে মাথার আচ্ছাদন উড়িয়া যায়, বৃষ্টির ধারা ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু অন্ধকারের জীব তাহাতে একটুও কষ্ট বোধ করে না।

শুনিতে শুনিতে রেবা হাসিয়া উঠে—তাহাদের মূর্খতার পরিচয়ে তাহার প্রাণে সমবেদনার চঞ্চলতা ও ব্যথা কোনও দিনই জাগিয়া উঠে না।

কোনও দিন অর্দ্ধেন্দু সুসজ্জিত ঘরখানির প্রত্যেক মূল্যবান্ দ্রব্য নাড়িয়া চাড়িয়া রেবাকে দেখায়, কোন্ জিনিষের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য কোথায় এবং তার মূল্যই বা কত। কোথা হইতে কত কষ্টে এই সব দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার বিস্ময়কর ইতিহাস শুনিতে শুনিতে রেবার গর্ব্বোৎফুল্ল নয়ন দুইটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা হয় ত কোনও দিন মেঘের অবগুণ্ঠনে মানব-মানবীর এই বিমুখতা দেখিয়া,—অভিমানে মুখ ঢাকে। আবার কোনও দিন তাহার বিরাট দেহের ভ্রূভঙ্গী নিষ্ঠুরভাবেই দম্পতির দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঘরের মধ্যে তখন অলঙ্কারের শিঞ্জিনী—চিত্রসম্ভারের কাহিনী—সম্পদের গরিমা ও খ্যাতির খেতাব মোহময় মূর্ত্তি লইয়া ঘুরিতে থাকে।

অর্দ্ধেন্দু হয় ত কোন দিন প্রশ্ন করিত, "আচ্ছা বল দেখি—তোমার এই হীরে-বসান নেকলেসটার দাম কত?"

রেবা উজ্জ্বল মণিটাকে দোলাইতে দোলাইতে বলিত,—"কত আর! হাজার পাঁচেক হবে হয় ত। সুশী-দির গলায় এর চেয়ে দামী হীরে আছে। যেমন বড়—তেমনি ফাইন প্যাটার্ণ।" অর্দ্ধেন্দু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিত,—"বটে! আচ্ছা—কাল দেখিও ত আমায়।"

আবার কোন দিন রেবাই প্রথম বলিত, "তোমার ও মোটরটার চেয়ে—বোস সাহেবের মোটর ঢের ভাল।—কেমন নিউ মডেলের—সুন্দর!"

—"হুঁ। আমার ওখানা বেচে একটা নিউ মডেলই কিনবো মনে করেছি।"

রেবা আনন্দিত হইয়া বলিত, "তা হ'লে বেশ হয় কিন্তু।"

একটু অপ্রসন্ন সুরে অর্দ্ধেন্দু বলিত, "কিন্তু শ' কতক টাকা লোকসান হবে।"

রেবা তাচ্ছীল্যব্যঞ্জক শব্দ করিয়া কহিত, "হুঁ! তা হোক, জিনিষটার কদর হবে। লোকের কাছে মান বাড়বে। আসছে বছর যদি 'রাজা বাহাদুর' হও—"

অর্দ্ধেন্দু বলিত, "যদি কি,—নিশ্চয়ই হব। দেখে নিয়ো। ভাল কথা,—ওই যে নেপোলিঁয়ার ছবিটা—ওটা কিনেছি কোথা থেকে জান?"

"নিউ মার্কেটে?"

হাসিয়া অর্দ্ধেন্দু বলিল, "না। একেবারে ফ্রাঁস থেকে। দাম ওর ছটি হাজার টাকা। এ দেশে ওর জোড়া নেই।" সঙ্গে সঙ্গে সগর্ব্বভঙ্গীতে একটা হ্যাভানা চুরুট ধরাইয়া লইত।

সে দিন রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "বেরুবে নাকি?"

"হাঁ। ঘোষ সাহেবদের ওখানে টি-পার্টি আছে। তুমি যাবে?"

"নাঃ, ভাল লাগছে না। এ সব মামুলী গয়না প'রে কোথাও যেতে—আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়।"

অপাঙ্গে রেবার পানে চাহিয়া অর্দ্ধেন্দু বাহির হইয়া গেল।

কয়েক ঘণ্টা পরে—সাজসজ্জা সমাপনান্তে রেবা বাহির হইবে,—এমন সময় একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে ছোট একটা টিনের বাক্স—সুটকেসের মত। রেবা কহিল, "কি চান?"

"মিঃ চ্যাটার্জ্জীর কি এই বাড়ী?"

"হাঁ। কিন্তু তিনি বাড়ী নেই।"

মেয়েটি ঘাড় দোলাইয়া হাসিয়া বলিল, "তা জানি। আমার দরকার মিসেস চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে। বসতে পারি কি?"

রেবা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলে—মেয়েটি ছোট বাদামী টেবলটার উপর স্যুটকেসটি রাখিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, "আসছি—লীলারামের ফার্ম্ম থেকে। মিঃ চ্যাটার্জ্জী বল্লেন—হীরে-বসান একটা নেকলেস—"

রেবার দুইটি চক্ষুতে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। হর্ষভরে সে কহিল, "ওহো—বুঝেছি। তা চ্যাটার্জ্জী কোথায় ?"

—"তিনি লেবং গেছেন।" বলিয়া মেয়েটি স্যুটকেস খুলিয়া কয়েক ছড়া দামী নেকলেস্ বাহির করিল।

অর্দ্ধেন বলিয়াছিল যে, ঘোষ সাহেবের ওখানে টি-পার্টিতে যাইবে—এই রমণী বলিতেছে, লেবং গিয়াছে। কিন্তু অত কথা ভাবিবার অবসর রেবার ছিল না। সম্মুখে দুইটি চক্ষুকে প্রলুব্ধ করিয়া হীরা-মরকতের সম্মোহন দ্যুতি। সে মনোযোগ সহকারে হীরার প্যাটার্ণ দেখিতে লাগিল।

অবশেষে একছড়া পছন্দ করিল। নেকলেসটা হাতে লইয়া ভাবিল,—সুশী-দির গৌরব ম্লান করিয়া দেওয়া যায় কি না ? মুখে তার গর্ব্বের হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল,—"এটির দাম কত ?"

মেয়েটি বলিল, "আগে বলুন—পছন্দ হয়েছে ? তারপর দামের কথা।"

রেবা বলিল, "এর চেয়ে ভাল নেকলেস—আপনাদের ফার্ম্মে নেই ?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "ও হীরে ভারতবর্ষে আর দুখানি নেই। এক আমেরিকান কোটিপতির কাছ থেকে ঘোষ সাহেব কেনেন। হ্যামিলটন্ কোং ২৫ হাজার টাকা দর দিয়েছিলেন—শুধু ঐ হীরেখানার ;—সাহেব বেচেন নি।"

রেবা উল্লসিত হইয়া কহিল, "তা হ'লে এটা আমি নিলুম। দাম—"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "মিঃ চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে ঠিক হবে। আসি,—নমস্কার।"

রেবার অধরে বিজয়িনীর মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে আপনার জয়দৃপ্ত যৌবনের অপরূপ প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

২

তিনটি মাস দার্জ্জিলিংয়ে কাটিয়া গেল।

অর্দ্ধেন মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভারে ভিলাখানি ভরিয়া ফেলিল। রেবার অঙ্গে রত্ন-মাণিক্যের কোন ত্রুটি রহিল না।

সারা সকাল—দ্বিপ্রহর—অর্দ্ধেনের লেবংয়ে কাটিয়া যায়। অপরাহ্ণে ফ্যান্সি পোষাক পরিয়া, রেবার হাত ধরিয়া ম্যলে বেড়াইতে বাহির হয়। চারিদিকে কৌতূহলী চক্ষুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টির সম্মুখে বেড়াইতে তাহার মন উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে সমাগত নর-নারীর সাজসজ্জা নিরীক্ষণ করে ও তাহাদের অশোভনতা লইয়া রেবার সঙ্গে কতই না হাস্য-পরিহাস করে!

এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা তাহার বহু কালের পুরাতন বন্ধু নৃপেনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

অর্দ্ধেন পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল, নৃপেন তাহাকে ডাকিল। পরনে খদ্দরের জামা-কাপড়—গায়ে একটা মোটা খদ্দরের চাদর। পায়ের জুতার পানে অর্দ্ধেন লক্ষ্যই করে নাই।

নৃপেন বলিল, "তোমায় যে একদম চেনাই যায় না ? তার পর ?—নমস্কার মিসেস চ্যাটার্জ্জী!"

শিষ্টাচার শেষ হইলে—অর্দ্ধেন বলিল, "বাই জোভ! এই শীতে দার্জ্জিলিংয়ে খদ্দর প'রে কেমন ক'রে বেড়াচ্ছ ?"

নৃপেন বলিল, "আমাদের কথা বাদ দাও। সামান্য কলেজের প্রোফেসর—এর চেয়ে"—পরে সে কথা চাপা দিয়া রেবার পানে চাহিয়া কহিল, "মিসেস চ্যাটার্জ্জী,—দার্জ্জিলিং আপনার কেমন লাগছে ?"

রেবা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "চমৎকার! আমার মনে হয়—দেবতাদের রাজ্য।"

নৃপেন অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু দেবদেবী ছাড়া মানুষকে এখানে মোটেই মানায় না। সে কথার প্রমাণ আমি।"

রেবা সকৌতুকে কহিল, "অর্থাৎ ?"

—"অর্থাৎ আমার খদ্দরের কাপড় চাদর,—একটু আগে অর্দ্ধেন যা বললে—"

অর্দ্ধেন লজ্জিত হইয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যে বেলায় আমার ওখানে চায়ের নেমন্তন্ন যদি করি"—

নৃপেন তাড়াতাড়ি কহিল, "আজ নয় ভাই, কাল। আজ একবার হাসপাতালে যেতে হবে। কিছু মনে করবেন না মিসেস চ্যাটার্জ্জী, কাল এইখানে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।—নমস্কার।"

নৃপেন চলিয়া গেলে অর্দ্ধেন রেবার পানে চাহিয়া হাসিয়া

বলিল, "গরীব মানুষ—ওরা সারাক্ষণই ব্যস্ত! দুনিয়ায় এত চাইবার জিনিষ আছে,—কিন্তু কিছুই চেয়ে দেখতে পায় না।"

রেবা বলিল, "লোকটা খুব সরল।"

অর্দ্ধেন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ ফুল। রেবা,—কথাটা যদিও আমার বন্ধুর অসম্মানকর,—তবু আমি অস্বীকার করি না।"

রেবা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল—এমন সময় সম্মুখে বোস সাহেবের দল আসিয়া পড়ায়—সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

পরদিন ম্যলে আবার দেখা হইল।

অর্দ্ধেন বলিল, "কি হে—আজ যাচ্ছ ত?"

নৃপেন কুণ্ঠিত হাস্যে রেবার পানে চাহিয়া বলিল, "যখন কথা দিয়েছি—যেতেই হবে।"

রেবা তাহার কুণ্ঠিত ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কিন্তু আপনার ভাব দেখে বোধ হচ্ছে—আজও না গেলে ভাল হয়!"

নৃপেন কোন উত্তর না দিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অর্দ্ধেন তাহার পিঠের উপর একখানি হাত রাখিয়া কহিল,—"ব্যাপার কি?"

নৃপেন বলিল, "কি জান ভাই, বাড়ীতে অসুখ। একটু বিব্রত হয়ে পড়েছি।"

রেবা সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল, "অসুখ? আপনার স্ত্রীর বুঝি? চলুন—দেখে আসি।"

নৃপেন অগ্রসর হইল না। তেমনই কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "কিন্তু মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী,—সে স্থান বড় নোংরা, আপনার হয় ত কষ্ট হবে।"

রেবা হাসিয়া বলিল, "আর অতিশয়োক্তি ক'রে জ্বালাবেন না, চলুন।"

নৃপেন বলিল, "অতিশয়োক্তি একটুও করি নি। চাঁদমারী জানেন ত? সেইখানে থাকি। কোন ভাল ভিলা সেখানে নাই।"

রেবা বলিল, "ভিলা না থাকলেও—ভাল ঘরের অভাব কোথাও নেই, আমি জানি। চলুন না।" পরে স্বামীর পানে ফিরিয়া দেখিল,—তিনি যেন এই সব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য, দূরে লেবংয়ের চিত্রার্পিত গোলাকার পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

রেবা তাহাকে কহিল, "যাবে না, তুমি?"

বন্ধুত্ব অর্দ্ধেনেরই সঙ্গে। সুতরাং অপ্রসন্নচিত্তে তাহাকে রেবার সঙ্গী হইতে হইল।

বাজারের নিম্নাংশে বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের উপর এই চাঁদমারী। ঘেঁষাঘেঁসি—ঠাসাঠাসি বাড়ীগুলি শ্রীহীন অগোছালো; রুচিপিপাসুর চক্ষুকে প্রথম দর্শনেই রূঢ় আঘাত করে। যেমন আঁকা-বাঁকা পথ, তেমনই জীর্ণ পুরাতন বাড়ী, অঙ্গন তার এতটুকু নাই। কাঠের বারান্দার উপর এলোমেলো ভাবে ফুলের টব সাজানো, একপাশে ঘুটে বোঝাই মস্ত ঝুড়িটা। কোথাও বা ফুলের সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া কাপড় জামা শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে এবং যত রাজ্যের ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা কাঠের টুকরা, ফুটা অব্যবহার্য্য তৈজসপত্র, লণ্ঠনের ভাঙ্গা চিমনী টবগুলির চারিপার্শ্বে বীভৎসতার সৃষ্টি করিয়াছে।

এই রকম একখানি বাড়ীতে নৃপেন তাহাদের আনিয়া তুলিল। একটা বড় বাড়ীরই অংশ,—মাত্র দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া সে এখানে উঠিয়াছে। ভিতরের ঘরখানি অন্দরমহল, বাহিরের খানি দিনে বৈঠকখানা—রাত্রিতে শয়নকক্ষ।

যত রাজ্যের জিনিষ দুইখানি ঘরে আকণ্ঠ বোঝাই। দেখিয়া রেবার চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

নৃপেন কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আপনাকে বসতে দেবার চেয়ার একখানাও নেই, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী। আমার অতিশয়োক্তির প্রমাণ কেমন পাচ্ছেন?"

রেবা কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধেন বলিল, "এ বিষয়ে তুমি খুবই সিনসিয়ার মানছি, কিন্তু অল্পের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখাও কি অসম্ভব?"

প্রশ্নের অসঙ্গতিতে রেবা কোপকটাক্ষে অর্দ্ধেনের পানে চাহিয়া কহিল, "শুনছো না—ওঁর স্ত্রী অসুস্থ!"

অর্দ্ধেন অপ্রস্তুত হইয়া ভাঙ্গা টুলটার উপর বসিয়া পড়িল।

রেবা কহিল, "চলুন নৃপেন বাবু,—আপনার স্ত্রীকে দেখে আসি।"

নৃপেন ম্লানহাস্যে কহিল, "আসুন।"

সে কক্ষে পা দিয়াই রেবার মনে হইল, না আসিলেই ভাল হইত! ময়লা তোষকের উপর শুইয়া এক রুগ্ন শীর্ণ

কুদর্শনা নারীমূর্ত্তি যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতেছিল। ছোট ছেলেটা তাহারই পাশে শুইয়া আছে—তাহার হাতে একটা কাঠের পুতুল। বোধ হইল—শিশুটি ঘুমাইতেছে। রুগ্নার কক্ষে বাতাসও যেন রোগযন্ত্রণায় ধুঁকিতেছে,—শ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হয়।

রেবা চঞ্চল হইয়া টিপয়ট'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েক দিনের বাসি গোলাপের তোড়াটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে দেখিল, নৃপেনের মুখে এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্ন নাই। দুইটি ব্যগ্রচোখে স্ত্রীর পানে চাহিয়া সে কুশল প্রশ্ন করিল,—পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে কত স্নেহসতর্ক উপদেশ দিল এবং তাহার শিয়রে বসিয়া রুক্ষ চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে রেবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "বড় কষ্টকর রোগ, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী। মানুষের মর্য্যাদা সে বোঝে না।"

কথাটা রেবার কাণে অভিযোগের মত শুনাইল। সে অপ্রস্তত হইয়া কহিল, "উনি সুস্থ হয়ে উঠুন—আর একদিন এসে আলাপ করবো।"

নৃপেন উঠিয়া কহিল, "চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

রেবা হাসিয়া কহিল, "ধন্যবাদ। বাইরে আপনার বন্ধু আছেন—আমরা যেতে পারবো। আপনি উঠবেন না,—দেখছেন না, আপনার উপর ওঁর কতটা নির্ভর।"

রেবা কক্ষ ত্যাগ করিল।

বাহিরে আসিয়া অর্দ্ধেন বলিল, "আজ সকালবেলা কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না,—এই দশ মিনিট ধ'রে তার প্রায়শ্চিত্ত করলুম।"

রেবা কহিল, "পাপের মাত্রাটা আমারই বোধ হয় বেশী ছিল; কেন না, অন্দর মহল অবধি যেতে হয়েছিল।"

অর্দ্ধেন বলিল, "সেখানে বোধ হয়"—

রেবা সহাস্যে বলিল, "বোধ হয় নয়—এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখে এসেছি। তোমার বন্ধুটি শুধুই সরল নন,—সেবা-পরায়ণ এবং প্রভুভক্ত।"

অর্দ্ধেন সকৌতুকে বলিল, "তার প্রভুভক্তির একটা দৃষ্টান্ত"—

রেবা কহিল, "বলছি। অমন তন্ময় হয়ে ঐ কুৎসিত স্ত্রীর সেবা করা—মাগো! আমি কল্পনাও করতে পারি না।" পরে আত্মগত ভাবে বলিল, "কিন্তু তাতে বেশ একটা নিষ্ঠা আছে। প্রাণের দরদ যেন ওঁর হাত দুখানিতে—চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল।"

অর্দ্ধেন রহস্য করিয়া কহিল, "উপস্থিত আমার চোখে মুখে চায়ের পিপাসা, চেয়ে দেখ। চল, রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক। একটা কনসর্ট ও কিছু লাইট্ রিফ্রেশ্‌মেণ্ট।"

উভয়ে হাসিতে হাসিতে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করিল।

৩

বর্ষার প্রারম্ভে শৈলাবাস পরিত্যাগ করিতে হইল।

কিন্তু নৃপেনের সেই ক্ষুদ্র ঘরের স্মৃতিটুকু রেবার অন্তর হইতে মুছিয়া গেল না।

যতই উপহাসের কষায় আঘাত করিয়া সে উহার মর্ম্ম ভেদ করিতে চাহিয়াছে,—কুৎসিত করিয়া সে দৃশ্যের কল্পনা করিয়াছে, ততই তাহার মনে হইয়াছে,—এ যেন ঠিক মত হইতেছে না! কোথায় কি যেন ত্রুটি এই দেখার ও আলোচনার মধ্যে রহিয়া গেল! বাহিরের বিপুল বিপর্য্যয়ের মধ্যে সেই রোগশয্যালীনা কুৎসিত তরুণীর পানে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া নৃপেনের সেই প্রাণময় পরিচর্য্যার কামনা,—না জানি উহার অন্তরালে কি মহান্ সম্পদই বা লুকাইয়া আছে। কুটীর জীর্ণ,—অভাব চারিদিকে—তীক্ষ্ণ তীরের মত সৌন্দর্য্যহীনতা চক্ষুকে প্রতিনিয়ত নির্ম্মম ভাবেই আঘাত করে, তথাপি মানুষের আয়ত্তাতীত লজ্জার মতই তাহাকে নিতান্ত অশোভন বলিয়া বোধ হয় না—তাহার দেহের সমস্ত কুশ্রীতা—যেন ওই দুইটি নয়ননিঃসৃত দৃষ্টির স্নিগ্ধ কিরণে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

এই ঐশ্বর্য্য—খ্যাতি—বিলাস—মানুষের লোভনীয় হইলেও,—কুৎসিতের প্রতি সুন্দরের সেই প্রাণপূর্ণ আকর্ষণও তুচ্ছ নহে; বরং অনেক অংশে তাহা উপভোগ্য। যেমন উপভোগ্য—সঙ্কুচিত শীতসায়াহ্নে অস্তমান কিরণের স্পর্শটুকু,—বৈশাখ-প্রত্যূষে প্রাতঃস্নানযাত্রীর অঙ্গে—মধুর ভোরের বাতাসটুকু,—বর্ষাব্যাকুল রজনীর গবাক্ষপথে অতি শঙ্কিত—কম্পিত—ভীরু অভিসারটুকু এবং চৈত্রের চাঁদিনী রাতে চম্পক-বেলা-গোলাপের গন্ধে আত্মাহারা মুহূর্ত্তটুকু!

অবশ্য রোগশয্যার প্রার্থনা কোন প্রাণীই করে না,—তবু যদি সে দিনই আসে ত—অমনই সেবানুনিপুণ দুইটি কর ও স্নেহদীপজ্বালা দুইটি চক্ষু সে শয্যার চারিদিকে যেন সুশীতল ছায়া রচনা করে।

অর্দ্ধেন তাহাকে কি না দিয়াছে? পলকের ইঙ্গিত মাত্র—মণিমাণিক্যখচিত বহু মূল্যবান্ অলঙ্কার—গৃহ-সজ্জা—মোটর—গৌরবের যত কিছু অত্যাবশ্যক দ্রব্যসম্ভার তাহার পাদমূলে স্তূপীকৃত হইয়াছে। অনুক্ষণ সে তাহার পাশটিতে হাসিমাখা মুখখানি লইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইচ্ছা মাত্র যে কোন বাসনার পূরণ হইতেছে। তবু তৃপ্তি নাই কেন? ইচ্ছার এই যে সীমাহীন পূরণ—এ যে চিরকালই—কামনার ফেনপুঞ্জে—অতৃপ্তির বিক্ষুব্ধিতে বিরাজ করিতে থাকিবে। মানুষকে দেখাইয়া এই খ্যাতির একটা গৌরবময় মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় বটে,—তৃপ্তি কিন্তু আর কোন মহা-মানবের প্রশংসা পাইতে ব্যগ্র। কেন এমন হয়?

স্বামীর উদ্দেশ্য অর্থ সঞ্চয় করা। সেই অর্থে আপনার যত কিছু সামগ্রীকে আলোকিত করিয়া লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করা!

গলার এই হীরা-বসান নেকলেসটার পানে চাহিয়া রেবার যেমন মনে হয়,—ইহারই গৌরবে আজ আমার গৌরবশ্রী বর্দ্ধিত হইয়াছে—লোকের দৃষ্টিতে একটা উচ্চ মর্য্যাদা ও আভিজাত্যমূল্য নির্ণীত হইয়াছে; তেমনই—রেবার পানে চাহিয়া কি অর্দ্ধেন ভাবে না?—

না, পাগল, রেবা পাগল! তুচ্ছতম দারিদ্র্যের পথের গ্লানি এক নিমেষে তাহার মনের খানিকটা এমনই কালো করিয়া দিয়াছে যে, আর্ত্ত দৃষ্টি বার বার সেই দিকেই যাইয়া পড়ে!

এমনই করিয়া কয়েক মাস কাটিবার পর রেবা দার্জ্জিলিংয়ের ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু ভুলিল। ব্যাধি-যন্ত্রণার দুঃস্মৃতি যেমন কয়েক মাস পর্য্যন্ত দুর্ব্বল অন্তরকে মুহ্যমান করিয়া রাখে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতাও তেমনই কয়েক মাস পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতি-রেখায় ফুটিয়া ছিল। তার পর এক সময়ে তাহা মুছিয়া গেল।

সে দিন মিসেস বোসের বাড়ীতে পার্টি ছিল। রেবা প্রসাধন শেষ করিয়া বেহারাকে হুকুম দিল, মোটর তৈয়ার করিতে।

অর্দ্ধেন বাড়ী ছিল না। পূর্ব্বাহ্নে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল। রেবা একাকী চলিল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে।

মিসেস বোস কক্ষটি সাজাইয়াছিলেন বল-নাচের প্রথায়। মাঝে মাঝে তাঁহার বাড়ীতে এরূপ ফ্যান্সি মজলিস বসিত। স্বামী বিলাত-ফেরৎ এবং কমিসরিয়েটে মোটা টাকা উপার্জ্জন করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার এতটুকু অঙ্গহানি মিসেস বোসের সহ্য হয় না।

সুসজ্জিতা সুন্দরী রেবাকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

সমাগত নর-নারী প্রশংসমান দৃষ্টিতে রেবার পানে চাহিলেন। রেবা সকলকে স্মিত হাস্যে অভিবাদন জানাইয়া অর্গ্যানটার সম্মুখে গিয়া বসিল।

চারিদিক্ হইতে অনুরোধ হইল, মিসেস চ্যাটার্জ্জীর গান একখানি হউক।

এক—দুই—তিন। পর পর তিনখানি গান হইলে রেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-ধ্বনিতে কক্ষ ভরিয়া উঠিল। আত্ম-গৌরবে রেবার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মিসেস বোস আসিয়া বলিলেন, "তোমায় বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে রেবা, একটু বিশ্রাম নাও।"

পাশেই সুপ্রশস্ত বারাণ্ডা। অর্কিড জাম গাছ ঘিরিয়া সেখানে ছোট ছোট কুঞ্জ রচনা করা হইয়াছিল। রেবা একটি কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা সোফায় অবসন্ন দেহভার এলাইয়া দিল। কিন্তু বিশ্রাম ভগবান্ সে দিন তাহার অদৃষ্টে লিখেন নাই।

রেবার কাণে গেল পার্শ্বের কুঞ্জান্তরালে কাহারা অর্দ্ধেনের কথা বলা-বলি করিতেছে। কুঞ্জ মধ্যে রঙ্গীন অস্পষ্ট আলো জ্বলিতেছিল, সুতরাং আলাপচারিণীরা রেবার নিঃশব্দ আগমন লক্ষ্য করে নাই—অথবা করিলেও তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

প্রথমা বলিল, "তুমি যা বলছো, ইলা-দি, এ যে ভোজ-বাজীর খেলা।"

ইলা বলিল, "ওঁর মুখে আমি শুনেছি, রেসে অর্দ্ধেন প্রায় সব খুইয়েছে। তার ওপর বেচারীর নিত্য নূতন সখের খাতিরে জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে। খুব যাই শক্ত ছেলে, তাই এখনও মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে সমান চালে চলছে।"

অপরা আগ্রহভরে কহিল, "কিন্তু আজ রেবা যে নেকলেসটা প'রে এসেছে, দেখেছ? কি সুন্দর ওর হীরেটি।"

ইলা মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কে জানে আজকের মজলিসই ওই হীরেটাকে শেষ দেখলে কি না? হয় ত এ মজলিসে রেবার এই শেষ পদার্পণ।"

অপরা বলিল, "না ইলা-দি, ও কথা বলো না। বড় ভাল মেয়ে রেবা। হয় ত তুমি যা শুনেছ, সব সত্য নয়।"

ইলা বলিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাই হোক। অর্দ্ধেন্দু যদি এখনও বুঝে চলতে পারে, হয় ত সামলে যাবে। কিন্তু যে বাহ্যাড়ম্বর ওদের, চাল কমাতে পারবে কি?"

এমন সময় ক্রিং ক্রিং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেই উভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ইলার সঙ্গিনী কহিল, "বোধ হয় ডান্সের বেল। আজ কাকে পেয়ার ঠিক করলে, ইলা-দি?"

ইলা হাসিয়া বলিল, "যাকে অনেক দিন আগে বেছে নিয়েছি।"

তার পর হাসিতে হাসিতে উভয়ে চলিয়া গেল।

রেবা চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিল।

কখনও কখনও এ সন্দেহ যে তাহার মনে জাগে নাই, তাহা নহে; কিন্তু স্বামীকে সে এতটা নির্ব্বোধ ভাবিতে পারে নাই। এমন ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তিনি যে লোকের উপহাসের পাত্র হইবেন, সে কথা যে রেবার স্বপ্নেরও অগোচর!

বাহ্যাড়ম্বর? তা তাহাদের আছে এবং অধিক মাত্রায়ই আছে। সমাজে বাস করিতে হইলে এগুলি যে অপরিহার্য্য অঙ্গ।

সমাজ ধনবানের কাছে সর্ব্ব প্রথম দাবী করে, সুন্দর রুচির। অর্থের সদ্ব্যবহার ঐ শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু সে সুদূর রুচির কাহিনী অন্তরালে যদি কুৎসার কালিতে ভরিয়া উঠে, তাহা হইলে মর্য্যাদার স্থান কোথায়? হায়! কেন রেসের নেশা তাহার স্বামীকে পাইয়া বসিল?

পরস্পর পরস্পরের সঙ্গী, কিন্তু রেবার কাছে অর্দ্ধেন্দুর এই দিক্‌টা একবারেই অদৃশ্য ছিল। অর্থ তাহার তীব্র আলোকে এই সরল পরিচয়ের মৃদু আলোককে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। প্রাণের সন্ধান কেহ কাহারও রাখে নাই, শরীরসজ্জায় সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল, এবং শরীরের তৃপ্তিতেই ছিল তাহাদের তৃপ্তি। নৃপেনের সেই দার্জ্জিলিংয়ের মলিন স্মৃতি—আজ বড় উজ্জ্বল হইয়াই রেবার অন্তর ভরিয়া দিল। সে আলোকে যেন অনেক কিছু অস্পষ্ট কাহিনী স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

আলোকিত কক্ষের পাশ দিয়া রেবা অন্ধকারের ছায়ায় গা ঢাকিয়া নামিয়া গেল।

৪

পরদিন অর্দ্ধেন্দু তাহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার কি কোন অসুখ করেছে, রেবা?"

রেবা ঘাড় নাড়িয়া কি বলিল,—নিজেই সে জানে না। সহসা অর্দ্ধেন্দুর বেশভূষার পানে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি কি এখনি বেরুবে?"

অর্দ্ধেন্দু বলিল, "হাঁ, মিঃ ষ্টেপলটনের কাছে একবার যাব। একটা জরুরী কায—"

বাধা দিয়া রেবা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "না, আজ থাক।"

অর্দ্ধেন্দু হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ? তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারলুম না, রেবা।"

রেবা বিষণ্ণ নয়ন দুইটি তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বাইরের কাযে ত অনেকদিন ঘুরলে, আজ একটু ঘরে ব'সো না।"

কৌতূহলী হইয়া অর্দ্ধেন্দু কহিল, "ব্যাপার কি—রেবা? তুমি কি কাব্য লিখতে সুরু করেছ?"

রেবা বলিল, "কাব্য লেখা কিছু অগৌরবের নয়। অনেক সময়ে মানুষের জীবনে এর প্রয়োজন আছে।"

অর্দ্ধেন্দু চঞ্চল হইয়া কহিল, "আটটায় এনগেজমেণ্ট। এসে তোমার কবিতা শুনবো।"

রেবা মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, "আজ কিন্তু তোমায় রুটিন ওয়ার্ক করতে দেব না। এতদিন কাযের কথা কয়েছি, আজ একটু বাজে আলোচনা করবো।"

মুখের ভ্রূকুটী-রেখায় অল্প একটু বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল।

অর্দ্ধেন হাসি দ্বারা তাহা ঢাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, সংক্ষেপে বল, ব্যাপারটা কি ?"

রেবা একমুহূর্ত্ত স্থিরভাবে অর্দ্ধেনের পানে চাহিয়া বলিল, "আজ পর্য্যন্ত রেসে কত টাকা হেরেছ,—সত্যি বলবে ?"

দারুণ বিস্ময়ে অর্দ্ধেন চমকিত হইয়া কহিল, "রেস ! কে বললে ?"

শান্তকণ্ঠে রেবা কহিল, "যেই বলুক,—সত্যি বলবে ?"

অর্দ্ধেনের মুখে ভ্রূকুটী-রেখা গভীর হইয়া ফুটিল। ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে সে বলিল, "পরের কথা আলোচনা করা আমি পছন্দ করি না।"

রেবা পূর্ব্ববৎ শান্তকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তুমি ত আমার পর নও।"

অর্দ্ধেন কথায় জোর দিয়া বলিল, "যেখানে ও সব কথা'র আলোচনা হয়,—সেখানে তোমার না যাওয়াই উচিত।"

রেবা হয় ত বলিতে যাইতেছিল—আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ও কথা শুনি নাই, কিন্তু অর্দ্ধেনের প্রশ্নে তাহার আত্মসম্ভ্রম যেন আহত হইল। সে ও ঈষৎ বেগের সহিত উত্তর দিল, "তোমার সঙ্গীদের আমি অতটা হীন ভাবতে পারি না।—তাঁহাদেরই মুখে—"

উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পাইয়া অর্দ্ধেন একটু নরম হইয়া কহিল, "রেবা, সকলেরই আর্থিক দিক্‌টা প্রকাশ না পাওয়াই ভাল। ওটা প্রাইভেট ব্যাপার। ব্যবসার ক্ষেত্রে কখনও টাকা যায়,—কখনও আসে।"

রেবা বলিল, "তা আমি জানি। কিন্তু পরের কাছে হয় ত প্রাইভেট কিছু থাকতে পারে,—ঘরেও কি তাই ?"

অর্দ্ধেন বাধা দিয়া বলিল, "অপ্রীতিকর আলোচনা মাত্রই মন খারাপ করে। ঘরে বাইরে যেখানে হোক—ও-সব আলোচনা না করাই ভাল।"

রেবার অন্তরে ব্যথা জাগিল। বুঝিল, স্বামী ও বিষয় গোপন করিয়াই চলিতে চান।

অর্দ্ধেন বোধ হয় রেবার ব্যথা বুঝিতে পারিল। তাই সস্নেহে তাহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া কহিল, "ছি ! অবুঝ হয়ো না। সংসারে ভাল মন্দ দুই-ই আছে। সাধ ক'রে ঘায়ের মধ্যে খুঁচিয়ে ব্যথা জাগালে কি মনের শান্তি থাকে ?"

অভিমানে রেবার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কণ্ঠদেশ হইতে হীরার বহুমূল্য হার খুলিয়া টেবলের উপর রাখিয়া বলিল, "কিন্তু যে ঘায়ের ব্যথা আছে, তাকে লুকিয়ে চললে ব্যথা কমে না, বাড়ে। শেষে হয় ত জীবন নিয়ে টানাটানি হয়। এই নাও, এটা বেচেও অন্তত কিছু দিনের জন্য মাথা উঁচু ক'রে সমাজে চলতে চেষ্টা কর।"

অর্দ্ধেন স্থিরদৃষ্টিতে রেবার পানে চাহিয়া কহিল, "অর্থাৎ ?"

রেবা শান্তস্বরে কহিল, "অর্থাৎ বাইরে চাল বজায় রেখে লোকের উপহাস কুড়োবার সখ আমার নেই।"

অর্দ্ধেন চঞ্চল হইয়া কহিল, "জান রেবা, বংশপরম্পরায় আমরা এই সম্মানের অধিকারী। একে নষ্ট করলে সমাজের কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে—জান ?"

অবিচলিত কণ্ঠে রেবা কহিল, "জানি।"

অর্দ্ধেন বলিল, "তারপর ?"

রেবা বলিল, "তারপর আমাদের ভাগ্য আমরা গ'ড়ে নেব।"

অর্দ্ধেন ব্যঙ্গহাস্য করিয়া কহিল, "এটা কাব্যের জগৎ নয় রেবা, যে, ওসব বড় বড় কল্পনা ও গালভরা কথায় লোকের বাহবা কিনবে ? এখানে যে কঠিন মূল্য দিতে হয়, সে মূল্য দেবার শক্তি আমারও নেই—তোমারও নেই।"

রেবা মুখ তুলিয়া অর্দ্ধেনের পানে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "দোহাই তোমার, ভুল বুঝো না। সমাজের উপহাস দু'দিন,—তারপর সব সয়ে যাবে।"

অর্দ্ধেন হাসিয়া বলিল, "তা হয় না, রেবা। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি—সেখান থেকে নামতে গেলে পাতাল আর অন্ধকার। ও সব পাগলামী ছাড়, নেকলেসটা তুলে নাও। আজ আবার রায়েদের টি-পার্টিতে—"

রেবা মাথা নাড়িয়া বলিল, "মাপ কর, পার্টিতে আমি যাব না।"

অর্দ্ধেন অধীর ভাবে বারকয়েক কক্ষমধ্যে দ্রুত পাদচারণা করিল,—কতবার অসহ্য ক্রোধে অধর দংশন করিল,—তারপর,—রেবার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "তবে শোন, রেবা। জগতে

একটা জিনিষের মূল্য আমায় জীবন-ভোর দিয়ে যেতে হবে। সে সম্মান। সর্ব্বস্ব দিয়েও আমায় তা রাখতে হবে। লোকের কাছে খাটো হ'তে আমি পারবো না। তুমি যেমন তোমার দেহের শোভা ও গৌরবের জন্য ভালবাস—ঐ সাড়ী—নেকলেস—স্নো, আমিও তেমনি ভালবাসি এই অট্টালিকা—আসবাব—মোটর—আড়ম্বর—সাজসজ্জা—এমন কি রেবা—তোমাকেও। সমস্তই আমার সম্মানের সোপান ব'লে মনে করি।" কথা শেষে অর্দ্ধেন আর কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইল না,—ধীর গম্ভীর পদে বাহির হইয়া গেল।

রেবা শরাহত বিহগীর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল।

৫

এই অকস্মাৎ প্রকাশে সম্মুখে যে আবরণ ছিল—তাহা সহসা ছিঁড়িয়া গেল। উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে বাহুল্যের ব্যসন এতদিন যে মায়ামধুর বাঁধনটি বাঁধিয়া অন্তরের দিকে পরম আয়াসে নিম্নমুখী হইতেছিল,—তাহা দুঃসহ আঘাতে ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, দুইজনেরই যেন লজ্জার আর অবধি রহিল না। কেহ কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারে না।—

রেবার সুখস্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে। এমন নিষ্ঠুর তাহার স্বামী! অচল আসবাব ও সচল মানবের কোন প্রভেদ তাঁহার কাছে নাই? তিনি চান—তাঁর স্বার্থ-গৌরবের যূপকাষ্ঠে সকলেই আসিয়া নিম্নশির হউক। স্নেহ, ভালবাসা ও প্রীতিকে তিনি কাঞ্চনমূল্যে কিনিতে চান। এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের দেওয়া প্রতি অন্নগ্রাস—রেবার কালকূট ভক্ষণ বলিয়া মনে হয়। মৃত্যু সে চাহে না,—বাঁচিবার সাধও বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হয়। সুন্দরী ধরণী—অতুল সম্পদ্‌শালিনী,—অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা মনে;—তাহার সম্মুখে বসন্তের নবমঞ্জুশ্রী বহন করিয়া কুসুমিত লতার কুঞ্জ-বিতান। পূর্ণিমা নিশিতে এই কুঞ্জদ্বার-প্রবেশমুখে—অবসন্ন ব্যথিত মস্তক রাখিয়া কাঁদিবার জন্যই কি সে অভিসারিকা সাজিয়াছিল? কাঁদিয়া কাঁদিয়াই কি জ্যোৎস্নাধবলিত পূর্ণিমার হাসি দিনের আলোয় মলিন হইয়া যাইবে?

ফিরিবার পথ ছিল, যদি না দার্জ্জিলিংয়ের সেই অতি ক্ষুদ্রঘরের অতি তুচ্ছ দৃশ্যটি তাহার মনের দ্বারে আসিয়া সন্তর্পণে দাঁড়াইত! লাঞ্ছিত আত্মসম্মানের উপর এরূপ প্রচণ্ড প্রহার লাভ করিয়াও সে অর্থ-মাণিক্যের সমারোহে হয় ত সকলই ভুলিতে পারিত। এক দিন স্বামীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সে বিদ্রূপের হাসিতে যোগও দিয়াছিল। কিন্তু মানুষের আত্মা প্রতি নিয়ত তাহার কাণে কাণে বলিত, এ দৃশ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিবার মত চক্ষু তোমার নাই। মিথ্যা হাসিয়া ইহার অসম্মান করিও না।

মনে হয়, সে কথা সত্য—কঠোর সত্য। আজ রেবার তেমনই যদি এক ভগ্ন গৃহ থাকিত, সে গৃহে মলিন রোগ-শয্যা পাতা এবং সেই শয্যা-শিয়রে রুগ্নর মুখের উপর দুইটি ব্যগ্র চক্ষু রাখিয়া একবার প্রাণপূর্ণ সেবার আকাঙ্ক্ষা! আঃ!

ভাবিতে ভাবিতে রেবার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। কতক্ষণের জন্য মনে পড়ে না, সে সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিল। সেবারত দাস-দাসীদের দেখিয়া তাহার সব কথাই মনে পড়িল, লজ্জায় সে ভাল করিয়া চাহিতে পারিল না। হস্তেঙ্গিতে তাহাদের বিদায় দিয়া আলো নিবাইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রায়ই এমনই ভাবে তাহার দিন কাটিতেছিল।

অর্দ্ধেনের চলার বিরাম নাই। অপ্রসন্ন ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন কটাক্ষের জন্য সে তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিল। অলক্ষ্যে বসিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। পাশে রেবা নাই, অর্দ্ধেন তাহার উগ্র বিলাসিতায় সে অভাব পূর্ণ করিতে চাহিল। বাহিরের কলগুঞ্জন যতই অস্পষ্ট হইয়া কর্ণে প্রবেশ করে, সে সকলকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য অর্দ্ধেনের উৎসাহ ততই অপরিসীম হইয়া উঠিল। অবশেষে জ্বলিতে জ্বলিতে এক দিন দমকা হাওয়া আসিয়া সে শিখাটিকে প্রবলভাবে কাঁপাইয়া দিয়া গেল।

সব কিছুকেই 'কিছু না' বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে—চলে না শুধু পাওনাদারকে। তাহার রক্ত আঁখিতলে সে যেন অর্দ্ধমৃত হইয়া—বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। শিখা নিবিয়াছে, আর কেন?—এইখানেই যবনিকাপাত হউক।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া অর্দ্ধেন ত্রিতলের ঘরে উঠিবে, এমন সময় সিঁড়িতে রেবার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

চমকিত হইয়া অর্দ্ধেন প্রশ্ন করিল, "কে?"

না চিনিতে পারিবারই কথা! রেবা যেন কত বৎসর

আগাইয়া চলিয়াছে। শীর্ণ রুক্ষ চেহারা—কোথায় সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—কোথায় বা সেই চপল লীলায়িত দুইটি স্নিগ্ধ সুকোমল আঁখি? কুঞ্চিত সুকৃষ্ণ কেশে কালের বিন্দুগুলি কর্কশ হইয়া চোখে বাজিতেছে। পাণ্ডুর আননে ও শুষ্ক করে একটা ক্লান্তিকর অপ্রসন্নতা। ফুটিবার মুখে প্রভাতের আলো না পাইয়া সহসা মধ্যাহ্ন-রবির খরতাপে ফুল যেন আতপ্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। যৌবন-অবসানে যে বার্দ্ধক্য ধীরে ধীরে মানুষের উপর স্নিগ্ধ ছায়া বিছাইয়া তাহাকে আর এক মহান্ সৌম্যরূপে সাজাইয়া দেয়, এই অকাল-বার্দ্ধক্যে সেটুকু স্নিগ্ধভাবই বা কোথায়? রুক্ষ কর্কশ, চাহিলে চক্ষু বিতৃষ্ণায় মুদিয়া আসে।

উত্তর না পাইয়া অর্দ্ধেন সভয়ে প্রশ্ন করিল, "কে তুমি?"

রেবা মাথা হেলাইয়া কহিল, "চিনতে পারছ না, আমি রেবা।"

অস্ফুট শব্দ করিয়া অর্দ্ধেন দেওয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইল। রেবার মুখে অতি ক্ষীণ এক টুক্‌রা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সে কহিল,—"ভয় পেলে না কি?"

অর্দ্ধেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, ভয় আমি কিছুতেই পাই নে, রেবা। ভয় কাটাবার মন্ত্র আমি জানি।"

রেবা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "এমন অসময়ে ওপরে চলেছ যে?"

অর্দ্ধেন বলিল, "আমার আর সময়-অসময় কি? তুমি শুনেছ কি না জানি না, এ বাড়ীতে আমার মেয়াদ আজ পর্য্যন্ত।"

রেবার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "তার পর?"

ম্লান হাসিয়া অর্দ্ধেন বলিল, "তার পর? অদৃষ্ট আমি মানি না, তুমি বোধ হয় জান। নিজের উপায় নিজেই আমায় করতে হবে।"

অন্তরে শিহরিয়া শুষ্কস্বরে রেবা কহিল, "কি উপায় করবে?"

রেবার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া অর্দ্ধেন বলিল, "কিন্তু তোমার পানে চেয়ে আমার সঙ্কল্প যেন শিথিল হয়ে আসছে, রেবা। ঘর-বাড়ী—টাকা-কড়ি—সবই ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল, শুধু মিলিয়ে গেল না—তোমার প্রতি কর্ত্তব্য।"

রেবার নয়নে অশ্রু আসিয়া জমিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।"

অর্দ্ধেন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "এ কথা তুমি বলতে পার, রেবা। এই ঘর-বাড়ী টাকা-কড়ির সঙ্গে তোমায় এক দিন সমান মনে করতুম। কেন করতুম, তাও বোধ হয় জান। কিন্তু এত করেও সে জিনিষ ত রাখতে পারলুম না। বাইরে আজ আমার মুখ দেখাবার জো নেই।" বলিতে বলিতে অর্দ্ধেনের গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। রেবার একখানি হাত ধরিয়া সে কোমলস্বরে বলিল, "এস, সব বলছি।"

অর্দ্ধেনের আচরণ রেবাকে কম বিস্মিত করে নাই! দীর্ঘ একটি বৎসর পরে হৈম-মাণিক্যের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া মানুষ অর্দ্ধেন আজ রেবার হাত ধরিয়াছে। অভিমানের কালো অন্ধকার সেই করস্পর্শে মানবী রেবার অন্তর হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

উপরের ঘরে চেয়ার টানিয়া উভয়ে মুখামুখি বসিল। অর্দ্ধেন অবরুদ্ধ বাতায়নগুলি খুলিয়া দিল না, বাহিরের আলোকিত প্রকৃতিকে সহ্য করিবার শক্তি আজ তাহার ছিল না।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পর অর্দ্ধেন রেবার পানে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "এক পথ আছে, রেবা। ভেবেছিলুম, তোমায় বলবো না, কিন্তু না বলেও আমার তৃপ্তি নেই। আগুনে হাত দিলে মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত পোড়ে, কেন না, তার ধর্ম্মই দাহন। আমাদের জীবনে পুড়তে আর অবশিষ্ট কিছু নেই। তাই জীবনকালে যে অধিকার তোমায় দিতে পারি নি, আজ সে পথের প্রান্তে এসে নতুন পথে চলবার জন্য তোমার হাত ধরেছি। যা কিছু আমাদের প্রিয় ছিল, তারই ভস্মরাশির উপর দিয়ে আমাদের লুপ্ত পথের রেখা। চলতে সাহস হয়?"

রেবা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল, "কি বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

অর্দ্ধেন হাসিয়া পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া

টেবলের উপর রাখিয়া বলিল, "এই মাত্র পথ। সাহস হয় ?"

শিহরিয়া উঠিয়া রেবা চীৎকার করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া অর্দ্ধেন বলিল, "চুপ। এ বিষ—এ্যাসিড। ভয় পেয়েছ, রেবা ?"

রেবা ম্লান হাসিয়া বলিল, "ভয় !"

অর্দ্ধেন বলিল, "ব্যস্! তবে আর কি ? এসো, এই সুধা—"

রেবা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "কিন্তু এ ভাবে জীবন নষ্ট করায় লাভ ? যে মানের জন্য এ কায করতে চলেছ, একবারও ভেবেছ কি—আমাদের মৃত্যুর পর লোকের মুখে মুখে—এই কলঙ্ক-কুৎসা—"

অর্দ্ধেন বলিল, "আমরা তা শুনতে আসবো না, রেবা। লোকের জিভকে যত না ভয় করি—তত ভয় করি আমার এই দুটো কাণকে। যত অসম্মান—যত জ্বালা—এই দুটো দিয়েই না মনের ভিতরটাকে বিষিয়ে তোলে ?" বলিয়া শিশিটা হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, "এই পথ বন্ধ হ'লে আর ভয় কি ?"

রেবা তাড়াতাড়ি অর্দ্ধেনের হাত হইতে শিশিটা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "এ পথ ভীরুর—কাপুরুষের। দার্জ্জিলিংয়ে তোমার বন্ধুর কথা মনে পড়ে ? তাঁর দুঃখ-সহিষ্ণুতার কথা নিয়ে এক দিন আমরা উপহাস করেছিলুম। কিন্তু, বুঝি নি—আসল মনুষ্যত্ব কল্পিত সুখ-দুঃখের অনেক উপরে। আমাদের উপহাসে তাঁর ক্ষতি বিশেষ কিছু হয় নি, অথচ সেই আত্মপ্রতারণায় আমরা খুইয়েছি ঢের বেশী।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া অর্দ্ধেন বলিল, "তুমি যাই বল, রেবা, সে জীবনযাপন করবার জন্য বেঁচে থাকার চেয়ে—"

রেবা কহিল, "মরণই ভাল ! না, না, ও কথা ব'লো না। জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষা শুধু বড় বড় লোকের সাজ-সজ্জার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ায় নয়। ঐ বস্তিগুলোর পানে চেয়ে দেখ—ওদের মধ্যেও জীবন আছে।"

অর্দ্ধেন বলিল, "হাঁ—আছে। কিন্তু উচ্চতর সুখের আস্বাদ পায় নি বলেই ওরা অমন ভাবে বেঁচে রয়েছে। আমাদের ও ভাবে বাঁচা চলে না। দাও শিশিটা।"

রেবা উঠিয়া একটা জানালা খুলিয়া শিশিটা বাহিরে ফেলিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারটায় বসিয়া বলিল, "প্রলোভন বড় ভয়ানক,—তাকে জয় করাই মনুষ্যত্ব।"

অর্দ্ধেন হতাশভরে কহিল, "রেবা—কি করলে ? কাল সকালে মুখ দেখাব কি ক'রে ?"

রেবা কহিল, "সে ব্যবস্থা আমি করবো। এত কাল যাকে আগলে রাখবার জন্য এত আড়ম্বর দিয়ে প্রাণপণে ঢেকে রেখেছিলে, এখনও কি বোঝ নি—সে মিথ্যা ভিন্ন আর কিছু নয়। এতে যদি সব যায়—তবু লোকে বলবে না—অমুক কাউকে ফাঁকি দিয়েছে—বা সে জোচ্চোর, না হয় বলবে—গরীব। তাতে অসম্মানের কিছু নেই।"

অর্দ্ধেন সহসা অস্থির হইয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল এবং আপনার দুইটি কর বারম্বার নিষ্পেষিত করিয়া অধীর কণ্ঠে বলিল, "মানি—দারিদ্র্য আমাদের সবই ফিরিয়ে দেবে। এক সমাজ থেকে আর এক সমাজে মাথা উঁচু ক'রেই চলতে পারবো। কিন্তু রেবা, টাকার আড়ালে যে জিনিষ লুকিয়েছিল, সে জিনিষ টাকার সঙ্গেই চ'লে গেছে।"

রেবা শান্তকণ্ঠে কহিল, "সম্মানের কথা বলছো ?"

অধীরকণ্ঠে অর্দ্ধেন কহিল, "না, সম্মানের কথা নয়—আমাদের কথা। আমরা টাকার মোহে পরস্পরকে চিনতে পারি নি; জানি নি—প্রাণ ব'লে কোন জিনিষ পৃথিবীতে আছে, যার সন্ধান পেলে বাইরের জগৎ বাইরে প'ড়ে থাকে।"

রেবা বলিল, "বেশ ত, সব জঞ্জাল এখন ঘুচে গেছে—"

রেবার পানে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অর্দ্ধেন কাতরকণ্ঠে কহিল, "সেই সঙ্গে প্রাণের সম্পদ্‌ও চ'লে গেছে। এ অমূল্য রত্ন চিনেছি, কিন্তু হাত বাড়ালে ধরতে পারি কৈ ? এক বছর আগে তুমি যে রেবা ছিলে,—এই এক বছর পরে যেন কুড়ি বছর এগিয়ে গেছ।"

সম্মুখেই প্রকাণ্ড দর্পণ ছিল এবং জানালা ছিল খোলা। দর্পণে আপনার অকালবার্দ্ধক্যভার-প্রপীড়িত দেহের পানে চাহিয়া রেবা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সত্যই ত! কোথায় তাহার সেই ভুবনবিজয়িনী যৌবন-বিকসিত দেহবল্লরী—কোথায় বা সেই ভ্রূবিলাস-মধ্যে ফুলময় অতনুর সুরভি-সোহাগ ? ঐশ্বর্য্যের গৌরব-পতাকাতলে যে রহস্য, সুনিপুণ যৌবনের লীলা, নিত্য নব

নররূপে প্রাণাবেগে বিচঞ্চল হইয়া উঠিত,—আজ অকাল-বার্দ্ধক্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সেই যৌবনকে ডুবাইয়া দিয়া দুঃস্মৃতিময় দুঃখবায়ু প্রবলতর বেগে বহিয়া যাইতেছে। সে দুর্দ্দম আঘাতে পতাকা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আবেগ ভাসিয়া গিয়াছে এবং বসন্ত-উপবনে তুষারকণা ঢালিয়া শীত যেন তাহার বার্দ্ধক্যের সমারোহভার লইয়া সহসাই আবির্ভূত হইয়াছে!

দারিদ্র্যে গৌরব আছে, ক্ষণপূর্ব্বে এ বিশ্বাস রেবার দৃঢ়তরই ছিল, কিন্তু দর্পণে আপনার দগ্ধপ্রায় রূপের ভস্মাবশেষ দেখিয়া তাহার সারা অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল।

পথিশ্রান্ত পথিক আজ মরুভূমির মাঝখানে—মধ্যাহ্নের সূর্য্য তাহার মাথার উপরে—পদতলে প্রজ্বলিত বালুতে স্নেহলেশশূন্য তীক্ষ্ণ ময়ূখমালা—ক্রীড়া-চঞ্চল। জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার বাসনা শুধু দুঃখ সহিবার সহিষ্ণুতা পরীক্ষা মাত্র। কি লাভ এই বৃথা বন্ধনের আয়োজনে? যাহা গিয়াছে—তাহা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যাক।

কাঁদিতে কাঁদিতে রেবা জানালার ধারে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে সেই অদূরনিক্ষিপ্ত ভগ্ন শিশিটার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে ক্রন্দনের ধ্বনি অর্দ্ধেন্দুর অন্তরে গিয়া গভীরভাবেই আঘাত করিল। ধীরে ধীরে সে উঠিয়া আসিয়া একখানি হাত রেবার স্কন্ধের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "অতীতের জন্য অনুশোচনা ক'রে লাভ নেই, রেবা। যা গেছে—তা ফিরবে না।"

রেবা ব্যাকুলদৃষ্টিতে অর্দ্ধেন্দুর পানে চাহিয়া কহিল, "তা আমি জানি। কিন্তু দোহাই তোমার, ওটা কুড়িয়ে এনে দাও।"

ম্লান হাসিয়া অর্দ্ধেন্দু বলিল, "একটু আগে বলেছিলে, ওটা ভুল, এখন ওটাকেই চাইছ? রেবা, আমরাও এত কাল যা চেয়েছি, যা পেয়েছি, তা না বুঝেই চেয়েছি, আর পেয়েও ঠিক বুঝতে পারি নি—কি চাই! অমন ক'রে তাকিও না—সত্যি বলছি, আমার কষ্ট হয়। নৃপেনের কথা কি এত শীঘ্র ভুলে গেলে!"

রেবা ব্যথিত দৃষ্টিতে অর্দ্ধেন্দুর পানে চাহিয়া কহিল, "না, ভুলি নি।"

অর্দ্ধেন্দু বলিল, "তার স্ত্রী কুৎসিত—তবু নৃপেনের কি প্রাণঢালা প্রীতি! আমরা ঠাট্টা ক'রে হেসেছিলুম। এই একটু আগে তুমিই সে দৃষ্টান্ত দিয়েছ।"

রেবা নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল।

অর্দ্ধেন্দু বলিতে লাগিল, "আমাদেরও সেই পথ। প্রাণের যোগ যেখানে, বাইরের সম্পদ সেখানে মনকে প্রলুব্ধ করবে না। সেখানেও কি আমাদের জন্য শান্তির আসনখানি পাতা নেই? সে আসনের এক প্রান্তে আমাদের ঠাঁই কি মিলবে না?"

রেবা সে কথার উত্তর না দিয়া অর্দ্ধেন্দুর কণ্ঠলগ্ন হইয়া আকুল অন্তরে কাঁদিয়া উঠিল।

অর্দ্ধেন্দুও রেবার বক্ষোলগ্ন মাথাটি দুইটি কম্পিত করে চাপিয়া ধরিয়া বাহিরের মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

অকস্মাৎ রেবা দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, মরব না। প্রলোভনকে জয় ক'রে আমরা যে মানুষ, তার প্রমাণ রেখে যাব। দারিদ্র্যেও কি গৌরবের মুকুট মেলে না?"

অর্দ্ধেন্দু তেমনই ভাবে বাহিরের আকাশ পানে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নে তখন দরদরধারে অশ্রুবন্যা বহিতেছিল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

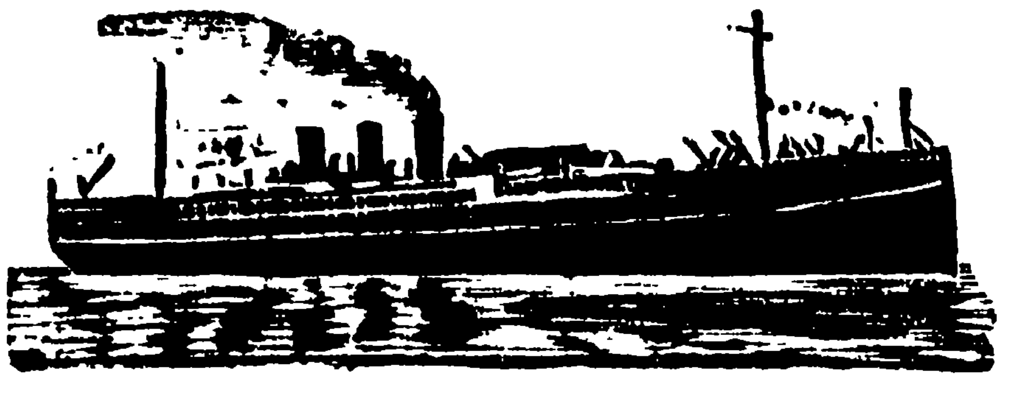

সান্‌ফ্রান্সিস্কো

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের রাজপথের দৃশ্য (সান্‌ফ্রান্সিস্কো)

লবণ-সমুদ্রে সান্‌ফ্রান্সিস্কোর জন্ম। প্রথম-জীবনে উহা একটি ক্ষুদ্র গ্রামরূপে বিরাজিত ছিল; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম 'রত্নহারা' নগরীতে পরিণত হইয়াছে। এত বড় বন্দর আরও থাকিতে পারে, কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যে এমন ঐশ্বর্য্যশালী বন্দরের কথা ইতিহাসে নাই। যেন যাদুকরের মায়াদণ্ডস্পর্শে তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

মেক্সিকোর অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র পল্লীটি কেমন করিয়া ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিল, তাহা জানিবার জন্য মানুষের আগ্রহ স্বাভাবিক। সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়াই যে ইহার এত দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা নহে। সমুদ্রই ইহার ললাটে জয়-টীকা আঁকিয়া দিয়াছিল। বৃহত্তর এবং দ্রুতগামী অনেক জল-যান সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকায় গ্রামটি ক্রমশঃ নগরে পরিণত হইয়াছিল।

আলাস্কার মৎস্য, ম্যানিলার নারিকেল, আনারস, চিনি প্রভৃতি; সিঙ্গাপুরী রবার, আমেরিকার কফি প্রভৃতি বহন করিয়া জাহাজ-সমূহ এখানে আগমন করায় মেক্সিকোর

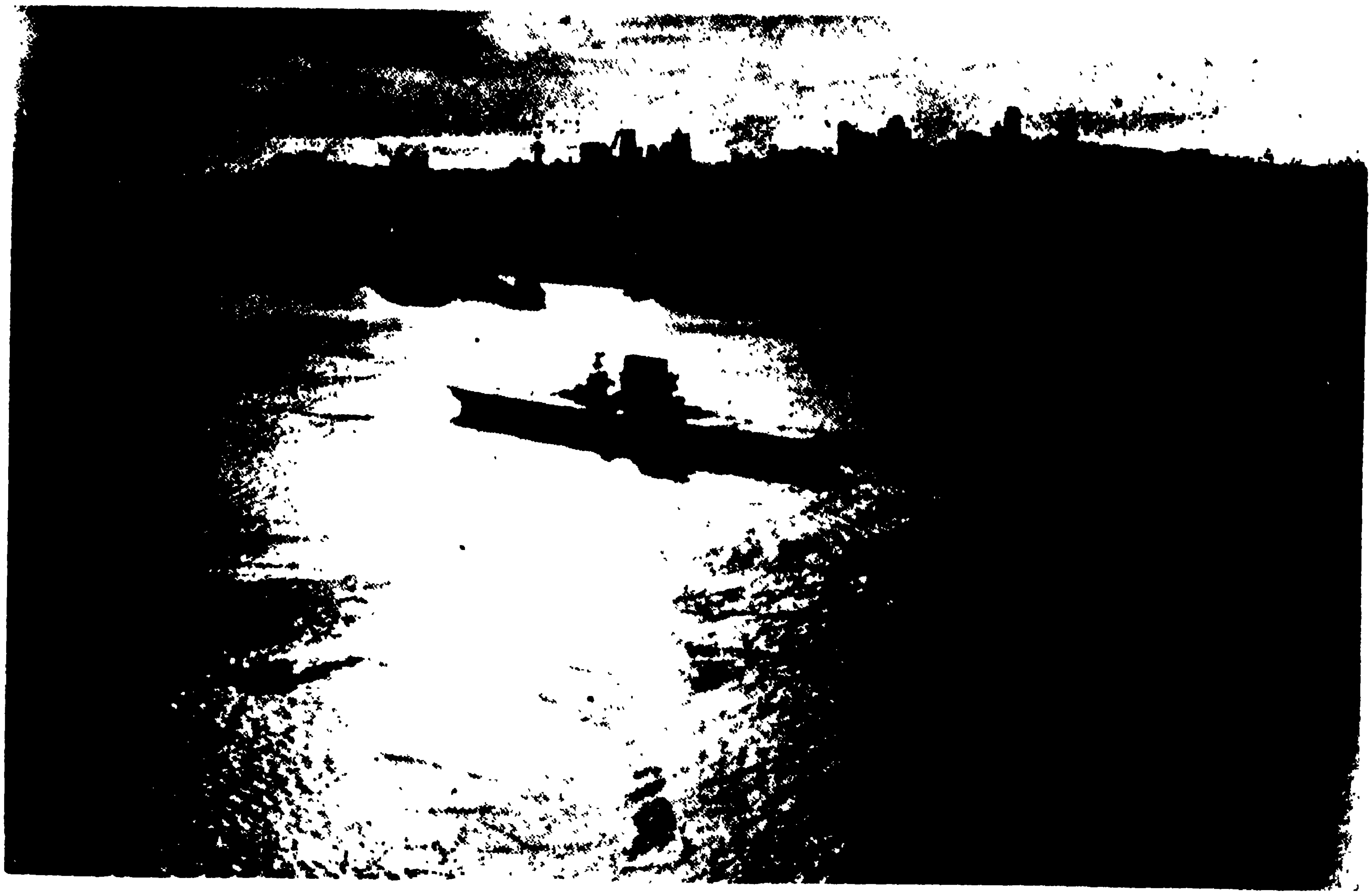

সান্‌ফ্রান্সিস্কো উপসাগর

পল্লীগ্রাম পরিপুষ্ট হইতে থাকে। সান্‌ফ্রান্সিস্কো এখন আন্তর্জ্জাতিক নগর।

সান্‌ফ্রান্সিস্কো সমুদ্রজননীর সন্তান। ইহার উপকূলভাগে উপস্থিত হইবার পক্ষে সমুদ্রপথই প্রশস্ত। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে সার ফ্রান্সিস্ ড্রেক সমুদ্রপথে এখানে উপনীত হন। সে দিন কুজ্ঝটিকায় দিগন্ত আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তিনি "স্বর্ণ-তোরণ" (Golden Gate)এর নিকট উপনীত না হইয়া উত্তরদিকে জাহাজ লাগাইয়াছিলেন। এখন সেই স্থানের নাম "ড্রেক্‌স্ বে" বা ড্রেক উপসাগর। ড্রেক তাঁহার রাণীর দাবীর স্বরূপ এই দেশটিকে 'নিউ এলবিয়ন' বলিয়া অভিহিত করেন এবং এখানে ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সে স্থান ত্যাগ করেন।

ইহার পর দুই শতাব্দী ধরিয়া কোনও শ্বেতকায় "স্বর্ণ-তোরণ" দেখেন নাই। কিন্তু মেক্সিকোতে তখন নানাপ্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল। ভাবী কালিফোর্ণিয়া ও সান্‌ফ্রান্সিস্কোর গঠনকার্য্যের উপযোগী অনেক ঘটনা তখন মেক্সিকোতে চলিতেছিল। কর্টেজ মন্‌টজুমাপ্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে স্বর্ণ-ক্ষুধাপীড়িত স্পানিয়ার্ডগণ উত্তরাভিমুখে অভিযান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান পুরোহিতগণ ক্রুশ সহ ইণ্ডিয়ানগণের মধ্যে আলোক-বিতরণের অভিপ্রায়ে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনেক সময় এমন ব্যাপার দেখা যাইত, খৃষ্টান পুরোহিত কোন ইণ্ডিয়ান্‌কে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আগে নিহত হইয়াছেন। অতি ধীরে কার্য্য চলিতেছিল, কিন্তু স্পানিয়ার্ডরা হতাশ হন নাই।

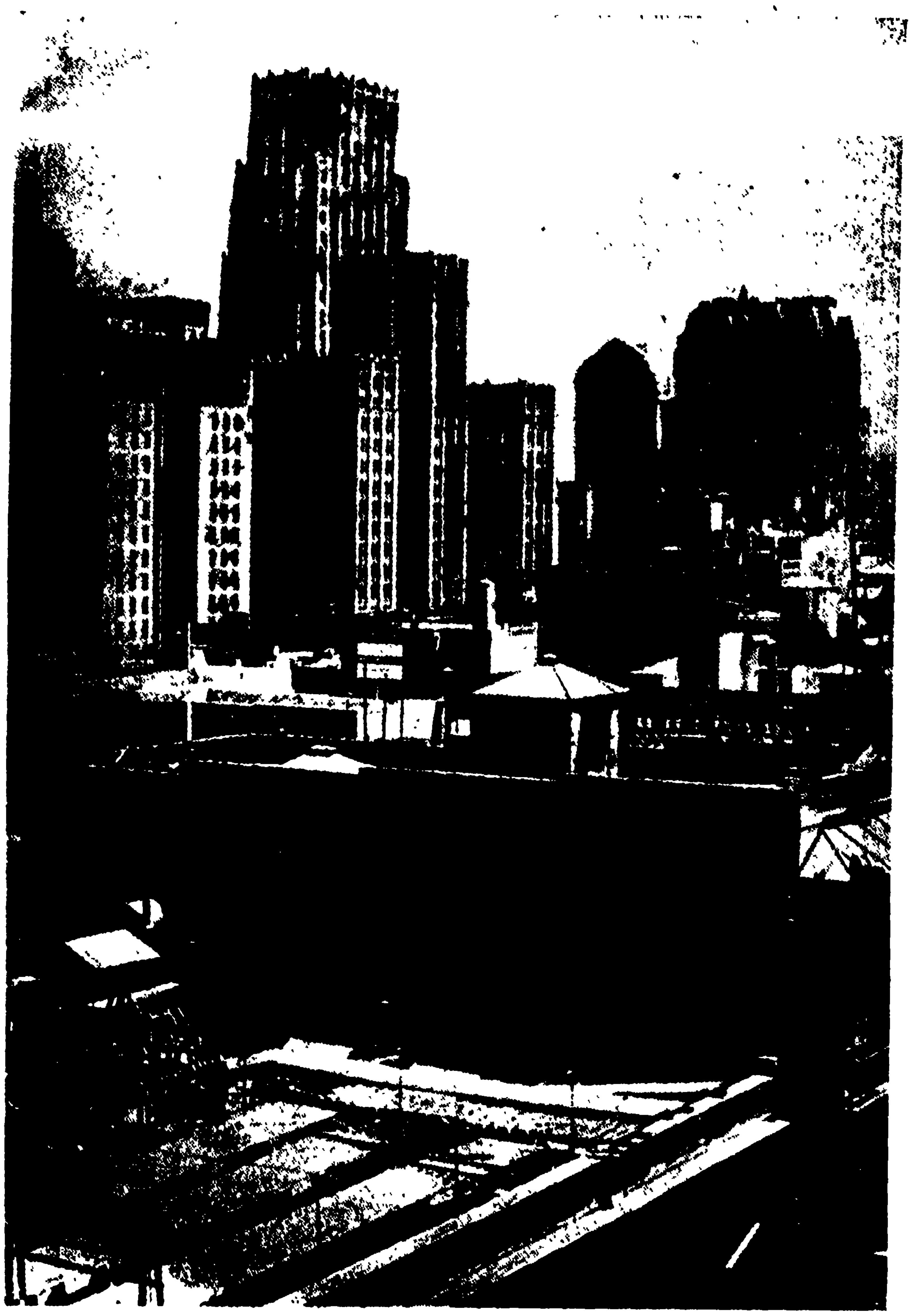

উচ্চতম অট্টালিকাশ্রেণী

কাঠের অগ্নিচালিত সানফ্রান্সিস্কোর প্রথম এঞ্জিন

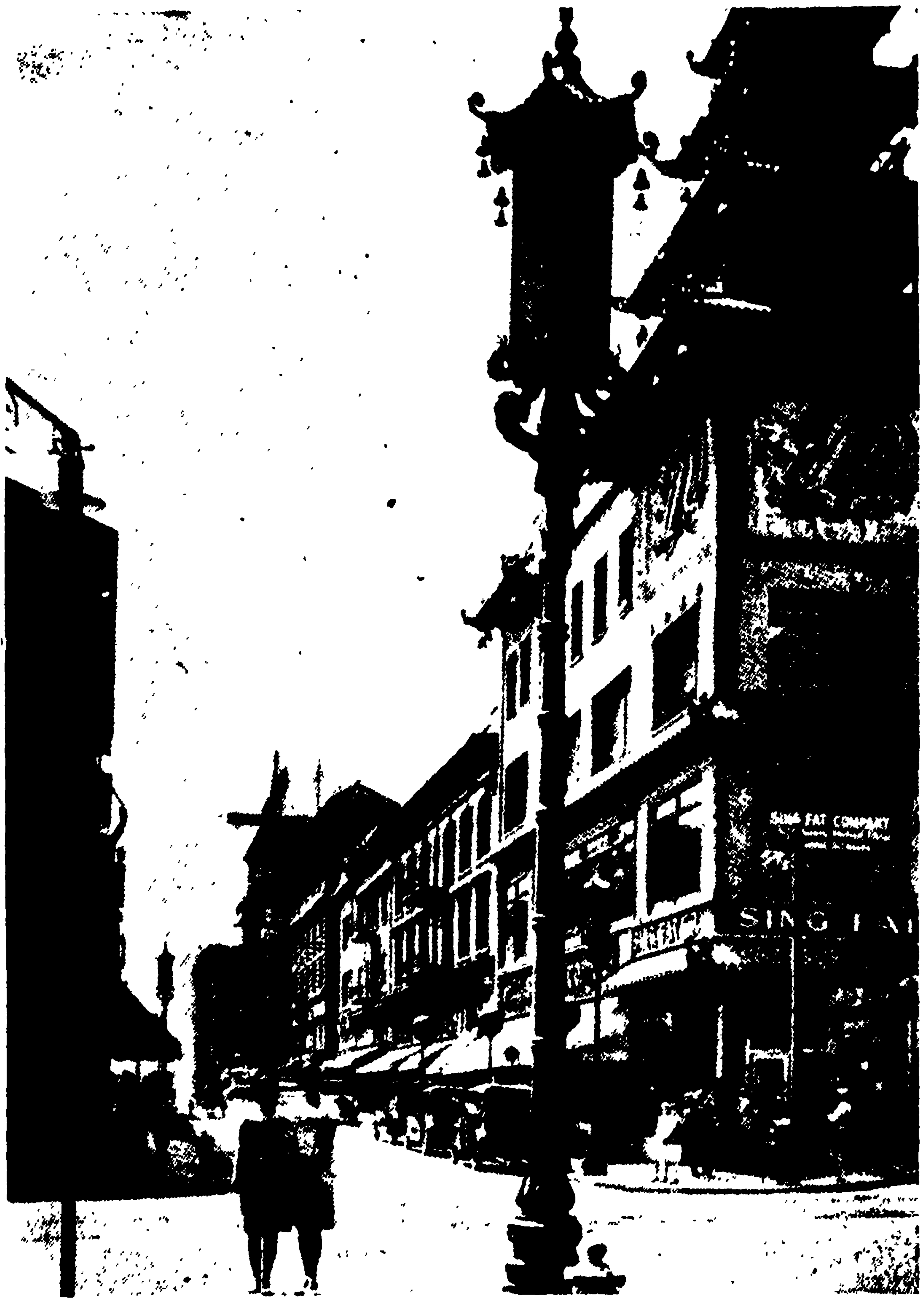

চীনাসহর—প্যাগোডা ছাদবিশিষ্ট অট্টালিকা

ক্রমে গোয়াডালাজারা হইতে সান্‌ডায়েগো পর্য্যন্ত স্থানে ফলপূর্ণ বিস্তৃত উদ্যান, সেচের খালযুক্ত কৃষিশালা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। তার পর বাজা কালিফোর্ণিয়ায় এক জন শাসক আসিলেন। তাঁহার নাম ডন্ গ্যাস্পার দা পোর্টোলা। এক দিন তিনি একটি চমৎকার বন্দর আবিষ্কার করেন। ইহাকেই তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্কো নামে অভিহিত করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর সান্‌ফ্রান্সিস্কোর নামকরণ হয়।

আধুনিক নগরের একাংশ ইদানীং [যুক্তরাজ্যের সেনাদলের জন্য সংরক্ষিত এখানে সামরিক কর্ম্মচারীরা যে ক্লাব-গৃহে অবস্থান করেন, সেই অট্টালিকা দীর্ঘকালের পুরাতন। কাপ্তেন আন্‌জার সময় উহা নির্ম্মিত হয়।

নূতন সহরে পুরাতনের চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু সামরিক কর্ম্মচারিগণের ক্লাব-গৃহ (প্রেসিডিও ক্লাব) এবং প্রাচীন "ডোলোরস্ মিশন" ব্যতীত অন্য কোন পুরাতন অট্টালিকা বিদ্যমান নাই। পুরাতন ও নূতনের মিলনের উহাই ভিত্তিভূমি। "মিশনের" অন্তর্গত সমাধিগুলির প্রস্তর-ফলকসমূহ খসিয়া পড়িতেছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বের বহু স্মরণীয় ব্যক্তির সমাধি এখানে বিদ্যমান। মেক্সিকোর প্রথম গভর্ণর ডন্ লুই আর্গুয়েলোর সমাধি এখানে আছে। তাঁহার ভগিনী, রেসানভ্ নামক এক জন রুসের প্রণয়ভাগিনী হন; কিন্তু রুস ভদ্রলোক আর প্রত্যাবর্ত্তন না করায় এই তরুণী সন্ন্যাসিনী হইয়া মঠে প্রবেশ করেন।

আল্‌টা কালিফোর্ণিয়ায় রুস সম্রাটের পক্ষ হইতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশ

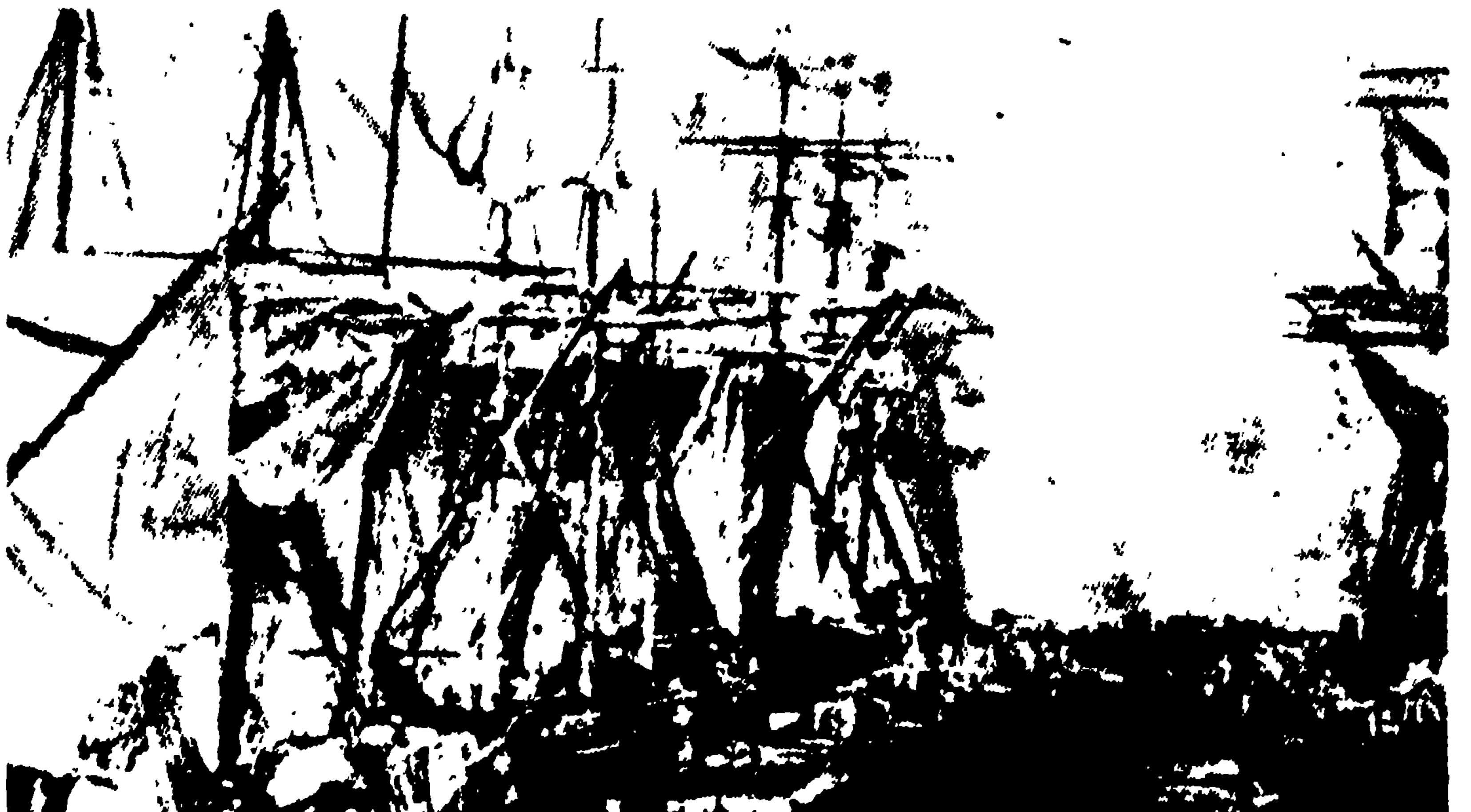

৬৭ বৎসর পূর্ব্বের সান্‌ফ্রান্সিস্কোর বন্দর-দৃশ্য

স্থাপন করা হয়। বডিগা নামক স্থানে একটি রুসীয় দুর্গও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রুসীয় জাহাজসমূহ এখানে মৎস্য শিকার করিবার জন্যও প্রেরিত হইত।

নিউ ইংলণ্ডের চতুর ব্যবসায়ীরাও এখানে ব্যবসায়ের জন্য আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মিশৌরী ও কেন্‌টকীর শস্ত্রধারী লোকও ক্রমে ক্রমে ধনার্জ্জনের আশায় সান্‌ফ্রান্সিস্কো বন্দরে আসিতে থাকে। তার পর "হডসন বে কোম্পানী", এইখানে কারখানা খুলিয়াছিলেন। ইংরাজ রণতরী এবং বাণিজ্যপোত-সমূহও এইখানে বৃটিশ উপনিবেশ সংস্থাপনের সংকল্প লইয়া যাতায়াত করিতে থাকে।

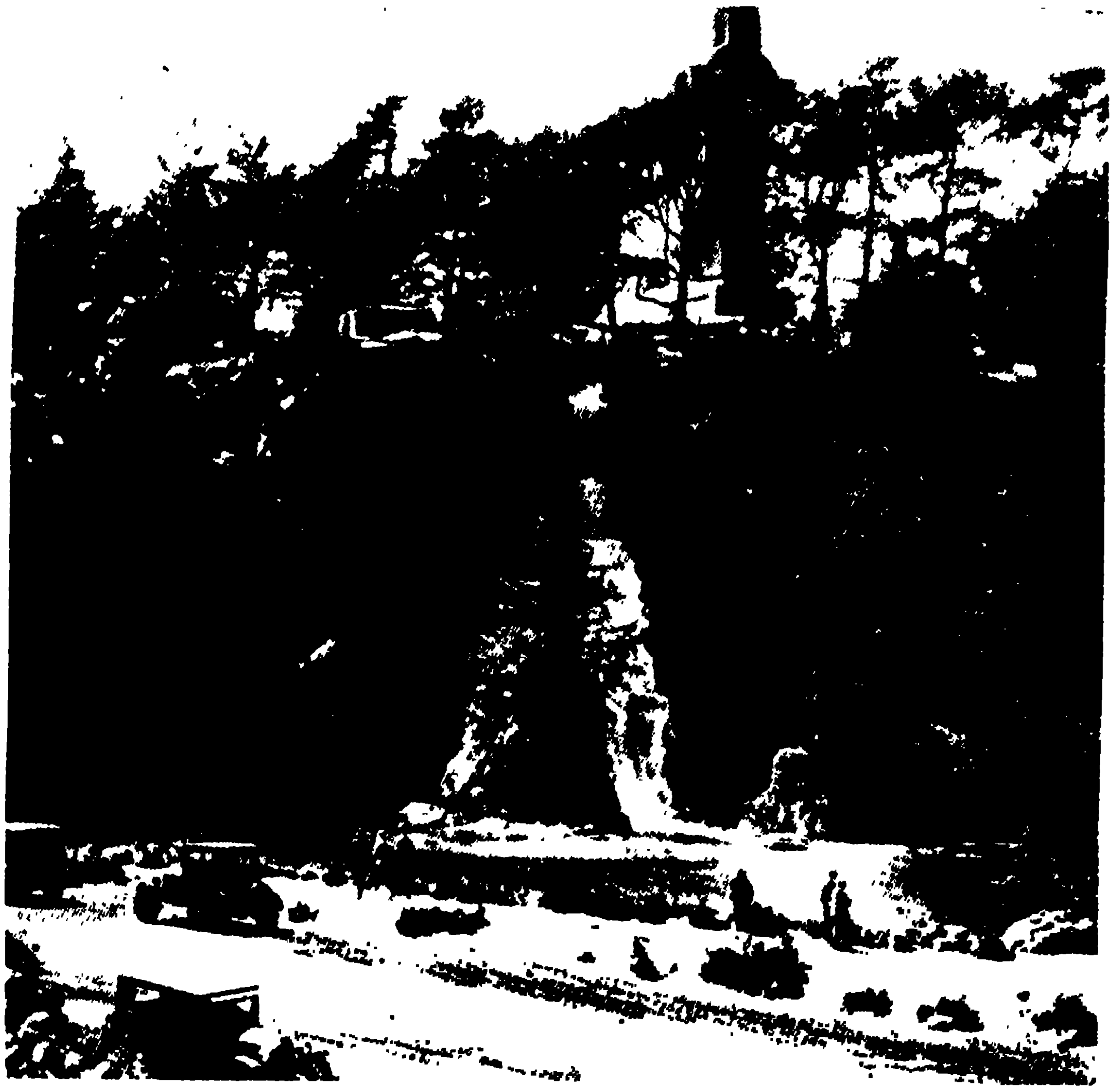

স্বর্ণতোরণ উদ্যান—সান্‌ফ্রান্সিস্ ড্রেকের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত ক্রুশ

১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের অধিকার চলিয়া যায়। নূতন পতাকা সেখানে সমুত্থিত হয়। এখনও সেই পতাকা সান্‌ফ্রান্সিস্কোর উপর পতপত রবে উড্ডীন হইতেছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। বৈদেশিকদিগের সহিত দেশীয়দিগের বিরোধ চলিতে লাগিল।

মেক্সিকোর সহিত যুদ্ধ বাধিল। ওয়াশিংটনে তখন দৃঢ়চেতা প্রেসিডেণ্ট পোলক অধিষ্ঠিত। স্কট, ডনিফান্ এবং জ্যাকারি টেলর তখন মেক্সিকোতে ছিলেন। ফ্রেমন্, কেয়ার্ণি এবং কিট কার্সন সে সময়ে কালিফোর্ণিয়ায়। যুক্তরাজ্যের নাবিকগণ তথায় আসিয়া আমেরিকার পতাকা উড্ডীন করিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়া অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

কালিফোর্ণিয়া যখন মেক্সিকোর অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই সময়ের বহু মার্কিণ এখনও জীবিত আছেন। তখন গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র ৯ শত। একখানি সংবাদপত্র ও একটি বিদ্যালয় সেখানে বিদ্যমান ছিল। মার্শাল কিছু দিন পরে সট্টার মিলের কাছে স্বর্ণ আবিষ্কার করেন। পাহাড়ের ধারে খনন করিতে করিতে খাঁটি সোনা পাওয়া যাইতে লাগিল। ৭ জন মার্কিণ ইণ্ডিয়ানদিগের সহায়তায় দেড় মাসের মধ্যে ২ শত ৭৫ পাউণ্ড ওজনের স্বর্ণ পাইয়াছিলেন।

ডায়েগো রিভারার প্রতিমূর্ত্তি—স্বর্ণতোরণ উদ্যান

এক সপ্তাহে দুই জন লোক ১৭ হাজার ডলার মুদ্রার স্বর্ণ লাভ করেন।

সমুদ্র-উপকূল—স্বর্ণতোরণোদ্যানের একাংশ, প্রমোদভবন

সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। পোলক এই স্বর্ণাবিষ্কারের সংবাদ কংগ্রেসে প্রকাশ করেন। সমগ্র জাতি উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্বর্ণলাভের উন্মাদনায় সমগ্র জগৎ ক্ষেপিয়া উঠিল। কালিফোর্ণিয়ার স্বর্ণ-খনির বিষয় দেশবিদেশে আলোচিত হইতে লাগিল। তখন সহস্র সহস্র লোক স্বর্ণ-লোভে সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে আসিতে আরম্ভ করিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২ শত ৩০ খানি মার্কিণ জাহাজ কালিফোর্ণিয়ায় পৌছিয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বসন্ত ঋতুতে মিশৌরী নদী অতিক্রম করিয়া ১৮ হাজার লোক পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

কালিফোর্ণিয়ার ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, জাতির ইতিহাসে এই ভাবে কোথাও কখনও জনসমাগম হয় নাই। নিউইয়র্ক হেরাল্ডের এক দিনের কাগজে কালিফোর্ণিয়া-সংক্রান্ত ৪০টি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। কামান, পিস্তল, এঞ্জিন প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিজ্ঞাপন।

স্বর্ণতোরণ উদ্যান—সারভান্টেজ ও তাঁহার দুই জন নায়ক

এই ব্যাপারে মৃতের তালিকাও ভারী হইয়াছিল। মরুভূমি অতিক্রম করিয়া দলে দলে যাত্রী অগ্রসর হইয়াছিল। জেমস এবে নামক জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহার দিনলিপির এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ১৫ মাইল দীর্ঘ মরুভূমি পার হইবার সময় তিনি ৭ শত ৫০টি মৃত অশ্ব, বলীবর্দ্দ এবং অশ্বতর গণনা করিয়াছিলেন। ৩ শত ৬২টি গাড়ী-পূর্ণ জিনিষ মরুভূমিতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ভার লঘু করিবার জন্য চামড়ার বাক্স, পরিধেয় বস্ত্র এবং অন্যান্য আসবাব কত যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা গণনা করা যায় না।

তদানীন্তন সান্‌ফ্রান্সিস্কোর অবস্থা কল্পনা-নেত্রে অনুমান করিয়া দেখিবার বিষয়। মানুষ তখন স্বর্ণ-প্রাপ্তির উন্মাদনায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলিলেই হয়। উহার লোভে মানুষ গৃহ-সুখ, পালিত পশু, উদ্যান, ক্ষেত্র প্রভৃতির মমতা ত্যাগ করিয়া

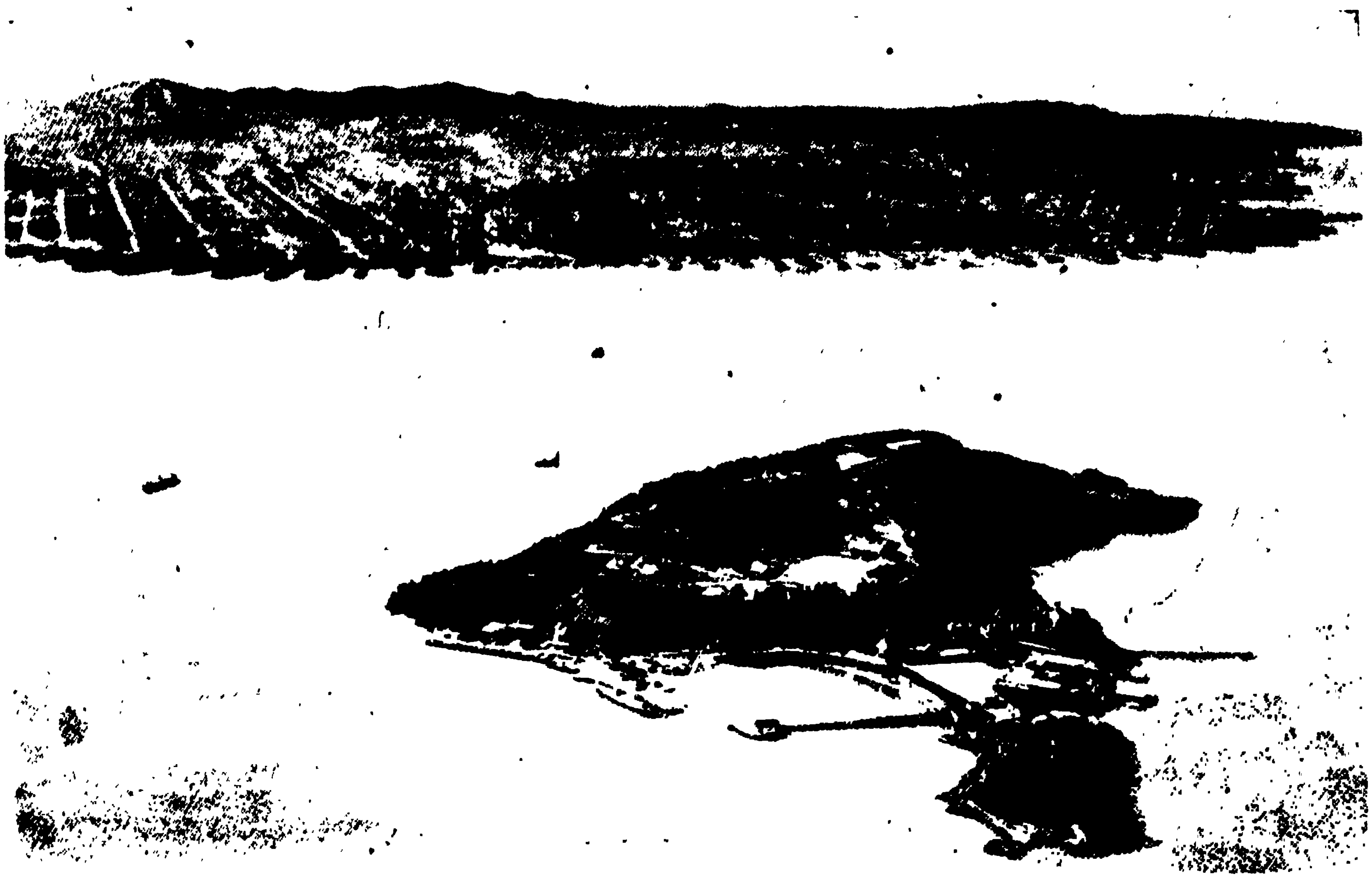

গটদ্বীপ—সানফ্রান্সিস্কো ও ওকল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ

সানফ্রান্সিস্কো অভিমুখে ছুটিয়াছিল। এমন কি, জাহাজের নাবিকগণও উন্মাদনায় অধীর হইয়া, জাহাজ আসিবামাত্র স্বর্ণ-লাভের আশায় স্বর্ণক্ষেত্রাভিমুখে অভিযান করিয়াছিল। উপসাগরে জাহাজগুলি মনুষ্যশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত।

তার পর সহসা গতির মোড় পরিবর্ত্তিত হইল! এই সময়েই নগরের শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব দ্রুতগতিতে সংসাধিত হইয়াছিল। সমুদ্রপথে নবাগতগণ আসিয়াই খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় এবং খনির উপযোগী দ্রব্যাদি যে কোনও মূল্যে কিনিতে আরম্ভ করিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লোকসংখ্যা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সহস্র সহস্র লোক বাসগৃহের অভাবে খোলা মাঠে শয়ন করিয়া থাকিত। স্বর্ণখনি অভিমুখে নব যাত্রিদল এবং খনি হইতে প্রত্যাবৃত্ত শ্রান্ত ব্যক্তিগণের টানা-পড়েনে পড়িয়া নগরের ঐশ্বর্য্য আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া গেল। সোজা কথায়, লক্ষ লক্ষ ডলার মুদ্রা নগরে আসিতে লাগিল। খনি-প্রত্যাগত পুরুষগণ রঙ্গমঞ্চের গায়িকার চরণতলে সোনার তাল ফেলিয়া দিতেও ইতস্ততঃ করিত না।

রবার্টলুই ষ্টিভেনসনের সমাধি

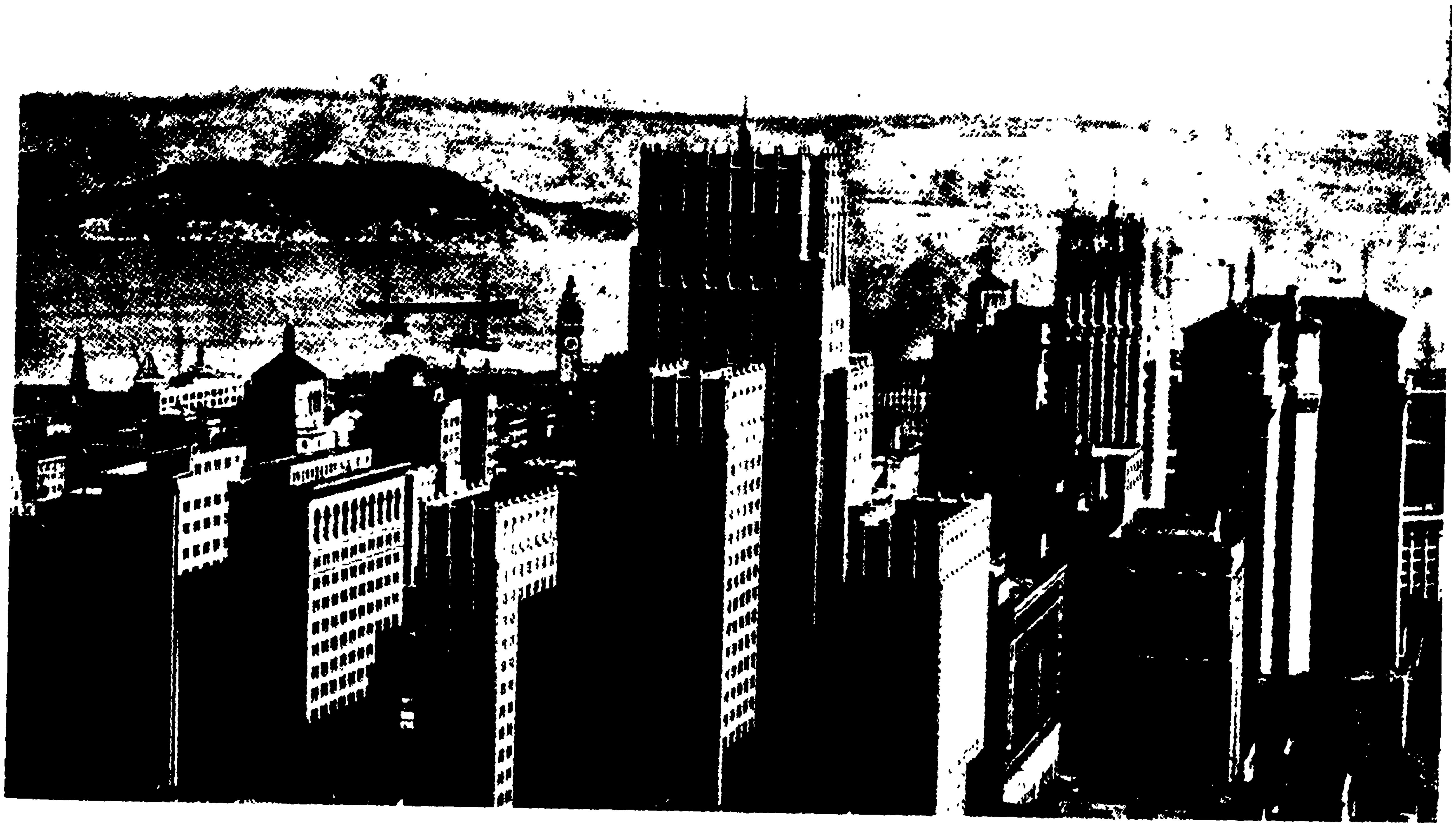

সম্মুখে সমুদ্র, পশ্চাতে আকাশচুম্বী অট্টালিকাসমূহ

সান্‌ফ্রান্সিস্কোর পুরাতন কামান

সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে বসবাসের জন্য অধিকসংখ্যক অট্টালিকা ছিল না। তাড়াতাড়ি উহার নির্ম্মাণকার্য্যও শেষ হইতে পারে না। কাযেই ৬০ ফুট দীর্ঘ এবং ২০ ফুট প্রশস্ত যে কোন কক্ষের মাসিক ভাড়া হাজার ডলার মুদ্রার কমে পাওয়া যাইত না। দুই পিপা হুইস্কির দাম ৭ হাজার ডলার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গৃহের অভাবে মাঠে বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইত। ক্রোশের পর ক্রোশ স্থান বস্ত্রাবাসে শোভিত হইত।

খনির কার্য্যে নিযুক্ত পুরুষরা ক্ষৌরকার্য্য করিত না। দীর্ঘ গুম্ফ-শ্মশ্রু-শোভিত পুরুষদিগের মধ্যে মাঝে মাঝে কিশোরের কচিমুখ দেখা যাইত। সান্‌ফ্রান্সিস্কো তখন সর্ব্বদেশের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। চোর, জুয়াচোর, ডাকাইত, নরহত্যাকারীরও প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। কিছুকাল সান্‌ফ্রান্সিস্কো অপরাধ ও জোরজবরদস্তির লীলা-ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল।

মানুষের জীবনের কোন মূল্যই তখন ছিল না। সকলেই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। প্রাণরক্ষার জন্য অনেক সময়

শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইত। কালিফোর্ণিয়ার ইতিহাস-লেখক ব্যানক্রফট্ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তথায় ৪ হাজার ২ শত নর হত হইয়াছিল। আদালত তখন এমন দুর্ব্বল ছিল যে, হত্যাকারীরা কদাচিৎ দণ্ডিত হইত। প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইত, প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে হইত। অবস্থা শেষে এমন দাঁড়াইল যে, এক দল লোক এই সকল কার্য্যে বাধা দিবার জন্য পাহারা দিতে আরম্ভ করিল।

নগরের ৯ হাজার অধিবাসী, সকলেই ভাল লোক, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটা সেনাদলে পরিণত হইল। তাহাদের পদাতিক ও কামানবাহী সেনাদল ছিল। দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অরাজকতা, অত্যাচার, লুণ্ঠনাদি দমন করিবার জন্য ৯ হাজার নাগরিক দৃঢ়তা সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

তখন গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। কিন্তু রক্ষিসেনাদলই জয়ী হইলেন।

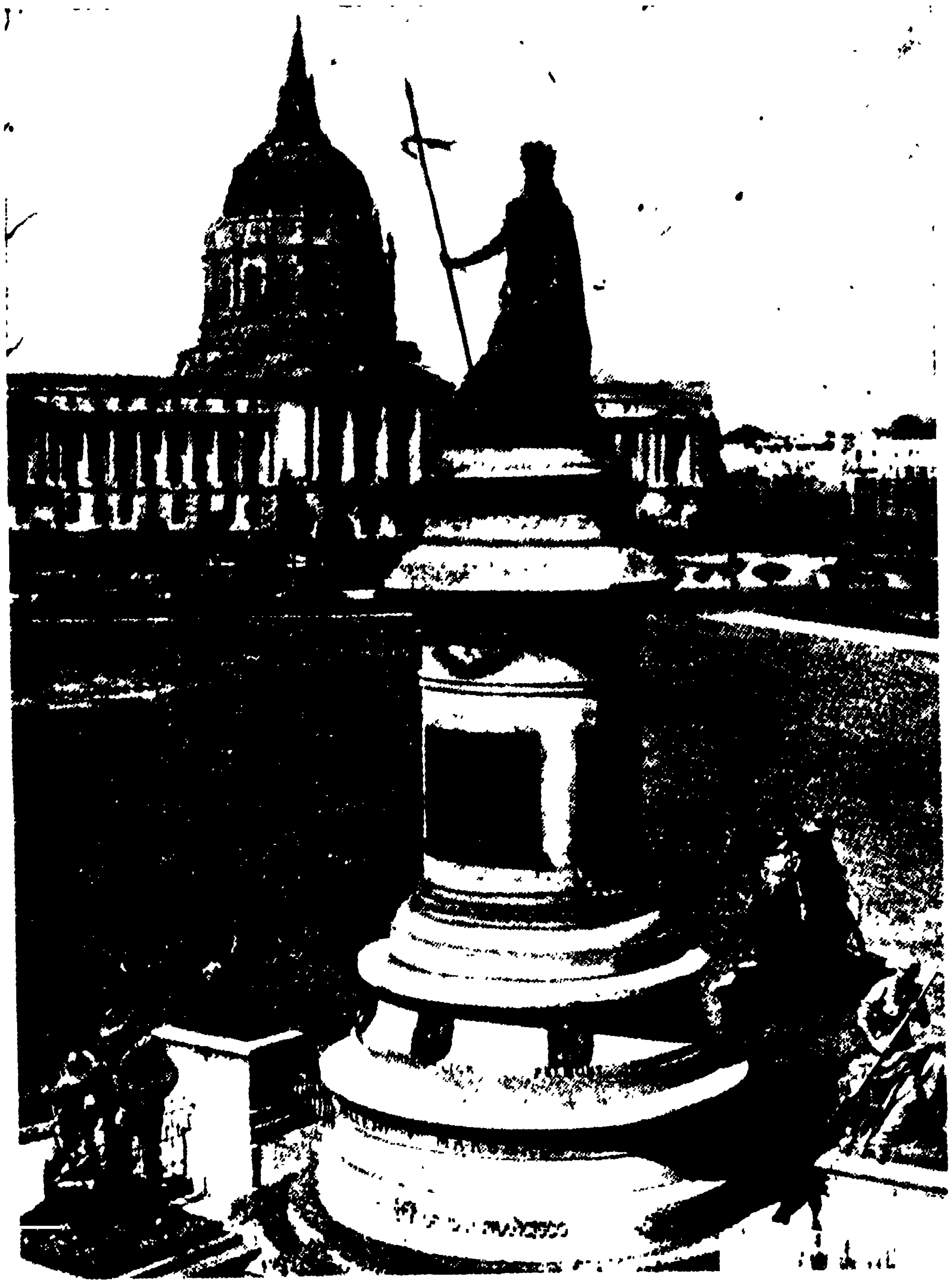

সিটি হল এবং লিক্ স্মৃতিসৌধ

তাঁহাদের দৃঢ় প্রচেষ্টার ফলে সানফ্রান্সিস্কোর নাগরিক আইনও উন্নত হইল। অরাজকতা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া গেল। নবগঠিত নগরী দিন দিন উন্নতির পথে ধাবিত হইল। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারও ঘটিল।

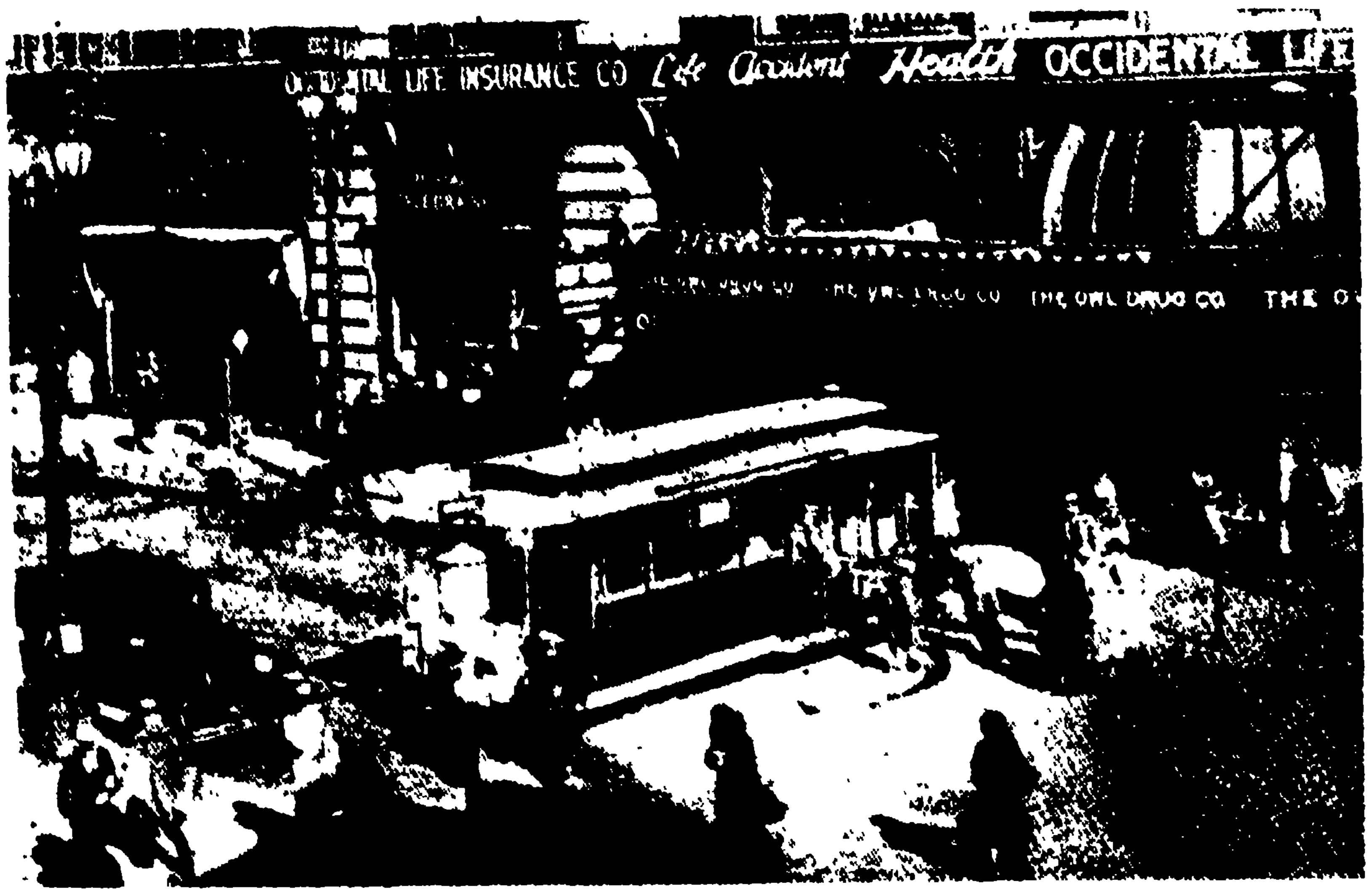

পার্ব্বত্যপথবাহী গাড়ী

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণ-খনি হইতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মুদ্রার স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল। গৃহযুদ্ধের সময় তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন নগরকে পুনরায় গঠিত করিতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। তার পর রেলপথের সৃষ্টি হইল। চীনা কুলীরা

স্বর্ণতোরণ উদ্যান

দলে দলে কায করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে নগরে বড় বড় হোটেল-বাড়ী নির্ম্মিত হইল, গাড়ীর বড় বড় কারখানা, আসবাব পত্রের দোকান, চিনির কারখানা দেখা দিল। সান্‌ফ্রান্সিস্কো বন্দরের আকার বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বর্ত্তমানে সাড়ে ১৭ মাইল-ব্যাপী স্থান লইয়া বন্দরটি বিস্তৃত।

নাবিকরা উল্কী পরিতে ভালবাসে। সান্‌ফ্রান্সিস্কো বন্দরে উহার প্রচলন অধিক। প্রত্যেক নাবিক সান্‌ফ্রান্সিস্কো দেখিবার জন্য ব্যাকুল। কারণ, এরূপ বন্দর পৃথিবীতে দুর্লভ। উল্কীর উপর এ দেশবাসীর এমনই অনুরাগ যে, এক জন ধনী মহিলা, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে তাঁহার উইল ছাপিয়া রাখিয়াছিলেন। এক জন ইংরাজ নাবিক তাহার কেশ-হীন মস্তকে—টাকের উপর, রাজা পঞ্চম জর্জ্জের মূর্ত্তি আঁকিয়া রাখি-য়াছে। জনৈক ধর্ম্মযাজক বক্ষো-দেশে—"শেষ ভোজের" দৃশ্য অঙ্কিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আর এক জন যীশুর দশটি আজ্ঞাই উল্কীর মত দেহে ধারণ করিয়াছিলেন।

সান্‌ফ্রান্সিস্কো বন্দরের নাম "স্বর্ণ-তোরণ"। উপসাগরের উপকূলভাগে ৪ শত ৫০ বর্গমাইলব্যাপী পথ রমণীয়-দর্শন! সর্ব্বত্রই কর্ম্মব্যস্ততা। ১ শত ১৮টি বিভিন্ন শাখার জাহাজ এই বন্দরে সমাগত হয়। ইহা হইতেই সান্‌ফ্রান্সিস্কোর বাণিজ্যপ্রসিদ্ধি কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

পানামা খাল কাটিবার পরই সান্‌ফ্রান্সিস্কোর আরও পরিবর্ত্তন ঘটে। আমেরিকার শ্রমশিল্প বিভাগের মহা-রথগণ এখানে শাখা-কারখানা স্থাপন করেন। পরিচিত 'ট্রেডমার্ক'গুলি রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে বন্দরের চারিদিকে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। এমন কোনও বস্তু নাই—যাহার কারখানা

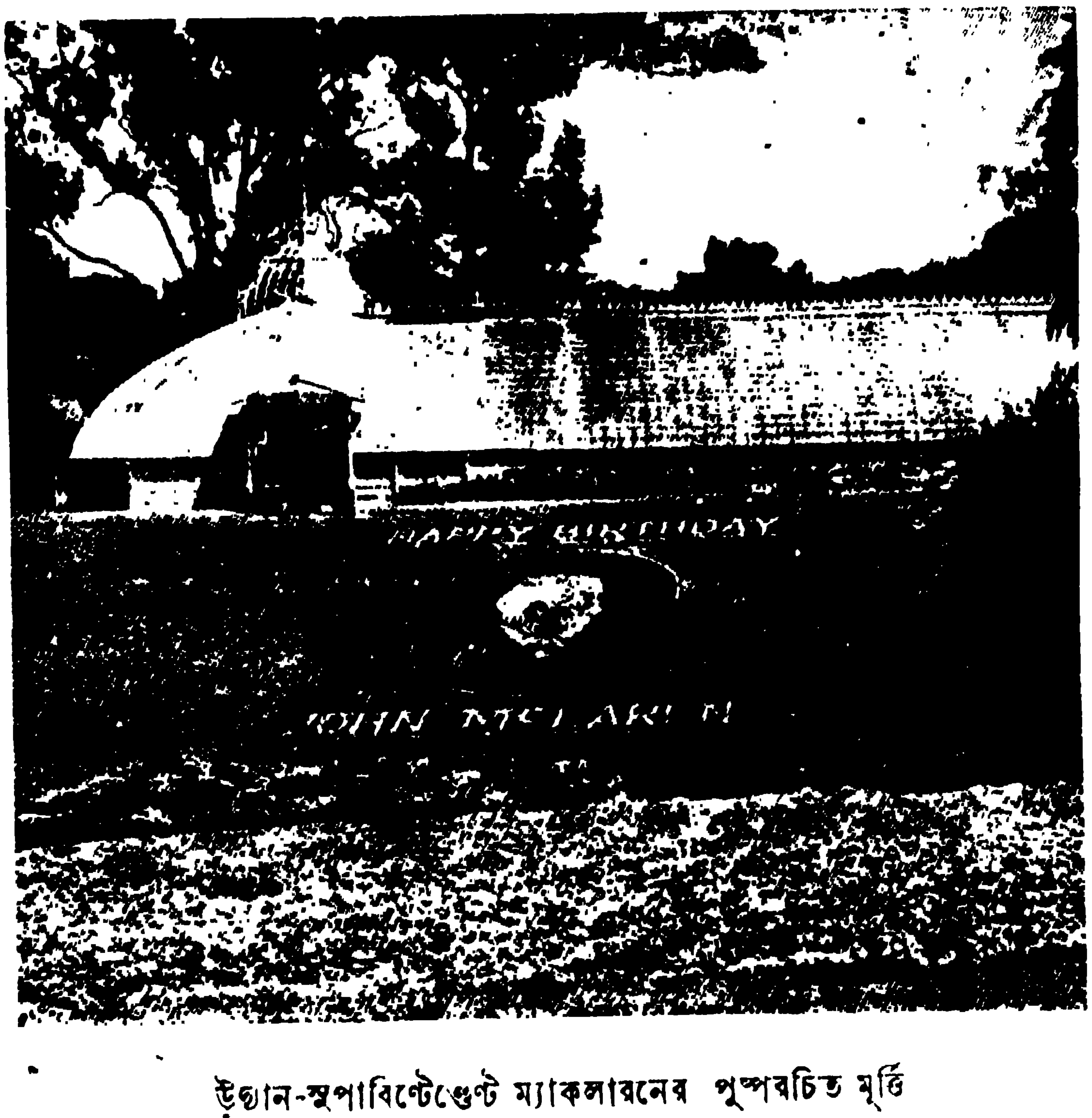

উদ্যান-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ম্যাকলারনের পুষ্পরচিত মূর্ত্তি

সাঁনফ্রান্সিস্কোয় দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

রাত্রিকালে উপসাগরের পূর্ব্বভাগে একটা বিদ্যুতের ঝর্ণা উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী

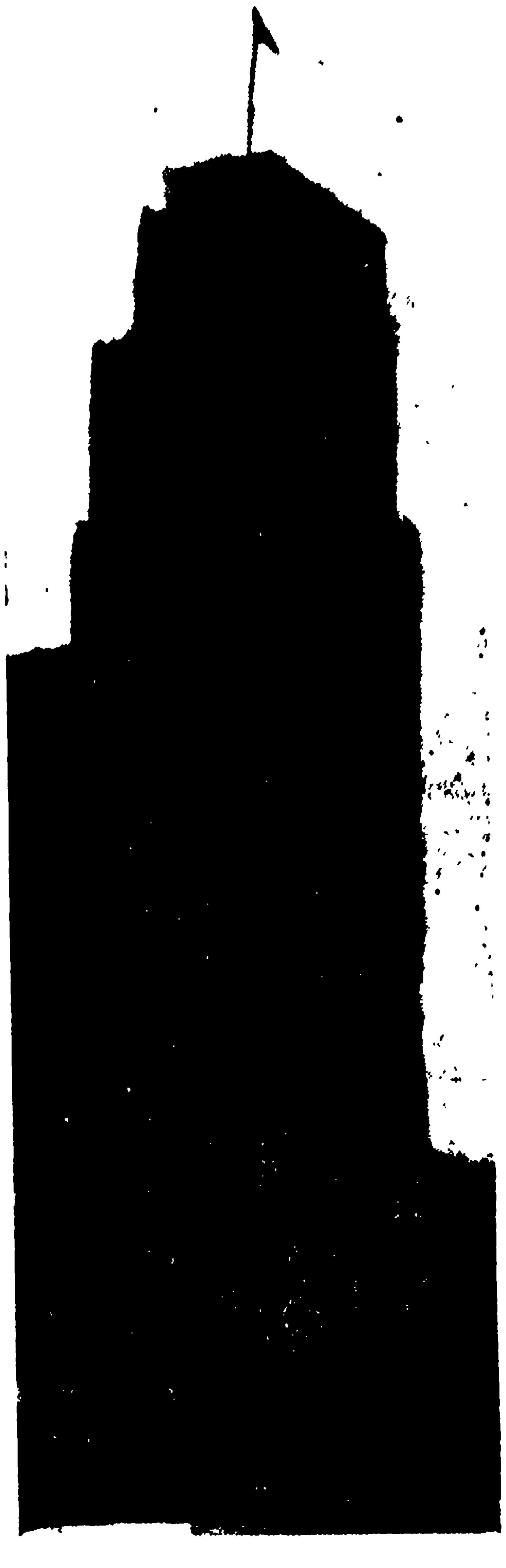

২৮ তলা ধর্ম্মমন্দির ও হোটেল

মাউণ্ট ডায়াব্লোর উপর বিমানের জন্য এই আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১ শত ৫০ মাইল দূর হইতে বিমানচালক উহা দেখিতে পায়।

উপসাগরের উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব কিছু দিন

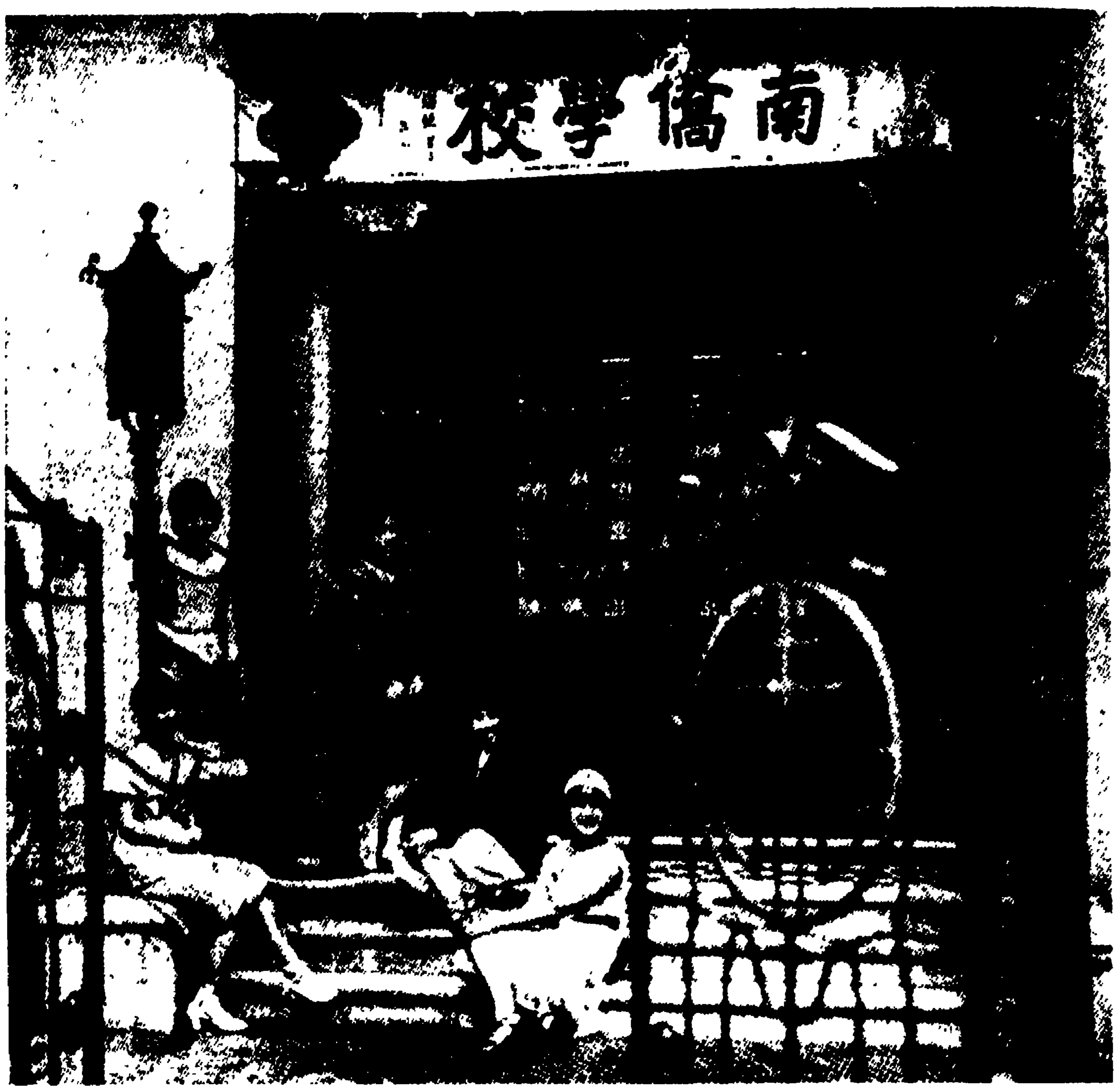

চীনা বালিকাবিদ্যালয়—চীনা-তরুণীদল

চীনাপল্লীর পথে চৈনিকসংবাদলিপি

ধরিয়া হইতেছিল। এই সেতু নির্ম্মিত হইলে সান্‌ফ্রান্সিস্কোর সহিত ওক্‌ল্যাণ্ডের সংযোগ হইবে। এখন উহা কার্য্যে পরিণত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বড় বড় এঞ্জিনীয়ার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সমুদ্রগর্ভে স্তম্ভ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। এমন বৃহৎ সেতু পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখনও নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া অভিজ্ঞগণ বলিতেছেন। উহা দৈর্ঘ্যে ৮ মাইল হইবে, উচ্চতা ৬ শত ৮০ ফুট। এই সেতু-নির্ম্মাণকল্পে ৫ বৎসর সময় লাগিবে। ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মুদ্রা ব্যয় পড়িবে।

প্রসিদ্ধ রাজপথ

সান্‌ফ্রান্সিস্কোর প্রাচীনতম ধর্ম্মমন্দির

সান্‌ফ্রান্সিস্কোর টেলিফোন্‌ ও টেলিগ্রাফ আপিস

এই সেতুতে মোটর-গাড়ী চলিবার জন্য ৯টি স্বতন্ত্র গলিপথ থাকিবে। অন্যান্য গাড়ী মোটর-বাসের জন্য দুইটি বিস্তৃত পথের ব্যবস্থাও হইবে। ইহাতে ঘণ্টায় ১৫ হাজার গাড়ী সেতু অতিক্রম করিবে। এঞ্জিনীয়ারগণ অনুমান করিতেছেন, এইরূপে সারা বৎসরে ৪ কোটি গাড়ী সেতুর উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারিবে।

সান্‌ফ্রান্সিস্কো উপসাগরে বৎসরে ৭ হইতে ৮ হাজার জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে। উপসাগরের সান্নিধ্যে অধুনা ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোক বাস করিয়া থাকে।

নববর্ষে স্নানার্থী অলিম্পিক ক্লবসদস্যগণ

এই নগর যেমন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, তেমনই গণতন্ত্রমূলক। নগরের মধ্যে রঙ্গালয়সমূহ দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছে। একটি রঙ্গালয় এমন প্রশস্ত যে, তথায় ১১ হাজার দর্শকের বসিবার আসন আছে।

অনেক দিন হইতেই সান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরে সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। অনেকগুলি মাসিক, দৈনিক পত্র তথায় বাহির হইয়া থাকে। "ওয়াস্প," "আল্‌টা কালিফোর্ণিয়া," "ওভারল্যাণ্ড মন্থলী," "নিউজ লেটার" ম্যারিয়টের প্রতিষ্ঠিত। "লণ্ডন ইলস্‌ট্রেটেড নিউজ" যাহার সৃষ্টি, তিনিই উল্লিখিত পত্রগুলির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার চেষ্টায় বহু নবীন লেখক সাহিত্যসেবায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। "আর্গোনট"ও অনেক লেখক-লেখিকার রচনা মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে যশস্বী করিয়া দিয়াছে। তন্মধ্যে মেরী অষ্টিন, এম্বোস্‌ বিয়ার্স, জ্যাক লণ্ডন, ষ্টুয়ার্ট এডোয়ার্ড হোয়াইট, ফ্রাঙ্ক এবং ক্যাথলিন্‌ নরিস্‌, গার্টড্‌ এথারটন্‌ এবং পলস্থপ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক লেখক মার্ক টোয়েন এইখানেই তাঁহার প্রথম সাহিত্য-রচনার বেদীপীঠ পাইয়াছিলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে তিনি বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

উক্তাধারণ

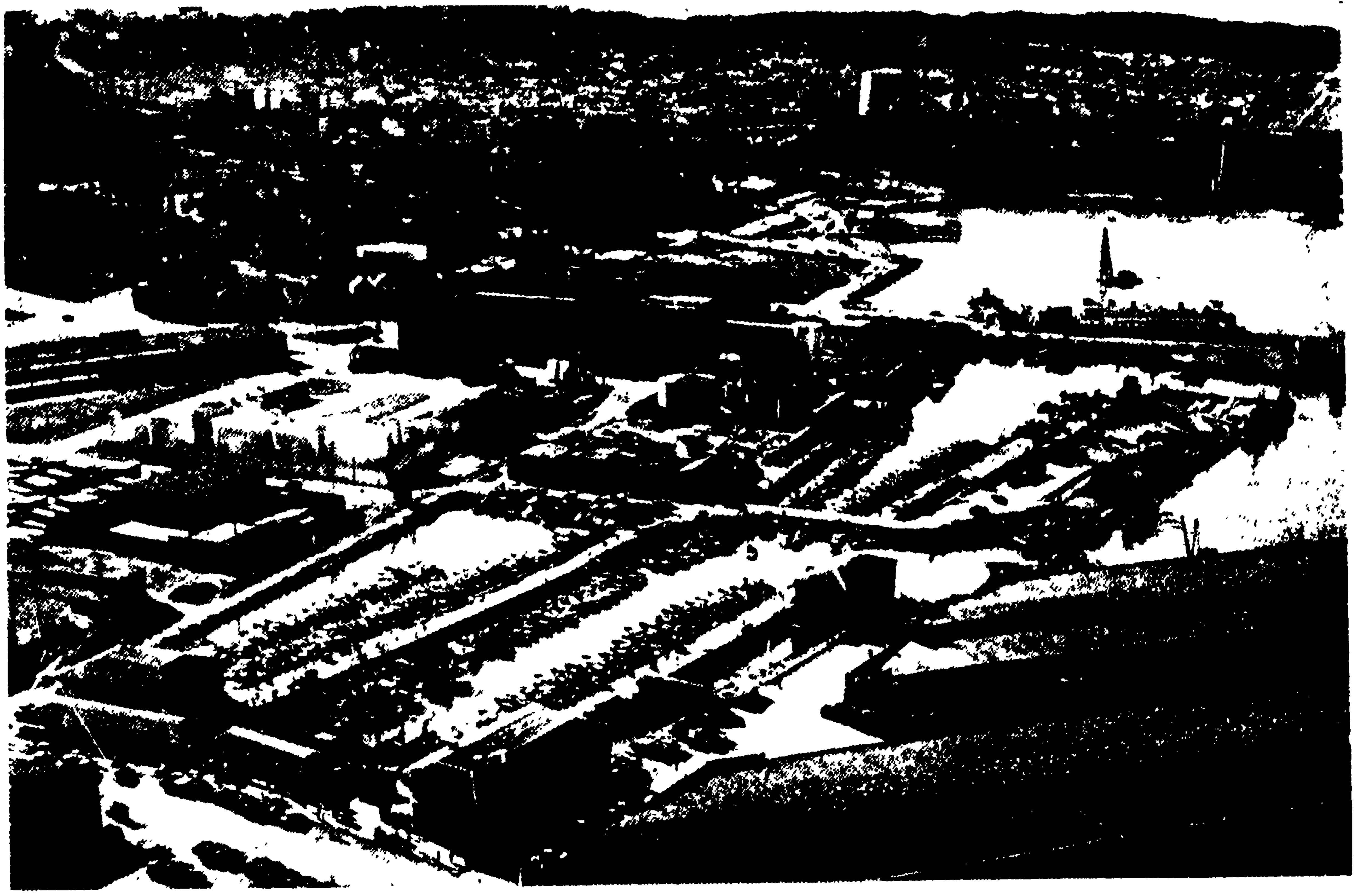

বন্দর—সমুদ্রগামী মৎস্য ধরিবার নৌকাসমূহ

আর্টিমস্ ওয়ার্ড, বব ইঙ্গারসল্, বিলনাই, ওয়াল্ট হুইটম্যান্ এবং হেন্‌রী ওয়ার্ড বিচার প্রভৃতির বক্তৃতা শুনিবার জন্য জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিত।

এইখানেই ফিনিয়াস থেয়ার "কেসে অ্যাট্ দি ব্যাট" রচনা করেন। ডি উল্‌ফ হপার উহা বোহেমিয়ান্ ক্লাবে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বহু নাটক রচিত হইয়া এখানকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে।

সান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরে সকলেই ব্যায়ামপ্রিয়। নববর্ষের দিন অলিম্পিক ক্লাবের সদর-দরজা হইতে ২ শত লোক স্নানোপযোগী বেশভূষা করিয়া সমুদ্রজলে অবগাহন করিয়া থাকে। প্রাচীন প্রথা অনুসারে এই ভাবে সমুদ্র-স্নানের নামে ব্যায়াম করা হইয়া থাকে। ডলফিন ক্লাবের সদস্যগণ শরৎকালে সমুদ্রবক্ষে সন্তরণ করিয়া থাকেন।

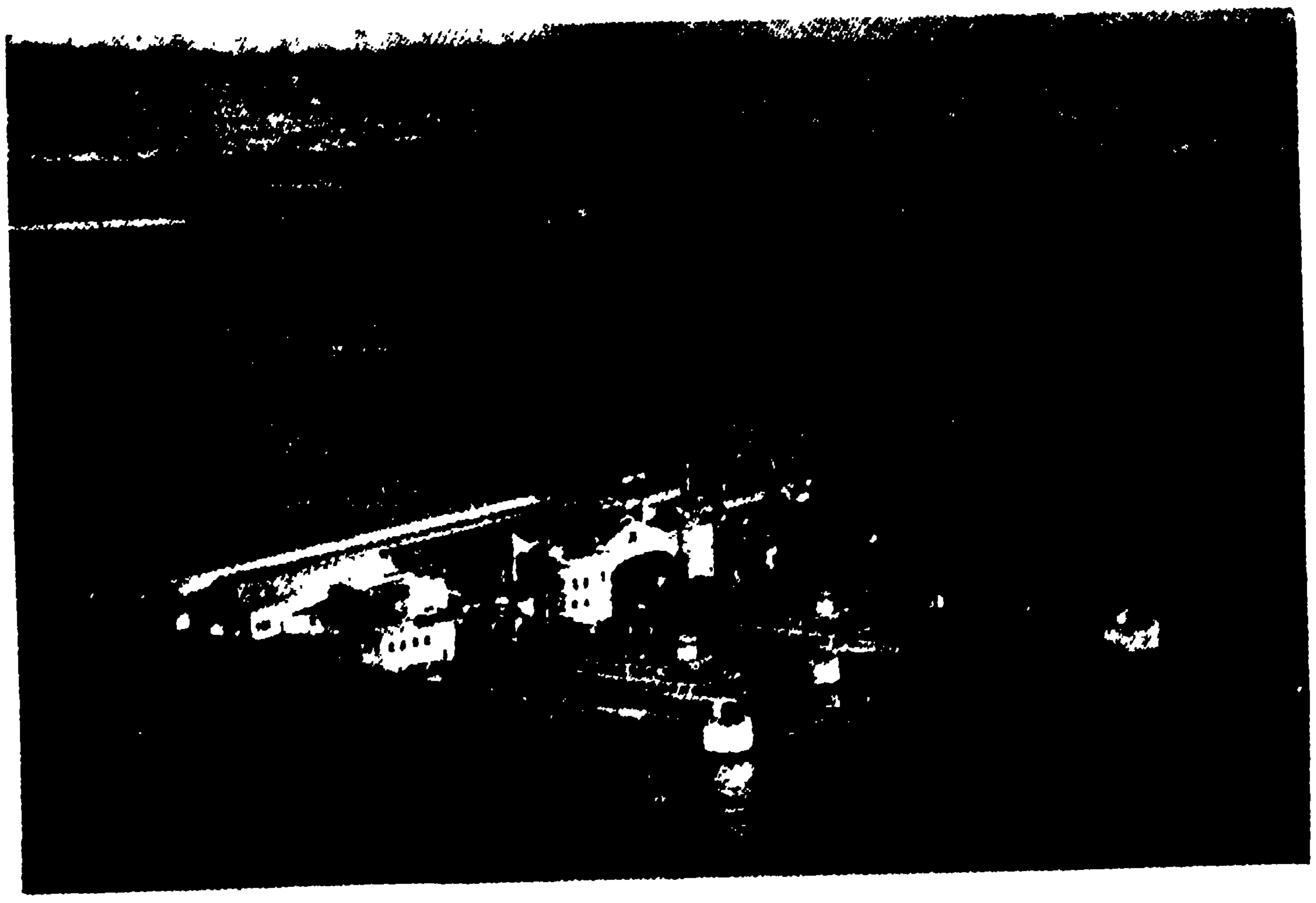

সমুদ্রগর্ভস্থ জেটি

সান্‌ফ্রান্সিস্কো নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া এখানে পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি বিশেষ হয় না। শীতকালে ৪৬ ডিগ্রীর নীচে তাপমান যন্ত্র নামে না। গ্রীষ্মকালে ৬৫ ডিগ্রীর বেশী হয় না। ব্যায়ামপ্রিয় লোকের সংখ্যা এখানে অত্যধিক। সর্ব্বপ্রকার ব্যায়ামানুরাগী নর-নারীই এখানে দেখিতে পাওয়া

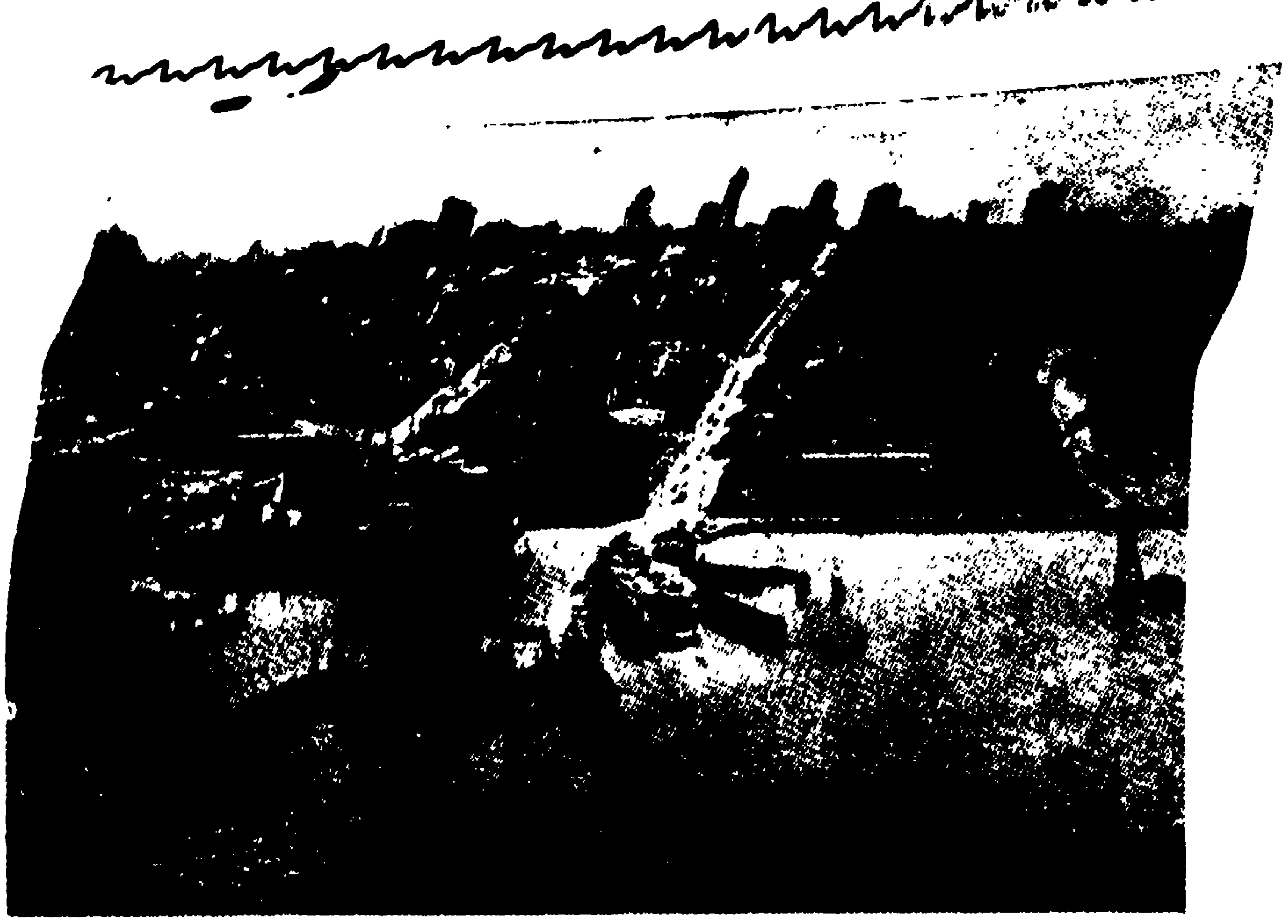

সান্‌ফ্রান্সিস্কোর জেটির একাংশ

যাইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধানুকী হইতে তীরধনুযোগে আফ্রিকার সিংহ-নিহতকারী ব্যায়ামবীর এখানে বিদ্যমান।

সান্‌ফ্রান্সিস্কোর স্বর্ণতোরণ উদ্যানের শোভা দেখিলে আলাদীনও তাহার ঐন্দ্রজালিক প্রদীপ নৈরাশ্যভরে ফেলিয়া দিত, প্রত্যক্ষদর্শীরা এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জন্‌ ম্যাকলারন্‌ নামক এক জন শিল্পী এই উদ্যানকে স্বর্গীয় মাধুর্য্য ও রমণীয়তায় নবজীবন দান করিয়াছেন। অর্দ্ধশতাব্দীর প্রাণপণ চেষ্টায় এই উদ্যান জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই উদ্যানমধ্যে বিচরণকালে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না যে, উহা কৃত্রিম উদ্যান। জলপ্রপাত, অরণ্য, অরণ্যচর পশু প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইবে, স্বভাবজাত এক রমণীয় উদ্যানে মানুষ পরিভ্রমণ করিতেছে। এক জন স্কটল্যাণ্ডবাসী শিল্পীর উদ্ভাবন-কৌশলে এমন বিচিত্র ব্যাপার সম্ভবপর, ইহা অনুমান করাই কঠিন।

এই উদ্যানটি অত্যন্ত বৃহৎ। এমন কি, ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে অনেক ছোট ছোট বন্য জন্তুও আশ্রয় লইয়া থাকে। তিব্বত হইতে রোডোডেনড্রেন্‌ পুষ্প আনীত হইয়া উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। শিল্পী ছাত্রগণ এখানে আসিয়া স্মৃতিস্তম্ভগুলির নক্সা লইয়া যায়। রবার্ট বারন্‌স্‌এর একটি ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি উদ্যানমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিটোভেনের মূর্ত্তিও বাদ পড়ে নাই। প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষাধিক দর্শক এই উদ্যান দর্শনে আসিয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্বপ্রকার দর্শনীয় বস্তু এখানে বিদ্যমান।

গবেষণার জন্য এখানে মিউজিয়ম আছে। নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতির গবেষণার বহু বস্তু উদ্যানমধ্যে পাওয়া যাইবে। নৃতত্ত্ব-সংক্রান্ত যাদুঘরে ৮০ হাজার মূল্যবান্‌ নিদর্শন আছে। পৃথিবীর কোনও নগরে এমন সংগ্রহ নাই। উদ্যান-রচয়িতা জন ম্যাকলারন্‌ ৮৫ বৎসর বয়সে এখনও এই উদ্যানে কায করিতেছেন।

আলকারাজ দ্বীপ—সামরিক বন্দিনিবাস

সান্‌ফ্রান্সিস্কো আহারের জন্য প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সৌখীন রুচিকর আহার্য্য যেমন প্রচুর পাওয়া যায়, এ দেশের অধিবাসীরা তেমনই পরিপাটীরূপে আহার করিতেও জানে। য়ুরোপের কয়েক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাচক সান্‌ফ্রান্সিস্কোয় আসিয়া বসবাস করিতেছে। ইহারা রকমারী আহার্য্য উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে জানে। রন্ধন-শিল্পে তাহাদের দক্ষতা অতুলনীয়। সান্‌ফ্রান্সিস্কোর বহু গৃহস্থ পরিবার রেস্তোরাঁয় আহার সমাপন করিয়া থাকেন। অথচ উত্তম আহার্য্যের জন্য ব্যয়াধিক্য হয় না।

শ্রমশিল্পের অভ্যুদয় এখানে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। উপসাগর-সন্নিহিত জেলা-সমূহে ৩ হাজার ৭ শত কারখানা আছে। বিবিধ বস্তু তাহাতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য নানাদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ফুলের চাষও এ অঞ্চলে প্রচুর। নানাবিধ ফুলের অপর্য্যাপ্ত চাষ হইয়া থাকে। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ভায়োলেট—ফুলের অসংখ্য নাম এবং অসংখ্য শ্রেণী আছে। আবার কৃত্রিম ফুলের কারখানাও দেখিতে পাওয়া যাইবে। সে ফুল দেখিয়া আসল-নকলের পার্থক্য বুঝা কঠিন।

বহু চীনা এ দেশে আসিয়া বসবাস করার ফলে তাহাদের সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে ৭ হাজার চীনা নরনারী আছে। ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে সহরের মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী। তিন পুরুষ ধরিয়া বসবাস করিয়া চীনারা তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিলেও, তাহারা চীনা ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। চীনা খৃষ্টান মন্দিরে গতায়াত করিলেও তাহারা কনফিউসসের নীতি-কথা পাঠ করিয়া থাকে।

চীনা তরুণীরা মার্কিণ কিশোরীদিগের সাহচর্য্যে আসিয়া তাহাদের বেশ-ভূষা নকল করে সত্য। মার্কিণী তরুণীদিগের মতই তাহারা সর্ট স্কার্ট পরিধান করে। কিন্তু বিবাহের পর তাহাদের আর এক মূর্ত্তি। তখন আময়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহাদের পিতামহী বা মাতামহীরা যেরূপ বেশভূষা পরিয়া থাকেন, তাহাদের পরিধেয় বসনাদি ঠিক তাহারই অনুরূপ হইয়া থাকে।

সান্‌ফ্রান্সিস্কো সকল দেশের, সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের লোকের বাসভূমি। এত বিভিন্ন জাতির সমন্বয় আর কোথাও নাই। অথচ কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। সকলেই নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করিতেছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মুক্তিমন্ত্রের পুরোহিত বিপিনচন্দ্র

৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা দেড় ঘটিকার সময় বাঙ্গালার অগ্নিযুগের মাতৃমন্ত্রের পুরোহিত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ৭৬ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসরোগে তাঁহার বালিগঞ্জ-এভেনিউস্থিত আবাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বের বৃহস্পতিবারেও তিনি মাদ্রাজের কোন পত্রের জন্য 'Autonomy and Federation' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। পরিণতবয়সে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাঁহার এই সাহিত্য, রাজনীতি ও সংবাদপত্র-সেবা তাঁহার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ষট্‌সপ্ততিবৎসরবয়সে স্বাস্থ্য ও শক্তির সদ্ব্যবহার এমনভাবে কয় জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন?

শ্রীহট্ট জেলার পইল নামক গ্রামে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে বিপিনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত রামচন্দ্র পাল মহাশয় জমিদার। তিনি মুনসেফীও করিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন। তাই যখন বিপিনচন্দ্র যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষালাভ করেন, তখন তিনি বিপিনচন্দ্রকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র সে জন্য বিচলিত হন নাই। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন, দারিদ্র্যের ভয় তাঁহাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এই মনোবৃত্তি হেতু তিনি যে নিয়মানুগ পথের পথিক ছিলেন, পরিণত বয়সে দেশের কোনও আন্দোলনই তাঁহাকে তাঁহার সেই বিশ্বাস হইতে টলাইতে পারে নাই।

প্রথমে শ্রীহট্টের সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্যের পেষণে তিনি এফ, এ, পাশ করিয়াই প্রথমে কটক কলেজে ও পরে বাঙ্গালোরে নারায়ণস্বামী মুদেলিয়ার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যবিধাতা তাঁহার জন্য যশের অন্য পথ নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে তিনি সংবাদপত্র-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দেশবন্ধু দাশের পিতা

বিপিনচন্দ্র পাল

৺ভুবনমোহনের "ব্রাহ্ম জনমত" নামক এক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতেই তাঁহার সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক জীবনের আরম্ভ। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্র সম্পাদনকালে তিনি লাহোর কংগ্রেসে (তৃতীয় কংগ্রেস) যোগদান করেন। তখন হইতেই তিনি বাঙ্গালার ও ভারতের 'জাতীয়তার জনক' সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছু দিন মেটকাফ হলে অবস্থিত কলিকাতা সাধারণ পুস্তকালয়ে (অধুনা Imperial Library) লাইব্রেরিয়ান হইবার পর তিনি একাধিকবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রা করেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি একে একে 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'বন্দে মাতরম্', 'স্বরাজ', 'ডিমোক্রাট' 'ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট', 'হিন্দু রিভিউ', প্রভৃতি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ঐ সময়ে তিনি 'নারায়ণ', নবপর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' এবং 'বিজয়া' পত্রেও নিয়মিতভাবে লিখিতেন। পরে তিনি বহুজ্ঞানগর্ভরচনাসম্ভারে 'মাসিক বসুমতীর' অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 'দৈনিক বসুমতীতেও' কখনও কখনও তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। তাঁহার রচিত উপন্যাস 'শোভনা', 'ভারত-সীমান্তে রুস', 'জেলের কথা,' 'ভারতের জাতীয়তা', 'চরিত্র-চিত্র', 'গল্পগ্রন্থ' 'সত্যমিথ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থেরও নাম আছে। তাঁহার 'ভারতের আত্মা' ও 'জাতীয়তা ও সাম্রাজ্য' প্রমুখ কয়খানি গ্রন্থও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

কিন্তু বিপিনচন্দ্র এ সকলে যত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা তাঁহাকে তদপেক্ষা বহু উর্দ্ধে স্থান দান করিয়াছে। তাঁহার মধ্যযুগের জীবন—স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ যুগের জীবনই তাঁহাকে দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনেতৃগণের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিয়াছিল। সেই যুগে তিনি বাঙ্গালা ও মাদ্রাজের তরুণগণকে তাঁহার বাগ্মিতাশক্তির দ্বারা উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার কণ্ঠে আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত লাভাপ্রবাহের মত দেশজননীর বন্দনাগান যে ভৈরবরাগে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহা দেশের নর-নারী কখনও ভুলিতে পারিবে না। সে বক্তৃতা-গৈরিক-নিঃস্রাবে দেহ রোমাঞ্চিত হইত, ধমনীতে তড়িৎসঞ্চার হইত, জাতির যশোগৌরব-স্মরণে নয়নে পুলকাশ্রু প্রবাহিত হইত। কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, উভয় ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। যাঁহারা বিপিনচন্দ্রের বাঙ্গালা ও ইংরাজী বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অপূর্ব্ব শব্দবিন্যাসের অন্তরাল হইতে নিশ্চিতই দেশাত্মবোধের অনুভূতির রসাস্বাদ করিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র চিরদিনই নব্য-ভারতের দেশপ্রেমিক, চিন্তাশীল, রাজনীতিকগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার রাজনীতির সহিত কূটবুদ্ধি স্বার্থান্বেষীর উচ্চপদ-কামনা ও দলগঠনের সম্পর্ক ছিল না, দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত বিপিনচন্দ্রের রাজনীতি গভীর চিন্তামূলক ছিল। বর্ত্তমান ভারতের জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের উন্মেষ-সাধনে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব, অরবিন্দের প্রেরণা এবং বিপিনচন্দ্রের দার্শনিকতা কতখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক নির্ণয় করিতে পারিবেন। 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের যে অভিনব উৎসের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, কবি মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহাদের অমর অবদানে যাহা অবিনশ্বর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী যুগে সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার স্বদেশী ও বয়কটের চিরস্মরণীয় যুগে—১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর তারিখ যখন 'জাতীয় দিবস' বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল, তখন তাহার প্রথম সাম্বৎসরিক পর্ব্ব উপলক্ষে বিপিনচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"We dedicate this day to that Patriotism which finds its fulfilment in Humanity." তাঁহার স্বদেশপ্রেম মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ সাধনেরই নামান্তর ছিল। উহাই তাঁহার রাজনীতির দার্শনিকতা।

বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনকালে বিপিনচন্দ্র দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমারের সহিত একযোগে মাতৃমন্ত্র-প্রচারে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি একাধিকবার দুঃখ-বিপদও বরণ করিয়াছেন। উহাই বিপিনচন্দ্রের রাজনীতিক জীবনের চরমোৎকর্ষের যুগ। সে সময়ে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তিনি শত শত সভায় স্বভাবসিদ্ধ জ্বালাময় বক্তৃতায় দেশের তরুণগণকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ধ্বনিত 'বর্জ্জন' এবং 'ভিক্ষা চাই না' মন্ত্র তখন বাঙ্গালায় জাতীয় পতাকারূপেই গৃহীত হইয়াছিল। সে উৎসাহ উদ্দীপনা

যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালার সে যুগের বিপিনচন্দ্রের ধারণা করিতে পারিবেন না। একবার ১৯০৭ খৃঃ 'বন্দে মাতরম্' পত্রের আদালত অবমাননা অপরাধে ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান হইতে অসম্মত হইয়া এবং আর একবার ১৯১১ খৃঃ রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি এক দিনও তাঁহার গৃহীত 'নিয়মানুবর্ত্তিতা' নীতি হইতে তিনি এক বিন্দুও বিচলিত হন নাই। তিনি পরলোকগত ভারত-তিলক তিলক মহারাজের 'হোমরুল' আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। সে সময়ে এ দেশবাসী 'লাল, বাল ও পাল' অর্থাৎ লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের নাম রাজনীতিক্ষেত্রে একই সূত্রে গ্রথিত করিত। লালা লাজপৎ রায় কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে নেতৃত্বকালে মহাত্মা গান্ধীর 'অসহযোগ' নীতির বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র বরিশাল কনফারেন্সের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু দাশের প্রস্তাবিত 'অসহযোগ' প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বাঙ্গালার তরুণ সমাজের সকাশে ও রাজনীতিক্ষেত্রে গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইতে আরম্ভ করে। যে বিপিনচন্দ্র এক দিন (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' পত্রের প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইলে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া ৬ মাস কারাদণ্ড মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বিপিনচন্দ্র বিলাতে অবস্থানকালে 'স্বরাজ' পত্রে 'Aetyology of Bombin Bengal' প্রবন্ধ লিখিয়া বোম্বাইএ পদার্পণ করিয়াই ১ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন,—সেই বিপিনচন্দ্রই পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর 'ইণ্ডে-পেণ্ডেণ্ট' পত্রে অসহযোগ মন্ত্র সমর্থন করিতে না পারিয়া উহার সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। মূলনীতির তিনি দৃঢ় উপাসক ছিলেন। কিন্তু দেশের তরুণ তাঁহার সে 'অপরাধ' মার্জ্জনা করে নাই। তদবধি তিনি একাধিক ক্ষেত্রে 'দেশদ্রোহী' আখ্যালাভও যে করেন নাই, এমন কথা বলা যায় না।

জীবন-মধ্যাহ্নে বিপিনচন্দ্র

বিপিনচন্দ্র মনে প্রাণে বঙ্গ-জননীকে ভালবাসিতেন, তাই তিনি বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের উপাসক ও প্রচারক ছিলেন। বাঙ্গালা অন্য প্রদেশকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছে, সেই বাঙ্গালা যে অপর কোনও দেশের রাজনীতিক কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবে না, ইহাই ছিল তাঁহার মন্ত্র। এই মন্ত্রের পুরোহিতরূপে জীবনে ভিন্নপ্রদেশীয় কোন নেতার নেতৃত্বই তিনি স্বীকার করেন নাই। সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযানের মূল সূত্র এইখানেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এই হেতু রাজনীতিক বিপিনচন্দ্রকে তাঁহার যৌবনে ও প্রথম প্রৌঢ়দশায় বাঙ্গালী যে ভাবে পাইয়াছিল, বার্দ্ধক্যে সেই ভাবে পায় নাই। সম্ভবতঃ এই হেতুই আজীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনে পরিণতবয়সে তিনি ভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সাহিত্য, দর্শন, সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি, ইতিহাস, পুরাণ—বিপিনচন্দ্রের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল।

সাহিত্যিক, দার্শনিক ও রাজনীতিক বিপিনচন্দ্রের সামাজিকতা ও সহৃদয়তাও সমভাবে ফুটিয়াছিল। তাঁহার সরলতা, আতিথেয়তা, সুহৃত্তা এবং দয়াদাক্ষিণ্যের কথা বিস্মৃত হইবার নহে। "সত্তর বৎসর" শীর্ষক তাঁহার জীবন-কথা-সম্বলিত প্রবন্ধ তিনি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন; উহা তিনি সাঙ্গ করিয়া যাইতে পারিলেন না। সাঙ্গ হইলে তাঁহার যুগ ও জীবনের বহু বিস্ময়কর কাহিনী আধুনিক যুগের বাঙ্গালী জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত। বাঙ্গালীর আরও দুঃখ এই যে, মাতৃ-মন্ত্রের পুরোহিত আপনার জীবনে দেশ-জননীর জন্য মুক্তি-সমরের পরিণাম দেখিয়া যাইতে পারিলেন না!

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

('শ্রীম')

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান অন্তরঙ্গ গৃহী ভক্ত, গুপ্তযোগী, অন্তঃসন্ন্যাসী, অক্লান্তকর্ম্মী, দেশে বিদেশে বিখ্যাত Gospel of Sri Ramkrishna পুস্তক প্রণেতা এবং বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের লেখক 'শ্রীম' আর ইহলোকে নাই। সাধু, ভক্ত, বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সকলের প্রাণে দারুণ দুঃখের শেল আঘাত করিয়া এই মহাপুরুষ গত ৪ঠা জুন, ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতঃ ৬টার সময় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করিয়াছেন। শেষ মুহূর্ত্তে "গুরুদেব!—মা,—কোলে তুলে নাও!" শেষ নিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয় এবং এই আজন্ম-ভক্তের এই শেষ প্রার্থনা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিশ্চয়ই পূর্ণ করিয়াছেন। যে আনন্দধাম হইতে ঠাকুরের এই পরম ভক্তটি আগমন করিয়াছিলেন, আবার কর্ম্মশেষে সেই আনন্দধামে আনন্দময়ের সকাশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সেখানে তিনি প্রভু-সন্নিধানে অচ্ছেদ্য ও অনন্ত শান্তি উপভোগ করুন, ভক্তমণ্ডলী আজ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এই আশা ও তাঁহার শ্রীচরণে সাগ্রহে এই প্রার্থনা করিতেছেন।

১২৬১ সালের ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার ইংরাজী ১৮৫৪ খৃঃ ১৪ই জুলাই নাগপঞ্চমীর দিনে মহেন্দ্রনাথ কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমলাপল্লীস্থ শিবনারায়ণ দাসের লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মধুসূদন গুপ্তের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। গুপ্ত-দম্পতি বড়ই ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। কথিত আছে, একে একে দ্বাদশটি শিব-পূজার ফলে এই পুত্রটি জন্মিয়াছে এই বিশ্বাসে মধুসূদন পুত্রটিকে অতিশয় ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং যেন কোন অনিষ্ট না হয়, এই ভয়ে মহেন্দ্রের সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক থাকিতেন। বালক মহেন্দ্র অতিশয় সুশীল ও মাতাপিতার বাধ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মহেন্দ্র পরিবারবর্গের সঙ্গে মাহেশের রথ হইতে ফিরিবার পথে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে অবতরণ করেন। তিনি বলিতেন, এই সময় তিনি কালী-মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট-মন্দিরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে থাকিলে কে এক জন আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা দেখান। মধ্যে মধ্যে তিনি বলিতেন যে, হয় ত তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই বা হইবেন! এই সময় (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে) ঠাকুরের প্রেমোন্মাদের আরম্ভকাল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী মাষ্টার মহাশয় হইতে এক বা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ মহেন্দ্রনাথ হইতে বয়সে ৭।৮ বৎসর কনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার জন্মের পরবৎসর রাসমণির ঠাকুর-বাড়ীর প্রতিষ্ঠা হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহেন্দ্রনাথ মধুসূদনের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা জন্মে। সর্ব্বকনিষ্ঠ কিশোরীও শ্রীশ্রীঠাকুরের এক জন বিশিষ্ট ভক্ত,এবং মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় সর্ব্বদাই ঠাকুরকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন কলিকাতায় ভক্তমন্দিরেও ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। কিশোরীও মহেন্দ্রনাথের মত সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং উভয় ভ্রাতায় খুব প্রীতি ও সখ্য ছিল। বাল্যেই মহেন্দ্রনাথের পিতা তাঁহাদের নূতন বাড়ী ১৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে উঠিয়া আসেন।

মহেন্দ্রনাথ বাল্যে হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান সর্ব্বদাই অধিকার করিতেন। যখনই স্কুলে যাইতেন বা স্কুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখনই ঠনঠনিয়ায় মা সিদ্ধেশ্বরী কালীর ওখানে প্রণাম ও পটলডাঙ্গায় কলেজ-ষ্ট্রীটস্থ শীতলা মাতার মন্দিরে প্রণাম করিতে কখন ভুলিতেন না। তিনি বলিতেন, কেহ এরূপ করিতে শিক্ষা না দিলেও স্বতঃ এইরূপ ভক্তিভাব তাঁহার মনে জাগ্রত হইত। বাল্যের এই ভক্তিপ্রবণতা উত্তরকালে পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক জন আদর্শ ভক্তে পরিণত করিয়াছিল। যাঁহারাই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার গভীর, অনাড়ম্বর, ঐকান্তিক ভক্তির কথা অবগত আছেন। তাঁহার মাতৃভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্রথম যখন তাঁহার মন নিরাকারের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিত, তখন কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে সাকার নিরাকার উভয়ই সত্য, এইটি বার বার বলিতেন। মৃন্ময়ী মূর্ত্তির উপাসনা বা সে স্বরূপ ধ্যান করিতে প্রথম প্রথম মহেন্দ্রনাথের বাধিয়া যাইত। তাই তিনি ঠাকুরকে নিজের মাতৃমূর্ত্তি ধ্যানের কথা বলেন। ঠাকুর তাহাতে রাজী হন। কারণ, তিনি বলিতেন, 'মা—ব্রহ্মময়ীস্বরূপা।'

যাহা হউক, মহেন্দ্রনাথ অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি হেয়ার স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এফ, এ, পরীক্ষায় অঙ্কের খাতা দিতে না পারিলেও—পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং বি, এ পরীক্ষায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসার টনী (Tawni) সাহেবের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বি-এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; কিন্তু পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর এই জন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে 'সাড়ে তিনটে পাশ' বলিতেন।

"শ্রীম"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সহপাঠিগণের মধ্যে অন্যতম।

মহেন্দ্রনাথ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজে অধ্যয়নকালে ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীকে বিবাহ করেন। কেশব সেন নিকুঞ্জ দেবীর সম্পর্কে ভাই হইতেন। নিকুঞ্জ দেবীও ঠাকুর ও মা'র নিকট সর্ব্বদা যাইতেন এবং তাঁহারা উভয়ে ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন।

গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমে নড়াইলের হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি সিটি, এরিয়ান, মডেল, মেট্রো-পলিটান্ মেন ও শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী প্রভৃতি কলিকাতার বিভিন্ন স্কুলে হেডমাষ্টার বা প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সিটী, রিপণ ও মেট্রোপলিটান কলেজ-সমূহে ইংরাজী সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিষয় অধ্যাপনা করিতেন। উত্তরকালে এই কারণে তাঁহাকে লোক প্রফেসার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিয়া জানিত। তিনি 'প্রফেসার্শ কি' নাম দিয়া কিছু দিন এন্ট্রান্স পরীক্ষার ইংরাজী সাহিত্যের অর্থ-পুস্তকও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে প্রথম গমন করিলেন, তখন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামবাজারের ব্রাঞ্চ স্কুলে অধ্যাপনা করিতেন। অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে তিনি কিছু দিন সরকারী চাকরী ও তৎপরে বহু দিন সওদাগরী আপিসে কার্য্য করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিকট যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার কেশব সেনের নিকট যাতায়াত ছিল। তিনি কখন তাঁহার বাটীতে, কখন নব-বিধান উপাসনা-মন্দিরে উপাসনায় যোগদান করিতেন।

কেশব সেনকে তাঁহার অতিশয় ভাল লাগিত। আমরা শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন যে, এক একটি উপাসনার সময় তিনি এমন হৃদয়স্পর্শী ভাষায় প্রার্থনা করিতেন যে, তাঁহাকে তৎকালে একটি দেবতা বলিয়া তিনি মনে করিতেন। ভাষায় এত মাধুর্য্য ও ভাবের এত হৃদয়গ্রাহিতা তিনি আর কখন কোথাও অনুভব করেন নাই। পরে কিন্তু তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কেশব বাবু ঐ সমস্ত ভাব শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে লাভ করিতেন। কেশব বাবু গোপনে বা অতি অল্প অন্তরঙ্গ সঙ্গে প্রায় সর্ব্বদাই যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিতেন, তাহা এক্ষণে ইতিহাসরূপে সকলেরই জ্ঞান-গোচর হইয়াছে।

ঠাকুরের সাক্ষাৎলাভ করার পর মহেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-জীবনের সাধনা-কার্য্য প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইল। তাঁহার মধ্যে যে অতিশয় ভাল মাল-মশলা ছিল, তাই প্রথম প্রথম যাইতেই ঠাকুর তাঁহাকে আভাসে জানাইয়া দেন এবং তিনি বিবাহিত, এমন কি, তাঁহার ছেলে হইয়াছে শুনিয়া তিনি আক্ষেপ করিতে থাকেন। যখন ঠাকুরের সহিত মহেন্দ্র-নাথের সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি শুধু যে কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তাহা নহেন, তখন তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। Kant, Hegle Hamilton, Herbert Spencer প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত তখন তিনি জানিতেন বলিয়া নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার যে অভিমান ছিল, ঠাকুরের দুই একটি বাক্যাঘাতে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তখনই কতক কতক বুঝিতে পারিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, আর বাকি বহুবিধ বিষয় জানার নাম অজ্ঞান।

প্রথম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গৃহস্থ-সন্ন্যাসের শিক্ষা প্রাপ্ত হন। 'সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক! কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।' এই উপদেশ মহেন্দ্র ধারণা করিতে পারিতেছেন কি না, তাহাও মধ্যে মধ্যে ঠাকুর পরীক্ষা করিতেন। একবার অপেক্ষাকৃত একটু দীর্ঘকাল তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারেন নাই, তাই ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন,—'কি গো, অনেক দিন আস নাই, মাগের সঙ্গে ভাব হয়েছে বুঝি!' আবার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দেখা যাইতেছে, তিনি বলিতেছেন—'এখন হইতে বাড়ীতে থাকো, তাদের জানিও, যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার নও—তারাও তোমার আপনার নয়। এই গৃহস্থ-সন্ন্যাসের শিক্ষা মহেন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। যে কেহ তাঁহার নিকট যাইতেন, তিনিই তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ দেখিয়া তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসী ভিন্ন কখনও গৃহী বা ভোগী সংসারী মনে করিতে পারিতেন না। ঠাকুর যে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যাহারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে চাহিবে, তাহারা যুক্তাহার-বিহার হইবে, ইহা তিনি ধারণা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আহার পেট-চলা পর্য্যন্তই ছিল। পরা শোওয়া সবই অতি সামান্যভাবে নির্ব্বাহ করিতেন। সন্ন্যাসীরও কখন কখন দণ্ড-কমণ্ডলুটির প্রতি যে পরিমাণ আড়ম্বর আনুরক্তি দেখা যাইত, তাঁহার জীবনে সেটুকুও কেহ কখনও দেখে নাই। শেষের দিকে তাঁহাকে দেখিলে প্রাচীন যুগের ঋষির ছবিই মনে পড়িত। সরল জীবন-যাত্রার সহিত কি উচ্চ চিন্তাধারার সংমিশ্রণ! অহর্নিশ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা। তাঁহার নিকট কেহ কখনও গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ছাড়া politics বা sociologyর কথা কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। ৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের চারতলাটি যেন ২০।২২ বৎসর ধরিয়া একটি ঋষির আশ্রম হইয়াছিল। যখন এখানে যাও,—কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি সন্ধ্যায়—ঐ এক ঠাকুরের কথা, উপদেশ,—না হয় কোন ভক্তিশাস্ত্রপাঠ, ইহা ছাড়া আর কিছুই সেখানে পাইবে না। ঠাকুরের কথা বলিয়া শ্রান্তি ক্লান্তি বোধ নাই এবং সেই সঙ্গে Bible, কোরাণ, পুরাণ, ভাগবত, গীতা বা উপনিষৎ হইতে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধার করিয়া ঠাকুরের ভাব ও শিক্ষার পোষকতা!—এই ছিল তাঁহার জীবনের নিত্যকর্ম্ম। তিনি সর্ব্বথা অন্য কথা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভাব এই ভাবে প্রচার করাই যে তাঁহার জীবনের প্রথম ও প্রধান কার্য্য, তাহার আভাস পাওয়া যায় তাঁহার আশৈশব কর্ম্ম-প্রণালীতে। তিনি অল্পবয়স হইতেই ডাইরী বা দৈনন্দিন ঘটনার লিপি-লেখনে অভ্যস্ত ছিলেন। এই অভ্যাস না থাকিলে ঠাকুরের অমূল্য, অমৃতকল্প,

প্রাণস্পর্শী বাণী যাহা Gospel ও শ্রীকথামৃতে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়াছে, তাহা চিরবিস্মৃতির অতলজলে ডুবিয়া যাইত। শুধু কি তাই,—ঠিক ঠিক কথা রক্ষিত ও লিখিত হইল কি না, এ জন্য মহেন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে ঠাকুর পরীক্ষা করিতেন। এক দিন রাত্রিতে ঘরে আর কেহ নাই। মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন,—ঠাকুর তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ সব কেমন কথা হয়েছে?' তার পর সে দিনের কথিত সব কথা repeat করানো—যেমন মাষ্টার ছেলেদের পাঠ গ্রহণকালে করেন। আবার হইয়াছে, তাহার মধ্যে যেখানে ঠাকুরের সহিত অতি গুহ্য গোপন কথা হইতেছে, সেখানে মহেন্দ্রনাথ আর মাষ্টার নহেন—মণি, একটি ভক্ত, মোহিনীমোহন প্রভৃতি কাল্পনিক নামে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। ঠাকুর তাই এক দিন বলিয়াছিলেন—"ওঁর অহঙ্কার নাই, আর বলরামের নাই।" নিজের ব্যক্তিত্ব কর্ত্তৃত্ব একবারে পুঁছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এত দিন ধরিয়া সমগ্র বাঙ্গালাদেশে, ঠাকুরের ভাব-প্রবাহ এমনই অনাড়ম্বর, গুপ্ত প্রপাত হইতে এমন ব্যাপক-ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং শুধু বাঙ্গালা কেন, শ্রীকথামৃত

যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত মাষ্টার মহাশয়

মাঝখানে একটু ভুল যেমন হইল, অমনই সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন! এই ভাবে পরীক্ষা। তাহা না হইলে লেখকের ব্যক্তিত্ব বইএর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের উপদেশ-গুলিকে জগা-খিচুড়ি করিয়া দিত নিশ্চয়। সাধ করিয়া কি বিবেকানন্দ স্বামী Gospelএর দ্বিতীয় খণ্ড পড়িয়া ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে লিখিয়াছিলেন—Socratic dialogues are Plato all over—you are entirely hidden. I now understand why none of us attempted his life before শ্রীকথামৃত চার ভাগ যাহা প্রকাশিত আজ সমগ্র ভারতে হিন্দী, সিন্ধি, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু, মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচলিত হইয়াছে। ইহা সামান্য কথা নহে। এই অনাড়ম্বর অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের গ্রন্থ বোধ হয় যত দূর অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে, বাঙ্গালা বা অন্য কোন ভাষায় কোন পুস্তক কখন এইরূপ বহুল বিস্তারলাভ করিয়াছে কি না জানি না। Europeএও Spanish, German প্রভৃতি ভাষায় Gospel ভাষান্তরিত হইয়াছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

বড় ঘর

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বয়সের ধর্ম্ম

ক্লাসে যথারীতি লেকচার চলিয়াছে, সে-দিকে প্রভাতের মন নাই। অনন্তকে সে খোঁচাইতেছিল,—লাটু বাবুর দুর্ব্বলতা যতই থাকুক, তাঁর স্ত্রী আর মেয়েটির জন্য আমার সত্যই বেদনা জাগে!

অনন্ত কহিল,—ভারতবর্ষে বহু কোটি আর্ত্ত ব্যথিত জীব বাস করচে ভাই, তাদের ছেড়ে ওঁদের জন্যই শুধু বেদনায় আর্দ্র হ'লে মুস্কিল বাধতে পারে।

—তার মানে?

হাসিয়া অনন্ত কহিল,—মানে খুব বেশী ঘোরালো নয়। ও-তিনটি জীবই এক স্রোতে জীবন-তরণী ভাসিয়ে চলেছেন!

প্রভাত কহিল—আমি বিশ্বাস করি না···

প্রভাতের পানে গম্ভীর-মুখে চাহিয়া নির্লিপ্ত ভাবেই অনন্ত কহিল,—করো না!···বিশ্বাস করতে আমি বলচি নে!

প্রভাতের অস্বস্তি ধরিল; প্রভাত কহিল,—না, না, বিশ্বাস করবার মত facts and figures তুমি দাও। তা নয়···

অনন্ত কহিল,—ও-তর্ক থাক্ না ভাই! তোমার tenacity যে-ভাবে বেড়ে উঠছে, শেষে কি বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবে! কথাটা বলিয়া অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একটু হাসি মিশাইয়া অনন্ত প্রভাতের পানে চাহিল, তার পরই একখানা এক্সার-সাইজ-বুক টানিয়া অনন্ত তার একটা পাতায় নিবিষ্ট মনে পেন্সিল দিয়া পশু-পক্ষীর অলৌকিক সব ছবি আঁকিতে লাগিল।

প্রভাত কোনো কথা কহিল না, খোলা বইয়ের পাতায় শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মনকে লইয়া কালিকার সেই স্মৃতি-স্তূপ ঘাঁটিতে প্রবৃত্ত হইল। লাটু বাবুর কথা কিছুতেই মুহূর্ত্তের জন্য মন-ছাড়া হয় না! ঐ মূঢ় স্বামীর পাশে বেচারী স্ত্রীকে কি না সহিতে হয়! মুখে রাজা-উজীর মারিয়া বেড়াইতেছে অথচ ভিতরে সব মিথ্যা! মেয়েও ডাগর—বাপের এই মূঢ়তা কি সে বুঝিতে পারে না? নিশ্চয় পারে এবং তা পারে বলিয়াই পুতুলের মত বেচারী অমন মৌন মূক! চোখের দৃষ্টিতেও যেন গূঢ় বেদনা! তাদের সামনে বাপ যা-তা বকিয়া চলিয়াছে নির্লজ্জের মত, ইহাতে সকলে তাঁকে কতখানি হেয়-জ্ঞান করিতেছে···তাই, নিশ্চয়! তাই মেয়েটি অমন ম্লানমুখী! নিজের ভবিষ্যৎও ভাবে,···অবস্থা তো··· অনন্ত বলিল, খারাপ! তার উপর বাপের ঐ প্রকৃতি, নিশ্চয় ঘরে বসিয়া ডাগর মেয়ের জন্য মহারাজ-কুমার পাত্র আনিয়া হাজির করিবে, এমনি বকিয়া চলে। আর মেয়েটিও সে কথা শুনিয়া নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া ব্যথা-ভরে আরো আকুল, আরো কাতর হয়! কে বা সান্ত্বনা দিবে? মা হয় তো বাপেরি প্রতিচ্ছায়া!

সহসা সে ডাকিল,—অনন্ত…

অনন্ত তখন পেন্সিলের রেখায় একটা পাখী আঁকিতে গিয়া মন্দির গড়িয়া বসিয়াছে ! আঁকিয়া নিজের কলা-পটুতায় বিমুগ্ধ…

প্রভাতের কথায় সে কহিল,—কি ?

প্রভাত কহিল,—ওঁদের বাড়ীতে আর কে আছে ?

অনন্ত কহিল—কাদের বাড়ী ?

একটা ঢোক গিলিয়া প্রভাত কহিল,—লাটু বাবুর বাড়ী হে। মানে, ওঁর আর কেউ নেই ?

—না।

প্রভাত কহিল—ওঃ !

অনন্ত প্রভাতের পানে চাহিল, কহিল,—তুমি যে ওঁদের চিন্তা ছাড়তে পারচো না ! ব্যাপার কি ? অনন্তর মুখে মৃদু হাসি…

প্রভাত কহিল—এমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম…

হঠাৎ ছেলেরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রভাত চমকিয়া উঠিল। পাশের ছেলেটিকে অনন্ত জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে মশায় ?

সে জবাব দিল—ও বেঞ্চে একজন ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ পড়ে গেছে হুড়মুড় শব্দে…

প্রফেশরের কথা কাণে গেল। প্রফেশর বলিতেছিলেন,—Newly married ? or new love ? or sleepless night ?

প্রফেশরটি ভালো, নৃপেন বাবু। এম-এতে ফার্ষ্ট…ভারী মিশুক…বয়স বেশী নয়, অহঙ্কার নাই, বন্ধুর ন্যায় সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন।

ছেলেদের হাসি আর-একবার উচ্চরোলে ধ্বনিত হইল। তার পর প্রফেশরের মুখ গম্ভীর, তিনি লেক্‌চার সুরু করিলেন। শেলির skylark পড়াইতেছিলেন।

অনন্ত কহিল—শোনো হে প্রভাত। লাটু বাবুর কথা আবার কাল ভেবো রবিবারে।

প্রভাত কোনো কথা কহিল না !…

অনন্ত কহিল—কলেজের পর আমাদের ওখানে যেতে হবে—মনে আছে ?

প্রভাত কহিল—আছে। তার পর বায়োস্কোপ—তাও ভুলি নি।

অনন্ত কহিল—এখনো লাটু বাবু মনটিকে ছেয়ে বসেন নি দেখচি !

প্রভাত কহিল—তুমি যা ভাবচো, তা নয়…

কথাটা বলিতে তার গায়ে কাঁটা দিল। অনন্ত কহিল,—কি ভাবচি, বলো তো ?…

প্রভাত কহিল—সে তো বুঝচোই…

অনন্ত কহিল—না, না—সত্যি…

প্রভাত কহিল—অর্থাৎ শুধু লাটু বাবুর কথাই ভাবছিলুম—আশ্চর্য্য লোক ! আর কারো কথা ভাবি নি।

অনন্ত কহিল—তাঁর চেয়েও আশ্চর্য্য ব্যক্তি আছে…

প্রভাত দ্বিধা-ভরা দৃষ্টিতে অনন্তর পানে চাহিল,—কে ?

অনন্ত কহিল,—লাটু বাবুর কন্যা পরিমল…

প্রভাতের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সহস্র প্রশ্ন বুকের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কুণ্ঠা যে প্রভাত একটি কথা বলিতে পারিল না।

অনন্ত কহিল,—বলা উচিত নয়, একটু scandalএর মত শোনাবে হয় তো। কিন্তু…

প্রভাতের মন এ-কথায় একেবারে ভাঙ্গিয়া লুটাইয়া পড়িল। সে কহিল,—কি—বলোই না। confidential…

অনন্ত কহিল,—মানে, চারু রক্ষিতকে জানো ? আনকোরা I. C. S…ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখে, পুরাদস্তর ইংরিজি চাল, শুধু গায়ের রংটি কালো ! তিনি বিলেত থেকে ফিরে নিজের সমাজে তাঁর যোগ্য কন্যা খুঁজে পান নি বিবাহের জন্য…অবশেষে লাটু বাবুর ওখানে কি রকমে এসে উদয় হন। I. C. S. জামাই পাবেন—লাটু বাবু আনন্দে সাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন। মাসখানেক রক্ষিত সাহেব সে গৃহে চায়ের টেবিলে নিত্য অতিথি-বেশে দেখা দিতে লাগলেন, তার পর হঠাৎ অন্তর্ধান !

প্রভাত কহিল,—তার পর ?

অনন্ত কহিল,—লাটু বাবু দু'চার দিন গভীর শোকে নিমগ্ন রইলেন, মেয়ের উপর রাগ হয়েছিল খুব…রক্ষিত সাহেব কর্ম্ম-স্থল বরিশালে চ'লে গেলেন। এ আজ সাত-আট মাসের কথা ! হঠাৎ এমন হলো কেন, বোঝা গেল না।

সুগভীর মনোযোগ-সহকারে প্রভাত সব কথা শুনিল, পরে একটা নিশ্বাস রোধ করিয়া কহিল,—এর মধ্যে scandal আবার কি ? It might be, the girl refused

him. Why? Well, she had every right to refuse an unworthy suitor ··

অনন্ত কহিল,—Unworthy! বলো কি হে···I. C. S. man! ··

প্রভাত কহিল,—I. C. S. হ'তে পারে ;···I. C. S. হলেই যে man হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই!···তা নয়। আমি ভাবচি, লাটু বাবু কি জাত? রক্ষিত কি ওঁদের পাল্‌টি ঘর?

অনন্ত কহিল,—মোটে নয়, পাল্‌টি ঘরের পথ দিয়েও যায় না। লাটু বাবু চাটুয্যে হে। এবং আমি চাটুয্যেদের ব্রাহ্মণ বলেই জানি।

প্রভাত কহিল,—রক্ষিতের সঙ্গে তবে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিলেন? ব্রাহ্ম বুঝি?

অনন্ত কহিল,—তাও নন্‌।

—তবে?

অনন্ত কহিল,—Necessity has no law. যে দিন-কাল পড়েচে, তাতে জাতের বেড়া ভাঙ্গা ছাড়া উপায় নেই। Any port in storm! তা ছাড়া I. C. S. জামাই পেলে অনেকেই Hindu-Moslem pactএর রীতিমত গোলাম হ'তে রাজী আছেন!···

প্রভাত কোনো কথা কহিল না ; সামাজিক বিধির উপর সংক্ষেপে দু'চারিটা মন্তব্য করিয়া অনন্ত অবশেষে কৌতুক-ভরে কহিল,—তোমার কি 'অনুরাগো' হলো? না কি? হা সহি···you will be quite an eligible candidate!

প্রভাত কহিল,—ছি ছি, কি যে বলো! তা নয়। আমার এমন কৌতূহল হচ্ছে, ভদ্রলোক interesting character—রবিবারে নিমন্ত্রণ করলেন। যদি যাই, আগে থেকে তাঁকে একটু বুঝে নেবো না? তাঁর পরিচয় যতটুকু জানা যায়! সকলেই মেশবার যোগ্য না হ'তে পারেন।

অনন্ত কহিল,—কাল তা হ'লে যাচ্ছো···সুনিশ্চিত?

প্রভাত কহিল,—না যাবার হেতু তো দেখছি না—তুমি যাবে না না কি?

অনন্ত কহিল,—তেমন কোনো পণ অবশ্য গ্রহণ করি নি। তবে কি জানি, এক দিন গিয়ে যদি বার-বার যাবার লোভ জাগে? and when there is a girl there, দুই বন্ধুতে না শেষে···

দুই চোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া প্রভাত কহিল,—তুমি রীতিমত বর্ব্বর হয়ে উঠচো। Vulgar rather!···

অনন্ত কহিল,—আচ্ছা ভাই, চুপ করলুম। সত্যি, আর না, ঘণ্টা ওদিকে প্রায় কাবার হয়ে এলো—একটু শ্রেণির সম্মান করি। অমর কবি! তুমিও না হয় তাঁর মান একটু রাখলে···

মৃদু হাসিয়া প্রভাত কহিল,—Thank you!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছুটীর দিনে

বেলা তিনটায় অনন্তর গৃহ হইতে দুই বন্ধু যাত্রা করিল। হেদুয়ার মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়া ট্যাক্সি ধরিল ; তার পর সোজা পূব দিকে।

বাগমারির প্রান্তে রেল-লাইনের দেখা মিলিল, তার পর বাগানও ; বাগান একখানি নয়, আশে-পাশে জায়গাটুকু বন-জঙ্গলে ভরা—কচিৎ দুটা ডোবা বা জলা, নয় পড়ো মাঠ। একধারে লোণা-ধরা ইটের দুটা থাম,—ফটকে কাঠের আটক আদৌ নাই। সেই লোণা-ধরা ইটের গায়ে একখানা কাঠ মারা। দেখিলে মনে হয়, কাঠের গায়ে এককালে হয় তো রঙ ছিল ; রৌদ্রে-জলে সে রঙ দশ-বারো বৎসর পুড়ে মুছিয়া গিয়াছে এবং সেই কাঠের বুকে আঁকা-বাঁকা মোটা কালো অক্ষরে A R A M লেখা। লেখাটুকু বোধ হয় আল কাৎরায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, পরে তার উপর কয়লা বুলানো হইয়াছে। এটিকে যদি ফটক বলিয়া ধরা যায় তো এই ফটক হইতে তৃণাচ্ছন্ন পথ সোজা বহু দূরে জঙ্গলে গিয়া ঢুকিয়াছে—এবং এই পথে দাঁড়াইয়া সন্ধানী দৃষ্টি ভিতরে প্রেরণ করিলে বৃক্ষপত্রপল্লবের অন্তরালে একখানা জীর্ণ দোতলা বাড়ীর অস্তিত্বও অনুভব করা যায়।

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া প্রভাত কহিল,—এই তো A R A M লেখা—কিন্তু বাড়ী?

অনন্ত সন্ধানী দৃষ্টিদ্বারা জীর্ণ বাড়ী আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কহিল—ঐ যে বাড়ী···

—বাড়ী!

অনন্ত কহিল—তাই! Back to nature···বোঝো না?

প্রভাত কহিল,—এর মধ্যে থাকেন! এ যে মানুষের দুর্গম স্থান!

অনন্ত কহিল—শুনেচি সেকালে তপস্যা যা চলতো, তা এমনি দুর্গম স্থানেই! ধ্রুবর কাহিনী পড়েচো তো! দুর্গম স্থানে পাড়ি দিতে না পারলে কি কাম্যফল পাওয়া যায়!

হাসিয়া প্রভাত কহিল—তোমার রসচাতুর্য্য একটু থামাও, ভাই! অতিরিক্ত রস-পানে শেষে নেশা লাগবে!

দু'জনে তৃণাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। বাঁয়ে একটু দূরে একটা পুকুর—পুকুরের ধারে ধোপারা কাপড় কাচিয়া মেলিয়া দিয়াছে। ডাহিনে বাড়ী। বাড়ীখানি স্তব্ধ; জীবনের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

অনন্ত কহিল,—বাড়ীতে আছেন তো? না, শিবপুরের বাগানে বেড়াতে গেছেন?

প্রভাত কহিল,—আমাদের আসতে বলেচেন ··

তার স্বরে বিস্ময়! অনন্ত কহিল,—সেই জন্যই আশঙ্কা আরো তীব্র হয়ে উঠচে!···

কিন্তু অনন্তর ভুল। একতলার বারান্দায় উঠিতে সামনের ঘরে দৃষ্টি পড়িল। একটা উড়িয়া মালী চুলা ধরাইতেছে।

অনন্ত কহিল,—সাহেব বাড়ী আছেন?

উড়িয়া মালী কহিল,—আছেন। কাট্?···

কাট্! ওঃ, কার্ড! অনন্ত হাসিল, কহিল,—আমার তো কাট নেই। তোমার আছে প্রভাত?

প্রভাত কহিল,—না।

অনন্ত কহিল,—উপায়? ··আচ্ছা, এই কাগজে নাম লিখে দিচ্ছি। সাহেবের কাছে দিবি গিয়ে।

কবে একটা ছাতা কিনিয়াছিল, পকেটে তার ক্যাশ মেমো লেখা কাগজটা ভাজ করা পড়িয়াছিল; পেন্সিলও এক টুক্‌রা ছিল, শীষ ভাঙ্গা। নখ দিয়া কাঠের চোক্‌লা ছিঁড়িয়া পেন্সিলে শীষ বাহির করিয়া সেই কাগজে দুজনের নাম লিখিয়া অনন্ত কাগজখানা মালীর হাতে দিল। মালী কাগজ লইয়া চলিয়া গেল।···

ধূমাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে দৃষ্টি চালনা করিয়া অনন্ত দেখে, দেওয়ালে মাকড়সার জাল; মেঝেয় যেমন ধূলা, তেমনি জঞ্জাল। এক রাশ শুষ্ক নারিকেল পাতা পড়িয়া আছে, কলার বাস্‌না, ভাঙ্গা কাঠ-কাঠরা, ঘুঁটে···ঘরে কি যে নাই, বলা কঠিন।

প্রভাতের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই আবর্জ্জনার মধ্যে···

মালীর সঙ্গে দু'জনে দোতলায় উঠিল। কাঠের সিঁড়ি; দেওয়ালের মাঝামাঝি সবুজ শ্যাওলার দাগ।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতলায় একটি হল্। হলের মেঝেয় জীর্ণ মাদুর পাতা, হলে পুরানো ক'টা ফার্ণিচার। হলের দু'ধারে ঘর। একটা ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া লাটু বাবু। তাঁর পরণে লম্বা পা-জামা, গায়ে কোট, পায়ে শ্লীপার। লাটু বাবু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—এসো—আমি ভেবেছিলুম, বুঝি ভুলে গেছ!

অনন্ত কহিল,—আপনি আদর ক'রে নিমন্ত্রণ করেছেন, আর আমরা ভুলে যাবো!

—এসো এই ঘরে···হুঁঃ! আজ সারা দিন ভারী বকাবকিতে কেটেছে! ঐ কন্‌ট্রাক্টর! এক মাস হলো এষ্টিমেট এ্যাপ্রুভ ক'রে দিছি, আজ মিস্ত্রী আসচে, কাল আসচে, এই করেই কাটাচ্ছে! আগাম কিছু নিতে চাও বাপু, আমি দিতে অরাজী নই! আজ ব'লে গেল, এত দূর আসবে, মিস্ত্রীরা বেশী মজুরী চাইছে। আমি বললুম, বেশ, আমি দেবো।··· বাড়ীখানা আমূল মেরামত করতে চাই। দেখি আর এক হপ্তা। কাজ না করে, অগত্যা ঐ ম্যাকিন্টশ্‌ বার্ণ কি মার্টিন-টার্টিন কাকেও ডেকে দেবো। দেশী কোম্পানি যে উন্নতি করতে পারে না, তার কারণই হলো এই unbusiness-like ধরণ! সাধে আমাদের উন্নতি হয় না! হুঁঃ!

প্রভাত চুপ করিয়া শুনিল।

দেশের দুর্দ্দশায় কত ব্যথা পাইয়াছে, মুখে-চোখে এমনি ভাব ফুটাইয়া অনন্ত কহিল,—যা বলেচেন! এই বিলিতি যত বড় দোকানেই যাই না কেন, যাবা মাত্র কোথা থেকে লোক এসে তখনি attend করে। আর আমাদের দেশী দোকানে গিয়ে চ্যাচাতে চ্যাচাতে জান বেরিয়ে যায়, কারো খেয়াল হয় না। খদ্দের দাঁড়িয়ে, বাবুরা তখন দেশ থেকে চিঠি এলো কি না, তার চিন্তাতেই মশগুল!···এই সে দিন থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে যাওয়ার ব্যাপারে···কি বলো প্রভাত, মনে আছে? পঞ্চাশখানা বই অম্লান চিত্তে বার ক'রে দিলে···এতটুকু বিরক্তি নেই আর আমাদের ঐ গুদামের মত বইয়ের দোকানগুলো,—বই কিনতে গেলুম—দাড়ি-গোঁফ-কামানো চাঁচা-ছোলা মুখে,—বেরুবার

বসুমতী চিত্র বিভাগ। প্রদোষে শিল্পী শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

সময় দেখি, সে-মুখে করিম-চাচার মত লম্বা দাড়ি গজিয়েছে! চেনা দায়! দাঁড়াতে দাঁড়াতে দু'চার বছর বয়স বেড়ে যায়!

লাটুবাবু কহিলেন,—Ezactly so!...

ক'জনে আসিয়া ঘরে বসিল। ঘরে চেয়ার কৌচ টেবিল, এককালে মন্দ ছিল না, এখন কোনোমতে নিজেদের অস্তিত্ব যেন বজায় রাখিয়াছে। মাদুলি আঁটিয়া রোগী যেমন আপনার শীর্ণ দেহখানাকে খাড়া রাখে, ঠিক তেমনি! জোড়া-তালির অন্ত নাই। তবে সজ্জায় শ্রী আছে। টেবিলের উপর একরাশ ঝিনুক—তাও বেশ সুশৃঙ্খল-পারিপাট্যে সাজানো।

লাটু বাবু কহিলেন,—এঁদের খপর দি...একটা মহিলা-প্রদর্শনী হবে বোম্বাইয়ে—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী সেখানে তাঁর আঁকা ক'খানা পেণ্টিং পাঠাচ্ছেন কি না...

প্রভাত কহিল—উনি ছবি আঁকতে জানেন?

মৃদুহাস্যে লাটু বাবু কহিলেন—জানেন। ভালো জানেন। বহু মেডেল পেয়েছেন। বহু প্রাইজ! দেখাচ্ছি ·

লাটু বাবু উঠিলেন, উঠিয়া ঘরের প্রান্তে যে আলমারি ছিল, তার কাছ অবধি গেলেন, দাঁড়াইলেন; পরে কহিলেন,—না—নেই। সেগুলো আমার এক বন্ধুর স্ত্রী,—মানে মিসেস্ উডের কাছে। তিনি নিয়ে গেছলেন · এখন মৈমনসিংয়ে—মিষ্টার উড্ সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। চিঠি লিখবো কালই, সেগুলো ফেরৎ পাঠাবার জন্য...

লাটু বাবু ফিরিয়া আসিলেন, কৌচে হেলিয়া বসিয়া কহিলেন,—ওঁর father, মানে, আমার শ্বশুর ছিলেন আজমীর ষ্টেটের একজন কাউন্সিলার—নাচ-গান—এ-সবে তাঁর ছিল বিধি-দত্ত ক্ষমতা! তাঁর কাছে ইনি নাচ-গানও শিখেছিলেন...এখন সব ছেড়ে দেছেন—চর্চ্চা করবেন কার সঙ্গে!

প্রভাতের আমোদ বোধ হইতেছিল। অকারণ মিথ্যা—তা হোক, বলিবার ভঙ্গীটুকু খাশা! শুনিতে বেশ লাগে, অথচ এ সব গল্পে কাহারো কোনো ক্ষতি ঘটে না!...

নৃত্য-গীতের কথা হইতে আজমীরের দৃশ্য-বৈচিত্র্য, রাজার বিপুল ঐশ্বর্য্য—এমনি কত কাহিনীই যে লাটু বাবু বলিয়া চলিলেন। রোমান্সের মত! একবার লাটু বাবু বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন,—তখন বয়স কম, চেহারা ছিল সুশ্রী—একজন রীতিমত সুপুরুষ! রাজার ভারী ভালো লাগিল। নিজের হাতীতে চড়াইয়া পাশে বসাইয়া লাটু বাবুকে লইয়া মহারাজ শীকারে চলিলেন—পাহাড়ে! কম উঁচু...দুটা মনুমেণ্ট ঘাড়াঘাড়ি করিলে যেমন হয়! সেই পাহাড়ে হাতী উঠিল। রাজা বলেন,—ডর হোতা হ্যায় বেটা? লাটু বাবুর ভয় হইয়াছিল—কিন্তু তা স্বীকার করিবেন কেন? একে তো এরা বাঙালীকে বলে, ভেতো বাঙালী, ভীতু বাঙালী। তিনি চালাক ছেলে! ভয় হইলেও মুখে তা প্রকাশ করিলেন না! শেষে এক সময় হাতীর পা গেল কেমন বেকায়দায় ফস্কাইয়া! অমনি...দৈব! হুঃ রাখে কৃষ্ণ, মারে কে? লাটু বাবু একটা গাছের ডালে আটকাইয়া রহিলেন; মহারাজ জোয়ান, তাগ্ জানেন, তাঁর কিছু হইল না! উঠিয়াই তিনি ডাকিলেন,—বাপজী...

লাটু বাবু কহিলেন,—এই গাছের ডাল ধরিয়াছি!

মহারাজ পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—সাবাস!...

অনন্ত অপাঙ্গদৃষ্টিতে প্রভাতের পানে চাহিল, প্রভাত তন্ময় হইয়া গল্প শুনিতেছে!

অনন্ত কহিল,—আপনার এখানে বেশ হাওয়া।

লাটু বাবু কহিলেন,—উড়িয়ে নিয়ে যায়। ফ্যান্ ছিল। খুলে রেখেছি। ভগবানের হাওয়ার কাছে মানুষের কলের হাওয়া! আরে ছ্যাঃ!

সহসা রমণী-কণ্ঠে স্বর—কার সঙ্গে কথা কইছো?

সঙ্গে সঙ্গে লাটু বাবুর স্ত্রী আসিলেন। কহিলেন—ও! তোমরা এসেচো! আমি ভেবেছিলুম, বুঝি আসবে না ··

অনন্ত কহিল,—আপনারা আদর ক'রে আসতে বললেন, আমি একা নই, ঘরের ছেলে—স্বতন্ত্র কথা ছিল। আমার এই বন্ধুটি—

হাসিয়া লাটু বাবুর গৃহিণী কহিলেন,—ভারী খুশী হয়েছি।

প্রভাত উঠিয়া তাঁর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

লাটু বাবুর স্ত্রী কহিলেন,—বেঁচে থাকো বাবা।

লাটু বাবু কহিলেন,—তোমার বয়কে ছুটী দিলে, এখন এদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা...

লাটু-গৃহিণী কহিলেন,—কেন ব্যস্ত হচ্ছো! ওরা ছেলে, ওদের সঙ্গে লৌকিকতার দরকার নেই তো!...

লাটু বাবু কহিলেন,—তা নেই। তবে কত দূর থেকে আস্চে—

লাটু-গৃহিণী কহিলেন,—আমি ব্যবস্থা করচি। আমার ছেলে ··

বেশ স্নেহ-ভরা স্বর।

প্রভাত ভাবিতেছিল, কি ভুল ধারণাই সে করিয়াছিল! চাল যত বিগড়াক, বাঙালীর মেয়ের অন্তরে মা'র স্নেহ তেমনই জাগিয়া থাকিবে, চিরদিন! তার ব্যতিক্রম ঘটিবার নয়। বাঙলা দেশের জল-হাওয়া···তার স্পর্শে স্নেহ, মায়া আপনা হইতে বুকে অঙ্কুরিত হয়।

লাটু-গৃহিণী কহিলেন,—বসো বাবা, আমি আসচি···

তিনি চলিয়া গেলেন। খোলা খড়খড়ির পানে প্রভাত চাহিয়া ছিল, আকাশের ছোট্ট একটু টুকরা দেখা যাইতেছিল। বাহিরে ঘন জঙ্গল, একটা পাখী ভারী মিষ্ট সুরে গান ধরিয়াছে। এই নির্জ্জন বনপ্রান্তে সে যেন এক দুঃখ-ভোলা হিংসা-ঝরানো রাগিণী!

দেওয়ালে একখানা কার্পেটের ছবি, এক তরুণীর কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া একটি হরিণ—তরুণীর কোলে তৃণগুচ্ছ। কালের প্রভাবে পশমের রং জ্বলিয়া গিয়াছে। ছবির নীচে নাম লেখা শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী।

লাটু বাবু কহিলেন,—ছবি দেখচো! ও কি আজকের, উঁ:—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী তখন সবে পশমের কাজ শিখচেন!

প্রভাত বুঝিল,—লাটু-গৃহিণীর নামই তাহা হইলে জাহ্নবী দেবী।

লাটু বাবু তখন সিগার ধরাইয়া পরিচয় লইতে বসিলেন। প্রভাতের বাড়ী কোথায়, বাপ-মা বাঁচিয়া আছেন কি না, কি করেন, জমিদারীর কত আয়, রেভেনিউ দিতে হয় কত···

প্রভাত সংক্ষেপে যথাসম্ভব উত্তরে তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিল।

লাটু বাবু কহিলেন,—তোমাদের ওদিকে এক বার শীকারে গেছলুম। পাখী শীকার। আ:, সে যা কাণ্ড ঘটে-ছিল! এক জলার ধারে, সঙ্গে ছিল সেক্রেটারিয়েটের মেম্বার গুডউইন সাহেব। ভারী রসিক লোক ছিল। আমার গুলীতে একটা পাখী পড়লো—ইয়া এক হাঁস। হাঁসটা জলে পড়ার পর গুডউইল সাহেব কি করলে, জানো? বুট টুট খুলে—ও:! আজো মনে হ'লে এমন হাসি পায়! হা:-হা:-হা:—

হাসির মৃদু উচ্ছ্বাস প্রবল হইয়া উঠিল, কাজেই সে কাহিনী আর শেষ হইল না!

অনন্তও সে হাসিতে যোগ দিয়া কহিল,—মনে আছে। আপনি ও বাড়ীতে থাকতে সে গল্প বলেছিলেন—ও:—সত্যি! হা:-হা:-হা:···

অনন্তর হাসি কৃত্রিমতার আবরণে মণ্ডিত থাকিলেও উচ্ছ্বাসে উগ্র হইয়া উঠিল।

প্রভাত সে হাসির বন্যায় পড়িয়া বিস্ময়ে, কৌতূহলে একেবারে মৌন!

জাহ্নবী দেবী আসিলেন, কহিলেন,—পরি আসচে। আমি খপর পাঠাচ্ছিলুম—ডলিদের ওখানে, তাদের বয়কে পাঠাবার জন্য। তা, টেলিফোনটা বিগড়ে আছে। সারাবার জন্য খপরও দিলে না—মুস্কিল!

লাটু বাবু কহিলেন,—একা মানুষ, কাঁহাতক পেরে উঠি!···তোমার নিবারণকে ছুটী দিলে, তার আর ফেরবার নামটি নেই।

লাটু বাবু প্রভাতের পানে চাহিলেন, কহিলেন,—সরকার! বহু কাল আছে, আব্দার বিলক্ষণ, আর এঁর আস্কারায় তাঁকে শাসন করা শক্ত হয়। আজ তিন মাস দেশে গেছে ছুটী নিয়ে, ফেরবার নামটি নেই। এতে কাজ চলে!

জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—মেয়ের বিয়ে দেবে বললে; কাজেই···

লাটু বাবু ঈষৎ বিরক্তভাবে কহিলেন,—মেয়ের বিয়ে কেউ তিন মাস ধ'রে দেয় না! হুঁ:! খবর্দ্দার! এবার টাকা চেয়ে পাঠালে একটি পয়সা আর দিয়ো না, বুঝলে!

জাহ্নবী দেবী সে কথার জবাব দিবার পূর্ব্বেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, পরিমল···মুখে-চোখে মৃদু হাসির জ্যোৎস্না ভরিয়া।

প্রভাত সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, অনন্তও তার দেখাদেখি উঠিল।

জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—আয় পরি, এঁরা এসেচেন, সেই আলিপুরের জুয়ে দেখা, আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেলেন পুলের ধারে······মনে পড়েচে?

মৃদু হাস্যে নমস্কার জানাইয়া পরি ধীর পায়ে আসিয়া একখানা কৌচে বসিল। [ক্রমশ:

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মহাত্মা গান্ধী

অধুনা এক শ্রেণীর বৃটিশ রাজনীতিক পৃথিবীর যত অপরাধের মূল বলিয়া কংগ্রেসকে অভিহিত করিয়া থাকেন। পরন্তু দুই একটি পুরুষ ও নারী য়ুরোপীয় প্রচারক এ দেশে দুই চার দিন ভ্রমণ করিবার পর এ দেশ সম্বন্ধে 'অভিজ্ঞতা' সঞ্চয় করিয়া গিয়া স্বদেশে বিজ্ঞের মত প্রচার করিতেছেন যে, মহাত্মা গান্ধী ধূর্ত্ত রাজনীতিক, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা সত্য নহে। কেহ কেহ বলেন, তিনি আদৌ রাজনীতিকই নহেন, তিনি ভাবপ্রবণ কল্পনাবাদী। চার্চ্চহিল, পীলের মত সাম্রাজ্যবাদীরাও তাঁহাকে 'রাজদ্রোহী উলঙ্গ ফকীর' আখ্যাই দিয়া ফেলিয়াছেন। এই সে দিনও মিঃ চার্চ্চহিল বলিয়াছেন, "লর্ড উইলিংডনের সরকার আরউইন সরকারের ভ্রম সংশোধন করিয়া মিঃ গান্ধীকে জেল দিয়া ভালই করিয়াছেন, তবে তাঁহারা ভারতবাসীকে যে অধিকার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাহা যেন অকপটতার সহিত করা হয়, বৃথা আশায় ভারত-বাসীকে প্রলুব্ধ না করিয়া তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইবে, তাহা হইতে কম করিয়া যেন আশা দেওয়া হয়।" আর এ দেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহের ত কথাই নাই। তাঁহারা সময়ে অসময়ে ক্রমাগতই বলিতেছেন, বৃটিশ সরকারের খুবই সদুদ্দেশ্য ছিল, কেবল মিঃ গান্ধীই যত অনিষ্টের মূল, তিনিই চুক্তিভঙ্গ করিয়া গঠনের পরিবর্ত্তে ভাঙ্গন আশ্রয় করিয়া ভারতের সমূহ ক্ষতি করিতেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, জগতের অনেক সভ্য উন্নত দেশের একাধিক মনীষী মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে ইহার বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করেন। অনেকের অভিমত, তিনি আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ মানব। অনেকে বলেন, তিনিই শান্তির অগ্রদূত, তাঁহার অহিংসা-নীতিই জগতে শান্তি আনয়নের শ্রেষ্ঠ উপায়। রোমে-রোঁলা, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রমুখ জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই ভাবের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। মার্কিণ দেশের খৃষ্টান পাদরী রেভারেণ্ড হোমস তাঁহাকে দ্বিতীয় খৃষ্ট বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি একটি উচ্চশিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার নাম বেগম ফতিমা সরিফা ইজ্জৎ পাশা। তিনি আরব মুসলমান। তাঁহার পিতা মহম্মদ আবেদ ইজ্জৎ পাশা সিরিয়া দেশের রাজস্ব-সচিব; এই সিরিয়া দেশই বেগম সাহেবার জন্মভূমি। তুর্কীর সুলতান আবদুল হামিদের রাজত্বকালে আবেদ পাশা তুরস্কের রাজসরকারে কার্য্য করিতেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি মার্কিণ দেশের ওয়াশিংটন সহরে তুরস্ক-দূতরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি আরবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ ব্যক্তি। পরন্তু পৃথিবীতে যে দশ জন শ্রেষ্ঠ ধনকুবের আছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার বংশ আরবের মধ্যে সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও উন্নত বলিয়া জ্ঞাত।

বেগম সাহেবা বিধবা, তাঁহার বয়স ৩১ বৎসর। তাঁহার স্বামী ছিলেন তুর্কীর অভিজাতবংশীয়, নাম তাঁহার সাবিজদা জাদেন রেফেৎ বে। ১৯০৮ হইতে কয়েক বৎর পর্য্যন্ত বেগম সাহেবা ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার পিতা পলাতক রাজনীতিকরূপে তথায় বসবাস করিতেছিলেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংবাদ রাখেন। ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, দর্শন,—প্রায় সকল বিদ্যাতেই তিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন এবং ইংরাজী, ফরাসী, গ্রীক, ইটালীয়ান, তুর্কী, আরবী প্রভৃতি ভাষায় কথা কহিতে পারেন। এহেন শিক্ষিতা মুসলিম মহিলার মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে ধারণা কিরূপ, তাহা জানিয়া রাখা সঙ্গত।

The Mahatma is a dear !—মহাত্মাকে আমি বড়ই ভালবাসি,—মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে সম্মান করি, আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ। আমি লণ্ডনে একাধিকবার তাঁহাকে সিরিয়া দেশে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বলেন যে, তাঁহাকে এবার শীঘ্রই ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। এই হেতু ইহার পর যখনই সুযোগ হইবে, তখনই তিনি সিরিয়ায় প্রথমে গমন করিবেন।

"একবার আমি লণ্ডনে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলেন, 'এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? এ ত ভগবানের গৃহ।' কি সুন্দর মানুষ ! আমি তাঁহাকে বর্ত্তমান জগতের জীবিত মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। গান্ধী হইতে বড় মুসলমান জগতে কে আছে ? তাঁহার সরলতা, তাঁহার সাধুতা, তাঁহার অকপটতা, তাঁহার নম্রতা,—এ সমস্তই ত মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। তিনি মুসলমানদের অনেক করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। যে মহাত্মা গান্ধীর গুণের মর্ম্ম বুঝে না, সে সত্যকে স্বীকার করে না, সে সত্যের শত্রু।"

এই মহাত্মা গান্ধীকেই মিঃ শৌকৎ আলি মুসলমানের শত্রু বলিয়া প্রচার করিতে লজ্জানুভব করেন নাই। কি উদ্দেশ্যে পরিণত বয়সে তিনি এই হীন প্রচারকার্য্যে ব্রতী

হইয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। এক দিন কিন্তু তিনি আপনাকে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্ত, দক্ষিণ চক্ষু, কত কি বলিয়াই অভিহিত করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার একটা উদ্দেশ্য ছিল। পরিণত বয়সে যুনানী তরুণীর পাণিগ্রহণ করারও তাঁহার উদ্দেশ্য আছে। স্বার্থ ই যে সেই উদ্দেশ্যের প্রধান উপকরণ, তাহা তাঁহার কার্য্যপরম্পরা আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। সুখের বিষয়, তিনি সম্প্রতি নবপ্রণয়িনীকে লইয়া অন্যত্র শান্তি উপভোগ করিতে গমন করিয়াছেন। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে যদি তিনি এইভাবে অপসারিত হন, তাহা হইলে ধরিত্রী শীতল হইতে পারেন।

লর্ড লোথিয়ানের উপদেশ

ভোটাধিকার কমিটীর চেয়ারম্যান লর্ড লোথিয়ান তাঁহার কার্য্য সাঙ্গ করিবার পর ভারতের নেতৃবর্গকে এই উপদেশ দিয়াছেন,—"যদি আমার আশার অনুযায়ী আগামী বৎসরে নূতন শাসন-তন্ত্রের জন্য প্রথম নির্ব্বাচনপর্ব্ব আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে নির্ব্বাচনক্ষেত্রে সহস্র সহস্র পদপ্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া প্রয়োজন ; পরন্তু যাহারা পূর্ব্বে কখনও ভোট দেয় নাই, এমন লক্ষ লক্ষ নির্ব্বাচককে নির্ব্বাচন ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, তাহাদের নিকট ভোটের জন্য প্রার্থী হইতে হইবে। কারণ, যাঁহারা ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশে এখনও নেতৃবর্গকে নির্ব্বাচন কালে প্রভূত পরিশ্রম ও ভীমের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, ভারতের ন্যায় বিরাট দেশের বিরাট নির্ব্বাচনে কিরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হইবে। বিশেষতঃ সময় যখন অল্প, তখন ত এখন হইতেই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। নির্ব্বাচন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়ার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে ; কারণ, দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধীনে যাহারা অধিক ভোট সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন।"

কথাগুলি সত্য। যদি যথার্থই আগামী বৎসরে সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ ও বহাল হয়, যদি সংস্কার আইন এমনভাবে গঠিত হয়, যাহা জাতীয়তাবাদীরা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা না করিয়া পারিবেন না, যদি সত্যই ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের সমান অংশীদারের স্থান দেওয়া হয় এবং ভারতীয়রা বৃটিশ উপনিবেশসমূহের অধিবাসীদের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়, তবেই ত এই উপদেশের সার্থকতা। তাহার উপর আরও একটা বড় কথা আছে, সে কথাটাও ত উপেক্ষণীয় নহে।

কথা এই যে, নির্ব্বাচনপর্ব্ব সফল করিবার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চাই। যদি কংগ্রেস-নেতা ও কর্ম্মীরাই কারারুদ্ধ রহিলেন, তবে নির্ব্বাচনই বলুন বা সংস্কারই বলুন, সে সকল সম্পন্ন হইবে কাহাকে লইয়া? কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নায়ক মহাত্মা গান্ধী যে, দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের লোকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেন, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? যিনি পর পর বহু অর্ডিনান্স জারী করিয়া দেশ-শাসন করিতেছেন, সেই বড়লাট লর্ড উইলিংডনই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান।

সুতরাং যাহাতে অর্ডিনান্স ও কঠোর শাসন উঠাইয়া লইয়া কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদীদের সহিত আপোষের বন্দোবস্ত করিয়া দেশে শান্তির আবহাওয়া বহাইতে পারা যায়, তাহারই জন্য সরকার পক্ষকে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া লর্ড লোথিয়ানের কর্ত্তব্য, দেশের লোককে পূর্ব্বাহ্নে আকাশকুসুমের জন্য প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিয়া কি হইবে?

অর্ডিনান্সের অপপ্রয়োগ

একেই ত অর্ডিনান্স অর্থে বে-আইনী আইন কে Lawless Lawকে বুঝায়, তাহার উপর উহার প্রয়োগ যদি সহৃদয়তার সহিত করা না হয়, তাহা হইলেই সোনায় সোহাগা হয় না কি? ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোর ও বড়লাট লর্ড উইলিংডন একাধিকবার জগদ্‌বাসীকে বুঝাইয়াছেন যে, অর্ডিনান্স হইতে আইনভীরু শান্তিপ্রিয় লোকের কোনও ভয় নাই, উহার প্রয়োগ এমন ভাবে করা হইবে, যাহাতে সাধারণ প্রজা মনে করিবে, দেশে কোন অসাধারণ অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হইতেছে কি? দেশের সংবাদপত্র-সমূহের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, অনেক সংবাদ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এমন কি, সংবাদ একত্র করিয়া সাজাইয়া দেওয়া, অথবা সংবাদের শীর্ষগুলি লোকচক্ষুর আকর্ষণযোগ্য করিয়া দেওয়াও নিষিদ্ধ! আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়াও যে অর্ডিনান্স ব্যবহার করা অথবা সংকটশক্তি প্রয়োগ করা হয় না, তাহাও ত কোন কোন রাজপুরুষের কার্য্যে বুঝা যায় না। মিঃ হর্ণিম্যান "বোম্বাই ক্রণিকল" পত্রে বোম্বাইএর দাঙ্গা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহার জন্য বোম্বাই সরকার উক্ত পত্রের নিকট ৬ হাজার টাকা জামিন চাহিয়াছেন! মিঃ হর্ণিম্যান ভারত-সচিবকে তারে জানাইয়াছেন, এই প্রবন্ধের সহিত আইন অমান্যের কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি যদি জামিন চাওয়া হয়, তাহা হইলে অতঃপর সরকারের কোন কার্য্যের বিপক্ষে সমালোচনা করাই দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া মনে হয়। এই প্রবন্ধে দাঙ্গা নিবারণের জন্য বোম্বাই সরকার প্রস্তুত ছিলেন না, এবং দাঙ্গার সময় অসহযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই অভিযোগ করা হইয়াছিল। ইহার জন্য সংকটশক্তি প্রয়োগ করা হইল কেন, তাহা মিঃ হর্ণিম্যান বুঝিতে পারেন নাই, ভারতের জনসাধারণও পারে নাই।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ সহরের এক দল যুবক পিকেটিং করিতে যায়। উহাদের মধ্যে খাসা সুব্বরাও ও পি, সি, রামস্বামী নামক দুইটি যুবক এক দল পুলিস-প্রহরী কর্ত্তৃক অতিমাত্র প্রহৃত হইয়াছিল। ঐ দলে দুইটি পুলিস-সার্জ্জেণ্ট ও তিন জন কনষ্টেবল ছিল। প্রহারের মাত্রা এত অধিক হইয়াছিল যে, মাদ্রাজ সরকার এই বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য পুলিস কমিশনারকে ভার দেন। তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু সেই রিপোর্টের উপর সরকার যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যদিও অবৈধ

জনতা ভঙ্গ করায় পুলিসের অধিকার ছিল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি এইটুকু বলা হইয়াছে—

"(১) এ ক্ষেত্রে পুলিস দলের পরিচালক ইনস্পেক্টর তাঁহার বিবেচনাবুদ্ধির বিষম ভুল করিয়াছেন। সে জন্য তিনি দায়ী।

(২) ঐ দুই ব্যক্তিকে প্রহার করা অনাবশ্যক ভাবে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখা হইয়াছিল।

সুতরাং সরকারের স্বমুখে স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশ যে, সঙ্কটশক্তি-প্রয়োগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায় হইয়া থাকে। একটি মামলায় এই স্বীকারোক্তি প্রকাশ, কিন্তু সকল মামলাই কি প্রকাশ পায়? বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে অসহযোগকামী ফরিয়াদী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে না?

মাদ্রাজ বিভাগের রাজামাহিন্দ্রীর ডাক্তার সুব্রহ্মণ্যমের মামলার কথাটাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার সুব্রহ্মণ্যম ও ভীমরাজু নামক রাজামাহিন্দ্রীর অন্য এক জন কংগ্রেসকর্ম্মী পুলিসের হস্তে প্রহৃত হইয়া হাঁসপাতালে নীত হইয়াছিলেন। পুলিস তাঁহাদের বিপক্ষে মামলা আনিলে রাজামাহিন্দ্রীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বালকৃষ্ণ আয়ার, এম, এ, আই, সি এস ঘটনাস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং সাক্ষ্য-সাবুদ গ্রহণ করিয়া যে রায় দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, সঙ্কট-শক্তির প্রয়োগ কোথাও কোথাও কি ভাবে হইতেছে :—

"আমি মামলার নথিপত্র বিশেষ যত্নসহকারে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি। যতই পাঠ করি, ততই আমি ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষিগণের অসমসাহসিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তাহাদের সাক্ষ্যের সকল কথাই প্রায় পরস্পর-বিরোধী ও অতিরঞ্জিত। আরও দেখিয়াছি যে, সাক্ষীরা একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য-চালিত হইয়া মামলাটিকে সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।" এই সাক্ষীরা পুলিস কনষ্টেবল ও হেড কনষ্টেবল!

যে গোয়েন্দাটা ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আসামীদের বিপক্ষে খবর দিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে বিচারক বলিয়াছেন, "এই লোকটা বাস্তবিক সশরীরে বিদ্যমান ছিল কি না, সেই বিষয়েই আমার ঘোর সন্দেহ আছে। এ লোকটা মামলার সময় দেখাই দেয় নাই।" কি বিষম কথা!

রায়ের অন্যত্র বিচারক বলিয়াছেন, "২নং সাক্ষী ঘটনাকালে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছাড়া পুলিসের আর সমস্ত সাক্ষীই ভীষণ মিথ্যা কথা বলিয়াছে, সেই মিথ্যা সাজাইবার কৌশলেও তাহারা অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, মিথ্যা এতই বিষম!"

১নং সাক্ষী ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি কেন এই মিথ্যা গল্প রচনা করিয়াছেন? বিচারক রায়ে তাহার জবাব দিয়াছেন, "ডাক্তার সুব্রহ্মণ্যম রাজামাহিন্দ্রীর জনপ্রিয় চিকিৎসক ও গণ্য মান্য নেতা, তদুপরি তিনি স্থানীয় কংগ্রেসের অধিনায়ক। কাযেই তাঁহার মত লোককে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত করিতে পারিলে গোদাবরী জেলায় আইন অমান্য দমন করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করা যায়, আর তাহা হইলে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদোন্নতি হয়। ইহাই এই মামলা সাজাইবার মূল কারণ।"

কি ভীষণ কথা! অর্ডিনান্সরূপ চমৎকার অস্ত্র হাতে থাকিলে এবং পুলিসের মনোবৃত্তি এরূপ হইলে কত কি না করা যায়! অবশ্য রাজামাহিন্দ্রীর বিচারকের ন্যায় ন্যায়বিচারক ছিলেন বলিয়াই এ ক্ষেত্রে পুলিসের সঙ্কটশক্তি প্রয়োগের এই চমৎকার আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল, নতুবা কি হইত? বিচারক মিঃ বালকৃষ্ণ আয়ারের জয় হউক! কিন্তু তিনি যে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে বড় লাট লর্ড উইলিংডনের ও ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোরের চক্ষু ফুটিবে ত?

বিপ্লববাদ

কোনও ইংরাজ সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন,—"আমি মনে করি না যে, সুপ্রতিষ্ঠ সরকারকে অচল করিবার অথবা ধূলিসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। অন্ততঃ তাহাদের অধিকাংশই যে সরকারকে স্থানচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে বোমা-রিভলভার ব্যবহার করে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই হিসাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ হইতে বিপ্লবীর জিঘাংসা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির কার্য্য। বিপ্লবীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের যে দুই একটা প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত আছে, তাহা হাস্যজনক। চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহ এই প্রকৃতির। কিন্তু ভারতের বিপ্লববাদীরা সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করে নাই বলিলেই হয়। তাহাদের বিপ্লবমূলক হত্যাচেষ্টা ও হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ,—প্রতিশোধ-গ্রহণ। সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যের ফলে তাহাদের দলস্থ লোক দণ্ডিত হইলে পর তাহারা সেই কর্ম্মচারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।"

কথাটা আংশিক সত্য। মেদিনীপুরের নিহত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডাগলাস মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার আত্মীয় রাজামাহিন্দ্রীর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ডব্লিউ, সি, ডাগলাসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এই যুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৩১ খৃঃ ৫ই আগষ্ট এবং ১৮ই জানুয়ারী তারিখে অধ্যক্ষ ডাগলাস যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে এই ভাবের কথা আছে :—

(1) The relevant fact is that my life is in real and serious danger......... I have received two anonymous threats from 'the two murderers of Mr. Peddie' that I would shortly be murdered. The C. I. D. discovered that the handwriting was identical with that of several threatening letters received by Mr. Peddie."

(2) I have seen a letter from the detention camp at Hijli in which the writer addressed a number of revolutionaries saying that "We must spare no one now—not even Bengalis."

সুতরাং প্রতিশোধ-গ্রহণই যে বিপ্লবীদের লক্ষ্য, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, প্রথমে অপরাধ না করিলে যখন প্রতিশোধ-গ্রহণের কারণ থাকে না, তখন দেখিতে হইবে, কি কারণে বিপ্লবীরা প্রতিশোধ লইতেছে। বিপ্লববাদ সহজে কেহ গ্রহণ করে না, উহার গুরু কারণ থাকে। কাহারও আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইলে, অথবা কোন কারণে লোক গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় দেখিতে না পাইলে মোরিয়া হইয়া বিপ্লববাদ গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের যুগে আবেদন-নিবেদনেও যখন আশা ও

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই, তখন হইতেই বাঙ্গালায় বিপ্লববাদের আমদানী হইয়াছে। উহা এ দেশীয়ের ধাতুসহ নহে, ভাবধারারও অনুগামী নহে। কতক যুবক ব্যর্থমনোরথ হইয়া এই পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং সুপ্রতিষ্ঠ সরকারও তাহাদের উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এইরূপে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার ফলে দণ্ডদান এবং প্রতিশোধ-গ্রহণ চলিতেছে। সরকার সে জন্য কঠোর আইন সৃষ্টি করিয়া কঠোর শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মাঝে পড়িয়া শান্তিকামী জনসাধারণ বিধ্বস্ত হইতেছে। বিপ্লববাদের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া উহা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

সরকার এক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উহা দমনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, উহার নাম ধর্ষণ-নীতি। এ জন্য তাঁহারা রেগুলেশান ও অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালার রেগুলেশান, বোম্বাইএর রেগুলেশান, ফৌজদারী আইনের সংশোধন আইন এবং অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোর, বড়লাট লর্ড উইলিংডন এবং তন্নিম্নস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা এই নীতির পক্ষপাতী।

বিপ্লববাদের দাওয়াই

সরকার রোগের এই একমাত্র দাওয়াই স্থির করিয়াছেন। কিন্তু মজা এই যে, যাঁহারা এ দেশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার সময় এই নীতির পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কার্য্যান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন সুর গাহিতেছেন। সার হিউ ষ্টিফেনসন বেহারের গভর্ণর ছিলেন। তিনি ঝুনা ব্যুরোক্রাট। বাঙ্গালা দেশের সিভিলিয়ানরূপে তিনি জবরদস্ত শাসনেরই পক্ষপাতী ছিলেন। বেহারেও তিনি সেই নীতি প্রচলন করিতে ত্রুটি প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি একবারে সুর পাল্টাইয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন যে,—"ভারতের বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেই বিপ্লববাদ দূর হইবে।" অর্থাৎ শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী তরুণরা জীবিকা অর্জ্জনের পথ পায় না বলিয়া বিপ্লবীদের দলপুষ্টি করে, অতএব তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের পথ করিয়া দিতে পারিলে বিপ্লবীর অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু তিনি এ দেশে থাকিতে নিজের ব্যক্তিত্ব দেখাইয়া এ কথা বলিতে সাহস করেন নাই কেন?

আর এক জন গভর্ণরের কথা বলি। তিনি বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন। তিনিও কার্য্য সাঙ্গ করিয়া দেশে ফিরিয়া বলিয়াছেন,—"বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করিতে পারিলেই বিপ্লববাদ দমন করা সহজসাধ্য হইবে।" এ কথা তিনিও কেন এ দেশ শাসনকালে বলেন নাই? জনমত সৃষ্টি ও গঠন করিবার জন্য তিনি কি করিয়াছেন? এ দেশের জনমত বিপ্লববাদের বিরোধী, এ কথা তিনিও যে জানেন না, তাহা নহে। মহাত্মা গান্ধী কতকাংশে বিপ্লবান্দোলনের আকর্ষণ হইতে দেশের তরুণগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অহিংসার আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ কথা কোন কোন ইংরাজ রাজনীতিকই স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাকে ভুল বুঝা হইয়াছে বলিয়াই আজ দেশে এত অশান্তি, ইহা জনসাধারণের অভিমত।

আসল দাওয়াই,— দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা, প্রতিশ্রুতি পালন করা। বলা হইতেছে, যেমন বিপ্লববাদ-দমনের জন্য ধর্ষণ-নীতি চালানো হইতেছে, তেমনই অন্যদিকে দেশকে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইতেছে; সে জন্য গোল টেবিল বৈঠক ও কমিটীসমূহ বসান হইয়াছে। কিন্তু এই এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে খড়্গ-নীতি—এই দ্বৈতনীতি যে কখন সফল হইবে না, এ কথা বহুবারই যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝান হইয়াছে। কিন্তু কি ফল হইয়াছে?

ভোটাধিকার কমিটীর চেয়ারম্যান লর্ড লোথিয়ান বলিয়াছেন, The dominant feeling in India to-day is the desire that the Government and Parliament should come to a decision about the new constitution with the least possible delay. তাহা হইতে পারে। কিন্তু এই dominant feeling কাহাদের? কাহারা দেশের "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যকর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের" প্রাণ? আজ তাহাদিগকে কারার অন্তরালে রাখিয়া কি new constitution গঠন করার আয়োজন হইবে? তবে কি হেতু তাহাদিগের প্রতিনিধিকে দ্বিতীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল? শান্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া গঠনকার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব, এ কথাও বলা হয়। কিন্তু সেই আবহাওয়া কি এইভাবে সৃষ্টি করা হইতেছে?

বিপ্লববাদীর বোমা-পিস্তল, সশস্ত্র বিদ্রোহীর অস্ত্রশস্ত্র, কংগ্রেসের সরাসরি আইনভঙ্গ,—এ সকল হয় ত সকল ভারত-বাসীর মনঃপূত না হইতে পারে, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ বা মুক্তি চাহে না, এমন ভারতবাসী কেহ আছে কি? এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত শাসনসংস্কার দ্বারা পূর্ণ হইলেই কি মডারেট, কি কংগ্রেসপন্থী, কি বিপ্লবী,—সকলেই সন্তুষ্ট ও শান্ত হইবে। ইহাই বিপ্লববাদের প্রকৃত দাওয়াই। যাহারা এই মুক্তির জন্য আজীবন আন্দোলন করিয়াছে, দুঃখবিপদ বরণ করিয়াছে, ত্যাগস্বীকার করিয়াছে, সেই কংগ্রেসপন্থীদিগকে লইয়া পরামর্শ করিয়া এই পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন, সেরূপ করিলে কংগ্রেসের সরাসরি কার্য্য আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

এ কথা কেবল ভারতবাসীই বলে না, বহু মনীষী প্রতীচ্য-বাসী সাম্রাজ্যের হিতকামীদের মুখেও ব্যক্ত হইতেছে। অধ্যাপক ব্রাইস ও হ্যারল্ড ল্যাস্কির মত মনীষী পণ্ডিত কি সাম্রাজ্যের হিতকাঙ্ক্ষী নহেন? মিঃ ল্যান্সবারী হয় ত আর দুই দিন পরে বিলাতের শ্রমিক নেতৃরূপে প্রধান মন্ত্রী হইবেন। তিনিও কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের শত্রু? বেন্‌ভারেও এণ্ডরুজ? তাঁহার ন্যায় মহামনা হৃদয়বান্ জনসেবক সাম্রাজ্যের মধ্যে কয় জন আছেন? "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের" মত নির্ভীক স্পষ্টবাদী নিরপেক্ষ সংবাদপত্র (সকল ক্ষেত্রেই যে এইরূপ তাহা বলিতেছি না) ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাও কি মিথ্যা? এই শ্রেণীর রাজনীতিক মনীষীরা ধর্ষণের পথ পরিহার করিয়া আপোষ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছেন না কি? তবে?

গ্লানি-প্রচার

মিস মেয়ো এখনও আছেন, তবে স্বতন্ত্র শরীরে। কে এক মিস কেণ্ডাল প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, ভারতে অর্ডিনান্সগুলি অতি মোলায়েমভাবে ব্যবহার করা হইতেছে; রাজবন্দীরা বাড়ীতে যে ভাবে থাকে, তাহার অপেক্ষাও জেলে সুখে ও আরামে থাকে, শাসনের বিপক্ষে একটি অভিযোগও শুনা যায় না, ইত্যাদি। এই রমণীটি মিস মেয়োর মত মার্কিণের হইয়া ফিলিপাইন দ্বীপবাসীদের বিপক্ষেও মিথ্যা প্রচার চালাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইয়াছেন কি না, জানি না, তবে তাঁহারও জানা উচিত যে, তাঁহাদের শ্রেণীর শত শত জীবের চীৎকার ফিলিপাইনবাসীদিগের স্বাধীনতালাভ রোধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, ভারতেরও পারিবে না।

ভারতের বিপক্ষে মিথ্যা রটাইবার লোকের অভাব নাই। এমন যে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান," তিনিও এ বিষয়ে দুই এক ক্ষেত্রে মিথ্যা রটনার প্রশ্রয় দিয়াছেন, পরন্ত সত্য-সংবাদ প্রকাশ করেন নাই। মিঃ রেজিনাল্ড রেণল্ডস্ বলেন, —যে ফাদার এলউইন সীমান্তপ্রদেশ হইতে সত্যতথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে সরকার নির্ব্বাসিত করেন, তিনি 'গার্ডিয়ান' পত্রে তাঁহার বিবৃতি প্রকাশ করিতে চাহিলে উহা প্রকাশ করা হয় নাই, অথচ ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 'গার্ডিয়ানে' জন গ্রেহামের দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। মিঃ রেণল্ডস বলেন, উহার আগাগোড়া ভারতের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদে ভরা! এই গ্রেহাম ভারতের সম্বন্ধে যত মিথ্যা রটাইয়াছেন, এত আর কেহ নহে, মিঃ রেণল্ডসের ইহাই অভিমত। এই লোকটা মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত মিথ্যাবাদী বানাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই! মিঃ রেণল্ডস এই সূত্রে বিলাতের "ডেলী এক্সপ্রেস" ও "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রের মিথ্যা প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের ভারতের সম্বন্ধে বিদ্যার দৌড় এত বেশী যে, "ডেলী এক্সপ্রেস" কাশীকে সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

ইহা ছাড়া মিঃ রেণল্ডস বলিয়াছেন, খাস য়ুরোপেও 'মিথ্যার কারখানা' সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পরিচালক এক জন জার্ম্মাণ, নাম তাহার ওয়ালটার বসহার্ড। এই লোকটা মিস মেয়োর Mother Indiaর মত "Indian Kamf" নামক এক বই লিখিয়াছে। উহা ভারতবাসীর সম্বন্ধে মিথ্যা কথার জাহাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতার সহিত কথা কহিয়া সাংবাদিকগণ যেন বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন, এইভাবে অনেক মিথ্যা সাজান Interviews এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হইয়াছে। এমন কি, মিঃ রেণল্ডস বলেন, তিনি যাহা কখনও কাহাকেও বলেন নাই, তাহাও Interviewএর আকারে উহাতে স্থানলাভ করিয়াছে।

মিঃ এণ্ড্রুজ এই মিথ্যাপ্রচারের ফলে ভারতের সম্বন্ধে ইংরাজের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যাহাতে ভ্রান্ত ধারণার বশে অর্ডিনান্স-রাজত্বের কাল দীর্ঘ করিয়া দেওয়ার বৃটিশ জাতি সম্মতি না দেন, তাহার জন্য মিঃ এণ্ড্রুজ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তিনি একা, আর প্রচারকের দল অনেক। চেষ্টা সাধু হইলেও উহা সফল হইতেছে না।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা-সম্পাদনের জন্য যে আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সমর্থন করিয়া ইয়র্কের আর্কবিশপ, অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, সার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড প্রমুখ মনীষিগণের স্বাক্ষরিত এক পত্র "টাইমস" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। রেভারেণ্ড ম্যাগনাস র‍্যাটার ভারতে দেড় বৎসরকাল অবস্থান করিয়া দেশে ফিরিয়া স্বজাতিকে জানাইয়াছেন যে, "বর্ত্তমান শাসননীতির ফলে আমরা ভারতে আমাদের সাম্রাজ্য হারাইতে বসিয়াছি।"

চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু কাল বিরূপ, বৃটেনে এখন সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীলদেরই প্রাবল্য। তবে এ কথা সত্য যে, অতীতে ভারত ইহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সুতরাং নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই।

অর্থসঙ্কট ও অটোয়া-কনফারেন্স

অর্থসঙ্কট এখন জগতের সর্ব্বত্রই। বৃটিশ সাম্রাজ্যও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাই বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে কানাডার অটোয়া সহরে এই বৈঠক বসাইতেছেন।

ভারত আবার ব্যাপারী, কেন না, তাহাকে সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া ধরা হইলেও অন্যান্য অংশের সহিত তাহার সমান আসন নাই। সুতরাং সাম্রাজ্যের এই বিরাট অর্থ-সমস্যারূপ জাহাজের খবরে ভারতের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই বৈঠকে ভারতকে 'নিমন্ত্রণ' করা হইয়াছে এবং বৈঠকে ভারতের 'প্রতিনিধিও' বসিবেন, এই কথা প্রচারিত হওয়ায় একটু গোল বাধিয়াছে।

কথা এই যে, বৃটেনে ও বৃটিশ উপনিবেশসমূহে সরকার ও প্রজা বলিতে একই বুঝায়, কেন না, সেখানকার সরকার প্রজার প্রতিনিধি। তাঁহাদিগকে প্রজার মতামতের উপর নির্ভর করিয়া শাসন বা বাণিজ্যনীতি গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে হয়। প্রজা তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং তাঁহাদের স্থানে অন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে এ বালাই নাই। এখানে সরকার স্থায়ী, প্রজার মতামতের জন্য তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয় না, বা শাসন ও বাণিজ্যাদি নীতি গ্রহণ-বর্জ্জন করিতে হয় না। এই হেতু, অটোয়া বৈঠকে ভারতের নিমন্ত্রণ হইয়াছে বা ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরিত হইতেছে শুনিলে কেমন মনে খট্‌কা লাগে।

নিমন্ত্রণ ভারত সরকারের হইতে পারে এবং সরকার প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন, ইহাই সম্ভব। কেন না, এ দেশের প্রজা ও সরকার এক নহে, প্রজারও এ সকল ব্যাপারে কোন হাত নাই। এই ভাবে 'প্রতিনিধি' প্রেরিত হইলে

তিনি বা তাঁহারা ভারতের হইয়া কি করিবেন, তাঁহার কি তথায় ভারতের স্বার্থে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা থাকিবে? স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন জাতিসমূহের শিল্পী ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সহিত সরকারের স্বার্থের প্রভেদ নাই; কেন না, শিল্পী ব্যবসায়ীরাও তথায় সরকারের অঙ্গভুক্ত। ভারতের শিল্পী ব্যবসায়ীরা তাহা নহেন। সুতরাং যদি বৃটিশ বা ঔপনিবেশিক সরকার-সমূহ বৈঠকে তাঁহাদের অঙ্গভুক্ত শিল্পী ব্যবসায়ী প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আপন স্বার্থসংরক্ষণের চেষ্টা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে যে ভারতের শিল্পী ব্যবসায়ীর শাসনে কোন হাত নাই, তাঁহাদের পক্ষের প্রতিনিধিদের বৈঠকে কত প্রয়োজনীয়তা, তাহা কি সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায় না? ভারতের স্বার্থ কি ভাবে রক্ষিত হইবে, তাহা তাঁহারা যত বুঝিবেন, তত কে বুঝিবে?

কিন্তু তাঁহাদিগকে বৈঠকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে কি? বৈঠকে তাঁহাদের প্রতিনিধি যাইতেছে কি? না। তাহা হইলে ভারতীয় বণিক্-সমিতি বর্ত্তমান ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেন না।

অর্থসঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার জন্য বৈঠক বসান হইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ইংরাজ ইকনমিকষ্টরা (কবডেন ও জন ব্রাইট প্রমুখ) অবাধ বাণিজ্যনীতিই মানব-সমাজের হিতকর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সরকার উহা পরিহার করিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যরক্ষণনীতি অবলম্বন করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছেন। উহা ভারতের পক্ষেও হিতকর কি না, তাহা ভারতীয় শিল্পী ব্যবসায়ীরাই ভাল বুঝিবেন। পক্ষপাতিতামূলক শুল্কনীতি ভারতের পক্ষে মঙ্গল কি ক্ষতিকর, তাহাও তাঁহারা ভাল বুঝিবেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা এবং বৈঠকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য ছিল।

বাঙ্গালায় শিক্ষার গতি

বাঙ্গালার অস্থায়ী শিক্ষা-নিয়ামক (Director of Public Instruction) মিঃ বটমলি বাঙ্গালার ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের শিক্ষার গতি সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালায় শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে মন নিরাশায় পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি বলিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও অণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীর সংখ্যা-হ্রাস হইয়াছে; স্কুলের শিক্ষাও সন্তোষজনক নহে; প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু হিন্দু ছাত্র কমিয়াছে। আর যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনই অন্য দিকে উচ্চ শিক্ষায় মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

আমাদের স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে বিবৃতিতে আশার কথা আছে। আলোচ্য বৎসরে স্কুলের শিক্ষার্থিনী বালিকার সংখ্যা ১০ হাজার ৮ শত ২৫টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ১৭টি, আর স্কুল-কালেজের শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ২ শত ২৮টি। কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে ইহাও কতটুকু? গত ৫ বৎসরের সরকারী হিসাব দেখিয়া জানা যায়, বাঙ্গালায় নারীর সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষার্থিনী বালিকার সংখ্যা শতকরা মাত্র ১·৩ জন! আদম সুমারির হিসাবে ভারতের হাজারকরা ২১টি নারী শিক্ষিতা। 'শিক্ষিতা' অর্থে বুঝিতে হইবে তাহাদিগকে—যাহারা কোনমতে লিখিতে বা পড়িতে জানে!

অবস্থা এইরূপ, অথচ ইহার উপর ব্যয়-সঙ্কোচের দোহাই দিয়া দুই একটা স্কুল উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে, কোন কোন স্কুলের সরকারী অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ফলে শিক্ষকরা কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন পান না বা কম পান। ইহাতে শিক্ষাদানেও ত্রুটি রহিয়া যাইতেছে।

দেশের প্রাইভেট স্কুল-কলেজসমূহ যে কেবলমাত্র অর্থের অনাটনের জন্য ক্রমশঃ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা শিক্ষানিয়ামক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে শিক্ষার উন্নতিসাধনের উপায় কি? সরকার পুলিস ও সরঞ্জামী খরচা বাবদে প্রায় সর্ব্বস্ব গ্রাস না করিলে এ অবস্থার উদ্ভব হইত কি?

ভোটাধিকার কমিটীর রিপোর্ট

লর্ড লোথিয়ানের সভাপতিত্বে এ দেশে যে ভোটাধিকার কমিটী বসিয়াছিল, গত ৩রা জুন তারিখে তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, কমিটী এ দেশের সহযোগকামীদের মনস্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও, তাঁহাদের রিপোর্ট কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। লর্ড লোথিয়ান এ দেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার রিপোর্ট সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এ দেশের লোক তাঁহার রিপোর্ট পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিবে, এমন আশা তাঁহার আছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সেই আশা সফল হয় নাই। এক কথায় এ দেশের লোক চাহিয়াছিল,—প্রাপ্তবয়স্কমাত্রের ভোটাধিকার, তাহাদের সেই দাবী রিপোর্ট পূর্ণ করে নাই।

রিপোর্ট দীর্ঘ হইলেও অসম্পূর্ণ। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে গোল টেবিল বৈঠকে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে আভাস দিয়াছিলেন, তাহারই আদর্শে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা সভাসমূহের ভোটদাতৃগণের সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা করিতে এবং ভোটাধিকার ব্যবস্থার সংশোধন করিতে গোল টেবিল বৈঠকের ভোটাধিকার সাব কমিটীকে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং উহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত একটি কমিটী গঠন করিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন। লোথিয়ান কমিটী তাহারই ফল।

কমিটী রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতের দুই একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত প্রদেশেই ঘুরিয়াছেন, সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের (কংগ্রেস ব্যতীত) লোকের সহিত মিলিয়াছেন মিশিয়াছেন, বহুসংখ্যক লোক তাঁহাদের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছে,

তাহা ছাড়া বহু প্রতিষ্ঠান ও বহুলোকের নিকট তাঁহারা লিখিত বিবৃতি পাইয়াছেন, এবং তাঁহাদের বৃটিশ ও ভারতীয় সদস্যরা পরম সদ্ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু একটি ফোঁটা গোমূত্রে যেমন এক কটাহ দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়, তেমনই একমাত্র কংগ্রেসকে বাদ দিয়া, কংগ্রেসের মতামত না জানিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় সেই দোষ দেখা দিয়াছে। সদস্যদের মধ্যে সদ্ভাবে কার্য্য সম্পন্ন হইলেও অনূ্যন ৮টি Note of dissent বা ভিন্ন মত রিপোর্টে দেখা দিবে কেন, তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন। কমিটী কংগ্রেস ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর সাহায্য পাইয়াছেন বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের এই 'আর সকলকেও' অন্ততঃ সন্তুষ্ট করা উচিত ছিল। ফলে কি হইয়াছে? জাতীয়তাবাদীদের ত কথাই নাই, দেশের তাবৎ মডারেট নেতা এবং বিস্তর মুসলমান ও দেশীয় খৃষ্টান প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে দাবী কি পূর্ণ হইয়াছে?

কমিটী বলিয়াছেন, এত বড় বিরাট দেশের বিরাট লোকসংখ্যা বুঝিয়া প্রাপ্তবয়স্কমাত্রেরই ভোটাধিকার ব্যবস্থা করা not theoretically sound nor administratively feasible উপপত্তি হিসাবে সুবিবেচনামূলক হইতে পারে না, প্রকৃত শাসনক্ষেত্রেও সম্ভব নহে। কেন? পৃথিবীর অন্যান্য স্বায়ত্ত-শাসন অধিকারসম্পন্ন দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে এই বাধা থাকে না কেন? গণতন্ত্র শাসন কথাটা কাগজে কলমে বেশ শোভা পায়। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে? মার্কিণ বা ফ্রান্সের মত সাধারণতন্ত্র-শাসনাধীন দেশেও প্রেসিডেণ্ট ও চেম্বার অব ডেপুটিজ অথবা সিনেটই সর্ব্বেসর্ব্বা। তবে তাঁহারা জনসাধারণের ভোটের উপর নির্ভর করেন, ইহা সত্য। ইহাই গণতন্ত্র নামে পরিচিত। সেই ভাবে ভারতের বিরাট জনসংখ্যার প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট সংগ্রহের ব্যবস্থাও ত করা যায়। কমিটী বলেন, ভারতের ৩২ কোটি লোকের মধ্যে ১৩ কোটি প্রাপ্তবয়স্কের ভোট গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নহে। কেন না, (১) ভোট গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাব, ঘুষখোর ও অযোগ্য লোক লইয়া ত কার্য্য চলিবে না, (২) যিনি সভাপতিত্ব করিবেন, তাঁহার, কর্ম্মচারী, এজেণ্ট, ভোটপ্রার্থী, ভোটদাতা এবং শান্তিরক্ষকদিগকে পরিচালন করিবার শক্তি থাকা চাই। তাঁহার পদমর্য্যাদাও এরূপ হওয়া চাই যে, তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন না, এ বিশ্বাস লোকের মনে বদ্ধমূল থাকা চাই। (৩) উপযুক্ত পরিমাণ পুলিসের লোকের অভাব, সুতরাং নির্ব্বাচন কেন্দ্র-সমূহে শান্তিরক্ষা হইবে কিরূপে? (৪) নারী ভোটারদের ভোট গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ নারী কর্ম্মচারী কোথায় পাওয়া যাইবে? এইরূপ আরও কয়েকটি কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, সকল দেশেই কি সাধু ও যোগ্য কর্ম্মচারী প্রয়োজনমত পূর্ণসংখ্যায় পাওয়া যায়? সকল দেশেই কি সভাপতি সর্ব্বত্রই লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন? শান্তিরক্ষার কি সকল স্থানেই প্রয়োজন হয়? ভোটারমাত্রকেই ভোটকেন্দ্রে গিয়া ভোট দিয়া আসিতেই হইবে, এমন কোন কথা আছে কি? বিলাত ও মার্কিণের মত এ বিষয়ে উন্নত দেশে এখনও নির্ব্বাচনকালে টাকার কিরূপ ছিনিমিনি খেলা হয় এবং কত যায়গায় ভোটকেন্দ্রে শান্তিভঙ্গ হয়, তাহা কি অবস্থাভিজ্ঞরা জানেন না? সুতরাং এরূপ যুক্তিতর্ক দিয়া প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে আপত্তি করার কোন হেতু নাই।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দায়িত্বপূর্ণ গণতন্ত্রশাসনের মূল ভিত্তি বলিয়া পরিচিত। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত দেশে হিন্দুমুসলমান-সমস্যার সমাধানে ইহা অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই কংগ্রেসপন্থী, মডারেটপন্থী, মুক্তিকামী মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান, শিখ, অনুন্নত সম্প্রদায়,—সকলেই সমস্বরে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দাবী করিয়াছে। সিংহলের ন্যায় দেশও সম্প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

একবার প্রস্তাব হইয়াছিল যে, এ দেশেও মিশর, তুর্কী, ইরাক ও সিরিয়ার ন্যায় Group systemএ নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হউক। এই ব্যবস্থায় দেশের সমস্ত লোককে ২০, ৫০, ১০০ করিয়া গণিয়া এক একটি Group বা মণ্ডলে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক মণ্ডল তাহাদের মধ্য হইতে এক বা ততোধিক জন ভোটদাতা নির্ব্বাচন করে, ঐ সকল ভোটদাতাকে লইয়া এক একটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্র গঠিত হয় কিন্তু এ প্রস্তাবও কমিটী গ্রহণ করেন নাই।

ফ্র্যাঞ্চাইজ সাব-কমিটী পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, "ভারতে ভোটদাতার সংখ্যা শতকরা অনূ্যন ২৫ এবং অন্ততঃ ১০ জন করিয়া বৃদ্ধি করা হউক।" কমিটী এই পরামর্শ অনুসারে যে একবারে চলেন নাই, তাহা নহে, তবে ব্যবস্থার কিছু ইতর-বিশেষ করিয়াছেন। তাঁহারা যে কয় বিষয়ে সুপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান;—(১) ভোটাধিকার-সমস্যা, (২) নির্ব্বাচন-কেন্দ্র-সমূহের ও ব্যবস্থা-সভা-সমূহের আকৃতি, (৩) ব্যবস্থা-সভাসমূহে বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিদের স্থান দান।

প্রথমতঃ কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ৭০ লক্ষ ভোটদাতার স্থলে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে শতকরা ৫'৪ জনের স্থলে শতকরা ২৭'৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবে। অবশ্য ইহা মন্দের ভাল হইলেও ভাল বলা যায় না। কমিটী ভোটাধিকারীর যোগ্যতার পরিমাণ এখনও তাহার সম্পত্তি অধিকারিত্বের বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়াছেন, তবে ভোটাধিকারীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার মানসে উহা কতকটা সহজ ও সরল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সুপারিশ অনুসারে এখন হইতে একই মাপে সকল প্রদেশে সম্পত্তি অধিকারিত্বের যোগ্যতা ধরা হইবে না, প্রত্যেক দেশের অবস্থা বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার সঙ্গে শিক্ষার যোগ্যতাও ধরা হইবে। এই যোগ্যতার পরিমাণ সকল প্রদেশেই সমান হইবে। পুরুষের পক্ষে উচ্চ প্রাইমারী অথবা উহার অনুরূপ শিক্ষা এবং নারীদের পক্ষে কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে জানাই যোগ্যতার পরিমাপক বলিয়া ধরা হইবে। ইহা দ্বারা শ্রমিক, অনুন্নত সম্প্রদায়, আয়করদাতা প্রমুখ কয়টি বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে ভোটাধিকারের যোগ্যতা ভিন্নরূপে নির্ণীত হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারে ২ শত সদস্যের সমবায়ে এক সিনেট এবং ৩ শত সদস্যের সমবায়ে এক ব্যবস্থা-পরিষদ থাকিবে, কমিটী এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন। সিনেটের ২ শত সদস্যের মধ্যে বৃটিশ ভারতের থাকিবে ১ শত জন, আর পরিষদে থাকিবে ২ শত জন। সিনেটের সদস্যরা প্রাদেশিক ব্যবস্থা-সভার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। পরিষদের সদস্যনির্ব্বাচন সরাসরিভাবে (dircet) হইবে। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-সভাসমূহের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে, তাহাই পরিষদে অবলম্বিত হইবে, কেবল ঐ সঙ্গে শিক্ষার যোগ্যতার পরিমাপ কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। পুরুষের পক্ষে ম্যাট্রিক বা তদনুরূপ পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং নারীদের পক্ষে উচ্চ প্রাইমারি বা তদনুরূপ শিক্ষা যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু ইহার ফলে পরিষদে প্রতিনিধি-প্রেরণের ভোটাধিকার ভারতের লোক-সংখ্যার অনুপাতে শতকরা মাত্র ৩.৩ জনেরও থাকিবে না!

ইহা সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ইহা হইতেই ভোটাধিকার কমিটীর মূল সুপারিশ সম্বন্ধে একটা ধারণা হইতে পারে। এই সুপারিশে কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, ভারতবাসী কি ইহাতে স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রাপ্ত হইবে? প্রাপ্তবয়স্কমাত্রেরই ভোটাধিকার না থাকিলে গণতন্ত্রশাসন যে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ভোটাধিকার কমিটীর সুপারিশে যে মডারেট-রাও সন্তুষ্ট হইবেন না, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

দহ্যমান অট্টালিকা—দমকলের অগ্নি-নির্ব্বাপণ

বোম্বাইএর দাঙ্গা

এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কত কাল হইতে সংঘটিত হইতেছে, তাহা বলা যায় না, তবে সার এণ্টনি ম্যাকডোনেল যে সময়ে যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট ছিলেন, তখন যে Cow Riotsএর সূত্রপাত হয়, তাহার মত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সংবাদ তৎপূর্ব্বে কখনও শুনা গিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। এবার বোম্বাই সহরে বহুদিন-ব্যাপী যে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হইল এবং এখনও পর্য্যন্ত যাহার শেষ আগুন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নিভিয়াও নিভিতেছে না; তাহার মত দাঙ্গা বোধ হয় কোথাও সংঘটিত হয় নাই। সেবার কলিকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়াছিল, তাহা ইহার তুলনায় ছোট বলিয়া পরিগণিত হইবার কথা। ১৪ই মে হইতে দাঙ্গা আরম্ভ হয়, আর ৩১শে মে পর্য্যন্ত হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, দাঙ্গায় ২ শত জন নিহত ও ২ হাজারের উপর লোক আহত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গৃহদাহ, লুণ্ঠন, মন্দির ও মসজিদ আক্রমণ, নিরীহকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে লাঠি বা ছোরার আঘাত যে কত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্য্য এই যে, শান্তির সময়ে যাহারা ভ্রমেও কখনও পরস্পরের শত্রুতা করে না অথবা মনে জিঘাংসা-বৃত্তি পোষণ করে না, তাহাদের রক্ত এত উত্তপ্ত হইয়াছিল যে, তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিবার জন্য উন্মত্ত পিশাচের মত তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছিল।

এ উত্তেজনা ও পরস্পর বিদ্বেষের কারণ কি? কেহ কেহ বলেন, ইহা ধর্ম্মগত। কিন্তু পৃথিবীর কোন ধর্ম্মমত হিংসার সমর্থন করে, এ বিশ্বাস কিরূপে করা যায়? তবে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এমন পাপানুষ্ঠান সম্ভব বটে। রবীন্দ্রনাথ পারস্যে ও ইরাক ভ্রমণে গিয়া শুনিয়াছেন যে, কোন অশিক্ষিত বেদুইন সর্দ্দার তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, "তাঁহাদের পয়গম্বরের মতে যে লোক বাক্য বা হস্ত দ্বারা অপরকে আঘাত করে, সে মুসলমান নহে।" রবীন্দ্রনাথ ইহাও বলিয়াছেন যে, "স্বাধীন মুসলমানরা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, ভারতে কেন এ সকল দাঙ্গা হয়, উহার পশ্চাতে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।" যে বেদুইন দস্যুদের নিষ্ঠুরতার কথা বহু ইংরাজী গ্রন্থে পাঠ করা যায়, তাহাদের যদি এই মনোভাব দেখা দিয়া থাকে এবং যে পারস্য ও আরব হইতে মহম্মদ বিন কাসিম, নাদীর শাহ ও আমেদ শা দুরানি ভারতে আসিয়া হত্যা ও লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত করিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, এখন যদি সেই সকল দেশের লোকের নবজাগরণের ফলে মনোবৃত্তির এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা হইলে কত সুখের কথা! মুসলমান আফগানখণ্ডের গজনির মামুদ অথবা মহম্মদ ঘোরীর বার বার ভীষণ ভারত আক্রমণ এবং মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠনের কথা স্মরণ করিলে এখনও হিন্দুর হৃদয় আলোড়িত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, ভারতের মুসলমানও যদি কালাপাহাড়, কাফুর ও ঔরঙ্গজেবের ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া গঠনকার্য্যে হিন্দুর সহায়তা করেন, তবে ভারতের কি প্রভূত মঙ্গলই না সাধিত হয়!

কেহ বা বলেন, দাঙ্গার কারণ আর্থিক। বোম্বাই ভারতের মধ্যে প্রধান ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান। কিন্তু তথায়

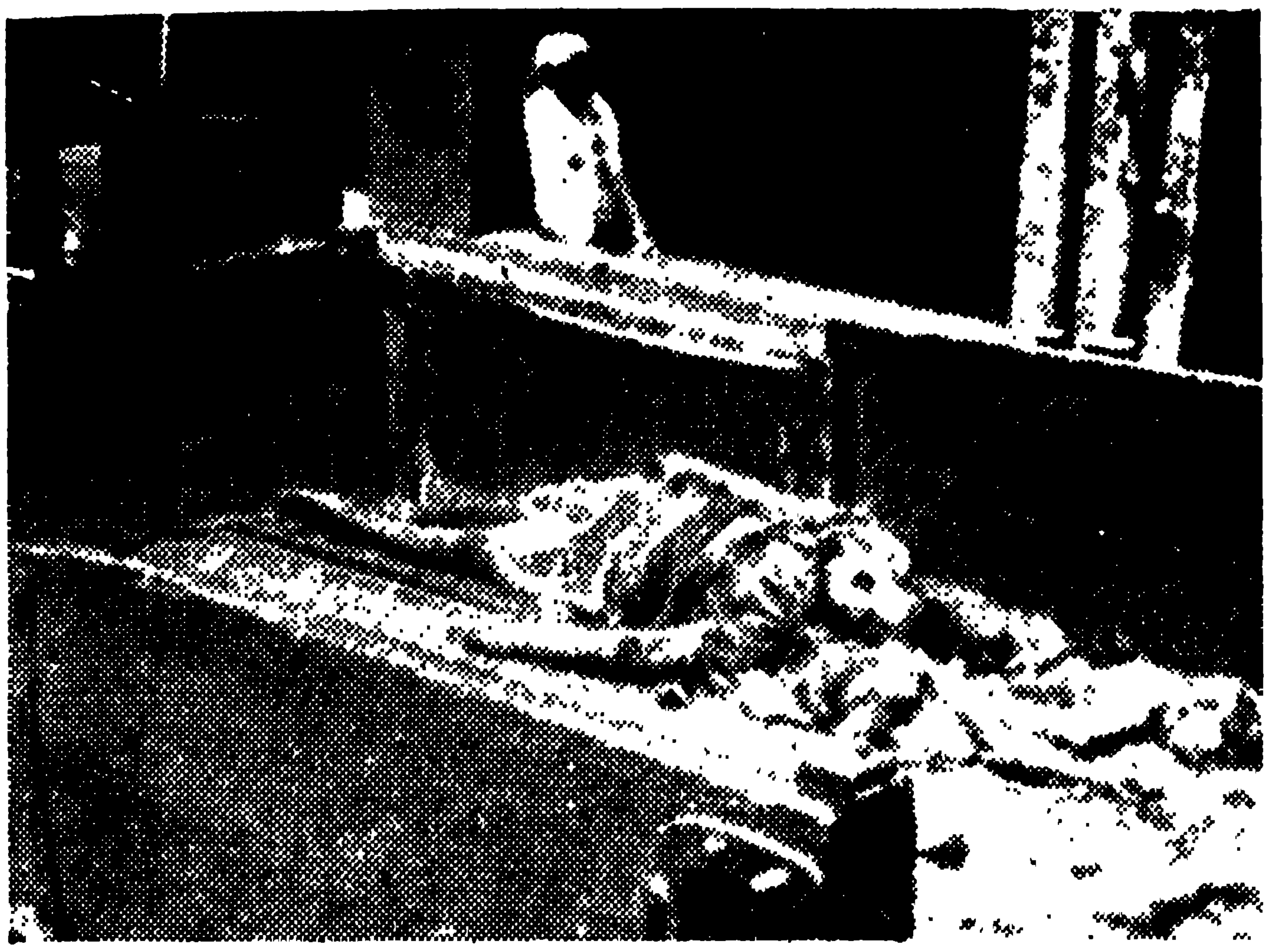

পথের উপরে ছোরার আঘাতে নিহত জনৈক হিন্দুর মৃতদেহ

দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় লোক ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিল, তাহারই ফলে এই দাঙ্গা। অপরে বলেন, কারণ রাজনীতিক। ভোটের ও চাকুরীর ভাগাভাগি লইয়া মনে যে উষ্মা সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা বাহিরে দাঙ্গায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু এ সকল কারণ অন্যত্রও বিদ্যমান, তবে তথায় দাঙ্গা ঘটে নাই কেন? মোট কথা, আর্থিক, রাজনীতিক বা ধর্ম্মগত,—ইহার কোনটাই দাঙ্গার মূল নহে। বোম্বাই সহরের হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান—সকল সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতৃগণকে লইয়া যে শান্তি-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা বলিয়াছেন, "আমাদের সন্দেহ, এই দাঙ্গার পশ্চাতে কোন এক অর্থসম্পন্ন সঙ্ঘের গুপ্ত প্ররোচনা বিদ্যমান রহিয়াছে Some organisation behind the riot and murderous attacks, with plenty of money." বস্তুতঃ কতকগুলি ধূর্ত্ত, স্বার্থান্ধ, কূটবুদ্ধি লোক যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছে, ইহাই সম্ভব। নতুবা দাঙ্গা সরকার ও শান্তিকামীদের প্রাণপণ চেষ্টাতেও থামিয়া থামিতেছে না কেন?

নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিল হিন্দুদের স্কন্ধে সকল অপরাধের বোঝা চাপাইয়াছেন; তাঁহারা এই দাঙ্গার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "A fresh instance of Hindu intolerance and highhandedness." চমৎকার!

সকলেই জানেন, মিঃ সৌকৎ আলি এ যাবৎ অসম্বদ্ধ প্রলাপ উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে (খিলাফতের সময়ের গুরু ও বন্ধু) এবং কংগ্রেসকে হিন্দুর স্বার্থরক্ষক ও মুসলমানদের শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দাঙ্গার কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে খোলা চিঠিতে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি হিন্দু কংগ্রেস মুসলমান দোকানদারের দোকানে পিকেটিং করা বন্ধ না করে, তাহা হইলে অনর্থপাত হইবে। শান্তি-সমিতির সদস্যরূপে তিনি ফ্রি প্রেস জার্ণালকে কটূক্তি করিলে যখন সভাপতি তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করেন, তখন তিনি ঘুষি পাকাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়াছিলেন, "শান্তি-সমিতিকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। আমি দেখিব, আমি কি করিতে পারি।" এই সদম্ভ উক্তিরই বা অর্থ কি? যাঁহার এইরূপ মনোবৃত্তি, তিনি মুখে শান্তি শান্তি করিলে কে তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিবে? তিনি একাধিকবার ভয় দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুদের বা হিন্দু কংগ্রেসের ভয়প্রদর্শনে মুসলমানরা ভয় করে না, তাহারা আত্মরক্ষা করিতে জানে। কে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছে যে, তিনি বালকের মত এমন আস্ফালন করিয়াছিলেন?

যে মুসলিম লীগের সদস্যদের মধ্যে মিঃ সৌকৎ আলির মত যুদ্ধপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোক আছেন, সেই লীগ কিরূপে হিন্দুদের স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইতে লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। ক্রফোর্ড মার্কেটের নিকট এক ট্যাক্সি গাড়ীতে ৪ জন মুসলমান ৩০ খানা ছোরা লইয়া যাইবার সময় ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। দাঙ্গা প্রশমিত হইয়া আসিলেও ক্রফোর্ড মার্কেট, ভেণ্ডীবাজার, মহম্মদ আলি রোড প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের পুলিস ও ফৌজ পাহারা সত্ত্বেও ছুরি-লাঠি চলিয়াছিল, এ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাইএর আদালতে এক মুসলমান ফিরিওয়ালা অনেকগুলি ছোরা সমেত ধরা পড়িয়া ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এ সকলও কি হিন্দুদের অপরাধ?

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য

দাঙ্গায় যে হিন্দুরা নিরপরাধ, এমন কথা কোন হিন্দু বলে না, কিন্তু হিন্দুরা কেবল মুসলমানদিগকে অপরাধী বলে না। তবে মুসলীম লীগ হিন্দুকেই অপরাধী করেন কেন? সরকারী বিবৃতিতে জানা যায় যে, (১) মুসলমান যুবকরা এক হিন্দুর নিকট মহরমের চাঁদা চাহিতে গিয়া নিরাশ হওয়ায় তাঁহাকে গালি-গালাজ করিয়াছিল, (২) এক মুসলমান একটি গাভীকে আঘাত করিয়াছিল,—ইহার যে কোনও একটা কারণ হইতে দাঙ্গার সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া জনরব। ইহাতেও কি হিন্দুরাই অপরাধী?

মনে হয়, যখন মিঃ শৌকৎ আলির মত মুসলমান নেতা হিন্দু কংগ্রেসকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এত অনর্থপাত হইত না।

রাজবন্দীর আত্মহত্যা

দেউলী জেলের রাজবন্দী মৃণালকান্তি রায় চৌধুরী আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। সন্দেহক্রমে ধৃত, বিনা বিচারে আটক, আত্মীয়-স্বজন হইতে—জন্মভূমি বাঙ্গালা হইতে বহুদূর রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যস্থ জেলের মধ্যে নীত বাঙ্গালী তরুণ রাজবন্দীর এই ভয়াবহ ও শোচনীয় মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া এমন কে বাঙ্গালী আছে যে, দুঃখ ও শোকভরে অবসন্ন হইয়া না পড়িবে? কি কারণে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই, ইহার বিশদ বিবরণও পাওয়া যায় নাই। তবে এ সম্বন্ধে কয়টি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়,—(১) রাজবন্দী যখন বাঙ্গালা হইতে স্থানান্তরিত হন, তখন তাঁহার দৈহিক বা মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন ছিল, তবে হঠাৎ কি জন্য তিনি দেউলীতে জীবনে বীতস্পৃহ হইলেন? (২) জেলের মধ্যে আত্মহত্যার উপযোগী উপকরণ তিনি কিরূপে সংগ্রহ করিলেন? (৩) কড়া পাহারা সত্ত্বেও এবং অন্যান্য রাজবন্দীর উপস্থিতি সত্ত্বেও এ সুযোগ তিনি কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন?

বাঙ্গালা হইতে বহুদূরে যখন বাঙ্গালী রাজবন্দীকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন সকলের আতঙ্ক ও সংশয় দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ হইতে স্যার জেমস গ্রেগার আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের আহারাদির সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু যখন তাঁহাদের সহিত আত্মীয়-স্বজনের দেখা-সাক্ষাতে সুযোগের কথা উত্থাপিত হয়, তখন তিনি বিশেষ সুবিধা বা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। তখনই লোকের মন সংশয়াকুল হইয়াছিল।

তাহার পর 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' দেউলীর বাঙ্গালী রাজবন্দীদের সম্পর্কে বিশেষ বিধানের (Regulations) কথা প্রকাশিত হইল। তখন সংশয় আতঙ্কে পরিণত হইল। সেগুলি হিজলী ও বক্সার বিধানের সংশোধিত সংস্করণ। দেখাসাক্ষাৎ ও চিঠিপত্রের আদানপ্রদান সম্বন্ধে জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উপর যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, তাহা বিষম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাছিয়া সংবাদপত্র পাঠের ব্যবস্থাও সুন্দর। বিধানের একটি ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইল যে, রাজবন্দীর তাঁহাদের স্বদেশের মঙ্গলের হানিকর কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, করিলে দণ্ডনীয় হইবেন। অর্থাৎ তাঁহাদের একমাত্র প্রতিবাদের অস্ত্র প্রায়োপবেশনও তাঁহারা করিতে পারিবেন না। অথচ অভাব-অভিযোগের প্রতীকারপ্রার্থী হইলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিবেচনার মুখ চাহিয়া আবেদনপত্র দিবার অধিকারী হইতে পারিবেন। তাঁহারা কোনরূপ অবাধ্যতার বা শৃঙ্খলাভঙ্গের চেষ্টা করিলে ১০ ধারা অনুসারে তাঁহাদের বিপক্ষে "any officer of the prison and any prison guard may use a sword, bayonet firearm or any other weapon." সরকার বা পুলিস যতই বলুন, রাজবন্দীরা ভয়ঙ্কর অপরাধী, তাঁহাদের বিপক্ষে ভীষণ অপরাধের প্রমাণ আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ্য বিচারে তাঁহাদের অপরাধ সপ্রমাণ না হয়, ততক্ষণ জনসাধারণ কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না যে, তাঁহারা অপরাধী। সরকার এ ক্ষেত্রে interested party, সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট বিচার না হইলে কেহ তাঁহাদের কথায় আস্থাস্থাপন করিবে না। এ অবস্থায় রাজবন্দীদের প্রতি সাধারণ কয়েদীদের মত জেল আইন প্রয়োগ করায় ফল কি মন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই?

আজ রাজবন্দী মৃণালকান্তির শোচনীয় অপমৃত্যুতে বাঙ্গালী জাতি শোকাচ্ছন্ন। কি কারণে মুকুলিত যৌবনে বাঙ্গালার এই সন্তান জীবনে বীতস্পৃহ হইল, তাহার যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

ভারত-সচিবের সুখ-কল্পনা

ঘোষণার পর ঘোষণায় এবং পার্লামেণ্টে তর্ক-বিতর্কে বা বক্তৃতায় ভারত-সচিব ভারতের আর্থিক ও রাজনীতিক অবস্থার দিন দিন উন্নতিরই পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

প্রথমে জিজ্ঞাস্য, আর্থিক অবস্থার কি উন্নতি হইয়াছে? ব্যবসায়-বাণিজ্য কি খুব ফলাও হইতেছে, না একের পর একটি করিয়া শুইয়া পড়িতেছে? চাক্ষুষ প্রমাণ ত তিনি উড়াইয়া দিতে পারেন না। গত ৩ মাসে পণ্যদ্রব্যসমূহের মূল্য কি কণামাত্রও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে? কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার-সমূহের আর্থিক অবস্থা কি স্বচ্ছল হইয়াছে? জমীদারী নীলামে চড়াইয়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া কি লাটের টাকা সব উঠিতেছে? রেলের বা ডাকের আয়, আবগারীর, কাষ্টম ও অন্যান্য শুল্কের আয় কি বাড়িয়াছে?

রাজনীতিক অবস্থার কি উন্নতি হইয়াছে? এসোসিয়েটেড প্রেসের হিসাবে গত কয় মাসে ৪২ হাজারেরও উপর নর-নারী ও বালক জেলে গিয়াছে। দেশব্যাপী ধরপাকড়, খানাতল্লাসী ও দণ্ড হইতেছে। বিপ্লবীদের বিভীষিকাও অনুষ্ঠিত হইতেছে। লোকের শান্তি কোথায় যে, রাজনীতিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলা যাইবে?

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী চিত্র-বিভাগ]   রক্তকমল   [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

সচিত্র মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ]   আষাঢ়, ১৩৩৯   [৩য় সংখ্যা

সেই আর এই

কথাটা আজ পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে গেছে, কিন্তু মনে হয় যেন সে দিনের কথা। প্রিয় যা, তা চিরদিনই হৃদয়ের সন্নিকট, দিন গুণে তার ব্যবধান বাড়ে না। সব জিনিষ হিসেবের নয়।

রাণী রাসমণির দেবালয় ছিল আমাদের বাল্যের বিচরণ-ক্ষেত্র, বেড়াবার যায়গা। দেবদর্শনে যে দেবদেবীর আকর্ষণ আমাদের টেনে নিয়ে যেত, তা নয়। তবে গিয়ে পড়লে যে তাঁদের না দেখে ফেরা হ'ত, তাও নয়; ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক্ বা সংস্কারবশেই হোক, দর্শন ও প্রণাম সেরে আসতেই হ'ত। তখনকার দিনের আবহাওয়াই ছিল তাই। কিন্তু যাবার সময় যেতুম—বেড়াতে। এটা বিকেলবেলার কথা।

দক্ষিণেশ্বর একটি ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম, প্রত্যেক ব্রাহ্মণবাড়ীতেই শালগ্রাম-শিলা ও তাঁর নিত্যপূজা ছিল। ঠিক যেন সংসারগুলি ছিল তাঁর এবং তাঁর জন্যই যেন সংসারের কায-কর্ম,—পরিচ্ছন্নতা, শুচিতা প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে স্ত্রীপুরুষরা নারায়ণের পূজার আয়োজন ও ভোগ-রন্ধনে ব্যস্ত। পূজা ও ভোগ সমাপনান্তে প্রসাদ গ্রহণ। মোটামুটি এই,—অন্য সবই গৌণ। অর্থাৎ তিনিই ছিলেন সংসারের মালিক, পবিত্রতা ও শুচিতা-রক্ষার শাসনদণ্ড বা প্রতীক। আর সব সেবায়েত।

আমরা সেই সংসারে মানুষ, সুতরাং বাল্যকালে পূজার ফুল সংগ্রহের ভার, স্বেচ্ছায় বা আদেশে নিতে হ'ত। সঙ্গীও জুটতো। প্রত্যূষে উঠে সাগ্রহেই এ কাযটি করা হ'ত। পবিত্রমনে বললে কি বোঝায়, তা বোধ হয় জানতুম না, তবে শ্রদ্ধার সহিত। এখন মনে হয়,—এমন আনন্দের কায জীবনে আর জোটেনি।

বাল্যের স্মৃতিপটে, রাণী রাসমণির গঙ্গাতীরস্থ বিরাট দেবালয়ের মেখলা সম, উত্তর ও পশ্চিম বেষ্টিত বাগান,—পুষ্প ও সৌরভ-প্রাচুর্য্যে

যে কোন জাতির গৌরবের বস্তু ছিল। মলিন ও অশান্ত প্রাণে, তার পবিত্র প্রভাব, অজ্ঞাতে শান্তি ও আনন্দ এনে দিত। সর্ব্বোপরি সুদূর-বিস্তৃত প্রশস্ত প্রাঙ্গণমধ্যে দ্বাদশ শিব-মন্দির, শ্রীশ্রীভবতারিণীর বিরাট দেউল, শ্রীগোবিন্দজীর সুদৃশ্য হর্ম্ম্য, যুগপৎ সুরলোকে উপস্থিত ক'রে দিত।

বালকের মন, কত দিনই ভেবেছে,—এ প্রাঙ্গণ কেশব বাবুর বক্তৃতার উপযুক্ত ক্ষেত্র। তখন কে জানতো যে, কেশব বাবু এক দিন এখানে এসে নীরবে শ্রদ্ধানতভাবে ব'সে থাকবেন?

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর

সে উদ্যান ছিল আমাদের পুষ্পচয়নক্ষেত্র—যেন আমাদেরই বাগান! কেহ কোনো দিন বাধা দেয়নি। যতই সকালে যাই, গিয়ে দেখতুম চার পাঁচ ঝুড়ি ফুল, বিল্বপত্র, মালীরা তুলে তুলসীমঞ্চের পাশে রেখে দিয়েছে। বাগান দেখে মনে হ'ত, ফুলগাছে এখনও কেউ হাত দেয় নি। ফুলের কি প্রাচুর্য্য! বেলা ৯টা পর্য্যন্ত কত লোকই তুলে নিয়ে যেত, কিন্তু শোভা নষ্ট হ'ত না। শত ঝাড় যুঁই ও বেল, কত না রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, চামেলী, নবমল্লিকা, করবী,—স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত চম্পকবৃক্ষ। আরও কত কি। সবই দেশী, —গন্ধসম্ভারে ভরপুর, শ্বেত পুষ্পের ক্ষেত। রাণী অজ্ঞাতে যেন দেবতার আবির্ভাব-ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন অকারণ কিছু হয় না, বর আসবে ব'লে লোক কত যত্নে ঘর বাড়ী আসর সাজায়।

ক্রমে কৈশোর কেটে গেল। গঙ্গাতীরের সেই সুদূর প্রসারী পোস্তা,—আমাদের বসবার বেড়াবার স্থান হ'য়ে গান-গল্প চললো।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন—পূজারী; তৎপূর্ব্বেই এসে গেছেন,—কঠোর সাধনাও শেষ করেছেন। বিশেষ কিছু

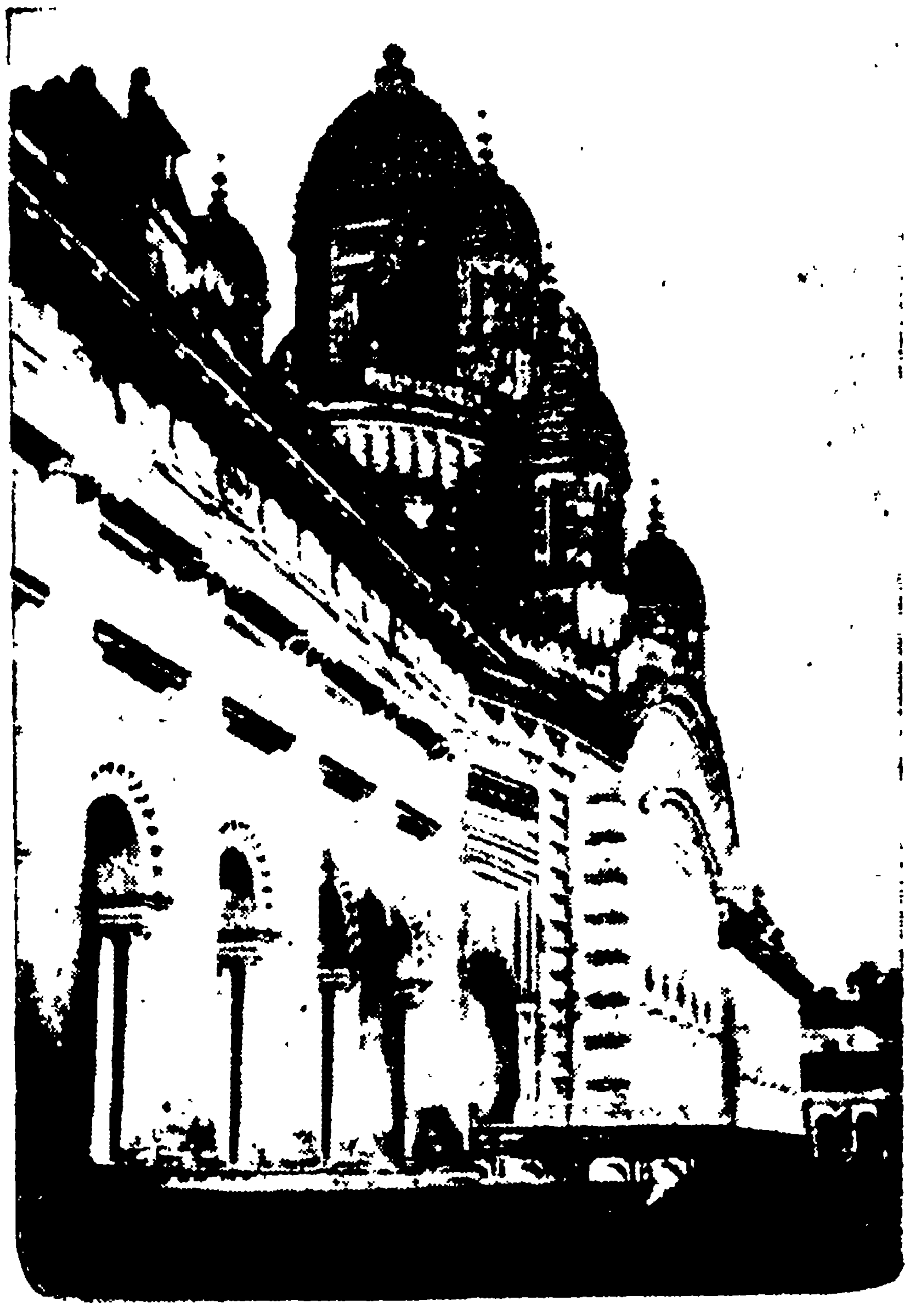

কালীবাড়ীর আর এক দিকের দৃশ্য

জানি না। প্রদীপের নীচে অন্ধকার। দূরের গাড়ী-জুড়ি বাগানে আসছে। পূজারীর সিদ্ধির কথার উল্লেখ হ'লে গ্রামের সন্ধ্যাহ্নিক-সিদ্ধ প্রবীণরা বিদ্রূপের হাসি হাসেন আমোল দেন না।

ইতিমধ্যে চার পাঁচ বছর—পশ্চিমে দাদার কাছে আর ক্যানিং কলেজে কাট্‌লো। বাল্যকাল থেকেই আমার একটা দুর্ব্বলতা ছিল,—কিছুতেই অবিশ্বাস ছিল না, মন সহজেই সব মেনে নিত, সাধু-সন্ত খোঁজা বাইও ছিল। আশ্চর্য্য,—ঘরের পাশের এত বড় প্রকাশটি এত দিন

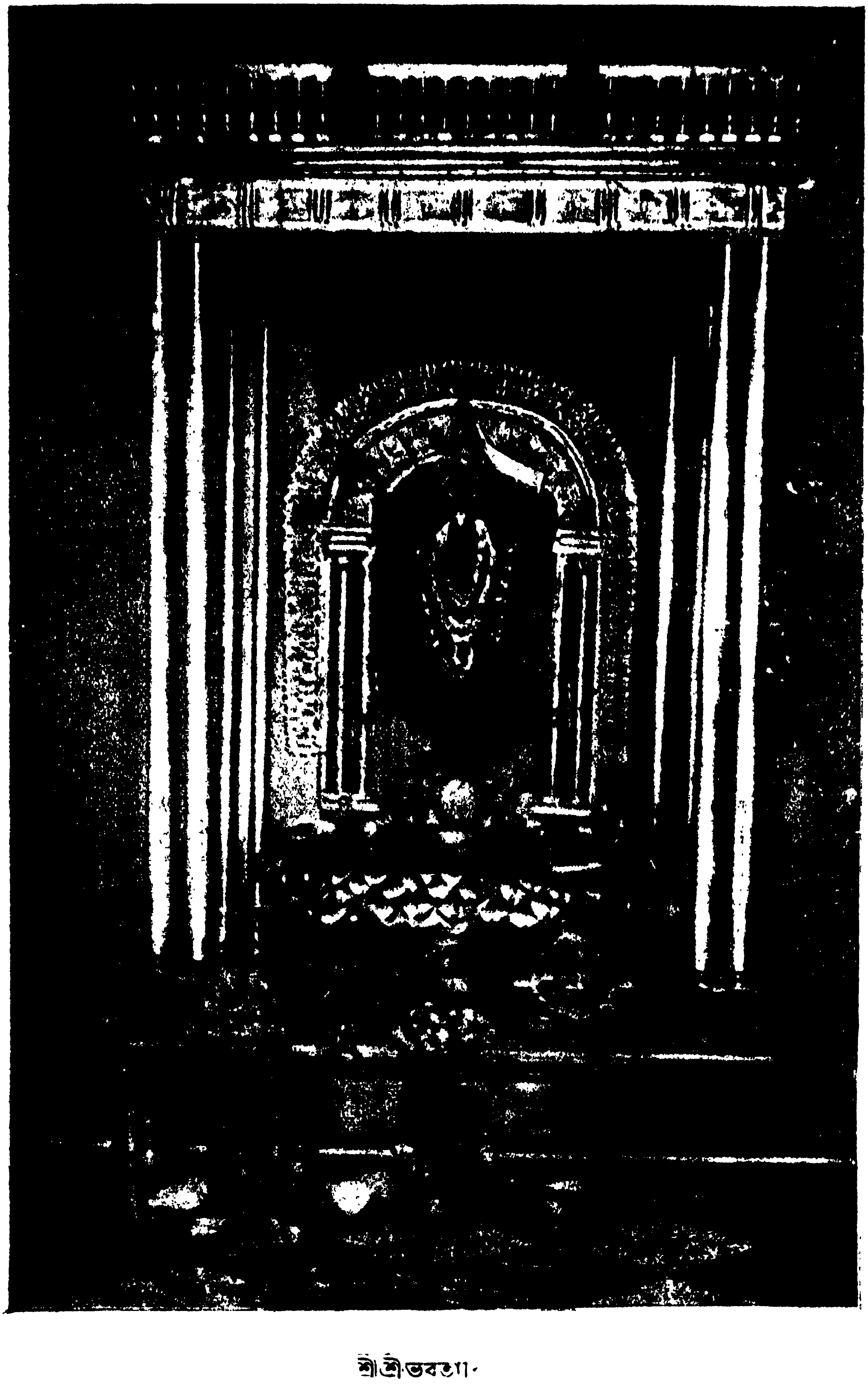

শ্রীশ্রীভবতারা

এড়িয়ে ছিল! অবশ্য তার অনেক কারণও ছিল—যা উল্লেখ করতে লাগে,—লজ্জাও হয়। প্রাণ চাইলেও সুযোগ খুঁজতে হ'ত।

ফিরে এসে দেখি—রাণীর বাগান ব্রজধাম। গাড়ী-জুড়ী এন্তোক্ লক্ষ যাওয়া-আসা করে,—বড় বড় লোকের ভিড়। বিদেশী মহাজনেই মধু লুঠছে, দেশীর (গ্রামের লোকের) সম্পর্ক নেই বল্‌লেই হয়।

শুনলুম,—"একমাত্র যোগীন চৌধুরী ভিড়েছে,—কলকেতা থেকে খোঞ্চে খোঞ্চে ক্ষীরেলা আসে, খুব মারছে, চেহারা ফিরেছে" ইত্যাদি। সবটাই বিদ্রূপের সুরে। ভাল লাগলো না। যোগীন ছিল আমার সহপাঠী, জমীদার-বংশের সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ীর ছেলে, অতি নিরীহ। সকল কথাই হাসিমুখে নিত।

এক দিন গিয়ে সসঙ্কোচে ঠাকুরের দরবারে ঢুকে পড়লুম। অনেক লোক, ঠাকুর মধ্যে মধ্যে এক একটি কথা বলছেন, কেশব বাবু তাঁর খাটের পাশে নতজানু ও যোড়করে ব'সে শুনছেন

তার পূর্ব্বে একটি সুন্দর যুবাকে আমাদের বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আসতে দেখি। নারকোল আর মুড়ি খাওয়া হ'ত, আর হাসি-তামাসা, ব্রাহ্ম-সমাজের কথা চোল্‌তো। পরে রাণী রাসমণির পোস্তায় গিয়ে বসা হ'ত। তিনি গাইতেন। যুবা তেজস্বী, সুকণ্ঠ, 'ব্রিলিয়েণ্ট'—আমার চেয়ে দু' তিন বছরের বড় ছিলেন। তাঁকে দেখলে তাঁর সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা হ'ত, না জিজ্ঞাসা ক'রে থাকা যেত না। হরিদাসের সহপাঠী হলেও, ঢের উঁচু ব'লে মনে হ'ত। সে যেন কারুর দাবে থাকবার বা পরাজয় স্বীকার করবার লোক নয়, নাকে দড়ি দিয়ে সকলকে চরিয়ে বেড়াবার লোক। তার সামনে কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সাহস হয় না, এখনই কেটে কুটে লজ্জিত ক'রে ছেড়ে দেবে,—a born leader. এটা যেআজ তাঁর পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ দেখে উল্লেখ করছি,—মোটেই তা নয়। তখনই এই ধারণা এসে ছিল,—তাঁর চক্ষু, তাঁর Commanding tone ব'লে দিত।

হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলুম,—ইনি কে?

"উনি আমার সহপাঠী—নরেন্দ্রনাথ দত্ত; বড় Brilliant ছেলে, কিছুই মানে না,—দৃক্‌পাতও করে না

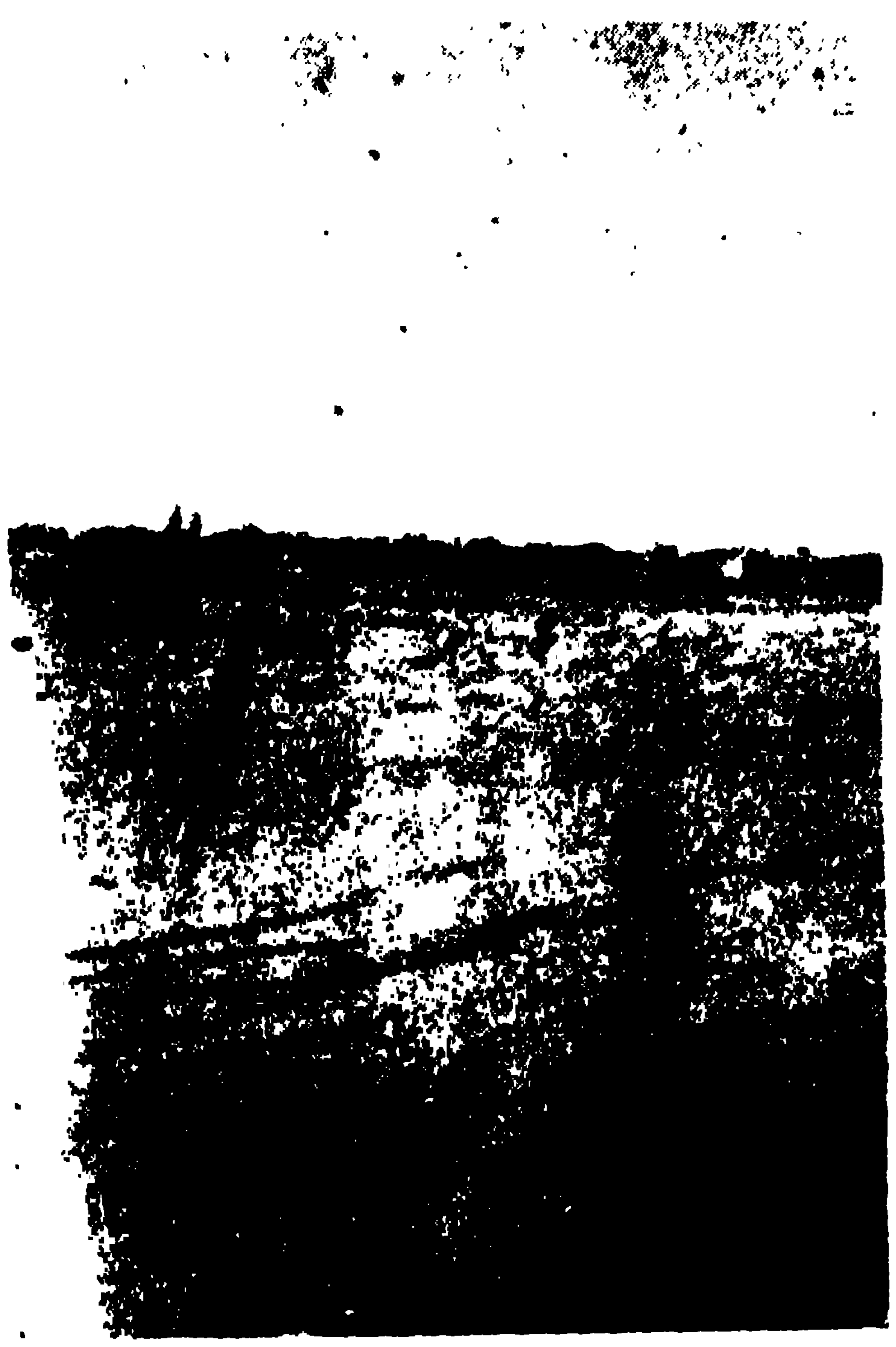

পরমহংসদেবের ঘরের সম্মুখ হইতে গঙ্গার দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বরের কালীমাতার মন্দির

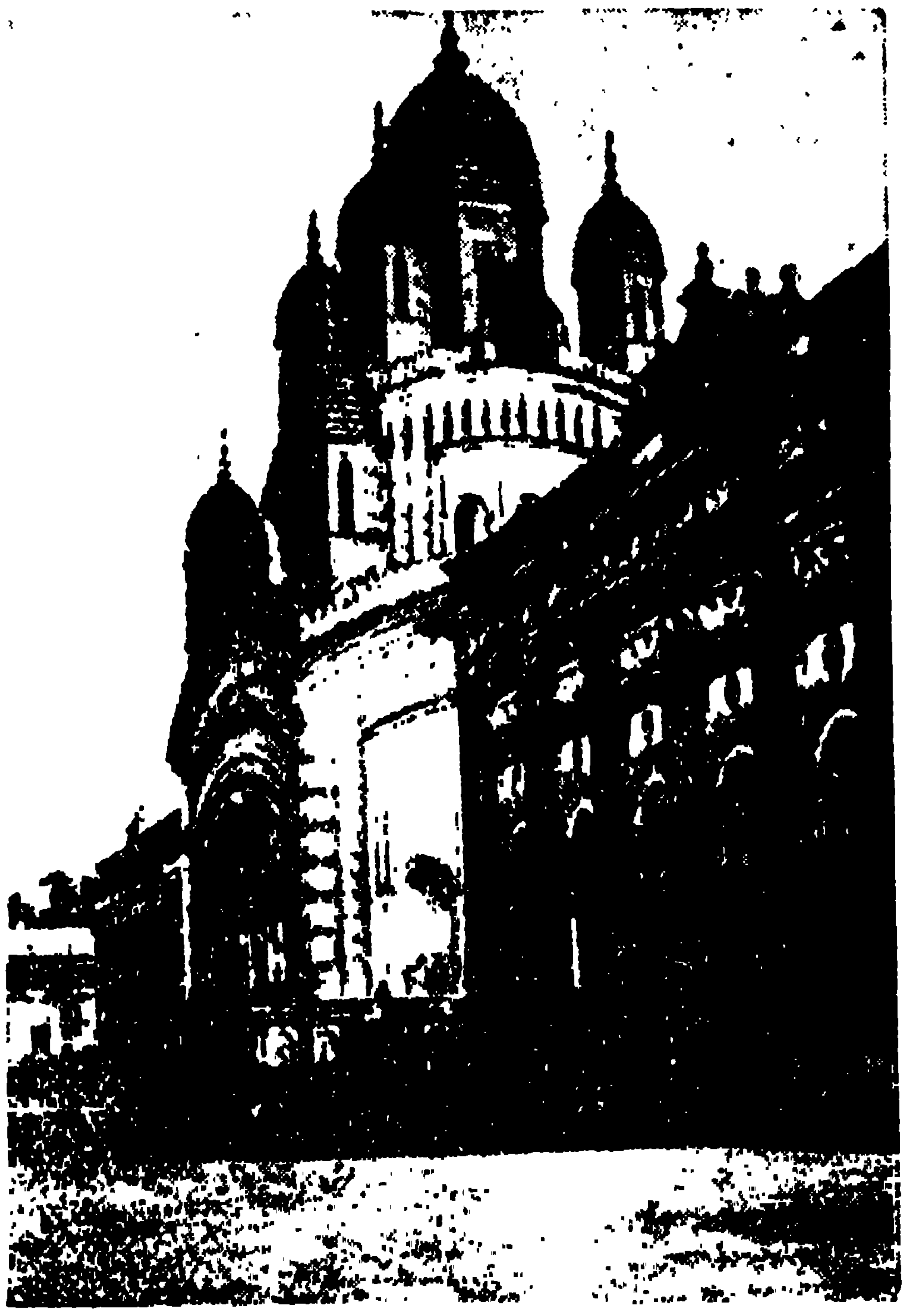

রাধাকান্তমন্দির, কালীমন্দির ও নাটমন্দিরের একাংশের দৃশ্য

গঙ্গার উপর দ্বাদশ শিবমন্দিরের একাংশ

কালীমন্দিরে প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার

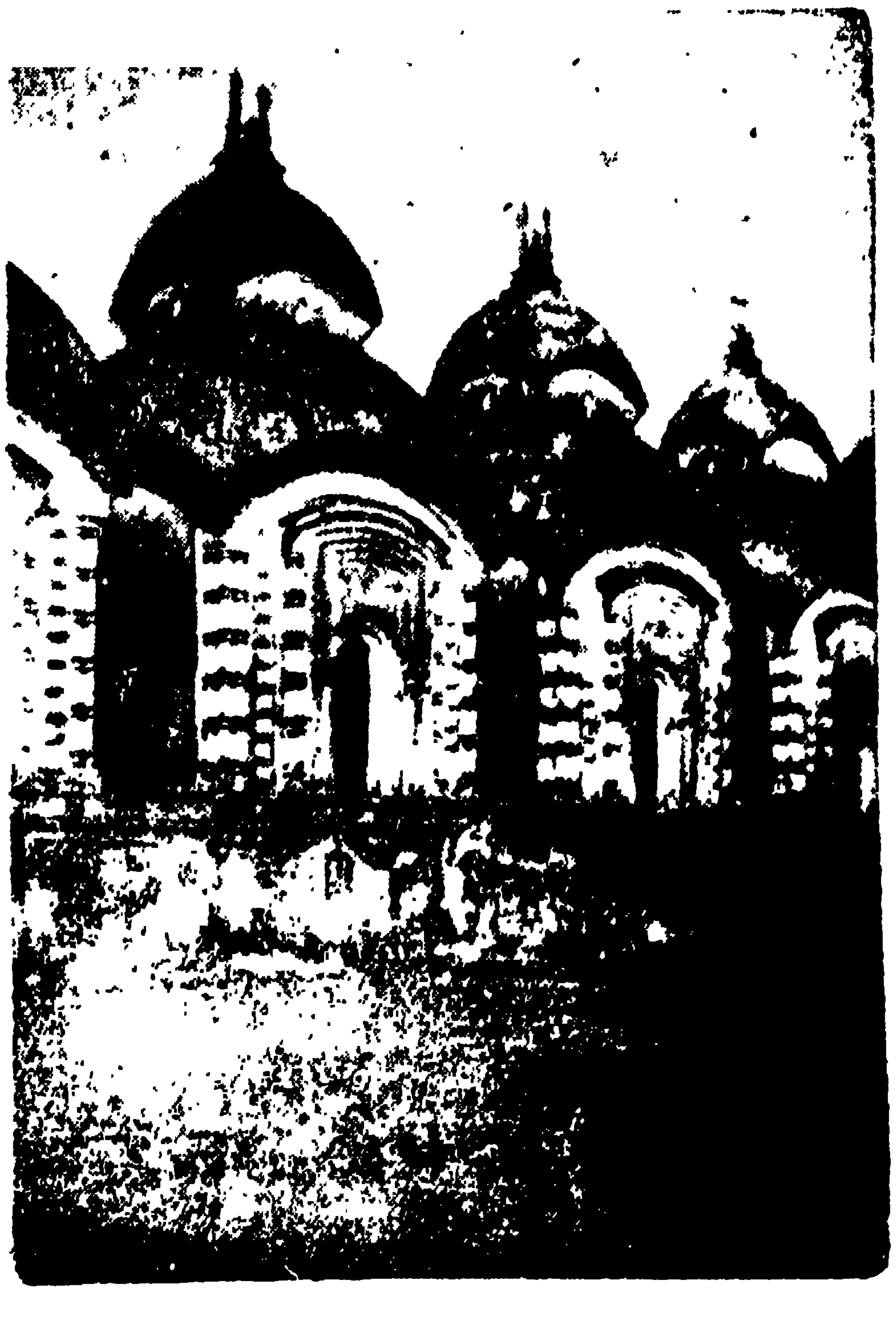

ভিতর হইতে দ্বাদশ মন্দিরের একাংশের দৃশ্য

—অথচ অনুসন্ধিৎসু, well-read, কিছুতে হটাবার যো নেই, তর্ক-বীর। আবার গাইতে, বাজাতে, রসিকতায় দক্ষ। ওর কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন ভগবান্‌ও অলীক কল্পনা, in a word—dont care dont of fellow খুব ধারালো brain, ওকে না পেলে, আমাদের সুখই হয় না, আসর জমে না।”

তখন কে জানতো—এই নরেন্দ্রনাথই আমাদের ভবিষ্যৎ দিগ্বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!

পোস্তার গানের আড্ডা ভেঙ্গে ক্রমে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ,—“শোনাই যাক না, লোকটা কি বলে,—দেখলেই বোঝা যাবে” ইত্যাদি।

পঞ্চবটী

তার পরের কথা আজ আর কারুর জানতে বাকী নেই, সভাজগৎ সাগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে।

* * * *

এবার ‘রবীন্দ্র-জয়ন্তী’ দেখতে গিয়ে, শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সাধনক্ষেত্র—লীলাভূমি দেখতে গেলুম, ৩৬ বছর পরে! সেই সুপরিচিত দেবালয়, সেই বাগান, যা গৌরবের ও গর্ব্বের সহিত স্মৃতিতে জড়িত, যার তুলনায় কোনও দিন কোনও দেবস্থান মনে ধরে নি। তার আর সে শান্ত সৌম্য গাম্ভীর্য্য, সে বিরাট প্রতিষ্ঠানের মহান্ প্রশান্তি অনুভবে এল না!

বাগানের সে শ্রীসৌন্দর্য্য নেই, শ্রীভ্রষ্ট। উত্তর-বারান্দার সামনের ‘গন্ধরাজের’ রাজত্ব লোপ পেয়েছে,—পাণ, বিড়ি, সোডা-লিমনই দেখলুম বেড়েছে যাত্রী, দোকান আর কোলাহল। প্রাঙ্গণে, নাটমন্দিরে, শ্রীশ্রীভবতারিণীর দেউলে লোকসমাগম, স্থানে স্থানে সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, অর্থার্জ্জন আর কেনা-বেচা। অর্থাৎ যেটা সচরাচর হয় এবং স্বাভাবিক।

এ যেন নতুন কিছু দেখলুম, আমাদের সে জিনিষ নয়। পঞ্চাশ বছর পরে, এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই,—পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির ধর্ম্ম, সেই ত বিশ্বের বৈচিত্র্য রক্ষা ক’রে আসছে যা দেখলুম—এইটাই, ত হিসাবমত ঠিক,—বিশেষ দেবস্থানে। বড় বড় দেবালয়ের এইটাই ত বড় সার্টিফিকেট—প্রসিদ্ধ প্রমাণ।

তখনকার কথা ছিল স্বতন্ত্র। অজ্ঞাতেই আবির্ভাবের আয়োজন—আপনিই গ’ড়ে উঠেছিল। ফুল,—ফোটবার জন্যে আকুল আগ্রহে প্রতিযোগিতা-পরায়ণ। শান্ত মৃদু সমীর সর্ব্বত্র সৌরভ ছড়িয়ে বেড়াতো, জাহ্নবী-বক্ষোবিহারী নৌ-যাত্রীরা, তা উপভোগ করতে করতে যেতেন। ভগবৎ-কৃপান্বেষী ভক্তরা,—কোথাও একটি, কোথাও তিন চারটি, শুদ্ধান্তঃকরণে উদাসভাবে বিচরণ করতেন। সে গভীর মধ্যে বিষয়চিন্তা আসাই সম্ভব ছিল না। কেহ পঞ্চবটীমূলে চুপচাপ। মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের ঘরটিতে বা Power houseএ শ্রদ্ধানতভাবে ঢুকে inspiration সঞ্চয়। সেখানে নরেন্দ্রনাথ গাইছেন,—“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।” ঠাকুর শুনতে চান,—কোনটিই সম্পূর্ণ শোনা হয় না,—ঘনঘন ভাব-সমাধি বাধা দেয়। সুকোমল শরীর, কোথাও একটু টান্‌-টোন্ নেই—যেন ননীর পুতুল!

শ্রীশ্রীভবতারিণী ও শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে কায়সারা দর্শন ও প্রণামান্তে ঠাকুরের ঘরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হলুম। কি দেখবো, কিরূপ দেখবো, কি জানি কেমন ভাব আসবে! মনকে একটু প্রস্তুত ক’রে সংযত-সম্ভ্রমে ঢোকা চাই। সায়েবের ঘরে ঢুকতে হ’লে আপনা-আপনি চুলটায় হাত দিতে হয়, বোতামগুলো দিয়ে কোটটা একবার নীচের দিকে টানতে হয়; সুবিধা থাকলে রুমাল দিয়ে

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ভিতর—উত্তরদিকের দৃশ্য

থাকবেন। এখন তারই বিকাশ। স্থানটিকেও জাগ্রত ক'রে গেলেন। এও তাঁর আবির্ভাবেরই প্রভাব।

তবুও মন বোঝে না, আগেকার সেই দিনই খোঁজে। প্রাণটা হাহাকার ক'রে ওঠে। তাঁর পরম ভক্ত, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন, শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে "শ্রীরামকৃষ্ণ অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "হায়, সকলই সেই আছে, কৃষ্ণ রে, কেবল তোকেই দেখতে পাচ্ছি নি।" * * * সেই পবিত্র রজে লুটাইয়া, কৃষ্ণবিরহে আকুল হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—"ব্রজে সকলই সুন্দর, কেবল আমার ব্রজসুন্দর নাই।" -সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, আর কি তিনি থাকতে পারেন? অচিরেই সাড়া দেন।

মুখটাও মুছতে হয়। এখানে অন্তর নিয়ে কথা,—পঁয়তাল্লিশ বছরে কত ময়লাই না জমেছে! মুছে দাও ঠাকুর।

এক দিন যে ঘরটিতে তাঁর সামনে বসবার সৌভাগ্য তিনি দিয়েছিলেন, আজ সেই ঘরে সসঙ্কোচে বেদনা-পীড়িত সম্ভ্রম নিয়ে ঢুকলুম। প্রাণটা হায় হায় ক'রে উঠলো। চারদিক্ চাইলুম, তাঁর প্রিয় ছবিগুলি রয়েছে, খাটখানি দক্ষিণে স'রে গেছে, বোধ হয়, যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে, স্থানের জন্যেও। সবই নিষ্প্রভ ঠেক্‌লো। এ ঘরেও স্ত্রী-পুরুষের ভিড়। ঠাকুরের চরণস্পর্শে পবিত্র মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। তীর্থদর্শন শেষ হ'ল।

তখন যেখানে তপোবনের বাতাস বইতো, সবই সাধন-অনুকূল ছিল, এখন তা জনকোলাহল-মুখর দেবস্থানে দাঁড়িয়েছে, ভক্তরা দেবদর্শনে আসেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। জানতেন, নিজে চ'লে যাবেন, যে মাকে জাগ্রত করেছিলেন, তাঁর ভক্তদের নিয়ে তিনিই

অন্তরটা কাঁদলেও আমার শতধা বিক্ষিপ্ত দশের মুখচাওয়া মন, পাঁচ জনের সামনে ব্যথিত কাঙালের মত একটু কাঁদতেও দিলে না। মূঢ়ের অন্তর কেবল হায় হায় করলে. ধিক্, এতটা দিন বৃথাই দেহভার বহন করা হ'ল! তুমি না দিলে কেউ পায় না, দয়া করো ঠাকুর। জয় রামকৃষ্ণ!

গঙ্গাবক্ষ হইতে দক্ষিণেশ্বরের দৃশ্য

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

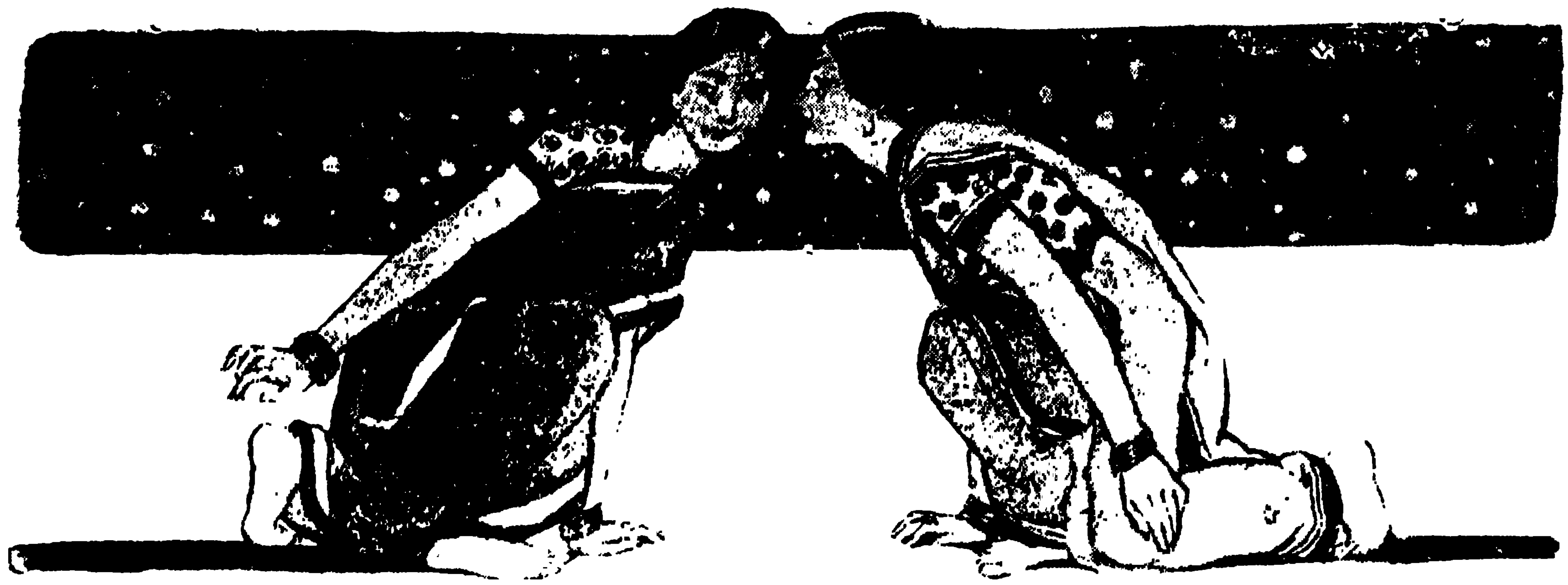

স্পর্শের প্রভাব

১

বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে একটি গলী অষ্টাবক্রের মত আঁকিয়া-বাকিয়া খালের ধারে গিয়া পড়িয়াছে। গলীর মধ্যস্থ একটি টিনের বাড়ীর কলতলায় গ্রীষ্মের অপরাহ্নে একটি শ্যামাঙ্গী তরুণী বাসন মাজিতেছিল এবং আপন মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল। গৃহবাসীরা তখন সম্ভবতঃ নিদ্রার আরাম উপভোগ করিতেছিল।

তরুণীর ছিপছিপে একহারা চেহারা হইতেও যৌবনের লাবণ্য উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। কিন্তু সে লাবণ্য উপভোগ করিবার সে ছাড়া সেখানে আর কেহ ছিল না। মনে করিয়াই বোধ হয়, সে বাসন মাজার তালে তালে লাবণ্যের তরঙ্গভঙ্গ সন্দর্শন করিয়া আপন মনে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; অধিকন্তু মাঝে মাঝে পশ্চাতে ফিরিয়া আপনার দীর্ঘ কৃষ্ণ এলোয়িত চিকুরদামের সৌন্দর্যে আপনিই মুগ্ধ হইতেছিল।

অঙ্গনের পার্শ্বস্থ দীর্ঘোন্নত নারিকেলবৃক্ষের শীর্ষদেশে উপবিষ্ট একটা চিল সংগৃহীত খড়কুটায় বাসা বাঁধিতেছিল, মধ্যে মধ্যে তাহার কর্কশস্বরে স্থানটা ভরিয়া যাইতেছিল। একটা মার্জ্জার কলতলার আঁস্তাকুড়ের মধ্যে একদফা আহার সারিয়া নিমীলিতনেত্রে আর একদফার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের পিয়ারা-বৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়া একটি বালক পিয়ারা পাড়িতেছিল এবং ভুক্তাবশিষ্ট পিয়ারা প্রতিবেশীর কলতলার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়া পত্রপুঞ্জের অন্তরালে লুক্কায়িত হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

তরুণী প্রথমে চমকিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে লক্ষ্যস্থলের দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হইতেই বালককে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাসিয়া ছোট হাতের ছোট কিল তুলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল; তাহার পর সন্তর্পণে উঠিয়া আসিয়া মধ্যস্থ ব্যবধান-প্রাচীরের সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া একবার চতুর্দ্দিক্ ভয়চকিত-নয়নে দেখিয়া লইল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "কি ব'লে দিইছি? জানলা দিয়ে দিলে হ'ত না? যা, যা!"

বালক খিল খিল হাসিয়া আর একটা পিয়ারা ছুঁড়িয়া মারিয়া তাড়াতাড়ি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। তরুণী পিয়ারাটা ক্ষিপ্রগতি কুড়াইয়া লইল, তাহার অঙ্গে একখানি কাগজের মোড়ক।

"কে গা, বৌমা?" চক্ষু মুছিতে মুছিতে একটি প্রৌঢ়া বিধবা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৃশাঙ্গী তরুণীর তুলনায় এই স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়ার অঙ্গসৌষ্ঠব যে অতীব বিসদৃশ দেখাইতেছিল, তাহা আর কেহ না দেখিলেও তরুণী স্বয়ং বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছিল।

পুত্রবধূর মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনযুক্ত ছিল না, শ্বশ্রূকে দেখিয়াও সে বিষয়ে তাহার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না; বরং তাহার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ নিবিড় জলদজালের মত কালো অন্ধকার হইয়া আসিল। পরুষ স্বরে সে উত্তর দিল, "কে আবার আসবে এই ভাঙ্গা টিনের কলতলায়?"

সারদাসুন্দরী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "ও মা, বেলা তিনটে বেজে গেল, কলে জল এল, বাসনের ডাঁই প'ড়ে রইলো, বলি কচ্ছিলে কি বৌমা এতক্ষণ বল ত?"

তরলা মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি ত বলেছি, ও সব আমার দ্বারা হবে না।"

সারদাসুন্দরী রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "তবে কি হবে শুনি? চুল এলো ক'রে কেদারার উপর এলিয়ে প'ড়ে নাটক-নভেল

পড়া? তা এ বাড়ীতে এ সব হবে না। ব'লে দিচ্ছি, বাপু। আমার কাছে বাপু পষ্টো কথা, হঁ্যা!"

তরলা বাসন ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ-মুখ তখন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। "বাপের জন্মে যা করি নি, তা আমি করবো কি ক'রে? আমি ত বলছি, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি ও সব দাসীবৃত্তি করতে পারবো না, এই শেষ ব'লে দিচ্ছি তোমাদের।"—চোখমুখ ঘুরাইয়া কথা কয়টা বলিয়াই তরলা দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

সারদাসুন্দরীও সপ্তমে চড়িয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ফরফর ক'রে ঘরে গিয়ে ঢুকলি যে বড় মুখনাড়া দিয়ে? ও বাসনের ডাঁই মাজবে কে? সহুরে লেখাপড়া-শেখা মেয়ে, উনি বাসন ছোঁবেন না! কেন, যখন মিন্‌ষে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, তখন নবাব-পুত্তুরের সঙ্গে দেখে দিতে পারে নি? মর, মর! তবু যদি বাপের কোটাবালাখানা থাকত!"

নর্ম্মদা-প্রপাতের মতই প্রৌঢ়ার বাক্যস্রোতঃ অবিরাম-গতিতে ঝরঝর নামিয়া আসিল। ততক্ষণ বধূর কিন্তু সাড়া শব্দ নাই—সে সেই যে শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, তাহার পর হইতে আর কথাটিমাত্র কহে নাই। সে তখন পিয়ারা-মোড়া পত্র পাঠে আত্মবিস্মৃত। মাঝে মাঝে তাহার মুখখানি বিদ্যুদ্দামদীপ্ত অন্ধকার আকাশের মত হাসিয়া উঠিতেছিল। সে পত্রে কি ছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে।

"কৈ মা, ভাত দাও," বলিয়া তারকনাথ একবারে পাদুকা সমেত বারান্দার শাণের মেঝের উপর হাজির। সে সারদাসুন্দরীর কনিষ্ঠ পুত্র। একেই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পুত্রবধূর ব্যবহারে সারদা মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার উপর পুত্রের এই ম্লেচ্ছাচার,—মাথার মধ্যে একবারে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া তিক্তস্বরে বলিলেন, "চুলোর পাঁশ দোবো'খন গিলতে! বুড়োমদ্দা, জুতোটা খুলে দাওয়ায় উঠতে কি হলো বল্ ত? আমার মাথামুণ্ড খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে!"

তারক গালি খাইয়াও একগাল হাসিয়া বলিল, "আমিই না হয় গোবরছড়া দিয়ে ধোব'খন গো—অত চেঁচামেচি কেন? ভাত দাও দিকি খপ ক'রে, আমায় এখনই কলে বেরুতে হবে—আজ সন্ধ্যে হ'তেই ওপর টাইম। দাও, দাও।"

সন্তান-জননী,—কতক্ষণ ক্রোধ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত সন্তান ক্ষুধায় অন্ন প্রার্থনা করিতেছে। তাড়াতাড়ি স্থান করিয়া দিয়া অন্ন পরিবেষণ করিতে করিতে মাতা আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিলেন, —"ভাত ত বাড়বো, কিন্তু কিসে ক'রে, বাবা? কলতলায় দেখ না বাসনের ডাঁই প'ড়ে রয়েছে। তোদের লেখাপড়া-শেখা পটের পুতুল বৌ—ও কি দাসী-বাঁদীর মত বাসন মেজে হাত কালো করবে? তুইও বাপু এত বড়টা হলি—দেখে শুনে না হয় গরীবের ঘরের মুখ্‌খুশুক্কু একটা বৌ নিয়ে আয় না। আমি যে আর পারি নি, বাপু! পাঁচ পাঁচটা বছর এমন ক'রে যে একবারে হাড়-মাস কালি হয়ে গেল রে!"

জননীর নয়নে ধারা নামিয়া আসিল, মাতৃ-অন্তপ্রাণ তারকেরও চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল। সংসারের অশান্তি উপদ্রবের মধ্যে সে আদৌ যাইতে চাহিত না, অতি সামান্য ব্যাপারেই তাহার বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। সে তাড়াতাড়ি গৃহে শান্তিস্থাপনের চেষ্টায় বলিল, "তার জন্যে ভাবনা কি, মা? বাসন মাজা ত? ও আমিই সেরে দিয়ে যাচ্ছি মা—তুমি ভেবো না।"

তাড়াতাড়ি আহার সমাপ্ত করিয়া তারকনাথ অঙ্গের পিরিহানটা খুলিয়া ফেলিয়া বাসন মাজিতে লাগিয়া গেল, তাহার সদা-প্রফুল্ল আননে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সানন্দে বলিল, "গেল বুধবারে কেমন কড়া মেজে দেয়েছিলুম, মা? তুমিই না বলেছিলে, এমন ঝকঝকে ক'রে বাড়ীর মেয়ে-ছেলেরাও মাজতে পারে না? বউ কোথা মা? ঘুমুচ্ছে বুঝি—আহা, ঘুমুক একটু। এ সব ত অভ্যেস নেই।"

মায়ের দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া তখন শ্রাবণের ধারা নামিয়াছে। এই পাগলা হাবা ছেলেটার মায়ের অভাবে কি দুরবস্থাই না ঘটিবে! ছুটিয়া অঙ্গনে নামিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "আমার মাথা খাস যদি বাসনে হাত দিস, তারু! আয়, উঠে আয় বলছি।"

বাসন ত্যাগ করিয়া হস্ত-মুখ প্রক্ষালনের পর জননীর মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তারক ক্ষণেক নীরব রহিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল, "ধরে বউ

আনি নি বলেই ত তোমার রাগ, মা? তা, আমি যদি তোমার বোয়ের কায ক'রে দি, তা হ'লে রাগ কিসের?"

ছেলের কথায় মায়ের যাহা কিছু ক্রোধ-বহ্নির শিখা অবশিষ্ট ছিল, তাহা একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, তাহার পরিবর্ত্তে হাসি দেখা দিল। তথাপি ক্রোধের ভান দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "তা বলবিই ত। তোদের দুটোই যদি মেনিমুখো না হতিস, তা হ'লে আর দুঃখ কি? বড়টি ত কামিখ্যের ভেড়াটি! তুই যে তারও বেহদ্দ, বাড়া রে!"

তারক পাতকা পরিধান করিতে করিতে বলিল, "না মা, ও কথা বোলো না। আমি যা-ই হই, দাদা আমার সদাশিব। ভাব দিকি, আমাদের জন্যে কোথায় ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরে প'ড়ে রয়েছেন দুমুঠো ভাতের যোগাড়ের জন্যে। জমীদারী সেরেস্তার কায —উদয়াস্ত খাটুনি।"

সারদাসুন্দরীর মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ্যে বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "যা, যা, দাদার গুণ ব্যাখ্যান করতে হবে না, কাযে যাচ্ছিস, যা। বলে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। আমি দু' চোখ বুজলে দেখতে পাবি, তখন দাদা বৌদির গুণ কত!"

স্বয়ং যেন কত অপরাধে অপরাধী, এই ভাবে তারক তাহার ভ্রাতৃজায়ার কক্ষের দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল,—"মা যেন আমার কি? ছেলে-মানুষ বৌ—নতুন যায়গায় এসেছে"—

এই সময়ে যদি তারক একবার জননীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকাইত, তাহা হইলে আপনিই কথা কহিতে নিরস্ত হইত। কিন্তু তাহার বক্তৃতার অন্য কারণেও আর অবসর হইল না, জননী অগ্নিমুখী হইয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষ? পাঁচ বছর ঘর করছে, সময়ে ছেলে-মেয়ে হ'লে যে পাঁচ ছেলের মা হ'ত রে, বুড়ো বাঁদর! থাক্ বাপু তোদের বৌ নিয়ে, আমিই ত দুষী—না হয় আমিই—"

তারক জুতা খুলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ক্রুদ্ধ জননীর পাদমূলে বসিয়া পড়িল, তাঁহার চরণের উপর মাথা রাখিয়া কাতর স্বরে বলিল, "দোহাই মা, রাগ কোরো না, এই তোমার পায়ে মাথা কুটছি—"

সারদাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন, দুই হস্তে পুত্রকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বালাই, বালাই, ষেটের বাছা আমার!" তিনি পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলিচুম্বন করিলেন। তাহার পর সমস্ত কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "কলে কেন এত দেরী হ'ল, মাণিক?"

তারক আদরে গলিয়া গিয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মত জননীর পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া বলিল, "দেরী কৈ, মা?"

মা বলিলেন, "সেই ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছিলি, বারোটার সময় ত আসবার কথা।"

তারক বলিল, "না মা, আজকাল কলে বড্ড কায—কেবল ওপরটাইম। এই দেখ না, আবার পাঁচটায় জয়েন, আর সেই রাত্তির এগারোটায় ছুটী।"

মা বলিলেন, "এত খাটলে যে অসুখে পড়বি, বাবা! দুধের ছেলে বাছা—"

তারক গৃহত্যাগ করিবার সময় এই কথাটা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "দুধের ছেলেই বটে! মা যেন কি?"

জননী বলিলেন, "না ত কি রে? এই ত ষেটের কোলে বোশেখ মাসে সতেরো উতরে আঠারোয় পা দিইছিস, বাবা।" ততক্ষণ তারকনাথ তাঁহার দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

গৃহিণী আপন মনে বকিতে লাগিলেন, "যেমন বরাত ক'রে এসেছিলি, বাছা! না হ'লে কায়েতের ঘরে গোমুখ্খু হয়ে কলের মিস্ত্রীগিরি করতে যাবি কেন বল। আমার যেমন মরণ নেই! বড়টির কাণে মন্তর দেবার মানুষটি এসেছেন যে দিন থেকে, সে দিন থেকে কি দুধের বাছার লেখাপড়া কেউ দেখলে?"

ইহার পর কিছুক্ষণ এই টিনের বাড়ীর অঙ্গন গৃহিণীর মুখনিঃসৃত বাক্যরবে মুখরিত হইয়া রহিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, যে পুত্রবধূ অন্য দিন প্রত্যুত্তরদানে কার্পণ্য প্রকাশ করিত না, আজ সে রুদ্ধকক্ষে নীরবে বসিয়া রহিল।

৬

"তার পর কি হলো, সোনাদা?"

সুধাংশু বাগানে ছুটাছুটি করিতেছিল, তাহার সরল প্রাণখোলা হাসির লহরীতে উদ্যানের আকাশ-বাতাস ভরিয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্না সরোবরের সোপানে বসিয়া সনাতনের সহিত কথা কহিতেছিল।

সোনা বলিল, "তার পর দাদাবাবু কলকাতায় চ'লে গেল, ঘর-দুয়ার প'ড়ে রইল, ভোগ করে কে, মা ? সেই অবধি দেশে ঘরে বড় আসে না, বললেই বলে পড়াশুনো করছে। হাঁ মা, কি এত পড়াশুনা বলতে পার ?"

জ্যোৎস্না হাসিয়া বলিল, "পড়াশুনোর কি শেষ আছে, সোনাদা ? মানুষ কি একটা জীবনে পড়াশুনো শেষ করতে পারে ?"

"তা যেন হলো, কিন্তু ওর এত পড়াশুনোর দরকার কি বল ত ? এত বড় বিষয়, ওর আবার ভাবনা ! কেন যে বিদেশ-বিভুঁয়ে প'ড়ে থাকা, বুঝতে পারি নে, মা।"

"না, তা পারবে না তুমি। তা তোমার দাদাবাবু পড়াশুনা করেও ত বিষয়-আশয় দেখতে পারেন। তা দেখেন না কেন ?"

"খেয়াল ! বড় কর্ত্তা যাই দেহ রাখলেন, বাবুও অমনি ছরাদ্দ-শান্তি সেরে কলকাতা চ'লে গেলেন। দেশে ঘরে মন টিকলো না বোধ হয়।"

"কেন, বিয়ে-থা ক'রে ঘর-সংসার করলেন না কেন ? মা ত ছিলেন ? না, তাও না ? তিনি ত বিয়ে দিলে পারতেন।"

সনাতন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে আর দুঃখ কি, মা ? কর্ত্তা থাকতে হয়েছিল সবই ; আমাদের বরাতে সইলো না। কর্ত্তা ত তোমার মতই মা লক্ষ্মী ঘরে এনেছিলেন। কি যে শনি ঢুকলো। হাঁ মা, তোমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে, মাথায় সিঁদুর দেখছি ?"

জ্যোৎস্না হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "শুনেছি হয়েছে। তা তোমাদের বরাতে সইলো না বলছিলে, তোমার বাবুর বৌ কি মারা গিয়েছেন ? কর্ত্তা আবার বিয়ে দিলেন না কেন ?"

সোনা বিষণ্ণমুখে বলিল, "সে ঢের কথা মা, সে তখন আর এক দিন বলব। সোনার পিত্তিমে ঘরে এয়েছিল মা, তা সইলো না। কর্ত্তাদের কি এক ঝগড়া হ'ল, তার পর সেও যে বিয়ের কনে বাপের বাড়ী চ'লে গেল, আর এলো না।"

সোনা কথাটা শেষ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে বলিল, "লক্ষ্মী ঘরে থাকলে কি বাড়ী-ঘরের এমন লক্ষ্মীছাড়া দশা হয়, মা ? তা, তুমি এইখেনে একটু ব'স মা, আমি চট্ ক'রে একবার দেখে আসি, জনমজুরগুলো খাটছে, না ব'সে তামাক ফুঁকছে।"

সনাতন চলিয়া গেল। জ্যোৎস্না দীঘির কালো জলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। এই প্রশস্ত সরোবর, সংস্কারাভাবে অযত্নে অনাদরে হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে, শৈবালদামে জলাশয় ছাইয়া ফেলিয়াছে, ঘাটের শাণ ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িতেছে। এই প্রকাণ্ড উদ্যান কণ্টকগুল্মে ভরিয়া গিয়াছে, অট্টালিকার ছাদে ও অঙ্গে অশ্বত্থবৃক্ষ গজাইয়া উঠিতেছে। কেহ দেখিবার নাই, কেহ যত্ন করিবার নাই। বৃদ্ধ প্রভুভক্ত ভৃত্য আছে বলিয়া তবুও এই প্রাণহীন প্রতিষ্ঠানে প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। কর্ত্তব্য—মনুষ্যত্ব—ইহা কি কথার কথা ? সুদূর-অতীতে যে পুরুষ-ব্যাঘ্র ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি আজ এ মর জগতের অপর পার হইতে এই শ্মশানের দৃশ্য দেখিয়া কি নয়নাশ্রু মোচন করিতেছেন ?

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন দুর্জ্জয় ক্রোধে ভরিয়া উঠিল। শিক্ষা, সভ্যতা, বংশের গৌরবের কি ইহাই পরিণাম ? স্বেচ্ছায় জ্ঞাতসারে যে এমন করিয়া এই উদ্যান ও সরোবরকে হত্যা করিতেছে, বহু প্রাচীন পিতৃপিতামহের বিষয়সম্পত্তি রসাতলে দিতেছে, তাহার মনুষ্যত্ব কোথায় ? আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ কোথায় কোন্ দেশে না হয় ? কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কে কবে এমন করিয়া কাপুরুষের মত আত্মাকে হত্যা করিয়া থাকে ? যে লোক এমন করিতে পারে, এই প্রভুভক্ত বৃদ্ধ ভৃত্যের মনে দারুণ ব্যথা দিয়া আপনার কর্ত্তব্য হইতে দূরে পলায়ন করিয়া দায়িত্বহীন আরাম ও নিশ্চিন্ততার জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার মত স্বার্থপর কে ? তাহার জন্য কোন্ শাস্তি বিহিত ?

জ্যোৎস্নার মনে হইল, যদি সে এই মানুষটার সাক্ষাৎ পায়, তাহা হইলে দুই চারিটা উচিত কথা শুনাইয়া দেয়। আলালের ঘরের দুলাল কেবল আত্মসুখান্বেষণের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে, ভৃত্য-পরিজন সভয়ে তাহার আজ্ঞা-পালনই করিয়া আসিয়াছে, কেহ ত কখনও তাহাকে উচিত কথা শুনাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই !

হঠাৎ পশ্চাতে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া জ্যোৎস্নার দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হইল, সে চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া

দেখিল, একটি লোক দ্রুতপদে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার হস্তে মৎস্য ধরিবার ছিপ, গলদেশে লম্বিত একটি ক্যানভাস ব্যাগ, বোধ হয়, মাছ ধরিবার সরঞ্জাম তাহার মধ্যে ছিল। আর পশ্চাতে প্রকাণ্ড কুক্কুর। সেই লোকটি আপন মনে বলিতেছিল, "বাঃ, সোনাদা এই দিকেই রয়েছে বললে--"

আগন্তুক কথার মধ্যস্থলে দারুণ বিস্ময়ে অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং একদৃষ্টে জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নাও বিস্ময়বিমূঢ়ের মত লজ্জা-সঙ্কোচহীন দৃষ্টি অবনত করিয়া লইল, তাহার সমস্ত মুখচক্ষুর উপর দিয়া এক ঝলক রক্ত খেলিয়া গেল। সে তখনই অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু আগন্তুক তাহার পথরোধ করিয়া বলিল,—"আপনি? আপনি এখানে? কি আশ্চর্য্য, চিনতে পারেন নি বোধ হয়?"

ঝড়ের বেগে এক নিশ্বাসে কথা কয়টি বলিয়া আগন্তুক অপ্রতিভ হইয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না তখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই, তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বক্ষের মধ্যে যেন সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইয়াছিল। চিনিতে পারে নাই সে? এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা সেই কোম্পানীর বাগানে, সে ত ভুলিবার নহে!

জ্যোৎস্না নীরবে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে আগন্তুক বাধা দিয়া বিষাদাভিমানজড়িত কণ্ঠে বলিল, "কি করেছি বলুন ত আপনাদের? সে দিন গার্ডেনে আপনার বাপ—বাপই বোধ হয়, কেমন না? হাঁ, আপনার বাপ আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে আপনাদের নিয়ে চ'লে গেলেন, আজ আপনিও বিরক্ত হয়ে চ'লে যাচ্ছেন। তা যাক, আপনি যাবেন কেন, আমিই যাচ্ছি।"

উত্তরের প্রত্যাশা না রাখিয়াই যুবক যেমন ঝড়ের বেগে আসিয়াছিল, তেমনই ঝড়ের বেগে চলিয়া গেল। প্রভুভক্ত কুক্কুরও লম্ফ দিয়া প্রভুর অনুসরণ করিল। জ্যোৎস্না কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি অবনত, সে সাহস করিয়া মুখোত্তোলন করিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। সেই মুহূর্ত্তে পুষ্করিণীর অপর তট হইতে সনাতন ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুকে দেখলে মা এই দিকে—আমাদের দাদাবাবুকে? এইমাত্র শুনলুম, সকালের গাড়ীতে এয়েছে, শুনেই ছুটে আসছি কোথা গেল দেখি গিয়ে।" সোনা আর দাঁড়াইল না, হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে সে সকল মালী ও দিন-মজুর ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহারাও তাহার অনুসরণ করিল। ঘাটে রহিল জ্যোৎস্না একাকী।

সে তখন আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। এই বাবু?—বাগানের মালিক? কি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর এই লোকটা! কিন্তু—কিন্তু—শিবপুরের বাগানে সে ত তাহার বিপদের সময় ছুটিয়া আসিয়াছিল—বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে নাই। এ লোকই কি এত বড় স্বার্থপর, পরের স্কন্ধে নিজের দায়িত্বের ভার চাপাইয়া দিয়া যে কাপুরুষের মত কর্ত্তব্য হইতে দূরে সরিয়া যায়, সে কি হৃদয়বান্ হইতে পারে? এ কি প্রহেলিকা!

কে এ? সনাতন বলিল, তাহার বাবু। জমীদার, পিতৃমাতৃহীন, বিবাহিত, কিন্তু বিবাহের দায়িত্বও ত এই জমীদার অনায়াসে স্কন্ধচ্যুত করিয়াছে! তবে কি—

জ্যোৎস্নার বক্ষঃস্থল সম্ভাবনার আশঙ্কায় গুরু গুরু করিয়া কম্পিত হইল, একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার সমস্ত অন্তরকে যেন প্রচণ্ড আঘাতে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার পিতার নিকট আত্ম-জীবনের যে কাহিনী সে শুনিয়াছে, তাহার সহিত ত সনাতনের বর্ণনা সবই মিলিয়া যাইতেছে। তবে কি—তবে কি?—

জ্যোৎস্নার মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল, সে দুই হস্তে মাথা ধরিয়া জীর্ণ ঘাটের শাণের উপর বসিয়া পড়িল। [ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

ঘরের টান

১

সিদ্ধেশ্বরীতলায় অধর কুণ্ডুর দোকানের সম্মুখে তখনও শীতের প্রভাত-রৌদ্র আসিয়া পৌঁছায় নাই।

এই সময়টা নিত্য যাহারা এখানে হাজিরা দিয়া, অধর কুণ্ডুর দোকানের দা-কাটা তামাক ছিলিমের পর ছিলিম ভস্মে পরিণত করিতে করিতে চীন-জাপানের যুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধী নরাকারে দেবতা, এরোপ্লেন ইন্দ্রজিতের সৃষ্টি, বাঙ্গালী ঝি-বৌদের মেম-সাহেব হওয়া, হিন্দুত্বের বিলোপ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতেন, একে একে তাঁহারা সব দেখা দিতে সুরু করিলেন।

যদু ঘোষাল কহিলেন,—"দেখ্‌, অধর, সিদে ঘোষের এবার পতন হবে। বেটার দেমাক যতদূর বাড়বার বেড়েছে।"

সিদ্ধেশ্বর ঘোষের হঠাৎ পতনের কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অধর তাঁহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই যদু ঘোষাল কহিলেন,—"নিশ্চয় এইবার ওর পতন। আসবার সময় দেখি, খিড়কীর পুকুরে এই সকালেই জেলে নামিয়ে মাছ ধরাচ্ছে। বেশ বড় বড় বাটা অনেক উঠেছে। বল্লুম—পোয়াটাক্ দিস্‌রে সিধু, দাম যা হয় দেবো না হয়, ছেলেপুলেগুলো খাবার সময় মাছ মাছ করে! তা মুখের কথা আমার সবটা বলতেও দিলে না, একেবারে খিঁচিয়ে-মিচিয়ে এলো—'মাছ কি বেচবার জন্যে ধরাচ্ছি না, পাল্লা-দাড়ী হাতে নিয়ে গাঁয়ে ফিরি করতে বেরুবো?' শোন কথা একবার! বেটার দেমাকের আর সীমে-পরিসীমে নেই! উচ্ছন্ন যাবেন আর কি, তারই লক্ষণ!"

অধর সাজা কলিকাটি ঘোষাল মশায়ের হুঁকায় বসাইয়া দিয়া কহিল,—"তা তার কাছেই বা চাইতে গেলেন কেন? পয়সা নিয়ে গেলে জেলেবাড়ীতে ত আর মাছের অভাব নেই। তা, আপনার যে একটা মস্ত দোষ। উপুড় হস্তটি করা যে আপনার ধাতে নেই।"

ঘোষাল মশাই কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু গা-নাড়া দিয়া ভাল করিয়া খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিলেন ও অন্যমনে তামাক টানিয়া যাইতে লাগিলেন।

এ দিক্ হইতে রামজয় ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "আর একটা মস্ত খবর হে, ভূতনাথ! তোমার কাবুলের মহাবাক্ত না কি সৈন্যসামন্ত নিয়ে শাগ্‌গীর এ দিকে আসছে। এইবার বোধ হয়, যা হোক কিছু একটা হয়!"

ভট্টাচার্য্যের এত বড় কথাটার একটা উত্তর দেওয়া দূরের কথা, একটুখানি মনোযোগমাত্রও না দিয়া ভূতনাথ কহিল—"বিলেতের মস্ত কে এক জন গণৎকার গুণে বলেছে, বছর সাত আটের মধ্যে পৃথিবীর ওপর দিয়ে একটা মহা অগ্নিবৃষ্টি হয়ে যাবে, তাতেই সমস্ত জগৎ ধ্বংস হবে।"

বহুকাল হইতে প্রতিদিনই অধর কুণ্ডুর এই দোকানটিতে ইঁহাদের এইরূপ মজলিস বসিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে অধরও ইহাতে যোগদান করে, মধ্যে মধ্যে করে না, খরিদ্দারকে সওদা দিতে ব্যস্ত থাকে।

আর এক জন যে একটু তফাতে বসিয়া তাহার কাণ এবং মনকে সকালবেলাকার এই সব গল্পে ডুবাইয়া দেয়, সে নেড়া, অধরের অষ্টমবর্ষীয় দৌহিত্র। দাদামহাশয়ের

সহিত সে প্রত্যহ এক কোঁচড় মুড়ি ও এক দপ্তর বই লইয়া দোকানে আসে এবং দোকান-ঘরের মধ্যে মেঝের একধারে একখানি চট্ পাতিয়া দপ্তর খুলিয়া পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দেয় অর্থাৎ ইঁহাদের এই সব কথা হাঁ করিয়া গিলিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে দাদামহাশয়ের ধমক খাইয়া, সাতান্ন কড়া ১৪ গণ্ডা এক কড়া, আটান্ন কড়া ১৪ গণ্ডা ২ কড়া ইত্যাদি পড়িয়া যায়। তাহার দপ্তরের মধ্যে পাঠ্য ও অপাঠ্য যে কয়খানি পুস্তক ছিল, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাটির সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ছিল মাত্র তুইখানি, নীতিপাঠ আর সরল ধারাপাত। অপাঠ্যের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। একখানি বহুকালের নূতন পঞ্জিকার কিয়দংশ, একখানি "জীবন-সংগ্রাম" পুস্তিকা। তাহার ভিতরের প্রত্যেক পাতায়—'হ্যানাটো-জন'এর রকম রকম ছবি ও গুণের বিবরণ, একখানি 'বেঙ্গল কেমিক্যালে'র 'পাইরেক্সে'র ব্যবস্থাপত্র, আধখানি 'সবজ্ববালা' উপন্যাস, কাহাদের একখানা দলীলের একটু-খানি ছেঁড়া অংশ, তাহাতে দেড়টাকার কোর্ট-ফি লাগান, খান তুই ব্যবহৃত ময়লা রেলের টিকিট, তুইচারিখানি তাসের গোলাম বিবি ইত্যাদি। তাহার দপ্তরের জন্ম হইবার পর হইতেই এইগুলি সে বহুযত্নে সংগ্রহ করিয়াছে ও যক্ষের ধনের মত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাহার খেলার সাথীদিগকে কতবার যে এই সব সে দেখাইয়াছে, তাহার হিসাব নাই।

অধর নিতাই তাহাকে সঙ্গে করিয়া দোকানে লইয়া আসিত, কারণ, না আনিয়া উপায় নাই। মা-মরা ছেলে। বাড়ীতে দ্বিতীয় কোন লোক নাই। জামাতা আবার বিবাহ করিয়াছে। সেখানে অধর 'দৌহিত্র'কে দিতে নারাজ। নেড়াকে ছাড়িয়া দিলে অধরকেও হয় ত এ জগৎ ছাড়িতে হইবে। যখন নেড়া আড়াই বছরের, তখন কন্যা সারদা মারা যায়, সেই হইতেই অধর নেড়াকে উপলক্ষ করিয়া তাহার বৃদ্ধবয়সের অন্তরবেদনাকে কোন-মতে চাপা দিয়া আসিতেছে। নেড়া ও দোকান—এই তুইটিকে লইয়া থাকাই তাহার প্রধান কায। নেড়ার মত দোকানটিও তাহার অচ্ছেদ্য বন্ধন। দোকানে বিক্রী হয় ত দিনান্তে একটা টাকাও হয় না, কিন্তু বিক্রয়ের সঙ্গে ত দোকানের কোন সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ যা আছে, তাহা অন্যরূপ। এ যে তাহার পিতামহের আমলের দোকান। মা সিদ্ধেশ্বরী যে এক দিন তাঁহার স্নেহদৃষ্টি দিয়া কুণ্ডুদের এই দোকানের সর্ব্বঠাই ভরাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক সময়ে এই সিদ্ধেশ্বরীতলায় হাট বসিত। এ অঞ্চলের সেই ছিল শ্রেষ্ঠ হাট। আর তেঘরার হাট বলিলে তখনকার দিনে কুণ্ডুদের দোকানই সব চেয়ে বড় হইয়া সকলের চোখে ফুটিয়া উঠিত।

ঠাকুরদাদার আমলের কৃত্তিবাসী রামায়ণখানি—যাহা সুর করিয়া নিত্য পড়া হইত, তাহা জীর্ণ অবস্থায় এখনও সযত্নে কুলুঙ্গীতে গণেশের পাশে তোলা আছে। পিতামহ দয়াল কুণ্ডু নিত্য অপরাহ্ণে একখানি জলচৌকীর উপর এই রামায়ণ রাখিয়া অপূর্ব্ব সুরে ইহা পাঠ করিত। তাহার পিতাও তাহা করিয়া গিয়াছে। তাহারও মন যে দিন পরিপূর্ণ থাকে আর সেই পরিপূর্ণ মন হইতে চিরদিনের এই জগৎটা যে দিন একটু তফাতে সরিয়া যায়, সে দিন সে-ও একাকী দোকানের দাওয়ায় বসিয়া একান্তমনে ইহা পাঠ করে।

আজ দোকানের চিরকালের প্রাতঃকালীন বৈঠকে অধর ভাল করিয়া মন দিতে পারিতেছিল না। কারণ, আজ নেড়া কোন্ ফাঁকে তাহার দপ্তর গুটাইয়া পলাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে এরূপ করে। এমন সকালবেলাটায় সে নীতিপাঠের নীতি ও নামতা পড়িতে মোটেই পছন্দ করিত না। দাদামহাশয়ের তাড়নায় সে মুখে নামতা পড়িয়া গেলেও, চোখ এবং হাত তাহার হ্যানাটোজেনের ছবিগুলি কিম্বা তাসের গোলাম, বিবি প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। রেলের টিকিট তুইখানা কেমন মোটা কাগজের তৈরী! এই টিকিট লইয়া সে এক দিন রেলে গিয়া চাপিয়া বসিবে। অনেক দূরে যাইবে—অনেক—অনেক—অনেক দূর। ইষ্টিশান ত কাছেই। কতই আর দূর? দখিণ-ডাঙ্গার বড় বটগাছটার তলা দিয়া গিয়া বীরখালির জলা, তার পরেই নদীর ধার দিয়া পায়ে-চলা পথে বরাবর গেলেই আজাপুরের গঞ্জ, তার পরেই ত রেলের ইষ্টিশান। সে এক দিন যাইবে—নিশ্চয়ই যাইবে।

কিন্তু আজ সে দখিণডাঙ্গার বটগাছের তলা দিয়া, বীরখালির জলা পার হইয়া, আজাপুরের গঞ্জের ভিতর দিয়া, নদীর ধারের পথ ধরিয়া ইষ্টিশানে যে যায় নাই, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। টিকিট তুইখানা আজ তাহার

দপ্তরের মধ্যেই পড়িয়া ছিল। আজ বোধ হয়, তাহার রেলে চাপার চেয়েও অত্যাবশ্যক কোন কাযের তাড়া ছিল। হয় কায়েতডাঙ্গার তেঁতুলতলায় আজ তাহাদের চড়িভাতি, কিম্বা সাঁওতালপাড়ার বড় বাগানে শিরীষগাছে দোলা খাটাইয়া সকলের দোলা খাওয়া, আর নয় ত বা মণিপুরের সাঁকোর পাশে যেখানে বোষ্টমদের বাগান, বাগানে নীচের দিকে বাঁশের ঝাড়গুলি নদীর জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা ছায়া-ঢাকা কুঞ্জ গড়িয়া তুলিয়াছে, এক পাশে তাহার শিয়াকুলকাঁটার ঝোপগুলি কুটস্ত বন-যুঁইয়ের লতাকে কাঁটার আলিঙ্গনে জড়াইয়া রাখিয়াছে, সেইখানে হয় ত আজ ছেলেদের সকালবেলাকার অভিযান। সে দলে নন্টু আছে, তিনু আছে, লোকু আছে, ভোলা, শিবে, এককড়ি, রাসু সব আছে।

একটু আগে, যখন অন্নদা পাল রামজয় ভট্টাচার্য্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল যে, গেল বছর পীরগাথির মাঠ দিয়া অনেক রাত্রিতে যখন বাড়ী আসিতেছিল, তখন সে স্বয়ং দেখিয়াছে যে, সাদা ধবধবে কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাহার পিছনে পিছনে খোনা কথায়—ইত্যাদি, ঠিক সেই সময় ও-পাড়ার তিনু ও লোকু একবার আসিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সাদা ধবধবে কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তির কথায় তখন কেহই লক্ষ্য করে নাই যে, নেড়ার সঙ্গে চোখে চোখে ইহাদের কি পরামর্শ হইয়া গেল এবং তাহার কিছু পরেই যখন সেই অপূর্ব্ব ছায়ামূর্ত্তি অন্নদা পালের পিছনে পিছনে নিঃশব্দে আসিতে লাগিল, তখন নেড়াও তদপেক্ষা নিঃশব্দে দোকান হইতে বাহির হইয়া অন্নদা পালের ছেলে লোকুর অনুসরণ করিয়াছিল।

২

ও-পাড়ার নিবারণ তেলীর মা দুই বেলা আসিয়া অধর কুণ্ডুর ভাত রাঁধিয়া দিয়া যায়। তাহার তিন কুলে আর কেহই ছিল না। এইখানে সে রাঁধিত, নিজে দু'টি খাইত, অধরকে ও নেড়াকে খাওয়াইয়া আপনার ঘরে চলিয়া যাইত।

আজ নিবারণের মা আসিতে পারে নাই। কাল যখন ঐ বৃষ্টিটা হয়, তখন খিড়কীর ঘাটের শেওলায় পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া ডান হাতে ব্যথা হইয়াছে, আর হাত উঠাইতে পারিতেছে না।

অধরের তাই আজ দোকানে যাওয়া হয় নাই। রান্না-বাড়ার কাযে সে ব্যস্ত। নেড়ারও আজ পড়িবার বালাই নাই। অধরই তাহাকে হুকুম দিয়াছে—থাক্ ভাই, আজ আর দপ্তর পাড়িস নি, চুপড়ীটা নিয়ে খিড়কীর পুকুর-গাবায় দেখ দেখি, দু'টি কলমী কি শুষ্‌ণী কিছু পাস কি না। দাদামহাশয়ের মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই ব্যস্ত হইয়া সানন্দে নেড়া চুপড়ী হাতে বাহির হইয়া গেল। আজ তাহার পক্ষে একটা চমৎকার দিন। আজ নিবারণ দাদার মা আসিবে না, নিজের হাতেই তাহাদের রাঁধিয়া খাইতে হইবে। এ রকম যে কখন হয় না, তাহা নহে। মাসের মধ্যে এক আধ দিন নিবারণের মা'র এইরূপ গর-হাজির ঘটিয়াই থাকে এবং সে দিন আনন্দ ও উৎসাহের আর অন্ত থাকে না। নেড়ার বরাবরই ইচ্ছা যে, সে নিবারণ দাদার মাকে রান্নার কাযে কিছু কিছু সাহায্য করে ও সেইখানে সে একটু আমল পায়। কিন্তু নিবারণের মা তাহাকে মোটে আমলই দেয় না। দৈবাৎ কোন দিন নিবারণের মা তাহাকে ডাকিয়া বলে—"দেখ্ ত বাবা, ঐ ঝোলের আলুখানা খেয়ে, নুণ দিয়েছি কি না?" কিন্তু নেড়া খাইয়া বুঝিতে পারে না তাহাতে নুণ দেওয়া হইয়াছে কি না। একবার বলে হাঁ, একবার বলে না; "না মাসীমা, নুণ দাও নি।" খাইবার সময় অধর বলে, "একেবারে নুণে পুড়িয়ে ফেলেছ, নিবারণের মা।" নেড়ার ইচ্ছাটা, সে নিত্যই পরীক্ষা করিয়া দেয় যে, নুণ দেওয়া হইয়াছে কি না; কিন্তু তাহার পরীক্ষা করিবার শক্তি দেখিয়া নিবারণের মা আর তাহাকে বড় একটা ডাকে না; নিজের স্মরণশক্তির উপরেই যতটা পারে নির্ভর করে।

আজ চুপড়ী হাতে বাহির হইয়া নেড়া খিড়কীর পুকুরের বদলে পাড়ার সমস্ত পুকুর কয়টি ঘুরিয়া আসার সঙ্কল্প করিল এবং চুপ্‌ড়ীটি টুপীর মত করিয়া মাথায় দিয়া যাইতে যাইতে পথে তিনু ও লোকুর সহিত তাহার দেখা হইল। অতঃপর তিন জনে মিলিয়া পাড়ার প্রায় সব কয়টি পুকুরের পাড় খানাতল্লাসী করিয়া ঘণ্টা দুই পরে যখন নেড়া কোঁচড়ে করিয়া একরাশি কলমী ও শুষ্‌ণী এবং চুপ্‌ড়ীর মধ্যে কতক-গুলি গেঁড়ি, শামুক, দু'টো পুঁটি মাছ, গোটাকতক ঝ'রে পড়া শুকনা ডুমুর, গণ্ডা দুই চারি তেঁতুল, একটা আধ-পচা চালতা আর কতকগুলি বন-কচুর ডাঁটা আনিয়া হাজির

করিল, তখন অধরের রান্না শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং নেড়ারই অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া ক্রমেই তাহার উপর ক্রোধ তাহার বাড়িয়া উঠিতেছিল আর মনে মনে বলিতেছিল—'আজ সে বাড়ী আসুক। এই দুপুর রোদে পুকুরের গাবায় গাবায় ঘুরে বেড়ানর মজা টের পাওয়াব এখন।' সুতরাং দাওয়ায় উঠিয়া বিজয়গর্ব্বোদ্দীপ্ত বীরের ন্যায় নেড়া তাহার আহরিত দ্রব্যগুলি অধরের সম্মুখে নামাইয়া রাখিতেই অধরের হাতের কয়েকটা চড় উপর্য্যুপরি তাহার পিঠের উপর আসিয়া পড়িল।

সে দিন দুপুরবেলা কিন্তু আর একটা বড় রকমের কাযের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সকালে তাঁতি-পুকুরের পাড়ের উপরকার তেঁতুল-বাগানে তেঁতুল কুড়াইবার সময় একটা ভয়ানক দ্রব্যের তাহারা আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছে। বড় শিমুল-গাছটার পাশে যে বৈঁচি-ঝোপ, তাহারই এক ধারে প্রকাণ্ড একটা শিয়ালের গর্ত্ত। তিনু ও লোকু উঁকি দিয়া দেখিয়াছে -গর্ত্তের অন্ধকারের মধ্যে ৩।৪টা বাচ্ছা কিল্‌বিল্ করিয়া নড়িতেছে। বাগ্দীপাড়ার গোবরা, মন্ট, মতি প্রভৃতি এই কথা শুনিয়া বলিয়াছে যে, আজ দুপুরবেলা সকলে তাহারা কোদাল, শাবল প্রভৃতি লইয়া সেখানে যাইবে ও গর্ত্ত খুঁড়িয়া শিয়ালের বাচ্ছাগুলিকে ধরিয়া আনিবে। নেড়ার কিন্তু এ বিষয়ে মোটেই উৎসাহ ছিল না। সে তাড়াতাড়ি দু'টি ভাত খাইয়াই বাগ্দীপাড়ায় গোবরাদের বাড়ী গিয়া তাহাদের সব বারণ করিবে, এইরূপ মনে করিয়াছিল। কিন্তু দাদামহাশয়ের রাগ দেখিয়া ও চড় খাইয়া, আপাততঃ আজ যে আর তাহার বাড়ীর বাহির হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর হইবে না, তাহা সে বেশ বুঝিল।

বৈকালে দাদামহাশয়ের সহিত দোকানে যাইতে যাইতে পথে মতির সহিত নেড়ার দেখা হইল। সে তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসির সহিত হাতের তিনটা আঙ্গুল তাহাকে দেখাইয়া কি ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেল।

সঠিক বিস্তারিত খবরটার জন্য তাহার মন ছটফট্ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছু আগে লোকু একটা তেলের ভাঁড় হাতে করিয়া তাহাদের দোকানে আসিলে, তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'ল রে?" তেমনই ফিস্ ফিস্ করিয়া লোকু কহিল,—"তিনটে ধরা হয়েছে। গোবরাদের বাড়ী ঝুড়ি-চাপা আছে। কাল সকালে মনসাতলায় বলি দোওয়া হবে।"

নেড়ার মনটায় ভাল লাগিল না। আহা-হা! বাচ্ছা! সে দেখে নাই, কতটুকু বাচ্ছা। সে দিন হাড়ীদের ছটা কুকুর-বাচ্ছা হ'ল। বোধ হয়, সেই রকম ক্ষুদে ক্ষুদে একরত্তি বাচ্ছা। আহা! তাদের বলি দেবে? তাদের ত একটু গলা টিপ্‌লেই ম'রে যায়! ভারী অন্যায়, লোকুকে ব'লে দিলে হ'ত, যেন না বলি দেয় ওরা। কাল ভোরে উঠেই গোবরাদের বাড়ী যেতে হবে একবার। কেন ওরা ধ'রে আনলে? সে ধরবার কথায় বারণ করেছিল। তিনুটা যত নষ্টের গোড়া। তিনুর সঙ্গে আর সে ভাব করবে না।

নেড়ার মনটা তখন হইতেই খারাপ হইয়া গেল। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া দাদামহাশয়কে সব বলিয়া তিনুর বিপক্ষে নালিশ জানাইল, কহিল,—"আচ্ছা দাদামশাই, ওদের মা আছে?"

অধর এপাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে কহিল,—"তুই ঘুমো দিকিন্, রাত হয়েছে যে।"

"বল না, ওদের মা আছে? অ দাদামশাই, বল না।"

"থাকবে না ত কোথায় যাবে?"

"ওদের মায়েদের বরাবর বেঁচে থাকতে হয় বুঝি? কোথাও যেতে হয় না?—আচ্ছা, ওদের বাবাও আছে?"

"আছে।"

খানিক পরেই নেড়া ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক দৌড়ে বাগ্দীপাড়ায় গোবর্দ্ধনদের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। গোবর্দ্ধন তাহাকে উঠানের একটা ঝুড়ি দেখাইয়া কহিল যে, রাত্রিকালে তাদের মা চুপি চুপি এসে ঐ ঝুড়ি খুলে সব বাচ্ছাগুলি লইয়া গিয়াছে। নেড়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ক'রে নিয়ে গেল?"

"ওরা গন্ধ পায় কি না। গন্ধ পেয়ে অনেক রাতে হয় ত এসেছে, তার পর টুঁটি ধ'রে একটা একটা ক'রে নিয়ে গেছে।"

নেড়া কাল রাত্রিতে ঘুমাইবার আগে এই রকম একটা কিছু ভাবিয়াছিল। ভাবিয়াছিল যে, হয় ত তাহাদের মা আঁতিপাতি করিয়া চারিদিকে তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; মাই শুধু খুঁজিতেছে, বাপের কথা তাহার মনে হয় নাই। বাপ খুঁজিলেও খুঁজিতে পারে, কিন্তু মা'ই বেশী করিয়া

খুঁজিতেছে। কিন্তু কাল সকালেই যে তাহাদিগকে মনসাতলায় বলি দেওয়া হইবে, এ কথা তাহাদের মা জানিতেও পারিবে না; রোজ রাত্রিতেই চারিদিকে সে হয় ত শুধু শুধুই তাহার বাচ্ছাদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইবে। হে মা সিদ্ধেশ্বরী, হে মা মনসা, গোবরারা যেন ওদের বলি না দেয়।

আজ সকালে এই খবর শুনিয়া তাহার মনের ভারটা একবারে নামিয়া গেল।

৩

বছর দুই কাটিয়া গিয়াছে। নেড়া আরও দুই বছরের বড় হইয়াছে। অধর তাহাকে গ্রামের ইউ, পি, স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। স্কুলে আসিয়া তাহার অনেক নূতন ছেলের সহিত ভাব হইয়াছে। সব চেয়ে হইয়াছে নদীর ওপারের কৈবর্ত্তদের ছেলে রাধার সঙ্গে। নেড়া প্রায়ই রাধার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী যায়। আসিবার সময় রাধার কাকা তাহাদের চাষের জিনিষ কিছু না কিছু তাহার হাতে দিয়া দেয়। দু'চারগাছা আখ, কি একটা তরমুজ, কি নূতন তোলা ক্ষেতের কিছু আলু, বেগুনের সময় বেগুন, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙ্গে—যখন যাহা থাকে, রাধার কাকা নেড়াকে তাহাই দেয়। রাধাও প্রায়ই স্কুলের ফেরত নেড়াদের বাড়ী আসে ও উঠানে কিম্বা খিড়কীর বাহিরে উভয়ে নানা প্রকার খেলা করে। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে সে তাহার বই-শ্লেট গুছাইয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া যায়। ছুটীর দিন বৈকালের দিকে প্রায় তাহারা নদীর পোল পার হইয়া বোষ্টমদের সেই বাগানে যায়। নদীর উপরের বাঁশঝাড়গুলো, যেখানে নদীর জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেইখানটি নেড়ার খুব পছন্দের যায়গা। দুই জনে তাহারই তলায় গিয়া বসে। পিছনে একটা প্রকাণ্ড যজ্ঞডুমুরের গাছে পড়ন্ত রৌদ্র আটক খাইয়া থাকে; বাঁ দিকে সরু সরু বাঁশের সেই ঝাড়গুলা, যাহাদের মাথা ধনুকের মত বাঁকিয়া যেন জল খাইবার জন্য নদীর জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আর ডানদিকে কতকগুলি সোঁদাল গাছ। ফুল ফুটিলে কি সুন্দরই দেখায়। তখন যদি 'কেষ্টগোকুলে' পাখী তাহারই কোন শাখায় বসিয়া অনবরত চীৎকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঠিকানাটি ঘোষণা করিতে থাকে, তাহা হইলে সোঁদাল-ফুলের সোনালী স্তবক-রাশির মধ্য হইতে সোনালীরঙ্গের ক্ষুদ্রকায় ঘোষণাকারীটিকে খুঁজিয়া বাহির করা সত্যই শক্ত হইয়া পড়ে।

এইখানটায় সাঁকোর নীচে নদীটা কিছু চওড়া ও বাঁকিয়া দক্ষিণমুখে গিয়াছে; জলও অন্য স্থান অপেক্ষা অনেক বেশী। চৈত্র-বৈশাখে নদীর অন্য স্থানে হয় ত হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়, কিন্তু এই স্থানটায় অথৈ জল। কিন্তু প্রায় তাহার সবটাই ঝাঁঝি ও দামে একবারে ভরিয়া আছে। আর সেই ঝাঁঝি ও দামের উপর কতরকমের কত পাখী শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছোট ছোট 'ভাটাঙ্গ'। তাহারা ঊর্দ্ধদিকে লেজ তুলিয়া তাহা অনবরত নাচাইতে নাচাইতে দামের ভিতর হইতে ছোট ছোট পোকা ধরিয়া খাইতেছে। ও পারের দিকে একটু দূরে এক রাশ পানকৌড়ির বাচ্ছা অনবরত সাঁতার দিয়া ঘুরিতেছে ও মধ্যে মধ্যে ডুব গালিয়া পরক্ষণেই আবার ভাসিয়া উঠিয়া গা ঝাড়া দিতেছে। তীরের এক সারি বাব্‌লাগাছ সেইখানকার জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ছোট ছোট অসংখ্য সোনালী চোখ দিয়া যেন তাহাদের এই খেলা দেখিতেছিল।

এই সব দেখিতে দেখিতে নেড়া রাধার মুখের দিকে চাহিয়া বলে—'বড় হ'লে এইখানটায় একটা ঘর করব, কেমন ভাই?'

আষাঢ় মাসে রথের পর পাঠশালায় বসিয়া এক দিন রাধা বলিল, সে তাহার বাবার কাছে শ্রীরামপুর যাইবে। এখানে বড্ড ম্যালেরিয়া হচ্ছে, তাই। নেড়া বলিল,—"যাস্। আমিও যাব। বাবা ত কলকাতায় থাকে, ছোট রেল ছেড়ে বড় রেলে উঠলেই ত কলকাতায় যাওয়া যায়। আমার কাছে রেলের টিকিট আছে। একখানা হারিয়ে গেছে, একখানা এখনও আছে। তাই নিয়ে আমি যাব।"

"তোর বাবা কলকাতায় থাকেন?"

"হ্যাঁ। সেখানে আড়তে কায করে। আমাকে নিয়ে যেতে চায়, দাদামশাই পাঠায় না।"

ইহার দিন ৫।৬ পরে এক দিন রাধা বলিল,—"বাবা নিতে এসেছে, কালই আমি চ'লে যাব।"

সে দিন পাঠশালা হইতে বাটী আসিয়া নেড়া অধরকে ধরিয়া বসিল, সে কলিকাতায় বাবার কাছে যাইবে। অধর প্রথমটা তত গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু নেড়ার মুখে সেই একই কথা, সে কলিকাতাতে তাহার বাবার কাছে যাইবে। অধর দুই একবার ধমক দিল, তথাপি নেড়া না-ছোড়-বান্দা।

তখন বিরক্ত হইয়া অধর তাহার পৃষ্ঠে গোটা কত চড় বসাইয়া দিয়া দোকানে বাহির হইয়া গেল। তাহার উচ্চ গলার কথা কয়টা ঘরের মধ্যে যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—'পোড়ারমুখো ছেলে আমায় জ্বালিয়ে খেলে। মাকে খেয়ে ফেলে এই বুড়ো বয়সে আমার আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধন জড়িয়েছে। বাপের কাছে যাব! বাপ একবার ভুলেও তোর নাম করে!"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাওয়ার খুঁটী ধরিয়া নেড়া চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি কথা এলোমেলোভাবে তাহার মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। তাহার বাবার উপর তাহার খুব রাগ হইল। তাহার বাবা একটিবারও তাহার কাছে আসে না কেন? মা থাকিলে নিশ্চয় আসিত। দুই বছর পূর্ব্বের একটি কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল। সেই শিয়ালবাচ্ছাগুলার কথা। গন্ধে গন্ধে সারারাত ধ'রে খুঁজে খুঁজে তাদের মা তাদের নিয়ে গিয়েছিল। বুড়োর কাছে আর কিছুতেই আমি থাক্‌বো না,—ভারী দুষ্ট্। ঠিক আমি কলকাতায় গিয়ে থাকবো। সহর যায়গা; কত সব বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া; দোকান-পাট, রাস্তা-ঘাট!

খুঁটী ছাড়িয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া তাহার দপ্তর খুলিয়া পুরাতন রেলের টিকিটখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দখিণডাঙ্গার বড় বটগাছটার তলা পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সূর্য্য তখন সম্মুখের ঐ গাগুলার পিছনে ডুবিয়া গিয়াছে। উঃ! বীরখালির জলাটা কত বড়। এইটা পেরিয়ে যেতে হয়। একটা লোকও ত পথ দিয়ে যাচ্ছে না! গাড়ী কি এখন পাওয়া যাবে? সন্ধ্যা হয়ে আসছে যে! সন্ধ্যাবেলা কি গাড়ী চলে? চলে কিন্তু। রাত্রিতে যে গাড়ীর গম্ গম্ শব্দ কত দিন দাওয়ায় শুইয়া শুনিতে পাওয়া যায়। তা যাক, আজ আর গিয়া কায নাই, আর এক দিন যাইব। টিকিটখানা সে পকেটের ভিতর টিপিয়া ধরিয়া বাড়ীর পথে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিল।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর নেড়া বিছানায় শুইয়াছিল। ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অধর বসিয়া থাকিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—"খুব লেগেছিল?"

নেড়া চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

"আমি এইবার ম'রে যাব—দেখিস, ঠিকই ম'রে যাব।"

"কেন দামশাই?"

তেমনই পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে অধর কহিল,—"কি জন্যে আর বেঁচে থাকবো, ভাই। খালিই ত এই রকম অন্যায় মারটা খাবি আর আমার পাঁজরের বুড়ো হাড়গুলো এক একখানা ক'রে ভেঙ্গে দিবি?"

দুই ফোঁটা গরম চোখের জল নেড়ার মুখের উপর পড়িল।

"তুমি কাঁদ্‌ছ দামশাই?"

আরও দুই ফোঁটা, তার পর আরও। নেড়া কিন্তু খানিক পরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সে দিন রবিবার। বাগ্দীপাড়ার সংকীর্ত্তনের দল তখন গাঁ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া হরিসভার প্রাঙ্গণে নাচিতে নাচিতে গাহিতেছিল:—

"—কানাই বলাই, নাই ব্রজে নাই, গেছে গোকুল ছেড়ে।
(ওরে) এই নদীয়ায়, তারা দু'ভাই, এসেছে রে।"

৪

ভাদ্র মাসের শেষে এক দিন রামজয় ভট্টাচার্য্য অধরের দোকানে বসিয়া কথায় কথায় বলিল,—"চ রে অধর, এবার একটু তীর্থ ঘুরে আসা যাক্। সিদ্ধেশ্বর ঘোষ-টোষ সব যাচ্ছে। যাবি?"

অধর একটুখানি হাসিল, তাহার পর কহিল,—"আমিই তীর্থ করতে যাব বটে! কোথায় কোথায় সব যাবে?"

"ওরা হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাবে। আমরা না হয় কাশী, গয়া আর বৃন্দাবনটুকু হয়েই দু'জনে ফিরে আসবো। কি বলিস?"

"তুমি ক্ষেপেছ দা'ঠাকুর! পায়ের লোহার বেড়ী আমার যা শক্ত হয়ে বসেছে, তাতে কি আর আমার কোন যায়গায়—। তবে ইচ্ছেটা বড্ড হয় বটে। অদৃষ্টে আর আমার ওসব ঘটবে না, দা'ঠাকুর।"

কিন্তু অদৃষ্টে তাহা ঘটিবারই ব্যবস্থা হইল। ঠিক হইল যে, মাসদুয়েকের জন্য নেড়াকে তাহার বাবার কাছে রাখিয়া সে কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন এবং সুবিধা হয় ত হরিদ্বার পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিবে। নেড়ারও কলিকাতায় তাহার বাবার কাছে থাকিবার বড় ঝোঁক হইয়াছে; কিছু দিন না হয় সে তাহার বাপের কাছেই থাক।

পূজার পর ১৬ই তারিখ ইহাদের যাইবার দিন ধার্য্য হইল। কলিকাতায় জামাতার নিকট অধর পত্র দিল। চিনিবাস আসিয়া ২রা তারিখে নেড়াকে কলিকাতায় লইয়া গেল। নেড়ার মুখে হাসি আর ধরে না। অন্তরে তাহার আনন্দ ও উৎসাহের আর অন্ত নাই।

যাবার আগের দিন নেড়া তিনু, লোকু, মণ্টু, রাসু প্রভৃতি সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার যাইবার সংবাদ দিয়া আসিল। তিনু বলিল,—"কলকাতায় গিয়ে চিড়িয়াখানা দেখবি? সেখানে সত্যিকারের সব বাঘ সিঙ্গী আছে।"

"দেখবোই ত। আমি ত আর এখানে আসব না। সেখানে বড় স্কুলে ভর্ত্তি হব।"

দপ্তরটা নেড়া সঙ্গে করিয়াই লইল। তাহার সেই পুরানো নীতিপাঠ আর ধারাপাত এখন আর দপ্তরে নাই। তাহার স্কুলের অনেক সব নূতন বই সেখানে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সেই ছেঁড়া নূতন পঞ্জিকার কিয়দংশ, 'জীবন-সংগ্রাম' পুস্তিকা, বেঙ্গল কেমিক্যালের সেই ব্যবস্থাপত্রখানি, 'সরযূবালার' অর্দ্ধ অংশ আর রেলের টিকিট একখানি এখনও ঠিকই আছে। দলীলের টুকরাটা আর তাসের গোলাম-বিবিগুলো কাহাকে দিয়া দিয়াছিল। টিকিটের একখানাও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

কলিকাতা দেখিয়া তাহার মনের উপর চমকের একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। চিনিবাস স্ত্রীকে কহিল, "দেখ দেখি, কেমন ছেলে। ও এখন থেকে এখানেই থাক্‌বে বলেছে, আর সেখানে যাবে না। বুড়ো কষ্ট-টষ্ট দেয়, খাওয়া-পরার ত সেখানে সুখ নেই।"

নেড়ার জন্য নূতন স্যাণ্ডেল জুতা আসিল, রঙ্গীন হাফ প্যাণ্ট কেনা হইল, খাকী রঙ্গের টুইলের হাত-কাটা জামা তাহার গায়ে উঠিল। নূতন নূতন খাবার দ্রব্য যাহা সে কখনও দাদামহাশয়ের কাছে খাইতে পায় নাই, তাহা নিত্য দুই বেলা খাইতে লাগিল। কেক, বিস্কুট, নকলদানা, টানা লজেঞ্চুস, অবাক্ জলপান, তা ছাড়া দোকানের নানা রকম খাবার ত আছেই। এ সব ছাড়া আরও কত কি। প্রথম দুই চারি দিন চিনিবাস সকাল-সন্ধ্যায় তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতার পথ, ঘাট, বাজার দেখাইয়া ফিরিল। নেড়ার উৎসাহ-আনন্দের সীমা-পরিসীমা নাই। চিনিবাস তাহাকে হ্যারিসন রোডের বড়বাজার দেখাইতে দেখাইতে বলিল,—"কি রে, তোদের তেঘরায় এ রকম আছে?" নেড়া হাঁ করিয়া শুধু চারিদিকে দেখিতে থাকিল। গড়ের মাঠের কেল্লা, তাহার নীচে গঙ্গার উপর কত জাহাজ! নেড়ার মুখে কোন প্রশ্নও আর বাহির হইল না। হাওড়ার পোলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিনিবাস জিজ্ঞাসা করিল,—"তোদের মণিপুরের পোলটা প্রায় এই রকমই, না?" নেড়া একটুখানি মুচকি হাসিয়া চঞ্চল সোৎসুক দৃষ্টিতে গঙ্গার এপার ওপার দেখিতে লাগিল। "ওটা কি বাবা—ঐ যে মন্দিরের মত, ঘড়ী আঁটা রয়েছে?" "গীর্জ্জে রে গীর্জ্জে—সাহেবদের ঠাকুরবাড়ী।" "ঐটে?"—"ওটা ডাকঘর।"—"ওতেও ঘড়ী আঁটা?" "হ্যাঁ।—দাঁড়াস্ নি, চ'লে আয়। ও বহুরূপী রে! ঐ রকম সং সেজে তেল বিক্রী কত্তে যাচ্ছে। আয়, এ দিকে আয়। ভয় কি? কারেন্সী আফিস কি না, তাই বন্দুক সঙীন নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ওখানে গভর্ণমেণ্টের সব টাকাকড়ি, নোট, গিনি, এই সব থাকে।"

খানিকটা চলিয়া আসিয়া আবার সে থম্‌কিয়া এক যায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িল। চিনিবাস বলিল—"চল্ চল্, এ হচ্চে—লালবাজার পুলিস কোর্ট। যেমন তোদের তেঘরার নেলো সর্দ্দার, মগলো হাড়ি, সব চৌকীদার, ঐ যে সব লালপাগড়ী পরা দেখছিস, ওরাও তাই। ওরা সব পথে ঘাটে চৌকী দেয়, চোর ধরে। বুঝেছিস?"

নেড়া আসার পর ৫।৬ দিন কাটিয়া গেল। তার পর এক দিন চিনিবাস কাষ হইতে বিমর্ষ-মুখে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"নেড়া কোথায়?"

স্ত্রী কহিল,—"সে আজ সমস্ত দিন চুপটি ক'রে ঐ ঘরের কোণে ব'সে আছে। তোমার ফিরতে আজ এত দেরী হ'ল যে?"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চিনিবাস কহিল,—"৫'টা ক'রে টাকা মাইনে ক'মে গেল এ মাস থেকে।"

সুশীলা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চিনিবাস বৌবাজারের কোন এক ধনী মহাজনের আড়তে অনেক দিন হইতেই ২০ টাকা মাহিনায় কায করিয়া আসিতেছে। মনিব তাহার খুবই ভাল, এ রকম

ভাল প্রায়ই হয় না। কিন্তু আজ দুইটা টাকা মাইনা কাটার জন্য নহে, মনিবের বিচারের ভুলের জন্যই তাহার মনে খুব আঘাত লাগিয়াছে। মুখ-হাত ধুইয়া সুশীলাকে আজকার সব কথা বিস্তারিত বলিয়া শেষে চিনিবাস কহিল,—"দু'টো টাকার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই, সুশীলা, কিন্তু বাবু এত দিনের পর এ কি বিচার করলেন ? আমি তাঁর ১২ মাসের লোক, আর ঐ ব্রাহ্মণটি, যিনি আজ এসেছেন, উনি বারো মাসের নন। ছিলেন না, এসেছেন — দু'মাস পরে আবার চ'লে যাবেন। অথচ তাঁকে আমাকে একই দামের ভেতর—একটুখানি ইতরবিশেষও করলেন না ! তোমাদের মেয়েলী একটা কথায় বলে— 'নটে, পালং, দু'চার দিন— সজ্‌নে বারো মাস।' তা, বারো মাসের জিনিসের মর্য্যাদা তিনি একটু রাখলেন না। দুঃখ আমার এইখানে। নইলে সেই ব্রাহ্মণটির ওপরেও আমার কোন হিংসে বা রাগ নেই, আর বাবুর ওপরেও কোন দুঃখ অভিমান নেই। দুঃখ যা, সে শুধু তাঁর বিচারের ভুলের উপর।" একটুখানি থামিয়া চিনিবাস আবার কহিল, "এত দিন একই যায়গাতেই যে কায কচ্ছি, আর চারিদিককার প্রশংসাও যে এত পেয়েছি —এটা যেমন ভগবানের দান, এ যেমন মাথা পেতে নিয়েছি, আজকের বাবুর এই বিচারও তেমনই মাথা পেতেই নিলুম।"

সুশীলা কহিল, —"মাথা পেতেই নাও আর যাই কর, ঐ নেড়াটিই তোমার বোধ হয় অপয়া। দেখ গিয়ে, আজ সারাদিন কথা নেই, বাত্রা নেই, চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে কি ভাবছে। আজ একবারটি ঘরের বার পর্য্যন্ত হয় নি।"

চিনিবাস নেড়ার কাছে আসিয়া দেখিল, সে তাহার দপ্তর খুলিয়া এটা ওটা নাড়া-চাড়া করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ রে, তোর এখানে মন টেঁক্‌ছে ত ?"

"হ্যাঁ।"

"থাকতে পারবি—না তেঘরায় যাবি ?"

"এইখানে থাকবো।"

"দাদামশায়ের জন্যে মন কেমন কচ্ছে—না ?"

"না।"

"তা' হ'লে এখানেই থাকবি ত ?"

"হাঁ।"

তাহার মন কেমন করিতেছে কি না, তাহা সে বলিতে পারে না, কিন্তু সে জিনিষটা যে আজ তাহার এখানে নাই তাহা আজ তেঘরার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কায়েতডাঙ্গার তেঁতুলতলা, সাঁওতালপাড়ার বড় বাগান, দখিণডাঙ্গার বটগাছ, বীরখালির জলা, সুদোর বিল, তাহাদের দোকান-ঘর, খিড়কীর পুকুর-পাবা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, সকলের উপর মণিপুরের সাঁকোর পাশে বোষ্টমদের বাগান। সেখানকার সেই বাঁশঝাড়, সেই যজ্ঞডুমুরের গাছ, সেই সোঁদালফুলের ঝালর, সেই পানকৌড়ির সাঁতার, সেই ভাটাং পাখীর নাচন ! তিনু, লোকু, শিবে, রাসু— ওরা সব জোড়া মন্দিরের অশ্বত্থগাছটায় দোলা খাটাইয়াছিল। সে দেখিয়া আসিয়াছে নদী কানায় কানায় বর্ষার জলে ভরিয়া গিয়াছে। বোষ্টমদের বাগানে, যেখানে সে আর রাধা বসিত, সেখানকার বাঁশঝাড়ের তলা পর্য্যন্ত নদীর জল ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

বীরখালির জলায় আর ঘাস দেখা যায় না। যত দূর চাওয়া যায় —খালি জল—খালি জল। যেন সমুদ্দুর। রাতের বেলা সেই জলা পেরিয়ে রেলের শব্দ কেমন গম্ গম্ ক'রে আসে। আজ বুঝি রবিবার ? এতক্ষণে বাগ্দীপাড়ায় হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল গাঁ ঘুরতে বেরিয়েছে। এই গোবরা ! অ মণ্টু, কি রে মতি ! খঞ্জীটা একবার আমার হাতে দে না ভাই—একটু বাজাই। চ', আমিও গাইতে গাইতে তোদের সঙ্গে যাই,—

"কানাই বলাই, নাই ব্রজে নাই, গেছে গোকুল ছেড়ে।
(ওরে) এই নদীয়ায়, তারা দু'ভাই, এসেছে রে॥"

হঠাৎ বাহির হইতে ঘরে ঢুকিয়া চিনিবাস কহিল,—"কি রে নেড়ু, এখনও চুপটি ক'রে এখানে ব'সে রয়েছিস ? তোর কি মন কেমন করছে ? তেঘরায় যাবি ?"

"যাব।"

"এখানে থাকতে পারবি না ?"

"না। হাঁ পারবো। কাল একবারটি নিয়ে চল, একবারটি দেখে এসে তার পর থাকবো। কালকেই আমাকে নিয়ে চল।"

* * * *

আশ্বিন মাসের আজ ১০ দিন। ইহাদের তীর্থে যাইতে মধ্যে আর পাঁচটি দিন বাকী। অধর এই দশ দিনের মধ্যে সমস্তই যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে। ব্যবস্থা হইয়াছে, নিবারণের মা বাড়ী আগলাইয়া থাকিবে। দোকানটি

…ন্ধই রাখিতে হইবে। কাহনটাক ধান বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। কিছু টাকা ডাকঘর হইতেও তুলিতে হইবে। কাল-পরশু লাগাং তুলিলেই চলিবে। নেড়ার স্কুলের দুই মাসের মাহিনাটা পণ্ডিতের কাছে জমা দিয়া যাইতে হইবে।

'ছেলেটার পড়াশুনায় কিছুমাত্র চাড় নাই। শ্লেটখানা নিয়ে যায় নি—ফেলে গিয়েছে। ইস্! চটের থলে ক'খানায় যে রুই ধ'রে আর কিচ্ছু রাখে নি। মুখপোড়া ছেলে সে দিন সব করেছিল, উঠোনের এইখানেই জড় ক'রে রেখে গিয়েছে। জালিয়ে খেলে—জ্বালিয়ে খেলে! আহা হা! জামগাছটায় দা দিয়ে কি রকম কুপিয়েছে দেখ! এই যে! দা'খানার মাথাও খেয়েছে দেখছি! কে রে তিলু? কি রে ভাই?'

তিলু উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—"নেড়া কবে আসবে?"

"এই গেছে, এখন কি আর আসবে? আমি ফিরে এসে আবার আনবো। কোথায় যাচ্ছিস ভাই এই রোদে? সদর দরজাটা ভাল ক'রে ভেজিয়ে দিয়ে যা দাদা আমার।"

অধরের আহার হইয়া গিয়াছিল। জামগাছের ছায়ায় বসিয়া—থলেগুলার রুই ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া পাট করিয়া রাখিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—'থাক দু'টো মাস, একটু জব্দ হ'ক!—কিন্তু শরীরটা তার ভাল থাকলে হয়। কি খাবে—কোথায় থাকবে, কেউ ত দেখবেই না। গাড়ীঘোড়ার যায়গা—হাঁ ক'রে হয় ত পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর—না, দরকার নেই। তাকে আমি ফিরিয়ে নিয়েই আসি। তীর্থ-মীর্থ এখন আমার থাক্। কে রে?'

"দামশাই!"

প্রচণ্ড শব্দে সদর ঠেলিয়া নেড়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে অধরকে জড়াইয়া ধরিল।

"নেড়া! ক'দিনে এ কি চেহারা হয়েছে রে তোর?"

"আমি আর সেখানে যাব না। বাবা ঐ আসছে, তাকে চ'লে যেতে বল। তোমার পায়ে পড়ি, দামশাই। আমি এখান ছেড়ে কোথাও যাব না।"

নেড়ার মুখের দিকে অধর অপলকনেত্রে শুধু চাহিয়া রহিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

গোপন-গাথা

আজি মনে পড়ে বহুদিন আগে দেখেছিনু আমি তাহারে
নদীর ঘাটেতে কলসী কক্ষে শাড়ীখানি পরা বাহারে;
সে ছিল তখন অনাঘ্রাত যে একটি কুসুম সম,
জানি না সহসা কেন সে দাঁড়ালো যাবার পথেতে মম।

কাতর চাহনি দেখিয়া তাহার কুড়ায়ে বুকেতে আনি'
রাখিনু তাহারে অতি সুগোপনে করিয়া হৃদয়রাণী।
রূপের প্রদীপ গরীবের ঘরে ঘর-আলো-করা মেয়ে
এসেছিল মোর আঁধার কুটীরে করুণ রাগিণী গেয়ে;
গোলাপের মত গণ্ড তাহার, হরিণের মত আঁখি,
পাগল আমারে করেছিল সে যে পরায়ে প্রেমের রাখী।

যৌবনে মোর ঢালিল হিয়ায় কত কি কুসুম অর্ঘ্য
সে যে গো আমার গড়েছিল এক মিলন মধুর স্বর্গ!
শুভ্র শ্যামল অন্তরে তার গুপ্ত ছবিটি ফুটিয়া—
নিবিড় সুখেতে রেখেছিল সে যে সব জ্বালা মোর টুটিয়া।
জানি না কেন গো উঠিল ঝটিকা ভরা-ভাদরের নদীতে,
তরীখানি মোর ডুবে গেল হায়, আমার জীবন বধিতে!

স্মৃতির আগুন নিভে নি এখনো, আমার হৃদয়ে জ্বলে—
উদাস পথিক চলেছি একাকী ভাসিয়া অশ্রুজলে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

বাঙ্গালা নাটকের গোড়ার কথা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা নাট্যশালা পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও একটা স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার কয়েক জন ধনী ব্যক্তির উৎসাহে কয়েকটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহার কোনটিই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। তাহা ছাড়া এই সকল প্রচেষ্টার একটির সহিত আর একটির কোন যোগও ছিল না। তাই দেখিতে পাই, পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন যায়গায় অভিনয়-প্রদর্শন সত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশে একটা স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জনসাধারণের শিক্ষা ও রুচির অভাব এই বিফলতার একটি কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড় কারণ—বাঙ্গালা ভাষায় নাটকের অভাব। এক লেবেডেফ ও নবীন বসু তাঁহাদের নাট্যশালায় বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় করান; অন্য সকলেই শেক্সপীয়রের নাটক অথবা কোন সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। লেবেডেফ ও নবীন বসু যে কয়েকটি নাটক অভিনয় করান, সেগুলি আর পাইবার উপায় নাই এবং অভিনীত হওয়া ব্যতীত খুব সম্ভব ছাপাও হয় নাই। সুতরাং নাটক-হিসাবে সেগুলি কোন্ শ্রেণীর রচনা, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। বাঙ্গালা নাটকের অভাবে বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় ইংরাজী নাটকের অভিনয় হইত, কিন্তু উহার জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ইংরাজী নাট্য-সাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, সহজ ও স্বাভাবিক-ভাবে তাহার রসগ্রহণ বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, ইংরাজী শিক্ষালব্ধ বাঙ্গালীর পক্ষেও একটু আয়াস-সাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছু পরে পর্য্যন্তও কৃত্রিমই ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাঙ্গালা দেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক-রচনার ধারায় একটা নূতনত্ব দেখা দিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল ও উহাতে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। বঙ্গীয় নাট্যশালার সত্যকার গোড়াপত্তন এই সময় হইতেই হইল বলা চলে।

বাঙ্গালা দেশে নাট্যাভিনয়ের এই নূতন ধারার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। লেবেডেফের নাটক ও 'বিদ্যাসুন্দরে'র কথা ছাড়িয়া দিলে, যতদূর জানা গিয়াছে, গৌরীভার বৈদ্য নন্দকুমার রায় কর্ত্তৃক রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'ই প্রথম অভিনীত বাঙ্গালা নাটক। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে (ভাদ্র ১২৬২) এই নাটক প্রকাশিত হয় ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী সিমলার আশুতোষ দেব বা ছাতু বাবুর বাড়ীতে অভিনীত হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও কয়েকটি বাঙ্গালা নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবুও বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের উল্লেখ অবশ্য-কর্ত্তব্য। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, 'হাস্যার্ণব' নামক একটি প্রহসনই প্রথম বাঙ্গালা নাটক। ইহা ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় বলিয়া পাদরী লং উল্লেখ করিয়াছেন।* কিন্তু এই পুস্তকখানি আমি এখনও কোথাও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। যে সংস্কৃত প্রহসন অবলম্বনে উহা রচিত, তাহার একটি মুদ্রিত সংস্করণ দেখিয়াছি। †

---

*Long's **Descriptive Catalogue of Bengali Works,** p. 78.

† রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' (১৭৮০ শক, চৈত্র) 'হাস্যার্ণব' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন,—

"......যদিচ কবিভিন্ন এই অস্ত্রের [ব্যঙ্গোক্তি কাব্যের] ব্যবহার অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য পরন্তু কবিদিগের হস্তে ইহা সর্ব্বদাই পদ্যরূপে প্রকটিত হয় এমত নহে, কখন গদ্যে ও কখন বা পদ্যে ইহার বিকাশ দেখা যায়। অপর ইহার সম্যক্ ফললাভের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে নাটকরূপে পরিণত করত তাহার অভিনয়ে দুরাত্মাদিগের বিশেষ তিরস্কার করিয়া থাকেন। সর্ব্বকালেই এরূপ রচনার প্রচার আছে। ইহার আদর্শস্বরূপ আমরা হাস্যার্ণব নামক প্রহসনের উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহাতে নাটকছলে কামপরবশ মূর্খ রাজা, লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞান চিকিৎসক, ভীরু সেনানী প্রভৃতি জঘন্য অকর্ম্মণ্য রাজকর্ম্ম-চারিদিগের তিরস্কার করা হইয়াছে। যদিচ তাহা সম্যক্ হাস্যজনক ও সুতীক্ষ্ণ হইয়াছে বটে, তত্রাপি তাহা অশ্লীলতাদোষে দূষিত হওয়াতে

'হাস্যার্ণব'এর পর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে 'কৌতুকসর্ব্বস্ব' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়। 'হাস্যার্ণব'কে প্রথম ধরিলে এটি বাঙ্গালা দেশে প্রকাশিত দ্বিতীয় নাটক। ইহা দুই অঙ্কে সমাপ্ত। মূল 'কৌতুকসর্ব্বস্ব' নাটক সংস্কৃতে, গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত। নাটকটির আখ্যানভাগ কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান। ইহার যে বাঙ্গালা ভাষান্তর আছে, তাহাও পূর্ণ অনুবাদ নহে। ইহার প্রধান অংশ সংস্কৃতেই, কেবলমাত্র সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্যে অনুবাদ দেওয়া আছে। এই অনুবাদ হরিনাভির রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার কৃত। এই নাটকের এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। *

'কৌতুকসর্ব্বস্বে'র কুড়ি বৎসর পরে আর একটি বাঙ্গালা নাটক প্রকাশিত হয়। এটি রামতারক ভট্টাচার্য্য কৃত সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুবাদ। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিতেছেন,—

"আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য গৃহের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক গৌড়ীয় গদ্য পদ্যে শ্রীমন্মহাকবি কালীদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটক গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তদীয় ভূমিকা ও মঙ্গলাচার প্রভৃতি কিয়দংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, অপর উক্ত পুস্তক উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে,…।

গৌড়ীয় ভাষায় পুনরুন্নীত হওন কালাবধি প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক ব্যতীত আর কোন নটরসাশ্রিত গ্রন্থের গৌড়ীয় অনুবাদ হয় নাই, বিশেষতঃ এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়-দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পাদন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না, অতএব এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরস যাহাতে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে সন্দীপন হয়, তাহাতে সম্যগ্রূপ প্রযত্ন প্রকাশ করা বিধেয়, আমরা এই জন্যই শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্যের সংকল্প সুসিদ্ধ যাহাতে হয়, এমত অনুরোধ দেশহিতৈষি সমাজে জানাইলাম।"

ইহার পর দুই তিন বৎসরের মধ্যে চার-পাঁচখানি বাঙ্গালা নাটক রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে নীলমণি পাল রচিত রত্নাবলী নাটিকা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' ১৮৫২ * খৃষ্টাব্দে, তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ও হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার ঠিক পরেই ১৮৫৩ কি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' প্রকাশিত হয়। † 'বাবু নাটক' সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। খুব সম্ভব উহা একটি ক্ষুদ্রকলেবর প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু সে যাহাই হউক, সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া, পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাঙ্গালী-জীবনের ঘটনা লইয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপে বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের যে ধারার সূত্রপাত হইল, তাহা আর বাধা পাইল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মুদ্রিত বাঙ্গালা নাটকের মধ্যে

অনেকের পক্ষে আদরণীয় নহে। তৎকালজাত কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। পরন্তু তদুভয়ই সংস্কৃতভাষাজাত; তাহা বাঙ্গালি সাবক্ষেপ-বাক্যের প্রসঙ্গে কেবল উপমাকল্পে উল্লিখিত হইতে পারে।"

* বৃটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় 'কৌতুকসর্ব্বস্ব' নাটকের নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ আছে,—

"**Kautukasarvasva Nataka**—A Sanskrit play with intervening portions appearing in a Bengali version in prose and verse by Ram Chandra Tarkalankara (1235—Calcutta? 1828)."

পাদরী লঙের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকাতেও (পৃঃ. ৭৫) পাইতেছি,—

"**Kautuk Sarbasa** Natak, Ch. P., 1830, a drama, by R. Chundra Tarkalankar of Harinabhi."

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে এই নাটকের এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই। পাদরী লঙের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকাতেও ইহার প্রকাশকালের উল্লেখ নাই। অর্দ্ধেন্দু-নাট্যপাঠাগারে হস্তলিখিত পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল "১২৫৮ সাল" বলিয়া উল্লেখ আছে।

কীর্ত্তিবিলাস নাটক ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—"বিদ্বন্মোদ সভার সম্মতিক্রমে সংপ্রতি বঙ্গভাষায় 'কীর্ত্তিবিলাস' নামক যে এক নাটক বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা আমরা সেই নাটক প্রাপ্ত হইয়া কিয়দংশ পাঠ করিলাম।"

† ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' পাইতেছি:—"বিজ্ঞাপন। পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি, কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক। মূল্য ॥০, বিনা স্বাক্ষরকারী ৸০ মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।"

বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'ই প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয় হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জানুয়ারী তারিখে। এই সময় হইতে বাঙ্গালা নাট্যশালা ও বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস পরস্পর-সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইহার পর এ দুইটি বিষয়ের পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর) বাড়ীতে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা দেশে নাট্যাভিনয়ের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। সেই সময় হইতে বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত কোন বড় বা উল্লেখযোগ্য নাট্যশালায় আর কোন ইংরাজী নাটকের অভিনয় হয় নাই। দু এক যায়গায় ইংরাজী নাটক অভিনয়ের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু শুধু ইংরাজী নাটক অভিনয়ের জন্য আর কোন নাট্যশালা স্থাপিত হয় নাই। যে নাটক অভিনয়ের দ্বারা এই নূতন ধারার সূত্রপাত হয়, সেটি ছাতু বাবুর বাড়ীতে শকুন্তলার অভিনয়। এই অভিনয়ের উদ্যোগ করেন,—ছাতু বাবুর দৌহিত্রেরা। ছাতু বাবু তখন পরলোকগত (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়)। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা শকুন্তলা অভিনয়ের আয়োজনের নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি পাই,—

"আমরা শ্রুত হইলাম, ৺বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভ্য সকলে শ্রীযুত নন্দকুমার রায়ের কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামক নাটকের অনুরূপ দর্শাইবার নিমিত্ত শিক্ষা করিতেছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উত্তম বটে, বহু দিবস আমারদিগের কলিকাতায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ হয় নাই, উক্ত সভায় বঙ্গভাষার আলোচনা অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে।"

ইহার পনের দিন পরে ৩০শে জানুয়ারী তারিখে সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে শকুন্তলার প্রথম অভিনয় হয়। * এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ দিতেছি,—

"কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা সখের অভিনেতাদের প্রদর্শিত নাট্যাভিনয়ের দ্বারা আনন্দ লাভ করিয়াছিল। তখন হিন্দু যুবকদের দ্বারা শেক্সপীয়রের কয়েকটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক অভিনীত হয় এবং যে যে চরিত্রের অভিনয় তাঁহারা করিয়াছেন, তাহার মূলগত ভাবটি ধরিবার চেষ্টা করেন ও অনেকটা কৃতকার্য্য হন। আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ না করিলেও, তখন জনসাধারণ—বিশেষ করিয়া দেশীয় সমাজ—এইরূপ অভিনয় সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য দেখাইয়াছিল, তাহা হইতে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা ছিল, শুধু যদি থিয়েটারের কার্য্যনির্ব্বাহকেরা সেই চমৎকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা নাটক সম্বন্ধে এই রুচি পুনঃ পুনঃ উত্তম অভিনয়ের দ্বারা পূর্ণ বিকশিত না করিয়া, যেটুকু উপকার করিয়াছিলেন, তাহাও ছোট-খাট ঈর্ষ্যা ও দলাদলির দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের নাট্যশালার উপর যে যবনিকাপাত হইল, তাহা আর উত্তোলিত হইল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। নাট্যশালা বলিয়া আমাদের যে একটা জিনিষ ছিল, তাহাও আমরা ভুলিয়া গেলাম। এমন সময়ে একটি নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্য-শালার ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্স-পক্ষীর ন্যায় আর একটি বঙ্গীয় নাট্যশালা আবির্ভূত হইয়াছে। এই নিমন্ত্রণের মধ্যে আরও উৎসাহের বিষয়—যে নাটকটির অভিনয় হইবে, উহা একটি সত্যকার বাঙ্গালা নাটক—কালিদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ। আর একটি কথা শুনিয়া আমরা আরও আনন্দিত হইলাম যে, এই নাট্যশালা পরলোকগত বাবু আশুতোষ দেবের দৌহিত্রগণের উৎসাহে ঐ লক্ষ-পতিরই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সম্ভ্রান্ত ও ধনী দেশীয় ভদ্রলোকেরা বিশুদ্ধ আমোদের জন্য অর্থব্যয় সচরাচর করেন না। এই কারণে আমাদের সম্ভ্রান্ত যুবকদিগকে সাধারণতঃ তাঁহারা যে-সকল নীচ আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন, তাহা হইতে মুক্ত দেখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।...কালিদাসের শকুন্তলার অতি সুন্দর অনুবাদ ইংলণ্ড ও জার্ম্মেণীতে হইয়াছে। অথচ যাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের জন্য এই অমর কবি তাঁহার প্রতিভার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেই এই উচ্চাঙ্গের নাটকটি প্রায় অবোধ্য। অল্প লোকই মূল সংস্কৃতে এই নাটক পড়িয়াছেন। অনুবাদও আরও অল্পসংখ্যক লোক পড়িয়া-ছেন। এই নাটকটি অভিনয়ের পক্ষে খুব উপযুক্ত। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই গত মাসের ৩০এ তারিখের রাত্রে যে অভিনয় হয়, তাহা হইতে। যে-যুবকটি শকুন্তলার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁহার অঙ্গভঙ্গী ও চলাফেরা সত্যই রাণীর মত এবং যে-চরিত্র তিনি অভিনয় করিতেছিলেন, তাহার উপযুক্ত হইয়াছিল। অন্য অভিনেতাদের অভিনয়ও

* ছাতু বাবুর বাটীর নাট্যশালাটি ইহারও দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে; অন্ততঃ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের মাঝামাঝি তথায় যে 'থিয়েটার' হইয়াছিল, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে,—"...কার্ত্তিক-পূজার রজনীতে কোন বিপ্র-বালক শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে থিয়েটার দেখিয়া ৺রাধাকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বের গলি দিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিতেছিল,..."

ভালই হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম যে, এই যুবকেরা সুনিপুণ অভিনেতাদের নিকট শিক্ষালাভ করিবার কোন সুযোগ পান নাই। এই কারণে তাঁহাদের অভিনয় আরও প্রশংসার্হ। আমরা আশা করি, একটু অভ্যাসের পরই এই অভিনেতারা অতি চমৎকার অভিনয় করিতে পারিবেন।"

এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় সেই বৎসরেরই ২২শে ফেব্রুয়ারী। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা দেখিতে পাই,—

"গত ১২ ফাল্গুন [২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭] রবিবার যামিনী যোগে ৺বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে শকুন্তলা নাটকের অনুরূপ পুন: প্রদর্শিত হয়, নাট্যশালার শোভা অতি রমণীয় হইয়াছিল, বিশেষত: প্রায় ৪০০ শত ভদ্রলোক বিবিধ প্রকার বিচিত্র পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া সভার শোভা অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সম্রান্ত ভদ্র কুলোদ্ভব বালকগণ নট-নটীরূপ ধারণ পূর্ব্বক নাটকের বিচিত্র বচনানুক্রমে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া আপনাপন বক্তৃতা ও শরীরের ভঙ্গি অতি উত্তমরূপে প্রকাশ করাতে দর্শকমাত্রেই পরম পুলকিত হইয়া সাধুবাদ করিয়াছেন, বিশেষত: শকুন্তলার লাবণ্যজ্যোতি: শরচ্চন্দ্রের দ্যোতির প্রায় প্রকাশ হইবায় রঙ্গস্থল উজ্জ্বল হইয়াছিল এবং তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে মধুবর্ষণ হইয়াছে, তিনি সভাস্থ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহার আনন্দে সকলে আনন্দিত ও বিমোহিত, তাঁহার ম্লানবদন সন্দর্শনে সকলেরই ম্লান মুখ এবং তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে অনেকের অশ্রুপাত হইয়াছে, আহা, তরুণবয়স্ক ছাত্রগণ মহাকবি কালীদাস প্রণীত শকুন্তলা নাটকের অনুরূপ প্রদর্শন সময়ে কবিবরের মনোগত ভাব প্রকাশ করাতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, অধুনা অন্যান্য ভদ্রকুল প্রসূত বিদ্যানুরাগি ছাত্রগণ এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া যদ্যপি সংস্কৃত কবিগণ কৃত নাটকের পুনরুদ্ধার করেন তবে পরমোপকার হয়।"

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'সংবাদ প্রভাকর' উভয় পত্রিকার বিবরণ হইতেই শকুন্তলার অভিনয় ভাল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, অথচ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র কেন যে এই অভিনয় সফল হয় নাই বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

২৩শে জুলাই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই সময়ে শকুন্তলার তৃতীয়বার অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল।...এই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' উল্লেখ আছে যে, শকুন্তলার পূর্ব্ববর্ত্তী অভিনয়ে সম্পূর্ণ শকুন্তলা অভিনীত হয় নাই, মাত্র তিন অঙ্ক হইয়াছিল।

'শকুন্তলা'র অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকা লইতেন, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা হইতে তাহা জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন,—

"শকুন্তলার অভিনয় হইল। ছাতু বাবুর নাতি শরৎ বাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন Stageএর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎ বাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণী-বেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল।...দুষ্যন্ত—প্রিয়মাধব মল্লিক। ইনি বালিমেভ্রোজানির বাড়ী কর্ম্ম করিতেন, Cashier ছিলেন। দুর্ব্বাসা—গ্রে ষ্ট্রীটের অন্নদা মুখোপাধ্যায়, বেশ সুপুরুষ, পরে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। অনসূয়া—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ইনি পরে হাইকোর্টের Interpreter হইয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা—ভুবনমোহন ঘোষ, স্কুল মাষ্টার। আমি হইতাম কথ মুনির আশ্রমের এক ঋষিকুমার। শরৎ বাবুর ভগিনীপতি উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) Stage-manager ছিলেন। তখনও তিনি খ্রীষ্টান হয়েন নাই। তাঁহার কায ছিল whistle দেওয়া, পটক্ষেপণ ও উত্তোলন ইত্যাদি।...এক ব্যক্তি 'শকুন্তলা'র গান বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে আমরা কবিচন্দ্র বলিয়া ডাকিতাম।" *

যেমন একালে, তেমনই সেকালেও কলিকাতার ফ্যাশন্ মফঃস্বলে যাইতে বেশী বিলম্ব হইত না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় নূতন থিয়েটারগুলি দেখা দিবার পরবৎসরই জনাই গ্রামে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইল। সেখানেও শকুন্তলা নাটকেরই অভিনয় হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন 'হিন্দু পেট্রিয়টে' জনাইয়ের অভিনয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ২৯শে মে তারিখে জনাইয়ের জমীদার বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও ব্যয়ে তাঁহার নিজ বাড়ীতে এই অভিনয় হয়।

ছাতু বাবুর বাড়ীতে শকুন্তলার অভিনয়ই একমাত্র অভিনয় নয়। এই নাট্যশালায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (ভাদ্র, ১২৬৪) মাসে 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকটি সংস্কৃত কাদম্বরী অবলম্বনে মণিমোহন সরকার কর্তৃক রচিত। † মহাশ্বেতা নাটকের অভিনয়ে কে কোন্ চরিত্রের অভিনয় করেন, তাহা নাটকখানির 'ভূমিকা'য় দেওয়া আছে। সেটি এইরূপ :—

* 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (দ্বিতীয় পর্য্যায়)—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃ: ১৫০-৫১।

† অভিনয়ের দুই বৎসর পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি (আশ্বিন, ১২৬৬) 'মহাশ্বেতা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (সংবাদ প্রভাকর, ১৭ই অক্টোবর, ১৮৫৯—১লা কার্ত্তিক, ১২৬৬)।

"ভূমিকা।…নাটক সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হইতে হইতেই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষের প্রযত্নে তাঁহাদিগের ভবনে ইহার অভিনয় প্রদর্শিত হয়, উক্ত রঙ্গস্থলে দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত মনুষ্য উপস্থিত ছিলেন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ। এবং যাঁহারা ৺আশুতোষ দেব ভবনে অভিনয় করিয়াছিলেন।

রাজা	…	বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
পুণ্ডরীক নট	…	বাবু মহেন্দ্রনাথ মজুমদার
কপিঞ্জল	…	গ্রন্থকার
কঞ্চুকী মহাশ্বেতা নটী	…	বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ
কাদম্বরী	…	বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ
তরলিকা	…	বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ
রাণী	…	বাবু ভুবনমোহন ঘোষ
ছত্রধারিণী	…	বাবু মহেন্দ্রলাল [নাথ ?] মুখোপাধ্যায়

রামজয় বসাকের বাটীতে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়

ছাতু বাবুর বাড়ীতে শকুন্তলা নাটক অভিনয়ের অল্পদিন পরেই আর একটি নাট্যাভিনয়ে কলিকাতায় খুব উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহা নূতনবাজারে * রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়। এত দিন কলিকাতায় যে-সকল নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সেগুলি প্রায়ই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা দেশে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ হওয়াতে তখন হইতে নাটকে সামাজিক সমস্যার অবতারণা হয়। যতদূর জানা যায়, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' এইরূপ সামাজিক নাটকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। † ইহার পর অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতায় এই নাটকটির আরও দুইবার অভিনয় হয়,—একবার রামজয় বসাকেরই বাড়ীতে, তাহার পর গদাধর শেঠের বাড়ীতে। গদাধর শেঠের বাড়ীতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ এই নাটকের তৃতীয় অভিনয় সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ পত্র ১৮৫৮, ২৫শে মার্চ্চ (১৩ই চৈত্র, ১২৬৪) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়, সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার মত।—

"হে সম্পাদক মহাশয়!

অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি আপনি আমার এই কয়েক পংক্তি আপনার সুবিখ্যাত পত্রে সমাবেশিত করিয়া সজ্জন সমক্ষে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থম্মন্য হইব।

গত ১০ চৈত্র সোমবার রজনীতে শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর সেট্ মহাশয়ের ভবনে, কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নামক নবীন নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় হয়। বড়বাজারস্থিত এই রঙ্গভূমি প্রায় ছয় সাত শত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া সভামণ্ডপ শোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয় প্রক্রিয়া যে কতদূর সুন্দর হইয়াছিল, তাহা লেখনী সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই অভিনয় দর্শন করিয়া প্রত্যেক দর্শকেই ভূরি ২ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু সূত্রধার কোন রঙ্গভূমিতে অভিনয় না করাতে, তাঁহার কথোপকথন ও সংগীত ব্যাপারের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত এই অত্যল্প দোষ সাধুদিগের গণনা করা কদাচ উচিত নয় যেহেতু কবিবর কালিদাস কহিয়াছেন।

'একোহিদোষো গুণসন্নিপাতে,
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥'

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাপ্রসাদ বশাক উদরপরায়ণ ও ঘটকের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করাতে সভাসদ্গণের প্রীতির ভাজন ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, যিনি জনাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনিও উক্ত রঙ্গভূমিতে ধর্ম্মশীলের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বশাকের বাটীতে এই কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের আর দুইবার অভিনয় হয়, কিন্তু উপরোক্ত দিবসে যে অভিনয় হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকতর উৎকৃষ্ট।

* পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকাভিনয়ে কুলাচার্য্য সাজিয়াছিলেন; তাঁহার স্মৃতিকথায় দেখিতেছি :—"চড়কডাঙ্গা রোডে (বর্ত্তমান টেগোর কাস্‌ল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেণ্টের অফিসের বড়বাবু রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইল। জগদ্দুর্ল্লভ বসাক তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।…'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক এই বাড়ীতে চার বার অভিনীত হইয়াছিল।…আমি কুলাচার্য্য সাজিতাম।"—পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্য্যায়), শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। ১৩২০, পৃঃ ১৪১।

† "**Friday, the 13th March**......... The Educational Gazette states that the well-known farce of Koolino Kooloshorbushya was acted in the private residence of a Baboo in Calcutta with great success. We are glad to see these new pieces acted."—The **Hindoo Patriot** for March 19, 1857.

বঙ্গদেশে আজ্ কাল বড় ধুমধাম।
যেথা সেথা শুনা যায় অভিনয় নাম।
বঙ্গদেশে বঙ্গবিদ্যা হোতেছে প্রকাশ।
সকলে উৎসাহ করে এই মম আশ॥
নাটক লইয়া সবে রঙ্গরসে থাক।
কালিদাস হোয়ে সবে কালীনাম ডাক।
একজন সভ্যতাপথের পথিক।"

ইহার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে চুঁচুড়ার ৺নরোত্তম পালের বাটীতে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়ের দিন 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা সানন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, অদ্য রাত্রি ৯ ঘটিকাকালে চুঁচুড়া নগরে ৺নরোত্তম পালের বাটীতে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকে'র অভিনয় প্রদর্শিত হইবে। অতএব বিদ্যোৎসাহী নাট্যপ্রিয় সুরসিক দর্শকগণ উক্ত স্থানে নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া কথিত কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করত নাট্যরসে আমোদী হইবেন।" *

এই নাটকের অভিনয়ে চুঁচুড়ার কুলীন ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার কল্পনাজল্পনা করেন। †

কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

ইহার পরই কলিকাতায় যে নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তাহার নাম বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ‡ বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চও কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে * প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই রঙ্গমঞ্চ পরবৎসরের ৯ই এপ্রিল উন্মোচিত হয় ও উহাতে প্রথম অভিনীত হয়, ভট্টনারায়ণ কৃত 'বেণীসংহারে'র রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক একটি বাঙ্গালা অনুবাদ। † ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বহু গণ্যমান্য দেশীয় ও য়ুরোপীয় দর্শকের সম্মুখে এই নাটকের অভিনয় হয় এবং সকলেই এই অভিনয়ের খুব প্রশংসা করেন। কালীপ্রসন্ন নিজেও এই নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় খুব প্রশংসার্হ হইয়াছিল।

বেণীসংহার অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কালীপ্রসন্ন নিজেই নাটক-রচনায় হাত দেন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের বিখ্যাত নাটক বিক্রমোর্ব্বশীর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই নাটকের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটক কিরূপে রচিত হইল, তাহার কথা বলেন। বাঙ্গালা দেশে নাট্যশালার অভাবের কথা উল্লেখ করিবার পর কালীপ্রসন্ন লেখেন—

"সেক্সপিয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গ ভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবার কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গ ভূমিতে বঙ্গবাসী গণ পুনরায় বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গ ভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গ ভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে মাস্করর নটগণ

* কবিরাজ শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায়, ১২৬৫ সালের ২০শে আষাঢ় তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে এই অংশটির নকল সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

† "Tuesday, the 13th July......... The acting of the **Koolin-o-Kooloshurboshhwo** Natuck at Chinsurah has, it appears, given great offence to the Koolins of the locality .... The acting took place in the house of a gentleman of the Banya caste, and the Coolin Brahmins intend, it is said, to retaliate in kind."—The **Hindoo Patriot** for July 15, 1858.

‡ কালীপ্রসন্ন সিংহের ইংরাজী ও বাঙ্গালা—দুইখানি জীবনীতেই শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টাব্দটি ১৮৫৩ বলিয়া গ্রহণ করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এ সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষ' (শ্রাবণ, ১৩৩৮) ও 'প্রবাসী' (১৩৩৮, শ্রাবণ) পত্রে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে আমার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

* বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে ১৮৫৭, ৩রা ডিসেম্বর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন—
"**The Biddotshahini Theatre** is in the second year of its existence."

† রামনারায়ণের আত্মকথায় প্রকাশ, এই নাটকখানি নূতন-বাজারে রামজয় বসাকের বাটীতেও অভিনীত হয়।

যথাবিহিত নিয়ম ক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতি ভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গ ভূমিতে অনুরূপ কারণই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের পাঠ যোগ্য এবং নাগরীয়.অন্যান্য রঙ্গ ভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।"

'বিক্রমোর্ব্বশী'র প্রথম অভিনয়ের সঠিক তারিখ ২৪শে নভেম্বর, ১৮৫৭। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা দেখিতে পাই,—

"সন ১২৬৪ সাল, অগ্রহায়ণ —১০ অগ্রহায়ণ দিবসে যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুরূপ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়।"

বিক্রমোর্ব্বশীর অভিনয় খুব কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে নিবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিক্রমোর্ব্বশীর অভিনয়েও বহু দেশী ও য়ুরোপীয় দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ (পরে স্যর) সিসিল বীডন ছিলেন। ইনি অভিনয় দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া অভিনেতাদের খুবই সুখ্যাতি করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রেও এই অভিনয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণে প্রশংসা ভিন্ন অনেকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্যও আছে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রথমেই বলিতেছেন,—

"আমরা ছয় সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে আমাদের পত্রিকায় বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের বাংলা অনুবাদের সমালোচনা করিয়াছিলাম, তাহা বোধ করি আমাদের পাঠকদের স্মরণ আছে। এই সংখ্যায় আমরা ঐ বাবুরই উদ্যোগে তাঁহার নিজের বাটীতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয়ের পরিচয় দিব। বুদ্ধি, সুরুচি, বিজ্ঞতা, বিলাস ও সম্ভ্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের দেশীয় সমাজের যাঁহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন তাঁহারা সকলেই মহার্ঘ শীতবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নাট্যশালার আয়তনের অনুপাতে বেশী হইয়াছিল। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত শুনিলাম দর্শকের ভিড়ের জন্য চৌরঙ্গীর অভিজাতবর্গের মধ্যে অনেকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বিচারে টিকেট বিতরণ সম্বন্ধে জনসাধারণের যতই আপত্তি থাকুক না কেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতি আমাদের অবিচার করা উচিত নয়। তাঁহার বদান্যতা ও অকুণ্ঠিত অর্থব্যয়ের ফলে কলিকাতায় বিশুদ্ধ আমোদের একটি চমৎকার স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে। ইহা কালীপ্রসন্ন বাবুর নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও, বুদ্ধিমান্ ও ভদ্র ব্যক্তিমাত্রেই ইহাতে গিয়া স্বাধীনভাবে আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।"

ইহার পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই নাটকে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। পরিশেষে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন যে, এইরূপ একটি নাট্যশালা চিরস্থায়ী হওয়া উচিত এবং দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। নাট্যানুরাগী ব্যক্তিরা যদি এই উদ্দেশ্যে সমবেত হন, তবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাঁহাদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

বিক্রমোর্ব্বশী অভিনয়ের পর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে আর একটি অভিনয়ের উদ্যোগের সংবাদ আমরা পাই। উহার নাম—সাবিত্রী-সত্যবান্। ইহাও কালীপ্রসন্নের রচিত। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ইহার মহলা দেওয়া হয়। ৪ঠা জুন (শুক্রবার) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি,—

"আগামী শনিবার ৭ টার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের অভিনয়ন পাঠ হইবেক। এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক, অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।"

এই অভিনয় উপলক্ষ করিয়া খৃষ্টানদের 'অরুণোদয়' নামক পাক্ষিক পত্র ১৫ই জুন তারিখে লিখিয়াছিল,—

"পাক্ষিক সংবাদ।...কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীর রঙ্গভূমিতে এবং জনাঞি গ্রামে নানা রঙ্গ হইতেছে। স্বদেশীয় বাবু ভাইয়েরা দয়া ধর্ম্ম এবং দেশোন্নতি ছাড়িয়া নাট্যশালায় রঙ্গ করিতেছেন!"

বেলগাছিয়া নাট্যশালা

ইহার পর আমরা যে নাট্যশালার কথা বলিতে যাইতেছি, সেটি বাঙ্গালা দেশের একটি বিখ্যাত নাট্যশালা। তখনকার দিনের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকদের মতে ইহার অপেক্ষা সুন্দরতর নাট্যশালা ও উচ্চাঙ্গের অভিনয় পূর্ব্বে আর হয় নাই। এই নাট্যশালাটির নাম বেলগাছিয়া নাট্যশালা। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হয়। এই নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং ইঁহাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে সে-যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙ্গালী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলিকাতায় খুব একটা সাড়া পড়িয়া যায়। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কি নাট্যশালার সাজ-সজ্জায়, কি গীতবাদ্যে, কি অভিনয়ে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাট্যাভিনয় বাঙ্গালা দেশে কখনও দেখা যায় নাই। গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালা অভিনয়ে খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এ কথা বলা একটা সুপরিচিত প্রবাদ-বাক্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাঁহার বিবরণ হইতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধে আমরা অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারি। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই প্রথমে দেশীয় ঐকতানবাদনের প্রবর্ত্তন হয় ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল কর্তৃক এই ঐকতানের দল গঠিত হয়। এই নাট্যশালার সাজসজ্জা-সংগ্রহ ও দৃশ্যপট-অঙ্কনে বহু অর্থব্যয় হয়। এক 'রত্নাবলী' অভিনয়ের জন্যই রাজাদের দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নাট্যশালা-নির্ম্মাণে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। এই নাট্যশালার অভিনেতাদের সকলেই ছিলেন সে-যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী। ইঁহাদের মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী বিদূষকের ভূমিকা খুব দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন, এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহও একটি চরিত্রের অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে কলিকাতার দেশীয় ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রেই এবং সপরিবারে বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গভর্ণর স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেশব বাবুর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও বলেন যে, কেশব বাবুর গম্ভীর ও শান্ত চেহারা দেখিয়া তিনি যে বিদূষকের ভূমিকা এরূপ নিপুণতার সহিত অভিনয় করিতে পারেন, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। *

যে নাটকখানির অভিনয়ের কথা বলা হইল, উহা রত্নাবলী নাটক। (শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অবলম্বনে) রামনারায়ণ তর্করত্ন উহা প্রণয়ন করেন। এই নাটকের অভিনয়ই বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রথম অভিনয়। এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই, শনিবার। এই অভিনয়ের কয়েক দিন পরে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' (১৮৫৮, ৫ই আগষ্ট) উহার একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কথার মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন যে,—

> "পাইকপাড়ার রাজারা শিক্ষা ও দেশের মঙ্গলের জন্য মুক্তহস্তে দান করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এবারে তাঁহারা নাট্যশালা ও নাটকের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়িতে তাঁহারা একটি চমৎকার সখের নাট্যশালা স্থাপিত করিয়াছেন। এই নাট্যশালা গত শনিবার রত্নাবলী অভিনয়ের দ্বারা উন্মোচিত হয়। আমাদের দেশীয় ও ইউ-রোপীয় প্রৌঢ় পাঠকদের মধ্যে যাঁহাদের বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, মেরেডিথ পার্কার, হোরেস উইলসন, হেনরী টরেন্স এবং চৌরঙ্গী ও সাঁসুসি থিয়েটারের কথা স্মরণ আছে, তাঁহাদের নিকট ভারতীয় নাটকের পুনরভ্যুদয় ও বিশুদ্ধ আমোদের প্রতি অনুরাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংবাদ খুব আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে হইবে। এ-যুগের নবীন যুবকেরাও এই আমোদের নূতনত্ব ও নাট্যশালার সুব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। বিচক্ষণ দর্শকেরা সেদিনকার অভিনয় দেখিয়া খুব তৃপ্ত হইয়াছিলেন।"

'হিন্দু পেট্রিয়টের' সমালোচকের নিকট এই অভিনয়ের নৃত্য ও সঙ্গীত খুব ভাল লাগিয়াছিল। এক জন ইংরাজ শ্রোতা ইঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, এই অভিনয়ে ভারতীয় বাদ্য ও সঙ্গীত শুনিয়া তাঁহার মনে হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ ভাব ছিল, তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কিন্তু এই অভিনয়ের প্রশংসা মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কতকগুলি দোষও দেখাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী অভিনয়ে সেই দোষগুলি সংশোধিত হইয়াছিল।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রত্নাবলী নাটক ছয় সাত বার অভিনীত হয়।

* যোগীন্দ্রনাথ বসুর "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত" (৩য় সং) পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত Reminiscences of Michael M. S. Datta by Gour Das Bysack দ্রষ্টব্য।

রত্নাবলী নাটকের অভিনয় আর এক দিক্ হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখিয়াই মাইকেল মধুসূদন দত্তের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে। আমরা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' হইতে জানিতে পারি যে, ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মাইকেলের প্রথম নাটক "শর্ম্মিষ্ঠার' প্রথম অভিনয় হয়। 'শর্ম্মিষ্ঠার' ষষ্ঠ বা শেষ অভিনয় হয় সেই বৎসরেরই ২৭শে সেপ্টেম্বর। বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব, পাটনার মুনশী আমীর আলী, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ বহু গণ্যমান্য দেশীয় ও বিদেশীয় ভদ্রলোক এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন।*

শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন অভিনয় হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই নাট্যশালার অস্তিত্ব লোপ পায়। এই অল্প কালের মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালা যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। মাইকেল সত্য সত্যই বলিয়া গিয়াছেন যে, "যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুই জন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না,—ইঁহারাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।"

বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয়

বেলগাছিয়া নাট্যশালা যে-সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে যুগটি বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাসের খুব একটি স্মরণীয় যুগ। তখনকার দিনের সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইলেই নাট্যশালা ও নাটক সম্বন্ধে বহু মন্তব্য চোখে পড়ে। এই সকল লেখকদের সকলেই নাট্যশালা ও নাটকের প্রসারকে দেশের উন্নতির লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাইকেলকে একটি পত্রে লেখেন যে "এক্ষণে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয়, এগুলি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তবু এগুলি সুলক্ষণ বলিয়াই গণ্য করা উচিত; কারণ, ইহাদের দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে রুচির প্রসার হইতেছে।" এই ধরণের অভিমত আমরা সে যুগের অনেক সংবাদ পত্রেই পাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় এক জন সংবাদদাতা লেখেন,—

> "নাট্যাভিনয়ের প্রতি অনুরাগের ফলে বহু হিন্দু যুবক দেশীয় পাড়ায় অস্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় আশুতোষ দে'র বাড়িতে 'শকুন্তলা,' এবং তাহার পর সিংহ বাবুদের বাড়িতে 'বেণীসংহার' অভিনীত হয়। সম্প্রতি আমরা শুনিতে পাইতেছি যে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু যুবক শীঘ্রই 'বিধবোদ্বাহ' ও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিবেন। প্রথমোক্ত নাটকটির অভিনয় কাঁশারিপাড়া নিবাসী মুৎসুদ্দী বাবু মহীন্দ্রলাল বসুর বাড়িতে হইবে। ইহা দেশের পক্ষে খুব মঙ্গলের লক্ষণ, এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে উৎসাহ বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইবেন।"

উপরে যে-প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অভিনয়ের আয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা খুব সম্ভব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করেন। ইহা শেষ পর্য্যন্ত মোটেই অভিনীত হয় নাই। কবি ও নাটককার মনোমোহন বসু ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে আছে,—

> "প্রসিদ্ধ কবি বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা অনেক বড় বড় লোক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক বাঙ্গালায় রচনা করাইয়া লইলেন। কিন্তু তাহার গানগুলি যত উত্তম হইল, কথোপকথন তেমন সৌন্দর্য্য-সাধক হইল না। যাহা হউক, মহা ধুমধাম পূর্ব্বক কয়েক মাস তাহার আখড়া চলিল—রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইল—কিন্তু পরিণামে হরিনাম বই আর কিছুই ফল দর্শিল না!" (মধ্যস্থ, পৌষ ১২৮০, পৃঃ ৬১৮)

কিন্তু প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ বিফল হইলেও, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধীয় একটি নাটকের অভিনয় পরিশেষে সুসম্পন্নই হয়। এই নাটকটি উমেশচন্দ্র মিত্র

---

*"The Sermista was performed, for the last time as we understand before the holidays, on Tuesday evening last, at the little private theatre erected by the Rajahs Pertaub and Isser Chunder Singh at their Belgachia Villa. A selected number of the European and Native friends were invited by the Rajahs to witness the performance. Among the company were present the Hon'ble J. P. Grant, Lieutenant Governor of Bengal,........."—The **Bengal Hurkaru** of Thursday, September 29, 1859.

প্রণীত 'বিধবা-বিবাহ নাটক'। * আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালা দেশে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। নাটক-রচনার ক্ষেত্রেও সেই আন্দোলন ও উত্তেজনার ঢেউ আসিয়া লাগে। এক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দেই বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি নাটক প্রকাশিত হয়। ইহাদের একটি পূর্ব্বোল্লিখিত বিধবা-বিবাহ নাটক, অপরটি উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত বিধবোদ্বাহ নাটক। † এই দুইটি নাটকের মধ্যে বিধবোদ্বাহ নাটক অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে, 'বেঙ্গল হরকরা'য় এই সংবাদ প্রকাশিত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত উহার অভিনয় হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলীয় যুবকদের উৎসাহে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় হয়। সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে মনে হয়, কেশবচন্দ্র সেনের পূর্ব্বে অন্য দু-একজন ব্যক্তিও এই নাটকটি অভিনয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়,—

> "আমরা জানিতে পারিলাম যে বাবু বিহারীলাল শেঠ বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র ও অন্যান্যের সাহায্যে শীঘ্রই বিখ্যাত বিধবা-বিবাহ নাটক অভিনয় করিতে যাইতেছেন। বাবু বিহারীলাল শেঠ কৃতকার্য্য হউন, আমরা এই কামনা করি।"

কিন্তু এই উদ্যোগের কোন ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পরিশেষে কলুটোলার সেনেরা বিধবা-বিবাহ নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশ যে, সেই বৎসরের ১৬ই এপ্রিল চীৎপুরের সিঁদুরিয়াপটিতে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বিধবা-বিবাহ নাটকের মহলা দেওয়া হয় ও তাহাতে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। এই বাড়ীতেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়; বর্ত্তমানে বাড়ীখানির কোন চিহ্নই নাই।

যে নাট্যশালায় বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় হয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল—'মেট্রোপলিটান থিয়েটার।' এই নাট্যশালায় ১৮৫৯, ২৩শে এপ্রিল বিধবা-বিবাহ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ লইয়া অনেকেই ভুল করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ২৭শে এপ্রিল (বুধবার) তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে আর কোন গোল থাকিবে না:—

> "বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয়—গত শনিবার অধুনা-লুপ্ত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। অভিনয় রাত্রি আটটায় আরম্ভ হয় ও তিনটা পর্য্যন্ত চলে। উহাতে প্রায় পাঁচ শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এরূপ একটি নিষ্ঠুর দেশাচারের ফলে হিন্দুনারীরা যে চিরবৈধব্য ভোগ করে তাহার কুফল এই নাটকে উজ্জ্বল অথচ যথার্থ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।...অভিনয়ের মধ্যে টোল পণ্ডিত, তর্কালঙ্কার ও সুখময়ীর অভিনয় দর্শকদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা পাইয়াছিল। কিন্তু নাম করিয়া এই কয়েকটি অভিনেতার উল্লেখ করিলেও, অন্যান্য ভূমিকার অভিনয়ও যে খারাপ হয় নাই তাহার একটি প্রমাণ—নাটকটির দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও কোন দর্শক অভিনয় শেষ হইবার পূর্ব্বে স্থান ত্যাগ করেন নাই।...দৃশ্যপট সুচিত্রিত হইয়াছিল এবং এতটা যে সুচিত্রিত হইবে তাহা আশা করা যায় নাই।...এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু মুরলীধর সেন ও অন্যান্য যাঁহারা এই নাট্যাভিনয়ের পরিচালনে উদ্যোগী ছিলেন তাঁহারা খুবই ধন্যবাদার্হ। দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এই নাটকে নারী-চরিত্রের অভিনয় যেন নারীদের দ্বারাই হয়।"

সেই বৎসরের ৭ই মে বিধবা-বিবাহ নাটকের আর একটি অভিনয় হয়।* এই নাট্যশালার দৃশ্যপটগুলি মিঃ হলবাইন্ (Holbein) নামে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল। †

১৮৫৯, ১৪ই মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে আমরা এই অভিনয়ের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি পাই:—

---

* ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখের *The Calcutta Literary Gazette* পত্রের ৪৮৪ পৃষ্ঠায় "Bidobha Bibako :—A Tragedy in Bengallee, Bhowanipore—1856" এই নামে বিধবা-বিবাহ নাটকের এক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

† "বিজ্ঞাপন। সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে আমি যে 'বিধবোদ্বাহ নাটক' প্রস্তুত করিয়া যোড়াসাঁকোস্থ 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভায় বিশেষ অনুরোধে প্রায় বৎসরাতীত হইল প্রদান করিয়াছিলাম, সভার অধ্যক্ষগণ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ে অক্ষম হইবায় আমি নিজ ব্যয়ে এইক্ষণে উক্ত মুদ্রাঙ্কন করিতেছি অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক,...। সন ১২৬৩ শাল ২৩ আষাঢ়। শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সাং হালিশহর পাসবাটী। (সংবাদ প্রভাকর, ৮ই জুলাই, ১৮৫৬)।

***The Bengal Hurkaru and India Gazette** for May 6, 1859.

†Ibid., May 20, 1859.

"...সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর সেন স্বীয় বন্ধুবর্গ সংযোগে পূর্ব্বতন মেট্রোপোলিটন কালেজ বাটীতে এক সুরম্য রঙ্গভূমি স্থাপিত করিয়া কয়েকবার যেরূপ শ্রবণ-মনোহর ও লোচন-সুখকর অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয়, বাঙ্গালাভাষায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হয় নাই। সুদক্ষ কুশীলব মহাশয়েরা প্রায় সকলেই অতি সুচারুরূপে অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কুশীলবের অভিনয়ে মোহিত হইতে হয়। আর ঘটনা স্থলের প্রতিকৃতির অধিকাংশই এরূপ চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে যে তাহা দেখিলে স্বরূপ ঘটনাস্থলই বোধ হয়, রঙ্গভূমির কাল্পনিক কাণ্ড বোধ হয় না। আর গায়ক মহাশয়েরাও সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি কহিব, দর্শকমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে এই অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীন প্রশংসা করিয়াছেন। অবশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিতেছি, যে ইহার সম্পাদক মুরলীধর বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং তিনি এ বিষয়ে যে অকাতরে অর্থব্যয় ও অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সার্থকতা হইল বলিতে হইবে, এই অভিনয়ের সংগীত সকল আমাদের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহোদয় দ্বারা রচিত হয়।...হাটখোলাস্থ গায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় এই সকল গীতের সুর যোজনা করেন।"

বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্দ্র ছিলেন রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ। কেশবের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়া গিয়াছেন যে, হ্যামলেট প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দ্বারা কেশব রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধানে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই জন্য বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন। মজুমদার-মহাশয়ও এই নাটকের একটি ভূমিকা লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিকবার আসিয়াছিলেন ও অভিনয় দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই অভিনয়ে কলিকাতায় যে খুব উত্তেজনা হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিধবা-বিবাহ নাটক ছাড়া, আর একটি নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা'র 'নব বৃন্দাবন অর্থাৎ ধর্ম্মসমন্বয় নাটক।' ইহার অভিনয় হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে।*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

*The Indian Mirror for September 23, 1882, (Saturday); P. C. Mozoomdar's **Life and Teachings of Keshub Chunder Sen**, 3rd ed., pp. 291-92.

আষাঢ়ের উদাস দিবসে

যক্ষের বিরহী চক্ষু হ'তে এ আষাঢ়ে,
আজি বুঝি অবিরাম ঝরিছে নির্ঝর!
বদ্ধ গৃহে বসি' তাই ভাবিতেছি তাঁরে—
যেই জন আষাঢ়েরে করেছে নির্জ্জর।

তখন ছিল না হেথা আজিকার মত,
সাজাইয়া ক্ষত বপু শত অলঙ্কারে,
বাজাইয়া ঢক্কা শত, ঢাকি' গ্লানি যত—
জাহির করার প্রথা বহু অহঙ্কারে।

অম্লান তথাপি সেই মহারত্ন-খনি—
কত শতাব্দের গাঢ় অন্ধকার ভেদি'
উজ্জ্বল আলোক দানে—যাঁর হীরা মণি,
স্পর্শি' যাঁ'রে বাঁচে কত—মৃত্যুজাল ছেদি'।

সেই কালিদাসে এক দীন কবি বসে'—
স্মরে এক আষাঢ়ের উদাস দিবসে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, (এম এ)।

স্মৃতির মূল্য

১৪

সরোজ হ্যারিসন রোডের এক মেসে একটি ঘর লইয়া থাকিত। এক ইংরাজী প্রকাশকের জন্য একখানি ইংরাজী বই শীঘ্র লিখিয়া দিবার ভার লওয়ায় কয় দিন সে বড়ই ব্যস্ত ছিল; সে জন্য কয়েক দিন হিমাদ্রির নিকট যাইতে পারে নাই। আজ সকালে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হিমাদ্রির ও পুষ্পিতার কথা মনে পড়িল। অনেকগুলি কথাও তাহাদিগকে বলিবার আছে। স্থির করিল, খানিকটা লিখিয়াই আজ একবার সেখান হইতে ঘুরিয়া আসিবে। বেলা ৮টা আন্দাজ হিমাদ্রির এক ভৃত্য আসিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিল। হিমাদ্রি লিখিয়াছে, "অনেক দিন আস নাই; সকালের দিকেই একবার আসিও। দরকার আছে।"

পত্র পড়িয়া সরোজ ভৃত্যকে বলিল, "তুমি চল, আমি এখনই যাইতেছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

সরোজ আসিয়া দেখিল, হিমাদ্রি ঘরে একা বসিয়া আছে। হিমাদ্রি বলিল, "এস; কিন্তু তুমি যে রকম দিন-ক্ষণ দেখে আসা আরম্ভ করেছ, তোমাকে আসুনই শেষটা বলতে হবে দেখছি।"

সরোজ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "ইতিহাসখানা হাতে নিয়ে ফেলে রেখেছিলাম। প্রকাশক বড় তাগাদা দিতে তাই নিয়ে প'ড়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম, একেবারে শেষ ক'রে তবে বেরুবো—তাই দিন পাচেক আসতে পারি নি।"

হিমাদ্রি একটু হাসিয়া বলিল, "আমি ত ঠিক করে-ছিলাম, আজকাল রোজই উত্তরে যাত্রা নাস্তি। তাই তুমি শুভ দিনের অপেক্ষায় আছ। শুধু ত এই ক'দিন নয়, তোমার আসা আজকাল অনেক ক'মে গিয়েছে।"

সরোজ প্রসঙ্গের পরিবর্তন করিয়া বলিল, "আজ একা যে?"

হিমাদ্রি তৎক্ষণাৎ একটু গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "সেই জন্যই ত তোমাকে ডেকেছি।"

সরোজ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "কেন, পুষ্পিতার অসুখ করেছে?"

হিমাদ্রি বলিল, "অসুখ ঠিক করে নি, তবে খুব অসুস্থ। কাল সারা রাত কষ্ট গিয়েছে। সকালের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনও শুয়ে।"

সরোজ চিন্তিতভাবে বলিল, "অসুখ করে নি অথচ অসুস্থ, এ যে অনেকটা হেঁয়ালীর মত হ'ল। কথাটা প্রকাশ করেই বল। তুমিও কি আজকাল কবিতা লেখা ধরেছ?"

হিমাদ্রি তখন সংক্ষেপে সব কথা সরোজকে বলিল। শুনিয়া সরোজ অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "Brute (জানোয়ার)! ছি, তুমি কি ব'লে তাকে ছেড়ে দিলে?"

হিমাদ্রি বলিল, "ধ'রে রেখে কি করতাম?"

সরোজ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "কি করতে? বেশ কসে ঘা কতক চাবুক দিতে পার নি?"

হিমাদ্রি প্রশান্তভাবে বলিল, "হাজার হোক আমাদের বাড়ীতেই যখন এসেছিল, তখন কি ক'রে আর চাবুক দিয়ে আতিথ্য করি?"

সরোজ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আচ্ছা বেশ, ও আতিথ্যের ভার আমারই রইল। তোমার যদি গৃহস্থধর্ম্মে বাধে, আমার বাধবে না। আমি এখনই একবার তার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে আসছি।"

সরোজ উঠিতে যাইবে, এমন সময় ভিতরের দিক্ হইতে পুষ্পিতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার মনে বিশেষ আঘাত লাগায় এক রাত্রির মধ্যেই তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল এবং সর্ব্বদেহে যেন অনশনের কৃশতা আসিয়াছিল।

হিমাদ্রি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি কেন তাড়াতাড়ি ক'রে উঠে এলে? আমরা একটু পরে ত ঐ ঘরেই যেতাম।"

পুষ্পিতা নিকটবর্ত্তী একটা আসনে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি উঠেই দেখলাম, তুমি পালিয়েছ। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম, সরোজ বাবুর সঙ্গে গল্প হচ্ছে। তাই এলাম।"

তার পর সরোজের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি আজকাল এখানে আসা ছেড়েই দিয়েছেন।"

সরোজ বলিল, "আমার না আসাই বড় অন্যায় হয়েছে। আমি আজকাল বেশীর ভাগ সময় এখানে থাকব—তা হ'লে হিমাদ্রি পশুদের উপর অতখানি উদারতা দেখাতে পারবে না।"

পুষ্পিতার দিকে চাহিয়া হিমাদ্রি বলিল, "তুমি আসার একটু আগে সরোজ চাবুক নিয়ে তার ওখানে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। তুমি এসে পড়ায় ব্যাঘাত ঘটল। ওর চোখ-মুখ রাগে যে রকম লাল হয়ে উঠেছিল, শারীরিক বল-প্রয়োগ না করলে আর সরোজকে আটকান যেত না।"

পুষ্পিতা রাত্রিকার ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ায় লজ্জিত হইয়া মুখ নীচু করিল।

সরোজ একবার পুষ্পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "এতে আপনার ত লজ্জা পাবার কথা নয়, এ লজ্জা একান্তই আমাদের যে, আমরা মেয়েদের সঙ্গে মিশবার মোটেই উপযুক্ত নই।"

হিমাদ্রি বলিল, "দুটো অভদ্র ব্যবহার উপরি উপরি হওয়ার জন্য পুষ্পিতার অত আঘাত লেগেছে। ঘরে বাইরে দু'জায়গাতেই অপমানিত হয়ে আর জ্ঞান ছিল না।"

সরোজ বলিল, "কিন্তু তুমি সে অপমানের প্রতিশোধ কৈ নিলে? তারই জন্য তোমার উপর রাগ হচ্ছে আমার। আমার নিজের উপরেও রাগ হচ্ছে—আমি এ ক'দিন আসতে পারি নি ব'লে।"

হিমাদ্রি বলিল, "যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য আর অনুশোচনা বৃথা। এ একেবারে সনাতন সত্য। এবার থেকে ঠিক হয়েছে, পুষ্পিতাকে একা রেখে আর আমি কোথাও যাব না—যদিও পুষ্পিতার আপনাকে রক্ষা করবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এবারকার মত ও রকম লোককে ক্ষমা করা গেল।"

সরোজ ঈষৎ বিদ্রূপভরে বলিল, "হাঁ, তোমাদের দেহে বল আছে, কাযেই ক্ষমা করাও সাজে। কিন্তু আমাদের মত লোকের পক্ষে ও জিনিষটাকে অত সহজে ক্ষমা করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে কবির কথা—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে।
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে॥'

অতি সত্য।"

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল, "এ শুধু দেশ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য, ঐখানেই এ সত্য। যদি আমাদের প্রতি ব্যক্তিগত অন্যায়ের জন্যেই প্রতিশোধ নিতে হয়, তা হ'লে উদারতা বা ক্ষমার কোথাও স্থান নাই। তোমার দেশের প্রতি অন্যায় তুমি সহ্য করবে না, এতে তোমার মহত্ত্ব আছে। কিন্তু তোমার নিজের প্রতি কোন অন্যায়ও যদি তুমি সইতে না পার, তা হ'লে সেটা তোমার নীচতা ও স্বার্থপরতারই পরিচয় দিবে।"

সরোজও হাসিয়া বলিল, "বেশ, তোমার মহত্ত্বের দাবী আমি মেনে নিচ্ছি এবং সে জন্য তোমাকে না হয় একটা দণ্ডবৎ করতে প্রস্তুত আছি।"

হিমাদ্রি বন্ধুর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "না, এর জন্য দণ্ডবৎ প্রাপ্য নয়। কারণ, এরূপ মহত্ত্ব অল্প-বিস্তর সকলেরই করণীয়। সমাজে থাকতে গেলে পরস্পরের দোষ-ত্রুটি সইতেই হয়, ভাই।"

সরোজ অসহিষ্ণুভাবে চেয়ারের উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিল, "বেশ, এ প্রসঙ্গ থাক। কারণ, এ বিষয়ে আমরা দু'জন দুই মেরুতে অবস্থান করছি, মিল হওয়া দুরাশা, তবে একটা বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে মিল হয়ে গেছে। আজ সকালে আমি ভাবছিলাম, একটা বিশেষ কথা তোমাকে বলবার আছে, একবার ঘুরে আসি। ঠিক সেই সময় তোমার লোক গিয়ে উপস্থিত।"

হিমাদ্রি মৃদু হাসিয়া বলিল, "এটা বোধ হয় তোমার কিছু বলবার উপক্রমণিকা। কথাটা কি, শুনি?"

সরোজ বলিল, "লক্ষ্ণৌএ একটি প্রফেসারী পেয়েছি।"

হিমাদ্রি বলিয়া উঠিল, "তার মানে? এখানকার প্রফেসারী পছন্দ হ'ল না, না অন্য কোন চাকরী তোমার জুটত না বাঙ্গালা দেশে?"

সরোজ বলিল, "তা নয়, চাকরীর একটা প্রস্তাব পেলাম, নিয়ে নিলাম। নূতন দেশ।"

এতক্ষণে পুষ্পিতা কথা কহিল, সে বলিল, "ও আপনার অন্যায়, সরোজ বাবু। সারা ভারতের লোক আসছে কলকাতায় চাকরী করতে, আর আপনি যাবেন লক্ষ্ণৌ, কলকাতার স্থায়ী প্রফেসারী ছেড়ে দিয়ে?"

হিমাদ্রি বলিল, "তোমার যদি নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের দরকার হয়ে থাকে, এক কায কর, ইংরাজী বই প্রকাশ করবার একটা দোকান খোল না কেন? তাতে কি কম উপায় হবে মনে কর? তোমার মত লোক যদি এ ক্ষেত্রে নামে, দেখবে কি রকম কায চলে।"

সরোজ বলিল, "আমি যে চাক্‌রী নিয়ে ফেলেছি, কথা দিয়েছি তাদের, এদেরও নোটিশ দিয়েছি। আসছে শনিবারেই সেখানে রওনা হ'তে হবে।"

হিমাদ্রি দুঃখিতভাবে বলিল, "বেশ করেছ। তা হ'লে এ খবরটা দেবারও কোন দরকার ছিল না। সেখানে পৌছে একখানা চিঠি দিলেই হ'ত।"

ইহার কোন উত্তর সরোজের মুখ হইতে বাহির হইল না। তিন জনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সরোজই সর্ব্বপ্রথম কহিল, "আমার এখনও একটা কায বাকী আছে, সেটা শেষ ক'রে আসি এই বেলা। ও বেলা আবার আমি আস্‌ব।"

সরোজ উঠিল। কেহ সে কথায় ভাল-মন্দ কহিল না। সরোজ একবার দুই জনেরই মুখপানে চাহিল। কিন্তু কাহারও কোন উত্তর দিবার লক্ষণ না দেখিয়া ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

দুই জনে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কি ভাবিতে লাগিল। পুষ্পিতা বলিল, "আচ্ছা, সরোজ বাবু হঠাৎ এমন করলেন কেন? উনি ত ভাল ক'রে না ভেবে চিন্তে কোন কায করেন না।"

হিমাদ্রি ম্লানকণ্ঠে বলিল, "এ কথার উত্তর সে ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। আমি কেবল এইটুকু বুঝেছি, মানুষ যা কখনও ভাবতেও পারে না, তাও পৃথিবীতে ঘটে। সরোজ যে আমার সঙ্গে একটিবার পরামর্শ না ক'রে হঠাৎ এ কায নিয়ে বসবে, এ কথা আমি কোন দিন ভাবি নি। আর অপরে এ কথা বল্লে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতো না।"

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল।

হিমাদ্রি আবার বলিল, "এবার থেকে তুমি আর আমি, আর কেহ আমাদের সাথী নেই।"

হিমাদ্রির গলাটা একটু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে উঠিয়া তাহার বিচলিত ভাব গোপন করিবার জন্য জানালার ধারে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; আবার আপনার আসনে ফিরিয়া আসিল। খানিকক্ষণ পরে বলিল, "অথচ তার চিরদিনকার ব্যবহার এমন স্নেহপূর্ণ ও উদার যে, এমন একটা ব্যবহার কোন দিন ওর কাছ থেকে পাই নি—যা মনে ক'রে ওর পর একটু রাগ করি।"

পুষ্পিতা স্বামীর কাতর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দুই জনের মনেই সরোজের কথাটি এমন দাগ কাটিয়া রাখিয়া গেল যে, খানিকক্ষণের জন্য রাত্রিকার ব্যপার কথাও দুই জনই ভুলিয়া গেল।

১৫

সরোজ রাস্তায় বাহির হইয়া একগাছা বেত কিনিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাহিয়া অগ্রসর হইল। তাহার মনে তখন আসন্ন বিদায়ের কথা বেশী করিয়া বাজিতেছিল না। যে দিন সরোজ হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, সে প্রবাসে যাইবেই, সেই দিন হইতেই সে সেই দুঃখ অনুভব করিয়া আসিতেছিল। আজ হিমাদ্রির মুখে পুষ্পিতার প্রতি নরেন্দ্রের ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাহার

এই কথাটাই বারে বারে মনে হইতেছিল যে, ইহারই জন্য সে অনুক্ষণ ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। অত্যন্ত অশোভন ব্যবহার করিয়া নরেন্দ্র নিরাপদে চলিয়া যাইবে, ইহা সরোজ কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিতেছিল না। এ কথা জানিবে না—কেহ শুনিবে না; কত বড় অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতার কায সে করিয়াছে, এ কথাটাও কেহ তাহাকে বলিবেও না? অসহ্য—অসহ্য!

সরোজ বেতগাছা হাতে করিয়া গতির বেগ বাড়াইয়া দিয়া নরেন্দ্রের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিল। উদ্দেশ্য, সে কাপুরুষকে কিছু শিক্ষা দিয়া তবে ফিরিবে।

ছোট দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে দেখিল, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। একটিবার ভাবিয়া লইয়া সে জোরে জোরে বার কয়েক কড়া নাড়িল। কেহই উত্তর দিল না। কে যেন উপর হইতে নামিয়া একবার দুয়ারের কাছে আসিয়া আবার পা টিপিয়া ফিরিয়া গেল। ক্ষণেক পরে অতি ক্লান্ত কণ্ঠে এক জন কথা কহিল,—"কে বাবা? নরেন এখনও ওঠে নি।"

সরোজ বলিল,—"একবার দুয়ারটা খুলুন ত। নরেন বাবু আমার পরিচিত, তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে।"

একটু পরে ভিতর হইতে দুয়ার খুলিয়া গেল। সরোজ বেত হাতে অনেকটা রুদ্র-মুখেই ভিতরে প্রবেশ করিল; দেখিল, সম্মুখে এক বিধবা প্রৌঢ়া নারী। মুখে অপরিসীম ক্লান্তি ও রোগযাতনার সদ্যচিহ্ন। অতি কষ্টে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। দুয়ার ভেজাইয়া তিনি সরোজের মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে,—নরেন তোমার কি করেছে, বাবা?"

সরোজ এবার বেশ ক্রুদ্ধ স্বরেই বলিল,—"সে যা করেছে, তা কোন ভদ্রসন্তানের উপযুক্ত নয়। যাকে বন্ধু বল্‌ত, তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ী গিয়ে তার স্ত্রীকে অপমান করেছে। তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।" বলিয়া একবার ক্রোধদীপ্ত দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একখানি সুন্দর অশ্রু-প্লাবিত ও ভীতি-বিহ্বল মুখ তাহার চোখে পড়িল। তাহার চরণ আর উঠিল না। সরোজ বুঝিল, সম্মুখে সরোজের অবজ্ঞাতা জননী, আর জানালায় যাহাকে দেখিল, সে তাহার নির্য্যাতিতা স্ত্রী।

ঠিক সেই সময় বিধবা মাতা বলিলেন, "বাবা, সে যদি দোষ ক'রে থাকে, আমাদের কেন শাস্তি দিতে এসেছ? আমরা তোমার কাছে কোন্ দোষে দোষী, সেটা ত একটু ভাববার কথা। আমাদের সামনে ওকে যদি তুমি একটা কঠিন কথাও বল—আঘাত যে আমাদের বুকে শতগুণ হয়ে বাজবে।"

সরোজের পা আর উঠিল না। হাতের উদ্যত বেতগাছটাও যেন নত হইয়া পড়িল। বুঝিল, এক নারীর অপমানের জন্য এক নির্লজ্জ পুরুষকে শাস্তি দিতে আসিয়া আর দুইটি নিরপরাধা নারীকে অপমান করিবার—তাহাদের সুখ-শান্তি হরণ করিবার অধিকার তাহার কি আছে?

নরেন্দ্রের মা আবার বলিলেন, "আমরা, বাবা, নরেনের হয়ে তোমার কাছে আর যাঁকে অপমান করেছে, তাঁর কাছে আমরা দুই শাশুড়ী-বৌয়ে হাত-যোড় ক'রে ক্ষমা চাইছি। কত কাল পরে যে কারণেই হোক, ঐ হত-ভাগিনীর পানে ও মুখ তুলে চেয়েছে। এখনই ওর সুখের স্বপ্নটা ভেঙ্গে দিও না, বাবা।"

সরোজের বক্ষে কে যেন প্রচণ্ড আঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ দুই পা পিছাইয়া আসিল। বলিল, "আমায় মাপ করবেন, মা। আমি চ'লে যাচ্ছি। আমার শিক্ষা হয়েছে। এক জনের দোষে আর এক জনকে শাস্তি দেবার অধিকার কারুরই নেই। আমি চললাম।"

সরোজ দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল। "ভগবান্ তোমার ভাল করুন, বাবা," কথাটা তাহার কাণে পশ্চাৎ হইতে আশীর্ব্বাদের মত ভাসিয়া আসিল।

সরোজ আবার যখন রাস্তা চলিতে লাগিল, তখন তাহার মন হইতে সমস্ত ক্রোধ নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।

ট্রামে চাপিয়া সরোজ ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল, এ কি পৃথিবীর বিচিত্র সুখ-দুঃখ! এক জন দুঃখ না সহিলে অপরের সুখ অসম্ভব। এক জনকে আঘাত করিতে গেলে অপর এক জনের বক্ষে গিয়া সে আঘাত কঠিনতর হইয়া বাজে। ভালবাসিয়া কেহ বা অমৃত পায়, কাহারও ভাগ্যে বা গরল উঠে।

কলেজে গিয়াও আজ সরোজ এই চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না। সেই দিন পাঠ্য ছিল, Palgrave এর Golden Treasunry'র একটি ছোট প্রেমের কবিতা।

সরোজের ইংরাজী অধ্যাপনার—বিশেষ করিয়া কবিতার অধ্যাপনার সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু আজিকার মত এত সুন্দর করিয়া আর কোন দিন সে পড়ায় নাই। প্রেম যেন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার কণ্ঠে প্রকাশ হইতেছিল। প্রেমের মর্ম্মন্তুদ বেদনা পাতায় ঢাকা ফুলের মত তাহার অভিনব আনন্দ নিমেষে নিমেষে তরুণ ছাত্রগণের দৃষ্টির সম্মুখে অপরূপ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পাঠ শেষ করিয়া অধ্যাপক চলিয়া গেলে ছেলেরা নানা কথাই বলাবলি করিতে লাগিল।

এক জন বলিল, "আচ্ছা, সরোজ বাবুর আজ কি হয়েছে রে? এমন ক'রে পড়ালেন, যেন প্রেমের দুঃখ ও আনন্দ—যা উনি গভীরভাবে হৃদয়ে অনুভব করেছেন, তাই মধুর ভাষায় ব'লে গেলেন।"

অপরে বলিল, "যখন উনি পড়াচ্ছিলেন—চোখ দিয়ে জল ক' ফোঁটা পড়েছিল—দেখেছিলি?"

অন্য এক জন বলিল, "আমি ওঁর কথার সুরে এমন মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, অন্য কোন দিকে চাইবারও অবকাশ পাই নি। বড়ই দুঃখের বিষয়, সরোজ বাবু চ'লে যাচ্ছেন। Love poems অমন আর কেউ পড়াতে পারবেন না। আসছে সপ্তাহে হয় ত মিঃ কেলি পড়াতে আসবেন। দিব্যি লক্কা পায়রার মত সেজে গুজে এসে শুধু বক-বকম্ করবেন আর কি।"

"আচ্ছা, উনি চ'লে যাচ্ছেন কেন?"

"আমার দাদা ওঁর ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিলেন। তাঁকে এক দিন বলতে শুনেছি, উনি বিবাহ করেন নি আজও। এরও মূলে কোন রহস্য আছে। হয় ত ওঁর প্রেম ব্যর্থ হয়েছে।"

"তা হ'লে সে প্রেমটা কার সঙ্গে? কতখানি গভীর?"

"সম্ভবতঃ কোন যুবতীর সঙ্গে এবং গভীর বোধ হয় সমুদ্রের মত।"

"সে যুবতীটি তা হ'লে কে?"

"গুরু জানেন এবং জান্‌লেও সে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্বন্ধবিগর্হিত হবে।"

এ বিষয় লইয়া আরও হয় ত আলোচনা চলিত; কিন্তু অন্য এক জন অধ্যাপক আসিয়া পড়ায় আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

কলেজ শেষ হইয়া গেল। ছুটীর ঘণ্টা পড়িয়া গেল। ছেলেরা সব আপন আপন বাড়ী চলিয়া গেল। সকলেরই মনের নিভৃত কোণটিতে ব্যর্থ প্রেমের সুন্দর ছবির মধুর স্মৃতিটুকু জাগিয়া রহিল।

১২

বাসায় না গিয়া কলেজ হইতে সরোজ হিমাদ্রিদের বাড়ী আসিল। হিমাদ্রি তখন পুষ্পিতাকে একখানি কবিতার বহি পড়িয়া শুনাইতেছিল। সরোজকে আসিতে দেখিয়া হিমাদ্রি বলিল, "তুমি আবার এসেছ—সে জন্য তোমার সঙ্গে আবার কথা কইছি। কিন্তু তোমার বড় অন্যায়।"

সরোজ বসিয়া বলিল, "থাক্—তোমার বদান্যতাকে প্রশংসা করি।"

হিমাদ্রি বলিল, "বদান্যতা কোথায় দেখলে?"

সরোজ বলিল, "বসতে না ব'লে তুমি ত 'এস গে যাও' বলতে পারতে। ও বেলা যে রকম রাগ দেখলাম।"

পুষ্পিতা হাসিয়া বলিল, "রাগেরই যত দোষ দেখ্‌লেন—আপনার ব্যবহারের কোন দোষ নেই, নয়?"

সরোজ বলিল, "আচ্ছা, আমি দোষের জন্য ক্ষমা চাইছি—এবং সন্ধি প্রার্থনা কচ্ছি।"

হিমাদ্রি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "ও সব কুটুম্বিতের কথা ছেড়ে দাও, সরোজ। তোমার যাওয়া হবে না।"

সরোজ বলিল, "আর কি ক'রে হবে, ভাই। এখানে এক মাসের নোটিশ দিয়েছিলাম। সেখানে সোমবারে কায আরম্ভ করব—সে পত্রও দিয়েছি, আর ত উপায় নেই।"

হিমাদ্রি ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "অথচ ১ মাসের মধ্যে একটি বারও আমাদের সে কথা জানালে না। তোমাকে আর কি বলব।"

সরোজ বলিল, "যা ইচ্ছে, তাই বল—কিন্তু আমার উপর আর রাগ রেখো না।"

সরোজ হিমাদ্রির হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে লইল।

হিমাদ্রি আর রাগ করিতে পারিল না। শুধু বলিল, "আচ্ছা, কেন তুমি হঠাৎ কল্‌কাতা ত্যাগ করছ, এ কথা বল।"

সরোজ বলিল, "এরই বা কি উত্তর দেব ? একে একটা হঠাৎ খেয়াল ছাড়া ত আর কিছু বলা যায় না।"

হিমাদ্রি মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার মত জ্ঞানী ও বিবেচক লোক খেয়ালের বশে এ রকম একটা কায হঠাৎ করবে, এ কথাও আমাকে বিশ্বাস করতে বল? তুমি থাকলে মনে হয়, এমন এক জন কাছেই আছে—যাকে বিপদের সময় ডাকবামাত্র সে এসে হাজির হবে। পুষ্পিতাও তাই ভাবে।"

সরোজ শান্তকণ্ঠে বলিল,"আমি যত দূরেই যাই না কেন, পুষ্পিতা ও তুমি দু'জনেই এ বিশ্বাসটা আমার উপর রেখো। আমি ভাই ইচ্ছা ক'রে ত এ কাযটা নিই নি। হঠাৎ পেলাম ; কি জানি কি মনে হ'ল—নিয়ে নিলাম। এখন ছাড়াটা আর ভদ্রতা হয় না।"

পুষ্পিতা বলিল,"আচ্ছা, আপনি সকালে অত তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন কেন? এত কাল পরে এলেন—আর অমনি চ'লে গেলেন। আমার সত্যিই আপনার উপর রাগ হয়েছিল।"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "সকালে আমিও রাগ সামলাতে পারি নি। নরেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

হিমাদ্রি বলিয়া উঠিল, "বল কি ? বেশ—তার পর কি হলো ? একটা কাণ্ড ক'রে আস নি ত?"

সরোজ হাসিয়া বলিল,"না, কোন কাণ্ড করবার ক্ষমতাই হ'ল না, বরং একটা শিক্ষা পেয়ে এলাম।"

হিমাদ্রি সবিস্ময়ে বলিল, "শিক্ষা আবার কি পেলে—কার কাছে?"

সরোজ বলিল, "এখান থেকে বেরিয়েই একগাছা বেত কিনে বরাবর নরেনদের বাড়ী গেলাম। ডেকে দুয়ারও খোলালাম। কিন্তু তার পর আর এগুতে পারলাম না। নরেনের কোন চিহ্ন পাবার আগেই তার মায়ের মূর্ত্তি চোখে দেখলাম। জানালা থেকে তার স্ত্রীর ম্লান দৃষ্টি চোখে পড়ল। নরেনকে শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প অনেকটা শিথিল হয়ে গেল। তার পর তার মা বললেন, 'নরেন না হয় দোষ করেছে—কিন্তু আমরা ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নি। আমাদের বিনা অপরাধে কেন শাস্তি দেবে, বাবা?' এর পরে পা আর উঠল না। ধীরে ধীরে চ'লে এলাম। শাস্তির অপর দিক্‌টা এমন উজ্জ্বলভাবে এর আগে কখন চোখে পড়ে নি।"

হিমাদ্রিরও মনে হইল, কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মতই বটে।

ইহার পরে আবার পুরানো দিনের মত কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। সরোজের অনুরোধে পুষ্পিতাকে গান গাহিতে হইল। সরোজকেও চা ও খাবার খাইতে হইল। তার পরে তিন জনে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইল এবং ফিরিবার পথে—সরোজকে মেসের দুয়ারে দিয়া আসিল।

শনিবার শীঘ্রই আসিল। সন্ধ্যার ট্রেণে সরোজের রওনা হইবার কথা। জিনিষপত্র আগেই রওনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া সরোজ সকালবেলাই পুষ্পিতাদের বাড়ী আসিয়া পৌছিল।

হিমাদ্রি সে দিন আর একটুও রাগ দেখাইতে পারিল না। পুষ্পিতা এ কয় দিনে সে রাত্রির অপমানের স্মৃতি হইতে প্রায় উদ্ধার পাইয়াছিল। তাহার মুখের পরিচিত শান্ত হাসিটিও ফিরিয়া আসিত—যদি না সে দিন সরোজের বিদায়ের দিন হইত।

পুষ্পিতা আজ নিজ হাতে সরোজকে চা করিয়া দিল, রাঁধিয়া খাওয়াইল। সরোজ অনুযোগ করিল। এ সব করার অপেক্ষা বসিয়া একটু গল্পগুজব করিলে ভাল হইত।

পুষ্পিতা বলিল, "গল্প ক'রে ত অনেক দেখলাম—আপনাকে ত রাখতে পারা গেল না। তখন আর বৃথা গল্পে কি হবে?"

হিমাদ্রি বলিল, "পুষ্পিতা ভেবেছে, ভাল ক'রে পেট ভ'রে খাইয়ে তোমাকে জয় করাই সুবিধে।"

সরোজ বলিল, "অর্থাৎ আমি পেটুক?"

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল, "না হয় ঔদরিক বল, পোষাকে সব দেখি ঢেকে যায়।"

এইরূপ রহস্যালাপে বিদায়ের সময় আসিল। সরোজকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবার জন্য উভয়ে তাহার সঙ্গে চলিল।

ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলে জনস্রোত দেখিয়া হিমাদ্রির একবার মনে হইল, মানুষে যেমন বনে আসিয়া আপনার লোককে বনেই ছাড়িয়া দিয়া যায়, সেও যেন তেমনই সরোজকে জনারণ্যে হারাইবার জন্য আসিয়াছে।

যেটুকু সময় পাওয়া যায়, দুই জনে প্লাটফরমে সরোজের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝে মাঝে দুই একটা কথাও কহিতে লাগিল। সতর্ক করিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেল।

তার পর শেষ ঘণ্টা বাজিল। সরোজ একবার ম্লান হাসি হাসিয়া হিমাদ্রির পানে চাহিল, তার পর অতি স্নিগ্ধ ও মধুর দৃষ্টিতে পুষ্পিতার দিকে চক্ষু মেলিল ও হাত বাড়াইয়া হিমাদ্রির ও পুষ্পিতার প্রসারিত হাত দুইখানি আপনার হাতের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য রাখিল। গাড়ী ছাড়িবামাত্র সরোজ সম্মিলিত হাত দুখানিকে মুক্তি দিল। হিমাদ্রি দেখিল, তখন সরোজের নয়নে সেই অমৃতমধুর হাসি, পুষ্পিতার নয়নযুগলে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত টলটল করিতেছে।

ফিরিবার পথে কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। হিমাদ্রির মনে পড়িতে লাগিল, সরোজের চিরদিনকার স্বার্থশূন্য ব্যবহার। পুষ্পিতার পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখখানি বড় ম্লান; সস্নেহে পুষ্পিতার হাত দুইখানি আপন হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একবার ভাবিল—সরোজ ত পূর্ব্ব হইতেই পুষ্পিতাকে জানিত। সরোজের হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে কি ইহার কোন সম্বন্ধ আছে? তাহা হইলে কি সরোজ পুষ্পিতাকে মনে মনে——

হিমাদ্রিরই মত উদার হিমাদ্রির মনে সরোজের জন্য ব্যথা জাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

প্রত্যাবর্ত্তন

বহু দিন পরে নগর-প্রবাসী ফিরিছে আপন গায়,
আলপথে যেতে তৃণদল যেন প্রণাম করিছে তায়।

চারধারে তার ক্ষেতে ক্ষেতে শোভে লক্ষ্মীর আল্পনা,
সফল করিয়া ফসলে ফসলে চাষীদের কল্পনা।
ঐ দেখা যায় গ্রামখানি তার প্রান্তরটুকু পারে,
আম-নারিকেল-জামগাছে আর ঘেরা সে বাঁশের ঝাড়ে।
হোথা পাখীদের ওঠে কলরব গাছে গাছে দোলে ফল,
দীঘিতে দীঘিতে পদ্মের পাশে ভাসে গো হংসদল।
ফাল্গুনে হোথা ঝরে গো বকুল শরতে শেফালি-রাশি,
বর্ষায় ফোটে কেতকী কদম শীতে কুন্দের হাসি।
হোথা রাতে বাজে ঝিল্লীর বীণা সারাটি পল্লীমাঝে,
বনদেবী-দেহ করে ঝলমল জোনাকী-ভূষণ-সাজে।
কুটীরে কুটীরে হোথা নর-নারী শান্তিতে করে বাস,
সভ্যতা নামে নাহিক কণ্ঠে বিলাসিতা নাগপাশ।
সরল সহজ জীবন-যাপনে নাহিক আড়ম্বর,
খেটে খুঁটে এনে মোটা খেয়ে প'রে খুসীভরা অন্তর।
হোথা প্রান্তরে খেয়াঘাটে বাটে বন-উপবন-মাঝে,
বাল্য-জীবনে কত সে ঘুরেছে সকাল দুপুর সাঁঝে।
সখাদের সনে দল বেঁধে হোথা খুঁজে খুঁজে সারাগাম,
খেয়েছে পাড়িয়া খেজুরের রস নারিকেল আম জাম।
কত মাছ-ধরা নৌকার বাচ্ কত বা বন-ভোজন,
কত লাঠিখেলা 'কপাটী কপাটী' কত না কুস্তী ডন্।
সে দিনের কথা মনে পড়ে আজ, চোখে আসে তার জল,
হৃদে ফোটে সেই ভোলা সখাদের কচিমুখ ঢলঢল।
প্রতি তরুলতা দেখে সে চাহিয়া পরম তৃপ্তিভরে,
গাভীটি দেখিলে হাত সে বুলায় যতনে পিঠের 'পরে।
প্রবেশিতে গ্রামে কপালে তাহার হাওয়া দিল চুম্বন,
মর্ম্মর করি তরু-বীথিকারা জানাল সম্ভাষণ।
নিমেষের মাঝে পথের শ্রান্তি কোথা চ'লে গেল তার,
বহুকাল পরে সন্তান যেন কোলখানি পেল মা'র।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সিরাজ ও ইংরাজ

৩

আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশ

মুর্শিদকুলী খাঁর পর তাঁহার জামাতা সুজা-উদ্দীন মহম্মদ খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। তাঁহার সময়ে বিহার প্রদেশের শাসনভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। কাযেই সুজা-উদ্দীন বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিম হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। বিহার প্রদেশের ভার সুজা-উদ্দীনের হস্তে আসিলে তিনি আলিবর্দ্দী খাঁকে তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। আলিবর্দ্দীর এই নূতন পদপ্রাপ্তির কয়েক দিবস পূর্ব্বে ১৭৩১—৩২ খৃঃ অব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র জৈনউদ্দীন আহম্মদ খাঁর সহিত বিবাহিতা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগম এক পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিরাজ-উদ্দৌলা। আলিবর্দ্দীর কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় তিনি এই দৌহিত্রটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিজের নিকটে রাখিয়া লালন-পালন ও শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও করেন। সিরাজের জন্মের পরই আলিবর্দ্দী বিহার-শাসনের ভার প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার জন্ম শুভলক্ষণযুক্ত মনে করিয়া তিনি সিরাজকে যার-পর-নাই স্নেহ করিতেন। সে যাহা হউক, এই সময় হইতে আমরা সিরাজ-উদ্দৌলার পরিচয় পাইতে আরম্ভ করি।

মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার রাজস্বের যে নূতন বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুজা-উদ্দীন তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলেন। মুর্শিদকুলীর সময়ে বন্দী অনেক জমীদারকে মুক্তি প্রদান করিয়া তিনি অনেকের রাজস্ব হ্রাস করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য দিকে আয় বাড়াইয়া মোটের উপর বঙ্গরাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার জমীদারী বন্দোবস্তের মধ্যে ইংরাজ কোম্পানীর কলিকাতা জমীদারীও অন্যতম ছিল। ইংরাজরা আপনাদের জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, কলিকাতাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ উদ্যমে বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন, তাঁহারা আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই, তাঁহাদের পূর্ব্ব-স্বভাব সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে ইংরাজদিগের রেশম-পরিপূর্ণ একখানি নৌকা হুগলীর ফৌজদার আটক করিলে, কলিকাতা হইতে এক দল সৈন্য প্রেরিত হইয়া ফৌজদারকে ভয় দেখাইয়া রেশম ও অন্যান্য দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। ইংরাজদিগের এইরূপ ঔদ্ধত্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নবাব সুজা-উদ্দীন আদেশ প্রদান করেন যে, কলিকাতা ও তাহার অধীনস্থ অন্যান্য কুঠীতে কেহ শস্য প্রদান করিতে পারিবে না। ইহাতে ইংরাজদের অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায় তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান ও আপনাদের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নবাবের ক্রোধশান্তি করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুযোগ পাইলেই ইংরাজরা আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশে ত্রুটি করিতেন না। ইংরাজ কোম্পানী অবাধ-বাণিজ্যের আদেশ পাইলেও তাঁহারা কিন্তু বিশেষরূপ লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে সময়ে ওলন্দাজ কোম্পানী শতকরা ২৫ টাকা লাভ করিতেন, সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর ৮ টাকার অধিক লাভ হইত না। ইহার কারণ, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা গুপ্ত ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া নিজেরাই লাভবান্ হইতেছিলেন, কাযেই কোম্পানীর ক্ষতি হইতেছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তিন শত টাকার অধিক বেতন পাইতেন না, কিন্তু তাঁহারা ষড়শ্বযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া ও ভোজনকালে সঙ্গীত-সুধায় কর্ণ শীতল করিয়া আড়ম্বরপ্রিয়তার পরিচয় দিতেন। ফরাসী বণিক্‌রা কিন্তু সতর্কতার সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ডিউপ্লে বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারই পরামর্শে সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইত।

ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিক্‌গণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া রাখিতে মনস্থ করেন। ইহার মধ্যে ইংরাজ ও ওলন্দাজরাই আবার প্রধান ছিলেন। এই সময়ে অষ্টেণ্ড কোম্পানী নামে একটি জর্ম্মাণ বণিক্-সম্প্রদায় এ দেশে বাণিজ্যের জন্য উপস্থিত হইয়া কলিকাতার উত্তরে বাঁকিবাজারে কুঠী স্থাপন করেন। জর্ম্মাণ কোম্পানীর বাণিজ্যে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী তিন

জাতিরই আপত্তি ছিল, কিন্তু ইংরাজ ও ওলন্দাজগণ ইহাতে বিশেষরূপ বিরক্ত হন। তাঁহারা হুগলীর ফৌজদারকে হস্তগত করিয়া তাঁহার দ্বারা নবাবকে জর্ম্মাণ বণিক্‌দের বিরুদ্ধে লিখিয়া পাঠাইয়া বাঁকিবাজার ধ্বংস করিয়া অষ্টেণ্ড কোম্পানীকে এ দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। এইরূপে ইংরাজ ও ওলন্দাজগণ এ দেশের বাণিজ্যব্যাপারে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকেন।

সুজা উদ্দীনের পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব হন। তিনি কিন্তু অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরা ষড়যন্ত্র করিয়া বিহার হইতে আলিবর্দ্দী খাঁকে আহ্বান করিয়া আনেন। আলিবর্দ্দী সরফরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করিয়া লন। কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ শান্তিতে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই, তাঁহার সময়ে বর্গীর হাঙ্গামা ও আফগান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই বর্গী বা মহারাষ্ট্রীয়রা নাগপুরের ভোঁসলাদের প্রেরিত এক বিপুল বাহিনী। সে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়রা ভারতে আপনাদের প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্য এক এক প্রদেশে রাজস্বের চতুর্থ ভাগ বা চৌথ আদায়ের জন্য ধাবিত হইত, বঙ্গদেশেও তাহারা সেই উদ্দেশ্যেই উপস্থিত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাদিগকে রীতিমত বাধা দিবার চেষ্টা করেন। তাহারা গ্রাম-নগর লুণ্ঠন, গৃহ-গোলা-গঞ্জ ভস্মীভূত এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উপর যার-পর-নাই অত্যাচার করিয়া পশ্চিম-বঙ্গকে একরূপ উজাড় করিয়া তুলে। আলিবর্দ্দী খাঁ শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন, তিনি তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালার চৌথের জন্য ১২ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হন। সেই সময়ে আবার তাঁহার আফগান সেনাপতিগণ বিদ্রোহী হইয়া বিহার প্রদেশে অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহারা বিহারের শাসনকর্ত্তা সিরাজের পিতা জৈনউদ্দীন আহম্মদকে নিহত করে। আলিবর্দ্দী সে বিদ্রোহ দমন করিয়া সিরাজের নামে বিহারের শাসনভারের ব্যবস্থা করিয়া রাজা জানকীরাম নামে তাঁহার এক প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করেন। এইরূপে সিরাজ ক্রমে ক্রমে রাজ্যশাসনের সহিত পরিচিত হইতে থাকেন।

বর্গীর হাঙ্গামায় দেশের জমীদার, প্রজা, বণিক্, ব্যবসায়ী সকলেরই যার-পর-নাই ক্ষতি হয় এবং বর্গীদের ভয়ে সকলেই সন্ত্রাসিত হইয়া উঠে। ইংরাজরা নবাবের অনুমতি লইয়া কলিকাতা দুর্গ সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করেন। ফরাসীদিগের সহিত বিবাদের ফলে কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ কলিকাতা দুর্গকে আরও সুদৃঢ় করিতে বলেন। নবাব বাধা দিলে এ দেশে বাণিজ্য বন্ধ ও ইংলণ্ডাধিপের সাহায্যেরও ভয় প্রদর্শন করিবার কথাও থাকে। এই সময়ে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে তোপ ও গোলন্দাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীরা বর্গীর হাঙ্গামায় ভীত হইয়া সরকারের অনুমতি লইয়া কলিকাতার পূর্ব্বদিকে সূতানটী হইতে গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত একটি খাত কাটিতে আরম্ভ করে, অবশ্য ইংরাজদিগেরও ইহা অভিপ্রেত ছিল। কারণ, যেরূপে বা যে কারণে হউক, তাঁহারা কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এই খাত সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই; কারণ, বর্গীর হাঙ্গামা তৎপূর্ব্বে নিবৃত্ত হওয়ায় তাহার আর প্রয়োজন ঘটে নাই। এই খাতকে মারহাট্টা ডিচ্ বলা হইত। তাহা পূর্ণ করিয়া এক্ষণে সারকুলার রোড় হইয়াছে। ইংরাজরা নবাবের আদেশে কাশীমবাজার কুঠীও সুরক্ষিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বর্গীর হাঙ্গামার সময় ইংরাজরা কতকটা শান্তভাবে অবস্থিতি করিলেও সুযোগ পাইলে তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৭৪৮ খৃঃঅব্দের শেষ ভাগে হুগলীর মোগল ও আর্ম্মেনীয়দিগের কয়েকখানি পণ্যদ্রব্য-পূর্ণ জাহাজ ইংরাজরা ধৃত ও লুণ্ঠন করেন। উক্ত জাহাজগুলির অধিকারিগণ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট সে বিষয়ে অভিযোগ করিলে, নবাব ইংরাজদিগের প্রধান কর্ম্মচারীকে লিখিয়া পাঠান যে, হুগলীর সৈয়দ, মোগল, আর্ম্মানী প্রভৃতি বণিক্‌গণ অভিযোগ করিতেছে যে, তোমরা তাহাদের বহুলক্ষ টাকার দ্রব্য ও অর্থপরিপূর্ণ কয়েকখানি জাহাজ আটক ও লুণ্ঠন করিয়াছ। সংবাদ পাইলাম, তোমরা সেগুলি ফরাসীদের বলিয়া ছলে লুণ্ঠন করিয়াছ। আণ্টনী নামে এক জন মহাজন বহুলক্ষ টাকার দ্রব্যসম্ভার সহ আমার জন্য প্রেরিত কতকগুলি মূল্যবান্ উপঢৌকন লইয়া যে জাহাজে আসিতেছিলেন, তোমরা সে জাহাজখানিও লুটিয়া লইয়াছ। এই সকল মহাজন রাজ্যের

কল্যাণ-সাধন করিয়া থাকে, তাহাদের এই গুরুতর অভিযোগ উপেক্ষা করা যায় না। তোমাদিগকে দস্যুবৃত্তি করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এই আদেশ পাইবামাত্র তোমরা মহাজনদিগের দ্রব্য তাহাদিগকে এবং আমার উপঢৌকন-সমূহ আমাকে প্রত্যর্পণ করিবে। অন্যথায় তোমাদের প্রতি উপযুক্তরূপ শাস্তিবিধান করা যাইবে। * কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী লিখিয়া পাঠাইলেন যে, রাজার জাহাজের লোকরা ঐ সকল দ্রব্য অধিকার করিয়াছে। তাহার উপর আমাদের কোনই হাত নাই। আর ফরাসীরাই আর্ম্মেনীয়দিগের জাহাজ ধৃত করিয়াছে। এ উত্তরে অবশ্য নবাব সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি কাশীমবাজার কুঠী অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন, ঢাকা প্রভৃতি স্থানেরও কার্য্য বন্ধের হুকুম বাহির হইল। ইংরাজরা আর্ম্মেনীয়দিগকে বশীভূত করিয়া একটা মিটমাটের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাদের সঙ্গে সম্মত হইল না, অগত্যা ইংরাজরা জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা নবাব দরবারে ১২ লক্ষ টাকা দণ্ড দিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। †

*"The Syads, Moghuls, Armenians, etc., merchants of Houghly have complained that lakhs of Goods and Treasure with their ships you have seized and plundered, and I am informed from Foreign parts that ships bound to Houghly you seized on under pretence of their belonging to the French. The ship belonging to Antony with lakhs on Board from Mochei, and several curiosities sent me by the Sheriff of that place on that ship you have also seized and plundered. These merchants are the kingdom's benefactors, their Imports and Exports are an advantage to all men, and their complaints are so grievous that I cannot forbear any longer giving ear to them.

As you were not permitted to commit piracies therefore I now write you that on receipt of this you deliver up all the Merchants' Goods, and effects to them as also what appertains unto me, otherwise you may be assured a due chastizement in such manner as you least expect."—[Long's selections from Unpublished Records of Government. Page 17.]

† Long. কেহ কেহ বলেন যে, এই দণ্ডের পরিমাণ ১২ লক্ষ টাকা নহে, ১ লক্ষ ২০ হাজার মাত্র।

ইংরাজরা ঐ টাকা আর্ম্মেনীয়দিগের নিকট হইতে আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া নবাব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মনোযোগ দিয়া দেখিলেন যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ ও তাঁহাদের আশ্রিত কতকগুলি দেশীয় বণিক্, সরকারের মাশুল না দিয়া কোম্পানীর নিশান তুলিয়া বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিতেছে। নবাব তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন। সুজা খাঁর সময়ে জর্ম্মাণরা এ দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও তাহাদের কেহ কেহ এ দেশে অবস্থিতি করিত। তাহাদের সাহায্যে কোন কোন ইংরাজ মুসলমানদের জাহাজাদি লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। নবাব তাহাদিগকে দমন করিবার কথা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে জানাইলে, তাঁহারা উত্তর দেন যে, য়ুরোপীয়দের সহিত বিবাদ করিতে নিষেধ আছে। নবাব তাহার উত্তরে জানান যে, সুজা খাঁর সময় ইংরাজ ও ওলন্দাজে মিলিয়া জার্ম্মাণদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তখন তাঁহারা তাহাদিগকে দমন করিতে সম্মত হন। এইরূপ কতকগুলি সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়াও নবাব ইংরাজদিগের উপর অসন্তুষ্ট হন, তিনি ক্রমে ইংরাজদিগকে ভাল করিয়াই চিনিয়া লইতেছিলেন। তিনি বর্গীর হাঙ্গামার সময় ইংরাজদিগকে লক্ষ্য করেন নাই, তাই এক সময়ে তাঁহার সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ইংরাজদিগকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অধিকার করার জন্য নবাবকে বলিলে, তিনি তাহার কোন উত্তর দেন নাই। তাহার পর মুস্তাফা খাঁ নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে দিয়া আবার নবাবকে অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে গোপনে বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজরা কি করিয়াছে যে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে হইবে? স্থলে যে আগুন জ্বলিয়াছে (অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামা), তাহার উপর যদি সমুদ্রে আগুন লাগিয়া যায় (অর্থাৎ ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধে), তাহা হইলে কে তাহা নির্ব্বাপিত করিবে? অবশ্য নবাব তখন ইংরাজদিগকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করেন নাই এবং তাহাদের কোন গুরুতর দোষও দেখিতে পান নাই। কিন্তু দূরদর্শী সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ইংরাজদিগের দিন দিন ক্ষমতাবৃদ্ধি বিশেষভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ক্রমে যতই ইংরাজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিতেছিলেন। ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে বিজয় লাভ করিলে, ইংরাজদিগের সহিত সিরাজ-উদ্দৌলার বিবাদের সূচনা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের অনেক স্থান য়ুরোপীয়রা অধিকার করিয়া লইবে। *

এইরূপে আলিবর্দ্দী খাঁ যতই য়ুরোপীয়দিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তাহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা বৃদ্ধি হইতেছিল, ইংরাজদিগের বিষয়ে সে আশঙ্কা কিছু অধিক পরিমাণেই হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামার অবসানের পর নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ্দৌলাকে রাজ্য-পরিদর্শনের জন্য হুগলীতে পাঠাইলে, যদিও ফরাসী ও ওলন্দাজগণের সিরাজকে উপঢৌকন প্রদানের ন্যায় ইংরাজরাও বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার উপহার প্রদান করিয়া সিরাজকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং নবাবও তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজদিগকে তাহা জানাইয়াছিলেন ; তথাপি আলিবর্দ্দী খাঁ ক্রমে ক্রমে ইংরাজদিগের সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি ক্রমে পীড়িত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের মসনদ লইয়া তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে বিবাদ ও ষড়যন্ত্রের সূচনা হইল। নবাব অবশ্য সিরাজ-উদ্দৌলাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। এ দিকে তাঁহার মধ্যম কন্যার পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব সকৎজঙ্গ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। আর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসিটি বেগমও তাঁহার পালিত পুত্র সিরাজের ভ্রাতা একরামউদ্দৌলার শিশুপুত্রকে মসনদে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী নওয়াজেস মহম্মদের সহকারী ঢাকার রাজা রাজবল্লভ ঘসিটির সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় থাকায়, তাঁহারা ইংরাজদের নিকট হইতে সাহায্যলাভের আশা করিতেছিলেন বলিয়া সিরাজ-উদ্দৌলার ধারণা হইল। বিশেষতঃ বিবাদের আশঙ্কায় রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ সমস্ত সম্পত্তি লইয়া তীর্থযাত্রার ছলে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করায় এ ধারণাটা আরও বলবতী হইয়া উঠে। আবার সেই সময়ে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধের ছলে ইংরাজরা কলিকাতা দুর্গের সংস্কার করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবশ্য এ সকল ব্যাপার যে আপত্তিকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। সিরাজ এ সকলের জন্য ইংরাজদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি নবাবকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন। সে সময়ে কাশীমবাজার কুঠীর ডাক্তার ফোর্থ সাহেব নবাবের নিকট উপস্থিত ছিলেন। নবাব তাঁহাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্য অস্বীকার করেন এবং ইহা তাঁহাদের শত্রুপক্ষের রটনা বলিয়া জানাইয়া দেন। নবাব কিন্তু কাশীমবাজারে কত সৈন্য আছে, ইংরাজদের যুদ্ধ-জাহাজ কোথায়, তাহারা বাঙ্গালায় আসিবে কি না, তিন মাস পূর্ব্বে গঙ্গায় কতগুলি জাহাজ ছিল, এই যুদ্ধ-জাহাজ সকল ভারতবর্ষে আসিয়াছে কেন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ হইতেছে কি না ইত্যাদি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ফোর্থ সাহেব তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে তখন শান্ত হইতে উপদেশ দেন। সিরাজ-উদ্দৌলা কিন্তু বলেন যে, তিনি ইহা প্রমাণ করিয়া দিবেন। *

নবাব ফোর্থ সাহেবের কথায় সিরাজকে শান্ত হইতে বলিলেন বটে ; কিন্তু তিনি যে সাহেবের সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয় না। কারণ, য়ুরোপীয়দিগের, বিশেষতঃ ইংরাজদিগের সম্বন্ধে আশঙ্কা তাঁহার মন হইতে দূর হয় নাই। যখন তাঁহার শেষ সময় নিকট হইয়া আসিল, তখন তিনি সিরাজকে ডাকিয়া তাঁহার মনের কথা সিরাজের নিকট প্রকাশ করিলেন। তিনি সিরাজকে বলিলেন,—"আমার সমস্ত জীবন যুদ্ধে ও কৌশলে অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু এ যুদ্ধ কাহার জন্য করিলাম, কি জন্যই বা এ সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করিলাম? তোমাকে নিরাপদ করিবার জন্যই ত এ সকল করিয়াছি। আমার অভাবে তোমার কি ঘটিবে, তাহা ভাবিয়া কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছি। আমি

* "He feared that after his death the Europeans would become masters of many parts of Hindoostan."—Stewart and Mutuqherin.

*Orme.

এ জগৎ হইতে বিদায় লইলে কে কে তোমার বিপদ ঘটাইবার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখিয়াছি। হোসেনকুলী খাঁর খ্যাতি, বিচক্ষণতা, সাহস এবং শাআমৎজঙ্গের (নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ) ও তাহার পরিবারবর্গের প্রতি অনুরাগ তোমার রাজ্যশাসনের পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইত বলিয়া আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম। এখন আর তাহার কোনই ক্ষমতা নাই। (অর্থাৎ সে এখন মৃত)। দেওয়ান মাণিকচাঁদের মন্ত্রণা তোমার শত্রুতা-সাধন করিতে পারিত বলিয়া আমি তাহাকে অনুগ্রহ-প্রদর্শনে সন্তুষ্ট রাখিয়াছি। য়ুরোপীয় জাতি সকলের দিন দিন যেরূপ ক্ষমতা-বৃদ্ধি হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে। ঈশ্বর আমার জীবন আরও দীর্ঘ করিলে, আমি তোমাকে এই আশঙ্কা হইতেও মুক্ত করিতাম। এ কার্য্য এখন তোমাকেই সাধন করিতে হইবে। ইহারা তেলেঙ্গা প্রদেশে যেরূপ যুদ্ধ ও কূট নীতির পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে তোমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। তাহাদের রাজাদের মধ্যে বিবাদের ছলে তাহারা ঐ দেশ অধিকার করিয়া বিভাগ করিয়া লইয়াছে এবং প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। কিন্তু সকল য়ুরোপীয়কে একসঙ্গে দমনের চেষ্টা করিও না। ইংরাজদিগের ক্ষমতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি তাহারা আংগ্রিয়াকে পরাভূত করিয়া তাহার দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে ইংরাজদিগকেই দমন করিবে, তাহা হইলে অন্য য়ুরোপীয়রা তোমাকে উত্ত্যক্ত করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে দুর্গ গঠন বা সৈন্য রক্ষা করিতে দিবে না। যদি দাও, তাহা হইলে দেশ তোমার থাকিবে না। *

"My life has been a life of war and stratagem: For what have I fought, for what have my councils tended, but to secure you, my Son, a quiet succession to my Subahdary? My tears for you have for many days robbed me of sleep. I perceived who had power to give you trouble after I am gone hence. Hossain Cooley Cawn, by his reputation, wisdom, courage, and affection to Shaw Amet Jung, and his house, I feared would obsruct your government. His power is no more. Moni Chund Dewn, whose councils might have been your dangerous enemy, I have taken into favour. Keep in view the power the European nations have in the country. This fear I would have also freed you from, if God had lengthened my days.—The work, my Son, must now be yours. Theirs wars and politics in the Telinga country should keep you waking. On pretence of private contests between their kings, they have seized and divided the country of the king, and the goods of his people between them: Think not to weaken all three together. The power of the English is great; they have lately conquered Angria, and possessed themselves of his country; reduce them first; the others will give you little trouble, when you have reduced them. Suffer them not, my Son, to have fortifications or soldiers: If you do, the country is not yours."—[Holwel's "India Tracts"—To the Honourable the Court of Directors for Affairs of the Honourable the Company of Merchants of England, trading to the East Indies.—Fulta 30th Nov. 1756. pp. 267-333 at p. 287.]

আলিবর্দ্দীর এই অন্তিম উপদেশ যে সিরাজ-উদ্দৌলাকে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহাই মনে হইয়া থাকে। যদিও

এই উপদেশ আবার কোন কোন স্থানে পল্লবিত আকারেও প্রকাশিত হইয়াছে :—

"My son, the power of the English is great; reduce them first; when that is done, the other European nations will give you little trouble. Suffer them not to have factories or soldiers; if you do, the country is not yours. I would have freed you from their task if God had lengthened out my days.—The work my son, must now be yours. Reduce the English first; if I read their designs aright, your dominions will be most in danger from them. They have lately conquered Angria, and possessed themselves of his country and his riches. They mean to do the same thing to you: they make not war among us for justice, but for money. It is their object; all the Europeans come here to enrich themselves; and, on pretence of private contests between their kings, they have seized the country of the king, and divided the goods of his people between them. Love of dominion, and gold, hath laid fast hold of the souls of the Christians, and their actions have proclaimed over all the East, now little they regard the express precepts they have received from God. They believe not that life and immortality which is brought to light by their revelation. They act in defiance of the good principles they would pretend to believe. My son, reduce

অনেকে এই উপদেশ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সিরাজকে খামখেয়ালির বশে ইংরাজদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে, সিরাজ-ইংরাজে সঙ্ঘর্ষ যে এক দিনে ঘটে নাই, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ইংরাজরা এ দেশে প্রভুত্ব-স্থাপনের জন্য পূর্ব্বাপর যেরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা আমরা বিশেষভাবেই দেখাইয়াছি। মোগল কর্ম্মচারী, নবাব বা বাদশাহকেও পর্য্যন্ত তাঁহারা যে গ্রাহ্য করিতে সম্মত ছিলেন না, তাহা তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। এহেন ইংরাজ যে সিরাজ-উদ্দৌলাকে ভয় করিয়া চলিবেন, ইহা কখনও মনে করা যায় না। আর সিরাজও যে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে হইবে। আলিবর্দ্দী খাঁ এক জন দূরদর্শী নবাব ছিলেন। মোগল সরকারের সহিত ইংরাজদিগের পূর্ব্বাপর ব্যবহার তাঁহার অবশ্য অবগত থাকা সম্ভব এবং তিনি নিজেও তাঁহাদের ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় তিনি যদিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু তাহার পর তিনি যে ইংরাজদিগের ব্যবহার বিশেষরূপেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ থাকিতে পারে না। য়ুরোপীয়রা যে এ দেশ ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া লইবে, এরূপ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূলই হইয়াছিল। তিনি কেবল এই অন্তিম উপদেশে নহে, আরও কোন কোন সময়ে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফরাসীদিগের দাক্ষিণাত্য-যুদ্ধে জয়লাভে তিনি সে কথা ব্যক্ত করেন। ডাক্তার ফোর্থ সাহেবের সহিত কথোপকথন হইতে তিনি যে ইংরাজদের প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যদিও তিনি সে সময়ে সিরাজ-উদ্দৌলাকে শান্ত হইতে বলিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির পরিচয়, ইহাই বলিতে হয়। কারণ, সিরাজের প্রতি অন্তিম উপদেশে তিনি তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই অন্তিম উপদেশই যে সিরাজের উপর বিশেষরূপে কার্য্য করিয়াছিল, তাহা সিরাজের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ হইতে সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। আমরা আগামীবারে সিরাজ-ইংরাজ-সঙ্ঘর্ষের শেষ কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহারের চেষ্টা করিব। [ক্রমশঃ।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

the English to the condition of slaves, and suffer them not to have factories or soldiers; if you do, the country will be theirs, not yours. They who, we see, are every day using all their policy, and their power, against what they themselves say is the law of the most high, are only to be restrained by force." [An Enquiry into our National conduct to other countries.]

মিলনে

কি কথা কহিব, কি কথা কহিবে,
ফুরাইয়ে যাবে রজনী;
না মিটিতে প্রিয় প্রাণের তিয়াষা
ভাসাইতে হবে তরণী।

চাহি নাক' এই ক্ষণিকের স্বাদ,
ঘনায়ে উঠিবে এখনি বিষাদ;
মিলনের আগে বিরহেরি সুর
ধ্বনিয়া উঠিবে এখনি।

যে মিলন জাগে তারায় তারায়,
অসীম কালের জীবন-ধারায়;
সে মিলনে দোঁহে জাগিব হে প্রিয়
বেদনা টুটিবে তখনি।

এ যে মরীচিকা এ ত' নহে সুখ,
শুধু বেছে নেওয়া প্রাণ-ভরা দুখ;
এ বিরহ পারে লভিব তোমারে
চরণে দলিয়া মরণই।

শ্রীকালীপদ ঘোষ।

নীচজাতীয়া

১

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বিপিন ডাক্তার ডাকিলেন—"বড় বৌ!"

ক্ষিপ্রপদে দরজার কাছে গিয়া প্রভাবতী বলিলেন,—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, ঢুকো না—আগে মাথায় ছিটে দিয়ে দিই।"

দরজার পাশের কুলুঙ্গীতে একটি গঙ্গাজলের ঘট ছিল। প্রভাবতী সেই দিকে হাত বাড়াইলেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই বিপিন ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন—"একটু গরম দুধ—শীগগির।"

ঐ সময়ে ঐ প্রার্থনার মধ্যে এমন একটু নূতনত্ব ছিল যে, প্রভাবতী বিস্মিত হইয়া স্বামীর দিকে চাহিলেন এবং চমকিত হইয়া বলিলেন—"ও মা, আজ যে এখনও কাপড়-চোপড় ছাড়া হয় নি দেখ ছি। যাও, যাও, ডিস্পেনসারীতে গিয়ে ওগুলো ছেড়ে এসো গে।"

"ও এর পর ছাড়বোখন্" বলিয়া বিপিন ডাক্তার ফের দুধের কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু প্রভাবতী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"আবার তখন কেন, এখনই ছেড়ে এসো—এলে ত ছত্রিশ জাত ঘেঁটে।"

এ কথায় বিশেষ কর্ণপাত না করিয়া বিপিন একটু ব্যস্ততার সঙ্গেই উত্তর করিলেন—"আমি এখন ভিতরে যাচ্ছি না—তুমি শীগ্‌গির—একটু দুধ।"

প্রভাবতী ভ্রূ দুটিকে কুঞ্চিত ও নিকটস্থ করিয়া বলিলেন,—"দুধ! দুধ কি হবে?" তিনি তাঁহার সহজ নারী-প্রতিভায় বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ বস্তু তাঁহার স্বামীর উদরস্থ হইবে না—সুতরাং অপব্যয় সুনিশ্চিত।

যথার্থ কারণ বলা উচিত কি না এবং না বলিলে কি বলা উচিত, বিপিন এইটুকু মনে মনে ঠিক করিয়া লইতেছেন, এমন সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুকূল সেখানে উপস্থিত হইলেন।

বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে অনুকূল বলিয়া উঠিলেন—"না দাদা, তোমার জন্য আমাদের আর জাতজন্ম রইলো না দেখছি। দেখ না বৌদি, কোথাকার কে—একটা মাগী, কি জাত, তার ঠিক নেই—বোধ হয়, ডোম কি চাঁড়াল হবে—তার আবার কি অসুখ, প'ড়ে প'ড়ে কাতরাচ্ছে—তাকে এনে তুলেছেন ডিস্‌পেনসারীতে। অন্ধকারে টের না পেয়ে আমি ত তাকে মাড়িয়েই—"

"ফেলেছ?" প্রভাবতী উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন।

"না, ফেলি নি—কিন্তু আর একটু হলেই ফেলেছিলুম আর কি। উঃ, তা হ'লে কি হ'ত বল দিকিন্।"

"কি আর হতো? এই রাত্রে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে এঁদো পুকুরে ডুব দিয়ে আসতে।"

দেবরের প্রতি এই প্রত্যক্ষ সহানুভূতি এবং স্বামীর প্রতি পরোক্ষ তিরস্কার বর্ষণ করিয়া প্রভাবতী সহসা

বিপিনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তোমায় কি সব ছেড়ে গিয়েছে ?"

তাঁহার অগ্নিবর্ষী কটাক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া জড়সড় বিপিনের আর কিছু ছাড়ুক্ না ছাড়ুক, নাড়ী ছাড়িবার যে খানিকটা উপক্রম হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নির্ব্বাক্ মুখের হতভম্ব ভাব হইতেই বুঝা যাইতেছিল।

প্রভাবতী নিজের মনে বলিয়া চলিলেন—"তাই ত বলি, দুধ চায় কেন ? দুধ দেবে না ছাই দেবে !"

অনুকূল দাদার কার্য্যকলাপের এতই প্রতিকূল ছিলেন যে, প্রজ্বলিত অগ্নিতেও ঘৃতাহুতি না দিয়া পারিলেন না—বলিলেন—"আর মনে কর, বৌদি, মাগী যদি মরেই যায়। ছোট জাতের মড়া ত—এ বাড়ীর আর ভদ্রস্থ আছে ?"

এতক্ষণে বিপিনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি অনুচ্চস্বরে কেবলমাত্র বলিলেন—"মরবে না, অনুকূল, মরবে না।"

একটা ঝাঁকির সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া এবং ঠোঁট দুইটিকে যথাসম্ভব বিকৃত করিয়া প্রভাবতী বলিলেন—"না মরলে ত আরও ভাল। ছোটজাতের ত আর জ্ঞানগম্যি নেই। আজ এটা ছোঁবে, কাল সেটা ধরবে। ছোঁয়া-লেপায় একশেষ হবে। এমন আপদ-বালাই—বিদেয় করো, বিদেয় করো।"

"কি বলছো, বড় বৌ—তোমার কি একটু—" বাক্যকে অসমাপ্ত রাখিয়াই বিপিন চুপ করিলেন।

"কি একটু ? দয়ামায়া নেই ? বলি, দয়া-মায়ার জন্যে কি আচার-বিচের ভাসিয়ে দিতে হবে না কি ? তোমার যদি এতই দয়া-মায়া উপ্‌ছে পড়ে—যাও না, হাঁসপাতালে গিয়ে থাকো গে।"

"হাঁসপাতাল ত বাড়ীতেই করছেন। আজ একটা এনেছেন, কাল আর দুটো আনলেই পারবেন।"

অনুকূলের এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিপিন শুধু গম্ভীরভাবে উপর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখা যাক্।"

উদ্দীপ্ত স্বরে অনুকূল বলিলেন—"ঐ শোনো, বৌদি—দেখা যাক্। তার মানেই আমাদের কথায় ওঁর কিছুই আসে যায় না। উনি যা করবেন, তা করবেনই।"

ক্ষুব্ধ নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রভাবতী এই মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন—"তা আর করবে কি, ঠাকুরপো ? ওঁর জন্যে আমাদের হয় মরতে হবে, না হয় ক্রীশ্চেন হ'তে হবে।"

বিপিন দেখিলেন, তাঁহার উভয়সঙ্কট। এ সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার মত তর্ক-শক্তি ও বাগ্মিতা তাঁহার নাই। সুতরাং তিনি আত্মসমর্থনের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অপরাধীর মতই ডিস্পেনসারীতে ফিরিয়া গেলেন এবং খানিক পরেই হন্ হন্ করিয়া গয়লাপাড়ার দিকে ছুটিলেন।

২

গভীর রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া সুরমা তাঁহার স্বামীকে—জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, তোমরা যে আজ দুজনে মিলে বট্‌ঠাকুরের উপর অত চোটপাট করছিলে—কেন ? তিনি করেছেন কি ? আমার ত মনে হয়, তিনি কোনই দোষ করেন নি।"

অনুকূলের নিদ্রার আমেজ এক মুহূর্ত্তেই ছুটিয়া গেল। তিনি মুখের উপর হইতে সজোরে লেপ টানিয়া নামাইয়া বলিলেন—"না, তা আর করবেন কেন ? তিনি খুব ভাল কায করেছেন। তবে এমন কায আমাদের বংশে কেউ কখনও করে নি।"

অনুকূলের এই হঠাৎ উত্তেজনায় সুরমার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। তাঁহার মনে হইল, যেন অনেকটা বিস্ফোরক এখনও তাঁহার স্বামীর বুকের মধ্যে সঞ্চিত আছে—যাহাতে অগ্নিসংযোগ করাই দরকার—সত্যের জন্য না হউক, অন্ততঃ কৌতুকের জন্যও। তিনি হাসি চাপিয়া গম্ভীরভাবেই বলিলেন—"ওঃ, বংশে কেউ কখনও করে নি ! কিন্তু সেটা কি একটা বড়াই করবার কথা মনে কর ? অনাথা মানুষ মাঠের মধ্যে প'ড়ে শূল-বেদনায় ছট্‌ফট্ করছে—সারাদিন এক ফোঁটা জল পেটে পড়ে নি—সঙ্গের লোকরা পথে ফেলে রেখে তীর্থে চল্‌লো—তাকে ঘরে তুলে এনে একটু দুধ খেতে দেওয়া, কি একটু চিকিচ্ছে করা—এমন কায যদি তোমাদের বংশে কেউ না ক'রে থাকে, তা হ'লে তোমাদের বংশের খুরে খুরে—"

সুরমা তাঁহার যুক্ত কর কপালে ঠেকাইবার পূর্ব্বেই অনুকূল ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন—"চুপ্ কর। এ সব তুমি বুঝবে না। তোমাদের বংশের মেয়ে হয়ে তুমি কি ক'রে বুঝবে যে, ব্রাহ্মণের পবিত্রতাই হচ্ছে সব ?"

"তোমার বোঝাবার গুণে। সেই জন্যই ত ভগবান্ তোমাদের বংশে এনে আমাকে ফেলেছেন। দাও না, একটু

বুঝিয়ে দাও না, পবিত্রতা কাকে বলে।" এই কয়টি কথা বলিয়াই সুরমা আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খোলা হাসির অপেক্ষা চাপা হাসি বেঁধে বেশী। হাতুড়ীর ঘা সহ্য হয়, সূঁচ ফোটানো সহ্য হয় না। অনুকূল যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"পবিত্রতা হচ্ছে পবিত্রতা। তাকে বোঝানো যায় না—অনুভব করতে হয়।"

"বেশ ত। আমি কি আর অনুভব করতে জানি না? আমাকে অনুভব করিয়েই দাও না।"

"অনুভব নিজে নিজে করতে হয়। এই মনে কর, আমি চাঁড়াল—"

"কি সর্ব্বনাশ! এ যে মনে করাও শক্ত।"

"হোক্ শক্ত, তবু মনে কর। আমি চাঁড়াল হয়ে তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম। মনে হচ্ছে কি না যে, তুমি অপবিত্র হয়ে গেলে?"

"কৈ, একটুও ত হচ্ছে না। তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ—তোমার দিব্যি পরিষ্কার হাত।"

"আঃ, হাত পরিষ্কার হ'লে কি হয়, জাত ত আর পরিষ্কার নয়। যার জাতই নোংরা, সে ছুঁলে শরীর অপবিত্র হবে না?"

"আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, কোন জাতই নোংরা নয়, যদি না নোংরা থাকে—নোংরা কায করে। আর ধরলুম, কোন কোন জাত এমনিই নোংরা—তা ব'লে সে জাতের লোক ছুঁলেই আমি অপবিত্র হয়ে যাব? পবিত্রতা হচ্ছে ভিতরের জিনিষ। বাইরের ছোঁয়াতে তার কি হয়? আর শরীরই বা অপবিত্র হবে কেন? যা অপবিত্র হয়, সে মন। মন পবিত্র থাক্‌লে কখনও শরীর অপবিত্র হ'তে পারে?"

"পারে, পারে। পবিত্রতা যে কি, তা বুঝতে অর্থাৎ অনুভব করতে তোমার এখনও ঢের দেরী আছে।"

"কিছু দেরী নেই। আমি বুঝছি অর্থাৎ অনুভব করছি যে, তোমাদের পবিত্রতার এক নাম হচ্ছে শুচিবাই, আর—আর এক এক নাম হচ্ছে অহঙ্কার।"

অনুকূল দেখিলেন, তাঁহার অশিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে কেবল যুক্তি দিয়া তর্ক করা তাঁহার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। তাই সাপে তাড়া করিলে মানুষ যেমন সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরিয়া ছোটে, তেমনই তিনিও শাস্ত্রের বক্রপথ অবলম্বন করিলেন; কেন না, তিনি জানিতেন যে, সে পথে চলিতে শুধু সুরমা কেন, হিন্দু নারী-মাত্রেই অনভ্যস্ত। তিনি বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—"এ সব শাস্ত্রীয় কথা, এতে তোমাদের অধিকারই নেই। গীতায় স্পষ্টই বলেছে—নীচ বর্ণের সংস্রবে উচ্চ বর্ণকে পতিত হ'তে হয়। সেই পতন হতেই বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি এবং 'বর্ণদোষাৎ প্রণশ্যতি'।"

ভাষায় দুর্ব্বোধ্যতা সত্ত্বেও সুরমা তাঁহার স্বামীর কথার অর্থ অনেকটা আন্দাজে বুঝিয়া লইলেন। নারীর স্বভাব-পটুত্ব যাবে কোথায়? তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ত বিয়ের কথা বল্‌ছো। আমি কি বল্‌ছি, তুমি চাঁড়ালের মেয়ে বিয়ে কর?"

অনুকূলের চোখ দুইটি অবাক্ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, সাপ বাঁকা পথেও চলিতে পারে। আর কেনই বা না পারিবে? সে যে সোজা পথেই আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। যাহা হউক, তিনি বাঁকা পথ ছাড়িয়া আর সোজা পথ ধরিলেন না; কেন না, হাজার হউক, সে পথ তাঁহার যতটা চেনা, সুরমার ততটা নয়। তিনি যেমন করিয়াই হউক, সুরমার চোখে ধূলা দিয়াও তাহাকে কাহিল করিতে পারিবেন। তিনি রূঢ় ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "সংস্রব মানে শুধু বিয়ে নয়। যোগ-দর্শনে বলেছে, মনন, শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন সবই সংস্রবের মধ্যে। ছোট জাতকে ছোঁয়া দূরে থাক্, দেখতেও নেই।"

সুরমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তার পর বেশ তেজের সঙ্গেই উত্তর করিলেন, "ঐ যদি তোমাদের শাস্ত্র হয়, ও শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেল। যে শাস্ত্র মনে না লাগে, তা মিথ্যে।"

কোন দুর্দ্ধর্ষ নাস্তিকই এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের এমন সদ্‌গতির ব্যবস্থা দেন নাই, অন্ততঃ এতটা খোলাখুলি ভাবের চাঁচা-ছোলা ভাষায়। অনুকূলের জিভের ডগা পর্য্যন্ত একটা অত্যন্ত কঠোর কথা আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি বলিতে যাইতে-ছিলেন যে, সেই মুখই পোড়ানোর যোগ্য—যা শাস্ত্রকে পোড়াতে বলে। কিন্তু তাহা পারিলেন না। সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কথাটাকে গিলিয়া ফেলিতে বাধ্য

হইলেন। সে মুখ দিয়া একটা অদ্ভুত জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল তাঁহার মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া দিল, এই রকম জ্যোতিই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মুখে জ্বলতো।"

নিজের ক্ষণিক দুর্ব্বলতাকে সাহসের সঙ্গে জয় করিয়া লইয়া অনুকূল বিছানার উপর খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"তুমি কি শাস্ত্র ওল্‌টাতে চাও না কি? এ সব কি আজকের তৈরী—না তোমার আমার মত লোক তৈরী করেছিলেন? জাতিভেদ চিরদিনই ছিল এবং থাকবেও, নৈলে ভৃগু হাজার বছর আগে লিখে যেতে পারতেন না, 'বিপ্রবংশে ভবেৎ বালো বর্ণো গোধূমচূর্ণবৎ'।"

ঈষৎ হাসিয়া সুরমা উত্তর করিলেন, "আমি কি তাই বলছি? জাতিভেদ থাক না, কিন্তু এত ঘেন্না কেন? ব্রাহ্মণ বলেই যে বামনাই ফলাতে হবে, শূদ্দুরের গলায় পা তুলে দিতে হবে, এ কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখে?"

কথার পৃষ্ঠে কথা খুঁজিয়া না পাইয়া অনুকূল তাঁহার চিন্তার অবসরকে বাড়াইয়া লইবার জন্য বলিলেন, "তার মানে?"

"তার মানে জাতিভেদ গাছপালার মধ্যেও আছে। কিন্তু আমগাছ কি সেওড়াগাছকে দেখে ডাল কোঁচকায়, যেমন তোমরা ছোট জাতকে দেখে নাক সেঁটকাও? আলাদা জাত মানেই নীচু জাত নয়- ভগবান্ উঁচু নীচু ক'রে মানুষ গড়েন নি।"

"আঃ, কি মুস্কিল! সবতাতেই ভগবান্ তোল কেন? মানুষ কর্ম্মফলেই উঁচু নীচু হয়, আর হয়েছেও তাই।"

"সে যখন হয়েছে, তখন হয়েছে, এখন ত জন্মফলেই হয়। আর ধরলুম, কর্ম্মফলেই হ'ল, কিন্তু বই পড়া আর হাঁড়ি গড়ার মধ্যে এমন কি তফাৎ যে, যে বই পড়ে, সে তাকে ছুঁলেই নাইবে? অথচ এক দিন না উনুনে হাঁড়ি চড়লে যে বই-পত্তর সব শিকেয় ওঠে। আর ধরলুম, যে বই পড়ে, সে আকাশের ঠাকুর, যে হাঁড়ি গড়ে, সে মাটীর কুকুর—তা কুকুরও ত শুনেছি কোন্ ঠাকুরের কোলে ব'সে থাকে। বল না কোন্ ঠাকুরের, তোমরা ত শাস্তর জানো।"

অনুকূলের ঠোঁট থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি উগ্র অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "থাক্ থাক্—যত অনৈরণ কথা—সাধে আর বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

একটু হাসিয়া সুরমা বলিলেন,—"প্রলয় কর তোমরাই, সৃষ্টি করি আমরা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রাম গুহক চণ্ডালকে কোল দেন নি, কৃষ্ণ শ্রীদাম-সুদামের উচ্ছিষ্ট খান নি?"

"আরে, রাম-কৃষ্ণের কথা আলাদা, তাঁরা দেবতা, তাঁদের কায কখনও আমাদের সাজে? আমি যদি গুহক চণ্ডালকে কোল দিতুম, আমাকে একশো ডুব দিয়ে নাইতে হতো, আমি যদি শ্রীদাম-সুদামের উচ্ছিষ্ট খেতুম, আমাকে এক মাস গোবর-জলে ভাত সিদ্ধ ক'রে খেতে হতো।"

এ কথায় সুরমা আর কোন উত্তর না দিয়া শুধু ফিক্‌-ফিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনুকূল যার-পর-নাই উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাসছো কি? তুমি একটা অনাচারিণী, একটা নাস্তিকী। আমার স্ত্রী হয়ে তুমি কি না জাত মান্‌তে চাও না! তোমার সঙ্গে দাদার, আর বৌদির সঙ্গে আমার বিয়ে হলেই ঠিক হতো।"

সুরমার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তিনি জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন, "ছি ছি, আমার ঘাট হয়েছে। আমি যদি আর কখনও তোমাকে ঘাঁটাই।"

"হুঁ হুঁ—পথে এসো। বুঝেছ যে, তর্ক ক'রে পারবে না। শাস্ত্রের তর্ক আমার সঙ্গে!"

অনুকূলের মুখ বেশ একটা বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সুরমা আর সে মুখে কালিমাসঞ্চার করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

৩

বিপিন বাবুর সংসারে সব শুদ্ধ পাঁচটি লোক। তাঁহারা দুই সহোদর, তাঁহাদের দুই স্ত্রী আর অনুকূলের তিনবর্ষীয় পুত্র সুশীল।

বিপিনের পরিচয় পূর্ব্বেই একটু দিয়াছি। তিনি ছিলেন পল্লীগ্রামের ডাক্তার। তবে সহরেও তাঁহার মত দুঃসাহসিক লোক কম দেখা যায়। তিনি কঠিন রোগের সংবাদ পাইলে গভীর রাত্রিতেও ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইতেন এবং গ্রামান্তরে যাইতে হইলেও লণ্ঠনের সাহায্য লইতেন না। কিন্তু তাঁহার অনেক রকম দুঃসাহসের মধ্যে প্রধান দুঃসাহস ছিল এই যে, তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা করিতে গিয়া কাহারও মুখের দিকে চাহিতেন না বা কাহারও কথায়

কর্ণপাত করিতেন না। তিনি কোন কোন রোগীকে নিজে মিছরী, বেদানা কিনিয়া দিতেন, কোন কোন রোগীর হাত-পা পর্য্যন্ত নিজে টিপিয়া দিতেন এবং কোন কোন রোগীর সঙ্গে গুরুতর আত্মীয়তা স্থাপিত করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। অবশ্য ঐ সব রোগী যদি উচ্চপদস্থ বা উচ্চবংশীয় হইত, তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না, কিন্তু বিপিনের সেবা ও সহানুভূতি প্রায়ই ধাবিত হইত দরিদ্র ও নীচজাতীয়ের প্রতি। একবার এক চণ্ডালকন্যাকে মাতৃ-সম্বোধন করায় গ্রামের পণ্ডিতমহলে বড়ই আন্দোলন হইয়াছিল—তাঁহাকে একঘরে করিবার জন্য, কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে উহার অনতিবিলম্বেই প্রভাবতী একটি ব্রত উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সদক্ষিণ ভূরিভোজনে নিমন্ত্রণ করায় তাঁহাদের সে সাধু সংকল্প আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

অনুকূল বিশেষ কোনই কাযকর্ম্ম করিতেন না। কারণ, করিবার সময় তাঁহার অতি অল্প ছিল। নিজের ত্রিসন্ধ্যা ও গৃহদেবতার পূজা লইয়াই তাঁহার সমস্ত দিনটা কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার সময় তিনি গায়ে নামাবলী ও পায়ে খড়ম দিয়া মুখুয্যেদের রোয়াকে বসিয়া পাড়ার মুরুব্বীদের সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের উপর ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া সকলের মনেই এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তিনি এক জন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ এবং তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ ছিল তাঁহার টিকি ও যজ্ঞোপবীত—যাহার একটির দীর্ঘত্ব ও অপরটির শুভ্রত্ব অনেক ভট্টাচার্য্যকেও লজ্জায় অধোবদন করিয়া দিত।

বৈষয়িক কায হিসাবে অনুকূল একটিমাত্র কায করিতেন—যার নাম যাজনক্রিয়া। পিতৃপিতামহের যে কয় ঘর যজমান ছিল, তাহা তিনি সযত্নেই রক্ষা করিতেন এবং বিনিময়ে বৎসরে দুই চারি টাকার কাঁচা পয়সা, দুইচারিখানা গামছা এবং দুইচারি সের কলা, বাতাসা, আলোচাল রোজগার করিয়া তিনি নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেন যে, তাঁহার এবং তাঁহার দাদার মিলিত উপার্জ্জনেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে এবং বোধ হয়, সেই জন্যই নিষ্কর্ম্মার ন্যায়—'দাদার অন্ন ধ্বংস করছি; সুতরাং দাদার উপর চোখ রাঙাবার আমি কে,' এ রকম কোন আত্ম-গ্লানিই কোন দিন তাঁহার সাত্ত্বিক হৃদয়কে স্পর্শ করিত না।

গৃহস্থালীর ছোট বড় সব কাযই সুরমা করিতেন। রান্না-ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া গোয়ালঘর ও বেগুনক্ষেত পর্য্যন্ত সমস্তই ছিল সুরমার কর্ম্মভূমি। প্রভাবতী কোন দিন পরিদর্শক হিসাবেও সুরমাকে সাহায্য করিতে পারিতেন না; কেন না, তাঁহার দেহলতা ছিল অত্যন্ত পেলব এবং স্বাস্থ্যও যৎকিঞ্চিৎ ভঙ্গপ্রবণ। তাহা ছাড়া তিনি জপতপ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অনুরোধে সংসার হইতে অনেকটা আলগোছে থাকিতেই বাধ্য হইতেন।

হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়াও সুরমার মুখে কিছুমাত্র বিরক্তির রেখা দেখা যাইত না। সে মুখখানি সর্ব্বদা হাসিভরাই থাকিত। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ছিল অটুট, যদিও তিনি প্রভাবতীর মত নিঃসন্তান ছিলেন না।

প্রভাবতী যে কোন কায করিতেন না, এ কথা বলিলে তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইবে। সুরমার একমাত্র পুত্র সুশীলকে খাওয়ানো-দাওয়ানো এবং সাজানো-গোজানোর ভারটা প্রভাবতীই লইয়াছিলেন। এ কায তিনি কাহাকেও করিতে দিতেন না; সুরমাকেও নয়—কেন না, তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সুরমা আর যে কাযই জানুক, সন্তানের লালনপালন জানে না। সুশীলের দৌরাত্ম্য বা অসঙ্গত আবদারে বিরক্ত হইয়া সুরমা যখন মা হইয়াও তাহার পিঠে চড় বসাইয়া দেয়, তখন মাতৃত্বের উপযোগী সহ্যগুণ ও মমতা নিশ্চয়ই তাহার হৃদয়ে নাই। এই জন্য যখনই সুশীলের অঙ্গে সুরমার শাসনের হাত পড়িত, তখনই প্রভাবতী সুরমাকে মিঠেকড়া ভাষায় শুনাইয়া দিতেন,—'ছেলে মানুষ করা ছেলেমানুষের কায নয়।' অমনি সুশীলও প্রভাবতীর আঁচলে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিত—'মা নক্ষী—বৌমা দুত্তু।' সে যে তাহার জ্যাঠাইমাকে মা এবং মাকে বৌমা বলিত, তাহার কারণ খুবই স্পষ্ট। ছোট ছেলেরা যাহার কাছে সর্ব্বদা থাকে এবং যাহার কাছে বেশী আদর পায়, তাহাকেই মা বলিয়া ডাকে; আর সুরমা যে বৌমা ভিন্ন কিছুই নয়, তা সে তাহার জ্যোঠামশায়ের মুখেই শুনিয়াছে।

প্রভাবতী যে দিন দিনই সুশীলকে তাহার মায়ের কাছ হইতে ছিনাইয়া নিজের কাছে টানিয়া লইতেছিলেন—এ সত্য অবশ্য সুরমার অবিদিত ছিল না, কিন্তু তিনি তাহাতে

দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আনন্দিত এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি স্পষ্টই এক দিন প্রভাবতীকে বলিয়াছিলেন,—'দিদি, তোমার ত ছেলে-পিলে হ'ল না—তুমিই সুশীলকে নাও—ওকে তোমার হাতেই দিলুম।'

৪

তরঙ্গিণী ওরফে তরী নামক যে নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকটিকে বিপিন বাবু রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন, সে বিপিন বাবুর ধরাবাঁধা চিকিৎসায় এক মাসের মধ্যেই নীরোগ হইয়া উঠিল। সে বিপিন বাবুকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহারই বাড়ীর ছাঁচতলায় সারা জীবনটা কাটাইয়া দিবার সংকল্প করিল; কেন না, ত্রিসংসারে তাহার আপনার বলিবার কেহই ছিল না। কিন্তু এই সংকল্পের বিষয় অবগত হইয়া অনুকূল ও প্রভাবতী যে উত্তাল আপত্তির তরঙ্গ তুলিলেন, তাহা বিপিন বাবুর পাহাড়ের মত নীরব দৃঢ়তাকেও ভাসাইয়া দিত, যদি না সুরমা তাঁহার সকৌশল অনুনয়ের মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করিতেন। তিনি এক দিন প্রভাবতীর পায়ে হাত দিয়া বলিলেন—"আমার মাথা খাও, দিদি, ওকে তাড়িও না। একটা হাত-পা-আলা মানুষ ত—অনেক কাযে লাগবে।"

"কি কাযে লাগবে শুনি? ভাত রাঁধবে, না বাসন মাজবে, না বিছানা পাতবে?"

প্রভাবতীর এই ক্রোধমিশ্রিত ব্যঙ্গ-প্রশ্নে সুরমা নম্র স্বরে উত্তর করিলেন—"কেন, ধান সিদ্ধ করবে, ঢেঁকিতে পাড় দেবে, গরুর জাব কাটবে, বেগুনগাছে জল দেবে।"

চিবুকে আঙ্গুল ঠেকাইয়া প্রভাবতী বলিলেন—"তবেই হয়েছে। তোর আশাও কম নয়। চাঁড়ালের মেয়ে কখনও বামুন-বাড়ীর কায পারে? ধান সিদ্ধ ক'রে পোড়াবে—চাল কুটে খুদ করবে, এমন জাব কাটবে—গরুতে মুখও দেবে না, এমন জল ঢালবে—বেগুনগাছ প'চে মরবে।"

"না দিদি, আমি সঙ্গে সঙ্গে থেকে দেখিয়ে দেব। ওকে দিয়ে ঠিক আমার মত কায না করাতে পারি ত কি বলেছি।"

এইবার সুরমার কথাগুলি প্রভাবতীর মনে একটু দাগ কাটিল। তিনি সুরমাকে যথার্থই ছোট বোনের মত ভালবাসিতেন। সুতরাং তরঙ্গিণী যদি উৎপাত ও অনিষ্টের কারণ না হইয়া সুরমার শ্রম-লাঘব করিতে পারে, তাহাতে তিনি কেন না হৃষ্ট হইবেন? তিনি ঈষৎ প্রসন্ন-মুখে বলিলেন—"বেশ, তা যদি পারিস্, তা হ'লে না হয় থাকুক্। কিন্তু শেষটা যেন বাঁদরকে দিলুম গাঁথতে হার, ছিঁড়ে করলে ছত্রাকার—এই না হয়।"

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া সুরমা চাপা আনন্দের সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলিলেন—"তা হবে না, তুমি দেখে নিও।"

"না হলেই বাঁচি" বলিয়াই প্রভাবতী কি যেন ভাবিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখের উপর দিয়া একটা আশঙ্কার কালো ছায়া ভাসিয়া গেল। তিনি সহসা সুরমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কিন্তু তা ব'লে দিচ্ছি, বোন্—ওকে খুব সাবধানে থাক্‌তে বলিস্—নৈলে ওকে আঁস্তাকুড়ের ছাই ঝেঁটিয়ে দূর করবো।"

সেই দিন হইতেই ঢেঁকি-ঘরের একটি দরমা-ঘেরা অংশ তরীর বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। সে ঢেঁকি-ঘরেই খাইত, ঢেঁকি-ঘরেই শয্যা করিত এবং পারতপক্ষে ঢেঁকি-ঘরের গণ্ডী পার হইত না। কেন না, কি জানি যদি দেবতা-বামুনকে ছুঁয়ে ফেলে। সে নিজেই নিজের শাক-ভাত রাঁধিয়া—কেন না, বামুনের পাতের প্রসাদটুকু পাইবার স্পর্দ্ধাও সে রাখিত না। সুরমা এক এক দিন রান্না-ঘরের জান্‌লা গলাইয়া তার হাতে কি যে ফেলিয়া দিতেন, তাহা সে আর সুরমা ভিন্ন কেহই জানিত না; কিন্তু সে জিনিষ হাতের মধ্যে লইয়াই সে চোরের মত চারি পাশে চাহিয়া এক দৌড়ে তাহার ঢেঁকি-ঘরে উঠিত।

৫

সুখ-দুঃখের মধ্যে যতখানি ব্যবধান আমরা কল্পনায় টানি, বাস্তব জীবনে ততখানি ব্যবধান কোন দিনই সত্য নহে। একটি স্নেহের দৃষ্টি—একটু সমবেদনার কথা অতি বড় দুঃখকেও সুখের পর্য্যায়ে টানিয়া তোলে। প্রথম-যৌবনে স্বামিহীনা তরঙ্গিণীর একমাত্র কোলের পুত্রটি যে দিন ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল, সেই দিন হইতে তাহার বুকের আকাশে যে দুঃখের মেঘ জমাট হইয়াছিল, তাহা লঘু হইয়া কোথায় মিলাইয়া যাইত, যখন সুরমা তাহার এক আধ টুকরা দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেন—বা কখন দিনের কার্য্যান্তে বিপিন বাবু ঢেঁকি ঘরের কানাচে গিয়া বলিতেন—"কি রে মেয়ে—ভাল আছিস্ ত?"

অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া তরঙ্গিণী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল আর একমনে তাহার জীবনের সুখ-দুঃখের হিসাব কসিতেছিল, এমন সময় তাহার পশ্চাৎ হইতে অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইল—"তলী !"

চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাতে চাহিতেই তাহার মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল। "এস খোকাবাবু" বলিয়া ঢেঁকি হইতে সে নামিল এবং একখানি ছোট পিঁড়িকে আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া ঢেঁকি-ঘরের এক প্রান্তে পাতিয়া দিয়া বলিল—"বসো।"

"না, পিঁলিতে কেন, আমি ঢেঁকিতে বসবো" বলিয়া সুশীল উৎসাহের সঙ্গে ঢেঁকির কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

"ঢেঁকিতে কি তুমি বসতে পার?" তরঙ্গিণীর মুখ দিয়া এই কথাটুকু বাহির হইবামাত্র সুশীল তাহার বড় বড় নির্ম্মল চোখ দুটিকে উজ্জ্বল করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, পালি। ও যে আমাল ঘোঁলা—আমি ওল পিতে চল্‌বো।"

"আর আমি পাড় দেব না?"

"হ্যাঁ—পাল দেবে ত—তুমি পাল দেবে আল ও টগ্‌বগ্‌ ক'লে চলবে। ও ঠগবগ ক'লে চল্‌বে আল আমি হেট্ হেট্ ক'লে ওল পিঠে চাবুক মালবো।"

"আর যদি তুমি প'ড়ে যাও?"

"না, পলে যাবো কেন—তুমি চলিয়ে দাও।"

ঢেঁকিতে নিজে চড়িয়া বসা সুশীলের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল, তাই সে তরঙ্গিণীকে আদেশ করিল চড়াইয়া দিতে। কিন্তু এ আদেশ পালন করা যে তরঙ্গিণীর পক্ষে আরও সাধ্যাতীত ছিল, তাহা তাহার সরল শিশুবুদ্ধি কি করিয়া বুঝিবে? তবু তরঙ্গিণী তাহাকে এই ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিল—"আমি কি ক'রে চড়াবো, খোকা বাবু? তুমি বামুন, আমি শূদ্দুর—তোমায় কি আমার ছুঁতে আছে?"

"হ্যাঁ আছে"—সুশীল ক্ষুব্ধ অভিমানের সঙ্গে বলিল।

"কিন্তু তোমায় ছুঁলে যে তোমার মা আমায় মারবে।"

"না, মালবে না"—সুশীলের কণ্ঠে ক্রন্দনের সুর বাজিয়া উঠিল। সে ঠোঁট ফুলাইয়া তরঙ্গিণীর দিকে দুই ফোঁটা টলটলে জলভরা চোখ তুলিয়া বলিল—"চলিয়ে দাও।"

তরঙ্গিণীর বুকখানা একটা অজানা ব্যথায় মুচড়িয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন তাহারই সেই স্বর্গগত পুত্রটি সুশীলের ভিতর দিয়া এই কাতর বাসনা জানাইতেছে। এ কি সহ্য হয়! ঐ নধর কচি শিশু একটা তুচ্ছ বাসনার জন্য ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিবে, আর সে পাষাণীর মত তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে? তাহার ইচ্ছা হইল, সে তখনই সুশীলকে দুই হাত দিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কিন্তু এ কি! একটা শুষ্ক কঙ্কাল ঢেঁকিঘরের এক কোণ হইতে তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া আছে না, তাহার চক্ষুহীন কোটরমাত্র দিয়া? ঐ কি জাতিত্ব—ঐ কি সামাজিক বিধান? ওকে অমান্য করিলে কি হয়? যা হয়, তাহারই হউক—জ্ঞানশূন্য খোকাবাবুর ত কোনই দোষ হইবে না। সে খোকাবাবুকে খুসী করিয়া, খোকাবাবুর দেহের ক্ষণিক সুকোমল স্পর্শে তৃষিত বুকখানাকে চির-দিনের মত জুড়াইয়া দিয়া, অনন্ত নরকের পথে যাইতেও রাজী আছে—পাপের গুরুভার বোঝা মাথায় লইয়া।

তরঙ্গিণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সুশীল ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"দেবে না—চলিয়ে দেবে না?"

"দেব—দেব" বলিয়া তরঙ্গিণী সুশীলের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল।

হঠাৎ নেপথ্য হইতে প্রভাবতী উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কি রে খোকা, কাঁদছিস্ কেন? কি হয়েছে?—দেখ না সুরো, মাগী ওকে কাঁদাচ্ছে কেন?"

তরঙ্গিণী ত্রস্ত হইয়া হাত টানিয়া লইল।

ধীরে ধীরে সুরমা ঢেঁকি-ঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিল—"খোকা!"

সুরমার দীপ্তিপূর্ণ চোখের দিকে চাহিয়া সুশীল অপরাধীর মত দুই একবার ঢোক গিলিয়া বলিল—"তলী আমায় ঢেঁকিতে চলাচ্চে না।"

চকিতের মধ্যে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইয়া সুরমা ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ছিঃ বাবা, তুমি ভারি দুষ্ট হয়েছ। ঢেঁকিতে না চড়লে তোমার সুখ হয় না?" এবং তার পরই সুশীলকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঢেঁকির উপর বসাইতে বসাইতে তরঙ্গিণীকে বলিলেন—"দিলেই পারতিস্ চড়িয়ে।"

তরঙ্গিণী কোন কথা না বলিয়া ঘাড় নীচু করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল মাটীতে পড়িতে লাগিল।

তাহার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা বুঝিয়া লইয়া সুরমা আবার

বলিলেন—"ওতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। তুই ওকে যা ভালবাসিস্—ওকে কোলে নেবার জন্য তোর যা—সে কি আমি বুঝতে পারি না ? কেবল দেখিস্, যেন দিদি কি উনি না দেখতে পান।"

বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে তরঙ্গিণী স্খলিতস্বরে বলিল—"না খুড়ীমা, না—কেনই আমি এখানে এসেছিলুম, কেনই আমি খোকাবাবুকে—?" সে আর বলিতে পারিল না—'দেখেছিলুম' কথাটাকে মুখের মধ্যে রাখিয়াই সে আঁচল দিয়া চোখ ঢাকিল।

তরঙ্গিণীর দুঃখ যে সান্ত্বনার অতীত, তাহা যে সুশীলকে এক আধবার গোপনে কোলে লইয়া মিটিবার নহে, তাহা অনুভব করিয়া সুরমা অনেকটা স্বগত বলিয়া ফেলিলেন—"ও কেন তোর ছেলে হ'ল না ?" এবং তার পরই তাঁহার সব-ভোলানো সাধা হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া বলিলেন—"দে, পাড় দে—খুব জোরের সঙ্গে, দুম দুম ক'রে—যাতে ও প'ড়ে যায়—যাতে আর কোন দিন ও না ঢেঁকিতে চড়তে চায়।"

সুশীল তাহার মায়ের হাসির অনুকরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"বা রে, পলবো কেন ?" এবং তার পরই দুই হাত দিয়া ঢেঁকির গলা জড়াইয়া ধরিল।

চোখের জল মুছিয়া তরঙ্গিণীও হাসিতে হাসিতে ঢেঁকিতে পাড় দিতে লাগিল। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সে পাড় খুব জোরে নহে, দুম দুম করিয়াও নহে।

সুরমা যদিও বলিয়াছিলেন যে, সুশীল পড়িয়া গিয়া শিক্ষালাভ করুক, তবু কেন জানি না, ঢেঁকির পাড় আরম্ভ হইতেই তিনি সুশীলকে দুই হাত দিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৬

উল্লিখিত ঘটনার তিন চারি দিন পরে এক দিন প্রাতঃকালে তরঙ্গিণী একখোলা গরম চিঁড়া কুটিয়া লইয়া সবে দুই এক গ্রাস মুখে দিয়াছে, এমন সময় সুশীল কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"কি খাচ্ছ, তলী দি ?"

মুখ মুছিতে মুছিতে তরঙ্গিণী বলিল—"কিছু না, দাদা।"

"হ্যাঁ, কিছু না কেন, তুমি চিঁলে খাচ্চো।"

"কৈ না—চিঁড়ে কোথায় পাবো ?"

"বা লে—ঐ যে তোমাল কোঁচলে—ঐ যে দেখি।"

"এ আর দেখবে কি দাদা—এ ভারি বিশ্রী চিঁড়ে—বাসি—তেতো—আমি ফেলে দিই গে।"

"না—ফেলে দেবে না—আমি খাব।"

সুশীল তাহার ব্যগ্র হাতখানিকে তরঙ্গিণীর কোঁচড়ের মধ্যে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তরঙ্গিণী কোঁচড় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"সরো—সরো—এ কি খেতে আছে ? এ আমার এঁটো।"

"হ্যাঁ, খেতে আছে" বলিয়া সুশীল ফের কোঁচড়ের দিকে হাত বাড়াইতেই তরঙ্গিণী তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দৌড়াইয়া গিয়া সমস্ত চিঁড়া নর্দমায় ঢালিয়া দিল।

সুশীল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বাড়ীর মধ্যে ছুটিল এবং কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল, প্রভাবতী তীব্রকণ্ঠে বলিতেছেন—"এমন মাগীও দেখি নি। খাবি ত লুকিয়ে খা—তা না, ছেলেটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে—সাধে আর বলে ছোট জাত ?"

সমস্ত রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া তরঙ্গিণী ভোরের দিকে ঘুমঘোরে স্বপ্ন দেখিল, যেন সুশীল তাহার কোঁচড় হইতে চিঁড়া কাড়িয়া খাইতেছে, অথচ সুশীলকে বাধা দিতে তাহার সাধ্য হইতেছে না। শুধু তাহা নহে, সে যেন উঠিয়া গিয়া কোথা হইতে এক টুক্‌রা পাটালি আনিয়া বলিল—"শুধু চিঁড়ে কি তুমি খেতে পার, দাদা, এই পাটালি দিয়ে খাও, আর তোমাকে যে আমি কিছু খেতে দিয়েছি, তা যেন তোমার বউমা ছাড়া আর কাউকে বলো না।" সুশীল যেন মুখ ভরা থাকার জন্য কথা না বলিয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই যেন প্রভাবতী—"ও মা গো! মাগী কি বজ্জাত গো—আমাদের আর কিছু রাখলে না গো" বলিয়া দূর হইতে চেঁচাইয়া উঠিলেন। ত্রাসে ও লজ্জায় তরঙ্গিণীর যেন শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল এবং তখনই সে গোংরাইতে গোংরাইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সারা পূবদিক্‌টা লাল হইয়া উঠিয়াছে—যেন সে তাহারই মত কোন্ হতভাগিনীর বুকের রক্তে ছোপানো।

কিছুক্ষণ ঠায় আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তরঙ্গিণী হঠাৎ উনুন জ্বালিয়া ধান ভাজিতে বসিল এবং সেই ভাজা ধান ঢেঁকির গড়ে পুরিয়া দিয়া দমাদ্দম পাড় দিতে

লাগিল। তার পর কুলোয় করিয়া গরম চিঁড়াগুলিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝাড়িল। তার পর একখানি পরিষ্কার ডালায় চিঁড়াগুলিকে সাজাইয়া একটি মেটে হাঁড়ির ভিতর হইতে এক টুকরা পাটালি বাহির করিল। পাটালি-খানিকে চিঁড়ের উপর রাখিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন কাহার পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। বেলা প্রায় এক প্রহর হইতে চলিল, তবু সে না উঠিল গরুর খড় কাটিতে, না উঠিল বেগুনগাছে জল দিতে। দুই হাতে দুই কপাল টিপিয়া ধরিয়া সে যে কি ভাবনায় মগ্ন ছিল, তাহা সে-ই জানে। এমন সময় "কুলী মামা কুল দাও" এই শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে চাহিয়া দেখিল, ঢেঁকি-ঘরের সংলগ্ন যে দিশী কুলের গাছটা ছিল, তাহার ডালগুলির দিকে চাহিয়া সুশীল হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বিশ্বাস, কুলী মামা নামক এক অজ্ঞাতশক্তিশালী পুরুষ আছেন—যাহার কুল-গাছের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে এবং যিনি ইচ্ছা করিলে বড় বড় টোপা কুল সুশীলের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে পারেন।

তরঙ্গিণী উৎফুল্ল হইয়া ডাকিল, "খোকা বাবু!" খোকা বাবুর সে কথা কাণেই গেল না। সে কুলী মামার নির্দ্দয়তায় বিরক্ত হইয়া ঝড়ু মামাকে ডাকিতে লাগিল—কেন না, সে মামারও শক্তি আছে—ডাল নাড়া দিয়া কুল ফেলিয়া দিতে।

তরঙ্গিণী আবার ডাকিল—"দাদাবাবু!" এবার সুশীলের কাণে সে ডাক প্রবেশ করিল। সে বিমর্ষ-মুখে তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া বলিল—"তলীদি—মামালা কুল দিচ্চে না"—

তরঙ্গিণী চিঁড়ার ডালার দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া সুশীলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিল—"কেমন সরু ধানের গরম চিঁড়ে তোমার জন্যে কুটেছি—ও আমার এঁটো নয়—ও খুব মিষ্টি।"

কিন্তু চিঁড়ার প্রলোভন আজ সুশীলের উপর ব্যর্থ হইল। তাহার মন আজ কুলের লোভেই আকুল। সে সংক্ষেপে তাহার মনোভাবকে এই ভাবে ব্যক্ত করিল—"আমি চিঁড়ে খাবো না—কুল খাবো।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তরঙ্গিণী বলিল—"এক মুঠোও খাবে না?"

সুশীলও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল—"কুল পলচে না কেন?"

ইহারই নাম অদৃষ্টের পরিহাস। এ যে কত করুণ, তাহা সেই জানে, যে এক দিন কাহাকেও কিছু দিতে পারে নাই বলিয়া প্রাণপণ যত্নে তাহারই জন্য বসিয়া থাকে—সেই বস্তুর উপহার অর্ঘ্যের মত সাজাইয়া লইয়া। কিন্তু সে যখন ফিরিয়া আসে, তখন তাহার বাঞ্ছিত আর সে বস্তু নহে, অন্য কিছু।

তরঙ্গিণী আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কুলগাছের কাছে গেল এবং তাহার গোড়ার দিকে খানিকটা পর্য্যন্ত উঠিয়া সজোরে গুঁড়ি ধরিয়া নাড়া দিতে লাগিল। টপাটপ্ করিয়া দুই চারিটা পাকা কুল মাটীতে পড়িল। সুশীল তাহা আগ্রহের সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া এক গালের মধ্যে পূরিয়া দিল। তাহার গালের সেই স্ফীত প্রফুল্ল ভাব লক্ষ্য করিয়া তরঙ্গিণীর বুকের মধ্যে শত-সহস্র উৎসবের দীপ জ্বলিয়া উঠিল—শত-সহস্র উৎসবের বাঁশী মধুরস্বরে বাজিতে লাগিল।

"পোঁ—ওঁ—ওঁ"—দূরে সত্যই একটা বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কে একটা ছেলে রাস্তা দিয়া তালপাতার বাঁশী বাজাইয়া চলিয়াছে। একটুখানি উৎকর্ণ হইয়া সুশীল কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমি বাঁশী বাজাবো।"

ভুলাইবার জন্য তরঙ্গিণী বলিল,—"তোমার জ্যেঠাবাবুকে বোলো অখন, হাট থেকে কিনে আনবেন।"

"না, হাট থেকে না। এখনই।"

"আচ্ছা, তোমার জ্যেঠাবাবুকে বল গিয়ে।"

"না, জ্যেঠাবাবু না, তুমি।"

"আমি কোথা থেকে আনবো, দাদা?"

নাকের ভিতর দিয়া তিন চারিটা গোঁৎ গোঁৎ শব্দ বাহির করিয়া সুশীল কেবল বলিতে লাগিল—"আনো।"

নিরুপায় হইয়া তরঙ্গিণী বলিল—"আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি।" তার পর কিছুক্ষণের জন্য সুশীলকে দারুণ প্রতীক্ষায় রাখিয়া সে অন্তর্হিত হইল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তাহার হাতে দুইটি লক্‌লকে সবুজ তালপাতার ফালি। সুশীল মুখ ভার করিয়া বলিল, 'বাঁশী কৈ?' 'ক'রে দিচ্ছি' বলিয়া তরঙ্গিণী একটি তালপাতার ফালি লইয়া নিপুণ হাতে কায করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ফালিটি একটি

সুন্দর বাঁশীর রূপ ধারণ করিল। সুশীল হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। বাঁশীটিকে সুশীলের হাতে দিয়া তরঙ্গিণী বলিল, "বাজাও।" বাঁশীর অগ্রভাগ মুখের মধ্যে পুরিয়া সুশীল প্রাণপণে ফুঁ দিতে লাগিল, কিন্তু বাঁশী বাজিল না। "এ বাজে না—এ খালাপ" বলিয়া সুশীল বাঁশীটাকে তরঙ্গিণীর কোলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। "তুমি যে ফুঁ দিতে পারলে না, দাদাবাবু" বলিয়া তরঙ্গিণী আবার বাঁশীটিকে সুশীলের হাতে দিতে গেল, কিন্তু সুশীল তাহা লইল না। সে তাহার লাল জুতাপরা ছোট পা দুইটিকে দ্রুতচ্ছন্দে মাটীতে আছড়াইতে আছড়াইতে বলিল—"ও ভালো না—ভালো বাঁশী ক'লে দাও।"

অগত্যা তরঙ্গিণী আবার একটি তালপাতার ফালি লইয়া আবার একটি বাঁশী তৈয়ার করিল। সেই বাঁশীটি সুশীলের হাতে দিয়া সে বলিল—"এইবার ভাল ক'রে বাজাও ত।" সুশীল পূর্ব্বের মত প্রাণপণেই বাঁশীতে ফুঁ দিতে লাগিল, বাঁশীর গা বহিয়া লাল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু বাঁশী এবারও নীরব। "তুমি পারছো না, দাদাবাবু—অতখানি কি মুখের মধ্যে দেয়? এই এতটুকু মুখের মধ্যে দিয়ে এমনি ক'রে ফুঁ দাও।" বলিয়া তরঙ্গিণী আগেকার বাঁশীটিকে নিজের ঠোঁটে ঠেকাইয়া ফুঁ দিল। বাঁশী পোঁ করিয়া বাজিয়া উঠিল। সুশীল "দাও—দাও—ঐ বাঁশী দাও, আমি ঐ বাঁশী বাজাবো" বলিয়া বাঁশী বদল করিতে গেল। কিন্তু তরঙ্গিণী নিজের মুখের বাঁশী কিছুতেই সুশীলের হাতে দিল না—বলিল, -"তুমি ভাল ক'রে বাজাও, ও বাঁশীও ঠিক এম্‌নি বাজবে।" "না, বাজবে না—এ বাঁশী খালাপ, ঐ বাঁশী ভালো।" বলিয়া সুশীল এমন একটা তীব্র অসন্তোষের উচ্চ করুণ সুর তুলিল যে, তাহা অন্তঃপুরে গিয়া প্রভাবতীর কাণে পৌঁছিল। তিনি সেখান হইতে তারস্বরে চেঁচাইয়া বলিলেন—"খোকা, আবার ঢেঁকি-ঘরে কেন? শীগ্‌গির এসো বল্‌ছি। এসো, নৈলে তোমার বউমা গিয়ে তোমায় এমন মারবে।"

মায়ের ভয়ে সুশীলের বাঁশীর দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে চোখের জলে দুই গাল ভাসাইয়া প্রভাবতীর কাছে দৌড়িয়া গেল এবং তাঁহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া খণ্ড খণ্ড ভাষায় নিজের অখণ্ড মর্ম্মবেদনার পরিচয় দিতে লাগিল।

"আহা, বাছা রে" বলিয়া প্রভাবতী তরকারি কোটা বন্ধ রাখিয়া সুশীলকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় অনুকূল এক খালুই মাছ লইয়া উঠানে প্রবেশ করিলেন। পূজা-অর্চ্চনার ফাঁকে ফাঁকে মৎস্য-শিকার ও দুগ্ধ-দোহন, এই কায দুইটি তিনি যে করিয়া হউক নির্ব্বাহ করিতেন। কেন না, এ কাযের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক টান ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভাবতী বলিয়া উঠিলেন—"বুঝলে ঠাকুরপো, মাগীটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। খোকাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়েই মারলে।"

খালুইটাকে সজোরে মাটীর উপর বসাইয়া দিয়া অনুকূল ভ্রূকুটীর সঙ্গে বলিলেন—"ও কথা আর আমাকে কেন, দাদাকে বোলো—আর ঐ ওঁকে বোলো—যিনি রান্নাঘরে।"

প্রভাবতী নাক ঘুরাইয়া বলিলেন—"বয়ে গেছে বল্‌তে। ওদের চোখ-কাণ নেই? উঃ, পাহাড়ে মাগী, ছেলে কাঁদাবার এত ফন্দীও জানে। কেন রে বাপু, কি দরকার ছিল তোর বাঁশী তৈরী করবার?"

সুরমা আর রান্নাঘরের মধ্যে থাকিতে পারিলেন না। ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া প্রভাবতীর কাছে গিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—"তুমি জানো না, দিদি, সে নিজের দরকারে বাঁশী তৈরী করে নি। আমি রান্নাঘর থেকে সব শুনেছি। খোকা বাঁশী দাও, বাঁশী দাও ক'রে যে বায়না ধরেছিল।"

প্রভাবতীর এ কথা বিশ্বাস হইল কি না, জানি না, কিন্তু মনঃপূত হইল না নিশ্চয়ই। "থাম্ সুরো, তোর আর মাগীর হয়ে লড়তে হবে না" বলিয়া তিনি স্নেহের সঙ্গে সুশীলের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া অনুকূল বলিলেন—"উনি লড়বেন না ত লড়বে কে? উনি আর দাদা যে এক সুরে—"

এমন সময় বিপিন বাবু "জ্যেঠা, তোমার পোষাক এনেছি" বলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা নিজের অঙ্গভঙ্গীকে সংযত করিয়া অনুকূল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বাহিরে গেল। সুরমা লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিয়া রান্নাঘরেই যাইতেছিলেন, কিন্তু বোধ হয়, পোষাক দেখিবার লোভেই প্রভাবতীর আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আলোয়ানের তলা হইতে একটা ছোটখাটো কাপড়ের

বাণ্ডিল বাহির করিয়া বিপিন প্রভাবতীর সম্মুখে ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন,—"দেখো, তোমাদেরও আছে।"

তরঙ্গিণী সম্বন্ধে বিপিনকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিবেন, এই রকম একটা ইচ্ছা প্রভাবতীর মাথায় চট্ করিয়া গজাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কাপড় দর্শনেই তাহা হুস্ করিয়া কোথায় উবিয়া গেল।

দাওয়ার উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া এবং সুশীলকে বাঁ কোলের উপর বসাইয়া প্রভাবতী হাস্যরঞ্জিত অধরে বাণ্ডিল খুলিতে খুলিতে বলিলেন—"দেখি কি কিনে আন্‌লে—তোমার ত যা পছন্দ।"

সুরমা প্রভাবতীর আড়ালে উবু হইয়া বসিয়া ভাসুরের পছন্দের প্রত্যক্ষ নমুনা দেখিবার জন্য শরীরকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত এবং গলাকে যথাসম্ভব দীর্ঘীকৃত করিয়া দিলেন। তাঁহার ঠোঁটের কোণে যে হাসিটুকু নদীর কিনারার জ্যোৎস্না-লেখার মত চিক্-চিক্ করিতেছিল, তাহা ঘোমটার আড়াল দিয়া বিপিনের চোখে লক্ষ্মী-প্রতিমার মৃদু হাস্যের মতই প্রতিভাত হইতেছিল।

প্রথমেই বাহির হইল সুশীলের রঙ্গীন জামা ইজের।

"আমাল জামা" বলিয়া সুশীল প্রভাবতীর কোলে বসিয়াই নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার কুন্দকলির মত দুধে দাঁতগুলির অমল-ধবল সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক্ যেন আলোকিত হইয়া উঠিল।

অতি মৃদুস্বরে সুরমা বলিলেন—"চমৎকার দিদি—না?"

ঈষৎ হাসিয়া প্রভাবতী বিপিনকে বলিলেন—"শুনছো, তোমার বৌমার খুব পছন্দ হয়েছে।"

বিপিনের চোখে মুখে একটা অপার তৃপ্তির আনন্দ শান্তোজ্জ্বল শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি প্রভাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-–"কেন, তোমার পছন্দ হয় নি?"

"হয়েছে—তবে আর দু' চারটে রেশমের ফুল থাকলে আরো ভাল হতো। যাক্, এখন গায়ে হ'লে তবে ত" বলিয়াই প্রভাবতী সুশীলকে জামা ও ইজের পরাইতে লাগিলেন।

পরানো শেষ হইলে সুরমা বলিলেন—"ঠিক ফিট করেছে দিদি।"

সুরমার গালে আস্তে একটি ঠোনা মারিয়া প্রভাবতী বলিলেন—"ঠাকুরপোর কাছে ইংরিজী শিখছিস না কি?"

তার পর নিজের মনে বলিলেন—"আর বছর না ছোট হয়ে যায়।"

"আর বছর নতুন পোষাক কিনে দেব", বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন।

সুরমা সুশীলের কাণে কাণে বলিলেন—"যাও, জ্যেঠা বাবুকে নমো ক'রে এসো।"

সুশীল দাওয়া হইতে নামিয়া বিপিনের কাছ পর্য্যন্ত গিয়া বলিল—"জেতা, নমো।"

সকলের মুখেই একটা উচ্চ হাসির স্রোত বহিয়া গেল। বিপিন সুশীলকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে এত বেশী চুম্বন দিতে লাগিলেন যে, সে ছট্‌ফট করিয়া তাঁহার কোল হইতে নামিয়া পড়িল। 'তলী-দিকে দেখাই গে' বলিয়া সে দৌড়িয়া অদৃশ্য হইল।

"এ কার? আমার না কি?" বলিয়া প্রভাবতী উপরের সাড়ীখানি দেখিতে লাগিলেন।

"হ্যাঁ, তুমি চেয়েছিলে গিন্নী পাড়, আমি এনেছি হাতী পাড়—বল ত এখনও ফেরত দিতে পারি।"

"না, ফেরত দেবে কেন? এই পাড়ই ত আমি চাই। সুরোর কাপড় কৈ?"

"ঐ যে নীচেই।"

"বেশ ভাল দেখে এনেছ ত?"

"দেখ না।"

"বাঃ, বেশ হয়েছে, সীঁথের সিঁদুর পাড়, খোলও বেশ। এখানা কার? এ যে ধুতির মত। তোমার না কি?"

"না, ওটা -।"

"ঠাকুরপোর?"

"না। আমাদের পরে কিনবো।"

"তবে কার, তাই খুলে বল না।"

"ওটা ওই—তারও কাপড় নেই কি না।"

'বলি কে নেংটো হয়ে আছে, শুনি না।"

"না, নেংটো নয়, তবে ওটা ওই ওর নাম কি মেয়ের অর্থাৎ—"

"চাঁড়াল মাগীর? উঃ, কি বাবাকেলে মেয়েই পেয়েছিলে। আসতে আসতে কাপড়—খোলও আমাদেরই মত—কর যা খুসী।"

কাপড়গুলোকে দলা-মলা করিয়া আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়া প্রভাবতী হন্-হন্ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

দুই এক মিনিট স্তম্ভিতের মত থাকিয়া বিপিন সুরমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বউমা, কাপড়গুলো তুমিই সব সোনাজাত দিও।"

৭

বিপিন বাবুর অন্তঃপুরের চার পোতায় চারিখানি ঘর। পশ্চিমের ঘরটি আটচালা এবং দুটি কক্ষে বিভক্ত। তাহার একটি কক্ষে শয়ন করিতেন বিপিন ও অপর কক্ষে সুশীলকে কোলে লইয়া প্রভাবতী। উত্তরের ঘরটি ছিল অনুকূল ও সুরমার শয়ন-গৃহ। পূবের ঘরটি রান্নাঘর এবং দক্ষিণের ঘরটি ভাঁড়ার ঘররূপে ব্যবহৃত হইত। ঘর চারটির মাঝখানে যে ছোট-খাটো উঠানটি ছিল, তাহা প্রত্যহ ভোরবেলা সুরমার হাতের ছড়া-ঝাঁট পাইয়া শাণ-বাঁধানো মেঝের মতই ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিত।

বাড়ীর মধ্যে সুরমার পূর্ব্বে কেহই সকালে উঠিতেন না। কিন্তু আজ কেন জানি না, তাঁহার এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। বোধ হয়, রাত্রিতে অনুকূল তাঁহাকে এমন কোন বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহার যন্ত্রণায় তিনি শেষ রাত্রির পূর্ব্বে চোখ বুজিতে পারেন নাই।

অন্তঃপুর ও বহির্বাটীর মধ্যে যে বাঁখারী-ঘেরা ফুল-বাগানটি ছিল, অনুকূল সাজি হাতে তাহার মধ্যে বেড়াইতে-ছিলেন, এমন সময় প্রভাবতী চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে পশ্চিমের ঘর হইতে উঠানে নামিলেন। উঠানের এক কোণে রাত্রির এঁটো বাসন তখনও জড় করা ছিল, সুরমা ভিন্ন উহা কে ঘাটে লইয়া যায়? দুইটা দাঁড়কাক ঠোঁটে করিয়া কতকগুলি ভাত উঠানময় ছড়াইয়াছে।

"ও মা, চারপাশে এঁটো—ছড়া-ঝাঁট পড়েনি—সুরোর আজ হয়েছে কি?"—এই কথাগুলি প্রভাবতী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিতেই অনুকূল দূর হইতে উত্তর করিলেন—"কি আর হবে? চাঁড়ালের মেয়েকে আস্কারা দেয় ব'লে একটু বকেছিলুম, ব্যস্, এরই জন্যে এখনো ঘুম ভাঙ্গে নি।"

ঈষৎ হাসিয়া প্রভাবতী বলিলেন—"তাই ত বলি। একটা কিছু না হ'লে কি আর সুরোর মত মেয়ে—কথাটা অবশ্য একটু শক্তই বলেছ। তা তোমার আর দোষ কি? ঐ আবাগী এসেই ত যত অনর্থ ঘটাচ্ছে—এখন ভেস্তাতে পারলে হয়।"

বিড় বিড় করিয়া আরও কত কি বকিতে বকিতে প্রভাবতী ডিঙ্গি পাড়িয়া উঠান অতিক্রম করিলেন—তার পর গোয়াল-ঘর ও বেগুন-ক্ষেতের পাশ দিয়া পুকুর-ঘাটে চলিলেন মুখ ধুইতে।

বিপিন বাবুর একটি দুরন্ত কালো গাই ছিল। সে কেবলই অপকর্ম্ম করার সুযোগ খুঁজিত। দড়ি ছিঁড়িয়া, গোয়াল-ঘরের আগড় ভাঙ্গিয়া সে সবে লালায়িত-মুখে বেগুন-ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়াছে, এমন সময় তরঙ্গিণী তাহাকে দেখিতে পাইয়া গ্রেপ্তার করিবার জন্য ছুটিল। প্রাতঃ-সূর্য্যের কিরণে তরঙ্গিণীর দেহের ছায়াও দীর্ঘকায় হইয়া পুকুর-ঘাটের পথ বহিয়া ছুটিল এবং নিমেষেই অগ্রগামিনী প্রভাবতীর পায়ের তলায় গিয়া পড়িল। প্রভাবতী চম-কিয়া উঠিয়া পিছনে চাহিলেন এবং কপালে একটা চপেটাঘাত করিলেন; কিন্তু তাঁহার উষ্মাপূর্ণ বাক্যাবলী তখন এই ভাবিয়া মুলতুবী রাখিলেন যে, সুরমা ও বিপিনের সম্মুখে তাহা বর্ষণ করাই অধিক সমীচীন হইবে। যাহা হউক, তিনি পুকুরঘাটে গিয়া শুধু যে মুখ ধুইলেন, তাহা নহে, অবগাহন স্নানও করিলেন। তার পর কাঁপিতে কাঁপিতে নিজের ঘরে গিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

প্রাতঃস্নান করা কখনই প্রভাবতীর অভ্যাস ছিল না, বিশেষ শীতকালে তিনি গরম জলে গা, হাত, পা ধুইয়াই শুদ্ধ হইতেন; সুতরাং তাঁহার শীতের কাঁপুনি যে অবিলম্বে জ্বরের কাঁপুনিতে পরিণত হইল, তাহা বলাই বাহুল্য।

সে দিন দুপুরবেলা আর একটি কাণ্ড ঘটিল। অনুকূল ভাঁড়ার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ভাত খাইতেছিলেন। সুরমা দুধ পর্য্যন্ত পরিবেষণ করিয়া দিয়া এক কলসী জল আনিবার জন্য পুকুর-ঘাটে গিয়াছিলেন। একটা বিড়াল অনুকূলের মুখ পর্য্যন্ত মুলো বাড়াইয়া দুধমাখা ভাতের উপর তাহার যে ন্যায়সঙ্গত দাবী আছে, তাহাই জানাইতেছিল। একটা কুকুর পৈঠার উপর পা তুলিয়া দিয়া অনুকূলের মুখের দিকে চাহিয়া হা হা করিয়া হাঁপাইতেছিল। বোধ হয়, সে বলিতে চাহিতেছিল যে, তাহার দাবী বিড়ালের দাবীর অপেক্ষা কম নহে।

উঠানে একটা দরমার উপর আমসত্ব শুকাইতেছিল। শীতকালেও এক একবার না রৌদ্রে দিলে ও জিনিষে যে পোকা ধরে, তাহা গৃহিণীমাত্রেই জানেন এবং সুরমাও জানিতেন।

হঠাৎ সেই কালো গাইটা উঠানে ঢুকিয়া আমসত্ব খাইতে লাগিল। অনুকূল চীৎকার করিয়া বলিলেন—"খেলে খেলে, আমসত্ব খেলে। ওগো, তাড়াও না, কোথায় তুমি? ঘরে নেই না কি? তবেই হয়েছে। ভাগাড়ে গরু ঠিক তক্কে তক্কে ছিল—এই—এই—দূর—নড়েও না যে! সারা বছরের আমসত্ব সাবাড় করলে।"

এক টুকরা বাঁশ লইয়া তরঙ্গিণী দ্রুতবেগে উঠানে ঢুকিয়া গরুকে তাড়াইতে তাড়াইতে বাহিরে লইয়া গেল। অবশ্য যাইবার সময় অসতর্কতার জন্য তাহার ছায়াটা অনুকূলের পাতের উপর পড়িয়াছিল।

অনুকূল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই "এঃ, হলো খাওয়া" বলিয়া পাত্রত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ষোল আনা দুধভাতের বারো আনাই তখনও অবশিষ্ট ছিল, সুতরাং অনুকূলের আপশোষ যে খুব বেশীই হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি খানিকটা দুধভাত বিড়ালের জন্য পাতে ফেলিয়া রাখিয়া—বাকীটুকু কুকুরকে দিবার জন্য বাটি হাতে উঠানে নামিলেন।

জলের কলসী লইয়া সুরমা উঠানে দাঁড়াইতেই অনুকূলের পাত ও হাত লক্ষ্য করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। "অত দুধভাত বিড়াল-কুকুরকে—"এই কথাটুকু অনুচ্চস্বরে বলিবামাত্র অনুকূল গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"দেব না? চাঁড়ালের উচ্ছিষ্ট খাব না কি?"

সুরমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে আবার কি?"

"সে তুমি বুঝলে আর দুঃখ ছিল কি? চাঁড়ালের মেয়ের ছায়া পড়লো। আর কি হাত ডুবিয়ে খাব?"

কলসীটাকে অবশ হাতে উঠানের উপর রাখিয়া সুরমা বলিলেন—"তার ছায়াতে উচ্ছিষ্ট হয় আর বিড়াল-কুকুরের—সে কি বিড়াল-কুকুরের চেয়েও—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—বিড়াল-কুকুরের ত জাত নেই—ও যে অজাত।"

"তা সে ভাত খেলে কি হতো?—জাত যেতো?"

"যেতো না? প্রায়শ্চিত্ত করে কি সাধে?"

"কি প্রায়শ্চিত্ত করতে? এক মাস গোবরজলে—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠাট্টা নয়—তাতেই ভাত সিদ্ধ ক'রে খেতে হতো।"

অনুকূলের গলার স্বর ক্রমেই এত উঁচু পর্দ্দায় চড়িতেছিল যে, ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য প্রভাবতী গায়ে কাঁথা জড়াইয়া দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"কি হয়েছে, ঠাকুরপো, সুরোর সঙ্গে ঝগড়া করছো কেন? আবার চাঁড়াল মাগী কিছু করেছে না কি?"

শেষ কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় প্রভাবতীর গলায় কাঁসরের ধ্বনির আভাস পাওয়া গেল। অনুকূল সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিবার পর তিনি আবার বলিলেন—"ও বেলা আমাকে দিয়ে ছায়া মাড়িয়েছে—নেয়ে এসে জ্বর বাধিয়েছি—এ বেলা করলে তোমার খাওয়া নষ্ট। ও আমাদের শেষ ক'রে তবে ছাড়বে।"

সুরমা তাঁহার লজ্জার মাত্রাটা একটু কমাইয়া দিয়া অনুকূলের সম্মুখেই প্রভাবতীকে বলিলেন—"তা তোমার যে দিদি বাড়াবাড়ি। নাইতে গেলে কেন? বট্‌ঠাকুরের মাথায় যেমন গঙ্গাজলের ছিটে দাও, তেমনই নিজের মাথায় দিলেই ত পারতে।"

সুরমা যে এতদূর সাফ সাফ কথা শুনাইবে, তাহা প্রভাবতী কল্পনাও করেন নাই। তিনি একদৃষ্টে সুরমার দিকে চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার নাকের পাটা দুইটি ফুলিতে লাগিল। শেষে দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া বলিলেন—"তোর ভাসুর যদি কচি খোকা হতো, ধ'রে পুকুরে চুবিয়ে আনতুম! তা কি করবো বল্? ম্লেচ্ছ ব'লে ত আর স্বোয়ামীকে ফেল্‌তে পারি না। ছিটে-ছাটা দিয়েই চালিয়ে নিই। তা ও ছিটে-ছাটা ত আর নিজের বেলায় চলে না। আমরা ত একেবারে ম্লেচ্ছ ঘরের মেয়ে নই।"

সুরমার পিতৃবংশের প্রতি এই সূক্ষ্ম কটাক্ষে অনুকূল বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিয়া বলিলেন—"আমি ত হার মেনেছি, বৌদি—এখন তুমি যদি বোঝাতে পার, দেখ।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রভাবতী সংকল্প স্থির করিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"বুঝবে না কেন? ও ত আর অবুঝ নয়। তবে বোধ হয়, আর জন্মে মাগী ওর কেউ ছিল—

তাই এখনও আঁতের টান যায় নি। তা শোন্, সুরো, আমি ব'লে দিচ্ছি—তুই রাগই কর্ আর যা-ই কর্—আর উনি আমার সঙ্গে কথাই বলুন আর না-ই বলুন্—আজ ভাঙ্গা দিনে আর তাড়াবো না, কিন্তু কাল সকালেই যদি না ওকে কুলো পিটিয়ে বিদেয় করি ত আমার নামই নয়।"

প্রভাবতীর ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সুরমার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

৮

সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। বিপিন বাবু এখনও বাড়ী ফেরেন নাই। অনুকূল নিজের ঘরে সন্ধ্যা-বন্দনায় মগ্ন। সুরমা মুখুয্যেদের বাড়ী গিয়াছেন বিয়ের নাড়ু পাকাইবার নিমন্ত্রণে। প্রভাবতীর জ্বরটা আবার জোরে আসিয়াছে। তিনি অনেকটা বেহুঁসের মত আটচালার ঘরে শুইয়া আছেন।

আগেই বলা হইয়াছে, আটচালার ঘরের দুইটি কক্ষ। বিপিনের কক্ষে একটি প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। প্রভাবতীর কক্ষ অন্ধকার। প্রভাবতীর চোখে আলো সহিতেছিল না বলিয়াই তিনি প্রদীপটাকে বিপিনের কক্ষে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

সুশীল প্রভাবতীর কোলের কাছেই শুইয়াছিল। রোজ সন্ধ্যাবেলা সে প্রভাবতীর মুখে পরীর গল্প, ছেলেধরার গল্প, ডাকাতের গল্প প্রভৃতি নানারকম গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত। তার পর একঘুমের পর যখন জাগিত, তখন প্রভাবতী তাহাকে দুধভাত খাওয়াইয়া আবার ঘুম পাড়াইতেন। আজ কিন্তু প্রভাবতী চুপ করিয়াই পড়িয়া আছেন, গল্প বলিতেছেন না দেখিয়া সে প্রভাবতীর গায়ে মৃদুমন্দ ধাক্কা দিয়া বলিল—"মা, গপ পো"। প্রভাবতী "উঃ খোকা,—আজ আর গল্প না, ঘুমো" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সুশীল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া রহিল; কিন্তু তার পরই উস্-খুস্ করিতে লাগিল। গল্প যখন চলিতেছে না, তখন শুধু শুধু নিষ্কর্ম্মার মত সে কি করিয়া শুইয়া থাকে? সে গল্পের অভাব খেলা দিয়া পূরণ করিবার জন্য বিছানার উপর উঠিয়া বসিল এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া নিজের মনে ঠক্কা-ফক্কা ও আগডুম-বাগডুম খেলিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গীর অভাবে এ সব খেলায় তাহার শীঘ্রই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল।

সে নিঃসাড়ে বিছানা হইতে উঠিয়া গুটি গুটি করিয়া তাহার জ্যেঠা বাবুর কক্ষে ঢুকিল। দরজার নিকটস্থ খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া সে উপযুক্ত খেলার সন্ধানে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সহসা তাহার উর্ব্বর মস্তকে একটি চমৎকার খেলার কল্পনা গজাইয়া উঠিল। সে দেখিল, খাটের পার্শ্বেই পিলসুজের মাথায় যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহার তলদেশে এক গোছা সলিতা এবং তাহা খাটের উপর বসিয়াই হাত বাড়াইয়া পাওয়া যায়। তখন সে একটি সলিতা টানিয়া লইয়া প্রদীপের শিখায় ধরিল।

জ্বলন্ত সলিতাটিকে বৃত্তাকারে প্রদীপের চারি পার্শ্বে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সলিতাটি নিভিয়া গেল। তখন সে সলিতার ডগাটিকে তৈলে সিক্ত করিয়া আবার প্রদীপের শিখায় ধরিল এবং আবার বৃত্তাকারে ঘুরাইতে লাগিল। এবার আর সলিতা নিভিয়া গেল না। সে নিজের সৃষ্ট আলোকমণ্ডলের সৌন্দর্য্যে উৎফুল্ল হইয়া ঘূর্ণনবেগ বাড়াইতে লাগিল। ইহাতে তাহার দোষ দেওয়া যায় না। বৃহৎ শিশু বৈজ্ঞানিকও দিনের পর দিন সূর্য্যের চারি পার্শ্বে অন্য জ্যোতিষ্কের আবর্ত্তন মুগ্ধনেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

এ দিকে সলিতার আগুন যখন প্রায় সমস্ত সলিতাটিকে নিঃশেষ করিয়াছে, তখন হঠাৎ সুশীলের আঙ্গুলের ডগা ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই অঙ্গুলিচ্যুত সলিতাটি উৎক্ষিপ্ত হইয়া মশারির চালে পড়িল। দাউ দাউ করিয়া মশারির চাল জ্বলিয়া উঠিতেই সুশীল ভীত হইয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িল; কিন্তু আর প্রভাবতীর কক্ষে ঢুকিতে পারিল না। কেন না, জ্বলন্ত মশারিটা তখন লম্বমান হইয়া দরজার দিকেই ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার একবার ইচ্ছা হইল, 'মা' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠে, কিন্তু সে ইচ্ছাকে সে এই ভাবিয়া দমন করিল যে, সে নিশ্চয়ই একটা গুরুতর অকায করিয়াছে এবং সে জন্য তাহার মাও তাহার পিঠে বউমার মত কিল প্রয়োগ করিতে পারেন। সুতরাং মশারিটা সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গেলেই সে নির্ঝঞ্ঝাটে দরজা দিয়া প্রভাবতীর কক্ষে ঢুকিবে এবং তাঁহার কোল ঘেঁসিয়া শুইয়া এমন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে যে, মশারি

পুড়াইবার অপরাধের জন্য কেহই আর তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিবে না।

কিন্তু ঘটনার ধারা ঠিক তাহার চিন্তার পথ ধরিয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে মশারির আগুনে খাটের চাদর—বিছানা পর্য্যন্ত ধরিয়া উঠিল। প্রভাবতীর কক্ষে যাইবারও সম্ভাবনা একবারেই লুপ্ত হইয়া গেল। সে আগুনের উত্তাপে দরজার বিপরীত প্রান্তের দিকে পিছাইতে লাগিল। আগুনের ভয়ের অপেক্ষা কিলের ভয়ের গুরুত্ব তাহাকে এখনও নির্ব্বাক্ করিয়াই রাখিয়া দিল। ক্রমে খাট, চৌকী, আলনা প্রভৃতি ঘরের সমস্ত আসবাব পত্র যখন এক এক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে ধোঁয়ার এবং উত্তাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য একবারে এক কোণ আশ্রয় করিল। হায়, তাহার জ্যেঠা বাবুর কক্ষে ত দু'তিনটে জানালা আছে, কিন্তু একটাও দরজা নাই কেন?

প্রভাবতী একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাশের কক্ষের অগ্নিকাণ্ডের প্রভাব তাঁহাকে শীঘ্রই জাগ্রত করিয়া তুলিল এবং তিনি জাগিয়া উঠিয়াই "ও মা, ও কি ও! ও ঘরে আগুন কেন? কি সর্ব্বনাশ! ও খোকা, কোথায় গেলি?" বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ও দিকে আগুনের লেলিহান জিহ্বা ধূম্রকুণ্ডলীর ভিতর দিয়া সুশীলের এতই নিকটবর্ত্তী হইয়াছে যে, সে কিলের ভয়কে বিসর্জ্জন দিয়া 'মা' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে বাধ্য হইল।

"ওরে, কোথায় তুই? ও ঘরে না কি? ও ঠাকুরপো, শীগ্গির এসো।" বলিয়া প্রভাবতী তাঁহার বক্ষঃস্থলের সমস্ত শক্তিকে কণ্ঠের ভিতর দিয়া প্রেরণ করিলেন।

অনুকূল তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া প্রভাবতীর কক্ষে ঢুকিয়াই বলিলেন, "ওরে বাপ রে, বেরোও, বেরোও।"

"বেরোব কি, খোকা যে ও ঘরে" বলিয়া তিনি বিকৃত স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন অনুকূল মালকোঁচা বাঁধিয়া দুই কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দরজার দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সাধ্য কি যে, দরজা দিয়া মাথা গলান? আগুনের ঝলকে চুল পুড়িয়া এবং ধোঁয়ায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া তিনি হটিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তখন প্রভাবতী দেবরকে ঠেলিয়া নিজে ঢুকিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারও চেষ্টা ঐ একই কারণে ব্যর্থ হইল। ও দিকে সুশীলের তীব্র করুণ চীৎকার, এ দিকে তাঁহাদের তুমুল আর্ত্তনাদের সঙ্গে বার বার নিষ্ফল চেষ্টা যখন কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে, তখন সহসা তরঙ্গিণী একটা ঝড়ের মত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার গায়ে একটা ভিজা কাঁথা জড়ানো, চোখে উল্কার মত দৃষ্টি। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দাদা বাবু!" দূর হইতে ক্ষীণ স্বরে উত্তর আসিল, "তলীদি।" শব্দ লক্ষ্য করিয়া তরঙ্গিণী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দিল এবং কোথায় যে ডুবিয়া গেল, তাহা অনুকূল কিম্বা প্রভাবতী কেহই আর দেখিতে পাইলেন না।

এক একটা মুহূর্ত্ত এক একটা বৎসরের মত কাটিতে লাগিল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া লাফাইয়া গণিতে লাগিল, এক দুই তিন। কিন্তু বেশী গণিতে হইল না। সাত গণিবার পূর্ব্বেই তরঙ্গিণী কি যেন বুকের মধ্যে জড়াইয়া লইয়া তাঁহাদের পাশ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ঐ বুঝি খোকা? ঐ কি তাঁহাদের একমাত্র বংশের প্রদীপ? তাঁহারা সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে নামিলেন। হ্যাঁ, তাই-ই ত। তাঁদের খোকাই দু'টি কচি হাত দিয়া তরঙ্গিণীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে, আর তরঙ্গিণীও দুই হাত দিয়া খোকাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে অজস্র চুম্বন দিতেছে।

তরঙ্গিণীর কি সংজ্ঞা আছে? না। যে নশ্বর দেহের এতটুকু স্পর্শ-সুখের জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় এত দিন ধরিয়া বুভুক্ষু হইয়া ছিল, আজ সেই দেহেরই এমন সর্ব্বাঙ্গীন নিবিড় আলিঙ্গন পাইয়া তাহার বুকের প্রতি তন্ত্রীতে—হৃদয়ের প্রতি রক্তকণিকায় যে কি অনির্ব্বচনীয় উন্মাদনার সুর বহিতেছে, তাহা সে ভিন্ন আর কে বুঝিবে? তাহার এখন আর কিছু মনে নাই। সে সমাজ ভুলিয়া গিয়াছে, সংসার ভুলিয়া গিয়াছে, আপনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। তাহার কাছে এখন জাত নাই, ধর্ম্ম নাই, আচার-বিচার কিছুই নাই। একটা বিপুল অন্ধ স্নেহের বিশ্বপ্লাবিনী বন্যা তাহার হৃদয়কে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। সে যেন তাহারই কোন্ হারানো ধনকে কত দিন পরে অকস্মাৎ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

ঠোঁটে, গালে, চোখে, কপালে কি মানুষ এত চুম্বন দিতে পারে? এত প্রাণ-ঢালা অগণিত চুম্বন! প্রভাবতী ও অনুকূল

অশ্রুপূর্ণ-চোখে কেবল তাহা-ই দেখিতেছেন ; তাঁহাদের আট-চালা-ঘরের চালের উপর দাঁড়াইয়া অগ্নিদেব কি কৌতুক-হাস্যের সঙ্গে বিরাট লীলানৃত্য করিতেছেন, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন না।

পাড়ার কয়েক জন যুবক বাঁশ হাতে ছুটিয়া আসিয়া অগ্নিনির্ব্বাপণের চেষ্টা করিতে লাগিল—যাহাতে অন্য ঘরগুলি রক্ষা পায় ; কিন্তু প্রভাবতী ও অনুকূলের স্থিরবদ্ধ দৃষ্টিকে তাঁহারাও ফিরাইতে পারিলেন না।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে উন্মাদিনীর মত ও কে ছুটিয়া আসিল ? সুরমা। তিনি চকিতের মধ্যেই বুঝিয়া লইলেন, কাহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল এবং কে তাহাকে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বাঁচাইয়াছে !

তিনি ছুটিয়া গিয়া খোকার গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন যে, শরীরের কোন স্থান পুড়িয়াছে কি না। না—সে একবারেই অক্ষতশরীর। কিন্তু তরীর গায়ে দুই এক যায়গায় ফোস্কা পড়িয়াছে। তিনি বালিকার মত "তরী—তরী" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তাঁহার ক্রন্দনের ধাক্কায় শুধু তরীর নহে, অনুকূল ও প্রভাবতীরও চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। প্রভাবতী ছুটিয়া গিয়া তরীর কোল হইতে সুশীলকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখে শত শত চুম্বন দিতে লাগিলেন এবং তার পর অনুকূলও তাঁহার কোল হইতে সুশীলকে কাড়িয়া লইয়া স্নেহ-প্রকাশের ঐ এক প্রক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ইঁহারা করিলেন কি ? যাহার ছায়া মাড়াইলে নাহিতে হয়—সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় তাহাকে ছুঁইলেন ! যাহার চোখের উচ্ছিষ্ট খাইলে এক মাস কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহারই মুখের উচ্ছিষ্টের উপর অবলীলাক্রমে মুখ দিলেন !

সুরমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি তখনই বুঝিতে পারিলেন যে, কত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মানুষ তাহার ক্ষুদ্র কৃত্রিমতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিনিষেধের পাহারা দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে এবং কত সহজেই তাহা শাশ্বত সত্যের যাদুদণ্ড-স্পর্শে ভোজবাজীর মত মিলাইয়া যায়। তিনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ঈষৎ ভর্ৎসনার স্বরে প্রভাবতী বলিলেন, "হাসছিস্ কি লা, সুরো ? এর মধ্যে হাসির কি আছে ? বাছা আমার যে মরতে মরতে বেঁচে গেছে।"

সুরমা কোন উত্তর না দিয়া আরও হাসিতে লাগিল।

অনুকূল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বলি, কি জন্য হাসছো শুনি ? ভগবান্ না রক্ষা করলে যে এতক্ষণ চোখের জলে মাটী ভেজাতে।"

আরও হাসিতে হাসিতে সুরমা জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে না রক্ষা করলে ?"

"কে আবার, ভগবান্।"

"তবু ত বোঝ না যে, ভগবান্ সর্ব্বঘটেই আছেন।"

"বুঝিনা কি রকম ? চিরটা কাল বুঝে আসছি। আর বুঝি বলেই এই দেখ গায়ে কাঁটা দিয়েছে—ভক্তিতে গা থরথর ক'রে কাঁপছে—তোমার মত দাঁত বের ক'রে হাসতে পারছি না।"

মুখে কাপড় গুঁজিয়া সুরমা তাঁহার অদম্য হাসিকে চাপিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সে অবাধ্য হাসি কাপড়ের বন্ধন ভেদ করিয়া বার বার ফিক্ ফিক্ শব্দে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল।

"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে—তোমার ঘাড়ে হাসির ভূত চেপেছে।" বলিয়া অনুকূল ক্রুদ্ধভাবে মুখ ঘুরাইয়া লইলেন।

সুরমার ঘাড়ের হাসির ভূত একটু পরেই নামিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে আবার একবার ঘাড়ে চড়িয়াছিল—যখন প্রভাবতী তরঙ্গিণীকে কুলো পিটাইয়া বিদায় না করিয়া বলিলেন—"ওলো সুরো, ঘরামীদের আটচালা বাঁধা হয়ে গেলে ঢেঁকি-ঘরটাও একটু ছাইয়ে নিস্—চালের ভিতর দিয়ে যে হিম ঢোকে।"

সতীশচন্দ্র ঘটক।

সমাপ্ত

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

('শ্রীম')

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ঠাকুর এক দিন মা'র নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"মা, আমি আর বেশী বক্‌তে পারি না, তুমি গিরীশ, মহেন্দ্র, রাম, বিজয় প্রভৃতিকে শক্তি দাও, যাহাতে তাহারা এই কার্য্য করতে পারে।" শুধু তাই নয়, এক দিন ঠাকুর মাকে আবদার করিয়া বলিতেছেন—"মা, তুই ওকে এক কণা শক্তি দিলি কেন? ওঃ, বুঝেছি, ওতেই তোর কার্য্য হবে।" এইরূপে ঠাকুরের ভাবপ্রচার ও লোকশিক্ষা-কার্য্যে বিবেকানন্দ যেমন ঠাকুরের শক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন, মহেন্দ্রনাথও তাহা লাভ করিতে বঞ্চিত হন নাই। ঠাকুর বলিতেন, চাপরাস যাহাদের নাই, তাহাদের দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। কাশীপুরে ঠাকুর শেষাশেষি এক দিন নরেন্দ্র ও মহেন্দ্র দুই জনকে বসাইয়া ভক্তদের দেখাইতে লাগিলেন—প্রথম ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে দেখাইলেন, তার পর মণিকে দেখাইলেন। বুঝাইয়া দিলেন, শ্রীঠাকুর যে কে ও কি, তাহা এই দুই জনই উত্তরকালে সমানে বুঝিতে পারিবেন। বিবেকানন্দ ঠাকুরকে যে কতদূর বুঝিয়াছিলেন, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণামমন্ত্র যাহা তিনি রচনা করেন, তাহাতেই তাহা প্রকাশ। মন্ত্রটি এই—ওঁ স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য, সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে, অবতারবরিষ্ঠায়, রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।" আর মহেন্দ্রনাথ যে ঠাকুরকে কত দূর বুঝিয়াছেন, তাহারও জ্বলন্ত সাক্ষী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত। এখানেও অবতারবরিষ্ঠ, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, মায়াহত কলির জীবের তারণকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্তভাবে চিত্রিত!

মহেন্দ্রনাথ উত্তরকালে মাষ্টার ও পরে ভক্ত-সমাজে মাষ্টার মহাশয় নামে পরিচিত হন। তাহার কারণ দ্বিবিধ। যখন তিনি ঠাকুরের কাছে যাইতেছেন, তখন তিনি হেড মাষ্টার। তাই ঠাকুর তাঁহাকে 'মাষ্টোর' বলিতেন বা 'মহিন্দর মাষ্টোর' বলিতেন। তা ছাড়া ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অনেকেই যথা—বাবুরাম, নারায়ণ, পূর্ণ, তেজচন্দ্র, বিনোদ, বঙ্কিম, রাখাল প্রভৃতি তাঁহারই শ্যামবাজার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, সুতরাং তিনি প্রকৃতই ইঁহাদের মাষ্টার মহাশয় ছিলেন; ইঁহারা মাষ্টার মহাশয় বলিতেন, কাযেই উত্তরকালে ভক্তমণ্ডলীতে তিনি মাষ্টার মহাশয় নামেই অভিহিত হন। তিনি অনেকেরই মাষ্টারী করিয়াছেন এবং তাহা করিবারও তাঁহার অধিকার ছিল। এমন কি, বেলুড় মঠের বর্ত্তমান অনেক সাধু পর্য্যন্ত জীবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ ও ত্যাগের মহিমার ভাব মাষ্টার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইঁহাদেরও মাষ্টার। ঠাকুর যেমন নরেন্দ্রকে অখণ্ডের ঘর বলিতেন, তেমনই মাষ্টারকে বলিয়াছিলেন—'তোমায় চিনেছি তোমার চৈতন্য-ভাগবত পড়া শুনে, তুমি আপনার জন—এক সত্তা, যেমন পিতা আর পুত্র।' তা ছাড়া তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, বটতলা হইতে বকুলতলা পর্য্যন্ত তিনি যে চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনের দল চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে মাষ্টারকে দেখিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি কোন কোন অন্তরঙ্গের কাছে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, মাষ্টার আর কেহ নয়, চৈতন্যদেবের এক জন নিকট অন্তরঙ্গ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাষ্টার মহাশয় একবার কিছু দিন পুরীতে গিয়াছিলেন। তথায় এক দিন স্বর্গদ্বারের ওদিকে সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ সঙ্গী ভক্তকে বলিলেন, "দেখ, এই সব স্থান যেন বহু পরিচিত বলিয়া মনে হয়!" কেহ কেহ তাঁহাকে ঈষাশিষ্য St. Johnএর সহিত তুলনা করেন।

তিনি ঠাকুরের যে অতি নিকট ভক্ত ছিলেন, তাহা কিন্তু নিঃসন্দেহ। কত অবতারতত্ত্ববিষয়ক গুহ্য কথা যে তাঁহার সঙ্গে শ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—তাহা যাঁহারা শ্রীকথামৃত নিবিষ্টমনে পাঠ করিবেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন। সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই বলিয়া ঠাকুরের লীলার শেষাংশে মহেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। তাহাতে ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেন,

"সব ছাড়লে ভাগবত শুনাবে কে? তাই মা ভাগবতের পণ্ডিতকে দু' একটা পাশ দিয়ে সংসারে রেখেছেন। কিন্তু আমার কাছে যারা আসে, তারা কেউই সংসারী নয়।" শ্রীঠাকুরের কথার মর্ম্মার্থের এমন সরল ব্যাখ্যা করিতে ও ঠাকুরের কথা ধারণা করিতে মাষ্টার মহাশয়ের অপেক্ষা আর যোগ্যতর ব্যক্তি আমরা দেখিলাম না।

মহেন্দ্রনাথ তপস্যাও বড় কম করেন নাই। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ খৃঃ এই পাঁচ বৎসরকাল ছুটী বা অবসর পাইলে একটি দিনও ঠাকুরের সঙ্গ ব্যতীত অপব্যয় করেন নাই। ঠাকুর বলিতেন, নির্জ্জনে গোপনে ভগবান্‌কে ডাকতে হয়, তাঁকে ডাকবে মনে, কোণে ও বনে। মাষ্টার কলিকাতায় থাকেন, দৈনন্দিন অভ্যস্ত কর্ম্ম করেন, তিনি নির্জ্জন কোথায় পান? এই জন্য কিছু দিন তিনি ইউনিভার্সিটি হলের সম্মুখস্থ বারান্দায় প্রসন্ন ঠাকুরের মর্ম্মর-মূর্ত্তির পশ্চাতে গভীর রাত্রিতে গিয়া বসিয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিতেন। এইরূপ করিতে গিয়া এক দিন এক কনেষ্টবলের হাতে পড়েন এবং সে অবধি ওখানে যাওয়া বন্ধ করেন। আবার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম, প্রায় মাসাবধিকাল তিনি দিন-রাত দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া ঠাকুরের সঙ্গ করিয়া ও ধ্যান-জপে কাটান। উত্তরকালে ঠাকুরের অদর্শন ঘটিলে শ্রীকথামৃতের মধ্যে তিনি ডুবিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বরাহনগর মঠেও গিয়া গুরু-ভাইদের সঙ্গে থাকিতেন। কি আশ্চর্য্য, সিটি বা রিপণ কলেজে প্রফেসারের কার্য্য করিবার কালে যখন বিরাম ঘণ্টা আসিত, তখন অপিসঘরে বসিয়া ঐ ঠাকুর-চরিত-ঘটিত Diaryগুলিই পাঠ করিতেন।

এই ভাবে ১৮৮২ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তদিগের সঙ্গ ও অহর্নিশি তাঁহার কথা-রস পান করিতে করিতে যখন ১৩০৪ বা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঠাকুরের কথা প্রকাশে মা'র আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন, তখন ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে প্রথম ইংরাজীতে ১ম খণ্ড Gospel বাহির হইল। পাঠ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ লিখিলেন—Come out man,……Bravo! That is the way. রামচন্দ্র দত্ত তাঁহার তত্ত্বমঞ্জরীতে লিখিলেন—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এত দিন গুপ্ত ছিলেন, এইবার ব্যক্ত হইলেন। তবে ইংরাজীতে না লিখিয়া যদি তিনি বাঙ্গালাতে ঠাকুরের বাণী প্রচার করেন, তবেই লোকের অশেষ কল্যাণ হয়। তাহাই হইল। বাঙ্গালার শ্রীকথামৃত খণ্ডশঃ নব্যভারত, তত্ত্বমঞ্জরী, উদ্বোধন, হিন্দু পত্রিকা, সাহিত্য, জন্মভূমি, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল; এবং সেই সকল একত্রীভূত হইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক ১ম ভাগ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত প্রথম প্রকাশিত হইল। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। অনেকেই এই পুস্তককে পৃথিবীর ধর্ম্মজগতের নব সুসমাচার মনে করিতে লাগিলেন। N. N. Ghosh, 'Indian Nationএ লিখিলেন—

"The style is Biblical in simplicity. What a treasure would it have been to the world if all the sayings of Sree Krishna, Buddha, Jesus, Mahomed, Nanak and Chaitanya could have been thus preserved!"

মাষ্টার মহাশয়—মধ্য-বয়সে।

শ্রীকথামৃত ১ম ভাগ লিখনকালে মাষ্টার মহাশয় স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ী guardian tutor ছিলেন। পরে তিনি রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে তাঁহার

নাতিদের গৃহশিক্ষকও ছিলেন। তিনি যেখানে যে কোন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকুন না কেন, ঠাকুরের চিন্তা তাঁহার অবিচ্ছিন্ন ছিল এবং ঠাকুরের কার্য্যে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত দাস ছিলেন। স্বামীজী সত্যই বলিয়াছেন—এঁরা—"দাস তব জনমে জনমে"।

ক্রমে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভাগ, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে Gospel of Sri Ramkrishna মান্দ্রাজ Brahmavadin প্রেস হইতে প্রকাশিত হইল; এবং ঐ সঙ্গে শ্রীকথামৃত তৃতীয় ভাগও প্রকাশিত হইল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা অমর হইয়া রহিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভক্তগণও অমর হইয়া রহিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যথার্থই লিখিয়াছেন—

You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God.

শ্রীকথামৃত প্রকাশের ফলে অনেকেই শ্রীমকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন এই ভাবিয়া যে, কে এই মহাজন—যিনি কেবল অমৃতেরই পরিবেষণ করিতেছেন? চারিদিক্ হইতে ভক্তসমাগম হইতে লাগিল। তাঁহার নিকটে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানের ভক্ত সমাগত হইত। তাহা ছাড়া য়ুরোপ, আমেরিকা হইতে ভক্তগণ তীর্থভ্রমণে এ দেশে আসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা না করিয়া কেহই দেশে ফিরিতেন না। মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী সত্য একটি তীর্থেই পরিণত হইয়া গেল। পূর্ব্বে ঠাকুর যখন ছিলেন, তখন তিনিও তেলীপাড়ায় তাঁহার বাড়ীতে ২০শে অক্টোবর ১৮৮৪ খৃঃ উত্থান একাদশীর দিন আসেন। আর একবার মাষ্টার মহাশয়ের কলেরা রোগ হইলে ঠাকুর তাঁহার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ আবাসে দেখিতে আসেন। তাহা ছাড়া একবার মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে ঠাকুর শ্যামবাজারে বিদ্যাসাগরের স্কুলে দেখিতে আসেন—আর কোন ভাল ছেলে আছে কি না। তাঁহার দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীও মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাটীতে আসিয়া, এক একবার মাসাবধিকাল অবস্থান করিতেন। মঠের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহও তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। ১৮৮৯ হইতে ১৮৯৬।৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে এইরূপ চলিত। মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসীরা আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে উৎসবানন্দে মাতিতেন।

অধ্যাপনাকার্য্য ও শ্রীকথামৃত-প্রকাশ দ্বারা ঠাকুরের ভাবপ্রচারকার্য্য এইরূপে বরাবরই চলিতে লাগিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন, তার পর চাকুরী ছাড়িয়া নকড়ি ঘোষের পুত্রের নিকট Morton Institutionটি খরিদ করিয়া লন। উহা তখন ঝামাপুকুর লেনের মধ্যে ছিল। ক্রমে উহার ছাত্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৫০নং ভবনে উঠিয়া আসে এবং অদ্যাপিও সেইখানে আছে। বর্ত্তমানে ঐ স্কুলের নাম 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশান।'

ঠাকুরের অসুখের সময় মহেন্দ্রনাথ কামারপুকুর, জয়রামবাটী, সিওড়, শ্যামবাজারাদি তীর্থ ঘুরিয়া আইসেন। একবার দার্জ্জিলিংএ হিমালয় দর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃষ্টে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল এবং এ কথা তিনি ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন। কারণ, বুঝিয়াছিলেন—"পর্ব্বতানাং হিমালয়"ই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, তাহা দর্শনে যোগিগণের মনে ভাবোদ্রেক স্বাভাবিক! তাহা ছাড়া পুরী, বৃন্দাবন, কাশীধাম, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থেও তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে কাশী যান এবং সেখান হইতে বৃন্দাবন, কনখল, হৃষীকেশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রায় বৎসরাধিককাল কাটাইয়া আইসেন। এই সময়ে হৃষীকেশে ৭ মাস ছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরাহনগর মঠে গিয়া গুরুভাইদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে থাকিতেন বা দক্ষিণেশ্বরে Weekend কাটাইয়া আসিতেন। উত্তরদিকে নহবতের নীচের ঘরটি তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। রাত্রিতে নহবতের উপরতলায় উঠিয়া জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত ঠাকুরবাড়ী দর্শন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি কবিত্বপ্রিয় ভাবুক ছিলেন এবং চাঁদের আলোক দর্শনে শেষ পর্য্যন্ত যে কিরূপ আনন্দিত হইতেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। তিনি বলিতেন যে, এই সেই চন্দ্র—যাহা অনাদিকাল হইতে আছে ও থাকিবে। এই চাঁদ মথুরায় উঠিত, এই চাঁদ অযোধ্যায় উঠিত এবং সে দিন এই চাঁদ নদীয়ায় উঠিত, কত না অবতার-লীলার সাক্ষী এই চন্দ্র! আকাশ দেখিতে তিনি ভালবাসিতেন। সেই জন্য চারতলার ঘরটিতে বৃদ্ধলোকের

থাকাপক্ষে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও তাহা ছাড়িতে চাহিতেন না।

সাধারণ লোকের প্রায়ই বিদ্যা জাহিরের ইচ্ছা দেখা যায়। পণ্ডিতরা তর্ক করিতে ভালবাসেন। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় যেমন ঠাকুরের কাছেও মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন, তেমনই কখনও কাহাকেও তর্ক-যুক্তির বাগ্‌জাল দ্বারা নিজের মতে আনিতে চেষ্টা করিতেন না। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সুমেধা ছিলেন। কেহ তাঁহার কাছে তর্ক উঠাইলে যুক্তি-প্রমাণে তাঁহাকে কাবু করিবার উপায়

বরাহনগর মঠে—সন্ন্যাসী গুরুভাইদিগের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ

ছিল না। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে ঠাকুরের প্রচারিত ভাবময় কথা দ্বারা নিরস্ত করিতেনই। এইখানেই বুঝা যাইত যে, তিনি বাহিরে মধুর—মিষ্ট মানুষটি হইলেও ভিতরে তাঁহার ঠাকুরের প্রতি কত অনুরাগ ও সত্যের প্রতি কত প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। ঠাকুরকে সামান্য বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা কেহ করিলে বা তাঁহার প্রচলিত কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ মন্ত্রকে কেহ নিজের খেয়ালমত ঢালিয়া সাজিতে যাইলে তিনি দৃঢ়তার সহিত সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহার ঠাকুরকে তিনি Ideal man for the whole human race বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; এবং শ্রীকথামৃতে তিনি ঠাকুরের যে চিত্র সুচিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বোধ করি, এই উচ্চ আদর্শ হইতে অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রধানতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট ঠাকুরের লীলা ও শিক্ষা-বিষয়ক প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল। পরে রামকৃষ্ণচরিত ১ম ভাগ ও তৎপরে "লীলাপ্রসঙ্গ" ৫ভাগ প্রকাশিত হয়। শ্রীকথামৃত প্রকাশের পূর্ব্বে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-বৃত্তান্ত' রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত ও পরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত—এই দুইখানি বইএ ঠাকুরের জীবন-চরিত লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু লীলা না বিস্তৃত লিখিলে চরিত্র পরিপুষ্টি লাভ করে না। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত জীবনচরিত না হইলেও ইহার মধ্যে এত উপাদান ছড়ানো রহিয়াছে, যাহা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য ও মধ্য জীবনের অনেকটা আলোক ভক্তরা পাইয়াছেন। ঠাকুরের ইচ্ছায় যদি আরও ১৪ ভাগ শ্রীকথামৃত বাহির হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের আমূল ইতিহাস ভক্ত-সমাজে উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিত! কিন্তু তাহা হইল না। ৫ম ভাগ শ্রীকথামৃত প্রকাশের পূর্ব্বেই মাষ্টার মহাশয় জীবন-লীলা সাঙ্গ করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন, ভাগবত-ভক্ত, ভগবান্ একই। আমরা তাই ভক্ত মহেন্দ্রনাথের জীবন-কথা সংক্ষেপে বলিতে বসিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—যাহা এ যুগের ভাগবত, তাহার বিষয় অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক পরিমাণে বলিতে বাধ্য হইতেছি। আর মাষ্টার মহাশয়ের জীবনের কি মূল্যই বা থাকিত—যদি না তিনি শ্রীকথামৃতকার হইতেন। Gospel of Buddha এবং

New Testament গ্রন্থগুলিও মহাপুরুষের জীবনচরিত ও উপদেশ-কথার গ্রন্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সাধনবৈচিত্র্য ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাণীর যে সব বিধান, তাহা জানিতে হইলে তাঁহার দৈনিক আচরণ, তিনি কি কথা কহিয়াছেন, তাঁহার আহার, তাঁহার ভক্ত-সঙ্গে বিহার, তাঁহার গতিবিধি এ সব জানা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনসাধন করিয়াছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। ইহা পাঠ করুন, দেখিবেন, আপনি যেন সেই ঠাকুরের যুগের লোক, সেই ভগবান্ ও ভক্তমণ্ডলীতে ঘুরিতেছেন, ফিরিতেছেন। এমন জীবন্ত, জ্বলন্ত ও পরিপূর্ণ-সনাতন ধর্ম্মের মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণলীলাচিত্র আর কোনও পুস্তকে কেহ আঁকিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না এবং ঠাকুরের ছবি যেমন আজ ঘরে ঘরে পূজা হইতেছে, তেমনই সামান্যমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে কয়েক ভাগ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বিরাজ করিতেছে। এ বই নব-বেদ, নব-তন্ত্র, নব-বেদান্ত, শান্তির নির্ঝর ও সন্তপ্ত সংসারী জীবের পক্ষে মন্দাকিনীধারা! স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই আজ শ্রীকথামৃতের পাঠক। এমন কি, দেখিতেছি, আজকাল সরকার বাহাদুরের Radio station হইতেও মধ্যে মধ্যে শ্রীকথামৃত পাঠ broad-casting হইতেছে!

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মিহিজাম হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতেই মাষ্টার মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে থাকে। আহার বিশেষ কমিয়া যায়; হৃদ্‌যন্ত্রও বড় হয় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে এক এক সময় এমন বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন যে, শরীর বুঝি যায় যায়। এ দিকে শেষ শ্রীকথামৃত ৪র্থ ভাগ বাহির হয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। তার পর আরও ভাগের জন্য মঠ হইতে, শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে অনেক তাগিদ আসা সত্ত্বেও, ১৪।১৫ বৎসর ধরিয়া আর কিছুই লিখিতে পারেন নাই। হঠাৎ ৫ম ভাগের জন্য তাঁহার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল এবং সেই তীব্র ইচ্ছার বেগে ভগ্ন শরীর সত্ত্বেও ১৩৩২ সালে কতকগুলি খণ্ড লিখিয়া ৪।৫ মাসমধ্যে ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবর্ত্তক, বঙ্গবাণী, উদ্বোধন প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এইবার আবার শরীর পুনরায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, উৎসাহও প্রশমিত হইল। কিছু দিন পরে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক প্রকার Neuralgic pain নামক শূলবেদনা দেখা দিল। এই বেদনা যখন ধরিত, তখন তাঁহাকে অজ্ঞান অভিভূত করিয়া দিত, কিন্তু কিছু তাপ দিলেই বেদনা অপগত হইত। এই ভাবে ২।৩ বৎসর কাটিতেছিল। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখান হয়, কিছু কবিরাজীও করান হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গত বৎসর ১৩৩৮ শ্রাবণ মাস হইতে ৫ম ভাগ কথামৃতের জন্য আবার তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রকাশিত খণ্ডগুলি গ্রন্থিত করিতে ও আরও কিছু নূতন খণ্ড কেমন করিয়া লিখিয়া দিবেন, এই হইল তাঁহার চিন্তা। শেষে বই ছাপিতে দেওয়া হইল। লেখার সুবিধার জন্য তিনি ২।৩ মাস পূর্ব্বে ১৩।২নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনস্থ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এই বাটী ইতিপূর্ব্বেই ঠাকুরবাড়ীতে তিনি পরিণত করিয়াছিলেন। এখানে কতকগুলি সেবক ভক্তও থাকিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে ৫ম ভাগের কাপি লিখন ও মুদ্রণ কার্য্যে সহায়তা করিতেছিলেন। শুক্রবার ২০শে জ্যৈষ্ঠ তিনি শ্রীকথামৃতের কাপি লিখিয়া শেষ করেন এবং ঐ দিন দুইবার ৫০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যান। সেখানে একটি একতলার ঘরে থাকিবেন মনস্থ করিয়া ঐ ঘর পরিষ্কার করাইয়া উহাতে ঠাকুরের ছবি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া আসেন। ইচ্ছা, মধ্যে মধ্যে এ বাড়ীতেও থাকিবেন, ঠাকুর-বাড়ীতেও থাকিবেন কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। সন্ধ্যায় যেমন ভক্তরা আসেন, তেমনই আসিলেন। ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতি প্রভৃতি শেষ হইয়া গেল। ঐ রাত্রিতে ফলহারিণী অমাবস্যা উপলক্ষে কয়েক জন ভক্ত ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। মাত্র একটি সেবক রাখিয়া গেলেন। রাত্রি ১২টার সময় বেদনা আরম্ভ হইল। বেশী ঘাম হইতে লাগিল দেখিয়া সেবকটি ৫০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলেন এবং ওখান হইতে বাড়ীর লোকরা আসিলেন। নিকটস্থ পল্লী হইতে এক জন ডাক্তার আনাইয়া দেখান হইল। তিনি হৃদয় ও নাড়ীর অবস্থায় কোন উদ্বেগের কারণ নাই বলিয়া গেলেন। কিন্তু শরীর উত্তরোত্তর খারাপ হইতে লাগিল। গা-বমি-বমি আসিয়া জুটিল। সোডা দেওয়া হইল, কিন্তু সে উপসর্গ গেল না। বলিলেন, যদি বমি হয়, তবে আর রক্ষা নাই। বমিই হইল, এবং শরীর বেশী খারাপ হইয়া গেল। শেষ রাত্রিতে নিজেই বলিলেন,

আমায় নামাও, শ্বাস হইয়াছে। ৬টার সময় শেষ। শেষ কথা বলিয়াছিলেন, "গুরুদেব—মা, আমায় কোলে তুলে নাও।" জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, কারণ, দেহান্তে দেখা গেল, হাতে কর ধরা রহিয়াছে। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা, স্ত্রী ও পৌত্র-দৌহিত্রগণকে শোকে ভাসাইয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল।

অশুভ সংবাদ টেলিফোনে বেলুড় মঠে পাঠান হয় এবং অল্পকালমধ্যে সংবাদ কলিকাতায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সাধু ও ভক্তগণ চারিদিক্ হইতে আসিতে লাগিলেন। বেলা ১২টা ১টার সময় মহাপুরুষের দেহ ফুলমালা-চন্দনে সুসজ্জিত করা হইল। অতঃপর কাশীপুর শ্মশান-ঘাটে খট্টাঙ্গপরে দেহ বহন করিয়া লওয়া হইল। সেখানে ভক্তগণ যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিলেন। রাত্রি ১০টার পর ভক্তগণ ও আত্মীয়গণ এই মহাপুরুষকে কালের হাতে বিসর্জ্জন দিয়া সজল-নয়নে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তিনি চলিয়া গিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আর প্রকাশ হওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ডাইরীতে আরও ৪।৫ ভাগ পুস্তক প্রকাশিত হইবার মশলা এখনও রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীম নাই, আর কে মালা গাঁথিবেন? পঞ্চম ভাগ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে। আহা, আর যদি ২।১ মাস শরীর থাকিত, তাহা হইলে যে শ্রীকথামৃত ৫ম ভাগ প্রকাশকল্পে অপেক্ষা করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছিলেন, তাহা প্রকাশিত দেখিয়া যাইতে পারিতেন। ঠাকুর বলিতেন, অমৃত-বিন্দুতেই সিন্ধু। তিনি বঙ্গের ও ভারতের নরনারীকে যে অমৃত বণ্টন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সামান্য ও সাধারণ নহে। সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষভাবে, তথা সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁহার এই অমূল্য অবদানের জন্য তাঁহার কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী থাকিল, এবং ভবিষ্যৎ বঙ্গবাসী ও ভারতবাসী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার এই অমূল্য দান স্মরণ করিয়া শ্রীম বা 'M'এর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি চিরদিনই প্রদান করিতে থাকিবে।

শ্রীম—কাশীপুর বাগানে, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

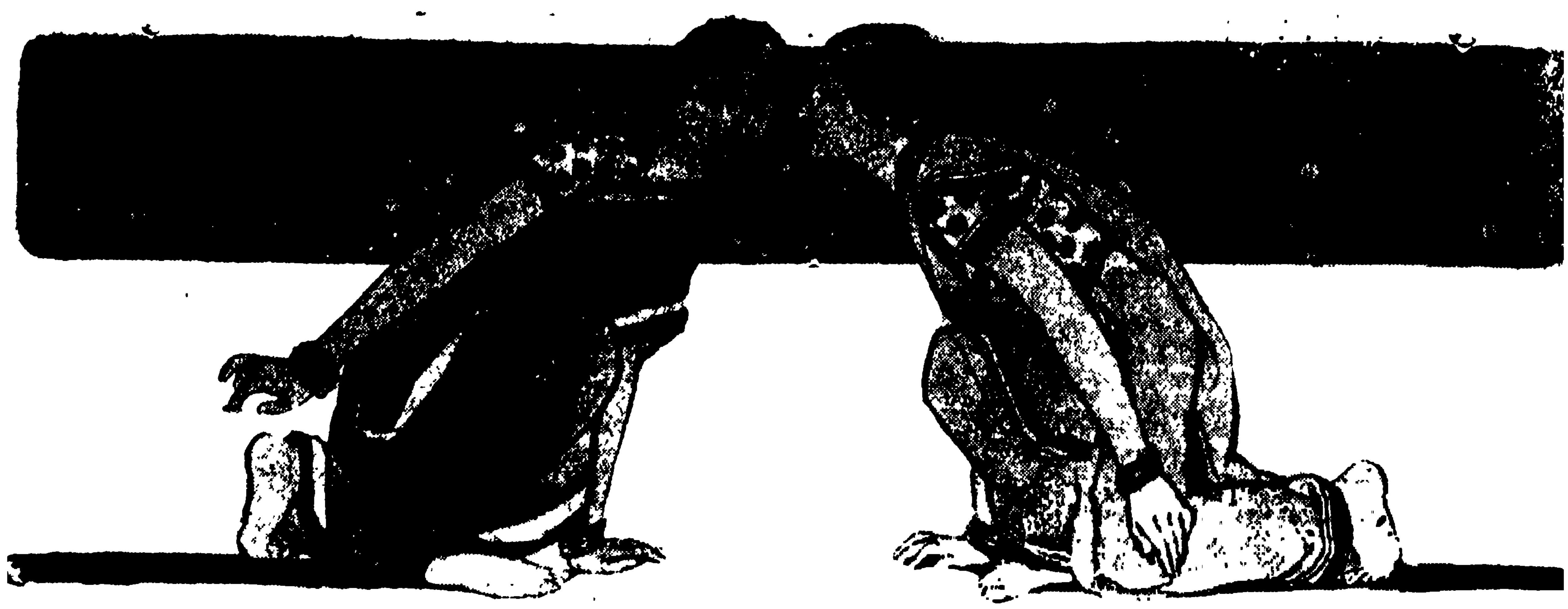

ভুলের বোঝা

১

বিপিন মুখুয্যে মাতৃহীনা কন্যা জয়ন্তীকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে পাত্রস্থ করিবার আর অবকাশ পাইলেন না। অকস্মাৎ উপর হইতে ডাক আসিতেই তাঁহাকে সেখানে হাজিরা দিতে যাইতে হইল।

তাঁহার দুইটি সন্তান। পুত্র নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ। পড়াশুনা শেষ করিয়া তিনি জামালপুর লোকো আফিসে চাকরী করিতেছিলেন। পিতা পর্ব্বতের মতই আড়াল করিয়া ছিলেন বলিয়া সংসারের কোন ধারই নিতাই ধারিতেন না। অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগে তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শোকবিমূঢ় নিতাই পিতার পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিতে না উঠিতেই প্রতিবাসিবর্গ আসিয়া প্রত্যহ অযাচিত হিতোপদেশ দিতে সুরু করিলেন।

জয়ন্তী সতের আঠার বৎসরের সুদর্শনা তরুণী। তাহার দেহ সুস্থ ও সবল। সেই দিক্‌টা অঙ্গুলীসঙ্কেতে দেখাইয়া হিতৈষিগণ যে যাহার অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মোটের উপর নিত্যানন্দ বুঝিতে পারিলেন, সহোদরাকে অবিলম্বে পাত্রস্থা করিবার জন্য ইঁহারা তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়াই তুলিবেন।

তবে বেশী দিন নিত্যানন্দকে উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হইল না। তাঁহার এক খুড়া পশ্চিমে থাকিতেন। জয়ন্তীর বিবাহের সম্বন্ধ একরূপ পাকা করিয়া তিনি চিঠি লিখিলেন।

পাত্রটি এঞ্জিনীয়ার। বয়সও ত্রিশ বত্রিশের বেশী নহে। আবার মর্য্যাদাস্বরূপ বরপণ ইত্যাদি কিছুই তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। সংবাদ শুনিয়া প্রতিবাসিবর্গ পরমানন্দে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বিস্ফারিত-নয়নে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। পাত্র এঞ্জিনীয়ার! আবার একটি পয়সা খরচ নাই—সহরের বাঙ্গালীমহলে একেবারে হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

নিত্যানন্দ অতিশয় সরল প্রকৃতির মানুষ। সংবাদটা সকলকেই শুনাইয়া দিয়া কহিতে লাগিলেন, "মশাই, দেখলেন আমার বোন্‌টির কপাল। পাত্র বড় যে সে ব্যক্তি নয়। মস্ত বড় একটা এঞ্জিনীয়ার তিনি।"

নিত্যানন্দের পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ পার্ব্বতীচরণ বোধ করি এই সুসংবাদে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার নাতনীর বিবাহপ্রস্তাব এক এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু পাত্রটিকে বরণ করিতে গেলে যে প্রভূত রজতমুদ্রার প্রয়োজন, তাহার তালিকা দেখিয়াই তিনি আর সে দিক্ মাড়ান নাই। পার্ব্বতীচরণ তাই এঞ্জিনীয়ার পাত্রের কথা শুনিয়া বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া প্রতিবেশীদিগের নিকট এমন ইঙ্গিত দিলেন যে, তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। পাত্রটি যে প্রকৃতই এক জন এঞ্জিনীয়ার, সে সংবাদটা জানা কি পাঁচ জন হিতৈষীর কর্ত্তব্য নহে?

প্রতিবাসীরা কোমর বাঁধিয়া গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এ দিকে নিতাই তাঁহার খুল্লতাতের উপর বিবাহের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আসন্ন শুভকর্ম্মের উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

নিতাই খুল্লতাতের পত্রে জানিয়াছিলেন, পাত্রপক্ষ কন্যার ফটো দেখিয়াই সন্তুষ্ট। সুতরাং প্রথামত পাকা দেখার কার্য্য বিবাহের পূর্ব্বেই করিলে চলিবে। খুল্লতাত স্বয়ং পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কন্যাপক্ষের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বিবাহের দিন বরপক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাত্রীর আশীর্ব্বাদ তাড়াতাড়ি হইয়া গেল। বিবাহসভায় বর আসিয়া বসিল। সম্প্রদানের পূর্ব্বে কন্যাপক্ষের এক জন প্রতিবেশী একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন। নিত্যানন্দের খুল্লতাত অকস্মাৎ অসুস্থ হওয়ায় বিবাহ বাড়ীতে আসিতে পারেন নাই। প্রতিবেশীদিগের এক জন বরপক্ষকে সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন, "কালী বাবু উপস্থিত থাকলে তাঁকেই আমরা জিজ্ঞাসা ক'রে নিতাম; কিন্তু তিনি যখন উপস্থিত নাই, তখন আপনারাই বলুন, পাত্রটি কি সত্যই এঞ্জিনীয়ার?"

কথাটার মধ্যে যে নীচ ইঙ্গিত ছিল, তাঁহার বলিবার ভঙ্গী ও মৃদুহাস্যে তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বরপক্ষ এই অশিষ্ট ইঙ্গিতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন উভয় পক্ষে গালাগালি হইতে ক্রমে হাতাহাতি আরম্ভ হইল। বিবাহ বুঝি পণ্ড হইয়া যায়।

অকস্মাৎ বর আসনের উপর সোজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল। তিনি শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আমি এঞ্জিনীয়ার নই। সামান্য ঠিকাদারী করতে আরম্ভ করেছি মাত্র।"

কন্যাপক্ষ প্রবল হাস্য এবং অপর্য্যাপ্ত শ্লেষ-বিদ্রূপে বাড়ীটাকে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। পার্ব্বতী মুখে কিছুই বলিলেন না; নিঃশব্দে ধূমপান করিতে করিতে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। বরযাত্রীরা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। নিতাই সম্প্রদান করিতে বসিয়াছিলেন, তিনি দুই হাতে মুখ আবৃত করিলেন। পাত্রীর আসনে বসিয়া লজ্জা ও ধিক্কারে জয়ন্তীর মাথা আরও নত হইয়া পড়িল।

নিত্যানন্দের আফিসের এক জন উচ্চপদস্থ প্রবীণ কর্ম্মচারী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনিই শেষ পর্য্যন্ত দুই পক্ষকে শান্ত করিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া দিলেন।

বর-কনে উঠিয়া বাসরঘরের দিকে চলিল। মহিলারা তখনও স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। গোলোকের মা পাড়ার ঠানদিদি। তিনি এক পাশে দাঁড়াইয়া কঠোর দৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিলেন। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার দুগ্‌গো পিবৃতিমের মত মেয়েকে কি না একটা দমবাজের হাতে দিল!"

বর-কনে তখন পাশ দিয়া চলিয়াছিল। উত্তরীয়টায় টান পড়ায় বর ফিরিয়া চাহিলেন। জয়ন্তী প্রবল চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিয়া টলিতে টলিতে বাসরঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

পাশের ঘরে বরের আহারের স্থান হইয়াছিল। বর তখন সবে আহারে বসিয়াছেন। জয়ন্তী এক পাশে চোখ বুজিয়া নিদ্রিতের মত এ ঘরে পড়িয়াছিল। পার্ব্বতীর নাতিনী শ্রীমতী, জয়ন্তীর বাল্যসখী। শ্রীমতীর স্বামী জেলা বোর্ডের ওভারসিয়ার। তাহারই গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, "ঠিকেদারগুলো এমনি ক'রে মিছে কথাই বলে। এর জন্য আমার কর্ত্তার কাছে কত যে বকুনী ওরা খায়। এই দেখ না, ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করতে এসে কি লাঞ্ছনাটাই না মানুষটার হ'ল?"

উপস্থিত মহিলা-বৃন্দ সকলেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। বিষয়টাকে লঘু করিবার জন্য কে এক জন প্রতিবাদ করিয়া উঠিতেই বরবেশী প্রমথ আসিয়া আহারান্তে বাসরঘরে প্রবেশ করিলেন। কথাটি তাঁহার কাণে গিয়াছিল। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "সত্যিই আমরা বড় কৃপার পাত্র।"

ওভারসিয়ার-গৃহিণী আনন্দে আত্মহারা হইয়া সকলেরই মুখের দিকে চাহিয়া লইল। পাত্রীর নিকটে যে সকল আত্মীয়া ছিলেন, তাঁহাদের মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া পড়িল।

জয়ন্তী ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করিয়া শ্রান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করছে। দিদি, এক গেলাস জল দাও।"

স্বামীর ভোজনপাত্রে আহার করাই অত্রকার রীতি। জয়ন্তী আহারে বসিল বটে, কিন্তু গলাধঃকরণ করিতে পারিল না। আহার্য্যগুলি ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে সেই থালার উপরেই আচ্ছন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িল। মেয়েরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তে বাড়ীতে যেন একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। মেয়ে পুরুষ যে যেখানে ছিল, সকলেই ছুটিয়া আসিল। নিতাই বাবু ছুটিয়া আসিয়া সহোদরার সংজ্ঞাহীন বিবর্ণ মুখের পানে তাকাইয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। দুই হাতে বুক চাপিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরের বারান্দায় ইতিমধ্যেই পুরুষ ও মহিলাগণের ভীড় জমিয়া গিয়াছিল। নিত্যানন্দ তাহাদের শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন, "খুড়োমশায় সদাশিব মানুষ! জোচ্চুরী ক'রে তাঁকে ঠকিয়েছে।"

ঠানদিদি পূর্ব্বেই আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন;—"বলি, ঐ ষাঁড় উচ্ছুগ্‌গু করবার আগে চোখ দুটো তোর ছিল কোথায়, তাই শুনি? এখন মানের ঘেন্নায় মেয়ে যদি আমার আত্মঘাতীই হয়, তুই তখন করবি কি?'

প্রত্যুত্তরে নিতাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "ঐ জীব আমি ধ'রে আনতে বলেছিলাম!"

বর প্রমথ তখন জয়ন্তীর পার্শ্বেই চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, বাক্যবাণ চারিদিক্ হইতে অশ্রান্তভাবেই বর্ষিত হইলেও যাহাকে উদ্দেশ করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাঁহার মুখের একটা রেখারও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

প্রমথর দাদামহাশয় চন্দ্র বাবু বরের অভিভাবকস্বরূপ আসিয়াছিলেন। ক্রোধে ও অপমানের জ্বালায় বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "প্রমথ!"

এতক্ষণে প্রমথর প্রশান্ত মুখের উপর চিন্তার গভীর রেখাপাত হইল। কিন্তু সে পলকের জন্য। মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার দুই বাহু বুকের উপর সন্নদ্ধ করিয়া প্রশান্তকণ্ঠে বলিলেন, "ওঁদের শান্তভাবে বিষয়টা চিন্তা করবার অবকাশ কি আপনি দিতে চান না, দাদামশাই?"

জয়ন্তীর এক মাতুল মুখ ভ্যাঙ্গচাইয়া কথাটার পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "শান্তভাবেই আমরা ভেবেছি।"

মামার এই অভদ্র আচরণে সকলেই ধিক্কার দিয়া উঠিল।

প্রমথ সহজ কণ্ঠে কহিলেন, "আজকার বিচারের ভার ত আপনারই উপর, দাদামহাশয়। আপনি যে আজ কর্ত্তা।" বলিয়া কুণ্ঠিতা স্ত্রীকে দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ দিকে চেয়ে যা আদেশ করবেন, তাই হবে।"

বৃদ্ধ একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার পরম স্নেহের পাত্র এই নাতিটি যে দিন এক কথায় ৫০০্ টাকা মাহিনার চাকরীটাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সে দিন বৃদ্ধ কম আশ্চর্য্য হন নাই। কিন্তু অদ্যকার এই দৃঢ়তা দর্শনে তাঁহার সমস্ত দেহ যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পরক্ষণেই জয়ন্তীকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি প্রমথর মস্তকে স্পর্শ করিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে কহিলেন, "তুমি স্থির হও, ধীর হও, শান্ত হও,—মানুষ হও। আর চরম শিক্ষা যা, নারীকে সেই মর্য্যাদা দিতে শেখ। এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আর আমার নাই।"

জয়ন্তীর সম্পর্কীয়া দিদি মনোরমা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামীর কাছে নিষ্ফল শিক্ষা পান নাই। জয়ন্তীকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, "তুমি ভাই জন্তুর পাশে এসে একবার ব'স। তোমার বাতাস গায়ে লাগলেও জন্তু ভাল

হয়ে যাবে। আর কেউ তোমায় চিনিতে না পারলেও আমি ভাই তোমাকে চিনেছি।" বলিয়াই প্রমথর হাতখানি ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন।

২

এলাহাবাদে স্বামিগৃহে পা দিয়াই জয়ন্তীর সমস্ত আক্ষেপ ও মর্ম্মজ্বালা যেন এক নিমেষে শীতল হইয়া গেল। তাহার স্বামীর প্রকাণ্ড বাংলো, বহুমূল্য আসবাব ইত্যাদিতে তাহা পরিপাটী-রূপে সজ্জিত রহিয়াছে। সম্মুখে প্রশস্ত উদ্যান। সামান্য ঠিকাদারী করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের পক্ষে ইহা দুর্লভ। স্বামী যে নিজের দৈন্য গোপন করিয়া কাহাকেও প্রতারিত করেন নাই, বরং তিনি সরলভাবেই সত্যকে প্রকাশ করিয়া নিজের মহত্বই দেখাইয়া আসিয়াছেন, ইহার মাধুর্য্যটুকু উপলব্ধি করিয়া সে যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকের ঘাতপ্রতিঘাতে জয়ন্তীর হৃদয়ে স্বামীর উপর যে অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার আর চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না।

জয়ন্তীর এক পিসতুত ভাই তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আনন্দে বাংলোর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দেখবার মত বাড়ী তোর, সেজদি। আর কি সব দামী দামী আসবাব! আর মুঙ্গেরে সব্বাই বল্লে, জামাই বাবু খুব গরীব। ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছে।" বলিয়াই সে চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "শুধু এই জিনিষগুলোর যা দাম, তাতেই আমাদের বাড়ীর মত তিন চারিটা বাড়ী কেনা যায়, তা জানিস?" জয়ন্তীর ভিতরটা যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে সে কৃত্রিম রোস প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুই কি বোকা ছেলে রে! ওরা শুনলে আমাদের কি মনে করবে বল্ ত!"—ছেলেটি লজ্জিত হইয়া সরিয়া গেল। জয়ন্তীর মনে হইতে লাগিল, বাড়ীটাকে কোনমতে একবার মুঙ্গেরে তাহার সখীদের দেখাইয়া আনিতে পারিলে তাহার সমস্ত আক্ষেপ আজ মিটিয়া যাইত।

শাশুড়ী আসিয়া কহিলেন, "মা, এত দিন ত প্রমথর চা বামুন ঠাকুরই করছিল। আজও কি সেই করবে?"

জয়ন্তী সলজ্জ হাস্যে কহিল, "আপনি যা আদেশ করবেন, মা!"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী অপরিসীম স্নেহে পুত্রবধূকে বুকে টানিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় মুখখানি তাহার উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আজ থেকে আমি তোমার শাশুড়ী নই, তোমার মা।"

প্রমথ আরামকেদারায় অবসন্নের মত পড়িয়াছিলেন। জয়ন্তী খাবারের থালা ও চা তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া সরিয়া যাইতেছিল। প্রমথ পেয়ালাটার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "আমার ভৃগু বাবাজী সাত জন্ম চেষ্টা করলেও চায়ের এমন গন্ধটি করতে পারবে না।" বলিয়াই এক চুমুক পান করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে কহিলেন, "আঃ!"

জয়ন্তীর সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই অপরিসীম লজ্জায় চতুর্দ্দিক্ লক্ষ্য করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, "আঃ, কেউ যদি শুনতে পায়?"

প্রমথ উঠিয়া বসিয়া পরম গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "অ্যাঁ! কথা বলছে ত? আমি ত ভেবেছিলাম, পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে, শুনিতে পায় না।"

জয়ন্তী হাসি চাপিতে চাপিতে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ, আমি তাই।"

এই তাহাদের স্বামী ও স্ত্রীর প্রথম আলাপ। প্রমথ সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া ঘরটিকে যেন মুখরিত করিয়া তুলিলেন। আর এই হাস্যতরঙ্গে দুলিতে দুলিতে জয়ন্তী অপূর্ব্ব রূপ ও মাধুর্য্যে সমস্ত ঘরখানিকে উদ্ভাসিত ও স্নিগ্ধ করিয়া বাহিরে পা দিয়াই দেখিল, বাড়ীর দাসদাসীগণ ভীড় করিয়া বাহিরের বারান্দায় তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা একে একে তাহাদের মনিব ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে লাগিল। জয়ন্তী নববধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও হেতুটা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে মূঢ়ের মত তাকাইতে লাগিল।

শাশুড়ী অশ্রুসিক্ত-মুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। স্বামীর ঘরের বাহিরের জানালাটা খোলা ছিল। সেই দিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখিল, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার যে স্বামী প্রবল হাস্যকৌতুকে ঘরটাকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তিনিই দুই হাতে মাথা চাপিয়া অশান্তচরণে ঘরময় পায়চারী করিতেছেন।

স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া, অজ্ঞাতে ক্রন্দন যেন জয়ন্তীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। জয়ন্তী আর সে দিকে চাহিতেও পারিল না; কোনমতে টলিতে টলিতে নিজের ঘরে আসিয়া বিছানার উপর সে পড়িয়া রহিল।

পরদিন বেলা বাড়িতে না বাড়িতেই অনেকগুলি কুলী-মজুর আসিয়া বাংলোর আসবাবপত্রগুলি টানিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিল। এক জন গুজরাটী দাঁড়াইয়া তাহাই গণিয়া গণিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া চালান করিতেছিল। জয়ন্তী জানালায় দাঁড়াইয়া কি যে দেখিতেছিল, কিছুই তাহার ঠিক ছিল না। তাহার ভাইটি আসিয়া কহিল, "সেজদি, এ কিছু তোদের নয়! সব ঐ লোকটার! জামাই বাবুদের তা হ'লে কিছু নেই—সব ফাঁকি।"

উত্তরের প্রত্যাশায় জয়ন্তীর অঞ্চলপ্রান্ত ধরিয়া টান দিতেই সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। রুদ্ধ আবেগে মুখ-চোখ তাহার ফাটিয়া পড়িতেছিল। ভাইয়ের দিকে পলকের জন্য তাকাইয়া অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্যে ততোধিক নিকৃষ্ট একটা মাটীর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার ঘরকন্না গুছাইতে লাগিলেন। ঘরদুয়ারের শ্রী দেখিয়া জয়ন্তী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ভাঙ্গা বাড়ী; জানালা এক রকম নাই বলিলেই হয়; ছোট ছোট দরজা; মেঝেটা ভিজা। চতুর্দ্দিকে নিঃসহায়ের মত তাকাইয়া জয়ন্তীর মনে হইতে লাগিল, সে বোধ করি ব্যাধের ফাঁদে আসিয়া পা দিয়াছে। স্বামীকে যে উচ্চাসনে সে গত কল্য বসাইয়াছিল, সে যেন বালির বাঁধের মত এক নিমেষে ধসিয়া পড়িল। বিবাহ-রাত্রি হইতে এ পর্য্যন্ত স্বামীর কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া

তাহার হৃদয় প্রবল বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। এখন কেবল তাহার ভয় হইতে লাগিল, তাহাকে আটক করিয়া যদি ইহারা ফিরিয়া যাইতে না দেয় ত সে কি করিবে? ভাইটিকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিল, "আচ্ছা নীলু, এরা যদি আমায় এখানে আটক রেখে দেয়, তুই দাদাকে গিয়ে বলতে পারবি?"

নীলু নিজেও কম বিচলিত হয় নাই। সে তাহার সেজ-দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "সেজদিদি, চল, আমরা কালই মুঙ্গেরে ফিরে যাই।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রমথ হাসিতে হাসিতে আসিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রিয়তমার অত্যন্ত বেদনার স্থানটিতে আঘাত করিয়া তিনি কহিলেন, "দুই ভাই-বোনে মিলে কি ষড়্‌যন্ত্রটা হচ্ছে, তাই একবার শুনি। ফিরে যাওয়া আর হচ্ছে না।"

জয়ন্তীর মাথার ভিতর যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। পিত্রালয়ে ফিরিবার আপত্তিতে সে আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল, "সে আমি জানি। তোমাকে চিন্‌তে আর আমার বাকী নাই।"

প্রমথ এক নিমিষে নিজের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিলেন। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "মা কি আমাদের এ বাড়ীতে উঠে আসবার কারণ কিছু তোমাকে বলেন নি?"

জয়ন্তীর সমস্ত চিত্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, "ঐ কথা কি আমাকে এখন বিশ্বাস করতে হবে?"

প্রমথ মূঢ়ের মত মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বেশ, কিছু দিন এখানে থেকে নিজের চোখেই তুমি দেখে যাও।"

জয়ন্তী উচ্ছ্বসিত রোদনবেগ চাপিতে চাপিতে কহিল, "দেখতে আমার আর সাধ নাই। দেখা আমার শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাকে আটক রাখবার এ তোমার একটা ছল।"

প্রমথ কয়েক মুহূর্ত্ত ঘরময় পদচারণ করিয়া জয়ন্তীর হাত-খানি নিজের মুঠার ভিতর লইলেন; পরে ধীরে ধীরে শান্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "ভেবেছিলাম, মা হয় ত অবস্থাটা তোমাকে ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, অপরাধ আমারই হয়েছে। পূর্ব্বেই তোমাকে বলা আমার কর্ত্তব্য ছিল।"

আবেগ-কম্পিত হস্তে স্ত্রীর অঙ্গুলী কয়টি নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিলেন, "এস আমার ঘরে।" বলিয়াই তিনি একটু টান দিতেই জয়ন্তী কাঠের মত শক্ত হইয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া হাত ছাড়াইয়া কহিল, "না।"

প্রমথ বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। জয়ন্তী তাহার দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা স্বামীর মুখের উপর ছড়াইয়া দিয়া পাশের ঘরে গিয়া স্তব্ধের মত বসিয়া রহিল।

নীলু তাহার জামাই বাবুকে দেখিয়া পূর্ব্বেই সরিয়া গিয়া-ছিল। এখন তাহার সেজদিদিকে এই অবস্থায় দেখিয়া চুপি চুপি আসিয়া বলিল, "সেজদি! জামাই বাবু বুঝি তোকে কিছু বলেছে? আমাদের বুঝি যেতে দেবে না?"

এতক্ষণ জয়ন্তী কোনমতে আত্ম-সম্বরণ করিয়াছিল। এবার তাহার দুই গণ্ড দিয়া অশ্রুর ধারা হু হু করিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেটি ভয় পাইয়া গিয়াছিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "তা হ'লে কি হবে?"

জয়ন্তী অশ্রু-নিরুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল, "চুপ্ কর বলছি, নীলু! চ'লে যা আমার সুমুখ থেকে!" বলিয়াই নিজেই সে মাটীতে একবারে লুটাইয়া পড়িল।

৩

দিন তিনেক বাদে জয়ন্তী পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর ইতিহাস সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। সে কথা ভাবিতেও সর্ব্বদেহ যেন তাহার ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু কথাটা চাপা রহিল না। তাহার সেই ভাইটা সমস্তই প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার সেজদিকে যে জামাই বাবু এক দিন ভর্ৎসনা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, সেটুকুও সে বাদ দিল না। নিতাই বাবু শুনিয়া আগুন হইয়া বলিলেন, "দিনরাত ছোট লোক নিয়ে যার কারবার, সে ইতর হবে না ত হবে আবার কে?"

প্রমথ জয়ন্তীকে পৌঁছাইয়া দিয়া বিশেষ জরুরী কাযে বৈকালের গাড়ীতেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর জয়ন্তীকে লইবার জন্য আরও দুই তিনবার আসিয়াছিলেন; কিন্তু নিতাই বাবু নানারূপ ওজর-আপত্তি তুলিয়া সহোদরাকে পাঠান নাই। এমনই করিয়া বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গেল।

দীর্ঘকাল পরে প্রমথ আসিয়া ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার মাতা অতিশয় পীড়িতা, স্ত্রীকে না পাঠাইলে চলিবে না।

নিতাই বাবু শুনিয়া একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন; ভালমন্দ একটা কুশলপ্রশ্নও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না।

রাত্রিতে স্ত্রীকে নির্জ্জনে পাইয়া প্রমথ কহিলেন, "মা তোমাকে কি ভালই যে বেসেছেন! এত বড় ব্যামোতে পড়েও সেই এক কথা—'আমার মেয়েকে এনে তুই দে, প্রমথ। তুই তাকে নিশ্চয় আমার কথা ভাল ক'রে জানাস্ নে'।" বলিয়াই জামার পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিতে করিতে পুনশ্চ কহিলেন, "তুমি পাশে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেও বোধ করি অর্দ্ধেক জ্বালা তাঁর জুড়িয়ে যাবে।"

জয়ন্তী ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মৃদুস্বরে কহিল, "একটা ঝি রাখলেও সে কাযটা হ'তে পারবে।"

প্রমথ স্নিগ্ধ হাস্যে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ওগো মশাই, সে হয় না। তাঁর যে ঝিটি আছে, তাকেই তিনি চান, বুঝলে?" বলিয়াই হাসিতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে পত্রখানি পরম আগ্রহের সঙ্গে জয়ন্তীর হাতে তিনি গুঁজিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই এখন দলা পাকাইয়া অবজ্ঞাত অবস্থায় স্ত্রীর পায়ের কাছে পড়িয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য একটা উদ্বেগের ছায়া প্রমথর মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আমার মায়ের লেখাটাকে এতদূর অশ্রদ্ধা করতে তুমি পার?"

স্বামীর এই দৃঢ়স্বর অকস্মাৎ জয়ন্তীর মাথায় যেন আগুন জ্বালাইয়া দিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্গত

রইল। সে কহিল, "পারি। কি ডাকবার নেমন্তন্ন পত্তর আমি পড়ি না!"

প্রমথ আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন। কহিলেন, "আমাকে যা তোমার খুসী, তাই তুমি বলতে পার, কিছু যায় আসে না; কিন্তু আমার মুখের উপর দাঁড়িয়ে আমার মাকে যদি তুমি এমন ক'রে অশ্রদ্ধা কর, সে আক্ষেপ—"

জয়ন্তী তাঁহার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া শ্লেষভরে কহিল, "আক্ষেপ হ'লে কি করবে তুমি? অপমান?"

প্রমথ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ জয়ন্তী রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিল, "এ আমার দাদার বাড়ী।" বলিয়াই সে উচ্ছ্বসিত রোদনবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

শীতের রাত্রি গভীর না হইলেও বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত হইয়াছিল, সমস্ত বাড়ীটা নীরব, নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ ক্রন্দন-শব্দে নিতাই বাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, জয়ন্তী দেয়ালে পিঠ দিয়া কাঁদিতেছে।

এই ভগিনীপতির উপর কোন দিনই নিতাই বাবু প্রসন্ন ছিলেন না; বরং তাঁহাকে ইতর অভদ্র বলিয়াই তাঁহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ক্রোধবহ্নি ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল। এখন সেই অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। ঐ বর্ব্বরটার অপমানের জ্বালায় যে তাঁহার ভগিনী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইয়া তাঁহার হিতাহিতজ্ঞান আর রহিল না।

জয়ন্তীকে শান্ত করিয়া ফিরাইয়া লইবার জন্য প্রমথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। নিতাই তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমার বোন্‌কে—"

বলিয়াই অসহ্য ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

প্রমথ তাঁহাকে শান্ত করিবার মানসে অগ্রসর হইয়া আসিতেই নিতাই ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় পিছাইয়া আসিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া কহিলেন, "ভেবেছ, তোমার জোচ্চুরী আমরা জানি না, শর্ম্মারাম সব খবর রাখেন। পরের বাংলো দেখিয়ে আমার খুড়োকে ঠকিয়ে বিয়ে করেছিলে; কিন্তু আমাকে পারবে না।" বলিয়াই দক্ষিণ হস্ত বাহিরের দরজার দিক্‌টায় প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে!"

চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর যে যেখানে ছিল, আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এমন কি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিও লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। এক জন জয়ন্তীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "পিসেমশাইকে বাবা খুব মেরেছে, না?" তাহার ছোটটা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। সে কহিল, "তলে দাও না, পিতে মত্তাই।"

পাশের বাড়ীটা পার্ব্বতীর। তিনি হুঁকা হস্তে আসিয়া নিতাইকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া তিনি সোজা হুকুম দিলেন, "কাণটা পাকড়ে ঐ কুলীর সর্দ্দারটাকে ষ্টিশনে দিয়ে এস। আর দ্বিতীয় কথাটা এর মধ্যে কিচ্ছু নেই, নিতু।"

এত বড় অপমানকে বরদাস্ত করা যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন, সে সন্ধান এই মানুষটাকে না চিনিলে বুঝাই যায় না। এমন কি, নিতাই বাবুর স্ত্রী পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, "একেবারে বেহায়া মানুষ! ঘেন্না-পিত্তি ব'লে বস্তুই ওর দেহে নেই।"

শুধু মনোরমা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বউদিদি, ওঁকে চিনতে আমাদের সময় লাগবে। যে দিন চিনব, সে দিন হয় ত ওঁর নাগালই আমরা আর পাব না। এই ভয়টাই আমার হচ্ছে।"

পরদিন প্রমথ যাত্রা করিবার সময় মনোরমাকে ডাকিয়া শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "দিদি! আমার মা ওঁকে তাঁর কন্যার চেয়েও স্নেহ করেন। যদি কখনও প্রয়োজন বোধ উনি করেন, জানালে উপায় তিনি একটা ক'রে দেবেন।"

মনোরমা তাঁহার ভগিনীপতির হাতখানি ধরিয়া কহিলেন, "নারীর দাবী করবার আর স্থান যে কোথায়, এ সন্ধান যে দিন জয়ন্তী জানতে চাইবে, সে স্থানটিকে সে দিন দেখিয়ে দিতে হবে, ভাই তোমার।"

প্রত্যুত্তরে প্রমথ কিছুই বলিলেন না। নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

৪

সহোদরার অন্তরে কোন দিক্ দিয়া এতটুকু আক্ষেপ বা মর্ম্মজ্বালা স্থান না পায়, সে দিকে নিতাই বাবুর চেষ্টা ও যত্নের কোন ত্রুটিই ছিল না। স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা স্নেহের সহোদরাকে তিনি ভ্রাতৃ-স্নেহের নির্ঝরধারায় স্নিগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রমথর সহিত কোন সম্বন্ধ যে আছে, ইহার পরিচয় নিতাই বাবু ও জয়ন্তীর ব্যবহারে কেহ বুঝিতে পারিল না।

মুঙ্গেরে একটা চলচ্চিত্র কোম্পানী ছবি দেখাইতেছিল। জয়ন্তী প্রায় প্রত্যহ সখীদের গাড়ীতে চড়িয়া বায়স্কোপ দেখিতে যাইত। আজও সাজগোজ করিয়া তাহার বধূঠাকুরাণীকে গিয়া কহিল, "বউদি, গোটা চারেক টাকা দাও ত, বায়স্কোপে যাই। তুমি ত আর যাবে না! কিন্তু আজ যা ছবি দিয়েছে, প্রত্যেকের তা দেখা উচিত।"

বউদিদি কমলা মুখ ভারী করিয়া কহিলেন, "জান ত ঠাকুরঝি, কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তবে এই দেড়শটি টাকা ঘরে নিয়ে আসেন। ও রক্ত-জল-করা পয়সা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে প্রাণ থাকতে ত আমি পারব না। গেলে আমারই ত যাবে।"

জয়ন্তীর হৃৎপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করিয়া নড়িতে লাগিল। কিন্তু নত হইতে জয়ন্তী কোন দিনই শিক্ষা করে নাই। সে প্রদীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আমার দাদার টাকাই আমি খরচ করছি। কিন্তু বউদি, তোমার এত গা-জ্বালা করে কেন, তাই শুনি?"

কমলাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। জয়ন্তীর উপর তিনি খুব প্রসন্নও ছিলেন না। আজকাল তিনি জয়ন্তীকে তাঁহার সুখের ঘরকর্ণার মাঝখানে একটা উৎপাত উপদ্রবের মতই মনে করিতেন। তিনি টিপিয়া টিপিয়া কহিলেন, "কি করব, ঠাকুরঝি! আমার ত আর ভাইয়ের রোজগারের পয়সা নয় যে, মায়া থাকবে না? এ যে আমার স্বামীর রক্ত-জল-করা খাটুনির

ন কি না ?" বলিয়াই তিনি বালিসের তলা হইতে টাকা আনিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে জয়ন্তীর সখীরা অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা মোটরের শৃঙ্গধ্বনি করিতে লাগিল। আজ তাহাদিগকে বায়স্কোপ দেখাইবে বলিয়া জয়ন্তী কথা দিয়াছিল। টাকা কয়টা সে তুলিয়া লইল বটে, কিন্তু এ যে বধূঠাকুরাণীর অনুগ্রহের দান, ইহারই আঘাতে হাতখানা যেন তাহার অবশ হইয়া রহিল।

অন্যদিন জয়ন্তীই সকলকে চিত্রগুলির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিয়া থাকে। আজও চলচ্চিত্র চলিতে থাকিল। সখীরা ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া তাহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু আজ সে কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষুর সম্মুখে চিত্রগুলি লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন সকালে নিতাই বাবু বাজার করিতে বাহির হইতেছিলেন। জয়ন্তী একখানি খদ্দরের সাড়ী দেখাইয়া কহিল, "দাদা, বিষ্টু বাবুর দোকান থেকে এমনি একখানি সাড়ী আমার জন্য আনবে ?" বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, "কাল মেয়েদের স্কুলে মিটিং হবে; আমি কিন্তু প'রে যাব।"

নিতাই বাবু কহিলেন, "নিশ্চয় আনবো—তোর যখন এত পছন্দ হয়েছে।" বলিয়াই স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখি আর গোটাকতক টাকা ?"

স্ত্রী কমলা আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিয়াছিলেন। সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "ও মা, টাকা আর থাকবে কোথা থেকে ? মাসের শেষ হয়ে এসেছে।"

নিতাই বাবু নড়িয়া-চড়িয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া কহিলেন, "গোটা পাঁচ ছয় টাকাও হবে না ?"

কমলা জবাব দিলেন না। মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া টাকার থলেটা স্বামীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াই ভিতরে চলিয়া গেলেন।

নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "দেখি না হয় বিষ্টুর কাছ থেকে ধারেই নিয়ে আসবো।"

জয়ন্তী প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল; ঠিক তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলা ওখান হইতে ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "আমার বাড়ীতে ধার-কর্জ্জ ঢোকাতে তুমি পারবে না। তা কিন্তু তোমাকে ব'লে দিচ্ছি।"

নিতাই কহিলেন, "এই কয়টা দিন বৈ ত নয়।"

জয়ন্তী প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "তা হ'ক দাদা, আমি পরেই নেব।"

জয়ন্তী কুণ্ঠিত চরণে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। উপর্য্যুপরি কয়টি ঘটনায় সে বুঝিতে পারিল, এখানে তাহার দাবী কোথায় ? সে এখানে অঙ্গের গলগ্রহের ন্যায় অনাবশ্যক নহে কি ?

আগামী বৈশাখী সংক্রান্তিতে জয়ন্তীর ব্রতপ্রতিষ্ঠা ছিল। সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, দাদাকে বলিয়া একটু ঘটা করিয়াই সে উহা সম্পন্ন করিবে। সমবয়সী সখীদিগকে ইতিমধ্যে কথায় কথায় প্রকাশ করিয়াও ফেলিয়াছিল। অগ্রজকে সে বলিল, "দাদা, আমার ব্রতপ্রতিষ্ঠার কিন্তু আর পনর দিন বাকী।"

নিতাই তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, "বেশ ত, ভটচাযি্যি মশায়কে ডেকে একটা ফর্দ্দ ক'রে ফেলো! রাণীর বিয়ের কথা চলছে—তোমার বউদিদি একটু চাপাচাপি করেই এখন চলতে চান—বুঝলে কি না ?"

জয়ন্তী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আচ্ছা।" তাহার আকাঙ্ক্ষাটা সে আর অগ্রজকে প্রকাশ করিতে পারিল না।

জয়ন্তীর এক সখী স্বামীর কাছে আসামে থাকিত, আজ কয় দিন হইল, সে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। বৈকালের দিকে জয়ন্তী তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে করিয়া সখীকে দেখিতে গেল। ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সেও পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। দুই সখীতে আলাপ-আপ্যায়নের পর জয়ন্তী প্রশ্ন করিল, "কত টাকা তুই ভাই খরচ করবি ? জ্যেঠাবাবুই ত সব দেবেন ?" মেয়েটি কহিল, "কেন ? বাবা খরচ করতে যাবেন কেন ? যার কাছে চাইবার, তার কাছেই পেস্ ক'রে এসেছি।" জয়ন্তী প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, যদি তিনি না দেন ?" মেয়েটি কহিল, "তা হ'লে বুঝব, নিতান্তই তিনি পারলেন না। কিন্তু তা হবে না। আমি যে চেয়ে এসেছি।" বলিতে বলিতে চাপা হাস্যে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তার পর সখীর কাণের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "রাগের ভয় করে না ?"

জয়ন্তীর কাছে ইহা যেন অপরিচিত রাজ্যের বার্ত্তার মত বোধ হইল। অকস্মাৎ বস্ত্রাঞ্চলে টান পড়ায় জয়ন্তী মুখ ফিরাইতেই দেখিল, তাহার সখীর বৎসর দুইয়ের শিশু পুত্রটি তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। তাহার জননী বলিল, "খোকন বাবু, বল মাসীমা।" মায়ের আদরে পুত্র গলিয়া গিয়া কহিল, "ম্যা।"

জয়ন্তীর বুভুক্ষু নারীহৃদয় এই মাতৃ-সম্বোধনে সহসা বিপুলভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। একটা অভূতপূর্ব্ব ভাবরসে সে যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। সে শিশুটিকে বুকের উপর চাপিয়া, দলিয়া পিষিয়া—চুম্বন করিয়া—এমন করিয়া তুলিল যে, জয়ন্তী নিজেই বুঝিল না, সে কি করিতেছে। ছেলেটি ভয় পাইয়া কেমন করিতে লাগিল। তাহার জননী পুত্রকে ফিরাইয়া লইতে হাত বাড়াইল। কিন্তু জয়ন্তী কোনমতেই তাহাকে বুক হইতে নামাইতে পারিল না। এক একবার নামাইতে গিয়া আবার দ্বিগুণ আগ্রহে তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিল।

এক বিচিত্র উন্মাদনায় জয়ন্তীকে যেন বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার নিদ্রা আসিল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার বউদিদিকে গিয়া বলিল, "বউদি, নন্দকে দাও না, রাত্রিতে আমার কাছে থাকবে ?"

বউদিদি অধরোষ্ঠ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "তোমার যে কি কথা! ঐ শিশু থাকবে তার মাকে ছেড়ে ? আর আমিই বা ঘুমুতে পারব কেন ?" বলিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া কহিলেন, "ছেলের মর্ম্ম তুমি বুঝবে কি ক'রে, ঠাকুরঝি! ও যে কি বস্তু!"

বিছানায় পড়িয়া জয়ন্তীর সমস্ত চিত্ত প্রচণ্ড হাহাকারে আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল; তন্দ্রাঘোরে শূন্য বক্ষ তাহার

দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কতবার যে জয়ন্তী জাগিয়া উঠিল, সে কথা তাহার অন্তর্যামীই কেবল জানিয়া রাখিলেন।

৫

বৈকালে জয়ন্তী তাহার ব্রত উপলক্ষে জিনিসপত্রাদি গুছাইয়া রাখিতেছিল। তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র সম্মুখে আসিয়া কহিল, "তোমার কি পূজো হবে, পিসীমা? অনেক লোকজন আসবে বুঝি?"

জয়ন্তী হাসিয়া কহিল, "হাঁ।" বালক বালকের মতই প্রশ্ন করিল, "পিসেমশাইও আসবে?"

জয়ন্তীর মুখ বেদনায় নীলবর্ণ হইয়া গেল। ছেলেটি যে কি বুঝিল, সে কথা সেই জানে। সে কহিল, "দাও না তুমি চিঠি লিখে, নিশ্চয় আসবে।"

জয়ন্তীর সমস্ত দেহটি যেন ঝিম্-ঝিম করিতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইল, "তুই নেমন্তন্ন কর না তাঁকে।"

বালক বোধ করি মনে করিল, তাহার পিসীমাতা তাহার অক্ষমতার জন্য বিদ্রূপ করিতেছেন। সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "বাঃ! আমি বুঝি লিখতে পারি না? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি আমি তোমাকে।" বালক ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সে তাহার পিতার টেবল হইতে পোষ্টকার্ড লইয়া এবং বড় ভাইকে দিয়া ঠিকানা লেখাইয়া ঘণ্টাখানেক বাদে পিসীমাতাকে প্রমাণস্বরূপ নিমন্ত্রণপত্র দেখাইয়া দিল। জয়ন্তী মনে মনে প্রমাদ গণিল। ছেলেটিকে নিরস্ত করিতে কহিল, "তুই ত ভারি মুখ্যু। ঐ রকম ঠিকানা লেখায় চিঠি কি কখন যায়? ও কিচ্ছু হয় নি।"

বড় দাদার বিদ্যাবুদ্ধির উপর বালকটির অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে-ও তেমনই ভাবে জবাব করিল, "না, যাবে না? আচ্ছা, দেখি কেমন যায় না!"

বালক দুই লাফে বাহির হইয়া অদূরস্থিত ডাকঘরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। জয়ন্তী স্তব্ধের মত তাকাইয়া লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে লাগিল।

ব্রতপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন নিতাই বাবু জিনিষপত্র খরিদ করিয়া আনিলেন। নিতাইএর যাহা না হইলে নহে, তাহাই। জয়ন্তীর মনটা ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু আজ সে কোনরূপ মন্তব্য করিল না।

বৈকালে নিতাই বাবু হাঁকডাক করিয়া বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন, "এলাম সব নেমন্তন্ন ক'রে"।

দুই তিনটা মুটের মাথায় জিনিষপত্র। বাড়ীতে যেন ধুম পড়িয়া গেল। জয়ন্তী বাহির হইয়া আসিতেই তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "নিয়ে আয় দেখি কাগজ পেন্সিল, আর কি কি তোর চাই?"

দাদার কাণ্ড দেখিয়া জয়ন্তী অবাক্ হইয়া গেল। তাঁহাকে এতখানি উৎফুল্ল সে বহুদিন দেখে নাই। বরঞ্চ সে কাছে আসিলে তাহার এই দাদাই যেন ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেন।

নিতাই প্রদীপ্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "ওর একটা পয়সাও আমার খরচ নয়, সব তোর জয়ন্তী। পাড়ার পাঁচ জন পাঁচ রকম ব'লে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে দিল। এই দেখ, কেমন ক'রে তোর ব্রতর খবর পেয়ে তোর শাশুড়ী একশ টাকা ইন্সিওর ক'রে পাঠিয়েছে।"

জয়ন্তী দাঁড়াইয়াছিল, সহসা থামটা আশ্রয় করিয়া আত্ম-সম্বরণ করিতে লাগিল। নিতাই ভগিনীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোর সব বাড়াবাড়ি। এর চেয়ে বড় গ্রহণের স্থান মেয়েমানুষের আর আছে না কি?"

খামখানি জয়ন্তীর পাশে রাখিয়া বোধ করি পাড়াময় প্রচার করিতেই তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

এতখানি পরিপূর্ণ আনন্দ জয়ন্তী জীবনে কখনও উপভোগ করে নাই। তাহার সমস্ত দেহ যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; মাটীতে বসিয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে স্তব্ধের মত বসিয়া রহিল।

রাত্রিকালে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া খামখানি যে কতবার সে মাথায় ঠেকাইল, কতবার যে ক্ষুদ্র লিপিখানি পাঠ করিল, তাহার সংখ্যা নাই। সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। নিদ্রা ও সুষুপ্তির মাঝখানে কিসের এক অপূর্ব্ব অনুভূতি আসিয়া বার বার তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল।

পরদিন যথারীতি ব্রতপ্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি সমাধা হইয়া গেল। প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। সকলেই আয়োজন ও ব্যয়াধিক্য দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। নিতাই বাবু মহোল্লাসে সকলেরই কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "মশাই, এ কি আর নিতাইয়ের শক্তিতে কুলায়? এর একটা কাণা কড়িও আমার নয়, সব জয়ন্তীর। ওর শাশুড়ী শুনেই অমনি টাকা পাঠিয়ে তাঁর পুত্রবধূর মানটি যাতে বজায় থাকে, তার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।"

জয়ন্তী অন্তরালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। সমস্ত দিন শুনিয়াও যেন তাহার ইচ্ছার নিবৃত্তি হইতেছিল না।

নিতাই বাবুর বড় ছেলে বাহির হইতে একটা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া কহিল, "পিসীমা, তোমার নামের তার। আমি সই ক'রে নিয়েছি।"

ভিতরের লেখাটার দিকে তাকাইয়াই জয়ন্তী ঠিক বজ্রাহত মানুষের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানই রহিল না, সে কি দেখিতেছে!

ভ্রাতুষ্পুত্র কাগজখানার দিকে চাহিয়াই শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "পিসীমা! তোমার শাশুড়ী দেখছি মারা গিয়েছেন!"

এই কণ্ঠস্বরে তাহার চেতনা ফিরিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহ্য বেদনার যন্ত্রণা তাহার সমগ্র অন্তরকে পিষ্ট করিয়া দিল। "মা গো!"—বলিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে একবারে লুটাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিতেই জয়ন্তী ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "যা একটুখানি রাস্তা আমি পেয়েছিলাম, ভগবান্, তাতেও তুমি বাধ সাধলে?" ঝর-ঝর করিয়া তাহার নয়নপথে ধারা নামিয়া আসিল।

নিতাই পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃহীনা সহোদরার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন সুগভীর ব্যথার স্থানটির আজ

সন্ধান জানিয়া তাঁহার আক্ষেপ ও মর্ম্মবেদনার আর অন্ত রহিল না।

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আসন্ন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এবার তাহাকে এলাহাবাদ হইতে লইতে আসিবে, জয়ন্তীর মনে এই আশা ছিল। কিন্তু কেহ তাহার খোঁজও করিল না। শুধু মামুলী নিমন্ত্রণপত্র তাহার দাদার নামে শ্রাদ্ধের দিন দুই পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সংবাদটা নিত্যানন্দ জয়ন্তীকে শুনাইলেন বটে, কিন্তু কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না।

পাড়ার পাঁচ জন জয়ন্তীকে পাঁচ রকমের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "তোর শাশুড়ীর শ্রাদ্ধে বুঝি তোকে ডাকল না? কি আর করবি?, অদেষ্ট তোর।"

ক্রমশঃ তাহাদের সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রবল উচ্ছ্বাসে লোকের কাছে মুখ দেখানও জয়ন্তীর ভার হইয়া উঠিল।

এ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া জয়ন্তী শয্যা গ্রহণ করিল। মাসখানেক ধরিয়া পীড়ার সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্রমে সে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল।

৬

নিতাই বাবুর কন্যার বিবাহ অগ্রহায়ণে ঠিক হইয়াছিল। জয়ন্তী দেহে একটু বল পাইয়াছিল; কিন্তু তখনও সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই। তবুও সে কাযকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিল।

পাত্রীর গাত্রহরিদ্রার দিন জয়ন্তী অতি প্রত্যূষে উঠিয়া জিনিষপত্র গুছাইতেছিল। বধূঠাকুরাণী মুখ কালো করিয়া আসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরঝি, তোমার দেহ ত ভাল নয়। কায কি তোমার ভাই এত খাটুনির ভিতর গিয়ে? করবার লোক ত রয়েছে আমাদের।"

জয়ন্তী আজ অনেক দিন বাদে হাসিল। কহিল, "বউদি, রাণীর বিয়েতেও কি একটু আমোদ-আহ্লাদ করব না? এই ছাইয়ের দেহের মায়া ক'রে ব'সে থাকব? রাণী যে আমার কত আদরের, সে ত তুমি জান।"

বউদিদি তাহার কালো মুখখানি আরও কালিবর্ণ করিয়া কহিলেন, "কর তোমার যা খুসী, তাই। এ বাড়ীতে ত আমার কিছু মুখ ফুটে বলবার উপায় নাই।"

বধূঠাকুরাণীর জননী নাতনীর বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। কন্যাকে তিনি ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া বোধ করি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি চিলের মত ছোঁ মারিয়া জয়ন্তীর হাত হইতে জিনিসপত্রগুলি একরকম কাড়িয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

জয়ন্তী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তিনি বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিলেন, "না বাছা, আমার চোখের উপর এরূপ অশাস্তর কাণ্ড আমি হ'তে দেব না। সোয়ামী যাকে পরিত্যাগ করেছে, এরূপ শুভকর্ম্মে সে হাত দিতে যায় কোন্ সাহসে? উনি কি সকলকেই নিজের মত ক'রে রাখতে চান?"

বাহিরে মাতা-পুত্রী সমানভাবেই আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঘরের ভিতর জয়ন্তী কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিবাহের দিন জয়ন্তী কোনমতেই পাঁচ জনের সম্মুখে বাহির হইতে পারিল না। একটা তীব্র লজ্জা ও ভীষণ আত্মগ্লানি তাহাকে ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিল। নিতাই বাবু নিজে আসিয়া ভগিনীকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু যে সাড়া দিবে, সে তখন মাটীতে পড়িয়া লুটাইতেছিল। অগ্রজের এই স্নেহের আহ্বানে উঠিতে গিয়া সে যেন মাটীর সঙ্গে আরও বুক দিয়া পড়িয়া রহিল।

নিতাই বাবুর স্ত্রী কহিলেন, "হিংসেতে ফেটে মরছেন আমার জামাই দেখে।"

নিতাই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "হিংসেটা আবার কিসে হ'ল?"

বধূ হেতুটা প্রকাশ করিলেন না। মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন, "ও তুমি বুঝবে না। আমরা মেয়েমানুষ খুব বুঝি—ঢের দেখা আছে।" বলিয়াই দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

সমস্ত বাড়ী যখন উৎসবে মগ্ন, জয়ন্তী তখন নিজের অন্ধকার ঘরে মাটীতে পড়িয়া মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল, "হে প্রভু! হে ভগবান্! আমার অপরাধের যে অন্ত নাই, সে আমি জানি। কিন্তু এমনি ক'রে শাস্তি আমায় দিও না, ঠাকুর! আমার স্বামীর পায়ের তলায় আমায় তুমি ফেলে দাও। আর আমি কিছু চাই না। তার পর যে শাস্তি তিনি দেবেন, তাকেই আশীর্ব্বাদ ব'লে মাথা পেতে আমি নেব।"

৭

মাস ছয়েক পরে কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে নিত্যানন্দ তাঁহার জামাতাকে আনাইয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলা কোণের ঘরটায় বসিয়া তিনি নিজের এবং পাড়ার দূর-সম্পর্কীয়া শ্যালিকাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া গল্প করিতেছিলেন, কথাপ্রসঙ্গে জয়ন্তীর কথা উঠিয়া পড়িতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, পিসেমশাই থাকেন কোথায়?"

জয়ন্তী নিজের ঘরে ঢুকিতেছিল। স্বামীর সংবাদ সে বহুদিন জানে না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবারও তাহার মুখ নাই। প্রশ্নটা শুনিয়াই সে চৌকাঠের উপর পা দিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

নিত্যানন্দের স্ত্রী জামাতাকে জলখাবার দিতে ঘরে ঢুকিতেছিলেন; তিনি প্রশ্নের জবাব করিলেন, "বিয়ের সময় শুনেছিলাম, ঠিকাদারী না কি একটা করেন। প্রমথ মুখুয্যে তার নাম। এলাহাবাদে বাড়ী।"

জামাতা সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, "আমি এক ভদ্র লোকের কথা শুনেছি। তিনি কিন্তু এলাহাবাদের নয়। তবে নামটা তাঁর ঐ বটে। লক্ষ্ণৌয়ের কণ্ট্রাক্টর তিনি, পি মুখার্জ্জি ব'লে সবাই তাঁকে জানে। এলাহাবাদে তাঁর বাড়ী ছিল কি না, তা জানি না। তবে সারা লক্ষ্ণৌ সহরে তাঁর মত ধনী বাঙ্গালী আর নেই। রেলের একটা কণ্ট্রাক্ট ধ'রে অতি অল্পদিনেই এত বড় হয়েছেন।"

ইহার পর তাঁহার এই পি, মুখার্জ্জি সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিয়া তিনি বলিলেন, "লোকটার কি উদার অন্তঃকরণ। মানুষটার ডান হাতের দেওয়া দান বাঁ হাতখানি তাঁর টের

পায় না। বোধ করি, হাজারখানেক অনাথা বিধবা তাঁরই দয়ায় শুধু প্রতিপালিত হচ্ছে।"

একঘর মানুষ স্তব্ধ হইয়া এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিতেছিল। তাহারা হর্ষসূচক আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। কেবল শ্বশ্রূমাতার মুখের ভাবটা কঠিন হইয়া উঠিল।

জয়ন্তী সেই অবস্থায় দরজার উপর দাঁড়াইয়াছিল। দুই হাতে চৌকাঠ শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সে কথাগুলি শুনিতে লাগিল।

জামাতা পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "মানুষটার তেজ আছে বটে। এক জন শক্তিমান্ পুরুষ বলতে হবে। আমার ছোট কাকার সঙ্গে প্রমথ বাবু একসঙ্গে পড়েছেন। কাকার কাছে শুনেছি, উনি বিবাহের দুই চার দিন পূর্ব্বে এক কথায় পাঁচশ টাকা মাইনের এঞ্জিনীয়ারীং ছেড়ে দিয়ে নিজের যা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রী ক'রে ঠিকাদারী করতে সুরু করেন।" বলিয়াই সকলেরই মুখের পানে চাহিয়া লইয়া কহিলেন, "বলুন ত কতখানি মানুষটার শক্তি, আর কত বড় তাঁর অধ্যবসায়।"

ঘর শুদ্ধ মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কেবল তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী হিংসায় পোড়া মুখখানি হাসিবার মত ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "তুমি ভুল কোরছ বাবা,—এ হবে সেই মানুষ? দেবতা আর বাঁদর? আমাদের যিনি, তিনি একটা দম্‌বাজ।"

জামাতা বলিলেন, "তা হবে।" তার পর তিনি তাঁহার ছোট কাকার মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "আপনার কথাই ঠিক। ছোট কাকা বলেছেন, প্রমথ বাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত বড় তিনি হলেন কি ক'রে? তাতে না কি তিনি কাকাকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর তৈলচিত্রখানি দেখিয়ে বলেছিলেন, তাঁর দরিদ্রতাই তাঁর গৃহলক্ষ্মীকে সরিয়ে দিয়েছে। সেই দুর্দ্দশাকে তাড়ানই ছিল তাঁর পণ।"

ঘরের মানুষগুলি এতক্ষণে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সকলেই একবাক্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মেয়েমানুষের কপালে কি এত সুখ সয়! তাই স'রে চ'লে গিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যিমানী বলতে হবে—যার ছবির এত মান। না জানি, সে মানুষটাকে কি সোনার চোখেই তিনি দেখেছেন।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মুখের কালো ভাবটা কাটিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছিল, এতক্ষণে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিয়া তিনি যেন বাঁচিয়া গেলেন। খাবারের থালা হাতে করিয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় তিনি কহিলেন, "ওর হবে সেই কপাল?—ঐ আবাগীর হবে এমন স্বামী!—একটা জোচ্চোর বাটপাড় সে।"

জয়ন্তীর বুকের ভিতর তখন প্রলয়কাণ্ড চলিতেছিল। এঞ্জিনিয়ারীং পরিত্যাগ করিয়া কনণ্ট্রাক্টরীর ইতিহাস স্বামী ত এক দিন অকপটে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জয়ন্তীর দেহের প্রতি শোণিত-বিন্দু প্রচণ্ড উন্মাদনায় প্রত্যেক শিরায় শিরায় নৃত্য করিয়া ছুটিতে লাগিল।

জয়ন্তী রুদ্ধ ক্রন্দনবেগকে সংবরণ করিতে পারিল না। সে বুকে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বধূঠাকুরাণী তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। অন্ধকারে প্রথমটা ঠিক পান নাই। ক্রন্দনশব্দে অগ্নিমূর্ত্তিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাঁহার কন্যা-জামাতাকে দেখাইয়া কহিলেন, "ঠাকুরঝি, না ব'লে ত আর পারছি না। ওদের দুটিকে দেখলেই যে তোমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়, বুক কপাল তুমি চাপড়াতে থাক, আমি মা হয়ে সহ্য করি কেমন ক'রে, তাই শুনি?"

জয়ন্তীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। এত বড় মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তাহার আর রহিল না।

বধূ ঠাকুরাণী জ্বলিতেছিলেন। মুহূর্ত্তকাল তিনি অগ্নিদৃষ্টিতে জয়ন্তীর আপাদ-মস্তক পুড়াইয়া দিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তার চেয়ে তোমার ঠিকাদার মশাইকে চিঠিপত্তর লিখে নিয়ে এসে আমোদ-আহ্লাদ কর না কেন? কেউ ত নিষেধ করছে না।"

বিদ্রূপের কশাঘাতে, শ্লেষের শক্তিশেলের ব্যথায় জয়ন্তী অস্থির হইয়া পড়িল।

হাঁ, তাহার মহা পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত ঠিকই হইতেছে। ইহা তাহার প্রাপ্য।

মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া জয়ন্তী শরবিদ্ধ মৃগীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

৮

জয়ন্তীর অন্তঃসারশূন্য জরাজীর্ণ দেহটা ক্রমশঃ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কিছু দিন হইতে তাহার বৈকালের দিকে প্রত্যহ জ্বর আসিতেছিল। আজও থামটা ঠেস্ দিয়া জ্বরের প্রতীক্ষায় সে বসিয়াছিল। এমনই সময় নিত্যানন্দ অতিশয় অবসন্নের মত বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল বিষাদাচ্ছন্ন। একটা গভীর অবসাদ তাঁহাকে যেন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া জয়ন্তী উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে, দাদা, অসুখ করে নি ত?"

ভগিনীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার দাদার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া আসিল। উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

পিতৃমাতৃহীন এই ভ্রাতা-ভগিনীর ভিতরে স্নেহ-ভালবাসার অন্ত ছিল না। দাদার মলিন মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া জয়ন্তীর দুই চক্ষু অশ্রুভারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

নিতাই জামা-কাপড় বাহিরে ফেলিয়া বোধ করি নিজেকে সংযত করিতেই বারান্দার এক কোণে তামাক সাজিতে বসিয়াছিলেন। বধূ ঠাকুরাণী আসিয়া প্রশ্ন করিয়া দাঁড়াইলেন, "হ্যাঁ গা, কি হ'ল, অমন করছ কেন?"

নিতাই আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কলিকাটাকে অনর্থক মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে কহিলেন, "করি কি আর সাধে? নিজের অদৃষ্টের কথাই ভেবে ভেবে করি।" বলিয়াই একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস চাপিতে চাপিতে কহিলেন, "ডাক্তার তারক গাঙ্গুলী তার মেয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রমথকে দেখাতে।"

সহরের ভিতর গাঙ্গুলীরা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তারক নিজেই দুই তিন হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, সেই তারক ডাক্তার তাঁহার একমাত্র কন্যাকে প্রমথর হস্তে সম্প্রদান করিবার মানসে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। এই অত্যদ্ভুত সংবাদে বধূ ঠাকুরাণী একবারে অবাক্ হইয়া গেলেন।

নিতাই স্খলিতকণ্ঠে কহিলেন,"ও দিক্‌টায় প্রমথর মত রেলের অত বড় কনট্রাক্টর ত আর নাই। আজ সে মস্ত ধনী, লাখ লাখ টাকার কনট্রাক্ট তার।" বলিয়াই জয়ন্তীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

জয়ন্তীর প্রাণটা তাহার বুকের অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইবার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহার সরলপ্রাণ, স্নেহময় দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া ইহার বাষ্পমাত্রও বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিল না। এই শূল যে তাহার অগ্রজের বুকে কতখানি গভীর হইয়া গিয়া বিঁধিয়াছে, তাহা দাদার মুখের পানে চাহিয়াই জয়ন্তী মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল। পাছে তাহার নিজের আক্ষেপ ধরা পড়িয়া সেই আঘাত আরও গুরুতর হইয়া দাদাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, এই মর্ম্মান্তিক আশঙ্কাই তাহার নিজের সমস্ত দুঃখ-বেদনাকে একবারে ছাপাইয়া উঠিল।

নিত্যানন্দের আক্ষেপ আজ মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। তিনি ভগিনীর দিকে তাকাইয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "ঐ ত আমার হাবা হাব্‌লা পাগলী বোন্। ওকে পরিত্যাগ ক'রে আর এক জনকে সে বিয়ে ক'রে ওরই চোখের উপর দিয়ে নিয়ে যাবে, এত বড় আক্ষেপ আমি সইব কেমন ক'রে?" বলিতে বলিতে দুই ফোঁটা অশ্রু টপ্-টপ্ করিয়া মাটীতে ঝরিয়া পড়িল।

এবার জয়ন্তী আর নিজেকে কোনমতেই সম্বরণ করিতে পারিল না। দাদার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে সে বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল। সে কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "পিসীমা কাঁদ্‌ছে, বাবা।"

জয়ন্তী ছেলেটিকে দুম করিয়া ফেলিয়া দিয়া বস্ত্রাঞ্চল মুখে চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিত্যানন্দ বসিয়াছিলেন, প্রবল উত্তেজনায় তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাতাল যেমন করিয়া টলিতে টলিতে পথ চলিতে থাকে, এই অভাগ্যও ঠিক তেমনই করিয়া প্রাঙ্গণময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ কবিরাজ আসিয়া কহিলেন, "কৈ গো দিদি? দেখি কেমন আছ।"

এমন সময় জয়ন্তী স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে আসিয়া দালানে উঠিল।

ঠাণ্ডা যাহাতে না লাগে, সে জন্য আজ সকালেই কবিরাজ বিশেষ সতর্ক করিয়া গিয়াছিলেন, এখন জয়ন্তীকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কত বড় আঘাতকে সহ্য করিতে না পারিয়া সে যে নিজের উপর এত বড় প্রতিশোধ লইয়াছে, সে কথা তাহার অন্তর্যামীই কেবল জানিয়া রাখিলেন। বাহিরে সে জোর করিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়াও জানিতে দিল না যে, ভিতরে তাহার কি অগ্নিকাণ্ডই না চলিতেছে।

নিতাই বাবুর স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "তুমি কি এ মানুষটাকে স্থির হয়ে দুদণ্ড বস্‌তেও দেবে না? মানুষটাকে কি খুন করতে চাও তুমি?"

নিতাইয়ের মাথার আজ ঠিক ছিল না। তিনি দ্রুতপদে আসিয়া ভগিনীর বিষাদক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া বড় দুঃখেই বলিয়া ফেলিলেন, "ওরে জন্তী! আমি তোর বড় ভাই, গুরুজন। এই সন্ধ্যাবেলায় আশীর্ব্বাদ করছি, তুই মর্ মর্ মর্!" বলিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিতাইয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আসিয়া কহিল, "বাবা! ইনি লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন পিসীমাকে এলাহাবাদে নিয়ে যাবেন ব'লে।"

অকস্মাৎ তিনটা মানুষ যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত চাহিয়া পড়িল। নিতাই "এঁ্যা" বলিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই একটি ১৭।১৮ বৎসরের যুবক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সংক্ষেপে প্রমথর সহিত তাহার সম্বন্ধটা উল্লেখ করিয়া কহিল, "দাদা বউদিকে নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন।"

নিতাই ছেলেটিকে দুই বাহু দিয়া যেন বুকের ভিতর ভরিয়া ফেলিলেন। আর্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "আমাদের কথা তোমার দাদার হঠাৎ মনে পড়ল যে, বীরেন? আমার ভাগ্য ত সেরূপ নয়।"

বীরেন সঠিক খবর জানিত না। তবুও সে যাহা অনুমান করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া কহিল, "সে কথা ত আমি বলতে পারি না, বড়দা! বোধ করি, মুঙ্গের থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁহাদেরই মুখে বউদির দেহের অবস্থা দাদা শুনেছেন। একখানা চিঠিও কে যেন দাদাকে লিখেছে।"

জয়ন্তী ঠিক সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। এক পাও সে আর নড়িতে পারিল না। শুধু ভিতরের একটা প্রবল উত্তেজনায় সমস্ত দেহ তাহার বার বার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক বাদে জয়ন্তী যখন শান্ত হইয়া রান্নাঘরে খাবার প্রস্তুত করিতে ঢুকিল, তখন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বধূ ঠাকুরাণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্ট করিয়াই শুনাইয়া দিলেন, "ঠাকুরঝি! বোকা-বালাই তোমার মিথ্যে, তুমি ভঙ্গী ক'রে প'ড়ে থাক।"

কিন্তু এ আঘাত আজ জয়ন্তীকে স্পর্শ করিতেও পারিল না। বরঞ্চ সে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

আজ জয়ন্তী তাহার ঠাকুরপোকে আর ছাড়িতে পারিল না। তাহাকে নিজের ঘরে বসাইয়া আহার করাইল, তাহার সঙ্গে গল্প করিয়া—হাসিতামাসা করিয়া কিছুতেই যেন তাহার আকাশপাতাল-জোড়া প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইতে চাহিল না। সে ক্ষুধা যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল।

আর একটা নূতন বস্তুর আস্বাদন সে আজ অনুভব করিতে শিখিল। অবগুণ্ঠন দেওয়া কোন দিনই তাহার অভ্যাস নাই; পিত্রালয়ে দরকারও হয় না। আজ তাহার এই ঠাকুরপোর সম্মুখে সেই অঞ্চলপ্রান্ত মাথার উপর তুলিয়া দিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, এমন গৌরবের বস্তু বুঝি নারীর আর নাই। এ যাহার ঘুচিয়াছে, তাহার নারী-জন্মই বৃথা। অনভ্যাস বশতঃ মস্তক হইতে যতবারই অঞ্চল স্খলিত হইতে লাগিল,

ততবারই তুলিয়া দিবার অব্যক্ত আনন্দে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল।

আজ বৈকালের গাড়ীতে জয়ন্তী শ্বশুরবাড়ী যাইবে স্থির হইয়াছিল। খোলা দরজার সম্মুখে বসিয়া সে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তাহার তোরঙ্গ সাজাইতেছিল। দীন পিসী আসিয়া প্রশ্ন করিয়া দাঁড়াইলেন, "আজ বিকেলের গাড়ীতেই বুঝি তোর যাওয়া হবে?"

চাপা হাস্যে জয়ন্তীর মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মাথা নীচু করিয়া কহিল, "দাদা ত সেই কথা বলেই বাজারের দিকে বেরিয়ে গেলেন।"

পিসীমা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তাই যা বাছা! আর অভিমান ক'রে থাকিস্ নে। পুরুষমানুষ একটার যায়গায় যদি পাঁচটাই রাখে, কি করবি? অদেষ্ট। বাপের বাড়ী প'ড়ে থাকাও ত অপমান!" বলিয়াই একটু অগ্রসর হইয়া চাপা গলায় কহিলেন, "পারিস্ ত সেই মাগীকে ঝেঁটিয়ে বাড়ীর বের ক'রে ছাড়বি। গাঙ্গুলীরা ত মেয়ে দিতে গিয়েছিল আর কি? বাড়ীতে অমন একটা আছে শুনে কে মেয়ে দেয়? ওদের মেজ বৌ সেই কথাই ত বল্লে!"

আর এক দফা আশীর্ব্বাদ করিয়া বোধ করি বধূঠাকুরাণীকে মুখরোচক সংবাদটা জানাইতে তিনি রন্ধনশালার উদ্দেশে দ্রুতপদেই অগ্রসর হইলেন।

জয়ন্তীর বুকে যেন শক্তিশেল পড়িল। স্বামী চরিত্রহীন, এত বড় আঘাত নারী সহ্য করিতে পারে? তোরঙ্গের উপর মাথা রাখিয়া দুই হাত তাহারই উপর প্রসারিত করিয়া চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল।

রান্নাঘর হইতে তাহার বধূ ঠাকুরাণী হাসির লহরে ঘরটাকে কাঁপাইয়া দিয়া কহিলেন, "তাই বল, পিসীমা! কেলেঙ্কারী চাপা দিতে আজ বৌ নিয়ে যাওয়ার গরজ।"

নিতাই অতিশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। তাঁহার বগলে চাপা একরাশ কাপড়, দুই হাতে আরও কত কি জিনিষপত্র। "ওরে জতী! তাড়াতাড়ি ধর দেখি এগুলো" বলিতে বলিতে ভগিনীর কক্ষের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "বেশ! তুই ঘুমুচ্ছিস্। সারা দিনেও তা হ'লে গুছোনো শেষ হবে না?"

জয়ন্তী ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করিয়া অগ্রজের মুখের দিকে তাকাইল।

নিতাই কহিলেন, "নে—নে, তাড়াতাড়ি সার, গুছিয়ে টুছিয়ে শেষ ক'রে নে, বোন্। তিনটে পনরতে আবার দিন ভাল। তখন যাত্রা করতে দেরী হ'লে চলবে না। ঠিক রাইট্ সময়ে বেরুতে হবে।" বলিয়া জয়ন্তীর পাশেই জিনিষপত্তরগুলি রক্ষা করিয়া কহিলেন, "এখনও সব কেনা-কাটা শেষ হ'ল না। যাই দেখি," বলিয়া তিনি যেমন ভাবে আসিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই ভাবে বাহির হইতেছিলেন, জয়ন্তী বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, "থাক্ না দাদা, আর দরকার কি?"

নিতাইয়ের দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। তাঁহার একমাত্র স্নেহের ভগিনী শ্বশুর-ঘর করিতে যাইবে। এই অতি বড় আনন্দের দিনে আজ স্বর্গগত জনক জননীর কথা বার বার তাঁহার স্মরণ হইতেছিল। উদ্দেশে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া প্রত্যুত্তরে নিতাই কহিলেন, "ওরে, এ কি তোর দাদার কায, না সে কি কিছু বোঝে?—যাদের এ সকল গুছিয়ে দেবার কথা, আমাদের মা, বাবা বেঁচে থাকলে এ সকল তাঁরাই করতেন।" বলিয়াই কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

যাত্রার সময় "আমি যাব না" বলিয়া সেই যে জয়ন্তী দরজা বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল, আর দরজা খুলিল না। নিতাই চেঁচামেচি, রাগারাগি, শেষ পর্য্যন্ত ভগিনীকে কঠিন তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভিতর হইতে জয়ন্তী এতটুকু সাড়া পর্য্যন্ত দিল না। শুধু একটা অব্যক্ত করুণ আর্ত্তনাদ রহিয়া রহিয়া ভিতর হইতে গুমরাইয়া বাহিরে আসিতে লাগিল। গাড়ীর সময় হইয়া গিয়াছিল। ছেলেটি তাহার বউদিদিকে প্রণাম করিবার জন্য মিনতি করিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু কেহ তাহার জবাবও দিল না। শেষ পর্য্যন্ত চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া সে গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

ষ্টেশনে যাহারা পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "অত বড় ছেলে, কিন্তু ট্রেণে ব'সে সে কি কান্না। বল্লে, একেই দাদার শরীর ভেঙ্গে গিয়েছে, তার পর মাছমাংস তিনি ছোন না। বল্লে ইনফ্লুয়েঞ্জায় প'ড়ে রয়েছে। তবুও নিজে উঠে সমস্ত গুছিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার পর চোখ মুছতে মুছতে বল্লে কি জান? বউদি আসেন নি শুনলে দাদা তার আর খাড়া হ'তে পারবেন না।"

জয়ন্তী পড়িয়াছিল, সোজা হইয়া বসিল। প্রমথর বর্ত্তমান অসুস্থতার সংবাদ সে-ও কিছু শুনিয়াছিল। কিন্তু নিজের দুঃখের ভারে সে ওদিক্টা ভাবিতেও পারে নাই। অকস্মাৎ তাহার চোখ-মুখ জ্বালা করিয়া মাথার ভিতর যেন তাহার পুড়িয়া যাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে ক্ষিপ্তার মত ঘরটার চতুর্দ্দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া পরক্ষণেই দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নিতাই চুপ করিয়া পড়িয়াছিলেন। জয়ন্তী আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া যে অদ্ভুত প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইল—সেরূপ অসঙ্গত উক্তি নিতাই তাঁহার সারা জীবনে কখন কোন মানুষের মুখে শুনেন নাই। তিনি সটান উঠিয়া বসিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। জয়ন্তী তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কহিল, "এবারটির মত আমায় মাপ ক'রে অনুমতি দাও, দাদা। আর কোন দিন তোমার অবাধ্য আমি হব না।" বলিয়াই সে তাহার দাদার পা দুইখানি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিল।

নিতাই ধীরে ধীরে ভগিনীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "তাই ত! দেখি, কি করা যায়।"

৯

বিবাহের পর যে বাংলোখানির যে কক্ষে জয়ন্তীর হাত ধরিয়া প্রমথ প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন, আজও এলাহাবাদের ঠিক সেই বাংলোর সেই কক্ষে প্রমথনাথ নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিয়াছেন। আশা ও ভরসা, উদ্যম ও উৎসাহ—যেন কোন

কিছুরই লেশমাত্র সে মুখে বিদ্যমান নাই। একটা নিদারুণ অবসাদ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

মুঙ্গের হইতে তাঁহার সেই ভাইটি ঘণ্টাদুই হইল ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া সে বেচারা আর ভাল করিয়া কিছুই বলিতে পারে নাই, দরজা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়াই সে চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া গিয়াছে। এবারও সে দূর হইতেই সরিয়া যাইতেছিল। প্রমথ ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোর বউদিদি কি বড় দুর্ব্বল হয়েই পড়েছেন ?"

এ যেন কত দবদূরান্তর হইতে তিনি কথা কহিতেছেন !

ছেলেটি সহ্য করিতে পারিল না। জবাব করিতে গিয়া পাছে তাহার নিজের দুঃখ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু চক্ষু দুইটি তাহার অশ্রুর উৎসে টল-টল করিতে লাগিল।

প্রমথ ধীরে ধীরে কহিলেন, "এখানে আসা যখন তাঁর হতেই পারে না, তখন আর কোথাও হাওয়া বদলানোর ব্যবস্থাও যদি ক'রে আসতে পারতিস ! এমনি ক'রে প্রাণটাকে—"

তাঁহার কথা আর শেষ হইতে পারিল না। অকস্মাৎ প্রমথ দুই কনুয়ের উপর ভর দিয়া উঠিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার এই ভাইটি দাদার বিহ্বল দৃষ্টির হেতু নিরূপণ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া চাহিয়াই দেখিল, দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া জয়ন্তী ! "বউদি, তুমি ?" বলিয়াই অবাক্ হইয়া সে দেখিতে লাগিল।

জয়ন্তী প্রাচীরগাত্রে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সুদীর্ঘ, বর্ণ-সমুজ্জ্বল তৈলচিত্রখানি যেন তাহার দিকেই চাহিয়া হাসিতেছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রথম যৌবনের যে রূপ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তৈলচিত্রে শিল্পী তাহা সযত্নে ধরিয়া রাখিয়াছিল।

জয়ন্তীর পা টলিতেছিল। সে অগ্রসর হইতে গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই প্রমথ আসিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার মুখের পানে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া স্নেহ-করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "দেহের যে কিছু নাই আর ?—কি ক'রে ফেলেছ বল ত ?"

এই একান্ত স্নেহের স্বর জয়ন্তীর হৃদয়-বীণার প্রত্যেক তার-গুলির উপর হাত বুলাইয়া দিতেই জয়ন্তীর সমস্ত ভুলের বোঝা যেন এক নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। নিজেকে আর সে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; স্বামীর বক্ষের উপর মাথা নত হইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেই সে দেখিল, স্বামী তাহার মাথাটিকে কোলের উপর রাখিয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতে করিতে নির্নিমেষদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। সে দৃষ্টিতে স্নেহ ও প্রেমের গভীর সমুদ্র যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

রূপনারায়ণে জোয়ার

কি রূপ ধরেছ আজি রূপনারায়ণ !
কূলে কূলে ফুলে তব উন্মত্ত যৌবন,
আকুল আগ্রহভরা মিলনের আশে,
বাড়ায়ে সহস্র বাহু, সায়াহ্ন-আকাশে—
দুরন্ত বিদ্রোহ তার সহিতে না পারি,
কে যেন দিগন্ত হ'তে উঠিছে চীৎকারি,
মুহুর্মুহুঃ শঙ্কাতুর সকরুণ বাণী,
"ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও পরাভব মানি" !

যে দিকে তাকাই, দেখি শুধু জল জল,
সুনীল, ফেনিল, বক্র, উদ্দাম, উচ্ছল—
উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ সাথে, ক্রুদ্ধ অট্টহাসে
করিতেছে মাতামাতি, কেন, কার আশে
এত উন্মাদনা তব, ওগো তৃষাতুর ?
অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখি, দূর বহু দূর—
নিঃসঙ্গ শূন্যতা লয়ে কেহ ত দাঁড়ায়ে
তব পানে চেয়ে নাই, আগ্রহে বাড়ায়ে
বুভুক্ষিত দুটি বাহু, হাসে তারাদল—
সন্ধ্যাকাশে, অরণ্যেতে হাসে ফুল-ফল,
মর্ম্মরিত উত্তরের উন্মত্ত বাতাস,
হা হা ক'রে হেসে যায় শুষ্ক রুক্ষ হাস
স্তব্ধ উপকূলে তব; গাঢ় অন্ধকারে,
অবসন্ন দিনান্তের মৌন-পারাবারে,
সুখ-সুপ্ত দিগ্বলয়, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী
উড়ে যায় নিজ নিজ কুলায়েতে, ডাকি
আপন আপন সহচরে, রজনীর
ধূসর কুন্তল 'পরে ঘনায় তিমির !

শুধু তব নাহি শান্তি, এ কি অহরহ,
অশান্ত পিপাসা প্রাণে ? কোন্ বাণী কহ,
অমন অস্ফুট ক্ষুব্ধ ক্রন্দনের সুরে,
কাঁপায়ে নক্ষত্র-লোক, সারা সৃষ্টি যুড়ে
জাগায়ে প্রলয়-নৃত্য, কার অন্বেষণে,
বেড়াও বিদ্রোহ-বার্ত্তা উচ্চারি সঘনে ?
কারে খোঁজো সারা বিশ্বে ওগো সর্ব্বহারা,
ওগো রিক্ত, ওগো ব্যর্থ, সজল-সাহারা ?
আমারে বলিতে পার তার পরিচয়,
কব তারে তব নাম যদি দেখা হয় !

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, (বি, এ)।

বড় ঘর

(উপন্যাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গলিত তুষার

কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কোনো কথা নাই! জাহ্নবী দেবী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—পরি গায় ভালো,—তবে গান শোনানো সম্ভব হবে না, হার্ম্মোনিয়মটা একেবারে বেসুরো হয়ে রয়েছে। ডোয়ার্কিনের লোক এসে দেখে গেছে, তারা দোকানে নিয়ে যেতে চায়। বলে, বাড়ীতে সারানো সম্ভব নয়!

অনন্ত প্রভাতের পানে চাহিল, তার চোখের দৃষ্টিতে চাপা কৌতুক! কিন্তু প্রভাতের তখন মুখ তুলিয়া চাহিবার অবস্থা নয়। পরি ঘরে আসিতে সে মাথা নামাইয়া সেই যে দুই চোখের দৃষ্টি মেঝের জীর্ণ গালিচাটায় নিবদ্ধ করিয়াছে, প্রত্ন-তাত্ত্বিকের দৃষ্টি হইলে বোধ হয় গালিচার জন্মতারিখ অবধি নির্ণয় করিয়া ফেলিত!

লাটু সাহেব কহিলেন,—গান শিখেচে অবশ্য এঁর কাছে। ইনিও আর তেমন দেখেন না!·· আমি এত বলি, বাজনা ছেড়ে গাক্। বাজনায় আসল সুর বাধা পায়। তা ওঁদের যে কি মত···

সহাস্য ভঙ্গীতে জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—থামো। তা কখনো হয়! বিশেষ ওর এই উঠতি গলা! বাজনার সঙ্গে মিলিয়ে গলা সাধলে ও কতখানি সাহায্য পায়।

অনন্তর আর ভালো লাগিতেছিল না। নিছক কৌতুকের একটা সীমা আছে। তাও যদি সে কৌতুকে মার্জ্জিত মনের ছাপ থাকে! নহিলে পাগলের মত যা-তা বকিয়া হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি—নেহাৎ নির্জ্জীব। প্রাণ তাহাতে সাড়া তোলে না! সে বলিল—আজ আমাদের আর একটা এনগেজমেণ্ট আছে, আজ উঠি···আর এক দিন আসা যাবে। আমার বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'লে দেখবেন, ও রীতিমত cultured, এ যুগের যত কিছু liberal viewsএর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলছে। তবে ভারি লাজুক···কথাটা বলিয়া অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রভাত বিরক্ত হইল, কি এমন এন্‌গেজমেণ্ট! সে নড়িল না।

অনন্ত লক্ষ্য করিল, এবং একটু দুষ্টামির ফন্দী তার মাথায় উদয় হইল। সে কহিল,—প্রফেশর নৃপেন বাবুর ওখানে পার্টি আছে—সন্ধ্যা বেলায়। আর দেরী করা চলে না, প্রভাত···উঠে পড়ো। আর এক দিন আসা যাবে···

রাগে সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিলেও প্রভাতকে উঠিতে হইল। সে জানে, কোনো এনগেজমেণ্ট নাই, নৃপেন বাবুর গৃহে কোনো পার্টি নাই, অনন্তর সব দুষ্টামি! কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না! ইহারা কি ভাবিবেন! হয় তো

মনে করিবেন, দুটাতে ফন্দী আঁটিয়া চালাকি করিতে আসিয়াছে !···

জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—শুধু-মুখে যাওয়া হ'তে পারে না, বাবা। বিশেষ তুমি আজ প্রথম আসচো ! না, একটু বসো।

প্রভাত জাহ্নবী দেবীর পানে চাহিল, সে দৃষ্টির একটুখানি পরিমলকেও স্পর্শ করিল।

পরিমলের চোখে লজ্জার আভাস !

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রভাত কহিল,—একটু বসো অনন্ত···

কথাটা সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল। কি জানি, এই ফাঁকে অনন্ত যদি ফশ্‌ করিয়া বলিয়া বসে—আজ আর এক মুহূর্ত্ত বসা চলে না ! হতভাগা কি যে ভাবিয়াছে···

জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—তোমরা পরির সঙ্গে যাও। ওর ঘরে বসো। পরি, নিয়ে যাও মা···তোমার ছবি, লেখা —এই সব দেখাও একটু···আমি এখনি চা তৈরী ক'রে নিয়ে যাচ্ছি ! বরাত ! না হলে বয়টাকে ছুটী দেবো কেন ! একেবারে মনে ছিল না যে তোমরা আসবে। যাও মা, নিয়ে যাও, একটু বসো'গে বাবা···

রাজ্যের লজ্জা গায়ে মাখিয়া পরিমল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীর পায়ে নিজের ঘরে চলিল—অনন্ত ও প্রভাত তার অনুসরণ করিল।

ছোট ঘর। এক ধারে একখানি ছোট খাট। দেওয়ালের সামনে কৌচ, ছোট একটি ড্রেসিং টেবিল, টেবিলের উপর ব্রশ. চিরুণী, ক্রীম, পাউডারের কৌটা প্রভৃতি প্রসাধনের নানা সামগ্রী। কোণে ছোট একটি বুক-কেশ, তার পাশে রাইটিং টেবিল। দক্ষিণের দিকে দুটা খড়খড়ি খোলা। খড়খড়ি দিয়া ওধারে অনিবিড় বন দেখা যাইতেছে।

অনন্ত একটা কৌচে বসিল, বসিয়া কহিল.—কি ছবি এঁকেচেন আপনি, দেখি ··

পরি সলাজ হাসি-মুখে কহিল,—সে কিছু নয়, যত পাগলামি ! মার কথা শোনেন কেন ?

প্রভাতের বুকের মধ্যে এক রাশ কথা ! মুখ দিয়া বাহির হইবার জন্য কথাগুলা রীতিমত সংগ্রাম বাধাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু ঠোঁট দুটা প্রাণপণ বলে তাদের রুখিয়া রাখিয়াছে !

অনন্তকে কথা কহিতে দেখিয়া সে প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কহিল,—তা ছাড়া লেখেন—বললেন !

অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে প্রভাতের পানে চাহিয়া পরিমল কহিল,—তাকে লেখা বলে না, ছেলে-খেলা। একা এই বনের মধ্যে থাকি, সঙ্গী পাই না তো ! কাজেই যা-তা লিখি।

প্রভাতের পানে একবার চাহিয়া লইয়া অনন্ত কহিল,—এমনি নিঃসঙ্গতার মধ্যেই তো মন নিজেকে মুক্ত করবার সুযোগ পায়। বড় বড় লেখকরা সাধনা করেছেন এমনি নির্জ্জনে, লোকালয়ের কলরবের বাহিরে ব'সে···

প্রভাতের হিংসা হইতেছিল, অনন্তটা বেশ গুছাইয়া কথা বলিতে পারে তো ! আর সে ?

কি বলিবে ? কি কথা ? অপরিচিতা তরুণীর সামনে দাঁড়াইবার ভাগ্য তার কখনো হয় নাই। এই প্রথম ! ঘরে বোনেদের সঙ্গে যা-তা কথা কওয়া চলে ! কিন্তু পরের ঘরে অপরিচিতা তরুণী···এবং যে তরুণী কবিতা লেখেন, ছবি আঁকেন, গান গাহিতে পারেন···

মনে মনে সে দেবী বীণাপাণিকে ডাকিতেছিল, এসো দেবি, আমার কণ্ঠে অধিষ্ঠান হও ! কণ্ঠ জুড়িয়া নৃত্য করো···

অনন্তর কথায় পরি কোনো জবাব দিল না, পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল,—সারা দেহে তেমনি লজ্জা মাখিয়া !

অনন্ত কহিল,—আমার কাছে এত লজ্জাই বা কেন করছেন, বুঝি না ! আমায় তো চেনেন, আমাদের পাড়ায় যখন ছিলেন, কত দিন গেছি আপনাদের বাড়ী—আপনি তখন খুব ছোট···তা ছাড়া লেখাটা এমন নিন্দার কাজ নয়···

পরিমল কহিল,—মা'র ভারী অন্যায় ! যে আসবে, তাকেই বলবে, লেখা দেখাও !·· এ লেখা আমার খেলা বৈ আর কিছু নয়। আসল লেখার কি বা আমি জানি !

অনন্ত কহিল,—লেখক তা জানতে পারে না। এই জন্যই লেখক-মাত্রেরই প্রয়োজন হয় একদল পাঠককে। লেখার তৃপ্তি পাঠকের পড়ায়···

পরিমল কহিল,—মানি। কিন্তু আমি তো পাঠক-পাঠিকার জন্য লিখি না। আমি লিখি নিজের সময় কাটাবার জন্য !

অনন্ত কহিল,—লেখা বস্তুটার প্রথম সৃষ্টি ঐ ভাবেই হয়েছে। কিন্তু লেখা প্রসার চায়। লেখার ধর্ম্মই তাই! ইতিহাসে নজীর আছে।

পরিমল কোনো কথা না বলিয়া কুতূহলী দৃষ্টিতে অনন্তর পানে চাহিল।

অনন্ত কহিল,—মহর্ষি বাল্মীকি হঠাৎ নিভৃত বনে ক্রৌঞ্চ-বধূর দুঃখে প্রথম কাব্য রচনা করেন, সে কাব্য রচনার সময় পাঠক-পাঠিকার অস্তিত্বও তিনি কল্পনা করেন নি। তার পর লিখলেন, রামায়ণ। সমস্ত বিশ্বের লোক যুগ-যুগ ধ'রে সে কাব্যামৃত পান ক'রে আজ অমরত্ব লাভ করছেন নানা উপায়ে…

প্রভাতের তাক লাগিয়া গেল, ফাজিল অনন্ত খাশা গুছাইয়া কথা বলিতে পারে! বাঃ! এমনি কথাবার্ত্তা সে দেখিয়াছে বটে, বাঙলা মাসিকের গল্পে-উপন্যাসে! মেয়েরাও সে সব গল্পে কত বড় বড় কথা কয়! সে ভাবিত, ওগুলা লেখকদের পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বাস! আজ সে প্রথম বুঝিল, তার সে ধারণা ভুল! বাস্তব জীবনেও একালের মেয়েরা এমনি আলোচনায় সমানে কথা জোগাইতে আশ্চর্য্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন!

নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া সে কাতর হইতেছিল, এই পাণ্ডিত্যের মধ্যে সে একেবারে বিমূঢ়ের মত বাক্যহারা দাঁড়াইয়া থাকিবে? কত গল্প-উপন্যাস পড়িয়াছে, উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই সব রচনার পাতায়-পাতায় সন্ধান করিতে লাগিল, যদি কোনো কথা কুড়াইয়া এই সভায় আলোচনার মধ্যে গুঁজিয়া দিতে পারে! সে কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইল।

অনন্ত কহিল,—দাঁড়িয়ে রইলে যে প্রভাত! বসো।

পরি কহিল,—সত্যি, আমিও লক্ষ্য করি নি। বসুন আপনি…

পরির স্বরে এমন একটু মাধুরী…প্রভাত তাহা অনুভব করিল। মৃদু হাসিয়া সে কৌচের এক প্রান্তে বসিল।

অনন্ত কহিল,—তোমার কি মত, এঁর লেখার সম্বন্ধে?

প্রভাত বর্ত্তাইয়া গেল! হাসিয়া সে কহিল,—আমাদের পড়তে দেওয়া উচিত। কারণ, আমরা ওঁর বন্ধু!

অনন্ত কহিল,—শুনলেন! আপনি out-voted হয়ে গেলেন…

পরিমল কহিল,—বেশ। আপনারা অতিথি, তাই আপনাদের কথা শিরোধার্য্য করতে হলো। কিন্তু প'ড়ে ঠাট্টা করতে পাবেন না, চুপ ক'রে থাকবেন।

অনন্ত কহিল,—রাজী আছি। কি বলো প্রভাত?

হাসিয়া প্রভাত কহিল,—আমিও রাজী…

অগত্যা পরিমলকে কবিতার খাতা বাহির করিয়া দিতে হইল। একখানি খাতা। দুই বন্ধুতে খাতা লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি, পরিমল গিয়া খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইল, দৃষ্টি এই দুটি পাঠকের উপর।

হাতের অক্ষর ভালো। নানা ভাবের কবিতা। বিশ্ব-দেবতা হইতে সুরু করিয়া নদী, পাখী, প্রেম, প্রীতি, বিরহ, ব্যথা, মিলন, বাঙলা দেশ, চরকা, মহাত্মা গান্ধী—সকলেই এই মোটা খাতার পৃষ্ঠায় ছন্দের বাঁধনে বন্দী আছেন!

অনন্ত কহিল,—এমনি করেই তো সাধনা…!

প্রভাত আর এক ডিগ্রী চড়িয়া কহিল,—আন্তরিকতার যদি কোনো মূল্য থাকে কাব্য-বিচারে, তা হ'লে আমি অকপটে বলতে পারি, আপনার কবিতাগুলি তুলনা-রহিত। They are simple and sincere outbursts of a living mind!

পুলকে লজ্জায় পরিমলের দুই গালে গোলাপ ফুটিল!

খাতার একটা পৃষ্ঠায় দৃষ্টি বুলাইয়া প্রভাত কহিল,—এ কবিতাটি…I would challenge these ultra-moderners…এমন কবিতা তাদের কলমের মুখে আজও বেরোয় নি…

পরিমলের কৌতূহল সীমাহীন হইল। লজ্জার আবরণে নিজেকে আর সম্বৃত রাখিতে না পারিয়া সে কৌচের পাশে আসিল, কহিল,—কোন্‌টার কথা বলচেন?

—এই যে! প্রভাত বলিয়া অনুচ্চ স্বরে কবিতাটি পড়িতে লাগিল,—

জগৎসভায় রোল উঠেছে, শিকল ছেঁড়ো, ভাঙ্গো খাঁচা,—
বন্দী হয়ে পায়ের তলায় পড়ে থাকা—ম'রে বাঁচা!
পুরুষেরি আছে মাথা? চিত্ত দোলে দুঃখ-সুখে?
নারী—সে নয় মানুষ? বটে! পাথর ভরা নারীর বুকে?
চোখ রাঙিয়ে তোমার আদেশ পালবে নারী পুরা দমে?
যত কঠিন অসাধ্য হোক্—নয় সে যাবে জাহান্নমে!
তোমরা পুরুষ প্রভু, রাজা—নারী দাসী আজ্ঞাবহা?
চলবে না সে ফন্দীবাজী—জাগো নারী সর্ব্বসহা!

আরো যদি স্তব্ধ রহো, সেঁধোও তবে মাটীর নীচে,
মানুষ হতে চাহো যদি, ভাঙ্গো সকল বিধি মিছে।
বাংলা দেশের নারী তুমি, বারেক ছাখো নয়ন তুলে,
বিশ্ব-নারীর পরাণ পেয়ে নূতন স্রোতে উঠছে দুলে!

কবিতাটি আগাগোড়া পড়িয়া প্রভাত কহিল,—চমৎকার! এই তো চাই। না হ'লে জড় পুতুলের মত জীব, কাপড়ে নিজেকে ঢেকে প'ড়ে আছে ঘরের কোণে, জগতের কোনো খপর রাখে না,—তারা কি নারী? জীবনে পুরুষের companionshipএর দাবী তারা করবে কোন্ অধিকারে!···আপনার এ কবিতা কোনো কাগজে ছাপান নি?

পরিমল কহিল,—না।

—কেন ছাপান না?

—কোনো কাগজের সঙ্গে জানাশোনা নেই, তা ছাড়া এ কি এমন লেখা, কে-বা পড়বে!···

প্রভাত কহিল,—পড়বে না? বলেন কি! এ যারা পড়বে না, তারা ঘৃণার পাত্র, uncultured. Well, they may be···

পরিমলও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া একটা চেয়ার টানিয়া কৌচ ঘেঁষিয়া বসিল, এবং খাতাখানা লইয়া কহিল,—আচ্ছা, তা হ'লে এই লেখাটা দেখুন তো···

অনন্ত কহিল,—এমন লেখা আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন···

পরিমল কহিল,—একটা লেখা দেখাই। কর্কট মিশ্রকে জানেন?

প্রভাত কহিল,—কর্কট মিশ্র!

পরিমল কহিল,—হ্যাঁ, আজকালকার মস্ত ক্রিটিক··· বাঙলা মাসিক পত্রে, সাপ্তাহিকে তাঁর লেখা অনেক প্রবন্ধ ছাপা হয়, দেখেন নি? তাঁর আসল নাম কর্কট মিশ্র নয়, ওটা ছদ্ম নাম!

প্রভাত কহিল,—আমরা তাঁর নাম শুনি নি।

পরিমল কহিল,—কর্কট মিশ্র কচিৎ কখনো এখানে আসেন। এ খাতার কতকগুলো কবিতা তিনি ছাপাতে চান—আমি দিই নি।

প্রভাত কহিল,—না, না, না—কোথাকার কে কর্কট মিশ্র—তাকে দেবেন না! নাম শুনেই বুঝচি, vulgar কাগজ-পত্রে লিখে বেড়ায়, ঐ থিয়েটারী চুটকি-দৈনিক-গোছের বোধ হয়—

পরিমল কহিল,—না, না। তাদের 'উজ্জ্বলা' কাগজ আছে—ভারী উঁচু দরের কাগজ, নারীর সকল রকম স্বাধীনতা আর আভিজাত্য ঘোষণায় অগ্রদূত। সেই কাগজে···

তার কথা শেষ হইল না, দ্বারে একখানা ভারী মুখ এবং সে মুখে কর্কশ বাণী ফুটিল,—পরিমল···

একটু হাসিও! ছুরির ফলার মত সে-হাসি ঝিক্-ঝিক্ করিয়া উঠিল! চোখে কঠিন দৃষ্টি!

অনন্ত ও প্রভাত চকিতের জন্য সে মুখের পানে চাহিল, বিরূপতায় তাদের চিত্ত রী-রী করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই পরিমলের পানে চাহিয়া তারা দেখে, পরিমল যেন কাঠ! অমন যে উৎসাহ, পুলক—চকিতে তা' উবিয়া গিয়াছে! তাদের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না!

ভারী মুখখানা দ্বারের কাছ হইতে সরিয়া গেল।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনন্ত ও প্রভাত পরিমলের পানে চাহিল।

প্রভাত কহিল,—উনি কে?

পরিমল প্রভাতের পানে চাহিল,—ম্লান দৃষ্টি! এবং সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই জাহ্নবী দেবী আসিয়া ডাকিলেন, —ও মা পরি···

একান্ত অনিচ্ছায় পরিমল উঠিয়া দাঁড়াইল।

জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—একটু বসো বাবা···ও এখনি আসচে।

জাহ্নবী দেবী আবার পরিমলের পানে চাহিলেন,— কহিলেন,—একবার এসো মা···

পরিমল একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর প্রভাত ও অনন্তর পানে চাহিয়া মৃদু স্বরে কহিল,—একটু বসুন···

পরিমল ও জাহ্নবী দেবী বিদায় লইলে প্রভাত অনন্তর পানে চাহিল, প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি!

ঠোঁট বাঁকাইয়া অনন্তও প্রভাতের পানে চাহিল, কহিল,—রহস্য!

——

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঝঞ্ঝা দারুণ

কোনো অপরিচিতা তরুণীর সহিত আলাপ ঘটিবে, এবং তার সঙ্গে প্রভাত এমন সুমধুর আলোচনা করিবে—এ দুটি বস্তুই ছিল তার কাছে পরম বিস্ময়! কিন্তু তার চেয়েও

সে বিস্ময় বোধ করিল, একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির দ্বার-সান্নিধ্যে এই অতর্কিত আগমন, এবং সে আগমনের ফলে পরিমলের এমন চুপ করিয়া যাওয়ায় ও তার জননী জাহ্নবী দেবীর এই প্রত্যাদেশে!

বিস্ময়ের প্রথম মুখে তার মনে হইল, সে যেন কোন্ বাদশার হারেমে গোপনে প্রবেশ করিয়াছে, এবং এ প্রবেশ তার সম্পূর্ণ অনুচিত! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনন্ত কহিল,—কোনো সম্ভ্রান্ত অতিথি! বোধ হয়, তিব্বতের কন্‌সল, কিম্বা তুতিকোরিনের নবাব!

প্রভাত মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে কহিল,—কি যে বকো! সব সময় চালাকি ভালো লাগে না।

অনন্ত কহিল,—সম্প্রতি যে ভালো লাগবে না, তা আমার বোঝা উচিত ছিল। এমন সরস আলোচনায় ব্যাঘাত···

প্রভাত কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনন্ত টেবিলের উপর হইতে একখানা বাঁধানো খাতা টানিয়া লইয়া এ-পাতা ও-পাতা উল্টাইল, তার পর কহিল,—আমাদের বোধ হয় ওঠাই উচিত! কাছাকাছি গাড়ী পাবো না, অনেকখানি হাঁটতে হবে।

প্রভাত কহিল,—কিন্তু বসতে ব'লে গেলেন···

অনন্ত কহিল,—ভয় নেই। অনুমতি নিয়েই যাবো।

প্রভাত স্থির-দৃষ্টিতে অনন্তর পানে চাহিয়া রহিল। সে কি ভাবিতেছিল।

মৃদু হাসিয়া অনন্ত প্রশ্ন করিল,—কি ভাবচো?

—কিছু না।

—তবে?

প্রভাত কহিল,—কি আবার তবে! আমি—হ্যাঁ, ভাবছিলুম একটা কথা। মানে, ইনি বেশ accomplished ···polish আছে—বাপের মত নন্। তোমার কথায় ভেবেছিলুম···

অনন্ত কহিল,—আমার কথায় চিন্তার খোরাক কি এমন ছিল, তা বুঝি না। আমি কোনো গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কথা বলি নি। By way of introduction কিম্বা কিম্বদন্তীর আশ্রয় নিয়ে···কিন্তু তর্কে কাজ নেই। ওঁরা বসতে ব'লে গেছেন, বেশ, বসা যাক্!

প্রভাত কোনো কথা বলিল না—উৎকর্ণ বসিয়া রহিল। জাহ্নবী দেবী বসিতে বলিয়া গেলেন, পরিমলও বলিল, বসুন!···তাঁদের এ অনুরোধ ঠেলিয়া ফশ্ করিয়া চলিয়া যাওয়া—না, উচিত নয়! সে অনন্তর পানে চাহিল, অনন্ত সেই মোটা খাতার মধ্যে মনোনিবেশ করিয়াছে!

চারিদিক্ স্তব্ধ—শুধু দূরে কোন্ পুকুরে ধোপারা কাপড় কাচিতেছে, তাদের কাপড় আছড়ানোর শব্দ স্তব্ধতার বুকে দাগ টানিয়া দিতেছে! প্রভাতের শূন্য দৃষ্টি বাহিরের অনিবিড় বনভুমিস্থিত গাছপালার উপর নিবদ্ধ।

সহসা নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল পরিমল—তার মুখে-চোখে বিষাদের শীর্ণ রেখা! দেখিলে মনে হয়, সদ্য-জাগ্রত বনের ফুল ঝড়ের আঘাতে ম্লান হইয়া গিয়াছে! পরিমল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইল।

অনন্ত কহিল,—আপনার খাতা দেখছি···হয় তো অনধিকার-চর্চ্চা! তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি···

প্রভাত কোনো কথা কহিল না—পরিমলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন তার বুকে বাজিয়াছিল! সে শুধু দুই চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া পরিমলের পানে চাহিয়া রহিল।

অনন্তর কথায় পরিমল তার পানে ফিরিয়া চাহিল, কোনো কথা বলিল না।

অনন্ত কহিল,—কি হয়েছে, পরিমল দেবী?

সবলে উদ্যত নিশ্বাস রোধ করিয়া পরিমল মৃদু হাসিল, কহিল,—কিছু নয়···

প্রভাত কহিল,—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটু agitated···

নেত্র-পল্লব চকিতের জন্য মুদিত করিয়া পরিমল ফিরিয়া চাহিল, পরে ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া কহিল,—একটু বসুন। মা চা আনচে।

কাহারো মুখে কথা নাই! প্রভাত ভাবিতেছিল, কি এমন ঘটিল!···নিশ্চয় কোনো বেদনা পাইয়াছেন! কাহারো রূঢ় কথা! কিন্তু কি কথা? কে বলিল? ঐ প্রৌঢ়?···কে ও? কৌতূহল বাড়িল, সে কৌতূহল দাবিয়া রাখা গেল না!

প্রভাত প্রশ্ন করিল,—ইনি কে··· এখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন? আপনারা চ'লে গেলেন···

পরিমলের মুখে-চোখে ম্লান ছায়া! পরিমল কহিল,—বাবার বন্ধু, অন্নদা বাবু…

কথার সঙ্গে একটা নিশ্বাস পড়িল।

প্রভাত চুপ করিয়া রহিল, পরিমলের কথায় বহু প্রশ্ন বুকে জাগিল, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন সঙ্কোচ, কুণ্ঠা…একটি প্রশ্নও সে করিতে পারিল না!…

জাহ্নবী দেবী আসিলেন, কহিলেন,—চা এনেচি। বড় লজ্জায় পড়েচি বাবা, লোক-জন বেরিয়ে গেছে। আর এমন দেশে বাস করচি যে, দুটো মিষ্টি মিলবে, সে উপায় নেই! ভালো খাবার আনতে হ'লে সেই মাণিকতলার বাজার! কাকে পাঠাই! কে বা যায়!

অনন্ত কহিল,—তার জন্য এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন! আমরা ঘরের ছেলে, আবার আসবো।

প্রভাত বুঝিল, কিছু কথা বলা প্রয়োজন, চুপ করিয়া থাকা ঠিক নয়। সে কহিল,—আপনাদের স্নেহ পেয়েচি, সে আমাদের পরম সম্পদ! দুটো মিষ্টান্নে লৌকিকতা রক্ষা পেতে পারে, কিন্তু স্নেহ তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস!

জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—তা মানি বাবা, ঘরের ছেলে তোমরা, তোমাদের কাছে লজ্জা নেই! তবু আজ প্রথম দিন, ভালোবেসে এসেছো। এত দূরে আসায় কষ্ট কতখানি, তাও বুঝি তো!…খাওয়ানোটা শুধু লৌকিকতার জন্য নয়—কষ্ট হয়েছে, সে কষ্ট একটু…

বাধা দিয়া প্রভাত কহিল,—সে কষ্ট এবার খুব দূর হবে। আপনি মিছে কুণ্ঠা বোধ করবেন না!

জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—তার পর একটু যে বসবো, তাতেও গোল বাধলো। ঐ যিনি এসেছেন…ওঁর খুব বন্ধু—আত্মীয়ের মত, বিশেষ কাজ আছে…

অনন্ত কহিল,—না, না, কিছু মনে করবেন না। আমরা আজ উঠছিলুম, ওঁর জন্য কোনো উপসর্গ ঘটে নি!

অনন্ত প্রভাতের পানে চাহিল, কহিল,—প্রভাতকে বরং জিজ্ঞাসা করুন—আমাদের এমন দরকারী কাজ আছে, বেলাও এদিকে প'ড়ে এসেছে, আমাদের আর বসবার উপায় ছিল না!…

চা-পানান্তে দুজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। অনন্ত কহিল,—একবার ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

জাহ্নবী দেবী নিষেধ তুলিলেন,—থাক, আমি বলবো'খন—ওঁরা ব্যস্ত আছেন…

লাটু সাহেবের কাছে বিদায় লওয়া হইল না। তবে তাঁর ঘরের সামনে দিয়াই নীচে নামিবার পথ। বাহির হইবার সময় প্রভাত পরিমলের দিকে বারেক চাহিল, তার মুখ সন্ধ্যার সূর্য্যমুখী ফুলের মতই পরিম্লান! প্রভাতের বুকে ছোট একটা নিশ্বাস ফুটিল। কিন্তু উপায় কি!

লাটু সাহেবের ঘরের পানে চাহিতে দেখিল, লাটু সাহেব চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, তাদের পানে চাহিলেন, কোনো কথা কহিলেন না। আর সেই প্রৌঢ় লোকটি… চোখে তার রাজ্যের বিরক্তি! সেও গুম্ হইয়া বসিয়া আছে! মস্ত রহস্য…

বুকে একরাশ কৌতূহল বহিয়া দুই বন্ধুতে নামিয়া আসিল। সেই মালী বাহিরের রোয়াকে বসিয়া আছে, তার সামনে একটা খোট্টা ধোপা একরাশ কাচা কাপড় মিলাইয়া দিতেছে।

অনন্ত কহিল,—একখানা গাড়ী হ'লে ভালো হয়…

প্রভাত কহিল,—যা বলেছো!

অনন্ত ডাকিল,—ওরে মালী…

মালী মুখ তুলিল।

অনন্ত কহিল,—একখানা গাড়ী ডেকে দিবি, বাবা? রিক্শ হোক, ঘোড়ার গাড়ী হোক, ট্যাক্সি হোক…

মালী কহিল,—আমার ফুরসৎ নেই, বাবু। কাপড় কেচে আনচে, মিলিয়ে দেখে পাঠাতে হবে…

অনন্ত প্রভাতের পানে চাহিল,—প্রভাতও…

অনন্ত কহিল,—তোর বুঝি ধোপার ব্যবসা?

এক-গাল হাসিয়া মালী কহিল,—হাঁ বাবু…

—লাভ হয়?

মালী কহিল,—না। এই বাগানের ভাড়া দি মাসে দশ টাকা, ঘরখানা আছে সেই সঙ্গে। দু'জন লোক আছে, তারা কাপড় আনে, কেচে আবার দিয়ে আসে।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া প্রভাত কহিল,—সাজো কাচিস্?

মালী কহিল,—তাই।

প্রভাত কহিল,—চলো অনন্ত…

ফটকের বাহিরে আসিয়া অনন্ত কহিল,—দশ টাকা ভাড়া দেয়, বললে। কাকে দেয়? লাটু সাহেবকে?

প্রভাত কহিল,—বাগান-বাড়ী ওঁর, না, উনিও ভাড়া নিয়েচেন?

অনন্ত কহিল,—ভাড়া নেওয়াই সম্ভব! ওঁর যে এখানে বাগান-বাড়ী আছে, সে কথা আমাদের পাড়ায় থাকতে ওঁর মুখে কখনো শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না!

প্রভাত কি ভাবিতেছিল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—সেই mystery!

এ মিষ্ট্রী আরো ঘনীভূত হইল, পরের দিন সন্ধ্যাকালে। নিজের ঘরে প্রভাত চুপ-চাপ বসিয়া ছিল; আলো জ্বালে নাই। তরুণ মন বাগমারির সেই জীর্ণ বাগান-বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল অধীর আবেগে…সেই ম্লান মুখ আজো তেমনি মলিন আছে? কেন, কেন, কেন চকিতে অমন পরিবর্ত্তন?…

সহসা অনন্ত আসিয়া উপস্থিত। সে ডাকিল,—প্রভাত…

প্রভাত চমকিয়া কহিল,—অনন্ত!

—হ্যাঁ!

—কি খপর?

—খপর আছে। আলোটা জ্বালো…

সুইচ টিপিতে আলো জ্বলিল। পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া অনন্ত কহিল,—প'ড়ে ছাখো। কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে পেয়েছি। ডাকে আসে নি। চিঠি পড়েই আমি তোমার কাছে আসছি।

প্রভাত কহিল,—কার চিঠি?

—প'ড়ে ছাখো না!

প্রভাত চিঠি পড়িল। চিঠি খুব বড় নয়। মেয়েলি হাতের অক্ষর। লেখা আছে,—

বাবা অনন্ত,

একটু বিপদে পড়িয়াছি। তুমি ঘরের ছেলে—তোমার কাছে লজ্জা নাই। যদি চিঠি পাইবামাত্র আসিতে পারো তো বড় উপকার হয়। একটু পরামর্শ আছে। তোমায় আসিতে লিখিলাম, এ কথা এখানে প্রকাশ করিয়ো না। যেন এমনি আপনা হইতে বেড়াইতে আসিয়াছ! এখানে আসিলে সব কথা জানিবে। তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা
জাহ্নবী দেবী।

একটু বিচলিত স্বরেই প্রভাত কহিল,—পরামর্শ! নিশ্চয় বিশেষ কিছু ঘটেছে, তাই তোমায় যেতে লিখেচেন। তুমি আমার কাছে এসে অনর্থক দেরী করলে!

অনন্ত কহিল,—আমি ঠিক বুঝতে পারচি না, তাই এলুম! তুমি যাবে?

প্রভাত কহিল,—না। আমায় যেতে লেখেন নি!

—তাতে কি! তুমিও আমার সঙ্গে গেছ…একত্র আমরা ঘুরি-ফিরি, তাঁরা জানেন।

প্রভাত কোনো উত্তর দিল না। মন বলিতেছিল, চলো না! সেখানকার জন্য হা-হুতাশের তো অন্ত নাই। সারাক্ষণ ঐ চিন্তা…

কিন্তু না…ভালো দেখায় না।

অনন্ত কহিল,—কি! একদম বাক্যহারা যে…

প্রভাত কহিল,—তুমি একা যাও…আমি বরং এক কাজ করতে রাজী আছি।

—কি?

—মাণিকতলার পুলের ধারে থাকবো, তুমি এসে সংবাদ দিয়ো।

অনন্ত কহিল,—পাগল! পথে কতক্ষণ ঘুরবে? তা হয় না!

প্রভাত প্রশ্ন করিল,—তবে?

অনন্ত কহিল,—তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের ওখানে এসো, আমি ততক্ষণে খপর নিয়ে ফিরবো।

প্রভাত কহিল,—তার চেয়ে…আমি তোমার সঙ্গে বেরুই। হেদোয় থাকবো'খন, তাতে কোনো কষ্ট হবে না। মানে, যদি এমন কিছু প্রয়োজন হয়, তুমি একা…

অনন্ত কহিল,—আমি তাই ভাবছিলুম, সেই ভেবেই এখান অবধি ধাওয়া করেছি…

প্রভাত কহিল,—কিন্তু তোমার কি অনুমান হয়? কারো অসুখ? কিম্বা…?

অনন্ত কহিল,—অসুখ নয়। চিঠির tone থেকে সেটুকু বেশ বুঝতে পারছি…

প্রভাত কহিল,—তা হ'লে দেরী নয়। চলো…

দু'জনে বাহির হইবে, সদরে সদাশিব বাবুর সঙ্গে দেখা। সদাশিব প্রভাতের মামা। সদাশিব বলিলেন,—বেরিয়ো না প্রভাত, দরকার আছে।

অপ্রসন্নতায় প্রভাতের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। কিন্তু মামার কথা ঠেলিতে পারে না! কখনো ঠেলে নাই। সে কহিল,—তুমি এগোও অনন্ত, দেরী করো না। আমি এখনি যাচ্ছি, হেদোয় আমায় পাবে। তুমি একটা ঠিকে গাড়ী নিয়ে যেয়ো, ঘণ্টা-হিসেবে ভাড়া করো—অনেকখানি সময় বাঁচবে, এবং সেই সঙ্গে হাঁটার পরিশ্রমও।

—বেশ! বলিয়া অনন্ত অগ্রসর হইল।

প্রভাত গিয়া মামার কাছে হাজিরা দিল, কহিল,—কি বলছিলেন মামা বাবু?

সদাশিব কহিলেন,—মাখনের খুব অসুখ। আপিসে তোমার বাবা টেলিগ্রাম করেছেন, এক জন নার্শ নিয়ে এই রাত্রেই তোমায় ষ্টার্ট করতে হবে। আমি নার্শ ঠিক ক'রে আসচি—এখনি এখানে তার জিনিষপত্র-সমেত আসবে। তুমি তৈরী হয়ে নাও।

প্রভাতের বুক দুলিয়া উঠিল মাখনের সহসা কি এমন অসুখ হইল! রোগ কঠিন, সন্দেহ নাই। নহিলে একেবারে নার্শের তলব কেন হইবে!

মাখন তার মেজ কাকার একমাত্র ছেলে—পিতৃহীন,—বিধবা মেজ কাকিমার জীবনের সম্বল!

প্রভাত কহিল,—কি অসুখ মামাবাবু?

সদাশিব কহিলেন,—তা তো জানান নি তোমার বাবা, শুধু টেলিগ্রাম করেছেন, এই ছাখো—Makhan seriously ill. Send nurse with Provat at once.

প্রভাতের চোখের সামনে আলো নিবিয়া গেল। তার মাথা ঘুরিতেছিল!

সদাশিব কহিলেন,—তুমি চট্ ক'রে কিছু খেয়ে নাও—খেয়ে তৈরী থাকো। নার্শ এলো ব'লে···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রভাত কহিল,—খাবার প্রয়োজন নেই। খেতে পারবো না। এমন ভাবনা হচ্ছে ··

—ভাবনার কথাই!···

প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা! মাখনকে প্রভাত ভারী স্নেহ করে। তার চেয়ে চার বছরের ছোট—ক্লাশের পড়াশুনায় ভালো। প্রভাতের কাছে তার আব্দারের অন্ত নাই! সেই মাখন···

অথচ অনন্তকে ওদিকে বলিয়া দিল, হেদুয়ায় তার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে! জাহ্নবী দেবী চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন, বিপদ!···

দ্বিধায় চিন্তায় বিজড়িত-চিত্ত প্রভাত যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছে! এখনি দেশে যাইতে হইবে, না গেলে নয়! ওদিকে আবার ··

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু ডাকিতেছেন। মেয়ে-ডাক্তার আসিয়াছে, গাড়ী তৈয়ার।···

প্রভাত নামিয়া আসিল। সদাশিব বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, কহিলেন,—ইনি যাচ্ছেন তোমার সঙ্গে—নার্শ বিনতা সেন···হিন্দু। বাঙালীর বাড়ী মেম নার্শে অসুবিধা হবে। তা তুমি···দেরী করো না। আমি অশ্বিনীকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি, দুটো সেকেণ্ড ক্লাশ বার্থ রিজার্ভ ক'রে রাখবে। তুমি পৌছেই একটা টেলিগ্রাম করো। আমি ভারী উদ্বিগ্ন থাকবো এখানে···বুঝলে!

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ক্রথনকের জীবন-কথা

উষ্ট্র একটি অদ্ভুত রোমন্থক জীব। পশুশালায় উষ্ট্রকে দেখিলেই হিতোপদেশের 'যূথভ্রষ্ট ক্রথনকের' কথাই মনে আসে। সকল জীবজন্তু হইতে ইহার আকারগত বৈশিষ্ট্য এত অধিক যে, ক্রথনক যেন স্বতঃই অপর জীবজন্তু হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। প্রথমে ইহার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিশিষ্টতার বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। চির-তুষারের দেশে শ্বেত ভল্লুকরা যেমন সুখে বাস করে, উষ্ট্রও সেইরূপ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা-রাশির মধ্যে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকে। মরুর প্রতি ইহার আকর্ষণ এতই অধিক যে, ঊষর ভূখণ্ড ব্যতীত ইহাকে অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, সুবিস্তীর্ণ মরুসাগর অতিক্রম করিবার পর দ্বীপোপম মরূদ্যানে ছায়ায় ভূখণ্ডে আসিয়া বিচরণের নিমিত্ত ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেও ইহারা ছায়াতলে বিশ্রাম না করিয়া প্রখর রৌদ্রতপ্ত বালুকার মধ্যেই উপবেশন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া থাকে।

প্রাচীনকালের ককুদহীন উষ্ট্র। ইহারা মাত্র ছয় ফুট দীর্ঘ হইত

বর্ত্তমানে ইহাদের এই মরুপ্রীতি লক্ষিত হইলেও পূর্ব্বে যে ইহাদের প্রকৃতি এই প্রকার ছিল, তাহা বোধ হয় না। প্রাচীন যুগে এখনকার মত মিশর, নিউবিয়া, পারস্য, তুর্কিস্থান, মোঙ্গোলিয়া প্রভৃতির মধ্যেই যে ইহাদের স্বাভাবিক গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। তখন পৃথিবীর বহুস্থানেই, এমন কি, য়ুরোপ ও আমেরিকাতেও উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যাইত। সে সকল উষ্ট্রের আকারও অদ্ভুত হইত। কোনও শ্রেণী বা আকারে শশকের মত ক্ষুদ্র হইত এবং কোনও শ্রেণী জিরাফের মত দীর্ঘ হইয়া স্বচ্ছন্দে বৃহদাকার পাদপের শাখা ও পত্র সকল ভক্ষণ করিয়া বেড়াইত।

উত্তর আমেরিকার প্রোটিলোপস্রা ছিল ক্ষুদ্রাকার-উষ্ট্র। আকৃতিতে তাহারা য়ুরোপের শশক অপেক্ষা বৃহৎ হইত না। বর্ত্তমান কালে উষ্ট্রের ৩৪টি দন্ত থাকিলেও প্রোটিলোপস্দিগের বদনবিবরে ৪৪টি দন্ত থাকিত। জিরাফের মত দীর্ঘগ্রীব উষ্ট্রের নাম ছিল অল্টিক্যামেলস্। উত্তর-আমেরিকায় ইহাদের বাস ছিল। ইহাদের আকারও জিরাফের মত হইত। উন-অশীতি বৎসর পূর্ব্বে এথেন্স নগরীর নিকটে যে হেল্লাডোথিরিয়মের অস্থি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখন প্রাচীন কালের ক্রমেলকাস্থি বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। হেল্লাডোথিরিয়মের দীর্ঘাকার অস্থিকে বহুকাল ধরিয়া অনেকেই জিরাফের অস্থি বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। প্রাচীনকালে জিরাফের মত আর এক শ্রেণীর উষ্ট্র আমেরিকায় বাস করিত। তাহাদের নাম ছিল অক্সিড্যাক্টিলস্। চীন দেশেও উষ্ট্রের মত বৃহদাকার এক জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উষ্ট্র-কঙ্কালের সহিত সাদৃশ্য থাকায় জীবতত্ত্ববিদরা ইহার নাম দিয়াছেন প্যারাক্যামেলস্। আমেরিকার ভূস্তরের মধ্য হইতে জিরাফ-ক্যামেল, গেজেল-ক্যামেল্ ইত্যাদি বহুশ্রেণীর লুপ্ত উষ্ট্রের কঙ্কালাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শিবালিক পর্ব্বত হইতেও সে যুগের লুপ্ত উষ্ট্রের (Camelus Sivalensis) কঙ্কালাদি পাওয়া গিয়াছে। রুমেনিয়া, অ্যাল্জিরিয়া, রুসিয়া হইতেও সে কালের লুপ্ত উষ্ট্রের প্রস্তরীভূত অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে কালে দক্ষিণ-আমেরিকার লামার মত মধ্যমাকারের এক শ্রেণীর উষ্ট্রও বাস করিত। লামার মত সেই সকল উষ্ট্রের নাম ছিল প্রোক্যামেলস্।

বর্ত্তমান কালে এসিয়া ও আফ্রিকায় মাত্র দুই শ্রেণীর উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের এক শ্রেণীর পৃষ্ঠে একটি ককুদ ও অপর শ্রেণীর পৃষ্ঠে দুইটি ককুদ থাকিতে দেখা যায়। মাত্র এই ককুদের দ্বারাই ইহাদের শ্রেণী-বিভাগ হইয়া থাকে। এক-ককুদসম্পন্ন উষ্ট্র বা ড্রোমিডারিরা উত্তর-আফ্রিকায় অ্যালজিরিয়া, লাইবিয়া, মিশর, নিউবিয়া প্রভৃতি দেশে, আরবে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থান করে। দ্বিককুদসম্পন্ন বক্ট্রিয় উষ্ট্রকে সমগ্র তুর্কিস্থান, মোঙ্গোলিয়া ও চীনের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ-আমেরিকার লামাকেও উষ্ট্র-শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা হইয়া থাকে। লামার আকৃতি উষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও এবং ইহাদের পৃষ্ঠে ককুদ না থাকিলেও লামাকে দক্ষিণ-আমেরিকার উষ্ট্র বলা হয়। উষ্ট্রের কঙ্কালাদির সহিত ইহাদের কঙ্কালের এবং উষ্ট্রের প্রকৃতির সহিত ইহাদের প্রকৃতির এরূপ নিকট মিলন যে, ইহাদিগকে উষ্ট্রশ্রেণীমধ্যে গণনা না করিয়া থাকা যায় না। পর্য্যাপ্তপরিমাণে তৃণাদি ভক্ষণ করিতে পাইলেও লামাদিগের পাকস্থলীর মধ্যে উষ্ট্রের পাকস্থলীর মতই জলকোষের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সরস লতাপত্র ভক্ষণ করিতে দিলে উষ্ট্রের মতই লামাদিগের জলপানের কোনও প্রয়োজন হয় না। দক্ষিণ-আমেরিকার যে সকল স্থানে ভারবহনের নিমিত্ত অশ্বকে চালনা করা যায় না, তথায় ইহারা অক্লেশে গুরুভার বহন করিয়া চলিয়া যায়। আণ্ডিস্ পর্ব্বতের খনির মধ্যে বহু লামাকে আকরের কর্ম্মে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের ভারবহনশক্তি বড় কম নহে।

পুরুষ-লামারা এক ম দশ সের দ্রব্যাদি বহন করিয়া দিবসে ছয় ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিতে পারে। উষ্ট্রের মত লামারাও দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিতে পারে। এই সকল কারণেই অনেক জীবতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন যে, উষ্ট্র ও লামারা একই পূর্ব্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে যখন এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে সংযোগ ছিল, তখন উষ্ট্র ও লামাদের পূর্ব্বপুরুষ উত্তর-আমেরিকায় বাস করিত। কালক্রমে উভয় মহাদেশের মধ্যে বিযুক্তি ঘটিলে লামারা দক্ষিণ-আমেরিকার আণ্ডিস্ পর্ব্বতে রহিয়া যায় এবং উষ্ট্ররা এসিয়া ও আফ্রিকার মরুপ্রদেশে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। ইহাদের রোমের বর্ণ

দক্ষিণ-আফ্রিকার লামা

শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্তিমাভ বা পীতাভ হইয়া থাকে। রোম স্থূল বলিয়া উহা হইতে সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হয়। গোয়ানাকো লামা ব্যতীত দক্ষিণ-আমেরিকার আলপাকা, ভিকিউনা, গোয়ানাকো প্রভৃতিও উষ্ট্রবংশীয়।

উষ্ট্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে উহাদের সমুন্নত গ্রীবা এবং ককুদই সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বৃষ, গয়াল, চমরী, বাইসন্ প্রভৃতির মত উষ্ট্রের ককুদ বসায় পরিপূর্ণ থাকে। আহারের অভাব ঘটিলে ককুদের এই বসাই উহাদের শরীরের পোষণ-ক্রিয়াকে অব্যাহত রাখিয়া ক্ষয়ের সম্পূরণ করিয়া থাকে। এই কারণেই মরুপারাপারকালে সুদীর্ঘকাল অনাহার বা স্বল্পাহারে ককুদের সমস্ত বসার ক্ষয় হইয়া যায়। মরুপারাপারের পর উষ্ট্রের সমুন্নত ককুদ বসার অভাবে উহাদের স্কন্ধের উপর একবারেই মিলাইয়া যায়। ককুদের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াই আরবীরা উষ্ট্রের শ্রমসাধনের শক্তি বুঝিয়া লয় এবং কেবলমাত্র সমুন্নত ককুদযুক্ত উষ্ট্রকেই তাহারা মরুভ্রমণের যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। যে উষ্ট্রের ককুদ সুপরিপুষ্ট নহে, সে উষ্ট্রকে তাহারা কদাচ গ্রহণ করে না। মরুভ্রমণের পরিশেষে আরবীরা উষ্ট্রকে কয়েক সপ্তাহ—এমন কি, অবস্থাবিশেষে তিন চারি মাস অবধি সযত্নে আহার করাইয়া থাকে। এইরূপ পর্য্যাপ্ত আহার ও বিশ্রামের ফলে উহাদের ককুদ পূর্ব্ববৎ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে আরবীরা পুনরায় উহাদিগকে দেশাভিমুখে প্রত্যাগমনে নিয়োগ করিয়া থাকে। উষ্ট্রের স্বাস্থ্যের বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে উহাদের চক্ষু ও ককুদের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। যে উষ্ট্রের ককুদ সমুন্নত ও সম্পরিপুষ্ট নহে এবং যাহার চক্ষু সজল ও নিষ্প্রভ, সে উষ্ট্রের স্বাস্থ্য মন্দ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

ককুদের পরেই উষ্ট্রের পাকস্থলীর বিষয় উল্লেখ করা উচিত। পাকস্থলীর এরূপ অদ্ভুত গঠন আর কোনও জীবের মধ্যে দেখা যায় না। রোমন্থক জীব হইলেও উষ্ট্রের পাকস্থলী অন্যান্য রোমন্থক প্রাণীর পাকস্থলী হইতে বিভিন্ন। ইহাদের পাকস্থলীর প্রথম কোষটির দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে কতকগুলি জলকোষ থাকিতে দেখা যায়। দক্ষিণ ভাগের জলকোষগুলি প্রায় তিন পোয়া জল শোষণ করিয়া রাখিতে পারে এবং বাম ভাগের বৃহৎ কোষগুলির মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন সের হইতে পাঁচ সেরের অধিক জল সঞ্চিত থাকিতে পারে। পাকস্থলীর দ্বিতীয় কোষের মধ্যেও জলকোষের দ্বাদশটি স্তবক থাকে। পাকস্থলীর এই দ্বিতীয় কোষটি উষ্ট্ররা কেবলমাত্র জল-সঞ্চয়ার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কোষে ভুক্ত খাদ্যাদি প্রবেশ করিতে পারে না। মরুর মধ্য দিয়া গমনকালে ইহারা এই সকল জলকোষের মধ্যে প্রচুর বারি সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং প্রয়োজনমত এই সকল কোষ প্রসারিত করিয়া পাকস্থলীর মধ্যে জল নিঃসারিত করিয়া থাকে। তৃষ্ণা বোধ করিলেই ইহারা জলকোষগুলিকে প্রসারিত করিয়া কতক জল পাকস্থলীর মধ্যে বাহির করিয়া দেয়। এই ভাবেই মরুমধ্যে উষ্ট্ররা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। মরুভ্রমণকালে ইহারা দিবসে বিশ ত্রিশ মাইল ভ্রমণ করিয়াও দুই তিন দিবস জল পান না করিয়া থাকিতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বঁফো উষ্ট্রপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, দশ দিবস অপীত থাকিয়া মৃত হইবার পরেও একটি উষ্ট্রের পাকস্থলী হইতে এক পাইট নির্ম্মল জল পাওয়া গিয়াছিল। অনেকের ধারণা এই যে, আরবীরা নিদারুণ জলকষ্টের সময় উষ্ট্রের পাকস্থলী কর্ত্তন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বারি পান করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটি কিন্তু একবারেই অসত্য বলিয়া বোধ হয়। উষ্ট্রের পাকস্থলীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকোষে জল এমন ভাবে সঞ্চিত থাকে যে, তাহা কেবল উষ্ট্রেরাই নিজ প্রয়োজনমত পাকস্থলীর মধ্য হইতে বাহির করিতে পারে এবং সে জল উষ্ট্রকে বধ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে নিষ্কাশিত করিলেও তাহা পানের অযোগ্য হইয়া থাকে। ইহাদের পাকস্থলীর মধ্যে

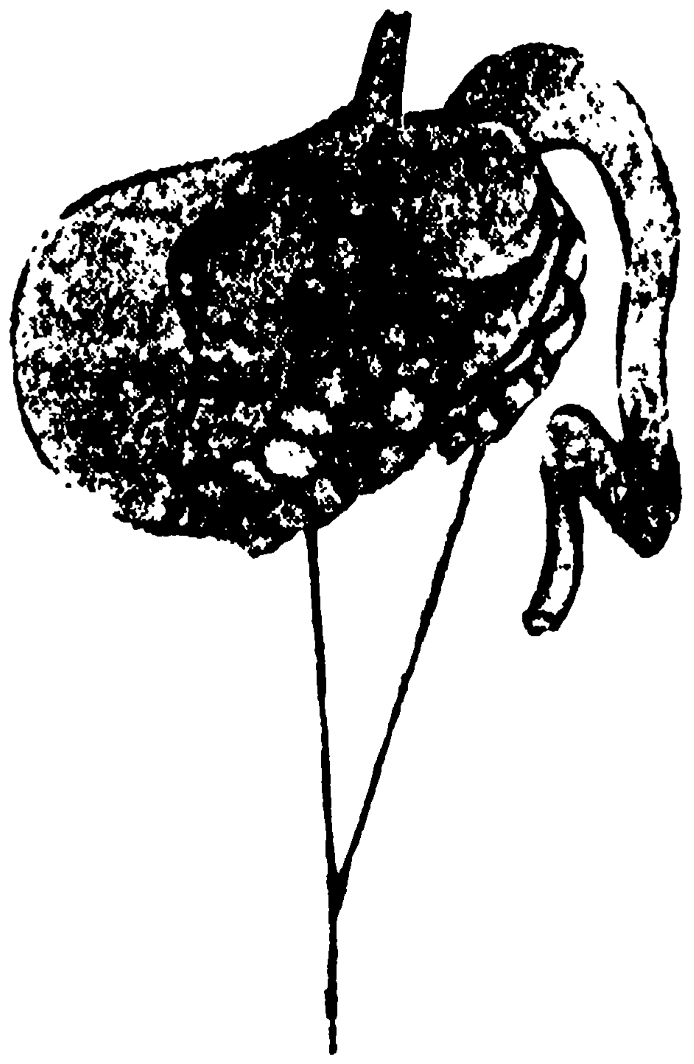

উষ্ট্রের পাকস্থলী

সঞ্চিত হইলেই পীত বারি আবিলতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। সে জল আর পান করা যায় না। স্তন্যপায়ী উষ্ট্রশাবকের পাকস্থলীর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোষটি সম্যক্ বিকাশ-লাভ করে না। এই কারণে মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ পাকস্থলীর প্রথম কোষ হইতে একবারেই ৪র্থ কোষে যাইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

মরুভূমির মধ্যে বাস করে বলিয়াই উটের গাত্রচর্ম্মের উপরিভাগে ঘর্ম্মনিঃসারক গ্রন্থি ও ঘর্ম্মপালির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং থাকিলেও তাহার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ইহাদের উর্দ্ধোষ্ঠ ও চরণের গঠনও মরুবাসের অনুকূল হইয়াছে। নাসারন্ধ্র হইতে শ্লেষ্মা-স্রাবাদি আসিয়া যাহাতে মুখবিবর ও গলনলীকে সরস রাখিতে পারে, তজ্জন্য উষ্ট্রের উপরের ওষ্ঠটি মুখের উপরেই দুই খণ্ডে কর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

এক-ককুদবিশিষ্ট আরবীয় উষ্ট্র বা ড্রোমিডারী

ওষ্ঠের গঠন এরূপ না হইলে গবাদির ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাব নাসারন্ধ্রের বাহিরে পড়িয়া শুকাইয়া যাইত। মরুমধ্যে সলিলের একান্ত অভাব বলিয়াই উটের দেহ হইতে কোনও প্রকার রস বৃথা নষ্ট হইতে দেখা যায় না। নাসারন্ধ্র হইতে শ্লেষ্মা-স্রাবাদি গড়াইয়া আসিয়া মুখের মধ্যে আপনা হইতেই চলিয়া যায়। চরণের তলে মাংসের একটি "প্যাড" থাকে বলিয়া ইহারা উত্তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া অক্লেশে গমন করিয়া থাকে। ইহাদের চরণে দুইটি-মাত্র অঙ্গুলী থাকে, এই অঙ্গুলী দুইটি আবার পরস্পর বিভক্ত হওয়ায় বালুকার মধ্যে ইহাদের পদ প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে পারে না। ড্রোমিডারীদের চরণ যেমন বালুকারাশির মধ্য দিয়া গমন করিবার উপযোগী, বক্ট্রিয় উষ্ট্রদের পদও সেইরূপ তুষারের মধ্যে ভ্রমণ ও অবস্থানের যোগ্য করিয়া গঠিত। হিন্দুকুশের তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথ বা সাইবিরিয়ার তুষারমরুর মধ্যে স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণের নিমিত্ত ইহাদের পাদাঙ্গুলীর অগ্রভাগের নখর ঈষৎ বক্রাকার হইয়াছে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ এই প্রকার হওয়ায় বক্ট্রিয় উটরা পিচ্ছিল বরফের উপর নিরাপদে চরণক্ষেপণ করিয়া ভ্রমণ করিতে পারে। ইহাদের চরণতল ড্রোমিডারীদিগের পদতল অপেক্ষাও কঠিন হইয়া থাকে এবং গাত্রের লোমও অধিক ঘন ও দীর্ঘ হয়।

উটের উদরতলে বসার ভাগ অত্যন্ত অল্প। শৈত্যাধিক্য ঘটিলে এই কারণেই সহজে ইহাদের পরিপাকের গোলযোগ উপস্থিত হয়। ফুসফুস দুইটিও দুর্ব্বল বলিয়া ইহারা সহজেই প্রতিশ্যায় রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

উষ্ট্রের দেহের প্রতি লক্ষ্য করিলে উদরের নিম্নে এবং সম্মুখ ও পিছনের পদে প্রায় ৭টি বৃহৎ অর্ব্বুদ দেখিতে পাওয়া যায়। বঁফো উষ্ট্রদেহের এই অর্ব্বুদগুলিকে দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদরের নিম্নে ও সম্মুখ-পদের পশ্চাদ্ভাগের অর্ব্বুদ দুইটিই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভার-গ্রহণ ও ভারাবতরণের নিমিত্ত বালুকাস্তীর্ণ ভূমির উপর অবিরত উপবেশনের ফলেই এই সকল অর্ব্বুদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

দন্তের গঠনেও অন্যান্য রোমন্থক প্রাণী হইতে উষ্ট্রের কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। গবাদির উপর পাটীতে ছেদন-দন্ত না থাকিলেও ইহাদের মধ্যে তাহার অভাব লক্ষিত হয় না। ছেদন-দন্ত ব্যতীত ইহাদের চোয়ালে সৌবন দন্তও থাকিতে দেখা যায়। মরুবাত্যাতাড়িত বালুকণা এবং সূর্য্যের প্রখর তাপ হইতে চক্ষুর্দ্বয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহাদের চক্ষুর উপরে দীর্ঘ অক্ষিপক্ষ্ম জন্মিয়া থাকে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তির বিষয় এবং ঝটিকার সময় ইহারা যে কিরূপে নাসারন্ধ্রকে একবারে বন্ধ করিতে পারে, তাহা পূর্ব্ব-প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। প্রবল বাত্যার সময় ইহারা জানু পাতিয়া এবং বালুকার মধ্যে মস্তক রক্ষা করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে। উষ্ট্র-চালকরা তৎকালে ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

উষ্ট্রের প্রণয়রীতির মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষিত হইয়া থাকে। জনন ঋতুতে উষ্ট্রের মুখের মধ্যে একটি মাংসের থলি জন্মাইয়া থাকে। যৌবন প্রাপ্ত না হইলে ইহাদের মধ্যে এই থলির উদ্ভব হয় না। পঞ্চমবর্ষে উষ্ট্র যৌবনে পদার্পণ করে এবং ষোড়শ বা সপ্তদশ বর্ষে পূর্ণাকার প্রাপ্ত হয়। জননকালে তৃষ্ণার দারুণ কষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশেই বোধ হয় ইহাদের বদনবিবরে এই অদ্ভুত থলির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কালে উষ্ট্র অপেক্ষা উষ্ট্রীরাই অধিক অস্থিরভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই কারণে এ সময়ে উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করাও বড় নিরাপদ হয় না। সুযোগ পাইলেই উষ্ট্রীরা প্রজননকালে পলায়ন করিয়া থাকে। উষ্ট্রদিগকে বরং এ সময় সংযত করিয়া চালনা করা সম্ভবপর হইয়া থাকে। প্রণয়ব্যাপারে ইহাদিগকে প্রায় সমস্ত দিবসই ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। পুরুষ উষ্ট্ররা প্রণয়িনী-লাভার্থ পরস্পরের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং স্ত্রীর চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশে মেঘগর্জ্জনের মত এক প্রকার অনুচ্চ শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে। আলিপুর পশুশালায় রক্ষিত এক-ককুদ-সম্পন্ন আরবীয় উষ্ট্রকে লক্ষ্য করিবার সময় আমি একবার উক্ত উষ্ট্রকে এই প্রকার শব্দোচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। মুখ বন্ধ করিয়াই ইহারা কণ্ঠের মধ্যে এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকে। ক্রমেলক-গোত্রীয় দক্ষিণ-আমেরিকার

লামারাও সারাদিবস স্ত্রীর পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া প্রণয়িনীর চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে।

য়ুরোপে উৎকৃষ্ট অশ্বের প্রজননব্যাপারে যেরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়, মিশর, আরব ও অ্যাল্‌জিরিয়া দেশেও উষ্ট্রের প্রজননে সেইরূপ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পঞ্চদশ হইতে পঞ্চাশৎটি উষ্ট্রীর নিমিত্ত একটিমাত্র বলবান্ উষ্ট্রকে পৃথক্ করিয়া রাখা হয়। অপর পুরুষ উষ্ট্রকে ভার-বহনের উপযোগী করিয়া ঐ সকল কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। বক্ত্রিয় উষ্ট্রা পর্ব্বতচারী ও শীতসহিষ্ণু এবং ড্রোমিডারীরা মরুক্লেশসহনশীল বলিয়া এসিয়া-মাইনরের কোনও কোনও স্থানে এতদ্দেশবাসীরা এই উভয়বিধ উষ্ট্রের সম্মিলনে এক প্রকার বর্ণসঙ্কর উষ্ট্রের উদ্ভব করাইয়া থাকে। পুরুষ বক্ত্রিয় উষ্ট্র ও স্ত্রী ড্রোমিডারীর সংযোগে যে সঙ্কর উষ্ট্রের উৎপত্তি হয়, তাহা উভয়বিধ উষ্ট্রের

দ্বিককুদবিশিষ্ট বক্ত্রিয় উষ্ট্র

গুণলাভ করিয়া মরুপ্রদেশ এবং পার্ব্বত্য পথের উপযোগী হইয়া থাকে।

একাদশ মাস গর্ভধারণ করিয়া উষ্ট্রী এককালে একটিমাত্র শাবক প্রসব করিয়া থাকে। সদ্যঃপ্রসূত উষ্ট্র-শাবক উচ্চে প্রায় আড়াই ফুট হইয়া থাকে। এক বৎসর হইতে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত শাবকরা স্তন্যপান করিয়া পুষ্ট হয়। উষ্ট্র-শাবকের মধ্যে মৃত্যুর হারও বড় কম দেখা যায় না। চারি বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই শতকরা প্রায় ৫০টি শাবক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই প্রকার শিশুমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গর্ভাবস্থায় উষ্ট্রীকে অত্যধিক পরিশ্রম করানর ফলেই এবং অকালে শাবককে স্তন্যপান হইতে বঞ্চিত করিয়া অত্যধিক কর্ম্মে নিয়োগ করিবার কারণেই এত অধিক শাবক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। আলিপুর পশুশালায় রক্ষিত একটি স্ত্রীলামা সম্প্রতি একটি শাবক প্রসব করিয়াছে। অন্যান্য পশুমাতার ন্যায় স্ত্রীলামার কিন্তু তাদৃশ সন্তানস্নেহ পরিলক্ষিত হয় নাই।

উষ্ট্রের চলনরীতির মধ্যে কোনও সৌষ্ঠব লক্ষিত হয় না। চলিবার সময় ইহারা এক পার্শ্বের দুইটি চরণ এককালে ক্ষেপণ করিয়া গমন করে। এই কারণেই গমনকালে ইহাদের দেহ দক্ষিণে ও বামে এরূপ ভাবে হেলিতে দুলিতে থাকে যে, ইহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহুদূর গমন করা কষ্টকর হইয়া উঠে। বক্ত্রিয় উষ্ট্র অপেক্ষা ড্রোমিডারীরা অধিক দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে। তিন লক্ষ বর্গ-মাইলব্যাপী সাহারা মরুর মধ্যে ক্ষিপ্রগতির নিমিত্তই ডাকহরকরার বাহকরূপে ড্রোমিডারীরাই নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সকল ড্রোমিডারী ঘণ্টায় ৮ হইতে ১০ মাইল অবধি চলিতে পারে। আবার যে সকল আরবী বা মিশরী উষ্ট্রকে কেবল ভারবহনের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়, তাহাদের গতি ঘণ্টায় তিন মাইলের অধিক হয় না। আরব দেশের উৎকৃষ্ট উষ্ট্রা প্রায় ছয় মণের অধিক বোঝা লইয়া এবং দিবসে ২৫ মাইল হিসাবে পথ অতিক্রম করিয়া একাদিক্রমে তিন দিবস আদৌ জলপান না করিয়া চলিতে পারে। তবে বোঝা ভারী হইলে এবং দিবসে অধিক পথপর্য্যটন করিলে উষ্ট্রকে দুই এক দিন অন্তর জলপান করান এবং বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। জেনারেল গর্ডন উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াই সুদানে দাস-ব্যবসায় ও দস্যুদমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি দেড় দিবসের মধ্যে ৮০ মাইল মরুপথ অতিক্রম করিয়া দস্যু ও নরঘাতকদিগকে দমন করিতেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে তিনি নিউবিয়ার ২ শত ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মাহদিদিগের আক্রমণ হইতে খার্টুমকে উদ্ধার করেন। চারি বৎসরের মধ্যে গর্ডন সাহেব মিশর ও সুদানে ত্রয়োদশ সহস্র মাইলের অধিক মরুপথ উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এই প্রকার ভ্রমণের সময় উষ্ট্রের পানাহার ও বিশ্রামের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেকের ধারণা এই যে, উষ্ট্রা বহু দিবস জল পান না করিয়া এবং সামান্য তৃণ-কণ্টকাদি আহার করিয়াই মরুভূমিতে বাঁচিয়া থাকে। এ ধারণা একবারে ভ্রমাত্মক। দুই এক দিন আহার না দিলেও ভ্রমণের সময় প্রত্যেক তৃতীয় দিবসে ইহাদিগকে পান করান একান্ত প্রয়োজন। তবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরস তৃণপত্রাদি ভক্ষণ করিতে পাইলে ইহারা জলপান না করিয়াও থাকিতে পারে। আরবীরা মরুভ্রমণকালে উষ্ট্রকে দুই একখানি রোটিকা, গুটিকতক খর্জ্জুর ও সামান্য পরিমাণে শুষ্ক শিম্বী আহারার্থ প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার স্বল্পাহারেই তৃপ্ত থাকিয়া ইহারা ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া থাকে। জলাভাব ঘটিলে ইহারা যে কি উপায়ে তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির দ্বারা মরুমধ্যে জলের সন্ধান পায়, তাহা পূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে বিবৃত করিয়াছি। মরুভ্রমণকালে উষ্ট্রকে যথেচ্ছা জলপান করিতে দেওয়া উচিত নহে। উষ্ট্রের পক্ষে সূর্য্যাস্তের পর জলপান অবিধেয়। মধ্যাহ্নকালই ইহাদিগের পক্ষে পানের প্রশস্ত সময়। জলপানের পরেই উষ্ট্রকে চালনা করা অনুচিত। পানের পর অন্ততঃ তিন ঘণ্টাকাল ইহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। বহুপথ

পর্য্যটনের পর জলপান করিতে দিলে অন্ততঃ অষ্টাদশ ঘণ্টাকাল ইহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

উষ্ট্রের আচরণে বিশেষ কোনও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। পালকের দর্শন বা স্পর্শে উষ্ট্রের অন্তরে হর্ষ-প্রীতির কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুকাল পালিত হইলেও পালকের প্রতি ইহাদের বিশেষ কোনও আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় না। বুদ্ধি-বৃত্তিতে গর্দ্দভও যেন উষ্ট্র অপেক্ষা উন্নত বলিয়া বিবেচিত হয়।

সকল জীবজন্তু অল্পাধিক সন্তরণ দিতে জানিলেও উষ্ট্রেরা আদৌ সন্তরণ দিতে পারে না এবং ক্ষুদ্র অগভীর নদীর মধ্যে আসিয়া পড়িলেও প্রাণরক্ষার বিষয়ে ইহারা একরূপ উদাসীন হইয়া পড়ে। নদীগর্ভে বালুকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে ঘোটকেরা স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে আত্মোদ্ধারের চেষ্টা করে, কিন্তু উষ্ট্রেরা এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে একান্ত নিশ্চেষ্টভাবেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। উষ্ট্রের এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। আফগান-সমরের সময় এক দল সৈন্য কতকগুলি উষ্ট্রবাহিনী লইয়া ক্ষুদ্র লোরা নদী পার হইতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে অগ্রগামী উষ্ট্রযূথ নদীর বালুকার মধ্যে নিমজ্জিত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াও নিমজ্জমান উষ্ট্রেরা কোনওরূপ ব্যাকুলতা বা ভয়প্রদর্শন না করিয়া বরং বালুকার মধ্যে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী উষ্ট্রেরাও পুরোবর্ত্তী উষ্ট্রগণের আসন্ন বিপদ দেখিয়াও অগ্রগমনে বিরত হয় নাই। উষ্ট্রযূথ বালুকার মধ্যে বসিয়া নিমজ্জমান হইতে থাকিলে সৈন্যরা তাহাদিগকে উঠাইয়া আনিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উহারা বালুকার মধ্য হইতে উঠিয়া আসিবার কোনও প্রয়াস না পাওয়ায় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক শেষে নদীগর্ভেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

পৃষ্ঠের বোঝা অধিক ভারী হইলে উষ্ট্রেরা কিছুতেই উঠিতে চাহে না। কিন্তু চলিবার সময় ক্রমে ক্রমে পৃষ্ঠের ভার বর্দ্ধিত করিলে উহারা তাহা বুঝিতে পারে না এবং সে ভার গ্রহণ করিতে কোনও কুণ্ঠা প্রকাশ করে না। এরূপ ভারবহনের ফলে মৃত্যু ঘটিলেও উহারা উহাদের অজ্ঞাতসারে ক্রমবর্দ্ধিত বোঝার ভার সহ্য করিতে কাতরতা প্রদর্শন করে না। নিরীহ বলিয়া বোধ হইলেও উষ্ট্র একবারেই শান্ত জীব নহে। একবার ক্রুদ্ধ হইলে ইহাদের আর জ্ঞান থাকে না। ক্রুদ্ধ উষ্ট্রকে অনেক সময়েই দংশন করিতে দেখা গিয়াছে। কসৌলির পাস্তুর চিকিৎসালয়ের বিবরণীতে কয়েকটি উষ্ট্রদষ্ট রোগীর কাহিনী পাওয়া গিয়াছে। ত্বরায় ইহাদের দংশনের সুচিকিৎসা না করিলে প্রায়ই সেপটিসিমিয়া রোগে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উত্তেজনার ফলে ইহারা যে আরবী চালকের মস্তকের খুলী দংশন দ্বারা মস্তক হইতে উঠাইয়া লইয়াছে, তাহাও জানিতে পারা গিয়াছে। একবার ক্ষিপ্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ইহাদিগকে আর ফিরান যায় না। যৌবন-সমাগমকালেই ইহাদের প্রকৃতি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উষ্ট্রজাতীয় লামারা ক্রুদ্ধ হইলে উত্তেজনাকারীর মুখমণ্ডলে হরিদ্রা বর্ণের নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া থাকে।

নির্ব্বোধ হইলেও বোঝা বহন ব্যতীত অন্য কর্ম্মেও উষ্ট্রকে নিয়োগ করিতে মানব ক্ষান্ত হয় নাই। অশ্বের ম পোষ্যভাব না দেখাইলেও উষ্ট্র যুদ্ধাদিতে কম সাহায্য ক নাই। উষ্ট্রবাহন না হইলে গর্ডন সাহেব মিশর ও সুদা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। মিশরে যুদ্ধের সম নেপোলিয়ন একটি উষ্ট্রবাহিনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। সিন্ দেশে সার চার্লস নেপিয়ার একটি উষ্ট্রবাহিনী সৃষ্টি করেন আফগান-যুদ্ধের সময় বহুসংখ্যক উষ্ট্র সামরিক কার্য্যাদি নিযুক্ত হইয়াছিল। বিকানীরের প্রসিদ্ধ উষ্ট্রবাহিনী বা "ক্যামে কোরের" বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। ১৯০৩-৪ খৃষ্টা আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ডে ও বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে মিশ বিকানীর উষ্ট্রবাহিনী বিশেষ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিল সুদানরক্ষণী উষ্ট্রবাহিনী শতাধিক সহস্র উষ্ট্র লইয়া গঠিত প্রাচীনকালে এ দেশের গোধনের মত উষ্ট্র যে শুধু আদরে পালিত হইত, এমত নহে; তখনও যুদ্ধে উষ্ট্রের ব্যবহা হইত। পারস্যরাজ সাইরাস্ বিশাল উষ্ট্রবাহিনী চালনা করি ক্রিসসের সৈন্যকুলকে বিধ্বস্ত করেন। এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে অশ্ব উষ্ট্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিরাগ আছে, তাহার কতক পরিচ পাওয়া যায়। লাইডিয়ার নৃপতি ক্রিসসের সৈন্যেরা অশ্বের উপ সমারূঢ় ছিল। পারস্যরাজের বিশাল উষ্ট্রবাহিনী ক্রিসসচমূ অভিমুখে চালিত হইলে বিপক্ষ পক্ষের অশ্ব সকল আগমনশী উষ্ট্রের দর্শনেই ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল। ক্রিস সেনাগণ অশ্ব সকলকে কোনমতে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ ন হওয়ায় সাইরসের জয়লাভ ঘটিয়াছিল।

উষ্ট্রের দ্বারা আরও বহুবিধ উপকার সাধিত হইয়া থাকে পূর্ব্ব-রুসিয়ার ওরেনবার্গ নামক প্রদেশে ইহাদের দ্বারা কৃষিকার্ সম্পাদিত হয়। তদ্দেশীয় কৃষকরা চারিটি উষ্ট্রকে যোত্রে বদ্ধ করিয়া হলচালনা করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে উষ্ট্রের দী রোমাবলী কর্ত্তন করিয়া আরবীরা পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তু করে। পারস্যদেশে উষ্ট্রলোম ও কার্পাসসূত্র-সংযোগে এব প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। উষ্ট্ররোম ঐ বস্ত্রের প্রোতসূত্র এব কার্পাস উহার ওতসূত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বক্তি উষ্ট্রের গাত্রে শীতকালে যে ঘন রোমাবলীর উদ্ভব হয়, বসন্তাগমে তাহা উহার দেহ হইতে ঝরিয়া পড়ে, মধ্য-এসিয়া ও তুর্কিস্থানে লোকরা ঐ সকল রোম সংগ্রহ করিয়া কম্বলাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাদের লোম হইতে চিত্রকরের তুলিক নির্ম্মিত হয়। উষ্ট্রের মূত্র ও বিষ্ঠা হইতে পূর্ব্বে "অ্যামোনিয়া" প্রস্তুত হইত। মিশর হইতে উষ্ট্রমূত্রজাত অ্যামোনিয়া এক সময় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত। মূত্রে অ্যামোনিয়ার ভাগ অত্যন্ত অধিক হইলেও ইহাদের মূত্রের পরিমাণ অতি অল্প। অশ্বাদির ন্যায় ইহারা এককালে প্রচুরপরিমাণে মূত্র ত্যাগ না করিয়া সারা দিবসে অত্যন্ত স্বল্পপরিমাণে মূত্র ত্যাগ করে। মরুভূমির মধ্যে জলাভাব বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের দেহ হইতে অধিক জলীয়াংশ মূত্রাদিতে বাহির হইবার ব্যবস্থা নাই। উষ্ট্রশাবকের মাংস আরবদিগের অতি প্রিয় খাদ্য। ইহাদের ককুদ নাকি অতি উপাদেয় সামগ্রী। উষ্ট্রেরা ৪০ হইতে ৫০ বৎসর অবধি জীবিত থাকে।

শ্রীঅশেষকুমার বসু, (বি, এ)।

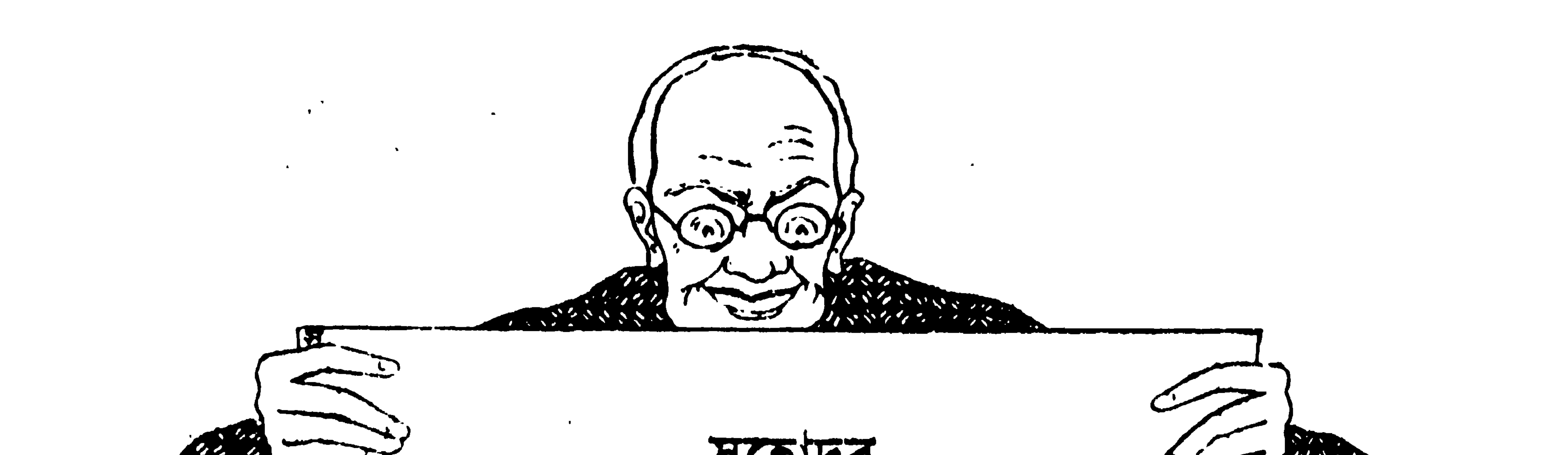

সহোদর

(পল্লী-চরিত্র)

১

হারাধন শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিল। বয়স একটু বেশী হইলে যখন সে সৈদাবাদের সন্নিহিত পল্লীসমূহে পিত্তল-কাঁসার বাসন ফেরি করিয়া অতি কষ্টে নিজের ও বৃদ্ধা জননীর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিল, তখন হারুকে সংসারী করিবার জন্য তাহার মা একটি টুকটুকে সুন্দরী মেয়ের সন্ধানে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন; কিন্তু তখন তাঁহাদের দুরবস্থার পরিচয় পাইয়া সেই বর্ণজ্ঞানহীন, স্বাবলম্বী, পরিশ্রমী যুবককে কন্যা সম্প্রদান করিতে কোন কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রও আগ্রহ প্রকাশ করিল না। এই জন্য হারাধনের মা মৃত্যুকালে পুত্রবধূর মুখদর্শনে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার অন্তিম আশা পূর্ণ হইল না।

হারাধন অসাধারণ পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর সে কোন দিন অনাহারে, কোন দিন অর্দ্ধাহারে থাকিয়া বাসনের ব্যবসায়ে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে লাগিল এবং সেই সঞ্চিত অর্থে দুই বৎসর পরে তাহার বাস্তুভিটায় স্থাপিত পৈতৃক জীর্ণ ভদ্রাসন মেরামত করিল। তাহার অবস্থা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল হইয়াছে বুঝিয়া কালান্তরের রাধু চৌধুরী তাহার মুরুব্বী হইয়া বসিল; রাধু হারুকে অনায়াসে বলিতে পারিত—'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে!' কিন্তু সে কন্যাদায়গ্রস্ত; তাহার মেয়েটির নাম বৃন্দারাণী; নাম যাহাই হউক, মেয়েটি কালীর বোতলের মত কালো এবং দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া হ্যাড়া। রাধু মেয়েটিকে আর কাহারও ঘাড়ে গছাইতে না পারিয়া নিখরচায় হারাধনের হস্তে সম্প্রদান করিল।

বিবাহের পর হারুর অবস্থা আরও একটু স্বচ্ছল হওয়ায় সে সৈদাবাদের বাজারে একখানি ক্ষুদ্র দোকান ভাড়া করিল। সেই দোকানে সে কয়েক প্রকার বাসন সাজাইয়া দোকানের মাথায় চার হাত লম্বা এক 'সাইন-বোর্ড' টাঙ্গাইল, তাহাতে মোটা মোটা হরফে লিখিল,—

ওভী উতক্রেষ্টো খাগড়াই বাসুন—
হারাধন পাল ব্রেদার্স এণ্ড কোং !!

মাথার মোট নামাইয়া হারু দোকানে বসিয়া পিত্তল-কাঁসার বাসন বিক্রয় করিতে লাগিল। দিনান্তে কোন দিন বারো আনা, কোন দিন এক টাকা লাভ হইত; সুতরাং মাসিক দশ টাকা দোকান-ভাড়া দিয়াও তাহাদের স্বামিস্ত্রীর অন্নবস্ত্রের আর তেমন কষ্ট রহিল না।

হারাধনের ছোট ভাই নারায়ণ বুদ্ধিমান্, সরল ও বিনয়ী, সে বাল্যকাল হইতেই জমীদার বাবুদের সংসারে প্রতিপালিত হইতেছিল।

জমীদার হরিচরণ বাগচী হারাধন ও নারায়ণের পিতা শশধর পালের মনিব ও মুরুব্বী ছিলেন; শশধর তাঁহার জমীদারীর গোমস্তা ছিলেন। শশধর মৃত্যুকালে হরিচরণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি যেন তাঁহার একটি ছেলের প্রতিপালনভার গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ হরিচরণ তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর রোগশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার ছোট ছেলে নারায়ণের সকল ভার গ্রহণ করিবেন এবং লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাকে মানুষ করিয়া দিবেন।

হরিচরণ বাবু তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন। হারু যে বৎসর সৈদাবাদের বাজারে বাসনের দোকান করিল, তাহার ছোট ভাই নারায়ণ সেই বৎসর রাজসাহী কলেজে বি, এ, পড়িতেছিল। রাজসাহীর রাণীবাজারে হরিচরণ বাবুর বাসাবাড়ী; তাঁহার তিনটি পুত্র ও একটি ভাগিনেয় সেই বাড়ীতে থাকিয়া রাজসাহী কলেজে পড়াশুনা করিত। হরিচরণ বাবু তাঁহার ছোট ছেলে ও ভাগিনেয়ের

শিক্ষার ভার নারায়ণের হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন। নারায়ণের বয়স হইয়াছিল; সে নিজেকে হরিচরণ বাবুর গলগ্রহ মনে করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারে ভাবিয়াই হরিচরণ বাবু তাহার হস্তে ছোট ছেলে ও ভাগিনেয়ের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নারায়ণই তাহাদের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক। সকলেই নারায়ণের পক্ষপাতী ছিল।

নারায়ণ প্রবাসে পরের বাসায় প্রতিপালিত হইলেও দাদার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বা ভালবাসার অভাব ছিল না। নারায়ণ ছুটী পাইলেই রাজসাহী হইতে সৈদাবাদে গিয়া দাদার সংসারে কয়েক দিন বাস করিয়া আসিত। হারুর স্ত্রী বৃন্দারাণী সুশিক্ষিত সুশীল দেবরটিকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করিত। হারু জানিত, তাহার কিঞ্চিৎ 'ব্যবসাবুদ্ধি' থাকিলেও সে বর্ণ-জ্ঞানহীন, তাহার ভাই ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছে—বি, এ, পাশ করিবে; বাসনের কারবারে যদি তাহার সাহায্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের কারবারের প্রচুর উন্নতি হইবে। নারায়ণের সাহায্যে সে তাহার ক্ষুদ্র দোকানটিকে জাঁকাইয়া তুলিতে পারিবে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে নারায়ণ বি, এ, পাশ করিতে না পারায় মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল এবং কলেজ ছাড়িয়া একটা মাষ্টারীর উমেদারীতে ঘুরিতে লাগিল। সেই সময় তাহার দাদা একটা জরুরী পরামর্শের জন্য তাহাকে সৈদাবাদে যাইতে অনুরোধ করিল। 'বেয়ারিং' পত্রখানি তিন দিন পরে নারায়ণের হস্তগত হইল।

২

নারায়ণ সৈদাবাদে আসিয়া তাহার দাদার নিকট জানিতে পারিল, দাইহাটের পতিতপাবন বাবুর 'খুঁটের' দোকানখানি বিক্রয় হইবে। পতিতপাবন বাবু বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি নিঃসন্তান; একমাত্র পত্নী ভিন্ন সংসারে তাঁহার অন্য কোন বন্ধন ছিল না। জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিন তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণবন্দনাতেই অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; এ জন্য তিনি সৈদাবাদের দোকানখানি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। দোকানে পিতল-কাঁসার নূতন বাসন অধিক না থাকিলেও ভাঙ্গা বাসন বিস্তর ছিল; এতদ্ভিন্ন রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় তাঁহার অনেক পাইকের ছিল; তাহাদের প্রত্যেকেই প্রতি মাসে পাঁচ সাত দশ মণ ভাঙ্গা বাসন দিয়া নূতন বাসন লইয়া যাইত। তাঁহার বেতনভোগী কারিকররা সেই সকল ভাঙ্গা বাসন গলাইয়া যে পিতল-কাঁসা পাইত, তদ্দ্বারা নূতন বাসন প্রস্তুত করিয়া দিত। এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ থাকিত। হারু নারায়ণকে বলিল, "দর-দাম ঠিক ক'রে ফেলেছি, ভাই; আড়াই হাজার টাকা নগদ পেলেই পতিতপাবন বাবু দোকানখানি আমাদের লেখাপড়া ক'রে দেবেন। তাঁর পাইকেরগুলিকেও হাতে পাওয়া যাবে। ভগবান্ যদি মুখ তুলে চান, তা হ'লে ঐ টাকা এক বৎসরেই শোধ করতে পারবো। তুমি টাকাটা যোগাড় ক'রে দাও। আমি ত কিছুই সঞ্চয় করতে পারি নি। আমি এক পয়সাও দিতে পারব না। কিন্তু যদি এ সুযোগ ছেড়ে দিতে হয়, তা' হ'লে এ রকম 'দাও' জীবনে আর কখনও জুটবে না—তা ব'লে দিচ্ছি। মা লক্ষ্মী আমাদের ভাঙ্গা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'আমাকে তোদের ঘরে একটু স্থান দে, আমার দয়ায় তোদের সকল অভাব দূর হবে, তোদের লোহার সিন্দুক টাকায় ভ'রে উঠবে।' আমি ভাই, লেখাপড়ার ধার ধারি নে, খরিদ-বিক্রীর কায এক রকম বুঝি। এই কারবারে যদি তোমার সাহায্য পাই, তুমি পাইকের-গুলাকে চালিয়ে নিয়ে হিসাবপত্র রেখে কারবারটা ভাল ক'রে চালাতে পার, তা হ'লে দু'বছরে আমরা গুছিয়ে উঠতে পারবো। চাই কি, দশ জনের এক জনও হ'তে পারি।"

নারায়ণ ২৫।৩০ টাকা বেতনের 'মাষ্টারী'র উমেদারীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হারুর কথা শুনিয়া তাহার ধারণা হইল—এই সুযোগ ত্যাগ করিলে মা-লক্ষ্মীকে গৃহদ্বার হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে; কিন্তু আড়াই হাজার টাকা সে কোথায় পাইবে? তাহার যে আড়াই টাকাও বাহির করিয়া দেওয়া অসাধ্য!

অনেক চিন্তার পর সাত দিনের সময় লইয়া নারায়ণ রাজসাহীতে ফিরিয়া গেল। সে তাহার চিরহিতৈষী মুরুব্বী হরিচরণ বাবুকে সকল কথা বলিয়া তাঁহার নিকট আড়াই হাজার টাকা ধার চাহিল। হরিচরণ বাবু জমীদার

হইলেও ব্যবসায়কার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি গোপনে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, নারায়ণের কোন কথা অতিরঞ্জিত নহে, সে যদি পতিতপাবনের দোকানখানি কিনিয়া মফঃস্বলের পাইকেরগুলিকে বশীভূত করিতে পারে, তাহা হইলে কমলার কৃপায় কয়েক বৎসরেই বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, তাঁহার টাকাগুলিও মারা যাইবে না। তিনি তাঁহার স্নেহের পাত্র ধর্ম্মভীরু ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ নারায়ণকে এই সুযোগে বঞ্চিত করিলেন না, একখানা হ্যাণ্ডনোটে নির্ভর করিয়াই আড়াই হাজার টাকা ধার দিলেন। হ্যাণ্ডনোটে সামান্য সুদের উল্লেখ থাকিল বটে, কিন্তু তিনি নারায়ণকে বলিলেন, তাহাকে এক পয়সাও সুদ দিতে হইবে না। দুই বৎসরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করিলেই চলিবে।

পতিতপাবন বাবু নারায়ণকে ভালই চিনিতেন এবং তাহার নানা সদ্‌গুণের জন্য তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। নারায়ণ নিজের দায়িত্বে টাকাগুলি ধার করিয়া আনিয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাকে নিজের নামে এই নূতন কারবার আরম্ভ করিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু নারায়ণ তাহার দাদাকে বঞ্চিত করা সঙ্গত মনে করিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা হবে না পতিতপাবন বাবু, এই আড়াই হাজার টাকা নষ্ট হ'লে, আমিই একা সে জন্য দায়ী। কিন্তু লাভ হোক, ক্ষতি হোক, দাদাকে বাদ দিয়ে নিজের নামে লেখাপড়া করতে পারব না।"

পতিতপাবন হাসিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ কারবারে লাভ হ'লে তোমার দাদা হবে তার অর্দ্ধেকের বখরাদার, আর লোকসান হ'লে ঐ টাকার জন্য তুমি একা দায়ী! এ রকম বখরাদারী মন্দ নয়। ছেলেমানুষ তুমি, লেখাপড়া শিখলে কি হবে, বৈষয়িক জ্ঞান থাকলে কি ও কথা বলতে? ঐ দাদাই এক দিন তোমাকে এমন হুড়ো দেবে যে, সে গুঁতো সাম্‌লাতে তোমার নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যাবে। যা ভাল বোঝ, কর বাপু! না ঠেক্‌লে ত শিখ্‌বে না।"

হারাধন ও নারায়ণ পাল দুই ভাইয়ের নামে নূতন কারবার লেখাপড়া হইয়া গেল। সেই সময় হইতে উভয় কারবার "হারু-নারায়ণ পাল এণ্ড সন্স" এই নামে চলিতে লাগিল।

অল্পদিন পূর্ব্বে হারুর একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। নারায়ণের বিবাহের জন্য হারুকে তেমন চেষ্টা করিতে হইল না; রাজসাহীর যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডুর সুশীলা কন্যা বিলাসিনীর সহিত নারায়ণের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। নারায়ণের তখন অবস্থা ফিরিয়াছে; তাহার মত সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে ধনাঢ্য আড়তদার যজ্ঞেশ্বরের আপত্তির কোন কারণ ছিল না।

৩

কুড়ি বৎসর পরের কথা।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর কুড়ি বৎসর অতীত হইয়াছে; এই কুড়ি বৎসরে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কত রাজ্যের রাজ-পরিবর্ত্তন, এমন কি, শাসনপ্রণালী পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কত ধনাঢ্য পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছে; কত সুখ-শান্তির আগার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সৈদাবাদ সহরে হারু ও নারায়ণের সংসারেও অল্প পরিবর্ত্তন হয় নাই; তাহাদের আর্থিক উন্নতি লক্ষ্য করিয়া লোক বিস্মিত হয়, সকলে বলাবলি করে, "উহাদের 'আঙ্গুল ফুলে তালগাছ' হয়েছে! কি পয়সাটাই রোজগার করছে, বাপ! ধূলো-মুঠো ধরলে তা সোনামুঠো হচ্ছে!"

'হারু-নারায়ণ পাল এণ্ড সন্স' পতিতপাবন বাবুর যে কারবার ক্রয় করিয়াছিল, তাহা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর, মালদা, ঢাকা, ময়মনসিংহের যত ভাঙ্গা-ফুটো বাসন ঐ সকল জেলার বিভিন্ন পাইকের দ্বারা 'জলের দরে' সংগৃহীত হইতে লাগিল। তাহা বস্তাবন্দী হইয়া রেলপার্শেলে 'পাল এণ্ড সন্সে'র দোকানে আনীত হইলে সপ্তাহে প্রায় কুড়ি জন কারিকরকে তাহা ভাগ করিয়া দেওয়া হইত; কেহ কেহ এক মণ পর্য্যন্ত লইয়া যাইত, এবং পারিশ্রমিক লইয়া তাহা গলাইয়া নূতন বাসন প্রস্তুত করিয়া দিত। ইহাতে কারিকররা প্রত্যহ এক টাকা পাঁচ সিকা উপার্জ্জন করিলেই যথেষ্ট; কিন্তু 'জলের দামের' সেই ভাঙ্গা বাসন গলাইয়া যে নূতন বাসন হইত, তাহার মূল্য ভাঙ্গাটির মূল্যের তুলনায় এত অধিক যে, কুড়ি বৎসরে সৈদাবাদের সেই নগণ্য পাল-ভ্রাতৃদ্বয়ের কারবারের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। পথের দুই ধারে প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা তাহারা ভাড়া দিতেছিল; এতদ্ভিন্ন সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকাও তাহারা বাসের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। কিন্তু ছোট ভাই নারায়ণই যে তাহাদের সকল উন্নতির মূল, এ কথা সকলে জানিলেও হারু তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল; কারণ, দোকানে ক্রয়-বিক্রয়ের ও কারিকরদের নিকট কাযকর্ম্ম বুঝিয়া লইবার ভার হারুর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। পাইকেরদের সহিত বন্দোবস্ত করা, মালের আমদানী-রপ্তানী, অলঙ্কার ও জমীজমা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া, ভাড়া দেওয়ার জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও ভাড়ার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি গুরুতর দায়িত্ব-ভার নারায়ণ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ, ঐ সকল কার্য্যে বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন; হারুর 'ক অক্ষর গো-মাংস!'

বাড়ীর ও দোকানের লোহার সিন্দুক যখন নগদ টাকা, নোট ও বন্ধকী গহনায় পূর্ণ হইল, তখন তাহাদের সুবৃহৎ বাসভবনও আত্মীয়-স্বজন ও পুত্র-কন্যার কলরবে মুখরিত। এই সময় হারুর একমাত্র পুত্র নীলমণি ও পত্নী বৃন্দারাণী ভিন্ন সংসারে তাহার অন্য কোন বন্ধন ছিল না; কিন্তু নারায়ণের চারি পুত্র ও এক কন্যা। হারুর আর্থিক উন্নতি যতই হউক, তাহার নজরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে দরিদ্র শ্বশুর-শাশুড়ী ও শ্যালক প্রভৃতিকে গোপনে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিত, কিন্তু নারায়ণের শ্বশুরবাড়ীর কোন লোক বাড়ীতে আসিলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইত; বিশেষতঃ তাহার নিজের সাংসারিক ব্যয় অল্প, নারায়ণের প্রকাণ্ড সংসার। নারায়ণের বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করিতে কি পরিমাণ অর্থ-ব্যয় হইতেছে,—তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়া হারু অত্যন্ত বিচলিত হইল। অবশেষে সে এক দিন নারায়ণকে বলিল, "আমাদের আর একসঙ্গে থাকা পুষোচ্ছে না নারাণ, এক এক দিন এক এক রকম কথা উঠছে। শাস্তরেই ত আছে,—'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই'; তা আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, সংসারে আমার ঐ সবে-ধন নীলমণি, কবে ম'রে-টরে যাব, এখনই 'প্রেথক' হওয়া ভাল।"

এক মাসের মধ্যে উভয় ভ্রাতা পৃথগন্ন হইল; বাড়ী-ঘর, যায়গা-জমী, অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সমান দুই অংশে বিভক্ত হইল। দুইটি আম্রবাগান ছিল;—একটি কলমের, একটি আঁটির আমের। হারু কাঁদিয়া-কাটিয়া কলমের বাগানটিই গ্রহণ করিল; কারণ—এজমালি অর্থে ঐ বাগান ক্রয়ের পর সে ও তাহার পুত্র সেই বাগানে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কলম লাগাইয়াছিল। রাঢ়ে ও কালান্তরের বিভিন্ন স্থানে তাহারা ধানের জমী কিনিয়াছিল; হারুর একই ছেলে, তাহার জমী-জমা ফসল প্রভৃতির তত্ত্বতল্লাসের মানুষ নাই, এই অকাট্য যুক্তির বলে উৎকৃষ্ট জমীগুলি অধিকার করিল। কিন্তু কারবার তখনও একত্র চলিতে লাগিল। এইভাবে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল; হারু নানাভাবে গুছাইয়া লইল।

৪

সহোদর নারায়ণ পালের সহিত পৃথক্ হইবার দুই বৎসর পরে হারু সহসা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইল। জেলার বড় বড় ডাক্তার প্রতিদিন নীলমণির নিকট মুঠা মুঠা টাকা লইয়াও রোগের প্রতীকারে অসমর্থ হইল; তখন নীলমণি কাকার কাছে কাঁদিয়া পড়িল, তাহাকে বলিল, "বাবাকে নিয়ে কলকাতায় চল, কাকা, তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে বাবার চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করলে এ যাত্রা বাবার রক্ষা পাওয়া কঠিন।"

হারুর স্ত্রীও নারায়ণকে বলিল, "ঠাকুরপো, তোমার দাদাকে বাঁচাও, তুমি বৈ আর আমাদের দেখবার শুনবার লোক কে আছে?"

হারুর স্ত্রী দুই বৎসর পরে তাহার দেবরের সহিত এই প্রথম কথা বলিল।

নারায়ণ কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া হারু ও তাহার স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে লইয়া গেল। এক মাস চিকিৎসার পর হারু আরোগ্যলাভ করিয়া বাড়ী ফিরিল। সে সুস্থ হইয়া জমা-খরচ মিলাইয়া দেখিল, কলিকাতায় চিকিৎসা করাইতে গিয়া তাহার প্রায় আট শত টাকা ব্যয় হইয়াছে! এ জন্য সে নারায়ণকেই দায়ী করিল। কারণ, নারায়ণ তাহার স্ত্রী-পুত্রকে মিথ্যা ভয় দেখাইয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে বাধ্য না করিলে তাহার এতগুলি টাকা অনর্থক জলে পড়িত না। তাহার 'প্রেমায়' (পরমায়ু) ছিল, সে বাঁচিয়াছে। টাকাগুলি ঐ ভাবে নষ্ট না করিলেও সে বাঁচিত।

এই ব্যাপারের পর হারু নারায়ণকে শত্রু মনে করিতে লাগিল। তাহার ধারণা হইল, সে জীবিত থাকিতে যদি

কারবার পৃথক্ করা না হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর নারায়ণ তাহার নির্ব্বোধ ছেলেটিকে 'টাট' হইতে নামাইয়া দিয়া সকলই আত্মসাৎ করিবে। সহরের অধিকাংশ প্রধান ব্যক্তির সহিত নারায়ণের আত্মীয়তা, স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তাহার সুহৃদ, হারু চক্ষু মুদিলে কেহই তাহার পুত্রের পক্ষসমর্থন করিবে না।

হারু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কারবারের অর্দ্ধাংশ পৃথক্ করিয়া লইল। এজমালী দোকান নারায়ণই রাখিল। হারু সেই দোকানের অদূরে একটি নূতন দোকান খুলিয়া বসিল। বিভিন্ন জেলায় যে সকল পাইকের ছিল, যাহারা তাহাদিগকে বস্তা বস্তা ভাঙ্গা বাসন পাঠাইত, হারু তাহাদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কয়েকটি জেলার মাতব্বর পাইকেরগুলিকে নিজের অংশে ফেলিবার চেষ্টা করিল। নারায়ণ বলিল, "পাইকেররা অস্থাবর সম্পত্তি নয়, তারা ব্যবসাদার মানুষ, যার সঙ্গে পোষায়, তার সঙ্গেই তারা কারবার করবে। তুমি পার, সমস্ত পাইকেরদের হাত কর, আমার কোন আপত্তি নেই।"—কিন্তু পাইকেররা নারায়ণকেই চিনিত, বিশেষতঃ হারু দুই একবার তাহাদিগকে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করায় তাহারা সকলেই হারুকে ত্যাগ করিয়া নারায়ণের সঙ্গেই কারবার করিতে লাগিল। সুতরাং কারবার পৃথক্ করায় প্রকৃতপক্ষে নারায়ণই লাভবান্ হইল দেখিয়া হারু ক্ষেপিয়া উঠিল; সে নানাভাবে নারায়ণের অনিষ্টচেষ্টা করিতে লাগিল। কোন বিদেশী পাইকের নারায়ণের দোকানে বাসন লইতে আসিলে হারু তাহাকে পথে ধরিয়া টানাটানি করিত, এবং সে তাহার দোকানে মাল লইতে সম্মত না হইলে তাহাকে ও নারায়ণকে এরূপ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিত যে, তাহার দোকানের নিকট বিস্তর লোক জমিয়া মজা দেখিত ও হারুকে উপহাস করিত। হারু তখন গালে মুখে চড়াইত।

হারু কি উপায়ে নারায়ণ ও তাহার ছেলেদের সর্ব্বনাশ করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহার কারবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল; কিন্তু সে নারায়ণের অনুগ্রহে দীর্ঘকাল লাভজনক কারবারে লিপ্ত থাকায় যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সেই টাকায় মহাজনী করিয়া ও বাড়ী ভাড়া দিয়া মাসিক যে ভাড়া পাইত, তাহাতেই তাহার যথেষ্ট অর্থাগম হইতেছিল, তখন তাহার বাসনের দোকান না চালাইলেও চলিত; কিন্তু নারায়ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লোভ সে ত্যাগ করিতে পারিল না।

৫

কিন্তু বাসনের কারবারের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে লাগিল; কিছুদিনের মধ্যে পিতল-কাঁসার বাসনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে এলুমিনমের বাসনের আবির্ভাব হইল। এতদ্ভিন্ন কাচের, চীনামাটীর ও পোরসিলেনের বাসনে সুদূর মফঃস্বলের পল্লী-সমূহ প্লাবিত হইল। অল্পমূল্যে হাঁড়ি, বোগ্‌নো, ডেক্‌চি, বাটি, থালা, গ্লাস, ডিস্ প্রভৃতি কিনিতে পাওয়ায় পল্লীগ্রামেও পিতল-কাঁসার বাসনের আদর কমিয়া গেল। যে ব্যবসায়ে হারু ও নারায়ণের অসাধারণ উন্নতি, সেই ব্যবসায় প্রতিদিন অবনত হওয়ায় নারায়ণ তাহার পুত্রগণকে বাসনের ব্যবসায়ে লিপ্ত না রাখিয়া সৈদাবাদের বাজারে আট দশ হাজার টাকা ব্যয়ে মুদীখানার দোকান খুলিয়া দিল।

এবার হারু দাদার মূর্চ্ছার উপক্রম। নারায়ণের অত্যাচার কি ভীষণ! নারায়ণ স্বয়ং টাকা কর্জ্জ করিয়া যে ব্যবসায় আরম্ভ করিল, দাদা বলিয়া সে হারুকে তাহার অর্দ্ধাংশের মালিক করিয়া লইল, তাহার পর হারু ব্যবসায়ের উন্নতিতে আঙ্গুল ফুলিয়া তালগাছ! স্ত্রীর ও পুত্র-বধূর অঙ্গে একশ ভরি করিয়া সোণা, সিন্দুকে ও ব্যাঙ্কে নগদ চল্লিশ হাজার টাকা মজুত, মাসিক আড়াই শত টাকা বাড়ীভাড়ায় আদায় এবং রেহানী সম্পত্তি ও অলঙ্কার বন্ধকের সুদ মাসিক তিন শতাধিক টাকা। আজ সৈদাবাদের বাজারে নগণ্য, দরিদ্র, বাসনের ফেরিওয়ালা হারু পাল—'হারু বাবু' নামে সুপরিচিত; নারায়ণ না থাকিলে আজ হয় ত বাসন বিক্রয় করিয়া তাহার দৈনিক অন্নের সংস্থান হইত, কিন্তু রাঢ় ও কালান্তর হইতে গাড়ী গাড়ী ধান-চাল আসিয়া গুদাম ঘর পূর্ণ হইত না, 'হারু বাবু' বলিয়া কেহ কুর্ণিশ করিত না। নারায়ণের সাহায্য ভিন্ন এই সুখ-সৌভাগ্য উন্নতির কোন চিহ্নও লক্ষিত হইত না। সেই নারায়ণ দশ হাজার টাকা ব্যয়ে ছেলেদের মুদীখানার দোকান খুলিয়া দিল, এবং দুই মাস না যাইতেই সেই দোকান বাজারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দোকানে পরিণত হইল; অধিক কি, তাহারা অত বড় জেলখানার 'রসদ-যোগানদার', হইল,

জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির রুটী, বিস্কুট, কেক্ সরবরাহের ভারও তাহারাই পাইল! শোকে দুঃখে হারুর ভুঁড়ি দিন দিন ধ্বসিতে লাগিল, দিবারাত্রি তাহার মনে হিংসার আগুন জ্বলিতে লাগিল। নারায়ণ ও তাহার ছেলেগুলাকে কি করিয়া জব্দ করিবে, এই সাধু চিন্তায় হারু দিন দিন কাহিল হইতে লাগিল। তাহার 'উদরের ক্ষুধা গেল, নয়নের নিদ্ গেল!'

নারায়ণের একটি পুত্র মাণিক বি, এ, পাশ করিয়া এম, এ, পড়িতেছিল; কিন্তু পরীক্ষার কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার মাথার অসুখ হওয়ায় তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া কিছুকাল চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় সে পিতামাতার দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল। কিছু দিন সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, কোন কোন দিন সে ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিত, যাহাকে সম্মুখে দেখিত, তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত; আবার কিছুকাল পরে তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিত; 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ' বলিয়া নারায়ণের পদপ্রান্তে মাথা কুটিত। কখন বা নৃত্য করিত।

হারু ভাইপোর অসুখের কথা শুনিয়া কোন দিন তাহাকে দেখিতে যায় নাই। উভয় পরিবারের কথাবার্ত্তা অনেক দিন পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। হারু আশা করিতেছিল, বি, এ, পাশ ভাইপোটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পাগলা গারদে প্রেরিত হইবে। কিন্তু তাহার এই আশা পূর্ণ হইল না; নারায়ণ বহু অর্থব্যয়ে ছেলেটিকে রোগমুক্ত করিল। মাণিক আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পাঠে মনঃসংযোগ করিল। নারায়ণ চিন্তিত হইয়া দোকান-পাট দেখিতে লাগিল। হারু মর্ম্মাহত হইয়া আহ্নিক-পূজা বন্ধ করিল।

৬

কিছু দিন পরে মাণিকের মামা বক্কেশ্বর কুণ্ডু মাণিকের জন্য একটি পাত্রী স্থির করিল। পাত্রীর পিতা নরহরি দে রাজসাহীর অধিবাসী; তিনি ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল; ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

উকীল নরহরি বাবু নারায়ণকে বহুদিন হইতে জানিতেন; নারায়ণ দীর্ঘকাল বাসনের ব্যবসায়ে অবস্থার কিরূপ উন্নতি করিয়াছিল, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তাহার উপর ছেলেটি বি, এ পাশ করিয়াছিল। নরহরি বাবু বক্কেশ্বরের প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলে বক্কেশ্বর নারায়ণকে সঙ্গে লইয়া মেয়ে দেখিয়া আসিল। পাত্রী দেখিয়া নারায়ণের পছন্দ হইল। নরহরি নারায়ণকে জানাইলেন, তিনি এক সপ্তাহ পরে সৈদাবাদে গিয়া পাত্র আশীর্ব্বাদ করিবেন।

নারায়ণ বাড়ী ফিরিয়া ভাবী বৈবাহিক নরহরি বাবুর অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিল। সংবাদটা সকলেই শুনিতে পাইল। নারায়ণের দাদা হারু শুনিল—নারায়ণ মাণিকের বিবাহ দিয়া নগদ তিন হাজার টাকা পাইবে, তাহার উপর বরাভরণ, পাত্রীর অলঙ্কার, যৌতুক প্রভৃতি ফাউ! যে উন্মাদ রোগে কয়েক মাস পূর্ব্বে পাগলা-গারদে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার বিবাহ দিয়া নারায়ণ পাঁচ হাজার টাকা ঘরে তুলিবে! হারুর অন্তর্বেদনার সীমা রহিল না। কি কৌশলে বিবাহটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, স্বামি-স্ত্রীতে দিবা-রাত্রি তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে নরহরি বাবু বক্কেশ্বরের সঙ্গে নারায়ণের গৃহে পদার্পণ করিলেন। নারায়ণ তাহার কোন জমীদার বন্ধুর মোটরকার সহ নরহরি বাবুর অভ্যর্থনার জন্য রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল।

পরদিন প্রভাতে নরহরি বাবু সোণার ফাউন্টেন পেন এবং সোনার 'রিষ্টওয়াচ' দিয়া মাণিককে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদের সময় হারুর উপস্থিত থাকা শোভন হইবে মনে করিয়া নারায়ণ তাহার একটি ছেলেকে বলিল, "যা, তোর জ্যাঠাকে ডেকে আন; বলিস, 'দাদাকে আশীর্ব্বাদ করতে ক'নের বাবা ঢাকা থেকে এসেছেন, আশীর্ব্বাদের সময় আপনি সেখানে না থাক্‌লে চল্‌বে না, জ্যাঠামশায়'!"

ভাইপোর আহ্বানে হারুর ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হইল; সে চোখ-মুখের বিকট ভঙ্গী করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "যা, যা, জ্যাটা মশায়ের সঙ্গে আর কুটুম্বিতে করতে হবে না। তোর দাদার বিয়ে হোক না হোক্—তাতে আমার এইটি—।" সে উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুগোল ভুঁড়ি আন্দোলিত করিতে করিতে নৃত্যের ভঙ্গীতে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ভাইপোর মুখের উপর প্রসারিত

করিল। জ্যাঠা মহাশয়ের অপরূপ ভঙ্গী দেখিয়া বালক সভয়ে পলায়ন করিল।

সন্ধ্যার পর কলিকাতার ট্রেণ। নরহরি বাবু সেই ট্রেণে কলিকাতায় যাইবেন স্থির করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিয়াছেন। বক্কেশ্বর তাহার দিদির অনুরোধে আর এক দিন ভগিনীপতির গৃহে থাকিতে সম্মত হওয়ায় নরহরি বাবুকে একাকী ফিরিতে হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি ট্রেণের প্রতীক্ষায় প্লাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

হারু পাল একখানা পাতলা চাদরে বিশাল উদরটির কিয়দংশ আবৃত করিয়া এক জোড়া বিবর্ণ চটির ভিতর ফাটা পদযুগল অতি কষ্টে প্রবেশ করাইয়া প্লাটফর্মে নরহরি বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, "পাত্তোর আশীর্ব্বেদ করতে এসেছিলেন বুঝি? আশীর্ব্বেদ হয়ে গ্যালো? 'পাত্তর' বেশ পছন্দ হয়েছে?"

নরহরি বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আপনাকে ত চিন্‌তে পারছি নে! নারায়ণ বাবুর বাড়ীতে আপনাকে দেখেছি ব'লেও মনে হচ্ছে না।"

হারু দন্তশ্রেণীর লোহিতকান্তি প্রদর্শন করিয়া বলিল, "কি ক'রে চিন্‌বেন? আমি নারায়ণের সহোদর দাদা। ভায়ার যা কিছু ঐশর্য্যি দেখচেন, তার মূলই হচ্ছে এই হারু পাল। (বক্ষে করাঘাত) তা আশীর্ব্বেদের সময় আমার ভাইপো ডাক্‌তে এলেও যাই নি ক্যানো শুন্‌বেন? আমার যে ভাইপোটিকে আপনি জামাই করতে মানস করেছেন, আশীর্ব্বেদও ক'রে যাচ্ছেন, সে হপ্তা দুই আগে আমার হাত কাম্‌ড়িয়ে 'আক্তো' বের ক'রে দিয়েছিলো। এই দেখুন হাতের ফিঁচেয় এখনও দাঁতের দাগ! কুকুর কুতায় নাগে!"

নরহরি বিস্ফারিত নেত্রে হারুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারই ভাইপো মাণিক? আপনার হাত কাম্‌ড়িয়ে রক্তপাত করেছিল? কারণ?"

হারু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা বুজি শোনেন নি? সে একখান লাঠী নিয়ে তার বাবার মাথা ফাটাতে যাচ্ছিল; নারাণ ছেলের হাতে মারা যায় দেখে আমি মাণকের হাত ধ'রে তাকে থামাতে যাই; সে আমার হাত ছাড়াতে না পেরে মারলে আমার হাতের ফিঁচেয় এক কামোড়!"

নরহরি ক্ষণকাল নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "ছেলে বি, এ, পাশ, এম, এ পড়ছে; বাপকে লাঠী নিয়ে মারতে ছুটলো, এ যে অতি অসম্ভব কথা বল্‌ছেন, পাল মশায়!"

হারু স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "নারাণ তার মাথায় কি একটা কব্‌রেজি তেল মালিস করতে গিয়েছিল, এই তার বাপের অপরাধ! উন্মাদ পাগল, হাত-পা বেঁধে ঘরে ফেলে রাখতে হ'তো। আজকাল একটু ভাল আছে! বিয়ের রাতে শুভোদিষ্টির সময় কনের গাল কাম্‌ড়িয়ে না ছায়, এই ভাবচি! আপনার ভাগ্যি ভালো যে, আপনি যখন আশীর্ব্বেদ করেন, তখন দাঁত বের ক'রে আপনার হাতে ছোবল মারে নি! একটু খোঁজ খবর নিয়ে বিয়ের দিন স্থির করবেন। ঐ বক্কেশ্বরটা শুনেচি ঘটক, সে সারাদিন আজ আপনাকে নজরবন্দী ক'রে রেখেছিল, কাযেই এ রকম জরুরী খবরটা আপনাকে দিতে পারি নি। বিয়ের দিন আবার সাক্ষেৎ হবে; তবে আসি, নমস্কার!"

হারু তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। নরহরি বাবু বাড়ী ফিরিয়া সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে মাণিকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল; কিন্তু সে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। তথাপি নরহরির মনের খট্‌কা দূর হইল না; চারি পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া একটা উন্মত্তের হস্তে প্রাণাধিকা দুহিতাকে সমর্পণ করিবেন? বরের পিতার সহোদর তাঁহাকে যে কথা বলিয়া গেল, তাহা অপেক্ষা আর কাহার কথা অধিক বিশ্বাসযোগ্য?

নারায়ণ বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত; দশ দিন পরে সে নরহরি বাবুর নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম পাইল,—তিনি পাগলের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না।

নারায়ণ এই মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করিতেও ঘৃণাবোধ করিল; সে আশীর্ব্বাদের জিনিষ দুটি নরহরির নিকট ফেরত পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সংবাদ তিনি কাহার নিকট পাইয়াছেন?

উত্তর আসিল, "আপনার সহোদরকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জর্জ ওয়াশিংটনের বাল্য-জীবন

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা ও আমেরিকার গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠাতা :প্রথম দেশমুখ্য জর্জ্জ ওয়াশিংটনের দ্বিশতবার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষে আমেরিকায় দেশব্যাপী উৎসব ও সমারোহ হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি একটি পরাধীন জাতিকে স্বাধীন করিয়া দেশের মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি যে এক জন নমস্য ও অসাধারণ ব্যক্তি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র-শাসনে কোনও অধিকার না পাইলে ট্যাক্স দিব না, এবং পরধনলোলুপ ইংলণ্ডের কোনও পণ্য ক্রয় করিব না বা কোনও বিলাতী দ্রব্য দেশে আমদানী করিতে দিব না, এই কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া আমেরিকার লোকরা যখন ইংলণ্ডের অনধিকার শোষণনীতির প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহাদের অগ্রণী ছিলেন জর্জ্জ ওয়াশিংটন। পরে যখন ইংরাজের একগুঁয়েমির ফলে আমেরিকাবাসীরা স্বরাষ্ট্র-শাসনের কোনও অধিকার পাইল না, এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যখন জোর করিয়া উহাদের নিকট হইতে ট্যাক্স, খাজনা, রাজস্ব আদায় করিবার ও বিদেশী মাল সেই দেশে আমদানী করিয়া শুল্ক আদায় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যখন মহামনা বার্ক প্রভৃতি দূরদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ বড় ইংরাজের হিতবাণী ও পরামর্শ ক্ষুদ্রচেতা ক্ষীণদৃষ্টি ও অদূরদর্শী ছোট ইংরাজরা শুনিল না, তখন আমেরিকার সহিত ইংরাজের দ্বন্দ্ব লাগিয়া গেল,—ভারতবর্ষের জিন, বুদ্ধ প্রভৃতির উত্তরাধিকারী ঋষি গান্ধীর অহিংস অসহযোগ নহে—সশস্ত্র সংগ্রাম দেশ রক্তাক্ত করিয়া তুলিল। স্বাধীনতা-লাভের সংগ্রাম বিফল হইলে তাহার নাম হয় বিদ্রোহ, এবং সফল হইলে নাম হয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম। এই সংগ্রামে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে আমেরিকার লোকরা নিজেদের দেশের শাসন-প্রণালী কিরূপ হইবে, তাহা স্থির করিতে গিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এক দল বলে যে, দেশে এক জন রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই রাজবংশের দ্বারা দেশ শাসিত হউক, অপর দল বলিল যে, রাজার কুশাসনের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া আবার সেই উপদ্রব ডাকিয়া আনিবার কি আবশ্যক আছে? দেশে সাধারণতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হউক। জর্জ্জ ওয়াশিংটন এই দুই দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়া দেশে স্বরাজ সংস্থাপন করিলেন, এবং আমেরিকার দেশশাসন-পদ্ধতি প্রণয়ন করিলেন। তিনি যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া বিশ্রাম করিবার অভিলাষ করিতেছিলেন, কিন্তু দেশের লোকের আগ্রহে তাঁহাকে দেশের প্রথম অধিনায়ক হইয়া দেশের স্বরাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে হইল।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন

যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে ও সকল ক্ষেত্রে দেশমুখ ও অগ্রণী ছিলেন, তিনি কেমন করিয়া এই মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। লোক বলে, উঠন্তি মুলা পত্তনেই বুঝা যায়, আর ঐ ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে, শিশুই মানুষের জনক, অর্থাৎ কোন্ শিশু বড় হইয়া কিরূপ হইবে, তাহা তাহার শৈশবেই তাহার আচরণ ও প্রকৃতি দেখিয়া জানা যায়।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জনশূন্য এক মাঠের মধ্যে একটি সামান্য কুটীরে বাস করিতেন। তাঁহাদের কেহ প্রতিবেশী ছিল না। তখন আমেরিকায় য়ুরোপীয়ানরা নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসিয়াছে, তখনও জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হয় নাই, এবং অগ্রণীদের অনেক সময় অগ্রসর হইয়া জনহীন অরণ্যে প্রান্তরে গিয়া জমী দখল করিয়া নিজেদের অধিকার স্থাপন করিতে হইতেছিল। কাযেই তাঁহাদের স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, কবে কে কোথায় অগ্রসর হইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। এমন অবস্থায় এই রকম পরিবারের বালক-বালিকাদের খেলার অবসর ছিল না, তাহাদিগকে সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, বাড়ীতে যে কয় জন লোক থাকে, এবং যে যতটুকু কায করিতে পারে, সকলকে তাহাই যথাসাধ্য করিয়া নিজেদের বাসস্থান নিরাপদ, আরামপ্রদ ও জীবন-ধারণোপযোগী করিয়া তুলিতে হইত। সে সময় দেশে বিদ্যালয় অধিক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং যাহারা গ্রাম হইতে একটু দূরে বাস করে, তাহাদের পক্ষে বিদ্যালয়ের সহিত সংযোগ স্থাপন করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের দুই বৈমাত্রেয় বড় ভাই ইংলণ্ডে লেখাপড়া শিখিতে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু জর্জ্জকে দেশের পাঠশালাতেই শিক্ষা করিতে হইতেছিল। তখন গুরুমহাশয়রা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া ফিরিতেন, এবং তাঁহারা চাণক্য-নীতিই সার নীতি জানিয়াছিলেন।

লালনে বহবো দোষাস্ তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ॥

গুরুমহাশয়রা তাই খুব বেত্রচালনা করিয়া শিক্ষা বিতরণের কার্য্য করিতেন। কিন্তু জর্জ্জের কাছে আসিয়া গুরুমহাশয়দের বেত্রের আস্ফালন স্তম্ভিত হইয়া থামিয়া যাইত। কারণ, ছেলেবেলা হইতেই জর্জ্জের খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল যে, সে অত্যন্ত সাহসী, সত্যবাদী, কষ্টসহিষ্ণু, তাহার দেহে অমিত বল, সে দুরন্ত ঘোড়া সায়েস্তা করিতে ওস্তাদ এবং সে একটু একগুঁয়ে গোঁয়ারও বটে। ইহা ছাড়া জর্জ্জ অসম্ভব রকমের মেধাবী, বুদ্ধিমান্ ও পাঠনিরত বালক ছিলেন, তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিবার মত বড় একটা প্রয়োজনও হইত না। পাঠশালার টিফিনের ছুটীর সময় যখন অন্যান্য ছেলেরা খেলা করিয়া বেড়াইত, তখন জর্জ্জ বসিয়া অঙ্ক কষিতেন বা হাতের লেখা সুন্দর করিতেন। তবে তাঁহার একটা আচরণ ছেলেদের ও গুরুমহাশয়ের কাছে নিন্দিত হইত, তিনি স্কুলের মধ্যে সব চেয়ে বড় যে বালিকা থাকিত, তাহার সহিত হাত-ধরাধরি করিয়া নাচিয়া লাফাইয়া বেড়াইতেন।

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের হাতের লেখার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন নমুনা যাহা এখনও সংরক্ষিত আছে, তাহা হইতেছে তাঁহার হাতের লেখা একটা কপিবুক, ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে লেখা। ইহাতে তিনি অনেক হিসাব ও তাঁহাদের সাংসারিক ব্যাপারের দলীলপত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ছেলেবেলা হইতেই কিরূপ সাবধানী হিসাবী লোক ছিলেন এবং অঙ্ক কষায় তাঁহার কিরূপ দক্ষতা ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি এই খাতায় "ভব্যতায় ১১০ ধারা" নাম দিয়া কতকগুলি নিয়ম রসিকতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, কেন ও কেমন করিয়া জর্জ্জ ওয়াশিংটন তাঁহার উত্তর-জীবনে অমন আদর্শচরিত্র লাভ করিতে পারিয়াছিলেন ও অত বড় মহৎ লোক কেমন করিয়া হইয়াছিলেন। কতকগুলি নিয়ম এখানে লিখিত হইতেছে—

আনন্দের মজলিসে কখনও দুঃখের কথা তুলিও না।

কখনও ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া থাকিও না।

যখন অপরে কথা কহিতেছে, তখন তুমি ঘুমে ঢুলিও না, অপরে দাঁড়াইয়া থাকিলে তুমি বসিয়া থাকিও না।

যখন চলিতে চলিতে তোমার সঙ্গী থামিয়াছে, তখন তুমি চলিও না।

যখন চুপ করিয়া থাকা সঙ্গত, তখন তুমি কথা কহিও না।

মুখে খাবার ভরিয়া কথা কহিও না।

যদি হাঁচি-কাসি আসে, অথবা হাই তুলিতে হয় বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয়, তবে যত আস্তে আস্তে সম্ভব, তত ধীরে করিবে এবং গোপন করিবার চেষ্টা করিবে।

হাই তুলিতে তুলিতে কথা কহিবে না। হাই তুলিবার সময় মুখ ফিরাইয়া মুখে রুমাল বা হাত চাপা দিয়া মুখ-ব্যাদান গোপন করিবে।

খাইতে বসিয়া দাঁত বা মুখ হইতে চর্ব্বিত খাদ্য বাহির করিবে না। খাওয়া হইলে আঁচাইবার সময় খড়িকা দিয়া দাঁত খুঁটিয়া সংলগ্ন খাদ্য বাহির করিয়া ফেলিবে।

ভব্যতার ১১০ ধারার শেষ ধারা হইতেছে যে,—তোমার অন্তরে স্বর্গীয় দিব্যজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বিবেক ও ধর্ম্মবুদ্ধিকে সতত জ্বলন্ত ও জীয়ন্ত রাখিতে যত্নবান্ থাকিবে।

স্কুলে থাকিতেই জর্জ্জের মনে এই বোধ জাগ্রত হইয়াছিল যে, তিনিই তাঁহার মাতা ও ভাই-ভগিনীদের একমাত্র নির্ভর, বড় হইয়া তাঁহাকেই উঁহাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। এই বোধ হইতে তাঁহার মধ্যেকার যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ, তাহা তিনি পরিণত করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য মনোযোগী হইয়াছিলেন। যখন জর্জ্জের বয়স মাত্র ১১ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশই জর্জ্জের দুই বৈমাত্রেয় ভাইকে দিয়া যান। সুতরাং জর্জ্জকে সেই অল্পবয়সেই তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাভগিনীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করিতে হইতেছিল।

১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার স্কুলের পাঠ সমাপ্ত হয়। তিনি আবাল্য অঙ্কশাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। স্কুল ছাড়িয়া তিনি জরিপ সার্ভে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জরিপ শিখিবার জন্য মাঠে মাঠে জমী মাপিয়া বেড়াইতেন, এবং অতি দক্ষতা ও নিপুণ একাগ্রতার সহিত তাঁহার কায করিতেন। ইহা লর্ড টমাস ফেয়ারফ্যাক্স্ নামক এক জমীদারের নজর আকৃষ্ট করিল। তিনি তাঁহার বিশাল জমীদারীর জরিপ করাইবার জন্য এক জন দক্ষ আমীন সার্ভেয়ার খুঁজিতেছিলেন। তিনি ওয়াশিংটনের কর্ম্মানুরাগ, একাগ্রতা, সম্পূর্ণ করিয়া কর্ম্ম সমাধা করিবার ঝোঁক প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আর লক্ষ্য করিয়াছিলেন ওয়াশিংটনের বলিষ্ঠ দেহে অসাধারণ শক্তি ও মনে অদম্য উৎসাহ ও অকুতোভয়তা। তখন আমেরিকার জমীদারী মানে নির্জ্জন প্রান্তর, বন-জঙ্গল, পাহাড়, খরস্রোতা নদী ও জল-প্রপাত; সেখানে হিংস্র মানব ও পশু জলে স্থলে সমান বিচরণ করে। তাহাদের মধ্যে গিয়া জমী জরিপ করিতে হইবে। ইহার উপযুক্ত ব্যক্তি জর্জ্জ ওয়াশিংটন। অতএব মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে জর্জ্জ ওয়াশিংটন এক জন সার্ভেয়ার হইয়া জমীদারী জরিপ করিতে চলিলেন। তাঁহার ডায়ারীতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, ১৭৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ তিনি লর্ড ফেয়ারফ্যাক্সের পুত্র জর্জ্জ ফেয়ারফ্যাক্সকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা আরম্ভ করেন।

ওয়াশিংটনের ডায়ারীতে এই জরিপের সময়ের অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করার কাহিনী লিখিত আছে। তিনি কদাচ কখনও বিছানায় শুইতে পাইয়াছিলেন, মাঝে মাঝে আবার সেই দেশী লাল মানুষের পাল্লায় পড়িয়া বিপদের আশঙ্কাতেও উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে।

এক মাসে তাঁহার জরিপ শেষ হয় ও এই কাযে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের এমন নাম হয় যে, তিনি সরকারী সার্ভেয়ার নিযুক্ত হন, এবং সেই কায তিনি তিন বৎসর করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি দেশের সকলের সঙ্গে মিশিবার ও দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ জানিবার ও বিপদে আতঙ্কে জড়িত হইয়া মানুষ হইয়া উঠিবার সুবিধা লাভ করিয়া আমেরিকার ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে পারিয়াছিলেন।

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সত্যবাদিতার কথা সকলে জানেন। তিনি পিতার প্রিয় চেরী-গাছ কাটিয়া ফেলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, ভয়ে মিথ্যা বলেন নাই। তিনি কেমন করিয়া নিজের প্রিয় বন্ধুকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার শত্রু-পক্ষীয় এক জন লোককে কায দিয়াছিলেন, ইহাও অনেকের জানা আছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বন্ধু আমার প্রিয়, কিন্তু দেশের কায যাহাকে দিয়া অধিক সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, আমি রাষ্ট্রনায়ক হইয়া তাহাকেই নিযুক্ত করিতে বাধ্য, তা হোক না সেই ব্যক্তি আমার বিপক্ষ। এইরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতার বীজ, জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বাল্য-জীবনের মধ্যেই দেখা যায় এবং এই সব দেখিয়া আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া এক জন মানুষ অসাধারণ মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন।

———

উপন্যাস-প্রতিযোগিতা

আমেরিকায় 'হার্পার ম্যাগাজিন' নামে একটি মাসিক পত্র আছে। সেই মাসিক পত্রে এক বৎসর অন্তর উপন্যাসের প্রতিযোগিতায় ১০ হাজার ডলারের একটি পুরস্কার দেওয়া হয়। এই বৎসর সেই প্রতিযোগিতায় অনেক উপন্যাস পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নির্ব্বাচনের জন্য তিন জন বিচারক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন রবার্ট রেণলডস্ দ্বারা প্রণীত "ব্রাদার্শ ইন্ দি

রবার্ট রেণল্ডস্

ব্রুক্স ডেভিস্

ওয়েষ্ট" নামক উপন্যাসখানিকে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করেন, আর এক জন বলেন, জর্জ ডেভিস প্রণীত "দি ওপনিং অফ এ ডোর" নামক উপন্যাসই শ্রেষ্ঠ। দুই জনের মতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত 'ব্রাদার্শ ইন দি ওয়েষ্ট' অর্থাৎ 'পশ্চিমাঞ্চলে দুই ভাই' নামক উপন্যাস ১০ হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩১ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কিন্তু তৃতীয় বিচারকের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট উপন্যাসখানিও বাজারে খুব নাম করিয়াছে, এবং তাহার ইহারই মধ্যে অনেক সংস্করণ ছাপা হইয়া গিয়াছে। এখন সমালোচকরা আলোচনা করিতেছে যে, কেন প্রথম বইখানি প্রথম হইল, এবং দ্বিতীয় বই দ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, এবং উভয়ের পক্ষের ওকালতীতে ব্যাপারটা উভয় গ্রন্থকারের পক্ষেই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহাই হউক, এই বিতণ্ডায় দুখানি বইয়েরই বেশ কাট্‌তি হইতেছে।

ব্রাদার্শ ইন দি ওয়েষ্ট উপন্যাসখানিতে স্থান ও কাল অনির্দ্দিষ্ট। যদিও প্লটের মধ্যে একটি গতি আছে ও তাহাতে ঘটনা-বহুলতাও আছে, তথাপি ইহাতে পাঠকের মনে আগ্রহ সঞ্চার করে না, কেবল দুই ভাইয়ের বাল্যাবধি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জীবনের কাহিনীর মধ্যে কোন ব্যাপারের চরম পরিণতি ও পরে কি হইবে জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত আগ্রহজনক অবস্থা নাই, ইহা যেন একটা রূপক রচনা, কেমন করিয়া জন ছয়েক লোকে মিলিয়া জংলা দেশের পশ্চিমাঞ্চলটা দখল করিয়া নিজেদের বাসস্থান করিয়াছিল, তাহারই কাহিনী।

দুই ভাইয়ের এক জন ছিল ফর্শা, লাল-চুলওয়ালা। আর ছোট ভাই ছিল কালো-চুলওয়ালা। তাহারা জানিত না, তাহাদের কোথায় জন্ম হইয়াছে, আর কে বা তাহাদের

পিতামাতা। তাহারা সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত জংলী লোকের সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দেখিলে এইটুকু বুঝা যাইত যে, যে সব লোক পুরাকালে য়ুরোপ হইতে আমেরিকায় আসিয়াছিল, যাহারা আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশের সূত্রপাত করে, ইহারা তাহাদেরই বংশধর। প্রথম উপনিবেশীরা আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূলে অবতরণ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া নূতন নূতন দেশ দখল করিবার যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, সেই আগ্রহই ইহারাও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া কেবল পশ্চিমমুখে চলিয়া যাইতেছিল।

ইহারা শিকার করে, ব্যবসা বাণিজ্যও করে, এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসী লাল মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিবাদ আর বন্ধুতা করিতে করিতে কেবল অগ্রসর হইয়া চলে। প্রথমে তাহাদের দলে কোনও স্ত্রীলোক ছিল না, কয়েক জন শ্বেতকায় পুরুষ দেশ দখলে যাত্রা করিয়া চলিয়াছিল। কিছু দিন পরে বড় ভাই ডেভিড একটি পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে হরণ করিয়া আনিল, সে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশের লোকের মেয়ে। সেই মেয়েটি এর আগে ছিল একটা হতভাগা আধাভাঁড় গোছের ফরাসী লোকের কাছে। সেই ফরাসী জাঁ গ্রোসজাঁ ডেভিডকে গুলী করিল, কিন্তু ডেভিড ভাল হইয়া উঠিল, এবং শেষে জাঁ তাহার সহিত আপোষ করিয়া তাহারই দলে আসিয়া ভিড়িয়া গেল। আর কিছু দিন পরে ছোট ভাই চার্লস এক জন স্পেনীয়-মেকসিকোর মেয়ের দেখা পাইল। সেই মেয়েটির আত্মীয়রা ইহাদের দলে যোগ দিল। একটা পলাতকা ছেলেও আসিয়া সেই দলে জুটিয়া গেল।

এই যাত্রিদল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিছু দিন পরে তাহাদের সঙ্গের স্ত্রীলোকদের সন্তান-সম্ভাবনা হইল, কাযেই তাহারা বাধ্য হইয়া এক স্থানে বাসা বাঁধিতে বাধ্য হইল। তাহারা গৃহস্থালী পাতাইয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া বসিল, তাহাদের সন্তানাদি জন্মিল, দুই ভাই তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান পরিবার দ্বারা পরিবৃত গৃহপতি হইয়া বাস করিতে লাগিল। জরা তাহাদিগকে স্থবির করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি তাহারা এক দিন দুই ভাই একত্র শিকারে বাহির হইয়া গেল, দূরে পাহাড়ের উপর জঙ্গলে তাহারা ক্লান্তদেহ লুণ্ঠিত করিয়া মরিয়া গেল। তাহাদের দলের আর বংশের লোকরা তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই উদ্বেগ প্রকাশ করিল না, আর শীঘ্রই তাহাদের স্মৃতি উহাদের মনের মধ্যে আবছায়া হইয়া আসিল।

এই ত বইয়ের প্লট। ইহার মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। আদিম পাঁচমিশালি আমেরিকার উপনিবেশীদের দেশ দখলে যাত্রার ছবি আঁকা। সুদূর উত্তরের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোক, সুদূর দক্ষিণের স্পেনের লোক, আর মধ্য-য়ুরোপের ফরাসীদের একত্র মিলিয়া দেশ দখল, তাহার পরে ফরাসীর পরাজয় ও বিজেতাদের সঙ্গে বীরের ন্যায় আপোষ, এবং যাহারা দেশ দখলের অগ্রণী, তাহারা তাহাদের জীবদ্দশাতেই লোকের কাছে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া কেমন করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল, তাহারই কাহিনী এই বইয়ে আছে। ইহাতে গ্রন্থকার বাস্তবতার সহিত রোমান্স মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থকার জর্জ ডেভিসের "দি ওপনিং অফ এ ডোর" বা 'দ্বারমোচন' নামক উপন্যাস সম্বন্ধে সমালোচকরা বলেন, উহা একটি মনোজ্ঞ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে রচনারীতি ও পরিণত চিন্তার উৎকর্ষ দেখা যায়। এই গ্রন্থকারের বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। এই উপন্যাসের সব পাত্র-পাত্রী জীবন্ত লোক হইয়াছে, যেন তাহারা সকলে চেনাশোনা জানা লোক। ইহার মধ্যে একটি ঠাকুরমার চিত্র আছে, সেই হইতেছে ইহার মধ্যমণি। ঠাকুরমা বুড়া হইয়া ভীমরতি হইয়াছে, সে আর কোনও কথা মনে রাখিতে পারে না, কিন্তু তাহারই মধ্যে তাহার চরিত্রের স্নেহ, মমতা ও ধূর্ত্ততা ফুটিয়া উঠে। এই ঠাকুরমার জন্যই ফ্লোরা পিসী জীবনে বিবাহ করিতে পারে নাই, বুড়া থুবড়া হইয়া ঘরে আছে, আর তার গুণের মধ্যে একটি দেখা যায় যে, সে খুব চোখা চোখা বাক্যবাণ বলিতে সুপটু। এই ঠাকুরমার জন্যই লিঙ্কলন্ কাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে যে ঠাকুরমার আদুরে খোকা ছিল, আর এই কাকার যত রকম নীচতা ক্ষুদ্রতা আর দুষ্টামির জন্যই পরিবারে যত রকম অশান্তি আর দুঃখ ঘটে। এই ঠাকুরমার জন্যই ঠাকুরদাদা যৌবনের আনন্দময় প্রফুল্ল লোক হইতে এখন বদল হইয়া হইয়াছে একগুঁয়ে খিট্‌খিটে বিষণ্ণবদন। এই ঠাকুরমার জন্যই থিয়োডোরা কাকীমার চঞ্চলতা, ড্যানিয়েল কাকার দুঃখ, আর আলেকজান্দ্রা জেঠিমার শুচিবাই আর ভগবান লইয়া নাড়াচাড়া হইয়াছে।

কিন্তু তথাপি এক ড্যানিয়েল ছাড়া সকলেই ঠাকুরমাকে ভক্তি করে, কারণ, সেই ত সকলকে এত দিন শাসনে চালনা করিয়া আসিয়াছে, এই ঠাকুরমা ত কেবল তার পরিবারে প্রচণ্ড ছিল না, যেখানে ঠাকুরদাদার মুদির দোকান ছিল, সেই সারা শহরটাই ঠাকুরমার প্রভাবে সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই কাহিনীর সঙ্গে ঠাকুরমা একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ নহে। এই উপন্যাসে কোনও বিশেষ একটি গল্পধারা নাই, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্র একত্র গ্রথিত করিয়া এই উপন্যাসখানি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। তথাপি সমালোচকরা বলেন যে, এই বইখানির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মাল-মসলা প্রচুর আছে।

ক্ষুদ্রতম পাঠশালা

প্রায় কুড়ি বৎসর আগে আমেরিকার ষ্ট্রাটন পরিবার সোনা সন্ধানের জন্য জনশূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া বাস করে। সেই পাহাড়ে ইহারা মাঝে মাঝে সোনার রেণু ত পায়ই, মাঝে মাঝে আবার এক আউন্সের চেয়েও ওজনে ভারী সোনার ডেলা কুড়াইয়া পায়। সুতরাং এ দেশ ছাড়িয়া তাহারা লোকালয়ে যাইতেও পারে না। এই বিজন পাহাড়িয়া দেশে তাহাদের তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা বড় ছেলেটির লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একবার নিকটবর্ত্তী সহরে গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ত অধিক দিন তাহাদের সোনার দেশ ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারে না, তাহাতে তো তাহাদের লোকসান। তাহারা সেই ছেলেকে সেখানকার বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিল। কিন্তু পরে যখন ছোট ছেলে দুটিও বড় হইয়া উঠিল, তখন উহাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থার জন্য তাহারা স্বামি-স্ত্রীতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের অবস্থা এমন স্বচ্ছল নহে যে, তাহারা তিন তিনটি ছেলেকে বিদেশে বোর্ডিং স্কুলে রাখিয়া মাসে মাসে খরচ জোগাইয়া তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে পারে। অথচ ছেলেকে লেখাপড়া শেখানও ত বাপ-মায়ের কর্ত্তব্য। ইহারা এই সোনার দেশ ছাড়িয়া সহরে লোকালয়ে গিয়াও থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তাহারা খাইবে কি? এখানে বিনা খরচে তাহারা গরু, ছাগল, ভেড়া পালন করে, সেগুলাই বা কাহাকে দিয়া যাইবে? তা ছাড়া তাহারা এখানে সোনার খনি খুঁড়িবার জন্য আবেদন করিয়াছে, তাহাও মঞ্জুর হইতে পারে। ছেলেদের বাপ ত এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে কিছুতেই রাজি নয়, তা যদি ছেলেদের লেখাপড়া না হয় ত কিই বা করা যাইবে।

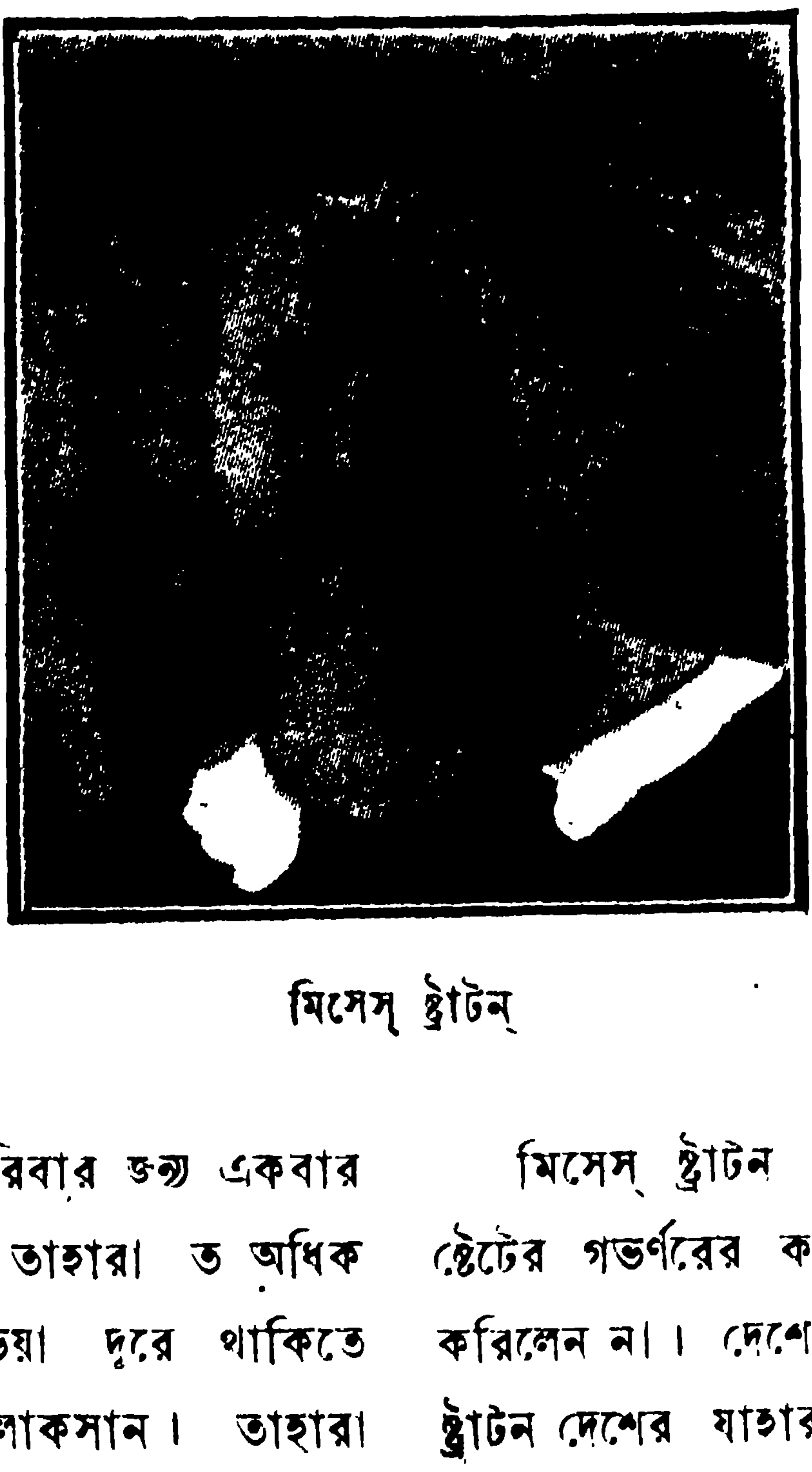

মিসেস্ ষ্ট্রাটন্

তখন ছেলেদের মাতা মিসেস্ ষ্ট্রাটন সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন, ছেলেদের বাবা যদি ছেলেদের লেখাপড়ার সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কোনও ব্যবস্থা না করে, তবে মাতাই সেই ব্যবস্থা করিবার ভার লইবেন। মিসেস্ ষ্ট্রাটন সেই জেলার স্কুল-কমিটীর কাছে আবেদন করিলেন যে, যেখানে এক জনও লোক বাস করে, সেখানে সকল রকম সুব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। দেশের কোনও ছেলে যদি শিক্ষা না পায়, তবে ত তাহা সমগ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থারই কলঙ্ক।

স্কুল-কমিটী এই দরখাস্ত পাইয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দিল, বিজন তুন্দ্রে দেশে আবার স্কুল-প্রতিষ্ঠা! এমন আজগুবি আবেদন কে কবে শুনিয়াছে?

মিসেস্ ষ্ট্রাটন দমিবার লোক নহেন। তিনি সেই ষ্টেটের গভর্ণরের কাছে আবেদন করিলেন; তিনিও কিছু করিলেন না। দেশের কর্ত্তাদের সাহায্য না পাইয়া মিসেস্ ষ্ট্রাটন দেশের যাহারা সাধারণ লোক, যাহারা ভোট দিয়া দেশের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে, সেই ভোটারদের দ্বারস্থ হইলেন, তাহাদের জনে জনে এই কথা বুঝাইতে লাগিলেন যে, যদি দেশের কোনও কোনও ছেলে অশিক্ষিত থাকে, তবে তাহা সমস্ত দেশেরই কলঙ্কের কথা ও দেশের প্রত্যেক লোকের কর্ত্তব্যহানির নিদর্শন। অতএব সকল লোকের সেই কলঙ্ক-মোচনের জন্য যত্নপর হইতে হইবে। দেশে

মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। শিক্ষা-ব্যবস্থার কর্ম্মচারীদের নিকট ভোটদাতা নিয়োগকর্ত্তা জনসাধারণ মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল যে, ষ্ট্রাটন পরিবারের বালক দুটির শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুরাতন স্কুল-কমিটী বরখাস্ত হইয়া নূতন কমিটী গঠিত হইল।

তখন কর্ম্মচারীরা বাধ্য হইয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহারা আইন দেখাইল যে, যেখানে অন্ততঃ তিনটি ছাত্র না জুটিবে, সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইতে পারিবে না। মিসেস্ ষ্ট্রাটনের ত মাত্র দুটি ছেলে, আর তাঁহার বয়সও ত আর নাই যে, আর একটি ছেলে তিনি আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিবেন।

মিসেস ষ্ট্রাটন কিছুতেই দমিবার পাত্রী নন। তিনি কর্ম্মচারীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রসিকতার উত্তর দিলেন, কথায় নহে, কাজে। তিনি আর সন্তান প্রসব করিতে পারিবেন না সত্য, কিন্তু তিনি ত পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি সহরে গিয়া একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ ছেলেকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, তাহার স্কুলে যাইবার বয়স হইয়াছে, সে মিসেস্ ষ্ট্রাটনের ছেলেদের চেয়ে বয়সে বড়ই। সে মেধাবী, লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া ভদ্র হইতেও চায়। মিসেস্ ষ্ট্রাটন সেই ছেলেটিকে দত্তক গ্রহণ করিয়া আবার স্কুলের জন্য স্কুল-কমিটীর নিকট দরখাস্ত করিলেন ও তাহাদিগকে জানাইলেন যে, আইনের আবশ্যক সংখ্যা পূরণ করিয়া তিনি তাঁহার তিনটি পুত্রকে স্কুলে পড়াইতে চাহেন, অতএব অবিলম্বে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হউক।

এখন আর স্কুল কমিটীর কোনও ওজর-আপত্তি করার উপায় রহিল না, তাঁহারা অগত্যা সেই ভূতুড়ে জংলা বিজন দেশে মাত্র তিনটি ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য স্কুল স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। একটি পুরাতন পোড়ো বাড়ীর ধূলা ঝাড়িয়া তাহাতে কয়েকখানা ডেস্ক পাতিয়া ও একটা কালো বোর্ড ও একখানা ম্যাপ বেড়ার গায়ে লট্‌কাইয়া দিয়া স্কুল বসিল এবং এক জন শিক্ষয়িত্রী ছাত্রদের শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া আসিয়া সেই জনশূন্য ভূতুড়ে দেশের এক জন বাসিন্দা বৃদ্ধি করিলেন।

মিসেস্ ষ্ট্রাটন পরের স্কুল-কমিটীর নির্ব্বাচনের সময় নিজেই কমিটীর এক জন ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মণ্টানা প্রদেশের, হয় ত বা সমস্ত ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের অথবা সারা পৃথিবীর মধ্যেকার সব চেয়ে ছোট পাঠশালা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সুব্যবস্থা করিয়া তিনি জগতে প্রত্যেক নর-নারীর শিক্ষিত হইবার অধিকার ও দেশের শাসক-পরিষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত দেশে দেশে অনুসৃত হউক।

ক্ষীণদৃষ্টি শিশুদের বিদ্যালয়

মানুষের সভ্যতার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় তাহাদের অভাব-মোচনের আয়োজনের পরিমাণ অনুসারে। সভ্যদেশে প্রত্যেক বালক-বালিকা শিক্ষিত হইয়া যোগ্য দেশবাসী হইয়া উঠিবে, ইহার জন্য সুব্যবস্থা করা দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ত্তব্য। এই জন্য স্বাভাবিক মেধাসম্পন্ন বালক-বালিকার শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় ত সকল দেশে গ্রামে গ্রামে আছেই, তাহা ছাড়া বোবা কালা অন্ধ বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্যও ব্যবস্থা সকল সভ্যদেশে প্রচুর করা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা একেবারে অন্ধ নয়, অথচ যে সব ছেলে-মেয়ের চোখে কোনো রকম অভাব ও অপূর্ণতা আছে, তাহারা ত না পারে অন্ধদের সঙ্গে শিক্ষালাভ করিতে, আর না পারে প্রখর-দৃষ্টি-সম্পন্ন বালক-বালিকাদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখিতে। তবে তাহাদের উপায় কি? শিক্ষাবিষয়ে অগ্রণী আমেরিকা ইহাদের কথাও ভুলে নাই।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসে অন্ধতা-নিবারক জাতীয় সমিতি আছে, বিকলাঙ্গ শিশুশিক্ষার সার্ব্বজাতিক পরিষৎ আছে। অন্ধতা-নিবারক জাতীয় সম্পত্তি শেষোক্ত বিকলাঙ্গ-শিশু-শিক্ষণ-পরিষদের কাছে ক্ষীণদৃষ্টি ৪৬ হাজার বালক-বালিকার জন্য কোনও রকমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই বলিয়া নালিশ করিয়াছেন।

কুড়ি বৎসর আগে বষ্টন আর ক্লিভল্যাণ্ড সহরে দৃষ্টি-রক্ষণ ক্লাস প্রথম খোলা হয়। ইহাতে দেশের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করিবার সময় এখনও হয় নাই, ইহার অমূল্য উপকারিতা বুঝা যাইবে আরও কিছুদিন গত হইলে। এই সব ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার আগে যে-সব শিশু বোকা, বিষণ্ণ, দুষ্ট, পাপাসক্ত ও অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহারা এখন মেধাবী কর্ম্মঠ সদানন্দ সাধু-চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া সে

দেশে এখন মোটের উপর ১১২ স্থানে ৪ শত স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক স্কুলে গড়ে ১ শত করিয়া বালক-বালিকা শিক্ষা পাইতেছে, তাহাতে দেশের ৪ হাজার শিশুর দৃষ্টির বিকলতার জন্য শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দেশে এখনও ৪৬ হাজার বিকৃত-দৃষ্টি বালক-বালিকা আছে—যাহারা শিক্ষার অভাবে জীবনে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

বিকৃত-দৃষ্টি শিশু-বিদ্যালয়ে যে-সব বই পড়ানো হয়, তাহার অক্ষর খুব বড় বড় করিয়া ছাপা, লেখাপড়ার অধিকাংশ কাযই কালো-বোর্ডের গায়ে লিখিয়া সারা হয়, তাহাতে চোখের উপর বেশী চাড় বা টান পড়ে না। যে

এই সব ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের নিজের দৃষ্টির দোষ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার ফলে তাহারা নিজেরাই কে কোন্ কাযের উপযুক্ত, তাহা স্থির করিয়া নিজেদের শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন করে, এবং সেই বিষয়টি হাতে-কলমে ও হাতে-হাতিয়ারে শিক্ষা করিয়া ভবিষ্য জীবনে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী হইয়া উঠে।

প্রায় সকল সভ্য দেশেই শিশুদের শিক্ষা আবশ্যক। অতএব এই রকমের বিকৃত ও বিকলদৃষ্টি যে সকল শিশু, তাহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করাও ষ্টেটের কর্ত্তব্য। সুস্থ স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা বিকলাঙ্গ শিশুদের

দৃষ্টিরক্ষণ ক্লাশ

সব আসনে ছেলেমেয়েরা বসে, সেগুলি আগাইয়া পিছাইয়া সরাইয়া ছাত্র-ছাত্রীর দৃষ্টির পাল্লার মধ্যে আনা যায়, যথাস্থানে সন্নিবেশিত আসনে বসিয়া ছাত্ররা লেখাপড়া করে, কাহাকেও চোখ চাহিয়া দেখিবার প্রয়াস করিতে হয় না। ঘরের মধ্যে আলোকেরও ইচ্ছামত ব্যবস্থা করা যায়, যে দিকে যতটুকু আবশ্যক, সে দিকে ততটুকু আলোক-পাত করিয়া ছাত্রদের বিকৃতদৃষ্টির অনুকূলতা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বাল্যাবধি হাতের স্পর্শের দ্বারা চোখে না দেখিয়া টাইপ-রাইটারে লিখিতে অভ্যাস করানো হয়, তাহাতে লেখার জন্য চোখের উপর কোনও খাটুনি পড়ে না।

শিক্ষায় খরচ বেশী পড়ে; কারণ, তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু যে সব শিশু অক্ষম হইয়া পরের গলগ্রহ হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে যদি মানুষ করিয়া তোলা যায়, তবে দেশের যে অর্থ-ব্যয় হইবে, তাহা সার্থকই হইবে। তাহারা পরে আত্মনির্ভর হইয়া উত্তম দেশবাসীতে পরিণত হইবে ও দেশের ধন-জন বৃদ্ধি করিয়া দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিবে। অতএব তাহাদের জন্য ব্যয় অপব্যয় নহে। এই জন্য আমেরিকায় নানা স্থানে বিকলাঙ্গদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং তাহার জন্য নানা শিক্ষক বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৩

পূজান্তে নৈবেদ্যের চাল-কলা লইয়া সুনন্দা বাহিরে ছড়াইয়া দিতেছিল। এক দল কাক ও পায়রা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া সেগুলি গলাধঃকরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পূজার চাল-কলা যে তাহাদের দৈনিক বরাদ্দ, শতস্থানের শতখাদ্য ফেলিয়া এই সময়টিতে তাহারা মন্দির-অঙ্গনে ছুটিয়া আসে।

কাক-পায়রাদের গা ঠেলিয়া অতিসাহসী দুই তিনটা চড়াই ভাগের উপর ভাগ বসাইতেছিল। একটি হতাশ শারিকা মন্দিরের কার্ণিসের উপর বসিয়া মনের খেদে কিচিরমিচির আরম্ভ করিল।

নন্দা টাটের চাউল ছড়াইয়া দিয়া পাখীদের খাওয়া দেখিতে লাগিল। রাজু পূজার বাসনগুলি ধুইয়া দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া নন্দার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

আজকাল দুই সখী স্নানান্তে একত্রে পূজা করিয়া থাকে। সন্ধ্যারতির সময় দুই জন একসঙ্গে মন্দিরে আসে। পাখীদের চাল-কলার ভোজে উভয়েই আনন্দ পায়, উহারা কত অল্পে সন্তুষ্ট, নৈবেদ্যের এক কণা তণ্ডুলও উহাদের দৃষ্টিপথ এড়ায় না। যাহারা অল্পে পরিতৃপ্ত, তাহারাই প্রকৃত সুখী।

দুই সখী যখন পাখীদের প্রতি তন্ময় হইয়া চাহিয়া ছিল, তখন ব্যস্তসমস্তভাবে বংশী আসিয়া কহিল, "ওরে নন্দা, রাজু, তোদের পুজো হয়ে গেছে? শীগ্‌গীর আয়, আমার কাপড়-চোপড় ক'খানা গুছিয়ে দে, আমি এখন কামাখ্যা দর্শনে যাচ্ছি।"

রাজু বিস্মিত হইল, নন্দা হইল না। কারণ, তাহার দাদার চরিত্র সে সবিশেষরূপেই জানিত। কোথাও যাইবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দিনস্থির করিয়া তাহার যাইবার অভ্যাস নাই।

নন্দা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে কামাখ্যায় যাবে, দাদা? তুমি কার সঙ্গে যাবে?"

বংশী কহিল, "তুই কি তাঁদের চিনবি, নন্দা? তাঁরা কামাখ্যার মস্ত জমীদার, সাথে কত লোকজন, প্রকাণ্ড বজরা, নদীর ঘাটে আমার সাথে আলাপ হ'ল। জমীদার নিজেই মহল দেখতে এসেছিলেন, এইবার দেশে ফিরবেন। মা'র শরীর খারাপ ব'লে জলের হাওয়া খাওয়াতে সঙ্গে এনেছেন মা আমাকে ডেকে কত আদর-যত্ন ক'রে কামাখ্যায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, আমায় না নিয়ে তিনি কিছুতেই যাবেন না। ভারী ভাল মানুষ, এমন দেখি নি।"

রাজু হাসিয়া কহিল, "তুমি ভাল ব'লে সকলকেই ভাল দেখ, দাদা। এক দণ্ডের আলাপে না কি মানুষ চেনা যায়? তুমি চিনবেই বা কেমন ক'রে, পৃথিবী ভরেই যে তোমার মা-ভাইয়ের ছড়াছড়ি।"

বংশী বলিল, "যা বলেছিস, রাজু, সত্যি। মেয়েদের মা ছাড়া যে আমি ভাবতে পারি না, পুরুষদের দেখলেই আমার ভাই ব'লে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয়। তোরা শীগ্‌গির চল, আমার আর সময় নেই। ওদিকে বৌ রেগে রয়েছে, তীর্থে গেলে কারুর সাথে না কি রাগারাগি ক'রে যেতে নেই। অথচ বলতে গেলে সে আরও রেগে যাবে, মহা মুস্কিল।"

নন্দা সহাস্যে বলিল, "দাদা, শোন, যেও না। বৌদির রাগ ভাঙ্গাবার ভার আমি নিলাম। আমায় ফেলে তোমায় আমি কখনও যেতে দেব না। তুমি যাঁকে মা বলেছ, তিনি কি আমারও মা হয়ে বজরায় একটু যায়গা দেবেন না? যদি না দেন, তা হ'লে চল না, দাদা, আমাদের মত আমরাই যাই। পোষ্টাফিসে আমার যে দু'শ টাকা আছে, সেইটা তুলে নিলেই সব হবে।"

বংশী ক্ষণকাল ভাবিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তুইও পালাতে চাস? কেন নন্দা, তোর ভয় কি? আমার ভয় আমি বুঝতে পারছি। মা'র দেওয়া তোর ও টাকাটা আমি ছোঁব না রে, যদি যাওয়াই হয়, এমনি হয়ে যাবে। তুই যাবি—আচ্ছা, আমি একবার বজরায় যেয়ে শুনে আসি।" বলিতে বলিতে বংশী রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল।

নন্দা ডাকিয়া বলিল, "এখনই যেয়ো না, দাদা। খেয়ে দেয়ে ধীরে সুস্থে যেয়ো।"

"দেরী হবে না, এই যাব আর আসবো, তুই রান্না করতে করতেই আমি আসছি।"

বংশী হন্ হন্ করিয়া ঝোপের পার্শ্বে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাজু বংশীর গমনপথ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

নন্দা শান্তমুখে হাতের টাটখানা ভাল জলে ধুইয়া, মন্দিরে রাখিয়া দ্বারটা টানিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,

"চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলি কেন, রাজু? চল ভাই, আমাদের জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে দিবি। যে ব্যস্তবাগীশ দাদা, হয় ত ঘুরে এসে বল্‌বেন, এখনই যেতে হবে। এমন সুযোগ সহজে আসে না। যদি পাওয়া গেল, একে আমি হেলায় হারাব না।"

রাজু নিরুত্তরে তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া নন্দা অগ্রসর হইয়া তাহার স্কন্ধে একখানি বাহু জড়াইয়া অপর হস্তে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিতেই চমকিয়া উঠিল। রাজুর দুই চক্ষু বহিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার অভিমানের অশ্রু ত অনেক দিন থামিয়া গিয়াছে। ইহা ত নিজের দুঃখের রোদন নহে, ইহা ব্যথিতের জন্য ব্যথার অশ্রু।

নন্দার চোখের প্রান্ত ভিজিয়া গেল। কষ্টে হৃদয়ের উদ্দাম ভাব দমন করিয়া নন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "আমি যাব শুনে কান্না কিসের, রাজু? আমি ত জন্মের মত যাচ্ছি না, কয়েক দিন পর আবার ফিরে আসবো, এমন আসা-যাওয়া সবাই ত করে।"

"তোর মত যাওয়া-আসা কেউ করে না, নন্দা। তোর মত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী সংসারে কয়টা আছে?"

রাজু দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

নন্দা কিছুই বলিল না, বলিতে পারিল না, নীরবে সখীকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

মধ্যাহ্নে বংশী গৃহে ফিরিলে জানা গেল, যোগমায়া সানন্দে নন্দাকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। তাঁহার বৃহৎ বজরায় স্থানের অপ্রতুলতা নাই। কামাখ্যা মা কুমারীর সেবাতে প্রীত, একে ব্রাহ্মণতনয়া, তায় কুমারী, সোনায় সোহাগা। পথযাত্রার মাঝখানে ইহাদের সঙ্গী পাইলেন বলিয়া যোগমায়া একটা সৌভাগ্যের শুভ সূচনা ধরিয়া লইলেন।

আসামের পাটের শাড়ী বিখ্যাত। বংশী আসামে পৌঁছিয়া সর্ব্বাগ্রে তরঙ্গিণীর পাটের শাড়ী কিনিবেন শুনিয়া তরঙ্গিণীর ক্রোধবহ্নি জল হইয়া গিয়াছিল। দুই ভ্রাতা-ভগিনীর তীর্থ-যাত্রার পথে আর কোন অন্তরায় হইল না।

সুজলা টুনটুনকে চুম্বন করিয়া, রাজুর চোখ মুছাইয়া দিয়া সেই দিন সন্ধ্যায় বংশীর সহিত সুনন্দা বজরায় গিয়া উঠিল।

'চোখের বালাই' মেয়েটার অন্তর্দ্ধানে মোক্ষদা ঠাকুরাণী আশ্বস্ত হইলেন। পাড়ার মেয়েদের পাটের শাড়ী দেখাই-বার কল্পনায় তরঙ্গিণীর আনন্দের সীমা রহিল না। কেবল রাজুর চক্ষুযুগলে বর্ষার ধারা ছুটিল।

৩৪

কিছুকাল হইতে অন্নপূর্ণা শরতের মেঘের মত এক আনন্দ-হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। সত্য পরীক্ষায় প্রথম হইয়া কঠোর পাঠ্য জীবন সমাপ্ত করিল, ইহা কি মায়ের পক্ষে কম নিশ্চিন্ততা! তার পর প্রবাসগত পুত্রের মায়ের স্নেহের নীড়ে প্রত্যাগমন, নিরানন্দ কুটীরে বিবাহের উৎসব আয়োজন। উপর্য্যুপরি ঘটনাগুলি একত্র মিলিত হইয়া অন্নপূর্ণার অন্তর বাহির পুলকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া চারিদিকে যেন মঙ্গলজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল, সেই জ্যোতিতে সত্যর মুখের উপর একটি সুন্দর উজ্জ্বল আভা পড়িল।

বিবাহের দিনস্থির করিয়া অন্নপূর্ণা নিকটতম আত্মীয়-বন্ধুকে সংবাদ পাঠাইলেন। প্রবাসী বান্ধবদিগকে পত্র লিখিলেন। সেক্‌রা ডাকিয়া আপনার সেকালের ভারী গহনা কয়খানি ভাঙ্গিয়া হাল ফ্যাসানের গহনা গড়িতে দিলেন। সত্যর বেণারসের বন্ধু কুমুদের কাছে খোঁভাতের চাঁপা রঙ্গের বেণারসীর ফরমাইস্ দিলেন।

ঘরদ্বার মেরামতের নিমিত্ত লোকজন নিযুক্ত হইল। ময়রাকে ডাকাইয়া মোটামুটি একটা ফর্দ্দও হইল। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত—জ্যোৎস্নালোকিত নীলাম্বরতলে ভীষণ ঝটিকার মত বংশীর পত্রখানা সমস্তই আলোড়িত, আন্দোলিত এবং ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। কোথায় গেল কল্পনার কুসুমকানন, কোথায় গেল আশা-বৈতালিকের কলগুঞ্জন! বংশীর "নন্দার এখন বিবাহে অভিরুচি নাই" কথাটা তীরের ফলার ন্যায় অন্নপূর্ণার সুকোমল হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। বেদনায় রক্তাক্ত হৃদয়ে মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "নন্দা, মা আমার, তোর মনে এই ছিল, তুই কি করলি!" ইহার অধিক কথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। আর কেহ নহে নন্দা, সেই নন্দা—যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার ভাবিয়া তিনি বুকে

তুলিয়া লইয়াছিলেন, যে তাঁহার কন্যাহীন অন্তরে তনয়ার চিরন্তন আসন অধিকার করিয়া লইয়াছিল! এ কি তাহারই কায? তাঁহার অসীম স্নেহের এই কি উপযুক্ত প্রতিদান? হায় অন্ধ, ভ্রান্ত! কিসের মোহে অঞ্চলের অতুল্য হীরকখণ্ড পথের ধূলায় দলিয়া মরীচিকার আশায় কোন্ অনির্দ্দেশ্যের উদ্দেশে ধাবিত হইতেছিস? সত্যকে পাইয়া যে গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহার তুল্য হতভাগ্য কয় জন আছে?

অন্নপূর্ণার চোখ জ্বালা করিয়া বড় যন্ত্রণার কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। লজ্জায় অপমানে তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন।

হিমুর প্রতি সংসারের ভার দিয়া অন্নপূর্ণা এক দিন রাত্রিতে বিছানায় পড়িয়া রহিলেন, কাহারও সহিত কথা কহিলেন না, কাহাকেও মুখ দেখাইলেন না।

পরদিন প্রভাতে সত্যর আহ্বানে তাঁহাকে উঠিতে হইল; কিন্তু সত্যর নিশাশেষের ম্লান চন্দ্রমার মত পাণ্ডুর মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়া অন্নপূর্ণার চক্ষু সজল হইল। মাত্র এক দিন এক রাত্রি, ইহার মধ্যে সত্যর এত পরিবর্ত্তন? কোথা গেল তাহার সরসোজ্জ্বল প্রসন্নজ্যোতির্বিচ্ছুরিত মুখমণ্ডল, আয়ত নীলনয়নের সলজ্জ দৃষ্টি! সত্যর ঢল-ঢল হাসিমাখা মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়াছে, চোখের কোলে কালি ঢালিয়া দিয়াছে।

মা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া ছেলের মাথা কোলে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "কিছুতেই যে তার আশা আমি ছাড়তে পারছি না, সতু। নন্দার নিজের মুখের কথা এখনও জানতে পারলাম না। একটা কায করলে হয়—তুই যদি নন্দাকে একখানা চিঠি লিখিস, আমার মনে হচ্ছে, কোথায় যেন গোল রয়েছে।"

সত্যর মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল, মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "বংশীদা আপনার ইচ্ছায় যে চিঠি লেখেন নি, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তাদের যা জানাবার, তা ত জানিয়ে দিয়েছে। এর পর কি কোন চিঠি চলে, মা, না সেটা ন্যায়সঙ্গত?"

অন্নপূর্ণা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সখেদে কহিলেন, "এখন এ বিষয় নিয়ে তাদের লেখালেখি হয় ত ন্যায়সঙ্গত নয়, কিন্তু সবখানেই যে ন্যায়ের শাসন মেনে চলা যায় না। একটু অন্যায় করলে যদি সুনন্দাকে পাই, তা হ'লে আজকের অন্যায়ের পায়ে আমার সারাজীবনের ন্যায়কে বলি দিতে পারি। তোরা জানিস নে, সে আমার কত অভিমানী। কোন কারণে হয় ত অভিমান হয়েছে, নইলে তাকে কি আমি জানি নে, সতু? তুই আজকের ডাকে তাকে একখানা চিঠি লিখে দে, আর অমত করিস নে।"

জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিতে ডুবিতে তৃণগাছি চাপিয়া ধরে, অন্নপূর্ণারও তাহাই হইয়াছিল। কিছুতেই ভ্রান্তি ঘুচিতেছিল না, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া তিনি মিথ্যা আশাকে প্রাণপণে বুকে জড়াইয়া ধরিতেছিলেন।

সত্য কিন্তু ভ্রান্ত আশার ছলনায় প্রলোভিত হইতে পারিতেছিল না। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ধীরে বলিল, "চিঠি যদি লিখতেই হয়, মা, তুমিই বংশীদাকে লিখে দাও, অন্য কাউকে লিখতে হ'লে তোমার জবানীতেই লেখো। আমায় কিছু বলো না, আমার অভিভাবক যেমন তুমি, সে দিকেও তেমনই বংশীদা। বিয়ের পাত্র-পাত্রী অভিভাবককে বাদ দিয়ে কবে কি করেছে?"

পুত্রের যুক্তিতর্কে অন্নপূর্ণা মনে মনে আহত হইয়া বলিলেন, "অভিভাবককে ত বাদ দিতে বলছি না, সতু। আমিই যে তোকে চিঠি লিখতে বল্‌ছি। আমি কি ছাই লিখতে জানি যে, নন্দাকে চিঠি লিখবো? হিমুকে দিয়ে এ সব আমার লেখবার ইচ্ছা নেই, অন্য কাউকে দিয়েও নয়, তাই তোকে বল্‌ছি, এতে দোষ নেই, সতু। আর একটা কথা, বংশী নামে মাত্র নন্দার অভিভাবক, আসলে নন্দাই বংশীর অভিভাবক। নন্দার বাপ-মা নেই, সে এখন বড় হয়েছে, জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে, আমি তার নিজের মুখের কথা জান্‌তে চাই, তুই তাকে চিঠি লেখ, সেই চিঠিই সে বংশীকে দেখাবে।"

ইহার পর সত্য আপত্তি করিতে পারিল না। বাক্যে ব্যবহারে ভ্রমেও যে তাহার মাকে আঘাত দিতে তাহার মন সরিত না। মাকে তাহার গোপন করিবার কিছুই ছিল না, লজ্জা করিবারও কিছুই ছিল না। মা-ও ছেলেকে তাঁহার কাছে লজ্জা করিতে শিক্ষা দেন নাই।

মাতৃ-আদেশে সঙ্কোচে সংশয়ে সত্য নন্দাকে পত্র লিখিতে বসিল। নন্দার "মা" তাহার নিজের হস্তাক্ষরে জানিবার জন্য পত্র লিখিতে বলিলেও ফল্গুর প্রচ্ছন্ন ধারার ন্যায় তাহার

হৃদয়ের অব্যক্ত উচ্ছ্বাস লেখনীর মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি চারিখানি পত্র লিখিয়া ছিঁড়িয়া অবশেষে একখানি চিঠি সম্পূর্ণ করিয়া সত্য ডাক-বাক্সে ফেলিল।

ময়নামতী হইতে বুড়া শিবতলা দূর নহে, প্রত্যেক দিনের ডাক প্রতি সন্ধ্যায় বিলি হইয়া থাকে।

সত্যদের দ্বারে সরকারী তক্‌মা-আঁটা লালপাগড়ী-পরা ডাকপিয়ন বহুবার আনাগোনা করিল, কিন্তু মাতাপুত্রের অভীষ্ট দ্রব্য আসিল না। দুইটি স্পন্দিত হৃদয় প্রভাতের অরুণ-কিরণে নব আশায় উদ্বেলিত হইয়া রজনীর অন্ধকারে ব্যথার ভারে আচ্ছন্ন হইত।

৩৫

সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে, সময় ত কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারে না।

অন্নপূর্ণা নীরব থাকিলেও আত্মীয়বন্ধু নীরবে রহিলেন না। যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে পারিলেন, তাঁহারা সংবাদ পাঠাইলেন। যাঁহারা আসিতে পারিবেন না, তাঁহারা হৃদয়ের শুভ কামনা পত্রে জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকে কর্ম্মপ্রবাহ নিয়মিতরূপে বহিয়া চলিল, অন্নপূর্ণা কাহারও কাছে লজ্জাকর বিষয়টা ভাঙ্গিতে পারিলেন না। সুনন্দার সহিত সত্যর বিবাহের কথা যে দেশ-দেশান্তরে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। তিনি কোন্ মুখে সকলের কাছে পাত্রী-পক্ষের বিবাহ-ভঙ্গের বিষয় ব্যক্ত করিবেন? এ লজ্জা কেবল তাঁহারই নহে, ইহা যে সত্যর গৌরবমণ্ডিত ললাটে অপমানের কালিমা আঁকিয়া দিবে!

সুনন্দার পত্রোত্তরের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মানের তুলনায় স্নেহকে উচ্চাসনে বসাইয়া অন্নপূর্ণা সে দিন বিশুকে বংশীর নিকটে পাঠাইয়া কাযের ফাঁকে ফাঁকে বিশুর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিশু ফিরিয়া আসিল। বিশুর নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক মুখের পানে তাকাইয়া অন্নপূর্ণার একটি প্রশ্ন করিতেও সাহস হইল না। কুহকিনী দুরাশার মোহে আয়ত্তের অতীতকে তিনি আয়ত্তের মধ্যে পাইতে কি প্রয়াসই না করিলেন; কিন্তু তাঁহার যত্ন-চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রাপ্য সম্পদ্ দূরেই রহিয়া গেল। শুধু তাঁহারই অন্তরে পরিতাপের বিদারণ-রেখা অঙ্কিত হইল।

বুড়া শিবতলায় বিশুকে পাঠাইতে সত্যর একবারেই ইচ্ছা ছিল না। মান-সম্ভ্রমের এত হতাদরে তাহার পৌরুষে বারম্বার আঘাত লাগিতেছিল। কিন্তু মা'র ইচ্ছার উপর — মতের উপর নিজের মতামত প্রকাশ করিতে সে কখন ভালবাসিত না। তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বিশু রওনা হইলেও সে মনে মনে উৎসুক হইয়া বিশুর অপেক্ষা করিতেছিল।

বিশু যখন ম্লানমুখে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল, মা তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তখন সত্যর আর চুপচাপ থাকা হইল না। অধীরাবেগে সন্দেহদোলায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ দুলিয়া উঠিল। বিশুর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া সত্য শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসিল, "বিশুদা, ফিরে এলে?"

বিশু অন্নপূর্ণার পদতলে মাটীতে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল, পরে ঘর্ম্মসিক্ত ললাট হাতের উল্টা পিঠে মুছিতে মুছিতে জবাব দিল, "এই ত ফিরে আসছি, দাদা, যাদের কাছে গিছলাম, তারা নেই, দেখা হ'ল না।"

নিমেষে সত্যর বদনমণ্ডলের চিন্তামেঘ অপসারিত হইল। নন্দা গৃহে নাই, তাই সত্যর পত্র পায় নাই, পত্রোত্তর দিতে পারে নাই।

এতক্ষণে অন্নপূর্ণা অনেকটা শান্ত হইয়া কহিলেন, "নন্দারা বাড়ী নেই, কোথায় গেছে, বিশু? কবে গেছে, কে কে গেছে?"

"বংশীদা আর নন্দাদি দুই জন কামিখ্যে দর্শনে গেছেন। আর কেউ যায় নি, মোটে দু'দিন হ'ল গেছেন। বংশীদার বৌয়ের সাথে আমার দেখা হয় নি, তিনি ঘাটে গিছলেন। সেই যে কটকটে ঠাকরুণটি আছেন, তিনিই সব বললেন।"

"মোক্ষদা ঠাকরুণ, তিনি বলেছেন? বংশী নন্দাকে নিয়ে হঠাৎ কামাখ্যা গেল কেন, শুনলে না কি?"

বিশু একবার অন্নপূর্ণার দিকে, একবার সত্যর দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে পুরাতন ভৃত্য, প্রভু-গৃহের নাড়ী-নক্ষত্রের সমস্ত খবরই রাখে, কিন্তু মোক্ষদা ঠাকুরাণীর নিকটে যে সংবাদ সে জানিয়া আসিয়াছে, তাহা ইহাদের কাছে গোপন করিবে কি সাহসে?

কাসিয়া, মাথা চুলকাইয়া বিশু নতনেত্রে কহিল, "শুনলাম, আসামের জমীদার মায়ের সাথে বজরা নিয়ে বেড়াতে এসেছিল। অল্পদিন হ'ল, তার পরিবার মারা গেছে। তারা নন্দা দিদিকে দেখে পছন্দ ক'রে নিয়ে গেছে, কামিখ্যেয় যেয়ে বিয়ে হবে।"

অন্নপূর্ণা বারান্দার থাম চাপিয়া ধরিলেন। সত্য টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

গভীর রজনীতে মা ছেলের শয়নকক্ষে পদার্পণ করিলেন। সত্য আলোর সম্মুখে একখানা বই খুলিয়া বিছানায় বসিয়াছিল, তাহার দৃষ্টি আকাশের গায়ে নিবদ্ধ। গবাক্ষপথে যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে, তাহা ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন। সেই মেঘের যবনিকা ছিন্ন করিয়া দুই তিনটি নক্ষত্রবধূ সকৌতুকে ধরার পানে চাহিতেছে। বর্ষার আধিপত্য নাই, তাহার ভাঙ্গা আসরে শরৎ উঁকি-ঝুঁকি দিতেছে, আপনার অধিকার কে ছাড়িতে চায়? তাই বিদায়োন্মুখ বর্ষা রহিয়া রহিয়া নিষ্ফল গর্জ্জনে চারিদিক্ সচকিত করিয়া তুলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা সরিয়া গিয়া বিছানায় বসিয়া ডাকিলেন, "সতু!" সত্য সচকিতে মা'র নিকটস্থ হইল।

অন্নপূর্ণা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "সবই ত শুন্‌লি, সতু। এখন কি করা যাবে?"

যথাসাধ্য চেষ্টায় গলার স্বর স্বাভাবিক রাখিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে সত্য বলিল, "আমায় তুমি কি করতে বল, মা?"

"কি করতে বলি, বাবা! তুই যে আমার একমাত্র সন্তান, তোকে দিয়েই আমার সব। সে মায়াবিনীর স্মৃতি নিয়ে আমাদের ত ব'সে থাকলে চলবে না, সতু, ব'সে থাক্‌বার প্রয়োজনও নেই।"

সত্য সংক্ষেপে কহিল, "না।"

অন্নপূর্ণা পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "আমার যে কিছু বাকী নেই, সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, আত্মীয়-কুটুম্বরা এই সময় আসবেন, তারিখ বদলাবার আমার ইচ্ছা নাই। তোর সইমার তোকেই জামাই করতে সাধ ছিল, ওরাও তাই লিখেছে, তা হ'লে তুই-ই হিমুকে নে, সতু।"

সত্য চমকিয়া উঠিল, তাহার অজ্ঞাতসারে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, "হিমু!"

মা'র চোখে এটুকু এড়াইল না, মা দ্বিধার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিমুর সঙ্গে যদি তোর অমত হয়, তা হ'লে মেয়ের দুঃখ কি, এক দিনের ভেতরেই আমি তোর উপযুক্ত মেয়ে দেখে নেব, কিন্তু হিমুকেই তোর নেওয়া উচিত, সতু। তিন কুলে ওর কেউ নেই, বিয়ে হ'লে আমাদের ছেড়ে যেতে হবে ভয়েই বাছা আতঙ্কে সারা। আমাদের কি ভালই বাসে, আহা অনাথা!"

সত্য স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার কাছে অপর মেয়েও যাহা, হিমুও তাহাই। সাধের পুষ্পমাল্যের পরিবর্ত্তে যখন লৌহশৃঙ্খল কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে, তখন তাহার আবার ভাল মন্দ কি? যাহার মৃত্যু নিশ্চিত, তাহাকে রামে মারিলেই বা কি, রাবণে মারিলেই বা কি? মৃত্যুকামীর পক্ষে উভয়ই সমান। তাহার নিজের সুখের নিমিত্ত আর কিছুই যে প্রয়োজন নাই। জীবনের আশা, আনন্দ, ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা এক জনের অগ্নিময় স্মৃতির তাপে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। হাঁ, মা'র জন্য করিবার অনেক আছে। সতু ছাড়া মা'র যে আর অবলম্বন নাই, কিছুই নাই, মা বড় দুঃখিনী।

সত্য বলিল, "আমায় জিজ্ঞাসা করছ কেন, মা? তুমি কি জানো না, তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা?"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

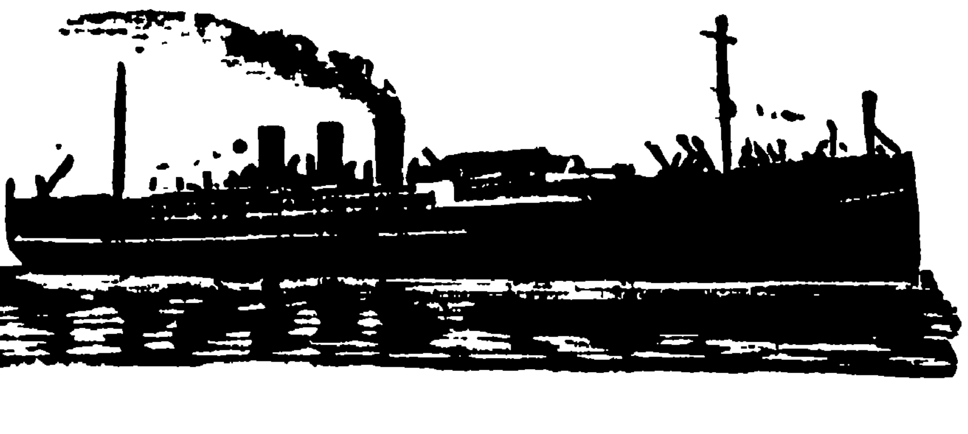

ছাগলাদ্য ঘৃত

আলাপ

কলিকাতায় সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত পঞ্জিকায় দ্রষ্টব্য। প্রত্যক্ষ বড় হয় না। দিনদেব সারাদিন ধ'রে আকাশ জরিপ ক'রে স'রে পড়েছেন, কি সরি সরি করছেন, বলা শক্ত। তবে, আকাশের এক পাশে রাঙা মেঘ এখনও ঝিক্-মিক্ করছে, আর গোধূলি অথবা নর-পদধূলিসমাচ্ছন্ন নগর ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে। এই সময় পকৌড়ি মিশ্র, ডালমুঠ দানাদার, ফুল্লরিমোহন শর্ম্মা আর মিষ্টার বয়কট্ ব্যানার্জি গোলেব-কাওলি নামক পার্কে সান্ধ্য ভ্রমণ করছিলেন। চার জনেই ছদ্মনামের পদ্মগন্ধ গায় মেখেছেন মাসিকের বাতিকে। তন্মধ্যে ফুল্লরিমোহন কবি—কথা কন গৈরিশী ছন্দে; পকৌড়ি খিচুড়ি পাকান প্রবন্ধে; দানাদার গাল্পিক, আর বয়কট ঔপন্যাসিক। মাসিকে লেখা ছাপতে এঁদের প্রত্যেকেরই মাসে মাসে কিছু কিছু খরচ হয়, কিন্তু সেটা এঁরা গায় মাখেন না; কেন না, চার জনেরই অবস্থা অল্প-বিস্তর স্বচ্ছল। পরস্পরে বেজায় সৌহৃদ্য। দিনান্তে এক-বার না দেখা হ'লে কুসুম-শয্যা কণ্টকিত হয়ে ওঠে। ঘুম হয় না। গোলেবকাওলি পার্ক এঁদের সঙ্গমস্থল। টাকার ভাবনা নাই। প্রত্যেকেরই মাসে প্রায় একশ' দেড়শ আয়। অবিবাহিত জীবন বেশ স্ফূর্তিতেই কাটে। সকলেই পণ করেছেন, স্বাধীনতা বাঁধা দেবেন না। বিবাহের পরিবর্ত্তে বায়স্কোপ, থিয়েটার, সাহিত্য এঁদের জীবনের অবলম্বন। বেশ আছেন! পরিবারের ব্রত উদ্‌যাপন নিয়ে কাউকে বিব্রত হ'তে হয় না।

বয়কট বল্‌লেন, বড় সঙ্গীন গাটে কাঠে-কাঠে ঠেকেছি।

ভাবুক কবি ফুল্লরিমোহন টীকা করলেন—পাটের গাটের কাছে সঙ্গীন কি আছে? রঙ্গিন সাহিত্য গাট, ভায়া, মহামায়া খুলিতে অক্ষম সে মোক্ষম গাট, আট পাশ বাঁধা আট দিকে।

বয়কট বল্‌লেন, না হে! নায়িকা পিয়ানো কোম্পানীর জাহাজে চ'ড়ে অকূল পাথারে পাড়ি দিচ্ছিলেন। হঠাৎ ঝড় উঠে, বুঝলে কি না, জাহাজখানা ভুস্! নায়িকা ডুবলেন অতলে। তাতেও ক্ষতি ছিল না, বুঝলে কি না, কিন্তু নায়ক কূলে দাঁড়িয়ে, বুঝলে কি না, হায় হায়, হাহাকার, বুক চাপড়ে মহামার, ইত্যাদি। এখন করি কি? দুজনে মিলন হয় কেমন ক'রে, কোথায়?

দানাদার ডালমুঠ ছাড়লেন, কেন? সাগরসঙ্গম—অনন্ত মিলন।

পকৌড়ি বল্‌লেন, তা হবেই যে, এমন কি কথা আছে? এক জনকে যদি হাঙ্গরে কি কুমীরে খায়? তার পর শুধু কি তাই? তিমি মাছ আছে, বড় বড় সাগুরে সাপ।

দারুণ চিন্তায় বয়কট ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন।

গাল্পিক বল্‌লেন, বিপদকে আগে ভাগে ডেকে আনা কেন? যখন খাবে, তখন খাবে!

ঔপন্যাসিক বল্‌লেন, তা বটে! কিন্তু এখন করি কি?

প্রাবন্ধিক বললেন, বেশ ত! হাঙ্গর কি তিমির গর্ভে দাও না। অনন্ত মিলন!

ঔপন্যাসিক বল্‌লেন, তা বটে! কিন্তু আটঘাট বেঁধে কায করতে হয়। একটা হাঙ্গরে যদি দুজনকে না খায়, এখন কি উপায়? তার পর হাঙ্গর কুমীর তিমিতে খেলে প্রথম পরিচ্ছেদেই উপন্যাস শেষ করতে হয়।

ফুলরি বল্‌লেন—

ঐ কি প্রথম দৃশ্য তব ?
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন—
ওষ্ঠে ওষ্ঠে আলাপন, গোষ্ঠে বিচরণ,
ঘষ্টে-ঘষ্টে ক্রমে আলিঙ্গন—
নেপথ্যে রেখেছ পুরে ?

হাঁ, ভাই, ও সব প্রথম দৃশ্যের পূর্ব্বেই হয়ে গেছে—নেপথ্যে। আমি একেবারে মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের চরম মুহূর্ত্তে পটোত্তোলন করেছি।

গাল্পিক বল্‌লেন, তা বল্‌লে হবে কেন, ভায়া ? চুম্বনে, আলিঙ্গনে মনস্তত্ত্ব কি কম আছে ? বরং যত মনস্তত্ত্ব ত ঐখানেই। ঐ হ'ল কাজের, আর সব বাজে।

পকৌড়ি এতক্ষণ চুপ-চাপ ভুরু কুঁচকে ভাবছিলেন। অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ইউরেকা (Eureka)! পেয়েছি, পেয়েছি—

দানাদার বল্‌লেন, কি বল দিকি ? তোমার সেই যে ছাতাটা হারিয়েছিলে, খুঁজে পেয়েছ না কি ?

সেটা ত পেয়েইছি! ভুলে দেরাজের ভিতর বন্ধ ক'রে রেখেছিলম। কিন্তু ছাতার কথা বলছি নি। এটাও পেয়েছি। বয়কট, উপায় আছে।

ব্যানার্জ্জি সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, কি, কি ? আঃ, বাঁচালে ! উপায়টা কি ?

ইচ্ছা শক্তি।

ডালমুঠ বল্‌লেন, সে আবার কি ?

ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব হে! তাতে কি না হয় ? তোমার পকেটের টাকা আমার হাতে চ'লে আসে—

গাল্পিক কপাল সিঁটকে বল্‌লেন, সেটা ত হাতের সাফাই, ভাই !

প্রাবন্ধিক বল্‌লেন, তাও বটে, আবার নাও বটে ! হাতের সাফাই ত বটেই, কিন্তু তার আগে ইচ্ছা। নইলে হিমালয় থেকে মহাত্মাদের কমণ্ডলু, ছড়ি, পাগড়ী উড়ে আসে কেমন ক'রে ? বল্‌লুম, মহাত্মাদের কাছ থেকে মন্ত্র নাও, সাধনা কর।

বয়কট জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম ক'রে সাধনা করব ? আমি ও হিড়িং মিড়িং জপ করতে পারব না। সহজ উপায় থাকে ত বল

তাও আছে। দৃষ্টি স্থির ক'রে মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা করবে—

ডালমুঠ বললেন, আরে, দৃষ্টি স্থির করলে ত চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ভায়া !

পকৌড়ি বললেন, তুমি করেই দেখ না।

ডালমুঠ বললেন, না করেই কি বলছি, ভাই ! এক মহাত্মা আমায় বলেছিলেন, চক্ষু স্থির ক'রে প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ও বশ হয়। এক দিন সত্যই এক ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের পাল্লায় পড়লুম। মহাত্মার বাক্য পরীক্ষা করবার এই সুযোগ ! স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু স্থির ক'রে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে লেগে গেলুম। বেটা পাষণ্ড মহিষাসুরের মত খণ্ড-প্রলয় করবার যোগাড় করলে আমি যত চক্ষু স্থির করি, সে তত চক্ষু লাল ক'রে শিং নেড়ে তেড়ে আসে। কাছাকাছি হ'তে ভাবলুম, চক্ষু আর ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা ত ঢের হ'ল, এখন পা দু'টির শক্তিটা একবার পরীক্ষা করা যাক। অসময় তারাই কাযে এল, বন্ধু ! নইলে চক্ষু-স্থিরটা শেষাশেষিই হ'ত।

পকৌড়ি বললেন, তোমার সাধনা ঠিক হয় নি, ভাই ! আচ্ছা, আর কিছু দিন সবুর কর, আমিই প্রমাণ ক'রে দেব

ব্যানার্জ্জি বললেন, তাতে আমার কি সুবিধা হবে ?

কেন ? নায়ক নায়িকা ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে পরস্পরকে আকর্ষণ করুক না।

টানাটানিতে যদি ছিঁড়ে যায় ?

পকৌড়ি বললেন, তা যাবে না। মহিলার ইচ্ছা প্রবল হলে তোমার নায়ককেই অকূল পাথারে ডোবাবে।

ফুলুরিমোহন বললেন—অতি সত্য কথা ! ইচ্ছাময়ী মহামায়া—

কবির কাব্য শেষ না হ'তে সাক্ষাৎ মহামায়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন। প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হ'লে স্থির নীর যেমন বিক্ষিপ্ত হয়, মহামায়ারূপিণী মহিলাটি সামনে এসে একটু হেসে একটি নমস্কার ক'রে দাঁড়াতেই চার বন্ধু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একে মহিলা, তায় ঈষৎ হাসি, তার উপর গ্রীবাভঙ্গে নমস্কার ! পকৌড়ি মিশ্রের চক্ষুস্থির হ'ল, বোধ করি, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ-প্রয়াসে। বয়কট ব্যানার্জ্জির মুখ হঠাৎ হাঁ ক'রে ফেললে। ডালমুঠের গাল দুটি ঝাঁ ক'রে

লাল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলুরিমোহনের কাছা পড়ল খসে।

মহিলাটি একটু হেসে বললেন, আমাকে চিনতে পারছেন না? না পারবারই কথা। কখন ত দেখেন নি। নামও বোধ হয়, জানেন না? না জানবারই কথা। কখন ত শোনেন নি। আমি—আমি—গোলাপী গাঙ্গুলি। অবশ্য এটা ছদ্ম।

ফুলুরিমোহন কাছা আঁটতে আঁটতে মনে মনে কবিতা লিখছিলেন। প্রকাশ্যে—কি বলিলে? গোলাপী গাঙ্গুলি!

শ্যাম্পেন্ কি শেরী, আপেল কি চেরী,
কি বিজয়-ভেরী বাজে নামে!
গোলাপি গাঙ্গুলি—উক্ষুর টিকলি,
সুষমার কলি, চক্ষুর শিকলি,
জীবন থাকিতে করে অন্তর্জ্জলি!
নাম রসে ভরা যথা রসকরা,
ধন্য হ'নু আমি পেয়ে পরিচয়!

অন্য তিন বন্ধুই মনে মনে বল্লেন, ক্ষিতে গেল।

গোলাপী গাঙ্গুলি ত অবাক্! পাগল না কি? প্রকাশ্যে বল্লেন, আপনি কবি!

ফুলুরি হর্ষ-বিকশিত মুখে বল্লেন—

কবি-রবি-ছবি, মাঘ কি ভারবি,
ভয়রোঁ কি ভৈরবী, যং কি ধামার,
মুচি কি চামার, কুমোর কামার,
জানি শুধু আমি ধন্য সুলোচনে,
সুবচনি, তব মধুর বচনে!

ইস্! শেরী-শ্যাম্পেন, যং-ধামার, মুচি-চামার, সুলোচনে-কুলোচনে, সব একাকার একসা ক'রে ফেলুলে! বেয়াক্কেলে। তিন জনেই পিছন থেকে চিম্‌টি কাটতে সুরু করলেন।

ফুলুরি সহজে নিরস্ত হবার পাত্র ন'ন—বিশেষ যখন ফোয়ারার মুখ খুলেছে। এক এক চিমটিতে চম্‌কে ওঠেন আবার বলেন—ধন্য আমি—

ধন্যবাদটা অবশ্য চিম্‌টির জন্য নয়, গাঙ্গুলিকে লক্ষ্য ক'রে। ধন্য আমি, উঃ—ধন্য আমি—ওঃ ধন্য, লাগে ধন্য উ-উ-ফ্!

গাঙ্গুলি এই বয়ঃপ্রাপ্ত নাবালকটিকে বাঁচাবার জন্য বল্লেন, আপনি নয়, আজ আমি ধন্য। কল্‌কেতায় এসে অবধি আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ খুঁজছি আপনারাও কটিতে মিলে কাল বায়স্কোপে গেছলেন। আমিও আপনাদের পিছনে বসেছিলুম। দেখতে পান নি?

এতক্ষণে গাল্পিক বল্লেন, সামনের ছবিতে চোখ ছিল, পিছনের ছবি—

গাঙ্গুলি মুচকে হেসে বললেন, কি যে বলেন! কিন্তু বেজায় রসিক আপনি—তা ব'লে দিচ্ছি। রাগ করবেন না।

ঔপন্যাসিক বললেন, রামঃ, দেবি!

আমি দেবী নই—মানবী।

বয়কট বল্লেন, রামঃ মানবি! রাগ আমাদের নাই। আছে শুধু অনুরাগ—

ওঃ, কি সৌভাগ্য! রসিকের হাতে এসে পড়েছি। কিন্তু—কিন্তু—(পকৌড়িকে লক্ষ্য করিয়া) আপনার মুখে একটি কথাও ত শুনতে পেলুম না?

মিশ্র কি বলবার জন্য একবার হাঁ করলেন। তার পর স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ।

গাঙ্গুলি বল্লেন, ও বুঝেছি, আপনি একটু লাজুক। কিন্তু প্রবন্ধতে অমন চোখা চোখা বাণ সন্ধান করেন কেমন ক'রে? কঁরট কমঠ-কাকিণী কঙ্কণ, কুলপ-টঙ্কণ—এ সব পান কোথা? চন্দ্রলোকের চড়াই চর্চ্চড়ি—এমন মিষ্টি লাগে!—অবশ্য চড়াই-চর্চ্চড়ি নয় আপনার প্রবন্ধ। আচ্ছা, ভাল রকম পরিচয় পেলে আপনার পেটে ডুবুরি নামাবো। দেখব, কত রত্ন ধরে রত্নাকর—

ফুলুরি বল্লেন—কিম্বা কুম্ভীর মকর, রস-বিষধর।

গাঙ্গুলি প্রশংসার চক্ষে ফুলুরির মুখখানি একবার জরিপ ক'রে তারিফ করলেন, এরেই বলে কবি! রসের বিষধর! এটি নূতন উপমা! বাঃ!

ফুলুরি বল্লেন—

নূতনের সমাগমে নূতন উপমা।
আমিও নূতন হব কৃপায় তোমার।

মিষ্টি কথায় ফাঁকি দিলে হবে না। আমাকে কাব্য কলা শেখাতে হবে, কবিবর!

সে ত সৌভাগ্য আমার, ব'লে ফুলুরি একটি সশ্রদ্ধ নমস্কার করলেন।

গাঙ্গুলি বল্লেন, কেবল কবিবর নয়, আমি আপনাদের সবারই শিষ্যা হব, এই আশায় এসেছি।

দানাদার জিজ্ঞাসা করলেন, আমার গল্প কি পড়া হয়েছে ?

পড়ি নি ! বল্‌ব ? 'চানাচুর' গল্পে আপনি কি সুন্দর লিখেছেন—শ্যামাঙ্গী ভগা বেয়াড়া রোগা, খাড়া হ'তে ভেঙ্গে পড়ে যেন লঙ্কগন্ধে পুঁইডগা। পড়েই লাফিয়ে উঠলুম, গুরু পেয়েছি !

বয়কট বল্‌লেন, আমার কোন উপন্যাস পড়া হয়েছে ?

বলেন কি ! কি সব সাংঘাতিক সমস্যাই আপনি তোলেন আর সমাধান করেন ! অলৌকিক, অদ্ভুত, অপরূপ, অমানুষি—

বয়কট সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝলে কি না, কি রকম ?

একেবারে মোক্ষম ! বেদম্ হয়ে দম্ খুঁজতে হয়। সেই যে শেষ উপন্যাসখানায় একটা জটিল রহস্য তুলেছেন—প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ কি—নায়কের বুকে ছুরি, না, নায়িকার গলায় ডুরি ? আচ্ছা, উভয়েরই গলায় দড়ি দিলে কি কিছু ক্ষতি হয় ?

কি জানেন, ভিন্নরুচি লোক। কেউ সন্দেশ ভালবাসে, কেউ কচুরি। তেমনি কেউ ছুরি, কেউ ডুরি।

বাঃ ! একটা শিক্ষা পেলুম। তা ব'লে আপনিও কম ন'ন্, মিশ্র ঠাকুর। কি আপনার ভাষা ! আমাদের দেশে প্রবাদ ত অনেক আছে, অনেকেই জানে। কিন্তু অমন লাগাতে কেউ পারে ? কেবল আপনারই প্রবন্ধে পড়েছি—প্রকৃত প্রেমের সমস্যা—পূর্ণিমায় অমাবস্যা। প্রেম যেখানে খাঁটি, সেখানে সোনার পাথরবাটি, প্রেমের প্রকৃত তত্ত্ব—কাঁঠালের আমসত্ত্ব। আপনারা বলুন, আমাকে শিষ্যা করবেন ? এই জন্যেই কল্‌কেতায় আসা। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ী। একটু আলোক পাই নি। সূর্য্য অবশ্য রোজ ওঠে। কিন্তু তাতে কি হৃদয় ফোটে ! সভ্য সমাজে নব্য ভব্য লোকের সঙ্গে না মিশলে জীবনই বৃথা ! বড় আশা—আপনারা আমায় জাতে তুলে নেবেন। আপনাদের ঠিকানা পেলে রোজ যাই। দয়া করবেন ত ?

সকলে সাগ্রহে স্বীকার পেলেন। ঠিকানাও দিলেন। আলাপ জম্‌ল।

প্রলাপ—

ছাত্রী ও শিক্ষকের মধ্যে প্রেম একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছে। আমি তা ব্যতিক্রম করতে সাহস করলুম না। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের মালিক—দ্বিভুজ মুরলীধর। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকরা বল্‌লেন—উঁহুঃ—ত্রিভুজ (Eternal triangle) নইলে, অর্থাৎ দুই ব্রহ্মচারী, এক নারী, অথবা দুই নারী, এক ব্রহ্মচারী নইলে মজা হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রেম চতুর্ভুজ হয়েছেন, অবশ্য গাণ্ডেরিকে বাদ দিয়ে। এক নারী গোলাপী গাণ্ডেরির প্রেমে চার ইয়ারই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। অন্যত্র ত দূরের কথা, বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ, কেউ কারুর গন্ধ সইতে পারেন না। গোলেবকওয়ালি পার্ক এই চারি চন্দ্র বিহনে একদম্ ডার্ক (dark)—অন্ধকার ! গাণ্ডেরি চার জনকেই বঁড়শীতে গেঁথেছেন, এখন খেলিয়ে আড়ায় তুলতে পারলে হয়।

গাণ্ডেরি জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি তুমি আমায় ভালবাস ?

পকৌড়ি বল্‌লেন, সত্যি !

তবে যে আপনি লিখেছেন—

আর আপনি কেন ? গাণ্ডেরি—হৃদয়েশ্বরি, 'তুমি' ব'লে আমায় ধন্য কর।

বেশ, তুমি—তুমিই সই—তবে যে, তুমি লিখেছ, প্রকৃত প্রেমের সমস্যা—পূর্ণিমায় অমাবস্যা। সোনার পাথরবাটি। কাঁঠালের আমসত্ত্ব। কেন লিখেছ ?

ঝকমারি করেছি।

না না, তা বলছি নি। রাগ করো না। আমি বড় দুঃখিনী। বল, তুমি কি চাও ?

আমি তোমায় চাই।

আমি ত তোমারই।

সত্যি বলছ ?

সত্যি !

তবে বল, কবে তুমি আমার হবে ?

হয়েছি, আর কি হব ?

তবে সব ব্যবস্থা করি ?

কিসের ?

বিবাহের।

শালগ্রাম সাক্ষী না করলে বিশ্বাস হয় না !

হয়। তবে কি জানো—সমাজ।

গাণ্ডেরি বল্‌লে, ঐ সমাজ—আমার সকল সাধে বাজ ফেলেছে।

কেন ? কি হয়েছে ?

কসরৎ

বসুমতী চিত্র-বিভাগ।

শিল্পী—চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার একটি ভাসুর-ঝি আছে, আমাকে খুড়ীমা বলে।

তা বললেই বা! মাসী-পিসী ত বলে না! তাতে আমাদের বে'র বাধা কি?

তার যে আজও বে হয় নি।

কেন? দেখতে ভাল নয়?

চমৎকার!

তোমার মত?

আমি কি চমৎকার? সে তোমার চোখে হ'তে পারে।

তুমি কি আমাকে তাকে বে করতে বলছ?

নিজের সর্ব্বনাশ কে নিজে করে? তোমাকে বল্‌ছি নিসে বে' কর। তার বে যদি দিয়ে দাও—

কেমন ক'রে?

তোমার পক্ষে সে কিছু নয়। সামান্য ব্যয়।

কত?

পাত্র ঠিক আছে। কিন্তু পাঁচ হাজার চায়।

পাঁচ হা—জা—র!

তাই ত চেয়েছে। এখন তুমি যদি আমায় রক্ষা কর, এই টাকাটা ভিক্ষা দাও, তার বে দিয়ে তোমাকে বরণ ক'রে ধন্য হই। দেবে না?

তোমাকে অদেয় কি আছে? তবে একটু দেরি হবে।

গাঙুরি এগিয়ে গিয়ে কাঁধে মাথা রেখে বল্‌লে—প্রিয়তম!

প্রথম অঙ্কের ড্রপ (drop) এইখানে। পকৌড়ি বিষয় বন্ধক দেবার জন্য নেপথ্যে দালাল লাগালেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক ডালমুঠ দানাদারের বাসা। আত্ম-নিবেদন হয়ে গেছে। তিন তিন জন প্রবাসপ্রতিদ্বন্দ্বীর কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য ডালমুঠ গাঙুরিকে বোঝাচ্ছেন—কল্‌কেতায় কি প্রেম হয়? দিন-রাত ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড়ানি, মোটারের হর্ণ! তার ওপর মাছির ভন্‌-ভন্‌, মশার পন্‌-পন্‌—প্রচণ্ড দংশন! প্রেমের উপযুক্ত স্থান—বন।

গাঙুরি বল্‌লে, কিন্তু সেখানে যে মশার মেসো ডাঁস আছে। রাম-সীতা কেমন ক'রে বাস করতেন, তাই ভাবি।

তা বুঝি জান না? সেখানে কুটীর-দ্বারে অনিদ্রায় অনাহারে ধনুর্ব্বাণ হাতে লক্ষ্মণ ঠাকুর যে দিন-রাত খাড়া পাহারা থাকতেন।

কি, মশা মারবার জন্য?

নইলে আর কি জন্য বল? দণ্ডকবনে ত বাঘ-ভাল্লুক, হাঙ্গর-কুমীর ছিল না। থাক্‌লে মহাকবি মাইকেল সাহেব লিখতেন না? তিনি বলেছেন—

"অতিথি আসিত নিত্য করভ-করভী
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম—স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কালো, কেহ বা চিত্রিত—

থাকলে এ স্থলে তিনি চিতা-বাঘের কথা লিখতেন।

গাঙুরি বল্‌লে, তা বটে! কিন্তু আমাদের ত লক্ষ্মণ নাই?

নাই রইল! আমি কি তোমায় জঙ্গলে যেতে বলছি? আমাদের গ্রামে চল।

সেখানে মাছি-মশা নেই?

সামান্য। তার জন্য ধনুর্ব্বাণ দরকার হবে না—মশারিই যথেষ্ট।

ম্যালেরিয়া?

কিছু আছে। তার জন্য কুইনাইনও আছে।

সে যে ভারি তেত। সে তেতর মুখে প্রেম টিকবে? তায় আমি বিধবা।

খুব টিকবে। চল ত!

গাঙুরি একটি অতি মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লে, আমার কি অসাধ! তোমার সঙ্গে আমি নরকে যেতেও পেছ-পাও নই।

তবে চল।

কোথায়? নরকে?

ওঃ, কি রসিক! বেজায় মজায় দিন কাটবে।

সব ত বুঝলুম। কিন্তু—

আবার কিন্তু কি? তুমি কিন্তু হ'লে যে আমি জন্ম হয়ে যাব! কিন্তু কি বল?

সেই ভাসুর-ঝিটার একটা গতি না ক'রে আমি কি ক'রে বে করি বল?

সে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন টাকা দেবই! নিদেন বিষয় বন্ধক দিয়েও দেব।

আমার জন্য এতটা করবে—হৃদয়েশ্বর!

এরও কাঁধে মাথা ঠেকানো।

তৃতীয় অঙ্ক—ব্যানার্জীর কক্ষ—বয়কট ধীরে ধীরে বল্‌লেন, ঐটেই বিষম সমস্যা। বুঝলে কি না!

কোন্‌টা ?

মাছি আর মশা। প্রেম মাত্রেই অর্থ অনর্থপাত করে।

কেন ? চণ্ডীদাস ত বলেছেন—‘রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম।’ আর পকৌড়ি ঠাকুরও বলেন, খাঁটি প্রেম সোনার পাথরবাটি।

আরে ওটা আস্ত পাগল ! ওর কাছে তুমি যাও না কি ?

রামঃ ! তোমার আশায় যখন নিয়েছি আর পেয়েছি—

বাস্, নিশ্চিন্ত থাক। তোমার ভাসুর ঝিরও বে হবে, আমাদেরও মিলন হবে। তুমি আর কারুর কাছে যেয়ো না। আমি টাকার যোগাড় করছি। করছি কেন ? ও হয়েই গেছে। খালি দলীলটা লেখাপড়া বাকি। তা হলেই তিন বেটাকে ফাঁকি। বুঝলে কি না !

আমার জন্য তুমি এত করছ ! হৃদয়সর্ব্বস্ব !

তৃতীয় অঙ্কটা একটু হ্রস্ব হ’ল। তা হ’ক। মামুলি প্রেম পাঠক কল্পনায় ইচ্ছামত পূরণ ক’রে নিতে পারবেন।

চতুর্থ অঙ্ক বিমর্ষ সন্ধি। আমাদের ফুল্লরিমোহন এখন নিজকক্ষে বন্দী। কি ক’রে টাকার যোগাড় হবে, কোন রকম ফন্দী করতে পারছেন না। অন্য তিন জনের মত তাঁরও বিষয় আছে সত্য, কিন্তু সে একটি ব্যাসকূট। তাতে দন্তস্ফুট করবার যো নেই, মা আছে। প্রেমের পথে বিঘ্নও আছে। নিরুপায় নিরুপায় ! ফুল্লরির আহারে রুচি নাই। খেতে হয়, তাই দুটি খান, তার পর খাটে লম্বমান। দৃষ্টি কড়িকাঠ সংলগ্ন, মনঃপ্রাণ গাণ্ডেরি-ধ্যানে মগ্ন। হতাশ প্রেমের যা কিছু লক্ষণ, সবই দেখা দিয়েছে। উদাস দৃষ্টি, অশ্রুবৃষ্টি, হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, কিছুই বাকি নেই, এখন হয় মৃত্যু, নয় গাণ্ডেরি। আপাততঃ গাণ্ডেরিই এলেন।

কবিগুরু দান্তের (Dante) প্রণয়িনী ছিলেন—বিয়াত্রিশ, আমাদের ইনি বিয়াল্লিশ। প্রসাধন প্রসাদে বর্ষীয়সীও ষোড়শী হয়। বিয়াল্লিশের কোঠায় উঠেও গাণ্ডেরি যৌবন-চ্ছটায় প্রদীপ্ত। মেড়েয় ফাঁক, মাথায় টাক, চুলে পাক, বয়সের স্বধর্ম ; কিন্তু একে দেখে তাক লাগে। মনে হয়, ভরা যৌবনও এমন মোহনীয়, এত সুন্দর নয় !

দূর হ’তে ফুল্লরিমোহনকে দেখে গাণ্ডেরির চোখে জল এল। মজা এই, যে পাঁচ জনকে মজায়, সেও এক জনের জন্য মজে। প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন—মুরারি, ফুল্লরি একেবারে বাখারি ! আহা, বেচারি !

কাছে এসে বল্‌লেন. ফুল্লরি, ফুল্লরি, দিনে দিনে যে সরু সল্‌তেটি হচ্ছ ! কেন অত ভাব ?

ফুল্লরি বল্‌লেন—

কেন, কেন ভাবি ? হে সুন্দরি,
তুমি কি বুঝিবে,
কি যন্ত্রণা সহি দিবানিশি !

গাণ্ডেরি বল্‌লেন, ও মা, আমি বুঝি নি, কি যন্ত্রণা ! তিন তিনবার বে’ করলুম, তিনবার বিধবা হলুম, আমি জানি নি ?

ফুল্লরি বল্‌লেন—

সধবা বিধবা কন্যা ভেদ নাই, প্রেয়সি !
কে বা জানে কচু কিম্বা কলাপোড়া শ্রেয়সী !

গাণ্ডেরি বল্‌লেন, তা হ’লে ত সব গোলই মিটেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। মা কার চিরদিন থাকে ?

কিন্তু তব ভাসুর-ঝিয়ারী ?

সে ভার আমার। কিছু ভেব না। শুয়ে শুয়ে কেবল দম্‌ব খাও আর মোটা হও। তোমায় আর কিছু করতে হবে না।

ফুল্লরি বল্‌লেন—

এত কৃপা তব অভাগার প্রতি ?
হয় কি আরতি ঘৃতহীন সলিতায় ?
এত দয়া হে গাণ্ডেরি-হৃদয়-কাণ্ডারি
প্রেমের ভাণ্ডারী মোর, মন-প্রাণ-চোর !
নহ দিদি, নহি দাদা, তবু এত দয়া ?
কে বা আমি তব ?

গাণ্ডেরি সনিশ্বাসে বল্‌লেন, তুমি আমার কে ? তুমি আমার পাকা জাম, বাঁকা শ্যাম—

ফুল্লরি তড়াক ক’রে উঠে ব’সে বল্‌লেন—

শুন গুণময়ি, বাঁকা শ্যাম নই,
আমি পটাশ্যাম সিয়া নাইট !
আমি গৌণ পাগল, যৌন ছাগল,
ক্ষ্যাপা কুকুরের বাইট্ !
আমি সভ্য ভব্য, চোষ্য চব্য,
পেয়েছি নব্য লাইট্।

(আমার) ফুটেছে দিব্য সাইট্।
(আমি) ভীম ভীমরুল, জাম জামরুল,
প্রেমে ভরা টোপাকুল—
খেলেই অম্লশূল!
আমি প্রণয়ের বুলবুল!
(আমি) প্রেমের আলোকে ঝিলিক-ঝলকে
দোলাই দোদুল দুল!—
না-না, ভুল হ'ল, হ'ল ভুল—
(আমি) মাটীর ভাঁড়েতে প্রণয়ের খাটি
ভড়াই পাইট্ পাইট্!

গাঙেরি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্লেন, হা হা, কর কি, কর কি, শুয়ে পড়! এখনি মূর্চ্ছা যাবে।

ফুল্লরি শুয়ে প'ড়ে জোরে জোরে নিশ্বাস টান্‌তে টান্‌তে ফুল্‌তে লাগলেন। গাঙেরি বল্লেন, তবে আসি। পাত্র, টাকা সব যোগাড় হয়েছে, এক সপ্তা পরে ভাস্তরঝির বে। মাথা খাও, ওষুধ খেয়ো!

বিলাপ

গাঙেরি চ'লে গেলেন। ফুল্লরি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন—

কি হ'ল কি হ'ল, কে বা মূর্চ্ছা গেল,
কোথা হ'তে কেবা এল;
পুরুষ কি নারী, ঠাহরিতে নারি,
এল কিম্বা চ'লে গেল।

সহসা তাঁর চিন্তা-স্রোতে বাধা দিয়ে ছাতি বগলে এক জ্ঞাতি-ভাই এসে বল্লেন, রোগ, ওষুধ, মায়ের হুকুম, নয় শেষে চল।

লোকটির যেমন বেয়াড়া আড়া—কড়িকাঠে চাড়া দেবার মত; গলার আওয়াজও তেমনি খাপ্‌ছাড়া—পাড়ায় সাড়া প'ড়ে যায়। বৃথা বাক্যব্যয় করেন না। মনের ভাব বোঝাতে যতটুকু দরকার, ততটুকু।

ফুল্লরি বল্লেন—

খাব না ঔষধ আমি খাব না খাব না।

খাবে না? জোর—বুকে হাঁটু—একদম চেপ্‌টে চাটু—প্রাণ আটুপাটু। পেট ফুলে ঢাক—পরিত্রাহি ডাক—বোম্বাচাক্! খাবে না?

কে দেবে ঔষধ, বৈদ্য কে বা?
শুনেছ—মুর্শিদার গঙ্গাধর?

প্রছাত্র—একমাত্র আদি, অকৃত্রিম, আর সব ঘোড়ার ডিম। সব ছোঁড়া মড়িপোড়া খায় বিলিতি কচুর গোড়া! এক বড়ীতে বুড়ো ছোঁড়া। টেকো বুড়ী মাথাটি তেল চুকচুকে নুড়ি। টিপ্‌লে নাড়ী, ঝাড়্‌লে বড়ী, লাগুল গোঁফ-দাড়ির হুড়োহুড়ি।

শুন্‌বি প্রশস্তি? মেদ অস্বস্তি! খেলে বড়ী, একদম্ লাক্‌লাইন দড়ি, কি পাকাটির ছড়ি, বেঁধে রাখত গোটা গেড়ে—পাছে ওড়ে! এল ঝড়—দড়ি-দড়া—চচ্চড় শোঁ উধাউ। বাড়ীতে হাউ-মাউ। হারিয়েছে খেই—পাত্তা নেই।

আওয়াজ কড়া? দিলে চূর্ণ এক মোড়া। কথা বেরুচ্ছে পকান্নর ওড়া। বেজায় সেয়না, চায়ে চিনি দেয় না। ফুঁ পাড়ে—গুড়গোলা জল ছাড়ে।

ফোকলা বাস্, একটি মোড়া এখন চিবুচ্ছে নোড়া। তোর কি অবিশ্বাস?

প্রেমজ্বর

ও ত ঘর ঘর। দিগ্‌গজকে আনি—দেখ্‌বি খানি। আছিস ফুল্লরি—হবি কচুরি! রোগা মোমবাতি—ঝাঁ হাতি—রাতারাতি।

কবিরাজ এলেন। ব্যবস্থা কর্‌লেন—ক্ষয়রোগাদিকারে—ছাগলাদ্য ঘৃত। দিগ্‌গজ বল্লেন, এতে বল-বুদ্ধি, মেদ-মেধা বৃদ্ধি পাবে। আপনি নূতন জীব হবেন। গঙ্গাধরের ঔষধ যেমন তেমন নয়, কথা কয়। উঁহু, ওতে হবে না! আমার দর্শনী এখন চৌষট্টি মুদ্রা, নইলে পেরে উঠি না। সবই গুরুদেবের গুণে আর গৌরবে। ছয় খণ্ড নোট ঠিক আছে ত? চারটে টাকা মেকি নয়? অচল হ'লে ফিরে পাঠাব।

জ্ঞাতি-ভাই বল্লেন, তবে চেনা ক'রে দি। আর কারুর মেকি বদল হ'তে পারে।

এমনি সদালাপের সঙ্গে সঙ্গে দিগ্‌গজ বিদায় নিলেন। দিন ভাল ছিল, ঔষধ সেবন আরম্ভ হ'ল।

আজ গোলাপী গাঙেরির ভাস্তরঝির শুভ পরিণয়। সকাল থেকেই রোসনচৌকি বাজতে সুরু করেছে। অন্যান্য আবশ্যক সরঞ্জামের সঙ্গে একটি ভাস্তরঝিও সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, বর আপাততঃ এ বাড়ীতে উপস্থিত নাই। কনে সাজগোজ প'রে একটি ঘরে চুপ ক'রে ব'সে আছে। তাকে সে জন্য মেহনৎ আনা পুষিয়ে দিতে হবে।

পরস্পরে না দেখা হয়, গাঙেরি এমনি ক'রে ডালমুঠ,

পকৌড়ি ও বয়কটকে আস্‌বার সময় নির্দ্ধারিত ক'রে দিয়েছিলেন।

ডালমুঠ এলেন হাস্যমুখে সকালবেলা। গাণ্ডেরির হাতে পাঁচ হাজার টাকার নোট দিয়ে বল্‌লেন, দেখে নাও, ঠিক ত ?

গাণ্ডেরিও হাস্যমুখে বল্‌লেন, কি যে বল! কিন্তু গুণ্‌তেও ছাড়লেন না।

ডালমুঠ জিজ্ঞাসা করলেন, লোক কত আস্‌বে ?

তা আস্‌বে বৈ কি, আস্‌বে। কিন্তু সন্ধ্যার একটু পরেই তোমার আসা চাই। নইলে দেখ্‌বে, শুন্‌বে, করবে কে ?

সে ত আস্‌বই।

মনে রেখ, তুমিই কন্যাকর্ত্তা।

সে ত বটেই! কিন্তু আমরা শুভযাত্রা করছি কখন্, বল ?

কাল মেয়ে পাঠিয়েই মোটরে ওঠা। মিছে দেরি ক'রে কি হবে ?

রামঃ! ব'লে প্রস্থান।

দ্বিপ্রহরে এলেন বয়কট্। তিনিও পাঁচ হাজার টাকার নোট্ গাণ্ডেরির হাতে দিয়ে বল্‌লেন, গুণে তুলে রেখে দাও গে। তোমার যে ভুলো মন!

উভয়ে একটু হাসি, আপ্যায়িত, তার পর সন্ধ্যার পর উপস্থিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর কনে বিদায়ের পর উভয়ে যাত্রা করবার সময় ঠিক ক'রে নিয়ে বয়কট্ নিষ্ক্রান্ত।

পাঁচ হাজার টাকার নোট্ পকেটে নিয়ে অপরাহ্নে এলেন পকৌড়ি। বল্‌লেন, কৈ গো! লুচির গন্ধ পাচ্ছি নি যে!

ক্ষেপেছ! একলা মেয়েমানুষ, ঐ সব ব্যালা আমি বাড়ীতে করি! আজকাল কল্‌কেতা সহরে আবার খাওয়াবার ভাবনা! মায় পাণটি পর্য্যন্ত কন্‌ট্রাক্ট (contract)। পাতা পেতে খাইয়ে দিয়ে চ'লে যাবে।

দানসামগ্রী ত সাজাও নি ?

পোড়াকপাল! কিছু চায় না। নগদ পাঁচ হাজার আর মেয়েটি। আমি তাই কিছুই যোগাড় করি নি।

ওঃ, খুব বুদ্ধির কাম করেছ। টাকাটা গুণে নাও।

ও ঠিক আছে।

না, না, গুণে নাও।

তা নিচ্ছি। তুমি আর একটু পরেই এস।

নিশ্চয়, ব'লে পকৌড়ি বিদায়।

কিন্তু সন্ধ্যার পর এসে তিন জনে যা দেখলেন, তাতে তিন জনেরই আক্কেল গুড়ুম! সে রোসনচৌকি লোপাট! বাড়ী ভোঁ-ভাঁ—সব অন্ধকার ; জনপ্রাণী নেই।

রক্তচক্ষু পকৌড়ি বয়কটের গলার চাদর পাকিয়ে ধ'রে প্রশ্ন করলেন, কোথায় সরালি বল্ ?

এ প্রশ্নের উত্তর বয়কট্ দিলেন—মুখে নয়, হাতে। নাকের ওপর একটি ঘুষিতে।

উঃ, ব'লে পকৌড়ি ব'সে পড়তেই ডালমুঠ দুজনেরই উপর অবিশ্রান্ত কিল-চড় বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন তিন জনেরই পরস্পরকে সন্দেহ, গাণ্ডেরিকে সরিয়েছে।

শেষ বাড়ীওয়ালা চাবি বন্ধ করতে এসে বল্‌লে, আপনারা মিছে খেয়োখেয়ি ক'রে মরছেন! কোথায় বে, মশাই? আমার কাছ থেকে এক দিনের জন্য বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল, মাইকেল আছে ব'লে। অর্দ্ধেক ভাড়া দিয়েছিল আর কথা ছিল, অর্দ্ধেক দেবে এই সময়। তা কোথায় কে ? আমার অর্দ্ধেক ভাড়া গেল। আপনাদেরও কিছু গেছে না কি ?

পকৌড়ি বল্‌লেন, পাঁচ—

যাক্, অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়েছেন। পাঁচ টাকায়—

ডালমুঠ বল্‌লেন, পাঁচ টাকা কি ? পাঁচ হাজার !

তিন জনেই তাই না কি ?

তিন জনেই চুপ।

ওঃ, বিবিধরা গেম্ (game)! যাক্! ভেবে নিন্, আক্কেলসেলামী গেছে!

তিন জনেই মনে মনে হায় হায় করতে লাগলেন।

কিন্তু সে গেল কোথা ?

সে অর্থাৎ গাণ্ডেরি তখন ফুলুরির বাসায়। একবারে মোটর নিয়ে হাজির ; ডাক্‌লে ফুলুরি—ফুলুরি চাঁদ!

চাদরের ভিতর থেকে বাজখাঁই গলায় আওয়াজ এল—ভ্যা।

আর রসিকতা করতে হবে না। শীগ্‌গির পালাই চল! ভ্যা।

ব্যাপার কি, ব'লে খাটের দিকে অগ্রসর হতেই ফুলুরি ঘাড় নীচু ক'রে মাথা ঘুরিয়ে গুঁতুতে এলেন—ব্যা—

সে বিকট আওয়াজে কাণে আঙ্গুল দিয়ে গাণ্ডেরি যত দ্রুত পলাতে লাগলেন, পিছন থেকে একটা উৎকট আওয়াজ ততই তাড়া করতে লাগল—ব্যা—ব্যা—ব্যা—

শাস্ত্র মিছে নয়, দিগ্‌গজের বড়ী কথা কয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

ওহিও

এক শত কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ওহিও প্রায়শঃ অরণ্যসমাকুল ছিল। ওহিও অঞ্চলের আয়তন, অপর ৩৪টি ষ্টেটের পরবর্ত্তী; কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় ইহা ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১ শত ২০ বৎসর পূর্ব্বে লাইনৃষ্টারলিং, আলেক-জান্দার ম্যাক্‌লালিন্, জন কার এবং জেমস্ জনষ্টন্, রাজধানী স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই ৪ জন অরণ্যমধ্যে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরে কলম্বস্ নামক স্থানে ওহিওর প্রধান সহর স্থাপিত হয়।

ক্রমে নানা স্থান হইতে মানুষ আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিতে থাকে। দিকে দিকে রাজপথের বিস্তার, ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কলম্বস্‌কে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলে। ক্ষুদ্র সহর এখন প্রকাণ্ড নগরে পরিণত হইয়াছে। সিওটো নদের উপর কলম্বস্ অবস্থিত। নগরের একটি রাজপথ ২১ মাইল দীর্ঘ। ইহা যেমন রমণীয়দর্শন, তেমনই প্রশস্ত। এই পথের ধারে ওহিও বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সহরে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ আছে।

ওহিও অঞ্চলে দুইটি সর্পাকৃতিবিশিষ্ট মৃত্তিকাস্তূপ বিদ্যমান আছে। এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিতে ৪ হাজার লোক লাগিয়াছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। এক পুরুষেই উহা সমাপ্ত হইয়া থাকিবে। ওহিওর এই স্তূপগুলি লোকপ্রসিদ্ধ। নিউয়ার্ক ও লেবাননে যে মৃত্তিকাস্তূপ

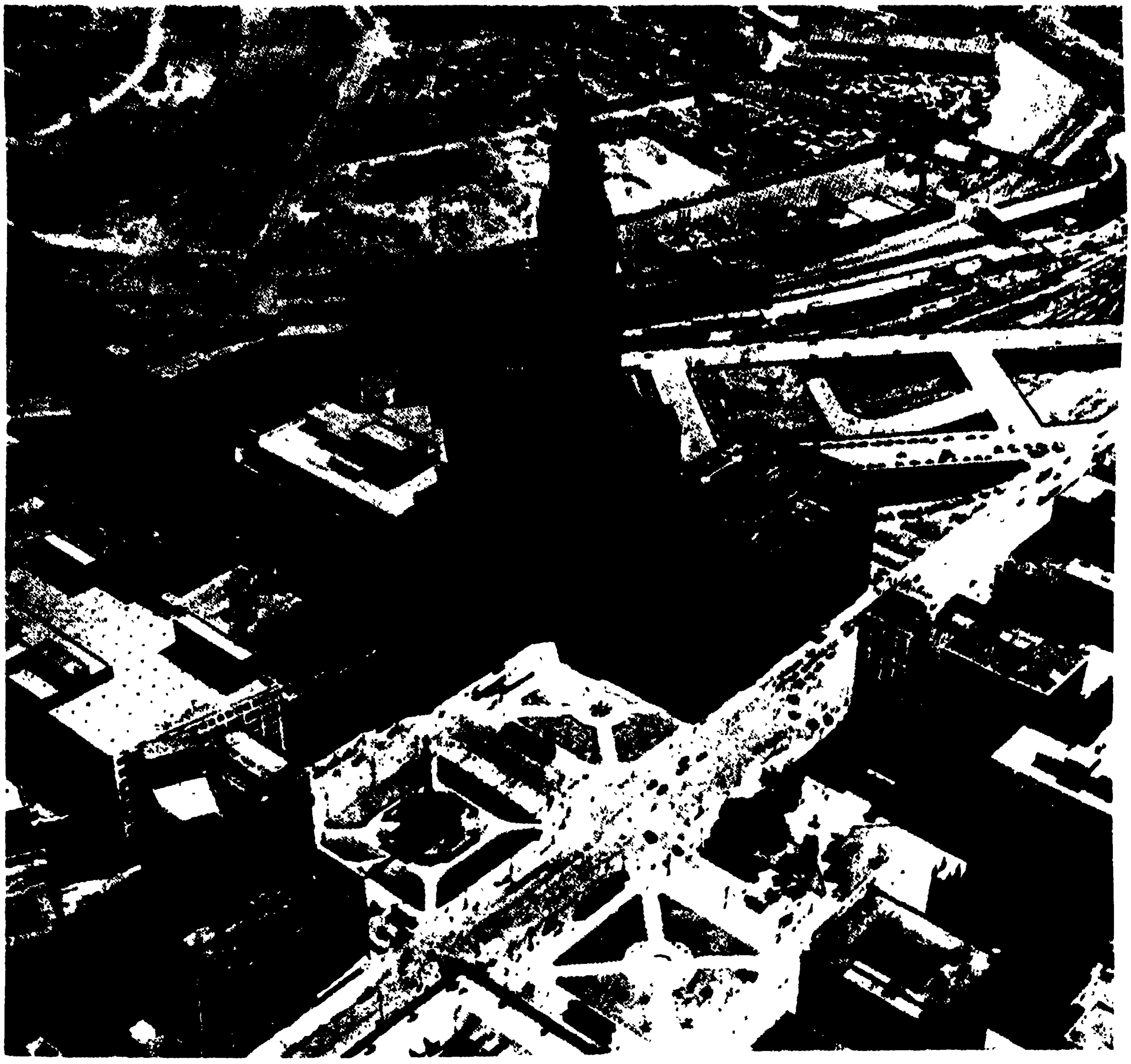

ক্লেভল্যাণ্ড সহরের একাংশ

আছে, তাহা দেখিলে মনে হইবে, যেন সামরিক বিভাগের জন্য এই মৃত্তিকা-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। লেবাননের এই স্তূপটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সাড়ে ৩ মাইল স্থান পর্য্যন্ত প্রসৃত। এই প্রাচীরের উচ্চতা ১০ হইতে ২৫ ফুট। উহার স্থূলত্বও সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন কোন স্থান ৭০ ফুট স্থূল, সুতরাং উহা সহজে ভেদ করা অসম্ভব।

ওহিওর স্তূপ-নির্ম্মাতারা এই সকল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্তূপ নানা আকারে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। নিউয়ার্কএ ঈগল পাখীর আকার, গ্রান্‌ভিলিতে কুম্ভীর, ওয়ারেন ও এডাম্‌স্‌এ সর্পাকার স্তূপ। সর্পাকার একটি স্তূপ ৪ শত ৪০ গজ দীর্ঘ। এই সর্পবৎ স্তূপটি যেন রৌদ্র পোহাইতেছে, তাহার ব্যাদিত বাদামী মুখবিবর যেন একটি ডিম্ব দুই চোয়ালের দ্বারা চাপিয়া রাখিয়াছে।

স্নোয়েনব্রন্‌ ওহিও অঞ্চলের একটি প্রথম উপনিবেশ। ১ শত ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ডেভিড জেস্‌বার্গার এইখানে আগমন করেন এবং অরণ্যমধ্যে একটি ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করেন। ইহাই এ অঞ্চলের প্রথম খৃষ্টধর্ম্ম-মন্দির। মোরাভিয়া ও বোহেমিয়া হইতে ধর্ম্মযাজকগণ নূতন জগতে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এতদঞ্চলে শিক্ষারও প্রবর্ত্তন করেন।

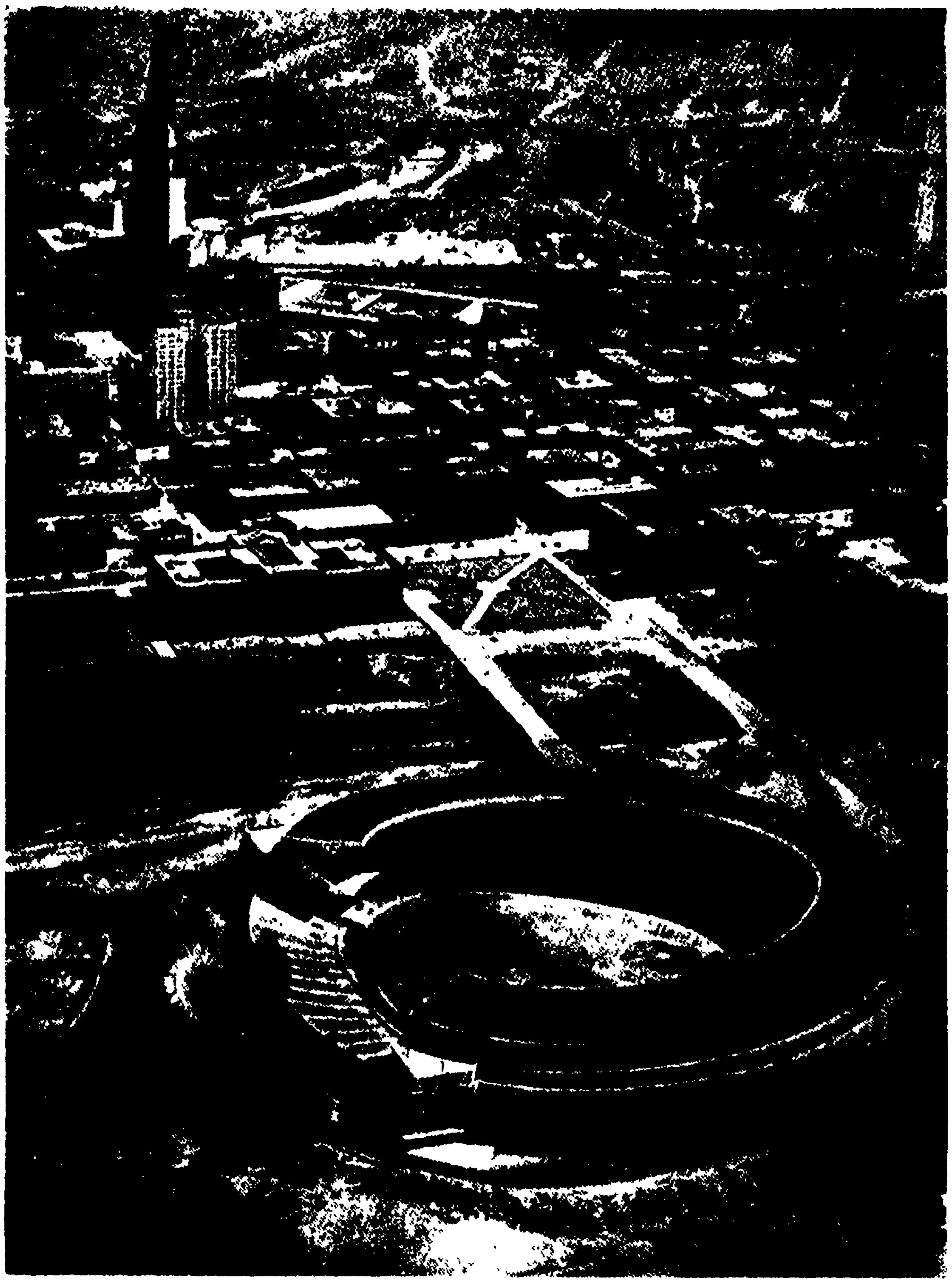

বিমানযোগে ক্লেভল্যাণ্ডের দৃশ্য

বিপ্লব উপস্থিত হইলে স্কোয়েনব্রন্‌ পরিত্যক্ত হয়। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১ শত ৪৬ বৎসর পর্য্যন্ত স্কোয়েনব্রনের কথা কাহারও স্মৃতিপথে ছিল না। তাহার পর মৃত্তিকা খনন করিয়া প্রথম ধর্ম্মমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ওহিও নদ ও মস্‌কিংগমের সংযোগস্থলে মোরিয়েটা নগর অবস্থিত। এই নগর পরম রমণীয়দর্শন। প্রশস্ত রাজ-পথ—দুই ধারে বৃক্ষবীথি। অট্টালিকাগুলি বৃক্ষপত্রের ছায়ায় অর্দ্ধাবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই নগরে নিউ ইংলণ্ডের সমরবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্ম্ম-চারীরা বসবাস করেন।

গ্যালিপলি মোরিয়েটা হইতে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। বহু ফরাসী এক কালে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লববাদে বহু ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারাই এখানে আসিয়াছিলেন।

ওহিও নদের উৎপত্তিস্থলে পূর্ব্বে মানুষ বড় বড় কাঠ আনিয়া জমা করিত। তার পর তদ্দ্বারা নৌকা তৈয়ার করিয়া সেই নৌকায় সপরিবারে আশ্রয় লইয়া নৌকা স্রোতে ভাসাইয়া দিত। এই সকল নৌকা দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট হইত কখনও কখনও আরও বড়

আকারের নৌকা নির্ম্মিত হইত। এই সকল নৌকা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে উপযুক্ত ছিল না। ক্রমে আর এক শ্রেণীর নৌকা দেখা দিল। তাহার গাত্রে ছিদ্র থাকিত। সেই ছিদ্রপথে গুলী নিক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

হ্রদতীরবর্ত্তী স্থানের একটি গৃহ

ক্রমে নৌ-জীবনে অভ্যস্ত পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য, জলপথে জলযানের সাহায্যে ভাসমান দোকান দেখা দিল। প্রত্যেক নৌকায় এক এক প্রকার পতাকা উড্ডীন থাকিত। রক্তপতাকাচিহ্নিত নৌকা মুদীখানা, পীতপতাকাচিহ্নিত নৌকায় শুষ্ক মাল আছে, ইহাই বুঝাইত। শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইলেই মৃগচর্ম্মপরিহিত ক্ষেত্রপতিগণ অথবা তাহাদের সহধর্ম্মিণীরা পতাকা তুলিয়া নৌকা থামাইত। তার পর দরদাম করিয়া তাম্রকূট, শুষ্ক মৎস্য, ফার-নির্ম্মিত দ্রব্য এবং অন্যান্য বস্তু ক্রয় করিত। সময়ে সময়ে ক্ষেত্রপতিগণও নৌকায় করিয়া মাল ফেরি করিত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে গৃহ-যুদ্ধের কাল পর্য্যন্ত ওহিও অঞ্চলে নদীপথেই ক্রয়-বিক্রয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সকল প্রকারের দোকানই নৌকায় দেখিতে পাওয়া যাইত।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই দ্রুতগতিতে ওহিওর উন্নতি ঘটিতে থাকে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ২৫টি দুর্গ শ্বেতকায়দিগের অগ্রগতিতে বাধা দিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। অর্থাৎ শ্বেতজাতিরা যাহাতে পশ্চিমাভিমুখে আর অগ্রসর হইতে না পারে, তাহার জন্য 'রেড' জাতি এই বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ওহিওর বিভিন্ন জাতি যখন দেখিতে পাইত, শত্রু তাহাদিগের দুর্গ অধিকার করিতে আসিয়াছে, তখন তাহারা পরবর্ত্তী দুর্গকে দুর্ভেদ্য করিবার জন্য সামরিক শক্তি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিত।

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শ্বেত ও লোহিত জাতির রণযাত্রা চলিতে লাগিল। নিদ্রাভঙ্গে কুটীরবাসী শ্বেত জাতিরা দেখিতে পাইত, তাহারা শত্রুবেষ্টিত হইয়াছে। অমনই যুদ্ধারম্ভ হইত। যুদ্ধের শেষ উপকরণ যতক্ষণ থাকিত, সংগ্রামের নিবৃত্তি ঘটিত না। তার পর নানাবিধ বিভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারিপার্শ্বে তাহাদের জীবনান্ত হইত।

এইরূপে উপনিবেশকামীরা পুনঃ পুনঃ রেডজাতির দ্বারা বিধ্বস্ত হইলেও উপনিবেশের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে নাই। অবশেষে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ওয়েন্ ওহিওর উত্তর-পশ্চিমদিকে অভিযান করেন। মউমি নদের তীরে উভয় দলের যুদ্ধ হয়। এই ভীষণ সংগ্রামে শত্রুপক্ষকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। গ্রেন্‌ভিল সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের

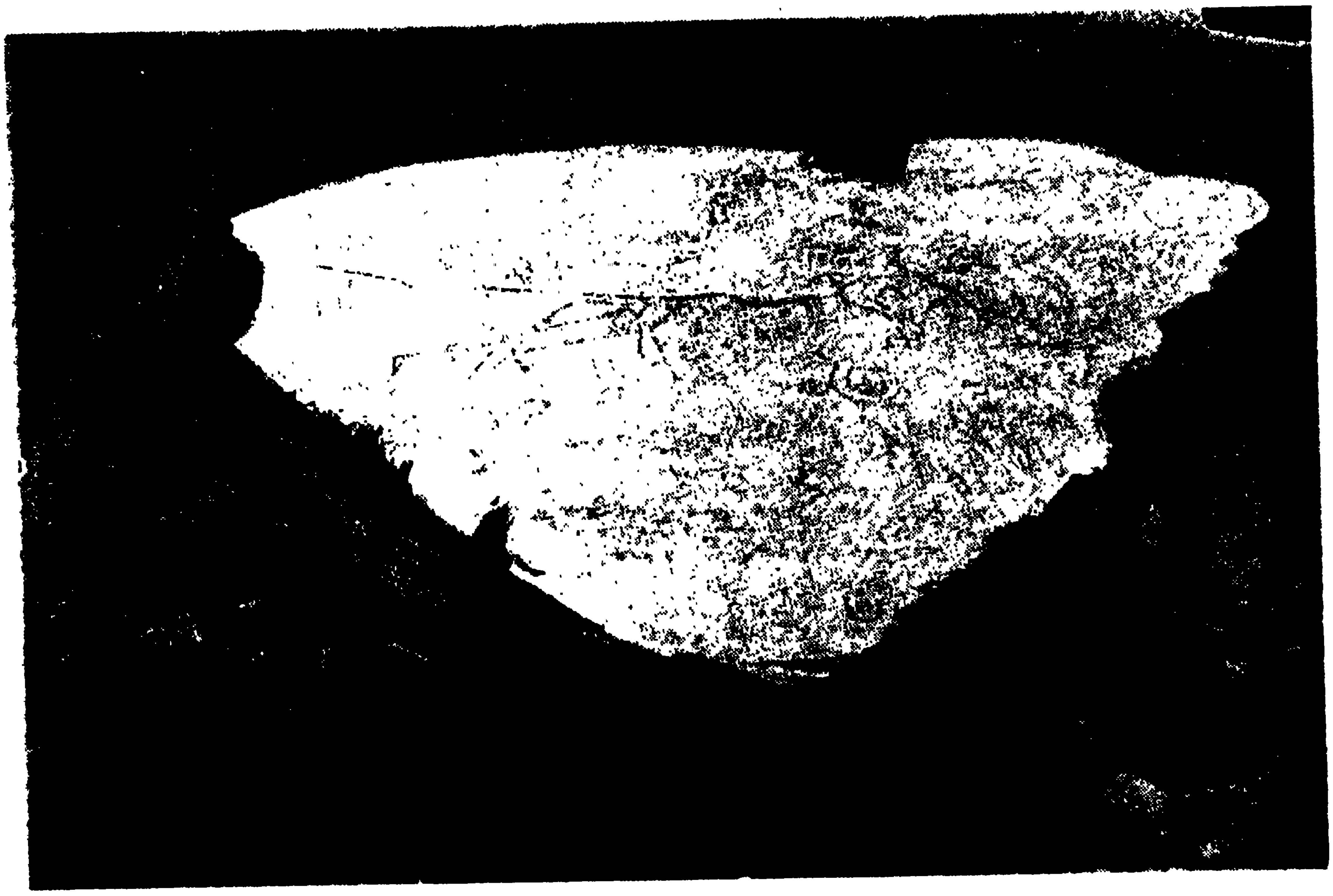

কেলিদ্বীপের আদিমনিবাসীর শিলালেখ

স্নানার্থী তরুণ-তরুণীদিগের বেলাভূমে ক্রীড়া

প্রেসিডেন্ট গ্রান্টের জন্মস্থান

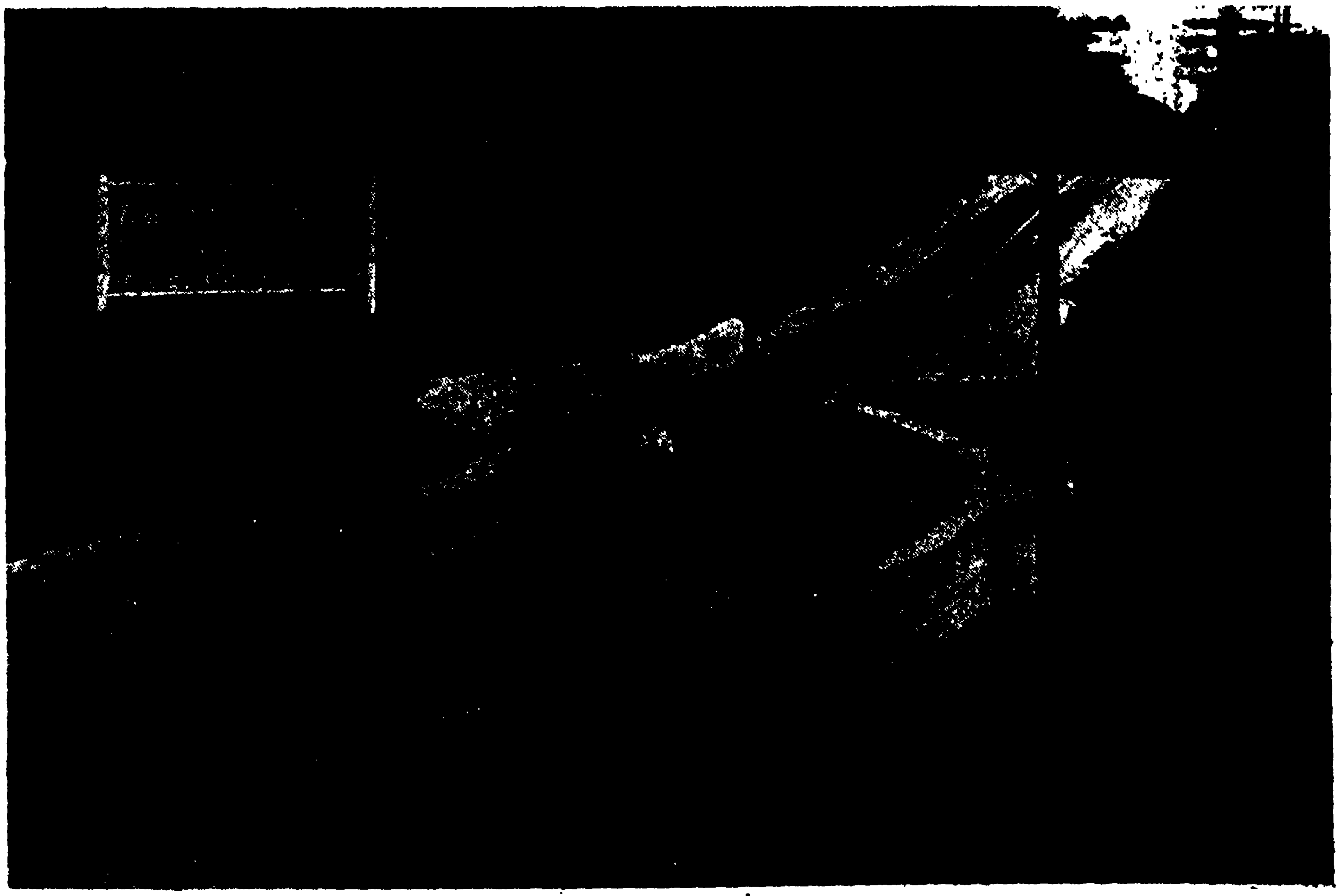

একটি সেতু

গৃহপালিত পশুর বাজার

মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহাতে 'ওহিওতে উপনিবেশ গঠনে আর কোন বাধা ঘটে নাই।

৬ বৎসরের মধ্যে ক্লেভল্যাণ্ড, কনিয়ট, ইয়ংস্‌টাউন টলেডো এবং আক্রণ বসতিপূর্ণ হয়। ওহিওর দক্ষিণাঞ্চলেও পোর্টস্‌মাউথ, চিলিকথি, ডেটন, এথেন্স, জ্যানেস্‌ভিলি ও ল্যাঙ্কাষ্টার নামক জনপদগুলি গড়িয়া উঠে। বাস্তবিকপক্ষে বিপ্লবসংগ্রামের ২০ বৎসরের মধ্যে ৮৮টি জনপদ গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। সামরিক ও বেসামরিক কর্ম্মচারীরা এই সকল স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জন ইয়ং সদলবলে যখন ইয়ংস্‌টাউন গঠিত করিয়া তথায় বসবাস করেন, তখন পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারেন যে, তথায় প্রচুর কয়লা ও পাথুরে চূণের খনি বিদ্যমান। ৬ বৎসর পরে ইয়ংস্‌টাউনে উক্ত দুই প্রকার খনিজ পদার্থের

ঊনবিংশ প্রেসিডেণ্টের জন্মস্থান

সাহায্যে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া উঠে। এখন এই ব্যবসায়ে ইয়ংসটাউন হইতে ৪০ কোটি ডলার মুদ্রার ইস্পাত ও লৌহ প্রতি বৎসর বাহির হইয়া থাকে।

ডানিয়েল ইটন্‌ই প্রথম কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন। তখন যদি তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন যে, ইয়ংস্‌টাউন হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বহন করিতে বৎসরে এত গাড়ী লাগিবে যে, ১২ শত মাইলব্যাপী স্থান সেই গাড়ী অধিকার

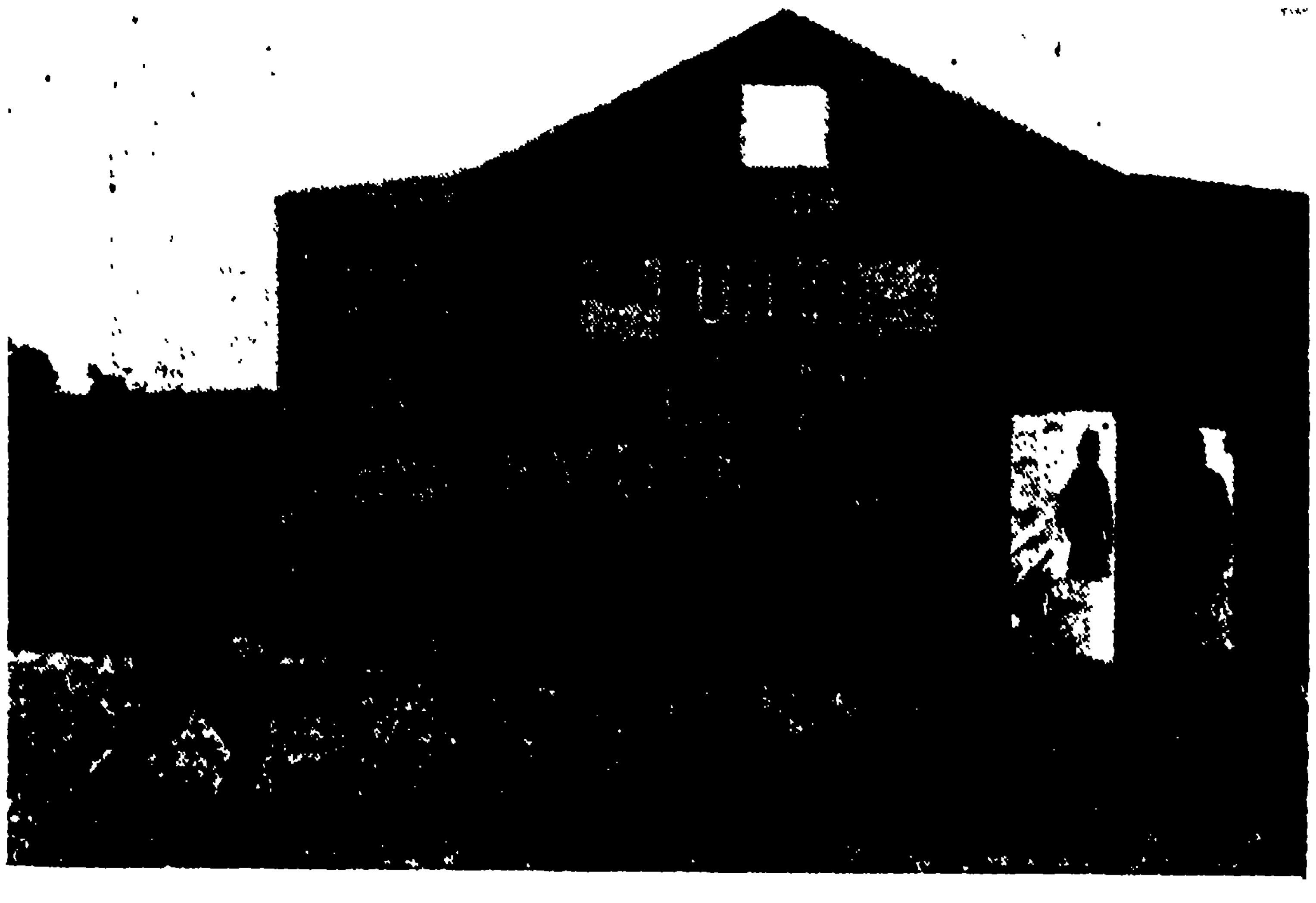

পুলিসের পিস্তল-শিক্ষার স্থান

করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে সে যুগের মানুষ তাঁহাকে পাগ্‌লা-গারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিত! কিন্তু তিনি যে কায আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহা স্বপ্নকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ইয়ংসটাউনের একটা ইস্পাত মিলের দৈর্ঘ্য ৩ মাইল, প্রস্থ প্রায় এক মাইল। সাধারণ অবস্থায় এই কলে ১৫ হাজার শ্রমিক কায করিয়া থাকে। ২২ কোটি ২৪ লক্ষ মণ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য প্রতি বৎসর নির্ম্মিত হইয়া থাকে, লৌহ ও ইস্পাত হইতে যুদ্ধ-জাহাজ যেমন নির্ম্মিত হয়, তেমনই শিশু-দিগের খেলানাও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইয়ংসটাউন কল-কারখানায় পূর্ণ হইলেও দৃশ্যতঃ মনোরম। অট্টালিকাগুলি সুদৃশ্য ও মনোরম, প্রমোদোদ্যানগুলি চিত্ত হরণ করে, নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বহু গৃহস্থ পরিবার এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। খালি কুলী-মজুরের সহর নহে।

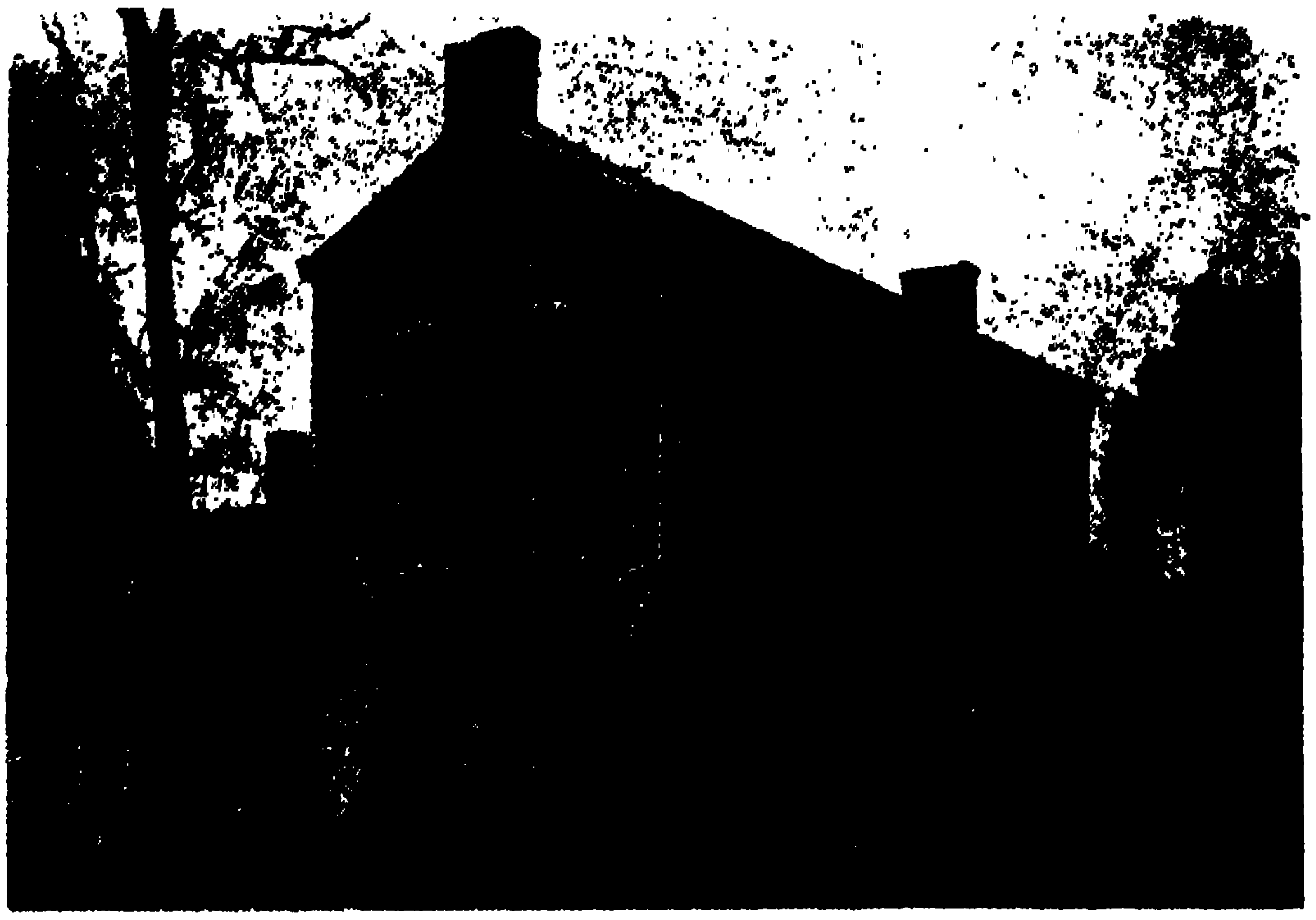

বেঞ্জামিন হ্যারিসনের জন্মক্ষেত্র

ইয়ংসটাউন গঠিত হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে ক্লেভল্যাণ্ডে বসতির সূত্রপাত হয়। মোজেস্ ক্লেভল্যাণ্ড সদলবলে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এই নগরের পত্তন করেন। ৫০ জন নর-নারী সহ ক্লেভল্যাণ্ডে বসতি আরম্ভ করিবার পর দ্রুত ইহার উন্নতি ঘটিতে থাকে। কোন পথ এখানে পূর্ব্বে ছিল না। ক্লেভল্যাণ্ডের আগমনের এক বৎসর পূর্ব্বে জেনারেল সেণ্ট ক্লেয়ার—উত্তরাঞ্চলের গভর্ণর—ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "এ দেশে একটিও পথ নাই! মহিষের

ম্যারিয়েটার জাঁতার স্তূপ

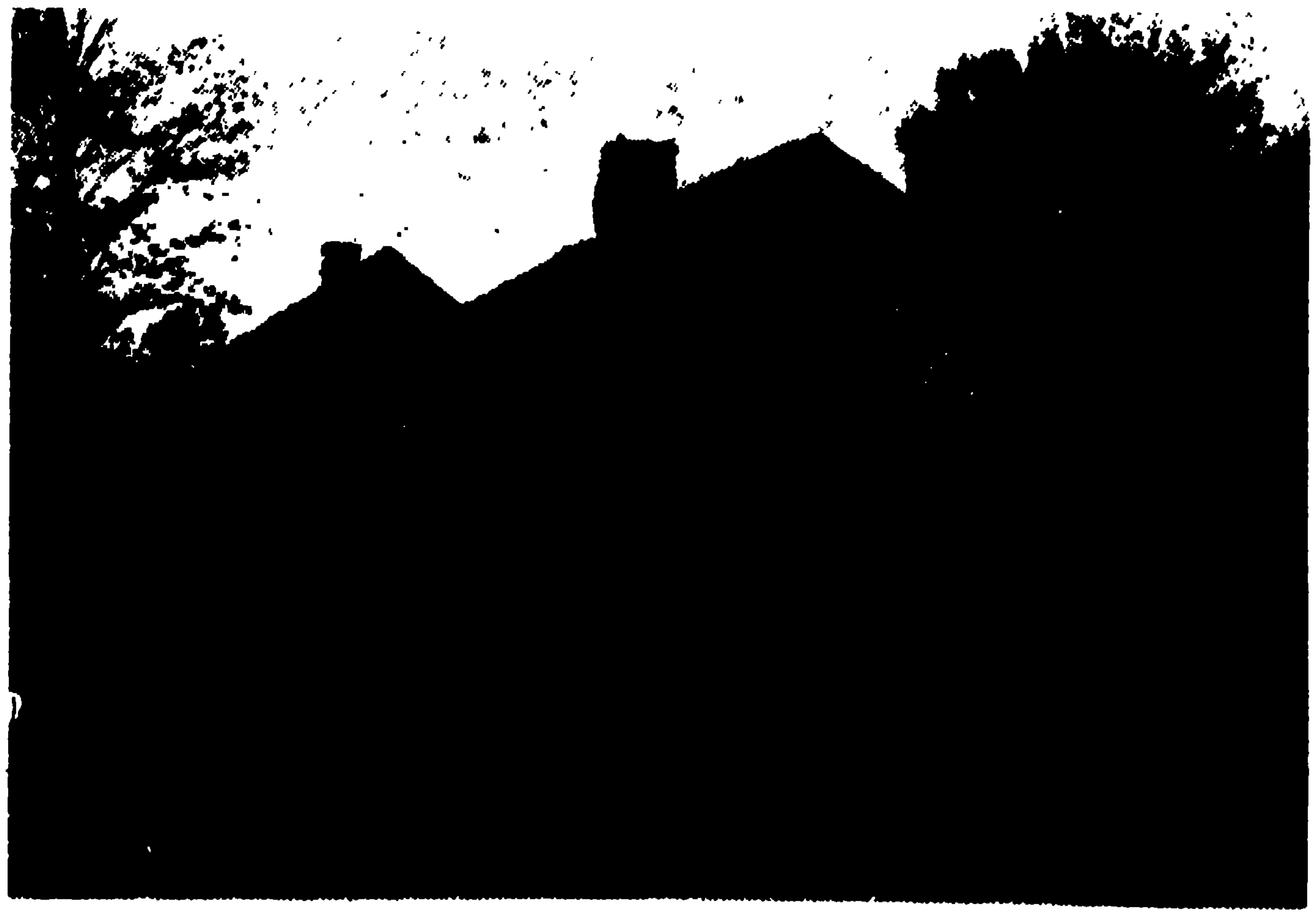

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ওহিও সহরের অবস্থা

কলম্বস্ নগরের প্রাসাদ

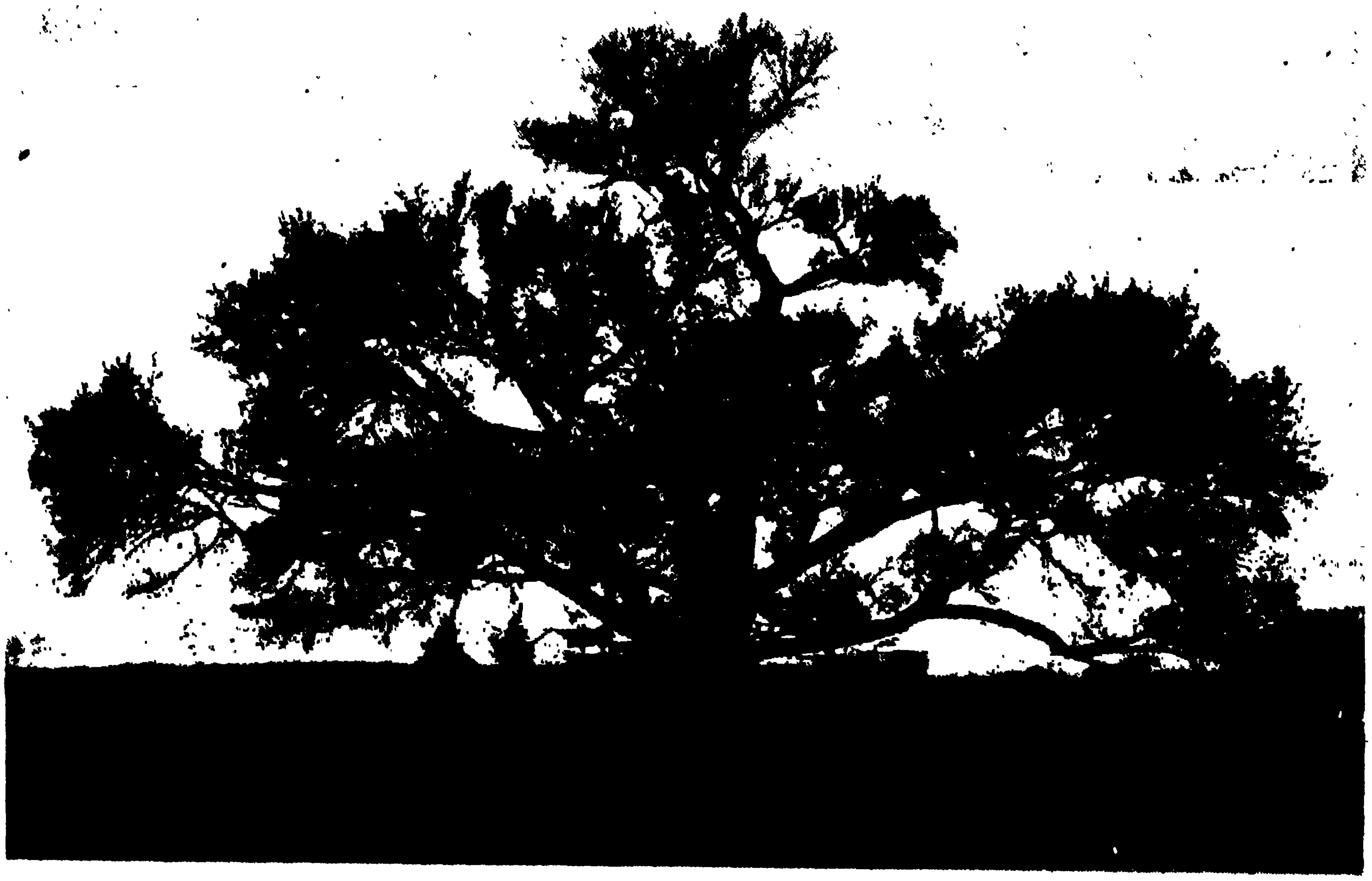

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ। সর্দ্দার লোসান ইহারই তলে বক্তৃতা দিয়াছিল

সর্পাকৃতি মৃত্তিকাস্তূপ

মার্টিন ফোরি—ইস্পাত-কারখানার অন্যতম কেন্দ্র

কলম্বস সহরের প্রমোদ-পরিচ্ছদ

মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়

ওহিও নদের একাংশ

সমুদ্রে মাছ ধরা

দ্রাক্ষাস্তূপ

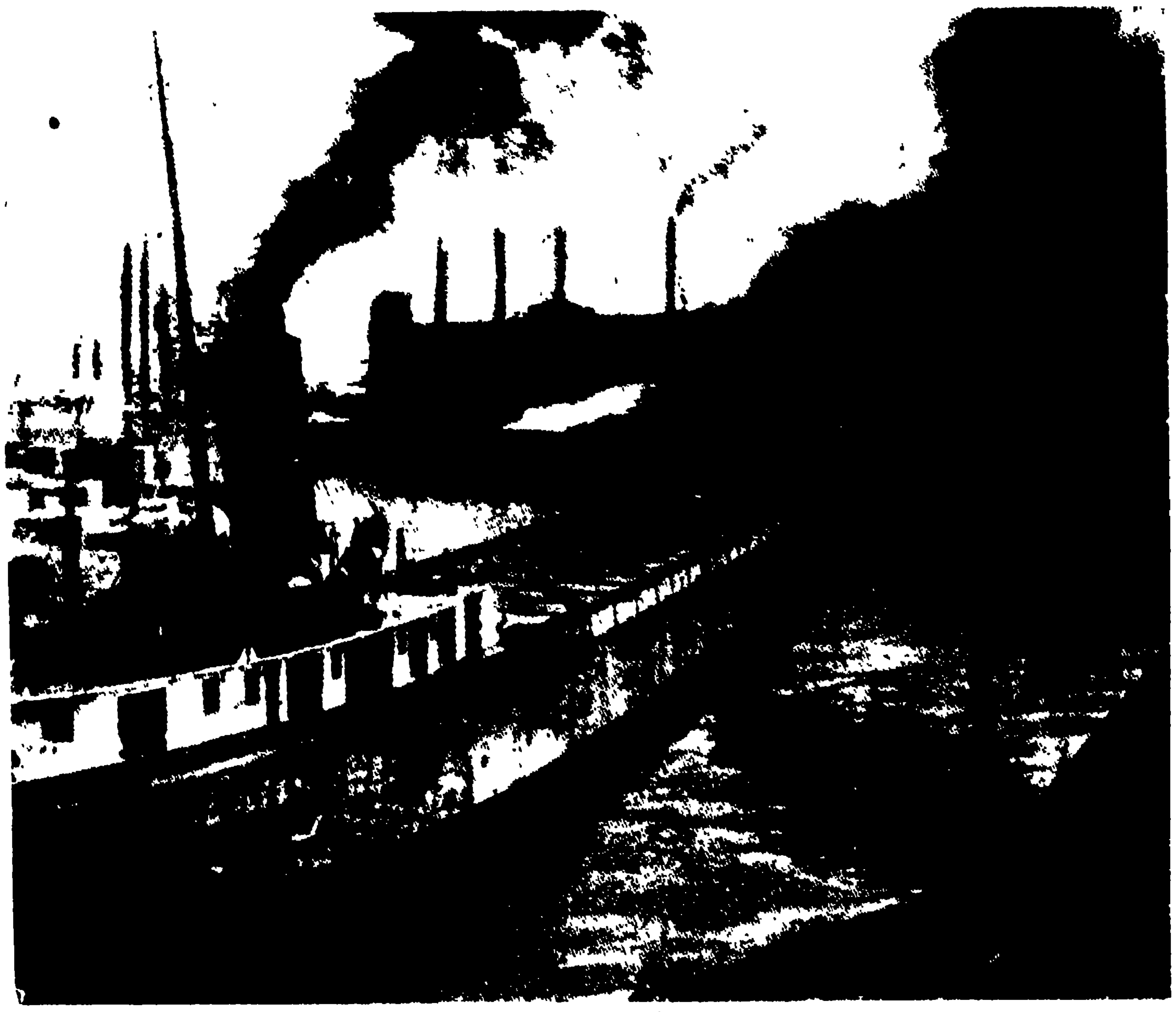

ক্লেভল্যাণ্ডের বন্দর

দল চলিয়া চলিয়া অরণ্যমধ্যে যে পথের রেখা পড়িয়াছিল, তাহা ধরিয়া ইণ্ডিয়ানগণ যাতায়াত করিত মাত্র। সেই সকল চলা পথ ক্রমশঃ বিস্তৃত রাজপথে পরিণত হয়।"

ক্রমশঃ বিস্তৃত, সুদীর্ঘ রাজপথ ১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এই পথ কলম্বিয়ায় গিয়া পৌছে। যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ অরণ্যসমাকুল ছিল, রাজপথ নির্ম্মিত হওয়ায় তাহার চতুর্দ্দিকে যাতায়াতের ক্রমশঃ বিশেষ সুবিধা ঘটে। নবগঠিত জনপদে বসবাসের উদ্দেশ্যে তখন রাজপথে বলীবর্দ্দ বা অশ্ববাহিত যানে চড়িয়া দলবদ্ধ পরিবার দীর্ঘপথ অতিক্রম করিত। রবিবার বিশ্রামের দিবস বলিয়া পথ চলা বন্ধ থাকিত। তখন পথের ধারে স্বল্পপরিসর শকটে রাত্রিযাপন করিতে হইত। প্রতিদিন ১২ মাইলের অধিক পথ চলা ঘটিত না। এইরূপে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া সে

যুগে নর-নারীরা নবগঠিত উপনিবেশে বাস করিতে যাইত।

ওহিও অঞ্চলের কোনও নদীপথে ১৮১১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনও বাষ্পীয় পোত দেখা দেয় নাই। বাষ্পীয় পোত সম্বন্ধে জনসাধারণের কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষজ্ঞান ছিল না। ওহিও নদে ১৮১১শ খৃষ্টাব্দের এক প্রভাতে এক অদ্ভুত-দর্শন রাক্ষসাকার পদার্থকে ধূম্রোদ্গার করিতে দেখিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ ভাবিয়াছিল, ধূমকেতু বোধ হয় খসিয়া জলে পড়িয়াছে; কেহ ভাবিয়াছিল, কোন ভাসমান কলকারখানা নদীর বুকে দেখা দিয়াছে। বাষ্পীয় পোতের ধারণা তখন কাহারও ছিল না।

উক্ত ঘটনার ২৫ বৎসর পরে ওহিও নদে ১০৭ খানি বাষ্পীয় পোত সর্ব্বদা গতায়াত করিত। পরবর্ত্তী বিশ বৎসরে বাষ্পীয় পোত নদীবক্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

ত্রিপত্রবিশিষ্ট পুষ্পিত তৃণক্ষেত্র

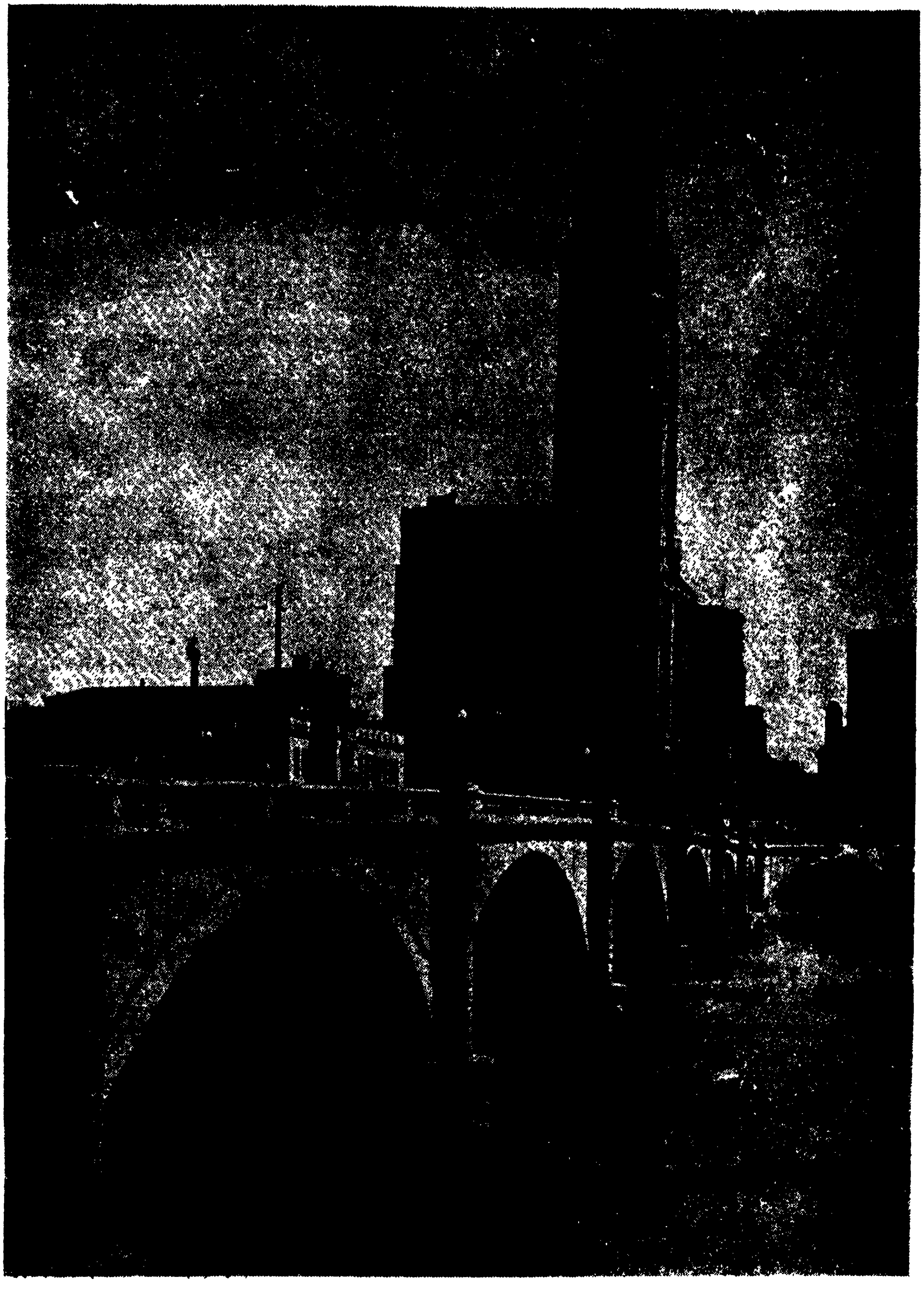

গগনচুম্বী অট্টালিকা

ক্রমে বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া জলদস্যুগণ অনেক স্থানে লুণ্ঠনকার্য্যেও রত হইত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ওহিওতে সেচের খাল নির্ম্মিত হইতে থাকে। ওহিও নদ হইতে ৮ শত মাইলব্যাপী খাল খনন করা হইয়াছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ওহিও নদ ও এরিহ্রদকে রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। রেলপথের

লোক বসবাস করিয়া থাকে। লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার।

যে সকল মার্কিণ সহর শ্রমশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ, তথায় বিদেশী লোকেরই অধিক বাস। ক্লেভল্যাণ্ডের শ্বেতকায় অধিবাসীদিগের শতকরা ২৫ জন বৈদেশিক। জেচোশ্লোভাক্, শ্লাভ, পোল, ইটালীয়, জার্ম্মাণ, হঙ্গেরীয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র পাড়া আছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি সত্বেও নাগরিক-জীবনে সকলেরই সহযোগিতা বিদ্যমান

সাবানের স্তূপ

বৃদ্ধি ও প্রসারের ফলে নদীপথের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে জলযানগুলিও একে একে অন্তর্হিত হইতে থাকে।

ক্লেভল্যাণ্ড সহর শ্রমশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, বড় বড় অট্টালিকা, শিক্ষাকেন্দ্র, প্রমোদকেন্দ্র এবং হোটেল জীবনের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সহরে ১ হাজার ৭ শত মোটর-গাড়ীর জন্য গ্যারেজ আছে। রেস্তোরাঁ-সমূহে প্রত্যহ দশ হাজার লোক লাঞ্চ গ্রহণ করে। হোটেলেই অধিকাংশ

ইষ্ট লিভার পুলের নদীতীরের দৃশ্য

মধ্যে সাবান কাটা হইতেছে

বিভিন্ন দেশের লোক বসবাস করায় ক্লেভল্যাণ্ডের আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারেও বিশেষ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখানে বিভিন্ন ভাবের নাটক রচিত হইয়া অভিনীত হইয়া থাকে। পাঠাগারে বিভিন্ন ভাষার পুস্তক অপর্য্যাপ্ত। ছেলেদের জন্য যে সকল ক্লাব আছে, তাহাতে মাসে মাসে সহস্রাধিক ছাত্র যোগ দিয়া থাকে।

ক্লেভল্যাণ্ডের রঙ্গালয়গুলিতে বিভিন্ন জাতির প্রীতি-সম্পাদনের জন্য নানাবিধ ভাবের নাটক অভিনীত হইয়া থাকে। ২৯টি বিভিন্ন জাতি হইতে রঙ্গালয়

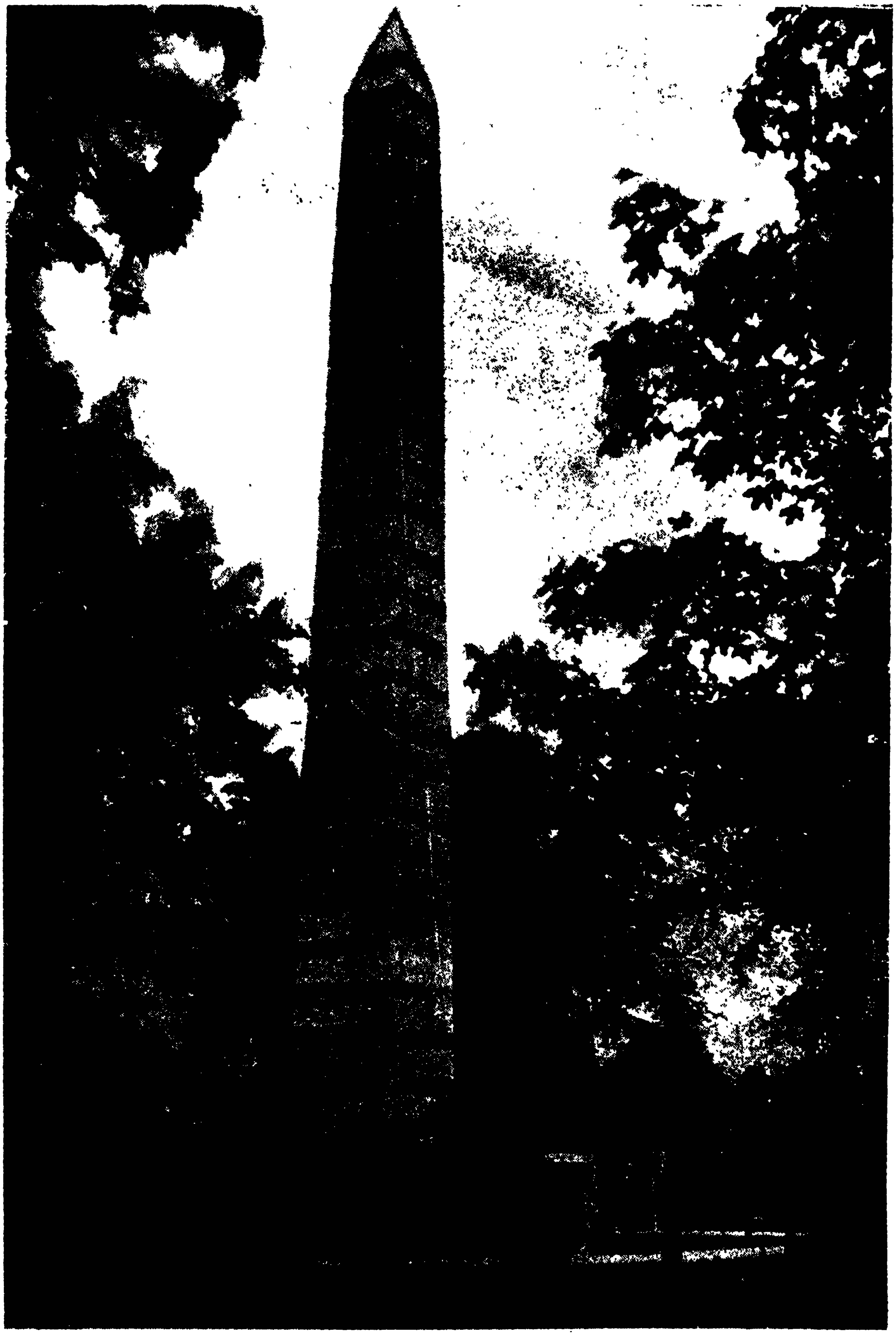

ণ্টনিওয়েন্ স্মৃতিসৌধ

পরিচালকগণ ১২শত অভিনেতা অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। ২০ হাজার দর্শকের উপযোগী ২২খানি নাটক বৎসরে অভিনীত হইয়া থাকে। আমোদ-প্রমোদে অভিনয় ব্যতীত, সঙ্গীত, গ্রাম্যনৃত্য প্রভৃতির প্রদর্শনীও বসে। অবশ্য সকল দেশের, সকল জাতির উপযোগী ব্যবস্থাই তাহাতে

ক্লেভল্যাণ্ড হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলে স্যান্ডস্কি নামক জনপদ দেখা যাইবে। এইখানে প্রচুর মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। বন্দরটি মৎস্যের জন্য প্রসিদ্ধ। স্যান্ডস্কি হইতে কাটাওবা দ্বীপে গমন করিতে হয়। দ্বীপটি এমনভাবে অবস্থিত যে, স্থলপথে মোটরে এখানে যাওয়া চলে।

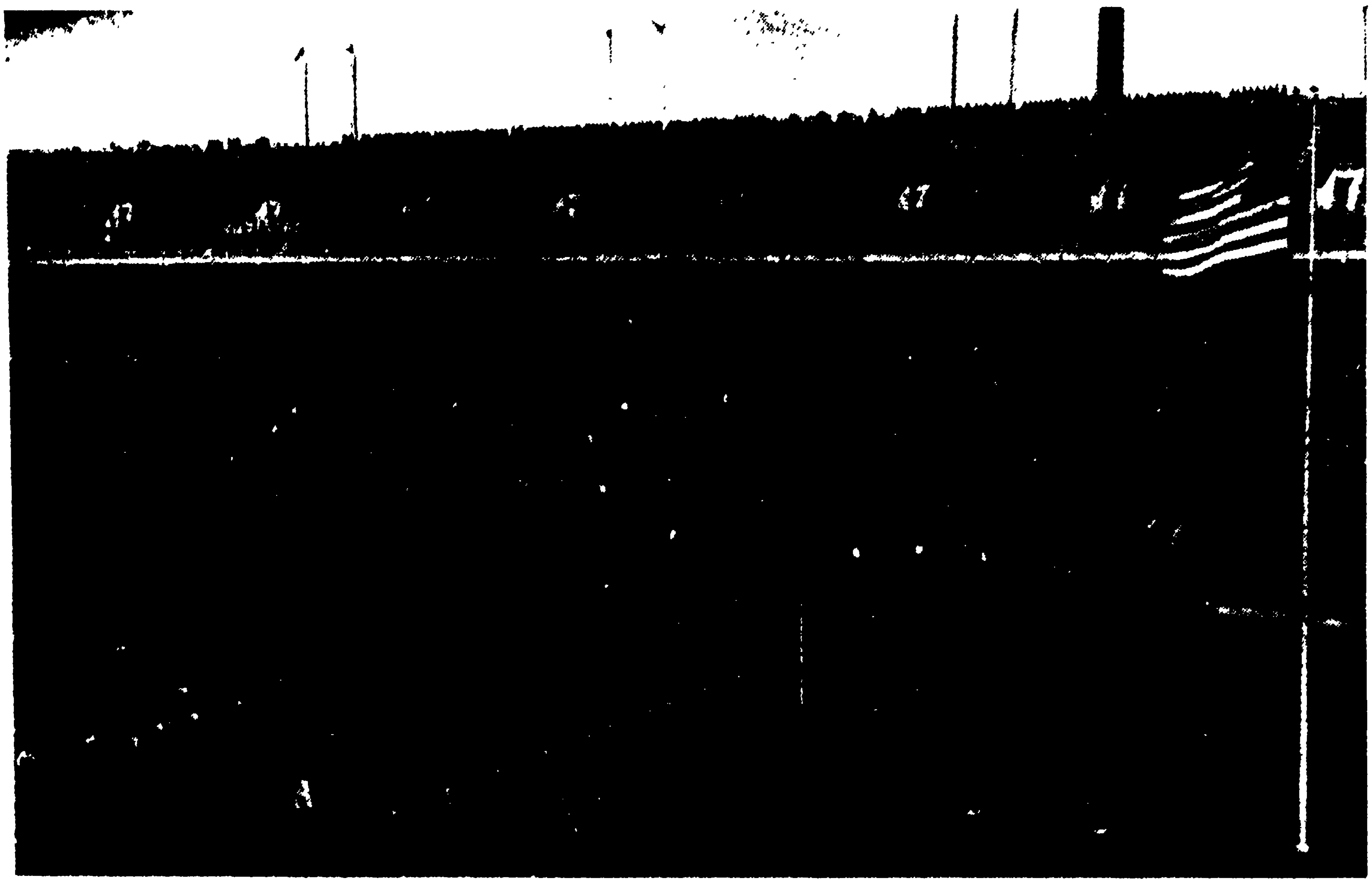

ওহিওর ফুটবল খেলার দৃশ্য

বিদ্যমান। চীন হইতে আয়ার্ল্যাণ্ড, বলকানরাজ্য হইতে ওয়েল্‌স্ এবং স্কানডিনেভিয়া হইতে স্পেন—সকল দেশের লোকের উপভোগ্য করিবার ব্যবস্থা ক্লেভল্যাণ্ডের শিক্ষা-গৌরবের দ্যোতক।

আরও অনেকগুলি দ্বীপ পাশাপাশি বিদ্যমান;—বাস্‌দ্বীপ, পুট-ইন্-বে, কেলি, মার্ব্বেলহেড, জনসনদ্বীপ প্রভৃতি। জনসনদ্বীপে এক সময়ে ১৫ হাজার বন্দীকে রাখা হইয়াছিল।

বাস্‌দ্বীপে পেরীজয়ের স্মৃতিসৌধ

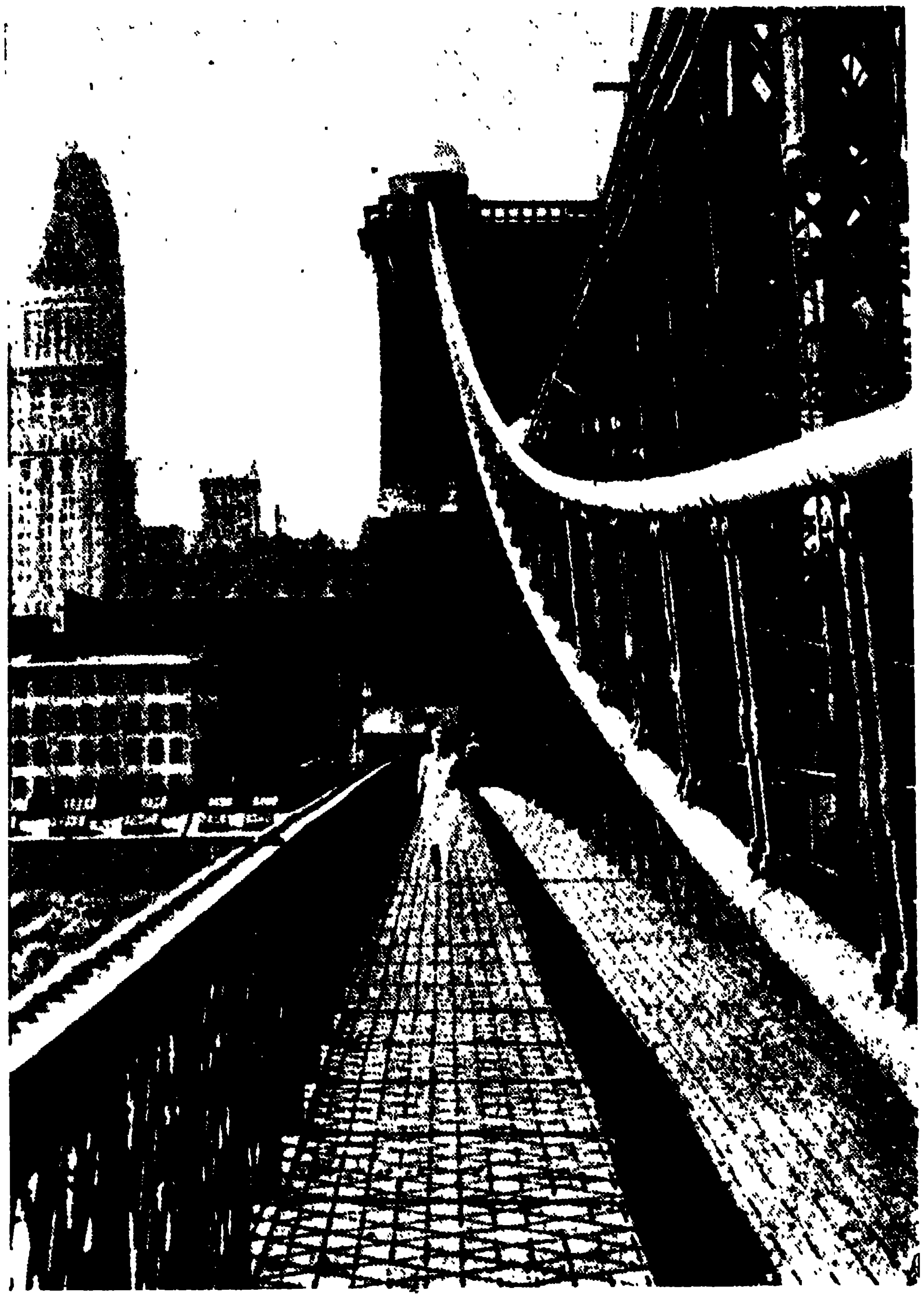

সিনসিনাটির বিরাট সেতু

টলেডো সহর কয়লার জন্য বিখ্যাত। এক সময়ে টলেডো যুদ্ধভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। এক দিন এখানে রক্তের নদী বহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন সে নগর দেখিলে মনে হইবে না, বিবাদের বহ্নি এক দিন ভীষণভাবে এখানে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। টলেডোকে লইয়া অনেক কবি যুদ্ধের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ওহিওর কৃষিক্ষেত্রগুলি দেখিলেই মনে হইবে, পল্লী অপেক্ষা সহরের দিকেই মানুষের ঝোঁক বেশী। এ জন্য নগরে বসতির সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, পল্লীর অধিবাসীর সংখ্যা সেই অনুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। ৬৬ লক্ষ ৪৭ হাজার জনসংখ্যার শতকরা ১৬ জনকে কৃষিমূলক পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ জমীর শতকরা ৮৩ ভাগই কৃষির উপযোগী। কৃষির দিকে ওহিওবাসীর মন এখন নাই।

ডেটন সহর লোকসংখ্যার অনুপাতে ওহিওর ৬ষ্ঠ জনপদ। এই সহরটি অতি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত—রমণীয়-দর্শন। কিন্তু এখানেও শ্রমশিল্পের প্রচুর সমাবেশ আছে। ডেটনের শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি পৃথিবীর

ওহিওর সহিত ঘরোয়াযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত আছে। ওহিওর বহু ব্যক্তি এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। ৫৩ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, ১৯ জন মেজর-জেনারেল, ৩ জন জেনারেল তন্মধ্যে প্রধান। ইহাদের মধ্যে সেরিডান্‌, সার্ম্মান এবং গ্রাণ্টের নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সার্ম্মান ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলম্বস্‌ সহরে সমবেত রণবিশারদগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভাবিতেছেন, যুদ্ধের মত এমন গৌরবজনক ব্যাপার আর নাই। কিন্তু তাহা সত্য নহে। যুদ্ধ নরকতুল্য জঘন্য ব্যাপার!"

টমাস্‌ এডিসনের জন্মস্থান

সর্ব্বত্র বিক্রীত হইয়া থাকে। ডেটনে প্রস্তুত বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটর যন্ত্র বহু গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের খাদ্যদ্রব্যরক্ষার সমস্যার সমাধান করিয়াছে। গৃহ শীতল রাখিবার যন্ত্রও ডেটনে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রচুর বারিপাতের ফলে মিয়ামি নদ প্লাবিত হইয়া ডেটন সহর ভাসাইয়া দেয়। সহরে ৮ হইতে ২০ ফুট জল দাঁড়াইয়াছিল। ইহাতে সহরবাসীর ভয়ানক কষ্ট হইয়াছিল। ডেটনবাসী এ শিক্ষা ভুলে নাই। ৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার মুদ্রা ব্যয় করিয়া এমন ভাবে জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছে যে, বন্যাতে কখনও এই সহর প্লাবিত হইবে না।

ওহিওর স্থাপয়িতা জেনারেল পুটনামের বাসগৃহ

ডেটন সহর হইতেই মানুষ প্রথম আকাশপথে উড্ডীন হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিমানযোগে মানুষ আকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়াছিল। যুক্তরাজ্যের সেনাবিভাগের বিমান-বন্দর ডেটন সহরে অবস্থিত। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বন্দর "রাইটফিল্ড" নামক স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

সিনসিনিটি সহরকে "সাত পাহাড়ী নগর" বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সহরের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৭২ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সিনসিনিটির অধিকার সীমার মধ্যে তিনটি মিউনিসিপ্যালিটী বিদ্যমান—এল্‌উড্, সেণ্টবার্ণার্ড এবং নরউড্।

মেলাক্ষেত্রে ঘোড়ার বোঝা টানিবার শক্তি-পরীক্ষা

জলযানে গৃহস্থ-জীবন

লৌহ, কয়লা এবং কাঠ এই তিন প্রকার দ্রব্য সিনসিনিটিতে প্রচুর পাওয়া যায়।

সিনসিনিটি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র। নগরের চারিদিকে পাহাড়। ইহাতে নগরটিকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। নগরের মধ্যে সুদৃশ্য অট্টালিকাশ্রেণী এবং মনোরম প্রমোদোদ্যানের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান।

সিনসিনিটি সহর সঙ্গীতশিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। নগরের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রতি বৎসর মে মাসে এখানে সঙ্গীত-সংক্রান্ত উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। বৎসরে এইরূপ দুইবার উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। গত ৬৫ বৎসর ধরিয়া এইরূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। সুবিখ্যাত বাদকগণ এখানে সম্মিলিত হইয়া থাকেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এখানে আছে। মিসেস্ উইলিয়াম্ হাউয়ার্ড টাফট "অর্চ্চেষ্ট্রা এসোসিয়াশনের" প্রথম প্রেসিডেণ্ট। গত ৪০ বৎসর ধরিয়া উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

প্রত্যেক পাহাড়ে একটি করিয়া প্রমোদোদ্যান আছে। ক্রীড়াক্ষেত্রের সংখ্যা নাই—যেখানেই স্থান মিলিয়াছে, সেইখানেই একটি করিয়া ক্রীড়াক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সিনসিনিটির মাউণ্ট অবরণ উইলিয়ম্ হাউয়ার্ড ট্যাফটের জন্মভূমি বলিয়া বিখ্যাত। ইনি প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান বিচারপতির পদ একসঙ্গে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ওহিওর প্রেসিডেণ্টগণের মধ্যে, ইতিহাসের ধারা অনুসারে, উইলিয়াম্ হাউয়ার্ড ট্যাফট ৭ম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

২১ বার জাতীয় নির্ব্বাচনব্যাপারে ওহিও ৮ জন প্রেসিডেণ্ট হোয়াইট হাউসে পাঠাইয়াছে। ওহিও বার বার প্রেসিডেণ্ট পাঠাইয়াছে, ইহাতে তাহার বিশেষ গৌরব সন্দেহ নাই। শুধু তাহাই নহে, ওহিওতে বহু উদ্ভাবনকারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বহু প্রসিদ্ধ লেখক, ভাস্কর, শিল্পী, কূটনীতিবিদ্ ঐতিহাসিক, চলচ্চিত্র-নায়ক, সামাজিক সংস্কারক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ওহিওর প্রসিদ্ধি পৃথিবীব্যাপী।

ওহিও এবং এরিখালের দৃশ্য

উইলিয়ম হাউয়ার্ড টাফটের জন্মস্থান

ওহিওর জীবন-ইতিহাসে নদীর প্রভাব অসামান্য ছিল। নদীর সাহায্যেই ওহিওর প্রথম উন্নতির সূত্রপাত হয়। তার পর ধীরে ধীরে তাহার জীবননাট্যের পট-পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। নদীর পর রেলপথ দেখা দিল। রেলপথ দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা-সন্নিবেশকে পরিণতির পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট।

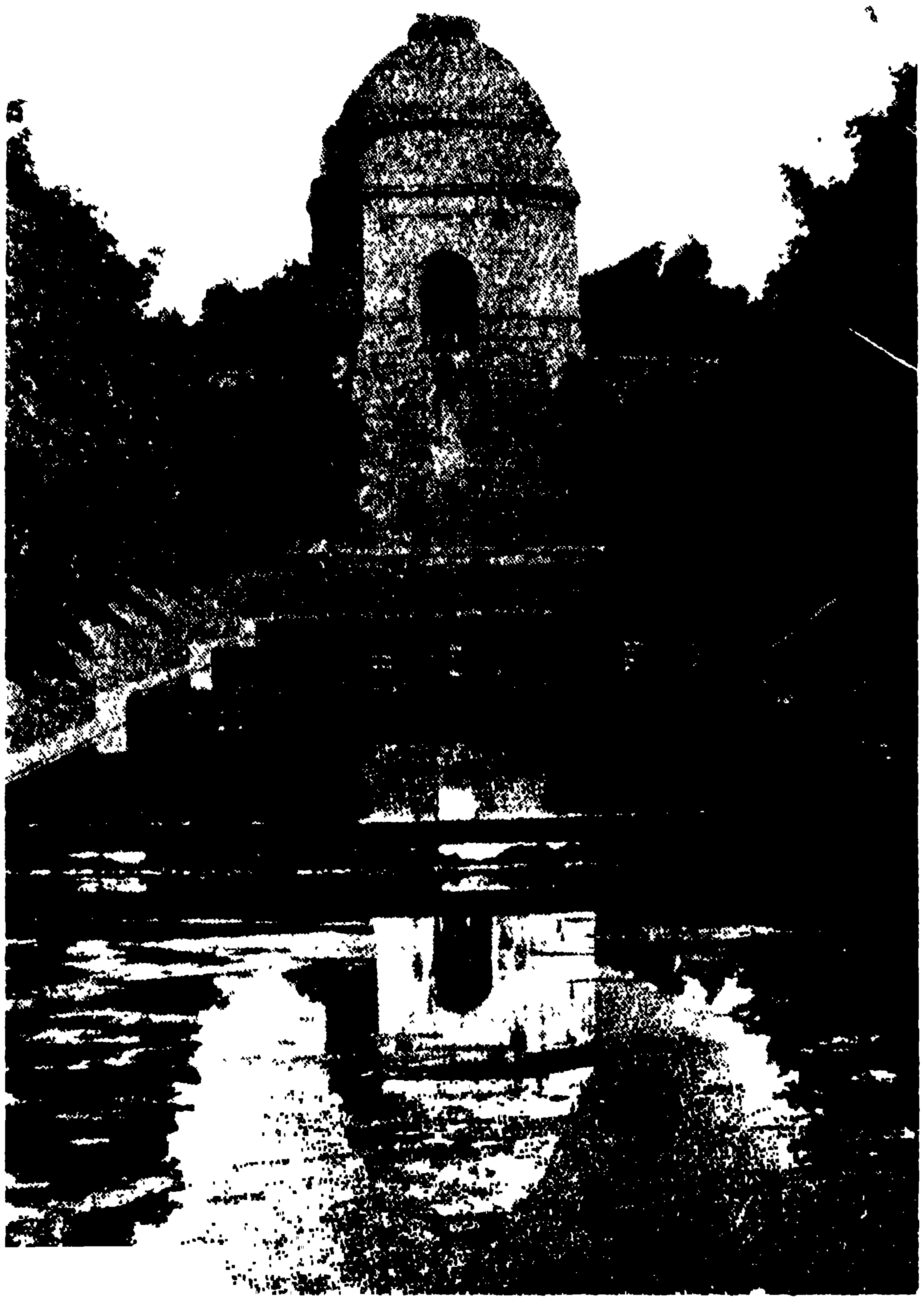

প্রেসিডেণ্ট ম্যাফ্‌বিচানের সমাধি-সৌধ

বৈজ্ঞানিক যুগ ওহিওর জীবননাট্যের তৃতীয় অঙ্ককে প্রভাবিত করিয়াছিল। বিমান আসিয়া চতুর্থ অঙ্ককে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের পথে লইয়া চলিল। মোটর-গাড়ী চলিবার পথ ওহিওর দিকে দিকে প্রসারিত হইয়াছিল।

কিন্তু ওহিওর ভাগ্য যাহার প্রভাবে সর্ব্বপ্রথম গঠিত হইয়াছিল, সেই পুরাতন নদ-নদী মাঝে মাঝে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিত, তাহার যুগের মানুষগুলি কোথায় আছে—সবাই কি তাহাদের স্মৃতি চিরদিনের জন্য ভুলিয়া গিয়াছে, না, কৃতজ্ঞতার অবশেষ বর্ত্তমান যুগের ওহিওবাসীদিগের মনে কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে?

না, ওহিওবাসীরা নদ-নদীকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় নাই। আধুনিক যুগের বাঁধ এবং "লকগেট" নদ-নদীগুলিকে নৌপথের উপযুক্ত অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছে। শীঘ্র নদীপথগুলির স্রোতোধারা বিলুপ্ত হইবার নহে। এরিহ্রদের সহিত নদীর সংযোগ যাহাতে জলপথকে স্থায়িভাবে বজায় রাখিতে পারে, সে বিষয়ে প্রস্তাব চলিতেছে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ব্যোমপথে, ডাঙ্গাপথে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেমন অব্যাহত থাকিবে, জলপথেও সেই জয়যাত্রা চলিতে থাকিবে। ওহিওবাসীরা নদীকে ভুলে নাই। নদীই সর্ব্বপ্রথম ওহিওর ভাগ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। প্রথম ভাগ্য-বিধাতাকে ওহিও সম্মানসহকারে জীবন-ইতিহাসের পৃষ্ঠে অমর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

কিন্তু নদীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আপন মনেই বহিয়া চলিয়াছে—চলিতে থাকিবে। সে জানে, তাহার বক্ষে যাহারা প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহারা জয়-তিলক ললাটে ধারণ করিয়া পৃথিবীর দরবারে সম্মান ও যশের অধিকারী হইয়াছে। নূতন বিজ্ঞান সেই জয়যাত্রার প্রেরণা দিয়াছে সত্য, কিন্তু নদীর কথা তাহাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে। এই কথা মনে রাখিয়া নদীর জলধারা উদ্দাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি *

সাহিত্য

জাতির ভাবধারা—চিন্তার ধারা যাহার মধ্য দিয়া যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্জীবিত থাকে, তাহাই জাতির সাহিত্য। সম (সম্যক্) যে হিত, সহিত, তদুত্তরে ষ্য প্রত্যয় করিলে সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। সম্যক্‌রূপে যাহা জাতির হিতকর এবং যাহা নিত্য, তাহাই সাহিত্য। জাতির বিনাশ হইলেও জাতির সাহিত্য তাহাকে প্রলয়ান্ত কাল পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখে। অতীতের গ্রীক ও রোমান জাতি আজ কোথায়? কিন্তু গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য আজিও এ্যারিষ্টটল প্লেটো, কিকেরো থিউকিডিডিসের যুগের মানুষকে আমাদের দৃষ্টির পথে জীবন্ত প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষাকে dead language বলা হয়; কিন্তু সেই মৃত ভাষা-সাহিত্যের ভাবসম্পদ আধুনিক উন্নত সভ্য জাতিসমূহের ভাষায় ও সাহিত্যে পূর্ণ সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে, তাই মানুষ এখনও নিরোকে জ্বলন্ত রোমের দিকে চাহিয়া হর্ষভরে বাঁশী বাজাইতে দেখে, এখনও তাই মানুষ একিলিস অ্যাজাক্সের শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনীতে মুগ্ধ হয়, এখনও মানুষ তাই মোহিনী ক্লিওপ্যাটরার প্রেমের ফাঁসে মার্ক এ্যান্টনিকে আত্মাহুতি দিতে দেখিয়া হর্ষ-বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়। মানুষের মহত্ত্ব, বীরত্ব, সতীত্ব, পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, সৌভ্রাতৃত্ব, মাতৃস্নেহ, দাম্পত্য-প্রণয়, চরিত্রের ধৈর্য্য, সংযম, দার্ঢ্য, অধ্যবসায়, পরার্থপরতা, সেবাপরিচর্য্যা প্রভৃতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাহার সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, মানুষ অতীতের সেই উৎস হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ধন্য হয়, জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকে; পরন্তু অতীতের অক্ষয় ভাণ্ডারের সেই অমূল্য সঞ্চয়ের উপর আপনার দান ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। এইরূপে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে চিন্তা-ধারার অবিচ্ছিন্নতা সংরক্ষিত থাকে। আমাদের সংস্কৃত ভাষাকেও কেহ কেহ মৃতের পর্য্যায়ে ফেলিয়া থাকেন। সত্য বটে, সংস্কৃত এখন দেশের সর্ব্বত্র কথিত ভাষারূপে গৃহীত হয় না; কিন্তু সে হিসাবে সংস্কৃত হইতে উদ্গত দেশীয় লিখিত ভাষাসমূহও ত কথিত ভাষারূপে গৃহীত হয় না। তবে কি কথিত ভাষাই কেবল জীবন্ত? আধুনিক অসংখ্য লিখিত দেশীয় ভাষাসমূহের মত সংস্কৃত বহু জনের মধ্যে প্রসারিত না হইলেও দেশীয় ভাষাসমূহ কোথা হইতে তাহাদের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে? দেশীয় ভাষা মাত্রেই সংস্কৃতের ভাবসমূহে পুষ্ট, গৌরবান্বিত। সে হিসাবে সংস্কৃত মৃত ভাষা কিরূপে বলা যাইতে পারে? বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভারবি, বাণভট্ট প্রমুখ সংস্কৃত সাহিত্যের দিক্‌পালগণের অমর রসভাণ্ডার হইতে মধু আহরণ করেন নাই, দেশীয় ভাষার সাহিত্যরথিগণের মধ্যে এমন কয় জন আছেন? আধুনিক বাঙ্গালার তরুণ সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকের পক্ষে বাঙ্গালার অতুল সম্পদ বৈষ্ণব-সাহিত্য মৃত, এ কথা বলিলে বোধ হয় আমি বিশেষ অপরাধে অপরাধী হইব না। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালার কবিসম্রাট্ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের সকাশে কত মতে ঋণী! সুতরাং যে ভাষার প্রাণ—রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের প্রভাব দ্বারা—সত্য, শিব ও সুন্দরের মধ্য দিয়া আত্মজ ভাষাসমূহকে পুষ্ট, পরিণত ও ভাবসম্পদে গৌরবান্বিত করে, সে ভাষাকে মৃত বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সাহিত্যের একটা প্রধান কাযই হচ্ছে এক শতাব্দীকে অন্য শতাব্দীতে রওনা ক'রে দেওয়া। কালিদাসের কাল দূর তারার আলোর মতো অতীত যুগ থেকে নিঃসৃত হয়ে বর্ত্তমান কালে এসে পৌঁচচ্চে। একটুখানি বাধা আছে, সংস্কৃত ভাষার দুরবীণ দিয়ে দেখতে হয়। এই বাধা কোনো কালে ঘুচবে না। সে কালের সমস্ত রস ও রূপ নিয়ে তাকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে হ'লে দৃষ্টিকে সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই নিবিষ্ট করতে হবে।" হইতে পারে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ঘটনার সংস্পর্শে সেই সকল ভাষা এক এক যুগে নূতন অভিনব ভাবসম্পদ দ্বারা অধিকতর পুষ্টি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রথম ঋণ ত অপরিশোধ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, ভাব ভাষা, চিন্তাধারা প্রভৃতি সকল বিষয়ে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে ঋণী, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্রই সেই যুগের পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সৌরমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী যে কয় জন ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক গ্রহনক্ষত্ররূপে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে রূপ, রস ও ভাবসম্পদ দিয়া সাজাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখরই অগ্রণী।

বঙ্কিম-সাহিত্য

যে দেশ সাহিত্য-সৌষ্ঠবে যত সম্পন্ন, সেই পরিমাণে সেই দেশ উন্নত ও সভ্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আফ্রিকার

---

* কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মেলনে, দশম বার্ষিক অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত।

জুলু বা হটেনটটের, অথবা প্যাপুয়া নিউগিনির নরমাংসভুক্ আদিম অধিবাসীর সাহিত্য-সম্পদ নাই বলিয়া তাহারা অনুন্নত অসভ্য। পক্ষান্তরে, যাহারা অসভ্য অনুন্নত, তাহারা প্রকৃতির সন্তান, স্বাবলম্বী; যাহারা সভ্য ও উন্নত, তাহারা কৃত্রিমতার আশ্রয়াবলম্বী, পরমুখাপেক্ষী। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিশারদ Marshall বলিয়াছেন,—"The wants of uncivilised man are nearly the same as those of animals. Every step in our progres increases the variety of our wants." সত্য কথা। মুসলমান শাসনের অবসানে এ-দেশ এক সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার সম্মুখবর্ত্তী হইল, সে আলোকে প্রথমে দেশের দৃষ্টি ঝলসিয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সেই যুগের প্রতীচ্য খৃষ্টান শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, তখনকার বাঙ্গালী তরুণরা লোক দেখাইয়া অতীতের ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়াস পাইত, বিজাতীয় বিদেশীয় ভাষা ও ভাবের প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া অনুকরণপ্রিয় খিচুড়ী জাতিতে পরিণত হইবার ভাণ করিত। কলেজ ষ্ট্রীটের শিক-কাবাবের দোকানে তাহারা প্রকাশ্যে অখাদ্য ভোজন করিয়া সগর্ব্বে ডিরোজিওর শিষ্যত্ব গ্রহণের পরিচয় প্রদান করিত। তখন বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আধা-খৃষ্টান আধা-ইংরাজ বলিয়া আখ্যা লাভ করিয়াছিল। যে কয় জন বাঙ্গালী মনীষী সে সময়ে বিজাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও দেশজননীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভাষা ও ভাবকে দেশের পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে আবার আপনার ঘরের দিকে ফিরাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমের পূর্ব্বে চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রামরাম, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, কীর্ত্তিবাস প্রমুখ বাঙ্গালী কবিশ্রেষ্ঠগণ পদ্যসাহিত্যে সংস্কৃত, মৈথিলী, হিন্দী, ফার্সীর প্রভাব অতিক্রম করিয়া খাঁটি বাঙ্গালার স্থান করিয়া দিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। বাঙ্গালী কবিকুলশ্রেষ্ঠ চণ্ডিদাস যখন গাহিলেন,—"বঁধু কি আর বলিব তোরে,

অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া রহিতে দিলি না ঘরে।"

তখন তাঁহার সেই সুর বাঙ্গালীর কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছিল। সে সুর, সে ভাষা বাঙ্গালীর নিজস্ব।

কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকে রূপ ও রসে, ভাবসম্পদ ও বিন্যাসপদ্ধতিতে অপরূপ করিয়া গড়িয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যে কয় জন বাঙ্গালা সাহিত্যিকের রচনাসম্ভারে তাঁহার 'বঙ্গদর্শনের' অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহারাও তাঁহার প্রভাবান্বিত হইয়া সংস্কৃত, ফার্সী ও মৈথিলীর আড়ষ্ট ভাব হইতে বাঙ্গালা গদ্যকে মুক্ত করিয়া স্বচ্ছন্দগতিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের অব্যবহিত পূর্ব্বে মাইকেল মধুসূদন বিজাতীয় আদর্শে অভিভূত হইয়া প্রথমে বিজাতীয় ভাষায় রচনার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। Captive Lady তাহার ফল। মাইকেলের অমর কাব্যেও বিজাতীয় ভাব ও কল্পনার ছায়াস্পর্শ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে বিজাতীয় ভাষায় রচনার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কালের প্রভাব অতিক্রম করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণত্ব ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে যুগধর্ম্মকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং এক অভিনব যুগপ্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। Carlyle তাঁহার Hero Worship এবং Emerson তাঁহার Representative Men গ্রন্থে একাধিক যুগ-মানবের চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। Emerson তাঁহাদিগকে First men অর্থাৎ যুগ-মানব বা শ্রেষ্ঠ-মানব আখ্যা দিয়াছেন। এই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রও First menদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকে নূতন আকৃতি-প্রকৃতি প্রদান করিয়া আপনার মত করিয়া সাজাইয়াছেন। সেই ভাষা এবং সেই ভাষাকে অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাই বঙ্কিম-সাহিত্য।

কেবল ভাষার দিক্ দিয়া নহে, ভাবসম্পদের দিক্ দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পথিপ্রদর্শক। তিনি যেমন ব্যাস, বাল্মীকি, কবিশিরোমণি কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, চণ্ডিদাস হইতে ভাবসম্পদের কুসুমনিচয় অবচয়ন করিয়া আপনার সাহিত্যকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, তেমনই আবার প্রতীচ্যের সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞানগবেষণাপ্রসূত রচনাসম্ভার হইতে বহু রত্ন আহরণ করিয়াছেন। কিন্তু হংস যেমন নীর পরিবর্জ্জন করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনই যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দেশের সনাতন ভাবধারার অনুযায়ী না হইলে গ্রহণ করেন নাই। স্বল্পধী অনুকরণপ্রিয়ের মত যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই বমন করিয়া দেন নাই; তাঁহার নিকটে যাহা দুষ্পাচ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই হেতু তিনি অজীর্ণরোগগ্রস্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে অমেধ্য অনুকরণ দ্বারা পুষ্ট করেন নাই।

দেশপ্রেম ও জাতীয়তার উদ্বোধনে বঙ্কিমের দান

অতীতের পুণ্যস্মৃতিকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে—বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সামঞ্জস্যবিধান না করিলে—ভবিষ্যতের ক্রমোন্নতির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত না করিলে যে কোনও জাতি জাতি-হিসাবে বাঁচিতে পারে না, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রও যে বুঝিতেন না, তাহা নহে। তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে বর্ত্তমানের সহিত সামঞ্জস্যবিধানের প্রবল প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। কাল তাহার কার্য্য করিয়া যাইতেছে, কালের বিধানে কত ভাঙ্গন-গঠন হইতেছে, কাল যুগে যুগে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছে। কিন্তু যাহা নিত্য, শাশ্বত, সনাতন, যাহা সত্য শিব সুন্দর,—তাহা কালজয়ী, তাহার বিনাশ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র—গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাই এ দেশের নিত্য সত্য সুন্দর সনাতন ভাবধারা হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই, সেই ভাবধারার অনুযায়ী করিয়াই তিনি তাঁহার সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। বিশ্বপ্রেম, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব,—এ সকলই বড় কথা, খুবই উচ্চাদর্শের পরিচায়ক। কিন্তু জগতের সমস্ত শক্তিশালী জীবন্ত স্বাধীন জাতি এ আদর্শ কল্পনায় ধারণ করিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে বসুধৈব কুটুম্বকম্ নীতি অনুসরণ করে না, তাহাদের নিকট Charity begins at home অথবা Blood is thicker than water নীতিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত।

যখন দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারামে' হিন্দুর কণ্ঠে বিপন্ন হিন্দুর জন্য রব উত্থিত হইতেছে,—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে," তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণের উৎস খুঁজিয়া পাই, তাঁহার হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষার ব্যথা-বেদনা বুঝিতে পারি। সাধক কমলাকান্তের মত তাঁহার অতুলনীয় মানসপুত্র কমলাকান্ত যখন কৈ মা ; কোথায় মা! কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি! বলিয়া আকুল অন্তরে অন্ধকার কালসমুদ্রে দেশ-জননীকে আতাড়িপাতাড়ি করিয়া খুঁজিয়াছিল, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের অন্তস্তলে কোন্ কামনা অহর্নিশ জাগরূক থাকিত, তাহা জানিতে বা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর লাঠির পূজা করিয়া গিয়াছেন, আজ বাঙ্গালীর হাতের লাঠি সৌখীন বাবুর ছড়িতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া দুঃখক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। তাঁহার সত্যানন্দ-জীবানন্দ আনন্দমঠে যে আনন্দময়ী মূর্ত্তির কল্পনা প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিয়াছিলেন, যাঁহার কথা কহিতে কাহিতে, যাঁহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, যাঁহার বন্দনা-গান গাহিতে গাহিতে এই ত্যাগী কর্ম্মী সন্ন্যাসীদের নয়নে প্রেমভক্তির মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইত, সেই তাঁহার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি—বঙ্কিমচন্দ্র মনে প্রাণে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাঁহার মানসপটে মায়ের মূর্ত্তি সত্যই মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিত। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষির মত ভবিষ্যদর্শী—তাঁহার জগদ্বরেণ্য 'বন্দে মাতরম্' গান ৩০ বৎসর পরে বাঙ্গালার অগ্নিযুগে বাঙ্গালার তরুণের মুখে জলদমন্দ্রে ধ্বনিত হইয়াছিল, বাঙ্গালী জাতি—কেবল বাঙ্গালী কেন, মুক্তিকামী ভারতবাসিমাত্রেই সেই অমর জাতীয় সঙ্গীতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রই এই ভবিষ্যবাণী করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুগপুরুষের সেই বাণী বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছে,—ফরাসীর 'লামার্শেল' সঙ্গীতে ফরাসী জাতির মনে যে উন্মাদনা আনয়ন করে, 'বন্দে মাতরম্' তাহারও অপেক্ষা আরও উন্মাদক, আরও প্রাণোন্মাদকর, তাহার তুলনা জগতে নাই। It's a long long way to Tipperary, God save the King, অথবা Under the star-spangled banner এরও এ উন্মাদনাশক্তি আছে কি না সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা সাহিত্যে এ দানের তুলনা নাই। বাঙ্গালা ভাষাকে তিনি ইহা দ্বারা প্রাণবন্ত, শক্তিসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালী প্রতাপ ও রাজপুত রাজসিংহের কল্পনাও ইহা দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহার নারী-চরিত্রেও এই দেশাত্মবোধ পরিস্ফুট। তাঁহার প্রফুল্ল, তাঁহার শান্তি, তাঁহার শ্রী, তাঁহার চঞ্চলকুমারী মহীয়সী আর্য্য মহিলা। প্রফুল্ল পুরুষোচিত ব্যায়ামে শক্তিমতী হইয়াছিল, ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিল। শান্তি ও প্রফুল্লও এই পথের পথিক। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে এই নারী দান করিয়া গিয়াছেন। মিহি আওয়াজ, মিহি হাবভাব, মিহি অশন, মিহি ভূষণ, মিহি প্রসাধন, মিহি গান, মিহি চিন্তা,—এ সবই পৌরুষের বিরাট অন্তরায়, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র

মনেপ্রাণে জানিতেন। তাই তাঁহার সাহিত্যের ভাবধারা বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে, পৌরুষ সঞ্চয় করিতে শিখাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ঋণ অপরিশোধ্য।

বঙ্কিম-সাহিত্যের ভাষা

অধুনা লিখিত বনাম কথিত ভাষা লইয়া খুবই একটা তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে। যেহেতু, রবীন্দ্রনাথ আদ্য ও মধ্য সাহিত্য-জীবনের লিখিত ভাষা বর্জ্জন করিয়া কথিত ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু প্রমথনাথ সবুজপত্রী ভাষা ব্যবহার করেন, সেই হেতু এই ভাষাই বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য; পরন্তু 'বঙ্কিমী ভাষা' 'সেকেলে' ও সংস্কৃতপরিমার্জ্জিত বলিয়া বর্জ্জনীয়,—এই ভাবের কথা প্রায়ই শুনা যায়। যে সকল অনুকরণপ্রিয় আধুনিক লেখক এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বা প্রমথনাথের কয়খানি রচনা ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। 'সাধনা' যুগের রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতুলনীয় ভাষা পরিহার করিয়া আধুনিক 'চলতি' ভাষার দ্বারস্থ হইয়াছেন, এ কথা সত্য; কিন্তু তাঁহার গভীর চিন্তা ও ভাবসম্পদে সে ভাষা গৌরবান্বিত হয় বলিয়া তাহার দৈন্য সহজে ধরা পড়ে না। প্রমথনাথের বাক্যের ক্রিয়া-পদ বর্জ্জন করিবার পর যাহা পাওয়া যায়, তাহা কোনও কালে 'চলতি' ভাষার পর্য্যায়ভুক্ত হইবার উপযুক্ত হইবে কি?

এই শ্রেণীর লেখকদের মুখে একটা কথা প্রায়ই শুনা যায় Nature. অর্থাৎ মানুষ স্বাভাবিক যে ভাষায় কথা কহে, যে ভাবে চিন্তা করে, যে ভাবে চলা-ফিরা করে, তাহাই ভাব ও সাহিত্যের বাহন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সভ্যতা—শিক্ষাদীক্ষা—ভাবধারা বলিয়াও একটা কথা আছে। মোট কথায় সভ্যতার অপর নাম প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, Civilisation is the negation of nature, অভাব-অভিযোগের আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি।

ভাষার পক্ষে এই কথা প্রযোজ্য। মানুষের আটপৌরে ভাষা এক, আর পোষাকী ভাষা অন্যরূপ। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে আপনার জনের নিকটে থাকে, তখন মাত্র লজ্জা-নিবারণের অনুরূপ বেশপ্রসাধন করে, কিন্তু বাহিরে সভ্য-সমাজের নিকট যাইতে হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গের প্রসাধন করিয়া যাইতে হয়। তেমনই মানুষ যখন ঘরোয়া কথা কহে, তখন তাহার আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করিলেই চলে।

কিন্তু যখন ঘরের গণ্ডীর বাহিরে বৃহত্তর জগৎকে সম্বোধন করিতে হইবে, তখন আটপৌরে ভাষায় চলিবে না, হয় ত প্রাদেশিকতার দোষে অনেক প্রদেশে সে ভাষা দুর্ব্বোধ্যই হইবে। সে ক্ষেত্রে পোষাকী ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র যে আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করিতে জানিতেন না, তাহা নহে, তাঁহার উপন্যাসসমূহে কথোপকথনের ভাষা কথিত ভাষা। সুতরাং তিনি বৃহত্তর বাঙ্গালাকে সম্বোধন করিবার কালে পোষাকী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্রও করিয়াছেন। বাহিরে যাইবার সময় যেমন অঙ্গের প্রসাধন করিতে হয়, তেমনই বৃহত্তর বাঙ্গালীকে আপনার কথা নিবেদন করিতে হইলে ভাষাকে সাজাইয়া গুছাইয়া পাঠাইতে হয়। সে ভাষা বাঙ্গালা ভাষাভাষিমাত্রেই যেখানে থাকুন, তাঁহাদের পক্ষে সহজে বোধগম্য হইবে এবং সেই ভাষাই সর্ব্বত্র আদর্শরূপে গৃহীত হইবে।

আর এক হিসাবে বঙ্কিমের 'লিখিত ভাষার' স্থান আধুনিক 'কথিত ভাষাকে' অধিকার করিতে দেওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করি না। মিহি সুরে, মিহি ঢঙ্গে ভাষার ব্যবহারের উপযোগী সময় ও ক্ষেত্র আছে। কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালায় সে কাল দেখা দেয় নাই। এখন দেশবাসীর মন মুক্তির আকুল আকাঙ্ক্ষায় আকুলি-বিকুলি করিতেছে, জাতির প্রাণের মধ্যে নটরাজের তাণ্ডব-নর্ত্তন চলিতেছে, সুতরাং মেঘমল্লার রাগের আলাপকালে যেমন মৃদঙ্গের গুরু-গম্ভীর মেঘগর্জ্জনের প্রয়োজন হয়, ঠুংরি-টপ্পার ডুগী-তবলার বাদ্য যেমন তাহাতে বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়, এখনকার মিহি সুরের মিহি ঢঙ্গের মিহি ভাষাও জাতির জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে তেমনই সঙ্গতিশূন্য—প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। একটা নূতন কিছু কর বলিয়াই যে ভাষাকে টেড়া-বাঁকা করিয়া অষ্টাবক্রের আকারে পরিণত করিয়া বাহাদুরী লইতে হইবে, তাহার কি কারণ আছে? বঙ্কিমের ভাষা যখন জরা-জীর্ণতা বা বার্দ্ধক্যের লক্ষণ প্রকাশ করিবে, যখন তাহার ভাবপ্রকাশের আর সামর্থ্য থাকিবে না, তখন সে শিকারীর বৃদ্ধ কুক্কুরের মতই তিরস্কৃত ও পরিত্যক্ত হইবে। সে জন্য অসময়ে তাহাকে যষ্টির সাহায্যে হত্যা করিবার প্রয়োজন কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব-সম্পদের অতুলনীয়তা

কুক্ষণে ফ্রয়েডের সস্তা তর্জ্জমা এ-দেশে আমদানী হইয়াছিল। এখন তাই স্কুলের ছাত্রও যৌনতত্ত্বে পাকাপোক্ত অভিজ্ঞ! নর-নারীর মনে subconscious stateএ যৌনলিপ্সা কিভাবে অবস্থান করে, সে বিষয়ে আমাদের এক শ্রেণীর তরুণ বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছে এবং উহা দ্বারা প্রভাবান্বিত তাহাদের ভাব ও ভাষাসম্বলিত রচনা পরম দুষ্পাচ্য খিচুড়ি কথা-সাহিত্যে পরিণত হইতেছে। জগতের দুর্ভাগ্য এই যে, বিজ্ঞানচর্চ্চায় বর্ত্তমান যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, তেমনই সাহিত্যে তাহার অবনতি ঘটিয়াছে। নতুবা আজ সেক্সপিয়ার মিলটনের দেশে রাডিয়ার্ড কিপলিং কবি? বর্ত্তমানের কালের অনুরূপ

কথা-সাহিত্য এখন স্কট ডিকেন্সকে অন্ধকারে ডুবাইয়া দিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে! জগৎ Romantic স্থলে বহুলপরিমাণে Realistic হইয়াছে বটে, কিন্তু এই Realistic জগতের দান অতীতের দানের তুলনায় কতটুকু? Classic literature বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র যাহা গৃহীত, আধুনিক সাহিত্যের কতটুকু তন্মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য? ইংলণ্ডের এলিজাবেথের যুগ যাহা দান করিয়া গিয়াছে, শৌর্য্যে বীর্য্যে, সাহসিকতায়, একাগ্রতায়, প্রেমে, বিরহে, কাব্যে, সাহিত্যে তাহার তুলনায় বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্য কতটুকু? বর্ত্তমান Continental, American ও English সাহিত্যে নূতনত্ব আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাহা কি Classic বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য?

আধুনিক Realistic Novelএ বর্ত্তমান জগতের নূতন নূতন জীবন সমস্যা আলোচিত বিশ্লেষিত হইতেছে এবং তাহা অবলম্বন করিয়া নর-নারীর চিত্র নানা আকারে নানাভাবে অঙ্কিত হইতেছে। নরনারীর জীবনযাত্রা আধুনিক 'কলের যুগের' এবং জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতার কল্যাণে পূর্ব্বকালের স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা হইতে সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, তাই সমস্যা জটিল ও নানা প্রকৃতির হইয়া উঠিতেছে। প্রতীচ্যে নারীর অন্নসংস্থান সমস্যা যতই জটিল হইয়া উঠিতেছে, নারী ততই স্বাবলম্বিনী ও স্বাধীনা হইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও নারীর বিবাহ ও যৌন-সম্বন্ধেরও বিষম ওলটপালোট হইয়া যাইতেছে। কবি Goldsmith তাঁহার Deserted Villageএ "Trade's unfeeling train"এর দৌরাত্ম্যের নিন্দা করিয়া ধ্বংসোন্মুখ গ্রামের সর্ব্বনাশে আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর কত দিন চলিয়া গেল; সুতরাং তখন তিনি কলকারখানার যে সূত্রপাত দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখন লক্ষগুণে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়াছে। কলকারখানার কল্যাণে কুটীর-শিল্পের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আর সহস্র সহস্র গ্রাম্য নর-নারী উপায়ান্তর না দেখিয়া সহরে গিয়া কলকারখানায় মজুরী অথবা অন্যত্র কেরাণীগিরি করিয়া উদরান্ন সংস্থান করিতেছে। গ্রামের ধ্বংস কত পরিবারকে ছিন্ন ভিন্ন উদ্বাস্তু করিয়া দিয়াছে, ফলে নারীকে স্বাবলম্বী হইতে হইয়াছে। গৃহ ও পরিবারের শান্ত সংযত স্নিগ্ধ প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলে এখন প্রতীচ্যে I a. m. girl, Lonely girl এবং Surplus girlএর উদ্ভব হইয়াছে। পিতামাতা অভিভাবক ক্লাবে, সিনেমা অপেরায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া আসেন, পুত্রকন্যা তাঁহাদের সাহচর্য্য পায় না, কাজেই রাত্রি ১টা ২টায় গৃহে ফিরিবে না কেন? Night club, Nudity club, River picnic, Suburb picnic,—এ সকলে যোগদান করা স্বাভাবিক হইয়া যাইতেছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সংসার, গৃহ, বিবাহ, মাতৃত্ব প্রভৃতির পরিবর্ত্তে যদৃচ্ছা ভ্রমণ শয়ন অশন বসন জীবন-যাপনই যে অবলম্বিত হইবে, Companionate marriage, Platonic love, তরুণ-তরুণীর Friendship, Co-education প্রভৃতির অবাধ প্রচলন হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং প্রতীচ্যের শ্রমিক ও দরিদ্র জীবনের, নারীর জীবনসংগ্রামের যত নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, ততই প্রতীচ্যের কথা-সাহিত্যে নূতন ভাবে নর-নারীর চরিত্র চিত্রিত হইতেছে। আমাদের দেশে যদিও কলের যুগের সমস্যা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে, তথাপি নারীজীবনের সমস্যা তত জটিল হয় নাই। আমাদের একলা ঘরের একলা নারীর সংখ্যা অতি সামান্য, আত্মনির্ভরশীলা স্বাবলম্বিনী নারীর সংখ্যাও অঙ্গুলীর পর্ব্বে গণনা করা যায়। সুতরাং এখনও এ দেশে নারীসমস্যাকে বিশেষ জটিল করিয়া চিত্রিত করিবার যুগ সমুপাগত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ত ছিলই না। সুতরাং যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গালার 'নারীর ব্যথা' বুঝাইতে পারেন নাই বলিয়া অনুযোগ করেন, পরন্তু তাঁহাকে 'তৃতীয় বা চতুর্থ' শ্রেণীতে নামাইয়া দেন, তাঁহারা কি বেচারী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অবিচার করেন না?

আদর্শ কি হওয়া উচিত?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালী জাতি যেমন অশন-বসনে শয়নে ভ্রমণে মিহি হইয়া পড়িতেছে, তেমনই তাহার সাহিত্যও সঙ্গে সঙ্গে মিহি হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু ইহাই কি আদর্শ? নারীর ব্যথা ফুটাইতে হইলেই কি পুরুষকে কাপুরুষ করিয়া চিত্রিত করিতে হইবে? নারীর "সমান অধিকার" বিশ্লেষণের জন্য কি নারীকে অনুক্ষণ পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু অথবা পুরুষের ঈর্ষাকারিণীরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে? রামায়ণের সীতা বনগমনকালে পতির অনুমতি না পাইয়া বলিয়াছিলেন,—আমার পিতা কি না জানিয়া এক কাপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন? যেহেতু সে আমাকে বনে সহগমনে অনুমতি দিতে সাহসী হইতেছে না? বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর, বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী নারীর অধিকারের জন্য, নারী স্বাধীনতার জন্য কম যুদ্ধ করে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া বাল্মীকি বা বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও তাঁহাদের নারীকে এ দেশের আদর্শ হইতে বিচ্যুত করেন নাই।

সভ্যতার মাপকাঠি সকল দেশে সকল সমাজে সমান নহে। কেতাবের তাড়া বগলে করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে না ছুটিলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, ইহাও বলা যায় না। জগতের নানা দেশের নানা জাতির নানা প্রকার বিভিন্ন সভ্যতা আছে। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার মাপকাঠিতে নর-নারীর বিবাহ-বন্ধনের মূল এইরূপ ছিল:—

(১) দেবদেবীর পূজা-পার্ব্বণ চালাইবার জন্ম পত্নীর প্রয়োজন।

(২) রাজ্যের ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য। পত্নীর গর্ভে বংশধরের উৎপত্তিসাধন করিয়া জাতির স্থায়িত্ব-সাধন।

(৩) নিজের বংশরক্ষা। বংশধররা পিতৃপুরুষের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবে, এই উদ্দেশ্যে পত্নীগ্রহণ।

কতকটা আমাদের পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র-পিণ্ড-প্রয়োজনেরই মত নহে কি? বর্ত্তমানে প্রতীচ্যে বিবাহের বন্ধন উঠিয়া যাইতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে Companionate marriage ও পুত্রোৎপাদনের পরিবর্ত্তে contraceptive উপায় অবলম্বিত হইতেছে। আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতাভিমানী। তবে কি গ্রীক, রোমান বা হিন্দুদের এ সব ধারণা নাই বলিয়া তাহারা অসভ্য? সে বিচার করে কে? জগতের সকল দেশে সকল সমাজে নারীর শিক্ষা ও কার্য্যক্ষমতা এবং স্থান নিক্তির ওজনে সমান হইতে পারে না। দেশের জলবায়ু, আকৃতি-প্রকৃতি, সুবিধা-অসুবিধা ও আবহাওয়ার অনুপাতে সভ্যতার মান নির্ণীত হয়। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, সেখানে মানুষ অনাবৃত গাত্রে থাকিলেই অসভ্যতা। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ, এখানে অনাবৃত গাত্র অসভ্যতার পরিচায়ক নহে, বরং এখানে 'উলঙ্গ ফকীরের' চরণরেণুতে মুকুট-ধারীর মুকুট রঞ্জিত হইয়া থাকে। হিমালয়ের শীতে শ্বেতাঙ্গ পাহাড়িয়ারা আবৃতগাত্র হইয়া থাকে। কাশী কাঞ্চীতে গ্রীষ্ম, সেখানকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা কৃষ্ণাঙ্গ এবং অনাবৃতগাত্র। তাই বলিয়া কি পাহাড়িয়ারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অপেক্ষা সভ্য? ব্রহ্মের নারীরা কর্ম্মক্ষম, তাহারা পূর্ণ স্বাধীন। এক য়ুরোপীয় ভূপর্য্যটক লিখিয়াছেন,

"There is probably no country in the world where married women are given so much freedom as in Burmah."

সত্য কথা। তাহা ছাড়া ব্রহ্মবাসিনীরা কার্য্য করে, পুরুষরা অলস (Drones) হইয়া বসিয়া থাকে, নারীর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে। পরন্তু ব্রহ্মবাসিনীদের বিবাহে ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শের বন্ধন নাই, সম্পত্তিতে তাহাদের মালিকানি স্বত্ব আছে। তবেই কি তাহারা জগতের সকল নারী অপেক্ষা সভ্যা? নম্বুদরী ব্রাহ্মণকন্যা অনাবৃতবক্ষা, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা অসভ্যা?

Sir Walter Scottএর যুগে বৃটেনে নারী a ministering angel thou ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি fit companion অর্থাৎ পুরুষ ও নারীতে give and take লেন-দেনের ভাবই বিদ্যমান, তুমি যেমন ব্যবহার করিবে, আমিও তেমনই করিব। বহু প্রাচীন যুগে হিন্দুর বিবাহের বেদোক্ত মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়:—

(১) হে বধু! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক।

(২) হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অবধারণ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর! তুমি এক-মনা হইয়া আমার বাক্যের সেবা কর।

(৩) অন্নরূপ পাশ এবং মণিতুল্য প্রাণসূত্রের দ্বারা ও তথা সত্যরূপ গ্রন্থি দ্বারা হে বধু! তোমার মন ও হৃদয়কে আমি বন্ধন করিতেছি।

(৪) হে সপ্তপদগমনকারিণী কন্যে! তুমি আমার সহচারিণী হইলে। আমি তোমার সখ্য প্রাপ্ত হইলাম।

এখন দেখুন দেখি, "সেবা কর" ও "বন্ধন" এই দুইটি কথা বাদ দিলে একবারে পুরাপুরি প্রতীচ্যের fit companion পাওয়া যায় কি না? কিন্তু 'সেবা' ও 'বন্ধন' কথা দুইটির মধ্যে প্রাচ্যের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য নিহিত রহিয়াছে।

সমাজে নর-নারী বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিয়া থাকে, না মানিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও অভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিধি-নিষেধের বন্ধনও দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। মানুষের স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী স্বাধীনতা-প্রিয় প্রকৃতি অভ্যাস ও সংযমের অনুবর্ত্তী হইয়া নিয়মানুগ পথে বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়া চলিয়া থাকে, কিন্তু মনোবৃত্তির সম্যক্ স্ফুরণে বাধা-প্রাপ্ত হইলে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিতে চাহে। উহাই সমাজের বিপক্ষে বিদ্রোহ। অধুনা শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের এক শ্রেণীর তরুণ সনাতন বিধি-নিষেধের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। এই বিদ্রোহ কার্য্যে পরিস্ফুট না হইলেও কথায় ও মনোভাবে বিলক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিদ্রোহী তরুণ-তরুণীরা বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া প্রতীচ্যের অনুকরণে স্বেচ্ছাবিবাহ বা Companionate বিবাহ অথবা বিবাহশূন্য platonic love (তাহাও নির্লজ্জভাবে আত্মীয় পর বিচার না করিয়া) সাহিত্যে স্থান দিয়া দুধের অভাব ঘোলে মিটাইতেছেন, আবার Co-educationএর জন্য মহা পীড়াপীড়ি করিতেছেন। কিন্তু যে মার্কিণ দেশ Companionate marriage ও Co-educationএর লীলাভূমি, সেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা একটু শুনুন। মার্কিণ দেশের এক আধুনিক গ্রন্থে Co-educationএর এইরূপ বর্ণনা আছে:—

"The school-girl and the school boy at co-educational institutions, thrown together in an atmosphere of vice, drug and cock-tail, indulge in the dissipations that have become now recognised as part of school life."

"In the Carolina Magazine:—The results of a questionaire answered by the students revealed some startling facts. The average man had affairs with six girls. 87.7 of the girls were necked and about 60 p.c. were necked at also proved that the same girl went round to several men and was necked by a number of them."

এ বীভৎস চিত্র আর দিতে ইচ্ছা করে না। বিলাতের অবস্থা কিছু কম-বেশী। সেখানকার Companionate marriageএর প্রবৃত্তির কথা একটু শুনুন :—

At a meeting (10th March, 1931) of the undergraduates of both sexes at Oxford a number of speakers demanded reform of marriages upon the lines of those in Russia. One young woman startled her hearers by saying from the women's point of view companionate marriage in the University should not only be tolerated but encouraged. It would be far better than living in lonely flats as at present."

যে শিক্ষায় নর-নারীর মনোবৃত্তি এইরূপ হইতে পারে, তাহাই কি বিদ্যা, না শিক্ষা? কালেজে বিদ্যার্জ্জনই শিক্ষা নহে, ইহা ভুলিলে চলিবে কেন? কথা হইতেছে, নারী-জীবনের সার্থকতা যেখানে, সেখানকার উপযোগী শিক্ষাই নারীর প্রকৃত শিক্ষা। জাতির মধ্যে দুই দশটা লেডী টাইপিষ্ট, নারী উকীল, নারী ডাক্তার বা নারী কাউন্সিলার হইলেই দেশ নারীশিক্ষা-প্রসারের ফলে Lord Lyttonএর মতানুসারে 'সভ্য' হইতে পারে, কিন্তু সকল জাতির মতানুসারে নহে, বিশেষতঃ আমাদের ত নহেই। আমাদের ভাবধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাত্মা গান্ধীর মত সমাজসংস্কারক খুব কমই আছেন। অথচ তিনিই বলিয়াছেন,—

"I cannot for instance imagine a home to be really happy home in which wife is a typist and scarcely ever in it."

মাতৃত্বেই নারীত্বের সার্থকতা ও চরমবিকাশ, ইহা আমাদের দেশের সনাতন ভাবধারার অনুযায়ী চিন্তা। নারী শিক্ষিতাই হউন বা অশিক্ষিতাই হউন, এ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। পাইলে ঘর-সংসার (Home) থাকে না, hotel-জীবনই মানুষের গতি হয়। প্রতীচ্যই বলিয়াছে,—Woman is not only the help-mate of man she is the Mother.

সুতরাং প্রতীচ্যের সামাজিক বিদ্রোহের অনুকরণই যে জাতির সাহিত্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিলে সাহিত্যের নূতন 'চেহারা' দেওয়া হয়, গতানুগতিক একঘেয়ে প্রাচীন পূতিগন্ধময় পন্থা পরিহার করিয়া নূতন পন্থার সন্ধান দেওয়া হয়, ভাষা ও ভাবকে অভিনব সম্পদে সম্পন্ন করা হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। বর্গ্যসঁ বলিয়াছেন,—"সদা পরিবর্ত্তনশীলতা সজীবতার লক্ষণ।" অতএব অমনই মানিয়া লইতে হইবে যে, অতীত যাহা কিছু সবই বর্জ্জনীয়। বর্গ্যসঁর দেশের পক্ষে যাহা প্রেয় ও শ্রেয় বলিয়া মনে হইবে, আমাদেরও তাহার সহিত 'তাল' রাখিয়া চলিতে হইবে, সাহিত্যের চরিত্রচিত্রাঙ্কনের মধ্যেও তাহা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, এমন কিছু মাথার দিব্য দেওয়া নাই। যে যাহার মনের মত কথা শুনিলে গুরুজন বা আচার্য্যদের না মানিয়া তাহাই গ্রহণ করিব, স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে আত্মসুখ ও ইন্দ্রিয়লিপ্সা চরিতার্থ করিব, ইহাই যদি কালধর্ম্ম বলিয়া প্রতীচ্যে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অমনই যে তাহা এ দেশেও কালধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে, তাহারই বা অর্থ কি? বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এই শ্রেণীর উদ্ভট 'কালধর্ম্মও' দেখা দেয় নাই, এমন ধিক্কারজনক সাহিত্যের সৃষ্টিও প্রতীচ্যে হয় নাই। সুতরাং তিনি যদি উহার সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া দেশের ভাবধারার সহিত বিদেশের সুচিন্তার সামঞ্জস্যবিধান করিয়া যুগ-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়া থাকেন, তবে তিনি 'তৃতীয়' শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিবেন কেন? বিখ্যাত ফরাসী লেখক Anatole France বলিয়াছেন,—"বরং একখানি সদ্‌গ্রন্থ পাঠাগারে থাকা ভাল, তথাপি পাঠাগারের কলেবর-বৃদ্ধির জন্য এক শত অসদ্‌গ্রন্থ আহরণ করা কর্ত্তব্য নহে।" "Art for art's sake"এর ছুতা ধরিয়া বাণীর পবিত্র মন্দির যাঁহারা অমেধ্য উপচারে ভরাইয়া দিতেছেন, তাঁহাদেরই মুখে বঙ্কিমের গ্লানি শুনা যায়, এ কথা বলিলে বোধ হয় কোন অপরাধে অপরাধী হইতে হয় না।

মনস্তত্ত্ব—চরিত্র-বিশ্লেষণ

বঙ্কিমচন্দ্রের বিপক্ষে অধুনা আর এক অভিযোগ শুনা যায় যে, তিনি না কি Psychologyতে—মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে একবারে Fourth rate, কাঁচা! পরন্তু নারী-চরিত্র-বিশ্লেষণে তিনি না কি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্রাটের সিংহাসন পাইবার যোগ্য নহেন। এত বড় দর্প, স্পর্দ্ধা ও আত্মম্ভরিতার কথা তাঁহাদেরই মুখে শুনা যায়, যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসই পাঠ করেন নাই, অথবা যাঁহাদের পাঠ করিবার পরেও তাহাতে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য হয় নাই। অষ্টমবর্ষীয় বালক পুত্রের অঙ্গস্পর্শের ফলে তাহার গর্ভধারিণীর অঙ্গে 'শিহরণ' আনয়ন করা, শিক্ষিতা বাঙ্গালী বিবাহিতা তরুণীর প্রবাসে সাঁওতাল যুবকের অঙ্গলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া ভুজযুগে তাহাকে বাঁধিবার জন্য টানাটানি করা, পত্নীর অনুপস্থিতিতে বিধবা আত্মীয়া পাচিকাকে টানিয়া অন্ধকার কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করা,—যদি আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও চরিত্র-বিশ্লেষণের নমুনা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী সাহিত্য-রসপিপাসু নিশ্চয়ই বলিবে,—চাহি না আমরা প্যারিয়ান মার্ব্বেলের আমদানী করা কোঠা-বালাখানা, আমাদের শ্যামল পল্লীর খড়ের চণ্ডীমণ্ডপই ভাল!

শাস্ত্রমগ্ন বয়স্ক পণ্ডিতের সুন্দরী যুবতী পত্নী শৈবলিনীর ঘৃণ্য অস্পৃশ্য ফিরিঙ্গীর সহিত কেবল প্রেমাস্পদের সঙ্গলাভের আশায় গৃহত্যাগ, প্রণয়ীর প্রত্যাখ্যানে দলিতা ভুজঙ্গীর ন্যায় ঊর্দ্ধফণ হইয়া বলা,—"কেন তুমি তোমার অতুল রূপ নিয়ে আমার প্রথম যৌবনের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলে?" যখন স্বামী কি বুঝিতে পারিয়াছিল, তখন এই শৈবলিনীর মুখেই শুনিয়াছি,—"এই যে চন্দনচর্চ্চিত ললাট বিশালবক্ষ সাগরের ন্যায় স্থিরগম্ভীর স্বামী, এর কাছে প্রতাপ! ছিঃ!" এই মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয়, এই যে হৃদয়ের অন্তস্তলের ঘাত-প্রতিঘাত, এই যে স্তরের পর স্তরবিন্যাস, চরিত্রের ক্রমবিকাশ—ইহার তুলনা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? নবাবের প্রাসাদ হইতে চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, পথে ঘরের কথা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা যুবতী পত্নীর কথা মনে পড়িল,—যদি শৈবলিনীর রোগ হইয়া থাকে? হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইবার উপক্রম করিল, ব্রাহ্মণের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। চন্দ্রশেখর দ্রুত অগ্রসর হইলেন। কি সুন্দর চিত্র! মনের সহিত দেহের এই খেলার বাঁধন, কত বড় মনস্তত্ত্ববিদের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ফল, তাহা কাব্যরসামোদিমাত্রেই বুঝিবেন। Lear যখন কন্যার অকৃতজ্ঞতার ফলে পাগল হইবার প্রথম লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন বলিয়াছিল, "Pray, undo this button, Kent!" সাতগজী রচনাসম্ভারে গ্রন্থকে পীড়িত করিতে হয় নাই, এই একটিমাত্র কথাতেই —Learএর প্রাণ কিভাবে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা মহাকবি এই একটিমাত্র কথাতেই দেখাইয়াছেন। চন্দ্রশেখরেরও এই একমাত্র কথায় তাঁহার গভীর অতলস্পর্শ প্রেমের অভিব্যক্তি যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রেই তাহা সম্ভবে। এমনইভাবে Othello মিথ্যাবাদী নিন্দুক Iagoর মুখে Desdemonaর বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, "Oh! Oh!" এই একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু ইহার মধ্যে জগতের কত বুকভরা বেদনাই না লুক্কায়িত ছিল! শুভ্র সরল কুন্দের বুকভরা আকুল আকাঙ্ক্ষা মরণযাত্রার পথে মাত্র একটি ব্যথাকাতর কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সাত বৎসর পরে পাপিষ্ঠ গোবিন্দলাল যখন নিঃশব্দে মরণের কোলে শায়িত ভ্রমরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, সাত বৎসর পরে যখন ভ্রমর গবাক্ষ উন্মোচন করিতে বলিয়া চাঁদের আলো আর ফুলের বাতাস ঘরে আনয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া সেই একটি মিলনের দিনের প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে গোবিন্দলালের পায়ের ধূলিকণা মাথায় ধারণ করিয়াছিল, তখনও তাহার মধ্যে সাতকাণ্ড রামায়ণের গভীর শোকোচ্ছ্বাস লুক্কায়িত ছিল। যুগপুরুষ সাহিত্য-সম্রাটের এই suggestive চরিত্রের বিশ্লেষণ জগতে অতুল্য। বিক্ষিপ্তচিত্ত রুক্ষ শুষ্ক নগেন্দ্র দত্ত যখন ভগিনীপতির সাক্ষাতে প্রাণসমা পত্নীর গুণব্যাখ্যার প্রয়াস পাইয়াও নিঃশব্দে আপনার কণ্ঠরোধ করিতে উদ্যত হয়, তখন পাঠকের মনে ভাবসাগরের যে গভীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয়, তাহাতে মনস্তত্ত্বের যে অভূতপূর্ব্ব অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব বিশ্লেষণ হয়, তাহার তুলনা আধুনিক কথা-সাহিত্যে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আবাল্য সমাজ ও লোকালয় হইতে গভীর বনের মধ্যে ভীষণ কাপালিকের নিকটে পালিতা কপালকুণ্ডলার চরিত্র-অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র যে গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা জগতের সাহিত্যে দুর্ল্লভ। মহাকবি কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় যে উদ্যানলতার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, বা মহাকবি সেক্সপিয়ার তাঁহার Mirandaয় যে স্বভাবপালিতা কন্যার চরিত্রচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহারাও এক দিন সংসারের বক্ষে সমাজের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বনের দেবী কপালকুণ্ডলা সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে পুষ্টি ও প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, exotic plantএর মত অকালে শুকাইয়া গিয়াছিল। এই অসামান্য চরিত্রের ক্রমবিকাশে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ দেখিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অন্তর পুলকিত হয়, অভাগিনী কপালকুণ্ডলার ব্যথাভরা জীবনের কথায় অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠে, নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। যে কথা-সাহিত্যের প্রভাব স্থায়ী হয়, যাহা একবার পাঠ করিয়া তৃপ্তি হয় না, যাহা বারবার পাঠ করিয়াও কখনও পুরাতন হয় না, তাহা যদি মানুষের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে সাফল্যমণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে কোন্ শ্রেণীর রচনা হইবে, জানি না।

সত্য বটে, আধুনিক জগতের পারিপার্শ্বিক ঘটনা-সমূহের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া আমাদের বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যে যে সকল নারী-চরিত্র গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে অধিকারের সাম্য, অভিমানাহত আত্মসম্মানের অভিব্যঞ্জনা, সমাজের বেত্রদণ্ডে বেদনাকাতর নারী-হৃদয়ের ব্যথার চীৎকার প্রস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যদ্দর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনীতে, রোহিণীতে অথবা হীরা দাসীতে তাহার বীজ প্রথম উপ্ত হয় নাই কি? বঙ্কিমচন্দ্রের নারী-চরিত্রেই প্রথম নারী-বিদ্রোহ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শৈবলিনী-চরিত্রকে আদর্শ করিয়া তাহারই অনুকরণে আধুনিক কথা-সাহিত্যে কত নারীচরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন নারী-চরিত্রে বেদনা-কাতর সমাজদ্রোহী নারীচরিত্রের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোথাও আমাদের আদর্শ ভাবধারা হইতে বিচ্যুত হন নাই। তিনি precipiceএর ভয়াবহ তটপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু কোথাও সংযমের বাঁধ অতিক্রম করেন নাই, আধুনিক কথা-সাহিত্য হইতে তাঁহার ইহাই বৈশিষ্ট্য। নারী শিক্ষিতা, মার্জ্জিতা, সভ্যতালোকপ্রাপ্তা হইলেও গৃহ যে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র, মাতৃত্বেই যে নারীত্বের চরমবিকাশ

এবং পুরুষের পৌরুষের মত নারীর সতীত্বই যে ধর্ম্ম,—এই সনাতন ভাবধারা হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই।

বঙ্কিম-যুগের Humour ও অলঙ্কার

মানুষের অন্তর গভীর হর্ষ-বিষাদে আলোড়িত করিতে, স্নিগ্ধ গম্ভীর সুষ্ঠু সুন্দর ভাষার অমিয়-প্রবাহে মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে, সত্য, শিব ও সুন্দরের দিকে মানুষকে পথনির্দ্দেশ করিতে বঙ্কিম-সাহিত্য যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনই সরস সুমার্জ্জিত হাস্যরসের অবতারণা করিয়া এই ব্যথাভরা জগতে মানুষের মনে বিমল আনন্দ প্রদান করিতেও সিদ্ধহস্ত। তাঁহার সাহিত্য এ বিষয়েও বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রেরণা দান করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্কিম দীনবন্ধুর পর, ইন্দ্রনাথ, রসরাজ অমৃতলাল এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত আর বড় কেহ বাঙ্গালীকে প্রাণ খুলিয়া হাসাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের গজপতি, রামচন্দ্র, পেষমন, গিরিজায়া, শান্তি, ইন্দিরা, 'কালীর বোতল', চঞ্চলকুমারী, মাণিকলাল আবার কবে বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা দিবে? বঙ্কিমচন্দ্রের "জলধর ও জেলিয়ানি", বঙ্কিমচন্দ্রের বিদেশীর হস্তে বাঙ্গালার ইতিহাস, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের প্রসন্ন গোয়ালিনীর গো-দুগ্ধে অধিকারের দাবী, বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষিত বাঙ্গালীর আধা-খিচুড়ী বুলী,—কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা বলিব?

বঙ্কিমচন্দ্র অনন্যসাধারণ humour শক্তি দ্বারা বাঙ্গালী জাতিকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করিয়া স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রত্যয়ী হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে, অথচ ইহাতে জাতির প্রতি দ্বেষ বা ক্রোধ-প্রকাশের কোন চিহ্ন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দান কি সাধারণ দান?

বাঙ্গালীর শুষ্ক নিরানন্দ হৃদয়ে তেমন করিয়া আর কে দুঃখের মাঝেও হাসি ফুটাইবে? সে হাসির তরঙ্গ কাতুকুতু দেওয়ার ফলে উঠে না, শুভ্র জ্যোৎস্নার মত সে অনাবিল পবিত্র রসধারা ঝরঝর ধারে ঝরিয়া পড়ে। দীনবন্ধুর অপূর্ব্ব চরিত্র জলধরের তুলনা বাঙ্গালা ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। তাঁহার নদেরচাঁদ, তাঁহার নদেরচাঁদের মামা, তাঁহার বক্কেশ্বর (দ্বিতীয় Falstaff), তাঁহার সধবার একাদশীর Son-in-law কি চমৎকার চরিত্র-চিত্র! জামাইবারিকের দ্বিপত্নীকে অথবা নীলদর্পণের তোরাফে তাঁহার Humourএর গাঢ় রসের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন গভীর অন্তর্বেদনার স্রোতঃ ফল্গুধারায় প্রবাহিত হয়, তাহার সহিত একমাত্র Gulliver's travelsএর রচয়িতা Dean Swiftএর Humourএর তুলনা করা যায়। কিন্তু দীনবন্ধুতে Dean Swiftএর তীব্র মর্ম্মান্তিক কঠোর কশার আঘাত ছিল না, Mark Twaineএর Humourএর মত তাহা অনাবিল, ক্রোধ-দ্বেষ-হিংসাহীন, পবিত্র। তাঁহার তোরাফ যখন ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়, তখন সরল গ্রাম্য কৃষকের অন্তরের রুদ্ধ ক্রোধ যে Humourএর আকারে ব্যক্ত হয়, তাহাতে Stella বা Vanessaর অকালে মৃত্যুর মূল Killing Humourএর চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহার নিমচাঁদ আর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি—বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার তুলনা কোথাও নাই। বঙ্কিমচন্দ্রে দীনবন্ধুর Humour যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার তীব্র সমালোচনা লোককে 'হত্যা' করিত না, কিন্তু তাহার মর্ম্মস্থলে অনুশোচনা জাগাইয়া দিত। তাঁহার সীতারামের ফকীর সাহেব গঙ্গারামকে ধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা যে ভাবে দিয়াছিল, তাহাতে শ্লেষ আছে, ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রূপ আছে, কিন্তু কোথাও দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, ক্রোধ নাই, কেবল শ্রোতার মর্ম্মস্থলে পশিবার চেষ্টা, তাহার ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা। এই Humour তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনায় অজস্র ধারে বর্ষিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যে অনেকেরই রচনাকে রূপ দিয়াছিল। নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক দৃশ্যমাত্রই বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ফলে যে উপমা ও অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতেন, তাহা অতীতে মহাকবি কালিদাস-ভবভূতিতে এবং বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব হইয়াছে।

ভাষাজননীকে অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে অদ্ভুত শক্তি ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, অধুনা তাহা নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যও এ বিষয়ে গর্ব্বানুভব করিতে পারে। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবের ইহা কম বৈশিষ্ট্য নহে। কমলাকান্তের 'দুর্গোৎসবে' অথবা দেবী চৌধুরাণীর ত্রিস্রোতার বর্ণনায় যে অপূর্ব্ব শব্দবিন্যাস ভাবরাশির সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছে, তাহার তুলনা আধুনিক সাহিত্যে নাই। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের 'চন্দ্রালোকে' অথবা চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' ভাষার ও শব্দবিন্যাসের যে লীলায়িত স্বচ্ছন্দ সুন্দর গতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় আধুনিক গুরুচাণ্ডালী খিচুড়ী সাহিত্য? ছিঃ! বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দ-সম্পদ এমনই চমৎকার যে, তাঁহার একটি শব্দও পরিবর্ত্তিত করিবার উপায় নাই। Pattison কবি Sir Walter Scottএর গ্রন্থ সমালোচনাকালে বলিয়াছেন,—Scott, কবি Wordsworthএর "The swan on still St. Mary's Lake" স্থলে "The swan on sweet St. Mary's Lake" বসাইয়া Wordsworthকে হত্যা করিয়াছেন, কেন না, still কথাটির সার্থকতা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। হ্রদের জল স্থির না হইলে swan কিরূপে float double, swan and shadow হইবে? Sweet কথা অধিক মিষ্ট হইতে

পারে, কিন্তু স্বভাবকবি Wordsworth মিষ্টতা চাহেন নাই, স্বভাবের অনুযায়ী চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়া still কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাতে Scottএর namby pamby ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দবিন্যাসও এই প্রকৃতির ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন চলে না।

বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নিকটে ভাষাজননী কিরূপ ঋণী, তাহা একমুখে কি বলিব? যে বিষয়ে তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাই তিনি অলঙ্কৃত, উন্নত ও মহৎ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লোকরহস্য, তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ, তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তর, তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, দর্শন-তত্ত্ব, ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কোন্ বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তা ও বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় না পাওয়া যায়? অনুশীলন-তত্ত্বে তিনি বাঙ্গালী জাতিকে যাহা দিয়া গিয়াছেন, সে দানের কথা ভুলিলে বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকটে অকৃতজ্ঞ রহিবে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দান স্বাদেশিকতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা দেশজননীর অঙ্কে ফিরিয়া যাইতে প্রকাশ্যে ও ইঙ্গিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যের আবহাওয়ায় যাঁহারা পুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের রচনায় এই মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে উহা গৈরিক-নিস্রাবের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যেমন এ যাবৎ যথার্থ 'স্বদেশী' ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন, বঙ্কিম-সাহিত্যও তেমনই দেশপ্রেমকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টান মাইকেলও "রেখো মা দাসেরে মনে", 'শ্যামা জন্মদে' বলিয়া দেশজননীর চরণে আকুল নিবেদন জানাইয়াছিলেন। স্বদেশজাত পণ্যকে—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়কে মাথায় করিয়া লইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতরাই এ যাবৎ আমাদের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই হেতু পূজা-পার্ব্বণে, তীর্থে, যোগেযাগে, ব্রতোপবাসে, পদে পদে ধর্ম্মের বন্ধন ও প্রচণ্ড বিশ্বাসকে বাঁধিয়া দিয়াছেন। দেবতার পূজায় চিনি, লবণ, বস্ত্র, মিষ্টান্ন,—কোনও কিছুই স্বদেশজাত না হইলে দিবার উপায় নাই; কাঁসা, পিতল বা তামার পাত্র ভিন্ন অন্য পাত্র (এনামেল, কাচ, পোর্শলেন) অব্যবহার্য্য। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের স্বদেশপ্রেম এইরূপই অন্তরের অন্তস্তল হইতে উদ্গত হইয়াছিল এবং সেই যুগের সাহিত্যে তাহা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

বঙ্কিম-সাহিত্য আমাদের দেশের নারীকে দেশের নারীই রাখিয়া গিয়াছে, বিদেশের ধার-করা অত্যুৎকট অধিকারের দাবীধারিণী নারীতে পরিণত করিয়া যায় নাই। ইহাতেও তাহার আন্তরিকতার ও স্বাদেশিকতার পরিচয় পরিস্ফুট। তাহার মধ্যে ব্যর্থ অনুকরণপ্রিয়তার লক্ষণ দেখা দেয় নাই। কি উদ্দেশ্যে, কোন্ সমাজের কোন্ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে, কি আদর্শের অনুযায়ী করিয়া Ibsen তাঁহার House of Doll লিখিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অন্যান্য Continental কথা-সাহিত্যিকরা তাঁহাদের নারীচরিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম না বুঝিয়া এ দেশে অসম্ভব নারীচরিত্র সৃষ্টি করিলে তাহার উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হইবে, বরং আদর্শকেও ছাপাইয়া গেলে যে সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইবে, তাহা ভাবিবারও কেহ অবসর পান না। বিখ্যাত মার্কিণ কথা-সাহিত্যিক Robert. W. Chambers তাঁহার Common Law গ্রন্থে নায়িকা Valerie Westএর যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব, পরম উপভোগ্য। তাঁহার নায়িকা নায়কের আহ্বানে দেহ-দানেও সম্মত, কিন্তু গ্রন্থকার Precipiceএর ধার পর্য্যন্ত গিয়া কি চমৎকার কৌশলে মোড় ফিরিয়া সমাজে Common Lawএর মহিমার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আধুনিক নব্যতন্ত্রের কথা-সাহিত্যিক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? Victoria Cross তাঁহার তরুণী ইংরাজ সৈনিক-দুহিতার মনে মানসিক ও দৈহিক আসঙ্গলিপ্সার যে অপূর্ব্ব ঘাত-প্রতিঘাত দেখাইয়াছেন, অথবা বর্ব্বর নিরক্ষর পাঠান তরুণের সহিত দৈহিক আসঙ্গলিপ্সার ভয়াবহ পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার মনস্তত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন কি? সুতরাং এ দেশের ধাতুসহ করিয়া নারী-চরিত্র গড়িয়া তুলিবার জন্যও বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সমধিক বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

বাঙ্গালা ভাষার শুভ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। বাঙ্গালার পুরুষ-শার্দ্দূল সার আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষাকে বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃষ্ট স্থান দান করিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা এখন আর ঠেলিয়া ফেলিবার ভাষা নহে, অবজ্ঞার পাত্র নহে। আধুনিক শাসন-সংস্কারের ফলে বাঙ্গালা ভাষার সম্মুখে এক অভিনব বিরাট যুগের আবির্ভাব হইতেছে। ভোটপ্রার্থীদিগকে এখন লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালা ভাষাভাষীর দ্বারে ভোটের জন্য প্রার্থিরূপে দণ্ডায়মান হইতে হইবে—বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞতা এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচনা ব্যতীত সেই ভোটাধিকারীর হৃদয় জয় করা অসম্ভব হইবে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাকে এখন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সহজবোধ্য করিয়া পুষ্ট ও পরিণত করিতে হইবে। এই মহৎ কর্ত্তব্যের ভার দেশের আশাভরসাস্থল তরুণ বাঙ্গালীর উপরেই নিপতিত হইবে। তাঁহাদের সম্মুখে দেশের প্রতি এই গুরু কর্ত্তব্যের দুইটি পথ পড়িয়া আছে, কোন্ পথ তাঁহারা গ্রহণ করিবেন?

বঙ্কিম যে ভাষা দেশজননীর চরণে অর্ঘ্য দিয়া গিয়াছেন,

যাহা বঙ্কিম-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, তাহাই কি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র গ্রহণীয় নহে? ভাষা আরও সহজ ও সরল করিতে হয় করা হউক, কিন্তু মূল আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়া চলিবে না। বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা এইখানে বিশেষরূপে অনুভূত হইবে।

বঙ্গজননীর আর একটি সুসন্তান—দেশের আর একটি দিক্‌পাল—দেশের মুক্তি-যুগের আর একটি যুগপুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্কিমচন্দ্র শুধু এক জন ব্যক্তি নহেন, যদিও তিনি খুব ব্যক্তিত্বশালী পুরুষই ছিলেন। **বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ, বঙ্কিম-সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস দুই-ই।**……বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর য়ুরোপের সাহিত্য দর্শন ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, তথাপি **বঙ্কিম-সাহিত্য আত্মস্থ-সমাহিত, তেজঃপূর্ণ, অথচ প্রশান্ত গভীর, ইহা সমুদ্রবিশেষ।…বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন, অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।**"

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদত্ত মাতৃমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া ভাষাজননীকে সাধ্যমত সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে জগতে বাঙ্গালা ভাষা অবশ্যই সমাদৃতা বরেণ্যা হইবে। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে একনিষ্ঠতা আমাদের সহায় হউক, আমরা তাঁহারই 'সন্তানগণের' কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—'বন্দে মাতরম্'!

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্য-রত্ন)।

রস-রূপ

প্রাণে আমার রসের ছায়া ফেলে,
হে রসময়, এবার তুমি এলে।
সম্বরিয়া রৌদ্র-কায়া
আন্‌লে এ কি সজল মায়া!
অজস্রধার করুণা-দান ঢেলে
স্নিগ্ধ-করুণ হৃদয় দিলে মেলে।

এবার আকাশ মমতাতে ঢাকা—
নয় সে তাপের তিরস্কারে মাখা।
বয় না বাতাস আর হাহাকার,
প্রশ্বাসে নাই দগ্ধতা তার,
সে যে সুধা-শীকরকণায় ছাঁকা।
উদাস পরাণ কর্‌ছে না আর খাঁ—খাঁ!

ক্ষেত্র আমার শ্যামল-শোভন কেমন—
নয় তো ধূসর নীরস-উষর তেমন।
আমার অ-নীর শুষ্ক সরস্
এবার আতটপূর্ণ, স-রস।
কঠিন মাটী এবার কোমল নরম;—
তপ্ত তৃষায় তৃপ্তি এল পরম!

দিশাহারা মোর কামনাগুলি
দিকে দিকে ছুটছে না পথ ভুলি'—
কালো, কামের কালি-মাখা,
কাকের মতন করি' কা-কা
ছুটছে না আর;—শুভ্র ডানা তুলি'
বকের মতই জুটছে দুলি' দুলি'!

সিক্ত করি' করুণ-রস-নীরে,
কারণ, তুমি এবার এলে ফিরে'।
বাদর-ঝরা যুথির সম
তরুণ হরষরাশি মম
ঝরি' ঝরি' তুল্‌ল ধীরে ধীরে
পরাণ আমার গন্ধে আজি ঘিরে'!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

পিশাচের নাগপাশ

সপ্তম প্রবাহ

নাচের মজলিসে দাঙ্গা

সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে মিঃ লক লাইট-ওয়েকে সঙ্গে লইয়া পেড্রোর ভোজনালয়ে উপস্থিত হইলেন। সেই হোটেলটি অত্যন্ত জঘন্য স্থান। নগরের এক প্রান্তে ডকের আঙ্গিনার অদূরে ইহা সংস্থাপিত। তাঁহারা সেই হোটেলে প্রবেশ করিয়া তামাকের তীব্র গন্ধে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন; সেখানে মুক্ত বায়ু-প্রবাহের অভাব অনুভূত হইল।

মিঃ লক সেখানে বহু লোকের সমাগম লক্ষ্য করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি জানিতেন, কাহারও সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে হইলে জনতার ভিতর তাহার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। সেখানে যে যুবতী নর্ত্তকী গান করিতেছিল, তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

মিঃ লক সকলের অজ্ঞাতসারে সেই মজলিসের এক কোণে উপস্থিত হইলেন। কয়েক মিনিট পরে লাইটওয়ে সেই জনতার ভিতর হইতে একটি কদাকার লোককে সেই স্থানে টানিয়া আনিল, তাহার পরিধানে পাটানিয়ার নৌ-কর্ম্মচারীর পরিচ্ছদ ছিল। লোকটা মিঃ লকের মুখের দিকে চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। মিঃ লকের আদেশে সেই স্থানে মদ্য আনীত হইলে লক লাইটওয়েকে ইঙ্গিতে সরাইয়া দিয়া সেই লোকটির সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন।

তাঁহাদের কাযের কথা শেষ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। লোকটি মিঃ লককে নিজের যে পরিচয় জানাইল, তাহা লক বিশ্বাস করিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাহাকে জেরা করিলেন না। সে বলিল, তাহার নাম কোয়ার্টার মাষ্টার ষ্টিফানো জোস্ রিগো। তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইল, সে পঞ্চাশ 'পিসো' (রৌপ্যমুদ্রা), লইয়া কাপ্তেন বয়েলকে সংবাদ দিয়া আসিবে—কালেসোতে এক জন ইংরাজ আসিয়াছেন, তিনি জেনারেল কালভেটির কবল হইতে তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন। আরও স্থির হইল, বয়েল এই সংবাদ পাইয়াছেন, ইহার প্রমাণস্বরূপ কোন অভিজ্ঞান আনিয়া দিতে পারিলে সে আর পঞ্চাশটি 'পিসো' পুরস্কার পাইবে। মিঃ ডেক তাহাকে হাতে রাখিবার জন্য তাহাকে আশা দিলেন, সে বিশ্বস্তভাবে তাঁহার সকল আদেশ পালন করিলে তিনি সেই নগর হইতে বিদায় লইবার সময় তাহাকে আরও এক শত 'পিসো' উপহার দান করিবেন। তিনি জানিতেন, লোকটিকে এইভাবে বশীভূত করিতে না পারিলে যে কোন দিন অন্ধকার রাত্রিতে তাঁহার পিঠে ছুরী মারিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

অতঃপর মিঃ লক তাহাকে আর এক গ্ল্যাস মদ্য পান করাইয়া নৃত্যগীতে মনঃসংযোগ করিলেন।

মিঃ লক দুই তিনবার তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, নাচের মজলিসে তখন মুহুর্মুহুঃ হর-রা চলিতেছিল, হাসি, গান, হাততালি ও হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কিন্তু সটি লাইটওয়ের কণ্ঠস্বর সকল শব্দের সেই মিশ্র কল্লোল ডুবাইয়া দিল!

সটি তখন উচ্চৈঃস্বরে গায়িতেছিল—

"আমি প্রাণ-খোলা এক প্রেমিক এসেছি
জেনিরোর এক যুবতীকে ভালো বেসেছি—"

সে এই গানের তালে তালে নর্ত্তকীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছিল; তাহাদের পশ্চাতে বাদ্যযন্ত্র সমতালে ধ্বনিত হইতেছিল। দর্শকগণ সটির গানের তারিফ করিয়া বাহবা দিতেছিল।

মিঃ লক মধ্যে মধ্যে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নৃত্য গীত উভয়ই জমিয়া উঠিয়াছে। দ্রুততালে নৃত্যের সহিত সঙ্গীতধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। অনেকে উৎসাহে অধীর হইয়া তাহাদের স্বরে স্বর মিলাইয়া গান ধরিল। কেহ কেহ মাটীতে পদাঘাত করিয়া তাল দিতে লাগিল। এক দল লোক পশ্চাতে বসিয়া মদের গ্লাস লইয়া পানানন্দে বিভোর হইল। তাহাদের বিকট হাস্যে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সটি লাইটওয়ে উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিল। মিঃ লক তাহার রুচির নিন্দা করিতে পারিলেন না, সেই নর্ত্তকী রূপবতী, তাহার মুখের বর্ণ ঈষৎ বাদামী, চক্ষু-তারকা কৃষ্ণবর্ণ, দক্ষিণ আমেরিকায় সে আদর্শ সুন্দরী বলিয়া রসিক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাহার নৃত্যে কলা-কৌশলের অভাব ছিল না। সে নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিভিন্ন অঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। তাহাদের নৃত্যগীত শেষ হইয়া আসিলে লাইটওয়ে নাচিতে নাচিতে যুবতীকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। সেই মুহূর্ত্তে কে গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিল,—

"কারাম্বা! ইংলেজ ডায়াব্লো!

'ইংরাজ নিপাত যাক্' এই ভাবের হুঙ্কার। সেই হুঙ্কার শুনিয়া মুহূর্ত্তে গানের মজলিস নিস্তব্ধ হইল। মিঃ লক সন্দিগ্ধচিত্তে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটি দীর্ঘদেহ পাটানিয়ান যুবক দুই হাতে জনতা ভেদ করিয়া লাইটওয়ের দিকে অগ্রসর হইল, ক্রোধে তাহার মুখ বিকৃত, চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার দক্ষিণ হস্ত সুলোহিত কোষে আবদ্ধ ছুরিকার মুষ্টি সংলগ্ন।

পাটানিয়ান সটি লাইটওয়ের সম্মুখে আসিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি এই যুবতীকে চুম্বন করিয়াছ? তুমি জান, এই নারী আমার প্রেয়সী? তুমি তাহার সঙ্গে নাচিয়া গান করিতেছিলে, ইহাতে আমি আপত্তি করি নাই, কিন্তু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন! ওরে নচ্ছার বিদেশী! আমি তোকে কোতল করিব।"

পাটানিয়ান যুবক লাইটওয়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিতেই লাইটওয়ে নর্ত্তকীটাকে এক পাশে সরাইয়া দিয়া দক্ষিণ হস্ত পিঠের দিকে ঘুরাইয়া মুহূর্ত্তে তাহা ঊর্দ্ধে তুলিল এবং করতল প্রসারিত করিয়া তাহার গালে প্রচণ্ডবেগে চপেটাঘাত করিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ স্বরে বলিল, "আমি তোকে এমন শিক্ষা দিব যে—"

কিন্তু লাইটওয়ে তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কি শিক্ষা দিবে, মিঃ লক তাহা জানিতে পারিলেন না। তাহার সেই চপেটাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল জনসমুদ্র বিকট গর্জ্জন করিয়া লাইটওয়ের দিকে ধাবিত হইল। মিঃ লক তৎক্ষণাৎ সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে পাটানিয়ান যুবক লাইটওয়েকে আক্রমণ করিতেই চারিদিক্ হইতে 'মার মার' শব্দ উত্থিত হইল। তাহার পর ভীষণ কোলাহল ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে সেই জনস্রোতের মধ্যে বহুলোকের মাথা, হাত, পা, দেহের বিভিন্ন অংশ আন্দোলিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি গ্লাস চূর্ণ হইল, চেয়ার-টেবিলগুলি উল্টাইয়া পড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। পুরুষগণের চীৎকারে ও রমণীগণের আর্ত্তনাদে হোটেলের প্রতি কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মিঃ লক মনে করিলেন, উন্মত্তপ্রায় লোকগুলা লাইটওয়েকে হত্যা করিবে। তিনি সম্মুখের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, লাইটওয়েকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। এ জন্য তাঁহাকে অনেককে ঘুসি মারিয়া সরাইয়া দিয়া, অনেকের দেহ পদদলিত করিয়া সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিতে হইল। কিন্তু লাইটওয়ে জনতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় মিঃ লক তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সটি, সটি, তুমি কোথায়?"

লাইটওয়ে তাঁহার কথা শুনিয়া বলিল, "এই যে আমি, সেই মাথাগরম গোঁয়ারটাকে একটু শিক্ষা দিতেছি!"

মিঃ লক সেই স্থানে বসিয়া দুই জন যুদ্ধনিরত জোয়ানের পায়ের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, লাইটওয়ে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী পাটানিয়ান যুবকের ধরাশায়ী দেহের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। যুবকের দুই চক্ষু তাহার অক্ষিকোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির

হইয়াছিল। কিন্তু মিঃ লক আরও দেখিতে পাইলেন—লাইট-ওয়ের মাথার দিকে বসিয়া আর একটি পাটানিয়ান যুবক একটা মদের বোতল তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিয়াছিল।

মুহূর্ত্তকাল পরেই সেই বোতলটি লাইটওয়ের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মস্তক চূর্ণ করিত, সেই প্রচণ্ড আঘাতে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইত, এ বিষয়ে মিঃ লকের সন্দেহ রহিল না। লাইটওয়ের জীবন এই ভাবে বিপন্ন দেখিয়া মিঃ লক মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি চক্ষুর নিমেষে পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া লইয়া তাহার ঘোড়া টিপিলেন। পিস্তলের মুখ হইতে যেন অগ্নিস্রোত নিঃসারিত হইল।

যে যুবক লাইটওয়ের মাথার উপর বোতলটা তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা লাইটওয়ের মস্তক স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই মিঃ লকের অব্যর্থ গুলীর আঘাতে শতখণ্ডে চূর্ণ হইল। যুবক তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া নিজের মুঠার দিকে চাহিয়া রহিল। বোতলের ভাঙ্গা গলাটা তাহার মুঠায় আবদ্ধ ছিল, বোতলের অবশিষ্ট অংশ লাইটওয়ের দেহের চারিদিকে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল।

পিস্তলের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিয়া উত্তেজিত জনতা চারিদিক্ হইতে 'মারো' 'মারো' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মিঃ লক তখন সেই জনতার উর্দ্ধে পিস্তলের একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। যাহারা সেই মজলিসে আমোদ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই নিরস্ত্র, পুনঃ পুনঃ পিস্তলের নির্ঘোষ শুনিয়া তাহারা সকলেই আতঙ্কে অভিভূত হইল এবং প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। দ্বারের নিকট অনেকে দলবদ্ধ হইয়া বাহিরে যাইবার জন্য ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল, কেহ কাহাকেও ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া তাহার পিঠের উপর দিয়া চলিয়া গেল, কেহ কাহারও কাঁধের উপর দিয়া লাফাইয়া পলায়ন করিল, কেহ কেহ উপায়ান্তর না দেখিয়া অতি কষ্টে উচ্চ বাতায়নে উঠিয়া অদৃশ্য হইল। তাহাদের আশঙ্কা হইয়াছিল, সৈন্যদল কোন কারণে সেই হোটেল আক্রমণ করিয়াছিল। মিঃ লক সকলকে এই ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া লাইটওয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রেমিক পাটানিয়ান যুবকটি অচেতন অবস্থায় তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়াছিল; মিঃ লক লাইটওয়ের হাত ধরিয়া অন্যদিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

তখন সেই হোটেলের অবস্থা সঙ্কটজনক। হোটেলের মালিক পিড্রো সেইরূপ দাঙ্গা চলিতে দেখিয়াও সেখানে পুলিস ডাকিতে সাহস করে নাই; তাহার হোটেলে দুই জন ইংরাজ নিহত হইলে তাহাকে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, এই ভয়ে সে তাহার স্বদেশবাসীদের যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া সঙ্গত মনে করে নাই, বরং সে তাহাদিগকে তাহার হোটেল হইতে তাড়াইবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল।

কিন্তু দাঙ্গা ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিলে সে কয়েক জন সৈনিক পুরুষের সহায়তা-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। পাটানিয়ার কোন অংশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইলে পুলিসের পরিবর্ত্তে তাহারাই দাঙ্গাবাজদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া শান্তি-স্থাপন করিত। তাহাদেরই কয়েক জন হোটেলে প্রবেশ করায় দাঙ্গা দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে নাই।

সৈন্যদল আসিয়া সেই নাচের মজলিসে মিঃ লক ও লাইটওয়েকে দেখিতে পাইল। তাহারা সেনাপতির ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীন সহ রাইফেল উদ্যত করিল।

মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের সহিত বিরোধ করিয়া কোন ফল নাই, বরং তাহাতে তাঁহাদের অনিষ্টেরই আশঙ্কা ছিল। অগত্যা তিনি তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের দুই জনকেই গ্রেপ্তার করিল। তাহারা জানিতে পারিল, তাঁহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াই সেই পাটানিয়ান যুবক হতচেতন অবস্থায় সেখানে পড়িয়াছিল।

মিঃ লক বিনা প্রতিবাদে তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করায় গোলমাল সহজেই মিটিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে কালেসোর রাজপথ সৈনিকগণের পদশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহারা পথে আসিয়া কতকগুলি নিরীহ পাটানিয়ানকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। যাহারা দাঙ্গায় যোগদান করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। যে সকল পথিক পথে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল, তাহারাই ধরা পড়িল, কেহ কেহ দুই চারিটা গুঁতাও খাইল। তাহারা নিরপরাধ বলিয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিলে সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাদিগকে বাঁধিয়া মিঃ লক ও

লাইটওয়ের সঙ্গে চালান দিল। তাঁহারা সৈন্যদল-পরিবেষ্টিত হইয়া কোথায় চলিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন না।

কিছু কাল পরে তাঁহারা কারাগারের সম্মুখে নীত হইলেন। সেনাপতির আদেশে কারাদ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং মিঃ লক, লাইটওয়ে ও এক দল দরিদ্র পাটাগনিয়ান অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সেই সকল কক্ষে রাত্রিকালে আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা ছিল না এবং কোন কক্ষে কোন প্রকার আসবাবও ছিল না। কয়েদীগণকে রাত্রিকালে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে অনাবৃত ভূমিশয্যায় স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর শয়ন করিতে হইত। সেই সকল কক্ষ কুকুরেরও বাসের অযোগ্য। কয়েদীগণকে সেই সকল কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া ওককাষ্ঠনির্ম্মিত সুদৃঢ় দ্বার সশব্দে রুদ্ধ করা হইল। মিঃ লক ও লাইটওয়ে বুঝিতে পারিলেন, কিছু কালের জন্য বহির্জগতের সহিত তাঁহাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল!

অষ্টম প্রবাহ

গ্রেপ্তারের পর

মিঃ লক ও লাইটওয়ে একই কক্ষে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। মিঃ লক সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। অন্ধকারে সেই কক্ষের কোন অংশ পরীক্ষা করিবার উপায় ছিল না, তাঁহার সেরূপ উৎসাহও ছিল না। কিছু কাল পরে তিনি লাইটওয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সটি, তুমি একটি নিরেট গাধা—ভয়ঙ্কর নির্ব্বোধ।"

লাইটওয়ে বলিল, "আমি নির্ব্বোধ, এই জন্য আমাকে গাধা বলিলেন? কিন্তু আমি এ রকম অনেক গাধা দেখিয়াছি, যে অনেক শিয়াল অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্‌। আমাকে গাধা বলিয়া গাধার অপমান করিবেন না।"

মিঃ লক বলিলেন, "তুমি নির্ব্বোধ না হইলে, আমাদিগকে এ ভাবে বিপন্ন হইতে হইত না। ইচ্ছা করিয়া এ রকম ফাঁসাদে পড়িবার প্রয়োজন ছিল না।"

লাইটওয়ে বলিল, "ফাঁসাদে না পড়িলে কি মানুষ তাহার বুদ্ধির, কৌশলের বা শক্তির পরিচয় দিতে পারে? আহার, নিদ্রা এবং অবসরকালে বন্ধুবান্ধবের দলে মিশিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া, গল্প করিয়া সময় নষ্ট করা—ইহাকে কি বাঁচিয়া থাকা বলে? ঐ রকম একঘেয়ে জীবন কি বিড়ম্বনাপূর্ণ নহে? সেই ভাবে আরামে সময় কাটাইবার ইচ্ছা থাকিলে এ দেশে কেন আসিলেন? আমি ফাঁসাদকে ভয় করি না, তবে আমার জন্য আপনি কষ্ট পাইলেন, এই জন্যই আমি দুঃখিত। একটা অসভ্য পাটাগনিয়ান আপনার স্বদেশের এক জন নাবিককে আপনার সম্মুখে অপমানিত করিবে, আর আপনি ফাঁসাদের ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তাহা দেখিবেন—ইহা আমি প্রত্যাশা করি নাই; সুতরাং আমি নির্ব্বোধ এবং গাধার অধম।"

মিঃ লক বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, পৃথিবীর কোন কোন দেশে এরূপ নরাধম কাপুরুষও আছে—যাহারা চক্ষুর উপর তাহাদের স্ত্রী, কন্যা বা ভগিনীকে দুর্দ্দান্ত গুণ্ডার হস্তে নিগৃহীত হইতে দেখিয়া প্রাণভয়ে একটি কথা বলিতেও সাহস করে না, সেই সকল ঘৃণিত জীব সত্যই কৃপার পাত্র। আশা করি, তুমি আমাকে সেই দলে ফেলিবে না। তোমার অপমান ও লাঞ্ছনা আমি কদাচ সহ্য করিতাম না; কিন্তু তুমিও নিরপরাধ নহ, তুমিই প্রথমে দোষ করিয়াছিলে: সেই যুবতী নর্ত্তকীকে ধরিয়া নাচের মজলিসে ঐ ভাবে চুম্বন করিয়া তুমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছিলে। ইহা তোমার চরিত্রগত দুর্ব্বলতারই পরিচয়।"

লাইটওয়ে বলিল, "সে কাহারও মাতা, ভগিনী বা পত্নী নহে, সাধারণ নর্ত্তকী—যে অর্থবিনিময়ে আত্মবিক্রয় করে, এক জন বীরপুরুষের চুম্বনলাভ তাহার পক্ষে গৌরবের বিষয়।"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "কিন্তু সে এক জনের প্রণয়িনী। বিশেষতঃ তাহাকে দুশ্চারিণী বলিয়া সিদ্ধান্ত করাও তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। না, তোমার এই নির্লজ্জতা সমর্থনের অযোগ্য।"

লাইটওয়ে বলিল, "তাহার নৃত্যকৌশলে মুগ্ধ হইয়া আমি তাহাকে ঐ ভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিলাম। আপনিও বোধ হয়, উৎকৃষ্ট কলা-কৌশলকে পুরস্কারের অযোগ্য মনে করেন না।"

মিঃ লক বলিলেন, "অর্থাৎ উহার কলা-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া আমিও তোমার মত উহার মুখচুম্বন করিতাম! চমৎকার যুক্তি। আমরা যে উদ্দেশ্যে এই দূরদেশে আসিয়া ছদ্মবেশে এখানে বাস করিতেছি, তোমার দোষে আমাদের সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল, ইহা কি অল্প ক্ষোভের বিষয়?"

"কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দু'টি ?"— রবীন্দ্রনাথ।

বসুমতী চিত্র-বিভাগ।

লাইটওয়ে বলিল, "আপনি হতাশ হইবেন না ; আপনি যতদূর আশঙ্কা করিতেছেন—আপনার সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আমরা এই সঙ্কট হইতে শীঘ্রই উদ্ধার লাভ করিব। হয় ত বিচারে আমাদের কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড হইবে। একটা নেটিভকে জুতাপেটা করিয়া সেরূপ অর্থদণ্ড দেওয়া অগৌরবের বিষয় নহে, তাহাতে তেমন কোন ক্ষতিও নাই। আজ পেড্রোর হোটেলে এই রকম হাঙ্গামা না হইলে পাটানিয়া রাজ্যের প্রেসিডেণ্টের কি কিছু লাভের আশা থাকিত ? তাহার মোটর-কার অচল হইত না ?—দাঙ্গা না হইলে জরিমানা আদায় হইত না, জরিমানা আদায় না হইলে মোটর-কারের পেট্রল কিনিবার মূল্য জুটিত না, সুতরাং পেট্রলের অভাবে তাহার গাড়ী অচল হইত। যাহার এতদূর দূরদৃষ্টি, আপনি তাহাকে বলেন নিরেট গাধা, ভয়ঙ্কর নির্ব্বোধ ! এখন ভাবিয়া দেখুন, কে বেশী নির্ব্বোধ ?"

মিঃ লক বলিলেন, "সত্যি, তুমি একেবারে গোল্লায় গিয়াছ, তুমি কখন মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না।"

রাত্রিটা কাটিয়া গেল, পরদিন প্রভাতেও মিঃ ব্লেক মানসিক চাঞ্চল্য দূর করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল না। পূর্ব্ব-রাত্রিতে তাঁহার মেজাজ যেরূপ রুক্ষ ছিল, প্রভাতেও সেইরূপ রহিল। সেই দুর্গন্ধময়, বায়ু-প্রবাহহীন কারাকক্ষে কতকগুলা ইতর দস্যু-তস্করের সহবাস তাঁহার অসহ্য মনে হইল। অবশেষে তাঁহারা বিচারালয়ে নীত হইলে তাঁহার ধারণা হইল, লাইটওয়েকে তিনি যেরূপ নির্ব্বোধ মনে করিয়াছিলেন, সে ততদূর নির্ব্বোধ নহে ; তিনি তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন।

তিনি বিচারালয়ে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হইয়াছিলেন, তিনি সেই দেশেরই একটি ঘটীরাম। আমাদের দেশের অনেক ঘটীরাম ডেপুটী পুলিসকে তাঁহাদের অন্নদাতা অর্থাৎ পদোন্নতির কর্ত্তা বলিয়াই মনে করেন, অনেকের আশা থাকে, পুলিসের নেকনজর থাকিলে ঘটীরামী করিতে করিতে তাঁহারা জেলার মসনদে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। আমাদের এই ঘটীরামটির ধারণা ছিল—তিনি মামলার আসামীদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যত জরিমানা আদায় করিবেন, ততই তাঁহার সুবিচারের প্রশংসা হইবে, পদোন্নতির দাবী চলিবে। এই জন্য তিনি আসামীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ শুনিবার পূর্ব্বেই আসামীর অর্থদণ্ডের আদেশ করিতে লাগিলেন, তবে রামের অপরাধে রামের বাবার বা কাকার ঘটিবাটী, লেপ-কাঁথা, কাপড়-গামছা ক্রোক করিয়া টাকা আদায়ের আদেশ করিলেন না। যাহারা অর্থাভাবে জরিমানা দিতে অসমর্থ হইল, তাহাদিগকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ভাবিলেন, সেই সকল অপরাধীর কোন আত্মীয় জরিমানার টাকা দাখিল করিতেও পারে।

স্থানীয় অপরাধিগণের বিচার শেষ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট লক ও লাইটওয়ের মামলা ধরিলেন। মিঃ লকের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পঠিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট শুনিলেন, মিঃ লক নাচের মজলিসে পিস্তল হইতে গুলীবর্ষণ করিয়া এক জন পাটানিয়া যুবককে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিস্তল-ব্যবহারে দক্ষতার অভাবে সেই গুলীতে যুবকটির হাতের বোতল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে সুধাপানে বঞ্চিত হইয়াছিল, এবং তাহাকে মৃত্যুর অধিক মনঃকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, অতএব মিঃ লক যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা নরহত্যার অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর। এই জন্য তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ লকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

লাইটওয়ে মিঃ লকের হাতের কাছে দাঁড়াইয়াছিল ; সে মিঃ লকের কাণে কাণে বলিল, "মুন্সিন্দি আপনার কত টাকা জরিমানা করিবে, তাহাই ঠাহর করিয়া দেখিতেছে, কর্ত্তা !"

লাইটওয়ের এই অনুমান মিথ্যা নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট বক্র-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবেই বলিলেন, "দেখ সিনর, তুমি বিদেশী লোক, এ দেশের এক জন যুবক মদ্যপান করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় তুমি গুলী মারিয়া তাহার মদের বোতল ভাঙ্গিয়া দিয়াছ, এ জন্য তাহার পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয় নাই, তাহার ফলে তাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে। মানুষের অগ্নিমান্দ্য হইলে তাহার উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগে ভুগিবার আশঙ্কা থাকে। তুমি তাহার রোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছ—এই অপরাধে আমি তোমার দশ ও তোমার ভৃত্যের পাঁচ পেসো জরিমানা করিলাম। এতদ্ভিন্ন এই মামলার খরচা দশ পেসো তোমার নিকট আদায় হইবে।"

লাইটওয়ে বলিল, "আপনি হতাশ হইবেন না ; আপনি যতদূর আশঙ্কা করিতেছেন—আপনার সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আমরা এই সঙ্কট হইতে শীঘ্রই উদ্ধার লাভ করিব। হয় ত বিচারে আমাদের কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড হইবে। একটা নেটিভকে জুতাপেটা করিয়া সেরূপ অর্থদণ্ড দেওয়া অগৌরবের বিষয় নহে, তাহাতে তেমন কোন ক্ষতিও নাই। আজ পেড্রোর হোটেলে এই রকম হাঙ্গামা না হইলে পাটানিয়া রাজ্যের প্রেসিডেন্টের কি কিছু লাভের আশা থাকিত? তাহার মোটর-কার অচল হইত না?—দাঙ্গা না হইলে জরিমানা আদায় হইত না, জরিমানা আদায় না হইলে মোটর-কারের পেট্রল কিনিবার মূল্য জুটিত না, সুতরাং পেট্রলের অভাবে তাহার গাড়ী অচল হইত। যাহার এতদূর দূরদৃষ্টি, আপনি তাহাকে বলেন নিরেট গাধা, ভয়ঙ্কর নির্ব্বোধ! এখন ভাবিয়া দেখুন, কে বেশী নির্ব্বোধ?"

মিঃ লক বলিলেন, "সটি, তুমি একেবারে গোল্লায় গিয়াছ, তুমি কখন মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না।"

রাত্রিটা কাটিয়া গেল, পরদিন প্রভাতেও মিঃ ব্লেক মানসিক চাঞ্চল্য দূর করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল না। পূর্ব্ব-রাত্রিতে তাঁহার মেজাজ যেরূপ রুক্ষ ছিল, প্রভাতেও সেইরূপ রহিল। সেই দুর্গন্ধময়, বায়ু-প্রবাহহীন কারাকক্ষে কতকগুলা ইতর দস্যু-তস্করের সহবাস তাঁহার অসহ্য মনে হইল। অবশেষে তাঁহারা বিচারালয়ে নীত হইলে তাঁহার ধারণা হইল, লাইটওয়েকে তিনি যেরূপ নির্ব্বোধ মনে করিয়াছিলেন, সে ততদূর নির্ব্বোধ নহে; তিনি তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন।

তিনি বিচারালয়ে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হইয়াছিলেন, তিনি সেই দেশেরই একটি ঘটীরাম। আমাদের দেশের অনেক ঘটীরাম ডেপুটী পুলিসকে তাঁহাদের অন্নদাতা অর্থাৎ পদোন্নতির কর্ত্তা বলিয়াই মনে করেন, অনেকের আশা থাকে, পুলিসের নেকনজর থাকিলে ঘটীরামী করিতে করিতে তাঁহারা জেলার মসনদে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। আমাদের এই ঘটীরামটির ধারণা ছিল—তিনি মামলার আসামীদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যত জরিমানা আদায় করিবেন, ততই তাঁহার সুবিচারের প্রশংসা হইবে, পদোন্নতির দাবী চলিবে। এই জন্য তিনি আসামীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ শুনিবার পূর্ব্বেই আসামীর অর্থদণ্ডের আদেশ করিতে লাগিলেন, তবে রামের অপরাধে রামের বাবার বা কাকার ঘটিবাটী, লেপ-কাঁথা, কাপড়-গামছা ক্রোক করিয়া টাকা আদায়ের আদেশ করিলেন না। যাহারা অর্থাভাবে জরিমানা দিতে অসমর্থ হইল, তাহাদিগকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ভাবিলেন, সেই সকল অপরাধীর কোন আত্মীয় জরিমানার টাকা দাখিল করিতেও পারে।

স্থানীয় অপরাধিগণের বিচার শেষ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট লক ও লাইটওয়ের মামলা ধরিলেন। মিঃ লকের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পঠিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট শুনিলেন, মিঃ লক নাচের মজলিসে পিস্তল হইতে গুলীবর্ষণ করিয়া এক জন পাটানিয়া যুবককে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিস্তল-ব্যবহারে দক্ষতার অভাবে সেই গুলীতে যুবকটির হাতের বোতল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে সুধাপানে বঞ্চিত হইয়াছিল, এবং তাহাকে মৃত্যুর অধিক মনঃকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, অতএব মিঃ লক যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা নরহত্যার অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর। এই জন্য তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ লকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

লাইটওয়ে মিঃ লকের হাতের কাছে দাঁড়াইয়াছিল; সে মিঃ লকের কাণে কাণে বলিল, "সুমুন্দি আপনার কত টাকা জরিমানা করিবে, তাহাই ঠাহর করিয়া দেখিতেছে, কর্ত্তা!"

লাইটওয়ের এই অনুমান মিথ্যা নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট বক্র-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবেই বলিলেন, "দেখ সিনর, তুমি বিদেশী লোক, এ দেশের এক জন যুবক মদ্যপান করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় তুমি গুলী মারিয়া তাহার মদের বোতল ভাঙ্গিয়া দিয়াছ, এ জন্য তাহার পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয় নাই, তাহার ফলে তাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে। মানুষের অগ্নিমান্দ্য হইলে তাহার উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগে ভুগিবার আশঙ্কা থাকে। তুমি তাহার রোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছ—এই অপরাধে আমি তোমার দশ ও তোমার ভৃত্যের পাঁচ পেসো জরিমানা করিলাম। এতদ্ভিন্ন এই মামলার খরচা দশ পেসো তোমার নিকট আদায় হইবে।"

মিঃ লক তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে টাকার থলি বাহির করিয়া পঁচিশ পেসোর নোট ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পণ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাতে অপমান বোধ করিয়া নোটগুলি সক্রোধে তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও টাকা পেস্কারের কাছে জমা করিয়া দাও।" "ঐ টাকা পেস্কার ও ফরিয়াদী বখরা করিয়া লইবে। প্রেসিডেণ্টের অংশে বিশেষ কিছু পড়িবে না।" লাইটওয়ে মিঃ লকের কাণে কাণে এই কথা বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

মিঃ লক লাইটওয়েকে ধমক দিয়া আসামীর কাঠরা হইতে নামিয়া পড়িলেন, লাইটওয়েও তাঁহার অনুসরণ করিল। মিঃ লক অতি সহজে মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু আদালতের অনেক লোক তাঁহাকে চিনিয়া রাখিল ভাবিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভেরও সঞ্চার হইল। মিঃ কার্টরাইটকে অনেকেই চিনিত, তাঁহাকে ফৌজদারীর আসামী হইতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। মিঃ লক লাইটওয়েকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি বিচারালয় ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু তিনি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা আদালতের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অপরাধ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি সভয়ে দেখিলেন, সেই দলের একটি লোক তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত!

সেই লোকটি বিচারালয়ের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল এবং আদালতের এক জন প্রহরীর সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছিল। সে মিঃ লককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, সে তাঁহাকে সত্যই চিনিতে পারিয়াছিল। তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাহারও নিকট তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ না করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

কিন্তু সেই লোকটা তাঁহার ইঙ্গিত গ্রাহ্য করিল না বা বুঝিতে পারিল না। মিঃ লককে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সে বলিল, "সে কি মিঃ লক, আপনি আমার সঙ্গে আলাপ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন যে? এটা কি ভদ্রোচিত কায হইতেছে? আপনি কানিমোতে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? কোন চোর-ডাকাত এ দেশে পলাইয়া আসায় তাহার সন্ধানে আসিয়াছেন বুঝি? হা, আমার এই অনুমান যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে আমি হাজার টাকা বাজি হারিব—হা, হা!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গিরিধিতে

হের প্রিয়ে 'উস্রি'তটে দীর্ঘায়ত তরুণ সবল
ঘন-পত্র সমাচ্ছন্ন শালতরু পবন চঞ্চল,
উঠিয়াছে বীরদর্পে তেজে রসে পূর্ণ প্রাণবান্,
আনন্দে গৌরবে করে পত্রপুটে সূর্য্যালোক পান
অবিশ্রান্ত। রোগশীর্ণ জীর্ণ মোর পঞ্জরের তলে,
লজ্জা হয় বলিবারে—হেরি ওরে হিংসানল জ্বলে,
অকারণে। পাইতাম আহা যদি উহার মতন
সতেজ সবল স্বাস্থ্য, রসঘন শ্যামল যৌবন
কয়টি বরষ তরে! শত বর্ষ যৌবন উহার
কয়টি বৎসর মাত্র ও কি মোরে দেয় নাক ধার
ক্ষত্রবীর পুরুসম, লয়ে মোর এই স্বাস্থ্যহীন
তারুণ্যের নামধারী রোগপাণ্ডু জীর্ণতা-মলিন?
বড় স্বার্থপর আমি? স্বার্থ নয় এ যে বড় ব্যথা
জড়ায়ে ওঠে নি ওরে, দেখিছ না, কোন বনলতা,
তাই বলিয়াছি প্রিয়ে। তোমা পানে যত চাই সখি,
হিংসা হয় তত মোর ঐ শাল তরুরে নিরখি।

শ্রীকালিদাস রায়।

মার্কিণের বেকার

সামরিক কার্য্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত একলক্ষাধিক মার্কিণ সৈনিক ও সেনানী রাজধানী ওয়াসিংটন সহরে কংগ্রেসকে অর্থাৎ পার্লামেণ্টকে একটি বিল পাশ করিতে বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে অভিযান করিয়াছিল। মার্কিণেও আর্থিক অনাটন অনুভূত হইয়াছে, ডিয়ারবোর্ণ সহরে বেকারের অভিযান ও পুলিসের গুলীর যে ভয়াবহ বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। সম্প্রতি কংগ্রেসে নানারূপ ব্যয়-সঙ্কোচের প্রস্তাব হইয়াছিল। পাছে War bonusও এই কাটছাঁটের তালিকাভুক্ত হয়, এই হেতু সৈন্যদের এই অভিযান। এই সৈনিক ও সেনানীরা গত জার্ম্মাণ যুদ্ধে দেশের জন্য—জগতের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিল। এখন তাহাদের মধ্যে অনেকে বিকলাঙ্গ হইয়াছে, অনেকে বেকার বসিয়া রহিয়াছে। সুতরাং দেশের কর্তৃপক্ষ তাহাদের কৃত কর্ম্মের পুরস্কার না দিয়া যদি তিরস্কারের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহারা সহ্য করিবে কেন? সে দেশে ত কিসমতের স্কন্ধে সকল অপরাধের বোঝা চাপাইয়া নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত হইবার প্রথা বিদ্যমান নাই। মার্কিণ স্বাধীন দেশ, মার্কিণ-জাতি স্বাধীন জাতি, তাহাদের প্রতিনিধিরাই দেশের কংগ্রেস ও সেনেটে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই কংগ্রেস ও সেনেটের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কংগ্রেস এক চালাকি খেলিয়াছেন। তাঁহারা এই ব্যাপারের সিদ্ধান্তের ভার সেনেটের উপর ফেলিয়া দিয়া আপনারা সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ দিকে সেনেটও বিপদ বুঝিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা ও গোলযোগে থাকিবেন না। কাযেই শেষ দায়িত্ব গিয়া পড়িবে প্রেসিডেণ্ট হুভারের স্কন্ধে। তহবিলে টাকা নাই, কাযেই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার Veto ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হইবেই। আর তাহা হইলেই তাঁহার President পদের স্থায়িত্বও আর অধিক দিন থাকিবে না। স্বাধীন দেশের স্বতন্ত্র কথা!

বৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড

রাজানুগত্যের শপথ ও আর্থিক বন্দোবস্ত লইয়া বৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডে আপোষ বন্দোবস্ত হইল না; লণ্ডনে ডি ভ্যালেরার সহিত বৃটিশ মন্ত্রীদের আলোচনা ফাঁসিয়া গেল; ডি ভ্যালেরা শূন্য হস্তে আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বৃটিশ মন্ত্রীরা তাঁহাকে সন্ধির 'পবিত্রতা', সাহচর্য্য ও বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং সাহায্যের মূল্য বুঝাইতে ত্রুটি প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু ইয়ামন ডি ভ্যালেরা এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, কলিন্স বা গ্রিফিথের মত তিনি লেনদেনের কথা বুঝেন না; কস্‌গ্রেভের মত কিছু ছাড়িয়া, কিছু ক্ষমা-ঘৃণা করিয়া বন্দোবস্ত করিতে চাহেন না, তিনি সেই যে এক জিদ ধরিয়াছেন,—আয়ার্ল্যাণ্ডের আত্মসম্মান আহত হইতে দিব না, বৃটেনের সহিত যখন সাম্রাজ্যের সমস্ত উপনিবেশের সমান আসন, তখন বৃটেনকে আয়ার্ল্যাণ্ড বাৎসরিক বৃত্তি দিবে না, রাজানুগত্যের শপথ ইচ্ছা হইলে গ্রহণ করিবে, না হইলে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিবে না,—সেই জিদ ছাড়িতেছেন না। তাঁহাকে ভয় দেখানও কম হয় নাই, যথা,—চুক্তি বা সন্ধিভঙ্গ অধর্ম্ম কার্য্য, আন্তর্জাতিক নীতির বিরোধী, কোন নিরপেক্ষ জাতিই—বিশেষতঃ বৃটিশ উপনিবেশিকরা তাঁহার এই গর্হিত কার্য্য কখনই সমর্থন করিবেন না, আলষ্টার তাঁহার এই ব্যবস্থায় কখনই সন্তুষ্ট হইবে না, পরন্তু ফ্রি ষ্টেটেরও অনেক লোক তাঁহার বিরোধী হইবে, চুক্তিভঙ্গ করিলে বৃটিশ নৌ-শক্তি তাঁহার দেশকে রক্ষা বা সাহায্য করিবে না, বৃটিশ জাতি তাঁহার দেশের সহিত বাণিজ্যের আদান-প্রদান করিবে না, ইত্যাদি। কিন্তু ডি, ভ্যালেরা অটল, অচল। তাঁহার আর যে অপরাধই থাকুক, তিনি যে ডি, ভ্যালেরা—তাঁহার ব্যক্তিত্বের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা তিনি সপ্রমাণ

ডি ভ্যালেরা

করিয়াছেন। বৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে পরিণামে যে সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত হউক, ডি, ভ্যালেরার নাম যে বৃটিশ ও আইরিশ ইতিহাসের পত্রাঙ্কে তাহার ছাপ রাখিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কুৎসা-প্রচার

মিস মেয়োর এক দোসর জুটিয়াছেন, তাঁহার নাম মিস প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডল। এই নারীটিও মিস মেয়োর মত মার্কিণ দেশে ভারতের কুৎসা-প্রচারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এই মার্কিণ নারীটি আবার মিস মেয়োর বন্ধু; সুতরাং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগও থাকিতে পারে। সে বলিতেছে, সে না কি এইবার লইয়া চারিবার ভারতে সফর করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে।

অভিজ্ঞতা কিরূপ শুনুন :—ভারতে বৃটিশ শাসন কোমল মধুর। পুলিসের 'মৃদু লাঠিচালনা' হইতে সে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে কি না, তাহা বলে নাই। কিন্তু বৃটিশ ভারতের জেলখানার কয়েদীদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার দেখিয়া একবারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে। এমন ব্যবহার না কি কয়েদীরা বাড়ীতেও পায় না, বোধ হয়, শ্বশুরালয়েও পায় না! তবে যে প্রায়ই জেলখানায় সত্যাগ্রহ হয়, কয়েদীরা প্রায়োপবেশন করে,—সে সব বোধ হয় সখ করিয়াই করে! কেহ কেহ বদমায়েসী করিয়া মাসেক দুমাস উপবাস করিয়া থাকে। জেলখানায় শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য অর্ডিনান্সের কল্যাণে যে সকল মোলায়েম নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিও বোধ হয়, এই স্ত্রীলোকটির মতে অতীব মোলায়েম! এই শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গীরা না ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া থাকে?

এই নারীটি কেমন নিরপেক্ষ দর্শক ও সমালোচক, তাহার নমুনা তাহার Quest for truth হইতে জানা যায়। ইহাতে সে দেখাইয়াছে যে, ভারতীয় পিতামাতারা তাহাদের শিশু-কন্যা হত্যা করিয়া থাকে। এত বড় পাহাড়ে মিথ্যাবাদী বোধ হয় তাহারই বন্ধু মিস মেয়ো ছাড়া আর কেহ নাই। ভারতে যদি এত শিশুহত্যা হইত, তাহা হইলে গত ১০ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি বাড়িল কিরূপে? যে দেশে ভাড়াটিয়া নার্সের উপর সন্তানপালনের ভার দিয়া জননী Night club or Nude club & অথবা Cinema ও অপেরায় রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া আরাম ও লালসা চরিতার্থ করিতে যায়, সে দেশের রমণীর মুখে ভারতের এই গ্লানি-প্রচার মানাইয়াছে ভাল! দুঃখের বিষয়, মিস কেণ্ডলের দলের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা সফল হইবে না। কেন না, এখন জগতের সকল দেশের লোকই এই নীচ প্রচারকার্য্যের উৎসের সন্ধান পাইয়াছে।

ফ্রান্সে গভর্ণমেণ্ট বদল

গত ৮ই মে তারিখে ফ্রান্সের Chamber of Deputies বা পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনের ফলে প্রধান মন্ত্রী M. Tardieuএর বিষম পরাজয় হইয়াছে এবং তাঁহার দলের পরিবর্ত্তে এখন Radical Socialistরাই ফরাসীদেশের ভাগ্য ও শাসননীতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন। তৎপূর্ব্বে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট Paul Doumeir আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এখন Edouard Herriot প্রধান মন্ত্রী এবং সেনেটর Albert Lebrun প্রেসিডেণ্ট হইলেন। ইহাতে ফরাসীর শাসননীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। M. Lebrun ফরাসী সাধারণতন্ত্রের চতুর্দ্দশ প্রেসিডেণ্ট। প্রধান মন্ত্রী M. Herriot পূর্ব্বে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আর একবার ফ্রান্সের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এতদুভয়ের যোগাযোগে এইবার ফরাসী দেশে Socialistদের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিশারদগণ অনুমান করিতেছেন যে,—"(১) The effect of the French policy would be revolutionary. হিরিয়ট সন্ধিসর্ত্তের মর্য্যাদা-রক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প, তিনি অস্ত্রসংবরণের পক্ষপাতী, কিন্তু ফরাসীর প্রাপ্য দাবীসমূহ কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝিয়া না লইয়া কোনও অস্ত্রসংবরণ নীতিতে সম্মতি দান করিবেন না। (২) লেব্রান প্রাচীনপন্থী ফরাসী রাজনীতিক। তিনিও সমস্ত সন্ধিসর্ত্তের মর্য্যাদা-রক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। তিনিও জার্ম্মাণীর জন্য আদৌ নরম হইয়া দয়াপ্রকাশ করিবেন না। তিনি ফ্রান্সের আপদশূন্যতার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবেন এবং জার্ম্মাণীর নিকট ক্ষতিপূরণ কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করিয়া লইবার জন্য জিদ করিবেন।"

তবেই য়ুরোপের ভবিষ্যৎ কিরূপ মেঘযুক্ত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। জার্ম্মাণী বলিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষতিপূরণের টাকা দিবেন না। সে ক্ষেত্রে ফরাসী যদি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে আবার এক বিষম সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার উদ্ভব হইবে। জগতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয়, সর্ব্বত্রই অর্থসঙ্কট উপস্থিত। তবে এক সুরাহা, লসেন বৈঠকে ফরাসী ও জার্ম্মাণীর একটা রফা হইয়া গিয়াছে।

রাজপথের দুর্ঘটনা

বুয়র যুদ্ধে বৃটেনের নিহতের সংখ্যা হইয়াছিল ৫ হাজার ৮ শত জন এবং আহতের ২২ হাজার ৮ শত জন। গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের রাজপথে নিহতের সংখ্যা হইয়াছিল ৬ হাজার ৭ সাত এবং আহতের সংখ্যা হইয়াছিল ২ লক্ষ ২ হাজার। সুতরাং বুয়র যুদ্ধে বৃটেনের যত লোক হতাহত হইয়াছিল, তদপেক্ষা যানবাহনের কল্যাণে বৃটেনের রাজপথে দুর্ঘটনায় মানুষ হতাহত হইয়াছিল অনেক অধিক! "মর্ণিং পোষ্ট" পত্র বলেন, এই বৎসরের দুর্ঘটনার সংখ্যা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের দ্বিগুণ এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পাঁচ গুণ! অর্থাৎ মোটর-গাড়ীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি

হইতেছে। অথচ এই সর্ব্বনাশা রোগের প্রতীকারের কি উপায় আছে? এই পত্র বলিতেছেন,—"গত বৎসর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার শতকরা ১০ জন কমিয়াছিল, কিন্তু তেমনই আহতের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, জনসাধারণ এ বিষয়ে আদৌ দৃষ্টিপাত করে না। যেখানে দুর্ঘটনা হয়, তাহার সান্নিধ্যে ঘটনার সময় একটু হৈ-চৈ হয়, তাহার পরে সব চুপচাপ! যদি একটা রেল-দুর্ঘটনায় ১৮ জন যাত্রী নিহত ও ৫ শত ৫৩ জন আহত হয়, তবে সপ্তাহকাল ধরিয়া সংবাদপত্রে তাহার সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা চলে এবং অপরাধীদিগের হাতে মাথা কাটিবার ব্যবস্থা করিতে জিদ করা হয়। কিন্তু বৃটেনের রাজপথে প্রত্যহ ১৮ জন দুর্ঘটনায় নিহত হয় আর ৫ শত ৫৩ জন আহত হয়, এ কথা সত্য হইলেও জনসাধারণের তাহাতে মাথাব্যথা হয় না।"

যান্ত্রিক সভ্যতা

ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলির অবস্থা ক্রমশ: শোচনীয় হইতেছে। অনেক মিলে ধর্ম্মঘট দেখা দিতেছে। কোন কোন কলে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে মজুরদের বেতন হ্রাস করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হ্রাসের সম্ভাবনা আছে। কয়টা কল বন্ধই হইয়া গিয়াছে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে কেবল ভারতবর্ষের বর্জ্জন আন্দোলনের ফল, তাহা নহে, ইহার মূলে জগতের অর্থসঙ্কটও আছে। তাহা ছাড়া জাপান ও অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতাও ইহার অন্যতম কারণ। ফল কথা, জগতে কল-কারখানার যুগের উদ্ভব হওয়ার পরিণাম এইরূপ হইবে বলিয়া মনীষী অর্থনীতিবিদ্‌রা স্থির করিয়াছেন। উহাতে দুই চারি জন বড় বড় ধনী হয় বটে, কিন্তু গ্রাম্য কুটীর-শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে বহু নর-নারী সহরের কল-কারখানার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জগতে কল-কারখানার পণ্য উৎপাদনে বিষম প্রতিযোগিতার ফলে যখন চাহিদার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হইতে থাকিল, তখন হইতে কল-কারখানার কাযও বাধ্য হইয়া কমাইয়া দিতে হইল। পণ্যের মূল্যহ্রাসও প্রতিযোগিতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিল। তাই মহাযন্ত্রনীতি জগতের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এ সমস্যার সমাধান এক ভগবান্ ভিন্ন কেহ করিতে পারেন না।

লসেনের আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মি: ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন,—"এই ঘোর সঙ্কট কেবল ফ্রান্সের নহে, কেবল ইটালীর নহে, কেবল জার্ম্মাণীর নহে, কেবল মার্কিণ বা বৃটেনেরও নহে, ইহা জগদ্ব্যাপী, সার্ব্বজনীন।" সত্যই তাই। জার্ম্মাণ যুদ্ধ এবং যান্ত্রিক সভ্যতা এই সর্ব্বনাশের মূল। পূর্ব্বে য়ুরোপের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ যাহা ছিল, এখন তাহার একার্দ্ধেরও কমে দাঁড়াইয়াছে। য়ুরোপের বেকার-সংখ্যা ২ কোটি হইতে আড়াই কোটির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এ মহাপ্রলয়ের সম্মুখীন হইয়া আজ প্রতীচ্যের বড় বড় রাজনীতিক ধুরন্ধররা ও অর্থনীতিবিদ্‌রা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকেই অনেক রকম পরামর্শের সুধা-ভাণ্ড লইয়া বিতরণ করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু কেহই সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইতেছেন না। বৃটেন আপন সাম্রাজ্যের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যে রক্ষণনীতি অবলম্বন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই জন্যই অটোয়া বৈঠকের আয়োজন। কিন্তু উহার ফলে য়ুরোপের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে।

লসেন ও জেনিভা

আসল কথা, স্বার্থ আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে কোনও কন্‌ফারেন্স বা কমিটী কিছুই করিতে পারিবে না। অস্ত্রসংবরণ বৈঠক বা ক্ষতিপূরণ বৈঠক, যুদ্ধঋণ-পরিশোধ বৈঠক বা শান্তি-বৈঠকই বসান হউক, যতক্ষণ জার্ম্মাণ-যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জগতের শক্তি-সমূহ কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ না করিতেছেন, ততক্ষণ এই মহাপ্রলয় নিরুদ্ধ করা সম্ভবপর হইবে না। মুখে শান্তি শান্তি রব,—অথচ কার্য্যে বিমানযোগে বোমা ফেলিয়া গ্রামনগর ধ্বংস করার মধ্যে কি সামঞ্জস্য থাকিতে পারে?

জার্ম্মাণী বলিতেছেন, আমরা আর ক্ষতিপূরণের এক পয়সাও দিব না, ফরাসী বলিতেছেন, ক্ষতিপূরণের টাকা আমরা কিছুতেই ছাড়িব না। কেহ বলিতেছেন, স্বর্ণমান ছাড়িয়া স্বর্ণ, রৌপ্য দুই মানই প্রচলন করা হউক, তবেই জগৎ বাঁচিবে। আবার অপরে বলিতেছেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না।

সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার বলিয়াছেন,—মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট হুভার। তিনি জলদ-গম্ভীরনাদে বলিয়াছেন,—শক্তিপুঞ্জ এক-তৃতীয়াংশ অস্ত্র সংবরণ করুন, তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হইবে। মার্কিণ প্রতিনিধি বৈঠকে জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন যে, যদি য়ুরোপ অস্ত্র সংবরণ না করে, তাহা হইলে মার্কিণ ঋণের কড়ির এক পয়সা ছাড়িবে না। প্রেসিডেণ্ট হুভারের অস্ত্র-সংবরণের আরও কয়টি প্রস্তাব আছে, যথা,—(১) ট্যাঙ্ক সাহায্যে যুদ্ধ, (২) রাসায়নিক বিদ্যা সাহায্যে যুদ্ধ, (৩) বিমানযোগে বোমা ফেলিয়া যুদ্ধ এবং (৪) বড় বড় কামান লইয়া যুদ্ধ তুলিয়া দেওয়া।

প্রেসিডেণ্ট হুভারের এই প্রস্তাব ইটালী সর্ব্বান্ত:করণে গ্রহণ করিয়াছেন, জার্ম্মাণী ও অন্যান্য ২০টি য়ুরোপীয় ক্ষুদ্র শক্তিও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ফরাসী একবারে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ফরাসী জার্ম্মাণীর নিকট কোনরূপ জামিন (secur.ty) না লইয়া অস্ত্রসংবরণ করিতে সম্মত নহেন, ক্ষতিপূরণের টাকাও ছাড়িতে চাহেন না, তবে ৩ বৎসরে শোধের ওয়াদা দিয়াছেন।

দর-কষাকষি খুবই চলিতেছে। জার্ম্মাণী বলিতেছেন,—আপাতত: এক কাণা কড়িও দিতে পারিব না, তবে যখন দিব, তখন একবারে মোটা টাকা দিয়া দিব। ফরাসী চটিয়া আগুন। তাঁহার পক্ষ হইতে বলা হইতেছে, "বা:, ভার্সাইল সন্ধিপত্রখানা চোতা কাগজ না কি? জার্ম্মাণী সন্ধির সর্ত্ত মানিবে না কেন? জার্ম্মাণীর অবস্থা কি মন্দ? জার্ম্মাণীর সুন্দর সহরগুলি দেখিলে ত তাহা কেহ বলিবে না। জার্ম্মাণরা খায় দায় ভাল, পরেও

কাপড়-চোপড় ভাল, জার্ম্মাণীর আমোদ-প্রমোদ খেলা-ধূলারও ত কামাই নাই। জার্ম্মাণ কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল, রেঁস্তোরাও ত চলিতেছে ভাল। তবে জার্ম্মাণী টাকা দিবে না কেন ? এ সব কি নষ্টামী নহে ?”

বৃটিশ মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড দেখিতেছেন মহা বিপদ ! যদি লসেন ফাঁসিয়া যায়, তাহা হইলে জগতের অর্থ-সঙ্কট দূর হইবার আর কোনও উপায় থাকিবে না। তাই তিনি দূতীর মত ঘুরিয়া ফিরিয়া দুই দিকেই গাওনা করিতেছেন ; যদি জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সে এখনও মিটমাট হয়।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

যাহার যেখানে স্বার্থ, সেখানে ঘা দিবার যো নাই। বৃটেন জলের ও আকাশের শক্তি ছাড়িবেন না, তবে সাবমেরিণ কমাইতে বা স্থলের সৈন্য কমাইতে রাজী। ফরাসী স্থলের সৈন্য কমাইতে রাজী নহেন। তবে শেষ মুহূর্ত্তে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের দূতিয়ালী সার্থক হইয়াছে। জার্ম্মাণী য়ুরোপের পুনর্গঠনে টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন, ফরাসীও তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। সন্ধিপত্রে জার্ম্মাণদের জন্য মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল,—এ কথাটা তুলিয়া দেওয়া সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন শান্ত হোক বসুন্ধরা ; ইহাই কামনা।

শ্যামে ওলোট-পালোট

প্রাচ্যের শ্যামরাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ওলোট-পালোট হইয়া গেল। কিন্তু এই বিপ্লবে রক্তপাত হয় নাই বলিলেই হয়। বিনা রক্তপাতে একটা রাজ্যের শাসনতন্ত্রের এত অল্পসময়ের মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন জগতে বিরল—এ সদ্‌দৃষ্টান্ত প্রতীচ্যের সভ্যতাভিমানী শক্তিপুঞ্জের পক্ষে অনুকরণীয়।

শ্যামরাজ্য স্বাধীন, ইহার রাজবংশীয়রা বাঙ্গালারই মানুষ, এ গর্ব্ব করিবার অধিকার আমাদের আছে। বহু প্রাচীনকালে মলয়-উপদ্বীপে ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে বাঙ্গালী বিজেতারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, বহু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শ্যামরাজ্যের রাজা চূড়ালঙ্করণ, ষষ্ঠ রাম এবং বর্ত্তমান রাজা প্রজাধিপকের নামই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যুবরাজের নাম পরিবত্র (পবিত্র ?), রাজভ্রাতার নাম নগরস্বর্গ, সেনাপতির নাম প্রিয়সেনাসংগ্রাম, জেনারল ষ্টাফের কর্ত্তার নাম শ্রীরাজ দেবোজয়, অন্য এক রাজকুমারের নাম ধর্ম্ম, এক রাজপ্রাসাদের নাম দুষিত, অন্যের নাম পুরুযশ, একটি রাজপথের নাম নৌকর্ণ জয়শ্রী রোড, অন্যের নাম রাজদমন এভেনিউ।

তাহা ছাড়া শ্যামের অধিবাসীরা বাঙ্গালীরই মত কাপড়-চোপড় পরে, খায়-দায় ; তাহাদের অনেক আচার-ব্যবহার বাঙ্গালীরই মত। সুতরাং বাঙ্গালীর বংশধররা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং তথায় স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের পরিবর্ত্তে রাজাকে বিনা যুদ্ধে গণতন্ত্রমূলক শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে বাধ্য করিয়াছে, ইহাও বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

বিপ্লবের ইতিহাস বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। বিপ্লবের সময় রাজা প্রজাধিপক রাজধানী ব্যাঙ্ককে ছিলেন না, প্রথামত দক্ষিণাঞ্চলের হোয়াহিন নামক স্থানে অবসরবিনোদন করিতেছিলেন। গত ২৪শে জুন প্রত্যূষে ৫টার সময় প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হয়। স্থল ও নৌসৈন্যদের সহযোগিতায় Peoples Party অথবা প্রজাসমিতি মুহূর্ত্তমধ্যে রাজধানীর চারিদিকের আট-ঘাট বাঁধিয়া ফেলে এবং রাজভ্রাতা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, সেনাপতি প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া দুষিত প্রাসাদের অনন্তসমাগম নামক সিংহাসনকক্ষে আনয়ন করে। বন্দী করিবার কালে একটি গোলাগুলীও ছুটে নাই, কেহ হতাহত হয় নাই, কেবল নৌকর্ণ জয়শ্রী রোডে ১ম গার্ড ডিভিসনের সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর-জেনারল প্রিয়সেনাসংগ্রাম বিদ্রোহীদের কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গুলী করিয়া নিহত করা হইয়াছিল।

শ্যামদেশের রাজা প্রজাধিপক ও রাণী রামবাই বার্নি

বিদ্রোহীরা অতঃপর রাজাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য হোয়াহিলে একখানি গান-বোট পাঠাইয়া দেয় এবং বলিয়া দেয় যে, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইবে না, তবে তাঁহাকে গণতন্ত্র-শাসনাধীনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজ্য-শাসন করিতে হইবে। রাজা শেষোক্ত সর্ত্তে সম্মত হন, কিন্তু গান-বোটে যাওয়া অপমানজনক বলিয়া ট্রেণে করিয়া রাজসম্মান সহ রাজধানীতে যাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। প্রজাসমিতি তাহাতে সম্মত হয়। রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজকুমার ষষ্ঠী, পুরছত্র ও সিংহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু যুবরাজ পরিবত্রকে সপরিবারে শ্যামদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে; সম্ভবতঃ তিনি য়ুরোপে গিয়া বসবাস করিবেন।

পিপলস্ পার্টি যে হাণ্ডবিল বিলি করেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল:—"রাজার শাসন-নীতি প্রজাপক্ষের হতাশার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি রাজকুমারদের ও রাজপুরুষদের এমন সব রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা প্রজাদের উৎপীড়ন করিতেছেন, নানারূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ধনবান্ হইতেছেন। এ জন্য দেশে অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে। দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছে। প্রজার উপর গুরুকরভার চালাইয়া রাজকোষ পূর্ণ করা হইয়াছে। এই সকল কারণে এই স্বৈরাচারমূলক শাসনের উচ্ছেদসাধনের সময় আসিয়াছে। পার্লামেণ্টের পরামর্শাধীন নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।"

রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পিপলস্ পার্টির নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করেন। এই ঘোষণায় শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনকে আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা হয়। ঘোষণায় আরও বলা হইল যে,—"কয়েক জন রাজবংশীয় ও রাজপুরুষকে বন্দী করা হইলেও উহা করা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। প্রজাবর্গের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার জন্য এবং সহজে পরিবর্ত্তন সাধিত করিবার জন্য এরূপ করা হইয়াছিল। রাজা নিয়মতান্ত্রিক শাসন সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, পিপলস্ পার্টি যাহা করিয়াছেন, তাহা ঠিকই করিয়াছেন। উহার মূলে কোন মন্দ উদ্দেশ্য নাই। রাজা এই হেতু এই কার্য্য সমর্থন করিতেছেন।"

এইরূপে রাজায় প্রজায় বিনা যুদ্ধে শ্যামরাজ্যে প্রজার ইচ্ছানুসারে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। গণদেবতার পূজা এখন জগতের সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা কালের ভেরীব পরিচায়ক। এই কালস্রোতের বিপক্ষে সকল বাধাই জাহ্নবী-স্রোতে মত্ত মাতঙ্গের মত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

"ধরার মেয়ে"

তুমি অতুলন, তুমি অনুপম, রূপসী তোমারে বরণ করি!
তুমি র'য়ো মোর হৃদি আলোকিয়া সারাটি জীবন-মরণ ভরি'!
নয়ন তোমার কত মধুময়
অমিয়া-নিঝর মম মনে লয়,
অলকার যত রূপসী বালার মাধুরী আনিলে হরণ করি'!
আমি কি ছিলাম পিয়াসী যক্ষ? কেমনে সে কথা স্মরণ করি!

বিম্বিত তব বিম্ব-অধর; সরোবর জলে ভাসিছ তুমি!
ছায়া পেয়ে বুঝি নহে সে তুষ্ট, কায়াটিরে চায় লইতে চুমি।
আকাশের চাঁদ হয়ে আনমনা
ছড়ায়ে ফেলেছে কত না জ্যোৎস্না!
ওপারে তাহার হ'ল নাক যাওয়া, মাঝ-পথে এসে বাঁধিল তরী!
তব অনুপম তনু শোভা মম হেরিছে সে দুটি নয়ন ভরি'!

সুন্দরী বালা, আজিকে নিরালা কি ভাবিছ ব'সে অন্যমনে?
বুঝি গো বিগত জনমের কথা অথবা কি কোন ধন্য-জনে?
চাহনি তোমার ত্রিভুবন হ'তে
ভেসে গেছে কোন্ ভাবনার স্রোতে—
কেহ বুঝি কিছু মিনতি করেছে তোমার ও দুটি চরণ ধরি'?
তাই বুঝি তুমি আনমনা হ'লে ভিখারীর মুখ স্মরণ করি'?

জ্যোছনার ডালি নিয়ে চলেছিল গগনের পারে প্রিয়ার কাছে—
তায় সুধাকর জানিত কি এই ধরায়ও সুধার আকর আছে?
হেরিয়া তোমারে সোপান-শিলায়
তাহার প্রিয়ার স্বপন মিলায়!
গগন-পারের তীর্থ তাহার গগনেরি পারে রহিল পড়ি'
তোমারে দেখিয়া ভুলে গেল সব, মাঝ-পথে এসে বাঁধিল তরী।

ঘরে ফিরে যাও রাত হয়ে এল, সোপান-শিলায় থেকো না আর,
মনে যদি কেহ দিয়ে থাকে ব্যথা, কোনো কথা মনে রেখো না তার।
রাঙা পদতলে অথৈ শীতল
কালো জলরাশি করে টলমল,
এখনো তোমার নয়নের জলে ভেজে নি বুকের নীলাম্বরী,
জল-ছলছল সরসী তোমারে সাধিতেছে কেন চরণে পড়ি'?

ওঠো সুন্দরি, রাত বেড়ে যায়, কাননে পাখীরা কূজে না আর,
আনমনা হেরি অভিমান করি' শুকালো গলার বকুল-হার;
তব পথ চেয়ে যারা ধরণীতে
জেগে আছে এই গভীর নিশীথে
তাদের কুটীরে এস ধীরে ধীরে, লইতে এসেছি সঙ্গে করি'
এ মাটীর পানে মুখ তুলে চাও, স্বর্গ রহুক স্বর্গে পড়ি'!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

চয়ন

গুলী-প্রতিরোধক দুর্গ

প্রকাণ্ড নহে, ছোটখাট, দুর্গবৎ সুদৃঢ় গৃহ। ইস্পাতের দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ অট্টালিকাকে রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত। বন্দুক বা পিস্তলের গুলী এই সুদৃঢ় ইস্পাত-গৃহকে ভেদ করিতে পারে না। চিকাগোর একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকার সম্মুখভাগে এই দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক দল সশস্ত্র রক্ষী সর্ব্বদা গুলী-নিবারক বাতায়নের অন্তরালে অবস্থিত থাকে। সেই বাতায়ন-

গুলী-প্রতিরোধক ইস্পাতনির্ম্মিত দুর্গ

পথে বাহিরের চারিদিক্ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক বাতায়নের নিম্নে একটি করিয়া ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে বন্দুক রাখিয়া গুলীবর্ষণ করা যায়। ইস্পাত-দুর্গের উপরিভাগে রাত্রিকালে আলো জ্বলিয়া উঠে। সেই আলোকধারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। বিপদ্‌জ্ঞাপক সঙ্কেত করিবার বহু প্রকার ব্যবস্থা আছে। তাহাতে অট্টালিকার সর্ব্বত্র সেই সঙ্কেত প্রেরিত হয়।

বর্ণের সাহায্যে বেহালা শিক্ষা

পূর্ব্ব-শিক্ষা না থাকিলেও সহজ সুরগুলি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে যে কেহ আয়ত্ত করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা বিজ্ঞানের সাহায্যে ঘটিয়াছে। নিউইয়র্ক সহরে এই প্রণালীতে সঙ্গীত-শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। অতি অল্পকাল শিক্ষা-প্রাপ্তির পর ৪০টি
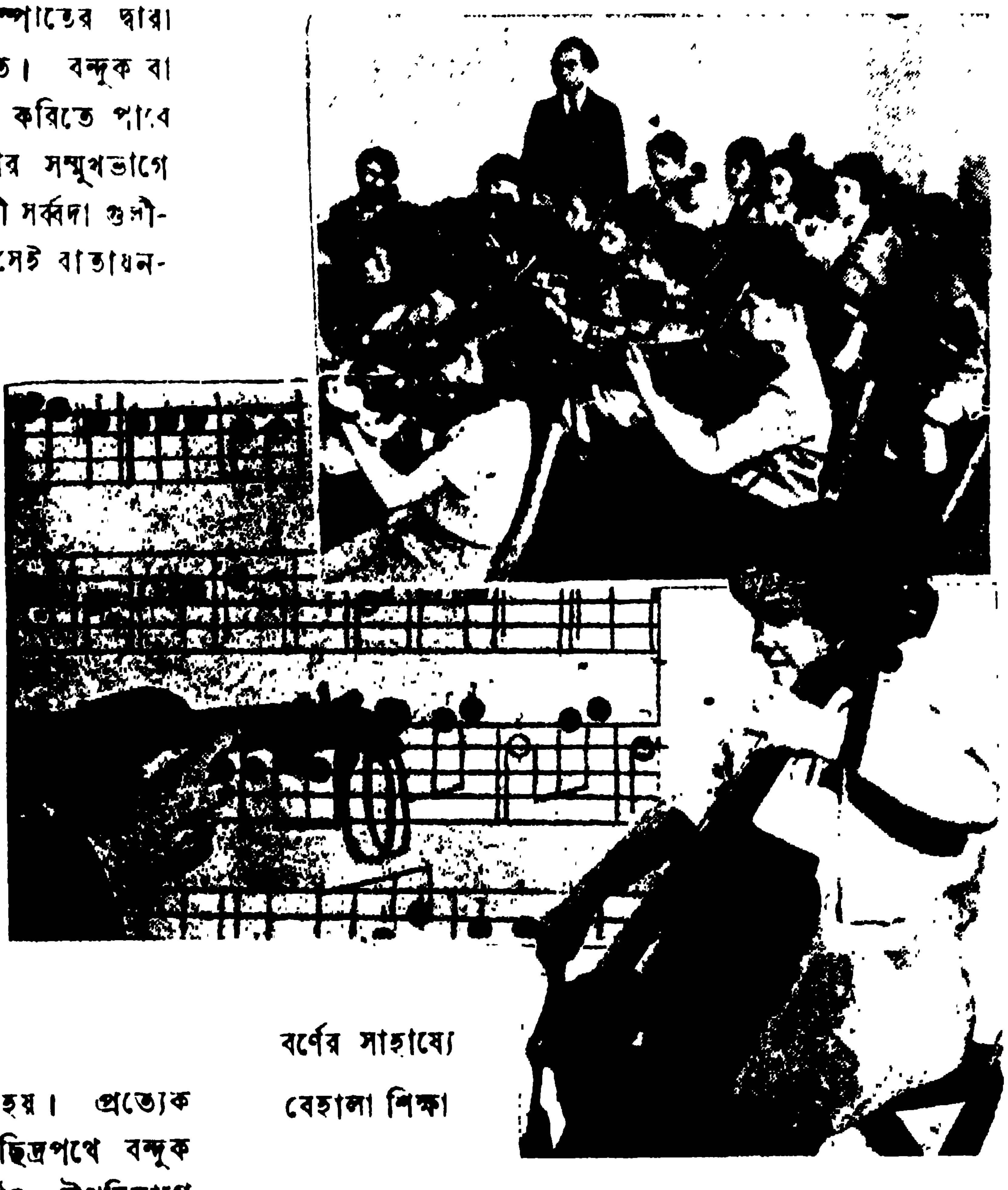
বর্ণের সাহায্যে বেহালা শিক্ষা

ছাত্র ছাত্রী—৫ হইতে ১১ বৎসরের অধিক বয়স কাহারও হয় নাই, সম্প্রতি এ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছিল। নূতন শিক্ষাপ্রদান-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য শুধু বর্ণ-রঞ্জিত সুরগ্রাম। সুর-সপ্তকের প্রত্যেকের এক একটি বর্ণ আছে। বেহালার যেখানে অঙ্গুলি-চালনা করিতে হয়, তথায় অনুরূপ বর্ণ-রঞ্জিত দাগ কাটা আছে। চারিটি তন্ত্রীতেও স্বতন্ত্র বর্ণানুরঞ্জন আছে। ছড়িটি কি ভাবে কখন্ চালনা করিতে হইবে, বর্ণের সাহায্যে তাহারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থায় সহজেই যে কোন গৎ বাজাইতে পারা যায়।

ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার আলোকস্নান

চিকাগোর সন্নিহিত কোনও স্থানে এক বৃহৎ অশ্বশালায় ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়াকে আলোকস্নান দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার আলোকস্নান

ইহাতে ঘোড়ার শরীর বেশ ভাল থাকে। এই ভাবে আলোক-স্নানের সাহায্যে অশ্বকে প্রতিপালন করিলে, তাহার দেহে কোন পীড়া ঘটে না। ঘোড়-দৌড়ের সময় অভীষ্ট ফললাভ করা যায়।

বীর-পূজা

নিউইয়র্কের লং আইল্যাণ্ডের পথের ধারে হার্কুলিসের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। উক্ত স্থানের তরুণীরা এই বীর-মূর্ত্তিকে প্রকারান্তরে পূজা করিয়া থাকে। "ওহিও" নামক জাহাজের ভগ্নাবশেষ হইতে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। মণ্টাক্ রাজপথের ধারে উহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মূর্ত্তির নিম্নভাগে একটি ফলকে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে—এই দেবতার গণ্ডে যদি কোন কুমারী তরুণী চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দেয়, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার ভাগ্য-ফল নির্ণীত হইবে। যদি কোন কুমারী এই মূর্ত্তি বহিয়া উপরে উঠে এবং বীরের ললাটদেশে তাহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করায়, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে তাহার বিবাহ ঘটিবে। তরুণীরা এই হার্কুলিস মূর্ত্তির বিশেষ ভক্ত।

বীর পূজা

নৌ-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

নিউপোর্টে যাহারা নাবিকের কার্য্য শিক্ষার জন্য গমন করে, তাহারা সমুদ্রে গমন না করিয়া, জাহাজে না চড়িয়া, জাহাজের

নৌবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

প্রত্যেক অংশের সহিত যাহাতে সুপরিচিত হইতে পারে, সেই ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। একখানি যুদ্ধ-জাহাজের নমুনা থাকে। উহার প্রত্যেক অংশের নমুনা দেখিয়া শিক্ষার্থী সবই জানিয়া লয়।

অধমর্ণের চেয়ার

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতীচ্যদেশে কোনও লোক টাকা ধার করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে না পারিলে, তাহাকে বলপূর্ব্বক একখানি চেয়ারে বসাইয়া দেওয়া হইত। এই চেয়ারের বা আসনের নাম "অধমর্ণের চেয়ার।" ওয়াশিংটনে এই চেয়ারের একখানি নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই আসনখানিতে নানাবিধ কারুকার্য্য আছে। আসনটির বৈশিষ্ট্য এই যে, কেহ উপবেশন করিবামাত্র উহা পশ্চাতে হেলিয়া পড়ে। উহাতে এমন কল-কৌশল আছে যে, হেলিয়া পড়িবামাত্র অধমর্ণকে আসনের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। তখন আর তাহার নড়িবার শক্তি থাকে না। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অধমর্ণকে এই ভাবে দণ্ড প্রদান করা হইত। চেয়ারে আবদ্ধ হতভাগ্য যখন নিষ্ক্রিয়

অধমর্ণের চেয়ার

হইয়া পড়িত, তখন হয় তাহার অঙ্গে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইত, নয় ত বালতি করিয়া তাহার অঙ্গে জল ঢালিয়া দেওয়া হইত। উত্তমর্ণকেই সে কার্য্য করিতে হইত।

প্রাচীন যুগের খড়্গধারী গণ্ডার

মনটানার ব্যাডল্যাণ্ডস্ নামক স্থানে প্রাচীন যুগের একটি খড়্গধারী গণ্ডারের কঙ্কাল আবিষ্কার করা হইয়াছে।

অতিকায় গণ্ডার

এরূপ বৃহৎ খড়্গী গণ্ডার বর্ত্তমান যুগে নাই। মস্তকের তুলনায় ইহার দেহ কিরূপ অতিকায় ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দ্রুতগামী মোটর

ইংলণ্ডে সম্প্রতি এক প্রকার মোটরগাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার মোটর গাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত। এই গাড়ী একাদিক্রমে ৩৬ ঘণ্টা দ্রুত-বেগে চালিত হইবে—একবারও থামিবে না। এই গাড়ীর আকৃতিও অসাধারণ। কারণ, যাহাতে বায়ু ইহার গতি-বেগকে কোনও-রূপে প্রতিহত করিতে না পারে, সেই প্রণালীতেই ইহা নির্ম্মিত। পশ্চাতের দিকে বিশিষ্ট-জাতীয় কাচ-বাতায়ন আছে। পশ্চাতের দৃশ্য উত্তমরূপে দেখিবার উদ্দেশ্যেই উহা নির্ম্মিত।

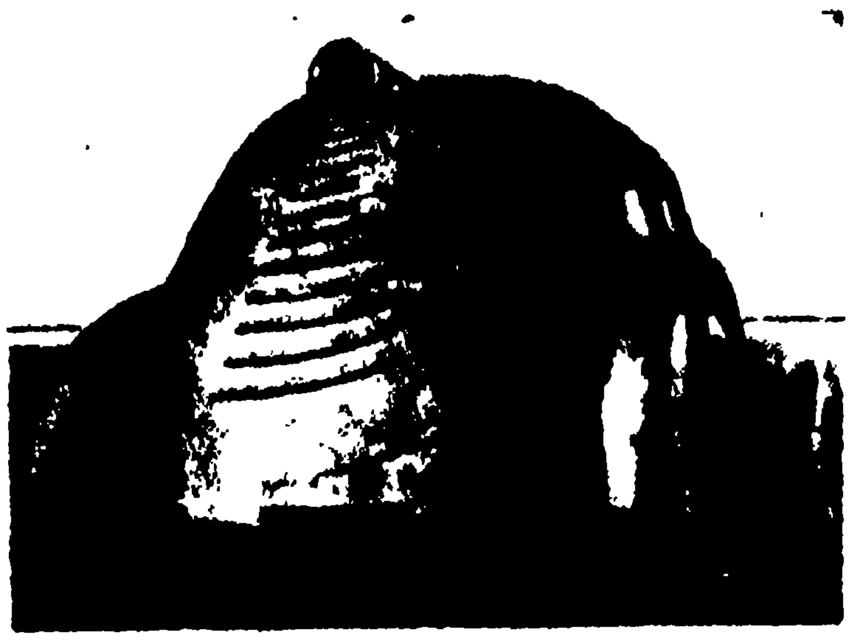

দ্রুতগামী মোটর

প্রাচীন যুগের কীর্ত্তি

জার্ম্মাণ ভূতত্ত্ববিদ্ বাহুমান্ মোস্কো সহর দেখিতে গিয়াছিলেন। বাসের্ন মঠ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন। উহা ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভূতত্ত্ববিদ্ বলেন, এই মঠের দেহে সে যুগে রবার গলাইয়া তাহার দ্বারা অঙ্গরাগ করা হইয়াছিল বলিয়া এখনও তাহার ঔজ্জ্বল্য সমভাবে বিদ্যমান আছে। জলবায়ু প্রভৃতির আক্রমণে তাহার অঙ্গের কোথাও সামান্য বিবর্ণতা প্রকাশ পায় নাই।

প্রাচীন কীর্ত্তি

পথ-পরিষ্কারক যন্ত্র

প্যারী নগরীর রাজপথ-সমূহ হস্তচালিত যন্ত্রের দ্বারা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। এই যন্ত্রগুলি দেখিতে ছেলে-মেয়েদের ঠেলা গাড়ীর মত। যন্ত্রগুলি হাতে ঠেলা গাড়ীর মতই পথের উপর দিয়া ঠেলিয়া লওয়া হইয়া থাকে। যন্ত্রের সহিত একটি ব্রাস সংশ্লিষ্ট থাকে। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলেই ব্রাস আবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহার ফলে যাবতীয় জঞ্জাল গাড়ীর নিম্নস্থ আধারে সঞ্চিত হয়।

পথ-পরিষ্কারক যন্ত্র

বিবর্ত্তন

(উপন্যাস)

৪

অনিমেষের ফিরিতে সে দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। স্নানাহার সারিয়া সেই যে তাদের দুজনকার মধ্যে তর্ক-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তার আর শেষ নাই। বৈকালে চায়ের টেবিল হইতে যখন বয় খবর দিতে আসিল, তখনও তুমুলভাবে তর্ক চলিতেছিল, তার মধ্যেই সুচারু বলিল, "চল, চা খেতে খেতে তোমার এ কথার উত্তর দেওয়া যাবে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, একটু না ভিজিয়ে নিলে আর চলছে না।"

অনিমেষ হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে তুমি চা খেয়ে এস, আমি এইখানেই বসি।"

সুচারু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, চা কি তুমি খাও না?"

অনিমেষ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, তার পর কথার জবাব দিল, বলিল—"ও সব জোটে কোথা? যে দিন যা পাই, তাই খাই, আজ ত অনেকই জুটে গেছে। আজ যা খেয়ে নিয়েছি, দু' তিন দিন এখন না খেলেও চ'লে যেতে পারবে।"

সুচারু এ অভিব্যক্তির কোন সম্যক প্রতিবাদ খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিয়া উঠিল, "পাগল!"

অনিমেষ কহিল, "না সত্যি, যথেষ্ট খাওয়া হয়ে গেছে। তোমার মাসীমা নিজে ব'সে খাওয়ালেন, কিছুতেই 'না' বলতে পারলুম না। আর কি যত্ন ক'রে খাওয়ানো, 'না' বলাও যায় না। হ্যা হে! উনি তোমার নিজের মাসীমা না মাসশাশুড়ী?"

সুচারুর মুখটা ঈষৎ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে লজ্জিত-ভাবে ঈষৎ হাস্য করিল; বলিল, "মাসীও নন, শাশুড়ীও নন, উনি এই এঁদের মাসীমা, ওঁরই এই বাড়ী।"

অনিমেষ এ কথার কোন অর্থোপলব্ধি করিতে না পারিয়া ছোট করিয়া বলিল, "ওঃ", তার পর ক্ষণকাল নীরব থাকার পর পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে কি এটা তোমার শ্বশুরবাড়ী নয়? আমি ত তাই ভেবেছিলুম।"

সুচারু মৃদু হাসিয়া কহিল, "খুবই অন্যায় কিছু হয় ত ভাব নি। তবে বর্ত্তমানে শ্বশুরবাড়ী নয়, ভবিষ্যতের বটে অর্থাৎ এই বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে আমি বিবাহের জন্য বাগ্‌দত্ত।"

অনিমেষ এ সংবাদে খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, "বাঃ, বেশ মজা ত! বাগ্‌দত্ত? বিয়ের আগেই শ্বশুরঘর করছো? আচ্ছা, ঐ মেয়েটি—ঐ সুরুচিদেবী—উনি তোমার ভাবী শ্যালিকা বোধ হচ্ছে, না?"

সুচারু সকৌতুকে কহিল, "কেমন, খাসা মেয়ে না?"

অনিমেষ অন্তরের সহিত সায় দিয়া বলিল, "চমৎকার!" পরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁর দিদিটিও বোধ করি ওঁর চাইতে নিরেস নন?"

সুচারু কহিল, "চল না, চায়ের টেবলে পরিচয় ক'রে দেব, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে নিলেই ত পারবে।"

অনিমেষ সম্মত হইল না, আপত্তি করিয়া কহিল,—"সে এর পর এক দিন যদি তাঁর ইচ্ছা হয় ত হবে, আজ আর নয়। আজ আমায় ছেড়ে দাও। যাও তুমি, তোমাদের চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, ওঁরা হয় ত প্রতীক্ষা করছেন, দেরি করো না, যাও। আমি ততক্ষণ এই খবরের কাগজটা দেখি।"

কিছুক্ষণ আগে একটা উদ্দীপরা চাকর ডাকে আসা কালকের খবরের দৈনিক কাগজ একখানা সামনের টিপয়ের উপরেই রাখিয়া গিয়াছিল, সুচারু তার মোড়কটা ছিঁড়িয়া খবরের পৃষ্ঠার হেডলাইনগুলার উপরে শুধু একবার চোখ বুলাইয়া গিয়াছিল, সেইখানা সে তুলিয়া লইয়া তার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। অগত্যা সুচারু তাহাকে আর কিছু না বলিয়াই উঠিয়া গেল। অনিমেষকে সে ত আজ জানিল না, সে যেটা করিতে চাহে না, সেটা তাকে করাইতে কাহারও সাধ্য নাই। তবে সুরুচির কথায় সে যে তখন তাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়া লইল, সে শুধু নিতান্ত অপরিচিত ভদ্র-কন্যার অনুরোধ বলিয়াই সম্ভব। তার পর সে মনে মনে ঈষৎ চিন্তিত হইল। শুধুই কি তাই? সুরুচির অতিসুন্দর মুখখানি কি এর মধ্যে একটু-খানিও কায করে নাই? মনের মধ্যে আবছাভাবে একটা ছায়া দেখা দিলেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হইল না। অনিমেষের মনটা যে কত শক্ত, তার পণ কত দৃঢ়,

সুচারু তা জানে। এ সব মানুষ একখানি তরুণ মুখের মৃদুহাস্যে ভাসিয়া যাওয়ার মানুষ নয়। ওটুকু তার সহজ ভদ্রতা মাত্র।

খবরের কাগজে অনেক আবশ্যক অনাবশ্যক, সোজা-সুজি এবং আজগুবি খবর চোখে পড়িল, সিনেমার বড় বড় বিজ্ঞাপনে কাগজের পৃষ্ঠা ভর্ত্তি! অনিমেষ একটা নিশ্বাস ফেলিল, লোক সিনেমা দেখিতে যা পয়সা খরচ করে, সেটা খরচ করিলে পল্লীগ্রামের প্রায় সব পুকুর সংস্কার করা যায়; যেখানে পুকুর নাই, সেখানে টিউব ওয়েল বসান যায়। কাগজটা নামাইয়া রাখিয়া সে ঘরটাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

বেশ বড় মাপের ওল্ড গোছেরই ঘর! শার্সি চুণ-ফেরানো ও কাঠের রং শেষ করা হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। উপরে পাঁচ ডালের বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলিয়া আছে, অবশ্য তাতে বাতি পরানো নাই, জ্বলে না। টানা-পাখায় বোধ করি এক সময়ে ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে মিলন করিয়া পেন্টিং করা ছিল, তা আছে, কিন্তু ঘরের দেওয়ালে এখন সে পেন্টিং নাই, বোধ হয়, নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাই তার উপর চুণ ঢাকা দেওয়া হইয়াছে। ঘরে এক সেট বেশ ভারি ওজনের লম্বাচৌড়া কৌচ কেদারা আছে, তারও ঢাকনাগুলা নূতন তৈরী করা। দেওয়ালে যে সব বড় বড় অয়েলপেন্টিং টাঙ্গানো, সে সব দেখিলেই বেশ জানা যায় যে, এই ঘরখানি যখন প্রথম সাজানো হয়, তখন ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব আরম্ভ হয় নাই, আর যদিই হইয়া থাকে, তবে সে নেহাৎই এক আধ বছর মাত্র।

দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা চওড়া সোনালী হল-করা ফ্রেমে বাঁধা দাগ ধরা আয়না, গিল্টি করা দেওয়ালগিরি সেই আয়না ক'খানার মাথায় মাথায় এবং এই ঘরের চারিধারের চারিটা কোণে কোণে চারিটা শ্বেতপাথরের টিপয়ের উপর খড়ির পুতুল, খুব সম্ভব এ কয়টা ইটালীয়ান আর্টেরই কোন পাশ্চাত্য অনুকরণ। এ ভিন্ন মধ্যের প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের টেবিল; তার বনাতের টেবিলক্লথের উপর রক্ষিত আছে—তিন ডালের একটি প্রকাণ্ড বেলওয়ালী ফুলদানী। ফুল কিন্তু একটিও তাহাতে নাই। যেহেতু, বাগানে ত ফুল ফোটে না।

অনিমেষ বসিয়া বসিয়া মনে মনে একটা অঙ্ক কষিল, এই সব জিনিষপত্র মিউজিয়মে দিয়া আসিলে সেখান হইতে কত টাকা পাওয়া যাইতে পারে এবং সেই টাকায় এ গাঁয়ের কয়টা পুষ্করিণী সংস্কার করা যায়?

দামটা কিন্তু খুব মনঃপূতমত উঠিল না। এ সবের মূল্য বাড়িবে আরও দু' এক শতাব্দীর পরে, এদের সময় এখনও খুব দূরের অতীতে মিলিত হয় নাই।

সুচারু চা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। তাদের চায়ের টেবল বোধ করি খুব বেশী দূরে নয়, এই ঘরের ওদিকে বাড়ীর ঐ পিছনকার বারান্দাতেই পড়িয়াছিল। অনিমেষ সে দিকে কাণ না দিলেও অনাহূতভাবে তার কাণে আসিয়া দু'চারিটা সাড়াশব্দ প্রবেশ করিতেছিল। সুচারুর রহস্যপূর্ণ কলঝঙ্কারী উচ্চ হাস্যই পুনঃপুনঃ শব্দিত হইয়া উঠিতেছিল, আর বড় কিছু তার কাণে পৌঁছে নাই। ফিরিয়া আসিয়া সুচারু দেখিল, অনিমেষ অনিমেষে তার ঠিক সামনের দেওয়ালে দরজার খিলানের উপরে রক্ষিত একখানা তৈল-চিত্রকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সুচারু জানিত, ছবিখানা কি, তবু সে কাছে আসিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিল,—"কি দেখছো অত ওকে?"

অনিমেষ তার দৃষ্টি যথাস্থানে নিবদ্ধ রাখিয়া গভীর বিষাদপূর্ণ ভগ্নকণ্ঠে মৃদু মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিল,—

"যাত্রী তোমার সাক্ষাতে ওই পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইবের খঞ্জর।"

সুচারুর হাসি মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া আসিল, একখানা গদিমোড়া চেয়ারে সে বসিয়া পড়িয়া নীরব রহিল। উপ-হাসের বাণী যা তার মুখের আগায় আসিয়াছিল, সে তাহা চাপা দিয়া লইল। অনিমেষের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, যার পর আর হাসি আসে না।

ক্ষণকাল তেমনই করিয়া চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া তার পর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনিমেষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ তা হ'লে আসি, সুচারু!"

সুচারু কি যেন ভাবিতেছিল, চকিত হইয়া মুখ তুলিল। অনিমেষকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এরই মধ্যে? আর একটু সন্ধ্যা হোক না, এখনও ত বেলা রয়েছে।"

অনিমেষ কহিল, "অনেকটা যেতে হবে, তা ছাড়া সন্ধ্যা আটটার সময় আমাদের একটা মিটিং হবার কথা আছে, হবে কি না ঠিক নেই, হ'তেও পারে। আজ

আসাই যাক।" বলিতে বলিতে সে ছুই এক পা অগ্রসর হইয়া আসিল।

সুচারু তাহার সঙ্গ লইয়া বলিল, "কিন্তু অনিমেষ! আজ ত ভাল ক'রে কোন কথাবার্ত্তাই হলো না। না না, এ কি হলো? এ ভারি বিশ্রী লাগছে। তুমি যাও, আমার একটুও ভাল লাগছে না। নিতান্ত না গেলেই না হয় যদি, ফের কবে আসছো ব'লে যাও।"

অনিমেষ দরজার কাছে পৌছিয়াছিল, পর্দ্দা তুলিয়া ধরিয়া জবাব দিল, "আসছে রবিবারে।"

"ওঃ, সে যে অনেক দিন! না না ভাই, অত দেরি আমার সহ্য হবে না।"

সুচারু বেশী রকম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিল,— "সে ত তুমি তোমার চাল নিতে আসবে, আমার জন্যে কবে আসবে বল? না বল্লে যেতে পাচ্ছো না।"

তখন অনিমেষ বারান্দাটার শেষ সীমানায় পা দিয়াছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিমুখে মুখ ফিরাইয়া সে উত্তর করিল,—"তোমার জন্যে আবার এসে কি করবো? তোমার সময় কি এখন এতই মূল্যহীন আছে যে, তা রোজ রোজ আমার জন্যে ব্যয় করতে পারবে? অপব্যয় হয়ে যাবে না?"

সুচারু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িল, "নিশ্চয়ই না। আমাদের সময় এমন অমূল্য নয় যে, তা তোমার মত এক জনের জন্যে একটুখানি খরচ করতে আমরা তার সার্থকতা বোধ করবো না। সত্যি ভাই! শীগ্‌গিরই এসো। বল আসবে?"

অনিমেষ তার উজ্জল দুটি চোখ তার পূর্ব্ব-প্রিয়বন্ধুর মুখের উপর তুলিয়া ধরিল, চোখের দৃষ্টি তার বেশ সহাস্য, কিন্তু তীক্ষ্ণ। সে সলজ্জ অথচ বেশ দৃঢ় স্বরেই জবাব দিল,— "তা হয় না, চারু! রোজ রোজ গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলে আর আড্ডা দিয়ে দিন কাটিয়ে গেলেই আমার ত চলবে না। আমি সেই রবিবার বারোটার সময়েই ঠিক আসবো।" —এই বলিয়াই সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছে, পিছন দিক হইতে হঠাৎ ডাক আসিল, "শুনে যান।"

স্বর শুনিয়াই সে বুঝিল, এ ডাক সুরুচির এবং তাহাকেই সে ডাকিতেছে। ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সুরুচির ঈষৎ উত্তেজনারক্ত মুখের ছবি তার চোখে পড়িল, সে যেন খুব ব্যস্ত হইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছে। পাতলা ঠোঁট দুটি তার ঈষৎ ভিন্ন, শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততালে বক্ষের উত্থান-পতন তার পরা কাপড়ের উপর দিয়াও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

অনিমেষ সবিস্ময়ে তার দিকে চাহিয়া রহিল, তার মুখ দিয়া মৃদুভাবে উচ্চারিত হইল—"কি, বলুন?"

সুরুচি নিজের এই উদ্বেগব্যাকুল ভাবটুকু ধরা পড়ায় একটু কুণ্ঠিত হইয়াছিল, চোখ দুটি তার স্বতঃই তাই নামিয়া আসিয়াছিল, একটা ঢোক গিলিয়া, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে কহিল,—"আপনি যে দিনই আসবেন, মাসীমা বল্‌তে ব'লে দিলেন, এইখানে এসে আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। রবিবারের পূর্ব্বে কি আর আসতে পারবেনই না?"

অনিমেষ কহিল,—"না।"

সুরুচি কহিল, "তা হ'লে রবিবার ত্বপুরেই এখানে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, সে দিন কিন্তু এত আগে চ'লে গেলে চলবে না।"

অনিমেষ দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া তাহার উদ্দেশ্যে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল; হাসিয়া বলিল,—"বেশ, তাই হবে।"

বলিয়াই সোজা নামিয়া চলিয়া গেল। সুচারুর মুখ ঈষৎ হাস্যস্মিত, সে অনিমেষকে যতক্ষণ দেখা গেল, দেখিল, তার পর শিষ দিয়া একটা গান ধরিল। সুরুচি তখন ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

নদীর গান

কল কল গেয়ে আমি চ'লে যাই নদী
আমারে তোমরা কেউ বাধা দাও যদি,
তাহাতে আমার বেগ কমে নাক কিছু,
নতমুখে বাধা যত প'ড়ে থাকে পিছু।

আবর্ত্ত রচিয়া সেথা পাক খেয়ে খেয়ে,
পুনঃ আমি চ'লে যাই নিজ গান গেয়ে,
তবু মোর সনে যার যুঝিবার সাধ
তার তরে রেখে যাই মোর আশীর্ব্বাদ।

খোন্দেকার আবুল কাসেম।

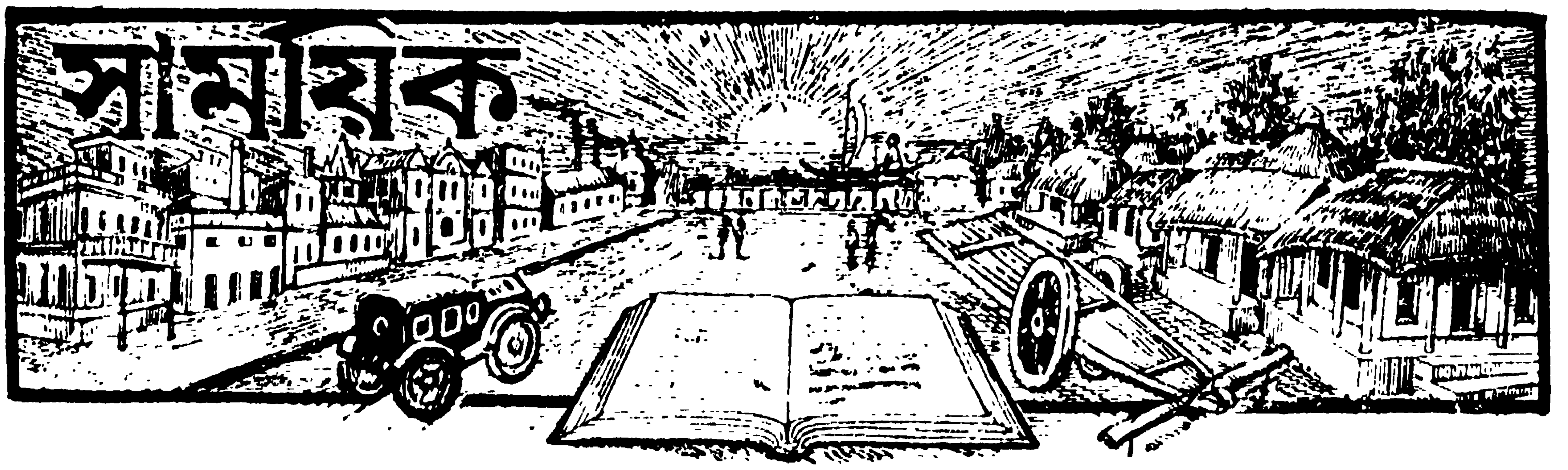

মেওয়া ফল

সার স্যামুয়েলের একটি গুণ আছে যে, তিনি পেটে এক মুখে আর করেন না, বেশ সহজ সরলভাবে স্পষ্ট কথাই ব্যক্ত করেন। মি: চার্চ্চিল এক দিন বলিয়াছিলেন,—দোহাই তোমাদের, ভারতবাসীকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিও না; যাহা দিবে, তাহার কম বলিও, বরং দিবার সময় বেশী দিলে পার। সার স্যামুয়েল বোধ হয় মি: চার্চ্চিলের নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রথম উপদেশ পালন করিয়াছেন। এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—শাসনসংস্কার সম্পর্কে এক বিলের ব্যবস্থা করা হইবে, ফলে প্রথমেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদত্ত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে উহার ভিত্তির উপর যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র সৌধ নির্ম্মিত হইবে।

আর গোল টেবিল বসান হইবে না। ভারত হইতে কয় জন সদস্যকে মনোনীত করিয়া বিলাতে লইয়া যাওয়া হইবে এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যৎকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে। অর্ডিনান্স জারী দ্বারা দেশে শৃঙ্খলা ও শান্তি-প্রতিষ্ঠা হওয়ায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, অর্ডিনান্স প্রত্যাহৃত হইলে উহার ফল আবার মন্দ হইবে, এই হেতু অর্ডিনান্সের প্রয়োজন আছে।

ইহাই হইল বিলাতের সরকার পক্ষের মোট কথা। কথাগুলি শুনিবার পর এ দেশের সহযোগকামী সাম্রাজ্যহিতৈষীদের কণ্ঠ হইতেও আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে,—ইহাই কি মেওয়া ফল? তাই তাঁহারা গোল টেবিলের সংশ্লিষ্ট পরামর্শ সভা বর্জ্জন করিয়াছেন।

সার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত জয়াকর সরকারের পরম বন্ধু। তাঁহারা এ যাবৎ প্রাণপণে সরকারের সাহচর্য্য ও সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাই বলেন যে, তাঁহারা দেশবাসীর অবজ্ঞা ও অনাদর সহ্য করিয়াও মণ্টেগু-সংস্কার সফল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, গোল টেবিলও সার্থক করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, অথচ এত করিয়াও তাঁহারা সরকারের মন পাইলেন কৈ, সরকারও তাঁহাদের মুখ রাখিলেন কৈ?

মডারেটদের মধ্যে সার তেজ বাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুত জয়াকর, শ্রীযুত চিন্তামণি, শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সার ফেরোজ শেঠনা, সার চিমনলাল শীতলবাদ প্রভৃতিই শীর্ষস্থানীয়। প্রথমোক্ত দুইজন একাধিকবার সরকারের ও কংগ্রেসের মধ্যে শান্তিদৌত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সরকারের প্রতিনিধিরূপে একাধিক গুরু রাজকার্য্যে মনোনীত হইয়াছেন। এক সময়ে তিনি সরকারের show boy নামে অভিহিত হইতেন। শ্রীযুত চিন্তামণি ত sober and sane statesman বলিয়াই সরকারের দরবারে খ্যাত। সার ফেরোজ ও সার চিমনলালেরও সরকারের দরবারে বিশেষ খাতির আছে। ইহারা সকলেই যে সাম্রাজ্যের হিতকামী সহযোগকামী রাজনীতিক, এ বিশ্বাস সরকারের আছে। আচ্ছা দেখা যাউক, এই শ্রেণীর 'বন্ধুর' সার স্যামুয়েলের বিবৃতির সম্বন্ধে মতামত কিরূপ।

সার তেজবাহাদুর ও শ্রীযুত জয়াকর একযোগে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন,—"সার স্যামুয়েল বৃটিশ সরকারের নির্দ্ধারিত নীতিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন, সংখ্যায় অধিক রক্ষণশীল দলীয়দের সমর্থনে প্রধান মন্ত্রীর আশ্বাসবাণী ও প্রতিশ্রুতিকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন।" হায় মি: ম্যাক-ডোনাল্ড! হায় শ্রমিকদলের নীতি!

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "এই পরিবর্ত্তন সামান্য নহে,—আমূল। ভারতের অগ্রগামী উন্নতিকামী দল এরূপ রাষ্ট্রবিধি গ্রহণ করিতে পূর্ব্বে সম্মত হন নাই, এখনও হইবেন না।" পরমবন্ধু সাম্রাজ্যহিতকামীর মুখে এ কি কথা? শুধু কি তাই? সার স্যামুয়েল অন্যান্য নগণ্য প্রতিষ্ঠানের মত কংগ্রেসকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া লিবারল ও মুসলমানদের লইয়া জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটী গঠন করিতে চাহেন, গোল টেবিল বৈঠক আর বসাইবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। শ্রীযুত শাস্ত্রী ইহাতে বলিয়াছেন,—"কংগ্রেসকে রাষ্ট্রবিধির ক্ষেত্র হইতে বাদ দিয়া, জাতীয়তা-বাদীদের মধ্য হইতে লিবারল ও অগ্রগামী মুসলমান দলের সাহায্যে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর নিকট হইতে কোন আশানুরূপ শাসনসংস্কার লাভের আশা নাই।" হরি! হরি! লিবারল-শিরোমণি শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আজ এ কি কথা বলিতেছেন? এখন সার স্যামুয়েল ও বৃটিশ সরকার কি করিবেন? প্রবাসী য়ুরোপীয় ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের লইয়া কি তাঁহারা শাসন-সংস্কার সফল করিবার আশা করেন?

অর্ডিনান্সের শাসন

রস জমাট হইয়া যেমন মিছরির দানা বাঁধে, তেমনই ৪ খানি অর্ডিনান্স এক হইয়া এক মহা অর্ডিনান্সে পরিণত হইল! আবেদন-নিবেদন, কান্নাকাটি, যুক্তি-তর্ক— কিছুই খাটিল না। লর্ড উইলিংডনের ও সার স্যামুয়েল হোরের সরকার ইহাতে বৃটিশ শাসনের শৌর্য্যবীর্য্য অথবা দৌর্ব্বল্যের—কিসের পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ। প্রজার মন জয় করিয়া শাসনদণ্ড পরি-চালনা করায় শক্তির পরিচয় দেওয়া হয়, কি বিধিবজ্রের

অন্তরালস্থ হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করায় শক্তির পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা কে মীমাংসা করিবে, আর মীমাংসা হইলেও তাহা কে শুনিবে ?

৩রা জুলাই যে চারিটি অর্ডিনান্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা ছিল, সেগুলি এই :—(১) সঙ্কটশক্তি, (২) বে-আইনী প্ররোচনা, (৩) বে আইনী জনতা, (৪) বয়কট। এই চারিটি অর্ডিনান্সের অধিকাংশ ক্ষমতাকে একখানিতে পরিণত করিয়া গত ৩০শে জুন এক "বিশেষ শক্তি অর্ডিনান্স" প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪টি অর্ডিনান্স গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে জারী হইয়াছিল।

প্রথমখানিতে সরকার ও সরকারী কর্ম্মচারীদের হস্তে কতকটা উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে প্রবর্ত্তিত অর্ডিনান্সের মত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তবে সীমান্তের ক্ষমতার অপেক্ষা ইহাতে আরও অধিক ক্ষমতা ব্যবহার করিবার উপযোগী বিধি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে কোন কার্য্যে সাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা হইবে, তাহারই বিপক্ষে উহা প্রযুক্ত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। উহা দ্বারা পুরাতন প্রেস অর্ডিনান্সের পুনঃ প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল, তাহাও সমগ্র ভারতের উদ্দেশ্যে। বোম্বাই ও বাঙ্গালায় উহা প্রথমেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং উহা বিশেষ অর্ডিনান্সের অঙ্গভুক্ত হইয়া বিরাজ করিয়া কেমন আরাম প্রদান করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অপর তিনখানিতে (১) অবৈধ প্ররোচনা, (২) অবৈধ সমিতি এবং (৩) অবৈধ বিরক্তি উৎপাদন (molestation) এবং বর্জ্জন ও শান্তিপূর্ণ পিকেটিং, এইগুলি নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং আইন অমান্য আন্দোলন দমনের জন্য যতগুলি বজ্র গত জানুয়ারী মাসে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া একখানিতে পরিণত করিয়া মাথার উপর ঝুলাইয়া রাখা হইল।

তবে এইটুকু সান্ত্বনা যে, সরকারের মরজি দেশের লোককে (১) সাধারণ ব্যবহার্য্য পণ্যাদির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা, (২) স্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিবার ক্ষমতা, (৩) অতিরিক্ত পুলিস নিয়োগের ক্ষমতা এবং (৪) সাধারণের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতার প্রভাব হইতে রেহাই দিয়াছে।

শুনা গিয়াছিল, কেবল বিপ্লবীর জিঘাংসা ও ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টা নিবারণের জন্য সরকার অতিরিক্ত ক্ষমতা হাতে রাখিবেন, সরকারের বিপক্ষে সরাসরি অথচ অহিংস আন্দোলন দমনের জন্য আর অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার না করিয়া সাধারণ আইন প্রয়োগ করিবেন। সে আশা নির্ম্মূল হইল, সার স্যামুয়েল হোর ও লর্ড উইলিংডনের সরকার এ দেশ অর্ডিনান্সের দ্বারা শাসন করিতেই মনস্থ করিয়াছেন। বিধির নির্ব্বন্ধ!

কাযেই এখনও কিছু দিন জনমতের অনুমোদন না লইয়া, আইন সভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া মরজিমত অর্ডিনান্স জারীর দ্বারা এই হতভাগ্য দেশের ৩২ কোটি নর-নারী শাসিত হইবে। এই অবস্থায় ভারত-সচিব অথবা ভারত সরকার, কাহার কতটা হাত, তাহা জানা যায় নাই। তবে ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিল বিলাতের এক সংবাদপত্রে মহা খুসী হইয়া সার স্যামুয়েলকে বাহবা দিয়া লর্ড বার্কেণ-হেডের পদে সমাসীন করিয়া এই ব্যবস্থার যেরূপ সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ইহার মূল সূত্র কোথায়। সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে বসিয়া টোরী ভোটের জোরে বে-আইনী আইনের দ্বারা ভারত-শাসনের ব্যবস্থা করা সহজ বটে, কিন্তু যাঁহাদিগকে হাতে-কলমে ব্যবস্থা পালন করিতে হইবে, তাঁহাদের বিপদ অভাগা ভারতবাসীদের অপেক্ষা কম নহে।

যাহা হউক, আপাততঃ ৪ বজ্র এক হইল। পরে আবার যখন অন্য অর্ডিনান্সের মেয়াদ ফুরাইবে, তখন নূতন নূতন বিশেষ অর্ডিনান্স বাহাল হইবে। বজ্রশাসন যুগই এখন সুস্থ-শরীরে বাহাল তবিয়তে বিদ্যমান রহিল।

এই নূতন বিশেষ অর্ডিনান্স সরকার মেহেরবাণি করিয়া কোন কোন স্থানে আপাততঃ প্রয়োগ করিবেন না। বাঙ্গালার ১১টি জেলা, যথা—দার্জ্জিলিং, মালদহ, বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, নোয়াখালী এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম আপাততঃ রেহাই পাইল। তবে ভবিষ্যতে জেলাগুলির ব্যবহার বুঝিয়া প্রয়োগ করা না করা বিচারসাপেক্ষ রহিল।

যুক্তপ্রদেশের ২৬টি জেলা এবং পঞ্জাবের ১৭টি জেলায় কতকগুলি ক্ষমতা আপাততঃ প্রযুক্ত হইবে না। আসামের ৬টি জেলায় উৎপীড়ন ও বর্জ্জন-নিবারক অর্ডিনান্স অনুযায়ী ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হইবে। সীমান্তপ্রদেশের পেশোয়ার জেলা ব্যতীত সমগ্র দেশটাই অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। মাদ্রাজের কালিকট, মাদুরা ও অন্য কয়টি সহরে আইন অমান্য চলিতেছে বলিয়া বিশেষশক্তি অর্ডিনান্সের দুইটি অধ্যায় সমগ্র প্রদেশে প্রযুক্ত হইবে। বোম্বাই প্রদেশের একটি জেলায় এবং আজমীর মাড়বারার সামান্যমাত্র অংশে অর্ডিনান্স বলবৎ রহিল। মধ্যপ্রদেশের একার্দ্ধে অর্ডিনান্স প্রযুক্ত হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মোটের উপর বৃটিশ ভারতের প্রায় অর্দ্ধাংশ এখনও অর্ডিনান্সের নাগপাশে বদ্ধ রহিল। অপরার্দ্ধের কোথাও কিছু ঘটিলে মাথার উপর বজ্র ঝুলিবে!

প্রথমে বিপ্লবীর বিভীষিকাবাদ দমনের উদ্দেশ্যে অর্ডিনান্স প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর কংগ্রেস আন্দোলন দমনের জন্য উহা প্রযুক্ত হয়। এখন যে বিশেষশক্তি অর্ডিনান্স প্রযুক্ত হইল, উহা কংগ্রেস আন্দোলনেরই বিপক্ষে। বিভীষিকা-দমনে বিশেষ শক্তি ব্যবহৃত হইলে কথা ছিল না, কিন্তু কংগ্রেসের বিপক্ষে বহুদিনব্যাপী বিশেষশক্তি ব্যবহারে দেশে কি অবস্থা উপস্থিত হয়? ভারত-সচিব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা জয়ী থাকিতেই ইচ্ছা করেন। ভাল কথা। কিন্তু এ যাবৎ যত ইস্তাহার তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের পরাজয়ের—কংগ্রেস আন্দোলন নির্ব্বাণের কথাই বলিয়াছেন, অর্ডিনান্সের দ্বারা যেটুকু উপকার হইয়াছে, কংগ্রেসের সহিত এখন রফা করিলে তাহার সুফল নষ্ট হইয়া যাইবে, এই জন্য বিশেষশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলন যদি ধ্বংস হইয়া থাকে, আর কংগ্রেস-নেতারা এবং হাজার হাজার কংগ্রেসকর্ম্মী যদি কারারুদ্ধ হইয়া থাকেন, তবে কাহার বিপক্ষে এই অভিযান হইতেছে?

কংগ্রেসের বিপক্ষে অভিযানের নামে দেশের জনসাধারণের নানাবিধ স্বাধীনতায় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামতের অভিব্যক্তিতে যদি হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হইবে, না অশান্তি অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে? বিংশ শতাব্দীর স্বাধীন মনোবৃত্তির যুগে স্বাধীনতার উপাসক বৃটিশ জাতির নিযুক্ত ভারত-সচিবের আদেশে ভারতের সংবাদ-পত্রসমূহের স্বাধীন আলোচনার পথ কণ্টকবহুল হইল, ইহা কি সাম্রাজ্যের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা?

অর্ডিনান্সের প্রভাবে বে-পরোয়াভাবে গৃহস্থ-গৃহে পলাতক অপরাধীর সন্ধানের অছিলায় কি অনাচার আচরিত হইতে পারে, সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যদি চট্টগ্রামে অর্ডিনান্স ও 'কার্ফিউ-অর্ডার' (সান্ধ্য-আইন) প্রবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে কি হিন্দু গৃহস্থ কুলবধূর সর্ব্বনাশ সাধিত হইত? এই বে-আইনী আইনের সুযোগ পাইয়া দুইটা পাঠান সৈনিক বিবাহিতা হিন্দু যুবতী চারুবালার উপর পৈশাচিক অনাচার আচরণ করিতে পারিয়াছিল। ভারত-সচিব কি এ সংবাদ বিদিত নহেন? এই নরপশুদের কি দণ্ড বিহিত হইয়াছে, তাহাও কি তিনি অবগত নহেন? কোন স্বাধীন সভ্য দেশের ভদ্র গৃহস্থ মহিলার উপর এইরূপ অনাচার আচরিত হইলে কি হইত,—তাঁহার দেশে বৃটিশ মহিলার উপর এরূপ অনাচার সংঘটিত হইলে কি হইত? কিন্তু অর্ডিনান্সের এমনই মহিমা যে, উহাতে বোধ হয়, বৃহৎকেও ক্ষুদ্র করিয়া দেখা যায়!

এই অর্ডিনান্সের কবলে পড়িয়া কত নিরীহ লোকের জীবন নানাভাবে বিড়ম্বিত হইতে পারে, তাহাও কি তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরীক্ষা বিভাগের বড় কর্ত্তা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কয়েক দিন পূর্ব্বে সেনেটের বিশেষ অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ হওয়াই স্বাভাবিক। ডাক্তার বিধান-চন্দ্র আয়-ব্যয়ের সমতা প্রদর্শন করিয়াও বলিয়াছেন যে,—"বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন দিন আসিতেছে, যাহার জন্য সময় থাকিতে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত না হইলে যোগ্যতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করা দুরূহ হইয়া উঠিবে।" কথাটা ভাবিবার নহে কি?

অর্থকরী বিদ্যাকে আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি, এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতে সেই বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকেন। এই অর্থসঙ্কটের দিনে সেই বিদ্যা যাহাতে সহজে, সুলভে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, সে জন্য আমাদিগকে চেষ্টিত থাকিতে হইবেই। আমাদিগকে জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে—কঠোর জীবন-সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে—যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়, সে জন্য আমাদিগকে সময় থাকিতে অবহিত হইতে হইবেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের অনাটন দূর করিতে হইবেই।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র তিনটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—(১) সরকারী সাহায্য দানের হার বৃদ্ধি করা, (২) আরও অধিক ব্যয়সঙ্কোচ করা, (৩) নূতন আয়ের পন্থা আবিষ্কার করা। ইহার মধ্যে একটি উপায়কে পত্রপাঠ ধূলা-পায়েই বিদায় করিতে হইবে, কেন না, তৃতীয় উপায় অর্থাৎ নূতন আয়ের পন্থা আবিষ্কার করা এই অর্থসঙ্কটকালে একবারেই অসম্ভব। নূতন আয় হয় ছেলেদের পরীক্ষার ফীজ হইতে, না হয় সরকারী স্কুল-কলেজের বেতন-বৃদ্ধি হইতে। কিন্তু আর শাকের আঁটিও সহিবে না, উষ্ট্রের পিঠ এমনই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অন্যান্য বারে স্কুল-কলেজে ছেলেদের স্থান করাই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, এবার স্কুল-কলেজে চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়া ছেলে ডাকিতে হইতেছে, ক্লাস ভরে না। ঘরে পয়সা নাই, বাপ-মা ছেলে পড়াইবে কিসে? গাছতলায় ঘুরিয়াও উকীল-মোক্তারের এক পয়সা আয় নাই,—কাযেই ঘরে যখন হাঁড়ী চড়াই দায় হইয়াছে, তখন পড়ানর সখ মিটাইবে কে?

দ্বিতীয় উপায়, ব্যয়-সঙ্কোচ। ডাক্তার বিধানচন্দ্র বলিয়াছেন,—যথাসম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইতেছে। তাহা হইতে পারে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, "পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের জিওলজি ও ফিজিওলজি বিভাগ যখন প্রেসিডেন্সী কালেজে স্থানান্তরিত করা হইবে, তখন আমাদের সামান্য কিছু টাকা বাঁচিবে।" কিন্তু উহা যৎসামান্য, কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য বাবদেও কি ব্যয়সঙ্কোচ করা যায় না? দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিক্ষা-নিয়ামকের (Director of Public Instruction) আফিসের কথা বলা যায়। তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারীর সংখ্যা কত? ঐ আফিসের সরঞ্জামী খরচা কত? উহা কি কমান যায় না? শিক্ষা-নিয়ামকের আফিস বিদ্যমান থাকিতে কি জন্য এক জন শিক্ষা-বিভাগীয় সিভিল সার্ভ্যাণ্ট সেক্রেটারী, এক জন সহকারী সেক্রেটারী এবং তাঁহাদের অধীনে বহুসংখ্যক কেরাণী রাখা হইয়াছে? এ সকল অকারণ আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? স্কুল-কলেজ পরিদর্শনের জন্য Inspectorএর ভিড় রাখিবার কি সার্থকতা আছে? সংখ্যা-হ্রাসে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অনেক সরকারী স্কুল-কলেজ বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে দিলে কি সরকারের অনেক খরচা বাঁচিয়া যায় না? এইরূপ নানা ভাবে নানা চেষ্টা চলিতে পারে।

শেষ উপায়, সরকারী সাহায্য। সকল সভ্য দেশেই সরকার শিক্ষাপ্রচারে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এ দেশে সবই বিপরীত। অন্য বাবদে সরকার মুক্তহস্ত, কিন্তু জাতিগঠন কার্য্যে—শিক্ষা-স্বাস্থ্যাদি বাবদে টাকার অনাটন হয়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র বলিয়াছেন যে,—"১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিংএ ও তাহার পর অন্যান্য স্থানে যে সকল বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সরকারকে জানানো হইয়াছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য সরকারের বার্ষিক ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করিয়া স্থায়ী সাহায্য প্রদান না করিলে চলিবে না। তবে প্রথম বৎসরে সাহায্যের পরিমাণ কমাইয়া ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিলেও চলিবে। কিন্তু সরকার এই

প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক মাত্র ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা স্থায়ী সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়সঙ্কোচ-সাধন ও আয়বৃদ্ধির নূতন পন্থা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।"

যে হিসাবে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন, সে হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কি দানের ব্যবস্থা করিলেন? কলিকাতা কত বিরাট ও কত প্রাচীন বিশ্ব-বিদ্যালয়। আর ঢাকা? এখানেও কি কুলারী সুয়োরাণী দুয়োরাণী নীতি অনুসৃত হইতেছে না কি? সে যাহা হউক, ডাক্তার বিধানচন্দ্রের সাবধান-বাণী শুনিবার পর সরকার কি ব্যবস্থা করিবেন? ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর সমক্ষে য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশানের কমিটী যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—অন্য বাবদে যে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে প্রয়োজন হয় কর, কিন্তু পুলিসের বাবদে এক পয়সাও কাটিতে পারিবে না। অর্থাৎ সরঞ্জামী, শৈলবিহার, ব্যাণ্ড, বডিগার্ড, পুলিস, গোয়েন্দা বিভাগ—এ সকলের সকল ঠাটই যেমন তেমনই থাকিবে, কেবল মারিতে হয় মার জাতিগঠন বিভাগ—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-বাণিজ্যাদি! এই ব্যবস্থাই কি চিরদিন বজায় রাখা হইবে? ব্যয়সঙ্কোচ না করিলে এ দিকে সরকারের কি করিবার সামর্থ্য থাকিবে?

কালিদাস ও রামগিরি

গত ১৩৩৯ সাল ১লা আষাঢ় কলিকাতার এলবার্ট হলে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' উৎসবে বাঙ্গালার একাধিক কৃতী সাহিত্যিক ও পণ্ডিত তাঁহার ও তাঁহার অমর কাব্য মেঘদূতের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপ্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁহারা রামগিরির নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কবির স্মৃতিপূজায় অর্ঘ্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নাগপুর সারস্বত সভার লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম গোস্বামী, উক্ত সভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাগপুরের শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের রচনা উল্লেখযোগ্য। প্রবাসী থাকিয়াও কর্ম্মক্লান্ত জীবনের মধ্যে অবসর করিয়া আমাদের বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণ যে সাহিত্যসেবায় এইভাবে আত্মনিয়োগ করেন, ইহা নিশ্চিতই আনন্দের কথা। আমাদের আশা আছে, প্রবাসী বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণ বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী কিছু দান করিবার জন্য প্রয়াস পাইবেন।

গূঢ় রহস্য কি?

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ দেশে নানা কারণে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বোম্বাই সহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বৈশিষ্ট্য আছে। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত উহা ফুৎকারে মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে কেন, উহার পশ্চাতে কি গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহা কেহ অবধারণ করিতে পারিতেছে না। দাঙ্গায় দুই শতেরও উপর হিন্দু-মুসলমান নিহত, দুই হাজারের উপর আহত এবং মসজিদ মন্দির দোকানপাট হয় লুণ্ঠিত, না হয় অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। লাভ ইহাতে কোন সম্প্রদায়েরই নাই। অন্ততঃ নিরক্ষর গুণ্ডা শ্রেণীর লোক ইহা না বুঝিলেও শিক্ষিত সমাজ বুঝেন ত! তবে কেন এমন হয়? শিক্ষিত সমাজের "শান্তি-সমিতি" দাঙ্গা-নিবারণে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সরকারের পুলিস ও ফৌজ, বন্দুক-বেয়নেট, লাঠি-বেটন—কোন কিছুই দাঙ্গা-নিবারণে সমর্থ হয় নাই। গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক ছোরা হস্তে ধৃত হইলেও অথবা ছোরাছুরি প্রকাশ্যে ফেরী করিবার ভাণে পথে বাহির হইলেও মাত্র ৫৲ টাকা ১০৲ টাকা জরিমানা দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছে বলিয়া গুণ্ডাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, এ কথাও অনেকে বলিতেছেন। শান্তি-সমিতি এমন কথা বলিতেছেন যে, দাঙ্গার পশ্চাতে নাচাইবার লোক আছে, তাহারা ভিতর হইতে কল টিপিতেছে, তাই দাঙ্গা রহিয়া রহিয়া দেখা দিতেছে। বোম্বাইর এক শক্তিশালী সংবাদপত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন, ধনী ব্যক্তি দাঙ্গার পশ্চাতে থাকিয়া টাকা যোগাইয়া দাঙ্গা জিয়াইয়া রাখিতেছে। দাঙ্গার পূর্ব্বে শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর মারফতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে শাসানো হইয়াছিল, এ কথাও সকলে জানে। এমন কি, 'শান্তি-সমিতির' অধিবেশনেও শাসানো হইয়াছিল। আরও শুনা যায়, বোম্বাইএর 'খিলাফত' নামক উর্দ্দু পত্রে দাঙ্গার পূর্ব্বে গরম গরম তাতাইবার মত রচনা বাহির হইয়াছিল। এ সকল বিষয়ে সরকার কি নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া দেখিয়াছিলেন? দেখিয়া তাঁহারা সময়মত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন কি? শান্তিপ্রিয় আইনভীরু হিন্দু মুসলমান প্রজা এ কথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

দেউলীর রাজবন্দী

আজমীর মাড়বারের চিফ কমিশনার এক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, দেউলীর জেলে বাঙ্গালী রাজবন্দীদের প্রতি যথাসম্ভব সদয় ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে তাঁহারা বাঙ্গালীর মত বসবাস ও আহারাদির উপযোগী সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেন, তাহার জন্য নিয়ম-কানুন করা হইয়াছে।

অতীব আনন্দের কথা। ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্রসচিব সার জেমস ক্রেরার বাঙ্গালী রাজবন্দীদের প্রতি যে সদয় ব্যবহারের আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু দেউলীর কোন রাজবন্দীর পত্র হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের কোন এডভোকেট যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দৈনিক সংবাদপত্রের মারফতে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ত এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় না, বরং বিপরীত কথাই পাওয়া যায়। তাঁহার মোট কথা এই:—

(১) বাঙ্গালী রাজবন্দীদিগকে পাটের গুদামের মত ঘরে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে।

(২) দেউলীর উত্তাপ এই সময়ে দিবাকালে ১২৪ ডিগ্রীর উপরেও চড়িয়া থাকে। বাঙ্গালায় এই সময়ে সচরাচর ৯০

ডিগ্রীর উপরে উঠে না। তাহা হইলে গুদামের মধ্যে বাঙ্গালীর পক্ষে এই গরম কিরূপ আনন্দদায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

(৩) সার জেমস ক্রেরার ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালী সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, দেউলীতে বিজলী পাখা বা আলোর বন্দোবস্ত নাই, এই হেতু বাঙ্গালী রাজবন্দীদের জন্য টানা পাখার বন্দোবস্ত করা হইবে। রাজবন্দীরা জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে আবেদন করিয়াও খসখস-পর্দ্দা বা টানা পাখা পায় নাই, অথচ তাঁহার নিজের আফিসে সবই আছে।

(৪) বাঙ্গালী মাছভক্ত। সার জেমস বাঙ্গালী বন্দীকে মাছ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। দেউলীতে মাঝে মাঝে বাঙ্গালীকে বহু বাঙ্গালীর অখাদ্য বোয়াল মাছ খাইতে দেওয়া হয়। উহা মাছ না দেওয়ারই সামিল।

(৫) রান্নাবান্নায় বা স্নানে বাঙ্গালীকে সর্ষপ-তৈল দেওয়া হয় না। জেলের কয়েদী রান্না করে, সে বাঙ্গালীর রান্নাবান্না কিছুই জানে না। সুতরাং বিনা সর্ষপ-তৈলে প্রস্তুত এই পাচকের হাতের রান্না কি উপাদেয়, তাহা সহজে অনুমেয়।

(৬) বাঙ্গালী রাজবন্দীকে তরি তরকারী, মাছ, সর্ষপ-তৈল, ফলমূল ও বরফ, পাখা, খসখস-পর্দ্দা দিতে বার বার অনুরোধ আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই।

বাঙ্গালা হইতে—আত্মীয়-স্বজন হইতে—বহুদূরে রাজপুতনার মরুভূমিতে বাঙ্গালী রাজবন্দীকে নির্ব্বাসিত করিবার সময় সার জেমস সরকার পক্ষের হইয়া কত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিই না দিয়াছিলেন! তাঁহারা কোন্ অপরাধে ধৃত হইয়াছেন, তাহাও কেহ জানে না। কেবল পুলিস সন্দেহক্রমে তাঁহাদিগকে ধরিয়াছে। বিনা বিচারে তাঁহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। যতক্ষণ না তাঁহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হয়, ততক্ষণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগকে নিরপরাধ বলিয়াই বিবেচনা করিবে। তাঁহারা শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারের সন্তান, সুতরাং বাঙ্গালীমাত্রেই তাঁহাদিগকে আপনার জন বলিয়া মনে করে, আর সেই কারণেই তাঁহাদের জন্য এত উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের পরিচয় দেয়। সরকার এই সকল কথা ভাবিয়া এই শ্রেণীর ভদ্র আটক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পারেন না কি?

পুলিসের গুলী

নদীয়া জেলার তেহাটা গ্রামে এবং মেদিনীপুর কাঁথির মাগুরিয়া গ্রামে পুলিসের গুলী চলিয়াছে। পুলিসের গুলী চলা যে খুব একটা বিস্ময়ের বিষয়, তাহা নহে, তবে যে উপলক্ষে গুলী, সেই উপলক্ষে গুলী চলাটাই বিস্ময়ের বিষয় বটে। প্রথমটি "রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন" এবং দ্বিতীয়টি "বন্দিদিবস পালন" উপলক্ষে। এই দুইটি অনুষ্ঠান পুলিসের নিষেধ সত্ত্বেও আইন ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাই পুলিসের অভিযোগ। কিন্তু এই দুইটির সহিত বিপ্লবীর বিভীষিকার কোন সংস্রব ছিল বলিয়া পুলিসও অভিযোগ উপস্থিত করে নাই। তবে গুলী কেন? অভিযোগ, জনতা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইত্যাদি। উহাই কি গুলীর যথেষ্ট কারণ? যাহাতে প্রজার প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা যখন তখন অনুষ্ঠিত হওয়াই কি সুশাসনের পরিচায়ক? যদি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের মন বিরূপ ও অসন্তুষ্ট হইবে, ইহাও বোধ হয় ভাবিবার কথা নহে!

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ডাগলাস-হত্যার পর ঢাকায় মুন্সীগঞ্জের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ সেন আততায়ীর গুলীতে নিহত হইলেন। ইহা বিপ্লবীর জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ফল বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। কেহ কেহ ইহাতে ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণ আছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। আসল কথা কি, তাহা অপরাধী ধরা না পড়িলে জানা সম্ভব নহে। যদি বিপ্লবীর বিভীষিকাই ইহার মূল হয়, তাহা হইলে এমন ভাষা নাই—যাহা দ্বারা এই শ্রেণীর ঘৃণিত কার্য্যের নিন্দাবাদ করা সম্ভবপর। চট্টগ্রামের এক গ্রামে বিপ্লবীদের সহিত সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ নিহত হইয়াছেন, ইহারও নিন্দাবাদ হইয়াছে। এ ভাবের নিন্দাবাদ এবং অহিংসাগ্রহণে বিপ্লবীকে উপদেশ প্রদান—দেশের ভাবধারার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া, যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? সরকারও সঙ্কট-শক্তি অর্ডিনান্স এবং নানা রেগুলেশানের শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, কিন্তু তাহাতেও ত বিপ্লবীর বিভীষিকার উপশম হইতেছে না। তবে? সুতরাং অন্য পথে ইহা দমন করা সম্ভব কি না, তাহা কি এখনও ভাবিবার সময় উপস্থিত হয় নাই?

নারী-ধর্ষণ

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কলঙ্ক নারীধর্ষণ বুঝি বাঙ্গালার ললাট হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না। পশুপ্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত গুণ্ডাদের পাপের উপযুক্ত দণ্ড হয় না, সামাজিক শাসনও হয় না বলিয়াই ক্রমশঃ তাহাদের বুক বলিয়া যাইতেছে।

তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সরকারের শান্তিরক্ষক প্রহরীরা যদি অসহায়া অবলার উপর অতিরিক্ত ক্ষমতার সুযোগ পাইয়া পাশব অত্যাচার অনুষ্ঠান করে, আর তাহার গুরুপাপে লঘুদণ্ড হয়, তাহা হইলে কি বলিতে ইচ্ছা করে?

নওয়াপাড়া চট্টগ্রামের একটি গ্রাম। গত পৌষ মাসের এক দিন গভীর রাত্রিতে এই গ্রামের অধিবাসী মণীন্দ্র দের গৃহে দেওয়ানজী হাটের সামরিক ছাউনির ফরমান আলি ও আমেদ খাঁ নামক দুই জন পাঠান পুলিস উপস্থিত হয় এবং খানাতল্লাসী অথবা অন্য কোন ছলে ফরমান আলি নিদ্রিত মণীন্দ্রকে উঠাইয়া তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। আমেদ খাঁ মণীন্দ্রকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বাহিরে লইয়া যায়। সেখান হইতে আর ৩ জন কনষ্টেবল এক পুষ্করিণীর তটে মণীন্দ্রকে লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখে। অর্দ্ধ-ঘণ্টারও অধিককাল আটক রাখিবার পর তাহারা মণীন্দ্রকে ছাড়িয়া দেয়। মণীন্দ্র কুটীরে ফিরিয়া দেখে, আমেদ খাঁ বাহিরে পাহারা দিতেছে, আর ফরমান আলি ঘরের মধ্য হইতে

বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহারা ভয়প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া যায়।

অতঃপর হতভাগ্য স্বামী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, তাহার শয্যা লণ্ডভণ্ড, তাহার ১৯ বৎসর-বয়স্কা যুবতী পত্নী চারুবালা ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে শয্যার উপর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে! তাহার এক বৎসর-বয়স্ক শিশুপুত্র কাঁদিতেছে। ভয়ে মণীন্দ্র ঘরের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া নীরবে থাকে। বাহির হইবার বা প্রতিবেশীদের সাহায্য লইবার উপায় নাই,—সান্ধ্য আইন মুখব্যাদান করিয়া আছে!

প্রত্যূষে হতভাগিনী চারুবালা তাহার স্বামীর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার উপর সামরিক মুসলমান পাঠান পুলিসের পৈশাচিক অত্যাচারের কথা নিবেদন করিল। তাহার মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত, বস্ত্র ছিন্নভিন্ন, তাহা রক্তাক্ত ও * * চিহ্নিত।

এই ঘটনার কথা আদালতে উঠে। বিচারে লম্পট নরপশুর ৩ বৎসর এবং তাহার সহকারীর ২ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে! ইহাই বলপূর্ব্বক বিবাহিতা গৃহস্থবধূর সতীত্ব-হরণের উপযুক্ত মূল্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, ইহাই শান্তিরক্ষকের শান্তিভঙ্গের ও অতিরিক্ত ক্ষমতার সাহায্যে অবলার উপরে কাপুরুষতা আচরণের উপযুক্ত শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে!

অর্ডিনান্সের ও কার্ফিউ অর্ডারের যে মহিমা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিবে সন্দেহ নাই! প্রতিবেশীরাও কার্ফিউর ভয়ে চারুবালার চীৎকার শুনিয়াও ঘরের বাহির হইতে সাহস করে নাই! ধন্য অর্ডিনান্স! ধন্য কার্ফিউ! আরও অর্ডিনান্সের মহিমা এই যে, ইহারই জোরে এই লম্পট শান্তিরক্ষক ঘটনার পূর্ব্বে চারুবালার ঘরে ঢুকিয়া তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়াছিল। তদবধি যে এই পশু কামশরে পীড়িত হইয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্ডিনান্সে এই ক্ষমতা না দেওয়া হইলে ত এমন সম্ভব হইত না। কত বলিব? যশোহরের গিরিবালা-হরণ, শ্রীহট্টের তরঙ্গিণী-হরণ, সত্যদিন তালির পত্নীর উপর অনাচার-চেষ্টা, যশোহরের সরোজিনী-হরণ,—অন্ত যেন নাই। সকল ক্ষেত্রেই যে অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বা অপরাধী উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমাণাভাবে আসামী বেকসুর মুক্তিও পাইয়াছে।

কিন্তু এত দিন পরে একটা বিচারের মত বিচার হইয়া গিয়াছে। যশোহরের দায়রা জজ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরোজিনী-হরণের মামলায় ৯ জন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান লম্পটকে যথাক্রমে ১৭ বৎসর ও ১৪ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ২ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গালার নারীধর্ষণের মামলায় এরূপ দণ্ড এই প্রথম। আমরা স্বভাবতঃ প্রতিশোধমূলক অথবা শিক্ষাদানমূলক গুরু দণ্ডের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু যেখানে অসহায়া অবলার প্রতি এইরূপ পশুত্বের পরিচায়ক অনাচার আচরিত হয়, সেখানে মনে করি, এমন কোন গুরুদণ্ড দণ্ডবিধির আইনে নাই, যাহা তাহার সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে না পারে। সেই হিসাবে বিচারক সমগ্র সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি দীর্ঘজীবী হউন!

সুখের কথা, হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ জাগ্রত হইতেছে। 'নারী-রক্ষা সমিতি', 'মাতৃমঙ্গল' প্রভৃতি সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মাতৃসদনের সুষেণ বাবুর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলেই অভাগী সরোজিনীর উদ্ধারসাধন সম্ভব হইয়াছিল। তিনিও এ জন্য দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহার মাতৃসদনের সদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া যশোহরের ভদ্র শিক্ষিত সমাজ যশোহরে এক শাখা মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার প্রতি জেলায় এইরূপ শাখা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইবে।

মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও এ বিষয়ে অনেক কিছু করিতে পারেন। তাঁহারা যদি একযোগে এই পাপাচরণের বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা হইলে এ রোগের প্রতীকার হইতে পারে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান তরুণরাই এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন। তাঁহারাই ত দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, সমাজ রক্ষা করা তাঁহাদের ধর্ম্ম।

—

পুলিসের অপ্রতিহত ক্ষমতা

সম্প্রতি রাজনীতিঘটিত পর পর কয়টি মামলায় পুলিসের অপ্রতিহত ক্ষমতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অর্ডিনান্সের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া সরকার ভাল কি মন্দ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। আমরা একটিমাত্র মামলার কথা বলিব।

ঢাকা ট্রেণ ডাকাতির মামলায় ধৃত আসামী জ্যোতির্ম্ময় সেনের পক্ষ হইতে ঢাকার সেসন জজ মিঃ এ, এন, সেনের সকাশে জামিনের আবেদন হইয়াছিল। দায়রা জজ জামিন মঞ্জুর করিবার কালে রায়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কিছু উদ্ধৃত করিতেছি, উহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, অতিরিক্ত ক্ষমতা-প্রাপ্তির ফলে পুলিসের কোন কোন কর্ম্মচারীর মদগর্ব্বে কিরূপ মাথা টলিয়াছে :—

"(১) প্রথমে মহকুমা হাকিমের নিকটে এই মামলার শুনানী হইতেছিল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিয়াছিলেন যে, অভিযুক্তকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতেই হইবে। পুলিসের পক্ষে তাঁহার এই আদেশ অমান্য করিবার কোনই অধিকার নাই। মহকুমা হাকিমের অজ্ঞাতসারে সহকারী জেলা হাকিমের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অভিযুক্তকে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ বাহির করিবারও কোন অধিকার পুলিসের নাই।

(২) অভিযুক্ত আসামী তাহার ব্যবহারাজীবের সহিত পরামর্শ করিবার প্রার্থনা করাতে মহকুমা হাকিম সে আদেশ দিলেও পুলিস তাহাকে তাহার উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয় নাই। এ অধিকারও পুলিসের নাই।

(৩) সেসন জজ আসামী পক্ষের আবেদন—উকীলের সহিত পরামর্শ গ্রহণ করিবার অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আদালতে দাখিল করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সেসন জজ রায়ে বলিয়াছেন, "সে সকল আবেদনপত্র ও কাগজপত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই।"

সুবিজ্ঞ সরকারী উকীলও সে বিষয়ে কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারেন নাই।

(৪) অন্যত্র রায়ে আছে,—"আইন অনুসারে, কোনও ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া ধৃত হইলেই সেই দিনই সে তাহার উকীলের পরামর্শ গ্রহণের অধিকারী হয়। মিঃ ক্রাসবি (গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) যে মন্তব্য করিয়াছেন—চার্জ্জসিট প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার উকীলের সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিতে পারিবে না, ইহা আইনের সাধারণ নীতির প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশক উক্তি।"

সুন্দর! ইহার উপর মন্তব্যের প্রয়োজন হইবে কি? সাধারণে আদালতের আদেশ অমান্য করিলে কি শাস্তি হয়? অর্ডিনান্স লঙ্ঘন করিলে কি হয়? মহামান্য দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ সরকারের সুপ্রতিষ্ঠ আইন ও আদালত অমান্য করিবার ক্ষমতা—বুকের পাটা কাহার হয়, সরকার ইহা হইতেই তাহার পরিচয় পাইতে পারেন না কি?

কুহেলিকা

বাঙ্গালায় সম্প্রতি দুইটি রাজনীতিক বন্দী পুলিসের হেফাজতে থাকা কালীন যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ঘন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। ঢাকার অনিল দাসের মৃত্যু এবং মেদিনীপুরের ফণীন্দ্র দাসের উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া জনসাধারণের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, অধিকন্তু সন্দেহ সঞ্জাত হওয়া স্বাভাবিক। অনিলের সম্বন্ধে গভর্ণর তদন্তের প্রয়োজন নাই বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে?

অবশ্য ঢাকার অনিলকুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে অতিরিক্ত জেলা হাকিম এক তদন্ত করিয়াছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তে জনসাধারণ সন্তোষ লাভ করিতে অথবা উদ্বেগশূন্য ও নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছে না, কর্ত্তৃপক্ষের ইহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

জেলা হাকিম যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার মূল কথা এই—

"মৃত অনিলকুমারের প্রতি কোন প্রকার মন্দ ব্যবহার করা হয় নাই। পুলিসের হেফাজতে সে যত দিন ছিল, তত দিন তাহার প্রতি কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করে নাই। তাহাকে প্রহার করা হইয়াছিল বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

কিন্তু জেলার হাকিম মিথ্যা বলিলেন বলিয়াই যে তাহা মিথ্যা, কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? আসল দেখিতে হইবে, প্রমাণ ও সাক্ষ্য;—যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই রায় দিয়াছেন। তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাউক। আমরা পর পর কয়টি প্রশ্ন করিতেছি, উহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে, সরকারের বিবৃতি প্রভৃতি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই উহা উদ্ধৃত করা হইতেছে।

(১) মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নথিপত্রে অনিলকুমারের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কি না?

(২) অনিলের দেহে অত্যাচারের নিদর্শন ছিল কি না?

(৩) অনিলের জননীর আবেদনপত্রে এ কথা ছিল কি না যে,—অনিলকে কদর্য্য আহার দেওয়া হইত, তাহাকে স্নানের অবকাশ দেওয়া হইত না, তাহাকে নির্জ্জন কক্ষে রাখা হইয়াছিল?

(৪) যদি অনিলকে রীতিমত আহার দেওয়া হইয়াছিল, তবে তাহার আহারে রুচি বা আগ্রহ দেখা যায় নাই কেন?

(৫) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, কোনও নিরপেক্ষ সাক্ষী অনিলের তরফ হইতে পুলিসের বিরুদ্ধে অনিলের প্রতি অত্যাচারের কথা বলে নাই। জিজ্ঞাস্য, যে ৫ দিন অনিল পুলিসের হেফাজতে ছিল, সে ৫ দিন তাহার পক্ষে নিরপেক্ষ সাক্ষী সংগ্রহ সম্ভবপর ছিল কি?

(৬) ডাকাতি সম্পর্কে অনিলকে গ্রেফতার করিবার পর তাহাকে পুলিসের হেফাজতে রাখিবার ব্যবস্থা হাকিম অনুমোদন করিয়াছিলেন কেন? অনিলকে মাত্র সন্দেহক্রমে ধৃত করা হইয়াছিল, সুতরাং যাহারা বাদী, তাহাদের হস্তে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা কি আইনসঙ্গত? যদি হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে আইনের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে কি?

(৭) ৭ই জুন অনিলের জননী ও দুই জন পিতৃব্য যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তাহাকে সুস্থ ও সবল দেখিয়াছিলেন। ৬ই, ৮ই ও ৯ই জুন অতিরিক্ত পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে পরীক্ষা করিয়া কোন বৈলক্ষণ্য দেখেন নাই, কেবল আহারে স্পৃহার অভাব দেখিয়াছিলেন। তাহার কি কারণ, তাহা তিনি অনুসন্ধান করেন নাই কেন? অন্ততঃ জেলা হাকিমের বিবরণে সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই।

(৮) ১১ই জুন জেলে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর অনিলকে পরীক্ষাকালে সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করেন যে, তাহার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, অনিলের পিতা উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৯) ১৩ই জুন অনিল মহকুমা হাকিমের নিকটে তাহার উপর পুলিসের অত্যাচারের অভিযোগ করে। হাকিম প্রহারের কোন নিদর্শন দেখেন নাই। তাহার দৃষ্টিতে উন্মাদের লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে চিকিৎসাধীনে রাখিবার আদেশ দেন। ১৫ই জুন সরকারী ডাক্তারের মন্তব্যে জানা যায়, অনিলের উন্মাদরোগ প্রকাশ পাইয়াছে। ১৭ই জুন অনিলের অবস্থা সাংঘাতিক হয় এবং হাসপাতালে নীত হইয়া সে মারা যায়।

এই ত ঘটনা। সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণের অকালে এইভাবে লোকান্তর ঘটিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের মন এ বিষয়ে আরও অধিক তথ্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। সে উৎকণ্ঠা দূর করা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য কি না, তাঁহারাই বিচার করিয়া দেখিবেন।

মেদিনীপুরের ডগলাস-হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ধৃত ফণীন্দ্রনাথ দাসের হিষ্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা জানা যায়:—

(১) ফণীন্দ্র অভিযোগ করে যে, ৩রা মে তারিখে মেদিনীপুর থানায় সে যখন পুলিসের হেফাজতে ছিল, তখন তাহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করা হয়। কারণ, সে পুলিসের ইচ্ছামত বিবৃতি প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই।

(২) সন্ধ্যার সময় সে প্রস্তুত হয়, রাত্রি ১১টার সময় সিভিল সার্জ্জনকে ডাকিতে হয়। পুলিস তাঁহাকে বলে, রাহাৎ বক্স চৌধুরী নামক পুলিস-কর্ম্মচারী যখন ফণীকে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তখন ফণীর হিষ্টিরিয়া রোগ দেখা দেয়। ফণী পলাইবার চেষ্টা করে, তাই তাহার দেহে লোহার গরাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।

(৩) স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইসলাম হিষ্টিরিয়ার কথাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁহার কথায় সায় দিয়াছেন।

(৪) ফণীর পিতা সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছেন, ফণীর কখনও হিষ্টিরিয়া রোগ ছিল না।

(৫) ৩০শে এপ্রেল হইতে ২১শে মে পর্য্যন্ত ফণী পুলিসের হেফাজতে ছিল। শেষোক্ত দিনে তাহাকে সাক্ষ্য দিতে অতিরিক্ত জেলা হাকিমের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। এ যাবৎ তাহার হিষ্টিরিয়া রোগ দেখা দেয় নাই।

(৬) ৩রা মে তারিখেই তাহার ঐ রোগ এখানে প্রকাশ পায় এবং উহাই তাহার জীবনে প্রথম ও শেষ। ঐ দিনেই সে অভিযোগ করে যে, পুলিস তাহাকে গুরুতর প্রহার করিয়াছে।

(৭) ৩রা মে রাত্রি ১১টার সময় সিভিল সার্জ্জন ফণীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, "ফণীর হিষ্টিরিয়া ফিট হইতেছিল। তাহার ঘাড়ে, বাম কনুয়ে এবং গালে বহু ক্ষত ও ফুলা দেখা দিয়াছিল, উহাতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঘাম হইতেছিল। এই আঘাত অত্যাচারের ফল।" পুলিস বলিতেছে, ফণী পলাইবার চেষ্টায় লোহার গরাদের উপর বার বার আছাড়িয়া পড়িয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে ফণীর দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ আহত হইল কেন? বলা হইয়াছে, কয়েক জন কনষ্টেবল তাহাকে সজোরে ধরিয়াছিল, তবে সে আছাড় খাইল কিরূপে? সিভিল সার্জ্জন আসিয়াই দেখিয়াছিলেন, ফণীর ফিট হইতেছে বটে, কিন্তু সে তখন আর শরীরে আঘাত পাইতেছে না। ইহাই বা কিরূপ? পূর্ব্বে ফিটের সময় আঘাতের পর আঘাত লাগিল, অথচ ডাক্তার আসার পর একটা আঘাতও লাগিল না?

(৮) সিভিল সার্জ্জন স্বয়ং সাক্ষ্যে বলিয়াছেন, "হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ শরীরে যাহাতে আঘাত না লাগে, সেই চেষ্টা করে।" তবে? হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত ফণী কি সৃষ্টি-ছাড়া—সাধারণ আইনের বহির্ভূত?

(৯) সিভিল সার্জ্জন ফণীকে ব্রাণ্ডি পান করিতে দিয়াছিলেন (ঔষধার্থে)। হিষ্টিরিয়া-রোগীকে কোন্ চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে ব্রাণ্ডি দেওয়া হইয়া থাকে?

(১০) নার্স পিণ্টো সাক্ষ্যে বলিয়াছে,—"ফণীকে ৪ঠা মে হাঁসপাতালে আনা হয়। ৫ই মে প্রাতঃকালে সে ফণীকে দেখে। ফণী নিজে খাইতে পারিত না, তাহাকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইত। সে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়িতে পারিত না। সে তাহাকে প্রায় সপ্তাহকাল খাওয়াইয়া দিয়াছিল। তাহার মুখে, চোখে ও গালে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাহার নিষ্ঠীবনে রক্ত উঠিত।" এ সবই কি ফণীর লোহার গরাদেতে আছাড় খাওয়ার দরুণ হইয়াছিল? নার্স ফণীর চক্ষুর উপর কালশিটার দাগ লক্ষ্য করিয়াছিল, অথচ সিভিল সার্জ্জন তাহা লক্ষ্য করেন নাই। উহা কিসের ফল? ফণী অভিযোগ করিয়াছিল, "তাহার চোখের উপর চটি জুতার প্রহার করা হইয়াছিল।" চোখের কাল্‌শিটার মূলেও কি লোহার গরাদে?

(১১) হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, তাঁহার হাঁসপাতালের ভর্ত্তির টিকিটে ফণীর নানা আঘাতের কথা আছে, 'হিষ্টিরিয়ার' কথা নাই।

ফণীর নিউমোনিয়া তাহার শরীরের উপর অত্যাচারের দরুণ হইয়াছিল, ইহা সিভিল সার্জ্জন ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের অভিমত।

এখন কথা, এই দেহের উপর আঘাতচিহ্ন কোথা হইতে হইল? পুলিস বলিতেছে হিষ্টিরিয়ার দরুণ, ফণী বলিতেছে প্রহারের দরুণ। সিভিল সার্জ্জন বলিতেছেন, সাধারণতঃ হিষ্টিরিয়া-রোগী নিজ দেহের উপর অত্যাচার করে না। তবে এই অদ্ভুত প্রহেলিকার মীমাংসা কিসে হইবে?

পরলোকে স্বর্ণকুমারী দেবী

অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া যাঁহার বীণাধ্বনি দেবী ভারতীর পূজা-প্রাঙ্গণকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল, যাঁহার

স্বর্ণকুমারী দেবী (যৌবনে)

নৈবেদ্য-সম্ভারে মন্দিরতল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, পদ্মাসনা কমলার সেই অশেষস্নেহাস্পদা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী কবির বর্ণিত আষাঢ়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন—স্বর্ণময় ঘৃত-প্রদীপ

মন্দিরতলে আর আলোক দান করিবে না। বঙ্গ-সাহিত্যে কবিবর রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর দান অসামান্য এবং বিচিত্র। বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কলিকাতা ঠাকুর-পরিবারের দান অক্ষয় হইয়া থাকিবে। স্বর্ণকুমারীর পূর্ব্বে কোনও বঙ্গ-মহিলা সাময়িক পত্রের সম্পাদনভারের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। "ভারতী ও বালক," "ভারতী" স্বর্ণকুমারীর নামের স্পর্শে ধন্য হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র জীবনব্যাপী সাধন-ফলে অসংখ্য উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে যে রস পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহা যে কোনও দেশের মহিলা রচয়িত্রীর পক্ষে গৌরবজনক। "দীপ নির্ব্বাণ," "ছিন্ন মুকুল," "মিলন-রাত্রি," "কাহাকে" "স্নেহলতা" প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গালা-সাহিত্যে গৌরবময় আসন গ্রহণ করিয়াছে, ইহা রসিক পাঠক সমাজ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান যুগে যৌন-তত্ত্ববিশারদ যে সকল সাহিত্যিক প্রতীচ্যের পচামাল আমদানী করিয়া দেবী ভারতীর তপোবনকে কলুষিত করিতেছেন, স্বর্ণকুমারী কোনও দিন তাহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থে অসম্ভব, অবাস্তব, অসামাজিক কোনও চরিত্রের সমাবেশ নাই। বাঙ্গালীর উচ্চাদর্শ হইতে স্বর্ণকুমারী কখনও ভ্রষ্টা হইয়া কোনও উপন্যাস রচনা করেন নাই। রাজপুত-কাহিনী লইয়া যে সকল উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়া নারী ও ক্ষত্রবীরগণের চরিত্রের বিন্দুমাত্র খর্ব্বতা-সাধনের অবকাশ দেন নাই। "দীপনির্ব্বাণে" যে বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুর আদর্শ বীরত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেশাত্মবোধে স্বর্ণকুমারী উজ্জীবিতা হইয়া 'মিলনরাত্রি' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী কোনও দিন শ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবী (শেষ যৌবনে)

ভারতীর বীণাগুঞ্জন সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরকে কাব্যরসে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত। অভিজাত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থাকাই যে যুগে দূষণীয় ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত না, সেই যুগে প্রচুর অর্থসম্পদ এবং ভোগ-বিলাসের মধ্যে অবস্থান করিয়াও নিষ্ঠাভরে ভাষা-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে কি? স্বর্ণকুমারীর জীবন-ব্যাপী সাহিত্য-প্রচেষ্টা তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। "মাসিক বসুমতীর" পৃষ্ঠে স্বর্ণকুমারীর বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সারা জীবনব্যাপী সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে তিনি বাঙ্গালী জাতিকে ভাবিবার বহু উপাদান দিয়া গিয়াছেন। বার্দ্ধক্যে পীড়িত হইয়াও তাঁহার লেখনী বিশ্রাম করিতে পায় নাই। তাঁহার শেষ রচনা "সাহিত্য-স্রোত" পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বাঙ্গালী, বহু গুণী ও সাহিত্যসেবীর জন্য উৎসব করিয়াছে, কিন্তু ৭৬ বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহার অকুণ্ঠ সাহিত্য-সেবার জন্য কোনও জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান বাঙ্গালী করে নাই। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী জাতির এই বিস্মৃতি শোভন হয় নাই। কিন্তু এখন তিনি সকল প্রকার স্তুতি-পূজার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। তথাপি বাঙ্গালীর পক্ষে একটা কর্ত্তব্য আছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি বাঙ্গালীর সেই কর্ত্তব্য পালনের এখনও অবকাশ আছে। পরিণত বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, সে জন্য শোক-প্রকাশের অবকাশ থাকিতে পারে না; কিন্তু তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অংশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার বিয়োগে সে অংশ শূন্য হইয়া গেল। আর কেহ সে স্থান পূর্ণ করিতে পারিবে কি?

পরলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

গত ১০ই আষাঢ় অপরাহ্নে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার শ্যামবাজারস্থ বাটীতে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন বিজ্ঞ ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি বয়স্কাউট

এসোসিয়েশনের (বেঙ্গল) সহঃ সভাপতি ও কলিকাতা ফুটবল লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবের জেনারল সেক্রেটারীরূপে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার চারি পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

—

পরলোকে সতীশচন্দ্র ঘটক

বঙ্গ-ভারতীর আর এক জন সাধক, পরিহাস-রসিক ও কথা-সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র ঘটক বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ হইতে অকালে খসিয়া পড়িয়াছেন। ভাষা-জননীর দুর্ভাগ্যক্রমে এক এক করিয়া হাস্য-রসিক সাহিত্যিকগণ বঙ্গ-জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের স্থান আর পূর্ণ হইতেছে না। রসরাজ অমৃতলালের পর প্রভাতকুমার বঙ্গ-সাহিত্যে পরিহাস-রস পরিবেষণ করিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সতীশচন্দ্র হাস্য-পরিহাসের বিমল রসধারা বর্ষণ করিতেছিলেন। প্রভাতকুমারের দেহান্তরের কিছু পূর্ব্বেই সতীশচন্দ্র ঘটক রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। উভয় বন্ধুর আর ইহ-জগতে দেখা হইল না। ২রা আষাঢ় ৪৭ বৎসর বয়সে সতীশচন্দ্র পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার পর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সতীশচন্দ্র ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু বাল্যকাল হইতেই দেবী ভারতীর বীণার ঝঙ্কার যাঁহার প্রাণের তন্ত্রীগুলিকে সুরে তানে লয়ে দেবীর পূজার জন্যই সঙ্গীতপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার সমগ্র অন্তর সাহিত্যের তপোবনেই সাধনা করিবার উপযুক্ত। তাই দেবী ইন্দিরার সেবার অধিকার পাইয়াও তিনি পদ্মাসনা দেবী ভারতীর পূজায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র প্রথম-যৌবনে "রঙ্গ-ব্যঙ্গ" রচনা করিয়া সাহিত্য সমাজে রস-রসিক বলিয়া যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহা সহস্রদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন সংস্করণ "রঙ্গ-ব্যঙ্গে" তিনি "বংশ" প্রভৃতি আরও কয়েকটি অপূর্ব্ব হাস্যরসপূর্ণ প্রবন্ধের সমাবেশ করিবেন ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা শুধু রসাত্মক প্রবন্ধ রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কবিতা, নাটক ও কথা-সাহিত্য রচনায় তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। বহু পরিশ্রম ও যত্নসহকারে তিনি "সাবিত্রী," "ইরাণের ফুল" এবং আরও কতিপয় নাটিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। "সাবিত্রী" ও "ইরাণের ফুল" কোনও রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই—হইলে দর্শক এবং রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ লাভবান্ হইতেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের অমর গ্রন্থ কমলাকান্তের দপ্তরকে নাটকাকারে পরিণত করিয়া সতীশচন্দ্র অপূর্ব্ব নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ম্যাডান্ কোম্পানী উহা চলচ্চিত্রে প্রকাশ করিবেন। তবে সতীশচন্দ্র তাহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। সঙ্গীতে এই সাধক-শিল্পীর বিচিত্র দক্ষতা ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে এই একনিষ্ঠ সাধকের প্রতিভার স্ফুরণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরিণতি ঘটিবার পূর্ব্বেই এই বন্ধুবৎসল, নিরহঙ্কার, উদারহৃদয় সাহিত্যিক বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। আমরা দীর্ঘদিনের প্রিয়দর্শন বন্ধুকে অকালে হারাইয়া ব্যথিত হইয়াছি। 'মাসিক বসুমতী'তে তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বহু সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠে তাঁহার বহু রচনা মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এখনও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্র হইতে হাস্যরসের যে ফোয়ারার উৎসমুখ চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়া গেল, আর তাহা হইতে রসধারা নির্গত হইবে না। সতীশচন্দ্রের শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননী, পতিবিয়োগবিধুরা পত্নী, পিতৃহারা পুত্র, স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও অনুরক্ত বন্ধু-বান্ধবগণকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। সতীশচন্দ্রের "নীচজাতীয়া" শীর্ষক গল্পটি বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখ এই, তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

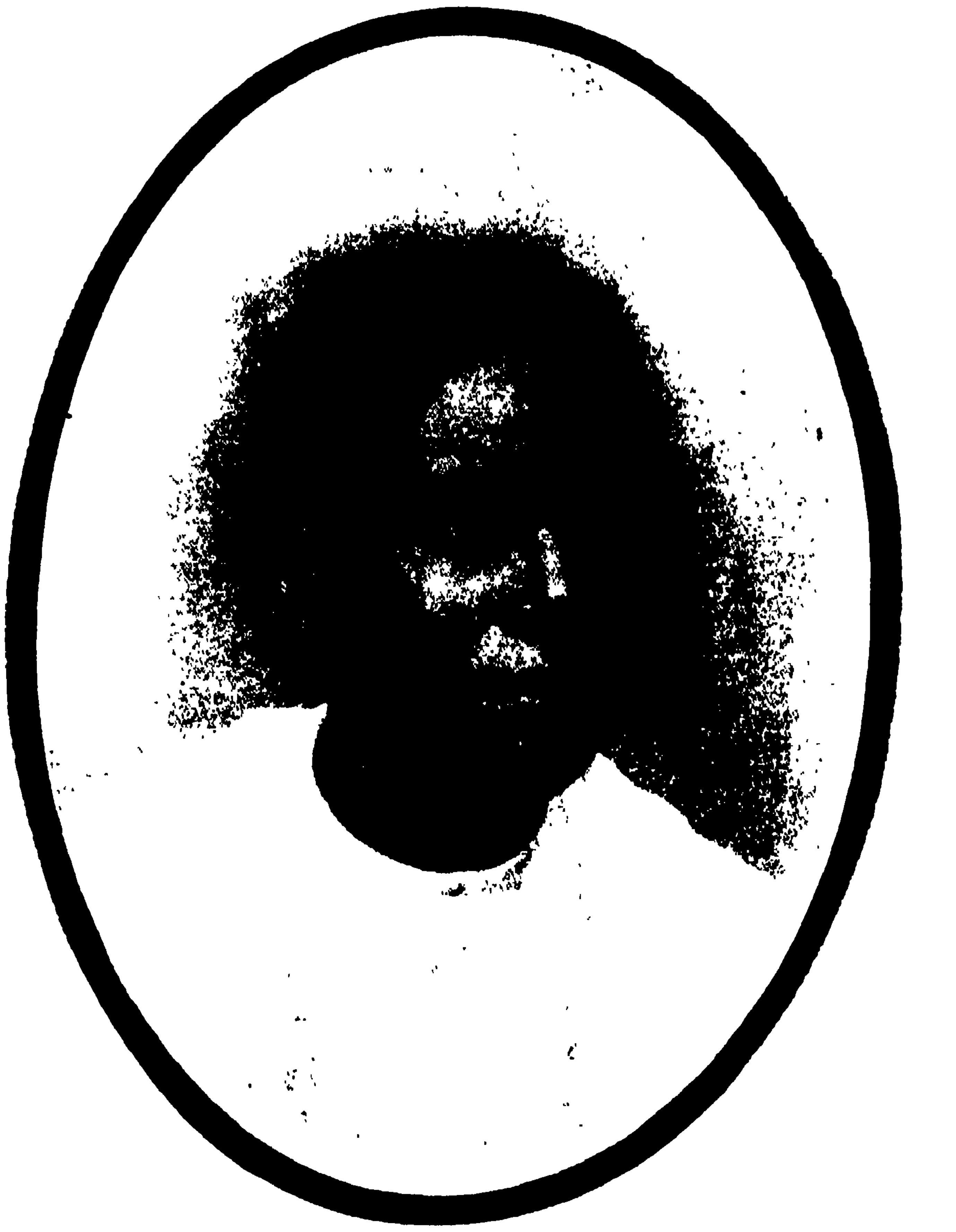

সতীশচন্দ্র ঘটক

জাতের নামে

জাতের নামে কোন্ সুজাতের গাল-ভরা গাল জোগায় ভাল
জাতের কথায় জাতের ব্যথায় মুখখানি হয় কাজল-কাল।
ছাগল-নীতির পাগল হাওয়া তার মাঝে যার সকল পাওয়া
সমাজ বাঁধন ধূপের ধোঁয়া সেই বঁধুয়ার চোখ ধাঁধাল॥

যুগযুগান্তে এই ভারতে মানবগুরু মনুর মতে
সবাই মিলে সমাজরথে সুখসুবিধায় দিন চালাল।
এবার বিধান দিচ্ছে কাজি ব্যাস বশিষ্ঠ সবাই পাজি
পাতের এঁটো চাটলে আজি আসবে নেমে স্বরাজ-আলো॥

ভাতের সানকি চা-পেয়ালায় বদনা গেলাস হুঁকোর মালায়
সার্ব্বজনীন মুখের লালায় কোন্ দেশে কে ভেদ ঘুচাল?
নাইকো যেথায় জাতের বিধান হোটেলখানাই তীর্থ মহান্
বাজ্‌ল সেথাও বিষের বিষাণ সাম্যবাদীর মুখ শুকাল।

চীন-জাপানে খুলছে কৃপাণ বলশেভিকে তুলছে তুফান
শুভ্রজাতির কাঁপছে রে প্রাণ মৈত্রী কোথায় রূপ লুকাল?
এই বিবাহ এই বিচ্ছেদ, মানুষ-পশুর নাই কোন ভেদ
ভোজের মাঝেই ভোজবাজি ঐ ভারত-মড়ার মুখ হাসাল।

ওরে বেকুব মুক্তকচ্ছ! শাস্ত্র নিজেই সত্য স্বচ্ছ
বুঝলি নি তায় করলি তুচ্ছ পুচ্ছ নাচাস্ বা'রজাঁকাল।
শুয়োর গরু মানুষ ভেড়া—সকল জাতিই বিধির গড়া
কেউ অভিরাম কেউ বা হারাম জাতজালিয়াত বিশ্বজোড়া?

অন্ধ বধির অধীর মূর্খ মুখর বোবা বামন খোঁড়া
কোন্ খেয়ালীর সৃষ্টি এ সব ভাব্ দেখি ভাই সবার গোড়া।
ঘুচবে জাতের ভ্রান্তি রে তোর 'সব সমানে'র নেশার ঘোর
জানলে জীবের কর্ম্মডোর, শুষ্ক হৃদয় হয় রসাল॥

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম, এ)।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা

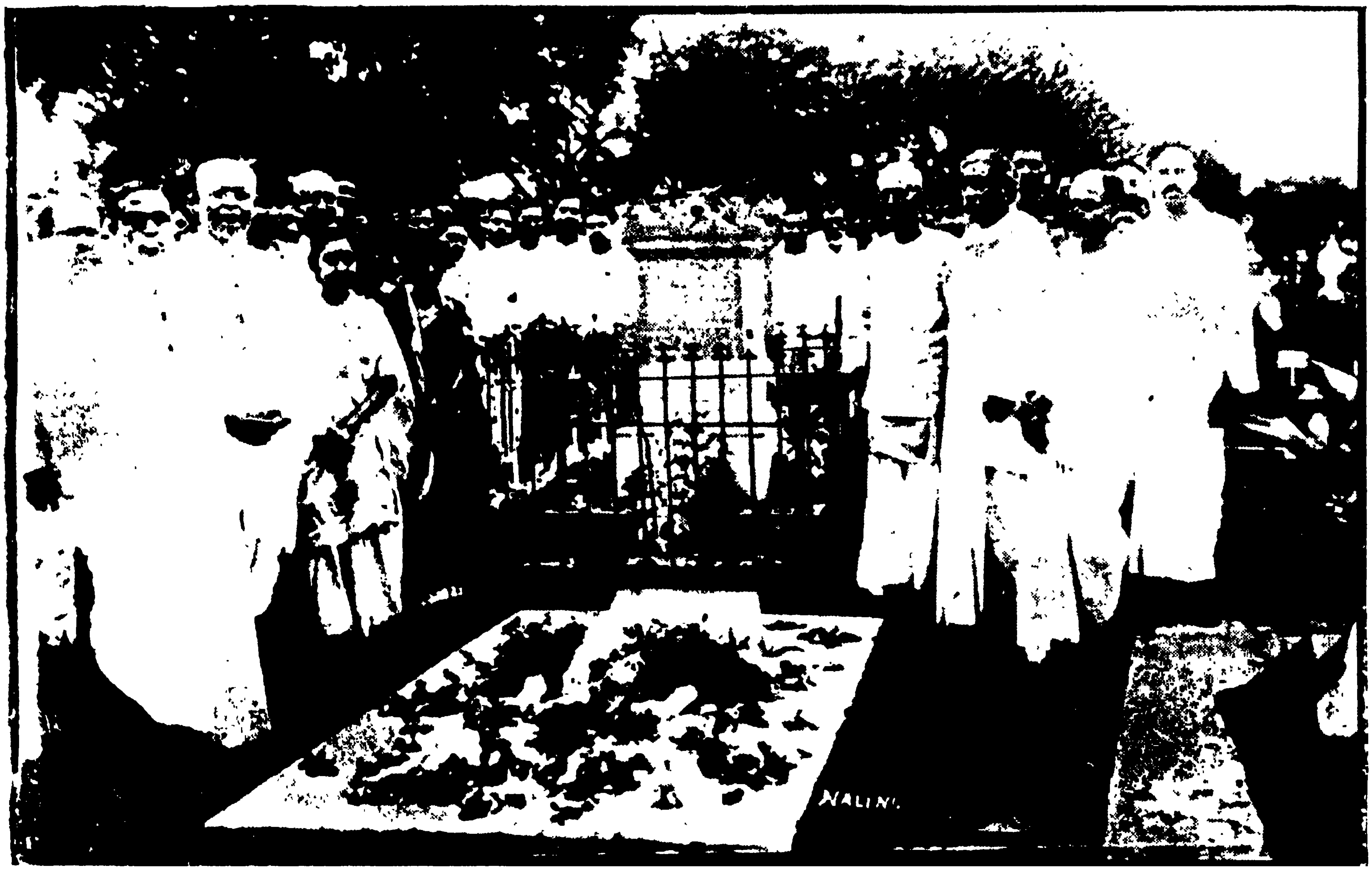

সমাধিক্ষেত্রে খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর সভ্যগণ ও অন্যান্য উপস্থিত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ

[খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর সৌজন্যে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নয়নে বাদল—গগনে বাদল—জীবনে বাদল ছাইয়া,
এসো গো আমার বাদলের বঁধু—চাতকিনী আছে চাহিয়া।—রবীন্দ্রনাথ।

বসুমতী চিত্র-বিভাগ] [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সচিত্র মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৯ [৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও মহেন্দ্রনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি রামকৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায়ে মাষ্টার মহাশয় বলিয়া পরিচিত, আমার আত্মীয়। বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে জানিতাম। সে সময়ে আমরা বিহার অঞ্চলে থাকিতাম। পিতা ঠাকুরের কর্ম্ম উপলক্ষে আমাদিগকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় যাইতে হইত। মহেন্দ্রনাথকে প্রথমে ছাপরায় দেখি। তখন আমার বয়স আট নয় বৎসর। তিনি এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষা দিয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। আমার অপেক্ষা বড় হইলেও মহেন্দ্রনাথ সকল সময় আমাকে ডাকিতেন, আমার সঙ্গে গল্প করিতেন। দুই বৎসর পরে যখন আমরা আরায়, সে সময় সেখানেও আসিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে দেখা ভাগলপুরে। আমরা একত্রে বেড়াইতে যাইতাম, একত্রে আহার করিতাম, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিতাম। সে সময় মহেন্দ্রনাথ কতকটা ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী, কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতা-মাতা বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারাও ভাগলপুরে কয়েক মাস আমাদের বাড়ীতে ছিলেন।

ইংরাজী ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় যাই। পাঠ্যাবস্থায় বিবেকানন্দ আমার সহপাঠী ছিলেন। সে সময় মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। মহেন্দ্রনাথ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। সেই কারণে তাঁহাকে সকলে মাষ্টার মহাশয় বলিত। কিছু দিন কর্ম্ম করিয়া তিনি শ্যামপুকুরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমাদের বাড়ী গ্রে ষ্ট্রীটে, শ্যামপুকুরের নিকটে। মহেন্দ্র বাবু সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিতেন।

তাঁহাদের বাড়ী ১৩ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী গলি, সিমলা কালীতলার নিকটে। কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া কিছু দিন পরে মহেন্দ্রনাথ পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন। কয়েক বৎসর তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর কাছে কলুটোলায় বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীর সহিতও আমার কুটুম্বিতা আছে। অবশেষে মহেন্দ্রনাথ শ্যামপুকুরে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

কলিকাতায় থাকিতে আমি সর্ব্বদা তাঁহাদের বাড়ী যাইতাম। সে সময় তিনি গুরুপ্রসাদ চৌধুরী গলিতেই থাকিতেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে আমি দক্ষিণেশ্বরে যাই। কেশবচন্দ্রের জামাতা কুচবিহা-রের মহারাজার একখানি ছোট ষ্টীমার ছিল। সেই ষ্টীমারে করিয়া আহিরীটোলা ঘাট হইতে আমরা দক্ষিণেশ্বর যাই। দলে দশ পনর জন লোক ছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল এবং আরও কয়েক জন প্রচারক ছিলেন। সঙ্গে খোল-করতাল ছিল। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া ষ্টীমার হইতে আমরা নামিলাম না। ঘাট হইতে একটু

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—রাখাল মহারাজ

মাষ্টার মহাশয়—মধ্য বয়সে

কেশবচন্দ্র সেন

পরমহংসদেব ও হৃদয়

নমস্কার করিলেন। দুই জনে সম্মুখীন হইয়া পরস্পরের নিকট বসিলেন। কেশবচন্দ্র আমাকে ডাকিয়া তাঁহার পাশে বসাইলেন।

সে দিনের বৃত্তান্ত আমি ইংরাজীতে লিখিয়াছি। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রোমাঁ রোলাঁ তাঁহার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিতে ঐ বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবেশন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একবার আমাদের সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কহিলেন, 'বেশ, বেশ! বেশ পটলচেরা চোখ সব।' তাহার পরেই বাক্যালাপ আরম্ভ হইল। কথোপকথন নয়, কারণ, বক্তা এক জন, আর সকলেই শ্রোতা। বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আমরা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম। কেহ একবার উঠে নাই, ষ্টীমার কোথায় যাইতেছে, কাহারও দৃষ্টি নাই। কদাচিৎ কেশব-

...রে নোঙ্গর ফেলিয়া ষ্টীমার দাঁড়াইল। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, আমরা পৌঁছিবার একটু পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়। আর দুই জন লোক দুই ধামা মুড়ি ও এক ধামা সন্দেশ লইয়া আসিলেন। ঘাটে ডিঙ্গী বাঁধা ছিল, সেই ডিঙ্গীতে উঠিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ষ্টীমারে আসিলেন। ষ্টীমারে সকলে দাঁড়াইয়াছিল। কেশবচন্দ্র অত্যন্ত ভক্তি ও সমাদরের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যর্থনা করিলেন। দুই জনই মস্তক জানু পর্য্যন্ত অবনত করিয়া পরস্পরকে

চন্দ্র একটি প্রশ্ন করেন, এই মাত্র। বাণী এক মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের; বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই। পর্ব্বতনিঃসৃত নির্ঝরের ন্যায় নির্ম্মল, অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় গভীর! সে রকম কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। শুদ্ধ ভাষার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, 'তুমি আপনির' বিচার নাই। মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন, 'বুঝ্‌লে কি না, মশায়?'

পরিধানে একখানি রাঙ্গা পাড়ের ধুতি, গায়ে পিরাণ, তাহার বোতাম নাই। পরিধেয় বস্ত্র ক্রমে কটিদেশ হইতে স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। কথা কহিতে কহিতে

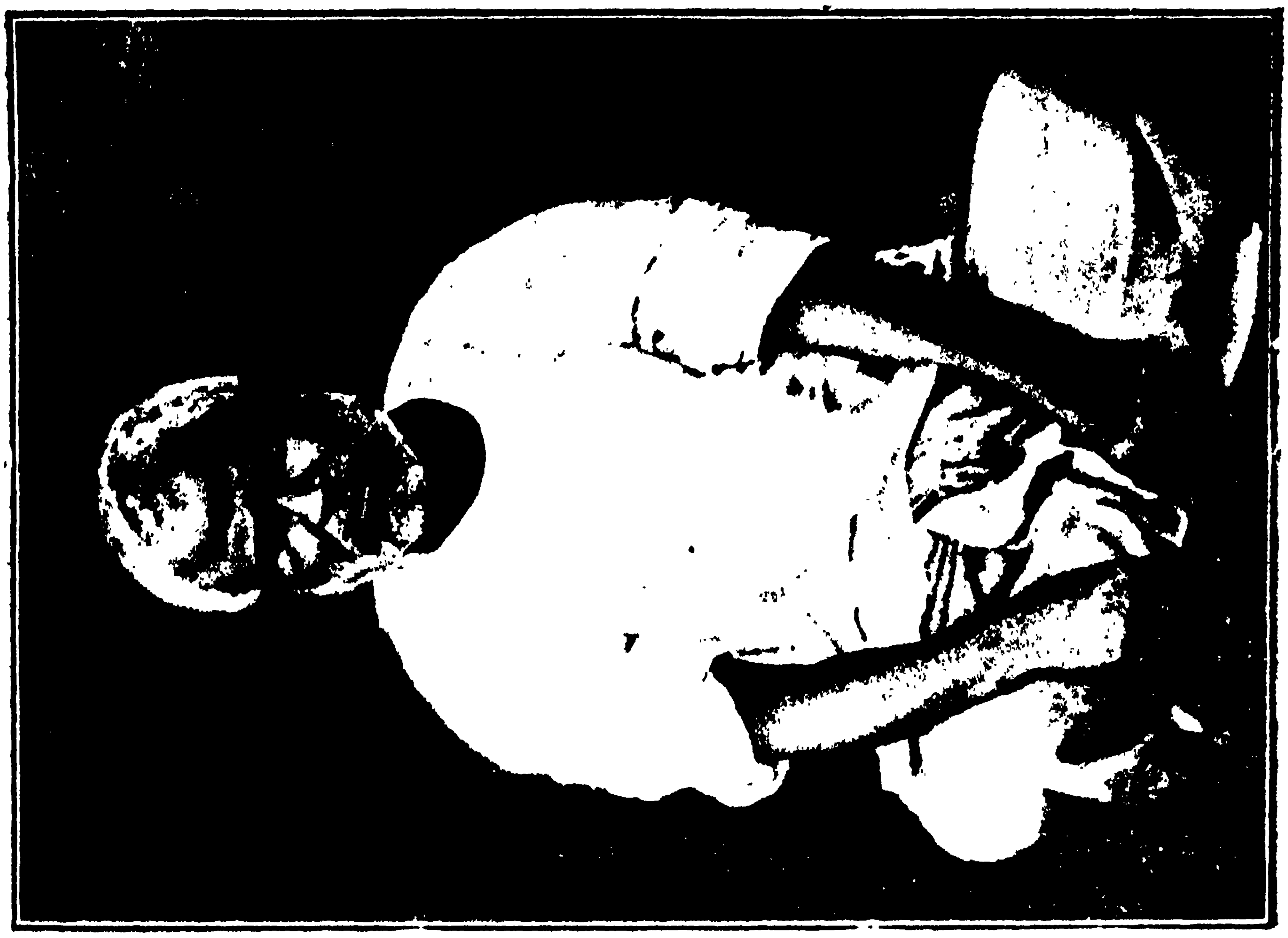

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

স্বামী সারদানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ

পরমহংসদেব অল্পে অল্পে কেশবচন্দ্রের নিকটে সরিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার উরুদ্বয় কেশবচন্দ্রের উরুর উপর রক্ষিত হইল। কেশবচন্দ্র সরিয়া গেলেন না, পরমহংস দেবের উরু নিজের উরুস্থল হইতে নামাইবার চেষ্টা করিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার প্রসঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, 'দেখ, বাবু, আমি অনেক রকম করেছি। কখন আমি যেন চকী আর ঠাকুর যেন চকা। আমি ডাকতাম, চকা! অমনি ভিতর থেকে রা শুনতাম চকী! কখন সখী ভাবে ডাকতাম।' বলিতে বলিতে একটু হাসিয়া কহিলেন, 'সাধনার সব কথা বল্‌তে নেই। ও সব বড় গুহ্য বিষয়।'

কথার বিরাম নাই। অবশেষে কেশবচন্দ্র বলিলেন, 'নিরাকারের সম্বন্ধে কিছু বলুলেন না?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'নিরাকার? নিরাকার? ঐ ত, ঐটে মস্ত কথা।' এই কথা বলিয়াই সমাধি। সর্ব্বাঙ্গ স্থির। ওষ্ঠাধর ঈষম্মুক্ত, চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত। বাহ্যদৃষ্টি নাই, বাহ্যজ্ঞান নাই। অধরে, মুখে ভূমানন্দের অপূর্ব্ব জ্যোতি।

স্বামী শিবানন্দ

সকলে স্তব্ধ, কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। সকলে নির্নিমেষ-নয়নে সেই সমাধিস্থ ব্রহ্মানন্দমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কেশবচন্দ্র ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালকে ইঙ্গিত করিলেন। খোলের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ গান ধরিলেন। খোলে মৃদু মৃদু ঘা পড়িতে লাগিল, গায়ক মধুর কণ্ঠে, অনুচ্চ স্বরে গান করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণেই শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বিৎ হইল। চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, 'এরা সব কে?' তাহার পর কয়েকবার মস্তকের উপর করাঘাত করিয়া কহিলেন, 'নেমে যা! নেমে যা!' প্রকৃতিস্থ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তখন নিজে গান ধরিলেন, 'শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে!'

দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছু দিন পরে আমি মহেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তখন তিনি কলুটোলায় থাকিতেন। সে সময় তিনি পরমহংসদেবকে দর্শন করেন নাই। আমি সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে অনুরোধ করিলাম। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় মহেন্দ্রনাথ আমাকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার কিছু কাল পরে

আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের পশ্চিমসীমান্তে করাচি চলিয়া যাই। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতাম। আমি প্রবাসে থাকিতে একবার মহেন্দ্র বাবুর অতি কঠিন কলেরা রোগ হয়। সে সময় তিনি শ্যামপুকুরে বাস করিতেন। আমার খুড়তুত ভাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহেন্দ্র বাবুকে আমাদের গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আনিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। মহেন্দ্র বাবু আরোগ্যলাভ করেন। এ ঘটনাও মহেন্দ্র বাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেঙ্গল বোর্ড অব রেভিনিউয়ের মেম্বর হইয়াছিলেন। এখন পেন্সন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

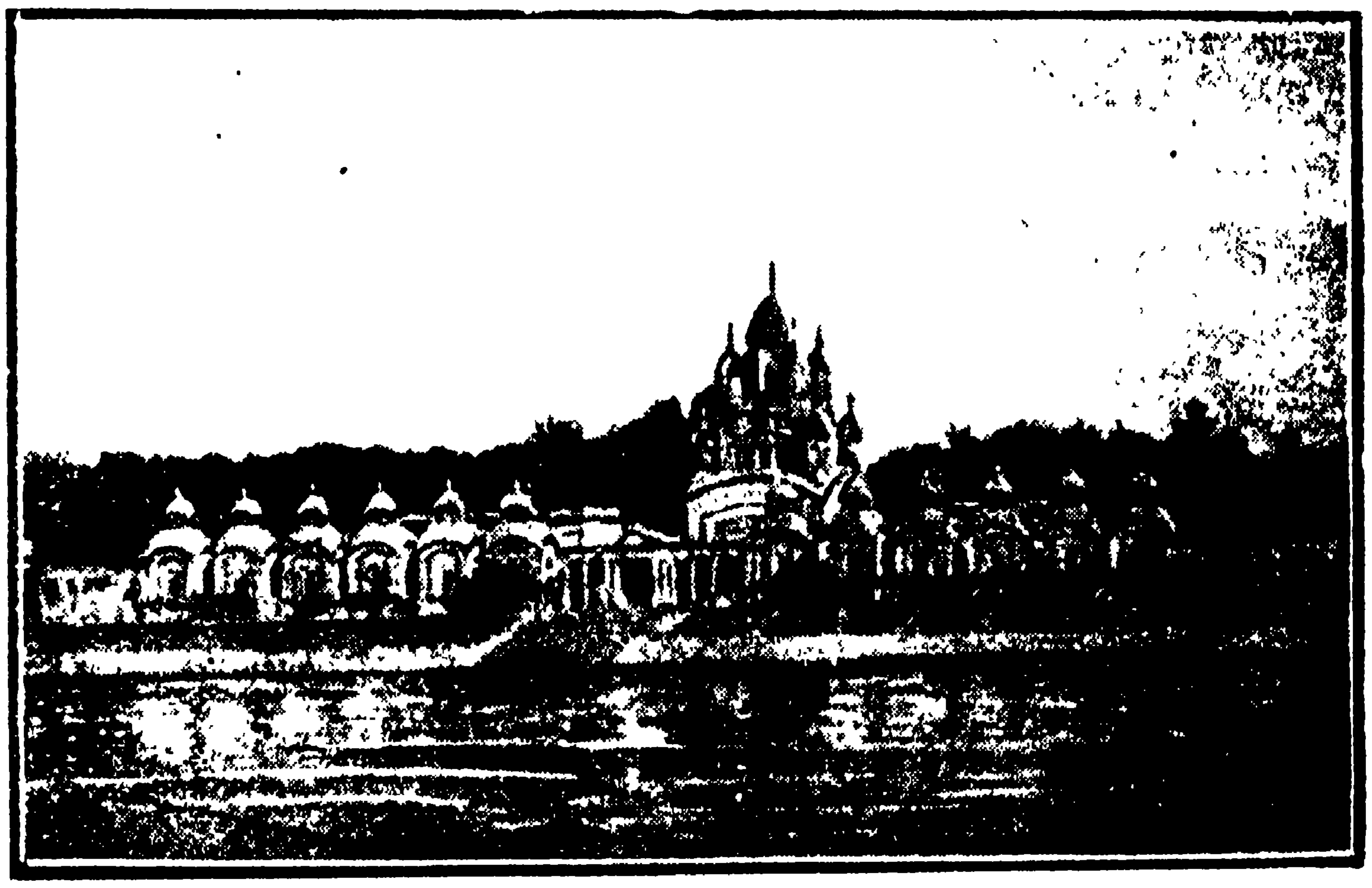

গঙ্গাবক্ষ হইতে দক্ষিণেশ্বরের দৃশ্য

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাঁহাকে দেখিয়াই মহেন্দ্রনাথের মনে উদিত হয়। মুখে মুখে পরমহংসদেবের উক্তি কলিকাতায় অনেক স্থানে প্রচলিত হইয়াছিল। কতকগুলি উক্তি কেশবচন্দ্রের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কথামৃত কিরূপে লিখিত হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ মহেন্দ্র বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন। তিনি যখনই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিতে বসিতেন। এক দিনের কথা লিখিতে তিন দিন লাগিত। যাহা লিখিতেন, মধ্যে মধ্যে পরমহংস মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইতেন।

কিছু কাল পরে মহেন্দ্রনাথ মর্টন ইন্‌স্টিটিউশন নাম দিয়া নিজের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাসের জন্য আর স্বতন্ত্র বাড়ীর প্রয়োজন রহিল না। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ী ভাগ হইয়া গেলে মহেন্দ্রনাথ নিজের অংশের নাম ঠাকুরবাড়ী রাখিয়াছিলেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত ছিল ও নিত্য পূজা হইত। বেলুড় মঠ হইতে ও অপর স্থান হইতে সন্ন্যাসীদের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল।

যে সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি হয়, তখন আমি কলিকাতায়। কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে মহেন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমরা সকলেই কাশীপুরের শ্মশানে গিয়াছিলাম। আমার ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু আমার বোধ হয়, মহেন্দ্রনাথ আর আমি একত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

মহেন্দ্রনাথের প্রধান গুণ ছিল আত্মগোপন। কথামৃত গ্রন্থে তিনি নিজের নামের আদ্যক্ষর মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। 'শ্রী ম' ব্যতীত সম্পূর্ণ নাম লিখিতেন না। প্রকাশ্য সভায় কখন উপস্থিত হইতেন না। তাঁহার স্বাক্ষরিত কোন প্রবন্ধ বা রচনা কখন কোন মাসিক অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। কথামৃত ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ তিনি রচনা করেন নাই।

গৃহস্থ হইলেও মহেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কোন বিষয়ে আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। আহারে, পরিধেয় বস্ত্রে, সকল বিষয়ে সংযমী ছিলেন। স্কুলবাড়ীতে একটি ছোট ঘরে একখানি ছোট তক্তপোষ ছিল, তাহার উপর সামান্য শয্যা। তাহাতেই শয়ন করিতেন। বাক্‌সংযমও অসাধারণ। কাহারও চর্চ্চা করিতেন না, কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন না। মহেন্দ্রনাথ আদর্শচরিত্র সাধু পুরুষ। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিলে জাতির কল্যাণ হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

স্পর্শের প্রভাব

৭

রাত্রি এক প্রহর অতীতপ্রায়। কলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল পরিশ্রম করিয়া তারকনাথ বাসায় ফিরিতেছিল। গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, কে এক জন লোক তাহার বাসার গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাহার সহিত অনুচ্চ স্বরে কথা কহিতেছে। তারক বিস্মিত হইল। এত রাত্রিতে তাহার ভ্রাতৃজায়ার শয়ন-কক্ষের গবাক্ষ-সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া কে এই লোকটা ভিতরে কাহার সহিত কথা কহিতেছে?

তারক দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া পরুষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে কে?" কথাটা বলিবার সময় তারক সবিস্ময়ে দেখিল, তাহাদের জানালার পার্শ্ব হইতে কে যেন তাহাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গেল। তারকের কপাল ঘামিয়া উঠিল। সে পুনরায় বলিল, "কে হে তুমি?"

লোকটা তখনও এক পদ নড়িল না, জড়িত স্বরে বলিল, "তোর বাবা।"

তারকের মাথার রক্ত চন্‌-চন্‌ করিয়া উঠিল, সে তখনই উদ্যতমুষ্টি হইয়া তাহার দণ্ডবিধানের জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু লোকটাকে মত্তাবস্থায় দেখিয়া হস্ত নামাইয়া লইল, বলিল, "বাবা? মুখ সামলে কথা কোয়ো, ছোট লোক কোথাকার!"

লোকটা তখনও গবাক্ষ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারকের ভর্ৎসনায় তাহার চৈতন্য বিশেষ সজাগ হইয়া উঠিল, জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, "ছোঁড়া, মরণ ডেকে আনলি? গুপে গুণ্ডাকে গাল দেয়, এমন বাপের বেটা আছে কে বাগবাজারে?" বলিয়াই সে মুষ্টি উঠাইয়া তারককে মারিতে গেল, কিন্তু মুষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জানালার গরাদের উপর পড়ায় বিষম বাধা পাইয়া সে সশব্দে ভূতলশায়ী হইল। তারক হাসিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল,—লোকটার হাত কাটিয়া রক্তস্রোত বহিতেছে। পথের খোয়ায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার কপাল কাটিয়া রক্তাক্ত হইয়াছে। তারক তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র গুপে গুণ্ডা ওরফে গুপীনাথ কপালী সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্রোধ ও ঘৃণা-মিশ্রিত স্বরে বলিল, "যা বেটা, আজ বড় বেঁচে গেলি। কিন্তু এক দিন যদি তোর রক্ত না দেখি ত আমার নাম গুপে গুণ্ডা নয়।" লোকটা প্রায় একরূপ টলিতে টলিতে স্থানত্যাগ করিল। তারক তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, তাহার পর গম্ভীর-মুখে ঘরে প্রবেশ করিল। ক্ষণ-পূর্ব্বে গবাক্ষের অন্তরালে সে একখানি মুখ দেখিয়াছিল,—সেখানি—সেখানি—তারকের মুখমণ্ডল অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া সে দাওয়ার উপর গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বর্ষীয়সী জননী তন্দ্রাকাতরা হইয়া তাহাকে আহারের জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছেন—সে তাহা শুনিয়াও শুনিল না।

সারদাসুন্দরীর তন্দ্রাঘোর কাটিয়া গেলে, তিনি যখন তাহার সমীপস্থ হইয়া ডাকিয়াও সাড়া পাইলেন না, তখন বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সদানন্দ পুত্র ত এমন অসম্ভব গম্ভীর কখনও হয় না। তাঁহার কাকুতি-মিনতি ব্যর্থ হইল, পুত্র কেবল বলিল, "বউ কি শুয়েছে, মা?"

গৃহিণী রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "তাঁর কথা তিনিই জানেন, আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ রাখি নি। আয় বাপু, খাবি আয়, বউ বউ করেই অজ্ঞান, বউ যে কি ধনী, তা ত জান্‌লি নি।"

তারক বলিল, "না মা খাব না, অবেলায় খেয়ে ক্ষিদে হয় নি। তুমি শোও গে, আমি দোরে খিল দিয়ে যাচ্ছি।"

কিন্তু মা ছেলের নিষেধ সত্বেও বকিতে বকিতে ভাতের থালা বাড়িয়া দিলেন। তারক উঠিয়া ভাতৃজায়ার কামরার দ্বারে গিয়া ডাকিল, "বৌ, ঘুমিয়েছ ?"

ভিতর হইতে কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না, ঘরের আলোকও নিষ্বাপিত। তারক আর একবার ডাকিল, কিন্তু সাড়া না পাইয়া জননীর পুনঃ পুনঃ আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আহারে বসিল, কিন্তু এক গ্রাসও মুখে তুলিতে পারিল না। কেবল বলিল, "দাদার চিঠি পেয়েছ মা, কবে ছুটী হচ্ছে ?"

মা বলিলেন, "দাসী-বাঁদী ও সব খবর কোথা পাবে, বাবা ? যারা চিঠি পায়, তারা পেয়েছে, তারা খবর বলতে পারে।"

তারক ছোট একটু 'হুঁ' দিয়া ভাত নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং তন্ময় হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিতে দেখিল, শ্রান্তা ক্লান্তা বর্ষীয়সী জননী দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়া ঝিমাইতেছেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া জননীকে তুলিয়া দিল। তাহার পর উভয়ে শয়ন করিল।

রাত্রিটা তাহার ভাল কাটিল না। পরদিনও যে তাহার ভাল কাটিবে, তাহার লক্ষণও দেখা গেল না। কার্য্যে যাইবার পূর্ব্বে সে সঙ্কুচিতভাবে তাহার ভ্রাতৃজায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার চিঠি পেয়েছ, বৌ ? আমায় ত কিছু লেখে নি। কবে আসছে লিখেছে ?" তরলা বলিল, "ছুটীর আর দশ দিন আছে।"

হঠাৎ তারক কাতর দৃষ্টিতে তরলার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এখানে কি তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে, বৌ ? একটা ঠিকে ঝি রেখে দেবো ? অভ্যেস নেই তোমার—কি বল ?"

প্রশ্নের মধ্যে কতখানি স্নেহ ও আদর প্রচ্ছন্নভাবে প্রশ্নকর্ত্তার মনটাকে জড়াইয়া ছিল, তরলার তাহা বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। সরল শিশুর মত এই দেবরটি! তাহারও মনটা নরম হইয়া আসিল। সেও স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "না, কেন, কষ্ট কিসের ? ঠাকুরপো যেন একটা পাগলা ছেলে! ঘর-সংসার করতে গেলে অমন কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে, ওতে কি বেটাছেলেরা কাণ দেয় ?" তরলার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল!

তারকের বক্ষের উপর হইতে যেন জগদ্দল পাষাণের গুরু ভার নামিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস নির্গত হইল। সে আরও মিনতির সুরে বলিল, "আমরা গরীব ব'লে তোমায় মনের মত ক'রে রাখতে পারি নি, বৌদি। দোহাই বৌদি, আর তিনটে মাস আমায় সময় দাও, আমার বাইসম্যানি পাকা হ'লে, কোন কষ্টই আর হবে না।"

তরলা হাসিয়া বলিল, "কষ্ট কি, ভাই! তোমার মত লক্ষ্মণ দেওর থাকতে কষ্ট কি আবার ?"

তারক তাহার হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল, "না, বলছিলুম কি, বাইসম্যানির পুরো মাইনেটা পেলেই সীতেনাথ দের ঐ একতলা কোঠাবাড়ীটায় উঠে যাব। দাদা একলা ক'দিক্ সামলাবে বল দিকি।"

'দাদার' নামটি যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতই কার্য্য করিল। এতক্ষণ তরলা প্রফুল্ল মনে হাসিয়া দেবরের সহিত কথোপকথন করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ এই নাম শ্রবণের পর তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মুখরা চপলা অমনই তীব্র কণ্ঠে বলিল, "অত সুখে কায নেই আমার আর, যা আছে, তাই থাকলে হয়। সত্যি বলছি ভাই, তুমি আছ বলেই এখানে তিষ্টে আছে, নইলে এ বাড়ীতে কাক-চিল বাস করে ?"

তারকের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে চাহে সকলে মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা! ঘরে কি এতটুকুও শান্তি নাই ? কি আশ্চর্য্য! ইহারা কেহই তাহার দাদাকে চিনিল না ?—তাহার শিব তুল্য দাদা! তাহার মনে ঈষৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল, সে বলিল, "তা যাই বল বউ, দাদা আমার গরীব গোমস্তা হলেও বংশে খাটো নয়, আমার মত মুখ্যুও নয়। দাদার মত মানুষ হাজারে কটা ?"

তারক দাঁড়াইল না, হন হন করিয়া কাযে চলিয়া গেল। তরলা নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ইহার পর আরও দুই চারি দিন তারক গুপীনাথকে তাহাদের গৃহের আশে পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। তাহাকে দেখিলেই গুপীনাথ নিমিষে সরিয়া যাইত। তারকের মন বিষম সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল। লোকটার মতলব কি? সে সঙ্কল্প করিল, এক দিন সে সুযোগমত ধরিয়া এ বিষয়ে বোঝাপড়া করিয়া লইবে। এক দিন সত্য সত্যই সেই সুযোগ ঘটিয়া গেল।

সে দিন কলে অতিরিক্ত কায করিবার প্রয়োজন ছিল না। তারক সকাল সকাল কলের কায সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। মনটা তাহার ভাল ছিল না। জ্যেষ্ঠাগ্রজের পত্র পাইয়াছে, তাহার কর্ম্মস্থলে কয়দিন হইতে কলেরা দেখা দিয়াছে। তারক কলেরাকে যমের মত ভয় করিত। সে জানিত, সাপে স্পর্শ করিলে যেমন মানুষের নিস্তার নাই, তেমনই এই ভয়ঙ্কর রোগ মানুষকে একবার স্পর্শ করিলে তাহার আর রক্ষা নাই। পত্র পাইয়াই তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, সে অগ্রজকে পত্র-পাঠ চলিয়া আসিতে পত্র লিখিল, ছুটী মঞ্জুর না হইলে কর্ম্মে জবাব দিতেও যেন দ্বিধাবোধ না করে, ইহাও সে লিখিয়া দিল।

কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে সে গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। গলির মধ্যস্থ কুস্তির আখড়ার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সে দেখিল, একটা লোক বুক ফুলাইয়া হেলিয়া দুলিয়া খালের দিকে চলিয়াছে—সে গুপীনাথ।

তারক তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তোমাকেই খুঁজছিলুম। আমার বাড়ীর জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি কেন হে তোমায়? কি ভেবেছ?" গুপীনাথ প্রশ্নটা বিস্মিত হইল - ক্ষুদ্র মেষশাবক, ব্যাঘ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সে জল ঘোলা করিল কেন? তাহার পর সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "যদিই দাঁড়াই, তোর কোন্ বাবা কি করতে পারে?"

তারক ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া এক লম্ফে তাহার অঙ্গের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! মানুষ রুদ্ধ লৌহদ্বারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে দ্বারের যে ক্ষতি হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গুপীনাথ বজ্রের মত ভীষণ মুষ্টি উত্তোলিত করিয়া এক আঘাতে তাহাকে ভূমিশায়ী করিয়া দিল, তারকের ললাটদেশ হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িল, সে মাত্র একটি আর্ত্তনাদ করিয়া প্রায় অচৈতন্যের মত পড়িয়া রহিল।

আখড়ার মধ্য হইতে একটি লোক এই সময়ে বহির্গত হইয়া যাইতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল; দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তারকনাথকে ধরিয়া তুলিল, বলিল, "ইস! রক্ত যে ঝুঁঝিয়ে পড়ছে। ওরে ভবা, শীগ্‌গীর আয় তোরা এ দিকে, আহা হা, বাচ্চা ছেলে!"

তরুণের দল হৈ হৈ করিয়া আখড়া হইতে বাহির হইয়া আসিল, কাহারও দেহ নগ্ন, মৃত্তিকালিপ্ত, কেহ মাত্র কৌপীন ধারী, কেহ বা বস্ত্র পরিধান করিতে করিতেই বাহির হইয়া আসিয়াছে। ব্যাপার বুঝিয়া অন্য লোক হইলে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িত, কিন্তু গুপীনাথ সে ধাতুতে গঠিত নহে। সে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "আহা হা, কচি খোকা! একটা ঘুসির ভর সইতে পারে না, এয়েছে তেড়ে মারতে।"

তারকনাথ ততক্ষণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, আখড়ার ব্যায়াম-বীররা তাহার আঘাতস্থল তখন জল দিয়া ধুইয়া দিতেছে। তারকনাথ ভগ্নস্বরে বলিল, "ক্ষমতা নেই, নইলে তোর মুখ লাথি মেরে ভেঙ্গে দিতুম জানিস"—

গুপীনাথ বন্য মহিষের মত তাহাকে আবার তাড়া করিয়া গেল। কিন্তু এবার তাহার যাওয়াটা তত সহজ হইল না। যে লোকটি তারককে প্রথমে আসিয়া ধরিয়া তুলিয়াছিল, সে বজ্রমুষ্টিতে গুপীনাথের একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। সে রণেন্দ্র। গুপীনাথ বাধা পাইয়া একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, ভীষণ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া রণেন্দ্রকে প্রহার করিতে গেল। কিন্তু সে চেষ্টাও তাহার ব্যর্থ হইল। রণেন্দ্র অতি সহজে সুন্দর কৌশলে তাহার আর একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া এমন মুচড়াইয়া ধরিল যে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল। রণেন্দ্র জিজিৎসু জানিত।

গুপীনাথ ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া ইতরের ভাষায় গালি পাড়িয়া রণেন্দ্রের মুষ্টি হইতে হস্ত মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রণেন্দ্রকে দুই একটা পদাঘাত করিতেও ক্ষান্ত হইল না, চীৎকার করিয়া বলিল, "শালা, চিনিস নি আমায়? আমি গুপে গুণ্ডা।"

রণেন্দ্রের বন্ধুরা তাহার ইতরামি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে গেলে রণেন্দ্র সঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া মৃদু হাসিয়া গুপীনাথকে বলিল, "ধীরে বন্ধু, ধীরে!

তুমি গুপে গুণ্ডাই হও আর গুপে মেড়াই হও, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তোমার গুণ্ডামী এই বালকের উপর ফলাচ্ছিলে কেন বল ত? লড়তে চাও, চল, আখড়ার মধ্যে। এদের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছে লড়তে চাও লড়বে। কেমন হে?"

বন্ধুরাও চীৎকার করিয়া বলিল, "আলবাৎ।" খুব একটা হাসির গর্‌রা উঠিল। গুপীনাথের দেহখানা ক্রোধে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তখন রণেন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। রণেন্দ্র সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তারকের অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিয়া সস্নেহে বলিল, "কেমন হে ছোকরা, ব্যথাটা কমেছে একটু? এস, আখড়ার মধ্যে গিয়ে একটু জিরুবে চল।"

রণেন্দ্র তারককে লইয়া আখড়ায় প্রবেশ করিতেছিল, বন্ধুরাও তাহার অনুসরণ করিতেছিল, এমন সময়ে ক্ষিপ্তপ্রায় গুপীনাথ বাধা দিয়া বলিল, "কোথা যাবি, শালা"—

কিন্তু কথাটা তাহাকে শেষ করিতে হইল না, রণেন্দ্রের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে সে টলিয়া আখড়ার বেড়ার গায়ে পড়িল। রণেন্দ্র এবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "ফের গাল? সাহস থাকে, শক্তি দেখা, মুখ খারাপ করলে মুখ ভেঙ্গে দেবো।"

রণেন্দ্র কথাটা বলিয়া গাত্রাবরণ উন্মুক্ত করিয়া বন্ধুদের হস্তে অর্পণ করিয়া সংঘর্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ গেঞ্জির আবরণ সত্ত্বেও স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইল।

গুপীনাথ একবার অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেল। তাহার পর বলিল, "এত জন আর আমি একলা। আচ্ছা এর পর"

রণেন্দ্র বলিল, "বেশ ত, এরা কেউ আসবে না, দাঁড়িয়ে দেখবে।"

গুপীনাথ বলিল, "মুখে ও সবাই ব'লে থাকে। সব বেটাকেই জানা আছে।"

পথে জনতা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা লোক বাজার হইতে দুইটা ঝুনা নারিকেল কিনিয়া লইয়া যাইতেছিল। রণেন্দ্র তাহার হস্ত হইতে একটা নারিকেল লইয়া বলিল, "আচ্ছা, কার কত জোর আছে, জানাই যাবে এতে। ভাঙ্গ ত হে গুণ্ডা, এই নারকোলটা টিপে।"

গুপীনাথ রুষ্ট স্বরে বলিল, "তামাসা করবার যায়গা পাও নি আর? মানুষে হাতে নারকোল ভেঙ্গে থাকে না কি?"

রণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না ভাঙ্গলে তোমায় বলবো কেন? দেখ, ভেঙ্গে দিচ্ছি।" রণেন্দ্র একটি নারিকেল লইয়া দুই হস্তের মধ্যে ধরিয়া চাপ দিল, তাহার মুখচক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল। জনতা নীরব নিথর হইয়া বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল—সকলেরই মুখে ঔৎসুক্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে মড়মড় শব্দে নারিকেল ভাঙ্গিয়া পড়িল! জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া রণেন্দ্রের প্রশংসায় মুখর হইল।

গুপীনাথের মুখখানা কালো আঁধার হইয়া গেল, সে তবুও বলিল, "নারকোলটা পচা ছিল।"

রণেন্দ্র বলিল, "বেশ, আর একটা রয়েছে, এটা না হয় তুমিই ভাঙ্গো।"

গুপীনাথ নারিকেলটা লইয়া একবার প্রাণপণ শক্তিতে চাপ দিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। সে আরও দুই তিনবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন বারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

রণেন্দ্র তাহার হস্ত হইতে নারিকেলটি লইয়া বলিল, "কি হে, দেখলে, নারকোলটা ভাল না পচা? পচা নয় বোধ হয়? দেখ, এটাকেও ভাঙ্গি।"

কথামত কার্য্য সম্পন্ন করিতে রণেন্দ্রের দুই মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। জনতা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। গুপীনাথ আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, সে যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেল, "আচ্ছা, দেখা যাবে।" রণেন্দ্র হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সেই প্রাণখোলা হাসি স্থানটার বিকট গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া দিল!

৮

রাজেশ্বর বাবু কলিকাতায় গিয়াছেন। জ্যোৎস্না আর পূর্ব্বের মত গ্রামের পথে ভ্রমণে বহির্গত হয় না। পিতার নিষেধাজ্ঞা হইতেও তাহার আরও একটা বড় ভয়ের কারণ ছিল,—যদি দেখা হয়! সেই অপরিচিত অথচ পরিচিত আগন্তুক যদি এই গ্রামেই অবস্থান করে! এ খবর সে রাখে না, রাখিবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। যাহার সহিত ইহকালের সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াও ইহ-জীবনের মত ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহার উপস্থিতিতে কোন কিছু আসিয়া

যায় না। কিন্তু তবু—তবু সেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা মনে পড়িলে বক্ষ দুরু দুরু করে কেন? যদি সে গ্রামে উপস্থিত থাকে, তবে হয় ত ঘটনাক্রমে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাইতে পারে। সে বিপদ স্বেচ্ছায় আহ্বান করিবার প্রয়োজন কি?

কিন্তু তাহার উপস্থিতির সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন না হইলেও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী তাহার উপস্থিতির কথা প্রায় নিত্যই জানাইয়া দেয়। সে দেখে, সম্মুখের উদ্যান ও উদ্যান-বাটিকার আকৃতিপ্রকৃতির নিত্যই পরিবর্ত্তন হইতেছে—সেই শ্মশানের বিকট নীরবতা নিত্য ভঙ্গ হইতেছে—লোক-লস্করের হাঁকডাকে উদ্যান কোলাহলমুখরিত হইতেছে, নিরাভরণা বিধবা যেন সালঙ্কারা হইয়া উঠিতেছে। কখনও সে শুনিতে পায়, সনাতন লোকলস্করকে ধমক দিয়া শাসাইতেছে, "বিকেলে এসে বাবু যদি পুকুর-পাড়ের এ ঝোপটা দেখতে পায়, তা হ'লে অনর্থ বাধাবে ব'লে দিচ্ছি।" আজ তরিতরকারির ডালি, কাল ফুল-ফলের; কিন্তু তাহাদের আলয়ে কিছুই ত গৃহীত হয় না। সুধা ছুটিয়া আসিয়া আনন্দে করতালি দিয়া বলে, "অ-দিদি, অ-দিদি! দেখবে এস না, রণেন বাবু কত বড় একটা রুই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে। খাসা লোক, না দিদি?" কিন্তু রামধনিয়ার ত সে সওগাদ লইবার হুকুম নাই!

এক দিন এ জন্য সনাতন তাহাকে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিল, "বাবুর জিনিষ বাবু দিয়েছে, নেবে না কেন, মা লক্ষ্মি?" জ্যোৎস্না মহা বিপদে পড়িল, কথার উত্তর দিতে সে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সে অন্য কথা পাড়িয়া মিষ্ট কথায় সনাতনকে ভুলাইয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল!

রামধনিয়া দুই তিন দিন খবর দিয়াছে, বাগানের জমীদার বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। অমনই জ্যোৎস্নার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইয়াছে, ধমনীতে রক্তের স্রোত তীরবেগে বহিয়াছে! কিন্তু সে যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর অকম্পিত রাখিয়া জবাব দিয়াছে, পিতা এখানে নাই, কাযেই সাক্ষাৎ হইবে না। তবু তিনি সাক্ষাতের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে ছাড়েন্ নাই।

জ্যোৎস্নার মন রণেন্দ্রের ব্যবহারে কি ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিত? সে কেবল ভাবিত, পিতা এত দিন পরে এখানে বাস করিতে আসিয়া ভাল করেন নাই। কত দিন সে মনে করিয়াছে, এ বিষয়ে পিতাকে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিবে, কিন্তু বলি বলি করিয়া বলা হয় নাই।

এক দিন অপরাহ্নে জ্যোৎস্না তাহাদের বাগানের ক্ষুদ্রায়তন জলাশয়ের সদ্য-সংস্কৃত শাণের ঘাটে বসিয়া এই সমস্ত কথাই মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছিল। গৃহে রামাবতারের পত্নী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। পিতা কলিকাতায়, পিসীমাতা সুধাকে লইয়া বামুনপাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন, মালী ও রামধনিয়া হাটে গিয়াছিল।

জ্যোৎস্না অতীত ও বর্ত্তমানের কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। তখন অস্তগমনোন্মুখ সহস্ররশ্মির রক্তরশ্মিজাল পশ্চিমগগনপ্রান্তে সিন্দূর লিপ্ত করিয়া দিয়াছিল বাতাসের সামান্য আন্দোলনে সরোবরের কালো জলে ক্ষুদ্র তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছিল। ঝাউ দেবদারুর পত্র রাশি সর্ সর্ শব্দে খসিয়া পড়িয়া বীথিকার বক্ষে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছিল। রঙিয়া রঙিয়া পাখীর কূজন বকুল-শাখার পত্রান্তরাল হইতে আকাশে ভাসিয়া আসিতেছিল। বায়ুতাড়িত সরোবরের কালো জলের উপর আকাশের রাঙ্গা ছবির প্রতিচ্ছায়া পড়িয়া আন্দোলিত হইতেছিল। কতকাল—কতকাল পূর্ব্বে এই ভদ্রাসনে তাহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল—তখন সে কতটুকু—সে কথা ত তাহার বিন্দুমাত্র মনে নাই, সর্ব্বধ্বংসী কাল তাহার স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে!

"ওঃ! এখানে আপনি? ফটক ভেজান ছিল, ভিতরে এসে কারুর সাড়াশব্দ পেলুম না। দু'টো কথা বলতে এলুম রাজেশ্বর বাবুকে—তিনি কি বাড়ীতে নেই?"

জ্যোৎস্না চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার বিস্ময়ের অবকাশে রণেন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখুন, বড় জরুরী কায, দুটো কথা বলতে এসেছিলুম, বেশী না। এই চাতালটার এক পাশে বসতে পারি কি?"

জ্যোৎস্না কোন উত্তর না দিয়া অবনত-মস্তকে স্থান ত্যাগ করিতে গেল। রণেন্দ্র নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও অপমানাহত স্বরে বলিল, "দেখুন, পথের ভিখিরী অতিথি এলেও গেরস্ত দাঁড়াতে বলে, দু'মুঠো দেবার জন্যে। অন্ততঃ দেবে কি না দেবে, ব'লে দেয়। আমি মান অপমানের কথা মনে না করেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম, তা কথাটাও শুনে যাবেন না?"

জ্যোৎস্না চমকিয়া দাঁড়াইল। রণেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে এমন একটা করুণ মিনতির বিষাদপূর্ণ ঝঙ্কার উঠিল যে, তাহা তরুণীর হৃদয়তারে আঘাত করিয়া সশব্দে বাজিয়া উঠিল।

রণেন্দ্র বলিয়া চলিল, "আপনার পিতা এখানে নেই। সুধা বালক, কাযেই জরুরী একটা কথা না বললেই নয়, আর আপনাকে ছাড়া কাকেই বা ব'লে যাই? ক'দিন চেষ্টা ক'রে ফল পাই নি। ভেবেছিলুম, রাজেশ্বর বাবু ফিরে এসেছেন, তাই এসেছিলুম। তিনি আসেন নি, কিন্তু সময়ও আমার আর নেই। শীগ্‌গীর—বোধ হয় আজ রাতেই আমায় এ গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। কিন্তু ফিরবো কবে জানি নে, হয় ত আর ফিরবোই না। তাই কথাটা আপনাকে না ব'লে যেতে পারবো না।"

জ্যোৎস্না ঘামিয়া উঠিল, এমন বিপদে সে কখনও পড়ে নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে তাহার ভ্রাতা ও পিতৃস্বসার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ যেন তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের নামগন্ধও নাই। সে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "যা বলবার, কল্‌কাতায় বাবাকে গিয়ে বলতে পারেন।"

বাঁধ ভাঙ্গিলে রুদ্ধ জলস্রোত যেমন উদ্দাম অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়া বাহির হয়, রণেন্দ্রের মনের কপাট উন্মুক্ত হইবার অবসর পাইয়া কথার স্রোত জ্যোৎস্নাকে সেই ভাবে ভাসাইয়া দিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিল, "না, তা পারি নি, বোধ হয়, সে সময়ও পাব না। কলকাতায় কবে ফিরবো, তাও জানি নে; তাই আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, দয়া ক'রে শুনুন। আপনারা এখানকার বিষয়-সম্পত্তির জন্যে আমার নামে আদালতে নালিশ করেছেন শুনলুম। কিন্তু আইন-আদালত করবার দরকার কি? ন্যায্যমতে এ সব সম্পত্তিই আপনার, আমার এতে কোন অধিকার নেই। মরবার আগে আমার ঠাকুরদাদা এ সব বিষয়-সম্পত্তি আপনার নামে দানপত্র ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যা ঘটে গিয়েছে, যদিও তার জন্যে আমি বা আপনি দায়ী নই, তা হ'লেও ইহজন্মে বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিলনের কোন আশা নেই। এ কথা আপনার বাবা উকীলের চিঠি দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।"

জ্যোৎস্না বিচলিত হইয়া উঠিল। সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "এ সব কথা না ব'লে বাবাকে লিখে দেবেন।"

রণেন্দ্র পূর্ব্বের মত দ্রুত কণ্ঠে, অধীর আবেগে বলিয়া গেল, "না, তা যাব না। আপনার বাবা বোধ হয় আমার চিঠি পড়বেন না, না পড়েই ছিঁড়ে ফেলবেন। কথাটা এমন কিছু না, এই গাঁয়ের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে; বলেইছি ত, ঠাকুরদাদা মরবার সময়ে আপনার কৃত কর্ম্মের জন্যে অনুশোচনা ক'রে দানপত্র ক'রে গিয়েছেন, বোধ হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে। ধরতে গেলে ন্যায়তঃ বিষয় এখন আপনার, সে সব কথা তাঁর দানপত্রে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া আছে। আমি সেই দানপত্র তাঁর মৃত্যুর পর প'ড়ে আপনাদের বিস্তর খোঁজ করেছি, কিন্তু ফল পাই নি। যে দিন থেকে জানতে পেরেছি, এই গ্রামের বিষয় আপনার, সে দিন থেকে তার উপস্বত্বও ভোগ করি নি, যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনই রেখে দিয়েছি। এই নিন দানপত্র।"

রণেন্দ্র একটা কাগজের তাড়া জ্যোৎস্নার সম্মুখে রাখিয়া দিল। কি জানি কেন, জ্যোৎস্না একটা কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। "যেমন অবস্থায় পেয়েছিলেন, তেমনই রেখে দিয়েছেন?"

রণেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ঠিক!—ও কথাটা বলতে পারেন বটে। তা দেখুন, আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকতুম, বিষয়সম্পত্তি দেখবার অবকাশ পেতুম না। ঠিক করেছিলুম, যাঁর বিষয়, তাঁর সন্ধান পেলে তাঁর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। কিন্তু সন্ধানও পাই নি, নিজেও দেখি নি। সে জন্যে এ সব নষ্ট হয়ে গেছে বটে। এর জন্যে নিশ্চয়ই আমি দায়ী। তা, এবার এসে—যে দিন আপনাদের পরিচয় পেইছি—সেই দিন থেকে এসে যতটা সম্ভব ত্রুটি শুধরে নেবার চেষ্টা করছি। এখন একবার বাগানটা দেখে আসবেন, কতটা কি করতে পেরেছি। বাকীটা শুধরে নেবার জন্যে আপনার নামে ব্যাঙ্কে কতকটা নগদ টাকা জমা রেখে দিয়েছি, এই নিন তার চেক-বই। যারা এ সব বিষয়-আশয় দেখছিল, কাযে তাদেরই রেখে দিয়েছি। তাদের কোন অপরাধ নেই, তারা বারবার আমার অকর্ম্মণ্যতার জন্য অনুযোগ করেছে। ইচ্ছে হ'লে আপনি তাদের রাখতে পারেন না হ'লে ছাড়িয়ে দিয়ে আপনার নিজের পছন্দমত লোক রাখতে পারেন। তবে সোনাদা—থাক্ গিয়ে—আমি এখন চল্লুম। নমস্কার।" রণেন্দ্র প্রস্থানোদ্যত হইল।

জ্যোৎস্না কাগজের বাণ্ডিলটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ

করিয়া বলিল, "এ সব কেন রেখে যাচ্ছেন, আমি ছোঁব না। আপনি বাবাকে দেবেন।"

রণেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, এতে ত কোন গোলের কথা নেই। বিষয় আপনার, আপনি মালিক—এতে আর কারো ত মতামতের ত দরকার নেই।"

জ্যোৎস্না বলিল, "না, আমাদের অধিকার নেই। বিশেষ যেখান থেকে এ দান এসেছে, তা নেওয়া আমাদের উচিত কি না, তা বাবা বলতে পারেন, আমি জানি না।"

রণেন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি? শুনেছি, আপনি লেখাপড়া শিখেছেন। মৃত্যুকালে যিনি অনুতাপ ক'রে গিয়েছেন, নিজের ভুল বুঝে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গিয়েছেন, —তাঁকে পরলোকে তৃপ্তি দেবার জন্যও ত অন্ততঃ আপনার এ দান নেওয়া উচিত। দেখুন, মানুষে মানুষে রাগারাগি হয়, কিন্তু মরা মানুষের উপর কি রাগ ক'রে থাকতে হয়?"

জ্যোৎস্নার মুখে কথা যোগাইল না, সে কি উত্তর দিবে? তথাপি সে দলিলগুলি রণেন্দ্রের দিকে সরাইয়া দিল।

রণেন্দ্র বিষণ্ণ মুখে বলিল, "তা হ'লে দয়া করবেন না? আচ্ছা, দলিলগুলো আপনি না নিলেও ক্ষতি নেই, ও সব রেজেষ্টী করা আছে। তবে চেক বইখানা? ওখানাও নেবেন না? না নিন, তবুও রইলো। জানি, যা আপনার ন্যায্য প্রাপ্য, তা দিয়ে গেলুম, নিন বা না নিন, আমি আর দেখতে আসবো না।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া রণেন্দ্র দ্রুতপাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল।

জ্যোৎস্না নিস্পন্দ, নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সে কিছু পরে দলিলগুলি কুড়াইয়া লইয়া ভাবিতে লাগিল, সে এইগুলি লইয়া কি করিবে? এখনই সরোবরের শীতল বারিরাশির মধ্যে কি ঐগুলির সমাধির ব্যবস্থা করিবে, না, রাখিয়া দিয়া পিতার মতামতের জন্য অপেক্ষা করিবে?

বাণ্ডিলের সাদা ধপ্‌ধপে খামের মোড়কের উপর মুক্তার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে;—"শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবীর করকমলে তাঁহার পরিত্যক্ত স্বামীর শ্রদ্ধার উপহার।

শ্রীরণেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী।"

মুগ্ধনেত্রে জ্যোৎস্না সেই অক্ষরগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, যেন অক্ষরগুলির প্রাণস্পন্দন হইতেছে, যেন সেগুলি নাচিয়া নাচিয়া অতীতের কত কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রণেন্দ্রনাথ? তাহার স্বামী? অথচ পত্নীর অধিকার হইতে সে বঞ্চিত। বিধাতার এ কি রহস্যলীলা?

অকস্মাৎ তাহার মোহভঙ্গ হইল—দেখিল, রণেন্দ্রনাথ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। রণেন্দ্র কোন ভণিতা না করিয়াই বলিল, "হাঁ দেখুন, আর একটা ভিক্ষে চাইবো ব'লে ফিরে এলুম। বোধ হয় আপত্তি হবে না?"

জ্যোৎস্না বলিল, "ভিক্ষে? আমার কাছে?"

রণেন্দ্র বলিল, "হাঁ, আপনার কাছে। বাগানবাড়ীর যে দিকটা একবারে পোড়ো, মাস দুই তিনের জন্যে ঐ দিকের দুটো কুঠুরী আমি ধার চাই, এর জন্যে আপনি যা ভাড়া ধার্য্য করবেন দোবো, আপনি মাস মাস সোনাদার কাছেই পাবেন, দরকার হয় যদি, এখনই সব ভাড়াটাও দিয়ে দিতে পারি—"

জ্যোৎস্না ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আপনার বাড়ী, আপনি থাকবেন, তাতে আমাদের কি? আপনি দলিলপত্র নিয়ে যান, আমি নোবো না।"

রণেন্দ্র দুই হাত পশ্চাতে সরিয়া গিয়া বলিল, "বলেইছি ত, নিন বা না নিন, কিছুই এসে যায় না।"

রণেন্দ্র নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, জ্যোৎস্নার মুখে চোখে হঠাৎ একটা দুষ্ট হাসি খেলিয়া গেল। সে বলিল, "এই যে বললেন, কোথায় যাবেন ঠিক নেই, তবে সব নিয়ে কি হবে?"

রণেন্দ্র বলিল, "ওঃ, আপনি তা মনে ক'রে রেখেছেন? দেখুন, আমি থাকবো না, আমার এক বন্ধু দিন কতক থাকবেন; মন হ'লে হয় ত কখনও কচিৎ আমিও ঘণ্টা কতকের জন্যে আসতেও পারি।"

রণেন্দ্র আর দাঁড়াইল না।

সে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ জ্যোৎস্না চাতালের উপর বসিয়া দলিলপত্রগুলি নাড়াচাড়া করিল, কিন্তু ভিতরে কি আছে, খুলিয়া দেখিল না, উহাতে তাহার আগ্রহ ছিল কি না, সেই বলিতে পারে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

দিগ্বিজয়ী গান্ধী

দিকে দিকে আজ ভাবের অগ্নি ছড়াল কে মহীয়ান ?
দিগ্বিজয়ীর প্রতাপে কাহার দেশে দেশে অভিযান ?
দেশে দেশে কার শৌর্য্যাভিমান তড়িদভিযান হয় ?
কাহার বজ্রবাণীতে জগৎ হতেছে কম্পময় ?
দেশে দেশে কার প্রবল প্রতাপ রাজা হ'তে ভিখারীরে
জাগায়ে বুঝায়ে দিতেছে শিখায়ে ন্যায়ের মর্ম্মটিরে ?
বাণী কার যেন খড়্গ সমান, নিষ্ঠুর তবু নয়,
কলুষ ছেদিছে, ছেদিছে মিথ্যা, ছেদিছে জড়তা, ভয় ?
অত্যাচারীর উদ্যত বাহু কাহার দৃষ্টি বাণে
হতেছে রুদ্ধ, অত্যাচারিত জেগে ওঠে সুখ প্রাণে।
শত্রু কাহারে রুষ্ট লোচনে আঘাত করিতে আসি'
ক্ষমা-উজ্জ্বল নয়ন নিম্নে নতশিরে রহে ত্রাসি' ?
দর্পের নাশ কামনা কাহার, দর্পীর কভু নহে ;
দর্পীরে হ'তে সরল মানুষ কে উদার কথা কহে ?
দিক্-জয়ে চলে তবু নাহি লুঠে রত্ন বা ভূমিভাগ ;
লুণ্ঠন করে মানব-চিত্ত, তারি দামী অনুরাগ।
প্রীতিকণা মাগে, মাগে মিত্রতা, মাগে সে প্রেমের জয় ;
দিগ্বিজয়ী সে, ভীতি নাহি সাথে, প্রীতি সাথে সাথে রয়।

কে এ মহাবীর ? আলেক্জাণ্ডার ? এ কি বীর চেঙ্গিস ?
তাদেরি সমান মানব-হৃদয়ে ছড়াবে দর্প-বিষ ?
তারা তো লুঠেছে অর্থ-বিভব দেশে দেশে অবিরাম
শিশু নারী মেরে ইতিহাসে তারা রাখিয়াছে বড় নাম।
সে দেশ-জয়ের এ কি বিপরীত দেশজয় হেরি আজ,—
ভারতের এ কি সবি অঘটন, সবি অভিনব কাজ ?
বিদ্রোহী যেবা অতি চূড়ান্ত, তরবারি নাহি তার !
দেশে দেশে যার প্রবল প্রবেশ, ছাড়ে না সে হুঙ্কার !
আসে প্রশান্ত অথচ দৃপ্ত, সত্য ও ন্যায়ে বলী ;
করে না দলন, তবু চ'লে যায় অত্যাচারেরে দলি' !
ক্লিষ্ট-পিষ্ট পতিত যাহারা জগতে অবজ্ঞাত,
জীয়নের কাঠি ছোঁয়ায়ে তাদেরে ক'রে দেয় জাগ্রত।

বহু শতকের শাসনে সুপ্ত জনমি' ভারত কোণে,
চকিত করেছে ধর্ম্মশিখায় নিখিল জগৎ-জনে।
দম্ভে যাদের জোড়া নাই ভবে, অস্ত্রে নিপুণ যারা,
স্থলে জলে আর শূন্যে যাহারা নিয়ত দিতেছে নাড়া,
নিমেষে যাহারা লক্ষ মানবে ধূলিতে শোয়াতে পারে,
এ মহামানবে হেরিতে তারাও যেন আঁখি বিস্ফারে !
কামান, মাইন্, টর্পেডো আর ভীষণ হাউইট্জার
রাখি' হাত হ'তে শোনে কৌতুকে এ বাণী চমৎকার !
মারণে দাহনে জিনিতে জগৎ জানিয়াছে তারা সার,
প্রেমের প্রতাপ কত সে বিজয়ী দেখে তারা নিঃসাড়।
এ মহামানব গান্ধী ফুকারে—"সভ্য হয়েছ নর ;
সভ্য মানুষ নাশিছে মানুষে, কি দুখ অতঃপর ?
এ কি সভ্যতা ? বর্ব্বরতা এ,—পশুর ধর্ম্ম জয়ী ;
মানুষ করিবে মানুষে রক্ষা—সে মহাধর্ম্ম কই ?
কামানে মাইনে করিবে যে জয়, সে তো ব্যাঘ্রের জয়,
দন্তে নখরে সে তো নাশে জীবে ; মানুষ কাহারে কয় ?
পশু হ'তে কোথা শ্রেষ্ঠ মানুষ, কোথা তার মর্য্যাদা ?
মানুষ হউক হিংসাবিহীন, দূরুক্ লোভের বাধা।"

মহামানবের এ মহামন্ত্র এপার ওপার শোনে ;
নিখিল মানব নূতন প্রেরণায় চিন্তার জাল বোনে।
শোনে ইউরোপ, শোনে আমেরিকা, শুনিছে নিখিল ধরা,
শুনিছে শান্তদান্তমন্ত্র বাণী বিস্ময়ভরা।
জাগাতে ভারতে নব চিন্তায় জগতে জাগাল কে রে ?
বুদ্ধ-যীশুর প্রেমের আবেগ কার হৃদে ঘোরে ফেরে ?

আজি গান্ধীর প্রেমের গন্ধে জগৎ ভরিয়া উঠে,
হ'তে শত্রুর শক্ত হৃদয় শ্রদ্ধা ও প্রেম লুঠে।
বিজিত ভারত আজিকে বিজয়ী, তারি ধর্ম্মের জয় ;
প্রেম-সত্যের আগুনে গান্ধী নাশে শত্রুতা, ভয়।
হে মহামানব, দিগ্বিজয়ী হে, হে মহাপ্রেমিক, বীর,
তোমারি মন্ত্রে জাগিয়া মানুষ হোক্ স্থায়ী সুস্থির।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

শিল্পীর সংসার

কেহ দুঃখকে সহজে গ্রহণ করিতে চাহে না, নাম শুনিলেই ভয় পায় এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে ইহার কাছ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে মানুষমাত্রেই সচেষ্ট থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই একান্ত অনভীপ্সিত সংঘাতই মানুষকে গৌরব, সম্পদ দান করিয়া পৃথিবীর যশের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে।

নিখিল ভারত চিত্রপ্রদর্শনীতে শকুন্তলার স্বামিগৃহে গমন চিত্রখানি অবিসংবাদিরূপে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া শিল্পীকে মহা গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু যে সীমাহীন বেদনাকণা শকুন্তলার আসন্ন বিচ্ছেদ-কাতর মুখের উপর শিল্পীর অপূর্ব্ব কলাকৌশলে সজীব হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনার সেই প্রচণ্ড হৃদয়নিষ্পেষণই শিল্পীর বাঁচিয়া থাকিবার শক্তিটা নিঃশেষে লুপ্ত করিয়াছিল।

তাহার ইতিহাসটা এই রকম;—

অনেকগুলি সন্তানের পিতা হইলেও উমানাথের একটি-মাত্র সাথী ছিল কন্যা কল্যাণী।

অভাবের উৎপীড়নে সদ্‌বৃত্তিরাশি উৎক্ষিপ্তচিত্তে ভোরের শিশিরের মত পরমায়ুহীন। তাই স্বামীর প্রতি অণিমার যত কিছু শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তাহা নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া সেখানে জমিয়া উঠিয়াছিল, দারুণ বিতৃষ্ণা—একান্ত উপেক্ষা। পুত্রদের উপর অণিমার দৃষ্টি সজাগ থাকিয়া যক্ষের মত পাহারা দিত। তাহারা যেন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে।

উমানাথ ইহা লইয়া অনুযোগ করিতে পারিতেন না। পত্নীর দুর্ভাগ্যের মূল তিনি স্বয়ং, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া তিনি অপরাধের গুরুভারে পীড়িত অন্তর লইয়া পত্নীর কাছ হইতে নিজেকে তফাতে রাখিতে চাহিতেন। সংসারের কোন সংবাদই উমানাথ রাখিতেন না, অণিমাও কোন দিন ডাকিয়া তাঁহাকে নিজের কোন দুঃখের কথা বলিতেন না। ত্রিতলের একটা ঘরে উমানাথ তাঁহার চিত্রাঙ্কনের যত কিছু সাজ-সরঞ্জাম লইয়া দিনের অধিকাংশটা তথায় কাটাইয়া দিতেন, এবং রাত্রিকালে শয্যা পাতিয়া তাহার একটি পাশে শয়ন করিতেন। ক্ষুদ্র বাড়ীর বাকী সবটুকু স্থানে অণিমা তাহার সন্তানাদি লইয়া জুড়িয়া থাকিত।

বিন্ধ্যগিরি মাথা তুলিয়া দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ। উমানাথ ও তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবধানের প্রাচীর দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল। পিতার মত তাহারা বাণীর উপাসনায় শুকাইয়া মরিতে প্রস্তুত নহে। মায়ের প্রভাব তাহাদের উপর অনেক। বাণীর শিক্ষা-মন্দিরকে তাহারা কমলার তোরণদ্বার বলিয়া চিনিতে শিখিল; এবং এই পথ দিয়া পুত্ররা জননীর দরিদ্রতা-ভরা সংসারে লক্ষ্মীকে ডাকিয়া আনিবার চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভক্তদের একান্ত আহ্বানে কমলাকে দেখা দিতে হইল। এম, এতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হইয়া অসীম যে প্রফেসারীটা পাইল, তাহার বেতন আরম্ভই হইল তিন শত টাকায়। সৌভাগ্য যখন আসে, তখন সেও দুর্ভাগ্যের মত অতি সামান্য পথ অবলম্বন করিয়া—তুচ্ছকে উপলক্ষ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়।

বি, এস্-সি, পাশ করিয়া অজিত দাদার কাছ হইতে কিছু মূলধন লইয়া স্বদেশী পেন্সিল-কলমের ব্যবসা আরম্ভ করিল। বছর কয়েকের মধ্যে আশাতীতরূপে তাহার ব্যবসাটা বাড়িয়া উঠিয়া সকলকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া তুলিল। অজিত জননীর হাতে বাড়ী কিনিবার টাকা জমা দিল।

প্রচণ্ড দুঃখের অমানিশার শেষে সুখের আলোকিত প্রভাত দেখা দিয়াছিল। তাহারই পানে চাহিয়া অণিমার দেহ-মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। অনটনের উষ্ণ উত্তাপ দেহটাকে শীর্ণ করিয়া রূপলাবণ্য কাড়িয়া লইয়াছিল, সে তাহার কোমল চিত্তটাকেও রুক্ষ করিয়া রাখিত। স্বচ্ছলতার স্নিগ্ধ স্পর্শে দেহে রূপ ফুটিয়া উঠিল, অন্তরও তাহার কোমল হইয়া আসিল।

আয়ের পথটা সুগম হইলে কাহারও কাহারও ব্যয়ের ইচ্ছাটা আপনা হইতে মনের মাঝে জাগিয়া উঠে। কারণ, আনন্দ জিনিষটা মানুষ একা ভোগ করিতে পারে না, তাহাতে আনন্দও থাকে না। তাই এত রকম উৎসব-অনুষ্ঠানের সৃষ্টি।

অপহৃত সৌভাগ্য দীর্ঘকাল পরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে! তাহাকেই দশ হাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য অণিমার একান্ত সাধ হইল। বধূ-বরণের উৎসবে তাহা সার্থক হউক।

কথাটা তিনি ছেলেদের নিকট পাড়িলেন।

বধূ আনিবার প্রস্তাবে ছেলেরা হাসিয়া জামাতা আনিবার কথাটা জননীকে স্মরণ করাইয়া দিল।

চাঁদের উপর মেঘ ঢাকিয়া অন্ধকার সৃষ্টি করার মত অণিমার আনন্দভরা মুখের উপর একটা চিন্তার ছায়া উদ্বেগ-চিহ্ন আঁকিয়া দিল।

অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুসুম-কোরকের মত কন্যার বাল্য-কৈশোর-জড়িত মূর্ত্তিখানির পানে চাহিয়া তাহার বিবাহের কথাটা অণিমার মনে অনেকবার উদিত হইত। কিন্তু সে পরের ঘরে চলিয়া গেলে স্বামীর নিঃসঙ্গ অবস্থার বেদনাটা কল্পনার নেত্রে দেখিয়া অণিমার অন্তরও ব্যথিত হইত। ভাবিত, মেয়ে যে দিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই নিশ্চিত হইয়া আছে—তাহাকে পরের ঘরে যাইতে হইবে। তথাপি অনিবার্য্য দুঃখটাকে যে কয়টা দিন দূরে রাখিতে পারা যায়, লাভ সেই কটা দিনই। তাই কন্যাটির বিবাহের কথা অণিমার মনে আসিলেও মুখে ফুটিতে পারিত না।

* * *

দুর্ভাগ্য যে দিন রাঘব-বোয়ালের মত হাঁ করিয়া অণিমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই একান্ত বিপৎসঙ্কুল ভয়-ভাবনার মাঝে কল্যাণী মাতৃকোলে আসিয়াছিল বলিয়া আদর-যত্ন সে জননীর কাছে ভাল করিয়া পায় নাই। মনুষ্যপ্রকৃতি এক দিকের অভাব অন্য দিক্ দিয়া পূরাইয়া লইতে চাহে। তাই জননীর উপেক্ষার তরঙ্গাঘাত হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া কল্যাণী জনকের বুক-ভরা আদরের মাঝে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিল। চিত্রকর পিতার রঙের বাক্স, তুলির গোছা শিশুকাল হইতে কল্যাণীর আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল।

মানুষের অন্তর স্নেহহীন হয় না। উদাসীনতার বর্ম্ম আচ্ছাদনে নিজেকে সে যতই নির্লিপ্ত রাখিতে চেষ্টা করুক না কেন, দুর্য্যোধনের ঊরুদেশের মত একটা স্থান তাহার দুর্ব্বল থাকে। মায়ার কর্ম্মবন্ধন মানুষকে জড়িত করিবেই।

পত্নীকে উমানাথ ভয় করিতেন; সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে এড়াইয়া তিনি চলিতে চেষ্টা করিতেন, পুত্ররা তাঁহার নিকট কদাচ আসিত। তাহাদিগকে উমানাথ চাহিতেন না, অনুক্ষণ চাহিতেন শুধু কন্যা কল্যাণীকে। পিতৃস্নেহের যত কিছু দাবী বা জোর ছিল, তাহা শুধু এই মেয়েটির উপর। ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশার যত কিছু কথাকাহিনী তাঁহার মনের মাঝে জাগিয়া উঠিত, সব আলোচনারই সাথী হইত কল্যাণী।

সে দিনও কি একটা আলোচনার ঝড় তুমুল হইতে গিয়া অকস্মাৎ থামিয়া গেল। উমানাথ চিত্রের উপর রং চড়াইতে সহসা নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কল্যাণী নত-মুখে রঙের বাক্সটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

অণিমা ক্ষণেক স্বামি-কন্যার ম্লান মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। আপনা হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল এবং তাহারই শব্দে চকিত হইয়া নিজেকে সে সংবরণ করিয়া বলিল, "একটা কথা আছে।"

উমানাথ বিস্মিত হইলেন। পত্নী সকল প্রয়োজন হইতেই ত তাঁহাকে অক্ষম বুদ্ধিহীন বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়াছেন। স্বামি-স্ত্রীর ভালমন্দের কথা অনেক দিন ত তাঁহাদের মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই পত্নীর এই অনাহূত আগমন ও অযাচিত কথাটা উমানাথকে কেমন শঙ্কিত করিয়া তুলিল।

অণিমা কহিলেন, "কলি এই বোশেখেতে ষোল পার হবে।"

কল্যাণী ষোল অথবা ছাব্বিশ পার করুক, তাহা জানাই-বার জন্য অকস্মাৎ তাহার জননী ব্যস্ত হইয়া পড়ে নাই। ইহাকেই সূত্র করিয়া সে কোন একটা বৃহত্তর সমাচার আনিয়াছে, তাহাই অনুমান করিয়া উমানাথের বুকের মাঝটা কাঁপিয়া উঠিল। দৃষ্টিতে ভীতির ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

স্বামীর মুখের ভাবান্তর অণিমার দৃষ্টিতে গোপন রহিল না। একটু থামিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে সে বলিল, "ওকে ত আর রাখা চলে না। বাড়ন্ত গড়ন। পাঁচ জন পাঁচ কথা বলে।"

বিরক্ত-কণ্ঠে উমানাথ কহিলেন,—"ও আমার কাছে থাকে, পাঁচ জনের কাছে নয়, তাদের কথার দরকার কি?"

অণিমা কহিল, "দরকার একটু আছে বৈ কি। তবে সমাজ বলেছে কেন? আমরা ত বনে বাস কচ্ছি না!"

উমানাথ কহিলেন,—"তা আমাদের কি করতে হবে?" তাঁহার কণ্ঠস্বরে অন্তরের ক্রোধটা চাপা রহিল না।

উষ্ণতার স্পর্শে শীতল পদার্থও উষ্ণ হইয়া উঠে। স্বামীর অন্তরের ক্রোধটা গ্রীষ্মের তপ্ত বায়ুর মত অণিমার চিত্তে একটা জ্বালা আনিয়া দিল, তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে সে বলিল,—"তুমি অনেক করেছ, দয়া ক'রে আর কিছু কর না, এই ভিক্ষা চাই। ছেলেদের কথা হ'লে বলতে আসতুম না। এ তোমার মেয়ের কথা, তাই তোমায় জানাতে আসি।"

অণিমা থামিয়া গেল। স্বামীকে তিরস্কার করিতে বা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে বিদ্ধ করিতে সে আসে নাই ত! আসিয়াছিল অনিবার্য্য কর্ত্তব্যটা অন্তরের গভীর সহানুভূতি ভরিয়া পালন করিবে বলিয়া। তথাপি কি কথায় কি আসিয়া পড়িল দেখিয়া সে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল।

পত্নীর সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের সুস্পষ্ট বাণীগুলির অন্তরালে যে সত্য নিহিত ছিল, তাহার খোঁচায় উমানাথের অন্তর বিদ্ধ হইল। তাঁহার গৌর মুখ খানিক কালো হইয়া উঠিল।

নিক্ষিপ্ত শরকে ফিরান যায় না। কিন্তু মরণাহতের যন্ত্রণাটাও সকল সময়ে চোখে দেখা যায় না। অণিমা দ্রুতপদক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

খোলা জানালার পথে বাহিরের আকাশটার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উমানাথ বসিয়াছিলেন। কল্যাণী বর্ণ-ফলকটি টেবলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া কহিল,—"বাবা, এস না, এটা শেষ করবে।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উমানাথ কহিলেন,—"না মা, আজ থাক।"

"এগুলা তবে পরিষ্কার করি"—বলিয়া সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া কল্যাণী তৈলের বাটিটা টানিয়া লইল।

মেয়ের কর্ম্মনিরত মূর্ত্তিখানির পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া উমানাথ ডাকিলেন,—"খুকী!"

কল্যাণীর পর অণিমার কোলে কেহ আসে নাই বলিয়া খুকী নামটা কল্যাণীর অনেক দিন চলিয়াছিল। কিন্তু ইদানীং তাহার কল্যাণী নামের অপভ্রংশ কলি শব্দটাই সকলের মুখে বাহির হইত। তাই পিতার মুখে অতীতের স্নেহ-সম্বোধন শুনিয়া কল্যাণী চমকিয়া উঠিল; কহিল, "বাবা, ডাক্‌ছ?"

"হ্যাঁ মা, তুই চ'লে গেলে এ সব কে করবে?"

অসহায় বালকের বিপন্ন দৃষ্টিতে সাহায্য-ভিক্ষার মত উমানাথের দুই চোখে গভীর মিনতি ফুটিয়া উঠিল।

কল্যাণী পিতার পার্শ্বে সরিয়া আসিল। ভিতরে ভিতরে সে-ও ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল; তথাপি জনকের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "মা বলে, দাদার বৌ আসবে।"

মর্ম্মপীড়া যেমন ভিতরের সত্যটাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিতে পারে, এমন বোধ করি, আর কিছুতে পারে না। ইহারই বেদনায় অস্থির হইয়া মানুষ দেশ-কাল-পাত্র ভুলিয়া অতি অকস্মাৎ তীব্র অভিযোগ করিয়া বসে। উমানাথ কহিয়া উঠিলেন,—"দাদার বৌ, অজিতের পরিবার আমার হবে কেন? তারা তোমার—"

উমানাথ থামিয়া গেলেন। যে অপ্রীতিকর স্মৃতিগুলি বৃশ্চিক-দংশনের মত সারা চিত্তে একটা জ্বালা ছড়াইয়া অপ্রত্যাশিতরূপে এই বাণীগুলি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, তাহা উমানাথের নিজের কাণেই বড় কটু ঠেকিল।

কল্যাণী কথা কহিতে পারিল না; শুধু চাহিয়া রহিল। অস্তরবি যে রক্তরাগটুকু তাহার সুন্দর মুখখানির উপর ছড়াইয়া দিয়াছিল, সন্ধ্যার আঁধার তাহা কাড়িয়া লইল।

নিস্তব্ধ কক্ষ যেন ব্যথার ভারে থম-থম করিতে লাগিল।

* * * *

অণিমা যখন বধূরূপে শ্বশুর-গৃহে আসিয়াছিল, রুদ্রনাথের সংসারের উপর তখন কমলার প্রসন্ন দৃষ্টি ছড়াইয়াছিল। উমানাথ ছাত্র-জীবন যাপন করিতেছেন, তথাপি তাঁহার মুখের পানে চাহিলেই অভিজ্ঞের দৃষ্টি ধরিতে পারিত, গাদা-গাদা বই মুখস্থ করিয়া সরস্বতী-সাধনা করিতে ইনি কোন দিনই পারিবেন না। শিল্পীর প্রাণ দিয়া ইনি এক জন বাণীর একনিষ্ঠ পূজারী।

কোন একটা শক্তি বিশেষ করিয়া বাড়িয়া উঠিলে, তাহার বিরুদ্ধ শক্তিটা হীনবল হইয়া পড়ে। উমানাথের সমস্ত মনঃপ্রাণ যখন চিত্রকলার ধ্যানে তন্ময় থাকিত, সেই সময়ে তাঁহার বি, এস-সি, পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

রুদ্রনাথ দিন গণিতেছিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই তিনি পুত্রকে ইংলণ্ডে এঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষা করিতে পাঠাইয়া দিবেন এবং গোটা কয়েক বছর পরে সে যখন একটা ডিক্রী লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবে, তখন তাঁহার কন্‌ট্রাক্‌টারী ফারমের প্রধান এঞ্জিনীয়ার চৌধুরী সাহেবকে অনুক্ষণ সন্তুষ্ট করিয়া রুদ্রনাথকে চলিতে হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা টাকাও গৃহে থাকিয়া যাইবে। হাঁ, অবশ্য চৌধুরী সাহেবের প্রাপ্যটা উমানাথ পাইবে!

এমনই করিয়াই রুদ্রনাথের কল্পনা-সৌধ যখন গগনকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইতেছিল, সেই সময়ে বাস্তবের কঠিন সংঘাত সেই উচ্চচূড় বিরাট প্রাসাদকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিল। উমানাথের পরীক্ষার ফল বাহির হইল।

রুদ্রনাথ জ্বলিয়া উঠিলেন। আশাভঙ্গের মর্ম্মবেদনা মানুষকে বড় ভয়ানক অস্থির করিয়া তুলে। রুদ্রনাথ রুদ্রমূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"দু'দুটো মাষ্টার দিয়েছি, তবু হতভাগা ছেলে ফেল হয়ে ম'ল!"

ঝড়ের মত তীব্র গতিতে তিনি পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ যেন মন্ত্রবলে পাষাণ হইয়া গেলেন। স্তম্ভিত ভঙ্গীতে রুদ্রনাথ পুত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন।

উমানাথ নিবিষ্ট-মনে চিত্রের উপর রং চড়াইতেছিলেন, পিতার পদশব্দে মুখ তুলিতেই রুদ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, পরীক্ষার ব্যর্থতা জনিত বিষাদ বিন্দুমাত্রও সে মুখে ছায়াপাত করে নাই। পিতার পানে চাহিয়া সপ্রতিভ কণ্ঠে উমানাথ কহিলেন,—"ও আমার হবে না।"

রুদ্রনাথ কহিলেন,—"কি হবে না? বি, এস-সি পাশ-করা?"

সংক্ষিপ্ত উত্তরে উমানাথ কহিলেন,—"হাঁ।"

রুদ্রনাথ কহিলেন,—"তবে আমার এতগুলা টাকা মাসে মাসে খরচ করালি কেন?"

সহজ কণ্ঠে উমানাথ কহিলেন,—"চেষ্টা কল্লুম, পাছে আপনার ক্ষোভ থাকে।"

বিদ্রূপভরা কণ্ঠে রুদ্রনাথ কহিলেন,—"সদাশয়! পিতৃভক্তি আছে, আমার ক্ষোভ উনি রাখবেন না! হারামজাদা, তোর নিজের ক্ষোভ হয় না?"

পিতার নিকট এরূপ তিরস্কার সহ্য করা উমানাথের অভ্যাস ছিল! অম্লান-মুখে তিনি কহিলেন, "আমি ত জানতুম পারব না। আমার ক্ষোভ থাকবে কেন?"

কঠিন হাসিতে রুদ্রনাথ কহিলেন,—"তা সত্যি! আচ্ছা, তোমার ক্ষোভ হয় কি না দেখছি! তোমার ঐ গোষ্ঠীর পিণ্ডি ছবিগুলায় আজ নিজে হাতে আগুন দেব।"

অকস্মাৎ মৃত্যুকে সশরীরে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিলে মানুষের যেমন সমস্ত দেহ ভয়ের তাড়নায় শিহরিয়া উঠে, চুল হইতে গায়ের প্রতি লোম খাড়া হয়, তেমনই উমানাথের সারা দেহে যেন একটা তড়িৎ খেলিয়া গেল। নিজের সৃষ্টিকে নষ্ট হইতে দিতে কেহ পারে না।

প্রচণ্ড ক্রোধের মাথায় রুদ্রনাথ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া থামিলেন। ইজেলের উপর ক্যানভাসের বুকে যে তরুণী অপরূপ রূপলাবণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মুখখানি যে রুদ্রনাথের আনীত পুত্রবধূর মুখ! দণ্ড আর দেওয়া হইল না। "উচ্ছন্ন যাও" বলিয়া দণ্ডদাতা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আহারের আসনে রুদ্রনাথ বধূর পানে চাহিয়া কহিলেন, "মা লক্ষ্মি! তুমি ত আমার বুদ্ধিমতী। মা, তুমি একটু শক্ত না হ'লে উমাটা কিছু কচ্চে না।"

বাহিরের ঘটনাগুলা মুখে মুখে অণিমার কাণে আসিয়াছিল। শ্বশুরের কথায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

পরের দোষটা যখন দ্বিধাহীনভাবে নিজের স্কন্ধে চাপিয়া বসে, এবং অস্বীকার করিবার পথ রাখিয়া দেয় না, তখন মানুষের ক্রোধের অন্ত থাকে না। পুত্রের পরীক্ষার অসাফল্যের জন্য যখন ইঙ্গিতে বধূকেই দায়ী করিয়া রুদ্রনাথ

এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে অণিমাকে বিদ্ধ করিলেন, তখন অণিমা শ্বশুরকে কিছু বলিতে পারিল না, মাথা অবনত করিয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তরটা মর্ম্মান্তিক-ভাবে বিরক্ত হইয়া উঠিল স্বামীর উপর।

রাত্রিতে পত্নীকে শয়নকক্ষে পাইয়া হাসিমুখে উমানাথ কহিলেন,—"আজ ভারি মজা হয়েছে! বাবা আমার ছবি রাগ ক'রে নষ্ট করতে গিয়ে তোমার মুখ দেখে"—উমানাথ থামিয়া কহিলেন,—"ও কি, কোথা যাচ্ছ?"

"পানের ডিবে আনতে।"

"ঝিয়েরা দিয়ে যাবে খন! তুমি অমন ক'রে চল্লে কেন?"

অণিমা কোন কথা কহিল না: ফিরিয়াও চাহিল না! নিঃশব্দে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পত্নীর প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ সোফার উপর কাটাইয়া অবশেষে ঘড়ীর কাঁটার পানে চাহিয়া উমানাথ বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িবার জন্য তিনি চোখের উপর বাম হাতখানি আচ্ছাদন দিলেন। কিন্তু মানুষ রাগ করিয়া শুইতে পারে, চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার ছল করিতে পারে, ঘুমাইতে পারে না। কারণ, ক্রোধই যে নিদ্রার একটা প্রধান ব্যাঘাত।

ঘড়ীতে টং টং করিয়া রাত্রির গভীরতা নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তখন উমানাথকে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হইল। ভেজান কপাট খুলিয়া পত্নীর সন্ধানে দালানে আসিয়া দেখিলেন, একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়া অণিমা বসিয়া আছে। চাঁদের আলোয় দেখিতে পাইলেন, দুই চোখের জলে তাহার গণ্ডদেশ প্লাবিত।

* * * *

পরের দিন রঙ্গের বাক্স তুলির গোছা লইয়া উমানাথ যখন চিত্রাঙ্কনে বসিলেন, দৃষ্টি তাহাতে সংযোগ করিলেন বটে, কিন্তু মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। অণিমার অশ্রু-প্লাবিত গত রজনীর মুখখানি এই হাসিভরা মুখখানিকে আড়াল করিয়া উমানাথের চোখের সম্মুখে বার বার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

শীতের দিনের মেঘলা আকাশ যেমন মিষ্ট-মধুর রৌদ্রের উপভোগটুকু বঞ্চিত করিয়া দেহ-মনে একটা জড়তা—একটা অসোয়াস্তি ভরাইয়া সকল কায বন্ধ রাখে, তেমনই অণিমার চোখের জলের ধারা তাঁহার মনের সব প্রফুল্লতা ঢাকা দিয়া সারাদিন উমানাথকে চিত্রাঙ্কনকর্ম্মে বিরত রাখিল।

পত্নীকে একাকী পাইয়া উমানাথ কহিলেন,—"অণু, তুমি আর দুঃখ পেয়ো না! আমি ছবি আঁকা ছেড়ে দেব।"

পিতার নিকট গিয়া উমানাথ কলেজে ভর্ত্তি হইবার প্রস্তাব করিল।

ক্ষণেক পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ এ দুর্ম্মতি?"

মুখ নীচু করিয়া উমানাথ কহিলেন,—"আমি আর একটা চান্স চাই আপনার কাছে।"

পুত্রের সেদিনকার কথাগুলি রুদ্রনাথের অক্ষরে অক্ষরে মনে ছিল। গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন,—"চাওয়াটা তোমার হাতের মধ্যে, তুমি যা ইচ্ছা চাইতে পার: কিন্তু দেওয়াটা যখন অন্যের হাতে, তখন তারও একটা ইচ্ছা আছে।"

উমানাথ মৃদুস্বরে কহিলেন,—"আমার মাষ্টার আর দিতে হবে না। শুধু যা কলেজের মাইনে।"

কূটবুদ্ধিজীবীরা মানুষের সহজ সরল প্রশ্নেরও একটা রহস্যময় গোপন অর্থ টানিয়া বাহির করিতে চাহে। রুদ্রনাথ ব্যবসা করিয়া মাথার চুল পাকাইয়া লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের চাবিকাঠিটি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। মানুষের মনের কথা—গোপন অভিসন্ধি টানিয়া বাহির করা তাঁহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। পুত্রের পড়িবার ইচ্ছাটা তাঁহার কাছে একটা অপর কর্ম্মের অছিলা বলিয়া নিশ্চিত হইল। পড়াশুনা ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে, পাছে পিতা নিজের ব্যবসায়ে তাহাকে টানিয়া লন, তাহারই ভয়ে ছাত্রজীবনের মাঝে সে নিজের শঠগিরি নির্ব্বিঘ্নে করিবার সুবিধায় এমন ভাল মানুষটি সাজিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে! পাছে মাষ্টাররা আসিয়া চিত্রাঙ্কনে খানিকটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাই সেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগকে বিদায় দিবার জন্য পিতার অর্থের উপর অকস্মাৎ মমতা জন্মিয়াছে। রুদ্রনাথ অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"আর ভাল মাষ্টার অবধি চাই না! ওরা ভারি জ্বালাতন করে! এবার শুধু কলেজের মাইনে দিলেই হবে!"

প্রচণ্ড অপমানে, আগুনে পোড়া লোহার মত, উমানাথের সারা মুখ আরক্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

কঠিনকণ্ঠে তিনিও কি একটা উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াই

থামিয়া গেলেন। পিতার মুখের উপর অতি সামান্য প্রত্যুত্তর একটা লঙ্কাকাণ্ড সৃষ্টি করিয়া বসিবে এবং এই বাড়ী-ভরা আত্মীয়, অনাত্মীয় ও বেতনভোগীদের দৃষ্টির উপর যেন একটা অনর্থ সৃষ্টি করিবে, যাহার পর পাঁচ জনের কাছে মুখ দেখাইবার লজ্জা তাহাকে গৃহকোণে বন্দী করিয়া পৃথ্বীতলে নিজেকে লুকাইতে চাহিবে।

একপক্ষ সম্পূর্ণ নীরব থাকিলে অপর পক্ষের রাগ প্রকাশের ব্যাঘাত ঘটে। নিরুত্তর পুত্রের অবমানিত মুখের পানে চাহিয়া রুদ্রনাথের কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল, মগজেও একটা বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। রুদ্রনাথ কহিলেন, "বেশ, যথার্থই যদি তোমার ঐ পটোগিরি ছেড়ে মানুষ হবার বাসনা হয়ে থাকে ত আমায় সাহায্য কর।"

উমানাথ মুখ তুলিয়া প্রশ্নভরা দুই নেত্রে পিতার পানে চাহিতেই তিনি কহিলেন,—"এতে ভয় পাবার কিছু নেই, উমা! আমি জানি, এক দিনে কেউ সব শিখতে পারে না: কিন্তু যত্ন নিয়ে কাযের মাঝে ঢুকলে ধীরে ধীরে সব অলিগলির সন্ধান তুমি পাবে, তখন আর তোমার কষ্ট হবে না। কাল হ'তেই তুমি আমার সঙ্গে আপিস যাবে। আঃ, বাঁচি তোকে সব শিখিয়ে দিতে পাল্লে।"

ইহার পর উমানাথ আর একটি কথাও কহিতে পারিল না।

* * * *

রুদ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, পুত্রকে পাকা ব্যবসায়ী করিয়া দিয়া তবে তিনি মরিবেন। কেমন করিয়া কোন্ রহস্যময় পথ ধরিয়া কমলার আলুতাপরা পা দুইখানিকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বটিকে পুত্রের কাছে জ্ঞেয় করিয়া দিবেন।

কিন্তু গোল বাধিল এইখানে। ইচ্ছা করিবার মালিক মানুষ হইলেও তাহা সম্পূর্ণ করিবার মালিক যিনি, সেই ভগবানের মর্জ্জিটা সব সময়ে মানুষের ইচ্ছার সহিত মিল খায় না। কাযেই এ জন্মের যত ইচ্ছা আশা বুকে লইয়া অকস্মাৎ রুদ্রনাথকে অনিচ্ছায় মহাপ্রয়াণে যাইতে হইল।

শরতের মেঘহীন আকাশ হইতে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হইল।

পিতার শোকে উমানাথ বড় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। অতি বাল্যে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, সে শোকের অনুভবটা বুকে এত দিন ভাল করিয়া জাগিত না; পিতৃস্নেহের আচ্ছাদনে তাঁহার অভাবটা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু আজ পিতৃহারা সংসারে সে অভাবটাও দারুণ হইয়া বুকে বাজিল! নিজেকে বড় অসহায় বিপন্ন বোধ হইতে লাগিল।

মৃতের আদ্যশ্রাদ্ধ প্রকাণ্ড পর্ব্ব -আত্মপর অনেকের পরামর্শে অনেক কিছু তাল পাকাইয়া অনেক আয়াসে উমানাথ তাহা সম্পূর্ণ করিলেন।

অণিমার পিতা বৈবাহিকের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণে আসিয়া নিঃশব্দে সব নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

যাইবার সময়ে কন্যাকে নিরালায় ডাকিয়া কহিলেন, "কিছু মনে করিস্ নি, মা! কথাটা বড্ড তাড়াতাড়ি হচ্ছে! হাকিম মানুষ, অনেক দেশ ঘুরে অনেক কিছু দেখে বুড়ো হলুম!" রাধিকামোহন থামিলেন।

উদ্বেগভরা দুই নেত্র পিতার মুখের উপর স্থির করিয়া অণিমা কহিল, "বাবা! আমায় তুমি কি বলতে চাচ্ছ? এত সঙ্কোচ কচ্ছ কেন?"

"না মা, কথাটা একটু কঠিন। জামাই না রাগ করে—গায়ে প'ড়ে কথা কইছি মনে ক'রে!"

অণিমা শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল,—"কেন বাবা, তুমি কি পর? আমার শ্বশুরের যে দাবী ছিল, তোমারও তা আছে।"

"সে ত আমি বুঝি, মা! সেই জন্যেই তোর ভবিষ্যৎটা আমায় এমন ক'রে ভাবিয়ে তুলেছে। ছেলে-পুলে পাঁচটি হয়েছে তোর! উমানাথকে বলিস—ও কনট্রাক্টারী কারবারটা তুলে দিতে। কখন্ কিসের ভুল-চুকে বিপদ হাঁ ক'রে তেড়ে আস্‌বে, তার মুখ হ'তে বার হবার শক্তি ও কিছুতেই খুঁজে পাবে না।"

গভীর বিস্ময়ভরা দুই চোখের দৃষ্টি মেলিয়া অণিমা কহিল, —"কারবার বুঝবার শক্তি ওঁর নেই! উনি ত আমার শ্বশুরের সঙ্গে বার হতেন। তা ছাড়া ঐ আমাদের লক্ষ্মী।"

রাধিকামোহন কহিলেন,—"তা জানি, মা! তিনি ছিলেন—লক্ষ্মীর ছেলে, তাই তাঁকে ধ'রে রাখতে পেরে-ছিলেন। কিন্তু উমানাথ সরস্বতীর সন্তান।"

অণিমা চুপ করিয়া রহিল। মেঘহীন নীলাকাশের খানিকটা যেমন কুণ্ডলীকৃত চিমনীর ধূম্রে মলিন করিয়া তুলে, তেমনই পিতার বাণীগুলি একটা অশুভ ছায়া রচনা করিতে লাগিল।

রাধিকামোহন কহিলেন,—"এরা গুণী, শিল্পী, এদের জাত আলাদা! ব্যবসায়-বুদ্ধি এদের মাথায় ঢোকাতে যাওয়া তেলের সঙ্গে জল মেশানর চেষ্টা শুধু!"

হতাশভরা কণ্ঠে অণিমা কহিল,—"এখন তবে কি করব, বাবা?"

"কেন মা, তোমার শ্বশুর যা রেখে গেছেন, তা যথেষ্ট! তাকে বাড়াবার চেষ্টায় যাবিও না। ও সাজপাট ধীরে ধীরে তুলে দাও। আর এক কথা, ঐ হরেন দত্ত— উমানাথের বন্ধুটি, ওর সঙ্গে বাবাজীকে মিশ্‌তে দিও না, এ বুড়ো সংসারের অনেক দেখেছে! এ কথাটা ভুলো না।"

* * * *

মানুষের চিন্তা-প্রবৃত্তি তাহার কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু পরের চিন্তা-প্রবৃত্তি দিয়া কর্ম্মকে যখন নির্দ্ধারিত করিয়া নিজের স্বাধীন চিন্তার মুখ চাপিয়া ধরিতে হয়, তখন যেমন করিয়া আত্মহত্যা ঘটে, এমন করিয়া বড় আত্মহত্যা আর কিছুতেই ঘটে না।

উমানাথের শিল্পী-প্রাণ পিতার সহস্র তাড়নার মধ্য দিয়াও নিজেকে স্থির রাখিয়া সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া বাণীর সাধনা করিত। কিন্তু অণিমার চোখের জলে অস্থির হইয়া যে দিন নিজের চিন্তা-প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম-পদ্ধতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ নূতন পথে নূতনতর করিয়া চালিত করিল, সে দিন সঙ্গে সঙ্গে উমানাথের সেই ভিতরের মানুষটির মৃত্যু ঘটিল: তাহার কোমল চিত্ত পত্নীর এক ফোঁটা চোখের জল সহিতে পারিত না।

পিতার উপদেশগুলি অনুক্ষণ অণিমার মনে জাগিত; তাঁহার প্রদর্শিত ভয়টা যেন অণিমার বুকে পাথরের মত ভারী হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল।

স্বামীকে সে জনকের সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ বলিয়া অবশেষে কহিল,—"বাবার মত ব্যবসা তুলে দেওয়া, আমার ইচ্ছাও তাই।"

শ্বশুরের চিন্তাশক্তির বিশ্লেষণগুলি উমানাথের নিকট গায়ে পড়িয়া অনধিকারচর্চ্চার মতই তিক্ত ঠেকিতেছিল। তাঁহার হিতকামী চিত্তের ভয়-ভাবনাগুলি নিছক উমানাথকে তুচ্ছ হেয় করিবার জন্যই উদ্ভব হইয়াছে, ইহা অসংশয়ে কেমন বিশ্বাস জন্মিয়া গেল ও তাহারই ফলে অন্তরটা তাহার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তাই অণিমার অনুনয়ভরা কণ্ঠস্বরের উত্তরে উমানাথের মুখ দিয়া যাহা বাহির হইল, তাহা ত কোমল নহেই, বরঞ্চ কঠিনতা তাহাতে অনেকখানি মিশ্রিত ছিল! উমানাথ কহিলেন,—"তোমার বাবার মত ও তোমার ইচ্ছা এক হ'লেও জিনিষটা যখন আমার বাবার, এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাটা আমারই খাটবে।"

স্বামীর এমন রূঢ় প্রত্যুত্তরের কল্পনা অণিমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিস্ময়ভরা চোখের অপলক দৃষ্টিতে ক্ষণেক স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে অণিমা কহিল, —"তুমি বাবার কথা শুনবে না? জান, তিনি এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমাদের চেয়ে জ্ঞান তাঁর অনেকখানি।"

উমানাথ অসঙ্কোচে কহিলেন,—"তাঁর জ্ঞান কতখানি, তাঁর স্বার্থ কতখানি, সে বিচার আমি করব না। আমার ইচ্ছাই কায করবে।"

তীব্রস্বরে অণিমা কহিল,—"তুমি কার সম্বন্ধে কি বলছ, খেয়াল আছে? স্বার্থ!—কাকে কি বলছ?"

উমানাথ কহিলেন,—"কারু নামে আমি কিছু বলতে চাই না। সে অভ্যাস আমার নেই। তবে হরেন দত্তকে আমি ছাড়তে পারব না। সে আমার বন্ধু।"

উষ্মার সহিত অণিমা কহিল,—"ঐ তোমার ম্যানেজার থাকবে? না, আমি তা দেব না। বাবার আমলেও ছিল না।"

উমানাথ কহিলেন,—"বাবার আমলে বাবার ম্যানেজার প্রয়োজন ছিল না। এখন হয়েছে বলেই সে থাকবে। হরেন এ সব কথা আমাকে আগেই বলেছিল, পাছে তুমি রাগ কর, তাই আমি বলি নি। এ রকম হবে সে জানত।"

অতি বড় দুঃস্বপ্নের অতীত স্বামীর এই কঠিনতা অণিমার বিবাহিত জীবনের অগোচর ছিল; ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল,— "কি জানত? কি বলেছিল—একপ্রাণ বন্ধুটি তোমার শুনি?"

"দেখ অণিমা, আমি তোমায় বারণ কচ্ছি; হরেন সম্বন্ধে ওরকম কথা তুমি ব'ল না।"

প্রচণ্ড ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। সগর্জ্জনে অণিমা কহিল,—"আমি যদি তা না শুনি?"

"যদি না শোন—একটা ভয়ানক উত্তর উমানাথের রসনাগ্রে আসিয়াই থামিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "আমি এখনই এখান হ'তে বার হয়ে যাব।"

সগর্জ্জনে অণিমা কহিল, "দেখ, অত শাসিও না বলছি! ঐ বন্ধুই তোমার সর্ব্বনাশ করবে। তা না হ'লে এমন মতিচ্ছন্ন ধরে না। তুমি কি করবে? আমি নিজে তাকে জবাব দেব।"

যত নিকটতম অভেদ্য আত্মীয় হউক না কেন, কলহের মুখে পরাজয় স্বীকার করিতে কেহ সহজে চাহে না। বারুদস্তূপে অগ্নি-নিক্ষেপের মত অণিমার কথাগুলি উমানাথের প্রাণপণে সম্বরণ-করা ক্রোধরাশিকে নিমেষে জ্বালাইয়া দিল। বিকৃত-কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "হাঁ, হরেন দত্তকে বিদেয় ক'রে তোমার উকীল দাদাকে ম্যানেজারী করতে দিও! তোমার বাবা খুসী হবেন। হরেন শ্রাদ্ধের সময় তোমার বাবার মুখ দেখে তাঁর মতলব বুঝেছিল।"

*　　*　　*

উগ্র মদ যেমন মানুষের মুখ দিয়া অনেক অকথ্য বাহির করে, তেমনই উগ্র ক্রোধও মানুষের মুখ দিয়া অনেক হীন কথা বাহির করে—সুস্থ সহজ অবস্থায় যাহার চিন্তা অবধি মানুষ সহিতে পারে না।

স্বামি-স্ত্রীর কলহটা সে দিন এমনই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার পর ভয়ানক লজ্জায় উমানাথ সাতটা দিনের মধ্যে আর অন্তঃপুরের ছায়া মাড়াইতে পারিলেন না। আর মর্ম্মাহতা অণিমা তিনটা দিন ভরিয়া চন্দ্র-সূর্য্যের মুখ দেখা বন্ধ করিয়া অনাহারে গৃহকোণে পড়িয়া রহিল।

কিন্তু তিনটা দিন পরে অণিমাকে আপনিই উঠিয়া মুখে চোখে জল দিতে হইল। ভাতের আসনে বসিতে হইল। উপায় নাই! মা যে সে! তাহা ছাড়া আরও একটি সংসারের মুখ দেখিবার জন্য আসন্ন। তাহাকে ত বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। প্রথম দুঃখটাই দুঃসহ হইয়া মানুষকে আঘাত করে, তাহারই বেদনায় অস্থির হইয়া সহিতে পারিব না বলিয়া চীৎকার করে। কিন্তু উপর্য্যুপরি দুঃখই যখন সারি বাঁধিয়া আসিতে থাকে, তখন নিরুপায় মানুষ তাহাকে সহিবার শক্তিটুকুই আকুল অন্তরে ভিক্ষা করে।

স্বামীর সহিত ভালমন্দ কোন কথা কহিতে অণিমার আর ইচ্ছা হইত না। অদৃষ্ট তাহার জন্য যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রাক্তনের ফল বলিয়া তাহাই সে গ্রহণ করিতে বাধ্য; নিজেকে এই বলিয়াই সান্ত্বনা দিত। তথাপি অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের অন্ধকারে একটা অনির্দ্দিষ্ট অকল্যাণ যে তাহারই উপর পতিত হইবার জন্য নিঃশব্দে অবস্থান করিতেছে, ইহাই নিশ্চিত করিয়া অন্তর তাহার নিরন্তর কাঁদিত।

মনের সহিত শরীরের অতি নিকটতম সম্বন্ধ। তাই দেহটা তাহার দ্রুতগতিতে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। অণিমা ভয় পাইয়া উঠিল। সুখের দিনে বাঁচিবার স্পৃহাটা জড়াইয়া ধরিতে পারে নাই—যেমন করিয়া জড়াইয়া ধরিল এই দুঃখের দুর্দ্দিনে। অনেকগুলি সন্তানের মা সে, মরিয়া নিষ্কৃতি লইবার অধিকার ত তাহার নাই! অণিমা শরীরের উপর যত্ন আরম্ভ করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের যখন চেষ্টার ত্রুটি থাকে না, মৃত্যু তখনই চুপে চুপে শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়।

অণিমাকে লইয়া এইবার যমের সহিত মানুষের লড়াই বাধিল। কল্যাণীকে ভূমিষ্ঠ করিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

উমানাথ পত্নীর উপর রাগ করুন, মুখে তাহাকে যাহা খুসী বলুন, সারা অন্তর দিয়া তিনি অণিমাকে ভালবাসিতেন। ভালবাসা কখন মরিয়া যায় না, ধূর্জ্জটির জটাজালে অবরুদ্ধ জাহ্নবীর মত প্রকাণ্ড অভিমানে সাময়িক নিরুদ্ধ হইয়া থাকিলেও বেদনার সংঘাতে আবার সে বাহির হইয়া পড়ে।

উমানাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। চিকিৎসকদের মোটরে বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাটা ভরিয়া উঠিল।

হরেন দত্ত কহিল,—"অত টাকা এখন হাতে নেই।"

বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে উমানাথ কহিলেন,—"যে বিষয় বোঝ না, সে বিষয়ে কথা ব'লো না।" নিজের কণ্ঠস্বরে উমানাথ নিজেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন! কহিলেন,—"অণির চেয়ে কোন জিনিষের দামই আমার কাছে বেশী নয়!" অশ্রুর আভাসে উমানাথের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল।

অনেক চেষ্টার পর, চিকিৎসার বিরাট সমারোহের শেষে অণিমার জীবনটাকে যে এবারের মত মৃত্যুর কবল হইতে সম্পূর্ণ কাড়িতে পারা যাইল, তাহা নিশ্চিত হইল। কিন্তু এই মৃত্যুর কবল হইতে কাড়িয়া আনার ব্যাপারে উমানাথ যে কাহার কবলে নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া

দিলেন, তাহা জানিতে পারিলে অণিমা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিত। তথাপি অণিমাকে শুধু ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দেই উমানাথ কন্যার নাম রাখিলেন কল্যাণী। জীবনের যত অকল্যাণ যেন ইহার শুভ আগমনে অন্তর্হিত হইয়া যায়, ইহাই ছিল উমানাথের গোপন বাসনা।

সম্পূর্ণ মৃত্যুর মুখ হইতে মানুষ যখন ফিরিয়া আসে, তখন দেখা যায়, তাহাদের অনেকেরই ভাগ্যের যেমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, প্রকৃতিও তেমনই বদল হইয়া গিয়াছে।

অণিমার জীবনে যে একটা মন্দগ্রহের দৃষ্টিপাত হইয়াছিল, তাহা অণিমা বুঝিতে পারিত; কাণে তাহার অনেক কথাই আসিত। কিন্তু তাহার কাণ ও বুদ্ধির মধ্যে এমন একটা দুর্ভেদ্য প্রাকার দাঁড়াইয়াছিল, যাহা ভেদ করিয়া সে নিজের প্রকৃত অবস্থাটা কিছুতেই দেখিতে বা বুঝিতে পারিত না। সে দেখিতে পাইত, অর্থের অনাটন সংসারের চারিপাশে ধরিয়াছে; তাহার কষ্টটুকুও ভোগ করিত। তাহাদের কারবারের অবস্থা যে সঙ্কটাপন্ন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিত; কিন্তু সে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা যে এখন চরমে উঠিয়া তাহাদের বাড়ী ঘর দোর, বিষয় বৈভব সব নিঃশেষে শেষ হইয়া গাছতলা সম্বল করিয়াছে, অণিমা তাহা বুঝিতে পারিত না। যে দিন দেনার দায়ে উমানাথকে ওয়ারেণ্ট আসিয়া ধরিল, অতি বড় দুঃস্বপ্নের অতীব এই সত্যটা মুহূর্ত্তে অণিমার সংজ্ঞা কাড়িয়া লইল। কল্যাণী তখন দুই বছরের বালিকা। রাধিকা বাবু পরলোকে। স্বামীকে নিদারুণ অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিতে অণিমার গহনার সিন্দুক নিঃশেষে খালি হইয়া গেল।

হাজার সহিষ্ণু চিত্তও দুঃখের প্রবল আঘাতে ক্ষেপিয়া উঠে। অণিমা স্বামীকে গিয়া কহিল,—"মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে? হরেন দত্তের পরিবারের দাসী দরকার থাকে, আমায় দিয়ে এস।" অণিমা কাঁদিয়া ফেলিল।

চোখের জল মুছিয়া আবার কহিল—"শুনলুম, বাড়ীটা হরেনের কাছে বাঁধা দিয়েছিলে—আমার রোগের সময়? কেন, এমন ক'রে আমায় বাঁচালে কেন? একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই যখন রাখলে না!"

* * * *

কল্যাণীকে অণিমা পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া দিয়া মুগ্ধনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া কহিল,—"মা আমার লক্ষ্মী! চ'লে গেলে ঘর অন্ধকার হবে!"

অতি আকস্মিক অপ্রত্যাশিতরূপে মানুষের মুখ দিয়া যে বাণীটা বাহির হয়, তাহাই দেববাণী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কারণ, মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইলেও তাহার বক্তা দেবতা।

অণিমা নিজের কথায় নিজেই চমকিয়া চুপ করিয়া গেল। অতীতের স্মৃতিগুলি মনের মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় নিমেষে খেলিয়া গেল।

অসিত আসিয়া কহিল,—"মা! বাবা কি বৈঠকখানাতে একবার যাবেন না? কলিকে যে ওরা দেখ্‌তে আসবেন।"

অপ্রসন্ন কণ্ঠে অণিমা কহিল,—"জিজ্ঞেস ক'রে এস, আমার এ উপকারটুকু করতে পারবেন কি না?"

জনকের উপর জননীর শেষ উক্তিটা কল্যাণীকে আঘাত করিল; প্রতিবাদ করিবার জন্য সেও তীব্র কণ্ঠে কহিল, "বাবা ত বিয়ে দিচ্ছেন না! বাবা কেন যাবেন?"

অণিমা কহিল,—"তাঁকে কি আমরা বিয়ে দিতে মানা করেছি? সব কাযে ত যোগ্যতা দেখিয়েছেন, এটাই বা বাকী থাকে কেন?"

জননীর হাতের মাঝ হইতে নিজের হাতখানি টানিয়া লইয়া কল্যাণী কহিল, "যাও, আমি দেখা দেব না।" বলিয়া কাহারও মুখের পানে না চাহিয়া, সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া দুম্‌দুম্ করিয়া সে কক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে বজ্রপাত দৃষ্টে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া থাকার মত মাতাপুত্র মুহূর্ত্ত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে সংবাদ পাইয়া অণিমা গর্জ্জাইয়া উঠিল; ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"হতভাগী পেটে এসে আমার সুখ-শান্তি পয়সা খেয়েছে, বিয়েতে মান-মর্য্যাদা খাবে!"

মাতার কণ্ঠস্বরে অসিতের বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিল। ভীতকণ্ঠে সে কহিল,—"কি হচ্ছে মা? কি কাণ্ড বাধাচ্ছ? তাদের যে আসবার সময় হ'লো!"

"আমি কিছু জানি না! তোমার যা খুসী কর গে!" বলিয়া অণিমা পরাজয়ের অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল।

বাড়ীময় একটা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। যাহারা পাত্রী দেখিতে আসিয়াছিলেন, সাদর অভ্যর্থনায় তাঁহাদের বসান

হইয়াছে। কিন্তু কল্যাণীর রুদ্ধ কপাট মুক্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঝড়ের মত অণিমা স্বামীর কক্ষে ছুটিয়া গেল। গলায় আঁচল দিয়া জোড় হাতে কহিল,—"এখনও কি শত্রুভাব শেষ হ'ল না?"

উমানাথের হাত হইতে রঙের তুলি পড়িয়া গেল! বুদ্ধির দোষেই হউক আর বিধিলিপির গুণেই হউক, মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হইলেই কি পত্নী-পুত্রের দৃষ্টিতে শত্রু বলিয়াই বিবেচিত হইবে?

অসিত আসিয়া ব্যস্তকণ্ঠে কহিল, "কলি যে আমাদের ডাকে কিছুতেই দোর খুল্‌ছে না। তুমি একবার তাকে বলবে এস।"

উমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

* * * *

উমানাথ নিজের পায়ের উপর কল্যাণীর হাত রাখাইয়া শপথ করাইয়া লইলেন,—গর্ভধারিণীর বিরুদ্ধে সে যেন বিদ্রোহাচরণ না করে।

কাঁদিতে কাঁদিতে কল্যাণী কহিল,—"মা কেন তোমাকে অমন ক'রে বলে?"

হঠাৎ একটা অতর্কিত দীর্ঘশ্বাস উমানাথের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। লজ্জায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য! সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া তিনি যে বেদনাটা নিজের মাঝে ঢাকিতে অভ্যাস করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। পরক্ষণেই শান্তকণ্ঠে উমানাথ কহিলেন,—"এতে তার দোষ নেই, খুকী! আমার হাতে প'ড়ে তিনি অনেক দুঃখই পেলেন, এখনও পাচ্ছেন।"

কল্যাণী রাগিয়া উঠিল,—"ও কথা তুমি ব'ল না, বাবা! তোমার মত স্নেহ-মায়া কার, তুমি কখন কষ্ট দিতে পার না।"

এইবার উমানাথ অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। আর উত্তর দিতে পারিলেন না। তার পর যখন মুখ ফিরাইলেন, একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন। স্বচ্ছন্দ হাসিটি আর ফুটিল না। কথা কহিলেন,—কণ্ঠস্বরে একটা অপরিচিত ভার চাপিয়া আসিল, কহিলেন,—"অকরুণ কমলার পায়ের ধূলা পায়; পায় না সে বাণীর আশীর্ব্বাদ! তা যাক্, সাধারণ ত তা বুঝবে না। তাদের মাপকাঠী দেখবে অন্যরকম। তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে চাই, খুকী! তোমাদের মায়ের ব্যথা যেন আমা হ'তেই শেষ হয়! তোমাদের কাছ হ'তে তিনি যেন তাঁর মনোমত শান্তিকে পান! মুখে যেন তাঁর হাসি ফুটে।"

কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া গেল। আয়ত দুই নেত্রের গভীর শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টিতে পিতার পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

উমানাথ কহিলেন,—"খুকী, তোর মা'এর মুখের এই তৃপ্তিটুকু দেখবার জন্যে আমি ছেলেদের ছেড়েছি! তোকেও ছেড়ে দিচ্ছি। কল্যাণী, তোর ক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে তুই মা, আমাকে দুঃখ দিস্‌নি।"

আঁচলে চোখ মুছিয়া, রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কল্যাণী কহিল,—"না বাবা! তোমার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে মানব।"

* * * *

মহা সমারোহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া কল্যাণীর বিবাহটা চুকিয়া গেল। মেয়ের একান্ত বাধ্য নম্র মূর্ত্তির পানে চাহিয়া অণিমার আনন্দ সীমাহীন হইয়া উঠিল। কল্যাণীকে লইয়া একটা মস্ত ভয় অনুক্ষণ তাহার জাগিত। আজ তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইল, তাহারই একটা আরামে সুদীর্ঘ শ্বাস অণিমার মুখ দিয়া বাহির হইল।

বাসি বিবাহের দিন বর-বধূ বিদায়-মুহূর্ত্ত—অসম্বরণীয় চোখের জল লইয়া উপস্থিত হইল। নহবতের করুণ-সুর, একটা আসন্ন বিদায়-ব্যথা, উৎসব-কোলাহলভরা আনন্দ-মুখর প্রাসাদের প্রতি নর-নারীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

মেয়েকে জামাইয়ের হাতে সঁপিয়া দিবার জন্য উমানাথের ডাক পড়িল।

বিচারক কর্ত্তব্যবুদ্ধি লইয়া ফাঁসীর আদেশ প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু গলায় রজ্জু বাঁধিয়া দিতে পারেন না! তাহা হইলে ঘাতকের সহিত তাঁহার পার্থক্যটুকু ঘুচিয়া যায়।

উমানাথ আসিলেন না, উত্তর আসিল, সময় নাই। অণিমা নিজে স্বামীকে ডাকিতে আসিল, তথাপি উমানাথ নড়িলেন না। মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না। ক্যানভাসের বুকে তখন শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যে তপোবনদুহিতার সাজে কল্যাণীর ব্যথা-কাতর মুখখানি পিতার পানে চাহিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

আমেরিকার একটি বিদ্যালয়

আমেরিকার একটি বিদ্যালয় নাম দিয়া বহু কাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি পরিচয় লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই স্কুলের একটি প্রতিবেদন বাহির হইয়াছে। সেই দুই বিবরণ হইতে আমরা সেই অসাধারণ বিদ্যালয়টির পরিচয় সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। এইরূপ স্কুলের আবশ্যক আমাদের দেশে অনেক বেশী। সুতরাং ইহা দ্বারা যদি কাহারও কর্ম্মচেষ্টা ও হিতসাধনা জাগ্রত হয় ত দেশের কল্যাণ হইবে।

লোকহিতকর কাযে অল্প অল্প করিয়া আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে। কিন্তু এর প্রবৃত্তি যথেষ্ট ব্যাপক হয় নাই এবং তাহার মধ্যে প্রাণশক্তিও অল্প। অল্প কাযই আরম্ভ হয় এবং তাহা অল্প দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। সফলতার মূর্ত্তি আমরা প্রায়ই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না বলিয়া দেশের চিত্তে উৎসাহের সঞ্চার হয় না।

কোনও অনুষ্ঠান যে ভাল করিয়া শেষ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিতে চায় না, তাহার প্রধান কারণ—আমরা দুর্ব্বল চেষ্টা লইয়া কায করি; আমরা অল্প খরচ করিয়া হাতে হাতে বেশী লাভ করিবার প্রত্যাশা করি। নিষ্ফলতার জন্য আমরা অদৃষ্টকে, এবং কম্মগোএকেই দায়ী করি এবং নিজেকে নিষ্কৃতি দিই।

আমাদের সঙ্কল্পের মধ্যে, চেষ্টার মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে এই যে একটা বলহীনতা আছে, সে দিকে আমাদের বিশেষ-ভাবে মনোযোগ করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের নিজের মধ্যে যে অপরাধ ও অসম্পূর্ণতা আছে, তাহাকে অস্বীকার করিয়া অহঙ্কার করিলে আমরা বড় হইব না।

অন্যদেশে প্রতিকূল অবস্থায় সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা কায কেমন করিয়া সার্থক হইয়া উঠে, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে বড় আবশ্যক। সেই জন্যই আমরা একখানি আমেরিকান পত্র হইতে নিম্নলিখিত ইতিহাসটি সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

জর্জিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটসের একটি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। সেই জর্জিয়ার পার্ব্বত্য অংশে যাহারা বাস করে, তাহাদের পড়াশুনা একবারে নাই বলিলেই হয়। তাহাদের কুটীর-গুলি দূরে দূরে স্থাপিত, অবস্থা অত্যন্ত হীন। ছেলেরা লেখাপড়া শিখিয়া বাপ পিতামহের চেয়ে কোন অংশে বড় হইয়া উঠিবে, ইহা তাহারা শ্রেয় বলিয়া মনে করিত না।

এইরূপ নিভৃত একটি পার্ব্বত্যগ্রামের কুটীর কোনো একটি নগরবাসিনীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার নাম কুমারী মার্থা ম্যাকচেস্নী বেরী। গ্রামটির নাম পোসাম ট্রট। মিস্ বেরী এই কুটীরটিকে বেশ মনের মত করিয়া বাড়াইয়া লইয়া এইখানে শৈলাশ্রমের অরণ্যশোভা ভোগ করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

বিলাসী আমেরিকান সমাজের উপযুক্ত বেশভূষা করিয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে, আমোদ-আহ্লাদে, স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইবার পক্ষে তাঁহার আয় যথেষ্ট ছিল। ঘরের কায সমস্তই কাফ্রি দাস-দাসীর দ্বারাই ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই অনুমানে আন্দাজ করিয়া লইয়া সম্পন্ন হইত, প্রভুর আদেশের জন্য তাহারা হাজির হইয়া অপেক্ষা করিত এবং অভাব হইবার পূর্ব্বে প্রভুর আবশ্যক সামগ্রী তাহারা হাতের কাছে আনিয়া উপস্থিত করিত। সমাজে আদর পাইবার ও সৎপাত্রের সহিত বিবাহ হইবার মত বিদ্যা, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের অভাব তাঁহার ছিল না। ইনি যে অশিক্ষিত

গিরিবাসীদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

এক দিন অপরাহ্ণে মার্থা বেরী তাঁহার কুটীরে বসিয়া আছেন, এমন সময় বনপথ দিয়া গুটিকয়েক ছোট ছোট ছেলে যাইতে যাইতে সঙ্কুচিত কৌতূহলে তাঁহার কুটীরের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। মার্থা বেরী তাহাদিগকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, তাহারা কোনও কালে বিদ্যালয়ে যায় নাই। তিনি তাহাদিগকে ঘরে লইয়া বই পড়িয়া শুনাইলেন, গল্প বলিলেন ; তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তাহার পরের রবিবারে তাহারা তাহাদের ভাই-বোনদের সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। এমনি পড়ে। কিন্তু তাহারা অশিক্ষিত নিরুৎসাহ অকালবৃদ্ধ হইলে কি হয়, তাহাদের একটি গুণ পূরা মাত্রায় আছে। তাহারা আত্মনির্ভর—স্বাবলম্বী, পরানুগ্রহে কিছু লাভ করা তাহারা অপমানজনক মনে করে।

মিস্ বেরী প্রথমে ঘরে ঘরে যাইয়া সেই গ্রামের অধিবাসীদের লেখাপড়া করিতে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে উৎসাহ দিয়া ফিরিতে লাগিলেন। প্রতি রবিবারে তিনি সকলকে একত্র করিয়া বাইবেলের গল্প প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইয়া কায আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কুটীরের সম্মুখে একটি কাঠের কুঁদায় তৈরী ঘরে তাঁহার প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ছেলে পাওয়াই শক্ত। পড়াশুনা করিয়া

মিস মার্থা বেরী ও ছাত্রবৃন্দ

করিয়া কয়েক সপ্তাহ না যাইতেই মিস্ বেরী স্বয়ং একটি ঘোড়ায় চড়িয়া গিরিবাসীদের ঘরকরণা দেখিতে বাহির হইলেন। তিনি তাঁহার প্রিয় ঘোড়া রোয়ানীর পিঠে চড়িয়া সেই গ্রামের মধ্যে গিয়া দেখিলেন, সেখানকার সব ঘর কাঠের কুঁদা সাজাইয়া তৈরি করা হইয়াছে। গৃহস্থরা ভুট্টা-মকাইর ক্ষেত আর শুওরের খোঁয়াড় লইয়া বাস করিতেছে পশুর ন্যায়।

তিনি শুনিলেন, উহাদের ভুট্টা ক্ষেতে আর শুওরের পালে এক রকমের কি রোগ লাগে, তাহাতে তাহাদের সব শক্তি উদ্যম চুষিয়া খায়, তাহারা ইহাতেই অকালে বুড়া হইয়া কোন লাভ নাই, বরঞ্চ তাহাতে ছেলে মাটী হইয়া যাইবে, ইহাই লোকের ধারণা।

অনেক কষ্টে অনেক বলাকহা করিয়া, মিষ্ট কথা বলিয়া ভুলাইয়া প্রথমে দশটি ছেলে লইয়া পড়া আরম্ভ হইল। কিন্তু সামান্য কোনও ছুতাতেই বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠানো বন্ধ হয়। মিস্ বেরী তাহাদিগকে আদম ও ইভ, নোয়ার জাহাজে করিয়া মানব-বংশের জলপ্লাবন হইতে রক্ষা, যিশুখৃষ্ট ও ভগবানের অসীম প্রেম ও দয়া সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। সেই নিরক্ষর লোকরা ক্রমে স্বর্গ, নরক, ঈশ্বরের দেবদূত প্রভৃতির

কথাও জানিতে লাগিল। তখন তাহারা ভাবিল, মিস্ মার্গা বেরী এক জন দেবদূত, ভগবানের অসীম করুণা তাঁহাকে তাহাদের উদ্ধারের জন্য তাহাদের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাহারা মিস বেরীকে "পোসাম ট্রটের রবিবাসরীয় মহিলা বা সাণ্ডে লেডী" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

মিস্ বেরী ক্রমে সেই রবিবাসরীয় পাঠসভার সঙ্গে দৈনিক বিদ্যালয় যোগ করিলেন। সামান্য যাহা বেতন জুটিত, তাহা হইতে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা কঠিন দেখিয়া মিস্ বেরী নিজের অর্থ দিয়া শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলেন। তিনি নিজের আয় হইতে স্কুলের আর সকল খরচও জোগাইতে লাগিলেন। যে জমীর উপর স্কুল ছিল, আর যে বাড়ীতে সেই স্কুল বসিত, তাহা তিনি নিজে খরিদ করিয়া বিদ্যালয়কে দান করিতে চাহিলেন। তাঁহার এটর্ণী তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু মিষ্টভাষিণী মিস্ বেরীর কথায় পরাজিত হইয়া সেই এটর্ণীই শেষে সেই স্কুলের এক জন প্রথম ট্রাষ্টি হইলেন।

এইরূপে কোনমতে বিদ্যালয়কে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য যখন তিনি চেষ্টা করিতেছেন, তখন আর একটি চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, হাতের কায করিয়া খাটিয়া খাওয়া যে হেয় নয় এবং নিজের উন্নতিসাধন করা যে সকলেরই উচিত, ইহাই এখানকার নিশ্চেষ্ট উদাসীন লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া চাই। নিজেদের দারিদ্র্য ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হইয়া জীবনযাপন না করিয়া, যাহাতে তাহারা একটা জনসমাজ গড়িয়া তোলে এবং নিজেদের উদ্যমে রাস্তা-ঘাট তৈরি করিয়া ও স্কুল স্থাপন করিয়া নিজেদের শক্তিতেই সকলে সমবেতভাবে বড় হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এখন তাহারা যেরূপে ক্ষেত্র চাষ করে, তাহাতে ফসল ভাল হয় না এবং যে দুই তিনটি ফসল তাহারা বরাবর আবাদ করিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়া আর কিছুই করিতে চায় না, ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। ইহারা নির্বিচারে বন কাটিয়া, জঙ্গল পোড়াইয়া কৃষিক্ষেত্রের সর্ব্বনাশ করিতেছে, এ সম্বন্ধেও তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া চাই।

সাশ্রম বিদ্যালয় বা বোর্ডিং স্কুল ব্যতীত এ সমস্ত শিক্ষা দিবার অন্য উপায় নাই। মিস্ বেরী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দিয়া একটি দশ-কুঠরীওয়ালা বাড়ী তৈরি করাইয়া তাহা সঙ্গে খানিকটা বনভূমি যোগ করিয়া লইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা এক জন শিক্ষিতা মহিলা মিস্ ক্রুষ্টার তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।

আশ্রমে ছাত্র পাওয়া আরও কঠিন। দুই একটি করিয়া পাঁচটি ছেলে ও দুইটি শিক্ষক লইয়া স্কুল আরম্ভ হইল।

নিভৃত পাহাড়ের মধ্যে পাঁচটি গ্রাম্য ছেলেকে পড়াইবার কাযে জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহ কত অল্প হইতে পারে, সে কথা আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, আড়ম্বর একটা মস্ত বেতন। সেটুকু হইতেও বঞ্চিত হইলে ত্যাগমাহাত্ম্যের আকর্ষণ চলিয়া যায়।

এক হপ্তা স্কুল বসিবার পর ছুটীর দিন আসিল। সে দিন ছাত্রদের কাপড় কাচিবার দিন। একটা বড় হাঁড়িতে জল গরম হইতেছে, কাছে বড় বড় দুইটা গাম্লায় সাবান-গোলা জল রহিয়াছে। এক রাশ ময়লা কাপড়, বিছানার চাদর আর টেবিলের পাতন জমা করা রহিয়াছে। মিস্ বেরী তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঁচটি ছাত্রকে বলিলেন,—ফর্সা কাপড় চাদর ব্যবহার করা সভ্যতার লক্ষণ। তোমাদের সকলের কাপড় চাদর পরিষ্কার করিয়া কাচিয়া লইতে হইবে। কেমন করিয়া কাপড় কাচিতে হয়, আমি দেখাইয়া দিতেছি। তাহার পরে তোমরা নিজের কাপড়-চোপড় কাচিয়া লও।

ছেলেরা বলিল,—না ঠাক্রুণ, সে হইবে না। পুরুষ-মানুষে আবার কবে কাপড় কাচে?

মিস্ বেরী সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন—আচ্ছা, বেশ, আমি কাচি, তোমরা সকলে দাঁড়াইয়া দেখ।

মিস্ বেরী জামার হাতা গুটাইয়া গরম জলের গাম্লায় সাবান-গোলার মধ্যে হাত দিতে উদ্যত হইলেন। যে ক্ষীণাঙ্গী ধনশালিনী মহিলার সেবা ও আদেশের জন্য কত দাস-দাসী ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করে, তিনি ময়লা কাপড় কাচিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া একটি ছাত্রের বিসদৃশ বোধ হইল। সে লজ্জা পাইয়া একটু উস্‌খুস্ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল এবং বলিল—মিস্ বেরী, আমার জন্মে কখনও আমি পুরুষ-মানুষকে কাপড় কাচিতে দেখি নাই। কিন্তু আপনি কাপড় কাচিবেন, ইহাও আমি দেখিতে পারিব না। তার

চেয়ে বরং আমি পুরুষমানুষ হইয়াও কাপড় কাচিবার হীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

মিস্ বেরীর প্রথম জয় হইল। কিন্তু অপর সকলকে এত সহজে আয়ত্ত করিতে পারা যায় নাই। তবে ক্রমে ক্রমে সকলের মধ্যেই শ্রমের মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তখন ক্রমে সকলে সকল কাযই নিজেরা করিতে আরম্ভ করিল, ঘর ঝাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না পর্য্যন্ত সমস্তই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অসঙ্কোচে সম্পন্ন করিতে লাগিল।

ছাত্রদের মধ্যে কর্ম্মের মর্য্যাদাবোধের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক আত্মনির্ভরতা ব্যক্ত হইল। তখন তাহারা অন্যের কাছে অমনি কিছু সাহায্য গ্রহণ করা অপমানকর বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। বিদ্যালয়ের নিজের বেতন ও বিদ্যালয়ের আশ্রমে বাসের খরচ নিজেরাই দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। একটি ছাত্র তাহার বাড়ী হইতে জোড়া বলদ হাঁকাইয়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত, সে ইহাদের দিয়া চাষ করিয়া তাহার সম্বৎসরের খরচ শোধ করিবে। এক জন ছাত্র এক জোড়া মুরগীর বাচ্চা লইয়া আসিল, ইহাদের বাচ্চা হইয়া বংশবৃদ্ধি হইলে তাহা দ্বারা তাহার বিদ্যালয়ের খরচ সঙ্কুলান হইতে পারিবে। একটি ছাত্র তাহার বাড়ীর তাঁতে বোনা হাতে কাটা সূতার মোটা খদ্দর কাপড়ের একটা পেটী আনিয়া হাজির, তাহা দিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরিচ্ছদ, বিছানার আর টেবিলের চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে ত পারিবে।

তাহারা নিজেরা আশ্রমে বাগান করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, নানাবিধ ফলের গাছ লাগাইল, পশুপক্ষীর বাচ্চা পালন করিয়া আহারের সুব্যবস্থা করিতে লাগিল।

অবশেষে ছাত্ররা নিজেদের বাসের জন্য দশ কুঠরীওয়ালা একটা শয়নশালা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল।

এই সময়ে মিস্ বেরী খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলেন যে, স্পেনিশ-আমেরিকান যুদ্ধে ব্যবহৃত খাটগুলি নীলাম করা হইবে। তিনি সহরে গিয়া সস্তা দামে কিছু কিনিয়া আনিলেন। তাঁহার কোনও বন্ধু তাঁহার বিদ্যালয়ে কতকগুলি পুরাতন ডিশ্ ও পুরাতন চেয়ার দান করিলেন। আর মিস্ বেরী নিজের বাড়ীর আসবাব-পত্র যাহা কিছু বিদ্যালয়ে আবশ্যক হইতে পারে মনে করিলেন, তাহা বাড়ী উজাড় করিয়া লইয়া আসিলেন। এক জন লোক তাঁহার স্কুলে একটি পুরাতন পিয়ানোও দান করিলেন। এইবার তাঁহার বিদ্যালয় রীতিমত আরম্ভ হইয়া গেল।

ক্রমে স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিল, ছাত্র অল্পে অল্পে বাড়িতে লাগিল। যেমন যেমন ছাত্র বাড়ে, ছাত্ররা নিজেরাই ছুতারের নির্দ্দেশমত নিজেদের বাসের ঘর তৈরি করিয়া তুলে। এক জন শিক্ষিত কৃষক ছাত্রদিগকে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া চাষের কায শিখাইতে লাগিল, এবং মিস্ বেরী ও মিস্ ব্রুষ্টার ছাত্রদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন।

তাঁহার বিদ্যালয়ের খ্যাতি বহু ছাত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, ছাত্রীরাও ভর্ত্তি হইতে চায়। কিন্তু মিস্ বেরীর নিজের সমস্ত পুঁজি শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বিদ্যালয় বাড়াইবার সঙ্গতি তাঁহার নাই। ছাত্র ছাত্রীদের প্রত্যাখ্যান করিতে হইতেছিল।

নিরাশ বালক বালিকাদের মলিন মুখ দেখিয়া মিস্ বেরীর কোমল মনে ব্যথা লাগিতে লাগিল। তখন তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি ধনকুবেরদের স্বর্ণপুরী নিউ-ইয়র্কে গিয়া এই সব বালক-বালিকাদের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবেন, সেখানকার মহাধনীরা ইচ্ছা করিলে শিক্ষা-লাভে সমুৎসুক এই শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন আলোকময় ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারেন। ঈশ্বরের উপর ভরসা করিয়া দ্বিধাকম্পিত হৃদয়ে তিনি নিউ-ইয়র্কে গিয়া উপনীত হইলেন। প্রথমে তিনি বণিকশ্রেষ্ঠ রুল্টন কাটিং এর নিকটে গেলেন। তিনি কাটিংকে নিজের স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের কথা কম্পিত কণ্ঠে কুণ্ঠার সহিত বলিলেন, তাহারা কেমন করিয়া জ্ঞানপিপাসায় অধীর হইয়াছে, কেমন করিয়া তাহারা তাহাদের নিজেদের হাত দিয়া দেহের অস্থি পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া কায করিতে ও নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কাহিনী তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বর্ণনা করিলেন।

মিস্ বেরী তাঁহার বিবরণ সমাপ্ত করিলে কাটিং জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা মিস বেরী, এই কাযে আপনার লাভ কি? আপনি ইহাতে কত বেতন পান, এই সব কাযের থেকে আপনার কত আয় হয়?

মিস্ বেরী ত অবাক, বজ্রাহত! তিনি আম্‌তা আম্‌তা

করিয়া বলিলেন,—আমি আমি···আমি ত আমার সবই এই বিদ্যালয় হইতে লাভ করি, এক একটি ছেলে-মেয়েকে যখন চিন্তাপটু শিক্ষিত নর-নারীতে পরিণত হইতে দেখি, তখন তাহার যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহাই আমার পরম পুরস্কার। হায় মিষ্টার কার্টিং, যদি আপনি একটা ছেলেকে এক বৎসর স্কুলে পড়াইয়া মানুষ হইবার পথে অগ্রসর করিয়া দেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে তাহার ও আপনার কত বড় লাভ হইবে।

মিষ্টার কার্টিং চেক-বই বাহির করিয়া খুলিতে খুলিতে মিস্ বেরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, একটি ছেলেকে এক বৎসর আপনার স্কুলে পড়াইতে হইলে তার কত খরচ পড়ে?

আনন্দে ও আশায় মিস্ বেরীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি গদগদ-কম্পিত কণ্ঠে সেই চেক-বইয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—পঞ্চাশ ডলার।

মিষ্টার কার্টিং চেক লিখিতে লাগিলেন। মিস্ বেরীর হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, তাহা হইলে তিনি এই জ্ঞানভিক্ষু ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু সাহায্য দিতে উদ্যত হইয়াছেন। উনি যদি কিছু দেন, তবে অন্য ধনীদের দ্বারে গেলেও কিছু-না-কিছু পাওয়া যাইতে পারার সম্ভাবনা তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

মিষ্টার কার্টিং চেক ভাঁজ করিয়া মিস্ বেরীর হাতে দিলেন। তিনি তাহা লইয়া আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন।

রাস্তায় আসিয়া তিনি চেক খুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, কার্টিং কত দান করিয়াছেন—পাঁচ ডলার? দশ ডলার? পঞ্চাশ ডলার খরচ পড়ে, সবটাই কি আর দিয়াছেন?

তিনি চেক খুলিয়া তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তিনি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। এও কি সম্ভব? সত্যই সম্ভব—তিনি একেবারে এক থোকে পাঁচ শত ডলার দান করিয়াছেন! দাতা শতং জীবতু!

এই পাঁচ শত ডলার দিয়া এই বৎসর দশটি বালককে বিদ্যালয়ে লওয়া সম্ভব হইল।

এইরূপে ছয় বৎসরে তাঁহার বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হইল দেড় শত। দশটি ভালো ভালো কুটীর প্রস্তুত হইল। তাহার প্রায় সমস্তই ছেলেদের নিজের হাতে তৈরি। বহু শত বিঘা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া চাষ চলিতেছে। তাহার মাঝখান দিয়া একটি পাকা রাস্তা গিয়াছে, তাহাও ছেলেরা তৈরি করিয়াছে। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি বড় গোয়াল আছে। কোন্ জাতের গরুর কি গুণ, তাহা ছেলেরা নিজেরা দেখিয়া শিখিয়া লয়। ইহা ছাড়া ফলের বাগান আছে, এবং সেই বাগানের ফল টিনের কৌটায় বাতাসশূন্য করিয়া ভরিয়া বিক্রয় করিবার জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

এত বড় একটি কাণ্ড করিয়া তুলিবার জন্য ছেলেদের যেমন খাটিতে হইয়াছে, শিক্ষকদিগকেও সেইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। যাঁহারা দেড় শত ডলার বেতনের যোগ্য, তাঁহারা ত্রিশ ডলার মাত্র অর্থাৎ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের মত বেতন লইয়া কায করিয়াছেন। মিস্ বেরীর পরিধেয় বস্ত্র যখন একটিতে আসিয়া ঠেকিয়াছিল, তখন ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্য হইতে চাঁদা তুলিয়া সাড়ে চার ডলার তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়াছিল—তাঁহার নূতন কাপড় কিনিবার জন্য। বিদ্যালয়ের পঞ্চম বৎসরে ছাত্ররা নিজে খাটিয়া উপার্জ্জন করিয়া প্রায় আট শত টাকা বিদ্যালয়কে দান করিয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যেখানেই গিয়াছে, সেইখানেই শ্রমশীলতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে।

ভোর রাত্রিতে চারিটার সময় বিদ্যালয়ে প্রথম কায চুলায় আগুন ধরানো। অনতিকাল পরে ছাত্ররা আসিয়া রান্না চড়াইয়া দেয়। ছয়টার মধ্যেই আহার প্রস্তুত হইয়া যায়। তাহার পরে প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃ ছই ঘণ্টা মাঠে ও চার ঘণ্টা ক্লাসে শিক্ষালাভ করিতে হয়। বিদ্যালয়ের এমন কোন কায নাই—যাহা ছেলেরা নিজের হাতে না করে। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইউনাইটেড ষ্টেটসের দাক্ষিণাত্যে কাফ্রি দাসরাই সমস্ত হাতের কাষ করে বলিয়া এই সমস্ত কায সেখানে শ্বেতকায়দের পক্ষে বিশেষ ঘৃণ্য ও লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হয়। এরূপ সংস্কার কাটাইয়া উঠা যে কিরূপ কঠিন, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

মিস্ বেরীর বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় একত্রিংশ বৎসর আগে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। এই একত্রিশ বৎসরে পোসাম ট্রট গ্রাম বর্দ্ধিতায়তন হইয়া সহরে পরিণত হইয়াছে, মিস্

বেরীর স্কুলও বর্দ্ধিতায়তন ও বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে। সেই সমগ্র সহর এখন আত্মনির্ভর—স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। একটি কলের যাঁতা বসানো হইয়াছে, তাহাতে ভুট্টার আটা ময়দা তৈরি হয়, আর সেই ময়দা হইতে উৎকৃষ্ট রুটি সেকা হইয়া বিক্রয় করা হয়। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভুট্টার রুটি বলিয়া পোসাম ট্রটের রুটীর খ্যাতি রটিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়-কাটা গ্র্যানাইট পাথরে মধুবর্ণ বিদ্যালয়ভবন ও আরত্রিকক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। পীচ ফলের বাগানে পাহাড়ের গা ঢাকিয়া গিয়াছে, আর যেখানে খালি আছে, সেখানে লোমশ ছাগ দলে দলে বিচরণ করে। সেই এঙ্গোরা ছাগের লোমে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কম্বল, র‍্যাগ প্রভৃতি বুনে—নিজেদেরই চরকায় সূতা কাটিয়া নিজেদেরই তাঁতে।

বিদ্যালয়ের নীচে সমতল জমীতে দোকানঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে তৈরি কাঠকাঠরার আসবাবপত্র বিক্রয় হয়। মিস্ বেরীর বাড়ীতে প্রাচীন কালের সুন্দর নক্সার যে সব মেহগিনি কাঠের আস্‌বাব ছিল, তাহার নকল করিয়া সুন্দর সুন্দর কাঠের জিনিষ ছাত্র-ছাত্রীরা তৈরি করে। তাহারা শণ জন্মাইয়া সুন্দর তোয়ালে তৈরি করে, ইহা ইটালীর প্রসিদ্ধ তোয়ালের চেয়েও মোলায়েম ও সুন্দর হয়।

ছাত্রদের ক্ষেত্রে কলের লাঙ্গলে চাষ হয়, সে সব লাঙ্গল মোটরে চলে। সেই সব মোটর আর কল মেরামত করিবার জন্য বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি কামারশালা আছে। তাহার পাশেই মুচির দোকান আছে, সেখানে প্রতি মাসে দুশো আড়াইশো জোড়া জুতা তৈরি হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনযাপনের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা তাহারা নিজেরা প্রস্তুত করিয়া ও মেরামত করিয়া লয়। কুড়ি হাজার একার অর্থাৎ ষাট হাজার বিঘা জমীর উপর যে বিরাট বিদ্যায়তন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক জনও বেতনভোগী ভৃত্য নাই। এখানে যাহারা কায করে, কেবল তাহারাই বিদ্যালাভ করিতে পারে, সুতরাং প্রত্যেকেই কায করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিবারও সময় পায়।

প্রত্যেক বৎসর শত শত বালক-বালিকাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতে হয়—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। এই বৎসর ১৫০ জন প্রখরবুদ্ধিমান্ ও চরিত্রবান্ বালক ও বালিকাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। প্রত্যাখ্যাত বালক-বালিকাদের করুণ মিনতি ও ক্রন্দন হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেয়, কিন্তু নিরুপায়, স্থানাভাব।

কিন্তু মিস্ মার্থা বেরী তাহার যথাসাধ্য চেষ্টায় বিদ্যা-বিতরণের মহাব্রত পালন করিতেছেন। এখন ত বিদ্যালয়ের আয়তন হইয়াছে, কুড়ি হাজার একর জমী। ইহার সমস্ত সম্পত্তির মূল্য এখন এক কোটি টাকার কাছাকাছি। প্রত্যেক বৎসর এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্ত্তি হয়। তাহারা নিজেদের শিক্ষার ব্যয় নিজেরা উপার্জ্জন করিয়া মানুষ হয়, তাহারা কাহারও কাছে ঋণী হইয়া খাটো হইয়া থাকে না এবং মিস্ বেরীর পুরস্কারের আর ইয়ত্তা নাই। তিনি এ পর্য্যন্ত অনেক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই বিদ্যালয় সুবিস্তীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তিনি বৎসরে পনেরো লক্ষ ডলার অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন এবং তাহার দ্বারা তাঁহার বিদ্যালয়ের খরচ সঙ্কুলান করিতে হয়।

আমেরিকার মধ্যে পঞ্চাশ জন শ্রেষ্ঠ মহিলার নাম জানিতে চাওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই একমত হইয়া মিস্ মার্থা বেরীর নাম উল্লেখ করিয়াছিল। জর্জ্জিয়ার শাসন-পরিষৎ তাঁহাকে "সম্মানিতা দেশবাসিনী" বলিয়া ভোট দিয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড ষ্টেটসের রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেণ্ট কুলিজ বিশেষ সামাজিক হিতসাধনের জন্য "রুজভেল্‌ট মেডাল" দিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। জর্জ্জিয়া ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে সম্মানসূচক "ডক্টর অফ পেডাগগী অর্থাৎ শিক্ষণাচার্য্য উপাধি অর্পণ করিয়াছেন। নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটী তাঁহাকে তাঁহার সমাজ-সেবার জন্য "ডক্টর অফ ল" বা আইনের আচার্য্যা উপাধি দান করিয়াছেন এবং পিক্টোরিয়াল রিভিউ প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ ও স্মরণীয় সমাজসেবার জন্য পাঁচ হাজার ডলার পারিতোষিক বিতরণ করেন, তাহাও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মিস্ বেরীকে দেওয়া হইয়াছে।

মিস্ বেরী দেখাইয়াছেন যে, সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নরসেবা ও দেশসেবা করুন। ভগবান্ করুন, আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আমাদের দেশের গুরুকুল, ঋষিকুল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় মিস্ বেরীর ন্যায় মহাকর্ম্মীর অনুপ্রেরণা ও দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিয়া

আমাদের দেশকেও বিদ্যায়, চারিত্রে গৌরবান্বিত করিয়া তুলুক এবং এইরূপ নব নব প্রতিষ্ঠান দেশের সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়া দেশবাসীদের মানুষ করিয়া তুলুক।

অতি-আধুনিক বিদ্যালয়

আমেরিকা অতি-আধুনিক নব্য দেশ। সেখানকার সব কারবারই অতি-আধুনিক ধরণের। সেখানে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কলেজ সমস্তই অতি আধুনিক প্রণালী অবলম্বন করিতে ব্যগ্র। সকল বিদ্যালয়ে নিত্য নব নব পন্থা অবলম্বিত ও পুরাতনের পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমেরিকার ৫ শত উচ্চ শ্রেণীর স্কুল পরিদর্শনের এক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে সেই সব স্কুলে কি পড়ানো হয়, তাহার একটু আভাস দেওয়া হইয়াছে।

ষ্টেট দ্বারা পরিচালিত অথবা বে-সরকারী সকল বিদ্যালয়েই নূতন পদ্ধতির শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হইতেছে।

ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থাতেই পুরাতন পদ্ধতির বিসম ও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ইংরাজীভাষী নানা দেশের সাহিত্য ত তুলনামূলক ভাবে পড়ানো হইতেছেই, তাহার সঙ্গে আবার প্রাচীন সাহিত্যও পড়ানো হইতেছে। ইংলণ্ডের প্রাচীন লেখকদের রচনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক লেখকদের রচনা ক্যানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়া—যেখানে যেখানে ইংরাজীতে পুস্তক রচনা হয়, সে সবও পড়ানো হইতেছে। ইহাতে সকল দেশের ভাষার বাগ্‌ভঙ্গী আয়ত্ত করা সহজ হইতেছে।

ছাত্র যে বিষয় পড়িতে ভালবাসে, অথবা যে বিষয়ে পরে সে বিশেষ অধ্যয়ন করিবে, সেই বিষয়েই তাহাকে রচনা করানো হয়।

অনেক স্কুলে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা একেবারে খুব কমাইয়া লঘুতম করিয়া আনা হইয়াছে, ছাত্ররা কেবল নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক পড়ে না, তাহারা সকল পুস্তকই পড়িতে বাধ্য হয়, কোন্ পুস্তক হইতে কি প্রশ্ন হইবে, তাহা কে বলিবে?

অনেক ক্লাসে সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির বিলক্ষণ চর্চ্চা হয়, যুদ্ধ, শান্তি, নিরস্ত্র-সমস্যা, মাদকসেবা-নিবারণ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও অন্যান্য সমাজ-সমস্যা ক্লাসে আলোচিত হয়।

স্কুলে চলতি খবরের ক্লাস আছে, যাহা নিত্য ঘটিতেছে, তাহার সম্বন্ধে নিত্য আলোচনা ও বিতর্ক হয়। ইহা এখন ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিষয় বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

আগে মেয়ে-স্কুলে গৃহস্থালীর কায শিক্ষা দেওয়াই প্রধান বিষয় ছিল। এখন মেয়ে-স্কুলে দোকান রাখিবার, দোকান সাজাইবার, রেস্তরাঁয় পরিবেষণ করিবার নানাবিধ কায মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণ, মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র এখন গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বরষা

শ্রাবণ ঘন কাজল মেঘে বরষা নামে ধীরে
আকাশ-বধূ মিনতি-চোখে চায়;
প্রিয়ার কালো আঁখির তারা বিভল্ হ'ল কি রে
পরমতম দুখের বেদনায়?
শিহর-লাগা উদাস হাওয়া বহিয়া আনমনে
নীরব সাঁঝে কি কথা কহে কাণে?
গোপন বন সুরভি আসি' পশিয়া বাতায়নে
বেদন-জাগা বিরহ লিপি আনে।
অদূরে কালো তমাল তলে গোপন-বন-পথে
বাদল-নটী চলিছে অভিসারে;
নিবিড় ঘন আঁধার মাঝে জোনাকী দীপ সাথে
চমকি' ফিরি খুঁজিছে যেন কারে?
নদীর জলে চকিত ছায়া বিবশ হয়ে লোটে,
চপলা-সখী ঘুরছে কালো মেঘে;
প্রিয়ার তরে ব্যাকুল হ'য়ে জলদ কেঁদে ওঠে,
বাদল-ধারা বরিষে ঘন বেগে।
নিরালা মম প্রবাস-ঘরে বধূরে মনে করি'
একেলা বসি' বিরহগীতি লিখি;
নিখিল-জন-বিরহি-সমা অলকা স্মৃতি স্মরি'
প্রিয়ার কাছে পাঠায়ে দিবে না কি?

শ্রীমনু চট্টোপাধ্যায়।

মাণিক-জোড়

১

—মাণিক নম্বর এক—

একদা বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কলিকাতা মহানগরীর বাগবাজার পল্লীমধ্যস্থ একটি বাটীর অন্দরে বিষম দাম্পত্য-কলহ ঘটিয়া গেল।

চন্দ্র তখনও গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া ভুবন আলোকিত করিতে আসেন নাই, আসি আসি করিতেছিলেন। সমস্ত দিনের অসহ্য গুমটের পর দক্ষিণদিক্ হইতে মৃদু মৃদু বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছিল। সেই বাতাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া উঠানের মাচার উপরকার লাউপাতাগুলি আনন্দে ধীরে ধীরে নড়িয়া উঠিতেছিল এবং দালানের কাকাতুয়াটি হঠাৎ কি মনে করিয়া ভয়ানক চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছিল। এমনই সময়ে রন্ধন-গৃহের মধ্য হইতে আরক্ত-লোচনে এবং বিরক্ত-বচনে স্ত্রী কহিলেন,—"দেবে না?"

রন্ধনগৃহের বাহিরে গরম চা পান করিতে করিতে গরম সুরে স্বামী উত্তর করিলেন,—"দেবো না।"

"দেবে না?"

"না।"

গম্‌গম্ শব্দে স্থানটা কাঁপাইয়া স্ত্রী রান্নাঘর হইতে শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামীও চায়ের শেষ বিন্দুটুকু চুমুক দিয়া, হুঁকাটি হাতে লইয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

তখন সম্মুখের পথ দিয়া 'অবাক জলপান' হাঁকিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দে বাবা, দু'টো মোড়া দে দেখি, খেয়ে খানিক অবাক হয়ে যাই, নইলে এর ওপর কিছু বল্‌তে গেলে, হয় ত রাত্রে আর কোন জলপানেরই ব্যবস্থা ঘটবে না।"

অবাকজলপানওয়ালা দুই মোড়া জল পান দিয়া বোধ হয়, পয়সার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল। তিনকড়ি একটা মোড়া খুলিয়া কিছু জলপান মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন,—"বেশ টাট্‌কা ভাজা রে। তুই কোন্ পাড়ায় থাকিস, বাবা? পয়সা দু'টো কাল এসে নিয়ে যাস্। তোর নাম দুঃখীরাম না সুখময় রে?"

"নিশিকান্ত। ধার বাবু রাখতে পারব না। পয়সা দু'টো দিয়ে দিন, কর্ত্তা।"

চিবাইতে চিবাইতে তিনকড়ি কহিলেন,—"নোটের ভাঙ্গানি হবে তোর কাছে?"

"নোটের ভাঙ্গানি কোথা পাব, বাবু।"

"তাই ত বলছি, কাল এসে নিয়ে যেও মাণিক আমার, ধন আমার। যা রাগ রেগেছে আজ, এই বৈঠকখানা পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে না এলে বাঁচি। হয়েছে কি জানিস? পাঁচটা টাকা ছিল ওঁর পুঁজি। ধার নিয়েছিলুম, সুদ দেবো ব'লে। কবে নিয়েছিলুম জানিস? সেই যে পূজোর সময় যখন ৭ দিন ধ'রে অনবরত বৃষ্টি। টাকায় তের পো ক'রে চালের দাম হ'ল। কাপড়ের দাম—"

"পয়সা দু'টো দিয়ে দিন, বাবু।"

"ওই ওরা সব ফিরছে। শুনতে পাচ্ছিস না? ওই যে (সুরে) 'পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহে বহিল বিষম ঘূর্ণি ঝড়। ভিক্ষা দিয়ে রক্ষা কর গো, তাদের প্রাণ, তাদের ঘর।' যা বাবা। আজ আর বিরক্ত করিস্ নি।" বলিয়া তিনকড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

খানিক পরেই লাল সালুর উপর বড় বড় অক্ষরে তুলা দিয়া লেখা 'করুণাময়ী সেবক সমিতি' ধ্বজা ধরিয়া ৮।১০ জন লোক রাস্তা দিয়া গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া তথায় দাঁড়াইল। একখানি চাদরের চারিটি খুঁট চারি জনে ধরিয়া লম্বা একটা ঝোলার মত করিয়াছিল। তাহার মধ্যে চাউল, কাপড়, এবং টাকা-পয়সা প্রভৃতি জমা হইয়াছিল। তিনকড়ির বাটীর সম্মুখে আসিয়াই, হার্ম্মোনিয়ম থামিয়া গেল। তিনকড়ি বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঝোলাটার চারি খুঁট এক হইয়া গুটাইয়া লওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গানও বন্ধ হইল।

শুধু তাহার রেশটুকু যেন তখনও বাতাসে ভাসিতে লাগিল—

"পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহে বহিল বিষম ঘূর্ণী ঝড়।
ভিক্ষা দিয়ে রক্ষা কর গো তাদের প্রাণ, তাদের ঘর॥"

ভিতরের ইতিহাসটা এইরূপ। নাম তাহার তিনকড়ি ভাওড়া। কোন এক সময়ে হয় ত কোন অফিসে কোন কাযকর্ম্ম করিতেন। কিন্তু বহু দিন হইতে সে সব ত্যাগ করিয়া পরাধীন জীবনের অন্ত করিয়াছেন। এখন স্বাধীন-ভাবে থাকিয়াই এটা ওটা সেটা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সম্প্রতি ময়মনসিংহের ভীষণ ঝড় উপলক্ষ করিয়া 'করুণাময়ী সেবক সমিতির' দল গঠন করিয়াছেন। গান বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য যাহা কিছু করিবার সব করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার রচিত গান গাহিয়া এই দল প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সারা কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া নগদ ও দ্রব্যাদিতে যাহা আমদানী করে, তাহা তিন ভাগ হইয়া এক ভাগ দলপতি হিসাবে তাঁহার হাতে আসে, বাকী দুই ভাগ দলের দশ জনের মধ্যে ভাগ হয়।

দলের আয়টি তিনকড়ির একবারে অস্থায়ী। বরিশালের বন্যার পর বহুদিন যাবৎ দলের কায বন্ধই ছিল ও বর্ত্তমানে ময়মনসিংহের ঝড়ের দয়ায় কিছুদিন হইতে এ কায আবার চলিতেছে। তবে আজকাল ইহার শত্রুসংখ্যাও যথেষ্ট, এবং তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শত্রু—কংগ্রেস।

গৃহে অপুত্রক গৃহিণী ও একটি ২০।২১ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভ্রাতুষ্পুত্রটি ছিল অঙ্গহীন। একটিমাত্র চোখ লইয়াই সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সে তাহার একটি চোখে পড়িয়াই পাঁচখানা ইংরাজী ও সাতখানা বাঙ্গালা বই শেষ করিয়া পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তার পর আর এক বিড়ম্বনা। গলার ভিতর টাকরায় হঠাৎ তাহার কি অসুখ হইল, সেই সূত্রে কথা তাহার বন্ধ হইয়া চিরজীবনের মত বোবা হইয়া গেল। এখন কথা কহিবার চেষ্টা করিতে গেলে একটা গোঁ গোঁ শব্দমাত্র তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হয়।

সন্ধ্যাবেলার কলহের বিবরণ হইতেছে এই যে, তিনকড়ি স্ত্রীর নিকট হইতে ৫টি টাকা সাত দিনের কড়ারে সাতমাস পূর্ব্বে কর্জ্জ লইয়াছিলেন। সাত মাসের অনবরত কড়া তাগাদাতেও সে টাকা এ পর্য্যন্ত পরিশোধ হয় নাই। আজ স্ত্রী মালতীমঞ্জরী এই লইয়া একটু বিশেষ রকম বকাবকি আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমি টাকা দেবে কি না?" তিনকড়ি চা খাইতে খাইতে বলিয়াছিলেন,— "দেবো না।"

রাত্রিতে আহারাদির পর তিনকড়ি সহসা খুব নরম হইয়া মালতীকে কহিলেন,—"তোমার মত বোকা স্ত্রীলোক আর জগতে নেই। রাগ ক'রে বললুম—'দেবো না,' ত তাই অমনি বিশ্বাস করলে?"

"কালই আমায় দিতে হবে। আর আমি তোমার কথায় ভুলবো না। রোজই ৪৷৫ টাকা ক'রে ভাগে পাচ্ছ, আর আমায় দেবার বেলা খালি টাকা নেই।"

"আহা-হা, তুমি বড় কম বোঝ, মঞ্জরী! তুমি হ'লে ঘরের মহাজন। বাইরের পাওনাদারগুলোকে ত আগে ঠাণ্ডা করতে হবে। রাস্তায় যে আর বেরুবার যো নেই—চু'পাশ থেকে যেন নীলেমের ডাক ডাকতে সুরু করে! ৪৷৫ টাকা ক'রে রোজ ভাগে পাচ্ছি বলছ, এ পাওনা আর ক'টা দিন। এরি মধ্যে কংগ্রেসের লোক হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে। লোকে কংগ্রেস ছাড়া আর কাকেও বিশ্বাস ক'রে কিছু দিতেও চায় না। এ সব ব্যবসায় কি আর সুখ আছে, মঞ্জরী! আর দু'চার দিন পরে হয় ত নিশেন একেবারেই গুটোতে হবে।"

"তা হ'লে আমায় আর তুমি দিচ্ছ না?"

"আহা-হা, বলছি কি ছাই! একটু সবুর কর না। এই নন্টটার বিয়ে দেবার যোগাড়ে আছি। এক যায়গায় লেগে গেলেই, যেখানে যার যত পাওনা সব দিচ্ছি একেবারে শোধ ক'রে।"

"ভাইপোটি ত কাণা; তার ওপর বোবা। ও ছেলের বুঝি আবার বিয়ে হবে! আর তাই এঁচে আছ যে, সেই টাকায় জমীদারী কিনবে?"

এই সময় নন্ট আসিয়া দাঁড়াইয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। তিনকড়ি মঞ্জরীকে কহিলেন—"ও বুঝি খেতে চাইছে, ওকে খেতে দাও গে।"

২

—মাণিক নম্বর দুই—

জ্যৈষ্ঠের কাঠ-ফাটা রোদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া একটি রিক্সাওয়ালা বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় বালীগঞ্জ এভেনিউ

দিয়া সোয়ারী লইয়া ছুটিতেছিল। হঠাৎ ডানদিকের একটা সঙ্কীর্ণ গলির মুখে রিক্সাখানা আসিয়া পৌছিতেই সোয়ারী বাবুটি বলিয়া উঠিলেন,—"রাখো—রাখো, দাঁড়া এইখানে।"

রিক্সা থামিল।

রিক্সাওয়ালা হাত দিয়া তার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। বাবুটি নামিয়া পড়িলেন ও অদূরের একটি বৃক্ষতল দেখাইয়া দিয়া রিক্সাওয়ালাকে কহিলেন,—"গলিকো অন্দর ত যানে নেই শেকো গে। হুঁইপর ঠায়রো,—আধা ঘণ্টাকা ভিতর হাম্ আ-যাগা। সমঝা?"

রিক্সাওয়ালা তাহার কোমরের ময়লা গামছাখানা খুলিয়া, মুখের কাছে নাড়িয়া বাতাস খাইতে খাইতে কহিল, "বহুৎ আচ্ছা, বাবুজী। যানা আনেকো ভাড়া, উসি আয়াস্তে হাম্ এত্তাদূর আয়া হ্যায়, হুজুর।"

অতঃপর বাবুটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আঁকা-বাঁকা গলিটার মধ্যে একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার ঈশানে, একবার নৈঋর্তে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে অপেক্ষাকৃত বড় যে রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন—সেটা লেক রোড। সেইটা ধরিয়া সামান্য একটু অগ্রসর হইয়াই দক্ষিণদিকে আর একটা রাস্তা ধরিয়া তিনি একটি ছোট একতলা বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িতে লাগিলেন।

ভিতর হইতে একটি তেরো চোদ্দ বছরের খোঁড়া মেয়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"ভোরে উঠেই কোথায় গিয়েছিলে, বাবা? সমস্ত দিন খাওয়া দাওয়া হয় নি?"

জামা-কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বাবুটি কহিলেন,—"না মা! তুই একটু চায়ের যোগাড় করতে পারিস্? তোর মা ঘুমুচ্ছে বুঝি?"

"হ্যাঁ বাবা, আমিই ক'রে দিচ্ছি; তুমি জিরোও।"

মেয়েটি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ভিতরে চলিয়া গেল।

বাবুটির নাম এককড়ি চক্রবর্ত্তী। এটি তাঁহার একমাত্র কন্যা—সাগর। জামাকাপড় ছাড়িয়া এককড়ি জানালার ধারে চৌকীর উপর বসিয়া চায়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রিক্সাওয়ালা যে এখনও পর্য্যন্ত হাঁ করিয়া গাছতলায় বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং আর খানিক পরে যে তাঁহার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করিতে করিতে ফিরিয়া যাইবে, সে কথাটাও একবার ভাবিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটু মুচকি হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, "বেটা আচ্ছা জব্দ হয়েছে! উঃ, এই রোদে সেই মাণিকতলা থেকে—"

মেয়েটি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া চায়ের কাপটি রাখিয়া বলিল,—"মাকে তুলে দেবো, বাবা?"

"থাক্, দরকার নেই।—কি হ্যা? কাকে খোঁজ?"

রাস্তা হইতে একটি লোক জানালার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া কহিল,—"দেখুন ত বাবু ঠিকানাটা। ঘণ্টা ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

খোলা চিঠি। তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া লইয়া এককড়ি কহিলেন,—"দর্জ্জিপাড়া থেকে আসছ? এস—এস। বড্ডই ঘুরতে হয়েছে বুঝি? আহা—এই রোদ্দুরে!" বলিয়া দরজার খিল খুলিয়া লোকটিকে ভিতরে ডাকিয়া লইলেন। মনে মনে বলিলেন,—"হাতে যখন এসে পড়েছে, ছাড়া উচিত নয়। এ ব্যাটা ত দেখছি আহাম্মুকের ধাড়ী!" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"বাবুরা ভাল আছেন? গিন্নীমা ভাল আছেন?"

"এই বাড়ী তা হ'লে? এটাই নিক্ রোড্?"

"তুমি বুঝি নতুন লোক! কেষ্টা, গদা, শিবে—ওরা কেউ নেই?"

"আমি এই ছমাস হ'ল এসেছি। দেশ থেকে বাবু আনিয়েছেন। আমার আগে ছিল ছিরু।"

"ও ছিরে বেটা ছিল ভারি দুষ্টু! যাক্—এর পর এলে আর কখনো ভুল হবে না। তুমি ত আর ছিরের মত বোকা নও। বেটা দুষ্টুও যেমন ছিল, বোকাও ছিল তেমনি।—হ্যাঁ বাবা, তোমার নামটি কি?"

"এজ্ঞে—নারাণ।"

"বাবা নারাণ, বোসো বাবা,—ওদের ডাকি।"

ওদের আর ডাকিতে হইল না। গোলমাল শুনিয়া নয়নতারা এ ঘরে আসিতেই এককড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার মামা পাঠিয়েছেন। দর্জ্জিপাড়ার মামা গো! ছিরে বেটার জবাব হয়ে গেছে, তার যায়গায় নারাণকে মামা দেশ থেকে আনিয়েছেন।"

"আইজ্ঞে বাবু, ছিরে ছিল মস্ত একটা চোর। মায়ের আলমারী থেকে সোণার নেকলেশ্ চুরি ক'রে নিয়ে—"

"বল কি নারাণ! মামীর আলমারী খুলে সোণার নেকলেস্! ওঃ! বেটার ধর্ম্মে সইবে! বাবা নারাণ, ভিতরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এস। ওঃ! মস্ত কাঁটালটা! চিঠিতে লিখে দিয়েছিলুম কি না? কাপড়খানা তুলে নাও গো। নারাণ, ধামাশুদ্ধ অমনি ভেতরে সব নিয়ে যাও বাবা। আমগুলো ত দেখছি বোম্বাই। পেতলের হাঁড়িতে বুঝি রসগোল্লা? মামার একবার কাণ্ড দেখ!"

নারাণ কোঁচার খুঁটে বাঁধা একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া কহিল,—"আইজ্ঞে, মা ঠাকরুণ লুকায়ে এই দশটা টাকা দিয়েছেন।"

"দেবেন, তা আমি জানি। তুমি যাও বাবা, মুখ হাত ধোও গে।"

নয়নতারা নারাণকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"আচ্ছা, এ কি কাণ্ড তোমার?"

এককড়ি কহিল,—"হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই, নয়ন!"

নয়নতারা বিরক্তস্বরে চাপাগলায় কহিল,—"আর কাল যদি সেই দর্জ্জিপাড়া থেকে পুলিস নিয়ে সব আসে?"

"তোমার 'নারাণে'র মত আহম্মকের চৌদ্দপুরুষও এ বাড়ী চিনে আর দ্বিতীয়বার আসতে পারবে না, এ তুমি ঠিক জেনো। নহলে ব্যাটা আজ এমন সর্ব্বনাশটা ক'রে ফেলে!"

নয়নতারা বিরক্তির সহিত অস্ফুটে কি সব বলিতে লাগিল। এককড়ি কহিল,—"আহা-হা, চুপ কর না। রিক্সাওয়ালা ব্যাটা ত আজ আর গালাগালের কিছু বাকী রাখে নি। দর্জ্জিপাড়ার মামামামীও একচোট নেবেন। তার ওপর তুমি আর গজ্‌গজ্ কোরো না। তোমার মামার চিঠিখানা একবার শোন" বলিয়া এককড়ি সেই ভাঁজ করা ক্ষুদ্র চিঠিটুকু পড়িতে লাগিলেন,—"মা বিন্দু, ঠাকুরের পুষ্প চাহিয়া পাঠাইয়াছিলে, কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিলাম। কাপড়খানি শান্তিপুর হইতে তোমার মেজমামীমা কিনিয়া আনিয়াছেন। দেশে গিয়াছিলাম। আম মোটেই নাই, ৫০টি বোম্বাই কিনিয়া পাঠাইলাম। কাঁটাল ও তালের গুড় দেশ থেকে আনিয়াছি। পিতলের হাঁড়িটি আর ফেরত দিতে হবে না। ঐটি তোমার বড় মামী তোমার জন্য কিনিয়াছেন। অ... অধিক কি লিখিব। তোমার ও ছেলেমেয়েদের কু... দিবে। এ বাটীর সব মঙ্গল। এই লোকটি নূতন। প... ঘাট ভাল চিনে না। কেষ্ট কি মতিকে দিয়া শ্যামবাজারের বাসে উঠাইয়া দিও। আগামী সপ্তাহে আমি তোমার ওখানে যাইব।

ইতি—"

"—ওগো, আসচে হপ্তায় মামা আবার আসছেন!"

নয়নতারা অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত কহিল,—"এ সব তোমার ভালও লাগে? আজ যে মাণিকতলায় গেলে, সে খবরটার কি হ'ল? সাগর যে পনরয় পড়লো। তাতে মেয়ে আমার খোঁড়া। আমার যে গলা দিয়ে ভাত নামছে না।"

"ভাত এবার—এস বাবা নারাণ। ওগো নারাণকে জলটল একটু খাইয়ে দাও। যাও বাবা, একটু জল খেয়ে নাও। তার পর চল, তোমায় আমি বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

নয়নতারা নারাণকে লইয়া পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিল।

৩

'—মিলন হ'ল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে।'

মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটের পূর্ব্বাংশে এক দিন প্রাতঃকালে তিনকড়ি ভাদুড়ী একখানি রিক্সা হইতে নামিয়া, গাড়োয়ানকে ভাড়া দিতে গিয়া কহিলেন,—"আমাকে আবার বাড়ী নিয়ে যেতে পারবি? আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার কায হয়ে যাবে।"

রিক্সাওয়ালা কহিল,—"নেহি বাবু। ভাড়া হামকো দে দিজিয়ে। হাম্ ঐ মোড়পড় রহেগা, দরকার হোয় ত হুঁয়ি যানেসে হামকো মিলেগা। ওরোজ এক বাবুকো মাণিকতলাসে লিক রোডমে—নেহি বাবু, এ ক্ষেপকা ভাড়া হামকো দে দিজিয়ে, হাম মোড় পরই আবি ঠারেগা, দরকার হোয় ত হুঁয়াপরই হামকো মিলেগা।"

ভাড়া লইয়া রিক্সাওয়ালা চলিয়া গেল। তিনকড়ি সম্মুখের একটি গলির মুখে দাঁড়াইয়া এক জন পথিককে

'চল চল যুগলে যুগলে যাই'—অমৃতলাল।

বসুমতী চিত্র-বিভাগ]   [শিল্পী—চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা করিল—"এইটিই ত হলধর সেন লেন ?" লোকটি বলিল,—"হ্যাঁ।" অতঃপর তিনকড়ি দুই পার্শ্বের বাটী দেখিতে দেখিতে গলিটির ভিতর প্রবেশ করিল।

কিছু পরেই আর একটি ছড়ি হাতে বাবু আসিয়া সেই গলির মুখে দাঁড়াইয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভৃত্য সঙ্গে বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মশাই, হলধর সেন লেন এইটে ত ?"

"কার বাড়ী চান ?"

"আসামের একটি জমীদার নতুন এসে রয়েছেন।"

"ওঃ, হালে বাপ মারা গিয়ে জমীদারী হাতে পেয়ে খুব কাপ্তেনী করছেন ? সেই তিনি ত ? তিনি এই গলির ভিতরেই একটা বাড়ীতে ছিলেন বটে, সম্প্রতি বৌবাজারের দিকে উঠে গেছেন মশাই, কোথা থেকে আসছেন ?"

"আমার বাড়ী কালীঘাট, সেখান থেকেই আসছি।"

"আপনাদের কালীঘাটটি ভয়ানক যায়গা, মশাই। লেক রোডে আমার একটি ভাগনী-জামাই থাকে। সে দিন একটা লোক দিয়ে সামান্য কিছু জিনিষ সেখানে পাঠিয়েছিলুম। লোকটা ছিল একটু আনাড়ী, দেশ থেকে নূতন এসেছে, তা——"

"তার কাছ থেকে ফাঁকী দিয়ে বুঝি আর কেউ সেগুলি গাপ করেছে ?"

"ঠিকই তাই। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। তাকে না পাঠিয়ে আমাদের এই চাকরটিকে যদি পাঠান হ'ত—। এটি আমার খুব চালাক চোস্ত, কিন্তু বিকেলের দিকে ও আবার থাকে না বাড়ী। অবাক জলপান, নকলদানা বিক্রীর আবার ওর ব্যবসা আছে, তাই বেলা দুটোর পরই ও চ'লে যায়, কিন্তু কি ভয়ানক লোক সব বলুন !"

"বলবেন না। ছোটলোক জোচ্চরকে পার আছে, ত ভদ্র জোচ্চরকে পার নেই। বেটাদের মাথায় বাজ পড়ে না, এই আশ্চর্য্য।"

নিশিকান্ত চাকরটি কহিল,—"ছাই পড়বে বাবু। ভদ্দর লোকই ত বেশী ঠকায়। সে দিন বাগবাজারের দিব্বি এক ভদ্দর বাবু দু' পয়সার অবাক জলপান নিলে, আজ প্রায় এক মাস হ'তে চললো, পয়সা দু'টো আর আদায় করতে পারলুম না। দু'টো পয়সা বাবু দু'টো পয়সা। তাই ফাঁকি দিলে।"

"মহাশয় লোক আর কি ! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেন নি। দু'পয়সা—দু'পয়সাই সই।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ভৃত্যকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

বাবুটি পার্শ্বের একটি পাণের দোকানের বেঞ্চে বসিয়া পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধূমপানের ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন।

সেই সময় গলির ভিতর হইতে তিনকড়ি বাহির হইয়া বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলতে পারেন, আসামের জমীদার এখানে ছিলেন—কোথায় উঠে গেছেন ?"

বাবুটি কহিলেন,—"এইখানেই ছিলেন বটে, দিনকতক হ'ল আসামের দশখানা চা-বাগিচা কিনে, সেই সব দেখবার শোনবার জন্যে, আসামে চ'লে গেছেন, কলকাতায় আর আসবেন না। তাঁর আসামের ঠিকানা হচ্ছে—"চিচিংকুজান টি কন্‌সার্ন, সিয়াংমারি পোঃ আঃ, আপার আসাম। মশায়ের নাম ?"

"তিনকড়ি ভাদুড়ী।"

"বিষয়কর্ম্ম কি করা হয় ?"

"মেদিনীপুরের দিকে সামান্য একটু জমীদারী আছে। এই হাজার বিশ পচিশ টাকা মোটে—"

"মেদিনীপুরে ? আমারও যে একরত্তি যা হোক কিছু আছে। তবে আমার মহালটা ঠিক মেদিনীপুরে নয়—ওটা হ'ল আপনার গিয়ে বালেশ্বর জেলার ভেতর।"

পাণওয়ালার বেঞ্চির উপর বসিয়া উভয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া আলাপ-পরিচয় কথাবার্ত্তা হইল। তিনকড়ি কহিলেন,—"ভাইপোটি আমার হীরের টুক্‌রো। লেখাপড়া শেখালে আজ হয় ত এক জন পি, আর, এস্ হ'ত। কিন্তু ইচ্ছে করেই আর পড়ালুম না। ভাইটি হঠাৎ ম'রে গেল। জমীদারীটা দেখবার শোনবার জন্যে একটা ম্যানেজার রাখতে গেলেও ত একশ'টা ক'রে টাকা লাগতো, ওইতেই তাই লাগিয়ে দিয়েছি। এই ক'দিন হ'ল বিয়ের জন্যেই আনিয়েছি। সামনে আবার আষাঢ় কিস্তির আদায়ের সময়। বেশী দিন আর রাখতেও পারব না।"

"জ্বর ফোড়াটা তা হ'লে এখনও সারে নি আপনার ভাইপোর ?"

"ফোড়া সেরে এসেছে, তবে ডাক্তাররা পনের দিন ব্যাণ্ডেজ খুলতে বারণ করেছে। কেন না, হঠাৎ যদি আঘাত-টাঘাত লাগে, তা হ'লে আবার—একেবারে চোখের ওপরেই, যায়গাটা খুব খারাপ কি না! আজ তিন দিন হ'ল,—আর দিন বার পরেই ব্যাণ্ডেজ খুলে দেবো। তা হ'লে কালই সকালে ঠিক যাবেন ত? আপনি ছেলে দেখে গেলে, কাল বিকেলেই আমি মেয়ে দেখে আসতে পারি। কারণ, দিন বড় সংক্ষেপ। দিন ১০।১২র বেশী ওকে এখানে আর আমি আটকে রাখতে পারব না। তা হ'লে ওদিকে আবার—বুঝেছেন ত?"

"সে ত কথাই। ছেলে যদি আমার পছন্দ হয়, আর আপনার যদি মেয়ে পছন্দ হয়, তা' হলে এই হপ্তার ভেতরেই চার হাত এক ক'রে দেওয়া যাবে। আমিও এই জন্যেই ব'সে আছি। আমিও জমীদারীটা একটু ঘুরে আসবো মনে করছি। শুভকাযটা হয় যদি, আমিও তা হ'লে বাবাজীর ওপর দেখবার শোনবার ভার দিয়ে, কাশীর দিকে একটু লম্বা পাড়ি দেবো।"

"ছেলে আপনার পছন্দ হবেই।"

"মেয়েও আপনার অপছন্দ হবে না। মা লক্ষ্মী আমার অন্য পাঁচটা মেয়ের মত নয়। যেমন লজ্জা, তেমনই বিনয়, তেমনই ঠাণ্ডা। যেখানে বসিয়ে রাখবেন, সেইখানেই ব'সে থাকবে। মা আমার চ'লে গেলে, বসুন্ধরাও জানতে পারেন না।"

পাণওয়ালার দোকানের আয়নার উপর হইতে একটা টিকটিকি টিক টিক্ শব্দ করিয়া উঠিল।

৪

—দেখা-দেখি—

"ছেলে তা হ'লে আপনার পছন্দ হয়েছে?"

"হয়েছে। তা হ'লে ওবেলা গিয়ে আপনি মেয়ে দেখে আসুন।"

"হাঁ, বারবেলাটা অতিক্রম ক'রে যাব। এই ৭টা নাগাদ গিয়ে পৌঁছাব আর কি। আজ যে সোমবার, সেটা আমার কাল খেয়ালই ছিল না। নইলে আজ আর আপনাকে আসতে না ব'লে কাল মঙ্গলবারেই আসতে বলতুম। কি যে সব আজকালকার ছেলেদের হয়েছে, মশাই। মহাত্মা গান্ধীর বড্ড ভক্ত কি না! তাঁর দেখাদেখি ঐ সোমবার হলেই কথা বন্ধ ক'রে থাকবে। ক্ষিদে পেলে বলবে না—দাও, ঘুম পেলে বলবে না—শোব।"

"ভাল—ভাল। সপ্তাহে একটা দিন বাক্-সংযম—এও একটা যোগ ত।"

"আর শুধুই কি সোমবার? এর আবার ফাউ নেই মনে করেছেন বুঝি? আজ বোম্বাইয়ে মারপিট—অমনি সে দিন কথা বন্ধ! আজ অমুক নেতার জেল—কথা বন্ধ। আজ—এই স্বদেশী হয়ে অবধি এই রোগটা যা ওর ঢুকেছে, নইলে নন্টু আমার—; হাতের বাঙ্গালা ইংরিজী লেখা দেখলেন ত, যেন মুক্তোর অক্ষর! তবু একটা চোখ ব্যাণ্ডেজে বাঁধা, সেটাও ত একটা মস্ত অসুবিধে। আর ঐ যে বাপ পিতামহ প্রপিতামহ সাত পুরুষের নাম লিখতে বললেন, আর তরতর ক'রে লিখে দিলে, আজকালকার ছেলে হ'লে পারত না মশাই। তারা পাশই করে, বাপের উর্দ্ধে কারুর নাম জিজ্ঞাসা করুন, তা' হলেই বিপদ! বড় জোর ঠাকুরদাদার নামটা পর্য্যন্ত কেউ কেউ জানে। তার পর জিজ্ঞাসা করলেই হাঁ ক'রে থাকতে হবে! রোদ্দুর বেড়ে উঠছে, আর আপনাকে দেরী করাব না। ছেলে তা হ'লে আপনার——"

"আজ্ঞে খুব পছন্দ হয়েছে। নমস্কার। সন্ধ্যা সাতটার সময় তা হ'লে"—

"ঠিকই যাচ্ছি। নমস্কার—নমস্কার।"

সন্ধ্যা সাতটার পূর্ব্বেই তিনকড়ি মেয়ের বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইল। এ পক্ষ হইতে তাঁহাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করা হইল। মেয়ের বাপ কহিলেন,—"যেমন ছেলে, তেমনই মেয়ে। সাত চড়ে মুখে রা-টি নেই। আজকালকার মেয়েদের মত দৌড়-ঝাঁপ করতে জানে না। ওই যে বলছি, যেখানে বসিয়ে রাখবেন, ঠিক সেইখানেই ব'সে থাকবে। আর লজ্জাসরমই বা কত! এই আপনি দেখতে এসেছেন, শুনেই ভাঁড়ার ঘরের কোণ নিয়েছে।"

ঝি আসিয়া কহিল,—"দিদিমণি কিছুতেই আসতে চায় না, আপনি বাবা চলুন একবার।"

পিতা উঠিয়া গেলেন ও মিনিট চারি পাঁচ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"যা বলেছি। এমন লাজুক মেয়ে ত

আর দুনিয়ায় নেই। কিছুতেই আসবে না। দরজা আকড়ে যে দাঁড়িয়েছে, কার সাধ্যি টেনে আনে। হাত-পায়ের জোরকে বলিহারি যাই মশাই, কিছুতেই টানাটানি ক'রে আনতে পারলুম না। রাগ ক'রে আমার স্ত্রী দিয়েছে পিঠে গোটাকতক চড় বসিয়ে।"

"আহা-হা! বারণ করুন—বারণ করুন। চলুন, আমি গিয়েই দেখে আসি। খুবই লাজুক বটে। ভাল—ভাল।"

অগত্যা ভাঁড়ারঘরে যেখানে মেয়েটি দরজার কাছে পা গুটাইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল, তিনকড়িকে সেই-খানে আনা হইল। তিনকড়ি কন্যা দেখিয়া খুবই পছন্দ করিলেন। সেইখানে উবু হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তোমার নাম কি মা?"

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে তাহার নাম বলিল।

"লিখতে পড়তে জান?"

"জানি।"

"ছুঁচের কায-টায?"

"ভাল জানি না।"

"রান্না?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ জানে।

উভয় পক্ষেরই পছন্দ হইয়া গেল। কিন্তু শুভকর্ম্ম যথা-সম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করিতে হইবে, উভয়পক্ষেরই এই ইচ্ছা, লেন-দেন সম্বন্ধেও কোন গোলযোগ হইল না। দুই বেয়াই-ই একমত হইলেন যে, গহনাপত্র, লোকজন খাওয়ান প্রভৃতি সম্বন্ধে এ বাজারে কোনরূপ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই, এবং ছেলেকে নগদ দু'শো টাকা দিলেই হইবে। তবে পৌষ কিস্তিতে কন্যার পিতা কন্যাকে গা সাজাইয়া গহনা দিবেন এবং তিনকড়িও ঐ সময়ে বধূকে যাহা দিবার তাহা দিবেন।

পরদিন বাগবাজার হইতে পুরোহিতের দ্বারা পাঞ্জী দেখাইয়া তিনকড়ি বেহাইকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, পরের সোমবার ২৮শে তারিখে বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

৫

—হিসাবের মিল—

আটাশে জ্যৈষ্ঠ সোমবার শুভ বিবাহ।

লগ্ন ছিল রাত আটটা ১৭ মিনিটে। বর আসিতেই সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। সুতরাং একটুখানি আসরের মধ্যে বরাসনে বসিয়াই বরকে ভিতরে বিবাহস্থলে যাইতে হইল। তাহার চোখে তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কে এক জন বরকে তাহার চোখের অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিল। কন্যার পিতা কাছেই ছিলেন; কহিলেন,—"বাবাজীর আজ সোমবার, কথা কইবেন না ত।"

"মন্ত্র-টন্ত্রগুলো?"

"সে সব মনে মনে ব'লে যাবেন।"

বরযাত্রীর সংখ্যা দুই চারি জন মাত্র। কন্যাযাত্রীরাও তদ্রূপ। উভয় দলের মধ্যে নানারূপ আলাপ আলোচনা চলিতে লাগিল। যথা,—এবার আমের আমদানীটা খুব হইয়াছে। কাপড়ের দামও খুব সস্তা। মোহিনী, বঙ্গলক্ষ্মীর উৎকৃষ্ট ধুতি দু'টাকা দু'আনা। পাড়াগাঁয়ের দিকে চাল সাতসিকে। আবার সায়েস্তাখাঁর আমলের বাজার এসে পড়লো। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভিতর হইতে অনবরত হুলুধ্বনি ও শাঁখের শব্দ হইতে লাগিল। তিনকড়ি বরপণের দুইশত টাকার নোট দু'খানি কোটের ভিতরের বুকপকেটে রাখিয়া দিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হইতে টিপিয়া দেখিতেছেন, ঠিক আছে কি না। বিবাহ হইয়া গেলেই, তিনি সামান্য কিছু জলটল খাইয়া বাগবাজারে চলিয়া যাইবেন, কাল প্রত্যূষে আবার আসিবেন।

কন্যাকর্ত্তা ভিতর হইতে আসিয়া কহিলেন,—"বিয়ে হয়ে গেছে, বরকনে বাসরে গেল। এইবার আপনাদের যোগাড়টা ক'রে দি। গরম গরম ভেজে ভেজে দেবে—আর আপনারা খাবেন, তাই একটু দেরী—তা আর বেশী দেরী হবে না,—মিনিট পনর বিশ।" বলিয়া তিনি দ্রুতগতি আবার অন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সময় কাটাইবার জন্য কে এক জন আসরে গান করিতেছিল। অনবরত গাহিয়া গাহিয়া এক্ষণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে ও হার্ম্মোনিয়মটাকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। একদল বোধ হয় তাসও খেলিতেছিল, এক প্যাকেট তাসও অনাদরে একধারে পড়িয়া রহিয়াছিল।

কন্যাকর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিলেন,—"আর মিনিট পনর। কি করবেন—বড্ড কষ্টটা হ'ল সব। আচ্ছা, আসুন, ততক্ষণ আপনাদের দু'একটা ম্যাজিক দেখাই।" বলিয়া তাসের প্যাকেট হাতে করিয়া তুলিয়া লইলেন এবং মুক্ত দরজার ফাঁকে ভিতরের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে

কহিলেন,—"শীগ্‌গীর—শীগ্‌গীর, হাত চালিয়ে নাও সব।—আচ্ছা, এই দেখুন রুইতনের গোলাম; খালি একখানি, আর নেই। রুইতনের গোলামই ঠিক ত? কি দেখছেন এইবার? রুইতনের গোলাম নয়? তবে? চিড়িতনের টেক্কা? হাঃ হাঃ হাঃ!"

সকলেই আগ্রহের সহিত ম্যাজিক দেখিতে লাগিল।

"আচ্ছা, এর ভেতর থেকে একখানা মনে করুন। কে? আপনি? করেছেন? আচ্ছা, আমায় বলবেন না যেন। একটা ফুঁ দিন।" ফটাস্—ফটাস্!—"এইবার ওপরের তাসখানা তুলে দেখুন ত। ঐ খানাই? হাঃ—হাঃ—হাঃ!"

মিনিটখানেক সকলে চুপচাপ করিয়া রহিলেন।

—"এই আমার হাতে একটা টাকা, কেমন? ভাল ক'রে দেখুন, একটা ছাড়া দু'টো নেই। আচ্ছা, এই মুঠো করলুম। একটা জোরে ফুঁ দিন ত। হাত পাতুন। কটা? দু'টো?"

বাসর-ঘরের দিক থেকে যেন কিসের অল্প একটু অস্ফুট কলরব শুনিতে পাওয়া গেল।

"আচ্ছা, কারুর কাছে নোট আছে? হাঁ, ভাল কথা—বেয়াইয়ের কাছেই ত আছে। নোট দু'খানা দিন ত একবার বেয়াই। -এই দু'খানা নোট আমার হাতে। কেমন? তিনখানা নয়, চারখানা নয়, ঠিকই দু'খানা, ভাল ক'রে সব দেখুন। দু'খানা একশ' টাকার নোট্। আচ্ছা, এই ভাঁজ করলুম—এই মুঠো করলুম—এই-–" বলিয়া সহসা কন্যাকর্ত্তা ত্রস্তে উঠিয়া নোট দুখানি মুঠা করিয়া লইয়াই ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেই সময় বাসরঘরের সেই কলরব একটু উচ্চতর পর্দ্দায় উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নন্টু ক্রোধে গোঁ গোঁ করিতে করিতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া গিয়া কাণা চোখ বাহির হইয়া পড়িয়াছে; মাথার চুল উস্ক-খুস্ক, চোখে মুখে বিষম একটা বিরক্তির ভাব।

ব্যাপার দেখিয়া সকলে হতভম্ব হইয়া গেল। তিনকড়ি অবাক্।

* * * *

রাত প্রায় দুইটা। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। বৈঠকখানাঘরে আর কেহই নাই। দুই বেয়াই মুখোমুখী হইয়া বসিয়া আছেন।

"বেয়াই!"

"বেয়াই!"

"এইটে কি ভাল হ'ল? খোঁড়া মেয়ে আপনার এমন ক'রে ঠকিয়ে—"

"আপনারও কি এটা ভাল হ'ল? কাণা-বোবা ভাইপো—এমন ক'রে জলজ্যান্ত ঠকিয়ে- -তা, আমাদের দু'জনের পক্ষে হয়েছে ঠিকই। অর্থাৎ দু'জনেরই ছেলেমেয়ের গলদটার দিকেই আমাদের দু'জনের দৃষ্টিটা ছিল। অপরপক্ষে যে গলদ থাকতে পারে, নিজের দিকের গলদের জন্যে সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহের অবসর কারোর হয় নি; নিজের ময়লা চাপা দিতেই দু'জনে ব্যস্ত ছিলুম। নইলে এমনটা কখন হ'তে পারে?—তা যাক্, হিসেবে দু'জনের ঠিকই মিলে গেছে,—কাণা-বোবা আর ল্যাংড়া।"

"আমার টাকা দু'শ'?"

"তাও হিসেবে ঠিক্ মিল বেয়াই! আপনার নামে জমায় উঠ্‌লো, আবার আমার নামে খরচ পড়ল। হিসেব একেবারে ঠিক-ঠিক! তবে আসলে, আপনাতে আমাতে দু'কড়ার তফাৎ!" বলিয়া এককড়ি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—"যা হবার তা ত হয়ে গেল, এখন এস দাদা, 'ভাদুড়ী-চক্রবর্ত্তী কোম্পানী' য়্যামাল্‌গ্যামেটেড্ ক'রে নিয়ে ব্যবসাটা আমাদের একবার ভাল ক'রে চালাবার চেষ্টা করা যাক্।"

তিনকড়ি এককড়ির মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

মুসলমানের মনোবৃত্তি

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এক শ্রেণীর মুসলমান, রাজনীতিক্ষেত্রে সম্প্রদায়বিশেষের প্ররোচনায়ই হউক, অথবা নিজেদের খেয়ালবশেই হউক, ক্রমাগত অসঙ্গত আব্দার করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ আব্দার করিতে করিতে তাঁহারা কোন বিষয়ের সঙ্গতি অসঙ্গতি আর দেখিতে পারেন না। হিন্দুর ক্ষতি হইলে বা হিন্দু জব্দ হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। বিশ্বের দরবারে হিন্দু তাঁহাদের ক্ষতি করিতেছে, হিন্দু তাঁহাদের ধর্ম্মহানি করিতেছে, ক্রমাগত এইরূপ চীৎকার বা ক্রন্দন করিয়া আসিতেছেন—যাহাতে হিন্দু, সাধারণের দৃষ্টিতে হীন প্রতিপন্ন হন। সম্পূর্ণ ও বিশদভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই। যেটুকু আছে, তদনুরূপ করিতে যাইলেও প্রবন্ধের কলেবর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে, সে জন্য আজ গোটা কয়েক বিষয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

মুসলমানগণের ওয়াকফ বা ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি-সমূহ যাহাতে ভালভাবে শাসিত ও সংরক্ষিত হয় ও তাহার আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহাতে যথাযথ রক্ষিত হয় এবং সাধারণে দেখিতে পায়, তজ্জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৪২ নং মুসলমান ওয়াকফ এক্ট পাশ করেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কোন নূতন আইন-কানুন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে গভর্ণর জেনারল বাহাদুরের সম্মতি দরকার। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর উক্ত মুসলমান ওয়াকফ এক্ট সম্বন্ধে সম্মতি দেন এবং উহা ঐ তারিখ হইতে কার্য্যকর হয়। উক্ত আইনে এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, যে কোন প্রাদেশিক সরকার উক্ত আইনের মর্ম্মানুযায়ী ও যাহাতে উহার উদ্দেশ্য সফল হয়, তজ্জন্য উপবিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং উক্ত আইনের বিধান-সমূহ বলবৎ করিতে পারিবেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, বাঙ্গালা সরকার কিরূপে তাঁহাদের কর্ত্তব্যসাধন করিতেছেন। দিল্লী হইতে লেপাফাদুরস্তভাবে হুকুম আসিতে কিছু বিলম্ব হয়! সরকারের সব কাযেই ১৮ মাসে বৎসর। প্রথমেই কথা উঠে, বাঙ্গালা সরকারের সংরক্ষিত বিভাগ (Reserved half) বা হস্তান্তরিত বিভাগ (Transfered half) এই কার্য্য করিবেন। তাহার পরে হস্তান্তরিত বিভাগই যদি এই কার্য্যভার পাইলেন, কোন্ মন্ত্রীর হাতে এই কার্য্যভার ন্যস্ত হইবে? সিদ্ধান্ত হয় যে, বাঙ্গালা শিক্ষা-বিভাগের হাতে এই উপবিধি-সমূহ প্রণয়নের ভার অর্পিত হইবে। প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট হইতে উক্ত আইন অনুযায়ী উপবিধি-সমূহ প্রবর্ত্তনের তারিখ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে পর্য্যন্ত কে কে বা কাহারা শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন।

৫ই আগষ্ট ১৯২৩ হইতে ৩রা জানুয়ারী ১৯২৪	সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র
৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৪ হইতে ২৭শে আগষ্ট ১৯২৪	এ. কে ফজল্ উল্ হক্
২৮শে আগষ্ট ১৯২৪ হইতে ১৩ই মার্চ্চ ১৯২৫	কোন মন্ত্রী ছিল না *
১৪ই মার্চ্চ ১৯২৫ হইতে ২৫শে মার্চ্চ ১৯২৫	নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী
২৬শে মার্চ্চ ১৯২৫ হইতে ২১শে জানুয়ারী ১৯২৭	কোন মন্ত্রী ছিল না *
২২শে জানুয়ারী ১৯২৭ হইতে ২৫শে জানুয়ারী ১৯২৭	সার আবদার রহিম
২৬শে জানুয়ারী ১৯২৭ হইতে ২৮শে আগষ্ট ১৯২৭	ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

যে সময়ে কোন মন্ত্রী ছিল না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সময় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ প্রথমে বাঙ্গালার লাট-বাহাদুর কর্ত্তৃক ও পরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন হইতে ডায়ার্কী রদ ও রহিত হইলে সংরক্ষিত বিভাগ গণ্যে গভর্ণর বাহাদুরের শাসন-পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী শিক্ষা-বিভাগের ভার পাইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভায় বজেট আলোচনা শেষ হইবামাত্র এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন ও মাসখানেকের মধ্যেই উপ-বিধিসমূহ প্রণয়ন ও প্রচলিত করেন। তদ্ব্যতীত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে শিক্ষা-বিভাগ—কেবলমাত্র অল্পসময়ের জন্য সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের হস্তে থাকা ব্যতীত—সর্ব্বসময়ে মুসলমান মন্ত্রী বা মুসলমানরা যাঁহাদিগকে হিন্দুর অপেক্ষাও আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতৈষী বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই ইংরাজ সরকারের হাতে ছিল। কেন তাঁহারা নিজে বা ইংরাজ সরকারকে দিয়া মুসলমান সমাজের কল্যাণকর বিধি-সমূহের শীঘ্র শীঘ্র প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন নাই? তাঁহাদের বড় বড় বক্তা, বড় বড় সম্পাদক, ব্যবস্থাপক সভার মালসীপদপ্রাপ্ত 'হিস্যাদাররা' নীরব ছিলেন কেন? না, ইহাতে হিন্দুর তাদৃশ ক্ষতি হইবে না বা হিন্দু জব্দ হইবে না বলিয়া নীরব ছিলেন! সার প্রভাসচন্দ্রের না করিবার কারণ, দিল্লী হইতে হুকুম আসিবার দেরী ও কাহার হাতে ভার দেওয়া যাইবে, তৎসম্বন্ধে লেখালিখি ও আলোচনা। বিশেষ করিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সার সুরেন্দ্রনাথের ভোটে পরাজয়, প্রভাস বাবু প্রভৃতির মন্ত্রিত্বের অবসানের কারণ। এমত অবস্থায় নূতন জিনিষে হাত না দেওয়া স্বাভাবিক, এবং মুসলমানরা যদি বলেন, প্রভাস বাবু গাফিলতি করিয়াছেন ও তাঁহারই দোষ বেশী, আমরাও তাহাতে সম্মত হইতে রাজী আছি।

সমগ্র বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানেই দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের

জমীজমা হস্তান্তরের অযোগ্য বলিয়া চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ জমীদারেরা হস্তান্তর হইলে নূতন প্রজার নাম-পত্তন করিবার পূর্ব্বে চৌথ অর্থাৎ বিক্রীত সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ২৫৲ টাকা লইয়া হস্তান্তর স্বীকার করিয়া লইতেন। কিন্তু এই স্বীকার তাঁহাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ; ইচ্ছা করিলে হস্তান্তর অস্বীকার করিয়া নূতন প্রজাকে তাহার ক্রীত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনকালে প্রস্তাব হয় যে, সর্ব্বপ্রকার জমীজমা হস্তান্তরের যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে; কিন্তু দখলী স্বত্ববিশিষ্ট জমীজমা হস্তান্তরিত হইলে জমীদারেরা সাধারণতঃ শতকরা ২০৲ কুড়ি টাকা করিয়া পাইবেন।

কিন্তু নিকট-আত্মীয়ের নামে দান বা উইল করিলে, বা সম্পূর্ণ দেবোত্তর করিলে, বা নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য ওয়াকফ করিলে জমীদারেরা এই ২০৲ কুড়ি টাকা পাইবেন না। মুসলমান সদস্যরা প্রস্তাব করেন যে, ওয়াকফ মাত্রেই—তাহা বেনামী বা নাম মাত্র ওয়াকফই হউক আর প্রকৃত ওয়াকফই হউক—জমীদারকে দেয় ২০৲ টাকার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। বাঙ্গালার জমীদারদিগের মধ্যে শতকরা ৮০।৯০ জন হিন্দু এবং প্রজাদিগের মধ্যে মুসলমান শতকরা ৫৫ জন কি আরও বেশী। সুতরাং ওয়াকফ করিবার ছলে যদি মুসলমানরা হিন্দু জমীদারকে ফাঁকি দিতে পারেন, তাহার তুল্য পুণ্যকার্য্য মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে আর কি হইতে পারে? বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, পূর্ব্বে মুসলমান প্রজার এই অধিকার ছিল না এবং সাধারণতঃ তাহাকে শতকরা ২৫৲ টাকা দিতে হইত, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, হিন্দুকে জব্দ করিবার এরূপ সুযোগ কি ছাড়া যায়? ইংরাজ সরকার চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হউক বা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রস্তাবের একান্ত অসঙ্গতি দেখিয়াই হউক, ইহাতে রাজী হয়েন নাই। এই প্রস্তাব না-কচ হইবার পর মিঃ ফজলুল হক্ প্রমুখ নেতারা মুসলমানের ধর্ম্ম বিপন্ন, এই ধুয়া তুলেন ও আন্দোলন চালান। কিন্তু এই ফজলুল্ হকই নিজের মন্ত্রিত্বকালে মুসলমানের ওয়াকফ সম্বন্ধে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা পাইয়াও কিছুই করেন নাই—কেবল স্বরাজ্য দলকে হারাইয়া কিসে নিজের মাহিয়ানা পান, সেই বিষয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

মুসলমান শিক্ষা-মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সমস্ত হিন্দু সদস্যের একবাক্যে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া একরূপ সরকারী ও মুসলমানের ভোটের জোরে বঙ্গীয় গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষাবিধান পাশ করাইয়া লয়েন। হিন্দুরা ২।১ বৎসরের জন্য আইন স্থগিত রাখিতে বলিলেও তাহাও অগ্রাহ্য হয়। মুসলমান নেতারা এই নূতন বিধানের হিতকারিতায় একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। একটু তলাইয়া দেখিলে ইহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারা যাইবে। হিন্দুরা যদি বেশীর ভাগ টাকা দেন এবং উহার ফলভোগ যদি মুসলমানেরা বেশী করিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপর কোন কারণ থাকুক বা নাই থাকুক, সেই বিধান হিতকর। নূতন আইনে ধার্য্য শিক্ষা-সেস্ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, জমীদার শতকরা ৩০৲ টাকা দিবেন, আর প্রজা শতকরা ৭০৲ টাকা দিবেন। জমীদারদিগের মধ্যে—সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতে—অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৮০ জন হিন্দু। এমতে জমীদারদিগের দেয় ৩০৲ টাকার মধ্যে হিন্দুর দেওয়া টাকা হইতেছে ২৪৲। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৫৫ জন, জমীদার ও অপর অপর শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী থাকায় আমরা ধরিয়া লইলাম প্রজার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৬০ জন, এমতে মুসলমান প্রজার দেওয়া টাকা হইতেছে ৪২৲ আর বক্রী হিন্দু প্রজার দেওয়া টাকা হইতেছে ২৮৲ টাকা। একুনে হিন্দু জমীদার ও প্রজার দেওয়া টাকা হইতেছে ২৪+২৮=৫২৲ টাকা; আর মোট মুসলমানের দেওয়া টাকা হইতেছে ৪৮৲ টাকা।

কিন্তু এই টাকার ফল উপভোগ করিবে কে বেশী করিয়া? উক্ত আইনে ৬ বৎসর হইতে ১১ বৎসরবয়স্ক শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু আদম সুমারীর অঙ্কতালিকায় কেবল ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের শিশুদের হিসাব আছে। সমগ্র বঙ্গদেশে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর সব খবর এখনও বাহির হয় নাই বলিয়া দেওয়া গেল না) ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স বলিয়া যাহাদের বাপ-মা বয়স লিখাইয়াছে, এরূপ মুসলমান শিশুদের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ১ শত ৬৩। বক্রী সর্ব্বজাতির। ধরিয়া লওয়া গেল, হিন্দুর শিশুসংখ্যা ৩১ লক্ষ ১০ হাজার ৫৫। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কদের সমান, তাহা হইলে উপরি-লিখিত অঙ্ক হইতে হিন্দু ও মুসলমান শিশুদের অনুপাত পাওয়া যাইবে। ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যার সমান না হইলেও, ৬—১১ হিন্দু : ৬—১১ মুসলমান এই অনুপাত ৫—১০ হিন্দু : ৫—১০ মুসলমান এই অনুপাত হইতে বেশী বিভিন্ন হইবে না। এই হিসাবে লাভের বেলায় হিন্দুর অংশ হইতেছে শতকরা ৪১ মাত্র।

আরও একটু সূক্ষ্মভাবে হিসাব করা যাউক। গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত শ্বেতাঙ্গের Actuary মিঃ এইচ, জি, ডব্লিউ মিকলি লিখিয়াছেন—

The rates of mis-statement are greater among Muhammadans than amongst Hindus" অর্থাৎ মুসলমানের মধ্যে বয়স ভুল বলা হিন্দুর অপেক্ষা বেশী. আর এইটা যে ইচ্ছাকৃত, সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, "any disturbance of the normal age distribution by famines, plagues, malaria &c. is of trifling significance compared with the large and systematic mis-statement of age" এবং অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, "deliberate mis-statment of age, can not be corrected by the application of methods of graduation suitable only to cases where positive and negative deviations are equally likely," কোন মুসলমান সম্পাদক হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা কবিবার সময় এই কথা কয়টি ভুলিয়া যান বা এ সম্বন্ধে একবারে নীরব থাকেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় আদম সুমারীর রিপোর্টে ভাড়ান বয়স বিশুদ্ধ গণিতের হিসাবে শুদ্ধ করিয়া প্রকৃত বয়স কি

দাঁড়ায়, তাহার একটি তালিকা দেওয়া আছে। উক্ত তালিকা উক্ত রিপোর্টের ২৩৫ পৃষ্ঠায় আছে। ঐ তালিকা হইতে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি উদ্ধৃত করা হইল।—

প্রত্যেক ১ লক্ষ লোকের সংশোধিত বাৎসরিক হিসাবে প্রকৃত বয়স :—

বয়স	হিন্দু-পুরুষ	হিন্দু-স্ত্রী	মুসলমান-পুরুষ	মুসলমান-স্ত্রী
৬	২,৩৪০	২,৩৯৬	২,৮৪৬	২,৮০৭
৭	২,৩০৫	২,৩৫৯	২,৮৯৭	২,৮৬১
৮	২,৩০৫	২,৩৫৯	২,৮৯৭	২,৮৬৩
৯	২,২৩৫	২,২৮৮	২,৭৩১	২,৭০০
১০	২,১৮২	২,২৩৪	২,৬৪৫	২,৬১৮
১১	২,১৩৯	২,১৮৭	২,৫৬২	২,৫৩৮
মোট ৬-১১	১৩,৫০৬	১৩,৮২৩	১৬,৫৭৮	১৬,৩৮৭

কিন্তু হিন্দুর মধ্যে প্রত্যেক ১ হাজার পুরুষে ৯ শত ১৬ জন নারী, সে হিসাবে প্রত্যেক ১ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে উক্ত বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ১৩ হাজার ৮৪। মুসলমানের মধ্যে প্রত্যেক ১ হাজার পুরুষে ৯ শত ৪৫ জন নারী, সে হিসাবে প্রত্যেক ১ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ঐরূপ শিশুর সংখ্যা ১৬ হাজার ৩২। মোট লোকসংখ্যার মধ্যে মুসলমান শতকরা ৫৫, সে হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান ৬ হইতে ১১ বৎসর শিশুর অনুপাত দাঁড়াইতেছে, ১৩,০৮৪ × ৪৫ ; ১৬,০৩২ × ৫৫ অর্থাৎ শতকরা ৪০ জন হিন্দু ৬০ জন মুসলমান।

হিন্দু ৫২৲ টাকা দিয়া ফল ভোগ করিবে ৪০ ; মুসলমান দিবে ৪৮৲ টাকা, ফল ভোগ করিবে ৬০ ; ইহার অপেক্ষা মুসলমানের পক্ষে আর কি হিতকর ব্যবস্থা হইতে পারে? হিন্দু সদস্যরা যাহাই বলুন না কেন, তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা বোধ করিবার অবসর কৈ?

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া কলিকাতা কর্পোরেশনে গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক বৎসর মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এ যাবৎ মধ্যে কেবল এক বৎসর বাদ, কংগ্রেসী—তথা স্বরাজ্য দলের একচেটিয়া প্রতিপত্তি। তাঁহারা নিজের দলের লোক ছাড়া অপর দলের কাহাকেও মেয়র করেন নাই। গত ৮ বৎসর কেহই মেয়রী পদের জন্য কোন মুসলমানকে মনোনীত করেন নাই, নির্ব্বাচন করা দূরে যাউক। এ বৎসর মিঃ ফজ্‌ল-উল্ হক সাহেবের নাম মনোনীত হইয়াছিল, এবং তিনি নিজে যাহাতে এ বৎসর মুসলমান মেয়র হয়, তজ্জন্য Statesman মারফৎ সাহেব কৌন্সিলরদের নিবেদন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, সাহেবরা তাঁহাকে ভোট দেন নাই, এবং ১০ জনের মধ্যে ৮ জন মাত্র তাঁহাকে ভোট দিয়াছিলেন। অতএব দোষ হইল হিন্দু কংগ্রেসী দলের—কেন তাঁহারা এ যাবৎ মুসলমানকে মেয়র করেন নাই? তাঁহারা কংগ্রেসী দলে যোগদান করিবেন না অথচ দলে যোগদানের চরম সুবিধাটুকু লইবেন!

বর্ত্তমানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে শিখ ও হিন্দু মিলিয়া সংখ্যায় শতকরা ৮এর অধিক নহেন। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মুসলমান, মন্ত্রী মুসলমান, এরূপ অবস্থায় হিন্দু কি আশা করিতে পারে না যে, সহকারী সভাপতির পদ হিন্দু পাইবে? সেখানকার ৩টি রাজনৈতিক মুসলমান দল একজোট হইয়া এক জন মুসলমানকে সহকারী সভাপতি করিলেন। সেখানকার মুসলমানরা না হয় তেমন ভাল লোক নহেন, কৈ, বাঙ্গালার বা ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমান নেতারা ত ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বা উচ্চবাচ্য করিলেন না! যত বড় বড় বুলি কি কেবল হিন্দুর নিকট আদায় করিয়া লইবার বেলা! ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের India office list দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের ৮টি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে বোম্বাই, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসামের ৪টি সভার সভাপতি মুসলমান। বিহারে মোট ১০৩ জন সদস্যমধ্যে নির্ব্বাচিত হিন্দু সাধারণ সদস্যের সংখ্যা ৪৮ এবং নির্ব্বাচিত হিন্দু জমীদার সদস্যের সংখ্যা ৫, মুসলমানরা সরকারী সাহায্য পাইলেও নির্ব্বাচিত হিন্দুদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক নহেন, এ ক্ষেত্রে মুসলমান সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার একমাত্র কারণ, হিন্দু গুণের আদর করিতে জানে। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার মোট সদস্যসংখ্যা ১১১। তাহার মধ্যে নির্ব্বাচিত হিন্দু সাধারণ সদস্যের সংখ্যা ৪৬ জন, নির্ব্বাচিত মুসলমানের সংখ্যা ২৭, হিন্দুর সাহায্য ব্যতীত মুসলমানের সভাপতি হওয়া শক্ত। পাঞ্জাবে নির্ব্বাচিত মুসলমানের সংখ্যা ৩২, নির্ব্বাচিত হিন্দুর সংখ্যা ২০ ও নির্ব্বাচিত শিখের সংখ্যা ১২। পাঞ্জাবে শুধু সভাপতিই মুসলমান নহেন, সহকারী সভাপতিও মুসলমান। কৈ, হিন্দুরা ত আর্ত্তনাদ করিতেছে না? আসামে ৩৯ জন নির্ব্বাচিত সদস্যের মধ্যে কেবলমাত্র হিন্দুর সংখ্যা ২১, অথচ আসামে সভাপতি মুসলমান। বাঙ্গালার সভাপতি হিন্দু, সহকারী সভাপতি মুসলমান, এই ব্যবস্থা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। হিন্দু কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় সভাপতিপদপ্রার্থী হইলে সার আবদুল্লা সুরহাওয়ার্দ্দীর জন্য স্বরাজী হিন্দুরা কি চেষ্টা করেন নাই? এবং সরকার বিপক্ষে না থাকিলে তিনিই হইতেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না। হিন্দু পক্ষে এইরূপ নিরপেক্ষতার ও গুণগ্রাহিতার চেষ্টা, অপর পক্ষে [illegible] বা সুযোগ পাইলে হিন্দুকে যেন তেন প্রকারেণ হটাইবার চেষ্টা! ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিপদ ভি, জে, প্যাটেল পরিত্যাগ করিলে লাহোর হাইকোর্টের হিন্দু ব্যারিষ্টার ডাঃ নন্দলাল উক্ত পদপ্রার্থী হয়েন, মুসলমানের পক্ষে মোরাদাবাদ জেলা কোর্টের উকীল মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব মনোনীত হয়েন। সরকার বাহাদুর মজা দেখিবার জন্য ও প্যাটেল আমলের ঝাজ হইতে রক্ষা পাইবার মানসে ইয়াকুবকে সমর্থন করেন। মুসলমানগণ সকলেই একবাক্যে ইয়াকুবকে সমর্থন করেন, এমন কি, কতিপয় হিন্দুও ইয়াকুবকে সমর্থন না করিলে হিন্দুর পক্ষে ভাল দেখাইবে না বলিয়া সমর্থন করেন। ফলে মৌলভী মহম্মদ ইয়াকুব সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন; কিন্তু তিনি এমনই যোগ্য যে, ২।৩ মাসের মধ্যেই তাঁহার যোগ্যতা জাহির হইয়া পড়িল। সরকার বাহাদুর কায চালাইবার জন্য বোম্বাই হইতে সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লাকে আমদানী করিলেন। একবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে বরাবর তিনিই সভাপতি থাকিবেন, এমন কি, তিনি যদি নির্ব্বাচিত সদস্য হয়েন, অপর কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে ভোটের

সময় দাঁড়াইবেন না। এইরূপ একটা parliamentary convention যে চলিয়া আসিতেছিল, তাহার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া বাধ্য হইয়া মৌ: মহম্মদ ইয়াকুবের স্থলে সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লাকে সভাপতি করিতে হইল। কিন্তু মুসলমানরা ইহাতে সন্তুষ্ট; কেন না, তাঁহারা হিন্দু নন্দলালকে হঠাইতে পারিয়াছেন ত!

মুসলমানদিগের যত আক্রোশ, যত উষ্মা হিন্দুদের বেলা। ইংরাজ সরকার অন্যায় করিলে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার বা করিবার তাঁহাদের কিছুই নাই। সার আবদার রহিম ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সর্ব্বাপেক্ষা মান্য senior সদস্য, এমন কি, vice president of the council। বড় লাট লর্ড রেডিং ছুটী লইয়া বিলাতে যাইলে বাঙ্গালার লাট লিটন তাঁহার স্থলে কর্ম্ম করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। এ অবস্থায় বাঙ্গালার লাট-গদী সার আবদার রহিমের প্রাপ্য। আসামের লাট সার জন কার ছুটী লইয়া দেশে ফিরিতেছিলেন, তাঁহার ছুটী রদ ও বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া বাঙ্গালার লাট-গদীতে বসান হইল। কৈ, সার আবদার রহিম ত কোন আপত্তি করিলেন না, বা বক্রী কয় মাসের চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া ইস্তফা দিতে পারিলেন না!

যুক্তপ্রদেশের লাট সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যানের হঠাৎ মৃত্যু হইলে শাসন পরিষদের senior সদস্য ছাতারীর নবাব আইনবলে যুক্তপ্রদেশের লাট হইলেন। পাঞ্জাব হইতে স্থায়ী লাট সার ম্যালকম হেলীকে আনাইয়া যুক্তপ্রদেশের গদীতে বসান হইল, তিনি আবার ছুটী লইয়া দেশে গেলেন। এবার কিন্তু ছাতারীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না, শাসন পরিষদের junior সদস্য ল্যাম্বার্ট সাহেব, যিনি ছাতারীর অধীনে তাঁবেদারী করিয়াছেন, তাঁহাকেই লাট-গদীতে বসান হইল। ছাতারীর নবাব ল্যাম্বার্ট সাহেবের তাঁবেদারী করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমনই চাকুরীর মোহ ও মায়া যে, এইরূপ খোলাখুলি প্রকাশ্য অপমানের পরও তিনি কর্ম্মে ইস্তফা দিতে পারিলেন না!

মধ্যপ্রদেশের লাট সার মণ্টেগু বাটলার দুইবার লাট-গদী খালি করেন। শাসন পরিষদের সদস্য জে, টি, মার্টেন ও শ্রীপাদ বলবন্ত তাম্বে উভয়েই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর একই দিনে কার্য্যে যোগদান করেন। মার্টেন সাহেব পুরাতন সরকারী চাকুরে বলিয়া প্রথম বারে অস্থায়ী লাট হয়েন এবং তাম্বে তাঁহার তাঁবেদারী করেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার লাট-গদী খালি হইলে তাম্বে পূর্ব্বাদস্তুর লাট-গদীতে বসেন ও মার্টেন সাহেবকে তাঁহার অধীন তাঁবেদারী করিতে বাধ্য করেন। ব্রহ্মার লাট-গদী অস্থায়িভাবে খালি হইলে ব্রহ্মা শাসন পরিষদের Senior সদস্য সার জোসেফ আগষ্টস্ মংগ্যি অস্থায়ী লাট হয়েন। Junior সদস্য সিভিলিয়ান হইলেও তাঁহাকে লাট হইতে দেন নাই।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের শাসন পরিষদের Senior সদস্য ডুমরাওঁয়ের মহারাজা যেমন জানিলেন, বিহার ও উড়িষ্যার লাট সাহেব ছুটী লইলে অস্থায়িভাবেও তাঁহাকে লাট-গদীতে বসান হইবে না, শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য সিভিলিয়ান সিফটন্ সাহেবকে দেওয়া যাইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ শাসন পরিষদের সদস্য পদ, সিফটন্ সাহেবের লাট হইবার খবর গেজেট হইবার পূর্ব্বে, পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও ২।০ বৎসর কাল সদস্যপদে থাকিতে পারিতেন; কিন্তু ইজ্জৎ নষ্ট করিয়া কেবল মাত্র মাহিয়ানার লোভে থাকিতে রাজী হইলেন না।

বড় লাটের শাসন পরিষদের সদস্যপদ মতের মিল হয় নাই বলিয়া হিন্দু পরিত্যাগ করিয়াছেন;—লর্ড সিংহ, সার শঙ্করণ নায়ার, সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, প্রত্যেকেই মতের অমিলের জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এক জনও মুসলমান সদস্য কোন কারণেই পদত্যাগ করেন নাই। সার মিঞা মহম্মদ সফী যখন বড় লাটের শাসন পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং লোকত: ধর্ম্মত: মুডিম্যান সাহেবের অপেক্ষা বড় চাকুরিয়া, তখন তাঁহার মতের বিরুদ্ধ হইলেও চাকুরীর খাতিরে মুডিম্যান কমিটীর রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন। পরে এক মাস বাদে তাঁহার প্রকৃত মত ব্যক্ত করেন। কেন, তিনি কি এক মাস আগে চাকুরী হইতে ইস্তফা দিতে পারিতেন না? না, তাঁহার অপর কোন বড় চাকুরীর উপর লোভ ছিল?

আসল কথা, তোষামোদ করিয়া বা হিস্যা দেখাইয়া কোন চাকুরী বা পদ লাভ করিলে তাহা ত্যাগ করিতে মায়া বেশী হয়। বিশেষ করিয়া আবার যদি তাঁহার সেই পদের বা চাকুরীর উপযুক্ত নিজ যোগ্যতা না থাকে। কাহারও কাহারও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় কোন বিশিষ্ট পদ পাইয়া, আবার কেহ কেহ নিজের যোগ্যতায় সেই পদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন। হাইকোর্টের জজীয়তি সার আশুতোষের গৌরব নহে, সার আশুতোষ জজ থাকায় জজীয়তিরই গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানরা কথায় কথায় সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে তাঁহাদের সংখ্যানুপাতিক হিস্যার কথা তুলেন। কিন্তু যেখানে যেখানে তাঁহারা সংখ্যানুপাতিক হিস্যার অধিক চাকুরী করেন, সেখানে ত এ কথা তাঁহাদের মুখে শুনা যায় না। কেন, সেখানে নিজ সম-ধর্ম্মাবলম্বীদের চাকুরী ছাড়িতে বলুন না? তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ইসলামের সমদর্শিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত।

আসামে মুসলমান সংখ্যায় শতকরা ১৯। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি আসাম শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্য ৩ জন মুসলমান হইয়াছেন, ১ জন হিন্দুও হন নাই। এ কথা কি হিন্দু বলিতে পারে না, ভাই মুসলমান, তুমি একবার শাসন পরিষদের সদস্য হইয়াছ, হিস্যা অনুযায়ী আমি দুইবার সদস্য হইব? কিন্তু হিন্দু এ যাবৎ এ কথা বলে নাই। শুধু আসামে নহে, যুক্তপ্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১৪ জন মাত্র। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে এ যাবৎ কেবলমাত্র মুসলমানই শাসন পরিষদের সদস্য-পদ পাইয়াছেন। এমন কি, ৩।৪ মাসের ছুটী লইলেও, মুসলমান সদস্যের স্থলে অস্থায়ী মুসলমান সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশে দুইটি সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় আছে, একটি এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ইহার স্থায়ী প্রধান বিচারপতি সাহ মহম্মদ সুলেমান, অপরটি অযোধ্যার চীফ কোর্ট, ইহার স্থায়ী প্রধান বিচারপতি সৈয়দ উজীর হোসেন। কৈ, হিন্দু ত বলে না, মুসলমান সংখ্যায় অল্প, অতএব যোগ্যতা থাকিলেও তাঁহাকে চাকুরী দিও না। বরঞ্চ এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ এক জন ভারতবাসী সর্ব্বপ্রথম এইবারে পাইয়াছেন, ইহারই আনন্দে মসগুল। যোগ্যতার মর্য্যাদা রক্ষিত

হইয়াছে বলিয়া কলিকাতার 'ল জর্ণ্যাল' তাঁহার ছবি ছাপিতেছেন। হিন্দু-পরিচালিত সমগ্র ভারতের নানা কাগজে তাঁহার যোগ্যতার প্রশংসা বাহির হইতেছে। হিন্দুর সৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদিগের সন্দেহ ইহাতেও যাইতেছে না। কি করিলে তাঁহাদের সন্দেহ যাইবে? না, ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে এই নীচ সন্দেহ পোষণ করিবেন ও যাহাতে তাহার পরিপুষ্টি হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবেন?

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিলাতে ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-সভায় ৫ জন মুসলমান ও ১১ জন হিন্দু নিযুক্ত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে একমাত্র সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী মহোদয় পদত্যাগ করেন, আর হিন্দুর মধ্যে ২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া বাদে ৬ জন কর্ম্মে ইস্তফা প্রদান করেন। হিস্যা অনুযায়ীও ৫ জন মুসলমান নিয়োগ ঠিক হয় নাই। আরও কম লোক নিযুক্ত করা উচিত ছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে সমগ্র হিন্দু-ভারতে এটুকু উচ্চ-বাচ্যও ত শুনি না।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ১০.৮৫। ইংরাজী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করেন যে, উড়িয়ারা চারিটি শাসন-বিভাগের অধীন থাকায় তাঁহাদের নানাবিধ অসুবিধা হইতেছে, তাঁহাদিগকে এক শাসনাধীনে আনা হউক। দুই প্রকারে উড়িয়াদিগকে এক শাসনাধীনে আনা যায়—এক সমস্ত উড়িয়াকে এক স্বতন্ত্র লাটের অধীনে আনয়ন করা; অপর বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত অন্যান্য বিচ্ছিন্ন উড়িয়া-ভাষা-ভাষী স্থানসমূহকে একত্র করা। ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলিবার অনেক যুক্তি-তর্ক আছে; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত করা হয়। মৌলভী মহাম্মদ ইয়াকুব (যিনি পরে সার হইয়াছেন ও কিছুদিনের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হইয়াছিলেন) বলেন যে, বিহার মুশ্লীম লীগের মতে সমস্ত উড়িয়া জাতির একত্র হওয়ায় বিশেষ আপত্তি আছে, তাহাতে বিহারের মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তির লাঘব হইবে। কারণ, সমস্ত উড়িয়াকে একত্র করিলে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যা শতকরা ১০.৮৫ হইতে কমিয়া যাইবে। হয় ত শতকরা ৮এ দাঁড়াইবে। ইহাতে হিন্দুরা তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকতর সুযোগ পাইবেন। মুসলমান ভ্রাতারা ভুলিয়া যাইলেন যে, যদি বিহার প্রদেশের শতকরা ৯০ জন হিন্দু তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব বা অত্যাচার না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা শতকরা ৯২ জন হইলেই বা অত্যাচার আরম্ভ করিবেন কেন? আর যদি ৯০ জনই অত্যাচার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মাত্র ১০ জন হইয়া কিরূপে ইহার প্রতিরোধ করিবেন?

সাম্প্রদায়িক মুসলমানদিগের মনোবৃত্তি এরূপ হইয়াছে যে, তাঁহারা কোন প্রশ্নের ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি একবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। দিন দিন তাঁহাদের সাম্প্রদায়িকতা এরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, আমরা অতঃপর পোষ্টকার্ডের মূল্য ৩ পয়সা হইতে কমান হইবে কি না, ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মত আপত্তির কথা শুনিতে পাইব। মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষিত লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অল্প। অতএব পোষ্ট কার্ডের দাম কমাইলে সুবিধা হিন্দুরই বেশী হইবে—এ কারণ ইহাতে মুসলমানের আপত্তি করা একান্ত উচিত! নচেৎ তাঁহাদের রাজনৈতিক মানহানি হইবে!

শেষকালে এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মুসলমান ভাইদের একটা কথা নিবেদন করি, তাঁহারা আমাদের সহিত একই দেশের লোক, একই দেশের জলবায়ুতে আমরা উভয়েই পুষ্ট। আমাদিগের ক্ষতি করিয়া বা হিংসা করিয়া কি তাঁহারা বড় হইতে পারিবেন? সত্যের জয় চিরকালই চলিয়া আসিতেছে—যে সত্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে সর্ব্বসমাজে গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে—সেই সত্য রাজনৈতিক পন্থানুযায়ী চলাই তাঁহাদের উচিত। তাঁহারা যেন দয়া করিয়া এই কথা কয়টি ভাবিয়া দেখেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত।

কুমারী ইন্দুমতী বক্সী বি, এ,

প্রায় প্রতি বৎসরই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী ছাত্রদের বি, এ, পরীক্ষার ফল ভাল হয় না। যাহা হউক, এ বৎসর সেখানকার বি, এ, পরীক্ষায় কুমারী ইন্দুমতী বক্সী বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, মহিলা পরিক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী যেরূপ বিদ্যানুরাগিণী, সেইরূপ তাঁহার নৃত্য-গীতাদিতেও বিশেষ চর্চ্চা আছে। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পার্লামেণ্টের কেবিনেট সদস্যা। বাঙ্গালী মহিলাদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদ পাইয়াছেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, বাঙ্গালী নারী অনেক সময় বাঙ্গালীর সহায়। কুমারী ইন্দুমতী তাহা সার্থক করিয়া তুলুন।

মানচিত্র রচনার ক্যামেরা

যুক্তরাজ্যের ভূসংস্থানবর্ণনার মানচিত্র গ্রহণ উপলক্ষে এক প্রকার ক্যামেরা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার ওজন ৮২ মণেরও অধিক।

বৃহত্তম ক্যামেরা

এই যন্ত্র-সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করিলে, অধুনা যে সুবৃহৎ আলোকচিত্র পাওয়া গিয়া থাকে, তদপেক্ষা ২ শত গুণ বর্দ্ধিতাকার আলোকচিত্র পাওয়া যাইবে। ইহাতে ক্ষুদ্রতম অংশও বাদ পড়ে না। ক্যামেরাটির উচ্চতা ২০ ফুট। উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ মানচিত্রের জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

অগ্নিনির্ব্বাণের বিচিত্র ব্যবস্থা

কোথাও আগুন লাগিয়াছে—গৃহমধ্যে মানুষের প্রবেশ অসম্ভব, অথচ আগুন নিভাইতে হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভাবনকার্য্যে লাগিয়া গেলেন। উপায় উদ্ভাবিত হইল। যে কক্ষমধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, তন্মধ্যে নবোদ্ভাবিত, আবর্ত্তিত নল ঠেলিয়া দেওয়া হইল। নল আবর্ত্তিত হইতে হইতে চতুর্দ্দিকে জলধারা বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। চিত্র

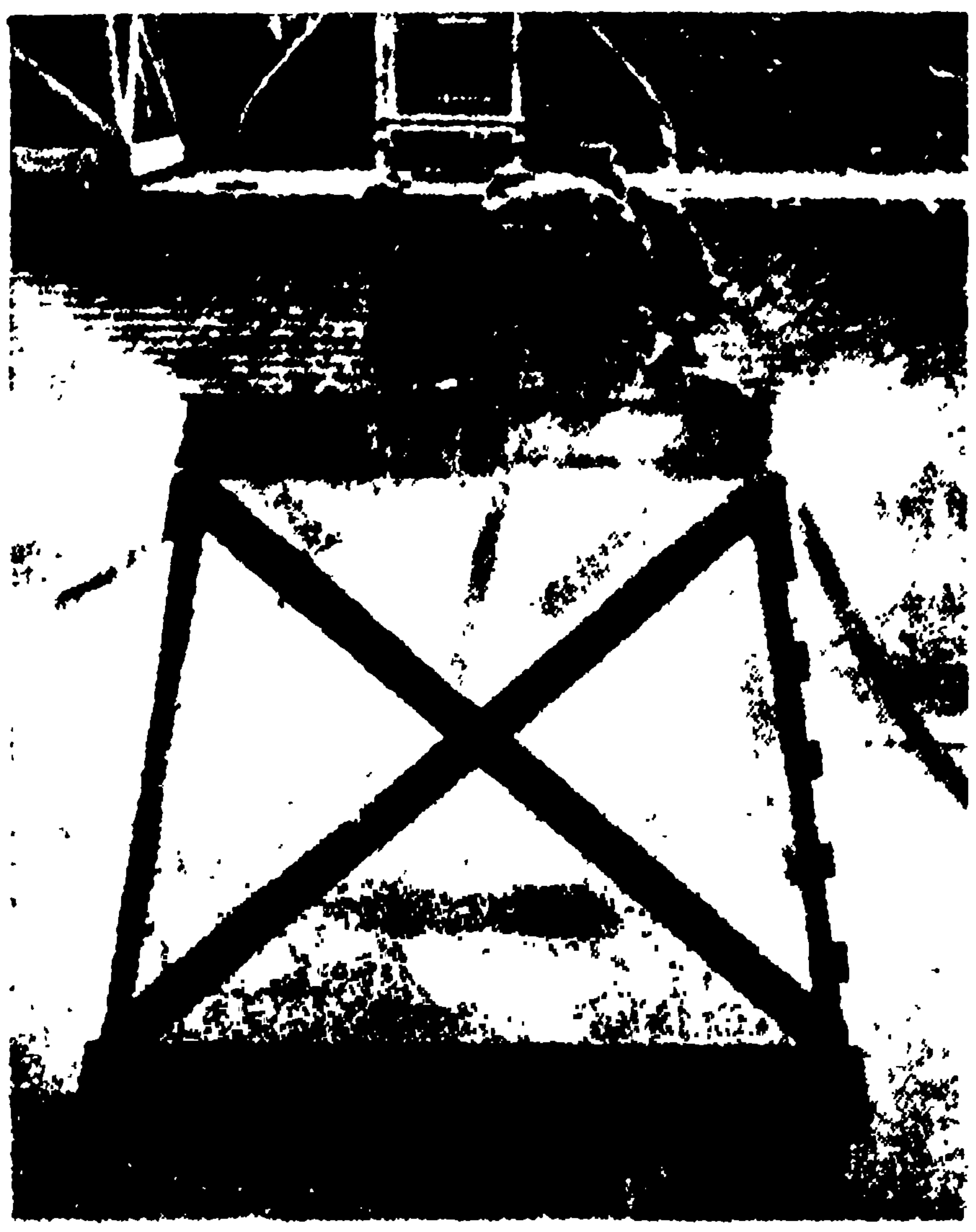

অগ্নিনির্ব্বাণে আবর্ত্তিত নল

দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, একটি কাঠামোতে নল সংলগ্ন। ছাদ ভাঙ্গিয়া গর্ত্ত করিয়া সেই পথে এই কাঠামো-সংলগ্ন আবর্ত্তিত নল ঘরের মধ্যে নামাইয়া দেওয়া যায়। উহা ভূমি স্পর্শ করে না। দ্বিতল বা ত্রিতলের ঘর হইলে তাহার তলদেশে বড় ছিদ্র করিয়া সেই পথেও ঐ যন্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। বাতায়ন-পথেও ঐ কার্য্য করা যায়।

বায়ুচালিত অভিনব তরণী

জার্ম্মাণীতে একপ্রকার নূতনধরণের তরণী নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা বায়ু দ্বারা পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তরণীখানি ৬০ জন যাত্রীকে বহন করিবে। আটলাণ্টিক মহাসাগরে এই তরণী পাড়ি জমাইবে। তাহাতে বিপদের কোনও আশঙ্কা

:কিবে না। তরণীব উভয় পার্শ্বে সেতু সংলগ্ন থাকায়, তরণী- :নি সোজা হইয়া থাকে। বায়ুতাড়িত তরঙ্গের আঘাত :হুও ঋজুভাবেই অবস্থান করে। তরণীর উভয় পার্শ্বেই অনেক-

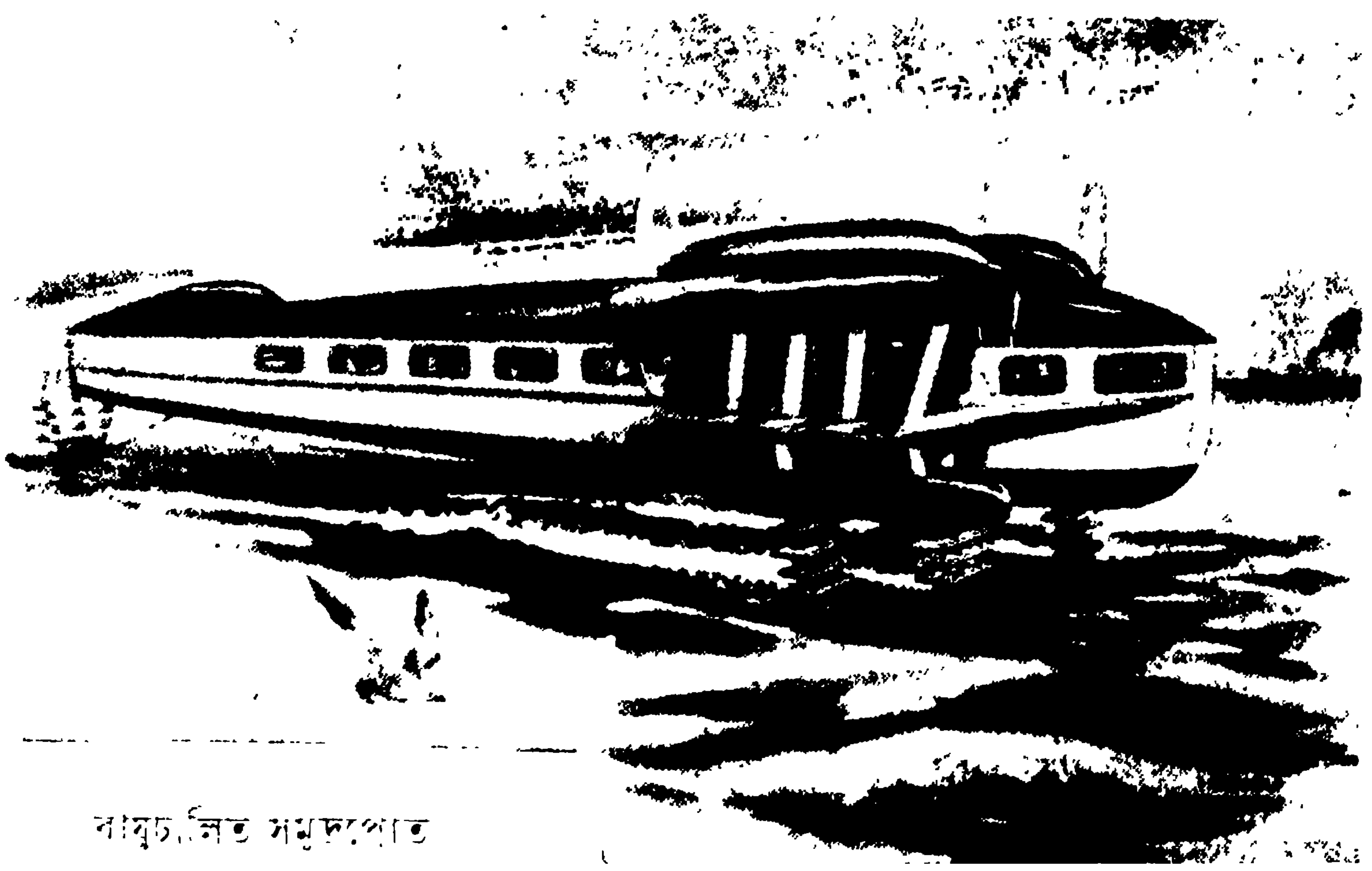

বায়ুচালিত সমুদ্রপোত

'ল ডানা থাকায় উহাব গতি দ্রুত হয় এবং সম্মুখভাগ উচ্চ :য়া থাকে।

সন্তরণে বায়ুপূর্ণ বিচিত্র দস্তানা

:ন সন্তরণশিক্ষার্থীর সাহায্যের জন্য একপ্রকার বায়ুপূর্ণ :না নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা বাহুর যে কোন অংশের পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। এই দস্তানা পরিয়া সন্তরণ আরম্ভ করিলে দেহ জলের উপর আপনা হইতেই ভাসিয়া থাকে। দস্তানাগুলি রবার-নির্ম্মিত। উহা ধারণ করার ফলে হস্তচালনার কোনও অসুবিধা হয় না; বরং অতি সহজেই যে কোনও প্রকারে হস্তচালনা করার সুবিধাই ঘটিয়া থাকে। অনেক দূর পর্য্যন্ত সন্তরণ করিতে হইলে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম করার সুবিধাও ইহাতে পাওয়া যায়। হস্ত-পদে খিল বা ঝিঁঝি ধরিলে জলে ডুবিবারও কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সন্তরণে বায়ুপূর্ণ দস্তানা।

মৎস্য-শিকারীর ঝুড়ি

মৎস্য-শিকারীর ঝুড়ি

মৎস্য-শিকারী মাছ ধরিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিয়া উহা হাতে ঝুলাইয়া লইতে অসুবিধা বোধ করে। এ জন্য বাজারে একপ্রকার নূতন ঝুড়ি বাহির হইয়াছে। উহা পার্শ্বে অথবা পৃষ্ঠে অনায়াসে ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। শিকারীর ইহাতে বিশেষ সুবিধা।

পৃষ্ঠবাহিত যন্ত্র

জার্ম্মাণীতে উদ্যান চাষীরা পৃষ্ঠদেশে একটি ক্ষুদ্র মোটর-যন্ত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই মোটর একটি অশ্বের শক্তিবিশিষ্ট।

পৃষ্ঠবাহিত মোটর-যন্ত্র

উদ্যান-চাষের যন্ত্র এই মোটরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে, তাহার সাহায্যে কর্ষণ-যন্ত্র অতি দ্রুত ভূমি কর্ষিত করিয়া ফেলে। অন্যান্য যন্ত্র-চালনাতেও এই মোটরের সাহায্য গৃহীত হইয়া থাকে।

৩৬

শুভদিনে হৈমবতীর সহিত সত্যপ্রিয়র বিবাহ হইয়া গেল। যেরূপ সাড়ম্বরে বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল, তেমনই সংক্ষেপে কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। হিমুর আপনার বলিতে এক রমাদিদি, সে একাই এক'শ হইয়া আনন্দে কলরবে পাড়া সরগরম করিয়া তুলিল।

সমবেত কুটুম্বিনীগণ বধূর সুন্দর মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া অজস্র ভাষায় হিমুর রূপের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। যাহারা সুনন্দাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা নব-বধূর প্রশংসার মাঝে মাঝে ফোড়ন দিতে লাগিলেন, "এ রূপের ডালির কাছে কি সুনন্দা? সুভাল হালে দু'হাত এক হয়ে গেল, এখন বলতে দোষ নাই, তোমরা নন্দার কি দেখে ভুলেছিলে, সতুর মা? গায়ের রং ত গায়ের রং, যাকে পুরুষমানুষরা শ্যামবর্ণ বলে, আমরা বাপু কালোই বলি; গড়ন তাই বা কি, ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা ছিরি-ছটা নেই। এক থাক্‌বার ভিতর মুখখানির যা চটক, চোখে লেগে যায়। আর বয়েস—মা গো, সে যেন সতুর দিদিমা, তার গাছ-পাথর নেই। তোমরা ঠিক করেছিলে, আমরা আর কি বলবো বল, নিজেরাই বলাবলি করেছিলাম, সতুর মায়ের মাথা খারাপ হয়েছে, নইলে ও মেয়ের তরে এত পাগল হয়?"

সকলের নানাবিধ মন্তব্যে অন্নপূর্ণা একটা ক্ষোভের নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সত্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

বিবাহের পর প্রেমিকের অতি আশার—অতি সাধের ফুলশয্যা আসিল। সন্ধ্যার পর অল্পবয়স্কা মেয়েরা হিমুর কুসুমপেলব তনুলতা কুসুমভূষণে সাজাইয়া ফুলশয্যার অনুষ্ঠান সারিয়া প্রস্থান করিবার পর—সত্য গলার যুঁইফুলের মালাগাছি খাটের বাজুতে রাখিয়া গাত্রোত্থান করিল।

এ সেই গৃহ, যে গৃহে সুনন্দা এক দিন আসিয়া সত্যের আলোকচিত্রের নিম্নে হৃদয়ের অমলিন ভক্তিপ্রীতির ধারা ঢালিয়া প্রণাম করিয়াছিল। সে দিনের ন্যায় কক্ষের প্রতি দ্রব্যটি সত্য তেমনই সাজাইয়া রাখিয়াছে। যে জড় ফটোখানি এক দিন এক জনের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ধন্য হইয়া গিয়াছিল, সে ছবিখানাও টেবলের উপর তেমনই রহিয়াছে। আলেখ্যের অধিকারীর বিড়ম্বনায়, ছবির মুখে কোনই বিকার নাই, চোখেও অম্লান দীপ্তি, এইখানে চেতন ও অচেতনের প্রভেদ।

সত্য গৃহের এক পাশ হইতে অপর পার্শ্বে কয়েকবার পায়চারী করিয়া খাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দুগ্ধধবল শয্যায় পুষ্পস্তবকের উপর পুষ্পময়ী হিমু আনত-বদনে বসিয়াছিল। তাহার কপালের চন্দনলেখার সীমায় এতটুকু ঘোমটা, প্রদীপের উজ্জ্বলরশ্মি নববধূর মুখের উপর ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে, ফুলের গহনার অন্তরালে নূতন পালিস-করা কর্ণাভরণ, কণ্ঠমালা ঝকমক করিতেছে। বাহিরের জ্যোৎস্নাটি বড় স্নিগ্ধ, বড় মিষ্ট, বাতাসটিও উতলা, পুষ্প-পরিমলে কক্ষ যেন মদিরোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আনমনা সত্য হিমুর পানে তাকাইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "তুমি যে এখনও ব'সে রয়েছ, গলার মালাটালাগুলো খুলে ফেলে শুয়ে থাকো, হিমু! রাত কম হয় নি, এ দু'দিন ত প্রায় অনিদ্রাতেই কেটে গেছে, আজ ঘুমিয়ে নাও, নইলে অসুখ করবে।"

হিমু চোখ তুলিতেই সত্যর চোখে দৃষ্টি মিলিত হইল। লজ্জায় হিমুর আয়ত নয়ন-পল্লব তখনই নিমীলিত হইল। সে ঢোক গিলিয়া চুপে চুপে কহিল, "এ ক'দিন আপনারও ঘুম হয় নি, আপনিও ঘুমুন।"

"আমি পরে ঘুমাব, হিমু! আমার পড়া-শোনার একটু কায আছে। এক আধ দিন ঘুমের ব্যাঘাত হ'লে আমার কিছু অসুখ হয় না। পরীক্ষার আগে কত রাত জাগতে হ'ত, ও আমার অভ্যাস আছে। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার ভাল ঘুম না হ'লে অসুখ করবে, আর দেরী করো না, শুয়ে পড়।"

বলিয়াই সত্য চেয়ারে গিয়া বসিল। টেবলের উপর একখানি খোলা চিঠি পড়িয়াছিল, চিঠিখানা সত্যর বন্ধু কুমুদের। কুমুদ বেণারস হিন্দু-কলেজের নবীন অধ্যাপক। বন্ধুর বিবাহে যোগ দিবার ইচ্ছা তাহার পূর্ব্বাপর থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমে কুমুদ কলেজের উপরওয়ালা-দের প্রতি ঝাল-ঝাড়িয়া বন্ধুকে লিখিয়াছে—

"ছুটী পেলাম না ভাই, পরের গোলামীর দোষ ত ঐখানে। ওরা যে মানুষের সাধ-আহ্লাদ সুখ-দুঃখ বুঝতে

চায় না। মনুষ্যত্ব বিবেক সব বলি দিয়েই না চাকুরীর পায়ে দাসখৎ লিখে দেওয়া। থাকুক, আর অরণ্যে রোদন ক'রে কি হবে? আমি এখান থেকেই দিব্য দৃষ্টিতে তোদের যুগল-মিলন দেখতে পাচ্ছি। যুগল-মিলন কথাটা নিতান্ত সেকেলে, তবু ওর মত মিষ্টি কথা আর নেই, তাই ওটি প্রয়োগ করলাম।

তুই আমার গান শুন্‌তে ভারী ভাল বাসতিস, সতু! সাধ ছিল, তোদের বাসরে "চাঁদ হাস, হাস, হারা হৃদয় দু'টি ফিরে এসেছে, কত দেশ ঘুরে গহন সাগরতীরে, সোণার তরণী দুটি কূলে লেগেছে" গানটি গাইব। তা হ'ল না। না হ'ল— ভগবান্ করুন, সত্যর হৃদয়ের মহাপারাবারে সুনন্দার ক্ষুদ্র হৃদয়-নির্ঝরটি সংমিলিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করুক, সার্থক হোক্, সফল হোক্, তোদের বন্ধুর এই ঐকান্তিক কামনা।

প্রাণের শুভেচ্ছার সাথে তোদের ক্ষুদ্র বন্ধু তার একটা ছোট্ট স্মরণচিহ্ন সখী সুনন্দার জন্যে পাঠাচ্ছে। সত্য-প্রিয়র গভীর প্রেমে যে হৃদয় স্পন্দিত উচ্ছ্বসিত, সেই হৃদয়ে বন্ধুর দীন উপহারটি তিনি ধারণ করলে আমি ধন্য হয়ে যাব। তুই আমার হয়ে এই একরত্তি হারটুকু তাঁর গলায় পরিয়ে দিস।"

চিঠি রাখিয়া সত্য টেবলের দেরাজের মধ্য হইতে একটা লাল মকমলের বাক্স বাহির করিল। বাক্সের বোতাম টিপিতেই ডালা খুলিয়া গেল, বাক্স হইতে আত্মপ্রকাশ করিল, একছড়া গিনি সোণার ছোট হার। হারের মধ্যস্থলে লকেটের গায়ে 'সুনন্দা' নামটি মুক্তাখচিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে-ছিল। সত্য দুই হাতে হার তুলিয়া অনিমেষলোচনে লকেটের পানে চাহিয়া রহিল। ক্ষুদ্রতর বালুকণার ন্যায় স্বচ্ছমুক্তায় কত যত্নেই না এই নামটা লেখা হইয়াছে। ইহা ত মানুষের হাতের কায, কিন্তু বিধাতার হাতের কাযেও যে মানুষ বাদ সাধিয়া থাকে। বুকের গোপন স্থানে রক্তের অক্ষরে তিনি স্বয়ং যে নাম লিখিয়া দেন, অকরুণ মানব হাসিতে হাসিতে সে অক্ষরও মুছিয়া দেয়। কিন্তু মুছিলেই কি মোছা যায়?

সত্য হারছড়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া এক-বার পশ্চাতে চাহিল—হিমু লক্ষ্মী মেয়ের মত গলার মালা খুলিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে আবরণ নাই, চক্ষু নিমীলিত। সেই মুখের প্রতি তাকাইয়া সত্য মনে মনে ভাবিল, কুমুদের প্রদত্ত উপহার কিরূপে সে ঐ সরলা বালিকাকে পরাইয়া দিবে? কেবল লকেটের গায়ে নহে, তাহার অন্তরের অন্তস্তলে যে সুনন্দা অক্ষরটি লেখা রহিয়াছে, তাহাই বা সরলা বালিকার নিকটে কি প্রকারে ব্যক্ত করিবে? কিন্তু ঐ অপাপবিদ্ধা সরলা বালিকার সহিত প্রাণান্তেও সে প্রতারণা করিবে না। প্রভাতে কুমুদের উপহার মা'র কাছে দিবে, মা এ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিবেন। সত্য আর ভাবিবে না, নিজের সুখে দুঃখে বিচলিত হইবে না। সে নীরবে মায়ের কায—জগতের কায করিয়া যাইবে।

৩৭

চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সত্য টেবলে মস্তক রাখিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। এ কয়েক দিন মানসিক ঝড়-ঝঞ্ঝায় নিদ্রা-দেবী তাঁহার করপল্লবখানি একটিবারও সত্যর নয়নে বুলাইতে পারেন নাই। এখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে, দ্বন্দ্ব সমাধা হইয়াছে। মানুষ গাছ হইতে পড়িবে বলিয়াই না ভয়! পড়িলে আঘাত পাওয়া ছাড়া আতঙ্ক আর থাকে না। সত্যর আঘাতের যন্ত্রণা থাকিলেও আতঙ্ক ছিল না। তাহার জীবনের গ্রন্থি-মোচনের ভার মাকে দিয়া সে অনেকটা শান্ত হইয়াছে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সত্য স্বপ্ন দেখিতেছিল, সুনন্দা যেন আসিয়াছে। তাহার পরিত্যক্ত মালাগাছা সত্যর গলায় পরাইয়া দিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে বলিতেছে, "আমি এসেছি"।

সত্য পার্শ্ববর্ত্তিনীকে কাছে টানিয়া লইবার নিমিত্ত ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া দিতেই স্বপ্নের সুনন্দা সত্যর বাহুপাশে আশ্রয় লইয়া কহিল, "বিছানায় গিয়ে শোন্ গে, এমন ভাবে শুয়ে থাক্‌লে ঘাড় ব্যথা হবে।"

সত্যর সুখস্বপ্ন টুটিয়া গেল, একটা পঞ্জরভেদী নিশ্বাস বুকে চাপিয়া সত্য বিজড়িত স্বরে বলিল, "তুমি এখনও জেগে রয়েছ, হিমু? একলা বিছানায় শুতে তোমার বুঝি ভয় করছিল?"

হিমু সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ভয় করে নি। আমার কেবলই কান্না পাচ্ছিল, ঘুম হ'ল না!"

"কান্না, কান্না কেন, মা'র কথা মনে ক'রে মন খারাপ করছিলে বুঝি ?"

"না, দিদি বলেছিলেন, কাঁদলে মা'র কষ্ট হয়, সেই কথা শুনে আমি মা'র জন্যে কাঁদি না।"

"তবে কিসের কান্না, হিমু ?"

হিমু ফুলের চুড়ির একটা পাপড়ি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে অনেকক্ষণ পর কহিল, "আজ আমার কেবলই দিদির কথা মনে হয়ে কান্না পাচ্ছে। দিদি আমাকে যায়গা ক'রে দিয়ে কোথায় ভেসে গেল ! মা যদি আমায় দিদিকে না দিয়ে যেতেন, তা হ'লে দিদির যায়গা দিদিরই থাকতো, আমি আসতাম না।"

সত্য আশ্চর্য্য হইল। হিমু এতটুকু মেয়ে যাহা বুঝিয়াছে, তাহারাই কি সেটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই ? সত্যই কি সুনন্দা হিমুকে নিরাপদ নীড়ে রাখিয়া নিজে স্বেচ্ছায় সরিয়া গিয়াছে ? এই যাওয়া-আসার ভিতর আত্মত্যাগের অলকনন্দা কি বহিয়া যায় নাই ? মৃতার অন্তিম বাসনা, বালিকার নির্ভরতা কি সুনন্দার ভাবান্তরের প্রধান অন্তরায়, ইহার মধ্যে কি ঐশ্বর্য্যের লোভ নাই ? প্রাধান্যের গৌরব নাই ? না থাকিলে কি সুনন্দা অত সহজে গড়া জিনিষ দুই পায়ে দলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিত ? না বালকের ভগ্ন বাঁশের বাঁশরীর ন্যায় সত্যকে দূরে ঠেলিয়া অতুল বৈভব-সম্পদে ঝাঁপাইয়া পড়িত ! নারী—নারীই, তাহারা যে সম্পদ চায়। হীরা-মণি-মুক্তায় ছিনিমিনি খেলিতে ভালবাসে। হৃদয়ের খবর কি তাহারা রাখে ? রাখিলে এ দুর্গতি হইবে কেন ?

সত্য মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল, "তোমার ভুল—মহাভুল, তুমি ছেলেমানুষ, বুঝতে পার না। না, তোমার দিদি তোমাকে যায়গা দিয়ে স'রে যান নি। মস্ত জমীদারের স্ত্রী হওয়ার লোভেই স'রে পড়েছেন। তাঁর জন্যে বৃথা মন খারাপ ক'রে কষ্ট পাও কেন ? তিনি কারুর মন খারাপের উপযুক্ত নন। তুমি আমার কাছে তাঁর নাম মুখে এনো না।"

হিমু কাঁদিতে লাগিল।

সত্য ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও কি হিমু, কাঁদছ কেন ?"

সে উচ্ছ্বসিত রোদনের মধ্যে বলিল, "আপনারা দিদিকে জানেন না, তাই এমন কথা বললেন। মা বলতেন, নন্দার মত মেয়ে হয় না। দিদির কাছে থাকতে পাব ব'লেই আমি এখানে থাকতে চেয়েছি। এত কাণ্ড হবে তখন বুঝতে পারি নি, বংশীদা যখন চিঠি লিখলেন, আমি তখুনি রাঙ্গাদিকে বল্লাম, 'দিদি, এ সব আমারি জন্যে করছে।' রাঙ্গাদি আমার কথা কাণেই তুল্লে না। মাকে বলতে গেলাম, মা শুনলেন না। লজ্জায় আপনাকে কিছু বলা হ'ল না, বিয়ে হয়ে গেল।"

সত্যর হৃদয়ে কাঁটা ফুটিল। কাহাকে সে জ্ঞানশূন্য, বালিকা ভাবিয়াছিল ? যে বয়সের বালকরা সংসারের কিছুই জানে না, সেই বয়সের মেয়েরা বুদ্ধি-বিবেচনায় অনেকখানি পক্বতা লাভ করে। এক জন বয়স্ক যাহা ধরিতে পারে না, একটি বালিকা অনায়াসে তাহা ধরিতে পারে। ইহাদের ধারণাশক্তি অসাধারণ—প্রখর হইলেও হৈমর শেষের কথাটা সত্যর মিষ্ট লাগিল না। সত্য একটুখানি হাসিয়া ঈষৎ ঝাঁঝের সহিত বলিল, "বিয়ে হয়ে গেল ব'লে তুমি কি দুঃখিত হয়েছ, হিমু ? না হ'লে হয় ত খুসী হ'তে, অথবা আর কারুর সাথে—"

হিমু তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল, "ছিঃ, ও সব বলবেন না, বলতে নেই। মা যে আপনার সাথে বিয়ে দেবার জন্যেই দিদির হাতে আমায় দিয়ে গিয়েছেন। আমি দুঃখিত হব কেন ? কিন্তু—"

"কিন্তু কি হিমু, চুপ ক'রে রইলে কেন, বল ?"

হিমু আরক্ত হইয়া বলিল, "যার সাথে যার বিয়ে হবে, ভগবান্ তা ঠিক ক'রে দেন। দিদির সাথে আপনার বিয়ে তিনিই ঠিক করেছিলেন, কিন্তু উল্‌টো হয়ে গেল। আগে দিদির সাথে হয়ে পরে আমার—"

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। নতনেত্রে শাড়ীর পাড় খুঁটিতে লাগিল।

সত্য মনে মনে পরম কৌতুক বোধ করিল, হিমু বলে কি ? সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা ত ঠিক নহে, সত্যই হিমু ভারী ছেলেমানুস, ভারী অবুঝ।

৩৮

শরতের অপরাহ্ণ। শৈলদেহে শারদশ্রী ঝলমল করিতেছে, শ্যাম সমুন্নত শিখর-শ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা, নিম্নের নিবিড় বনরাজির অপূর্ব্ব শোভা দিগ্‌দিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কামাখ্যা ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের প্রশস্ত শিলাসনে বসিয়া সুনন্দা ও যোগমায়া দূরের উমানন্দ পাহাড়ের পানে চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের মেখলা পরিয়া সবুজ পত্রান্তরে আবৃত উমানন্দ দ্বীপটি অতুলনীয় ছবির মত দর্শকের দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হইতেছে। বিপুলসলিল ব্রহ্মপুত্রের এক দিকে সৌন্দর্য্যের অভিনব সমাবেশ—অনন্ত শোভার আকর কামাখ্যার নীল পর্ব্বত। অপর দিকে সুন্দর সুশোভিত রমণীয় আলেখ্যবৎ গৌহাটী সহর। দূরে শান্ত-গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ শান্তিরসাস্পদ পবিত্র বশিষ্ঠাশ্রম। ব্রহ্মপুত্রের মধ্যদেশে মুক্তাগারের মধ্যস্থিত পান্নার ধুক্‌ধুকির ন্যায় উমানন্দ বিরাজিত।

সুনন্দা বিস্মিত বিস্ফারিত নয়নে প্রকৃতির সুমহান্ সজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে গ্রামের বুকে লালিত-পালিত হইয়া এত বড়টি হইয়াছে, পল্লীর বাহিরে যাইবার সুযোগ পায় নাই। গিরি-শিখরের এ অম্লান সম্পদ—অবর্ণনীয় মাধুর্য্য তাহার কল্পনার অতীত, ধারণার বহির্ভূত।

যোগমায়া ও সুরেশ্বরের সহিত একপক্ষকাল হইল তাহারা ভাই-ভগিনী এখানে আসিয়াছে, কিন্তু এত দিন এখানকার সৌন্দর্য্যসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া নন্দা পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা মধুর লাগিয়াছে—ভুবনেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ। গুলঞ্চ-বিছানো বিশাল পাষাণাসনে বসিয়া পাখীর মৃদু কাকলীর সহিত ব্রহ্মপুত্রের ভৈরব হুহুঙ্কার শ্রবণ করিতে নন্দার ভারী ভাল লাগিত।

যোগমায়ার এ স্থলে বহুবার যাতায়াত থাকিলেও নন্দার আগ্রহে তিনি সমস্ত অপরাহ্নটা ভুবনেশ্বরীর মন্দির-চত্বরে অতিবাহিত করিতেন।

পরকে সহজে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতা বিধাতা বংশীকে প্রচুররূপেই দিয়াছিলেন। কোথাও কাহারও কাছে তাহার বাধিত না। উদ্দাম নদীস্রোতের ন্যায় ছোটখাটো বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার পথ সে আপনিই করিয়া লইতে পারিত।

বজরায় অবস্থানকালের মধ্যেই বংশী যোগমায়াকে 'মা' ডাকিয়া, সুরেশ্বরকে 'দাদা' সম্বোধন করিয়া একবারে তাঁহাদের ঘরের ছেলে হইয়াছিল। এককালে সুরেশ্বরের ফটো তোলার বাতিক ছিল, সে দিনকার সাধের 'ক্যামেরা'টা আবর্জ্জনার সামিল দাঁড়াইলেও বংশীর অদম্য উৎসাহে সুরেশ্বর পুনরায় সেটা লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে সুরেশ্বর একবার সঙ্গীতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহা সা, রে, গা, মা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া বন্ধ হইয়াছিল।

বংশীর সাহচর্য্যে প্রতি সন্ধ্যায় সে পুরাতন লুপ্ত বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। বংশী যে সুরেশ্বরের উদাসচিত্ত নানা কাযে, আনন্দে, উৎসাহে ভরাইয়া রাখিতেছে, ইহাতেই যোগমায়া বংশীর প্রতি যেমন কৃতজ্ঞ, তেমনই প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, বংশী দীর্ঘকাল সুরেশ্বরের সঙ্গী থাকিলে সুরেশ্বরের পত্নীবিয়োগের মর্ম্মান্তিক বেদনার তীব্রতা কমিয়া যাইবে। সুরেশ্বর শান্তিলাভ করিবে।

মা'র অন্ধবিশ্বাসের ফলে—আপনার সরল স্বভাবের গুণে রায়পরিবারে বংশীর সমাদরের সীমা ছিল না। দাস-দাসী হইতে বাড়ীর কর্ত্তা-গৃহিণী অবধি বংশীর বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাযেই বংশীর দিনগুলি মন্দ কাটিতেছিল না।

কেবল নন্দাই ইহাদের সহিত মিশ খাইতে পারিতেছিল না। আপনার মায়ের পর প্রথম সে অন্নপূর্ণাকে মা ডাকিয়া ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভরতা লইয়া তাঁহার পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, সেই অসীম স্নেহ স্বেচ্ছায় হারাইয়া আর কাহাকেও মা বলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। এক জনকে যথার্থ মা ভাবিয়া মা'র সম্মান সে রাখিতে পারিল না, আবার মা ডাকিয়া মা নামের অমর্য্যাদা কেন?

যোগমায়া নিঃশব্দে মালা জপ করিতেছিলেন, সুনন্দা পিপাসিত আঁখির পিপাসা মিটাইতেছিল। এমন সময় হাসি-কলরবে চারিদিক্ সচকিত করিয়া বংশীর সহিত সুরেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাহাড়ের গায়ে ঝরণার ছবি লইতে তাঁহারা নীচে নামিয়াছিলেন, কাপড় ছিঁড়িয়া হাতে গায়ে মাটী মাখিয়া শ্রান্তক্লান্তভাবে উভয়ে যোগমায়ার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সুনন্দা শিথিল অঞ্চলটা মাথার উপর আর একটু টানিয়া দিল।

যোগমায়ার মালাজপ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দিনান্তের অস্তগামী সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া মালাগাছা মাথায় ঠেকাইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমাদের ছবি নেওয়া হ'ল, বাবা? ওপরের এত দৃশ্য থাকতে আবার নীচে নামা কেন? গায়ে যে কাদা লেগে গেছে। ও কি মা,

তুমি সুরকে দেখে মাথায় কাপড় টানছ কেন? ও যে তোমার দাদার মত, ওর কাছে লজ্জা কিসের?"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "সত্যি মা, উনি বংশীদা'র মত নন, ভারী লাজুক। আমাকে রীতিমত লজ্জা ক'রে চলেন, বংশীদার দাদা হয়েছি, কিন্তু দিদিমণির ভাই হবার যোগ্যতা এখনও লাভ করি নি।"

বংশী নন্দার নিকটস্থ হইয়া তাহার পৃষ্ঠে গোটা দুই মৃদু চপেটাঘাত করিয়া কৃত্রিম ধমকের স্বরে কহিল, "তুই ত কোনকালেও লজ্জাবতী লতা ছিলি না, নন্দা! এ আবার কি রে? সুরদাকে লজ্জা কচ্ছিস দেখে আমারই যে লজ্জা কচ্ছে। আমি তোর শুধু দাদা আর উনি হলেন 'বড় দাদা, ডাক বড়দাদা ব'লে!"

নন্দা সুরেশ্বরের প্রতি চোখ তুলিয়া সলজ্জ-কণ্ঠে ডাকিল "বড় দাদা।" যোগমায়ার চক্ষু সজল হইল। তিনি স্নেহ-বিজড়িত স্বরে বলিলেন, "ভগবান্ যা থেকে বঞ্চিত করে-ছিলেন, তীর্থে এসে তাই পেলি সুর; ভাইও পেলি, ছোট বোন্‌টিও হ'ল।"

সুরেশ্বর হাসিমুখে বলিলেন, "কপালে থাক্‌লে পথে কুড়িয়েই রত্ন পাওয়া যায়, মা। ছোট বোন্ পেলাম, বড়দাও হলাম, কিন্তু আমি বোন্‌টিকে দিদিমণি ব'লে ডাকবো, আমার দিদিমণি ডাকতে সাধ হয়েছে।"

"তাই ডাকিস, সুর! আমারও একটা ইচ্ছা হয়েছে, সুনন্দাকে আমার নন্দিনী ব'লে ডাকতে সাধ হয়। তীর্থে এসে মানুষ তীর্থগুরু, তীর্থমা কত কি পায়, আমিও নন্দিনী পেয়েছি।—হ্যাঁ মা, আমি তোমায় নন্দিনী বল্লে তোমার কি আপত্তি আছে?"

রবিবাবুর 'রক্ত করবীর' নন্দিনীর কথা মনে করিয়া নন্দা হাসিয়া বলিল, "না, আপত্তি কিসের? আজ থেকে আপনি আমার মাসীমা হলেন। দেশে আমার এক মা আছেন, আপনাকে মাসীমা বলতেই আমার ভাল লাগবে। আপনি আমায় নন্দিনীই বলবেন, মাসীমা।"

বংশী পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "নন্দাকে নন্দিনী বানিয়ে বেশী ভালবাসলে চলবে না, মা। আমিও হেলা-ফেলার দ্রব্য নই, আমাকে নন্দন বল্লে মন্দ শোনাবে না। নন্দা মার বোনঝি, আমি হলাম ছেলে।"

বংশীর বলিবার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। হাসি-কৌতুকের মধ্যে সে দিনকার সভাভঙ্গ হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

চাঁদের মরণ

ফি'ক হয়ে গেছে নিবিড় আঁধার,
ফোটো ফোটো প্রায় দৃশ্য ধরার।

শীতল মৃদুল বায়ে বারবার
নেভে সারি সারি প্রদীপ তারার।
দিনের আলোকে দীপ-শিখা প্রায়
নিষ্প্রভ চাঁদ গগনের গায়।
ক্লান্ত চরণে পাণ্ডু বদনে,
ঢলিয়া পড়িল মরণ-শয়নে।
পূরব আকাশ করিয়া উজল,
জলিয়া উঠিল তার চিতানল।
প্রিয়বিচ্ছেদে হয়ে পাগলিনী
ঝাঁপ দিল তাই জলে কুমুদিনী।

টুপ টুপ করি প্রকৃতি দেবীর,
শিশিরে ঝরিল নয়নের নীর;
তারি শোকে হায় একে একে পাখী,
সকরুণ স্বরে ওঠে ডাকি ডাকি।
চাহিল মানব মেলিয়া নয়ন,
উঠিল ছাড়িয়া নিশীথ শয়ন।
কল কোলাহল জাগিল ধরায়,
জীবন-যুদ্ধে সবে ধেয়ে যায়।
ইন্দু-বিয়োগে বিন্দু ব্যথায়,
কারো চোখে জল ঝরিল না হায়!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ব্যাঘ্র-কবলে চা-কর

(শিকার-কাহিনী)

মি, এইচ, বুকানন তেজপুর জেলার এক জন প্রবীণ ও বহুদর্শী চা-কর। তিনি সংপ্রতি লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিকে ব্যাঘ্র-শিকারের যে লোমহর্ষণ কাহিনী প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাগণের প্রীতিকর হইবে, এই আশায় তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মিঃ বুকানন লিখিয়াছেন, "আসামে চা আবাদের কায যে সকল সময়েই বৈচিত্র্যহীন, এ কথা বলা চলে না। গত কুড়ি বৎসর হইতে আমি এ দেশে বাস করিয়া আসিতেছি—কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমি এক দিন যে ভীষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা এত দিন পরেও ভুলিতে পারি নাই।

আসামের তেজপুর জেলায় আমাদের বাগানে, এক দিন প্রভাতে আমি আমার বাংলোর বারান্দায় বসিয়া 'ছোট হাজিরী' উপভোগ করিতেছিলাম, সেই সময় এক জন কুলী উত্তেজিতভাবে আমার বাংলোর আঙ্গিনায় দৌড়াইয়া আসিল এবং রুদ্ধশ্বাসে আমাকে জানাইল—তাহার ভাইকে বাঘে খা'ল করিয়াছে। তাহার কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি 'হাজিরা' শেষ করিয়া, আমার 'উইনচেষ্টার' সহ তাহার সঙ্গে 'কুলী লাইনে' চলিলাম। চলিতে চলিতেই বন্দুকে টোটা ভরিয়া লইলাম। কুলীটা তাহার যে ভাইএর কথা বলিয়াছিল, সে আমাদের বাগিচায় হাঁসপাতালে 'ড্রেসারের' কায করিত।

'ড্রেসার' তাহার অভ্যাসানুযায়ী সেই দিন প্রত্যুষে উঠিয়া, হাঁসপাতালের কার্য্যে যোগদানের পূর্ব্বে, তাহার ছাগলগুলিকে চরাইতে লইয়া গিয়াছিল। সে ছাগলগুলিকে চরিতে দিয়া অদূরবর্ত্তী হাঁসপাতালের দিকে যাইতে যাইতে একটা ছাগলের আর্ত্তধ্বনি শুনিতে পাইল, ছাগলটার আর্ত্তনাদে একটু বিশেষত্ব ছিল, যেন তাহার কণ্ঠরোধের উপক্রম হইয়াছিল। ছাগলটাকে শিয়ালে ধরিয়াছে মনে করিয়া ড্রেসার একখান লাঠী লইয়া, ব্যাপার কি, তাহা দেখিতে চলিল।

চা-বাগিচার ভিতর দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ নালা কিছু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। ছাগলের আর্ত্তনাদ সেই নালা হইতে আসিতেছিল মনে হওয়ায় ড্রেসারটা সেই নালার সন্নিহিত সুদীর্ঘ শুষ্ক ঘাসগুলি দুই হাতে ফাঁক করিয়া দেখিতে পাইল—বাদামী রংএর একটা মূর্ত্তি তাহার ছাগলটিকে আক্রমণ করিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে অগ্রসর হইয়া তাহার হাতের লাঠী দিয়া সেই মূর্ত্তির উপর আঘাত করিবামাত্র একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকার ছাড়িয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহাকে এরূপ সাংঘাতিকভাবে চর্ব্বণ করিল যে, সে হাঁসপাতালে নীত হইবার অল্পকাল পরেই প্রাণত্যাগ করিল। তাহার স্ত্রী তাহার কুটীর হইতে ড্রেসারের সেই বিপদ দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সে তাহার স্বামীকে সাহায্য করিতে আসিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছিল।

এই সকল সংবাদ শুনিয়া আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। অল্পকাল পূর্ব্বে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণের অভাব হইল না। কিন্তু আমি বাঘটাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না; তবে আমার মনে হইল—বাঘটা নিকটেই কোথাও লুকাইয়া আছে; এই জন্য, সেটা হঠাৎ পলায়ন করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি চারিদিকে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিবার জন্য কুলী সংগ্রহ করিতে চলিলাম।

কিন্তু এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র জটিলতা ছিল না। যেখানে বাঘটা লোকটিকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই স্থানটি ত্রিভুজাকার এবং তাহার পরিমাণফল তিন একরের অধিক নহে, তাহা চা-গাছে পূর্ণ। সেই ক্ষেতের দুই পার্শ্বে পথ; পথ দুইটি ত্রিভুজের দুই বাহুর মত প্রসারিত হইয়া যে স্থানে পরস্পর মিলিত হইয়াছে, হাঁসপাতালটি সেই স্থানে অবস্থিত। তাহার বিপরীত দিকে ফাঁকা ময়দান। আমি যে সকল লোক লইয়া আসিলাম, তাহারা সেই স্থান হইতে কেরোসিনের ক্যানেস্তা বাজাইতে বাজাইতে সম্মুখে অগ্রসর হইল। আমি তাহাদিগকে বলিয়া রাখিলাম—বাঘটাকে তাহারা পলায়নের চেষ্টা করিতে দেখিলেই আমাকে সংবাদ দিবে।

অতঃপর আমি কারখানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে কুলীরা সমবেত হইয়া সেই দিনের কাযের ভার লইবার

জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহাদের দলের কোন্ কোন্ কুলী ব্যাঘ্র-শিকারে আমাকে সাহায্য করিতে যাইবে?—আমার কথা শুনিয়া সকলেই আমার সঙ্গে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি তাহাদের সকলকে না লইয়া, ৪০ জন বলবান্ মুণ্ডা কুলীকে বাছিয়া লইলাম। শিকারে তাহাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা ছিল, এবং আমি জানিতাম, এই কার্য্যে তাহারা আনন্দের সহিত যোগদান করিবে।

আমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। যাহারা ক্যানেস্তা বাজাইয়া বাঘটাকে তাড়াইয়া বাহির করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, আমি তাহাদের সম্মুখে রহিলাম। সকল আয়োজন শেষ হইলে আমি ক্যানেস্তা-বাদকদের ক্যানেস্তা পিটিতে পিটিতে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলাম। আমার আদেশে তাহারা ক্যানেস্তা বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইল। সেই সময় তাহারা এরূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল যে, আমার মনে হইল, সেই চীৎকার শুনিলে যে কোন সাহসী জানোয়ার প্রাণভয়ে পলায়ন করিত।

তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ক্যানেস্তা বাজাইয়া ও ভৈরব হুঙ্কারে কয়েক গজ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় বাদামী ও কালো রংএর চক্রবিশিষ্ট একটা বাঘ বিদ্যুদ্বেগে চা-গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া একটা ক্যানেস্তা-বাদক কুলীর ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। শিকারীর গুলীর আঘাতে খরগোস্ যে ভাবে মাটীতে লুটাইয়া পড়ে, বাঘটার আক্রমণে সেই কুলী বেচারাও সেই ভাবে ভূতলশায়ী হইল। তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গী সকল কুলী মুহূর্ত্তমধ্যে বাঘটাকে চারিদিক্ হইতে এ ভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়া, সজোরে ক্যানেস্তা বাজাইতে ও 'হলুই' দিতে লাগিল যে, আমি জানোয়ারটাকে গুলী করিতে সাহস করিলাম না।

বাঘটা যেরূপ বেগে আমাদের সম্মুখে আসিয়াছিল, কুলীটাকে ঘা'ল করিয়া সেইরূপ বেগেই চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইল! আমি তখন কুলীগুলাকে তফাতে সরাইয়া আহত কুলীটাকে চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে পাঠাইলাম; তাহার পর তাহাদিগকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিলাম—ভবিষ্যতে তাহারা ও ভাবে চারিদিক্ হইতে শিকারটাকে না ঘিরিয়া, নিজের যায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, কোন কারণে তাহারা স্থানত্যাগ করিবে না; তাহা হইলে আমি তাহাদের কাহারও জীবন বিপন্ন না করিয়া বাঘটাকে গুলী করিতে পারিব। কিন্তু তাহারা তখন এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের কেহই আমার আদেশে কর্ণপাত করিল না। সুতরাং আমি যে ভাবে বাঘটাকে শিকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, ঠিক সেই ভাবে শিকার করিবার সুযোগ পাইব—ইহা আশা করিতে পারিলাম না।

এ অবস্থায় মাটীতে দাঁড়াইয়া বাঘটাকে শিকার করিবার চেষ্টা করিলে বিপদ ঘটিতে পারে, ইহা আমার সঙ্গীদের বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বলিলাম, শিকার আপাততঃ বন্ধ থাক, আমি শীঘ্রই একটা হাতী এবং কয়েক জন বন্দুকধারী ইংরাজ শিকারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব; তখন আমরা নিরাপদে বাঘটাকে শিকার করিতে পারিব। কিন্তু উত্তেজিত কুলীর দল ততখানি বিলম্ব করিতে সম্মত হইল না। আমার প্রস্তাবে তাহারা কর্ণপাত করিল না। তাহারা মাথা ঝাঁকাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, বাঘটা তাহাদের দলের দুই জন লোককে কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে, তাহারা স্বহস্তে ইহার প্রতিফল দিবে। তাহারা আমার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, বাগানে চায়ের গাছগুলি এরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, সেই দুর্গম স্থানে হাতীর মত প্রকাণ্ড জানোয়ারের পক্ষে পথ করিয়া লইয়া অগ্রসর হওয়া অসাধ্য হইবে।

কুলীরা আমার মতানুবর্ত্তী হইল না দেখিয়া আমি আমার সাবেক যায়গায় ফিরিয়া আসিলাম এবং আমার সহচরদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলাম। এইবার ক্যানেস্তাবাদকের দল চায়ের ক্ষেতের ভিতর দিয়া বাগানের প্রায় অর্দ্ধাংশ অতিক্রম করিল। সেই সময় সেই ভীষণ-দর্শন ক্রুদ্ধ জানোয়ারটা বিকট গর্জ্জন করিয়া হঠাৎ লাফাইয়া পড়িল, এবং দুই জন কুলীকে আক্রমণ করিয়া এ ভাবে তাহাদিগকে চিবাইয়া দিল যে, তাহার তীক্ষ্ণ দন্তের আঘাতে তাহারা দুই জনেই সেই স্থানে প্রাণত্যাগ করিল! ক্রোধান্ধ কুলীরা বাঘটাকে এভাবে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে করিতে লাঠী ঘুরাইতে লাগিল যে, পাছে আমার গুলীতে তাহাদের কেহ আহত হয় বা পঞ্চত্ব লাভ করে, এই ভয়ে এবারও আমি বাঘটাকে লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিতে

সাহস করিলাম না। বাঘটা সেই সুযোগে পুনর্ব্বার আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইল। কুলীগুলার বুদ্ধির দোষে আমার চেষ্টা এই ভাবে বিফল হওয়ায় আমার ক্ষোভের সীমা রহিল না; আমি তাহাদিগকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করিলাম।

কিন্তু তখন তাহাদের মাথায় 'খুন চাপিয়াছিল'; তাহারা আর একবার চেষ্টা না করিয়া ছাড়িবে না বলিল। কিন্তু তাহাতে বিপদ অপরিহার্য্য বুঝিয়া, আমি দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে সেই চেষ্টায় বিরত হইতে আদেশ করিলাম। বাঘটা সেই অল্পসময়ের মধ্যে তিন জনকে দন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া হত্যা করিয়াছিল:—'ড্রেসার'টা এবং দুই জন কুলী—এই তিন জনের কেহই জীবিত ছিল না! এ অবস্থায় তখন আর শিকারের চেষ্টা না করাই কর্ত্তব্য, এই কথা বুঝাইবার জন্য আমি আমার অনুচরদের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলাম। সেই সময় আমার বৃদ্ধ কুকুর, 'মংগ্রেল'টা, আমরা যে পথে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই পথে আসিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কুকুরটা আমাদের কাছে আসিয়া সহসা চায়ের গুল্মরাশির ভিতর প্রবেশ করিল, এবং সেই স্থান হইতে একটি সঙ্কীর্ণ ড্রেণের নিকট উপস্থিত হইলে হঠাৎ তাহার চলৎশক্তি রহিত হইল! সে অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই স্থান হইতে তাহাকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়ায় আমার মনে হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন হঠাৎ পাষাণে পরিণত হইয়াছে; কেবল তাহাই নহে, তাহার পিঠের লোমগুলি কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম—কুকুরটা আতঙ্কে অভিভূত হওয়ায় তাহার ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা!

আমি কুকুরটার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে কিছুকাল সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চায়ের গাছগুলির ভিতর দিয়া অতি ধীরে পিছাইয়া আসিল, এবং নিস্তব্ধভাবে পথে উঠিয়া দ্রুতবেগে কুলীদের বস্তির দিকে পলায়ন করিল। তাহাকে ঐ ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমার ধারণা হইল, কুকুরটা হয় বাঘটাকে দেখিতে পাইয়াছিল, না হয় বাঘের গায়ের গন্ধ তাহার নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। বুঝিলাম, আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার কয়েক গজ দূরবর্ত্তী ড্রেণের ভিতর বাঘটা লুকাইয়া বসিয়া ছিল।

এইরূপ অনুমান করিয়া আমি একটি ফন্দী খাটাইলাম, তৎক্ষণাৎ একটা মুণ্ডা কুলীকে ডাকিয়া বলিলাম, "বাঁশের একটা লম্বা 'আগালে' কাটিয়া আনিয়া, তাহার এক মুড়ায় কতকগুলা খড় বাঁধিয়া লও, ইহাতে তাহা কতকটা মশালের মত দেখাইবে; সেই মশালে আগুন ধরাইয়া, ড্রেণের মাথায় যে শুক্‌নো ঘাস দেখিতেছ, ঐ ঘাসে মশালের আগুন লাগাইয়া দাও। ড্রেণের একটু তফাতে দাঁড়াইয়া সতর্কভাবে ঘাসে আগুন ধরাইবে, এবং সেই আগুনে ড্রেণের ঘাসগুলি জ্বলিয়া উঠিবামাত্র তাড়াতাড়ি পথের উপর পলাইয়া আসিবে।"

দুর্ভাগ্যক্রমে কুলীটা আমার এই আদেশ অগ্রাহ্য করিল। ড্রেণের ঊর্দ্ধস্থিত ঘাসগুলি অগ্নিস্পর্শে জ্বলিয়া উঠিবামাত্র সেই স্থান হইতে পলায়ন না করিয়া সে ড্রেণের অন্য মুড়ায় চলিয়া গেল, তাহাকে ড্রেণের পাশ দিয়া সেই দিকে যাইতে দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে থামিতে আদেশ করিলাম; কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। ইহাতে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিল।

বাঘটা যেখানে লুকাইয়া বসিয়া ছিল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম, কুলীটা সেই স্থানে যাইবামাত্র বাঘটা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহাকে দন্তাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া চায়ের গুল্মরাশির ভিতর প্রবেশ করিল, কেহই তাহাকে আর দেখিতে পাইল না, অন্যান্য কুলীরা মুণ্ডা কুলীটার শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়া প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিল।

আমি সেই ড্রেণের মাথায় দাঁড়াইয়া বাঘটার কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতেছিলাম। বাঘটা তৎক্ষণাৎ তাহার গোপনীয় আশ্রয়স্থান হইতে বাহির হইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এক লম্ফে তাহার সম্মুখের দুই পা ঊর্দ্ধে তুলিল; সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া লাফাইবামাত্র আমি গুলী করিলাম; কিন্তু গুলী চালাইবার পূর্ব্বে আমি লক্ষ্য স্থির করিবার সুযোগ পাই নাই; চক্ষুর নিমেষে রাইফেলটা আমার হাত হইতে খসিয়া পড়িল, এবং সেই মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখের দুই পা আমার উভয় স্কন্ধে স্থাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সে সুদীর্ঘ

তীক্ষ্ণ দন্তশ্রেণী উদ্ঘাটিত করিয়া এ ভাবে মুখব্যাদান করিল—যেন সেই মুহূর্ত্তেই সে আমার মস্তকটি গ্রাস করিবে !

তখন আমার অবস্থা কি ভয়াবহ ! তাহার দেহের ঊর্দ্ধাংশের সকল ভার আমার স্কন্ধে স্থাপিত হইল। আমি সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়াও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম ! তাহার পর যখন দেখিলাম, তাহার উদ্ঘাটিত দন্তশ্রেণী আমার মাথার কাছে নামিয়া আসিয়াছে, মাথাটি তাহার মুখে প্রবেশ করে আর কি, তখন আমি দেহের সকল শক্তি আমার উভয় মুষ্টিতে সঞ্চয় করিয়া দুই হাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিলাম। তাহার পশ্চাতের পদদ্বয় মাটীতে, সে সম্মুখের পদদ্বয় আমার স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা আমার মুখ স্পর্শ করিবার জন্য দৃঢ়বলে আমার উভয় মুষ্টির বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি 'মরিয়া' হইয়া উভয় হস্তের মুষ্টি শক্ত করিয়া আঁটিয়া রাখিলাম। আমার মুষ্টির বন্ধন যাহাতে শিথিল না হয়, সে জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু বাঘটার দেহের বল কি ভীষণ ! সে আমার স্কন্ধে যে দুইখানি পা তুলিয়া দিয়াছিল, তাহাতে এরূপ বেগে চাপ দিতে লাগিল যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মনে হইতে লাগিল, আর আমার রক্ষা নাই, সেই চাপে আমাকে অবিলম্বে ধরাশায়ী হইতে হইবে। আমার দেহের ভারকেন্দ্র যেন স্থানভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইল।

আমার গলদেশে ও উভয় স্কন্ধে যে চাপ পড়িল, তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমার দেহের পেশী ও শিরা উপশিরাগুলি সেই প্রচণ্ড চাপে যেন টন্ টন্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তাহাদের মট্ মট্ শব্দ আমি সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলাম। সেই মুহূর্ত্তে একটা গাছের গুঁড়িতে পা বাধিয়া যাওয়ায় আমি ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলাম ; আমার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল। কিন্তু তথাপি আমি সেই জানোয়ারটার গলা ছাড়িলাম না ; আমি তাহা পূর্ব্ববৎ দৃঢ় মুষ্টিতে আঁটিয়া ধরিয়া রাখিলাম। সেই সময় সে তাহার সম্মুখস্থ দক্ষিণ পা-খানি আমার কাঁধ হইতে নামাইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া চাপ দিতে লাগিল।

ব্যাঘ্র-কবলে চা-কর

আমি তখন চিৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম,—জানোয়ারটা আমার বুকের উপর দাঁড়াইয়া গর্জ্জন্ করিতে লাগিল। সেই

অবস্থাতেও আমি উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহার গলা এ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম যে, বাঘটার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল। এই ভাবে পড়িয়া থাকায় আমি আমার হাতের কব্জিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল পাইয়াছিলাম। বাঘটার গলায় আমার মুঠার প্রচণ্ড চাপ পড়ায় সে হাঁপাইতে লাগিল, মুখব্যাদান করিয়া জোরে জোরে শ্বাস টানিতে লাগিল; কিন্তু আমারও বল ক্রমশঃ টুটিয়া আসিল।

বাল্যকালে আমার ডান হাতখান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, হাতের ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাইবার ক্রটিতে পরিণতবয়সেও আমি হাতখানি সটান সোজা করিতে পারি নাই। বাঘটা মুখ নামাইয়া আমার মস্তকটি গ্রাস করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে, আমি তাহার গলা ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া রাখায় আমার ভাঙ্গা হাতে যে চাপ পড়িল, তাহা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল এবং কনুই বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। ভাঙ্গা হাতখানি ঠিক সোজা করিতে না পারায় তাহা একটু বাঁকিয়া রহিল, এজন্য তাহা উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিতে আমার ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল, বিশেষতঃ তাহার কণ্ঠনালীর যে পেশী আমি দৃঢ়-মুষ্টিতে আয়ত্ত করিয়াছিলাম, তাহার দৃঢ়তা আমার হাতের পেশীর অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক। কয়েক মিনিট পরে আমার ভাঙ্গা ডান হাতখান নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আর তাহা সোজা রাখিতে না পারায় ক্রমশঃ তাহা বাঁকিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারটার ভয়ঙ্কর মুখ ও তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের অসহ্য দুর্গন্ধ আমার মুখের কাছে ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় আমি হতাশভাবে হাত ছাড়িয়া দিলাম; তৎক্ষণাৎ তাহার সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণ দন্তশ্রেণী সশব্দে আমার মাথায় বসিয়া গেল! আমি প্রাণের আশা বিসর্জ্জন করিয়া ব্যাকুলভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। আকুল প্রার্থনা আমার মনের ভিতর গুঞ্জরিয়া উঠিতেই বাঘটা আমাকে ছাড়িয়া দিল।

আমি কোন রকমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে হাসপাতালের পথে অগ্রসর হইলাম। আমাকে আশ্রয়-দানের জন্য অনেকেই সাগ্রহভরে হাত বাড়াইল। আমি শোণিতাপ্লুত দেহে হাসপাতালের 'ড্রেসিং রুমে' নীত হইলাম।

আমি সেখানে য়ুরোপীয় চিকিৎসকের আগমন প্রতীক্ষায় অবসন্ন-দেহে পড়িয়া রহিলাম। আমাদের চা-বাগিচার অনতিদূরে আর একটি বাগিচা আছে—সেই বাগিচার ম্যানেজার জিম ব্রিসকেট আমার বন্ধু, তাঁহাকে অবিলম্বে আসিবার জন্য খবর দেওয়া হইল। তাঁহাকে তাঁহার হাতীটিও সঙ্গে আনিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। তিনি তাঁহার হাতী এবং 'ডবল এক্‌স্‌প্রেস্ রাইফেল' সহ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

জিমের শিকারী হাতীর নাম ধনরাজ। আমি চা-বাগিচার যে স্থানে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম, সেই স্থানে ধনরাজ পরিচালিত হইল। সে পথ হইতে নামিবামাত্র ব্যাঘ্রের গম্ভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা ক্ষিপ্তবৎ হইয়া ধনরাজকে আক্রমণ করিল, এবং ব্রিস্‌কেট্‌কে লক্ষ্য করিয়া তীরবেগে ছুটিয়া শূন্যে একটি লাফ্ দিল! কিন্তু শার্দ্দূলরাজের আক্রমণে বৃদ্ধ ধনরাজ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় অকম্পিত রহিল। জিম বাঘটার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া এক গুলী মারিতেই সে মাটীতে পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পুনর্ব্বার লাফাইতে উদ্যত হইল; ব্রিসকেট আর এক গুলীতে তাহার চক্ষু বিদীর্ণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাঘ্রলীলার অবসান।

ডাক্তার আসিয়া আমার ক্ষত পরীক্ষার পূর্ব্বে আমি বুঝিতে পারি নাই যে, আমার ক্ষতগুলি সাংঘাতিক হয় নাই। বাঘটার তীক্ষ্ণ দন্তে আমার মস্তকের অস্থি বিদ্ধ হইলেও সৌভাগ্য বশতঃ তাহা আমার মস্তিষ্ক ভেদ করিতে পারে নাই। আমি আরও শুনিতে পাইলাম—বাঘের থাবায় আমার ঘাড়ে যে ক্ষত হইয়াছিল, সেই ক্ষতের নীচে এক চুল ব্যবধানে একটি শিরা ছিল; তাহাতে নখর বিদ্ধ হইলে আমাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইত; অতি অল্পের জন্য আমার রক্ত বিষাক্ত হইতে পারে নাই বলিয়াই অবশেষে আমি আরোগ্যলাভ করিলাম। আহত কুলী দুই জনও ক্রমশঃ সুস্থ হইল। আমার শিকার-স্মৃতির দর্শনস্বরূপ বাঘটার চামড়াখানি বাঁধাইয়া রাখিয়াছি!"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ধূমকেতু

নাটিকা

পাত্র

তারিণী দত্ত	...	সুদখোর ধনী বৃদ্ধ
অপ্রকাশ	...	ঐ নাতজামাই
দেবনাথ	...	ঐ ভাগিনেয়ী-পুত্র
ঘটক	...	...
বরপক্ষীয় ভদ্রব্যক্তিদ্বয়	...	...
প্রতিবেশিদ্বয়	...	...
ভৃত্য	...	...
পাণওয়ালা	...	...
বাস্তু বাগ	...	...

পাত্রী

সুহাসিনী	...	তারিণীর পৌত্রী
অপ্রকাশের মাতা	...	...
গয়লানী	...	...

প্রথম দৃশ্য

তারিণী দত্তর বহির্ব্বাটীর কক্ষ

তারিণী ও ঘটক

তারিণী দত্ত। আপনি খুব ভাল সম্বন্ধ এনেছেন, বেশ করেছেন, কিন্তু এনেছেন বলেই যে আমায় তক্ষণি তাকে মেনে নিতে হবে, এও ত বড় মন্দ কথা নয়! না মশাই! একেবারে ক্ষেপে যাই নি ত, তামাসা পেয়েছেন না কি! হাঁ!

ঘটক। আজ্ঞে, তামাসার আর এতে কি পেলুম? আমাদের কাযই তো এই; আমরা হলুম, প্রজাপতির দূত, কোথায় কোথায় ফুল ফুটেছে খবর নিয়ে আসি, ফুলের মালা যাঁরা করবার, তাঁরাই বিনিময় ক'রে নেন, আমরা শুধু অগ্রদূত, শুভ-মিলনের উত্তরসাধক।

তারিণী। (চটিয়া উঠিয়া) অগ্রদূত না ভগ্নদূত! কোন্ শ্যাওড়াগাছে ফুল ফুটেছে, তাই এসেছ আমার কাছে খবর দিতে? এর চাইতে তামাসা আবার কা'কে বলে? আমার কি না এখন মালা-বদলানোর সময় পড়েছে? নাই বা থাকলো আমার বংশধর? তাতে তোমাদের কার কি ক্ষতি হচ্ছে? যদি বংশধর আমার থাকবারই হতো, তা হ'লে একটার পর একটা ক'রে ছেলেমেয়েগুলো সব যাবেই বা কেন? যাক্, ও যম যখন নিশ্চিন্দিই করেছে, তখন আর ও হাড়িকাঠে মাথা গলাতে যাচ্ছি নে, এ এক রকম আছি ভাল, কোন জ্বালা-ঝক্কি নেই, খাই-দাই নিদ্রে যাই, যে ক'টা—

(প্রতিবেশীর প্রবেশ)

প্রতিবেশী। বলেন কি ঠাকুদ্দা, নিদ্রে আপনার হয়? দেশে যে শুনছি, ভারি চোরের উৎপাত হয়েছে।

তারিণী। না না, কে বল্লে? অমন সব বে-ফাঁস বে-ফাঁস কথা তোরা পাস কোত্থেকে বল্ ত? কে তোদের ও সব বাজে খবর দেয়? (আত্মগত) দুগ্গা! দুগ্গা! মা! হত-চ্ছাড়া ছোঁড়া মনটা বেজায় রকম বিগড়ে দিলে। সিন্দুক-ফিন্দুকগুলো পাশের ঘর থেকে না হয় মাঝের ঘরেই আনাবো। আচ্ছা, সিন্দুকটার উপর বিছানা পেতে শুলে কেমন হয়?

ঘটক। তা হ'লে কি বিয়েয় আপনার মত নেই? তাঁদের ব'লে এসেছি, আবার খবর দিতে হবে।

তারিণী। (সক্রোধে) না না, মত নেই, একশো বার না, দুশো বার না, সেই দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর" সেই পেয়েছেন না কি—"পেঁচোর মাকে বিয়ে কর," আমাকেও? বিয়ে করবার সখ আমার নেই। গিন্নীর যখন গঙ্গালাভ হয়, তখন ত ইচ্ছে করলে অনায়াসেই ডাগর-ডোগর দেখে মেয়ে বিয়ে ক'রে এনে সংসার-ধম্ম বজায় করতে পারতুম, তাই বলে করি নি। তখন ত ছেলে দুটির বয়েস পনের আর সতের, মেয়েটার তখন প্রথমকার সন্তানটি মাত্তর জন্মেছে।

প্রতিবেশী। তা ঠাকুদ্দা! করেই ফেলুন না একটি ডাগোর-ডোগর দেখে বিয়ে, আপনি তাঁকে দেখা-শুনো না ক'রে উঠতে পারেন, আমায় নিযুক্ত ক'রে নেবেন, ঠানদির সব ভার ঝক্কি না হয় আমিই ঠেল্‌বো, কিন্তু তখন আর তিন পয়সার বাজারে চলবে না, 'বাজার হদ্দা কিইনে এন্যা চাইলে দিচ্ছি পায়।' করতে হবে, ভয় হয়, হাটফেল না করে!

ঘটক। আপনি কি বলছেন? বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো আবার কি? আমি ত আপনার নাতনী সুহাসিনীর জন্যে একটি সুপাত্রের সন্ধান নিয়ে এসেছি, তা যদি নেহাৎই এখন বিয়ে না দেন, সে আপনার ইচ্ছা, কিন্তু পাত্রটি সব দিক দিয়েই উপযুক্ত ছিল।

তারিণী। সুহাসের জন্যে বরের খবর দিচ্ছেন? তা কেমন ক'রে বুঝবো বলুন? তার কি এখন বিয়ের সময় হয়েছে? এই ত সে দিন সে জন্মালো। আমার ঘরেই জন্ম হয়, নাপতে এলো খবর নিয়ে। অবাক্ ক'রে দিলে, মশাই! একটা মেয়ে ছানা হয়েছে, তার আবার নাপতে বিদেয়! আমার বাপ কখনও এমন কথা শোনেন নি। আবার বলে কি না, আপনার এই পেরথমকার নাতনী, সৃষ্টিধরী, বংশধরী, জোড়া টাকা, ধুতী-চাদর, আর ঢালাই ঘড়া, এর কমে নিচ্ছি নে; বায়নাক্কা কত!

প্রতিবেশী। দিলেন?

তারিণী। হুঁ, দিচ্ছে! তুমিও যেমন! দিলুম ত কচুটি! তবে বরাতে থাকলে কে খণ্ডাবে? তখন আমার মেয়ে হরিদাসী বেঁচে, সে চুপে চুপে খিড়কি দোরে ডেকে নে গিয়ে দুটো টাকা না কি দিয়েছিল, পরে আমি শুনলুম। নিজের ট্যাঁক থেকেই দিক, আর আমার থেকেই দিক, ও ত জলেই গেল। এই যে এখন মেয়ের বে' দিতে হবে, দেবে কি তারা তোর ঐ দুটো টাকার একটাও তোকে ফিরিয়ে?

প্রতিবেশী। হ্যাঁ ঠাকুদ্দা! মেয়ের জন্যে যেটা খরচ হয়, সেটা ত জলেই যায়, আর ছেলেবটা বুঝি ডাঙ্গায় থাকে?

তারিণী। তা' না ত কি? ছেলের বিয়েতে ত আর ঘর থেকে টাকার বস্তাটি বার করতে হয় না বাপু! তার বদলে ও নাপতে বিদায়ে দুটো, অন্নপ্রাশনে চারটে, এই উপনয়নে সাতটা এই রকম না হয় করা হ'ল। আর এঁদের —গাছেরও পাড়বেন, তলারও কুড়বেন, মজাটি মন্দ নয়।

ঘটক। তা হ'লে বিবাহের

তারিণী। না না, ও সব ল্যাটা এখন সাধ ক'রে ডেকে আনার দরকার নেই। ও দূরের আপদকে নিকট ক'রে কোন লাভ নেই। যদ্দিন যায়, তদ্দিন ভাল। যদ্দিন না যায়, তদ্দিন ভাল। তা ছাড়া, দেখুন, এই আমি এখনকার ছোঁড়াদের ঐ মতটাকে পছন্দ করি। ঐ যে ওরা বলে, বাল্য-বিবাহের জন্যেই আমাদের দেশে যত কিছু মন্দ সব হচ্ছে, তা আমারও সেই মত। মেয়ে বড় হোক না, এখন একটু ইয়ে-টিয়ে শিখুক, বিয়ে ত এক দিন হবেই, তাড়াতাড়ি কি?

প্রতিবেশী। কিয়ে-টিয়ে শিখবে, ঠাকুদ্দা মশাই? খরচের ভয়ে ইস্কুলে ত কখন দিলেই না, অথচ ওর পড়া-শুনার ইচ্ছে খুব বেশীই ছিল।

তারিণী। (চটিয়া) ভায়া হে! ব্রহ্মজ্ঞানী ত আর হই নি, কৃশ্চানও নই, স্কুলে মেয়ে দেওয়া মানেই ত মেয়ের কাঁচা মাথাটি চিবিয়ে খাওয়া, তা' আর খাই কি ক'রে? সব ম'রে হরে মাখেকো, বাপখেকো সবে মাত্তর ঐ একটিই তো পৌত্তরী আছে। নইলে খরচের আবার ভয় কি? স্কুল ছেড়ে কলেজে, বিলেতে পাঠিয়েও ত পড়াতে পারতুম, ঐ জন্যেই ত বলি দাদা! মেয়ে ছানা না হয়ে ওটা যদি একটা ছেলে হতো।

ঘটক। তা' তা' বেশ ত, ছেলে নাই বা হলো? ওঁর বিয়ে দিলেই ত মেয়ের বদলে ছেলেই পাবেন। খাসা ছেলে, তিনটে পাশ ক'রে চারটের পড়া পড়ছে, ইচ্ছে যে বিয়ে ক'রে বিলাত যায়, আপনারও যখন সেই মত, তখন আর বাধা কিসের? ও চটপট সেরে নিয়ে নাতজামাইকে বিলাত পাঠিয়ে দিন। গায়ের রং যে রকম, সাহেব ব'লে সেখানে মেমগুলো ধ'রে না রাখে, এই যা ভয়!

তারিণী। দুর্গা! দুর্গা! বিলেত? বিলেত কেমন ক'রে পাঠাব? জাত যাবে যে! দেখুন, ও সব অনাচার কদাচারের মধ্যে আমি নেই। যে ছেলে বিলেত যাবার কথা মুখে আনে, তার সঙ্গে আমি আমার বাড়ীর মেয়ের বিয়ে দিই নে। দুর্গে, দুর্গতিনাশিনী মা! (হাই তুলিয়া তুড়ি দেওন)

ঘটক। (স্বগত) সেই যে কথায় বলে, তোরা দান ভানারি গা? না, আমাদের না ভানাবার গা। এও দেখছি তাই। যাক গে—মরুক গে, এক দিন ভদ্দর লোকেদের এনেই ফেলবো, কনে যদি তাদের পছন্দ হয়, হয় ত না বলতে পারবে না। (প্রকাশ্যে) তা' তা' আপনার যদি বিলাত-ফেরতের আপত্তি থাকে, ছেলের সাধ্যি কি যে বিলেত যাবার নাম করে? আর আপনার ঘরে বিয়ে করলে পয়সার ত দুঃখ থাকবে না, বিলেত গিয়ে আর কি লাটসাহেব হবেন? কি বলেন বাবু? বলুন না, সত্যিকথা বলছি কি না?

প্রতিবেশী। কথাটা সত্যি, তবে ঠাকুদ্দার একটু অপ্রিয় হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে, হিন্দুশাস্ত্রে অপ্রিয় সত্য বলায় নিষেধ আছে।

ঘটক। (অর্থবোধ করিতে না পারিয়া) ছেলেপিলে সবই গিয়ে ঐ ত সবেধন নীলমণি একমাত্র মেয়েটিই আছে, তা ওঁরই ত সর্ব্বস্ব। আহা! ভগবান্ যে কার কখন্ কি করেন, এত ধন ঐশ্বর্য্য ঘরে, অথচ ভোগ করবার যারা, তাদেরই ডেকে নিলেন!

তারিণী। (নীরস কণ্ঠে) তার জন্যে তাঁকে আমি বেকুফ বলতে পারি নে, যদি ছেলে-পুলেগুলোকে রেখে পয়সাগুলোকে টেনে নিতেন, বাছাদের হাতগুলি ধ'রে আমি দাঁড়াতাম গিয়ে কার দোরে? এ তবু তারা গেছে, আমায় ত এ বয়েসে ভিক্ষে মেগে খেতে হচ্ছে না।

(প্রতিবেশী ও ঘটক দৃষ্টি বিনিময় করিল)

প্রতিবেশী। ঠিক বলেছেন, ঠাকুদ্দা! যাদৃশী সাধনা যস্য, কথাটা কি নিছকই মিথ্যা? আচ্ছা চল্লেম, প্রণাম।

[প্রস্থান।

ঘটক। তা' হ'লে আজ বিদায় হই। নমস্কার।

[প্রস্থান।

তারিণী। আপদ গেল! না! পাঁচ জন মিলে স্থিতে দিতে চায় না! কাল বিষ্ণু বাবুদের সুদটা দিয়ে গেছে, টাকাগুলো যদিও বাজিয়ে নিয়েছি, তবু আর একবার দেখা ভাল। লোকে ত ঠকাতে পেলে আর ছাড়বে না। ঐ যে বলে সাবধানের মার নেই, সে ঠিক কথা! (সিন্দুক খুলিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে টাকা গণিতে লাগিল, মুখে বেশ হাসি হাসি ভাব।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

তারিণী দত্তর অন্তঃপুর

সুহাসিনী

সুহাসিনী! (একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম বাজাইয়া)

সা রে মা পপপা পা ধা নি র্সা

র্সা নি ধা প প প পা মা গ্ রে সা

আঃ, এ কি বাজানো যায়? একটা সুর বার হচ্ছে ত তিনটে হচ্ছে না, রীডগুলোকে কিলিয়ে বসাতে পাল্লেই তবে বসে, আঙ্গুলের টিপের সাধ্যি কি!

সা—রে—গ্ গ্ গ—

(তারিণী দত্তর প্রবেশ)

তারিণী। কি আপোদ! এ আবার তোকে কি ভূতে ধরলো? চুপ্ চুপ! তুই কি বেটাছেলে রে, সাত হাত গলা বার ক'রে ষাঁড়ের মতন চীৎকার সুরু ক'রে দিয়েছিস্—সা রে মা পা ধা নি সা।—পাড়ার লোকে বলবে কি?

সুহাস। হাঁ, তা বৈ কি? পাড়ার লোকরা কিছু বলবে না, কাদের বাড়ীতে না আজকাল মেয়েরা গান শিখছে? যত কিছু নিষেধ সব আমারই জন্যে? ওরা সবাই স্কুলে যায়, ওস্তাদের কাছে গান শেখে। বেশ ত, আমার কিছুই দরকার নেই, আমি নিজে নিজেই শিখবো, তুমি শুধু এই বাজনাটা মেরামত করিয়ে দাও।

তারিণী। হায় রে! ও সেই তোর বাবার বিয়ের সময় তোর মাতামোর দেওয়া, কতকাল ধ'রে অমনি পড়ে আছে, ও মেরামত করতে গেলে কি আর রক্ষে আছে, একটি আঁচলা টাকা জলাঞ্জলি দিতে হবে। তা ছাড়া—

সুহাস। না গো, দাদু! একটি আঁচলা টাকা খরচ হবে না গো হবে না। মোটে তিনটি কি চারটি টাকা দিলেই ওদের বাড়ীর সুরেশদা বলেছেন, বেশ ভাল ক'রে মেরামত করিয়ে দেবেন, ওঁরা করিয়েছেন।

তারিণী। বলিস্ কি, সুসি! তিনটে টাকা বড় কম হলো? কোথা থেকে আসে তিনটে টাকা বল ত? সারাদিন ধ'রে মাটী কোপা, তিনটে টাকা উঠে আসবে?

সুহাস। (ছলছল চোখে নীরব)।

তারিণী। তা ছাড়া দেখ, ও সব পছন্দ করি নে, নৈলে কি টাকার জন্যে কিছু আটকায়? পুরনো মেরামত কেন? নতুনই ত কিনে দিতে পারি। আড়াইশো থেকে পাঁচশো হ'লে খাসা বাজনা হয়, কিন্তু কেন? ভদ্দর ঘরে জন্মেছ, ভদ্দরআনা শেখো, এ কি নাট্‌শালা? দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! নাঃ, কি কালই পড়েছে! জাত-জন্ম আর কিছু রইলো না, বাছ-বিচের সব উঠে গেল। দুর্গতিনাশিনী দুগ্‌গা! যাই—হরিচরণের সুদটোর হিসেব কষতে বাকি রয়েছে।

[প্রস্থান।

সুহাস। (বাজনা ঠেলিয়া দিয়া) আমার বেলায় জাত সব-তাতেই যায়, এ দিকে বুড়ো হাতী ক'রে রেখেছেন, লোকে সাঁথেয় সিঁদুর নেই দেখলে যে চমকে উঠে আহা বলে, তার বেলায় ওঁর জাত যায় না! হাতে গুগাছা রুলি আর সস্তা ব'লে সরু পাড়ের ধুতী পরনে, এদিকে ধেড়ে একটা মাগী, লোকের আর অপরাধটা কি? ভাবে বিধবা! যাক্ গে, মরুক্ গে, আমার আবার সাধ-আহ্লাদ! জন্মেই যখন মা বাপকে শেষ করেছি, তখনই সকল সাধে ইস্তফা দেওয়া হয়ে গেছে। যাই, ঘরগুলো ঝাঁট দিই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

তারিণী দত্তর বহির্ব্বাটী

তারিণী, ঘটক ও বরপক্ষীয় দুই জন লোক

ঘটক। মস্ত বাড়ী, বিস্তর টাকা, এক যমেই মেরে রেখেছেন। কে বা দেখে, কে বা শোনে। এই যে বে-মেরামত হয়ে রয়েছে, করে কে, এনে দিয়ে করবার লোক ত একটা চাই।

বরপক্ষীয়। তা' ত বটেই, তা ত বটেই, উপায় ত নেই, ভগবানের মার।

ঐ অপর জন। এর আর নালিশ-ফরিয়াদ চলে না। সইতেই হবে।

ঘটক। (অগ্রসর হইয়া তারিণীর প্রতি) এই এঁরা এদিক পানে এয়েছিলেন, তা বল্লেন, চলো একবার পায়ে পায়ে দত্ত মশাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসব, আর অমনি ওঁর পৌত্ত্রীটিকে একবার দেখেও আসা হবে।

তারিণী। (খাতার পাতা হইতে চোখ তুলিয়া) আসতে আজ্ঞা হোক, নমস্কার! (স্বগত) জ্বালালে! এই বিধু পোদ্দারের সুদের সুদটা একে গোলমেলে হিসেব, আর এই সময়েই কি না! (প্রকাশ্যে) তা' মেয়ে দেখা, তা সে ত হ'তে পারবে না, সে আজ ত এখানে নেই, আর তা ছাড়া সে দিনই ত আপনাকে ব'লে দিইছি, আমি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী নই, মেয়ে এখনও ছোট আছে।

ঘটক। মেয়ে আর বিশেষ ছোট কৈ? বছর ষোল-সতেরর ত হয়েছেন, তবে তিনি যদি আজ বাড়ী না থাকেন ত সে আলাদা কথা। কোথায় গেছেন?

তারিণী। গেছে? হ্যাঁ, তা ঐ মামার বাড়ী না মাসীর ওখানে—(স্বগত) কি যে বলি, আছে কি ছাই মামা কি একটা মাসী পিসী যে, তাই বলবো?

ঘটক। কবে ফিরবেন? আর না হয় সেখানে গিয়েও ত দেখা শোনা হ'তে পারবে, ঠিকানাটা বলুন দেখি, লিখে নিই। (পেনসিল ও কাগজ বাহির করিল)

তারিণী। (স্বগত) শালার বেটা শালা দেখছি—নাছোড়বান্দা! যাই কর বাপু, বান্দাকে পাড়তে পারছো না! ভেবেছ আমার নাতনীর বিয়ে দিইয়ে খুব একটা দাঁও মারবে, সে আমি হ'তে দিচ্ছি নে, ঘটক-ফটক আবার কি রে বাপু! ও সব সেকেলে, ও সব আমি পছন্দ করি নি। জন্মালেই ধাই-নাপিত বিদেয়, বিয়ে হবে, তাতে চাই ঘটক, মরলুম ত রেওভাট, অগ্র-দানী, এ ছাড়া ওদেরই জুড়িদার পুরুত আছেন, কাঙ্গালী আছেন, ছেলে ছটোর বে দিয়ে এলুম, বাসরজাগানী, গ্রাম-ভাটী লাইব্রেরী, কত কত ছুতো করেই না টাকাগুলো ছিনিয়ে নিলে! থাকলে এদ্দিনে মুটোপানেক সুদ হতো। (প্রকাশ্যে) সে এখন কবে আসবে, তারও কিছু স্থিরতা নেই, আর তাদের বাড়ীর ঠিকানাই বা কে মনে ক'রে ব'সে আছে, বাপু! তার চাইতে আপনারা বরঞ্চ অন্য কোন—

(নেপথ্যে। দাদু! চান করতে যান, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, খেতে পারবেন না, যা মোটা চাল কিনেছেন !)

ঘটক। ঐ না আপনাকে 'দাদু' ব'লে কে ডাকলে? এই যে মা লক্ষ্মী নিজে হ'তেই দেখা দিতে এসেছেন! এস, মা! এসো।

(সুহাসিনীর প্রবেশ এবং অপরিচিত লোকেদের দেখিয়া প্রস্থানের উপক্রম)

বরপক্ষীয় এক জন। এসো মা, এসো! লজ্জা কি মা! তুমি ত আমাদের মা। খাসা মেয়ে, দিব্যি মেয়ে, দত্ত মশাই! বাল্য-বিবাহের ভয় করছিলেন, তা ত কৈ মনে হয় না, মা আমাদের মতন ছেলেদের মা হবার ত অযোগ্যা নন। বসো মা! বসো।

(সুহাসিনী বিপন্নভাবে পিতামহের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে অন্য দিকে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল)

বরপক্ষীয় অন্য জন। বসো মা, তোমার নামটি কি মা?

সুহাস। (মৃদুস্বরে) সুহাসিনী।

বরপক্ষীয়। বেশ নাম, কি পড় মা? স্কুলে পড়ছো ত? গান-বাজনা শিখেছ বোধ হয়? তারের বাজনা? তোমাদের পাড়ায় ত এস্রাজের শব্দ খুব শুনতে পাচ্ছিলাম।

তারিণী। (ভীষণভাবে ফিরিয়া) কেন, গানবাজনা জানতে যাবে কেন? গানবাজনা কেন শিখবে? গানবাজনা শিখে কি হবে? মুজরো করবে?

বরপক্ষীয় ভদ্র লোক। (অপ্রতিভভাবে) সে কি কথা! না না, অমন কথা বলবেন না, এ সব ললিতকলা, এ কি শুধু বেচে খাবার জন্যে? আর এ ত আমাদের দেশে আবহমান-কাল ধরেই প্রচলিত ছিল। মহাভারতেই দেখুন, বিরাট-রাজার কন্যা উত্তরাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেবার জন্যে বৃহন্নলাকে নিযুক্ত করা হলো, তা—

তারিণী। (বাধা দিয়া) সেকালে গান্ধর্ব্ববিয়ে আসুরবিয়ে চলতো, তার ঘটকও ছিল না, বরকর্ত্তারও তাতে পাঠ নেই, সেগুলোই বা ছাড়লেন কেন? এ কলি যখন সে কাল নয়, তখন একালে আর সেকালে জের টেনে কি হবে?

বরপক্ষীয়। তা' আপনার যদি আপত্তি থাকে, ওটা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, তবে লেখাপড়া নিশ্চয়ই শিখিয়েছেন? 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।' এ ত আর নড়চড় হবার জিনিষ নয়, এ বিধি সনাতন বিধি, যুগান্তরেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

তারিণী। বাপু হে! পৃথিবীটা যদি অচল হতো, তা' হ'লে তোমার মতটা মানতুম। যুগে যুগে বিধি-ব্যবস্থা সবই বদল হচ্ছে, কোন নিয়মেরই চিরস্থায়িত্ব মানা চলে না, আর মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ফাজিল হয়, বাচাল হয়, বেচাল হয়েও ওঠে, ওদের তখন সামলানো দায় হয়ে ওঠে। ঐ জন্যে ও-সবের ভেতর আমি যাই নে, তবে হ্যাঁ, কোম্পানীর কাগজ কিনতে হ'লে নিজের নামটা সই করতে পারলেই হলো। বন্ধকী তমস্সুকের একটা সই দিতে পারা চাই, টিপ সইতেও যে কায না চলে, তা নয়, তবে হাতের সইটাই পাকা।

বরপক্ষীয় বৃদ্ধ। (আত্মগত) ভাল, ভাল, তাই পারলেই আমিও খুসী! কোম্পানীর কাগজে সই! অতি উত্তম বস্তু! এর কাছে খনা-লীলাবতীর কৃতিত্ব কোথায় লাগে! মোট কতটি টাকার ও বস্তু আছে, কে জানে! (প্রকাশ্যে) তা' না ত কি? ঠিক বলেছেন, ওর বেশী বিদ্যে নিয়ে আর আমাদের ঘরে হবে কি? পাশ ক'রে ত আর চাকরী করতে যাচ্ছে না।

ঘটক। তা হ'লে কোষ্ঠিবিচার যদি করতে চান ত এই নকল ক'রে এনেছি, কন্যার জন্মকুণ্ডলী—

তারিণী। (চটিয়া) তোমার গোষ্ঠীর মুণ্ডু! আমি এখন বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নই। আর সত্যি কথাই বলবো বাপু! আমার একটি নাতনী, আমি খুব বড় চাকরে, আবার জমীদার, কলকাতার ইংরেজটোলায় বাড়ী থাকবে, চেহারাটি হবে কার্ত্তিকের মতন এ রকম না হ'লে ওর বিয়েই দেব না।

বরপক্ষীয়গণ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘটকের প্রতি সক্রোধে) অপমান করবার জন্য আমাদের নিয়ে এসেছিলে? এমন ছোট ঘরে আমরা কুটুম্বিতে করি নে। [প্রস্থান।

ঘটক। দেখবো, কত ভাল পাত্র আপনার জোটে। এমন ছেলে পছন্দ হলো না! [প্রস্থান।

তারিণী। (মুখ খিঁচাইয়া সুহাসিনীকে) তুই পোড়া মেয়ে কি করতে এই সময়েই ধিঙ্গি নাচন নাচতে বোঠোক্‌খানায় এসে উপস্থিত্ হলি বল ত? রূপ দেখাতে?

সুহাস। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) কেমন ক'রে জানবো, তোমার ঘরে টাকা ধার করবার লোক ছাড়া আবার অপর লোকও আজ এসেছে। যত দোষ, নন্দ ঘোষ!

[চোখে আঁচল চাপা দিয়া সবেগে প্রস্থান।

তারিণী। ঘটক-বিদেয় খাবেন! হাড়হাবাতেগুলোর ইচ্ছে, হাতে টুকনী নিয়ে ওদের মত লোকের দোরে দোরে টোকলা সেধে বেড়াই, আর লোকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। দুগ্‌গে দুর্গতিনাশিনী মা! যাই, চান করি গে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

তারিণী দত্তর পিছনের বাগান (এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ)

সুহাসিনী বেড়াইয়া বেড়াইয়া গান গাহিতেছিল।

সুহাস।— (গীত)

কঁহা কঁহা ঢোড়হুঁ ভাই
ঢোড়নু সব দিশি পেখন না যাই।
হৃদয় তিয়াসল, পিয়াস ন মিটল,
বিয়াকুল চিত ভেল দরশন চাই।
সো জন বিন সখি, চিত ধৈরয নহি,
আঁখি বরখত রহি, কঁহা তাকো পাই,
পুন হেরব তাকে নহি পতিয়াই।

(হাসিয়া) লোকে শুনলে ভাববে, আমি যেন প্রোষিতভর্তৃকা বিরহিণী। প্রিয়তমের পথ চেয়ে বিজনে ব'সে দুঃখের গান গাইছি! গানটা সে দিন সুরেশ দাদার বউ গাইছিল, শিখে নিলুম। বাড়ীতে ত গলা ছেড়ে গাইবার যো নেই, অমনি দাদামশাইএর পুরাতন আদর্শ জেগে উঠবে। মন্দ শোনালো না। একটি যদি হারমোনিয়ম পেতুম, বেশ মন খুলে বাজিয়ে গাইতুম। যাক্, ও হবে না, আমার অমনিই ভাল। অমনি গাইলে গলাও খোলে। একটি ভদ্রলোক যে ঐখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা ত দেখতে পাই নি! ও মা, কি লজ্জা! নিশ্চয় ও আমার গান শুনতে পেয়েছে। ভাবলুম, এখানে কেউ নেই, গানটা খুব গলা ছেড়ে গেয়ে গেয়ে অভ্যাস ক'রে নি। তা' না, ভাঙ্গা পাচীলের ধারে, এত যায়গা থাকতে, উনি দাঁড়িয়ে থাকতে এলেন! অভাগা যে দিকে চায়—সাগর শুকায়ে যায়!

[প্রস্থান।

অদূরস্থ যুবক। খাসা মেয়েটি ত! গলা ত নয়, যেন বাঁশী! কুমারী বলেই মনে হলো।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

তারিণী দত্তর বহির্বাটী

তারিণী ও অপর প্রতিবেশী।

প্রতিবেশী। ছেলেটি আমার শ্যালীপো হয়, এসেছিল মাসীর কাছে, তোমার নাতনীকে কেমন ক'রে জানি নে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে, মাকে গিয়ে বলেছে, ওর মা আবার গিন্নীকে লিখেছেন। ছেলে খুবই ভাল, চেহারাও মন্দ নয়, তবে তৈরি ছেলেও নয়, অবস্থাও বিশেষ কিছু না। সবে বি, এস্-সি পাশ করেছে, ডাক্তারীতেই যাবার ইচ্ছে, বাপ ডাক্তার ছিল, বই-টই সবই ত তার প'ড়ে রয়েছে, ইস্তক ওষুধের আলমারী ষ্টেথিস্কোপটি পর্য্যন্ত।

তারিণী। তা মন্দ কি? পড়ো ছেলেই ভালো, বয়েস কম আছে, আক্কেল্লো হয়ে যাবে। ধেড়ে ধাড়ী ক'রে বিয়ে দেওয়া আমি দুটি চক্ষে পড়ে বলে দেখতে পারি নে। ও সব একেলে চাল দাদা, আমাদের পক্ষে অচল! ছেলে ত মেয়ে দেখেইছে, আর বেটাছেলের আবার দেখাশুনো কিসের? তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ। তুমি যখন মধ্যস্থ রইলে, তখন ত আর কোন কথাই নেই। ও একেবারে পাকা ক'রে ফেলে দিন স্থির ক'রে দাও!

প্রতি। তবু একবার ছেলেটিকে স্বচক্ষে দেখলে ভাল হয়। এ ত আর ঘটী-বাটি কেনা নয় যে, অপরে পছন্দ ক'রে দেবে, নিজের জিনিষ নিজে দেখে শুনে বাজিয়ে নেবেন, সেইটাই ভাল। না হ'লে এর পরে—

তারিণী। বলো কি তুমি অনুকূল! তুমি আর আমি কি ভিন্ন? তোমার শ্যালীপো, ও ত আমারই আপন জন; তা ছাড়া সোনার আংটী আবার বাঁকা! বেটাছেলের আবার দেখ দেখি কিসের? ও ধরো দেখাই হয়েছে। তা হ'লে দিনটা স্থির করতে আর দেরী না হয়, মেয়ে বড় হয়েছে, যত শীগ্‌গির পাত্রস্থ করতে পারি, ততই মঙ্গল। ওর বের ভাবনা ভেবে ভেবে আমার গলায় জল গলে না। যাদের ভাবনা, তারা ত আমাকেই ভাবতে দিয়ে গেছে। এখন দুহাত এক করতে পারলে নিশ্চিন্দি হয়ে দু দণ্ড পরকালের চিন্তে ক'রে বাঁচি।

প্রতি। তা' দেনা-পাওনার কি রকম কি হবে-টবে, সেটা তাদিকে লিখতে হবে ত?

তারিণী। ওঃ, তা সে তুমি বলো, আমি বরপণের বিশেষ বিরুদ্ধ, তা বোধ হয় তোমায় বলতে হবে না। নগদ এক পাই পয়সা আমি দিচ্ছি নে, তবে কন্যাভরণ, বরের আংটী, খানকতক নমস্কারী—এ দেব বৈ কি।

প্রতি। নগদ একেবারে না দিলে কি হবে, ভায়া? ছেলের বাপ নেই, বিধবা মা, সে যে ঘর থেকে খরচ দিয়ে ছেলের বে দিতে পারবে, তা ত বোঝায় না। আসা-যাওয়ার খরচা, আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব, বৌভাতের খাওয়ান-দাওয়ান, একখানি গয়নাও দিতে হবে, তা বেশী না দাও, হাজারখানেক টাকাও ত দেবে? মেরে কেটে ওরই মধ্যে না হয় টেনে বুনে কোন রকমে কায সেরে নিতে ব'লে দেব।

তারিণী। ভায়া হে! তারিণী দত্তর এক কথা! মরদ কি বাত, হাতী কি দাঁত! ফেরাতে ত পারবো না, ভাই! তা ছাড়া বরপণনিবারণীর যে সভা হয়, তা'তে যে সই ক'রে মরেছি, দেবার কি যোই আছে? তা ঘটা-ফটার অত দরকারই বা কি? এ কি ডোম-চামারের বিয়ে, বাজনা-বাদ্যি আমাদের ব্রাহ্ম বিবাহে অপ্রশস্ত,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো কথা, মনেও ছাই সকল সময় কি সব কথা থাকে! আমাদের ত আইবুড় ভাতের তত্ত্ব নিতে নেই, ফুলশয্যেও আমরা দিই না। ঐ একবারে জোড়ের তত্ত্ব করা হয়। আমার পিসীর বিয়েতে ঘোট হওয়া থেকেই এ বাড়ীর এই নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রতি। কিন্তু সরলার এই একমাত্র ছেলে, ওর মনের সব সাধ আহ্লাদ ত জমানো আছে। নিজের অল্পবয়সে কপাল ভাঙ্গলো, কিছুই মেটে নি, ছেলে বউ নিয়ে তার সকল সাধ সে মেটাবে, সে কি—

তারিণী। তা'তে কি এসে যায়? বিয়ের পর, দোল আছে, রথ আছে, চড়ক আছে, পূজো, পৌষপার্ব্বণ, তার পর তোমার গে' আম সন্দেশ, নেবু, আতা, কত কিই আছে ভায়া, সাধ মেটাবার আর ভাবনা কি?

প্রতি। কিন্তু—ঐ পণের টাকাটা না পেলে যে সরলা রাজী হয়, তা আমার ভরসা হচ্ছে না। ঘরে ত তার নগদ টাকা নেই, তত্ত্ব না করলেও আসা-যাওয়া বৌভাত। ভাল কথা! তুমি বরপণের বিরুদ্ধ যে বলছো, তা সুহাসিনীর বাপের যখন বিয়ে হয়, ওঁরা ত যথেষ্ট বরপণ দিয়েছিলেন, আমার মনে পড়ছে। রূপার থালে ঢেলে সমস্তই চকচকে নগদ টাকা দেড় হাজার আন্দাজ হবে যেন।

তারিণী। (সহাস্যে) হবেই ত, তখন ত বরপণনিবারণী

সভার সভ্য হই নি। তা দেখ অনুকূল! তা হ'লে এখন না হয় থাক, দিন কতক এখন না হয় যাক, সময়টা বড্ডই মন্দ! পয়সা-কড়ি এখন একদম হাতে নেই, আর মেয়েও আমার এমন কিছু অরক্ষণীয়া হয়ে যায় নি যে, সকালে উঠে যার মুখ দেখবো, ধ'রে দেবো। আর তোমার ঐ শ্যালীপোটি, ভাই, যতই বল, তেমন লায়েক ছেলেও নয়, আর অবস্থাও ত দেখতে পাচ্ছি, তেমন সুবিধের মতন মনে হচ্ছে না। শেষকালে কি মেয়েটাকে তাড়া-হুড়ো ক'রে জলে ফেলে দেব?

প্রতি। (মনে মনে) জাল বুঝি ছিঁড়ল! না দেয় না হয় নগদ টাকা নাই দিলে! বুড়ো আর কত কালই বাঁচবে? লোকে বলে, তারিণী দত্ত টাকার আণ্ডিল বেঁধেছে, সবাই বলে ও 'যখ' দেবে, তা ত আর সত্যি পারবে না! মরলে পর পাবে ত সবই ঐ মেয়েটাই। ধারধোর করেও না হয় দিয়ে ফেলুক বিয়েটা। (প্রকাশ্যে) তা যদি সত্যি সত্যিই তুমি বরপণ-নিবারণী সভার সভ্য হয়ে থাক, কেমন ক'রে আর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে? সে এখনই বা কি, আর তখনই বা কি? তা হ'লে তাই হোক, যা তোমার ইচ্ছে হবে, তুমি তোমার নাতনী নাতজামাইকে দিও, এতে আর বলবার কি আছে? আচ্ছা, আমি গিয়ে সরলাকে সকল কথা গুছিয়ে লিখে দিচ্ছি, যা দিনকাল পড়েছে, খরচপত্র বেশী না করে, সেই ভাল।

তারিণী। ঠিক বলেছ ভায়া! চারটে কাচের পুতুল আর সাত থালা বাজারে মেঠাই পাঠিয়ে টাকাগুলো ন দেবায় ন ধর্ম্মায়, খামকা জলে ফেলা। তাঁর ওতে কি লাভ? তাই করো, কিন্তু দেখ, খবরদার, এখন পাঁচ কাণ করো না, পাড়ার লোকরা তা হ'লে সব পেয়ে বসবে; তাদের কি, ঘর থেকে ত আর পয়সা বার করতে হবে না।

প্রতি। (প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্বগত) পাঁচ কাণ নিজের গরজেই করবো না। তারিণী দত্তর ষোল এয়ারেসের সঙ্গে অপূর বিয়ে দিচ্ছি, এ জানলে কি আর রক্ষে আছে! কত লোকেই ভাংচি দিতে আসবে। বাড়ী-ঘর ওদের সামান্য, অবস্থা মোটেই ভাল না, কত কিই না বলবে। (প্রকাশ্যে) ক্ষেপেছেন! আমি কি তেমনি কাঁচা লোক!

[প্রস্থান।

তারিণী। যাক বাঁচা গেল! ঘটক বেটাগুলো সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন এসে জ্বালিয়ে মারছিল, এইবার তাদের জোঁকের মুখে নুণ পড়েছে। মন্দ কি? পরে বে হ'লে এখন বছর পাঁচেক ঘর করতে পাঠাবো না, বলবো, আগে রোজগেরে হও, তখন বউ নে' যেও। সুহাস চ'লে গেলে আমার ঘর-কন্না সাত ভূতে লুটে খাবে, সেই ভয়েই ত আরও ওর বে দিতে পারি নে, চাকুরে ছেলে, বড় লোকের ছেলে, এই সবই ত ছাই ঘটক ব্যাটারা খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসবে কি না! নাঃ, এ বেশ হচ্ছে! (সিন্দুকের নিকট গিয়া) যাক, একটু নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে আশু বিশ্বেসের খতেনখানা পড়া যাক্।

ষষ্ঠ দৃশ্য

তারিণী দত্তর অন্তঃপুর

(সেলাই করিতে করিতে সুহাসিনী গান গাহিতেছিল)

সুহাসিনী— (গীত)

আমার মানস-কানন ছেয়েছে আজ ফুলে ফুলে,
হৃদয়-নদী উঠছে সদাই দুলে দুলে।
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে গায়,
মত্ত কোকিল কিসের গান গায়,
সুখের জোয়ার বইছে বেগে কূলে কূলে
আপনাকে আজ বিকিয়ে দিছি (ওই) চরণমূলে।

(অপ্রকাশের চুপি চুপি আসিয়া পশ্চাতে অবস্থান ও গান থামিলে চোখ চাপিয়া ধরিয়াই)

অপ্র। বলদিখি নি কে?

সুহাস। (সানন্দে) এসেছ। মেঘ দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেছলো।

অপ্র। (চোখ ছাড়িয়া পাশে বসিল) না এসে কি থাকতে পারি? এত ঘন ঘন আসা তোমার দাদু পছন্দ করেন না জানি, তবু ছুটে ছুটে আসি, কি বেহায়াই আমায় ভাবেন!

সুহাস। (অপ্রিয় প্রসঙ্গকে প্রিয় প্রসঙ্গে পরিণত করিতে চাহিয়া) ভাবলেই বা! তুমি কি বেহায়া কিছু কম? সে দিন পাঁচীলের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে আমার গান শোনা হচ্ছিল, কেন বল ত শুনি? কোথাকার কে একটা মেয়ে লুকিয়ে একটা গান গাচ্ছে, তাই অমনি চুরি ক'রে ক'রে কেউ শুনতে আসে?

অপ্র। (সুহাসের কাণের দুলে দোলা দিয়া) ভাগ্যে শুনতে পেয়েছিলুম! আচ্ছা সুহাস! তবে যে তোমার ঠাকুর্দ্দা আমারই একটি বন্ধুর বাপ একবার তোমায় দেখতে এসে গানবাজনা জানো কি না, জিজ্ঞেস করায় তাঁকে মারতে গেছলেন? অথচ তুমি একটি পাকা ওস্তাদের মত এ বিদ্যায় পারদর্শিনী। আশ্চর্য্য কাণ্ড ত!

সুহাস। হাঁ, দাদু বুঝি জানে? তা হ'লে চুলের ঝুঁটি ধ'রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিত না! এ আমি সুরেশদা'র বউএর কাছে গিয়ে গিয়ে শিখেছি। হারমোনিয়মটা ভাল থাকলে বেশ বাজিয়ে গাইতুম, তা পারি না। মেরামত করাবার ইচ্ছে ছিল, হয়ে উঠলো না, অনেক খরচ প'ড়ে যাবে।

অপ্র। (সনিশ্বাসে) 'লক্ষ্মীর মা ভিক্ষে মাগে' ব'লে যে একটা চলিত কথা আছে, তোমার ভাগ্যে সেটা বেশ চৌচাপটে মিলে গেছে, দাদুর এ দিকে শুনতে পাই অগাধ টাকা। না, পৃথিবীটা একটা আশ্চর্য্য স্থান!

সুহাস। থাক্ গে, যেতে দাও। ক'দিন থাকছো বলো?

অপ্র। তোমায় এবার নিতেই এসেছি, সুসু! ঠাকুর্দ্দা ত আমার পড়ার খরচ দিতে পারবেন না বলেই দিয়েছেন, আমার পক্ষে পড়া তা হ'লে অসম্ভব! এত দিন মেসোমশাই যথেষ্ট সাহায্য করতেন, কিন্তু তাঁরও কারবার ফেল করেছে, তিনি নিজেই ঘোর অভাবে প'ড়ে গেছেন, এখন আমারই উচিত তাঁর

এ অসময়ে একটু সাহায্য করা। তা' সে ত আর আমার দ্বারা হবেই না, নিজেরটুকু শুধু চালিয়ে নিতে পারলেই এখন বাঁচি। স্থির করেছি, পড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরেই কম্পাউণ্ডার বা হোমিওপ্যাথিষ্ট হয়ে বসি গে, যে কটা টাকা হয়; কিন্তু তোমায় না পেলে যে জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠবে। আমি পারবো না, এক বৎসর ত হয়ে; গেছে ঠাকুদ্দা বলেছিলেন, বিয়ের এক বৎসর তোমাদের বাড়ীর মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যায় না, যেতে নেই, এখন ত আর বাধা নেই। তবে যদি—

সুহাস। (সাগ্রহে) তবে যদি কি? বলতে গিয়ে থামলে কেন? না, আমার মাথা খাও। শীগ্‌গির বলো।

অপ্র। হুঃ, ওইটুকু হলেই আমার ষোল কলা পূর্ণ হয়! বলছিলুম কি, আমরা গরীব, ভেবেছিলেম, অবস্থার উন্নতি এক দিন করবো, কিন্তু সকল আশাতেই ত জলাঞ্জলি দিয়েছি। সেখানে গিয়ে গরীবের ঘরে কি তুমি ঘর করতে পারবে, হাসি?

সুহাস। (স্বামীর কাঁধে হাত রাখিয়া) তুমি এই কথা বল্লে? তুমি যদি আমায় গাছতলায় নিয়ে যাও, আমি তাই যাব। তুমি গরীব, আর আমিই কি বড়লোক? আর ধর, তাই যদি হতেম, তোমার চেয়ে আমার কে আছে? কি সুখ আমার এখানে? নিয়ে যাও, আমি হাসিমুখেই যাব।

অপ্র। (হাত ধরিয়া) তা' আমি জানি সু! ওইটুকুই আমার সান্ত্বনা! কি আশা করেছিলাম, আর কি হলো? তোমায় সুখী করতে পারলুম না, এই আমার যা দুঃখ! তবে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, যত্ন দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে যা হয়, তার কোনই ত্রুটি পাবে না, সুহাসিনী! আর আমার মা তোমার মা হবেন।

সুহাসী। (সজলচক্ষে) ঢের হবে, ঢের হবে, আমি স্নেহের কাঙ্গাল, ভালবাসার ভিখারিণী, তোমরা আমায় তাই দিও, আমি সানন্দচিত্তে তোমাদের দাসীত্ব করতেও প্রস্তুত আছি। ঐশ্বর্য্য কি জিনিষ! আমি তার জন্য কিছুমাত্র লালায়িত নই। ধনী হলেই কি সুখী হয়? তা হ'লে আমার দাদুর মত সুখী সংসারে খুঁজে পেতে না। এস, এস, মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খাবে এস। কতদূর থেকে এসেছ।

অপ্র। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

তারিণী দত্তর বহির্ব্বাটী

(তারিণী দত্ত ও ভৃত্যের প্রবেশ)

তারিণী। তোদের মতলব কি বল্‌তে পারিস্? সব্বাই মিলে গলায় আমার পা দিবি?

ভৃত্য। (হাত কচলাইতে কচলাইতে) আজ্ঞে, তা' আর কেমন ক'রে দেব? মুনিব হচ্ছো! (স্বগত) অন্ন লোকের বায়াত্তুরে ধরেছে, এনার বিরেনব্বইয়ে ধরেছে!

তারিণী। রোজ তিন পয়সা ক'রে পাণ! আমার বাপ ক... কেনে নি! নাঃ, এই বয়েসে নাতজামাই শালা দেখা... পথে দাঁড় করিয়ে তবে ছাড়বে। ভদ্দর লোকের ঘ... পড়ো ছেলে তুই, গাইগরুর মত চব্বিশ ঘণ্টা পাণ চিবু... লজ্জা করে না? যদি আর জন্মের অভ্যাস থাকে, সরু স... ক'রে বিচুলি কেটে তাই দুটি দুটি জাবর কাট, এ আমা... মাথায় কাঁটালভাঙ্গা কেন?

ভৃত্য। আজ্ঞে, তা কাঁটাল ত শুনি পরের মাথাতেই ভাঙ্গেক!

তারিণী। থাম্ থাম্, তোকে আর ফাজলামী করতে হবে না। আচ্ছা, দে, হিসেব দে। আর ত কিছু নেই?

ভৃত্য। আরে আছেক বৈ কি, বাবু! লাতজামাই বাবু কি বামুন-কায়েতের ঘরের বিধবা? মাছ খাবেক নি? চার পয়সায় দু ছটাক পোনা মাছ অ্যানে দেলাম নি? তা'পরে হাদ্দেকে গে, কি বলে গে ওই উনারি জলপানের লেগ্যে চার পয়সায় দুটো কাঁচাগোল্লা,—

তারিণী। কাঁ-চা-গোল্লা! তার চাইতে আমার কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেলেই পারতো! নিত্যি নিত্যি আসা, এলেও ত আর যাবার নামটি পর্য্যন্ত নেই, এত বড় হাড়-বেহায়া জামাই ত কখনও দেখি নি! সেবার এলেন, সাত দিন ধ'রে বৃষ্টি থামে না, শালাও মজা পেয়ে গেল, বল্লে, এত বিষ্টি, বেরোন যায় কি? কেন রে বাপু, বেরোন যায় না? তুই কি কুমোরের গড়া কাঁচা মাটীর পুতুল যে, বিষ্টি লাগলে গ'লে যাবি? আবার আজ এই তেরাত্তির ত কাবার করেছেন, এখনও করাত্তির কাটান দেখো। আজ ত আবার বেজায় মেঘ ক'রে আসছে। এ যে দেখছি, 'রুগী যা চায়, বৈদ্যে মাপায়' তাই হ'লো! হ্যাদেখ নেপা, ঘরের জামাই ঘরে এয়েছে, তার অত ঘটা কিসের? ও ত আর আমার কুটুম নয়, তুই কাল থেকে ঐ পাণ, সুপুরী, খয়ের, কাঁচাগোল্লা— ওগুলো সব কমিয়ে দিবি। বলিস, পাণ বাজারে পাই নি, এক পয়সার সুপুরী এনে দিস। সায়েবরা কি পাণ খায়? ব্যাটাছেলে, কলেজ যাবে, দাঁত নোংরা, ঠোঁট রাঙ্গা, সুট-বুট পরলে মানাবে কেন? বাতাসা বরং এনে দিস, গাছে নেবু আছে, ভিজিয়ে দিলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। বুঝলি? সুহাসের হয়েছে আদেখ্‌লেপানা, মনে করে যে, খুব কতকগুলো গিলিয়ে দিলেই খুব আদর হবে। যাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, আসল যত্ন সেইটুকুন্। বড় বড় ডাক্তারদের কাছে যা' দেখি, দেখবি, আমিও যা' বলেছি, তারাও তাই বলবে। বাজারের মিষ্টি-ফিষ্টি খাওয়া, আর যমের বাড়ীর দরজার দিকে এগুনো এক কথা!

ভৃত্য। (চটিয়া) আমি বাতাসা এনে খুকীদিদির বরকে খাওয়াতে পারব নি। বাজারের মিষ্টি খ্যালে যদিক ব্যারাম হয়, ঘরে ঘি অ্যাজ্ঞে কি লুচি-ফুচি করলে হয় না? সাতটা না, দশটা না, একটা মোট্টে লাতজামাই, তেনারে খাওয়াবেক বাতাসা? আমি সে কিনতে পারবে নিক।

[সরোষে প্রস্থান।

তারিণী। মুখ্যুর অশেষ দোষ! কত দিনেই যে সরকার থেকে ওদের লেখাপড়া শিখোবার ব্যবস্থা করবে! নাঃ, সুহাসকেই

ডেকে ব'লে দিতে হবে। কলি কি বদলাচ্ছে না? সেকালে জামাই-আদর ব'লে কথাটার সৃষ্টি হয়েছিল ব'লে সেটাকে একাল পর্য্যন্ত চালাতেই হবে, তার কোন মানে আছে? সেকালের জামাইরা কি শ্বশুরবাড়ী কখনও তেরাত্তির পোয়াতো? তারা জানতো, তা হলেই তারা ভ্যাড়া হয়ে ভ্যা ভ্যা করবে। (চিন্তিতভাবে) তা মিথ্যে নয়! এরা ত ও সব আমাদের পুরানো বিধিনিষেধ কিছুই মানে না। তাই হয় ত একেলে ছেলেগুলো বে' হ'তে না হ'তে বউএর গোলাম হয়ে ঐ ভ্যা ভ্যা করতে থাকে।

(অপ্রকাশের প্রবেশ)

এই যে! কি? আজ বুঝি বাড়ী ফিরছো? পেরণাম ঠুক্‌তে এয়েছো? তা বেশ, বেশ, পেরণামের আর দরকার নেই, আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ করছি, সকল সময়েই তোমাদের দুটিকে আশীর্ব্বাদ করছি।

অপ্র। আজ্ঞে না, বাড়ী যাবার কথা বল্‌তে আসি নি, অন্য কথা ছিল।

তারিণী। (হতাশভাবে) কিন্তু আজ শনিবার, মেঘে আকাশ ভ'রে গেছে, আজ যদি বিষ্টি নামে, সাতটি দিন যার নাম, কথায় বলে,—'শনির সাত।' দেখ, তা হ'লে আর বেশী দেরি-টেরি করো না, বিষ্টিটা এসে পড়লে বেরুনো মুস্কিল হবে কি না, তাই বলছি। সাতটি দিন ত আর এখানে ব'সে থাকতে পারবে না।

অপ্র। (দুঃখিতভাবে) না, যাবার কথা বলতে আসি নি, জিজ্ঞেস করতে এসেছি, পড়া কি তা হ'লে ছেড়েই দেব? একটা বছর পড়তে পারলে ডাক্তার হ'তে পার্‌তেম, এ হব কম্পাউণ্ডার! আপনার নাতনীই ত তা'তে চিরদিন ধ'রে দুঃখ-কষ্ট পাবে। একটু বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

তারিণী। ভায়া হে! বিবেচনা করেই দেখা গেছে যে, আজকাল এত বেশী ডাক্তার, মোক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টারে দেশটা ছেয়ে গেছে যে, ও আরও দু এক জন বাড়লে কমলে কিছুই আসবে যাবে না। তা ছাড়া নতুন যে সব থিওরী বেরুচ্ছে, তা'তে ডাক্তারের কোন যায়গা নেই। রোগ হলেই পাহাড়ের চূড়োয় চেঞ্জে পাঠান হয়েছে, শীঘ্রই তাদের এরোপ্লেনে রেখে দেবার ব্যবস্থা-পত্তর বার হবে, ডাক্তাররা তখন আর কি কচু করবে? ভায়া হে! পৃথিবী যে চলবে, এক যায়গায় হাত পা মেলে বসলেই ওর দৌড়ের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারবো কেন? তার চাইতে ঐ যে হোমিও করবে ঠিক করেছিলে, সে নেহাৎ মন্দ হবে না। গরীব-গুরবো যারা প্লেনে-ফ্লেনে চড়বার যুগ্যি নয়, ওবাই তবু ডাকবে।

অপ্র। (নিশ্বাস ফেলিয়া) তাই হবে।

তারিণী। হ্যাঁ, তাই কর গে। ওহে ভায়া! এতে মনে কোন দুঃখু করো না, কে কি বলতে পারে? ভবিষ্যৎ কি কেউ দেখতে পায়? মহেন্দ্র সরকার, অক্ষয় দত্ত, ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, প্রতাপ মজুমদার যে তুমিই হবে না, তা কি কিছু জানো? দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! হাঁ, কি বলছিলুম, তা হ'লে আজই আসছ ত? সেই ভাল, অনর্থক সাত সাতটা দিন মিথ্যে কেন নষ্ট ক'রে ফেলবে। সঙ্কল্প করেছ, যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।

অপ্র। মা ব'লে দিয়েছেন, এদেরও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে। আজকে কি পাঠাতে পারবেন?

তারিণী। (স্বগত) কি বিপদ! মেয়েটা চ'লে গেলে আমার ঘর-কন্না করবে কে? না, না, ওকে এখন পাঠালে চলবে না যে। (প্রকাশ্যে) এই দেখ, অমনি তোমার মায়ের বৌ নে' যাবার সখ চাগ্‌লো! এটা যে ওর জোড়া বছর চলছে! এ বেটী কি হিঁদুয়ানী কিছুমাত্র জানে না? বেটী কি সায়েবের বেটী নাকি? তা' ত হয় না, ভায়া! আমরা ত শাত্তর লঙ্ঘন করতে পারি নে। এই বোশেখের পরের বোশেখের আগে আর ওকে পাঠানোর সুবিধে নেই। এই ওর জন্মমাস কি না। আর তাও বলি বাপু! এখন একটা নতুন কাযে বসতে যাচ্ছো, সব মনটা সেই দিকেই দাও গে, এর মধ্যে আবার নেংবোটের মত একটা বউ পিছনে বাঁধা কেন? বউ ত আর পালাচ্ছে না!

অপ্র। (স্বগত) বিশ্বাসই বা কি? যে বাড়ীর হাওয়া! নাঃ, এ বুড়ো বড় সোজা লোক নয়। জীবনটা দেখছি কাটবে ভাল! আচ্ছা, তা হ'লে চল্লুম।

[প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

তারিণী। (হাসিয়া) হুঁ, হুঁ, তারিণী দত্তর কাছে এয়েছ চালাকী খেলতে! ডাক্তারী পড়ার খরচা জুগিয়ে এই বয়েসে পথে গিয়ে দাঁড়াই আর কি! আমার কি না দু চারটে রোজগেরে বেটা আছে! ঐ টাকাগুলিই ত আমার রোজগেরে বেটা! যাক্‌, ছোঁড়া বাড়ী গেল না বাঁচলুম! খেয়ে খেয়ে কদিনে ফতুর করলে, আবার ন্যাপা ব্যাটার এতেও পছন্দ হয় না। বলে, 'দাদাবাবু, বৌদি ঠাক্‌রুণ থাকলে অমন জামাই কত খাওয়াতো, মাখাতো।' আবার কি খেতে হয় রে, বাপু! সোণা খাবি, না রূপো খাবি? যাই, হবিধন মাইতির আজ সুদ নে' আসার কথা আছে। এলো কি না, দেখি গে। [প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

কলিকাতা—রাজপথ

ট্রামের আশায় অপ্রকাশ দাঁড়াইয়া আছে

রাস্তায় হকার হাঁকিতেছিল, (বসুমতী, বঙ্গবাণী,
অমৃতবাজার, লিবাটি, সাড়ে আঠার ভাজা,
পাঁঠার ঘুগ্‌নী, কাশীর ধূপ, ল্যাংড়া আম)

(জনৈক পাণওয়ালার প্রবেশ)

পাণ— (গীত)

বাবু পাণ,—মিঠা পাণ,
আপনি একটি পয়সা খরচা ক'রে এর, দুটি খিলি খেয়ে দেখুন।
এই পাণ দুটি খেলে, আপনার দিল্‌ যাবে খুলে,
তার ফলটি পাবেন হাতে হাতে ওই, বউএর কাছে বাড়বে মান॥
পেলে মুনিব হবেন পরিতোষ, ভুলে যাবেন (আপনার) শতেক দোষ,
এই সে দিন যিনি মুখ ফেরালেন, তিনিই হেসে ফিরে চান।

অপ্র। (মনে মনে হাসিয়া) কিনবো না কি ছুটো ? মুনিবও নেই, বউএর কাছে মান বাড়াবার দরকারও দেখি নে, ঐ সে দিন যিনি মুখ ফেরালেন, তাঁর মুখে ছুটো দিতে পারলে মন্দ হতো না। যদিই একটু হেসে ফিরে চাইতেন ত বেঁচে যেতুম ! কিন্তু সে বড় বিসম ঠাঁই !

(আর এক ব্যক্তি, সম্ভবতঃ সেও অপূর মত ট্রাম ধরিবার জন্তই আসিয়াছিল, সহসা অপূকে দেখিয়া)

অপরিচিত। এ কি ? আমাদের অপ্রকাশ না ?

অপ্র। (সবিস্ময়ে) আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি ! আমার বিয়ের সময়ই বোধ হয়। দেবনাথ দাদা না ?

দেবনাথ। (কাছে আসিয়া অপূর পিঠ ঠুকিয়া) এই ত চিনতেই ত পেরেছ ! বাঃ, হঠাৎ তবু দেখাটা হয়ে গেল ! তার পর সব খবর কি ? ওখানে গেছলে, দাদামশাই মরছেন কবে ? লক্ষণ কিছু প্রকাশ পায় নি এখনও ? সুহাস ? সে তোমাদের ওখানেই বোধ হয় ? আছে ভাল ?

অপ্র। (তুঃখিত স্বরে) নাঃ, তাকে ত পাঠান না, সেখানেই আছে। আনতে গেছলুম, ফিরিয়ে দিলেন।

দেব। কেন ? কেন ? বল্লেন কি ? ও গেলে ওঁর চলবে না ? কেন পয়সা আছে, ছুটো লোক রাখুন না, মেয়েটা কি চির-কাল বুড়ো আগলেই ব'সে থাকবে ? তবে বিয়ে দেওয়া কেন ?

অপ্র। (সহানুভূতি পাইয়া গাঢ় স্বরে) আমিও সেটা ঠিক বুঝতে পারি নে, বাড়ী গেলেও যাও যাও ক'রে বিদায় করেন, ওকেও পাঠাবেন না, তবে কেন বিয়ে দিলেন ? বলেছেন, এখন তের মাস ত পাঠান হতেই পাবে না। এ নাকি শাস্ত্রের নিষেধ।

দেব। ওঃ, শাস্ত্রের ত সবই খবর রাখছেন ! ওঁর শাস্ত্র ত উনি নিজেই তৈরি করেন। ভাল কথা ! তুমি এখন করবে কি ? বিয়ের সময় বলেছিলে ডাক্তারী পড়বে, তাই পড়ছো বোধ হয় ?

অপ্র। পড়তুম, ছেড়ে দিছি।

দেব। (সবিস্ময়ে) কেন ?

অপ্র। (তুঃখগম্ভীর স্বরে) সুবিধে হলো না।

দেব। কিছু মনে করো না, অসুবিধেটা কিসের ? আর্থিক না শারীরিক অথবা মানসিক ?

অপ্র। (নতচক্ষে) শারীরিক নয়, শরীর আমার ভালই।

দেব। ওঃ, বুঝেছি ! দাদামশাইকে গিয়ে ধরলে না কেন ?

অপ্র। পায়ে ধরা ছাড়া আর কিছুই বাকি রাখি নি।

দেব। তবু পেলে না ? (সহাস্যে) তুমি একটি বোকারাম !

অপ্র। আপনি তা হ'লে ওঁকে ভাল ক'রে চেনেন না।

দেব। (হাসিয়া) বেশ, রাখো বাজি, আমি যদি তোমায় ডাক্তারী পড়াবার সমস্ত খরচ মায় তার নাতনীকে শুদ্ধ আদায় ক'রে দিতে পারি, আমায় কি দেবে ?

অপ্র। আমি ত নিঃস্ব !

দেব। আমার বোনের কেনা গোলাম হয়ে থাকবে বল ?

অপ্র। (হাসিয়া আত্মগত) সে ত অমনিতেই আছি ! (প্রকাশ্যে) বোনের কেন, তা হ'লে ভাইএরও কেনা গোলাম হয়ে থাকতে রাজি আছি।

দেব। ইস্ ! তা' আর পারতে হয় না। আচ্ছা, দেখাই যাক, কত দূর কি করতে পারি। ঐ ট্রাম আসছে। চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

তারিণী দত্তর অন্তঃপুর

সুহাসিনী

সুহাসিনী। এমন কপাল করেও জন্মেছিলুম, মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাই-বোন পর্য্যন্ত হয় নি, বুড়ো বাহাত্তুরে ঠাকুদ্দা নিয়েই জন্ম কাটালুম। যদিই ভগবানের দয়ায় এক জন ব্যথার ব্যথী সত্যিকারের ভালবাসবার লোক পেয়ে-ছিলুম, বিধি বুঝি তা'তেও বাদী হলেন। দাদু যদি আমায় ওঁর রাঁধুনীগিরি করবার জন্যে না পাঠিয়ে রেখে দেয়, উনি কি চিরকাল আমার পথ চেয়ে কি তাই সহ্য করবেন ? পোড়া অদৃষ্টে এত সুখ আমার সইবে কেন ?

(চোখ মুছিল)

(তারিণী দত্ত ও পশ্চাতে দেবনাথের প্রবেশ)

দেব। এই যে সুহাস ! বিয়ে হয়ে গেছে, তবু এখানে কেন ? হঁ্যা দাদামশাই ! ওকে শ্বশুরঘর পাঠান না যে ?

তারিণী। এটা যে ওর জোড়া বছর, সেই জন্যে পাঠাতে পারি নে।

দেব। ওঃ, তাই। তা না হ'লে ও এক একটি মেয়ে পোসা না এক-একটা হাতী পোষা ! আমি ত ওর মহা বিরুদ্ধ। খরচ পত্তর ক'রে বিয়ে দেব, সব করবো, আবার বাড়ীতে বসিয়ে তু'বেলা কুঁড়ো পাথর গেলাবো, কোটাবো, রামো চন্দর ! অতো আর পারা যায় না।

তারিণী। (মুগ্ধ হইলেন) তা—তা—বড় মিথ্যেও বলিস নি দেবু ! কথাটা তোর ঠিকই, তবে, তবে কি জানিস—

দেবু। আজ্ঞে, তা আর আপনাকে ব'লে দিতে হবে না, কিন্তু দেখুন, সে দিকেই বা কি এমন সুবিধে ? সধবা মেয়ে, তুটি বেলা মাছটি চাই, আজকালের দিনে চুলগুলোয় সিঙ্গেল বিঙ্গেল বব—যা হয় একটা কিছু করলেই হয়, তা নয়, রক্ষে-কালীর মতন একটি গাদা চুল, নারকোল তেলটাও ত নেহাৎ কমটি লাগে না ? আর বেটা ছেলের তু'খান গামছা হলেই দিন কেটে যায়, ওঁদের আবার দশহাতি সাড়ী সেমিজ এটি ত চাই-ই, আরও বেশী হলেই ভাল হয়।

তারিণী। (তদ্গতচিত্তে) ঠিক বলেছিস্, দেবা ! ঠিক রে ঠিক ! আহা, বেঁচে থেকো দাদা ! মা বাপের নাম রেখো !

দেবু। তা দাদামশায় ! আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাকলেই হবে, ও ছাড়া আমাদের আর সম্বলই বা কি আছে ? ওইটুকুনই ত যা কিছু ভরসা।

সুহাস। (আত্মগত) ও বাবা রে ! এ যে দেখেছি, বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড় ! হে বাবা তারকনাথ ! তোমার নন্দী মশাইকে নিয়েই অস্থির ছিলুম, আবার ভৃঙ্গী ঠাকুরটিকে তাঁর দোসর ক'রে দিলে !

তারিণী। (সাগ্রহে) প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি রে দেবু! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক, বেঁচে থাকাই হচ্ছে আসল।

দেবনাথ। তা হ্যাঁ, দাদামশাই! অপ্রকাশ আসে-টাসে না?

তারিণী। (উৎসাহিত হইয়া) অপ্রকাশ আসে না? সে ত বলতে গেলে এইখানেই থাকে। এই ত এই সে দিন মাত্তর গেছে, সহজে কি যেতেই চায়, নেহাৎ তার মা ভাববেন ব'লে কত ক'রে ঠেলে-ঠুলে পাঠিয়েছি, আবার দেখ না কোন্ দিন গুপ ক'রে এসে পড়ে।

দেব। খুব বেহায়া জামাই জুটিয়েছেন ত! শ্বশুরবাড়ী এসে ফিরতে চায় না? আমরা কখনও শ্বশুরবাড়ী তেরাত্তির থাকি নে —ও থাকতেই নেই। শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

সুহাস। (মনে মনে অত্যন্ত রাগিয়া) এ কি আবার গোদের উপর বিষ ফোড়া জুটলো! কবে এ আপদ বিদেয় হবে? হে হরি! হরির লুঠ দেব।

[প্রস্থান।

দেবু। (সেই দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য) দেখুন আপনার অবস্থা দেখে আমার বড্ড মায়া লাগছে। দিনকতক না হয় থেকে একটু সুবিধে ক'রে দিয়ে যেতুম, একটা ইকমিকে রান্না ক'রে নিলে আর ও সব মেয়েমানুষের ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না! চাকরটা ত খুব খাটতে পারে, তবে ওর ও দোষ নেই, তা নয়, একপো ক'রে ডাল রোজ আনে কেন? বৈদ্যক শাস্ত্রের কোথাও ডালের সুখ্যাতি করেন নি, ডালের জুসেরই করেছে, আধ পো ডাল হলেই ত খাসা দু'বেলা ডালের জুস্ খাওয়া যায়, আর ভিটামিনও কিছু তাতে কম পড়ে না। তার পর রাঙ্গা চালে অবশ্য ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণেই পাচ্ছেন, কিন্তু তরকারিগুলো রান্না ক'রে যে ভিটামিন সির দফা সারা হচ্ছে, তার কি? কুটনো কোটা জিনিষটা ভিটামিনের পক্ষে মহা আপদ। খোসা শুদ্ধ ভাতে দাও, কচি কচি কাঁচা খাও, শরীর থাকবে ইয়া তাজা! আমি ত ওই ক'রে ক'রে থাইসিস্ কাটিয়ে উঠলুম, এখন দেখছেন ত বুকের ছাতি, এই দেখুন স্যাণ্ডোর মত হাতের গুলোগুলো। কি দরকার আমাদের ওই শাকের ঘণ্ট, শুখতুনি, কুমড়ো-চর্চ্চড়ি খাবার বলুন ত?

তারিণী। (চিন্তিতভাবে) ঠিক বলেছিস, দেবু! তুই দাদা, দিন কতক থেকে আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দে, আমারও খরচ কমে, ওরাও বত্তায়, তাই কর। তোর এখন ত ছুটী আছে?

দেব। তা' আছে, আমাদের কলেজ ও বিষয়ে খুব দরাজ, টানা আড়াইটি মাস ছুটী। তা হ'লে তাই না হয় করি, আগে আমার ইকমিক কুকারটি আনি, তার পর ওকে এক বেলার জন্যে গিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দিয়েই আসবোখন। দেখুন, আর জামাই আনার ল্যাঠায় কায নেই, এলেই কতকগুলো মিথ্যে খরচ বৈ ত না। কি দরকার?"

তারিণী। কিন্তু যাবার ভাড়াটা ত তা হ'লে—

দেবু। রামোচন্দর! আমার যে রেলের পাস আছে, ভাড়া আবার কিসের জন্যে লাগবে? তা লাগলে কি আর এ পরামর্শ দিই? দেখুন, আমরা কথা বেচে খাই, আমাদের কাছে পয়সা বড় চিজ! ওয়ান পাইস ফাদার মাদার, অর্থাৎ চলিত কথায় একটি পয়সা মা-বাপ।

তারিণী। (গদ্‌গদ স্বরে) তুই-ই আমায় যথার্থ চিন্‌লি রে, দেবু! এ পৃথিবীতে কেউই আমায় তোর মতন ক'রে চিন্‌লে না! নাতনী ত চটেই আছেন, নাতজামাই পড়বার খরচ চাইতে এসেছিলেন, দেওয়া হয় নি। হ্যাঁ রে দেবু! তুই-ই বল ত ভাই, কোথা থেকে আমি দেব? আমার কি একটাও রোজগেরে ছেলে বেঁচে আছে? তারা গেছে, তবু টাকা কটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে খাচ্ছি: ধরো, তারাও থেকে যদি টাকাগুলোও যেতো, আমায় কি তোরা খেতে দিতিস? জানিস্ দেবু? জগতে কন্যেই বল, পুত্রই বল, আর যিনি যতই বল, এই টাকার বাড়া আর আপন কেউ নয় রে, দাদা!

দেবু। আজ্ঞে, তা যা বলেছেন! টাকার চাইতে আপন, আমার নিজের আত্মাও নয়, তা নাতনী আর নাতজামাই! না না, দেবেন না। টাকা কি না খোলামকুচি যে, অমনি আঁচলা ভ'রে ঢেলে দিলেই হলো? আচ্ছা, সে চাইলেই বা কোন্ আক্কেলে? আমরা হ'লে ত কখনো পারতুম না।

তারিণী। দেখ, দাদা! তোরাই দেখ! দশে ধর্ম্মে দেখে হক্ কথাটা বল!

দেবু। না না, ও কোন অন্যায় হয় নি, বেশ করেছেন দেন নি, কেনই বা দেবেন? চলুন, চান-টান ক'রে নিয়ে আজকের মতন ওই চচ্চড়ি হড়হড়ি খেয়ে নিন, কালই আমি আমার ইকমিক কুকার নিয়ে আসছি।

তারিণী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুহাস। (প্রবেশ করিয়া) হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে বাবা তারকনাথ! ও যেন কাল কুক'র আনতে গিয়ে আর না ফিরে আসে। আমি তোমাদের পূজো দেব।

[প্রস্থান।

—

দশম দৃশ্য

অপ্রকাশের বাটী

অপ্রকাশের মা ও সুহাসিনী

মা। মা আমার! লক্ষ্মী আমার! আমার আঁধার ঘর আলো হলো মা! এত দিনের সকল দুঃখ আজ আমার সার্থক হলো। বসো মা! এই ঘরে বই-টই নিয়ে পড়ো, আমি রান্নাটা সেরে নিই।

সুহাস। সে কি মা! আমি থাকতে আপনি রাঁধবেন? তবে আমি এলুম কি করতে? আমায় সব দেখিয়ে দিন, আমি কুটনোও কুটে নেব, রেঁধেও ফেলবো।

মা। (জিভ কাটিয়া) বলিস্ কি মা! আমার কত দুঃখের ধন অপু, তার বউ তুই, তোকে দিয়ে আমি রাঁধিয়ে খাবো? তা কি হয় মা! তুমি বসো—আমার কতক্ষণই বা লাগবে।

[প্রস্থানোদ্যত।

সুহাস। (অগ্রসর হইয়া) সে হবে না, মা! আমি কখন মা পাই নি, আপনাকে আমি মা পেয়েছি, আমায় আশ মিটিয়ে সেবা করতে দিন।

মা। (মাথায় হাত দিয়া সাশ্রুনেত্রে) সাবিত্রী সমান হয়ো মা আমার! পাকা চুলে সিঁদুর প'রে চিরসুখী হয়ো, আমার মাথার যত চুল, তোমাদের দুজনকার তত বছর ক'রে পেরমাই হোক। আচ্ছা, এখন একটু বসো, আমি চান ক'রে এসে ডেকে নিয়ে যাবো'খন।

[প্রস্থান।

সুহাস। দেবু দাদাকে ঠিক যেন চিনতে পারলুম না! কি যেন একটা রহস্য আছে বোধ হচ্ছে! আমায় ত এক রকম দূর দূর করেই বিদেয় করলে, অবশ্য আমার তাতে শাপে বরই হলো, কিন্তু তার পর ট্রেণে উঠে দেখি, চার জোড়া নতুন ভালো ভালো সাড়ী, সেমিজ, ব্লাউস, সেণ্ট সিঁদুর তেল আলতা থেকে, হাঁড়িভরা মিষ্টি, শাশুড়ীর গরদ, এক প্রস্থ কাঁসা-পেতলের বাসন ইস্তক বিছানা বালিস—কিচ্ছুটিই বাদ পড়ে নি। আবার শাশুড়ীর কাছে একশো টাকা নগদ দিয়ে ব'লে গেল, দাদু দিয়েছেন, অথচ আমি জানি, দাদু সন্দেশের দুটি টাকা ছাড়া আর একটি পয়সাও দেয় নি, এ সব তা হ'লে এলো কোত্থেকে? জিগ্‌গেস করলুম, তা ইয়ারকি ক'রে উড়িয়ে দিলে। (ঘর গুছাইতে লাগিল)

(অপ্রকাশের প্রবেশ)

অপ্র। (সহাস্যে) এই যে! এসেই ঘরের লক্ষ্মী ঘর গুছোতে লেগে গেছেন! তার পর তোমার জন্যে একটি বক্স হার্ম্মোনিয়ম কিনতে দিলুম যে, কিনে এলে আমায় কিন্তু রোজ দু' একটি ক'রে গান শোনাতে হবে, তা ব'লে রাখছি।

সুহাস। (প্রফুল্লমুখে) মা রয়েছেন যে? যদি কিছু মনে করেন?

অপ্র। আমার মা মনে করবার মা-ই নন, দু'দিন থাকলেই তা তুমি নিজেই জানতে পারবে। মাকে আমি বলেছিলুম, তিনিই ঐ একশো টাকা থেকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বাজনা কিনে আনাতে বল্লেন।

সুহাস। (নিশ্বাস ফেলিয়া) এত দিন পরে আমি তোমায় পেয়ে মা পেলেম। ভাগ্যে সে দিন লুকিয়ে গান শুনেছিলে! নইলে এ মা ত আমি পেতুম না!

অপ্র। হুঁ! আর আমি বুঝি ভেসে গেলুম?

সুহাস। (হাত ধরিয়া) ওগো, না না, রাগ করো না, তুমি ত আমার সর্ব্বস্ব। কিন্তু আজ আমি মাতৃস্নেহ লাভ ক'রে যে আনন্দ পেয়েছি, তাতে যেন আমায় মাতাল ক'রে দিয়েছে। উঃ ভগবান্! কি জিনিষে আমায় তুমি চিরকাল ধ'রে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলে!

একাদশ দৃশ্য

তারিণী দত্তর বহির্ব্বাটী

তারিণী দত্ত টাকা গুণিতেছিল

(দেবনাথের প্রবেশ)

দেবনাথ। দাদামশাই! বিদায় দিন, বাড়ী যাব ভাবছি। ঐ নেপা ব্যাটাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছি, ও চড়িয়ে দেবে, আপনি অনায়াসে দুটি ঘণ্টা বাদে নামিয়ে নিয়ে খেতে পারবেন। আর রাত্তিরে ত দুধটুকু আর ফল।

তারিণী। (দুঃখিত কণ্ঠে) সে কি রে দেবু! এরই মধ্যে চ'লে যাবি? তবে যে বলেছিলি, আড়াই মাস ছুটী, এখনও ত মাসও পোরে নি রে!

দেবু। তাই ত ভেবেছিলুম দাদামশাই! কিন্তু যে রকম কাণ্ডটি দেখছি, ভরসা হচ্ছে না। আর না গিয়েই বা কি করি, কটা দিনই বা আর আছি। যে কটা দিন আছি, একটু ধর্ম্ম-পুণ্যি ক'রে নিই গে। মনে করছি, বাড়ী হয়ে সব্বাইকে নিয়ে কাশীই যাব। যেতেই যখন হবে, স্বর্গেও যাতে যেতে পারি, তারও একটা পথ-টথ ত ক'রে রাখাই ভাল, নৈলে আবার মদ্দারাম যমদূতগুলো হেঁইও হেঁইও করতে করতে কাটাবন দিয়ে হিঁচুড়তে হিঁচুড়তে নিয়ে যাবে।

তারিণী। হ্যাঁ রে দেবু! হঠাৎ তোর হলো কি? কি সব বলছিস?

দেবু। তা তোমায় বলতেই বা লজ্জা কি, কাউকে কিন্তু ব'লে ফেলো না। মিথ্যে মোকদ্দমা ক'রে এক জনের ক'বিঘে জমী কেড়ে নিয়েছিলুম, সেটা গিয়েই ফিরিয়ে দেব, আর পয়সা-কড়ি দুটো দশটা যাই আছে, দু'হাতে তুলে বিলিয়ে ছড়িয়ে এই বেলা পুণ্যি ক'রে নিই গে।

তারিণী। (সবিস্ময়ে) হ্যাঁ রে দেবা, তোর ত কোন দিন নেশা-ফেশা অভ্যেস ছিল না, এ কি বলছিস?

দেবু। (হাসিয়া) আজও নেই গো দাদামশাই। নেশার ধার ধারি নে। কেন, তুমি কি কিচ্ছুই শোন নি?

তারিণী। কিসের কি শুনবো রে?

দেবু। কেন ঐ তেলির ধূমকেতু? তার চেহারা দেখেছ ত? ও কি করবে, তা বুঝি এখনও জানো না?

তারিণী। কি আবার করবে? ও রইলো আকাশে, আমরা রইলুম মাটীতে।

দেবা। ঐ ত মজা দাদামশাই! নৈলে,—

"সে থাকে নীলনভে, আমি নয়নজলসায়রে।"—

১৮ই মে আমাদের পৃথিবীটা যে ঐ ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়ে যাবে, তা জানো না?

তারিণী। হা হা হা হা! ভায়া! ও সব কাগজওয়ালাদের কাগজ কাটাবার ফন্দি। অমন পুচ্ছ-মুচ্ছ হাজার হাজারবার পার হয়েছে। পৃথিবীটে কি বেলে মাটীর যে, আঙ্গুল ঠেকলেই টস্‌কে যাবে?

দেবা। (অসহায়ভাবে) হাসছেন কি, দাদামশাই! যখন হবে, তখন বলবেন হ্যাঁ! এই কুসংস্কারগুলো আমাদের পচা

দেশেই নয়, পৃথিবীর সমুদয় ভাল ভাল সুসংস্কৃত দেশে শুদ্ধ এই নিয়ে হৈ-হৈ প'ড়ে গেছে। সব্বাই নিজের কায সামলাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক তার রিসার্চের ফল তাড়াতাড়ি রেকর্ড করছে, রাসায়নিক তার এক্সপেরিমেণ্ট অবজার্ভ করছে, পাপী পুণ্যিধর্ম্মে মন দিচ্ছে, পুণ্যাত্মা তার গ্রেড বাড়াবার বা ডবল প্রমোসনের বন্দোবস্তে উঠে প'ড়ে লেগে গেছে। আমিই বা প'ড়ে থাকি কেন বলুন দেখি। যদি পট্ ক'রে মরেই যাই। আর এ কেমন সুযোগ, তাই দেখুন না? ছেলে-পিলে ইস্তক ঘরের গিন্নী সব সপুরী একগাড়। কাঁদতে ক'কাতে নেই। পিছটান ছেড়ে দু'হাতে ছড়িয়ে দাও। পুণিকে পুণ্যি!

(প্রথম প্রতিবেশীর প্রবেশ)

প্রতি। ওহে দেবনাথ! ১৮ই মের কথা কিছু ভাবছো? আমি ত স্থির করেছি, কাশী গিয়ে ওদিনটা উপোসী থেকে ভৈরবমন্ত্র জপ করবো, শিবলোকটাই আমার বেশী পছন্দ।

দেবনাথ। ঠিক বলেছেন, দাদা! আহা, কৈলাস! কৈলাসের মত কি যায়গা আছে? ভাং খেয়ে ভোলানাথ যখন তানপূরায় সঙ্গত আরম্ভ করেন, বাগ্‌বাদিনীর বীণা ঝঙ্কার ক'রে ওঠে, মন্দাকিনীর কুলুকুলু ধ্বনি কাণে যায়, আর নন্দি-ভৃঙ্গীরা গাল বাজিয়ে ব-ব বোম্ ব-ব বোম্ র-ব তোলে, তখন সেই কোমলে-কঠিনে মিঠে-কড়ায় কি অনির্ব্বচনীয় শব্দলহরীরই সৃষ্টি হয়। আর মধ্যে মধ্যে সিংহগর্জ্জনও শোনা যায়। আহা!

(গয়লানীর প্রবেশ)

গয়। দাদাঠাকুর! দুধের দামটা আমার চুকিয়ে দিও, বাবু! ধূমকেতুর ল্যাজ না কি পিরথিমেকে ঝেঁটিয়ে নেবে, তা বাবু, যদি মরেই যাই, আর জন্মে আবার আমার ট্যাকা আদায়ের জন্যে তখন ধেরো থেকে গাছ হবে, আমি পরগাছা হয়ে তোমার গায়ে জড়িয়ে থাকতে পারবো না, বাবু! হুঃ, একটা কথা কইতে পাব না; দুপুর রোদে তেষ্টায় টা-টা করলেও জল-রক্তি গড়িয়ে খাবো, তার যোটি নেই! হিসেব ক'রে রেখো, কাল এসে নে যাব।

[প্রস্থান।

(রাসু বাগের প্রবেশ)

রাসু। বাবাঠাকুর! আপনার টাকা ক'টা নিয়ে আমার খতখানা ফেরৎ দিন, আজকের পর্য্যন্ত সুদ চড়িয়ে বেবাক ক'রে এনেছি।

তারিণী। ভূতের মুখে রাম নাম! পায়ের দড়ি ছিঁড়ে তোর সুদ আদায় করতে পারি নে, হঠাৎ আজ এমন ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে উঠলি যে বড়?

রাসু। আর বাবাঠাকুর! এমন সোণার পিরথিমিটেই যখন গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে, তখন আর এই কটা টাকা? সঙ্গে ত আর বেঁধে নে' যেতে পারা যাবে না, যেতে ওর অধম্মটুকুনই সঙ্গে যাবে।

[টাকা দিয়া খত লইয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

প্রতিবেশী। দেবু ভায়া! তা হ'লে এখন চল্লাম, কাশী যে যাব, তার বিলি-ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে ত হবে, সময়ও ত খুব সংক্ষেপ। আচ্ছা, যাবার আগে আবার দেখা হবে। আসি, দাদামশাই!

[নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান।

তারিণী। (চিন্তিতভাবে) দেবা!

দেব। আজ্ঞে?

তারিণী। হাঁ রে, সত্যি তা হ'লে?

দেব। তাই ত সবাই বলছে, দাদামশাই! সত্যি-মিথ্যে কেমন ক'রে জানবো বলুন, যতক্ষণ না একটা কিছু হচ্ছে। বিলেতে আমেরিকায় সর্ব্বত্রই ত এই একই রব। পাদরীরা গির্জ্জেয়, আর মোল্লারা মসজিদে, আর আমাদের সন্ন্যাসীরা কোথায় আছেন জানি নে, থাকেন হয় ত গুহা-গহ্বরে, মনে কিন্তু সবারই ঐ একই রব, "ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ!" তা আমিও ভাবছি, কাশী যেয়ে সকালে উঠে দশাশ্বমেধে চান ক'রে একখানা গরদের ধুতি পরবো, দোবজা কাঁধে ফেলে কপালে চন্দনের ফোঁটা—কোশাকুশি নিলেও হয়, না নিলেও চলে, তা নেওয়াই ভাল।

তারিণী। (ব্যাকুলকণ্ঠে) হাঁ রে, আমার যে লাখ টাকার ওপোর আছে, সে সব কি হবে?

দেব। তার জন্য অত ভাবছেন কেন? সবই যেমন আছে, ঐ সিন্দুকে বন্ধ থাকবে। চুরি করবার জন্যে এক জনও ত আর বেঁচে থাকবে না যে, তার এত ভাবনা! তা ও সিন্দুক-ফিন্দুক সবই একাকার লণ্ডভণ্ড! পৃথিবীটা যদি টোক্কর খেয়ে উল্টে যায়, তা হ'লে মানুষগুলো উপরদিকে পা, নীচে দিকে মাথা ক'রে উল্টে পড়বে। যদি বাঁয়ে হেলে, তা হ'লে—

তারিণী। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) হাঁ রে দেবু! সত্যি কি সব যাবে রে? আমার যে বড় কষ্টের টাকা!

দেব। টাকা যাবে কোথায়, দাদামশাই? যাই ত যাব আমরা! ওঁরা ত মরেন না; ওঁরাই হচ্ছেন অমৃতস্য পুত্রাঃ। ভাল ক'রে তালাটা বন্ধ রাখবেন, বেরুতে পারবে না, তবে যদি বাঁয়ে হেলে, আমরাও ঘর-বাড়ী, সিন্দুক-পেটরা নিয়ে বাঁ-কাতে গড়িয়ে পড়বো, মাথাগুলো হয় ত ঠোকাঠুকি হবে না হয় ত ঐ সিন্দুকেই ছেঁচে যাবে। ভরা সিন্দুকটা ধাঁ ক'রে হয় ত পিঠের উপরেই চেপে পড়লো, ভেতর থেকে টাকাগুলো ঝম্ ঝম্ ঝম্! কিন্তু যাই বল, দাদামশাই! টাকার যেমন শব্দটি, অমনটি কিন্তু এস্রাজের তারেও বাজে না। আচ্ছা, টাকা বাজিয়ে ওস্তাদরা গান গায় না কেন?

তারিণী। দেবু! তা হ'লে না হয় একটা কায করবো? কিছু দান-টান না হয় করি?

দেব। আরে রাম! দান করলেই যে কমে যাবে, দাদামশাই! তা হ'লেই ত গেল।

তারিণী। কিন্তু যদিই পৃথিবী ধাক্কাই খায়?

দেবু। কিছু বিশেষ তাতে নেই দাদামশাই! এ আমাদের টিকিওয়ালা পণ্ডিতরা ত বলে নি, ঐ হ্যাট-পরা পণ্ডিতদের বাণী, ধরুন খাবে। আর পৃথিবী ধাক্কা যদি খায়,

তা হ'লে নিজেকেই গোলামকুচির মতন কুচিয়ে গুঁড়িয়ে ছিনিমিনি খেয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তা অন্যে পরে কা কথা।

তারিণী। তা হ'লে আমাকেও তোর সঙ্গে কাশী নিয়ে চল, দেবু! আর এই টাকা, বন্ধকী খত, আর কোম্পানীর কাগজ এগুলো না হয় ওদের কাছেই পাঠিয়ে দিই। যদি যায়ই সব, তবু ওদের কাছ থেকেই যাক।

দেব। কিন্তু দেওয়াটা যেন কেমন একটু লাগে। আচ্ছা, একটা কায করুন, একটা উইল লিখে সবশুদ্ধ, এখন ব্যাঙ্কে জমা রাখুন। একটা খসড়া করা যাক্, কি লিখবো, বলুন ত?

(কাগজ-কলম লইল)

তারিণী। আমার একমাত্র পৌত্রী শ্রীমতী সুহাসিনীর এবং তাহার স্বামী শ্রীযুক্ত অপ্রকাশচন্দ্রকে আমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি এবং আমার ভাগিনেয়ীপুত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ দেবনাথকে—

দেব। (বাধা দিয়া) ও আবার কি দাদামশাই! আপনার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট! ও সবে আর জড়াবেন না, ক্ষমা করুন।

তারিণী। তুই লেখ ত, আমার টাকা, আমি যদি রাস্তায় ছড়িয়ে দিই, তুই কেন কথা কোস্? হ্যাঁ, দেবনাথকে দশ হাজার টাকা দিয়া বাকি ক্যাসে এক বন্ধকী খত প্রভৃতিতে নগদ নব্বই হাজার টাকার সমস্তই উক্ত সুহাসিনী এবং শ্রীযুক্ত অপ্রকাশচন্দ্রকে—

দেব। দাদামশাই! ওর থেকে আর বিশ হাজার এখন রেখে দিই, ওটা আপনার নামেই থাক, এর পর ওটা গরীব বিদ্যার্থীদের সাহায্যের জন্যে আপনার নামে একটা ফণ্ড ক'রে দেব। কি বলেন?

তারিণী। (অর্থনাশভয়ে ভীত হইয়া নিতান্ত অবসাদগ্রস্তই আছেন) তুই যা ভাল মনে করিস দাদা, তাই কর; আমার কিছুই আর ভাল লাগছে না। অ্যাঁ! আস্ত পৃথিবীটা ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেবে? অ্যাঁ! এরা সব বলে কি? ওরাই পাগল হলো, না আমাকেই পাগল করলে? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

দেব। (লেখা শেষ করিয়া) উকীল বাবুকে খবর পাঠাই। সময় সংক্ষেপ, সব তাড়াতাড়ি সারতে হবে ত! কাশীতেও বাড়ীর খবর নিতে চিঠি দিই গে।

[প্রস্থান।

তারিণী। সব যাবে? টাকা, নোট, কোম্পানীর কাগজ, বন্ধকী খত কিছুই থাকবে না? হাঃ, তোর ধূমকেতুর নিকুচি করেছে! এত যায়গা থাকতে পৃথিবীর ওপোরেই পড়তে এলি? ঐ যে চাঁদটা, আজকাল সায়েবরা বলে, ওতে মানুষ নেই, জল নেই, ওইটেকেই না হয় গুঁড়িয়ে দিলেই হতো, না হয় পূর্ণিমা নাই হতো, অমাবস্যেই থাকতো বারো মাস! আক্কেল কি শুধু মানুষেরই গেছে, ও সব সমান। আত্মগর্বের একশেষ।

[সরোষে প্রস্থান।

শেষ দৃশ্য

কাশী দশাশ্বমেধ ঘাট

তারিণী দত্ত, দেবনাথ, সুহাসিনী, অপ্রকাশ

তারিণী। তোরা তোদের ঘরে ফিরে যা' দিদি! আমি আর ফিরবো না। দেবার কল্যাণে আমি বাবা বিশ্বনাথকে পেয়েছি। বেশ আছি, শেষ দিন ক'টা এইখানেই কাটিয়ে যাব।

সুহাস। দাদু! আমি তা হ'লে আপনার কাছে এখন থাকি, উনি ফিরে যান, কলেজ খুলে গেছে। দাদারও ত ছুটী ফুরুলো, কলেজ শীঘ্রই খুলবে। আপনার কষ্ট হবে।

তারিণী। দেখ দিদি! এখানে এসে আমি যেন বদলে গেছি, বাড়ীতে ব'সে থাকতে ত আর ভাল লাগে না, এই দশাশ্বমেধে আমি পাঁচ জনের সঙ্গে কথা কই, কেত্তন শুনি, দেবদর্শন করি, ভাগবতপাঠ হয়, বেশ আছি, কেন মিথ্যে কষ্ট করবি, তুই ফিরে যা। বামুন মেয়ে বেশ যত্ন করে, আমার চ'লে যাবে। দেখ অপূ! টাকা-কড়িগুলো যেন বরবাদে দিও না, খুব হাত টেনে টেনে খরচ করো, সিগরেট ফুঁকে, পাণ চিবিয়ে বাজে খরচে উড়িয়ে দিলে ও আর কতক্ষণ! আচ্ছা, সব এস গিয়ে, আমি কথা শুনতে যাই।

[প্রণাম গ্রহণ ও আশীর্ব্বাদানন্তর প্রস্থান।

অপ্র। দেবনাথ দাদা! এ কি কাণ্ড! এ কি সত্যি না স্বপ্ন? আপনি কে? কোন দেবতা ছলনা করছেন না ত?

দেব। (সহাস্যে) ভাই! হেলির ধূমকেতু আর যার ভাগ্যে যা আনুক, তোমাদের বরাতে ও হয়ে এসেছিল মঙ্গল গ্রহ! ১৮ই মে ত কেটে গেল, কিন্তু আমার দাদামশাইএর না মরেই পুনর্জ্জন্ম হয়ে গেল।

যবনিকা-পতন

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

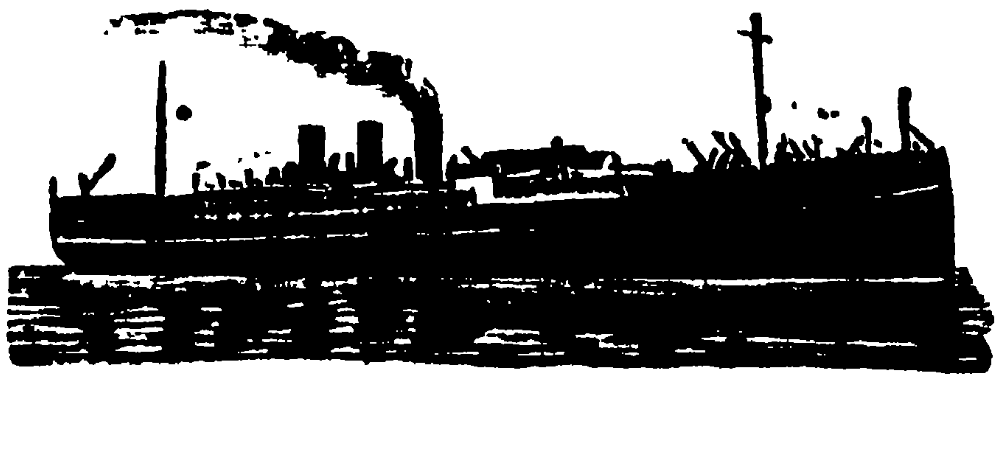

আমার বিয়ে

বিয়ে কিছু হবার মত লক্ষণ ত নাই।
না হ'লে নয় তাতেই কেবল ইস্কুলেতে যাই॥
বয়স হ'ল বছর বাইশ কোষ্ঠীতে মোর আছে।
'এই আঠারো চল্‌চে' বলেন বাপ-মা সবার কাছে॥
যাক্ গে সে সব, কি আসে যায় ফালুসা কথা নিয়ে।
বাপ-মা বেঁচে থাক্‌লে ছেলের আট্‌কায় না বিয়ে॥
বিশেষ যদি ছেলের বাপের অবস্থাটা তায়।
নেহাৎ খারাপ না হয়, তবে আর কে তাঁকে পায়॥
আট্‌কালো 'না বে' তাই মোর, প্রজাপতির বরে।
অল্প দিনেই পাত্রী এসে জুটলো আমার তরে॥
দুই পক্ষের কথা যা তা চুক্‌লো সমুদয়।
এখন 'ঘরের লক্ষ্মী' ঘরে নিয়ে এলেই হয়॥
পুরুত-মশাই পাঁজি এনে সম্‌ঝে সকল দিক্।
বিশে বোশেখ বিয়ের তারিখ ক'রে গেলেন ঠিক॥
আজ্‌কে বারই বোশেখ, মাঝে সাত দিন আর আছে।
চিঠি নিয়ে লোক একটা এলো বাবার কাছে॥
সোলই বোশেখ কনের বাবা দেখে যাবেন পাকা।
সঙ্গে নিয়ে পড়সী দুজন আর পাত্রীর কাকা॥

পাকা দেখা

তার পরেতে যথাদিনে এলে তাঁরা পর।
বসাইলেন বাবা তাঁদের ক'রে সমাদর॥
ডাকাডাকি লাগ্‌লো হতে আমায় বারে বার।
বস্‌লেম গে সেথায় আমি ক'রে নমস্কার॥
মাথায় দিয়ে ধান-দুব্বো হাতে দিয়ে টাকা।
শ্বশুর মশাই সোলই আমায় দেখে গেলেন পাকা॥
তার পরেতে বাবাও আমার তাঁদের কথা রেখে।
দিনেক পরে গিয়ে সেথা পাত্রী এলেন দেখে॥
আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিয়ের নিমন্ত্রণ।
গিছলো আগেই আস্‌তে তাঁদের ক'রে আবাহন॥
তাঁরাও এলেন বাবার আমার পত্র ক'রে পাঠ।
নির্জ্জন ঘর মোদের এখন হলো হ'রের হাট॥

আমার চিন্তা

দিন ধার্য্য ছিলো না কি বোশেখ মাসের বিশে।
মনে বড় চিন্তা এলো জানি নাকো কিসে॥
মা আর বাবা—তাঁরা মা-বাপ আছেন চিরদিনই।
ঠিক তেম্নি দাদা দিদি পঞ্চু ভুলো মিনি॥
সবাই মিলে এক পরিবার, সবাই নিজের জন।
সবার সঙ্গে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধন॥
কিন্তু বিশে বোশেখ যেটা ঘটবে দুদিন পরে।
আপ্‌নার লোক হয়ে এসে ঢুকবে মোদের ঘরে॥
সে—কি রকম আপ্‌নার লোক নাইকো কিছুই জানা।
এই নিয়ে আজ আমার মনে ভাব্‌না এলো নানা॥
আমার বাড়ী হরিশপুরে, তার সে বারাসত।
হেঁটে গেলে শুনেছি যে প্রায় দু'দিনের পথ॥
কোনো কালে পরস্পরে চেনা-শুনা নাই।
আচার-ব্যভার কেমন তাদের ভাব্‌চি ব'সে তাই॥

সাহেবদেরি নিয়ম ভাল বিয়ের বিষয় নিয়ে।
আগে বর আর কনের মিলন, তার পরেতে বিয়ে॥
কোর্টশিপেতে দুই জনেতে মিলন যখন হয়।
তার পরে হয় বিয়ে—আহা কেমন মধুময়!
যা হোক্ সে সব হেন-তেন ভাবাই আমার ভুল।
আট্‌কায় না কিছুতে আর ফুট্‌লে বিয়ের ফুল॥

গায়ে হলুদ

বিয়ের আগের দিন সকালে পাঁচটি এয়ো মিলে।
শাঁখ বাজিয়ে হুলু দে' মোর গায়ে হলুদ দিলে॥
চার কোণে চার কলার ডাঁটা, মাঝখানেতে তার।
পিঁড়ি পাতা, বসেছিলেম তাতেই দিয়ে বার॥
ঘড়ায় ক'রে মাথায় গায়ে জল কর্‌লে দান।
'আকাটা-পুকুরে' আমার হয়ে গেলো স্নান॥
এখন থেকে পেলেম আমি সঙ্গের এক সাথী।
কোমরেতে রাখ্‌তে হলো গুঁজে রূপোর জাঁতি॥

বর-যাত্রা

সেই শুভদিন বিশে বোশেখ হাজির হ'ল আজ।
সকালবেলা হলো বিয়ের আভ্যুদয়িক কাজ॥
শাস্ত্রে আছে শুভ কাজে পূর্ব্বপুরুষগণে।
স্মরণ ক'রে জল দিতে হয় ভক্তিভরা মনে॥
তাতে শুভ হয় সকলের, জন্মে মনে প্রীতি।
এই জন্য এরূপ করা পূর্ব্বাপরের রীতি॥
বাবাও এ সব কল্লেন তাই ভক্তিভরা মনে।
বিয়ের পূর্ব্বকৃত্যটা শেষ হলো এতক্ষণে॥
হলুদ-মাখা সুতো বেঁধে দিলেন আমার হাতে।
শুধু সুতো তাই কি? আবার দূর্ব্বোগুছি তাতে॥
বর-যাত্রার সময় ক্রমে হাজির হলো এসে।
দিব্যি ক'রে সাজিয়ে আমায় দিলে বরের বেশে॥
নূতন বাহার আমার সে দিন খুললো চেলির যোড়ে।
কপালেতে চন্দন-ছাপ, গলায় বেলের গোড়ে॥
পম্‌-শু পায়ে, মাথায় টোপর বিচিত্র কাজ তায়।
বর যে আমি, দেখ্‌লেই তা স্পষ্ট বুঝা যায়॥
প্রণাম ক'রে তখন আমি দেবতা গুরুজনে।
পাল্‌কী চেপে বস্‌লুম গে নিতবরটির সনে॥

শাঁখ বাজালে, হুলু দিলে বৌ-ঝি মনের সাধে।
বেহারারা চল্‌লো তখন পাল্‌কী তুলে কাঁধে॥
পাল্‌কী চ'ড়ে গিয়ে খানিক, পৌঁছে নদীর ধার।
পান্‌সী চেপে তখন নদীর আড়-খে হলুম পার॥
সেইখানেতে ঘোড়ার গাড়ী ছিল ভাড়া করা।
তাতেই উঠে বস্‌লেম গে বরের পোষাক পরা॥
ট্রেনের কাছে গিয়ে যখন থামলো ঘোড়ার গাড়ী।
বরযাত্র সমেত তাতে উঠনু তাড়াতাড়ি॥
পরের ট্রেনে গেলেও হতো, তবু এটা পেয়ে।
ভাব্‌লে সবাই এটাই ভালো, গউণ করার চেয়ে॥
বিরামপুরের ইষ্টিসেনে থাম্‌লো গিয়ে ট্রেন।
নামনু সেথা—ছিলো সেথা পাল্কী মোতায়েন॥
আবার তাতেই বস্‌নু উঠে, দিলেম আবার পাড়ি।
কিছু পরেই শুননু দেখা যাচ্চে শ্বশুরবাড়ী॥
পাল্‌কী, নৌকা, ঘোড়ার গাড়ী, আর এই যে ট্রেন।
চতুরঙ্গে শ্বশুরবাড়ী—বাকি এরোপ্লেন॥

বিয়ে-বাড়ী

আর একটু গিয়ে যখন ফিরছি পথের বাঁক।
হুলুধ্বনির সঙ্গে মিশে উঠ্‌লো বেজে শাঁখ॥
উঠ্‌লো ক'রে বুক টিপ্‌-টিপ্ উৎসাহে কি ভয়ে।
পারি নাকো বল্‌তে, যেন গেনু কেমন হয়ে॥
বিয়ে-বাড়ী পাল্‌কী গিয়ে পৌঁছিলে তার পর।
ছুটে এলো এক পাল লোক—"ঐ এসেছে বর"॥
দেখনু গিয়ে আলোয় আলো, ব্যস্ত সকল জন।
সজ্জিত বিছানার মাঝে বরের বরাসন॥
হাতে ধ'রে আমায় তাতে বসালে তার পর।
টোপর মাথায় বস্‌নু সেথা নবীন নটবর॥
চার দিকেতে ভদ্রাভদ্র লোক গিয়েছে ছেয়ে।
সবাই কি ছাই একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে!॥
লজ্জা যে কি জান্‌তেম না আমি জীবন-ভোর।
আজ সে যেন গলা টিপে ধরলো এসে মোর॥
কথায় বলে "বর নয় চোর"—কথাটা যে খাঁটি।
আজকে আমি মর্ম্মটা তার বুঝনু পরিপাটী॥
ভাব্‌ছি কেবল এ অবস্থা কাটবে কেমন ক'রে।
এমন সময় ঠাকুর সদয় হলেন আমার 'পরে॥

মন্ত্রপাঠ

‘বাজ্‌লো ন-টা’ কে এক জন, বল্লে ঘড়ী খুলে।
অম্নি পুরুত হাঁকলো ‘তবে বরকে আনো তুলে॥
সময় বড় সংক্ষিপ্ত—লগ্ন যাবে ব’য়ে।’
তাই-না শুনে দুজন যুবা এলো আগু হয়ে॥
সেই সময়ে শ্বশুর মশাই খুব নম্র বেশে।
যোড়হস্তে দাঁড়াইলেন সভার পাশে এসে॥
সভাস্থ সকলে বলেন করিয়ে সম্মান।
‘অনুমতি করুন আমি কন্যা করি দান॥’
আনন্দে সভাস্থ সবে দিলেন অনুমতি।
আমার তখন হলো কাজেই স্থানান্তরে গতি॥
দালানে চিত্রিত পিঁড়ি আলিপনা দিয়ে।
তায় বসালে আমায় তখন যত্নে নিয়ে গিয়ে॥
করবেন শাশুড়ী না কি কন্যা নিজেই দান।
উপবাসে ক্লিষ্ট তবু আহ্লাদিত প্রাণ॥
আসনে এক ব’সে দেখেন মৃদুভাবে চেয়ে!
মানুষকে কি বানরটিকে দিচ্ছেন তাঁর মেয়ে॥
যা হোক্, আমি বসলে গিয়ে চিত্রিত পিঁড়িতে।
পুরুত ঠাকুর লেগে গেলেন মন্ত্র বলাইতে॥
শাশুড়ীকে আর আমাকে পালা মাফিক তাঁর।
মন্ত্র ব’লে যেতে হলো, মন্ত্র যেটা যার॥

স্ত্রী-আচার

এই রকমে কতকগুলি মন্ত্র বলার পরে।
উঠ্‌তে হলো আমাকে ফের স্ত্রী-আচারের তরে॥
এবার গেলাম ছাঁদ্‌লাতলায়—অপূর্ব্ব সে ঠাঁই।
সর্ব্বে-সর্ব্বা মেয়েই সেথা—পুরুষ কেহ নাই॥
সেখানেতে আলোয় আলো—লোমটি দেখা যায়।
সুসজ্জিতা রূপসীদের রূপের আলো তায়॥
কি আনন্দ বইছে সেথা কেমনে তা বলি।
সবার মুখে আনন্দ আর হর্ষ-কলকলি॥
‘হংসমধ্যে বকো যথা’ দাঁড়াইলাম গিয়ে।
পিঁড়ির উপর চেলি-পরা, টোপর মাথায় দিয়ে॥
তাই-না দেখে রূপসীদের আনন্দ না ধরে।
আমায় নিয়ে কত রকম রঙ্গ তারা করে॥
তাদের মুখে হাস্যের কথা, রং-তামাসা কত।
‘বর নয় চোর’ আমি কাজেই দাঁড়িয়ে বোবার মত॥
কিন্তু সেথা সে দিন আমার খাতির দেখে কে।
ঘুর্‌লো আমার চারদিকে সব হুলুধ্বনি দে॥
শাঁখ বাজিয়ে হুলু দিয়ে কি বরণের ঘটা!
আমি এমন বরণীয় জান্‌তেম কি সেটা?॥
আমার খাতির দেখে আমি গেলাম বোকা ব’নে।
এমন সময় পিঁড়েয় তুলে আন্‌লে দুজন কনে॥
পিঁড়েয় ব’সে আছে কনে মাথা ক’রে নত।
উপুড় হয়ে যেন আমায় গড় করবার মত॥
আমায় বেড়ে তখন তাকে ঘোরালে সাত পাক।
পরে আমায় ঘোরাবে এ, তারি এটা তাক॥
এই সময়ে কনে নিয়ে ঘোরার তালে তালে।
সুন্দরী কেউ হেসে আমার মার্‌লে ঠোনা গালে॥
আদর ক’রে ‘বাঁদর’ ব’লে ঠান্‌দি দিলেন গালি।
হাস্‌তে হাস্‌তে আস্তে আস্তে কাণ মল্‌লেন শালী॥
‘চার চোখ চাও’ বল্‌লে তখন সবাই অনুরাগে।
পিঁড়ে সমেত কনে এনে ধর্‌লে সম্মুখভাগে॥
উড়ানি এক মোদের দোঁহার মাথার উপর ঢেকে।
‘পরস্পরে চেয়ে দেখ’ বল্লে মোদেব ডেকে॥
‘মঙ্গল কাজ কর্ত্তে হয় এ’ ক’লে সবাই দাওয়া।
কাজেই হ’ল তার ভিতরে চার-চক্ষে চাওয়া॥
এমন সময় সুন্দরী এক আমার মালা নিয়ে।
হেসে হেসে কনের গলায় দিল পরাইয়ে॥
কনের মালাছড়া দিলে আমার গলায় ফের।
‘মালা বদল’ হয়ে তখন গেলো উভয়ের॥
তার পর মোর উড়ানিতে, কনের চেলির খুঁটে।
এক ক’রে নে গেরো তারা বেঁধে দিলে এঁটে॥
বাঁধা হলো ‘গাটছড়া’ যে, যেথাই থাকি যাই।
জীবনে আর মোদের দোঁহার ছাড়াছাড়ি নাই॥
বিয়েতে খুব হাঙ্গাম, মোর মনে ছিল ভয়।
দেখ্‌ছি এখন ভুল সে আমার—মন্দ এ তো নয়॥

আবার মন্ত্র

বাইরে থেকে খবর এলো এমন সময়টায়।
‘বরকে ছেড়ে দাও তোমরা—লগ্ন বয়ে যায়’॥

কাজেই আমায় বাইরে গিয়ে সাবেক পিঁড়িটিতে।
বস্‌তে হলো আর একবার বিনা আপত্তিতে॥
মন্ত্র পড়াইলেন পুরুত যত ছিল তাঁর।
সারাংশ তার— আমার ঘাড়ে পড়্‌লো কনের ভার॥
তুজনাতে আমরা হবো একই মনঃপ্রাণ।
এমন কথাও করমু স্বীকার নারায়ণের স্থান॥
আমার হাতের উপর তখন রেখে কনের হাত।
পাণিগ্রহণ কাজটা হলো সমাধা পশ্চাৎ॥
এই রকমে পুরোহিতের সাঙ্গ হলো কাজ।
মন্ত্র বলার হাতে আমি রেহাই পেলেম আজ॥

আমার খাওয়া

তার পরেতে অন্দরেতে নিয়ে গেলো মোরে।
বসাইল একটা ঘরে যত্ন আদর ক'রে॥
আসন পাতা, সম্মুখে তার বড় রেকাবেতে।
ফল-ফুলারি মিষ্টান্ন—হবে আমায় খেতে॥
কাজে কাজেই আমি তাহার খেলাম কিছু কিছু।
চারদিকে-সাজানো-বাটি অন্ন এলেন পিছু॥
সমস্ত দিন কেটে গেছে, তায় এতটা রাত।
জলযোগের পরে এখন আর কি রোচে ভাত?॥
তবু খেতে হলো কিছু নৈলে ছাড়ান্ নাই।
সুন্দরীদের পীড়াপীড়ি—মান রাখা তো চাই!॥
খাওয়ায় আমার চিরকালই নাইকো মোটে লাজ।
কিন্তু এত নারীর মাঝে খাট্‌লো না তা আজ॥
থালায় যখন হাত দি, তাদের দৃষ্টি থালায় যায়।
মুখে যখন তুলি, তখন মুখের পানে চায়॥
কেমন ক'রে তুলি, চিবুই, কেমন ক'রে গিলি।
সমস্তটি দেখ্‌বে তারা, ছাড়্‌বে না এক চুলই॥
এমন অবস্থাতে খাওয়ার বিড়ম্বনা কত।
বে করেছেন যিনি তিনিই জানেন বিধিমত॥

বাসর-ঘর

কোনও রূপে ভোজন-ব্যাপার সাঙ্গ হ'লে পরে
মুখটি ধুয়েই ঢুক্‌তে আমায় হলো বাসর-ঘরে॥
বাসর সে খাস্ নারীর আসর—খুব গুলজার ঠাঁই।
রং-তামাসা ভিন্ন সেথা অন্য কথা নাই॥
নানা রকম বসন-ভূষণ সর্ব্বাঙ্গে প'রে।
সুন্দরী সব ব'সে আছেন বাসর আলো ক'রে॥
মাঝখানেতে রেখে দেছেন আমার তরে ঠাঁই।
আমায় তখন গিয়ে সেথা বস্‌তে হলো তাই॥
বস্‌লে আমি, কত রকম প্রশ্ন আমার 'পরে।
এলো যে, তা অধম আমি বল্‌বো কেমন ক'রে॥
সুন্দরী এক ডিবে সমেত এগিয়ে দিলেন পাণ।
মুখে সবার কথা তখন 'গাও না হে বর গান'॥
এক জন নয়, তুই জন নয়, সবার মুখেই ওই।
একবারেতে খোলায় যেন উঠ্‌লো ফুটে খই॥
ভাব্‌না আমার হলো বড় রক্ষা কিসে পাই।
গানও ত নাই জানা তেমন, সুরও মোটে নাই॥
সময় সময় বই বাজিয়ে ব'সে পড়ার ঘরে।
গান গেয়েছি বটে নিজে ভালই মনে ক'রে॥
কিন্তু কোন বন্ধু যে দিন শুনেছে সেই গান।
সে-ই হেসেছে, সে সব ভেবে দ'মে গেল প্রাণ॥
রাত পোহাতে এখনো ত দেরি আছে ঢের।
কেমন ক'রে উপায় আমি করি তবে এর॥
আকুল হয়ে এই কথাটাই ভাব্‌ছি মনে মনে।
ভাব্‌তে কি দেয়? ফের অনুরোধ করে জনে জনে॥
তাদের অনুরোধেই তখন একটি ছোট মেয়ে।
কচি গলায় দিলে ছোট গান একটি গেয়ে॥
তার পরেতে আরো তুজন গাইলো তুটো গান।
এবার আমি না গাইলে আর নাইকো পরিত্রাণ॥
বিনয় ক'রে আমি তাদের জানাইলাম তাই।
গান জানি নে আমি, আমার গলাও মোটে নাই॥
সবাই বলে, ঐ যে তোমার অত বড় গলা।
উচিত কি হয় এমন ক'রে মিথ্যে কথা বলা?॥
হচ্চে তোমার বিয়ে—নেহাৎ ছেলেমানুষ নও।
'গান জানি নে' কেমন ক'রে এমন কথা কও?॥
সুন্দরী এক হয়ে তখন যেন আমার দিক্।
বল্লেন—"সুর সবার সমান থাকে না তা ঠিক॥
যেমনই সুর হোক্ না তোমার, যেমন জান গান।
একটা গেয়ে রাখতে হবে এ সকলের মান॥
মেয়েমানুষ হয়েও এরা গাইলে তোমার কাছে।
তুমি যদি না গাও, মান কেমনে বাঁচে?॥

লেখাপড়া শিখ্‌ছো, নারীর মান রাখাটা চাই।
এ সবও কি বোঝাতে আজ হবে তোমায় ভাই॥”
এই রকমে কত না জিদ কল্লে জনে জনে।
গাইতেই যে হবে আমায় স্থির জান্‌লুম মনে॥
মহিলাদের মাঝে যদি গাইতেই হয় শেষ।
গাইতে হবে থাক্‌বে না যায় অশ্লীলতার লেশ॥
এই-না ভেবে, চিন্তা ক'রে ধরনু তাহার পর।
‘মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর!’॥
এইটুকু যেই গাওয়া, গৃহ হাস্যে গেলো ছেয়ে।
সবাই বলে—‘থামো থামো, আর কাজ নাই গেয়ে’!॥
সুর খুলেছি আমি তখন, কেমন ক'রে থামি।
থাম্‌তে হলো কিন্তু, বেজায় ভেব্‌ড়ে গেলাম আমি॥
সুরের লহর, গানের বহর দেখে চমৎকার।
বরাতক্রমে গাইতে আমায় বল্লে না কেউ আর॥
নিজেই তারা হেসে গেয়ে কাটিয়ে দিলে রাত।
বাসর-ঘরের বাজি আমার হয়ে গেলো মাত॥
ভোর না হতেই পায়খানাতে যাবার অভিপ্রায়।
জানিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলুম,—আর কে আমায় পায়॥

কুশণ্ডিকা

অনেক দূরে বাড়ী মোদের, বাড়ী এসে তাই।
সে দিন না কি কুশণ্ডিকা হবার সুযোগ নাই॥
তাই পরদিন তাঁদের বাড়ী থাকতে হলো ফের।
কুশণ্ডিকা সেথাই হলো, মিটলো বিয়ের জের॥
সাক্ষী রেখে আগুন, এ দিন মন্ত্র অনেক ব'লে।
পাকা হয়ে গেল বিয়ে—ছাড়ছিড় নাই ম'লে॥
বিয়ের পরের দিনে না কি ‘কালরাত্রি’ হয়।
বর-কনেতে সে দিন রাতে দেখা হবার নয়॥
তাইতে হয়ে সে দিন মোরা ভিন্ন-গৃহ-গত।
রাত কাটালেম চক্রবাক আর চক্রবাকীর মত॥

বাড়ী ফেরা

রাত পোহাতেই তার পরদিন বাড়ী ফেরার তাড়া।
বর-কনেকে কত্তে বিদায় প'ড়ে গেলো সাড়া॥
মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ী, হাঙ্গামা তার ঢের।
কতক ছিল গুছানো, নেয় গুছিয়ে কতক ফের॥
বাহির হলাম আমি তখন, কনেও এলো সাথে।
শাশুড়ী তায় স'পে দিলেন আমার হাতে হাতে॥
চোখ ছল্‌ছল্ ভাঙা গলায় বলেন ছেড়ে লাজ।
“এতো দিন এ আমার ছিলো, তোমার হলো আজ॥
ছেলে-মানুষ, করে যদি কোন ত্রুটি দোষ।
ক্ষমা ক'রো, বাপু, তাতে ক'রো না কো রোষ॥”
মেয়ের দিকে চেয়ে তখন বলেন বিনাইয়ে।
“ব'লে দিছি যেমন, মা, সব ক'রো তেমন গিয়ে॥
শাশুড়ী কি শ্বশুর এঁরা মা-বাপেরই মত।
ভক্তি ক'রো তাঁদের, সদাই থেকো অনুগত॥
স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি রেখো মনে।
গিয়ে সেথা সোনার চোখে দেখো সকল জনে॥
আপ্নি ভাল হও যদি, মা, সদয় সবার পর।
পরম সুখে থাক্‌বে, স্বামীর আলো ক'রে ঘর॥”
এই-না ব'লে মুছিয়ে দিয়ে মেয়ের চোখের জল।
বিদায় নিলেন শাশুড়ী মোর কেঁদে অনর্গল॥
আমরা তখন ছাড়ান পেয়ে, ক্রমে নানা যান।
বদল ক'রে পৌছে গেলাম এসে নিজের স্থান॥
বাড়ীতে পৌছিলে মোরা আনন্দ কে দেখে।
প্রতিবেশী সবাই ছুটে এলো একে একে॥
বরণ ক'রে আদরে মা বৌ তুল্লেন ঘরে।
যেন কি এক রত্ন পেলেন এত দিনের পরে॥
রাত্রে হলো ফুলশয্যা, আনন্দ তায় কত।
বৌ-ভাতেতেও আর এক দিন উৎসব এইমত॥

৭ বছর পরের কথা

বিয়ে করা থেকে আমি পাই নে অবসর।
লিখ্‌ছি যা, তা বিয়ে করার সাত বৎসর পর॥
সুখ্যাতিতে বৌয়ের আমার ভ'রে গেছে গ্রাম।
ভাল বৌয়ের কথা হলেই আগে তাহার নাম॥
কোট্‌শিপ্‌টা হয় নি ব'লে ছিলো মনে ধোঁকা।
সে ধোঁকা মোর কাটিয়ে দেছে গেলো-বছর খোকা॥

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

অনভ্যাসের ফোঁটা

১

মানুষ প্রায়ই নিজেকে খুব হুঁশিয়ার বলিয়া মনে করে। তাহার বিশ্বাস, সকল প্রকার কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও গুণ তাহার আছে। যত বড় বুদ্ধি-বিদ্যার কাযই হউক না কেন, ভার পাইলে সে কায সহজেই সে করিতে পারিবে।

রাজকার্য্য, মন্ত্রিত্ব কোন্ কায অচল হইয়া থাকে? পদের ভার পাইলে আপনা হইতেই কায চলিয়া যাইবে। এঞ্জিনীয়ার না হইয়াও এঞ্জিনীয়ারের কায চালান যায় না? ডাক্তারী পাশ না করিয়াও মানুষ ডাক্তারী করিতেছে না? মানুষের মনে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপ ভুল ধারণায় সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয়। যে বিষয়ে শিক্ষা, বিদ্যা ও অভ্যাস নাই, সে বিষয়ে কায করিতে হইলে "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্‌-চড়্ করে।"

সাধারণ লোক মনে করে, নায়েবী করা অতি সহজ। ইহাতে কোন দায়িত্ব নাই এবং বিদ্যা-বুদ্ধিরও প্রয়োজন নাই, খালি একটু "জুলুমবাজ" হইলেই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে।

এই আখ্যায়িকাভুক্ত বল্লমধারী ও যোগিনী তাহাই ভাবিয়াছিল। বল্লমধারী মালীর কায করিত, এক বৃহৎ মালঞ্চ রাখিয়াছিল, ঐ মালঞ্চে ফুল জন্মাইয়া তাহা বিক্রয় করিত। যোগিনী তাহার পত্নী, মালিনী।

সঙ্কল্পপুষ্প দেব ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পুষ্পসার গ্রামের জমীদার। তাঁহার দাসদাসী, সরকার, গোমস্তা, বরকন্দাজ, মাষ্টার, ডাক্তার এবং অন্যান্য অধস্তন ও উচ্চতন কর্ম্মচারী সকলেই তাঁহাকে রাজা বলিয়া ডাকিত। মনোরমা দেবী সঙ্কল্পপুষ্পের বনিতা। "বধূমাতাদেবী" বলিয়াই তিনি খ্যাত। কৌশল্যা দেবী সঙ্কল্পপুষ্পের মাতা। তাঁহাকে সকলে "রাজমাতাদেবী" বলিয়া ডাকিত। যোগিনী মনোরমা দেবীকে ফুল যোগাইত এবং মধ্যে মধ্যে তাজা মাছ সংগ্রহ করিয়া ভেট দিত।

যাহা এক জন মানুষ পারিয়াছে, অপর মানুষ কেন তাহা পারিবে না, ইহাই হইল সাধারণ মানুষের ধারণা। যদি রাম, হরি ও যদু এ কার্য্য করিতে পারে, তবে মাধব কেন পারিবে না? মাধবকে যদি বুঝাইবার চেষ্টা করা যায় যে, রাম, হরি ও যদু কোন বিশেষ কর্ম্মে শিক্ষিত হইয়াছে, সেই কার্য্যে তাহাদের অভ্যাস আছে বলিয়া তাহারা অনায়াসে উহা সম্পন্ন করিতে পারে। মাধবের সে কার্য্যে শিক্ষা নাই, অভ্যাস নাই বলিয়াই সে পারিবে না, তাহাতে মাধব কখনই বুঝিতে চাহিবে না। এইরূপ লোককে বুঝাইবার শক্তি কাহারও নাই।

যে কাহিনী বলিতে চলিয়াছি, প্রসঙ্গক্রমে তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান দৃষ্টান্তটি উল্লেখযোগ্য।

এক সময়ে কোন এক এটর্ণি ব্যবসা করিতে গিয়াছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষা বিনা ব্যবসায়ে নামিয়া তিনি ব্যবসাও নষ্ট করিলেন, নিজেরও সর্ব্বনাশ করিলেন। অনেকগুলি টাকা লোকসান হইয়া গেল। ঐ ব্যবসাটি বন্ধ করিবার জন্য জজের কাছে তিনি হাজির হন। এটর্ণি হিসাবে তাঁহার বেশ নাম ছিল, জজরাও তাঁহাকে বেশ খাতির করিতেন। জজসাহেব যখন শুনিলেন যে, উকীল বাবু ব্যবসা করিতে নামিয়া অর্থকষ্ট ও মনঃকষ্ট পাইয়াছেন, তখন তিনি এটর্ণি বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "A cobbler should stick to his last." মুচি তাহার নিজের কাযই করুক, অপরের কায তাহার শোভা পায় না, তাহাতে কখন ভাল ফল ফলে না। যে কার্য্য জানা নাই, সে কার্য্য করিতে গেলে অর্থনষ্ট ও মনঃকষ্ট দুই-ই হয়। এ জন্য যে কার্য্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নাই, তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে।

২

স্বামি-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। পত্নী স্বামীকে বলিল, "দেখ, বধূমাতা দেবী আমায় বড় ভালবাসেন। আমি রকমারী ফুল নিয়ে গেলে তিনি বড় খুসী হন। বলেন, হ্যাঁরে যোগিনি! তুই ভাল ভাল ফুল কোথা হ'তে আনিস্? আমার ত বাগান রয়েছে, মালীও আছে। সেখানে ত এমন সুন্দর সুন্দর ফুল হয় না। তুই এ ফুল জোগাড় করিস্ কোথা থেকে? আমি বলি—আমরা গরীব মানুষ, গতর খাটিয়ে খাই, সময় পেলেই গাছ-পালার দিকে বিশেষ নজর

রাখি। পৃথিবীতে যতরকম আমোদ আছে, গাছে ফুল ও ফল ফুটুতে পারলে যেমন আমোদ হয়, আর কিছুতেই তা হয় না। আমার মরদ, সেও এ সব বিষয়ে খুব পটু। চাষবাস করে, সময় পেলেই আমাদের জমীর গাছ-পালার ফুল-ফলের জন্য ব্যস্ত থাকে।"

বল্লমধারী উৎসুককণ্ঠে বলিল, "বটে! তার পর, তার পর?"

যোগিনী বলিল, "তার পর আমাদের সংসারের অনেক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন। ক'টি ছেলে, ক'টি মেয়ে, কি ক'রে সংসার চলে, তুমি আমাকে ভালবাস কি না ইত্যাদি। বধূমাতা জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁরে, তোদের কত জমাজমী আছে? আমি বলেছি, জমাজমী যে বেশী আছে, তা নয়, তবে আমার স্বামী খুব খাটতে পারে। আমার এক দেওর আছে, সেও খুব মেহনৎ করে। আর আমার এক পিসতুতো দেওর আছে, সেও আমাদের সংসারে থাকে। খেটে-খুটে সংসার একরকম ক'রে চ'লে যায়।"

বল্লমধারী খুব আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল। সে বলিল, "ছেলে-মেয়ের কথা কি বল্‌লি?"

যোগিনী হাসিয়া বলিল, "তাও কি বলি নি? সবই বলেছি। বল্লাম, আমার ছেলে দুটি ছোট, মেয়েও একটি আছে। এই সব কথা শুনে তিনি আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখতে চান। আমি তাদের নিয়ে গিয়েছিলুম। তাদের দেখে তিনি খুসী হন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাদের জলখাবারও দেন। মুড়ি-মুড়কী, বাতাসা, মিষ্টি—সে অনেক জিনিষ! তার পর নায়েবকে হুকুম ক'রে পাঠান, যেন দুই ছেলে ও মেয়েকে এক এক টাকা বকসিশ দেওয়া হয়। আমি সে দিন তাঁর জন্য যুঁয়ের মালা গেঁথে নিয়ে গিয়েছিলুম। গোলাপ, বেল, মল্লিকা, অনেক বকুল ফুলও নিয়েছিলুম। বৌমার যে তাতে কি আনন্দ, তা যদি তুমি দেখতে। রাজার মা'র জন্যে পঞ্চমুখী জবা, করবী—লাল ও সাদা, তিন চার রকম অন্যান্য রংয়ের জবা, সাদা, বেগুনি, অপরাজিতা ইত্যাদি নিয়েছিলুম। তিনি ঐ সব ফুল বড় ভালবাসেন।"

বল্লমধারী সাগ্রহে বলিল, "তিনি কে?"

যোগিনী বলিল, "জমীদার বাবুর মা। বধূমাতা বাবুর স্ত্রী। তিনি প্রায়ই বলেন—দেখ, মালিনী বউ, আমাদের পুষ্পসার গ্রামের মধ্যে তোরই ফুল অতি সুন্দর, তোর মালঞ্চে আমি দেখ্‌ছি সব ফুলই ফোটে। আমি বললাম, আমরা গরীব লোক, পরিশ্রম না করলে ছেলে-মেয়েকে খাওয়াব কোথা থেকে? আমার মানুষ চাষের কায ও মালঞ্চের কায শেষ ক'রে সময় পেলেই মাছ ধরতে যায়। কত রকম রকম মাছ ধরে, আমি আপনার জন্য মাঝে মাঝে ভাল মাছ নিয়ে আসব।"

বল্লমধারী বলিল, "তুই ওখানে কত দিন যাচ্ছিস বল ত?"

যোগিনী বলিল, "তা প্রায় দু' বছর হবে।"

বল্লমধারী মৃদু কণ্ঠে বলিল, "মাতা দেবী লোক কেমন রে?"

যোগিনী বলিল, "বড় ভাল লোক।"

"আর জমীদারের গিন্নী?"

যোগিনী বলিল, "তিনি আরও চমৎকার। তাঁর দয়ার শরীর। তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখতে পারেন না। সর্ব্বদা দেবদেবীর পূজা নিয়েই ব্যস্ত। তিনি আমাকে এত ভালবাসেন, তার বিশেষ কারণ, তাঁর দেবদেবীর পূজার জন্য ভাল ভাল ফুল নিয়ে যাই ব'লে। তুমি এক দিন ভাল ভাল মাছ ধ'রে এনো। আমি তাঁদের দেব।"

বল্লম বলিল, "হ্যাঁরে, ঐ যে তুই একবার নায়েব সাহেবের কথা বললি, সে লোকটি কেমন?"

যোগিনী বলিল, "নায়েবরা যেমন হয়ে থাকে, তেমনি। তুমি ত জান বোধ হয়, দেবদেবীর কাছে যারা থাকে, তারা অনেক সময়ে ভূত-পেত্নী। দেবতারা ভালও হ'তে পারেন, না-ও হ'তে পারেন, কিন্তু দেবতার পাশে যারা থাকে, তারা আর কিছু না হোক, যারা বিপদে প'ড়ে দেবতার আশ্রয় নিতে আসে, তাদের উপর যথেষ্ট জুলুমবাজী করে। সে দিন যখন জমীদার-গিন্নী আমার ছেলে-মেয়েকে টাকা দিতে হুকুম দিলেন, সে টাকা দেবার সময় নায়েব এমন ভাব দেখিয়েছিল, যেন টাকাটি তারই।"

বল্লম একবার কাসিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আচ্ছা যোগী! আমার মনে হয়, জমীদার বাবুর চেয়ে নায়েবের অবস্থা আরও ভাল। খালি পৃথিবী শুদ্ধ লোকের উপর জুলুম চালায়। বাঃ, কেয়া মজা! জমীদার বাবুর অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক লোকের বিচার করতে হয়, দুঃখী ও আর্ত্তের দুঃখ মোচন করতে হয়। দেশে জলপ্লাবন বা দুর্ভিক্ষ হ'লে প্রজাদের সাহায্য করতে হয়।

আর নায়েব বাবু! উনি ত শাঁখের করাত, যেতেও কাটেন, আসতেও কাটেন। দেখ যোগ! যে কার্য্যে কোন দায়িত্ব নেই, অথচ ক্ষমতা ব্যবহার করবার সুযোগ আছে, আমি সেই কার্য্যই পছন্দ করি। জমীদারের নায়েবী ক'রে ছোট বড় গৃহস্থ ভদ্রলোকের উপর জুলুম চালিয়ে ও লোকজনের উপর জুলুমবাজী ক'রে একবার চুটিয়ে নায়েবী করবার ইচ্ছে আছে। তুই যখন জমীদার-গিন্নীকে খুসী করতে পেরেছিস্, ইচ্ছা করলে তাঁকে ধ'রে আমার নায়েবীটাও ক'রে দিতে পারিস্। আর কাযটাই বা কি! ধোবদস্ত ঢালা ফরাসে ব'সে কিম্বা চেয়ারে ব'সে লোকের উপর হুকুম চালালাম। মার-ধোর, ধরপাকড়, গালিগালাজ এই সব কায আমি খুব পারবো। তুই ব'লে কয়ে যদি আমায় নায়েবী কায জুটিয়ে দিস্, তা হ'লে আমি বুঝিয়ে দেব যে, হরেকৃষ্ণ বেরার ছেলে বল্লমধারী কি রকম নায়েবী করে! আর যোগী! তোর তখন এ অবস্থা থাকবে না। তুই মালীর মেয়ে হ'লেও খালি ফুলের গহনা প'রে তোর সাধ মেটাতে হবে না; সোনা-রূপো-হীরার গহনায় তোকে ছাইয়ে দেব, বুঝলি কি না? আমরা যদি নায়েবী করি, শুধু জুলুমবাজ হব না, গরীব-দুঃখীর উপর দয়া-দাক্ষিণ্যও দেখিয়ে দেব। হরেকৃষ্ণ বেরা একটা কেষ্টবেষ্ট লোক ছিল, তবে সে নায়েবী পদ পায় নি, এই যা দুঃখ। যোগী! তুই একটু চেষ্টাবেষ্টা করলেই নায়েবীপদ তোর মুঠোর ভেতর, আর এই কাযটা যদি জোগাড় ক'রে দিতে পারিস্, তোর সেই চির-অনুগত বল্লম তোর মুঠোর ভিতর থাকবে। যোগী! একটু গা চালা। রাণীকে খোস করতে পারলে রাজা তা মুঠোর ভিতর। রাণীমা যা বলবেন, রাজামশাই তাই করতে বাধ্য।"

৩

যোগিনী স্বামীর কথামত এক দিন জমীদারবাড়ী হাজির হইল। বড় মাছ এবং ফুলের গহনা ভেট দিয়া সে জমীদার-গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটাইল। তিনিও যোগিনীকে আদর করিয়া বসাইলেন। কথায় কথায় যোগিনী প্রস্তাবটা উত্থাপন করিল। সে বলিল, "রাণীমা, আমার মরদকে নায়েবীটা দিন। আমি ছাড়বো না, একবার দিয়েই দেখুন না, না পারে, তাড়িয়ে দেবেন। আমার মানুষকে আপনি দেখ্‌লে বেশ বুঝতে পারবেন যে, তার চেহারাও বেশ নায়েবী কাযের উপযুক্ত। সে জুলুমজালাম সবই করতে পারবে, টাকাকড়ি আদায়েতেও বেশ মজবুত, চালাক-চতুরও বেশ আছে, শরীরে দয়াও আছে। তা যাই বলুন মা, আপনাকে আমি ছাড়ছি না।" এই বলিয়া সে তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল।

জমীদার-গৃহিণী বলিলেন, "পাগলা মেয়ে, পা ছেড়ে দে, পা ছেড়ে দে। রাজাবাবু ইচ্ছা করলেই কি যাকে তাকে নায়েব করতে পারেন?"

যোগিনী বলিল, "খুব পারেন মা, খুব পারেন। রাজারাজড়ারা মনে করলেই তাঁদের মুখের কথাতে সাধারণ লোককে বড় ক'রে দিতে পারেন। ভাল থিয়েটার করলে রাজা তাকে 'লাট' করতে পারেন, ভাল বেলুনে চড়তে পারলে রাজা তাকে 'লাট' করতে পারেন। মুখের কথা, মা, মুখের কথা। তোমরা বড় লোক, ইচ্ছা করলে মুখের কথায় সব করতে পার। মালীর ছেলেকে নায়েব করা ত বেশী কথা নয়। আজকালকার দিনে জাত-বিচার নাই, আমাদের যে মালীর ছেলে অনেকে হাকিম হচ্ছে মা। মুখ্যু ব্রাহ্মণছেলের অপেক্ষা হুঁশিয়ার মালীর ছেলে অনেক ভাল। তা মা, আমি কোন কিছু শুনবো না, রাজা বাবুকে ব'লে আমার মরদকে নায়েব ক'রে দিতে হবে।"

বধূমাতা দেবী যোগিনীর ক্রমান্বয় কাকুতি-মিনতিতে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য বিশেষ বদ্ধপরিকর হইলেন। সময়ে অসময়ে জমীদার বাবুকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বধূমাতা দেবীর সকরুণ প্রার্থনা—নায়েবী পদটি কিছু দিনের জন্য যোগিনীর মানুষকেই যেন দেওয়া হয়।

এরূপ ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় কোন মানুষই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, প্রার্থিত কার্য্যটি করিতে হয়। গরীব সামান্য গৃহস্থ এবং বড় লোকের সকলের পক্ষে এই কথা খাটে। জমীদার বাবু মনস্থ করিলেন, পাকা নায়েবকে কিছু দিনের জন্য ছুটী দেওয়া যাক্। সেও অনেক দিন হইতে ছুটী চাহিতেছিল। তিনি তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "সচ্চিদানন্দ, তুমি কিছু দিনের

জন্য ছুটী লও, আমি নূতন লোকটিকে কাযে বাহাল করব। দেখি কায কেমন করে। তুমি ছুটী হ'তে এলে তাকে অন্য কায দেব, তুমি তোমার কায করবে।"

বল্লমধারী অতঃপর পাকা নায়েব নিযুক্ত হইল। তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। সে আর যোগিনী উভয়েই চরিতার্থ হইয়া গেল।

বল্লমধারী যে দিবস-নায়েবী পদে নিযুক্ত হইল, সেই দিন মালীপাড়ায় মহা ধূম। মালীর ছেলে নায়েব হইয়াছে।

সে নায়েব নিযুক্ত হইবার পর পুরাতন নায়েবের অনুকরণে পোষাকাদি প্রস্তুত করা হইল। বসা-দাঁড়া চলা-ফেরা সকলই পুরাতন নায়েবের অনুকরণে হইতে লাগিল। তাহার স্বজাতীয় এবং আত্মীয়স্বজন তাহাকে একটা বড় ভোজ দিল। জমীদার বাবুর বাড়ীতে প্রত্যহ ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর ফুল আসিতে লাগিল, টাটকা মাছও যথেষ্ট আসিতে লাগিল। সকলেই খুসী, তবে লোকজন, দাস-দাসী, রসুয়ে বামুন, পুরোহিত, সরকার, সকলেই ভাবিতে লাগিল, বধূমাতা দেবীর এ আবার কি নূতন খেলা?

এই রকম করিয়া ২০।২৫ দিন কাটিয়া গেল। বল্লমধারী জোরে নায়েবী কার্য্য করিতে লাগিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, কায আপনিই চলে, যাহাকেই সেই কার্য্যে বসাইয়া দাও, সে চালাইয়া লয়।

এইরূপে কিছু দিন চলিল। ঐ গ্রাম হইতে আট ক্রোশ দূরে এক জমীদারের বাড়ীতে পুষ্পসারের জমীদারের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ রাখিতেই হইবে অথচ জমীদার নিজে অত দূর যাইতে পারিবেন না, কাযেই নায়েবের উপরে এই নিমন্ত্রণ-রক্ষার ভার পড়িল। সরকার হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার যে পোষাক আছে, তাহা বাহির করিয়া দেওয়া হইল। নায়েব সেই পরিচ্ছদে প্রস্তুত হইল। পালকীতে নায়েব যাইবে, সঙ্গে বেহারা ছাড়া দুই জন পাইক সজ্জিত হইয়া চলিল।

জমীদারের কথামত বেলা দুইটার সময় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নায়েব জমীদারবাটী হইতে বহির্গত হইল। কিন্তু যোগিনীর কথামত সে নায়েবী পোষাক পরিয়া তাহাদের মহল্লার সব যায়গায় সে পালকী চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইল।

অবশেষে বেলা ৬টার পর সে পাড়া হইতে বাহির হইল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া যাইতে যখন নিমন্ত্রণস্থানে পৌছিল, তখন রাত্রি ১১টা। অত রাত্রিতে জমীদারের বাড়ীর কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। সদর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যখন নূতন নায়েব সেখানে পৌছিল, তখন সব অন্ধকার। ডাকাডাকি করিল, কোন আওয়াজ পাইল না। জমীদারের হুকুম, নিমন্ত্রণ রাখিতে হইবে, অথচ কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। অতএব নূতন নায়েব তাহার চির-অভ্যস্ত হুঙ্কার ছাড়িয়া লাঠির সাহায্যে দোতলার ছাদে লাফাইয়া পড়িল। দোতলার ছাদ পার হইয়া অন্দরমহলের ছাদে পড়িল। অন্দরমহলে লোক তখনও ছিল, আলো জ্বলিতেছিল। তাহারা একটা লোক লাঠির সাহায্যে অন্দরমহলে পড়িল দেখিয়া মনে করিল, ডাকাত পড়িয়াছে। সকলে মিলিয়া নায়েবকে ধরিয়া ফেলিল এবং আসল তথ্য অবগত না হইয়া বেদম প্রহার করিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

"নায়েব মশাই, আমি পুষ্পসারের জমীদারের নায়েব, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি। আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবেন না।"

সেখানকার নায়েব বলিল, "তুমি ত পুষ্পসারের নায়েব নও।"

তখন সে অতি কষ্টে তাহার পালকীর বেহারা ও সিপাহীর দ্বারা প্রমাণ করাইল, সে পুষ্পসারের নূতন নায়েব। তখন সকলে হাসিয়া আর বাঁচে না। বেহারা-দের এবং পাইকদের আহার করাইয়া দিল। নায়েবকেও খাইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু সে এত মার খাইয়াছে যে, তাহার আর অন্য খাদ্য খাইবার ক্ষুধা ছিল না। সে কিছু জল খাইয়া রাত্রি ১২টার সময় বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। জমীদারীবাড়ী হইতে একটি পাইকও সঙ্গে গেল পথ দেখাইয়া। ভোর ৪টার সময় নায়েব বাবু পুষ্পসারে আসিয়া দর্শন দিল। সেখানে জমীদারের বাড়ীতে না আসিয়া নিজের বাড়ীতে উঠিল এবং লোক-জনদের বলিয়া দিল, তাহারা যেন এ সব কথা কাহাকেও না বলে, নায়েব বাবু তাহাদের বখসিস্ দিবেন।

যোগিনীকে সকল কথাই সে আসিয়া বলিল। যোগিনী শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। যেখানে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেখান-কার জমীদার এখানকার জমীদারকে একখানি চিঠিতে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন।

উল্লিখিত ঘটনার পর বল্লমধারী আর চাকরী করিতে আসিল না। জমীদার পুরাতন নায়েবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। যোগিনী তাহার স্বামীকে বুঝাইয়া দিল, তাহারা ত বেশ সুখে ছিল; ফুল বেচিত, মাছ ধরিত, তাহাতে তাহাদের কোন কষ্টই ছিল না, তবে এ নায়েবী ঝঞ্ঝাট কেন? বল্লমধারীও বলিল, একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, আমার কোন কষ্ট ছিল না, আমি বেশ সুখেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম, তবে এ খেয়াল কেন?

অনেক সময়ে দেখা যায়, মানুষ সুখেই থাকে, তবে আরও সুখী হইতে গিয়া নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে। প্রবাদ আছে, এক জন লোক প্রায় মনে করিত, সে পীড়িত, এই ভাবিয়া সর্ব্বসময়ে ঔষধ ব্যবহার করিত। মনের বিকারে সে অতিরিক্ত ঔষধ খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সব সময়েই তাহার চেষ্টা ছিল, যে অবস্থায় আছে, তাহা হইতে ভাল অবস্থায় থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে তাহার আত্মীয়-স্বজনকে বলিয়া গেল, তাহার গোরের উপর এই কয়টি কথা যেন লিখিয়া দেওয়া হয়,—"আমি ভালই ছিলাম, আরও ভাল হইতে চেষ্টা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি।"

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

বনবাণী

আমার মনের ভাষা বুঝে যারা মম অঙ্কে থাকি
আরণ্যক বার্ত্তা তারা অমৃতের পুত্রগণে ডাকি
শুনায়েছে। শুনেছে যে সেই বাণী প্রাণমন দিয়া
এসেছে সে মোর কোলে গৃহরাজ্য সব তেয়াগিয়া।

আজো আমি সেই বার্ত্তা কই স্তব্ধ নিশীথ প্রহরে
অন্তরঙ্গ আশ্রিতের মোহমুক্ত শ্রবণ কুহরে
স্নেহভরে। মঠ, দুর্গ, গড়, পথ, পুর, জনপদ
তীর্থ, ঘাট, রাজপাট, স্তম্ভ, চূড়া, হর্ম্ম্য, পরিষদ

যা কিছু গড়িস্ তোরা যুগে যুগে সবি চূর্ণ করি,
কন্দ সম একে একে এ জঠরে লই যে সংহরি
দেখিয়াও দেখিবি না? সবি ব্যর্থ, অনিত্য, অসার,
ছায়াচ্ছন্ন মায়ালোকে মা'র বুকে ফিরিয়া আবার

আয় বৎস মোহমুগ্ধ। যদি তোরা দেখিস্ খুঁড়িয়া
আমার অঙ্গনখানি, যদি তোরা দেখিস্ ঢুঁড়িয়া
শ্বাপদের গুহাগুলি,—কত পুরী কত বসতির
ধ্বংসের জঞ্জাল-স্তূপ,—কত শত সুসভ্য জাতির

পার্থিব কঙ্কাল জীর্ণ—কত মঠ মন্দিরের চূড়া
পুষ্ট করে তরুরাজে মাটীতে হইয়া আজি গুঁড়া।
তবে বৃথা সমারোহ মাতৃদ্রোহে! করিয়া বিদ্রূপ
জীবন্ত অঙ্গন মোর বৃথা শিলা ইষ্টকের স্তূপ

মথুরা কোশল কোথা দ্বারাবতী কোথায় এখন,
হৃদয়-যমুনা-তটে চিরদিন রাজে বৃন্দাবন
কদম্ব-তমালে ভরা। ফিরে আয় বনের আঁধারে
যদি বনবিহারীর বেণু-তান চাস্ শুনিবারে!

শ্রীকালিদাস রায়

সোণারগাঁ

(ভ্রমণ)

প্রথম পর্ব্ব

সাধকপ্রবর মহাত্মা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পদরেণু বক্ষে ধারণ করিয়া "বারদী" * পল্লীটি বাঙ্গালার ভিতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন "সোণারগাঁ" এই পল্লী হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

আমার দুই পুত্র এবং কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া আমি সোনার-গাঁ দর্শনে যাত্রা করিলাম।

আমরা একটির পর একটি সদ্যঃকর্ষিত ক্ষেত্রের আলি বাহিয়া চলিতে লাগিলাম। এই ভাবে আমরা একটি বিশাল প্রান্তর অতি-ক্রম করিয়া "পঞ্চবটী" গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হইলাম। এই স্থানে একটি মুসলমান ছাত্র স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের দলপুষ্টি করিল। একটু অগ্রসর হইয়া আমরা "পঞ্চবটীর" হাটের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। তখন বেলা প্রায় ১০টা। হাটে তখনও ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছিল, কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা এতই অল্প যে, ইহাকে প্রকৃতপক্ষে "হাট" বলা চলে না, তথাপি এই ক্ষুদ্র স্থানটি পল্লীর দৈনন্দিন জীবনের অনেক অভাব দূর করিতেছে। দুইখানা ক্ষুদ্র টিনের চালা-ঘর হাটের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। কয়েকটি দোকানী প্রখর সূর্য্যকিরণে মস্তক আবৃত করিয়া চাউল, চিঁড়া, তৈল, গুড়, লুণ, তরি-তরকারী ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই হাটের মধ্যস্থলে একটি বিশাল বটবৃক্ষ শ্রান্ত পথিক ও ক্রয়-বিক্রয়ার্থীদিগকে ছায়া বিতরণ করিয়া ঐ স্থানটির শোভা বর্দ্ধন করিত। আমরা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে একটি সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ক্ষেত্রগুলি রৌদ্রে খাঁ খাঁ করিতেছে। গ্রামগুলি হতশ্রীপ্রাপ্ত ও দারিদ্র্য যেন চারিদিকে তাহার ছায়াপাত করিয়াছে, যেন পল্লী-জননী নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার সেই শুভ্র, প্রফুল্ল আননটি যেন শোকতাপে মলিন হইয়াছে।

আমরা তৎপর একটি প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। অদূরে "হামসাদী" গ্রামটি আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কয়েকটি কৃষকগৃহের পার্শ্বদেশ অতিক্রম করিয়া আমরা "হামসাদী"র ভিতর প্রবেশ করিলাম। গ্রামটি মনে হইল, এক সময়ে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামের প্রধান রাস্তাটি বোধ হয় এক কালে বাঁধান ছিল, আজিও ঐ রাস্তাটির কতকটা স্থান তাহার অতীত গৌরবের চিহ্ন বহন করিতেছে। এই গ্রামের কয়েকটি দীঘি উল্লেখযোগ্য। শুনিতে পাই যে, "সোণারগাঁর" সমৃদ্ধির সহিত এই গ্রামের ঐশ্বর্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। দুঃখের বিষয়, আজ এই পল্লীটি অত্যন্ত শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

লেখক ও তাঁহার ভ্রমণের সহযাত্রী পুত্রদ্বয়

তৎপর আমরা উত্তরদিকে একটি বৃহৎ প্রান্তর অতিক্রম পূর্ব্বক "পানাম"এর পূর্ব্বপ্রান্তে পৌঁছি-লাম এই স্থানে একটি "কালী-বাড়ী" বর্ত্তমান। ইহার অবস্থান বাস্তবিকই মনোহর। অদূরে কয়ে-কটি কদলী-উদ্যান দেখা গেল। শুনিলাম, ঐ বাগানগুলির অধি-কারী বিখ্যাত ধনকুবের "পানাম"-এর শ্রীযুত আনন্দমোহন পোদ্দার। কালীবাড়ী হইতে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আমরা পানামের সুরম্য সৌধশ্রেণী দেখিতে পাই-লাম। বর্ত্তমান পানামই প্রাচীন "সোনার-গাঁ"। বোধ হয়, এই স্থানে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ১৪৮১ খৃঃ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "মগ্রাদেও" (মকরদেব) নামে দের এক জন হিন্দু রাজা বর্ত্তমান "মগ্রাপাড়ায়" * স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতেন। ইনিই বোধ হয়, হিন্দুর স্থাপিত "সুবর্ণগ্রামের" শেষ নরপতি। বোধ হয়, "ফতে শাহে"র (১৪৮১ খৃঃ—১৪৮৭) রাজত্বকালে পানাম হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া মগ্রাপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি মগ্রাপাড়া "বলদে সোণারগাঁ" ক (সহর সোণারগাঁ) নামে পরিচিত হইল। ১৫৮৬খৃঃ "রালফ ফিচ" (Ralph Fitch) নামক এক জন ইংরাজ পরিব্রাজক "সোণারগাঁয়" উপস্থিত হন।

---

* "ঢাকা" জেলার "নারায়ণগঞ্জ" উপবিভাগের অন্তঃপাতী একটি পল্লীগ্রাম।

* এই পল্লীটি "পানামে"র দক্ষিণে "মেনিখালী" নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত।

ক "দনুজ রায়"—"সেন-বংশের শেষ স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রথিত।" কিন্তু কিংবদন্তীর উপর আস্থা স্থাপন করিলে "মকর-দেব"কে "দনুজের" পরবর্ত্তী নৃপতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তিনি তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর উপর "সোণারগাঁ"র নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"'Sonargao' is a town six leagues from 'Serripur' where there is the best and finest cloth made of cotton, that is in all India. The Chief King of all these countries is called 'Is a Can', and he is Chief of all the other Kings, and is a great friend to all Christians. The houses here as they be in the most part of India, are very little and covered with strawe, and have a fewe mats round about the walls. Many of the people were very rich. Here they will eat no flesh nor kill no beast. They live on rice, milke and fruits. They go with a little cloth before them, and all the rest of their bodies is naked. Great store of cotton cloth goeth from hence, and much rice, where with they serve all India, Ceilon, Pegu, Malacca, Sumatra and many other places."

এই সোণারগাঁ" সম্ভবতঃ "শ্রিভিরপুর" * এবং আইন-আকবরী-বর্ণিত "সোণারগাঁ" বর্ত্তমান "মগ্রাপাড়া"। কথিত আছে যে, "সোণারগাঁ"য় দশ জন ক মুসলমান রাজা রাজত্ব করেন এবং ইহাদের রাজত্বকাল সর্ব্বশুদ্ধ ২ শত বৎসর।

আমরা সোজাসুজি একটি সঙ্কীর্ণ গলি অবলম্বন করিয়া শ্রীআনন্দমোহন পোদ্দার, এম, এ, এর সুরম্য বৃহৎ উদ্যানের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহার আবাসবাটীও এই উদ্যানটির সংলগ্ন। পোদ্দার মহাশয়ের ভবনটির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তিনি বর্ত্তমান সভ্যতার রুচির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে কোনও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া সদর রাস্তাটি দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে, ইহার উপর দিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আমরা পানাম বাজারে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর পশ্চিমে একটু মোড় ফিরিয়া আমরা বরাবর চলিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়ের দ্বিতল ইষ্টক-ভবনটি দৃষ্ট হইল। ইহার সম্মুখভাগের সহিত ভিতরের কোন সামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হইল না। খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, পানাম বাজারের শেষ প্রান্তে একটি বকুলগাছের তলদেশে একটি "মৃন্ময় বর্ত্তিকা" ও সেই "বৃক্ষত্বকে" গ্রাম্য-লক্ষ্মীগণের কোমল করপল্লবের দ্বারা চিত্রিত সিন্দুরের ফোঁটা তাঁহাদিগের সহজ, সরল ধর্ম্মপ্রাণতার সাক্ষ্যদান করিতেছে। তৎপর আমরা একটি পুষ্করিণীর ধার অবলম্বন করিয়া একটি ফটকের নিকট উপনীত হইলাম। ফটকের দ্বার লৌহনির্ম্মিত। শুনিতে পাইলাম যে, রাত্রিতে না কি ইহা ভিতর হইতে অর্গলের দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই স্থান হইতে রাস্তার উভয় পার্শ্বে দ্বিতল অট্টালিকাশ্রেণী আরম্ভ হইয়া একটি প্রাচীন ইষ্টক-সেতুর প্রান্তভাগে শেষ হইয়াছে। এই স্থানটির গৃহরচনা বর্ত্তমান সময়ের অনেক বড় বড় সহরের অনুরূপ। মাঝে মাঝে দুই একটি জীর্ণ অট্টালিকা আজিও সোণারগাঁর অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া পানামের এই অঞ্চলটির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। রাস্তাটির প্রান্তভাগে একটি সুদৃঢ় প্রাচীন ইষ্টকসেতু বর্ত্তমান। ইহার গঠন-নৈপুণ্য উহাকে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা করিতেছে। ইহার ইষ্টকগুলির বং গাঢ় বাদামী ও ইহারা অতি মসৃণ। এই স্থানেও একটি ফটক বর্ত্তমান। রাত্রিতে এই ফটকের লৌহদ্বারটি পূর্ব্ব-বর্ণিত দ্বারটির ন্যায় ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ থাকে। ফটকটি উত্তীর্ণ হইয়া একটু অগ্রসর হইলে তুলালপুরের রাস্তাটি দৃষ্ট হইল।

উত্তরদিকে একটু অগ্রসর হইয়া একটা খালের উপর একটি বৃহৎ প্রাচীন ইষ্টকসেতু দৃষ্ট হইল। সেতুটি স্থাপত্য হিসাবে উপরি-উক্ত সেতুটির সমপর্য্যায়ভুক্ত, কিন্তু ইহার দেহে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্বের ছাপটি বর্ত্তমান। একটি বৃদ্ধ মুসলমানকে এই সেতুটির নির্ম্মাণকাল জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। সেতুটির উত্তরপ্রান্তে কয়েকটি বৃহৎ মসৃণ কালো পাথর মৃত্তিকায় প্রোথিত অবস্থায় বর্ত্তমান। এই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড হিন্দুর দেব-দেবী-মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া মুসলমান বিজেতৃগণ স্থানে অস্থানে ইহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহাদিগের বাহুবল ও ধর্ম্মবোধের গৌরব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আমরা প্রায় ১১টার সময় তুলালপুর পৌঁছিলাম। দুইটি সুপ্রাচীন জীর্ণ ইষ্টকগৃহ রাস্তার ডাহিন ও বাম পার্শ্বে দৃষ্ট হইল। বামপার্শ্বস্থ গৃহটির বর্ত্তমান অধিকারী কর্ম্মকার-বংশসম্ভূত শ্রীললিতমোহন রায়। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ এক সময়ে না কি এই অঞ্চলে কমলার বরপুত্র ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদের অতীত ঐশ্বর্য্যের কাহিনী প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা তাঁহার গৃহের ফটকের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার নিকট গৃহ দুইটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রথমতঃ আমরা তাঁহার বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতে অনুরুদ্ধ হইলাম কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট হইতে আমি অনেক তথ্যের সন্ধান

---

* ঢাকার অন্তঃপাতী নারায়ণগঞ্জের সংলগ্ন "চন্দর" নামক পল্লীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। এই স্থানে এক সময়ে ঈশা খাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ক (১) বাহাদুর শাহ— ১৩১১ খৃঃ—১৩১৯খৃঃ
১৩২৫ খৃঃ—১৩৩১ খৃঃ

(২) বহরম শাহ (তাতার খাঁ)— ১৩২৫ খৃঃ—১৩৩৮ খৃঃ

(৩) ফখরুদ্দিন আবুল মজঃফর মোবারক শাহ—
(৭৩৯ হিঃ—৭৪১ হি)
(১৩৩৯ খৃঃ—১৩৫০খৃঃ)

(৪) ইখতিয়ার উদ্দিন আবুল মজঃফর গাজি শাহ—
(৭৫১ হিঃ—৭৫৩ হিঃ)
(১৩৫০ খৃঃ—১৩৫৩ খৃঃ)

(৫) শামসুদ্দিন আবুল মুজঃফর হাজি ইলিয়াস শাহ।
(শ্যামসুদ্দিন ভাঙ্গরা)

(৬) আবুল মুজাহিদ সিকেন্দর শাহ।

(৭) গিয়াসউদ্দিন আবুল মজঃফর আজম শাহ।

(৮) সায়েফউদ্দিন আবুল মুজাহিদ হামজা শাহ।

(৯) শামসুদ্দিন (২য়)

(১০) জালালউদ্দিন আবুব মুজঃফর ফতে শাহ।
(১৪৮১ খৃঃ—১৪৮৭ খৃঃ)

প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার গৃহটি না কি ১১১৯ বঙ্গাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে প্রশ্নের দ্বারা জর্জ্জরিত করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু কি মুসলমানের অতীত ঐশ্বর্য্যের কোন ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম না। এত বড় একটা সমৃদ্ধ জনবহুল সুবিস্তৃত মহানগরের অধিবাসিগণের বংশধররা আপনাদিগকে এমন নিঃশেষে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সোণারগাঁর বর্ত্তমান অবস্থা সন্দর্শন করিলে ইহার গৌরব-যুগের অস্তিত্বটি নিছক কল্পনার বিষয়বস্তু হইয়া একটি ঘোর সন্দেহের অবতারণা করে! সে যাহা হউক, তাঁহার পরিচর্য্যায় আমরা মুগ্ধ হইলাম।

অতঃপর আমরা ডাহিনের বিশাল ইষ্টক-ভবনটি দেখিতে চলিলাম। ইহার বর্ত্তমান অধিকারী—শ্রীযুত হরিহরচন্দ্র রায়। গৃহস্বামী তখন বাড়ী ছিলেন না, রায় মহাশয় স্বয়ং গৃহটির ভিতরের অংশটি দেখাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। ভবনটি দ্বিতল—নিম্নতলটি এক প্রকার অব্যবহার্য্য। গৃহটির ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ প্রকোষ্ঠ দৃষ্ট হইল। ইহার বামভাগে ভিতর-বাটীর প্রবেশদ্বার। আমরা প্রথমতঃ একটি সঙ্কীর্ণ দ্বার অতিক্রম করিলাম। ইহার বিপরীত দিকে অপেক্ষাকৃত একটি নিম্নদ্বার বর্ত্তমান। আমরা মস্তক নত করিয়া ইহা অতিক্রম করিলাম। তৎপর ডাহিনদিকে একটি অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া রায় মহাশয়ের পশ্চাতে অতি সন্তর্পণে ভিতর-মহলে প্রবেশ করিলাম। অপরিচিত লোকের পক্ষে এই প্রকার বাটীর ভিতর প্রবেশ করা একটি অসাধ্য ব্যাপার। প্রাচীনকালে দস্যু-তস্করের আক্রমণ হইতে নিজেকে নিরাপদ রাখিবার জন্য গৃহস্বামী এই প্রণালীতে প্রবেশদ্বার নির্ম্মাণ করাইতেন। নিম্নতলে ৮টি প্রকোষ্ঠ অক্ষত অবস্থায় বর্ত্তমান, কিন্তু ইহাদের ভিতর অধিকাংশগুলি মৃত্তিকার ভিতর বসিয়া গিয়াছে। কোঠাগুলি খিলান করা এবং কড়ি-বরগার সাহায্য ব্যতীত নির্ম্মিত। উপরতলায় উত্তর ও দক্ষিণ—প্রত্যেক দিকে দুইটি করিয়া "ঝিকুটি ঘর" এবং চারিটি কোঠা বিদ্যমান। এক সময়ে এই চারিটি মন্দিরে বিগ্রহের যথারীতি অর্চ্চনার ব্যবস্থা ছিল। অধুনা শুধু উত্তরের একটির ভিতর বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। ভবনটির বহির্ভাগের ইষ্টকগুলি "নোণা" ধরিয়া গিয়াছে। জনশ্রুতি যে, এই বিরাট ভবনটি না কি ঈশা খাঁর শাসনকালের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত। শুনিতে পাইলাম যে, কতিপয় দিবস পূর্ব্বে এক য়ুরোপীয় পর্য্যটক এই দুইটি ভবনের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমিও ঐ দুইটি ভবনের আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলাম। অতঃপর আমরা গোয়ালদী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা পুনরায় দুলালপুরের ইষ্টক-সেতুটি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আদমপুরের কালীবাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইলাম। এই স্থানটি না কি স্থানীয় দেশকর্ম্মিগণের সভা-সমিতির অনুষ্ঠানক্ষেত্র। এই স্থানে আমাদিগের সহিত কতকগুলি "শাখা-মৃগের" দর্শনলাভ ঘটিল। আমরা অতঃপর কালীবাড়ীর দক্ষিণ ধারের রাস্তাটির উপর দিয়া তাজপুর পৌঁছিলাম। রাস্তাটি বেশ উচ্চ এবং ইহার মৃত্তিকা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন; ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। কিয়ৎক্ষণ পর একটি কাষ্ঠসেতুর সমীপবর্ত্তী হইলাম। একটি খালের উপর ইহা নির্ম্মিত হইয়া চলাচলের পথটি সুগম করিয়াছে। ইহার নিম্নের জল ঘোলা ও পানা-দামে আচ্ছন্ন। সেতুটি অতিক্রম করিয়া স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের মনোহর আশ্রমটি দৃষ্টিগোচর হইল। আশ্রমটির অবস্থান বড়ই সুন্দর। একটি নাতিবৃহৎ ইষ্টক-গৃহ আশ্রমের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। কতক দূর সোজা অগ্রসর হইয়া আমরা এই রাস্তাটি পরিত্যাগ করিয়া ডাহিনের একটি অর্দ্ধকর্ষিত ক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। এইভাবে কতকগুলি অর্দ্ধকর্ষিত ক্ষেত্রের "আলির" উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম।

তখন বেলা ১২টা। কৃষকগণ রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া ছায়াবৃক্ষের তলদেশে বিশ্রামভোগ করিতেছিল। আমরাও তখন অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ করিলাম। তপনদেব যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের প্রতি তাঁহার খর বক্র দৃষ্টিপাত করিলেন। দারুণ পিপাসায় আমাদের প্রাণ এক প্রকার ওষ্ঠাগত, এক বিন্দু জল পাইবারও যো নাই। এইভাবে আমরা ঝোপ-জঙ্গল অতিক্রম

গোয়ালদীর ভগ্ন মসজিদ

করিয়া ১২॥টার সময় গোয়ালদীর প্রাচীন মসজিদটির দর্শনলাভ করিলাম। মসজিদটি পূর্ব্বদ্বারী; আমরা উত্তরদিক্ হইতে ইহার ভিতর প্রবেশ করিতে মনস্থ করিলাম। উত্তরদিকের ভগ্নস্তূপটি মসজিদটির প্রবেশদ্বারটিকে এক প্রকার দুর্গম করিয়াছে। অতি কষ্টে আমরা এই স্তূপটির উপর দিয়া কোনও প্রকারে ইহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। "মসজিদটির" ভিতরে ইট-পাথরে স্তূপীকৃত হইয়া আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিয়াছে।

পশ্চিমদিকে "ইমামের" কারুকার্য্যখচিত, সুমসৃণ, কালো পাথরের আসনটি "কাল"কে যেন উপেক্ষা করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। মসজিদটির শিলালিপি পাঠে দৃষ্ট হয় যে, ইহা সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে মোল্লা হিঝাবর আকবর খাঁ কর্ত্তৃক ১৫১৯ খৃঃ এর ১২ই আগষ্ট তারিখে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিম্নে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"God Almighty says, 'The mosques belong to God, worship no one else with him. The Prophet, on whom be peace, says, 'Whoever builds a mosque for God becomes deserving of the pleasure of God. (God will build for him a similar building) in Paradise.' This mosque was built in the reign of the King of the Kings, Sultan Hussain Shah, son of Sayid Ashraf-Al-Hussaini and may God perpetuate his kingdom and rule. This mosque was built by Mulla Hizabar Akbar Khan, on the 15th of Shaban, 925 A.H."

মসজিদগাত্রে ইষ্টক ও প্রস্তর অতি সুকৌশলে পরস্পর গ্রথিত। কয়েকটি প্রস্তরস্তম্ভও ভিতরের দেয়ালে দৃষ্ট হইল এবং সুবিন্যস্ত রূপদক্ষ শিল্পীর কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকশ্রেণী ভিতরকার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। তখনও আমাদের দেশে Cementএর প্রচলন হয় নাই, কিন্তু ইষ্টকগুলি Cementএর মত একটি অজ্ঞাত পদার্থের দ্বারা এমন সুকৌশলে মসজিদগাত্রে সংবদ্ধ যে, আজিও একটি ইষ্টক স্থানচ্যুত করা অসম্ভব। সুবৃহৎ গম্বুজটি বটবৃক্ষের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ধ্বংসপথের যাত্রী হইয়াছে! মসজিদের যাবতীয় প্রধান উপকরণ যে হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরাদি বিধ্বস্ত করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সত্যতা এই মসজিদের শিলালিপিটি সমর্থন করে। বর্ত্তমানে ইহা একটি বিকৃতমস্তিষ্ক মুসলমান কর্ত্তৃক হৃত হইয়া আলমদী-পল্লীতে * একটি মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে। ইহার এক দিকে "তোগরা" অক্ষরে উৎকীর্ণ আরবী ভাষায় মসজিদটির পরিচয়ও বিপরীত পৃষ্ঠে একটি ক্ষোদিত মূর্ত্তি খসিয়া অদৃশ্য করার চেষ্টা করিতেছে। এই পার্শ্বটি মসজিদগাত্রে সংযুক্ত ছিল। এই মসজিদ হইতে সামান্য উত্তরদিকে অন্য একটি বৃহৎ মসজিদ দৃষ্ট হইল। ইহা পূর্ব্ববর্ণিত মসজিদ হইতে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত। মসজিদ-প্রাঙ্গণে দেবদেবীমূর্ত্তি-খচিত দুই-হস্ত-পরিমিত একটি বিশাল প্রস্তরস্তম্ভের একটি ভগ্নাংশ অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। মসজিদের "খাদেমে"র নিকট শুনিলাম যে, এই ভগ্ন স্তম্ভটি পুরাতন মসজিদের ধ্বংসস্তূপ হইতে সংগৃহীত। আমি এই স্তম্ভটি উপযুক্ত অর্থবিনিময়ে ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে ইহার স্বামিত্ব ত্যাগ করিতে চাহিল না। শুনিলাম যে, এই স্তম্ভটি হস্তগত করিবার জন্য Dacca Museumএর কর্তৃপক্ষগণ না কি অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বিমুখ হইয়াছেন। মসজিদটি শিলালিপিযুক্ত। ইহার লিপিটি

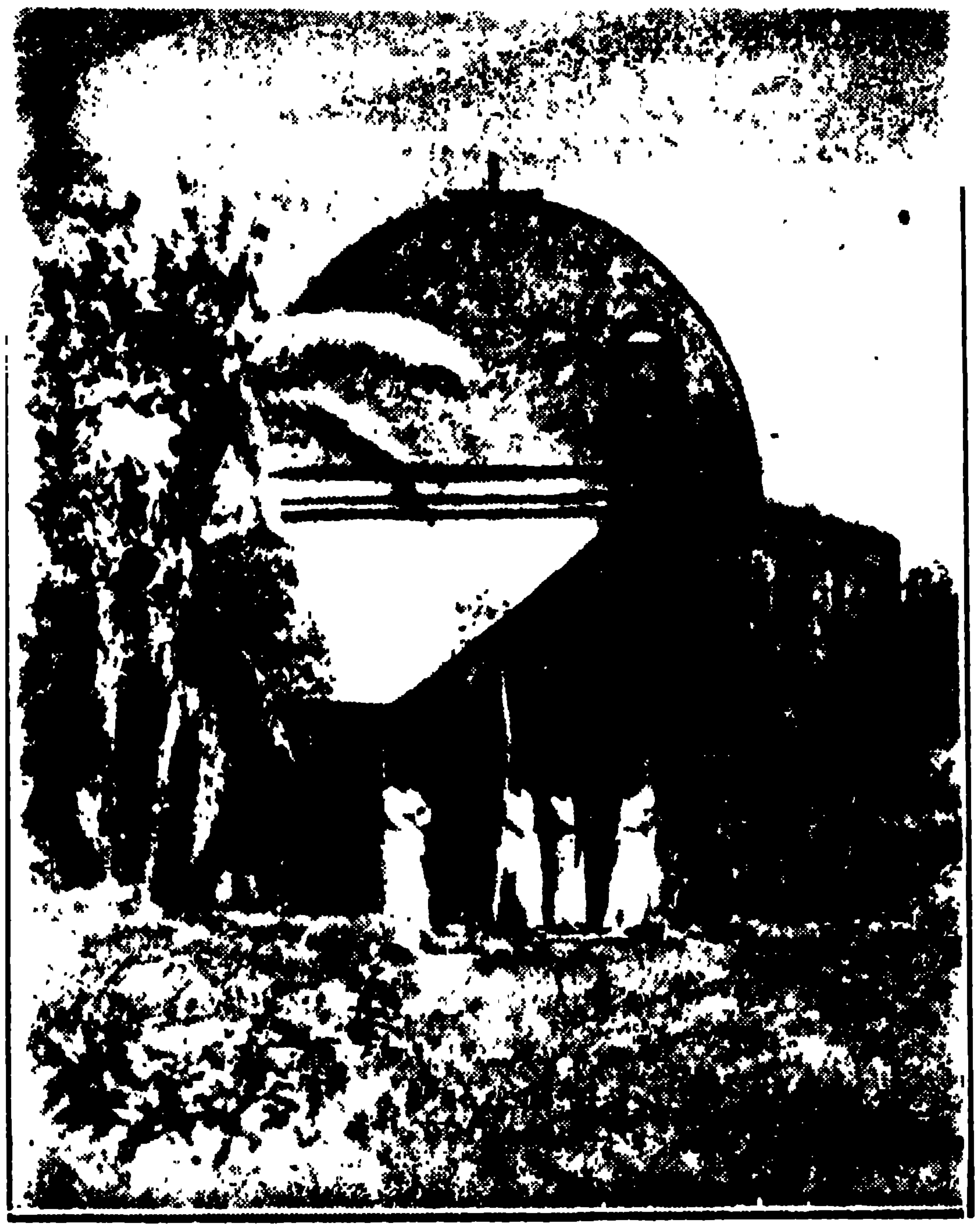

গোয়ালদীর মসজিদ

পুরাতন মসজিদের অনুরূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ। আমি ইহার একটি ছাপ লইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আরোহণীর অভাবে আমাকে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইল। এই স্থানে আমরা অর্দ্ধ-ঘণ্টা অবস্থান করিলাম।

গোয়ালদী হইতে আমরা অতঃপর "মুক্তারপুর" অভিমুখে যাত্রা করিলাম। দুইটি বৃহৎ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ১টা ৮ মিনিটের সময় আমরা মুক্তারপুর পৌঁছিলাম। আমাদের দৃষ্টিপথে প্রথমতঃ একটি উচ্চ, সুবিস্তৃত, সমতল ভূমি পড়িল। পুরাকালে বোধ হয়, এই স্থানটি কোন সমৃদ্ধ লোকের বাসভূমি ছিল। অধুনা এই স্থানটি এক প্রকার উলু খড়ে আবৃত, মাঝে মাঝে দুই একটি আম ও গাব গাছ বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার ভিতর কতকটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভূমির দক্ষিণ-দিক্ দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। রাস্তাটি অত্যন্ত ঢালু, সহসা আমার বড় ছেলে—মণি গড়াইয়া মগদীঘির গর্ভে প্রায় ৩৪ হাত নীচে পড়িয়া গেল, আমাদের অনেকেরই তখন ঐ দশা ঘটিবার উপক্রম হইল। দীঘিটি এখন শুষ্কগর্ভ,—ইহা অতিক্রম করিয়া আমরা ইহার দক্ষিণ তটে উপনীত হইলাম। প্রথমেই আমাদের চোখে পড়িল—"মনাই পীরে"র জীর্ণ সমাধিটি। ইহার ইষ্টকরাশি ভেদ করিয়া, একটি আম্রবৃক্ষ তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া এই সমাধির উপর ছায়াদান করিতেছে। স্থানীয় লোকের নিকট শুনিলাম যে, মনাইপীর না কি অলৌকিক শক্তি-বিষয়ে এক জন দ্বিতীয় "পীর"। একটু পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া আমরা সুলতান গিয়াস উদ্দিনের সমাধিস্থানটি দেখিতে পাইলাম। ইহাকে স্থানীয় লোক "পোড়া রাজার রথ"ও

* "পানামে"র উত্তরে একটি গণ্ডগ্রাম।

সুলতান গিয়াস উদ্দীনের সমাধি বা পোড়া রাজার রথ, মুক্তীশপুর

বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে না কি এই স্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত রথ-চক্র ও বৃহৎ অনেকগুলি স্তম্ভ দৃষ্ট হইত, সম্প্রতি ঐ স্থানে সমাধিটি ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না। সরকার বাহাদুর এই সমাধিটির জীর্ণ-সংস্কার করিয়া তাঁহাদিগের পুরা-কীর্ত্তি-রক্ষণ নীতির পরিচয় দান করিয়াছেন। জনশ্রুতি যে, কোন সময় "মগেরা" না কি পোড়া রাজার রথের একটি প্রস্তর বাণবিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। তদবধি লোক মানস করিয়া প্রস্তরের ক্ষতরন্ধ্র গুলির ভিতর দুগ্ধ ঢালিয়া না কি অভীষ্ট বস্তুলাভ করিতে আরম্ভ করে। কথিত আছে যে, দুগ্ধ ঢালিবামাত্রই না কি প্রস্তরের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গমন হইত। সম্প্রতি আমরা সেই প্রকার কোনও অলৌকিক কাণ্ড সমাধিপ্রস্তরে দেখিতে পাইলাম না। এখনও সেই পূর্ব্ব সরল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এই অঞ্চলের পল্লীবাসীদিগের ভিতর কেহ কেহ একটা কিছু মানস করিয়া সমাধির সম্মুখভাগের উপর দুগ্ধ ঢালিয়া থাকে। স্থানীয় মুসলমানগণ এই সমাধিস্থানটিকে পরম ভক্তির চোখে দেখিয়া থাকে, ইহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিবার সময় ইহারা ইহাকে সেলাম না করিয়া অতিক্রম করে না। আমার বোধ হয় যে, পোড়া রাজার রথটি পরবর্ত্তী কালে গিয়াস উদ্দিনের সমাধি বা দরগায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হয় ত ইহা কোন অধুনা-বিস্মৃত হিন্দু রাজার প্রতিষ্ঠিত বিরাট রথের অধিষ্ঠানভূমি ছিল, এখন শুধু জনশ্রুতি এই অজ্ঞাতনামা "পোড়া রাজার" একটা সুদূরকালের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিয়া তাঁহার এক কালের অস্তিত্বটি জ্ঞাপন করিতেছে। এই মুক্তীশপুর নামটি শুনিয়া আমার মনে ভগবান্ "মুক্তি-নাথ"—"জগন্নাথ দেবের" কথা মনে পড়িল! অতীতে হয় ত এক দিন এই স্থানটি তাঁহার ভক্ত সাধকমণ্ডলীর সমাগমে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। আজ মুক্তিনাথ অন্তর্হিত হইয়াছেন, শুধু তাঁহার নামটি পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে।

সরকার বাহাদুর ঐ সমাধিটি সংস্কার করিয়া নিম্নলিখিত লিপিটি মর্ম্মর-প্রস্তরে সংযুক্ত করিয়াছেন। সমাধিটি কালো পাথরে নির্ম্মিত ও ইহার প্রান্তভাগ কারু-শিল্প-শোভিত।

Tomb of
Ghias Shah
Who is believed
To have been
Ghiasuddin Azam Shah
Sultan of Bengal
From 1389 to 1396 A. D.

এই স্থানে আমরা অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করি-

পাঁচ পীরের দরগা—মাধবপুর

লাম। তৎপর আমরা পশ্চিমদিকে একটু অগ্রসর হইয়া ২ টার সময় মাধবপুর পৌছিলাম। এই স্থানে সুবিখ্যাত পাঁচ পীরের দরগা" ও একটি বৃহৎ প্রাচীন মসজিদ বর্ত্তমান। বাঙ্গালার মাঝি এই পাঁচ পীর বদর * মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কত নদ-নদীর

* ১৪৪০ খৃঃ (৮৪৪ হিঃ) চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ বদর উদ্দিন বদরে আলমের মৃত্যু হয়। অদ্যাপি পূর্ব্ব-বাঙ্গালার লোক নৌকা খুলিবার পূর্ব্বে পীর বদরের নাম করিয়া থাকে।

বক্ষের উপর তাহার তরণী ভাসাইয়া নির্ভয়ে চলিয়াছে। আজিও বাঙ্গালার মাঝি জলপথে কোনও প্রকার বিপদে পড়িলে বা কোন স্থানে যাত্রা করিতে হইলে "পাঁচ পীর বদর" এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ করিতে ভুল করে না। দরগার খাদেমের নিকট "পাঁচ পীরের" পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। কথিত আছে যে, এই অজ্ঞাতনামা "পাঁচটি পীর" বল্লাল সেনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া না কি নিহত হন। জনশ্রুতি যে, ইঁহাদিগের পাঁচটি মস্তক না কি একসঙ্গে ভাসিয়া দরগার নিম্নবর্ত্তী আনারখালে আসিয়া ঠেকিয়া পড়ে। তৎপর ঐ মস্তকগুলি না কি জল হইতে উত্তোলন করিয়া যথারীতি সমাহিত করা হয়। এই দরগার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে একটি ভগ্ন স্তম্ভ পড়িয়া আছে। ইহা বোধ হয়, কোন হিন্দু মন্দির ভগ্ন করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্থানে আমরা ১৫ মিনিট অপেক্ষা করিলাম। অদূরে বিখ্যাত লাঙ্গলবন্দ গ্রাম দেখা গেল।

আমরা সকলেই পথশ্রমে ক্লান্তি বোধ করিলাম, তজ্জন্য স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা সিদ্ধান্ত করিলাম। আমরা ২টা ৪৬ মিনিটের সময় কামারগাঁর সন্নিহিত হইলাম।

এই স্থানে এক ঘণ্টা বিশ্রাম ও জলপানের পর আমরা পুনরায় পানামের দিকে চলিলাম। ইচ্ছা ছিল, পথিমধ্যে অর্জ্জুনদীর নীল-কুঠীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যাইব; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। পানাম যখন পৌঁছিলাম, তখন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। কয়েকটি ছাত্রের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহাতিশয্যে আমাকেও বাধ্য হইয়া আমিনপুর গমন করিতে হইল। এই পল্লীটি এক কালে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, তাহার অতীত গৌরবের চিহ্ন এখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। ইহা পানামের পশ্চিমে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বদিকের খালটি বিষ্ঠাপূর্ণ ও পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা-স্তূপের দ্বারা সমাচ্ছাদিত। একটি বিরাট প্রাচীন দীঘির দক্ষিণ পারে শ্রীযুত নলিনীকান্ত সেনের বৃহৎ আবাসবাটী। জনশ্রুতি যে, এই বিশাল ভবনটি না কি প্রায় ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে প্রাচীর ভগ্ন হইয়া ধরাগর্ভ আশ্রয় করিয়াছে। একে একে আমরা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দক্ষিণদিকে একটি দ্বিতল ইষ্টক-গৃহের উপর একটি জোড়-বাংলা মন্দির সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। মন্দিরটির বহির্গাত্রে গোয়ালদীর ভগ্ন মসজিদের অনুরূপ সুচারু গ্রথিত ইষ্টকশ্রেণী দৃষ্ট হইল; কিন্তু ইহারা অত্যন্ত জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। শুনিলাম, গৃহটির বর্ত্তমান অধিকারী তাঁহার সুরম্য ভবন ও পল্লীর মায়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতা-প্রবাসী হইয়াছেন। মনে হয়, এই ভাবে বাঙ্গালার কত সোনার পল্লী বন্য জন্তুর আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যা ৭ টার সময় প্রায় . মাইল অতিক্রম করিয়া আবার সেই পদব্রজে পিতা-পুত্র আম. বারদী ছাত্রনিবাসে পৌঁছিলাম।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

৭ই চৈত্র, রবিবার, আমি মগ্রাপাড়া অভিমুখে গমন করা স্থির করিলাম। অদ্যকার ভ্রমণের সহযাত্রী কয়েক জন ছাত্র ও আমার বড় ছেলে মণি। আমরা বেলা ১২টার সময় বারদী হইতে যাত্রা করিয়া ২টার সময় পানাম পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে মগ্রাপাড়া প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পানাম হইতে একটি সুপ্রাচীন রাজপথ মগ্রাপাড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পথটি অবলম্বন করিয়া আমরা দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অগৌণে আমরা ইছাপুর নামক পল্লীর সমীপবর্ত্তী হইলাম। রাস্তার বাম পার্শ্বে কাশীবাসী সর্দ্দার মহাশয়দিগের সুবৃহৎ রাজোপম ইষ্টক-ভবন দৃষ্ট হইল। এই ভবনটি আধুনিক রুচির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার একটু দক্ষিণে খাশনগরের সুবিশাল প্রাচীন দীঘিটি অবস্থিত। প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের হিন্দু রাজাদিগের ইহাই একমাত্র কীর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। আমরা রাস্তা হইতে বাম পার্শ্বে একটু নিম্নে অবতরণ করিয়া দীঘিটির উত্তরপশ্চিম কোণে উপনীত হইলাম। এই স্থানে একটি প্রাচীন তিন্তিড়ী-বৃক্ষ কালের সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান। দীঘিটি আপাতদৃষ্টিতে দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ-মাইল ও প্রস্থে প্রায় পাঁচ শত হস্ত-পরিমিত বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর আমরা পূর্ব্বকথিত রাস্তার উপর দিয়া অর্দ্ধ-মাইল অতিক্রম পূর্ব্বক কোম্পানীগঞ্জ পৌঁছিলাম। সম্ভবতঃ এই স্থানটি কোনও সময় বৈদেশিক

খাশনগরের দীঘি। ইহার তীরে এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত "খাশা" নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত

বিহার নগরে ইঁহার সমাধিস্থান বর্ত্তমান।—"গৌড়ের ইতিহাস" (শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্যকৃত।)

বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। স্থানীয় লোক কোম্পানীগঞ্জের উৎপত্তিসম্বন্ধে একবারে অজ্ঞ। এই স্থানে একটি খালের উপর একটি সুবৃহৎ প্রাচীন ইষ্টক-সেতু দৃষ্ট হইল। ইহার গঠন-প্রণালী পানাম ও তুলালপুরের সেতু তুইটির সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে। সরকার বাহাতুর এই সেতুটির স্থানে স্থানে সংস্কার করাইয়া ইহাকে ব্যবহারোপযোগী রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সোজাসুজি কতক দূর অগ্রসর হইয়া পশ্চিমে একটু মোড় ফিরিয়া ইউসুফগঞ্জে পৌছিলাম, তখন বেলা ২॥টা। স্থানটির অবস্থান বড়ই সুন্দর। দূরে দিক্‌চক্রবালে মেঘনার তট-রেখা একটি কলঙ্ক-রেখার মত প্রতিভাত হইতেছিল। নিম্নে ক্ষীণ-তোয়া মেনীখালি তাহার অতীত স্মৃতির কঙ্কালটি বক্ষে ধারণ করিয়া মগরাপাড়া পর্য্যন্ত মৃদুমন্দবেগে চলিয়াছে। রাস্তার

শম্ভুনাথের দরগা, ইউসুফপুর

দক্ষিণপার্শ্বে শম্ভুনাথের দরগা বা দালান আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। আমরা দরগাটির ভিতর প্রবেশ করিলাম। ইহা পূর্ব্বে বোধ হয়, একটি হিন্দু মন্দির ছিল এবং পরবর্ত্তী কালে মুসলমান বিজেতৃগণ ইহাকে একটি মসজিদে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন। দরগাটির অভ্যন্তরে পরবর্ত্তী কালের সংযোজিত অংশগুলি স্থানে স্থানে স্থানচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে। গৃহ-ভিত্তির মধ্যভাগের কতকটা স্থান কালো পাথরে বাঁধান দৃষ্ট হইল।

প্রাচীরগাত্রে ইমামের আসনের মত কতকগুলি আসন চতুর্দ্দিকে নির্ম্মিত হইয়াছে। এইগুলি যে পরবর্ত্তী কালে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা এক জন অসতর্ক দর্শকেরও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

স্থানীয় মুসলমানগণ বলেন যে, অতি প্রাচীন সময় শম্ভুনাথ নামে এক জন মুসলমান সাধু ইহার ভিতর বাস করিতেন, তজ্জন্য ইহা শম্ভুনাথের দরগা বলিয়া কথিত হয়। আমার বিশ্বাস, ইহা প্রথমতঃ একটি শিবমন্দির ছিল এবং উত্তরকালে ইহা মসজিদে পরিণত হইয়া থাকিবে। সম্প্রতি ইহা শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। বর্ত্তমানে ইহার উপর মুসলমানদিগের কোন আধিপত্য নাই। সম্প্রতি এই দরগা বা দালানটির সেবায়েৎ শ্রীমহিমচন্দ্র মাঝি। অদ্যাপি এই স্থানে একটি টিনের চৌ-চালার অভ্যন্তরে শম্ভুনাথের বেদিকা বর্ত্তমান। এই স্থানে লোক মানস করিয়া পাঁঠা, কপোত, কলা, দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্য ইত্যাদি শম্ভুনাথের উদ্দেশে বলিস্বরূপ অর্পণ করে।

তৎপর একটু দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া বেলা ৩টার সময় মগরাপাড়া পৌছিলাম। নিম্নে শীর্ণকায়া মেনীখালী প্রবাহিতা, ইহা অধুনা চড়া পড়িয়া এক প্রকার লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই স্থানটি যে নৌ-বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী ছিল, তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থানটি আজিও সাক্ষ্যদান করে। এই ক্ষুদ্র নদীবক্ষে অনেক দেশীয় নৌকা অবস্থান করিতেছে। আমরা স্থানীয় বাজারে পৌছিয়া প্রথমতঃ হজরত সাহেবের দরগার খোঁজ করিলাম। একটি মুসলমান আমাদিগকে দরগার রাস্তাটি অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিল। তদনুসারে আমরা শীঘ্রই সাহেববাড়ীর ফটকের সমীপবর্ত্তী হইলাম। ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি মুসলমান ভদ্রলোকের নিকট আমি নান্না মিঞা * সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলাম। সেই সময় কয়েকটি মুসলমান ভদ্রলোক একটি ছোট দালানের রোয়াকে উপবিষ্ট ছিলেন। ইহাদিগের ভিতর এক জন নান্না মিঞা সাহেবকে আমার কথা জানাইবার জন্য গমন করিলেন। দালানটি একতল ও উত্তরদ্বারী। ইহার সম্মুখে একটি পুকুর দৃষ্ট হইল। ইহার দক্ষিণ পারে একটি প্রকাণ্ড গৌরী-পাট অনাদৃতভাবে পড়িয়া আছে। মিঞা সাহেবের পুত্রের নিকট শিবলিঙ্গটির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ইহা তাঁহার ব্যায়ামচর্চ্চার সহায়ক হইবার জন্য স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধুনা অদৃশ্য হইয়াছে। গৌরীপাটটি উত্তোলনের দ্বারা না কি তাঁহার ব্যায়ামক্রীড়া সম্পাদিত হইত। ইহার নিকটে একটি দেবদেবী-মূর্ত্তিখচিত বিশাল প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হইল। ইহার উপর ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলি ঘর্ষিয়া তোলার জন্য যেন বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। তজ্জন্য ইহাদিগকে এখন বুঝিবার কোন যো নাই। হিন্দু রাজা মগরাদেও কর্ত্তৃক (মকরদেব) প্রতিষ্ঠিত তদীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবমূর্ত্তিটিকে একটি প্রাচীরের ভিতর উল্টা করিয়া গ্রথিত করিয়া ইহার অপর পৃষ্ঠে আরবী লেখমালা উৎকীর্ণ হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে নান্না মিঞা সাহেব আসিয়া উপস্থিত

* ইনি সাধারণের ভিতর এই নামেই পরিচিত। "হজরত সাহেবের মসজিদ" ইত্যাদির বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক।

হইলেন। লোকটি বেশ ভদ্র ও অমায়িক। আমার আগমনের উদ্দেশ্যটি জ্ঞাপন করিলে তিনি আমাকে "Antiquities of Dacca" নামক একটি পুস্তিকা পড়িতে দিলেন। আমি ইহার পৃষ্ঠাগুলি আগাগোড়া উল্টাইয়া দেখিলাম। ইহা একদেশ-দর্শিতাদোষে দুষ্ট। মগ্রাপাড়া পল্লীটি সম্ভবতঃ মকরদেব নামক এক জন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। মুসলমানদিগের উচ্চারণ-বিকৃতিফলে মকর শব্দটি—মগরএ পরিণত হইয়া বর্ত্তমানে মগ্রা আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ মগ্রা দেও নামক জনৈক পিশাচ (demon) হইতে এই স্থানের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া থাকেন। ইহাকেই নিহত করিয়া না কি মুসলমানগণ এই স্থানের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ইহার অমানুষিক বিক্রমের মুখে ইহারা তৃণখণ্ডের ন্যায় এককালে ভাসিয়া গিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ইহাকে (মকরদেবকে) পিশাচ- (demon)-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিকই এই মহাবীরের "দেও" পদবীটি সংস্কৃত দেব শব্দের অপভ্রংশ, ইহা কখন পিশাচ অর্থ বহন করিতে পারে না; বরং এই অদ্ভুত অর্থটি একটি বিজাতীয় ঘৃণা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন যে, অতি প্রাচীনকালে মগ্রা নামক একটি "দেও" (demon) এই মগ্রাপাড়ায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ক্ষমতা এত অপরিসীম ছিল যে, কোনও মানুষ এই স্থানে আসিতে সাহস করিত না। অনেক মুসলমান সুলতান এই পিশাচের অধিষ্ঠানভূমিটি অধিকার করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। পরিশেষে বোগদাদ হইতে আগত শাহ ইব্রাহিম দানিশমন্দ নামক এক জন সাধুপুরুষ এই স্থানে আগমন করিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তির সাহায্যে মগ্রা দেওকে নিহত করেন। অতঃপর জালাল উদ্দিন আবুল মোজাফর ফতে শাহকে তিনি এই স্থানের আধিপত্য প্রদান করেন। এই সময় হইতে মগ্রাপাড়ায় ফতে শাহের" রাজধানী স্থাপিত হইল। ফতে শাহের রাজত্বকাল (১৪৮১খৃঃ—১৪৮৭ খৃঃ) ৬ বৎসর। বোধ হয়, ১৪৮১খৃঃএর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্থানটির শাসনদণ্ড যে মগ্রা দেও (মকরদেব) পরিচালিত করিতেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই মগ্রাদেওই (মকরদেব) সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রামের শেষ হিন্দু রাজা। ফতে শাহের শাসনকাল হইতে হিন্দুর স্থাপিত সুবর্ণগ্রাম—বদলে সোণারগাঁ (সহর সোণারগাঁ) নামে পরিচিত হইল। নব সুলতান কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সাধু শাহ ইব্রাহিমের হস্তে স্বকীয় একটি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ইহার পুত্র শেখ আল্ আহম্মদ,—পৌত্র, খন্দকার ইউসুফ এক জন বিখ্যাত সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি মগ্রাপাড়ায় সাহেববাড়ী নামক ভবনে বাস করিতেছেন। ইহার ভিতর চারিটি মুসলমান সাধু পুরুষের সমাধি ও হজরত সাহেবের মসজিদটি বর্ত্তমান। এই স্থানে প্রাচীন মুসলমান সুলতান-গণের প্রাসাদ, রাজকোষ, শস্যাগার ও নহবৎখানার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইল। এখানে আজিও একটি মুসাফেরখানা (অতিথিশালা) সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। নিম্নে হজরত সাহেবের মসজিদটির শিলালিপির ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"God Almighty says, 'The mosques belong to God, worship no one else with Him. The prophet on whom be the blessings of God says, 'Whoever builds a mosque for God becomes deserving of the pleasure of God. God will build for him a similar (building) in Paradise.' This Mosque was built for God, in the reign of the great and the exatted King, the Sultan, the son of Sultan Nasiruddinya-Waddin Abul Muzafar Nasrat Shah, the Sultan, son of Hussain Shah, the Sultan Ali Hussaini, may God perpetuate his Kingdom and rule, and build it for the pleasure of God with the house for the reservoir of water, the chief of the learned in Fiqah and Hadis, Taquiddin, son of Ainuddin known as Mubarak Mulla son of Majlis Muktar, may God preserve him in both the worlds in 929 A.H. (1522 A. D.)

সাহেববাড়ীর অদূরে একটি উচ্চ ঢিপি দৃষ্ট হইল, এই স্থানে না কি কোন সময়ে একটি সুদৃঢ় দুর্গ দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজধানীটিকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত।

এই স্থানে আমরা এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। হঠাৎ আকাশে তুমুল ঘনঘটা আরম্ভ হইল এবং ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তথাপি আমরা এই দুর্য্যোগের ভিতর দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলাম। কাহারও সঙ্গে ছাতা ছিল না, তজ্জন্য বৃষ্টিধারায় অভিষিক্ত হইয়া প্রায় ৫টার সময় পানাম পৌঁছিলাম। তখন মেঘ কাটিয়া যাইয়া আকাশের গায় সুরঞ্জিত রামধনু দেখা গেল। আমরা তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম অতঃপর সন্ধ্যা ৭টার সময় প্রায় ১৬ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সিক্ত-দেহে বারদী ছাত্র-নিবাসে পৌঁছিলাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী, (বি, এ, এম, আর, এ, এস).

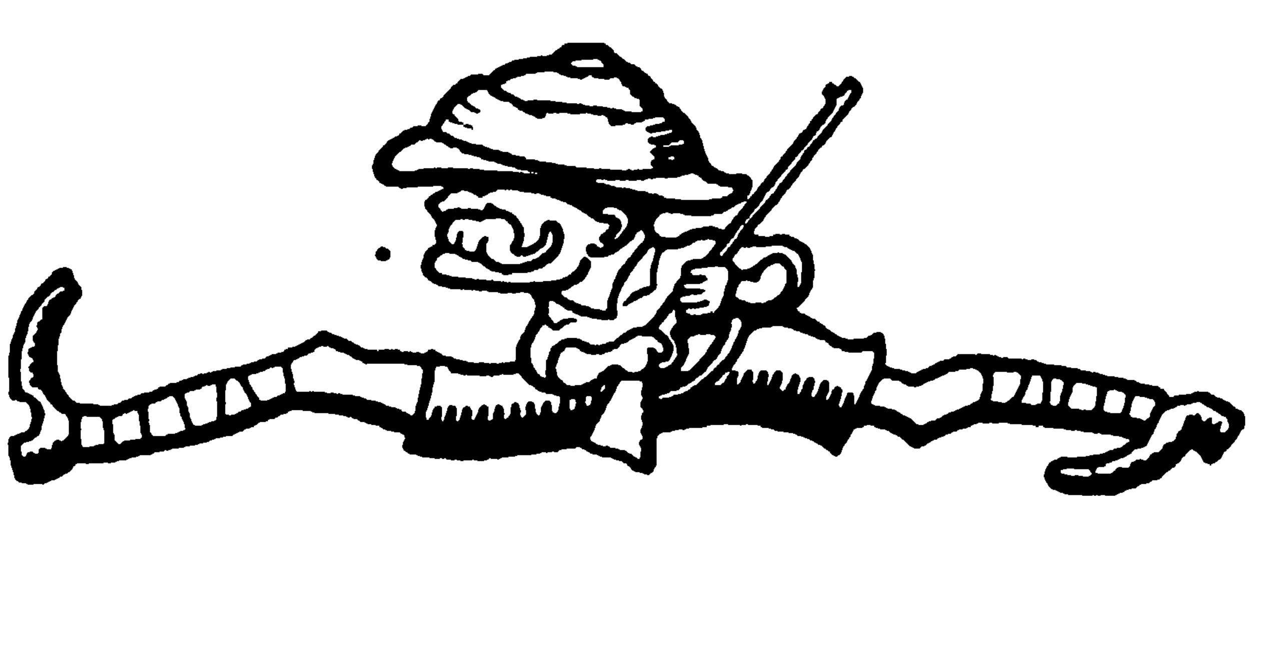

স্মৃতির মূল্য

১৩

এক সপ্তাহ পরে সকালের দিকে সুন্দরীমোহন হঠাৎ অনন্তকে সঙ্গে করিয়া কন্যার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই তাঁহার প্রথম কথা, "তোমরা মেয়েরা আজকাল বাপমায়ের উপর বড়ই নির্মম হচ্ছ, পুষ্পিতা। বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা থাকলে তবে সে বৃক্ষ। কন্যা, পত্নী, মাতা তিন মূর্ত্তিই যখন সমানভাবে তোমাদের মধ্যে জেগে থাকবে, তখনই তোমরা পরিপূর্ণা নারী।"

পুষ্পিতা পিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া তাঁহার শেষ কথা শুনিবার জন্য মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সুন্দরীমোহন বলিয়া চলিলেন, "অনন্তের মুখে শুনলাম, সে দিন আমাদের ওখান থেকে আসবার সময় ট্যাক্সি ক'রে হাওড়া গিয়েছিলে। ফিরবার পথে ট্যাক্সিওয়ালা না কি টালার কাছাকাছি ট্যাক্সি নিয়ে পালিয়েছিল। তার পর বাসাতেও না কি কি একটা বিপদে পড়েছিলে। তা আমাকে কি একটিবার খবর দিতে নেই? আর এই ক'দিনেই এত রোগা হয়ে গিয়েছিস—যেন কত দিন রোগে ভুগেছিস।"

অনন্ত বলিল, "তা হবে না, জ্যেঠামহাশয়। মানুষের অসভ্যতায় মনে একটা আঘাত লাগবে না?"

সুন্দরীমোহন মেয়ের দিকে চাহিয়াই অনন্তকে উত্তর দিলেন, "তোমরা এখনও ছেলেমানুষ, ও সব বোঝবার মত স্থিরবুদ্ধি হ'তে এখনও দেরী আছে। স্বাধীনভাবে মেয়েদের চলাফেরা করতে গেলে মাঝে মাঝে বিপদ ঘটা বিচিত্র নয়; পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে কখন কখন কাহারও কাছ হ'তে অভদ্র ব্যবহার পাওয়াও অসম্ভব নয়। এটুকু যদি সহিতে না পারো, তবে আবার অবরোধে ফিরে যাও, বাক্স-বন্দী হয়ে থাক। আঘাত লাগবে, কিন্তু তা শুধু দেহে—মনে তা কেন পৌঁছুবে? তোমরা স্ত্রী-স্বাধীনতায় পাইওনীয়ারের কায করছ—কত কাদা-মাটী ঘাঁটতে হবে, কত আছাড় খেতে হবে। তার জন্য কাতর হ'লে চলবে না। কি বল, মা?"

পুষ্পিতা বলিল, "হ্যাঁ, বাবা।"

সুন্দরীমোহন অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিলেন, "এই ত ঠিক বলেছ, মা। আমার মায়ের যোগ্য কথা।" তার পর আপন কথা পাড়িয়া বলিলেন, "চল ত মা, আজ, তোমার মায়ের কাছে দিনকতক থাকবে। অনন্তের মুখে শোনবামাত্র তোমার মা তোমার জন্য উতলা হয়েছেন। কি বল, হিমাদ্রি? তুমিও দিনকতক থাকবে চল না?"

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল, "আপনি ত আগে আমাকে বলেন নি—আপনার মেয়েকেই বলেছেন।"

অনন্ত হাসিয়া বলিল, "পুষ্পিতাকে বললেই আপনাকে ঐ সঙ্গে বলা হ'ল। কোনখানে যেতে হ'লে কোন মহিলা সঙ্গে প্রয়োজনমত আসবাবপত্র নেন কি না? আসবাবপত্রের জন্য আবার পৃথক্ ক'রে বলতে হয় কি?"

এ কথায় সকলেরই মুখে হাসি আসিল। তার পর স্থির হইল, পুষ্পিতা এখনই পিতার সঙ্গে যাইবে। ২।১ দিন থাকিয়া তবে ফিরিবে। কাযকর্ম্ম মিটাইয়া হিমাদ্রিকেও যাইতে হইবে।

পুষ্পিতা পিতা ও ভ্রাতাকে খাবার ও চা খাওয়াইয়া উহারই মধ্যে সময় করিয়া আড়ালে স্বামীকে একবার বলিয়া যাইল, ঠিক ৬টার মধ্যে ওখানে যাওয়া চাই। তার পর পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে যাত্রা করিল।

পুষ্পিতা চলিয়া যাওয়ার পর হিমাদ্রি স্নানাহার করিয়া লইয়া কাযে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় সুবেশে সজ্জিত এক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। হিমাদ্রিকে দেখিবামাত্র বলিল, "মহাশয়, ক্ষমা করবেন, আপনার শান্তির ব্যাঘাত করলাম।"

হিমাদ্রি যুবককে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

যুবক হাসিয়া বলিল, "আসছি সোণাডিঙ্গি থেকে; কিন্তু সে কথা বললে ত চিনতে পারবেন না। সোণাও জানেন, ডিঙ্গিও জানেন, অথচ সোণাডিঙ্গি বলায় একেবারে অবাক্ হয়ে গেছেন। এখন যা বললে চিনবেন, তাই বলি, শুনুন।"

হিমাদ্রি যুবকের বলিবার ভঙ্গীতে একটু বিস্মিত হইয়া চাহিল।

যুবক তেমনই বেগে বলিয়া গেল,—"আমি হচ্ছি সরোজনাথের ভগিনীপতি। আমার নাম যদিও না বললেও চলে, কারণ, আমি সরোজের ভগ্নীপতি বলেই পরিচিত। তবু নিজের নামটা বলা ভাল, কারণ, তাতেও ত ২।১ জনের কাছে নিজের নামটা জাহির হবে। আমার নাম হচ্ছে কমলাকান্ত—চক্রবর্ত্তী নই এবং বলা বাহুল্য, দপ্তরও নেই।"

হিমাদ্রি বলিল, "আপনি সরোজের ভগ্নীপতি যখন, তখন আমারও ভগ্নীপতি।"

যুবক ওরফে কমলাকান্ত এ কথায় কথা বন্ধ করিয়া বিশেষ একটু বিস্মিতভাবে হিমাদ্রির পানে চাহিল।

হিমাদ্রি তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনি এ কথায় আশ্চর্য্য হবেন না। সরোজ আমার ঠিক ভাইয়ের মত, কাযেই সরোজের ভগ্নী আমারও ভগ্নী। আর আমার নিজের কোন ভগ্নী নেই—সে জন্য সম্পর্কে আপনার বা আমার কোন বিবাদ নেই।

কমলাকান্ত এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর আপনাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া বলিল, "বেশ বলেছেন কথাটা—বিবাদ নেই। প্রথমা বর্ত্তমানে অপরা হলেই বিপদই ঘটে—ঘোর বিপদ। তার পর শুনুন—সূত্রটা বড় দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। আমি আসলে একটু দীর্ঘসূত্রী। আমার স্ত্রী ঠিক কথাই বলেন। দেখুন না, কি কথায় কি কথা নিয়ে এলাম।"

যুবক কমলাকান্ত একটু থামিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এখন আসল কথা বলি, শুনুন। সরোজ বাবু আমাদের নিয়ম ক'রে চিঠি দেন আর মাসে মাসে ৩০৲ টাকা দেন, এবারও তাই পাঠিয়েছেন; কিন্তু তার সঙ্গে চিঠি দেন নি। আমার স্ত্রী ত কেঁদেই অস্থির—বলেন, নিশ্চয়ই দাদা ভাল নেই—আমায় এখন কাকার কাছে নিয়ে চল। তাঁরা সব খবর নিশ্চয় জানেন। দেশে কেবল খুড়শ্বশুর, খুড়শাশুড়ী ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা থাকেন—তাঁদের সরোজ বাবু টাকা ৪০৲ পাঠান মাসে। সেখানে গিয়ে শুনলাম, সরোজ বাবু হঠাৎ পশ্চিমে কায নিয়ে গিয়েছেন—ঠিকানা দেন নি। বলেছেন গিয়ে দেবেন। স্ত্রী বললেন—কলকাতায় মেসের বন্ধুরা নিশ্চয় ঠিক খবর জানেন। স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ীতে রেখে কলকাতায় বরাবর তাঁর মেসে উঠে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন—তাঁরা কিছু জানেন না—তাঁর এক বন্ধু আছেন, তাঁর কাছে যান ব'লে মহাশয়ের নাম ও পুস্তকালয়ের ঠিকানা ব'লে দিলেন। সেখানে গিয়ে আপনার বাসার ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে এই আসছি। এখন সরোজ বাবুর ঠিকানাটি ব'লে আমার প্রাণ বাঁচান।"

সরোজ পৌছিয়াই হিমাদ্রিকে ঠিকানা লিখিয়া পত্র দিয়াছিল। হিমাদ্রি সেই ঠিকানা বলিয়া দিল। কমলাকান্ত ঠিকানাটা নোটবুকে টুকিয়া লইয়া আপন মনে বলিল,—"আহা, এমন লোক, কিন্তু একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে রইলেন।"

হিমাদ্রি বলিল, "তা আপনারা বিবাহ দিলেন না, তা কি করবেন? আগে থেকে যদি সংসারী ক'রে দিতেন, তা হ'লে কি আর সন্ন্যাসী হ'তে পারতেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "আর মশায়! তা বুঝি জানেন না? সে দিকে যে এক ট্র্যাজিডি।"

হিমাদ্রি সবিস্ময়ে বলিল, "ট্র্যাজিডি কি রকম ?"

কমলাকান্ত বলিল, "দাদা যে এক জনকে রীতিমত এবং অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু বলি বলি করেও তাকে মনোভাব প্রকাশ ক'রে বলতে পারেন নি। মেয়েটি না কি বড় রূপবতী ও গুণবতী। মেয়েটির তাঁর উপর ঠিক অনুরাগ না হলেও বিরাগ ছিল না, এবং হয় ত চেষ্টা করলে তাঁর অনুরাগও অর্জ্জন করতে পারতেন। ইত্যবসরে মেয়েটি এক জনের প্রেমে প'ড়ে গেলেন এবং তাঁরই সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল। তিনি হলেন আমার দাদার এক বন্ধু। দাদা জানতে পারা মাত্র ও পথ ত্যাগ করলেন, তাঁর মনোভাব তাঁর মনের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, কেউ আর জানলে না। এক দিন আমার স্ত্রী বড়ই অনুরোধ করায় ও রীতিমত কান্নাকাটি করায় খানিকটা কথা তাকে প্রকাশ ক'রে বলেন ; সেই দিনই কথাটা আমার স্ত্রীর কাছে শুনি।—এই দেখেছেন কি বোকা আমি !"

এ সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইলেও হিমাদ্রি কহিল, "কেন, বোকা কেন বলছেন ?"

কমলাকান্ত বেশ জোরের সহিত বলিল, "তা বলব না ? একশবারই বলব। স্ত্রী পই পই ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন, খবরদার, এ সব কাউকেই বলবে না। আর দেখুন, আমি বোকারাম ঠিক সেই কথাটি ব'লে তবে ছাড়লাম। আমার স্ত্রী বলেন—আমার পেটে কথা থাকে না। তা সে কথা খুব ঠিক। তা কিছু মনে করবেন না—নমস্কার। আমি তা হ'লে এখন উঠি।"

হিমাদ্রি বলিল, "এখনই উঠি কি রকম ? ভদ্র লোকের বাড়ী দুপুরবেলা এসে অনাহারে চ'লে যাবেন, এ একটা কথা হ'ল ? আর আপনি হলেন সরোজের ভগ্নীপতি।"

কমলাকান্ত বলিল, "কি করি বলুন, আমি গিয়ে খবর দেব, তবে আমার স্ত্রী খাবেন। এ অবস্থায় আমি কি ক'রে সময় নষ্ট করি বলুন।"

হিমাদ্রি বলিল, "তা এখানে সময় নষ্ট না করুন, এখন চ'লে গেলে ষ্টেশনে গিয়ে ত সময় নষ্ট করতেই হবে। আপনাদের ট্রেণ ত বেলা ৩ টার আগে নয়।"

কমলাকান্ত বলিল, "আপনি তাও জানেন দেখছি। তা আমাকে এখন কি করতে বলেন ?"

হিমাদ্রি বলিল, "স্নান ক'রে আহার করুন। একটু বিশ্রাম করুন। তার পর ষ্টেশনে গমন করুন।"

কমলাকান্ত বলিল, "বেশ তাই, কিন্তু এ যে আর এক মহা বিপদ !"

হিমাদ্রি বলিল, "আবার কি বিপদ হ'ল ?"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার সঙ্গে ত কাপড় নেই—গামছাও আনি নি। আমি যে একেবারে নিশ্চিত ক'রে এসেছিলাম—খবর নিয়ে রওনা হব।"

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল, "তা খুঁজে পেতে আমার বাড়ীতে একখানা কাপড় পাওয়া যাবে।"

হিমাদ্রি তখন অতিথির স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিল ; স্নানের পর আহার আসিল। নিজে পাশে বসাইয়া তাহাকে খাওয়াইল।

আহারাদির পর হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি সরোজের বিবাহ না করার যে কারণ বল্লেন, তা কি ঠিক ?"

কমলাকান্ত হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, বিলক্ষণ ঠিক ! নইলে আমি আপনাকে এ কথা বলি ? না বিশ্বাস করেন, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন ; তিনি ত এখন সম্বন্ধে আপনার ভগ্নী হলেন।"

হিমাদ্রি বলিল, "আচ্ছা, যে মেয়েটিকে সরোজ ভালবাসতেন, তার সম্বন্ধে আপনি আর কি জানেন ?"

কমলাকান্ত বলিল, "আর কি জানি। আমার যা জানা, তা আমার স্ত্রীর কাছ থেকেই শোনা। আর শুনেছি, সে মেয়েটির বাপ হচ্ছেন উকীল। নাম হচ্ছে এক জন ভাল ডাক্তারের নাম—দাঁড়ান, সুন্দর সুন্দর—হ্যাঁ সুন্দরীমোহন।" হিমাদ্রি আর কোন কথা বলিল না।

আপনার গাড়ীতে করিয়া হিমাদ্রি কমলাকান্তকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া পাঠাগারে না গিয়া ভাবিতে বসিল। এত বৎসরের মধ্যে কি করিয়া এ কথাটা তাহাকে এড়াইয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্য বটে ! এক এক করিয়া হিমাদ্রির দৃষ্টির সম্মুখে অতীতের চিত্রগুলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

পূর্ব্বের সদা-প্রফুল্ল সরোজ তাহার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও প্রফুল্ল হইয়াছিল। তার পরেই যেন তাহার মুখের হাসি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। তখন সে নিজের সুখেই মগ্ন ছিল, তাই ধরিতে পারে নাই ;

আজ ত তাহা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট মনে হইতেছে।

হিমাদ্রি ভাবিল—পুষ্পিতাকে দেখিয়া, তাহাকে কাছে পাইয়া ভাল না বাসা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। সে পুষ্পিতার কাছেই শুনিয়াছিল—সরোজ তাহার মামার বাড়ীর দেশের লোক। তখনই তাহার এ কথাটা মনে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের আতিশয্যে অন্যের বিষয় ভাবিতেও পারে না।

হিমাদ্রি আজ যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করিল, দিনের পর দিন সরোজ কি ব্যথা হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে। যখন আর সহ্য করা একবারে সরোজের পক্ষে অসম্ভব হইল, তখনই সে চলিয়া গেল।

তখন মনে পড়িল—যাত্রাকালে সরোজের সেই শেষ অমৃত-মধুর দৃষ্টি।

হিমাদ্রির মনে এতটুকু ঈর্ষা হইল না। সরোজের দুঃখে তাহার প্রাণ কাতর হইল। এ আঘাতেও সে তাহাদের বন্ধুত্বকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইবার অবকাশ দেয় নাই। সরোজের মহত্ত্বে সে মুগ্ধ হইল।

১৪

ঠিক দুই দিন পরে পুষ্পিতা সলজ্জে ফিরিবার কথা পাড়িল। মা বলিলেন, "বিয়ে হয়ে গেলেই মেয়ে পর হয়ে যায়। দেখেছ গা? পুষ্প বলছে, আজই যাবে।"

কথাটা স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। সুন্দরী-মোহন একটু ঔদাস্যের সহিত বলিলেন, "সে ত ঠিক কথাই গো। তোমাকে দিয়েই দেখ না, তোমাকেও ত শাশুড়ী ঠাকুরাণী ঐ কথাই বলতেন।"

স্ত্রী চপলা রাগিয়া গিয়া বলিল, "তোমার ত মেয়েকে কিছু বললে সহ্য হবে না, অমনি দোষ কাটাবে। আমি আর তোমার মেয়ে? তখন তোমার সংসারে কত কায ছিল বল দিকি? আমি না থাকলে চলত এক দিন? ওদের সংসারে কি কায বল দিকি? অমনি বললেই হ'ল?"

সুন্দরীমোহন তখন পুষ্পিতাকে বলিলেন, "তোমাকেও বলি, মা। তোমাকে ত আমি ২।১ দিন থাকবে ব'লে এনেছি। তুই আর একের গুণফলটা না নিয়ে যোগ-ফলটা নাও। কি বল, মা?"

পুষ্পিতা লজ্জিত হইয়া সে দিনটাও থাকিল। রাত্রিতে হিমাদ্রি আসিয়া শয়নের সময় পুষ্পিতাকে বলিল, "কি গো, রকম কি? আর যাবার যে নাম কর না!"

আজ যাইবার নাম করায় কি ঘটিয়াছিল, পুষ্পিতা তাহা স্বামীকে বলিল।

হিমাদ্রি শুনিয়া হতাশ হইয়া বলিল, "তবে এখন উপায়?"

পুষ্পিতা স্বামীর হতাশা দেখিয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া হাসিয়া বলিল, "আজই ত যোগ-ফল শেষ হবে, কাল আর যাত্রার কোন বাধা থাকবে না।"

হিমাদ্রি বলিল, "যদি বাধা দেন ত বলো, আমরা বরং রোজ সন্ধ্যায় এখানে আসব। কেমন?"

পুষ্পিতা বলিল, "দেখি, যদি পীড়াপীড়ি করেন, তাই বলব।"

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল, "দেখো, শেষটা যেন কাল ব'লে বসো না যে, যোগফলের পর আবার গুণফল, তার পর যোগফল আর গুণফলে যোগ করলে যা হয়, তাই না সাব্যস্ত হয়। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

কি কষ্ট, পুষ্পিতা জানিয়াও তবু জিজ্ঞাসা করিল, "কি কষ্ট?"

জানা থাকিলেও বুঝি সকল নারীরই দয়িতের মুখে সে কথা শুনিতে সাধ হয়।

হিমাদ্রি বলিল, "কি কষ্ট? তুমি যেন জান না? আজ ৬।৭ বছর বিবাহ হয়েছে, ক'দিন তুমি আমার কাছ-ছাড়া হয়েছ? এইটুকু ত ব্যবধান, তবু যেন মনে হয়, কত দূরে তুমি আছ। আর এই ক'দিন ত এসেছ—তাই মনে হয়, কত কাল ছাড়া। ঘরে ঢুকলেই মনে হয়, এই তুমি আসবে। তুমি আস না। হঠাৎ কোন শব্দ যদি হয়—মনে হয়, তুমি বুঝি ছুটে চ'লে আসছ। কাল সকালে ২।৩ বার দেখবার জন্য ছুটে দরজা পর্য্যন্ত এসেছি। তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

পুষ্পিতার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তখন আমি ফিরে যাবার জন্য বড়ই অধীর হয়ে উঠেছিলাম আর মাকে যাবার কথা বলেছিলাম—তাই তো'মার

মনে অমন ভাব হয়েছিল। আমিই কি তোমাকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারি?”

পুষ্পিতার চোখ দিয়া সত্যই জল গড়াইয়া পড়িল। হিমাদ্রি পুষ্পিতাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সযত্নে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল।

আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিয়াই হিমাদ্রি বলিল, “দেখ, একটা কথাই ভুলে গেছি, তাতেই সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।”

পুষ্পিতা চক্ষু মেলিয়া উৎসুক হইয়া বলিল, “কি কথা?”

হিমাদ্রি বলিল, “মা চিঠি লিখেছেন একখানা।”

পুষ্পিতা বলিল, “কি লিখেছেন?”

হিমাদ্রি বলিল, “আমাদের দুজনকে একবার দেখতে চেয়েছেন। কালই আমরা সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হব; কাযেই কাল সকালে বাসায় না ফিরলে কি ক’রে হবে?”

পুষ্পিতা বলিল, “তা ঠিক, কিন্তু রাত্রেই বাবাকে বা মাকে ব’লে রাখলে না কেন?”

হিমাদ্রি বলিল, “সকালে উঠেই বলব। প্রথমে ত গুণ বা যোগফলের হাঙ্গামা বুঝতে পারি নি। পারলে আগেই ব’লে রাখতাম।”

পুষ্পিতা বলিল, “আর চিঠিখানা এনেছ?”

হিমাদ্রি বলিল, “হ্যাঁ, পকেটে আছে।”

পুষ্পিতা বলিল, “আচ্ছা, আমি নিয়ে আসি, একটু ছেড়ে দাও।”

হিমাদ্রি বলিল, “উঁহুঁ, সে হবে না। আমার বুকের পাশে এমনি ক’রে থেকে যদি আনতে পার—নিয়ে এস।” বলিয়া আলিঙ্গন আরও একটু নিবিড় করিয়া দিল। পুষ্পিতা আর উঠিবার কথা মুখেও আনিতে পারিল না। খানিকক্ষণ পরে হিমাদ্রি বলিল, “আচ্ছা, আমি এনে দেব?”

পুষ্পিতা হাসিয়া বলিল, “তা হ’লে বুঝি ছেড়ে যাওয়া হবে না?”

“উঁহুঁ, এই দেখ না” বলিয়া হিমাদ্রি পুষ্পিতাকে বক্ষে আলিঙ্গনবদ্ধ রাখিয়াই শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িল ও যেখানে তাহার জামাটা টাঙ্গান ছিল, তাহার কাছে আসিয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া পুষ্পিতার হাতে দিল।

পুষ্পিতা বলিল, “নামিয়ে দাও, তবে ত পড়ব।”

হিমাদ্রি বলিল, “এ যায়গা থেকে নামতে আজ পাবে না—তবে পড়বার উপায় ক’রে দিচ্ছি।” বলিয়া যেখানে আলো জ্বলিতেছিল, তাহার নীচে সোফায় আপনি বসিয়া পুষ্পিতাকে আপনি বামদিকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বসাইল ও বলিল, “পড় এবার।”

পুষ্পিতা কিন্তু পড়িবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। হিমাদ্রির কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া যেন স্পর্শ-সুখটুকু পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে লাগিল।

হিমাদ্রিও আর কিছু বলিল না। কর্ণ দিয়া পুষ্পিতার বুকের দুরু দুরু শব্দ শুনিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পুষ্পিতা মাথা তুলিয়া বলিল, “এমনি করেই তুমি আমাকে পাগল ক’রে রেখেছ। এক মুহূর্ত্ত তাই তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি নে। এ কি ভাল?”

হিমাদ্রি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, পুষ্পিতার মুখখানি অশ্রুস্নাত। সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করিল, তাহার কাঁধের উপরটা ভিজিয়া উঠিয়াছে।

হিমাদ্রি বলিয়া উঠিল, “এ কি! তুমি কাঁদছ? কান্না কেন? কেন, এ ভাল নয়?”

পুষ্পিতা অশ্রু মুছিয়া বলিল, “যদি তুমি সব সময় কাছে না থাক, যদি কোথাও কিছু দিনের জন্য যাও, যদি ফিরতে দেরী কর—তখন আমি কি ক’রে থাকব?”

পুষ্পিতা এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল। হিমাদ্রি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কিছুক্ষণ তাহার পিঠের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া পুষ্পিতা শান্ত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে একটু লজ্জাও পাইল। এ প্রসঙ্গ আর না তুলিয়া চিঠিখানি পুষ্পিতার হাত হইতে লইয়া তাহাকে পড়িয়া শুনাইল। মা লিখিয়াছেন—“বাবা, বহুদিন তোদের দেখি নাই, দেখিবার জন্য বড়ই সাধ হইতেছে। বৌমাকে লইয়া একবার শীঘ্র এখানে আয়।”

কিছুক্ষণ পরে পুষ্পিতা জিজ্ঞাসা করিল, “কাল যাবে ত তা হ’লে?”

হিমাদ্রি বলিল, “হ্যাঁ, নিশ্চয়, চল এবার শুই গে, কি বল?”

পুষ্পিতা বলিল,—“আচ্ছা।”

হিমাদ্রি আবার তেমনই করিয়া পুষ্পিতাকে বুকের উপর উঠাইয়া আলো নিভাইয়া শয্যায় আসিল।

অন্ধকারে উভয়ে যেন উভয়ের আরও কাছে আসিল।

তখন দুইটি বক্ষই যেন দুই নদীর মতই আকুল আবেগে এক হইতে চাহে। বক্ষের ব্যবধানটুকুও তখন সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এ ব্যবধান—এই বাঁধটুকু ভাঙ্গিতে পারে না, তাই বাঁধের উপরেই শুধু আছাড়িয়া পড়িতে থাকে!

বহুক্ষণ এমনই করিয়া কাটিয়া গেল; কিন্তু মনে হইল, এ যেন এক মধুময় মুহূর্ত্ত!

হিমাদ্রি স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ এমন বিচলিত হ'লে কেন?"

পুষ্পিতা আবার যেন স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। বলিল, "আমার এক একবার কি জানি কেন মনে হয়—আমার হয় ত এত সুখ সইবে না—এত ভালবাসবে না—হয় ত বা এক দিন—"

পুষ্পিতা কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না।

"হয় ত কি পুষ্পিতা? হয় ত এক দিন চ'লে যাব?"—

পুষ্পিতা তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ও কথা আর বলো না। আমার মাঝে মাঝে ঐ ভয় হয়। তাই বুকের মাঝে তোমায় রেখেও তৃপ্তি পাই না।"

পুষ্পিতা দুই হাত দিয়া স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিল।

রাত্রি গভীর হইয়া চলিল। ধীরে ধীরে চারিদিক স্তব্ধ হইয়া গেল। মুক্ত বাতায়নগুলি দিয়া—রাত্রিশেষের স্নিগ্ধ বাতাস যেন কোন মধুরতর জগতের বার্ত্তা বহিয়া আনিতে লাগিল। বাহিরের অন্ধকাররাশি যেন মূর্চ্ছিত হইয়া এই দুইটি নর-নারীর অনাবৃত পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

শুধু বিশ্বজগতে যেন এই দুইটি প্রাণী—এই দুই তরুণ-তরুণী—উভয়ে উভয়ের হৃদয় দিয়া অফুরন্ত প্রেমের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

শ্রাবণ-সঙ্গীত

আজি সাম্য সামের উতলা বাউল শ্রাবণ এসেছে রে,
বুঝি প্রেমের নদীতে প্লাবন জাগায়ে ভুবন ভাসাবে সে।
ঐ ঝর-ঝর ঝর জলধার
যেন খর কর-অঙ্গুলি তার
হের তর তর তর আকাশ বীণার তারে তারে বাজে যে।

আজি নিরজন কোণে বসি নিজমনে হায় রে খেয়ালী হায়,
মিছে কি ভাবিস? পথে শোন শোন ঐ বৈরাগী গান গায়—
ও কি নিমায়ের প্রেমবন্যা
ঝরে করিতে ধরণী ধন্যা?
কোন ভিখারী দেবতা মানবের দ্বারে হৃদয় ভিক্ষা চায়?

ওরে খুলে গেছে কার জটিল জটার কুট বন্ধনটি?
তাই ক্রন্দন গানে মন্দাকিনীর তন্দ্রা টুটিল কি?
বল কার তরে ঐ আঁখিজল
শুধু গাল বেয়ে পড়ে অবিরল?
আহা ধরণীর ব্যথা শিলীমুখ তার মরমে ফুটিল কি?

ওরে নিজেদের মাঝে ভেদের প্রাচীর মানুষ গড়েছে আজ,
রয় বর্ণ বিচার ভিন্নাচারের খুপরীতে কেটে খাঁজ।
ধনী উঠে বংশের রণপায়
চায় দীন-হীনে অনুকম্পায়
আর সৃষ্ট কীটের ধৃষ্টতা শুধু স্রষ্টারে দেয় লাজ।

আজি সাম্য সামের বিধান বিধাতা শ্রাবণ এসেছে রে,
ঐ গগনে মেঘের প্লাবন ভাঙিয়া ভুবনে নামিছে সে।
কয়, তৃণ বিটপীতে নাই ভেদ
কেন প্রাসাদে কুটীরে বিচ্ছেদ,
আমি দর্পাসুরের মদ মন্দিরে অশনি হানিব রে।

মূঢ় কেন আজ আভিজাত্যের মোহে লুকায়ে থাকিস হায়
মিছে শুকায়ে মরিস বিলাসের অলি চম্পক লালসায়।
দেখ দীনের শিয়রে অনিবার
ঐ ভগবান ঢালে আঁখিধার
তুই মোহ মুক্তির মুক্তধারায় মাথা পেতে দিবি আয়।

শ্রীজগৎমোহন সেন।

সিংহলের "পেরাহেরা" শোভাযাত্রা

সিংহলের প্রাচীন শৈল রাজধানীর নাম কান্দি। সহস্র সহস্র ভক্ত তীর্থযাত্রী গ্রীষ্ম-ঋতুশেষে বর্ষার প্রারম্ভে এই নগরে সমাগত হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত এখানে মন্দিরমধ্যে সযত্নে রক্ষিত আছে বলিয়া প্রবাদ। সে দন্ত-দর্শনের সৌভাগ্য কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিবৎসর কান্দি-সহরে যে বিরাট উৎসব এবং বিচিত্র শোভাযাত্রা ঘটিয়া থাকে, তাহা দর্শন করিবার আশায় তীর্থযাত্রীরা এখানে সমবেত হয়। সিংহলে এই উৎসবকে "পেরা-হেরা" বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়া থাকে।

তথাগতের পবিত্র দন্ত, "ডালাডা মালি-গাওয়া" নামক দন্তমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের গর্ভকক্ষ অসংখ্য-রত্নমণ্ডিত। সেই গর্ভকক্ষে ভক্তের আরাধ্য গৌতমবুদ্ধের পবিত্র দন্ত (দক্ষিণ অক্ষিগোলকের নিম্নস্থ, উপর পাটীর দন্তশ্রেণীর একটি দন্ত) রত্নাধারমধ্যে সংরক্ষিত।

উল্লিখিত "পেরাহেরা" উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা বহু শতাব্দীর পুরাতন। কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধদেবের দন্ত সিংহলে আনীত হইবার পর হইতেই দন্ত-উৎসব আরম্ভ হয়। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের ৮ শত বৎসর পরে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৩ অব্দে কোনও কলিঙ্গরাজনন্দিনী তাঁহার কেশরাজির অন্তরালে পবিত্র দন্তটি লুক্কায়িত করিয়া সিংহলে উপনীতা হন।

উক্ত দন্ত সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী বিদ্যমান। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজরা উহা সিংহল হইতে গোয়া নগরে লইয়া যায়। তাহারা বলিয়া থাকে যে, বর্ত্তমানে কান্দিতে যে দন্ত আছে, তাহা আসল নহে, নকল। সিংহলে যে উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে প্রাচীন যুগের পদ্ধতি বিদ্যমান। বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রায় একই ভাবে উৎসব ও শোভাযাত্রা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

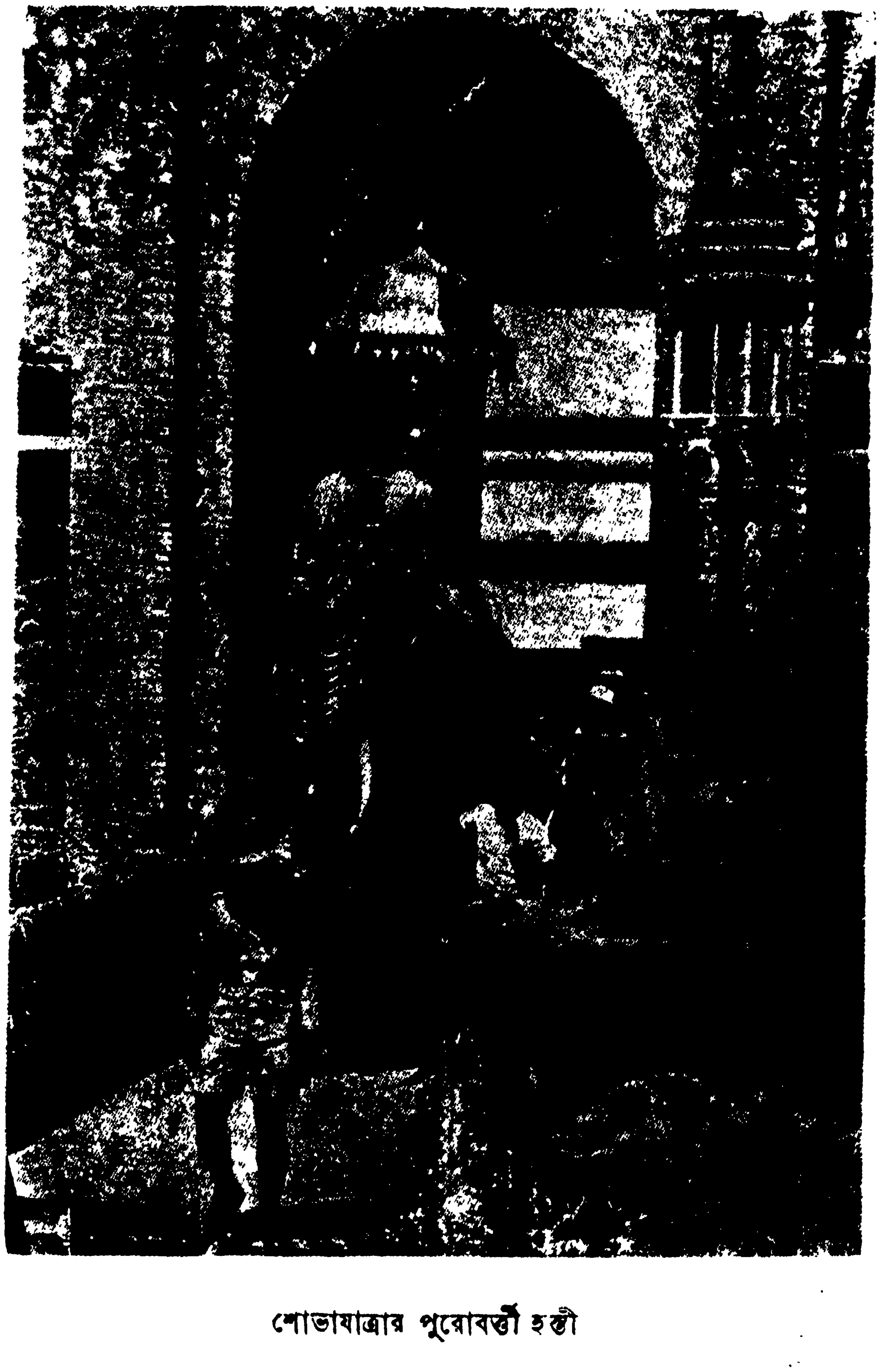

শোভাযাত্রার পুরোবর্ত্তী হস্তী

বর্ত্তমান যুগে "পেরাহেরা" উৎসব ভগবান্ বিষ্ণুর নরজন্মগ্রহণ উপলক্ষেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যেমন জন্মাষ্টমী উৎসব আছে, ইহা তাহারই রূপান্তরমাত্র। কান্দিসহরে জুলাই-আগষ্ট (শ্রাবণ) মাসে ভগবান্ বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সিংহল-বাসীদিগের ধারণা।

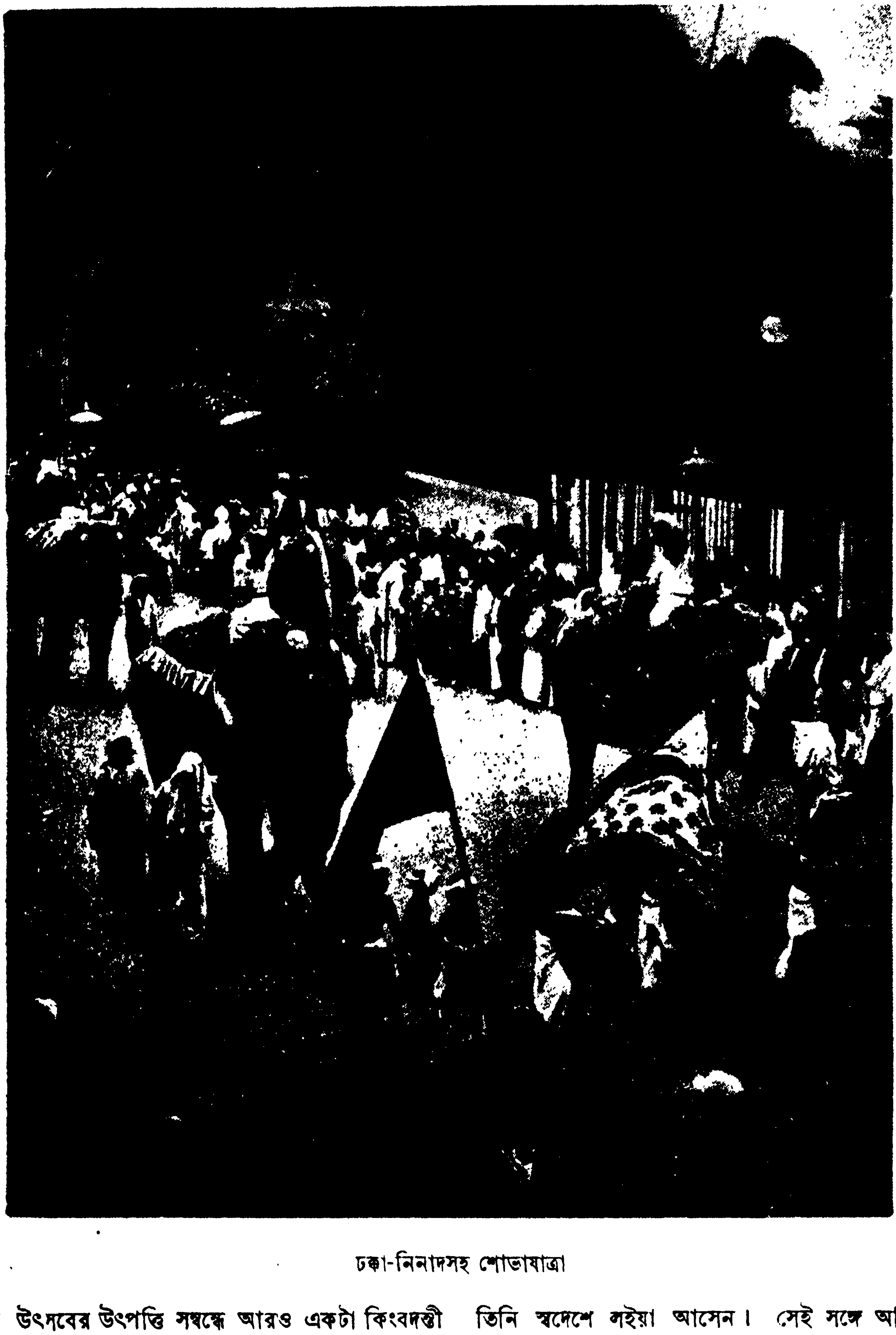

ঢক্কা-নিনাদসহ শোভাযাত্রা

উক্ত উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। গজবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার দেশের বহু লোক বৈদেশিক শাসনের অধীন ছিল। উক্ত নৃপতি স্বদেশের ১২ হাজার অধিবাসীকে বৈদেশিক শাসনপাশ হইতে মুক্ত করেন। তাহাদিগকে তিনি স্বদেশে লইয়া আসেন। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত ১২ হাজার বন্দীকেও আনয়ন করেন। তাঁহার রাজত্বের ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পবিত্র দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারও অধিকাংশ সেই সঙ্গে তিনি পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিজয়-উৎসব উপলক্ষে যে

শোভাযাত্রায় নর্ত্তকবৃন্দ

শোভাযাত্রা হইয়াছিল, এখনও প্রতিবৎসর তাহারই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

"পেরাহেরা" উৎসবের উৎপত্তির যে কারণই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে কান্দিসহরে উহা অতিশয় আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেশবাসীরা এই উৎসবকে অতিশয় পবিত্র মনে করে। উৎসব এবং শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য বহু বৈদেশিকও কান্দিসহরে গমন করিয়া থাকেন।

রাত্রিকালে এই শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। দশ দিন

শোভাযাত্রায় কান্দির সর্দ্দারবৃন্দ

দন্তমন্দিরের সান্নিধ্যে মুক্ত স্থানে নর্ত্তকদের নৃত্য

দশরাত্রিব্যাপী এই উৎসবের সমারোহ সমগ্র নগরীকে উচ্চকিত করিয়া রাখে। পূর্ণিমার পর হইতে কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হইলে, পেরাহেরা উৎসবের প্রথম সূচনা হয়। দশরাত্রির প্রত্যেক উৎসবটিই ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার। তবে প্রথম ৫ দিন জনসাধারণ উৎসবে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করে না। ৬ষ্ঠ দিনের সন্ধ্যা হইতে, সহরের প্রত্যেক অধিবাসীই উৎসব-শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া থাকে। অন্য কোন কায না থাকিলেও হয় ত মশাল ধরিয়া থাকে, অথবা নর্ত্তকগণকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করে।

আকাশে তখন চন্দ্রালোকের বিমল দীপ্তি এবং প্রজ্বলিত মশালের আলোকধারা শোভাযাত্রাকে বিচিত্র-দর্শন করিয়া তুলে সহস্র সহস্র প্রদীপ্ত মশাল, মাথার উপর জ্যোৎস্নাতরঙ্গ—শোভাযাত্রার সংশ্লিষ্ট নর্ত্তকগণের বিচিত্র বর্ণের বেশভূষা দর্শনে দর্শকের চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে।

এক দিনমাত্র দিবালোকে শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়। সে সমস্ত সূর্য্যালোক শোভাযাত্রার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া থাকে সমুজ্জ্বল বেশ-ভূষার উপর প্রদীপ্ত সূর্য্যের রশ্মিজাল পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতে থাকে—সে দৃশ্য পরম রমণীয়।

সুবৃহৎ হস্তিপৃষ্ঠে জনৈক কান্দি-সর্দ্দার

দন্ত-মন্দিরটি ক্ষুদ্রাকার হইলেও দ্বিতল। উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, শীতল, স্নিগ্ধ কক্ষে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত পাদপীঠ। উহার অঙ্গে বিবিধ রত্নরাজি ক্ষোদিত। মন্দিরটি স্বর্ণ-মণ্ডিত। উহার আকার ঘণ্টার ন্যায়। মন্দিরও রত্নখচিত। এই কক্ষমধ্যে রৌপ্য-পাদপীঠের উপর একটি স্বর্ণ-শতদলের উপর দন্তটি রক্ষিত। যাহাতে কাহারও দৃষ্টিগোচর না হইতে পারে, এমনই ভাবে স্বর্ণ-শতদলের উপর দন্তটিকে সংগোপনে রাখা হইয়াছে। রাজপুত্র অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহ উহা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করে না। তাঁহারাও সকল সময় দন্তের দর্শন পান না; কদাচিৎ কখনও সে সৌভাগ্য তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে। আধারে স্থাপিত দন্তটির চারিদিকে কাচের প্রাচীর। ছাদ হইতে ভূমিতল পর্য্যন্ত কাচ-প্রাচীর বিদ্যমান। দন্ত ব্যতীত আরও বহুবিধ মূল্যবান্ রত্ন কাচ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে রক্ষিত আছে। মন্দিরের উপর একটি রৌপ্য-ময়ূর। তাহার পুচ্ছবিলম্বিত কান্দির প্রসিদ্ধ মরকত হইতে দ্যুতি নির্গত হইতেছে।

পেরাহেরা শোভাযাত্রা বাহির হইলে, শত শত দামামা ধ্বনিত হইতে থাকে। সহস্র সহস্র সিংহলবাসী রঞ্জিত

দন্ত-মন্দির

বস্ত্রে দেহাচ্ছাদিত করিয়া শোভা যাত্রাকে পরিপুষ্ট করে। মন্দিরের হস্তী শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত থাকে। নর্ত্তকের দল বিপুল উদ্যম সহকারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে।

শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। পথের মধ্যে মাঝে মাঝে থামে। বাদ্যযন্ত্র তখন দ্রুততালে সঙ্গত করিতে আরম্ভ করে। সে সময় ঢক্কাবাদকগণের উন্মদ আগ্রহ দর্শন করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। উৎসাহের উত্তেজনা দর্শকের চিত্তকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। বিরাট শোভাযাত্রা বহু-দূরব্যাপী হইয়া থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, অসংখ্য নর্ত্তকের দল থাকিলেও নর্ত্তকী এক জনও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

শোভাযাত্রার দৃশ্য

শোভাযাত্রায় অনেকগুলি হস্তী থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার হাতীর পৃষ্ঠে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মণ্ডিত হাওদা,—মস্তকের মধ্যস্থলে বিদ্যুতের একটি চক্ষু সংলগ্ন। সেই চক্ষু হইতে আলোকধারা নির্গত হইতে থাকে। আর একটি হস্তীকে নীলবর্ণের রাজপরিচ্ছদে ভূষিত করা হয়। সেই পরিচ্ছদ রৌপ্য-খচিত। এই হস্তীর পৃষ্ঠদেশে যে রত্নরাজি শোভিত থাকে, তাহা যে কোন রাজার ঐশ্বর্য্যের সমতুল্য।

এমন দিন ছিল, যখন কান্দির রাজা এই বাৎসরিক উৎসব-শোভাযাত্রায় যোগ দিতেন। তিনি সর্দ্দারবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া যখন শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিতেন, তখন

শোভাযাত্রার অপর দৃশ্য

প্রজাবর্গ আনন্দে জয়ধ্বনি করিত ; শোভাযাত্রার গৌরব বৃদ্ধি পাইত। এখন রাজা নাই, কিন্তু সর্দ্দাররা আছেন। তাঁহারাই পূর্ব্বাচরিত প্রথা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতার যুগে হয় ত অনেক সর্দ্দার শোভাযাত্রার অনুগমন করিতে না পারিলে বাঁচিয়া যান ; কিন্তু সরল বিশ্বাসী গ্রাম্য প্রজাবৃন্দ তাহাদের প্রভুকে শোভাযাত্রায় দেখিলে আনন্দ লাভ করে বলিয়া তাঁহারা লজ্জার খাতিরে এখনও পূর্ব্বাচরিত প্রথা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

দিবাভাগে শোভাযাত্রার যে সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, রাত্রিকালে তাহার বিচিত্রতা শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। নক্ষত্রখচিত আকাশে চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারা, সহস্র সহস্র মানবের করধৃত ধূমায়মান মশালের আলো—গমন-গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই মশালগুলি আন্দোলিত হইতে থাকে, রত্নখচিত ভূষণের উপর আলোকরশ্মি পড়িয়া মণিমুক্তার দীপ্তি বিকীর্ণ হইয়া দর্শকের চিত্তে পরীরাজ্যের স্বপ্নদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

শোভাযাত্রার পশ্চাদ্ভাগে পাল্কীবাহকগণ পাল্কী লইয়া আসিতে থাকে। তন্মধ্যে পবিত্র জল আধারে রক্ষিত থাকে। মাহাওয়েলী গঙ্গা নামক একটি বড় নদী হইতে এই জল পূর্ব্ববৎসর সমাহৃত হয়। কান্দি সহরের মধ্য দিয়া এই নদী প্রবাহিতা। মন্দিরের পুরোহিতগণ এই জলের উপর তরবারির আঘাত করে এবং পরিচারকগণ সেই জল স্বর্ণভৃঙ্গারে করিয়া রাখিয়া দেয়। উৎসবের ইহাই শেষ অঙ্গ।

পাল্কীর পশ্চাতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি চলিতে থাকে। যত দূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায়—নরমুণ্ড অগ্রসর হইতেছে! এই জনসমুদ্র কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিতে থাকে। অধীরতা নাই, শুধু একটা বিপুল আনন্দদীপ্তি সকলেরই আননকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। এইভাবেই শোভাযাত্রীরা শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইতে দেখে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পত্নীব্রত

১

নির্ব্বিবাদে দিনগুলি কাটিতেছিল। ছোট সহরের মাঝখানে পল্লী-প্রকৃতির মাধুর্য্যের মাঝে অভাবের কশাঘাত ছিল না। দশটা পাঁচটা আফিস করি, সকাল-সন্ধ্যা প্রিয়তমার স্নেহমধুর কাকলী শুনি, রাত্রিকালে বন্ধুদের সঙ্গে জটলা করি।

বৃহৎ পৃথিবীর বিচিত্র জীবন-যাত্রা কোনও আহ্বান আনে না, ক্ষুদ্র জীবনের পরিধির মাঝে হাস্য-কলরবে দিন কাটিয়া যায়।

ফাল্গুনের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে বারান্দায় বসিয়া দক্ষিণ-সমীরণ সেবন করিতেছিলাম। শুক্লা পঞ্চমীর আলো-ছায়ায় মল্লিকার কেয়ারি হইতে সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল। দূরে উপবনে 'বৌ কথা কও' থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল।

বৌকে কথা বলাইবার জন্য পাখীর তাড়া আমার মনেও বসন্ত জাগাইয়া তুলিল। প্রিয়তমাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম, "কি করছ, এখানে এস না?"

অশান্ত খোকাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছিল, তাহা পালন না করায় পদ্ম-পলাশাক্ষীর রাগ হইয়াছিল। উত্তর আসিল না।

নীল আকাশের তলে পাখী তবু ডাকিয়া গেল,—'বউ কথা কও।' তাহার গৃহিণীও কি এমনই অভিমানিনী? স্বর-লহরী ভাসিয়া আসিতেছে, অকাল-প্রৌঢ়তার মাঝে যৌবন জাগিয়া উঠিল, কাজেই মান ভাঙ্গাইতে হইল।

মান-ভঞ্জনের পালা শেষ হইলে গৃহিণী বলিলেন, "শুনেছ, সমুখের ঐ লাল বাড়ীতে তোমাদের আফিসের বড় বাবু আসছেন।"

আমার মন তখন জীবনের ধূলি-মাটী ভুলিয়া কাব্য-জগতে চলিয়া গিয়াছে। কোকিল কুহুরব করিতেছিল, আকাশে জ্যোৎস্না ঝরিতেছিল। কিন্তু সংসার কাব্য নহে, প্রিয়তমা কবি নহেন। চুপ করিয়া তাহাই ভাবিতে বসিলাম।

গৃহিণী বলিলেন—"শুনছ না?"

আমি বলিলাম, "ঐ পাখীর ডাক শুনছ। কাতর ব্যথা-ভরা সুরে ডাকছে—কউ কথা কও। তোমার মনে আছে, ফুলশয্যার রাতে তোমায় কত সাধ্যসাধনা করতে হয়েছিল।"

ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "বুড়ো হ'তে চললে, এখনও ন্যাকামি যায় না, আমি যা বলছি, তা কাণে যায় না?"

কি বলিব? জ্যোৎস্না-রাত্রি যখন মধুধারা ঢালে, মানুষ তখন কেন আনন্দবিহ্বল হয় না?

সৃষ্টির এই ত মস্ত সমস্যা। কিন্তু প্রশ্ন সমাধান করিবার সময় নাই, তাই বলিলাম, "কে বলেছে তোমায়?"

"কাণ থাকলে জানা যায়, সংসারে চোখ চেয়ে চলতে হয়।"

হায় অন্ধনারী! ঐ যে দূর-আকাশে মণি-দীপ জ্বলিতেছে—প্রতিদিন নব নব অক্ষরে উহারা নব নব বাণী বলিতেছে; চোখ কি এই সব সুন্দরের প্রকাশ

দেখিবার জন্য নহে? সে কি মানুষের তুচ্ছতার খবর লইয়া মজিয়া রহিবে? এ কথা বলা চলে না, তাই জড়িত স্বরে উত্তর দিলাম, "কাযের ভিড়, তাই ত খবর নিতে পারি না—।"

"তা ত পারবে না, ভবেশ বাবুর বাড়ীতে শুনলাম, যিনি আসছেন, তাঁর নাম সুশান্ত বাবু, কলকাতার মস্ত বনেদী বংশ, যেমন টাকা, তেমনি মান, চাকরী করবার দরকার নেই, কেবল বাঙ্গালা দেশ দেখবার জন্য বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবার জন্য চাকরী নিয়েছেন।"

"ভাল কথা।"

"শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীও পরম পণ্ডিত, তিনি বি, এ না এম, এ পাশ করেছেন। এইবার দেখা যাবে, মেয়েদের যে তুমি ঘৃণা কর, তুচ্ছ কর, সে দম্ভ তোমার ভাঙ্গবে।"

ব্যাপারটার একটু সামান্য ইতিহাস আছে। স্থানীয় মেয়েদের পাঠশালায় পারিতোষিক-বিতরণী সভায় হঠাৎ একটা বক্তৃতা দিয়া ফেলি, তাহাতে ভাবাবেগে বলিয়া ফেলি যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হওয়ার চেয়ে চালিয়াৎ হওয়া বেশী পছন্দ করেন। মনের অলঙ্কারের চেয়ে বাইরের চাকচিক্যে বেশী মন দেন। শিক্ষয়িত্রী এ কথা হজম করিতে পারেন নাই। অলঙ্কারপ্রিয়া পত্নীকে বুঝাইয়া তিনি বিদ্রূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

নিরুপায় হইয়া বলিলাম, "বড় ঘরের খবরে আমাদের দরকার কি, তার চেয়ে—?"

"তার চেয়ে কি?"

"কিছু না, কেমন মিষ্টি হেনার বাস আসছে—"

"তোমার কবিত্ব রাখ, আমি কিন্তু তোমার ঐ পচা শাড়ী প'রে দেখা করতে যেতে পারব না। আমায় যে অসভ্য বলবেন, সে আমি সইতে পারব না।"

অর্থনীতির বক্তৃতা করিলে মানাইত। কিন্তু অর্থনীতির সহিত রসের বিরোধ, কাযেই সে বক্তৃতা করিয়া সুফল হইবে—দুরাশা, তবে গৃহিণীর দাবী ভাবাইয়া তুলিল।

গরীব কেরাণী—কোনও মতে সংসার চালাই। মাঝে মাঝে দেনা করিতে হয়, অসুবিধা হয়, তথাপি গৃহিণী বুঝেন না। দারিদ্র্যের আভিজাত্য লইয়া গর্ব্ব করিতে বলি, গৃহিণীর তাহাতে মন উঠে না। এই ত সবে ছ'বছর আগে দেড়শত নগদ মুদ্রা ব্যয় করিয়া বারাণসী শাড়ী কিনিয়াছি।

গৃহিণী বলেন—এ সব শাড়ী পুরানো হইয়া গিয়াছে, আজকাল কেহ আর পরে না, তাহার পরে তার রঙও না কি পছন্দসই নহে। ভাবনায় পড়িলাম।

আকাশে জ্যোৎস্না হাসিতেছে। পাতার আড়ালে আলো-ছায়ার লুকোচুরি—দূরে পাখী উদাস রাগিণীতে ডাকিতেছে —'বউ! কথা কও।' হায়! পাখী! তোমার বধূকে কথা কহাইবার এত তাড়া কেন? পাখীর দোষ কি? তাহার ত আর গহনা কিনিতে হয় না, তাহার ত শাড়ী কিনিবার ভাবনা নাই!

২

সুশান্ত আসিয়া সহরে বিস্ময় ও কৌতুকের কল্লোল তুলিল। চারি পাঁচখানা গরুর গাড়ী ভরিয়া তাহার কৌচ, দেরাজ, আলমারী, টেবল, চেয়ার আসিল। দশ গাড়ী ধরিয়া ক্রোটন ও পাম গাছ আসিল। জনরব, তাহার কাছে র‍্যাফেলের ম্যাডোনার ষোড়শ শতাব্দীর এক নকল আছে।

দেখা করিতে ভয় হয়। বিকালে প্যারাম্বুলেটার করিয়া তাহার খোকা ও খুকী আয়ার সহিত বাতাস খায়। সুশান্ত আর তাহার স্ত্রী মেম সাজিয়া বাহির হইয়া পড়ে। পথ-চলা পথিকরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে।

আফিসে নানা কলরব শুনিলাম। প্রত্যেকেই সুশান্তের নানা অলীক ও কাল্পনিক কীর্ত্তি ও যশোগাথা গাহিতেছে। সকলে দেখা করিয়াছে, যাই যাই করিয়া আমার যাওয়া হয় নাই।

সে দিন আফিস-ফেরত নিজ হাতেই মল্লিকার কেয়ারি পরিষ্কার করিতেছিলাম। এই মল্লিকার প্রথম-ফোটা ফুলে ফুলশয্যার মালা গাঁথা হইয়াছিল, তাই গাছটিকে আমি বড়ই ভালবাসি।

পিছন হইতে আহ্বান আসিল:—"কি মিঃ ঘোষ, কি করছেন?"

ফিরিতেই দেখিলাম, সুশান্ত ও তাহার স্ত্রী।

আমি শশব্যস্তে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম, "আসুন, আমার পরম সৌভাগ্য।"

"না, সে কি বলছেন, মিসেস রায়ের সহিত আপনার পরিচয় করিয়ে দেই।"

পরিচয় শেষ হইলে আমি উভয়কে বসিতে অনুরোধ করিলাম। বাড়ীর ভিতর গিয়া তাড়াতাড়ি একটি পরিষ্কার শার্ট পরিয়া আসিয়া ভদ্র সাজিলাম। মিসেস রায়কে বাড়ীর ভিতর আমার স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে পাঠাইলাম। সুশান্ত বলিল, "আপনার স্ত্রী বুঝি বার হ'ন না?"

আমি বলিলাম "ওঁর কোন অমত আছে ব'লে জানি নে, কিন্তু এত কাল কোন দরকার হয় নি।"

আলাপ জমিল। সুশান্ত কথা কহিতে জানে। আমাদের মত কোণ-ঠাসা ছেলে সে নহে। জগতের বিচিত্র খবর সে রাখে। অভিজাত-সমাজে জীবনে মিশিবার সুযোগ হয় নাই, তাহাদের জীবনযাত্রার অস্পষ্ট জনরব লইয়া এত দিন কাটিয়াছে। সুশান্ত সকল রকম সমাজে মিশিয়াছে, সকল স্থানে গিয়াছে। আর তাহার বলিবার ভঙ্গীটিও বেশ মধুর, মনকে স্পর্শ করিয়া বসে। কিন্তু একটি জিনিস নেহাৎ অমনোযোগী আমার মনেও ধরা দিল, সেটি সুশান্তের একান্ত পত্নী-ভক্তি।

কথাটা অনেকের খারাপ লাগিতে পারে। আশেপাশে বন্ধুদের অনেকেই আদর্শ স্বামী বলিয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সুশান্তের পায়ের তলায়ও দাঁড়াইতে পারেন না। সমস্ত কথা পত্নীকে কেন্দ্র করিয়া এমন সরসভাবে কাহাকেও বলিতে দেখি নাই। ভদ্রলোক যে নিজের পত্নীর গৌরব বাড়াইবার জন্য বলিতেছে, তাহা নহে, এই প্রশস্তিপাঠ যেন তাহার স্বভাব।

সুশান্ত বলিতেছিল, "সেবার আমারা সিমলা গিয়েছিলুম বেড়াতে, মিসেস্ রায়কে ওরা ধরলে বাঙ্গালী মেয়েদের সভায় বক্তৃতা করতে হবে। মিশনারী এক মেম সে সভায় ছিলেন, তিনি যেই ভারতবাসীর নিন্দা করেছেন, আমার স্ত্রী রেগে তাঁকে তখনই বার ক'রে দিয়েছিলেন। সিমলায় আপনি গিয়েছেন?"

ব্যথিত স্বরে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে না।" বেড়াইবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও অভাব বাঁচাইয়া বিলাসের আয়োজন করিতে পারি না।

সুশান্ত বলিল, "যাবেন সেখানে বেড়াতে, যা আরাম। বক্স পাহাড়ে উঠে আমার স্ত্রী যে কবিতা লিখেছিলেন, শুনে সবাই খুসী হয়ে গিয়েছিল। তখন বিশ্ববন্ধুর সম্পাদক ওখানে ছিলেন, লেখাটি ছাপবেন ব'লে চেয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু জানেন ত বাঙ্গালীর স্বভাব, নিয়েই হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাঙ্গালীর কাছে নিয়ম-শৃঙ্খলা আপনি কিছুতেই আশা করতে পারেন না।"

ছোট বয়সে কবিতা ও গল্প লিখিবার বাতিক ছিল। তখন সম্পাদকগণের শরণ লইতে হইত। তাহাতেই বাঙ্গালী সম্পাদকগণের অমনোযোগ ও অসতর্কতার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। আমার কাঁচা লেখা হারাইয়াছে, তাহাতে বঙ্গবাসীর কোনই ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রতিভাশালী লেখকের লেখাও হারাইয়া যায় শুনিয়াছি, কাযেই সুশান্তের কথায় সায় দিয়া নিজের জাতির নিন্দা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। বলিলাম, "তা যা বলেছেন, Business courtesy and business etiquette আমাদের নেই বল্লেই হয়, তাই ত আমরা কোথাও স্থান পাই না।"

গৃহিণী খবর পাঠাইলেন, কিছু জলযোগের আয়োজন করিয়াছেন। সুশান্ত বাবু হাত যোড় করিয়া বলিল, "মাপ করবেন, এখন কিছু খেতে পারবো না।" তার পরে কথার মোড় ফিরাইবার জন্য বলিল, "আপনার পিয়ানো আছে কি? তা হ'লে মিসেস রায় আপনাকে গান শুনিয়ে দিতেন। উনি সেবারে দিল্লীর জলসায় গেয়ে খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন। জানেন-ই ত খোট্টারা বাঙ্গালীকে আমল দিতে চায় না, কিন্তু ওঁর গলা শুনে সবাই চমৎকার।"

পিয়ানো রাখিবার সৌভাগ্য নাই। প্রথম বিবাহের পর গৃহিণীর সাধ হইয়াছিল, গান শিখিবেন। তাই একটা কম দামের হারমোনিয়াম কিনিয়াছিলাম। সেটা ধুলামাটীর আবর্জ্জনায় কোথায় ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহা সৌখীন সমাজে বাহির করিবার দুঃসাহস নাই, তাই লজ্জাকুণ্ঠ স্বরে উত্তর দিলাম, "বড়ই দুঃখের বিষয়, ওঁর গান শুনবার সুযোগ হয়ে উঠবে না।"

"তার জন্য আর কি? সবাই কি আর পিয়ানো কিনতে পারে, আর উনি পিয়ানো না হ'লে গাইতেই পারেন না। তা এক দিন যাবেন। মিসেস রায় আপনাকে গান শুনাতে খুসী হবেন, তবে আগে থাকতে জানাবেন, কবে যাচ্ছেন, ওঁর ত আবার রুটিন-বাঁধা কায। বাড়ীর সব ভারই ওঁর উপর ছেড়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত আরামেই থাকা গেছে।"

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পর সুশান্ত বিদায় লইল।

আমি সুশান্তের কথাই বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। নিরহঙ্কার, নিরভিমান ব্যক্তি, চরিত্রের কোথাও এতটুক মালিন্য নাই, তবে দুর্ব্বলতা—পত্নীর দিকে একটু দুর্ব্বলতা আছে, সেটা মার্জ্জনীয়। ভক্তির পদার্থ ত দিনে দিনে নষ্ট হইতেছে, কাযেই দেব-দেবতার কুসংস্কারে ফুলচন্দন না দিয়া পত্নীর শ্রীচরণে কেহ যদি অর্ঘ্য-ভার ঢালিয়া দেয়, আমার তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবার নাই।

পল্লী শ্মশান হইয়াছে। পিতামাতা যেখানে নির্ব্বাসনে দুঃখযাপন করিতে চাহেন, তাহাতে আমাদের কি হাত আছে? গৃহদেবতারা উপবাসী, তাহাতে নাচার, কারণ, যুক্তির আলো দেবতার দ্যুতি হরণ করিয়াছে। জীবনে আর কি আবেগ উচ্ছ্বাস আছে? একান্নবর্ত্তী পরিবার, পল্লী-গোষ্ঠী, সমাজ সব ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এখন যদি পত্নীর চরণ-সরোজে প্রতিদিন ভক্তির অর্ঘ্য না ঢালিব, তাহা হইলে কেমন করিয়া দিন চলিবে? সুশান্তের পত্নী-ভক্তি যদি মাত্রা ছাড়াইয়া থাকে, তাহাতে তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইতেছি, অবশ্য একটু শঙ্কার কারণ আছে। সুশান্তের আচরণ আমাদের গৃহে অশান্তির আগুন না জ্বালাইলেই হইল।

আমি একটু সেকেলে। স্ত্রীকে দাসী বলিয়া দেখিতে অভ্যস্ত, ভক্তির মাত্রাটা আমার পোষাইবে না। Chivalry জিনিষটা বিলাতী, ওর নকল করিতে পারি না বলিয়া মেয়ে-মহলে গালি খাইয়াছি, কিন্তু গালি খাইলেও স্বভাব বদলায় না, কাযেই পত্নী-ভক্তির এই আতিশয্যের পরিচয় পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "কি ভাবছ? ওঁদের ওখানে এক দিন যেতে হয়, কিন্তু বেশী না পার, অন্ততঃ একখানা সাদা শান্তিপুরে শাড়ী নিয়ে এস।"

যাক, ভাবনা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। গবেষণার তুলনায় শান্তিপুরের শাড়ী অধিকতর সত্য আর যাচ্ঞাকারিণী অধিকতম সত্য, কাযেই গবেষণা ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি চুম্বন চুরি করিয়া লইলাম। গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "যাও, তুমি ভারী দুষ্টু হচ্ছ।"

৩

সুশান্ত আমাদের জীবন কতক পরিমাণে অশান্ত করিয়া তুলিল সে দিন ভবেশের বাড়ীর আড্ডায় যাইতে পথে অশোকের সহিত দেখা হইল। তাহাকে বলিলাম, "চল হে অশোক, অনেক দিন তোমার দেখা পাই নি, দুহাত ব্রীজ খেলে নেবে।"

অশোক অপ্রতিভ-কণ্ঠে বলিল, "দাদা, আমায় মাপ করতে হচ্ছে। তোমাদের বড় বাবু যে নমুনা দেখাচ্ছেন, তাতে তাল সামলানই ভার হয়ে উঠছে। একটা স্তবগানের মহাকাব্য লিখতে বসেছি।"

হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিল। অশোক কাব্য লিখিবে! সূর্য্য কি পশ্চিমে উঠিতেছে? বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া অশোকের মুখের দিকে চাহিলাম।

অশোক মুখ কাচুমাচু করিয়া উত্তর দিল, "বুঝছ না দাদা, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার, একা পারবে কেন? সন্ধ্যে হলেই ট্যাঁ-কোঁ আরম্ভ করলে কেমন ক'রে পারে বল ত হে?"

সেটা ভাবিবার কথা। কিন্তু অশোকের আবার তাস-খেলা না হইলে ভাত হজম হয় না। বুঝিলাম, প্রতিযোগিতা চলিতেছে। পূজাপাত্রীরা কে কত বেশী ভক্তির অর্ঘ্য আদায় করিতে পারেন, তাহা লইয়া রেষারেষি আরম্ভ করিয়াছেন।

অশোককে ফেলিয়া ক্ষুণ্ণ-মনে ভবেশের ওখানে গেলাম। দেখি, সুশান্ত বসিয়া গল্প করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই সুশান্ত বলিল, "আসুন, শ্যামল বাবু, আজ আপনাদের সঙ্গে দুহাত খেলে যাই।"

সুশান্ত প্রায়ই একক বাহির হয় না। যুগলে চলে, কাযেই আমাদের মজলিসে তাহার আসার সৌভাগ্য হইয়া ওঠে না। আমি তাই প্রশংসমান সুরে বলিলাম, "সে আমাদের ভাগ্য।"

ভবেশ এমন সময় একটি নবীন যুবককে পরিচিত করিয়া দিল, "এঁর নাম পরিতোষ চৌধুরী, ইনি স্বদেশী ইনসিওর কোম্পানীর এজেণ্ট, সম্পর্কে আমার প্রধানতর আত্মীয়, সেই খাতিরে তোমাদের উপর উনি জুলুম করতে চান।"

সুশান্ত প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "বেশ, বেশ, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব খুশী হলাম।"

কিছুক্ষণ বাজে আলাপ চলিবার পর পরিতোষ সুশান্তকে বলিল, "আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন, কিন্তু আমরা কাযের

লোক, কাষে আমোদের ফাঁকে আবদারটা ক'রে রাখি, আপনার কিছু পলিসি এবার নিতে হবে।"

সুশান্ত বিনয়নম্র ভাষায় বলিল, "আজ্ঞে, সে ত পরম আনন্দ। তবে বুঝলেন কি না, আমার সব ব্যাপারই মিসেসের হাতে। উনিই সব বিলিব্যবস্থা করেন। তবে উনি আজকাল বড়ই ব্যস্ত আছেন কি না। জার্ম্মাণী থেকে একটা নূতন পিয়ানো আনা হয়েছে। মিসেস রায় আজ মেয়ে-মজলিসে নাইন্‌থ সিন্‌ফোনি (ninth Symphony) বাজিয়ে শুনাবেন—ওঁর মাথা এখন মোজার্ট বীটোভোনে মসগুল হয়ে আছে কি না।"

পরিতোষ অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনার স্ত্রী বীটোভোন জানেন, কি আশ্চর্য্য প্রতিভা!"

আমি সোৎসাহে বলিলাম, "ওঁর স্ত্রীর পরিচয় জানেন না বলেই আপনি অবাক্ হয়ে যাচ্ছেন, সেবার দার্জ্জিলিঙে লাট সাহেবের দরবারে ওঁর স্ত্রী এমন বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, বাঙ্গালাদেশের ইংরাজী বাঙ্গালা সব দৈনিকে জয়জয়কার প'ড়ে গিয়েছিল।"

ভবেশ বলিল, "উনি আমাদের বনগাঁয়ে প'ড়ে আছেন দেখে ওঁকে তোমার অবজ্ঞা করা চলবে না। মিসেস রায় যখন উটকামণ্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন টেনিস-খেলায় বড় বড় খেলোয়াড়দের হারিয়ে দিয়ে Champion Cup পেয়েছিলেন। সুশান্ত বাবুকে আমরা পেয়েছি, এ আমাদের পরম গর্ব্ব।"

আমি ভবেশের প্রশস্তিপাঠে যোগ দিয়া বলিলাম, "তা বৈ কি, এই অন্ধকারের মাঝে ওঁরাই ত আলোর বর্ত্তিকা জেলেছেন। আমরা ত নিতান্ত গেঁয়োর মত ছিলাম, ওঁরা এসেই ত বাইরের সব খবর আনিয়েছেন, আনন্দ তাই বুক ছাপিয়ে উপছে পড়ছে।"

সুশান্ত নম্র-মধুর স্বরে উত্তর দিল, "আপনারা আমায় বাড়িয়ে বলছেন। তবে আমার পত্নীর কীর্ত্তি গৌরব, সেটা অবশ্য বলবার মত। কারণ, তিনি আমাকে কৃতার্থ করেছেন, সেটা আমার পরম পুরস্কার, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, তিনি নব্যা বাঙ্গালী রমণীর অগ্রদূত নারীপ্রগতির মূর্ত্ত প্রতীক—তাঁর গৌরবে সারা বাঙ্গালা গৌরবান্বিত।"

আমরা সবাই মুগ্ধ পরিতৃপ্তিতে সুশান্তের ভাবোচ্ছ্বাস শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু পরিতোষ এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে যোগ না দিয়া কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের সহিত সুশান্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মজলিসের সর-গরম থামিলে পরিতোষ প্রশ্ন করিল, "আপনার শ্বশুরের নাম প্রোফেসর বসুভূতি নয় কি?"

সুশান্ত অবাক্ হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিল, পরে কুণ্ঠিত মৃদুভাষে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

পরিতোষ বলিল, "আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন, প্রোফেসর বসুভূতির অনেক কথাই শুনেছি কি না, তাই আপনার পারিবারিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হয়েছি, কিছু মনে করবেন না।"

সুশান্ত যেন হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হইয়া পড়িল। দু'চার বাজী খেলিয়া সে বিদায় লইয়া গেল।

৪

সুশান্ত বাবু চলিয়া গেলে পরিতোষ বলিল, "আপনারা যোগ-শক্তি মানেন?"

প্রশ্নের আকস্মিকত্ব ও অদ্ভুতত্বে আমরা কি বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। পরিতোষ বলিয়া চলিল, "বিভূতি-বিদ্যা ব'লে আমাদের দেশে একটা বিদ্যা আছে, সে খবর কি আপনারা রাখেন?"

আমি বলিলাম, "পঞ্জিকার পাতায় বিজ্ঞাপন দেখেছি, এই যা।"

পরিতোষ গম্ভীর হইয়া বলিল, "এই উপহাসের ভাব শুনলে সত্যই আমার মর্ম্মপীড়া হয়। দেশের গৌরবের জিনিষের আপনারা কোনই খবর রাখেন না। ফিলজফি সম্প্রদায়ের কেমন ক'রে প্রচার হয়েছে জানেন?

ভবেশ বলিল, "এরা কি ক'রে জানবে, এ সব বিষয়ে এদের কোনই খেয়াল নেই।"

"তবে বলছি, শুনুন। ম্যাডাম ব্লাভ্যাটাস্কি হিমালয়ের সুদুর্গম স্থানে ত্রিকালজ্ঞ যোগীদের সঙ্গে আট বৎসর বাস করেছিলেন। সেখানে তিনি যোগবিদ্যা শিক্ষা করেন।"

কথায় বাধা দিয়া যোগেশ বলিল, "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জীবনচরিতেও এই সব হিমালয়বাসী যোগীদের কথা আছে।"

যোগেশ এক জন সাধুভক্ত ও বিশ্বাসী। আস্তিক যোগেশ নাস্তিক আমাদের সংস্পর্শে পড়িয়া আঁটিয়া উঠিতে

পারিত না। পরিতোষের বাক্যে তাই তাহার উৎসাহের সীমা রহিল না।

পরিতোষ প্রসন্নচিত্তে আরম্ভ করিল, "এ সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য কথা। ব্লাভ্যাট্যাস্কি আর আলকট শেষে ভারতবর্ষে থিয়োজফি সম্প্রদায়ের পত্তন করেন। এককালে বাঙ্গালা দেশের অনেক গুণী ও জ্ঞানী থিয়োজফিষ্ট হয়েছিলেন, এখনও অনেক আছেন।"

ভবেশ ব্রীজখেলায় বাধা পড়িতেছে দেখিয়া বলিল, "তোমার কাছে ফিলজফি শুনতে চাই নি।"

"অত ব্যস্ত হয়ো না। বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট করবার ছেলে আমরা নই। ইন্‌সিওর আফিসে কায করি, কাযেই কথার দাম আমরা বুঝি। যাক্, যা বলছিলাম, প্রোফেসর বসুভূতি এই দলের এক জন পাণ্ডা হয়ে পড়েন। আমার মামাবাড়ীর পাশেই ছিল তাঁর বাসা। তাই তাঁকে আমি দেখেছি। তিনি ইন্দ্রজাল ও সম্মোহন বিদ্যার খুব চর্চ্চা করেছিলেন।"

যোগেশ বাধা দিয়া বলিল, "এ দুটা জিনিসও খাঁটি স্বদেশী। কিন্তু শিক্ষিত লোকের উপহাসে এ সব বিদ্যা আমাদের দেশ ছেড়ে সাগরপারে চ'লে গেছে।"

পরিতোষ বলিল, "তা ঠিক, দু চার জন অশিক্ষিত লোক কিছু কিছু জানে; কিন্তু এ সব বিদ্যা দিনে দিনে লোপ পাচ্ছে বল্লেই হয়।"

ভবেশ তাস দিতে দিতে বিরক্তির সুরে বলিল, "চটপট গল্পটা সেরে নাও।"

পরিতোষ সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "প্রোফেসর বসুভূতির নাম আপনারা শুনে থাকবেন। এককালে কলিকাতায় তাঁর খুব নামডাক ছিল। তাঁর মেয়ে পিতার কাছ থেকে এই মন্ত্র শিখেছিল। কলকাতায় জোর গুজব যে, সুশান্ত বাবু বশীকরণে মুগ্ধ হয়ে আছেন।"

আমি বলিলাম, "এ আপনি বেশী বলছেন। ভদ্রলোক একটু স্ত্রৈণ, তা ব'লে—"

পরিতোষ আড্ডার হাসি হাসিয়া বলিল, "না জেনে যা তা বলার ছেলে আমরা নই। গল্প শোনেন নি যে, কামরূপ-কামিখ্যে গেলে সে দেশের মেয়েরা পুরুষদের ভেড়া ক'রে রাখত, আপনাদের সুশান্ত বাবু একটা আস্ত ভেড়া ব'নে আছেন।"

আমরা সকলে হতবুদ্ধি হইয়া বক্তার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যোগেশ কেবল নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "অসম্ভব নয়, ইন্দ্রজালের অসীম শক্তি।"

ভবেশ উষ্ণ হইয়া বলিল, "হয়েছে তোমাদের গাঁজাখুরি গল্পগুলি, এখন রাখ।"

যোগেশ বলিল, "গাঁজাখুরি বলবেন না। আমেরিকার নোলস্ সাহেব ব'লে এক জনের হিপনটিজমের বই পড়েছি আমি, তাতে এ সব ক্ষমতার কথা লেখা আছে। তা ছাড়া অষ্টসিদ্ধির কথা শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ব্যাখ্যাত হয়েছে। অণিমা, লঘিমা—"

ভবেশ এবার রাগিয়া বলিল, "হয়েছে, হয়েছে, পরিতোষ, তুমি যোগেশদার মাথা খেয়ে দিলে দেখছি।"

পরিতোষ বলিল, "মাথা খাওয়া নয়—উনি কিছু জানেন দেখি। তুমি ভাবছ, আমি কেবল জীবন বীমা ক'রে বেড়াই, তা নয়।"

"ভদ্রলোক না হয় ইনসিওর করবেন না, তা ব'লে তাঁর পিছনে লাগা তোমার উচিত নয়।"

ভবেশের কথায় সম্মতি জানাইয়া আমিও বলিলাম, "স্ত্রৈণতার জয়গান করতে রাজী নই, কিন্তু তাই ব'লে গল্পটা বেজায় বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হচ্ছে।"

পরিতোষ এবার রাগের ভাষায় বলিল, "কিছুই সংসারের খবর রাখবেন না, আর অপরকে নিন্দাবাদ করবেন, এটা ভাল নয়। আপনাদের মিসেস রায় উটকামন্দে টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বল্লেন না। জীবনে ওরা কলকাতার বাইরে পা বাড়ায় নি।"

আমি অবাক্ হইয়া বলিলাম—"সে কি?"

পরিতোষ উত্তর দিল—"ব্যাপারটা হিপনটিজম। তা না হ'লে সুশান্তের মত একটা বনেদী বংশের ছেলে ঐ কালো মেয়েটার প্রশংসায় এমন বিহ্বল হতেন না। এটা একেবারে বশীকরণ, সুশান্ত বাবু মনে করেন, আর সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁর স্ত্রী সত্যই দিগ্বিজয়ী, কিন্তু আসলটা একেবারে ফাঁকি।"

মিসেস রায় অবশ্য রূপসী নহেন। কিন্তু তাঁহার নিত্য নূতন সজ্জা, প্রসাধন তাঁহাকে আমাদের দৃষ্টিতে অলোকসামান্য করিয়াছিল। পরিতোষের কথায় তাঁহার কালো চেহারার ছবি চোখে জাগিল। পরিতোষের কথা হয় ত

...কে পরিমাণে সত্য ভাবিয়া নিরুত্তর হইয়া পরিতোষের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পরিতোষ তাসের প্যাক নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আপনাদের সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হবে না, তা বুঝি, কিন্তু এই সব প্রশস্তি কি কোনও দিন পরখ করেছেন? লাট-দরবারে ওঁর স্ত্রী যদি বক্তৃতা দিত, তা হ'লে সে লেখা ওঁদের ঘরেই দেখতে পেতেন, তা কি কখন দেখেছেন?"

পরস্পরে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিলাম। পরে অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "না, অবিশ্বাস হয় নি, তাই ত সে বক্তৃতা পড়তে কোনও দিন চেষ্টা হয় নি।"

"চেষ্টা হলেও বিফল হতে হ'ত। কারণ, মিসেস রায় কোনও দিন লাট-দরবারে কোনও বক্তৃতা দেন নি।"

আমরা 'নিশ্চুপ' হইয়া বসিয়া রহিলাম। কি বলিব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। যোগেশ অবকাশ পাইয়া অনেকটা আপন মনে বক্তৃতা দিয়া বলিল, "এটা ঠিক হিপনটিক পাওয়ার। আমি সেবার এক বিলাতী সাহেবের বইতে এমনই একটা গল্প পড়েছিলাম।"

পরিতোষ বলিল, "গল্পের চেয়ে সত্য চিরকাল চমৎকার। এতগুলি লোকের চোখে ধুলো দিয়ে ব্যাপারটা চলছে।"

আমি বিব্রত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু কোনও উপায় কি নাই, ওঁকে সতর্ক ক'রে দিলে হয় না?"

"না, তাতে কোন লাভ নেই, প্রথমতঃ সুশান্ত বাবু আপনাদের কথা সহজে প্রত্যয় করবেন না, দ্বিতীয়তঃ ওঁর এই সুখস্বর্গ ভেঙ্গে দিলে এমন শক্ (Shock) লাগতে পারে যে, উনি হয় ত আর বাঁচতে নাও পারেন।"

যোগেশ ফেউ ধরিল, "এ সব অতি গুহ্য বিদ্যা। অনেক তপস্যা—অনেক সাধন ক'রে তবে বিভূতিলাভ হয়। সেরূপ মহাপুরুষ এখানে কোথায় মিলবে—যিনি ডাইনীর হাত থেকে সুশান্ত বাবুকে রক্ষা করবেন?"

আমি বলিলাম, "সুশান্ত বাবুর কোনও ক্ষতি হবে না ত?"

"ক্ষতি হবে কি না, বলতে পারি না। সংসারে স্ত্রীকে সারাৎসার মনে সবাই করেন, উনি না হয় তার চেয়ে একটু বেশী করবেন, তাতে আর ক্ষতি কি? নিজের পত্নীকে প্রতিভার অধিকারিণী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী ও সরস্বতী জানতে কার চিত্ত না মুগ্ধ হয়ে ওঠে?"

ভবেশ তাস ফেলিয়া দিয়া বলিল, "রাত হয়ে গেছে, সভা ভঙ্গ করা যাক। গাঁজাখুরী গল্প যতই চালাবে, ততই চলবে, ওর আর শেষ নেই।"

যোগেশ বলিল, "আপনার বিশ্বাস হয় না?"

ভবেশ বলিল, "না হ'লে আর কি করি বলুন। বিংশ শতাব্দীতে বাস ক'রে মধ্য-যুগের কুসংস্কারে ডুবে থাকতে পারি নে।"

ভবেশের কথা আমাদের মনে আঘাত দিল।

পরিতোষ শুধু বলিল, "ভায়া, বিংশ-শতাব্দী ব'লে বড় জোর গলা করো না। তোমাদের বড় বৈজ্ঞানিক লজ সাহেব কি করছেন, জান ত হে? হ্যামলেটের কথাটা মনে রেখো।"

আমরা উঠিয়া পড়িয়াছিলাম, কাযেই আলোচনা আর অগ্রসর হইল না।

৫

সারাপথ এই চমকপ্রদ কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। মন বিশ্বাস করিতে চায়, আবার বিশ্বাস করে না। বাড়ী ফিরিয়া প্রিয়তমাকে সমস্ত কথা বলিলাম।

তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া সমস্ত ব্যাপারটি তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া মন্তব্য করিলেন, "তোমাদের ভেড়া হওয়াই উচিত।"

অবাক্ হইয়া স্তিমিত দীপালোকে প্রেয়সীর চারু মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমরা বোকা বনিয়াছি ভাবিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "এটা একেবারে সত্যি, ত না হ'লে—"

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সত্যি-মিথ্যে নিয়ে আমি তর্ক করছি নে।"

"তবে?"

"ভেড়া হওয়ার জন্যই তোমাদের জন্ম, এই কথাটাই বলছিলাম।"

সতী নারীর মুখে এ কি ভাষণ!

আমি ব্যথাদীর্ণ স্বরে বলিলাম, "জয়দেব দেহিপদপল্লবমুদারম্ বলেছেন, ওটাই আমার কাছে বিশ্রী লাগে, তার উপর—"

"তার উপর উঠতে হবে বৈ কি, ওটা যখন লেখা হয়, তখন নারী ত জাগে নি, আজ নারী-প্রগতির দিনে তোমাদের

ভেড়া না করতে পারলে নারীর মহত্ব কোথায়? সে দিন বাঙ্গালা মাসিকে পড়ছিলাম—এক জন তরুণী লিখেছেন, 'বাংলার মা, বাংলার মেয়ে, এগিয়ে আয়, পুরুষ তোদের পদদলিত করেছে এত দিন, এবার তোরা পুরুষকে পায়ের তলে পিষে নারী-গৌরবের জয়ধ্বজা উড়া'।"

আমি চুপ করিয়া প্রেয়সীর হাস্যমধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এ কি কৌতুক, না এ সত্য?

তিনি হাতপাখা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমরা অনেক দিন আমাদের উপর চাল চেলেছ, এবার আমাদের পালা।"

আমি বিস্ময়ে ও ক্রোধে জোরে বলিলাম, "তাই ব'লে হিপনটিজম ক'রে?"

হাসিতে হাসিতে প্রেয়সী বলিলেন, "চেঁচিও না বলছি, খোকন জাগলে রক্ষা থাকবে না কিন্তু।"

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা হ'লে তুমি কি বলতে চাও?"

হাস্যরেখা রক্তাধরে বিজলীরেখার মত ক্ষণদীপ্তিতে মিলাইয়া গেল। পাখা বেশী করিয়া নড়িতে লাগিল।

অবশেষে উত্তর পাইলাম—"বলতে চাই, ওটা হিপনটিজম নয়। সুশান্ত বাবু ভালবাসতে জানেন, তুমি জান না।"

এ কথার উত্তর নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। রাস্তায় তখন পথিক গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল:—

'সকলি ভুলেছে ভোলা মন
ভোলে নি ভোলে নি শুধু ঐ চন্দ্রানন।'

শ্রীমতিলাল দাশ (এম, এ, বি, এল)।

অপরাজিতা

দিক্ দেশ হ'তে আজিকে হয়েছে অপ্সরী-সমাগম,
উদয় - গগনে মন্দাকিনীর ধারা ঝরে অনুপম;
ধরণী যেমন আঁখি ধুয়ে নেয় প্রভাত আলোর কূলে,
তেমনি দু-আঁখি ধুয়ে নাও আজ রূপের ঝরণা-মূলে;
এস এস আজ যত বঞ্চিত রস-পিপাসিত জন,
রূপসীরা হেথা করেছে সৃজন ধরণীতে নন্দন।

এই বটে এক রূপসী রমণী উজল দীর্ঘকায়,
ঝ'রে পড়ে যেন রূপ-লাবণিমা কেশ হ'তে পদছায়,
অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো সুনীল নীলাম্বরীর সাজ,
জরির তারকা করে ঝলমল যেন অম্বর-মাঝ;
বড় সুন্দর মানি করযোড়ে, শির করি মোর নত;
তবুও এ নয় পদ্মিনী মোর তিলোত্তমার মত।

অবাক্ মানিছে আঁখি-যুগ হেরি এই আর এক জনা,
ইহারে দেখেই কবি করেছে কি লক্ষ্মীর কল্পনা?
ওষ্ঠ অধর দুটি যেন নব পদ্মকোষের দল,
হরিণীর মত ভাসানো ডাগর আঁখি দুটি অবিকল;
হে নারি! তোমারে এ রূপ-পূজারী প্রণিপাত করে পায়,
তবু তার মত এ কথা বলিতে মন কিছুতে না চায়।

এ এক রমণী সতেজ চাহনি জ্বলিছে শিখার মত,
বাসনা কামনা শলভের মত পুড়ে মরে অবিরত,
কপালের শেষে পুলকে অলক লতায়ে রয়েছে ঢলি,
মৃণালিনী সম বাহুবল্লরী আঙুল চাঁপার কলি,
তারও চেয়ে ঢের সুন্দর এর 'মরমর' জিনি স্বর,
তবুও ইরাণী শাহাজাদী মোর এর চেয়ে সুন্দর!

ওই হোথা এক বসেছে তরুণী চম্পকতরুছায়ে,
রাজার কাননে শ্যামালতা যেন দুলিছে দখিণ বায়ে;
এ এক রূপসী মরি মুখশশী ঢাকিয়াছে ওড়নায়,
লুব্ধ ভ্রমর তবু জরজর উঁকি মেরে ফিরে চায়;
ওই রমণীর নয়ন-তূণীর, হাসিও ছুরিকা শত,
তবু ওরা নয় রূপকথাপুরী রাজকুমারীর মত।

হা রে প্রাক্তন! ভুলে এতখণ ছিলাম এ কিশোরীরে,
পটে বলিহারি মুখখানি মরি আঁকা রহিয়াছে কি রে!
পদ্ম-পলাশা আঁখি-মদালসা সুদূরের কল্পনে,
এরে দেখে মোর বৃন্দাবনের রাধিকারে পড়ে মনে!
ছাঁচে গড়া এর কচি মুখ হেরে হাতিয়ারও হয় নত,
তবুও এ নয় উর্ব্বশী মোর অপরাজিতার মত।

শ্রীগোপাললাল দে (বি-এ)।

নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে

আমরা পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে (বিগত চৈত্র ও বৈশাখ মাসের বসুমতীতে) দেখাইয়াছি, কত অধিকসংখ্যক পাশ্চাত্য কুমারী দীর্ঘকাল অবিবাহিতা অবস্থায় কাম উপভোগ করিতে বাধ্য হন। ক্রমে তাঁহারা মাতৃত্বের অনুপযোগী হইয়াও পড়েন। তাঁহাদের কাছে মাতৃত্ব কষ্টকর বলিয়া অনুভূত হয় এবং ক্রমে তাঁহারা মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়েন। এই সকল কারণে কত অধিক পাশ্চাত্য নারী কাম উপভোগ করিতে গিয়া ভ্রূণহত্যা করিতে বাধ্য হন, তাহা বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের লেখা হইতে দেখাইতেছি।

বিচারপতি লিণ্ডসে লিখিয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ ভ্রূণহত্যা হয়—Deainn Inge বলেন ২০ লক্ষ। ফ্রান্সের Boucicaulr হাঁসপাতালে যত জীবিত শিশু জন্মায়, তাহার আড়াই গুণ অধিক গর্ভস্রাবজনিত রোগী আসে। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ Bertrand Russel তাঁহার M rriage and Morals নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, Ju'ias Walf বহু তদন্ত করিয়া লিখিয়াছেন, জার্ম্মাণীতে প্রতি বৎসর ছয় লক্ষ ভ্রূণহত্যা হয়। Bertrand Russel বলেন, গ্রেট বৃটেনে প্রতি বৎসর ছয় লক্ষেরও অধিক ভ্রূণহত্যা হয়। পাশ্চাত্য দেশে অসংখ্য হাঁসপাতাল আছে, এই সকল কর্ম্মের জন্য অসংখ্য সেবাসদন আছে—আমাদের দেশে তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই। সুতরাং আমাদের দেশে যে সকল তরুণী গর্ভবতী হইবে, তাহারা কি করিবে? কাম উপভোগ করিতে গেলেই অনেকেরই গর্ভ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হইলে কতক অংশ যে প্রকৃতির তাড়না এড়াইতে পারিবে না, তাহাও নিশ্চয়। পাশ্চাত্যের মত অত গর্ভ-নিরোধ-প্রথা এ দেশের তরুণীদের জানা নাই এবং প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য ও কৌশল অধিকাংশের না থাকায় পাশ্চাত্যের অপেক্ষা আরও শতকরা অধিকসংখ্যক নারী গর্ভবতী হইবে—তখন তাহারা কি করিবে? অভিভাবকদিগের যেরূপ অর্থস্বচ্ছলতা থাকিলে কন্যাদিগের চরিত্রদোষ চাপা দিয়া তাহার মন্দ ফলের লাঘব করা যায় আমাদের দেশে শতকরা একটিরও সেরূপ অর্থ-স্বচ্ছলতা নাই। সমস্ত বাঙ্গালা দেশে মাত্র ৪৫ হাজার লোক বাৎসরিক ২ হাজার টাকা আয়ের উপর আয়কর দেয়। চাষের জমীর আয় হইতে আরও চারি বা পাঁচ লক্ষের ঐরূপ আয় আছে ধরিয়া লইলে দেখা যায়, শতকরা একটি লোকের মাত্র বাৎসরিক ২ হাজার টাকা আয় আছে। বাৎসরিক ২ হাজার টাকার বহুগুণ আয় না থাকিলে কন্যাদের চরিত্রদোষ চাপা দিয়া তাহার মন্দ ফলের লাঘব করা যায় না। সুতরাং এই সকল গর্ভবতী তরুণীকে অনভিজ্ঞ দাইদিগের দ্বারা গর্ভপাত করাইতে গিয়া অনেকগুলি মরিবে—সকলকেই গর্ভপাতের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—তাহার অধিকাংশকে তজ্জন্য বহুকাল-ব্যাপী স্বাস্থ্যহানি ভোগ করিতে হইবে—অনেককে বাধ্য হইয়া শিশু-হত্যা করিতে হইবে বা শিশুকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যাহারা ভ্রূণহত্যা বা সন্তান ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে একা জারজ সন্তানের ভারবহন করিতে গিয়া বারবনিতার শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। বারবনিতা হইয়াও অধিকাংশের উদরান্নের সংস্থান হয় না। তাহার উপর দাসীবৃত্তি করিতে হয়—সকলেই নিত্য দেখিতে পাইতেছেন।

পাশ্চাত্যদেশের এখনও নারীদিগের সদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করা অতিশয় কঠিন। আমাদের দেশে নারীদিগের বারবনিতা ও চাকরাণীর কর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্ম করিবার পথ নাই বলিলেই হয়। শতকরা ৯৭টি নিরক্ষর। প্রাথমিক শিক্ষা এই দেশে শতকরা ৯২টি পুরুষও পায় না। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা পাইয়াও জীবিকা অর্জ্জনের বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়াই পুরুষরা বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারে না—নিত্যই দেখিতেছি। সুতরাং আমাদের তরুণীদের কি ভয়ানক দুর্গতি হইবে, সংস্কারকরা একবার ভাবিবেন কি? বাল্যবিবাহের দোষ তাঁহারা কল্পনার দ্বারা অনুমান করিয়া দেখাইতেছেন। সেই দোষের সহিত এই অবস্থার তুলনা করিবেন কি? পাশ্চাত্য দেশে যে সমাজগঠনদোষে মাতৃত্বনিরোধকারী উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে প্রতি বৎসর ছয় হইতে পনর, বিশ লক্ষ ভ্রূণহত্যা করিতে নারীরা বাধ্য হয়েন—অনেক প্রদেশ ও সহরে শতকরা ৪ হইতে ২০টি পর্য্যন্ত জারজ সন্তান জন্মে—আমাদের দেশের অবস্থা অনুসারে তদপেক্ষা অধিকগুণ হইবার সম্ভাবনা—তাহা না বুঝিয়া আমাদের সংস্কারকরা পাশ্চাত্যের মোহে সেইরূপ সমাজ গঠন করিয়া নারীদিগের ও দেশের উন্নতি হইবে আশা করেন ও তাহাই করিতে বদ্ধপরিকর।

এখন পাশ্চাত্য দেশে এমন হইয়াছে যে, যেন ভ্রূণহত্যা করা কোন দোষের মধ্যেই নহে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম তিন মাসে ইংলণ্ডে ১৫৯৮২০ শিশু জীবিত অবস্থায় জন্মিয়াছে, সুতরাং বৎসরে ৬৩৯২৮০ শিশু জীবিত অবস্থায় জন্মায় ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, তথায় বৎসরে ৬ লক্ষেরও অধিক ভ্রূণহত্যা হয়—অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক গর্ভধারিণীরা ভ্রূণহত্যা করে। আমাদের সংস্কারকরা হয় ত বলিয়া বসিবেন যে, যাহারা

অপত্যদিগকে সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিতে পারে না বা করিতে হইলে তাহাদের অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয়, শিশুদেরও কষ্ট হয়, তাহাদের ভ্রূণহত্যা করাই বিধেয়, সেই জন্য পাশ্চাত্যেরা ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করে।

এ দেশে বৎসরে দুই চারি হাজার মাত্র বিধবা ভ্রূণহত্যা করে। তাহারা গর্ভজাত সন্তানকে সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারিবে না বা তজ্জন্য তাহাদের অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হইবে, শিশুদেরও দুর্গতি হইবে বুঝিয়াই ত ভ্রূণহত্যা করে; তখন দেখা যায় যে, নব্যতন্ত্রী সকলেই তাহা হিন্দু সমাজের নারী-নিগ্রহের প্রমাণ বলিয়া ঢোল পিটাইতে থাকেন। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-রাও হিন্দুদিগকে গালি দিয়া বক্তৃতা দিবার সুযোগ ছাড়েন না। কিন্তু যখন দুই বা চারি হাজারের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য সমাজের অর্দ্ধেক গর্ভধারিণীরা কি কুমারী, কি বিধবা, কি সধবা ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করে, তখন ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করাটাই বিধেয় বলিতেছেন। ইহাই কি তখন নারীস্বত্বাধিকার-প্রসার—নারীদিগের উন্নতির চিহ্ন হইয়া দাঁড়ায় যে, সেরূপ পাশ্চাত্য সমাজ গঠনের জন্য, সেরূপ জীবনাদর্শের জন্য সে দেশের অর্দ্ধেক নারীরা ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করে, সেইরূপ সমাজ-গঠন করিতে—সেইরূপ আদর্শ অনুসরণ করিতে তরুণদিগকে প্ররোচিত করিতেছেন?

যাঁহারা সম্যক্‌রূপে সন্তান প্রতিপালনের অক্ষমতায় ভ্রূণহত্যা করাই বিধেয় মনে করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই "সম্যক্"রূপের অর্থ কি? এই সম্যক্‌ত্বের মাপকাঠি (Standard) কোথায়? আমরা যাহাকে "সম্যক্" প্রতিপালন করা বলি, বড়মানুষরা তাহাকে সম্যক্ প্রতিপালন করা বলেন না—গরীবরা তাহাকে অযথা অর্থব্যয় মনে করে। এই মতবাদটি স্বীকৃত হইলে আমাদের দেশের শতকরা ৯৫টি গর্ভধারিণীরই ভ্রূণহত্যা করা বিধেয় হয়। কারণ, কোন সভ্য সমাজের মাপকাঠিতে এ দেশের শতকরা ৯৫টি গর্ভধারিণী অপত্যদিগকে সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারে না; সুতরাং গরীবদিগের—আমাদের অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব সকলেরই ভ্রূণহত্যা করাটা বিধেয় হয়। যদি গর্ভস্থ সন্তানকে পিতামাতার হত্যা করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে অপত্যের কিঞ্চিৎ বড় হইবার পর যদি পিতামাতারা দেখেন যে, তাহাদের অবস্থা মন্দ হইয়াছে—অপত্যদিগকে 'সম্যক্' প্রতিপালন করিতে অপারগ হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের সেই অল্পবয়স্ক শিশুদিগকেও হত্যা করা বিধেয় হয়—গর্ভের ভিতরে থাকা ও বাহিরে থাকায় কোনরূপ পার্থক্য করাও কুসংস্কারের ভিতর গণ্য হওয়া উচিত। আর যদি পিতা-মাতারা তাহাদিগকে হত্যা করিতে না চায়, গভর্ণমেণ্ট হইতেই বা কেন তাহা করা হইবে না? গরীবরা ত পৃথিবীর প্রায় সকল সুখেই বঞ্চিত। অপত্য প্রতিপালন করিতে পাইয়া—তাহাদিগকে আদর করিয়া ভালবাসিয়া যে সুখ আছে—যাহার নিমিত্ত নিজে না খাইয়াও শিশুদিগকে খাওয়ায়, সেই সুখ হইতেও গরীবদিগকে বঞ্চিত করা হয়। হিন্দু-সমাজে লোকরা যত গরীব হউক না কেন, এখনও তাহারা স্বামী বা স্ত্রী-পুত্রাদির ভালবাসা পায়—অসুস্থ হইলে, বৃদ্ধবয়সে তাহাদের সেবা-সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার আশা করে—পাইয়াও থাকে। সেই জন্যই সকলেই সন্তান কামনা করে, তদুদ্দেশ্যে ষষ্ঠীর পূজা ও ব্রত করিয়া থাকে।

সংস্কারকরা উন্নতিকামনায় তাহাদের সে আশা ও সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন না কি? তাহাদিগকে কি প্রকারান্তরে বলা হইতেছে না—"তোমরা গরীব, তোমরা বিবাহ করিও না, কাম উপভোগ যদি কর, দেখিও, যেন অপত্য উৎপাদিত না হয়; যদি বা গর্ভসঞ্চার হয়, নিজেরাই ভ্রূণহত্যা কর, ধনীদিগকে তজ্জন্য খবরদার বিরক্ত করিও না?" জীব ও যন্ত্রের পার্থক্য এই অপত্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতায়। তাহাদিগকে ভালবাসা, স্তন্যপান করান, আদর করা, তাহাদিগের ভালবাসা, যত্ন ও সেবা পাওয়াই মনুষ্য-জীবনের একটি প্রধান সুখ বিশেষতঃ নারীদিগের। তাহাদিগকে কি বলা হইতেছে না যে, "সে সুখ তোমাদের জন্য নয়, সে কেবল ধনীদিগের, তোমরা যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইয়া ধনীদিগের জন্য আজীবন খাটিয়া মর, তোমাদের শরীর অসুস্থ হইলে—তোমাদের বৃদ্ধবয়সে তোমাদের স্ত্রী (বা স্বামী) পুত্রকন্যারা তোমাদের সেবা-যত্ন করিবে আশা কর—সে আশা ত্যাগ করিতে শিখ—সে আশা মরীচিকা মাত্র? উন্নত পাশ্চাত্য সমাজে পিতা-মাতার সেবা, সাহায্য, যত্ন কেহ বড় একটা করে না। আমাদের সেই "উন্নত" আদর্শে চলিতে হইবে, ভারতের সেই বহু প্রাচীন আদর্শ সকল ত্যাগ করিতে না শিখিলে আমাদের কোন উন্নতির আশা নাই—ও সকল কুসংস্কারের মধ্যেই গণ্য,—আমরা অনেকেই সেই জন্য তাহা ত্যাগ করিতেছি, পিতৃমাতৃভক্তি একালে আর চলে না। সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত নিজেদেরই করা আবশ্যক, সকলকেই স্বাবলম্বী হইতে হইবে, একান্ত না পার, গভর্ণমেণ্ট হইতে করা হইবে, আমাদের যদিও এখন তাহা করিবার ক্ষমতা নাই, আমরা ক্রমে তাহা করিব, নিশ্চয় জানিও। কিন্তু কোন সুদূর-ভবিষ্যতে, তাহা জানিতে চাহিও না। এখন যদি তোমরা গরীব সন্তান না রাখিয়া মরিয়া যাও—গরীবদিগের সংখ্যা শীঘ্রই কমিয়া যাইবে, আমরা তখন ঐরূপ বন্দোবস্ত সহজে করিতে পারিব?"

সংস্কারকরা যাহাই করা বিধেয় বলুন না কেন, আমাদের সাধারণ লোকরা অত উন্নত হয় নাই যে, তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে চলিলে দেশটা কত শীঘ্র কত উন্নত হইবে, লোক-সংখ্যাবিরল অপ্সরাকণ্ঠমুখরিত নন্দনকাননে পরিণত হইবে, তাহাদের সামান্য কল্পনাশক্তি নাই বলিয়া দেখিতে পায় না। আমাদের সাধারণ লোকের মনের গতি ও প্রকৃতি এখনও উন্নত পাশ্চাত্য আদর্শে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সেই জন্য যে সন্তান নিজের রক্তে পুষ্ট হয়, তাহার প্রতি প্রকৃতিপ্রদত্ত মাতার হৃদয়ে টান থাকিয়া যায়। পাশ্চাত্যদের মত উন্নত মার্জ্জিত বুদ্ধি ও সুদূরভবিষ্যৎদর্শিতা ও সহানুভূতির আতিশয্য না থাকিলে, অর্থ-স্বচ্ছলতা ও নিজের ভোগেচ্ছা পূরণ যে পৃথিবীর প্রধান কাম্য, এ বিশ্বাসে চলিতে না শিখিলে ও তজ্জন্য হৃদয়ের বৃত্তিগুলি বলি দিতে প্রস্তুত না হইলে—গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা বা ত্যাগ করিতে মাতাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। তাহা করিতে হইলে তাহাদের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগে—তাহা তাহাদিগের যে স্বত্বাধিকারপ্রসার, তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। এখনও এ অসভ্য দেশে ভ্রূণ-হত্যা নরহত্যারই মত মহাপাপ বলিয়া

পায়। গর্ভস্রাব হইলে বা ভ্রূণ-হত্যা উন্নত ব্যয়সাপেক্ষ উপায়ে না হইলে (সে সকল উপায়ে করিবার সামর্থ্য আমাদের শতকরা একটিও নাই) নারীদিগের ভীষণ কষ্টকর হয়; একবার গর্ভস্রাব বা ভ্রূণ-হত্যা করিলে পুনরায় গর্ভ হইলে আপনা আপনিই গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক থাকে, সকলেরই বিশেষ স্বাস্থ্যহানি হয়—অনেক স্থলে মরিয়া যায়। ঘোর শত্রুকেও পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া হত্যা করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামাজিক অপরাধ ও পাপ বলিয়া সর্ব্বত্রই গণ্য। এইরূপ হত্যা করিতে মানুষমাত্রেই কুণ্ঠিত হয়। যাহাকে নিজের রক্ত দিয়া পুষ্ট করিয়াছে,—যাহাকে স্তন্যপান করান, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা মাতার জীবনের প্রধান উপভোগ ও সার্থকতা—সেই গর্ভস্থ সন্তানকে পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া নিজের অবশ্যম্ভাবী শারীরিক ভীষণ কষ্ট ও স্বাস্থ্যহানি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সমাজের অর্দ্ধেক গর্ভধারিণীরা প্রতি বৎসর পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া হত্যা করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য হয়, ইহা বড় বড় পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্‌রাই বলেন। কিরূপ ভয়ানক নির্য্যাতন-ভয়ে কিরূপ আবেষ্টনী ও শিক্ষার ফলে—কিরূপ বিকৃতস্নায়ু হওয়ার ফলে নারীরা এইরূপ ভীষণ নৃশংসতার কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, আমাদিগের সংস্কারকরা ও তরুণ-তরুণীরা তাহা ভাবিবেন কি? যে সমাজগঠন-যন্ত্রে সমাজের প্রায় অর্দ্ধেক নারীদিগের প্রকৃতিগত মাতৃস্বভাব পিষিয়া নিষ্কাশিত করে, তাহাদিগের হৃদয় পাষাণে পরিণত করিয়া নিজের অপত্য-হত্যা-রূপ ঘোর নৃশংসতার কার্য্য করিতে বাধ্য করে, সেই পাশ্চাত্য সমাজই "নারীস্বত্বাধিকার-প্রসারক" "অবলাবন্ধব" "নারীপূজক"। আমাদের সংস্কারকরা ও রাজনৈতিক নেতারা তরুণদিগকে বুঝাইতেছেন পাশ্চাত্যের সেই উচ্চ আদর্শে আমাদের সমাজ গঠন না করিলে আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই; বুঝাইতেছেন—সেই জন্য আমাদের সমাজগঠন ভাঙ্গিতে তাঁহারা সকলেই বদ্ধপরিকর। সর্দ্দা আইন পাশ বাল্য-বিবাহের উপর আরোপিত দোষ কত ভিত্তিহীন, রজস্বলা কন্যারা অবিবাহিতা থাকিলে তাহাদের কিরূপ দুর্গতি হইবে পাশ্চাত্য সমাজগঠন আমাদের পক্ষে কত অনুপযোগী,—আমাদের সমাজগঠন তদপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট,—তাহা দেখাইবার স্থান তাঁহাদিগের সম্পাদিত সংবাদপত্রে দেন না সভা করিয়া ব্যক্ত করিতে গেলেও তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাদের স্বদেশভক্তির, ব্যক্তিগত মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতাপ্রিয়তার ও নবার্জ্জিত গণতন্ত্রপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখান! অনেক শিক্ষিতা মহিলাও—স্কুলের ছাত্রীরাও এই সকল অতীব মঙ্গলজনক কার্য্যে যোগ দিতেছেন। তাঁহারা কি মনে করেন যে, পাশ্চাত্য ভাবের নারীস্বত্বাধিকার-বৃদ্ধিতে সেখানকার নারীরা এত অধিক সুখী হইতেছেন যে, সেই সুখের আতিশয্য প্রায় তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে? সেই জন্য সেখানকার নারীপূজকদিগের সহিত বহুকাল একত্র বাস করিতে পারেন না—মধ্যে মধ্যে সেই সুখের বিরাম আবশ্যক হয়—সেই জন্যই বিবাহবিচ্ছেদ প্রতি বৎসরেই বাড়িতেছে—(আমেরিকার কোনও কোনও প্রদেশে বৎসরে যত বিবাহ হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক বিচ্ছেদ হয়) পুনরায় নূতন নারীপূজকদিগের অর্ঘ্যপ্রয়াসিনী হইতেছেন—তাঁহাদের পুত্রকন্যা থাকিলে নূতন পিতার আদর-যত্ন পাইয়া তাহাদের জীবন মাতাদেরই মত মধুময় হয় এবং তাহা দেখিয়া তাঁহারা পরম সুখী হন? তাঁহারা কি দেখেন না যে, যতই পাশ্চাত্যভাবের নারী-স্বত্বাধিকার বৃদ্ধি হইতেছে ও স্ত্রীশিক্ষারও বিকাশ হইতেছে, ততই স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর জীবজগতে অদৃষ্ট, ইতিহাসে অশ্রুত বিদ্বেষভাব উত্তরোত্তর বাড়িতেছে? তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, স্ত্রী ও পুরুষের সহজ প্রাকৃতিক সম্বন্ধই সাপ ও নেউলের মত বিদ্বেষভাব—এতকাল নারীরা ভীষণভাবে নির্য্যাতিতা হইতেন—তাঁহারা মূর্খ ছিলেন, সেই জন্য সেই প্রকৃত সম্বন্ধ এতকাল বুঝিতে পারেন নাই—পুরুষদিগকে ভালবাসিয়া তাঁহারা সুখী ও কৃতার্থ হইতেন, এখন তাঁহারা শিক্ষিতা হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিয়াছেন, পুরুষদিগকে চিনিয়াছেন—সেই জন্যই নারী-নিগ্রহের যত নিবৃত্তি হইতেছে, নারীস্বত্বাধিকারবৃদ্ধি হইতেছে—যতই শিক্ষাবিস্তার হইতেছে—ততই স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর বিদ্বেষভাবের বৃদ্ধি হইতেছে?

পাশ্চাত্যদের অনুরূপ সমাজগঠন ও দেশাচার হইলে পাশ্চাত্যের শতকরা ৫০টির পরিবর্ত্তে যখন আমাদের দেশে শতকরা ৯০টি গর্ভধারিণীকে ঐরূপ ভ্রূণহত্যা করিতে হইবে, তখন পাশ্চাত্যদের অপেক্ষা আমাদের উন্নতি আরও অধিক হইবে ও তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে পারিব, সেই জন্যই কি নব্য সাহিত্যে বিবাহের অতীব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে উদ্দাম প্রেম-উপভোগের উজ্জ্বল চিত্র-সমন্বিত উপন্যাস ও গল্প লিখিয়া এক দল নব্য সাহিত্যিক সংসারের হৃদয়হীনতায় নীচাশয়তায় অনভিজ্ঞা তরুণীদিগকে প্ররোচিত করিতেছেন ও জটাবল্কলধারী অর্দ্ধ-উলঙ্গ অসভ্য ঋষিদের, স্বার্থজ্ঞানশূন্যা, অশিক্ষিতা, সতী, সীতা, সাবিত্রীর আদর্শের পরিবর্ত্তে বিবাহ-শৃঙ্খল-মুক্ত, উন্নত স্বাধীন প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন? কিন্তু সেই উন্নত প্রেমের আতিশয্য যেরূপ কিছু-দিন পরেই অসহ্য হইয়া পড়ে, তখন প্রায় সকল নারীকেই - বিশেষতঃ যৌবনান্তে (দুই দশ জন ধনিকন্যা ভিন্ন পাশ্চাত্যের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা এদেশে নগণ্য মাত্র) পরম রমণীয় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত আশ্রমে, তাঁহারই মত উচ্চ আদর্শ অনুসারিণী অন্য নারীদিগের তারস্বরে উচ্চারিত মধুর আলাপ শুনিয়া ও অনেক সময়ে গৃহস্বামিনীর ও দোকানদারদিগের তুচ্ছ অর্থের নিমিত্তও অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরম প্রীত হইয়া স্বাধীন নারীর উচ্চ আদর্শের জীবন যাপন করিতে হয়,—অনেক সময়ে যৌন ব্যাধিগ্রস্ততার সুখও উপভোগ করিতে হয় ও লোকহিতকর পরের সেবায় (দাসীবৃত্তি) জীবন উৎসর্গ করিতে হয় ও সেই আদর্শ প্রেমের চিহ্নস্বরূপ অপত্য থাকিলে, তাহার মাতার উচ্চ আদর্শের জীবনের জন্য সমবয়স্ক ও প্রতিবেশীদিগের সসম্মান ব্যবহারের কথা যখন স্ফীতবক্ষে ও বাষ্পাকুলনেত্রে মাতাদিগকে নিবেদন করে, তখন তাঁহারা তাহা শুনিয়া যেরূপ নিজেদের জীবন ধন্য বোধ করেন ও সার্থক জীবনের সুখস্মৃতি রাত্রিতে নির্জ্জনে উপভোগ করেন ও ব্যাধিগ্রস্তা হইলেও তাঁহাদের সম্মানাতিশয্যের নিমিত্ত কেহই নিকটে আসিতে সাহসী হয় না, মৃত্যু পর্য্যন্তও স্বাবলম্বনের আদর্শ দেখাইয়া ইহলোক ত্যাগ

করেন—সেই বাস্তব চিত্রটা, সেই আদর্শ জীবনের শেষ অধ্যায়গুলি তাঁহাদের সুনিপুণ হস্তে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হইলে ত তরুণীরা দুইটি ভিন্ন আদর্শের সম্যক্ তুলনা করিতে পারিতেন—অতীব হৃদয়গ্রাহী হইত ; সেই আদর্শ স্পৃহণীয় হয় কি না—কাম উপভোগের স্বাধীনতা নারীদিগের ও দেশের মঙ্গলজনক কি না, তাহা তরুণীরা সম্যক্ বিবেচনা করিতে পারিতেন।

প্রায় সকল সমাজেই এক দল নারী চিরকালই এই স্বাধীন প্রেমের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে—সামাজিক নিয়ম সকল তুচ্ছ করিয়াছে, সুতরাং এই স্বাধীন প্রেমের আদর্শতে কোন নূতনত্ব নাই—ইহা বহু বহু পুরাতন। নূতন কেবল বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র বৈদ্যুতিক আলোতে ইহার মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া ও ঐ আলোতে চক্ষু ঝলসিত হওয়ায় ঐ উচ্চ মহৎ আদর্শ অনুসরণের ফলে যে পরিণামে প্রায় সকলকেই (দুই দশ জন ধনী নারী ভিন্ন আমাদের দেশে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য মাত্র) বারবনিতার উচ্চ আদর্শের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতে হয়—শেষ জীবন ভীষণ কষ্টকর ও মরুময়, তাহা দেখিতে না পাওয়া—আর নূতন—এই পরিণামের দিকে না দেখিয়া ঐ স্বাধীন প্রেমের ক্ষণস্থায়ী মাদকতার উজ্জ্বল বর্ণের চিত্র দেখাইয়া সংসারের হৃদয়হীনতায়, নীচাশয়তায়, শঠতায় মনের গতির পরিবর্তন-শীলতায় অনভিজ্ঞা তরুণীদিগকে উহা উপভোগ করান নারীর নূতন স্বত্বাধিকার-প্রসার বলিয়া বুঝাইবার ও তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত করিবার প্রকাশ্য প্ররোচনা।

পাশ্চাত্য ধরণের নারীস্বত্বাধিকার-বৃদ্ধির সহিত যখন পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্রই বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে—কি কুমারী, কি বিধবা, কি সধবা, সকলকেই উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যায় মাতৃত্ব-নিরোধকারী উপায় অবলম্বন করিতে ও ভ্রূণহত্যা করিতে হইতেছে—পুরুষ ও নারীর ভিতর বিদ্বেষ ও রেশারেশির ভাব দেখা দিয়াছে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তখন নারীর স্বত্ব, নারী ও পুরুষের সম্বন্ধ, সমাজে নারীর স্থান ও কার্য্য (Function) কি, তদ্বিষয়ে যে গোড়ায় গলদ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় গোড়ায় গলদ না থাকিলে এরূপ বিষময় ফল হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, স্ত্রী ও পুরুষে পার্থক্য এই মাতৃত্বে ; সুতরাং মাতৃত্বই স্ত্রীত্ব,—মাতৃত্বই তাঁহাদের স্বত্ব। মাতৃত্বের অঙ্গগুলি তাঁহাদের প্রধান অঙ্গের মধ্যে গণ্য—মাতৃত্বের উপরই সৃষ্টি নির্ভর করে—তজ্জন্যই প্রকৃতি নারীদিগের হৃদয়বীণার তার 'মা' সুরে বাঁধিয়াছেন 'মা' সুরেই তাহাতে মধুর স্বরলহরী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে ও সকলকে তৃপ্তিদান করিতে পারে। কিছুকাল ব্যবহার অভাবে সে তারে মরিচা ধরে,- তাহা ক্ষণভঙ্গুর হয়। পাশ্চাত্য সমাজগঠনদোষে ও নারীস্বত্বের প্রসার ভাবিয়া যেরূপ কর্ম্মে নারীরা উত্তরোত্তর অধিকভাবে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সেই মাতৃত্ব স্বতই ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের উপর ঘোর নির্য্যাতনই বাড়িতেছে এবং তাহার ফলে তাঁহারা জীবনে শান্তি পাইতেছেন না—পুরুষদিগকেও শান্তিদান করিবার তাঁহাদিগের প্রকৃতিপ্রদত্ত ক্ষমতা ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতেছে—শান্তিদান করিতে অপারগ হইয়া পড়িতেছেন। তজ্জন্য বিবাহবিচ্ছেদ এত বাড়িতেছে—পিতা, মাতা ও সকলেরই শেষজীবন মরুময় হইতেছে, সকলেরই জীবন অশান্তিময় হইয়াছে। অর্থই জীবনের একমাত্র উপভোগ্য, সেই জন্য পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্রই বিরোধ দেশে দেশে বিরোধ - সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ স্বামিস্ত্রীতে বিরোধ—পিতা মাতা ও অপত্যতে বিরোধ। আমাদের শিক্ষিত সংস্কারকরা আমাদের সমাজের তিলপ্রমাণ দোষকে পাশ্চাত্যদের কথায় তাল-প্রমাণ দেখেন ও সকল সময়ে তাহা ঢোল পিটাইয়া বলিয়া থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের পর্ব্বতাকার দৃষ্টি-অবরোধকারী দোষ সকল পাশ্চাত্যের মোহে দেখিতে পান না, পাশ্চাত্যদের মত সমাজগঠন করিয়া আমাদের দেশের নারীদিগের উন্নতির আশা করিতেছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

স্বরাজ ও বর্ণাশ্রম

সবিনয় নিবেদন,

কিছুদিন পূর্ব্বে (মাঘ ১৩২৮) প্রবাসীতে বর্ণাশ্রম-স্বরাজ-সংঘকে বিদ্রূপ করিয়া কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমি একটি পত্র লিখিয়াছিলাম, গত বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে তাহা ছাপা হইয়াছিল। তাহা ছাপিবার সময় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় পুনরায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিকূল কয়েকটি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি পুনরায় প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় তাহা ছাপান নাই। বৈশাখের প্রবাসীতে সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সহিত স্বরাজের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।" আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই উক্তি যুক্তিহীন। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজকাল ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায়ই শাস্ত্রচর্চ্চা করেন না। ইহার ফলে অনেকেরই শাস্ত্রে আস্থা নাই। অধিকন্তু স্বরাজলাভের জন্য দেশে একটা ব্যাকুলতা আসিয়াছে। এ ক্ষেত্রে যদি প্রচার করা যায় যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরাজের প্রতিকূল, তাহা হইলে সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া অনেকেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরাজলাভের কিছুমাত্র অন্তরায় নহে। যদি এইক্ষণে হিন্দুসমাজ হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে স্বরাজলাভের সুবিধা হইবে, ইহা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। আমার এই পত্রখানি মাসিক বসুমতীতে ছাপা হইলে সাধারণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে পারে মনে হয়। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ছাপান, তাহা হইলে অত্যন্ত সুখী হইব।

আমার নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় না ছাপাইয়া ফেরত দিয়াছেন।

মাননীয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
সবিনয়-নিবেদন,

বর্ণাশ্রম স্বারাজ্যসংঘ সম্বন্ধে আমি যে প্রতিবাদ লিখিয়াছিলাম, বৈশাখের প্রবাসীতে তাহা ছাপিয়াছেন, এ জন্য অনুগৃহীত হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে আপনি লিখিয়াছেন, "বর্ণাশ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বরাজ্যস্থাপন অসম্ভব—ইহা এখনও আমার মত।" আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, মহাত্মা গান্ধী বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার পক্ষপাতী। শুধু তাহাই নহে, তিনি লিখিয়াছিলেন যে, স্বরাজ্য কি, তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ (definition) করা কঠিন, তবে স্বরাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি এই বলিতে ইচ্ছা করেন যে, স্বরাজ্য ও রামরাজ্য প্রায় এক কথা। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের সময় বর্ণাশ্রমব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং বাল্মীকির মতে শ্রীরামচন্দ্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংরক্ষক ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং মহাত্মাজীর মতে বর্ণাশ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বরাজ্যস্থাপন নিশ্চয়ই সম্ভব। স্বরাজ কি এবং ইহা পাইবার প্রতিবন্ধক কি, এ বিষয়ে মহাত্মাজীর মতের একটা বিশেষ মূল্য আছে। আপনার মত মহাত্মাজীর মতের বিপরীত। আপনার মতটি নির্ভুল কি না, ইহা পুনরায় বিবেচনা করিবার ইহা একটি গুরুতর কারণ নয় কি?

আপনি যদিও মনে করেন যে, আপনার মত নির্ভুল এবং মহাত্মাজীর মত ভুল, তথাপি এ বিষয়ে আপনার মত প্রচার করা উচিত নহে। নিজের দোষ অপেক্ষা পরের দোষ দেখা যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক, সেইরূপ নিজ সম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের দোষ দেখা সহজ ও স্বাভাবিক। খৃষ্টানের মনে হইতে পারে যে, তাঁহার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এবং স্বরাজ্যলাভের পক্ষে খুব উপযোগী। কিন্তু তিনি যদি প্রচার করেন যে, মুসলমান-ধর্ম্মানুমোদিত কোনও বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থা অনিষ্টকর এবং স্বরাজলাভের অন্তরায়, তাহা হইলে মুসলমানের মনে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষসঞ্চার হইবে। সেইরূপ আপনি, রবি বাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মরা যদি প্রচার করেন যে, বর্ণাশ্রম থাকিলে স্বরাজ অসম্ভব, তাহা হইলে যাহারা মনে করে যে, বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম্মের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহাদের মনে ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিকূল ভাবের উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এইরূপ প্রতিকূল ভাবের উদয় হইলে উভয় সম্প্রদায়ের একযোগে স্বরাজ্যলাভের জন্য চেষ্টা করিবার পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হয় না কি? ব্রাহ্মরা যদি হিন্দুধর্ম্মের এইভাবে দোষ আবিষ্কার করেন, হিন্দুরাও ব্রাহ্মধর্ম্মের দোষ বাহির করিতে চেষ্টা করিবে। তাহারা বলিতে পারে যে, ব্রাহ্মদের সামাজিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে, ইহার পশ্চাতে একটা আত্মপ্রত্যয়ের অভাব এবং দাসসুলভ অনুচিকীর্ষা বিদ্যমান, এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া স্বরাজ্যসাধন অতি দুরূহ। ব্রাহ্মদের অভিযোগ যথার্থ, না হিন্দুদের অভিযোগ যথার্থ, কে ইহার মীমাংসা করিবে? এইরূপ কলহের ফলে উভয়ে একযোগে কার্য্য করিতে অক্ষম হইবে, এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি অপর সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হারাইবেন, communal representationএর কথা উঠিবে, এইরূপে স্বরাজ্যের পথে নানা প্রকার বাধা দেখা দিবে। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা স্বরাজ্যলাভের অন্তরায় কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে,- কারণ, আপনার ও মহাত্মাজীর এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যাইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মরা আপনার ন্যায় মত প্রচার করিলে যে সাম্প্রদায়িক কলহের উদ্ভব হইবে, তাহা যে স্বরাজ্যলাভের অন্তরায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনারা এরূপ মত প্রচার করিলেও যাঁহারা স্মৃতিপুরাণাদিতে শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা আপনাদের কথায় সে শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিবেন না। যে বিষয়ে বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে মতভেদ, যাহার প্রচার করিয়া কোন সম্প্রদায়ের লাভ নাই, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপাদন করে, একপ মত প্রচার করা কি সমীচীন?

স্বরাজ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, রাজশক্তি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিবে। ভারতে হিন্দুগণ যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করে, তাহা হইলে রাজশক্তি কেন প্রজাদের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত থাকিতে পারে না, আপনি তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দিতে পারেন কি?

এক্ষণে ভারতবর্ষের স্বরাজ্যলাভের প্রকৃত অন্তরায় কি? কয়েক জন মুসলমান নেতা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি বিশেষ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, অন্য সম্প্রদায়ের নেতারা তাহাতে রাজি হইতেছেন না। হিন্দুরা যদি আজ জাতিভেদ তুলিয়া দেন, তাহা হইলে এই অন্তরায় কি করিয়া দূর হইবে?

যদি হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত না হইলে স্বরাজ হইতে পারে না, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধে বিবাহ-প্রচলন না হইলেও স্বরাজ আসিবে না, কারণ, স্বরাজ ত কেবল হিন্দুদের হইবে না, স্বরাজ ভারতের হইবে। জাতিভেদ তুলিয়া দিবার পর, ধর্ম্মভেদ তুলিয়া দেওয়াও কি আপনাদের অভিপ্রায়?

আপনাদের এই আন্দোলনের ফলে অল্পসংখ্যক প্রবীণ হিন্দুই অসবর্ণ-বিবাহে মত দিবেন। কয়েকটি অপরিণতমতি যুবক-যুবতী গুরুজনদের বাক্য অবহেলা করিয়া আপনাদের মতের অনুসরণ করিবে। তাহাতে পারিবারিক অশান্তি হইবে প্রচুর, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ হইবে অল্প।

ভারতবর্ষে স্বরাজ্যলাভের জন্য আজকাল যে আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম অপেক্ষা হিন্দুগণ কি কম পরিমাণে যোগদান করিয়াছেন? ভারতের সমগ্র অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দুদের যে অনুপাত (Proportion), আন্দোলনকারীদের মধ্যে হিন্দুদের অনুপাত তাহা অপেক্ষা বেশী নহে কি? যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরাজ্যলাভের বিরোধী, তাহা হইলে একপ হয় কেন? আপনি বলিবেন, আজকাল হিন্দুরা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করে না। তাহা হইলে ইহা তুলিয়া দিতে আপনারা এত ব্যস্ত হইবেন কেন? বর্ণাশ্রমব্যবস্থা কিছু পরিমাণে হিন্দু সমাজের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রচলিত আছে। অসবর্ণ-বিবাহ ত এখনও প্রচলিত হয় নাই। যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরাজ্যলাভের প্রতিপন্থী হইত, তাহা হইলে হিন্দুদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও স্বরাজ্যলাভের আন্দোলন অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিতে পারিত না। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ভোগবাসনা কমাইয়া দেয়, সমাজ-সেবার আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া কর্ত্তব্যপালনের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দেয়; বোধ হয়, সেই কারণেই এই আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছে।

সত্য বটে, আজকাল এক বর্ণের ব্যক্তি অন্য বর্ণের জীবিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্ব্বেও এরূপ ছিল। দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ইঁহারা যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরশুরাম অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ত ক্ষত্রিয় হইয়া যান নাই।

আপনি বলিয়াছেন,—"ভগবান্ যাঁহাদিগকে যে যুগে পাঠান, তাঁহাদের সেই যুগের উপযোগী কায করা উচিত।" এ বিষয়ে আপনার সহিত কাহারও মতভেদ হইবে না। মতভেদ হইবে, কি কায কোন্ যুগের উপযোগী, ইহা লইয়া? কর্ত্তব্যনির্ণয় অতি দুরূহ। গীতা বলিয়াছেন—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ" কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, কোন্ কর্ম্ম করা উচিত নহে, ইহা স্থির করিতে জ্ঞানিগণও ভুল করিয়া থাকেন। এরূপ দেখা যায় যে, ভাল কার্য্য করিতেছি, এইরূপ বিশ্বাসে কেহ কেহ এরূপ কার্য্য করিয়া বসেন—যাহার ফলে নিজের এবং সমাজের অকল্যাণ হয়। দলাদলি এবং সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যে এরূপ আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কয়েক জন মুসলমান নেতা ভাবিতেছেন, Communal representation প্রভৃতির জন্য চেষ্টা করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য এবং এই উপায়েই তাঁহারা মুসলমান-সমাজের বেশী উপকার করিতে পারেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন,—আপনিও বোধ হয় মনে করেন ইঁহারা ভ্রান্ত। আপনি ভাবিতেছেন যে, বর্ণাশ্রম ধ্বংস করিবার চেষ্টা করাই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী কার্য্য এবং এইরূপ চেষ্টা করিলেই হিন্দু সমাজের উপকার করা হইবে। কিন্তু এমন হইতেও পারে যে, আপনার ধারণা ভুল। আমরা সকলেই রাগদ্বেষের প্রভাবে অনেক সময় কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়ি। এ জন্য হিন্দু কর্ত্তব্যনির্ণয় জন্য নিজ প্রবৃত্তি অপেক্ষা শাস্ত্রবাক্যের উপর অধিক নির্ভর করে। গীতা বলিয়াছেন—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

অতএব কোন্ কর্ম্ম করা উচিত এবং কোন্ কর্ম্ম করা উচিত নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রের বিধান জানিয়া কর্ম্ম করা উচিত। আশা করি, আপনার সহিত মতভেদ হইলেও আপনি বিশ্বাস করিবেন যে, বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসংঘের উদ্যোগিগণ মনে করেন যে, এই সংঘস্থাপন বর্ত্তমান যুগের উপযোগী, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আমি বলিয়াছিলাম যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺বালগঙ্গাধর তিলক, ইঁহারা শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি-প্রতিপাদিত হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্। আপনি লিখিয়াছেন, "ইঁহারা প্রত্যেকেই বর্ণাশ্রমের সমর্থক ছিলেন কি না, জানি না, কিন্তু তাঁহাদের জীবিতকালে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসংঘ নামক 'খিচুড়ীর' সৃষ্টি না হওয়ায় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মত-প্রকাশের সুযোগ হয় নাই।" যত দিন বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসংঘের সৃষ্টি হয় নাই, ততদিন কোনও ব্যক্তি বর্ণাশ্রমের সমর্থক কি না, এ মত প্রকাশের সুযোগ হয় নাই, ইহা আপনার কি প্রকার যুক্তি? আপনি, রবিবাবু, ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, আপনারা ত বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসংঘের সৃষ্টির বহু পূর্ব্ব হইতেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমাজের অনিষ্টকর, এই মত প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা হিতকর, এই মত প্রকাশের সুযোগ পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই, ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হয়? স্মৃতিকারগণ ত "বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসংঘ" স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা কি করিয়া বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ভাল, এ কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন? সুতরাং এ কথা আপনি অস্বীকার করিতে পারেন না যে, "বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য সংঘ" স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেও বর্ণাশ্রম ভাল কি মন্দ, এ বিষয়ে মত দিবার সুযোগ সকলের ছিল। আমি যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের জীবনচরিত আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, ইঁহারা সকলেই বর্ণাশ্রমের সমর্থক ছিলেন। আর এক জনের নাম উল্লেখ করিতে পারি। বলিয়াছি, ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ণাশ্রমের সমর্থক ছিলেন, এবং ব্রাহ্ম সমাজের অপর সম্প্রদায়ের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের ইহাই পার্থক্যের কারণ। আপনার মতে ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ যুগে বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্য নহেন কি?

বোধ হয়, বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসংঘের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ আপনি ভ্রান্ত উক্তি করিয়াছেন যে, এই সংঘ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কেহ বর্ণাশ্রমের সমর্থক কি না, এই মত প্রকাশের সুযোগ পান নাই। সংঘের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় আপনার পূর্ব্বপ্রকাশিত মন্তব্যে দেখা গিয়াছিল। বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত মন্তব্যে "খিচুড়ী" শব্দে আপনার বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে খিচুড়ী শব্দের প্রয়োগ কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? বর্ণাশ্রম এবং স্বরাজ উভয়ে কি মিশিতে পারে না? হিন্দুরা যত দিন স্বাধীন ছিল,—দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ও শিল্পে যখন হিন্দুরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনও বর্ণাশ্রম ছিল। সুতরাং আপনার মতে তখন হিন্দুদের স্বরাজ ছিল না। অর্থাৎ স্বরাজ একটি নূতন সম্পদ, আমরা আজকাল পাশ্চাত্যদেশ হইতে শিখিয়াছি। ইহাই কি ঠিক? না, আমরা স্বরাজ পূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলাম, ইহা লাভ করিবার যোগ্যতা আমাদের চিরকাল আছে, পুনরায় অর্জ্জন করিতে পারিব,—ইহা ঠিক? বস্তুতঃ বর্ণাশ্রম এবং স্বরাজ্য উভয়ের একত্র সমাবেশ করা যায়, করিলে 'খিচুড়ী' হয় না। বরং ব্রাহ্মদের যে ধর্ম্ম ও সমাজ,—কিছু উপনিষদ হইতে লওয়া হইল, কিছু মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম হইতে লওয়া হইল, কিছু প্রাচ্য প্রথার সহিত কিছু প্রতীচ্য প্রথা মিশাইবার চেষ্টা হইল, ইহাতেই খিচুড়ীর সৃষ্টি হয়। আপনি নিজেই নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া বলুন, 'খিচুড়ী' কোনটি। "কাচের ঘরে বাস করিলে বাহিরে ঢিল না ছোড়াই ভাল।" ব্রাহ্মরা গোঁড়া হিন্দুদিগকে আর যাহা বলিয়াই গালাগালি দেন, 'খিচুড়ী' বলিয়া গালাগালি দেওয়া শোভা পায় না।

বালিকার অল্পবয়সে বিবাহ সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছেন, "অনেক প্রাচীনতম শাস্ত্রের" মতেও ইহা অনিষ্টকর আপনার এই উক্তি পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। স্মৃতিশাস্ত্রে

গ্রন্থ আছে, প্রায় সকলেই বালিকার অল্পবয়সে বিবাহ দিবার বিধান দিয়াছেন। কোনও স্মৃতিতে ইহাকে অনিষ্টকর বলা হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদে এক স্থানে অল্পবয়সে গর্ভাধানের নিন্দা আছে, অল্পবয়সে বিবাহের নিন্দা কোথাও নাই। আপনি কোন্ প্রাচীনতম শাস্ত্রে অল্পবয়সে বিবাহের নিন্দা দেখিয়াছেন, তাহা জানাইবেন কি? তন্ত্রশাস্ত্রকে আপনি বোধ হয় প্রচীনতম শাস্ত্র বলেন নাই। ইহা বেশী প্রাচীন নহে।

(প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়কে লিখিত পত্র সমাপ্ত)

এই পত্রটি ফেরৎ দিবার সময় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করিয়াছেন :—

(১) তাঁহার ইহা বলিবার অভিপ্রায় ছিল না যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে তাঁহাদের মত প্রকাশের স্যোগ পান নাই। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসংঘ সম্বন্ধে তাঁহারা মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পান নাই।

বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসংঘ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই সংঘ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা সম্ভব নহে, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই সংঘের যাহা উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য যদি উল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের জীবদ্দশায় সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে এই সংঘ সমর্থন করিতেন। বৈশাখের প্রবাসীতে আমি এই সংঘের গত অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির বিবৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, এই সংঘের উদ্দেশ্য শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিত সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ-সাধন। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের জীবদ্দশায় শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিত সনাতন ধর্ম্মে আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে এই সংঘের উদ্দেশ্য সমর্থন করিতেন।

(২) "স্মৃতি প্রাচীনতম গ্রন্থ নহে এবং এক মতে তন্ত্রও প্রাচীন।"

মনুস্মৃতি যে অন্ততঃ দুই হাজার বৎসরের পুরাতন, তাহাতে কেহ সন্দেহ করেন না। যে তন্ত্রশাস্ত্রে বয়ঃস্থা বালিকার বিধান আছে, সে তন্ত্র তাহা অপেক্ষা অনেক পরবর্ত্তী, এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। সুতরাং প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় যে বলিয়াছেন, "অনেক প্রাচীনতম শাস্ত্রের মতে" বালিকার অল্পবয়সে বিবাহ অনিষ্টকর, ইহা সমর্থন করা যায় না।

প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের মতে :—

(৩) "মহাত্মা গান্ধীর বর্ণাশ্রম সাধারণ অর্থে বর্ণাশ্রম নহে। তিনি গন্ধবণিক্ অথচ তাঁহার এক পুত্রের সহিত এক ব্রাহ্মণের (রাজাগোপালাচার্য্যের) কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মেথরজাতীয়া পালিতা কন্যার সহিত ও মুসলমানদের সহিত তিনি আহার করেন, ইত্যাদি।"

প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের উক্ত মন্তব্যগুলি পড়িলে বোধ হয়, মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুসারেই তাঁহার পুত্রের সহিত রাজা গোপালাচার্য্যের কন্যার বিবাহ হইতেছে! ব্যাপার কিন্তু অন্যরূপ। মহাত্মাজীর পুত্র এবং রাজা গোপালাচার্য্যের কন্যার প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হইবার ফলে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। মহাত্মাজীর নিকট উভয়ের বিবাহের প্রস্তাব করা হইলে পর তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া দৃঢ়ভাবে উহাতে আপত্তি জানান। কারণ, তিনি অসবর্ণ-বিবাহের বিরোধী। কিন্তু অবশেষে তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার মত না হওয়াতে ব্যর্থপ্রেম হেতু এই যুবক-যুবতীর জীবন বিষময় হইয়া উঠিতেছে, তখন তিনি নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে মত দিতে বাধ্য হইলেন। কারণ, অসবর্ণ-বিবাহে তাঁহার আপত্তি থাকিলেও এই যুবক-যুবতীর আপত্তি ছিল না, তাহাদের স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করা উচিত মনে করিলেন না। যে কেহ Young India পত্রিকা নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, মহাত্মাজী কেবল ইহা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই যে, তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, অসবর্ণ-বিবাহ অকল্যাণকর এবং যে ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে, সেই বর্ণের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করাই তাহার কর্ত্তব্য; যে মেথর হইয়া জন্মগ্রহণ করে, মেথরের কার্য্যই তাহার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত, এবং এই ভাবেই তাহার সমাজসেবা করা কর্ত্তব্য, সমাজসেবার কোন বৃত্তিই হীন নহে। "মহাত্মাজী তাঁহার মেথর-জাতীয়া পালিত-কন্যার সহিত ও মুসলমানের সহিত আহার করেন," ইহা সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে। এক পাত্র হইতে আহার গ্রহণ (interdining) তিনি নিন্দা করিয়াছেন। তবে এই পালিত কন্যা এবং মুসলমানের স্পৃষ্ট অন্ন তিনি আহার করেন, ইহা সত্য। কারণ, তিনি অস্পৃশ্যতার বিরোধী। কিন্তু অস্পৃশ্যতার বিরোধী হইলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে দুইটি সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, সে দুইটিতে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন। সে দুইটি হইতেছে (ক) অসবর্ণ-বিবাহে আপত্তি এবং (খ) জন্ম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিই কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করা। সুতরাং প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় যাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মহাত্মাজী যদিও বলেন যে, তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বিশ্বাসী, তথাপি সচরাচর লোক বর্ণাশ্রম বলিতে যাহা বুঝে, তিনি সেই বর্ণাশ্রম মানেন না, ইহা যথার্থ নহে।

(৪) স্বরাজে "সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের, বর্ণের (caste) ও শ্রেণীর (classএর) লোকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান হওয়া চাই। কিন্তু বর্ণাশ্রম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে বিশেষ বিশেষ অধিকার দেয়।"

যদি প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, স্বরাজ হইলেও হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এক Penal Codeএর (দণ্ডবিধির) অন্তর্গত হইবে, তাহা হইলে কেহ আপত্তি করিবে না। এখনও ইহারা এক Penal Code দ্বারা শাসিত হইতেছেন, স্বরাজ হইলেও সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা কাহারও অভিপ্রেত নহে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি যে বলেন, বর্ণাশ্রম থাকিলে স্বরাজ হইতে পারে না, ইহার তিনি কিরূপ যুক্তি-সঙ্গত কারণ দিতে পারেন? ইহার উত্তরে তিনি এই কারণ ভিন্ন অন্য কারণ দেন।

(৫) প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা আছে।" হয় ত

আছে। কোনও বিষয়ে নির্ভুল ধারণা করা অতি কঠিন। তাঁহার স্থায় জ্ঞানী ও প্রবীণ ব্যক্তির যদি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ ভুল ধারণা থাকিতে পারে যে, বর্ণাশ্রম হইলে স্বরাজ হইতে পারে না, তাহা হইলে মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্বেষবুদ্ধি বড়ই ভুল ধারণার পরিপোষক। সুতরাং বিদ্বেষ-বুদ্ধি যাহাতে না হয়, এ বিষয়ে সকলের যত্ন করা উচিত। এক ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মের নিন্দা করিলে বিদ্বেষবুদ্ধির উৎপত্তি স্বাভাবিক। অতএব হিন্দুর উচিত নহে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিন্দা করা এবং ব্রাহ্মের উচিত নহে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করা। হিন্দু যদি ব্রাহ্মের সমাজসংস্কার করিবার চেষ্টা করে, তাহাতে যেমন শুভ অপেক্ষা অশুভ উৎপত্তির সম্ভাবনা অধিক, সেইরূপ ব্রাহ্ম যদি হিন্দুর সমাজসংস্কার করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলেও শুভ অপেক্ষা অশুভের উৎপত্তি বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এইরূপ চেষ্টার ফলে বিদ্বেষবুদ্ধি অপরিহার্য্য।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিম-বন্দনা

প্লাবি দুই কূল, আবেগে আকুল, অকূলের ডাক শুনি,
সরস-পুণ্য পরশ বিতরি বরষার সুরধুনী,
খর-রবি-কর-দগ্ধ মহীরে, অভিনব শ্যাম-সম্পদে ঘিরে,
ছুটে যায় যথা তুলি দিকে দিকে গম্ভীর কল-তান,
বঙ্গবাণীর অঙ্গে তেমনি তব নব অবদান।
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

গল্প রচিলে কল্প-লোকের স্বপ্ন-সুষমা আনি,
উজ্জ্বলি তাঁরে প্রোজ্জ্বল অতি সত্যের প্রভা দানি।
অঙ্কিত তব আলেখ্য দেখি, আজো ভাবি মোরা অপূর্ব্ব একি?
সৃষ্টি তোমার ব্যঞ্জনা-বলে সুন্দর সুমহান্!
হে মহা-মনীষি! সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা মূর্ত্তিমান্!
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

"কুন্দ"-কলির গন্ধামোদিত কাব্য-কুঞ্জবন!
(যথা) রঞ্জিছে চিত মঞ্জুল-তানে "ভ্রমর"-গুঞ্জরণ!
(তব) কল্পনা-সরে করে টলমল, প্রফুল্ল কমল!
মূর্ত্ত হইল যাহার মাঝারে গীতার কর্ম্ম জ্ঞান!
কি চিত্র তব "সত্যানন্দ" বিচিত্র মহীয়ান্!
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

ভাষার বর্ণে ভাব-তুলিকায় আঁকিলে যে ছবি, কবি!
সপ্তকোটি বাঙ্গালীর হৃদে চির-অঙ্কিত সবি!
রক্তের সনে শিরায় শিরায়, তোমার কাহিনী যেন বয়ে যায়,
নিদ্রায় তারা স্বপ্ন মোদের জাগ্রতকালে ধ্যান!
বঙ্গ-হৃদয়-সঙ্গীত তব অপূর্ব্ব আখ্যান।
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

নির্ম্মিলে তুমি "আনন্দমঠ" মন্দির জননীর,
বন্দন গীতি-মন্ত্র-মুখর বক্ষেতে বনানীর!
মূর্ত্তি মাতার দশ-মহাভুজা, গাহি মন্দিরে করে সবে পূজা,
বন্দি মাতায় নির্ভয়ে গায় সাতকোটি সন্তান!
প্রাণে মায়া-হীন সাধিবার তরে স্বদেশের কল্যাণ
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

যে মহামন্ত্র তোমার কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিল, ঋষি!
ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে আজি তা' মন্দ্রিছে দিবানিশি।
হিমাদ্রি হ'তে কন্যা-কুমারী, উচ্চারে মহামন্ত্র তোমারি,
ছুটে যায় সবে ভৈরব রবে সে মন্ত্র করি গান!
আকাশ, বাতাস, সাগর ভূধর, সে তানে কম্পমান!
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

সন্তানবর! স্বদেশ-মাতারে কি ভালবাসিলে তুমি।
গাহিলে আবেশে "ত্বং হি দুর্গা জননী জন্ম-ভূমি!"
তব রচনার পাতায় পাতায়, বন্দিনী মা'র বেদন-গাথায়,
বহিতেছে যেন লক্ষ ধারায় অশ্রু-জলের বান!
কে আছে পাষাণ সে কাহিনী শুনে ঝরিবে না দুনয়ান?
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

তব বিচিত্র "কমলাকান্ত" ওগো সাহিত্যভূপ!
বিমল-কান্ত প্রতিভার তব অবদান অপরূপ!
বাহিরে রঙ্গ-রসের পাথার, কিন্তু রয়েছে অন্তরে তার,
কোথাও দিব্য দেশাত্মবোধ উন্নত গরীয়ান্,
কোথাও দীপ্ত তত্ত্বের অসি উদ্যত খরশাণ!—
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

"ভীরু কাপুরুষ চির-দুর্ব্বল" কলঙ্ক বাঙ্গালীর
মর্ম্মেতে তব বাজের মত দিয়েছিল ব্যথা, বীর!
কহিলে গর্জ্জি "কাপুরুষ তারা, বিজয়-গর্ব্বে এক দিন যারা
সিংহল, বালি, সুমাত্রা দ্বীপে করেছিল অভিযান?"
ধরিলে লেখনী প্রচণ্ড তেজে রাখিতে জাতির মান।
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

সর্ব্ববিষয়ে ভূষিল ভাষায় তোমার প্রতিভা-জ্যোতি,
ধর্ম্মেরও তুমি মর্ম্ম উঘাড়ি' দেখাইলে, মহামতি!
বাঙ্গালীরে তুমি দিলে নব ভাষা, দিলে নব প্রাণ, দিলে নব আশ
জাগিল বাঙ্গালী তোমারি শিক্ষা-বলে হয়ে বলীয়ান্,
তোমারি দীক্ষা দিল বাঙ্গালীরে মোক্ষের সন্ধান!
বন্দি তোমারে বঙ্গের গুরু বঙ্কিম মহাপ্রাণ!

শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন সাহিত্য-বিশারদ।

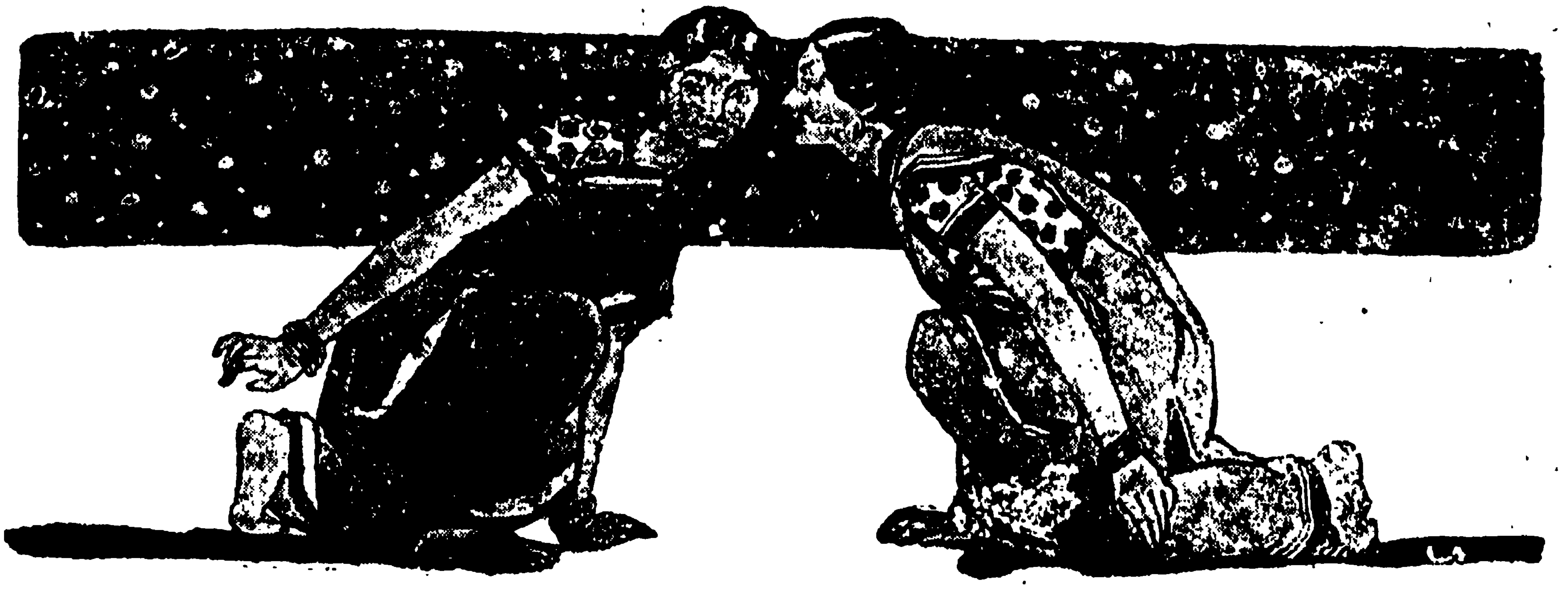

পিশাচের নাগপাশ

নবম প্রবাহ

ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে

মিঃ লক ভীতি-বিস্ময়পূর্ণ-নেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই আদালতে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত যে লোকটি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার আসল নাম ধরিয়া আহ্বান করিল, তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল; কিন্তু তিনি পলায়নের সুযোগ পাইলেন না। সেই আমেরিকানটা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনিই ত মিঃ লক, কি বলেন?"

মিঃ লক মৃদুস্বরে বলিলেন, "মিঃ স্ক্রডার, তুমি তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বাহিরে চল। তোমার সঙ্গে আমার দুই একটি জরুরী কথা আছে।"

মিঃ লক তাহার হাত ছাড়াইয়া আদালতের বাহিরে আসিলেন, আমেরিকানটা তাঁহার অনুসরণ করিল।

আদালতের বাহিরে কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র ভোজনাগার ছিল; স্থানটি তখন নির্জ্জন ছিল দেখিয়া মিঃ লক স্ক্রডারকে সঙ্গে লইয়া সেই ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিলেন, তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে সেই নগরে আসিয়াছিলেন; কিন্তু নগরের কোন লোক তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিত না, সকলেরই ধারণা ছিল, তিনি আধ-পাগলা প্রত্নতত্ত্ববিদ্, তাঁহার নাম কার্টরাইট।

এই সকল কথা বলিয়া তিনি ক্ষণকাল উৎকণ্ঠিতচিত্তে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন; তাহার পর তাহাকে বলিলেন, "দেখ মিঃ স্ক্রডার, আদালতে আমি তোমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ কারণেই আমি তোমার দৃষ্টি এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, তোমাকে এখানে দেখিয়া আমি খুসী হইয়াছি; কিন্তু তুমি আমাকে আর 'মিঃ লক' বলিয়া সম্বোধন করিও না, চোর-ডাকাত বা গোয়েন্দা সম্বন্ধেও কোন কথার উল্লেখ করিও না।"

তাঁহার কথা শুনিয়া লোকটা ঐরূপ ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, "আমি আদালতে ও ভাবে আপনাকে সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি মিঃ ল—না, না, মিঃ কার্টরাইট! আমি এ রকম অপকর্ম্ম আর কখন করিব না; যদি পুনর্ব্বার ও কায করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে বেত্‌সনের কাঁটার ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন।"

মিঃ লক বলিলেন, "আশা করি, তোমার কথা কেহ শুনিতে পায় নাই। তবে আদালতের দরজার কাছে যে লোকটা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার ভাবভঙ্গী আমার ভাল বোধ হইতেছিল না। সেনাপতি কলভেটি এই অঞ্চলের এক জন নামজাদা লোক, তাহার সঙ্গে আমি উহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি।"

আমেরিকান স্ক্রডার বলিল, "আমি এখানে আসিয়া আমার জাহাজেই বাস করি; আমার জাহাজখানির নাম 'কানিপ্‌সো।' আমি কত দিন এখানে থাকিব, তাহার স্থিরতা নাই। তবে ইতিমধ্যে আপনি যদি কোন বিপদে পড়েন, তাহা হইলে আমি আপনাকে যথাশক্তি সাহায্য করিব। আপনি যে সেনাপতির এত খ্যাতি-প্রতিপত্তির

কথা শুনিয়া আসিতেছেন, সে একটা নিরেট আহাম্মুখ। সে কলের কামান দেখিয়া মনে করে, উহা এক বাণ্ডিল বিচিলী! আপনি বিপন্ন হইয়া আমাকে জানাইলে আমি রেডিওর সাহায্যে 'সামচাচার' (আমেরিকান) কোন যুদ্ধজাহাজে সেই খবর দিয়া আপনাকে উদ্ধার করিতে অনুরোধ করিব; তাহা হইলে তাহারা কামান দাগিয়া এ ভাবে গোলা-বর্ষণ করিবে যে, কালেশোর চারিদিকে গর্ত্ত হইয়া যাইবে। সেনাপতির সাধ্য নাই যে, সেই ধাক্কা সামলাইবে।"

মিঃ লক তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, লম্বা লম্বা কথা বলাই তাহার স্বভাব; তাহার বাক্যাড়ম্বরের কোন মূল্য নাই। তথাপি সে তাঁহার হিতৈষী, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তিনি তাহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিলেন, "দেখ মিঃ স্নুডার, এখন আমি আমার হোটেলে ফিরিয়া যাইতেছি। পিজারোতে আমার বাসা। তুমি যে কোন দিন সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়া আমার সঙ্গে আহার করিলে আমি সুখী হইব।"

মিঃ লক হোটেলে ফিরিয়া স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি রিগোকে অপরাহ্নে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কারণ, সে যদি তাঁহাকে কোন নূতন সংবাদ দিতে পারে, তাহা শুনিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি হোটেলের যে স্থানে বসিয়া চারিদিক্ লক্ষ্য করিতেন, সেই স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া মিঃ লক তাঁহার কামরার বাহিরে আসিবেন, সেই সময় হোটেলের নীচের তলায় অনেক লোকের কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া ইচ্ছামত হোটেলের ভিতর দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছিল এবং হোটেলের অধ্যক্ষ তীব্র স্বরে তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মিঃ লক দোতলার একটি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সভয়ে মাথা টানিয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি নীচে এক দল সৈন্য দেখিতে পাইয়াছিলেন; তাহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে হোটেলের বাতায়নগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল।

মিঃ লক তৎক্ষণাৎ দ্বারের দিকে দৌড়াইলেন। কোন অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইলেন; তিনি অবিলম্বে পলায়ন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

কিন্তু তখন আর পলায়নের সুযোগ ছিল না। তিনি দ্বার খুলিবামাত্র বাহিরের সিঁড়িতে এক জন রাজকর্ম্মচারীকে দেখিতে পাইলেন। যে কর্ম্মচারী পূর্ব্বে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, এবারও সেই ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তাহার পশ্চাতে এক দল সৈন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি রাইফেল!

তাহারা মিঃ লককে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের হাতের রাইফেল প্রসারিত করিল। সেই সৈন্যদলের অধিনায়ক মিঃ লককে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনাকে পুনর্ব্বার বিরক্ত করিতে হইল, এ জন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু মহাশয়কে এই মুহূর্ত্তে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ পাইয়াছি।"

মিঃ লক বলিলেন, "আমার অপরাধ? আমি ত জরিমানার টাকা দাখিল করিয়া"—

সৈনিক কর্ম্মচারী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া অধীর স্বরে বলিল, "হাঁ, হাঁ, জরিমানার টাকা আপনি দাখিল করিয়াছেন, তাহা আমার জানা আছে; কিন্তু আপনি কি মনে করেন, উহা বসন্তরোগের টীকা, একবার চামড়া বিঁধাইয়া টীকা লইলে রোগ আর কখনও আপনার কাছে ঘেঁসিবে না? আপনি যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহার শাস্তি ত হইয়াই গিয়াছে; কিন্তু আপনার নূতন অপরাধ কি, তাহা আমার জানা নাই। আপনার অপরাধ যাহাই হউক, খোদ সেনাপতি আপনাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবার আদেশ করিয়াছেন; আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।"

মিঃ লক বলিলেন, "সেনাপতি কলভেটি আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছেন?"

সৈনিক কর্ম্মচারী বলিল, "হাঁ সিন্নর, আপনি আমার উপদেশ গ্রহণ করুন; আপনি সেনাপতিকে অসন্তুষ্ট

করিবেন না। তিনি অসন্তুষ্ট হইলে আপনার কাঁধের উপর মাথাটি না থাকিতেও পারে।"

মিঃ লক বলিলেন, "যদি আমি তাঁহাকে খুসী করিতে না পারি, যদি আমি তাঁহার এই অবৈধ আদেশ পালন না করি, তাহা হইলে বিনা বিচারে আমার কাঁধের উপর হইতে মাথাটা কাটিয়া ফেলা হইবে? আমি ত তাঁহার পিয়ন নহি যে, তিনি ইচ্ছামত আমাকে জেলে পুরিবেন, আবার জেলখানা হইতে বাহির করিয়া দিবেন?"

কর্ম্মচারী বলিল, "হঁ্যা সিনর, তাঁহার সে ক্ষমতা আছে; কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করিতে চাহি না। আমি তাঁহার আদেশ পাইয়াছি—সেই আদেশ পালন করিব। আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়া 'প্রেসিডিও'তে লইয়া যাইব। যদি আপনি আমার সঙ্গে যাইতে না চাহেন, তাহা হইলে আপনাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইব না; সেনাপতির দ্বিতীয় আদেশটি পালন করিব।"

মিঃ লক বলিলেন, "সেনাপতির দ্বিতীয় আদেশটি কি?"

কর্ম্মচারী বলিল, "আপনাকে গুলী করিয়া মারিবার জন্য আমার সৈন্যগণকে আদেশ করিব। এতদ্ভিন্ন আমিও নিরস্ত্র নহি; এই দেখুন।"

কথা শেষ করিয়াই সে বুকের পকেট হইতে টোটাভরা পিস্তল বাহির করিল এবং তাহা সে মিঃ লকের ললাটে উদ্যত করিল।

মিঃ লক তাহার কথা শুনিয়া এবং ভাবভঙ্গী দেখিয়াও নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া কর্ম্মচারী বলিল, "দেখুন সিনর, আমরা সকলেই সেনাপতির আদেশ-পালনে প্রস্তুত। আপনি আমাদের সঙ্গে না যাইলে এই দুপুর রৌদ্রে ঐ উত্তপ্ত পথ দিয়া আপনাকে লইয়া যাইবার কষ্ট হইতে আমি অব্যাহতি লাভ করিব।"

মিঃ লক বলিলেন, "অর্থাৎ?"

কর্ম্মচারী বলিল, "অর্থাৎ আপনাকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়া আপনার মৃতদেহ এখানে ফেলিয়া যাইব। তাহার পর জেলখানার গাড়ীতে তাহা অপসারিত হইবে।".

মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, তাহার আদেশপালন ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই। তিনি আরও ভাবিয়া দেখিলেন, যদি তাহারা তাঁহাকে দেশনায়কের (প্রেসিডেণ্ট) বাসস্থান কিল্লার ভিতর লইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি যত সহজে বয়েল ও তাঁহার কন্যাকে সাহায্য করিবার সুযোগ পাইবেন, কিল্লার বাহিরে থাকিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে সেরূপ সহজ হইবে না। এতদ্ভিন্ন তিনি সেনাপতির আদেশ পালনে অসম্মত হইলে সৈনিকরা তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই সকল কারণে তিনি তাহাদের সহিত যাইতে সম্মত হইলে দৈনিক কর্ম্মচারী তাঁহার কোটের পকেটগুলি পরীক্ষা করিয়া পকেট হইতে পিস্তলটি বাহির করিয়া লইল।

মিঃ লক মনে করিলেন, তাঁহাকে তাহারা কিল্লার জেলখানায় আবদ্ধ করিলেও তিনি অল্প চেষ্টাতেই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি যে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা দেখিয়াই তাঁহার ঐরূপ ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কিল্লার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, এই স্থানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। কিল্লার কারাপ্রাচীর অত্যন্ত স্থূল ও দুর্ভেদ্য, তাহার দ্বার-জানালাগুলি লৌহনির্ম্মিত কপাট ও লোহার স্থূল গরাদে দ্বারা সুরক্ষিত, এবং প্রত্যেক দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান। মিঃ লক কিল্লার অন্তর্ব্বর্ত্তী কারাকক্ষে নীত হইলেন। ঘূর্ণ্যমান পাষাণসোপানের সাহায্যে তাঁহাকে কারাগারে প্রবেশ করিতে হইল। সেই সোপানশ্রেণী এরূপ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন যে, সেই সঙ্কীর্ণ পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিবার সময় একটা লণ্ঠন সঙ্গে লইতে হইল। বিভিন্ন দ্বার অতিক্রম করিবার পর তাঁহার পশ্চাতে সেই সকল দ্বারের তালা বন্ধ করা হইল। এই ভাবে বিভিন্ন দ্বার অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সেই সঙ্কীর্ণ কক্ষটিই তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

দশম প্রবাহ

প্রাণদণ্ডের আদেশ

মিঃ লক সেই নিভৃত কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়া কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া সেই কক্ষের প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই কক্ষের প্রাচীরের ঊর্দ্ধে স্থূল গরাদে দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বাতায়ন ছিল; সেই বাতায়নের ভিতর

দিয়া যে আলো আসিতেছিল, সেই আলোকে কারাকক্ষটি আলোকিত হইতেছিল, নতুবা সেই কক্ষের অন্ধকার অপসারিত হইবার অন্য কোন উপায় ছিল না। কারা-প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে একখানি অপ্রশস্ত, পুরাতন, ধূলি-সমাচ্ছন্ন তক্তা সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই কয়েদীর শয্যারূপে ব্যবহৃত হইত; এতদ্ভিন্ন একখানি টেবিল ও একখানি চেয়ারও সংস্থাপিত ছিল। দেওয়ালে কয়েকটি লোহার কড়া প্রোথিত ছিল এবং তাহাতে কয়েক গাছা লৌহ-শৃঙ্খল আবদ্ধ ছিল। দুর্দান্ত ও অবাধ্য কয়েদীগণকে সেই শৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইত।

মিঃ লক সেই শৃঙ্খল দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "মধ্য-যুগের ব্যবস্থা এই বিংশ শতাব্দীতেও এখানে প্রবর্ত্তিত আছে দেখিতেছি!"

মিঃ লককে দুই দিন এই কারাপ্রকোষ্ঠে বাস করিতে হইল। কারাধ্যক্ষ ব্যতীত এক জন নির্ব্বাক্ কারারক্ষী প্রত্যহ একবার সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে তাঁহার খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া যাইত। তাহাদের পদশব্দ এবং সেই কক্ষের দ্বার খুলিবার ও দ্বার বন্ধ করিবার শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ মিঃ লকের কর্ণগোচর হইত না। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনে হইত, তিনি সমাধিগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, সেই সমাধিগর্ভ হইতে জীবনে তাঁহার নিষ্কৃতি-লাভের আশা নাই। তাহা যেন তাঁহার জীবন্ত সমাধি।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই কারাপ্রকোষ্ঠ সমাচ্ছন্ন হইলে মিঃ লক কারাকক্ষের বাহিরে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। সেই সময় তিনি প্রাচীরস্থিত বাতায়নের নীচে যাইতেছিলেন, দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া তাঁহার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে কারাদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটি লণ্ঠনের আলোক তাঁহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল।

মিঃ লক সুপ্তোত্থিতের ন্যায় শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, সেনাপতি কলভেটির ক্ষুদ্র চক্ষুর ধূর্ত্ততাপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল!

অবশেষে সেনাপতি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ-ভরে তাঁহাকে অভিনন্দন করিল! সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "নমস্কার, সিনর লক!"

মিঃ লক তাহার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "লক! লক কে? আমার নাম কার্টরাইট।"

কলভেটি বলিল, "আমার সঙ্গে চালাকী করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। তুমি বোধ হয় শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, তোমার সকল কথাই আমার সুবিদিত। আমি জানি, তোমার আসল নাম মিঃ ফেরার লক, এবং তুমি এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডিটেক্টিভ। আমি স্বীকার করি, লণ্ডনে তুমি গোয়েন্দাগিরি করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলে; কিন্তু এ ত লণ্ডন নহে, এখানে তোমার চালাকী খাটিবে না। আমি তোমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই মনে করি, তুমি নির্ব্বোধ না হইলে ছদ্ম নাম ধারণ করিয়া এই দূরদেশে কি অনধি-কারচর্চ্চা করিতে আসিতে? যে কার্য্যের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই—সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া তোমার সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট ও জীবন বিপন্ন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? হী—হী! তুমি আশা করিয়াছিলে, তুমি আমার কবল হইতে ক্যাপিটান বয়েল ও তাহার সুন্দরী কন্যাকে উদ্ধার করিয়া দেশে লইয়া যাইবে? এরূপ দুরাশাকে যে মনে স্থান দান করে, সে যদি নির্ব্বোধ না হয় ত নির্ব্বোধ কে? আমার কথা শুনিয়া তুমি বুঝিতে পারিয়াছ—আমি তোমার মনের কথা সকলই জানিতে পারিয়াছি?"

মিঃ লক বলিলেন, "তুমি পাগলের মত কি বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমার নাম কার্ট-রাইট; আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ্। কালেশ নগরে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিবার সুযোগ আছে শুনিয়া আমি এখানে প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন করিতে আসিয়াছি।"

কালভেটি মাথা নাড়িয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "হাঁ, হাঁ, এই রাজ্যে তুমি প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন করিতে আসিয়াছ; প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার উপযুক্ত স্থান এখানকার যত ইতর লোকের হোটেল! সেই হোটেলে নাচের মজলিসে উপস্থিত হইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যোগদান করাই তোমার প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার উৎকৃষ্ট উপায়! প্রত্নতত্ত্বের এরূপ উপাদান পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

মিঃ লক বলিলেন, "এই অপরাধেই কি আমাকে এই নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছে? ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে আমার নিকট হইতে যে জরিমানা আদায় করা হইয়াছে,

...ই অর্থ-দণ্ডই কি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই ; এই কারাদণ্ড কি তাহার উপর ফাউ ?"

কলভেটি বলিল, "দেখ সিনর, তুমি আমাকে যত নির্ব্বোধ মনে কর, আমি তত নির্ব্বোধ নহি। তোমার কি স্মরণ নাই—তোমার মামলার বিচার শেষ হইলে, তুমি যখন আদালতের বাহিরে যাইতেছিলে, সেই সময়ে এক জন আমেরিকান তোমাকে চিনিতে পারিয়া তোমাকে যে নামে ডাকিয়াছিল, সে নাম 'কার্টরাইট' নহে ? তাহা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নাম, তোমার সেই আসল নামটি যে আর কেহ শুনিতে পায় নাই, সকলেই কাণে তুলা গুঁজিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবারই বা কারণ কি ? আমেরিকানটা তোমাকে তোমার আসল নাম ধরিয়া ডাকিলে তুমি কিরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলে—তাহাও কি কাহারও নজরে পড়ে নাই মনে কর ? আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করাইয়াছিলাম কেন জান ? তোমার সম্বন্ধে ভাল রকম তদন্ত করা দরকার মনে হইয়াছিল। লণ্ডনে আমার যে এজেণ্ট আছে, সে যেমন উপযুক্ত লোক, সেইরূপ বিশ্বাসী ; আমি তোমার সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য লণ্ডনে তাহাকে তার করিয়াছিলাম। সিনর লক, তাহার নিকট হইতে আমি তোমার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই বা তুমি কিরূপে জানিবে ? আমি এ সংবাদও পাইয়াছি যে, তুমি আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে ; কিন্তু আমরা কি তোমাদের সরকারের খাস-মহলের প্রজা যে, আমরা তোমাদের বৃটিশ সরকারের হুকুম তামিল করিব ?"

মিঃ লক কলভেটির কথা শুনিয়া বলিলেন, "যদি আমার প্রকৃত নাম লকই হয়, তাহাতে কি যায় আসে ? তুমি কি আশা করিয়াছ, চিরকাল আমাকে কয়েদ করিয়া রাখিবে ? বৃটিশ গবর্মেণ্ট কি তোমার এই ব্যবহারে—"

কলভেটি বাধা দিয়া বলিল, "বৃটিশ সরকার তোমার কি উপকার করিতে পারে ? তাহারা কি তোমার মত ক্ষুদ্র ...টের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিবে ? একটা সামান্য গোয়েন্দার জন্য বৃটিশ সরকার কোটি কোটি টাকা ...র খরচা বহন করিবে ? তাহাদের কি আর কোন কায ...ই ? আর যদি সত্যই তাহারা তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করেও, তাহা হইলে সেই চেষ্টা কি সফল হইবে মনে কর ? তাহার পূর্ব্বেই যে গোরের ভিতর তোমার অস্থি-কঙ্কাল সাদা হইয়া যাইবে। একটা গোয়েন্দা তাহাদের দেশ হইতে এ দেশে অনধিকারচর্চ্চা করিতে আসিয়াছিল, আমরা তাহাকে ধরিয়া শাস্তি দিয়াছি শুনিয়া তোমাদের দেশের লোকের এতই মাথাব্যথা করিবে যে, তাহারা এই রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য একরাশি যুদ্ধ-জাহাজ পাঠাইবে ? এই বুদ্ধি লইয়া তুমি গোয়েন্দাগিরি কর ? যাহারা আমাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করিতে আসে, তাহাদের কিরূপ শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা তুমি জান কি ?"

"কি ?" বলিয়া মিঃ লক এরূপ উত্তেজিতভাবে সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন যে, কলভেটি ভয় পাইয়া দুই হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর তাহার তলোয়ারের খাপে হাত দিয়া বলিল, "সাবধান, সিনর !"

মিঃ লক বলিলেন, "গোয়েন্দাগিরির কিরূপ শাস্তির কথা বলিতেছিলে, শুনি !"

কলভেটি বলিল, "গুপ্তচর ধরা পড়িলে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই তাহার কিরূপ শাস্তি হয়, তাহা কি তুমি জান না ? বিদেশী গুপ্তচর ধরা পড়িলে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। আমাদের এই কালেশ নগরে গুপ্তচরের ভাগ্যে ভিন্নরূপ ব্যবস্থা হয় না। কিন্তু আমার দয়ার শরীর, তুমি যাহাতে সসম্মান মৃত্যুকে বরণ করিতে পার, তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছি।"

মিঃ লক বলিলেন, "বিনা বিচারে আমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবে ? দুই হাত বাড়াইয়াও তোমার দয়ার 'বেড়' পাওয়া যায় না !"

কলভেটি বলিল, "বিচার ! বিচারের কথা কি বলিতেছ ? ও একটা কুসংস্কার, একটা অভিনয়মাত্র ; বিচারের অভিনয়ে সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি ? কা'ল সন্ধ্যার পর তোমাকে এই কারাপ্রকোষ্ঠের বাহিরে লইয়া গিয়া রাইফেলের গুলীতে বীর পুরুষের মত হত্যা করা হইবে। হাঁ, তুমি বীরের আকাঙ্ক্ষিত গৌরবজনক মৃত্যু লাভ করিবে। এখন তুমি সুখে নিদ্রা যাইতে পার—ডিটেক্‌টিভ লক !"

মিঃ লক দেখিলেন, কলভেটি তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। কক্ষদ্বার রুদ্ধ

হইলে তিনি সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাপ্রকোষ্ঠে অনাবৃত তক্তার উপর পড়িয়া রহিলেন। সেই রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। সেই দুর্ভেদ্য কারাকক্ষ হইতে তিনি কি উপায়ে পলায়ন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন অস্ত্র বা যন্ত্রাদির সহায়তা ব্যতীত মুক্তিলাভ অসাধ্য মনে করিয়া তিনি হতাশ হইলেন; অথচ আর এক দিন মাত্র পরেই তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল! এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি কি উপায়ে পলায়ন করিবেন? এই চেষ্টায় কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে?

কিন্তু তিনি আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না; আশায় নির্ভর করিয়াই মানুষ জীবিত থাকে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও সে আশা ত্যাগ করিতে পারে না। মিঃ লক কঠিন কাষ্ঠশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া একটা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, কলভেটি ত সরুটি লাইটওয়ের প্রসঙ্গে তাঁহাকে কোন কথা বলিল না! মিঃ লক যে সময় স্কুডারের সহিত গোপনে আলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় লাইটওয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে অদৃশ্য হইয়াছিল। মানুষ জলে ডুবিবার সময় সম্মুখে ক্ষুদ্র তৃণ দেখিলেও তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া থাকে; মিঃ লকের তখন সেই অবস্থা। তাঁহার আশা হইল, লাইটওয়ে তাঁহার বিপদের সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে গিয়াছে; সম্ভবতঃ সে স্কুডারকে তাঁহার বিপদের সংবাদ জানাইয়া তাহার সাহায্যাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে।

মিঃ লক প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, প্রভাতে কারাধ্যক্ষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, কারণ, কারাধ্যক্ষ পূর্ব্বদিনও প্রভাতে তাঁহার কারাপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

মিঃ লক কারাধ্যক্ষের সংক্ষিপ্ত কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, লোকটি অল্পভাষী; কিন্তু তাহার চোখ-মুখ দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতি কঠোর নহে, এবং তাহার হৃদয়ে বিপন্নের প্রতি সহানুভূতির অভাব নাই। সর্টি লাইটওয়ে তাঁহাকে বলিয়াছিল, পাটানিয়ার রাজকর্ম্মচারীদের প্রায় সকলকেই উৎকোচে বশীভূত করিতে পারা যায়; তাহার কথা সত্য হইলে কারাধ্যক্ষকেও উৎকোচে বশীভূত করা হয় ত কঠিন হইবে না। মিঃ লক মনে মনে স্থির করিলেন, তাহাকে প্রচুর অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া তাহার সাহায্যে পলায়নের কোন উপায় স্থির করিতে পারেন কি না, সে জন্য চেষ্টা করিবেন।

নানা দুশ্চিন্তায় মিঃ লক বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত করিলেন; অবশেষে প্রভাতে তিনি কারাপ্রকোষ্ঠের বহির্ভাগে কাহারও পদশব্দ শুনিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে কারাধ্যক্ষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দুই মিনিটের মধ্যেই কারাপ্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইল, মিঃ লক পূর্ব্বদিনের ন্যায় সে দিনও কারাধ্যক্ষকেই দেখিবার আশায় আগন্তুকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু আগন্তুকের মুখ দেখিয়া তিনি নিরাশভরে একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

তিনি যে ব্যক্তিকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, সে কারাধ্যক্ষ নহে। লোকটা কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার দৃষ্টিতে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা প্রতিফলিত। তাহার কুৎসিত মুখ যেন পিশাচের মুখের প্রতিচ্ছবি। মিঃ লক জীবনে কখন কোন মনুষ্যের সেরূপ ভীষণ মুখকান্তি নিরীক্ষণ করেন নাই। তাহার সেই বিকট, দন্তহীন মুখ শুষ্ক ক্ষতচিহ্নে পূর্ণ!

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

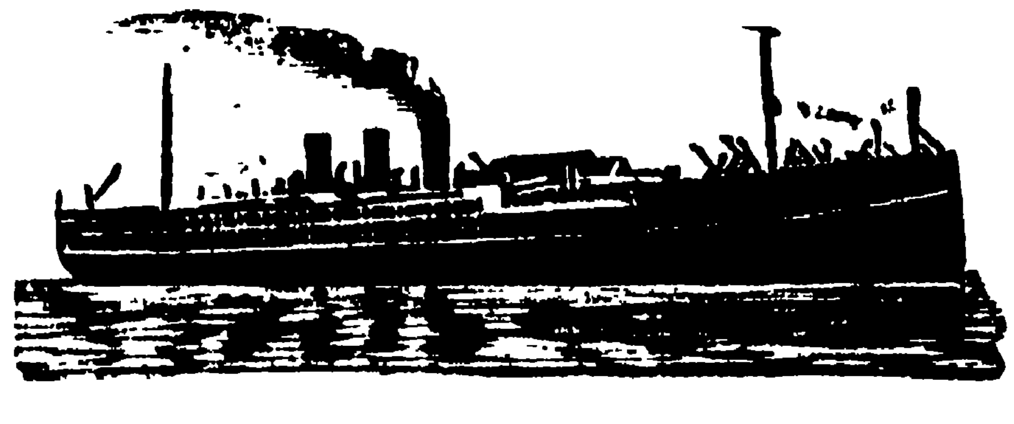

একে বহু

মাত্র আলোক ও ছায়া এবং প্রসাধন-কলার সাহায্যে রূপদক্ষ শিল্পী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী নিম্নের মূর্ত্তিগুলি ধারণ করিয়াছেন। সাগর-পারে না গিয়াও দেশে থাকিয়া তিনি যে বিশিষ্টতা দেখাইয়াছেন, তাহা অনুকরণযোগ্য।

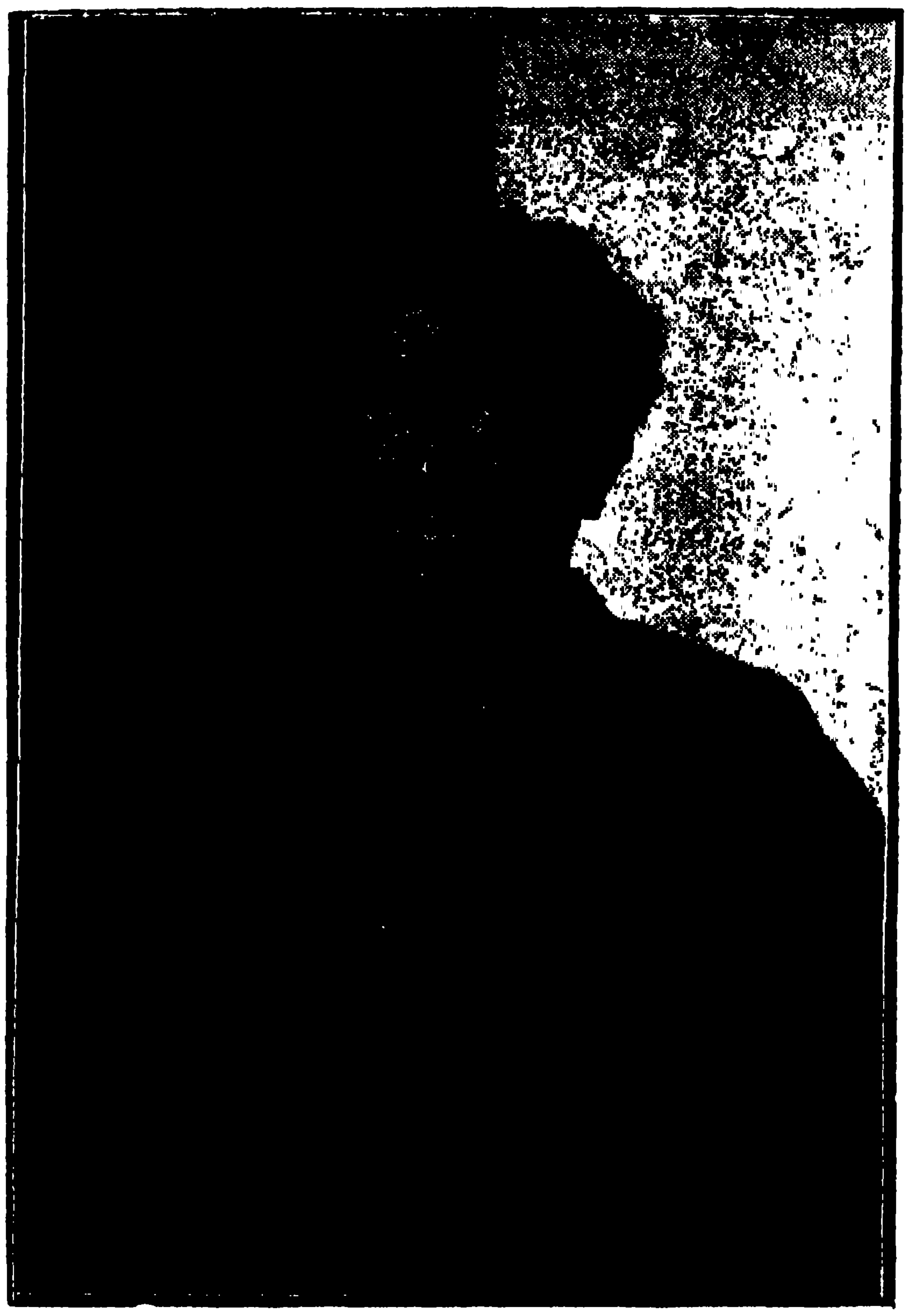

অ্যাবিসিনিয়ান

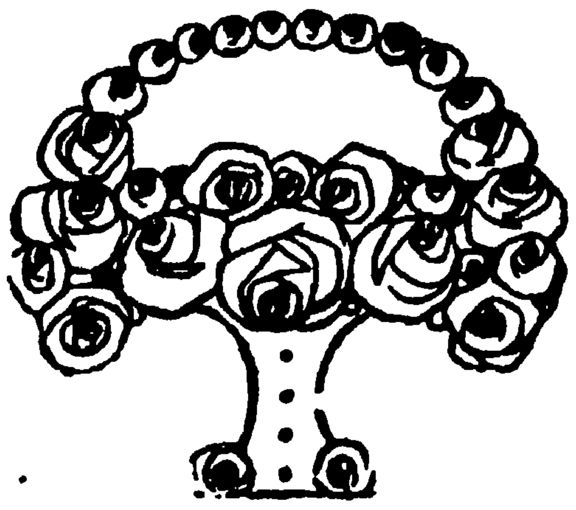

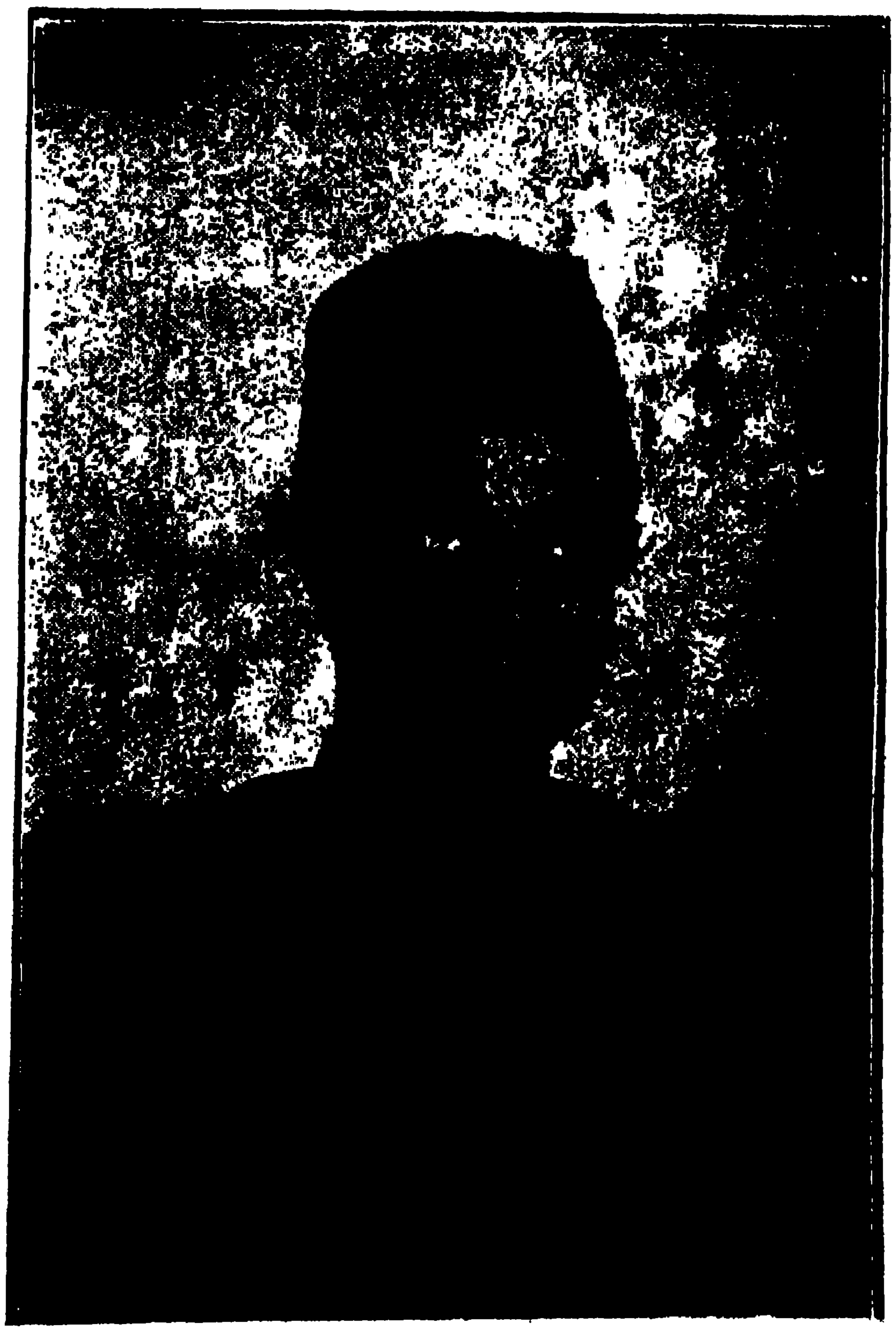

মুসলমান

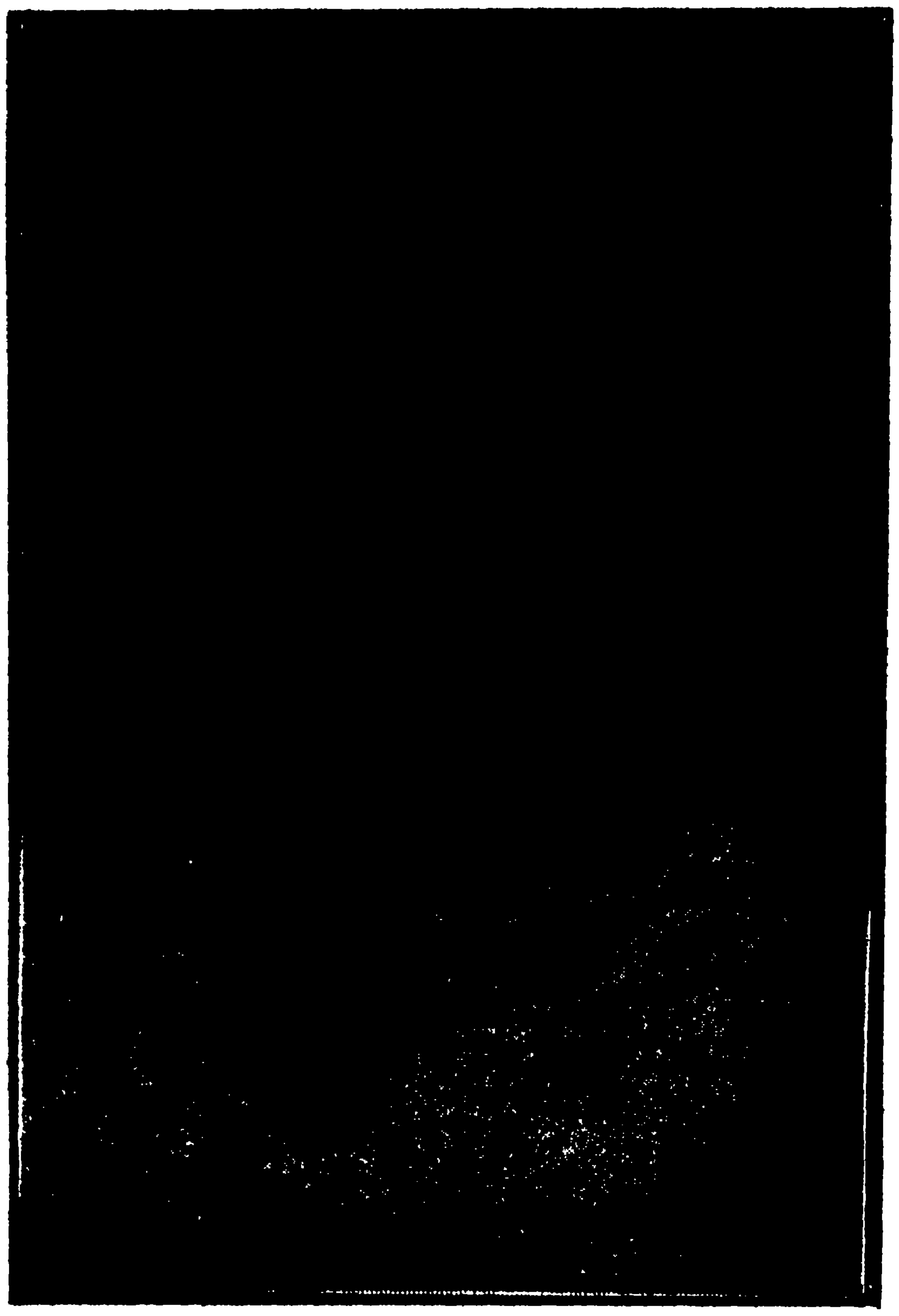

মাদ্রাজী

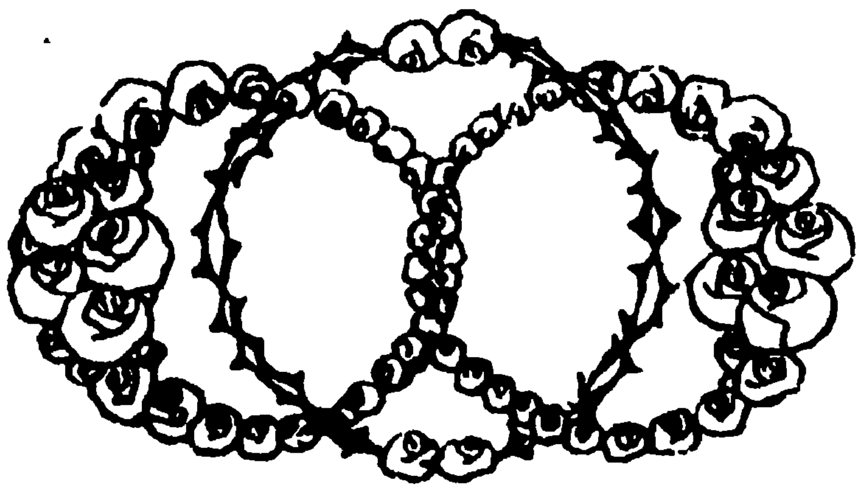

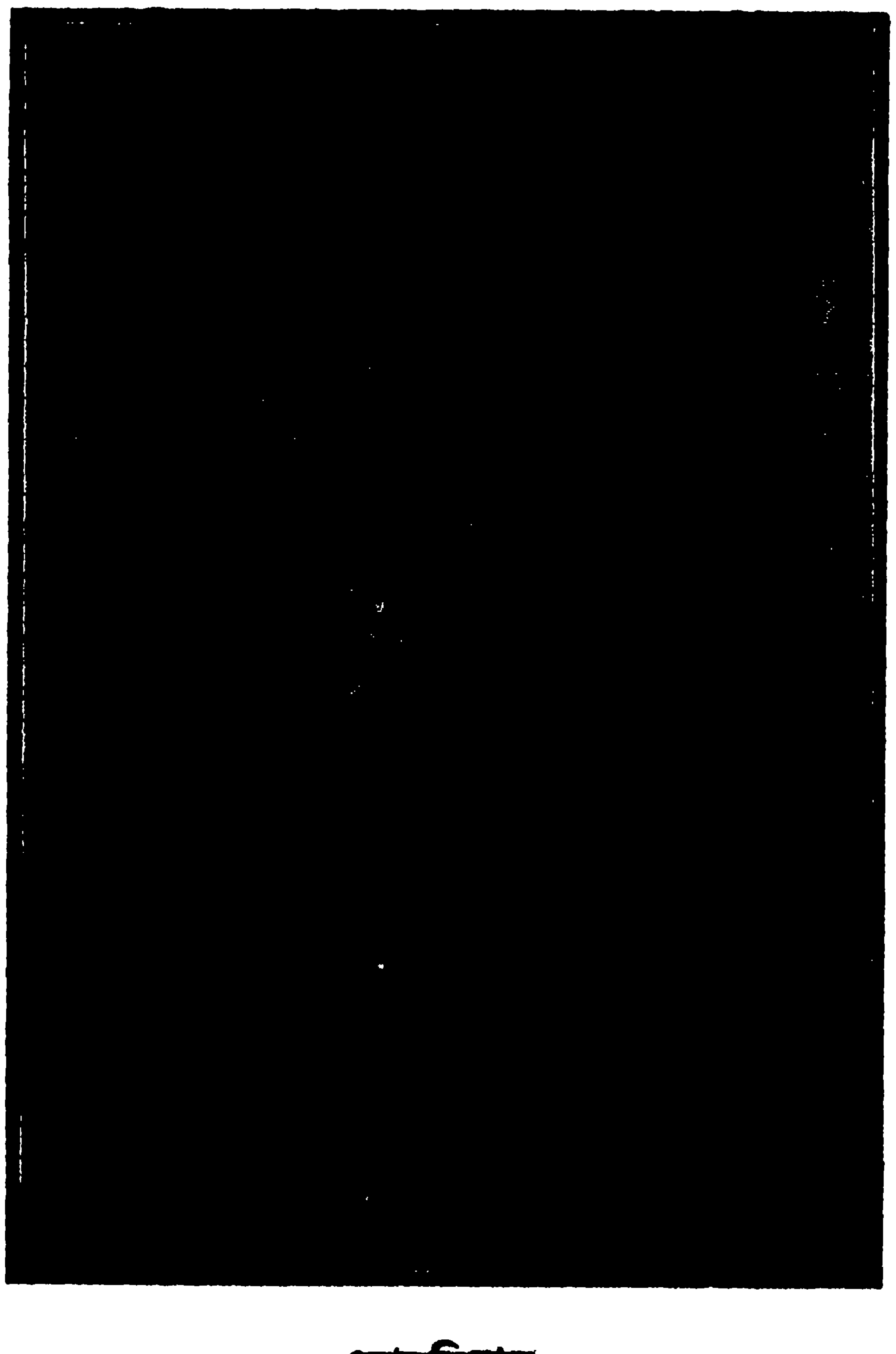

মোঙ্গলিয়ান

[রূপদক্ষ শিল্পী—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

তৃতীয় পর্য্যায়

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে যে-সকল নাট্যশালার কথা বলা হইল, তাহাতে সর্ব্বশেষ যে অভিনয় হয়, তাহার তারিখ ও বাঙ্গালা দেশে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার মধ্যে বারো বৎসরের কিছু বেশী ব্যবধান। নাট্যশালার এই বারো বৎসরের ইতিহাস অনেকটা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি বৎসরের ইতিহাসের মতই। তখনও কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সামান্য কিছু অর্থব্যয়মাত্র করিয়াই অভিনয় দেখিবার আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ ছিল না। তখনও নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও অভিনয় কয়েক জন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উৎসাহের উপর নির্ভর করিত। তাঁহারা অভিনয় দেখিবার জন্য তাঁহাদের বন্ধুবর্গকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেন বটে, কিন্তু এই সকল অভিনয়ে সর্ব্বসাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না। এইটি ছাড়া সে যুগের নাট্যাভিনয়ের আর একটি অসম্পূর্ণতাও ছিল। তখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালা দেশে নাট্যাভিনয় অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক-ভাবে আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনী বা বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের হুজুগ দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু, মত-পরিবর্ত্তন বা উৎসাহ-লোপ হইলে সে নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইত, এবং আর এক জন নাট্যানুরাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত নাট্যাভিনয় একবারে বন্ধ থাকিত। এই সকল কারণে শকুন্তলা, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, রত্নাবলী, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি অভিনয় হইবার পরও আমরা বাঙ্গালা পত্রিকায় নাট্যাভিনয়ের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ ও দুঃখ পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সোমপ্রকাশের' একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিতেছেন,—

> "...আমাদিগের পূর্ব্বতন অভিনয়াদি পুনরুজ্জীবিত হউক। রত্নাবলী, শকুন্তলা প্রভৃতির অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম এই সভ্য আমোদ ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইবে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আর উহার প্রসঙ্গ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুনরায় তাঁহাদিগের এ বিষয়ে চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। স্বভাবের অনুকরণ দর্শন ব্যতিরেকে কৃতবিদ্যব্যক্তিদিগের নয়ন ও মনের প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।"

এই মন্তব্য পড়িয়া মনে হয়, সে সময়েও লোক সাধারণ নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে সচেষ্ট হইতেছিল। কিন্তু সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা আরও দশ বৎসর পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হয়। তাহা হইলেও এই দশ বৎসর কলিকাতা নাট্যাভিনয়-বর্জ্জিত ছিল না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় কয়েকটি অতি উচ্চশ্রেণীর সখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল নাট্যশালা সাধারণ না হইলেও উহাদের সাজসজ্জা অতি উচ্চাঙ্গের ছিল, এইগুলিতে যে-সকল অভিনয় হইত, তাহাতেও খুব উৎকর্ষ দেখা যাইত। প্রকৃত-প্রস্তাবে সখের নাট্যশালাতেই বাঙ্গালা দেশের সাধারণ নাট্যশালার ভিত্তিস্থাপন ও শিক্ষা হয়। বাঙ্গালা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে, বেলগাছিয়া প্রভৃতি নাট্যশালার মত পরের যুগের সখের নাট্যশালাগুলির স্থানও অতি উচ্চে।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় এ যুগের প্রথম নাট্যশালা। উহা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বাবু (পরে মহারাজা স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক তাঁহার নিজ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়ই এই নাট্যশালার প্রথম অভিনয়।

ইহার পূর্ব্বেও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদি বাড়ীতে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।* এই অভিনয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন

---

*"In 1859 the Nataka Malavikagnimitra or Agnimitra and Malavika, was performed ...."—"The Modern Hindu Drama" by Kishori Chand Mitra. **Calcutta Review, 1873,** p. 259.

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের শেষ দুই অঙ্কের পাণ্ডুলিপি মাইকেলকে পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। সুতরাং এই তারিখের পরে যে নাটকখানি অভিনীত হয়, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ('মধু-স্মৃতি', পৃ ১২০ দ্রষ্টব্য)।

যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের উক্তি যে নির্ভরযোগ্য, তাহার প্রমাণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মাইকেল মধুসূদনকে লিখিত যতীন্দ্রমোহনের নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানিতে পাওয়া যাইবে।—

"...আমার বিশ্বাস, রাজারা [পাইকপাড়ার] বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন বাংলা নাটকের অভিনয় করাইবেন না। আর আমার ভ্রাতার নাট্যশালার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার আশঙ্কা হয় 'মালবিকা'র অভিনয় এই নাট্যশালার প্রথম ও শেষ অভিনয়।" *

'মালবিকাগ্নিমিত্রের' অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন,—

"প্রথমে গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীর দোতালার নাচঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বলিলেন- 'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' † নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবারমাত্র Stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন;...আমি বিদূষক সাজিয়াছিলাম,...।" ‡

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের এই অভিনয়ের বৎসর-ছয়েক পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ও উহাতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০এ ডিসেম্বর 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালায় ইহার পর বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় হয়।...এই নাটকটি রাজা যতীন্দ্রমোহন কর্ত্তৃক নাট্যাকারে লিখিত হয়। তিনি ইহা সংশোধন করিয়া সমুদয় অশ্লীল ইঙ্গিত বর্জ্জন করেন।...এই নাটকটির অভিনয় হয় ১৮৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে, এবং ইহা অভিনীত হইয়া যাইবার পর 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে একটি হাস্যরসাত্মক প্রহসনের অভিনয় হয়।"

কিশোরীচাঁদ মিত্র এই অভিনয়ের যে-তারিখ দেন, তাহা ঠিক। কারণ, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রেও পাইতেছি :—

"গত সপ্তাহে [রেওয়ার] মহারাজা শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিমিত্ত ঐ রম্য ভবন অতি চমৎকার রূপে সুসজ্জীভূত করা হইয়াছিল, তথায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া পরে বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে আগমন পূর্ব্বক তথায় বিদ্যাসুন্দর অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যথেষ্ট আমোদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

বিদ্যাসুন্দর নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী। এই অভিনয়কালেও রেওয়ার রাজা উপস্থিত ছিলেন। পরবর্ত্তী ৯ই জানুয়ারী তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে পাইতেছি :—

"...আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে রাওয়ার মহারাজা সে দিবস [শনিবার, ৬ জানুয়ারী] শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আরো শুনা গেল যে মহারাজ গীত বাদ্যে পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমেটীয়ারদিগকে তিন হাজার টাকা ও প্রতি জনকে এক এক খানা কাসমেরি শাল পুরস্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভদ্রসন্তান ও মানের কারণ উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।"

১০ই জানুয়ারী তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রে এই অভিনয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণের লেখক অভিনয়ের দু-একটি দোষ-ত্রুটি দেখান, কিন্তু বিদ্যা, গঙ্গাভাট, রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতির অভিনয় অতি চমৎকার হইয়াছে বলেন। এই বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয়ের পর পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে যে-প্রহসনটি প্রদর্শিত হয়, উহার নায়ক একটি বৃদ্ধ মুনসেফ; তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করেন। এই লেখকের মতে দৃশ্যপট ও গীতবাদ্য বেশ মনোরম হইয়াছিল।

'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে কে কি সাজিয়াছিলেন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 'সন্দর্ভ-সংগ্রহে' তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

* 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'—যোগীন্দ্রনাথ বসু, ৩য় সং, পৃ ২৬৫-৬৬।

† "কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের মর্ম্মানুবাদ" করেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর,—রামনারায়ণ তর্করত্ন নহেন। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১২৬৬ ও ১২৮৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তকে শৌরীন্দ্রমোহনের নাম ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহার নাম আছে। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আমি এই নাটকের দুইটি সংস্করণই দেখিয়াছি।

‡ 'পুরাতন-প্রসঙ্গ'—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত: দ্বিতীয় পর্যায়, ১৫৫-৫৬।

রাজা বীরসিংহ (বর্দ্ধমানাধিপতি)	শ্রীরাধাপ্রসাদ বসাক
মন্ত্রী	শ্রীহরিমোহন কর্ম্মকার
গঙ্গা (ভাট)	৺গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুন্দর (কাঞ্চীপুরাধিপতি গুণসিন্ধু রাজার তনয়)	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ধূমকেতু (কোটাল)	শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যা (রাজা বীরসিংহের কন্যা)	৺মদনমোহন বর্ম্মন খোট্টা।
হীরে (মালিনী)	শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুলোচনা, চপলা (রাজকন্যার দাসী)	শ্রীষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায় ৺যদুনাথ ঘোষ ও ফটিকচন্দ্র ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বিমলা (রাজবাটীর প্রতিবাসিনী এবং চপলার সই)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসাক
প্রতীহারী	শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রহরী	ব্রজদুর্ল্লভ দত্ত

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন—ঘনশ্যাম বসু। * এই নাট্যালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক ও 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসনটি আট-নয় বার অভিনীত হয়। ১৮৬৬, ২৩এ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের অভিনয়ে "বিজয়নগরের মহারাজা সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন।"

এই অভিনয়গুলির পর পাথুরিয়াঘাটায় 'বুঝলে কি না' নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। উহার তারিখ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর। সেই বৎসরের ২২এ ডিসেম্বর (শনিবার) তারিখের 'বেঙ্গলী'তে দেখিতে পাই,—

"গত শনিবার পাথুরিয়াঘাটার সখের দলের থিয়েটার নাট্যানুরাগী ব্যক্তিগণকে গীতবাদ্য শুনাইয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে, বিশেষ করিয়া এই দলের জন্য লিখিত 'বুঝলে কি না' নামে একটি বাংলা প্রহসনের সমালোচনা আমরা করিয়াছিলাম; এখন আমরা সুন্দর দৃশ্যপট ও উন্নত স্তরের বাদ্য প্রভৃতির সহিত প্রদর্শিত অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।...ঘন ঘন করতালি ও উচ্চহাস্য হইতে মনে হয় অভিনয় খুব কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দু-এক জন ছাড়া সকল অভিনেতাই বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।...অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দলপতিদের মুখের ভাব ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিতেছিল। আশা করি তাঁহাদের দল পাকাইবার প্রবৃত্তি ইহা দ্বারা লোপ পাইবে, ও বাঙালী সমাজ শান্তি পাইবে।"

ইহার পর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতীমাধব' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকখানি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ১৫ই ফেব্রুয়ারী (৫ই ফাল্গুন ১২৭৫) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দেখিতেছি :—

"মালতীমাধব নাটকের অভিনয়। গত ২৫এ মাঘ শনিবার রাত্রিতে আমরা পাথুরিয়াঘাটায় মালতীমাধব নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।... গ্রন্থের নায়ক মাধব; কিন্তু তাঁহার অভিনয় প্রীতিকর হয় নাই।... মকরন্দের অভিনয়টী অতিশয় মনোহর হইয়াছে। তাঁহার অভিনয়ে, চতুরতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, সদাশয়তা ও অকপট মিত্রানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। অঘোরঘণ্টের পূজা মন্ত্রপাঠ, কপালকুণ্ডলার বলিদানের উদ্যোগ হইয়াছে বলিয়া জিজ্ঞাসা এগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। মাধব যখন মালতীর উদ্ধারসাধন করিলেন তখন তাঁহার মনোরথ বিফল ও যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত হইল দেখিয়া তাঁহার প্রগাঢ় ক্রোধ গালী না দিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে কটিবন্ধন, অব্যাকুলভাবে মাধবকে খড়্গাঘাত করিবার উদ্যোগ, নয়নরক্তিমা ও অঙ্গভঙ্গি এগুলি অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রীর যোগিবেশ ও ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া শোকসম্বরণ অপ্রীতিকর হয় নাই। মালতীর অভিনয় উত্তম হইয়াছে। কামন্দকীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্ত্রীজনদুর্ল্লভ প্রশান্ত সাহস ও চতুরতা অতিশয় আনন্দিত করিয়াছিল। চন্দ্রোদয় মেঘাড়ম্বর বিদ্যুৎ জলপ্রপাত প্রভৃতিও নাম পর নাই প্রীতিকর হইয়াছিল। এখানকার একতানবাদ্যের ন্যায় বাদ্য আমরা আর কোথাও শ্রবণ করি নাই।" *

ইহার তিন দিন পরে—১৯এ ফেব্রুয়ারী তারিখে 'মালতীমাধব' নাটক পুনরায় অভিনীত হয়। ১৮৬৯, ২৬এ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রে দেখিতেছি :—

---

* "গত শনিবার রজনীযোগে পাতুরিয়াঘাট্টা নিবাসী যশোধর্ম্মরাশি দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে বঙ্গনাট্যালয়ে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম বসু দ্বারা অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।" (সংবাদ প্রভাকর, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬, মঙ্গলবার)।

* 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)" প্রবন্ধে (পৃঃ ১৮১) এবং মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে মালতীমাধব নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ "৩১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তারিখটি যে ভুল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কারণ, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস "৩০শে" তারিখেই শেষ হইয়াছে, "৩১শে" হয় কেমন করিয়া? কিশোরীচাঁদ মিত্র ঠিকই বলিয়াছেন যে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই অভিনয় হয়।

"লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার অনেক ইউরোপীয় সহচর সমভিব্যাহারে গত শুক্রবার রাত্রে বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে 'মালতীমাধব' নাটকের অভিনয় সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। অনেক ইউরোপীয় বিবিও তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। যতীন্দ্র বাবু তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন।"

মালতীমাধব নাটক পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে দশ-এগার বার অভিনীত হইয়াছিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে পাথুরিয়াঘাটায় দুইটি প্রহসন অভিনীত হয়—এই দুইটির নাম 'চক্ষুদান' ও 'উভয়-সঙ্কট।' ১৮৭০, ১০ই মার্চ্চ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় দেখিতে পাই,—

"পাথরিয়া ঘাটা নাট্যালয়।… শৌরীন্দ্র বাবু এই প্রায় দশ বৎসর নাট্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল আছেন ও এক্ষণে তাঁহারা অকুতভয়ে প্রধান প্রধান ইংরাজ আহ্বান করিয়া থাকেন ও তাঁহারাও দর্শন ও শ্রবণ করিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের নাটকের প্রধান অভাব এই যে স্ত্রীলোক আক্টর পাওয়া যায় না, তাহা বলিয়া হাত কি।

এবারেই দুইটী প্রহসনই চমৎকার হইয়াছে, একটীর নাম 'চক্ষুদান,' আর একটীর নাম 'উভয়সঙ্কট'। এ দুইটীর প্রণয়নকর্ত্তা যতীন্দ্র বাবু।…"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয় হয় নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী সেখানে 'রুক্মিণী-হরণ' ও 'উভয়সঙ্কট'এর অভিনয় হয়: ১৮৭২, ১৫ই জানুয়ারী (সোমবার) তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন,—

"পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার।—এই নাট্যশালাটি রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতা বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হইলেও এই দুই স্বত্বাধিকারীর বদান্যতায় উহা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য গত বৎসর উহা যখন বন্ধ হইয়া যায়, তখন সাধারণের পক্ষে উহা অত্যন্ত নিরাশার কারণ হইয়াছিল। এই বৎসর আবার উহা উন্মোচিত হইয়াছে, ও গত শনিবার উহার প্রথম অভিনয় হইয়াছে। আমরা কয়েক দিন পূর্ব্বে 'রুক্মিণী-হরণ' নামে যে-নাটকটির আলোচনা করিয়াছিলাম এবারে উহা অভিনীত হয়। অভিনয় বরাবরই যেমন হয়, খুব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।… এই নাটকের পর 'উভয়-সঙ্কট' নামে একটি খুব আমোদজনক প্রহসনের অভিনয় হয়।"

পরবর্ত্তী ১০ই ফেব্রুয়ারী এই নাটকখানির আর একটি অভিনয় হয়। এ বিষয়ে ১৮৭২, ২১এ ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ন্যাশন্যাল পেপার' লেখেন:—

"পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার।—গত ১০ই শনিবার রাত্রে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে যে নাট্যাভিনয় হয়, তাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। নাট্যমঞ্চে একটি করুণ-হাস্যরসাত্মক নাটক ও আর একটি প্রহসন দেখান হইয়াছিল। নাটকটি মহাভারত হইতে সঙ্কলিত। প্রহসনটির বিষয়বস্তু দুই পত্নী যুক্ত একটি ব্যক্তির লাঞ্ছনা।… রাজপ্রতিনিধির (লর্ড মেয়োর) মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আপাততঃ এই নাট্যশালাটি বন্ধ আছে।"

কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার নিবন্ধে এই অভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে সে জন্য ভ্রমক্রমে ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এই অভিনয়কেই রুক্মিণী-হরণের প্রথম অভিনয় বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে উহার প্রথম অভিনয় আরও মাসখানেক আগে হয়।

'রুক্মিণী-হরণ' নাটকের আরও একটি অভিনয়ের উল্লেখ সংবাদপত্রে পাইয়াছি। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে পাইতেছি:—

"রুক্মিণীহরণ নাটকাভিনয়।—গত ৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের পাতুরিয়া ঘাটাস্থ ভবনে উক্ত নাটকের অভিনয় অতিসুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। নাটকখানি যেমন সুরসিক কবি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে তেমনি তাহার অভিনয়ও সুবিজ্ঞ অভি-নেতৃগণ দ্বারা অভিনীত হইয়াছে। সংগীত এবং ঐকতান বাদনে শ্রোতৃগণ…প্রীতিলাভ করিয়াছেন।…ধনদাসের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল এতদ্ব্যতীত প্রতিরূপ-গুলিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল…।"

রামনারায়ণ বলিয়া গিয়াছেন যে, মহারাজার বাড়ীতে রুক্মিণী-হরণ সর্ব্বশুদ্ধ দশ-এগারবার অভিনীত হয়। *

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে 'উপসংহার' নামে দশ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাইয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ:—

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। সন ১২৭৮ সালের নাট্যাভিনয় সমাপনোপলক্ষে উপসংহার। কলিকাতা।…সন ১২৭৯ সাল।

ইহা রুক্মিণী-হরণ নাটকের অষ্টম রজনীতে অভিনীত হইয়াছিল। এই পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় আছে:—

"ব্রাহ্মণ…দর্শক-মহাশয়েরা! অদ্য রুক্মিণী-হরণ নাটকাভিনয়ের অষ্টক রাত্র; এই অষ্টাহতে আপনাদের অনুগ্রহ সহকারে আমরা নাট্যামোদে যে কি পর্য্যন্ত আমোদিত ছিলেম তা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা কঠিন।…"

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

"রূপকটি কেবল ১২৭৮ সালে ১১ই চৈত্র (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ্চ) তারিখে 'রুক্মিণী-হরণ' নাটকের অভিনয়ান্তে অভিনীত হয়।"

ইহার পর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয়ে উল্লেখ করিবার মত একটিমাত্র অভিনয় হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারী রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে পদার্পণ করেন। তাঁহার সম্মানার্থ 'রুক্মিণী-হরণ' ও 'উভয়সঙ্কটের' অভিনয় হয়। পরবর্ত্তী ৩রা মার্চ্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের ও রাজপ্রতিনিধির আগমনের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা এই নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য নাটকগুলির ইংরাজী চুম্বক * দেওয়া হইয়াছিল। অভিনয়-শেষে গভর্ণর-জেনারেল গৃহস্বামী ও অভিনেতাদের ধন্যবাদ দেন।

'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,' 'উভয়সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান'—পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত এই তিনখানি প্রহসন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচনা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্নের আত্মকথা † হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি এই "তিনখানি প্রহসন প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত" হইয়াছিলেন।

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটী

ইহাই এ-যুগের দ্বিতীয় নাট্যশালা। এই রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক—মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুপরিচিত প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা ?" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি অনেকে ভ্রমক্রমে এই অভিনয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু উহার প্রকৃত তারিখ যে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই, তাহা পরবর্ত্তী ২৭এ জুলাই (১৩ শ্রাবণ ১২৭২) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে জানা যাইবে :—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহোদয়েষু।
মহাশয় ! সম্প্রতি শোভাবাজারস্থ রাজভবনে একটি অভিনয় সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে। তাহার অধ্যক্ষ সভাপতি, সভা এবং সম্পাদকের কার্য্য শ্রীমান্ রাজকুমার বাহাদুরেরা সবান্ধবে সম্পাদন করিতেছেন। উক্ত সভার উদ্দেশ্য এই যে, নানা প্রকার অপূর্ব্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া স্বদেশের কু-আচার কুব্যবহার নিবারণ করা মাত্র। সম্পাদক মহাশয় ! শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার এবং অর্থ ব্যয় করিয়া যে, এইক্ষণে যুবা ধনী সন্তানেরা দেশের পাপাচারের মূলোৎপাটনে যত্নশীল হইয়াছেন, ইহাও এক অতি আনন্দের বিষয় বলিতে হইবেক। অতএব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন শোভাবাজারস্থ নাট্যসভা চিরস্থায়িনী করিয়া তাহার মঙ্গল বিধান করেন। যাহা হউক, গত ৪ঠা শ্রাবণ রজনীযোগে সভার ব্যবস্থাক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনের প্রথম বার অভিনয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তদবলোকনার্থ অনেক মান্য ভদ্রসন্তানদিগকে সে দিবস নিমন্ত্রণ করা হয়, আমিও উক্ত রাত্রিতে আহুত দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলাম, তাহাতে কুমার বাহাদুরেরা স্ব স্ব প্রিয় বান্ধবের সহিত সমবেত হইয়া যে প্রকার সুনিয়মে নাটকের অভিনয় বিস্তার করিলেন, তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইলাম,...। কস্যচিৎ নিমন্ত্রিতজনস্য।"

এই নাট্যশালায় 'একেই কি বলে সভ্যতা' দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই তারিখে। ৩১এ জুলাই তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই অভিনয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করেন, কিন্তু ভুল করিয়া ইহাকে 'প্রথম' অভিনয় বলিয়াছেন। * এ দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা নীচ আমোদ-প্রমোদে অর্থব্যয় না করিয়া নাটকের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন দেখিয়া লেখক সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং

* 'রুক্মিণী-হরণ' নাটক ও 'উভয়-সঙ্কট' প্রহসনের চুম্বক মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা হওয়া সম্ভব। প্রথমটি আমি শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং দ্বিতীয়টি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি।

† 'ভারতবর্ষ', ১৩২৩ কার্ত্তিক, পৃঃ ৭১১। 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৩৮, পৃঃ ৭৬২-৬৩।

* "**The Hindoo Theatre.** We are glad to notice the resuscitation of the Hindoo Theatre by the praiseworthy exertions of the junior members of the Shobha Bazar Raj family.........

On last Saturday night the Shobha Bazar amateurs had their first performance ....the performance was exceedingly creditable to the young amateurs. The scenes, which we believe were painted by a native artist, were appropriate and well done. The music, though not in keeping with the high merits of the acting, was not inferior. The dacing was varied and very spirited. Indeed it was one of the principal attractions of the performance. All the characters of the force, we must do them the justice to say, sustained their parts equally well and admirably."—The **Hindoo Patriot** of July 31, 1865 (Monday).

বলেন যে, শোভাবাজারের নাট্যশালা বেলগাছিয়া, পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো নাট্যশালার সহিত নাট্যশালার ইতিহাসে জড়িত থাকিবে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' মোটের উপর অভিনয়ের প্রশংসাই করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি পারিবারিক নাট্যশালাতে অভিনয়ের উপযুক্ত নয়। ইহাতে এমন অনেক চরিত্র আছে, যাহার অভিনয়ে সুরুচি ও সুনীতি ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। এই অভিনয়-প্রসঙ্গে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট (বৃহস্পতিবার) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"নাট্যাভিনয় ('একেই কি বলে সভ্যতা ?')—গত সোমবারের প্রতিজ্ঞানুসারে শোভাবাজার রাজভবনস্থ অভিনয় ক্রীড়ার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনস্থ একটী নিম্নতল গৃহে রঙ্গভূমি সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজবাটীর কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সাহায্যাভাব বোধ হইল। কয়েক জন রাজকুমারের উদ্যোগেই এই অভিনয়টী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোগলকুঁড়িয়া প্রভৃতি নিকটস্থ পল্লীর কয়েক জন যুবক এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছেন।

দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ দর্শকগণ নিয়মিত সময়ে অভিনয় গৃহে উপস্থিত না হওয়াতে রজনী প্রায় দশ ঘটিকার সময় অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রথমে নট ও নটী রঙ্গভূমিতে আগমন করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিয়া যান। নব বাবু ও কালী বাবুর কথোপকথনে সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছেন। বৈরাগীর ভাবভঙ্গি ও বাক্যে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এমন কি, সমুদয় অভিনেতাদিগের মধ্যে বৈরাগী ও কর্ত্তার অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাটীও যথার্থ তরঙ্গিণী বটে। আমরা জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার (পেটরন্) নব বাবুর বক্তৃতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ না বলিয়া বিরত হইতে পারি না। নব বাবু বক্তৃতাকালীন যে প্রকার ভঙ্গী করিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই তাঁহাকে প্রকৃত নব বাবু জ্ঞান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অন্যান্য বিষয়ে তিনি প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। নর্ত্তকীদ্বয়ের অভিনয় অতি চমৎকার। তাঁহাদের ভাবভঙ্গি ও নৃত্যতে, অনেকেরই তাঁহাদিগকে প্রকৃত নর্ত্তকী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। নব বাবুর শয়নগৃহ অতি মনোহারিণী হইয়াছিল। অন্তঃপুরস্থিত ললনাগণের তাসক্রীড়া ও নব বাবুর মদোন্মত্ততা ও তন্নিবন্ধন পরিজনের অনুশোচনা অতি প্রকৃত রূপে অভিনয় করা হইয়াছিল। নব বাবুর স্ত্রী হরকামিনীর, মনোহর লাবণ্যে, সুমধুর স্বর ও হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপে উপস্থিত দর্শকদিগকে বিমোহিত করিয়াছিল। নায়িকাদিগের মধ্যে হরকামিনীই বিশেষ প্রশংসাপাত্রী হইয়াছেন। সারজন, পাহারাওয়ালা, মুটে, বরফ ও বেলফুলওয়ালা, গৃহিণী কমলা প্রভৃতি অপর অভিনেতৃগণ অসামান্য পরিপাটীর সহিত অভিনয় করিয়াছেন। দ্বারপালের ভোজপুরী ভীষণ গভীর স্বরটী মনে পড়িলে এখনো আমাদিগের হৃৎকম্প হয়। উনিশ জন অভিনেতা দ্বারা এই প্রহসনখানির অভিনয় হইয়াছে।

উক্ত অভিনয় স্থলে বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি অন্যূন একশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে অভিনেতাদিগের সাধুবাদ করিয়াছেন। অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমরাও স্থানের সঙ্কীর্ণতা ব্যতীত আর কোন দোষ দর্শন করিতে পারি নাই।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রস্তাবিত প্রহসন মধ্যে যেরূপ নিপুণতা ও ব্যবহারানুভাবকতা গুণের পরিচয় দিয়াছেন, অভিনয়কর্ত্তাগণ কোন অংশেই তাঁহার হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। যে সকল ব্যক্তির সমক্ষে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় স্বভাবের লোক থাকেন, তাঁহারাও স্ব স্ব গোপনীয় ক্রীড়ার প্রকাশ্য অভিনয় দর্শনে লজ্জিত ও হর্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমরা কায়মনবাক্যে অভিনয়ের কর্ত্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। বাঙ্গালা দেশ যাঁহাদিগের প্রযত্নে পূর্ব্বসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা সাধু সমাজের মহামূল্য রত্ন বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইবেন, এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয়াভাব।" *

শোভাবাজার নাট্যশালার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিছু দিন পরে কোন কারণে তিনি এই নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেহ কেহও চলিয়া যান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্য সদস্যেরা নাট্যশালাটি চালাইয়া উহাতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী (সোমবার) তারিখে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করেন। অনেকে ভুল করিয়া এই তারিখটিকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৪এ জুলাই বলিয়া উল্লেখ করেন। ১৮৬৭, ১১ই ফেব্রুয়ারী (সোমবার) তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' দেখিতে পাই—

"শোভাবাজার নাট্যশালা। কলিকাতার দেশীয় নাট্যশালাগুলি খুব উদ্যমের সহিত চলিতেছে। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এই পত্রিকায় পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো নাট্যশালা উন্মোচন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। গত শুক্রবার রাত্রিতে শোভাবাজারের সখের থিয়েটারের দল সম্ভ্রান্ত ও

* এই সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকর' বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত এই অভিনয়ের বিবরণ আমার জন্য নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

সুনির্ব্বাচিত দর্শকদের সমক্ষে, বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত সুপরিচিত বিয়োগান্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করেন। 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক।······নাট্যমঞ্চে এই নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলীর অভিনয় কম কৃতিত্বের কথা নয়। এজন্য শোভাবাজারের অভিনেতাদের যে-সকল ত্রুটিবিচ্যুতি হইয়াছে সেগুলি ক্ষমার চক্ষে দেখা উচিত। কোন অভিজ্ঞ শিক্ষাদাতার সাহায্য ব্যতিরেকে যাহা করা সম্ভব তাঁহারা তাহা করিয়াছেন।··· এই দলের অভিনেতাদের মধ্যে যাঁহারা ধনদাস, মদনিকা, ভীমসিংহ, বলেন্দ্র ও সত্যদাস চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিনয়ের বেশ ক্ষমতা আছে। চেষ্টা করিলে তাঁহারা কালে সুদক্ষ অভিনেতা হইবেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে দেওয়া আছে। আমরা তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

পুরুষগণ

সূত্রধার	···	বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীমসিংহ	(উদয়পুরের রাণা)	শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বলেন্দ্রসিংহ	(ঐ রাণার ভ্রাতা)	বাবু প্রিয়মাধব বসু মল্লিক
সত্যদাস	(রাণার মন্ত্রী)	কুমার আনন্দকৃষ্ণ
জগৎসিংহ	(জয়পুর-মহারাজ)	" শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ
নারায়ণ মিশ্রী	(জগৎসিংহ-মন্ত্রী)	বাবু বেণীমাধব ঘোষ
ধনদাস	(মহারাজের পারিসদ)	বাবু মণিমোহন সরকার
দূত	···	" বেণীমাধব ঘোষ
ভৃত্য	···	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব

স্ত্রীগণ

কৃষ্ণকুমারী	(রাণা-কন্যা)	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ
অহল্যা বাই	(রাণার রাণী)	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ
তপস্বিনী	···	শ্রীউদয়কৃষ্ণ দেব
বিলাসবতী	(মহারাজের রক্ষিতা বেশ্যা)	বাবু হরলাল সেন
মদনিকা	(বিলাসবতীর পরিচারিকা)	বাবু রামকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রথম সহচরী	···	শ্রীহরলাল সেন
দ্বিতীয় সহচরী	···	বাবু নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উভয়েরই বাল্যকালে নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। তাঁহাদের দুই জনের সমবেত চেষ্টায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি হয়। অভিনয়ের আয়োজন, নাটক-নির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী এবং জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কে লইয়া একটি Committee of Five গঠিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণবিহারী সেনই অভিনয়-শিক্ষক হইলেন। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অভিনীত 'বিধবা-বিবাহ' নাটকে পড়ুয়ার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

ঠাকুর-বাড়ীতে প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং তাহার কিছুদিন পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হইল। দুইবারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুই অভিনয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও সার্জ্জনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পরিচালকরা অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা নাটকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে 'কমিটি অফ ফাইভ' ঠাকুর-বাড়ীর ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বিষয় ঠিক করিয়া দিলে একটি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা নাটক-রচনার জন্য সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা হইল। *

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের (জুন ?) মাসে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্' পত্রে প্রথমে বহুবিবাহ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই কমিটি সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কমিটি হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামস্থ জমীদারগণের অত্যাচার—এই দুইটি বিষয়ে দুইখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখের 'ইণ্ডিয়ান

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৯৬, ৯৯, ১০০।

মিরার' (তৎকালে পাক্ষিক) সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয় :—

ADVERTISEMENTS.

The following Prizes are offered by the Committee of the Jorasanko Theatre for the best dramatic productions on the following subjects :—

No. 1—Rs. 200.

The Hindoo Females,—Their Condition and Helplessness.

To be handed over to the Committee before the 1st of June 1866.

Adjudicators,—Babu Peary Chand Mitra.
Professor Krishna Comul Bhuttacharjee, B. A.
Pundit Dwarka Nauth Bidyabhoosun.

No. 2—Rs. 100.

The Village Zemindars.

Period—Before the 1st of February 1866.

Adjudicators,—Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar.
Pundit Dwarka Nath Bidyabhoosun.
Baboo Raj Krishna Bannerjee.

The dramas are to be written in Bengali, and must be dedicated to the Jorasanko Theatre.

The subject on Polygamy which, was advertized in the **Indian Daily News** of the 22nd instant [June ?], is, after due consideration, withheld from public competition, as the Committee have been able to secure the services of Pundit Ram Narian Turkorutno for the task. The following gentlemen have kindly taken upon themselves task of examining the same :—

Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar.
Baboo Raj Krishna Banerjee.

বহুবিবাহ-বিষয়ক যে নাটকখানি রচনার জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর ভার দেন, তাহা তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই নাটকখানির নাম নব-নাটক। রচনার তারিখ—১৫ই বৈশাখ ১২৭৩।

অবিলম্বে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখের 'দি বেঙ্গলী' নামক সাপ্তাহিক পত্রে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে নাটকখানির সমালোচনা করা হইয়াছে।

রামনারায়ণকে পুরস্কার দিবার জন্য ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে (২৩ বৈশাখ ১২৭৩) অপরাহ্ণ তিনটার সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড সভা আহূত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মিত্র মহাশয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিশ্রুত পুরস্কারস্বরূপ একটি রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত দুই শত টাকা পণ্ডিত রামনারায়ণের হাতে দিলেন।

এইবার অভিনয়ের আয়োজন। নাট্যশালা কমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছিল এবং 'বড়র' দল—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি—এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারি যে—

"...এখন হইতে 'বড়'র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ (scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ 'জগমন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত-ভগিনীপতি ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদি) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 'চিত্ততোষ', আর এক ভগিনীপতি ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড় স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্য নির্দিষ্ট হইল। (পৃঃ ১০৪) ...শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী 'কৌতুকে'র পাঠ লইয়াছিলেন। (পৃঃ ১১১)...আমার এক শ্যালক অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগিন্নির ভূমিকায়,... । ৺বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ) সুবোধের ভূমিকায়,... (পৃঃ ১১২)।

অতঃপর ভূমিকা সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে, খুব ঘটা করিয়া রিহার্শাল বসিয়া গেল।...ছয় মাস কাল যাবৎ দিনে রিহার্সাল, আর রাত্রে বিবিধ যন্ত্রসহকারে কন্‌সার্টের মহলা চলিল। আমি কন্‌সার্টে হার্মোনিয়ম বাজাইতাম। (পৃঃ ১০৭)...

অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্‌খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।" (পৃঃ ১০৮)

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে নব-নাটকের প্রথম অভিনয় হয়—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী (২২ পৌষ ১২৭৩) তারিখে। * প্রথম অভিনয়-রজনীতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

"প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'যা-রা পলাট (plot) নাই, পলাট নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক'—সমালোচকদের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে, তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্ব্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন।"

রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঠাকুর-বাড়ীতে 'নব-নাটক' উপর্য্যুপরি নয়বার অভিনীত হইয়াছিল। নব-নাটকের একটি অভিনয় দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬৭, ২৮এ জানুয়ারী (সোমবার) তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শনিবার আমরা যোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এখানে নাটক অভিনয়ের যে প্রণালী দর্শন করিলাম, তাহা যদি সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া উঠে। নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতিমনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই, এসমুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত। দর্শকদিগের উপবেশন প্রণালী অদ্যাপিও উৎকৃষ্ট হয় নাই। এজন্য গালারি করা আবশ্যক। সংকীর্ণ স্থানে অধিকসংখ্য চৌকি সন্নিবেশিত হয়। এককালে দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া সকলেই সম্মুখের আসন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাত্রঘর্ষণ, ও আসনভঙ্গ ইহার ফল হইয়া উঠে। যত দিন গালারি না হইতেছে, ততদিন আগন্তুকদিগকে এক এক করিয়া উপবেশন করিতে দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ, নচেৎ প্রায় ১০ মিনিট কাল রেলওয়ে ষ্টেসনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইবার ন্যায় গোলযোগ হইবে।···

অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই স্বকর্ত্তব্য অভিনয়ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। গবেশ ও চিত্ততোষের ত কথাই নাই, কৌতুক ও রসময়ীর অংশ উত্তম হইয়াছে এবং নাগর ও গ্রাম্যের চরিত্রও নৈসর্গিক হইয়াছে। রঙ্গভূমির নাগর আদি যাবতীয় যুবক কৃতবিদ্যের আদর্শ হন, তাহা হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়। এ ব্যক্তির অভিনয় দর্শনে সবিশেষ পরিতোষ লাভ হইয়াছে। সুধীর পণ্ডিতের চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সাবিত্রী দাসীর অংশটী জঘন্য হইয়াছে। সকলেরই বেশ প্রায় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাবিত্রী না স্ত্রীলোক না হিজড়ে রূপ ধারণ করে। এ ব্যক্তির কথার ভাবও তুষ্টিকর হয় নাই। সুবোধের শেষ অংশটি বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। অর্দ্ধ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেবল ক্রন্দন,কোন্ ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারেন? যে যুবক অভিমানে অনায়াসে দেশান্তরে গমন করিতে পারেন, তাঁহার স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন সঙ্গত নয়। উপসংহারকালে বক্তব্য এই, কোন কোন অংশে কিছু কিছু ত্রুটি থাকুক, সাকল্যে বিবেচনা করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হইয়াছে।"

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি নাটক ছাড়া আরও দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একটির বিষয়—হিন্দু মহিলাগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা। এই বিষয়ে 'হিন্দু মহিলা নাটক' রচনা করিয়া সোমড়া-নিবাসী বিপিনমোহন সেনগুপ্ত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। কিন্তু নাটকখানি জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। কারণ, নাটকখানির 'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায় যে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দেই ঐ "নাট্যশালা-সমাজ বিগত-জীবন" হইয়াছিল।

পল্লীগ্রামস্থ জমীদারগণের অত্যাচারের বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি যে পুরস্কার ঘোষণা করেন, তাহা কেহ পাইয়াছিলেন কি না, আমার জানা নাই।

*"**Jorasanko Theatre.** On Saturday night last we had the pleasure of witnessing the Jorasanko Theatre, established at the family house of Baboo Gonendra Nauth Tagore, grandson of late Baboo Dwarka Nauth Tagore. The subject of the performance was the celebrated **nobo natock,**.........the acting on the stage, which was pronounced by all present on the occasion to be of the most superior order. To choose out one or two or more amateurs for especial commendation, would we fear, be doing gross injustice to the rest, each acquitted himself so creditably. Beginning with the graceful bow of the **natee,** the representation of every succeeding character, elicited loud shouts of applause from all sides, and rendered the whole scene an object of peculiar amusement to the audience. The concert was excellent. It had no borrowed airs, and was quite in keeping with national taste."

বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়

বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় এ যুগের একটি বিখ্যাত নাট্যালয়। এটি বলদেব ধর ও চুনিলাল বসুর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ইঁহাদের দুই জনেই সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, এবং ইতিপূর্ব্বে পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার অভিনেতা ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই নাট্যশালাটি প্রথমে বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। বহুবাজারের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র * ও অন্যান্য কয়েক জন ইহার স্বত্বাধিকারী ও বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সম্পাদক ছিলেন। এই নাট্যশালার জন্য বিখ্যাত নাটককার মনোমোহন বসু নাটক লিখিয়া দিতেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মনোমোহনের 'রামাভিষেক' † নাটকের অভিনয়ই এই নাট্যশালার প্রথম অভিনয়। বরাহনগরবাসী এক জন দর্শক এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় দেখিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৫এ মার্চ্চ তারিখের 'ন্যাশনাল পেপারে' একখানি পত্র প্রেরণ করেন; তাহার কিয়দংশের বাঙ্গানুবাদ দিতেছি,—

"সম্প্রতি বহুবাজার নাট্যসমাজ রামাভিষেক নাটকের যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। দর্শক-হিসাবে ও এই দলের প্রতি সুবিচারের উদ্দেশ্যে আমি আপনার পত্রিকার মারফৎ কয়েকটি কথা সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতে চাই।…অর্থব্যয়ের দ্বারা নাট্যশালাটিকে যত সুন্দর করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছিল এবং দৃশ্যপটগুলিও প্রয়োজনানুযায়ী হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দর্শকগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, অভিনেতারা উপযুক্ত ও সুরুচিসম্পন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে, অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল। অভিনয়ের বিষয়বস্তু খুব করুণ হওয়াতে অনেকের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। কিন্তু অভিনয়-নৈপুণ্যের কোন অভাব হয় নাই, কারণ প্রায় সকল দর্শকই অশ্রুধারার দ্বারা পোষাক নষ্ট করিবার ভয়ে রুমাল বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সমালোচকেরা চেষ্টা করিলে হয়ত কয়েকটি দোষ বাহির করিতে পারিতেন, যেমন নট সুগায়ক ছিলেন না, চিত্রার বর্ণ রমণীর উপযুক্ত নয়, ইত্যাদি। কিন্তু এ-বিষয়ে একটি কথা মনে রাখা উচিত, আমি দ্বিতীয় অভিনয় দেখিয়াছি; তাহার পরে হয়ত অভিনয়ের ভুলগুলি সংশোধিত হইয়াছে।"

রামাভিষেক নাটকের পর বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে মনোমোহন বসুর সতী নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জানুয়ারী তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় একটি পত্র প্রকাশিত হয়। উহা হইতে সতী নাটকের মুদ্রাঙ্কণ ও মহলার কথা জানা যায়ঃ—

"মহাশয়! সম্প্রতি কতিপয় ভদ্র যুবক কর্ত্তৃক বহুবাজার নাট্যশালা নামক একটী নূতন নাট্য-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইঁহারা একটী নূতন মাঠ লইয়া তথায় নূতন নাট্যমন্দির করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারা রামাভিষেক অভিনয় করিয়া লোকের নিকট অতিশয় আদরণীয় হইয়াছিলেন। ইঁহারাই রামাভিষেক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে অভিনয় করেন। এবারও ঐরূপ একখানি নূতন নাটকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য প্রায় শেষ করিয়াছেন, গুপ্ত অভ্যাস আরম্ভ হইয়াছে এবং বহুবাজার ঐক্যতান সমাজস্থ সভ্যেরা ইঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। ইঁহারা প্রায় ৪।৫ বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী যন্ত্র সকল বাদন করিতেছেন। সম্প্রতি উক্ত ঐক্যতান সমাজে পাঁচ জন লোকের আবশ্যক হইয়াছে। পিওনো হারমোনিয়ম, কনসার্টিনা, সিকলে ফ্লুট ও ফ্লাট বাদক।…ঐক্যতানের অধ্যক্ষ (ব্যাণ্ড মাষ্টার) শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতী চরণ দাস উহাদিগকে শিক্ষা দিবেন, নাট্যশালা হইতে যন্ত্র সকল দেওয়া হইবে এবং উপদেশক অবৈতনিক।…শ্রীকামিক্ষাচরণ বসু। বহুবাজার ঐক্যতান সমাজ। ২৬এ জানুয়ারি ১৮৭৩।"

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী ২৫নং বিশ্বনাথ মতিলালের লেনে * নূতন রঙ্গমঞ্চে সতী নাটক প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৭৪, ২২শে জানুয়ারী (বৃহস্পতিবার) 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছিলেন,—

"সংবাদ।…বহুবাজারে কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি একটী সখের নাট্যসমাজ সংস্থাপন করিয়া একটী রঙ্গ-গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবার এখানে সতী নাটক অভিনীত

---

*"Last Saturday Babu Nilcomal Mittra of Allahabad and others, proprietors of the Bowbazar amateur Theatre gave a brilliant entertainment to H. H. of Vizianagram, Raja Chandra Nath Bahadoor, and a few European gentlemen."—Amrita Bazar Patrika of Thursday, 19 March, 1874.

† রামাভিষেক নাটক ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ—"শকাব্দাঃ ১৭৮৯, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।" ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখের *The National Paper* নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

* এই ঠিকানা এবং "শনিবার মাঘ ১২৮০" তারিখযুক্ত "সতীনাটকাভিনয়"-এর একখানি টিকিটের প্রতিলিপি ১৩৩০ সালের মাঘ মাসের 'বঙ্গবাণী'তে শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ আপন আপন অংশ অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়টী দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। প্রসূতী ও সতীর দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যগুলি কমাইয়া ফেলিলে ভাল হয়। নাট্যসমাজের ঐক্যতানবাদনটি আমাদের অতি মধুর লাগিয়াছিল।"

সতী নাটকের অনেকগুলি অভিনয় হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩০ মার্চ্চ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি পত্র হইতে জানিতে পারি যে, প্রতি শনিবারই সতী নাটকের অভিনয় হইত। পত্রটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"সম্প্রতি বহুবাজারের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়া বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় নামে একটী নাট্য মন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রতি শনিবারে এই নাট্যালয়ে বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত সতীনাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। আমরা একদিন উক্ত অভিনয় দেখিয়া যৎপরোনাস্তি তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি।...

উপসংহার সময়ে আমরা নাট্যালয়ের সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।"

সতী নাটকের সর্ব্বশেষ অভিনয় হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল।*

ইহার পর বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের অভিনয় হয়। উহার কাল ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি। ১২৮১ সালের মাঘ মাসের 'মধ্যস্থ' পত্রে পাইতেছি,—

"হরিশ্চন্দ্র নাটকাভিনয়।—বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গনাট্যসমাজের অবৈতনিক রঙ্গভূমিতে বাবু মনোমোহন বসুকৃত হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয় হইতেছে। আমরা বারদ্বয় দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি।" †

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

*"Saturday 4th April. This Evening's performance of the Bow Bazar Native Theatre was the last......" The **Hindoo** Patriot for April 6, 1874.

† ১৩৩০ সালের মাঘ মাসের 'বঙ্গবাণী'তে শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র "বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ" নামে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে অনেকগুলি মারাত্মক ভুল আছে।

প্রত্নশালায়

(শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়ের পুরীধামস্থ প্রত্নশালা দর্শনে)

হেথা বসি আজি অন্তর মম
ভরে যুগপৎ হর্ষ-শোকে,
চিত্ত আমার উড়ে যায় কোন্
স্মৃতিলোকে,—দূর কল্পলোকে;
শ্রমণের দলে করে সে ভ্রমণ
বিশ্রাম করে সংঘারামে,
ফিরে যায় পুন চৈত্যবিহারে
বোধিবন্দিত পুণ্যধামে।
স্বাধীন ভারত যে যুগে শিল্প-
কলা-সাহিত্য-ধ্যানব্রতে,
করিত আত্মপ্রকাশ সে যুগে
কল্পনা ফিরে স্বপ্নপথে।
হেরে কতরূপে ধর্ম্ম তাহার
বিকাশ লভিল সাধনাবলে,
থমকি দাঁড়ায় সহসা আসিয়া
কালাপাহাড়ের কুঠার-তলে।
ভেঙ্গে যায় তার মোহন স্বপ্ন
ঘুচে যায় তার হংসবেশ।
কালপুরুষের রথের চক্র-
মর্দ্দনে সব ধ্বংসশেষ।
সে কাল চক্রতলের কয়টি
গুঁড়ানো গরিমা কুড়ানো ধূলি
রক্ষিত হেথা—হেরি এ কক্ষে
গতগৌরব আভাসগুলি।
ছিল সমগ্র কত অপরূপ
অংশ যাহার এমন চারু,
ধ্বংসে যাহার এত শ্রী তাহার
জীবনে কি ছিল রুচির কারু,
কঙ্কাল যার এত অপূর্ব্ব
প্রতিমা তাহার ছিল কেমন,
ভাঙা-চোরা চালচিত্রের পানে
চেয়ে চেয়ে তাই ভাবে এ মন।
স্মরিয়া অতীত হয় মাথা নত,
কেটে যায় দ্বিধা অবিশ্বাস,
বাঙ্গালী কবির চোখে ঝরে নীর
উথলে গভীর দীর্ঘ-শ্বাস।

শ্রীকালিদাস রায়

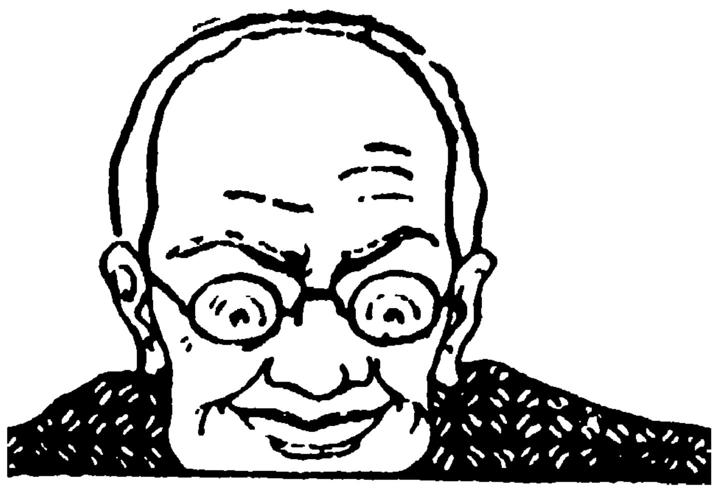

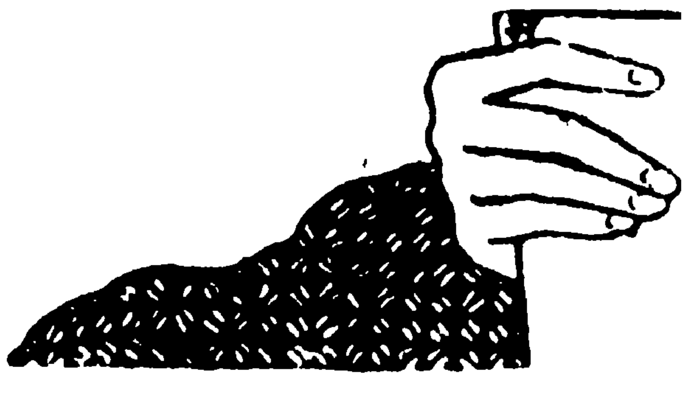

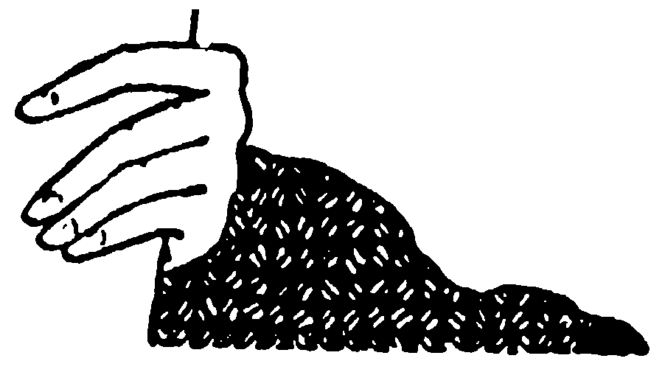

অর্থহীনের বন্ধু

কোথায় পড়িয়াছিলাম মনে নাই, জাহাজ যেমন তীর হইতে দূরে সরিয়া যায়, তীরও তেমনই জাহাজ হইতে দূরে অবস্থিত হয়। বাল্যের ক্রীড়াভূমি, কৈশোরের অধ্যয়নের স্থান ও যৌবনের স্বল্পদিনব্যাপী কার্য্যক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যখন প্রবাসে যাই, তখনও বুঝি এই কথাটাই মনে হইয়াছিল। তথাপি দূর-প্রবাসের সুখ-দুঃখের অন্তরালে দিনব্যাপী কার্য্যের অবসানে যখন আপনার দেশের কথা মনে হইত, সেই খেলার স্থান, পাঠের গৃহ, বন্ধুর প্রীতি ও সাথীর গুঞ্জন ছবির মত চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত, মধুর সঙ্গীতের মত কাণে বাজিত। তখন সব ভুলিয়া দেশের পানেই চাহিয়া রহিতাম। প্রবাসের প্রচুর সম্মান, ঈপ্সিত বিত্ত, স্ত্রীর সর্ব্বক্ষণের সখীত্ব ও সপ্রেম পরিচর্য্যা, পুত্রকন্যার ভালবাসা কিছুতেই মন পল্লীগৃহের দিক্ হইতে ফিরিত না। মন ছুটিয়া চলিত গ্রামের বাহিরে—যেখানে মাঠের পর মাঠ আকাশে গিয়া মিশিয়াছে, যেখানে মুক্ত আকাশের নীচে গাছে গাছে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় গলাগলি করিয়া দাঁড়াইয়াছে—যেখানে সহরের কোলাহল হইতে বহু দূরে কয় বন্ধু মিলিয়া বিদ্যালয়ের অবকাশের সময় অনাগত জীবনের মধুর স্বপ্ন দেখিতাম। যে দেশে থাকে, শাস্ত্র যাহাকে সৌভাগ্যবান্ বলে, সেই অপ্রবাসী জানে না, দেশকে সত্যকার কে ভালবাসে ;—অপ্রবাসী, না প্রবাসী ?

কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে দেশে আসিয়াছিলাম। দুই এক বৎসর অন্তর মাঝে মাঝে একবার দেশে কয়েক দিনের জন্য আসিতাম। মাঝে পাঁচ বৎসর আসা হয় নাই। এবার দীর্ঘকাল পরে যখন ফিরিলাম, আত্মীয়-বন্ধুগণের সঙ্গে যখন আলাপ করিলাম, তখন বার বার এই কথাটাই মনে হইল, এ আলাপ নিতান্তই মুখের ; হৃদয়ের সঙ্গে বুঝি ইহার কোনই যোগ নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন, ভাল ত ?"

উত্তর পাইলাম—"হাঁ, চল্‌ছে একরকম। তুমি ভাল ত ?"

উত্তর দিলাম—"হাঁ, চ'লে যাচ্ছে।"

প্রশ্ন হইল—"কবে এলে ?"

উত্তর—"আজই সকালে।"

প্রশ্ন—"থাক্‌বে ত কিছু দিন এখন ? দেখা হবে'খন আবার।"

উত্তর—"আছি দিনকয়েক।"

শেষ উত্তরটি শুনিবার একটু পূর্ব্বেই প্রশ্নকর্ত্তা একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

প্রবীণ আত্মীয় ও প্রতিবাসীদের সহিত ভাষা একটু অন্যবিধ। প্রায় এই রকমই, কিন্তু দুই একটা কথা বেশী থাকে। যথা—

"তার পর ছেলেপুলে সব ভাল ত ?"

"হাঁ, একরকম ভাল। তোমার ছেলেপুলেরা কেমন ?"

"বেঁচে আছে বাঙ্গালা দেশে থেকে—এই যথেষ্ট। তোমরা ত বেঁচেছ বাঙ্গালা ছেড়ে। আমরাই মলাম চিরটা কাল প'চে।"

"সব দেশই সমান। তুমিও যেমন। এখানে যেমন বারোমাস ম্যালেরিয়া, সে সব দেশে লেগেই আছে তেমনই প্লেগ, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি।"

কথা শেষ হইল।

দেখিলাম, মনের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যাহার সঙ্গে দিনরাত্রি থাকিয়াও ক্লান্তি আসিত না, তাহারই সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়াই কথার ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়। আর কি বলিব, খুঁজিয়া পাই না। যে বন্ধুর কাছ হইতে 'আসি আসি' করিয়াও ঘণ্টা দুই বসিতে হইত, তাহার কাছ হইতে আসিতে আর কোনই কষ্ট পাইতে হয় না। "কিছুদিন যদি থাকা হয় ত, আবার এক দিন এসো"

বলিয়া সহজেই সে নিষ্কৃতি দেয়। মনে একটা আঘাত লাগে। কিন্তু ক্রমে তাহা সহিয়া যায়।

লোকের অবস্থারও পরিবর্তন কম হয় নাই। বিখ্যাত কুণ্ডুদের অবস্থার বিপর্য্যয় দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। দেশে দুই দুইখান দোকান;—একখানা খুচরা, অপরখানি পাইকারী বিক্রয়ের জন্য। তাহা ছাড়া কলিকাতায় দুই দুইটা চাউলের কল। কি করিয়া সব নষ্ট হইল, ভাবিয়া পাইলাম না! কাহারও কোন বদ খেয়াল দেখি নাই। ধীর শান্ত কর্ত্তাটি। ছেলে দুটিও তেমনই—তদুপরি উদার। অনেক লোকের উপকার করিতে দেখিয়াছি। ফুটবলের ম্যাচের বা কাঙ্গালী-ভোজনের জন্য চাঁদার খাতা লইয়া গিয়া কখনও তাঁহার কাছ হইতে বিমুখ হই নাই, অন্য কাহাকেও হইতে দেখি নাই। ভোজ-বাজীর মত সে সব কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল! প্রকাণ্ড চকমিলানো বাড়ী—তাহাও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাহারই পশ্চাতে নিজেদের পুরাতন দুইখানা ঘরে কোন গতিকে তাঁহারা মাথা গুঁজিয়া আছেন। নিজেদের অট্টালিকায় অপরে বাস করিতেছে। প্রতি প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পরে তাহাই দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িতেছেন।

পথে কর্ত্তার সহিত দেখা। চেহারা প্রায় সেই রকমই আছে; কেবল চিন্তার ভারেই হউক বা বার্দ্ধক্যের জন্যই হউক, সম্মুখের দিকে একটু নুইয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এই যে ললিত! কবে এলে, বাবা? ভাল আছ ত?"

আমি অত্যন্ত নম্র হইয়া বলিলাম,—"কাল এসেছি, ভালই আছি। আপনি ভাল আছেন?"

"আর ভাল! সবই ত শুনেছ, বাবা। সে দিনও দেখেছ, আজও দেখছ। কিছুই স্থায়ী নয়, বাবা। সবই দু'দিনের।"

কি বলিব? উত্তর করিবার বা সান্ত্বনা দিবার যে কিছুই নাই!

তবু বলিলাম—"আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে ত আমার বল্‌বার কিছু নেই। আপনি চিরদিনই লোকের উপকার ক'রে এসেছেন। সেই কীর্ত্তি আপনার চিরদিন থাক্‌বে। আপনাদের সম্মান কোনকালে যাবে না।"

"আর সম্মান, বাবা! না পারলাম নিজেদের কোন উপকার করতে, না হ'ল অপরের কোন স্থায়ী কায! আর পুরানো কথা কি সবাই মনে রাখে, বাবা! রাখি আমরা। রাখ্‌তেন তোমার বাবা, যদি বেঁচে থাক্‌তেন। দুজনে ঠিক দুই মায়ের পেটের ভাইয়ের মত ছিলাম। তিনি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, এ কথা কি বুঝ্‌তে পার্‌ত কেউ?"

তার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "যখন আস্‌বে, একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা ক'রে যেও। কোন্ দিন শুন্‌বে, বুড়ো জ্যাঠা আর নেই!"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখা কর্‌ব।" বলিয়া গভীর সম্মান, সহানুভূতি ও বেদনার দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বিদায় লইলাম।

একটু অগ্রসর হইয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়া আপনার পুরাতন অট্টালিকার দিকে চাহিয়া আছেন। একটু পরে চোখ দুইটা আপন উত্তরীয় দিয়া মুছিয়া দৃষ্টি নামাইয়া লইলেন।

আমি ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে নিশ্বাস ফেলিয়া কুণ্ডুজ্যাঠার কথা ভাবিতে ভাবিতে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে পথ দিয়া যাইতেছিলাম। বড় রাস্তার উপর এক চারতলা প্রকাণ্ড নূতন বাড়ী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কার বাড়ী?"

বন্ধু সবিস্ময়ে বলিল, "বাঃ, তাও জান না না কি? জান্‌বেই বা কি ক'রে? দেশে ত আস না! এ দেবদাসের বাড়ী।"

"বল কি! কাল রাত্রেও দেখ্‌লাম, তারা ত আগেকার বাড়ীতেই রয়েছে।"

"তা থাকুক। এখনও গৃহপ্রবেশ হয় নি। আস্‌ছে মাসেই এখানে উঠে আস্‌বে।"

"দেবদাস এত টাকা খরচ ক'রে বাড়ী করেছে! এতে ত অন্ততঃ ৩০।৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।"

"তা কেন করবে না? ও ত পরের আফিসে ফ্যানের নীচে ব'সে—দুদশ লাখ টাকার হিসাব রাখে না, ওর নিজের সিন্দুকে দুচার লাখ থাকে। বাবা মারা যেতে ও এখন কত টাকার মালিক জান?"

"কত টাকার?"

"অন্ততঃ তিন লাখ! কাকার ভাগে তিন লাখ, ওর নিজের ভাগে তিন লাখ। ও এখন আর সে দেবদাস নেই।"

"তা এত খরচ যখন করলে, বেশ খোলা যায়গার উপর বাড়ী করলেই হ'ত। সাম্‌নে বাগান, প্রচুর যায়গা, সবই ত ঐ টাকায় হয়ে যেত।"

"তা হ'লে কি হয়! ওর এই ভাল লেগেছে, এই রকম করেছে। ঐশ্বর্য্যের একটি প্রধান ইচ্ছা হচ্ছে আত্মীয়দের দেখানো। ওর অনেক আত্মীয় এ পাড়ায় আছে। এ বাড়ী সর্ব্বক্ষণ তাদের মনে করিয়ে দেবে—তোমরা নিজেদের বড় লোক ভাব। দেখ, দেবদাস তোমাদের চেয়ে কত বড়। এই একটা মস্ত লাভ। গরীবের পাড়ায় গরীবদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে কি লাভ?"

বলিলাম, "তা বটে।" ভাবিলাম, যাবার আগে একবার দেবদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইব।

রাত্রিতে বাল্যকালের অনেক কথাই স্বপ্নে দেখিলাম। দেবদাস, বলাই, আমি নদীতে স্নানে যাইতেছি। ঘাটে আরও কত সঙ্গী। কাকচক্ষুজল একটুখানির মধ্যেই আবিল হইয়া উঠিল। কয় জনে নদী পার হইলাম। যেন ভিন্ন দেশে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কত অজানা গৃহ, কত অজানা সুখ-দুঃখ, কত অজানা কাহিনী। সেখান হইতে রায় চৌধুরীদের প্রাসাদোপম সৌধ আমাদের গ্রামের মুকুটের মত মনে হইতে লাগিল। কয় জনে তীরে চড়িয়া উপরে উঠিলাম। সম্মুখেই আম বাগান। গাছে উঠিয়া কাঁচা আম কোঁচড় ভরিয়া পাড়িলাম। কাঁচা আম খাইতে খাইতে আবার নদী পার হইলাম।

বাড়ী ফিরিতে মা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ রে, সেই কোন্ সকালে নাইতে গেছিস, আর এলি বেলা বারোটায়। খা এখন শুক্‌নো কড়কড়ে ভাত!"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় মা, কোথায় পুরাতন সঙ্গিগণ, কোথায় সে মধুর বাল্যকাল! আমার ছোট মেয়ে মাথার কাছে বসিয়া ডাকিতেছিল, "বাবামণি, ওঠ, কত যে বেলা হ'ল।"

২

দেবদাসের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম, দেখা করিবার প্রয়োজন শীঘ্রই ঘটিল।

হিসাব না করিয়া খরচ করিবার ফলে দেখা গেল, চাকুরী-স্থানে যাইবার রেল-ভাড়ার টাকায় কম পড়িবে। অন্ততঃ গোটা ৩০৲ টাকা নহিলে কিছুতেই চলিবে না। ইহার উপর গৃহিণীর দেশ হইতে দুই চারিটি জিনিষ কিনিবার ফরমাস আছে। সেও গোটা কুড়িক টাকা লাগিবে। সব শুদ্ধ ৫০৲ টাকা হইলে চলিবে। না হয় কুড়ি টাকা না দিয়া স্ত্রীর সগর্জ্জন অভিমান সহিলাম। কিন্তু ভাড়ার টাকা নহিলে ত কোনমতেই চলিবে না। ভাবিলাম, এক সময় দেবদাস ত প্রায় অভিন্ন-হৃদয়ই ছিল। সে এখন টাকার মানুষ। পঞ্চাশটে টাকা—অন্ততঃ ত্রিশটে টাকাও কি দিবে না?

দেবদাসের উদ্দেশে বাহির হইলাম। পথেই দেখা। সে তাহার গদী হইতেই ফিরিতেছিল। সঙ্গে এক জন লোক, বোধ হয়, ব্যাপারীই হইবে। সাধারণ প্রশ্নোত্তরের পর আমিই বলিলাম, "চল না, বেড়াতে বেড়াতে ডাকঘর পর্য্যন্ত যাওয়া যাক্।"

সে ব্যবসাদার, বুদ্ধিমান্, ইহাতেই কি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল? বলিল, "এর সঙ্গে একটু বিশেষ কায আছে। অন্য সময়ে এসো না, গল্প করা যাবে।"

ইহার পর কি আর কথা কওয়া চলে—টাকা ধার চাওয়া ত দূরের কথা। একবার মনে হইল, সেই দেবদাস ধনী হইয়াছে বলিয়া একবার বসিতেও বলিল না! কিন্তু এখন সে চিন্তায় কোন ফল নাই। মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, তোমার সঙ্গে বাল্যকালে বন্ধুতা ছিল বলিয়াই কি টাকা ধার দিতে হইবে? বাল্যবন্ধু ত অনেকেই আছে। তাহা হইলে ত ধনী লোকদিগকে এক একটা 'বাল্যবন্ধু রিলিফ ফণ্ড' খুলিতে হয়। বলিলাম বটে; কিন্তু উহা নিছক দর্শনের কথা। ইহাতে জ্ঞান বাড়ে, অভাব নিবারণ হয় না।

অতুলের কথা মনে হইল। সে বন্ধুও বটে, পরের উপকার করারও অভ্যাস আছে তাহার। তাহার কাছে মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিব, আর বোধ হয়, বিফলও হইব না। কাছেই বাড়ী। বিলম্ব না করিয়া তাহার বাড়ীতে গেলাম। সদর-দুয়ার বন্ধ—সে দুয়ার প্রায় বন্ধই থাকে। পূজা-পার্ব্বণ বা কোন বড় উপলক্ষ না হইলে খোলা হয় না! খিড়কিতে কলের দুয়ার লাগানো। সেখানে গিয়া ডাকিলাম, অতুল! বার তিনেক ডাকার পর সাড়া মিলিল, কে?

উত্তরে বলিলাম, "এসেই দেখ না—বোধ হয়, চিনতে পারবে।"

অতুলও রান্নাঘরে স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ রন্ধন করিতেছিল কি স্ত্রীর রান্না চাকিতেছিল, বলিতে পারি না। বাহিরে আসিয়া হাত ধুইতে ধুইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ললিত যে! এস।"

মনে হইল, 'এস' কথাটা অভ্যর্থনাসূচক নহে, নিতান্তই শিষ্টাচারসূচক। কারণ, কথাটা বলিয়াই অতুল বাহিরে আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইল। সেটা একেবারে গলি, তদুপরি নির্জ্জন। কাযেই সেখানে কথাটা পাড়িতে তেমন কোন অসুবিধা হইল না। বলিলাম, "ভাই, একটা বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি। কালই ফিরে যাব, এ দিকে টাকা কম প'ড়ে গেছে। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে হবে।"

বন্ধুর মুখখানা মুহূর্ত্তে মলিন হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আমি পৌঁছেই এক দিন পরে তোমাকে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।"

অতুলের মুখের মলিনতা তাহাতে ঘুচিল না। বলিল, "হাতে যা ছিল, তাই কুড়িয়ে-বুড়িয়ে কালই দেনদারকে একশো টাকা দিয়েছি। আজ যে হাতে পাঁচটা টাকাও নেই।"

ভয় পাইয়া বলিলাম, "সহধর্ম্মিণীর কাছে একবার খোঁজ নেও ভাই। ওঁর হাতেও ত থাকে। না পেলে যে মহা বিপদ।"

অতুল বলিল, "তবে আর কুড়িয়ে-বুড়িয়ে বল্লাম কেন? আমার টাকা কুড়িয়ে, ওর টাকা বুড়িয়ে অর্থাৎ গায়ে হাত বুলিয়ে তবে না এক শ' হ'ল। হাত একেবারে খালি।"

অতুলের রসিক বলিয়া একটু খ্যাতি ছিল, সে খ্যাতিটা এখনও অবস্থা ভাল হওয়ায় বজায় রাখিতে পারিয়াছে। সে আপন রসিকতায় হাসিল। কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়াও হাসিতে পারিলাম না। ম্লানমুখে বলিলাম,—"তবে আর কি হবে, চল্লাম।"

"একবার বলাই বা প্রবোধের কাছে দেখ না। বোধ হয়, তোমাকে দিতে পারে" বলিয়া অতুল দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। যাক্, পুরাতন বন্ধু ত, একবারে শুধু হাতে ফিরাইয়া দিল না; কিছু উপদেশ ত দিল। ঐ বা কয় জনে দেয়?

বিমল কনট্রাক্টর; কিন্তু পড়াশোনা, বড় বড় লোকের সঙ্গে মেলামেশা আছে। তাহার উপর কণ্ঠের সুরের জন্য সে জনপ্রিয়। খুবই বন্ধুত্ব ছিল তাহার সঙ্গে। কিন্তু আর অতীতকালের জিনিষে বিশ্বাস নাই। অতীত এক দিন ছিল, আজ নেই। অতীতের বন্ধুত্ব আনুগত্যও বুঝি তাই—অন্ততঃ গরীবের পক্ষে।

বিমলের মনের ভাব বর্ত্তমানে আমার প্রতি কিরূপ, একবার না জানিয়া চেষ্টা করা সমীচীন নহে। এক প্রতিবেশীর কাছে বিমলের কথাটা পাড়িলাম, দেখি কি বলেন! প্রতিবেশী বলিলেন, "লোক অনেকটা আগেকার মতই আছে। তবে 'হাম-বড়া' ভাবটা বেশী হয়েছে। চক্ষুলজ্জায় মানুষ অনুরোধ এড়াতে না পেরে লোকের কথা রাখে; কিন্তু একটু পরেই তার জন্য অনুশোচনা করে। যার কায করে, তারই উপর রেগে যায়। তোমার ত অত বন্ধু ছিল। তোমার উপরও সন্তুষ্ট নয়।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"কেন, তা ঠিক জানি নে। সে দিন বিমল বল্‌ছিল—ললিত লোকটা শুধু স্বার্থ নিয়ে থাকে। বিদেশ থেকে আসছে, লোকের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করবে না। কিন্তু নিজের দরকার পড়লেই দু'বারের যায়গায় দশবার যাবে।"

ইহার পরে সেখানে যাওয়া আর উচিত মনে হইল না। কিন্তু তবু যাইতে হইল। সে টাকার মানুষ, হয় ত দিতেও পারে।

মনে মনে ভাবিলাম, তৃতীয় ব্যক্তির মুখে শোনা কথার কোন দাম নেই; তার উপর বেশী আস্থা রাখাও উচিত নয়। হয় ত সে খারাপ ভাবিয়া কোন কথা বলে নাই। হয় ত ইহার মধ্যে কিছু বাড়াইয়া বলা আছে।

বিমলের ওখানে গেলাম। পুরাতন ভাবের আভাস এখানে কিছু পাইলাম। এক সময়ে যে দুজনে বন্ধু ছিলাম, এখানে আসিলে এখনও সেটুকু মনে পড়ে। তফাতের মধ্যে একটু মুরুব্বী চাল। এইটুকুই নূতন আমদানী। ধনী ও সৌখীন ব্যক্তিদের সঙ্গে বেশী মেলামেশার ফলে বোধ হয় এটুকু আসিয়াছে। বয়সের প্রভাব এবং অর্থ ও স্বচ্ছলতার ফলও ইহাতে কিছু পরিমাণে আছে।

কথাটা তুলিলাম, কিন্তু অন্যভাবে বলিলাম, "অল্পবয়সে—যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মন উদার থাকে, অর্থ নীচে তলাইয়া থাকে, আদর্শ কর্ত্তব্য সব উপরে ভাসিয়া থাকে। এক সময় ছিল—বন্ধুর জন্য বন্ধু—ভাইয়ের জন্য ভাই প্রাণ

ত্যাগ করতে পারে, কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতাম। এখন প্রাণত্যাগ ত দূরের কথা, একটা সামান্য স্বার্থ-ত্যাগও কঠিন হয়ে ওঠে।"

বিমল বলিল, "তখন স্বার্থ কম থাকে, সেটুকু ত্যাগ করা কঠিন হয় না। স্বার্থ যখন বড় হয়, তখনই তার উপর মায়া বেশী। পকেটে একটা টাকা বেঁচে গেলে তার সমস্তটা অনায়াসে দান করা সহজ হয়; কিন্তু Savings Bank-এ যদি হাজার টাকা জমে—তার থেকে চার আনা তুলে দিতে কষ্ট হয়।"

আমি বলিলাম, "আজ মনে একটা আঘাত পেয়েছি, তাই কথাটা তুললাম। কথাটা তোমাকে বল্‌ছি, শোন। সামান্য কটা টাকার জন্য আমার এক বিশেষ বাল্যবন্ধুর কাছে গেলাম। সে ধনী, কিন্তু অনায়াসে বল্লে, 'নেই ভাই।' অথচ আমার সামনে বড় লোক বন্ধুদের সে এক মিনিটের মধ্যে ঢের বেশী বেশী টাকার যোগাড় ক'রে দিয়েছে।"

বিমল একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে বল্ দেখি?"

আমি অতুলের নাম করিলাম।

বিমল একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ্ ভাই, এর আর একটা দিক্‌ও আছে। আমি সেটা বিশেষ জানি। বড় লোক বন্ধু, মধ্যবিত্ত বন্ধু, গরীব বন্ধু সকলকেই টাকা ধার দিয়ে দেখেছি। দিলে পাওয়া কঠিন। কোন কোন বন্ধু সরলভাবে এমন কথাও বলেন, 'তোর টাকা, তাই প'ড়ে আছে।' তারা ভাবে, কি আপ্যায়িতই করলে আমাকে! এই ত দেশের অবস্থা। আমি অনেক টাকার ঘাড়ে জল দিয়েছি ঐ ভাবে।"

বিমলের কাছে আর টাকার কথা তুলিতে সাহস করিলাম না।

কিছু জলযোগ করিয়া আরও কয়েকটা ভাসা-ভাসা কথা বলিয়া ও শুনিয়া চলিয়া আসিলাম।

তার পর আশায় নিরাশায় আরও দুই একটা যায়গায় ঘুরিলাম। সব নিষ্ফল। কাহারও পাসবহি অন্যলোকের কাছে, কেউ অসুস্থ, কাহারও সময় খারাপ, কেহ বা দুঃখিত। এইরূপে দ্বিপ্রহর কাটিয়া গেল। বুঝিলাম, আমি এখানে এখন বিদেশী। বিদেশীকে বিশ্বাস করিয়া কে টাকা দিবে? কেন দিবে? কিন্তু এখন উপায়? টাকা নহিলে ত চলিবে না। ইহার পূর্ব্বে দুটি কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া স্ত্রীর অলঙ্কার যাহা ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। ভাবিতে লাগিলাম—এখন কার্য্যস্থানে কাহাকেও লেখা দরকার। কিন্তু চিঠি লেখা, তার পর টাকা পাঠানো, তাহাতে ত বড়ই বিলম্ব হইবে। টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিতে হইবে। নহিলে উপায় নাই।

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, এমন সময় কাণে গেল—"চাই পাউরুটী বিস্কুট।" চাহিয়া দেখি, এক জন দীর্ঘাকৃতি লোক মাথায় একটা চাঙারি লইয়া হাঁকিয়া চলিয়াছে। স্বর যেন পরিচিত। হয় ত ইহার গলা এক দিন শুনিয়াছি। তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। একটা পাশ দেখিতে পাইলাম। দীর্ঘ দেহ, কিঞ্চিৎ শীর্ণ, বর্ণ এক সময়ে গৌর ছিল, দেখিলেই বুঝা যায়। এমন সময়ে সে আমার দিকে ফিরিল। তাহার সমস্ত মুখখানি দেখিলাম। হঠাৎ সে আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। বলিয়া উঠিল—"ললিত!"

তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকে চিনিলাম। সে বসন্ত। মুখ দিয়া প্রায় একসঙ্গেই বাহির হইল—"বসন্ত!"

পাউরুটীর ধামা রাস্তায় ফেলিয়া সে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। একটুখানির জন্য। তার পর কি ভাবিয়া হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল—"তুমি বেঁচে আছ তা হ'লে?"

বলিলাম—"হাঁ ভাই—মরণ অভাবে।"

বসন্ত সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে একবার চাহিল। বোধ হয়, সে যেন আমার মনে কোন গভীর ব্যথা আছে, তাহা বুঝিল। বলিল—"ভাই, ঐ কাছেই আমার বাসা। যাবে?"

বলিলাম, "নিশ্চয়। চল।"

চাঙারি তুলিয়া লইয়া সে অগ্রসর হইল। খানিকটা গিয়া একটা ছোট একতলা পুরানো বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বসন্ত থামিল। বলিল, "এই বাসা আমার।"

বাহিরের ঘরের দুয়ার খুলিয়া বসন্ত ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া একখানা হাত-পাখা আগাইয়া দিল। দুই জনে মাদুরের উপর বসিলাম।

বসন্তই প্রথমে কথা কহিল,—"কত কাল পরে দেখা!"

আমার মুখ দিয়াও বাহির হইল—"কত কাল পরে।"

"কিন্তু ললিত, তোমার মুখে নিরাশার বাণী! তুমি ছিলে আমাদের মধ্যে আশার অবতার।"

"সময়ে আরও কত পরিবর্ত্তন হয়। তোমার মত বাবু আর সৌখীন যে আমাদের মধ্যে কেউ ছিল না, বসন্ত। চোখে না দেখলে কে বিশ্বাস করত যে, সেই তুমি একখানা গামছা কাঁধে পাঁউরুটী বেচছ?"

বসন্ত বলিল, "তা বটে।"

তার পর দুই জনের কে কি করিতেছি ও কেন করিতেছি. তাহার বিবরণ দিলাম ও লইলাম। কাহিনী সবই সংক্ষিপ্ত। বসন্তের কাহিনী—সে চাকরী করিত; কিন্তু সময়ের গুণে বা দোষে তাহার চাকরী যায়; আর কিছুতেই চাকরী জুটাইতে পারে না। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন ১৫৲ টাকারও একটা কায খুঁজিয়া পাইল না এবং চোখের উপর যখন ভাই, বোন্ ও মাকে অনাহারে মৃতপ্রায় দেখিল, তখন সে মান-সম্ভ্রমের বৃথা অভিমান ত্যাগ করিয়া পাঁউরুটী বেচিতে সুরু করিল। এখন এই করিয়া বসন্ত তাহাদের দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে দিতে পারিতেছে।

আমার বিবরণ—আমি উড়িষ্যায় এক রাজ-আফিসে মাসিক এক শত টাকা বেতনে চাকরী করি। সম্প্রতি কন্যাদায়ে বিব্রত ও প্রায় সর্ব্বস্বান্ত।

বসন্ত বলিল, "এত বেলায় কোথায় গিয়েছিলে?"

কাযেই টাকা ধারের কথাটা লুকাইতে পারিলাম না; বলিতে হইল।

খানিক পরে উঠিলাম। বলিলাম, "এবার যাই ভাই।"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "যাই বল্‌তে নেই, বল আসি।"

দুঃখ ও দুর্ভাবনার মধ্যেও এবার আমি না হাসিয়া পারিলাম না। বলিলাম, "এখনও এ সব কথা তোমার মুখে আসে? আমার ত আর মনেও আসে না।"

বসন্ত বলিল, "না মুখে এলেই বা লাভ কি, ভাই! কাযেই মুখে আনি।"

পায়ে পায়ে দুই জনে দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। বসন্ত বলিল, "একটু দাঁড়াও, ভাই, আমি এলাম ব'লে।"

বলিয়া দ্রুতপদে একবার সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। ক্ষণপরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ভাই, মনে কিছু কোরো না। এই নোট কখানা নিয়ে যাও।"

বলিয়া খানকয়েক নোট বসন্ত আমার হাতে গুঁজিয়া দিল। গণিয়া দেখিলাম, দশ টাকা করিয়া পাঁচখানা নোট—যাহার জন্য সারা সকালটা আজ সমস্ত দিন ধনী বন্ধুদের বাড়ী ঘুরিয়া মরিয়াছি। বসন্ত ততক্ষণ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছে।

কৃতজ্ঞতার একটা কথাও মুখে আসিল না। কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। কেবল বাহিরে আসিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ দুটা একবার বেশ করিয়া মুছিয়া লইলাম।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

"প্রণয়ী"

(তোমার) কালো চুলের ঢেউ উঠেছে,
মাথায় বাঁকা সাঁথি!
নয়ন দুটি সোণার কমল
চায় গো প্রণয়, প্রীতি!
তুমি — কালো-বরণ—কোকিল পাখী!
তাই তোমারে বুকে রাখি;
ফুল-বসন্ত আন ডাকি,
প্রেমের মোহন স্মৃতি!

(তোমার) কালো চুলের ঢেউ উঠেছে
মাথায় বাঁকা সাঁথি!
বুকে সোহাগ-সাগর ঢালা,
দিব গলে যুঁথীর মালা;
জুড়াব আজ প্রাণের জ্বালা,
গেয়ে মিলন-গীতি!
(তোমার) কালো চুলের ঢেউ উঠেছে
মাথায় বাঁকা সাঁথি!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সার্ক দ্বীপ

ইংলণ্ডের তটভূমি হইতে ৭০ মাইল দূরে, ফ্রান্সের উপকূল হইতে মাত্র ২২ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে সমুদ্রবক্ষে সার্ক নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের নাম য়ুরোপের মানচিত্রে থাকিতে পারে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপের কাহিনী জনসাধারণের জ্ঞানের অগোচর। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে দ্বীপটি কিন্তু খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রচলিত

দ্বীপের শৃঙ্গগুলি চারিদিকে প্রায় সরল রেখাবৎ ঊর্দ্ধগামী। নানাবিধ লতা ও গুল্মে পাহাড়গুলি সমাচ্ছন্ন। অসংখ্য পুষ্পের সমাবেশও দেখিতে পাওয়া যাইবে। পাহাড় সমূহের নিম্নভাগে বালুকাময় বেলাভূমি এবং বিচিত্র-দর্শন গুহা। সমুদ্রবেলায় মূল্যবান্ প্রস্তর মিলিবে। চন্দ্রমণি, বৈদূর্য্যমণি এবং রাজাবর্ত্তমণি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়া

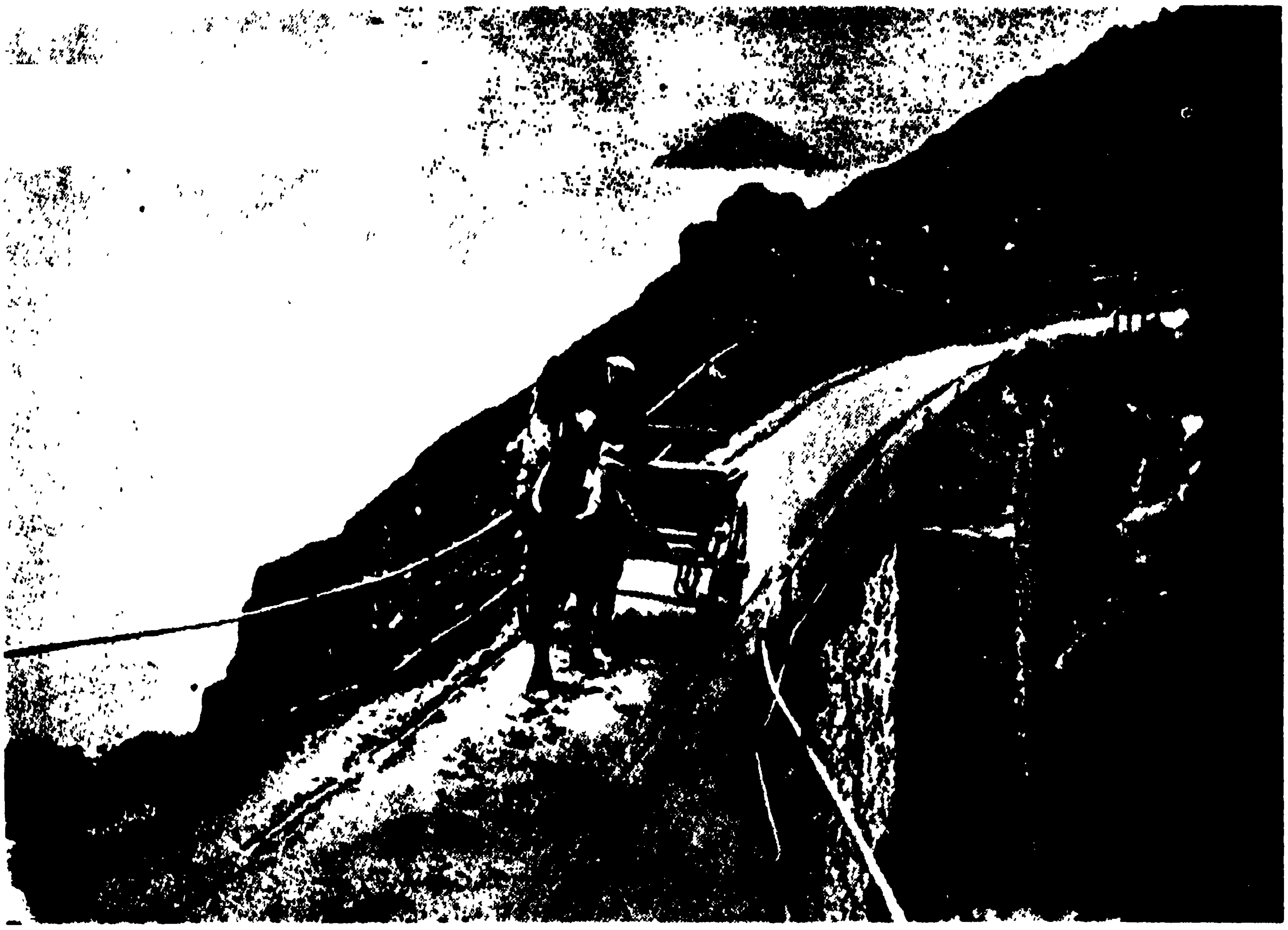

সার্ক দ্বীপের রাজপথ

বিধান অনুসারে শাসিত হইয়া থাকে। অথচ প্যারী বা লণ্ডন হইতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র জাহাজে চড়িয়া এই দ্বীপে উপনীত হওয়া যায়। জমীদারশাসিত অন্য কোন স্থান সমগ্র য়ুরোপে আর কোথাও নাই।

সার্ক দ্বীপ দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন মাইল, প্রস্থে মাত্র দেড় মাইল। দ্বীপটির অনেকগুলি উপসাগর এবং খাড়ি থাকায় ইহার উপকূলভূমির পরিমাণ ৩৫ মাইল হইবে। "ইংলিস চ্যানেল"এ যতগুলি দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে সমুদ্রবক্ষ হইতে এই দ্বীপের উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

থাকে। নানাপ্রকার ধাতুও এই দ্বীপে বিদ্যমান। তাম্র, রৌপ্য, বরনাগ প্রভৃতির খনি কিছুকাল পূর্ব্বে এই দ্বীপে পাওয়া গিয়াছিল।

দ্বীপের অভ্যন্তরপ্রদেশ তরঙ্গায়িত। উপত্যকাভূমি আরণ্য পুষ্পে সমাকীর্ণ। বসন্ত-ঋতুতে সমগ্র উপত্যকাভূমি নীল, পীত এবং রক্তবর্ণের পুষ্পরাজিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সমগ্র দ্বীপে কোনও বিষাক্ত জীব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না—একটিও ভেক পর্য্যন্ত তথায় নাই।

সার্ক দ্বীপের বন্দরটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কোনও দর্শক

এই বন্দরে অবতরণ করিয়াই দেখিতে পাইবেন যে, তাহার চারিদিকে দুরারোহ পাহাড়। দ্বীপের ভিতর প্রবেশ করিবার একটিমাত্র পথ আছে, পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথে চলিতে হয়। এই সুড়ঙ্গপথটি দুই শত ফুট দীর্ঘ। পাহাড় ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গপথটি নিৰ্ম্মিত। সুড়ঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া পথটি ক্রমশঃ খাড়া ভাবে উঠিয়া বাঁকিয়া দ্বীপের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে কতিপয় ক্ষুদ্র বিপণি ও চারিটি হোটেল আছে।

রাজপথটি লাকুপি পর্য্যন্ত প্রসৃত। এইখানে সমগ্র দ্বীপটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 'গ্রেট সার্ক' ও 'লিটল সার্ক' একটি প্রকাণ্ড পাহাড় সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে। উহার উচ্চতা ৩ শত ফুট, দৈর্ঘ্য ৪ শত ১৫ ফুট। এই পাহাড় অতিক্রম করিয়া একটি পথ চলিয়াছে। একখানি গাড়ী ও একটি ঘোড়া পাশাপাশি চলিতে পারে, রাস্তার বিস্তৃতি তাহার অপেক্ষা অধিক নহে।

সার্ক ক্ষুদ্র দ্বীপ হইলেও, ইহার ইতিহাস সামান্য বা উপেক্ষণীয় নহে। ইহার লিখিত ইতিহাস ৫৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে পাওয়া যায়। প্রস্তরযুগেও এখানে মানুষের বসবাস ছিল, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৃটানীর ডলের বিশপ সেণ্ট ম্যাগ্‌লয়ার এই দ্বীপে একটি মঠের স্থাপনা করিয়াছিলেন। দ্বীপের বর্ত্তমান মালিক মিসেস্ সিবিল হ্যাথাওয়ের অট্টালিকার পার্শ্বে এখনও সেই মঠের ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান। ১৪১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মঠে ৬২ জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তার পর তাঁহাদিগকে ফ্রান্সের মণ্টবরো আবে মঠে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

উল্লিখিত ঘটনার পর জলদস্যুগণ সার্ক দ্বীপে আশ্রয় লইয়া লুণ্ঠনে রত হয়। উক্ত জলদস্যুগণ স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। ইহাদের অত্যাচারে "ইংলিস চ্যানেল"এ বাণিজ্যপোত-পরিচালন বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে অস্থির হইয়া অবশেষে ইংলণ্ড হইতে তাহাদের দমনকল্পে অভিযান আরব্ধ হয়। সার্ক দ্বীপ হইতে জলদস্যুদিগকে অবশেষে বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু তাহার পর সার্ক দ্বীপ শ্রীহীন হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসীরা উক্ত দ্বীপ কিছু দিন অধিকারে রাখিয়াছিল। তার পর উহা ফরাসীদিগের হস্তচ্যুত হয়। সার ওয়াল্টার

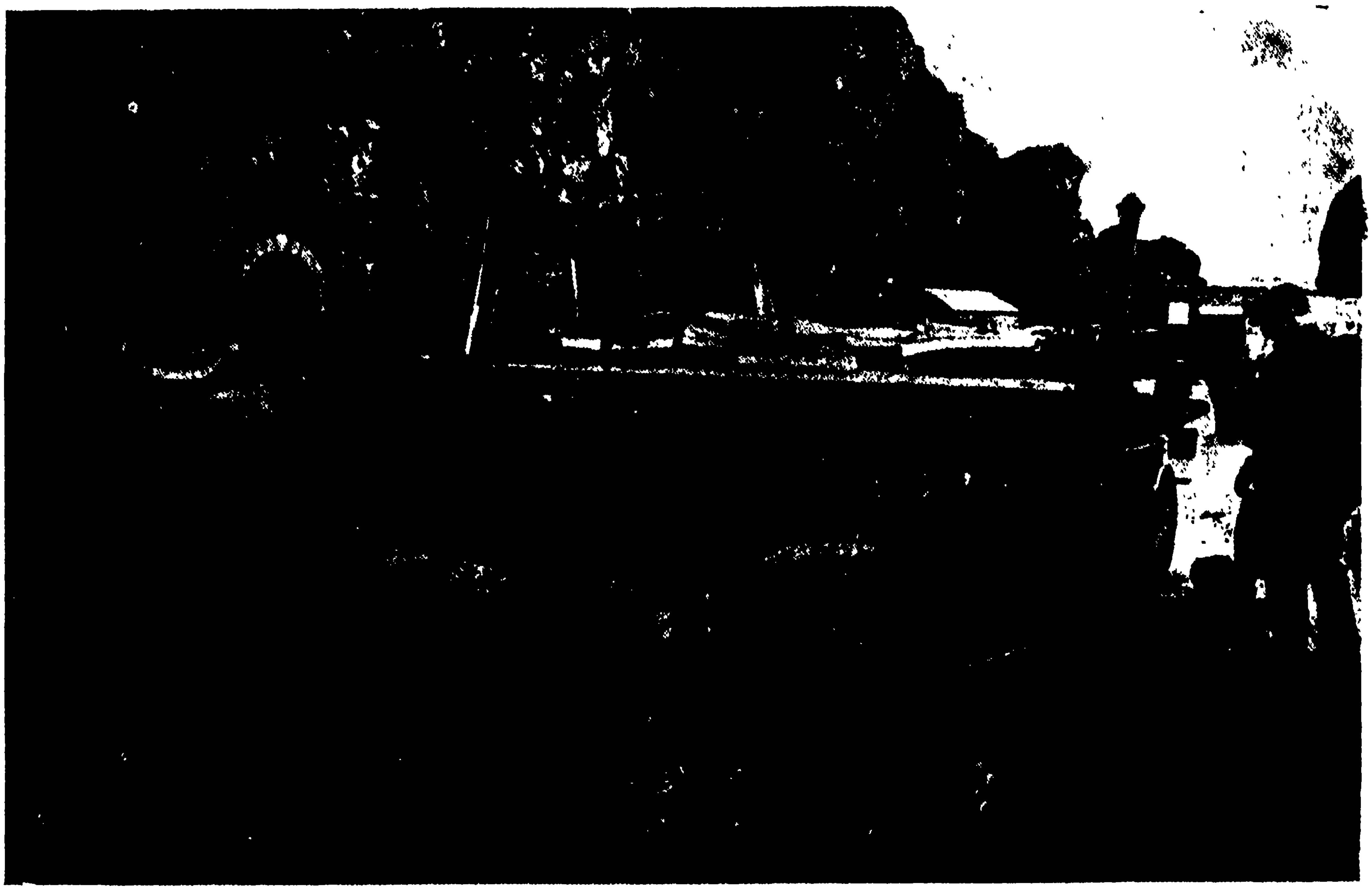

সার্ক বন্দর - পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একমাত্র সুড়ঙ্গপথ

ষ্ট্যালে যখন জার্সির শাসক ছিলেন, সেই সময় উল্লিখিত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

ঘটনাটির বিবরণ এইরূপ :—

একটি জাহাজ সার্ক দ্বীপের উপকূলে সমাগত হয়। নাবিকগণ বলে যে, তাহাদের জাহাজের অধ্যক্ষ মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ যদি দ্বীপে সমাহিত করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ উপকৃত হইবে। সার্ক দ্বীপের কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদান করেন। নাবিকগণ শবাধার বহন করিয়া পাহাড়ের উচ্চ পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া যায়। তথায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহারা শবাধার খুলিয়া ফেলে। শবাধারে শব ছিল না। উহা শুধু মারণাস্ত্রপূর্ণ ছিল। নাবিকগণ সশস্ত্র হইয়া ফরাসী সেনাবারিক আক্রমণ করে। ইহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া কয়েক জন সৈনিক হত হয়। বাকীগুলিকে বন্দী করা হয়।

উল্লিখিত ঘটনার পর দ্বীপটি পুনরায় পরিত্যক্ত হয়। তার পর জার্সি হইতে এক জন লোক আসিয়া সার্ক দ্বীপ অধিকার করেন। তাঁহার নাম সার হেলিয়ার ডি কার্টারেট্। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ সনন্দ দ্বারা তাঁহাকে সর্ত্তানুসারে উক্ত দ্বীপের অধিকার প্রদান করেন।

রাণী এলিজাবেথের সনন্দে এই সর্ত্ত থাকে যে, সার হেলিয়ার এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা উক্ত দ্বীপে ৪০টি পরিবারের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপন করিবেন। উক্ত ৪০টি পরিবার নির্দ্দিষ্টপরিমাণ জমী চাষ করিবে। প্রত্যেক পরিবারের প্রধান ব্যক্তি একটি করিয়া বন্দুক পাইবে। উহার সাহায্যে তাহারা দ্বীপটিকে রক্ষা করিবে। এ জন্য এই দ্বীপটিকে এখনও ৪০ জনের দ্বীপ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। উল্লিখিত বিধান অনুসারে যদি কোনও কৃষিক্ষেত্রের মালিকের হস্ত হইতে উক্ত সম্পত্তি অন্যের নিকট চলিয়া যায়, তাহা হইলে নূতন মালিককে এক জন বন্দুকধারী লোক নিযুক্ত করিতেই হইবে।

ডি কার্টারেটএর বংশধরগণ জার্সির সেণ্টকোঁয়ে ম্যানসনের মালিক হইলেও, সার্ক দ্বীপে উক্ত বংশের অধিকার নাই—উহা হস্তান্তরিত হইয়াছে। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে উহা বিক্রীত হইয়া যায়। সার্ক দ্বীপের স্বত্ব-স্বামিত্বের যাবতীয়

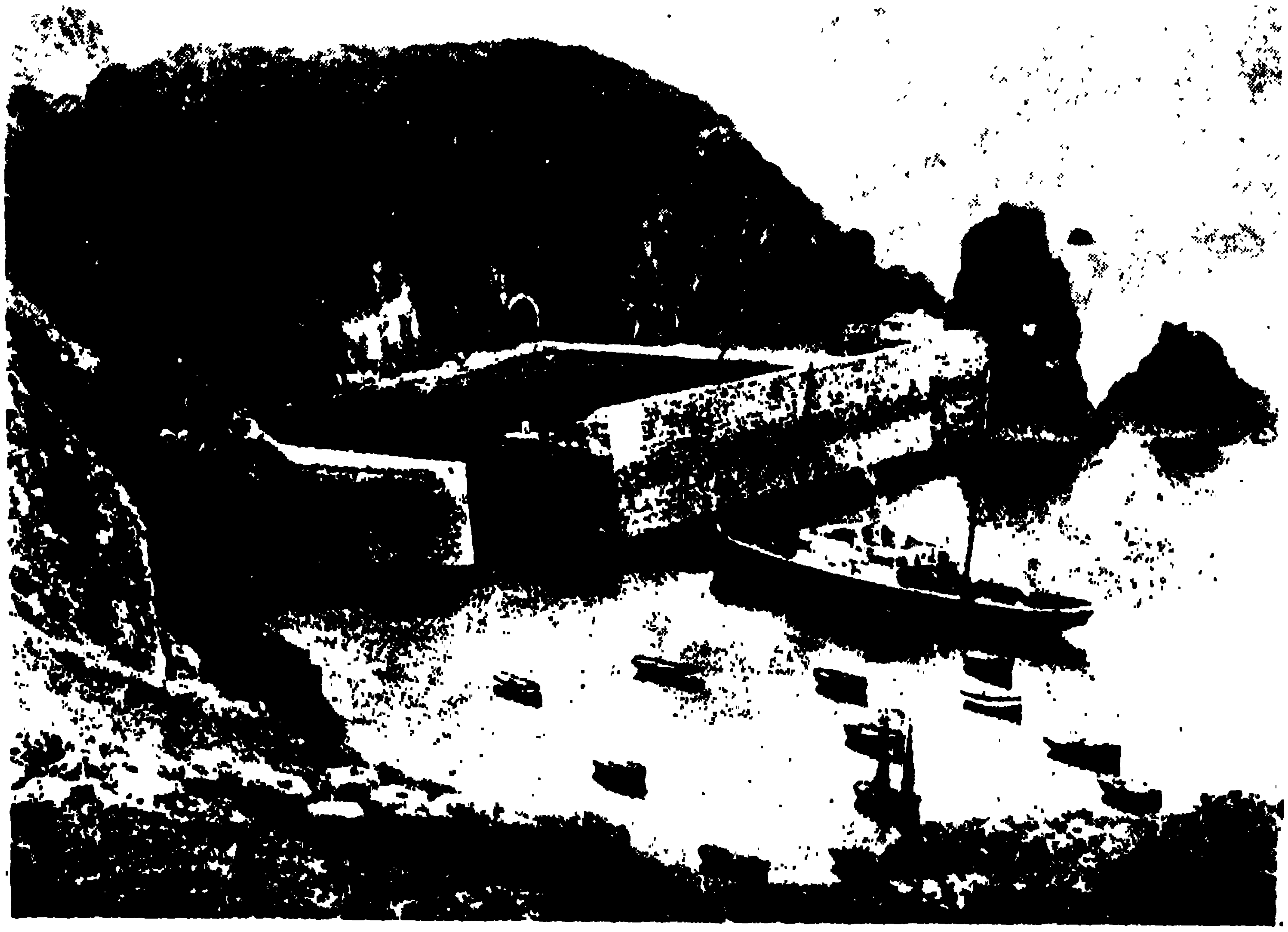

বন্দরমধ্যে ষ্টীমার প্রবেশ করিতেছে

অধিকার সিবিল হ্যাথাওয়েয়র বৃদ্ধ পিতামহীর হস্তগত হয়। ইহা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের কথা।

সার্কদ্বীপের বর্ত্তমান অধিকারিণী সার্ক দ্বীপের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "বহু বৎসর ধরিয়া এক দল বেতনভুক্ত সেনার দ্বারা দ্বীপটি রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। সেই সেনাদলে ১ শত সৈনিক ছিল এবং আমার পিতামহ উক্ত সেনাদলের শেষ কর্ণেল। ইদানীং কয়েকটি পুরাতন কামান অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমার বাড়ীতেও একটি ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত কামান আছে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ সার্ক দ্বীপের প্রথম অধিস্বামীকে উহা উপহার দিয়াছিলেন। কামানের অঙ্গে উহা ক্ষোদিত আছে।

"আমার গৃহ বা প্রাসাদ দ্বীপের একটি ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তে অবস্থিত। ধূসর বর্ণের গ্রানাইট প্রস্তরে উহা নির্ম্মিত। প্রাসাদের মূল অংশ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরাতন ধ্বংসপ্রায় মঠের সান্নিধ্যেই উহা অবস্থিত। উক্ত ধ্বংসস্তূপের বহু প্রস্তর আমার অট্টালিকার দেহে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান প্রত্যেক সোমবারে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। উহার জন্য কাহাকেও কোনও দর্শনী দিতে হয় না।"

দ্বীপের অধিকারিণী দ্বীপবাসী যে কোনও ব্যক্তির সহিত যখন তখন দেখা করেন। সকলেই তাঁহার কাছে সকল প্রকার বিষয়ের মীমাংসার জন্য আসিয়া থাকে। তিনি কখনও সে জন্য বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন না।

ক্ষুদ্র দ্বীপ হইলেও সেখানে পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা আছে। এই পার্লামেণ্টের নাম "চীফ প্লীজ।" বৎসরে উহার তিনবার অধিবেশন হয়। প্রয়োজন হইলে দ্বীপাধিকারিণী পার্লামেণ্টের অতিরিক্ত অধিবেশনও আহ্বান করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্টের প্রধান কর্ত্তা দ্বীপস্বামিনী স্বয়ং ও তাঁহার স্বামী। ৪০ জন ক্ষেত্রস্বামীই সভার সদস্য। ইহা ছাড়া দ্বীপের ৬ শত ৭৫ জন অধিবাসীর মধ্য হইতে ১২ জন ডেপুটী নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

দ্বীপের শাসনসংরক্ষণকল্পে এই পার্লামেণ্ট হইতেই বিধান রচিত হইয়া থাকে। রাজকীয় কোন প্রকার করের বালাই এখানে নাই। শুধু সপারিষদ ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমোদিত কোনও বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে,

সুড়ঙ্গমুখ

তাহা ঐ দ্বীপের আইনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

এই দ্বীপবাসীরা ইংলণ্ডেশ্বরকে নর্ম্মাণ্ডির ডিউক হিসাবে এখনও তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে। এই দ্বীপবাসীদিগের মত এমন বিশ্বস্ত এবং অনুগত প্রজা আর কোথাও নাই। এই দ্বীপবাসীরা স্মরণাতীত কাল হইতে নর্ম্মাণ্ডির অধিকারভুক্ত এবং অংশস্বরূপ। নর্ম্মাণ্ডির ডিউক "উইলিয়ম দি কংকারার" ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করেন। তিনিই পরে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া গৃহীত হন। কিন্তু এই দ্বীপবাসীদিগের কাছে তিনি চিরদিনই নর্ম্মাণ্ডির ডিউক রহিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে ইংলিশ উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ কখনও ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত ছিল না, বরং নর্ম্মাণ্ডির অধিকারভুক্তরূপেই পরিগণিত। সার্ক দ্বীপ ক্ষুদ্র হইলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই জাতীয় ঋণ আছে, শুধু এই দ্বীপ উহার বহির্ভূত। কাযেই এই দ্বীপের জমার অঙ্কে বেশ মোটা টাকাও আছে। এখানে কোন প্রকার আয়কর-প্রথা নাই; শুধু সম্পত্তির উপর একটা সামান্য কর ধার্য্য আছে। কোনও লোক এই দ্বীপে নামিলে তাহাকে মাত্র মাথা পিছু এক সিলিং কর দিতে হয়। সুরাসারজাতীয় দ্রব্য এবং তাম্রকূটের জন্য যে কর আদায় হয়, তাহাও অধিক নহে। উল্লিখিতভাবে যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহাতে সরকারী আয়-ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। দ্বীপে বেকার-সমস্যা নাই। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রনীতিকের কোনও বালাই সেখানে একেবারেই নাই।

রাজপথের একটি দৃশ্য

দ্বীপবাসীদিগের সরকারী ভাষা ফরাসী। কিন্তু সকলেই ইংরাজী বলিতে কহিতে পারে। বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার সঙ্গে ইংরাজী ভাষার শিক্ষাও সযত্নে প্রদত্ত হয়। এ জন্য দ্বীপবাসিমাত্রই দুইটি ভাষা জানে। এতদ্ব্যতীত দ্বীপমধ্যে প্রাচীন নর্ম্মান ও ফরাসীভাষার মিশ্রণে যে ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, সেই ভাষা প্রচলিত ছিল। এই ভাষার কোনও লিখিত গ্রন্থ নাই। মুখে মুখেই এই ভাষা প্রচলিত। সকলেই এই ভাষায় গৃহে কথা কহিয়া থাকে।

দ্বীপে দুইটি বিদ্যালয় আছে;—একটি বালকদিগের জন্য, অপরটি বালিকাদিগের নিমিত্ত। এখানে সকলেই লেখাপড়া

শিখিতে বাধ্য। দ্বীপের অধিকারিণী স্বয়ং বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া ছাত্রছাত্রীগণের ফরাসী ও ইংরাজী-ভাষার জ্ঞানের পরিচয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মানসিক উন্নতি হইতেছে কি না, এ বিষয়ে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

মোটর-গাড়ী দ্বীপে প্রবেশ করিতে পায় না। আইন করিয়া উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান অধিস্বামিনীর বিশেষ লক্ষ্য আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, আমার দ্বীপে মোটর-গাড়ীর প্রবেশাধিকার নাই। পৃথিবীর মধ্যে এমন একটা স্থানও অন্ততঃ আছে—যেখানে বর্ত্তমান যুগের যানবাহনের কথা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে, এই দৃষ্টান্ত আমি রাখিয়া যাইতে চাই। ইহাতে মানুষ নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে।"

দ্বীপে কুক্কুরীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। বহু শতাব্দী ধরিয়া তথায় একটি বিধান প্রচলিত আছে যে, দ্বীপের অধিস্বামী ব্যতীত অপর কেহ কুক্কুরী পুষিতে পারিবে না। সেই অধিকারবলে দ্বীপস্বামিনীর স্বামী পারাবতও পুষিতে পারেন। ইহার ফলে তথায় অতিরিক্তসংখ্যক পারাবতের বালাই নাই। উহারা শস্য নাশ করিতে পারে না।

দ্বীপের মধ্যে অন্য কাহারও কল নির্ম্মাণ করিবার অধিকার নাই। দ্বীপস্বামিনী ব্যতীত অন্য কেহ গম পেষা বা ময়দা প্রস্তুত করিবার অধিকারী নহে। এ কার্য্য দ্বীপস্বামিনী স্বয়ং করেন, অবশ্য বর্ত্তমান যুগের উপযোগী মোটরশক্তির সাহায্যে। প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে এ জন্য সামান্য মূল্য গ্রহণ করা হয়।

পার্লামেণ্ট ব্যতীত একটি বিচারালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। এক জন বিচারক দ্বীপস্বামিনী নিযুক্ত করেন। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার স্থিতিকাল। এই বিচারক বিচারফলে অপরাধীকে জরিমানা করিতে পারেন, কারাদণ্ডও দিতে পারেন। একটি কারাগার আছে বটে, তবে তাহা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। কোনও বিষয়ের মীমাংসার প্রয়োজন হইলে, আদালতে না আসিয়াই সকলে বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া লইয়া থাকে। বর্ত্তমান দ্বীপস্বামিনীর পিতামহীর আমলে একবার কারাগার ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাঁহার কোনও যুবতী পরিচারিকা লোভে পড়িয়া মনিবের কিছু পরিচ্ছদ

সার্ক দ্বীপের প্রাসাদ

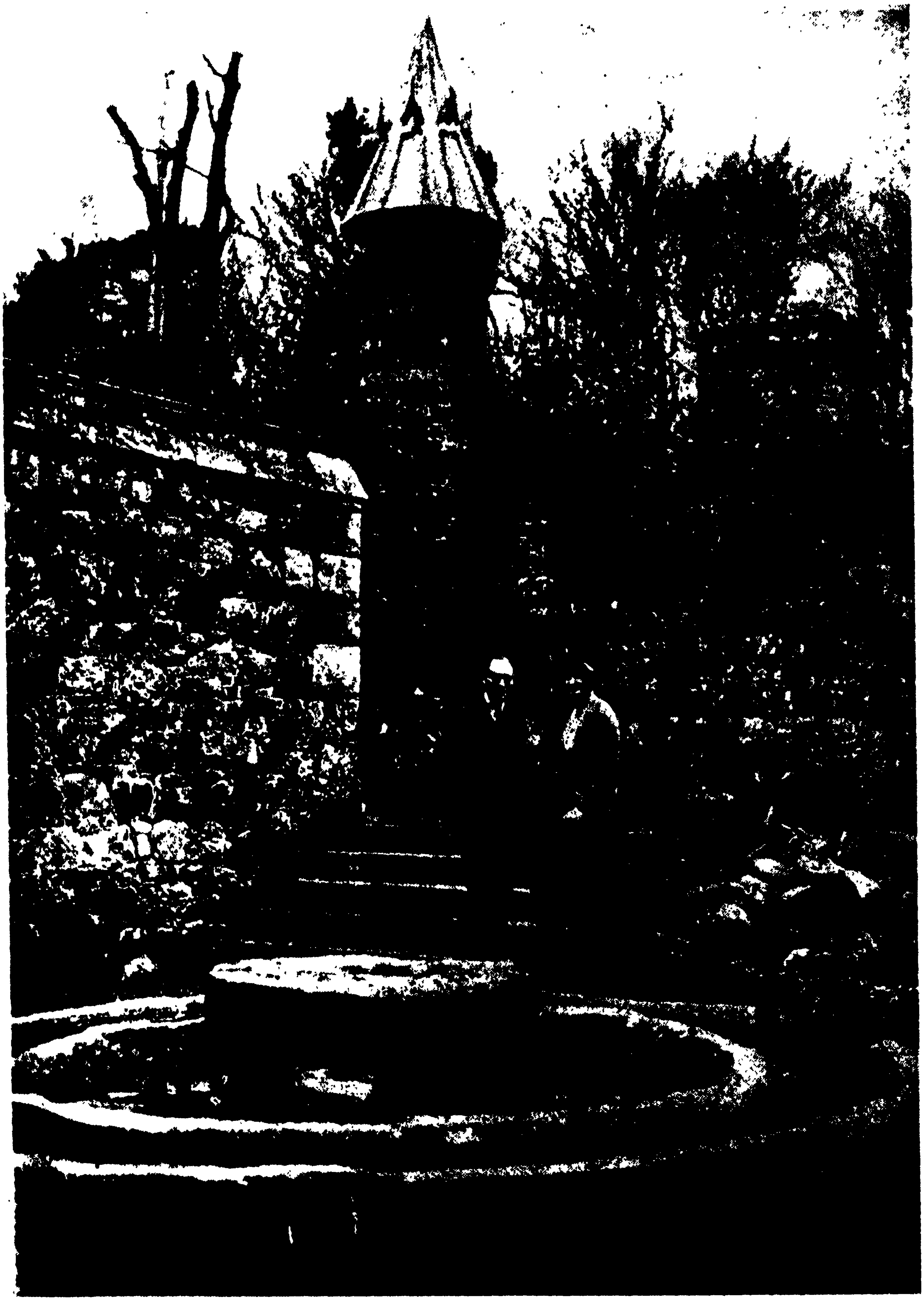

পারাবত-গৃহ ও হ্যাথাওয়ে দম্পতি

রাণী বেস্-প্রদত্ত কামানের সম্মুখে হ্যাথাওয়ে দম্পতি

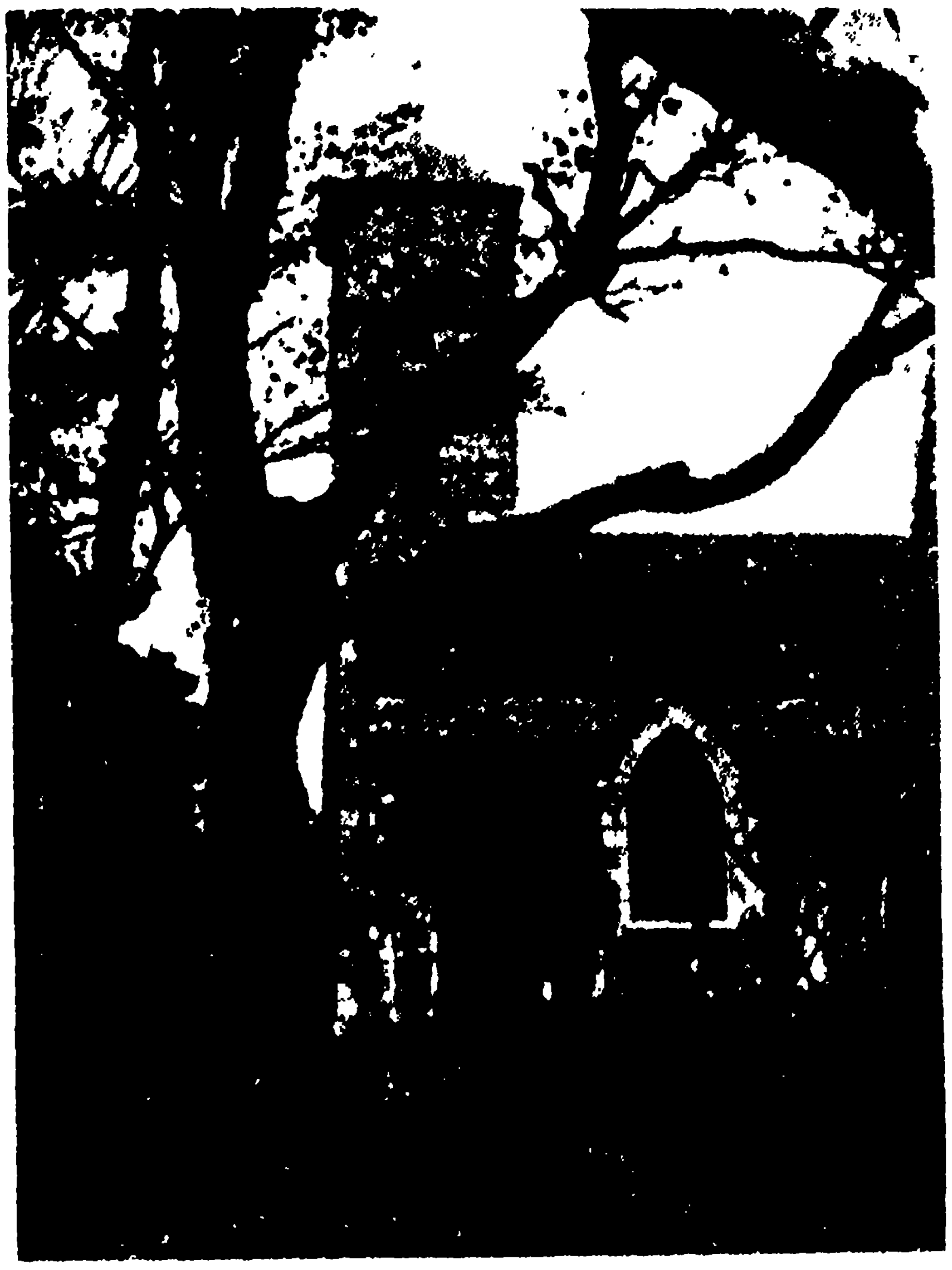

ধর্ম্ম-মন্দির

ষোড়শ শতাব্দীর বায়ুচালিত কল

তরঙ্গ-প্রহত দ্বীপের একাংশ

চুরি করিয়াছিল। বিচারে তাহার কারাদণ্ড হইলে, সে এমন ভাবে কাঁদিতে লাগিল যে, কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া কারাদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যুবতী পরিচারিকার আত্মীয়স্বজন মুক্ত দ্বারপথে কারাগারে আসিয়া তাহার সহিত গল্প করিত, খেলা করিত।

দ্বীপে অপরাধপ্রবণতা অত্যন্ত অল্প। তাহার প্রধান কারণ, অপরাধ করিয়া দ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কোনও উপায় নাই। দ্বীপের মধ্যে এক জন

দ্বীপের একাংশের দৃশ্য

ধর্ম্মমন্দিরের সম্মুখে—পারাবত ও হাথাওয়ে দম্পতি

কনষ্টেবল আছে। সে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়। পার্লামেণ্ট হইতে তাহাকে নিযুক্ত করা হয় বলিয়া সে কার্য্য করিতে অস্বীকার করিতে পারে না। এই প্রণালীতে প্রায় প্রত্যেক সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষকেই কনষ্টেবলের কায করিতে হয়। ইহাতে আইন সম্বন্ধে দ্বীপবাসীর জ্ঞান প্রসৃত হইয়া থাকে। আদালতের এক জন কেরাণী, এক জন সেরিফ এবং এক জন কোষাধ্যক্ষও আছে।

সাক দ্বীপে যত শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার দশমাংশ দ্বীপস্বামীকে প্রদান করিতে হয়। দশমাংশ গৃহীত না হইলে কেহ ক্ষেত্র হইতে শস্য লইয়া যাইবার অধিকারী নহে। ক্ষেত্রস্বামী ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে দ্বীপস্বামিনীকে সংবাদ দিয়া থাকে যে, তাহার দশমাংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি উহা গ্রহণ করিলে, সে নিজের শস্য গৃহে লইয়া যাইতে পারে। মেষপাল, কাষ্ঠ, পশম এবং অন্যান্য খনিজ ধাতুর সম্বন্ধেও দশমাংশ দ্বীপস্বামিনীর প্রাপ্য। ৪০ জন ক্ষেত্রস্বামীকে তাহাদের

দ্বীপবাসীর গৃহ

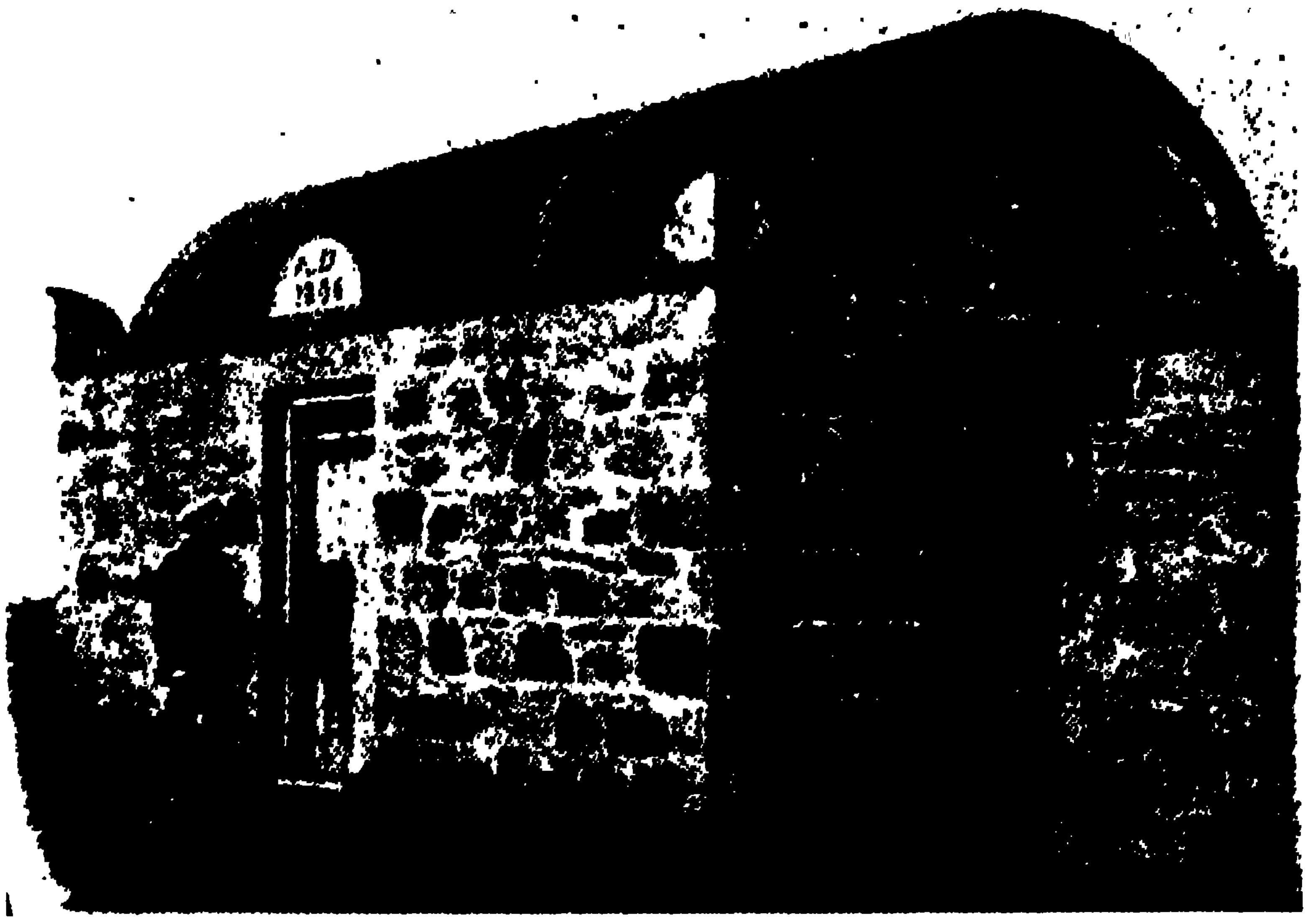

দ্বীপের অব্যবহৃত কারাগার

কাহারও কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে, দ্বীপস্থ কোনও সম্পত্তি কেহ অপরকে দান করিয়া যাইতে পারে না। পাঁচ পুরুষের মধ্যে কোনও উত্তরাধিকারী না থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি দ্বীপের অধিস্বামীতেই ফিরিয়া আসে।

অতি প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই সার্ক দ্বীপে জমীর ক্রয়-বিক্রয়কার্য্য সম্পন্ন হয়। কেহ কোনও জমী বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে ক্রেতাকে দ্বীপস্বামীর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। যে মূল্যে জমী ক্রীত হইবে, তাহার

পথিপার্শ্বস্থ রমণীয় দৃশ্য

জমীর জন্য একটা খাজানা দিতে হয়।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে একটি আইন রচিত হয়, তাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, ষোড়শ বর্ষের অধিকবয়স্ক প্রত্যেক পুরুষকে রাজপথ মেরামতের জন্য বৎসরে ৬ই দিন বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে হইবে। যাহাদের তাহাতে অসুবিধা হইবে, তাহারা উপযুক্ত মূল্য অথবা অন্য লোককে তাহাদের স্থানে কায করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

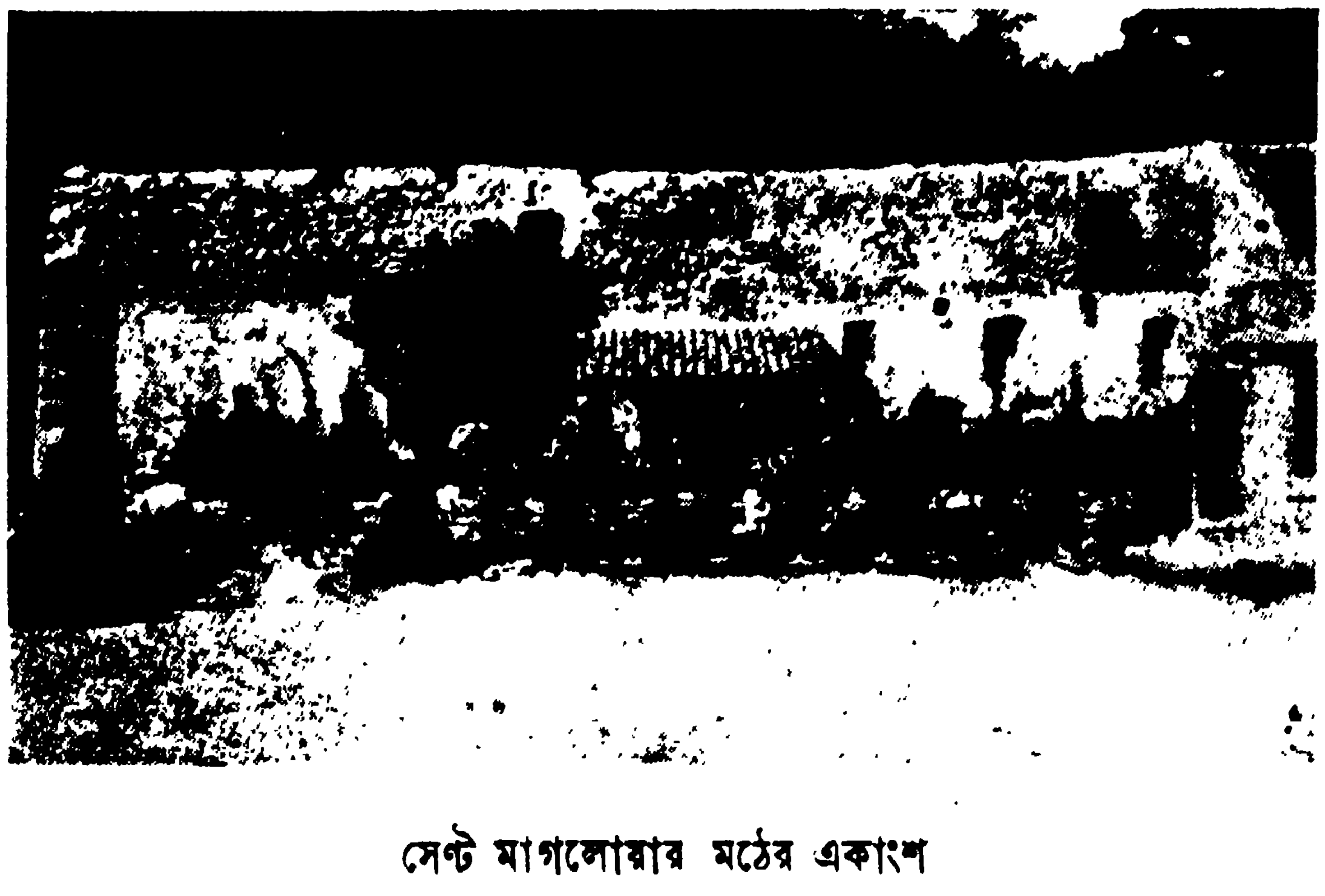

সেণ্ট মাগলোয়ার মঠের একাংশ

ত্রয়োদশ ভাগের এক ভাগ দ্বীপস্বামীকে প্রদান করিতে হইবে।

কোনও জমীর মালিক তাহার জমীর একটা অংশ বিক্রয় করিবার অধিকারী নহে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে যে বিধান প্রচলিত আছে, তাহাতে এরূপ ভাবে আংশিক বিক্রয়ের ব্যবস্থা নাই। ইহার ফলে মৌলিক ৪০টি ক্ষেত্রস্বামীর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই।

সামুদ্রিক গল পাখী শিকার করা

সার্ক দ্বীপের উদ্যান

এই দ্বীপে নিষিদ্ধ। কারণ, কুজ্ঝটিকার সময় এই পাখীরা দ্বীপের উপরে চীৎকার করিতে করিতে উড়িতে থাকে। তাহাতে দ্বীপবাসীরা আসন্ন বিপদের বার্ত্তা অবগত হইয়া থাকে।

সার্ক দ্বীপের বর্ত্তমান অধিস্বামিনী সিবিল হ্যাথাওয়ে এক স্থানে লিখিয়াছেন, "সার্ক দ্বীপে যে সকল বিধান প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা আমরা পুরাতন রীতিনীতি এবং স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববাসীকে এই কথা বিজ্ঞাপিত করিতে চাই যে, ষোড়শ শতাব্দীর আবহাওয়া বজায় রাখিয়া আমরা সুখে ও আনন্দে কালযাপন করিতেছি। আধুনিক প্রণালীতে যে সকল গভর্ণমেণ্ট কায চালাইতেছেন, তাঁহারা আমাদের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, অনুকরণ করিবার অনেক বিষয় আমাদের ব্যবস্থায় আছে।"

২ শত ৫৭ বৎসরের পুরাতন অগ্নিকুণ্ড

সার্ক দ্বীপের ডাকঘর

স্বত্বাধিকার-সংক্রান্ত কোনও আইন না থাকিলেও, কোনও স্বামী স্ত্রীর অনুমোদন ব্যতীত তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন না। আবার স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর কোনও বিশেষ অধিকার না থাকিলেও, স্বামী যদি সম্পত্তি বিক্রয় করেন, তবে তাহা হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ স্ত্রী পাইয়া থাকেন। বাড়ীর এক-তৃতীয়াংশ স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র রাখিতেই হইবে।

ইংলিশ উপসাগর দ্বীপপুঞ্জের কোনও অধিবাসীরই বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নাই। যদি কোনও দম্পতির পক্ষে একত্রবাস নানাকারণে অসম্ভব হইয়া পড়ে, তবে তাহারা আইনবলে স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করিতে পারে মাত্র। বিবাহ-বিচ্ছেদ নাই। বিশ বৎসর বয়সে সাবালকত্বের অধিকার জন্মে। তবে যদি আদালতের বিচারে এমন স্থির হয় যে, আরও এক বৎসর কাহাকেও অপেক্ষা করিতে হইবে, তবে ২১ বৎসর না হইলে কেহ সাবালক হইতে পারে না।

একটা চমৎকার বিধান দ্বীপে প্রচলিত আছে। উহা

সার্ক দ্বীপে যান্ত্রিক জীবন এখনও আরব্ধ হয় নাই। অবশ্য মোটর-চালিত নৌকা বা রেডিও যন্ত্র শীতকালের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তথায় বিদ্যমান, কিন্তু এখানে চলচ্চিত্র প্রভৃতি দেখিয়া অর্থব্যয়ে আনন্দ উপভোগ করিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। উহা এই দ্বীপে নিষিদ্ধ।

য়ুরোপের মহাসমরে দ্বীপ হইতে ৪০ জন যুবক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭ জন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু দ্বীপে নর-নারীর সংখ্যা সমান। বহুনারী শস্যক্ষেত্রে কায করে, পশুপালনে সাহায্য করিয়া থাকে। দ্বীপের অধিবাসীরা শিষ্টাচারসম্পন্ন, অতিথিবৎসল।

মিঃ রবার্ট উডওয়ার্ড হ্যাথাওয়ে বর্ত্তমান দ্বীপাধিকারিণীর স্বামী। তিনি আমেরিকার অধিবাসী। কিন্তু ব্যবসায় উপলক্ষে ইংলণ্ডে বাস করায় এখন তিনি এক জন বৃটিশ প্রজা।

প্রাচীন বিধান অনুসারে, দ্বীপস্বামিনীর বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার যত কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহার সমস্তই তাঁহার স্বামীর অধিকারভুক্ত হয়। এই জন্য, তিনিও এই দ্বীপের প্রভু। দ্বীপে বিবাহিতা নারীর সম্পত্তির

বন্দরের অপরাংশ

অত্যন্ত প্রাচীন। যদি কোন লোক কোন ব্যক্তির জমী বা গৃহে অনধিকারপ্রবেশ করে বা আক্রমণ করিতে চাহে, তবে আক্রান্ত ব্যক্তি তিনবার "হারো" (Haro) বলিয়া চীৎকার করিলেই, যে কেহ সে শব্দ শুনিতে পাইবে, সেই তাহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য। "হারো" শব্দের অর্থ "সাহায্য কর, আমার উপর অত্যাচার হইতেছে।" ধৃত ব্যক্তির পরে আদালতে বিচার হইয়া থাকে।

দ্বীপের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস—যাহাকে সভ্যযুগ কুসংস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে—প্রবল। যাদুবিদ্যার প্রতি দ্বীপবাসীর বিশেষ বিশ্বাস আছে। দ্বীপস্বামিনীর একটি পুত্র এবং কন্যা উভয়েই যাদুবিদ্যার প্রভাবে পীড়িতা হইয়াছিল। ওঝার মন্ত্র এবং প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাহারা আরোগ্য লাভ করে। কোনও চিকিৎসক কিন্তু তাহাদিগকে আরোগ্য করিতে পারেন নাই।

দ্বীপমধ্যে ভূতের সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। লোক ভূতেও বিশ্বাস করে। দ্বীপের অধিকারিণীর প্রাসাদের পুরাতন অংশে ভূতযোনি অবস্থান করে বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। কাহারও মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি নারীমূর্ত্তি দ্বারে আসিয়া আঘাত করে, এমন দৃষ্টান্ত অনেকেই দেখিয়াছে। মিসেস্ হ্যাথাওয়েয়র পিতামহীর মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ দৃশ্য দেখা গিয়াছিল।

অশ্বারোহী একটি ভূতের কাহিনীও দ্বীপে প্রচলিত। মূর্ত্তির মাথা নাই। খৃষ্টমাস উৎসবের পূর্ব্বদিনে কোনও লোক কূপ হইতে মধ্যরাত্রিতে জল তুলিতে গেলে ভূত তাহার নাম ধরিয়া ডাকে। সেই ব্যক্তির এক বৎসরকালের মধ্যে মৃত্যুও ঘটে।

সেণ্টজন উৎসবের দিনে মধ্যরাত্রিতে গৃহপালিত পশুগুলি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়ে। তখন না কি তাহাদের মুখে মানুষের ভাষা নির্গত হইয়া থাকে।

এই দ্বীপটিকে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকদীপ্ত যুগে, প্রাচীন রীতিনীতির প্রভাবে পরিচালিত রাখিবার ব্যবস্থার দিকে মিঃ ও মিসেস হ্যাথাওয়ে প্রাণপণ যত্ন লইয়া থাকেন। মিসেস হ্যাথাওয়ে লিখিয়াছেন, "এই দ্বীপবাসীরা পরম সুখে আছে। দুষ্টমতি ব্যক্তিরা এখানকার শান্তি নষ্ট করিতে পারে না। শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যেকের জীবনযাত্রা চলিতেছে।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বরষায়

গগনে নব নীরদমালা গরজে গুরু গুমরি ;
চপলা চাহে চকিতে আঁখি মেলিয়া।
পবন হু হু শ্বসিয়া ফিরে ; কি যেন গূঢ় বেদনা
বাজিয়া বুকে চেতনা ফেলে ঘেরিয়া !
আতপতাপতাপিতহিয়া পিপাসাতুরা ধরণী
বরষ-আশে জলদে যাচে কাতরে,—
"কোথা গো মেঘ, করুণানিধি, নামিয়া এস উরসে,
বিন্দুসীধু ঢাল গো বিধুরাধরে।"
মিনতি-ভরা এ আবাহনে মেঘের মন টলিল,
করুণাঝরি ঝরিল শত নয়নে !
শান্ত হ'ল শ্রান্ত ধরা নবীন প্রাণ লভিয়া,
শ্যামল মায়া ভাতিল চারু'বয়নে !
আজি চাতকচিত "ফটিক জল" পিয়া গো,
কাননে নীপ পুলকে উঠে শিহরি' !
কীচকবনে ব্যাকুল বাজে মদির মধু মূর্চ্ছনা,
মীড়ের রেশে বিবশ করে বাঁশরী !
শিখীর সনে শিখিনী নাচে, দাদুরী ডাকে সঘনে
বাদল-বায়ে কাহারে অভিলাষিয়া !
সান্দ্র শুভ ভুবন ভরে সিক্ত-ভূমি-সৌরভে,
কেতকী-যূথী-গন্ধ আসে ভাসিয়া।
এম্‌নিতর বরষা কত এসেছে, গেছে, ভুবনে
জলদজালে বদনবিধু আবরি'।
প্লাবন সনে নিখিল প্রাণ কাঁদিয়া গেছে কত না,
নিবিড় ব্যথা বেজেছে বুকে গুমরি'।
ধারার জলে ধরণী স্নাত দৈন্য কোথা নাহি রে,
কান্তকম শষ্পশ্যাম বরণী।
শূন্য শেষে বিরহী শুধু যাপিছে যামি জাগিয়া
নিমেষহারা চাহিয়া প্রিয়সরণী !

শ্রীবিনায়ক সান্যাল (এম্, এ,)

বড় ঘর

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ট্রেণের কামরায়

ট্রেণে ভিড় ছিল না। দু'খানি বার্থের একখানিতে প্রভাত, অপরখানিতে বিনতা সেন। দু'খানিই নীচে-কার বার্থ।

বিনতা সেনের সঙ্গে একটা হোল্ড-অল্ ছিল; প্রভাত কহিল,—ওতে আপনার বিছানা আছে, নিশ্চয়…?

মৃদু হাস্যে বিনতা কহিল,—আছে।

প্রভাত হোল্ড-অল্টা খুলিতে উদ্যত হইলে বিনতা সসঙ্কোচে কহিল—আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন! আমি ব্যবস্থা করচি…

প্রভাত কহিল—আমি থাকতে আপনি কষ্ট করবেন! তা হয় না! আপনি আমার guest…

বিনতা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—কেন হবে না! খুব হয়। আমার এই কাজ। হামেশা আমায় এমনি call নিয়ে বাইরে যাতায়াত করতে হয়। তা ছাড়া আপনি মনিবের মতন…

—ছি, ছি, কি বলেন! মনিব কি!…লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া প্রভাত হোল্ড-অল্টা খুলিয়া ফেলিল। বিনতা আসিয়া ছোট একখানা সুজনি ও ঝালর-দেওয়া ওয়াড়ে-ঢাকা একটা বালিশ টানিয়া বাহির করিল,—তার সঙ্গে একখানা রঙীন দোসুতী।

সেগুলা রাখিয়া হোল্ড-অল্টা টানিয়া জড়াইয়া বিনতা সেন সেটাকে বেঞ্চের তলায় পুরিয়া দিল; তার পর প্রভাতের পানে চাহিয়া কহিল,—ভারী তো বিছানা! এর জন্য আপনি অস্থির হয়ে উঠছিলেন…

হাসিয়া সুজনিখানা বেঞ্চের উপর বিছানায় পাতিয়া সে বালিশ ও দোসুতীটা পাশে রাখিল; রাখিয়া ছোট ব্যাগ খুলিয়া একখানা মলাট-দেওয়া বই বাহির করিল। ট্রেণ তখন চলিতে সুরু করিয়াছে। প্রভাত নিজের বিছানা পাতিতে উদ্যত হইল। তার বেডিংয়ের সঙ্গে সরু একখানা তোষক ছিল—ট্রেণে যাতায়াতের জন্য ঠিক বেঞ্চের মাপে তৈয়ারী করা। তোষকটা লইয়া প্রভাত কহিল—এটা আপনার ঐ সুজনির তলায় পাতুন। না হ'লে…

তার মুখের কথা লুফিয়া হাসিয়া বিনতা কহিল,—না হ'লে শয্যা-কণ্টকী হবে? কি যে বলেন আপনি! সেকেণ্ড ক্লাশের এমন গদি-পাতা বেঞ্চি…এমন নরম বিছানায় বাড়ীতেও শুতে পাই না! নিন্, ও-তোষক আপনি রাখুন। আমার যা আছে, তাতে যথেষ্ট হবে…

এ-কথার প্রতিবাদ করিতে প্রভাত কুণ্ঠিত হইল,—দুটি কারণে। প্রথম কারণ, তার লজ্জা হইতেছিল এই ভাবিয়া

সে, অপরিচিতা মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস তার নাই পাছে বিনয়ের মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া পড়ে—ইনি পাছে বেকুব ঠাওরান! দ্বিতীয় কারণ, সামান্য ব্যাপার লইয়া বহু কথার সৃষ্টি করিতে তার চিরদিন বাধে!

বিনা-বাক্যে তোশক পাতিয়া নিজের শয্যা রচনা করিয়া সে তাহাতে বসিল। বিনতা সেন নিজের আসনে বসিয়া বইখানা খুলিল। তাকে নিশ্চিন্তভাবে বসিতে দেখিয়া প্রভাত কহিল ভালো কথা, আপনার খাবার সময় হ'লে বলবেন, আমার টিফিন-ক্যারিয়ারে দু'জনের মত খাবার আছে। মামী-মা সঙ্গে দিয়েচেন, সেই সঙ্গে মামা বাবু ব'লে দিয়েচেন, দুজনের খাবার আছে।

হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বিনতা সেন কহিল—দেখা যাবে যদি দরকার হয়, বলবো। আমি এক পেয়ালা চা আর দু'খানা টোষ্ট খেয়ে এসেচি। সবে একটা case থেকে ছুটী পেয়ে বাড়ী এসে স্নান করচি, এমন সময় সদাশিব বাবুর লোক গিয়ে খবর দিলে…এখনি আসতে হবে, দেরী সইবে না—এমন জোর তলব!

প্রভাত কহিল,—আপনি কখন খান্?

বিনতা কহিল,—আমাদের খাবার ধরা-বাঁধা টাইম্ নেই। কবে, কখন্, কোথায় জুটবে, তারো ঠিক থাকে না তো। কথাটা বলিয়া সে হাসিল।

—আপনার খুব বেশী প্র্যাক্‌টিশ…না?

—খুব বেশী নয়। তবে আমি মিড্‌ওয়াইফ নই, সিক্-নার্শ! কাজেই বড় বড় ঘরে হামেশা ডাক পড়ে। তাঁরা বিলাসিতা জানেন, সাজগোজ, বেড়ানো, পার্টি—এ সবে আশ্চর্য্য তৎপরতা…কিন্তু রোগ হ'লে সেবায় হাত ওঠে না—ভারী nervous হয়ে পড়েন। তাঁদের এই weakness এর উপর দিয়েই আমাদের বাণিজ্যের প্রসার…

কথাটা বলিয়া বিনতা হাসিল।

কথাটা কিন্তু প্রভাতের গায়ে তীরের মত বাজিল। সে কহিল,—শুধু কি তাই আপনাদের ডাক পড়ে! সহজভাবে জীবন-যাত্রা চলছে—অসুখ-বিসুখে nervous হওয়া স্বাভাবিক। সেবার অভ্যাস সকলের থাকে না। কখন্ কি ভাবে কি করতে হবে, জানা নেই,—আপনাদের একটা experience আছে—একটুতে অধীর হবার আশঙ্কা নেই—তাই। তা ছাড়া এই যে আমাদের বাড়ী যাচ্ছেন—সেখানে কিন্তু উল্টো রকম দেখবেন। আমরা খুব সেকেলে আছি এখনো। পাড়াগাঁ কি না…আপনার যে ডাক পড়েচে, তা থেকে বুঝচি, অসুখ শক্ত—এবং ডাক্তারের বিশেষ আদেশ হয়েচে নিশ্চয় আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য।

—কি অসুখ?

—তা জানি না। ঘণ্টাখানেক আগে আমি রোগের সংবাদও জানতুম না। হঠাৎ শুনলুম। এবং আদেশ হলো, এখনি বেরিয়ে পড়ো…

ট্রেণ দমদমায় থামিল। আলো-আঁধারের একটু চমক, কলরবের মৃদু ঝাপ্‌টা—ট্রেণ আবার চলিল। বিনতা কহিল—কখন্ পৌছুবো?

প্রভাত কহিল—পৌণে ছটোয় ঈশ্বরদি পৌছুবো। সেখান থেকে মোটর-সার্ভিস আছে। তাতে আরো ঘণ্টাখানেক কি, ঘণ্টা দুই…পাবনায় পৌছে দেবে। পাবনা থেকে আটুয়াখালি—আরো ঘণ্টাখানেকের পথ।

বিনতা কহিল—পেশেণ্ট পুরুষ? না, মেয়ে?

—পুরুষ। আমার খুড়তুতো ভাই। আমার চেয়ে চার বছরের ছোট। ভারী ভালো ছেলে।

—বটে!

প্রভাত খোলা জানালা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল—আকাশ ঘোলাটে হইয়া আছে। মেঘ? বোধ হয়…সে দিকে খেয়াল করিবার মত মনের অবস্থা তার নয়; দুশ্চিন্তায় মন এমনি আচ্ছন্ন…মাখনের কি অসুখ হইল? কেমন আছে? গিয়া দেখিতে পাইবে তো?…

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ট্রাঙ্কটার পানে চাহিয়া ট্রাঙ্কটা টানিল। বিনতা তখন বই খুলিয়া তাহারি একটা পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছে।

ট্রাঙ্ক খুলিয়া প্রভাতও একখানা বহি বাহির করিল—একখানা ইংরাজী মাসিকপত্র…ট্রেণে যদি ঘুম না হয়, পড়িবে বলিয়া মামা সদাশিবের টেবিল হইতে আনিয়াছে। মামার বই পড়ার সখ প্রচণ্ড…ভালো বই, বাজে বই, হাতের কাছে যা পান, তাই পড়িতে বসেন। ইংরাজী-বাঙলা—সে-সবের কোনো বিচার করেন না—সর্ব্ব-ভাষায় সর্ব্ববিধ গ্রন্থের দিকে তাঁর একটা কেমন প্রবল আকর্ষণ আছে!

পত্রিকাখানা খুলিয়া একটা গল্প সে পড়িতে সুরু করিল জটিল মনস্তত্ত্বের লীলা প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছে! ভালো

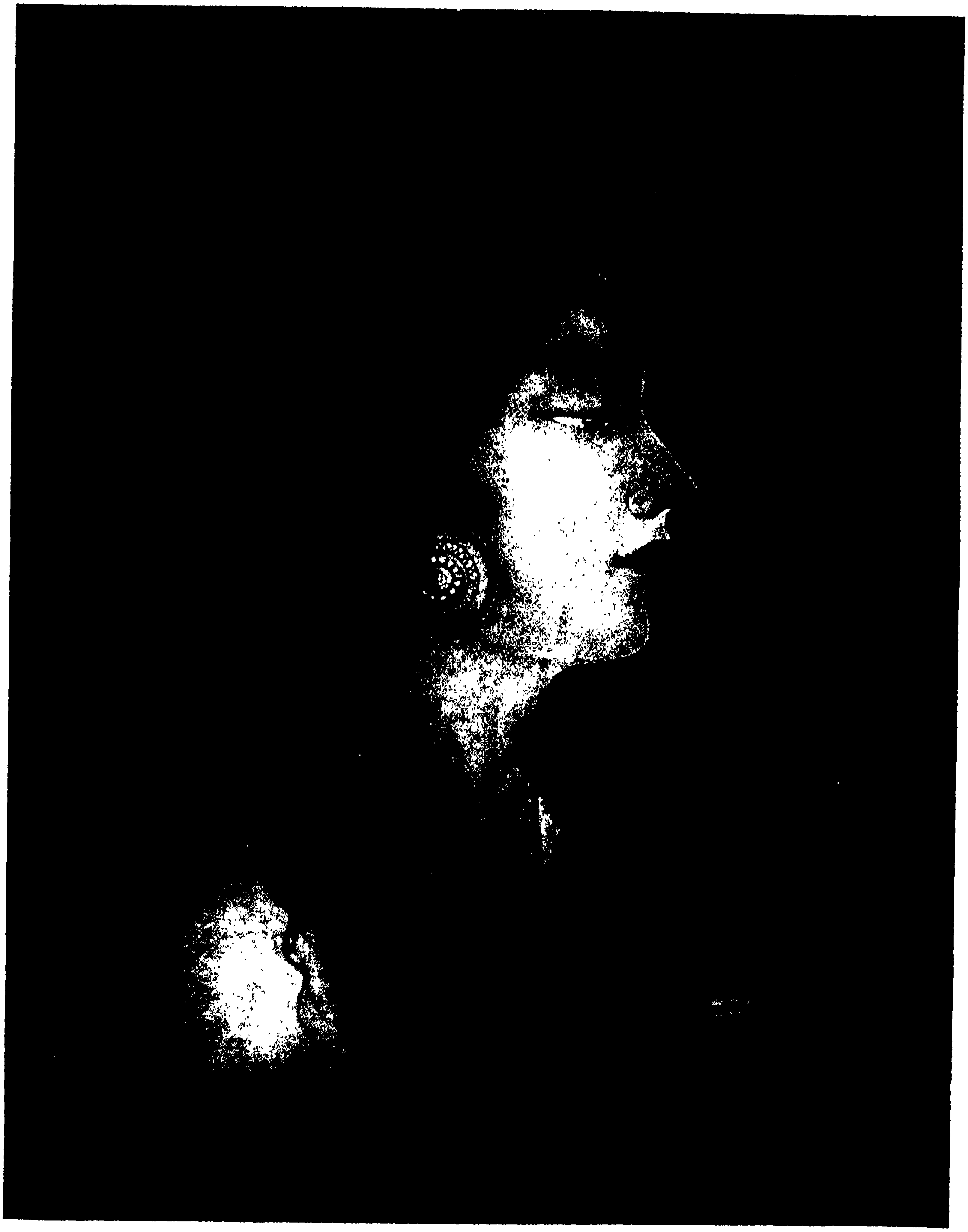

"বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন শিথিল বেশ ;
সে দিনও এমনিতর অন্ধকার দিন ।"

বসুমতী চিত্র-বিভাগ । [শিল্পী—শ্রীতারকনাথ দাস ।]

লাগিল না—কোনো রস নাই···তবু প্রভাত দমিল না—পড়িতে লাগিল।

ট্রেণ বারাকপুর ছাড়িলে বিনতা কহিল—আপনি খাবেন না?

বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া প্রভাত বিনতার পানে চাহিল, কহিল—খেয়ে নিলে হয়! রাত হচ্ছে···বেশ!

বইখানা মুড়িয়া প্রভাত উঠিয়া টিফিন-ক্যারিয়ারটা টানিল; বিনতা দ্রুত-পায়ে আসিয়া সেটা তার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া কহিল—ওটা আমায় দিন তো। জুতো-মোজা পায়ে দিয়ে অর্থ-উপার্জ্জনে নেমেচি ব'লে দেহে-মনে মেয়েমানুষই আছি। এ কাজ চিরদিনই মেয়েদের। দিন্ আমায়, আমি খাওয়াচ্ছি।···

প্রভাতের বিস্ময় বোধ হইল। সম্পূর্ণ অপরিচিতা নারী এভাবে নিমেষে এতখানি অন্তরঙ্গতা করিতে পারেন, এমন কুণ্ঠাহীন ভঙ্গীতে···এ তার স্বপ্নের অগোচর ছিল!

বিনতা অতি-নিকট আত্মীয়ার মত পরম স্নেহে ক্যারিয়ার খুলিল। উপরের পাত্রে দু'খানি কলাপাতা ভাঁজ করা ছিল, একখানি পাতা বেঞ্চে পাতিয়া লুচি, ভাজা, তরকারী প্রভৃতি তার উপর সাজাইয়া বিনতা কহিল—খেতে বসুন···

বিনতা হাত ধুইবার জন্য উঠিল, কহিল—মিষ্টি আছে! তরকারী দিয়ে খাওয়া হ'লে দেবো···

প্রভাত কহিল—আপনি···?

বিনতা কহিল—আপনার খাওয়া হোক, তার পর প্রয়োজন বুঝি—খাবো। নিখাকী আমি নই। এই যে রোগীর সেবা করতে ট্রেণে চ'ড়ে চলেছি আপনার সঙ্গে, এ শুধু অন্নের সংস্থান করতে—

প্রভাত ছাড়িল না, নিজে জোর করিয়া বিনতার জন্য আর একটি পাতায় লুচি-তরকারী সাজাইয়া দিয়া কহিল—আপনি খান্। আপনি খেলে আমি খাবো। না হ'লে আমিও না···

—আপনি বড় গোল বাধান্···বলিয়া বিনতা হাত ধুইয়া আসিয়া নিজের বেঞ্চে বসিয়া কহিল—খান্···

প্রভাত কহিল—আপনি বসুন···কোনো সঙ্কোচ করবেন না। আমি জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে খাবো'খন···

হাসিয়া বিনতা কহিল—কেন বলুন তো! আপনার সামনে খেতে আমার লজ্জা হবে—তাই?···তা ভয় নেই···খাওয়ার মধ্যে লজ্জা পাবার কিছু নেই, অন্ততঃ থাকলেও তা মানবার মত প্রেজুডিস আমার কোনো কালে নেই।

আহারাদি চুকিয়া গিয়াছে। দুখানি বার্থে দুজন আরোহী। বিনতা বসিয়া বই পড়িতেছে; বই অসহ্য-বোধ হওয়ায় প্রভাত শুইয়া চক্ষু মুদিয়াছে! চোখে কিন্তু ঘুম আসিতেছিল না। অনন্ত, পরিমল, জাহ্নবী দেবী, লাটু সাহেব কখনো আসিয়া সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, আবার পরক্ষণে সে ভিড় সরাইয়া রোগশয্যায় শায়িত মাখনের মলিন কাতর শীর্ণ মুখচ্ছবি মুদিত চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে! তার চঞ্চলতার সীমা নাই! এমন দোটানায় সে জীবনে পড়ে নাই···

তাকে এপাশ ওপাশ করিতে দেখিয়া বিনতা কহিল—ঘুম হচ্ছে না?

প্রভাত চোখ খুলিয়া মুখখানা বিকৃত করিল, তার পর উঠিয়া বসিয়া কহিল—না!

—কেন বলুন তো? মাথা ধরেচে?

—না।

—তবে?

—কি জানি!

—আমার কাছে স্মেলিং-সল্ট আছে, দেবো?

অন্যমনস্কভাবে প্রভাত কহিল—নাঃ···

স্থির দৃষ্টিতে বিনতা প্রভাতের পানে চাহিয়া রহিল, তার পর কহিল—ব'সে রইলেন কেন? শুয়ে পড়ুন···আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি। ঘুম আসবে'খন···

—না, না—কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন!

বিনতা কহিল—ব্যস্ত হচ্ছি এই কারণে যে, আপনার আশ্রয়েই এখন দূরদেশে যাচ্ছি—সে দেশ জানি না, সে-দেশের পথ-ঘাটও চিনি না। আপনার অসুখ হ'লে মুস্কিল ঘটবে কি না, তাই। আর যাচ্ছি যে কাযে, তাও খুব serious···আপনি তর্ক করবেন না, করলে আমি কোনো কথা শুনবো না। আপনি শুয়ে পড়ুন। ঘুম পাড়াবার নানা কৌশল আমি জানি। ব্যবসা-সূত্রে জানতে হয়েচে। এতে লজ্জা বা কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই···

এ-সব কথায় কথা তুলিলে অহেতুক আরো কথা বাড়িয়া চলিবে। প্রভাতের তাহাতে রুচি ছিল না। দুর্ভাবনায় তার বুক ভরিয়া আছে! ওদিকে জাহ্নবী দেবীর চিঠি পাইয়া অনন্ত সেই যে ছুটিয়া গিয়াছে···তার সঙ্গে হেতুয়ায় দেখা হইবার কথা! এদিকে মাখনের কি এমন অসুখ হইল! তার উপর বিনতা সেনের এই বক্তৃতা!

সে শুইয়া চক্ষু মুদিল। বিনতা দেবী পাশে বসিয়া তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।···

ট্রেণ দ্রুত ছুটিয়াছে, কামরার জানালা খোলা স্নিগ্ধ-শীতল হাওয়া! তার মধ্যে প্রভাত কখন্ যে পরিমলের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে···

কতক্ষণ, জানা নাই। হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড়িয়া প্রভাত উঠিয়া বসিল, দুই চোখে ব্যাকুল দৃষ্টি! বিনতা চমকিয়া উঠিল, কহিল, কি হলো! এমন ক'রে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন যে!

প্রভাত একটা নিশ্বাস ফেলিল। মৃদুস্বরে কহিল আপনি!

হ্যাঁ। আপনি কি ভেবেছিলেন···?

ঠোঁটের উপর একটা নাম গড়াইয়া আসিয়াছিল,—প···

তখনি সতর্কভাবে প্রভাত নিজেকে সামলাইয়া লইল, কহিল—স্বপ্ন দেখছিলুম ··

—কি স্বপ্ন···?

যেন,···না, তা নয় ··

প্রভাত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। মাঠ, জলা, গাছপালার ছবি অস্পষ্ট রেখায় সরিয়া সরিয়া যাইতেছে!

ট্রেণের গতি মন্থর হইয়া আসিল। হাত-ঘড়ির পানে চাহিয়া প্রভাত কহিল একটা বেজেচে। এই তো ঈশ্বরদি পৌঁছুবার সময়।

বিনতা কহিল—শেষ ষ্টেশন পোড়াদ ছেড়ে এসেচি। আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন।

—তা হ'লে মাল-পত্র ঠিক ক'রে গুছিয়ে নি—বলিয়া প্রভাত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিজে বিছানা গুটাইয়া ষ্ট্রাপে বাঁধিয়া বিনতার বেঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল, বিনতা কহিল চোখে-মুখে জল দিন গে। স্বপ্নের ঘোরে কোথায় নামতে কোথায় শেষে নামবেন!···আমার বিছানা আমি গুছিয়ে নিচ্ছি! এ-সব কাজে আমার অভ্যাস আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মেঘ-ভার

জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁর বিপদের কথা শুনিয়া অনন্ত ক্ষণেকের জন্য কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জাহ্নবী দেবী কাতর নয়নে তার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি হবে, বাবা?

অনন্ত কহিল—সমস্যা!···

জাহ্নবী দেবী কহিলেন—তা হ'লে মেয়েটা জন্মের মত যাবে?···মা হয়ে আমি ··

বাষ্পের উচ্ছ্বাসে তাঁর মুখের কথা বাধিয়া গেল।···

অনন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ সমস্যার মীমাংসা কি করিয়া হয়, তা সে বুঝিতে পারিল না।

জাহ্নবী দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তোমার সে বন্ধুটিও কোন উপায় করতে পারে না?

অনন্ত কহিল—আমার অবস্থা তো জানেন! কাকার অন্নে আছি—লেখাপড়া করচি। টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করা অসম্ভব। কোথা দিয়ে তার ব্যবস্থা করা যায়, তাও আমার বুদ্ধিতে আসচে না! না হলে এ যে কত বড় বিপদ, তা বুঝচি এবং এ বিপদে মাথা দিতে আমায় গৌরব কতখানি, তাও অনুভব করচি! কিন্তু কি করতে পারি? আপনার মতই নিরুপায় আমি···!

জাহ্নবী দেবী চুপ করিয়া রহিলেন,—বহুক্ষণ ·· বাহিরে বনভূমি ঝিল্লীর রবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে সেই আখড়ায় কে গান গাহিতেছে···

জাহ্নবী দেবী কহিলেন—উনি বেরিয়েচেন—বেলা তখন পাঁচটা, কিন্তু কোথায় বা যাবেন! কি যে করবেন! আমি তো জানি, কতখানি তিনি নিরুপায়! মনের বেদনা চেপে রাখবার জন্য শুধু বেরিয়েচেন, নিজের সঙ্গে ছলনা ক'রে···তাঁর দ্বারা উপায় হ'তে পারে না··· এ আমি জানি, তিনিও জানেন। তাই চুপি চুপি তোমায় ডেকেচি···না ডেকে উপায় ছিল না। তোমার সেই বন্ধুটি···

একটা বড় নিশ্বাস জাহ্নবী দেবীর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

অনন্ত প্রভাতের কথা ভাবিতেছিল। কিন্তু প্রভাতই বা কি করিতে পারে! সেও স্বাধীন নয়। তার বাপ বাঁচিয়া আছেন—বাপের কাছে তার আব্দার চলে—এবং বাপের

পয়সা আছে প্রচুর—এ সব সত্য ! কিন্তু পয়সা থাকিলেই বাপ ছেলের কথায় সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এত টাকা কোন্ অজানা অপরিচিতের বিপদে ফেলিয়া দিবেন···কেন ? প্রভাত শিশু নয়—সেই বা বাপের কাছে এমন অন্যায় আবদার করিবে কোন্ মুখে !···

জাহ্নবী দেবী কহিলেন—সে-ছেলেটিকে বললে কোনো উপায় হয় না ?

উদ্বেগাকুল কণ্ঠে অনন্ত কহিল,—সে'ও তো পরাধীন। বোঝেন তো, পয়সা জিনিষটা সহজে কেউ ত্যাগ করে না, বিশেষ যে ক্ষেত্রে কোনো স্বার্থ নেই, বা সে-পয়সা ফিরে পাবার কোনো ভরসা নেই···সে-আশা সংশয়ে আচ্ছন্ন !···

জাহ্নবী দেবী কহিলেন—সে-কথা তোমায় আগেই বলেচি বাবা, শোধ দেবার সামর্থ্য নেই। এ পয়সা যিনি দেবেন, গরীবকে দান করচেন বলেই তিনি দেবেন।··· একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে রক্ষা করতে—নিরপরাধ নিরীহ মেয়ে···

রাজ্যের গল্প-উপন্যাসের প্লট অনন্তর মাথায় জট্ পাকাইয়া জাল রচিতেছিল। এমন বহু গল্প কেতাবে পড়া যায়। গরীব বাপ দেনার দায়ে পরের কাছে নিজেকে এমন বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, সে-বন্ধন হইতে মুক্তির কোনো উপায় নাই ! সে বন্ধন দিনে দিনে এমন জটিল, এমন কঠিন হইয়া উঠিতেছে যে, তার চাপে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলে বুঝি দম্ বন্ধ হইয়া মরে ! এমন সময় প্রতিবেশী যুবার করুণায় বাঁধন কাটিল, মুক্তির হাওয়া বহিয়া সকলকে সজীব করিয়া তুলিল ! গল্পে এমন নিত্য পড়িতেছে ! কিন্তু সে গল্প ! তা বলিয়া বাস্তব জীবনে···

নিজের পরিচিত বিশ্বভূমিটুকুর উপর দিয়া সতর্ক দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াও কোনো সন্ধান মিলিল না—এমনটি কোথাও ঘটিয়াছে···কৈ ?···হয় তো গল্পে যে-লেখকটি করুণায় বিগলিত যুবার ছবি আঁকিতেছেন, বাস্তব জীবনে তিনিই দড়ি-দড়া টানিয়া মানুষকে পিষিয়া বাঁধিতে অনুক্ষণ ব্যস্ত !···

জাহ্নবী দেবী কহিলেন—তিনটি দিন মাত্র সময়। না হ'লে শাসিয়ে গেছে, পেয়াদা এনে হাত ধ'রে সে বার ক'রে দেবে এ-বাড়ী থেকে ! এ আশ্রয় হারিয়ে কোথায় দাঁড়াবো, এমন ঠাঁই আছে ব'লে কোথাও দেখচি নে ! শুধু তাই নয় বাবা, আরো ভয় আছে—তাও তোমায় বলেচি।···এ বয়সে জেলে গেলে উনি বাঁচবেন না !

জাহ্নবী দেবীর চোখে অশ্রু একেবারে ঠেলিয়া আসিল। অনন্ত বিপদে পড়িল—উপায় যে কি ! অথচ···

সে কহিল—কোনো আশা দিতে পারচি না। তবু এটুকু ব'লে যাচ্ছি, প্রভাতের সঙ্গে এখনি দেখা করবো। পয়সা এখন দিতে না পারুক, বুদ্ধি ক'রে কোনো উপায়ও যদি সে নির্দ্দেশ করতে পারে···

জাহ্নবী দেবী সজল চক্ষে অনন্তর দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন—তোমাদের দুজনকে উপায় করতেই হবে। তোমাদের 'পরেই আমার সকল ভরসা, বাবা···

—দেখি, ভগবান্ কি করেন···

—তোমার মঙ্গল হবে বাবা···এত-বড় বিপন্নকে রক্ষা করলে জীবনে চিরসুখী হবে···অন্তর থেকে আমি আশীর্ব্বাদ করচি···

অনন্ত কহিল—আমি দাঁড়াবো না। আসি। প্রভাতের সঙ্গে এখনি আমি দেখা করবো···

—শুধু দেখা করা নয়। উপায় একটা করতে হবেই, বাবা···

অনন্ত ঘর হইতে বাহির হইল। নীচে নামিতে পরির সঙ্গে দেখা। সিঁড়ির প্রান্তে নীরবে সে দাঁড়াইয়াছিল। অনন্ত কহিল, —আপনি নীচেয়···

পরিমল শুধু করুণ চোখদুটি তুলিয়া তার পানে চাহিল—কোনো কথা কহিল না। অনন্ত কহিল—উনি একলা আছেন—আপনি উপরে যান্ !···আপনার বাবা এখনো ফেরেন নি ?

মৃদু কণ্ঠে পরিমল কহিল—না।

অনন্ত আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না—দ্রুত-পায়ে পথে আসিল। পথের একধারে তারি ভাড়া-করা রিক্‌শখানা দাঁড়াইয়াছিল। রিক্‌শতে চড়িয়া অনন্ত কহিল—হেদুয়ায় চল্।

রিক্‌শওয়ালা গাড়ী লইয়া ছুট্ দিল।···

গাড়ী ছাড়িয়া হেদুয়ায় ঢুকিয়া অনন্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিল—প্রভাতের খোঁজে। প্রভাত নাই। দুটি তরুণ বসিয়া আছে—কাব্য লইয়া তাদের বিরাট তর্ক চলিয়াছে।

অনন্ত হেদুয়ায় ঘুরিয়া প্রভাতকে খুঁজিল—তার দেখা মিলিল না। সে বিরক্ত হইল। হয় তো বাবুর ধৈর্য্য সহে নাই—বাগমারির বাগানে ছুটিয়াছেন!…উপায়?…

কিন্তু এতখানি অধৈর্য্য সত্যই হইবে? কথা না রাখিয়া বাগমারিতে ছুটিবে? এটুকু সে বুঝিবে না, অনন্ত এখানে নিশ্চয় আসিবে… যখন তেমনি কথা আছে?

আরো দু'চারিবার সে হেদুয়া প্রদক্ষিণ করিল, কিন্তু কোথায় প্রভাত! সহসা দেখা হইল সহপাঠী যোগীনের সঙ্গে। একটা নিরালা কুঞ্জে বসিয়া যোগীন সুর-সাধনা করিতেছিল; অনন্তকে দেখিয়া ডাকিল—অনন্ত…

অনন্ত কহিল—যোগীন!

—হঁ্যা…

—এখানে ঝোপে ব'সে কি করচো?

—গলা সাধচি, ভাই!…

—এখানে?

—বাড়ীতে সকলে ভারী পিছনে লাগে, টিট্‌কারী দেয়। এত-বড় সব fools…এটা বোঝে না। Science-course-এর ছাত্র আমি—soundটার কি দাম, তা একেবারে মজ্জাগত করেচি! একটু cultivate করলে আমার গলা যা দাঁড়াবে!…এই শোনো তুমি…দিন পনেরো তো culture করচি…কি রকম দাঁড়িয়েচে…

কৌতুক বোধ করিলেও এখন এ কৌতুক অনন্তর ভালো লাগিল না, কৌতুকের সময়ও এ নয়। সে কহিল—আজ মাপ্ করো ভাই…ভারী জরুরী কাজে ছুটোছুটি ক'রে মরচি। আজ থাক্, আর একদিন তোমার গলা শুনবো।

যোগীন কহিল—কেন, কি হয়েচে?

অনন্ত কহিল—প্রভাতের সঙ্গে খুব দরকারী appointment ছিল…তা কোথায় কে!…হুঁঃ…এমন irresponsible লোক…

বকিতে বকিতে অনন্ত বাহিরে পথে একেবারে পশ্চিমের ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কি করিবে? বেচারী জাহ্নবী দেবী ব্যাকুল চিত্তে পথ চাহিয়া থাকিবেন!…কোথায় গেলেন লাটু-সাহেব! সে তো জানে লাটু-সাহেবকে! এত-বড় অকর্ম্মা বাক্যবাগীশ আর দুটি নাই! মনে এই উদ্বেগ বহিয়া কোথায় যে ঘুরিতেছেন! বাড়ীতে স্ত্রী আর মেয়ে…ঐ জঙ্গলের মধ্যে একেবারে অসহায়!…

কিন্তু প্রভাত? তার আসিতে দেরী হইয়াছে বলিয়া প্রভাত যদি বাগমারিতেই গিয়া থাকে? কিন্তু এই একটি পথ—বাগমারিতে গেলে পথে দেখা হইত নিশ্চয়—সে রিক্‌শয় চড়িয়া আসিয়াছে, ট্যাক্সিতে নয়!

সামনে একখানা ট্রাম—এস্‌প্লানেড চলিয়াছে। দ্বিধা-গ্রস্ত চিত্ত লইয়া অনন্ত ঝুপ্ করিয়া ট্রামে চড়িয়া বসিল—কণ্ডাক্টর আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইলে অনন্ত পার্শ্ হইতে পয়সা বাহির করিয়া তার হাতে দিল, কহিল—কালীঘাট…

সদাশিব বাবু কহিলেন—প্রভাত বাড়ী গেছে—এখন তো সাড়ে নটা…ট্রেণ শেয়ালদা ছেড়ে গেছে ক্যালকাটা টাইম নটা কুড়ি মিনিটে। তা কি দরকার?

অনন্তর শুষ্ক মুখ, উদ্বেগাকুল দৃষ্টি—দেখিয়া সদাশিব বাবু চিন্তিত হইয়াছিলেন।

অনন্ত কহিল—না, এমন বিশেষ কিছু নয়…

সদাশিব কহিলেন—এই সন্ধ্যার সময় এসেছিলে—দুজনে বেরুচ্ছিলে, দেখলুম! তারপর আবার এখন…

অনন্ত কহিল—মানে, কলেজে কাল একটা debate আছে, তাই… তা ছাড়া এধারে এসেছিলুম একটু কাযে… ফিরচি এখন…

বিপদ!

জাহ্নবী দেবীকে সে কথা দিয়া আসিয়াছে, প্রভাতের কাছে আর্থিক আনুকূল্য না মিলুক, একটা পরামর্শ! তারো যে দাম ছিল! একা এত-বড় দায় ঘাড়ে লইবে কি সাহসে…

ঘাড়ে লওয়া কি! তা কি সাধ করিয়া লইয়াছে? তা নয়! জাহ্নবী দেবী তাদের দুজনকে এমন কি রক্‌ফেলা ঠাওর করিয়াছেন…

অন্যায়—এ অন্যায়!…

মাথায় তার দারুণ দাহ। সেই দাহ বহিয়া সে গৃহে ফিরিল। ফিরিয়া ঝোঁকের মাথায় প্রভাতকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল,—

—"যা ভাবিয়াছিলাম! সেই যে লোকটাকে দেখিয়াছিলে, সেটা শাইলক জু। তার কাছে দেদার টাকা ধার করিয়া লাটু সাহেব ঠাট বজায় রাখিতেছিলেন। নিজের সব গিয়াছে। ঐ জীর্ণ বাগান-বাড়ীটা সেই শাইলক অন্নদা বাবুর। হতভাগার হাতে মস্ত ডিক্রী—শাসাইতেছে, হয়

পরিমলের সঙ্গে বিবাহ দাও, নয় বাগান-বাড়ী ছাড়িয়া জেলে ঢোকো। সিভিল জেলের সকল ব্যয় হাসি-মুখে সে রহিতে রাজী।

লাটু সাহেব জেলে গেলে জাহ্নবী দেবী ও পরিমল দেবী পথে দাঁড়াইবেন। তাঁদের এমন কোনো আত্মীয়-বন্ধু নাই, যার গৃহে আশ্রয় লন্। লাটু সাহেব উপায়-নির্দ্ধারণে বাহির হইয়াছেন,—কি উপায়, তা উঁহারা কেহ জানেন না।

তিন দিন সময়। তিন দিনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ হাজার মুদ্রা আমানত না করিলে চতুর্থ দিনে পেয়াদা আসিবে।

আর একটি কথা, জাহ্নবী দেবী সজল চক্ষে জানাইলেন, রক্ষিত আই-সি-এসকে লাটু সাহেব সংগ্রহ করিয়া ছিলেন মুক্তির কামনায়। কিন্তু রক্ষিত মদ গিলিতে যেমন ওস্তাদ বিলাতে থাকিতে তেমনি এমন সব কীর্ত্তি করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু সে কথার প্রয়োজন নাই। পরচর্চ্চা গর্হিত এখানকার সংবাদ,—পরিমলের মুখ মলিন, দৃষ্টি কাতর, করুণ; জাহ্নবী দেবীর দুই চক্ষে জল-ধারা; এবং আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়।

তোমার বুদ্ধি কি বলে,—উৎসুক রহিলাম। জানি না, তোমার এখন বুদ্ধি খুলিবে কি না! শুনিলাম, মাখনের খুব অসুখ।

তবু চিঠি ছাড়িয়া দিলাম। আমি আজ হইতে ঘোর fatalist। দেখি, ভাগ্যদেবী সপরিবার লাটু সাহেবের সঙ্গে কি খেলা খেলেন!

Wait for further news.

অনন্ত।—

চিঠিখানা লিখিয়া একবার পড়িয়া সে খামে মুড়িল; তারপর খামে টিকিট আঁটিয়া বাহিরে যাইবার জন্য উঠিল।

মা বলিলেন,—ভাত বেড়েচি—চললি কোথায়?

অনন্ত কহিল,—একটা দরকারী চিঠি আছে মা, ডাকে দিয়ে এখনি আসচি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বর্ষার বিরহ

তুমিও কি ব'সে আছ আজি বরিষার বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
ব্যাকুল-নয়নে একা বাতায়নে এমনি চাহিয়া—
ধারাঘন বাদলের মত বেদনার অশ্রু-উৎস, হায়,
তোমারো কপোল প্লাবি' এমনি কি যেতেছে বাহিয়া?

কালো আকাশের পানে তুলি' আমারি মতন দু'টি আঁখি,
ফিরে চাহি' হৃদয়ের পানে, দেখিছ কি হৃদয়ো তোমার
অমনি নিবিড়-কালো-করা?—অমনি এসেছে গাঢ় ঢাকি'
মেঘ আর অন্ধকার, শ্রাবণের আসন্ন অমার?

নষ্টনীড়ে আর্ত্ত আশঙ্কিত শুনি' কম্প্র বিহঙ্গের স্বর
চমকিয়া চাহিছ কি ম্রিয়মাণ মর্ম্মনীড় পানে,
হায় প্রিয়া, আমারি মতন? প্রাণপাখী লুটিছে কাতর,—
দেখিছ কি, শুনিছ কি ব্যর্থ বিলাপন তার কাণে?

পরবাসী নিঃসঙ্গের ব্যথা—আত্মজন-পরিবৃতা তুমি—
তোমারো অন্তর-মাঝে উঠিছে কি বাজি' ক্ষণে ক্ষণে?
অথবা হরষে আছ প'ড়ে দীপ্ত কক্ষে তপ্ত শয্যা চুমি'
তৃপ্তির তন্দ্রায়?—হায়, কে কহিবে আছে কি না মনে!

দীপহীন অন্ধকারে একা শ্রান্ত বক্ষে চিন্তাভার নিয়া
কাঁদিয়া পোহাব রাতি নিদ্রাহীন জাগ্রত মরণে;
কোমল পালঙ্ক'পরে তব নিদ্রা কি ব্যাহত হবে প্রিয়া—
নিমেষের তরে কি এ অভাগারে পড়িবে স্মরণে?

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

অর্থ-সঙ্কট

বর্ত্তমানে সভ্য জগৎ এমন একটা অর্থসঙ্কটের অবস্থার মধ্য দিয়া গমন করিতেছে, যাহার তুলনা অতীত ইতিহাসে বিরল। এখন সকল দেশেরই শাসনকর্ত্তৃপক্ষের মুখে রব উঠিয়াছে,—ব্যয়-সঙ্কোচ কর, করবৃদ্ধি কর। ভারতে কর এমন চড়িয়াছে যে, সরকারী অন্যান্য আয়ের বিভাগে আয় পড়িয়া যাইতেছে। রেলে ও ডাকে জনসাধারণ এখন কৃপণের মত অর্থব্যয় করিতেছে, —নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কেহ রেলের মাশুল দেয় না, ডাকটিকিট কিনে না। কাজেই এই দুই বিভাগেই আয় বেশী কমিয়া গিয়াছে, ফলে অনেক গাড়ীর চলাচল বন্ধ করিতে হইয়াছে, রেল নির্ম্মাণ বা বিস্তার ত বন্ধ করিতে হইয়াছেই। এ দিকে কত যে সাব-পোষ্ট আফিস তুলিয়া দিতে হইয়াছে, আর কত ডাকবাবুর (কেরাণী প্রভৃতির) চাকুরী গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

এই দুঃসময়ে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা বৃটিশ জাতির আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহার কিছু পরিচয় রাখা ভাল। এখানকার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের প্রমুখাৎ প্রায়ই শুনা যায়, বৃটেনের আর্থিক অবস্থা জগতে অপেক্ষাকৃত ভাল, বৃটেন অন্যান্য জাতির সহিত একযোগে কায করিলে এখনও জগতের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারা যায়, ইত্যাদি। অথচ এই ষ্টেটসম্যানের মুখেই আবার Bi-metalism এর প্রয়োজনীয়তার কথাও শুনা যায়! স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দুই ধাতুর মুদ্রাই প্রচলিত করিলে জগতের আর্থিক কষ্ট দূর হইতে পারে, ইহা কোন কোন অর্থনীতিক বলিয়া থাকেন। কিন্তু দুই ধাতুর মান গ্রহণ করার বিপদ এই যে, ফ্রান্স ও মার্কিণ প্রমুখ দেশ অন্য দেশের নিকট মালের বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা দিতে পারে, কিন্তু নিজে মুদ্রা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে স্বর্ণমুদ্রা দিবে না; উহারা বাহিরের সোনা ঘরে তুলিবে, কিন্তু ঘরের এক ভরি সোনাও বাহিরে দিবে না। ইহাতে ত জগতের বাজারে লেন-দেন চলিতে পারে না।

ষ্টেটসম্যান বৃটেনের আর্থিক অবস্থা যতই সোনালী রংএ চিত্রিত করুন, প্রকৃতপক্ষে বৃটেনের ব্যয় অসম্ভবরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর করও তদনুরূপ বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। এখানকার অর্থনীতিবিজ্ঞান 'আয়ব্যয়ের বিজ্ঞান' আর নাই, এখন ইহা 'ব্যয়ের বিজ্ঞান' হইয়াই দাঁড়াইয়াছে! প্রাচীনযুগের লোক আয় অনুরূপ ব্যয়ের ব্যবস্থাই পছন্দ করিত, এখন বিজ্ঞান যেমন প্রাচীন যুগের 'বিবাহ ও যৌন-তত্ত্ব' উড়াইয়া দিয়া অপরূপ নবীন 'তত্ত্ব' গ্রহণ করিতেছে, তেমনই এখন 'বর্ত্তমান' প্রথমে খরচ করে, তাহার পর ভাবে, কোথা হইতে খরচের দেনা শোধ করিব। এখনকার শাসনকর্ত্তৃপক্ষরা প্রথমে ব্যয় করেন, তাহার পর নাগরিক প্রজাদের নিকট যতটা সম্ভব কর আদায় করিয়া লন। সর্ব্বদা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয়ে স্বার্থের কড়াক্রান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপাদমস্তক রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া রাখিতে হইলে এরূপ করা ছাড়া গত্যন্তর কি?

বৃটেনের বাজেটটাই আলোচনা করা যাউক। গত সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ ফিলিপ স্নোডেন পার্লামেণ্টে ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের বাজেটের এইরূপ আনুমানিক হিসাব পেশ করিয়াছিলেন:—

আয়—৮ শত ১'৭ মিলিয়ন পাউণ্ড মুদ্রা

ব্যয়—৮ শত '৮ " " "

উদ্বৃত্ত— '০৯ " " "

১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ জার্ম্মাণ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৃটেনের বাজেট এইরূপ হইয়াছিল:—

আয়—১ শত ৯৮'২ মিলিয়ন পাউণ্ড মুদ্রা

ব্যয়—১ শত ৯৭'৫ " " "

উদ্বৃত্ত—সামান্য কিছু।

১৯১৩-১৪ খৃঃ বাজেটের সহিত ১৯৩১-৩২ খৃঃ বাজেটের তুলনা করিয়া দেখা যায়, ব্যয় ১শত ৯৮ মিলিয়ন হইতে ৮শত ১ মিলিয়নে উঠিয়াছে! প্রায় চারি গুণ! এই অসম্ভব ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইলে (অবশ্য সামরিক সাজ ও স্বার্থরক্ষার আগ্রহ ত্যাগ না করিয়া) কর বৃদ্ধি করা ভিন্ন গত্যন্তর কি?

তাহার পর বৃটেনের জাতীয় ঋণ কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, দেখা যাউক:—

১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে জাতীয় ঋণের বাবদ সুদ খরচা হইয়াছিল ৩৭'৩ মিলিয়ন পাউণ্ড মুদ্রা, ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে জাতীয় ঋণের বাবদ সুদ খরচা হইয়াছে ৩৩১'৪ মিলিয়ন পাউণ্ড মুদ্রা।

জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ জাতি যাহা ব্যয় করিত, তাহার অপেক্ষা জাতি সুদ গণিতেছে এখন অনেক অধিক! যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা সে সময়ে কেবল জাতির বিষম ধনক্ষয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ভবিষ্যবংশীয়গণের জন্য দায়িত্বের বোঝা রাখিয়া গিয়াছেও বিষম! এ বিষয়ে ভারতের অদৃষ্ট আরও মন্দ। ভারতে সামরিক ব্যয় জার্ম্মাণযুদ্ধের পূর্ব্বের সময় অপেক্ষা এখন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

শেষ বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ইহার জন্য প্রত্যেক জাতিই পরস্পর পরস্পরের বিপক্ষে পণ্যের উপর শুল্কের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতেছে, ফলে পরিণামে

সাধারণ ক্রেতাকেই পূর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব অধিক ব্যয় করিতে হইতেছে। করবৃদ্ধি ও পণ্যশুল্কবৃদ্ধি এত চরমে উঠিয়াছে যে, পৃথিবী আর ভার সহিতে পারিতেছে না। এই অর্থসঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেষারেষি, স্বার্থপরতা ও প্রভুত্বকামনা কোন কালে পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক দেশের সরকার সাম্রাজ্যবাদী সমরপ্রিয় ধনী মহাজনদের দ্বারা প্রভাবিত, পার্লামেণ্ট-সমূহেরও এই কালের স্রোত নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং জগৎ যে ক্রমে ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

আর আমাদের দেশে? বাল্মীকি, ব্যাস অথবা কালিদাস-ভবভূতির ত কথাই নাই, অর্থাভাবে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের আবাসভবনের সংস্কার সাধিত হওয়া সম্ভব হয় না, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বসতবাটী বিক্রয় হইয়া যায়, দেশবন্ধু দাশের চিতাস্থলে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হয় না, মাইকেলের সমাধিস্থলে জন্ম বা মৃত্যুস্মৃতিবাসরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য জনসমাগম হয় না! জাতির মহাপুরুষগণের স্মৃতিপূজা আন্তরিকভাবে করিতে না শিখিলে জাতি কিরূপে বড় হইবে? অথচ আমরাই আবার স্বরাজ ও স্বদেশ বলিতে অজ্ঞান হই।

স্মৃতিরক্ষা

বৃটিশ ও মার্কিণ জাতিই প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী-ভাষাভাষী, তাহাদের মাতৃভাষাই ইংরাজী। এই হেতু এই দুই জাতি তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার সেক্সপীয়ারের স্মৃতিসম্মান-রক্ষার জন্য

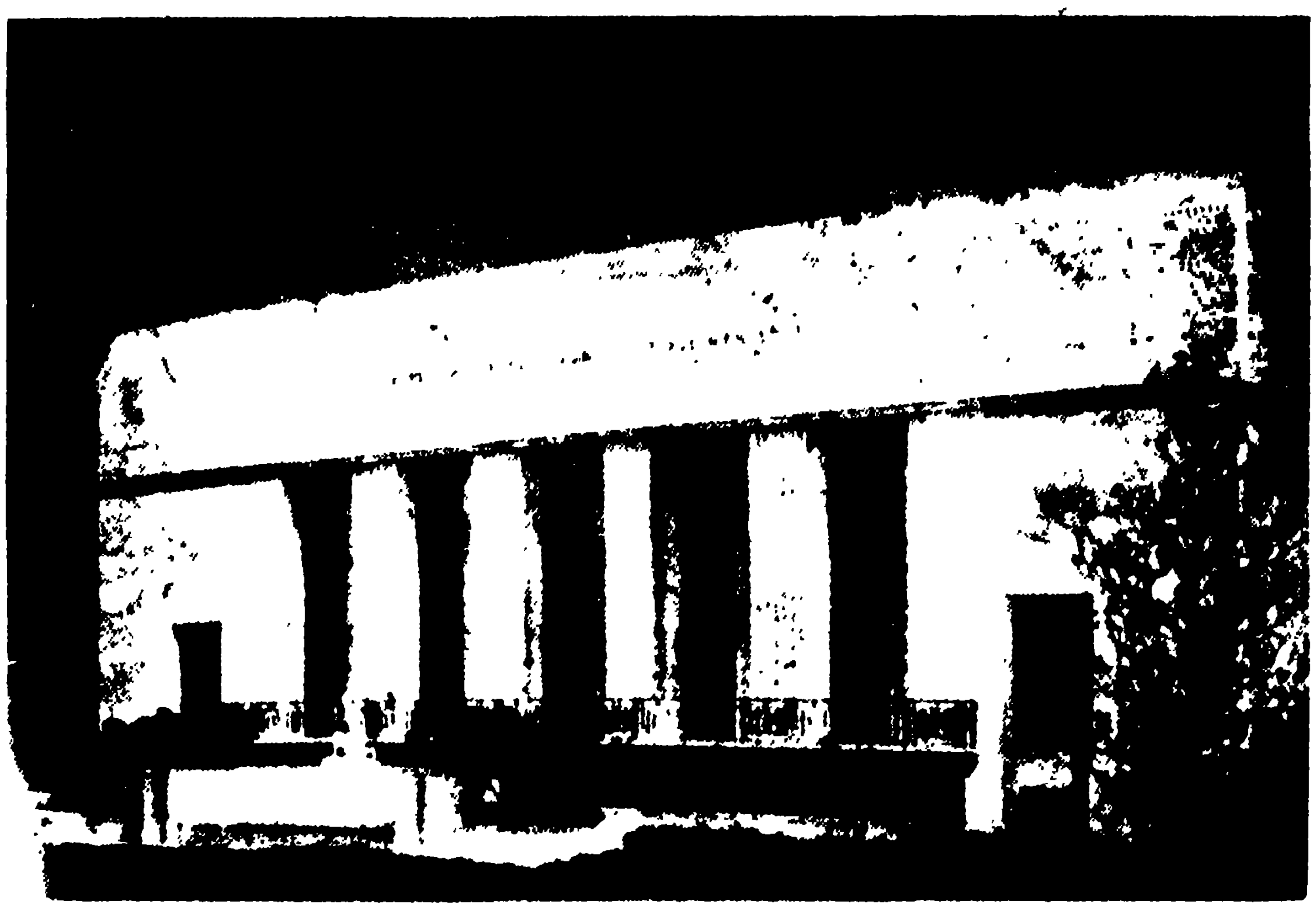

ফোলজার সেক্সপীয়ার লাইব্রেরী

অকাতরে মুক্তহস্ত হইয়াছে। ইংরাজ তাহার মহাকবির জন্মস্থান এভন নদতটস্থ ষ্ট্র্যাটফোর্ড সহরে গত এপ্রেল মাসে সেক্সপীয়ার মেমোরিয়াল থিয়েটারের উদ্বোধন করিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের রাজধানী ওয়াসিংটন সহরে 'ফোলজার সেক্সপীয়ার লাইব্রেরীর" উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, দুইটি স্বাধীন জাতি স্বতন্ত্রভাবে আপনাদের জাতীয় কবির স্মৃতি-সম্মান যথাযোগ্য শ্রদ্ধাপ্রীতি সহকারে রক্ষা করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ী ধনকুবের হেনরি ক্লে ফোলজার এতদর্থে যে ব্যয় করিয়াছেন, পরন্তু যে ভাবে লাইব্রেরীতে সেক্সপীয়ারের মানস পুত্রকন্যাগণের প্রতিমূর্ত্তি ও দৃশ্যাদি তন্মধ্যে নানা আকারে বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে উহা যে জগতের এক অষ্টম বা নবম আশ্চর্য্যমধ্যে পরিগণিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

গরগুলফ্-রহস্য

ডাক্তার পল গরগুলফ রাসিয়ানজাতীয়, ফ্রান্সের প্যারী সহরে বসবাস করিতেছিলেন। প্রকাশ্য স্থানে বিষম জনতার মধ্যে এই লোকটি ফরাসী প্রেসিডেণ্ট পল ডুমারকে হত্যা করিয়াছিলেন।

এই ভাবের রাজনীতিক হত্যাকাণ্ডে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। রাজনীতিক কারণে এরূপ হত্যাকাণ্ড প্রতীচ্যের শিক্ষা-দীক্ষার আবহাওয়ায় বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। রাসিয়ার নিহিলিষ্ট এবং ইটালীর, ফ্রান্সের, জার্ম্মাণীর এনার্কিষ্টের নাম জগতে কে না শুনিয়াছে? এই সে দিন জাপানেও এক প্রধান রাজপুরুষ আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। এমন হত্যাকাণ্ড অনেক হইয়াছে এবং হইতেছে, ভবিষ্যতেও হয় ত হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে হত্যার মূল কারণ জানা যাইতেছে না, উহা গভীর রহস্যজালে জড়িত বলিয়া মনে হইতেছে। এই হত্যাকারী ডাক্তার গরগুলফ কে? তিনি Red না White রাসিয়ান, এ সমস্যার মীমাংসা হইতেছে না। সোভিয়েটের শত্রুরা বলিতেছে, তিনি Red, সোভিয়েটরা বলিতেছেন, তিনি White, সোভিয়েটের শত্রু এই 'শ্বেত' রাসিয়ান নির্ব্বাসিত শ্বেত রাসিয়ানদের পক্ষ হইতে ফ্রান্সের সহিত সোভিয়েট সরকারের বিবাদ বাধাইবার উদ্দেশ্যে রাসিয়ার নামে এই হত্যাকাণ্ড সমাধিত করিয়াছে।

হত্যার সময় ফরাসীর তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মুসিয়ে তার-দিউ ও অন্যান্য মন্ত্রী এক ঘোষণায় বলিয়াছিলেন যে, গরগুলফ বলসেভিকদের Third International এর ভাড়াটিয়া লোক। মস্কো সহরের কম্যুনিষ্ট দলের সেণ্ট্রাল কমিটীর মুখপত্র "প্রাভদা" ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,—"গরগুলফ কম্যুনিজমের ঘোর শত্রু, তাহার নানা রচনা হইতেই তাহা জানা যায়; ফরাসী পুলিসের নিকট সে স্বীকারোক্তি করিয়াছে, তাহাতেও ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া Third International রাসিয়ার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি,—তাহারা

চিরদিনই বিপ্লবীর হিসাবাদকে নিন্দা করিয়া আসিয়াছে। ফরাসীরা 'শ্বেত রাসিয়ানদিগকে' আশ্রয় দিয়া এবং বন্ধুরূপে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া এখন তাহার ফলভোগ করিতেছে। হত্যাকারী তাহার স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছে, 'আমি রাসিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধাইবার উদ্দেশ্যেই হত্যা করিয়াছি।' ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াও শ্বেত রাসিয়ানদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য।"

ইহার উত্তরে প্যারীর শ্বেত রাসিয়ান সংবাদপত্রসমূহ তারস্বরে বলিতেছে,—"ইহা একবারেই অসম্ভব। শ্বেত রাসিয়ানরা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ফরাসীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই ফরাসীর অনিষ্ট করা কি তাহাদের পক্ষে আত্মহত্যা করার সমান নহে? গরগুলফ কোন কালে নির্ব্বাসিত শ্বেত রাসিয়ানদের কোন ক্লাবের সভ্য ছিল না। সে ডাক্তারীও করিত না, অথচ বেশ বড়মানুষি চালে চলিত। তাহার ব্যয় যোগান হইত কোথা হইতে? সোভিয়েট-সরকারের গুপ্ত সাহায্য কি সে প্রাপ্ত হইত না?"

এই ভাবে চিলেন-উতোর গাওনা হইতেছে। কিন্তু হত্যার অন্তরালে কি গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহা বোধ হয়, কোন কালে ব্যক্ত হইবে না।

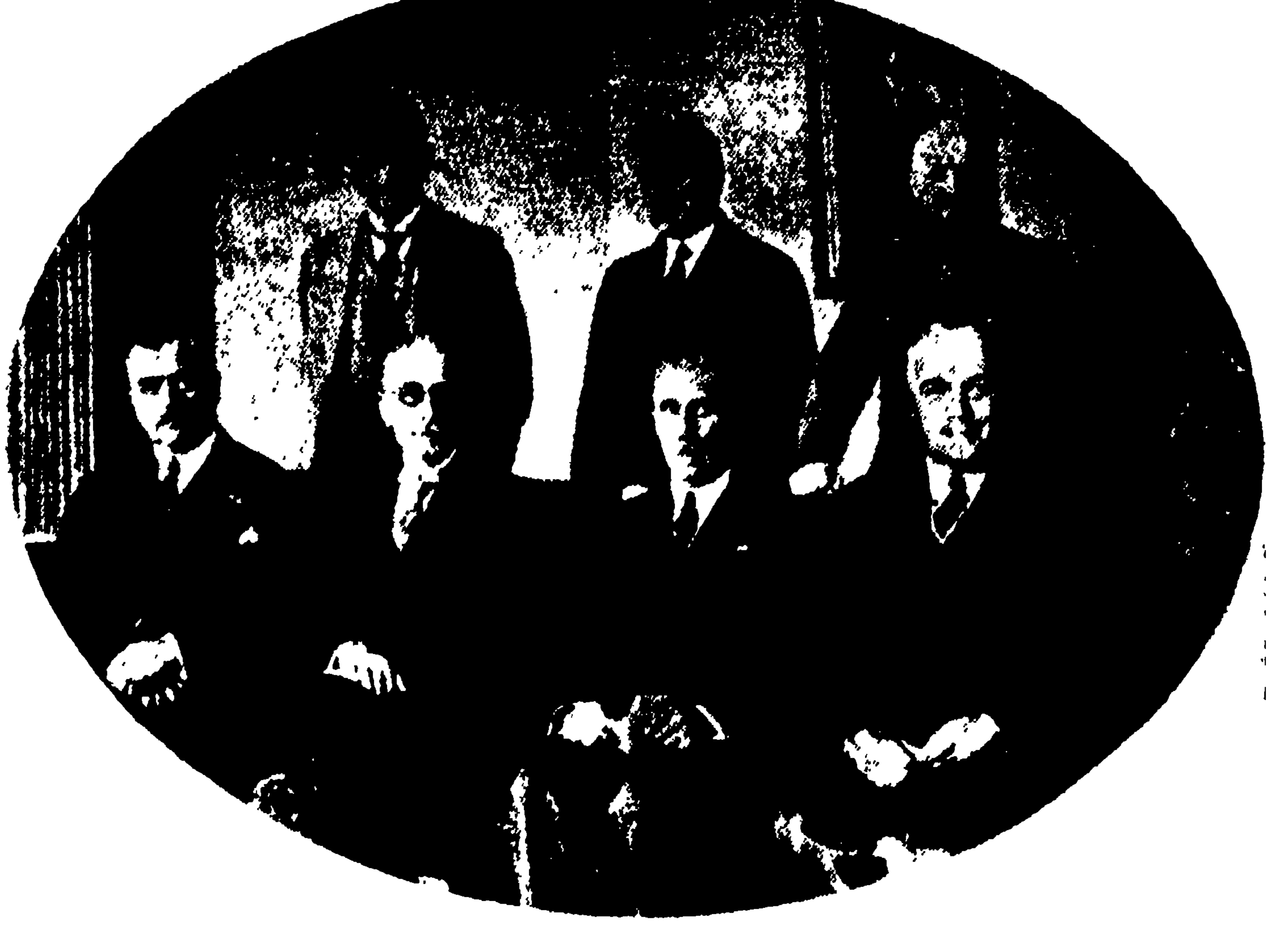

বাম হইতে দক্ষিণে উপবিষ্ট (১) ব্যারন ভন ব্রন, (৩) ভন প্যাপেন, দণ্ডায়মান ভন মিচার

জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ

উন্নতিমার্গগামী জাতি হিসাবে আধুনিক জগতে জার্ম্মাণীর স্থান বহু উচ্চে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণী যে ভাবে দলিত পিষ্ট হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সে যে কোনও কালে আবার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, তাহা কেহ আশা করে নাই। কিন্তু জার্ম্মাণী অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছে। অদ্ভুত সংযম ও ত্যাগস্বীকার করিয়া স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের গুণে জার্ম্মাণজাতি গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কয় বৎসরের মধ্যে আবার সমৃদ্ধ শোভাসম্পন্ন জাতিতে আপনাকে পরিণত করিয়াছে, এখন তাহার পণ্য জগতের বাজারে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট পল ভন হিণ্ডেনবার্গ যেমন বিচ্ছিন্ন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জার্ম্মাণ জাতিকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, তেমনই দেশ ও জাতিগঠনমূলক কার্য্যে খাস জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার হিনরিক ডাক্তার ক্রনিং এবং প্রুসিয়ার ডাক্তার ব্রন প্রধান মন্ত্রিরূপে অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়া শিল্প-বাণিজ্যে, নগরগঠনে, ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলের সংস্কার-সাধনে, দেশের পণ্য উৎপাদন প্রচার ও প্রসারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম ইতিহাস-প্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি আড়াই বৎসর সুশাসনের পর ক্রনিংকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ লেঃ কঃ ফ্রাঞ্জ ভন প্যাপেনকে চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তার ক্রনিংএর অভাবে জার্ম্মাণী এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। ভন প্যাপেনের সরকারের আমলে প্রুসিয়ার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে ডাক্তার ব্রনের অপসারণও প্রুসিয়ার রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। ১০ বৎসরেরও উপর গঠনকার্য্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ডাক্তার ব্রন প্রুসিয়ার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার যুক্তিতর্কসম্বলিত বক্তৃতা, তাঁহার সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তা, তাঁহার শক্তিশালী চরিত্র, তাঁহার সুশাসন, সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রজাবর্গের সুখে দুঃখে আশা-আকাঙ্ক্ষায় সহানুভূতি তাঁহাকে জার্ম্মাণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় রাজনীতিকের আসন প্রদান করিয়াছে। আজ ভন হিণ্ডেনবার্গের রাষ্ট্রতন্ত্র সরকারের নির্ম্মম নির্দ্দেশে ভন প্যাপেনের ব্যবস্থায় জার্ম্মাণীতে সোসালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ দমনের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহারই ফলে ডাক্তার বন প্রুসিয়ার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন।

এডোয়ার্ড হিরিয়ট্

এখন জার্ম্মাণীতে রাষ্ট্রতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে মহা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণ নির্ব্বাচন সমুপাগত। উহাতে

কোন্ পক্ষ জয়লাভ করেন, জগৎ তাহাই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে। ডাক্তার ব্রনের passionate socialism-এর কথা খ্যাত। আজ তিনি অপসৃত, সুতরাং রাষ্ট্রতন্ত্রবাদীরাই সম্ভবতঃ জার্ম্মাণীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিবেন। তাহা হইলে ইটালীর facism-ই ক্রমে য়ুরোপে প্রসার লাভ করিবে এবং সাম্রাজ্যগর্ব্বীরা আরও কিছু দিন প্রশ্রয় লাভ করিবে, অনেকের এইরূপই অনুমান। যাহা হইবে, তাহা অচিরভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে।

ব্যাভেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী এবং প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ

আবার আর এক শ্রেণীর ভাবুক ইহার বিপরীত কথাই বলিতেছেন। সকলেই জানেন, মসিয়ে এলবার্ট লেব্রান ফরাসীদেশের চতুর্দ্দশ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পরন্তু মসিয়ে এডোয়ার্ড হেরিয়ট ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় ফরাসী দেশে Radical Socialist-দেরই জয়লাভ হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট লেব্রান্

হেরিয়ট ফ্রান্সের Socialist দলপতি Leon Blum অপেক্ষাও প্রতিপত্তিশালী। হেরিয়ট লিয়ন্স সহরের এক দরিদ্র সেনানীর ঔরসে এবং ঔপন্যাসিক Maurice Barres-এর এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা লাভ করিয়া প্রথমে শিক্ষকতা করেন ও পরে Lyons সহরের মিউনিসিপ্যালিটীর Councillor হন। উহা হইতে ক্রমে তিনি Mayor হন। তখন তাঁহার অদ্ভুত শাসনক্ষমতার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি এখন ফ্রান্সের অতি উচ্চপদে সমাসীন হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ন্যায় Radical Socialist ক্ষমতাশালী থাকিতে জার্ম্মাণীর facism কিছুই করিতে পারিবে না, ইহাই এই শ্রেণীর রাজনীতিকদিগের ধারণা।

চিন্তার ধারা

প্রতীচ্যের চিন্তার ধারা কোন একটা বিষয়ে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই যেন নূতন খাত অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। প্রতীচ্যের অস্থির (Restless) জীবন ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয়,—এই জীবন কেবলই নূতন খুঁজিতে চাহে। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রতীচ্য প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিল যে,—ভারতে য়ুরোপীয়ের জীবন আর নিরাপদ নহে, বিপ্লবীদের উৎপাতের আশঙ্কায় প্রত্যেক য়ুরোপীয় নর-নারী সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া থাকে। বিপ্লবীরা য়ুরোপীয় প্রভুত্বের অবসান করিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টায় বোমা-রিভলভার লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইংরাজ সংবাদপত্র-সম্পাদক রিভলভার কাছে রাখিয়া পত্র সম্পাদন করেন, মেমসাহেব বাজার করিতে গেলে রিভলভার লইয়া যান, ইত্যাদি।

কথাটা শুনিয়া দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়। ইহাই য়ুরোপীয় প্রচারকার্য্যের নমুনা। যেন সারা ভারতে বিপ্লবীরা অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছে, আর শাসক জাতি একবারে ভয়ে দিশাহারা হইয়া সশস্ত্র অবস্থায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে।

এই প্রচারকার্য্য চলিবার পর এখন আবার আর এক ভাবের প্রচারকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। মার্কিণ ও য়ুরোপের কয়েকখানি শক্তিশালী সংবাদপত্র এখন প্রচার করিতেছেন যে, ভারতের বিপ্লববাদের মূলে য়ুরোপীয় প্রভুত্ব অবসানের সঙ্কল্প বিদ্যমান নাই, আসলে পেটের জ্বালাই বিপ্লববাদের মূল! শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত তরুণরা কায পাইতেছে না, কাযেই বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া তাহারা হিংসার পথ ধরিয়াছে। তাই দেশে এত রাজনীতিক ডাকাতি, ডাকলুঠ, হরকরাকে আক্রমণ, মোটর ও রিভলভার সাহায্যে রাহাজানি চলিতেছে।

কোন্‌টা সত্য? রাজনীতিক ক্ষুধা, না জঠরজ্বালা? যেটাই সত্য হউক, ক্ষুধা মিটাইবার উপায়বিধান করিলেই ত অনর্থক এত চিন্তা করিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না।

অটোয়া

বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাজ্য কানাডার অটোয়া-সহরে সাম্রাজ্য-বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছে। জগদ্ব্যাপী অর্থসঙ্কটে এবং শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি হেতু সাম্রাজ্যের সকল অংশের অর্থসমস্যা ও বাণিজ্য-সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। তাই বৈঠকে সকল অংশের প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়া সমস্যাসমাধানের উদ্দেশ্যে বিচার আলোচনা করিয়া একটা সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে অংশসমূহের মধ্যে পণ্যের আদান-প্রদানে সুবিধা করিয়া এবং বিদেশীয় পণ্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টার ফল কিরূপ হইবে, তাহা ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে।

বলা বাহুল্য, ভারতও সাম্রাজ্যের 'অংশীদার'রূপে বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইয়াছে। অন্যান্য বারের বৈঠকে ভারতসচিব ভারতের 'প্রতিনিধি'রূপে অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। এবার ভারতের হাই কমিশনার সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'প্রতিনিধি'। তিনি এ জন্য আনন্দগদগদস্বরে বৈঠকের অধিবেশনে ভারতের পক্ষ হইতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন যে, "ইহাতে ভারতবাসী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।" কেন? সার অতুল ভারতীয় হইলেও সরকারেরই দশ জনের এক জন, তিনি ভারতের জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন নাই, সুতরাং তিনি বৃটিশ ব্যুরোক্রাটেরই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া অটোয়ায় গিয়াছেন, ভারতবাসীর প্রতিনিধি হইয়া যান নাই। যে দেশ স্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধি ও সেবক, ভারতে তাহা নাই। অতএব তিনি যে কথা বলিয়া গর্ব্বানুভব করিয়াছেন, তাহার কোন ভিত্তি বা মূল্য নাই।

ইহা ছাড়া সার অতুল বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা শুল্ক সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বেই কতকটা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়াছে, কারণ, ভারত সরকার ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ সেখানে একযোগে শুল্ক সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়াছেন, সেখানে ভারতসচিব হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা কতক পরিমাণে সত্য বটে, কিন্তু ইহাও সত্য যে, শাসনব্যবস্থা অনুসারে ভারত-সচিবের এ সকল বিষয়ও নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার আছে, ইচ্ছা করিলেই তিনি সেই ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি করেন নাই, ইহা তাঁহার মরজি বা দয়া!

যাহা হউক, সার অতুল যাহাই বলুন, আসলে বৃটেনের শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় যে এই বাণিজ্য-বৈঠক বসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; স্বার্থের অনুকূলে উপনিবেশ-সমূহের এবং ভারতের নিকট হইতে কতটুকু সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, প্রধানতঃ তাহাই অবধারণ করিবার জন্য যে বৈঠকের অধিবেশন হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এ বিষয়ে সাম্রাজ্যের সকল অংশের মধ্যে পরস্পর সাহচর্য্য ও সাহায্য করার কথাও যে নাই, তাহা নহে। গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্য-বিভূতি জগতে অনন্যসাধারণ ছিল। এখন নানা কারণে—বিশেষতঃ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বৃটিশ বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছে। তাই এই বৈঠকের জন্য বৃটেনে আজ কয় মাস হইতে যে উৎসাহ ও হৈ-চৈ দেখা যাইতেছে, উপনিবেশ-সমূহে তাহার কিছুই দেখা যায় নাই। আসল কথা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফরিকা বা আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত পূর্ব্বে বৃটেনের যে বৃহৎ ব্যবসায় চলিত, এখন আর তাহা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এখন মার্কিণই কানাডার সহিত বড় রকম ব্যবসায় চালাইতেছে। তাই অটোয়ার বৈঠকে সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়ে রক্ষণনীতি অবলম্বিত হইবার কথা আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের দেখিতে হইবে, ভারত এই বৈঠক হইতে তাহার শিল্প-বাণিজ্যের কতটুকু সুবিধা করিয়া লইতে পারে। সার অতুল যদি ভারতের এই স্বার্থটা বজায় রাখিয়া আসিতে সমর্থ হন, তবেই তাঁহার প্রতিনিধি সাজিবার সার্থকতা আছে। সার অতুল এ সম্বন্ধে বৈঠকের বক্তৃতায় মন্দ বলেন নাই।

ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কিন্তু আধুনিক জগতে কোন জাতিই কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে পারে না, তাহার শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রচারেরও প্রয়োজন আছে। ভারত অতি দরিদ্র, সুতরাং ধনাঢ্য দেশসমূহের শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহার শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে রক্ষণনীতি এখন কিছু দিন অবলম্বন করিতেই হইবে। ভারতের লোকের গড় আয় এবং ক্রয় করিবার শক্তি অতি সামান্য। অথচ ভারতে শিল্পের উপাদান কাঁচা মাল পর্য্যাপ্ত। ভারতীয় শিল্পীরা কল ও কুটীরজাত শিল্প দ্বারা যাহাতে সেই কাঁচা মালকে ব্যবহার্য্য পণ্যে পরিণত করিতে পারে, ভারতকে সেই সুযোগ দেওয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল অংশেরই কর্ত্তব্য। এইটুকু সর্ত্ত পালিত হইলে ভারতও সাম্রাজ্যকে সাহচর্য্য ও সাহায্য প্রদান করিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হইবে!

সার অতুল তাই বলিয়াছেন যে,—"বৃটিশ জাতির কোন উপনিবেশে বা রাজ্যে ৩৫ কোটি লোকের বাস নাই, দুর্ভিক্ষের আক্রমণও এত ঘন ঘন হয় না, অথবা এত অধিক সামরিক ব্যয়ও কোথাও হয় না। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া এবং ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও ক্রয় করিবার ক্ষমতার অল্পতার কথা বিবেচনা করিয়া ভারতের শুল্কের আয়ের পক্ষে বিশেষ বাধা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।"

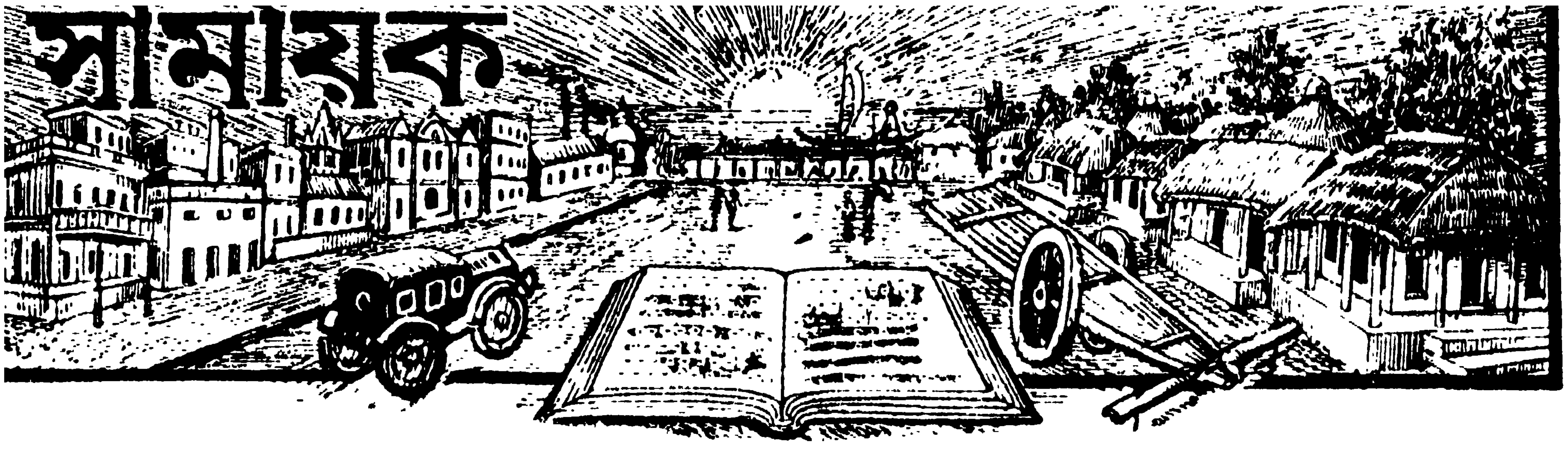

আবার আন্দামান

ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোর কেবল কংগ্রেসকে গুঁড়া (Pulverise) করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এ দেশের রাজবন্দী ও রাজনীতিক বন্দীদিগকেও 'শায়েস্তা' করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, এক শত বন্দীকে আন্দামানে পাঠাইয়া ঢিট করিতে হইবে, যেন তাহাদের শাস্তি দেখিয়া অন্যান্য বন্দীরা শিক্ষা লাভ করে, বোধ হয়, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। বন্দীদের অপরাধ,—তাহারা জেলের আইন ও 'শৃঙ্খলা' ভঙ্গ করে। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বোমা ও ষড়যন্ত্র মামলার কয় জন বন্দী ব্যতীত এই এক শত জনের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী বন্দী, এইরূপ জানা গিয়াছে। রাজপুতানার মরুভূমিতে দেউলি জেলে কয় জন বাঙ্গালী বন্দীকে 'দ্বীপান্তরিত' করার পর এক জন আত্মহত্যা করিয়াছে, আর তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করা দুষ্কর,—ইহাতেই বাঙ্গালী জনসাধারণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং আন্দামানে 'দ্বীপান্তরিত' করিলে অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

যদি বন্দীরা 'অপরাধী' বলিয়া প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালী জনসাধারণের অশান্তির কোনও কারণ থাকিত না। লর্ড লীটন বাঙ্গালার গভর্ণররূপে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল অর্ডিনান্স (অন্য নাম বাঙ্গালার ফৌজদারী আইনের সংশোধিত আইন) বিধিবদ্ধ করেন। তখন লর্ড অলিভিয়ার ভারত-সচিব, তিনি ঐ বে-আইনী আইন বিধিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, বিস্ময়ের বিষয়, এই লর্ড অলিভিয়ারই কিন্তু ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ রেগুলেশনের নিন্দাবাদ করিয়া উহাকে "Out of place in any civilised society" বলিয়াছিলেন! অথচ এই দুই ব্রহ্মাস্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। দুইটিই বিনা বিচারে বিনা কৈফিয়তে যে কোনও লোককে ধরিয়া আটক করিবার ক্ষমতা প্রদান করে, দুইটিই লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। এইরূপ বিধিবদ্ধের কল্যাণে ধৃত বন্দীদিগকে কিন্তু লর্ড লীটন 'বিভীষিকাবাদী বিপ্লবী' (Every single man who has been arrested under the Bengal Ordinance of 1924 or under Regulation III of 1818 is a member of a terrorist organisation) বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

কিন্তু যথার্থই এই শ্রেণীর রাজবন্দী বা রাজনীতিক বন্দীদিগকে কিছুতেই অপরাধী বলা যাইতে পারে না। এ দেশের পুলিস যাহাদিগকে কেবল সন্দেহক্রমে ধৃত করে, যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বা অপরাধের বিচার হয় না,—জনসাধারণ তাহাদিগকে কিরূপে অপরাধী বলিয়া ধরিয়া লইবে? কেবল সরকারের পুলিসের মুখের কথায় ত তাহা সম্ভব হয় না। ৩ রেগুলেশান অনুসারে দেখা হয় যে, 'Security of the British Dominions from foreign hostility and from internal commotion' বজায় রহিল কি না। সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে দেখা হয় যে, "dealing with the terrorists" কার্য্যটা সম্পন্ন হইল কি না। উভয় ক্ষেত্রেই আইনের বাঁধন খুবই সোজা—পুলিস বলিলেই হইল যে,—এই লোকটি বৃটিশ শক্তির বহিঃশত্রুদের অথবা অন্তঃ-শত্রুদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে, অথবা বিভীষিকাবাদী বিপ্লবীদের দলের সহিত সংশ্লিষ্ট। বস্! আর রক্ষা নাই। কিন্তু বৃটিশ আইন বলে,—যতক্ষণ কোন লোকের অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে সপ্রমাণ না হয়, ততক্ষণ সে অপরাধী নহে; বরং শত আসামীকে মুক্তি দেওয়া হউক, তথাপি সন্দেহক্রমে যেন এক জনও দণ্ডিত না হয়। এই জন্যই জনসাধারণের রাজবন্দী বা রাজনীতিক বন্দীদের শাস্তিপ্রদানে এত আপত্তি। বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ভদ্র শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনকেই এই দুই অসাধারণ আইনে ধরা ও আটক করা হয় বলিয়াই বাঙ্গালীর তাহাদের সম্বন্ধে এত উৎকণ্ঠা।

সকলেরই বোধ হয় স্মরণ আছে যে, ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে আন্দামানে নির্ব্বাসন সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত Cardew অথবা Indian Jails Committee বসিয়াছিল। এই কমিটীর রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই সরকার আন্দামানে নির্ব্বাসনরূপ দণ্ড উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কার্ডিউ কমিটী রিপোর্টে বলিয়াছিলেন;—

(১) আধুনিক দণ্ডদানের ধারণা অনুসারে দ্বীপান্তর বর্ব্বর-প্রথানুযায়ী।

(২) নির্ব্বাসনে পূর্ব্বের মত আর ভয় নাই।

(৩) দ্বীপান্তরে ব্যয়বাহুল্য আছে।

(৪) আন্দামানের জলবায়ু স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভীষণ। সেখানকার পুলিসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ভারতে চিকিৎসার্থ পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কয়েদীদের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা নাই।

(৫) ঘরবাড়ী ও আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে কয়েদীদিগকে প্রেরণ করিলে তাহাদের দেহ ও মন ভঙ্গ হয়। উহাতে দণ্ডের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

(৬) সেখানে জনমতের প্রভাব না থাকায় তাহাদের প্রতি স্থানীয় রক্ষকদিগের ব্যবহার মন্দ হইলে প্রতিবাদ বা প্রতীকারের উপায় থাকে না।

এই কারণগুলি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ভারত-সচিব কিরূপে রাজবন্দী ও রাজনীতিক বন্দীদের আবার দ্বীপান্তরদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যে দণ্ড প্রতিহিংসামূলক বলিয়া মনে করিতে পারা যায়, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে প্রয়োগ করা কিরূপে সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে ?

রাজন্যরাজ্য কমিটী

ডেভিডসন তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রাজন্যরা কি ভাবে অর্থের বণ্টনের দিক্ দিয়া ভারতের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্র শাসনের মধ্যে তাঁহাদের রাজ্যসমূহের স্থান করিয়া লইতে পারেন, সেই সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। যে অল্পসময় কমিটীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তাঁহারা যেরূপ বিস্তৃত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। তবে তাঁহারা সংহিত রাষ্ট্রে রাজন্যরাজ্যের প্রবেশের যে সকল সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা রাজন্যদের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু তুলনায় তাঁহারা বৃটিশ ভারতকে সেই সুবিধার অংশমাত্রও প্রদান করেন নাই। কোনরূপ জোর-জবরদস্তি বা চাপ না পাইয়া যখন খুসী হইবে, রাজন্যরা একে একে আপন আপন রাজ্যের বিশেষ সুবিধা অসুবিধা যাচাই করিয়া লইয়া 'অনুগ্রহ করিয়া' সংহিত রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের সন্ধিসর্ত্তমত বিশেষ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন, অর্থবণ্টনব্যাপারে তাঁহারা বৃটিশ ভারত অপেক্ষা অনেক অধিক সুবিধা পাইবেন, মোটামুটি রিপোর্টে এই ভাবের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

কমিটীর সদস্যরা প্রধানতঃ বৃটিশ অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল ; সুতরাং তাঁহারা যে রাজন্যদের দিকে টানিয়া রায় দিবেন, ইহা স্বাভাবিক। আপাততঃ ১২ এবং পরে ১ কোটি পর্য্যন্ত টাকা রাজন্যদের সম্পর্কে রেহাই দিবার ব্যবস্থার কথা রিপোর্টে আছে। কমিটী বলিয়াছেন,—রাজন্যরা সংহিত রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে সম্মত হইয়া বৃটিশ ভারতকে যে 'দয়া' করিতেছেন, তাহার মূল্য টাকা আনা পাইএর হিসাবে অবধারণ করা যায় না। কেন ? সংহিত রাষ্ট্রে স্থান লাভ করিয়া রাজন্যরাই কি অধিক লাভবান্ হইতেছেন না ? বৃটিশ ভারতের সহিত রাজন্যরাজ্যসমূহ খাপ খায় না, কারণ, রাজন্যরাজ্যে যে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন এখনও বিদ্যমান, তাহা ভবিষ্যতের গণতন্ত্রমূলক সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র শাসনের সহিত কখনই তুল্যমূল্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাজন্যরা আপনাদের সেই অধিকারগুলি ছাড়িতেছেন না, অথচ বৃটিশ ভারতের কর্ত্তৃত্বেরও সমান অংশ দাবী করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাই কি গাছেরও খাইতেছেন ও তলারও কুড়াইতেছেন না ?

Federal Structure Committee অথবা সংহিত রাষ্ট্রগঠন কমিটীর Finance Sub-committee বা অর্থনৈতিক সাবকমিটী এ দিকে কতকটা কার্য্য অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আরও বিশদভাবে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য এই ডেভিডসন কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী এই কমিটী নিয়োগকালে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। উহা কমিটীর চেয়ারম্যানের নিকট প্রধান মন্ত্রীর পত্রে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

"একই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া (on a uniform basis) সংহিত রাষ্ট্রের সমস্ত অংশগুলি যাহাতে সাধারণ ধন-ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিতে পারে, সেই ভাবে আদর্শ সংহিত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি রচনা করিতে হইবে। দুইটি বিষয়ে এই আদর্শ কি ভাবে প্রভাবিত হইতেছে, তাহা কমিটীকে দেখিতে হইবে, যথা,—(১) কতকগুলি রাজন্যরাজ্যের বর্ত্তমান অধিকার সম্পর্কে, (২) কতকগুলি রাজ্য এখন যে ভাবে ভারতসরকারকে অর্থ-সাহায্য করিতেছে, অথবা অতীতে করিয়াছে।"

কিন্তু কমিটী একই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া সকল রাজ্যের দেয় অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, পারা অসম্ভব। রাজন্য-রাজ্যসমূহ ও বৃটিশ ভারতীয় সরকারের মধ্যে অথবা রাজন্য রাজ্যসমূহের পরস্পরের মধ্যে একই ভাবে এই ব্যবস্থা করার আশা করা যাইতে পারে না। এই হেতু কমিটী পরামর্শ দিয়াছেন যে, যখন যে রাজ্য বৃহত্তর ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিবে, তখন তাহাকে অর্থসাহায্য ও অধিকারলাভ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে ভারত সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে ; কোন্ নীতি অনুসারে উহা সম্পাদিত হইবে, তাহা রিপোর্টে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই নীতির উপর পরস্পর যোগাযোগের ব্যবস্থা করিবার পর কমিটী বলিয়াছেন যে, বৃহত্তর ভারতে প্রবেশলাভে সম্মত হইলে রাজন্যরাজ্যগুলিকে রিপোর্টে নির্দ্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা মানিতে হইবে, নতুবা কেবল বিশেষ অধিকারগুলি লাভ করিব অথচ বাধ্যবাধকতা মানিব না—ইহা হইতে পারে না। পরন্তু প্রবেশ ও অধিকারলাভ বা বাধ্যবাধকতা স্বীকার করার মূলে জোর-জবরদস্তি থাকিবে না, উহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক হইবে। অর্থাৎ এই মিলন উভয় পক্ষেরই সমান সুবিধা ও আকর্ষণের অনুকূল হইবে।

এইখানেই গোলের কথা। কমিটী যে নীতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কতকগুলি রাজ্য বৃহত্তর ভারতে যে পরিমাণে সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতে পাইবে, সেই পরিমাণে সংহিত রাষ্ট্রে অর্থসাহায্য দান করিবে না। ইহার ফলে অনুমান হয়, বর্ত্তমান ভারত সরকারের স্কন্ধে যে দায়িত্বের বোঝা আছে, তাহার উপর বাৎসরিক আরও ১ কোটি টাকার দায়িত্ব চাপিয়া বসিবে। বৃটিশ ভারতের পক্ষ হইতে এইটুকুই বিশেষ আপত্তিকর : যেমন বর্ত্তমানে বৃটিশ ভারতের মধ্যেই কোন কোন প্রদেশকে অন্যায় দায়িত্বের বোঝা বহন করিতে হয়—অথচ অন্য কতকগুলি প্রদেশকে সে বিষয়ে রেহাই দেওয়া হয়, তেমনই রাজন্য-রাজ্য-সমূহের সম্পর্কেও সেই ভাবের ব্যবস্থা করা হইতেছে—বৃটিশ ভারতই ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এমন বাঙ্গালার দান লইয়াই কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য দরিদ্র প্রদেশে পোদ্দারী করিয়া থাকেন, এখানেও সেইরূপ বৃটিশ ভারতের দান লইয়া রাজন্য-রাজ্য-সমূহে পোদ্দারী করিবেন। সান্ত্বনাস্বরূপ কমিটী বৃটিশ ভারতের লোককে বলিতেছেন,—"তোমাদের বৃহত্তর ভারতে প্রবেশ করিয়া রাজন্যরা তোমাদের যে উপকার করিতেছেন, তাহার মূল্য নাই।" চমৎকার সান্ত্বনা বটে!

—

নারীধর্ষণে দণ্ড

বাঙ্গালার ললাটে এই কলঙ্করেখা দুরপনেয় হইয়াই রহিল বলিয়া মনে হয়। দুই একটি সাধুপ্রকৃতির সেবাধর্ম্মপরায়ণ রক্ষা ও সাহায্য সমিতি ব্যতীত বাঙ্গালী নারীর এই অবিচ্ছিন্ন ধর্ষণ ও লাঞ্ছনা-লীলায় বাধা দিবার কেহ নাই, ইহা কি বাঙ্গালীর পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্কের কথা নহে? সংবাদপত্রে তীব্র প্রতিবাদ ও সমাজের উপর কশাঘাতেও সমাজ জড়, অচৈতন্য ও ক্লীবের মত পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে, সরকারের আদালতেও ঠিকমত বিচার সব সময়ে হয় না বলিয়াও মনে করা যায়। তাহার উপর অনেক ক্ষেত্রে একাধিক কারণে মামলাই উঠে না। কাযেই পশুপ্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত লম্পটদের দল বাঁধিয়া অবলা অসহায়া নারীধর্ষণে বুক বলিয়া যাইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষকদের ঔদাসীন্য ও অমনোযোগিতা গুণ্ডা-লম্পটদিগকে প্রশ্রয় দিতেছে।

যশোহরের গিরিবালা-হরণের মামলাটি একটা দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিতেছি। গিরিবালা দরিদ্র হিন্দু বিধবা, সে তাহার ৭ বৎসরবয়স্ক পুত্রকে লইয়া আপনার ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল। ঘরের দেওয়ালে গর্ত্ত কাটিয়া নরপিশাচ কামার্ত্ত কুক্কুরগণ অসহায়া বিধবার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, অসহায়া অবলা গিরিবালা ধর্ম্মরক্ষার্থে প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু সেখানেও আশ্রয় পায় নাই। নরপশুগণ তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য ইংরাজরাজত্বে এমন ঘটনা সম্ভবপর হয়, ইহা কি লজ্জা ও ঘৃণার কথা নহে? এমনই ভাবে বৃটিশ-সরকারের সামরিক পাঠান পুলিসের দ্বারা চট্টগ্রামের চারুবালার উপর পৈশাচিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর পাষণ্ড মুসলমান গুণ্ডারা গিরিবালাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায় এবং সমভাবেই অভাগীর উপর অত্যাচার করিতে থাকে। অবশেষে সে কোনরূপে উদ্ধার পাইয়া য়ুনিয়ন বোর্ডের সদস্য শ্রীযুক্ত শ্যামলাল বাবুর আশ্রয় পায়। তিনি তাহাকে যশোহর কোতোয়ালী থানায় নালিশ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। অভিযোগে প্রকাশ পাইয়াছে যে, থানার লোক গিরিবালার এজাহার লইতে অস্বীকার করে। অতঃপর তাহাকে ফৌজদারী আদালতে পাঠান হয়। উপযুক্ত কোর্টফির অভাবে প্রথমে আদালতে অভিযোগ করা যায় নাই। শেষে আদালতের আদেশে বিনা কোর্ট-ফিতেই নালিশ দায়ের হয়। নিম্ন-আদালত আসামীদিগকে দায়রা-সোপর্দ্দ করেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ অনুসারে সরকারী উকীল দায়রা আদালত হইতে মামলা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেন। আসামীরা মুক্তি পায়। হাইকোর্টে আবেদন করায় দায়রা আদালতে মামলা হাইকোর্টের আদেশে বিচারার্থ প্রেরিত হয়। দায়রা জজ আসামী দুই জনকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

এইরূপ কামার্ত্ত পাষণ্ড পশুপ্রকৃতির অপরাধীর এইরূপ গুরু অপরাধে ৫ বৎসর দণ্ডও যৎসামান্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে এইভাবের এক মামলায় বিচারক আসামী মুসলমানদের ১৭ বৎসর ও ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। উহা হইতেও কঠোরতর দণ্ড এই শ্রেণীর মামলায় ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পরলোকগত জজ আমির আলি মহোদয় বাঙ্গালা হইতে এই মহাপাপ নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে সরকারের সকাশে যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আত্মজীবন-কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে আছে যে, তিনি যখন বিচারপতির আসনে সমাসীন ছিলেন, তখন তিনি নারীধর্ষণকারীদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, এই শ্রেণীর কামুক পাষণ্ডদের প্রাণদণ্ডবিধান করিলে বাঙ্গালা দেশ হইতে এই মহাপাপ অন্তর্হিত হইবে। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব যে দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি স্বয়ং নারীধর্ষণের মামলা পাইলেই অপরাধীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ দিতেন, এই কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় আমীর আলির উদ্ভব হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

এই গিরিবালা-হরণ-ব্যাপারে কোতোয়ালী পুলিস কেন এজাহার লয় নাই, কেন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট দায়রা আদালতের সরকারী উকীলকে মামলা তুলিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, তাহারও কৈফিয়ৎ লওয়ার প্রয়োজন আছে। যাহারা রক্ষক, তাহাদের ঔদাসীন্যের সম্পর্কে সরকার কি প্রতীকার ব্যবস্থা করেন, তাহাও জনসাধারণ জানিতে চাহে। এইরূপ ঔদাসীন্য ও অমনোযোগিতার ফলে কত দুর্ব্বৃত্ত মহাপাপ অনুষ্ঠান করিয়াও বুক ফুলাইয়া বেড়ায়, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

—

শাসকের মনোভাব

বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সন ঢাকায় যে কয়টি বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার শাসন-নীতির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। এ দেশে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর এই প্রথম তিনি শাসিতগণকে এই সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

তিনি যে কয়টি বক্তৃতা বা অভিভাষণের উত্তর দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কথা কয়টি স্মরণীয়—(১) বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সরল অনাড়ম্বর ত্যাগপুণ্যপূত জীবনযাত্রার প্রশংসা কীর্ত্তন, (২) শিক্ষা-প্রসারে অর্থাভাবের কথা নিবেদন, (৩) পুলিসের গুণকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের অনাচারের প্রতিবাদ এবং (৪) ছাত্রগণকে ভ্রান্ত ও মিথ্যা আদর্শ ত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান।

প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্য সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়, ইহাই ভারতের সনাতন আদর্শ ও প্রথা. এখন প্রতীচ্যের অর্থকরী বিদ্যার প্রচলনের ফলে দরিদ্র দেশে বিদ্যালাভ ব্যয়বহুল হইতেছে ও তাহাতে শিক্ষা বিকৃত হইতেছে, অথচ আকাঙ্ক্ষাবৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি ? 'বুনো রামনাথের' মত তেঁতুলপাতার ঝোল ও ভাত দিয়া ছাত্রগণকে ঘরে রাখিয়া শিক্ষাদান করিবার মত স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তির উন্মেষণ করা এ যুগে দুঃসাধ্য। তবে যাহার ঘরে পাঁচটি শিক্ষার্থী ছেলে আছে, তাহার জ্যেষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত পুত্রগণের পর্য্যায়ক্রমে কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; অর্থাৎ বড় ছেলেকে যদি ৪৲ টাকা বেতন দিতে হয়, তবে মেঝো ছেলেকে ৩৲ টাকা, সেজোকে ২৲ টাকা, নছেলেকে ১৲ টাকা,—এই ভাবে বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে গৃহস্থও এই অর্থসঙ্কটের দিনে বাঁচিয়া যায়, স্কুল-কালেজের বাড়ীভাড়া ও শিক্ষকগণের বেতন যোগানও সম্ভবপর হয়। তাহার পর যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল অথবা যাহারা জনহিতব্রতে ব্রতী, এইরূপ ব্যক্তিরা দেশের মঙ্গলার্থে ত্যাগস্বীকার করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে কিছু সময় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হাইকোর্টের শত শত উকীলের কথা ধরা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কয় জন পেশা অবলম্বন করেন ? অধিকাংশই সঙ্গতিপন্ন, তাঁহারা বার লাইব্রেরীতে হাজিরা দিয়া খোসগল্প ও রাজনীতি-চর্চ্চা করিতে যান মাত্র। তাঁহারা কিছু ত্যাগস্বীকার করিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে কিছু সময় বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করিলে পারেন। এখন দেশে অনেক ধর্ম্ম-মিশনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহাদের কতকাংশ এই শিক্ষাদান সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। সরকারেরও যদি সাড়াই পুলিসের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উপায় থাকে, তবে শিক্ষার জন্য অর্থ-সংগ্রহের উপায় করা যাইবে না কেন ? পুলিসের বাবদে এবং শাসন-সরঞ্জামী বাবদ যে ব্যয় হয়, তাহার সঙ্কোচসাধন করিলেও অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়া শিক্ষায় নিয়োগ করা যাইতে পারে।

তৃতীয় বক্তব্য সম্বন্ধে বলা যায় যে, বর্ত্তমান গভর্ণর গতানুগতিক পথে চলিয়া পুলিসের ঢালা গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ না হইয়া তাহাদের দোষ দেখাইয়া সাবধান হইতে বলিয়া নিশ্চিতই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তিনি যে পুলিসের অনাচারের বিষয়ে বিশেষ সজাগ, তাহা জানা যাইতেছে। যদি তিনি এখন তাঁহার কথামত পুলিসের অনাচার ও অতিরিক্ত ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহারে কার্য্যতঃ বাধা প্রদান করেন, তবে তাঁহার শাসনকাল চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে সন্দেহ নাই। তিনি পুলিসের অনাচার বা অন্যায়রূপে ক্ষমতা ব্যবহার সহ্য করিবেন না, এ কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করায় যে অনেক কায হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে তিনি রাজনীতিক বন্দীদের জেলে বা স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রাকালে রক্ষী পুলিসের হস্তে শৃঙ্খলা-রক্ষার উদ্দেশ্যে যে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কথার মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা দুষ্কর।

বাঙ্গালায় মিশ্র নির্ব্বাচন

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় মৌলভী আবদুল সামাদ মিশ্র নির্ব্বাচনের সম্পর্কে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণাকারে না হইলেও সংশোধিত অবস্থায় অধিকাংশ ভোটে জোরে গৃহীত হইয়াছে। মোটের উপর বাঙ্গালা যে 'মিশ্র নির্ব্বাচন' গ্রহণ করিয়াছে এবং 'স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন' বর্জ্জন করিয়াছে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ইহার ফল বহু দূরবিসারী। ইহাতে এই কয়টি কথা সপ্রমাণ হইয়াছে :—

(১) বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা যে ভাবে গঠিত, তাহাতেও যখন মিশ্র নির্ব্বাচন গৃহীত হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে বাঙ্গালার অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমানই জাতীয়তাবাদী, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী নহেন, তাঁহারা সমগ্র দেশের স্বার্থকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করেন।

(২) গজনবি-সুরাবর্দ্দীর মুষ্টিমেয় দল টাউন হলে ভিন্ন প্রদেশীয় মুসলমানের সাহায্যে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের পক্ষে যে চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত বাঙ্গালী মুসলমানের কোন সম্পর্ক নাই। গজনীর বংশধর গজনবি সাহেব বাঙ্গালা জয় করিতে পারিলেন না, এইবার বোধ হয়, সদলবলে পঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে হানা দিবেন।

(৩) প্রধান মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তই করুন না, যে বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক, সেই বাঙ্গালাই পূর্ব্বাহ্নে মিশ্র নির্ব্বাচনের ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে আপনার অভিমত ব্যক্ত করিল।

(৪) সমগ্র দেশের মুক্তি বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের কাম্য ও লক্ষ্য, কেবল প্রাদেশিক মুক্তি নহে।

মৌলভী আবদুল সামাদের জয় হউক, তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মীদিগকে জাতীয়তা ও একতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে থাকুন, ইহাই প্রার্থনা।

সরকার ও কর্পোরেশান

বাঙ্গালা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশানের নিকট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) কি ভাবে কর্পোরেশান কন্‌ট্রাক্ট দিয়া থাকে,

(২) কর্পোরেশানের শিক্ষা-বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষালয়-সমূহের ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারকার্য্য পরিচালনা করা হইয়া থাকে কি না,

(৩) এই সকল শিক্ষালয়ের কয় জন শিক্ষক ও কর্ম্মচারী রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন,

(৪) তাঁহাদের কারামুক্তির পর কয় জনকে আবার চাকরীতে গ্রহণ করা হইয়াছে,

(৫) তুচ্ছ কারণে কতবার কর্পোরেশানের স্কুল-সমূহ বন্ধ রাখা হইয়াছে,

ইহা ছাড়া আরও প্রশ্ন আছে। প্রশ্নের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সরকার যেন গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড ধারণ করিয়া অপরাধী ছাত্রের অপরাধের কৈফিয়ৎ চাহিতেছেন। যদি কর্পোরেশানের গলদ বাহির করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টায় সরকার পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে কাহারও আপত্তি ছিল না। কর্পোরেশানের ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্ট আছে, এ কথা করদাতারাও জানে এবং তাহার প্রতিবাদও করে। কর্পোরেশানের উত্তরোত্তর করবৃদ্ধি, বৃষ্টির সময় জলনিকাশের অব্যবস্থা, চাকুরী ও কণ্ট্রাক্ট দানে ন্যায়বিচারের অভাব, অন্যায় ব্যয়বৃদ্ধি, ট্যাক্স-বৃদ্ধির অনুযায়ী সুখস্বাচ্ছন্দ্য-প্রদানে অসামর্থ্য, কাউন্সিলারদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট তঙ্কা আদায়ে অমনোযোগিতা, চলার পথে বেসাতি করিবার অনুমতি প্রদান, দীর্ঘসূত্রিতা,—ত্রুটি অনেক আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশপূজ্য সার সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট পাশ করাইয়া কর্পোরেশানকে যদবধি প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করিয়াছেন, তদবধি কর্পোরেশান করদাতৃবর্গের কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহাও ত স্বীকার করিতে হইবে।

দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিবার চেষ্টা করা ভাল, কিন্তু কর্পোরেশানের হস্ত হইতে প্রাপ্ত অধিকার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে করদাতৃগণের ঘোর আপত্তি থাকিবেই। বিশেষতঃ যখন করদাতারা বুঝিতেছেন যে, য়ুরোপীয় এসোসিয়েশান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সমূহ "দীনেশ গুপ্তের মন্তব্য" গ্রহণ অবধি কলিকাতা কর্পোরেশানকে জাহান্নামে দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন, এখনও চালাইতেছেন, সে ক্ষেত্রে এই ব্যাপারের অন্তরালে তাঁহাদের ইঙ্গিত নাই, এমন কথা কে বিশ্বাস করিবে? ভারতীয়দের এত বড় একটা রাজধানীর উপর কর্তৃত্ব—'নেটিভের কাছে হবে মোদের বিচার?' নেভার, নেভার!

কর্পোরেশান কোন কোন প্রশ্নের জবাব দেওয়া অপ্রয়োজনীয়, কোনটা বা অযৌক্তিক, আবার কোনটা বা নিরর্থক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কোন কোনটার জবাব তৈয়ারও করিতেছেন। তাঁহারা কি জবাব দেন এবং সরকার সেই জবাব পাইয়া কি ব্যবস্থা করেন, তাহার জন্য দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। তবে সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, ইহা সরকার জানিয়া রাখিবেন যে, কর্পোরেশান যে অধিকার পাইয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে দেশের লোক তাহা কখনই সহ্য করিবে না। এ স্পষ্ট কথাটা সরকারের জানিয়া রাখা ভাল।

ভারতীয় পুলিস

প্রথামত: এবারও শাসকের মুখে পুলিসের প্রশংসাবাণী নানা ছাঁদে উচ্চারিত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, দেশের লোকের নিকট পুলিস সাহায্য ও সহানুভূতি পায় না। এ অভিযোগ নূতন নহে, পূর্ব্বে শাসকপক্ষ হইতে বহুবারই উত্থাপিত হইয়াছে।

আমরা নিজের মুখে এ কথার প্রতিবাদ করিব না; কেন না, পূর্ব্বে বহুবারই বহু প্রমাণ দিয়া সেরূপ প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এবার সরকারেরই ধর্ম্মাধিকরণের বিচারকরা পুলিসের 'কর্ত্তব্যপালন' সম্বন্ধে তাঁহাদের রায়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

(১) পুলিস সন্দেহক্রমে লোককে ধৃত করিয়া পরে অপরাধের সহিত ধৃত ব্যক্তির সংস্রব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, অম্বালার সব-জজের রায়ে তাহা কেমন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে দেখুন,—"ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ বা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্যতিরেকে যদি কোনও পুলিস-কর্ম্মচারী, ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে কাহাকেও গ্রেপ্তার করে, তবে ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুযায়ী তাহাকে গ্রেপ্তারের অনুকূলে গ্রেপ্তার করিবার ধারাটি সঙ্গত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে হইবে। গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে দেখা কর্ত্তব্য যে, অভিযোগ সত্য কি না। কিন্তু যদি সহজবুদ্ধির কোনও লোকের নিকট অবিশ্বাস বা সন্দেহ বলিয়া অনুভূত না হয়, তাহা হইলে তাড়াতাড়ি কোন কায করা অসঙ্গত।" মন্তব্যটি এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট পুলিস-কর্ম্মচারীর সম্পর্কেই ব্যক্ত হইয়াছে। এই পুলিস-কর্ম্মচারী সবজজ কর্তৃক দণ্ডিতও হইয়াছে।

(২) রেঙ্গুনের এক মামলার বিচারকালে হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ব্রাউন আসামী পুলিস-কর্ম্মচারিদ্বয়কে জামিনে মুক্তি দেন নাই। রায়ে তাহার এই কারণ দেখান হইয়াছে;— "নিম্ন-আদালতে যে সকল সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আসামীরা পুলিসের লোক বলিয়া তাহাদের প্রতি বিশেষ ব্যবহার করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ নাই।"

ইহার উপর মন্তব্যের প্রয়োজন হয় কি?

সরকার ও কংগ্রেস

সরকারের সহিত মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় কংগ্রেস সরকারের বিপক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছে এবং নানারূপে আইন ভঙ্গ করিয়া দণ্ডভোগ করিতেছে। কংগ্রেসের বিপক্ষে সরকার যথাশক্তি দণ্ডপ্রয়োগ করিয়া আন্দোলন চূর্ণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। সরকারের শীর্ষ-স্থানীয় ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোর বলিতেছেন, এ যুদ্ধে কংগ্রেস পরাজিত হইয়াছে এবং আন্দোলন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে।

ইহাতে কোন কথা বলিবার নাই। কংগ্রেসের সরাসরি বাধা-প্রদাননীতি বা আইনভঙ্গ আন্দোলন যে দেশের সকল লোক সমর্থন করে, তাহা নহে। তাহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধেরও প্রতিবাদ করে না। কেন না, উভয় পক্ষে যখন শক্তি-পরীক্ষা হইতেছে, তখন পরস্পর যে আপন আপন সামর্থ্যমত শক্তি প্রয়োগ করিবেন, তাহা জানা কথা। কিন্তু তাহা বলিয়া কংগ্রেস যাহা নহে, তাহা বলিয়া তাহাকে চিত্রিত করিয়া জগতে তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কি ভাল? উহার সার্থকতা কি?

সার রেজিনাল্ড ক্রাডক এক দিন এ দেশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, এ দেশের লোকের মনোভাবের কথা, কংগ্রেসের কথা, মহাত্মা গান্ধীর কথা, জনসাধারণের মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতির কথা সমস্তই জানেন। অথচ তিনিই এই সময়ে বিলাতে কংগ্রেসের ও মহাত্মা গান্ধীর বিপক্ষে নীচ কাপুরুষোচিত প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। তিনি সার স্যামুয়েলের নূতন কার্য্যপদ্ধতির ব্যবস্থায় মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলের মতই খুসী, বলিতেছেন,—"কেন্দ্রে দায়িত্ব দেওয়া?—সর্ব্বনাশ আর কি! ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা কি সুন্দর শাসনই না করিয়া আসিয়াছি। আর আজ? আপনারা (পার্লামেণ্টের সদস্যরা) জানেন না যে, মিঃ গান্ধী এক জন গুজরাটী বেণিয়া। তিনি দর-কসাকসিতে খুবই পোক্ত। ভারতের শোষক মহাজন-শ্রেণীর তিনি এক জন। তিনি আসলে কি চাহেন, তাহা চাপিয়া রাখিয়া কথা কহেন, আর যাদুকরের মত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে মন্ত্র আওড়াইয়া সাধু সাজিতে তিনি খুবই মজবুত।" ইত্যাদি।

ক্রাডক ওডয়ার সিডেনহামের দিন অতীত হইয়াছে, যদিও তাহারা এখনও 'বাপ-মা শাসনের' স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের বর্ত্তমান শাসক সার ম্যালকম হেলির সম্বন্ধে ত এ কথা বলা যায় না। তিনি কংগ্রেসের সম্বন্ধে যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় শাসকের পক্ষে আশা করা যায় না। কংগ্রেসের বিপক্ষে প্রচারকার্য্য চলিতেছে, ইহা সকলেই জানে। 'হায় রে সেকাল' প্রভৃতি পুস্তিকা-প্রচারই ইহার প্রমাণ। কোন কোন স্থানে যুনিয়ন বোর্ডের কর্ম্মচারীদের লইয়া 'ভিজিল্যান্স সোসাইটী', কোন কোন সহরে 'লয়্যালিষ্ট সোসাইটী', কোথাও বা 'ব্লু বার্ড সোসাইটী,' প্রভৃতি বানানো হইতেছে। কংগ্রেসের বিপক্ষে যুক্তপ্রদেশের শাসক 'আমন সভা', 'জেলা বোর্ড' ও 'জেলা মঙ্গল লীগ' সমূহকে দল বাঁধিতে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। বালিয়া জেলার Welfare Leagueকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"You are not merely opposing a disreputable and discredited faction, but are actually laying the foundation of a new and powerful force in provincial politics."

হাসিও পায়, দুঃখও হয়! ওয়েলফেয়ার লীগ বা আমন সভাগুলিকে কংগ্রেসের স্থান অধিকার করিতে উৎসাহিত করিতে বলা, আর চাদর দিয়া সূর্য্যকিরণ আড়াল করা একই কথা নহে কি? কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে কেবল যে disreputable ও discredited বলা হইয়াছে, তাহা নহে, গাজীপুরে তাহাকে (Political Ghouls) রাজনীতিক শবখাদক প্রেতরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। পাড়াকুঁদুলী কনে ঠানদির মত এই গালির ছড়াকাটা কি শোভনই হইয়াছে!

অথচ এই কংগ্রেসের সহিত যাঁহার বিরোধ সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন, সেই বড়লাট লর্ড উইলিংডনই কংগ্রেসকে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কার্য্যক্ষম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন!

বর্ত্তমান অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যথা পাইয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠার মানসে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত হইল:—

"ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা অতিদ্রুত অতীতের অনুন্নত যুগের দিকে ধাবিত হইতেছে। অশেষ-প্রকার পীড়ন ও প্রতিহিংসাপ্রসূত বিরোধ-বিবাদে এবং অবিশ্বাস-সন্দেহে নাগরিক জীবন শতধা ছিন্ন হইয়াছে। যদি এ অবস্থার অবসান না হয়, তাহা হইলে বিরোধী পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ

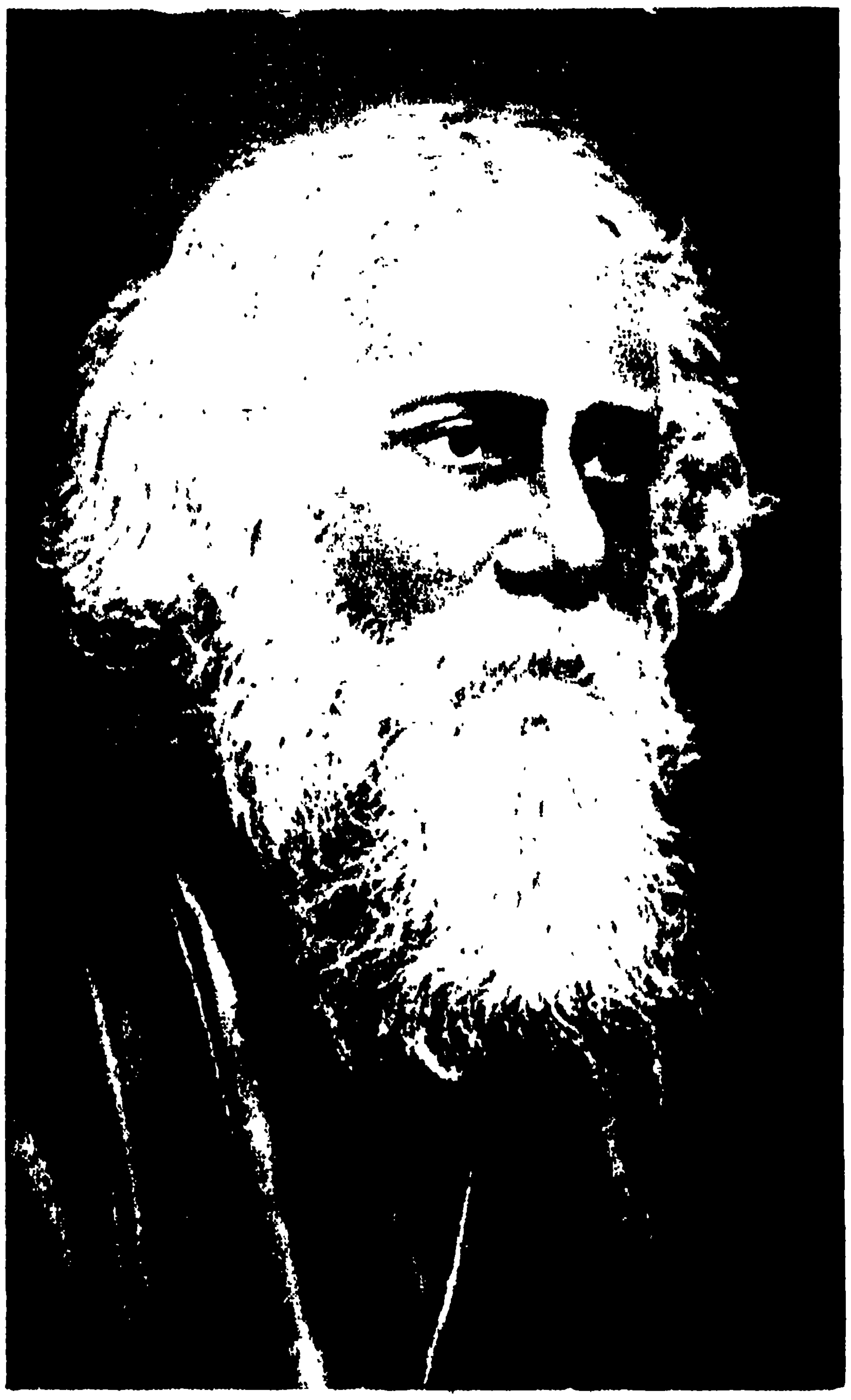

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবশ্যম্ভাবী।......শাসক-শাসিতগণের মধ্যে অসদাচরণের নীতি-সমুদ্ভূত বিরাট দুঃখের ও কষ্টের যে দৃশ্য ভারতে দেখা দিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ যে কেবল অধিকতর কষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা নহে, ক্রমে বিকটতর হইয়া আদিযুগের অরাজকতার দিকে এই মহাদেশের পশ্চাদাবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস সূচনা করিতেছে।"

এই অবস্থার পরিচয় দিবার পর রবীন্দ্রনাথ উহার প্রতীকার-মানসে বলিয়াছেন,—"The time has arrived for the establishment of harmonious under-standing upon

the ground of justice and forbearance", "ন্যায়, ক্ষমা ও সহনশীলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে মিলনের অনুকূল ভাবের আদান-প্রদান করার সময় আসিয়াছে।" কবীন্দ্র ইহা ছাড়া বিবদমান পক্ষদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, যেন সকলে "To evolve a suitable constitution through which the country can proceed towards peaceful social and economic development, এমন একটি উপযুক্ত শাসন-তন্ত্র আবিষ্কার করেন, যাহার সাহায্যে দেশ শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিমার্গের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।" তাঁহার আরও বিশ্বাস যে, "A sufficient number of individuals are ready for a final effort, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাজনীতিক বিশৃঙ্খলার স্থলে সভ্যজনোচিত অবস্থা আনয়নের জন্য শেষ চেষ্টা করিতে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রস্তুত রহিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্যের জন্য নিশ্চিতই ধন্যবাদার্হ। পূর্ব্বে এক সময়ে যখন তিনি ভারতে তাঁহার দেশবাসীর সাধারণ মনুষ্যোচিত অধিকার পদদলিত হইতে দেখিয়াছিলেন, তখন তিনি রাজদত্ত 'সার' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে তিনিই প্রথম পথিপ্রদর্শক। তিনি বিশ্বকবি, তিনি বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাসী, তাঁহার মতের মূল্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সর্ব্বত্র সভ্যজাতির দরবারমাত্রেই আছে। সুতরাং তিনি শাসক ও শাসিত জাতির মধ্যে সদ্ভাব আনয়নের উদ্দেশ্যে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই পক্ষে প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই।

কিন্তু তিনি যে ভাবে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য অভিমত নিবেদন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, কোথায় এই বিরোধের উৎপত্তি, তাহা নির্ভীক ও স্পষ্ট কথায় বলিতে তিনি যেন বিশেষ স্বস্তি অনুভব করেন নাই। যদি তিনি সোজা সরল কথায় বর্ত্তমান চণ্ডনীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উহা প্রত্যাহার করিবার কথা পাড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিমতের সার্থকতা থাকিত। ভারত-সচিব যে ভাবে প্রধান মন্ত্রীর নভেম্বর ও জানুয়ারী মাসের প্রতিশ্রুতির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। সুতরাং আজ তাঁহার বিবৃতি লইয়া কেন যে এতটা হৈ-চৈ হইতেছে, তাহা বুঝা যায় না। তিনি যেন সকল পক্ষকে তুষ্ট করিবার খাতিরে ভারতের আসল প্রাণের কথাটা বলিতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এ ভাবে তাঁহার ন্যায় প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী জগদ্বরেণ্য মানুষের অস্পষ্ট বিবৃতিতে লাভ ত কিছুই হয় নাই, বরং জগতের নিরপেক্ষ জাতিসমূহের দরবারে উহার ক্ষীণ প্রভাব অনিষ্টকরই হইবে, এরূপ ধারণা হইলে দেশবাসীকে কেহ দোষ দিতে পারিবেন কি?

বাঙ্গালী হিন্দু ও অন্যান্য জাতি

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, গত ১০ বৎসরে বাঙ্গালার জনসংখ্যা শতকরা ৭·৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হিসাব দেখিয়া কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর আনন্দ বা গর্ব্ব করিবার কিছু নাই। কারণ, হিসাবে প্রকাশ, বাঙ্গালার জনসংখ্যার ৪৩ ভাগ হিন্দু, ৫৪ ভাগ মুসলমান, বাকী ৩ ভাগ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। মুসলমানের তুলনায় হিন্দু বাঙ্গালী সংখ্যায় ত কম আছেই, পরন্তু অন্যান্য অর্থাৎ বিদেশীয় ও ভিন্নপ্রদেশীয়রাও ক্রমশঃ বাঙ্গালায় বসবাস করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, বাঙ্গালীকে ক্রমে নানারূপ অন্নসংস্থানের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতেছে। অন্য প্রদেশে বাঙ্গালীর স্থান আর নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রদেশ স্বজাতীয়ের জন্য সংরক্ষিত করিতেছে, কেবল বাঙ্গালীই উদার উন্মুক্ত বাহু প্রসারণ করিয়া সকলকে বক্ষে স্থান দিতেছে। আর ব্যবসায় ও শিল্পবাণিজ্য-ক্ষেত্রের ত কথাই নাই, ময়রা, মুদী, মাছ-তরিতরকারী-বিক্রেতা, Public utility Service (যানবাহনাদি ব্যাপারে),—কোথায় ভিনদেশীয়রা বাঙ্গালীকে প্রতিযোগিতায় পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতেছে না? সহরের ত কথাই নাই, সুদূর নিভৃত পল্লীতেও বাঙ্গালী দিনমজুর বা কৃষাণের কার্য্যও ক্রমে অপরের হস্তগত হইতেছে। অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই, খাস রাজধানী কলিকাতার উপকণ্ঠে ভাগীরথীর উভয় তটে পাট ও চটের কলের কল্যাণে ভিন-দেশীয়ের সারি সারি পল্লী বসিয়া গিয়াছে, সে সব সহর দেখিলে মনে হইবে, বুঝি পাটনা, গয়া, মুঙ্গের অথবা মীরাটে উপনীত হইয়াছি। এই সহরের ভবানীপুর-কালীঘাট অঞ্চলে পদার্পণ করিতে ভ্রম হয়, বুঝি লাহোর-মুলতানে আসিয়াছি। এ জন্য ভিনদেশীয়দিগকে অপরাধী করা চলে না, কেন না, ইহাতে তাহাদের শ্রম, অধ্যবসায় এবং কর্ম্ম-প্রচেষ্টার প্রশংসা করাই উচিত। কলির অন্নগত জীবের মত চাকুরীগতপ্রাণ বাঙ্গালীর অক্ষমতা, শ্রমবিমুখতা এবং ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব ইহার মূল কারণ, আর দেশের জল-বায়ু এবং ভূমির উর্ব্বরতা অন্য কারণ। ফলে মফঃস্বলে জনমজুর এখন সাঁওতাল, বাউরী ও বেহারী উড়িয়া, সহরেও তাই। পুলিস লাইনে বাঙ্গালী কয়টি? রেলে, ষ্টীমারে, পোর্টে পরিশ্রমসহ কার্য্যে কয় জন বাঙ্গালী নিযুক্ত?

বাঙ্গালী নিজের দেশে বেকার বসিয়া থাকে, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইবে না কেন? কেহ কেহ বাঙ্গালী হিন্দুর দেশাচারকে ইহার জন্য দায়ী করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ত পূর্ব্বেও ছিল, অথচ তখন ত বাঙ্গালী হিন্দু জাতি-হিসাবে পিছাইয়া পড়ে নাই। ১০ বৎসরে শতকরা ৭·৩ বৃদ্ধি মুসলমানের ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে যত অধিক, বাঙ্গালী হিন্দুর তত নহে, এ কথা জাজ্বল্যমান সত্য। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দু নিজে বাঁচিতে চেষ্টা না করিলে, কে তাহাকে বাঁচাইবে?

মামুদের বংশধর

গজনবি সাহেবের কোন কোন সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যোগ্যতার ধার ধারেন না, তাঁহারা কথায় কথায় 'গজনীর মামুদের বংশধর' হিসাবে মুসলমানের জন্য মাছের মুড়া ও দুধের সর 'রিজার্ভ' করিয়া রাখিতে চাহেন। গজনবি সাহেবের মত বাঙ্গালী মুসলমানরা গজনী, কাবুল বা ইরাণ-তুরাণকে আপনাদের আকর-স্থান বলিয়া গর্ব্বানুভব করিয়া বাঙ্গালাকে বিজিত পদানত মুল্লুক

বলিয়া গর্ব্বানুভব করুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু 'ভারত-বন্ধু' ষ্টেটসম্যানের মত যে সকল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র ইতিহাসের খোঁজ রাখিবার বড়াই করেন, তাঁহারা কোন্ হিসাবে বলেন যে, —"আমাদের (বিদেশী ইংরাজের) মত মুসলমানরা ভারত জয় করিয়াছিল, আমরা তাহাদের নিকট ভারত জয় করিয়াছি; সুতরাং বিজেতা হিসাবে মুসলমানদের দাবী সমধিক।" এলফিনষ্টোন, কানিংহাম এবং হাণ্টার প্রমুখ বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিকই লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"ইংরাজরা মুসলমানদিগের নিকটে নহে, হিন্দুদের নিকট হইতেই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন।" পাঞ্জাব শিখদিগের নিকট, পশ্চিম-ভারত এবং মধ্যভারত মারাঠাদের ও জাঠদের নিকট হইতেই ইংরাজরা জয় করিয়াছিলেন; স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহ যখন মারাঠাদের হস্তে বন্দী এবং আগ্রা যখন জাঠদের হস্তগত, তখন ইংরাজরা আসরে নামিয়াছিলেন। কেবল দক্ষিণে ও পূর্ব্বে (বাঙ্গালায়) মুসলমান শাসনকর্ত্তার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, সেখানেও (বাঙ্গালায়) হিন্দুরাও নবাবের সেনাপতি, মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং মুসলমানের হস্ত হইতে ইংরাজের ভারত-বিজয়ের কথা সত্য নহে, অন্ততঃ ইতিহাস তাহা বলে না। তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তবে কিরূপে কেবল সংখ্যার অনুপাতে অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারা হইবে?

গজনবী সাহেব যে কেবল বাঙ্গালী মুসলমান পুরুষদের (যাঁহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদীর সংখ্যাই সমধিক) প্রতিনিধি নহেন, তাহা নহে, তিনি মুসলমান নারীদেরও প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী করিতে পারেন না। টাউনহলের বৈঠকে তিনি নারীর ভোটাধিকার ও সদস্যপদের অধিকারের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যে অশিষ্ট উক্তি করিয়াছিলেন, শ্রীমতী সয়িদা খাতুন শিক্ষিতা বাঙ্গালী মুসলিম মহিলার পক্ষ হইতে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। মিঃ গজনবী মস্ত নীতিবিদ্। পাছে 'অবাঞ্ছিতা' নারীরা পর্দ্দানশীনাদের নামে ভোটাধিকার লাভ করিয়া ভোটকেন্দ্র কলুষিত করে, এই আশঙ্কায় তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন! কিন্তু শিক্ষিতা মুসলিম মহিলারা ভোটার্থিনী বা সদস্যপদপ্রার্থিনী নহেন, পরন্তু 'চরিত্রহীনারাই' সে বিষয়ে অগ্রণী, এই অদ্ভুত বারতা নীতিবিদ্ মহাশয় কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? সেখাবৎ মেমোরিয়াল মুসলিম বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী আর, এস হোসেন সাহেবা কি পর্দ্দানশীনা বা শিক্ষিতা মুসলিম মহিলা নহেন? তিনি কি মুসলিম নারীদের শিক্ষার উন্নতি এবং অধিকারলাভের পক্ষপাতিনী নহেন? এই সমস্ত সম্ভ্রান্তা শিক্ষিতা পর্দ্দানশীনা মুসলিম মহিলাদের মনের কথা জানিবার গজনবী সাহেবের সুযোগ না হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া চরিত্রহীনারা ভোটকেন্দ্র কলুষিত করিবার জন্য পা বাড়াইয়া রহিয়াছে জানিবার সুযোগ নীতিবিদ্ গজনবী সাহেবের কিরূপে হইল, তাহা ত বুঝা যায় না।

হিন্দু, শিখ ও মুসলমান

বার বার খোঁচা দিলে ভেকও কখন কখন মাথা তুলিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী কয় জন মুসলমানের অহোরাত্র হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও আন্দোলনের ফলে এইবার হিন্দু ও শিখও জবাব দিয়াছে। হিন্দু মহাসভা অথবা সেই মহাসভার বাঙ্গালার শাখা এ যাবৎ মিশ্র নির্ব্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারই চাহিয়া আসিয়াছে, কখনও আপন সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য মাথা কোটাকুটি করে নাই বা কাহাকেও ভয় দেখায় নাই। কিন্তু সাফাৎ আমেদ শৌকৎ-আলি গজনবী ইকবালের ঘ্যানর ঘ্যানর আবদারে এবার বাঙ্গালার ও অন্যান্য স্থানের হিন্দু সভারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দুরা জানে যে, বাঙ্গালায় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যাই অধিক, তথাপি গজনবী সুরাবর্দ্দীর দল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার সহায়তায় এমন প্রচারকার্য্য চালাইতেছে যে, তাহাতে জগদ্বাসী হয় ত সত্যই মনে করিবে যে, উহারাই বাঙ্গালী মুসলমানের প্রতিনিধি। কাযেই অনন্যোপায় হইয়া হিন্দুসভা বাঙ্গালী হিন্দুদের এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাননীয় সার বিপিনবিহারী ঘোষ সভানেতৃত্ব করিবার কালে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাহে না; কারণ, তাহারা জানে, উহা জাতীয়তার বিরোধী এবং প্রকৃত মুক্তির পরিপন্থী; কিন্তু কতিপয় স্বার্থান্বেষী মুসলমানের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে এখন হিন্দুদিগকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং ঐ স্বার্থান্বেষীদের চেষ্টার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে হইবে; নতুবা হিন্দুরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সকলেরই স্ব স্ব স্বতন্ত্র সঙ্ঘ আছে, সকলেই আপন আপন কোলে ঝোল টানিবার জন্য ব্যস্ত, এ জন্য সকলেই ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতেছে। কেবল হিন্দুরাই কি বেঘোরে মারা যাইবে?

এ দিকে হালিম গজনবী রণং দেহি বলিয়া আসরে নামিয়াছেন, ও দিকে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে সার মহম্মদ ইকবাল প্রমুখ দুই চারি জন সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, হিন্দু মহাসভা ও শিখ-লীগ আর মুসলমানদিগকে বাঁচিতে দিল না, তাহারা এবার ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল! এই শ্রেণীর ভাক্ত মুসলিম-হিতৈষীদের মুখের মুখোস খুলিয়া মৌলভী রেজাউল করিম বি, এ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ইহাদের আন্দোলন কৃত্রিম, হিন্দু বা শিখের নিকট মুসলমানদের কোন ভয় নাই, বরং সকল সম্প্রদায়েরই রাজনীতিক্ষেত্রে একযোগে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের আদর্শ উপস্থিত করাই উচিত ও মঙ্গলকর। পাঞ্জাবের হিন্দু নেতারাও সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধ মুসলমানদের অন্যায় দাবীর জোর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

শিখরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা জাতীয়তাবাদী, তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাহেন না, মিশ্র নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী; কিন্তু মুসলমানরা যদি পাঞ্জাবে অখণ্ড প্রভুত্ব কামনা করিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ও অন্যান্য দাবী আঁকড়িয়া ধরে, তবে শিখরাও

তাহাদের ১৪ পয়েণ্টের মত আপনাদের ১৭ পয়েণ্টের দাবী করিবে। সার মহম্মদ ইকবাল অমনই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পাঞ্জাবের ষ্টেটসম্যান "সিভিল মিলিটারী গেজেটের" মারফতে বলিয়াছেন, "শিখরা জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের গোঁড়ামীর আগুনে বাতাস দিতেছে।" যে সার মহম্মদ করাচী হইতে কাশ্মীর আর বেলুচিস্থান হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ভূভাগটাকেই মুসলমান-রাজত্বে পরিণত করিতে চাহেন, তাঁহার মুখে এ কথা মানাইয়াছে ভাল! সার মহম্মদই প্রথমাবধি অন্যান্য সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতেছেন, অসম্ভব আবদার বাহানা ধরিয়াছেন, কাযেই শিখরা আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। মুসলমানের পরিবর্ত্তে যদি পাঞ্জাবে হিন্দু-প্রাধান্যের জন্য আবদার ধরা হইত, তাহা হইলেও শিখরা আপত্তি করিত। তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে ত। সার স্যামুয়েল যেমন আকাশ হইতে পড়িয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ্যাঁ, মডারেটরা সহযোগ ছাড়িলেন কেন, আমি ত কোন পরিবর্ত্তন করি নাই।" সার মহম্মদও তেমনই ন্যাকা সাজিয়া বলিয়াছেন, "শিখরা হিন্দুদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য করিবার চেষ্টা করিতেছে।" আহা! এই স্বার্থবাদীটি ভাজা মাছটি উল্‌টাইয়া খাইতেও জানেন না বোধ হয়! কাহারা সংখ্যায় অল্প হইয়াও অপর সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্যের জন্য সকল প্রকার প্রচারকার্য্য চালাইতেছে আর সে জন্য দেশের স্বার্থের শত্রুদের দ্বারস্থ হইতেছে, তাহা এখন আর জগতের কাহারও জানিতে বাকী নাই। এই স্বার্থপরদের লজ্জাকর দাবী স্বয়ং সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নেতা মাননীয় আগা খাঁকে পর্য্যন্ত লজ্জায় অধোবদন করাইয়াছিল। অন্য পরে কা কথা!

মরুভূমিতে রাষ্ট্রগঠন

'মর্ণিং পোষ্ট' ও 'সাণ্ডে অবজার্ভারের' ভারতীয় সংবাদদাতারা বিলাতে খবর পাঠাইয়াছেন যে,—সার স্যামুয়েল হোরের রাষ্ট্রগঠনের নূতন কার্য্যপন্থাতে ভারতের অধিকাংশ রাজনীতিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছে। এখন ভারতীয় জনমত বহুলাংশে সার স্যামুয়েল ও লর্ড উইলিংডনকে সমর্থন করিয়াছে।

এত বড় নির্জ্জলা নির্ভেজাল মিথ্যা বোধ হয় ফলষ্টাফের পরে আর কোন ইংরাজ বলিয়াছে কি না সন্দেহ। স্বার্থের জন্য ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেওয়া এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। লক্ষ্য করিবার এইটুকু যে, এমন নির্লজ্জভাবে মিথ্যা প্রচার করিতে এই ইংরাজ সংবাদদাতাদের বিন্দুমাত্র লজ্জানুভবও হইল না!

সার স্যামুয়েল নিজেও মহা খুসী! সারমেয়ের চীৎকারে বিচলিত না হইয়া তাঁহার 'ক্যারাভন' বে-পরোয়া চলিয়াছে, কংগ্রেস ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে, ভারতের রাজনীতিক আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে,—তাঁহার খুসীর যথেষ্ট কারণ কি নাই? তবে যদি বল, কংগ্রেস গেল, মডারেটরা গেল, জাতীয়তাবাদী হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টানরা গেল, তবে রহিল কে?—তবে তাহার উত্তরে সার স্যামুয়েল বলিবেন, এ সকল ছাড়াও সরকারের সহযোগ ও সাহচর্য্য করিবার অনেক "মনের মানুষ" আছে, ভয় কি? সার স্যামুয়েল থোড়াই কেয়ার করেন মডারেটদের মনোভাবের!

কিন্তু ছাই দিয়া আগুন চাপা যায় না। 'মর্ণিং পোষ্টকে' সবাই চিনে, সুতরাং উহার কথার মূল্য কতটুকু, তাহা আমরাও জানি। কিন্তু "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের" সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। বৃটিশ জাতির মধ্যে ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সামান্য নহে। অন্ততঃ এই পত্রের ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা সর্ব্বজনবিদিত। এই পত্র সম্প্রতি রাজন্যরাজ্য তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন,—"রাষ্ট্রগঠনের কমিটী কমিশনের রিপোর্ট ত অনেক বাহির হইল, কিন্তু রাষ্ট্র চালাইবে কে? পার্লামেণ্ট সংস্কার আইন না হয় বিধিবদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহার পর? ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের নেতারা কারারুদ্ধ, পরন্তু ইহার কর্ম্মীরা গত ১০ বৎসরে যত না তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। মডারেটরা বহুদিন ধৈর্য্যের সহিত সহযোগিতা করিবার পর বিরক্ত হইয়া সহযোগ বর্জ্জন করিয়াছে। সংহিত রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনায় রাজন্যদের আগ্রহ নাই। কেবল একমাত্র সার স্যামুয়েল হোর বরাবর মহা আশান্বিত! এই অবস্থায় রাষ্ট্রগঠননীতি রচনা করা সাহারার মধ্যস্থলে একটি সুন্দর সহর নির্ম্মাণ করারই সমতুল! পরিকল্পনা এবং খসড়া অনেক হইতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহা মরুভূমির মধ্যে কার্য্যে পরিণত করিবার লোক নাই।" লর্ড আরউইনও এক দিন ঠিক এই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন! তখন তিনি বর্ত্তমান ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টে মন্ত্রিত্ব চাকুরী গ্রহণ করেন নাই এবং সার স্যামুয়েলের বর্ত্তমান অর্ডিনান্সরাজকে বা তাঁহার মতপরিবর্ত্তনকে সমর্থন করেন নাই। 'গার্ডিয়ানের'ও যে অরণ্যে রোদন সার হইবে, তাহাও জানা কথা। তথাপি মাঝে মাঝে এ ভাবে সত্য প্রকাশ হওয়ার প্রয়োজন আছে।

কর্ম্মী সাহিত্যিকের পরলোক

বাঙ্গালার অতীত সাহিত্যযুগের "অনুসন্ধান" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী গত ৬ই আগষ্ট অপরাহ্নে তাঁহার হাওড়া ব্যাঁটরার ভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী, পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়শীল সাহিত্যিক বঙ্গদেশে অধুনা বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যৌবনকাল হইতেই তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং দারিদ্র্যের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া পরিণত জীবনে কমলার কৃপাদৃষ্টিলাভে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন। 'অনুসন্ধান' পত্র সম্পাদনকালে তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহার পর দারিদ্র্যের পেষণে 'বঙ্গবাসী' পত্রের সেবাকার্য্যে ব্রতী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি 'অন্নরক্ষিণী' সভা প্রতিষ্ঠার

চেষ্টায় বাঙ্গালার বহুস্থানে ঘুরিয়া ছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি 'বঙ্গবাসীর' কার্য্য ত্যাগ করিয়া 'পৃথিবীর ইতিহাস' গ্রন্থ সঙ্কলনে ব্রতী হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। তাঁহার 'রাণী ভবানী,' 'রামকৃষ্ণ,' 'বাঙ্গালীর গান' প্রভৃতি গ্রন্থ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। পরে তিনি 'সাহিত্যসংবাদ' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। বেদের বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশ তাঁহার শেষ জীবনের সাধনা। শেষ বয়সে তিনি কর্ম্মক্লান্ত জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। গত দুই মাস যাবৎ গ্রহণী রোগ ভোগ করিয়া তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি সদালাপী পুরুষ ছিলেন। আজ আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই সমকর্ম্মীর বিয়োগের তীব্র বেদনা অনুভব করিতেছি। পরিণতবয়সে তিনি পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে শোক করিবার কিছুই নাই। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহাকে চিরজীবিত করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যাপনার ভারগ্রহণ করিয়াছেন। এ জন্য দুই বৎসরে তিনি ১০ হাজার মুদ্রা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন। ইহাতে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জয় এবং অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের পরাভব অনুসূচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্রবে আসিতে আশঙ্কা ও সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন, পরিণতবয়সে সেই রবীন্দ্রনাথ যে আকর্ষণেই হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিতই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গৌরবের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—বিশ্ববিদ্যালয় এত দিন বাঙ্গালা ভাষাকে বিমাতার আসন প্রদান করিয়াছিল। কোন সভ্য স্বাধীন দেশে মাতৃভাষার এমন আসন নাই। মাতৃভাষার অনাদর করিয়া জাতির কল্যাণ কখনও সাধিত হয় বলিয়া ধারণা করা যায় না। আজ বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার ন্যায্য ও যোগ্য আসন প্রদান করিতেছে বলিয়া তিনি সাদরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা-জননীর প্রতি এই মমত্ববোধ তাঁহাকে জাতির হৃদয়ে শ্রদ্ধাপ্রীতির আসন প্রদান করিবে। পরলোকগত অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মাতৃভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য স্থান দান করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময়ে তাঁহাদের উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। বাঙ্গালী তখনও আত্মবিস্মৃত জাতি, তখনও বাঙ্গালী পরানুকরণে এবং পরভাষানুশীলনে অতিমাত্র ব্যগ্র। তাহার পর স্যর আশুতোষ মাতৃভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বরণ করিয়া তুলিয়া লইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশাবীজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল মাত্র, আজ তাহা ফলে ফুলে শোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। বাঙ্গালীর ইহা পরম আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর রবি সেই অঙ্কুরে আলোক-উত্তাপ দান করিয়া তাহাকে সজীব ও পুষ্ট করিবার ভার গ্রহণ করিতেছেন, ইহা ত সুখেরই কথা।

* * * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা ফাণ্ড সংশ্লিষ্ট বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদে প্রার্থী মনোনয়নের আংশিক ভার প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিচারশক্তির আশ্চর্য্য বিকাশে তাঁহার দেশবাসী অধিকতর মুগ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং অধ্যাপক পার্শি ব্রাউন,—এই তিন জন এসেসরের উপর এই ভার অর্পিত হইয়াছিল। পার্শি ব্রাউনের নির্দ্ধারণ যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের ভোটাধিক্যে মিঃ সাহিদ সুরাবর্দ্দী সাহেব এই পদে মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। বাগ্‌দেবী ইহাতে অতিমাত্রায় প্রসন্না হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কি ইহাই ধারণা? তিনি কি মিঃ সাহিদ সুরাবর্দ্দীর অশেষ কলা-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই কলাবিদ্যার ইতিহাস শিখাইবার যোগ্যতম পাত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন? শুনিয়াছি, রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এই পদের অন্যতম প্রার্থী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কলিকাতা যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে তিনি বহু গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের ত কথাই নাই, প্রতীচ্যেও তাঁহার এ বিষয়ে সুনাম আছে। রবীন্দ্রনাথ যে এ কথা অবগত ছিলেন না, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তথাপি যদি তিনি মিঃ সাহিদ সুরাবর্দ্দীকে যোগ্যতম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে তাহার মূলে গুপ্ত চুক্তিরহস্য লুক্কায়িত আছে বলিয়া লোকে মনে করিলে তাহাদিগকে বিশেষ অপরাধে অপরাধী করা যায় কি? যদি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, মিঃ সাহিদ সুরাবর্দ্দী কলাবিদ্যার কোন্ ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন বা তাহার সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি কি জবাব দিবেন? উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে ভারতের ও পৃথিবীর অতীত কলাবিদ্যার তুলনামূলক শিক্ষা দিবার কি অভিজ্ঞতা সুরাবর্দ্দী সাহেবের আছে, দেশবাসী সে প্রশ্ন কি তাঁহাকে করিতে পারে?

...চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
...রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]

দোঁহে দোঁহা দরশনে ভাবে বিভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ-লোর॥—গোবিন্দদাস

[শিল্পী—শ্রীযুত ভবানীচরণ লাহা।

সচিত্র মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৯ [৫ম সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী, অতুল-ধন-ধান্য-রত্নৈশ্বর্য্যময়ী 'ভুবনমনোমোহিনী' এই ভারতভূমি এক দিকে যেমন ভোগের প্রমোদ-কানন, অন্য দিকে তেমনই মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। স্বর্গভোগ-বিতৃষ্ণ দেবগণ এই পুণ্যতীর্থে অবতীর্ণ হইয়া মোক্ষ-সাধনে ব্রতী হন এবং সে মোক্ষধর্ম্ম কলুষিত হইলে শ্রীভগবান্ আপনি শরীর পরিগ্রহ করিয়া তাহার আবিলতা দূর করেন।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দু জাতিই আধ্যাত্মিকতাকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যখনই এই জাতি কাম-কাঞ্চন-ভোগের আকর্ষণে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকে, তখনই ইহাকে ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য ব্রহ্মশক্তি গুরুরূপে আবির্ভূতা হন। এই গুরুরূপী ব্রহ্মশক্তিই হিন্দুর নিকট আধিকারিক পুরুষ বা অবতার নামে পরিচিত।

ভারতের যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসে এই অবতার-তত্ত্ব স্বর্ণসূত্রে মণি-রত্নমালায় গ্রথিত। যখনই ধর্ম্মজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, যখনই আসুরিক প্রকৃতি বলবতী হইয়া তাহার প্রশান্ত দেব-প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, যখনই অত্যাচাররূপী দুরন্ত, দুর্দ্দান্ত দানবের পীড়নে—দীনহীন দুর্ব্বলের কাতর ক্রন্দনে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, কাম-কাঞ্চনমুগ্ধ, ভোগলুব্ধ হইয়া ভারত-ভারতী যখনই জটিল সংসারারণ্যে জীবনের পথ হারাইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে নির্গম অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, পাপ-তাপ-পীড়িতের আকুল আহ্বানে তখনই ব্রহ্মশক্তি গুরু-রূপে অবতীর্ণা হইয়া পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতের আদি-কবি

পঞ্চবটী

বাল্মীকির অমরকাব্যে এই তত্ত্বই লিপিবদ্ধ। ত্রেতায় আসুরিক প্রকৃতি বলবতী। কাঞ্চনের রাজ্য—স্বর্ণময়ী লঙ্কা। সুন্দরী নারী লইয়া কেহ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে না। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, কাম-কাঞ্চন-বিলাসী দশাননের অত্যাচারে ভারত-ভূমি সন্ত্রস্তা। নিরীহ বনচারীর নারী-হরণ। পরিণাম—

"এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি।
এক জন না রহিল বংশে দিতে বাতি॥"

সত্যযুগাবসানে যে একপাদ সত্য ক্ষয় হইয়াছিল, তাহারই পূরণে ব্রহ্মশক্তি ত্রেতায় রামরূপে অবতীর্ণ। কবি-গুরু বাল্মীকির অমর লেখনী সেই পূত গাথা কীর্ত্তন করিয়াছে।

তার পরে দ্বাপরের অবসানে পুণ্যক্ষেত্র ভারত অসংযত রিপুর উচ্ছৃঙ্খল বিহারভূমি। কোথাও ব্যভিচারী কামের নির্লজ্জ স্ফূর্ত্তি; কোথাও ক্রোধের করাল মূর্ত্তি; হেথা বিশ্বগ্রাসী লোভের বিশাল কবল; হোথা অন্ধদৃষ্টি মোহ বিবেক-বিহ্বল; এখানে উন্মদ মদ মেদিনীকে আঘাত করিবার জন্য গর্ব্বিত পদ উত্থিত করিয়াছে; ওখানে মাৎসর্য্য ঐশ্বর্য্য-বিলাসে ধৈর্য্য হারাইয়াছে! রাজ্যাকাঙ্ক্ষায় সহোদর সহোদর-বিরোধী, পিতাপুত্রে বাদী! এ যুগেরও মুখ্য লক্ষ্য ছিল কাম-কাঞ্চন-বিলাস, দীন প্রজার সর্ব্বনাশ। ধর্ম্মের সিংহাসন অধর্ম্মের অধিকৃত, ধর্ম্মপুত্র রাজ্য-বিতাড়িত। এক দিকে পাশব অত্যাচার, অন্য দিকে দীন প্রজার মর্ম্মভেদী হাহাকার! তাই, তাপিতের অশ্রুবারি মুছাইতে

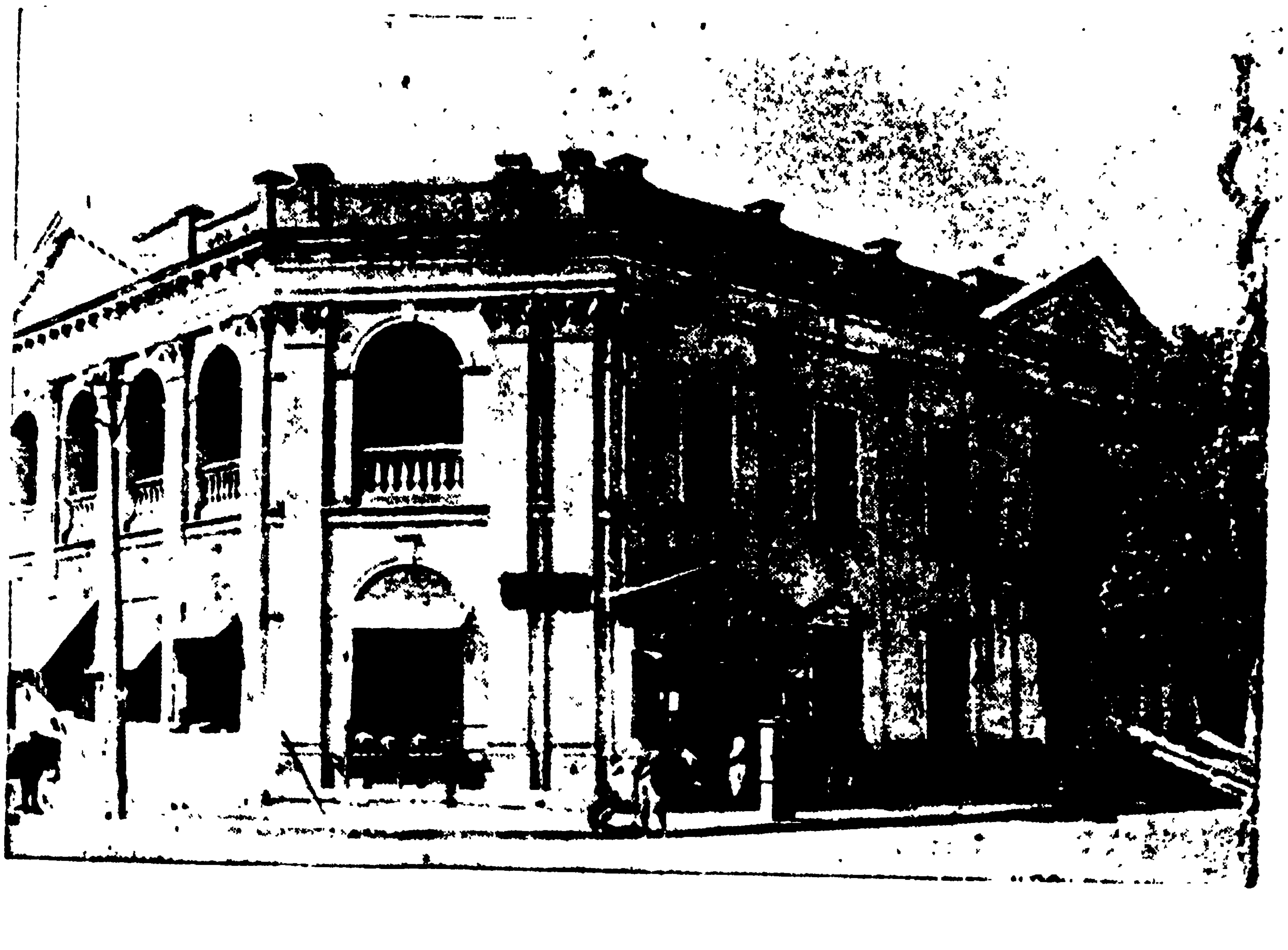

রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটী

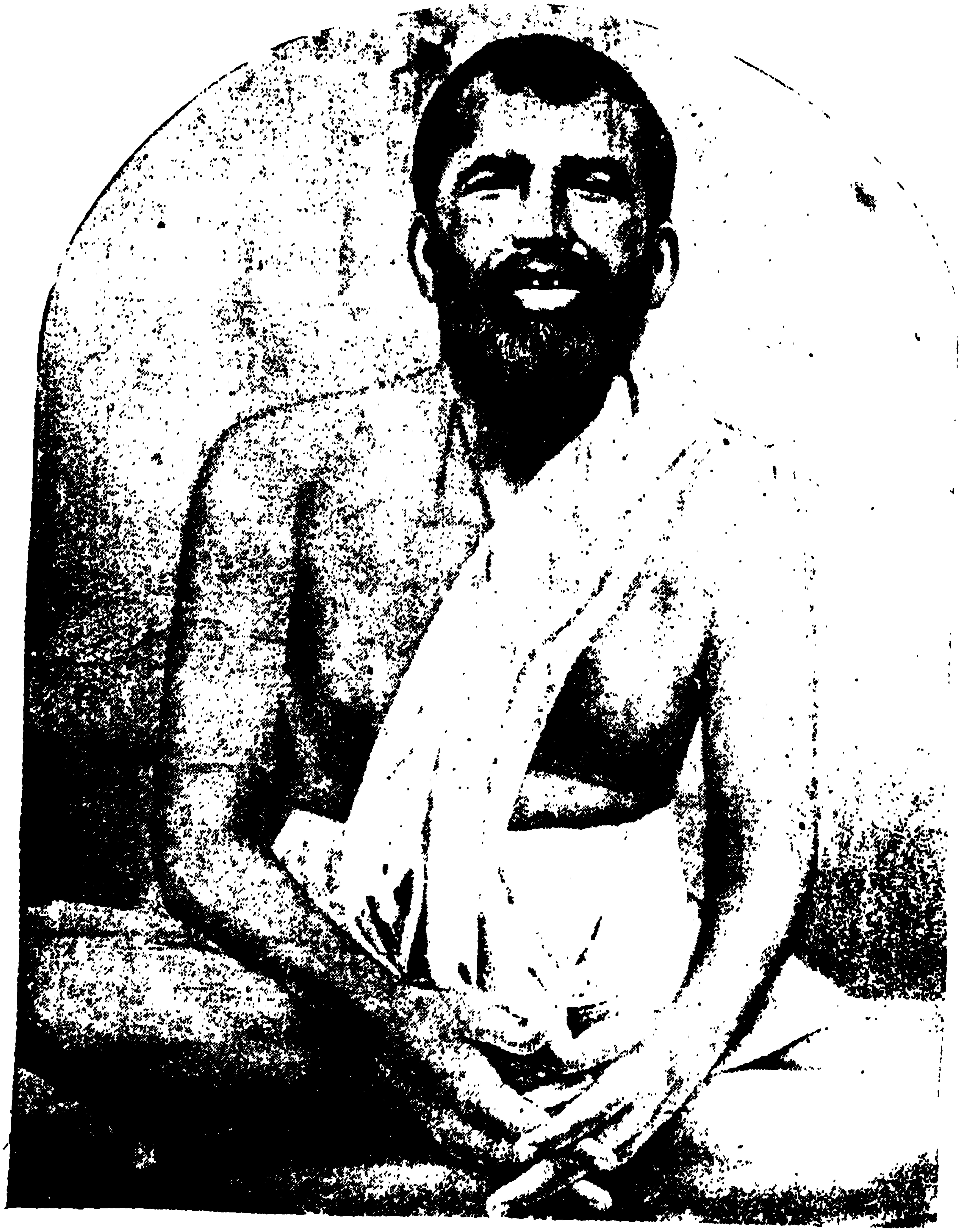

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ধর্ম্মের সিংহাসন স্থাপন করিতে দীননাথ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। ফল—পাশব বলের নিঃশেষে সংহার এবং নিজ বংশ ধ্বংস করিয়া ধরায় নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ প্রচার। ধর্ম্মা-ধর্ম্মের এই আঘাত-সংঘাতের কাহিনী সত্যবতীসুত ব্যাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কালে কলির উদয়। দুর্ব্বল মানব নিরতিশয় পাপময়। ধর্ম্ম ভোগবাসনায় যজ্ঞানুষ্ঠানরত; জিঘাংসাব্রত; নিরীহ জীবহত্যায় রুধির-বন্যায় মেদিনী প্লাবিত। দয়াবতার

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী

ভগবান্ বুদ্ধ অহিংসা—সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান—এই পরম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ক্রমে সে ধর্ম্ম কদাচারলীন। ভোগ-পিপাসায় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ অভিচার-ক্রিয়াসক্ত। ভগবান্ শ্রীশঙ্কর দৃঢ়পণে তাহার উচ্ছেদসাধনে আত্মশক্তি নিযুক্ত করেন।

কালে আবার তান্ত্রিকতার অভ্যুদয়। ভোগ-পিপাসায় মানব মহাশক্তির উপাসক —

"না বুঝিয়া মর্ম্ম, ত্যজে লোক ধর্ম্ম
মদ্য মাংস রমণী লইয়া খেলা।"

ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ভক্তি ও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন—"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।"

কালে কলি বলবান্। জ্ঞান মোহাবৃত, প্রাণ কাম-কাঞ্চন-তান-তন্ত্রিত, ধ্যান স্বার্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রদর্শিত ভক্তি-পথ ক্রমে ভণ্ডামিতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম এখন ব্যভিচারী, কর্ম্ম হঠকারী। রুচি এখন কামে, নাম কেবল নামে। সত্য মূক, প্রবৃত্তি সর্ব্বভুক্। নিষ্ঠা নিরাকারা, বিশ্বাস দিশাহারা। এই দুর্দ্দিনে আবার সাগর-

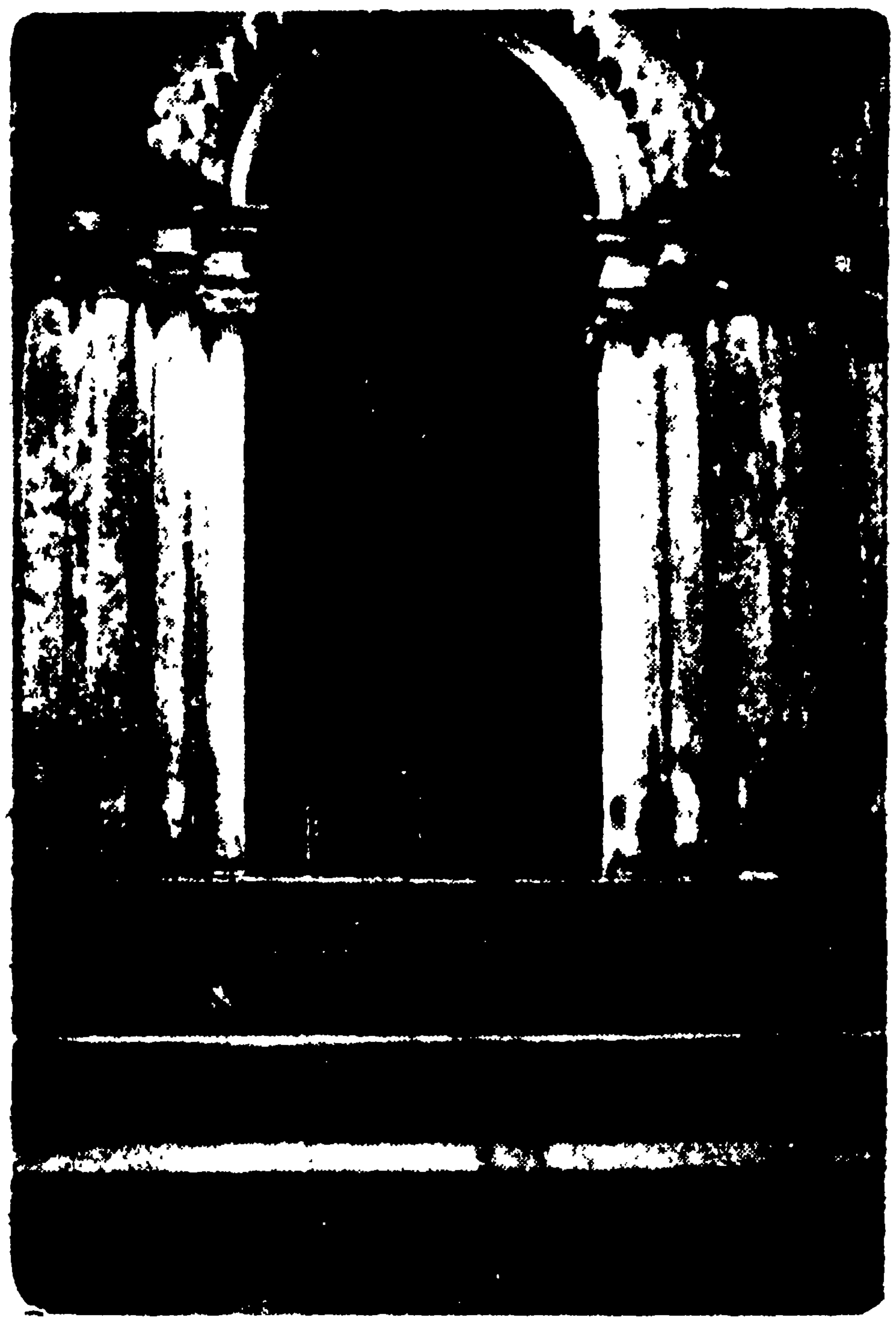

রাধাকান্তজীর মন্দিরের সম্মুখের দৃশ্য

পার হইতে জড়বিজ্ঞান আসিয়া হিন্দুর অধ্যাত্ম-ধর্ম্মকে কুসংস্কার বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। খৃষ্টের জয়-পতাকা উড়িল। দেব-দেবীগণ মুখ ঢাকিলেন। চারিদিকে নানা মত, নানা পথ প্রচারিত হইতে লাগিল। প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসুগণ শঙ্কিত-চিত্তে সংশয়দোলায় দুলিতে লাগিলেন।

ভারতের এই দারুণ সঙ্কট ও ধর্ম্মগ্লানির দিনে বাঙ্গালার এক নিভৃত পল্লী হইতে সহসা শঙ্খ-রোল উঠিল,—'সম্ভবামি যুগে যুগে!' আকাশে তখন তমোনাশ করিয়া উষার আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে! নিবিড় তমসাবৃত ধর্ম্ম-জগৎ শত সূর্য্য-

কিরণে উদ্ভাসিত করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন এবং জগদ্‌গুরু-রূপে প্রচার করিলেন, ঈশ্বরলাভই মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য, নানা মত নানা পথ মাত্র।

এই পরম সত্য তাঁহার অনুমান নহে, সুদীর্ঘ সাধন-লব্ধ অনুভূতি—গোকল ব্রত হইতে অদ্বৈতসিদ্ধির উপলব্ধি। দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভব-তারিণীর পূজকরূপে তাঁহার প্রথম সাধনা অন্তরের আগ্রহ-বলে, আকুল অশ্রুধারায় ও ব্যাকুল ক্রন্দনরোলে। বলিতেন,

পরমহংসদেবের ঘর

মাগ-ছেলের জন্য লোকে এক ঘটী কাঁদে! টাকা-মান-যশ প্রতিষ্ঠার জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে? বলিতেন, ব্যাকুলতা হলেই অরুণোদয় হ'ল, তার পর সূর্য্য দেখা দেবেন। বলিতেন, ভগবান্ খুব কাণ-খড়কে, যত ডেকেছ, সব শুনেছেন, এক দিন দেখা দেবেনই। তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। তিন টান এক্ক হ'লে তবে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। যেমন বিষয়ীর বিষয়ের ওপর টান, মায়ের সন্তানের ওপর টান আর সতীর পতির ওপর টান। কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে।

তার পর, বিল্বমূলে ও পঞ্চবটীতলে তন্ত্র-সাধনা। তাঁহার তন্ত্র-সাধনার বিশেষত্ব ছিল এই যে, শক্তি ও কারণ-গ্রহণ ব্যতীতও সিদ্ধিলাভ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাস্থল, জানবাজারের রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যান। ভাগীরথী-অঙ্কে এই আরাম যেমন মনোরম, কলিকাতা হইতে তেমনি সুগম। শ্রীশ্রীজগজ্জননীর ইঙ্গিতে এই স্থান মনোনীত হয়। ইহা বিধিনির্দ্দিষ্ট। কলিকাতা তখন ভারতের রাজধানী, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। বহু দেশ হইতে এই নগরীতে বহু জনসমাগম হয়। বিধাতা

দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানা

সেই জন্যই ইহাকে নব যুগের নব-ধর্ম্মসংস্কারের প্রধান ক্ষেত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

যে সমন্বয়-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের এই দেবমন্দির যেন তাহার প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি। এক পার্শ্বে সুরধুনী-তীরবর্ত্তী সমুন্নতশির দ্বাদশ শিবমন্দির। পশ্চাতে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ-পারে নবচূড়মণ্ডিত দেবীদেউল—শ্রীশ্রীভবতারিণীর সুরম্য হর্ম্ম্য। তৎপার্শ্বে চক্রধর বিষ্ণুঘর—শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর প্রাসাদ। রাণী ভক্তিডোরে হর-হরি-শিবসুন্দরীকে দৃঢ়-বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যান জ্ঞান-ভক্তি-শক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম—শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের সমন্বয়

সভা। সকাল-সন্ধ্যায় ভোগারতির সময় ঢাক-ঢোল-খোল-শঙ্খরোল একসঙ্গে উত্থিত হয়। হরি-হরি, হর-হর, জয়-মা রবে বিশাল প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। এখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ভেদাভেদ, সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অবসান—সকল ভাবের সম্মিলনস্থান। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ কখন কালী-কালী, কখন শিব-শিব, কখন কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেন। জটাধারী বাবাজীর স্নেহ-বিগ্রহ 'রামলালা'র অবস্থিতি দক্ষিণেশ্বর দেবভূমিকে সর্ব্বসম্প্রদায়ের

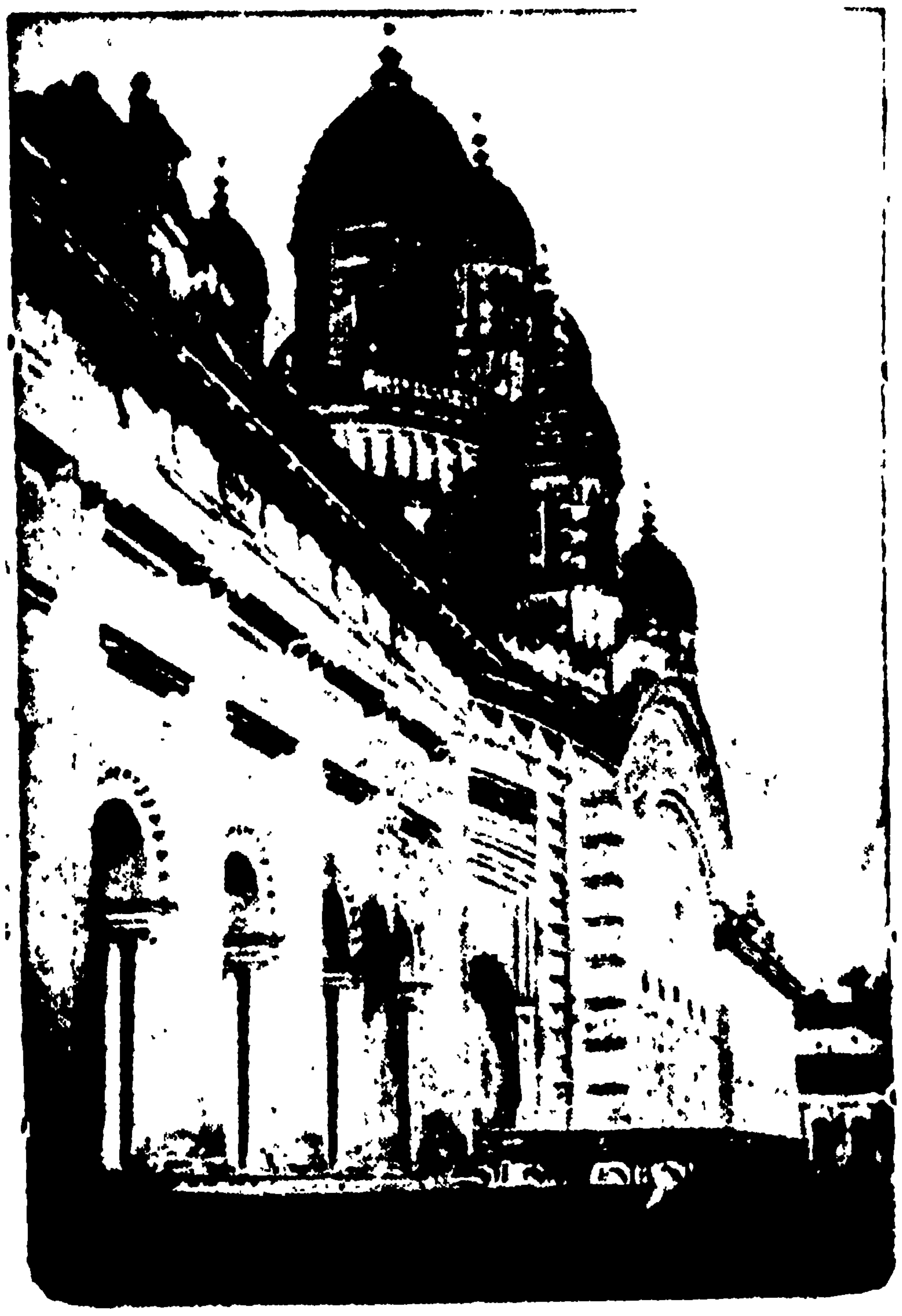

কালীবাড়ীর আর এক দিকের দৃশ্য

তীর্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত অপূর্ব্ব সাধনায় এ স্থানকে সর্ব্বতীর্থ-মহিমায় মণ্ডিত ও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার অণু-পরমাণু-রেণু, বৃক্ষবল্লী, জল-স্থল, আকাশ-বাতাস সর্ব্বক্ষণ সচেতন।

অন্তরের আকুল আগ্রহ ও ঐকান্তিক ব্যাকুলতা-সহায়ে জগজ্জননীর দর্শনলাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিমা পাষাণময়ী নহে, জীবন্ত। শ্রীমন্দির, পূজার উপাদান, তরুলতা-সমন্বিত উদ্যান, সব সচেতন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, আগে ফুল, পরে ফল, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কোথাও কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন লাউ-কুমড়া—আগে ফল, পরে ফুল। শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যায় আগেই ফল দেখা দিয়াছিল। কিন্তু অনভিজ্ঞ পূজক আত্মপ্রত্যক্ষে প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না। যতক্ষণ না শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ও আত্মপ্রত্যক্ষ এক হয়, ততক্ষণ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও দৃঢ়-বিশ্বাস অসম্ভব। উত্তরসাধিকা যোগেশ্বরী ভৈরবীর প্ররোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসাধনায় মগ্ন হইলেন। প্রথম তন্ত্র।

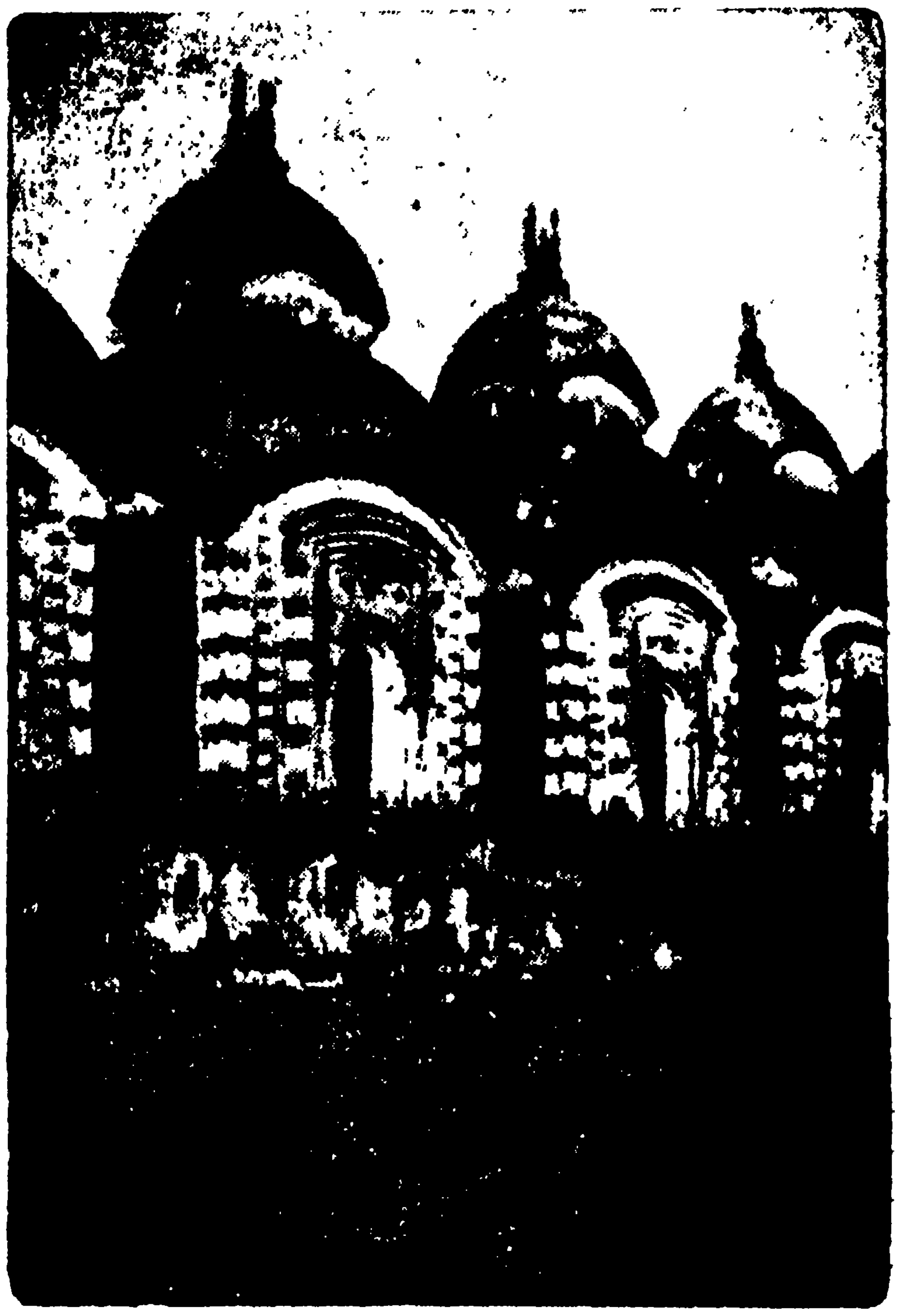

ভিতর হইতে দ্বাদশ মন্দিরের একাংশের দৃশ্য

পরে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবসাধনা। এই দুই তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া অদ্বৈত-উপলব্ধির জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কৃপায় আপনা হইতে গুরু আসিয়া উপস্থিত—তোতাপুরী। অদ্বৈত-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সুফি গোবিন্দরায়ের নিকট আল্লামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। একশ্মশ্রুল জ্যোতির্ম্ময় পুরুষপ্রবরের দর্শনলাভে এ সাধনার নিবৃত্তি হইল। অবশেষে খৃষ্টের প্রত্যক্ষ দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, মানুষকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে দর্শন না করিলে জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। তাই, স্বীয় পত্নীকে প্রত্যক্ষ ভগবতীরূপে

ষোড়শীপূজা করিয়া তাঁহার সকল সাধনার পরিসমাপ্তি। বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখিয়া জপমালা প্রভৃতির সহিত অর্পণ করিয়া শ্রীসারদেশ্বরীর শ্রীচরণে বর প্রার্থনা করিলেন, লোক-কল্যাণ-সাধন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, শুধু শাস্ত্র ঘেঁটে কিছু হয় না। পাজীতে লেখা থাকে বিষ আড়া জল, টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না। কিছু সাধনা চাই। কলির মানুষ নিরতিশয় দুর্ব্বল, অন্নগতপ্রাণ। এ যুগের সাধনা—ঈশ্বরের নাম-গুণগান। বলিতেন, বিবেক-বৈরাগ্য, ত্যাগ-অনুরাগ, দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেম-ভক্তি, সারল্য এবং সর্ব্বোপরি ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা চাই। সংসারে থেকে ঈশ্বর-লাভ না হবে কেন? তবে, আগে ঈশ্বর, পরে সংসার। অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুসী কর। বুড়ী ছুঁলে আর চোর হ'তে হয় না। সংসারে থেকে সাধনা—কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এই সবের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ঘরে তা সুলভ। বলিতেন, মন নিয়েই কথা। একপাশে পরিবার, একপাশে সন্তান। এক জনকে একভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে আদর করে—কিন্তু একই মন।

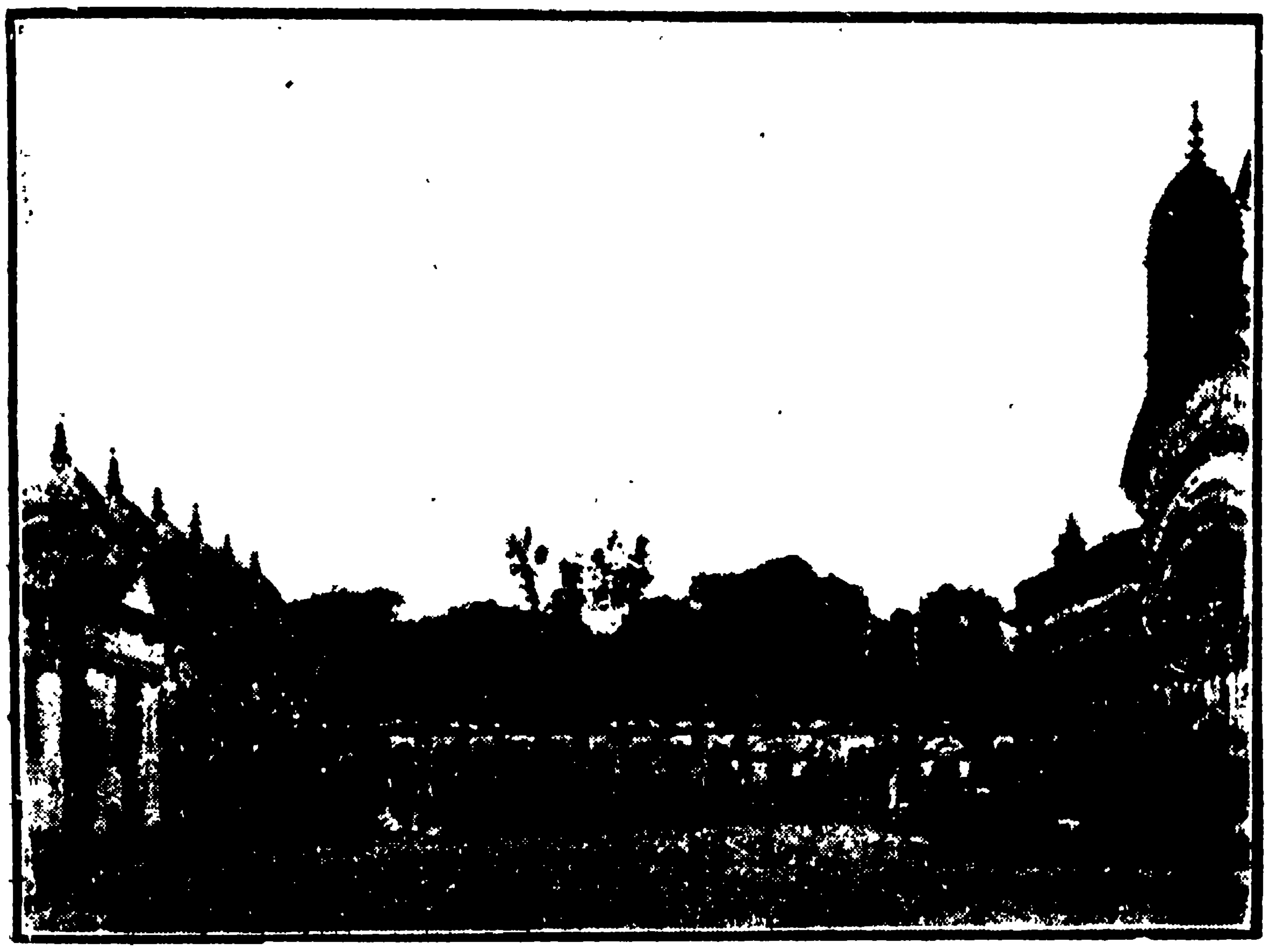

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ভিতর—উত্তরদিকের দৃশ্য

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারীদের এই অভয় আশ্বাসবাণী দিয়াছেন। বলিতেন, যে ঈশ্বরের কাছে টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী চায়, সে কিছুই পায় না। আর যে আগে ঈশ্বরকে চায়, সে সবই পায়।

কুরুক্ষেত্রে সঙ্কটসঙ্কুল ভীষণ রণ-স্থলে নিরস্ত্র, অশ্বকশামাত্র হস্তে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, দেখ, অর্জ্জুন, আমি ঈশ্বর। আর এই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ জীবনের শেষভাগে কণ্ঠক্ষত হইতে যখন অবিশ্রান্ত রক্ত-বর্ষণ হইতেছে, তখন শ্রীনরেন্দ্র-নাথকে নিজ সাধনলব্ধ উপলব্ধিবলে বলিয়াছিলেন, তোর এখনও সন্দেহ? যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং এই দেহে সেই রামকৃষ্ণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

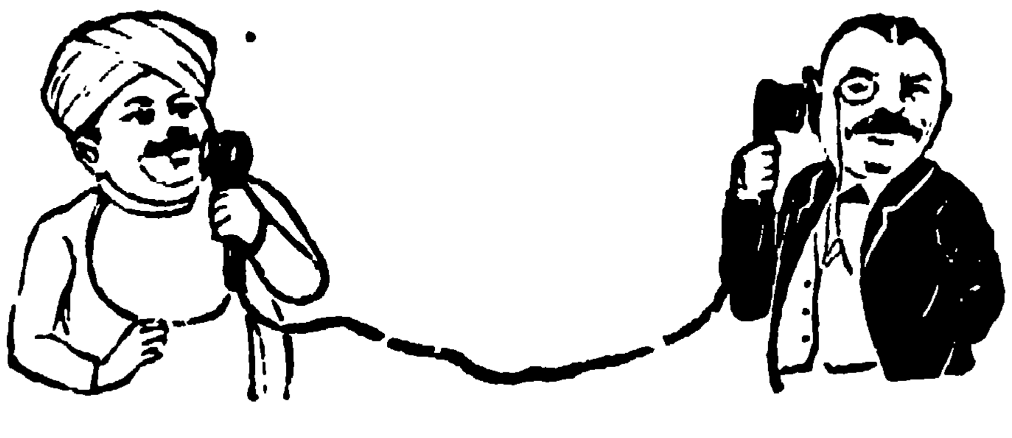

পিশাচের নাগপাশ

একাদশ প্রবাহ

লোমহর্ষণ প্রস্তাব

সেই কদাকার লোকটা কয়েক ফালি কালো রুটী ও একটা টিনের মগপূর্ণ পানীয় জল সেই কক্ষের টেবিলের উপর রাখিয়া মিঃ লকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া হী-হী শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার নিশ্বাসের দুর্গন্ধ মিঃ লকের অসহ্য হইল। তাহার দুই কস্ দিয়া লালা ঝরিতে লাগিল ; তাহা দেখিয়া মিঃ লক বিরক্তিভরে মুখ সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "চলিয়া যাও, কেন আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ ?"

কারাপ্রহরী তাঁহার আদেশে কর্ণপাত না করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "সিনর, তাহারা তোমাকে আজ রাত্রে গুলী করিয়া মারিবে, তুমি গুপ্তচর কি না। এ দেশে গুপ্তচরগুলাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া হত্যা করা হয়, তুমি গোয়েন্দা কুকুর ; তুমি আজ রাত্রে ঠিক মরিবে।"

মিঃ লক বলিলেন, "সে কথা আমার জানা আছে ; তুমি বাহিরে যাও।"

প্রহরী বলিল, "তুমি মরিতে চাও ?"

মিঃ লক বলিলেন, "যদি আমার মুখ তোমার মুখের মত কদাকার হইত, তাহা হইলে আমি মরিতে আপত্তি করিতাম না।"

প্রহরী বলিল, "তুমি ঠাট্টা করিতেছ, সিনর! মৃত্যু যাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া মুখব্যাদান করিতেছে, তাহার মুখে ঠাট্টা ভাল শুনায় না। তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বলিতেছ। তুমি ধনবান্ ইংরাজ, তোমার হাতে অনেক টাকা থাকিতে তুমি মরিবে ? এ বড় অন্যায় কথা! টাকার মানুষের মরা উচিত নয়। টাকার জোরে যমকে সে ফাঁকি দিতে পারে, ইহা কি তোমার জানা নাই? টাকার মানুষ ত ওরকম বোকা হয় না।"

প্রহরীর কথা শুনিয়া মিঃ লক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে যাহা বলিল, তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। কিন্তু সে কোন্ সাহসে, কাহার পরামর্শে এই ইঙ্গিত করিল ? সে কারাগারের নূতন প্রহরী, মিঃ লক পূর্ব্বে তাহাকে কারাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে দেখেন নাই, কারাধ্যক্ষের অজ্ঞাতসারে সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল কি না, তাহাও তাঁহার জানিবার উপায় ছিল না। সেই কদাকার লোকটা কি উৎকোচ লইয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে পারিবে ? তিনি তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নীরব রহিলেন।

প্রহরী তাঁহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া বলিল, "তুমি কি আমার কথা বুঝিতে পার নাই, সিনর ? না, আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না ?"

মিঃ লক তাহার প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন ; কিন্তু প্রহরীটা তাঁহার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া নিঃশব্দে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। সে দ্বারে কাণ পাতিয়া দুই তিন মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মিঃ লকের নিকট আসিয়া তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "দেখুন সিনর, আপনি যদি প্রচুর পয়সা (পেসোজ) খরচ করিতে পারেন, তাহা হইলে কেবল যে আপনার প্রাণরক্ষা হইবে, এরূপ নহে, আপনি স্বাধীনতাও লাভ করিতে পারিবেন। আপনার জীবনের ও স্বাধীনতার জন্য অর্থ ব্যয় করা কি অপব্যয় মনে করেন ? তাহা কি অকর্ত্তব্য ?"

মিঃ লক বলিলেন, "আমি স্বীকার করি, সে জন্য অর্থ ব্যয় করিলেই যে মৃত্যুদণ্ড হইতে রেহাই পাইব, মুক্তিলাভ করিব, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব ? তুমি এই কারাগারের এক জন নগণ্য প্রহরী মাত্র, তুমি কিরূপে আমার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ রহিত করিবে ? কিরূপেই বা আমাকে মুক্তিদান করিবে ? তোমার যে সেরূপ শক্তি আছে, ইহার প্রমাণ কি ?"

প্রহরী বলিল, "সিনর, আমার প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, আমি সেই ষ্টিফেনো জোস্ রিগোর বন্ধু। আপনি যে বহু অর্থের মালিক, প্রকাণ্ড ধনবান্ ব্যক্তি, তাহা তাঁহারই নিকট জানিতে পারিয়াছি। যে কাপ্তেন ও তাঁহার সুন্দরী কন্যাকে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা-দের উদ্ধারের জন্য আপনি রিগোকে অনেক টাকা দিতে রাজী আছেন, আমি কি তাহা জানি না ? আপনি যথেষ্ট

পরিমাণে অর্থব্যয় করিলে আপনারও প্রাণরক্ষার এবং আপনার মুক্তিদানের ব্যবস্থা হইবে। আমার কথা আপনি অবিশ্বাস করিবেন না; আপনার আশঙ্কারও কোন কারণ নাই। আমি সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করিব। এই সকল গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবার আশঙ্কা নাই।"

মিঃ লক চিন্তাকুল-চিত্তে বসিয়া রহিলেন। লোকটা তাঁহাকে যে সকল কথা বলিল, তাহা কি সত্য? সে তাহার অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে, ইহার প্রমাণ কোথায়? এই সকল দুরূহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিতে হইলে যেরূপ শক্তি-সামর্থ্য ও ফন্দি-ফিকির খাটাইতে হইবে, সে তাহার অধিকারী কি না, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, যদি কারাগারে ন্যূনপক্ষে তিনি দুই জন লোকের সহায়তালাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা কোন কৌশলে তাঁহাকে মুক্তিদান করিতেও পারে। তাঁহার উদ্ধারের জন্য তাহারা গোপনে যে ষড়যন্ত্র করিবে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত থাকিলেই বা ক্ষতি কি?

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ লক বলিলেন, "তোমরা টাকা চাও, আমি টাকা দিয়া তোমাদিগকে খুসী করিতে পারিব, হাঁ, আমি তোমাদিগকে তোমাদের আশাতীত পুরস্কার দান করিব। কিন্তু তোমরা আমার জীবনরক্ষার জন্য, আমাকে মুক্তিদানের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে, তাহা আমি জানিতে চাই।"

প্রহরী বলিল, "আমার বন্ধু ষ্টিফেনো পূর্ব্ব হইতেই সে জন্য চেষ্টা করিতেছেন; যে নাবিকটা পিড্রোর হোটেলে সেই নাচওয়ালী যুবতীকে চুম্বন করিয়াছিল, ষ্টিফেনো সেই নাবিকটির সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই আপনার পরিচিত আমেরিকান ভদ্রলোকটির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে—আজ রাত্রে যে রাইফেলধারী সৈনিকের দল আপনাকে গুলী করিয়া মারিবে, ষ্টিফেনো সেই দলে যোগদান করিবেন। তাহার কি ফল হইবে, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের রাইফেল হইতে গুলী বর্ষিত হইবে, কিন্তু আপনার মৃত্যু হইবে না।"

মিঃ লক বলিলেন, "তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়া রাইফেল হইতে গুলী বর্ষণ করিবে, অথচ সেই গুলীর আঘাতে আমার মৃত্যু হইবে না! এই ব্যাপারে তাহাদের কোন রকম চালাকি খাটিবে না; কারণ, যে সময়ে আমাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে, কলভেটি সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত থাকিবে। কি কৌশলে তাহার চোখে ধূলা দিবে, বলিতে পার?"

প্রহরী বলিল, "সেনাপতি সেখানে উপস্থিত থাকিবেন সত্য; কিন্তু গুলীর আঘাতে আপনি ধরাশায়ী হইলে তাঁহার খুব স্ফূর্ত্তি হইবে। তিনি উৎসাহভরে মাথা নাড়িয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিবেন। তাহার পর তিনি নিশ্চিন্ত-মনে কাফেতে প্রবেশ করিয়া সরাব টানিবেন।"

মিঃ লক বলিলেন, "আমাকে লক্ষ্য করিয়া রাইফেল হইতে গুলী বর্ষিত হইবে, সেই গুলী আমার দেহে বিদ্ধ হইবে, আমি গুলীর আঘাতে ধরাশায়ী হইব, কিন্তু আমার মৃত্যু হইবে না, আমি জীবিত থাকিব—এ যে কি ব্যাপার, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রাইফেলের অব্যর্থ গুলীর আঘাতে কেহ জীবিত থাকে, ইহা বিশ্বাস করা আমার অসাধ্য।"

প্রহরী বলিল, "কি কৌশলে আপনার প্রাণরক্ষা হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না? বুঝিতে না পারিবারই কথা বটে; কিন্তু আপনারা যাহাকে 'অভিনয়' বলেন, এ ক্ষেত্রে সেইরূপ করা হইবে। ঐরূপ অভিনয় পূর্ব্বেও করা হইয়াছে। তাহারা আপনাকে হত্যা করিবার জন্য গুলী মারিবে সত্য, কিন্তু সেই সকল গুলী আসল গুলী নহে। সেগুলি দেখিতে আসল গুলীর অনুরূপ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা মোম-নির্ম্মিত। রাইফেল হইতে গুলী বাহির হইয়া আপনাকে আহত করিবে, আপনি সেই গুলীর সংস্পর্শে ধরাশায়ী হইবেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; গুলী আপনার দেহে বিদ্ধ হইবে না, আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু গুলীর আঘাতে আপনি নিহত হইয়াছেন, এই ভাবে পড়িয়া থাকিবেন, অর্থাৎ মৃত্যুর অভিনয় করিবেন। সেই অবস্থায় তাহারা আপনার অসাড় দেহ তুলিয়া লইয়া কফিনের ভিতর নিক্ষেপ করিবে। সেই সময় ষ্টিফেনো এবং আমার অন্যান্য বন্ধুরা কফিনসহ আপনাকে বহন করিয়া, কিল্লার প্রাচীরের নিকট যে সমাধিক্ষেত্র আছে—সেই স্থানে লইয়া যাইবে। সেই সমাধিক্ষেত্রে তাহারা

কফিনটি নামাইয়া রাখিলে আপনি সতর্কভাবে কফিন ত্যাগ করিয়া তাহার বাহিরে আসিবেন, এবং আপনার বন্ধু সেই আমেরিকানের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; সেই সময়ে আপনি আমাকে পাঁচশত 'পেসো' পুরস্কার দিবেন। হাঁ, আমি সেই সময় আপনার নিকট টাকাগুলি গ্রহণ করিব, তাহার পূর্ব্বে নহে। সুতরাং আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, আমার ব্যবহারের সহিত প্রতারণার সম্বন্ধ নাই। সে সময় যদি আপনি জীবিত না থাকেন, গুলীর আঘাতে যদি তাহার পূর্ব্বেই আপনাকে নিহত হইতে হয়, তাহা হইলে আমিই বা কিরূপে আপনার নিকট টাকার দাবী করিব, আর আপনিই বা কিরূপে তাহা তখন আমাকে দিবেন? সুতরাং আপনার হতাশ হইবার কারণ নাই। আপনি আমার কথাগুলি বুঝিতে পারিয়াছেন? আপনাকে প্রতারিত করি, এ ইচ্ছা আমার নাই। আপনার জীবন লইয়া আমরা ব্যবসায় করিতেছি, আপনি ক্রেতা, আমরা বিক্রেতা। প্রতারণায় আমাদের কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? আমি আপনার জীবন—আপনার স্বাধীনতার বিনিময়ে পাচশত পেসোর দাবী করিয়াছি; আমাদের এই দাবীর পরিমাণ অধিক, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। আপনার জীবনের মূল্য উহা অপেক্ষা অনেক অধিক হওয়াই উচিত। একটা নগণ্য কুলীর জীবনও উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্, আপনার মত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ইংরাজের ত কথাই নাই!"

মিঃ লক স্তব্ধভাবে প্রহরীর সকল কথাই শুনিলেন, কিন্তু তিনি কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। প্রস্তাবটি এরূপ অদ্ভুত, এরূপ অসাধারণ ও লোমহর্ষণ যে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার মনে হইল, এই কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করা অসাধ্য না হইতেও পারে; কিন্তু পদে পদে ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা বর্ত্তমান, এবং যে কোন সামান্য ত্রুটি তাঁহার পক্ষে সাংঘাতিক হইতে পারে। প্রহরী বলিল, রাইফেলে প্রাণান্তকর সীসার গুলীর পরিবর্ত্তে মোমের গুলী ব্যবহৃত হইবে; কিন্তু যদি চক্রান্তকারীরা মোমের গুলী পুরিবার সুযোগ না পায়, যদি তাহার ভিতর সীসার গুলী থাকে এবং সেই গুলী ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ধীর ভাবে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে। সেই অবস্থায় তিনি আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে পারিবেন না।

মিঃ লককে নির্ব্বাক্ দেখিয়া প্রহরী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, তাহার ধারণা হইল, তিনি তাহার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারায় অতঃপর তাঁহার কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া প্রহরী বলিল, "আমার প্রস্তাব যুক্তিসহ নহে বলিয়া আপনার সন্দেহ হইয়াছে, সিনর! কিন্তু আপনি অনায়াসে আমার উক্তিতে নির্ভর করিতে পারেন। আমি আপনাকে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা তেমন সহজ না হইলেও অসাধ্য হইবে না। ইহা কিঞ্চিৎ কৌশল ও সতর্কতা-সাপেক্ষ, ইহা অস্বীকার করিব না। আপনি অল্পদিন পূর্ব্বে এ দেশে আসিলেও আশা করি, পরাক্রান্ত বিদ্রোহী পাস্কো জেনারোর নাম শুনিয়াছেন। এই পাটানিয়ান বিদ্রোহীর নাম আমেরিকার সকল দেশেই সভ্য সমাজের সুপরিচিত; এমন কি, তাহার অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর বিবরণ যুরোপের দেশে দেশে সুবিদিত। আপনার বোধ হয় ধারণা, সেই পরাক্রান্ত স্বদেশদ্রোহীকে এই নগরের কিল্লায় আবদ্ধ করিয়া সৈনিকের রাইফেলের অব্যর্থ গুলীতে হত্যা করা হইয়াছিল। বহু দিন পূর্ব্ব হইতে এই জনরবই এ দেশে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। দেশ-বিদেশেরও অধিকাংশ লোকের ধারণা, স্বদেশদ্রোহী পাস্কো জেনারোর প্রতি এই ভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হইয়াছিল; কিন্তু সিনর, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। সৈনিকের রাইফেলের গুলীতে তাহাকে নিহত হইতে হয় নাই। এই কৌশলেই তাহারও প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। সে নির্ব্বিঘ্নে ইউনাইটেড ষ্টেটসে পলায়ন করিয়াছিল। সেই দেশে এখনও সে বাস করিতেছে, হাঁ, নিরাপদে সুস্থ দেহে সে সেই দেশে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। এখন সে আর বিদ্রোহী নহে, নিউ ইয়র্কে একখানি হোটেল খুলিয়া পরম সুখে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কি না, জানি না, কিন্তু ঠিক ঐরূপ কৌশলে আমিই তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম; আমারই সাহায্যে সে স্বাধীনতালাভ করিয়া স্বদেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল, এবং সে পলায়নের পূর্ব্বে আমাকে

ঐ পরিমাণ অর্থাৎ পাচ শত পেশো বকশিস্ দিয়াছিল। বস্তুতঃ আমার দাবী অসঙ্গত নহে।”

মিঃ লক তাহার সকল কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, লোকটি কপট বা ভণ্ড নহে, তাহার কথা নির্ভরযোগ্য। তাঁহার জীবন রক্ষা হইবার পর তিনি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যখন তাহার দাবীর টাকা দিবেন, তৎপূর্ব্বে সে টাকা তাহাকে দিতে হইবে না, তখন সে অঙ্গীকার পালনে ত্রুটি করিবে না, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন, যদি তিনি তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনরক্ষার বা মুক্তিলাভের কোন আশা নাই, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি কারাগারের সকল প্রহরী এবং কারাধ্যক্ষ ও তাহার সহযোগিগণকে উৎকোচ-দানে বশীভূত করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সেরূপ অগণ্য অর্থও তাঁহার সঙ্গে ছিল না।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তিনি প্রহরীকে বলিলেন, “আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমি যে মুহূর্ত্তে আমেরিকান জাহাজে আশ্রয় লাভ করিব, সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে পাচ শত ‘পেশো’ বক্শিস দিব।”

প্রহরী বলিল, “উত্তম, সিনর! আপনি কাল প্রভাতে সূর্য্যোদয় দেখিতে পাইবেন। আজ রাত্রে আপনার জীবনান্ত হইবে না, ইহা স্থির জানিবেন। এখন বিদায়, সিনর!”

প্রহরী মিঃ লককে অভিবাদন করিয়া কারাপ্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিল। বাহিরে সশব্দে সেই কক্ষদ্বার রুদ্ধ হইল।

—

দ্বাদশ প্রবাহ

প্রাণদণ্ড

মিঃ লক কারাকক্ষে অতি কষ্টে বৈচিত্র্যহীন দিন অতিবাহিত করিলেন, দিবাভাগে আর কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল না। কারাপ্রহরী রিগোর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিল—তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

কারাপ্রকোষ্ঠের উর্দ্ধদেশে যে সঙ্কীর্ণ বাতায়ন ছিল, সেই বাতায়নপথে দিবালোক প্রবেশ করিয়া কারাকক্ষটি আলোকিত করিতেছিল; সন্ধ্যাসমাগমে কারাপ্রকোষ্ঠ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল! সুবিস্তীর্ণ কিল্লার কোন অংশ হইতে কোন শব্দ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল না!

অবশেষে নিবিড় নৈশ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত হইল। রাত্রি গভীর হইলে মিঃ লক কারাপ্রকোষ্ঠের বহির্দ্বারে একাধিক লোকের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহার পর কারাকক্ষের দ্বার উদ্ঘাটনের খট্‌খট্ শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। মিঃ লক রুদ্ধনিশ্বাসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অতঃপর তাঁহার মুখমণ্ডলে লণ্ঠনের আলোক প্রতিফলিত হইল। সেই আলোক সৈনিকগণের সঙ্গীনের সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগে জ্বল্-জ্বল্ করিতে লাগিল। মিঃ লক চারিজন সশস্ত্র সৈনিক-পরিবেষ্টিত হইয়া কিল্লার কেন্দ্রস্থলে একটি সঙ্কীর্ণ চত্বরে নীত হইলেন। তখন তাঁহার উভয় হস্ত রজ্জু-বদ্ধ ছিল। তাঁহার পশ্চাতে একটি প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরে তাঁহাকে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে হইল। সেই প্রাচীরটি প্রস্তর-নির্ম্মিত। পূর্ব্বেও সেই স্থানে সৈনিকের গুলীতে অন্যান্য ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। সেই সকল গুলীর দুই একটি সেই প্রাচীরে বিদ্ধ হওয়ায় তাহাদের সংঘর্ষণ-চিহ্ন তখন পর্য্যন্ত সেখানে বর্ত্তমান ছিল। সেই প্রাচীরের অদূরে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি শবাধার সংরক্ষিত ছিল। মিঃ লক সেই শবাধার দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার মৃতদেহ তাহাতে স্থাপিত করিয়া সমাধিক্ষেত্রে প্রেরিত হইবে। তাঁহার বীর হৃদয় সেই দৃশ্যে মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল; তিনি ঈষৎ বিচলিত হইলেন।

মিঃ লক সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার প্রায় পনেরো ফুট দূরে চারিজন সৈনিক যুবককে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিলেন। সেই সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণটি লণ্ঠনের আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। মিঃ লক সেই আলোকে সৈনিক-চতুষ্টয়ের মুখ পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাহাদের দলে রিগোকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি কাহারও মুখে কোমলতা, সদাশয়তা বা সহানুভূতির চিহ্ন-মাত্র দেখিতে পাইলেন না। সকলেরই মুখ ভাবসংস্পর্শ-রহিত। এমন কি, রিগোর মুখেও তিনি সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও কঠোরতা অঙ্কিত দেখিলেন, যেন সে-ও তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াই সেখানে আসিয়াছিল।

মিঃ লককে সেখানে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতে

হইল। প্রায় দশ মিনিট পরে সেনাপতি কলভেটি উজ্জ্বল সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে মিঃ লকের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার মুখের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতে লাগিল। পৈশাচিক আনন্দে তখন তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার মুখে নিষ্ঠুরতা প্রতিফলিত।

সেনাপতি কলভেটি মিঃ লককে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "ওহে গুপ্তচর! তুমি বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ—সেনাপতি কলভেটির চক্ষুতে ধূলা দিয়া তাহাকে প্রতারিত করা সহজ নহে, এবং সেই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি সিনর কাপ্তেন বয়েল ও তাহার রূপসী কন্যার উদ্ধারের আশায় ছদ্মনাম ধারণ করিয়া এ দেশে উপস্থিত হইয়াছিল, তোমার এই অনধিকারচর্চার কথা শুনিয়া তাহারা তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, তাহারাও তোমার মূঢ়তা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে। তাহার ন্যায় অপরাধীর সাহায্যের জন্য অন্য কোন ইংরাজ এ দেশে আসিয়া তোমার মত অনধিকারচর্চা না করে—এই উদ্দেশ্যে আজ রাত্রে তাহার অপরাধ-সংক্রান্ত সকল কথা তাহার মুখ হইতে বাহির করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি সে সহজে তাহার অপরাধের কথা প্রকাশ না করে, তাহা হইলে তাহার সুন্দরী কন্যার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা হইবে যে, কোন কথা গোপন করা তাহার অসাধ্য হইবে। কন্যার সম্ভ্রমরক্ষার জন্য সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকল কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবে। তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই সংবাদটি তোমাকে শুনাইয়া রাখিলাম। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ, তোমার চেষ্টার ফল কি ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে।"

মিঃ লক কলভেটির কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কলভেটি, তোমার যাহা সাধ্য, তাহা তুমি করিতে পার। কাপ্তেন বয়েল ও তাহার কন্যা তোমাদের মত পাতানিয়ান কুকুর নহে যে, তুমি তাহাদিগকে যে ভাবে পরিচালিত করিবে, তাহারা সেই ভাবে পরিচালিত হইবে, বা তোমার ইচ্ছামত তাহারা কথা বলিবে। তাহাদের মুখ হইতে কথা বাহির করা তোমার অসাধ্য।"

কলভেটি সরোষে বলিল, "অসাধ্য? পৃথিবীতে কি এরূপ কোন কায আছে, যা সেনাপতি কলভেটির অসাধ্য? সিনরিটা আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নির্ব্বাক্ থাকিলে তাহাকে কিরূপ কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে, তাহা তুমি জীবিত থাকিয়া দেখিতে পাইবে না। এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

মিঃ লক কঠোরস্বরে বলিলেন, "ওরে ইতর কুকুর! তোকে পদাঘাত করিলেও পা কলুষিত হয়, আমি তোর কথার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলাম।" তিনি তাহার পদপ্রান্তে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন।

মিঃ লকের কথায় কলভেটির মুখ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। সে তাঁহাকে কদর্য্য ভাষায় গালিবর্ষণ করিয়া বলিল, "যম যাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার প্রলাপবাক্যে আমি বিচলিত হই না।—সৈন্যগণ, তোমরা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ কি?"

কলভেটি সৈন্য-চতুষ্টয়ের পশ্চাতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে আদেশ জ্ঞাপন করিল।

মিঃ লক তাহার আদেশধ্বনি শুনিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন; তিনি কারাপ্রহরীর নিকট যে আশার বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহা সত্যই কার্য্যে পরিণত হইবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল, তিনি সৈনিকগণের রাইফেল-নিঃসৃত গুলীতে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিবেন। তিনি দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া স্পন্দমান বক্ষে শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কলভেটির আদেশে সৈনিক-চতুষ্টয়ের হাতের রাইফেল মিঃ লকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইল। মিঃ লক পুনর্ব্বার রাইফেলধারী সৈন্যগণের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদের পশ্চাতে কলভেটির মুখ দেখিতে পাইলেন, তিনি দীপালোকে তাহার ভ্রূকুটিকুটিল চক্ষুতে সাফল্যগর্ব্ব প্রতিফলিত দেখিলেন। তাহার মুখ তখন ভীষণপ্রকৃতি শ্বাপদ জন্তুর মুখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

সঙ্গে সঙ্গে কলভেটি গম্ভীরস্বরে আদেশ করিল, "ফায়ার করো।"

সৈনিক-চতুষ্টয়ের করধৃত চারিটি রাইফেল যুগপৎ গম্ভীর নির্ঘোষে ধূমাগ্নিশিখা উদ্গিরণ করিল। মিঃ লক সেই মুহূর্ত্তে বক্ষঃস্থলে অসহ্য বেদনা অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার

বুকে প্রচণ্ডবেগে হাতুড়ির ঘা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরাশায়ী হইলেন।

মিঃ লক পতনের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইলেন, তিনি সেই স্থানে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। অবশেষে তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইলে তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া শুভ্র নক্ষত্ররাজিখচিত নীলাকাশ দেখিতে পাইলেন। আনন্দে উৎসাহে তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—কারাপ্রহরী তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল, তাহার সেই কৌশল ব্যর্থ হয় নাই। রিগোর সহিত তাহার ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছিল। তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন!

মিঃ লক চক্ষু মুদিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তিনি ভাবিলেন—প্রতারণার সাহায্যে তাঁহার জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তিনি নিরাপদ হইতে পারেন নাই, শত্রুকবল হইতে উদ্ধারলাভের তখনও বহু বিলম্ব; এতদ্ভিন্ন পদে পদে বিঘ্নবিপত্তির আশঙ্কা ছিল। তিনি নিরাপদ হইবার পূর্ব্বে যদি এই প্রতারণা ধরা পড়ে, তাহা হইলে অদ্ভুত কৌশলে তাঁহার জীবন রক্ষা হইলেও শেষরক্ষা হইবে না।—মিঃ লক নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকিয়া, নির্নিমেষনেত্রে ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুই এক মিনিট পরে রিগোর মুখ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। রিগো তাঁহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দলের আর একজন লোক অদূরে দাঁড়াইয়া চক্ষু ঘুরাইয়া তাহাকে কি ইঙ্গিত করিল। তাহার ইঙ্গিত অনুসারে তৃতীয় সৈনিক যুবক মিঃ লকের পাশে আসিয়া তাঁহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং তাঁহার দুই কাঁধ ধরিয়া তাঁহাকে তুলিতে উদ্যত হইল, সেই সময় চতুর্থ ব্যক্তি একখানি অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার উভয় হস্তের বন্ধনরজ্জু অপসারিত করিয়া তাঁহার দুই পা ধরিয়া উঁচু করিয়া তুলিল।

সৈনিক যুবকদ্বয় মিঃ লককে ধরাশয্যা হইতে শূন্যে তুলিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত শবাধারের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর তাহার ডালা বন্ধ করা হইল। মিঃ লক শবাধারের ভিতর প্রসারিত দেহে পড়িয়া থাকিয়া হাতুড়ির ঠকাঠক শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, গজাল দিয়া শবাধারের ডালাটি সশব্দে আঁটিয়া দেওয়া হইতেছিল। তাঁহার আশঙ্কা হইল—তবে কি নরপশু কলভেটির আদেশে শবাধার সহ তাঁহাকে সমাধি-গহ্বরে সমাহিত করা হইবে? তিনি হয় ত তৎপূর্ব্বে আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পাইবেন না। কিন্তু তিনি হাতুড়ির শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনটি মাত্র গজাল দ্বারা ডালাখানি আঁটিয়া দেওয়া হইল; শবাধারের ভিতর হইতে ধাক্কা দিয়া সেই গজাল তিনটি অপসারিত করা এবং ডালাখানি উদ্ঘাটিত করা তাঁহার অসাধ্য হইবে না। তিনি একটু আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু সেরূপ সুযোগ কখন্ পাইবেন, তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না।

শবাধারের ডালা বন্ধ হইলে শবাধারটি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইল। সৈনিকরা মিঃ লককে কাঁধে করিয়া লইয়া বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সমাধিক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল। মিঃ লক সেই শবাধারের ভিতর পড়িয়া থাকিয়া শুনিতে পাইলেন—তাহারা তাঁহাকে ঐ ভাবে বহন করিয়া হাঁপাইতেছিল; তাহারা চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল, তাহা তিনি শুনিতে পাইলেন না।

অবশেষে মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বাহকরা কোন উচ্চস্থান হইতে নীচে নামিল এবং শবাধারটি মাটীতে নামাইয়া রাখিল। অতঃপর তাহারা শবাধারের পাশে দাঁড়াইয়া অনুচ্চ স্বরে পাটানিয়া ভাষায় কি পরামর্শ করিতে লাগিল। মিঃ লকের ধারণা হইল, কোন বিষয় সম্বন্ধে তাহারা বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়াছিল। রিগোর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাস ছিল; কিন্তু মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন না, রিগো সঙ্গিগণের সহিত কি উদ্দেশ্যে কলহ করিতেছিল।

শবাধারের বাহকেরা কলহ আরম্ভ করায় মিঃ লক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তখন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার নূতন কোন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার বাহকগণের মতভেদের জন্য কোন দিক্ হইতে বিপদ আসিয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন।

মিঃ লকের বাহকরা যখন শবাধারটি নামাইয়া রাখিয়া পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল, সেই সময় তিনি তাহাদিগকে দুইটি কথা বলিতে শুনিয়াছিলেন;—একটি কথা 'গীর্জ্জার প্রাঙ্গণ', দ্বিতীয় কথা 'সমাধিক্ষেত্র'। মিঃ লক ভাবিলেন, তবে কি উহারা আমাকে জীবিত অবস্থায় মৃত

দেহের ন্যায় সমাধি-গহ্বরে নিক্ষেপ করিবে? এইরূপ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃৎকম্প হইল।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরে বাহকরা শবাধারটি সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া দূরে প্রস্থান করিল। মিঃ লক তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিল। অবশেষে তিনি আর কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না।

মিঃ লক শবাধারের ভিতর নড়িয়া চড়িয়া তাহা হইতে বাহির হইবার জন্য উৎসুক হইলেন, আর এক মুহূর্ত্তও তাহার ভিতর আবদ্ধ থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি শবাধারের ডালায় দুই হাতের ধাক্কা দিলেন, নরম কাঠে যে কয়েকটি গজাল বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার হাতের ধাক্কায় উৎপাটিত হওয়ায় ডালাখানি খুলিয়া গেল। তখন তিনি তাহা দুই হাতে সরাইয়া ফেলিয়া শবাধারের বাহিরে আসিলেন।

এই ভাবে মুক্তিলাভ করায় তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। কিন্তু এই আনন্দ স্থায়ী হইল না; কারণ, তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, মুক্তিলাভ করিয়াও তিনি তখন পর্য্যন্ত নিরাপদ নহেন; কারণ, শবাধারটি কিল্লার বাহিরে লইয়া না গিয়া বাহকরা তাহা কিল্লার অভ্যন্তরে তাহার প্রাচীর-সন্নিধানে নামাইয়া রাখিয়াছিল।

তখন চতুর্দ্দিক্ নিবিড় নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। মিঃ লক উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দুই দিকেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর স্পর্শ করিলেন। তাঁহার পদতলে ঝপ্ ঝপ্ করিয়া জল পড়িবার শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্রে ভিজা মাটীর বিশ্রী সোঁধা গন্ধ প্রবেশ করায় তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে ভূগর্ভস্থ কোন খিলানের নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছিল। সেখানে মুক্ত সমীরণ প্রবাহিত হইবার উপায় ছিল না।

মিঃ লকের অনুমান হইল, তিনি সৈনিক-চতুষ্টয়ের রাইফেলের গুলীর আঘাত ব্যর্থ করিয়া তখনও জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিকতর বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হইতে হইয়াছিল। কিল্লার অভ্যন্তরে তাঁহাকে একটি নিভৃত ভূবিবরে ফেলিয়া রাখিয়া শবাধারের বাহকরা প্রস্থান করিয়াছিল, সেই স্থানে তিনি জীবিত অবস্থায় সমাহিত হইয়াছেন! সেই সমাধি-বিবর হইতে তিনি কিরূপে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কমলরাণী সিংহ এম, এ

কমলরাণী ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বধলা নিবাসী ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ সিংহ এম-বির সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সম্প্রতি মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে লোকান্তরিতা হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিশেষ স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যাট্রিকে তিনি ১৫ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

কুমারী জাহানারা বেগম চৌধুরী

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে কলা-শিল্পের প্রদর্শনীতে ছাত্রীদের মধ্যে শিল্পকার্য্য ও সূচি-কার্য্যে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদক পুরস্কার পাইয়াছেন। ইঁহার বয়স ১৬ বৎসর। এই অল্প বয়সেই ইনি শিল্পকার্য্যের প্রতিযোগিতায় অনেক স্বর্ণ পদক পাইয়াছেন।

চয়ন

অন্ধকারে ক্ষৌরকার্য্য

অধুনা প্রতীচ্য দেশের বাজারে এক প্রকার ক্ষুর বাহির হইয়াছে, উহার সাহায্যে অন্ধকারে ক্ষৌরকার্য্য অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়। ক্ষুরের হাতলের সহিত একটি ব্যাটারি ও বাল্ব সংলগ্ন থাকে। হাতলটি ধাতু-নির্ম্মিত। ক্ষৌরকার্য্যকালে মুখমণ্ডলে আলোক নিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং অন্ধকার সত্ত্বেও কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় না।

অন্ধকারে ক্ষৌরকার্য্য

রবারের পরচুলা টুপী

স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীদিগের জন্য রবার-নির্ম্মিত একপ্রকার টুপী বাহির হইয়াছে। উহা কেশরাজির উপর ধারণ করিয়া স্নান করিতে গেলে জলে কেশ আর্দ্র হইবে না, অথচ চুলের পারিপাট্য বজায় থাকিবে। এই টুপীগুলি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, সহসা দেখিলে মনে হইবে, চুলগুলি প্রসাধিত অবস্থায় রহিয়াছে। সুতরাং সন্তরণকালে সন্তরণকারিণীদের কেশসৌন্দর্য্য যেন অব্যাহত রহিয়াছে, এমনই মনে হইবে। ইদানীং প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থানে স্নানার্থী নর-নারীর মধ্যে উহার বহুল প্রচলন হইয়াছে।

রবারের পরচুলা টুপী

অন্ধকারে লিখিবার পেন্সিল

পেন্সিলের আধারের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক আলোক রাখিবার ব্যবস্থা করায় অন্ধকারে লেখার অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। পেন্সিলের মধ্য হইতে লিখনকালে যে আলোক কাগজের উপর পতিত হয়, তাহাতে লিখনকার্য্যের কোনও অসুবিধা হয় না। সৈনিক, বিমানচালক প্রভৃতির সুবিধার জন্যই এই জাতীয় পেন্সিল উদ্ভাবিত হইয়াছে।

অন্ধকারে লিখিবার পেন্সিল

চলচ্চিত্রে পুলিসের শিক্ষা

পুলিস সম্প্রতি চলচ্চিত্রের সাহায্যে লক্ষ্যভেদের শিক্ষালাভ

চলচ্চিত্র-সাহায্যে পুলিসের শিক্ষা

করিতেছে। তাহাতে চোর ডাকাইত, পুলিসের গুলী হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। চলচ্চিত্রে দেখান হয়, কি ভাবে চোর-ডাকাইত পলাইতেছে। সেই সময় পুলিস চলচ্চিত্রের ছবি লক্ষ্য করিয়া গুলী-নিক্ষেপ করে। প্রত্যেক গুলী নিক্ষেপের পর চলচ্চিত্র থামিয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়, কোথায় গুলী লাগিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে গুলীনিক্ষেপ অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষা চলিতে থাকে।

জুতার মধ্যে উকা ও করাত

জুতার মধ্যে উকা ও করাত

কলম্বিয়ার জেল-কর্ত্তৃপক্ষ, বন্দীদিগের জন্য আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে যত-প্রকার পুলিন্দা আসে, রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে তাহার প্রত্যেকটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তবে বন্দীদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন। পরীক্ষা-কালে সম্প্রতি তাঁহারা একজোড়া জুতার মধ্যে উকা ও করাত আবিষ্কার করিয়াছেন। বন্দী ঐরূপ যন্ত্রের সাহায্যে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে মনে করিয়া জুতার মধ্যে উক্ত জিনিষগুলি রাখিয়া জুতা সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিরূপ কৌশলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, চিত্রখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

তার-বিলম্বিত যান

আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশে এক স্থানে নদীর উপর যে সেতু ছিল, তাহা জলস্রোতে ধ্বংস হইয়া যায়। নদীর পরপারে

তার-বিলম্বিত যান

পাহাড়ের উপর এক ভদ্রলোকের বাসভবন ছিল। সেতু পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে বহু অর্থব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ দেখিয়া তিনি নদীর উভয় পারস্থিত পাহাড়ে সুদৃঢ়, মোটা তার টানাইয়া দেন। তার পর চক্রসমন্বিত একখানি যান সেই তার-সংলগ্ন করিয়া দেন। একটা লৌহ-দণ্ডকে তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহারই সাহায্যে যানখানি চালনা করিয়া পারাপারের সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।

বিচিত্র যুগ্ম বিমান

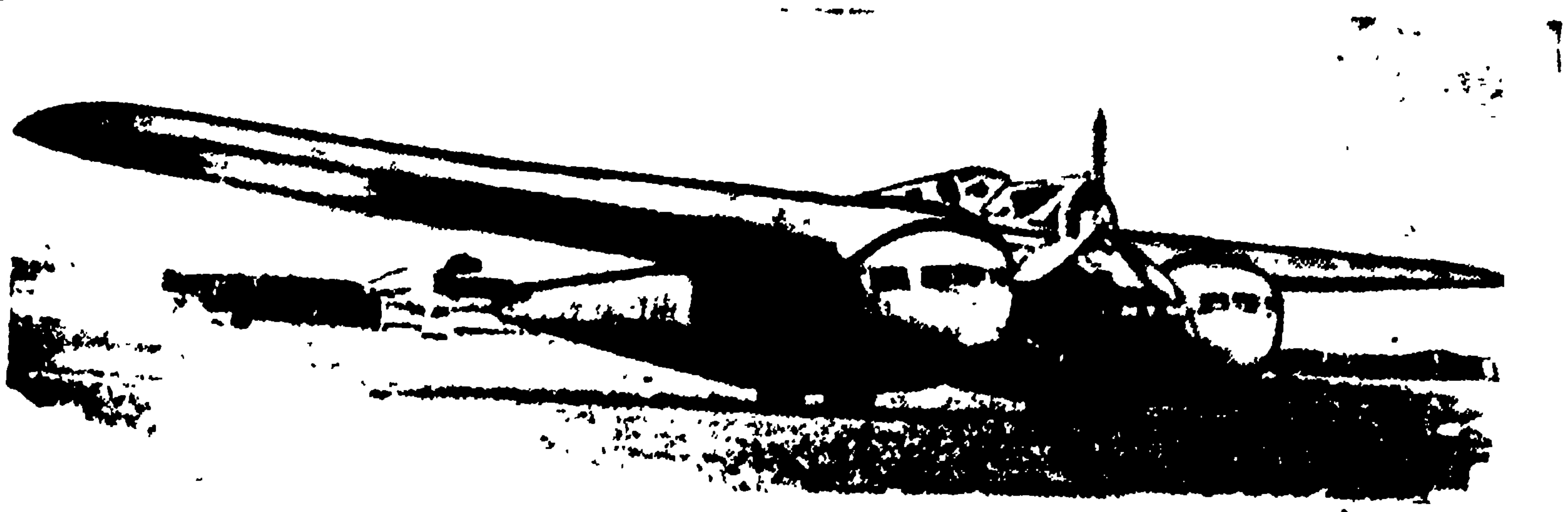

বিচিত্র যুগ্ম বিমান

ফ্রান্সে একটি যুগ্ম বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। বিমান-চালকের কক্ষ এই বিমানের মোটরকক্ষের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। দুই পার্শ্বে যাত্রী-দিগের কক্ষ। ৫ শত অশ্ব-শক্তিবিশিষ্ট দুইটি মোটর এই বিমানে সংশ্লিষ্ট আছে। ১৬ জন যাত্রী এবং ৪ জন নাবিকের থাকিবার যোগ্য স্থান ইহাতে আছে।

চলচ্চিত্র-সাহায্যে অপরাধী গ্রেপ্তার

লস্ এঞ্জেলেসের পুলিস-কর্ম্মচারীরা গোপনস্থান হইতে চলচ্চিত্র গ্রহণ করিয়া কয়েক জন জুয়াড়ীকে আদালতে অভিযুক্ত করিয়াছে। জুয়াড়ীরা যে বাড়ীতে জুয়া খেলিতেছিল, পুলিস-কর্ম্মচারী তাহার বিপরীত দিকের অট্টালিকায় কোন নিভৃত স্থান হইতে তাহাদের খেলার ছবি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিচারের সময় সেই ছবি প্রদর্শিত হয়। ইহাতে জুয়াড়ীদিগের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, কার্য্যকলাপ হুবহু চলচ্চিত্রের মত আদালতে দেখান হইয়াছিল। সুতরাং জুয়াড়ীদিগের উদ্ধারের আর কোন উপায় ছিল না।

চলচ্চিত্র-সাহায্যে আসামী গ্রেপ্তার

৺ধুরন্ধর শর্ম্মা

(নক্সা)

দেশের কোনো বড়লোক ৺লাভ করিলে কাগজে কাগজে কি ভীষণ হৈ-চৈ বাধিয়া যায়! যা গেল, তা আর হইবে না; বাঙলার গগনে উল্কাপাত হইল, না ইন্দ্রপাত হইয়া গেল; আহা-প্রবন্ধে, উহু-কবিতায় শোকের বন্যা বহাইয়া কাগজগুলা আমাদের একেবারে সচকিত করিয়া তোলে! এ খুব ভালো কাজ, মানি! মহতের পূজা না করিলে জাতির কলঙ্ক, তা'ও জানি! তবে থাকিয়া থাকিয়া আমার কেমন তাক লাগে, যত দিন বেচারীরা জীবিত থাকেন, তত দিন ছোট একটা ইঙ্গিতেও তাঁদের অস্তিত্ব কেহ জানান না! মরিয়া গেলে এই যে স্তব-স্তুতি, পূজা-অর্ঘ্য দেন, আমি ভাবি, বেচারীরা বাঁচিয়া থাকিতে এই অপরিসীম শ্রদ্ধার একটু আভাসও যদি হায়, পাইতেন! মরিয়া না গেলে কে বড়, তা জানিবার কোনো উপায় কি সত্যই নাই? কিন্তু এ সব বাজে অবান্তর কথা! আজ আমি আপনাদের কাগজে এমনি ঘনঘটাচ্ছন্ন শোক-প্রবন্ধের অনুকরণে এক মহজ্জীবনীর আলোচনা করিতেছি। আপনারা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন না, আমি কার কথা বলিতে চাই? তিনি আমাদের স্বনামধন্য প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত—অধুনা স্বর্গীয় ধুরন্ধর শর্ম্মা।

আপনারা নাম শোনেন নাই? না শুনিবারই কথা! তিনি আপনাদের কাগজে প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতা লেখেন নাই; আপনাদের কাগজের গ্রাহকও তিনি ছিলেন না। গ্রাহক থাকা কি,—আপনারা যেমন তাঁর নাম শুনেন নাই, তিনিও তেমনি আপনাদের কাগজের নাম জানিতেন না! ইহাকেই বলে, tit for tat!

তবু আজ যখন তিনি ইহলোকে নাই,—তখন আজই মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে, তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিবার! তিনি যে কত-বড় ছিলেন, মনে করিলে তিনি কি না করিতে পারিতেন, আমার এই পরিচয়িকা-পাঠে আপনি এবং আপনার পাঠক-পাঠিকাবর্গ তাহা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিবেন—এবং উপলব্ধি করিয়া বলিবেন,—আহা! কি ছাই···! Tut! কি মহাপ্রাণই না অযত্নে ঝরিয়া গিয়াছে! কবি কি সাধে বলিয়াছেন,—Full many a flower···

ধুরন্ধর শর্ম্মার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা—পথে। একখানা মোটর চলিয়াছিল হু-হু-বেগে। আমি ফিরিতেছিলাম, —বাজার হইতে। পকেট কাটা গিয়াছিল, মনের অবস্থা কাজেই সহজে অনুমেয়! গাড়ীখানা প্রায় ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। ড্রাইভারের ভেঁপু ও গালি এমন বজ্র-নির্ঘোষে বাজিয়া উঠিল যে, হঠিয়া পথের একধারে সরিয়া গেলাম। সরিতে গিয়া এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়িলাম—তিনি একটি ধাক্কা দিয়া কহিলেন—শুধু কাণা নও, দেখছি, কালাও···!

ধাক্কা খাইয়া টলিয়া পড়িতেছিলাম—পড়িলাম না। বোধ হয় অদৃষ্ট-গুণে। মোটর তখন চলিয়া গিয়াছে। যিনি ধাক্কা দিয়াছিলেন, তাঁর কণ্ঠে তখনো কঠোর স্বরের বন্যা বহিতেছে। তাঁর পানে তাকাইলাম। তিনি কহিলেন—হুঁশিয়ার হয়ে পথ চল্‌তে যদি না পারো তো ঘরে ব'সে থেকো। কচি খোকা!···

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন—আমি কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।···

পরে জানিয়াছিলাম, উনিই আমাদের প্রতিবেশী ধুরন্ধর শর্ম্মা।

প্রথম পরিচয় এইভাবে।···তার পর দেখা বোসেদের বাড়ীর রোয়াকে। সবে সন্ধ্যা হইয়াছে, আষাঢ়ের শেষাশেষি—গঙ্গায় তখন নূতন ইলিশ উঠিয়াছে। নালুবাবু দুটি মাছ কিনিয়া হাতে ঝুলাইয়া পথে চলিয়াছিলেন, তাঁকে লইয়া মাছের দর সম্বন্ধে কি নাকি প্রশ্ন ওঠে—এবং তা লইয়া প্রাচীন কালের মাছের দরের সম্বন্ধে তর্ক বাধিয়া যায়! আমি অকস্মাৎ সেখানে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছিলাম। ধুরন্ধর শর্ম্মার মুখে তামাকের ধোঁয়া এবং বচনের আগুন—দুই বস্তুতে একেবারে মণি-কাঞ্চন-যোগ ঘটাইয়া তুলিয়াছিল। আমি স্তব্ধ হইয়া তর্ক শুনিতেছিলাম। শক্তিমান পুরুষ···তর্কের বলে বেচারী নালুবাবুর গঙ্গায়-ধরা, ঘাটে-সস্তা-কেনা

মাছটাকে পদ্মার চালানী মাছ বলিয়া তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন। সে দিন তাঁর তর্কশক্তি দেখিয়া আমি শুধু বিমোহিত হইলাম না—শ্রদ্ধায় আমার চিত্ত একেবারে তাঁর পায়ে বিগলিত হইয়া পড়িল!

তার পর কেমন করিয়া তাঁর পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি লাভ করিলাম, সে যেন স্বপ্ন! সে কথা বলিয়া কাহারো তাক্ লাগাইয়া দিতে চাহি না! যে দিন-কাল পড়িয়াছে, সরল সত্য কথা বলিলেও কি নিস্তার আছে! ফোঁশ্ করিয়া কে হয় তো ভিন্ন দলের কাগজে উল্টা তর্ক জুড়িয়া দিবে···এ তর্ক আমায় খাটো করিবার জন্য তত নয়, যত ভিন্ন দলের কাগজের চোখে আপনার কাগজকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে! তবে ধুরন্ধর শর্ম্মা আমায় একেবারে বুকে লইলেন—নিকটতম আত্মীয়ের মত! সাধে কি কবি গাহিয়াছেন—'পর কৈলা আপন!'

কবির গানগুলি ধুরন্ধরের জীবনে ভারী আশ্চর্য্যরকম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আমার রচনা পড়িলেই সকলে তা বুঝিবেন! এবং সে জন্য এ কথা বলিয়া সকলকে সতর্ক রাখা ভালো যে, ধুরন্ধরের প্রকৃত পরিচয় সকলের সামনে দিতে গেলে আমার পরিচয় অনেক বেশী প্রকট করিতে হইবে। আমি তা জানি! কিন্তু জানি বলিয়া সঙ্কোচ করাও উচিত নয়। যেহেতু আগে সত্য—পরে আর সব! এবং ইহা যখন অপ্রিয় সত্য নয়, তখন এ সত্য প্রচারে শাস্ত্রে নিষেধ নাই। যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছে—'সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" অতএব দ্বিধা ত্যাগ করিয়া আমাকে সে পরিচয় বিবৃত করিতেই হইবে।

ধুরন্ধর ছিলেন আমার···কি বলিব? আড্ডায় বন্ধু, স্নেহে ভগ্নীপতি এবং···

কিন্তু সবিস্তারে এত কথা বলিয়া ফল কি! অর্থাৎ আমায় নহিলে তাঁর যেমন চলিত না, তাঁহাকেও তেমনি আমার মাঝে মাঝে প্রয়োজন ঘটিত।

এক দিনের কথা বলি। কলিকাতা হইতে ক'জন বন্ধু আসিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বড়দার বেমেরামতি হার্ম্মোনিয়মটা লইয়া জনৈক বন্ধু স্বর-সাধনা বা সুর-সংগ্রাম যা বলুন, তাই করিতেছিলেন। কোথা হইতে ধুরন্ধর শর্ম্মা আসিয়া দেখা দিলেন। স্নেহ এমনি বস্তু! এ-বাড়ীতে সহসা গানবাজনা,—তার পিছনে আহার্য্য-বৈচিত্র্যের আভাস—ধুরন্ধর যেন বুঝিয়াছিলেন। অত্যন্ত অন্তর্দ্দর্শী ভিন্ন এতখানি অনুমান কি আর কেহ করিতে পারেন? যাক্ সে কথা!

ধুরন্ধর কহিলেন,—এটি কি রাগিণী?

বন্ধু কহিলেন,—পূরবী।

ধুরন্ধর ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—সেকি পূরবী! সেকালে খাঁটি পূরবীর চর্চ্চা ছিল—এমনি সন্ধ্যায়। আর আজ?···

তাঁর মুখে সে কি ভাব! তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন। আমি স্পষ্ট দেখিলাম, সুদূর অতীত-ভারতের গরিমাময় ছবি সে নিশ্বাসে উড়িয়া চলিয়াছে!—আর সেই জল্‌জ্বলে ছবির গায়ে বেহালার ছড়ি পড়িতেছে। সে ছড়ির ঘায় তানসেন পুলক-তান ধরিয়া দিয়াছেন! সে দিন বুঝিলাম, ধুরন্ধর শর্ম্মা পাড়ায় থাকেন বলিয়াই লোকে তাঁকে চিনিল না—নহিলে ঐ দীর্ঘনিশ্বাস এবং ক্ষুদ্র উক্তিটুকুর মধ্যে ভারতের প্রাক্-যুগের গোটা ইতিহাসখানা কি ভাবেই না ঠাশা রহিয়াছে! হায়! একালে সকলি মেকি—নহিলে··· নহিলে···ঘর—পবিত্র ঘর—যাকে পাশ্চাত্য জাতি fort বলিয়া গর্ব্ব করে, সেই ঘরকে ব্যঙ্গ করিয়া আমরা 'ঘরের ঢেঁকি' কথাটার সৃষ্টি করি!

ধুরন্ধর শর্ম্মার কথায় আসরে অমন গানের ঘটা নিমেষে চুপ! প্রায় পাচ মিনিট গায়ক-বন্ধুর মুখে কথা নাই। পাচ মিনিট পরে তিনি কহিলেন—একটা আসল পূরবীর সঙ্গে যদি পরিচয় করিয়ে দেন—দয়া ক'রে···

ধুরন্ধরের যেন চমক ভাঙ্গিল। এতক্ষণ তিনি যেন সেই অতীত লোকে বিরাজ করিতেছিলেন,—সুরের রেশে আবিষ্ট, তন্ময়ের মত! ধুরন্ধর শর্ম্মা বন্ধুর পানে চাহিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ; তার পর অতি ধীর-স্বরে কহিলেন,—খাঁটি পূরবী···?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হুঁ!

তার পর সুগভীর তুষ্ণীম্ভাব! সেই যে কোথায় পড়িয়াছিলাম, সূচী-পতনের শব্দ শুনা যায়, এমন স্তব্ধতা—ঠিক তেমনি! শুধু দেওয়ালের গায়ে ঘড়িটি টক্-টক্ শব্দ করিতেছিল। চাহিয়া দেখিতেছিলাম—ঘড়ির বড় কাঁটা পাচের দাগ ছাড়িয়া একেবারে ছয়, সাত, আট ডিঙ্গাইয়া এগারোটার দাগও বুঝি ছাড়িয়া যায়, এমন সময় ধুরন্ধর

শর্ম্মার অঙ্গ দুলিল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি সকলের পানে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তার পর কহিলেন,—বীণ আছে? বীণ? মৃদং?···

আমরা কহিলাম,—না!

—না! ধুরন্ধর শর্ম্মার স্বরে যেন বাজ হাঁকিল!

আমরা কহিলাম,—ও সব যন্ত্রের নামই শুনেচি। চোখে কখনো দেখি নি!

ধুরন্ধর বিরক্ত হইলেন, কহিলেন,—হুঁ! বীণ নেই, মৃদং নেই! খাটি পূরবী শুনতে চাও! এ কি কাঁঠালের আমসত্ব পেয়েচো বাপু!···

তিনি রাগিয়া গেলেন এবং একটা প্রচণ্ড তর্ক তুলিতে গিয়া সহসা থামিয়া পড়িলেন! ঝড়ের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতি যেমন থামিয়া থাকে, তেমনি থামিয়া রহিলেন। মুখে কোনো কথা উচ্চারণ করিলেন না। তা না করুন, তাঁর ভঙ্গী হইতে বেশ বুঝিলাম, তর্কের প্রবল ঝোঁক আসিতেছে! কিন্তু থামিয়া গেলেন, হয় তো ভাবিলেন, আমরা পাচ সিকা, দেড় টাকার স্বর-লিপির বই, নয় গ্রামোফোনের রেকর্ড শুনিয়া সুর-সাধনা করি, আমরা সে পাণ্ডিত্য কি বুঝিব! কিন্তু···!

বহুক্ষণ পরে আমি কহিলাম,—এ বিষয় আপনার বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

তিনি কহিলেন,—উচিত, এবং বুঝিয়ে দেবো। তবে অনেক কথা আছে। এর মধ্যে বহু reference প্রয়োজন। কটা প্রবন্ধ লিখবো আমায় মনে করিয়ে দিয়ো··· বুঝলে!

কহিলাম,—দেবো।

আমার আলস্য এবং ঔদাস্য! তবু একদিন তাঁকে ধরিয়া বসিলাম,—সুরের সম্বন্ধে সেই যে প্রবন্ধ লিখবেন, বলেছিলেন!

হাসিয়া ধুরন্ধর কহিলেন,—বলেছিলুম। কিন্তু লিখে কোনো ফল হবে না। কে বুঝবে! আর কি সে যুগ আছে! মানুষের চিন্তাশীলতা লোপ পেয়েচে।

কথাটা বলিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

তাঁর সে গম্ভীর ভাব দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম, মূর্খ আমাদের দেশ, লোকে বোধশক্তি হারাইয়াছে, তার ফল ফলিবে না?—কাজেই অভাগা দেশবাসী কত বড় পাণ্ডিত্য, কতখানি জ্ঞানের পরিচয়-লাভে বঞ্চিত রহিল! নিজের উপর আজ ধিক্কার ধরিতেছে—হায়, কেন এ নির্ব্বোধ দেশে নির্ব্বোধের মধ্যে ধুরন্ধর জন্ম লইয়াছিলেন, আমি জন্ম লইয়াছি, দেশবাসী জন্ম লইয়াছে! তা যদি না জন্মিত তো ধুরন্ধরের কল্পিত প্রবন্ধে হয় তো স্বর-বিজ্ঞানে একটা নূতন আলোকপাত ঘটিত! হয় তো স্বর-তত্ত্বের সমস্তটাই উল্টাইয়া যাইত! বাঙলার ক্ষুদ্র পল্লীর এক অবহেলিত ভদ্র সন্তানের জ্ঞানালোকে সমস্ত জগৎ নবারুণালোকে প্রদীপ্ত হইত! বাঙালীর নাম, বাঙলার নাম উজ্জ্বল হইত! সোনার হরফে বিশ্ব-ইতিহাসে বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় ছাপা থাকিত!

কিন্তু আজ এ সম্বন্ধে অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই। কথাটা বলিলাম, শুধু ধুরন্ধরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ছোট একটু পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটুকু হইতেই আপনার সঙ্গীত-শাস্ত্রে ধুরন্ধর শর্ম্মার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইবেন, আশা করি।

শুধু কি তাই! ঐ যে ভারতীয় চিত্র-কলা! আজ ঘরে ঘরে এ কলার এমন আদর! ধুরন্ধর শর্ম্মা শৈশবে অমন চিত্র কত আঁকিয়াছিলেন, তার আর লেখা-জোখা নাই স্বচক্ষে তুলির সে লিখন দেখিবার ভাগ্য আমাদের ঘটে নাই, তবে ধুরন্ধর শর্ম্মা ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির চিত্র দেখিয়া আমায় বহু দিন বলিয়াছেন, ছেলেবেলায় এমনি ছবি শ্লেটে কত এঁকেছি, তার সংখ্যা নেই।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে, আপনারা হয় তো বলিবেন, তাঁর আঁকা ছবি যখন চক্ষে কেহ দেখে নাই, তখন ওদিকে তাঁর প্রতিভা লইয়া এ কথা তোলো কি বলিয়া? আমরা জানি, এ কথা ওঠা স্বাভাবিক। তার উত্তরে আমরা অকাট্য যুক্তি দিতে পারি। ধুরন্ধর তাঁর দীর্ঘ জীবনে পাশ্চাত্য প্রথায় আঁকা বহু চিত্র দেখিয়াছেন, যেহেতু যে সব বাঙলা মাসিক পত্রে প্রাচ্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবি ছাপা হয়, সেই সব কাগজ পাশ্চাত্য আদর্শের ছবিও ছাপে। সে ছবি দেখিয়া তিনি কোনো দিন তো বলেন নাই, এমন ছবি আমিও আঁকিয়াছিলাম! যখন পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে আঁকা ছবির সম্বন্ধে এমন কথা তিনি বলেন নাই, শুধু প্রাচ্য-পদ্ধতিতে আঁকা ছবির সম্বন্ধেই এ-কথা বলিয়াছেন, তখন

এ কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া নিশ্চয় মানিব যে, সে রকম অর্থাৎ ঐ পাশ্চাত্য আদর্শের ছবি তিনি আঁকেন নাই। প্রাচ্য কলার ছবি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, আঁকিয়াছি। অতএব আমরা মানিতে বাধ্য, প্রাচ্য কলা-পদ্ধতির ছবি শৈশবে তিনি আঁকিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে হাসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, অঙ্কর পরিবর্তে শ্লেটে উক্তরূপ অপূর্ব্ব ছবি আঁকার ফলে অঙ্কর মাষ্টারের হাতে স্কুলে বহু কাণ-মলা খাইয়াছেন, বহুবার বেঞ্চে দাঁড়াইয়াছেন। তাই ভাবি, আমাদের দেশের ঐ স্কুলগুলায় শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার চাই বলিয়া যে মাঝে মাঝে আপনারা কাগজে আর্ত্তনাদ তোলেন, তা কি মিছা হইবে? বিশেষ ঐ অঙ্কর মাষ্টার-দল! তাঁদের নির্ম্মম-চিত্ততার ফলে অঙ্ক-শাস্ত্রটা কত অভাগার কাছে সুন্দরবনের বাঘের তুল্য ভয়ঙ্কর বেশ ধরিয়া বিভীষিকা ও ত্রাস জাগাইয়াছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকের রেজাল্ট তার প্রচুর সাক্ষ্য দিতেছে। আরো ভাবি, হায় রে, ঐ প্রতিভাধর ধুরন্ধর যদি ছবি আঁকার জন্য ঘুষি কাণ-মলা খাওয়ার পরিবর্ত্তে উৎসাহ পাইতেন, তাহা হইলে আজ সাউথ কেনসিংটনে হয় তো তাঁর নাম ছাপা থাকিত,—ওয়েষ্ট-মিনষ্টার এবিতে প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট বলিয়া তাঁর নশ্বর দেহের ভস্মাবশেষ স্থান পাইত! হায় মা ভারত-জননী, তোমার কত সুপুত্র যে এমনি অযত্নে অনাদরে কামিনী-ফুলের পাপড়ির মত মলিন মাটীতে পড়িয়া ঝরিয়া মরিতেছে, কে তার ইয়ত্তা করিবে!

আর্টিষ্ট ধুরন্ধরের এর-চেয়ে বড় পরিচয় আর কি হইতে পারে, জানি না।

তার পর সাহিত্য! সাহিত্যে বহু বিভাগ এবং বিভাগে-বিভাগে যে একটু রেশারেশি আছে, এ কথা আপনি যখন মাসিক কাগজের সম্পাদক, তখন নিশ্চয়ই ভালো করিয়া জানেন! যাঁরা প্রত্নতত্ত্ব লেখেন, বেদের ব্যাখ্যা ছাপান-গল্প-লেখক ও উপন্যাসিকের দল হয় তো আড়ালে নাক সিঁটকাইয়া বলেন, তাঁরা নিরেট! ভস্মে ঘী ঢালিয়া মরিতে-ছেন! আবার প্রত্নতত্ত্বের ধূলা-রাবিশ ঘাঁটিয়া যাঁরা হাড় ময়লা করিতেছেন, তাঁরা বলেন—গল্পে আর উপন্যাসে লক্ষ্মীছাড়াগুলো দেশটাকে খাইল—ছেলেপিলের মস্তিষ্কে ঘুণ ধরাইয়া দিল! যাঁরা কবি, তাঁরা থাক্—একে তাঁদের বই বিক্রয় হয় না, তার উপর তাঁদের বিরুদ্ধে যদি দু'ছত্র এখানে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করি, তাহা হইলে হয় তো আপনিও তাঁদের কবিতা ছাপা বন্ধ করিয়া দিবেন, এবং পাঠক-পাঠিকারা…

সাহিত্যের এই বিভিন্ন বিভাগে ধুরন্ধরের প্রতিভা ছিল আশ্চর্য্য রকমের।

প্রথমেই ধরুন ঐ প্রত্নতত্ত্ব! এ কি সহজ বিভাগ! কবে দু'হাজার বছর পূর্ব্বে কাদের বাড়ীর ছেলেরা পাথর-নুড়ি লইয়া খেলা করিয়াছিল, আজ সেই সব নুড়ি পাথর ঘষিয়া দেখিয়া তাঁরা সে খেলার সাল-তারিখ বলিয়া দিতে-ছেন…মাটীর নীচে কেঁচোর বাস উঠাইয়া সেখানে কত বড় বড় সাম্রাজ্য বসাইতেছেন! তা ছাড়া হাতাকে হাতা, নোড়াকে নোড়া, ফুটা কলসীকে কলসী বলিয়া জোর গলায় প্রকাশ করিতেছেন। বহু বহু বৎসরব্যাপী এত বড় যে বিভাগ, সে বিভাগে ধুরন্ধরের সুগভীর ব্যুৎপত্তির কথা বলি।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র আমরা জানি, পাঞ্জাবে দিল্লীর কাছে ছিল। ধুরন্ধর একদা আমাদের বুঝাইয়া দেন, কুরু-পাণ্ডবদের ব্যাপার এ দেশে ঘটিয়াছিল। হস্তিনাপুর নামে রাজ্য…সে রাজ্যের রাজা পাণ্ডু। পাণ্ডুর ভাই ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ। পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কৌরব। পাণ্ডু মারা গেলে ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য লইল। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। এই অন্ধতার অর্থ বিষয়-লোভে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অন্ধতা; হস্তিনাপুরী ছিল বাঙলা দেশে—হস্তি+না+পুরী—অর্থাৎ যে পুরীতে হস্তী নাই। বাঙলা দেশ হাতীর দেশ নয়। যে সব হাতী এ দেশে দেখি, সেগুলা অন্য দেশ হইতে আমদানি। এখানে হাতীর মত মোটা পেট দেখি, সে মানুষের ভুঁড়ি। থপ্‌থপে পাও দেখা যায়, তাকে বলে গোদ। কিন্তু শুধু হাতীর মত পেট, বা হাতীর মত পা থাকিলেই কেহ হাতী হয় না! হস্তি-মূর্খও অনেক আছে, জানি। কিন্তু তারাও "হস্তী" নয়; তারা হস্তি-মূর্খ! 'জাম' আর 'জামরুল', 'কাঁকড়া ও কাঁকড়া-বিছা' যেমন এক বস্তু নয়, বিভিন্ন, তেমনি "হস্তী" ও "হস্তি-মূর্খ" এক বস্তু নয়। এ সব কথা আমার নয়, ধুরন্ধর শর্ম্মার যুক্তি। অকাট্য যুক্তি, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা থাক্। যা বলিতেছিলাম,—বাঙলা দেশে হাতীর পিঠে সওয়ার কেহ দেখিয়াছেন? অথচ পশ্চিমে দেখিতে পাই ইহাতে প্রমাণ হইল, হস্তিনাপুরী বাঙলা দেশে ছিল। রাজা অর্থে জমিদারী! জমিদাররাই রাজা-উপাধিতে ভূষিত হন

কাজেই ওদিকে বেশী গবেষণার প্রয়োজন নাই। ধৃতরাষ্ট্র রাজা-অর্থে জমিদারীটি গ্রাস করিলে, দু'বংশে ভারী মারামারি বাধিয়া গেল। মারামারিতে ধূম বাধিলেই আমরা বলি, কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। অতএব কথাটা জলবৎ সাফ হইয়া গেল।

কথাটা ছোট নয়। 'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান'—সেই মহাভারতই যখন ধুরন্ধরের চোখে সাফ হইয়া গেল—তখন অন্যে পরে কা কথা!

বেদ-বেদান্তের টীকা…? মাসিক-পত্রে ও-সব প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা যেমন চক্ষে ধোঁয়া দেখি, বেদ-উপনিষদ্ সম্বন্ধে ধুরন্ধর যখন বচনামৃত-ধারা বর্ষণ করিতেন, তখনও আমরা চক্ষে তেমনি ধোঁয়া দেখিতাম! অর্থাৎ এ সব গবেষণাত্মক প্রবন্ধ যেমন চিরদিন দুর্বোধ, ধুরন্ধরের বেদ-বেদান্ত-বিষয়ক বচন-রাশিও ছিল তেমনি দুর্ব্বোধ! (আচ্ছা, সম্পাদক মহাশয়, জনান্তিকে একটা প্রশ্ন আপনাকে করি,—ঐ যে বেদ-বেদান্তের ব্যাপার লইয়া বড় বড় প্রবন্ধ আপনারা কাগজে ছাপেন, নিজেরা সে-সবের মর্ম্ম ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন? আপনি একটা খামে চিঠি লিখিয়া আমায় জানাইবেন কি? জানাইলে বাধিত হইব।) সুতরাং বেদ-বেদান্তের ব্যাপারে ধুরন্ধরের নৈপুণ্যও তুল্যরূপ উৎসাহ-প্রশংসার যোগ্য।

গল্প? উপন্যাস? নাটক? যখনি যে গল্প, যে উপন্যাস ধুরন্ধর শর্ম্মা পড়িয়াছেন, তখনি বলিয়াছেন,—এ কি লিখেচে? এর চেয়েও ভালো আমি লিখতে পারি! তবে লিখি কখন্? কেন লিখবো? সকালে সময়ের অভাব। বাড়ী বাড়ী চা খাইয়া বেড়ানো, সঙ্গে সঙ্গে সদুপদেশ-বর্ষণ; দুপুরে আহারের পর নিদ্রা আসে; সন্ধ্যায় আড্ডা, বৈঠক, তাস খেলা, গল্প-গুজব করা—ইহাতেই রাত বারোটা বাজিয়া যায়…তার পর আহার এবং শয়ন! শয়ন-মাত্রে নিদ্রা!

নাটক? সেই তো রামায়ণ-মহাভারত লইয়া টানাটানি! ও কাজে কোনো দিন তাঁর স্পৃহা ছিল না। যা একজন লিখিয়া গিয়াছে, তা লইয়া নাট্যে রূপান্তর—ও-কাজ যাঁরা থিয়েটার চালান, তাঁরা করুন। যাঁর মৌলিক নাটক গড়িবার প্রতিভা আছে, তিনি পরের ব্যবহৃত মশলা কেন ধার করিবেন? কথাটা ভারী সত্য।

সামাজিক নাটক? গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের ঝগড়া-কলহ যত ফন্দী, যত অভিসন্ধি, এবং উভয় পক্ষকে তাঁর গোপন উস্কানি—ইহাতে যদি তাঁর নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় কেহ না পান তো দেড়শো পাতা বানানো কথায় ছাপিয়া-ভরাইয়া দিলেই কি সে পরিচয় পরিস্ফুট হইবে? ইহার উপর তিনি মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখিতেন;—প্রায় দেখার বাসনা ছিল, কিন্তু ফ্রী-পাশ এমন অকৃপণের মত কে তাঁকে নিত্য দিবে? হায় বাঙলা দেশ! হায় থিয়েটার!

তার পর কবিতা। এ কথা সত্য, বাঙলা ভাষায় ৭১২ খানি মাসিক পত্র এবং ৫২৩৭খানি সাপ্তাহিক কাগজ আছে; ইহাদের কোনোটায় ধুরন্ধর শর্ম্মার কোনো কবিতার একটি ছত্রও ছাপা হয় নাই। তাই বলিয়া কি তাঁর কবি-প্রতিভা রসাতলে যাইবে? না।

খনা দেবীর নাম শুনিয়াছেন? তাঁর লেখা কোনো কাব্য-গ্রন্থ সাহিত্যে নাই। কিন্তু বাল্মীকি-বেদব্যাসের মতই খনার আদর ঘরে ঘরে। তাঁর ছন্দে-রচা বচনাবলীর সঙ্গে কার না পরিচয় আছে? বাল্মীকি-বেদব্যাসের ক'ছত্র আপনি মুখস্থ বলিতে পারেন, মহাশয়? আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, একটি ছত্রও পারেন না। আর খনা দেবীর কবিতা? নিশ্চয় দু-চারিটি জানেন। ধুরন্ধরের প্রতিভা ছিল ঐ খনার প্রতিভার তুল্য। এত কাব্য-কুচি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন! সেগুলি ছাপাইয়া অনায়াসে আপনি দু'খণ্ড গ্রন্থাবলী বানাইতে পারেন। বিবিধ বিষয়ে তাঁর কবি-প্রতিভা স্ফুচিত হইয়াছিল। কতকগুলি কবিতা আমার মনে আছে—শুনুন।

"পায়ে আল্‌তা—কোটেন চাল্‌তা।" ছোট্ট দু'টি লাইন—কিন্তু কি suggestive! পায়ে আলতা…তরুণী, নহিলে পায়ে আলতা কে দিবে? রাঙা পায়ের আভাস ইহাতে পাই! তিনি কি করেন? 'চাল্‌তা কোটেন।' চাল্‌তা-কোটায় বিশেষ নৈপুণ্য আছে। অর্থাৎ সুন্দরী রক্তচরণী তরুণী…গৃহ-কর্ম্মেও সুনিপুণা! এমন গৃহ-কল্যাণীর চিত্র ছোট্ট দুটি কবিতার ছত্রে কোন্ কবি আঁকিয়াছেন?…"পাবে যখন নেমন্তন্ন, খাবে হয়ে মতিচ্ছন্ন!" অর্থাৎ পরের পয়সায় ভোজ মিলিলে মরিয়া হইয়া খাইবে। এ দুটি ছত্রে সামাজিকতার সহিত economicsএর কি সুমধুর সংমিশ্রণ! চমৎকার! "যদি করবি মামলা, তো ধরবি আমলা।" অর্থাৎ মামলা-মকর্দ্দমা করিতে চাহিলে উকিলের পরামর্শ লওয়া দরকার;

বাজে কোপর-দালালের কথায় ভুলিয়ো না! এমন উপদেশাত্মক কবিতা পদ্যপাঠে নাই, নীতিবোধকেও নাই! "পরের ছেলে—সে তাকে ফেলে;" "পরের নিন্দে, নিজের যশ; গেয়ে গেলে তনিয়া বশ;" "সময় বুঝে স্ত্রীর গোলাম, তবেই সংসার পাবে মোলাম! তালুকা রাশ দেখলে স্ত্রী, ঠুকরে খাবেন মাথার ঘী।" ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

এই বিবিধ ছত্রে দেখিবেন, আত্ম-প্রীতির কি চমৎকার আদর্শ ফুটিয়াছে! আত্মানং সততং বিদ্ধি—শাস্ত্র-বচন মানেন তো। Realise thy national self ধুরন্ধর শর্মার জীবনে এই দার্শনিক সত্য প্রতিফলিত হইয়াছিল।

আমরা তাঁকে বহুবার বলিয়াছি, সেই কবিতাগুলি সম্বন্ধে যে ওগুলি ছাপান ছোট হীরার কুঁচি দিয়া মাথার মুকুট তৈয়ারী হয়, এগুলিও দেবী বীণাপাণির মাথায় মুকুটের দীপ্তি জাগাইবে।

তিনি বলিতেন, না! আমি কবিতা ছাপিলে বহু কবির অন্ন মারা যাইবে, পশার নষ্ট হইবে!

তা ছাড়া এ কথা বোধ হয় জানেন, যাঁদের লেখা ছাপা হয়, তাঁদের চেয়ে ঢের বেশী সমজদার ও শক্তিমান তাঁরা, যাঁদের লেখা ছাপা হয় না! তাঁরা লিখিতে পারেন না বলিয়া লেখেন না, এ কথা ভাবা ভুল। তাঁরা লেখেন না শুধু লিখিয়েদের প্রতি কৃপা-পরবশতার জন্য। নহিলে দেখেন নাই, রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়িয়া বহু না-লিখিয়ের দল নাক-মুখ সিঁটকাইয়া বলেন, কি এ? অর্থাৎ তাঁরা যদি লিখিতেন, তাহা হইলে কেল্লা একদম ফতে করিয়া দিতেন! যত ভালো লেখাই তাঁদের সামনে ধরুন, তাঁরা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিবেন, কিস্যু নয়!...

কিন্তু এ-সব অবান্তর কলরবের প্রয়োজন নাই। আজ বাঙলার কুলপ্রদীপ ধুরন্ধর শর্মা নাই, তাই তাঁর স্মৃতি তর্পণ করিলাম তাঁরি কথায় অর্ঘ্য রচিয়া—যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গাজলে!

আজ ধুরন্ধর নাই, গিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে বাঙলার বড় অর্দ্ধেক মাটী ধ্বসিয়া গিয়াছে! আর গিয়াছে বাঙালীর কত আশা, কতখানি ভরসা, বাঙলার কি প্রচণ্ড ভবিষ্যৎ—ওঃ! আপনারা কিছু বুঝিবেন না, যেহেতু আপনারা তাঁকে চিনিতেন না! কিন্তু আমরা তাঁকে চিনিতাম, এবং জানিতাম, কি যেন তিনি করিতে পারিতেন! করেন নাই—শুধু করিয়া কি হইবে—এই ভাবিয়া! হায় অকৃতজ্ঞ বাঙালী—হতভাগা বাঙালা দেশ! তোমাদের অপরাধেই ধুরন্ধরের অত-বড় শক্তি চুপচাপ চলিয়া গেল! বাঙালী বুঝিতেছে না, কিন্তু আমরা তাঁকে জানিতাম বলিয়া আমরা বুঝিতেছি, বঙ্গ-জননীর হাড়গোড় আজ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বাঙলার মাটীতে পচ ধরিয়াছে, বাঙালীর একটিমাত্র সম্বল—বাক্য, ধুরন্ধরের সঙ্গে সে বাক্য আজ ঝরিয়া গিয়াছে! তাই আজ সজল চক্ষে বক্ষে করাঘাত করিয়া শুধু হায়-হায় করিতেছি এবং ধুরন্ধর-মরণ-স্মরণে তাঁর অমর কাহিনী আপনাদের কাগজে ছাপাইয়া দিলাম। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমার নামটাও কাগজে ছাপা হইবে, ইহা ভাবিয়াই হৃদয়ের দারুণ শোক-ভার আজ কথঞ্চিৎ লাঘব করিতেছি।

শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত।

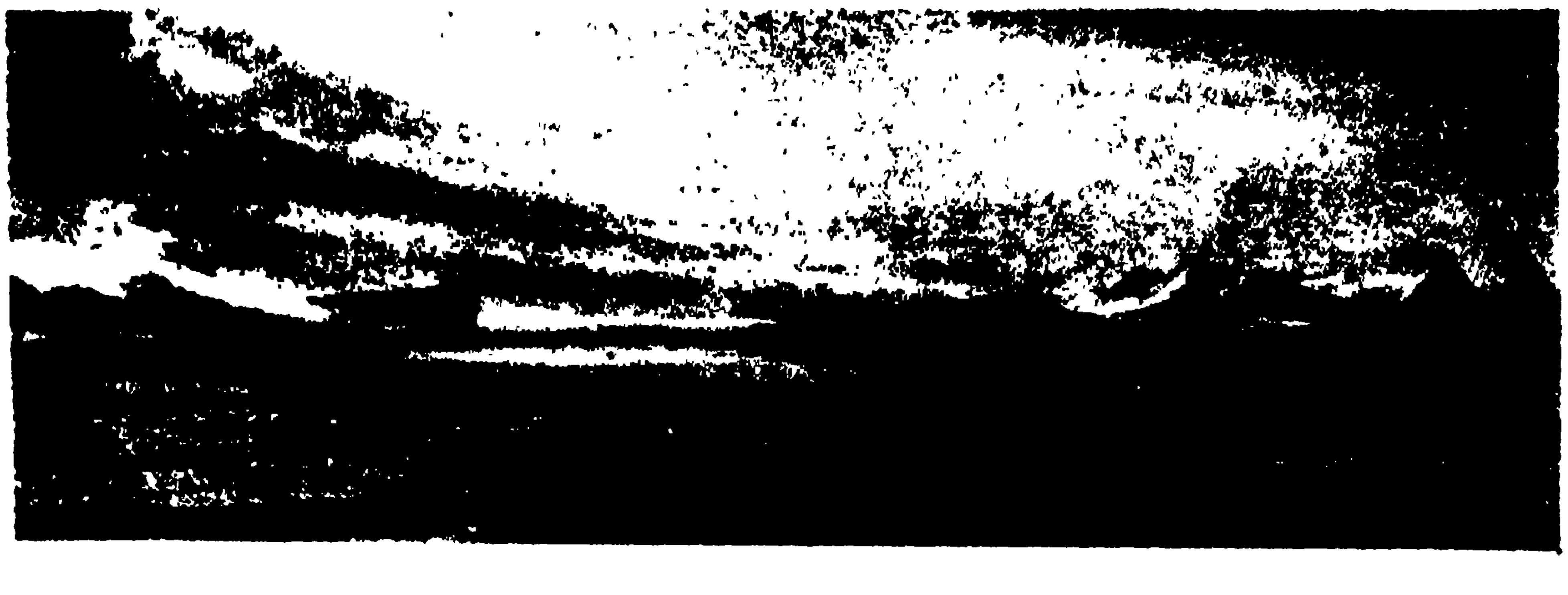

তুষারতীর্থ—অমরনাথ

সিন্ধু ও বিতস্তার মিলনক্ষেত্রই "সাদিপুর"। ইহার পুরাতন নাম "পরিত্রাণপুর"। ইহা অষ্টম শতাব্দীতে রাজা ললিতাদিত্যের রাজধানী ছিল, পরে রাজা "শঙ্কর বর্ম্মন্" ৯০০ খৃঃ অব্দে এখান হইতে রাজধানী পত্তনে লইয়া যান।

পরদিন খুব ভোরেই নৌকা ছাড়িল। বেলা ৮টার সময় ক্ষীরভবানী পৌঁছিলাম। এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলা হয়। সে সময়ে মহারাজা ও মহারাণীরাও এখানে দেবী-দর্শনে আসেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দও এখানে আসিয়াছিলেন। প্রবাদ, তিনি দেবীর মন্দিরের ভগ্নদশা দেখিয়া মহারাজের নিকট ইহার সংস্কারের জন্য আবেদন করিবেন ভাবেন, কিন্তু দেবী স্বপ্নে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলেন যে, আমার এই সামান্য বিষয়ের জন্য তোমাকে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না। আমার ব্যবস্থা আমিই করিয়া লইতে পারি। অতঃপর স্বামীজী ক্ষান্ত হয়েন। নদীর ধারেই মন্দির,—বেশ বড় পাথর-বাঁধান চত্বর, মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় বা চারকোণা খালে

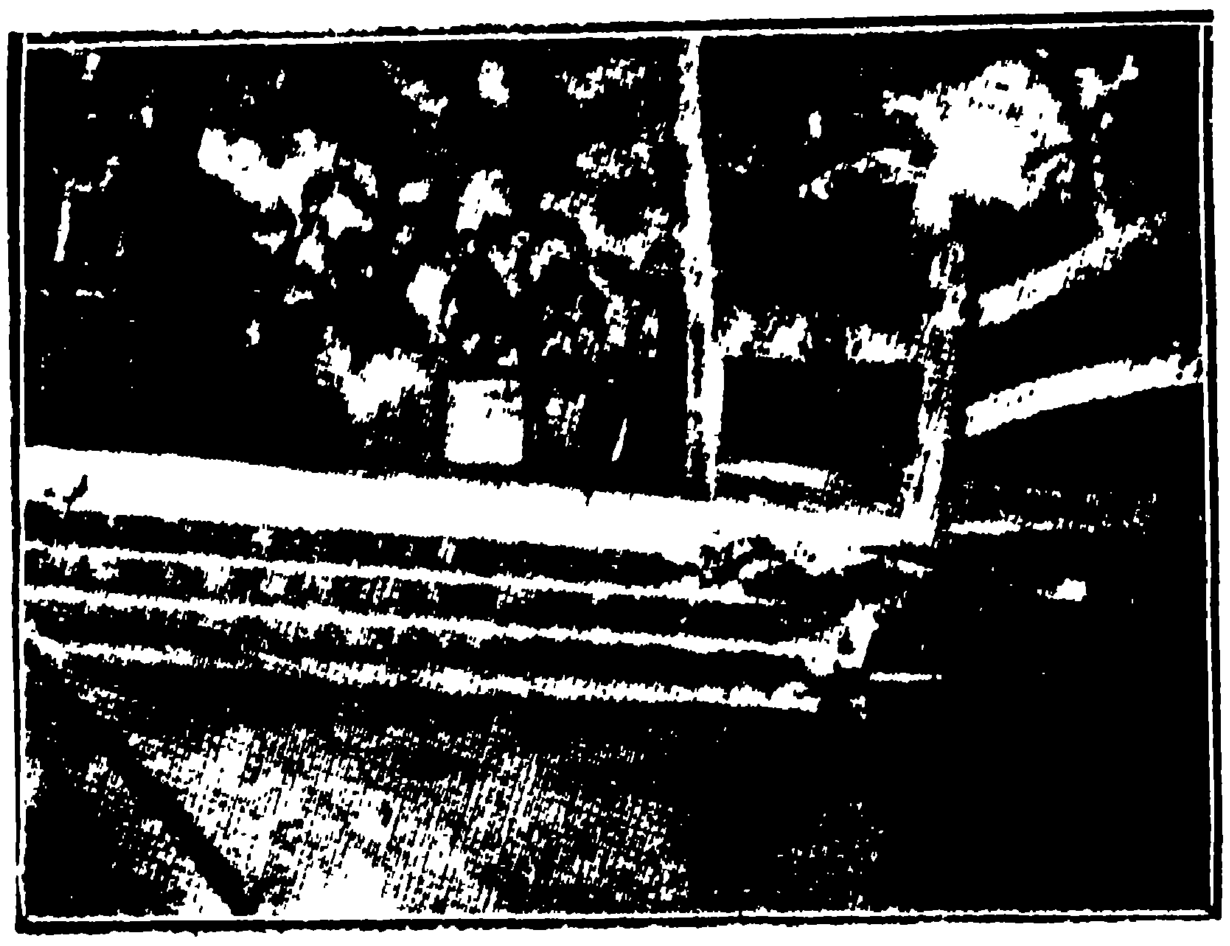

ক্ষীরভবানী

['পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ' হইতে গৃহীত।

মন্দির। এই খালটির মধ্যে পচা দুধ ও জল; যাত্রী ও পূজার্থীরা এই চৌবাচ্চার তীর হইতেই পূজা করে। কারণ, দেবীর ক্ষুদ্র মন্দির, ইহার মধ্যস্থলে তীর হইতে সেখানে যাইবার কোন পথ নাই। কাযেই পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্প সবই এই কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। দেবীর মূর্ত্তি লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি উক্ত কুণ্ডেই পাওয়া গিয়াছে। শঙ্করনাথজী বলিলেন, তিনি দশ বৎসর পূর্ব্বে দেবীর চোখ-নাকওয়ালা কোন মূর্ত্তিই দেখেন নাই, দশ বৎসর পর পূজারীদের কৃপায় দেবী চোখ-নাক লাভ করিয়াছেন। তবে যায়গাটি ও দেবী যে প্রাচীন, তাহা স্থানটি দেখিলে কতকটা বুঝা যায়। এখানে ধর্ম্মশালা ও একটি দোকান আছে। আমরা বড় তাড়াতাড়ি দেখিয়া ফিরিলাম বলিয়া এখানকার ঐতিহাসিক তথ্য কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মন্দির-চত্বরে একটি গাছের নীচে শিলা-নির্ম্মিত নারায়ণ, হনুমান্ ও দশভুজার মূর্ত্তি দেখিলাম। বুঝিলাম, হনুমান্ শুধু লঙ্কা যাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এ দিকেও লাফ দিয়াছিলেন।

পাশেই একটি জলস্রোত (ইহার নাম ক্ষীরসাগর)। মায়েরা ও স্বামীজীরা স্নান করিতে গেলেন। একে সেই শীতের সকাল, তাহাতে বাদলা হাওয়ায় শীতটা দ্বিগুণ পড়িয়াছিল; কাযেই স্নানের পুণ্য আমি নির্লোভের মত ত্যাগ করিলাম। কাছেই একটি দোকানে বসিয়া একটি কাংড়ী কোলে লইয়া শীতের হাত এড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই কাংড়ীগুলি কাশ্মীরের বিশেষত্ব। একটি বেতের ফ্রেমের মধ্যে মাটীর ভাঁড়ের মত জিনিস। মাটীর ভাঁড়টিতে আগুন থাকে, উহার উপরে বেতের দ্বারা এমন ভাবে ফ্রেম করা আছে যে, গায়ের কাপড়ের মধ্যে লইলেও কাপড় আগুনে পুড়িবে না। এগুলি বড় আরামদায়ক। শীতকালে প্রত্যেক কাশ্মীরী এক একটি কাংড়ী জামার মধ্যে বুকে ঝুলাইয়া রাখে; ফলে তাহাদের অধিকাংশেরই বুকের রং লাল অথচ শরীরের অন্যান্য অংশ সাদা··· যাহাকে বলে সুন্দর।

স্নান সারিয়া শঙ্করনাথজী এক দুধওয়ালাকে কিছু দুধ দিয়া যাইতে বলিলেন। দর লইয়া খানিকক্ষণ মারামারি করিয়া কিছু দুধ লওয়া হইল। আবার নৌকা চলিল। জলপ্লাবনে চারিদিক্ চক্চক্ করিতেছিল। কোথাও কোথাও জলের মাঝ হইতে সবুজ ধানগুলি আত্মরক্ষার আনন্দে হাসিতেছে। অনেক ভাঙ্গা ঘর-বাড়ীও চোখে পড়িল। কাল যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলাম, আজ আবার সেই রাস্তা দিয়া ফিরিয়া চলিলাম। ভোরের অন্ধকারে এ দিক্কার একটি দ্রষ্টব্য স্থান 'গন্ধর্ব্ববন' ভাল দেখিতে পাই নাই।

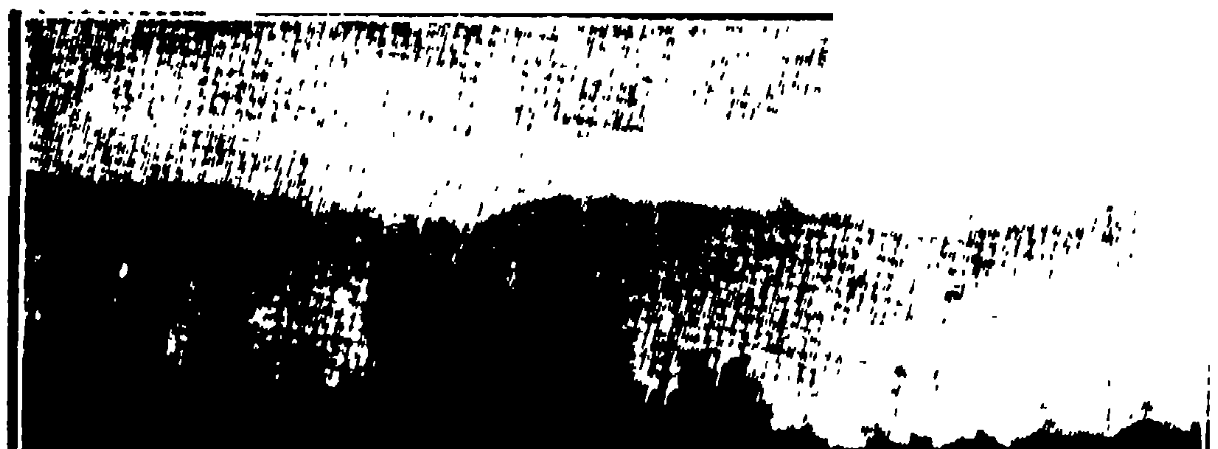

গন্ধর্ব্ববল ঘাট

['পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ' হইতে গৃহীত।

ফিরিবার সময় একটি চানার-বাগানের নীচে অনেকগুলি নানা রঙ্গের হাউস-বোট দেখিয়া মাঝিকে সেই যায়গার নাম জিজ্ঞাসা করায় বলিল—গন্ধর্ব্ববল। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত বহু শ্বেতকায় নর-নারী স্বাস্থ্যান্বেষণে এবং স্থানীয় ধনী লোক এইখানে গ্রীষ্মবাস করিতে আসেন; সেই সময় ইহা বেশ একটি ছোট-খাট সহর হইয়া উঠে। এখানকার জল খুব ভাল। ইহাতে পরিপাকশক্তি আছে। শ্রীনগর হইতে গন্ধর্ব্ববন ১২৷০ মাইল উত্তরে এবং ইহা শ্রীনগর অপেক্ষা ১ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। শ্রীনগর হইতে এখানে

আসিবার স্থল-পথে একটি পাকা রাস্তা আছে। এখানকার আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। কখনও ৮০ ডিগ্রির বেশী তাপ উঠে না। গন্ধর্ব্ববনের তিন দিকে পাহাড়, এক দিকে সিন্ধুনদ। শ্বেতাঙ্গ নর-নারীদিগের কেহ হাউস-বোটের ছাদে, কেহ চানার গাছের নীচে বসিয়া চা পান করিতেছে, গল্প করিতেছে। গন্ধর্ব্ববন হইতে তিব্বত যাইবার পথ আছে। স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি পরিব্রাজকরা এই পথ দিয়াই তিব্বত গিয়াছিলেন।

ক্রমে নৌকা আবার ঝেলাম নদীতে পড়িল। সিন্ধু অপেক্ষা ঝেলামের জল ঘোলা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ। ইদানী যেন আরও বাড়িয়াছে। মাঝিরা খুব সাবধানে নৌকা চালাইতে লাগিল। এ দিকে নৌকায় হাল এবং দাঁড় পৃথক্ নাই; একটি হরতনের মত কাঠের তক্তার এক দিকে লম্বা একটা কাঠ বাঁধিয়া সেইটি ধরিয়া তক্তা দ্বারা জল কাটে। যখন যে দিকে ফিরিতে হয়, সেই দিকে দাঁড়টি জলের মধ্যে ডুবাইয়া হাতলটিকে কোলের দিকে টানে, ইহাতে নৌকার পশ্চাদ্ভাগ ক্রমশঃ উল্টা দিকে যায় এবং আপনি সম্মুখভাগ যে দিকে যাইতে হইবে, সেই দিকে ঘোরে।

এ দিকের নদী হ্রদ অত্যন্ত ভালমানুষ বলিয়াই এমনই একখানি দাঁড় বা হালের সাহায্যে শিশুরাও নৌকা বাহিয়া থাকে। খরস্রোতা নদীতে এই হাল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। নৌকাতেই রান্না হইল, খাওয়া হইল। বুড়ী-মা নিয়মমত উপবাস দিলেন (কারণ, নৌকায় মুসলমান মাঝি ছিল), সাধু-মা রুটী পাকাইলেন। পথে একটি নৌকার মাঝির কাছ হইতে কিছু মাছ কেনা হইল। এখানকার মাছ বেশ সুস্বাদু। খাওয়া-দাওয়ার পর আরাম করিয়া একটু শুইলাম। কিছু দূর আসিয়া মাঝি নৌকা থামাইয়া কহিল, "বাবুজী, আউর ত নেহি যানে শেকে গা।" অবাক্ হইয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাহে ?" সে কহিল, "পানি বহুত হো গিয়া। আগারী কদলকে অন্দর ইস নাও নেহি যায়ে গা। লাগ যাগা।" অগত্যা তীরে নামিলাম, দেখি, সম্মুখেই একটি সেতু আছে। জল এত বাড়িয়াছে যে, তাহার নীচে দিয়া নৌকা যাইলে নৌকার চাল সেতুতে ঠেকিয়া আটকাইয়া যাইবে। কাছেই ১২খানি নৌকা দাঁড়াইয়াছিল; উহাদের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত নীচু, তাহাকে সোপুর পর্য্যন্ত যাওয়ার ভাড়া জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল "৯ রূপেয়া"; সর্ব্বনাশ! শ্রীনগর হইতেও ৯ রূপেয়া, এখান হইতেও তাই! কাছেই অনেকগুলি লোক যাত্রীদের এই বিপদে কৌতুক

সোপুরের ব্রিজ—সহরের একাংশ—[শ্রীনগরের বিখ্যাত ফটোগ্রাফার ভি, সি, নাথ এণ্ড সন্সের সৌজন্যে

দেখিতে আসিয়াছিল ; তাহাদের এক জন বলিল, তোমাদের নৌকায় পার করিয়া দিব, কি দিবে ? আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। ব্রিজ খোলা যায় না কি ? আমাদিগকে বেশী কথা কহিতে হইল না, নৌকার মাঝিই ইহাতে আপত্তি করিল। "নেহি নেহি"। আমরা বলিলাম, উহারা বলিতেছে, যে কোনোরূপে হউক পার করিয়া দিবে, তোমার আপত্তি কেন ? সে বলিল যে, উহারা বিশ পঁচিশ জন নৌকায় চাপিয়া নৌকাকে ভারী করিয়া আরো আধহাত জলে ডুবাইয়া দিবে এবং তাহা হইলে নৌকা পার হইবে, কিন্তু উহা বড় বিপজ্জনক। নৌকা-পারের পন্থা শুনিয়া আমরাও সাহস পাইলাম না। কি করা হইবে ভাবিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে শঙ্করনাথজী ও বিশ্বনাথজী সেতুর অপর পারে একটি নৌকা ঠিক করিয়া আসিলেন। ভাড়া ৭৲ ঠিক হইল। পূর্ব্ব-নৌকাওয়ালাকে ১৷৹ দিয়া মালপত্র দ্বিতীয় নৌকায় লইয়া আসিলাম। কুলী পাওয়া গেল না, মাঝিরা এবং আমরা নিজেরাই মাল বহিলাম। এই যায়গাটির নাম সম্বল। ইহা এ দিক্‌কার বেশ একটি বড় যায়গা। শসা, পাউরুটী, বিস্কুট প্রভৃতি নদীর ধারে ধারে বিক্রয় হইতেছে। আমরা বৈকালিক জলযোগের জন্য কিছু শসা ও বিস্কুট লইলাম। আচারনিষ্ঠায় সর্ব্বানন্দজী মায়েদের দলে ছিলেন, ছোঁয়াছুঁয়ি বাজারের বিস্কুট খাওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না ; যদিও সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব-সংস্কার সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন। আমি গৃহী হইয়াও স্বামীজীদের দলে নিজেকে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছিলাম। কিছুতেই অরুচি ছিল না, অভাবেও কষ্ট বোধ করিতাম না।

এই নৌকায় সামান্য দূর আসিয়া আমরা "মানসবল" নামে একটি হ্রদ দেখিবার জন্য নৌকা বাঁধিলাম। "বল" শব্দটিতে বৃহৎ জলাশয় বুঝায়। "গন্ধর-বল", "মানসবল", গাগরী-বল, ইত্যাদি হইতে ইহা অনুমান করা যায়। ঝিলামের দক্ষিণ-তীরে নৌকা বাঁধিয়া আমরা পায়ে হাঁটিয়া "মানসবল" দেখিতে গেলাম। অল্প কিছুদূর গিয়াই মানসবল চোখে পড়িল। ঝিলাম হইতে একটি খাল মানসবলে গিয়াছে। এক যায়গায় ইহার উপর একটি সেতু আছে। সেতুর উপর বসিয়া অনেকে নাশপাতি, পওগোসা প্রভৃতি বেচিতেছিল। আমরা কিছু কিনিলাম, খুব সস্তা। সেতুটির কাছেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। মানসবলে প্রচুর পদ্ম জন্মে। মানসবল দৈর্ঘ্যে দুই মাইল, আন্দাজ খুব গভীর। ইহার এক দিকে "আহাতাং" পাহাড়, অন্যদিকে উচ্চ অধিত্যকা। এইখান হইতে গন্ধরবলে যাইবার একটি স্থলপথও আছে। উত্তরদিকে সিন্ধু নদের একটি শাখা হ্রদটিতে পড়িয়াছে।

এখানে একটি জলমগ্ন (ফেঝাবুড়া দেখা যায়) মন্দির ও

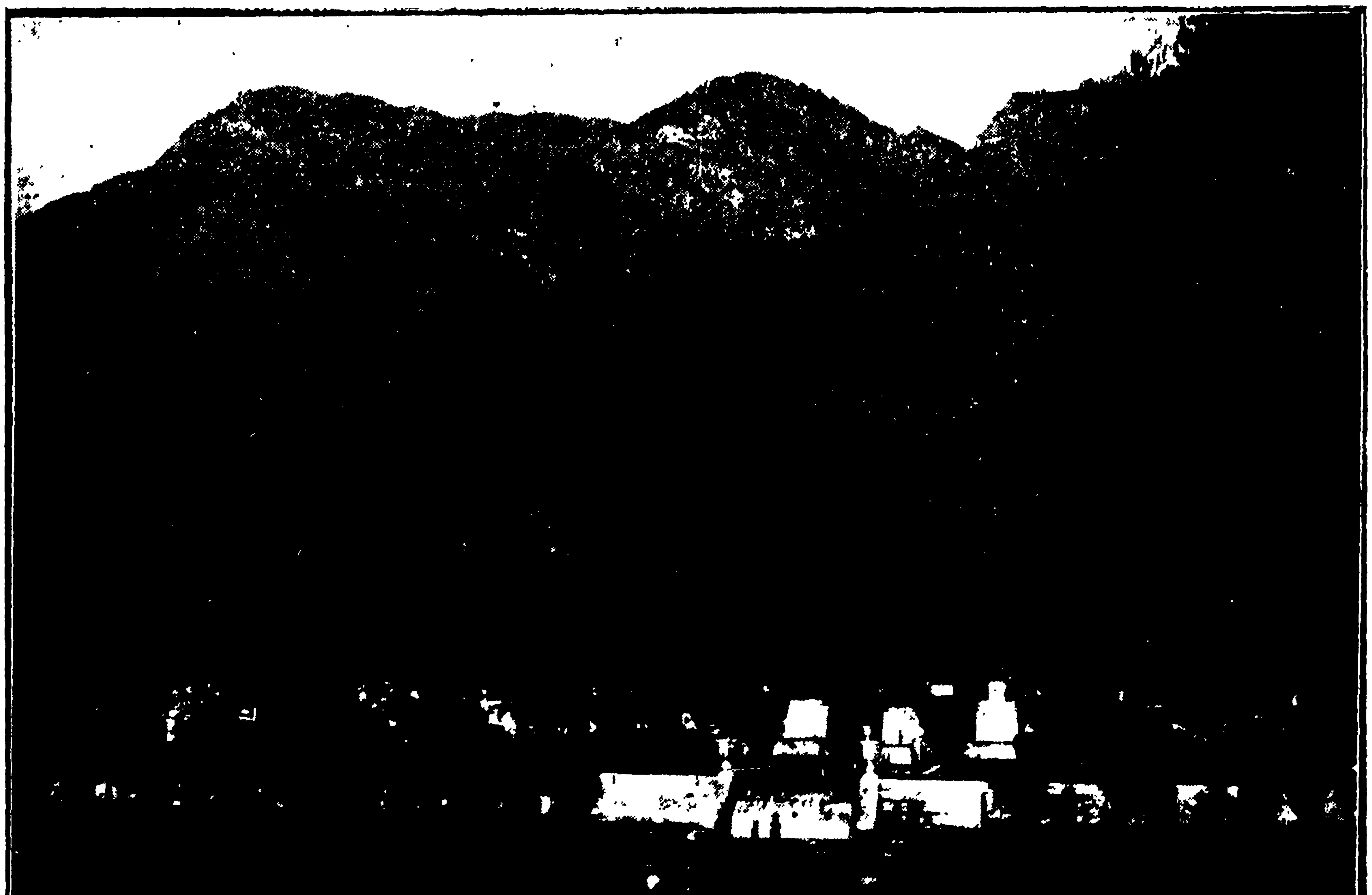

নিশাদবাগের অভ্যন্তরের দৃশ্য

একটি কবরস্থান এবং গুহা আছে। "আহাতাং" পাহাড়ে প্রচুর lime stone পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর-নির্ম্মিত দারোগা পগ নামে একটি প্রমোদ-উদ্যানের ধ্বংসাবশেষ আছে। ভারত-সম্রাট দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা-র বংশধরের সাধের বাগানের আজকের রূপ দেখিয়া মনে হইল, ধন্য নিয়তি, ধন্য তোমার করালদংষ্ট্রা!

ফিরিয়া নৌকায় চাপিতেছি, এমন সময় শঙ্করনাথজী কতকগুলি লাল রং-এর ফল দিয়া কহিলেন, খাও ত, কেমন লাগে! খাইয়া দেখিলাম অম্লমধুর, বেশ মুখরোচক। দুইটা পয়সা দিয়া নিকটবর্ত্তী গাছ হইতে কিছু বেশী পরিমাণে পাড়াইয়া লইলাম। এগুলির নাম তুঁত।

শসা, তুঁত, পীচ, আপেল, বিস্কুট প্রভৃতি ধ্বংস করিতে করিতে আবার আগাইয়া চলিলাম। সন্ধ্যায় 'কিস্তি' 'নাইদখাই' নামে এক জায়গায় নঙ্গর করিল। মায়েরা রান্নার জোগাড় করিতে লাগিলেন। শঙ্করনাথজী বলিলেন, "চল, নেমে একটু চায়ের জোগাড় দেখা যাক্।" আমি বলিলাম—"আপনার জন্য চা নিয়ে এখানে কে ব'সে আছে?" তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসীর জন্য সকলের দ্বারই মুক্ত।" আমি হাসিয়া নিজেকে দেখাইয়া বলিলাম, "কিন্তু আমি?"

"তুমিও সাধুসঙ্গ ক'রে সাধু বনে গেছ। নেহাৎ যে বিয়ে ক'রে ফেলেছ, নইলে গেরুয়া দিতাম"। হাসিতে হাসিতে বিশ্বনাথজী, শঙ্করনাথজী ও আমি নৌকা হইতে তীরে নামিলাম। সর্ব্বানন্দজী রন্ধনকার্য্যে বিশেষ পটু বলিয়া মায়ের কাছেই সাহায্যার্থে রহিলেন। নদীর ধার হইতে উপরে উঠিতেই একটি বেশ ভাল বাড়ী চোখে পড়িল। আমাদিগকে দেখিয়া এক জন "পণ্ডিত" (এ দিকে ব্রাহ্মণমাত্রেই পণ্ডিত) আগাইয়া আসিলেন ও স্বামীজীদিগকে প্রণাম করিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামীজীরা বলিলেন যে, আমরা সারদা দেবীকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। আমাদের সাধু উদ্দেশ্য এবং সাধুদের গেরুয়া দেখিয়া পণ্ডিতজী খাতির করিয়া একটি কম্বল বিছাইয়া বসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর স্বামীজী আমাদিগকে 'চা খিলাইবার' জন্য অনুরোধ জানাইলেন। পণ্ডিতজী সঙ্গে সঙ্গে এক জন লোককে চা তৈয়ারী করিতে পাঠাইলেন।

গ্রামে সাধু আসিয়াছে খবর পাইয়া একে একে অনেকগুলি লোক আসিয়া জমা হইল। সকলেরই যে সাধুসঙ্গ করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা নহে। অধিকাংশই আসিয়াছিল নিজেদের রোগের কোন সিদ্ধ ঔষধ লইতে। একে একে অনেকেই নিজেদের রোগের কথা জানাইল ও ঔষধ প্রার্থনা করিল, স্বামীজীরা বলিলেন যে, তাঁহারা ঐ সকল রোগের ঔষধ জানেন না এবং যেগুলিরও জানেন, তাহাও সঙ্গে নাই। অগত্যা অনেকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। এখানে অধিকাংশই কুৎসিত রোগে ভুগিতেছে। ইহা নৈতিক চরিত্রের অবনতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কেনই বা হইবে না—শিক্ষার আলোক ইহাদের কেহই পায় নাই। কাশ্মীরের মুসলমান, যাহারা জনসংখ্যায় শতকরা ৯৭ ভাগ, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২ জনও লেখাপড়া জানে কি না সন্দেহ। ইহারা অত্যন্ত নোংরা, স্নান বোধ হয় কখনও করে না। অনেকেরই গায়ে মাথায় ঘা হইয়া আছে। কৃষিই কাশ্মীরবাসীদের একমাত্র জীবিকা। শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালীর মত চাকরীর উপরই নির্ভর করে। কাশ্মীরীর ব্যবসা কাশ্মীরে আশানুরূপ নাই। পাঞ্জাবীরা বাঙ্গালার মত কাশ্মীরের বুকেও ব্যবসা পাতিয়াছে। এই জন্য এখন কাশ্মীর সরকার নিয়ম করিয়াছেন যে, কাশ্মীরে কোন বিদেশী স্থায়ী ব্যবসা করিতে পাইবে না ও তেজারতি করিতে পাইবে না। ইহাতে বিদেশীর দৃষ্টি কিছু কম প্রখর হইবে সন্দেহ নাই। কাশ্মীরবাসী মুসলমানরা অত্যন্ত দরিদ্র। পরনে একটি কৌপীন, মাথায় একটি ময়লা টুপী ও গায়ে একটি মোটা লুই ছাড়া বেশভূষার আর কিছু নাই। মেয়েরা গায়ের উপর একটা আলখাল্লা পরিয়াই নিশ্চিন্ত। তাহার বেশী কিছু পরিবার সামর্থ্য তাহাদের অনেকেরই নাই। ভূস্বর্গে এই দারিদ্র্য বড় বিশ্রী বেসুরো লাগে।

লেখক

বুড়ীমার উপযুক্ত গরম কাপড়-জামা না থাকায় এখান হইতে বহু দাম কসাকসির পর একটি লুই কেনা হইল। এই লুইগুলি ভেড়ার লোম হইতে তৈয়ারী হয়। কাশ্মীরীরা ইহা ৭।৮ বৎসর যথেচ্ছ ব্যবহার করে, পরে ইহা কাচাইয়া "পটু" তৈয়ার করে। পটু-জীবনেও ইহা অনায়াসে ৮।১০ বৎসর যায়। কাশ্মীরীরা লুইগুলি গায়ে দেয়, পাতিয়া বসে, প্রয়োজন হইলে পিঠে বাঁধিয়া বোঝা বয়—সব কিছুই করে। ২।৪ বৎসরের ব্যবহৃত লুই নূতন বলিয়াই গণ্য হয়। লুইগুলি কাশ্মীরের নিজস্ব গৃহশিল্প।

বর্ত্তমান মহারাজার উপর তাঁহার প্রজাবৃন্দ তাদৃশ সন্তুষ্ট নহে। যদিও তিনি একবার শস্যহানির জন্য লক্ষাধিক টাকা খাজনা মাফ দিয়াছিলেন এবং এবারও বন্যায় ক্ষতির দরুণ খাজনা কমি দিবেন বলিয়া আশা করিতেছে, তবু তাঁহার খামখেয়ালির জন্য প্রজারা খুসী নহে।

৺প্রতাপ সিংএর সহিত প্রজারা ইচ্ছা করিলে দেখা করিতে পারিত ও নিজেদের সুখ-দুঃখ জানাইতে পারিত, কিন্তু এখন সে প্রথা না থাকায়, প্রজাদের সকল অভিযোগ রাজকর্ণে পৌঁছায় না। বর্ত্তমানে কাশ্মীরে কোনও সংবাদপত্র নাই। বাহির

হইতে কেবল "ট্রিবিউন" ও "হিন্দু হেরাল্ড" যায়। ভারতের আন্দোলন সম্পর্কে সভা বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ; কিন্তু এত কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরবাসীরা ভারতের আন্দোলনের গতি সম্বন্ধে জানিতে অত্যন্ত উৎসুক এবং সংবাদপত্রাদি না থাকা সত্ত্বেও জানেও অনেক কিছু। মহাত্মাজীর প্রতি তাহারাও উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

চা আসিল। প্রত্যেকে এক একটা কাঁসার ছোট বাটি পাইলাম। কাপড়ে বাটি ধরিয়া চা-পানের উপদেশ পাইলাম। নহিলে হাত এঁটো হইয়া যাইবে। কিন্তু কাপড়ের উপর লইয়া খাইলে এঁটো হইবে না। পণ্ডিতজী একটি প্রকাণ্ড জল দিবার জগের আকারের চা-দানী লইয়া আসিলেন এবং তাহা হইতে চা পরিবেষণ করিলেন। শীতের সন্ধ্যায় চাটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। এখানকার চা-প্রস্তুত-প্রণালীও নূতন। চা-দানীর মধ্যে একটি নলে কাঠের কয়লার আগুন দিয়া তাহার চারিধারে জল দিবার পাত্রে জল দেওয়া হয়। আগুনের ধূম-নির্গমনের আলাদা রাস্তা আছে। জলের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। মধ্যে আগুন থাকায় জল ক্রমশঃ গরম হয়, কতকটা বয়লারের মত। জলের সঙ্গেই এক প্রকার কাঁচা চায়ের পাতা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রায় আধঘণ্টা উহা জলে সিদ্ধ হয়। পরে তাহাতে চিনি, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ ও দুধ দিয়া চা তৈয়ারী হয়। ইহা খুব মুখরোচক ও সর্দ্দিনাশক। 'নাইদখাই'এর সহৃদয় পাটোয়ারীর নাম "বেদলনা পণ্ডিত"। সন্ধ্যার পর সর্ব্বানন্দজী পাশের নৌকা হইতে ডাক দিলেন—'খাবার হয়েছে'। আমরা খাইতে গেলাম। বেদলনাজী কিছু আচার ও নিজের ভাগ হইতে কাশ্মীরের বিখ্যাত ও প্রধান খাদ্য 'করমকা শাক' আমাদিগকে খাইতে দিলেন। আচারটি একরকম লাগিলেও "করমকা শাক" ভাল লাগিল না, যদিও বেদলনাজী ও শঙ্করনাথজী উভয়েই ইহার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। শঙ্করনাথজী বলেন যে, বাঁধিতে পারিলে উহা অতি উপাদেয়; কিন্তু আমরা কাশ্মীরের যেখানেই খাইয়াছি, কোনোদিনই কোনো-খানেই 'করমকা শাক' বেশ রুচির সহিত খাইতে পারি নাই।

পরদিন খুব ভোরে 'নাইদখাই' ছাড়িলাম। কিছু দূর আসিয়া দেখিলাম, নদী ও পাশের মাঠ জলে এক হইয়া গিয়াছে। কেবল নদীর তীরের দুই ধারের গাছগুলি হইতে আসল নদীটি চেনা যাইতেছে এবং আসল নদীতে জলের টান খুব জোর। মাঝিরা স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া হাল ও লগির সাহায্যে বহু কষ্টে সেই কয়েক মাইল যায়গা পার হইল। তাহার পর নদী আবার শান্ত, কিন্তু খুব প্রশস্ত। এক দিকের তীরের গাছের গোড়া ধরিয়া ধরিয়া অতি সাবধানে আমাদের নৌকা চলিল। ক্রমশঃ নৌকা উলার হ্রদে আসিয়া পড়িল। বিতস্তা ও উলারের সঙ্গমস্থলের কাছেই "সোণালঙ্কা" নামে একটি দ্বীপ আছে। ইহার চারিদিকে চারটি পাথর-বাঁধান ঘাট আছে ও দ্বীপের উপরে একটি শিব-মন্দির ও মসজিদ।

পাহাড়ের কোলে ভাল রাস্তা

[ক্রমশঃ।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবর্ত্তন

৫

এ দিনও বিদায়বেলায় সুচারু অনিমেষকে পুনর্নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিল, অনিমেষ গ্রহণ করে নাই। সেবারে সুরুচির মুখের অনুরোধ সে এড়াইতে পারে নাই বলিয়া আজ আবার তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা দেখাইয়া এই বিলাসী এবং ধনীর গৃহে তাহাকে তাদের ইচ্ছার অধীনরূপে আসিতে, বসিতে ও খাইতে হইয়াছে, ইহারই একটা অস্বাচ্ছন্দ্যতাপূর্ণ গ্লানি তাহার অত্যন্ত শুচি, শুদ্ধ, একনিষ্ঠ চিত্তকে পীড়ন করিতে ছাড়িতেছিল না। পাছে আবার সেই রকমই কোনপ্রকার বাধ্যতার ভিতর বাঁধা পড়িতে হয়, এই ভয়ে সে এঁদের বাড়ীর বর্ত্তমান গৃহিণী তার নিমন্ত্রক শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী মাসীমাতাকে সাক্ষাৎমাত্রেই প্রণামের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানাইতে ত্রুটি করে নাই যে, আগামী রবিবার এবং তার পরের রবিবারেও সে আর এখানে আসিতে সমর্থ হইবে না। তাদের হেডকোয়ার্টার যে জেলার যে সহরে, তাকে সেইখানেই একবার দিনকয়েকের জন্য নিশ্চিত করিয়াই যাইতে হইবে, ফিরিবার দিন অনিশ্চিত এবং করণীয় বিষয় অত্যন্ত বেশী, সেই অনুপাতে অবসর একান্তই কম।

মাসীমার নাম গায়ত্রী দেবী, যৌবনে রূপের বুঝি সীমা ছিল না, এখনও তাঁর প্রৌঢ়দেহে রূপ ধরে না। অতি সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধরে মৃদুহাসির ছাপটুকু গোলাপদলের মৃদু-সৌরভটুকুর মতই মধুর ও করুণ হইয়া সর্ব্বদা ফুটিয়া আছে। বড় বড় চোখ দুটির কোলের কাছে শোকের ছায়া কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু কালো দুটি চোখের তারা দুটি যেন দীপ্তিমান মঙ্গলগ্রহ। তার মধ্যে যেমন আলো, তেমনই সুধা যেন ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। তলায় একটি গ্রন্থিবাঁধা ভিজা চুলগুলি হাঁটুর কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছে, সাদা কাপড়ের আঁচলখানি ভিজাচুলের উপর দিয়া মাথায় ঢাকা, ঈষদুন্নত সরল ঋজুদেহ, যেন একটি হোমানলের দীপ্তশিখা। পাশাপাশি দুজনে বসিয়াছিল, তাই অনিমেষ সহজেই তুলনা করিতে পারিল। সে দেখিল, এই সুরুচি-নাম্নী মেয়েটি এই গায়ত্রী দেবীরই বোনঝি, অনেকটাই যেন এঁর মতন। চেহারায়ও মিল আছে, হয় ত দুজনের স্বভাবেও খুব বেশী অমিল নাই। হয় ত এই সুরুচি দেবীর মা এঁরই বোন্ নিজেও এই রকমই ছিলেন; এই রকমই সুন্দরী, এই রকমই মহিমান্বিতা এবং হৃদয়বতী। কিন্তু কৈ, সুরুচি দেবীর বড় বোন্ কৈ? যিনি সুচারুর বাগ্‌দত্তা? অনিমেষ এদিক্ ওদিক্ আশপাশ একবার চকিত-কটাক্ষে চাহিয়া লইল। না, কেহ কোথাও নাই। এমন কি, কোন অন্তরালবর্ত্তিনীর কঙ্কণ-কিঙ্কিণীর মৃদুশব্দধ্বনিও কচিৎ শুনা যায় না।

অনিমেষের মত লোক, যার সাংসারিক কোন বিষয়েই বড় একটা খেয়াল থাকে না, যে নারী-সংস্পর্শ-বর্জ্জনে সচেষ্ট, তারও আজ এ ঘটনায় ঈষৎ বিস্ময়ানুভব না হইয়া পারিল না। সে দিনও সে তার বন্ধুর ভাবী পত্নীকে দেখিতে পায় নাই, আজও না। অথচ এই সুরুচি দেবী, ইঁহার সহিত এই দুদিনে সে কতটাই না পরিচিত; এমন কি, যেন একটুখানি হৃদ্যতা-অন্তরঙ্গতার মধ্যেও জড়িত হইয়া গিয়াছে বলিলেও বলা যায়। এ ঘটনাটা অনিমেষের মনকে ঈষৎ একটু যেন কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। হয় ত তার ভবিষ্যৎ বন্ধুপত্নী তাঁর মাসীমার মত মহীয়সী নন, তাঁর ছোট বোনের সহজ সরলতা, হৃদ্যতা ও উদারতা হয় ত তাঁর মধ্যে নাই, তিনি হয় ত অত্যন্ত সৌখীন রুচির নব্য তন্ত্রের মহিলা। অনিমেষের খদ্দরের ধুতী, মোটা লাঠী, বলিষ্ঠ দেহ, স্বাধীন মতবাদ—এ সমস্তই যে এ দেশের একটি কোন বিশেষ শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত অরুচিকর, সে খবর সে রাখিত। সুরুচির দিদিকে সেই শ্রেণীরই এক জন ভাবিয়া লইয়া সে যেন মনে মনে একটুখানি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল। সুরুচির দিদি কে, এই মহিমান্বিতা গায়ত্রী দেবী তার মাসীমা, তাঁতে ত স্বার্থসর্ব্বস্ব মনুষ্যত্ব-বিহীন সৌখীনতন্ত্রতা সাজে না! অন্তরে সে ব্যথা পাইল।

সুচারু সর্দ্দার মিস্ত্রীর সহিত কি একটা কাযের গোলমাল লইয়া কি যেন একটা গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল; অদূর হইতে মিস্ত্রী-পুঙ্গবের জবাবদিহি আর তার মৃদু তিরস্কার শুনা যাইতেছিল। তাকে সেই দিকে উৎকর্ণ হইতে দেখিয়া মাসীমা যেন কৈফিয়ৎ দিবার ভাবেই কহিলেন, "একটা পিলুপে গাঁথছিল, বাঁকা হয়েছে, সুচারু

বল্‌ছেন সেটা ভেঙ্গে গাঁথতে, ওরা রাজী নয়; বলে, ওটুকু থাকায় কোন দোষ হবে না।"

অনিমেষ হাসিয়া কহিল, "ওর চিরদিনই ঐ স্বভাব, মাসীমা! ও কোন দিনই ছন্দের অমিল সইতে পারে না, আর ধোপার কাপড়ের ইস্তিরি করার ত্রুটিও ওর সয় না। বাঁকা পিল্‌পে ও সহ্য করবে কি ক'রে?"

মাসীমা এই কথায় ঈষৎ একটু মৃদু হাস্য করিলেন, মৃদু মৃদু কহিলেন, "অছিমন্দিরও দোষ আছে, বল্‌ছে যখন, শুন্‌লেই হয়।"

সুরুচি অনিমেষের জন্য শ্বেত পাথরের বড় গ্লাসে এক গ্লাস লেবুর সরবৎ লইয়া সেই মাত্র ঘরে ঢুকিয়াছিল, অনিমেষের সুচারু-সম্বন্ধীয় মন্তব্য শুনিয়া সহাস্যমুখে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সুচারু বাবু বুঝি তখনও কবিতা লিখতেন? উনি বুঝি বরাবরই কবিতা লেখেন?"

অনিমেষ সুরুচির প্রদত্ত পানীয়ের গ্লাসটি গ্রহণ পূর্ব্বক অনাস্বাদিত রাখিয়া দিয়া প্রথমে তার প্রশ্নের উত্তর দিল: কহিল, অথবা তাহাকেই প্রশ্ন করিল, "আপনি বুঝি মনে করেন, কবিরা হঠাৎ এক দিন কবিতা লিখতে ব'সে পড়ে আর অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গেই কবি হয়ে যায়?"

তার কথার ধরণে এবারেও গায়ত্রী দেবীর অধরোষ্ঠ হাস্যবিভাসিত হইয়া উঠিল, তিনি তাহা গোপনার্থ ঈষৎ মুখ ফিরাইলেন। সুরুচির সুন্দর মুখখানি সলজ্জ হাসির আভায় উজ্জ্বলতর দেখাইল। যেন আকাশের একখানি শুভ্র মেঘের উপর ঊষার অরুণরাগ উদ্‌ভাসিত হইয়া পড়িল। সে ঘাড় নীচু করিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ মৃদুহাস্যে উত্তর করিল, "সুচারু বাবুর কবিতা প'ড়ে তা' অবশ্য মনে হয় না, কি সুন্দর লেখেন যে! আপনি ওঁর "কেয়া" "কদম্ব" আর "অতসী" নিশ্চয়ই পড়েছেন?"

সেই কোন্ ভোরে উঠিয়া এত মাইল পথ হাঁটা, ভাদ্র মাসের প্রখরতর রৌদ্রভোগ, তার উপর মদনা ডুলের ঘরের পাশের বাঁশঝাড়ের কাছে একটা জাতসাপ দেখা দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই সময় সেখানে গিয়া পড়ায় সাপটাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেই প্রকাণ্ড গোখুরা সাপটাকে বাঁশের বাড়ীতে মারা, আবার সেই সর্পমেধ লইয়া সমবেত জনতার সঙ্গে তুমুল তর্ক—এই সবেতে অনিমেষের বিলক্ষণ তৃষ্ণা পাইয়াছিল। সেই প্রকাণ্ড বড় কালো গোক্ষুর সাপটা যখন তার কুলোপানা চক্রটি তুলিয়া দাঁড়াইল, ভয়ে জনতা দশ হস্ত পিছু হটিল বটে, কিন্তু তাহাকে মারিবার ব্যবস্থায় কেহই সম্মত হইল না। সাপ না কি ব্রাহ্মণ, উহার নাশে ব্রহ্মহত্যার মহাপাতক হইবে, ফলে নির্ব্বংশ হওয়া অনিবার্য্য, কে এত বড় সর্ব্বনাশ ঘরে ডাকিয়া আনিবে? অনিমেষ অনেক করিয়া বুঝাইল, হিংস্র জীবের নাশে পাপ নাই, জানিয়া শুনিয়া না মারিয়া এই সাপ গৃহে বাস করাতেই বরং মহাপাতক সম্ভবে। যদি এর পর কাহাকেও সর্পাঘাত হয়, আপশোষের সীমা থাকিবে না। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাহার যুক্তিতে টলিল না, তাহারা বলিল, 'আরে মশাই! কতায় বলে সাপের নেখা আর বাঘের দেখা', অদেষ্টে না থাকলে কখন কাউকে সাপে খেয়েছে? আর বছরে যে বিশুদে'র বউকে আর খশুর খোকাকে সাপে খেলো, সে কি তাদের কপালের লেখন ছাড়া আর কিছু? তা হ'লে পাশেই শুয়েছিল বিশু, তাকে কেন খেলো না বলুন ত?'

অনিমেষ আর কিছুই বলিল না, সে তার সেই প্রকাণ্ড মোটা বাঁশের লাঠি তখন সেইরূপে গর্জ্জমান ফণীন্দ্রের মাথার উপর প্রাণপণ বলে বসাইয়া দিল।

ডুলে-পাড়ারই একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া অনিমেষের প্রায় গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়, চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে, "ও কালি গোক্ষুরা, কিষ্টকে ওই পথ দেখায়ে নিয়ে গিয়েছিল, ওরে আমি মারতে দিব নি।" ততক্ষণে দ্বিতীয় লাঠীর আঘাতে 'কালি-গোক্ষুরা'র উদ্যত ফণা মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে!

অনিমেষকে আজ একটু যেন ক্লান্ত করিয়াছিল, সরবৎটা সে এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া সুরুচির প্রশ্নের জবাব দিল,—"আমি যখন ওকে জানতুম, তখন ওর 'বনবীথি' ব'লে একটিমাত্র কবিতার বই ছাপা হয়েছিল, তার উৎসর্গটা—ও—"

সুরুচি সোৎসাহে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "জানি, আপনাকে করেছেন। তার মধ্যের ছটো লাইন খুব মজার আছে, না?—

'ভুল ক'রে ভালবাসিয়াছি, সাধ্য আর নাহি ভুলিবার,
দেখো বা না দেখ চেয়ে, লহো বা না লহো—
তোমারেই দিনু উপহার।'

আপনার মনে আছে?"

সুরুচির সঙ্গীতময় উচ্চারণ-ভঙ্গীতে অনিমেষ ঈষৎ যেন বিমুগ্ধতা অনুভব করিল। মেয়েলী গলার গানকে তার একান্ত ভয় ছিল। তার মনে হইত, সে সব গানই যেন এক সুরের, একঘেয়ে, তাল-লয় তার মধ্যে কমই থাকে, শুধু যেন একটা নাকি সুরের পদ্য বলা! সুরুচির এই দু'লাইন কবিতার আবৃত্তিতে সে যেন নারীকণ্ঠে এক নূতন সুর শুনিল। আধ মিনিট সে সেই সুরের রেশ-টুকুতে মগ্ন থাকিয়া তার পর সহজ সহাস্যে উত্তর করিল, "ছিল কি না, জানি নে, এখন মনে প'ড়ে গেল। আপনি কবিতা খুব ভালবাসেন, বুঝি?—নিজে লেখেন না?"

সুরুচির স্বাভাবিক হাস্যস্মিত মুখখানি এই প্রশ্নে একটুখানি যেন ভার ভার হইয়া আসিল। তার ঘন কালো পক্ষ্মে ঘেরা স্বচ্ছ দুটি কালো চোখ স্বতঃই আনত হইয়া আসিল, মৃদু অথচ ঈষৎ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে সে একটুখানি থামিয়া থামিয়া উত্তর করিল, "কবিতা আমি খুবই ভাল-বাসি, কিন্তু নিজে লিখি নে, লেখে দিদি।"

"দিদি"র উল্লেখ এই তাদের মধ্যে প্রথমবারের জন্য হইল। অনিমেষও ঈষৎ একটু গম্ভীর হইয়া পড়িয়া সংক্ষেপে মন্তব্য করিল,—"ওঃ"—

যে লোক তাদের বাড়ীতে দুদিনের আতিথ্য-গ্রহণের মধ্যে বারেকের জন্যও দেখা দিয়া তার পক্ষের আতিথ্যধর্ম্ম পালন করিল না, সে কোনমতেই তার সম্বন্ধে কোন প্রকারের আলোচনায় যোগদান করিতে পারে না, ইহা সমাজধর্ম্মের বিধিতেও বটে, হৃদয়ধর্ম্মের বিধিতেও বটে আঘাত করে। পদ্মমালার কাছে অনিমেষ আজ সকালেই গর্ব্ব করিয়া বলিয়া আসিয়াছে, 'ভিখারীর মনে অভিমান থাকে না', কিন্তু মনের মধ্যে তারও যে একটা অতি প্রচণ্ড গর্ব্ব সতেজে মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছিল, যে গর্ব্ব তাকে দিয়া ঐ কথাগুলাই বলাইয়াছিল, সে যে কোন মুকুটধারী রাজার সিংহাসন-গর্ব্বের চাইতে কিছুমাত্রও কম নয়, সে কথা সে হয় ত ভাবিয়া দেখে নাই বলিয়াই জানিতে পারে নাই। ধন-গর্ব্বের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, দারিদ্র-গর্ব্বও তার চেয়ে অল্প সাংঘাতিক নয়। অনিমেষের মত ভিখারীদের গর্ব্বহীনতার গর্ব্ব আবার অত্যন্ত বেশী মারাত্মক! তাই সুরুচির দিদির উল্লেখে অনিমেষ শুধুই একটি ছোট্ট করিয়া 'ওঃ' বলিল, অথচ ঐ দিদিটির কবিযশঃ-প্রার্থনার বিষয়ে কতই না কিছু জানিবার এবং আলোচনা করিবার রহিয়াছে! অর্থাৎ সুচারু কবি বলিয়াই তিনি কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, অথবা দু'জনেই কবি বলিয়া দু'জনকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন! আরও কত কি? কিছুই বলিল না।—"মান অভিমান হীন ভিখারী"র আত্মাভিমানে আঘাত পড়া কি সঙ্গত?

সুচারু আসিল, মাসীমা অনিমেষের খাবার দেওয়াইতে উঠিয়া গেলেন। সুচারু আসিয়াই সুরুচিকে আক্রমণ করিল—"কেমন, আমার বন্ধুটি তোমার পক্ষে বেশ রুচিকর বোধ হচ্ছে না? এই দেড় দিনেই তুমি ত ওকে অর্দ্ধগ্রাস করেছ দেখছি।"

সুরুচি আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভ্রূকুটিকুটিলনেত্রে সবেগে কহিয়া উঠিল, "আঃ, সুচারু বাবু! আপনার যা খুসী, আপনি বুঝি তাই বলবেন? যান্ আপনি!"

সুচারু একখানা বেতের মোড়া টানিয়া আনিয়া বসিতে বসিতে অনিমেষের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতের হাসি হাসিল, "শোন অনি! আমার আসাটা দেবীর পছন্দ হয় নি, পাছে তুমি কিছু মনে কর, তাই আমি কোথায় অছিমদ্দিকে কোনমতে পিটিয়ে পাটিয়ে থামিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলুম। বেশ, তোমাদের বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত হব না, প্রস্থানং কুরু কেশব ক'রে" বলিতে বলিতে সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরুচির দুই চোখ জলভরা হইয়া আসিল, সে সুচারুর দিকে বারেক চাহিয়াই চলনোদ্যত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি চল্লুম।"

"বাঃ! কি ছেলেমানুষ তুমি, সুরুচি! থামো, থামো, ফেরো ফেরো, লক্ষ্মীটি, ফিরে এসো, ঠাট্টা করছিলুম, বুঝতে পার না? নাও বসো, অনিমেষ! আচ্ছা,—তার পর তোমার এবারকার প্রোগ্রামটা কি?"

সুরুচি আসিয়া যথাস্থানে বসিয়াছিল, অনিমেষ ততক্ষণ সেইখানে পড়িয়া-থাকা একখানা মরক্কো-বাঁধানো খাতার পাতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। খাতাখানার পাতায় পাতায় অতি সুন্দর হাতের লেখায় মেয়েলী অক্ষরে কতক-গুলি খণ্ড-কবিতার সমষ্টি। অনিমেষের বোধ হইল, তার সব চাইতে শেষের কবিতাটির লেখার কালি যেন তখনও

ভাল করিয়া শুকায় নাই এবং কবিতাটির শেষচরণ তুটি পড়িলেই বুঝা যায়, ঐ কবিতাটি তখনও অসমাপ্ত। হয় ত তার এ বাড়ীতে আসার আগেই, হয় ত সে এ ঘরে সুরুচির সঙ্গে প্রবেশ করিবার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই এই কবিতার খাতার অধিকারিণী এইখানে বসিয়াই ঐ কবিতাটি লিখিতেছিলেন, হয় ত তাঁর এ ঘরের আসার সম্ভাবনা, হয় ত বা অন্য কোন অত্যাবশ্যক কার্য্যব্যপদেশে তাঁকে উন্মনা করিয়া এখান হইতে উঠাইয়া দিয়াছে। খাতার কথা হয় ত বা তাঁর মনেও ছিল না, আর না হয় ত খাতা লইয়া যাওয়ার আবশ্যকতা বোধ হয় নাই। অনিমেষ সেই শেষের কবিতার শেষ তুই ছত্র মনে মনে পাঠ করিল :—

বীরধর্ম্মে মনুষ্যত্বে দিয়ে জলাঞ্জলি, ফির দ্বারে দ্বারে,—
ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে বহি ; ধিক্ ! জননীর পূজা করিবারে !
মা তুলে নেবেন পূজা ? এত ক্ষুদ্র এত তুচ্ছ এত দীনতার
এই ভিক্ষান্নের থালি, কোন্ ভরসায় হাতে দিবে মার ?

অনিমেষের মুখ এক নিমেষেই যেন ছাই-ঢাকা পড়া আগুনের মত ম্লান নিষ্প্রভ হইয়া গেল, খাতার পাতা আপনা হইতেই তার হাত বন্ধ করিয়া দিল। তার বোধ হইল, সে লাঠী দিয়া আজই সে সেই কৃষ্ণসর্পকে বধ করিয়াছে, সেই প্রকাণ্ড ও বিষদাঁত-ফোটান লাঠীটার বাড়ী ঐ কবিতা-লেখিকা যেন তাহার কথায় তেমনই প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন। যে দিন হইতে এ পথে আসিয়াছে, অনেক শ্লেষ, বিদ্রূপ, তিরস্কার তাহাকে সহ্য করিয়া লইতে হইয়াছে, প্রথম প্রথম একটু চাঞ্চল্য আসিত ; এখন তাও আসে না, কিন্তু এই অন্তরালবর্ত্তিনী—তার বাল্যসুহৃদের ভাবী প্রেয়সী তাকে যেমন নির্ম্মম ঘৃণার কঠোর আঘাত প্রদান করিল, এমন আর কখনও কেহ পারে নাই। যেটুকু সংশয় ছিল, ফুরাইয়া গেল ; লজ্জাসঙ্কোচ এ সব কিছুই না ; সততই সে তার প্রতি গভীর ঘৃণায়ই তার সামনে দেখা দেয় নাই ! আর এই খাতাখানা এ ঘরে ফেলিয়া রাখা—এটাও কি তবে ইচ্ছাকৃত ?

এ গৃহের আর তুজন অধিবাসী কিন্তু তার এই ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। অনিমেষকে উত্তর-বিমুখ দেখিয়া সুচারু সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল যে, অনিমেষ তার সঙ্গে এ সব বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে অনিচ্ছুক, সে মনে মনে ঈষৎ হাসিল। আহা বেচারা ! তার পর সুরুচিকে প্রশ্ন করিল,——"শ্রীশ্রীমতী রুচি দেবি ! তোমার দিদির আজও মাথা ধরেছে না কি ?"

সুরুচি ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকাইয়া মৃত্তিরস্কারের ভাবে কহিল, "আচ্ছা, তুটো 'শ্রী' দেবার দরকার কি ? না, দিদির মাথা ধরে নি, রোজ রোজ মাথাই বা ধরবে কেন ? ওর পিঠে হঠাৎ একটা ফিক্‌ব্যথা ধরলো কি না—তাই বসতে পারলে না।"

সুচারু ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—"তা হ'লে ডাক্তারকে ত একবার ডাকানো দরকার ছিল। আমি রামধনিয়াকে পাঠিয়ে দিই, হরিপদ ডাক্তারকে একবার ডেকে আনুক গে।"

সুরুচি বলিল, "সে আমি বলেছিলুম, দিদি বারণ করলে, গরম জলের ব্যাগ দিয়েছে, বল্লে, ঐতেই সেরে যাবে।"

"তবু একবার ডাকা ভাল, আচ্ছা, আমি মাসীমার কাছে খবর লিখি।" বলিতে বলিতে সুচারু ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল। অনিমেষ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, এই 'ফিক্‌ব্যথা' রহস্যের মূল কোথায়, তাহা তার ভালরূপ জানা থাকা সত্ত্বেও সে একটিমাত্র কথা কহিল না। তার গর্ব্ব কি খর্ব্ব হইয়াছে ? ভিখারীরও মান অভিমান থাকে ?

পাশের ঘর হইতে মাসীমা ডাকিয়া বলিলেন, "রুচি ! অনিমেষকে ডেকে নিয়ে আয়, ভাত দেওয়া হয়েছে।"

৬

ছোটখাট বাড়ীখানি। স্থানে স্থানে চূণ-বালি খসিয়া পড়িয়া সুরকিমাখা ক্ষয়া ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে নোণা লাগিয়া ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে, নীচের দিক্‌টায় প্রায় বেশীর ভাগই কবেকার সেই প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের চূণকামকে চাপা দিয়া বহুতর-বর্ষীয় বর্ষার বিজয়-নিশানের নিশানাস্বরূপ পুরু সেওলায় সবুজ হইয়া আছে। উঠানে কোন কালেই শাণ বাঁধানো হয় নাই, তার এক পাশে একটা ছোট মাচায় কতকগুলি কুমড়া-লতা ; কাঁচা কাঁচা কুমড়া তাহাতে কয়েকটা দোল খাইতেছে। রান্নাঘরের ছাদে একটা লাউগাছ বেশ তেজ করিয়াই উঠিয়া গিয়াছে, সাদা সাদা ফুল তাহার গায়ে গায়ে অনেক ফুটিয়া আছে, ফল ফলিয়াছে কি না, দূর হইতে দেখা যায় না। মাচাটার তলার দিকে বেশ

খানিকটা জমী লইয়া অনেকগুলি ডেঙ্গোশাক, চাঁপানটে, পুদিনাপাতা এবং কাঁচা লঙ্কার গাছ। ঐ উঠানেরই একটি পাশে একটি ডাবা পোতা, হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি একটি রাঙ্গা গরু তাহাতে জাব খাইতেছে, আর তার অনতিক্রান্ত-শৈশব সুন্দর বৎসটির পানে মধ্যে মধ্যে সস্নেহ করুণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া আহ্বান জানাইতেছে "মুমাঃ!"—

বাড়ীখানি ছোট-খাট, গৃহস্থদের অবস্থা যে গৃহনির্ম্মাণের সময়াপেক্ষা কোন দিনই উন্নত হইতে পারে নাই, এ গৃহের পূর্ব্বাপর অবস্থা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। ইদানীং যে সে অবস্থাও অবনতির দিকে নামিয়া চলিয়াছে, তাহাও এর চেহারা দেখিয়া আন্দাজ করা অসঙ্গত নয়; কিন্তু একটি জিনিষ এ বাড়ীতে লক্ষ্য করিবার মত ছিল, তাহা বাড়ী, ঘর, উঠান, দালানের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া একটি স্নিগ্ধ সুন্দর নির্ম্মলতা। এর সমস্তটুকু যেন সযত্নে পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়া ইহার সকল দৈন্য—সমুদয় ত্রুটিকে ঢাকা দিয়া ফেলিবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা ইহার সর্ব্বত্র দিয়াই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে, এতই ইহা সুপ্রত্যক্ষ।

উঠানটি গোময়মৃত্তিকায় সুপরিচ্ছন্নভাবে নিকানো, ঘরের ভিতরে আসবাবপত্র কিছু আছে। মনে হয়, এই সে দিনে মাত্র সেগুলি ক্রীত হইয়াছে, কিন্তু এগুলির কেনার হিসাব লইতে গেলে হিসাবের খাতার পাতাখানি হয় ত কীটদষ্ট অথবা জীর্ণাতিজীর্ণ মূর্ত্তিতে খুঁজিয়া মিলিবে কি মিলিবে না, তাহা বলা দুষ্কর।

যে দিনে লোকে ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিয়া নিজের শোবার খাটের মধ্যের গুপ্ত বাক্সের মধ্যে নিজের সঞ্চিত ধন ন্যস্ত রাখিয়া তার উপর মাতুর বিছাইয়া শয্যা পাতিত, সেই যুগেরই একটি তক্তাপোসের উপর দুজনকার মত একটি বিছানা পাড়া। একখানি অনেক রংয়ের পাড়ের সূতা দিয়া অনেক রকমের সেলাই দেওয়া বড় কাঁথায় বিছানাটির আগাগোড়া ঢাকা। এই কাঁথাখানিই এ বাড়ীতে একটি দর্শনীয় বস্তু। কত দিনের কতখানি ধৈর্য্য লইয়াই যে রচয়িত্রী এই দেড়-পাট্টা কাঁথাখানিকে তৈরী করিয়াছেন, জিনিষটিকে চোখে না দেখিলে তাহা আন্দাজ করা যায় না। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সূজনীর মতই এর সরু কায। সেই মিহি সেলাইএর দোরখা কাযে হাতী, ঘোড়া, সিপাই, খেজুর ও নারিকেল গাছ, কলাঝাড়, পদ্ম ও কহ্লারপুষ্পযুক্ত ঘাট-বাঁধানো পুষ্করিণী, তার চারি কোণে চারিটি বিচিত্র শিবমন্দির, জগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা, নাগরদোলা কোন কিছুরই ইহাতে অভাব রাখা হয় নাই।

দেওয়ালের গায়ে কোণাকুণি করিয়া টাঙ্গানো আছে একটি কড়ির আন্‌লা। কাটা-সালুর খোপা দেওয়া সাদা সাদা ঘিঁচি কড়িগুলি এর এখনও পর্য্যন্ত তাদের স্বাভাবিক বর্ণ হারাইতে পায় নাই, আল্‌নায় যে সাড়ী প্রভৃতি সাজানো আছে, বাজার দরে তারা নিকৃষ্ট হইলেও পরিচ্ছন্নতায় তাদের কোনই ত্রুটি লক্ষিত হয় না। কড়িকাঠ হইতে চারগাছি সালু-জড়ানো দড়িতে একটি রঙ্গীন দড়ির জালির মধ্যে শীতকালের জন্য কতকগুলি লেপ একটি ফরসা কাপড়ে জড়াইয়া তোলা আছে। একধারে একটি বড় চৌকোণা কাঠের সিন্দুক, তার কাঁঠাল-কাঠের উজ্জ্বল হলুদরংটি যেমন তেমনই টুক্‌টুক্ করিতেছে। তার উপর একটি ছেঁড়া সাড়ীর পাড়জোড়া ঢাকন দিয়া কয়েকটি ছোট হাত-বাক্স প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। আর এর ঠিক পাশটিতেই একখানি মাঝারি জল-চৌকিতে একটি ঝক্‌ঝকে মাজা পিতলের পিলসুজের উপর প্রদীপ আর তেমনি করিয়াই ঔজ্জ্বল্য বিকিরণ করিতেছিল একজোড়া মসলা-সজ্জিত পাণের বাটা। একটি সরপোষ-লাগানো পরীযুক্ত হুঁকাদানীতে রক্ষিত একটি বাঁধা হুঁকা, পাণের ডিবা, জলের গ্লাস এমনই অত্যাবশ্যক ঘরগৃহস্থালীর কতকগুলি সামান্য সামান্য দ্রব্যসামগ্রী, অথচ এই সমস্ত গৃহকার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকে—এই দুইটি মা ও মেয়ে;—পদ্মমালা আর তার বিধবা মা। দাসদাসী তাদের ঘরে একটিও নাই, রাখার যোগ্যতাও ছিল না, আবশ্যকবোধেরও অভাব ছিল। ভোরের বেলা উঠিয়া রাত্রি এক প্রহর দেড় প্রহর কাল পর্য্যন্ত অনায়াসে ও অবলীলাক্রমেই তারা দুই মাতা-পুত্রীতে এ সংসারের সকল আবশ্যক অনাবশ্যক প্রত্যেক কর্ম্মটি অতি শ্রদ্ধার সহিত যেন দেবারাধনার মত করিয়াই সম্পন্ন করিত, এতটুকু আলস্যবোধ ছিল না, বিরক্তিবোধ ছিল না।

গীতা হয় ত তারা পাঠ করে নাই, কিন্তু তাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী দেখিলে বোধ হয়, যেন গীতাকারের নির্দ্দেশ

তাহারা বুঝিয়াছিল। তেমনই শ্রদ্ধা, তেমনই প্রীতি, তেমনই ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মসুখেই তন্ময় থাকিয়া কর্ম্ম করা।

জীবনবন্ধু গড়গড়ির জীবনে এখন অপরাহ্নেরও অবসানে সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে। ষাটের কোটা পার হইলেই বৃদ্ধত্বপ্রাপ্তি, তারও মধ্যে বাহাত্তর পর্য্যন্ত এ যুগের প্রথম সীমা নির্দ্দিষ্ট ; বাহাত্তরের পর আর এ দেশে ঐ জীবটির কাছে কোনই দাবীদাওয়া করার থাকে না, তখন অপক্ষয়ের প্রভাবে বৃদ্ধত্বের পূর্ণ প্রকোপ তাহাকে প্রায় আবার বালকত্বে, এমন কি, কখন কখনও শিশুত্বেও পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতেও অপারগ হয় না। জীবনবন্ধুর বিলীন-মায়ালোক জীবনসন্ধ্যা আবার যেন তাঁর অতি শৈশবের সেই অর্দ্ধস্ফুটিতালোক উষাকালের অতীত স্বপ্নকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। সারা জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝার অবসানে ক্লান্তি-শ্রান্ত প্রকৃতির মূর্চ্ছাতুর বিরামের মতই তাঁরও সংগ্রাম-পূর্ণ অবসানোন্মুখ জীবনের শেষভাগটা ঐ রকমেরই একটা তাঁর অবসাদময় অর্দ্ধ-বিস্মৃতির জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিল। জমীদারের সেরেস্তার কায করিয়া যে অর্থ তিনি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, জমীদার-বাড়ীতেই তার শেষ কপর্দ্দকটিকে শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়া ভগ্ন-দেহমনে এই পরিত্যক্ত পল্লীগৃহে যে দিন ফিরিয়া আসেন, মনের উপর এই বিস্মৃতির জাল সেই দিনই নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। পদ্মমালা তখন সাত বছরের, এখন তার বয়স তেরো। পদ্মমালার বাপের কথা পদ্মমালার মনে পড়ে না, জ্ঞানের উদয় হইয়া অবধি সে তার মাকে এই রকমই থান-ধুতী পরা, হাত শুধু এবং নির্জ্জলা একাদশী করিতে দেখিতেছে। বাড়ীতে তাদের মাছ-মাংস আসিতে সে কোন দিনই দেখে নাই ; নিজেও খাইতে পায় না ; জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইয়াছিল যে, তারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবকে জীবহিংসা করিতে নাই, তাই বৈষ্ণবে মাছ খায় না। তা তার ঠাকুরদাদার গলায় এক লহর তুলসীকাঠের মালা পরা আছে বটে, ভিক্ষা করিতে আসে যে রকম বৈরাগী, তার গলাতেও এই রকমই আছে।

অতীতের কতকগুলি কথা পদ্মর মনের মধ্যে একটা সুখস্বপ্নের স্মৃতির মতই আধভাঙ্গা ঘুমঘোরের ভিতর দিয়া যেন উঁকি মারিত। আধ ফোটা ফুলের কাছে মৌমাছিরা যেমন গুঞ্জন করিতে গিয়া ফিরিয়া আসে, তেমনই করিয়াই তার অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন শৈশবস্মৃতির মধ্য হইতে কি একটা অস্ফুট মৃদু গুঞ্জন সে সময়ে অসময়ে আচম্‌কা শুনিতে পায় ; আবার অজানা ভাষার অবোধ্য সঙ্গীতের মতই সে ধ্বনি যেন কূলহারা তরঙ্গের মতই তার বুকের মধ্যে মিলাইয়া যায়, কোন একটা নির্দ্দেশ, কোন একটা আলম্বন সে পায় না। মাকে এক দিন সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, আমরা তখন কোথায় ছিলুম, মা?" মা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "সে একটা অন্য দেশে।"

পদ্ম যেন কতকটা আশান্বিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "সে কোন্ দেশ?—সে দেশের নাম কি, মা?"

মা আবারও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলেন, পরে মেয়ে পুনঃ প্রশ্ন করিলে কেমন যেন একটু বিব্রত বিপন্নতায় কথা চাপা দিবার মত করিয়াই শুষ্কভাবে জবাব দিলেন, "আমার সে মনে নেই, সে সব অনেক দিনের কথা কি না। তুমি যাও দেখি, দেখে এস, তোমার ঠাকুর্দ্দা উঠেছেন কি না, উঠে থাকেন ত ওঁর জলখাবার আর ছেঁচা পাণটুকু নিয়ে যাও। জান ত, দেরি হ'লে রেগে কুরুক্ষেত্র বাধাবেন।"

পদ্মর প্রমোদিত চিত্ত সহসাই মুদিত হইয়া গেল,—সে তার নিজেরও বোধ করি অজ্ঞাতেই একটা অনতিদীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক নিঃশব্দে আজ্ঞা পালন করিতে চলিয়া গেল। সে ছেলেমানুষ এবং অত্যন্ত সরল হইলেও সে দেখিয়াছে, তার ছোটবেলার কোন কথা, তাদের অতীত দিনের ইতিবৃত্ত কোন কিছুই সে তার মা'র মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইতে পারে না। অথচ আর সমস্ত ছেলে-মেয়ের মতই নিজের বিস্মৃত শৈশবের আলোচনা করার জন্য প্রাণ তার ভিতরে ভিতরে ছটফট করিয়া খুন হয়। কার হয় না?

মেয়েটি কিন্তু এ দিকে বড় লক্ষ্মী। পৃথিবীতে তার আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যে এই ত এই দুজন। একটি অতিবৃদ্ধ জরা ও বিকলচিত্ত পিতামহ, আর একটি স্বল্প-ভাষিণী এবং স্বল্প-ভাষিতার দোষে পাড়াপড়সীদের নিকট হইতেও প্রায় পরিত্যক্তা এই নিরত কর্ম্মপরা যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ এই মা। মেয়েটি কর্ম্মিষ্ঠা, চঞ্চলা এবং সুপ্রচুরতররূপে মনোবৃত্তি-শালিনী ; এই গুণে পাড়ার সকলেই তার মাকে 'ঠেকারে' বলিয়া অপছন্দ করিয়া থাকে, তারাই ইহাকে অন্তরের সহিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। পাড়ার পুরুষ সকলেই

পদ্মর কাকা, দাদা, জ্যেঠা এবং ঠাকুরদাদা, পাড়ার মেয়ে সকলেই পদ্মমালার আপন জন। পদ্মর পিসী-সম্পর্কীয়া কেহ কেহ পদ্মর মাকে ঠেস্ দিয়া দিয়া বলিত, "তুমি না মিশলে হবে কি, আমার ভাইঝি ত আর পর নয়, সে যে ডেকে আনে, তাই আসি।"

পদ্মকে ভালবাসে না, এমন মেয়ে-পুরুষ এই জলার গাঁয়ে নাই।

সে দিনও রবিবার। শরতের আকাশে স্বচ্ছ নীলিমার উপর শুক্তিশুভ্র মেঘমালা ইচ্ছাসুখে যথেচ্ছ ভ্রাম্যমাণ হইয়া রহিয়াছে। হয় ত কেহ অলকায়, হয় ত কেহ আরও দূরে চলিয়াছে। সূর্য্যের আলোয় তাদের অঙ্গ বৈদূর্য্যমণিখচিত হইয়া উঠিতেছিল। বেলা বেশী হয় নাই, পদ্মমালা সে দিন সকল দিনের অপেক্ষা সকাল সকাল কাযকর্ম্ম—বাসন মাজা, সকল কিছু সারিয়া বারবারই ঘরবার করিতেছিল। সে দিন যে অনিমেষের হাঁড়ির চাল লইবার জন্য আসার দিন, সে কথা এ কয় দিনে সে একটিবারের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। বরং প্রত্যহ একবার করিয়া হিসাব করিয়াছে যে, সাত দিনের আর কয় দিন কয় ঘণ্টা কাটিতে বাকী আছে। তার রকম দেখিয়া মা যে মা, সহজে যিনি হাসেনই না, তিনিও সে দিন হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—"চাল দিবি দে—দেবার ব্যাগ্রতায় পায়ের বাঁধন ছুটোও কি ছিঁড়ে দিবি? চাল নিতে সে এলে পরে তোকে ডাক্‌বে, স্থির হয়ে দুদণ্ড বোস।"

মা'র কথায় পদ্ম অপ্রতিভ হইল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল, তার পর উঠিয়া একটা টুল টানিয়া আনিয়া দরজার সরদাল হইতে এক চুপড়ি পাজা তুলা ও কয়েকটা নলি নামাইল, কোথা হইতে একটা চরকা বাহির করিল, করিয়া একমনে বসিয়া খানিকটা সরু সূতা কাটিল। তার পর তার আর ভাল লাগিল না, সে সকল বস্তু যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়া সে এক লাফে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, বোধ করি, মাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়া আসিল,—"চরকার ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে বুঝি কখন কেউ বাহিরে থেকে ডাক্‌লে শোনা যায়? বা রে, যদি তিনি সাড়া না পেয়ে ফিরে যান?"

মা শিলে ডাল বাটিতেছিলেন, তাঁর ঠোঁটের পাশে ঈষৎ একটুখানি হাসির টিপ্ পড়িল। মা ত মেয়ের মত অনভিজ্ঞ শিশুচিত্ত নহেন, পাকা সংসারী। ভিখারী যে কত সহজে ভিক্ষা ছাড়িয়া যায়, মেয়ে না জানিলেও মা তা জানেন।

পদ্ম আসিয়া তার অবাধ্য খোলা চুলের একটা ঝাপ্‌টা চোখ-মুখের উপর হইতে হাতের এক ঝট্‌কায় পিছনদিকে ঠেলিয়া দিয়া উৎসুক স্মিতমুখে রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। অদূরে ঐ কে এক জন না—এই দিক্ পানেই আসিতেছে? হঁ্যা, আসিতেছেই ত! নিশ্চয় সেই—সেই তিনি। ভিতরে দৌড়িয়া গিয়া—হাঁড়ি-ভরা চাল প্রাণপণে বহিয়া আনিল। ইহাতে চৌদ্দ মুঠির পরিবর্ত্তে বোধ করি চুয়াল্লিশ মুঠিরও কিছু বেশী বেশী চাল রাখা হইয়াছিল। মা বারণ করিলেও সে কোনমতে শোনে নাই। অবশেষে ঠাকুর্দ্দার সম্মতি লইয়া আসিয়া এই হাঁড়ি ভরিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, যে আসিতেছিল, সে সেই হাঁড়িওয়ালা ভিখারী নয়, এই গাঁয়েরই রতন বৈরাগী। পদ্মকে দেখিয়া রতন রাস্তা ছাড়িয়া তাদের বাড়ী ঢুকিল এবং "জয় রাধে গোবিন্দ!" বলিয়াই খঞ্জনীতে তাল দিয়া গান ধরিল—

"যশোমতী গো! কালুর তোমার জাত গিয়েছে।
ওই, শিকেয় ছিল হাঁড়ি, তাতেই তরকারি,
চেটে পুটে গোপাল সব খেয়েছে।
—কি গো, মা জননি! হাঁড়িতে কি আছে, মা?
সন্দেশ না গোল্লা?"

"না বৈরিগী দাদা! ও সব কিছু নেই, তুমি দাঁড়াও, তোমার জন্যে ভিক্ষে নিয়ে আস্‌ছি।" পদ্ম নিতান্ত নিরুদ্যম-ভাবেই ভিতরে চলিয়া গিয়া হাঁড়ি রাখিয়া এক বাটি চাল আনিয়া বৈরাগীর প্রসারিত ঝুলিতে ঢালিয়া দিল। অন্য দিন সে ফরমাস দিয়া দিয়া বৈরাগীর যা কিছু সঞ্চয় প্রায় সকল কটি গান শুনিয়া লইয়া তাকে প্রায় নিঃস্ব করিয়া ছাড়িয়া দেয়। আজ তার নূতনত্বের স্বাদপ্রাপ্ত উৎসুক চিত্ত পুরাতনের প্রতি একটা তিক্ততা অনুভব করিল। গানের জন্য সে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। রতন কিছু বিস্ময় বোধ করিল। গান ত অম্‌নি শোনায় না, যেমন গান গায়, তেম্‌নি আলুটা, পটলটা, একখানি কুমড়া, হইল একটুখানি লেবুর নিম্‌কী বা তেঁতুলের ছড়া অরুচির দোহাই দিয়া চাহিয়া লইল, কোন দিন একটা পয়সা। ক্ষুণ্ণ হইয়া সে বলিল,—"কি মা! আজ আর গান শুনবে না?"

পদ্ম বলিল, "আজ থাক বৈরাগী দাদা! আস্‌ছে রবিবারে বেশী ক'রে শুন্‌বো।" সে পথের দিকেই চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

উত্তরটা রতনের মনঃপূত হয় নাই, সে খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু গুঞ্জন তুলিয়া অনুদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল,—

"একটা নতুন গান শিখেছি, শুনিয়ে যাই, শুন্‌তে ভালবাস, তাই শোনাতেও ভাল লাগে।" বলিয়া আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই গান আরম্ভ করিয়া দিল,—

"বৌকে কিছু বলিস্‌নে ভাই বড় দাদা।
বৌয়ের ধান ভেনে ভেনে পা গোদা।"

গান শুনিয়া পদ্মর সমস্ত ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ কোথায় যেন ভাসিয়া গেল। সে গান শুনিতে শুনিতে হাসিয়া লুটোপুটি খাইল, তার পর গান শেষ হইলে ছুটিয়া গিয়া বৈরাগীর অনেক দিনের তাগিদ দেওয়া একখানি পুরাতন ধুতী আনিয়া তার হাতে দিয়াছে, এমন সময় তার কাণে ঢুকিল,—"এই যে, দেখুন, তা হ'লে বাড়ী ভুল করি নি? কৈ, আমার চাল কৈ?"—

যেন কি নিধি পাইল, এম্‌নি করিয়া পদ্ম গিয়া সেই ভর্ত্তি হাঁড়ি চাল আনিয়া অনিমেষের সাম্‌নে ধরিয়া দিল। তাই দেখিয়া হাঁড়ির মত বড় এবং হাঁড়ির তলার মত কালো মুখ করিয়া রতন বৈরাগী ফর্‌-ফর্‌ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। তার বিশ্বাস হইল, এই সবল সুস্থ দৃঢ়দেহ পালোয়ানের মত চেহারার বাবুটি তার এ বাড়ীর বাঁধা অন্নের হন্তারক হইয়াই এখানে দেখা দিয়াছে।

অনিমেষ একনিমেষে হাঁড়িটার দিকে চাহিয়া লইয়া হাসিমুখে মুখ তুলিয়া বলিল,—"আপনার হাতের মুঠোগুলি ত দেখ্‌ছি, এ গাঁয়ের সন্ধার চাইতেই বেশ বড় বড়! বাঃ, সন্ধার যদি এমন হতো! যাই হোক, আপনাদের ঐ ডোবাটি আমি না কেটে আর থামছি নে। আচ্ছা, আপনার বুঝি ঠাকুর্দ্দা আছেন? মা? নিয়ে চলুন ত তাঁর কাছে, তাঁর অনুমতিটা নিয়ে রাখি, যত শীঘ্র সম্ভব কাযটা আরম্ভ ক'রে ফেলতে চাই।"

শুনিয়া খুসীতে মুখখানি ভরাইয়া তুলিয়া পদ্মমালা তার সাম্‌নে অগ্রসর হইয়া কহিল, "আসুন, কিন্তু ঠাকুর্দ্দার শরীর ভাল নয়, বুড়ো হয়েছেন কি না, খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে না বল্লে অনেক কথাই বুঝতে পারেন না, আচ্ছা চলুন, আপনি না পারেন, আমি ত আছি।"

"বেশ, তাই ভাল।" বলিয়া অনিমেষ তার ঝোলার মধ্যে হাঁড়ির চালগুলা ঢালিয়া লইয়া ঝোলাকাঁধেই পদ্মর প্রদর্শিত পথে তাদের বাড়ী ঢুকিল। পদ্মমালা হাঁড়িটা লইয়া তার আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতে চলিতে তার এলোচুলে ভরা হাসিভরা ছোট্ট মুখখানি ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল,—"দেখুন, ঠাকুর্দ্দা হঠাৎ বড় রেগে ওঠেন, হয় ত আপনাকে খুব বকুনিও দিতে পারেন, আপনিও যদি রেগে যান?"

অনিমেষ হাসিয়া ফেলিল, সে হাসিয়া বলিল, "আমি রাগি নে। রাগ মানেই অভিমান, ভিখারীর কি মান অভিমান থাকে?"

পদ্ম চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছুতেই রাগেন না?"

অনিমেষ কেবল হাসিল, জবাব দিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ভাগ্য-পরিবর্ত্তন

(সত্য ঘটনা)

অনেকে মনে করেন, চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা জীবনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু জীবনে সাফল্যলাভ যে অনেক সময় ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলে মানুষের ধূলা-মুঠা কিরূপে সোনা-মুঠায় পরিণত হয়, নিম্নলিখিত বিবরণটি তাহার অকাট্য প্রমাণ। ইহা কাল্পনিক গল্প নহে; এই সত্য ঘটনার বিবরণটি সংপ্রতি কোন বিখ্যাত বিলাতী মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে; লেখক ইংরাজ, তিনি তাঁহার আত্ম-কাহিনী এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন :---

"আমি লণ্ডনের কোন বণিকের আফিসে চাকরী করিতাম। চারি বৎসর চাকরী করিয়া যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, চাকরী হারাইয়া সেই সম্বলে নির্ভর করিয়া কয়েক মাস অতিবাহিত করিলাম।

সংপ্রতি কিছু দিন হইতে যে পৃথিবী-ব্যাপী অর্থ-সঙ্কট আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রভাবে সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর কাযকর্ম্মের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বাজার মন্দা দেখিয়া অনেক ব্যবসায়ী কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই জন্য ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আমাকেও পদচ্যুত হইতে হইল। আমি একটি নূতন চাকরী সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উমেদারের সংখ্যা এত অধিক ও চাকরীর সংখ্যা এত অল্প যে, আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল। আমি ফরাসী, জর্ম্মাণ ও ইটালিয়ান ভাষা জানিতাম। কেরাণীগিরিতে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল; কিন্তু দীর্ঘকালের চেষ্টাতেও চাকরী মিলাইতে পারিলাম না।

অতঃপর লণ্ডনে বাস করা আমার অসাধ্য হইয়া উঠিল। আমার দেহ সুস্থ ও সবল ছিল, আমি বিদেশ-ভ্রমণের অনুরাগী ছিলাম এবং সংসারে আমার কোন বন্ধনও ছিল না, এ জন্য আমি সঙ্কল্প করিলাম, দেশান্তরে গিয়া চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি এক দিন আমার ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলাম। ব্যাঙ্কে তখনও আমার চুরাশী পাউণ্ড ৯ শিলিং ৩ পেন্স সঞ্চিত ছিল। সেই সমস্ত টাকাই আমি ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইলাম এবং ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চাকরীর চেষ্টায় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

যাহারা দেশভ্রমণে সাহায্য করে, এরূপ একটি এজেন্সীতে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের নিকট একখানি টিকিট কিনিলাম। সেই টিকিটে আমার প্যারিস, বার্ণি ও মিলান ঘুরিয়া জেনোয়া পর্য্যন্ত যাইবার ব্যবস্থা ছিল। এতদ্ভিন্ন আমি কুড়ি পাউণ্ডের ফ্রাঙ্ক সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট টাকা হুণ্ডী করিয়া দেশান্তরে পাঠাইলাম। তাহার পর লণ্ডনের বাসায় ফিরিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি একটা প্রকাণ্ড ব্যাগে পূরিয়া লইলাম, এবং অবশিষ্ট জিনিসপত্রগুলি বাড়ীওয়ালীর জিম্মায় রাখিয়া ব্যাগটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

পরদিন আমি ভিক্টোরিয়া হইতে ডোভার ও ক্যালের পথে প্যারিসে যাত্রা করিলাম। প্যারিসে উপস্থিত হইয়া আমি গারে সেণ্ট লাজেয়ারের নিকট একটি হোটেলে একটি কামরা ভাড়া লইলাম এবং এক সপ্তাহ প্যারিসে থাকিয়া চাকরীর চেষ্টা করিলাম। এই এক সপ্তাহে প্যারিসের দর্শনযোগ্য সকল দৃশ্য দেখিলাম বটে, কিন্তু চাকরী জুটিল না। অতঃপর প্যারিস হইতে আমি সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণিতে উপস্থিত হইলাম। বার্ণির নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহ ও সুখস্পর্শ সূর্য্যালোক উপভোগ করিয়া আরও এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিলাম। তাহার পর আল্পস্ গিরিমালা অতিক্রম করিয়া ও লম্বার্ডির সমতলক্ষেত্র পার হইয়া মিলানে আসিলাম, এবং মিলান হইতে এক সপ্তাহ পরে জেনোয়ায় উপস্থিত হইলাম। আমি প্রত্যেক নগরেই চাকরীর চেষ্টার ত্রুটি করিলাম না, কিন্তু সময়ের প্রতিকূলতায় কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। আমার সঞ্চিত অর্থ ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে আমার চাকরীর আশাও হ্রাস হইতে লাগিল।

টাকা ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া আমি স্থির করিলাম, জেনোয়া হইতে ফ্রান্সের নাইস নগরে আমি চারি সপ্তাহে হাঁটিয়া যাইব। জেনোয়া নগরের দৃশ্য-বৈচিত্র্য দর্শনে আমি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম; এইরূপ মনোজ্ঞ নগরে চাকরী জুটাইতে না পারায় আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। তাঁজকরা একটা বস্তা এবং একগাছ মোটা লাঠি লইয়া আমি জেনোয়া ত্যাগ করিলাম। আমি ভূমধ্যসাগরের তটপ্রান্তবর্ত্তী পথ ধরিয়া সুদৃশ্য নগরসমূহের ভিতর দিয়া ৩৪ দিন ভ্রমণ করিলাম, এই ভ্রমণে যে আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়। আমার সঙ্গে যে লগেজ ছিল, তাহা জেনোয়ার একটা ডিপোতে রাখিয়া ডিপোদারকে বলিয়া আসিয়াছিলাম—ভবিষ্যতে আমি যেখানে পাঠাইতে লিখিব, সেই স্থানে সে তাহা পাঠাইয়া দিবে।

আমি ভলট্রি, সাভোনা, আলাসিও, সান রেমো এবং বর্দ্দিঘেরার ভিতর দিয়া ইটালীয়-ফরাসী সীমান্তে সেণ্ট লুই নগরে ভ্রমণ শেষ করিয়া মন্টিকার্লো, এজে ও নাইসে পদার্পণ করিলাম। এই সময়ে আমার শেষ সম্বল ১৯ পাউণ্ড, ৬ শিলিং, ৪ পেন্স! তথাপি আমি নিশ্চিন্তমনে দিনের পর দিন উজ্জ্বল রবিকরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। রাত্রিকালে আমি কোন সুলভ হোটেলে বা গ্রাম্য পান্থ-নিবাসে বিশ্রাম করিতাম। এক দিন আমি একটি পুরাতন পরিত্যক্ত মঠে রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম, আর দুই রাত্রি একটি জলপাই-ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াছিলাম; আমার মস্তকের উপর নক্ষত্র-নিকর-খচিত নীল চন্দ্রাতপ প্রসারিত ছিল। আমি কখন জলপাই বা কমলাক্ষেত্রে বসিয়া, কখন সমুদ্রতটে আসিয়া জলযোগ শেষ করিতাম। আমার আহার্য্য দ্রব্যের পরিমাণ অল্প হইলেও তাহা স্বাস্থ্যজনক। উজ্জ্বল রৌদ্রে ও মুক্ত বায়ুপ্রবাহে ভ্রমণ করিয়া আমার মুখের বর্ণ লোহিতাভ হইয়াছিল, আমার দৈহিক বল ও পরিশ্রমের শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অবশেষে নাইসে উপস্থিত হইয়া স্থির করিলাম, যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে দিনপাত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমি পুরাতন পার্ব্বত্য নগর ও গ্রাম-সমূহে বাসের সঙ্কল্প করিলাম। সেই সকল স্থানে খাদ্যসামগ্রী অপেক্ষাকৃত সুলভ।

আমি ভ্রমণ করিতে করিতে একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম; সেই গ্রামের নাম ট্রিনিটি ভিক্টর। সেই গ্রামের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে একটি সুদৃশ্য পুরাতন ভজনালয় দেখিতে পাইলাম। সেই ভজনালয়টির নাম "চ্যাপেল ডিলা ম্যাডোন ডি বনভয়েজ।" পথের ধারে একটি বৃদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহাকে এই নামটির তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি যে পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই পথটি পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে, পূর্ব্বকালে এই পথটি বিপৎসঙ্কুল ছিল, এই জন্য পথিকরা এই পথে চলিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মেরী মাতার আশীর্ব্বাদপ্রার্থনার প্রথা ছিল। এই প্রথাটি আমার এরূপ উৎকৃষ্ট মনে হইল যে, আমিও সেই ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া আমার আরব্ধ ভ্রমণের জন্য দেবীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলাম।

সেই দিন অপরাহ্ণে আমি কর্ণেস্ নামক গ্রামে পদার্পণ করিলাম। গ্রামখানি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। আমি স্থির করিলাম, যদি এই গ্রামে বাসের উপযুক্ত স্থান পাই, তাহা হইলে সেই স্থানেই বাস করিব। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, তখন আমার যে সামান্য অর্থ শেষ সম্বল ছিল, তাহা যথাসম্ভব অল্পপরিমাণে ব্যয় করিলেও তিন মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইবে।

আমি একটি পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পুরাতন খিলানের তলা দিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলি অতিক্রম করিলাম। তাহা পুরাতন ভজনালয় পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই স্থানে আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, অতি অল্প ভাড়ায় দুইটি কামরা বাসের জন্য পাইতে পারি; সেই কামরা দুইটি যে অট্টালিকার এক প্রান্তে অবস্থিত, তাহা ছয় শত বৎসরের পুরাতন সৌধ।

সেই অট্টালিকার অবশিষ্টাংশ এরূপ পুরাতন ও জীর্ণ যে, তাহা বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য; কিন্তু উক্ত কামরা দুটি তখন পর্য্যন্ত বাসের অযোগ্য হয় নাই, তাহা দেখিয়া আমার ত ভালই মনে হইল। তাহার পাষাণময় দেওয়ালগুলি অনাবৃত ও চুণকাম করা। প্রতি কক্ষে এক একটি বাতায়ন ছিল, তাহা স্থূল গরাদে দ্বারা সুরক্ষিত। কক্ষ দুইটির অভ্যন্তরে জিনিষপত্র কিছুই ছিল না, কেবল একটি কক্ষের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র বেদী ছিল। অন্য কক্ষের দেওয়ালে একটি কাঠের ক্রশ সিমেণ্ট দ্বারা আবদ্ধ ছিল; কিন্তু ক্রশটি কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। ক্রশটি প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ এবং প্রায় ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত।

সেই কক্ষ দুইটি দেখিয়া আমার ধারণা হইল, এক সময় তাহা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের বাসকক্ষ ছিল অথবা তাহা কোন মঠেরই অংশ ছিল। মধ্য-যুগের কোন ভজনালয়ের পবিত্রতা তখনও যেন সেই কক্ষ দুইটিতে বর্ত্তমান।

আমি সেই দুই কক্ষ এবং তৎসংলগ্ন একতলার তিনটি প্রকোষ্ঠ ভাড়া লইলাম। সেই তিনটি প্রকোষ্ঠও খালি পড়িয়া ছিল। তাহা ভাড়া লইবার পর সেই দুইটি বাসোপযোগী করিবার জন্য কিছু কিছু আসবাব-পত্র কিনিয়া আনিলাম। কয়েকটি খুঁটি ও তক্তার সাহায্যে আমি একখানি খাটিয়া প্রস্তুত করিলাম। এতদ্ভিন্ন খালি প্যাকিং বাক্সের তক্তাগুলি খুলিয়া লইয়া ব্যবহারযোগ্য কয়েকটি আসবাবও প্রস্তুত করিলাম। আমি তিন মাসকাল সেই স্থানে বাস করিলাম। আমি অবসর-কালে অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের ধারে বা নিকটবর্ত্তী গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

সেই দিনগুলি কি সুখেই কাটিয়াছিল! নিকটে একটি পুরাতন ঝরণা ছিল, ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গ্রাম্য রমণীগণ সেই ঝরণা হইতে জল লইয়া তাহাদের কলসী পূর্ণ করিত, আমি দূরে দাঁড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতাম। কখন গ্রাম্য বৃদ্ধদের সহিত গল্প করিতাম, বালকবালিকাদের সঙ্গে গল্পে, খেলায় ও নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতাম। সেই সরল পল্লীজীবন আমার বড়ই ভাল লাগিত।

কিন্তু কোন আনন্দই চিরস্থায়ী হয় না, বিশেষতঃ মানুষ যখন নিঃসম্বল হয়। অবশেষে দেখিলাম, আমার শেষ সম্বল ২ পাউণ্ড ১৬ শিলিংএর অধিক নহে। এই সময় আমার সর্ব্বক্ষণই মনে হইতে লাগিল, লণ্ডন ছাড়িয়া আসিয়া কি মূঢ়ের কাজই করিয়াছি, দূরদেশে আসিয়া পড়িয়া আশাহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন কাটাইতেছি, যাহা কিছু সম্বল, সমস্তই নিঃশেষিত হইল, কোথাও চাকরীও জুটাইতে পারিলাম না। আমার অবস্থা কি শোচনীয়!

পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি আমার ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম, এবং জীবনে বীতস্পৃহ হইলাম। আমার খানা প্রস্তুত করিয়া যথানিয়মে শয্যাদি পাতিয়া রাখিলাম। তাহার পর বাহিরে যাইবার জন্য পোষাক পরিতে লাগিলাম। যে সময় আমি গলায় কলার আঁটিতেছিলাম, সেই সময় কলারের বোতামটি আমার হাত হইতে পদপ্রান্তে খসিয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইল। আমি তাহা কোন স্থানে খুঁজিয়া পাইলাম না, তখন অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমি ভারী পাইন-কাঠ দিয়া একখান আগড়া চেয়ার প্রস্তুত করিয়াছিলাম, চেয়ারখানা আমার পথরোধ করিয়া পড়িয়া ছিল, আমি সেখানিকে ধাক্কা দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেই তাহা সবেগে দেওয়ালে প্রতিহত হইল। সেই ধাক্কায় দেওয়ালটি এরূপ জোরে কাঁপিয়া উঠিল যে, পূর্ব্বোক্ত কাঠের ক্রশখানি দেওয়াল হইতে খসিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

আমি সেই ক্রশখানি তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহা সেগুন বা ঐ জাতীয় কোন কঠিন কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ক্রশটি বহু পুরাতন। উহার পশ্চাদ্ভাগ একটু যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত, এই সংখ্যাগুলি সুস্পষ্টরূপেই ক্ষোদিত ছিল।

আমি ক্রশখানি আমার শয্যায় ফেলিয়া রাখিয়া আর একটি বোতাম খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইলাম, এবং তাহার সাহায্যে কলার আঁটিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। কিছু কাল

বেড়াইয়া কয়েক খণ্ড পিষ্টক লইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং তদ্দ্বারা ভোজন শেষ করিয়া ক্রশটি আমার শয্যা হইতে তুলিয়া লইলাম এবং দেওয়ালের যে ফুকর হইতে তাহা খসিয়া পড়িয়াছিল, সেই ফুকরে তাহা বসাইবার চেষ্টায় চেয়ারে উঠিয়া সেই ফুকরটি পরীক্ষা করিতে করিতে সেই ফুকরের ভিতর ঠিক ঐ প্রকার আর একটি ক্রশ প্রোথিত দেখিলাম ; তাহা দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

অতঃপর আমি একখানি ছুরী লইয়া তদ্দ্বারা সেই ফুকরটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত করিয়া সেই দ্বিতীয় ক্রশটি বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম। কয়েক মিনিট পরে সেই ক্রশটি আমার হস্তগত হইল। দেখিলাম, ক্রশটির বর্ণ পীতাভ। পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহা কোন ভারী ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত। অতঃপর আমি ছুরীর ডগা দিয়া তাহার এক প্রান্ত চাঁচিয়া দেখি — কি আশ্চর্য্য, তাহা স্বর্ণনির্ম্মিত!

ক্রশটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত! এই রহস্যভেদে আমি হতবুদ্ধি হইলাম, এবং সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া অতঃপর আমার কি কর্ত্তব্য, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এই স্বর্ণ-নির্ম্মিত ক্রশটি যে মহামূল্য সম্পত্তি, এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ রহিল না। বহু শতাব্দী ধরিয়া সেই দেওয়ালের ফুকরের ভিতর কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রশ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এই প্রকার মহামূল্য দ্রব্য সেই স্থানে ঐ ভাবে সংগুপ্ত ছিল, ইহা না দেখিলে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না ; কিন্তু ফ্রান্সের এই অংশের বিপ্লবাদির বিবরণ আলোচনা করিলে এরূপ ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

আর একটা কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। আমি যে মহার্ঘ দ্রব্য আবিষ্কার করিলাম, তাহাতে আমার কি বৈধ অধিকার আছে? আমি তখন নিরুপায়, নিঃসম্বল ; কিন্তু আমার হাতের সেই ক্রশটি স্বর্ণনির্ম্মিত, সুতরাং বিপুল সম্পত্তি আমার হাতে আসিয়াছিল, তাহা সেই ক্রশের ওজন পরীক্ষা করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি ভাবিতে লাগিলাম, যদি তাহা গ্রহণ করি, তাহা হইলে কিরূপে তাহা কাযে লাগাইব ; আমি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিলাম।

গ্রাম্য নারীদিগকে কলসী ভরিয়া উৎস হইতে জল লইতে দেখিতাম

অবশেষে সঙ্কল্প স্থির করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে হিরণ্ময় ক্রশটি তাহার পূর্ব্বস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া কাঠের ক্রশটি তাহার উপর বসাইয়া দিলাম, এবং হঠাৎ উহা খসিয়া না পড়ে, এ জন্য 'খুঁচি' দিয়া তাহা আটকাইয়া রাখিলাম।

অবশেষে আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে যাহার নিকট ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার নিকট জানিতে পারিলাম, সে গৃহস্বামীর গোমস্তা মাত্র ; সেই অট্টালিকার মালিক ধনাঢ্য ব্যক্তি, তিনি কন্‌টেসের অল্প দূরে বাস করেন। পরদিন প্রভাতে গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাস-গ্রামে উপস্থিত হইলাম। আমি তাঁহার নিকট যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিলাম, তাহা অত্যন্ত উদ্ভট বলিয়াই তাঁহার মনে হইল।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'প্রত্নতত্ত্বে আমার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। আমার বিশ্বাস, কনুটেসের প্রাচীন অট্টালিকা-সমূহে

সংগ্রামপূর্ণ মধ্যযুগে নানাবিধ মূল্যবান্ সামগ্রী প্রোথিত হইয়াছিল। যাহাদের পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি আছে, তাহারা চেষ্টা করিলে সেই সকল সামগ্রী আবিষ্কার করিতে পারে। মসিয়ে, কনুটেসে আপনার তিনখানি অত্যন্ত পুরাতন ঘর আছে; যদি আমি সেই সকল ঘর অন্বেষণ করিয়া কোন মূল্যবান্ দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে আপনি কি সেই দ্রব্যের মূল্যের শতকরা ৬৫৲ টাকা আমাকে দিতে রাজী আছেন?'

সেই ফরাসী ভদ্রলোকটি আমার অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। তিনি হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ উপন্যাস পাঠ করিয়া আমার মাথায় ঐরূপ খেয়াল প্রবেশ করিয়াছে? কিন্তু তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, আমার প্রস্তাবে আন্তরিকতার অভাব নাই, তখন তিনি পরিহাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, যদি সত্যই আমি কোন মূল্যবান্ পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি—তাহা হইলে তিনি আমাকে তাহার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিবেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, এ জন্য আমি পরিশ্রম করিলে অনর্থক সময় নষ্ট হইবে।

এইবার আমি দারুণ অসুবিধায় পড়িলাম। তিনি মৌখিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বীকৃত সর্ত্তটা তিনি লিখিয়া না দিলে তাঁহার মুখের কথায় আমি কিরূপে নির্ভর করিতে পারি? অবশেষে আমি তাঁহার অঙ্গীকার কাগজে লিখাইয়া লইলাম, তিনি ও কয়েক জন সাক্ষী তাহাতে স্বাক্ষরিত করিলেন।

অতঃপর আমি বাসায় ফিরিয়া হৃষ্টচিত্তে শয়ন করিলাম, এবং গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

সেই দিন অপরাহ্ণে আমি গৃহস্বামীকে একখানি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া জানাইলাম, তিনি যেন তাঁহার উকীল ও ব্যাঙ্কের এক জন কর্ম্মচারী সহ আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন। কারণ, আমি একটি মহামূল্য দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছি। গৃহস্বামী আমার টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহার ব্যাঙ্কার ও উকীল সহ অত্যন্ত উৎসাহিত-চিত্তে আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন।

আমি মহানন্দে আমার আবিষ্কৃত হিরণ্ময় ক্রশ তাঁহাদের সম্মুখে রাখিলে, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ব্যাঙ্কারটি বলিলেন, ক্রশটি স্বর্ণনির্ম্মিত—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই। তখন কথা হইল, আমি আমার এই আবিষ্কারের সংবাদ অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না; কারণ, সেই অট্টালিকার অন্যান্য অংশেও ঐ প্রকার মূল্যবান্ দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর সেই হিরণ্ময় ক্রশটি প্যাকবন্দী করিয়া ব্যাঙ্কে লইয়া যাওয়া হইল। উহা যে বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মিত, ইহা প্রতিপন্ন হইলে, উহার ওজন অনুসারে তাহার মূল্য প্রায় তিন হাজার পাউণ্ড হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার প্রাপ্য এক হাজার চারি শত চুরানব্বই পাউণ্ড নাইসের ব্যাঙ্কে আমার নামে জমা হইল।

যে কয় দিন দেনা-পাওনা-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত শেষ না হইল, সেই কয় দিন আমি গৃহস্বামীর অতিথিরূপে তাঁহারই গৃহে বাস করিলাম। আমি তাঁহার প্রতি যে কপটাচরণ করিয়াছিলাম, সে জন্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট দেখিলাম না; বরং আমি যে সময় সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত বলিয়া তাঁহার নিকট শত টাকা ধার চাহিলাম, তাহাই তিনি প্রসন্ন-মনে আমাকে ধার দিলেন। ক্রশটি কে কি জন্য ঐ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তর্ক-বিতর্কে তাহার সিদ্ধান্ত না হইলেও আমরা অনুমান করিলাম, উহার প্রকৃত মালিক বহুকাল পূর্ব্বে সোণা গলাইয়া তাহা ঐ স্থানে ঐ ভাবে গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক, আমি লণ্ডনাগত কপর্দ্দকহীন পর্য্যটক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া সৌভাগ্যক্রমে সেই মহামূল্য ক্রশ আবিষ্কারে সমর্থ হইলাম।

অতঃপর আমি নাইসে প্রত্যাগমন করিয়া ভদ্রোচিত পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিলাম, এবং একটি উৎকৃষ্ট হোটেলে বাসা লইয়া কিছু দিন সেখানে পরম সুখে বাস করিলাম। কয়েক সপ্তাহ পরে আমি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলাম। এখন আমি একটি ফারমের হিসাবনবীশ ও অডিটরের পদে নিযুক্ত আছি।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

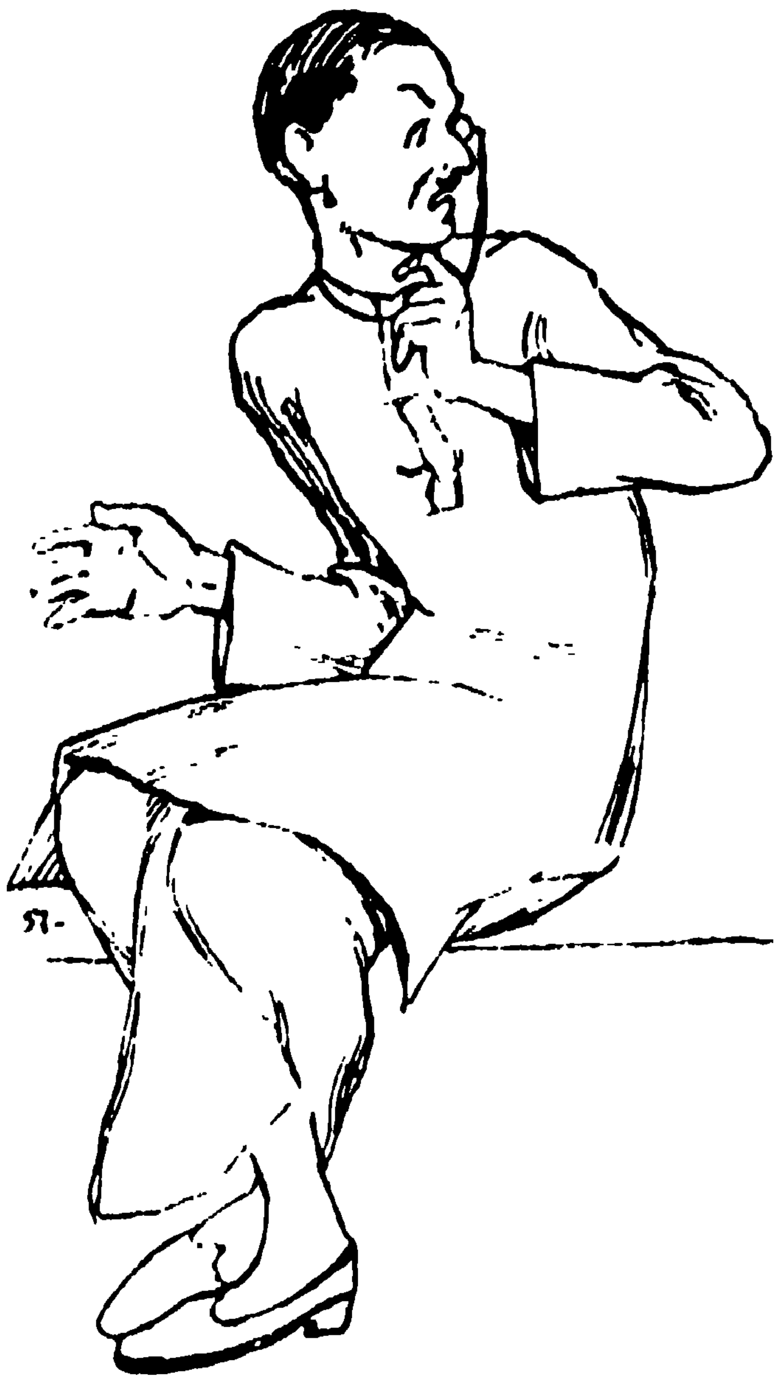

সুপ্রভা

আপিস হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রীর কাছে একটি পরমা-সুন্দরী নব-যুবতী বসিয়া আছে। সাতাশ বৎসর অতিক্রম করিতে চলিলাম—এমন দীপ-শিখার মত চঞ্চল, চোখ-ঝল্সানো রূপ ত কখনও চোখে পড়ে নাই! কি অপূর্ব্ব গাত্রবর্ণ, মুখের ডৌলটি কি মাধুর্য্য-ভরা। উজ্জ্বল, কালো, ভাষাময় নেত্রযুগল যেন বিশ্ব-সংসার ভুলাইয়া দেয়! পরিধানে একখানি চওড়া লালপাড় সাড়ী। সাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে সৌন্দর্য্য যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি তাহার পানে বিস্মিত-নেত্রে তাকাইয়া রহিলাম। সুন্দরী আমাকে দেখিয়া চট করিয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল।

বিস্ময়ের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাড়াতাড়ি পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেলাম। হৃৎপিণ্ড এমন বিপুলবেগে স্পন্দিত হইতেছে কেন?

জামা-জুতা না ছাড়িয়াই একখানা চৌকী টানিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। রূপকথায় রাজকন্যার যে রূপবর্ণনা বাল্যকালে শুনিয়াছি, এত দিনে সেই বিশ্ব-বিমোহিনী রাজ-নন্দিনীর সহিত যেন চাক্ষুষ পরিচয় হইল। একটি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আলোকে ইঁহার মুখ-কমল উদ্ভাসিত—সে আলো যেন এ পৃথিবীর নহে।

এই অপূর্ব্ব-শোভনা সুরসুন্দরীর পার্শ্বে আমার স্ত্রী কাদম্বিনীকে কল্পনা করিয়া মনটা সহসা বিরস হইয়া উঠিল।

এমন সময় কাদম্বিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমার মাসতুত বোন্ সুপ্রভাকে তুমি ত কখনও দেখ নি, তাই চিনতে পারলে না—তাড়াতাড়ি চ'লে এলে।"

সত্যই একটু চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তাই না কি? তা হঠাৎ—"

কাদম্বিনী বলিল, "ওর স্বামীর চোখের অসুখ, কলকাতায় চিকিৎসা করাতে এসেছে! কালীঘাটে ওদের দূর-সম্পর্কের কোন কুটুম্বের বাড়ীতে উঠেছে—সেখানে থাকার অসুবিধা হবে। তা হাঁ গো, আমাদের নীচের ঘরটা কি ওদের মাস দেড়েকের জন্য ছেড়ে দেওয়া যায় না? হাজার হোক ওরা ত আমাদের নিতান্ত পর নয়। ভদ্রলোক বড় বিপদে পড়েছে—এ সময় উপকার করাই উচিত। কি বল? ছোট ভাই সতীশকে সঙ্গে নিয়ে সুপ্রভা তাই জানতে এসেছে।"

মেয়েটির পরিচয় পাইয়া এবং আমার সহিত নিগূঢ়, মধুর আত্মীয়তার কথা শুনিয়া মনটা অনির্ব্বচনীয় খুসীতে ভরিয়া উঠিল। যথাসাধ্য মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "তা বেশ ত, থাকুক না। ও ঘরটি ত বারো মাস পড়েই থাকে—ভাড়াও টানতে হয়—ওদের যদি কাযে লাগে, আমার কোন আপত্তি নেই।"

কাদম্বিনী বলিল, "সুপ্রভা কখনও তোমাকে দেখে নি ব'লে লজ্জায় তোমার কাছে আসতে পারছে না; নীচে দাঁড়িয়ে আছে—গিয়ে ব'লে দিই, কাল মুকুন্দ বাবুকে যেন সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে।"

সুপ্রভা নামটি শুনিয়া বুকের সমস্ত তার ঝম্-ঝম্ করিয়া

বাজিয়া উঠিয়াছিল—মুকুন্দ নামটি কর্ণগোচর হইবামাত্র সব সুর যেন নামিয়া গেল। এখন পর্য্যন্ত সে ভদ্রলোককে আমি চোখেও দেখি নাই। নাম শুনিয়াই মনটা বিরূপ হইয়া উঠিল। এমন অলোকসামান্যা রূপসী স্ত্রী যাহার, তাহার নাম কি না মুকুন্দ! সেই অপরিচিত, চক্ষুপীড়াগ্রস্ত, বোধ করি বা প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোকটির স্ত্রী-সৌভাগ্যে আমার সমস্ত চিত্ত ঈর্ষার বিষে জ্বলিয়া উঠিল। যাহাকে কখনও দেখি নাই, তাহাকে প্রৌঢ় বলিয়া কল্পনা করিবার হেতু কি? মন বলিল, মুকুন্দ নামটি কোন যুবকের হইতে পারে না। ঐ নামটার গায়ে যেন প্রৌঢ়-বয়সের গন্ধ লাগিয়া আছে। তাহাকে না দেখিয়াই সুপ্রভার সহিত তাহার বিবাহ, বিধাতার একটা নিদারুণ অবিচার বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ঘাড় হেঁট করিয়া জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে বলিলাম, "সুপ্রভাকে আমার কাছে ডেকেই নিয়ে এসো না। তাকে ব'লে দিচ্ছি—কালই যেন মুকুন্দ বাবুকে এখানে নিয়ে আসে—আমি তাঁর চিকিৎসার সুব্যবস্থা ক'রে দেব। ডাক্তার মৈত্র ত আমাদের এ পাড়াতেই থাকেন, খুব সুবিধা হবে।"

"আচ্ছা, তাকে নিয়ে আসছি" বলিয়া কাদম্বিনী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

উঃ, বুকের মধ্যে যেন সমুদ্রমন্থন চলিয়াছে! মনের দুর্ব্বলতায় যেন বিরক্তি অনুভব করিলাম। তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া ফেলিয়া টেবলের উপর হইতে সেই মাসের 'মাসিক বসুমতী' খানি তুলিয়ালইয়া একটি চুরুট ধরাইয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। 'মাসিক বসুমতী' এবং চুরুটের ধোঁয়ার আড়াল হইতে তাহার সহিত আলাপ জমাইতে পারা যাইবে না?

সোপানে পদশব্দ। নারীকণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনি!

বুঝিলাম, কাদম্বিনীর সহিত সুপ্রভা আসিতেছে।

জামা-কাপড় সব ঘামে ভিজিয়া উঠিল! অকস্মাৎ এমন গ্রীষ্মবোধ হইতেছে কেন? এ কি বিশৃঙ্খল তাণ্ডব-নৃত্য চলিয়াছে! চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল। মনে হইল, দুই কর্ণ কে যেন জ্বলন্ত অগ্নিতে চাপিয়া ধরিয়াছে!

কাদম্বিনীর পশ্চাতে সুপ্রভা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখ খোলা, মাথায় কাপড় নাই—পশ্চিমদিকের জানালা দিয়া অস্তমান সূর্য্যের গোলাপী আভা আসিয়া সে মুখে পড়িয়া একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই রবিরশ্মিদীপ্ত মুখকমলকে কেন্দ্র করিয়া আমার মনটা যেন মধুন্মত্ত ভ্রমরের মত তাহার চারি পাশে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

সুপ্রভা লঘু মৃদুচরণে অগ্রসর হইয়া আমার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়া কহিল, "জামাই বাবু, ভালো আছেন ত?"

উত্তর দিতে গিয়া প্রবল চেষ্টার আতিশয্যে সহসা মাথা ঘুরিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ঠোঁট শুকাইয়া গেল। বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া 'বসুমতী' খানা বাগাইয়া ধরিয়া জ্বলন্ত চুরুটটায় একটা প্রচণ্ড টান দিলাম।

"ওঃ, তু—তু—তুউ উমি—সু সু সু—সুউপ্রো" বলিতে বলিতে সহসা বিষম খাইলাম।

কাসিতে কাসিতে এমন অস্থির হইয়া পড়িলাম যে, কম্পিত পদযুগলের তাড়নায় হুড়মুড় করিয়া টেবলটা উল্টাইয়া পড়িল, আমিও চেয়ার হইতে গড়াইয়া ভূমিশয্যা লইলাম। পড়িতে পড়িতে লক্ষ্য করিলাম, দোয়াতের কালী ছিটকাইয়া সুপ্রভার সুন্দর সাড়ীখানা নষ্ট হইয়া গেল।

তরুণী সুপ্রভা উদ্গতপ্রায় হাস্যবেগ সংবরণ করিবার জন্য মুখে কাপড় চাপিয়া ধরিল। পরমুহূর্ত্তে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

লজ্জায় ধিক্কারে আমি তখন নিজের মৃত্যুকামনা করিতেছিলাম! চট্ করিয়া উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল—মূর্চ্ছার ভান করিয়া তাড়াতাড়ি চোখ বুজিলাম।

"ওগো, কি হলো গো! কি হলো গো! অমন ক'রে প'ড়ে গেলে কেন? ওরে সুপ্রভা, পালাস্ নে—ঐ দেখ, কুঁজোতে জল আছে—গড়িয়ে তোর জামাই বাবুর মুখে চোখে ঝাপটা দে—আর ঐ হাতপাখাখানা দে ত—" বলিয়া কাদম্বিনী আমার শিয়রে বসিয়া মূর্চ্ছার ঘোরে আমার ঢলিয়া পড়া মাথাটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

সুপ্রভা ঘরে ঢুকিয়া, আমার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "দিদি, জামাই বাবুর কি ফীটের ব্যারাম আছে?"

কাদম্বিনী বলিল, "না বোন্, এর আগে ত কখনও দেখি নি—এই প্রথম দেখ্‌ছি।"

"তা হ'লে এখুনি আরাম হয়ে যাবেন, ওটা গরমে হয়েছে, যে গরম পড়েছে।" বলিয়া সুপ্রভা কুঁজা গড়াইয়া অঞ্জলি পুরিয়া জল লইয়া আসিয়া আমার মুখে ঝাপ্‌টা দিয়া আমার মুদ্রিত চোখের পাতার উপর ধীরে ধীরে তাহার পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিল। সে কি কোমল স্পর্শ! আমার মূর্চ্ছা ত সহজে ভাঙ্গিবে না! সেই স্পর্শ আমাকে যেন স্বর্গের দুয়ারে পৌছাইয়া দিতেছিল—সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সেই অবস্থায় একটা সন্দেহ মাঝে মাঝে মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল—সুপ্রভা আমাকে সন্দেহ করে নাই ত? সে কি আমার দুর্ব্বলতার কথা টের পাইয়াছে? মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে তাহাকে আমি চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। ছি, ছি, সে আমাকে কি মনে করিতেছে?

প্রায় ১০ মিনিট কাটিয়া গেল। এমন ভাবে থাকাটা আর ভাল দেখাইতেছে না। এইবার চোখ মেলা যাক।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আস্তে আস্তে চোখ মেলিতেই দেখিলাম, পদ্মপলাশলোচনের স্থির দৃষ্টিতে সুপ্রভা আমার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সে কি স্নিগ্ধ দৃষ্টি! অন্তরের সমস্ত জ্বালা যেন নিমেষের মধ্যে জুড়াইয়া শীতল হইয়া যায়।

সুপ্রভা কহিল, "দিদি, এই দেখ, জামাই বাবু চোখ মেলেছেন।" আমার কাণের গোড়ায় মুখ আনিয়া কাদম্বিনী কহিল, "ওগো, শুনছো! কেমন বোধ হচ্ছে?"

তাই ত, কি উত্তর দেওয়া যায়? চুপ করিয়া থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বুঝিয়া পাগলের মত উদাস দৃষ্টিতে কাদম্বিনীর মুখের পানে চাহিতে লাগিলাম। মুখের ভিতর অঙ্গুলি পুরিয়া, দাঁত লাগিয়া আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া কাদম্বিনী কহিল, "দাঁতটা ছেড়ে গেছে—কিন্তু চোখের ঘোর এখনও কাটে নি।"

সুপ্রভা বলিল,—"হাঁ, তাই ত দেখছি।"

কাদম্বিনী কহিল, "সতীশটা গেল কোথায়? আমার বড় ভয় করছে—ডাক্তারকে একটা সংবাদ দিলে হয় না?"

সুপ্রভা বলিল, "সতীশ ত অনেকক্ষণ হলো গাড়ী ডাকতে গেছে—এল ব'লে। ডাক্তারের দরকার নেই—এখুনি চেতন হবে।"

ডাক্তারের নামে ভয় পাইয়াছিলাম। সুপ্রভার কথায় আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইলাম। বুদ্ধিমতী সুপ্রভা তবে কি আমার রোগের কারণ ধরিয়া ফেলিয়াছে?

হঠাৎ একটি অপরিচিত আঠারো উনিশ বৎসরের যুবক সে কক্ষে ঢুকিয়া সুপ্রভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দিদি, গাড়ী ডেকে এনেছি, তোমার আর দেরী কত? এ কি! কি হলো?"

সুপ্রভা বলিল, "জামাই বাবু হঠাৎ মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন—এখন ভাল আছেন।" তার পর কাদম্বিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তা হ'লে দিদি, আজ আসি—ও দিকে আবার উনি ভাবছেন" বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

কাদম্বিনী কহিল, "হাঁ, আজ এসো। কাল যেন মুকুন্দ বাবুকে আনতে ভুলো না। বুঝলি সতীশ—কাল এদের এখানে নিয়ে আসিস। দিনকতক না হয় এখান থেকেই কলেজ যাতায়াত করবি—তার পর সেই ত তোদের মেস্ আছেই।"

"সে যা হয় হবে" বলিয়া সতীশ মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল।

সুপ্রভা বলিল, "সতীশ, দিদি ও জামাই বাবুকে প্রণাম কর।"

সতীশ আমার ও কাদম্বিনীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। তার পর সুপ্রভার সহিত নীচে নামিয়া গেল।

* * * *

পরদিন আপিসে গিয়া কাযে মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না; থাকিয়া থাকিয়া কেবল সুপ্রভার কথাই মনে পড়িতে লাগিল। কালকার সেই ঘটনায় সুপ্রভা যদি আমার মনের কথা টের পাইয়া থাকে, তাহা হইলে আজ ত তাহাকে আমি মুখ দেখাইতে পারিব না।

যাহা হউক, কাদম্বিনী যে আমার মনো-বৈকল্যের প্রকৃত হেতু ধরিতে পারে নাই, সত্যই মূর্চ্ছা মনে করিয়াছিল, ইহাতে আমি মনে মনে লজ্জানিবারণ ভগবানের চরণে নতি জানাইয়াছি।

কিন্তু এমনটা হইল কেন? ইতিপূর্ব্বে আমি ত

অনেক অপ্সরার মত সুন্দরী যুবতীর সংস্পর্শে আসিয়াছি, কখনও ত এমন দুর্ব্বলতা অনুভব করি নাই। সুপ্রভাকে দেখিয়া কেন এমন মনোবিকার উপস্থিত হইল? তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি? "প্রথম দর্শনে প্রেম" কথাটাকে এক দিন আমি নিছক কবি-কল্পনা বলিয়াই হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! শেষটা আমার জীবনেও সেই 'প্রথম দর্শনে প্রেম' কথাটা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল! তাও আবার প্রথম যৌবনে নহে—ত্রিশ বছরের কাছাকাছি সময়ে আমি একটি সধবা নারীর প্রেমে পড়িয়া গেলাম?

কাদম্বিনী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তাহার বয়স যখন ৯ বৎসর এবং আমার বয়স ১৩ বৎসর, তখনই তাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। কাদম্বিনী রূপবতী না হইলেও অসাধারণ গুণবতী—যদিচ তাহার সহিত প্রেমে পড়িয়া আমার যৌবন-বিবাহ হয় নাই; কিন্তু সে জন্য এ পর্য্যন্ত আমার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না—আমি তাহার কতকগুলি গুণের পক্ষপাতী ছিলাম। বালকবয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া কখনও বিবাহিতা স্ত্রীর প্রেমে পড়িবার সুযোগ পাই নাই—এত দিন সে জন্য মনে কোন ক্ষোভও ছিল না। হঠাৎ কোথা হইতে সুপ্রভা আসিয়া নিমেষের মধ্যে আমার অন্তরে দারুণ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল।

মনের এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কাদম্বিনীর কাছে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু এই নবজাগ্রত প্রেমকেও অস্বীকার করিতে পারিলাম না। মনটা নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কিন্তু অন্তরের এক প্রান্ত হইতে একটা প্রশ্নের ক্ষীণ স্বর উঠিল—"ইহা কি প্রেম?"

বৈকালে আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলাম। কাদম্বিনী কহিল, "নীচের ঘরটা মুকুন্দ বাবুদের ছেড়ে দিয়েছি। তুমি যাও, দেখে এসো—সুপ্রভা ঐ ঘরেই আছে।"

পূর্ব্বদিনের দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া আমি কহিলাম, "তুমি দেখে এসেছ ত, তাতেই হবে। আমার যাবার প্রয়োজন নেই।"

কাদম্বিনী কহিল, "না না, সে বড় অভদ্রতা হবে। তুমি একবার গিয়ে মুকুন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে এসো—"

সেই ঘরে সুপ্রভা আছে শুনিয়া আমার আর পা উঠিতেছিল না। দারুণ অনিচ্ছার সহিত লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে ওধারের ছোট কুঠরীতে প্রবেশ করিলাম।

ঈষৎ অন্ধকার ঘরের মধ্যে একখানি ছোট তক্তপোষের উপর কম্বল বিছাইয়া, তাকিয়া ঠেস দিয়া, চোখে সবুজ রঙ্গের ঠুলীপরা এক জন শীর্ণকায় প্রৌঢ়ব্যক্তি বসিয়া আছেন। তাঁহার একটু দূরে নতমুখে আধ-ঘোমটা টানিয়া সুপ্রভা বসিয়াছিল। ইনিই সুপ্রভার স্বামী!—বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল।

আমার জুতার শব্দ শুনিয়া ভদ্রলোক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কে?"

দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া আমি বলিলাম, "নমস্কার, মুকুন্দ বাবু! আমি নলিনীনাথ।"

প্রতিনমস্কার করিয়া মুকুন্দ কহিলেন,—"নলিনী বাবু! আসুন, আসুন; বসুন ঐখানে। বড় দয়া আপনার। তার পর আপিস থেকে কখন্ আসা হলো?"

"এই এলাম।"

সুপ্রভা আমার মুখের পানে চাহিয়া আছে লক্ষ্য করিয়া আমার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। একটা দারুণ অস্বস্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। ঠিক কি যে বলিলে কথাটা সুপ্রভার কাণে ভাল শুনাইবে, ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত কথার খেই হারাইয়া ফেলিলাম।

মুকুন্দ বলিতে লাগিলেন—"দুটো চোখেই ঝাপ্‌সা দেখি; আলো সহ্য হয় না; দিন-রাত জল পড়ে। জলের ভিতর চাইলে যেমন সব ঘোলাটে ঘোলাটে বোধ হয়, তেমনই সবই ঘোলাটে বোধ হচ্ছে। আপনার মুখখানিও দেখতে পাচ্ছি নে—কেবল আব্‌ছা আব্‌ছা সাদা কাপড়টি দেখা যাচ্ছে।"

তাড়াতাড়ি মনের মধ্যে কতকগুলা ভাল ভাল কথা সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে গিয়াই দেখিলাম, সুপ্রভার সমুজ্জ্বল নয়ন-যুগলের ইন্দ্রজাল-ভরা দৃষ্টি আমার মুখের উপর সংন্যস্ত। যে কথাগুলি গুছাইয়া বলিব ভাবিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলাম।

"হাঁ, দেখুন—ইয়ে হয়েছে—উঃ, এখানে কি গরম! কিন্তু সুইজার্ল্যাণ্ডে এখন ভয়ানক ঠাণ্ডা—অবিরাম তুষারপাত

হচ্ছে—বাজারে রবি বাবুর আর একখানি গানের বই বেরিয়েছে—দেখেছেন—ঐ ঐ কি নামটা—হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে—গীতালি—গীতালি—খালি গান—গীতি-কবিতা—বড় সুন্দর গানের বই—আর কি যে বলছিলেম, ভুলে যাচ্ছি—হাঁ, ডাক্তার মৈত্র—ঐ মৈত্রের চিকিৎসাধীনে থাকলেই মাসখানেকের মধ্যেই সেরে উঠবেন" বলিয়া ঘর্ম্মধারায় স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

আমার দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে সুপ্রভা বলিল, "সুইজারল্যাণ্ডের ঠাণ্ডায় আমাদের দরকার নেই—উনি সেরে উঠুন—তার পর আপনার মুখে রবি বাবুর গান দু'একখানা শোনা যাবে।"

আমি গান গাহিব? সুপ্রভার সম্মুখে? কি সর্ব্বনাশ! তবে দূর হইতে কবিতা পড়িয়া শুনাইতে পারি। কোন উত্তর না করিয়া কলের পুতুলের মত বাহির হইয়া গেলাম।

বাহিরে যখন পা দিয়াছি, তখন শুনিতে পাইলাম, সুপ্রভা বলিতেছে, "কাল হঠাৎ ফীট হয়ে পড়েছিলেন—আজ ভাল আছেন ত?"

চলিতে চলিতে উত্তর দিলাম, "হাঁ।"

ছি ছি! ইহার কাছে কি আমি পদে পদে অপ্রস্তুত হইব!

* * * *

মুকুন্দ বাবুর চক্ষু-চিকিৎসা চলিতেছে। দুই চোখেই অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। এখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। ক্রমশঃ তিনি আরোগ্যের পথে চলিয়াছেন—তবে বাম চক্ষুটি হয় ত আর ফিরিয়া পাইবেন না। ঐ চক্ষুটি সম্বন্ধে ডাক্তার বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমি ত ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম—মুকুন্দ নামটি কোন যুবকেরই হইতে পারে না। সুপ্রভা ইঁহার তৃতীয় পক্ষ। পাড়াগাঁয়ে ঘর-বাড়ী, পুকুর-বাগান, জোতজমা এবং তেজারতী-মহাজনীর কারবার আছে। খুব টাকার মানুষ—অত্যন্ত কৃপণস্বভাব। সন্তানাদি হয় নাই—যদিচ তাহারই জন্য বিবাহ করা—বিবাহ এ যাবৎ নিষ্ফল হইয়াছে।

লোকটির প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার অন্ত রহিল না। সুপ্রভার মত সুন্দরী রমণীর জীবনটা যে নষ্ট করিয়া দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই, সেই চক্ষুলজ্জাহীন পাষণ্ডের অমানুষিক বর্ব্বরতার কথা স্মরণ করিয়া একটা অন্ধ ক্রোধ বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহার চক্ষু যায় যাক্! আমি আর কোন যত্ন লইব না। হতভাগিনী সুপ্রভার প্রতি গভীর সহানুভূতিতে মনের মধ্যে করুণার বান ডাকিয়া উঠিল।

* * * *

সেই থতমত ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। সুপ্রভাকে দেখিয়া এখন আর তেমন বিচলিত হই না। ক্রমশঃ সাহস বাড়িতেছে। নির্জ্জনে তাহার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতেও আর কোন বিপদ ঘটাইয়া বসি না।

ঠোঁট-কাটার দাগটা কিন্তু এখনও মিলায় নাই। কথাটা একটু খোলসা করিয়া বলিতে হইবে। মুকুন্দ বাবুরা এ বাড়ী আসার কয়েক দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় উপরে একাকী বসিয়াছিলাম।

সুপ্রভা চায়ের পেয়ালা লইয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার হাত হইতে গরম চায়ের পাত্র লইতে গিয়া কম্পিত হস্তে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসিলাম,—যাহার ফলে পেয়ালাটা পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেকায়দায় মাটীতে পড়িয়া গেলাম। ভাঙ্গা পেয়ালার কুচি লাগিয়া ঠোঁট কাটিয়া গেল। এবার ফীটের ব্যারামটা উঠে নাই,—পরমুহূর্ত্তেই সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া বসিয়াছিলাম। ঠোঁট দিয়া তখন রক্তস্রোত বহিতেছিল।

"ছি ছি, এমন ক'রে কেটে ফেল্লেন! দাঁড়ান, একটা জলপটি লাগিয়ে দিই, তা হ'লেই রক্তটা বন্ধ হয়ে যাবে।" বলিয়া একটা ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া সুপ্রভা সেই স্থানটায় লাগাইয়া দিল।

আমি তখন ধরণীকে মনে মনে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিতেছিলাম।

এখন সে সব দুর্দ্দিন গত হইয়াছে। তাহার সান্নিধ্যে আর ততটা কাবু হই না। এখন স্বচ্ছন্দে তাহার সহিত দু'দণ্ড কথা বলিতে পারি।

মুকুন্দ বাবুকে এখনও মাসখানেক থাকিতে হইবে। আমি মনে মনে কামনা করিতে লাগিলাম—মুকুন্দ বাবুর চোখ যেন এ জন্মে আরোগ্য না হয়—তাঁহাকে যেন চিরস্থায়িভাবে এখানে থাকিতে হয়।

আজকাল মুকুন্দ বাবুর সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়—নীচের ঘরটায় বড় একটা প্রবেশ করি না। সুপ্রভার মুখেই তাঁহার চোখের খবর লই। ব্যাণ্ডেজটা এখনও বাঁধা আছে—সতীশ মেস হইতে দুই বেলা আসিয়া খোঁজখবর লইয়া যায়—এক এক দিন এখানে তাহার রাত্রিবাসও ঘটে; ফল-মূল, ঔষধপত্রাদি যখন যাহা দরকার, সেই আনিয়া দেয়।

কাদম্বিনী রান্নার কাযে ব্যস্ত থাকে—সুপ্রভা আমার জন্য চা, জলখাবার ইত্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দেয়।

* * * *

একটি নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম। বুকের মধ্যে যেন একটা নূতনতর সুখানুভূতির জোয়ার আসিল। সুপ্রভার সংস্পর্শে আসিয়া আমার বয়স যেন দশ বৎসর পিছাইয়া গেল। দামী এসেন্সের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হইয়া থাকে—পোষাক-পরিচ্ছদের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে—সাবান ঘষিয়া ঘষিয়া মুখের এক পুরু চামড়া তুলিয়া ফেলিয়াছি। সন্ধ্যাবেলা সুর করিয়া রবি বাবুর প্রেমের কবিতা পড়ি—কণ্ঠস্বর এতটা উচ্চ করিয়া পড়ি—যাহাতে আমার কবিতা আবৃত্তিটা সুপ্রভার কাণে গিয়া পৌছায়। সুপ্রভা রবি বাবুর কবিতা শুনিতে ভালবাসে, ইহা আমি তাহার মুখেই শুনিয়াছি। বাছিয়া বাছিয়া প্রেমের কবিতাগুলিই আবৃত্তি করি।

বৃদ্ধ সুদখোর মুকুন্দলাল! সুপ্রভার মত রমণী-রত্নের কদর তুমি কি বুঝিবে? আজন্মটা তুমি কেবল সুদের হিসাবই কষিলে—কাব্যরসিক। সুপ্রভার অন্তরের গোপন রস-ভাণ্ডারের কখনও সন্ধান করিয়াছ কি?

সে দিন মধ্য-রাত্রিতে উপরের বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে শুনিতে পাইলাম, নীচে সুপ্রভা গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছে—'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না, শুক্‌নো ধূলো যত?'

আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—পল্লীগ্রামের গরীব ঘরের মেয়ে সুপ্রভা এ গান শিখিল কোথা হইতে? বৃদ্ধ মুকুন্দলালের ত ও পথে গতিবিধি নাই? পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাহার ছোট মামা মফঃস্বলের কোন কলেজের প্রফেসার ছিলেন। সেই উচ্চশিক্ষিত মামার আওতায় সুপ্রভা মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুর পর জন্মদুঃখিনী বিধবা মায়ের হাতে পড়িয়া সুপ্রভার এই দশা ঘটিয়াছে। প্রফেসার মামা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সুপ্রভার আজ এ দশা ঘটিত না।

কাদম্বিনী সাধা-সিধা মানুষ। সুপ্রভার দিকে আমার মন যে আজকাল অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ইহা সে বুঝিতে পারিত না। তথাপি খরচের আতিশয্য দেখিয়া মাঝে মাঝে সে অনুযোগ করিত; কিন্তু সে সব হিতোপদেশে কাণ দিবার মত তখন আমার মনের অবস্থা ছিল না।

আমি শ্রীনলিনীনাথ মিত্র—দেড়শো টাকা মাহিনার সামান্য চাকরে! দেশে আমার বৃদ্ধা মা ও বিধবা দিদি আছেন। সামান্য বিঘাকতক জমীর উৎপন্ন শস্যে বৎসরের খরচ কুলায় না। ঘরে পৈতৃক ঠাকুর রাধাগোবিন্দজী আছেন—তাঁহারও সেবাদির বন্দোবস্ত আছে। বাড়ীতে মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া খরচ পাঠাইতে হয়—এ সব তুচ্ছ কথা আপাততঃ ভুলিয়া গেলাম। গত দুই মাস হইতে বাড়ীতে একটি টাকাও পাঠাইতে পারি নাই। বৃদ্ধ পুরোহিত মথুরানাথ ভট্টাচার্য্যকে দিয়া টাকার জন্য মা চার পাঁচখানি পোষ্টকার্ড লিখাইয়াছেন; কাদম্বিনী পুনঃ পুনঃ টাকা পাঠাইতে বলিতেছে; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের সর্ব্বনাশা নেশায় আমি যে তখন কোথায় চলিতেছি, সে দিকেও আমার খেয়াল ছিল না।

* * * *

সুপ্রভা যে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, আভাসে ইঙ্গিতে তাহার পরিচয়ও পাইতে লাগিলাম।

মুকুন্দলালের স্ত্রী যে আমার মত সুশ্রী যুবা পুরুষের প্রেমে পড়িবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? এত অর্থ-ব্যয়, এত চেষ্টা-যত্ন কি বৃথা হইবে? তাহার মন পাইবার জন্য আমি ত কম চেষ্টা করি নাই। তাহার হাসি, তাহার কথা, তাহার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য আমাকে যেন পাগল করিয়া তুলিয়াছিল; তেমনই সেও কি আমার জন্য পাগল হয় নাই? তবে কেন সে বার বার কোন না কোন ছুতায় আমার কাছ দিয়া আনাগোনা করে? চোখো-চোখি হইলেই কেন ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়? তাহার বিপুল কৃষ্ণতার নয়ন-যুগলের মধ্যে আমি যে দীপ্তশিখা দেখিয়াছি, তাহা কি প্রেম ব্যতীত

উৎপন্ন হয় ? অনির্ব্বাণ প্রণয়-বহ্নিতে যেমন আমি পুড়িতেছি, তেমনই সেও পুড়িতেছে—আসক্তির আগুন পরস্পরের মনে ধরিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত সুপ্রভাকে আমার অন্তরের অবস্থার কথাটা খোলাখুলিভাবে জানাইতে পারি নাই। এক একবার নিজেকে ভীরু, কাপুরুষ বলিয়া ধিক্কার দিতাম। তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহসে কুলাইত না—কি জানি, নারী-জাতিকে বিশ্বাস নাই পাছে হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে—এই ভয়ে পিছাইয়া রহিতাম।

মাঝে মাঝে বিবেকের কশাঘাতে মোহের ঘোর যখন কাটিয়া যাইত, তখন ভারী লজ্জা করিত। অনুতাপের তীব্র জ্বালায় মনটা ছোট হইয়া যাইত। সতী সাধ্বী কাদম্বিনীর একনিষ্ঠ অচঞ্চল ভালবাসার আমি অপমান করিতেছি, এই কথা মনে করিয়া গভীর আত্মগ্লানিতে মন ভরিয়া উঠিত। কিন্তু সে ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। পুনরায় সুপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ হইবা-মাত্র স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পাইত। তখন বিশ্বগ্রাসী উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বন্যায় দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ভাসিয়া যাইতাম। সে যে পরস্ত্রী তাহাকে ভালবাসা যে মহা অপরাধ, মনের মধ্যে যতই আকুলি-ব্যাকুলি করি না কেন, তাহাকে পাইবার সমাজ ও শাস্ত্রসম্মত কোন সৎপথ নাই। শৃঙ্খলমুক্ত, দুর্দ্দার মন এ সব কথাকে বড় একটা আমল দিত না। কিছুতেই সুপ্রভাকে পর ভাবিতে পারিতাম না—কোন্ উপায়ে সুপ্রভাকে নিজের করিয়া লইব, এই চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিয়া নিশিদিন আমাকে তুষের আগুনে দগ্ধ করিতে লাগিল।

* * * *

মুকুন্দ বাবুর চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হইয়াছে। ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি অনেকটা ফিরিয়া আসিয়াছে—বাম চক্ষুটি একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া চশমা লাগাইয়া দিয়াছেন—সেইটি অহরহ আঁটিয়া থাকিতে হইবে।

আর সাত দিন পরে মুকুন্দ বাবুরা দেশে ফিরিয়া যাইবেন। এ সংবাদ আমার পক্ষে কিছুমাত্র প্রীতিকর নহে। মুকুন্দ বাবুর সহিত দেখা হইলে কথায় কথায় তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন; কিন্তু তাহাতে আমার বিরক্তির মাত্রাই বাড়িয়া উঠে। বুড়াকে আমি দু'চোখে দেখিতে পারি না।

সুপ্রভা চলিয়া যাইবে শুনিয়া বুকের মধ্যে যেন পাষাণ-ভার চাপিয়া বসিল। আমি বাঁচিব কি করিয়া? গত দুই মাস হইতে যাহাকে বলিবার জন্য মনের মধ্যে কথার পর কথার মালা গাঁথিয়া আসিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাহাকে একটি কথাও বলা হয় নাই। এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে যেমন করিয়া হউক, তাহাকে এ কথাটা জানাইতে হইবে।

একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন তা যাহাই হউক, ছেঁড়া সাড়ীর পাড়, মাথার একগাছি কেশ, না হয় একটা চুলের কাঁটা চাহিয়া লইব। নহিলে তাহার অদর্শনে বিরহ-বেদনায় হৃদয় যখন আকুল হইয়া কাঁদিতে থাকিবে, তখন কেমন করিয়া অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিব? আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, দুই এক দিনের মধ্যেই একটা এস্পার ওস্পার করিতে হইবে।

সুপ্রভা যে আমাকে ভালবাসে, সে বিষয়ে আমার আর কণামাত্র সন্দেহ নাই। আজ সন্ধ্যার সময় যখন তাহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া কিছু একটা আদায় করিয়া লইব। সে কি মুখ ফিরাইয়া লইবে? তাহাকে বলিব—"তুমি আমার! তুমি আমার! আমি কেবল আমার প্রেমকে মানি। সেই প্রেমের জোরে আমি তোমাকে আমার করিয়া লইব।"

মুকুন্দলালের সহিত বিবাহে সুপ্রভা যে সুখী নহে, ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। ঐ লোলচর্ম্ম, একচোখো, হীন স্বার্থপর, কদাকার বৃদ্ধটিকে সুপ্রভার মত নারীরত্ন কি ভালবাসিতে পারে? ইহা কখনই সম্ভব নহে।

আপিসে বসিয়া সারাদিন জল্পনা-কল্পনা করিলাম—আজিকার সন্ধ্যাকে ব্যর্থ হইতে দিব না। আজ প্রস্তুত হইয়া যাইব—আজ একটা কিছু চাহিয়া লইব।

অত্যন্ত সঙ্গোপনে কায হাসিল করিতে হইবে! কাদম্বিনী যদি কিছুমাত্র টের পায়, তাহা হইলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে। কাদম্বিনীকে আমি ভয় করি। সে যে আমার এই প্রেমকে সম্মানের চোখে দেখিবে না, তাহাও জানি। সান্ত্বনার কথা এই যে, স্থূলবুদ্ধি কাদম্বিনী এই সূক্ষ্ম প্রেমের

রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তথাপি সাবধান হইয়া চলাই ভাল।

কাদম্বিনী যেন আজকাল সুপ্রভাকে ঈর্ষার চোখে দেখিতেছে, তাহার কথায় তেমন আর উৎসাহ প্রকাশ করে না। মেয়েরা এমনি হিংসুক জাতই বটে!

* * * *

পরদিন একটু বিলম্ব করিয়া সন্ধ্যার কাছাকাছি বাসায় ফিরিয়া শুনিলাম,—অপরাহ্ণ পাঁচটার ট্রেণে সুপ্রভা বৃদ্ধ স্বামীকে লইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। আমার সহিত দেখা না করিয়া যাইবার হেতু বুঝিলাম। মনটা যেন ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের মত ধূলায় লুটাইতে লাগিল। গভীর অনুশোচনার সহিত কেবলই মনে হইতে লাগিল, অন্যায় করিয়াছি! অন্যায় করিয়াছি! ইহজীবনে ইহার আর কোন প্রতীকার নাই। ক্ষমা চাহিবার অবসর না দিয়াই সুপ্রভা চলিয়া গিয়াছে,—তাহার কাছে আমি চির-অপরাধী রহিয়া গেলাম। তাহাকে যে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই, ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। তাহা ছাড়া আমার মত মহাপাতকীর আর সান্ত্বনা কি আছে? আমি সাধ্বী সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর অনাবিল প্রেমের অপমান করিয়াছি। পবিত্র-চরিত্রা সংযত-হৃদয়া পরস্ত্রী সুপ্রভার পানে পাপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে কুপথে টানিবার চেষ্টা করিয়াছি। আজ আমার দৃষ্টির উপর হইতে যবনিকা সরিয়া গিয়াছে, সুপ্রভাকে আজ দেবী বলিয়া মনে হইতেছে। সে আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গেল, তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না।

ইতিপূর্ব্বে আমার মত এমন কি কেহ ঠকিয়াছে? এমন ভুল কি কেহ করিয়াছে? গল্পের মানুষের সঙ্গে সত্যকার রক্ত-মাংসের মানুষের যে কত প্রভেদ, সুপ্রভা তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছে।

তথাকথিত গল্প ও উপন্যাস পড়িয়া আর কখনও নারী-চরিত্র বিচার করিতে যাইব না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উপরে উঠিয়া চৌকী টানিয়া বসিতেই নজরে পড়িল, টেবলের উপর কে এক টুকরা কাগজ দোয়াত চাপা দিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, লেখা আছে—

"চলিলাম। জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না।

সুপ্রভা—"

ঠিক হইয়াছে! আমার ক্লিন্নকামনার উপযুক্ত উত্তর পাইয়াছি!

পরমুহূর্ত্তেই কাদম্বিনী চায়ের পেয়ালা লইয়া সেই কক্ষে ঢুকিল। তাড়াতাড়ি কাগজটা লুকাইয়া ফেলিলাম। তার পর কাদম্বিনীর হাত হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া টেবলের উপর নামাইয়া রাখিয়া দীর্ঘদিন পরে অকস্মাৎ তাহার দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইলাম।

মুখ তুলিতেই চাহিয়া দেখিলাম, তাহার দুই চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে।

আশ্চর্য্য! কাদম্বিনীর চোখে জল? তাহা হইলে সেও কি আমাকে বুঝিতে পারিয়াছিল? বিচিত্র এই নারী-জাতি! আত্মহত্যার প্রলোভন হইতে মুক্তি পাইয়া আজ তাঁহারই চরণে অলক্ষ্যে প্রণতি জানাইতেছি।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

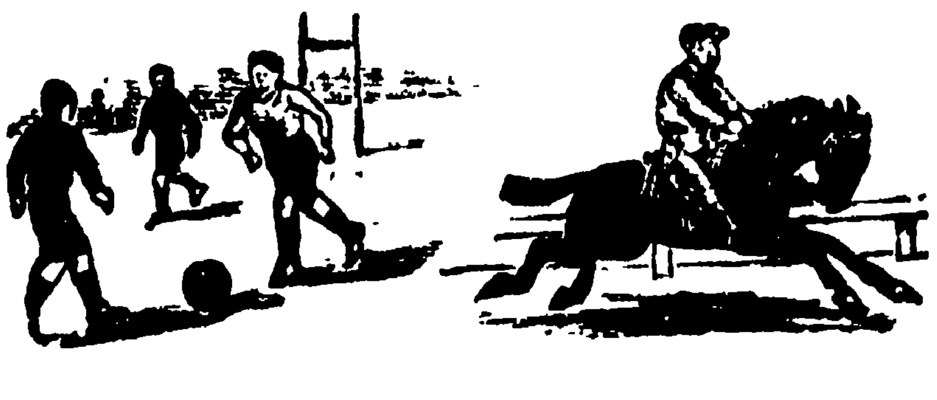

পাল-সাম্রাজ্য ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধপণ্ডিত গৌড়-বিক্রমপুরনিবাসী সুবিখ্যাত আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ খৃষ্টীয় দশম শতকে গৌড়-মগধ-বঙ্গের অধীশ্বর প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বসময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া মহামনীষী পণ্ডিতরূপে শ্রদ্ধার্জ্জন করেন। নরপাল প্রথম মহীপালদেব তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তৎকালীন বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল সুবিখ্যাত বিক্রমশীলা বিহারে আহ্বান করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে নরপাল নয়পালদেব দীপঙ্করের পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিক্রমশীলা বিহারের গৌরবময় অধিনায়ক-পদে অধিষ্ঠিত করেন।

নয়পালদেবের রাজত্বসময়ে দীপঙ্কর ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বত-রাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিবার জন্য বিক্রমশীলা বিহার হইতে তিব্বতযাত্রা করেন। বৌদ্ধযুগে বহির্ভারতে যাহারা ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল মহামনা মহাপুরুষের মধ্যে বাঙ্গালার গৌরব, বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বলকারী, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ অন্যতম। যে পাল-সাম্রাজ্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল,—যে পালরাজবংশের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া পাল-সাম্রাজ্যকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, আজ আমরা এই প্রবন্ধে অষ্টম শতাব্দীর শেষ হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সেই পাল-সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নরপালগণের ইতিহাস আলোচনা করিলাম।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটে। উত্তরভারতে মহারাজাধিরাজ নামে কেহই ছিল না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাজন্যবর্গের অধীনস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হয়। সমগ্র দেশের উপর কাহারও কোনপ্রকার আধিপত্য ছিল না। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ তাঁহার "ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন, দেশে এক জনও প্রকৃত রাজা ছিল না, অথবা থাকিলেও তাঁহারা পরস্পর গৃহ-বিবাদে ব্যস্ত থাকিতেন। *

* Indian Antiquiry P. 366. 1875

ইহার ফলে হিন্দুগণ একতাশূন্য ও রাজনৈতিক শক্তিহীন হইয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। প্রবলের হস্তে দুর্ব্বল নিরন্তর নিপীড়িত হইতেছিল। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

রাজা নাহি রাজপাটে শূন্য সিংহাসন
যেই পারে সেই মারে লয় প্রাণ ধন।— *

দেশ সম্পূর্ণ অরাজক। দেশের এইরূপ অবস্থা সংস্কৃত সাহিত্যে 'মাৎস্য-ন্যায়' নামে অভিহিত। এই মাৎস্য-ন্যায় বা অরাজকতা দূর করিবার জন্য দেশের জনসাধারণ এক জন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদের হস্তে গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসন স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছিল। এই ভাগ্যবান্ ইতিহাসে প্রথম গোপালদেব নামে পরিচিত।

সত্যই গোপালদেবের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না ছিলেন। তাহা নহিলে প্রকৃতিপুঞ্জ কখনই তাঁহাকে কর্ণধারহীন রাজ্যের কর্ণধাররূপে মনোনয়ন করিত না। প্রাচীন যুগে বাহুবলে, বিবাহ দ্বারা, অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্য-লক্ষ্মী লাভ করিবার প্রথা ছিল। গোপালদেবকে এ সমস্ত কিছুই করিতে হয় নাই। প্রজামণ্ডলীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও যত্নে তিনি রাজ্য-লক্ষ্মী লাভ করেন। †
তাই বলিতেছিলাম, সত্যই গোপালদেব বিধাতার আশীর্ব্বাদ-লাভের মত ভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিলাভের সহিত গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

গোপালদেবই পালরাজবংশের প্রথম নরপাল। প্রথম নরপতি গোপালদেবের রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। প্রথম গোপালদেবকে নির্ব্বাচন করিয়া বাঙ্গালার প্রকৃতিপুঞ্জ প্রজাশক্তির উন্মেষ ও জাগরণের যে অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঘটনা। বাঙ্গালী আজ সে অতীত গৌরবের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইতিহাস তাহা ভুলে নাই!

পাল-রাজবংশের প্রথম ভূপাল গোপালদেবের পরিচয়

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড।

† Indo Aryans, R. L. Mitter Vol. ii P. 262.

ইতিহাসে এইরূপ পাওয়া যায়;—তাঁহার পিতার নাম ব্যপট; তিনি যুদ্ধবিশারদ ছিলেন; (১) এবং তাঁহার পিতামহের নাম দয়িতবিষ্ণু; তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। (২) গোপালদেবের প্রপিতামহ অথবা তদূর্দ্ধ-পুরুষগণের কোনরূপ নাম বা পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইঁহারা জাতিতে বাঙ্গালী এবং বরেন্দ্রভূমি তাঁহাদিগের জনকভূমি ছিল। তাঁহারা সমুদ্রকুলজাত ছিলেন। (৩)

গোপালদেবের পুর্ব্বপুরুষগণ যে হিন্দুধর্ম্মাচরণ করিতেন, তাহা তাঁহাদিগের সমুদ্রদেবজন্মতত্ত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায়। গোপালদেব নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন কি তাঁহার পিতৃদেব ব্যপট বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

সে যাহা হউক, প্রথম গোপালদেব বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দু অমাত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ অমাত্যবর্গের কুশাগ্রবুদ্ধি, মন্ত্রণা ও শাসন-নীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পালরাজগণ রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। (৪)

প্রথম গোপালদেব ৭৮৫—৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া গৌড়-মগধ-বঙ্গের রাজসিংহাসনে অধি-রোহণ করেন। সে সময় যদিও বহিঃশত্রুর আক্রমণ শেষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও মাৎস্য-ন্যায়ের বন্যা দেশ হইতে দূরীভূত হয় নাই। (৫) প্রথম গোপালদেব প্রথমে গৌড়, পরে মগধের রাজ্য লাভ করেন। (৬) খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোপালদেবের রাজত্বকাল হইতে গৌড়-মগধ ও বঙ্গ পাল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। (১)

(১) গৌড় লেখমালা পৃঃ ১১—১২।

(২) ঐ ১১।

(৩) Memoirs of Asiatic Society of Bengal Vol. iii P. 31-34.

(৪) Journal of the Behar & Orisa Research Society Vol. V. Part ii P. 1; Indian Historical Quaterly Vol. No. 4. P. 625-26.

(৫) Memoires of Asiatic Society of Bengal. Vol. iii P. 31-34.

(৬) স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-লিখিত গৌড়-রাজমালার ভূমিকা পৃঃ ।/০; বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় সংস্করণ, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৭৪

গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই লক্ষ্য করেন, পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় রাজগণের আক্রমণে দেশ হীনবল হইয়াছে। সে কারণ প্রথমেই তিনি শক্তিসঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। অনতিকালমধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি দেশব্যাপী অরাজকতা হইতে দেশ—রাজ্য রক্ষা করেন। এই কার্য্যে তিনি প্রভূত দক্ষতা ও রাজনীতিকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃদেব ব্যপটের মত যুদ্ধ-বিশারদ না হইলে কখনই প্রজাপুঞ্জ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন না। কারণ, উৎক্ষীপ্ত প্রজাপুঞ্জ কায়মনোবাক্যে এমন এক জন শক্তিধরের অপেক্ষা করিতেছিল, যিনি শৌর্য্য, বীর্য্যবলে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন।

দেবপালদেবের মুঙ্গের তাম্রশাসনের বর্ণনা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, গোপালদেব শক্তিসঞ্চয় করিয়া কিরূপ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। (২) তিনি দক্ষিণ-রাঢ় এবং 'ব'দ্বীপের শেষ সীমা পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। (৩) গোপালদেব পাঁচ বৎসর-কাল রাজত্ব করিয়া ৭৯০-৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। (৪)

গোপালদেব তাঁহার স্বল্পকাল রাজত্বের সমস্ত কালই দেশের অরাজকতা ও অশান্তি দূর করিতে অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। এই স্বল্পকাল রাজত্বসময়ের মধ্যেও গোপালদেব উদন্তপুরীর (বর্ত্তমান বিহার) নিকটবর্ত্তী নালন্দা নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। (৫) ইহাতে তাঁহার একনিষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল ৭৯২-৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়-মগধ-বঙ্গ-রাজ্যের রাজপদ

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় সংস্করণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৫৯

(২) গৌড় লেখমালা পৃঃ ৩৫—৩৬

(৩) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় সংস্করণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৭৬

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় সংস্করণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮

(৫) Archeological Survey Reports Vol. XV. Preface P. iii.

গ্রহণ করেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে পালরাজবংশের মহত্ত্ব ও প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার রাজত্ব-সময় হইতে পাল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত অভ্যুদয়কাল। ধর্ম্মপাল কূটরাজনীতিক ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমার্দ্ধ এবং নবম শতকের প্রথমার্দ্ধে উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তিনিই প্রধান নায়ক ছিলেন। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের মত উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমের পদলাভের জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক যে কার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, ধর্ম্মপাল সেই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কনৌজ জয় করিবার পর হইতে ধর্ম্মপাল উত্তর-ভারতের অধীশ্বর হয়েন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক হিসাবে তিনি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন। (১)

গর্গদেব নরপাল ধর্ম্মপালদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী গর্গদেবের কূটবুদ্ধি ও মন্ত্রণাকৌশলে ধর্ম্মপাল সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। (২)

ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ভানারায়ণের পুত্র আদি-গোসাঞি ওঝাকে ধামসার নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। (৩) ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন হইতেও জানিতে পারা যায় যে, তিনি মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণ বর্ম্মার অনুরোধে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অংন্তপাতী চারিখানা গ্রাম নারায়ণপূজক ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন (৪)

ধর্ম্মপাল যেমন ধার্ম্মিক, তেমনই বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি এমনই শক্তিধর ছিলেন যে, বাহুবলে উন্মত্ত হস্তীর গতিবেগ সংযত করিতে পারিতেন। (৫)

ধর্ম্মপালদেবের দেহাবসান ঘটিলে তাঁহার পুত্র দেবপালদেব সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। (৬)

(১) Introduction to Ramcharita P. 8.

(২) Indian Historical Quaterly Vol. I No. 4. P. 625-26.

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. L. xiii. Part 1. P. 55.

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, পৃঃ ১৫৬ পাদটীকা ৪১

(৫) Introduction to Ramcharita P. 7.

(৬) Early History of India (3rd Edition) V. A. Smith. P 399.

দেবপালদেব প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করেন। হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। (১) নরপতি দেবপালদেব যেমনই ধর্ম্মনিষ্ঠ, ভিক্ষুগণের প্রতি তেমনই ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত বীরদেব (২) তীর্থভ্রমণোপলক্ষে মগধে বজ্রাসনে আগমন করেন। বীরদেব বজ্রাসনে মহাবোধি দর্শন করিয়া যশোবর্ম্মপুরে (আধুনিক ঘোষর্যারা) বিহারে আগমন করিলে নরপতি দেবপালদেব তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। (৩) বীরদেব বৌদ্ধ-শাস্ত্র-জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য বৌদ্ধগণের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানভাজন ছিলেন। নালন্দা বিহারের অধিনায়ক সত্যবোধির মৃত্যু হইলে বীরদেব ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। (৪) দেবপালদেব চত্বারিংশৎ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। (৫)

ধর্ম্মপাল-মন্ত্রী গর্গদেব-পুত্র দর্ভপাণি দেবপালদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী দর্ভপাণি শাস্ত্র-জ্ঞান ও শাসন-নীতির জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। রাজা দেবপাল প্রধান মন্ত্রী দর্ভপাণিকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। মন্ত্রী রাজসভাগৃহে প্রথমে আসন পরিগ্রহ না করিলে তিনি আসন গ্রহণ করিতেন না। দর্ভপাণি রাজসভা-গৃহে প্রবেশোন্মুখ হইলে রাজা সসম্মানে আসন ত্যাগ করিয়া দ্বারদেশে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন। প্রধান অমাত্য দর্ভপাণির নীতিকৌশলগুণেই রাজা

(১) Indian Antiquiry Vol. XXI. P. 253-58; Asiatic Researches Vol. I. P. 113. (Popular Edition.)

(২) বীরদেব নগরহারবাসী (আধুনিক আফগানিস্তানের অন্তর্গত খাইবার গিরিসঙ্কটের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ) বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ইনি যৌবনে বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া কণিষ্কবিহারে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে সজ্জস্থবির সর্ব্বজ্ঞ শান্তির নিকট দীক্ষিত হয়েন।

(৩) গৌড় লেখমালা পৃঃ ৪৮; Indian Antiquiry Vol. XXI. P. 253-58.

(৪) Introduction to Ramcharita P. 7.

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় সংস্করণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২১৩।

দেবপালদেব সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। (১) দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বর দেবপালদেবের সেনাপতি ছিলেন। (২)

নরপতি প্রথম মহীপালদেব দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একাদশ শতকের প্রারম্ভে রাজ্যশাসন করেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ বলিয়া গিয়াছেন, প্রথম মহীপালদেব ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। (৩) তিনি যুদ্ধানুরাগী শশাঙ্ক, ধর্ম্মপালদেব, পালদেবের মত রণ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন না। শান্তিই তাঁহার প্রিয় এবং কাম্য ছিল। তিনি শেষ-জীবনে প্রিয়দর্শী অশোকের মত বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরহিতব্রত এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি অসংখ্য জনহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি, বরেন্দ্রভূমি, দিনাজপুর জিলার মহীপালদীঘি অদ্যাপি নরপাল মহীপালদেবের জনহিতনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। এই সমস্ত সদনুষ্ঠানগুণে তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রজাপুঞ্জও অকপট কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গীতরচনা দ্বারা তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর কীর্ত্তন করিত। অদ্যাপিও বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁহার কীর্ত্তি-স্মৃতি-গাথা পরম শ্রদ্ধাভরে বিঘোষিত হয়।

নরপতি প্রথম মহীপালদেব পরম সৌগত ছিলেন। তিনি যে শুধু জনহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; বারাণসীর সারনাথের প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ স্তূপ, ধর্ম্মরাজিকে ও সাঙ্গধর্ম্মচক্রের জীর্ণ সংস্কার ও শৈলগন্ধকুঠী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (৪) এই কার্য্যে তিনি তাঁহার দুই পুত্র স্থিরপাল ও বসন্তপালকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বারাণসীর চতুর্দ্দিকে শত শত চৈত্য ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বারাণসীকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। (৫)

প্রথম মহীপালদেব পরম সৌগত হইয়াও বিষ্ণুসংক্রান্তির দিন গঙ্গাস্নান করিয়া বুদ্ধপ্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে প্রভেদ ছিল না।

বামনভট্ট প্রথম মহীপালদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। (১)।

প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বসময়ে বাঙ্গালার গৌরব, ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্য্য সুবিখ্যাত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্রে এতই পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সমতুল্য জ্ঞানী ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষে কেহই ছিল না। তিনিই তৎকালীন বৌদ্ধগণের মধ্যে জ্ঞান-পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। (২) নরপাল মহীপালদেবের রাজত্বসময়েই তিনি বিক্রমশীলা বিহারে অধ্যাপনার্থ আগমন করেন। (৩)

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজ-আহ্বানে বজ্রাসন হইতে মগধে আগমন করেন। এই সময়ে মগধে শান্তিপাদ, নাড়পাদ, কুশল, ডোম্বি, অবধূত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যগণ বাস করিতেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানশাস্ত্রের এক এক বিভাগে এক এক জন দিক্‌পাল ছিলেন। দীপঙ্কর মগধে আসিয়া কিছু দিন ইঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁহারা মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শাস্ত্রজ্ঞান ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য-প্রভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ-সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামনীষী আচার্য্যরূপে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। (৪)

প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নয়পালদেব গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। নয়পালদেব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণের মত সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই। আনুমানিক মাত্র কুড়ি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। (৫) তিনি "সকল দিকে প্রতাপবিস্তারী" ও "লোকানুরাগভাজন" ছিলেন। মহীপালদেবের মত নয়পালদেবও রণপ্রিয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি

---

(১) গৌড় লেখমালা, পৃঃ ৭৮-৭৯।
(২) ঐ পৃঃ ৭৩।
(৩) Indian Antiquiry Vol. XIV. P. 165. Not. 17.
(৪) গৌড় লেখমালা, পৃঃ ১০৭-৮।
(৫) Introduction to Ramcharita P. 9-10.

(১) গৌড় লেখমালা, পৃঃ ৯৯।
(২) Indian Pandits in the Land of Snow. S. C. Das.
(৩) Indian Pandits in the Land of Snow. P. 50. S. C. Das.
(৪) Ibid P. 51.
(৫) গৌড় লেখমালা, পৃঃ ১২৫।

"স্নিগ্ধপ্রকৃতি" ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। ভারতবর্ষ অপেক্ষা মহাচীন ও তিব্বতে তিনি সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত ছিলেন।

নয়পালদেবের রাজত্বসময়ে বৈদ্যজাতির প্রাধান্য ও উন্নতি হয়। বৈদ্য-গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। (১) তাঁহার প্রশস্তিকারও ছিলেন। বৈদ্য সহদেব জনার্দ্দন-মন্দিরের প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। (২) বৈদ্য বজ্রপাণি গদাধর-মন্দিরের প্রশস্তি রচনাকারী ছিলেন। (৩) সুবিখ্যাত বৈদ্য চক্রপাণি এই যুগেই আবির্ভূত হইয়া বহুসংখ্যক চিকিৎসা-গ্রন্থের টীকা রচনা ও সম্পাদন করেন। (৪)

নরপাল নয়পালদেব দীপঙ্করের অনন্যসুলভ ও অপরাজেয় পাণ্ডিত্যপ্রতিভার প্রতি প্রণতি জানাইয়া তাঁহাকে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় অধিনায়ক-পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। (৫) দীপঙ্কর সম্মতি জানাইলে মহারাজ নয়পাল তাঁহাকে বিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। দীপঙ্করের পূর্ব্বে ১৭ জন আচার্য্য বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। আচার্য্য জ্ঞানশ্রী মিত্রের পরই দীপঙ্কর বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক-পদে অধিষ্ঠিত হয়েন।

দীপঙ্করের অধিনায়কতার সময়ে শুভাকর গুপ্ত, রত্নাকর শান্তি, জ্ঞানশ্রী মিত্র, নাড়পাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্য্যগণ বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। অধিনায়ক দীপঙ্কর এই সকল বৌদ্ধাচার্য্যের উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। (৬)

এই সকল বৌদ্ধাচার্য্যের শ্রীচরণতলে বসিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামনীষিরূপে শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়াছিলেন। তরুণ হইয়াও জ্ঞানবৃদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাগৌরবময় এবং দায়িত্বপূর্ণ অধিনায়ক-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুগণের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। দীপঙ্করের সময় হইতে বিক্রমশীলার গৌরবগরিমা দিকে দিকে সমধিক বিস্তৃতি লাভ করে।

নরপতি নয়পালদেব সংঘ স্থবির আচার্য্য দীপঙ্করকে আপন ইষ্টদেবতার সম জ্ঞান করিতেন। তিনি অনেক সময় বিক্রমশীলা বিহারে আগমন করিয়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চরণতলে বসিয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত পরমার্থ উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নরপাল নয়পালকে যে সমস্ত পরমার্থ উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহা দীপঙ্কর-রচিত "বিমলরত্ন লেখন" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। (১)

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নয়পালদেবকে পরমার্থ উপদেশ ব্যতীত অনেক সময়ে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত নানাবিধ জটিল বিষয়েও মন্ত্রীর মত পরামর্শ দিতেন। (২)

নয়পালদেবের রাজত্বকালে কর্ণ্যরাজ মগধ আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি নগর অধিকার করিতে না পারিয়া অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করিয়াছিলেন। গৌড়-মগধ-বঙ্গেশ্বর নয়পালদেব এই হঠাৎ আক্রমণ সম্বন্ধে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথম যুদ্ধে নয়পালদেব পরাজিত হইলেও শেষ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। শেষ যুদ্ধে যখন কর্ণ্যরাজ-সেনাগণ, গৌড়-মগধ-বঙ্গেশ্বরের সেনাগণ-হস্তে নিহত হইতেছিল, সেই সময় অহিংসমন্ত্রের পুরোহিত ও প্রচারক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীলা বিহারের অধিনায়ক; তিনি কর্ণ্যরাজ-সেনাগণকে বিহারে আশ্রয়দান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্ন ও উপদেশে যুদ্ধ স্থগিত হইয়া উভয়-পক্ষের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়; উভয় রাজা মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়েন। (৩) নয়পালদেবের পুত্র বিগ্রহপালদেবের সহিত কর্ণ্যরাজ-দুহিতা যৌবনশ্রীর বিবাহ হয়। (৪)

উল্লিখিত ঘটনা হইতে দীপঙ্করের পাণ্ডিত্য, যুদ্ধাদি বিষয়ে দূরদর্শিতা, লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা, রাজনীতিক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সকল বিভাগে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

(১) চক্রদত্ত, পৃঃ ১২০।

(২) গৌড় লেখমালা, পৃঃ ১২০।

(৩) Memoires of Asiatic Society of Bengal Vol. V. P. 78.

(৪) Introduction to Ramcharita P. 15.

(৫) Indian Pandits in the Land of Snow p.

(৬) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২য় সংখ্যা, ১৩২৩ পৃঃ ৮৬ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্বোধন।

(১) Journal of the Buddhist Text Society Vol. 1, Part 1, P. 9-14; Indian Pandit in the Land of Snow p. 76.

(২) Ancient India. Vincent. A. Smith P 76

(৩) Journal of the Buddhist Text Society Vol. 1, Part 1, P. 31.

(৪) Memoires of Asiatic Society of Bengal Vol. iii, P. 22.

মুকুটমণি

৩৯

অপরাহ্ণে খুব ঘটা করিয়া মেঘ সাজিয়া আসিয়াছিল। ক্যামেরা লইয়া নূতন ছবির আশায় সুরেশ্বরের সঙ্গে আজ আর বংশীর বাহির হওয়া হইল না।

বাধ্য হইয়া নন্দাকেও জানালায় আশ্রয় লইতে হইল। জানালার নীচে সঙ্কীর্ণ পাথরের পথ, বাঁকের দুই পার্শ্বে দুইটা কেরোসীনের টীন বসাইয়া পাহাড়ী ভারীরা নারিকেল-পাতার 'টোকা' মাথায় দিয়া গৃহস্থবাড়ী জল যোগাইতে চলিয়াছে। যাহাদের ভারীকে পয়সা দিবার সামর্থ্য নাই, তাহাদের বৌ-ঝিরা রাত্রির জলের প্রয়োজনের নিমিত্ত মেঘ-বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই ঝরণার দিকে ছুটিয়াছে। তাহাদের পায়ের গুঁজরীর শব্দে সারা পথ মুখরিত হইতেছে, পরিধানের রাঙ্গা শাড়ীর সহিত অঙ্গের হরিদ্রাবর্ণ মিশিয়া গিয়াছে। যুক্ত-শরাসন তুল্য ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে নবোদিত তপনের ন্যায় বৃহৎ সিন্দূরের টিপ জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে।

সুনন্দা পথের দিকে ঝুঁকিয়া পাণ্ডা-বধূদের অম্লান লাবণ্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এ কয়েক দিন বাহিরের অনন্ত মাধুরীতে সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, নিকটে দৃষ্টি পড়ে নাই। বাহির আজ মেঘের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়াছে, তাই চক্ষু নিকটের দ্রব্য খুঁজিতে ব্যগ্র হইয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত কুজ্ঝটিকা মিশিয়া চারিদিক্ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। বৃষ্টির বেগও বৃদ্ধি হইল।

সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া যোগমায়া আসিয়া ডাকিলেন, "নন্দিনি, আজ আবদ্ধ হয়ে পড়েছ, মা। তোমরা ছেলে-মানুষ—বাইরে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসবে; আমি বুড়ী-সুড়ি, তোমাদের মত পাহাড়ে পর্ব্বতে বেড়াতে না পাল্লেও ঘরে থাকতে পারি না। পাহাড়দেশে বৃষ্টি বড্ড বিশ্রী ব্যাপার, প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে। চল মা, তোমার বাজনা একটু শুনি গে।"

নন্দা কহিল, "শুধু বাজনা কি ভাল লাগবে, মাসীমা? গান বাজনা দু'টো একসঙ্গে হ'লে এমন দিনে শুনতে ভাল। দাদাকে ডাকুন, দাদা যে গান-বাজনার অফুরন্ত ভাণ্ডার। যারা দাদার গান-বাজনা একবার শুনেছে, তারা আমার বাজনা শুনতে চাইবে না।"

"চাইবে না আবার! বংশীর মত না হ'লেও তোমার বাজনার হাত খুব মিষ্টি, নন্দিনি! হাতের পরিবেষণের স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু গলার মধুর ছিপি এখনও খুলতে পারি নি। মাসীর কাছে যখন রয়েছ, কিছুই ফাঁকি দিতে পারবে না, ক্রমে ক্রমেই ধরা দিতে হবে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে যোগমায়া ছেলেদের ঘরে চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎকাল পর গান-বাজনার রীতিমত আসর বসিয়া গেল। সুরেশ্বর বংশীকে শিক্ষাগুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সবে এস্রাজের তার বাঁধিয়া ছড়িচালনা করিতে শিখিতে-ছিলেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা সুবিধা হইল না।

বংশী বেহালাখানা নন্দার দিকে ঠেলিয়া দিয়া নিজে এস্রাজ লইয়া যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি শুনবেন মা, ফরমাইজ করুন।"

যোগমায়া মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া জবাব দিলেন, "একটি 'গোষ্ঠ' শোনাও, বাবা, অনেক দিন শুনি নি।"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "মা যে বৈষ্ণবের মেয়ে, এই তাঁর পরিচয়, বংশীদা। বৈষ্ণবের মেয়ে না হ'লে কেউ কামাখ্যার মন্দিরদোরে ব'সে গোষ্ঠ শুনতে চায় না।"

যোগমায়া তাঁহার দুই স্নিগ্ধ চক্ষু সুরেশ্বরের পানে তুলিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "বৈষ্ণব বল্লে আমার বাবাকে গা'ল হয় না রে, সুর? 'সর্ব্বজীবে সম দয়া ভক্তি নারায়ণে' বাবা আমারও সেই বৈষ্ণব ছিলেন। তোরা রক্তখেকো শাক্ত, বৈষ্ণবের মহিমা জান্‌বি কি ক'রে?"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "জানি না আবার, তুমি না জানিয়ে ছেড়েছ কি না। শুনেছ বংশীদা, মা'র কত কীর্ত্তি; আমাদের আমলে সাবেকী নিয়মানুসারে দুর্গাপুজোয় একান্নটা বলি হ'ত, কালীপুজোয় হ'ত পঁচিশটা। মা ঘরে আসার পরের বছর থেকে পাঁঠা-মোষের পরিবর্ত্তে কুমড়ো বলি প্রচলিত হ'ল। কেবল তাই নয়, বাবার এক দিন মাছ-মাংস ছাড়া খাওয়া হ'ত না, মা'র দৃষ্টান্তে বাবাও মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন। ঠাকুরমারা মাকে অঘটনঘটন-পটীয়সী ব'লে ডাক্‌তেন। এখন মা কেবলই বৈষ্ণবের মেয়ে নন,

আমাকেও বৈষ্ণবের ছেলে বানিয়ে ছেড়েছেন।" বলিয়া সুরেশ্বর হাঃ হাঃ শব্দে হাসিতে লাগিলেন।

অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া যোগমায়ার চোখ ছলছল করিতে লাগিল। তিনি আর্দ্রহৃদয়ে কহিলেন, "সে আমার এক দিন গেছে বংশী, জীবের দুর্দ্দশায় রক্তপাতে কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাই পেয়েছি, তা বলবার নয়। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অমানুষিকতার বিরুদ্ধে কি করতে পেরেছি? আমি নারী, আমার ক্ষুদ্র শক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। থাক্ ও সব কথা, তুমি গাও, বাবা। সুরো আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ভালবাসে, ওর কথায় কাণ দিও না।"

শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বংশীর অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। হাঁ, ইঁহাকেই মা বলিতে হয়, জগতের দুঃখ, জীবের দুঃখ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সে কি মা হইতে পারে?

বংশী বিগলিত-হৃদয়ে বলিল, "আপনি যা পেরেছেন মা, তা যদি প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক গৃহিণী পারতেন, তা হ'লে সংসারের অনেক দুঃখ ক'মে যেত। আপনি আমাদের এমন জগদ্ধাত্রী মা, তা এক দিনও বুঝতে পারি নি।"

আত্মপ্রশংসায় যোগমায়ার মুখ রাঙ্গা হইল। তিনি এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার নিমিত্ত আরক্তিম-বদনে কহিলেন, "আমার গোষ্ঠ শোনা তোমরা যে ধামা চাপা দিচ্ছ, বংশী, সন্ধ্যা বয়ে গেল, দুপুর রাতে কি গোষ্ঠ শুনবো?"

সুনন্দা নিঃশব্দে বেহালা তুলিয়া লইল। বংশী নীরবে এস্রাজের উপর ছড়ি টানিতে লাগিল।

বাহিরের বিষণ্ণ প্রকৃতি আরও যেন সকরুণ হইয়া উঠিল। গৃহের সব ক'টি প্রাণীর অন্তর ব্যাপিয়া কিসের যেন একটা করুণতার উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সেই বিষাদ-প্রবাহে দৈবকণ্ঠ বংশীর মধুর সঙ্গীতে দিগ্বিদিক্ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।—

"গোঠে হ'তে আইল নন্দদুলাল (আমার)
গোধূলি-ধূসর শ্যাম-কলেবর আজানুলম্বিত বনমাল॥
ঘন ঘন শিঙ্গাবেণু শুনিয়া, বরজবাসিগণ সব ধায়,
মঙ্গল-থারি দীপ করে বধূগণ, মন্দির-দুয়ারে দাঁড়ায়;
আকুলপন্থে যশোমতী ধাওল,
ঝর-ঝর দুটি আঁখি লাল॥
পাগলিনীর মত, (হায় পাগলিনীর মত)
ধারার বিরাম নাই, প্রেমধারার বিরাম নাই (বিরাম নাই)"

এই একটি গান বংশী বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিয়া চলিল। গানের স্বর স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া, যোগমায়ার বেদনাতুর হৃদয় প্লাবিত করিয়া দুই নয়নে জল ঝরিতে লাগিল।

৪০

অনেক রাত্রিতে সঙ্গীত থামিলে যোগমায়া অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "আজ যে আনন্দ পেলাম, বংশী, অনেক দিন গান শুনে এমন আনন্দ পাই নি। তোমার গান শুনে কেবলই মনে হচ্ছিল, নদীয়া আঁধার ক'রে আবার বুঝি গোরাচাঁদ এসেছে, আমি যেন শচীমা।"

বংশী কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া স্মিতমুখে বলিল, "গোরাচাঁদের কোন গুণ ভগবান্ আমায় দেন নি, কিন্তু আপনি যে আমার শচীমা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেক দেখা হ'ল, অনেক গান গাওয়া হ'ল; এবার আপনার গোরা-গৌরীকে বিদায় দিতে হবে মা। এক মাসের ওপর এসেছি, এ যায়গা আর ভাল লাগছে না; এইবার ফেরবার অনুমতি হোক্।"

যোগমায়ার বুকের ভিতর ধপ্ করিয়া উঠিল। সত্যই ত উহাদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। রক্তের সম্বন্ধীয় যাহারা, তাহাদেরও চিরজীবন কাছে রাখিবার দাবী করা যায় না। ইহারা ত আগন্তুক, দুই দিনের অতিথি মাত্র। উড়িতে উড়িতে শ্রান্ত হইয়া পথপার্শ্বে বিশ্রামের নীড় বাঁধিয়াছে। যাহাদের কাছে রাখা যাইবে না, যাহারা থাকিবে না, তাহারা এত সহজে হৃদয়ের এত কাছে আসে কেন? এ কেনর উত্তর দেবে কে?

যোগমায়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, চট্ করিয়া তাঁহার উত্তর যোগাইল না।

সুরেশ্বর বংশীর প্রতি একটা সকরুণ কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নদীয়ার গোরার ভাই ছিল না, বংশীদা, তাই তাঁর যাত্রাপথ সুগম হয়েছিল। বুড়া শিবতলার গোরার যে সণ্ডাগুণ্ডা একটা ভাই রয়েছে, এখান থেকে সহজে তোমার নিষ্কৃতি নেই। বাড়ীতে ত তোমার

কোন কায নেই, আর কিছুকাল আমাদের কাছে থেকে যাও না। এ যায়গা ভাল লাগছে না, এখানে ত আমরা থাকছি না। শিলং যাওয়াই ঠিক হয়েছে, এখন পালাতে চাইলে তোমায় ছাড়বো না, বংশীদা।"

যোগমায়া সায় দিয়া কহিলেন, "না বাবা, এত সহজে তোমায় ছেড়ে দেওয়া হবে না। মায়ের সাথে—ভাইয়ের সাথে শিলং তোমায় যেতেই হবে। আরও ঢের দিন গোষ্ঠ শুনাতে হবে। কেবল মুখের মা ডাকে চলবে না, ছেলের কাযও যে তোমায় করতে হবে, বংশী। সুরো সত্যি বলেছে, গোরার ভাই থাকলে অমনভাবে পালাতে পারতো কি না সন্দেহ। অনাথা মা, বালিকা স্ত্রী, তাদের ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ, যে ধ'রে আনতে পারে, তাকে ফাঁকি দেওয়া একটু মুস্কিল বৈ কি। রামচন্দ্রকে ভরতের ভয়েই না বন হ'তে বনান্তরে পালাতে হয়েছিল।"

বংশী একটুখানি হাসিয়া জবাব করিল, "সে কালের ভ্রাতৃপ্রীতির আর এ কালে ভয় নেই, মা। এ কালের ভাইরা বনবাস থেকে ভাইকে আনতে যায় না, ঘর থেকে বনবাসে পাঠাতে পারলেই বাঁচে। এ কালে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, এক মায়ের দুধ খেয়ে একত্রে লালিত-পালিত হয়ে ভাই ভাই যে এমন শত্রু হয় কি ক'রে, আমি তা ভাবতেই পারি না। থাকুক গে, আমার ভাই যখন শত্রু না হয়ে মিত্র হয়েই আমায় ধ'রে রাখতে চাচ্ছেন, মা'রও মত হচ্ছে না, বিশেষতঃ শিলং সহরটি দূর থেকে ডাক দিচ্ছেন, তখন আর যাওয়া হবে কেমন ক'রে? ত্র্যহস্পর্শ যে মানতে হয়।"

বংশী সহজেই রাজী হইল বুঝিয়া যোগমায়ার মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। সুরেশ্বরও প্রসন্ন হইলেন।

শিলং যাইবার সম্ভাবনায় সুনন্দা তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিল না। চিরপরিচিতা চির-শান্তিদায়িনী যে পল্লী-জননীকে সে ছাড়িয়া আসিয়াছিল, তিনি তাহার মনো-মন্দিরে জাগ্রত হইয়া কাণে কাণে ডাকিতে লাগিলেন, "ঘর ছেড়ে পরের দ্বারে আর কেন? আয় রে আয়, তোরা আমারই স্নিগ্ধ শীতল কোলে ফিরে আয়।"

নিভৃতে নন্দা বংশীকে বলিল, "ওঁরা থাকতে বল্লেন বলেই কি তোমার থাকতে হয়, দাদা? এত দিন হ'ল এসেছ, একবারও যাবার নাম মুখে আনো নি, যদি বা আন্‌লে, তা না-আনার সমান। আমরা ত চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে বেরুই নি, ফিরতে ত হবে। এমন ভাবে পরের বাড়ীতে আর কত দিন থাকা চলে?"

বংশী ক্ষণেক ভাবিয়া চিন্তাক্লিষ্টস্বরে বলিল, "তোর কি খুব অসুবিধা হচ্ছে, নন্দা? তোর বিষয় আমি ভেবে দেখি নি, জানিস ত, তোর পাগলা দাদা বসুধা কুটুম্ব ক'রে ব'সে আছে। দাদাঠাকুরের চিঠি পেয়ে আজ আমার মনটা ভাল ছিল না, একবার মনে হচ্ছিল, বাড়ী ফিরে যাই, পরে মনে হ'ল, যাব কোথায়? কিসের আশায় তোকে কোথায় নিয়ে যাব? তোর সৌভাগ্যের শিখর আমি যে নিজের হাতে গুঁড়ো ক'রে এসেছি। এখন আমার মনে হয়, আমায় একটা আস্ত গাধা পেয়েই তুই আমাকে দিয়ে অতবড় কাযটা করিয়ে নিলি, মানুষ হ'লে পারতিস না।"

এক কথায় অন্য কথা উঠিবে, নন্দা তাহা ভাবিতে পারে নাই। আজকাল বংশীর পরিবর্ত্তন নন্দা লক্ষ্য করিতেছে। সে উচ্ছল হাসি, সরল আপনভোলা বাক্যবিন্যাসের ভিতর হইতে একটা অনুতাপের বেদনা সময় সময় যেন মূর্ত্তিমান হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। নন্দার কৃত কর্ম্ম নন্দাই করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত বংশীর অনুশোচনা নন্দার বুকে বাজে।

নন্দা মনে মনে আহত হইয়া ধীরে কহিল, "কি যা তা বলছ দাদা, তোমার কথার অর্থ হয় না। আমার অসুবিধা কিসের? এঁরা ত খুবই আদর-যত্ন করছেন, টুন্‌টুন্ সুজলির জন্যে সময় সময় মনটা আমার খারাপ লাগে, তা শিলংটা দেখে পরেই যাওয়া যাবে।"

নন্দা ক্ষণকাল চুপ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিল, "হ্যাঁ দাদা, কি যেন বলছিলে, আজ দাদাঠাকুরের চিঠি এসেছে, সবাই ভাল আছে ত? কৈ, চিঠির কথা ত এতক্ষণ বল নি?"

"সবাই ভাল আছে। দাদাঠাকুর ময়নামতী গিয়ে শুনে এসেছেন।"

নন্দার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, হাত-পা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কোনরূপে পা দুটাকে ঠিক রাখিয়া সে বিবর্ণ-মুখে বংশীর দিকে চাহিল।

কিছু লক্ষ্য করিবার অভ্যাস বংশীর কোন কালেই ছিল না। মৃদু দীপালোকে নন্দার ভাবান্তর তাহার চোখেই পড়িল না। সে ক্ষণেক মৌন থাকিয়া আপনার মনেই

বলিতে লাগিল, "সেই তারিখেই সতুর সাথে হিমুর বিয়ে হয়েছে। আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে আমি বুদ্ধির দোষে হারালাম, সাধে কি শাস্ত্রকাররা বলেছেন—'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী?' আমার নিজের বুদ্ধির গোড়ায় জল ঢেলে তোর বুদ্ধিতেই আজ এ দুর্দ্দশা।"

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া নন্দা ঘুমাইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, বংশীর সম্মুখে সেই আকস্মিক ভাব-বিপর্য্যয়। কামনা-বাসনাকে জয় করিয়াছি ভাবিয়া তাহার মনে যে অহঙ্কার জাগিয়াছিল, এখন কোথায় গেল সেই অহঙ্কারের তেজ, বিজয়িনীর গৌরব? ছিঃ ছিঃ, হৃদয় এত দুর্ব্বল, ধৈর্য্যের বাঁধ এত ক্ষণভঙ্গুর! একটা কথার আঘাত যে সহিতে পারে না, তাহার আবার মিথ্যা অহঙ্কার—মিথ্যা আত্ম-প্রবঞ্চনা?

হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নন্দা আর পারিল না; উঠিয়া শিয়রের রুদ্ধ বাতায়নটা খুলিয়া দিতেই রাশি রাশি শীতল বাতাস গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার ক্লিষ্ট শরীরটাকে যেন জুড়াইয়া দিতে লাগিল। সন্ধ্যার জলদোৎসব অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। শরতের অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না মেঘের স্তর ভেদ করিয়া সুপ্ত শান্ত ধরিত্রীর বক্ষে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। পাণ্ডাদের শুভ্র করোগেটের টীনের চালের উপর ম্লান জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িতেছে। দূরের পাদপ-ভূষিত পাহাড়-শ্রেণী ও নারিকেল-কুঞ্জ মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নাধারায় স্নাত হইয়া বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। নারিকেল-কুঞ্জের অন্তরালে মায়ের মন্দিরটি নীরবে মাথা তুলিয়া গগন-পটে চাহিয়া আছে। স্থির শান্ত আকাশ মন্দিরকে যেন নয়নে নয়নে রাখিয়াছে।

সুনন্দা যুক্তকরে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিল, "আমায় বল দিও মা, বল-হারা করো না। আমার সর্ব্বস্বদের সুখে রেখো, শান্তিতে রেখো, দুঃখের এতটুকু কণ্টকাঘাতও যেন তারা জানতে পারে না।"

৪১

শিলং সহরে আজকাল মেঘ-বৃষ্টির বালাই নাই। স্নিগ্ধ রৌদ্রে চারিদিক্ ঝল-মল করিতেছে। গাছে গাছে ফুলের যেমন বাহার, ফলের তেমনই শোভা। পিচ, ন্যাসপাতি বৃক্ষ আলো করিয়া পাকিয়া উঠিয়াছে। কমলা-লেবুর গায়ে রং ধরিয়াছে। আকাশের বৈচিত্র্য, বর্ণের প্রতিবিম্ব গিরি-চূড়ায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

মাসখানেক হইল, যোগমায়া সকলকে লইয়া শিলং আসিয়াছেন। গঙ্গা-বিহীন ঠাকুরদেবতাবর্জ্জিত স্থান মোটেই প্রিয় নহে। মা গো, কেহ না কি সাধ করিয়া এই খাসিয়া মুল্লুকে আসে! প্রাকৃতিক দৃশ্য অভিনব হইলেও দেশবাসীদের যে আচার-বিচার একবারেই নাই। না থাকিলেও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বছরে একবার এখানে আসিতে হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুরেশ্বর সপরিবারে শিলং বেড়াইতে আসিয়া বড় সাধ করিয়া একখানি বাগানবাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পুত্র ও বধূর পছন্দে বাড়ী হইল বলিয়া মা বধূর নামেই বাড়ীর নাম দিয়াছিলেন "মাধবী-কুঞ্জ"। কালের মহা ঝটিকায় মাধবী কুঞ্জের মাধবী ঝরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কুঞ্জ তেমনই আছে; বরং বাহার খুলিয়াছে। মাধবী আপনার হাতে যে গাছগুলি রোপণ করিয়াছিলেন, তাহারা শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া পুষ্প-পরিমলে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।

গোলাপগেটের পর একটা প্রশস্ত রাস্তা সিঁড়ির প্রান্তে গিয়া থামিয়াছে, দুই পার্শ্বে দেশী ও বিলাতী নানাবিধ বৃক্ষ বল্লরীতে সুশোভিত কুঞ্জকানন। কুঞ্জের মধ্যস্থানে কৃত্রিম পাহাড়ের গা বহিয়া কৃত্রিম ঝর্ণা ঝিরি-ঝিরি করিয়া বহিয়া যাইতেছে। বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকখানি লৌহাসন পুষ্পবীথিকার শেষ সীমায় বৃহৎ বারান্দাযুক্ত দুগ্ধধবলিত মনোহর গৃহ। গৃহের পশ্চাদ্ভাগে ফলের বাগান।

প্রতি হেমন্তে সুরেশ্বর একবার করিয়া পত্নীর আদরের মাধবীকুঞ্জ দেখিতে আসেন। হেমন্তে মাধবীকুঞ্জের উদ্বোধন হইয়াছিল বলিয়া সুরেশ্বর ঐ দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

ছেলেকে একা পাঠাইয়া মা শান্ত থাকিতেন না। আহা! এই বয়সেই সুরেশ্বর সংসারে একা হইয়া পড়িয়াছে, এখন উহাকে না দেখিলে কে দেখিবে? কে উহার সঙ্গী হইবে? গৃহে, বাহিরে, জলপথে, স্থলপথে সর্ব্বত্র পুত্রের সঙ্গী হইবার ব্যগ্রতায় যোগমায়ার হিতৈষিণী সখীর দল অনেক হিতোপদেশ দিয়াছিলেন, "বুড়ো বয়সে ছেলের পিছনে তোমার কেন ঘুরে মরা, এমন অনাসৃষ্টি

দেখতেও ভাল দেখা যায় না। হাজার লোকের বৌ মরেছে, তারা ত শ্রাদ্ধের আগেই বর সাজতে চায়। তোমার ছেলে না হয় একটু বাড়াবাড়ি করছে, তাই ব'লে মাকেও কি এমনি থাকতে হবে? ছেলের এত রূপ, এত গুণ, ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা, তুমি ছেলের পিছে লেগে নতুন বৌ বরণ ক'রে আনো। দেখো, আগে যেমন স্থির ছিল, তার চেয়েও আরও ভাল হবে।"

সকলের এ হেন মন্তব্যে যোগমায়া সখেদে উত্তর দিয়াছিলেন, "না দিদি, তোমরা অমন কথা বলো না। আমি নারীজন্ম ধারণ ক'রে মা হয়ে নারীর স্মৃতির অপমান করবো না। সুরো যদি মাধবীকে ভুলতে চায়, আমি ভুলতে দেব না। সাধ্বীর আসনে মাধবী না থাকলেও তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। সেখানে আর কারুর প্রবেশাধিকার নাই।"

মা'র মুখের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সুরেশ্বর ভক্তির আবেগে মা'র পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর সাহস করিয়া আর কেহ যোগমায়ার কাছে সুরেশ্বরের পুনর্ব্বার বিবাহের প্রসঙ্গ তোলে নাই। সোনাদানা, হীরা-জহরৎ বেশী বেশী ব্যবহার করিলে মানুষের মাথা যে কি পরিমাণে বিগড়াইয়া যায়, তাহার উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিয়া হিতৈষিণীরা পরস্পর খুব হাসাহাসি করিয়াছিলেন।

আচারপরায়ণা যোগমায়া পাহাড় অঞ্চলে বাস করিতে তেমন ভালবাসিতেন না। শিলংএ শীতের প্রাবল্য ক্রমেই বাড়িতেছে, উত্তরের কন্‌কনে হাওয়ায় চীরতরুবনে দিবা-রাত্রি ঝড় বহিয়া যাইতেছে। মা'র কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া সুরেশ্বর সত্বর কাশী যাওয়া মনস্থ করিয়াছেন। সুরেশ্বরের পিতা কাশীনাথ কিছু কাল যাবৎ কাশীবাস করিতেছিলেন। পুত্রস্নেহে যোগমায়া স্বামীর সহযাত্রী হইতে পারেন নাই। স্থির হইয়াছে, সুরেশ্বর জমীদারীর তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়ানের উপর ছাড়িয়া দিয়া এ দিকের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া পিতামাতার সহিত কিছু কাল কাশীতে গিয়া থাকিবেন।

শিলং মাতা-পুত্রের নিকটে পুরাতন হইলেও বংশী-সুনন্দার কাছে এক স্বপ্নরাজ্য। এটা সেটা দেখিতেই তাহাদের দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছিল।

বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যদেব সমস্ত দিবাব্যাপী সুতীব্র জ্বালা বিকিরণ করিয়া গিরি-অন্তরালে বিশ্রাম করিতে ছুটিয়াছেন।

দিনান্তের ম্লানরৌদ্র পশ্চিমের বারান্দায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া যোগমায়া রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময় সুরেশ্বর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদিমণি কোথায় মা? আজ না সকাল সকাল বেড়িয়ে ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার হাউস্ দেখতে যাবার কথা ছিল? বংশীদা ত দুপুর থেকেই তাড়া দিচ্ছে, এ দিকে দিদিমণির সাড়া নেই, তুমিও দিব্যি রোদ পোয়াচ্ছ!"

যোগমায়া সহাস্যে কহিলেন, "যে গরমের দেশে এসেছিস, বাবা, সূর্য্যি ডুবতে দেখলেই ভয় লাগে, মনে হয়, রাতের জন্য আঁচলে বেঁধে রাখি। আমার তাড়া কি, আমি ত তোদের সে পাতালপুরে নামবো না। সে পাতালে আমার নামা-ওঠা অসাধ্যি। ওদের নিয়ে দেখিয়ে আনো গে। নন্দিনীকে অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না, তার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে নি ত?"

নিতাই বেহারা ষ্টোভ জ্বালাইয়া চায়ের জল গরম করিতেছিল। টগর ঝি কাশ্মীরী ট্রের উপর শ্বেত পাথরের পেয়ালা পিরিচগুলি মুছিয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল।

গৃহিণীর কথা কাণে যাইতেই টগর হাতের কাষ রাখিয়া সরিয়া গিয়া উত্তর করিল, "দিদিমণি ঘুমুন নি মা, তিনি আবার ঘুম যাবার মুনিষ্যি। বামন ঠাকুরকে বেড়াতে পাঠিয়ে বেলাভোর রান্নাঘরে খাবার কচ্ছেন।"

"কে খাবার করছে, টগর?" বলিতে বলিতে বংশী আসিয়া উপস্থিত হইল।

টগর মাথার আঁচলটুকু টানিয়া দিয়া একমুখ হাসি হাসিয়া কহিল, "কে আবার দাদাঠাকুর, আমাদের দিদিমণি খাবার করছেন, কতশত খাবার, আমরা কি তার নাম জানি, করছেন দেখছি, খেতে দেবেন খাব।"

টগর অনেক কালের পুরানো ঝি, সুরেশ্বরকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, এ সংসারে টগরের আধিপত্য কম নহে। টগরের কথায় সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

যাহাকে উপলক্ষ করিয়া হাসি হইতেছিল, কিয়ৎকাল পর সে নিজেই উপনীত হইল। তাহার দুই হাতে দুইখানি

রূপার থালায় ফুলকপির সিঙ্গাড়া, কড়াইশুঁটির কচুরী, চিনির রসে ভিজানো খইবড়া পরিপাটীরূপে সাজান।

অগ্নির উত্তাপে সুনন্দার মুখখানি ঈষৎ আরক্ত হইয়াছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে, শাড়ীর অঞ্চলটি কোমরে জড়ান।

যোগমায়া সেই সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিটির পানে মুগ্ধনেত্র মেলিয়া দিয়া অনুযোগের স্বরে কহিলেন, "সারা দুপুর বুঝি তোমার এই কায হচ্ছিল, নন্দিনি? রাত-দিন খাটিয়ে মারবার জন্যেই বুঝি তোমায় এখানে এনেছি, মা। লোক-জন রয়েছে, তাদের দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেই হয়। তোমাদের না আজ পাওয়ার হাউজ দেখতে যাবার কথা আছে? কখন্ বা চুল বাঁধবে, কখন্ বা তৈরী হবে। এমন কায-পাগল মেয়ে আমি জন্মে দেখি নি।"

সুনন্দা স্মিতমুখে বলিল, "হাঁ, কত কায করছি, মাসীমা, তাই আবার বলছেন। আপনার কাছে বোসে থেকে থেকে আমার বাতে ধরবার যো হ'ল। টগর দিদি, দু'খানা যায়গা ক'রে দাও, দাদাদের খেতে দিই।"

ভোজনকক্ষে দুই বন্ধু আহারে বসিলে যোগমায়া একটা চৌকীতে বসিয়া উঁহাদের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বর একখানা সিঙ্গাড়া গলাধঃকরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, কি সুন্দর, রামদিন ঠাকুরের বাবারও সাধ্য নেই এমন খাবার করে! মা, তুমি আর যাই কর না কেন, কিন্তু দিদিমণিকে রান্নাঘরে যেতে বারণ করো না।"

বংশী একটা রসবড়া মুখে দিয়া সহাস্যে বলিল, "নন্দার রান্নাঘরে থাকা আমিও খুব ভালবাসি, সুরোদা। গরীব মানুষ, কি আর করবো, বাড়ীতে রান্নাঘরখানা ভাল ক'রে দিয়েছি।"

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, "মেয়েদের সত্যিকার পরিচয় যে রান্নাঘরেই, বাবা। যতই শিক্ষা-দীক্ষা হোক না কেন, কিন্তু রান্নাঘর বাদ দিলে ওদের মানায় না। আমি ত নন্দিনীকে বারণ করি নে, তাই ব'লে রাতদিন রান্না নিয়ে থাকা ভাল লাগে না। একেই নন্দিনী রামদিন ঠাকুরকে প্রায় ছুটীতে রেখেছে, তার পর তোমরা এত সুখ্যাতি করলে ওকে আর রান্নাঘর থেকে বের করা যাবে না।"

নন্দা কাছেই ছিল, সে ঘাড় ফিরাইয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, "দাদাদের প্রশংসার লোভে আমি খাবার করি না, মাসীমা। রান্নাবান্না করতে আমার ভারী ভাল লাগে ব'লেই করি।" বলিয়াই আরও কিছু খাবার আনিতে সে উঠিয়া গেল।

৪২

'পাওয়ার হাউস' দেখিয়া সন্ধ্যার পর ফিরিয়া সুনন্দা একখানি পত্র পাইল। আপনার নিভৃত গৃহে বিছানায় বসিয়া নন্দা পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল, রাজু লিখিয়াছে—

"ভাই নন্দা, অনেক দিন তোকে চিঠি লিখি না ব'লে রাগ করিস না। জানিস ত, আমি এত দিন এক নতুন জগতের মানুষ হয়ে ছিলাম, তাও তোরি কৃপায়। অভিমানের আত্মহত্যার পাপ হ'তে তুই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছিলি, তোর এ ঋণ জন্মে জন্মেও পরিশোধ করতে পারবো না।

"বুড়ো শিবের দয়ায় তোদের রাজুর জীবনের সমস্ত কালো মেঘ আজ অন্তর্হিত হয়েছে, আবার আমি সুখের সমুদ্রে স্নান করতে যাচ্ছি, বোন্। কিন্তু এর মূল কে? তুই, তোর পায়ে কোটি কোটি প্রণাম।

"কথাটা এখন পরিষ্কার ক'রে বলি—তিনি কাল আমায় নিতে এসেছেন। এর আগে ওঁর অনেকগুলি চিঠি পেয়েছিলাম, তুই বোধ হয় আন্দাজেই বুঝতে পারবি, তার একখানারও উত্তর দিই নি। উনি এলে দেখা করবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু মা'র তাড়নায় দেখা করতে হ'ল।

"নন্দা, তোকে আমি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা কেমন ক'রে জানাব, কিন্তু তুই যে আমার সবই জানিস। নূপুরের সম্বন্ধে তোকে যা বলেছিলাম, যা ভেবেছিলাম, তা মনে করলে লজ্জায় মুখ লুকোবার যায়গা পাই না। সত্যি ভাই, আমি বড় ক্ষুদ্র, বড় হীন। তিনি কত উদার, কত মহৎ।

"আমি জানতাম না, বহু দিন থেকে নূপুর এক জনার বাগ্‌দত্তা; বি, এ পরীক্ষাটাই তাদের বিয়ের অন্তরায় ছিল। নূপুর বি, এ পাশ করেছে, বিয়ের দিনও ঠিক হ'য়ে গেছে।

"উনি যে সর্ব্বদা নূপুরদের বাসায় গিয়ে থাকতেন, সে নূপুরের কাছে নয়, তার দাদার কাছে। ওঁরা দুই বন্ধু আর একটি বিষয়ের এম, এ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তাই অন্যমনস্ক থাকতেন, আমার দিকে তেমন মন দিতে

পারেন নি। পাশ ক'রে আমাকে অনেকখানি আনন্দ দেবার আশাতেই আমাকে আগে কিছু জানান নি। আমি এমনি ঘৃণ্য যে, তা থেকে কত কি অনুমান করেছিলাম।

"কাল তাঁর পায়ের কাছে বোসে সবই স্বীকার করেছি, অপরাধের ক্ষমাও পেয়েছি। আনন্দও কম পাই নি। তিনি পরীক্ষা দিয়ে গোপনে খবর নিয়েছেন, খুব ভাল ক'রে পাশ করেছেন। এইবার উনি ডবল এম, এ হলেন, উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

"তুই যদি তখন আমায় না বাঁচাতিস, তা হ'লে এ সুখের অধিকারিণী হোত কে? এ আনন্দ কে উপভোগ করতো? ওঁর কাছে আমি সব বলেছি, উনি তোকে হৃদয়ের শত সহস্র কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

"আমরা দুই তিন দিনের ভেতর চ'লে যাব। যাবার সময় তোর সাথে দেখা হবে না ব'লে দুঃখ হচ্ছে। আরও একটা গভীর দুঃখ রয়েছে, তা তোকে না লিখে পারছি না। নন্দা, তুই এ কি করলি? এ খেলার শেষ কোথায়, একবার ভেবে দেখেছিস? সামনে সমস্ত জীবন প'ড়ে আছে, কোথায় কার আশ্রয়ে কি ক'রে ও জীবনের সমাপ্তি হবে?

"সে দিন বাবা ময়নামতী গাঁয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখে শুন্‌লাম, সত্যপ্রিয় বাবু দেশের কাযে জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। সে দেশসেবা 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' নয়। নিজের জন্মভূমির—গাঁয়ের প্রকৃত উন্নতির কায।

"বাবা শুনে এসেছেন, সত্য বাবু এখনও তোর কথা শুনে কেমন যেন হয়ে যান। তোর কথা উঠলে তাঁর মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। হিমু দিদি দিদি ব'লে কেঁদে আকুল হয়। তাদের সে বিশু চাকরটা, সেও না কি তোকে ভুলতে পারে নি। এত পাওয়া ক'জনার ভাগ্যে হয়, নন্দা? তুই সব পেয়েও খেয়ালের দোষে হারিয়ে ফেল্লি। কুলীনের মেয়ের না বড় দর্প করেছিলি, পুরাকালে আজীবন কুমারী থেকেই কুলীনকুমারীরা কুলমর্য্যাদা রক্ষা করে নি, তার চেয়ে বেশী ত্যাগ তাদের করতে হ'ত।

"আমরা অকুলীনের মেয়ে, ত্যাগের মন্ত্র জানি না, তার অনেক প্রমাণ পেয়েছিস। কিন্তু তুই যে ত্যাগী, নিজেকে বলি দিতে জানিস, পরহিতে প্রাণ দিতে জানিস্! যারা তোকে পেলে হারাধন এখনও কুড়িয়ে পায়, তাদের কথা একবার ভাবিস। তোকে বলবার আমার আর কিছু নেই, হয় ত আছে, আজ খুঁজে পাচ্ছি না।

"তোদের বাড়ীর সকলে ভাল আছে। গৌহাটী থেকে তোরা যে পাটের শাড়ী পাঠিয়েছিলি, তা পেয়ে তরী বৌদির কি আনন্দ, তা বলবার নয়। তোরা শীগ্‌গির বেনারসে যাবি শুনে একখানা বেনারসী শাড়ীর কথা বৌদি তোকে লিখে দিতে বলেছেন। বেচারা শাড়ী-গহনার লোভে বেশ আছে, হৃদয়ের বালাই নেই।

"বংশীদা কেমন আছেন? তুই কেমন আছিস জানাবি। আবার বলছি, আমি ত ফিরলাম, তুই ফিরবি কবে? কবে তোর সময় হবে?

"তোর বুড়ো শিবের ভার মা নিয়েছেন, তাঁর পূজো আরতির ব্যাঘাত হবে না। তুই ত শিবভূমিতেই যাচ্ছিস, বিশ্বনাথের মাথায় বেলপাতা চাপালেই বুড়ো বাবার পূজো হয়ে যাবে, তিনি ইনি তো পৃথক্ নন।

"আজ আর কত লিখবো, অনেক লিখতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সময় কৈ? কাযেই এইখানেই ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি তোর বাল্যসখী—রাজু।"

পত্রখানা পড়িতে পড়িতে পুলকোচ্ছ্বাসে নন্দা স্নাত হইয়া উঠিল। রাজুর নির্ম্মল হৃদয়াকাশের সন্দেহের মেঘরেখা অপসারিত হইয়াছে। আর নিরাশার ব্যথা নাই, দুঃখের দাহিকাশক্তি নাই। ভ্রম সংশোধন হইয়াছে, প্রীতির হিল্লোলে অশান্তি দূরে পলাইয়াছে। দুইটি হৃদয় আজ তৃপ্তিতে পূর্ণ, আনন্দে উদ্ভাসিত।

সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও নন্দার হৃদয়-সমুদ্র উঁহাদের হর্ষের তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত, উদ্ভাসিত হইতেছে। সুনন্দা কল্পনার বলে রাজুকে নিকটে আনিয়া স্নেহে আপ্লুত হইয়া মনে মনে বলিল, 'এবার তোরা সুখী হ রাজু, সুখী হ, বড় ব্যথাই পেয়েছিলি।'

রাজুর চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া খামে তুলিয়া রাখিবার পূর্ব্বে নন্দা চিঠিখানি উল্টাইয়া একটি নামের প্রতি চাহিয়া রহিল। কত দিন ঐ সুন্দর হইতে সুন্দরতর অক্ষর চারিটির প্রতি নন্দার আঁখিপল্লব নিপতিত হয় নাই। সমস্ত মধুর-শব্দ-মন্থন-করা ঐ একটিমাত্র শব্দ কত দিন নন্দার কর্ণ-কুহরে সুধাবর্ষণ করে নাই। সেই অক্ষর কয়েকটির পানে

চাহিতে চাহিতে প্রভাতের শুকতারার ন্যায় নামের অধিকারী আসিয়া তাহার অন্তরাকাশে উদয় হইল। তাহারই ধ্যানে নন্দা বিহ্বল হইয়া গেল।

"নন্দিনি, তোমার কি অসুখ করেছে, মা?"

নন্দা চমকিয়া দ্বারপ্রান্তে তাকাইয়া দেখিল, যোগমায়া কখন্ নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। রাত হইয়াছে, লোকবিরল পথে আর কোলাহল নাই। পথের বাঁকে বাঁকে বিদ্যুতের বাতিগুলি দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

নন্দা চিঠিখানা বিছানার নীচে রাখিয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, পরে শুষ্কমুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "না মাসীমা, আমার অসুখ করে নি, কেমন যেন আলস্য বোধ হচ্ছিল, তাই চুপ ক'রে বসেছিলাম।"

মাসীমা এত সহজে ভুলিলেন না। তিনি কথাচ্ছলে বংশীর নিকটে সুনন্দার সমস্ত ইতিহাস অবগত হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল চুপ করিয়া একটু দ্বিধার সঙ্গেই জিজ্ঞাসিলেন, "অনেক দিন হ'ল, আমি তোমাদের ধ'রে রেখেছি মা, আমার অনুরোধে বাধ্য হ'য়েই তোমরা ত কাশী যেতে স্বীকার কর নি? যদি বাড়ীর জন্য মন খারাপ হয়ে থাকে, তা হ'লে তোমাদের কাশী গিয়ে কায নেই, বাড়ীতেই পাঠিয়ে দেই।"

বাড়ীর জন্যে মন খারাপ, সুনন্দার বাড়ী! সে যে গগনচ্যুত উল্কার মত লক্ষ্যহারা হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে তাহার আবার গৃহ!

নন্দা ম্লান হাসিয়া বলিল, "যে কাশীতে অনেকেই সাধনা ক'রে যেতে পারে না, আপনি সেই কাশীতে আমাদের নিয়ে যাবেন, তাতে আবার মন খারাপ হবে কি? না, আমার কিছু মন খারাপ হয় নি। কাশী যাব ব'লে ভারী ভাল লাগছে।"

যোগমায়া প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "ভাল লাগলেই ভাল, মা। কাশী দেখো নি, গেলেই মনের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাবে। বড় শান্তিপূর্ণ স্থান, ক'দিন পর গেলেই দেখতে পাবে। এখন 'সীতারামের' বাকীটুকু পড়বে, না আজ থাকবে? এ পোড়ার দেশ সন্ধ্যার পর একেবারেই ভাল লাগে না।"

"সত্যি মাসীমা, একটু পড়াশোনা না করলে রাত যেন কাটতে চায় না। 'সীতারামের' অবশিষ্টটা এখুনি শেষ করা যাক। কা'ল 'দেবীচৌধুরাণী'খানা আরম্ভ করা যাবে। আপনি সোফাটায় ভাল হয়ে বসুন, র‍্যাগখানা পায়ের ওপর তুলে দেন, তা হ'লে আরাম লাগবে।" বলিয়া সুনন্দা টেবলের উপর হইতে "সীতারাম" বইখানি লইয়া পড়িতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

দাবী

মায়ার ধাঁধায়, মরীচিকায়, কভু যদি-ই পথ ছাড়ি' হায়,
মরুর মাঝে পড়ি' একা আপন মোহে হই হারাদিশ্,
যেথাই থাকিস্, দাবী জানিস্, মা, স্মরণে আমায় আনিস্,
কুপথ রুধে' দাঁড়াস্ বারেক—কঠোর ক'রে তুই তাড়া দিস্।

ঘোর দুরাশায় ঘোর-পিপাসায়, নেহাৎ যখন প্রাণ রাখা দায়,
চলে না আর বিবশ চরণ, বিষম ক্ষুধা—প্রাণভরা বিষ,
করুণ-মুখে কোমল হাসি', সমুখে মোর দাঁড়াস্ আসি,'
আদর ক'রে বারেক মুখে, ভুলিস্ না মা, স্তনধারা দিস্।

শোক-রোগেশ্বীর কাল-ঝটিকায়, কখন্ বুকের বাঁধ টুটি' যায়!
রুষ্ট হ'লে দুষ্ট গ্রহ, দিস্ মা অভয়—দিস্ বরাশিস্;
জীবন-বেলার শেষে যখন, আঁধার হয়ে আস্‌বে গগন,
তোর দুয়ারেই পড়ব ঢুলে',—তুলিস্ ধ'রে, বিষ ঝাড়া দিস্।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

পূরবী

চৌধুরীদের বিধবা বধূ পূরবী চৌধুরাণীর নামে সকল প্রজাই মাথা নত করিত। ভয়ে নহে, ভক্তিতে। তাহারা বলিত, এই সাতখানা গাঁয়ের গরীব-দুঃখীর উনিই ত মা হইয়া আছেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়রা দুঃখ করিত, "এমন সাবিত্রী মেয়ের কপাল হইতে কি না সিন্দুরের রেখা আঠার বছর বয়েসে মুছে গেল! ঘোর কলি! কিন্তু হ্যাঁ! স্বামি-শোক বটে! আজকালকার দিনে এমন নিষ্ঠাচারিণী আচার-পরায়ণা বিধবা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

শত্রুপক্ষও এ কথাটার প্রতিবাদ করিতে পারিত না। মুখ বাকাইয়া "ছোটরাণী ভবানী" অন্যায় বিদ্রূপ করিয়া, তৃতীয় পক্ষের টান বেশী বলিয়া হাসিলেও বধূ রাণীর ত্যাগের প্রশংসা তাহারা না করিয়া থাকিতে পারিত না; এবং ত্যাগশিক্ষা যে তাহার বয়সধর্ম্মে হয় নাই, যে দিন স্বামীকে হারাইয়াছিলেন, সেই আঠার বছর বয়স হইতে ইহা হইয়াছে, এ কথাটাও তাহারা স্বীকার করিত। আরও বলিত, অশৌচান্তের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া পূরবী তাহার ভ্রমর-কালো কুঞ্চিত চুলের রাশ, যাহা পিঠ ভরিয়া থাকিত, মানুষের একটা দেখিবার জিনিষ ছিল, তাহা কেমন করিয়া এই বধূটি নিজের হাতে কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই সকরুণ গল্প! আর পূরবীর গর্ভজাত বলিয়াই তরুণকে সকলে বড় বেশী ভালবাসিত। এই আদর্শ-জননীর পুত্রই যে চৌধুরী-বংশের মধ্যাহ্ন-রবি হইয়া উঠিবে, ইহা সকলেরই বিশ্বাস হইল।

কিন্তু শত্রু-মিত্রের মুখে পূরবীর যত আলোচনাই বাহির হউক না কেন, তাহার বুকের মাঝে যে বেদনা ছিল, যে অনুতাপের বহ্নিতে পুড়িয়া সে এমন সোনা হইয়াছিল, তাহার সংবাদ এক পূরবীর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই জানিত না।

*   *   *   *

ঊষার প্রথম আলোর রেখা আকাশের রং বদলাইয়া পৃথিবীর দিকে চাহিতেছিল, পূবের খোলা জানালা দিয়া তাহার খানিকটা আসিয়া পূরবীর বিছানার উপরে ছড়াইয়া পড়িল, তাহার নিদ্রাহীন চোখেতেও পড়িল। পূরবী ত্রস্তে উঠিয়া বসিল, এবং নিদ্রিত স্বামীর মুখের উপর একটা তাচ্ছীল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া খাটের উপর হইতে সে নামিয়া পড়িল।

খট্ করিয়া দুয়ারের ছিটকানি খোলার শব্দে অনন্ত-মোহনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া প্রস্থানোদ্যতা পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "এত ভোরে কোথায় যাবার হচ্ছ? সবাই ঘুমুচ্ছে। একটা প্রাণীও জাগে নি!"

পূরবী দরজা ধরিয়া থমকিয়া দাড়াইল। অনন্তমোহন ডাকিলেন, "শুনে যাও!" তাহার স্বরে বিরক্তিও ছিল না, আদরও ছিল না।

পূরবী ফিরিয়া দাড়াইল। প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে সে এক-বার স্বামীর পানে চাহিয়াই মুখ ঘুরাইয়া লইল। অনন্তমোহন

দেখিলেন, নব-বিবাহিতা তরুণীর লজ্জার রাগ তাহার আননে নাই, অন্তরের সীমাহীন বিরক্তিতে ভরা কারা-বাসিনী বন্দিনীর উপায়হীনতার ম্লান ছায়া যেন তাহার মুখে কে লেপিয়া দিয়াছে।

অনন্তমোহনের অন্তরটা বেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহাকে দেখিয়া তরুণী পত্নীর মুখে হাসি ফুটিতে পারে না, তাহা তিনি জানিতেন, তথাপি এতখানি বিরক্তিও তিনি আশা করেন নাই। মানুষ সকলের কাছে ঘৃণা সহিতে পারে, সহিতে পারে না শুধু স্ত্রীর কাছে।

গতরাত্রিতে ফুলশয্যা হইয়া গিয়াছে। বিছানার উপর ইতস্ততঃ ছড়ান ফুলের মালা, তোড়াগুলাকে অনন্তমোহন টানিয়া একপাশে ফেলিয়া দিলেন ; খাটের উপর হইতে নামিতে একটা বেলফুলের মোটা গড়ের মালা তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িল, সেটাকেও তিনি পা দিয়া একপাশে সরাইয়া কক্ষস্থিত সোফায় গিয়া বসিলেন।

পূরবী দরজার কাছে তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া স্বামীর কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল ; যে ফুলের মালাটাকে স্বামী পা দিয়া সরাইয়া দিলেন, সে মালাটা পূরবীর কণ্ঠে উঠিয়াছিল এবং ঘৃণায় পূরবী তাহা খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল ; তথাপি অনন্তমোহন সেটাতে পা দিলেন দেখিয়া রাগে পূরবীর সুগৌর মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল।

অনন্তমোহন পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"একটা কথা আছে, তুমি একটু ব'সো !"

স্বামীর সোফার একটা পাশ দখল করিয়া পূরবী বসিল।

অনন্তমোহন তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন,—"তুমি আজ বাপের বাড়ী যাবে ?" অনন্তমোহনের মুগ্ধ দৃষ্টি পূরবীর মুখেতেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।

পূরবী মাথা নত করিল ; কহিল, "তোমরা পাঠালেই যাব।"

অনন্তমোহন একটুখানি হাসিলেন,—কহিলেন, "আমরা কারা ? আমিই ত এ বাড়ীর সর্ব্বপ্রধান, আর এক জন প্রধানা, সে তুমি। তোমায় আটকাবে কে ? কিন্তু সে কথা ত বল্‌ছি না ; জিজ্ঞেস কচ্ছি, আজ তুমি বাপের বাড়ী যাবে ?"

"হাঁ, যাব।"

অনন্তমোহন কহিলেন,—"আসবে কবে ?"

"সে আমি কি জানি ? আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি ?" পূরবীর অন্তরের ক্রোধটা কণ্ঠের স্বরে চাপা রহিল না।

অনন্তমোহন অন্তরে একটা আঘাত পাইলেন। ক্ষণেক নিঃশব্দে অবনত-দৃষ্টিতে থাকিয়া নিজের মাঝে তাহা সহিয়া লইলেন এবং কহিলেন, "তা জানি। একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্যেকবার ত তা করতে ইচ্ছে করি নে। তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি, আসছ কবে ? তোমার নিজের ইচ্ছে থেকে বল।"

পূরবী কহিল, "আমার নিজের ইচ্ছে একটুও আসবার নেই।"

অনন্তমোহন বিরক্ত দৃষ্টিতে একবার পত্নীর পানে চাহিয়া কি বলিতে উদ্যত হইয়াই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইলেন। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া কহিলেন, "যদি কখন ইচ্ছে হয়, সঙ্কোচ ক'রো না, জানিও।"

দরজা খুলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

* * * *

পূরবীর সহিত অনন্তমোহনের বিবাহ ঘটিয়াছিল, তৃতীয় পক্ষে। প্রথমা পত্নী সুশীলা বিবাহের একটা বৎসরের মধ্যেই স্বামীকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। অনন্তমোহনের বয়সটা তখন তরুণ, মাথার চুলগুলা তখন সাদা ও পাতলা হইবার অনেক বিলম্ব ছিল। প্রিয়াহারা শোকটা বিরহী যক্ষের মত তাঁহার বুকের মাঝে নিবিড় হইয়া বাজিয়া প্রিয়ার ধ্যানে মনটাকে আত্মভোলা করিয়া তুলিল এবং কবিতার আকারে তাহারই যে উচ্ছ্বাস বাহির হইতে লাগিল, তাহাতে মাসিক পত্রিকা-পাঠকের দল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। অনন্তমোহনের জননী ভয় পাইলেন ; ছেলে বুঝি বধূ-বিয়োগে সংসার আশ্রম ত্যাগ করিবে। ব্যস্ত হইয়া তিনি বিবাহের কথা তুলিলেন। অনন্তমোহনের ঘোর আপত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের অনুরোধটা জেদে পরিণত হইয়া গেল এবং একটা শুভলগ্নে শুধু জননীর শপথ-বাণীর জন্যই নাকি অনন্তমোহন দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে চলিলেন।

বধূ তরুলতা বেশ সুন্দরী ও বয়স্থা। অনন্তমোহনের

কাছে রাত্রিগুলা স্বল্পমুহূর্ত বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। কবিতা লিখিবার অবসর আর মিলিত না। সরস্বতীর অর্চ্চনায় লক্ষ্মীকে ত তিনি রুষ্টা করিতে পারেন না!

অনেকগুলি বৎসর কাটিয়া গেল। অনন্তমোহনের বয়স প্রৌঢ়তার দরজায় আসিল, রগের দুই পাশের চুল সাদা হইতে আরম্ভ করিল; তথাপি তরুলতা মা হইল না। অপুত্রক-দম্পতির মনের মাঝে স্নেহ-তৃষ্ণা মিটিত না। গৃহের প্রতি তাহাদের চিত্ত বিমুখ হইয়া পড়িল। স্বামি-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে ও দেশভ্রমণে বাহির হইলেন এবং ঐতিহাসিক অনেক কিছু কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করিয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে তাঁহারা ফিরিতে লাগিলেন। আর প্রত্যেক দেবদেবীর পায়েই তরুলতা মাথা খুঁড়িলেন, পূজা মানত করিলেন, "শ্বশুরবংশের বাতি দিবার জন্য,—তাহাদের জল-পিণ্ড দিবার অধিকারীর জন্য!"

কেদার-বদরী দর্শন করিয়া দিন কতক বিশ্রাম করিবার জন্য অনন্তমোহন হরিদ্বারে আস্তানা পাতিলেন। পথে তরুলতার ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছিল এবং হরিদ্বারে আসিতে ডাক্তার বলিল, "নিউমোনিয়ার জ্বর।" অনন্তমোহন ভয় পাইলেন। পত্নীর পীড়াটা তাঁহাকে আত্মপরিজনহীন প্রবাসে ভয়ানক বিপন্ন করিয়া তুলিল। কলিকাতায় তার প্রেরিত হইল,—তরুলতার পিতা-মাতাকে আসিবার অনুরোধে এবং কাশী হইতে ডাক্তার আনিবার বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু তরুলতার পীড়া এতখানি কিছু করিবার অবসরই দিল না। স্বামীর ভীতি-ব্যাকুল মুখের পানে চাহিয়া তরুলতার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। অনন্তমোহনের হাতটা সাগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া তিনি কহিলেন,—"তুমি অত অধৈর্য্য হয়ো না। তুমি আমার পাশে থাক। তুমি আমার ডাক্তার, ওষুধ—সব!"

দুইটি দিন কাটিল। তরুলতার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইল। নিউমোনিয়ার সর্দ্দি তাহার দুই বুক ভরিয়া কণ্ঠনালীকে রুদ্ধ করিতেছিল।

ডাক্তার অক্‌সিজন্ দিবার কথা বলিলেন,—কিন্তু তরুলতা সম্মতি দিল না।

অনন্তমোহন আকুল কণ্ঠে কহিলেন,—"তরু, ও রকম কচ্ছ কেন? এতে তোমার ভয় নেই। নিউমোনিয়ার লাষ্ট ষ্টেজ হ'তে অক্‌সিজন্ ব্যবহার করা ভাল।"

তরুলতা কহিলেন,—"ভাল-মন্দর কথা হচ্ছে না। কেদার-বদরীর কাছে আমি জল-পিণ্ডের অধিকারী, বংশের বাতি চেয়েছিলুম। আমার প্রার্থনা তিনি শুনেছেন। আমায় যেতে দাও।"

অনন্তমোহন শিহরিয়া উঠিলেন,—পত্নীর জ্বরতপ্ত ডান হাতখানা গভীর মিনতিতে চাপিয়া ধরিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "না তরু, অমন ক'রে তুমি বলো না। ছেলে হয় নি, আমাদের দু'জনেরই মন্দ ভাগ্য।"

তরুলতা স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। অনন্তমোহনের চোখে অশ্রু দেখিয়া তাঁহার দুই চোখে অশ্রু বহিল। স্বামীর এতখানি ভালবাসা ত্যাগ করিয়া মেয়েমানুষ কি স্বর্গ কামনা করিতে পারে?

তরুলতার চোখের পানে চাহিয়া, তাঁহার মনের ইচ্ছা বুঝিয়া, অনন্তমোহন পত্নীর মাথাটা নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন।

তরুলতা কহিলেন, "আমায় একটা প্রতিশ্রুতি দেবে?"

রুমালে চোখ মুছিয়া অনন্তমোহন কহিলেন, "তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই! কি চাই, তরু? কিসের মিনতি?"

নিভিয়া যাইবার আসন্ন মুহূর্ত্তে দীপ জ্বলিয়া থাকিবার শেষ চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিঃশেষে ঢালিয়া যেমন একবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তেমনই ভাবে নিষ্ঠুর ব্যাধির নিষ্পেষণে তরুলতার যন্ত্রণা-কাতর মুখখানির উপর অন্তরের সমস্ত আনন্দ যেন নিঃশেষে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "দেখ, যত দেশ আমি ঘুরেছি, ছোট ছেলের যত কিছু খেলনা আমি দু'চোখে দেখেছি, সব কিনেছি। কার জন্যে যে কিনেছি, কাকে যে আমি এত দেব, তা কিছু বুঝতে পারলুম না। না কিনেও থাকতে পারলুম না। ছোট ছেলের জুতা, কাপড়, জামা, ছড়ি আমি এত কিনেছি যে, দেখলে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। আমি কাকে এ সব দেব, বলতে পার? তুমি বলবে, পাঁচ জনের ছেলেকে দাও। কিন্তু আমি পাঁচ জনকে দিয়েও আলাদা ক'রে রাখি। মনে হয়, যেন আমার কেউ আছে, তাকে দেব।"

অনন্তমোহন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সন্তান নাই বলিয়া তাঁহার মনেও একটা অভাব, একটা ক্ষোভ ছিল। কিন্তু পত্নীর দুঃখের তুলনায় আজ যেন তাহা বোঝা যায় না—

এমনই ক্ষুদ্র অস্পষ্ট হইয়া গেল। সন্তানের জন্য নারীর এই প্রচণ্ড লোভ, তাহা না পাওয়ায় এই তীব্রতম ব্যথার বেদনা দেখিয়া অনন্তমোহনের অন্তর স্তব্ধ হইয়া গেল।

তরুলতা কহিলেন, "আমার সত্যিই কি কেউ থাকবে না? আমার এত সাধের কেনা জিনিষ কি কেউ ভোগ করবে না? আমি কেদার-বদরীর কাছে ভোগের লোক প্রার্থনা ক'রে এসেছি—তুমি আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর।"

ভয়কণ্ঠে অনন্তমোহন কহিলেন, "তরু, সে লোক হ'লে তোমার তৃপ্তি কি? তাতে কি তুমি শান্তি পাবে?"

বিদায়মাখা দিনের শেষ রক্তলেখাটুকুর মত তরুলতার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "আমার তৃপ্তি হবে না তুমি বলছ? আমার খাটে, আমার বিছানায় সে খেলা করবে, তোমার বুকে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার কান্না ভুলাতে, বায়না সামলাতে আমার জিনিষ দিয়ে তাকে তুমি ভুলাবে; তখন আমি এত শান্তি, এত তৃপ্তি পাব—যা জীবনে কোন দিনই পাই নি। আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি, আমার সব জিনিষের উপর দু'টি ছোট ছোট হাত-পায়ের ছাপ পড়েছে, তাতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। বল তুমি, প্রতিশ্রুতি দাও! আমি আরামে মরি!"

অনন্তমোহন রুমালে নিজের চোখ চাপা দিলেন। মরণপথযাত্রিণীর শেষ প্রার্থনা পূরণের উত্তরটা কণ্ঠে তাঁহার বাধিয়া গেল।

তরুলতার নিশ্বাসের কষ্ট ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল। ব্যাকুলকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ওগো, বল না? আর যদি শুনতে না পাই? আমার জল-পিণ্ডির অধিকারী তুমি এনে দেবে, আমার স্বর্গের সিঁড়িতে আলো দেবে? বল না, পুন্নাম নরকে আমায় পচ্‌তে হবে না?"

পত্নীর প্রতীক্ষা-অধীর চোখের পানে চাহিয়া অনন্তমোহন কহিলেন,—"তোমার কথা আমি রাখ্‌ব, তরু!"

* * *

একটা বৎসর কাটিয়া গেল। অনন্তমোহনের কাছ হইতে পূরবীর ডাক আসিল না। সুমতি মেয়ের পানে চাহিয়া কহিলেন,—"সেই আট দিনের দিন চ'লে এলি, তার পর দেখছি, ওরা আর নামগন্ধ করে না।"

পূরবী ঝাঁকিয়া উঠিত! কহিত, "কেন, আমায় কি তুমি দুটো ভাত দিতে পার না? দিনরাত যদি আমার কাণের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর কর ত সত্যি বলছি—"

সুমতি কন্যার কথাটাকে শেষ হইতে না দিয়া, "ষাট্‌, ষাট্‌" করিতে করিতে কক্ষ হইতে পলায়ন করিতেন।

ঠাকুরমা কহিতেন,—"ওলো, গৌরী হেন ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর মোরা করব কি?"

মুখ বাঁকাইয়া পূরবী কহিত, "তা ত বটেই গো! ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ও কথা বললেই পারতে? আমিও সিঁদুর পরা আর মোছা একসঙ্গে শেষ ক'রে এসে তোমার আলো-চালের ভাগ নিতুম!"

"ষাট্‌! ষাট্‌! আবাগী মেয়ের কথা শোন। মুখে গোবর গুঁজে দিতে হয়! এমন অলক্ষণে কথা! বল হ্যালা, অত হীরে মুক্ত কার দৌলতে পরছিস্? সেই তোর দু'চোখের বিষ যে, তার দৌলতেই ত!"

জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই-ষষ্ঠী আসিল। সুমতি কহিলেন, "আমি অনন্তকে নেমন্তন্ন করব। হাজার হোক্, আমার একটা সাধ আহ্লাদ আছে ত।"

পূরবী ঘরের ভিতর ছিল, কথাটা শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া বারন্দায় মাতৃ-সন্নিধানে আসিল। বিপুল ক্রোধের রক্তোচ্ছ্বাসে সুগৌর মুখখানি সিন্দুর-রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর পানে চাহিয়া সে কহিল, "সত্যি! সত্যি! সত্যি! এই তিন সত্যি কল্লুম; যদি সারকুলার রোডে নেমন্তন্ন কর ত আমি কেরোসিন জ্বেলে পুড়ে মরব। কর তুমি জামাই-ষষ্ঠীর আমোদ!" উত্তেজনার বশে পূরবী কাঁদিয়া ফেলিল।

সুমতির মুখ পাংশু হইয়া গেল। তাঁহারও অন্তরের একটা প্রচণ্ড ক্রোধ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু মেয়ের শপথবাণী ও চোখের জলে মাতৃ-প্রাণ ভীত হইয়া পড়িল! রাগে ওষ্ঠাধর শুধু থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তথাপি একটা কথাও তিনি কহিতে পারিলেন না।

—"মেয়ে যেন চামুণ্ডারূপিণী" বলিয়া ঠাকুরমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

জামাই-ষষ্ঠীর আনন্দভরা দিনটা আসিয়া উপস্থিত; প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে কন্যা-জামাতার আদর-যত্নের, পরিপাটী ভোজনের হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। পূরবী ছাদে

উঠিয়াছিল। আশে-পাশের আনন্দমুখর কর্ম্মচঞ্চল বাড়ীগুলির পানে চাহিয়া তাহাদের নিজের বাড়ীখানি বড় নিস্তব্ধ বোধ হইতে লাগিল। পূরবীর মনে হইল, তাহাদের সারা বাড়ীখানি যেন একটা নিবিড় ব্যথার ভারে থম্ থম্ করিতেছে। ছাতটা আর পূরবীর ভাল লাগিল না। অপরাধীর মত কুণ্ঠিত পদে আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া আসিয়া জননীর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সুমতিকে বিছানার উপর শুইয়া থাকিতে দেখিয়া পূরবী চমকিয়া উঠিল। আকস্মিক একটা অজানা ভয় তড়িৎ-শিহরণের মত তাহার সমস্ত দেহ মনের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। শত কাজের অবসর থাকিলেও এমন অসময়ে ভরা সাঁঝে জননীকে শয্যা গ্রহণ করিতে পূরবী জ্ঞানে কোন দিন দেখে নাই। ত্রস্তে সে সুমতির নিকট সরিয়া আসিয়া ভীতকণ্ঠে কহিল, "মা, তোমার অসুখ কচ্ছে?"

সুমতি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া চোখ মুদিয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যার কথায় কোন সাড়াও দিলেন না, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়াও দেখিলেন না। তথাপি বুঝিতে পারিলেন,—একখানি ব্যথাভরা মুখের দুইটি আয়ত নেত্র হইতে অনেকখানি ব্যাকুলতা তাঁহার উপর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতেছে। কন্যার আচরণে সুমতি ক্ষুব্ধা মর্ম্মপীড়িতা হইলেও তাহার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া তাহার দুঃখ ও বেদনার হেতুটা বুঝিয়া অন্তর তাঁহার আর্দ্র হইয়া পড়িত। শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের এই দুর্ব্বলতাটুকুর জন্য পূরবীর উপর কোনদিন তিনি কঠিন হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

পূরবী আবার কহিল,—"মামণি, অসুখ কচ্ছে?" পূরবী জননীর ললাটে হাত দিল।

সুমতি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মেয়ের দিকে ফিরিয়া পূরবীর মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন,—"রুবি! আমি যদি ম'রে যাই?"

ধাঁ করিয়া মায়ের মুখের উপর একখানি হাত চাপা দিয়া পূরবী কহিল, "ইস্, মরতে দিলে তো?" কিন্তু মুখে সে জোর দেখাইলেও পরিপূর্ণ সন্ধ্যায় মায়ের এই বাণীটায় তাহার বুকের মাঝটা ধক্ করিয়া উঠিল। পূরবীর দুই চোখে জল ভরিয়া গেল।

সুমতি কন্যার অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্র দুইটির পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তারপর কহিলেন, "সত্যি রুবি, তোর জ্বালায় আমার মরতে ইচ্ছে করে।"

পূরবী কাঁপিয়া উঠিল। ভীতকণ্ঠে কহিল, "সত্যি কি মা, আমি তোমায় বড্ড দুঃখ দিই?" পূরবী কাঁদিয়া ফেলিল। সুমতিও কাঁদিলেন। বেদনার ভারটা চোখের জলেই উপশমিত হয়।

দিনকয়েক কাটিয়া গেল। সুমতি মুখে অস্বীকার করিলেও পূরবী ধরিয়া ফেলিল, মা সত্যই পীড়িত। পিতাকে কহিল, "ডাক্তারকে একবার 'কল' দাও। মা'র এই সর্দ্দি-কাসি—ঘুস্‌ঘুসে জ্বর—অরুচি! যদি একটা বেশী—"

সুরেশ কহিলেন, "সব বুঝি মা! কিন্তু বুঝলেই কি সব করতে পারি? ডাক্তার ত অমনি আসবে না।"

আরো গোটাকয়েক দিন কাটিয়া গেল। সুমতির শীর্ণ দেহটা বিছানা লইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশ ডাক্তার আসিলেন এবং তাঁহার মন্তব্যে সুমতি যে চলাফেরাটুকু নিজে করিতেছিলেন, তাহা ত বন্ধ হইয়াই গেল, উপরন্তু বায়ু-পরিবর্ত্তনের বিধিটাও তিনি দিয়া গেলেন।

কাঙ্গালের ঘোড়া চড়িবার সাধের মত অনটনের গৃহস্থ সংসারে বায়ু-পরিবর্ত্তন ব্যবস্থাটা একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তা আনিয়া দিল।

সুরেশ মাথায় হাত দিলেন। সুমতি পাশ ফিরিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

পূরবী পিতার নৈরাশ্য-পীড়িত মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কেন, অত ভাবনা কিসের, আমার গয়নাগুলো ত সব আমার কাছে রয়েছে।"

একান্ত প্রয়োজন গ্রহণের অধিকারটা সঙ্গত কি না চিন্তা করিতে পারে না। বর্ষার মেঘকে দুই পাশে সরাইয়া হঠাৎ মধ্যাহ্নরবির আত্মপ্রকাশের মত সুরেশের চিন্তাচ্ছন্ন মুখে একটা আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল। প্রফুল্লকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "তোর তোলা চুড়ি জোড়াটা থেকেই পাঁচশ টাকা বাঁধা দিলেই পাওয়া যাবে। বিক্রীর আবশ্যক নেই।"

সুমতি এতক্ষণ চুপ করিয়া স্বামী কন্যার আলোচনা শুনিতেছিলেন। কিন্তু আর পারিলেন না। সব বস্তুরই একটা সীমা আছে, তাহা অতিক্রম করিলেই ক্ষতি ঘটে। তিক্তকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "কি আছে! তোলা চুড়ি? তুমি দিয়েছিলে বুঝি?"

এ রকম যে একটা কথা উঠিতে পারে, সুরেশ তাহা ভাবেন নাই। তিনি বিষম অপ্রতিভ হইয়া মুখখানি কাচুমাচু করিয়া মাথা নত করিলেন।

পূরবী কহিল, "বাবা নাই বা দিলেন! সে ত আমারই, আছেও আমার কাছে; ছেলেমেয়ের জিনিষ মা-বাপের নেবার দাবী আছে।"

সুমতি মেয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তা জানি, ছেলেমেয়ের জিনিষে মা-বাপের নেবার দাবী আছে, তা মানি; কিন্তু যে ছেলেমেয়ে মা-বাপের পানে চায়। কিন্তু তুমি ত তা নও, বাছা!"

পূরবীর মুখে কে যেন একটা ভয়ানক জোরে চড় মারিল। নিমেষে তাহার সুগৌর মুখখানি নীলাভ হইয়া একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণার ছাপ তাহাতে ফুটিয়া উঠিল। কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; কণ্ঠে বাধিয়া গেল। প্রচণ্ড আঘাত বাক্‌শক্তিকে লুপ্ত করিয়া দেয়।

সুরেশ কহিল, "তুমি কি বলছ? রুবি আমাদের ভালবাসে না! আমাদের চায় না!"

সুমতি কহিলেন, "আমি তা বলি নি। রুবি আমাদের ভালবাসলেও আমাদের মুখপানে চায় না। তা ছাড়া ওর নিজের জিনিষ ত কিছু নেই।"

সুরেশ কহিলেন, "মেয়েমানুষের স্বামীর দেওয়া জিনিষটাই নিজের জিনিষ। আমি যা তোমাকে দিয়েছি, সে কি তোমার নিজের নয়?"

উত্তেজিত কণ্ঠে সুমতি বলিলেন, "কেন আমার তা হবে না? আমি ত তোমার পায়ের তলাতেই প'ড়ে আছি। তোমার কাছ হ'তে আলাদা ক'রে নিজের কিছু রাখি নি, কিন্তু রুবি কি তা করেছে?"

পূরবী জীবনে কোন দিন জননীর কাছে এরূপভাবে তিরস্কৃত হয় নাই। তাহারই ক্রোধ—চোখের জল—আব্দার জননীর কাছে অনুক্ষণ জয়ী হইত! সুমতি নির্ব্বিকার হাসিমুখে তাহার অত্যাচারগুলা সহিয়া আসিতেন। সেই সর্ব্বসহনশীলা ধৈর্য্যময়ী জননী কেন যে সহসা এমন করিয়া ক্ষিপ্তের মত তাহার প্রতি কঠিন হইয়া উঠিলেন, কোন্ অপরাধে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। পীড়াদুর্ব্বলা মায়ের মুখের উপর কোন কথা কহিবারও তাহার সাহস হইতেছিল না।

ধৈর্য্যের বাঁধন একবার টুটিয়া গেলে সে বড় ভয়ানক হইয়া উঠে। দীর্ঘদিনের পীড়নের যত কিছু বেদনা-বিরক্তি সে তখন নিঃশেষে তাহা বাহির করিয়া দিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সুমতি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমার গয়না বলতে রুবির লজ্জা করে না! এ গয়না ওর এল কোথা হ'তে? ওকে দিয়েছিল কে? ও কি তার ঘর করেছে? সে কি অনেকখানি আশা নিয়ে ওকে নিয়ে যায় নি? কিন্তু সে ত জোর ক'রে ওকে নেয় নি! তার হাতে আমরা রুবিকে দিয়েছি, তবেই সে পেয়েছে। এ কথা কি ও এক দিনও ভাবে?"

সুরেশ প্রমাদ গণিলেন। জননীর এতখানি তিরস্কারের এতটুকুও পূরবী সহিতে পারিবে না, ইহা সুরেশের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ভীতকণ্ঠে কহিলেন, "কি পাগলামী কচ্ছ! আচ্ছা, টাকার আমি অন্য ব্যবস্থা করব।"

স্বামীর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া সুমতি কহিলেন, "আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর, তুমি ওর কিছু নেবে না। তুমি কি ভুলে গেছ কতখানি আশা নিয়ে আমরা ওর বিয়ে দিয়েছিলুম। বড় মানুষ! রূপ আছে! স্বাস্থ্য আছে! শুধু একটু বয়েস হয়েছে, তিন বরে ব'লে ও তার ঘর করবে না! ওর এতখানি বুকের সাহস—আমাকে তার নাম করতে মানা ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের কত পাপ হ'লো বল দেখি! সে বেচারী বংশধরের কামনায় ওকে বিয়ে করেছিল।"

"ও কি! ও কি! পূরবী, অত কাঁপছিস্ কেন?"

সুরেশ উঠিয়া কন্যাকে ধরিবার পূর্ব্বেই পূরবীর সংজ্ঞাহারা দেহ মাটীতে পড়িয়া গেল।

* * * *

বায়ু-পরিবর্ত্তনের কোন ব্যবস্থাই সুমতির হইল না। হার্ট ভয়ানক দুর্ব্বল! ডাক্তার তাঁহাকে বিছানার উপরই বেশী নড়াচড়া করিতে মানা করিয়া দিলেন। পূরবী মাকে ফেলিয়া একটি মুহূর্ত্তও কোথাও নড়িত না।

কিন্তু পূরবীর এই প্রাণঢালা সেবার মাঝেও সুমতির দিন যে শেষ হইয়া আসিতেছিল, তাহা তাঁহার মুখের পানে চাহিলেই বেশ বুঝা যাইত।

তৈলহীন দীপ যেমন আলোকে মৃদু হইতে মৃদুতর করিয়া অবশেষে নিভিয়া নিঃশেষে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়,

তেমন ধারাই সুমতির জীবন-দীপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর—অবশেষে নিভিয়া পূরবীর চোখে অন্ধকার ভরাইয়া দিল।

যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইল! সমস্ত পরিবারটা গভীরতম শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ইহার মাঝে আশ্চর্য্যের কিছু ছিল না। তথাপি জননীর চতুর্থী শ্রাদ্ধের প্রভাতে পূরবী ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেল, যখন অচিন্তনীয়-রূপে তাহার নামে চারি শত টাকার মণিঅর্ডার আসিয়া উপস্থিত হইল। আর তাহার সঙ্গে আসিল একখানি ক্ষুদ্র পত্র।

হস্তাক্ষর পূরবীর সম্পূর্ণ অপরিচিত! তথাপি লেখক যে কে, তাহা সে বুঝিতে পারিল। কম্পিত হস্তে ক্ষুদ্র পত্রখানি সে পড়িতে আরম্ভ করিল।

আড়ম্বর তদূরের কথা, সামান্য একটা সম্ভাষণ অবধি নাই। দ্রুত লেখনীর মুখে শুধু এই কয়টি ছত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"এই মাত্র জানিতে পারিলাম, তোমার জননী স্বর্গগত হইয়াছেন। জানিয়া দুঃখিত হইলাম। মাতৃহারার বেদনা যে কতখানি, তাহা আমি জানি। তাই আত্মীয় অনাত্মীয় কাহারও সংবাদ শুনিলে আমি ব্যথিত হই। কিন্তু সে জন্য এ পত্রখণ্ডের সৃষ্টি হইতেছে না! ইহা সৃষ্টি হইবার কারণ এই—তুমি যখন বিবাহিতা—অবশ্য শাস্ত্রমতে—তবে তুমি তাহা মান কি না জানি না; কিন্তু আমি তাহা মানি এবং সেই জন্য লিখিতে বাধ্য হইলাম। বোধ হয় তুমি তোমার স্বর্গগতা জননীর চতুর্থী শ্রাদ্ধ করিবে! এবং ধর্ম্মের অনুশাসনে আমি তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য। তাই চারিশত টাকা পাঠাইলাম। ইহার উপর যদি খরচ হয়, কুণ্ঠিত হইও না, আমায় জানাইলেই পাঠাইয়া দিব। ইতি

শ্রীঅনন্তমোহন চৌধুরী।

পূরবী বসিয়া পড়িল। এই তাহার স্বামীর পত্র! ইহাতে একটা কুশল জিজ্ঞাসা নাই। স্নেহ-সম্ভাষণ নাই। সমবেদনার অশ্রুপাত নাই। শুধু ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে কর্ত্তব্যের সত্যনিষ্ঠ মূর্ত্তি। তথাপি এ যে তাহার স্বামীর পত্র, এ কথা পূরবীকে স্বীকার করিতে হইবে। সহসা পূরবীর মনে হইল, ইহা তাহার প্রথম পত্র—জীবনে ইহাকে অনেকখানি গৌরব-সম্মান দিতে হইবে। পূরবীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল! স্বামীর প্রতি বিন্দুমাত্র তাচ্ছিল্য দেখাইলে পূরবীর জীবনের একান্ত প্রিয় পূজ্যতমা জননী স্বর্গ হইতে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, তাহা মনে করিয়া অন্তর তাহার কাঁপিয়া উঠিল।

শোকাচ্ছন্ন দুর্ব্বল মন নিজের অপরাধকে অত্যন্ত বেশী করিয়াই দেখিতে পায়। অকস্মাৎ পূরবীর মনে হইল, মা বোধ হয় তাহার উপর রাগ করিয়াই এমন অসময়ে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মেঝের উপর লুটাইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পূরবী কাঁদিতে লাগিল,—"মা! মা!"

জননীর শেষযাত্রার সময়ে তাঁহার আলতা-পরা সুগৌর চরণ দুইখানি, নববিবাহিতার মত সীমন্তে স্থূল সিন্দুরের রেখাটি, চন্দন-চিত্রিত ললাটটি, পরণের লালপাড় গরদের সাড়ীখানি, কুসুমমাল্যে বিভূষিত দেহখানি পূরবীর চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। পাঁচজনে মিলিয়া তাহার মাকে নববিবাহিতা কনেটির মত সাজাইয়া পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিল। আত্মীয়া অনাত্মীয়া সকল মেয়েই তাহার মায়ের পায়ের তলায় মাথা লুটাইল। যাহারা একদিন সুমতির প্রণম্যা ছিলেন, তাঁহারাও সে দিন সুমতির পায়ে আলতা দিয়া, কপালে সিন্দুর দিয়া সৌভাগ্য ভিক্ষা করিয়া সুমতিকে প্রণাম করিলেন। জননীর মাথার সিন্দুর, হাতের লোহা ও পায়ের ধুলা লইবার জন্য সকল মেয়ের আগ্রহ দেখিয়া পূরবীর সে দিন মনে হইয়াছিল, তাহার মা শুধু তাহার দেবী নহেন, সকল নারীর সম্মুখেই তিনি আজ দেবীর আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য এই সীমাহীন আগ্রহ সকলের মাঝে জাগিয়া উঠিয়াছে।

পূরবী শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল—এ শুধু সিঁদুরের মর্য্যাদা। সীঁথার সিঁদুর তিনি উজ্জ্বল রাখিতে পারিয়াছিলেন শুধু নিজের একান্ত স্বামি-ভক্তির জন্য।

* * *

কয়দিন ধরিয়া অশ্রান্ত বর্ষণে কাঁদিয়া আকাশ পৃথিবীর বক্ষ ভাসাইয়া আজ চোখের জল মুছিয়া উদাস নেত্রে চাহিয়াছিল! কিন্তু ধরণীর বুকের সিক্ততা এখনও শুকায় নাই।

অনন্তমোহন নিজের কক্ষে বসিয়াছিলেন। মনটা অকারণ কেন যে উতলা হইয়া উঠিতেছিল, তাহার কারণ তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। বাদল দিন দেখিয়া

কাঁদিবার দিন তাঁহার চলিয়া গিয়াছে; তথাপি থমথমে আকাশের মত মনটাও তাঁহার থমথম করিতেছিল। সিক্ত তরুপল্লব বাতাসের আঘাতে যেমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, তাঁহার মনের মাঝেও একটা ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে যেন তেমনই ভাবে অন্তরকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছিল। শার্সি-রুদ্ধ গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া অনন্তমোহনের কেবলই তরুলতাকে মনে পড়িতেছিল। তাহারই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য প্রৌঢ়ত্বের দরজায় মাথা গলাইয়াও তিনি বরমাল্য পরিয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত স্পৃহার জন্য এ কায তিনি করেন নাই। তথাপি ছাদনাতলায় পূরবীর কিশোর মুখখানি তাঁহার মনে একটা মায়ার সঞ্চার করিয়াছিল। তেমনই একটা বেদনার অনুভূতিও জাগাইয়াছিল! এমন অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত রক্ত-গোলাপের মত তরুণী মেয়েটি কি তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিবে? এই চিন্তাটাই শীতের কুয়াসার মত অনন্তমোহনের মনের আনন্দটাকে ঢাকিয়া একটা ভয়ের ছায়া রচনা করিয়াছিল। অনন্তমোহনের অর্থের অভাব ছিল না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এই তরুণীর মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে অর্থের ব্যয়ের দিকের হিসাবটার প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখিবেন না। অর্থের মত চিত্তাকর্ষক আনন্দদায়ক আর কি আছে? কিশোরী বধূর মুখের হাসিটি ইহার দ্বারাই তিনি অটুট্ রাখিবেন।

তাই ফুলশয্যার দিন প্রভাতে নববধূর সারা অঙ্গ হীরা-জহরত-মতিতে মুড়িয়া দিলেন। আশা করিলেন, রাত্রিতে তিনি যখন পাশে আসিবেন, তখন ফুলাভরণা কিশোরী তাঁহার বয়সের আধিক্য ভুলিয়া যাইবে। হয় ত কৃতজ্ঞতার জন্যও একটুখানি সদয় হইবে। কিন্তু রাত্রিতে তিনি যখন কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর আসিলেন, সেই মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আকাশে রচিত তাসের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে। নববধূর তাঁহার উপর বিরক্তির সীমা নাই। পূরবী সরোষে তখন নিজের গা হইতে ফুলের গহনাগুলাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাটের একটা পাশে ফেলিয়াছিল। একটা মর্ম্মান্তিক ঘৃণা তাহার নেত্র হইতে ঐ সজ্জিত গৃহ ও গৃহ-স্বামীর উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

অনন্তমোহন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বধূর উপর রুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাহার মনে কৃতজ্ঞতা নাই বলিয়া তাহাকে নীচ ভাবিতে পারিলেন না; বরং মনে মনে একটু শ্রদ্ধা করিলেন। প্রলোভনে এ বশীভূত হইবে না। তাহা না হইলে নারীর কাছে অলঙ্কারের মত প্রলোভনের বস্তু আর কিছু নাই।

অনন্তমোহন একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। বংশধর-কামনায় যাহাকে তিনি গৃহে আনিবেন, সে যেন নীচ না হয়! ইহাই ছিল তাঁহার সর্ব্বান্তঃকরণের প্রার্থনা।

অনন্তমোহন বুঝিলেন,—পূরবী সাধারণ মেয়ের মত সহজে ভুলিবার পাত্রী নহে। আচরণে তাহার কপটতা নাই। ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাকাইয়া থাকিবার মত তাহার কাঙ্গাল দৃষ্টি নাই। হীরা-মুক্তার ঔজ্জ্বল্যে তাহার অন্তর লুব্ধ হয় না। অনন্তমোহন সমস্ত মন দিয়া এমনই দৃঢ়া আত্মস্থা নারীকে কামনা করিয়াছিলেন। যাহার হাতে তিনি কুবেরের সম্পত্তি ও বংশধরকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বিদায় লইতে পারিবেন। ঠিক তেমনই নারীকে বিধাতা তাঁহার পাশে আনিয়া দিলেন! কিন্তু বিচিত্র ভাগ্যলিপি এমনই বিপাক রচনা করিয়া রাখিল, যাহার কাছে বংশধর কামনা করা সুষুপ্ত রজনীর স্বপ্নের মত অলীক ও হাস্যকর। পূরবী সেই যে চলিয়া গিয়াছে, জানাইয়া গিয়াছে—আর সে ফিরিয়া আসিবে না।

সোফাখানার উপর শুইয়া অনন্তমোহন নিজের সমস্ত অতীত জীবনটাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। আর ভাবিতেছিলেন,—মাতৃহারা পূরবীর ব্যথা-কাতর মুখখানি! স্বামি-গৃহ হইতে সমস্ত সম্বন্ধবিচ্যুতা মেয়েটি আজ মাতৃকক্ষচ্যুতা হইয়া নিজেকে কতখানি অসহায়া ভাবিতেছিল, কল্পনার দৃষ্টিতে তাহা যেন অনন্তমোহনের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ অনন্তমোহনের চিন্তার ধারা-বাধা পাইল, ভয়ানক চমকিয়া তিনি সোফাখানার উপর উঠিয়া বসিলেন। মোটা খদ্দরের চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি নারী মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে নিজের মাথাটা নমিত করিল।

অনন্তমোহন দুই হাতে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন। তাঁহার জড়িত কণ্ঠের মধ্য দিয়া অস্ফুট বিস্ময়ের ধ্বনিতে বাহির হইল,—"কে?" নারীমূর্ত্তি এতটুকু সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হইল না। তেমনই ঋজুদেহে সে অনন্তমোহনের সম্মুখে

দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া ভঙ্গিমাহীন কণ্ঠে কহিল,—"আমি পূরবী।"

* * * *

আরও দুইটি বৎসর সমাপ্তপ্রায়। তরুলতার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে, ফুল্লকুসুম কোরকের মত অপরূপ লাবণ্যভরা শিশুর হাসিতে অনন্তমোহনের গৃহ পুলকিত, হর্ষোচ্ছলিত। তরুলতার যত্নসঞ্চিত সকল দ্রব্যেরই অধিকারী শিশুর নামকরণ অনন্তমোহন তরুলতার নামের সহিত মিলাইয়া করিয়াছিলেন—তরুণ।

তরুণের অন্নপ্রাশনের মহাধূম পড়িয়া গেল। পূরবী স্বামীর মুখের পানে আনন্দভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "টাকাকে কি টাকা জ্ঞান কর না; এ তোমার হচ্ছে কি ?"

পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া অনন্তমোহন কহিলেন, "বিশেষ কিছু নয়! জীবনে যে আনন্দের শুধু স্বপ্ন দেখতুম, আজ সেটা বাস্তবে পেয়েছি, তাই ভোগ কচ্ছি।" অনন্তমোহনের দুই চোখ দিয়া যেন আনন্দ উপছাইয়া পড়িতেছিল।

সাত দিন ধরিয়া তরুণের অন্নপ্রাশনের উৎসব-সমারোহ চলিল। নাচ, গান, আনন্দভোজ, যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ—কোনটাই বাদ পড়িল না। এই রকমারী অনুষ্ঠানগুলি যখন শেষ হইল, তখন অনন্তমোহনের সামান্য জ্বর দেখা দিল। পূরবী ভয় পাইয়া ডাক্তার আনাইল। পরীক্ষান্তে তিনি বলিলেন, "ও কিছু নয়! ক'দিন অনিয়ম ঘটেছে! একটু বয়স—" যুবতী পত্নীর সম্মুখে বয়সের কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে ডাক্তার অপ্রতিভের মত বক্তব্যটাকে অসমাপ্ত রাখিলেন। পূরবীর মুখে কিন্তু লজ্জা বা বেদনার ছায়াপাতও হইল না। সে আগ্রহভরা দুই চোখে স্বামীর পানে চাহিয়া ভীতকণ্ঠে ডাক্তারকে কহিল, "কাল রাতে দুবার কাস্‌লেন। শব্দটায় মনে হ'ল, বুকে একটু সর্দ্দি বসেছে। আপনি ত বলছেন না!" পূরবী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এক বার ডাক্তারের পানে চাহিল।

ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "ষ্টেথস্কোপটি দেখছি আমার কাণে না উঠে আপনার কাণে এসে উঠলেই ভাল হ'ত। উনি শুধু একটা অসুখের ফাঁদ পেতে আপনার সেবা নিচ্ছেন। আমি নিশ্চিত বলছি, আপনি যতখানি ভাবছেন, তার একটুখানিও ওঁর হয় নি।"

ডাক্তারের হাসির বাতাসে কিন্তু পূরবীর মুখ হইতে চিন্তার মেঘখানি সরিল না। বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "কাল রাত্রে টেম্‌পারেচার হান্‌ড্রেড ছিল, আজ দেখছি, হান্‌ড্রেড ওয়ান্! এটাকে ত বাড়া বলতে হবে।"

ডাক্তার কহিলেন, "তখন ত ঔষধটা পড়ে নি, তাই ওটা বেড়েছে। এই ফিবার মিক্‌স্চার দিচ্ছি, দু' ঘণ্টা অন্তর দেবেন। তবে সাবধানে অবশ্য থাকবেন। দেখবেন, দু'দিনেই উনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবেন! কি বলেন, অনন্ত বাবু ?"

অনন্তমোহন একটু হাসিলেন। কহিলেন, "ইচ্ছে তো আছে তাই! হবে কপাল।"

"—ইস্, আপনি দেখছি ভারী অদৃষ্টবাদী! না, না; একটু পুরুষকারের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। তবে উঠি।" বলিয়া ডাক্তার চেয়ার ছাড়িয়া বিদায় লইলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পূরবী সরিয়া স্বামীর গা ঘেঁসিয়া বসিল; নিজের একখানি হাত তাঁহার গায়ের উপর রাখিল। অনন্তমোহন কহিলেন, "খোকা কই? তাকে দেখছি না কেন ?"

পূরবী কহিল, "তাকে রামুর কাছে রেখেছি। এক্ষুণি হুটাপাটী করবে—চেঁচাবে! তোমার কষ্ট হবে।"

অনন্তমোহন পত্নীর পানে চাহিয়া হাসিলেন; কহিলেন, "পূরবী, তরুর দুষ্টামিতে আমার কষ্ট হবে! না না; খোকাকে, আমার তরুকে তুমি আনতে বল। সকাল হ'তে খোকাকে আমি দেখি নি।"

পূরবী অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কহিল, "না, তা বলি নি, তোমার অসুখ; আমি ডাক্‌ছি খোকাকে!"

পূরবী হাঁকিলেন, "ঝি, রামুকে বল খোকাবাবুকে আমার কাছে দিয়ে যেতে।"

দুইদিন কাটিল। ডাক্তার তাঁহার ফিবার মিক্‌শ্চারকে বদল করিয়া নূতন প্রেসক্রুপ্‌সন্ লিখিলেন। এবার অনেকগুলা ঔষধ আসিল। ট্যাবলেট্, মিক্‌শ্চার, পাউডার, পেণ্ট্ অনেক কিছুর পানে চাহিয়া পূরবী ভীত হইয়া পড়িল। জ্বর কিন্তু তাহাকে তাড়াইবার এতগুলা আয়োজন দেখিয়া ভীত হইল না। আপনার মনেই সে

নিজের অধিকারটা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। পূরবী ডাক্তার সরকারকে 'কল' দিলেন। দেখিতে দেখিতে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন একটা ভয়ানক লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া তুলে, ঠিক তেমনই করিয়া অনন্তমোহনের সামান্য সর্দ্দি ও শ্রমজ্বরটুকু একটা কঠিন ব্যাধির নাম লইয়া নিজেকে ভয়ানক করিয়া তুলিল। বাড়ীময় একটা চিকিৎসার সোরগোল পড়িয়া গেল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পূরবী স্বামীর পাশে সেবার আসনখানি পাতিল, জননীর শেষ বিদায়ের সিঁদূর-পরা মুখখানি পূরবীর মানসদৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠিত! পীড়িত স্বামীর পাশে বসিয়া অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে পূরবী মনে মনে কহিত, "মা, তোমার সৌভাগ্যের কণা তোমার মেয়েকে ভিক্ষা দাও! মা, সব অপরাধ আমার ভুলে যাও।"

অনন্তমোহনের অচৈতন্যদেহে যখনই সংজ্ঞা আসিত, চাহিয়া দেখিতেন, পার্শ্বে উপবিষ্টা পূরবীর অশ্রুবিবশা একান্ত কাতর মুখখানি। অনুভব করিতেন, তাহার প্রাণ-ঢালা সেবা! বাঁচিয়া থাকিবার আকুল আগ্রহে বুক তাঁহার ভরিয়া উঠিত। কিন্তু নিয়তির দাস মানুষ,—এক মুহূর্ত্ত বেশী থাকিবার শক্তি তাহার কোথায়?

অনন্তমোহনের জীবন-দীপ নিভিবার মুহূর্ত্তে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল,—স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া আদর ভরা কণ্ঠে ডাকিলেন,—"রুবি!"

আরক্ত স্ফীত নেত্রে আকুল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের উপর নত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে পূরবী কহিল,—"বলো!"

অনন্তমোহনের চোখে অশ্রু আসিল, কহিলেন, "খোকা! আমার খোকা?"

তরুণকে নিকটেই রাখা হইয়াছিল—ইঙ্গিতে তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনা হইল। স্বামীর ইচ্ছা বুঝিয়া পূরবী তরুণকে নিজের কোলে লইল। অনন্তমোহন কহিলেন,—"রুবি! আমার বংশের আলো তোমার কাছে রইল। যদি না খোকা মানুষ হয়, তোমার ওপর অভিমান আমার যাবে না।"

অনন্তমোহনের অন্তর আরও অনেক কথা বলিতে চাহিল! পূরবী নিজের কাণটা স্বামীর ওষ্ঠাধরের নিকট স্থাপিত করিল। বাণী তখন চির-অবরুদ্ধ, অনন্তমোহনের স্বর শুধু একটা অস্ফুট ধ্বনিই করিল।

পূরবীর চোখের সম্মুখে আলোক-উজ্জ্বল পৃথিবীটা নিবিড় আঁধারে ভরিয়া উঠিল! দুই হাতে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল। অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া পূরবীর সংজ্ঞাহীন দেহ অনন্তমোহনের প্রাণহীন বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল!

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

শরতের মেঘে

আজি শরতের মেঘে বাদল ঘনায় মুষল ধারে,—
শ্যাম বন-ছায়া, রচে মেঘ-মায়া নদীর পারে।
সন্ধ্যা-ধূসর গগন-সীমায়—
মানস-বলাকা পথ ভুলে যায়,
শ্রান্ত পাখায় আপনা হারায় অন্ধকারে—
নয়নে আমার বাদল ঘনায় অশ্রুধারে।

কোথা ছায়া-পথ—কিরণ-তটিনী শিশির-ঝরা!
শরতের শশী—কোথা কাঁদে বসি' তিমির-ভরা!
জোনার কুঞ্জে ওঠে হাহাকার,
টুটে দল ভার শেফালিবালার—
সজল বাতাস ফেলে নিশ্বাস কি জ্বালা-ভরা,
আকুল বাতাসে এ কি কম্পন ব্যাকুল করা!

আজি শরতের মেঘে নেমেছে বাদল অঝোর ঝর—
আশার কমল ফুটিল ব্যথায় বুকের 'পর!
উন্মাদ-ঝড়ে, শিলা-করকায়—
সবুজ-স্বপন মোহ টুটে যায়,
শ্যামল পুলিনে জাগে যে ব্যথার বালুর চর—
মোর সৃষ্টির মুখে মরণ-দেবতা তুলেছে ঝড়!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল (বি-এ)।

বিস্মৃতির পথে

পৃথিবীর কত জাতি, ভাষা, প্রথা, কত রীতি-নীতি, কত প্রকার আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদাদি প্রচলিত ছিল, আজ তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। আবার এখনও যাহা আছে, হয় ত দুই এক শতাব্দীর মধ্যে তাহার অনেক কিছু লুপ্ত হইবে। ভবিষ্যতের জন্য ইতিহাসই সেই সব কথা গাথিয়া রাখে। কিন্তু রাষ্ট্র, সমাজ, জাতি, শিল্প, বিজ্ঞান এই সবেরই নিছক স্বতন্ত্র ইতিহাস রচিত হইতে দেখা যায়। ইতিহাস ভিন্ন পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থ এবং কাব্য উপাখ্যান হইতেও রাষ্ট্র সমাজ প্রভৃতি সম্পর্কীয় বহু বিষয়ের ইতিহাস সংগৃহীত হইয়া থাকে, অবশ্য তাহা গবেষণা-সাপেক্ষ।

আমাদের বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনের দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও সংসার, সমাজ, আহার, পরিচ্ছদ, উৎসব, আনন্দাদির মধ্যে যাহা ছিল, আজ তাহার কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিবার ইতিহাস নাই। বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া সে ইতিহাস রচনার যোগ্যতা আমার নাই। স্মৃতির পথ হইতে কালের সঙ্গে যে সব একটু একটু করিয়া অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে বা সবে মাত্র হইয়াছে; যাহার কথা এখনও প্রাচীনরা সমস্তই অবগত আছেন, হয় ত নবীনদের অনেকের নিকট তাহা অশ্রুত বা অজ্ঞাত, আমি এখানে মাত্র সেই সকলেরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রত্যেক প্রদেশ, প্রত্যেক বিভাগ, এমন কি, প্রত্যেক জেলার রীতি-নীতি, সামাজিক প্রথা, গৃহস্থালীর ব্যবস্থাদি, এমন কি কথ্য ভাষার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যখন এক স্থানে যাহা প্রচলিত নাই, অন্যত্র তাহা থাকাও বিচিত্র নহে, তখন এই প্রবন্ধ-লেখক যে এক জন হুগলী জেলার অধিবাসী, পাঠিকা ও পাঠকগণ প্রবন্ধপাঠকালে ইহা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়।

আনন্দ-উৎসব

শুনিয়াছি ও গ্রন্থাদিতে দেখিয়াছি, বাঙ্গালাদেশ সোনার দেশ ছিল। বাঙ্গালার পল্লী চির-আনন্দ-মুখরিত ছিল। সে দিন বহু পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও দেশের যে শ্রী, যে উৎফুল্লতা, যে আনন্দ অনুষ্ঠান দেখা যাইত, আজ ক্রমে তাহা দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। অধুনা দেশে মানব-মনে আনন্দ দিবার জন্য, মনের সুস্থতাসম্পাদনের জন্য বহু ব্যবস্থা হইয়াছে, বহু উপকরণের সৃষ্টি হইয়াছে ও প্রতিনিয়ত হইতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে সে অনাবিলতা কৈ? আজকালের অধিকাংশ আনন্দ-উৎসবই প্রাণহীন কৃত্রিমতাপূর্ণ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালার পল্লীতে আজও শরতের দুর্গোৎসব হয়, বসন্তের শ্রীপঞ্চমীতে প্রায় গৃহে গৃহে—পাঠশালা-স্কুলে বাগ্দেবীর আরাধনা হয়। শ্যামাপূজায় আতসবাজী ও দীপাবলীর সাজসজ্জা এবং দোলের উৎসবে ফাগের খেলায় ছেলেমেয়েরা ভাল ভাল পিচকারি-কুমকুম লইয়া মাতোয়ারা হয় বটে; কিন্তু তখনকার দিনে বাঁশের লম্বা লম্বা পিচকারি লইয়া ছেলের দল পথে ছুটাছুটি করিয়া, নোনাফলের অর্দ্ধাংশ লইয়া তাহার বীচিগুলি খুলিয়া তাহার বা আলু কাটিয়া তাহাতে গাধা লিখিয়া তাহার ছাপ দিয়া যে আনন্দ পাইত, তাহা আজ কোথায়!

সে কালের শারদীয়া সপ্তমীতে নবপত্রিকা-স্নানের সঙ্গে সেই সানাইয়ের মাদকতা, নবমীর বলিদানের পর সেই রক্তস্নাত হইয়া মত্ততা, বিজয়ার সন্ধ্যায় সানাইয়ের করুণ সুরের সহিত সেই ভাসানের বিষাদোৎসব, তার পর গৃহে ফিরিয়া বিজয়ার সেই মিলনোৎসব আজিও যথারীতি পালিত হইয়া থাকে। ধনীর প্রাসাদে যাত্রা-থিয়েটার, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের জন্য নানাবিধ ভোজ্য উপকরণের আয়োজনের কোন অভাবই থাকে না। কিন্তু আনন্দময়ীর আগমনে উৎসবের উল্লাসে পল্লীপ্রাণ আর তেমন করিয়া নাচিয়া উঠে না। তখন ছেলেমেয়েদের একটা রঙ্গীন শাটীনের জামা, মাথায় পালকের টুপি কিনিয়া দিয়া এবং নারিকেল-নাড়ু, রসকরা মিঠাইয়ে যে তৃপ্তি ছিল, এখন মূল্যবান্ উপকরণেও আর সে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না।

তখন গ্রামে গ্রামে বারোয়ারি পূজায় গ্রামবাসীদের কি উৎসাহ ছিল! সেখানে তর্জ্জা পাচালী কবির লড়াই দেখিতে দূর গ্রামান্তর হইতে কত নর-নারী আগমন করিত। তখন আজকালের মত পুরস্কারের জন্য পদক বা প্রশংসা-পত্রের ব্যবস্থা ছিল না, সামান্য কিছু টাকা দেওয়া হইত।

কবির লড়াই বা পাঁচালী প্রভৃতির আসরে কখন কখন জেতার জন্য একদিকে একখানি নোট, অন্যদিকে পরাজিতের প্রাপ্য এক কাঁদি কদলী ঝুলান থাকিত। ইহাতে জয়ী হইবার জন্য তখন কি উৎসাহ উদ্দীপনাই না প্রকাশ পাইত! তখন কি ধনাঢ্যের প্রাঙ্গণ, কি বড় বড় বারোয়ারিতলার আসর, উপরে একখানি শামিয়ানার নিম্নে কাটগড়া, তাহার থামগুলির সহিত সংবদ্ধ দন্তাকৃতি বড় লোহার শিকে অথবা পালের দড়িতে লম্বিত সেকালের বড় বড় সর্পোস, না হয় বেললণ্ঠন ঝুলিত। আর সেই লণ্ঠনের গেলাস শোভাবর্দ্ধনের জন্য রঞ্জিত জলে পূর্ণ করা হইত। কখন কখন আসরের চারি কোণে একবারে বায়ুপ্রবেশ না করিতে পারে যেন এমনই ভাবে বস্ত্রাবৃত চারিটি সূক্ষ্মাগ্র বাঁশের খাঁচায় শ্যামা, ময়না বা টিয়া পাখী ঝুলান থাকিত। আর সন্ধ্যার মধ্যে কদাচিৎ মুখে থুবি দেওয়া ত্রিকোণাকৃতি সালুর নিশান বা কয়েকখানি কালী দুর্গা প্রভৃতির ছবি দেওয়া হইত। গ্রাম্য উৎসবের সে সরল সৌন্দর্য্য যিনি দেখেন নাই, তাঁহার এখন আর কল্পনার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

ঠাকুর ফেলা আজকাল একবারে উঠিয়া না যাইলেও এখন এ কার্য্য দ্বারা যাঁহারা ফেলেন এবং যাঁহার বাটীতে ফেলেন, পরিণামে অনেক স্থলেই কাহারও প্রীতিকর হয় না। অল্পক্ষেত্রেই আদর করিয়া তুলিয়া লইয়া পূজা করেন, নচেৎ অনেক স্থলে হয় গৃহস্বামী প্রাতে উঠিয়া উহা পুনর্নিক্ষেপ করেন, না হয় সন্দেহ করিয়া প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ করেন। পূর্ব্বে তাহা ছিল না, অনেক সময় সম্পৎশালী কৃপণের বাটীতে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কখনও বা গৃহিণীদের গোপন অভিপ্রায় মত এ কার্য্য করিতেন। কিন্তু তাহার পরিণাম আনন্দেরই হইত। গৃহস্বামী যত কৃপণই হউন, মা আপনা হইতে আসিয়াছেন মনে করিয়া ভক্তিভরে পূজাদি করিতেন।

প্রতিমা পূজাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও তখন চড়ক, পাটভাঙ্গা, গাজন, ঝাঁপান, পৌষ-পার্ব্বণ—এমন কি অরন্ধন ঘেটুপূজাতেও যথেষ্ট আনন্দ ছিল। বাণফোঁড়া চড়ক এখন গল্পের বিষয়, সে কথা ছাড়িয়া দি; পিঠে বাঁধা চড়ক এখন আর কয় জায়গায় হয়! পাটভাঙ্গা ঝাঁপান—এ সব বড় বড় সহরের ছেলেপুলেদের কাছে এক প্রকার অজ্ঞাত বলিলেও অন্যায় হয় না। পূর্ব্বে যে সব স্থানে পাটভাঙ্গার সময় ২০।২৫ হাত উচ্চ মঞ্চ হইতে সন্ন্যাসীরা পড়িত, এখন তথায় বড় অধিক হয় ত দশ বার হাত উচ্চ হইতে পড়িয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদের গাজনের উৎসব বা ঝাঁপানের সাপখেলান, এখন নামে মাত্র কোথাও কোথাও আছে। পৌষ মাসের সংক্রান্তির সময় পৌষ-পার্ব্বণের উৎসব পূর্ব্বে সর্ব্বব্যাপী ছিল। পল্লীগ্রামে কৃষক কৃষাণ হইতে ধনীর আবাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ইহার সমান প্রভাব ছিল। সহরেও সকলেই ইহা পালন করিত। ইহা তখনকার দিনে বাঙ্গালার জাতীয় উৎসবের মত ছিল, হিন্দু মুসলমান সকলের আদরের ছিল। এই সময় পল্লীবালাদের সোদো ভাসান, ইহাও এক সুন্দর উৎসব ছিল। এখনও সোদো ভাসান উঠিয়া যায় নাই; ভ্রাতার কল্যাণ-কামনায় এখনও পল্লীললনাগণ নিয়ম রক্ষা হিসাবে এ কার্য্য করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অন্যান্যের ন্যায় ইহাও নির্জ্জীব উৎসব।

পূর্ব্বে জন্মাষ্টমী রাধাষ্টমী প্রভৃতিতে বহু দলে বিভক্ত হইয়া বিবিধ সাজসজ্জা সহ কোথাও কোথাও বাদাইয়ের সং তামাসা বাহির হইত। এখন আর তাহা প্রায় দেখা যায় না। পূর্ব্বে রটন্তী, ফলহারিণী প্রভৃতি পূজা কোথাও কোথাও অনুষ্ঠিত হইত, এখন এ সব পূজা প্রায় পঞ্জিকাতেই দেখা যায়। হাতে খড়ি, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ—এ সবও আগের ন্যায় এখন বড় কেহ মানেন না। চূড়াকরণ ব্যাপারটা কি, তাহাই অনেকে জানেন না। তখনকার দিনে জন্মতিথির পূজা যথানিয়মে সামর্থ্যপক্ষে অনেকেই করিতেন। এখন যাঁহারা করেন, জন্মতিথির দিন গৃহদেবতার সামান্য পূজা দেওয়া এবং পায়স ও পাচরকম ব্যঞ্জনাদি সহ আহার করা ভিন্ন অন্য কিছু করণীয় আছে বলিয়া অনেকেই জানেন না।

মেয়েরা এখনও পুণ্যপুকুর, দশপুতুল, কুলকুলতি, শিবপূজা প্রভৃতির ব্রত করিয়া থাকে, কিন্তু এখন আর সেই ছোট ছোট মেয়েদের দল বাঁধিয়া পাড়ায় পাড়ায় তেমন আনন্দ করিয়া সাজি হাতে ফুল তুলিয়া বেড়াইতে দেখা যায় না। তখনকার দিনে মেয়েদের আদ্যঋতু হইলে একটা পারিবারিক উৎসব হইত, তাহাকে পুষ্পোৎসব বলিত। এখনও হয় ত অল্প স্থানে তাহা হইয়া থাকে, কিন্তু

তাহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান—গ্রাম্যভাষায় যাহাকে কাদা বলিত, মেয়ে কবিদের নৃত্যগীতাদির দ্বারা তাহা আর হয় না। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান সভ্যতায় সে সব ধূমধামের স্থান থাকিতেও পারে না।

সেকালের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব, রাখীবন্ধন—এ সবেতেও একটা সত্যকার উৎসব ছিল, আজকাল ইহা কতকটা নিয়মরক্ষার ব্যাপার হইয়া পড়িতেছে। তখন এ সব অনেকটা ব্যাপকভাবেই পালিত হইত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় তত্ত্ব-তাবাস পাঠান, কাপড়-টাকা দেওয়া এ সব পূর্ব্বের তুলনায় ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু ইহার আসল প্রাণ যাহা, তাহা চলিয়া যাইতেছে। তখন আনন্দই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য, এখন তাহা বাধ্যতামূলক নিয়মে দাড়াইয়া আনন্দকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়াছে। সেকালে যাহাদের সহোদরা ছিল না, তাঁহাদের অতি দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী বা পাড়ার ভগিনীস্থানীয়া মহিলারাও অতি যত্নপূর্ব্বক ফোঁটা দিয়া ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইতেন।

তখনকার কালে উপস্থিত সময়ের মত আনন্দ-উৎসব বহু ব্যয় ও চেষ্টা করিয়া সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইত না। যে কারণেই হউক, আনন্দ অনেক পরিমাণে সহজলভ্য ছিল। নবান্ন, অরন্ধন প্রভৃতিও যেন একটা উৎসবের অঙ্গ ছিল। নষ্টচন্দ্র দেখিয়া ফেলিলে পরের গালি না খাইলে পাপক্ষালন হইত না, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত থাকায় তখনকার গ্রাম্য যুবকদল স্বেচ্ছায় নষ্টচন্দ্র দেখিয়া রাত্রিকালে পরের বাগানে ফল-মূল চুরি করিয়া, গালি খাইয়া আমোদ পাইত। সরস্বতীপূজার দিন পল্লীগ্রামে মাঠ-বেড়ান একটা খুব আনন্দ ছিল। বৈকালে ছেলে বুড়া অনেকেই একত্র মিলিত হইয়া মাঠ বেড়াইতে যাইত। সে দিন মাঠে যাইয়া গাছ-ছোলা, কলাইশুঁঠি তুলিয়া খাওয়া, কুল পাড়া এ সব যেন প্রথা ছিল। কৃষকরা আনন্দের সহিত এ সব অত্যাচার সহ্য করিত।

খেলা-ধূলা

বাঙ্গালীর ছেলেদের খেলা-ধূলার ইতিহাস আলোচনা করিলে এ দিকেও অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ক্রিকেট খেলা ও মারবেল খেলা এ দেশে অনেক দিন প্রবেশলাভ করিলেও বহু প্রকার জাতীয় খেলার স্থান তখনও ছিল। বাটীর বাহিরে দৌড়াদৌড়ি খেলার মধ্যে প্রাচীন কপাটী বা ভেলদিগ্‌দিগ এবং ধাঁসা খেলার পুনঃ প্রবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তেনামান, হাপু খেলা, ঝালাঝাপ্পা বা ঝালঝাঁপটি, বসাবত্তী, নুনকোট এ সব খেলা সহর অঞ্চলে বহু স্থানেই তিরোহিত হইয়াছে, না হয় হইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশের দৈহিক, আর্থিক, প্রাকৃতিক সকল দিক্ দিয়াই এ সব খেলার উপযোগিতা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিতেন, বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে ইহা এখন আর ভদ্রসন্তানদের উপযোগী খেলা বলিয়া পরিগণিত নহে। পেশী সবল দৃঢ় এবং দৈহিক বলবৃদ্ধির জন্য এ সব অতি সুন্দর খেলা। আজকাল ফুটবল-টেনিসে যুবকগণ যে আনন্দ পাইয়া থাকে, তখন ইহাতেও তদপেক্ষা কম আমোদ ছিল না। ধাঁসা, নুনকোট, বসাবত্তী প্রভৃতি ঘর কাটিয়া মাঠে খেলা হইত, তেনামান-লুকোচুরি খেলারই বৃহত্তর সংস্করণ; ইহা কখন কখন একটি পাড়া লইয়া খেলা হইত। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী বা ব্যক্তিবিশেষের বাড়ী বা উদ্যান এই খেলার স্থান ছিল না। দূর হইতে ‘তেনামান চলে’ বলিয়া চীৎকার করিয়া যে কোন লোকের বাড়ী বা বাগানে লুকাইত, অন্য দল তাহাদের অন্বেষণ করিয়া বাহির করিয়া দিত।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবক ও কিশোররা বিচ্, চাঁই, কাণামাছি, তেলমুন, ঘোড়ামুটী এই সব খেলিত। গুলী-ডাণ্ডা ছোট বড় সকল শ্রেণীর ছেলেদেরই আদরের খেলা ছিল। শীতকালে, বিশেষ সরস্বতীপূজার সময় এই খেলা বেশী হইত। ঘুঁড়ি উড়ান আজকাল সকল ঋতুতেই দেখা যায়, কিন্তু ইহা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে শীতকালেই ঘুঁড়ি উড়ানর ধূম অধিক ছিল এবং এখনকার তুলনায় তখন অনেক বেশী ঘুঁড়ি উড়িত। তখনকার আগা সাহেবের ঘুঁড়ি, বামুনটক্কা, মান্‌স ঘুঁড়ি, ঢাউস্ ঘুঁড়ি এ সব এখন প্রায় দেখা যায় না। তখন প্যাচখেলার ধূমই বা কি ছিল! বৈকালে প্রায় সকল ছাদ হইতেই ঘুঁড়ি উড়িতে দেখা যাইত এবং ‘সুতো বাড়ায় না, জুতো খায়’ বলিয়া ছেলেদের প্রতিপক্ষকে চীৎকার করিয়া উত্তেজিত করিতে শুনা যাইত। বিশ্বকর্ম্মাপূজার দিন ঘুঁড়িরই উৎসব লাগিয়া যাইত, সে দিন সমস্ত দিনব্যাপী এই কার্য্য হইত। কলিকাতার গড়ের মাঠেও তখন ঘুঁড়ির

লড়াই খুব হইত এবং তাহা দেখিবার জন্য লোক জমা হইত।

তখনকার ছোট ছোট ছেলেরা ছিনিমিনি খেলা, টিল-প্যাচ, বুড়ি-বুড়ি এ সবেও বেশ আমোদ পাইত। ঘরে বসিয়া বাগবন্দী, লাউ কাটাকাটি, টুকটাক, কাটাকুটি খেলিত। শিশুরা টোক্কা-ফোক্কা, আগডুম্-বাগডুম্, ইকঁড়ি-মিক্ড়ি এই সব খেলা লইয়া থাকিত। ছেলেদের লুডো, স্নেক্ল্যাডার, ক্যাট্ এণ্ড সাইস্ বা ক্যারামের মত কোন খেলা ছিল না। বয়স্ক-বয়স্কাদের দাবা-পাশা, দশ-পঁচিশ এই সব, না হয় তাস ইহাই আদরের খেলা ছিল। আজকাল তাসের ব্রীজ, ব্রে, হুইষ্ট প্রভৃতি অনেক নূতন নূতন খেলা আমদানী হইয়াছে, তখনকার বিন্তি, ডাকতুরুপ, গ্রাবু, গোলামচোর, তেতাস এ সব ক্রমে নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের খেলায় পরিণত হইয়াছে। গ্রাবু এখনও অনেক স্থানে চলিতেছে বটে, কিন্তু অন্য খেলাগুলি বোধ হয় অদূর-ভবিষ্যতে লোপ পাইবে।

লাটুখেলা তখন আজকালের অপেক্ষা বেশী প্রচলিত ছিল। নৌকার বাচখেলা পূর্ব্বেও ছিল। এ সকল ভিন্ন বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বহু প্রকার খেলা প্রচলিত ছিল, সে সবের কথা আমার জানা না থাকায় লিখিতে পারিলাম না। তখন স্কুলের ছেলেরা ফার্ষ্ট বুক্ বা সেকেণ্ড বুক্ পড়িয়াই অনেকে শিখিত—Steal—হরণ (horn), সিং (Sing)—গান, (gun)—কামান (Come on)—আইস, (I saw)—আমি দেখিয়াছিলাম। আবার জ্যামিতি শিখিতে আরম্ভ করিয়াই Let V, J T. K, অথবা L, O, K, C be a rectangle এই সব লইয়া খেলা করিত। K O D D J S O S O, The ship is eighty one ইহা লইয়াও বন্ধুবান্ধবদের সহিত আমোদ করিত।

গৃহ-সংসারে

সেকালের সাংসারিক, সামাজিক নানা বিষয়ের মধ্যে নানাবিধ প্রথাদি যাহা প্রচলিত ছিল, তাহার কত লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইতে বসিয়াছে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। ছত্র, পালকী এককালে পদস্থ ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। গোয়ার ছাতা নামক পত্রবিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত এক প্রকার ছত্র পূর্ব্বে সর্ব্বত্র ব্যবহার হইত। উহার বাঁট এক খণ্ড তলতা বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত হইত, উহা এখনকার মত বন্ধ করা যাইত না। তালপত্রের টোকার ব্যবহারও তখন খুবই ছিল। কাঠের ও মাটীর দীপাধার—যাহাকে ডেলকো বলিত, তাহার ব্যবহার সহরে আর দেখা যায় না। পিলসুজও এখন সহরে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির দানের সঙ্গেই দেখা যায়। বেলি-থালা—যাহা পিলসুজ বসাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত, পতিঙ্গা—যাহা গেলাসে দিয়া আলো দেওয়া হইত, দেকাটী—যাহা দ্বারা অগ্নির শিখা উৎপাদন করা হইত, অধুনা যুবকদের মধ্যে অনেকে এ সব নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। চকমকির দ্বারা অগ্নি উৎপাদন এখনও পল্লীগ্রামে এক আধ যায়গায় দেখা যাইলেও উহা ক্রমে যাদুঘরে স্থান পাইবার জিনিষ হইয়া উঠিতেছে। লাল রংয়ের বারুদ দেওয়া দিয়াশালাই ও মোমের দিয়াশালাই—যাহা টিনের বাক্সে আসিত, তাহা একবারেই উঠিয়া গিয়াছে। হ্যারিকেনের উদ্ভবের সহিত সাবেক চৌকা হাত-লণ্ঠন তিরোহিত হইয়াছে।

কড়ির আনলা, ঢোলকের খোলের মত কাচের আলো ঢাকা, দাঁড় বাক্স—যাহা পূর্ব্বে গৃহের আসবাবরূপে স্থান পাইত, তাহা এখন কোন কোন সেকালের বড় মানুষদের বাজে জিনিষের ঘরেই দেখা যায় মাত্র। তক্তারামা, তঞ্জাম, মহাপায়া, খাসগেলাশ এ সব আর এখন বরসজ্জার অঙ্গ নহে। সিঁদুর-পেতে বা সিঁদুর-চুবড়ি এখন আর সধবা মহিলাদের ব্যবহারের জিনিষ নহে, এখন উহা বারব্রত ও দ্বিরাগমনের দ্রব্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কাচের শাসীর প্রচলন যখন হয় নাই, তখন বেত-বোনা জানালা-দরজা সৌখীন লোকরা লাগাইত। তখনকার দিনে বাঙ্গালা লেখা-পড়ায় কঞ্চি, সর বা খাগড়ার কলম, বাঙ্গালা কালী এবং লেখা শুকাইবার জন্য বালি ব্যবহৃত হইত। তখনকার দোয়াতের সহিত বালি রাখিবার স্থান থাকিত। ইংরাজী লিখিতে হাঁসের পালকের পেন ব্যবহার করিত। তখন বালির কাগজ—শ্রীরামপুরের কাগজ এই সব নামের কাগজ লোক বেশী পছন্দ করিত। বাঙ্গালা হিসাবের খাতায় তুলোট কাগজ চলিত।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ট্রাই সাইকেল গাড়ীর সম্মুখের চাকাখানি প্রায় ৪।৫ ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট এবং পশ্চাতের খানি এক দেড় ফুট ব্যাসের হইত। ভাল গোল টেবিল প্রায়ই

কুঁদোওয়ালা পায়া হইত। অর্থশালী লোকের শয়নকক্ষে পালঙ্কের ব্যবহার কিছু অধিক ছিল। ট্যাঁকঘড়ি তখনও মুখখোলা ছিল না, উপরে ঢাকনী দেওয়া ঘড়ীরই ব্যবহার ছিল। রিষ্টওয়াচ আদৌ ছিল না। মেকেব, চার্লস্, নেফিউ এই সব কারখানার ঘড়ীরই নাম ছিল।

সোডা-লেমনেড প্রথম যখন এ দেশে আইসে, তখন উহা কতকটা ঔষধ মনে করিয়া এ দেশের লোক পান করিত। পূর্ব্বে উহার বোতল ছিল তলা গোল, তাহা দাঁড় করাইয়া রাখা যাইত না। উহাতে কর্কের ছিপি তার দিয়া বাঁধা থাকিত এবং বোতলগুলি দোকানদাররা ছেঁদা করা তক্তায় ঢুকাইয়া উল্টাইয়া রাখিত। চাউল-দাইল মাপিতে কাঠা-খুচির ব্যবহার খুব ছিল। আজকাল সিগারেটের ব্যবহার খুব বেশী হইয়াছে। পূর্ব্বে বার্ডসাই চুরুটের ব্যবহার খুব অধিক ছিল। হুঁকা, গুড়গুড়ি ও শটকার ব্যবহার পূর্ব্বের মত আর দেখা যায় না। তাম্রকূট-সেবনে আমপাতা ও বাতাবিনেবুপাতার নল অনেকে ব্যবহার করিতেন। দাঁতের মাজনে গুলের গুঁড়া এবং মেয়েদের মিশি আর তেমন পছন্দ হয় না। দাঁতনের ব্যবহারও ভদ্রসমাজ হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। সেকালে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরও কাঠের পিঁড়ায় বসিতে দেওয়া লজ্জার বিষয় ছিল না। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের একখানি কাঠের পিঁড়ায় দাঁড় করাইয়া গৃহস্বামী বা তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র কেহ এক জন পদ ধৌত করিয়া দিত। সহরে ইহা ক্রমেই লোপ পাইতেছে, পল্লীগ্রামে এখনও দেখা যায়।

পূর্ব্বে মাথা ঘষা, ঝামা দেওয়া, খইল-ব্যাসন মাখা, ধুঁদুলের ছোবড়া দ্বারা গাত্রমার্জ্জনা, এই সব ছিল মহিলাদের বিলাসিতার উপকরণ। উল্কি পরা তখন একটা সখের জিনিষ ছিল। এমন কি, মেয়েরা উল্কি না পরিলে হাতের জল শুদ্ধ হইত না, এরূপও বলিত। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে আতর ও গোলাপ-জলই প্রধান ছিল। ফুলেল তৈলও আদরের সহিত ব্যবহৃত হইত। ধূপ-ধুনার আদর অধিক ছিল। সন্ধ্যার সময় ধুনা-গঙ্গাজল দেওয়া গৃহিণীদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। প্রাতে চৌকাঠে জল দেওয়া এবং সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখান ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। মুষ্টিভিক্ষা দিতে গৃহস্থ কোন দিন বিমুখ ছিলেন না। কলিকাতায় চারি কড়া কড়ি দিয়াও ভিখারী বিদায় করিতে দেখা যাইত।

বাটীতে ঢুকিবার প্রধান প্রবেশদ্বারের ভিতরদিক্‌টাকে 'দেউড়ী' বলিত এবং সদর দরজাকে 'নাচ দরজা' বলিত। এখন এ প্রদেশে এ নাম বলা উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় এক সম্প্রদায় ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকরা মশালের আলোকে ধনী লোকদের বাটীর প্রবেশদ্বারের বহির্দ্দেশে আসিয়া নৃত্যগীত করিয়া যাইত, তাহার সহিত দুই চারি জন পুরুষও থাকিত, তাহারা মাদল বাজাইত। তাহা তখনকার প্রথা ছিল। তাহা হইতেই নাচ-দরজা নামের উৎপত্তি হয়। অর্থশালী ব্যক্তিদের অনেকের বাটীর প্রবেশদ্বারের কবাটে ঘন ঘন লোহার পেরেক মারিয়া ডাকাতের ভয়ে দৃঢ় করা হইত। এখনও কোন কোন পুরাতন বড় বড় বাড়ীর এরূপ কবাট দেখা যায়। সচরাচর কাঠের পিঁড়ায় বসিয়া ভোজন করাই পূর্ব্বে প্রথা ছিল। প্রাচীন বনিয়াদী ঘরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পংক্তি-ভোজনেও পূর্ব্বে পিঁড়ার ব্যবহার দেখা যাইত। পূর্ব্বে পংক্তিভোজনে প্রত্যেককে মাটীর গেলাসের পরিবর্ত্তে পাঁচ সাত জন অন্তর একটি করিয়া পিতলের ঘটী দিতেও দেখা যাইত। কুটুম্বগণকে নারায়ণ বলিত। যে কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বাটী আসিলেই প্রথমেই তাঁহাকে পদ-প্রক্ষালনের জন্য আহ্বান করা হইত। নিমন্ত্রণ পত্র অনেক ক্ষেত্রে ভাটদের দ্বারা বিলি করা হইত। অভ্যাগতদের মাদুরে বসিতে দেওয়ায় বা বাটীর প্রাঙ্গণে মৃত্তিকায় আসন বা পিঁড়িতে বসাইয়া খাওয়ান লজ্জার বিষয় ছিল না। খাওয়ান-দাওয়ান খুব সাদাসিধা ছিল। ব্রাহ্মণ-ভোজনের তরকারিতে লবণ দেওয়া হইত না। তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে কাযকর্ম্মে আত্মীয় প্রতিবেশীর বাটীর মহিলারা আসিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রন্ধনাদি করিয়া দেওয়া এবং পুরুষদের ময়দা মাখা, লুচির লেচি তৈয়ারি করা প্রভৃতি যেন কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। ব্রাহ্মণবাটীতে ব্রাহ্মণেতর জাতিরা নিমন্ত্রণোপলক্ষে বা যে কোন কারণে আহার করিলে আহারান্তে স্বহস্তে পাতা পরিষ্কার করা পূর্ব্বে প্রথা ছিল।

পূর্ব্বে বাঙ্গালা চিঠিতে বহু প্রকার পাঠ যথা—সেবক শ্রী———, প্রণামা বহব নিবেদনঞ্চাগে প্রভৃতি লেখা হইত। পত্রের যে সকল পৃষ্ঠা বা যে সকল স্থান অলিখিত থাকিত, সে সকল স্থানে একপ্রকার চিহ্নিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। সে চিহ্নের নাম শ্রীমুখ। চিঠি বন্ধ করিয়া অপরে না খুলিতে পারে, এ জন্য ৭৪৷৷০ দিব্য দেওয়া হইত।

সেকালের বরের পোষাক এখন নিতান্তই পাড়াগেঁয়ে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। পূর্ব্বে বরকে গাড়ী, পাল্কী বা তঞ্জাম তক্তারামা হইতে ক্রোড়ে করিয়া নামান হইত। বর অনেক সময় হাঁটু গাড়িয়া আসরে বসিত। সে সময় কথা কওয়া তাহার যেন নিষিদ্ধ ছিল। বরযাত্রী ও কন্যা-যাত্রী কিশোর ও যুবকদের মধ্যে পাঠ্য ও অন্যান্য বিষয়—যেমন রামায়ণ মহাভারত—প্রভৃতি হইতে প্রশ্নোত্তর করিবার প্রথা ছিল। এ জন্য সব ঠকানে প্রশ্ন তৈয়ার হইত। এখন ইহা উঠিয়া গিয়াছে। বাসর জাগা অর্থাৎ বাসরঘরে বর-কন্যাকে লইয়া আনন্দ করা এ সবও অনেক কমিয়া গিয়াছে। বরকে তখন নানা প্রকারে ঠকাইবার—গান গাওয়াইবার চেষ্টা হইত। এ জন্য রসিকা বলিয়া খ্যাত এমন মহিলা দুই এক জন সর্ব্বত্রই দেখা যাইত। নূতন জামাইকে আহারীয় দ্রব্যের সহিতও অনেক প্রকার ঠকাইবার ব্যবস্থা ছিল, যেমন—ইক্ষুর পরিবর্ত্তে আনারসের বোঁটা, শশার পরিবর্ত্তে তেলাকুঁচা, ডিবার ভিতরে আরস্থলা, ছানাবড়ার ভিতরে সুপারি, বাতাসা ভিজানর পরিবর্ত্তে খড়ের জল, ভাতের মধ্যে বাটি দেওয়া। ঠাকুরমা বা ঠাকুরমা-সম্পর্কীয়াগণ অথবা শ্যালক শ্যালিকারাও নূতন জামাইকে লইয়া অনেক আমোদ-আহ্লাদে মাতিত। শুধু জামাই কেন, দাদামহাশয়—তা নিজের হউক, দূরসম্পর্কীয় বা প্রতিবেশি-সম্পর্কীয় হইলেও নাতি-নাতিনীদের সহিত সর্ব্বদা রহস্য-বিদ্রূপ করিত। পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিতও সম্বন্ধোচিত তামাসা-বিদ্রূপ করিতে বিরত থাকিত না। সে সব ক্রমে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। পাড়াপ্রতিবেশী, এমন কি, বাটীর পুরাতন দাসদাসীকেও ছেলেপুলেরা একটা সম্পর্ক ধরিয়া কথা কহিত। এমনও দেখা যাইত, পুরাতন দাসদাসী মৃত্যুকালে তাহার পুত্র-কন্যা না থাকিলে তাহার মনিব-পুত্রকে তাহার সঞ্চিত যাহা কিছু দিয়া যাইত।

পূর্ব্বে ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হইত একটি ভাল দিন দেখাইয়া হাতে খড়ি দিয়া। গুরুমহাশয়ের পাঠশালাই প্রথম শিক্ষালাভের স্থান ছিল। গুরুমহাশয়ের তামাক সাজা, পদসেবা প্রভৃতিও পাঠশালার পোড়ুয়াদেরই কায ছিল। ছোট ছোট ছেলেরা তালপাতার গোছা মাদুর জড়াইয়া, পাততাড়ি বগলে করিয়া পাঠশালায় যাইত। সেকালে সর্ব্বপ্রথম খড়িতে করিয়া মাটীতে লেখা, তৎপরে অঙ্গার ঘষিয়া সেই কালীতে তালপত্রে, তৎপরে কলাপাতায়, সর্ব্বশেষে কাগজে লিখিবার অভ্যাস করিত। খাতায় একবার লিখিয়াই সে পৃষ্ঠায় লেখার কার্য্য শেষ হইত না, তাহার উপর বিপরীত দিকে পুনঃ পুনঃ লিখিত। তাহাকে মক্সকরা বলিত। তখন ধারণা ছিল, মক্স করিলে হাতের লেখা ভাল হইবে। তখনকার পাঠশালায় সর্দ্দার পোড়ো বলিয়া এক জন থাকিত, সে পাঠশালায় নামতা ডাকের পড়া প্রভৃতিতে গুরুমহাশয়কে সময় সময় সাহায্য করিত। কোন ছেলে পাঠশালায় না আসিলে গুরুমহাশয় কতিপয় ছাত্রকে তাহার বাটীতে পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনাইতেন। শাসনের জন্য বেত্রদণ্ডই প্রধান ছিল, সময় সময় নাড়ুগোপাল করিয়া দেওয়া হইত। গাধার টুপী মাথায় দিয়া দেওয়া, কাণ ধরিয়া দৌড় করান, নীল্‌ডাউন্ করিয়া দেওয়া স্কুল-পাঠশালা হইতে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। তখন সকল শ্রেণীতে একখানি করিয়া কাষ্ঠফলক শিক্ষকের টেবিলে পড়িয়া থাকিত, কোন ছেলেকে বাহিরে যাইতে হইলে সেইখানি সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। তাহাকে 'পাস্' বলিত। পাঠ্য শ্রেণীতে যে যেরূপ পড়া বলিতে পারিত, তাহাকে সেইরূপ উঠাইয়া বা নামাইয়া দেওয়া হইত। তখন এন্‌ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীকে preparatory class বলিত। এন্‌ট্রান্স, এল-এ, বি-এ পরীক্ষা সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে সিনিয়র জুনিয়র নামে দুইটি পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল।

পূর্ব্বে মেয়েদের নামের পূর্ব্বে শ্রীমতী ও পরে দাসী অথবা ব্রাহ্মণ হইলে দেবী ভিন্ন আর কিছুর ব্যবহার ছিল না। বিধবাদের নামের সহিত শ্রীমত্যা এবং ব্রাহ্মণদের দেব্যা এরূপও অনেকে বলিতেন। কায়স্থ পুরুষদের নামের শেষে সর্ব্বদা উপাধির পূর্ব্বে দাস ব্যবহার হইত। মহিলাদের জামার ব্যবহার খুব কমই ছিল, জুতার ব্যবহার আদৌ ছিল না। ছাতা ও চশমা ব্যবহার করিতেও দেখা যাইত না। এগার বারো হাত শাটী বা ধুতি তখন বড় একটা কাহাকেও পরিধান করিতে দেখা যাইত না। আজকালের মত হাত তুলিয়া নমস্কার করা তখন মহিলা-সমাজে প্রচলিত ছিল না। বয়োজ্যেষ্ঠা বা সম্পর্কে বড় হইলে পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিত, ছোটদের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিত। গ্রাম্য প্রৌঢ়াদের

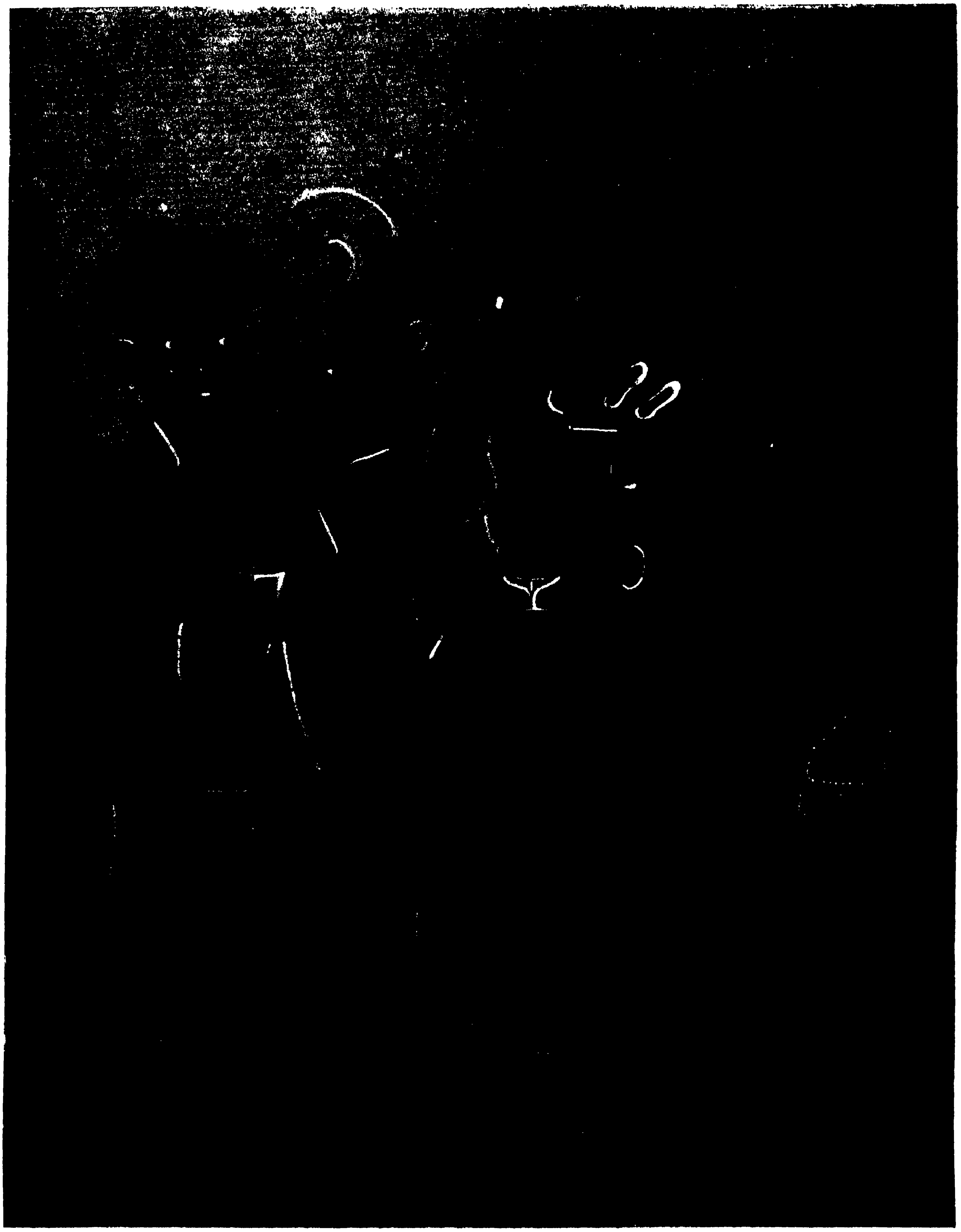

গুড বাই ফাদার—

বসুমতী চিত্র-বিভাগ]

[শিল্পী—চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেখা-সাক্ষাৎ হইলে বা তাঁহারা কোন অল্পবয়স্কাদের দেখিলে অনেক সময় 'আজ কি রাঁধলে গো,' 'মা কি করছে' 'পিসীমা কি করছে' এই ভাবে কথাবার্ত্তা হইত। মেয়েদের বেশী পড়াশুনা প্রাচীন-প্রাচীনাদের কাছে নিন্দা বা বিদ্রূপের বিষয় ছিল। যুবতীদের দিবসে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ বিধিবিরুদ্ধ ছিল। জামাতা বা জামাতা-সম্পর্কীয়-দের সহিত কথা কওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের সমক্ষে বাহির হওয়াও দোষের বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামী বা কোন কোন গুরুজনদের নামোচ্চারণ করা নারীদের নিয়ম-বহির্ভূত ছিল। পল্লীগ্রামে কোন কোন বর্ষীয়সীকে নিতান্ত আবশ্যকে নন্দলাল স্থানে 'ফন্দলাল' বা নবীন স্থানে 'ফবীন' বলিয়া অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেও দেখা যাইত। পল্লীগ্রামে মেয়েদের একটা বড় কু-অভ্যাস ছিল—বাটীর খিড়কির পুকুরের জলের অপব্যবহার করা। সেটা একবারে না যাইলেও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোক-দের বাটী হইতে কিছু দিনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইলে দধি-বিল্বপত্রাদি লইয়া 'যাত্রা' করিয়া বাটী হইতে বাহির হইতেন। এ সব এখন শিক্ষিতা নবীনাদের আর ভাল লাগে না। গর্ভবতী অবস্থায় সে কালে গৃহিণীরা সূঁচ-সূতা লইয়া সেলাই করিতে দিতেন না। এখন এ সব আর কেহ বড় মানেন না। সমবয়স্কা সহচরীদের সহিত একটা কিছু সম্বন্ধ পাতান তখনকার দিনে খুব প্রচলিত ছিল এবং আজীবন সেই সম্পর্ক ধরিয়া আত্মীয়তা, এমন কি, তত্ত্বতাবাস পর্য্যন্ত করিত। সই, গঙ্গাজল, বেয়ান, গোলাপ এই সব পাতানর নাম ছিল। সহরাঞ্চলে মূত্রত্যাগ কালে ব্রাহ্মণদের আর বড় একটা কাণে পৈতা গুঁজিতে দেখা যায় না।

পাখী ও পায়রা পোষা, অর্থবান্ যুবকদের বুলবুলির লড়াই দেওয়া বা টমটম্ হাঁকান অনেক ধনিসন্তানের সখ ছিল. ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম্ ইত্যাদি ভাল ভাল গাড়ী ধনী লোকরা ব্যবহার করিতেন। আড়ম্বরপূর্ণ পোষাক-পরিহিত হয় ত বা পৃষ্ঠদেশে চামর-লম্বিত সহিসরা গাড়ীর সহিত বিবিধ কথায় চীৎকার দ্বারা প্রভুর ধনৈশ্বর্য্য ঘোষণা করিতে করিতে যাইত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ সখের দল—যাত্রা, হাপ আখড়াই বা ফুল আখ-ড়াই অথবা নব হুল্লোড়—এই সবে মাতিত। মদ্য বা অখাদ্য-ভোজন শিক্ষিতদের মধ্যে এক সময় যেন বাহাদুরীর বিষয় ছিল। কোঁচান কালাপাড় ধুতি, চুনট করা পাঞ্জাবী, মাথায় চেরা সীঁথি হয় ত বা তাহার উপর একটি পাতলা কাপড়ের টুপী, হাতে ছড়ি ইহাই প্রায় তখনকার বাবুদের সজ্জা ছিল। অনেকে তুলায় আতর দিয়া কাণে রাখিত।

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ শামুকের খোলার মধ্যে নস্য রাখিতেন। পূর্ব্বে বসন্তের জন্য টিকা দিতে হইলে নূতন টিকা দিয়াছে, এমন একটি ছেলে বা মেয়েকে আনিয়া তাহার টিকা হইতে বীজ লইয়া টিকা দিয়া দিত। রন্ধনের জন্য কাঠের জ্বালই তখন প্রচলিত ছিল। বাবলা, তেঁতুল ও আম কাঠই ভাল বিবেচিত হইত। সুঁদরি কাঠও অনেকে পোড়াইত। গঙ্গাতীরে মৃত্যু তখনকার লোকদের বিশেষ বাঞ্ছনীয় ছিল। বৃদ্ধদের পুত্র-পৌত্রাদি ও বন্ধুগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আড়ম্বরের সহিত গঙ্গাযাত্রা করা ইহা পূর্ব্বে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইত। ষ্টীমার গাড়ীতে বা যে সে হোটেলে অথবা মুসলমানের হাতে অন্ন ভক্ষণে সেকালে জাতি যাইত। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর কোন কুটুম্ব বা অতিথি আসিলে চিঁড়া-মুড়কির সহিত দুগ্ধ বা দধি দিয়া ফলাহারের ব্যবস্থা করিতে সহরের লোকও তখন লজ্জাবোধ করিত না।

ভদ্রলোকদের ছেলে—কিশোর ও যুবকদের মধ্যে প্লীহা-জ্বর পূর্ব্বে অনেকের হইত। প্লীহার উপর ছাঁকা দেওয়া, জোঁক বসান, সোনার সেঁক এই সব ব্যবস্থা ছিল। নাসা হওয়াও পূর্ব্বে অধিক ছিল। ছেলেদের দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে চিরিয়া দেওয়া ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বে ধনী লোকদের বাড়ীতে পাইক, দরোয়ান, খানসামা এ সব বেশী দেখা যাইত। উড়ে মালীদের তখন চুলকাটা কিছু বিচিত্র ছিল। মাথায় খোঁপা, গলায় মালা ইহা সকলকারই থাকিত। উহাদের তালপত্রে সূক্ষ্মাগ্র লোহার দাগ দিয়া পত্র লেখা, ব্যারিং পত্র, শালপাতার চুরুট এ সব আর দেখা যায় না। চীনাদের লম্বিত বেণী রাখাও উঠিয়া গিয়াছে। কাবুলীওয়ালারা শীতকালে কাঁধে করিয়া গরম গায়ের কাপড় বিক্রয় করিত। নিশিতে ডাকা, ভূতে পাওয়া, ভূত নামান এ সব আর বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। সেকালে মিটিং বা সাধারণ সভাতে কেহ বক্তৃতা করিতে উঠিলে অপরকে hear hear বলিতে খুব শুনা যাইত।

সে কালে সংসারে কর্ত্তা হইতে ছেলেপুলেরা পর্য্যন্ত

সকলে প্রায় একসঙ্গে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিকালে ভোজন করিতে বসিত। পিতা, পুত্র, সহোদর প্রভৃতি সকলে বসিয়া অনেক সময় নানা গল্প-গুজব করিত। আজকাল পিতা-পুত্রের মধ্যেও বেশী দেখা-সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তার যে সুযোগের অভাব, এ ভাবটা তখন দেখা যাইত না। পূর্ব্বে ছোট ছেলেমেয়েরা কাহাকেও আপনি বলিয়া কথা কহিলে তাহা অশোভন মনে হইত। বৌ-ঝিরাও বাটীতে আপনি বলিয়া কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিত না। বলা বাহুল্য, এরূপ না করায় তখন কোন দোষের বিবেচিত হইত না।

আজকাল শত শত প্রকার এসেন্স, অটো প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য দেখা যায়। পূর্ব্বে নিতান্ত বাবুলোক কতিপয় ভিন্ন আতর ও গোলাপজল এবং ফুলেল তৈল সাধারণের গন্ধ-দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইত। তখনকার গোলাপজল বড় বড় কারপাতেই বেশী আসিত। মুঙ্গেরি মটকির ঘৃত, কলসীর খেজুর, তুলা দেওয়া বাক্সে আঙ্গুর আসা এ সবও অনেক কমিয়া গিয়াছে। চালা করিয়া জিনিষ আনাও কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের যুগলমূর্ত্তির চিত্রে কদম্বতলায় শ্যামের বামে ঘাগরাপরা শ্রীরাধার ছবি-ই ভক্তজনের বাঞ্ছিত ছিল। এখন সখ করিয়া ঘরে রাখিবার জন্য যুবক-যুবতীদের তেমন যুগলমূর্ত্তি আর পছন্দ হয় না। শ্বেত-সরোজোপরি শ্বেতবসনা দণ্ডায়মানা সরস্বতী-প্রতিমাও ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছেন।

আহার ও আহারীয়

আহার ও আহারীয় বিষয়েও বহুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। সেকালের অনেক খাদ্য যাহা লোভনীয় ছিল, যাহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, এখন তাহার কোন কোনটির ব্যবহার খুবই কমিয়া গিয়াছে; কোন কোনটি প্রায় ভুলিয়া যাইতেই বসিয়াছি। ভোজনবিধিতেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বের তুলনায় বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য অন্নের ব্যবহার এখন কতক পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রাত্রিতে রুটীর ব্যবহার এখনকার তুলনায় কম ছিল। তখন অনেকে তিনবার ভাত খাইত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরাও তখন বিদ্যালয় হইতে আসিয়া মধ্যাহ্নের প্রস্তুত চাপা দেওয়া ভাত খাইত, এখনকার মত মিষ্টান্ন বা লুচি-পরোটার ততটা চলন ছিল না। পান্তাভাত খাওয়া ভদ্রলোকদের মধ্যে এখন খুব কমই দেখা যায়, পূর্ব্বে গরীবের ছেলেমেয়েরা অনেকে সকালে পান্তাভাত খাইত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে মেয়েরা সকালে বাসি রুটী অনেকেই খাইত। মুড়ি-মুড়কির জলপানও অনেকের প্রাতরাশের কায করিত; চা, মিষ্টান্ন, বিস্কুট বা মাখন-রুটী তখন খুব কম পরিবারেই চলিত। এখনকার মত দিনে দুপুরে তখন চা-পান ছিল না বা আত্মীয়বন্ধু কেহ বাটীতে আসিলেই চা দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হইত না। এখনকার মত চায়ের দোকান তখন যে কোন সহরে মনে করিলেই পাওয়া যাইত না। তখন নিতান্ত প্রয়োজন হইলে সর্দ্দিকাশীর আক্রমণে লোক চা পান করিত। দশ জনের মধ্যে হয় ত এক জনের বাটীতে অনুসন্ধান করিলে একটা চায়ের কেট্‌লি, টিপট্ বা পেয়ালা সসার পাওয়া যাইত।

পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভাল করিয়া খাওয়াইবার জন্য উৎকৃষ্ট চাউল, ভাল ঘৃত, দুগ্ধ, মাছের মুড়া এই সকল সংগ্রহ করিয়া লোক নানা প্রকার সুপাচ্য ব্যঞ্জনাদির ও পায়স-পিষ্টকাদির ব্যবস্থা করিত। চপ-কাটলেট, কোপ্তা-কারি এ সব এক প্রকার অজ্ঞাতই ছিল। পোলাও খাওয়ান একটা বড় ব্যাপার ছিল। পায়স তখনকার একটি আদরের সামগ্রী ছিল। চিঁড়ার পায়স, লাউয়ের পায়স এ সব প্রচলিত থাকিলেও অন্নের পায়স ও সুজির পায়সই অধিক প্রচলিত ছিল। অন্নের পায়সকে পরমান্ন বলিত। এ কথাটি আজকাল খুব কমই শুনা যায়। পায়সের সহিত মধ্যাহ্নে সচরাচর ছোট ছোট সফেদার বা খাসার পান্‌তুয়া দেওয়া হইত, সখের খাওয়ানতে অমৃতি বা দুই একখানা ফুলকা লুচিও চলিত। নিমন্ত্রিত বা অভ্যাগতদের লুচির সহিত সুজির পায়স দেওয়া বা মাটীর সরায় করিয়া দুগ্ধ দেওয়া সহর অঞ্চলে একবারে উঠিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে ইহা সর্ব্বত্র দেখা যাইত।

রাত্রিতে খাওয়ান-দাওয়ানতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ধনী লোকের বাটীতেও লুচির সহিত মৎস্য-মাংসের প্রচলন কদাচিৎ দেখা যাইত। তখনকার উৎকৃষ্ট ভূরি-ভোজনাদিতে সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্‌তুয়া, বোঁদে, খাজা, গজা, মিহিদানা,

ক্ষীর-দধির অধিক বড় কিছু দেখা যাইত না। সচরাচর খাওয়ানতে মোণ্ডা, মিঠাই, বোঁদে, জিলাপি ও দধি ইহাই ছিল। দুগ্ধ ও সুজির পায়স ঠিক ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের। পেঁয়াজ, ডিম্ব, মাংস সামাজিক কাযকর্ম্মে কখনও চলিত না, এমন কি, এ সব অনেকের অন্দরমহলে যাইতে পারিত না। খাইতে হইলে বাহিরে আলাদা রন্ধন হইত। আজকাল ব্যঞ্জনাদিতে হিং যত ব্যবহার হইতেছে, পূর্ব্বে এত অধিক হইত না। টম্যাটো বিলাতী বেগুন সাহেবদের খাদ্য বলিয়াই তখন জানা ছিল, ইহার এতাদৃশ গুণ, তাহাও জানা ছিল না এবং বাঙ্গালী সমাজে আদরও ছিল না। পেঁয়াজ বা পেঁয়াজকালি—যাহা এখন অনেক পরিবারে সাধারণ তরি-তরকারীর মতই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বে হিন্দুর অস্পৃশ্য ছিল।

মিষ্টান্নের মধ্যে আনন্দলাড়ু, মুগ্মলাড়ু, খৈচুর, কদমা, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ এ সবের ব্যবহার দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। বৈবাহিক অনুষ্ঠানে যেমন এখনও একখানি চরকা আবশ্যক হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন পরিবারে বিবাহের সময় আনন্দলাড়ু প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। লালমোহন, ছানাবড়ার আদরও ক্রমে লোপ পাইতেছে। সন্দেশ এক্ষণে বহু প্রকারের হইয়াছে, কিন্তু জোড়া মোণ্ডা, সিঙ্গাড়া সন্দেশ এ সব আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোড়া মোণ্ডা এখন আর মানুষের ভোগে লাগে না, উহা দেবসেবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। সরুচাকলি, গুড়ের মালপোয়া এখন আর সখ করিয়া বড় কেহ খান না। পূর্ব্বে নলেন গুড়, পয়ড়া গুড়, লোক রুটীর সহিত—মুড়ির সহিত সখ করিয়া খাইত, এখন সহরে এ সব জিনিষ আর তেমন কেহ খোঁজ করেন না। দোলো দোবারা চিনির স্বাদ, সুগন্ধ ও মিষ্টতা এখন লোক ভুলিয়া যাইতেছে। মুড়ির চাক্‌তি, ছোলার চাক্‌তি ভদ্রলোকের ছেলেরা আর খাইতে চাহে না। গুগ্‌লীর ঝোল পূর্ব্বে অনেকে সখ করিয়া খাইত। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের মধ্যে পাতখোলার ব্যবহারও অনেক কমিয়া গিয়াছে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

সাজ-পোষাক, নিত্য পরিধেয় অলঙ্কার প্রভৃতিতে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে ও নিত্যই হইতেছে। বিশিষ্ট সহরাঞ্চলে চটি-জুতা, ধুতি, উড়ানি এখন আর বাঙ্গালীর সভ্যতানুমোদিত সাজ নহে। উড়ানি, চাদর, দোলাই প্রভৃতিকে দোছোট বলিত, ইহা ব্যতিরেকে তখন ভদ্রসমাজে কেহ যাওয়া আসা করিতে পারিত না। এখন চাদর-উড়ানির ব্যবহার ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে এখন কখন কখন কাহাকেও পার্শ্বে বাঁধা বেনিয়ান পরিধান করিতে দেখা যায়, নচেৎ উহা অন্তর্হিত হইয়াছে। পিরিহান, পার্শিকোট, কামিজ, বডি, জ্যাকেট, কাঁচুলিও উঠিয়া গিয়াছে। শীতকালে কদাচিৎ কোন পল্লী-বৃদ্ধ কাঁথা গায়ে দেন বা কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বনাৎ গায়ে দিয়া বিদায় আনিতে যান, নচেৎ এ দুইটি জিনিষের আর ব্যবহার নাই। ছিটের দোলাই জড়ান—গলায় বাঁধা বালকগণ মুড়ি কোঁচড়ে করিয়া পাঠশালায় যাইতেছে, এ দৃশ্য এখন আর কোন সহরেই দেখা যায় না। বালাপোস ব্যবহারও কমিয়া আসিতেছে।

পাছাপাড় শাটী এখন আর ভদ্রলোকের মেয়েরা, এমন কি, বালিকারাও পরিতে চায় না। পাছাপাড় কথাটিও এখন সভ্যসমাজের অনেকে ব্যবহার করেন না, এখন তাহার নাম হইয়াছে তে-পাড়। পূর্ব্বে বাঙ্গালী মেয়েদের সকল সময়ই পরিধেয়ের মধ্যে ছিল মাত্র একখানি শাটী, পরে কোথাও যাওয়া আসায় বা উৎসবাদিতে জামার ব্যবহার আরম্ভ হয়, তাহাকে বডি বা জ্যাকেট বলিত। সায়া, সেমিজ এবং জাঙ্গিয়া ব্যবহার আধুনিক; পুরুষদের জাঙ্গিয়া ব্যবহারও অল্প কয়েক বৎসর মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ল্যাঙ্গটের ব্যবহার তুলনায় পূর্ব্বে বরং অধিকই ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামা ফ্রক্—যাহাকে ঘাগরা বলিত, তাহারই মাত্র ব্যবহার হইত, এখন সহরে দুই তিন মাসের শিশুকেও অন্যের সমক্ষে বাহির করিতে হইলে ল্যাঙ্গটের মত পরান হয়। ইহা পনের বিশ বৎসর পূর্ব্বেও সাধারণের মধ্যে অজ্ঞাত ছিল।

ধনী জমীদার বা পদস্থ ব্যক্তিদের শালের চোগাচাপকান শীতকালে সম্ভ্রমের পোষাক ছিল, ক্রমেই তাহা কমিয়া আসিতেছে। শালের জোড়ার, জামিয়ারের এবং চওড়া-পাড় শালের ব্যবহার আর পূর্ব্বের মত আদরের নাই। জরির শাল সহরে এখন কেহ আর ব্যবহার করেন না। সার্ট পাঞ্জাবীতে পূর্ব্বে চওড়া পটিই ফ্যাসান ছিল, এখন সরু

হইয়াছে। পাঞ্জাবীর পার্শ্বে বোতাম দেওয়ার রেওয়াজও কমিয়া আসিতেছে। বরের পোষাকে এখন আর তসর বা মখমলের উপর জরির কায করা চাপকান, পায়জামা, তাজ, শিরপ্যাচ চলে না। পূর্ব্বে ধনী লোকদের ছেলেরা গলায় মুক্তার পেলি, কাণে জড়োয়া বীরবৌড়ী, হাতে অনন্ত বাজু বালা প্রভৃতি পরিয়া বিবাহ করিতে যাইত; এখন তাহা কদাচিৎ দেখা যায়। লাল চেলির কাপড় তখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের কনেদের পরিচ্ছদ ছিল। এখন মাথার খোপায় কাজললতা গোঁজা, লাল চেলি পরা কনে সহরের মধ্যবিত্তদের ঘরে আর দেখা যায় না। মেয়েদের মাথায় রকমারি ফিতা জরি গোটার ব্যবহারও সহর অঞ্চলে কমিয়া আসিতেছে। ধনবান্‌দের দ্বারবান এবং সহিস-কোচম্যানদের পোষাকের আড়ম্বরও পূর্ব্বের তুলনায় কমিয়া আসিতেছে।

অলঙ্কারের মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বহু প্রকার সেকালের গহনা ক্রমে লোপ পাইতেছে। সামান্য গৃহস্থের ঘরেও পায়ের কয়েকখানি ভিন্ন এখন রূপার গহনা প্রায় ব্যবহৃত হয় না। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেও বাউটি একটি নামজাদা গহনা ছিল। কন্যার বিবাহে যাহারা বাউটির সাজ গহনা দিতেন, তাঁহাদের দেওয়াটা একটা প্রশংসার বিষয় হইত। পৈঁচে, মুড়কি-মাদুলি, নারিকেলফুল, জোড়া মাদুলি, চৌদানি, কাণবালা, কণ্ঠমালা বাজুপাত, ঝাড়ইয়ারিং, উচ্চে ফল—এ সব গহনার কথা আজকালের যুবতীদের মধ্যে অনেকে জানেনই না। চন্দ্রহার, চিক, সাতনর, ঝাঁপটা, বড় বড় মাকড়ি, বোর, পাটি, কোমরের ব্যাং এ সব গহনা আর নূতন করিয়া কেহ প্রস্তুত করান না। পাটরি, ঝাঁপটা, রতনচুড় ইহাও এখন আর সহরের নর-নারীদের বড় সখের গহনা নহে। গৃহিণীদের নথ—যাহা পূর্ব্বেকার একটি প্রয়োজনীয় অলঙ্কার ছিল, তাহা আজকাল সহর অঞ্চলের নবীনারা পছন্দই করিতেছেন না। ছোট মেয়েদের নোলক—যাহাতে মুখখানি সুন্দরতর দেখাইত, তাহার চলনও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। পায়ে রূপার গুঁজরি পঞ্চম এখনও সময় সময় কন্যাদানের কালে মেয়েদের পরাইয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু উহাও যাইবার পথে বসিয়াছে।

শিশু বালকদের গহনা পরান এখনও প্রচলিত থাকিলেও, পূর্ব্বে কিশোরদেরও কোন কোন অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করা হইত, এখন তাহা আর প্রায় দেখা যায় না। যুবক ও বয়স্থ পুরুষরা পূর্ব্বে আংটী ও ঘড়ীর চেন ব্যবহার করিত, এখনও আংটীর ব্যবহার ঠিকই আছে, চেনের ব্যবহার খুবই কমিয়া আসিতেছে। গার্ড চেন নিতান্ত ছেলেমানুষ বা পল্লীগ্রামের কোন কোন লোক ভিন্ন কেহ ব্যবহারই করেন না।

প্রথাদি ও অন্যান্য

প্রথাদির ভিতরও বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে। পূর্ব্বে পিতাকে ঠাকুর বলারও প্রথা ছিল। তখন কেহ ঠাকুরের নাম জিজ্ঞাসা করিলে পিতার নাম বলিত। এখন ইহা কমিয়া যাইতেছে। দলিলাদির শীর্ষদেশে কোন দেবদেবীর নাম লেখার প্রথা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ধনবান্ লোকের বাটীতে ছেলে হইলে বক্‌শিসের প্রত্যাশায় দলে দলে বাজনা আসিত। সময় সময় তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়ের বাটীতেও যাইত। অর্থ ও বস্ত্রাদি দিয়া সকলেই যথাসাধ্য বিদায় করিত। অর্থশালী ব্যক্তিরা কখন কখন পুরাতন শাল-জামিয়ারও দিত। গৃহস্থের কল্যাণার্থ প্রত্যহ প্রত্যূষে বাটীতে নাম দিয়া যাওয়া সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইত।

পূর্ব্বে কেহ কিছু সমাজ-বিগর্হিত কার্য্য করিলে তাহার ধোপা-নাপিত বন্ধ করিয়া একঘরে করিয়া রাখিত। বিশেষ অপকর্ম্ম করিলে সমাজের প্রধানগণ না কি মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিত। সে সব সামাজিক শাসন এখন আর দেখা যায় না। রোস্‌নাই করিয়া বর আসা কমিয়া আসিতেছে, পূর্ব্বে সামর্থ্যপক্ষে ইহা বিবাহের অঙ্গস্বরূপ ছিল। তৎপূর্ব্বে হাত-লণ্ঠন লইয়া বর যাওয়ার প্রথা ছিল। কোন কোন ধনী লোকের বাড়ীতে এখনও রোস্‌নাই হইলে কুলপ্রথা হিসাবে হাত-লণ্ঠন সঙ্গে লইয়া যায়। বর আসিতেছে জানিতে পারিয়া কন্যাপক্ষ অগ্রগামী হইয়া তাহাদের লণ্ঠন লইয়া আনিতে যাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। অনেক স্থলেই পূর্ব্বে বরযাত্রীদিগকে ভোজন না করাইয়া কন্যাযাত্রীদিগকে ভোজন করান হইত না। যে কোন ভোজে প্রথমে ব্রাহ্মণ, তৎপরে অন্য জাতীয় বন্ধুবর্গের ভোজন না হইলে

স্বজাতিকুটুম্বদের খাওয়ান হইত না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের আহারের সময় ডাকিতে যাওয়া পূর্ব্বে একটা প্রথার মধ্যে ছিল। পল্লীগ্রামে এখনও ডাকা হয়, কিন্তু সহরে এ সব উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে থিয়েটারের প্রগ্রাম মাত্রেই 'রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষেধ' লেখা থাকিত। সাময়িক পত্রাদিতে প্রায়ই লেখা থাকিত 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন'। শাক-সব্জী, বেগুন, শিম প্রভৃতি পূর্ব্বে ওজন করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল না, এ সব থাউকা বিক্রয় হইত। পুরমহিলাগণ বহুদিন পরে কোন আত্মীয়সমীপে যাইলে কিছু মিষ্টান্ন সঙ্গে না লইয়া যাইতেন না। যাত্রা-পাঁচালীতে অনেক সময় পুরস্কারের প্রত্যাশায় পালা শেষে গৃহস্বামী, এমন কি, তাঁহার পুত্র, সহোদর প্রভৃতির গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া গান গাহিতে বা ছড়া কাটিতে দেখা যাইত। তখনকার যাত্রাদিতে সতী-নাটক, মৎস্য-বিদ্ধ, তরণীসেন-বধ, বৃষকেতু-বধ এই সব পালারই আধিক্য ছিল। যাত্রাতে বক্তৃতাদি অভিনয়ের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে চারি পাঁচ জন জুড়ী অথবা একদল বালক উচ্চকণ্ঠে গান গাওয়ার প্রথা ছিল। সে গান অনেক সময় বক্তৃতার শেষ কথাটি ধরিয়া আরম্ভ হইত। গানের সময় অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গ বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিত; গানের সঙ্গেও কেহ কেহ যোগ দিত। অনেক অভিনেতা এই অবসরে আসরের মধ্যেই মস্তক নীচু করিয়া তামাক খাইয়া লইত, তাহাতে সাবিত্রী, কৌশল্যা, দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীর ভূমিকা যাহারা গ্রহণ করিয়া থাকিত, তাহারাও বাদ যাইত না।

কাযকর্ম্ম উপলক্ষে মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে তখন এক জন দাসী ছেলে কোলে করিয়া যাইলেই চলিত, এখনকার মত গৃহিণী বা অন্য বয়স্থা মহিলাদের এ জন্য যাইবার দরকার হইত না। তখন ধাত্রীকে দাইমা, ব্রাহ্মণ দ্বারবান্‌কে পাঁড়ে-ঠাকুর, বৈবাহিক-বাটী হইতে কোন দাসী আসিলে অনেক সময় বাটীর মহিলারা তাহাকে বেয়ান বলিয়া সম্বোধন করিতে দেখা যাইত। তখন বড় বড় দেশনেতাদের সম্মান দেখাইবার জন্য গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া ভদ্রসন্তানদের উহা টানিয়া লইয়া যাইতে দেখা যাইত। সুরেন্দ্রনাথকেও সে সম্মান পাইতে দেখা গিয়াছিল।

পূর্ব্বে অনেক বিষয়েতেই একটা ধর্ম্মভাব দেখা যাইত। কোন দেবদেবীর নাম স্মরণ ব্যতিরেকে শয্যাত্যাগ, কোন দেবদেবীর প্রথম নামলেখা ভিন্ন দিবসের কার্য্যারম্ভ, ঠাকুর-প্রণাম না করিয়া স্থানান্তরে বা কোন বিশেষ কার্য্যে গমন পর্য্যন্ত অনেকে করিতেন না। ভোজনে জনার্দ্দন, শয়নে পদ্মনাভ স্মরণ না করিয়া শয়ন করিতেন না। হাম-বসন্ত হইলে বাটীতে মৎস্যপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বসন্ত-রোগীর গৃহে কেহ জুতা পায়ে দিয়া যাইত না, এমন কি, টিকা দিলে বাটীতে মৎস্য আসিত না। পূর্ব্বে রামধনু উঠিলে বালক-বালিকারা প্রণাম করিত।

ভগিনীপতির পিতাকে তালুই মশাই এবং ভগিনীপতির মাতাকে আঁবুই-মা বলা আজকাল আর প্রায় দেখা যায় না। গদাই, যদু, মাধব, যাদব, সৌরভ, ফুলকুমারী, রাইমণি এ ধরণের নাম এখন রুচিবহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। সেকালের ছেলেভুলান ছড়া বা ঘুমপাড়ানিয়া গান আর বড় বেশী শুনা যায় না। বৃদ্ধাদের সেই সুয়োরাণী দুয়োরাণী, একানোড়ে, সখিসানা, বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী, ইত্যাদির গল্প বলিতে আর প্রায় শুনা যায় না। তখন গল্পের শেষে 'নটেশাকটি মুড়াল—'ইত্যাদি যেন বলিতেই হইত। আর পাঠশালায় শটকিয়া শেষ হইলে 'এক-এ শূন্য দশ, দশ-এ শূন্য শ' শেষে শটকে সাঙ্গ হ' ইহাও যেন না বলিলে পড়া শেষ হইত না।

কালের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের মধ্যেও পরিবর্ত্তন হইয়াছে অসাধারণ। সাইড স্প্রীং জুতা আজকাল উঠিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে তাহাকে ঘোড়-তোলা জুতা বলিত। গেঁজে ও বাটুয়ার ব্যবহার শিক্ষিতদের মধ্যে আর প্রায় দেখা যায় না। আজকাল একটা ভাল ফাউন্টেন পেন ২০৲।২৫৲ টাকা দাম। পূর্ব্বে ইহা ছিল না। জামার পকেটে কালী না পড়ে, এই জন্য পূর্ব্বে একপ্রকার দোয়াত আসিত—যাহা একস্থানে টিপিলে খুলিয়া যাইত। কলমের পশ্চাদ্দিকে প্যাঁচ দেওয়া একপ্রকার ছোট দোয়াত লাগান আসিত। পুস্তককে চিত্রিত করিবার জন্য পূর্ব্বে কাষ্ঠের ব্লকই ছিল। ব্লক্‌খানির চারিদিকে স্ক্রুপ্‌ লাগানর দাগ প্রায় তখনকার গঙ্গাদেবী চাণক্য প্রভৃতির ছবিতে দেখা যাইত। শ্রীরাম-পুরের পঞ্জিকার পূর্ব্বে অধিক আদর ছিল। ডবল্‌ পয়সা পূর্ব্বে চলিত। কুড়ি টাকার নোটও তখন প্রচলিত ছিল।

একশত বা তদূর্দ্ধ টাকার নোট কাহাকেও দিতে হইলে তখন তাহার নম্বর রাখা নিয়ম ছিল। বড় বড় তাকিয়ার ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আসিতেছে।

গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেও যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা প্রাচীন গ্রন্থগুলি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কবিতার ছন্দের মধ্যেও বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ছন্দে গ্রন্থরচনার যুগ অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে রচয়িতার আত্মপরিচয় দিবার রীতিও তিরোহিত হইয়াছে। চলিত ভাষার কথার মধ্যেও অনেক কথার. ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। কথ্য ভাষার যে সব কথা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, সে সব উদ্ধৃত করিয়া দেখান সহজ নহে। যাহা বিস্মৃতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সেইরূপ কতিপয় কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

মোজাকে পূর্ব্বে অনেকে 'পাতাপা', চড়ুইভাতিকে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে 'পরশূলো', মাপ দেওয়াকে 'জোঁকা দেওয়া', রহস্য করাকে 'মস্করা', মহিলা-সমাজে গর্ভিণী প্রসব হওয়াকে 'স্পর্শ হওয়া', অয়েল ক্লথকে 'মোমঢাল', মেয়েদের পাইখানা যাওয়াকে 'ঘাটে যাওয়া', মূত্র ত্যাগ করিতে যাওয়াকে 'বাহিরে যাওয়া', খেলোয়াড়দের উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী লোককে 'ঘালধাঁড়', অনতিদূরবর্ত্তী স্থানকে দেখাইতে 'হুতু', তরকারিবিশেষকে 'ছক্কা', বা 'ঘ্যাঁট্', জাজিমকে 'ফরাস', জানালাকে 'ঝরোকা', তিরস্কার করাকে 'মুক করা', বড় বড় তাকিয়াকে 'গিদ্দে', পৃথক্ হওয়াকে 'ভেন্ন হওয়া', উপবাস করাকে 'লঙ্ঘন দেওয়া', শীঘ্র করিয়াকে 'খপ্ করিয়া' বলিত। এ সব কথা একবারে উঠিয়া না যাইলেও বর্ত্তমানের কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীদের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। 'নিরেঢাল', 'রোসো', 'ঠাঁইকরা', ঠাঁইনাড়া', 'ফুলবাবু', 'সিঁতিকাটা', 'পুঁটি', 'ওলাউঠা', 'ঘোঙা রাত্রি', 'ঘোঙা মোঙা', 'ন্যাক্‌রা,' 'ভারি রাত্রি', 'বেভার', 'নাচদরজা', 'ভুজনো' প্রভৃতি কথাগুলির ব্যবহার অনেকাংশে হ্রাস পাইতেছে। 'কুনিকা' 'রসি', 'ছোপা' এই সব পরিমাপক অর্থে ব্যবহৃত কথাগুলি এখন কমই শুনা যায়। 'কলের গাড়ী', 'কম্ফর্টার' (গলাবন্ধ), 'লেডি স্কুল' সহরের লোকের মুখে আর বড় একটা শুনা যায় না।

যাহা একবার যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কথা বলিতে না পারিলেও বিস্মৃতির পথে যে সকল যাইতে বসিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বহু দিক্ দিয়া তাহার মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। যদি ক্ষেত্রবিশেষে কাহারও সহিত মতান্তর হয় বা প্রবন্ধটি বিশিষ্টতাহীন মনে হয়, সে স্থলে আমার তর্ক নাই। আজ যাহা গমনোন্মুখ, কাল তাহার পুনরাগমন হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু সে অবস্থা না ঘটিয়া ইহা চিরবিলুপ্ত হইলে বিষয়গুলি একটা লেখাপড়ার মধ্যে থাকিলে ভবিষ্যৎবংশীয়দের কখন ইহা উপভোগ্য হইতে পারে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই ইহা লিখিত হইল।

শ্রীহরিহর শেঠ।

পথের ডাক

ওই যে দূরের ডাক্ এলো আজ
সাঁঝের বাতাসে ;
মন যে তবু পিছন টানে
কাঁদ্‌ছে হুতাশে।
তবু পথেই চল্‌তে হবে
পথকে ভালবেসে ;
পথের মাঝেই বাঁধন যত
ছিঁড়তে হবে হেসে।

পিছের সাথী ভুলো আমায়,
দোষ করো সব ক্ষমা ;
না হয় অভিশাপ দিও, সব—
রইবে শিরে জমা।
সকল দুখের প্রদীপ যেন—
সাম্‌নে দেখায় পথ ;
জাগবে মরণ-পারের আলোয়
নূতন ভবিষ্যৎ !

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী (বি-এল)।

১৮

সপ্তাহখানেকের জন্য কাযকর্মের ব্যবস্থা করিয়া, এক জন কর্ম্মচারীর উপর বাড়ীর ভার দিয়া হিমাদ্রি পুষ্পিতাকে লইয়া কাশীযাত্রা করিল। সকালের দিকে হিমাদ্রি মায়ের কাছে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিল।

ট্রেণে তখন ভিড় ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রায় খালি যাইতেছিল। দুই জনে একখানি বেঞ্চে শয্যা রচনা করিয়া পাশাপাশি বসিল। ট্রেণ ছুটিয়া চলিল। সম্মুখের বেঞ্চে দুইটি লম্বোদর মাড়োয়ারী বসিয়া পুষ্পিতার পানে ঘন ঘন চাহিতেছিল ও মাঝে মাঝে তাহারা অঙ্গুলীর হীরার আংটী দুইটি ইহাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিতেছিল ; ভাবটা, আমার আংটী দেখ। ইহার একটির দাম তোমাদের দুজনের পোষাকের চেয়ে ঢের বেশী।

দু'জনের এক জনও হীরার আংটীর দিকে লক্ষ্য না দেওয়ায় মাড়োয়ারী দুই জনই বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এক জন একটু মাতব্বরী সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেতো দূর যাতে হোবে ?"

পুষ্পিতা তাহার বাঙ্গালা কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল।

হিমাদ্রি বলিল, "কাশী যাব। আপনারা কোথায় যাবেন ?"

মাড়োয়ারী এবার আপনাকে বাঁচাইয়া শুধু বলিল, "হাজারীবাগ।"

পুষ্পিতার হাসি সে লক্ষ্য করিয়াছিল।

একটু পরে সে নিজের ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা বাবু আজকাল সাহেবদের দেখাদেখি আউরৎকে সঙ্গে নিয়ে যেতে শিখেছেন। কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে, তখন কি তাদের মত আউরৎকে রক্ষা করতে পারবেন ?"

হিমাদ্রি বলিল, "আপনার কি মনে হয় ?"

মাড়োয়ারী এক , তাচ্ছীল্যের সহিত বলিল, "মনে আর কি হোবে ? কলকাতায় ত আপনাদের দেখছি, আর খবরের কাগজেও ত পড়া যাচ্ছে—আজ এর ঔরৎকে, কাল তার ঔরৎকে মুসলমানে ধ'রে নিয়ে নিকে করছে। তবু ত আপনারা সাহেবদের মত দেখাতে ছাড়বেন না।"

হিমাদ্রি বলিল, "নারীদের উপর অত্যাচার করে যারা, তারাই বর্ব্বরতার পরিচয় দেয়। তবে প্রত্যেক নর-নারীর আত্মরক্ষার চেষ্টা ও শক্তি থাকা দরকার। চেষ্টা হয়েছে—ক্রমশঃ শক্তিও হবে।"

মাড়োয়ারী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "এখনই যদি ২।১ জন মুসলমান বা ১ জন সাহেব ওঠেন, তা হলেই বোঝা যাবে।"

হিমাদ্রি বলিল, "যদি ওঠে ত বুঝবেন।"

তার পর তাহারা নিজেরাই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। মাড়োয়ারীর দিকে আর তাকাইল না।

রাত্রি ৯টা আন্দাজ গাড়ী আসানসোলে আসিল। গাড়ী যখন ছাড়ে ছাড়ে, তখন সত্য সত্যই দুজন ফিরিঙ্গী বেত হাতে সেই কামরায় উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পুষ্পিতাকে দেখিয়া এক জন একটা বিশ্রী গোছের শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"a black beauty."

তার পর সে পুষ্পিতার দিকে অগ্রসর হইল। দ্বিতীয় লোকটিও প্রথমের অনুসরণ করিল।

হিমাদ্রি কঠোরকণ্ঠে কহিল, "What do you mean by it—you white brute !"

এরূপ সম্বোধনের জন্য দুই জনের এক জনও প্রস্তুত ছিল না—দুই জনেই হিমাদ্রির পানে চাহিল। তার পর প্রথম লোকটি দ্বিতীয় লোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "you go to the beast. I to the beauty first" বলিয়া একবারেই পাশে গিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 'ওঃ ওঃ' করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া সে ধরাশায়ী হইল। হিমাদ্রি তাহার মুখের উপর এক প্রচণ্ড ঘুসি ছুড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় বীরপুরুষটি ইহা দেখিয়া যেমন বেতগাছা উঠাইয়াছে—হিমাদ্রি তাহার মণিবন্ধ ডান হাত দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিল। তাহার বেত হাত হইতে মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িল ও লোকটা মাটীতে বসিয়া পড়িল।

হিমাদ্রি তখন পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, দুইজনকেই লক্ষ্য করিয়া ইংরাজীতে বলিল, "ঐ কোণে গিয়ে দাঁড়া পশু। ফের যদি বজ্জাতি করবার চেষ্টা পাও,

কুকুরের মত গুলী ক'রে মারবো। তার পর জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেব।"

ফিরিঙ্গী দুই জন পিতার সুপুত্র হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে অপর কোণে গিয়া একটা শূন্য আসনে বসিল। আর তাহাদের দিকে চাহিল না।

হিমাদ্রিও পিস্তল যথাস্থানে রাখিয়া স্থির হইয়া বসিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র ফিরিঙ্গী-দ্বয় আপনা হইতে উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া নামিয়া গেল। হিমাদ্রি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, তাহারা কয়েকটা কামরা ছাড়াইয়া গিয়া একটা ইণ্টার ক্লাসে উঠিল। হিমাদ্রি বুঝিল, ইহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল না, কিন্তু কথঞ্চিৎ সাদা চামড়ার জোরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছিল। এখানে আসিয়া একবার শুইতে পারিলে আর উহাদের পায় কে? প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীরা নিদ্রা গেলে—তাহাদের টিকিট থাকুক আর না-ই থাকুক—তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ করিবার না কি ব্যবস্থা নাই। আর মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকরা ত দিন-রাত ঘুমাইয়াই আছে,—সুতরাং তাহাদের জাগাইলে কোন দোষ নাই!

ফিরিঙ্গী দুই জন চলিয়া গেলে মাড়োয়ারীদ্বয়ের জ্ঞান হইল। তাহারা হীরার আংটী সমেত আঙ্গুল গুটাইয়া লইয়া বলিল, "বাবু সাহেব, ঠিক করিয়াছেন। এ দেশের সব লোক এই রকম করিতে পারিলে, আর কোন সাহেব অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না। আপনি 'ঔরৎ' লোক লইয়া ভ্রমণ করিবার উপযুক্ত লোক বটে। মাফ্ করিবেন।"

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল, "শেঠজী, আর এক জিনিষের জোরেও এদের অত্যাচার থেকে বিরত করা যেতে পারে। সেটা একতা। ওরা যদি জানত যে, দরকার হ'লে বা ওরা অত্যাচার করতে এলে আপনিও আমাদের দলে হবেন, তা হ'লে আমার যুযুৎসু জানা না থাকলেও বা আমার কাছে পিস্তল না থাকলেও ওরা এমন ব্যবহার করতে সাহস করত না। ওরা জানে, আমাদের দেশের এক জনকে অপমান করলে অপরে মিটি মিটি চেয়ে দেখে ও ভাবে, ভাগ্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছে! তাই না আমাদের এমন দুরবস্থা।"

মাড়োয়ারী দুই জন সত্যই লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চাহিল ও বলিল—"বহুৎ খুব বাবুসাহেব; আমাদের আজ জ্ঞান হইয়াছে।"

হাজারিবাগে গাড়ী পৌছিতেই মাড়োয়ারী দুই জন সেখানে নীরবে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল।

মাড়োয়ারীরা নামিয়া গেলে হিমাদ্রি দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল! গাড়ী অন্ধকার ভেদ করিয়া কখন সোজা, কখন আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছুটিতে লাগিল।

হিমাদ্রি বলিল,—"রাত্রি ১২টা বাজে—এইবার তুমি একটু ঘুমাও।"

পুষ্পিতা বলিল,—"আর তুমি?"

হিমাদ্রি বলিল,—"আমি জাগিয়া তোমাকে পাহারা দিব। কাছে বহুমূল্য রত্ন থাক্‌লে মানুষের কোথায় ঘুম আসে?"

পুষ্পিতা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "তা হ'লে রত্নও রত্নস্বামীর সঙ্গে জেগে থাকবে।"

পরে হিমাদ্রির মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিল, "তুমি গল্প কেন লেখ না—তাই ভাবি। এমন সুন্দর ক'রে তুমি কথা বলতে পার যে, ভেবে গল্প লিখলে ঠিক প্রভাত বাবুর মত মিষ্টি গল্প হয়।"

হিমাদ্রি বলিল, "লিখি নে দুটি কারণে। একটি সনাতন কারণ—যে জন্য ময়রারা সন্দেশ খায় না—যদিও তৈয়ারি করে। অপর কারণ, আমার তোমার মত সব পাঠক-পাঠিকা জুটুক, তবে না। এখন একটু শোও—নইলে অসুখ করবে।"

পুষ্পিতা বলিল,—"আহা, অসুখ করবে! রাত্তির যেন আজ মহাশয়ের সঙ্গে নূতন জাগ্‌ছি। তবু যদি ঘুম এলে চিম্‌টি কেটে বা সুড়সুড়ি দিয়ে উঠিয়ে না দিতে।"

হিমাদ্রি বলিল, "তখনকার কথা ছেড়ে দাও।"

পুষ্পিতা হাসিয়া বলিল, "এখনও ত কিছু কমি দেখ্‌ছি নে। সেই জন্য ত তোমার সঙ্গে জেগে থাক্‌বো থাক্‌বো করেও ত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। কি রকম ক'রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে—মনে নেই? আবার উঠি, আবার পদ্য প'ড়ে তোমাকে শোনাই—তবে না ছাড়।"

হিমাদ্রি বলিল, "আচ্ছা, তবে শুধু শুয়েই থাক। শুয়ে শুয়েই গল্প কর।"

হিমাদ্রি বেঞ্চির শেষপ্রান্তে সরিয়া বসিয়া শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। পুষ্পিতা অগত্যা স্বামীর দিকে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। বালিসটা অপর প্রান্তে ছিল। সেটা নীচেই রহিল। ইচ্ছা করিয়া উঠাইয়া মাথার দিকে আনিল না। হিমাদ্রি একখানা কোমল র‍্যাগ সযত্নে পুষ্পিতার গায়ে বেশ ভাল করিয়া জড়াইয়া দিয়া মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল।

পুষ্পিতা বলিল, "তোমায় লাগ্‌বে।"

হিমাদ্রি বলিল, "তা বটে, আজ বুঝি এ নূতন হ'ল?"

পুষ্পিতার কপালের চুলগুলি সস্নেহে সরাইয়া দিয়া সে পত্নীর কপালে, মুখে—চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে লাগিল।

পুষ্পিতা স্বামীর একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখিয়া পরম তৃপ্তির সহিত চক্ষু মুদিয়া রহিল ও কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন পুষ্পিতা উঠিয়া বসিল, তখন ভোর হইয়াছে, গাড়ী গয়ায় পৌঁছিয়াছে। গাড়ী এখানে কয়েক মিনিট থামিবে। অনেক পশ্চিমদেশীয় আরোহী নামিয়া পড়িল। সেই-খানেই শুষ্ক দাঁতন বিক্রয় হইতেছিল, কেহ কেহ তাহা কিনিল। কেহ বা আপনার পূর্ব্ব-সঞ্চিত ধন বাহির করিয়া তাহাদের কঠিন দাঁতকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিবার জন্যই দন্তধাবনপ্রক্রিয়া সুরু করিল। ক্ষীণদন্ত বাঙ্গালীদের কেহ কেহ সুটকেস হইতে বেঙ্গল কেমিকেলের টুথ পাউডার বাহির করিয়া ভয়ে ভয়ে দাঁতগুলিকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কেহ বা টুথপেষ্ট লাগাইয়া ব্রাস্ চালাইল, কেহ বা শুধু জলে বার কয়েক কুলি করিয়া অবশিষ্ট কৃত্যের জন্য গন্তব্যস্থানের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

হঠাৎ এক দল পাণ্ডা আসিয়া গাড়ীখানিকে যুগপৎ আক্রমণ করিয়া ফেলিল! 'গয়াধাম হ্যায় পিতৃকর্ম্ম কিজিয়ে' ইত্যাদি আহ্বানের সহিত বাসস্থান ও আহারের সুব্যবস্থার বিজ্ঞাপনের কলধ্বনিতে প্লাটফরম্ মুখরিত করিয়া তুলিল।

এক জন পাণ্ডা হিমাদ্রির গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বলিল, "কুথা যাওয়া হচ্ছে, বাবুজী!"

হিমাদ্রি বলিল, "কাশী।"

পাণ্ডা হৃষ্ট হইয়া বলিল, "বেশ বাবুজী, বেশ। কাশীজী চল্‌ছেন বাবুজী। বড় ভারী তীরথ আছে; তার আদর করবেন। তা এখানে নামুন। গয়াজীও দর্শন ক'রে যান। বহুৎ পূর্ণ হোবে। গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান বি হোবে। পিতামাতা জীয়ে আছেন কি?"

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল, "হাঁ, কিছু কিছু আছেন।"

পাণ্ডা তৎক্ষণাৎ সুর বদ্‌লাইয়া বলিল, "তা হ'লে এখন পিণ্ডদান করবেন না। শুধু দর্শন আর পরশ করেই আস্‌বেন। আহারও করিয়ে নেবেন। আচ্ছা থাক্‌বার আস্থান আছে! পাক করিবার সুবিধাও করিয়ে দিয়া হবে।"

হিমাদ্রি বলিল, "না, আমরা বরাবর কাশীজীই যাব। ফেরবার পথে দেখা যাবে যদি সুবিধা হয়।"

পাণ্ডা তথাপি হাল ছাড়িল না। এবার আপীল করিল মাইজীর কাছে। বলিল, "মাইজী যাবেন না? এখেনে গেলে দর্শন করিয়ে আহারাদি করিয়ে আবার সাঁঝের গাড়ীতে উঠিয়ে দিব। নেমে আসুন, মাইজী!"

হিমাদ্রি হাসিয়া পুষ্পিতাকে বলিল, "ওরাও বেশ জানে, তোমাদের মতই আমাদের মত। তাই লোয়ার কোর্টে কেস ডিস্‌মিস্ হওয়ায় হায়ার কোর্টে আপীল করেছে। এখন মোকদ্দমার রায় দাও।"

পুষ্পিতা হাসিয়া বলিল, "লোয়ার কোর্টের রায়ই বাহাল রহিল।"

পাণ্ডাজীও ভাবটা বুঝিয়া লইল। "তা হ'লে বাবুজী আস্‌বার সময় জরুর নাম্‌বেন। হামার নাম আছে গদাধর মিশির। গদাধরের পাণ্ডা গদাধর ইয়াদ রাখবেন।"

বলিয়া যেন শেষ চারটুকু পলায়িত মৎস্যের উদ্দেশ্যে জলে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ক্রমে দিনের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সূর্য্যোদয় হইল। চলন্ত গাড়ীর বাতায়নপথ দিয়া রৌদ্র আসিয়া পৌষের শীত-জর্জ্জর আরোহীদিগের উপর মৃদুমধুর উত্তাপ বর্ষণ করিতে লাগিল।

গাড়ী মোগলসরাই হইয়া কাশীর পথ ধরিল। যাত্রীদের জয়ধ্বনির মধ্যে হিন্দুর পরম তীর্থ—কাশীধাম পৌঁছিল।

১৬

হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছাকাছি ছোট দোতলা বাড়ীখানির সম্মুখে গাড়ী থামিতেই বিষ্ণুপ্রিয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া

দাঁড়াইলেন। পুত্র ও পুত্রবধূর প্রত্যাশায় দুয়ার পূর্ব্ব হইতেই খোলা ছিল।

সঙ্গের বাক্স ও বিছানাটা তুলিয়া লইয়া হিমাদ্রি পুষ্পিতাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ও দুই জনে নতজানু হইয়া মাকে প্রণাম করিল। মা দুই জনেরই মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইতেই হিমাদ্রির চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন ও পুষ্পিতাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার দুটি চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

হিমাদ্রি জানিত, পিত্রালয়ে সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও মায়ের দিন কি দুঃখে কাটিয়াছে। তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। শাশুড়ীর চোখে জল দেখিয়া পুষ্পিতার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

সকলে ঘরের ভিতর আসিয়া বসিল। হিমাদ্রি বলিল, "মা, সে ঝি তোমার আছে ত?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, আছে, তাকে একবার পাঠিয়েছি মাছ আন্‌তে।"

হিমাদ্রি বলিল, "মাছ আবার কেন আন্‌তে দিলে? ও ত রোজই খাই। যে ক'দিন তোমার কাছে থাক্‌ব, তোমার সঙ্গে আলোচালের ভাত আর মটর-ডাল ভাতে খাব। এ বেশ লাগে, মা।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "তোর না হয় ভাল লাগে, কিন্তু বৌমার? মাছ না হ'লে বৌমার পাতে কি ক'রে ভাত দেব?"

পুষ্পিতা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "আমিও মাছ না হ'লে বেশ খেতে পারি।"

একটু পরেই ঝি মাছ লইয়া ফিরিল ও তাড়াতাড়ি কুটিতে বসিয়া গেল।

হিমাদ্রি মাছ দেখিয়া বলিল, "বাঃ, খাসা পরিষ্কার মাছগুলি ত? কল্‌কাতায় এমন টাটকা মাছ পাওয়া যায় না!"

বিষ্ণুপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই যে তুই বল্‌লি, মাছ ভালবাসিস্ নে।"

হিমাদ্রি হাসিয়া বলিল, "মাছ ভালবাসি নে, তা ত বলি নি; বলেছিলাম, মটর-ডাল ভাতে আর আলোচালের ভাত ভালবাসি।"

শাশুড়ী ও বধূ দুই জনেই হাসিয়া ফেলিলেন।

বেলা দুইটা বাজে। রাত্রিতে আদৌ ঘুম হয় নাই, সে জন্য আহারাদির একটু পরেই হিমাদ্রি উপরের একটা ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়া ও পুষ্পিতা আহারান্তে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে রৌদ্রে পিঠ দিয়া গল্প করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পিতার মাথার একরাশি ভিজা চুলও শুকান হইতেছে।

পুষ্পিতা বলিল, "মা, গেলবছরের চেয়ে এবার আপনার শরীর খারাপ দেখাচ্ছে। একবারটি কল্‌কাতায় চলুন না!"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমার যে কল্‌কাতায় যাবার মুখ নেই জান ত, মা। যখন সময় ছিল, উপায় ছিল—এখন বল্‌তে কোন দ্বিধা নেই, মা—যখন উচিতও ছিল—তখন যাই নি, মা!"

পুষ্পিতা বলিল,—"সে যা হবার হয়ে গিয়েছে, মা। এখন আমাদের মুখ চেয়ে একটিবার চলুন, মা!"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমায় এমন ক'রে আর বোলো না, মা—বড় লোভ হয়। ছেলে বৌ নিয়ে ঘর করতে বড় সাধ যায়। আর তোমাদের মত ছেলে বৌ—যাদের বুকে রাখলেও বুক ব্যথা করে না। কিন্তু মা, সে দিনের কথা যে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারি নে। তুমি ত সব কথা জান না, মা। ছেলেকেও সে সব কথা বলা যায় না। কোন দোষ তিনি করেন নি; কিন্তু কি দুঃখই তিনি বিনা দোষে সহ্য করেছেন, আর মুখ বুজে। যৌবনকালে গৃহত্যাগী, হিমাদ্রি তখন ৫ বৎসরের। আমার বয়স তখন বছর কুড়ি হবে। বাবা বিনাদোষে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি শান্তভাবে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, তিনি নির্দ্দোষ। বাবা তাতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে আরও কটুকথা বলেন। সেই রাত্রেই তিনি একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেন। যাবার সময় আমাকে ডেকে বলেন—তোমাদের এখানে থাকবার আমার অধিকার নেই। যদি কষ্ট সহ্য করতে পার এবং ভরসা পাও ত আমার সঙ্গে এস। আমি যেমন ক'রে পারি, তোমাদের ভরণপোষণ করব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া কিয়ৎকাল আনমনে চাহিয়া রহিলেন। পুষ্পিতা করুণার্দ্রনয়নে শ্বশ্রূমাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি হতভাগিনী, তাঁর সঙ্গে এলাম না। মনে হ'ল, বৃদ্ধ বাপকে ফেলে কি ক'রে যাই? তাঁর পায়ে ধ'রে বল্‌লাম, আমার যে যাবার উপায় নেই। কত অনুরোধ কর্‌লাম—অভিমান ত্যাগ কর। বাবা বৃদ্ধ—অল্পে রেগে যান—আবার কালই শান্ত হবেন—যেও না। তিনি ম্লানমুখে বল্লেন—'তাঁর দোষ দিচ্ছি নে। তুমি যে আস্‌তে পার্‌ছ না—তার জন্যও তোমাকে দোষ দেব না। কিন্তু আমার থাকবার উপায় নেই।' হিমাদ্রি তখন ঘুমিয়েছিল—একবার তার পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন—একবার আমার মুখের পানে চাইলেন—বুঝি শেষবার এ অভাগিনীর মুখ দেখে নিলেন। ধীরে ধীরে বল্‌লেন—আমার সব রেখে আজ রিক্ত হয়েই বেরুলাম। হিমাদ্রিকে দেখো। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। আমি হতভাগিনী—লজ্জায় তাঁর মুখের দিকেও একবার চাইতে পারলাম না। তখন কে জানে, আর জীবনে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি চ'লে গেলে কেঁদে মাটীতে লুটিয়ে পড়লাম। বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল; কিন্তু তখন সে সব আমার অরণ্যে রোদন হ'ল।"

অশ্রুবাষ্পে বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখের জলধারায় কিছু দেখিতে পাইলেন না। পুষ্পিতাও কাঁদিয়া ভাসাইল। কিছুক্ষণ দুই জনের কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না। একটু পরে আপনাকে শান্ত করিয়া পুষ্পিতার চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন, "চুপ কর, মা—কেঁদ না। আমি বড় কেঁদেছি। তোমায় যেন কাঁদতে না হয়।"

পুষ্পিতা বলিল, "আপনার কথা ভাব্‌তে গেলে আর আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, আপনার কাছে থেকে—আপনার সেবা করি। কেবল চেষ্টা করি—আর যেন আপনার চোখের জল ফেল্‌তে না হয়। বড় কষ্ট পেয়েছেন আপনি, মা!"

বিষ্ণুপ্রিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার চেয়ে তিনি কষ্ট পেয়ে গেছেন বেশী, মা! অথচ এক দিনের জন্য কাকেও কষ্ট দেন্‌ নি। এমন কি শুনেছ, মা! যে স্ত্রী সঙ্গে আস্‌তে চায় নি—সেই স্ত্রীকে তিনি একটিবারের জন্য দুষলেন না। তারি জন্ত চিরকালের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে রইলেন? তাঁর যে কি গভীর দুঃখ, তা তুমি সবটা বুঝতে পার নি, মা। হিমাদ্রি তাঁর বুকের পাঁজর—এক দণ্ডও তাঁর কাছ-ছাড়া হ'ত না। এ হতভাগীর ওপরেও তাঁর যে কি গভীর অনুরাগ ছিল, তা তোমাকে বোঝাতে পার্‌ব না। এক কথায় তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে নিঃস্ব হয়ে কল্‌কাতার মত যায়গায় পথে গিয়ে দাঁড়ালেন।"

পুষ্পিতা বলিল, "তার পর বাবা আর কখন আসেন নি?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "না মা! তিনি যে আসবেন না, তা আমি জানতাম। তাঁর হৃদয় ছিল যেমন ফুলের মত কোমল, ইচ্ছা ছিল তেমনি বজ্রের মত দৃঢ়। একবার ভেবে যে সংকল্প স্থির করতেন, তা থেকে তাঁকে একটু কেউ টলাতে পারত না। তিনি চ'লে গেলে আমাকে কাতর দেখে বাবা বল্‌তেন—'ও যাবে কোথায় মা—ফিরে আস্‌তেই হবে। কল্‌কাতায় কে ওর ভার নেবে। দেখ না এল ব'লে। গিয়েছে রাগ ক'রে, তাই লজ্জায় আস্‌ছে না। বিষয়ের লোভ বড় কম লোভ নয়, মা! তুমি একটু মন স্থির ক'রে থাক—ও এল ব'লে।'

"আমি চুপ ক'রে শুনতাম। বাবাকে আর কি বলব! মনে মনেই বলতাম—তুমি তাকে জান না বাবা—তিনি দরিদ্র বটে, কিন্তু ধন-সম্পত্তির সে ক্ষমতা নেই যে, তাঁকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়ে আনে। তিনি যখন হিমাদ্রির মায়ায় ফেরেন নি, তখনই আমি বুঝেছিলেম, জগতে এমন কোন অমূল্য রত্ন নেই—যার লোভে তিনি ফিরে আসতে পারেন।

"এক দিন বাবা বড় রেগে বাহির থেকে এলেন। আমাকে দেখেই বল্লেন—'এই তোরই জন্য আমার মান-সম্ভ্রম সব গেল!' আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বাবার দিকে চেয়ে রইলাম।

"বাবা আপনা থেকেই ব'লে গেলেন। বাবার এক বন্ধু বুঝি কলকাতায় তাঁকে বই কাঁধে ক'রে বেরুতে দেখেছেন। বাবার বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন—কেন এ দুর্দ্দশা ভোগ করছ—এস আমার সঙ্গে—আমি তোমার শ্বশুরের রাগ শান্ত ক'রে দিচ্ছি। তিনি শুধু হেসে বলেছিলেন—আমি ত দুর্দ্দশা মনে করি নে, ভিক্ষা করার চেয়ে এ ভাল, এই আমার সান্ত্বনা।

"বাবার রাগ হ'ল—তিনি এতবড় জমীদার। তাঁরই জামাই বই ফেরি ক'রে বিক্রয় করে! তার পর বাবারই মুখে শুনলাম, তিনি বইয়ের দোকান খুলেছেন আর ক্রমশঃ সেই দোকান কলকাতার মধ্যে বাঙ্গালা বইয়ের সব চেয়ে বড় দোকান হয়েছে। বাবাই শেষে স্বীকার করলেন যে, তার ক্ষমতা আছে বটে—কিন্তু বড় অহঙ্কারী।"

পুষ্পিতা বলিল, "অবস্থা ফিরলেও বাবা আর ফেরেন নি?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "তিনি ত আর ফেরবার লোক ছিলেন না, মা! তবে অবস্থা ফিরলে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিখানির প্রতি অক্ষরটি পর্য্যন্ত আমার মনে আছে। লিখেছিলেন—অনেক কষ্ট সয়ে নিজের ও তোমাদের অন্নসংস্থান করতে পেরেছি। তোমরা হয় ত আসতে পার, এই আশায় একখানি বাড়ীও তৈয়ার করেছি। যদি আসা উচিত মনে কর, আমাকে লিখিও! আমি গিয়া তোমাকে লইয়া আসিব।"

পুষ্পিতা বলিল, "এর কি উত্তর দিলেন, মা?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "এর উত্তর দেওয়া হয় নি, মা! যে দিন তিনি নিঃসম্বল হয়ে বেরিয়ে যান, সেই দিনই আমার তাঁর সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। তখন ভুল ক'রে যাই নি। তাঁর ঐশ্বর্য্যের সময় তাঁর কাছে যেতে লজ্জায় বড় বাধল। চিঠির উত্তর দিতে পারলাম না। হিমাদ্রিকে কেবল চিঠিখানা দেখিয়ে বলেছিলাম—'আমার ত যাবার উপায় নেই, বাবা, তুই যাবি তাঁর কাছে?' বড় আগ্রহে সে ব'লে উঠল—'হাঁ মা, তুমিও চল না মা!' আমি যাব না শুনে তার মুখখানি শুকিয়ে গেল। বললে—তোমাকে একলা ফেলে কি ক'রে যাব, মা! তা হ'লে আমারও যাওয়া হ'ল না।' হিমাদ্রি কথায় কথায় এই চিঠিখানির কথা বাবাকে বলে। শুনে বাবা রাগ ক'রে তাঁর নামে কতকগুলা কটু কথা বলেন। হিমাদ্রি সে কটুবাক্য সহ্য করতে না পেয়ে ৩০ ক্রোশ পথ হেঁটে একবস্ত্রে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়।"

পুষ্পিতা সবিস্ময়ে বলিল, "আপনাকে ব'লে যায় নি?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমাকে বলেছিল, মা, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু আমার বাবার নামে এই দুর্ব্বাক্য শুনে আমি আর যে এখানে থাক্‌তে পারছি নে, মা! তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি বাবার কাছে যাই।

"আমি তাকে সমস্ত মনের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলাম। সে আমাকে প্রণাম ক'রে সজলচোখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। তার পর এসেছিল বছর-পাঁচেক পরে। তাঁর শেষ চিঠি ও শেষ খবর নিয়ে।

"সে চিঠিতেও একটুও রাগের কথা ছিল না। তাতে লিখেছিলেন, তোমার প্রতি অবিচলিত প্রেম লইয়া আমি পরজগতে চলিলাম। এই গৃহ তোমার—তোমারই জন্য চিরদিন মুক্ত রহিল। অভিমানের জন্য হউক, আর যে কারণেই আমি থাকতে তুমি আসিলে না। এখন সে বাধা তোমার নাই। যদি ইচ্ছা কর, ভাল মনে হয়, পুত্রের কাছে আসিয়া থাকিও। তাহার উপর ত তোমার অভিমান থাকিতে পারে না।

"এততেও আমার উপর তিনি এতটুকু রাগ করেন নি; আমি কি আর সেখানে গিয়ে সুখে ভোগ করতে পারি, মা?"

অশ্রুধারায় বিষ্ণুপ্রিয়া পুত্রবধূর কাছে আপনার দুঃখের কাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ শেষ করিলেন।

পুষ্পিতাও চোখের জল মুছিয়া বলিল, "মা, আমি তা হ'লে কিছু দিন আপনার কাছে থাকব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "না মা! ও কথাটি মুখেও এনো না। জন্ম জন্ম তুমি হিমাদ্রির কাছে থাকো, মা। স্বামীকে ছেড়ে থাকার কথা মুখে এনো না—মনের কোণেও যেন এ কথা আসে না, মা। স্বামীর চেয়ে বড়ও কেউ নয়, প্রিয়ও কেউ নয়। হিমাদ্রি ও তুমি রাম-সীতার মত হও, কিন্তু ছাড়াছাড়ি যেন কখন না হয়, মা!"

পুষ্পিতা নতজানু হইয়া শাশুড়ীর পায়ে মাথা পাতিয়া যেন আশীর্ব্বাদটুকু কুড়াইয়া লইল। যখন সে মুখ তুলিল, তখন তাহার মুখখানি শিশিরস্নাত ফুলের মত অশ্রুসিক্ত।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

দ্রষ্টা লরেন্স

জন্ম, ১৮৮৫—মৃত্যু, ১৯৩০

কবি লরেন্সের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট পরিচয় নেই, এর চেয়ে আক্ষেপের কথা বোধ হয় আমাদের পক্ষে কিছুই হ'তে পারে না। কারণ, বর্ত্তমান য়ুরোপে দ্রষ্টার, দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে যদি কেউ জন্মে থাকেন, তবে তিনি ডি এইচ লরেন্স। এই একান্ত ভোগবাদ, বাস্তবতা ও তথাকথিত "প্রগতির" উচ্চণ্ড হুহুঙ্কারী যুগে কোনও পরম সত্যে স্থির-দৃষ্টি রাখা যে কত কঠিন, তা বর্ত্তমান য়ুরোপকে যাঁরা একটু কাছ থেকে দেখে এসেছেন, তাঁরাই জানেন। আমরা এই য়ুরোপের অন্ধ-অনুকরণব্রতী আজকের দিনে। তাই লরেন্সের সঙ্গে পরিচয় আমাদের পক্ষে বেশি করেই স্বাস্থ্যকর, যিনি আমাদের উপাস্য য়ুরোপে জন্মেছিলেন—আজন্ম বিদ্রোহী হ'য়ে, এবং জীবনের শেষ দিনে ব'লেছিলেন, "Now-a-days Society is evil. It finds subtle ways of torture, to destroy the life-quick, to get at the life quick in a man. Every possible form." যিনি সব শেষের দিনে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, য়ুরোপের তথাকথিত স্বাধীনতা হচ্ছে মায়া, যেহেতু এ-আবেষ্টনের মধ্যে স্বাধীনতা অসম্ভব: Men are free when they are in a living homeland, not when they are straying or breaking away. Men are free when they are obeying some deep, in-ward, voice of religious belief. আমরা—যাঁরা ধর্ম্মকে কুসংস্কার মনে করি, তাঁরা—য়ুরোপের এরকম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর ও দ্রষ্টার সংস্পর্শে অনেক কিছু শিখতে পারতাম, য়ুরোপ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণাকে ভুল ব'লে বুঝতে পারতাম। তাই বলছিলাম, আমাদের নিজেদের দিক্ দিয়েও বড় আক্ষেপের কথা যে লরেন্সকে আমরা খুব কমই জানি, অথচ হামসুন, বারবুস বেনেট প্রমুখ তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীদের নামে অধীর হয়ে উঠি।

এ আমার লরেন্স সম্বন্ধে প্রবন্ধ নয়। তাঁর সম্বন্ধে পরে বড় প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রইল। আজ শুধু এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা দার্শনিক, মনীষী, স্বাধীনচিন্তার পুরোধা, কবি লরেন্সের সম্বন্ধে সামান্য দু' একটা কথা বলতে চাই—তাঁর দুটি মাত্র কবিতার ভূমিকা হিসেবে। একটু পরিচয়—মাত্র তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে।

কবি লরেন্সকে বিলেতে এক দল মনে করেন, বর্ত্তমান ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ imaginative novelist (যেমন খ্যাতনামা Forrester), আর এক দল মনে করেন, তিনি শিল্পীদের মধ্যে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের সব চেয়ে বড় মিস্টিক (যেমন বিখ্যাত Aldous Huxley)। আর এক দল মনে করেন, এ বিংশ শতাব্দীতে লরেন্সের চেয়ে বড় দ্রষ্টা· দার্শনিক ও কবি য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করেন নি। এ থেকে প্রতীয়মান হবে, লরেন্সের প্রতিভা কত বহুমুখী ছিল। বস্তুতঃ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান ইংলণ্ডের ঠিক্ শিরোমণি না হ'লেও সব চেয়ে মৌলিক শিল্পী ছিলেন, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নেই। তাঁর সৃষ্ট প্রতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, আশ্চর্য্য উজ্জ্বল ও স্বকীয়তায় ধন্য, তাঁর চিন্তার দীপ্তি আশ্চর্য্য রকম unique: তিনি যা কিছু লিখতেন, তার পিছনে ছিল প্রচণ্ড শক্তির স্পন্দন, তীব্র প্রেরণায় ওত-প্রোত। তিনি কতিপয় প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস লিখে গেছেন, এ-ও সত্য। কিন্তু দুঃখ এই, মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ হ'তে না হ'তে অকালমৃত্যু এত বড় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান থেকে আমাদের বঞ্চিত করল। তিনি যে কি ছিলেন, তার পূর্ণ পরিচয় পাবার অবসর আমাদের মিল্‌ল না। এ কথা বলার মানে নয় যে, লরেন্স যা লিখে গেছেন, সবই সম্ভাবনার দিক্ দিয়েই বড় শুধু। এ কথা বলছি না যে, তিনি যা সৃষ্টি ক'রে গেছেন, রসের চিরন্তন উৎসবসভায় তার স্থায়ী মূল্য নেই, কীর্ত্তির মৃত্যুহীন উৎসবসভায় তাঁর স্থান রইল না। এ কথা বলার মানে শুধু এই যে, লরেন্সকে শুধু তাঁর সৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে গেলে তাঁর দানের যথার্থ পরিমাপ হবে না। কারণ, তিনি যা দিয়ে গেছেন, তার ফলে একটা মস্ত গভীর সত্যের আভাস য়ুরোপের শিল্পিজগৎ পেয়েছে। সে সত্য হচ্ছে জীবনের সাধনাগত উপলব্ধি—যোগ। তিনি তাঁর সমসাময়িকদের চোখ অনেকটা খুলে দিয়ে গেছেন,

জীবনকে যা দেখায়, সেই ভাবে গ্রহণ না ক'রে গোড়া থেকে তার প্রকৃতি নিয়ে ভেবে গেছেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক মিডল্‌টন মারি লরেন্স সম্বন্ধে গত বৎসর Son of Woman ব'লে একটি তথ্যপূর্ণ জীবনচরিত লিখেছেন। তাতে তিনি লিখছেন—

"I implore those who read my book never to forget that Lawrence belongs to that order of men who cannot be judged, but only loved. If, at the end of the story, they feel that this great and frail and lovely man, this man of sorrows, this lonely hero, has been judged by one who was once his friend, then not Lawrence has been judged but the friend. This is the story of one of the greatest lovers the world has known."

বিখ্যাত আলডুস হাক্‌স্‌লি, সে দিন আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছেন যে, তিনি শীঘ্রই Lawrenceএর চিঠিগুলি একত্র ক'রে প্রকাশ করছেন। ইংলণ্ডে সবে সাড়া পড়তে আরম্ভ হয়েছে। বছরখানেক আগে কত বড় এক জন প্রতিভা প্রায় অজানিত, অনাদৃত ও ভগ্ন-হৃদয় হয়েই এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন! যিনি এ জগৎকে বহু কিছুই দিতে পারবেন, যাঁর দীপ্ত প্রতিভার কাছে ওয়েল্‌স্‌, গল্‌স্‌ওয়র্দ্দি, আলডুস হাক্‌স্‌লি প্রমুখ অসামান্য মানুষের প্রতিভাও পাণ্ডুর হয়ে যায়, যাঁর ভাবাবেগ ও অনুসন্ধিৎসা ছিল আগ্নেয়গিরির মতন উত্তপ্ত জীবন্ত, মিথ্যা যাঁর ছিল চক্ষু শূল, সমাজের শত নিষ্ঠুরতা, শত বাঁধাবাঁধি, শত হৃদয়হীনতার বিপক্ষে যাঁর মতন তীব্র বিদ্রোহ—জীবন দিয়ে বিদ্রোহ—বর্ত্তমান শিল্পীদের মধ্যে কেউ করে নি, তাঁকে অধিকাংশ ইংরাজও আজ ব'লে থাকে sex-obsessed, জঘন্যচরিত্র, উন্মাদ ইত্যাদি। (মনে পড়ে ইবসেনের কথা, যিনি জীবদ্দশায় সমস্ত য়ুরোপের কুৎসার লক্ষ্যস্থল হ'য়েছিলেন বিশেষ ক'রে তাঁর Ghost নাটক লিখে।)

সত্য, লরেন্সের মধ্যে উন্মত্ততা ছিল। মিডল্‌টন মারির বই পড়তে পড়তে এজন্যে দুঃখও হয়। যাকে বলে balance—চিত্তস্থৈর্য্য—তা তাঁর ছিল না, প্রতি দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বা নিষ্ঠুরতা তাঁকে পাগলের মত ক'রে তুল্‌ত। সূচীর অগ্রভাগও তাঁর স্পর্শকাতর মনে শূলের মতন বিঁধত। এজন্যে তাঁর লেখায় অনেক আতিশয্য, অনেক অতিচার, এমন কি, অনেক আক্ষেপজনক মালিন্য-ক্লেদও জমেছে অস্বীকার করার উপায় নেই। সদুঃখে স্বীকার করি, লরেন্সের বহু ত্রুটি ছিল। কিন্তু সত্য প্রতিভার বিচার তার ত্রুটি দিয়ে ত নয়। লরেন্সকে আমরা তাঁর মধ্যে কি ছিল না, তা দিয়ে বিচার করবার অধিকারী নই; তাঁর কাছে আমরা কত পেয়েছি, কত শিখেছি, কত আলো পেয়েছি, সেই দিয়েই তাঁর বিচার হবে, এবং এ-বিচার করবার সময় বোধ করি এখনও আসে নি।

আমি তাই আজ শুধু সহৃদয় অনুসন্ধানী বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাকে জানাচ্ছি, লরেন্সের পরিচয় করতে বেশি ক'রে, নিবিড় ক'রে, প্রেমের সঙ্গে। তাঁর পরিচয় ভারতের পক্ষে ঢের বেশি প্রয়োজনীয়, সত্যদৃষ্টিবর্জ্জিত বার্ণার্ডশ প্রমুখ charlatanদের ছেড়ে যারা মূলতঃ হচ্ছে আত্ম-বিজ্ঞাপক শিল্পীও না, দার্শনিকও না, কবিও না, দ্রষ্টা ত নয়ই। আর আমি তাঁদের দৃষ্টি বিশেষ ক'রে আকর্ষণ করছি লরেন্সের তিনটি বইয়ের প্রতি:—তাঁর দার্শনিক Credo,—"Fantasia of the Unconscious" (এ বইটির স্থানে স্থানে দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় যোগীর—যে-জন্যে মারি এই বইটিকে বলেছেন লরেন্সের masterpiece); তাঁর বৃহৎ সুন্দর উপন্যাস—"Sons and lovers"; এবং তাঁর অনুপম মৌলিক কবিতাবলী "Pansies."

লরেন্সের একটি কথা Fantasia-য় অতি গভীর। আমাদের চিন্তাহীন মেরুদণ্ডহীন ঝঙ্কার-সর্ব্বস্বতার যুগে বিশেষ ক'রেই স্মরণীয়, বিশেষ ক'রে তাঁদের যাঁরা ব'লে থাকেন কবিতায় দার্শনিকতা, ভাবের গাঢ়তা, গভীর দৃষ্টি এ সবের স্থান নেই—স্থান আছে শুধু মিষ্টতার, ললিত পদবিন্যাসের, শ্রুতিসুখকর মাদকতার ও ভাববিলাসিতার। এই art for art's sake মন্ত্রের উপাসকদের বিশেষ ক'রে পড়া দরকার লরেন্সের গভীর কবিতা, স্বাধীন চিন্তা, নতুন ধরণের শিল্পসৃষ্টি—art with on object যার স্থান (সত্য শিল্পীর হাতে পড়লে) বক্তব্যহীন ঝঙ্কারসর্ব্বস্ব আর্টের বহু উর্দ্ধে। কিন্তু আমরা এ কথা ভুলে গেছি, তাই কথায় কথায় হাল আমলের একটা অসার বুলির প্রতিধ্বনি ক'রে ব'লে থাকি—আর্টে ফিলসফি এলেই তার

জাত যেতে বাধ্য। লরেন্স তাঁর Fantasiaর ভূমিকায় লিখ্ছেন :—

"Even art is utterly dependent on philosophy or if you prefer it, on a metaphysic. The metaphysic or philosophy may not be anywhere very accurately stated and may be quite unconscious, in the artist, yet it is a metaphysic that governs men at the time, and is by all men more or less comprehended, and lived." ব'লে দুঃখ ক'রে লিখছেন—"Our vision our belief, our metaphysic is wearing woefully thin, and the art is wearing absolutely threadbare. We have no future; neither for our hopes, nor our aims nor our art···We have got to rip the old veil of vision across, and find what the heart really believes in."

লরেন্সের ছিল এই-ই Credo—জীবনের মূলমন্ত্র। যেখানে তিনি কুয়াশার আবরণ দেখেছেন, মায়াময় আত্ম-প্রতারণা দেখেছেন, সহজপন্থীর আত্মপ্রসাদের চামর-ব্যজন দেখেছেন—সেখানেই তিনি তাঁর জ্বালাময়ী ভাষার কশাঘাতে তাদেরকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সব ছিঁড়ে দিয়েছেন। ফলে এক দল লোক রুখে উঠে বলেছে—লরেন্স ছিলেন শয়তান, দানব, anti-christ; কিন্তু লরেন্স ছিলেন আসলে দ্রষ্টা—কবি—দার্শনিক। মানে, তাঁর গভীরতম প্রকৃতি ছিল—দ্রষ্টার—কবির—দার্শনিকের। দুঃখ এই, য়ুরোপ তাঁর সত্য জন্মভূমি ছিল না—য়ুরোপ তাই তাঁকে চেনে নি। তিনি ভুল যায়গায় জন্মেছিলেন। যে বেষ্টনীর মধ্যে তিনি আজীবন দুঃখ পেয়ে গেছেন, সেখানে তাঁকে অদূর-ভবিষ্যতেও বোঝার সম্ভাবনা কম। তাঁর লেখা কেউ ছাপ্‌তে চাইত না—অশ্লীল ব'লে—বিপদ্‌জনক ব'লে—দুর্নীতি ব'লে। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক্ থেকে ছিলেন saint—সে কথা মারি দেখিয়েছেন তাঁর জীবনীতে। দুঃখ এই যে, য়ুরোপের উৎপীড়নে এ অভিমানী কবি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন শেষের দিকে। একটি অনুপম শতদল অত্যাচারের করকাপাতে—বেদরদের তুহিনে ঝ'রে গেল অকালেই। কিন্তু তাতেও হয় ত দুঃখের কারণ নেই—গভীরভাবে ভাবতে গেলে। লরেন্স যে আলোর শিখা জ্বালিয়ে গেছেন তাঁর জীবনের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে, তা অনির্ব্বাণ থাক্‌বেই। প্রতিভা অনেক সময়েই বহুদিন অনাদৃত—দুর্ব্বোধ্য—নিন্দিত থাকে। বর্ত্তমান য়ুরোপের সে-যোগদৃষ্টি নেই, সে দিব্যাঞ্জন নেই, সে অন্তরের ধ্যানশক্তি নেই—যা বিনা লরেন্সের অবদানের গুণগ্রহণ অসম্ভব। তাই ত সে লরেন্সকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে। কিন্তু তাতেও সান্ত্বনা আছে বৈ কি। আমরা মারির ভাষায় বলব :—

In the order to which Lawrence belongs, nothing is lost. He is a symbolic man, one of the world's great exemplars of what a man may be; one of the chief of those rare spirits who bring men to a consciousness of their own strange destinies. Through Lawrence we learn to know ourselves, in a way in which men have never known themselves before. If he was crucified, as he surely was, it was for us that he was crucified, if at the last he was a thing of fragments dreaming impossible dreams it was tragedy for him who suffered the destiny, but for us who behold it, it is illumination. 'He lived through this experience for us; we owe him homage.'" (Son of Woman ৫৫ পৃষ্ঠা)

লরেন্সের দুটি গদ্য কবিতার অনুবাদ দিয়ে এ সামান্য প্রশস্তির সমাপ্তি টান্‌ব। ও শ্রেণীর দীপ্যমান, বহু ইঙ্গিত-ময়ী, ওজস্বিনী, মধুর ও একান্ত মৌলিক কবিতা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন অনেক—যা থেকে বোঝা যায়, তাঁর সত্যিকার দৃষ্টি ছিল কি গভীর, মর্ম্মস্পর্শী—উদাত্ত—সুন্দর। অকালমৃত্যু তাঁর প্রতিভার প্রবর্দ্ধমান অগ্নিশিখাকে নিবিয়ে না দিলে আরও কত আলোই না তিনি বিলোতেন!

কথা শুধু অনুবাদ দুটি সম্পর্কে :—

(১) অনুবাদ দুটি ভাবানুবাদ মাত্র, হুবহু অনুবাদ নয়। গদ্য থেকে পদ্যানুবাদ অক্ষরে অক্ষরে মূলানুগামী হওয়া আমি কাম্য মনে করি না।

(২) এ ছন্দ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের পরিভাষায় "মাত্রাবৃত্ত প্রবহমান মুক্তক।" 'প্রবহমান' মানে প্রতি পংক্তির শেষে যতি না থাকতেও পারে (যাকে বলে enjambement), এমন কবিতা। অমিত্রাক্ষরে ও ধরণের প্রবহমানতা তার সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ, এ কথা সকলেই জানেন। মাত্রাবৃত্তে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান কবিতা সম্প্রতি লিখেছেন। কিন্তু এখনো কোথাও ত ছাপানো হয় নি। প্রবোধচন্দ্র বলেন, তাঁর "সাগরিকা" খানিকটা প্রবহমান। কিন্তু বস্তুতঃ সাগরিকা মুক্তছন্দে লেখা মাত্র—ঠিক প্রবহমান নয়। মানে, ওতে প্রতি পংক্তির শেষেই যতি রয়েছে। আমার আশা আছে, যথার্থ প্রবহমান মাত্রাবৃত্তে আধুনিক কবিরা অনেক রকম কবিতা লিখে আমাদের কাব্যনন্দনের সমৃদ্ধি বাড়াবেন। আমার শক্তি-মত আমি মাত্রাবৃত্ত প্রবহমানের দুটি নমুনা দিলাম। আমার ভরসা আছে, মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতার সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞ কাব্যামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই অদূর-ভবিষ্যতে। কারণ, এর মধ্যে এক নতুন ধরণের মৌলিকতা ও সৌকুমার্য্য আছে।

THE PRIMAL PASSIONS

If you will go down into
yourself, under your
surface perso ality,
You will find you have
a great desire to
drink life direct
from the source,
not out of bottles
and bottled personal vessels:
What the old people
Call immediate contact
with God
That strange essential
Communication of life
not bottled in human bottles.

ALL I ASK

All I ask of a woman is that
She shall feel gently towards
me when my heart feels
kindly towards her:
and there shall be the
soft, soft tremor as of
unheard bells between
us—It is all I ask.

D, H, LAWRENCE,

প্রাণ-গঙ্গোত্রী

হেথা যে-রূপ তোমার বাহিরে উছলে যাহে তব পরিচয়
নিতি ঘোষে এ-জগতময়,—
তারে বিমুখি' অতলে ডুব দাও যদি
নিরবধি,—
যদি প্রতিভাস ছাড়ি' চাহো ভাস,—
ছাড়ি' নামরূপ
তব আপন স্বরূপ
যেথায় দীপ্ত পরকাশ,—
যদি তাহারে মর্ম্ম-গহনে
চাহো বিজনে,—
তবে পাইবে পরশ তার
চির- অভিসারী হিয়া তরে যার
নাম 'দেবদেব'—যার নিখিল পুরাণে রটে
তার নিবিড় পরশ-গাহন লভিবে প্রাণের গোমুখীতটে,
ছাড়ি' মানব-আধার
লভিবে অপার
মানবাতীত আধেয় গো,—
সেই অবর্ণ্য কম
প্রাণ-সঙ্গম
মিলনে পরম চেয়ো গো।

স্নিগ্ধা

আমি লো রমণী, শুধু এই চাই তব পাশে—
প্রীতি- বসন্ত তুমি ঝরায়ো মলয়বাসে,
যবে সখীর পরশ যাচিব—দিয়ো সজনী
তুমি সাড়া মরমরি'—মৃদুল চরণ ধ্বনি'
যথা অশ্রুত কিঙ্কিণী-কম্পনে কণিয়া কোমল বোলে
কম সখিত্বে তব
স্নিগধ পেলব
ভঙ্গে আমার
প্রাণ বেলাপার
রাঙি' জলধনু-দোলে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

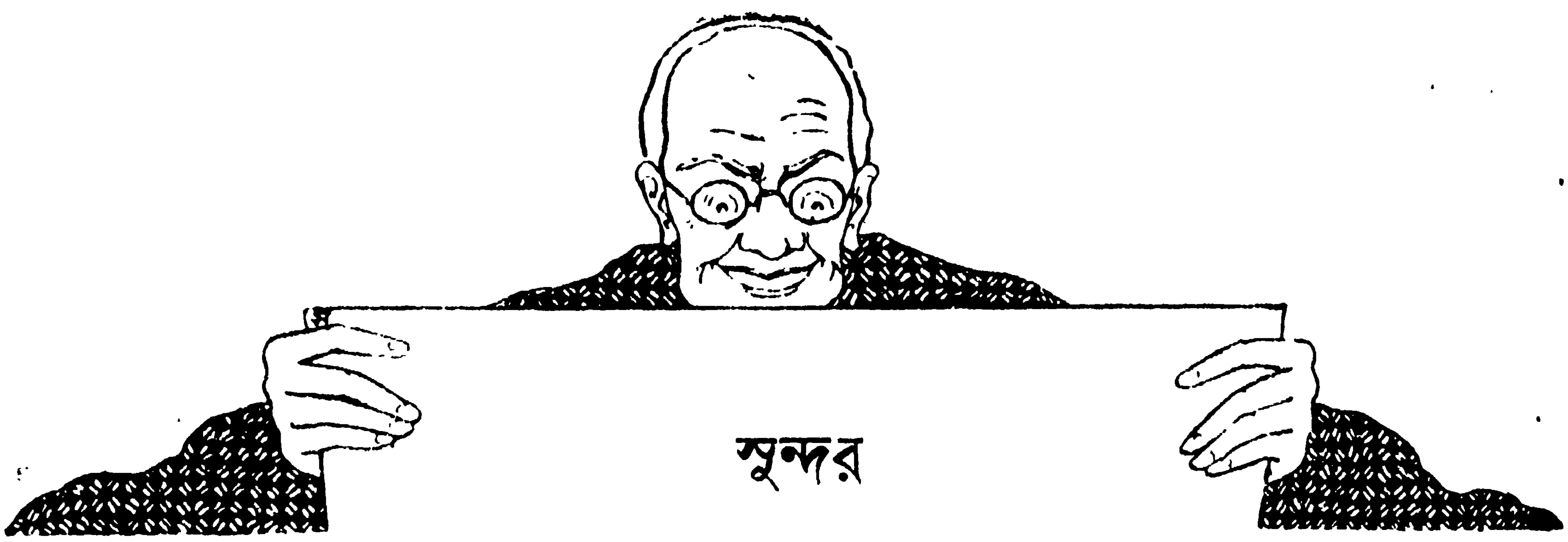

সুন্দর

যৌবন সুন্দরকে কামনা করিয়া থাকে।

আপনাকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা এবং সুন্দরের সন্ধানে দুইটি চক্ষুকে সতর্ক প্রহরী রাখা তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বলিতে লজ্জা নাই—আমারও সে কল্পনা ছিল।

যৌবনের সহজাত সংস্কারবশেই কামনা করিয়াছিলাম, জীবনের অবশিষ্ট কাল ব্যাপিয়া যিনি আবির্ভূত হইবেন, তাঁহার রুক্ষকুন্তল-ছায়ায় যেন কামনার জ্যোতি এতটুকু মলিন হইয়া না যায়।

কিন্তু আশ্চর্য্য! তিনি যখন আসিলেন,—যৌবনের স্বপ্নজাল তখন অন্তরে নভঃপুষ্প ফুটাইয়া মনকে শূন্যে উড়াইয়া খেলা করিতেছিল না। তাঁহার খেলার আয়োজন থাকিলে আমার কি দুর্দ্দশা হইত, বলা যায় না। তিনি আসিয়াই আমার সৌন্দর্য্য-স্বপ্নের চরণ ভূমিসংলগ্ন করিয়া দিলেন এবং মৃদু হাসিয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে এমন ভাবে আমার পানে চাহিলেন যে, ভুলিয়া গেলাম কোথাকার স্বপ্ন কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে।

সেই কথাই বলিতেছি।

ললিত ও আমি এক মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িতাম। এক জেলায় বাড়ী, স্বজাতি, স্বগোত্র না হইলেও উভয়ই ব্রাহ্মণ-সন্তান; সুতরাং বন্ধুত্বটা দুই জনের প্রগাঢ়ই হইয়াছিল।

তাহার ব্যায়ামপুষ্ট দেহটির পানে চাহিয়া কত দিন আমার ক্ষীণ দেহটির মধ্যে অমনই এক সুগঠিত সুন্দর বলশালী পুরুষমূর্ত্তির কামনা জাগিয়াছে। বাঁচিয়া যদি থাকিতে হয় ত অমনই নির্ভীক ও অটুট স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারী হইয়া থাকা ভাল।

কিন্তু কাব্য সম্বন্ধে ললিতের ধারণা তেমন সুস্পষ্ট নহে। নিতান্ত সাধারণকে সে ভালবাসে। কাব্যরসিক দল এ জন্য তাহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া তাহার অলক্ষ্যে মন্তব্য করিত—আহা বেচারা!

বিবাহ সম্বন্ধে ললিতের কোন মনোগত ইচ্ছার পরিচয় আমরা পাই নাই।

মতে না মিলিলেও আমরা উহাকে ভালবাসিতাম, সরল অন্তরের জন্য এবং কল্পনা-বঞ্চিত হতভাগ্য বলিয়াও।

আমাদের কল্পনা দেবী অবিশ্রান্ত কল্পনাজাল বুনিতেই লাগিলেন, কিন্তু ললিতের বাস্তব-রাণী এক দিন মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিলেন।

মেস শুদ্ধ সকলেই আশ্চর্য্য হইলাম! শেষে কি না অরসিকেষু—?

তেতলার ছোট ঘরখানি ছিল তাহার নিজস্ব। ছোট ঘরে একটিমাত্র জানালা ছিল এবং সেই অতি ক্ষুদ্র জানালা দিয়া আকাশের যেটুকু নীলিমা চোখে পড়িত, তাহাতে কল্পনার উপাদান ছিল অপ্রচুর। গলির ওপারে চারিতল বাড়ীখানা বিরাট বপু মেলিয়া, আকাশের অনেকখানি নীলিমা গ্রাস করিয়া একান্ত তাচ্ছীল্যভরে আমাদের এই চূণবালিখসা বাড়ীটির পানে চাহিয়া থাকিত। উহার বিরাট জঠরে দিবারাত্রি কলকোলাহল উঠিত। তাই ঐ দিকের সমস্ত জানালা আমরা সযত্নে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। কেবলমাত্র ললিতের তেতলার জানালাটা খোলা থাকিত। সে স্বপ্নবিলাসী নহে, হয় ত অতি আনন্দে এই অসম ছন্দের বিচিত্র ধ্বনি অভ্যস্ত শ্রবণে স্বাগত জানাইত!

কিছুদিন পরে জানা গেল, পিয়ানোটা বাজিত ওবাড়ীর ত্রিতলেরই কক্ষে এবং শিশুকণ্ঠের চীৎকার উঠিত দ্বিতলের প্রান্তসীমায়!

সংবাদটা ললিতই দিয়াছিল।

বর্ষাকাল। মেঘমেদুর আকাশে মন-গলানো একটি বিচিত্র আভাস পাওয়া যায়। বাদল হাওয়ার সজলস্পর্শ মনটাকে কি যেন কি না পাওয়ার ব্যথায় ম্রিয়মাণ করিয়া তুলে। বিরহী যক্ষের বার্ত্তাবহ মেঘ মিলনের যে স্মৃতি

বহিয়া লঘুগমনে ধারাবর্ষণের মধ্যে চকিতে দেখা দিয়া মিলাইয়া যায়, সে যেন হৃদয়ের মাঝে—বর্ষাব্যাকুল ধারায় নির্জ্জনে দুইটি প্রাণের একটি কথাকেই ব্যক্ত করিবার কামনায় বার বার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

এক দিন তেতলার জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আমরা জন-চারেক রোমান্সের সন্ধানে সেই ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে দিন পিয়ানো বাজিল না—সুর-ঝঙ্কার উঠিল না। ললিতকে বলিলাম, "কোন ষড়যন্ত্র না কি ?"

সে বলিল, "মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি। জানালাটা কোন দিন বন্ধ থাকে না। ওর বন্ধ হওয়ার রহস্য সম্ভবতঃ ওবাড়ীর অগোচর নেই।"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা, ওটা খুলে দাও"

তাহাতেও কোন ফল ফলিল না। শিশুকণ্ঠের একটানা চীৎকার ও হট্টগোল ছাড়া আর কোন শব্দই কাণে আসিল না।

বিরক্ত হইয়া আমরা কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

ঠিক মাসখানেক পরে। পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইয়াছে। বসিয়া বসিয়া নানা নীতির তর্কে আসর সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। ললিত আসিয়া ধীরে ধীরে সেখানে বসিল। চোখে মুখে তাহার কেমন যেন বিষণ্ণভাব।

কিছুক্ষণ পরে আমার কাণে চুপি চুপি বলিল, "জ্ঞান, একবার উঠবি ?"

বলিলাম, "কোন কথা আছে ?"

সে মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ, আমার ঘরে আয়।"

তেতলায় আসিয়া ললিত দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। আমায় শয্যার বসাইয়া নিজেও পাশে বসিল।

আজ জানালাটা ছিল খোলা এবং ও-বাড়ী হইতে মৃদু-কণ্ঠের কোমল সুরও যেন ভাসিয়া উঠিল। উৎসুক নেত্রে তাহার পানে চাহিতেই সে বালিসের তলা হইতে একখানি রঙ্গীন সুরভিত পত্র আমার হাতে দিয়া কহিল, "পড়।"

পড়িতে যাইতেছিলাম—সহসা সে আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া কাতরস্বরে বলিল, "কিন্তু, একটি কথা প্রতিজ্ঞা কর, এ কথা কারও সাক্ষাতে বলবি নে।"

পত্ররহস্য জানিবার জন্য মন আগ্রহান্বিত হইয়াছিল,—প্রতিজ্ঞা করিলাম।

ললিত বলিল, "আচ্ছা—তবে পড়।"

পড়িলাম।

সুন্দর বর্ণন-ভঙ্গী—চমৎকার হস্তলিপি। বাতায়নের সন্নিকটে যতটুকু রোমান্স-রমণীয়তা কল্পনায় আসিতে পারে—তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। বরমাল্য গাঁথিয়া মেয়েটি প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে,—বিজয়ীর বাহু-প্রসারণের অপেক্ষা মাত্র!

উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, "সাবাস! আর কেন,—মধুরেণ সমাপয়েৎ হোক।"

ললিত হাসিয়া বলিল, "মুস্কিল ঐখানে। আমি চিরকাল বাস্তবের ভক্ত—কাব্য-জগৎ কেমন যেন ধোঁয়ায় ভরা মনে হচ্ছে।"

বলিলাম, "বিধাতারই অবিচার। রসের তত্ত্ব নির্ণয়-ভার অরসিকের হাতে গিয়ে পড়ে।"

ললিত বলিল, "তা সত্য। জল চাতকের পিপাসা-নিবারণের জন্য মেঘের অবরোধ ভেঙ্গে নেমে আসে না, আসে তার নিজের প্রয়োজনেই।"

বলিলাম, "কথাটায় কবিত্ব আছে।"

সে হাসিয়া বলিল, "না, স্পষ্ট সত্য। তা যাই হোক, এ সমস্যাসমাধানের উপায় কি ?"

আমি উত্তর দিলাম, "জানালাযোগে পত্র প্রেরণ।"

ললিতের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। গম্ভীর স্বরে কহিল, "না, ছি! একটা হৃদয় নিয়ে এমন ছেলেখেলা করতে রাজী নই।"

সবিস্ময়ে কহিলাম, "তবে ?"

ললিত বলিল, "আমি ভাবছি, ওঁদের কাছে পরিচয় দিয়ে সোজাসুজি এর নিষ্পত্তি করবো।"

বলিলাম, "তাই ত বল্‌ছিলাম—অরসিকেষু। আরে ছ্যা! এমন রোমান্সটাকে গুঁড়িয়ে ভেঙ্গে দিবি ?"

সে বলিল, "ভেঙ্গে যায়—উপায় নেই। কিন্তু জানালা দিয়ে ইসারা-ইঙ্গিত বা চিঠিপত্র চালিয়ে দিনরাত হা-হুতাশ ক'রে কাব্য-নাটকের উপাদান আমি যোগাব না।"

একবারে সাধারণ মানুষ। কলেজ হইতে নাম কাটাইয়া দেওয়া উচিত!

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "তা আমাকে কি প্রয়োজন ?"

সে বলিল, "প্রয়োজন আছে। আমি সোজাসুজি তাঁদের

কাছে যেতে পারি না। কেমন যেন বেহায়ার মত দেখায়। তুই যদি একবার খবরটা নিস্—"

দৌত্য! তবু ভাল। কিন্তু অরসিকের দৌত্যও শেষে করিতে হইবে ভাবিয়া মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিলাম, "আচ্ছা, দেখা যাবে'খন।"

ললিত আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিল, "যাবে'খন নয়—আজই, ও-বেলা। এ ব্যাপারের একটা শেষ না করতে পারলে আমার নিষ্কৃতি নেই।"...

সম্মতি জানাইয়া উঠিলাম।

বাড়ীটি বড়। কর্ত্তা এক জন। তাঁহার পুত্র-পৌত্র অনেকগুলি এবং বয়সের অনুপাতে তাঁহারাও এক এক জন কর্ত্তা। কোলাহল-গোলযোগের কারণটা সহজেই অনুমেয়।

বৃদ্ধ কর্ত্তা অবসর-সহচর গড়গড়া লইয়া বাহিরের ঢালা ফরাসের উপর চিৎ হইয়া চক্ষু মুদিয়া আরাম উপভোগ করিতেছিলেন।

আমি নমস্কার করিতেই চক্ষু চাহিলেন ও বসিতে বলিলেন। বসিলাম।

তার পর পরিচয় জিজ্ঞাসার পালা। আমায় বিশেষ কিছুই বলিতে হইল না,—জেরা করিতে আসিয়া আসামী বনিয়া গেলাম। নাম, ধাম, মেল, গোত্র—যাহা জানি, কতক বলিলাম, কতক বা আন্দাজেই মারিলাম। তখন তাঁহার পরিচয় পাই নাই। গলায় দেখিলাম উপবীত। ব্রাহ্মণ। উপবীত খাটো নহে, সুতরাং সামবেদীয়। তার পর কি জিজ্ঞাসা করিব? আপনাদের ঐ যে ত্রিতলের ঘর, উহাতে যিনি—ছি! ছি! তা কি বলা যায়? ভদ্রতার একটা সীমা আছে ত!

যাহা হউক, ক্রমে সাহস সঞ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের বাস কি বরাবরই কলকাতাতেই?"

যেমন বলা—অমনই যেন রুদ্ধমুখ নদীর প্রবাহ খুলিয়া গেল। আদি অন্ত জন্ম পল্লীর ইতিহাস, বংশপরিচয়, কুল-মর্য্যাদা, পুত্রকন্যা-সংবাদ—দোল-দুর্গোৎসব জলস্রোতের মত আমায় পরিপ্লাবিত করিয়া তুলিল।

বুঝিলাম—আশা অসম্ভব নহে।

প্রায় এক ঘণ্টা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার পর সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল।

বেশ সহজভাবেই বলিলাম,—"আপনি এ কালের দোষ দিচ্ছেন বটে, কিন্তু আপনার বাড়ীতেই গান-টান—"

বৃদ্ধ কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিলেন, "হয়? হয়ই ত। বাবুরা জনে জনে কর্ত্তা—হবে না কেন?"

অতর্কিতে এমন এক যায়গায় ঘা দিয়াছি, যেখানে স-ধূম অগ্নিকণাই সঞ্চিত রহিয়াছে! বলিলাম, "হাঁ, তবে আমি এসেছিলাম একটু ইয়ে—"

বৃদ্ধ এতক্ষণে আমার আগমন সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "হাঁ—হাঁ—কি বলুন?"

কতক বাঁচাইয়া বিবাহপ্রসঙ্গ তুলিলাম।

বৃদ্ধ পরম আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, "তুমি ঘটক? ওঃ—তা এতক্ষণ বলতে হয়!"

ঘটক বলিয়াই কি সম্বোধনের সুর সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল?

বৃদ্ধ গড়গড়াটায় প্রবল টান দিলেন। আগুন নিবিয়া গিয়াছিল—ধূম বাহির হইল না।

কর্কশ-কণ্ঠে ডাকিলেন, "মণি, মণি,—ওরে শান্তি—খেঁদি—ভোলা—"

কিন্তু কেহই আসিল না। নেপথ্যে কে সুমিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "যা না হতভাগা ছেলে—দাদামশাই ডাকছেন। দেখুন দাদু—কেউ যাচ্ছে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তা তুমিই একবার এসো না, দিদি; আমার কলকেটা পালটে দিয়ে যাও।"

একটি কিশোরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া—আমাকে দেখিয়া একটু ইতস্ততঃ করিল। পরে ধীরপদে গড়গড়ার উপর হইতে কলিকাটি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার নাত্নী। দেখছো ত ছেলের আক্কেল—আজও বিয়ে দেয় নি। ওর বড়টি পর্য্যন্ত জীয়োনো আছে। মেম সাহেব নীচেয় নামেন না। গানবাজনা—ভাবন-চাকন নিয়েই মত্ত আছেন।"

আমার প্রয়োজন তাঁহারই সঙ্গে, সুতরাং ক্ষণিকের দেখা তরুণীর কথা ভুলিতে চেষ্টা করিলাম।

বৃদ্ধ পুনরপি বলিলেন, "দেখ ঘটক ঠাকুর, এক কথা বলি। বড় নাতনীর বিয়েটি আমি নিজে দিতে চাই, কিন্তু কথাটা যেন চাউর না হয়। অর্থাৎ সব ঠিক ঠাক ক'রে তবে ছেলেদের জানাবো।"

বলিলাম, "বেশ, ভাল কথা।"

তিনি বলিলেন, "আর এক কথা, ছেলের মেজাজ কি রকম? ইংরিজী ধরণের, না—নরম-সরম? বলি, গোঁফ আছে—না পুঁচিয়ে কাটে, না—নাকের ডগায় একটু লেগে থাকে?"

প্রশ্নের ধরণে হাসি আসিল। অভদ্রতা হইবে মনে করিয়া হাসি চাপিয়া বলিলাম, "না,—ছেলে একদম পুরাকালের, যাকে বলে গোঁড়া হিন্দু। ইয়া টিকি আর ইয়া গোঁফ্।"

খুসী হইয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "নাকে চশমা?"

"তাও নেই।"

"ব্যস্—তবে নিশ্চিন্ত! এইবার কথাবার্ত্তা হোক্। হাঁ দেখ ঘটকঠাকুর—"

এই সময়ে সাজা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে কিশোরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ঘটক ঠাকুর কে, দাদু?"

বৃদ্ধ আমার পানে চাহিয়া কি বলিবার উপক্রম করিতেই কিশোরী হাসিয়া উঠিল। কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় চাপাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "উনি ত ঐ মেসে থাকেন, কলেজে পড়েন।"

"অ্যাঁ!" বলিয়া বৃদ্ধ মুখব্যাদান করিয়া আমার পানে চাহিয়া আমৃতা আমৃতা করিয়া কহিলেন, "আপনি,—আপনি—তা এতক্ষণ—"

কিশোরী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

বৃদ্ধ ডাকিলেন, "ওরে মেন্তা, শোন—শোন—"

কিন্তু 'মেন্তা' আর আসিল না।

মেয়েটি কালো, জীবন-সঙ্গিনী করিবার অনুপযুক্ত। তথাপি চক্ষু মুদিয়া কণ্ঠস্বরটি শুনিলে কল্পনা রঙ্গীন হইয়া উঠে এবং দ্রুতগমনশীল হিল্লোলিত দেহলতাও পিছন হইতে দেখিতে মন্দ লাগে না। কথাগুলিও সুমিষ্ট ও কৌতুকরসচঞ্চল।

যাহা হউক, বৃদ্ধকে আর বেশী কিছু বলিতে হইল না। গোঁফের তত্ত্ব ও টিকির মহিমা তাঁহাকে দ্রব করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি সম্মতি দিলেন।

•

পরদিন ও-বাড়ীতে আবার আমার ডাক পড়িল। আজ দেখিলাম, ঘর-ভর্ত্তি কাঁচা পাকা লোক বসিয়া জটলা করিতেছে। খুব সম্ভব, এই বিবাহেরই আলোচনা চলিতেছিল।

আমি বসিলে আধা-বয়সী এক ভদ্রলোক জেরা করিতে লাগিলেন। তবে বৃদ্ধের কৌলীন্য-মর্য্যাদাজ্ঞানের অপেক্ষা ইঁহাদের কৌলীন্য-মর্য্যাদা-বোধ যে স্বতন্ত্র, তাহা প্রশ্নের ধরণ দেখিয়া বুঝিলাম। কুল-মান-শীলের প্রশ্ন বাদ দিয়া ইনি প্রথমেই জানিতে চাহিলেন, বিত্তের কথা। পরে রূপ এবং বিদ্যা। এই সমস্ত জানিয়া প্রীত হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাকা কথা স্থির হইয়া গেল।

মেসেও কথাটা রটিতে বিলম্ব হইল না। ভাবী বধূর রূপ-গুণের সমালোচনা আরম্ভ হইল। কণ্ঠস্বরকে আশ্রয় করিয়া যতটুকু কল্পনা চলিতে পারে, তাহার অনুশীলন করিয়া স্থিরীকৃত হইল, তরুণী সুন্দরী এবং জীবন-সঙ্গিনীর অনুপযুক্তা নহে।

বিবাহের দিনে আমরা বন্ধুর দল বলিলাম, ছাঁদনাতলায় দাঁড়াইয়া বিবাহ দেখিব। এ আব্দারটা যুগোপযোগী। গৃহকর্ত্তারা সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। কেবল বৃদ্ধের মুখে বিরক্তির কুঞ্চিত রেখা ফুটিয়া উঠিল।

ললিতের পাশেই আমি দাঁড়াইয়া মেয়েদের বিচিত্র অনুষ্ঠানগুলি কৌতুকভরে লক্ষ্য করিতেছিলাম। অকস্মাৎ পিঠের উপর সজোরে একটি কিল আসিয়া পড়িল। চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইতেই কে এক জন তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইল ও মেয়েমহলে খিল্‌খিল্ হাস্যধ্বনি উঠিল।

বন্ধুরা বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

বলিলাম, "বিশেষ কিছু নয়, বরের পাশে দাঁড়ানোর যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা।"

মেয়েদের মধ্যে কে এক জন বলিল, "দক্ষিণে নয় গো মশায়, ঘটক বিদেয়।"

আবার খিল্‌খিল্ হাস্যধ্বনি।

সরিয়া আসিতেছিলাম, একটি ছোট মেয়ে সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মেজ দিদি জামাই বাবু মনে ক'রে আপনার পিঠে কিল মেরেছে।"

বলিলাম, "আর যাতে ভুল না হয়, তাই স'রে যাচ্ছি।"

মেয়েটি বলিল, "দিদি বল্লে, অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ চাইলে।"

আর একটি তরুণী ভীড়ের ভিতর হইতে বলিল, "মেন্তারই বা দোষ কি? আজকালকার বরের ফ্যাসানই যে আলাদা। না চেলীর কাপড়—"

মেন্তা—সেই কালো মেয়েটি। কিন্তু তাহার হাতের কিলটুকু কালো নহে। অপরাধিনীকে দেখিবার জন্য আমি উৎসুকনেত্রে চারিদিকে চাহিলাম; কিন্তু অপরাধের বোঝা বহিয়া লজ্জানম্র মূর্ত্তিতে সে আর আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল না।

বিবাহ হইয়া গেল।

আমাদের কল্পনাকে খর্ব্ব করিয়া বধূর রূপরাশি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলাম, "হাঁ—ললিতের ভাগ্য বটে!"

বোধ হয়, মাসখানেক পরে ললিত এক দিন শুষ্কমুখে বলিল, "দেখ জ্ঞান, কাব্য জিনিষটাকে আমি আদপেই পছন্দ করি না, কিন্তু আমার ললাটের লেখা—"

বলিলাম, "অমন সুন্দর বউ পেয়েও তোমার আক্ষেপ কেন, বুঝি না!"

সে বলিল, "মাটীর জগতে সুন্দরের দাম বাইরে দেখে দেওয়া কতটা মুখ্যুমি—তা কল্পনার জীব তোরা জানবি কি ক'রে? সংসারকে যে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলতে না পারে, তার তাকে-তোলা সৌন্দর্য্য মানুষের কোন কাযে লাগে না।"

মনে হইল, এই বিবাহে ললিত সুখী হয় নাই। একটু কেমন ব্যথা জাগিল মনে। কহিলাম, "তাই ত বলছিলাম —তখন দেখে শুনে—"

ললিত বলিল, "সে অবসর তখন ছিল না। আমি ত নিজের পানে চাই নি—চেয়েছিলাম—থাক ও সব কথা। একটা বাসা দেখে দিবি?—ছোটখাটো!"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "কেন, মেসে আর পোষাচ্ছে না বুঝি? কথায় বলে বিয়ে হ'লে—"

ললিত বলিল, "চুপ ষ্টুপিড, তা নয়। যে দিন গলা বাড়িয়ে এ সোনার শেকল পরেছি, সে দিন থেকে আমার আমিত্বও ঘুচিয়েছি। তাই ত আমার দুঃখ বেশী। সে কি চিরকাল বাপের বাড়ী থাক্‌বে?"

—"কেন, বৌদিকে তোমার মা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে—যেমন এখানে ছিলে—"

—"ওরে পাগল, তা হয় না। কলকাতার মানুষ পাড়াগাঁয়ে গেলে দু'দিনে পাগল হয়ে যাবে যে! আমি স্বামী, ন্যায়ত ধর্ম্মত তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দায়ী।"

হায় রে জীবনের রঙ্গীন স্বপ্ন!

সংসারে কাব্যের চর্চ্চা অচল নহে, কিন্তু কাব্যের জীবনে সংসার অচল!

নিজের অন্তরের সৌন্দর্য্য আদর্শটা কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। বুঝিলাম,—এই দুইটি চোখে যাহা সুন্দর দেখায়, তাহাই জীবনের শ্রেয় নহে, হয় ত প্রেয়ও নহে। আরও মনে হইল, সুন্দর ভ্রান্তির পথে চলিতে গিয়া যদি কখনও মিথ্যার আবরণ খসিয়া পড়ে ত তাহার কদর্য্যতা ঢাকিয়া দিতে পারে, এমন কোন বস্তু পৃথিবীতে নাই।

ছোট একটি বাসা মিলিল—মেস হইতে কিছু দূরে। ললিত সস্ত্রীক উঠিয়া গেল।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গেজেটে কোথাও ললিতের নাম খুঁজিয়া মিলিল না। আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সে কলেজের মধ্যে ভাল ছেলে ছিল—তার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

অজিতকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেই বলিল, "তুই কিছু জানিস না? ললিত যে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে।"

বটে!—

তখনই তাহার বাসায় ছুটিলাম।

কড়া নাড়িতেই এক কুদর্শনা ঝি বাহির হইয়া বলিল, "কাকে চাই?"

"ললিত বাবুকে।"

ঝি বলিল, "তেনার আজ ক'দিন জ্বর হয়েছে। অজ্ঞান —অচৈতন্যি!"

"মা-জী কোথায়?"

"তিনি ত এ বাড়ীতে নেই। তাঁর আবার মূর্চ্ছোর ব্যামো আছে কি না! তাই চ'লে গেল।"

—"তবে কে আছেন বাড়ীতে?"

—"বৌয়ের বোন্ এসেছে। দাঁড়াও বাবু,—না, না, এসো। বন্ধুলোক তোমরা—আহা! বাছার বাড়ীতে একখানা তার ক'রে দাও।"

ঘরে গিয়া দেখিলাম, ললিত চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছে ও শিয়রের নিকটে পাখা লইয়া এক তরুণী বাতাস করিতেছে।

ললিতের পানে চাহিব কি—চক্ষু গিয়া পড়িল সেই তরুণীর উপর। সেই কালো মেয়েটি—মেন্তা। আজ যেন তাহাকে নূতন মূর্ত্তিতে দেখিলাম। সেবাপরায়ণা নারীর মহিমময়ী মূর্ত্তি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সে শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সুন্দরী পত্নীর গর্ব্বে বুক যতখানিই ফুলিয়া উঠুক না কেন, রোগশয্যাপার্শ্বে সেবা-সুনিপুণ দুইটি কোমল করের পরিচর্য্যা যে না দিতে পারে বা যাহার ব্যগ্র চোখের কল্যাণ-কামনার নির্ভরতায় সমস্ত মুখখানি একাগ্রতার আলোকে সমুজ্জ্বল না হইয়া উঠে, তেমন নারী কাব্যজগতেরও বাঞ্ছনীয় নহে। সে নারীর কাহিনী দশ জনের সম্মুখে বলিতেও লজ্জায় গণ্ডমূল আরক্ত হইয়া উঠে।

মেন্তা কথা কহিল, "বসুন। আজ দুদিন থেকেই অচৈতন্য। কাল বাড়ীতে একখানা চিঠি দেওয়া হয়েছে। আজ না হয় একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিন।"

সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলাম, "আজকের দিনটা দেখা যাক। ডাক্তার কি বলেন?"

—"বলেন ত কোন ভয় নেই।"

—"তা আমায় একটা খবর দেন নি কেন?"

মেন্তা ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "জামাইবাবুকে বলেছিলাম, কিন্তু সামান্য অসুখ ব'লে মানা করেছিলেন। দিদি—" বলিয়া সে কথা চাপিয়া গেল ও তাড়াতাড়ি কহিল, "ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।"

রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়া সে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। আরক্ত নেত্র মেলিয়া ললিত আমার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি বাড়াইল। সেই হাতখানি ধরিয়া ডাকিলাম, "ললিত!"

"অ্যাঁ—" বলিয়া আমার পানে চাহিয়া কি বলিতে গেল, পারিল না।

দুই দিন পরে ললিতের মা আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ললিতের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই।

ক্রমে ললিত সারিয়া উঠিল।

সে দিন তাহার মা কালীঘাটে পূজা দিতে গিয়াছেন। আমি ও ললিত বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।

অন্যান্য কথার পর আমি বলিলাম, "এবার বৌদিকে আনা, এক দিন পেট ভ'রে লুচি-মাংস খেয়ে যাই।"

ললিত বলিল, "লুচি-মাংসের চেয়ে এক দিন বরং পেট ভ'রে গান শুনে যাস্! কিন্তু সে ত এখন হবে না। মা দেশে না গেলে—"

—"কেন?"

ম্লান হাসিয়া ললিত বলিল, "সুখের জীবন কি না! থাক, থাক, ও-সব বাজে কথা। উপস্থিত আমার একটা অনুরোধ—"

হাসিয়া বলিলাম, "ভণিতা কেন?"

ললিত বলিল, "আর কত কাল একলা থাকবি বল দেখি? কাব্যের জগৎ ছেড়ে—"

বলিলাম, "তোমার পানে চেয়ে ও প্রবৃত্তি আর হয় না। নেহাৎ যদি কাব্যের জগৎ ত্যাগ করতে হয় ত সব রকমেই ত্যাগ করবো।"

"—কি রকম?"

"অর্থাৎ সুন্দরী রূপসী বিলাসিনী কাব্যময়ীর উদ্দেশে কবিতা রচনা করবো না।"

আনন্দিত হইয়া ললিত বলিল, "সত্যি?"

"বল ত তিন সত্যি করতে পারি।"

"—তার দরকার নেই। বুঝেছি—এ হতভাগার দৃষ্টান্তে তোর নেশা কেটে গেছে। কিন্তু ভাল ক'রে বুঝে দেখিস—সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানুষের জন্মগত বৃত্তি।"

বলিলাম, "তা সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যের ত এক রূপ নয়। যে রূপে যে সাধনা করতে ভালবাসে—তার তাই ভাল।"

আনন্দে ললিত আমার পিঠের উপর দুর্ব্বল হাতখানি চাপড়াইয়া কহিল, "এই কথা তোর মুখে যেমন মানায়—এমন আর কিছু না। তা হ'লে ঠিক করবো?"

কৌতুকভরে কহিলাম, "বল কি! এক দিন যে উপকার করেছিলাম, তার প্রত্যুপকার না কি?"

ললিত বলিল, "হাঁ। আমার ভুল তোকে দিয়ে শোধরাব।"

বলিলাম, "পাত্রী?"

ললিত বলিল, "যে ঘটক বিদায় করেছিল—কাব্য-বিসর্জ্জনের ভারও তার হাতে দিতে চাই। কেমন, রাজী?"

লজ্জায় গণ্ডমূল আরক্ত হইল কি না, জানি না, মাথা

নামাইলাম। মেস্তা—জীবনসঙ্গিনী হইবে? সেই কালো মেয়েটি?

তা হউক কালো,—অন্তরটি তার নারী-মহিমার শুভ্র শতদলে প্রস্ফুটিত। সংসারে গোলাপের অপেক্ষা ক্ষুদ্র শুভ্র সৌরভিত যুঁইয়ের আদর কি কম?

ললিত বলিল, "কি রে, উত্তর দিচ্ছিস না যে?"

বলিলাম, "আমার বন্ধুরা এই আদর্শ গ্রহণের কথা শুনলে নিশ্চয়ই আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রশংসা করবে না।"

ললিত বলিল, "তারা ত চিরদিনই আমার বাস্তবতাকে ঘৃণা ক'রে এসেছে এবং সংসারপ্রবেশমুখে কাব্যশতদলের সৌন্দর্য্য দেখে শতমুখে সুখ্যাতি করেছে। কিন্তু আমার আত্মপ্রসাদ তাতে কতটুকু হয়েছে, বলতে পারিস? ও সব কিছু না, কিছু না। কল্পনা সম্বন্ধে যার কণ্ঠ যত উচ্চগ্রামেই উঠুক না কেন, বাস্তবের ধাক্কায় সবার কণ্ঠই মৃদু হয়ে যায়। তবে কল্পনা বাস্তবে যদি মেশে, সে হ'লো আলাদা কথা। পৃথিবীতে কজন সে ভাগ্য নিয়ে আসে?" বলিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বলিলাম, "তা নয়, ঘটক-বিদায়ের যা নমুনা পেয়েছি, তাতে ভয় হয়!"

ললিত বলিল, "রহস্যে যে হাত চটুল, সেবায় তা সুকোমল। তার সাক্ষী আমি ভালই দিতে পারি।"

মনে মনে বলিলাম, "আমিও পারি।"

মুখে বলিলাম, "তোমার যা ইচ্ছে হয়, কর। তবে জেনে রেখো, গানে আমার যেমন অরুচি নেই, লুচি-মাংসেও তদ্রূপ।"

ললিত হাসিয়া বলিল, "তথাস্তু।"

তার পর?—বলা বাহুল্য।

বিবাহদিনে সঙ্গিনীকে দেখিয়া বন্ধুবর্গ আমার পীড়িত কল্পনাকে অজস্র নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। আমি প্রতিবাদমাত্র না করিয়া তাঁহাদের কাব্যজগৎ সম্বন্ধে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝিতে মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া রহিলাম।

তাঁহারা উদর ভরিয়া আহার করিয়া চলিয়া গেলেন। সৌন্দর্য্যহীনার অনিন্দ্য রূপ লইয়া যে কবিতাটি সযত্নে রচনা করিয়া ছাপাইয়াছিলেন, সেটিও যথাসময়ে বিতরিত হইয়াছিল।

যাইবার কালে শুধু বলিয়াছিলেন, "আমাদের অত যত্নের লেখাটা মাঠে মারা গেল! শেষকালে কি না—"

আমি তখন ভাবিতেছিলাম, "অন্তর-বাহিরের প্রভেদ বুঝি এমনই হয়। মনের নিকষ-পাথরে যে রূপটি চিরস্থায়ী হইয়া ফুটিয়া উঠে, বাহিরের লোক কি করিয়া তাহার মূল্য নির্ণয় করিবে? যে রূপের মোহে যে হৃদয় মুগ্ধ হয়, সে রূপের সার্থকতা সেই হৃদয়েই। তাই কল্পনা-প্রয়াসী চিত্ত আমার কালোর আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে।"

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

কালিদাস-গীতি

নববরষার প্রথম বাসরে, বিরহ-বিধুর বেদন-গান,
গেয়েছিলে কবি! কোন্ অতীতের মর্ম্ম-মাঝারে, মোহিত প্রাণ;
কতযুগ ধরি, সে সুর-লহরী, এখনও ধ্বনিছে বিদারি' বক্ষ,
দয়িত মিলন মধুরিমা মন মত্ত-মধুপ বিরহী যক্ষ,
বঙ্গমাতার, কনক-কিরীটে, শোভিল তোমার হীরক-দীপ্তি,
বিশ্ব প্রণত চরণে তোমার, হে কবি সাধক অমর-কীর্ত্তি।
বনবালিকার, চপল নয়নে, ফুটিল নিভৃত প্রণয় হাস্য,
জগত-প্লাবিত, কি করুণ সুরে, তাপস-প্রাণের বিদায়দৃশ্য;
বৈভবছাড়ি, শৈলজা চিত, বল্কলে ঢাকি, ললিত অঙ্গ,
ভৈরব তপে, কৈশোরে করে, কৈলাস-পতি সমাধি ভঙ্গ;
উজ্জ্বল করি, হিমগিরি-বন, মন্মথ করে কুসুম বৃষ্টি,
ঈশান-ললাটে জ্বলিল বহ্নি, ধ্বংস হবে কি বিশ্ব-সৃষ্টি!
সুরপতি সম, নরপতি কোথা, সুরভিত করি সূর্য্যবংশ,
ঋষির চরণে, লুণ্ঠিত শির, হোমধেনু পূজে আননে হর্ষ;
সিক্ত নবীন পয়োধর ধারে, বিরহিণী-হিয়া, নয়ন ম্লান—
বঙ্গ-গগনে, নন্দন ছবি, হে প্রেমিক কবি! তোমারি দান।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য (এম, এ)।

গীতার তত্ত্বোপদেশ

আষাঢ়ের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ "পারস্যযাত্রা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, বিমানপোত যত উপরে উঠিতে লাগিল, পৃথিবীর "সত্তা হ'ল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবী এল কমে। মনে হ'ল, এমন অবস্থায় আকাশযানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরোয়, তখন সে নির্ম্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে, তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যতবাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেন না, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে, তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ, অর্জ্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে, মরেই বা কে, কেই বা আপন, কেই বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্ম্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে সমাজনীতিতে ধর্ম্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে, তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 'বাগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ শেখদের গ্রামে প্রতিদিন বোমাবর্ষণ করছেন।' আকাশ হইতে গ্রামের উপর বোমা-বর্ষণ করা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধ করা রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টিতে সমান দোষাবহ বোধ হইল, ইহা বড় আশ্চর্য্য বিষয়। আকাশ হইতে বোমাবর্ষণের ফলে আবাল-বৃদ্ধবনিতা দোষী নির্দ্দোষ সকলেই মারা যায়। যুদ্ধে কেবল শত্রুসৈন্যই মারা যায়, তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার মারা যায় না, যাহারা যুদ্ধ করিতে আসে না, তাহারাও মারা যায় না। গ্রামের উপর বোমা ফেলিলে নিরীহ বালক, বৃদ্ধ ও রমণী হত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কাহার সঙ্গে?—যে দুর্য্যোধন ভীমকে বিষ খাওয়াইয়াছিল, পাণ্ডবদিগকে ঘরে আগুন দিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কপট পাশায় পরাজিত করিয়া তেরো বৎসর বনবাসে পাঠাইয়াছিল, দ্রৌপদীকে সভামধ্যে ধরিয়া আনিয়া বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করা কি বড় বেশী অন্যায়? রবীন্দ্র-নাথ বলিয়াছেন, "যাদের মারে, তাদের অপরাধের হিসাব-বোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না," তাঁহার এই মন্তব্য অর্জ্জুন সম্বন্ধে কিরূপ সঙ্গত হইয়াছে, পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখিয়াছেন, যে অত্যাচার করে, তাহার ত অন্যায় বটেই, যে অত্যাচার সহ্য করে, তাহারও অন্যায়। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কি উপায়ে অত্যাচারের প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা সাধারণের অবগতির জন্য বুঝাইয়া বলিলে ভাল হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কি বরাবর পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন? যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তাহার জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজে দূত হইয়া কৌরব-সভায় গিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ইচ্ছামত রাজ্য ভাগ করিয়া পাণ্ডবদের অংশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।" দুর্য্যোধন যখন তাহাতে রাজি হইল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার বিশাল রাজ্য হইতে পাঁচখানি মাত্র গ্রাম পঞ্চপাণ্ডবকে ছাড়িয়া দাও।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিব না।" তখন স্থির হইল, যুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই, যুদ্ধ করিতে হইবে। এই অবস্থায় পাণ্ডবদের যুদ্ধ করা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষা "নির্ম্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা" সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে অর্জ্জুন জানিতেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তখন তিনি বলিলেন, "না, ইহাদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে, আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।" যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া, যখন যুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হয়, তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।" যদি তখন অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইত? পাণ্ডবগণ পরাজিত হইত, এবং দুর্য্যোধন জয়লাভ করিত। অধর্ম্মের প্রভুত্ব স্থাপিত হইত। মৃতের সংখ্যা যে কিছু কম হইত, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন, এ অবস্থায় তোমার যুদ্ধ করাই উচিত।" শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এতই খারাপ বোধ হইল?

যদি কোনও অবস্থায় যুদ্ধ করা উচিত বলা যাইতে

পারে, তাহা হইলে সে এই অবস্থায়। অধার্ম্মিক ব্যক্তি যাহাতে বিপক্ষের সাধুতার আশ্রয়ে জয়দৃপ্ত হইয়া উঠিতে না পারে, এ জন্য যদি কখনও সাধু ব্যক্তিকে যুদ্ধার্থ কৃত-সংকল্প হইতে বলা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা হইলে সে এই স্থলে। যদি কোনও ব্যক্তি যুদ্ধের অপরিহার্য্য দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া, যুদ্ধনিবারণ জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়া, যুদ্ধ অনিবার্য্য দেখিয়া ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, এবং উপদেশপ্রার্থী শিষ্যকে নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সে উপদেশ দিয়াছিলেন।

কয়েক জন বিখ্যাত ব্যক্তির মত এই যে, যুদ্ধ কোন অবস্থাতেই করা উচিত নহে। টলষ্টয়ের এই মত। তিনি বলেন যে, কোনও কবির কোনও যুদ্ধের প্রশংসা করিয়া কবিতা লেখা উচিত নহে, কারণ, ঐরূপ কবিতা লিখিলে যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের এরূপ মত নহে। কারণ, তিনি যুদ্ধ ও যোদ্ধা বীরকে প্রশংসা করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। অতএব বোধ হয়, তাঁহার মতে সকল যুদ্ধই যে অন্যায়, তাহা নহে; ন্যায়যুদ্ধও আছে, অন্যায়যুদ্ধও আছে। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবরা যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা কি রবীন্দ্রনাথ ন্যায়যুদ্ধ বলেন না? যদি বলেন, তাহা হইলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া এত নিন্দা করিলেন কেন?

বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ মত নহে যে, কাহারও কখনও যুদ্ধ করা উচিত নহে। হিন্দুশাস্ত্র অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়াছেন, বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে এক ব্যবস্থা দেন নাই। ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রচর্চ্চা এবং ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন না; যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অবশ্য ধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধই কর্ত্তব্য, তদ্বিপরীত যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। রাজ্যভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষায় ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিবে না; স্বদেশের জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, এই ভাবে যুদ্ধ করিলে ভগবান্ প্রীত হইবেন, এই জন্যই ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিবে। ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়রা যদি বলেন, 'কখনও কোনও অবস্থায় যুদ্ধ করিব না', তাহা হইলে দুষ্ট লোকদের অত্যাচার বাড়িয়া যাইবে। শ্রীরামচন্দ্র যদি যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে সীতার উদ্ধার হইত না, রাবণের অত্যাচারে পৃথিবীর অনেকে বহু দুঃখ পাইত। অর্জ্জুন যদি যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া দুর্য্যোধন নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিত। তাহাতে জগতের অনিষ্টই হইত। এ অবস্থায় অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলা কিছুমাত্র অন্যায় হয় নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, যুদ্ধমাত্রই অন্যায়, ইহা বলা যায় না। কোনও অবস্থায় যুদ্ধ ভাল হইতে পারে এবং যুদ্ধ না করা অন্যায় হইতে পারে। স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রতাপসিংহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পুত্র-কন্যা অন্নাভাবে রোদন করিয়াছে, তাহাও সহ্য করিয়াছেন, তথাপি যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। সে যুদ্ধ কি অন্যায়? যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তিনি কি উচিত কার্য্য করিতেন? তাঁহাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়া কবি পৃথ্বীরাজ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কি (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) "সাম্রাজ্যনীতির উড়ো জাহাজ"—যাহার উদ্দেশ্য মানুষকে নিষ্ঠুর করা? পদ্মিনীর সতীত্ব-রক্ষার জন্য বালক বাদল যুদ্ধ করিয়াছিল, ষোড়শবর্ষীয় বীর পুত্তজী আকবরের বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, পুত্তের জননী এবং বালিকা বধূও যুদ্ধ করিয়াছিল, সে সব যুদ্ধ কি অন্যায়? আবার গজনীর মামুদ এবং পারস্যের নাদির শাও যুদ্ধ করিয়াছিল, সব যুদ্ধই কি সমান? গুপ্ত-হত্যাকারী রাজ্যাপহারক দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং অপূরণীয় সাম্রাজ্যলোভীর আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া যুদ্ধ—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমান বোধ হইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি?

যুদ্ধ ভাল, না সন্ধি ভাল, তাহা বলা যায় না। যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই ভাল। যুদ্ধ কর্ত্তব্য হইলে ভাল, কর্ত্তব্য না হইলে খারাপ। অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য ছিল, তাই অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধই ভাল ছিল। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই, তাহার কারণ ইহা নহে যে, এই যুদ্ধকে তিনি অন্যায় যুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, আত্মীয়স্বজন মারা যাইবে বলিয়া অর্জ্জুনের বড় কষ্ট হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতেই হইবে, তাহাতে যদি আত্মীয়স্বজন মারা যায়, তথাপি কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আত্মীয়-স্বজন যদি অধর্ম্মের পতাকার তলে দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম। আত্মীয়-স্বজন মারা যাইবে বলিয়া অর্জ্জুন শোকাকুল হইতেছেন, কিন্তু শোকের কারণ নাই, কারণ, আত্মা অমর, যুদ্ধে তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না; দেহ বিনশ্বর, এক দিন ত নষ্ট হইবেই, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার মৃত্যু হয় না,—গীতার এই উপদেশ উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করিয়াছেন,—("ঘরে বাইরে" উপন্যাসেও এই বাক্যের নিন্দা করিয়াছিলেন, এইরূপ স্মরণ হয়)। "আত্মা অমর" এই উপদেশ দিলে নিষ্ঠুরভাবে মারিবার প্রবৃত্তি কি ভয়ঙ্করভাবে বাড়িয়া যায়? রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বোধ হয় কেহ এ তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারকগণও ত এই উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশের ফলে পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতা বাড়িয়াছে, না কমিয়াছে?

আকাশযানে উচ্চে আরোহণ করিলে মারিবার প্রবৃত্তি বাড়ে, রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি যথার্থ নহে। আকাশযানে উড়িবার সুযোগ সকলের হয় নাই, কিন্তু মনুমেণ্ট বা বেণীমাধবের ধ্বজায় অনেকেই আরোহণ করিয়াছেন। উপর হইতে নীচের মানুষ এবং ঘরবাড়ীকে খুব ছোট দেখায় সত্য, কিন্তু নীচের মানুষদিগকে বধ করিবার বা ঘর-বাড়ী ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তি কাহারও হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। বরং উর্দ্ধে উঠিলে মানবের স্বাভাবিক দ্বেষ-হিংসা ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হয় এবং ক্ষণকালের জন্য আরোহণকারীর মন এই সকল ক্ষুদ্রতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া উদারতার সংস্পর্শ পাইয়া থাকে। যাহারা আকাশযানে উঠিয়া বোমা ছোড়ে, উপরে উঠিলে তাহাদের স্বভাব হিংস্র হইয়া উঠে বলিয়াই যে তাহারা বোমা ছোড়ে, ইহা সত্য নহে। উড়িবার পূর্ব্বে বোমা ছুড়িবে স্থির করিয়াই তাহারা উপরে উঠে, উপরে উঠিয়া তাহাদের স্বভাব বেশী হিংস্র হয়, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। নীচে দাঁড়াইয়া বোমা ছোড়া অপেক্ষা উপরে উঠিয়া বোমা ছুড়িবার সুবিধা বেশী বলিয়াই তাহারা উপরে উঠে; হিংস্রভাব বাড়াইবার জন্য উপরে উঠে, ইহা সত্য নহে। পৃথিবীর জিনিষ ঝাপসা বোধ না হইলেও, মানুষ ঘর-বাড়ী বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা গেলেও তাহারা বোমা ছুড়িতে ইতস্ততঃ করিত না। অনেক সময় দূরবীক্ষণ লাগাইয়া জিনিষগুলি বড় করিয়া দেখিয়া লইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহারা বোমা ছোড়ে। তাহারা পৃথিবীর দ্রব্যাদি ছোট করিয়া দেখে বলিয়া বোমা ছোড়ে না, পৃথিবীর দ্রব্য—ভোগের দ্রব্য অত্যন্ত বড় করিয়া দেখে, এত বড় করিয়া দেখে যে, তাহাতে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি আবৃত হইয়া যায়, এ জন্যই তাহারা বোমা ছোড়ে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের দুইটি উক্তিই ভুল,—আকাশের উপরে উঠিলে নীচের লোকদিগকে মারিবার প্রবৃত্তি বাড়ে না, গীতার তত্ত্বোপদেশ শুনিলেও নিষ্ঠুর হইয়া লোক-হিংসা করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রত্যুত বাস্তবজগতের সুস্পষ্ট অনুভূতি হইলে যেমন স্নেহ-মমতার উদ্রেক হয়, সেইরূপ পাত্রভেদে দ্বেষ-হিংসাও প্রবল হয়। নিরো, নাদিরশা, আওরঙ্গজেব ইঁহারা ব্যোমযানে উড়েন নাই, কিন্তু নিরপরাধের রক্তে পৃথিবী ভাসাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। য়ুরোপে মহাসমরে ব্যোমযানে না উঠিয়াও অনেক নিষ্ঠুর হত্যা সাধিত হইয়াছে।

অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন?—

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥"

"সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় সমান মনে করিয়া যুদ্ধ কর, তাহা হইলে পাপ হইবে না।"

যুদ্ধে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধের ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মফল ভগবান্‌কে সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"

"অতএব অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন কর, অসক্ত হইয়া কর্ম্মসম্পাদন করিলে মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে।"

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

"ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম নিক্ষেপ করিয়া, ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি ভৃত্য এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, আশা এবং অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।"

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল উপদেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের "নির্ম্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা", "অপরাধের হিসাববোধ উদ্যতবাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না", এই সকল মন্তব্য মোটেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

"সকল প্রাণীর সুখ-দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া যিনি বোধ করেন, তিনিই পরম যোগী।" অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে "নির্ম্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে" বলেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভুতস্থমাত্মানং সর্ব্বভুতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

"যোগী সকল প্রাণীর মধ্যে নিজ আত্মা দর্শন করে এবং নিজ আত্মার মধ্যে সকল প্রাণীকে দর্শন করে।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "করুণ" হইতে বলিয়াছেন,—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভুতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ॥"

"কোন প্রাণীকে দ্বেষ করিবে না, সকলের সহিত মৈত্র-ভাবাপন্ন হইবে এবং করুণহৃদয় হইবে।"

"দয়া ভুতেষলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।"

"সর্ব্বভূতে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা এবং অপ্রগল্ভতা" এই সকল গুণ অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন, অথচ যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, অতএব বুঝিতে হইবে, দয়া ও করুণা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও যুদ্ধ করা যাইতে পারে। সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য কাহাকেও পীড়া দেওয়া নহে, সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিজের ভোগৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করা নহে, সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের আদেশ মান্য করিয়া কর্ত্তব্য পালন করা, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে সহায়তা করা, তাহাতে যে সৈন্যবধ হয়, তাহা অভীষ্ট উদ্দেশ্য নহে, অনভীষ্ট ফলমাত্র।

সকলেই জানেন, গীতা হিন্দুর বড় আদরের সামগ্রী। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব হিন্দুর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় গীতাকে প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে, ইহাতে ধর্ম্মের সারভাগ সংকলন করা হইয়াছে।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

"সকল উপনিষদ হইতেছে গাভী, শ্রীকৃষ্ণ দোগ্ধা, অর্জ্জুন গোবৎস, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভোক্তা এবং গীতা দুগ্ধ।"

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনির্গতা॥"

"গীতা ভালরূপে অধ্যয়ন করা উচিত। অন্য বহুশাস্ত্রে প্রয়োজন নাই। কারণ, গীতা স্বয়ং বিষ্ণুর মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে।"

আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুগণও ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে নিরীক্ষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। মহাত্মা গান্ধীরও সেই মত। অরবিন্দের মতও অনেকটা সেইরূপ। শিবনাথ শাস্ত্রীও ইহার উচ্চ ধর্ম্মভাবের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিলকও গীতার উদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন। বহু বিদেশী মনীষী ইহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য এবং পরিতাপের বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথের মতে "গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশ এই রকমের উড়ো জাহাজ"—অর্থাৎ ইহা মানুষের স্বাভাবিক স্নেহকরুণা বিলুপ্ত করিয়া নিষ্ঠুর ও হিংস্র করিবার কৌশল মাত্র।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মানব-মন

দুর্জ্জেয় মানব-মন ; ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়
নিরবধি শতমুখে, কে জানে কোথায়
স্বপনেরে দিতে রূপ। অতৃপ্তির কালী
শুভ্র ভালে যেন তার কে দিয়াছে ঢালি'
চাঁদের কালোর মত। আলেয়া-দীপালি
তাহারে দেখায় পথ,—সে চলেছে খালি
ধরিতে সোনার মৃগ। ধরা নাহি যায়,
পিছু পিছু ছুটে তবু—শুধুই হারায়।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার

ভারতীয় নৃত্যকলা

১

ভারতীয় নৃত্যকলাকে রঙ্গমঞ্চের নটীর চরণ-ধূলি হইতে উদ্ধার-কল্পে যত প্রচেষ্টাই চলুক, তাহাকে উদ্ধার করিয়া সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা যাঁরা দিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী উদয়শঙ্করের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ আসনখানিকে গৌরবে মণ্ডিত করিয়াই তিনি ছাড়েন নাই, লক্ষ্মীদেবীর অঞ্চল-পূত করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতীয় নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে তিনি পাশ্চাত্য জগৎকেও বিমুগ্ধ করিয়াছেন।

কি গুণে এমন ব্যাপার ঘটিল, তাহা অনুশীলনের যোগ্য। আমরা উদয়শঙ্কর ও তাঁহার নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য কি ও কোথায়, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার চেষ্টা করিব।

এ বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস খুঁজিতে হইলে উদয়শঙ্করের পরিচয় বিশেষভাবে জানা উচিত। কি-ভাবে তাঁর নৃত্য-প্রতিভার উন্মেষ হইল, সে কাহিনী রোমান্সের মত বিচিত্র ও রমণীয়।

উদয়শঙ্কর

উদয়শঙ্করের পিতৃ-পুরুষের বাস নৈহাটীর কালিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত শ্যামশঙ্কর চৌধুরী। মাতা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী; গাজীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা। শ্যামশঙ্করের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। পশ্চিমেই তাঁরা চিরকাল বাস করিতেন। বিবাহের এক বৎসর পরে বেনারস ছাড়িয়া শ্যাম-শঙ্কর পিপলোদায় (মালব) আসেন, ওখানকার চীফের প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়া। তাঁর সঙ্গে তাঁর ওস্তাদজী আসেন। সুর-শৃঙ্গারে ও সঙ্গীতে ওস্তাদজীর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। এখানে আসিয়া শ্যামশঙ্কর রাজপুতানা ও মধ্য-ভারতের সভা-নর্ত্তকদের সঙ্গে নৃত্যকলার চর্চ্চা সুরু করেন। এই সময় শ্যামশঙ্কর চৌদ্দটি ভাষায় folk-songs গাহিতে পারিতেন। এদিকে তাঁর অনুরাগেরও সীমা ছিল না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্যামশঙ্কর উদয়পুরে আসেন এবং রাজকুমারগণ তাঁর বিবিধ গুণে বশীভূত হইয়া পড়েন। এখানে মহারাণা সজ্জন সিংয়ের সংস্পর্শে ললিত-কলার অনুশীলনে তিনি বহু সুযোগ পান।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে উদয়শঙ্করের জন্ম হয়, উদয়পুরে। উদয়পুরে জন্মহেতু পিতা তাঁর নাম রাখেন উদয়শঙ্কর। পিছোলা হ্রদের সম্মুখে ছিল শ্যামশঙ্করের গৃহ। গৃহে গীত-বাদ্যের রীতি-মত সমারোহ হইত এবং রাজপুত নর-নারীর বিচিত্র বেশ-ভূষা উদয়শঙ্করের শিশু-চিত্তে বর্ণ-রাগের প্রতি প্রথম অনুরাগ জাগায়। তার উপর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে বালক উদয়শঙ্কর ললিতকলার অনুরাগী হইয়া ওঠেন।

এ অনুরাগ প্রথম লক্ষ্য করেন মেটা জগন্নাথ সিংহজী (পরে ইনি মেবারের দেওয়ান হন)। মেটাজী গীত-বাদ্য চর্চ্চার উদ্দেশ্যে শ্যামশঙ্করের কাছে প্রায় আসিতেন। তিন বছর বয়সের সময় উদয়শঙ্কর পিতার সঙ্গে মথুরায় আসেন; এখানে স্বামী জ্ঞানানন্দ বালকের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হন। তার পর বহু জায়গা ঘুরিয়া পিতা কালিয়া এইচ, ই, স্কুলে হেডমাষ্টারী চাকরী গ্রহণ করেন।

উদয়শঙ্কর তখন মার সঙ্গে কলিকাতায় থাকিতেন। কলিকাতায় উদয়শঙ্করের ভ্রাতা রাজেন্দ্রশঙ্করের জন্ম হয়। রাজেন্দ্র বি, এস-সি পাশ করিয়াছেন; এখন তিনি উদয়ের সঙ্গে য়ুরোপে আছেন। রাজেন্দ্রর জন্মের অনতিকাল পরেই উদয় লক্ষ্ণৌয়ে মাতামহের কাছে আসেন এবং লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর লেখাপড়া সুরু হয়। শ্যামশঙ্কর পরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ঝালবা-পত্তনে আসিয়া বাস করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঝালোয়ারের মহারাণার সঙ্গে শ্যামশঙ্কর য়ুরোপ যাত্রা করেন; পত্নী ও পুত্রদের তিনি গাজিপুরে রাখিয়া যান। পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ঝালোয়ারে Minister of State হন। উদয়শঙ্কর প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে ঝালোয়ারে আসেন। এই সময় শ্যামশঙ্কর লক্ষ্য করেন, ললিত-কলার প্রতি উদয়ের শুধু অনুরাগ জন্মে নাই, চিত্রাঙ্কনে বাদ্যে ঐন্দ্রজালিক লীলায় তাঁর দক্ষতা জন্মিয়াছে অনেকখানি—তার উপর মেকানিক্সও বেশ শিখিয়াছেন। শ্যামশঙ্কর উদয়কে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন এবং চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতাদি শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। মহারাজার অধীনে কয়েকজন উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পী ছিলেন—রাজ্যের ব্যাণ্ড মাষ্টার মিষ্টার পিণ্টো ছিলেন য়ুরোপীয় মিউজিকে বিশেষ ওস্তাদ। এই দুই শিল্পে উদয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা ভালোই হইল। শ্যামশঙ্কর এটুকু করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না—বোম্বাই ও বরোদার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এবং কোটা ও ঝালোয়ারের পলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল পিককের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, পুত্রের মেকানিক্স-শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা সম্ভব হয় কি না! Air-pilot করার অভিপ্রায়ও ছিল—কিন্তু বয়স অল্প বলিয়া এ ব্যবস্থা সম্ভব হইল না। ঝালোয়ারে শ্যামশঙ্করের গৃহে প্রায়ই গান-বাজনার জলসা বসিত। এই সব আসরে উদয় বেহালা বাজাইতেন; ভাই রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র গান গাহিতেন। এই জলসার আসর হইতে নৃত্য-কলার দিকে উদয়ের চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

প্রথম-মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস

মহারাজের একটি নাট্যমঞ্চ ছিল। লাইব্রেরীও ছিল: লাইব্রেরীতে চিত্রবিদ্যা ও মিউজিক প্রভৃতি ললিতকলার বিবিধ মূল্যবান্ গ্রন্থ ছিল। মহারাজের অধীনে বহু বিচক্ষণ চিত্রশিল্পী, ওস্তাদ—তা ছাড়া মহারাজ রাণা পৃথ্বীরাজের

আমোলের প্রসিদ্ধা নর্ত্তকী 'কুকি'ও এই সময় ঝালোয়ারে অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজা প্রত্যহ নাচ-গানের আসর বসাইতেন—এ আসরে শ্যামশঙ্কর বসিতেন। নাট্যমঞ্চে ইংরাজী নাটকের অভিনয় হইত; এই অভিনয়-পরিচালনার ভার ছিল শ্যামশঙ্করের হাতে। বেশভূষায় পরিপাট্য ও সাময়িক মর্য্যাদা রক্ষা—এ দুটি ছিল এই অভিনয়ের বিশেষত্ব। নৃত্য-ব্যাপারে 'কুকি' ছিলেন পরিচালিকা। বয়সে প্রৌঢ়া হইলেও তাঁর উৎসাহের

গন্ধর্ব্ব-নৃত্য

সীমা ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর নৃত্যভঙ্গীতে যেন ছন্দ ঝরিত! উদয়শঙ্কর এই নৃত্য দেখিতেন এবং কাহারো শিষ্যগিরি না করিলেও অন্তরালে নৃত্য-চর্চ্চা করিতেন। অবশ্য এ নৃত্যে তিনি 'কুকি'র আদর্শের অনুকরণ করিতেন—'কুকি' নৃত্যের গতি-রাগ-তাল প্রভৃতির বিশেষত্বটুকুও তাঁর নাচে বাদ পড়িত না। এ গোপন চর্চ্চার সংবাদ জানিতেন শুধু মা হেমাঙ্গিনী। এক দিন তাঁর কাছেই শ্যামশঙ্কর এ সংবাদ শুনিলেন। শ্যামশঙ্কর তখনি উদয়কে বোম্বাইয়ের আর্ট স্কুলে পাঠাইলেন চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের গান্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়ে তাঁর নাচ শিখিবার সুব্যবস্থাও হইয়া গেল।

এমনি করিয়া তাঁর নৃত্য-শিক্ষার সূত্রপাত।

মঞ্চনৃত্যের অভ্যাস কি করিয়া ঘটিল,—সে কাহিনী অপূর্ব্ব। ঘটনা-সংস্থান অন্যরূপ হইলে উদয়শঙ্করকে আজ আমরা চিত্রশিল্পিরূপেই পাইতাম! সে ঘটনা-সংস্থান কি, এবার বলি।

১৯১২ সালের কথা। পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর তখন লণ্ডনে।

রাধা-নৃত্য

সেখানে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত ও মিষ্টার এনায়েৎ খাঁর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এনায়েৎ খাঁর সঙ্গে আলাপ পূর্ব্ব হইতেই ছিল। দাশগুপ্ত ও এনায়েৎ খাঁ সাহেব তখন লণ্ডনে ভারতীয় নাট্যশিল্পের প্রতিষ্ঠা-কল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের "প্রিন্সেস অফ আরাকান" নাটিকার অভিনয়-আয়োজন চলিয়াছে। কেদার বাবু আসিয়া ঝালোয়ারের মহারাণাকে ধরেন, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সম্বন্ধে সহায়তা করিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামশঙ্করের এই সূত্রে আলাপ ঘটে। মহারাণা

সম্মত হন—কিন্তু হাউস অফ কমন্সে বজেটের আলোচনার জন্য মহাত্মা গোখলে মহারাণাকে পার্লামেণ্টে ধরিয়া লইয়া যান। তখন তিনি শ্যামশঙ্করের হাতে এ ভার অর্পণ করেন। শ্যামশঙ্করও সানন্দে এ ভার গ্রহণ করিলেন।

এই অভিনয়-ব্যাপারে দুটি জিনিষ শ্যামশঙ্কর লক্ষ্য করেন; প্রথম, দাসগুপ্তের অভিনয়-আয়োজনে বেশভূষা ও দৃশ্যপটের ব্যাপারে ভারতীয় রীতি যথানুরূপ রক্ষিত হয় নাই এবং এনায়েৎ খাঁর বাদ্য-পরিচালনায় আছে শুধু একটি সেতার

গন্ধর্ব্ব-নৃত্য

ও হার্ম্মোনিয়ম! না আছে বীণা, না সুর-শৃঙ্গার, না সরোদ। এই সময় ভারতীয় রীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গারুত্রীয় নাট্যাভিনয়ের কল্পনা তাঁর মাথায় উদয় হয়। এ কল্পনার কথা তিনি ব্রাউন বাটারকে বলেন (ইনি সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের বন্ধু ও সেকালের ইংরাজী ষ্টেজের এক জন ষ্টার ছিলেন)। তাঁরা এ কথা শুনিয়া সেরূপ অভিনয়-আয়োজনে প্রচুর উৎসাহ দেন

কিন্তু এ ব্যাপারে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার অভাব, কাজেই মনের বাসনা মনে চাপিয়া রাখা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। অবশেষে ১৯১৩ সালে এক সুযোগ ঘটিল। মিস্ ভিক্টোরিয়া ড্রামণ্ড এই সময় ইংলণ্ডে ভারতীয় নৃত্য-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন; তিনি আসিয়া শ্যামশঙ্করকে ধরিলেন, সাহায্য করিতে হইবে। শ্যামশঙ্কর তখনি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। মিস্ ড্রামণ্ড ইতিমধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত আসরে ভারতীয় গাথা আবৃত্তি করিয়া সাধারণের পরিচিতা হইয়াছিলেন; শ্যামশঙ্কর মিস্ ড্রামণ্ডকে নৃত্য-কৌশল শিখাইলেন। মিস্ ড্রামণ্ডের নাম দিলেন

শ্যামশঙ্কর ও উদয়

'রাধারাণী'। পরে আর এক জন শিষ্যা মিলিল, মিস্ মরেল (পরে ইঁহার নাম হয় 'বৃন্দারাণী')। মিস্ মরেল লণ্ডন কলেজে মিউজিকের এক জন বিশিষ্টা ছাত্রী ছিলেন; তাঁর কণ্ঠও ছিল ভারী মিষ্ট। শ্যামশঙ্করের কাছে মিস্ মরেল প্রত্যহ ভারতীয় সঙ্গীত ও ভারতীয় নৃত্য শিখিতে আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের লইয়া রাধা-নৃত্য গঠিত হইল; ভাবানুরূপ ভঙ্গিমা শ্যামশঙ্কর শিখাইয়া দিলেন। প্রায় এক বৎসর রিহার্শাল চলিল, তার পর জার্ম্মাণ যুদ্ধ ঘটিল বড় আসরের অভাব ঘটিলেও

আহত সৈনিকদের সেবার সাহায্য-কল্পে শ্যামশঙ্কর তাঁর ছোট 'নর্ত্তকী'-সঙ্ঘ লইয়া ব্রাইটন, বোর্ণমাউথ প্রভৃতি নানা সহরে 'টুর' করিতে লাগিলেন। এ দলে মিষ্টার দাসগুপ্তের ইংরাজ এ্যামেচার অভিনেতা-অভিনেত্রীদলও ছিলেন; সাবিত্রীর অভিনয় হইয়াছিল। এই সঙ্গে আরো ছিলেন এনায়েৎ খাঁর দল। লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ড থিয়েটারে সম্রাটের সম্মুখে নৃত্যাভিনয় হয় এবং প্রচুর প্রশংসা মিলে।

তার পরই রাজ-দরবার হইতে শ্যামশঙ্করের আহ্বান আসে; তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন।

যাবতীয় বাদ্য-যন্ত্র। লণ্ডনে পৌছিয়া তিনি এই কন্সার্টে যোগ দেন এবং ম্যাজিক দেখান।

এই সময় ঝালোয়ারের মহারাণার নর্ত্তক শ্যামলালের কাছে জোশি, জোশির ভগ্নী, মিস্ ড্রামণ্ড ও মিস রিচমণ্ড ('কৃষ্ণারাণী') নাচ শিখিতে চাহিলেন,—নাচের ছন্দ গতি প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য-সমেত। উদয়ও নাচ শিখিবার জন্য তাঁদের দলে যোগ দিলেন।

কিন্তু এ দলটি বেশী দিন অবিচ্ছিন্ন রহিল না। এক মার্কিন ধনীর সহিত জোশির বিবাহ হইল এবং শ্যামশঙ্করকে

অনুরাগ-সঞ্চার (বিবাহ-নৃত্য)

লণ্ডনে উদয়শঙ্করের পিতা শ্যামশঙ্করই ভারতীয় নৃত্যের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না।

তার পর শ্যামশঙ্কর আবার লণ্ডনে আসেন ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে; আসিয়া শিষ্য পাইলেন কঁতেস দ্য ব্রেমোঁ (লেখিকা, কবি, গায়িকা) এবং ইতালীর গায়িকা ও নর্ত্তকী মিস্ জোশি গ্রাসিকে। শ্যামশঙ্করের শিক্ষায় ইঁহারা ভারতীয় নৃত্যে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। নাট্যাভিনয়ে ইঁহারা ভারতীয় কন্সার্টের প্রবর্ত্তন করেন। এই ব্যাপারে উদয়শঙ্করের ডাক পড়ে উদয় তখন বোম্বাইয়ে। শ্যামশঙ্করের আহ্বানে উদয় বিলাত যাত্রা করিলেন, পিতার কথামত সঙ্গে লইলেন ভারতের

ঝালোয়ারে ফিরিতে হইল। ফিরিবার সময় তিনি প্রফেসার রদেনষ্টাইনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া উদয়কে সাউথ কেন্সিংটনের রয়েল কলেজ অফ আর্টসে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। জোশির স্বর এমন মধুর এবং ভারতীয় গান এমন নিখুঁত ভাবে গাহিতেন যে, তাঁকে হারাইয়া শ্যামশঙ্কর দুঃখিত হন। তাঁকে শিক্ষা দিতে খুব শ্রম করিয়াছিলেন—সব পণ্ড হইল।

ঝালোয়ার হইতে শ্যামশঙ্কর আবার লণ্ডনে আসিলেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। সেই নৃত্যাভিনয়ের নেশা তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। এবার তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন লিম্বদির যুবরাজ, আমেদাবাদের শেঠ মুফৎলাল ও বোম্বাইয়ের গগন ভাই। ঝালোয়ারের কুমার (এখন মহারাজা।

তখন অক্সফোর্ডে পড়িতেছিলেন—তিনিও এ দলে যোগ দিলেন। শ্যামশঙ্কর দেখিলেন, তিন বছর তাঁকে সেখানে থাকিতে হইবে। তখন তিনি তাঁহার নাট্যাভিনয়, গীতাভিনয় ও ভারতীয় নৃত্য-প্রদর্শনের আয়োজন পাকা করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ ভারতীয় 'শেটিং' চাই। বৃন্দা দেবী তখন বোম্বাইয়ে ছিলেন—শ্যামশঙ্কর তাঁকে ১০০০০৲ টাকা পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন—ভারতীয় বেশভূষা, বাদ্যযন্ত্র ও মণিরত্ন লইয়া তিনি যেন সত্বর বিলাত যাত্রা করেন। উদয় ও উদয়ের সহপাঠীকে বেশভূষা সমস্তই ভারতীয় রীতি-অনুযায়ী তৈয়ার করাইলেন; কিশোর উদয়শঙ্করের হাতে অর্কেষ্ট্রার ভার দিলেন। অর্কেষ্ট্রায় ছিল ২ সুরবাহার, ২ দিলরুবা, একখানি সেতার, একটি তানপুরা, ২ সারেঙ্গী, বাঁয়া-তবলার জায়গায় নাকাড়া-ঢোলক, ও একজোড়া খঞ্জনী। বৃন্দা দেবী ৫০০৲ টাকা মূল্য দিয়া বোম্বাই হইতে ময়ূর-বীণা আনিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বাজাইবার লোক ছিল না। তা ছাড়া সানাই ছিল। কতকগুলি এ্যামেচার কিশোরী ও একটি বালককে লইয়া উদয়শঙ্কর বাজনা শিখাইয়াছিলেন। শিক্ষা-গুণে তারা

শিব-নৃত্য

ধরিয়া তাদের দ্বারা দৃশ্যপটাদি আঁকাইলেন; তারপর চিন্তা জাগিল ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী লইয়া। প্রকৃত নট-শিল্পী কোথায় পাওয়া যায়? যুবরাজ বলিলেন, দেশ হইতে তিনি নর্ত্তকী আনাইয়া দিবেন। কিন্তু সে বড় সহজ কাজ নয়। দেশ-ভুঁই ছাড়িয়া তারা আসিবে কেন? অনেকে আবার গোঁড়া হিন্দু। কাজেই বিপদ বাধিল। ওখান হইতে কয়েকটি 'আর্টিষ্টস্ মডেলকে' লইয়া শ্যামশঙ্কর কাজে নামিলেন। দু'খানি নাটক—The Dreamer Awakened (স্বপ্নাতুরের জাগরণ) এবং 'চিতোরের রাণী' (Queen of Chittore)—দু'খানি নাটিকাই নিজে লিখিলেন—গানও রচনা করিলেন। গানের সুর সম্পূর্ণ ভারতীয়। দৃশ্যপট, হিন্দী গান ও নেপালী নৃত্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক অভিনয়ও ছিল,—'কামরূপের রাণী', 'কালীর সাধনা', 'উড়ন্ত তরুণী', 'দড়ি-বাজী' প্রভৃতি।

লোকে তারিফ করিলেও শ্যামশঙ্কর দেখিলেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাবে অভিনয় তাঁর আশানুরূপ হয় নাই। শুধু 'চিতোরের রাণীর' ভূমিকায় 'রাধারাণী' অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইলেন।

তারপর ওখানকার কন্সার্ট-হলগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্যামশঙ্কর আবার কাজে নামিলেন। কয়েকটি কলা-রসিক ভারতীয় যুবা আসিয়া তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন—এবং আবার অভিনয় হইল। খ্যাতি মিলিল প্রচুর—ব্যয়

হইল অতিরিক্ত—কিন্তু অর্থাগম সুবিধাজনক হইল না। ডেলি মেল লিখিলেন,—

"Pandit Sham and Uday Shankar the versatile pair gave a wonderful performance at the Royal Court Theatre...the latter in his comic part made the audience laugh till they were on the verge of hysterics. পেলমেল্ গেজেট্ এবং অন্য সংবাদপত্রও নাচের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিল। তারপর Little Theatre ভাড়া লইয়া আবার অভিনয় হয়। সে অভিনয় দেখিয়া তখন আমেরিকায় অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু শ্যামশঙ্করের ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। যুবরাজের লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এবং উদয় আর্ট কলেজের ছাত্র।

তার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ঝালোয়ারের মহারাজ পীড়িত হইলে শ্যামশঙ্করকে দেশে ফিরিতে হইল, এবং মহারাণা সারিয়া স্বাস্থ্য-কামনায় জার্ম্মাণীর Black-forthএ আসেন। শ্যামশঙ্করকে তাঁর সঙ্গে আসিতে হইল। কাজেই অভিনয়-সঙ্ঘ উঠিয়া গেল। উদয়শঙ্কর তখন সদ্য রয়েল কলেজ অফ আর্টসের ডিপ্লোমা এবং ছবি আঁকিয়া দুইটি ফার্ষ্ট প্রাইজ পাইয়াছেন।

হর-পার্ব্বতী

Sunday Times লেখেন—"Pandit Shamshankar was one degree better than a pucca actor. He could out-foot (Oscar) Asch or (Matheson) Lang as sly glee of the cast.

এই সময় লণ্ডনে নিরঞ্জন পাল ও এস রায় Goddess অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন এবং অমরনাথ দত্ত (লিঙ্গা সিং) ম্যাজিক দেখাইয়া বেড়াইতেছিলেন। পাল পণ্ডিতের কাছে আসিয়া অভিনয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। শ্যামশঙ্কর এই অভিনয়-কমিটীর সভ্য হন; লিঙ্গা সিংও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন। অভিনয় হইল, কিন্তু খরচ উঠিল না।

শ্যামশঙ্কর যখন মহারাণার সঙ্গে হাম্বার্গে, তখন আনা-পাব্‌লোভা 'রাধা-কৃষ্ণ'-নৃত্যাভিনয়ে সাহায্য করিতে পারেন, এমন এক জন ভারতীয় শিল্পীর সন্ধান করিতেছিলেন। মিসেস্ এন, সি, সেনের (শ্রীযুক্তা রাণী মৃণালিনী দেবী) কাছে সন্ধান লইতে তিনি উদয়ের কথা বলেন। উদয় তখন মিস্ ভেরাকে লইয়া ছোট একটি গল্প-অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, দলে ছিলেন রাধারাণী ও কৃষ্ণারাণী। পাব্‌লোভার সাহচর্য্য পরম-কাম্য বিবেচনায় উদয় সানন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন এবং নিজে চিত্রকর, নর্ত্তক ও সঙ্গীতজ্ঞ, এই কারণে তাঁদের এ মিলন আর্টের ক্ষেত্রে পরম

উপভোগ্য হইয়া দাঁড়াইল। পাবলোভাকে উদয় ভারতীয় নৃত্যকলায় দীক্ষা দেন—ভারতীয় গতি-ছন্দ শিখাইয়া তাঁর সঙ্গে নৃত্য করেন। রাধাকৃষ্ণ নৃত্য-নাটিকায় উদয় সাজিতেন কৃষ্ণ এবং পাবলোভা সাজিতেন রাধা।

প্রথম নৃত্যাভিনয় হয় কভেণ্ট গার্ডেন রয়েল অপেরায়। এই নৃত্যলীলায় উদয়ের প্রতিভা দীপ্ত সমুজ্জ্বল রূপে দেখা দিল। তাঁর নাচের বিচিত্র ভঙ্গী, ভারতের বিশিষ্ট মুদ্রা—এ-সবে উদয়ের পূরা জ্ঞান থাকায় তাঁর নৃত্য-নৈপুণ্যে ইংলণ্ড বিমুগ্ধ হইয়া গেল। এ খ্যাতির সংবাদ আমেরিকাতেও

শ্রীরাধা

পৌঁছিল। তার ফলে উদয় ও পাবলোভা আমেরিকার বহু স্থানে নিমন্ত্রণ পাইয়া নৃত্যাভিনয় দেখাইয়া বেড়াইলেন। শ্যামশঙ্কর এ-ব্যাপারে উদয়কে প্রাণ খুলিয়া অনুমতি দিয়াছিলেন, বলিলেন—তুমি এই বৃত্তিই গ্রহণ করো। মহারাণা ও প্রিন্সিপাল রদেনষ্টাইন ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ এবং পাবলোভার উপর অপ্রসন্ন হন। রদেনষ্টাইন বলিয়াছিলেন,—I am very angry with Pablova—she has taken away the best and most promising of my pupils.—শ্যামশঙ্কর বলেন,—চিত্রকলায় প্রতিভা বিকশিত করিতে বহু ভারতীয় ছাত্র পরে মিলিবে; কিন্তু নৃত্যকলার সাধনায় নামিবে, এমন লোক কৈ?

অবশ্য শ্যামশঙ্কর বা উদয়শঙ্করের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় নৃত্য-লীলা কখনো প্রকটিত হয় নাই, এমন নয়—তবে সে সব নামেই শুধু ভারতীয় ছিল। শ্যামশঙ্কর ও উদয়শঙ্কর কদর্য্যতা মুছিয়া ভারতীয় নৃত্যের বিশিষ্ট রূপ প্রথম দেখাইলেন। ভারতীয় নৃত্যে যে ছন্দ, গতির যে অনায়াস লীলা, যে সহজ মরাল ভঙ্গী, তাঁহাদের কল্যাণেই য়ুরোপ তাহা প্রথম লক্ষ্য করিল। রুথ-সেণ্ট-ডেনিশ-প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী শ্যামশঙ্কর ও উদয়শঙ্করের কাছ হইতে ভারতীয় নৃত্যের টেকনিক শিখিয়া লন—কয়েকজন রুশ রাজকন্যাও তাঁহা-

রাধা-কৃষ্ণ

দের কাছে ভারতীয় নৃত্য শিখিতে আসিতেন। তাঁরা পূর্ব্বে অজন্তায় কয়েকটি ফ্রেশকো ছবি দেখিয়া নৃত্য-ভঙ্গিমায় সেই ছবি ফুটাইতেন; পরে শ্যামশঙ্কর ও উদয়শঙ্করের কাছে সে সকল ভঙ্গীর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া নৃত্য-লীলায় আরো বৈশিষ্ট্য ফুটাইতে সক্ষম হইলেন।

পাবলোভার সহিত উদয় যখন আমেরিকায় (১৯২৩-২৪), তখন ওয়েম্বলী এক্জিবিশনে Indian Pageant-এর ভার পড়ে শ্যামশঙ্করের হাতে। এই সময় রুশের প্রসিদ্ধা নর্ত্তকী মাদাম লিউনীডফ তাঁকে ধরেন কভেণ্ট গার্ডেন রয়েল অপেরার জন্য একটি ভারতীয় গীতি-নাট্য লিখিবার জন্য। তাঁর অনুরোধে শ্যামশঙ্কর "The Great Mughal's Chamber of Dreams" নামে নৃত্য-গীত-বহুল একখানি

নাটিকা রচনা করেন। ইহার অভিনয়ে পনেরো হাজার টাকা ব্যয় হয়। দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জা সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁদে রচিত হয় এবং গানে যে সুর দেওয়া হয়, তাহাতে ভারতীয় সঙ্গীতের রস ও ভাব পূরা-পুরি বজায় রাখা হইয়াছিল। ভারতীয় পদ্ধতিতে বৃন্দা দেবী এই নাটিকার সাজ-সজ্জা রচনা করেন।

ওদিকে আমেরিকায় ভারতীয় নৃত্যে পাবলোভার সহিত উদয়শঙ্কর প্রচুর খ্যাতি লাভ করিতেছিলেন। মিস্ ভেরা সোয়ান্‌ও প্রচুর খ্যাতি পাইলেন। তার পর যখন তাঁরা লণ্ডনে ফিরিলেন, তখন শ্যামশঙ্কর ৬০জন ইংরাজ মহিলাকে লইয়া 'ওয়েম্বলী পেজেণ্টে' অভিনয়ের আয়োজন করিতেছেন। নাচের জন্য শ্যামশঙ্কর কয়েকটি ভারতীয়

শিব-দুর্গা

মহিলার সন্ধান করিতেছিলেন। স্যর আলি ইমাম্-এর পুত্র দু'টি মহিলার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন—মিসেস্ ছগ্‌লা ও মিসেস্ পীরভয়। শ্যামশঙ্কর নিজে কয়েক দিন শিখাইয়া উদয়শঙ্করের হাতে তাঁদের নাচ শিখাইবার ভার দেন। উদয়শঙ্করের শিক্ষায় তাঁরা 'পাবলোভার' দলে যোগ দিয়া কভেণ্ট গার্ডেনে নৃত্য-লীলা দেখান। তার পর উদয়শঙ্কর পিতার সহিত ওয়েম্বলীর অভিনয়ে যোগ দেন। এই অভিনয়ে মিস্ ভেরা সোয়ানের সহিত স্ব-কল্পিত হর-পার্ব্বতী নৃত্য দেখাইয়া উদয়শঙ্কর বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

পাবলোভার সহিত দ্বিতীয় বার নৃত্যে তাঁর প্রতিভা আরো বেশী বিকশিত হয়। ছন্দ, তাল এখন তাঁর রীতিমত অভ্যাস হইয়াছে এবং গতি-ভঙ্গী আরো মাধুর্য্যে ভরিয়াছে; ভারতের প্রাচীন বিবিধ মূর্ত্তি হইতে তিনি প্রতিভা-বলে নৃত্যের নব নব ভঙ্গীর পরিকল্পনা করিয়া নৃত্যের বিচিত্র লীলায় নিজের অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিলেন।

তার পর পাবলোভা আবার আমেরিকায় চলিয়া যান। তখন ইংলণ্ডে দু'টি ইটালিয়ান কিশোরী মহিলাকে লইয়া উদয় আবার নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অর্থের তেমন সুবিধা ছিল না। কারণ, শ্যামশঙ্কর তখন ঝালোয়ারের চাকরী ছাড়িয়া কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করিতে আসিয়াছেন। আর্থিক অসুবিধাবশতঃ উদয়শঙ্কর পারীতে আসিলেন। অভিনয়-আয়োজন পরিপূর্ণ না হইলেও উদয়শঙ্কর ছোট-খাট নৃত্য দেখাইতে লাগিলেন এবং পারীতে ভারতীয় নৃত্যের প্রফেসর নিযুক্ত হইলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্যামশঙ্কর আবার য়ুরোপে ফিরিলেন এবং তাঁর পরামর্শে ও মিস্ বোনার নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার উদ্যোগে উদয়শঙ্কর ভারতবর্ষে ফিরিলেন, এখান হইতে কয়েক জন ভারতীয় যন্ত্র-শিল্পী ও মহিলাকে য়ুরোপে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে।

ভারতে আসিয়া বরোদা, উদয়পুর, জয়পুর, কপূরতলা, ও মহীশূরের মহারাজাদিগের সহিত তিনি দেখা করেন; কিন্তু শিল্পী সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়! এখানে আসিয়া আরো কয়েকটি নূতন ভারতীয় নৃত্য তিনি শিক্ষা করেন। তার পর কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্যে তিনি তিমিরবরণকে লাভ করেন। কলিকাতায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় কতখানি ফুটিয়াছে, তা আমাদের অবিদিত নয়।

ভারত হইতে যে কয়জন শিল্পী তাঁর সঙ্গে গিয়াছেন, তিমিরবরণ তাঁদের অগ্রণী। তার উপর সঙ্গে আছেন কনকলতা (শ্যামশঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্রী), রবীন্দ্রশঙ্কর (১১ বছর বয়স, উদয়ের কনিষ্ঠ সহোদর)। কনক ও রবীন্দ্র শৈশব হইতেই নৃত্য-লীলায় প্রতিভা দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের পাঠাইতে অনেকখানি বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। ভদ্র ঘরের মেয়ে, নৃত্য-লীলা দেখাইবে! কিন্তু এ আপত্তি টিঁকিল না। বড় ভাই এবং অন্য আত্মীয়-জনের অভিভাবকতায় থাকিবে,—কাজেই কাহারও অমত রহিল না।

পাশ্চাত্য প্রদেশে আগাগোড়া তাঁরা খ্যাতিই

পাইতেছেন। ভারতে-অনাদৃত এই নৃত্য-কলার অপরূপ বিচিত্র লীলা দেখিয়া পাশ্চাত্য জগৎ আজ বিমুগ্ধ! ভারতের প্রাচীন সভ্যতার দীপ্ত প্রতিচ্ছবি দেখিয়া পাশ্চাত্য জগৎ আজ ভারতকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেছে, এজন্য উদয়শঙ্কর ভারতবাসিমাত্রেরই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

উদয়শঙ্করের পিতা শ্যামশঙ্কর এক জন কৃতবিদ্য ব্যারিষ্টার। কিন্তু আইনের ব্যবসার দিকে কোনো দিন তাঁহার ঝোঁক ছিল না। তার উপর একটা প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে, উদয়শঙ্কর বাঙালী, তাঁহার উপাধি (হড়)-চৌধুরী। সে উপাধি তিনি বর্জ্জন করিয়া শুধু উদয়শঙ্কর নামে নিজেকে অভিহিত করেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য, স্বাধীন করদ রাজ্যে সম্ভ্রান্ত চাকুরীতে বাঙালীর প্রবেশাধিকার নানা কারণে বিঘ্ন-সঙ্কুল-বিধায় 'চৌধুরী' উপাধিটুকু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এ-সব অতি তুচ্ছ কথা। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ললিত-কলার বৈশিষ্ট্য-গৌরবে তাঁর এই পাশ্চাত্য দিগ্বিজয় সার্থক হউক!

সেখানে বিবিধ পত্রে বাঙালী উদয়শঙ্করের প্রতিভার যে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তার দু'চারটি তুলিয়া আজ বিদায় লইব। বারান্তরে ভারতী নৃত্য-কলার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব; ইচ্ছা আছে।

LA GRIFFE, PARIS.

.........the rhythm of this fine dancer is almost frensied and is a part of it; he is full of it. His dances handed down from centuries have a living character.

LA TRIBUNE DE GENEVE.

.........From beginning to end it is a vision of serene beauty, heiratic and chaste, enabling us to understand what sacred dancing really is.........

DER TAG, BERLIN.

Shankar shows the fundamental elements of Indian music.........

TEMPO, BERLIN.

This is a happy miracle.........Divinely he conducted the dance of the God Indra: he dominated as Siva.

DEUTSCHE ALLGEMAINE ZEITUNG—BERLIN.

.........the dances were presented with certainty, calm and domination of movement and gave us a picture of the Indian art of movement.

BERLINER ZEITUNG, BERLIN.

.........He brought us the salute of a far-off world.

PESTER LLOYDS BUDAPEST.

.........This young Indian with his animated body, his beautiful and noble face, and his refrinement of dancing culture will soon be recognised as the premier dancer of Europe.........

শ্রীশিবসুন্দর শর্ম্মা।

কামনার শেষ

ধন-দৌলতে হয় নাক' কভু
কামনার শেষ কারো,
দীনহীন যদি ক্রোরপতি হয়
তবুও মাগিবে আরো;

ধূলার এ দেহ ধূলা হয়ে গেলে
কোথায় কামনা রয়?
লভিলে তাঁহায় লালসার শেষ—
সাধু মহাজন কয়।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি

চাকরী

পৃথিবীতে যত রকম পেশা ও কার্য্য আছে, তাহাদের মধ্যে চাকরী প্রধান। স্বাধীন পেশা খুবই ভাল, তবে তাহাতে ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিবার জন্য ভীষণ সংগ্রাম করিতে হয়। হয় তাঁহার করুণা লাভ হইবে, নহে ত সেই চেষ্টাতেই জীবনপাত করিতে হইবে। স্বাধীন পেশায় ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তিনি কিছুতেই খুসী হইতে চাহেন না।

স্বাধীন পেশায় শতকরা একজন কৃতকার্য্য হয়েন, ৯৯ জন বিফলমনোরথ হইয়া জীবন যাপন করেন। সহস্রের মধ্যে একজন বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হন। স্বাধীন পেশায় আর একটি মস্ত বিপদ; একশতের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হইলেন, ৮০ জন একবরেই অকৃতকার্য্য, বাকি ১৯ জন আসেপাশে যে খুদ-কুঁড়া পড়িয়া থাকে, তাহা লইয়াই খুব খুসী। তবে মানুষ স্বাধীন পেশার জন্য এত ব্যস্ত কেন? কারণ, যদি কৃতকার্য্য হইতে পারে, তবে তাহার মত ভাগ্যবান্ কে? এই আশা।

সকলেই মনে করে, যদি আমার উপরেই দেবী সুপ্রসন্ন হন, তাহা হইলে সকল কষ্টেরই লাঘব হইবে। তবে স্বাধীন পেশার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেন, "যদি পৃথিবীর সর্ব্বসুখ ও আয়াস পরিত্যাগ করিতে পার, তবে আমার সেবায় রত হও। আমি কখন অল্পে সন্তুষ্ট নহি, স্ত্রী পুত্র, আয়াস আরাম সব ছাড়িয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইলে তবে আমি তোমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিতে পারি।" উকীল ও কৌন্সুলি হিসাবে যাহারা বড় হইয়াছেন, পেশার পেষণে তাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়াছেন; রাত্রি দেড়টা দুইটা পর্য্যন্ত সরস্বতীর সেবা করিতে হইয়াছে, ভোর ৬টা হইতে রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত কেবল মোকদ্দমার কাগজ দেখিতে হইবে, পড়াশুনা করিতে হইবে, তবে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর, নতুবা নহে। ভাল ডাক্তারদের মধ্যেও তাহাই, রোগী দেখা ত আছেই, তাহা ছাড়া গবেষণা পড়াশুনা চাই।

একসময়ে একজন এটর্ণিকে জজের সম্মুখে আসিতে হইয়াছিল। কারণ, তিনি ব্যবসা করিতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। জজ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া ঐ এটর্ণিকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, মিষ্টার—আপনাকে আমি একটা পরামর্শ দিই, একলোক ৫টা কায করিতে পারে না; এটর্ণির পেশা ভালই, আপনি সে পেশাতেই বিশেষ অর্থবান্ হইতে পারেন। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, 'A cobbler should stick to his last' মুচি তাহার নিজের কাযেই ব্যস্ত থাকিবে।"

বাল্যকালে যখন আমি পড়াশুনা করিতেছিলাম, তখন জানিলাম, ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক ডাক্তারী ও ওকালতী দুই-ই পাশ করিয়াছেন, ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়িতে লাগিয়াছেন। তখন আমার মনে হইল, বাঃ, এঁর তো খুব মজা। সকালে ও বৈকালে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং করিবেন, আর মধ্যাহ্নে ওকালতী করিবেন এবং সেই সময়ে একটা সাময়িক উত্তেজনায় মনে হইয়াছিল যে, শুধু ওকালতী পাশ না করিয়া ওকালতী ও ডাক্তারী দুইটি পাশ করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ, দুইটি পেশায় প্রভূত ধনোপার্জ্জনের সম্ভাবনা।

প্রথম প্রথম যখন ওকালতী পেশা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন আমার মনে হইত, দ্বিপ্রহরে ওকালতী ও সকাল বিকালে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং করিলে অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা। কিন্তু ১৯০৬ হইতে আরম্ভ করিয়া যত দিন যাইতে লাগিল, যত পেশা জমিতে লাগিল, তখন দেখিলাম, এক পেশা লইয়াই জীবন অতিষ্ঠ, অধিক পেশা হইতেই পারে না। এক ফৌজদারী আদালতে পেশা আরম্ভ করিয়া ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইতাম না। অনেক সময়ে ভাত খাইবার সময় না পাইয়া দুধে ভাতে মিশাইয়া মাতার অনুরোধে সেই দুধ-ভাত চুমুক দিয়া সময়ে আদালতে পৌঁছিয়াছি, আর সারাদিন পরিশ্রম করিয়া আদালত উঠিয়া গেলে ৫ টার সময় টিফিন করিতে সময় পাইয়াছি। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর রাত্রি ২ টার সময় কোন ভদ্রলোক থানায় ধরা পড়িয়াছে, তজ্জন্য অর্থের লোভে ও ভদ্রলোকের খাতিরে জামিনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছি। এমন দিন গিয়াছে যে, বন্ধুবান্ধব লইয়া রবিবারে থিয়েটারে যাইতেছি, যাইবার জন্য গাড়ীতে চড়িয়াছি, এমন সময়ে

ছোট আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আমার বন্ধুবর শ্রীযুত রাধিকাপ্রসাদ সান্যাল মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার অনুরোধ—আমি তাঁহার সঙ্গে থানায় যাইব। কারণ, তাঁহার এক দূর-আত্মীয় ধৃত হইয়া থানায় আছেন। আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের বলিলাম, তোমরা অগ্রসর হও, থিয়েটারে যাইয়া অভিনয় দেখিতে আরম্ভ কর, আমি কার্য্য সারিয়া পরে যাইব। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টারদের অবস্থাও তদ্রূপ, তবে পূজার সময় তাঁহাদের লম্বা ছুটী আছে, সেই জন্যই তাঁহাদের জীবন সহনীয়।

অনেক সময়ে পেশার খাতিরে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার তাঁহাদের স্ত্রীর জন্য যেটুকু সময় দেওয়া উচিত, তাহা দিতে পারেন না, এবং স্ত্রীরাও অনেক সময় বলিয়া থাকেন, “আমার পুত্রকে আর তোমার পেশায় দিব না, কারণ, পুত্রবধূ আসিয়া গালি দিবে।”

স্বাধীন পেশায় তিনটি দলে লোক বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম, যাহারা পেশায় কৃতী, তাঁহারা আরাম করিবার সময় পান না, সব সময়েই কার্য্যে ব্যস্ত। যাহারা পেশায় অকৃতী, তাঁহাদের অনেক সময় আছে, কিন্তু মনাগুনে তাঁহারা সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ, অর্থকষ্টে সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত; আর যাঁহাদের পেশায় সামান্য কৃতিত্ব হইয়াছে, অথচ বিশেষ খাটিতে হয় না, তাঁহারা ভাবেন, এ পেশায় না আসিয়া অন্য কোন পেশায় যোগদান করিলে হয় ত ইহা অপেক্ষা ভাল হইত। পেশা যত উচ্চ দরের, সেই পরিমাণে ইহা পীড়ক। অনন্যমনে তাহার সেবা করিবে, অন্য কোন দিকে চাহিবে না। অন্য কিছুতেই রত হইবে না, নিজের বৃত্তিতেই মজিয়া থাকিবে, অনন্যমনা হইয়া তাহার সেবা করিবে। এইরূপ করিতে রাজি হও, পেশা অবলম্বন কর, না পার, তাহার কাছেও যাইও না। “পেশা চায় ষোল আনা প্রাণ।” আমাদের এক জন নবীন উকীল প্রায় বলিত, “যেমন একটা ছাগলের অনেকগুলি বাচ্ছা, দুধ খায় একটা, বাকিগুলা নেচে কুঁদে বেড়ায়; উচ্চশ্রেণীর পেশাতেও তদ্রূপ। সুনাম, অর্থ উপার্জ্জন করে ২।৪ জন আর বাকিগুলা পেশার গর্ব্বে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়ান।”

যাঁহারা স্বাধীন পেশার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নহেন, তাঁহারা চাকরী করিতে যান। ইহা দুই শ্রেণীর;—এক সরকারী ও আর এক বে-সরকারী। সরকারী চাকরীতে অসুবিধা প্রথম ঢুকিবার সময়; উচ্চপদস্থ পিতা, খুড়া, জ্যেঠা, ভ্রাতা, ভগিনীপতি, শ্বশুর এরূপ নিকট-আত্মীয়ের সাহায্য না থাকিলে সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করা বিশেষ অসুবিধা, তবে কোন প্রকারে একবার ঢুকিতে পারিলে ইহার আর মার নাই। সময়ের গতির সহিত তঙ্কা-বৃদ্ধি, মরিবার পুর্ব্বে এক জন কৃষ্ণ-বিষ্ণু হবার সম্ভাবনা। যেমন কানুনগো বা সাবডেপুটী হইয়া ঢুকিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিভাগীয় কমিশনার হওয়া যায়, যেমন মুন্সেফ হইতে সুরু করিয়া জেলার জজ হওয়া যায়, যেমন সরকারী কেরাণী হইয়া ঢুকিলে শেষে আফিসের কর্ত্তা হওয়া যায়, যেমন Literate Constable হইয়া ঢুকিলে District Superintendent of Police পর্য্যন্ত হওয়া যায়, যেমন কেরাণিগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া Executive Counselএর সদস্য পর্য্যন্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরী বে-সরকারী চাকরী। ইহাতে বাড়ীর দরোয়ান হইতে সুরু করিয়া “প্রবল-প্রতাপান্বিত” Estateএ নায়েব মহাশয় পর্য্যন্ত সকলেই চাকর। চাকরী তাহাদের পেশা। আজকালকার অল্পশিক্ষিত বালক ও যুবক সকলেই—যাহারা সরকারী চাকরী জোগাড় করিতে পারে নাই, তাহারা সকলেই বে-সরকারী চাকরীর জন্য উমেদার।

ব্যবসা করিতে গেলে পুঁজির প্রয়োজন। যে ব্যবসা করিতে চান, সেই ব্যবসার উপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন, পরিশ্রমের প্রয়োজন। সকালে বৈকালে আড্ডা দিবার সময় পাইবে না, টপ্পাবাজীর সময় কম, কাযেই বে-সরকারী চাকুরিয়ার দল অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ চাকুরীর সংখ্যা অপরিমিত নয়, পরিমিত। কাযেই ইহার যোগাড় করিতে হইলে লোককে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সব জিনিষেরই প্রয়োজনীয়তার সংখ্যার উপর সরবরাহের সংখ্যা নির্ভর করে। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু সরবরাহ থাকিলে জিনিষের কদর থাকে। প্রয়োজন হাজার, সরবরাহ লক্ষ হইলেই যে কয়টির প্রয়োজন, সেই কয়টির এক রকম যোগাড় হয়, বাকি সকলকেই হাহাকার করিয়া মরিতে হয়। অল্পশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত সকলেই চাকরীর উমেদার, কাযেই এত চাকরী আসে কোথা হইতে? অর্থনীতিশাস্ত্রে ইহার কোন

মীমাংসা নাই। কোন শাস্ত্রেই ইহার সমীচীন সমাধান নাই। কাযেই বেকার-সমস্যা সমাজের একটি কঠিন সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। এই অসংখ্য লোকের অন্নসংস্থান কিরূপে হইতে পারে? উচ্চশিক্ষিত স্বাধীন পেশায় নয়, কারণ, তাহার সংখ্যা পরিমিত। বে-সরকারী চাকরীতেও নয়, কারণ, তাহার সরবরাহ প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। ব্যবসাতে কতকটা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও প্রভূত পরিশ্রম ও শিক্ষার প্রয়োজন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বলিতেছি না, ব্যবসার শিক্ষার কথা বলিতেছি। বেকার-সমস্যাসমাধান—এক চাষবাসের দিকে ভদ্রলোকের নজর পড়া চাই, আর কলকারখানার দ্রব্য প্রস্তুতের বিশেষ চেষ্টা থাকা চাই। অল্প পুঁজিতে সামান্য সামান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা বিশেষ আবশ্যক। খাঁটি খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহের দিকে নজর থাকিলে বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা বা কুঠী ভালরূপ চলিলে অনেক বেকার লোকের কার্য্য মিলিতে পারে।

কুলী-মজুর কখন বেকার থাকে না। এত অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনেও গৃহস্থের কাযের জন্য চাকর-চাকরাণী কখন বসিয়া থাকে না। তাহাদের সংখ্যার যত প্রয়োজন, তত সরবরাহ পাওয়া যায় না, কুলী-মজুরদেরও সেই কথা। তাহাদের আয় কম হইলেও অভাবের স্বল্পতা হেতু কষ্টের অনেক লাঘব হয়, এমন কি, কষ্ট অনুভবই করে না। বেকার-সমস্যা বলিলে, কুলী, মজুর, চাকর-চাকরাণীর বেকার-সমস্যা বুঝায় না, রাজ-মিস্ত্রী, ছুতোর, কামার, রং-মিস্ত্রী ইহাদেরও বেকার-সমস্যা বুঝায় না,—বুঝায় ভদ্রঘরের অল্পশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাপকাঠি অনুযায়ী উচ্চশিক্ষিত লোকেরই বেকার-সমস্যা।

যেখানে অভাব, সেইখানেই অন্যায়কামী চতুর দুষ্টলোকের অভাবমোচনের পথ। জীবন-সংগ্রামে উত্ত্যক্ত ভদ্রলোক চাকরী চাকরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাম, শ্যাম, যদুর কাছে চাকরীর উমেদার হইতেছে; অমনি কতকগুলি কূটবুদ্ধি চালাক চতুর দুষ্ট লোক এই সব অভাবগ্রস্ত লোকের উপর নিজ নিজ অভাবপূরণের খোঁটা গাড়িতেছে। তুমি চাকরী চাও, এই সব লোকের দিকে ধাবিত হইবে, তাহারাও সুবিধামত তোমাকে মারিয়া নিজের বাঁচিবার পন্থা করিয়া লইবে।

আজকাল এক শ্রেণীর কোন কোন বীমা কোম্পানীর সেয়ার (share) কিনিতে পারিলেই সর্ব্ব-দুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। নিজে সেয়ার কিনিয়া কিম্বা অপর লোককে কিনাইয়া দিলে, ভাল ভাল চাকরী পাওয়া যায়, এই অজুহাতে অনেক গরীব বেকার যুবক মা, ভগিনী, স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বা দেশের ধান-জমী বন্ধক দিয়া টাকা আনিয়া এই শ্রেণীর শোষক কোম্পানীর সেয়ার কিনিতেছে। তার পর সেই সেয়ার কোম্পানীর যে সব নিয়ম আছে, তাহার বেড়াজালে পড়িয়া টাকাগুলি সব হারাইতেছে, অনেক সময়ে ফৌজদারী মামলায় অকৃতকার্য্য হইতেছে। এই শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর প্রথম প্রস্তাব,—কয়েকখানি সেয়ার কিনিতে হইবে এবং অপরকে কিনাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে ঐ বীমা কোম্পানীতে তাহার চাকরী হইবে। বড় বড় ছেঁদো কথায় ইহাদের প্রস্তাবিত কোম্পানীর প্রস্তাবনা ছাপা হয়। তাহাদের কাগজপত্র পড়িলেই মনে হয়, ইঁহারা এত দিন কোথায় ছিলেন? ইঁহারা কোন্ বাগানের লুক্কায়িত আনারস ফল? এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে কোন্ বন হইতে সোনার টোপর মাথায় দিয়া বাহির হইলেন? তাঁহাদের উদ্দেশ্য কত মহান্! প্রাণ কত উচ্চ! যেন বেকার জনসাধারণের সুবিধার জন্য তাঁহারা এই শ্রেণীর কোম্পানী খুলিয়াছেন! আর আমাদের অভাবগ্রস্ত বেকার লোকগুলি বৎসরের পর বৎসর বেকার থাকিয়া যখন দেখেন যে, হয় ত এই কোম্পানী হইতে তাঁহাদের সুবিধা হইতে পারে, তখনই তাঁহারা পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিরূপী এই শ্রেণীর কোম্পানীর দিকে ঝাঁপাইয়া পড়েন ও মরেন

এই শ্রেণীর কোম্পানীর উদ্দেশ্য—যেমন করিয়াই হউক, আইন বাঁচাইয়া, প্রতারণা করিয়া, লোকদিগকে অধিকতর গরীব করেন। নিজে যিনি চিরকাল অভাবগ্রস্ত, কখন অর্থ-সংস্থান করিতে পারেন নাই, তিনিই এখন ভুঁইফোড় বীমা কোম্পানী করিয়া অপর বেকারীর অন্নসংস্থানের জন্য ব্যস্ত। এই জাতীয় কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে দেখা যাইবে এতগুলি সেয়ার খরিদ করিলে এই কোম্পানীর ভিতর এত গুলি চাকরী মিলিবে। মাসিক মাহিনা ৫০৲ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ের যে সব আড়কা

আছে, তাহারা বিশেষ মোটা কমিশনে লোক ধরিয়া আনিয়া থাকে।

আর এক শ্রেণীর প্রতারক বাজারে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহারা নিজে কোন চাকরী যোগাড় করিতে না পারিয়া অপর অনেক লোকের চাকরীর সংস্থান করিয়া দিতেছেন। চাকরীর জন্য নগদ টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে, মাসিক বেতনের পরিমাণ হিসাবে ২০০৲, ৪০০৲, ৫০০৲, ১০০০৲, ১০,০০০৲ ইত্যাদি। টাকা জমা দিলে মাহিনা ত পাইবেই না, অধিকন্তু ঐ শ্রেণীর জুয়াচোরের অফিস নামে যে তাহাদের আড্ডা আছে, সেই স্থানে যাইয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে। ভাল লোক যদি চাকরীর অজুহাতে চাকরী দিবার জন্য টাকা জমা চায়, তাহা সে পাইবে না, কিন্তু এই জুয়াচোররা এমনভাবে কার্য্যকলাপ করে যে, এই সব বেকার লোক তাহাদেরই খপ্পরে গিয়া পড়ে। আমার এক আত্মীয় সরকারী পোষ্ট অফিসে চাকরী করিতেন। কর্ম্মস্থান কলিকাতা হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ায় সামান্য পেন্সন লইয়া সরকারী কর্ম্ম হইতে বিদায় লইলেন। তাহার পর ২।৪ মাস যাইলে চাকরীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। কারণ, তখনও তিনি কর্ম্মক্ষম, বলিতে লাগিলেন, 'আমার কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে, আমি বসিয়া কেন খাইব ?' খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেন আর চাকরীর দরখাস্ত করেন। জবাব পান, এত টাকা জমা দিলে এত টাকার চাকরী পাইবে। তবে টাকাগুলি নগদ চাই। জবাব পাইলেই আমার কাছে আসেন এবং পরামর্শ করেন যে, এই টাকা জমা দিব কি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি ধরিয়া ফেলি যে, তাহা জুয়াচোর কোম্পানী। প্রথমে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তদারক করিবার পর আমি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, উহা একটি জুয়াচোর কোম্পানী।

এই রকম করিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর আমার নিকট চাকরীর জন্য ৩০।৪০টি প্রস্তাব আনিলেন এবং আমিও ঐ ৩০।৪০টি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিলাম। আমি বলিলাম, এ সব কয়টি কোম্পানীই জুয়াচোর কোম্পানী, জুয়াচুরি করিয়া টাকা মারিবার জন্য এরূপ বিজ্ঞাপন দিতেছে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ তিন বৎসর ধরিয়া আমার পরামর্শে এই সব কোম্পানীতে টাকা জমা না দিয়া চাকরী না পাওয়াতে বিশেষরূপে তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন ; শেষাশেষি আমাকে বলিতে লাগিলেন, "আরে ভাই, তোমার কথা শুনিতে গেলে ত আর চাকরীই হয় না। তুমি প্রত্যেক বিজ্ঞাপনকারীকেই জুয়াচোর বলিয়া ধরিয়া লও, তাহা হইলে আমার চাকরী হয় কোথা হইতে ?" আমি বলিলাম, "চাকরী কোথা থেকে হয়, সে কথা আমি বলিতে পারি না, তবে তোমার টাকাগুলি এই জুয়াচোররা ঠকাইয়া লইবে, এরূপ অবস্থায় এই অন্যায় পরামর্শ তোমায় দিব কিরূপে ?"

আমার এই বন্ধুটি ৩ বৎসর ধরিয়া ঘন ঘন আমার বাড়ীতে পরামর্শ লইতে আসিতেন। তাহার পর প্রায় আট মাস ধরিয়া আমার নিকট আর আসিলেন না। আরও শুনিলাম, ১০টার সময় খাওয়া-দাওয়া করিয়া বাহির হইয়া যান, ৫টার সময়ে আসেন। আমার মনে বিশেষ সন্দেহ হইল। মনে করিতে লাগিলাম, এই পোকাটিকে কোন্ বড় জানোয়ার ভক্ষণ করিল ? তার পর এক দিন তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়া হাজির। আসিয়াই আমতা আমতা স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'ভাই, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি।' কি বিপদ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি যে উত্তর দিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ ;—

সহরের উত্তর প্রান্তে বিশেষ বড়লোকের বাড়ীতে এক ঠিকানায় 'ঘোষ কোম্পানী' বলিয়া একটি কোম্পানী গঠিত হয়, সেই কোম্পানী কয়লার কাষ করিবে। অনেকগুলি চাকরী তাহাদের কাছে খালি আছে, Manager, Sub-manager, Secretary, Cashier, Office Superintendent ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার এই আত্মীয়টি ৫ শত টাকা জমা দিয়া Record-keeperএর কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। ছয় মাস ধরিয়া প্রত্যহ ১০টার সময় অফিসে যাইতেন, ৫টার সময় আসিতেন। অফিস ইংরাজটোলায় সহরের দক্ষিণ বিভাগে। টেবিল, চেয়ার, ইলেকট্রিক ফ্যান, লেডী টাইপিষ্ট সবই আছে ; খালি নাই কাষ আর নাই টাকা। তিনি বলিলেন, 'আমি ছয় মাস ধরিয়া খাটিয়াছি, একটি পয়সা পাই নাই। কাযের মধ্যে চারখানা চিঠি খাতায় entry করিয়াছি, এখন আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এই কোম্পানীটা জুয়াচোর কোম্পানী। যাহা হউক, আমার টাকা আদায় করিয়া দিন, আমি ছাপোষা গরীব মানুষ,

আমার এই টাকা যাইলে আমি একবারেই বিপদে পড়িব। মাইনে না পাই, তাহাতে কিছু যায় আসে না, তবে গচ্ছিত টাকা ফিরিয়া পাইলে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিব।'

আমি বলিলাম, "কৈ, তুমি ত আমাকে টাকা গচ্ছিত করিবার আগে জিজ্ঞাসা কর নাই।"

তিনি বলিলেন, "ভাই, আর লজ্জা দিও না। আমি কি আর সাধ করিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করি নাই? আমি জানি এবং তিন বৎসর ধরিয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে, যে সব বিজ্ঞাপনদাতা চাকরী দিবার জন্য নগদ টাকা গচ্ছিত চায়, তুমি সে সবগুলিকেই জুয়াচোর বলিয়া ধরিয়া লও। কাযেই দেখিলাম, তোমার সহিত পরামর্শ করিলে, তুমি কখনই টাকা গচ্ছিত দিবার মত দিবে না। আর তাহা হইলে আমার চাকরীও হইবে না।"

আমি বলিলাম, "নারাণ, (আমার বন্ধুটির নাম)—ঘরের টাকা পরকে দিবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন? আজকালকার দিনে চাকরী কি পড়িয়া আছে? ভাল চাকরী দিবার লোভ দেখাইয়া তোমার ভাল টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য অনেকেই বিজ্ঞাপনের আশ্রয় লইতেছে আর তোমাদের মত এক শ্রেণীর লোক আছে—যাহাদের কার্য্য বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরী যোগাড় করা। মোটের উপর আমার এত বৎসরের অভিজ্ঞতা হেতু এইরূপ স্পষ্টভাবে বলিতে পারি, যেখানে টাকা জমা লইয়া চাকরী দিবার বিজ্ঞাপন দেয়, আর কতকগুলি চাকরী খালি আছে বলিয়া জানায়, সেখানে তুমি ধরিয়া লইতে পার যে, সেগুলি কোন জুয়াচোর ফন্দিবাজের বিজ্ঞাপন। যদি তুমি একটা উদাহরণ দেখাইতে পার, যেখানে আমার মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, আমি ইম্পিরিয়াল রেষ্টুরেণ্টে তোমাকে এক দিন খাওয়াইয়া দিব!"

যাহা হউক, আমি সেই কোম্পানীর ঘোষ সাহেবকে চিনিতাম, আর তিনিও আমাকে বেশ ভালরূপ চিনিতেন। তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলাম, "ঘোষজা, এই নারাণ বাবুটি আমার আত্মীয়, ইঁহার গচ্ছিত টাকাটা উগরাইয়া দিতে হইবে, না দিলে আমি তোমার এই ব্যবসায়ের বিশেষ হন্তারক হইব। আমি দরখাস্ত করিলেই তোমার নামে Warrant পাইব, আর সেই Warrantএর কথা কাগজে ছাপাইয়া দিব, তাহাতে তোমার ব্যবসা একবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।"

অনেক কথাবার্ত্তার পর এইরূপ ধার্য্য হইল যে, সে আমার বন্ধুর টাকাটা ফেরত দিবে; আর আমি তাহার বিপক্ষে কিছুদিনের জন্য কোন মোকর্দ্দমা লইব না। আমি ঐ ৫ শত টাকা পাইয়া আমার বন্ধুকে দিবার সময় বলিলাম, "তোমার স্ত্রী আমার বিশেষ আত্মীয়া, এ টাকাটি তাকেই দিবে।"

বিশেষ নামজাদা বহুকাল স্থাপিত firm বিনা কোথাও টাকা জমা দিয়া সহজে কেহ চাকরী লইবেন না, এই কথাটা আমি বলিতে চাই।

কয়েক দিন হইল, আমার কাছে কোন একটি লোক দরখাস্ত লইয়া আসিয়াছিলেন একটি Lottery খুলিবার জন্য। তিনি এক জন শিক্ষিত লোক। তাঁহাকে আমি বলিলাম, "আপনার এই কার্য্যটি আইনসঙ্গত নয়, আপনি এক জন শিক্ষিত লোক, আপনি এ কার্য্যে কেন হাত দিয়াছেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "মশাই, লোকের যেরূপ অর্থকষ্ট, সাধারণের সুবিধার জন্য এই কার্য্যটি খুলিতে মনস্থ করিয়াছি।" আমি বলিলাম, "এই দুর্দ্দিনে সাধারণের সুবিধার দিকে নজর না রাখিয়া নিজের সুবিধা হয়, এরূপ কার্য্য করুন।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "এ কার্য্যে আমারও বিশেষ সুবিধা আছে। সাধারণেরও বিশেষ সুবিধা, আমারও বিশেষ সুবিধা।" আমি বলিলাম, "মশাই, পরের জন্য মাথা ঘামাইবেন না, ন্যায্য উপায়ে নিজের জন্য যাহাতে সুবিধা করিতে পারেন, তাহা দেখুন। আজকালকার দিনে তোতাপাখীর ন্যায় অনেকেই কপ্ চায়, 'দেশের ও দশের জন্য এই কায করিতেছি।' যতদূর সম্ভব, যত দিন আমি এই সরকারী কার্য্যে আছি, এরূপ 'দেশ-হিতকর কার্য্যে' আমি সর্ব্বদাই বাধা দিব। আপনার Lotteryর ব্যবসা আমি খুলিতে দিব না।"

ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যে দেশের ও দশের উপকারার্থে তাঁহার প্রস্তাবিত Lottery খেলাটি খুলিতে পারিলেন না, তাহার জন্য বিশেষরূপ আমাকে মনে মনে অভিসম্পাত করিয়া গেলেন। সরকারী উকীলের কার্য্য করিয়া আমি অনেক 'দেশ-হিতকামী' লোককে খুসী করিতে পারিলাম না, ইহাই আমার বিশেষ দুঃখের বিষয়।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

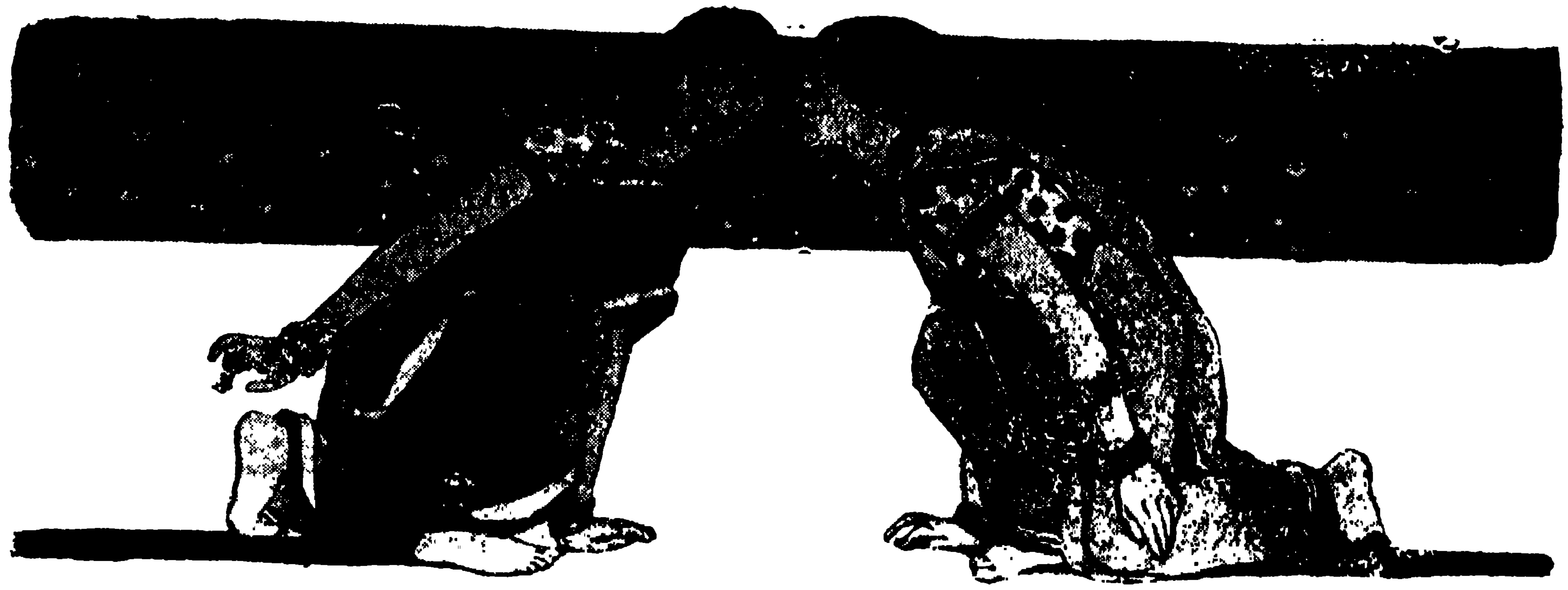

স্পর্শের প্রভাব

৯

কালীনাথ তোফা আরামে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিল। রণেন্দ্রের কৃপায় তাহার কোন অভাব ছিল না। রণেন্দ্র গ্রামে আসিয়াই তাহাকে বাগানবাড়ীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। সে আসিয়াই লোক-লস্করকে হাত করিয়া লইয়াছিল। তাহাকে সকলেই হুকুমবরদার বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। কেবল এক জন লোক তাহাকে বিশেষ আমল দেয় নাই। সে সনাতন মালী।

কালীনাথ সুচতুর এবং বিষয়বুদ্ধিতে পরিপক্ক ছিল। সে দুই চারি দিনের মধ্যেই রণেন্দ্রের বিষয়সম্পত্তির হদিশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। রণেন্দ্রের বিবাহিত জীবনের অনেক কিছুই সে জানিত। তাহার পর রণেন্দ্রের নিকট যখন সে জ্যোৎস্নাময়ীদের সম্বন্ধে সকল কথা শুনিল, তখন সে মনে মনে তাহার কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লইল। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এই মনোমালিন্যের অপার সাগর হইতে চতুর ডুবারী হইলে অনেক মণিমুক্তা আহরণ করিতে পারে, এ কথা সে বিলক্ষণ বুঝিয়া লইল। রণেন্দ্রকে সে ভালমানুষ অর্থাৎ 'বোকা' বলিয়া জানিত, এ জন্য সে প্রতি কার্য্যেই তাহার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। কিন্তু গোল বাধিল সনাতনকে লইয়া। বুড়া বড় দুষ্ট, তাহাকে যে রাজা উজীর মারিয়া ভুলান যায় না, তাহা সে দুই দিনেই বুঝিয়া লইয়াছিল।

এক দিন সে বাগানের লোক-লস্করকে দিয়া বাগান-বাড়ী পরিষ্কৃত করাইয়া লইবার সময় তাহাদিগকে আপনার পৈতৃক সম্পত্তির পূর্ব্ব-পরিচয় দিতেছিল। তাহাদেরও মস্ত জমীদারী ছিল, এইরূপ এক আধটি নহে, কত বাগানবাড়ী ছিল। জমীদারী করিয়া সে ঘুণ হইয়া গিয়াছে। সাধে কি রণেন্দ্র তাহাকে দেখাশুনা করিবার জন্য এখানে আনিয়াছে? কত সাধ্য-সাধনার পর তবে না সে সম্মত হইয়াছে! কেবল অত্যন্ত আপনার জন বলিয়া, আর তাহার মাথার উপর কেহ নাই বলিয়াই সে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া রণেন্দ্রের বিষয়সম্পত্তির তদারক করিতে আসিয়াছে। যে ভীষণ রকমের সব গলদ আছে, তাহার সংস্কারসাধন করিতে যে কত সময় ও পরিশ্রম দিতে হইবে, তাহা সে-ই জানে।

অবশ্য এ সমস্ত কথা রণেন্দ্র ও সনাতনের অসাক্ষাতেই যে হইয়াছিল, তাহা বলার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। সনাতন যখন বিস্মিত লোক-লস্করের প্রমুখাৎ সকল কথা অবগত হইল, তখন কেবল ঈষৎ হাস্য করিল, কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিল না। নির্জ্জনে সে কালীনাথের পূর্ব্ব-ইতিহাস স্মরণ করিল। জমীদার! জমীদারই বটে! তাহার সদাশিব বাবুর অন্নে যখন এই কালীনাথ প্রতি-পালিত হইত, তখন পাণ-চুরুটওয়ালা বা মণিহারী দোকান-দার অথবা লেমনেড-বরফওয়ালার তাগাদার চোটে তাহাকে অস্থির হইতে হইত, সে তখন বাবুর সহিত কলিকাতায় থাকিত। সে সকল দেনা তাহাকেই অনেক সময় মিটাইতে হইত, আবার কখনও কখনও মোটা রকমের দেনা হইলে তাহার বাবুর কাণে সে কথা উঠিত, তখন হাঙ্গামা মিটিত। রণেন্দ্র এ জন্য তাহার নামে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা দিয়া রাখিয়াছিল। কালীনাথ যখন শাল-আলোয়ানওয়ালা অথবা জামা-কাপড়ওয়ালার জন্য চেক কাটিতে আরম্ভ করিত, তখন চেকের বহর যে কোথায় গিয়া পৌছিত,

তাহা কালীনাথ বুঝিয়াও বুঝিত না। শেষে এমন হইত যে, পাওনাদার তাহার চেকের টাকা কখনও পাইত না। হ্যাণ্ডনোট কাটিতেও সে বিশেষ দক্ষ ছিল, কিন্তু তাহার হ্যাণ্ডনোটের টাকা কেহ কখনও পাইয়াছে বলিয়া সনাতন শুনে নাই। এ সকল দেনা অবশেষে রণেন্দ্রকেই মিটাইয়া দিতে হইয়াছিল। এমন একবার নহে, একাধিকবারই হইয়াছে। সেই আপদ আবার তাহার বাবুর স্কন্ধে ভর দিয়াছে, না জানি ইহার কি পরিণামই বা হয়! সনাতনের এই ভাবনাটা অন্যান্য চিন্তার সঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিল।

কালীনাথও মনে ভাবিত, এই বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্যটা তাহার জীবনের পূর্ব্ব-ইতিহাস অবগত আছে। উহাকে কিরূপে হাত করা যায়, এ বিষয়ে সে নানা ফন্দী খাটাইত। সনাতনকে বশ করিতে না পারিলে সে ত নিষ্কণ্টক হইতে পারিবে না। খাতাপত্র লইয়া বসিয়া সে এই কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া রণেন্দ্র ঝড়ের মত বেগে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "সমস্ত ঠিক ক'রে এলুম, তার জিনিষ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন তোমার সঙ্গে তাদের যা কিছু বোঝাপড়া। আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি। ম্যানেজার বাবু দু'চারদিনের মধ্যেই এসে পড়ছেন, তাঁর কাছে সব বুঝে সুঝে নিও, বুঝলে, কালীদা।"

কালীনাথ বলিল, "আরে বোসোই না, একবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ যে দেখছি। গাড়ী ত রাত্তির ৮টার আগে নেই, এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

রণেন্দ্র বলিল, "না দাদা, বসবার যো নেই, একবার ভট্টাচার্য্য-পাড়ায় যেতে হবে এখুনি, ওঁদের ওখানে একটা টিউবওয়েলের কথা পেড়েছিলেন, সেটার বন্দোবস্ত ক'রে যেতে হবে।"

কালীনাথ বলিল, "বাঃ, এ ত চমৎকার ব্যবস্থা। এই আমার উপরেই সব ভার দেওয়া হ'ল—আবার তা হ'লে—"

রণেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "ওঃ, তাও ত বটে! তা হোক, তবে এটা নিজেই বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যাব। আর—হাঁ দেখ কালীদা, খাতের গাজি বলছিল, ওদের পাঠশালের চালা-ঘরখানায় আর কুলুচ্ছে না। আমি মনে কচ্ছি, ওটা ফেলে দিয়ে খানতিনেক কোঠা-ঘর তুলে দেবো, কি বল?"

কালীনাথ হাসিয়া বলিল, "ডিক্রী-ডিসমিস সেরে ফেলে জিজ্ঞেস করছো, কি রায় দেবো—মন্দ নয়।"

রণেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, তা নয়! আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম ওটা, তবু তোমার মতটা একবার—"

কালীনাথ বলিল, "তোমার জিনিষ—তুমি যা ইচ্ছে করবে, এতে আবার আমার মতামত কি? হাঁ, ভাল কথা, ও গাঁয়ের বৈঠকখানা-বাড়ীর দরুণ যে ঘর ক'খানা স্কুল-ডিস্পেন্সারীর জন্যে দেওয়া হয়েছে, ওগুলো কি ঐখেনেই থাকবে, না ও দুটোর জন্যেও আলাদা কোঠা করতে হবে? আর লাইব্রেরীটা?"

রণেন্দ্র রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাইয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "না, আর দেরী করলে চলবে না—চললুম, কালীদা। যা করবার, তুমিই কোরো। ওগুলোতে সবে মাত্র ত হাত দিয়েছি আমি, এদ্দিন কর্ত্তাদের আমলের ব্যবস্থাই চ'লে আসছে বৈ ত নয়।"

রণেন্দ্র আর দাঁড়াইল না, যেমন ঝড়ের বেগে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই বাহির হইয়া গেল। কালীনাথ বদ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিল মাত্র। তাহার মুখচক্ষুতে তখন যে হিংসা-ঈর্ষ্যার কঠোর ভাব আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা মুহূর্ত্তে উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। বিধাতার কি অবিচার! এই হস্তিমূর্খের হস্তে তিনি কি বুঝিয়া এত বড় একটা অগাধ সম্পত্তির ভার দিয়াছেন! ইহারা কলসীর জল গড়াইয়া খাইতেই জানে, কি করিলে কলসী অহোরাত্র শীতল স্বাদু জলে পূর্ণ থাকে, তাহা ইহাদের মাথায় আসে না! যাউক সে কথা, বিধাতা যখন এত দিনের পর সুবিচার করিয়াছেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রে এত বড় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তখন সেও সেই বিশ্বাসের সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিবে না।

প্রথমেই পথের কাঁটা কয়টাকে না সরাইলে চলিতেছে না। কে এই মালীটা? বেতনভুক্ ভৃত্য—তাহার এত প্রভুত্ব কেন? এ কণ্টক উদ্ধার করিতে হইলে অন্য কণ্টকেরই প্রয়োজন। সে কে? কালীনাথ আপন মনে হাসিল। সে কণ্টকটি যে কে, তাহা সে পূর্ব্বাহ্নেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুই কণ্টকের

উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে উভয়ের সাহায্যে উভয়কেই সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে।

"কালী বাবু কি ডেকেছিলেন আমায়?" সনাতন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা কালীনাথ যে চমকিত হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু সে সংসারের খেলায় ঘুণ খেলোয়াড়, সহজে ভাবে অভিভূত হইবার পরিচয় সে দিবে না, ইহা নিশ্চিত। যাহার উচ্ছেদ-সাধনের সাধু কল্পনায় সে মনে মনে কত কি ফন্দী আঁটিতেছিল, হঠাৎ সে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, ইহাতে তাহার চমকিত হইবারই কথা; কিন্তু সে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিবলে বলীয়ান্। মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কে, সনাতন? হাঁ, ডেকেছিলুম তোমায় বটে। বাগানে ক'জন লোক খাটছে রোজ? তাদের নাম, ঠিকানা আর রোজের খাতা দিও আমায় কাল—একবার দেখে ব'লে দেবো, এখন থেকে কি ভাবে কায চলবে বাগানের। আর করালীকেও কাল সকালে খাতাপত্তোর নিয়ে বাগানে আসতে ব'লে দিও। এখন থেকে রোজ সকালে বাগানেই সেরেস্তা বসবে, তাকে জানিও।"

সনাতনের মুখখানা কালো হাঁড়ীর মত আঁধার হইয়া গেল। কিন্তু মুখের কথায় সে কোনও ভাবান্তরের পরিচয় না দিয়া কেবল ছোট একটি "হাঁ, তাই হবে" বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। কালীনাথ বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ, শোন! সামনের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা প্রায়ই বাগানে এসে দৌরাত্ম্য করে, ফুল তুলে নিয়ে যায়, গাছপালা ভাঙ্গে ব'লে শুনেছি। ওদের ও-সব করতে বারণ ক'রে দিও। বাগানে ঢুকতেই বা দাও কেন?"

সনাতনের মন এক্ষণে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে তেজোগর্ব্বদৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "যদিও তারা আর বাগানে আসে না, তবুও বলছি, বাবু যা বারণ করেন নি, আমি তা বারণ করতে পারবো না, কাউকে তা বারণ করতে দেবোও না। কালী বাবু, এই তোমায় ব'লে রাখলুম।"

ক্রোধে বলিষ্ঠ ভৃত্যের সর্ব্বশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল।

কালীনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কি বারণ করা হবে না হবে, তার হুকুম চালাবার মালিক তুমি নও। আজ থেকে আমার হুকুমমত সবাইকে চলতে হবে, এটা জেনে রেখো, সনাতন।"

সনাতনও দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "কারু অন্যায় হুকুম এ বয়সে কখনও তামিল করি নি, সে স্বভাবও আমার নেই। যে মালিক, সেও আমায় এমন অন্যায় হুকুম করতে সাহস করে নি কখনও, কালী বাবু।"

কালীনাথ বলিল, "রাগ দেখিও না, সনাতন, রাগে কোন ফল নেই। আমি যে ভাবে চলতে বলবো, তোমাদের সকলকেই এখন থেকে সেই ভাবে চলতে হবে।—বুঝলে? অনর্থক চেঁচা-মেচিতে ফল কি?" কালীনাথের ওষ্ঠের কোণে ব্যঙ্গ-মিশ্রিত মৃদু হাস্য-রেখা খেলিয়া গেল। সে বিন্দু-মাত্রও উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করিল না।

সনাতন করযোড়ে বিনীত স্বরে বলিল, "তা হ'লে আমায় ছুটী দাও, বাবু। আমি চ'লে যাচ্ছি কাল থেকে। তুমি অন্য লোক বন্দোবস্ত করো।"

সনাতন পুনরায় প্রস্থানোদ্যত হইল। হাতের পাশার ভিন্নরূপ দান পড়িল দেখিয়া কালীনাথ মুহূর্ত্তে ভাবপরিবর্ত্তন করিয়া হাসিমুখে বলিল, "আরে ছি সনাতন, বুড়ো বয়সেও তোমার রাগ গেল না? আমি যে পরখ করছিলুম তোমায়, তাও বুঝতে পার নি? কেন, এর আগে কতবার ত তোমায় এমনই ক'রে রাগিয়েছি। আরে ছ্যাঃ!" কালীনাথ সনাতনের পৃষ্ঠদেশে আদরের মৃদু করস্পর্শ করিয়া হাসিয়া আবার বলিল, "ওদের বাগানে আসতে মানা ক'রে লাভ কি আমার বল ত? তোমার বাবু যাদের আদর ক'রে বাগানে আসতে দিয়েছে, আমি তাদের বারণ করব? বিশেষ তুমি যখন ওদের এত আদর-যত্ন কর? আরে ছ্যাঃ! কাল থেকে বরং ওদের রোজ বাগানে আসতে ব'লে দিও। আর দেখ, মাঝে মাঝে ফুলের ফলের ডালি পাঠিয়ে দিও ওদের, বুঝলে?"

সনাতন একবারে আদরে গলিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, "তাই ত বলি বাবু, এও না কি কখনও হয়? যে বংশে বাবুর জন্ম, তার সঙ্গে তোমার রক্তের টান রয়েছে, এও কি মিথ্যে হয়? বাবু, ছেলেমেয়ে দুটি বড় ভাল! একবার যদি ওদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ"—

কালীনাথ আগ্রহভরে বলিল, "এর আর কি হয়েছে—কালই আমি ওদের সঙ্গে দেখা করবো। তবে ওরা ক'দিন দেখছি বড় একটা এ দিকে আসে না—ওরা কি এখানে নেই?"

সনাতন বলিল, "থাকবে না কেন, তবে হয় ত কায পড়েছে"—

কালীনাথ বলিল, "তা যাক্, এর পর না হয় এক দিন দেখাসাক্ষাৎ কোরবো। তুমি তা হ'লে মালীদের দেখো-শুনো। মানুষের রোজগুলো ঠিকঠাক ক'রে ফেলা যাবে হু'জনে, কি বল ?"

সনাতন হৃষ্টচিত্তে বলিল, "সে সব ঠিক ক'রে দেবো, বাবু। একবার ইষ্টিশানটা হয়ে আসি দৌড়ে।"

সনাতন নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। কালীনাথ তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে ক্রূর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র। তাহার পর আপন মনে মৃদুমন্দ হাস্য করিল। সে হাস্যের সহিত কি বিষ মিশ্রিত ছিল! এত সহজে যে তাহার কার্য্যোদ্ধারের ভিত্তিপত্তন হইবে, কালীনাথ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

১২

পাড়ায় হুলস্থূল, তারকদের বাড়ীর বৌ গত রাত্রি হইতে কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আজই তারকের দাদার কলিকাতায় আসিবার দিন, তারক সেই জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। সকাল হইতেই সে বাজার-হাটেই ব্যস্ত ছিল, সে জন্য সে সকালে কলের কাযে যায় নাই।

বেলা ৯টার পরেও যখন তারকের মা পুত্রবধূর কোন সাড়া পাইলেন না, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। তারকও সেই সময়ে বাজার করিয়া ফিরিল। মা ও পুত্র যখন চারিদিকে খুঁজিয়াও তরলার কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন হতাশ হইয়া দুই জনে বারান্দার উপর বসিয়া পড়িলেন। তারক কাতর-কণ্ঠে বলিল, "মা, কি হবে ?"

সারদাসুন্দরী মনে যাহাই ভাবুন, বাহিরে ঔদাসীন্যের ও তাচ্ছীল্য-বিরক্তির ভাব দেখাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "কি আবার হবে! আপদ গেছে, বালাই গেছে। মর, মর! গেলি ত গুষ্ঠী শুদ্ধ মুখ পুড়িয়ে গেলি কেন বল দিকি—"

তারক বাধা দিয়া বলিল, "অমন কথা বোলো না, মা, হয় ত রাগের মাথায় বাপের বাড়ী গেছে, একবার—"

সারদাসুন্দরী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আরে থাম বাপু তুই! বলে, জন্ম গেল—"

"বাবু তার হ্যায়—"বাহির হইতে গম্ভীর স্বরে পিওনের আওয়াজ আসিল। তারক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "তার ? কৈ দেখি।" এক লম্ফে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তারক লাল খামে মোড়া তার লইয়া ভিতরে আসিল। পিওন তাড়া দিয়া সহি লইয়া চলিয়া গেল।

তার পড়িতে পড়িতে তারক থর-থর কাঁপিয়া উঠিল—বুঝি অন্তরের জমাট-বাঁধা সপ্ত সমুদ্রের ক্রন্দন তাহার নয়ন ছাপাইয়া নামিয়া আসিল। সে ভাবিয়াছিল, হয় ত তাহার বৌদিদি কোথা হইতে এই তার করিয়াছে। কিন্তু গত রাত্রিতে যে গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার পক্ষে এই অল্প-সময়ের মধ্যে যে তার পাঠানো সম্ভব নহে, এ কথাটা সে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু এ কি ভীষণ সংবাদ!—"তোমার ভ্রাতার সাংঘাতিক কলেরার আক্রমণ হইয়াছে, এখনই চলিয়া আইস।"

বিধাতার এ কি অভিসম্পাত! বজ্রের উপর আবার বজ্রাঘাত! তারক সংসারে আঘাতসহনে একবারেই অসমর্থ—তারকনাথের উপরে এ কি আঘাতের উপর আঘাত! মা বলিলেন, "কি রে, কি হয়েছে ? অমন কচ্ছিস কেন ?"

তারকের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কতক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইবার পর তারক যখন তারের কথা জননীকে নিবেদন করিল, তখন সারদাসুন্দরী ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহার কান্নায় যোগদান করিলেন। তারক পাড়ায় বাহির হইয়া একখানা রেলের টাইম টেবল যোগাড় করিয়া জানিয়া লইল, বেলা আড়াইটার পূর্ব্বে গাড়ী নাই।

সে দিন আর বাড়ীতে উনান জ্বলিল না, মাতাপুত্র জল-স্পর্শও করিল না। তারক কিছু ডালিম, বেদানা সংগ্রহ করিতে গিয়া শুনিল, পাড়ার গুপে গুণ্ডাও কল্য রাত্রি হইতে বাড়ী আসে নাই। তাহার সরল মন তথাপি কু গাহিল না। কিন্তু তাহার জননী যখন সব কথা শুনিলেন, তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখছিস কি, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশী আমাদের সর্ব্বনাশ

ক'রে গেছে, তার পাপেই আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে।"

ইহার পর যখন সারদাসুন্দরী পুত্রবধূর শয়নকক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া তাহারই স্বহস্ত-লিখিত এক-খানি লিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, তখন সকল সন্দেহেরই অবসান হইল। সেই পত্রে পুত্রবধূ তাহার দেবরকে জানাইয়াছে, সে জন্মের মত তাহাদের সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তাহাকে পাড়ারই কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দয়া করিয়া নরক হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে যেন আর অনুসন্ধান করা না হয়। তারকের মনে হইল, যেন তাহার হস্ত-পদ অবশ হইয়া আসিতেছে, পৃথিবীটা এত বিশ্রী! সারদাসুন্দরীর মুখে কেবল উচ্চারিত হইল, অকৃতজ্ঞ! এমন যে ভ্রাতৃজায়া-অন্তপ্রাণ দেবর—তাহারও মুখ চাহিল না? ছি ছি!

ষ্টেশনের দিকে যাত্রাকালে তারকনাথ পাড়ার লোকদের মধ্যে কাণাঘুষা হইতে দেখিল। এক এক স্থানে এক একটা ছোট জটলা হইয়াছে, সকলেই আগ্রহভরে কথা কহিতেছে, কিন্তু তারককে দেখিলেই সকলে নীরবতা অবলম্বন করিতেছে। তারক বুঝিতে পারিল, অনেকেই তাহার প্রতি করুণা ও কৃপার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! কেন, তাহা বুঝিতে তারকের বিশেষ কষ্ট হইল না। তাহার মুখ চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল।

শিবের অসাধ্য রোগ—গিয়া দেখিতে পাইব কি,—এই চিন্তাই সারাপথ তারকনাথকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। রোগীর কক্ষে উপনীত হইয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। পরিত্যক্ত কক্ষের মধ্যে ছিন্ন মলিন শয্যায় তাহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ মন্মথনাথ শয়ান রহিয়াছে। তাহার চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, মুখমণ্ডল আসন্ন মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট। ব্যাধিপীড়িত রোগীর মলমূত্র পরিষ্কৃত করিবার লোক ত নাই-ই,—মুখে এক বিন্দু জলদান করে, এমন কেহ নাই। গ্রাম প্রায় জনশূন্য, নায়েব-গোমস্তারা তাহাকে তার পাঠাইয়া পলায়ন করিয়াছে, বেলদার পেয়াদারাও অন্তর্ধান করিয়াছে, গ্রাম শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে। ক্রোশ দুই দূরে এক জন ডাক্তার আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে ডাকিয়া আনে কে? আশ্চর্য্য এই মানুষের প্রাণ! এই অনাদৃত পরিত্যক্ত অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মন্মথর দেহে প্রাণ এখনও ধুক্ ধুক্ করিতেছে!

প্রথমটা তারকনাথ ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভ্রাতার বুকে মুখ লুকাইয়া খুব খানিকটা কাঁদিল, তাহার পর কঠোর কর্ত্তব্যপালনে উদ্যত হইল। অভুক্ত অস্নাত অবস্থাতেই সে স্বহস্তে রোগীর কক্ষের সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত করিল। কাছারীর সম্মুখেই বৃহৎ পুষ্করিণী, কাছারীতে আসবাব পত্রেরও অভাব ছিল না। কাযেই রোগীর পরিষ্কৃত শয্যা সংগৃহীত হইল, গ্রামের একখানি মাত্র মুদীর দোকান হইতে অবশিষ্ট অভাব যথাসম্ভব দূর করা হইল। তারকনাথ ভ্রাতাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিয়া স্নানান্তে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে চলিয়া গেল—সেখানে কলেরার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই গ্রামে সে মোদকের দোকানে যথাসম্ভব ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিয়া এক জন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তারবাবু হোমিওপ্যাথ, কখনও কোনও কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছেন কি না, কেহ জানে না। কিন্তু তথাপি তাঁহার হাতযশ ছিল। তিনি ভিজিট ও পাল্কীভাড়া পকেটস্থ করিবার পর বলিয়া গেলেন, যেন রোগীকে অতি অবশ্য সদরের হাঁসপাতালে পাল্কীযোগে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা হয়। কারণ, রোগীর নাড়ীর অবস্থা যেরূপ, তাহাতে 'কেসটা' তিনি নিজের দায়িত্বে হাতে রাখিতে ভরসা করেন না। কথাটা শুনিয়া তারকের মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, কাযে তাহা সফল করা তত সহজ নহে। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে নর-যান সংগ্রহ করা দুষ্কর। ডাক্তার বাবুর বেতনভুক্ বাহক ছিল বলিয়াই তিনি নরযান রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা জুটিত না। গোযানে স্থানান্তরিত করা নিষেধ। একমাত্র ডুলী ভরসা, কিন্তু তাহাতে কলেরা রোগে আক্রান্ত শয্যাশায়ী রোগীকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। কাযেই মন্মথকে স্থানান্তরিত করা ঘটিয়া উঠিল না।

তারক সেই যে ভ্রাতাকে লইয়া যমের সহিত যুদ্ধে বসিল, প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় সাত দিন সাত রাত্রি সেই ভাবেই কাটাইল। ডাক্তার মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন, বলিতেন, 'তারক, এই ভাবে সেবা করিয়া

আপনার জীবনকে বিপন্ন করিতেছ।' তারকের মুখের কোণে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিত!

কিন্তু মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে। তারক আপনার মনের মত করিয়া যাহা পরম যত্নে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, বিধাতার একটি নির্ম্মম আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। অষ্টম দিবসে মন্মথনাথ এপারের সকল জ্বালাযন্ত্রণা এড়াইয়া ওপারের অজানা দেশে চলিয়া গেল!

তারকের সৌভাগ্য যে, এই দারুণ আঘাত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অগ্রজের সংকারের পর সে বাসায় ফিরিয়া সেই যে অসুস্থ—অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে সে দুই তিন দিন আর উঠিয়া বসিতে পারে নাই, তাহার চৈতন্যও ফিরিয়া পায় নাই। সংকারের সময় সে কাহারও সাহায্য পায় নাই, একাকী অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। জ্ঞানসঞ্চার হইলে সে নয়ন মেলিয়া দেখিয়াছিল, কে তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতেছে। কে সে? সে কি তাহারই পাড়ার রণেন বাবু?

১১

দেহের খাদ্য যেমন অন্ন-জল, মনের খাদ্য তেমনই সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যে মনের পুষ্টি, আত্মার তৃপ্তি। যিনি চিরসুন্দর, তাঁহারই ত এই বিচিত্র সৃষ্টি!

কিন্তু এমন এক একটা মানুষ থাকে, যাহাকে সৌন্দর্য্য আকর্ষণ করিতে পারে না। এই ভোগায়তন দেহের তৃপ্তিতে তাহার আত্মা তৃপ্ত হয়—টাকা আনা পাই নাড়া-চাড়ায় সে যত আনন্দ পায়, অথবা রসনাতৃপ্তিকর লোভনীয় খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদনে সে যত তৃপ্তি অনুভব করে, প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাহাকে তত আনন্দ দিতে পারে না।

কালীনাথ চাঁপাপুকুরে আসিবার পর একাধিকবার জ্যোৎস্না ও সুধাংশুকে দেখিয়াছে। রূপে কে না মুগ্ধ হয়, আকৃষ্ট হয়? সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্ম হইতে কেহ সহজে মন বা নয়ন ফিরাইতে পারে না। সে পুষ্প চয়ন করিয়া ভোগের ইচ্ছা মনে উদয় হইতে না পারে, কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নিদর্শন বলিয়া—দেবতার পূজার অর্ঘ্য বলিয়া তাহার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ায় ত কোন বাধা নাই। কিন্তু কালীনাথ সে দৃষ্টিতে কখনও কোন প্রাণীকে বা উদ্ভিদকে দেখে নাই। সৃষ্টির তাবৎ পদার্থকেই সে দেখিয়া আসিয়াছে টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে—কিসে সেই পদার্থ হইতে তাহার লাভের সুবিধা বা সুযোগ হইতে পারে, তাহাই তাহার লক্ষ্যের বিষয় ছিল। সে ভ্রাতা-ভগিনীর অতীত ইতিহাসের বিষয় অবগত ছিল। কিসে ইহাকে মূলধনরূপে খাটাইয়া সে দুই পয়সা সুদ আদায় করিয়া আপনার লাভের খাতায় জমা দিতে পারে, সে তাহারই চেষ্টায় অবহিত হইয়াছিল। এই সাধু উদ্দেশ্য লইয়া সে একাধিকবার জ্যোৎস্না ও সুধাংশুর সহিত আলাপ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়াছিল। সুধাংশুর সহিত আলাপ জমাইতে পারিলেও এই স্বল্পভাষিণী তরুণীর সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পায় নাই। বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের তরুণীর সহিত আলাপ করার অসুবিধা অপর্য্যাপ্ত। তাহা ছাড়া জ্যোৎস্না সর্ব্বপ্রযত্নে কালীনাথকে পরিহার করিয়াই চলিত। ইহাতে কালীনাথ মনে মনে তাহার প্রতি আদৌ প্রসন্ন হইতে পারে নাই। মেয়ে বাঙ্গালী হিন্দুঘরের প্রচলিত অবরোধ-প্রথা তেমনই ভাবে মানিয়া চলিত না, তাহা কালীনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রয়োজন হইলেই প্রকাশ্যে সে পথে বাহির হইত এবং অপরের সহিত কথাও কহিত। সোনা মালীর সহিত তাহার আলাপটা সকলের অপেক্ষা অধিক। তবে? এই গর্ব্বিতার এত দর্প-দম্ভ কিসের জন্য? কে সে? তাহার পিতা ত গ্রামের একটা সামান্য লোক! হিংসা ও ঈর্ষায় কালীনাথের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিত। ইহার সমুচিত প্রতিফল না দিলে কালীনাথের প্রাণ তৃপ্ত হইতে পারে না। কালীনাথ উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোথায় আঘাত দিলে এ দর্প চূর্ণ হইবে, তাহাই সে বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তবে প্রকাশ্যে বিশেষ সদ্ভাব রাখিতে হইবে, এমন ভাবে না চলিলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তাহা কালীনাথ বহুবার অতীত জীবনে বুঝিয়াছে।

এক দিন সে রাজেশ্বর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ-পরিচয় করিল। রাজেশ্বর বাবু তাহাকে রণেন্দ্রের আত্মীয় বলিয়া জানিতেন, কাযেই প্রথমে আলাপে সম্মত হন নাই। কিন্তু সে যখন রণেন্দ্রের ও রণেন্দ্রের বংশের অশেষ নিন্দাবাদ করিয়া তাহার নিজের বংশের সহিত

রাজেশ্বর বাবুর নিকট-সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিল, তখন রাজেশ্বর বাবু তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত আকৃষ্ট হইলেন। শেষে আলাপ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হইয়াছিল, কথার কৌশলে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার কালীনাথের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সুধাংশু ইহার পূর্ব্বে কত দিন দিদির নিকট তাহার কত গুণগান করিয়াছে এবং তাহার সহিত বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু জ্যোৎস্না কোনও দিন এ বিষয়ে উৎসাহ অনুভব করে নাই। কেন যে দেখিলেই কালীনাথের প্রতি তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিত, তাহা জ্যোৎস্না নিজেই বুঝিতে পারিত না। ঘনিষ্ঠতা দুই তিন মাসের মধ্যে এতই জমিয়া উঠিল যে, রাজেশ্বর বাবু কালীনাথের রাজু কাকায় এবং কালীনাথ ভ্রাতা-ভগিনীর কাছে কালীদাদায় পরিণত হইল।

কিন্তু এক বিষয়ে কালীনাথ রাজেশ্বর বাবুকে কিছুতেই সম্মত করাইতে পারে নাই। বাগানের ফল-মূল তরি-তরকারী বা পুষ্করিণীর মাছ সে এক দিনও তাঁহাকে উপহার দিয়া গ্রহণ করাইতে পারে নাই। এ বিষয়ে রাজু বাবু তাহাকে তীব্র কণ্ঠে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। এক দিন বালক সুধা কালীদার কাছে একটা ফুলের তোড়া লইয়া পিতার নিকট যে ভর্ৎসনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার জীবনে বোধ হয় তেমন আর কখনও পায় নাই। বালক বিস্মিত হইয়া ভাবিত, কেন এমন হয়? এ বিষয়ে তাহার পিতাও যেমন কঠিন, তাহার সহোদরাও তেমনই কঠিন—কেন এই বিরাগ?

রণেন্দ্র ছয় মাস গ্রামত্যাগ করিবার পর এক দিন বৃদ্ধ সনাতন জ্যোৎস্নাময়ীকে সঙ্গোপনে একখানি পত্র দিয়া সকাতরে বলিল, "দিদিমণি, এই বুড়োর অনুরোধ, এ চিঠিখানা একবার পড়ো। আমার অনুরোধ—জান না, এ চিঠিখানা পড়লে একটা মহাপ্রাণী বাঁচলেও বাঁচতে পারে।" সনাতন দাঁড়াইল না, কাযে চলিয়া গেল।

জ্যোৎস্নার হৃৎস্পন্দন অকারণে দ্রুত হইয়া উঠিল। উপরের নাম ঠিকানা—"কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী, সাং চাঁপাপুকুর!—হস্তাক্ষর পরিচিত—মুক্তাপাঁতির ন্যায় একটির পর একটি সুসজ্জিত! ইহার পূর্ব্বে ডাক-যোগে এমন ত একাধিক পত্র তাহারই নাম-ঠিকানায় আসিয়াছে, কিন্তু সে না পড়িয়াই সেগুলি ছিন্ন অথবা অগ্নিসাৎ করিয়াছে। তবে আবার কেন? সনাতন এমন অনুরোধ করিল কেন? ইহা তাহার অত্যন্ত অন্যায়!

জ্যোৎস্না একবার পত্রখানি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন সনাতনের উপর—ততোধিক পত্র-লেখকের উপর—তাহার সমস্ত মনটা ক্রোধে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে নখাগ্রে দৃঢ়ভাবে ধৃত পত্রখানি যেন আপনিই তাহার মুষ্টিবদ্ধ হইল, সে কি ভাবিয়া আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। গবাক্ষ-সান্নিধ্যে একখানি জলচৌকী ছিল, জ্যোৎস্না প্রায়ই তাহার উপর আসন পাতিয়া বসিয়া বাহিরের গাছপালা দেখিত, মুক্ত আকাশে পাখী উড়িয়া যাইতে দেখিত; বৃষ্টিধারায় স্নাত বৃক্ষশাখায় পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন অথবা আকাশে বিচিত্র রামধনুর শোভা দেখিয়া তাহার চিত্ত আনন্দরসে অভিষিক্ত হইত। মুষ্টিবদ্ধ পত্রখানি লইয়া জ্যোৎস্না আসন গ্রহণ করিল। তাহার মনের দ্বন্দ্ব তখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে—পত্র দূরে নিক্ষেপ করি কি না! তাহার মনে হইল, যেন অতীতে কত যুগযুগান্তের অন্তরালে তাহার সংশয়াকুল মনের মাঝারে এই দ্বন্দ্বই চলিয়াছিল, যেন এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, অথচ তাহার মীমাংসা হয় নাই!

মুষ্টি হইতে পত্র মুক্ত হইল—একবার পত্র পাঠ করিবার ইচ্ছা ক্ষণেকের জন্য জাগরিত হইল, তখনই আবার পত্র মুষ্টিবদ্ধ হইল। একাধিকবার এইরূপে ইতস্ততঃ করিবার পর জ্যোৎস্না পত্রাবরণ উন্মোচন করিল,—সে সময়ে তাহার চম্পকাঙ্গুলীগুলি কম্পিত হইতেছিল, বক্ষ স্পন্দিত হইতেছিল।

ভিতরে সেই সজ্জিত মুক্তাক্ষরশ্রেণী—দৃষ্টিপাতমাত্র জ্যোৎস্নার মুখখানি কুঙ্কুমরাগ-রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সলাজ চকিত দৃষ্টি কক্ষের চারিদিকে নিপতিত হইল। বক্ষের দ্রুতস্পন্দন কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে জ্যোৎস্না পাঠ করিল:—

"জ্যোৎস্না!

ক্ষমা! যদিও অপরাধ আমার স্বকৃত নয়, তবুও পূর্ব্বপুরুষের হয়ে ক্ষমা চাইছি। অপরাধের কি ক্ষমা নেই? পরের পাপে আমার জীবনে ব্যর্থতা এনে দিচ্ছ, এ কেমন বিচার?

ছ'মাস চেষ্টা করেছি, ভুলতে পারি নি। কেন আবার দেখা দিয়েছিলে? বাল্য ও কৈশোরে যে বন্ধন বিধাতার বিধানে দৃঢ় হয়েছিল, মানুষের চেষ্টায় সে বন্ধনকে শিথিল

করবার আয়োজন কম ছিল না। কালের প্রভাবে কৈশোরের স্মৃতি একরকম ক'রে হয় ত চাপা প'ড়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুষ্পিত যৌবনে আবার কেন দেখা হ'ল? সে দেখার স্মৃতি—যাক্। একটা ভিক্ষে চাইছি;—ক্ষমা। যদি সে ভিক্ষা দাও, তা হ'লে একটা ছত্র—সামান্য ক'টা অক্ষর লিখে জানিও। এই আমার শেষ লেখা! জানি না, উত্তর পাব কি না। আগে যত কিছু লিখেছি, জবাব পাই নি, তাই ডাকে না দিয়ে সোনাদার হাতে দিয়ে পাঠালুম। একটা কথা ভেবে দেখো,—শুনেছি, তুমি শিক্ষিতা—স্বামী ব'লে কি আমার কোন অধিকার নেই? স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ এ জগতে কেউ ভেঙ্গে দিতে পারে কি? -ইতি

বর্গেন্দ্র।"

পত্র দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ করিয়া জ্যোৎস্না বাহিরে শূন্যাকাশের দিকে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টি কোনও দূর-দূরান্তরের অতীতের অন্তস্তলে গিয়া স্পর্শ করিল কি সম্মুখের অনন্ত অন্ধকারের পাতালগর্ভের তলদেশ অন্বেষণ করিল, তাহা সেই বলিতে পারে। তাহার হৃদয়ে তখন সপ্ত সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইতেছিল কি?

পত্রখানি আবার মুষ্টিমুক্ত করিয়া সে আর একবার পাঠ করিল। পড়িতে পড়িতে তাহার দীর্ঘায়ত নয়ন দুইটি নিমীলিতপ্রায় হইয়া আসিল। হঠাৎ মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আসন ছাড়িয়া সে কক্ষমধ্যে দ্রুত পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, পত্র মুষ্টিবদ্ধ হইয়া পিষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। জ্যোৎস্না গবাক্ষপার্শ্বস্থ কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল, তাহার পর দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া বাপীতটের অভিমুখে চলিয়া গেল। কক্ষমধ্যে যে তাহার স্বামীর পত্র পড়িয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল, তাহা তাহার মনেই রহিল না। ক্ষণপরে চোরের মত সঙ্গোপনে পা টিপিয়া একটি উল্কীবিভূষিতা নারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানি লইয়া অঞ্চলে লুকাইয়া তেমনই চোরের মত কক্ষত্যাগ করিল। সে জ্যোৎস্নাদের নূতন ঝি!

পত্রবাহিকা অপরের অলক্ষ্যে নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহত্যাগ করিল। সম্মুখের বাবুদের বাগানের অপর পার্শ্বস্থ ভগ্ন প্রাচীরের ক্ষুদ্র জীর্ণ দ্বার দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। সরোবরের সোপানে বসিয়া যখন জ্যোৎস্না বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র বীচিমালার দিকে স্থির দৃষ্টি রক্ষা করিয়াও সে দিকে দেখিতেছিল না, তখন তাহার অলক্ষ্যে ষড়যন্ত্রের জাল রচিত হইতেছিল, তাহা ত তাহার ঘুণাক্ষরেও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না! [ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র

পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের কৃতী পুত্র শ্রীমান্ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-সি-ই এই বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বি-সি-ই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছেন, পরন্তু আই-সি-ই পরীক্ষাতেও তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রই এই উভয় পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। ৩ হাজার ৫ শত টাকার 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' বৃত্তি পাইয়া এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করিবার জন্য তিনি বিলাত যাত্রা করিতেছেন। প্রবাসে বাঙ্গালী ছাত্রের এই কৃতিত্বে বাঙ্গালীমাত্রই গৌরব অনুভব করিবে সন্দেহ নাই। বিদেশে বিদ্যার্জ্জনের পর দেশে ফিরিয়া তিনি দেশজননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই কামনা।

সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি

কথায় বলে, ধরিয়া বাঁধিয়া প্রেম হয় না। অটোয়ার সাম্রাজ্য-বৈঠকে মাতৃভূমি (Mother country) ও তস্যা কন্যাগণের (Dominions) কত সম্ভাষণ আলিঙ্গন হইল, কিন্তু ফল যে বিশেষ কিছু হইল, তাহা মোট জমাখরচের হিসাব দেখিয়া মনে হয় না। বৃটেনের নষ্ট-ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্ধারসাধনই যে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, নতুবা বৃটেন যে এই 'মাগ্‌গি গণ্ডার' দিনে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে তীর্থ করিতে যান নাই, তাহা নিশ্চয়। তবে ঐ সঙ্গে মেয়েদের ঘর-সংসারও যাহাতে স্বচ্ছ সচল অবস্থায় চলিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হয়, সে দিকেও লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু মেয়েরা এখন বড় হইয়াছে, তাহারা যে যাহার ঘরের গৃহিণী, বৃহৎপরিবার—বিস্তর ছেলেপুলে লইয়া নিজেদেরই ঘর সংসার করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন কি তাহারা আর বুড়া মায়ের দুঃখবেদনা তত বুঝিতে পারে? আগে আপনার ছেলেপুলেকে খাওয়াইয়া শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া তবে ত মায়ের সঙ্গে কথা, মায়ের ব্যথা দেখা!

শুনা যাইতেছে, শেষ মুহূর্ত্তে আপোসে উভয় পক্ষের ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটা বিলিবন্দেজ হইয়াছে। কিন্তু মাঝে যখন খুবই কথাকাটাকাটি চলিয়াছিল, তখন পরস্পর স্নেহ-ভক্তির মধ্য হইতে স্বার্থের বোটকা গন্ধ কিছু যে উঁকিঝুঁকি মারে নাই, তাহাই বা বলা যায় কিরূপে? বৃটিশ পণ্য কানাডায় কাটতির সুবিধা করিয়া দিবার কথায় কানাডা নিজের কাঠের কারবারের কথা, গমচালানির কথা, লৌহ ও ইস্পাতের কারবারের কথা এবং অন্য অনেক কথা তুলিয়াছিল। রাসিয়ার কাঠের কারবার বড় ফালাও রকমের, উহার সহিত প্রতিযোগিতায় কানাডা দাঁড়াইতে পারে না। কাজেই কানাডা প্রার্থনা করিল, রাসিয়ার কাঠের কারবারের উপর এমন চড়া রকমের শুল্ক নির্দ্ধারণ করা হউক, যাহার ফলে কানাডার দরে রাসিয়া আর বৃটেনকে কাঠ সরবরাহ করিতে পারিবে না। এমন আবদার আরও অনেক ছিল। মাঝে এমন খবর আসিয়াছিল যে, কথাবার্ত্তা বুঝি ভাঙ্গিয়াই যায়। তবে শেষের দিকে কয়েকটি বৈঠক বসাইয়া আপোষের চেষ্টা করায় কতকটা সুরাহা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ একটি Economic co-operation Committee বসিয়াছিল। ঐ কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিলাতে যে Empire Marketing Boardএর সৃষ্টি হইয়াছে, উহা সাম্রাজ্যের সকল অংশের বাজারে পণ্য-বিক্রয়ের সুযোগ সুবিধা করিয়া দিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবে। এই boardটি খাস বৃটেনের অর্থে পুষ্ট হইয়াছে।

তাহার পর এক Commitee of Commercial relationsএর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঐ কমিটী আপনার স্বজাতীয়গণের (Most favoured nations) মধ্যে সম্বন্ধ ও সন্ধিসর্ত্ত সম্বন্ধে একটা আপোষ ব্যবস্থার উপায় নির্দ্ধারণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।.

আর একটি কমিটীর নাম Monetary policy committee. ঐ কমিটী একটি সাম্রাজ্যব্যাঙ্ক (Empire Central Bank) প্রতিষ্ঠার এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র পণ্যের মূল্য হ্রাসের চেষ্টায় অবহিত হইয়াছিল।

এই সকল কমিটী প্রতিষ্ঠার ফলে এ্যাংলো-কানেডিয়ান চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হইবার পথে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তবে কি ভাবে চুক্তি অনুসারে কার্য্যারম্ভ হইবে, তাহার সম্বন্ধে এখনও পাকা নিয়ম-কানুন গঠিত হয় নাই। প্রতিনিধিরা স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিবেন। যাহাই হউক, যে যাহার স্বার্থ-সংরক্ষণ না করিয়া যে চুক্তিবদ্ধ হইবেন, এমন আশা করা অসম্ভব।

কাযের মানুষ

আইরিশ প্রেসিডেন্ট মিঃ ডি ভ্যালেরা কেবল যে কথা-কাটাকাটিতে শ্রেষ্ঠ বৃটিশ রাজনীতিকদের সমকক্ষ তাহা নহে, যতই দিন যাইতেছে, ততই দেখা যাইতেছে যে, তিনি বিলক্ষণ কাযের মানুষও বটে। বৃটেনের মত অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশীর সহিত তাঁহার ক্ষুদ্র আয়ার্ল্যাণ্ডের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হওয়ার ফলে তাঁহার দেশকেই যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, এ কথা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, আর তাই সেই জন্য পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুতও হইয়াছিলেন। স্বদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য পুনর্গঠনের জন্য তিনি 'ডেলের' অর্থাৎ আইরিস পার্লামেন্টের সদস্যদের নিকট বিস্তর অর্থব্যয়-মঞ্জুরী চাহিয়াছিলেন। 'ডেল' উহা মঞ্জুরও করিয়াছেন। টাকা হাতে পাইয়া ডি ভ্যালেরা উহার সদ্ব্যবহারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে নানা পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহাতে বৃটিশ সরকারের অতিরিক্ত শুল্ক নির্দ্ধারণের ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের পণ্য কাটতি হইবার পথে অন্তরায় উপস্থিত না হয়, সেদিকে তিনি খরদৃষ্টি রাখিতেছেন। বৃটিশ কয়লার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন না বলিয়া তিনি জার্ম্মাণীর রুর এবং পোলাণ্ড প্রদেশ হইতে কয়লা আনয়ন

করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং দেশের নষ্টপ্রায় নানা কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে নানারূপে সাহায্য দান করিতেছেন। এ পথেও যে, তাঁহাকে নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইতেছে না, তাহা নহে। বিমান-ডাকে গত ২৩শে জুলাই রাজধানী ডাবলিন সহর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহের প্রচারকার্য্যের ফলে আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের বিপক্ষে যুরোপের কোন কোন দেশ পক্ষপাতদোষদুষ্ট হইয়া পড়িতেছে। বৃটিশ কয়লার উপর আয়ার্ল্যাণ্ড অতিরিক্ত শুল্ক বসাইবার ফলে ইতিমধ্যেই আয়ার্ল্যাণ্ডে কয়লার মূল্য টন-করা অর্দ্ধ ক্রাউন মুদ্রা চড়িয়া গিয়াছে। এদিকে পোলাণ্ড হইতে কয়লা আমদানির সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেলেও এখন পোলাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডকে কয়লা দিতে চাহিতেছে না। আইরিশ পক্ষ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইহার মূলে বৃটিশ সংবাদপত্রের প্রচার-কার্য্য এবং বৃটিশ সরকারের গুপ্ত চাপ বিদ্যমান। সরকারী সংবাদপত্রেই প্রকাশ,—"পোলাণ্ডের সরকার পোলাণ্ডের কয়লার খনির মালিকদিগকে আইরিশ ফ্রি ষ্টেটে কয়লা সরবরাহ করিবার সমস্ত চুক্তি নাকচ করিতে আদেশ দিয়াছেন।" ফ্রি ষ্টেটে এখন পোলাণ্ডের কয়লা খনিসমূহের যে সকল এজেণ্ট রহিয়াছেন, তাঁহারা দেশ হইতে তার পাইয়াছেন যে, "রাজনীতিক কারণে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।" ইহাতে অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, বৃটিশ সরকার পোলাণ্ডের সরকারের উপর এ বিষয়ে চাপ দিয়াছেন।

এ কথা সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক, আয়ার্ল্যাণ্ডের ডি ভ্যালেরার দল কিন্তু ইহাতে বৃটিশ সরকারের উপর আরও অধিক জাতক্রোধ হইয়াছেন। তাঁহারা ভয়-প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,—"আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত এরূপ চালাকী খেলিলে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। মনে থাকে যেন, মার্কিণ যুক্তরাজ্যে এবং কানাডায় আইরিশ জাতীয় আমেরিকানের সংখ্যা কম নহে। যতদিন না আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি সুবিচার হইবে, ততদিন উহারা স্ব স্ব সরকারের উপর চাপ দিয়া বৃটেনের সহিত কোন রূপ আপোষ চুক্তি করিতে দিবে না; মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে বৃটেনের নিকট সমর-ঋণের প্রাপ্য এক পয়সাও ছাড়িয়া না দেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে আইরিশ-আমেরিকানরা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না।"

এইরূপ ভয়-প্রদর্শন চলিতেছে। এ অশান্তি ও অসন্তোষ উদ্যার কবে অবসান হইবে কে জানে? অন্ততঃ চার্চ্চহিল বর্দারমিয়ার শ্রেণীর সাম্রাজ্যের অনিষ্টকারী দাম্ভিক 'কিপলিং যুগের' সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাধান্য থাকিতে যে হইবে না, ইহা নিশ্চিত।

আকাশ-কুসুম

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হুভার যুরোপের শক্তিপুঞ্জকে খুব শাসাইয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি এখনও অস্ত্র-সংবরণ না করেন এবং তাহার ফলে ব্যয়-সঙ্কোচসাধন করিয়া স্ব স্ব দেশ ও জাতিগঠনমূলক কার্য্যে মনোযোগ না দেন, তাহা হইলে মার্কিণ কাহারও নিকট সমর-ঋণের এক কপর্দ্দকও ছাড়িয়া দিবে না। কেবল ইহাই নহে, তিনি সকলকে সলা-পরামর্শ করিয়া একযোগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। যেন পণ্যের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি করা তাঁহাদের হাত ধরা! প্রতীচ্যের এ সব রাজনীতিক চালবাজীর যে কোনও মূল্য নাই, তাহা মার্কিণ মুল্লুকের সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন আসন্ন দেখিয়া সহজেই বলা যায়। প্রেসিডেণ্ট হুভার হাঁক দিয়া যুরোপীয় জাতিনিচয়কে পরস্পর ঋণদানের এবং কম সুদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাও প্রতীচ্যের 'ডিপ্লোমেসির' এক অঙ্গ। উহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে কেহ এতদিন প্রেসিডেণ্ট হুভারের 'উপদেশের' অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া জগৎটাকে জাহান্নামে পাঠাইবার পথ প্রশস্ত করিত না। প্রেসিডেণ্ট হুভার নূতন কিছু করেন নাই, প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজনীতিকরা সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে স্ব স্ব পদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে যেমন মস্ত মস্ত আদর্শের বুলি আওড়াইয়া থাকেন, তিনি তেমনই করিয়াছেন। ইহাতে বাহবা দিবার কিছুই নাই।

প্রতীকারের উপায় কি

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হুভার দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া আপনার পারিশ্রমিকের মধ্য হইতে ১৫ হাজার ডলার মুদ্রা স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করিয়াছেন। জাপানের কোন কোন রাজপুরুষ এবং রাজবংশীয় এই ভাবে ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। বৃটেনের রাজবংশও রাজার দৃষ্টান্তে যথাসম্ভব বিলাসিতা বর্জ্জন করিতেছেন, ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে।

খৃষ্টান রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মজগতের গুরু রোমের পোপ একাদশ পায়াস (Pius xi) তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে feast of the Sacred heart পর্ব্বটি জগতের পাপবৃদ্ধির জন্য অনুতাপ ও প্রার্থনাকল্পে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আশা, জগতের অন্যান্য খৃষ্টানরাও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

পোপ বলিয়াছেন,—"গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর হইতে জগদ্বাসীর দুঃখ বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা অরাজকতা চাহে, তাহারা এই সুযোগে অনর্থ ঘটাইবার প্রয়াস পাইতেছে। এই হেতু শান্তি বিপন্ন হইয়াছে এবং বিপ্লব ও অরাজকতা সমাজের মাথার উপর প্রকাণ্ড পর্ব্বতের মত নামিয়া আসিতেছে।"

ইহার কারণ কি? জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় যখন প্রবল প্রতীচ্য জাতিসমূহের মধ্যে সাম্রাজ্যিকতা, ঔপনিবেশিক অধিকার ও বাণিজ্যগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার হলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তখন ভবিষ্যদর্শী রাজনীতিকরা সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে দারুণ অর্থকষ্ট ও অন্ন-সমস্যা উপস্থিত হইবে। তখন সে কথায় কে কর্ণপাত করিয়াছিল?

পোপ বলিয়াছেন,—"মহাপ্লাবনের পর এত ভীষণ দুরবস্থা জগতে কখনও উপস্থিত হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ—Greed লোভ! অতি অল্পসংখ্যক লোক ক্ষমতা ও অর্থ হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে; জাতীয় ও দেশপ্রেমের পবিত্র নামে জাতি জাতির বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতেছে; সামাজিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতি এই লোভের পদতলে পিষ্ট হইতেছে; Communism এবং Ætheism জগতে ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতেছে।

"এই রোগ-প্রতীকারের উপায় কি? কোন অর্থনীতিবিদ্, কোন ব্যয়সঙ্কোচকারক রাজনীতিবিদ্, কোনরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা বা সহযোগিতা এই রোগের প্রতীকার করিতে পারিবে না;—যত দিন পর্য্যন্ত অর্থনীতি ও রাজনীতিক্ষেত্রে ভগবানে নির্ভরতা, বিবেকের উপর আস্থা এবং নৈতিক আইন-কানুনের অনুসরণ একমাত্র শ্রেয়: পথ বলিয়া গৃহীত না হইবে, তত দিন ইহার প্রতীকার হইবে না।"

খৃষ্টান ধর্ম্মজগতের গুরু আজ যাহা বলিতেছেন, উহা আমাদের আর্য্যাবর্ত্তেরই ভাবধারার অনুযায়ী। দুর্ভাগ্য এই যে, এ দেশের এক শ্রেণীর লোক সেই ভাবধারাকে অন্ধকুসংস্কার বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্রতীচ্যের এই হলাহল আকণ্ঠ পান করিয়া দেশে 'নূতন যুগ' 'নূতন ভাব' আনয়নে ব্রতী হইয়াছেন!

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত সংবাদপত্র "Churchman" লিখিয়াছেন,—"We have kowtowed to wealth and position and the tender feelings of our people, and searched for excuses to water down the principles of the Man of Galilee. But no longer can we tolerate the evils of an extremely selfish, unbridled, uncontrolled and leaderless individualism."

কত দুঃখে, কত ক্ষোভে আজ প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ উন্নতিশীল জাতির মুখ হইতে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, এ দেশের তথাকথিত 'বর্ত্তমানের' উপাসকরা তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন?

জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ

জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান রাজনীতি এবং অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তনের কিছু পরিচয় পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। এখন জার্ম্মাণীতে যে অবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহাতে অচির-ভবিষ্যতে নবীন রাসিয়ার ন্যায় জার্ম্মাণীও যে জগতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিচক্ষণ বহুদর্শী কোন কোন রাজনীতিক বলিতেছেন যে, য়ুরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বর্ত্তমান প্রাধান্যের দিন অপগত হইয়াছে, উহা আর শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই, এখন রাসিয়া ও জার্ম্মাণীরই দিন আসিতেছে। ইহা কতদূর সত্য, তাহা ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে।

জার্ম্মাণীতে যে ভাবে কম্যুনিষ্টদের দমন হইল, তাহাতে ত মনে হয় না যে, জার্ম্মাণীর কম্যুনিষ্টরা আর শীঘ্র মাথা তুলিতে পারিবে। সুতরাং তাহারা যে কোনও কালে রাসিয়ান কম্যুনিষ্টদের সহিত যোগাযোগ করিয়া প্রতীচ্যের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহা ত মনে হয় না। ইটালীর নিয়ামক মুসোলিনি যে ভাবে ইটালীর কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিয়া তথায় ফ্যাসিষ্টদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, কতকটা সেই ভাবেই ভন প্যাপেন জার্ম্মাণীতে কম্যুনিষ্টদের গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। ইহার কিছু পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি, এবার আরও কিছু দিতেছি।

জার্ম্মাণ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ভার্সাইল সন্ধি অনুসারে চলিয়া জার্ম্মাণী ক্রমশ: আত্মরক্ষায় অসমর্থ, অতি দুর্ব্বল পরমুখাপেক্ষী জাতিতে পরিণত হইয়াছে, এই ধারণা জার্ম্মাণীর সামরিক মহলে ক্রমশ: বদ্ধমূল হইতেছিল। ফলে তাঁহাদের মনে সোসালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট শাসকদিগের প্রতি একটা বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার হইতেছিল—তাঁহাদের মনে হইতেছিল যে, শাসকরা বিজেতৃবর্গের হুঙ্কারের ভয়ে fatherland কে—জন্মভূমি জার্ম্মাণীকে ক্রমশ: নিস্তেজ, হীনবল ও পরমুখাপেক্ষী করিয়া ফেলিতেছে। ঠিক এইরূপ মনোভাবই ইটালীর মুসোলিনির পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকদের সম্পর্কে দেখা দিয়াছিল। মুসোলিনি যেমন কিসে ইটালীকে জগতের দৃষ্টিতে আবার প্রাচীন যুগের রোমক রাজ্যের গৌরব ও সম্পদে সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন বলিয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীর সামরিক কর্ত্তারাও তেমনই ভাবে জার্ম্মাণীকে আবার জগতে বড় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই মনের কথা সে দিন এক প্রধান জার্ম্মাণ সামরিক পুরুষের মুখ দিয়া উত্তেজনার বশে বাহির হইয়া গিয়াছে,—"আমরা জার্ম্মাণীকে ছোট থাকিতে দিব না; ভার্সাইল সন্ধি মানিব না; জগতের সকল জাতিই আত্মরক্ষায় সমর্থ প্রবল সামরিক জাতিরূপে প্রভুত্ব করিবে, আর জার্ম্মাণীই শুধু নির্বিষ পদানত জাতি হইয়া থাকিবে, তাহা আর আমরা সহ্য করিব না।" ইত্যাদি।

মুসোলিনি

জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পর প্রথম সাধারণতন্ত্র প্রথমে ভন্ ক্যাপের মন্ত্রিত্বকালের শেষ মুখে বার্লিনে শ্রমিকদের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট ঘটিল, উহার ফলে সরকারের কর্তৃত্ব ধূলিসাৎ হইল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে হিটলারের মন্ত্রিত্ব আরম্ভ হইল; উহাও জার্ম্মাণীকে উন্নত করিতে পারিল না। এখন ক্যাপ্টেন ভন প্যাপেনের মন্ত্রিত্ব (নিয়ামকত্ব) সেই ত্রুটি সংশোধন করিবে, ইহাই জার্ম্মাণ সামরিক সম্প্রদায়ের আশা। সকলেই জানেন, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ, ভন প্যাপেনকে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের Special Commissar নিযুক্ত করেন। ইহা Weimar Constitutionএ ৪৮ article অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল। ভন প্যাপেন প্রথমেই

বার্লিন সহরে ও পার্শ্ববর্তী ব্যাণ্ডেনবার্গ-প্রদেশে সামরিক আইন জারী করিলেন। তিনি ঐ সঙ্গে জেনারল ভন রান্‌স্‌টেডকে ঐ অঞ্চলের মিলিটারী গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন। গভর্ণরের প্রথম আদেশ জারী হইল,—দাঙ্গা হইলেই পুলিস জনতাকে সতর্ক করিয়া অথবা না-ও করিয়া গুলী করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে। সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটের উত্তেজনা করা বে-আইনী বলিয়া বিঘোষিত হইল। জার্ম্মাণ কম্যুনিষ্টরা এই আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার যে সংসামান্য চেষ্টা করিল, তাহা এই নিষ্ঠুর আদেশানুযায়ী কার্য্যের ফলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। নিরুপায় হইয়া জার্ম্মাণ শ্রমিক (Trade Unions) ও সোসালিষ্ট দলের নেতারা শ্রমিকদিগকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। ফলে মাত্র ৪ দিন পরে সামরিক আইন বহাল রাখার প্রয়োজন রহিল না। গত ২৮শে জুলাই হইতে সামরিক আইন রদ করা হইয়াছে।

কে জার্ম্মাণীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিবে, উহাই এখন সমস্যার কথা। আসলে দেখিতে হইবে, জার্ম্মাণ সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব কাহার হস্তগত হইয়াছে। অধুনা ইটালী, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি দেশের এবং মধ্য ও পূর্ব্ব-য়ুরোপের কোন কোন দেশের সামরিক কর্ত্তারাই দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং জার্ম্মাণীতেও এখন যে পক্ষ সৈন্যবাহিনীর উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবেন, তাঁহারাই জার্ম্মাণীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইবেন। ভন প্যাপেনের মন্ত্রিত্বকালে জেনারল ভন স্লিচার দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার হস্তেই জার্ম্মাণীর সমরবাহিনীর প্রভুত্ব-ভার ন্যস্ত। তিনি ভন প্যাপেনের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইয়া বর্ত্তমান জার্ম্মাণ Reichswehr বা রক্ষী সেনাদলের সংস্কার ও উন্নতিসাধন করিতেছেন। তিনি রেডিওযোগে ঘোষণা করিয়া জগৎকে জানাইয়াছেন যে,—"সোসালিষ্টরা Reichswehrকে কেবল নিজদলের স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছে, দেশের বা জাতির স্বার্থে নহে। তাহারা ভার্সাইলের হুকুম বিনা ওজর আপত্তিতে মাথা পাতিয়া তামিল করিয়াছে, কখনও জগৎকে জানায় নাই যে, জার্ম্মাণীর মত অরক্ষিত দেশ জগতে আর একটিও নাই। তাহারা জার্ম্মাণ জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ গ্রহণে ক্রমাগত বাধা দিয়াছে। এই হেতু বর্ত্তমান সরকার Reichswehrকে কোন দলের স্বার্থসাধনোদ্দেশে নিযুক্ত করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন না, সমগ্র জাতির স্বার্থরক্ষার্থে উহা নিযুক্ত করা হইবে, উহার উন্নতি ও সংস্কার-সাধন করা হইবে।"

জার্ম্মাণ সামরিক কর্ত্তা ভন স্লিচার ইহাদ্বারা স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে,—আজ ১৪ বৎসর যাবৎ সোসালিষ্টরা জার্ম্মাণী শাসন করিতেছে, কিন্তু তাহাতে জার্ম্মাণীর অধঃপতনই হইয়াছে। এখন হইতে বর্ত্তমান সরকার ভার্সাইল সন্ধি সত্ত্বেও জার্ম্মাণীকে আবার শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর—এই সম্বন্ধে সোসালিষ্ট বা কম্যুনিষ্টরা বাধাপ্রদান করিবার চেষ্টা করিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

সুতরাং নূতন জার্ম্মাণী হইতে ফরাসী ও অন্যান্য শক্তির আবার আশঙ্কার কারণ সমুদ্ভূত হইল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইটালীর মুসোলিনির মত জার্ম্মাণীর ভন প্যাপেন রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তিশালী রাজনীতিকরূপে দেখা দিলেন; পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

ভবিষ্যতে কোথায় দাঁড়াইব

মার্কিণ সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রসমূহে মার্কিণ মুল্লুকের অর্থ-কষ্টের কথা নানা ছন্দে লিখিত হইতেছে। মার্কিণের মত ধন-কুবেরের দেশে আজ বেকারের সংখ্যা এত দ্রুত ও এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে যে, মার্কিণ শাসকশ্রেণী সত্যই শঙ্কিত হইয়াছেন। যদি জগতের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, যদি এই ভাবেই ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে, তাহা হইলে কি হইবে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া পাইতেছেন না।

মার্কিণ সমালোচকরা কিন্তু বৃটিশ জাতির চালচলন দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "এই বৃটিশ জাতি আমাদের কাছে দেনদার, ইহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য দারুণ প্রতি-যোগিতার ফলে অধঃপতনের দশায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অথচ ইহারা সমান হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের সিনেমা ও থিয়েটারে এখন লোক খুবই কম হয়, কতকগুলা উঠিয়াই গেল। কিন্তু বৃটেনে সিনেমা অপেরায় ভিড় যেমন তেমনই। ফুটবলে, ঘোড়দৌড়ে, দৌড়ঝাঁপে, সাঁতারে, ক্রিকেট খেলায়, কনসার্টে বৃটিশ জাতি পূর্ব্বের স্বচ্ছল সময়ের মত এখনও দলে দলে যোগ দিতেছে, পয়সা খরচ করিতেছে, দেখাইতেছে যেন কিছুই হয় নাই, জগতের সঙ্কটকাল দেখা দেয় নাই। আমরা মার্কিণরা কিন্তু ভাবিয়া আকুল হইতেছি, জগতের কি উপায় হইবে?"

সত্যই ভাবনার কথা। তাহা না হইলে মার্কিণ জাতি সাফ ডাকিয়া য়ুরোপের শক্তিগণকে বলিত না যে,—"তোমরা অস্ত্র ও সৈন্য সংবরণ না করিলে আমরা এক পয়সা ঋণের টাকা ও সুদ ছাড়িব না।"

বস্তুতঃ মার্কিণ জাতির একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর মার্কিণ তেমন প্রাণ খুলিয়া হাসে না, বা আমোদ-প্রমোদে যোগ দেয় না। নিউইয়র্ক সহর ধনী, বিলাসী এবং ব্যবসায়ী মহাজনের লীলাক্ষেত্র। পূর্ব্বে সেখানে গেলে বেকারের কোন না কোন কায জুটিয়া যাইত। এখন সেখানকার সংবাদপত্রসমূহে প্রায়ই বড় বড় হরফে লেখা হইতেছে যে,—"নিউইয়র্কে বেকাররা আসিও না। এখন আর নিউইয়র্ক বেকারদের মক্কা নহে। আশার নেশায় এখানে ছুটিয়া আসিলে পর যখন নেশা ছুটিয়া যাইবে, তখন অনাহারের কঠিন বাস্তব জগৎ সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে, পথে পড়িয়া মরিতে হইবে। কেহ সাহায্য করিবে না, কেহ ফিরিয়াও দেখিবে না, সকলেই আপনাকে বাঁচাইতে ব্যস্ত। এই নিউইয়র্ক সহরেই ৮ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ লোক বেকার বসিয়া আছে, সকলেই কাযের সন্ধানে ঘুরিতেছে। তাহারা কিছু রুটীর গুঁড়া বা টুকরা পাইলেও বাঁচিয়া যায়।

"বহু তরুণী কাযের সন্ধানে আসিয়া এই সহরে অভাব-সমুদ্রে ভরাডুবি হইয়া মারা যাইবার উপক্রম করিতেছে। হলিউডেই

নায়ক-নায়িকাদের পারিশ্রমিক হ্রাস হইতেছে। সেখানে নূতন শিক্ষানবীশ লওয়া হইতেছে না, পত্রপাঠ বিদায়ের ব্যবস্থা হইতেছে। নিউইয়র্কের অবস্থা আরও মন্দ। অনেক সুন্দরী তরুণী লোকের মুখে শুনিয়া আশায় আনন্দে এখানে চলচ্চিত্রে কাযের চেষ্টায় আসিতেছে। কিন্তু আসিয়া হতাশ হইতেছে। ঘরে ফিরিয়া যাইবার পয়সাও তাহারা জুটাইতে পারিতেছে না।

"সুতরাং পকেটে ঘরে ফিরিবার এবং সহরে অন্ততঃ দুই এক মাস গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া খাইবার ও থাকিবার সংস্থান না করিয়া কোন তরুণী বা তরুণ যেন লোকের পরামর্শে ভুলিয়া সহরে না আসে।"

বস্তুতঃ দূর হইতে পর্ব্বতকে কত বড় ও কত শ্যামল সুন্দর গম্ভীর দেখায়! কিন্তু কাছে গেলেই তাহার অর্দ্ধেক গাম্ভীর্য্য ও বিরাটত্ব কমিয়া যায়। আমাদের এই বিলাস-লালসার লীলাভূমি কলিকাতা মহানগরীর বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটা, যান-বাহনের দপ্‌দপানি, হাটবাজারের গমগমানি,—এ সকল দেখিলে কে বলিবে, উহার অন্তরালে অভাব, দৈন্য, কষ্ট ও দরিদ্র অভুক্ত আতুরের অশ্রু লুকাইয়া আছে।

সাহিত্যে আবর্জ্জনা

মার্কিণ মুলুকের প্রধান সহর নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার ডিষ্ট্রিক্টের সংবাদপত্রের ষ্টলওয়ালাদের ধরিয়া পুলিস চালান দিয়াছিল। অপরাধ,—তাহারা কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র বিক্রয়ার্থ প্রকাশ্যে সাজাইয়া রাখিত। যখন আদালতে মামলা উঠে, তখন ২২ জন প্রকাশক ও সম্পাদকের মধ্যে ১৫ জন তাঁহাদের গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র মুড়িয়া রাখিবেন, আর বিক্রয়ার্থ প্রকাশ্যে রক্ষা করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, বাকী ৭ জন পুনরায় ঐ শ্রেণীর অশ্লীল রচনা, ছবি, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। জেলা এটর্ণি মিঃ জেমস উইলসন এই শ্রেণীর গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদিকে Pictured filth 'সচিত্র আবর্জ্জনা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং আদালতে উহাদের প্রকাশের বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়াকে A victory for decency 'ভদ্রতা ও শ্লীলতার জয়' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই শ্রেণীর রচনা কিছুদিন হইতে ব্যাঙের ছাতার মত নিউ-ইয়র্কে গজাইয়া উঠিতেছে এবং মফঃস্বলের প্রায় সর্ব্বত্র সহরে ও গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কে কত আবর্জ্জনা ও অশ্লীলতা প্রদর্শন করিতে পারে, যেন তাহার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ভদ্র পরিবারে অভিভাবক, পিতা, মাতা কোন গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র ঘরে আনিতে সাহস করিতে পারেন না, পাছে ছেলে-মেয়ের হাতে পড়ে!

অবস্থা যখন এইরূপ, তখন নিউইয়র্ক সহরে 'একটি Citizens commitee on civic decency অথবা নাগরিক শ্লীলতা ও ভব্যতা রক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ভূতপূর্ব্ব যুক্তপ্রদেশের এটর্ণি মিঃ চার্ল্‌স টার্টল উহার সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

জঘন্য প্রচারের মধ্যে Humour magazines এবং Art periodicalsগুলিকে ধর্ত্তব্য। নিউইয়র্কের কোন সংবাদপত্র লিখিয়াছেন, "They not only outrage public decency, but offend the canons of good taste, they make vice attractive."

পাঠক, এখন মিলাইয়া দেখুন দেখি, ঠিক ইহারই অনুকরণে অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যে আবর্জ্জনাস্রোত প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে কি না, জঘন্য কামোদ্দীপক লজ্জাজনক রচনা artএর নামে বে-পরোয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে কি না!

সুখের বিষয়, কলিকাতায় কয়েকটি মনীষী মহিলা রচয়িত্রী এবং রচয়িতার উদ্যোগে একটি সুনীতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘের স্থায়িত্ব এবং প্রভাব বিস্তারের আমরা সানন্দে শুভ-কামনা করি।

আরব নরপতি ও নারী-স্বাতন্ত্র্য

জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর পরাজিত তুর্কী সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া যে কয়টি 'অনুগ্রহাধীন স্বাধীন' মুসলিম রাজ্য গঠিত হইয়াছে, ট্রান্স-জর্ডানিয়া বা ইন্দা তন্মধ্যে অন্যতম। উহা আরব মরুভূমির এক প্রান্তে অবস্থিত। আমীর আবদুল্লা উহার রাজা। তিনি হজের পূর্ব্বতন রাজা হোসেনের পুত্র এবং রাজা আলির ভ্রাতা। রাজা আলি হজের সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। আবদুল্লার আর এক ভ্রাতা রাজা ফয়জুল, তিনি মেসোপটেমিয়ার রাজা। সুতরাং আবদুল্লা যে প্রথিতনামা রাজবংশের সন্তান, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। পরন্তু তিনি মরুভূমির রাজা বলিয়া অশিক্ষিত বা পৃথিবীর 'উন্নতি যুগের' সকল তত্ত্বের সহিত সম্পর্কবর্জ্জিত, ইহাও বলা যায় না। কেন না, তাঁহার কথা-বার্ত্তা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি সুশিক্ষিত ও অবস্থাভিজ্ঞ।

আমীর আবদুল্লা

সম্প্রতি কুমারী বেটি রস নাম্নী এক তরুণী সংবাদ-সংগ্রাহিকা আরবের রুক্ষ ও ভুকজ দস্যু-পরিব্যাপ্ত মরুভূমি পার হইয়া আমীর আবদুল্লার সহিত তাঁহার রাজপ্রাসাদে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়াছিলেন। যে নারীর অধিকার সম্পর্কে জগতে

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মতের বিষম দ্বন্দ্ব আছে, সেই বিষয়েই উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

রাজা আবদুল্লার অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি কুমারী বেটি রসের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—"এক জন মানুষ জগতে স্ত্রীকে ভালবাসেন, তিনি তাঁহার স্বামী। কেবলমাত্র স্ত্রীকে দেখিবার অধিকার তাঁহারই আছে। স্বামীর পরিবারের বাহিরের কোন লোক তাঁহাকে দেখিলে তিনি অপবিত্র হইয়া যান। অপরিচিত পুরুষ আমাদের নারীকে অনবগুণ্ঠিত দেখেন, ইহা আমরা ইচ্ছা করি না।"

মিস রস। আপনার নারী প্রজাদিগকে আপনি কি অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিতে দিবেন না?

রাজা। কখনই না। আমার দেশের নারীরা কখনই অবগুণ্ঠনমুক্ত হইবেন না।

রস। কিন্তু অবগুণ্ঠন ত্যাগ করাই ত উন্নতির ও প্রগতির লক্ষণ। তুর্কী দেশে নারীরা অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়াছেন।

রাজা। অবগুণ্ঠনমুক্তা নারী আর নারীপ্রগতির মধ্যে সম্বন্ধ কি? নারী অবগুণ্ঠন মুক্ত করিলেই নারীপ্রগতি হয়, কে এ কথা বলে? নারীর উন্নতির জন্য আমি সকল প্রকার সাহায্য দান করি। আমি অনেক নারী-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এই নারীরা এখন লেখা-পড়া, স্বদেশের ইতিহাস এবং গৃহস্থালী শিক্ষা করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা গৃহস্থালী শিক্ষা করাই তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশ ক্ষুদ্র, সুতরাং আমাদের দেশে প্রজাবৃদ্ধি হওয়া চাই। সুতরাং নারীদের সন্তান প্রজনন ও পালন এবং গৃহপরিচর্য্যা শিক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন। তবে প্রতীচ্যের সভ্যতা-বিস্তারের ফলে আমাদের নারীদের মধ্যেও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে।

রস।—কিন্তু এই সভ্যতার আলোক আপনার দেশের অন্ধকার দূর করিতেছে, ইহাতে কি আপনি আনন্দ অনুভব করিতেছেন না?

রাজা।—না। কেন না, এই আলোক আমাদের নারীদের নূতন বিলাসের পিপাসা জাগাইয়া দিতেছে। তাঁহারা এখন নূতন সাজসজ্জা, য়ুরোপীয় ফ্যাসান, নানাপ্রকারের আমোদপ্রমোদ ও ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহাদের এই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পুরুষকে তাহার অশ্ব বিক্রয় করিয়া মোটর গাড়ী কিনিতে হইতেছে। আর এক দফা আলোক আসিতেছে, যাহাকে আমি বড়ই ভয় করি।

রস।—কি?

রাজা।—প্রতীচ্যের বিলাসিনী নারীদের অনুকরণের স্পৃহা এবং পরিবারের বাহিরে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি। আপনাদের প্রতীচ্যের নারীরা বাহিরের জগতের কার্য্য করিতে পুরুষের মত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহা না করেন, তাহা হইলে জগতের কোন ক্ষতি হইবে না। নারীরা যদি পুত্র পরিবার লইয়া ঘরসংসার করেন, তাহা হইলে জগতের অনেক লাভ হয়। তবে অবশ্য মনীষা-সম্পন্না নারীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতে পারেন। নারী পত্নী ও পুত্রের জননী হইবেন, ইহারই জন্য তাঁহার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা পুত্র পালন করিবেন এবং জাতিকে সজীব ও সবল করিয়া রাখিবেন, ইহাই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

পুরুষের বহু বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমীর আবদুল্লা বলেন,—"আপনাদের প্রতীচ্যের নারী কি সত্যই মনে করেন যে, তাঁহাদের স্বামী তাঁহাদের ছাড়া আর কোনও নারীকে ভালবাসেন না?"

রস।—হাঁ, তাঁহারা তাহাই মনে করেন। তাঁহারা তাহাই জানেন।

রাজা।—কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তিনি ভিন্নরূপ মনে করেন। আমি প্রতীচ্যের অনেক গ্রন্থ হইতে তাহা জানিতে পারিয়াছি।

রস।—আচ্ছা, আপনি প্রাচ্যের স্বামিরূপে নারীর সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন?

রাজা।—আমার কাছে নারী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দদায়িনী, আবার তিনি সকলের অপেক্ষা অধিক চিন্তার কারণ।

প্রতীচ্যের নাট্যকলাশিল্পীর পারিশ্রমিক

বিখ্যাত চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো সম্প্রতি মেট্রো-গোলড়ইন-মেয়ার চলচ্চিত্র কোম্পানীর সহিত সাপ্তাহিক ৩৫ হাজার টাকা পারিশ্রমিকে অভিনয় করিবার চুক্তি করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রতীচ্যের এই শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা সাপ্তাহিক ১৬ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। ব্যয়সঙ্কোচ হেতু অধুনা তাঁহাদের পারিশ্রমিক ১৬ হাজার হইতে ১০ হাজারে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রিন্-টিন্-টিন্ নামক চলচ্চিত্রের নায়ক কুকুর ১৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। এই কুকুরটি ফ্রান্সের এলসাস প্রদেশের অধিবাসী ছিল। এলসাস প্রদেশটি পূর্ব্বে জার্ম্মাণী ফ্রান্সের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ফরাসীরা যখন জার্ম্মাণ বাহিনীকে মেট্জ্ অঞ্চলে আক্রমণ করে, তখন জার্ম্মাণদের পরিত্যক্ত এক পরিখার মধ্যে কুকুরটিকে পাওয়া গিয়াছিল। মার্কিণ বিমান-বাহিনীর এক সেনানী কুকুরটিকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং পরে হলিউডের চলচ্চিত্রে উহাকে অভিনয় করিতে দেন। এই কুকুর অভিনয় করিয়া সপ্তাহে সাড়ে ৭ হাজার টাকা অর্জ্জন করিত! জগতে কয় জন মনীষী লেখকের ভাগ্যে এই পারিশ্রমিক জুটে!

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বকবি

আজকাল এ দেশের বিদ্যার্থী যুবকগণের মধ্যে যে চাঞ্চল্য, যে অসহিষ্ণুতা, যে উত্তেজনা ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রথম প্রকাশ হয় ২৬ বৎসর পূর্ব্বে। তখন যে সকল যুবক সরকারী বিদ্যালয়ে বা সরকারের পৃষ্ঠপোষিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পুনঃপ্রবেশে অসম্মত ছিল, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিত হইয়া "জাতীয় বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের উদ্‌গাতা ছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তিনি ঐ নব বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া, ১৩১৩ সালের ২৯শে শ্রাবণ কলিকাতা টাউন হলের সভায় বলিয়াছিলেন,—

"তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব কর—সমস্ত বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে, তাহা নিজের প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি কর—ইহাকে কোনও দিন একটি স্কুল মাত্র বলিয়া ভ্রম করিও না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরম ধনের রক্ষণভার, আজ তোমাদের উপর যতটা পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনও বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবী করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনও সহজ সুবিধা আশা করিয়া, ইহাকে ছোট হইতে দিও না। বিপুল-চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধর—ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখ—ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে, সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য, বড় নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস—যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ—ধর্ম্মস্বরূপ গ্রহণ করিও। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা—কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না;—ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না;—কেবল তোমাদের স্বদেশকে, তোমাদের ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণে রাখিয়া, তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।" (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩, ২৬৩-২৬৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, তিনি সেই বৎসরই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে কাব্য-কলা সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতার বিষয় 'সৌন্দর্য্য-বোধ।' এই বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, নিয়মে-সংযমে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষের এই প্রাচীন উপদেশের কথা তুলিতে গেলে, অনেকের মনে এই তর্ক উঠিবে, 'এ যে বড় কঠোর সাধনা। ইহার দ্বারা না হয় খুব একটা শক্ত মানুষ তৈরী করিয়া তুলিলে—না হয় বাসনার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া, মস্ত এক জন সাধুপুরুষ হইয়া উঠিলে—কিন্তু এ সাধনায় রসের স্থান কোথায়? কোথায় গেল সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত? মানুষকে যদি পূরা করিয়া তুলিতে হয়, তবে সৌন্দর্য্য-চর্চ্চাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।'

"এ ত' ঠিক কথা। সৌন্দর্য্য ত' চাই। আত্মহত্যা ত' সাধনার বিষয় হইতে পারে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। বস্তুতঃ শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য্যপালন শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিয়া তুলিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না। চাষা যখন লাঙ্গল দিয়া মাটী বিদীর্ণ করে, মই দিয়া ঢেলা দলিয়া গুঁড়া করিতে থাকে, নিড়ানী দিয়া সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপ্‌ড়াইয়া ক্ষেত্রটাকে একেবারে শূন্য করিয়া ফেলে, তখন আনাড়ী লোকের মনে হইতে পারে, জমীটার উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। কিন্তু এমনি করিয়াই ফল ফলাইতে হয়। তেমনি যথার্থভাবে রসগ্রহণের অধিকারী হইতে গেলে গোড়ায় কঠিন চাষেরই দরকার। রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে। সে পথে সমস্ত বিপদ্ এড়াইয়া পূর্ণতালাভ করিতে যে চায়,

নিয়ম-সংযম তাহারই বেশী আবশ্যক। রসের জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।"

তার পর, নিয়ম-সংযমকে উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মনে না করিয়া, যদি তাহাকেই উদ্দেশ্যস্থানীয় করা হয়, তাহা হইলে কি অনর্থ হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"অতএব কেবলমাত্র নিয়ম পালন করাটাকেই যদি লোভের জিনিস করিয়া তোলা যায়, তবে কঠোরতার চাপ কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়া স্বভাব হইতে সৌন্দর্য্যবোধকে একেবারে পিষিয়া বাহির করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ণতালাভের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া সংযমচর্চ্চাকেও যদি ঠিকমত সংযত করিয়া রাখিতে পারি, তবে মনুষ্যত্বের কোনো উপাদানই আঘাত পায় না, বরঞ্চ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

"কথাটা এই যে, ভিতমাত্রই শক্ত হইয়া থাকে, না হইলে তাহা আশ্রয় দিতে পারে না। যাহা কিছু ধারণ করিয়া থাকে, যাহা আকৃতিদান করে, তাহা কঠিন। মানুষের শরীর যতই নরম হোক্ না কেন, যদি শক্ত হাড়ের উপরে তাহার পত্তন না হইত, তবে সে একটা পিণ্ড হইয়া থাকিত, তাহার চেহারা খুলিতই না। তেম্‌নি জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত, আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত। জ্ঞানের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত, তবে সে কেবল খাপছাড়া স্বপ্ন হইত, আর আনন্দের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত, তবে তাহা নিতান্তই পাগ্‌লামি-মাত্‌লামি হইয়া উঠিত।

"এই যে শক্ত ভিত্তি, ইহাই সংযম। ইহার মধ্যে বিচার আছে, বল আছে, ত্যাগ আছে, ইহার মধ্যে নির্ম্মম দৃঢ়তা আছে। ইহা দেবতার মত এক হাতে বর দেয়, আর এক হাতে সংহার করে। এই সংযম গড়িবার বেলাও যেমন দৃঢ়, ভাঙিবার বেলাও তেম্‌নি কঠিন। সৌন্দর্য্যকে পুরামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন, নতুবা প্রবৃত্তি অসংযত থাকিলে শিশু ভাতের থালা লইয়া যেমন অন্নব্যঞ্জন কেবল গায়ে মাখিয়া মাটীতে ছড়াইয়া বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোলে, অথচ অল্পই তাহার পেটে যায়—ভোগের সামগ্রী লইয়া আমাদের সেই দশা হয়, আমরা কেবল তাহা গায়েই মাখি, লাভ করিতে পারি না।

"সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালায় না।"

যিনি তপস্বীর মত চিরজীবন কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এই উক্তি তাঁহার মুখেই শোভা পায়। বড় বড় চিত্রশিল্পীরাও এই কথাই বলেন। স্বাভাবিক শক্তি না থাকিলে কেহ কোন ললিতকলার অনুশীলন করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু সেই শক্তিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে কঠোর সাধনা চাই। রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন ১৯০৬ (১৩১৩) সালে। কিন্তু গত ২৬ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতের ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গত পৌষ মাসে জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট্ হলে ছাত্র ও ছাত্রীগণের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি যে প্রতিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই আত্মকাহিনীটুকু পাওয়া যায়,—

"আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি, মাষ্টার আমার ভাবী কালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন, সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মত বেরিয়ে পড়েছিল।

"ইতিপূর্ব্বেই কোন একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা, সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোক লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল, ছড়া যারা বানাতে পারত, তাদের দেখে লোক বিস্মিত হ'ত। এখন যারা না পারে, তারাই অসাধারণ ব'লে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ-অধিকার-বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর, ছয় অক্ষর, দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দ ভাগ নিয়ে চল্‌ল ঘরের কোণে আমার ছন্দ ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রবেশ পেল দশ জনের সাম্‌নে।

"এই লেখাগুলি যেমনি হোক্, এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুণো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজ-শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ীর শাসনও তার হাল্কা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়ীতে

দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা—যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মান্‌তুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোন বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মত। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা কর্‌তে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব কর্‌বার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন, তা হ'লে ভেঙ্গে-চুরে, তেড়ে-বেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয় ত' ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হ'ত, কিন্তু আমার মত একেবারেই হ'ত না।" (প্রবাসী, ১৩৩৮, মাঘ, ৫১১ পৃষ্ঠা)

এইখানে যে আত্মচরিত আছে, তাহা কি সম্পূর্ণ সত্য, না কল্পনা সমুজ্জ্বল সত্য? ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-তরুণীগণকে লক্ষ্য করিয়া কবিবরের এইরূপ বলা কি সঙ্গত হইয়াছে? ১৩১৩ সালে যে সকল যুবক জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্জ্জনের সম্ভাবনা খুব বেশী না থাকিলেও, একেবারে কিছু যে না ছিল, এমন নয়। কিন্তু ১৩৩৮-৩৯ সালে প্রত্যেক যুবকের মন নৈরাশ্যে পূর্ণ, প্রাণ উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত। কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের মানসিক অবস্থাও প্রায় একইরূপ। ভদ্র হিন্দু ঘরের মেয়েদের যে এখন যৌবনে বিবাহ হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ, স্ত্রীপুত্রপালনসমর্থ বর শীঘ্র পাওয়া যাইতেছে না। বেকার ভদ্র যুবকের সংখ্যা দিন দিন যেমন বাড়িতেছে, তাহাতে অনুমান হয়, ভদ্র ঘরের বাঙ্গালী মেয়েদের ভবিষ্যতে অনেক স্থলে চিরকুমারী থাকা অনিবার্য্য হইবে। এখনও অনেক অভিভাবক যে স্কুলের উচ্চ ক্লাসে এবং কলেজে মেয়ে পাঠান, তাহার কারণ, মেয়েদিগকে রত রাখিবার আর কোন উপায় তাঁহারা উদ্ভাবন করিতে পারেন না। অবশ্যই অভিভাবকগণের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা মেয়েদের বি, এ বা এম, এ পর্য্যন্ত পাঠের খুব পক্ষপাতী, এবং অনেক যুবক উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী ভিন্ন বিবাহ করিতে অসম্মত। যাহাই হউক, এখন যে সকল মেয়ে কলেজে পড়ে, তাহাদের মনোগত ভাব যে কলেজের ছাত্রদিগের মনোগত ভাবের অপেক্ষা ভিন্ন, এরূপ মনে করিবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। নৈরাশ্য এবং উত্তেজনা বোধ হয় তরুণীদিগের মন ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে। এরূপ স্থলে তরুণ-তরুণীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যদি স্বেচ্ছাচারিতার বিগ্রহরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তবে কার সাধ্য যে, ইহাদিগকে আর সংযম শিক্ষা দেয়, বা আবশ্যকমত শাসন করে।

গত ৬ই আগষ্ট (২২শে শ্রাবণ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন, তাহাতেও নিজের পরিচয় এইভাবেই দিয়াছেন,—

"I was born as a poet, with an inclination which prevented me from the pursuit of purposeful endeavour while allowing me to enjoy the indulgence of my providence in leading a life of mental vagabondage."

পুনরায়—

"But at the same time I am sincere in my thankfulness to my star which gifted me with a resourcefulness when I was young and helped me to avoid school masters."

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে নেহাৎ 'ইস্কুল-পালানো ছেলে' (avoiding school masters) ছিলেন,—তিনি যে কখন পরীক্ষা দেন নাই বা পাশ করেন নাই, এ কথা ঠিক নহে। প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অনুরোধে লিখিত 'শরৎচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"নর্ম্মাল স্কুলে সীতার বনবাস পড়া শেষ হ'ল। সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণের যোগে তার পরীক্ষাও দিয়েছি। পাস ক'রে থাক্‌ব, কিন্তু পারিতোষিক পাই নি। যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁরা সওদাগরী আপিস পার হয়ে আজ পেন্‌সন্ ভোগ করছেন।" (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮, ৮০৩ পৃষ্ঠা)

এখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া লইব। যাঁহারা পারিতোষিক পাইলেন, তাঁহারা ত' সওদাগরী আফিসে চাকুরী করিয়া পেন্‌সন্ পাইতেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত কবি—শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্য্যন্ত হইলেন। কিন্তু পারিতোষিক পাইলেন না রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এমন আরও অনেকে ত' ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এখন কে কি করিতেছেন, তাহা না জানিলে, পারিতোষিক

পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে কোন্‌টি যে বেশী হিতকর, তাহা স্থির করা যাইতে পারে কি? সে যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন, 'আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি', এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাঁহার কথাতেই আমরা তাহার প্রমাণ পাইলাম। সে কালে যে ঘরের কোণে কেবল 'ছন্দ ভাঙা-গড়ার খেলা' চলিত না, তদপেক্ষা গুরুতর কাযেও অনেক সময় হাত দেওয়া হইত, রবীন্দ্রনাথ 'পারস্য-ভ্রমণ' প্রবন্ধের ভূমিকায় তাহা বলিয়াছেন। যথা—

"বয়স যখন অল্প ছিল, তখন য়ুরোপীয় সাহিত্য গভীর আনন্দের সঙ্গে পড়েচি, বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ সত্য আলোচনা করে তার সাধকদের 'পরে ভক্তি হয়েচে মনে।" (বিচিত্রা, ১৩৩৯, শ্রাবণ, ৪ পৃষ্ঠা)।

যখন নিজের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীগণকে উপদেশ দিতে হয়, তখন যদি সকল কথা খুলিয়া না বলিয়া—আধা সত্য বলা হয়, তবে উপদেশের পাত্রদিগের অনিষ্টও ঘটিতে পারে। এখন ত' ছাত্ররা কলেজ ছাড়িতে—পরীক্ষা না দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত; এখন নিজের জীবনের স্কুল-পালান দিক্‌টা মাত্র আদর্শস্বরূপ উল্লেখ করিলে কার্য্যতঃ তাহাদিগকে স্কুল পালাইতে পরামর্শ দেওয়া হয় না কি? ১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী' পত্রে শিক্ষাবিধি নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া রাখিয়াছেন, "শাসন নহিলে তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই" (৫৮৭ পৃষ্ঠা)।

সদাপরিবর্ত্তনশীল মনের এইরূপ গতি লইয়া এই উত্তেজনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-ছাত্রীগণের নিকট হইতে যত দূর সরিয়া থাকেন, ততই মঙ্গল নহে কি? যিনি ২৬ বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, সেই প্রৌঢ় দেশনায়ক রবীন্দ্রনাথকে এবং ৭০ বৎসরের এপারের রবীন্দ্রনাথকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করা যায় কি?

এই ত' গেল নীতির শিক্ষার কথা। এখন দেখা যাক, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বকবির হাতে বঙ্গসাহিত্যের শিক্ষা কি আকার ধারণ করিতে পারে। বিশ্বভারতীর মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চ। কিন্তু বঙ্গভারতীর মন্দিরে কাহারও কাহারও মতে কোন কোন বিষয়ে তিনি মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিযোগী মাত্র। কিন্তু আশঙ্কা হয়, এইবার যেন এই দুই জন সৎসাহিত্যস্রষ্টা মনীষীকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য রীতিমত প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে; এবং বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ও পরীক্ষার সহায়তায় এই চেষ্টার সাফল্য অসাধ্য হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের আসনটি ভাঙ্গিয়া খাট করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই কুঠারাঘাত আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩৩৮ সালের জন্ম-দিন উপলক্ষে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'শরৎচন্দ্র' নামক প্রবন্ধের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা কত বেশী উচ্চ, তাহা মাপিয়া দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন মাপকাঠি উপস্থিত করিয়াছেন। এই তুলনামূলক সমালোচনা পাঠ করিয়া,প্রাক্‌-রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী এক জন সুলেখক গত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যার "মাসিক বসুমতী"তে 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' নামক প্রবন্ধে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা কত বড়, তাহা স্থির করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের ঘটনা আমাদের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রা হইতে কত দূরে, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহা জরিপ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই জরিপের পূর্ব্বেই আমরা জানিতাম যে, দুর্গেশনন্দিনীর, কপালকুণ্ডলার, মৃণালিনীর চিত্র আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা হইতে অনেক দূরে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"সেই দূরত্ব এদের মুখ্য উপকরণ। যেমন দূরদিগন্তের নীলিমায় অরণ্য-পর্ব্বতকে একটা অস্পষ্টতার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দেয়, এও তেমনই। সেই দৃশ্য ছবির প্রধান গুণ হচ্চে তার রেখার সুষমা, অন্য পরিচয় নয়, কেবল তার সমগ্র ছন্দের ভঙ্গিমা। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনীর সেই রূপের কুহক আছে। তা যদি রঙীন কুহেলিকায় রচিত হয়, তবুও তার রস আছে। কিন্তু নদী গ্রাম প্রান্তরের ছবি আর সূর্য্যাস্তকালের রঙীন মেঘের ছবি এক দামের জিনিষ নয়।" দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি কাহিনীতে 'বস্তুপদার্থটার অভাব' উহা দুধ নয়, দুধের ফেনা মাত্র; "তার উচ্ছ্বাসটা দেখতে মানায়, কিন্তু ভোগে লাগে না।" এই "তিনটে কাহিনী যেন দৃঢ় অবলম্বন পায় নি—তাদের সাজসজ্জা আছে, কিন্তু

পরিচয়পত্র নেই। তারা ইতিহাসের ভাঙাভেলা আঁকড়ে ভেসে এসেচে।...তারা বর্ত্তমানের সামগ্রী নয়;... আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার আদর্শও নয়।" সুতরাং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি উপন্যাস নগণ্য।

রবীন্দ্রনাথের এই সকল উক্তি ও যুক্তি সাহিত্য-সমালোচনা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে, বিদূষণ মাত্র। ৩৯ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" সমালোচনায় উপন্যাস সমালোচকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছিলেন,—

"হইতে পারে কোন কোন অতি কৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তরভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেইজন্য মনক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া, তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ বিবেচনা-সঙ্গত নহে।"

শরৎচন্দ্রের পরিচয় উজ্জ্বল করিবার উপলক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপত্তি ধূলিশায়ী করিবার উদ্যমে ব্যস্ত হইয়া, রবীন্দ্রনাথ নিজের এই সর্ব্ববাদিসম্মত সুন্দর কথাগুলি ভুলিয়া গিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের প্রশস্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের নাম করিতেও বিস্মিত হইয়াছেন।

"নদী গ্রাম প্রান্তরের ছবি" এবং "সূর্য্যাস্তকালের রঙীন মেঘের ছবি" এক শ্রেণীর ছবি নয় বটে, কিন্তু এক দামের জিনিষ হইতে পারে না; এ কথা কলা-রসজ্ঞের মুখে শোভা পায় না। চিত্রের বিষয়-নির্ব্বাচনের উপর ছবির মূল্য নির্ভর করে না; ছবির মূল্য কলা-কৌশলের উপরেই নির্ভর করে। অনেক সময় কলাকৌশলের গুণে "নদী গ্রাম প্রান্তরের ছবি" অপেক্ষা "সূর্য্যাস্তকালের রঙীন মেঘের ছবি" অনেক অধিক মূল্যবান্ হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম তিনখানি উপন্যাসে সাধারণের অভিজ্ঞতার আদর্শে প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার বা বর্ত্তমানের সামগ্রীর চিত্র অঙ্কিত করিতে বসেন নাই। কাহারও যদি এই ছবিগুলির দোষগুণের বিচার করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহাকে দেখিতে হইবে, চিত্রকর যে আদর্শ লইয়া তুলি ধরিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ সেই আদর্শের সমীপস্থ হইতে পারিয়াছেন কি না।

রবীন্দ্রনাথ যাহাকে কাহিনী এবং কথা বলেন, তাহাদের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা একই বস্তুর ছোট-বড়র পার্থক্য নয়,—জাতিগত পার্থক্য। কথা এবং কাহিনী এক জাতীয় উপন্যাস নহে; সুতরাং উভয়কে এক পংক্তিকে বসাইয়া ছোট বড় তুলনা করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কাহিনীর সহিত কাহিনীর তুলনা হইবে, এবং কথার সহিত কথার তুলনা চলিবে। দূরের এবং নিকটের জিনিষ দেখিবার জন্য দুই প্রকার চশমার দরকার, এ কথা কে না জানেন? দূরের জিনিষ যদি কাহারও দৃষ্টিতে অস্পষ্ট দেখায় (অর্থাৎ তিনি যদি short-sighted হন), তবে তদুপযোগী চশমা নাকের ডগায় আঁটিয়া তাহার সাহায্যে দেখিলে অস্পষ্টতা অন্তর্হিত হইবে।

মৃণালিনীর পর বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বিষবৃক্ষের প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল, তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দ্দা উঠে গেল।"

কিন্তু বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল কথা-সাহিত্য হইলেও পর্দ্দার অন্তরাল হইতে একবারে বাহিরে আসিতে পারিল না। কথা-সাহিত্যের পর্দ্দানশিনী পূর্ণমাত্রায় ঘুচাইয়াছেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইলের পর অনেক দিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্প-সাহিত্যে আর একটা যুগ এসেচে। অর্থাৎ আরও একটা পর্দ্দা উঠল।...এবারে নিমন্ত্রণকর্ত্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে-রসকে তিনি নিবিড় ক'রে জুগিয়েছেন, সে হচ্চে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পূর্ব্বের চেয়ে পাঠকের আরও অনেক কাছে এসে পৌঁছল; তিনি নিজে দেখেচেন বিস্তৃত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে, দেখিয়েচেন তেমনি সুগোচর ক'রে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদ্ঘাটিত করেচেন সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশপথ সহজ হ'ল। তাদের আনাগোনাও চল্‌চে।"

এই দ্বিতীয় পর্দ্দা উঠাইবার সম্পর্কে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের

পক্ষ হইতে হার স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। শরৎচন্দ্রের নায়িকার বর্ণনা, স্ত্রী, পুরুষের মেলা-মেশার বর্ণনা sensual, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার মত তাহা কেবল চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে না, তাহা যেন হাতে ঠেকে। কিন্তু এই ত্রুটির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে দোষী নহেন, দোষ তাঁহার কপালের! বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার আভিজাত্য-জ্ঞান প্রবল ছিল, তিনি সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন; তিনি সংসারী লোক ছিলেন; তাঁহাকে পৈতৃক দোল, দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, দেবসেবা ধুমধামের সহিত সম্পাদন করিতে হইত। সে কালে এই প্রকার লোকের পর্দ্দাহীন উপন্যাসের উপযোগী সহজ প্রেমের ঢলাঢলি "বিস্তৃত ক'রে, স্পষ্ট করে" দেখিবার সুযোগ ছিল না; এবং বোধ করি কল্পনার সহায়তায় দেখাইবার চেষ্টা করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সুতরাং এই ত্রুটির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহার চিত্র হাতে ঠেকে ঠেকে (sensual) না হইলেও চিত্তহারী। বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র দেখিলে যে চিদানন্দরস অনুভব করা যায়, শরৎচন্দ্রের চিত্র উজ্জ্বল হইলেও সে চিত্র দেখার আনন্দ তেমন বিশুদ্ধ কি?

রবীন্দ্রনাথ যে বিষবৃক্ষের এবং কৃষ্ণকান্তের উইলের পরেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ, তিনি পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস সরাসরি ভাবে ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"তার পর এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী, সীতারাম, একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্য নয়, উপদেশ দেবার জন্য। আবার অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরব-গর্ব্বে সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার ক'রে বসল।"

এই তিনখানি উপন্যাসে উপদেশ ছাড়া আর কিছু আছে কি না, সেই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নীরব। 'আনন্দমঠের' উপরই তাঁহার বিরাগ যেন বেশী। তিনি বলিয়াছেন,—

"আনন্দমঠ আদর পেয়েছিল কিন্তু সাহিত্য-রসের আদর সে নয়—দেশাভিমানের। এক এক সময়ে জনসাধারণের মন যখন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে থাকে, সেই সময়টা সাহিত্যের পক্ষে দুর্য্যোগের সময়। তখন পাঠকের মন অল্পেই ভোলানো চলে। শুঁট্‌কি মাছের প্রতি আসক্তি যদি অত্যন্ত বেশি হয়, তা হ'লে রাঁধবার নৈপুণ্য অনাবশ্যক হ'য়ে ওঠে। ঐ জিনিষটার গন্ধ থাকলেই তরকারির আর অনাদর ঘটে না। সাময়িক সমস্যা এবং চলতি সেন্টিমেণ্ট, সাহিত্যের পক্ষে কচুরি পানার মতই, তাদের জন্যে আবাদের প্রয়োজন হয় না, রসের স্রোতকে আপন জোরেই আচ্ছন্ন করে দেয়।"

শুঁট্‌কি মাছের তরকারির উপমা দিয়া সুরুচির পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ বীভৎস রসের অবতারণা করিয়াছেন। পাল্‌টা-প্রশস্তিতে শরৎচন্দ্রের যে 'উতোর', তাহাতে একেবারে ঢেলে দিয়াছেন বীররস। তিনি বলিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এত বড় কথা, এমন স্পষ্ট করে বোধ করি এর পূর্ব্বে আর কেহ বল্‌তে সাহস করে নি।" কিন্তু জিজ্ঞাস্য, যে সময় আনন্দমঠ প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন কি রাষ্ট্রিক ভাবরূপ শুঁট্‌কি মাছের আমদানী এত বেশী ছিল যে, তাহার দুর্গন্ধের জোরেই বঙ্কিমচন্দ্রের "রাঁধবার নৈপুণ্যহীন" শুঁট্‌কি মাছের ব্যঞ্জন 'আনন্দমঠ' পেটুক সমাজে আদর পাইয়াছে, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও পাইতেছে? আনন্দমঠ শেষ হইয়াছিল, ১২৮৮ (১৮৮১-১৮৮২) সালে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ২০ বৎসর। তখন যে রাষ্ট্রিক ভাবরূপ শুঁট্‌কি মাছের গন্ধে বাঙ্গালা ভরপূর ছিল, এমন কোন প্রমাণ বিশ্বকবি দেখাইতে পারেন কি?

১২৮৯ সালের বান্ধব পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, "আনন্দমঠের মূলমন্ত্র" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, প্রবন্ধটি বান্ধবের মনীষী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের রচনা। তৎকালে রাষ্ট্রিক ভাবের অভাব সম্বন্ধে এই প্রবন্ধকার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"কিন্তু হায়! বঙ্গমাতার এই সপ্তকোটি সন্তানের মধ্যে কে তাঁহাকে মা বলিয়া জানে, মা বলিয়া ডাকে, মা বলিয়া তাঁহার আরাধনায় এক ফোঁটা অশ্রুজল উপহার দেয়, বল! সেই 'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা' স্নেহশীতলা জননী মূর্ত্তিমতী হইয়া সকলেরই সমক্ষে রহিয়াছেন,—এই সপ্তকোটি কুসন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্যদানে লালন এবং অন্নজলে পালন করিতেছেন, কিন্তু কে তাঁহার দিকে মা বলিয়া

একবার ফিরিয়া চায়, মা বলিয়া তাঁহার চরণে লুটায় এবং দিনান্তে কি নিশান্তে, বর্ষান্তে কি যুগান্তে 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া একবার তাঁহাকে আহ্বান করে, বল"। (১৫ পৃষ্ঠা)।

এই কাব্যরসজ্ঞ সুপণ্ডিত সমালোচকের ভাষায় আনন্দমঠের গঠন-নৈপুণ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন—"কল্পনায় আনন্দমঠ পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং কবি কাব্যকুশল চিত্রকরের ন্যায় ইহার পট-প্রদর্শন-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার বহিঃস্থ প্রাঙ্গণ, প্রকোষ্ঠ, কানন ও কুসুমোদ্যান,—ইহার অভ্যন্তরস্থ সাধনাগৃহ, ভজনাগৃহ, ভক্তিমণ্ডপ, মুক্তিমণ্ডপ, ইহার দেবালয়, দেবমূর্ত্তি এবং দেবতার দেবতা সকলই তিনি একে একে ও উপযুক্ত অবসরে চিত্রপটে আঁকিয়া আঁকিয়া দর্শককে দেখাইতে যত্ন পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, সেই পটপ্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের দুই এক পরিচ্ছেদ শুনাইয়াছেন, ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাস একটু মিলাইয়া এবং উপন্যাসের মধ্যে কাব্যের তরল মধু ঢালিয়া ভাবের ভাবুক, রসের রসিক ও পথের পথিককে ঐ দেবালয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (বি, এ, রায়বাহাদুর)।

ঘরে ফিরে চল

সবে মাত্র দিনমণি অস্ত গেছে দূর সিন্ধু-মাঝে,
এখনো রক্তিমচ্ছটা তরঙ্গের শিরে শিরে রাজে
মহাযাত্রীটির কম্প্র পাণিটির আশীর্ব্বাদ সম।
অকূল হইতে আসি সান্ধ্য বায়ু হু হু শব্দে, মম
দেহমর্ম্মে চিত্তগ্রন্থি শিথিল করিছে বার বারই ;
চলিয়াছি সাগরের ধারে ধারে, চক্রতীর্থ ছাড়ি
এসেছি খানিক দূর। ক্রীড়ারত শিশু পুত্রটিরে
বামাকণ্ঠে কে বলিল, "সন্ধ্যা হ'ল ঘরে চল ফিরে,"
সহসা শুনিনু পিছে। চমকিয়া উঠিনু শিহরি
এ কি কণ্ঠ—এ কি স্বর কখনোও শুনিনি আ মরি
এমন মাধুরী-ভরা, নিশান্তের গাম্ভীর্য্যে মন্থরা
বহু বর্ষ মৌনব্রত পরে যেন ব্রতভঙ্গ করা
নিষ্কাশিল বাণীখানি। অবিরাম সিন্ধুর গর্জ্জন
আমার শ্রবণাকাশে করেছিল যে মেঘ সৃজন
তারি গায়ে চমকিল অই বাণী ক্ষণপ্রভাবৎ।
অনন্ত নীলিমামাঝে বিরচিল যেন ছায়াপথ।
উষার তারার মত গেল ঝরে সন্ধ্যাদৃশ্যখানি,
ফেনিল সৈকতশোভা। কোথা সিন্ধু, দূর অরণ্যানী
কোথা বা আমার দেহ ? ও বাণীর পক্ষে করি ভর
চিত্ত মোর চ'লে গেল বিশ্ব ছাড়ি লোকলোকান্তর
পার হয়ে গগনের সদ্যঃস্ফুট তারকানিকরে ;
কত দেশ দেশান্তর পার হয়ে যুগযুগান্তরে
স্বপ্নলোকে কল্পলোকে ঘরের সন্ধানে আপনার
ফুকারিয়া—"ফিরে যাব, কই কোথা সে ঘর আমার ?"
জানি না সে কতক্ষণ ছিনু বসি ভুবন বিস্মৃত
সিন্ধুতীরে। ফিরিলাম লোকালয়ে নির্জ্জন নিভৃত
নৈশ পথে। আজো সেই বামাকণ্ঠ নিভৃত সন্ধ্যায়
অন্তরের কর্ণে বাজে—'আয় বাছা ঘরে ফিরে আয়,'
দেহ ছাড়ি চিত্ত মোর ছুটে যায় অনন্তের পানে
সে দিনেরই মত সেই লোকে লোকে ঘরের সন্ধানে।

শ্রীকালিদাস রায়।

বড় ঘর

(উপন্যাস)

নবম পরিচ্ছেদ

উর্ণনাভ

যেমন অস্বস্তি, তেমনি দুশ্চিন্তা! নিজের উপর রাগ ধরিতে ছিল, কি কুক্ষণেই না আলিপুরের জু'য়ে সেদিন বেড়াইতে গিয়াছিল! কোনো মতে অন্নটুকু উদরস্থ করিয়া চিন্তার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য অনন্ত গিয়া বিছানায় আশ্রয় লইল! ঘুম কি চোখে আসে! প্রভাতও ঠিক চরম মুহূর্ত্তে দূরে চলিয়া গেল! সে কাছে থাকিলে তবু দু' মাথা এক করিয়া যা হোক একটা উপায় নির্ণয় করিতে পারিত! অদৃষ্ট!

জোর করিয়া অনন্ত চক্ষু মুদিল। মুদিত চোখের সামনে সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যা-কিছু ঘটিয়াছে, সে-সব বায়োস্কোপের ছবির মত ভাসিয়া চলিয়াছিল। তার পর কখন্ এক সময় যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে···

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নিশ্বাস কেমন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। অনন্ত উঠিয়া ঘরের সামনেকার বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক্ স্তব্ধ। জনহীন পথ। ও-পাশের বাড়ীর রোয়াকে পাঁচ-সাতটা কুলি অঘোরে ঘুমাইতেছে···দূরে গ্যাস-পোষ্টে ঠেশ দিয়া আধ-ঘুমে আচ্ছন্ন পাহারওয়ালা দাঁড়াইয়া আছে—যেন পুতুল! দিনের কাজ-কর্ম্মের অত কলরব, দুশ্চিন্তার যত চঞ্চলতা সব স্থির! ইহার মাঝে লাটু-পরিবারের সেই দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা তার বুকে শুধু কোলাহল জাগাইয়া রাখিয়াছে! অনন্তর সারা জগৎ আজ ঐ লাটু-সাহেবদের কথায় পরিপূর্ণ! এতখানি দায়িত্ব, কি বলিয়া সে মাথায় লইতে রাজী হইল! তার পানে তাঁরা কত আশায় চাহিয়া আছেন! কিন্তু সে কি···কি করিতে পারে? অনন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সহসা পাশে মার কণ্ঠস্বর—উঠে এলি কেন রে?

অনন্ত চমকিয়া উঠিল,—তার পর মাকে দেখিয়া কহিল,—ঘুম হচ্ছে না।

—কেন বল্ তো! অসুখ করে নি?···যে টো-টো করে সারাদিন ঘুরিস্ বাবা!···মা ছেলের কপালে হাত দিলেন, গায়ে হাত বুলাইলেন।

অনন্ত কহিল,—না, অসুখ নয়।

মা কহিলেন,—আমি দেখচি, খালি তুই বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করচিস্!···তার পর ঘুমোলি। তোকে ঘুমুতে দেখে তবে আমি শুলুম! কি হয়েচে?

একই ঘরে খাটের বিছানায় অনন্ত শয়ন করে, মেঝেয় একখানা মাদুর পাতিয়া সেই মাদুরে মা রাতের শয্যা রচনা করেন।

অনন্ত মার পানে চাহিল, ভাবিল, মাকে বলিবে?

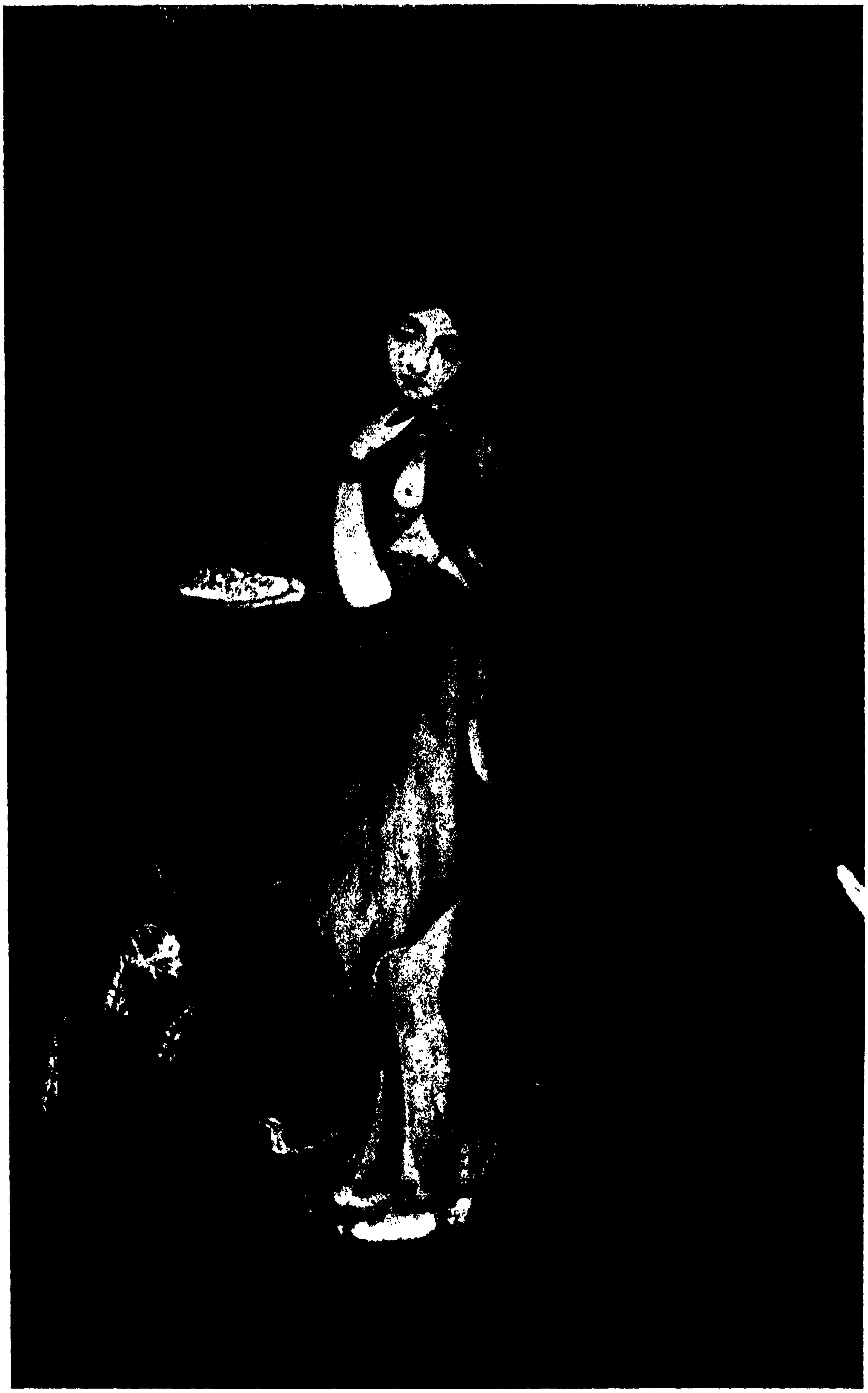

শারদ-প্রদোষে

বসুমতী চিত্রবিভাগ

একা এ দুশ্চিন্তার যাতনা আর সহিতে পারে না ! কিন্তু ··· না···অনন্তর চেয়েও নিরুপায় মা !

মা কহিলেন,—তোর মুখ দেখে বুঝচি, কিছু একটা হয়েচে !···কি, আমায় বল্ দিকিন্···

অনন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—শুনবে ?···কিন্তু এ এমন সমস্যা মা যে, তুমি আমি তার কোনো মীমাংসা করতে পারবো না !

মা কহিলেন,—তবু···

অনন্ত কহিল,—বসো, বলি। তোমার কাছে এতক্ষণ গোপন রেখে ভালো করি নি ! আমি তো জানি, আমার মা যে-সে মা নয়···মার মনে গর্ব্বের একটা ছোট শিখা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া তখনি নিবিয়া গেল।

মা কহিলেন,—বারান্দায় বাতাস আছে—এইখানে বোস, বসে বল্···

মা বসিলেন, অনন্ত তাঁর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। উর্দ্ধে আকাশে ছোট ছোট মেঘের ক'টা টুকরা চঞ্চল লীলা-ভরে ছুটাছুটি করিতেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট কয়েকটা নক্ষত্র···তাদের সঙ্গে মেঘ-শিশুদের খেলা চলিয়াছে !

অনন্ত ডাকিল,—মা···

অনন্তর মাথার কেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে মা কহিলেন,—যদি ঘুম আসে, ঘুমো—এখানে শুয়েই ঘুমো··· কাল সকালে না হয় বলিস !···ঘুম এলে ঘুমটুকুকে যেন তাড়াস্ নে···

অনন্ত কহিল—না মা, ঘুম আসবে না বল্‌চি। যতক্ষণ তোমায় না বলবো, ঘুম বোধ হয় আসবে না !···

অনন্ত তখন ধীরে ধীরে সমস্যা-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মা চুপ করিয়া রহিলেন। তাই তো, এ বিপদে তাঁর ছেলে কি করিতে পারে ? তিনিই বা কি পরামর্শ দিবেন ?···মা ভাবিতে লাগিলেন।

মাথার উপর মেঘের দলে তেমনি ছুটাছুটি ! আকাশের একপ্রান্তে ছোট এক-ফালি চাঁদ—দল ছাড়িয়া নেহাৎ একা, নিঃসঙ্গ ম্লান নেত্রে চাহিয়া আছে···কোথায় তার সে স্নিগ্ধ হাসি ! বর্ণের জৌলুষ !···

অনন্ত কহিল,—হয়তো কোনো উপায় করতে পারতো আমার বন্ধু প্রভাত ! সেও ঠিক এই সময় বাড়ী চলে গেছে !···

মা কহিলেন—সেই বা কি করবে ?

সে কি করিবে, অনন্তও ভাবিয়া পায় নাই ! তবু কেমন মনে হয়···

মা কহিলেন,—তারাই বা কি লোক ! তোরা ছেলে-মানুষ নিজেদের কোনো সামর্থ্য নেই। এ সব টাকা-কড়ির ব্যাপারে তোরা কি করতে পারিস···তোদের ঘাড়ে এত-বড় দায় চাপানো ! · তুই ভাবিস্ নে,—ঘুমো। আমি ভেবে দেখি, কোনো উপায় ঠাওরাতে পারি কি না···

অনন্ত কহিল,—ভাবো। আমিও ভাবি ··

অনন্ত চক্ষু মুদিল···

হঠাৎ মার আহ্বানে ঘুম ভাঙ্গিতে অনন্ত ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল—কি মা ?

মার কোলে মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা কহিলেন—বাইরে কে ডাকচে রে—বাবু-বাবু বলে ··

অনন্ত উঠিয়া বারান্দা দিয়া ঝুঁকিয়া নীচে চাহিয়া দেখে, দ্বারে একটা লোক ··

অনন্ত কহিল—কি চাও ?

লোকটা পথের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল,—বেচারা-গোছের লোক—খোট্টা।

অনন্তকে দেখিয়া সে কহিল,—নন্ত বাবুর এ কোঠি ?

নন্তবাবু ! ও···অনন্ত ! অনন্ত কহিল,—হ্যাঁ · কোথা থেকে আসচো ?

সে কহিল—রিকশায় জেনানা সওয়ারী আছে · নন্ত বাবুকো বোলাইছে···

জেনানী-সওয়ারী ! বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল ! নিশ্চয় ! ···রাগ ধরিল ! এমন কি দায় আমার যে এই গভীর নিশীথে আমার এখানে আসিয়াছ কিনারার সন্ধানে ! বিপদে পড়িবার সময় পরামর্শ লইতে পারো নাই ? অনন্ত কি এমন শাহানশাহ যে অত টাকা চুকাইয়া তোমাদের এ দায়ে উদ্ধার করিবে !

সে মার পানে চাহিল। মা তার পানে চাহিয়াছিলেন। মা কহিলেন,—তারাই ?

—বোধ হয়।

মা কহিলেন,—দ্যাখ্···কি হলো !

অনন্ত কহিল—বয়ে গেছে আমার দেখতে !···এ কি ফ্যাসাদ বলো তো ! আমি কি মহারাণী স্বর্ণময়ী, না,

অহল্যা বাই যে টাকা চাইলেই বার করে দেবো! ওঁদের মতই আমি নিঃসহায়!...এ যে জুলুম!

মা কহিলেন—রাগ করিস নে রে...খুব বেশী বিপদ না বুঝলে কি এ্যাদ্দুর অবধি এসেচে—এই রাত!...যা, শোন্, কি হয়েচে।

অনন্ত বিরক্তি বোধ করিল—একা বলিয়া এ বিরক্তি আরো তীব্র! শুধু একা? সে যে নিরুপায়! নহিলে উপায় থাকিলে খুশী-মনে সে গিয়া সেই পাষণ্ডটার হাতে সব টাকা গুঁজিয়া দিত, দিয়া বলিত,—এই নে তোর টাকা—নিয়ে নিকালো—আবি নিকালো!...কিন্তু...

মা কহিলেন—যা রে...

—যাই। আদুড় গায়েই সে বাহির হইতেছিল! আনলা হইতে তার গেঞ্জিটা টানিয়া মা কহিলেন—গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে যা...

তাই হইল। মাথা দিয়া গলাইয়া গেঞ্জিটা গায়ে চাপাইয়া চটী জুতা পায়ে অনন্ত বাহির হইয়া গেল।

লোকটা কহিল—গাড়ী দূরে আছে।

মোড়ের মাথায় একখানা রিক্শ। লোকটার সঙ্গে অনন্ত আসিয়া রিক্শর সামনে দাঁড়াইল। রিক্শয় বসিয়া জাহ্নবী দেবী। অনন্তকে দেখিয়া জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—সর্ব্বনাশ হয়েচে, বাবা—তাই এই রাত্রে তোমার উপর উৎপাত করতে এসেচি! কি করবো—নিরুপায়! জাহ্নবী দেবীর চোখে অশ্রু!

অনন্তর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। জাহ্নবী দেবীর বিষণ্ণ মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া সে কেমন থ হইয়া গেল। তার মুখে কথা ফুটিল না।

জাহ্নবী দেবী রিক্শ হইতে নামিয়া অনন্তর দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন, ডাকিলেন,—বাবা...

চিত্র-করা চোখের দৃষ্টিতে অনন্ত তাঁর পানে চাহিল। জাহ্নবী দেবীর চোখে রাজ্যের মিনতি...বিশীর্ণ কুণ্ঠিত বেশে জমা হইয়া আছে!

জাহ্নবী দেবী কহিলেন—কি হবে, বাবা?

অনন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—কি হয়েচে?

প্রাণটা দরদে গলিলেও একটু বিরক্তি! এই রাত্রে বিজন পথে বাড়ীর কাছে অশ্রুমুখী নারী...বহুকালের কুসংস্কার তার কালি-মাখা মুখখানা তুলিয়া বুকের মধ্যে উঁকি দিতেছিল! তার ইঙ্গিতে অনন্ত চারিধারে একবার চাহিয়া দেখিল—কোথাও কেহ নাই!

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—উনি তো বেরিয়েচেন সেই পাঁচটায়—তোমায় বলেছিলুম। ফেরবার নাম নেই। রাত দশটা বাজলো, এগারোটা, তার-পর বারোটা...মাতে-মেয়েতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কাঠ হয়ে বসে আছি...অনেক করে মেয়েকে বললুম, তুই ঘুমো মা, জাগলে অসুখ করবে! এই বিপদের উপর অসুখ করলে যাতনার আর অন্ত থাকবে না। মেয়ে শুনলো না—কিন্তু না শুনলেও পারবে কেন? ঢুলে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। আমার মনের মধ্যে যা হতে লাগলো—যত দেবতা আছেন, কাকেও ডাকতে বাকী রাখিনি, বাবা! শেষে একটা বাজতে অসহ্য বোধ হলো...নীচেয় নেমে সেই যে মালী আছে, তাকে তুললুম, বললুম, একটু খোঁজ করবি বাবা?...কিন্তু কোথায় সে খোঁজ করবে? একটু ঘুরে সে ফিরে এলো, সঙ্গে এই রিক্শওলা—তার হাতে চিঠি। চিঠি নিয়ে ডাকাডাকি...মা-জী, মা-জী! পড়ে ছাখো বাবা—এই সে চিঠি।

অশ্রুর আর দুটা তরঙ্গ আসিয়া জাহ্নবী দেবীর দুই চোখের কূলে লাগিল। অনন্তর হাতে তিনি চিঠি গুঁজিয়া দিলেন। খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া অনন্ত গ্যাসের আলোয় পড়িল,—

কোনো উপায় করিতে পারিলাম না। কোন্ মুখে ফিরিব? সব সহিতে পারি—কিন্তু সমাজে মাথা তুলিয়া চলাফেরা করিয়াছি, সে মাথা ধূলায় লুটাইবে, ইহা সহিতে পারিব না।

জোর করিয়া বিবাহ করিতে পারে না—মেয়ে বড় হইয়াছে। উকিলের পরামর্শ লইয়াছি। মেয়ে যদি বলে, বিবাহ করিব না—অন্নদার সাধ্য নাই, আইনের সাধ্য নাই—সে বিবাহ দেয়।

তবে টাকার জন্য আমাকে অপদস্থ করিতে পারে। তাই ভাবিতেছি, সরিয়া থাকি। তোমাদের উপায় তোমরা করিবে। আর কেহ আশ্রয় না দেয়, অনন্ত এবং তার সেই বন্ধুটি—তাহাদের পায়ে ধরিও—অকূলে পড়িবে না! আমার জন্য ভাবিও না। আইন বাঁচাইয়া যেমন করিয়া হোক, দিন আমার কাটাইয়া দিব।

নুটবিহারী

পুঃ—চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিও। রিক্শওয়ালাকে একটাকা দিয়াছি—তোমাদের কিছু দিতে হইবে না।

নুটু

অক্ষরগুলা সরীসৃপের মত অনন্তর চোখের সামনে

কিল্‌বিল্‌ করিতে লাগিল। স্বার্থান্ধ, শয়তান! পরের কাছে টাকা লইয়া চরম মুহূর্ত্তে এমন করিয়া সরিয়া দাঁড়ানো! ঐ তরুণী কন্যা, নিঃসহায় স্ত্রী—তারা এ উত্তাল বিপদের সামনে কি শক্তি লইয়া দাঁড়াইবে! এই বিপদ! তার উপর তোমার এই সরিয়া পলায়ন! নির্লজ্জ কাপুরুষ! অনন্ত রাগে জ্বলিয়া উঠিল।

কাঁদিয়া জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—আমি মেয়ে মানুষ, এ বিপদে কি উপায় করি, বাবা! চিঠি পেয়ে মাথা ঘুরে গেল! কিন্তু ভাগ্যে দিনের বেলা নয়—লোক-জন কেউ কোথাও নেই—তাই তোমার কাছে আসতে পেরেচি! মেয়েটা ঘুমোচ্ছিল···ঘরে চাবি দিয়ে এসেচি। ঐ রিক্সাওয়ালার হাতে-পায়ে ধরে যে করে এসেচি! তুমি উপায় করো, বাবা···

গভীর আবেগে জাহ্নবী দেবী অনন্তর হাত চাপিয়া ধরিলেন।

উপায়? কিন্তু অনন্ত কি উপায় করিবে? তার চোখের সামনে এক অকূল সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে ফুঁশিয়া উঠিল!···

জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—কষ্ট যখন দিয়েচি, আর তুমি বাবা যখন সে কষ্ট স্বীকার করেচো, তখন এ দীন-দুঃখীদের জন্য আর একটু কষ্ট করতেই হবে। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করবেন, বাবা—আমার তো কিছু করার ক্ষমতা নেই···

অনন্ত চুপ করিয়া রহিল। রাগ খুবই হইতেছিল! সেই এক কথা বার-বার মনের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইতেছিল,—অনন্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয় পাইয়াছ, না, মহারাণী স্বর্ণময়ী পাইয়াছ! সে কতখানি দীন, অসহায়, কতখানি শক্তিহীন···

জাহ্নবী দেবী আবার চোখের জল মুছিলেন।

অনন্ত কহিল,—আমাদের ওখানে আসতে পারতেন! কিন্তু জানেন তো, আমি কাকার অধীন, আমার মাও তাই। বাবা থাকলে···

—জানি বাবা, সব বুঝচি! কিন্তু তুমি ছাড়া আর কাকেও দেখচিনে, যে এ হতভাগীদের উপর করুণা করে!···তাঁর স্বর ক্রন্দন-জড়িত—সে স্বরে অনন্তের প্রাণ দুলিয়া উঠিল।

জাহ্নবী দেবী আবার কহিলেন,—মেয়েটাকে একা সেই বনের মধ্যে ফেলে এসেচি। যে বরাত···ঘরের ইট-কাঠগুলো যদি আজ অজগরের ফণা তুলে দাঁড়ায়, তাতে আশ্চর্য্য হবো না!···তুমি একবারটি এসে', এই গাড়ী আছে, কথায়-কথায় যদি হদিশ মেলে! কাল দিনের আলোয় কি করে চোখ মেলে পৃথিবীর পানে চাইবো, তা ভেবে আকুল হয়ে উঠচি! ভাবচি, যা হবার, এই রাত্রেই তা হয়ে যাক্। দিনের আলোয় এ-কালি যেন কারো চোখের সামনে না ধরতে হয়! বাঁচবার সাধ একটুও নেই, মেয়েটার হাত ধরে পুকুরের জলে গিয়ে ডুবি, এই সাধই জাগচে। আবার মনে হয়, মেয়েটা···তার সমস্ত জীবন···হয়তো তার এ দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য—তাকেও এ বয়সে মরণের পথে সাথী করবো! সে যে···

অশ্রুর তরঙ্গে জাহ্নবী দেবীর কথায় শেষটুকু ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্ত কহিল,—আমায় এখন কি করতে বলেন?··· এই রাত্রে?

জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—পথে দাঁড়িয়ে পরামর্শ হয় না, বাবা। দয়া করে একটি বার আমার সঙ্গে এসো··· দয়া···দয়া···

জাহ্নবী দেবী দুই হাত জোড় করিয়া সজল নেত্রে অনন্তর সামনে দাঁড়াইলেন, কৃপাপ্রার্থিনী! ক্ষণেকের জন্য অনন্তর মনে হইল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে!···সত্যই তাই? দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সে চাহিল। না, স্বপ্ন নয়! এ পথ, ঐ গ্যাসের আলো, রিক্‌শ-গাড়ী, ঐ রিক্‌শওয়ালা খোট্টা···এবং এই যে শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী—অশ্রু-পরিপ্লুত তাঁর দুই চোখ, মলিন কাতর মুখ, বিশীর্ণ শ্রী!···

অনন্ত কহিল,—বেশ, চলুন···কিন্তু দাঁড়ান, আমার মা জেগে আছেন—ভাববেন, কোথায় গেলুম!···তাঁকে খবরটা দিয়ে আসি।

—শীগ্‌গির এসো বাবা! মেয়েটার জন্য আমি ভেবে মরচি···

অনন্তর অস্বস্তি ধরিতেছিল! কিন্তু ধরিলেই বা কি করিবে? সে আসিয়া গৃহের সামনে দাঁড়াইল—উপরের বারান্দায় মা উদ্বেগে আকুল!

অনন্ত কহিল,—আমার জামাটা ফেলে দাও মা···আমি এখনি আসচি।

—কি হয়েচে রে ?

—এসে বলবো। জামাটা চট্ করে দাও…

মা তখনি জামা ফেলিয়া দিলেন—সেটা গায়ে দিতে দিতে অনন্ত ফিরিল। এবং…

উপায় যখন নাই, সেই রিক্শয় জাহ্নবী দেবীর পাশে উঠিয়া বসিতে হইল।

চোখের জল মুছিয়া জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—বড্ড কষ্ট দিচ্ছি, বাবা! কি করবো? আমি নিরুপায়, বড় নিরুপায়…

—

দশম পরিচ্ছেদ

নারী

গাড়ীতে দুজনে কোনো কথা হইল না। গৃহে সিঁড়ির কাছে গাড়ী থামিলে জাহ্নবী দেবী নামিলেন, নামিয়া কহিলেন,—এসো বাবা…

অনন্ত নামিয়া মাতালের মত কম্পিত পায়ে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইল। রিক্শওয়ালাকে জাহ্নবী দেবী কহিলেন,—তুই এইখানেই শুয়ে ঘুমো বাবা…! এত রাত্রে কি আর সওয়ারী পাবি, বিশেষ এধারে…

সে কহিল,—না—সে এখন ওদিকে বড় রাস্তায় যাইবে, গাড়ী লইয়া…রাতের গাড়ী। শুইলে কি তার চলে!

রিক্শওয়ালা বখশিস্ লইয়া চলিয়া গেল…ঘণ্টায় সেই ঠন্ ঠন্ ঠং শব্দ তুলিয়া! সে শব্দের রেশ বুকে ধরিয়া জাহ্নবী দেবীর সহিত অনন্ত দোতলায় উঠিল।

ঘরগুলা খাঁ-খাঁ করিতেছে। একে বিজন বন, তার উপর নির্জ্জন গৃহ! এবং সদ্য যা ঘটিয়াছে, তার করুণ স্মৃতি! অনন্তর মন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল—চেতনা যেন এখনি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এমন ভাব!

চাবি খুলিয়া জাহ্নবী দেবী ঘরে ঢুকিলেন,—পরক্ষণে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন,—ঘুমোচ্ছে! ভালোই হয়েচে…

তিনি অনন্তর পানে চাহিলেন, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—কি যে এখন করি!…এ বাড়ীতে আর থাকা চলবে না! ভরসা তুমি! জাহ্নবী দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন—কতখানি নিরুপায়, তুমি ধারণা করতে পারবে না।…তোমার কথাও বুঝি…বাঙালীর সংসার—তুমি লেখাপড়া করচো…কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া কার পানে চাইবো, এমন লোকও দেখচি না! আমি হলে ভাবনা ছিল না—ঐ মেয়ে…ওকে নিয়েই হয়েচে যত জ্বালা! ওর সমস্ত জীবনটা পড়ে রয়েচে—বড় অভিমানী…ওকে কত ঢেকে যে চলছি…জাহ্নবী দেবী আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

কথাগুলা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সেই অনন্ত…? কথা কাণে গেলেও তার মনে ঠিক প্রবেশ করিল কি না, বলা কঠিন। সে নিথর দাঁড়াইয়াছিল…চারিদিক্‌কার এই নিবিড় স্তব্ধতা তাকে যেন পাষাণ-স্তূপে পরিণত করিয়া দিয়াছে! সারা পথ তার মনে জাগিতেছিল একটা গল্প—গল্প নয়, সত্য ঘটনা। জীর্ণ একখানি গৃহ—কতকালের অযত্নে অবহেলায় তলে তলে কোথায় ফাট ধরিয়া তার প্রাণ-রসটুকু শুষিয়া কাঠামোখানা মাত্র কোনো মতে খাড়া রাখিয়া ছিল—সে গৃহের পাশ দিয়া পথে কত লোক আসিত-যাইত—সম্পূর্ণ নিরাপদ, নিঃসঙ্কোচ চিত্তে—কোনো উপদ্রব ঘটে নাই! কিন্তু একদিন এক বেচারী পথিক নিশ্চিন্ত মনে সেই পথে আসিতে জীর্ণ গৃহ সহসা হুড়মুড় করিয়া তার ঘাড়ে পড়িয়া তার জীবনটুকু চকিতে নিঃশেষ করিয়া দিল!…পথিক-দলে চমক লাগিল, ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই—কোথায় এমন ফাট ধরিয়াছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই! সহসা আজ!…

অনন্ত সেই কথা ভাবিতেছিল—এই লাটু-পরিবার! হাসি-গল্পে দিন ইহাদের বেশ কাটিয়া চলিয়াছিল—যখন যা সখ, খেয়াল…কোনটা পরিতৃপ্ত করিতে কোথাও বাধে নাই! সহসা দু' দিন মাত্র তারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাও কৌতুক-ছলে—অমনি কি দায়…সেই জীর্ণ গৃহের মত হুড়মুড় করিয়া আচম্বিতে ঘাড়ে পড়িল! কিন্তু এমন বিপদ শুনিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইতে বাধে! অথচ কি করিতে পারে সে? নিরুপায় নিরবলম্ব মন তাই অসীম শূন্যতার মাঝে ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছিল। এ ঘোরার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই!

মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস! অনন্তর চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল, পাশে বনানীর মাথায় বিস্তীর্ণ আকাশ—বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রে খচিত, আলো-ছায়ার স্বপ্নে বিজড়িত, অসীম রহস্যের মত আদি-অন্তহীন!

জাহ্নবী দেবী কহিলেন—ঐ ঘরে কৌচ আছে, তুমি বসো বাবা।…দু-একটা কায আছে, আমি সেরে নি—যতখানি সম্ভব তোমার ভার হালকা করতে পারি যদি, দেখি!…বসো বাবা। মিছে দাঁড়িয়ে কষ্ট কেন পাও! ঘুম থেকে তুলে তোমাকে টেনে এনেচি।

জাহ্নবী দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ওদিক্‌কার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। অনন্তর পায়ে বল নাই—কাজেই সেও কোনো মতে পা দুটাকে টানিয়া ঘরে আসিয়া কৌচে হেলিয়া বসিল। অদূরে খাট। খাটে শুইয়া পরিমল ঘুমাইতেছে। খাটে মশারি ফেলা। বাতাসে মশারির ঝালর দুলিতেছে!…অনন্ত নিমেষের জন্য খাটের পানে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইল, খোলা জানালা দিয়া বাহিরে ঐ দিগন্তবিস্তারী নীল আকাশের পানে! অন্তহীন রহস্যে ঘেরা—তবু ঐ আকাশ তার বড় ভালো লাগে! জীবনে যখনি কোনো দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা আসিয়া চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দাড়ায়, ঘন-ঘোর সমস্যা মনকে আকুল করিয়া তোলে, তখন ঐ রহস্যময় আকাশের উদ্দেশে শূন্য মনকে সে প্রেরণ করে। আকাশ কোনো কথা কয় না—মীমাংসার এতটুকু ইঙ্গিত জানায় না…তবু…মনের ভার তার লঘু হয়! এমন নয়ন-ভুলানো দুঃখ-জুড়ানো বন্ধু আর কে আছে!…

আকাশের দিকে চাহিয়া এই পরিবারটির কথাই অনন্ত চিন্তা করিতেছিল। সহরের বুকে কোথা হইতে ইঁহারা আসিলেন? আত্মীয়-বন্ধু কেহ এমন নাই, যার দ্বারে ক্ষণেকের জন্য গিয়া দাঁড়াইতে পারেন? ঐ পরিমল…মা-বাপের সঠিক পরিচয় সত্যই জানে না? ছোট নয়, মূর্খ নয়…তাছাড়া যে-সব বন্ধু বা অতিথির পরিচয় ইঁহাদের আলাপের পিছনে ভাসিয়া ওঠে…সেই আই-সি-এস রক্ষিত, ঐ কর্কট মিশ্র…কি সূত্রে তারা আসিয়া এখানে জুটিয়াছিল! কেন গেল? কেনই বা আর আসে না? তাদের সঙ্গে কত দিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়? আজ এ বিপদের কথা তাদের জানাইলে তারা কোনো উপায় করিতে পারে না? তবে?

রহস্য! এ রহস্য উড়াইয়া দিবার নয়!…জাহ্নবী দেবী? কোথায় গেলেন? কি কাজ?…অনন্ত উঠিয়া বসিল। চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা—শুধু দূরে থাকিয়া থাকিয়া কি একটা রব ঐ ওঠে…

চৌকিদারের পাহারা-ঘোষণা!…একটা নিশ্বাসের শব্দও…অনন্ত খাটের দিকে চাহিল—পরিমল পাশ ফিরিয়া শুইল। তার মুখে জ্যোৎস্নার মৃদু আলো পড়িয়াছে, মুখে নিশ্চিন্ত আরামের আভাস! অনন্ত ভাবিল, এত বড় বিপদ মাথার উপর উদ্যত, সে কথা পরিমল সত্যই জানে না? না জানা সম্ভব! জানিলে এতখানি নিশ্চিন্ত হইয়া কেহ ঘুমাইতে পারে না।…বেচারী পরিমল! এই বয়সে সামনে দুস্তর পৃথিবী—প্রান্তরের মত শূন্য! আশ্রয়-তরুর চিহ্নও কোথা নাই!

অনন্ত নির্নিমেষ নয়নে পরিমলের পানে চাহিয়া রহিল, বুক তার মমতায় ভরিয়া উঠিতেছিল…

হঠাৎ একটা শব্দ। নীচে কে খড়খড়ি খুলিতেছিল। চাহিয়া অনন্ত দেখে, ঘরে ঊষার প্রথম রশ্মি প্রবেশ করিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার তাহার স্পর্শে সরিয়া গিয়াছে! সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল? তাই!…

চোখ দুটা রগড়াইয়া সে উঠিয়া বসিল, খাটের পানে চাহিল, পরিমল তখনো ঘুমাইতেছে! আশ্চর্য্য! বাড়ীতে মা ওদিকে ভাবিয়া সারা হইতেছেন…জাহ্নবী দেবী? তিনিও কি ঘুমাইয়া পড়িলেন! এমন ঘুম? দিনের আলো ফুটিয়াছে…রাত্রিটা অনন্তর এইখানেই ঘুমে কাটিল? আশ্চর্য্য!

অনন্ত উঠিয়া কক্ষান্তরে উঁকি দিয়া দেখে, কেহ নাই। দালান, বারান্দা,—জাহ্নবী দেবী কোথাও নাই! সে নীচে নামিল। সেই মালীটা…

অনন্ত কহিল—দোতলার মা-জী কোথায় রে?

সে কহিল, জানে না।

অনন্ত কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—হয়তো…

আবার সে দোতলায় উঠিল—এ-ঘর, ও-ঘর—প্রতি ঘরে সন্ধান লইল…জাহ্নবী দেবী কোথাও নাই।

তার অস্বস্তি ধরিল।…কোথায় গেলেন?…

একটা আতঙ্ক নিমেষে জাগিয়া মনকে কাঁপাইয়া তুলিল। অসহ্য নিরুপায়তার মাঝে যদি…? তার গায়ে কাঁটা দিল। দোতলার গাড়ী-বারান্দা হইতে পুকুর দেখা যায়। সে গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল—পুকুরের পানে চাহিল—কোনো শাড়ী? নারীর দেহ…?

না, কিছু দেখা যায় না। একটা উড়িয়া মালী পুকুরে স্নান করিতে নামিয়াছে। সে কি নীচে গিয়া দেখিবে?…নীচে

নামিয়া পুকুরের জলে সন্ধান লইবার কথা মনে হইবামাত্র সারা অঙ্গ ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। দুশ্চিন্তার সীমা নাই! এ কি বিপদে ফেলিলে ভগবান্‌!

সে আকাশের পানে চাহিল,—জবাকুসুমসঙ্কাশ তরুণ সূর্য্য বৃক্ষ-পল্লবের অঙ্গ যেন আনন্দ-রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে! ···অনন্ত ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরে বসিল। পরিমল? এখনো ঘুমাইতেছে! তার ইচ্ছা হইল, ধাক্কা দিয়া তাকে তুলিয়া দেয়—তুলিয়া বলে, কি সর্ব্বনেশে ঘুম তোমার! এ-দিকে এমন বিপদ···আমি বাহির হইতে আসিয়া এ-বিপদে মাথা তুলিবার পথ পাইতেছি না, আর তুমি···

দারুণ অস্থিরতা, অসহ্য চাঞ্চল্য! উন্মাদের মত অনন্ত ঘরের মেঝেয় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। গল্পে-উপন্যাসে পড়া যত ভয়াবহ কাহিনী তার প্রাণে একেবারে বিভীষিকার জাল মেলিয়া ধরিল!

সহসা দৃষ্টি পড়িল, টীপয়ের উপর। একখানা চিঠি। খামে মোড়া—যেন সদ্য লেখা! খামখানা সে হাতে লইল। খামে তার নাম লেখা। তার বুক কাঁপিল। কম্পিত বুকে সে চিঠি হাতে লইল। ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া লেখা যা পড়িল, তাহাতে পায়ের নীচে সারা বিশ্ব একেবারে ভীষণ বেগে দুলিয়া উঠিল! চিঠি তারই। চিঠির তলায় জাহ্নবী দেবীর নাম। জাহ্নবী দেবী লিখিয়াছেন—

আমায় তুমি ক্ষমা করো, বাবা। একা আমি, চোখে অন্ধকার দেখিতেছি: অনেক কারণ আছে। সে মস্ত কাহিনী। সে সব কথা তোমায় এখন বলিতে পারিলাম না। বলিবার নয়, বোধ হয়!

আমি ও পরিমল—দুটো ভার তোমার পক্ষে বহা সম্ভব নয়, তাই আমি দূরে যাইতেছি। তিনি যেখানে থাকুন, তাঁকে পাইবই, পাইতে হইবে। নহিলে যে-মানুষ, তাঁকে হারাইতে বিলম্ব ঘটিবে না।

আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটুক, পরিমলকে তোমার হাতে দিয়া গেলাম। যদি বিবাহ করিতে পারো করিয়ো, বংশে কোন দোষ ঘটিবে না। আর যদি সে কাজ অসম্ভব ভাবো এবং পরিমলকে সত্যই যদি ভার বোধ করো, তাহা হইলে জানা-কোনো অনাথ আশ্রমে তাকে ফেলিয়া দিয়ো। তার সঙ্গে কোনো কথা হইল না। সে কাতর হইবে, তাকে বলিয়ো, তাহারি মঙ্গলের জন্য আমরা আজ তার কাছ ছাড়িয়া যাইতেছি। যদি ভাগ্য কখনো প্রসন্ন হয়, ফিরিয়া আসিব এবং দেখা হইবে।

তোমায় বলিবার কিছু নাই—পরিমল বড় দুঃখী, তাকে যদি আশ্রয় দাও, সে-আশ্রয়ের মূল্য দিবার শক্তি তার মা-বাপের নাই। তবে সকল মা-বাপের যিনি মা-বাপ, তিনি তোমায় চিরসুখী করিবেন! যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, প্রতিদিন প্রতি নিমেষ তাঁর কাছে শুধু এই প্রার্থনাই জানাইব।

দুঃখিনী

জাহ্নবী দেবী

অনন্তর পায়ের তলা হইতে দুনিয়া সরিয়া যাইতেছিল! তার পা কাঁপিল, গা টলিল। কোনো মতে সে কৌচটায় বসিয়া পড়িল। সদ্যজাগ্রত বিশ্ব-ভূমির স্পন্দনও যেন তার অনুভূতির পরশ মুছিয়া কোন্‌ শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছিল!···

বিস্ময়ে বিমূঢ় অনন্ত ভাবিতেছিল, সত্যকার জগৎ ছাড়িয়া জীবন আজ কল্পলোকের কুহেলিকায় ভরিয়া উঠিল না কি? যা ঘটিয়াছে—এ সত্য? না, মানুষের লেখা কাল্পনিক কাহিনী? কিন্তু···না,···

কাহিনী নয়, কাহিনী নয়! ঐ যে পরিমল···ঐ সে জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছে!

চমকিয়া পরিমল কহিল—অনন্ত বাবু! আপনি!

অনন্ত কহিল—হাঁ, আমি!

পরিমল কহিল—এই সকালে···? ব্যাপার কি?

অনন্ত কহিল—এই চিঠি···পড়ে দেখুন!

কম্পিত হাতে চিঠি লইয়া পরিমল পড়িল।···পড়া শেষ হইলে সে চীৎকার করিয়া উঠিল—এ কি অনন্ত বাবু··· এর মানে?

যাহা ঘটিয়াছে, বহু আয়াসে অনন্ত পরিমলকে বলিল। শুনিয়া পরিমলের কি সে আর্ত্তনাদ—চোখে তার অশ্রুর পাথার!···

চোখের জল মুছিয়া পরিমল কহিল—উপায়?

অনন্ত কহিল—তাই ভাবচি!

অনন্ত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল—পরিমলও তাই।··· বহুক্ষণ!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পরিমল আবার ডাকিল—অনন্ত বাবু···

নিশ্বাসের বোঝা অনন্তর বুকটাকে বিষম ভারী করিয়া তুলিয়াছিল। অনন্ত মুখ তুলিয়া চাহিল। পরিমল কহিল—কি করবেন? পরিমলের চোখ অশ্রুর বাষ্পে আচ্ছন্ন!

অনন্ত কহিল,—আপনি কি বলেন?

পরিমল কহিল—আমার বলবার কিছু নেই। আপনার ওপরই সব ভার!

অনন্ত কহিল—হাঁ। তাই ভাবচি···

একটা উদ্যত নিশ্বাস সবলে রোধ করিয়া পরিমল কহিল—এত ভাবনার দরকার নেই, অনন্ত বাবু। কারো গলগ্রহ হয়ে তাকে ব্যস্ত করতে আমি চাই না। আপনার হাতে মা আমার ভার দিয়ে গেছে—কিন্তু আমার একটি কথা আছে···

অনন্ত পরিমলের পানে চাহিয়া রহিল—তার মুখে কথা নাই! পরিমলের ঠোঁট কাঁপিল—একটা নিশ্বাস বুক হইতে উঠিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। পরিমল কহিল—আপনি বাড়ী যান···এত চিন্তার কারণ সত্যই ঘটে নি···

অনন্তর বিস্ময়ের সীমা নাই। পরিমল বলে কি! অভিমান?···সে কহিল,—আমি বাড়ী যাবো? আর আপনি?···

পরিমলের চোখের কোলে জল শুকাইয়া আসিয়াছে—কালির রেখা! ম্লান মৃদু হাস্যে পরিমল কহিল,—এখানে এ ক'দিন তো এখনো অনায়াসে থাকা যাবে! অন্নদা বাবু তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই···

তার কথা শেষ হইল না। অনন্ত তার মুখের পানে চাহিয়া, দৃষ্টি উদাস···কৌতূহলে ভরা!

পরিমল কহিল,—এর মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে যা হোক কোনো ব্যবস্থা বোধ হয় করতে পারবো!···মা'র অন্যায় হয়েচে, এ-ভাবে আপনাকে টেনে আনা! আপনি বাড়ী যান। বাড়ীর সকলে কত ভাবচেন!

অনন্তর দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে সে কহিল,—তা হয় না, পরিমল দেবী। আপনাকে এখানে একা রেখে আমি কোথাও যাবো না—যেতে পারবো না!

পরিমলের মুখে আবার সেই মলিন ম্লান হাসি···অশ্রুর চেয়েও করুণ সে হাসি! পরিমল কহিল,—পাগলামি করবেন না—বাড়ী যান! আপনার নিজের ভার নেবার সামর্থ্য আজো হয় নি—আপনি নেবেন আমার ভার!···মা'র যেমন বুদ্ধি!···

অনন্ত সত্যই যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছে! কোথায় কূল, কি করিয়া কূল পাইবে, ভাবিয়া পাইল না! চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পরিমল কহিল,—মিছে বসে আছেন! আমায় আপনি কোথাও নিয়ে যেতে চাইলেও আমি যাবো না!···

অনন্ত নিশ্বাস ফেলিল।

পরিমল কহিল,—যাওয়া যায়? এ অবস্থায়? আপনি বলুন! বিপদের ভয়ে মা-বাপ যাকে বিপদের মুখে ফেলে চলে যায়, লোকালয়ে মুখ দেখাবার তার কোনো উপায় আছে? না, আপনি দুঃখ করবেন না! চোখে জল কেন? মুছে ফেলুন। আপনার কোনো অপরাধ নেই। আমার নিজের কথা বলচি—ভাবুন তো, আমার নিজের কি এতটুকু মর্য্যাদা-বোধ নেই···এতটুকু সম্ভ্রম? কোন্ পরিচয়ে আমি···

পরিমলের কথা শেষ হইল না, বুকে অশ্রুর পাথার উথলিয়া উঠিল!

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সুখের স্মৃতি

রসাল তরু কিন্তু আমার হয় নি কভু ফল,
নামেই আমি ফলের তরু জীবন নিষ্ফল
শীর্ণ তনু ছিন্ন ছায়া তাও অনিত্য,
শক্তি নাহি করি আমি কারো আতিথ্য।
ঊষর ভূমি আগলে আছি ঠাঁইটি আগুলি,
দুঃখে আমার বক্ষ উঠে নিত্য ব্যাকুলি।
বালকদলে এলো নাক আম্র কুড়াতে,
মুকুলও হায় ধরলো নাক বক্ষ জুড়াতে

ধরার মাঝে সহেই গেলাম জীবনভরা দুখ,
কোকিল এসে করলে নাক ঝঙ্কৃত এ বুক।
তবু আমি দাঁড়িয়ে আছি একটি স্মৃতি নিয়া,
বালিকা এক ঘট পাতিল আমার শাখা দিয়া।
সার্থক মোর মরুজীবন ভাবি এক একবার,
একটি শাখা করলে শোভা ঘটটি দেবতার।
দীর্ঘ আমার জীবন-মাঝে একটি ছোট কাজ,
ভাঙ্গা ভিটায় দীপের মত সন্ধ্যা দেখায় আজ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কানাডা

বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহের মধ্যে কানাডা কিরূপ দ্রুতগতিতে কি উপায়ে উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহার পরিচয় পাইলে সকলেরই উপকার আছে। সম্প্রতি অটোয়ায় সাম্রাজ্য-বৈঠক হইয়া গেল। অটোয়া কনাডার অণ্টারিও অঞ্চলের বড় সহর। সুতরাং মাসিক বসুমতীর পাঠকবর্গের পক্ষে কানাডা—অণ্টারিওর ইতিবৃত্ত সময়োপযোগী বলিয়া আমরা উহা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

কানাডার লোকসংখ্যা এক কোটিরও অধিক। রেলপথই কানাডার উন্নতির প্রধান কারণ। ৫৬ হাজার মাইল রেলপথ কানাডায় বিদ্যমান। গত ২৫ বৎসরে কানাডা অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। চারিদিকে দ্রুতগতিতে রেল-বিস্তারের ফলে, যেন ঐন্দ্রজালিক দণ্ডপ্রভাবে কানাডা বস্তুতান্ত্রিক বিষয়ে অসম্ভব সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে। যে সকল স্থান জনশূন্য মাঠ ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তাম্র, নিকেল, কয়লা ও রৌপ্য-খনি কানাডার পাহাড়ে পাহাড়ে সঞ্চিত ছিল। স্বর্ণখনির হিসাবেও কানাডা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে ইণ্ডিয়ানগণ ডোঙ্গা চালাইত বা শীতকালে জল জমিয়া তুষারে পরিণত হইলে তাহার উপর দিয়া শ্লেজগাড়ী চালাইত, এখন তথায় প্রস্তর-রচিত রাজপথ বিদ্যমান।

অণ্টারিও কানাডার হৃদ্‌যন্ত্রের সমতুল্য। এইখানে সমগ্র কানাডা উপনিবেশের লোক-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বাস করিয়া থাকে। সমগ্র কানাডার ঐশ্বর্য্যের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক সম্পদ্ এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অটোয়ায় সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে স্থিরীকৃত হওয়ায় অণ্টারিওর প্রতি সমগ্র জগতের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। গ্রেটবৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, য়ুনিয়ন, আইরিশ ফ্রীষ্টেট প্রভৃতির প্রতিনিধিরা এখানে আহূত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ উপনিবেশ না হইলেও এখানে সরকারী প্রতিনিধির দ্বারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

কানাডার স্মারকবেদী—য়ুরোপীয় যুদ্ধে যাহারা প্রাণ দিয়াছিল, তাহাদের স্মরণার্থ

অরণ্যসম্পদ্ ও মৎস্য সংগ্রহের জন্য এই অঞ্চলের খ্যাতি অত্যধিক হইলেও, অণ্টারিও কৃষি, খনির কার্য্য, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, ব্যাঙ্কের কায এবং নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কানাডার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিবিধ বিষয়ে সৃষ্টিব্যাপারেও আণ্টরিওর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদি-

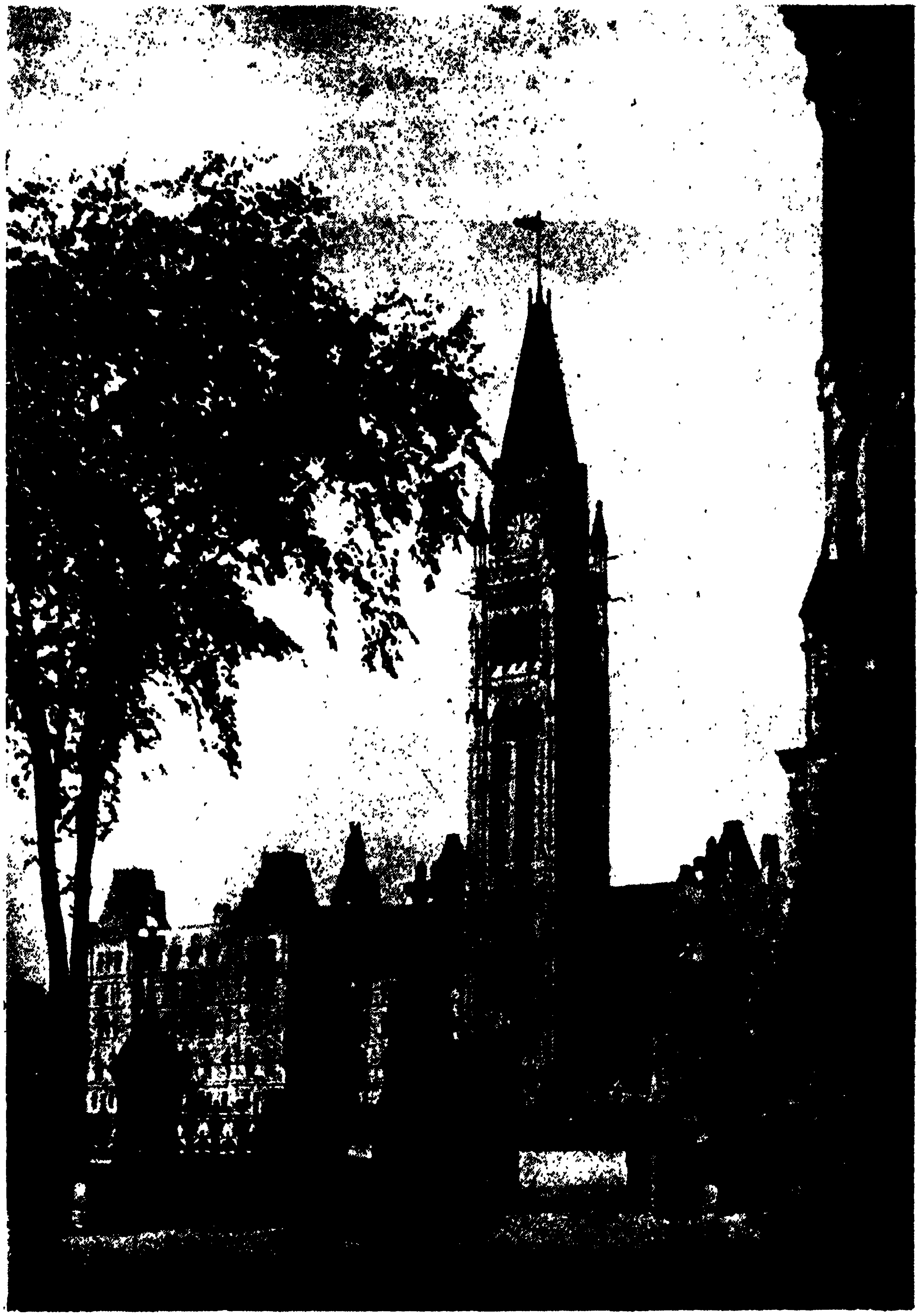

অটোয়ার পার্লামেণ্টগৃহ

হয়। অণ্টারিওর পাদদেশে তিনটি শ্রেষ্ঠ হ্রদ বিদ্যমান—মিচিগান্, সুপেরিয়র ও হুরণ। নিপিসিং, কণ্ডেন্, টিমিস্কামিং, সগুবারি, আলগোমা, অণ্ডার বে, রেনিরিভার ও কেনেরা এই কয়টি প্রসিদ্ধ জেলায় অণ্টারিও বিভক্ত। প্যাটিসিয়া জেলার অধিকাংশ এখনও অনাবিষ্কৃত এবং মনুষ্যবাসবর্জ্জিত রহিয়াছে। উহা সমগ্র প্রদেশের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। প্যাট্রিসিয়ার রেড লেক্ অঞ্চলে সোনার

অটোয়ার সিনেট গৃহ

খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে বিমান এবং ডোঙ্গার সাহায্যে গতায়াত করিতে হয়। এই স্থান হিংস্র পশু সমাকীর্ণ। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৫০ লক্ষ লোমশ পশু ধৃত হইয়াছিল।

স্পানিয়ার্ডরা যখন স্বর্ণের সন্ধানে ল্যাটিন আমেরিকায় আপতিত হইত, সে সময় ফরাসী ও ইংরাজ জাতি হ্রদ ও অরণ্য-সন্নিধানে লোমের সন্ধান করিত। এক জাহাজ বোঝাই পদার্থে প্রায়ই অজস্র অর্থ উপার্জ্জিত হইত। পশুলোমের জন্য মানুষের এত ব্যগ্রতার কারণ কি? ইতিহাসে ইহার একটা বিবরণ আছে। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে বর্ব্বরগণ ইটালী দখল করে। এই জাতি আরণ্যজীবের চর্ম্মের দ্বারা শরীর আবৃত করিত। ধনী রোমকগণ অচিরে এই প্রথার অনুরাগী হইয়া উঠে। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর যখন য়ুরোপে বিভিন্ন রাজশক্তির উদ্ভব হয়, রাজা ও আমীর-ওমরাহগণ পশুলোমজাত বিশিষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ধনী বণিক্-সম্প্রদায় এবং অভিজাতগণের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারে পশুলোমজাত পরিচ্ছদ পরিধান করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। ধনৈশ্বর্য্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম সুদৃশ্য পশুলোমের আদর এমন বাড়িতে লাগিল যে, সরবরাহের তুলনায় চাহিদা অধিক

হইয়া উঠিল। রুস্‌গণ পশুলোমের সন্ধানে এসিয়ার অনেক অনাবিষ্কৃত অংশ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। কানাডার এই আবিষ্কার ফ্রান্সের বিশেষ কাযে লাগিল। ক্রমে সমগ্র য়ুরোপেই উহার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া গেল।

পশুলোম ব্যতীত দেশীয়গণকে ধর্ম্মান্তরে দীক্ষিত করাও ফ্রান্সের প্রয়োজন হইয়াছিল। ফরাসী জাহাজে ধর্ম্ম-যাজকগণ কানাডায় উপনীত হইতে লাগিলেন। পশুলোমের আইনের বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণ ভূমির অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে একটা নূতন প্রদেশ গঠিত হইল। ইহার নাম অণ্টারিও। অটোয়া নদীর পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী সমস্ত স্থান ইহার অধিকারভুক্ত হইল। এখনও কুইবেক ও অণ্টারিওর সীমারেখা অটোয়া নদী। ভাষার পার্থক্য নদী পার হইলেই বুঝা যাইবে।

অটোয়ার কমন্স মহাসভা

লোভ এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রচারচেষ্টার ফলেই অণ্টারিওর গহন স্থানগুলি দ্রুতগতিতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কুইবেক্ ফরাসী-অধ্যুষিত হইলেও নিম্ন অণ্টারিও অঞ্চলে ইংরাজরাই উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু কুইবেকের ফরাসী শাসক তখনও এই অঞ্চলের কর্ত্তা। ফরাসীভাষাভাষী প্রজাদিগের জীবনযাত্রাকে সহজ ও সরল করিয়া তুলিবার জন্য ইংরাজগণ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী

কর্ণেল জন্ গ্রেভস্ সিম্‌কো ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে নায়েগ্রা গ্রামে যখন প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন, সেই সময় তিনি প্রত্যেক ঔপনিবেশিককে বিনা খাজনায় এবং বিনা মূল্যে জমী দান করিবার ব্যবস্থা করেন। তখন নানাদেশ হইতে দলে দলে জনসমাগম হইতে থাকে। যুক্তরাজ্য হইতে কয়েক বৎসর ধরিয়া উপনিবেশকামীরা আসিতে থাকে। তন্মধ্যে জার্ম্মাণ, লুথারান্, মেনোনাইট অনেক

ছিল। স্কটল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে জনসমাগম হইতে লাগিল। এখনও পর্য্যন্ত লোক বসবাস করিবার জন্য আসিতেছে। সম্প্রতি কুইবেক হইতেও ফরাসীরা অণ্টারিওর উত্তরাঞ্চলে আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম্মবিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংবাদ সবই সে অঞ্চলে প্রস্তুত হইতেছে।

ফিন্, রুস, পোল্, জার্ম্মাণ, চীনা খনিসমূহে ভিড় করিয়া রহিয়াছে। গ্রীক্, সিরীয়, ইতালীয় সকল জাতির সবই ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত। অণ্টারিও পুস্তকাগারে কানাডার গ্রন্থকারগণের রচিত ৮ শত ৮০ খানি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে ১ শত ২৪ খানি ব্যতীত অপর সমুদয় গ্রন্থই ইংরাজী ভাষায় রচিত। অটোয়ার "রয়াল ফ্লাইং কোর", রাজ-প্রতিনিধি, পার্লামেণ্ট গৃহ, পুলিস-প্রহরীর পরিচ্ছদ, বৈকালিক চা-পান প্রভৃতি দেখিলেই মনে হইবে, অটোয়া সম্পূর্ণভাবেই বৃটিশ।

গোয়াডালাজারার ন্যায় নিদ্রিত অটোয়া প্রত্যহ

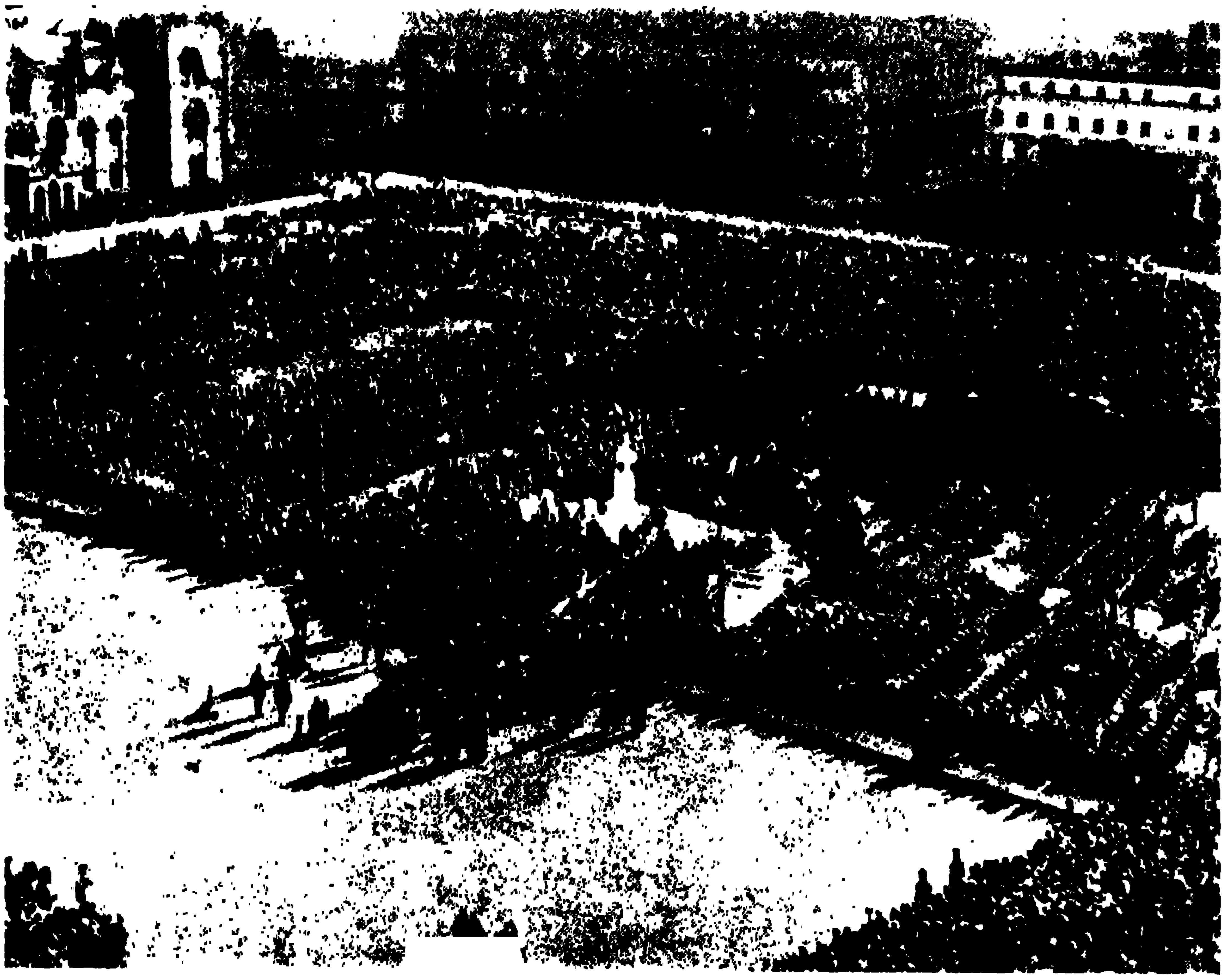

অটোয়া—স্মৃতিদিবসে সম্মিলিত সেনাদল ও জনসাধারণ

লোকই এখানে দেখা যাইবে। কেহ পাচকের কায করিতেছে। পরিচারক, মুচি, মালী প্রভৃতির কার্য্যে তাহারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে। অনেকে ধনী হইয়াও উঠিয়াছে। বহু ভাষাভাষী জনসমাগম সত্বেও অণ্টারিওর ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞতার আতিশয্য লোকগণনার বিবরণে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র এখানে প্রকাশিত হইতেছে। পুস্তক, পুস্তিকা

ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে। পার্লামেণ্টের অত্যুচ্চ প্রাসাদ-শীর্ষে ৫৩টি ঘণ্টা বিলম্বিত। এক একটির ওজন দশ পাউণ্ড হইতে ১০ টন পর্য্যন্ত। উল্লিখিত ঘণ্টাসমূহ হইতে যখন বিচিত্র ধ্বনি নির্গত হইতে থাকে, তখন চারিদিকে সেই শব্দ ছড়াইয়া পড়ে। ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় কৌশলে ঘণ্টাগুলি নিনাদিত হয়। এই ধ্বনি নগরের রাজপথ অতিক্রম করিয়া নদীবক্ষের উপর দিয়া যেন গগনপথে ধাবিত হয়। বৈদেশিকও এই শব্দতরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া জাগ্রত হয়।

পার্লামেন্টের অধিবেশনকালে অটোয়া তখন সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক বিষয়ে সরগরম হইয়া উঠে। কিন্তু পার্লামেন্টের সদস্যগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে আবার অটোয়া সহজ স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করে।

নগর-সমূহের মধ্যে অটোয়া সর্ব্বাপেক্ষা নবীন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ২০ হাজার ছিল। মহারাণী

প্রসার, শ্রমশিল্পের বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে জানিতে হইলে অটোয়া হইতেই তাহা অবগত হওয়া যাইবে।

অণ্টারিওর আবহাওয়া অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মৃদু, অর্থাৎ শীতও তেমন প্রচণ্ড নহে, গ্রীষ্মও অপেক্ষাকৃত অল্প। মিসিসিপি উপত্যকার ন্যায় এখানে প্রচুর আপেল, আঙ্গুর, জাম ও অন্যান্য ফল উৎপাদিত হইয়া হইয়া থাকে।

জাহাজে গম বোঝাই হইতেছে

ভিক্টোরিয়া উহাকে কানাডার রাজধানী বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। তখন রিডিউ খালের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা নাই। কানাডার উন্নতির ইতিহাস—ইহার জনসংখ্যা, বিদ্যালয়-সমূহের পরিপুষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্যের

অণ্টারিওর দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষা উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উত্তরাঞ্চল পর্ব্বতসঙ্কুল।

ব্রাম্‌টনের নিকট প্রাচীন রণনিপুণ জাতির অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মেনিকাস, অনিডাস, ক্যাটিনাস

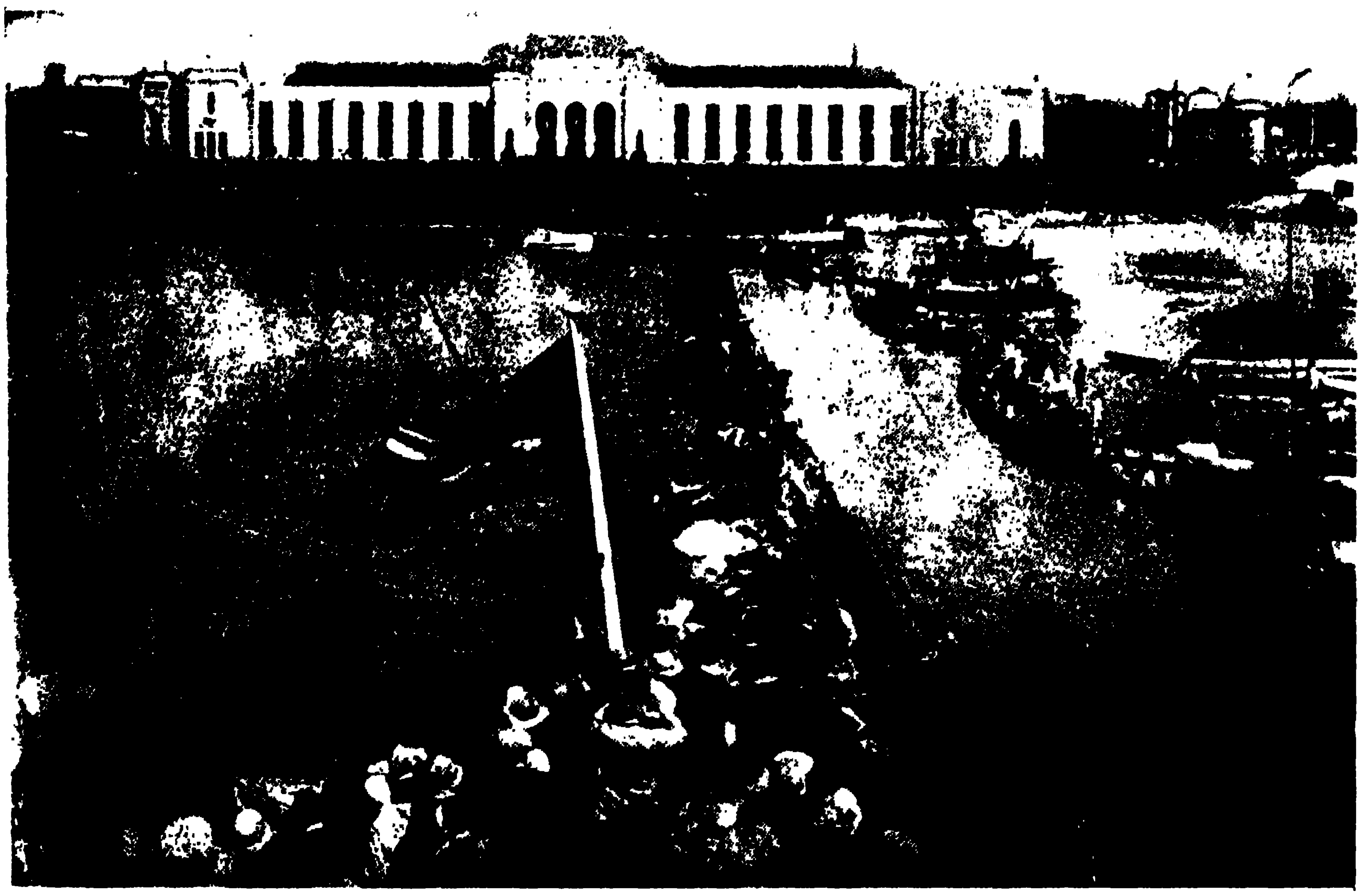

কানাডা-প্রদর্শনী—প্রতিযোগীরা ঝম্প-ক্রীড়ায় উদ্যত

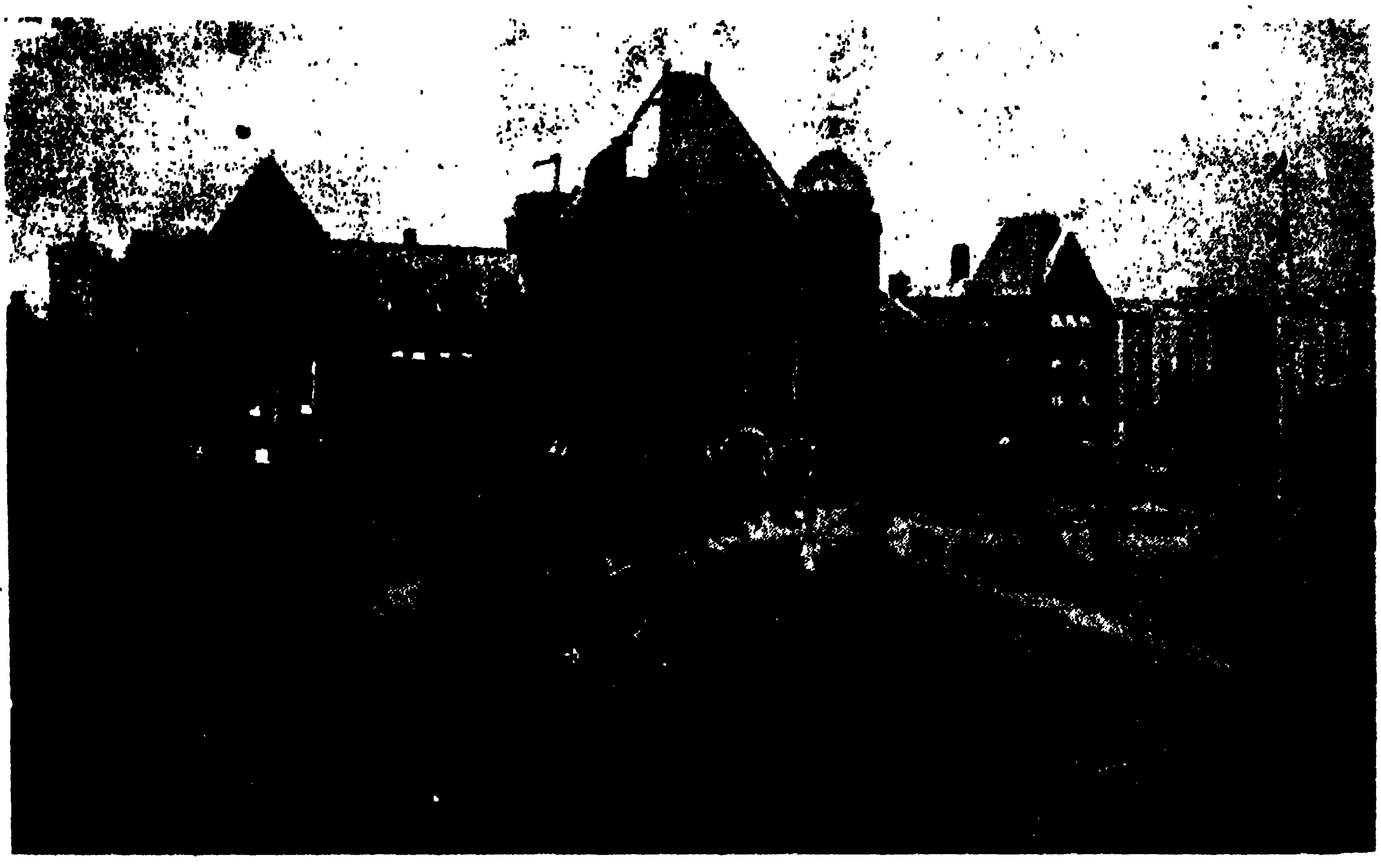

টরণ্টো পার্লামেণ্ট—প্রাদেশিক মন্ত্রিবর্গের বাসগৃহ

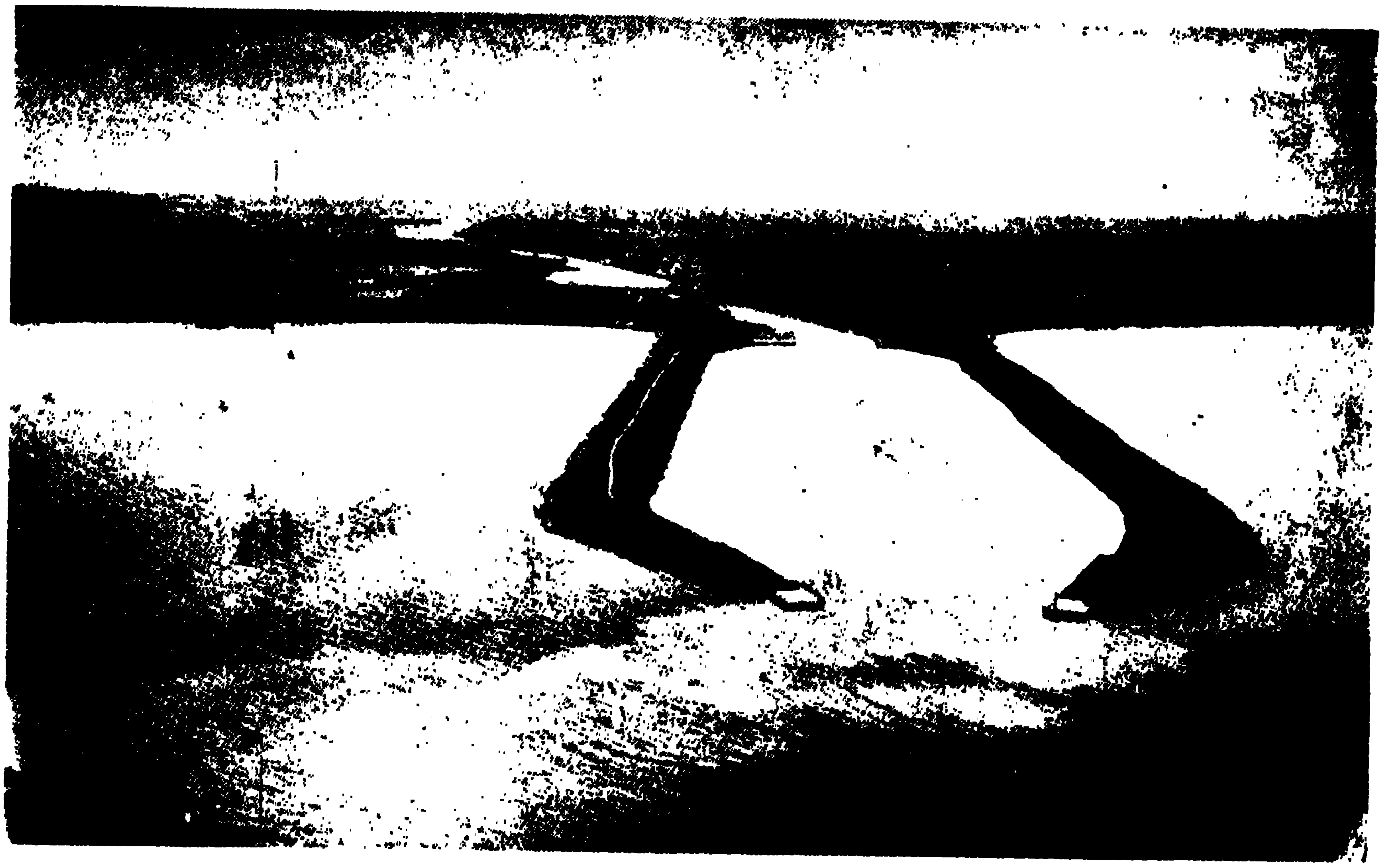

অণ্টারিও হ্রদে নবখনিত ওয়েল্যাণ্ড খাল

নায়াগ্রার অশ্বখুর-প্রপাত

টরণ্টোর শিকারীদিগের ক্লাব

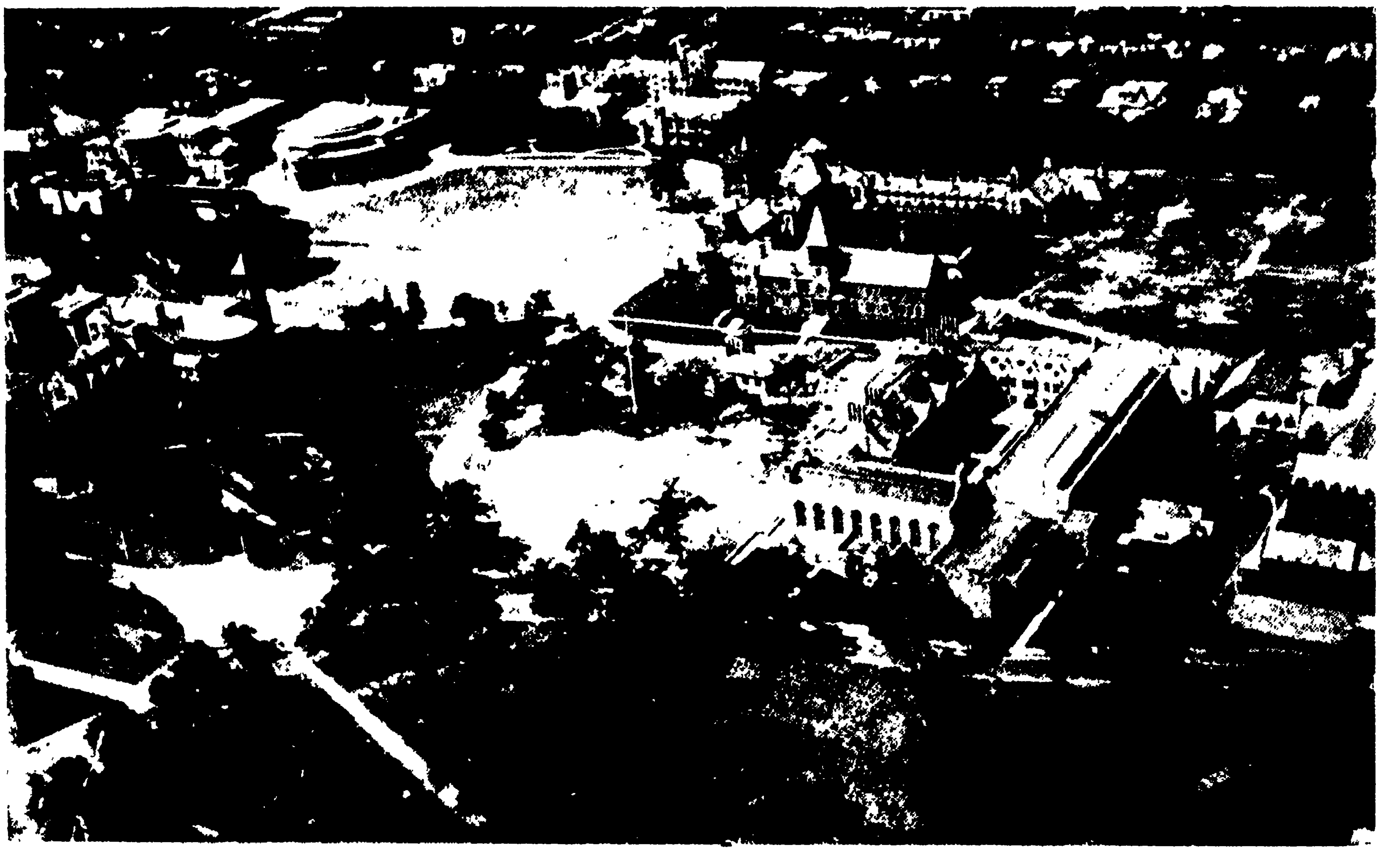

টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়

অশ্ব-প্রদর্শনী

অটোয়ার কুকুর-দৌড়

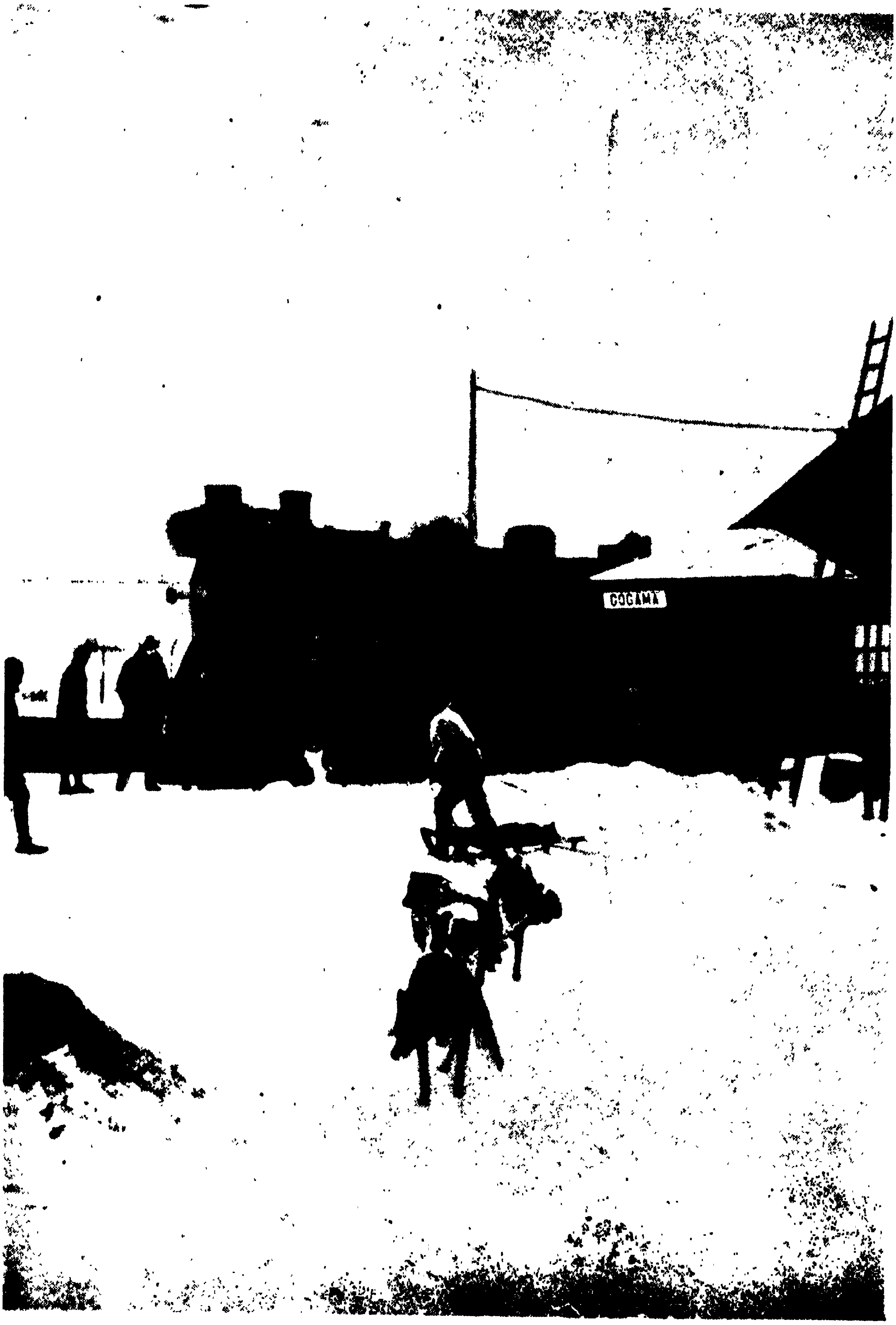

কুকুর-বাহিত স্লেড গাড়ী

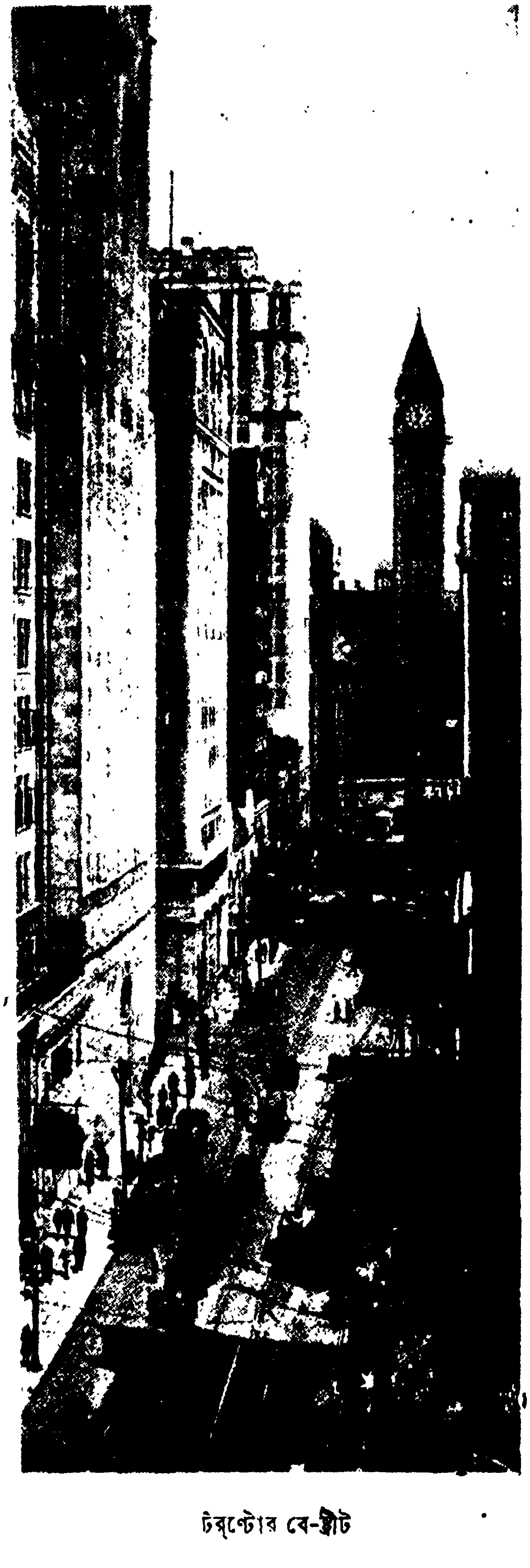

টরন্টোর বে-ষ্ট্রীট

অনডাগাস্, মোহক্স্ এবং তুস্করোরাস্ নামক সম্প্রদায়কে ইরোকয় কন্‌ফিডারেসি বলিত। এই জাতীয় মানুষ এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। গ্রাণ্ড নদের ধারে বৃটিশগণ তাহাদিগকে বসবাসের জন্য ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মোহক গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখনও তাহা বিদ্যমান আছে। জোসেফ্ ব্রাণ্ট বা থায়েলডানিসিয়া নামক এক জন মোহক সর্দ্দারের কাহিনী স্থানীয় ইতিহাসে লিখিত আছে। এই সর্দ্দার ইংলণ্ডে গিয়া রাজা ও মন্ত্রিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি বসওয়েলের বন্ধু ছিলেন। রাজপক্ষীয়গণের সহিত যোগ দিয়া তিনি মার্কিণ বিপ্লবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাইবেল গ্রন্থ তিনি মোহক ভাষায় অনুবাদও করিয়াছেন।

টরন্টো নগরে শত শত মার্কিণের কারখানা বিদ্যমান। বিবিধ বিষয় এখানে উৎপাদিত হইয়া থাকে। মোটরগাড়ী, আনুষঙ্গিক অংশ, রবারের বিবিধ প্রকার বস্তু, খাদ্যদ্রব্য, কাচ, বহুবিধ দ্রব্যের কারখানা এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বহু মার্কিণ জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের সুযোগ আছে দেখিয়া এখানে বসবাস করিতেছে।

সড্‌বেরি নিকেলের জন্মভূমি। নিকেলের আবিষ্কার অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে "কানাডিয়ান প্যাসেফিক" রেলপথ নির্ম্মিত হয়। সেই সময় জনৈক শ্রমজীবী অদ্ভুতদর্শন লোহিতাভ কর্দ্দম দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। এই লোহিতাভ কর্দ্দমই অসংস্কৃত নিকেল। তখন ২ শত হইতে ৩ শত টনের বেশী নিকেল সমগ্র পৃথিবীতে লাগিত না। গ্লাসগোর এক জন এঞ্জিনীয়ার জেম্স্ রিলে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে নিকেলের সাহায্যে ইস্পাতকে আরও দৃঢ় করা যাইতে পারে, ইহা উদ্ভাবন করেন। ইহার পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের বর্ম্মাদিতে নিকেল ও ইস্পাতের মিশ্রণ-জাত পদার্থ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। অন্যান্য স্থানের নৌ-বিভাগও উহা ব্যবহার করিতে লাগিল। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় কানাডা দিবারাত্রি খনি হইতে নিকেল উত্তোলন করিয়াছিল।

যুদ্ধ স্থগিত হইলে, ওয়াসিংটনে অস্ত্রসঙ্কোচের বৈঠক বসে। তাহার ফলে নিকেলের চাহিদা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আন্তর্জ্জাতিক 'মণ্ড নিকেল কোম্পানী' তখন উৎসাহ ও সাহসে ভর করিয়া নিকেলের ব্যবহারের অন্য গুণ উদ্ভাবন করিতে থাকেন। টমাস্ ডব্‌লু গিব্‌সন্ খনির সহকারী সচিব। তিনি বলেন, যুদ্ধের ভীষণতায় নিকেলের প্রয়োজন যেমন অধিক, শান্তির কলাসৌন্দর্য্যেও উহার প্রয়োজনীয়তা

ততোধিক। সমগ্র জগতের জন্য যত নিকেলের প্রয়োজন, সডবেরি তাহার শতকরা ৮৫ হইতে ৯০ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অন্টারিওর স্বর্ণ-খনি হইতে মাত্র ৪২ হাজার ডলার মুদ্রার অনুরূপ স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের স্বর্ণ অন্যত্র হইতে ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছিল। অন্টারিওর যাবতীয় খনি হইতে যে সকল ধাতু উত্তোলিত হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ ইদানীং বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অন্টারিওর শৃগাল-পালক

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জেম্‌স উপসাগর হইতে নিপিসিং হ্রদ পর্য্যন্ত ভূভাগ দুর্গম ছিল। কতিপয় ইণ্ডিয়ান এবং হড্‌সন বে কোম্পানীর দুই চারি জন লোক ছাড়া এতদঞ্চলের সম্বন্ধে কাহারও কোনও জ্ঞান ছিল না। তখন জলপথে ডোঙ্গা ব্যতীত গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। "কানাডিয়ান প্যাসেফিক" রেলপথ নির্ম্মাণকালে সডবেরিতে অকস্মাৎ নিকেল-খনি আবিষ্কৃত হয়। পরে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রৌপ্যখনি, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পর্কুপাইনে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়।

হডসন্ উপসাগর হেন্‌রিক্ হডসনের নামানুসারে আজ পৃথিবীতে পরিচিত। ৩ শত ২২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই উপসাগর আবিষ্কার করেন। কিন্তু বিদ্রোহী নাবিকগণ উপসাগরের তুষারশীতল সলিলমধ্যে তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই নিষ্ঠুর কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। হড্‌সন্ বে কোম্পানী ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। ভারতবর্ষের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ন্যায় 'হড্‌সন বে কোম্পানী' বহু ধনী বণিকের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল। এই কোম্পানীর হাতেই তখন দেশের শাসন-ভার ছিল। সমুদ্রের পরপারের দেশগুলি সম্বন্ধে য়ুরোপের তখন কোনও জ্ঞান ছিল না।

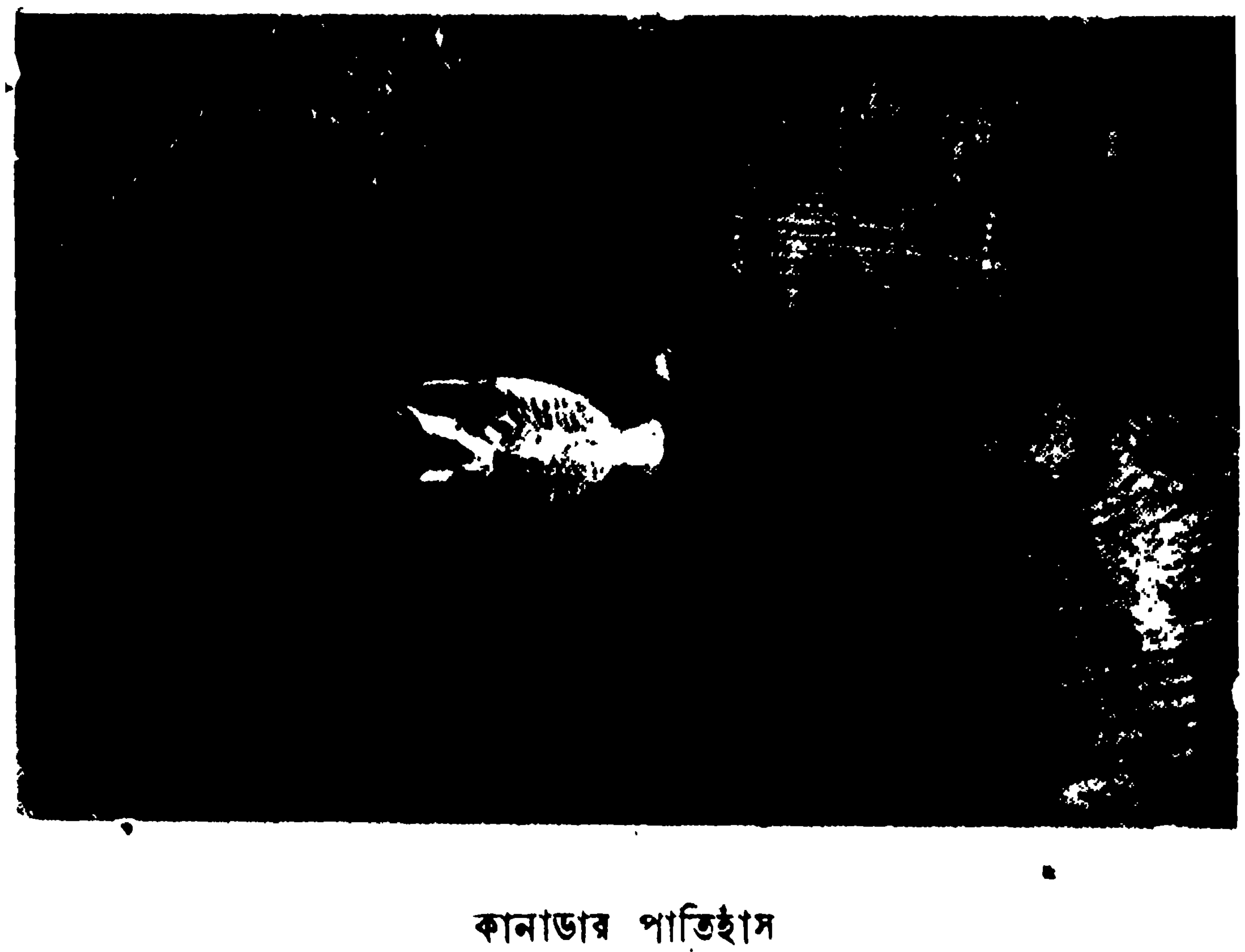

কানাডার পাতিহাঁস

ইংরাজগণ পশুলোমের আশায় প্রথমে 'হডসন বে কোম্পানী' নাম দিয়া কানাডায় আগমন করেন। কুইবেক ফরাসীরা পূর্ব্ব হইতেই অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং ইংরাজ বণিক্‌গণ হডসন উপসাগরে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। ভার্জ্জিনিয়ার অধিকাংশ স্থানই তখন ভীষণ অরণ্যসঙ্কুল বা মনুষ্যবর্জ্জিত প্রান্তরে পূর্ণ। ফরাসীরা ইংরাজ বণিক্‌গণকে আক্রমণ করিতে আসিত। কামানগর্জ্জনে বনস্থলী তখন কম্পিত হইয়া উঠিত।

বহু যুদ্ধ—বহু আক্রমণ প্রতিহত

রেলগাড়ীর মধ্যে ছাত্রগণের অধ্যয়ন

করিয়া 'হড্‌সন্ বে কোম্পানী' আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। কালক্রমে কানাডা উপনিবেশ হডসন বে কোম্পানীর শাসনাধিকারে পরিচালিত হয়। এই কোম্পানীই কানাডার সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রধান কর্ত্তা। এই কোম্পানীর যে কারখানা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম "মুস্" কারখানা। পশুলোমের সংগ্রহকার্য্যে এই কারখানা প্রধানতঃ ব্যস্ত ছিল। এই কারখানা যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সভ্য জগতের সহিত অণ্টারিওর সুসভ্য অংশের সহিত তাহার বিশেষ সংস্রব নাই। ২ শত ৬১ বৎসর ধরিয়া এই কারখানা জীবিত রহিয়াছে। অবশ্য যাঁহারা ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই পশুলোমব্যবসায়ীরা বহুদিন পূর্ব্বে পৃথিবীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া সমাধিগর্ভে বিশ্রাম করিতেছেন। এবার্ডিন, লিভারপুল, লণ্ডন সহরেরই তাঁহারা অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা এই চমৎকার স্থান ত্যাগ করিয়া আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। বর্ত্তমানে যে কর্ম্মকার মুস্ কারখানায় আছেন, তিনি বৃদ্ধ। ৬২ বৎসর ধরিয়া এইখানেই তিনি যাপন করিতেছেন।

মিঃ ফেডারিক সিম্পিচ্ এক জন প্রসিদ্ধ মার্কিণ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। তিনি 'মুস্' কারখানা স্বয়ং পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার এক স্থানে আছে, এই কারখানায় এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে কামারশালের কায সম্পন্ন হইয়া থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় এখনও তথায় অবলম্বন করা হয় নাই। পুরাতন রীতি-নীতি, চাল-চলন সবই বজায় আছে।

অণ্টারিও অঞ্চলে অসংখ্য প্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রকার পক্ষী ঋতু অনুসারে সমাগত হইয়া থাকে। ঈগল পক্ষীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। শিকারীদিগের বন্দুকের গুলীতে তাহারা প্রায় নিহত হইয়া থাকে।

নানাজাতীয় রাজহংস নায়াগ্রা নদীতে ভাসিয়া আসে। অনেক সময় অজ্ঞাতসারে তাহারা নায়াগ্রা-প্রপাতে পড়িয়া প্রাণ হারায়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে বহুশত রাজহংস এইভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। নানাজাতীয় পাতিহাঁসও দেখিতে পাওয়া যায়।

সুপিরিয়র হ্রদের তীরদেশে ফোর্ট উইলিয়ম্ ও পোর্ট আর্থার নামক দুইটি নগর আছে। গমের জন্য ইহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই দুই নগর হইতে প্রভূত-পরিমাণ গম য়ুরোপে রপ্তানী করা হইয়া থাকে। জাহাজের

সিল মৎস্য

মুসনদীতে ডোঙ্গা

ফলবাহী ট্রেণে বাক্সপূর্ণ ফল বোঝাই হইতেছে

অণ্টারিওর তামাক-পাতার ক্ষেত্র

৭শত বৎসরের পুরাতন বৃক্ষ

ওসাগায় স্নানের দৃশ্য

গ্রাম্য বালকবালিকারা গাড়ী-স্কুলে পড়িতে আসিতেছে

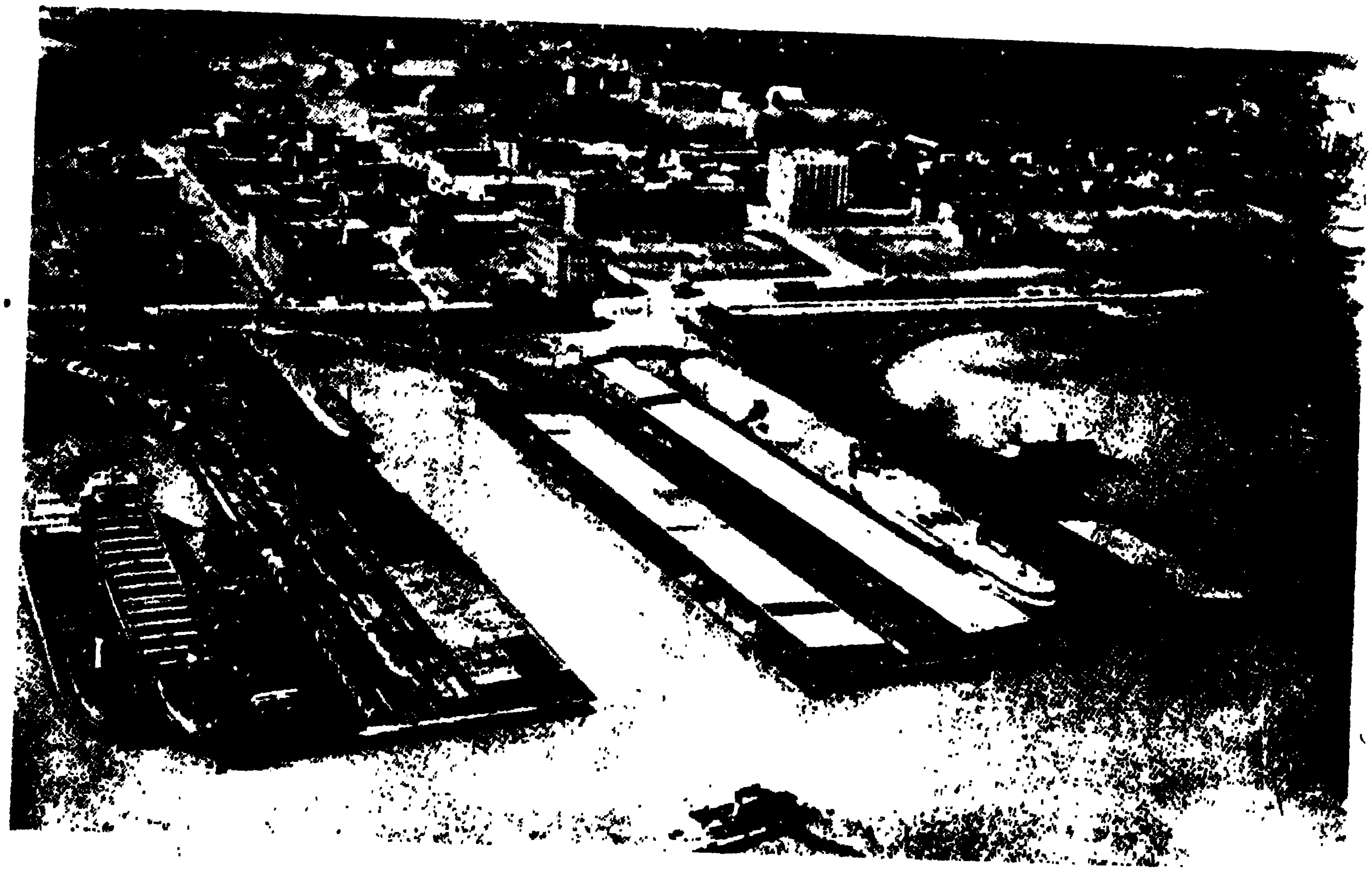

পোর্ট আর্থার বন্দরের দৃশ্য

কেনোরা—কাগজ-মণ্ড প্রস্তুত কেন্দ্র

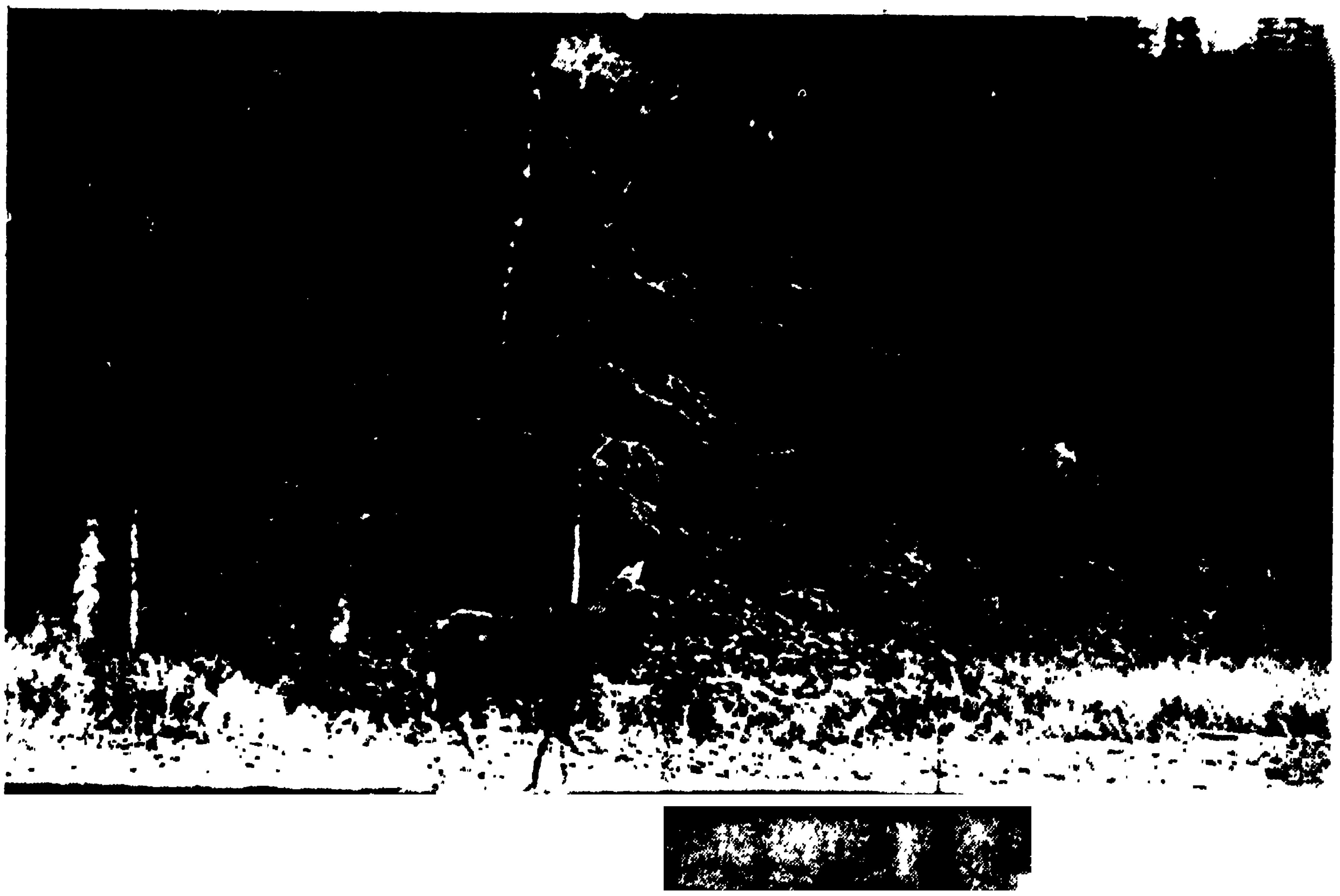

কানাডার মুস্-মৃগ

বন্ধনমুক্ত আরণ্য হাঁস

সুদীর্ঘ সেতু : দৈর্ঘ্য ৭ হাজার ৪ শত ফুট

মধ্যে নলের সাহায্যে গম বোঝাই করা হয়। এক বৎসরে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টন গম চালান গিয়াছিল।

বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে গাড়ী আসিয়া থাকে। সেই গাড়ীতে গ্রন্থ, মানচিত্র প্রভৃতি থাকে। শিক্ষকগণ এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে শিক্ষা দিয়া থাকেন। যে সকল অঞ্চলে লোকসংখ্যা অত্যল্প, তথায় এইরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষাদান চলে। যে সকল গ্রাম বসতি-বহুল, তথায় উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহ বিদ্যমান।

অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয় রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাদেশিক বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত। সরকার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির অর্থ দ্বারা উহা পরিচালিত হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইহার শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, উইক্লিফ কলেজ, নক্স কলেজ, ইমানুয়েল কলেজ, সেণ্ট মাইকেল কলেজ, অণ্টারিয়ো কৃষি-বিদ্যালয় প্রভৃতি টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের

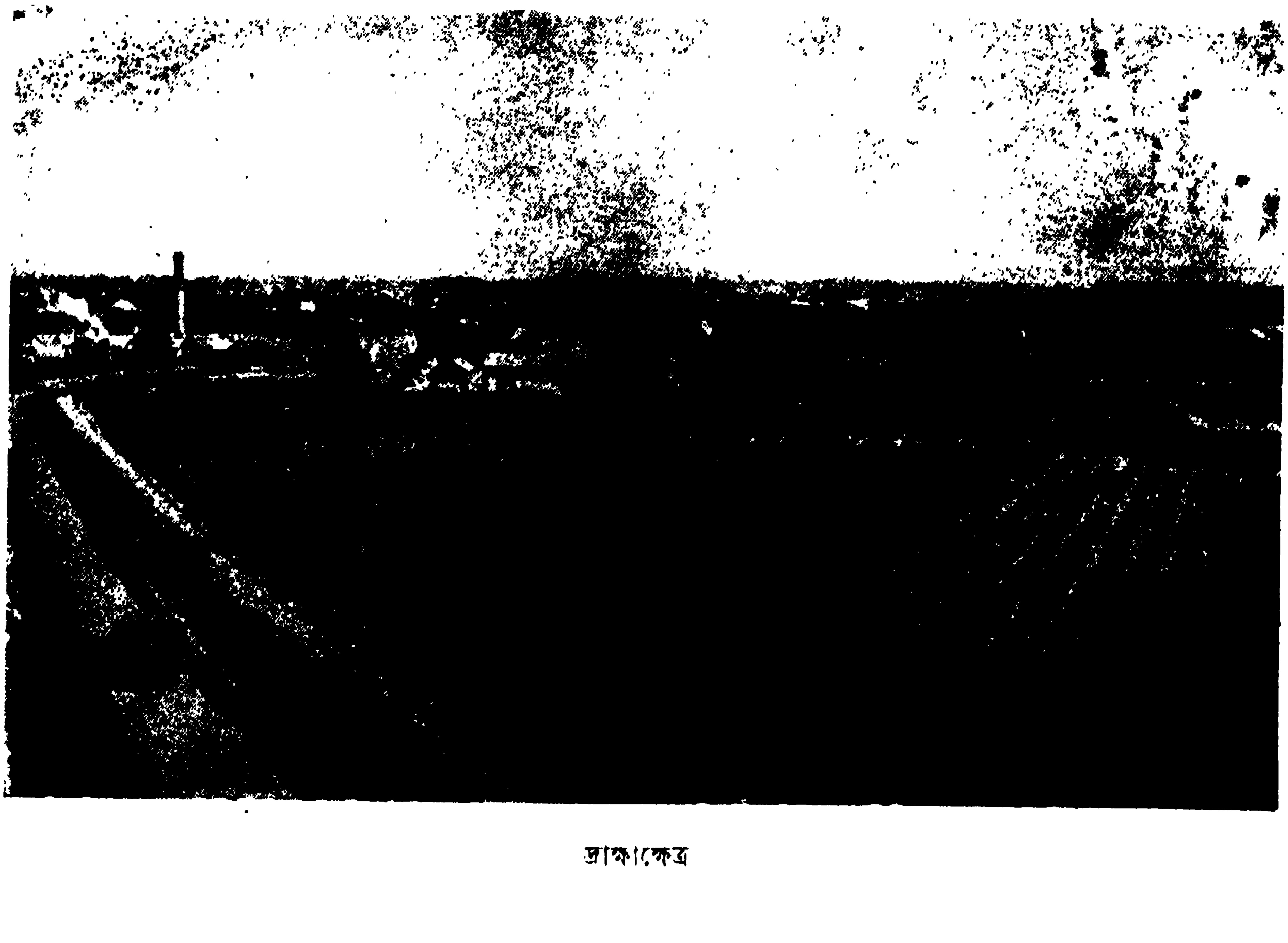

দ্রাক্ষাক্ষেত্র

অন্তর্গত। এই বিশ্ববিদ্যালয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। উহাতে ৬ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

সাহিত্য, ললিতকলা, বিজ্ঞান, পূর্ত্ত-বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিকার্য্য, দন্তচিকিৎসা, সাধারণ শিক্ষা, গৃহস্থালী শিক্ষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সামাজিক বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রম-শিল্প যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। উচ্চতম পরীক্ষার জন্য ৫ শত যুবক-যুবতী শিক্ষালাভ করিতেছে। দেশ-বিদেশ হইতে ছাত্র-ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য আসিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বহু কৃতী ছাত্র গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত আছে।

বিভিন্ন ওজনের সোনার ইট

টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বহুমূত্র রোগের ঔষধ আবিষ্কার করে। ডাঃ এফ্ জি, ব্যান্টিং এবং তাঁহার সহযোগী ডাঃ বেষ্ট এই ঔষধ উদ্ভাবন করেন। তাঁহাদের নাম বিশ্বের দরবারে বিঘোষিত হইয়াছে। বহুমূত্ররোগে তাঁহাদের উদ্ভাবিত ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে।

অণ্টারিও বিশ্ববিদ্যালয় নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত। তরুণ ডাক্তার লয়েড্ পশ্চিম-অণ্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একটা ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা তিনি নিজের

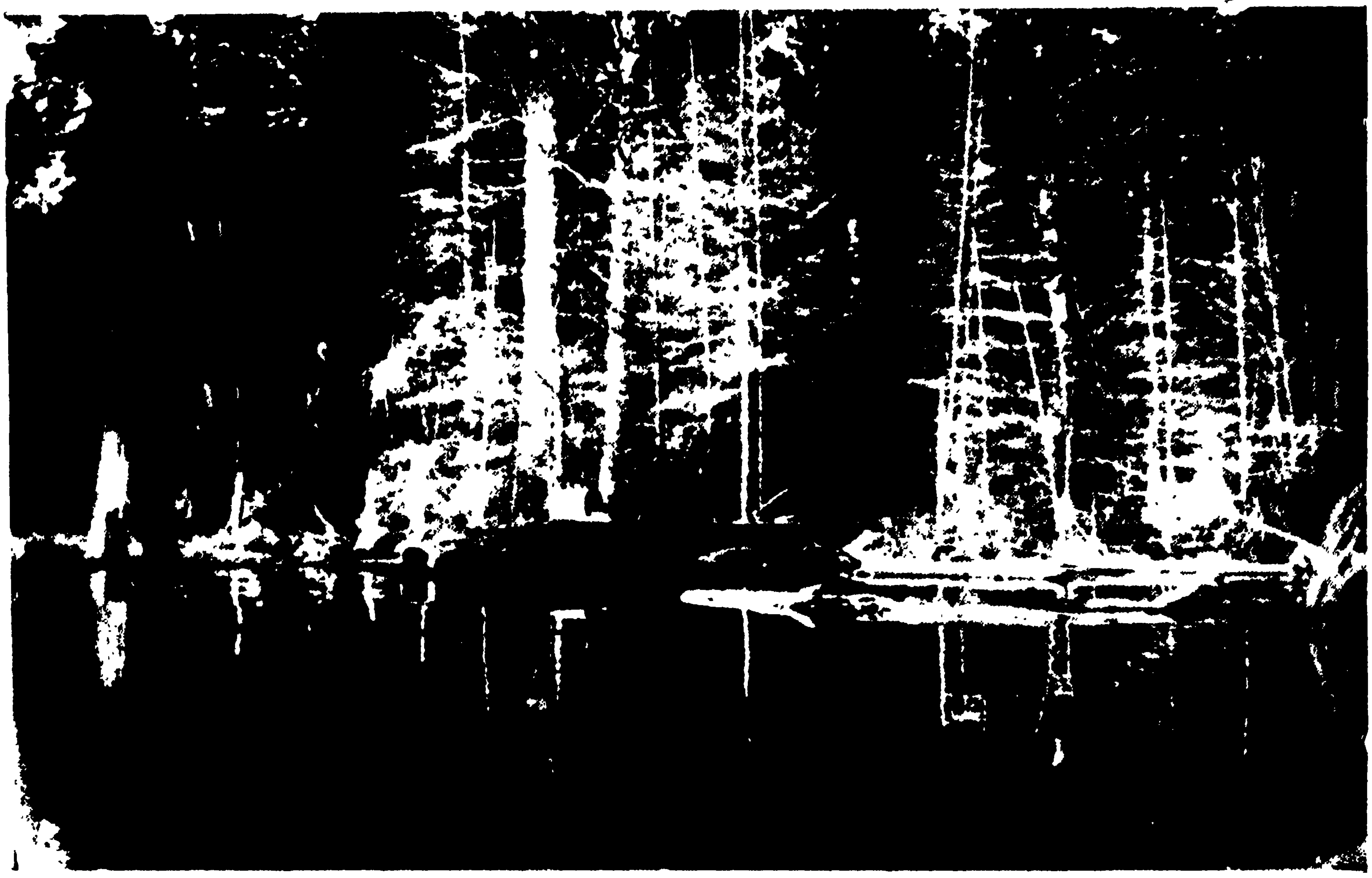

আলবানকুইন অরণ্য—নির্ভীক ভল্লুক

হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন রহিত করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ক্যাল্‌সিয়ম্‌ ক্লোরাইড হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ। এই দুই সাহসিক কার্য্যের জন্য এই তরুণ চিকিৎসকের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ক্লজ্‌ আফ্রিকার ভীষণ নিদ্রাপীড়ার প্রতিষেধক ঔষধ উদ্ভাবন করিয়া তাহার

টরণ্টো বালক ও সৈনিক

পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে চিকিৎসা-জগতের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছে। সার উইলিয়ম্‌ অস্‌লার বাল্‌টিমোর হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। তিনি রোগশয্যা-পার্শ্বে শিক্ষা দিবার পন্থা উদ্ভাবিত করিয়াছেন।

ডাক্তার এল্‌, বি, রবার্টসন্‌ অগ্নিদগ্ধ বালক-বালিকাদিগকে জীবনদানের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ডাক্তার গ্যালি দেহের এক অংশ হইতে একটি উপশিরাকে দেহের অন্যত্র সন্নিবিষ্ট করিবার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনার দ্বারা চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। ডিপথিরিয়া রোগে ডাক্তার মোলোনি প্রতিষেধক ঔষধ উদ্ভাবন করিয়াছেন। ৭ হাজার বালক-বালিকাকে এই উপায়ে তিনি ভীষণ ডিপথিরিয়া-রোগ-মুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তার এফ, এফ টিসভাল গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার বিসকুট প্রস্তুত করিয়াছেন। এই বিসকুটে সূর্য্যরশ্মি হইতে ভিটামিন ডি সঞ্চিত হইয়া থাকে। টিস্‌ভাল বিসকুটব্যবহারে বালাস্থি-বিকৃতি রোগ দূরীভূত হয়।

টরণ্টো সহরের লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ ৫০ হাজার। ২ হাজার ৩ শত ৫০টি কারখানা এখানে বিদ্যমান। ৬ শত ৫৪ কোটি ডলার মুদ্রার উপযোগী পণ্যসম্ভার প্রতি বৎসর এই সকল কারখানায় উৎপাদিত হইয়া থাকে। টরণ্টো অণ্টারিও হ্রদের তীরে অবস্থিত। ইহার বন্দর দশ মাইলব্যাপী। কানাডায় জাতীয় প্রদর্শনী উপলক্ষে যত লোক আসে, তন্মধ্যে ২০ লক্ষ দর্শক প্রতিবার টরণ্টো দর্শন করিতে আসে।

টরণ্টোর গ্রন্থপ্রকাশকেন্দ্র সর্ব্বদা কর্ম্ম-চঞ্চল। টরণ্টো মুদ্রাযন্ত্রে যত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র মুদ্রিত হয়, এমন সমগ্র কানাডায় আর কুত্রাপি নহে। এখানকার মুদ্রিত সাময়িক পত্র হ্যালিফাক্স হইতে ভাঙ্কুবার পর্য্যন্ত প্রচারিত। টরণ্টোতে অক্সফোর্ড প্রেস ও ম্যাকমিলান কোম্পানীর শাখা বিদ্যমান। বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে পুস্তক-পাঠস্পৃহা ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এমন প্রবল হইয়াছে যে, পূর্ব্বের তুলনায় ৪ গুণ বেশী গ্রন্থ বিক্রীত হইয়া থাকে।

অণ্টারিও পুরাতন ইংরাজ উপনিবেশ। কানাডার লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। সুতরাং টরণ্টো যে শিক্ষাবিষয়ে কানাডার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

শিল্পকলা ও সাহিত্য প্রাচীন—কানাডা তরুণ। কিন্তু

যেরূপ সাধনা কানাডায় চলিয়াছে, তাহাতে ইতিমধ্যেই টরণ্টো ললিতকলা ও সাহিত্যে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। টরণ্টোর গ্রন্থাগারে একখানি মূল্যবান্ প্রাচীন গ্রন্থ আছে। তাহার নাম "The Nun of Canada"—কানাডার সন্ন্যাসিনী। জুলিয়া বেক্‌ওয়ার্থ উহার রচয়িত্রী। ইহা অণ্টারিওর প্রথম উপন্যাস। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই উপন্যাসখানি কিংস্‌টনে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরে "A Day at the Falls of Niagra"—নায়াগ্রা-প্রপাতে একদিন নামক কবিতা-গ্রন্থ রচিত হয়। কবির নাম জে, এল, আলেকজাণ্ডার। ইহা কানাডার প্রথম কবিতাগ্রন্থ। টরণ্টো গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড সযত্নে সংগৃহীত আছে।

পূর্ব্বে কানাডায় এক জন জনপ্রিয় গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার নাম টমাস্ চ্যাণ্ডলার হ্যালিবার্টন। ইঁহাকে সকলে মার্কিণ হাস্যরসরচনার জনক বলিয়া অভিহিত করিত। নোভাস্কোসিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রেও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। মার্কটোয়েন্, আর্টিমস্ ওয়ার্ড এবং বিল্‌নাই প্রভৃতি হাস্যরসিকগণকে তিনি প্রভাবিত করিয়াছিলেন। রাল্‌ফ্ কোনরএর "The Glengarry Tales" সমগ্র আমেরিকায় সমাদৃত হইয়াছিল।

টরণ্টোর মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহা ভাঙ্কুবার হইতে হ্যালিফ্যাক্স পর্য্যন্ত—৩ হাজার মাইলব্যাপী স্থানে প্রচারিত। সাপ্তাহিক পত্রও চতুর্দ্দিকে সমাদৃত হইয়াছে। ৪০খানি দ্রুতগামী ট্রক্‌-গাড়ী বোঝাই সংবাদপত্র অণ্টারিওর সর্ব্বত্র বিলি করিতে লাগে। সাপ্তাহিক পত্রখানি কুকুরবাহিত গাড়ীতে ইরোকয় প্রপাতের সান্নিধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। আরও উত্তরাঞ্চলে তুষারের উপর তুষার-নিবারক জুতা পায় দিয়া সাপ্তাহিক ফিরি করিয়া বেড়ায়।

ত্রিবর্ণ-মুদ্রিত পুস্তকতালিকা ৮ লক্ষ লোকের নামে বিতরিত হইয়া থাকে। প্রতি দুই মাস পরে এইরূপ ভাবে পুস্তকতালিকা বিতরিত হয়।

রবিবারে অনেক দোকান বন্ধ থাকে। রঙ্গালয়-সমূহ কোনও অভিনয় করে না। সকলেই ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা করিতে গিয়া থাকে। জনসাধারণ পুলিস-প্রহরীকে "সার" বলিয়া সম্বোধন করে। অথচ এমন গণতান্ত্রিক দেশ আর নাই।

অণ্টারিও হ্রদে মাছ-ধরা

অণ্টারিওর সর্ব্বত্রই একটা উদ্দাম চাঞ্চল্য, কর্ম্মপ্রবণতা এবং অদম্য উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ব্যর্থমনোরথ হইতে এ দেশের লোক জানে না। অণ্টারিওর জনসাধারণের মূলমন্ত্র, "অন্যে না পারুক, অণ্টারিও অবশ্যই পারিবে।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শ্রীকৃষ্ণ

স্বাধীন ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের জন্য কারাগারে যাঁহার আবির্ভাব, জীবের বন্ধনমোচনের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জনক-জননী হইতে যাঁহার জন্মগ্রহণ, সুখের দিব্যালোক বিকাশের জন্য ঘন মেঘাবৃত কৃষ্ণপক্ষ নিশীথে যাঁহার উদয়, অসুরপ্রভাবে উদ্‌ভ্রান্ত রাষ্ট্রচক্রকে সুস্থির করিবার জন্য ঘূর্ণিত চক্র হস্তে যাঁহার আগমন, অপূর্ব্ব রূপমাধুরী বিলাইবার জন্য কৃষ্ণরূপে যাঁহার বিকাশ, বাল্যে যিনি বীরবিক্রমে অসুরকুল কম্পিত করিলেও যশোদার ক্রোড়ে নন্দদুলাল, কৈশোরে গোপীমনোমোহন হইলেও কংসাসুর-নিহন্তা, যৌবনে দ্বারকার অধীশ্বর হইয়াও ভক্ত-প্রেমিক-বন্ধুর আজ্ঞানুবর্ত্তী, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যিনি সারথি হইলেও বিশ্বগুরু—আত্মতত্ত্বোপদেশক, এমন বিচিত্র চরিত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ শুধু শ্রীকৃষ্ণেই দেখিতে পাওয়া যায়।

বাল্যের শ্রীকৃষ্ণ যেন একটি আদুরে ছেলে,—দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া, ক্ষীর-সর চুরি করিয়া, গোপীগণের বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া, রাখাল বালকগণের সহিত বনে বনে ঘুরিয়া—ফল পাড়িয়া বেড়াইতেছেন! দুর্দ্দমনীয় চঞ্চল বালক, কাহার সাধ্য তাঁহাকে সংযত রাখে! আবার তাঁহাকে ক্রোড়ে করিবার জন্য, তাঁহার অঙ্গ অঙ্গে সংলগ্ন করিবার জন্য সবাই ব্যাকুল! এমন পুরুষ নাই যে, সেই শিশু শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া পরিতৃপ্ত না হয়! এমন নারী নাই—যাহার সেই কোমল নীলমণি হৃদয়ে ধারণ করিবামাত্র বাৎসল্যের উৎস খুলিয়া না যায়। যশোদার অঞ্চলের নিধি—ক্ষীর-সর-নবনীভাণ্ড নিঃশেষ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, পূতনা—অরিষ্ট—ধেনুকাদি অসুর বধ করিয়া—গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া—যিনি বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, এক দিকে মধুর শিশুজনোচিত ক্রীড়া, অন্য দিকে ভূভারহরণের লীলা,—প্রাকৃত অপ্রাকৃতের অপূর্ব্ব মিশ্রণই শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্।

তাঁহার শৈশবের শক্তির কথা কাহারও অবিদিত ছিল না। চিরবিদ্বেষী শিশুপালের মুখে তাঁহার নিন্দাচ্ছলেই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি বাল্যে পূতনা, ধেনুকাসুর, কুবলয়াশ্ব, কংস প্রভৃতি বধ করিয়া—বল্মীকস্তূপ সদৃশ গিরি ধারণ করিয়া কি এমন অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন? (মহাভারত সভাপর্ব্ব ৪১ অঃ) দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধি করিবার জন্য পাণ্ডবপক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন একাকী দৌত্য করিতে গিয়াছিলেন, তখন দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া রাখিবার মতলব করিতেছিল; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সেই সময়ে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'অনেন হি হতা বাল্যে পূতনা শকুনী তথা। গোবর্দ্ধনো ধারিতশ্চ গবার্থে ভরতর্ষভ॥ অরিষ্টো ধেনুকশ্চৈব চাণূরশ্চ মহাবলঃ। অশ্বরাজশ্চ নিহতঃ কংসশ্চারিষ্টমাচরন্।' ইত্যাদি—অর্থাৎ ইনি বাল্যকালে পূতনা ও শকুনীকে নিহত করিয়াছিলেন; ইনি গোকুলরক্ষার্থ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন; ইনি অরিষ্ট, ধেনুক, চাণূর, অশ্বরাজ কংস প্রভৃতিকে নিহত করিয়াছেন। ইঁহার নিগ্রহ কি তোমরা করিতে পার?" (মহা, উদ্যোগপর্ব্ব ১৩০ অঃ) মহাকবি ভাস-প্রণীত 'বালচরিতম্' নামক নাটকেও শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্যসাধারণ পরাক্রমকথা নিপুণভাবে বর্ণিত। তাঁহার বাল্যলীলা কবিকল্পনা নহে, ধারাবাহিক সাহিত্যই তাহার প্রমাণ।

কৈশোরের শ্রীকৃষ্ণ—গোপীগণ-পরিবৃত—অদ্ভুত লীলারসে নিমগ্ন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাসলীলার প্রারম্ভে দেখা যায়,—

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।"

যোগশক্তিযুক্ত হইয়া তিনি গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। বহু স্থানেই তাঁহাকে 'যোগেশ্বর' —'যোগেশ' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। যোগের যে অদ্ভুত শক্তি—তাহার বহু প্রমাণ অন্য শাস্ত্রেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—কালিদাসরচিত কুমারসম্ভবে মহাদেবের যোগজনিত নির্ব্বিকার ভাব এবং মদনভস্মের বৃত্তান্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—যোগশক্তিপ্রভাবে কামজয় করা অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-লীলায় সেই যোগশক্তির অপূর্ব্ব মহিমাই প্রচারিত।

"রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥"

"সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ"—"যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া দুই দুই জনের মধ্যে প্রবেশ

করিলেন"—এবং তিনি যে উর্দ্ধস্রোতাঃ থাকিয়াই গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাও অবগত হওয়া যায়। যোগের এই যে একটা সাধনপদ্ধতি—যাহা গুহ্যবিদ্যা—অতি রহস্য বলিয়া মাত্র যোগিসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা লুপ্তপ্রায় বলিয়াই যোগী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাবধারণে আমরা অসমর্থ হই। যোগীর লক্ষণ নির্লিপ্ততা। দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণে তাহার পূর্ণ পরিচয়। ব্রজের সে লীলাময় গোপীরমণ কিশোর কৃষ্ণ,—দ্বারকায় কর্ত্তব্যকঠোর রাজ্যাধীশ্বর—যেন ব্যক্তিই স্বতন্ত্র। বহু তপস্যাফলে প্রকৃত যোগী হওয়া যায়, তাই শ্রীমদ্‌ভাগবতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের পক্ষে এই গোপীলীলা যে অনুকরণীয় নহে, তাহা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

যাঁহারা ঈশ্বর নহেন, তাঁহারা কখনও এতাদৃশ আচরণ করিবেন না, রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ বিষপান করিলেই মরিয়া যাইবে।—তার পর বলিলেন,—

"যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥"

যাঁহার চরণারবিন্দসেবক মুনিগণও যোগপ্রভাবে সমস্ত কর্ম্মবন্ধ দূর করিয়া থাকেন ও স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না, আর যিনি স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করিয়াছেন—তাঁহার বন্ধ হইবে কিরূপে? এই শ্লোকে যোগপ্রভাবে মনুষ্যগণও যে অমিতশক্তিশালী হইতে পারেন—তাহারই সংবাদ পাওয়া যায়। সুতরাং সমগ্র রাসলীলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে অনুপম যোগৈশ্বর্য্যের সন্ধান দিয়াছেন, তাহাই প্রণিধানের বিষয়।

এই যোগের আলোচনাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন, এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতদর্শন সম্ভবপর হয়। "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।"

(গীতা ৬ অঃ ২৯ শ্লোক)

যুক্তাবস্থায় যোগীর এই যে সর্ব্বভূতদর্শন—ইহা অলীক কল্পনা নহে। কেন না, যোগজন্য এইরূপ শক্তি বহু সাধকই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিভু সর্ব্বব্যাপক আত্মার সহিত সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থের সংযোগ আছে—ইহা দর্শনশাস্ত্রে স্বীকৃত, সেই আত্মদর্শন যদি ঘটে, তাহা হইলে তৎসংযুক্ত সমস্ত পদার্থের দর্শন হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিলেন, তখনও অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ মোহ বিদূরিত হয় নাই। শ্রবণ-মননে সম্যক্ আত্মদর্শনলাভ হয় না বলিয়াই নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। সেই নিদিধ্যাসনই যোগাভ্যাস। শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রভাবে অর্জ্জুনকে সেই যোগাবস্থায় আনয়ন করাইয়া আত্মায় সর্ব্বভূতদর্শন করাইলেন—সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত স্বরূপ অবগত হইয়া অর্জ্জুনের চিত্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। যোগসাধনায় সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে অনেকেই বিভীষিকা দর্শন করে ও ভীত হইয়া উঠে; কিন্তু তেমন গুরু সঙ্গে থাকিলে সে ভয় থাকে না। ভীত অর্জ্জুনকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ মূর্ত্তি পুনরায় দর্শন করাইয়া নিজ সান্নিধ্য জ্ঞাপন করিলেন। অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ হইলেন—তাঁহার মোহ দূর হইল। অর্জ্জুন প্রকৃত অধিকারী—এবং শ্রীকৃষ্ণকে গুরুবরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাই তাঁহার বিশ্বরূপদর্শন অনন্যসাধারণ ব্যাপার। তাই ভগবান্ বলিলেন—

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥"

দূতরূপে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য যখন দুর্য্যোধনাদি পরামর্শ করিতেছিল, তখনও শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—

"একোঽহমিতি যন্মোহান্মন্যসে মাং সুযোধন।
পরিভূয় সুদুর্ব্বুদ্ধে গ্রহীতুং মাং চিকীর্ষসি।
ইহৈব পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে তথৈবান্ধকবৃষ্ণয়ঃ।
ইহাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ মহর্ষিভিঃ॥"

ইত্যাদি (সভাপর্ব্ব ১৩১ অধ্যায়)।

এখানে দেখা যায়—দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় এবং ঋষিগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিগণকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলেন। দুষ্ট দুর্য্যোধনাদি সেই রূপ দর্শন করিয়া যখন ভীত হইল, তখন তিনি নিজরূপ ধারণ করিয়া সাত্যকি ও হার্দ্দিক্যের হস্তধারণ

করিয়া প্রস্থান করিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপধারণ যোগবিভূতিপ্রদর্শন মাত্র। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন মোহ-নিবারণের জন্য, ইহা মোহ আনয়নের জন্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপী নহেন, এই নিমিত্ত দ্রোণ ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতি ভক্তগণ এই মোহজনক বিশ্বরূপ দেখিতে পাইলেন না! সাধনাহীন কামক্রোধাদি রিপুবশীভূত চঞ্চল চিত্তকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে আয়ত্ত করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন; ক্ষুদ্র—দুর্ব্বল চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল—সে চিত্ত অপরূপ রূপদর্শন সহ্য করিতে পারিল না। সুতরাং অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন আর দুর্য্যোধনাদির বিশ্বরূপদর্শন অন্যবিধ। এই জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ যোগবল আশ্রয় করিয়া যে অর্জ্জুনকে গীতোপদেশ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বে ষোড়শ অধ্যায়ে—'ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ। পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া'—সুতরাং যিনি পূর্ণ যোগী—যোগতত্ত্বাভিমুখে মানবকে আকর্ষণ করা তাঁহার অবতার গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহাও একপ্রকার সাধুগণের পরিত্রাণ।

তাঁহাকে যোগসিদ্ধ মানব মাত্র বলিয়া চিন্তা করিতে পারা যায় না। বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক লীলার মধ্যেই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভাবের এমনই মিশ্রণ আছে যে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্যতীত অন্যরূপে ভাবিতে হইলে আত্মপ্রত্যয়ের অপলাপ করিতে হয়। এ বিষয়ে শ্রীগীতায় তাঁহার নিজ উক্তিই প্রমাণ,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য　*　*　*　*　*

৪র্থ অঃ, ৬।৭।৮।

আমি জন্মহীন, সনাতন ও জীবজগতের ঈশ্বর হইয়াও নিজ মায়ার আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যখনই ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি, সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকি।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম-এ)।

জন্মাষ্টমী

কোন্ নিশীথের তমসায় ঢাকা
　এ পাষাণ কারা-অন্তরালে,
এলে দেবকীর নয়নের মণি
　আলোকি স্বরূপ কিরণজালে;

আজি নন্দনে দুন্দুভি-ধ্বনি
　মন্দার-মধু মরতে বৃষ্টি,
ভূতলে উদিল ভবভয়হারী
　রক্ষিতে নিজ অতুল সৃষ্টি।

বঞ্চিত হয়ে নিজ অধিকারে
　রুদ্ধ কারাতে জনক-জননী,—
সহসা কাঁপিল কংস-বক্ষ,
　সঙ্কিত পাপে কাঁপিল ধরণী;

শিশু-ভয়ে ভীত দানবের রাজ!
এ কি লীলা তব লীলাময় আজ,
হরিতে ধরার পাপভার হরি—
যুগে যুগে যেন ও-রূপ নেহারি
মধুকৈটভ-কংস-নিধন কালিয়-দর্পহারি:
তব নামরসে ডুবিল যে জন,
ঘুচিল তাহার কর্ম্ম-বাঁধন,
ভকত-নয়নে বিগলিত শুধু
　একটি অশ্রুকণা—

হৃদি তামরস বিকচ আলোকে,
ঘোরা যামিনীর দামিনী ঝলকে:
(ওগো) নবজলধর শ্রীহরি ভূলোকে—
　ও প্রাণে কি বাজিবে না;—
ত্বরাতে তাপিতে, দানবে নাশিতে—
　ভালে শত শশি-কিরণ জ্বলে,
হও মম মন-মধুপ মগন
　পদকোকনদ-সুরভিতলে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য (এম-এ)।

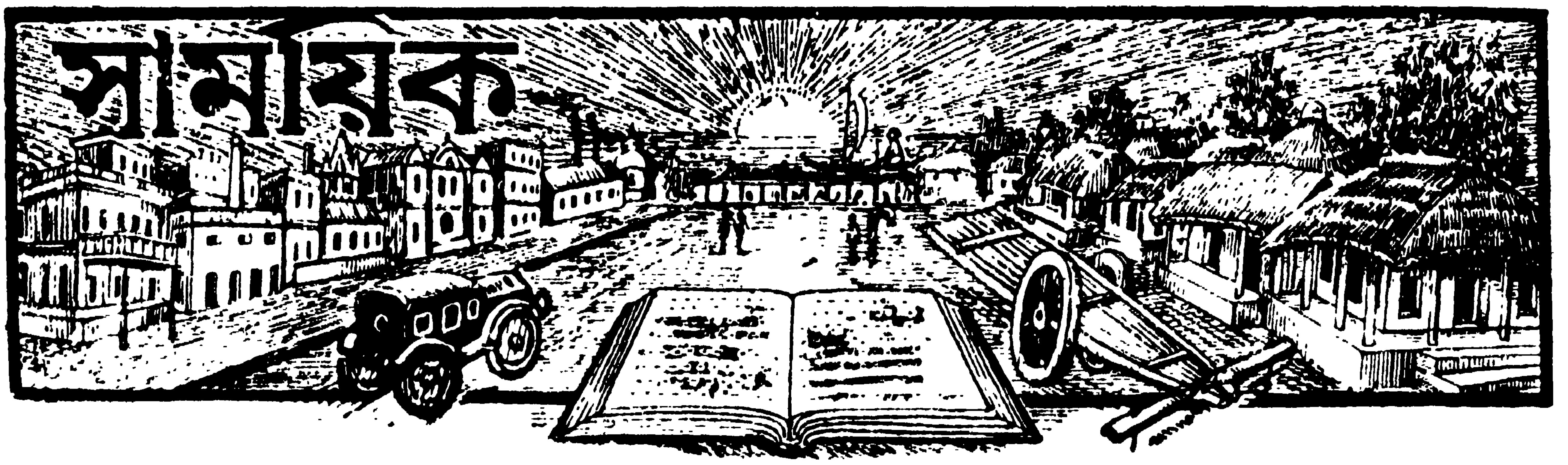

মুস্‌লিম বা ইঙ্গ-মুস্‌লিম রাজ?

প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে নির্দ্ধারণ গত ১৭ই আগষ্ট বিলাতে ও এ দেশে প্রচারিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টে তাঁহার এক প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় নিজেই বলিয়াছিলেন যে,—ভারতের এক শ্রেণীর লোক অতিরিক্ত মাত্রায় সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী, তাঁহারা সর্ব্বদা ভারতীয় জাতির স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া কেবল আপন আপন সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, এই প্রবৃত্তি ভাল নহে। কিন্তু আজ তাঁহার নির্দ্ধারণের মুখবন্ধে উহার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, -"তিনি ন্যায়বিচার ও যুক্তি অনুসারে যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া অধিকার বণ্টন করিয়া দিয়াছেন; যদি তাঁহার এই ব্যবস্থাটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া ন্যায়যুক্তি অনুসারে দেখা হয়, তাহা হইলে ভারতবাসী ইহাতে আপত্তিকর কিছুই দেখিতে পাইবে না, পরন্তু ভারতবাসীকে একটা আপোষের ভিত্তি দেখাইয়া দেওয়া হইল। যদি তাঁহারা ইহাতে আপত্তিকর কিছু দেখিতে পান, তাহা হইলে এখনও তাঁহারা আপনাদের মধ্যে ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আপোষ বন্দোবস্ত করিবেন, তাহাতে সরকার যত আনন্দিত হইবেন, এত আর কেহ নহে এবং তাহা গ্রহণ-যোগ্য হইলে গ্রহণ করিবেন। এই গুরু কর্ত্তব্যভার সরকার স্বয়ং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন নাই, উহা তাঁহাদের উপর জোর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং সরকার নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষরূপে অপর দুই পক্ষের স্বার্থের বিরোধ সম্পর্কে যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য কেহ তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারেন না।"

মোটের উপর ইহাই প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য। বলা বাহুল্য, এ দেশের সরকার পক্ষ হইতে এই উক্তির সমর্থনে কোথাও কোথাও প্রকাশ্যে সরকারের আন্তরিকতা ও সাধু উদ্দেশ্যের কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বড়লাটের শাসনপরিষদের অন্যতম সদস্য মিঃ হেগ ও পাঞ্জাবের বর্ত্তমান অস্থায়ী গভর্ণর ক্যাপ্টেন উমর হায়াৎ খাঁর উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মিঃ হেগ কেবল স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু আভাস দিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা যদি ইহা পছন্দ না হইলে এখনও আপনাদের মধ্যে আপোষ বন্দোবস্ত না করে, তাহা হইলে এই নির্দ্ধারণই ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কারের অঙ্গীভূত হইয়া আইনে পরিণত হইবে।

সরকারের ইহাই মনোভাব। আর এ দেশের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রগুলিও যে এই সুরে পোঁ ধরিবেন, তাহা জানা কথা। বিলাতের 'টাইমস' প্রমুখ কয়খানি পত্রও সরকারের উপদেশ ও সাবধানবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, 'ডেলি মেল' পত্রের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী পত্র আশঙ্কা করিয়াছেন যে, এই নির্দ্ধারণের ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং অশান্তি অরাজকতা দেখা দিবে।

কিন্তু সে যাহা হউক, আমাদের দেশের বুদ্ধিমান্‌ এবং অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যেও যে কেহ কেহ এই নির্দ্ধারণকে মানিয়া লইয়া শাসন-সংস্কারের অন্যান্য অংশের জন্য জোর দাবী করার পরামর্শ দিতেছেন,—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? যে মডারেট নেতারা গোল টেবিল-নীতি অনুসৃত হইবে না শুনিয়া সরকারের সহিত পরামর্শের সংস্রব বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে শীর্ষস্থানীয় সার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও সার চিমনলাল শীতলবাদ প্রধান মন্ত্রীর এই নির্দ্ধারণের কোনও প্রতিবাদ না করিয়া মূল শাসন-সংস্কারের জন্য যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেছেন! সার তেজ বাহাদুর বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও ছুটিয়াছেন, হয় ত তৃতীয় ছোট গোল টেবিলে যোগ দিতেও যাইবেন!

কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় নেতৃগণের বুঝা উচিত যে, বনিয়াদ যাহার খারাপ, তাহার উপরে নির্ম্মিত গৃহ কখনও পাকাপোক্ত হইতে পারে না। চাষ-আবাদের মাঠ অগাছা ও চোরকাঁটায় ভরিয়া গেলে অথবা বন্যায় ডুবিয়া থাকিলেও উহা হইতে সুফলের আশা করিতে হইবে, ইহা বাতুল ভিন্ন আর কে বলিবে?

কেন এ কথা বলা হইতেছে, তাহা নির্দ্ধারণের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে। প্রধান মন্ত্রী ভারতের সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ সম্পর্কে যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়াছেন, তাহাই ধরা যাউক।

প্রথমতঃ যাঁহারা কখনও স্বয়ং স্বতন্ত্র সদস্যপদের দাবী করেন নাই, সেই ভারতীয় খৃষ্টান, শ্রমিক, জমীদার, ব্যবসায়ী, নারী প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র সদস্য পদের অধিকার দিয়া ভারতবর্ষকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা যে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বিষম পরিপন্থী, তাহা মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও মনে মনে নিশ্চিতই স্বীকার করিবেন।

তাহার পর যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় লইয়া মূলতঃ সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা উঠে, তাহাদের মধ্যে পদবণ্টন যে ভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতে হয় মুসলিম-রাজ,

না হয় ইঙ্গ-মুসলিমরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবেই। বলা হইয়াছে যে, ইহা সাময়িক ব্যবস্থা, চিরদিনের জন্ম নহে। ১০ বা ২০ বৎসর ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে, তন্মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় এক-সঙ্গে দেশের কায করিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমে জাতীয়তার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখন আর বণ্টনে বৈষম্য রাখিবার প্রয়োজনই হইবে না। কিন্তু এ যাবৎ দেখা গিয়াছে যে, একবার অধিকারের আস্বাদ পাইলে উহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। মর্লে-মিণ্টো সংস্কার অথবা লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ ইহাই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। সুতরাং ১০।২০ বৎসরে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের আশা দুরাশা মাত্র।

বলা হইয়াছে, কাহাকেও Staturory majority দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যে ভাবে বিভিন্ন প্রদেশে সম্প্রদায়-সমূহের জন্ম পদবণ্টন করা হইয়াছে এবং weightageএর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে Statutory majority হইতে কি কম করা হইয়াছে, তাহা সরকার পক্ষ বলিতে পারেন কি? যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় কম, সেখানে তাঁহাদিগকে weightage দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুদিগকে কিছু weightage দেওয়া হইয়াছে বটে, অন্য কোথাও কিন্তু দেওয়া হয় নাই।

বাঙ্গালায় বণ্টনের এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, মুসল-মানরা য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত যোগ দিলেই হিন্দুরা কোণ-ঠেসা হইবেই। পাঞ্জাবে মুসলমানরা হিন্দু ও শিখদিগকে দাবাইয়া রাখিবেন। সিন্ধু ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের ত কথাই নাই। কিন্তু হিন্দুপ্রধান প্রদেশে মুসলমানরা weightage পাওয়ার দরুণ তাঁহাদের বিশেষ অসু-বিধায় পড়িতে হইবে না। এক কথায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী-দেরই জয় হইয়াছে, তাঁহারা ১৪ পয়েণ্টের মধ্যে ১৩ পয়েণ্ট আদায় করিয়াছেন, কেহ কেহ বলিতেছেন, তাঁহারা ১৪ পয়েণ্টের স্থলে ১৭ পয়েণ্ট পাইয়াছেন।

——

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যাহা হউক, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড অথবা তাঁহার টীকাকার ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব কিরূপ best possible solution of the communal tangle সাম্প্রদায়িক সমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভব উৎকৃষ্ট সমাধান করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদেরই ব্যবস্থা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাউক।

পাঞ্জাবে মুসলমানরা ১ শত ৭৫টি সদস্যপদের মধ্যে খুব কম করিয়া ধরিলেও ৮৯ টি পাইবেন, সম্ভবতঃ ইহা হইতে আরও দুই একটি অধিক পাইতে পারেন এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্প্রদায় এক-যোগে ৮৪টি পাইবেন, আর হিন্দু ও শিখরা ঐ ৮৪ টির মধ্যে বড় জোর ৮০টি পাইতে পারেন। ফলে মুসলমানরা পাঞ্জাবে অন্য সমস্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা সর্ব্বদা ৪।৫টি পদ অধিক পাইবেন। এই ব্যবস্থায় গোঁড়া সাম্প্রদায়িক মুসলমানের স্বার্থ-সাধনের যে উপায় করিয়া দেওয়া হইল, তাহা কোনও সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষী মুসলমান কখনও আশা করিয়াছিলেন কি? ইহাতেও ইকবালী দল সন্তুষ্ট নহেন! সার মহম্মদ ইকবাল এখনও বিবেচনা পূর্ব্বক আপনার দলকে নির্দ্ধারণটা বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। হাসি পায় না কি? অথচ কোন শিখ নেতা বলিয়াছেন, গত ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দেও শিখরা পাঞ্জাবে রাজত্ব করিয়াছিল!

উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে মুসলমান সদস্য-পদের সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের অপেক্ষা ২২ হইতে ২৪টি অধিক হইবে। সিন্ধু প্রদেশে হইবে ৮টি।

যে সকল প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য আছে, সেখানে মুসলমানদিগের weightage বর্ত্তমানের প্রথানুযায়ী অবিচ্ছিন্ন রাখাও স্থির হইয়াছে।

বাঙ্গালায় যদিও গজনবি সুরাবর্দ্দীর আবদারমত ৫১টি পদ দেওয়া হয় নাই, তথাপি ৪৮'৪ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার ফলে মুসলমানরা অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের উপরে চলিয়া গেলেন, য়ুরোপীয়দের মন যোগাইয়া চলিলেই অন্য সকল সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান কাউন্সিলে মোট ১৪০টি সদস্য পদের মধ্যে মুলমানদের ৩৯টি এবং অ-মুসলমানদের (হিন্দুদের) ৫৭টি। নূতন ব্যবস্থায় ২৫০টি পদের মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে ১১৯টি মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে; তাহা ছাড়া আরও ৭টি বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন। এই ব্যবস্থায় সম্মিলিত হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় খৃষ্টানদের সদস্যপদ হইতে মুসল-মানরা সর্ব্বদা অন্ততঃ ২টি পদ অধিক প্রাপ্ত হইবেন। অপর-দিকে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় য়ুরোপীয়দিগের হস্তে শক্তি বণ্টনের কলকাঠিটি দিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। মুসলমান-দিগকে সন্তুষ্ট করিবার প্রবল ইচ্ছা বিদ্যমান থাকাতেও তিনি য়ুরোপীয়দিগের প্রভুত্ব হ্রাস করিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং গজনবি সুরাবর্দ্দীর দল অন্য সম্প্রদায়গণকে তাঁবে রাখিবার জন্য যে য়ুরোপীয়দের মতে মত দিয়া দেশের স্বার্থ বলি দিবেন না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা হয় ত পুলিসের ভার—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার বিদেশীর হস্তে দিতে সম্মতি প্রদান করিয়া আপন সম্প্র-দায়ের জন্য স্বার্থ-সাধন করিয়া লইতে পারেন।

——

অ-মুসলমান

যে হিন্দুর জন্য ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন অন্য নাম 'হিন্দুস্থান', মুসলমান আমলেও নবাব-বাদশাহরা যে দেশকে হিন্দুস্থান বলিতেন, বৃটিশ শাসন-সংস্কারের কল্যাণে সেই 'হিন্দু' নাম উঠিয়া গিয়াছে। এখন ভারতবর্ষের দুইটি জাতি;—'মুসলমান' ও 'অ-মুসলমান'! নূতন শাসন-সংস্কার-সম্পর্কিত সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় 'অ-মুসলমান' কথাটির পরিবর্ত্তে General constituency 'সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী' কথা ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুকে শাসনে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত অতিথি হইলেন মুসলমান, আর অন্য পাঁচ জন রেয়োভাটের মত হিন্দু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দয়াদত্ত ভিক্ষা-মুষ্টির জন্য উমেদারী, কাকুতি-মিনতি করিবে! চমৎকার!

যদি সরকার ও সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের কথা মানিয়া লইয়া ধরা যায় যে, কংগ্রেস হিন্দুদের কংগ্রেস, উহার সহিত জাতীয়তা-বাদী মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান বা পার্শীদের কোনও সম্পর্ক নাই, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, আজ ৫০ বৎসরের উপর হিন্দু কংগ্রেস নানা ত্যাগস্বীকার এবং দুঃখ-বিপদ বরণ করিয়া যে জন্মগত অধিকারের দাবী করিয়া আসিতেছে, তাহার কি প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে? এখন যে অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আত্মরক্ষার্থে পদে পদে গভর্ণরের অতি-রিক্ত ক্ষমতার (certification) শরণ লইতে বাধ্য হইবে না কি? উহার ফলে দেশে দ্বৈত-শাসন কায়েম-মোকাম হইয়া বসিবে না কি? যে দ্বৈত-শাসনের উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যে শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা—যাহার জন্য অর্থ, শ্রম, অধ্যবসায় অপব্যয় করিয়া গোলটেবিল ও একাধিক কমিটী বসান হইল, সেই দ্বৈত-শাসনই যদি আরও পাকাপোক্ত হইয়া বসিয়া যায়, তাহা হইলে নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন কি,—উহার সাফল্যসাধনের জন্য চেষ্টারই বা প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ যখন প্রদেশেই এই ব্যবস্থা, তখন 'ভবিষ্যতে' কেন্দ্রে যাহা হইবে, তাহারই আশায় বা থাকিবার প্রয়োজন কি? প্রদেশেই যখন এই ব্যবস্থা, কেন্দ্রে তখন কি হইতে পারে?

মাল যাচাই

সার চিমণলাল শীতলবাদ তাঁহার বিবৃতিতে যদিও বলিয়াছেন যে,—"ভারতীয়রা স্বয়ং মীমাংসা করিতে সমর্থ না হইয়া যখন প্রধান মন্ত্রীর উপর উহার ভার দিয়াছে, তখন তাঁহার নির্দ্ধারণে আপত্তি করা উচিত নহে,"—তথাপি ঐ বিবৃতিতে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, "প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য বৃটিশ রাজনীতিক একাধিক ক্ষেত্রে জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, কোন ধর্ম্ম-সম্প্র-দায়ের লোকদিগের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ আসন নির্দ্দিষ্ট করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রী ও আর যাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বহর আরও বৃদ্ধি করিয়া ভারতে জাতীয়তার মূলোচ্ছেদ করা উচিত হয় নাই।" সুতরাং প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মতের ডিগবাজী খাইয়া যে ভাল করেন নাই, তাহা মডারেটরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার রচিত গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, এখন নিজেই তাঁহার নিজের কার্য্যে তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহার মত রাজনীতিকের পক্ষে ইহা শোভন হইয়াছে কি? উদারনীতিক লর্ড মর্লের মত তিনি সারা জীবনে অনুসৃত উদারনীতি বিসর্জ্জন দিয়া সঙ্কীর্ণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বৃটিশ রাজনীতিকদের এমন মতের ডিগবাজী বহুদিন যাবৎ লক্ষিত হইতেছে।

অধিক কথায় কায কি, যে সাইমন কমিশনকে এদেশবাসী বর্জ্জন করিয়াছিল, সেই সাইমন কমিশনই তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছিলেন,—"It would be unfair that Mahomedans should retain the very considerable weightage they now enjoy in the six provinces and that there should at the same time be imposed, in face of Hindu and Sikh opposition, a definite muslim majority in the Punjab and Bengal unalterable by any appeal to the electorate."

আসল কথা, বিলাতে এ্যাংলো-মুসলিম মিলন, মাইনরিটিস প্যাক্ট, বেঙ্গল ও মুসলিম মিলন এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সিভিলিয়ান সদস্যদের সহিত কোনও মুসলিম নেতার আঁতাত,—এই সকলের যোগাযোগে নির্দ্ধারণের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপক্ষে ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী হিন্দু ও মুসলিম-গণের ত কথাই নাই, জমিয়তে-উল-উলেমা, হিন্দু মহাসভা ও তাহার প্রাদেশিক শাখা-সমূহ, বিশিষ্ট হিন্দুগণের মধ্যে বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও অন্যান্য বাঙ্গালী মডারেট নেতা, পাঞ্জাবের ডাক্তার গোকুলচাঁদ নারাং, রাজা নরেন্দ্রনাথ, মোহনলাল, আর, পুরী, রায় বাহাদুর লালা দুর্গাদাস প্রমুখ মডারেট হিন্দুগণ; সর্দ্দার সন্ত সিং, সর্দ্দার অমর সিং, সর্দ্দার মেতাব সিং, সর্দ্দার নেহাল সিং, জ্ঞানী শের সিং, সার যোগেন্দ্র সিং, সার সুন্দর সিং মাঝিথিয়া, রাজা সার দলজিৎ সিং এবং সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং প্রমুখ শিখনেতৃগণ, ভারতীয় খৃষ্টানগণ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতৃগণ, নারীগণের নেত্রীবর্গ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান-সমূহের নেতৃগণ, শ্রমিক সম্প্রদায়ের নেতৃগণ,—সকলেই একবাক্যে এই নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেবল মুষ্টিমেয় কয়জন সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী মুসলমান, য়ুরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের এবং কয়জন যো-হুকুমদলীয় লোকের সমর্থনে কি ইহা ভারতবাসীর দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া জাহির করা যাইতে পারে? মাল যাচাই করিয়া যখন অধিকাংশ ভারতবাসীই ইহার সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছেন না, তখন ভারতবাসীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও চালাইয়া দিলে ইহা চলিবে কি? কাগজে কলমে উহা আইন আকারে দেখা দিতে পারে, কিন্তু উহা কার্য্যক্ষেত্রে সফল করিবে কে? বিশেষতঃ যে সময়ে ভারতের জাতীয়তা-বাদী নেতারা কারা-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া কোন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার পাইতেছেন না?

বাঙ্গালায় নারীহরণ

বাঙ্গালা কাউন্সিলে প্রশ্নোত্তরের ফলে সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে,—বাঙ্গালায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অপহৃতা বা ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ৮শত ৩০টি হইয়াছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৮শত ৯৮, ৯শত ১৬, ১হাজার ৫৭, ৯শত ৯১ এবং ৯শত ৩১টি হইয়াছে। অর্থাৎ গত ৬ বৎসরের হিসাব ধরিলে বৎসরে গড়ে ৯শত ৪৭ জন নারী ধর্ষিতা, অপহৃতা বা লাঞ্ছিতা হইয়াছে। হিসাব হইতে ইহাও দেখা যায় যে, যে সকল জেলায় মুসলমানের সংখ্যা সমধিক, সেই সকল জেলাতে সমধিক পরিমাণে হিন্দু নারী নির্য্যাতিতা বা অপহৃতা হইয়াছে। ময়মনসিংহ, বরিশাল,

রংপুর, পাবনা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, যশোহর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার হিসাব দেখিলে জানা যায়, সর্ব্বত্র ধর্ষিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা অনেক কম এবং লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা বা অপহৃতা হিন্দু নারীর সংখ্যাই সমধিক। জগতের কোন দেশে কোন কালে কোন সভ্য সরকারের আমলে এরূপ বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া কাহারও জানা আছে কি?

অথচ বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় যখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রতিবৎসর নারীধর্ষণের সংখ্যা-বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এ বিষয়ে সরকারের পক্ষে বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় কি না, তখন তাহার উত্তরে সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ রীড অম্লানবদনে উত্তর দেন যে, সাধারণ আইনই যথেষ্ট, বিশেষ ব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নাই!

এই উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইবেন সন্দেহ নাই। প্রচলিত আইনের বলে যদি এই পাপ নিবারিত হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে অপরাধ বাড়িয়াই চলিয়াছে কেন? যে সরকার বিপ্লব ও আইন অমান্য দলনে অমিত বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারেন, সেই সরকার শক্তি ও আইন প্রয়োগ দ্বারা এই মহাপাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই কেন? রাজনীতিক ব্যাপারে অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স জারী করার প্রয়োজন হয়, আর প্রজার আত্ম-সম্মান এবং পরিবারের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য বিশেষ বিধিরও প্রয়োজন হয় না? বিশেষতঃ সেই প্রজাকে যখন নিরস্ত্র ও দুর্ব্বল অবস্থায় থাকিয়া সরকারের শান্তিরক্ষকদেরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়?

ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলি তাঁহার আত্ম-জীবন-কথায় বাঙ্গালার এই নারীধর্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বের এক সংখ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি নারী-ধর্ষণের অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরামর্শ গ্রাহ্য হয় নাই। তাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট এই মহাপাপের মামলা উপস্থিত হইলেই তিনি কঠোর দণ্ডবিধান করিতেন। দেশবাসী না হইলে দেশের এই মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারে না। নতুবা আজ যদি বৃটিশ নারীর লাঞ্ছনা বা অবমাননা হইত, তাহা হইলে সরকার কি সাধারণ আইনের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতেন? কুমারী এলিস যখন পাঠান দুর্ব্বৃত্তের দ্বারা অপ-হৃতা হইয়াছিলেন, তখন কি হইয়াছিল? তখন যে সমগ্র বৃটিশ জাতি হুহুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল—প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের কথা আকাশে বাতাসে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রধান মন্ত্রীর আসন টলিয়াছিল!

সহায়হীনা অবলার নিরুপায় অবস্থার সুযোগ পাইয়া পাষণ্ড কামার্ত্ত নরপশু তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত করিয়া থাকে। গুরুপাপে লঘুদণ্ড হয় বলিয়াই তাহাদের বুক বলিয়া গিয়াছে। আর এখন যখন তাহারা জানিবে যে, সরকার তাহা-দের দণ্ডের জন্য বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা করিতে অসম্মত, তখন ত কথাই নাই। এখন যা করেন বাঙ্গালীর ভাগ্যদেবতা আর অসহায়া নারীর নয়নাশ্রু ও তপ্তশ্বাস!

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা

সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্সের কল্যাণে দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্র-সমূহের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। অনুক্ষণ মাথার উপর খড়্গ ঝুলিতেছে, কখন কাহার মাথায় পড়ে, তাহা পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও কেহ বুঝিতে পারে না। কোন্‌টা দণ্ডনীয়, কোন্‌টা নহে, সংবাদপত্রের ভাগ্যবিধাতাদের মর্জ্জির উপরেই তাহা নির্ভর করে। অতি সাবধানী হইয়া মতামত প্রকাশ করিলেও নিস্তার নাই। ডাকের উপর ডাক, সতর্ক হইবার তাড়না, ভর্ৎসনা, সম্পাদককে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সমঝাইয়া দেওয়া,—এ সব ত এখন সংবাদপত্রের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে।

'অমৃতবাজার পত্রিকার' আবেদনের বিচারে বসিয়াছিলেন, হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ এবং বিচারপতি শ্রীযুত মল্লিক। অধ্যাপক জর্জ্জের লিখিত 'India in Travail' শীর্ষক প্রবন্ধ পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছিল, ইহার জন্য পত্রিকার নিকট বাঙ্গালা সরকার ৬ হাজার টাকা জামীন চাহিয়াছিলেন। এই সূত্রেই আবেদন।

এ ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি মহাশয় পত্রিকার আবেদনের যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিতে পান নাই এবং বিচারপতি মল্লিক মহাশয়ও তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন। কিন্তু বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রধান বিচারপতির এই অভিমতের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"এই প্রবন্ধে ভারতের সহিত বৃটেনের বর্ত্তমান রাজনীতিক সম্বন্ধ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এই হেতু ভারতীয় খৃষ্টানদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম অনুসারে অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সরকারের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; ইহা দ্বারা ধর্ম্মোপদেশের আশ্রয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করার অভিযোগ ভিত্তিহীন।" বিচারপতি ঘোষ মহাশয় স্থানীয় সরকারের জামীনের আদেশ নাকচ করিবার ইহা উপযুক্ত কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

তবেই ত! এক জন বিচারক যাহাকে অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, অপর জন তাহাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতেছেন না। অথচ এমন সন্দেহস্থলেও দণ্ডের পক্ষে বিচারকগণের অভিমতের সংখ্যাধিক্যে সংবাদপত্র গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। অর্ডিনান্সের ব্যাখ্যা কতমতে হইতে পারে, এই মামলাই তাহার প্রমাণ। এ স্থলে সাংবাদিকগণের পক্ষে উহা জানা কিরূপ কঠিন, তাহা ইহা হইতেই জানা যায়। মহামান্য হাইকোর্টের এক জন বিচারপতি যে রচনাকে দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না, তাহা উদ্ধৃত করিলে দণ্ডাহ হইতে হইবে, ইহা কূট আইনে অনভিজ্ঞ সাংবাদিকের পক্ষে নির্দ্ধারণ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং সাংবাদিকমাত্রেই আজ অকূল পাথারে পড়িয়া বলিতেছে,—বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

পরলোকে শ্যামসুন্দর

গত ২২শে ভাদ্র বুধবার রাত্রিকালে কলিকাতার বাসভবনে দেশজননীর সুসন্তান, জাতির একনিষ্ঠ সেবক, সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ত্রিষষ্টিবর্ষ বয়সে তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পাবনা জেলার অন্তর্গত বাবেঙ্গ গ্রামের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্যামসুন্দর ইংরাজী শিক্ষালোক প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে শিক্ষকতাকেই জীবনের বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দরের পিতা আদর্শব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি পুত্রকে চাকরী গ্রহণ করিতে দেখিয়া অভিমানে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন। শ্যামসুন্দরের ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁহার জন্য জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র স্কুলগৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উহা আবদ্ধ হইয়া থাকিবে কিরূপে? তাই তিনি রাজনীতিক বাগ্মী ও সাংবাদিক রূপে দেশে লোকশিক্ষা ও জনমত-গঠনের গুরুভার বহন করিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী—সকল ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতরূপেও তাঁহার কতিত্ব অল্প ছিল না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করিয়াছিল। লেখক ও বাগ্মীরূপে তিনি এই পরাধীন জাতির মুক্তি-মন্ত্রের অগ্রদূতরূপে শ্রীঅরবিন্দের পার্শ্বচর হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 'প্রতিবাসী' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদনে—প্রকাশে তিনি প্রথমে তাঁহার শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। পরে ঐ পত্র বাঙ্গালা ও ইংরাজী 'People and the Pratibashi নামক পত্রে পরিণত হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীঅরবিন্দের সুপ্রসিদ্ধ 'বন্দে মাতরম্' পত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। সেই পত্রে তিনি যে সকল জ্ঞানগর্ভ উদ্দীপনাময় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এককালে অনেকে তাহা শ্রীঅরবিন্দের লেখা বলিয়া ভ্রম করিত। সে সকল প্রাণোন্মাদকর ওজস্বিনী রচনা যে কোন দেশে যে কোনও পতিত জাতির নিস্পন্দ প্রাণে জীবনের স্পন্দন আনয়ন করিতে পারে।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যখন 'সন্ধ্যার' মঙ্গল শঙ্খনিনাদে দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে আত্মনিবেদন করেন—পণ্ডিত শ্যামসুন্দরও সেই আহ্বানে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্লেষ-বিদ্রূপে দেশে এক জাগরণের সূচনা হইয়াছিল। পরে তিনি দেশনায়ক মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় যোগদান করেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রে অথবা তাঁহার নিজস্ব 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রেও তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এক সময়ে তিনি 'সার্ভ্যাণ্ট' পত্রকে আকুমারী হিমাচল ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত করিতে সমর্থ

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর

হইয়াছিলেন। তাহার পর 'নিউ সার্ভ্যাণ্ট' নামে এক পয়সার ইংরাজী দৈনিক প্রকাশ করিয়া স্বদেশসেবায় প্রবৃত্ত হন। পরিণত বয়সে তিনি ইংরাজী দৈনিক 'বসুমতীর' সম্পাদন-ভার বহন করিয়া জনসেবা করিয়া গিয়াছেন। উহার পর তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশের ও জাতির জন্য তিনি বহুবার দুঃখ-বিপদের কণ্টক-মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য দেশ-নায়কের সহিত স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন

এবং ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আর একবার তিনি কালিম্পংএ অন্তরীণ হইয়াছিলেন। 'সার্ভ্যান্ট' পত্র সম্পাদন কালে তিনি ৬ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনে তিনি একজন অগ্রণী নেতা ছিলেন। একবার তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট এবং পরে কিছুদিন বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অসহযোগ অভিযানে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মিরূপে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। শেষে মুসলমানগণের সহিত প্যাক্ট লইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত তাঁহার মত-বিরোধ হইলে তিনি দেশবন্ধুর নীতির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন এবং অসহযোগে অবিচলিত থাকেন।

একদিন দেশপ্রেম, দেশের জন্য ত্যাগস্বীকার, মূলনীতির মর্য্যাদারক্ষার্থে দুঃখ-দারিদ্র্য সাদরে বরণ—এই তেজঃপুঞ্জকলেবর পবিত্র ব্রাহ্মণসন্তানকে ভারতের সর্ব্বত্র সম্মানের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল। ভিন্ন প্রদেশের ধনকুবেরগণ তাঁহাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা অপরের পক্ষে সুদুর্ল্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্যামসুন্দর এ জীবনে অনেক শোকতাপ পাইয়াছেন, সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। শেষ বয়সে তিনি দারিদ্র্যের সহিত অনবরত সংগ্রাম করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজ তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে। আমরা তাঁহার বিয়োগে প্রিয়জন বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। [illegible] এই ধরায় আসিয়া তিনি জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার বড় সাধের শ্যামা জন্মদার মলিন মুখ প্রসন্ন দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু যতদিন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতির স্বদেশী যুগের এবং মুক্তি-যজ্ঞের ইতিহাস বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাহার সহিত তাঁহার নাম বিজড়িত হইয়া থাকিবে, ইহাই তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের ও বন্ধুবান্ধবের সান্ত্বনা!

দেশবাসীর শত উপেক্ষায় বিচলিত না হইয়া তিনি দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—তাঁহার সাধনার সিদ্ধি দেখিয়া যাইবার অবসর পাইলেন না।

সাহিত্যিকের লোকান্তর

গত ৯ই ভাদ্র দেওঘর-কুণ্ডুর আবাসভবনে সাহিত্য-সুহৃদ প্রবীণ সাহিত্যিক ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে কথা-সাহিত্যিক হিসাবে ফকীরচন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু ছোট গল্প ও উপন্যাস বাঙ্গালী সাহিত্যামোদীকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। 'মানসী' ও 'পুষ্পপাত্র' পত্রিকা সম্পাদনে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বজন ও বন্ধুবৎসল, মিষ্টভাষী, সদালাপী, বিনয়ী ফকীরচন্দ্রের হাস্যোজ্জ্বল সৌম্যমূর্ত্তি সকলকেই আনন্দিত করিত। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন যে, তাঁহাদের ন্যায় বহু সাহিত্যিক আজ ফকীরচন্দ্রের বিয়োগে আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছেন।

পরলোকে সুপ্রবীণ মুদ্রাকর ও প্রকাশক

গত ৩রা ভাদ্র বঙ্গবাসী পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক এবং বহু শাস্ত্রগ্রন্থের প্রবীণ মুদ্রাকর অরুণোদয় রায়ের ৮৩ বৎসর বয়সে দেহান্তর ঘটিয়াছে। আধুনিক যুগের তরুণ সাহিত্যিকগণের নিকট তাঁহার নাম পরিচিত না থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে 'বঙ্গবাসী' পত্রের রাজদ্রোহ মামলাকালে তাঁহার

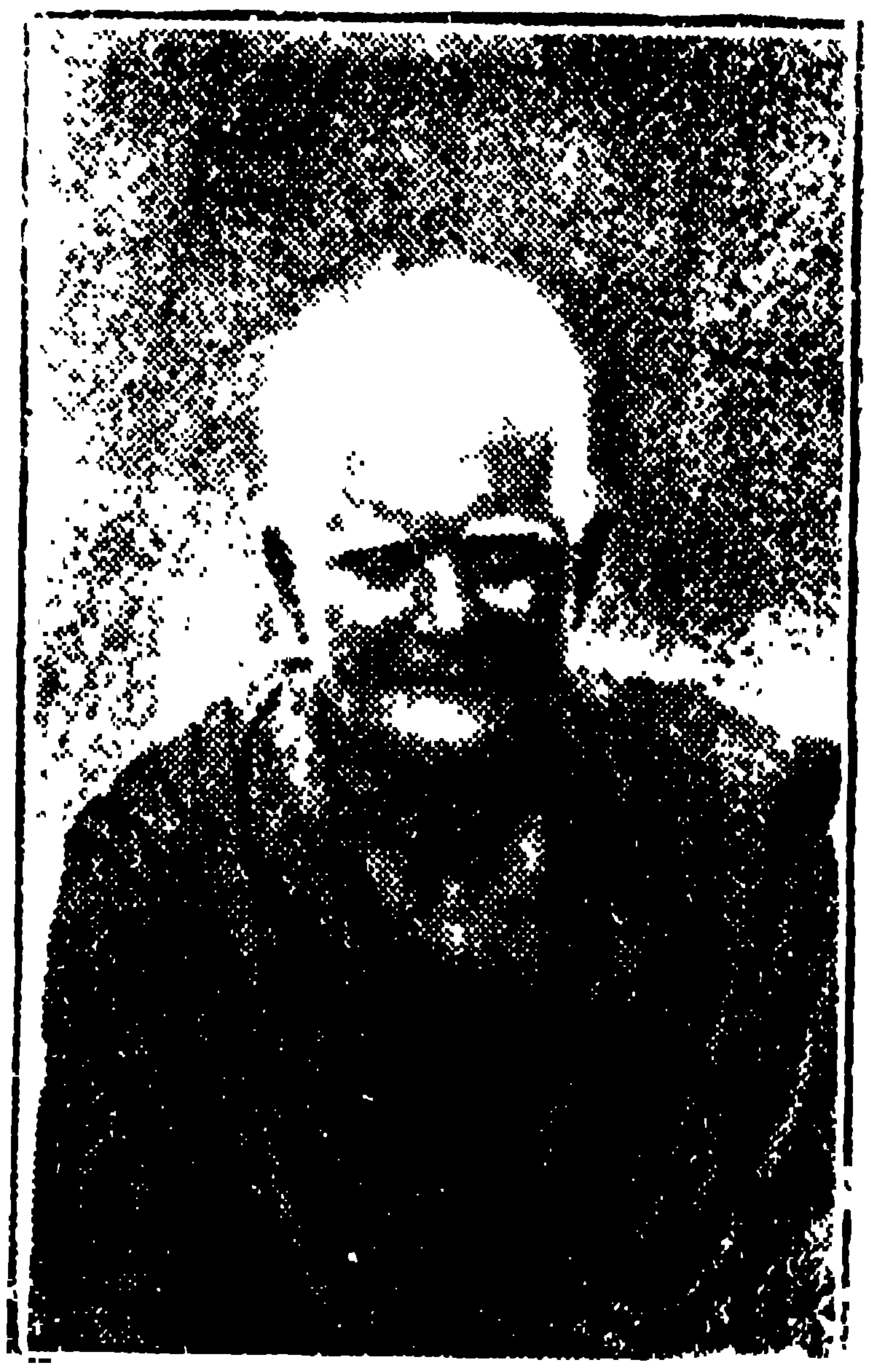

অরুণোদয় রায়

নাম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছিল। [illegible] পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় 'জন্মভূমি' পত্রে 'আমাদের ভক্তি' প্রবন্ধে তাঁহার নাম প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে আদর্শ ব্রাহ্মণ—সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ—পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছিল—অরুণোদয় রায় সেইসকল গ্রন্থ বিশেষ যত্নের সহিত মুদ্রণ করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থ-প্রারম্ভে মুদ্রিত তাঁহার নাম বাঙ্গালীর ঘরে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পরলোকে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল

গত ২৯শে শ্রাবণ পঞ্চনবতিবর্ষ বয়সে পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবোধের ফলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, দার্শনিক, নানাভাষাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞ ও আইনজ্ঞ পণ্ডিত অধুনা এ দেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষার প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলেন। মাত্র ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাওড়ার আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং পরে কিছুকাল হাইকোর্টেও ওকালতী করিয়াছিলেন। দেশপূজ্য পরলোকগত সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে রিপণ কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। আইন-কলেজেও তিনি হিন্দু আইন সম্বন্ধেও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বহু প্রবীণ উকীল, অধ্যাপক, ডাক্তার ও রাজপুরুষ ছাত্র জীবিত আছেন, এমন কি, পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এক দিন তাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্য প্রমুখ একাধিক সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থের তিনি সহজ সরল সংস্করণ করিয়া ছাত্রবর্গের প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় দার্শনিক পণ্ডিতের তিরোভাবে বঙ্গভাষাজননীর যে অভাব হইল, তাহা সামান্য নহে। তবে তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কারণ, তাঁহার ন্যায় দীর্ঘজীবী বাঙ্গালী অধুনা বিরল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তাঁহার সমসাময়িক, সুহৃদ, সুপ্রবীণ সদ্গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত তাঁহার সম্বন্ধে 'দৈনিক বসুমতীতে' লিখিয়াছেন,—

'অবোধবন্ধু' মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন, কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তী। আর তাহার সর্ব্বপ্রধান লেখক ছিলেন—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তাঁহারই প্রতিভার বিভিন্নমুখী বিকাশে অবোধবন্ধু নতনবেশে মণ্ডিত হইত। অবোধবন্ধু মাসিক পত্রেই কৃষ্ণকমলবাবু নূতন ধরণের বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিবার সূচনা করেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, সেই অভিনব বাঙ্গালা ভাষার সূচনা-পত্র অবোধবন্ধু-বক্ষেই নিবদ্ধ রহিয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষার সেই অভিনব আকারই ক্রমে 'বিদ্যাসাগরী ভাষার' পর উপন্যাস-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পূর্ণ পরিণতিলাভ করিয়া বর্ত্তমান প্রচলিত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই অভিনব বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা

পরলোকগত বৈদিক-সাহিত্যে সুপণ্ডিত মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও সুপ্রসিদ্ধ নির্ভীক সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং সার আশুতোষ সরস্বতীর স্বপ্ন-সৌধ এত দিনে যথার্থ দৃঢ়মূল বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর বড় আদরের বাঙ্গালা ভাষা-জননীর ন্যায্য প্রাপ্য আসন প্রদত্ত হইতে চলিল,—এ কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন সন্দেহ নাই।

গত ২৮শে শ্রাবণ শনিবার এই হেতু বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর একটি স্মরণীয় দিন হইয়া রহিল। ঐ দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী অনুমোদিত হইয়াছে। নিয়মাবলী রচনার্থে যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রস্তাবসমূহের সামান্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রস্তাব হইয়াছিল, ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষায় ৩০০ নম্বর থাকিবে। তন্মধ্যে ইংলণ্ডের ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

সেনেটে এই বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ্য হইতে ইংলণ্ডের ইতিহাসকে বাদ দিয়া উহার পরীক্ষার নম্বর ২৫০ করা হইবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ইংলণ্ডের ইতিহাস ও ভারতের ইতিহাসের প্রশ্নপত্রের ১০০ নম্বর ধার্য্য হইবে। ভূগোলের জন্য ৫০ নম্বর নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে,—বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সকল প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া চলিবে—কেবল ইংরাজী সাহিত্যের প্রশ্নপত্রের উত্তর ইংরাজীতে দিতে হইবে। সুতরাং ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা ইংরাজী ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে বাঙ্গালায় দিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষাই প্রধান বাহনের আসন প্রাপ্ত হইলেন। বাঙ্গালা সরকার এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেই আগামী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্যবস্থা বলবতী হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং পরীক্ষাদান বাঙ্গালীর মাতৃভাষার সাহায্যে সম্পাদিত হইবে, আমাদের আদরণীয়া পূজনীয়া বন্দনীয়া ভাষাজননীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরবের আসন দান করা হইবে,—এ আনন্দ, এ গর্ব্ব বাঙ্গালীমাত্রেই অনুভব করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমরা এখনও পূর্ণানন্দ—পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিতেছি না। যে দিন দেখিব, প্রতীচ্যের স্বাধীন জাতিসমূহের স্বদেশীয় ভাষায় শিক্ষাকার্য্য পরিচালনার ন্যায় আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও যাবতীয় পরীক্ষাকার্য্য কেবল বাঙ্গালা-ভাষার সাহায্যে সম্পাদিত হইতেছে, সেই দিনই আমরা পূর্ণ তৃপ্তি ও পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার অধিকারী হইব। 'বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?'—জননী জন্মভূমির প্রাণের স্পন্দন কি বিদেশীয় বিজাতীয় ভাষার মধ্য দিয়া অনুভূত হইতে পারে? জাতি কি আপনার ভাষা-জননীর স্নিগ্ধ শ্যামল ক্রোড়ে লালিত-পালিত না হইলে পরমুখাপেক্ষিতার দুর্ব্বল মনোবৃত্তি পরিহার করিতে সমর্থ হয়?

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মিলন-পূর্ণিমা

বসুমতী-চিত্রবিভাগ।

সচিত্র মাসিক বসুমতী

১১শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

দুর্গোৎসবে স্বপ্ন

মা, কে তুমি, মা বলিতেছি বটে, কিন্তু জানি না,—তুমি পিতা কি মাতা, পুত্র কি দুহিতা, সখী বা সখা,—না জানিলেও বড় তৃপ্তি পাই বলিয়াই ডাকিতেছি—মা, মা, মা দুর্গা !

শাস্ত্রের অর্থ গম্ভীর, অসংখ্য বিচারক—বিচারক দার্শনিকগণের জল্প-বিতণ্ডায় বুদ্ধি আচ্ছন্ন, শ্রোত্র বধির, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ধূলি-মুষ্টি-বর্ষণে নয়ন অন্ধ, কিছু বুঝিতে পারি না, শুনিতে পাই না, দেখিতে পাই না। তাই মা, আবার জিজ্ঞাসা করি—কে তুমি ? কি তুমি ?

আরও জিজ্ঞাসা করি,—মা, তুমি মৃন্ময়ী না চিন্ময়ী ? মা, শৈশবের পুণ্যস্মৃতি ভুলিতে পারি না,—তোমার ঐ চণ্ডীমণ্ডপ আলো-করা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য যে ব্যাকুলতা, যে স্তব্ধভাবে তোমার রূপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত সময় নিমেষের মত কাটিয়াছে—তাহা কি কেবলই বালকের অজ্ঞতাপ্রসূত ? না—তাহা সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত ?

মা, সে কাল গিয়াছে, কত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি বলিয়া অভিমানের পসরায় হৃদয় পূর্ণ করিয়াছি ; যৌবনে বালকের আকুলতা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়াছি, কিন্তু এই শেষ বয়সে শুধুই করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি—মা, কে তুমি ? কি তুমি ?

বেদ খুঁজিয়াছি, স্মৃতির সন্ধান করিয়াছি, দর্শনের অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছি—জানিতে পারি নাই—তুমি কে ? তুমি কি ?

তন্ত্র বলেন,—তুমিই কুলকুণ্ডলিনী, তদনুসারে যথাশক্তি ভাবিয়াছি,—অমৃতকরস্পর্শে—অলক্ষ্যে তপ্ত হৃদয়কে শীতল করিয়াছ বটে, কিন্তু বল নাই—কে তুমি এবং কি তুমি ?

মা, বৈষ্ণবের ভাগবত, শাক্তের চণ্ডী, শৈবের শৈবাগম, সবই যে মা অন্ধকার; তোমার কোটি-সূর্য্য-প্রখর কিরণে প্রতিহত মানবচক্ষুঃ সর্ব্বত্রই যে অন্ধকার দেখে,—মা, তাই তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, কৃপা করিয়া বল—কে তুমি—কি তুমি?

কখন যে কিছু দেখি নাই, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, তাহা কি তুমি? না, তুমি নও,—তুমি হইলে, হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া যাইত, সর্ব্বসংশয় দূর হইত; তাহা ত হয় নাই, তাই এখন বুঝিতেছি—জ্ঞানের অভিমান, সাধনার অভিমান, ভক্তির অভিমান যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা কেবলই মোহ, কেবলই অহঙ্কার, তাই করযোড়ে তোমারই চরণে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল—কে তুমি—কি তুমি?

মা, যতটুকু কৃপা তুমি করিয়াছ, ততটুকু বুঝিয়াছি, ততটুকু কৃপালাভে যে বঞ্চিত, সে তাহাও বুঝে নাই, সে যে ষট্‌চক্রের অস্তিত্বে বিশ্বাসই করে না; শববাবচ্ছেদে কৈ ঐ ষট্‌পদ্ম? মূলাধারের চতুর্দ্দল, স্বাধিষ্ঠানের ষড়্‌দল, মণিপূরের দশদল, অনাহতের দ্বাদশদল এবং বিশুদ্ধের ষোড়শদল ও আজ্ঞার দ্বিদল পদ্ম—কিছুই ত দেখা যায় না; কিছুই না—সবই কল্পনা!

কিন্তু ইহা কল্পনা নহে,—সত্য, মূলাধার—গুহ্যদেশ হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ছয়টি বায়ুচক্র বা বায়ুগ্রন্থি আছে, ইহারাই শরীরকে রাখিয়াছে, এই চক্র বায়ুর ঘূর্ণাবর্ত্ত। সেই আবর্ত্তের আকার চতুর্দ্দল ষড়্‌দল ইত্যাদি পদ্মবৎ, মৃত্যুকালে সেই চক্র বা বায়ুগ্রন্থির জটিলতায় শ্বাস উপস্থিত হয়; নাভিমণ্ডল—মণিপূরস্থান, নাভিশ্বাস যখন হয়, তখন মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানকে ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু দশদলের গ্রন্থিমুক্তি যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণই শ্বাস।

এখনকার বিজ্ঞান, শব্দের সহিত আলোকের সম্বন্ধ ধরিতে পারিয়াছে, বায়ুর সহিত শব্দের সম্বন্ধও অপরিজ্ঞাত নাই, কিন্তু বায়ুময় ষট্‌চক্রের সহিত সেই যে সূক্ষ্ম আলোক-সম্বন্ধ—সেই যে অব্যক্ত বর্ণসম্পাত, তাহা বিজ্ঞান এখনও ধরিতে না পারিলেও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না।

মা, তোমার অব্যক্ত কৃপায় ওটুকু বুঝিলেও—তোমায় ত বুঝি নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি—কে তুমি, কি তুমি?

ঋগ্বেদে দেখি,—অম্ভৃণ ঋষিকন্যা বাক্ বলিতেছেন,—'অহং রুদ্রেভিঃ' আমি রুদ্রাদির সহিত বিচরণ করি, আমিই মিত্রা-বরুণকে পালন করি—সেই অহং কি তুমি? জানি না মা, বুঝি না, বুঝাইয়া দেও।

চণ্ডীমণ্ডপে দেখিতেছি,—মৃন্ময়ী দশভুজা মূর্ত্তি, পার্শ্বে লক্ষ্মী-সরস্বতী, তৎপার্শ্বে গণেশ ও কার্ত্তিকেয়, পদতলে লেলিহানজিহ্ব সিংহ ও উদ্যতখড়্গ অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত মহিষাসুর। আবার শ্রুতি বলিতেছেন,—'অপাণিপাদো'...'অশব্দমস্পর্শ-মরূপমব্যয়ম্'—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কে তুমি এবং কি তুমি?

গণেশের দক্ষিণদিকে দেখিতেছি—নবপত্রিকা, কদলী-তরু প্রভৃতি নয়টি উদ্ভিদ্—ইহার স্নানপূজা—এ ব্যাপার কি? ইহা কি মা অসভ্যাবস্থার 'গাছ' পূজার নিদর্শন? অথবা তোমার সহিত ইহাদিগের কোন সম্বন্ধ আছে? বুঝি না মা,—তাই আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—কে তুমি—কি তুমি?

কোন কবির দৃষ্টিতে তুমি ভবিষ্যৎ ভারতের ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি, আশার ছলনা নহে, বাস্তবমূর্ত্তি,—কোন কবির দৃষ্টিতে তুমি ভারতেরই মানচিত্র। এ সব ভাবের কথায় মন ত' উঠে না, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—কে তুমি—কি তুমি?

মা, এ প্রতিমা কি গীতোপদেশে কুরুক্ষেত্র-চিত্র? তোমার এই দশভুজা মূর্ত্তি কি নর-নারায়ণের—শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের সম্মেলন? ইহাই কি "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ"? মা, তোমার বামপার্শ্বেই শ্রীপঞ্চমীর শ্রী—সরস্বতী, তাহার বামপার্শ্বে বিজয়-দেবতা দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। ইহারাই কি 'তত্র শ্রীর্বিজয়ঃ'? দক্ষিণপার্শ্বে লক্ষ্মীই কি 'ভূতিঃ'? তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে সিদ্ধিদাতা গণেশ—উনিই কি "ধ্রুবা নীতিঃ"? আর 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে'—ইহারই কি অভিব্যঞ্জক চিত্র সিংহ ও মহিষাসুর?

মা, অবোধ সন্তানের ধৃষ্টতা ক্ষমা কর, ইহার কোন মত নাই—কৃপা করিয়া তুমিই বল—কে তুমি—কি তুমি?

মা, তুমি ভাব না অভাব? তুমি জড় না চেতন? তুমি সদা চেতন না সাময়িক চেতন? তুমি অরূপ না সরূপ? তুমি স্ত্রী না পুরুষ? তুমি শক্তি না শক্তিমান্? তুমি মায়া না মায়ী? তুমি জীব না ঈশ্বর? এই আমার মূল প্রশ্ন

কত প্রকারে এই সকল প্রশ্ন করিতে লাগিলাম,—মৃন্ময়ী প্রতিমার দিকে চাহিয়া, কখন নিমীলিত-নয়নে হৃদয়ে মনকে প্রেরণ করিয়া প্রশ্ন করিলাম; কিন্তু উত্তর মিলিল না। আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম—ক্রমে মা'এর দয়া হইল। 'নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা' নিদ্রারূপে মা আমাকে অঙ্কে লইলেন। একটু পরেই স্বপ্নে—মা বলিলেন,—বৎস, শ্রুতিমুখে সবই ত বলিয়াছি, বুঝিতে পার নাই, শুন,—'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিবার পরে তাহাতে নির্বিণ্ন হইয়া সে অভিমান সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া বালক হইয়া থাকিতে যত্ন করিবে।

যে বাল্যের স্মৃতি লইয়া তুমি আক্ষেপ করিয়াছ,—সেই বাল্যকেই আশ্রয় করিয়া সেই ভাবে থাকিতে যত্ন কর,—মা আমি, বালক সন্তানকে উপেক্ষা করিতে পারি না। আমি কে এবং কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ? শুন—আমি সব, আমি ভাব, আমি অভাব, 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছান্দোগ্য০) 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত' (তৈত্তিরীয়০) আমি জড়, আমি চেতন 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে' (বৃহদা০) 'তদৈক্ষত' (ছান্দোগ্য০) আমি সদা চেতন 'ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বর্ত্ততে' (বৃহদা০) আমিই জীব—সুতরাং সাময়িক চেতন, সুষুপ্তি অবস্থায় অচেতন 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য' (ছান্দোগ্য০) আমি সরূপ এবং অরূপ 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, (শ্বেতাশ্ব০) 'অশব্দমস্পর্শমরূপম্' (কঠ০) আমি স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই 'ত্বং স্ত্রী—ত্বং পুমানসি' (শ্বেতাশ্ব০), আমি শক্তি, আমিই শক্তিমান্ 'দেবাত্মশক্তিং' এবং 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব' (শ্বেতাশ্বতর০), আমি মায়া এবং মায়ী 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' 'মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ' (শ্বেতাশ্ব০), আমি যে জীব, তাহা বলিয়াছি, আমিই ঈশ্বর 'এষ সর্ব্বেশ্বরঃ' (বৃহদা০)।

বৎস, এই সমস্ত উপনিষদের তত্ত্ব, ইহা ঋগ্বেদে ১০মং ১২৫ সূক্তে কথিত আছে। অম্ভৃণঋষি-দুহিতা বাক্ আমারই স্বরূপ—তাঁহার অহং আমিই, সেই যে বাক্, তাহার স্মরণার্থ এই বাগ্‌দেবী, আর 'অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ' দেব-মনুষ্য-সেবিত-বচনপ্রযোক্ত্রী বাগ্‌দেবতা আমি, তাই আমারই অংশভাবে আছেন, 'অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং' সেই ধনাধিদেবী লক্ষ্মী আমিই, তাই প্রতিমায় আমারই অংশভাবে বর্ত্তমান, পুত্র সিদ্ধিদাতা গণপতি এবং শক্তিধর কার্ত্তিকেয়, আমারই অনুগত, সিদ্ধি ও শক্তি আমার সাধকের সহজলভ্য।

উপনিষদের যিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি যে আমা হইতে অতিরিক্ত নহেন, তাহা বুঝিবে 'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা' আর 'পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা' বুঝিয়া নিশ্চয় করিও। আমি বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্ত্রী, দ্যাবাপৃথিবীর অতীত বৃহৎ পরিমাণ আমারই—ইহাই ঈশ্বরত্ব। ইহাতেই পিতৃত্ব মাতৃত্ব দুই ভাব আসিতে পারে। 'অহং সুবে' আমি যে প্রসূতি, তাই আমি মাতা,—'পিতাহমস্য জগতো মাতা' গীতার এই 'অহং' অপর কেহ নহে—আমি।

আমি স্বপ্নে দেখিতেছি, মৃন্ময়ীর মুখারবিন্দ স্মিত-প্রফুল্ল, নয়নে করুণার অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি;—বিস্ময়-বিমুগ্ধ-হৃদয়ে বলিলাম,—মা, অনেকটা বুঝিতেছি, কিন্তু দুর্গানাম কৈ? যাঁহার উৎসব বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর প্রাণের স্পন্দন, হৃদয়ের ধ্যান, বুদ্ধির সাধনা, সে নামের সহিত তোমার সম্বন্ধ জানিবার যে আমার প্রবল বাসনা, তাহা হয় ত' আমার প্রশ্নে তেমন ফুটে নাই—কিন্তু সেটুকু জানিবার জন্য আমার প্রাণের যে ব্যাকুলতা, তাহা ত' মা তোমার অবিদিত নাই।

মা বলিলেন, শুন বৎস, শুন,—বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা স্মরণ কর,—"সা বা এষা দেবতা দূর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ বা অস্মান্ মৃত্যুর্ভবতি সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্গময়াঞ্চকার।" প্রাণদেবতার নাম দূঃ, মৃত্যু তাঁহার নিকটে আসে না, যিনি ইহা জানেন, মৃত্যু তাঁহা হইতেও দূরে থাকে। সেই যে "দূঃ" দেবতা, তিনি অপর দেবতাদিগের মৃত্যু নিবারণ করিয়া দিগন্তে গমন করিলেন,—যিনি দূঃ এবং গা (দিগন্তগামিনী), তিনি দুর্গা—দুর্গাই যে দুর্গা। দেবতান্তরবিজয়ী অসুরগণ এই প্রাণদেবতার নিকট পরাজিত হয়,—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১ম অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণ—বেশ চিন্তা করিয়া দেখিবে।

বৎস,—উপনিষদের অসুরবিনাশিনী প্রাণ-দেবতা আমি দূঃ এবং দুর্গা হইয়া ঋষিগণের উচ্চারণে—নামে দুর্গা হইয়াছি।

মহাভারতের ভগবদ্গীতা-পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—'পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয় ।' (ভীষ্ম ২৩ অঃ) সেই দুর্গাস্তোত্রমধ্যে আমি বেদমাতা গায়ত্রী এবং "তথা বেদান্ত উচ্যতে।" আমার কথাই যে বেদান্তে আছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে।

বৎস, আমার সেই দুর্গা নামের প্রথম অধিকারিণী—আমার প্রাণদেবতামূর্ত্তি, কদলীতরু প্রভৃতি উদ্ভিজ্জকে আশ্রয় করিয়াও আছে, সেই উদ্ভিজ্জসমূহের সহায়তায় অন্যত্র প্রাণ-শক্তির প্রসার ঘটিয়া থাকে। ক্ষুধায় অন্ন, রোগে ঔষধ, অবসাদে বল—ঐ সকল উদ্ভিজ্জ হইতে মনুষ্য লাভ করিয়া থাকে—ইহা প্রাণদেবতার দান। নবপত্রিকা অসভ্যের দেবতা নহে,—উপনিষদুক্ত প্রাণদেবতার উৎকৃষ্ট প্রতীক, সেই প্রতীকে এবং প্রতিমায় আমার উপাসনা। মাতৃভাবে সেই উপাসনার দিগ্‌দর্শন উপনিষদে আছে—'প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্' 'মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ ধেহি নঃ' (প্রশ্নোপ০ ২য় খণ্ড)। বৎস, আমি মাতা, তোমরা পুত্র, আর তোমাদিগের প্রার্থিত শ্রী ও প্রজ্ঞা—লক্ষ্মী ও সরস্বতী আমারই স্বরূপ, আমারই পার্শ্বে, তোমার সম্মুখে—এই তোমার প্রশ্নের উত্তর। বৎস, আমার প্রথম কথা বিশেষভাবে মনে রাখিও—'পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ'।

কল্পারম্ভ-প্রভাতের বাদ্যধ্বনিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল,—দিব্য সৌরভে চণ্ডীমণ্ডপ আমোদিত,—আমার মন প্রসন্ন—আমার কর্ণপটহে তখনও 'পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ'—এই অমৃতময়ী বাণী প্রতিধ্বনিত।

আমি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলাম—মা, ধিক্ পাণ্ডিত্যে আজ হইতে। যেন অনন্যশরণ হইয়া বালক যেমন জননীতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে,—তাহার যতটুকু অভাব, আকাঙ্ক্ষা, যতটুকু সুখ-শান্তি, যতটুকু হাসি-কান্না, সবই তাহার জননীতে পর্য্যবসিত, সেইরূপ বাল্যভাবে জগজ্জননী তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতে যেন সমর্থ হই।

ভাবিলাম, ধন্য শাস্ত্র, ধন্য পূর্ব্বপুরুষ, যাঁহারা এই বাল্য-ভাবে সেই 'প্রাণস্য প্রাণম্' প্রাণদেবতাকে দুর্গানামে ডাকিয়া, 'মা' সম্বোধন করিয়া বাঙ্গালার দুর্গোৎসবসাধনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মা'এর কাছে বালকের আবদারের মত জগজ্জননীর চরণে 'রূপং দেহি জয়ং দেহি' ইত্যাদি অর্গলমন্ত্র স্মরণে বাল্যভাবের পবিত্রতা হৃদয়ে লইয়া বলিলাম,—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥'

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম,—

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

ব্যোমমণ্ডলে অনাহত নির্ঘোষ হইল,—

'লোকস্য দ্বারমর্চ্চিমৎ পবিত্রং
জ্যোতিষ্মদ্ ভ্রাজমানং মহস্বৎ।
অমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানং
চরণং নো লোকে সুধিতান্ দধাতু॥'

সবিস্ময়ে দেখিলাম—প্রতিমা-চরণে সচন্দন জবাপুষ্পদল অলক্ষ্যহস্তে অর্পিত হইল।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

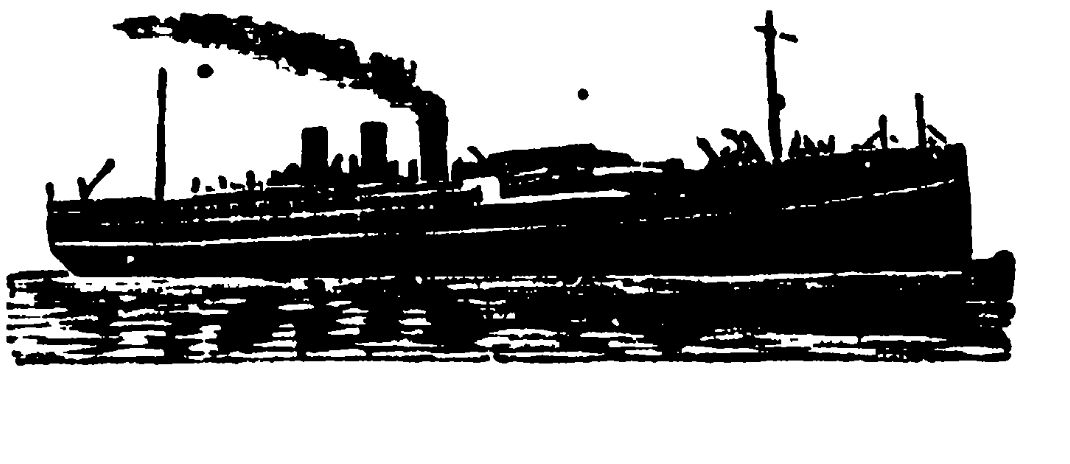

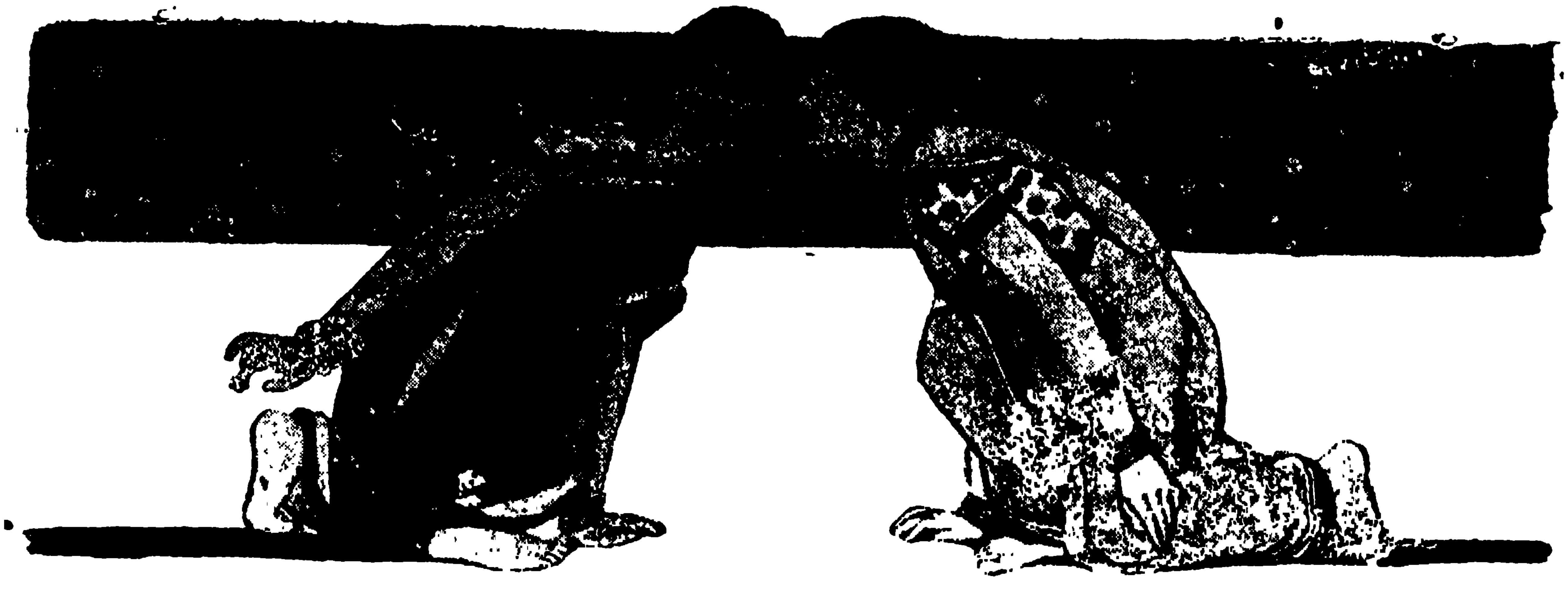

স্পর্শের প্রভাব

১২

শ্যামবাজারে রণেন্দ্রের বাসাবাড়ীতে তেমন আর মজলিস বসে না। গৃহস্বামী অনুপস্থিত, কাযেই বন্ধুবান্ধবের তেমন সমাগমও আর নাই। পাড়ার আখড়াও যাহার যত্নে বড় হইয়াছিল, তাহার অভাবে ক্রমে উঠিয়া যাইবার দশায় উপনীত হইয়াছে। রণেন্দ্রের ভৃত্য-পরিজন বাসাবাড়ীতে সবই আছে, কিন্তু হুকুম করিবার কেহ নাই। ক্বচিৎ কখনও দুই এক জন বন্ধুবান্ধব গৃহস্বামীর সন্ধানে আসিলে বৈঠকখানার ঘরের দ্বার, গবাক্ষ উন্মুক্ত হয়, হয় ত আলো জ্বলে, পাখা চলে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। যেমন প্রাণ ছাড়িয়া গেলে দেহ সাড়া দেয় না, তেমনই রণেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে গৃহখানি যেন লোকের ডাকে সাড়া দিত না। আখড়ার দ্বার বন্ধই থাকে, তবে রণেন্দ্র একবারে জমীর এক বৎসরের অগ্রিম ভাড়া দিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া উহা আখড়ারই অধিকারে ছিল।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভবেশচন্দ্র রণেন্দ্রের সন্ধানে আসিয়া তাহার বাসাবাড়ী হইতে বিষণ্ণমুখে ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল, খালের দিক হইতে তারকনাথ বাসায় ফিরিতেছে। সে তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কি হে ছোকরা, তোমায় যে আর দেখতেই পাই না হে, একবারে ডুমুরের ফুল—"

তারক ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিল, "আমরা গরীব-গুরবো লোক মশাই, আপনারা আমাদের না দেখলেই ভাল।" সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ভবেশ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "বল কি, তারক? তুমি ত এমন মেজাজের ছিলে না—বলি, হ'ল কি? রণা তোমায় বাসায় এনে চিকিৎসা-সেবা ক'রে বাঁচিয়ে দিলে। তুমি আবার বড়লোকের নিন্দে করছ? ছি!"

তারকের মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। সে কাতরস্বরে বলিল, "সে কথা ত কখনও অস্বীকার করি নি। রণেন বাবু যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু—"

ভবেশ বলিল, "কিন্তু কি? ওঃ, তখন তোমাতে আর ওতে কি গলাগলি ভাব—সে ত কম দিনের কথা নয়, বছর ঘুরে যেতে চললো। তার পর কি যে হ'ল—তুমিও আখড়া ছাড়লে, সেও বাড়ীঘর ছাড়লে—কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল।"

তারক অশান্তি বোধ করিয়া বলিল, "সরুন মশাই, রাত হয়ে গেল, মা একলা রয়েছে ঘরে।"

ভবেশ বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, ভাল কথা, তোমাদের বাড়ীর সে ব্যাপারটার কি হ'ল? কোন খোঁজ-টোঁজ পেলে?"

তারক মুখ-চক্ষু আগুন করিয়া বলিল, "আপনারাই ত বেশী জানেন সে কথা। সেই জন্যেই ত এ পাড়ায় এখনও আছি—নইলে—"

ভবেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমরা বেশী জানি? তার মানে? ভাই মারা গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। সেই গুপে গুণ্ডাটাও ত বেশ ছাতি ফুলিয়ে যাওয়া আসা করছে এখনও। অথচ—অথচ—"

তারক বলিল, "অথচ—অথচ কি? গুপীনাথ কাযটা করেছে—এটা ঠিক, কিন্তু কার জন্যে সেটা জানেন কি?"

ভবেশ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি বলছ,

তারক, কিছুই ত বুঝতে পারছি না। এ সব হেঁয়ালি রেখে সোজা কথা বল দিকি। এ পাড়ায় রয়েছ কার উপর রাগ দেখাতে বল ত?"

উভয়ে পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া তখন তারকদের বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। হঠাৎ তারক বলিল, "আসুন বাড়ীর ভেতরে, সব দেখাচ্ছি আপনাকে।"

উভয়ে তারকের বাসায় প্রবেশ করিল। তারক ভবেশকে লইয়া তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ভবেশ সত্যই অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিল। ব্যাপার কি? টিনের তোরঙ্গ খুলিয়া তারক একখানা পত্র বাহির করিল। ভবেশের হস্তে পত্রখানি দিয়া বলিল, "পড়ুন।"

ভবেশ পত্র পাঠ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। পত্রের হস্তাক্ষর রণেন্দ্রের, তাহা মাত্র একটি ছত্র দেখিয়া বুঝিল। পত্রের ছাপ কাশীর বাঙ্গালীটোলার। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—ঠিকানা কিছুই নাই। পত্রের কথা এই ঃ—

"অনেক কষ্টে খুঁজে বার করেছি কাল। কার সঙ্গে এসেছে, কবে এসেছে এখানে, কোথায় ছিল তার আগে, কিছুই বলতে চায় না। বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও বলে, যাবে না। জোর ক'রে নিয়ে গেলে আবার পালিয়ে আসবে। আগের চিঠিতে তোমায় জানিয়েছিলুম, গুপীনাথকে হঠাৎ দশাশ্বমেধের বাজারে ধ'রে ফেলে ভয় দেখিয়ে টাকা খাইয়ে পেটের কথা বার ক'রে নিয়েছিলুম। সে বলেছিল, তোমার বৌদি তাকে কাশী পৌছে দেবার কথা ব'লে অনেক দিন ধ'রে অনুরোধ করেছিল, টাকাও দিয়েছিল। এক দিন সে নেশার ঝোঁকে তাকে নিয়ে কাশীতে এসে পাণ্ডার বাড়ী উঠেছিল। সে দিন রাতেই সে আরতি দেখতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। গুপে ঢের খুঁজেছিল তাকে, কিন্তু সন্ধান পায় নি। সে শপথ ক'রে বলেছে, এ ছাড়া সে কিছুই জানে না। হাতে যা সামান্য পুঁজি ছিল, তাইতেই ক'দিন কাটিয়েছে, পরে জয়নারায়ণ স্কুলে সামান্য ১০৲ টাকা মাইনের ড্রিল মাষ্টারী করে। আমার পায় ধ'রে কাঁদতে কাটতে লাগলো—তাকে খরচা দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তার সব কথা সত্যি নয়। তা হ'লে কাশী আসবার আগে এত দিন কোথায় ছিল, তা বলে না কেন? যা হোক, কলকাতায় ফিরে এর কিনারা করবো। তার পর প্রায় মাসখানেকের ওপর তোলপাড় ক'রে খোঁজবার পর তার পাত্তা পেয়েছি কিন্তু কিছুতেই ফিরে যেতে চাইছে না। পুলিসের গোলমালে যেতে চাইনে, তাই কিছু করতে পারছি নে। নিয়ে কিন্তু যাবই। তুমি দু' চার দিন কলে ছুটী পাও না? তুমি এলে ভাল হ'ত। আশা করি, তোমরা ভাল আছ। ইতি রণেন্দ্র।"

ভবেশ পাঠান্তে বলিল, "ওঃ, তাই এতদিন উধাও! তা, এ ত ভাল কাযই করেছে। রণা তোমাদের অনিষ্ট করেছে, এই ভাবের ইঙ্গিতই যেন করছিলে তুমি; কিন্তু এতে অনিষ্টের কোন কথা ত নেই।"

তারক আর একখানি পত্র বাহির করিয়া ভবেশকে পড়িতে দিল। হস্তাক্ষর অপরিচিত, অতি কদর্য্য, বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ। স্বাক্ষর রহিয়াছে গুপীনাথ শাহা—সাং বাঙ্গালীটোলা কাশী। পত্র বহুদিন পূর্ব্বের। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—তারকের বউদিদি শাশুড়ীর উপর রাগ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়াছিল। পাড়ারই কোন স্ত্রীলোক—নাপিতানী বা ধোপানী এই রকম কিছু হইবে—এ জন্য পাড়ার কোন বড়লোকের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিত। সে রণেন বাবু। সবই ঠিকঠাক ছিল, কেবল সে অর্থাৎ গুপীনাথ নিমিত্ত মাত্র। সে কাশী পৌছাইয়া দিবার দিনই তাহার বৌদি পলাইয়া রণেন বাবুর কাছে যায়। সেখান হইতে রণেন বাবু তাহাকে লইয়া হিল্লী-দিল্লী ঘুরিয়া বেড়াইয়া কাশী ফিরিয়াছে। কিন্তু কিছুই স্বীকার করে না। বলে, কিছুই জানে না, আবার তাহার (গুপীনাথের) উপর উল্টা চাপ দেয়। অথচ সে বিশ্বনাথের শপথ করিয়া বলিতেছে, কাশী পৌছানর পরদিন হইতে সে তাহার বৌদির কোন খবর রাখে না। মিথ্যা কি সত্য, তাহা সে কাশীর বটুক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে।

ভবেশ চিঠিখানা পাঠ করিয়া ক্ষণেক নাড়াচাড়া করিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "তারক, তোমার মা কি করছেন? তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলবো।"

তারক বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন বাবু, মা বোধ হয় জপে বসেছে। মা, ও মা! হাঁ, তাই, তা এখুনি আমায় ভাত দিতে আসবে'খন। কেন, কি দরকার?"

ভবেশ বলিল, "থাক, আর এক দিন এসে তখন দেখা করবো। তারক, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, ধূর্ত্ত ধড়িবাজ লোকের বদমাইসি বোঝবার তোমার এখনও ঢের দেরী। এ সব কথা তোমার মাকেই বলবো এসে কাল।"

ভবেশ উঠিয়া পড়িল। কিন্তু তারক বাধা দিয়া বলিল, "বিশ্বেস হ'ল না, বাবু? ভাবছেন, ছোঁড়াটা কলে দিন-মজুরী করে, আকাট মুখ্যু, ওকে ঐ গুপে গুণ্ডা দমপটি দিয়েছে? না বাবু, তা নয়। বসুন এইখেনে আর একটু, আর একখানা চিঠি দেখাচ্ছি।"

কথাটা বলিতে বলিতে তারক আর একখানা পত্র বাহির করিয়া ভবেশের হস্তে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া যাইতে লাগিল,—"নইলে যে রণেন বাবু আমায় যমের মুখ হতে ফিরিয়ে এনেছেন, তাঁর উপর সন্দেহ করি? দেখুন না প'ড়ে। ছোট ভাইএর মত কোলে তুলে রোগে সেবা করেছেন, মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু তাঁর যে বাইরেটা ভাল, ভেতরটা বিষ, তা কি ভুলেও কখন মনে করেছি?"

ভবেশ পত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইল। পত্র লিখিতেছে, তারকের ভ্রাতৃজায়া গুপীনাথকে বটুক পাণ্ডার কালভৈরবের গলির ঠিকানায়। পত্রখানা এই:—"অনর্থক আমার খোঁজ ক'রে কাশী ব'সে থেকো না, আমায় খুঁজে পাবে না। আমি যার আশ্রয়ে আছি, তিনি বড়লোক, আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। যার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল, যে তোমায় অপমান করেছিল বলেছিলে। আগে থাকতে আমাদের বন্দোবস্ত হয়েছিল—তোমায় কেবল উপলক্ষ ক'রে কাশী এসেছিলাম। কিছু টাকা মণি-অর্ডারে তোমার ঠিকানায় পাঠাচ্ছি, পেলে কলকাতায় ফিরে যেয়ো। ইতি, তরলা।"

তারকনাথ কি বলিতেছিল, সে দিকে ভবেশের আদৌ দৃষ্টি ছিল না, সে তখন ভাবিতেছিল, জগতে মানুষ চিনিয়া লওয়ার মত কঠিন কায আর কিছু আছে কি না?

সেই দিন ভবেশ বাসায় ফিরিয়া চাঁপাপুকুরে কালীনাথকে লিখিল, "কালীদা, রণেনের সন্ধান পেইছি, সে কাশীতে আছে। কাশীতে কোথায় থাকে, তোমরা নিশ্চয় জানো। তুমি, করালীচরণ, ম্যানেজার বাবু বা সনাতন, কেউ না কেউ কাশীর বাড়ীর ঠিকানা জান না, এ হতেই পারে না। তাই বলছি, যে অবস্থায় থাক, তোমরা যে কেউ কাশী চ'লে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আন। আনতেই হবে, বিশেষ দরকার।"

এই পত্র কালীনাথের উন্নতির পথে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিল, পরে জানা যাইবে।

১৩

"এ্যাঁ, বলেন কি? রণেন বাবু?" সেক্রেটারী বিনয় বাবু প্রশ্ন করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে আগ্রহভরে বাবু শীতলপ্রসাদের মুখের দিকে উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বিনয় বাবু বেনারস বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী বা সম্পাদক, বাবু শীতলপ্রসাদ রাজঘাটের কংগ্রেস কমিটীর অন্যতম সদস্য। শীতলপ্রসাদ বলিলেন, "কলকাতার বাগবাজার থেকে যে বাবু এসেছেন, তিনিই ত বলছেন এ কথা।"

"তাঁর কথা যে সত্য, তার প্রমাণ কি? ঘর ভাঙ্গাবার চতুর লোকের অভাব আজকাল নেই, তা জানেন কি?"

"এঁর কাছে যে উত্তর-কলকাতা কংগ্রেসের মার্কা দেওয়া পরিচয়পত্র আছে।"

"বটে? তা ইনি কি খবর এনেছেন?"

"ইনি বলছেন, রণেন বাবু গুপ্তচর—ওঁর স্বভাব-চরিত্তিরও ভাল নয়। উনি না কি কলকাতা থেকে একটি গেরস্তর বউকে বার ক'রে নিয়ে এসেছেন।"

"তা যেন বুঝলুম। কিন্তু তাঁর ত পয়সার অভাব নেই, বড় লোক শুনেছি। তিনি এ কাযে ঢুকবেন কেন? ধরুন না, আমাদের কংগ্রেস কমিটীতে ত হাত লাগাত পাঁচ ছ'শ' টাকা দিয়েছেন, তা ছাড়া কংগ্রেস অফিসের জন্যে পাকাপাকি একখানা বাড়ীই দিবেন বলেছেন। উনি কি দুঃখে—"

শীতলপ্রসাদ তাঁহার কথা শেষ হইতে না দিয়াই বলিলেন, "আমরাও ত তাই বলছি, ওঁর অভাব কিসের? সে দিন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে হাজার টাকা দান করেছেন, আমাদের কোয়ার্টারের হাসপাতালের কলেরা ওয়ার্ডের চাঁদার খাতায় ওঁর নামে দেখলুম হাজার টাকা ফেলা রয়েছে।"

"তবে? তবে কি ক'রে বলা যায়, তিনি আর কিছু। রাম! ও আপনারা ভুল সংবাদ পেয়েছেন।"

"তাই হোক্, সংবাদ ভুল হ'লে আমরা যত সুখী হব, বোধ হয়, এত আর কেউ হবে না। রণেন্দ্র বাবু যথার্থই আমাদের বেনারসের কংগ্রেসে নূতন জীবন সঞ্চার করেছেন। যেমন বলতে কইতে, তেমনি লিখতে পড়তে, তার উপর দরকার হ'লে এমন ক'রে দরাজ হাতে কে দান করে বলুন ত? তবে কি জানেন, কলকাতার লোকটি বলছেন, টাকাটা কিন্তু অন্য পক্ষ যোগাচ্ছে।"

বিনয় বাবু তাচ্ছীল্যভরে বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমিও যেমন——কিছু না, কিছু না—"

শীতলপ্রসাদ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিদায়-গ্রহণের সময় বলিলেন, "তাই যেন হয়। এমন বন্ধু কিন্তু বেনারস কংগ্রেস কখনও পাবে না। কি বলেন? বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দী—সবতাতেই অনর্গল বক্তৃতা ক'রে যেতে পারেন এমন ক'জন? থাক্, চললুম, আমাদের সেক্রেটারী মশাই জানাতে বলেছেন, তাই এসেছিলুম, যা ভাল বোঝেন, করবেন।"

শীতলপ্রসাদ বিদায় গ্রহণ করিবার পর বিনয় বাবু কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের কয় জন সদস্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমটা বিনয় বাবুর সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। হঠাৎ তিনি শুনিলেন, তাঁহারই সহকারী রমানাথ বলিতেছেন, "দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে গেলুম!—রণেন বাবু! আমার চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

বিনয় বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রণেন বাবু? কি করেছেন তিনি?"

রমানাথের সঙ্গে আরও দুই চারি জন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কায যা করেছেন, তা খুব নোংরা বলেই মনে হচ্ছে—তবে—"

বিনয় বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "রমানাথই একলা বলুক, ব্যাপারখানা কি?"

রমানাথ যাহা বলিল, তাহার ভাবটা এই যে, সে একাধিক দিন রণেন বাবুকে এয়োর বটতলার একটা বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে—বাড়ীটার সুনাম নেই। পাড়ার কৃষ্ণ ময়রা এ কথা বলিয়াছে। তাহা ছাড়া নিবারণ ভট্টাচার্য্যও বলিয়াছে, ভিতরে কিছু গোলমাল আছে, না হইলে অল্পবয়সের একটি মেয়েমানুষ একলা ঐ বাড়ীটাতে থাকে, অভিভাবক কেহই নাই। রণেন বাবুর ওখানে যাওয়া-আসা যেন কেমন কেমন মনে হয়!

বিনয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নিজে দেখেছো ঐ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতে—রণেন বাবুকে?"

"কোথায় আমাকে কে যেতে দেখেছে, বিনয় বাবু?" যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা হইতেছিল, সেই রণেন্দ্রনাথ স্বয়ংই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে সকলের দিকে চাহিয়া রহিল। কক্ষমধ্যে যে একটা দারুণ অস্বস্তির ভাব দেখা দিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

কক্ষের বিকট নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রণেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এই মুহূর্ত্তে আমার কথাই কইছিলেন বোধ হলো। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি বিনয় বাবু, আমার অসাক্ষাতে আমার সম্বন্ধে কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা হচ্ছিল কি না?"

বিনয় বাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "অপ্রীতিকর কায করলে অবশ্যই সে সম্বন্ধে অপ্রীতিকর আলোচনা হ'তে পারে।"

রণেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু সে আলোচনা অপরাধীর সামনে হলেই ভাল হয় না? অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে?"

বিনয় বাবু বলিলেন, "এর ভেতরে লুকোচুরির কিছুই নেই। আজ না হোক, কাল বা দু'দিন পরে আপনার সামনেই এ বিষয়ে আলোচনা হ'ত। যাক্, ভালই হয়েছে, আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন! আপনার সঙ্গে উত্তর-কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পর্ক কি?"

রণেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "সে বিষয়ে কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য, এ কথা আমি মনে করি নে। তবে আপনি যদি ভদ্রভাবে, বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তা হ'লে বলি, এখানে আপনাদের কংগ্রেসের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, সেখানেও তাই ছিল, তবে সেখানকার চেয়ে এখানে কায একটু বেড়েছে—এখানে আপনাদের প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা ক'রে বেড়াতে হচ্ছে।"

"সেখান থেকে আপনার ক্রেডেনশ্যাল কিছু আনাতে পারেন?"

"এত দিন যা দরকার হয় নি, আজ হঠাৎ তা হচ্ছে কেন ?"

"কারণ উপস্থিত হয়েছে বলেই বলছি। থাক্, এয়োর বটতলার একটা বাড়ীর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ?"

রণেন্দ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "আমার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে আপনাদের কোন সম্বন্ধ নেই, ও বিষয়ে আমি কোন পরিচয় দিতে চাই নি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে ?"

বিনয় বাবু কিঞ্চিৎ নরম সুরে বলিলেন, "দেখুন রণেন বাবু, আপনার উপর আমাদের শ্রদ্ধা আছে বলেই এ সব কথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি। জানি, আপনি নির্দ্দোষ। তবুও সন্দেহের কথা যখন উঠেছে, তখন এ বিষয়ে একটা পরিষ্কার মীমাংসা হয়ে যাওয়া ভাল। মহাত্মার উপদেশ জানেন ত, সত্যাগ্রহীদের নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হওয়া প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন।"

রণেন্দ্রও নরম হইয়া বলিল, "যখন এ ভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, তখন আমার কথায় বিশ্বাস করুন, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি কাশীতে আছি, সেই জন্য ঐ বাড়ীতে আমায় যাতায়াত করতে হয়। এর বেশী আপনাকে কিছু বলতে পারবো না।"

বিনয় বাবু বলিলেন, "দেখুন, শুনেছি, একটি তরুণী একলা ঐ বাড়ীতে থাকেন—"

রণেন্দ্র অধীর হইয়া বলিল, "বস্, ঐ পর্য্যন্ত। এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলবো না। বলেই-ছি ত, এতে আপনারা আমায় যে ভাবে বুঝতে ইচ্ছে করেন, বুঝুন। অবশ্য আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লে খুবই দুঃখিত হব, কিন্তু উপায় নেই। কংগ্রেস যে লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তা জানা ছিল না। বোধ হয়, এর পর থেকে আমার উপস্থিতি আপনাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হবে। তার দরকার নেই, আমি আপনিই এ বিষয়ে সতর্ক হয়ে চলবো।"

রণেন্দ্র গৃহত্যাগের জন্য দুই পদ অগ্রসর হইল। বিনয় বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "রণেন বাবু, আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন। আমাদের দোষ কি বলুন ? আপনার উপর আমাদের এত বিশ্বাস আছে বলেই ত এ অপবাদের প্রতিবাদ আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছি।"

রণেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এত দিন আমার সঙ্গে ব্যবহার করেও যখন আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারলেন না আপনারা, তখন সাক্ষ্য-প্রমাণ দিলেও যে রাখতে পারবেন, তা ত মনে হচ্ছে না।" সে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল।

সকলে ক্ষণকাল নীরবে তাহার যাত্রাপথের দিকে সন্নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। তাহার পর বিনয় বাবু বলিলেন, "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, রণেন্দ্র বাবু অপরাধী। যা হোক, এ বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। দুঃখ এই, বেনারস কংগ্রেসের অঙ্গ থেকে একটা উজ্জ্বল রত্ন চ'লে গেল। কিন্তু কি করবো, আমরা নিরুপায়, জেনে-শুনে ত অন্যায়ের প্রশ্রয় আমরা দিতে পারি না।"

রমানাথ বলিলেন, "একবার খোঁজ ক'রে দেখলে হতো না ?"

বিনয় বাবু বলিলেন, "তুমিই ত বলছো, নিজে দেখে এসেছ—তবে—"

রমানাথ বলিলেন, "আমার ত ভুল হ'তে পারে।"

বিনয় বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, সে তখন করা যাবে, এখন চলুন সবাই, আজ চৌকে যাবার উদ্যোগ করি গে যাই।"

সকলে স্থান ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সকলেরই মনটা অসম্ভব ভারী হইয়া রহিল।

১৪

জ্যোৎস্না কি করিবে ? অন্ধকারে সে ত পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। এমন জটিল সমস্যা কাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষতঃ তাহার মত বয়সে ? সমস্ত পৃথিবীই কি যোগাযোগ করিয়া তাহাকে কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছে ? সে পিতৃ-আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করে নাই, অবিচারিতচিত্তে সে সেই আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছে। তবে এবার তাহার বিবেক তাহার মনের মধ্যে সংশয়ের ছায়াপাত করিতেছে কেন ?

মুষ্টিবদ্ধ নূতন পত্রখানির কথাই সে ভাবিতেছিল। আর একখানি পত্রের সহিত ইহার কত প্রভেদ? কোন্‌টা সত্য? মানুষ কি এত বিশ্রী? এত খল, এত কপট? শ্বশুরকুল যত অন্যায়ই আচরণ করুক, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে স্বামী কোন অপরাধ করিয়াছে,—এমন প্রমাণ এত দিন কেহ ত দিতে পারে নাই। কিন্তু, কিন্তু এই পত্র?

জ্যোৎস্না চঞ্চলচরণে কক্ষমধ্যে দুই চারিবার পাদচারণা করিয়া বেড়াইল। এ পত্রে যাহা আছে, তাহা কি সত্য? পূর্ব্বপত্রে যে তাহার মনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সমস্ত অন্তরটা দেখাইয়া দিয়াছিল, যে তাহার পত্নীত্বের দাবিত্বের নিকটে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া দয়াভিক্ষা করিয়াছিল,—না দয়া নহে, ন্যায়বিচার চাহিয়াছিল, সে কি এই পত্রে বর্ণিত বিশ্বাসহন্তা চরিত্রহীনের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে?

জ্যোৎস্না অস্থির হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে সমস্ত কক্ষটার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মত বেড়াইতে লাগিল। বাহিরে দ্বিপ্রহরের কঠোর রৌদ্রতাপে সমস্ত পৃথিবীটা যেন কাতর, অবসন্ন হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছিল। আম্রশাখায় উপবিষ্ট একটা বায়স পত্রান্তরাল হইতে কর্কশস্বরে মধ্যাহ্নের বিরাট অপরিমেয় স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। একটা পল্লী-কুকুর আবর্জ্জনাস্তূপের ভস্মরাশির মধ্যে অর্দ্ধশায়িত হইয়া হাঁপাইতেছিল।

জ্যোৎস্না সূর্য্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে চাহিয়া থমকিয়া গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। এত আলো—এত বাতাস ত তাহার দেহে ভাল লাগিতেছিল না। কক্ষ নির্জ্জন, কিন্তু বাহিরের জগৎ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া হাসিতেছিল। জ্যোৎস্না দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া সমীপস্থ আসনের উপর বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে পত্রখানি মুষ্টিমধ্য হইতে উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে লাগিল। পত্রখানি এইরূপ :—

শ্রীদুর্গা শরণম্‌

দশাশ্বমেধ ঘাট
কাশী

গুপীনাথ বাবু,

তোমায় না জানিয়ে ত চ'লে এসেছি। আগেই তা ঠিক ক'রে রেখেছিলুম। তুমি উপলক্ষ, একটা আশ্রয় না পেলে কুলের বার হতে পারতুম না। আমাদের পাড়ার যিনি রাজা, তাঁর সঙ্গে আগে হতেই সমস্ত ঠিকঠাক ছিল; কে তিনি, তুমিও জান। আমাদের বাসার কাছেই তাঁর কুস্তীর আখড়া ছিল, আর বাসার ঠিক দক্ষিণ গায়েই তাঁর আস্তাবোলও তুমি দেখেছ। নামটা নাই করলুম। আমি কাশী পৌছেই তাঁর বন্দোবস্তমত পাণ্ডার ওখান থেকে এখানে এসে উঠেছি। কোথায়, তা তোমার জেনে কায নেই। আমার খোঁজ কোরো না, যে পাণ্ডার বাড়ীতে এসে আমরা উঠেছিলুম, সে বেচারীকে পীড়াপীড়ি কোরো না, সেও কিছু জানে না। সেই যে তুমি পাণ্ডার সঙ্গে আলাদা বাসা খুঁজতে বেরুলে, আমিও সেই সুযোগে বিশ্বনাথ দেখতে বেরুলুম। পথে বেরিয়েই গাড়ী ভাড়া ক'রে সটান এখানে এসে উঠেছি। লোকজন সব ঠিক আছে। তিনি দু'চার দিনের মধ্যেই এখানে এসে উঠবেন, একটু গোলমাল থেমে গেলেই তিনি পশ্চিম বেড়াবার নাম ক'রে বেরুবেন।

কলকাতা ছাড়বার দিন যে টাকা তোমার হাতে দিয়েছি, তার মধ্যে বড় জোর না হয় পঞ্চাশ ষাট টাকা খরচ করেছো। বাকী দেড়শো টাকা তোমার কাছে এখনও আছে। আরও যা দরকার হয়, দেবো। কলকাতায় ফিরে যাও, সেখানকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবো। যে পাণ্ডার বাড়ী উঠেছিলুম, তাকে চিঠিতে কলকাতা পৌছাবার খবর দিও, আমার লোক গিয়ে জেনে আসবে। টাকা যা চাও, তার জন্যে ভেবো না, তবে বুঝে-সুঝে মাঝে মাঝে চেয়ো। বাবুর টাকার মায়া নেই।

তুমি আমার যে উপকার করেছ, তা ভুলবো না। তার জন্যে তোমায় সন্তুষ্ট করবো। কিন্তু তার বেশী না। যদি আমার খোঁজ করতে চেষ্টা করো, তা হ'লে তোমার এ কূল ও-কূল দু'কূল যাবে ব'লে রাখলুম। ইতি—

শ্রীমতী তরলা দাসী।

এই তরলাই ত শ্যামবাজারের তারকনাথের ভ্রাতৃজায়া। গুপীনাথ এই তারকনাথকে লইয়া তাহার পিতার নিকট আসিয়াছিল। তাহারা দুই জনেই ত তাহার পিতাকে শ্যামপুকুর ও কাশীর ঘটনা শুনাইয়াছিল। আবার এই তারকনাথই যাহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতেছে, তাহার নিঃস্বার্থ সেবার কথা সেই অম্লান-বদনে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে

স্বীকারও করিয়াছে। সে স্বয়ং অন্তরাল হইতে দেখিয়াছে, তখন তারকনাথের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়াছে, নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। সে সেবায় সেবাকারীর জীবনে আশঙ্কারও কারণ ছিল, কেন না, তারকনাথ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল—সংক্রামক রোগাক্রান্ত তারকনাথকে সকলেই ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, কেবল—

যাউক সে কথা। যে আত্মদেহদানে পরের সেবা করিয়া তাহাকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনে, তাহারই সম্বন্ধে দুশ্চরিত্রা নারীর এই পত্র! এ কি প্রহেলিকা!

জ্যোৎস্নার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, হস্ত আবার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল; একটি দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতসারে নির্গত হইয়া গেল। রক্তকমলতুল্য ওষ্ঠে অধর সংন্যস্ত করিয়া সে কিছুক্ষণ তন্ময় হইয়া বাহিরের সূর্য্যালোকিত শূন্যাকাশের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল।

আবার চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত হইল। আশ্চর্য্য এ যোগাযোগ! তরলার সহিত গুপীনাথের মিলন, উভয়ের গৃহত্যাগ, গুপীনাথ ও তারকনাথ পরস্পর পূর্ব্বশত্রু, অকস্মাৎ উভয়ের মিলন, যিনি তাহাদের কথা বিন্দু-বিসর্গও অবগত নহেন, সেই তাহার পিতা রাজেশ্বর বাবুর সকাশে তাহাদের আগমন ও পত্র দান—এই যোগাযোগ বিস্ময়কর বটে! তবে জগতে সকলই সম্ভব, ইহাও যে সম্ভব হইতে পারে না, তাহাই বা কে বলিল?

"দিদিমণি, এক বাবু দেখা করতে চায়—" রামাবতারের কণ্ঠস্বরে জ্যোৎস্না চমকিয়া উঠিল, দ্বারপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি বলছো, রামাবতার?"

"এক বাবু দেখা করতে চায়।"

"আমার সঙ্গে? বললে না কেন, কর্ত্তা বাড়ী নেই।"

"বলেছিলাম, বাবু খোকা বাবুকে নিয়ে সদরে গেছে কামমে, দোসরা সময়ে আসবে।"

"তবে?"

"বললে, বাবুর সঙ্গে কাম নেহি আছে, দিদি বাবুকা সাথ কাম আছে। এই লিখা দিয়েছে।"

জ্যোৎস্নার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অপরিচিত আগন্তুক—অন্তঃপুরের ভদ্রমহিলার সহিত দেখা করিতে চাহে, ইহার অর্থ কি? কম্পিত হৃদয়ে পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে তাহার বিস্ময় শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। কি সাহস এই মানুষটার! তাহাতে লেখা ছিল,—

"জ্যোৎস্না!

মাত্র একবার দর্শনপ্রার্থী। কেবলমাত্র দুই চারিটি জিজ্ঞাসা, তাহার পর আর বিরক্ত করতে আসব না। কাশী হ'তে একটানা এসেছি, বড় আশা করেই এসেছি, বোধ হয়, নিরাশ হবো না।

রণেন্দ্র।"

বিস্ময় অকস্মাৎ দারুণ ক্রোধে পরিণত হইল,—এই মানুষটা নিজেই নির্লজ্জের মত স্বীকার করিতেছে, সে পাপের স্থান হইতে সদ্য এখানে আসিতেছে, আসিয়াই ভদ্রকুলবধূর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে! জ্যোৎস্না ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিল, "বল গে যাও, আমার কাছে বলবার তাঁর কিছু নেই, কর্ত্তাবাবু বাড়ী ফিরে এলে দেখা করতে পারেন।" রামাবতার, "জী" বলিয়া মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া যাইতেছিল, দুই তিনটি সোপানও অবতরণ করিয়াছিল, এমন সময়ে তাহার ডাক পড়িল।

জ্যোৎস্না পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "না, দেখ, তাঁকে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে বল, আমি যাচ্ছি।" রামাবতার নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল। কি ভাবিয়া জ্যোৎস্না হঠাৎ এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, তাহা সে-ই বলিতে পারে। হয় ত সে এই—অশিষ্ট আগন্তুকের ধৃষ্টতার সরাসরি সমুচিত উত্তর দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

বাহিরের কক্ষে রণেন্দ্র অস্থির অধীরের মত পাদচারণা করিতেছিল। হঠাৎ অলঙ্কারের শব্দ শুনিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া কক্ষদ্বারাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল।

"জ্যোৎস্না!" দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দ্বারের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া রণেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নার মুখ-চক্ষুতে সে যে ভাবাভিব্যক্তি হইতে দেখিল, তাহাতে তাহার আর অগ্রসর হইতে সাহসে কুলাইল না। অবাক্ বিস্ময়ে সে কেবল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নার হৃদয়ে তখন কি ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস হইতেছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে।

কক্ষে পদার্পণ করিয়াই সে স্পষ্টকণ্ঠে গম্ভীরস্বরে

জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান আপনি আমাদের কাছে? বাবা এখানে নেই জানেন বোধ হয়?"

তখনও রণেন্দ্রের বিস্ময় অপনোদিত হয় নাই, তখনও সে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

জ্যোৎস্না পুনরায় গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "বাবার কাছে কি দরকারে এসেছেন, ব'লে যান।"

রণেন্দ্রের মোহ অপসারিত হইল, সে রুদ্ধস্বরে বলিল, "ব'লে ত দিয়েইছিলুম, তোমার কাছেই আমার দরকার জ্যোৎস্না!—"

রণেন্দ্রের স্বর কম্পিত হইল, সে দুই পদ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চরণ হুকুম শুনিল না, কম্পিত-চরণে সে একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্যোৎস্না পরুষকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে আপনার কোন দরকারই নেই—মিছে কষ্ট দিলেন কেন?"

জ্যোৎস্না কক্ষত্যাগ করিতেছিল। রণেন্দ্র যেন চেষ্টা করিয়া হৃদয়ে মত্তমাতঙ্গের বল ধরিয়া অগ্রসর হইয়া জ্যোৎস্নার হস্তধারণ করিবার জন্য কম্পিতহস্ত প্রসারণ করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল। ব্যথিত অভিমানাহত স্বরে বলিল, "চ'লে যাচ্ছ? আমি তোমার জন্যে কাশী থেকে অনাহারে অনিদ্রায় চ'লে আসছি—নিষ্ঠুর! চিঠিখানার জবাব পর্য্যন্ত দিলে না?"

একবার—মুহূর্ত্তের জন্য জ্যোৎস্নার বুক বোধ হয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন দুষ্টা সরস্বতী তাহার রসনাগ্রে ক্ষুরধার বিষাক্ত শরাগ্রের মত আবির্ভূত হইল। কঠোর ব্যঙ্গের স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "কাশীই ত আপনার যোগ্যস্থান—যেখানে আপনার মনের কথা স্বচ্ছন্দে খুলে বলতে পারেন—"

আঘাতের উপর তীব্রতর আঘাত! রণেন্দ্রের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—দারুণ ক্রোধ ও অভিমান তাহার সমস্ত মনটাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সেও কঠোর-স্বরে বলিল, "ঠিক কথা। আপনাদের পিতা-পুত্রীর মত ষড়যন্ত্রী মিথ্যা প্রচারকের সংস্রব হ'তে নরকে বাসও ভাল বটে! এ যুগে আন্তরিকতা বা অকপটতার ত স্থান নেই।"

জ্যোৎস্না সমান ওজনে বলিল, "মিথ্যাবাদী কপট ভণ্ড ষড়যন্ত্রীরা ত কাউকে ডেকে পাঠায় নি বাড়ী বয়ে এসে ঝগড়া করতে।"

রণেন্দ্রের মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে গর্ব্ব-ভরে প্রস্থানোদ্যতা জ্যোৎস্নার পথরোধ করিয়া প্রায় নত-জানু হইয়া কাতর করুণকণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কর জ্যোৎস্না, আমায় ক্ষমা কর। আমার মাথার ঠিক নেই। চারি-দিক্ হ'তে পৃথিবীটা যেন আমায় পিসে মারতে উঠেছে। এ সময়ে সবার চেয়ে আপনার জনের কাছে সান্ত্বনা সহানুভূতি পেতে ছুটে এসেছিলুম। আমায় বাঁচাও জ্যোৎস্না—তোমার কাছে আশা পেলে আমি সারা জগতের ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করি না। আমার অজ্ঞাতে যদি কোনও অপরাধ ক'রে থাকি, তা আমি জানি না, তুমি ক্ষমা করো। তুমি আমায় হাত ধ'রে তোমার পাশে টেনে নাও। আমার আপনার বলতে আর কে আছে, জ্যোৎস্না?"

জ্যোৎস্নার সমস্ত শরীরটাই যে কাঁপিতেছিল, তাহা নহে, তাহার সমগ্র অন্তরও ভীষণভাবে স্পন্দিত—আন্দোলিত হইতেছিল। কিন্তু তথাপি সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রণেন্দ্র হঠাৎ জ্যোৎস্নার কুসুম-পেলব করাঙ্গুলি ধারণ করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে দয়া করবে না? ন্যায়-বিচার করবে না? পূর্ব্বের স্মৃতির আগুন জ্বালিয়ে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান জাগিয়েই রাখবে? বেশ, তবে তাই হোক্। আর আসবো না, এই শেষ। ভবিষ্যতে যখন নিজের ভ্রম বুঝতে পারবে, তখন হয় ত খোঁজ করলে স্বর্গে মর্ত্তে আমার দেখা পাবে না—তখন কোথায় নরকের কোন্ স্তরে নেমে যাব, তা বলতে পারি নি।"

রণেন্দ্র ঝড়ের বেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। জ্যোৎস্নার সমগ্র অন্তর কি এই প্রচণ্ড বাত্যায় অবিচলিতই রহিল? একটা কুকুর-বিড়াল জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গেলে—না, সে ত ন্যায়-বিচারই চাহিয়াছে। তবে? তাহার অপরাধের ইহজগতে ক্ষমা কোথায়?

জ্যোৎস্নার করাঙ্গুলিগুলি আগুনের মত জ্বলিতেছিল। এ কি স্পর্শের প্রভাব? দূর হউক দুর্ভাবনা। কিসের অনুশোচনা? কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য—যতই কঠোর হউক, তবু কর্ত্তব্য। জ্যোৎস্না তখন পিতৃদত্ত পত্রখানার কথা স্মরণ করিয়া আহত মনের ক্ষতে প্রলেপ দিয়া সান্ত্বনা অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। সত্যই কি তাহা সান্ত্বনা?

১৫

মাতালের মত টলিতে টলিতে পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া রণেন্দ্র ষ্টেশনে আসিয়াছিল। কোনও মতে প্রথম শ্রেণীর নির্জ্জন কামরায় প্রবেশ করিয়া সে আসনের উপর আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল।

পৃথিবী, সংসার, সমাজ সবই কি আজ তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায় নাই? মানুষের সহিত মানুষের মধুর, পবিত্র সম্বন্ধ? বাজে কথা, মিথ্যার প্রহসন! ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি?—কবির উদ্ভট কল্পনা।

কিছু নাই, কেহ নাই! আছে শুধু মানুষ, তাহার উৎকট দম্ভ, স্বার্থপরতা, ভোগবিলাস লইয়া। উহাই সত্য, নিছক সত্য। আর সব মিথ্যা—সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা, মায়া মাত্র।

চরিত্রের পবিত্রতা, মানুষের প্রতি মানুষের করুণা, দয়া-মায়া—ব্যথিতের বেদনায় হৃদয়ে অসহ্য বেদনা বোধ? বোকামী, নির্ব্বুদ্ধিতা, প্রকাণ্ড অর্ব্বাচীনতা!

সারা জীবন ধরিয়া, জ্ঞানসঞ্চারের পর পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে যে আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিল, চিন্তায়, কার্য্যে যাহা সার্থক করিয়া তুলিবার সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা প্রকাণ্ড ভ্রান্তিপূর্ণ। বৃথাই সে এত দিন শৃঙ্খলাপূর্ণ পবিত্র জীবনযাপনে প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছে। বৃথাই সে এত কাল সংযমের পথে চলিয়া তাহার বুভুক্ষু আত্মাকে কষ্ট দিয়াছে।

কেন? কাহার জন্য, কিসের জন্য?—

কামরার বাতায়নপথে শ্রান্ত মস্তক রক্ষা করিয়া রণেন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

চলমান, শব্দায়মান ট্রেণের প্রচণ্ড শব্দকেও যেন অতিক্রম করিয়া তাহার অস্বাভাবিক হাস্যরব তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিল।

সেই বিকৃত হাস্যরবের শ্রোতা সে শুধু নিজে। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য সেই হাস্যরবে সে চমকিয়া উঠিল। এ কি তাহারই কণ্ঠস্বর? না, পাপ, শয়তান, তাহার অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গ-জয়ের আনন্দবার্ত্তা বিভীষণ রবে ঘোষণা করিতেছে?

নিমেষ মাত্র। পর-মুহূর্ত্তেই সে অনুভূতির রূপান্তর ঘটিয়া গেল।

মানস-দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যাখ্যানের নিষ্ঠুর দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ের দ্বার কঠিনরূপে, অটলভাবে রুদ্ধ হইয়া যেন সর্ব্বপ্রকার কোমল ভাবধারার প্রবাহ-বেগকে প্রতিহত করিয়া দিল।

সুন্দরী বালিকা পত্নীর সহিত তাহার কৈশোর-বয়সের পরিচয়ের অতি অল্পমাত্র নিদর্শনকে সে কোনও দিন বিস্মৃত করিতে পারিয়াছিল কি? অভিভাবকদিগের বাদ-বিসম্বাদ, মনান্তরের ফলে, মুকুলিত প্রেমপদ্ম সহস্রদলে বিকশিত হইয়া চরিতার্থতার সুযোগ পায় নাই সত্য, কিন্তু বালিকা পত্নীর স্মৃতি তাহার কিশোর-চিত্তে যে চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছিল, তাহার পবিত্রতার কথা সে যৌবনেও এক মুহূর্ত্তের জন্য অস্বীকার করিয়াছিল কি? অন্তর্হিতা পত্নীর কথা মনে করিয়াই সে অনুরুদ্ধ হইয়াও দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার সত্যনিষ্ঠ অন্তর শুধু বালিকা জ্যোৎস্নাকে প্রিয়তমার আসনে বসাইয়া অন্যের অগোচরে নিভৃতে প্রেম-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াই চরিতার্থ হইত।

কিন্তু তাহার ইতিহাস কে জানে? কে জানে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত সে তাহারই ধ্যানে মগ্ন থাকিতে ভালবাসিত? এত কাল পরে তাহার দেখা পাইয়া, তাহাকে পাইবার জন্য আবেদন করিয়া সে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—তাহার হৃদয়ের যাবতীয় কোমল প্রবৃত্তিকে পাষাণ-চাপে নিষ্পেষিত করিয়া, তাহার বিবাহিতা পত্নী তাহাকে নিদারুণ উপহাসের সহিত তাড়াইয়া দিয়াছে।

ইহার পর সংসার, সমাজ, ধর্ম্মের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? থাকিবার প্রয়োজনই বা কি? ইহকাল? পরকাল?—সে বিষয়ের সার্থকতা কোথায়? যাহার ইহকাল এমনই ভাবে উপেক্ষিত, অনাদৃত, লাঞ্ছিত, পরকাল আছে কি না, তাহা ভাবিয়া লাভ?

অসহ্য! অসহ্য!—

রণেন্দ্র অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। শত বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। প্রভূত অর্থ, দেহে পরিপূর্ণ শক্তি, অটুট স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল যৌবন—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও কি সে যৌবনের উন্মাদনায় গা ভাসাইয়া দিয়াছে? তথাপি, তথাপি, তাহারই পত্নীর নিকট হইতে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কি কুৎসিত ইঙ্গিতই না আসিয়াছে!

পৃথিবীর সকলেই যদি স্বার্থ লইয়াই তৃপ্তি লাভ করে, বস্তুতান্ত্রিক জগতের রূপ, রস ভোগ করিয়া জীবনকে চরিতার্থ করাই যদি বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সেও কি নির্ব্বোধের মত তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া শুধু অভিশাপই কুড়াইতে থাকিবে ?

আসনে বসিয়া পড়িয়া সে দুই হস্তে বক্ষোদেশ চাপিয়া ধরিল। এ কি দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ তাহার চঞ্চল অন্তররাজ্যে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে! এত দিনের সাধনা, এত দিনের সংযমকে ধূলিসাৎ করিয়া উন্মত্ত জয়োল্লাসে কাহারা বাহিরে আসিতে চাহিতেছে ?

অতি অম্লান, অতি অস্ফুট আর এক জনের কণ্ঠস্বর মিনতি করিয়া কি যেন বলিতে চাহিতেছে। রণেন্দ্র চমকিয়া উঠিল।

এক দিকে উন্মত্ত জয়োল্লাস—অন্য দিকে ক্ষীণ মিনতির কাতরতা! রণেন্দ্র অধীরভাবে গাড়ীর জানালায় শ্রান্ত মস্তক রক্ষা করিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

অকূল ও কূল

কূলহারা সংসার-জলধি—কলোর্ম্মি-কুটিল, টলোমলো ;
তুমি আমি আছি দুই জন,—ভয় নাই ভেসে যাই চলো !
হেথা তুমি হা'ল ধরি' বসো, দাঁড়ে গিয়ে বসি আমি হোথা ;
ঢেউ ভেঙে বেয়ে যাক তরী—ভাবনা কিসের ?—ভয় কোথা !
শূন্য প্লাবি' উৎসারিয়া পড়ে জ্যোৎস্নার সুধাজ্যোতিঃরাশি ;
ওষ্ঠ-অবকাশের কৌমুদী ঢালো তুমি মধুচ্ছন্দে হাসি'।
দূরে দেখ চলে দুটি তরী পা'ল-ভরে পাশাপাশি দুলে' ;
তুমি যদি বলো সখি মোরে পা'ল তুলি উত্তরীয় খুলে'।
উর্দ্ধে নীল আকাশ-সাগরে শুভ্র লঘু দু'টি মেঘ ওই
হেলে' দুলে' ভেসে চলে ধীরে ;—আমরাও ভেসে চলি, সই !

ঝটিকার পক্ষ-বিধূনন ?—ঈশানে কি কালো ধূম উঠে ?
সখি, তব হাসির কিরণে যত কালি যাবে না কি টুটে' ?
কি ভাবিছ ?—গাঢ় স্বরে তুমি গেয়ে উঠো গভীর মল্লারে,—
সব মেঘ গলে' যাক্ ঝরে' বৃষ্টিরূপে শত স্রোতোধারে।
সুবিমল মেঘবারি-স্নানে স্নিগ্ধ সিক্ত সুপবিত্র হয়ে
মুখোমুখি হাসিমুখে মোরা—তুমি আমি ভেসে যাব দোঁহে।
চলে পাড়ি।—তরী ভারী লাগে ? জলে গেছে তরিগর্ভ ভরে'?
তুমি বসো ; সিঞ্চি' ফেলি আমি ত্বরান্বিত করাঞ্জলি করে'।
হা'লে বসি' তুমি শুধু হাসো ; লাগি' মগ্ন সিন্ধুশৈল-শিরে
টুটিলেও তরী,—নাহি ভয়, পৃষ্ঠে বহি' লয়ে যাব তীরে।
সন্তরণে শ্রান্ত হয়ে হায় কূলে আসি' জলে ডুবি যদি,
যেয়ো তুমি ধীরে ধীরে উঠি'—আমি ডুবি, নাহি কিছু ক্ষতি !

হরি ! হরি !—হের, হের সই, যামী শেষ—পূর্ব্বাকাশ রাঙা ;
চক্রবালে আধো-দেখা যায় স্বর্ণভূমি—ওপারের ডাঙ্গা !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

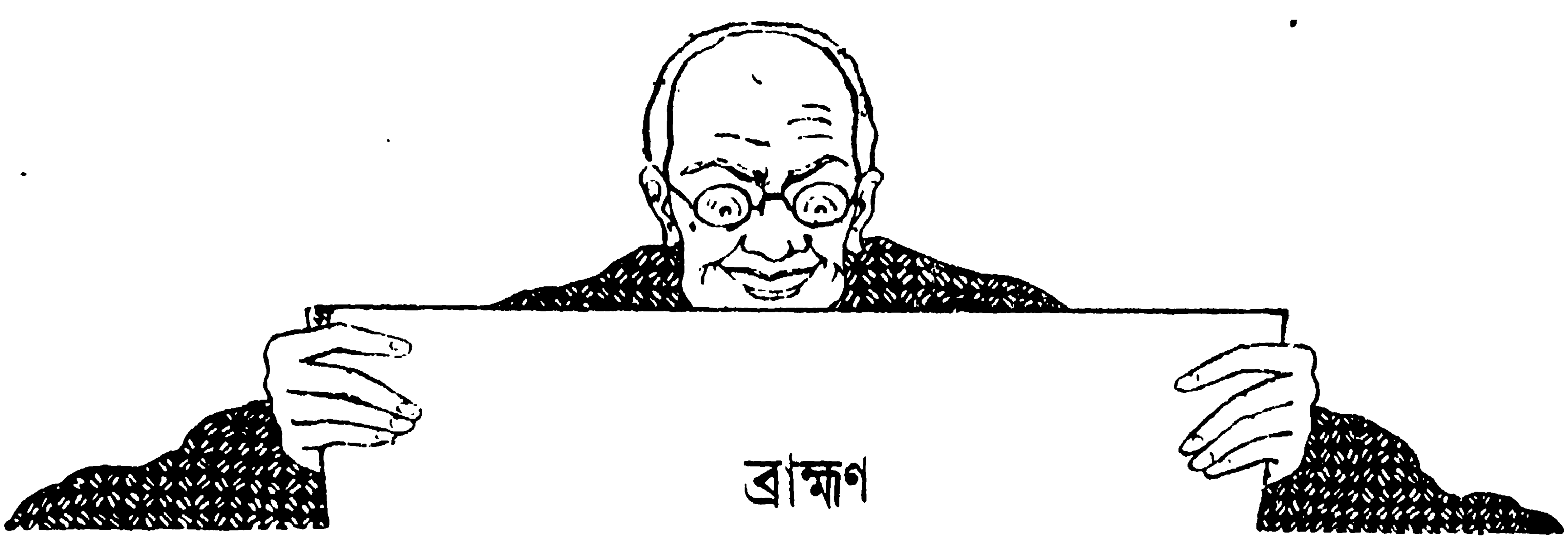

ব্রাহ্মণ

১

"আরে ছ্যাঃ! শিরোমণির কথা আর বললেন না। সেটা ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক।"

"যা বলেছ ভায়া! অমন অপদার্থ ভূভারতে নেই, নইলে কি না, ওই ছোটলোক বেটাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মাথায় তোলে!"

"রায় মশাই, আপনি এর একটা বিহিত করুন। না হ'লে দেখবেন, ওই শিরোমণিই এ গ্রামটা মজাবে।"

রায় মহাশয় তখন একটা কাঠি দিয়া কাণ চুলকাইতেছিলেন, সেই অবস্থায় মুখখানা বিকৃত করিয়াই বলিলেন, "কি জান হে পরেশ, তুমি ত লেখাপড়া শিখেছ, এম-এ পাশ করেছ, দেখতেই ত' পাচ্ছ—এখন দিন-কাল কি রকম পড়েছে, আর কি কাউকে কিছু বলবার জো আছে। নইলে আমার জমীদারীতে বাস ক'রে—"

পরেশ বলিল, "ও আপনি যাই বলুন, আমরা কোন কথাই শুনব না, আপনি মনে করলেই সব পারেন।"

রায় মহাশয় কাণের কাঠিটা আঙ্গুল দিয়া রগড়াইতে রগড়াইতে বিজ্ঞের মত বলিলেন, "পারি অবশ্য সবই। তবে কি না—ব্রাহ্মণ! কি বলেন বিদ্যার্ণব মশাই?"

বিদ্যার্ণব বলিলেন, "শিরোমণি ব্রাহ্মণ! গলায় পৈতে থাকলেই যদি ব্রাহ্মণ হ'ত, তা হ'লে ত আজ বাঙ্গালা দেশে অব্রাহ্মণ দেখতেই পাই নে। মশাই, বলব কি, যত রাজ্যের অস্পৃশ্যদের সঙ্গে ব'সে তাদের পড়া দেয়, রোগে সেবা করে, পথ্যি খাওয়ায়! ও রকম অনাচারী যদি ব্রাহ্মণ হয় ত, সে ব্রাহ্মণকে শাসন করাই উচিত।"

পরেশ বলিল, "আবার মজা দেখেছেন, তাদের করেও সব, আবার গঙ্গাস্নান ক'রে তবে ঘরে যায়। দেখে হাসিও পায়, দুঃখও করে। কিন্তু লোকটা পণ্ডিত বটে।"

বিদ্যার্ণব হঃ হঃ করিয়া একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ওহে পরেশ, শাস্ত্র কি বলছে জান? বলছে—'শিরোমণির্মহামূর্খে পণ্ডিতে চ কচিৎ কচিৎ।' মহামূর্খের উপাধিই হ'ল শিরোমণি! পণ্ডিতে কদাচ কখন দেখা যায়।"

পরেশ বলিল, "কিন্তু স্কুলের ছেলেরা ওঁর ভারি সুখ্যাতি করে। যখনই তারা তাঁর কাছে পড়তে যায়, তখনই তিনি পড়ান; তারা বলে, অমনটি কেউই পড়াতে পারে না।"

"স্কুলের পড়া? হঃ হঃ। কি জান পরেশ, ওকে 'ঋজুপেঠে' পণ্ডিত বলে।"

তার পর রায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বিদ্যার্ণব বলিলেন, "রায় মশাই, আপনি ভূস্বামী—রাজা। এর শাসন আপনাকে করতেই হবে।"

পথিপার্শ্বস্থ বকুল-বৃক্ষসংলগ্ন বেদীতে বসিয়া প্রাতঃকালেই এই মুখরোচক আলোচনা চলিতেছিল। কিন্তু গোল বাধাইল একটা অর্ব্বাচীন মুচি। সর্ব্বাঙ্গ মলসিক্ত সেই দুষ্টটা টলিতে টলিতে আসিয়া সেই বেদীর নিকটেই প্রথমে বসিয়া পড়িল, তাহার পর গোঙাইতে গোঙাইতে একটু জল চাহিয়াই শুইয়া পড়িল।

ইহার আবির্ভাবে এমন আনন্দপ্রদ প্রসঙ্গ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় পরেশ ত চটিয়া আগুন! রাগিয়া বলিল, "জল দেবে! ছাই দেবে! বেটা মাতাল কোথাকার! যত রাজ্যের পাপ জুটেছে!"

লোকটা হাত জোড় করিয়া কাতরকণ্ঠে অতি কষ্টে বলিল, "মশাই, আমি মদ খাই নি, বড় অসুখ, তেষ্টায় প্রাণ গেল। একটু জল—একটু জল দিন!"

"জল দিন! কে তোকে এখন জল দিয়ে স্নান ক'রে মরবে।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "জল একটু দিতে পারলে হ'ত—কিন্তু দেয় কে!"

পরেশ বলিল, "আপনি যদি এ রকম স্পর্দ্ধা দেন, তা হ'লে সনাতন ধর্ম্ম আর থাকবে না।"

"কিসে সনাতন ধর্ম্ম থাকবে না, পরেশ বাবু?"

পরেশ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, শিরোমণি দাঁড়াইয়া। সে একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "এই দেখুন না, একটা লোক এই এখানে প'ড়ে গোঙাচ্ছে, আর জল চাইছে, কে এখন জল দিয়ে স্নান করে বলুন দেখি।"

"জল দিলে স্নান করতে হবে কেন?"

"আপনি বলেন কি, শিরোমণি মশাই? জলের ধারাটা যখন মুখে পড়বে, তখন সেই ধারার সঙ্গে ত ঘটীটার যোগ থাকবে, তা হ'লেই ত ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে গেল। এই দেখুন না, একটা এঁটো পাত্তর থেকে জল গড়িয়ে যদি আর একটা পাত্তরে পড়ে, তা হ'লে কি সেটা এঁটো হয় না?"

শিরোমণি হাসিয়া বলিলেন, "অকাট্য যুক্তি বটে! তা কাকে জল দিতে হবে?"

"ওই যে, দেখুন না!" বলিয়া পরেশ সেই লোকটাকে দেখাইয়া দিল।

শিরোমণি মহাশয় তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটা দারুণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "দেখুন রায় মশাই, লোকটার কলেরা হয়েছে। এখনি একে হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে।"

রায় মহাশয় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "এটা ত কলকেতা সহর নয়, একটা কাচ ভেঙ্গে কল ঘোরালেই গাড়ী এসে হাজির হবে-- কোন ঝঞ্ঝাট নেই! এখানে ত তা হবে না, লোক চাই।" বলিয়াই তিনি ধীরে ধীরে স্থান-ত্যাগ করিলেন। পার্শ্বচর দুইটিও যে তাঁহার অনুগমন করিল, তাহা না বলিলেও চলে।

তখন শিরোমণি মহাশয় প্রথমে গায়ের নামাবলীখানা সেই বকুল-গাছের ডালে বাঁধিলেন, তাহার পর রোগকাতর পীড়িতকে দুই হাতে তুলিয়া নিকটস্থ হাঁসপাতালের দিকে অগ্রসর হইলেন।

২

রায় মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ। গ্রামের সব মাথালো মাথালো লোক হাজির। সকলের মুখেই উত্তেজনার ভাব। যেন কুরুক্ষেত্রের মত বিরাট যুদ্ধ সম্মুখে। মধ্যস্থলে বিশাল ভুঁড়ি সম্মুখে রাখিয়া প্রধান গ্রহ রায় মহাশয় উপবিষ্ট, চারি পার্শ্বে উপগ্রহগুলি তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।

পরেশ বলিল, "রায় মশাই, আপনি অনুমতি করুন, বিদ্যার্ণব যে প্রস্তাব করেছেন, আমরা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।"

রায় মহাশয় বিজ্ঞের ন্যায় ঘাড় দুলাইতে দুলাইতে বলিলেন, "দেখুন, বিচারকের দায়িত্ব বড় গুরু, আমার একটি কথায় যখন শিরোমণি একঘরে হবে, তখন আমাকে অনেক গবেষণা ক'রে রায় দিতে হবে।"

"সে কথা খুব সত্যি। কিন্তু এটাও আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, আপনি এ গ্রামের সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক। ধর্ম্মের কাছে ত আর কেউ বড় নয়।"

"নয় বলেই ত এত ভাবছি। আত্মীয়-বিচ্ছেদ হ'ক, বন্ধু পর হ'ক, কুটুম্ব বিরূপ হ'ক—ধর্ম্ম রাখতেই হবে। শিরোমণির এ অনাচার সহ্য করলে পাপী হ'তে হবে। সুতরাং এই ঘোষণা করছি যে, আজ থেকে শিরোমণি একঘরে।" বলিয়া তিনি মুখখানাতে এমন ভাব প্রকট করিলেন যে, যুদ্ধ জয় করিয়া ওয়েলিংটনেরও সেরূপ হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

রায় বাহির হইবামাত্র চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। রায় মহাশয় হাঁকিলেন, "ওরে তামাক দে যা!"

নিবারণ এতক্ষণ এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এইবার সে প্রশ্ন করিল, "শিরোমণির অপরাধ?"

রায় মহাশয় সগর্জ্জনে বলিলেন, "বল কি তুমি, নিবারণ? আমি নিজের চোখে যে এই একটু আগে একটা কলেরা রুগী মুচিকে কাঁধে করতে দেখেছি। এ অনাচার আমি সমাজপতি হয়ে সই কেমন ক'রে?"

নিবারণ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "একটা মুমূর্ষুকে—তা সে স্পৃশ্যই হ'ক আর অস্পৃশ্যই হ'ক—রক্ষা করা অপরাধ?"

"শাস্ত্র ত পড় নি বাপু, কি ক'রে এ সব জানবে? ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম জিনিষ, পোড়া মাটীর মত ঠুনকো, একটু লেগেছে কি অমনি নষ্ট হয়েছে।"

নিবারণ দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিল, "দেখুন, ধর্ম্ম যে কি, তা শিরোমণি মশাই-ই ঠিক বুঝেছেন। আপনারা যদি শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝতে পারতেন, তা হ'লে আজ

শিরোমণিকে একঘরে না ক'রে তাঁর মহদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ ক'রে ধন্য হ'তে পারতেন।"

"তুমি কি বলতে চাও, শিরোমণি এই যে সব অনাচার করছে, ছোটলোকদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে, তাদের রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে ভরসা দিচ্ছে, এ সব কি ভাল হচ্ছে? না, এ সব ব্রাহ্মণের করা উচিত?"

"প্রকৃত ব্রাহ্মণ ব'লে যিনি নিজেকে পরিচিত করতে চান, তাঁর এ সকল অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপন্নমাত্রকেই রক্ষা করতে হবে, তা সে কি জাতি, তা দেখবার আবশ্যক নেই।"

"তবে কি তুমি বলতে চাও বাপু, শাস্ত্র যে এই শুদ্ধাচারের কথা বলেছেন, সে সব মিথ্যে?"

"শিরোমণির শুদ্ধাচারের কি অভাব দেখলেন? তাঁর মত নিষ্ঠাবান্, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপনাদের এই গ্রামে—এই গ্রামেই বা কেন, বাঙ্গালাদেশে কয় জন আছেন? তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান ক'রে অবধি ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্য সব যথাশাস্ত্র পালন করেন। আপনাদের ভিতর কে তা পালন করেন? এই যে বিদ্যার্ণব দীর্ঘ টিকি দুলিয়ে—লম্বা ফোঁটা কেটে শাস্ত্রের দোহাই দিচ্ছেন, ইনি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে একটা 'ভেতো' সন্ধ্যা ছাড়া আর কি পালন করেন?"

যেন বারুদের স্তূপে আগুন পড়িল—বিদ্যার্ণব লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কি যে বলিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। রাগে তাঁহার শরীর ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

নিবারণ বলিতে লাগিল, "বৃথা রাগে কোন ফল নেই, বিদ্যার্ণব মশাই। শিরোমণি আমার কেউ নয়, বরঞ্চ আপনাদের অনেকের আত্মীয়। আপনারা বলছেন, শিরোমণি আচারভ্রষ্ট। কিসে তিনি আচারভ্রষ্ট? তিনি আবশ্যক হ'লে অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করেন বটে, তিনি তারপরই স্নান ক'রে শুচি হন; নইলে ত জলগ্রহণও করেন না, তবে কিসে তিনি আচারভ্রষ্ট? আর ঐ যে কলেরা-রোগীকে নিয়ে গেছেন, তা আপনারা বিবেচনা করুন, ঐ দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্তকে গ্রামের বাইরে দিয়ে ভাল করেছেন না মন্দ করছেন? ঐ লোকটা যদি সেখানেই মরত, আর তার ফলে যদি গ্রামে ঐ সংক্রামক রোগ দেখা দিত, তা হলেই বা আপনারা কি করতেন?"

"কেন, রায় মশাই রয়েছেন গ্রামের রাজা, তিনি নিজে যখন দেখেছিলেন, তখন তার ব্যবস্থা তিনিই করতেন।"

"ব্যবস্থা যদি তিনি করতেন, তা হ'লে আমাকে এ কায করতে হবে কেন?"

সকলে চাহিয়া দেখিল, শিরোমণি। তিনি কখন্ যে সেখানে আসিয়াছেন, তাহা কেহই জানে না। শিরোমণি বলিতে লাগিলেন, "ব্যবস্থা করা ত দূরের কথা, তিনি তখনি সেখান থেকে চ'লে এলেন।"

পরেশ বলিল, "তিনি লোক ডাকবার জন্য এলেন। কেমন, নয় কি, বিদ্যার্ণব মশাই?"

দীর্ঘ টিকি আন্দোলিত করিয়া বিদ্যার্ণব সায় দিলেন।

নিবারণ চুপ করিয়াছিল; কিন্তু শিক্ষিত লোকের এই মোসাহেবী তার সহ্য হইল না। সে বলিল, "দেখুন পরেশ বাবু, আর বিদ্যার্ণব মশাই—আপনিও শুনুন। আমার একটা উদ্ভট শ্লোকের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল, কিন্তু আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত লোকের ব্যবহার দেখে, সে অর্থটা আজ ভাল করেই বুঝলুম।"

উদ্ভট শ্লোকটি শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইল।

সহসা শিরোমণি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "না, নিবারণ, অপ্রিয় সত্য বলায় কোন লাভ নেই। তুমি যে শ্লোকটি বল্‌তে যাচ্ছ, সেটা সমাজপতি, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন রায় মশাইয়ের গৌরব-লাঘবের কারণ হ'তে পারে।"

নিবারণ বলিল, "তবে থাক। কিন্তু পরেশ বাবুকে শিক্ষিত বলেই জান্‌তুম। তাঁর নির্লজ্জ স্তাবকতা সমর্থন-যোগ্য নয়, এ কথা বল্‌তে আমি বাধ্য।"

হঠাৎ বোমা ফাটিলে যেমন সকলেই লাফাইয়া উঠে, নিবারণের এই কথায় রায় মহাশয়ের পার্শ্বচর পরেশের ঠিক সেই অবস্থা হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কেহই কোন কথা বলিল না। শিরোমণি বলিলেন, "আপনারা কেউ অপরাধ নেবেন না। নিবারণ বালক। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে যে রূঢ় কথা বলতে নেই, এ জ্ঞান এর হয় নি।"

বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, নিবারণও তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে আবার সকলের মুখ ফুটিল। পরেশ আস্ফালন করিয়া বলিল, "আমি দেখে নেবো।"

বিদ্যার্ণব বলিলেন, "উৎসন্ন যাবেন—আমি দিব্যচক্ষে

দেখছি, উৎসন্ন যাবেন। এত দর্প সেই দর্পহারী কখনই সহ্য করবেন না।"

অন্যান্য পার্শ্বচররাও নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

রায় মহাশয় কিন্তু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না, বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় মুখখানা কালো করিয়াই রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "তোমরা সকলে আমার সহায় হও, শিরোমণিকে আমি দেশছাড়া করব।"

পার্শ্বচররা অমনই বলিয়া উঠিল, "আমরা ত ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত এগিয়েই আছি।"

৩

বেলা দ্বিপ্রহর। শিরোমণি-গৃহিণী যোগমায়া পরিজনবর্গকে আহার করাইয়া আহ্নিকে বসিয়াছেন। শিরোমণি মহাশয় প্রায় দুই মাস অনুপস্থিত—পশ্চিমাঞ্চলের শিষ্যবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছেন। ফিরিবার দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আহ্নিকে বসিয়া যোগমায়ার কেবলই স্বামীকে মনে পড়িতেছে, পূজায় মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। তিনি মনে মনে দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রভু, স্ত্রীলোকের ত অন্য ধর্ম্ম নেই, স্বামি-সেবাই তার ধর্ম্ম। স্বামী বিদেশে, তাই তাঁর চিন্তাই মনে আসছে, অপরাধ নিও না, প্রভু।

যোগমায়া দেবতা-প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তার পর একবার বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, যদি কোনও অতিথি আসিয়া থাকে। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন অন্নের সম্মুখে বসিয়াছেন, অমনি তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল, "মা, দু'টি খেতে পাই—কাল থেকে খাওয়া হয় নি।"

যোগমায়া তখনই উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন, একটি কঙ্কালসার স্ত্রীমূর্ত্তি—পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, সঙ্গে ততোহধিক শীর্ণ একটি শিশু।

'ব'স মা ব'স' বলিয়া যোগমায়া পাতা পাতিয়া নিজের আহার্য্যগুলি আনিয়া সেই পাতে ঢালিয়া দিলেন। মাসের মধ্যে অনেক দিনই তাঁহার এরূপ ঘটিত! ক্ষুধার্ত্ত দুইটি প্রতি গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল, যোগমায়ার বোধ হইতে লাগিল, যেন সে গ্রাস তাঁহার নিজের মুখেই প্রবেশ করিতেছে। এমনই তৃপ্তির সহিত তাহাদের খাওয়াইতে-ছেন, এমন সময় সদর-দরজায় 'ডুগ্ ডুগ্' করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে জন কয়েক লোক লইয়া আদালতের পেয়াদা ও রায় মহাশয়ের এক জন গোমস্তা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া ভিখারিণী সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। মহামায়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে খাও।"

কর্ম্মচারীটি যোগমায়ার পরিচিত। সে অনেক দিন এই বাটীতে প্রসাদ পাইয়া গিয়াছে। তখন অবশ্য তাহার চাকরী হয় নাই। পরে শিরোমণি মহাশয়ের সুপারিশেই রায় মহাশয়ের সেরেস্তায় কার্য্য পাইয়াছে। যোগমায়া বলিলেন, "রামরূপ, পেয়াদার সঙ্গে তোমাকে আসতে দেখে আমি বুঝতে পারছি, কেন তোমরা এসেছ। কাণা-ঘুষায় একটা কথা আমার কাণেও এসেছিল। তোমাদের যা করবার, তা পরে করো। এখন তোমরা আমার আতিথ্য-ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিও না—বাইরে যাও। দেখছ না, অনাহারী ওই শীর্ণ মূর্ত্তি লোলুপ-দৃষ্টিতে ভাতের দিকে চেয়ে রয়েছে, কিন্তু তোমাদের দেখে ভয়ে খেতে পারছে না। যাও, বাইরে যাও। ওদের খাওয়া হ'ক, তার পর তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো।"

'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। হইলই বা এক দিন ঐ দয়াময়ীর দয়াতেই তাহার জীবন-রক্ষা হইয়াছিল। তা সে অন্ন ত কবে হজম হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহার অন্ন এখনও হজম হয় নাই, উদরের মধ্যে গজগজ করিতেছে, তাহার আদেশ ত পালন করা চাই। তাহারা নির্ম্মম ভাবে শিরোমণির গৃহের সকল জিনিষই টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। যোগমায়ার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি এক পাশে দাঁড়াইয়া অতি যত্নে সেই ভিখারিণীকে অভয় দিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

রামরূপের দল যখন সমস্ত জিনিষ-পত্রের ফর্দ্দ করিয়া গাড়ীতে বোঝাই দিয়া যোগমায়াকে গৃহত্যাগের জন্য আদালতের হুকুমনামা দেখাইতেছে, সেই সময় শিরোমণি মহাশয় আসিয়া উপস্থিত, ব্যাপার দেখিয়া তিনি ত স্তম্ভিত!

শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়া দু'পাটি দন্ত বিকাশিত

করিয়া রামরূপ বলিল, "প্রাতঃপেরণাম ঠাকুর মশাই। আপনাকেই খুঁজছিলাম।" ব'লিয়া সে আদালতের হুকুম-নামাখানা দেখাইল, শিরোমণি মহাশয় ভাল করিয়া পড়িয়া আকাশ হইতে পড়িলেন! এক হাজার টাকা দেনার জন্য তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, এমন কি, আজ দখল লওয়াও হইয়া গেল! তবে দয়ালু জমীদার রায় মহাশয় না কি আদেশ দিয়াছেন যে, যদি আজই শিরোমণি সব টাকা মায় খরচা পরিশোধ করেন, তা হইলে তিনি তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে পারেন। কেন না, ধর্ম্মই তাঁহার লক্ষ্য!

শিরোমণি মহাশয়ের মুখ দিয়া বাহির হইল, "হাজার টাকা ধার করিয়াছি আমি!"

এমন সময় বাহিরে মোটরের 'হর্ণের' শব্দ এবং বোধ হইল যেন গাড়ীখানা থামিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলেন, ব্রজগোপাল ডাক্তার। ব্রজগোপাল লব্ধপ্রতিষ্ঠ; শিরোমণি মহাশয়ের শিষ্য। তিনি প্রবেশ করিয়াই প্রথমে গুরু ও গুরুপত্নীকে প্রণাম করিলেন, তাহার পর ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। শিরোমণি মহাশয় আদালতের কাগজখানা ডাক্তারের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমি ত জীবনে কখন ঋণ করি নি, ব্রজ।"

ডাক্তার গভীর মনোযোগ দিয়া আদ্যোপান্ত পড়িয়া রামরূপকে বলিলেন, "জেলে যাবে?"

রামরূপ বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "জেলে আমরা যাব কেন, যেতে হয়, ওই ঠাকুর যাবেন—সব সম্পত্তিতে ত ওঁর দেনা শোধ হয় নি, এখনও প্রায় চারশো বাকি। দেনা ত অস্বীকার করবার যো নেই, আদালতে উনি নিজে সোলে ডিক্রী দিয়ে এসেছেন।"

শিরোমণি আকাশ হইতে পড়িলেন, "আমি! আদালতে সোলে ডিক্রী দিয়ে এসেছি? আমি জীবনে কখন আদালতে যাই নি।"

"তা যাবেন কেন? আমরা লোক জাল ক'রে ডিক্রী নিয়েছি।" বলিতে বলিতে সেখানে স্বয়ং রায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত।

ব্রজগোপাল গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ঠিক তাই। তার প্রমাণ আমি। কেন না, ওই দিন আমার স্ত্রীকে উনি দেখেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার বাড়ী ছিলেন। জান ত আমি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, বিশেষ ঐ দিন আমার বাড়ীতে আমার শালা—এই জেলারই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিল।"

এই কথা শুনিয়া রায় মহাশয়ের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ব্রজগোপাল বলিতে লাগিলেন, "বেশ, যাও তোমরা সব জিনিষ নিয়ে—তার পর আমি সব ব্যবস্থাই করছি। আসুন গুরুদেব, আমার বাড়ী পবিত্র করবেন চলুন।"

শিরোমণি বলিলেন, "যদি এ কথা প্রমাণ হয়, তা হ'লে রায় মহাশয়ের কি হবে?"

"জেল।"

"ব্রজ, এ টাকা আমি নিয়েছি।"

"সে কি কথা গুরুদেব! আপনি এ টাকা নিয়েছেন!"

"না নিলেও নিয়েছি ব'লে মেনে নিতে হবে। কেন না, সর্ব্বস্বের বিনিময়েও ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা শাস্ত্রের বিধি। নয় কি, ব্রজ?"

"কিন্তু এর ফলে আপনাকে যে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে।"

"ব্রাহ্মণের গাছতলায় বাস ত' অগৌরবের নয়, ব্রজ।"

ডাক্তার বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে গুরুদেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিষ্যকে নীরব দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "তুমি যাও ব্রজ, বেলা হয়েছে, আহার কর গে। আজ ত আমার প্রসাদ দেবার ক্ষমতা নেই।"

"গুরুর দর্শন যখন আজ মিলেছে, তখন আমার অদৃষ্টে প্রসাদও নিশ্চয় আছে। রায় মশাই, এখন কি করবেন?"

মুখখানা কাঁচু-মাচু করিয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "যা বলেন। শিরোমণি মশাই টাকা দেন, তাঁর সম্পত্তি তাঁরই। নচেৎ—"

"এ কথা এখনও বলতে পারছেন?"

"ব্রজ, উনি ভূস্বামী—রাজা। ওঁর অপমানে অধর্ম্ম হয়। উনি যখন বলছেন, উনি আমার কাছে টাকা পাবেন, তখন তাই-ই। বিশেষ কোন কারণেই আমি স্বেচ্ছায় আদালতে যাব না। উনি এই সম্পত্তি ভোগ করুন, আমি সানন্দে ছেড়ে দিচ্ছি।"

ব্রজগোপাল বলিলেন, "কিন্তু আমি ত গুরুপীঠ ছাড়তে

পারব না।" পকেট হইতে ডাক্তার চেকবহি বাহির করিয়া ১২ শত ৩৩ টাকা ৭ আনার একখানি চেক দিলেন। পেয়াদা টাকা লইয়া চলিয়া গেল। ব্রজ ডাক্তারকে সে ভাল করিয়াই চিনিত।

৪

আজ রায় মহাশয়ের কন্যার বিবাহ। জমীদার-বাটীর দেউড়ীতে নহবৎ বসিয়াছে, প্রকাণ্ড উঠান সামিয়ানায় ঢাকা হইয়াছে। ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে, বালকরা চারিদিকে ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি, কান্না-চীৎকারে বিবাহ-বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। মিঠাইএর গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত। অন্তঃপুরে রমণীগণের কমকণ্ঠের অস্ফুট-ধ্বনি—কচি ছেলের কান্না। সকলেই মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু যাঁহার কন্যার বিবাহ—সেই রায় মহাশয়ই বাটী নাই। সকাল সকাল আভ্যুদয়িক সারিয়া তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন, আসিবার সময় মেয়ের অলঙ্কার আর বরাভরণ লইয়া আসিবেন। চারিটার মধ্যে তাঁহার নিশ্চিত আসিবার কথা, কিন্তু সন্ধ্যা হয় হয়, অথচ তাঁহার দেখা নাই। রায়-গৃহিণী উৎকণ্ঠিত হইয়া ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ নাই। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, চারিদিকে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়া বিবাহ-বাটী অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইল। রাত্রি ৯টার পরই লগ্ন, সন্ধ্যার পরই বর আসিবে, অথচ এখনও রায় মহাশয়ের সাক্ষাৎ নাই! ভয়ে রায়-গৃহিণীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, মেয়ের বিবাহের যাহা হয় হউক, স্বামী সুস্থ-শরীরে ফিরিয়া আসুন, তিনি একান্তমনে গৃহ-দেবতার কাছে সেই প্রার্থনাই করিতেছেন।

রায় মহাশয় ফিরিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। শুষ্ক মুখ, কোটরগত চক্ষু—এ কি মূর্ত্তি! রায় মহাশয় ঘরে ঢুকিয়াই এক টানে জামা খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধপ্ করিয়া মেঝেতেই বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী তাড়াতাড়ি কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "কি হয়েছে তোমার? এ রকম চেহারা কেন?"

হতাশকণ্ঠে রায় মহাশয় বলিলেন, "আর চেহারা! এখন মলেই সব যন্ত্রণা যায়।"

উদ্বিগ্ন হইয়া গৃহিণী বলিলেন, "ও আবার কি কথা! এই শুভদিনে অলক্ষণে কথা মুখে আনে!"

"না এনে করছি কি! আজ শুভদিন নয় গিন্নি, বড় অশুভ দিন!"

"কেন, কি হয়েছে? শীগ্‌গির বল, ভয়ে যে আমার বুক কাঁপছে।"

"হবে আর কি, মেয়ের বিয়ে হ'ল না,—মান-সম্ভ্রম সব গেল!"

"কেন, বরের বাড়ীতে কি কোন বিপদ ঘটেছে?"

"তা হলেও ত নিস্তার পেতুম। শোন বলি, আজ ক'বছর ধ'রে জমীদারীর আয় এক পয়স'ও নেই, তা তুমি জান। সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে বাইরের মান-সম্ভ্রম আর গভর্ণমেণ্টের খাজনা দিয়ে আসছি। কোন সুযোগে সাড়ে বারো শ' টাকা পেয়েছিলাম, তাই দিয়ে এই সব খাবার-দাবার আয়োজন ক'রে কলকেতায় গয়নার বায়না দিয়েছিলাম। তার পর টাকার জন্য জমীদারীর সেকেণ্ড মর্টগেজ দেবার বন্দোবস্ত করেছিলাম। স্থির হয়, আজ টাকা দেবে—আলিপুর রেজেষ্ট্রী অফিসে; তাই তাড়াতাড়ি আভ্যুদয়িক সেরে টাকা আনতে গিয়েছিলুম, আসবার সময় গয়না আর বরের দান-টান নিয়ে আসব। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলুম, টাকা পাওয়া যাবে না।" বলিতে বলিতে রায় মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

গৃহিণী সব কথা শুনিয়া শান্তস্বরে বলিলেন, "আর কোথাও চেষ্টা করলে না কেন?"

"চেষ্টার ত্রুটি করি নি, প্রায় কুড়ি টাকা ট্যাক্সি ভাড়াই দিয়েছি। গিন্নি, এ অপমান আমার সহ্য হবে না। দেশ ছেড়ে চ'লে যাই, না হয় গলায় দড়ি দি।"

গৃহিণী বলিলেন, "এর জন্য এত ভাবনা কেন? আমার ত প্রায় পাঁচ হাজার টাকার গয়না রয়েছে, তাই আমি মেয়েকে দিচ্ছি। ভাবনা কি?"

গৃহিণীর কথা শুনিয়া রায় মহাশয়ের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তাঁহার মুখ দিয়া কোনমতে বাহির হইল—"না—না, তা হয় না।"

"কেন হবে না? পাঁচটা নয় সাতটা নয়, ওই একটা মেয়ে, তা ছাড়া যখন এই বিপদ। এই নাও, আমি গা থেকে গয়না খুলে দিচ্ছি।"

আর্ত্তস্বরে রায় মহাশয় বলিলেন, "ওগো, না না, তা হবার উপায় নেই।"

"কেন, তুমি এ কথা বলছ?"

বিপন্নস্বরে রায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "তবে শোন, তোমার মনে আছে, গেল বছর গয়নাগুলো রং করবার জন্য কলকেতায় নিয়ে যাই! কিন্তু যেগুলো নিয়ে যাই, সেগুলো ফিরে আসে নি—ঐ বালা আর হার ছাড়া। তার বদলে যেগুলো এসেছে, সে সবই গিল্‌টির—ঠিক সেই মাপের আর সেই গড়নের।"

শুনিয়া গৃহিণী কাঠ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

এই সময় বাহিরে বিপুল বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খরব শোনা গেল, রায়-দম্পতি বুঝিলেন, বর আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মুহূর্ত্তে সম্বিৎ পাইয়া রায়-গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, এখন আর অন্য উপায় নেই। তুমি ছেলের বাপকে সব অবস্থা খুলে ব'লে সাত দিন সময় নাও, বলো, এর মধ্যেই আমি গয়না আর টাকা নিশ্চয় পৌঁছে দেব।"

"সে শুনবে ব'লে ত মনে হয় না।"

"না শোনেন, উপায় নেই।"

রায় মহাশয় চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন, "আমি ভাবছি কি, না হয় এই গিল্‌টির গয়নাগুলোই এখন চালিয়ে দি, পরে বদলে দিলেই হবে।"

দৃঢ়স্বরে গৃহিণী বলিলেন, "না, তা কখনই হবে না। তাতে মেয়ের সংসার-সুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ হবে। তার চেয়ে বিয়ে না হয় নাই-ই হবে।" তার পর কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, তিনি ভদ্দর লোক, সব কথা বললেই তিনি বুঝবেন।"

"বাঙ্গালার ছেলের বাপকে ত চেন নি, গিন্নি। আচ্ছা, আজ তোমার কথাই শুনবো। তার পর যা থাকে অদৃষ্টে।" বলিয়া তিনি অবশ পা দুটাকে কোনমতে বিবাহ-মণ্ডপের দিকে চালনা করিলেন, গৃহিণী মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়া গৃহদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়, এই কর, বর বরণ করবার জন্য যদি আমাকে উঠতে হয়, তবেই যেন উঠি, নইলে এই শোয়াই যেন আমার শেষ শোয়া হয়।"

৫

বিবাহ-মণ্ডপ। মধ্যস্থলে সুসজ্জিত আসনে বর উপবিষ্ট। পার্শ্বে বরের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ বিচিত্র আলাপ-তর্কে ব্যাপৃত। বালকরা 'প্রীতি-উপহারের' জন্য কাড়াকড়ি হুড়াহুড়ি করিতেছে, কিশোররা প্রথমে ঔদাসীন্য দেখাইলেও শেষে বালকের অধমও ব্যবহার করিতেছে; যুবকরা পড়িতেছে, আর সমালোচনা করিতেছে; প্রৌঢ়রা একবারমাত্র দৃষ্টি-পাত করিয়া উপেক্ষাভরে হাতে করিয়া রহিয়াছে, বৃদ্ধরা পকেটে বা চাদরে বাঁধিয়া রাখিতেছেন, নাতি-নাতনীদের দিবেন; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা যে যাহার ঘনিষ্ঠের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছেন। নিমন্ত্রিতের মধ্যে শিরোমণি ও ডাক্তার ব্রজগোপালও আছেন। সঙ্গে তাঁহার পুত্র গোপাল। রায় মহাশয় যে কেন ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না, ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্যই হউক কিংবা নিজের সাধুতা দেখাইবার জন্যই হউক বা যে কারণেই হউক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহারাও ভদ্রতার খাতিরে আসিয়াছেন। সকলেই আছেন, নাই কেবল দুই কর্ত্তা—বর-কর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা। কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তাকে ডাকিয়া লইয়া গোপনে কি পরামর্শ করিতেছেন, লগ্নের সময় উপস্থিত, তথাপি তাঁহাদের দেখা নাই। এমন সময় হঠাৎ গভীরভাবে বরকর্ত্তার স্বর গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি, জোচ্চুরি! আদালতে পেস্কারি ক'রে মাথার চুল পাকালুম, আমার সঙ্গে জোচ্চুরি!"

সঙ্গে সঙ্গে মিনতিপূর্ণ স্বরে উচ্চারিত হইল, "আমি দিব্য করছি, ব্যাই মশাই, সাত দিনের মধ্যে যা যা দেব বলেছি, সবই দেব। আজ আমি কোনো উপায়েই সংগ্রহ করতে পারি নি।"

বলিতে বলিতে দুই কর্ত্তাই বরাসনের কাছে উপস্থিত হইলেন, সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও কতকটা আন্দাজ করিয়া লইল, তাহারা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

বরকর্ত্তা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সংগ্রহ করবেন ত সম্পত্তি মর্টগেজ দিয়ে, তাও প্রথমবার নয়—দ্বিতীয়বার।"

শুষ্কমুখে কন্যাকর্ত্তা বলিলেন, "কে আপনাকে এ কথা বললে?"

"মশাই, বললুম ত পেস্কারী ক'রে চুল পাকিয়েছি,

আপনার নাড়ী-নক্ষত্রের সব খবর আমি জানি। ভেবেছিলুম, মরুক গে, আমার ত পাওনা নিয়ে কথা, তা সে যেখান থেকেই আসুক। শুনুন মশাই, আমার এক কথা, হয় যা কথা হয়েছে, এখনি তাই দিন, আর ফুলশয্যের পাঁচশো টাকাও এই সঙ্গে নগদ দিন, নইলে আমি বর নিয়ে চল্লুম।"

তখন চারিদিকে একটা বিকট গোলমাল বাধিয়া গেল, কেহ বলিল কশাই, কেহ বলিল চামার ইত্যাদি।

রায় মহাশয় নিজে যাই-ই হউন, তাঁহার বংশের একটা মর্য্যাদা আছে, আজ সেই মর্য্যাদায় আঘাত লাগায় তিনি নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বরকর্ত্তা বর লইয়া সদলবলে চলিয়া গেলেন। রায় মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া শিরোমণি স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন, "রায় মশাই!"

শিরোমণিকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জায় ক্ষোভে রায় মহাশয় মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেও পারিলেন না। শিরোমণি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "রায় মশাই, আপনার ন্যায় মানী ব্যক্তির অপমান, বড়ই দুঃখের কথা। এর প্রতিবিধানের উপায় আপনি যদি অনুমতি করেন, তা হ'লে বোধ হয় করতে পারি।"

রায় মহাশয় শিরোমণির কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বিহ্বলদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। শিরোমণি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আপনি ব্রজ ডাক্তারকে জানেন ত? সে আপনাদের পালটি ঘর, তার ছেলে সংস্কৃতে এম-এ পাশ ক'রে আইন পড়ছে, আপনি যদি বলেন—"

"শিরোমণি—শিরোমণি, কেন এ মরাকে খোঁচাচ্ছ। তোমার নির্য্যাতনের শোধ ত ঐ পেস্কারই দিয়ে গেল, তুমিও দেবে, তা ত ভাবি নি।"

"সীতারাম! এ আপনি কি বলছেন, রায় মশাই! তবে আপনি স্থির হয়ে থাকুন, যা করবার, আমিই কচ্ছি।" তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ব্রজগোপাল পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন। শিরোমণি ডাকিলেন, "ব্রজ!"

"আদেশ করুন।"

"রায় মশায়ের মেয়ের সঙ্গে গোপালের বিয়ে এখনি হয় ত আমি বড় সুখী হই। রায় মশাই বিপন্ন—কন্যাদায়-গ্রস্ত।"

ব্রজগোপাল ডাকিলেন, "গোপাল, এ দিকে এসে এই পিঁড়িতে ব'স।"

বিপুল রবে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে শানাইও মিলন-সঙ্গীতের সুর ধরিল।

রায় মহাশয় ধারাবিগলিত-নয়নে শিরোমণির দুই পা জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া মাত্র বাহির হইল, "ক্ষমা—"

শিরোমণি উদাত্তস্বরে বলিলেন, "ক্ষমা কি চাইতে হয়, সে যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, রায় মশাই!"

শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণ।

পরিণতি

কুসুম কাঁদিয়া কহে মত্ত মধুকরে,—
"তুমি ত ফিরিছ সদা মধুপান তরে;
পরিণামে কিবা হয়—দেখেছ কি তায়?
লাবণ্য ঝরিয়া যায়, সুবাস মিলায়।"

অলি কহে,—"কেন, সখি, কাঁদ তার তরে?
ভাবিয়া দেখেছ কিবা হয় তার (ও) পরে?
ফুল গিয়া ফল হয় সাফল্যের ভারে,
রূপ লভে পরিণতি রসের মাঝারে।"

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য (এম, এ, কাব্য-সাংখ্যতীর্থ)।

৪৩

দুইটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ময়নামতী গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে স্থানে শৈবালাচ্ছন্ন জলাশয়, ডোবা-নালায় প্রভাতে সন্ধ্যায় মশকের ঐক্যতান বাজিয়া উঠিত, এখন সে স্থানে নয়নাভিরাম শ্যামল শস্যক্ষেত্র চঞ্চল পবনে হিল্লোলিত হইতেছে। বাঁশবন—বেতের ঝোপ নির্ম্মূল হইয়াছে, কর্ত্তিত ঝোপের উপর শ্রেণীবদ্ধ সরল সবুজ কার্পাসবৃক্ষ শুভ্র তুলার অলঙ্কার পরিয়া নীলাকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৃহে গৃহে তাঁত, চরকা। সত্যপ্রিয় তাঁত ও চরকায় নূতন রূপ প্রদান করিয়াছেন। কলের হাল-লাঙ্গলেও তাঁহার অভিনব কৃতিত্বে গ্রামের ইতর ভদ্র সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। কোথাও এতটুকু জমী পতিত নাই, সমৃদ্ধশালিনী পল্লী-জননী এক একনিষ্ঠ সেবকের ঐকান্তিক সেবা-যত্নে অজস্র শস্য-সম্ভার বক্ষে লইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। ঝিল-পারাপারের নিমিত্ত সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। সত্যর কারখানায় নির্ম্মিত ছোট ফেরী ষ্টীমারখানা পাইয়া দুই পারের দুঃস্থ গ্রামবাসীরা আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে ; কবিরাজ অমূল্য চক্রবর্ত্তী স্বদেশ-উৎপন্ন গাছগাছড়ায় প্রস্তুত ঔষধে দরিদ্র পল্লীবাসীদের সেবা করিতেছেন। গ্রামে পোষ্ট আফিসের অভাব দূর হইয়াছে। ছেলেদের একটা স্কুল, মেয়েদের পাঠশালা হইয়াছে। সকলে ধন্য ধন্য করিতেছে।

গ্রামের পরিবর্ত্তন হইলেও সত্যর গৃহের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই রাস্তার উপর বসিবার আট-চালা, অন্দরে দুইটি শয়ন-কুটীর, আমিষ নিরামিষের দুইখানা রন্ধনশালা। তরকারীর ছোট বাগানের সম্মুখে গোয়াল, গোয়ালের পার্শ্বে ঢেঁকিঘর। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের এদিকে ওদিকে দুই একটা রজনীগন্ধা, যুঁই ও বেলফুলের ঝাড়। চতুর্দ্দিক্ সৌরভাকুল রহিবে বলিয়া সুনন্দা সাধ করিয়া স্বহস্তে কতকগুলি ফুলের চারা রোপণ করিয়াছিল, সেগুলি এখন আর চারা নাই, অনেক স্থান জুড়িয়া ঝাড় বাঁধিয়া ফুলে ফুলে সাজিয়া উঠিয়াছে।

অগ্রহায়ণের শেষ, বেলা মন্দ হয় নাই। শীতের সুমিষ্ট রৌদ্র বৃক্ষশির হইতে প্রাঙ্গণে লুটাইয়া পড়িয়াছে। খোঁটায় বাঁধা বুধি গাই শ্যামল দূর্ব্বাদল খুঁটিতে খুঁটিতে রৌদ্রটুকু পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেছে। বুধির চারি মাসের লালমণি বাছুরটা সমস্ত অঙ্গনে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। আহারনিরতা মাতা এক একবার মুখ তুলিয়া দুই বিশাল আঁখি মেলিয়া শিশু সন্তানের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। দধিমুখী বিড়াল দুধের কড়া চাটিয়া নিশ্চিন্ত-মনে ঘরের পৈঁঠায় শুইয়া রোদ পোহাইয়া লইয়াছে।

স্নানান্তে পূজা সারিয়া অন্নপূর্ণা রন্ধন করিতেছেন। ভিজা চুলের ডগায় একটা গ্রন্থি বাঁধিয়া কালো-পাড় শাড়ীর আঁচল মাথায় দিয়া হিমু শিলে বাটনা বাটিতেছে। সে দিন-কার সেই শীর্ণা এতটুকু হিমু আজ আর এতটুকু নাই, মাথায় অনেকখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রাবণের নদীর ন্যায় শরীর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

শিলে গরমমশলা ছেঁচিতে ছেঁচিতে হিমু শাশুড়ীর পানে মুখ তুলিয়া শান্ত স্বরে বলিল, "এখন ত আমি ছোট নাই মা, এখনও কি আপনি আমার হাতে খাবেন না? রাঙ্গাদি বলে, গঙ্গাচান না করলে বিধবারা হাতে খেতে পারে না। আমায় কবে গঙ্গাচান করিয়ে আনবেন? একটিবার গঙ্গায় চান করলে আপনাকে আমি কখনও রাঁধতে দেব না।"

অন্নপূর্ণা খুন্তি দিয়া তরকারীটা নাড়িয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমায় রেঁধে খাওয়াতে এত ব্যস্ত কি? চির-কালই যে রেঁধে খাওয়াতে হবে, তখন বিরক্ত হয়ে ভাববে, 'বুড়ীটা মরে না কেন, রোজ রোজ বোক্‌নো পোড়াতে হয়।' তোমার হাতে খাব, তার আবার গঙ্গাস্নানই বা কি, ঠাকুরদর্শনই বা কি, তা নয় হিমু, আমার অত বিচার নেই। তুমি নিজেকে বড় মনে করলেও খুব বড় হ'তে পার নি, আর একটু বড় হলেই আমি তোমারই হাতে খাব। উনুন ছুঁতেও আসবো না। কপাল ভেঙ্গে যাবার পর কত বছর হয়ে গেছে, এ অবধি পরান্ন গ্রহণ করি নি। নিজে রেঁধে হবিষ্যি করতে করতে আমার একটা অভ্যাস হয়েছে, তা একবার ছাড়লে জন্মের মতই ছাড়তে হবে। রান্নাঘরে

মাছ রাঁধতে হয়, তুমি ছেলেমানুষ, দু'ঘর নিয়ে এখুনি পারবে কেন, মা?"

হিমুর বাটনা হইয়া গিয়াছিল। বাটির জলে শিলখানি ধুইয়া খুঁটির গায়ে রাখিয়া সে অভিমানে বলিয়া উঠিল, "রান্না করতে দেবেন না, তাই বলুন, মা। নইলে আমি আবার পারবো না? আমার চেয়ে কত ছোট মেয়ে রান্না রাঁধছে, আর আমাদের বাড়ীতে ত ভারী লোকের রান্না, মোটে তিন চারটি লোক। এতটুকু একটু মাছের ঝোল রেঁধে বেলাভোর বসেই থাক্তে হয়। ওতে দু'ঘর কেন, পাঁচ ঘরেও মানুষ রাঁধতে পারে।"

"আচ্ছা হিমু, তুমি দশভুজা হয়ে পাঁচ ঘরেই রেঁধো, এত ব্যস্ত কি? দিন ত পড়েই রয়েছে। বেলাভোর সতুর জন্যে ভাত নিয়ে ব'সে থাকতে ক্ষুণ্ণ হয়ো না। আমরা ঘরে ব'সে কতটুকু কায করি? সতু যে আমার কাযের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমার একরত্তি শিবরাতের শল্‌তে—সময়ে খাওয়া নেই, নাওয়া নাই, আমার প্রাণের ভেতর ধুক্ ধুক্ করে। এত খাটুনীতে বাছার যদি অসুখ-বিসুখ করে, তখন আমি কি করবো? এত করে' বলছি, 'বড় খাটুনি খেটেছিস সতু, এইবার বিশ্রাম ক'র। বলেছিল, এদিকের কায গুছিয়ে তোমায় নিয়ে পশ্চিমে মাস দুই গিয়ে আমি বিশ্রাম করবো। কায গোছানো হচ্ছেই না।" বলিয়া অন্নপূর্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

হিমু আনত-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, আপনাদের কোথায় কোন্ তীর্থে যাবার কথা হয়েছিল? তীর্থ যাওয়া হবে শুন্‌লে আমার বড্ড ভাল লাগে। আমি কখনও কোথাও যাই নি, আপনি মাঝে মাঝে তাড়া দিলেই যাওয়া হবে মা, নইলে যে ভোলামানুষ—"

লজ্জায় হিমু কথাটা শেষ করিতে পারিল না। ডালা হইতে একটি শাকের পাতা তুলিয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, "সত্যি বলেছ, মা। মনে করিয়ে না দিলে সতু তীর্থের কথা ভুলেই যাবে। ওকে জোর ক'রে বার না করলে স্ব-ইচ্ছায় কখনও বার হবে না। আজ থেকেই আমি যাবার তাড়া দেব, তীর্থে যাবার-জন্যে নয়, তোমরাই আমার বড় তীর্থ। একটিবার বাইরে গেলে সতুর বিশ্রাম হবে, তারি জন্যেই না আমার তীর্থযাত্রা। কোথা যাব—অনেক দিন সতু কাশীতে ছিল, সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, গেলে সকলের সাথে সতুর দেখা হবে, যায়গা ভাল। বিশ্বনাথ টান্‌লে দিনকতক তাঁর চরণ-তলেই থেকে আস্‌বো।"

আনন্দে হিমুর বক্ষ দুলিয়া উঠিল। সে বাল্যকাল অবধি কাশীর কত মাহাত্ম্য শুনিয়া আসিতেছে। কাশীর গঙ্গা, দেবালয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য সমস্তই তাহারা দেখিবে, সেখানে যাইবে।

বিবাহের পর সতু তাহার নিরুদ্দিষ্ট শ্বশুরের অনেক সন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, কাশীবাসী এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বৎসরাধিক পূর্ব্বে সদলবলে বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিয়া, দুর্গম পথে দেহরক্ষা করিয়াছেন। জনশ্রুতি ও রঙ্গদির মুখে শিবশেখরের আকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা শুনিয়া সত্যর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহার শ্বশুর আর জীবিত নাই।

হিমু পিতার স্নেহ জানিত না, পিতাকে জানিত না, তিনি আছেন ভাবিয়াই মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিল। সত্যর অনুসন্ধানের ফল জানিয়া পিতৃ-পরিত্যক্তার আশার ক্ষীণ প্রদীপটিও নিবিয়া গিয়াছিল। আজ কাশীর কথা উঠিতেই তাহার পিতার কথা স্মরণ হইল; মা'র ব্যথা মনে পড়িল। বালিকার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি তখনই ম্লান হইল।

হিমু ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি ত এর আগে একবার কাশী গিয়েছিলেন, মা। সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে বাবাকে হয় ত দেখে থাক্‌বেন? তখন কে জান্‌ত, বাবা কাশীতে থাক্‌বেন। বাবাকে খুঁজে বার করবার লোকও আমাদের ছিল না। তাই বাবা আর ধরা দিলেন না, কিন্তু মা ঠিক বলেছিলেন, বাবা না থাক্‌লে তিনি থাক্‌তেই পারেন না। হলও তাই, মা'র পর বাবার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল। গাঁয়ের লোক মাকে কত কষ্ট দিয়েছে, কত কথা শুনিয়েছে, তারা কেউ জান্‌তো না, মা'র কথা মিছে হ'তে পারে না।"

হিমুর চোখ ছলছল করিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা সস্নেহে কহিলেন, "তোমার সতীমা'র কথা কি মিছে হয়, হিমু? বাবার জন্যে আক্ষেপ করো না, বাবা তোমার মা'য়ের কাছে গেছেন। সেখানে আর জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, নারায়ণের চরণে তাঁরা অনন্ত শান্তিতে আছেন।"

৪৪

মধ্যাহ্নে সত্য আহারে বসিলে মা কাছে বসিয়া তীর্থে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বধূ আধ-ঘোমটার মধ্য হইতে একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিল।

সত্য ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তোমরা কি আমায় এতই ভোলা মানুষ মনে কর, মা? যতটা মনে কর, ততটা ভোলা আমি নই। কাশীতে নিয়ে যাবার কথা আমার দিব্যি মনে আছে, আমি উদ্যোগ-আয়োজনও করছি। এত দিন কাযের ঝঞ্ঝাটে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি, এইবার কায-কর্ম্ম গুছিয়ে এনেছি। দু' এক মাস আমি বাইরে থাকলে কাযের ক্ষতি হবে না। এখন তোমাদেরি তৈরি হবার পালা।"

অন্নপূর্ণা সন্তুষ্ট হইলেন। কর্ম্মস্রোতে ভাসমান সত্য এখনও মায়ের সাধ পূর্ণ করিতে কত যত্নশীল, উদ্‌গ্রীব। এমন সন্তানই যে নারীজীবনের তপস্যার ধন, দেবতার সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান।

তিনি স্নেহে গলিয়া উত্তর দিলেন, "আমি জানি, তোর কাছে মায়ের কোন সাধ অপূর্ণ থাকে না, সতু। তবু মনে হয়েছিল, কাযের তাড়ায় বোধ হয় ভুলে গেছিস। আমাদের তৈরি হ'তে বেশী সময় লাগ্‌বে না রে, আজ বল্লে কা'ল বোচকা বাঁধতে পারি। কিন্তু কোথায় যাবি, তা ঠিক করেছিস ত? যেখানেই যাই না কেন, আগে বাসা নিতে হবে। আমি যেখানে সেখানে থাকতে পারবো, আমার কচি বৌটিকে তা ব'লে যেখানে সেখানে ত রাখতে পারবো না। আগে বাসা ঠিক ক'রে পরে বেরুবার পালা।"

"তা করতে হবে বৈ কি। আমি আজই কুমুদকে চিঠি লিখবো। তুমি কাশী যেতে চেয়েছিলে, আগে কাশী গিয়ে ফিরবার পথে গয়া, বৈদ্যনাথ হয়ে আসলেই হবে। আর কাশী না গিয়ে অন্য কোথাও যদি যেতে চাও, তাও ঠিক করতে পারি, মা।"

"না বাবা, আগে বিশ্বেশ্বরের চরণেই নিয়ে চল, পরে যা হয় হবে। হিমুরও বড় সাধ কাশী যায়, তুই আজই কুমুদকে চিঠি দে, গঙ্গার ধারে যেন বাসা নেয়। কুমুদের উত্তর পেলে যাওয়ার দিন ঠিক করা যাবে। এর ভেতর তোর কায-কর্ম্ম সেরে নে। বাসা হ'লে কিন্তু তোর কোন ওজর আপত্তিই খাটবে না।"

"তোমার ভয় নেই, মা। আর কোন ওজর করবো না।" বলিয়া সত্য আহারান্তে উঠিয়া গেল।

নির্জ্জন কক্ষে হিমু পাণের ডিবাটি সত্যর হাতে তুলিয়া দিতেই সত্য পত্নীর দিকে চাহিয়া সকৌতুকে কহিল, "আজ যে বড্ড দয়া দেখছি, রোজ পাণের ডিবেটা বিছানায় রেখে পাণ দেবার কর্ত্তব্য সেরে রাখো, আজ দেখছি, স্বয়ং সশরীরে হাজির, ভারি খুসী ভাব যে, ব্যাপারখানা কি?"

হিমু স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসি হাসিয়া জবাব দিল, "আহা, কিছু যেন বুঝতেই পারছেন না! কাশী যাওয়া হবে, তা' শুনেও হাসি-খুসী হবে না, তবে হবে কিসে? তুমি ত জানো না, আমার কত কালের সাধ পূর্ণ হ'তে চলেছে। আচ্ছা, একটা কায করলে হয় না—কাশীর পথে কামাখ্যা দর্শন ক'রে গেলে চলে না?"

সত্য আনমনা হইল। কোথায় কামাখ্যা—কোথায় কাশী! হিমু দিঙ্‌নির্ণয় করিতে একবারে অদ্বিতীয়। এত দেশ থাকিতে, এত তীর্থ থাকিতে, সর্ব্বাগ্রে তাহার কামাখ্যার কথা মনে হইল কেন? কামাখ্যা আসাম ওই শব্দগুলি যে রক্তের অক্ষরে সত্যর বুকে লেখা হইয়া রহিয়াছে!

স্বামীকে নীরবে চিন্তামগ্ন দেখিয়া হিমু তাহার বাহুস্পর্শ করিয়া ডাকিল, "শোন, চুপ ক'রে রইলে কেন? কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হওয়া—এ তোমার গেল না। কাশীর পথে কামাখ্যা নামতে চেয়েছি, সেটা খুব ভয়ঙ্কর বিষয় নয়, যার জন্যে এমন ভাবতে বোসে গেছ।"

সত্য শুষ্ক হাসি হাসিয়া জবাব করিল, "ভয়ঙ্কর ব'লে ভয়ঙ্কর, এমন ভয়ঙ্কর আর নেই। কোথা কাশী, কোথা কামাখ্যা—হৈমবতীর এ ভূগোল-জ্ঞানেও আমায় যদি ভাব্‌তে না হয়, তা হ'লে ভাব্‌বো কিসে? তা থাকুক, কিন্তু তোমার ত সাহস কম নয়, মুল্লুকের এত দেশ থাক্‌তে তোমার কামাখ্যা যাবার সখ হ'ল কেন? শোন নি কি কামাখ্যা গেলে মানুষ ভেড়া হয়? অবশেষে আমায় ভেড়া বানাতে তোমার উঠে-পড়ে লাগা, স্ত্রী যে স্বামীর এমন শত্রু, তা জান্‌তাম না। কামাখ্যা যাবার যখন সাধ হয়েছে, তখন দড়ি-খোঁটার যোগাড় রাখ্‌তে হয়।"

সত্যর আর বলিতে হইল না। হিমু খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিছুতেই হাসির উচ্ছ্বাস থামিতে চায় না।

হাসি থামাইয়া স্বামীর প্রতি মুখ তুলিয়াই আবার সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

কিশোরীর সরল হাসির মূর্চ্ছনায় নিস্তব্ধ গৃহ মুখরিত হইল। বাহিরে তরুপল্লব যেন মন্থর শব্দে বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিল। মধুকর-গুঞ্জরিত বাতাবী ফুলগুলি চারিদিকে পরিমল বিলাইয়া হাসিতে হাসিতে ধরণীর ধূলায় ঝরিয়া পড়িল। সুদূর হইতে ভাসিয়া আসা বনবিহগের গানের রেশ সত্যর কর্ণে হাসির ঝঙ্কারে ভরিয়া তুলিল। বিশ্ব কি সুন্দর হাসিমাখা, আকাশ কি উদার নীলোজ্জ্বল, বাতাস কি স্নিগ্ধ সুরভিময়, সর্কোপরি হিমুর সুন্দর মুখের সুন্দর হাসিটি কি মধুর পবিত্র, কিন্তু এত মধুরতায় কাহার একখানি মুখ হৃদয়-দ্বারে উঁকি দিয়া সমস্ত সুন্দরকে অসুন্দর করিতে চাহে। আজকাল সে মুখের অতর্কিত আবির্ভাবে সত্য সংশয়ে সঙ্কুচিত হয়। সে মুখখানি আর তাহার ধ্যানের বস্তু নহে। সভয়ে সসঙ্কোচে সত্য তাহা দূরে পরিহার করিতে চায়।

কিয়ৎকাল হাসিয়া হাসিয়া হিমুর হাস্যস্রোত আপনা-আপনিই থামিয়া গেল। হাতের বালা খুঁটিতে খুঁটিতে হিমু অনুযোগের স্বরে বলিল, "তোমার মত এমন অদ্ভুত লোক একটিও দেখি নি। নিজে না হেসে অন্যকে এম্‌নি ক'রে হাসাতে পার! কামাখ্যা যেতে হ'লে এখুনি তোমায় খোঁটা-দড়ি সংগ্রহ করতে হবে না। যারা একলা যায়, তাদেরি ভেড়া হবার ভয়, আমি সঙ্গে যাব, সেখানে দিদি আছেন, কাযেই ভেড়া বানিয়ে দিলেও তোমার ভেড়া হওয়া হবে না।"

অকস্মাৎ সত্যর ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইল। সে নিজেকে সংযত করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "এ তোমার কেমন ঠাট্টা হ'ল হিমু? এ ঠাট্টা শুনলে আমার যে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে, সেটাও তোমার ভেবে দেখা উচিত। ছিঃ, তুমি এম্‌নি হাল্‌কা, এক জন পরস্ত্রীর সম্বন্ধে—তিনি তোমার দিদি হন, কিন্তু আমার—ছিঃ হিমু।"

এ তিরস্কারে হিমু বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইল না। দুই বিশাল নেত্র সত্যর মুখের উপর মেলিয়া সতেজে বলিল, "কাকে তোমরা পরস্ত্রী ব'লে অপমান কর, আমার দিদিকে? ওগো, আমি কেমন ক'রে বলবো, দিদি তোমার পরস্ত্রী নয়, নিজের স্ত্রী। তোমরা আমার কোন কথাই শুনতে চাও না, বিশ্বাস কর না, আমি কি করবো, কি করতে পারি? আমাকে আশ্রয় দিয়ে দিদি আমার আজ আশ্রয়হারা, আমাকে সুখী করতে দিদি দুঃখের পসরা মাথায় নিয়েছে। তোমরা দিদিকে চেনো না, জানো না, তাই সে যা নয়, তাই ভেবে রেখেছ।"

হিমুর এ অনুযোগ অভিযোগ নূতন নহে। সে যে মুহূর্ত্তের জন্যও নন্দাকে বিস্মৃত হয় নাই, ইহা সত্যর অবিদিত ছিল না। বংশগত রক্তের টান ও বালিকার খেয়াল ভাবিয়া সত্য হিমুর এ সব কথায় বড় একটা কাণ দিত না। নন্দার প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র সে কৌশলে তাহা এড়াইয়া চলিত। কি জানি আজ কি ভাবিয়া সত্য আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভেবে রেখেছি?"

উত্তেজনার সহিত হিমু উত্তর করিল, "তোমরা ভেবে রেখেছ, আসামের জমীদারের সাথে সত্যিই বুঝি দিদির বিয়ে হয়েছে। আমি বলছি, কখখনো তা হ'তে পারে না। যে দিন মা দিদিকে এ বাড়ীতে এনে বেনারসী কঙ্কণ পরিয়েছিলেন, সেই দিন তোমার সঙ্গেই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। তোমরা মোক্ষদা ঠাকরুণের কথা শুনে ভাল ক'রে একটা খোঁজ নিলে না। নিলে সবই জানতে পারতে।"

"আজ যে তোমার রাজ্যের বাজে কথা ফুরুচ্ছে না। জান্‌বার কি কিছু বাকী আছে, হিমু? আচ্ছা, মেনে নিলাম তোমার ধারণাই সত্যি, কিন্তু বিয়ে না হ'লে পরের ঘরে কি কেউ বছরের পর বছর কাটাতে পারে? একটা মিছে কথা মনে মনে পোষণ ক'রে কেন আমাকে তুমি যখন-তখন ত্যক্ত কর? আমাদের স্নেহ-মমতা পেয়েও কি তোমার আপনজনার অভাব পূর্ণ হয় না! যা শুনতে ভালবাসি না, তা' রাতদিন শোনানো কি ভাল, হিমু?"

"কে বলে ভালবাস না? রাগ ক'রেই না দিদির কথা তুলতে দাও না! তুমি মুখে যতই রাগ কর না কেন, তোমার অন্তর যে দিদিতেই ভরা, তা আমি জানি। দিদির আপন ঘর হ'লে বংশীদা কখনও দেশত্যাগী হতেন না, এত দিন নিশ্চয় ফিরে আসতেন। তোমাদের ভালবাসা পেয়ে দিদিকে যে আমার বেশি বেশি মনে হয়; এ সব ত তোমরা আমায় দেও নি, দিদিই দিয়েছে।—দেখ, মা'র সে সময়কার সে কথা—সে চাহনি কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না, মা যখন এ মায়ের পায়ে আমাকে জন্মের মত

দিতে চাইলেন, তোমায় দিতে চাইলেন, তখন তোমরা আমার ভার নিয়ে মাকে মুক্তি দিতে সাহস পেলে না। মার বুক দুঃখে ফেটে যাবার মত হ'ল, সে সময় দিদি আমার ভার নিলেন, মা'র মনোগত সাধ পূর্ণ কর্‌তে চাইলেন। মা'র মুখ আনন্দে হেসে উঠ্‌লো। সুখে আত্মহারা হয়ে আমি কি সেই দিদিকে ভুলবো ?"

হিমুর নয়নপ্রান্ত বহিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল, অবাক্‌পটু বালিকার যুক্তিযুক্ত বাক্যে বিস্মিত সত্য হতবাক্ হইয়া রহিল।

৪৫

দুই ভাই-বোনের মধ্যে তুমুল তর্ক চলিতেছিল। নন্দা কহিতেছিল, "তোমার একবার বাড়ী যাওয়া উচিত, দাদা। দু' বছর হ'ল, বাড়ী-ঘর ছেলে-মেয়েদের ফেলে মানুষ কি এমনি হয়ে থাকে ? যে বৌদি লিখ্‌তে জানতো না, সে-ও প্রাণের দায়ে লেখা শিখে চিঠি লিখেছে—'গয়না শাড়ী আর আমি চাই না, টাকা-পয়সারও আমার প্রয়োজন নাই, তুমি ফিরে এস।' দাদাঠাকুরও জানিয়েছেন—'বৌদি রোগা হয়ে গেছে, কারুর সাথে ভালো ক'রে কথা বলে না, আপনার হাতে বুড়োশিবের পূজো করে। সুজলা টুনটুন 'বাবা আসে না' ব'লে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।' সেই বৌদি—তার এত পরিবর্ত্তন—এতেও কি তোমার দয়া হয় না ? তুমি কি নিষ্ঠুর !"

বংশী উত্তর করিল, "নিষ্ঠুর ব'লে নিষ্ঠুর, কিন্তু তোর চেয়ে নয়, নন্দা। যে যা ভালবাসত, আমি দূরে থেকে তাই দিচ্ছি। তুই করছিস কি ? মজা ক'রে কাশীবাসী হয়ে আমায় ঘরগোলা ক'রে আবার ঘরে পাঠাবার মতলব, আমি কিছুতেই আর সেখানে যাচ্ছি না। তোর অনেক পরামর্শ শুনে অনেকবার ঠকে গেছি, আর ন্যাড়া বেলতলায় যাবে না।"

নন্দা রাগতস্বরে কহিল, "না গেলে আমার বয়েই গেল, তোমারি ছেলে, মেয়ে, বৌ কেঁদে খুন হচ্ছে। আমার জন্যে কেউ কাঁদ্‌ছে না, দাদা। আমায় না নিয়ে তুমি যাবে না, এ কেমন কথা বল দেখি, দাদা ? আমি সেখানে গিয়ে কি করবো ? এমন শীতল গঙ্গার জল, এমন বিশ্বনাথ, শান্তির স্থান জগতে আর কোথায় পাবো ? তুমি যদি কিছুতেই বাড়ী না যাও, তা হ'লে দাদাঠাকুরের ওপর বাড়ীর ভার দিয়ে বৌদিদের এখানেই আনাও না কেন ? এখন ত তোমার অভাব নাই। গানের স্কুলে গান শিখিয়ে পঞ্চাশ টাকা পাও, টিউসানি ক'রেও পঞ্চাশ-ষাট পাচ্ছ, ছোট একটা বাসা নিলে ওতেই বেশ চ'লে যাবে। বৌদি জন্মাবধি কিছুই দেখে নি, এই উপলক্ষে ওর দেখাশোনা হবে।"

বংশী ক্ষণকাল চিন্তার পর অপ্রসন্নমুখে কহিল, "তা হয় না। আমার চৌদ্দ পুরুষের ভিটায় সন্ধ্যাবাতি বন্ধ ক'রে, ইষ্টদেবতা বুড়োশিবের ফুল-জল বন্ধ ক'রে, সবশুদ্ধ এখানে থাকা হয় না। ওরা যেমন রয়েছে, তেমনি থাকুক, আমরা যেমন আছি, তেমনি থাকি। গঙ্গাজল তোর কাছে যেমন শীতল, আমার কাছেও তেমনি, বিশ্বনাথ তোরও বিশ্বনাথ, আমারও বিশ্বনাথ, তুই যদি এ সব নিয়ে জীবন কাটাতে পারিস্, তবে আমিই বা পারব না কেন ?"

"কি পারবে না, বংশী ? সকালবেলাই তোমাদের কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে ?" বলিতে বলিতে যোগমায়া আসিলেন।

বংশী মুখ হাত নাড়িয়া মহা আড়ম্বরের সহিত বলিয়া উঠিল, "আসুন মা, আপনিই বিচার করুন। নন্দা আমায় বাড়ী পাঠাতে নাছোড়বান্দা হয়েছে। ও আমার কাশীর কালভৈরব, কিছুতেই এখানে থাক্‌তে দেবে না, নিজে মজা ক'রে পুণ্যসঞ্চয় করবে। যত পাপের ভাগী আমি হব।"

যোগমায়া সহাস্যে বলিলেন, "পাপের ভাগী যে তোমারি হবার কথা, বাবা। তোমার স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, তাদের ফেলে ত উদাসীন হওয়া সাজে না। বল্‌তে পার, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তোমার পরিশ্রমের সব মূল্যই তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছ। স্বামি-স্ত্রীর, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ কেবল আর্থিক নয়। গৃহীর চিরদিন গৃহের বাইরে থাকা পোষায় না। তুমি যেতে যদি না পার, তাদের কাছে নিয়ে এস। শুন্‌লাম, বৌমা নাকি কেঁদে-কেটে চিঠি লিখেছেন, এ অবস্থায় অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে তোমার তাদের কাছে থাকা উচিত। নন্দিনী অন্যায় বলার মেয়ে নয়, যথার্থ বলেছে।"

সুনন্দা বলিল, "কেমন দাদা, এখন হয়েছে ত ? মাসীমার কাছে বড় না বিচারপ্রার্থী হয়েছিলে ? মাসীমা ন্যায়বিচারই করেছেন।"

"মা তোর দিক্ হয়ে বিচার করেছেন, তুই যে মাসীমা বলিস, জানিস না, লোকে বলে, 'মা'র চেয়ে মাসীর দরদ বেশী।' আমি মা-ডেকে ঠকেছি, তোর মাসীমা ডাকে জিত। কিন্তু নন্দার দিকে রায় দিলে চল্‌বে না। আমার কথাও আপনার শুনতে হবে, মা; আমি বাড়ীতেই যাই অথবা তাদের কাছেই আনি, ত্নটোতেই আমার সংসারের সুখভোগ করা হবে, আপনাকে বলতে কি, আমি যে তা চাই না। আমার নন্দাকে সন্ন্যাসিনীবেশে রেখে সুখ-শান্তি ভোগ করা আমার দ্বারা হবে না। লোকের চোখে নন্দা আমার গলগ্রহ—একটা অরক্ষণীয়া বোন, আমার কাছে সে যে কি—তা ত আপনি জানেন, মা! বিশ্বনাথ যদি সুখী করেন, দুই জনকেই করবেন, নইলে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে সুখী হওয়া আমার হবে না।"

শেষের দিকে বংশীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল,—চোখের কোণ অশ্রুভারে টলটল করিতে লাগিল।

যোগমায়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এত উদার, এত মহান্ ভাই-বোনের ভালবাসা! মৌখিক বিরাগ-কলহের অন্তরালে কি সুধার প্রস্রবণ বহিয়া যাইতেছে! তিনিও তাঁহার দাদার সহিত শতবার কলহ করিয়া পরক্ষণে ভাব করিতেন। এখন সে দিন কোথায়? সে দাদা কোথায়?

বংশীর কথাগুলি নন্দার অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার নয়নে অশ্রুধারা নামিয়া আসিতে চাহিলেও সে তাহা গোপন করিবার প্রয়াসে শীত-রৌদ্রালোকিত বাহিরের দিকে চাহিল। তাহার চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সেই রমণীয় প্রভাতে কর্ম্মের সহিত শান্তি বিরাজ করিতেছিল। কেবল শান্তি ছিল না তাহাদেরই মনে।

সুনন্দা ভাবিল, এ জীবনের সমাপ্তি কোথায়? তাহারই নিমিত্ত বংশী গৃহত্যাগী, বধূ বিরহে ক্লিষ্টা, শিশুগণ পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত। বংশীর এত বোঝা নন্দা কিরূপে বহিবে? অন্তর্যামী ত অন্তরে থাকিয়া দেখিতেছেন, দিনে দিনে পলে পলে সে কত অকর্ম্মণ্য—কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আর কেন, হে বিশ্বনাথ, তুমি যে বিশ্বের সকল ভার শ্রীচরণে তুলিয়া লও, অধম পাতকিনী বলিয়া নন্দা কি সে করুণার অযোগ্যা? একটু স্থান, শুধু একটু স্থান দাও, প্রভু, সকল দ্বন্দ্বের সমাধা হউক।

নিস্তব্ধ গৃহ মুখরিত করিয়া ঠং ঠং শব্দে ঘড়ীতে আটটা বাজিয়া গেল। বংশী ত্রস্তে উঠিয়া আল্‌না হইতে উড়ানি-খানা স্কন্ধে ফেলিয়া চটী জুতাজোড়ার মধ্যে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে বলিল, "ও, আজ রবিবার ভুলেই গিয়েছিলাম, হাড়ারবাগে এক জনকে ৮টা থেকে এগারোটা অবধি বেহালা শেখাতে হবে। আমি চল্লাম।"—বলিয়াই বংশী হন হন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

টগর আসিয়া ডাকিল, "মা, আজ না মাঘী-পূর্ণিমা, আপনি কি দর্শনে যাবেন? ক'টায় গাড়ী বার করতে হবে, ড্রাইভার জিজ্ঞেস করছে।"

"হাঁ, এখুনি গাড়ী বার করতে বল গে। নন্দিনি, তুমি তৈরি হয়ে নাও, মা। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার মন্দির হয়ে আজ একবার তিলভাণ্ডেশ্বরের ওদিকে যাবার ইচ্ছা আছে। অনেক দিন যাই না। তুমি এস, আমি তোমার মেসো-মশায়কে তাড়া দিই গে।" বলিতে বলিতে যোগমায়া প্রস্থান করিলেন।

নন্দা জানালার গরাদে মাথা রাখিয়া তেমনই অর্থ-শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। প্রভাতের এক অঞ্জলি সোণার রৌদ্র মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহে প্রবেশ করিয়া সাদা পাথরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। পাশের বাগান হইতে আম্রমুকুলের সুমিষ্ট গন্ধটুকু প্রমত্ত পবন চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পর যোগমায়া ফিরিয়া আসিয়া উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসিলেন, "এ কি নন্দিনি, তুমি রোদে মাথা দিয়ে অমন ভাবে রয়েছ কেন, অসুখ বোধ করছ? চোখ-মুখ রাঙ্গা হয়ে গেছে, এস ত গায়ে হাত দিয়ে দেখি।"

সুনন্দা সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, "আমার অসুখ হয় নি, মাসীমা। রোদটুকু ভাল লাগছিল ব'লে—রোদে ছিলাম, মেসোমশায় গাড়ীতে গিয়ে বসেছেন, চলুন, আমরাও যাই।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

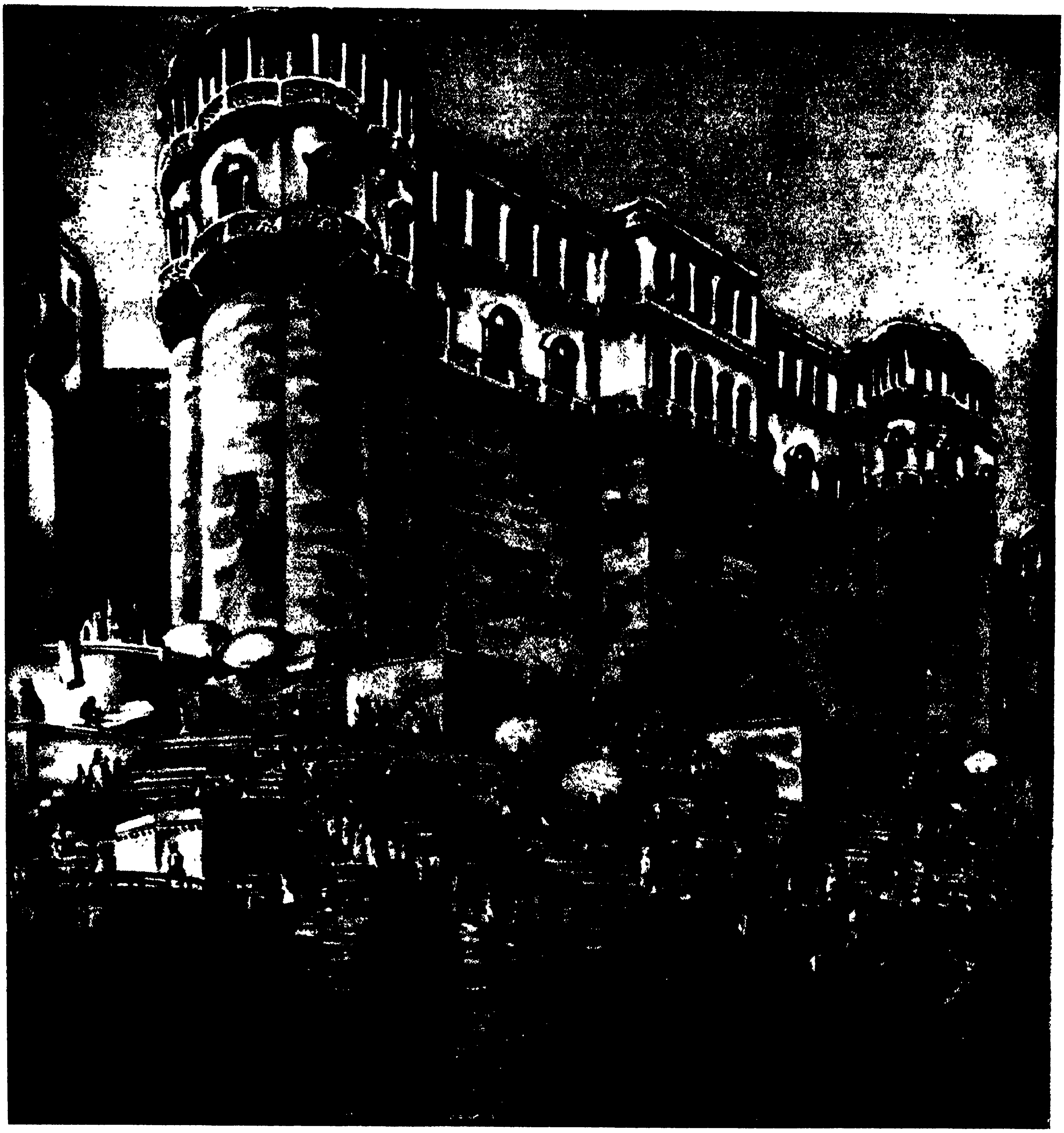

বারাণসী—অহল্যাবাঈ ঘাট

বসুমতী চিত্রবিভাগ

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

বিন্তি

১

দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী দলবল লইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। তবে সকল জেলায় প্রবেশাধিকার পায় নাই; যে দেশে পুরুষকারকে দৈব সাহায্য করিয়াছেন, সে দেশের রুদ্ধ দুয়ারে মাথা নোওয়াইয়া দুর্বল ও নিঃসহায়কে পীড়ন করিতে দানবী ছুটিয়াছে। কোন স্থানে সেনাপতিদের পাঠাইল, কোন স্থানে নিজে আসিয়া সৈন্য পরিচালনা করিল। হেড কোয়ার্টার্স হইল হলদিঘাট।

দানবীকে যুদ্ধ দিতে সন্ন্যাসীর দল সাজিলেন; অস্ত্র যোগাইলেন মহাপ্রাণ গৃহস্থরা। দুইটি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া দানবীর কবল হইতে নিঃসহায় প্রজাদের রক্ষা করিতে হলদিঘাটে উপনীত হইলেন এবং গ্রামে গ্রামে সাহায্য প্রেরণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তিন জন সন্ন্যাসী আসিয়া বিশাখা নদীতীরবর্তী গণ্ডগ্রাম বেতনায় সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র দলে এক জন তরুণবয়স্ক ধনি-সন্তান ছিলেন। সখ করিয়া হউক অথবা যে কারণেই হউক, তিনি এই সেবাকার্য্যে যোগ দিয়াছেন। নবীন যুবকের নাম সত্যেন্দ্রনাথ।

গ্রামপ্রান্তে যেখানে তাঁহারা বাসা লইয়াছিলেন, সেখানে বড় একটা লোকের বসতি ছিল না। তাঁহাদের আশ্রমটি ছোট, মাত্র তিনখানি খড়ের ঘর। একটা ঘরে ভাল ভাল কাপড়ের বস্তা ছিল; দ্বিতীয় ঘর সেবকদের বাসের জন্য; তৃতীয়টি রন্ধনশালা। ভৃত্যাদি ছিল না, সেবকরা স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। সত্যেন মহা উৎসাহে রন্ধনকার্য্যে সাহায্য করিত, কিন্তু ভোজনকালে মুখ বিকৃত করিত। যাহা দরিদ্রনারায়ণের সেবার্থে প্রদত্ত হইত, তদপেক্ষা উত্তম আহার্য্য সন্ন্যাসীরা গ্রহণ করিতেন না।

সত্যেন প্রাচুর্য্য ছাড়িয়া অভাবের মধ্যে সহসা আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতা নষ্ট হয় নাই। অপরাহ্ণে যখন সে কয়েকটা আলু লইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার মহানন্দ। যুবক সন্ন্যাসী সেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ শ্মশানে আলু কোথা পেলে, সত্যেন?"

"আবিষ্কার করেছি।"

"আবিষ্কার করতে কি আমেরিকা যেতে হয়েছিল?"

"অত দূর যেতে হয় নি; তার চেয়ে নিকটে চেরাই গাঁয়ে পেয়েছি।"

"ও-দিকে কি করতে গিয়েছিলে?"

"চাল পয়সা বিতরণ ক'রে আমি ঐ পথে ফিরছিলাম, পথের ধারে দেখি কি না, একটা বড় চালাঘরে শিয়ালে ভিড় লাগিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি, ঘরের মেঝেতে একটা মানুষ ম'রে প'ড়ে রয়েছে, আর তার পাশে একটা মেয়ে মরবে ব'লে শুয়ে আছে—"

"সে কি রকম?"

"রকম ত' এ দেশে আর পাঁচটা নেই; যা' দেখছেন চারিদিকে, সেই রকমই—"

"না খেতে পেয়ে মেয়েটা মরতে বসেছে বুঝি?"

"এইবার দেখছি, রকমটা আপনি ধ'রে ফেলেছেন। বুড়োটা আগে স'রে পড়ল—"

"সে-ও বুঝি না খেয়ে মল?"

"আপনি কি বল্‌তে চান, পোলাও-কাবাব খেয়ে মরেছে? তা' নয় ঠাকুর, সাত দিন হরিমটর ছাড়া তা'র পেটে আর কিছু যায় নি।"

"হরিমটরটা কি?"

"উপবাস—নির্ম্মল বিশুদ্ধ উপবাস।"

"মেয়েটা বেঁচে আছে?"

"এখন আছে কি না, জানি না, তখন কতকটা ছিল।"

"তার কোন ব্যবস্থা করেছ?"

"আর কিছু না পারি, তার একটা নামের ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।"

"সে আবার কি?"

"তার নাম দিয়েছি বিন্তি।"

"বিন্তি?"

"হাঁ। সে তার মামার সঙ্গে বিন্তি খেলছিল—কে হারে, কে জেতে। বুড়ো মামা হেরে স'রে পড়ল, মেয়েটার হাতে গোলাম ছিল ব'লে জিতে গেল।"

"দেখ সত্যেন, সব সময় রহস্য করা ঠিক নয়।"

"কোন্ সময় রহস্য করব, তার একটা নিয়ম বেঁধে দেবেন।"

"সে গ্রামটা এখান হ'তে কত দূর?"

"তা' ঠিক ক'রে বল্‌তে পারব না, আমার সঙ্গে ফিতে গজ ছিল না।"

"তোমার নিকট হ'তে কোন কথা সহজে পাবার যো নাই। কি গ্রাম বললে? চেরাই? আমি চললুম—"

"দাঁড়ান, আস্ল কোথা পেলাম, শুনে যান—"

"আর শুন্‌বার দরকার নেই।"

"আপনি অত বেগে ছুটছেন কোথা? মেয়েটা সেখানে নেই।"

"তবে কোথা?"

"এই গাঁয়ে।"

"তুমি তাকে এনেছ বুঝি? গোড়ায় বললেই ত চুকে যেত।"

"জেপলিনে ক'রে তাকে আন্‌তে গিছলাম—"

"সে মড়াটার গতি কি হ'ল?"

"সদ্গতি—শিবা জঠরে। আহা, সে মহাপুণ্য সঞ্চয় ক'রে গেল, পরজন্মে হয় ত কোন সাধু-টাধু হয়ে আসবে, বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে স্বীয় দেহ দ্বারা ব্যাঘ্রের উদরপূর্ত্তি করিয়েছিলেন।"

"তুমি আমাদের অপমান করছ, সতোন?"

"আপনাদের মান-অপমান-জ্ঞান থাকা উচিত নয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন—"

সন্ন্যাসী দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

২

বিন্তিকে সতোন কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিয়াছিল। গ্রামপ্রান্তে এক দরিদ্র বৃদ্ধার কুটীরে তাহাকে রক্ষা করিয়া একটু দুধ খাওয়াইয়াছিল, কিন্তু সে কথা আশ্রমের কাহাকেও বলে নাই;—বলিয়া বেড়ান তাহার স্বভাব নয়। কত দুঃস্থ ব্যক্তিকে অন্নবস্ত্র দিয়া বেড়াইতেছে, সতোন কাহাকেও তাহা জানিতে দিত না। সতোনের পিতা এই সেবা-কার্য্যে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় এই মহাপ্রাণ দাতার পুত্রকে স্বেচ্ছা-সেবকরূপে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেবানন্দ বিদায় হইলে সতোন ভাণ্ডার হইতে কিছু চাল, ডাল, লবণ ও এক জোড়া নূতন বস্ত্র লইয়া আশ্রম ত্যাগ করিল। পথে আশ্রমের অন্যতম সন্ন্যাসী আত্মানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাচ্ছ, সতোন বাবু?"

"বমি করতে।"

"সে কি রকম?

"দেখছি, আপনাদের রকমে পেয়েছে। বমি মানে ভমিটিং।"

"শুধু শুধু বমি করবে কেন?"

"খেয়াল।"

"তোমার কি অসুখ করছে?"

"বালাই—ষাট!"

"তবে বমি করবে কেন?"

"আপনাদের আশ্রমে যে রকম খাওয়া-দাওয়া চলছে, তা'তে বমি না ক'রে থাকা যায় না।"

"তোমার গামছায় কি?"

"চাল, ডাল, নুণ, লঙ্কা—"

"কোথা নিয়ে যাচ্ছ?

"রান্না ক'রে খেতে।"

"বমিও করতে, আবার খেতেও হবে?"

"বিধাতার নিয়মই এই। গীতা-টীতা একটু পড়বেন।"

"তোমার বগলে কাপড় কেন?"

"বেচে দুধ-চিনি কিনব ব'লে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে—চল্লুম।"

বলিতে বলিতে সতোন প্রস্থান করিল। বৃদ্ধার জীর্ণ কুটীরে আসিয়া ডাকিল, "আয়ি!"

উত্তর নাই।

"বেঁচে আছিস, না ম'রে গেছিস?"

এবার আয়ি শুনিতে পাইল। ভিতর হইতে সাড়া দিল, কিন্তু উঠিয়া আসিতে পারিল না। সতোন ভগ্নপ্রায় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি রে, এখনও তোরা বেঁচে আছিস?"

আয়ি উত্তর করিল, "হ্যাঁ দাদা, এখনও বেঁচে আছি—যমে আর কি নেবে?"

"খুব নেবে; নেবার জন্যেই যম আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—বলিস ত ডেকে দি।"

"আর দাদা—"

"নে, এখন ওঠ।"

বৃদ্ধা উঠিয়া বসিল। সত্যেন ডাকিল, "ওরে বিন্তি, চুলোটা ধরিয়ে ফেল্—"

অন্ধকার কোণে একটি মেয়ে ন্যাকড়া পরিয়া বসিয়াছিল, সে বুঝিয়াছিল, তাহার নামকরণ হইয়াছে বিন্তি। সে সাড়া দিল, কিন্তু উঠিয়া আসিল না, অঙ্গের কাপড় টানিতে টানিতে অন্ধকারের দিকে আরও সরিয়া গেল, মেঘ-ঢাকা চাঁদের ন্যায় তাহার মুখখানি অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃদ্ধা অর্দ্ধনগ্না, বিন্তি তা'র উপর আরও কিছু। সত্যেন বুঝিল, বালিকা কেন উঠিয়া আসিল না। তখন সে বস্ত্র যোড়া ফাড়িয়া দু'জনকে দুইখানা দিল এবং বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বল্পকালমধ্যে বিন্তি নূতন কাপড় পরিয়া বাহিরে আসিল এবং সত্যেনকে একটা প্রণাম করিল। সত্যেন কহিল, "নে নে, আর পেরণাম করতে হবে না, তোর মত লোকের পেরণাম পেয়ে আমি ধন্য হয়ে যাব। মা গো, চেহারা দেখ, যেন একখানা কাঁঠালের তক্তা।"

বিন্তি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। সত্যেন কহিল, "কি রে, রাগ হ'ল না কি ? তা তোর যে চেহারা, তোকে তক্তা বলব না ত কি বলব ? হাত-পা যেন আকন্দ গাছের ডাল, চোখ দু'টো কোথা যে লুকিয়ে পড়েছে, তার সন্ধান নিতে হ'লে জ্যোতিষী ডাকতে হয়, মাথার চুলগুলো যেন পরচুল-পরা সন্ন্যাসীর জটার মত, নাকটা খাঁড়ার মত দাঁড়িয়ে,—পাঁঠার দিকে তাক্ করছে—"

বৃদ্ধা আসিয়া কহিল, "চুলোটা ধরাতে কেন বল্‌ছিলে, দাদা ?"

"তোকে পোড়াব ব'লে। এই তোর পিণ্ডি এনেছি। ঘরে হাঁড়ি-কাঠ আছে ?"

"হাঁড়ি আছে, কাঠ নেই।"

"কাঠ আন্‌তে আমাকে কি আবার ছুটতে হবে ? ভাল জ্বালা ! এর চেয়ে তোরা ম'রে গেলেই ভাল ছিল।"

বলিয়া সত্যেন চাল-ডাল রাখিয়া প্রস্থান করিল এবং দণ্ডখানেকের মধ্যে এক বোঝা কাটা বাঁশ ঘাড়ে করিয়া ফিরিয়া আসিল। কহিল, "দেখ বুড়ী, এতে তোর চুলো জ্বল্‌বে কি না।"

"ঢের হবে, কিন্তু আর একটা হাঁড়ি যে চাই, দাদা।"

"আ মলো ! কত ভাত রাঁধবি যে, গণ্ডায় গণ্ডায় হাঁড়ি চাই ?"

"আমি ছোট জাত, আমার হাঁড়িতে মেয়েটির রান্না হবে কেমন ক'রে, দাদা ?"

"আরে, এটা যে জগন্নাথ-খেত্তর, আজকাল যেমন বিয়েবাড়ীতে—"

বিন্তি। আমি ভাত নাই খেলাম, দুধ ত খেয়েছি।

সত্যেন। ভাত খেয়ে খেয়ে তোর অরুচি ধরেছে না কি ?

বলিয়া সত্যেন প্রস্থান করিল। হাঁড়ি লইয়া যখন ফিরিল, তখন উনান ধরিয়া গিয়াছে। সত্যেন হাঁড়ি রাখিয়া কহিল,"আচ্ছা চাকর বানিয়ে নিয়েছিস্ আমাকে। কি কর্ম্মভোগ !"

বালিকা কোন উত্তর না করিয়া হাঁড়ি চাপাইয়া দিল। পূর্ব্বাহ্নে জল আনিয়া রাখিয়াছিল। হাঁড়িতে জল দিল, কিন্তু চাল দিল না। সত্যেন অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, "তোদের ভাত কি আমাকে রেঁধে দিতে হবে ?"

কেহ কোন উত্তর করিল না দেখিয়া সত্যেন পুনরায় কহিল,—"আমি রেঁধে দিলে তোদের জাত যাবে না, আমি বাগবাজারের বোস কায়েত ; বলিস ত রেঁধে দি—তোরা যে নড়তেই পারছিস না।"

বিন্তি কহিল, "আপনাকে রাঁধতে হবে না—আমি পারব। জল ফুটে উঠ্‌লে চাল ফেলে দেব।"

সত্যেন জানিত, চাল ও জল একত্র হাঁড়িতে দিতে হয়। পাছে তার বিদ্যা ধরা পড়ে, তাই রন্ধন সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা না করিয়া কহিল, "ওরে বিন্তি, তোকে একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। তোর মামা আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছল, বলেছিল তোকে দিতে—এই নে সে টাকা। মরা মানুষের টাকা না দিলে কখন্ হয় ত ভূত হয়ে ধরবে। এর পরে একটা রসীদ লিখে দিস্— ভূত উপদ্রব করলে তার নাকের উপর রসীদটা ধ'রে দেব। নে—"

বিন্তি লইল না ; কহিল,—"মামা মারা যাবার অনেক পরে আপনি আমাদের ঘরে এসেছিলেন।"

"আ মলো ! তুই কি ডাক্তার হয়ে পড়েছিস ! কেমন

ক'রে জান্‌লি, আমি যাবার আগে তোর মামা মারা গিয়েছিল? তুই কি নাড়ী টিপে দেখেছিলি? বল্ দেখি, মিনিটে কতবার নাড়ী উঠানামা করে? কিচ্ছু জানে না, শুধু শুধু আমার সঙ্গে তর্ক! নে, টাকা ক'টা উঠিয়ে নে—চাল-ডাল কিনে এনে খাবি—আমি তোদের ভাড়াটে মুটে নই যে, রোজ রোজ চাল, ডাল, হাঁড়ি এনে দিয়ে যাব, আর তোরা পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খাবি।"

বিন্তি একটু হাসিয়া টাকা কয়টা উঠাইয়া লইল। বৃদ্ধা বহুকাল টাকার শব্দ শুনে নাই। কি মধুর শব্দ! বৃদ্ধা লুব্ধ-নয়নে টাকা কয়টির পানে চাহিয়া রহিল। বিন্তি তাহা দেখিল; দেখিয়া টাকা কয়টা তাহাকে দিতে গেল। সত্যেন কহিল, "ওকে দিস নে বিন্তি, ওর ঘরে অনেক টাকা পোঁতা আছে।"

"কি যে বল, দাদা!"

"দেখ, মিছে কথা বলিস নে; আমি এখনি তোর ঘর খুঁড়ে টাকা বার করতে পারি। মাগী না খেয়ে যক্ষির মত টাকা আগ্‌লাচ্ছে, বলে কি না টাকা নেই!"

"আপনি কি বলছ?"

"দেখ্‌বি তবে?"

বলিয়া সত্যেন ঘরের ভিতর গেল এবং অল্পসময়ের মধ্যে মাটী খুঁড়িয়া পাঁচটা টাকা বাহির করিল। বুড়ী নিস্বাক্-বিস্মিত নয়নে সত্যেনের পানে চাহিয়া রহিল। বালিকা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল, "বুঝতে পারছ না, আয়ি? আমার মামা যেমন আমার জন্যে টাকা রেখে গিছল—"

"তোদের মত ছোটলোকের কাছে আসাই আমার ঝক্‌মারি—আর যদি তোদের ছায়া মাড়াই—"

বলিতে বলিতে সত্যেন প্রস্থান করিল।

৩

এক দিন মধ্যাহ্নে সত্যেন ক্লান্ত হইয়া আশ্রমে ফিরিল, সেবানন্দ বলিলেন, "ওহে সত্যেন, তোমার বাপের নিকট হ'তে লোক এসেছে।"

"ভাল হয়েছে; ভাবছিলাম, বাবা বুঝি আমাকে ভুলে গেলেন।"

"পাগল! বাপে কি কখন ছেলেকে ভোলে?"

"খুব ভোলে। এত দেখেও আপনার শিক্ষা হ'ল না? দেখ্‌ছি, সন্ন্যাসীরা বড় বোকা।"

"আমরা সকলে বোকা, আর তুমি বড় চালাক, না?"

"পাঁচশ'বার বলব, আপনারা বোকা। চোখের উপর নিয়ত দেখছেন, বাপ-মা ছেলেমেয়েকে বিক্রী ক'রে চাল কিন্‌ছে, তবু বলেন, বাপ কি কখন ছেলেকে ভোলে? মাথায় কিছু না থাকলেই সন্ন্যাসী হয়।"

সন্ন্যাসীরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আত্মানন্দ কহিলেন, "প্রমাণ কর সত্যেন বাবু, আমাদের কিছু নেই।"

"প্রমাণ ত পড়েই রয়েছে। তুমি কি বল্‌তে চাও, আত্মানন্দ, যারা ইচ্ছা ক'রে গণ্ডীর ভিতর ঢোকে, তারা বুদ্ধিমান্? আমি এখন ইচ্ছে করলে হোটেলে গিয়ে দুটো আণ্ডা খেয়ে আসতে পারি, হাত-মুখ নেড়ে দু'টো টপ্পা গাইতে পারি, তোমাকে দুটো চিম্‌টি কাটতে পারি, তোমরা এ সব কিছুই করতে পারবে না, করলে বড় অশোভন হবে। তোমরা একটি ছোট্ট ঠাকুরকে বুকের ভিতর পুরে মড়ার মত চোখ বুজে ধ্যান করছ, আর আমরা সেই ঠাকুরকে দেখছি। তোমরা বুদ্ধিমান্ হ'লে কি হাত-পা, মন গুটিয়ে নিয়ে খোঁয়াড়ের ভিতর আবদ্ধ থাকতে? যাক্ যাক্, তর্কে আর কায নেই।"

সেবানন্দ হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "সত্যেন গীতাটা সব বুঝে ফেলেছে; ওর সঙ্গে কি আমরা চালাকী করতে পারি?"

চপল।—সত্যেন বাবুর বাপ অনেক আম-সন্দেশ পাঠিয়েছেন, দু'টো কুলী—

সত্যেন।—পাঠাবেনই ত। তিনি ত আর আপনাদের মত বোকা ন'ন, তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন, এখানে কি রকম লেহ্য পেয় চল্‌ছে।

সেবা।—তবে কেন এ কষ্টের মধ্যে প'ড়ে থাক সত্যেন?

সত্যেন।—গেরো। আরে রামু, (ভৃত্যের প্রতি) তুই এতক্ষণ কোথা ছিলি? বাবা কি বেছে বেছে তোকেই পাঠিয়েছেন? এত বড় অপদার্থ, তোকে দেখলেই আমার গা জ্ব'লে যায়।

"বাবু জানেন, আমাকে দেখলে আপনি সব চেয়ে খুসী হবেন, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"তোর মাথা ! দে, বাবার চিঠি দে।"

ভৃত্য পত্র দিল ; সত্যেন তাহা লইয়া বাড়ীর পশ্চাতে গিয়া পড়িল। পড়িতে পড়িতে সত্যেনের চক্ষু সজল হইল। অতঃপর চক্ষু মুছিয়া ঘরের ভিতর ফিরিয়া আসিল এবং সেবানন্দকে কহিল, "এবার আপনারা ভোজনে লেগে যান।"

আত্মানন্দ তৎপরতার সহিত আমের ঝোড়ায় টান দিলেন। একটা ছোট চেঙ্গারি সরাইয়া লইয়া রামু কহিল, "এটা মা-ঠাক্‌রুণ আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন।"

"এতে কি আছে রামু ?"

"চন্দ্রপুলি।"

সত্যেন চন্দ্রপুলি ভালবাসিত, তাই গর্ভধারিণীর এই স্নেহদান। সত্যেন মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেবকরা তখন মহানন্দে আম ভোজন করিতেছেন। সেবানন্দ কহিলেন, "তুমিও ব'সে যাও সত্যেন, আজ আর ভাত-ডাল নাই খেলে।"

"আপনারা সেবা করুন, আমি একটু ঘুরে আসছি।"

বলিয়া চেঙ্গারি লইয়া ঘরের পিছনে আসিল। কয়েকখানি চন্দ্রপুলি খাইয়া রামুকে বলিল, "মাকে বলিস, চন্দ্রপুলি খুব ভাল হয়েছে।"

তখন তাহার চক্ষু বাহিয়া ধারা বহিতেছিল। চক্ষু মুছিয়া রামুকে কহিল, "তুই গোটা পঞ্চাশ আম আর কিছু সন্দেশ নিয়ে আমার সঙ্গে চল্।"

রামু আদেশমত এক ঝোড়া নেংড়া আম ও এক হাঁড়ি সন্দেশ আনিল। তখন সত্যেন গ্রামের পথ ধরিল এবং স্বল্পকালমধ্যে আয়ির কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বুড়ী তখন তাহার ঘরের মেঝে খুঁড়িতেছিল, আর বিস্তি দাওয়ায় শুইয়াছিল। বিস্তি সত্যেনকে দেখিবামাত্র উঠিয়া কাছে আসিল। সত্যেন কয়েক দিন এ দিকে আসে নাই, বালিকাকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল ; কহিল, "কি রে বিস্তি, তক্তা হ'তে গাছ গজিয়ে উঠেছে যে। মাথায় সন্ন্যাসীর জটা নেই—দিব্যি তেল চুকচুক করছে—"

"আপনিই ত ক'রে তুলেছেন—"

"তা' বৈ কি ! আমি তোমার মাথায় তেল দিতে রোজ রোজ ছুটে আসি, না ? তোমার চোখ দুটো টেনে তুলেছি, গায়ে মাংস এঁটে দিয়েছি—"

"দিয়েছেন ত। মা, মামা না খেয়ে মারা গেলেন, ছোট দাদা ফেলে পালালেন ; আপনিই ত আমাকে যমের দোর হ'তে টেনে এনে নূতন প্রাণ দিয়েছেন। তার পর—"

"থাম্ থাম্, তোকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না—মেয়ে বক্তা আমি মোটেই পছন্দ করি না। এখন তুই আম চারটে ধর, আর এই সন্দেশ দুটো টপ ক'রে খেয়ে ফেল। বুড়ী কৈ ?"

"সে মেজে খুঁড়ছে।"

"কেন ?

"টাকা পাবার আশায়।"

সত্যেনের তখন প্রথম দিনের কথাটা মনে পড়িল। সে হাসিয়া আকুল। চুপি চুপি কহিল, "দেখ বিস্তি, তুই এক কায কর—এই আমটাকে মেঝের এক পাশে মাটী চাপা দিয়ে রাখ, সন্দেশ দু'টোও পাতায় মুড়ে—বুঝলি ? আমি এখন চল্লুম।"

সত্যেন অন্য গ্রামে গেল। সেখানে কয়েকটি শীর্ণকায় বালক-বালিকার মধ্যে আম-সন্দেশ বিতরণ করিয়া রিক্তহস্তে আশ্রমের পথ ধরিল। পথে ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আপনি ত একটাও খেলেন না।"

"দূর বোকা, এই সব টক্ আম খেয়ে আমি কি ব্যায়রাম ক'রে বসব ?"

"এ যে সব নেংড়া আম—"

"তুই ত ভারি আম চিনিস ! নে নে, এখন বাকি আম-সন্দেশ নিয়ে আয়—অন্য গাঁয়ে যাই চল্।"

"সন্ন্যাসীরা খাবে না ?"

"ওঁরা ও সব ভালবাসেন না, ওঁরা ভালবাসেন ত্যাগ। যা' যা', চট ক'রে নিয়ে আয়—"

৪

কয়েক দিন পরে—

"স্বামীজী, আজ আমি একটা কাণ্ড ক'রে বসেছি।"

সেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করেছ, সত্যেন ?"

"আজ সরকার হ'তে চাষের জন্যে টাকা ধার দেওয়া হচ্ছিল—"

"তা ত জানি, আজ কয় দিন হ'তে দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে।"

"দরখাস্তই নেওয়া হচ্ছে, টাকা বড় একটা দেওয়া হচ্ছে না।"

"সে কি রকম? প্রজাবৎসল সরকার এ জন্যে ত অনেক টাকা বরাদ্দ করেছেন।"

"সরকার বরাদ্দ করলে কি হবে, তাঁর চাকররা যে দিচ্ছে না।"

"কেন?"

"ভাবছে, টাকা বাঁচাতে পারলে সরকার বুঝি ভারি খুসী হবেন।"

"বলছে কি?"

"বলবে আর কি? একটা লোক দরখাস্ত নিচ্ছে, আর বলছে, তোর ঘরে অনেক টাকা আছে—দরখাস্ত না-মঞ্জুর।"

"কি সর্ব্বনাশ! লোকটা কি হিঁদু?"

"জাত ঠিক পাবার যো নেই; সায়েবের মত সাজ-পোষাক, মুসলমানের মত বাৎ-চিৎ। লোকে বলে হিঁদু—হবে।"

"তা, তুমি কাণ্ডটা কি করলে?"

"আমি যখন বুঝলাম, দুঃস্থ ব্যক্তিদের আশা-ভরসা বড় একটা নেই, তখন আমি মাথা ঠিক না রাখতে পেরে ব'লে ফেল্লাম, টাকা রাখছ কি তোমার স্ত্রীর ভাইয়ের জন্যে?"

"তার পর? তার পর?"

"সায়েবের রাগ দেখে কে! কত রকম ভাষায় যে গাল দিয়ে উঠল, তা' বলবার নয়। আমারও দু'চারটে বাছা বাছা ইংরিজী গাল কালেজে শেখা ছিল, তাই ঝেড়ে দিয়ে ছুট দিলাম। দু'টো লোক আমাকে ধরতে ছুটল। একটা লোক তাহার বপু লইয়া অনেক পিছাইয়া পড়িল, দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার সমীপস্থ হইলে তাহাকে একটা ইংরিজী ঘুষিতে শুইয়ে রেখে মুহূর্ত্তে অদৃশ্য—"

"কাষটা ভাল হয় নি, সত্যেন।"

"ভাল কি মন্দ, তা' জানি না। ভগবান্ যা' করাচ্ছেন, তাই করছি। গীতায় উক্ত হয়েছে—"

"থাম, তোমাকে আর গীতার ব্যাখ্যা করতে হবে না।"

আশ্রমের সম্মুখে পথের ধারে সহসা বিন্তি আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যেন তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কা'কে খুঁজছিস?"

"আপনাকে।"

"তুই কেমন ক'রে জান্‌লি, আমি এখানে থাকি?"

"আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি।"

"বটে! গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছ? বাড়ী জান্‌লে ভিক্ষা করবার সুবিধা হবে, না? বেরো এখান থেকে!"

"আমি ভিক্ষে করতে আসি নি।"

"তবে কি করতে এসেছিস?"

"আয়ির খুব জ্বর হয়েছে, তাই বলতে এসেছি।"

"আমি কি ডাক্তার যে, আমাকে রোগের খবর দিতে এইছিস? দূর হ'—"

বিন্তি নড়িল না।

সত্যেন রাগিয়া উঠিল; কহিল, "এখনও গেলি নে? দেখবি? মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব।"

বিন্তি প্রস্থান করিল। সেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি কে?"

"কে জানে কে? কোন্ হাড়ি-মুচির মেয়ে-টেয়ে হবে।"

"ও রকম মেয়ে হাড়ি-মুচির ঘরে জন্মায় না। যাই হোক, ওকে কুকুর-শেয়ালের মত তাড়ান তোমার উচিত হয় নি।"

"আজ আমার মেজাজটা ভাল নেই।"

"তোমাকে বেদান্তের একটা কথা বলি, শোন।"

"বেদান্ত আমার সহ্য হয় না।"

"তোমাকে সহ্য করতেই হবে, তুমি এক দিন বড় সাধক হবে।"

"কেন শত্রুতা সাধছেন?"

"শত্রুতা?"

"হ্যাঁ; যে সাম্‌নে সুখ্যাতি ক'রে অভিমান বাড়িয়ে দেয়, সে শত্রু।"

"হার মানলাম। আচ্ছা, বেদান্ত না শোন, গীতার একটা কথা শোন।"

"গীতা আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

"সে কি? কেন?"

"বইখানা আগাগোড়া পাগলামি।"

"তুমি কি বলছ, সত্যেন?"

"গীতার যিনি বক্তা, তিনি পাগল, আর যিনি শ্রোতা, তিনি মহামূর্খ?"

"যে পাগল, সেই এ কথা বল্‌বে।"

"দেখ্‌ছি, আপনি গীতা ভাল ক'রে পড়েন নি। শ্রীকৃষ্ণ কি বলছেন, বলুন দেখি? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি সূর্য্য, আমি মেঘ, আমি বৃষ্টি, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ফলাফল, আমি গরুড়, আমি নারদ ইত্যাদি। কেমন, এই ত? আচ্ছা, বলুন দেখি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া আর কি আছে? আর কি থাকতে পারে? যে জলকণা, যে কীটাণু চোখে দেখা যায় না, যে শব্দ—যে ধ্বনি কাণে শোনা যায় না, যে চিন্তা—যে ভাব মানুষের বোধাতীত, সে সবও যখন তিনি, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত পরমাত্মাস্বরূপ যখন বিরাজ করছেন, তখন তিনি মাঠের মধ্যে—বেদীর উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে যদি বলেন, ওগো, আমি চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ, তা হ'লে তাঁকে আমি পাগল বল্‌ব না ত কি বলব? আর যে ব্যক্তি এ সব কিছুই না জেনে শুনে কেবল জিজ্ঞেসা ক'রে যাচ্ছেন, তুমি কে গো, তাঁকে মহামূর্খ বলব না ত কি বল্‌ব? গীতাখানা আগাগোড়া পাগলামি।"

সত্যেন বলিতে বলিতে উঠিয়া পড়িল। দুই চারি পা আশ্রমে ঘুরিয়া মাঠের দিকে গেল। সেখানে তৃণহীন মাঠের উপর স্বল্পকাল ঘুরিয়া বেড়াইয়া আয়ির বাড়ীতে আসিল। তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। বুড়ী দাওয়ার এক ধারে কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর বিন্তি উঠানের এক পাশে শুইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার কান্না দেখিয়া সত্যেনের প্রাণ গলিয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া বিন্তির কাছে আসিল এবং সস্নেহে তাহার একখানি হাত ধরিল। বালিকা চমকিয়া উঠিল। সত্যেনকে দেখিবামাত্র তাহার কান্না আরও বাড়িয়া গেল। সত্যেন কহিল, "রাগ করেছ, বিন্তি? ছি! রাগ করতে নেই—ওঠ।"

বিন্তি উঠিল না, মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সত্যেন।—কাঁদিস নে বিন্তি, তোর কান্না দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়।

বিন্তির কান্না বন্ধ হইল।

"মুখের কাপড় খোল্, তোর চোখ দুটো মুছিয়ে দি। আহা, সেই অবধি কত কেঁদেছিস্!"

বিন্তি মুখের কাপড় সরাইল; সত্যেন নিজের কাপড় দিয়া তাহার মুখখানি মুছাইতে মুছাইতে কহিল, "বিন্তি, তোর চোখ দু'টো এত বড়, তা ত আমি কোন দিন দেখি নি। তোর সে চোখ দু'টো গেল কোথা?"

বিন্তি—পিতৃমাতৃহীনা নিরাশ্রয়া—চক্ষু মুদিয়া আদরটুকু উপভোগ করিতে লাগিল। বুভুক্ষু উদর এক দিন অন্ন চাহিয়াছিল, আজ বুভুক্ষু অন্তর একটু স্নেহপ্রার্থী। যে ব্যক্তি সে দিন অন্ন দিয়াছিল, আজ সে-ই স্নেহ দিল। সত্যেন তাহার মাথাটি নিজের উরুর উপর উঠাইয়া লইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিল, "ওঠ দিদি, মাটীতে প'ড়ে থেকো না—আর কখন তোমাকে বক্‌ব না—আমার মেজাজটা বড় খারাপ—রাগ চাপতে পারি নে—এই নে দশটা টাকা—"

বলিয়া সত্যেন তাহার হাতে টাকা কয়টা গুঁজিয়া দিল। বিন্তি তাহা লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সত্যেন সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, বিন্তির মাথা মাটীতে সজোরে পড়িয়া আহত হইল। সত্যেন সক্রোধে কহিল, "তুই যে বড় আমার টাকা ছুড়ে ফেলে দিলি? তোর বড় অহঙ্কার হয়েছে, না? খেতে পেতিস নে, শেয়ালের পেটে যাচ্ছিলি, এখন পেটে ভাত প'ড়ে এত তেজ হয়েছে! আজ তোকে মেরেই ফেল্‌ব।"

বলিয়া সত্যেন হাত উঠাইল, কিন্তু মারিতে পারিল না। বালিকার কাতর মুখখানি তাহাকে স্তম্ভিত করিল। সে মুখে অনুযোগ নাই, তিরস্কার নাই, ভয় নাই। সে মুখ শুধু ব্যক্ত করিতেছে,—'আমি অবোধ, অজ্ঞানে অপরাধ করেছি—আমাকে মারো, শাস্তি দাও।' সত্যেন দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

৫

সত্যেন মাঠের পথ ধরিল। কোন্ পথে যাইতেছে, তাহার লক্ষ্য নাই—সে শুধু চলিতে লাগিল। অন্ধকার আসিয়া পৃথিবী ঢাকিয়াছে, তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ মেঘান্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে। শৃগালের দল স্থানে স্থানে শব-ভক্ষণে মনোযোগ দিয়াছে। সত্যেন কোন দিকে মন দিল না; তাহার অন্তরমধ্যে শুধু জাগিতেছিল বালিকার সেই কাতর মুখ।

ছোট মাঠটুকু পার হইয়া সত্যেন এক গ্রামমধ্যে পড়িল। পথের ধারে—পথ হইতে একটু দূরে একখানি চালাঘর; সেই ঘর হইতে মনুষ্যকণ্ঠোচ্চারিত কাতরধ্বনি

আসিতেছিল। সত্যেন তাহা শুনিল ; দাঁড়াইল ; তার পর অগ্রসর হইয়া কুটীরের দিকে চলিল। কুটীর অন্ধকার। সত্যেন শুনিল, এক ব্যক্তি বলিতেছে, "হা ভগবান্, তুমি কি এতই নিষ্ঠুর ! এত ডাক্‌লাম, শুন্‌লে না ?"

স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল, "কত লোকের ডাক শুনবেন বল—সকলেই যে আমাদের মত না খেয়ে মরছে।"

"তাঁর ভাণ্ডার যে অফুরন্ত—আমি আর কথা কইতে পারছি না। তুমি ঐ মুড়ি ক'টা খেয়ে লও—সন্ন্যাসিদত্ত—"

"তুমি খাও ; আমাকে আগে মর্‌তে দেও।"

সত্যেনের নিকট টর্চ ছিল, সে তাহা জ্বালিল। দেখিল, দুই ব্যক্তি অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় জীর্ণ শয্যার উপর পড়িয়া আছে। একটি পুরুষ, অপরটি রমণী। তাহাদের মধ্যে দুই মুঠা মুড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাই পরস্পর পরস্পরকে খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত। ইহা দেখিয়া সত্যেন স্তম্ভিত হইল। সে আর দাঁড়াইল না,—দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

সে স্থান হইতে আশ্রম প্রায় দুই মাইল। এই দীর্ঘ পথ সত্যেন অল্পকালমধ্যে অতিক্রম করিয়া আশ্রমে আসিল; দেখিল, সন্ন্যাসীরা আহারাদি শেষ করিয়া হস্ত ধৌত করিতেছেন, তাহার জন্য অন্নাদি রান্নাঘরে রক্ষিত ছিল। সে কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া একটা টিফিন ক্যারিয়ার মধ্যে অন্নাদি তুলিয়া লইল। জমাট দুগ্ধের একটা টিন কাটিয়া খানিকটা দুধ তৈয়ার করিয়া ফেলিল। দুধটাও একটা বাটিতে ঢালিল। অবশেষে দুগ্ধ ও ভাত লইয়া রান্নাঘরের বাহির হইল। সেবানন্দ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সত্যেনের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন। সত্যেন যখন বাহির হইয়া যাইতেছে, সেই সময় সেবানন্দ বলিলেন, "সত্যেন, তোমার জয় হউক। অনেকে অন্নদান করতে পারেন, কিন্তু মুখের গ্রাস যে দিতে পারে, সে অতি মহান্—"

"আপনি আমার অতি বড় শত্রু।"

বলিতে বলিতে সত্যেন প্রস্থান করিল। সত্যেন আবার মাঠ ভাঙ্গিয়া সেই কুটীরের দিকে চলিল। এবার অনেকটা সময় লাগিল। পৃথিবী নিস্তব্ধ—কোথাও একটু শব্দ নাই ; কেবল মধ্যে মধ্যে শিবার চীৎকার শুনা যাইতেছিল। সত্যেনের কোন দিকে লক্ষ্য নাই, শুধু ভাবিতেছিল, দুধটুকু যেন তাহাদের খাওয়াইতে পারি। কুটীর-সমীপে আসিয়া সত্যেন দাঁড়াইল ; কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল না। উদ্বিগ্ন হইল ; কাতরে প্রার্থনা করিল, "ভগবান্, তাদের বাঁচিয়ে রেখো।"

সে কাতর প্রার্থনা ভগবান্ শুনিলেন। পরের জন্যে যে প্রার্থনা, তা বুঝি তাঁহার কাণে পৌঁছায়। সত্যেন ঘরের ভিতর আসিয়া দেখিল, দুই জনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—মধ্যে সেই মুড়ি ; কেহ তাহা খায় নাই। সত্যেন এই দৃশ্যে বিগলিত হইল ; ডাকিল, "মা !" উভয়ে চক্ষু খুলিয়া দেখিল। সত্যেন কহিল, "ভগবান্ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনিই আবার আমাকে দিয়ে তোমাদের জন্যে দুধ বইয়ে এনেছেন। ওঠ, দুধ খাও।"

তাহাদের উঠিবার শক্তি নাই, কথা কহিবারও সামর্থ্য নাই। সত্যেন একটু একটু করিয়া তাহাদের দুধ খাওয়াইল। তাহারা একটু সুস্থ হইলে তাহাদের কিছু ভাত খাওয়াইল। অবশেষে সত্যেন পরদিবস আসিবে বলিয়া বিদায় লইল। বিদায়কালে রমণী কহিল, "ভগবান্‌কে কখন দেখি নি বাবা, আজ দেখলাম—তিনি যে কত রূপ ধ'রে আসেন।"

সত্যেন উঠিল। টিফিন ক্যারিয়ারে তখনও কিছু দুধ ও অন্নাদি ছিল—অপর এক ব্যক্তিকে তাহা দিবার জন্যে সত্যেন তাহা লইয়া চলিল। সন্ধ্যাকালে সত্যেন যাহাকে নির্য্যাতন করিয়া আসিয়াছিল, সে হয় ত তখনও খায় নাই। তাহার কাতর মুখখানি সত্যেনকে পীড়া দিতে লাগিল। সে যে অনাথা নিঃসহায়, সত্যেন কেন তাহাকে পীড়ন করিল ?

আয়ির কুটীরে আসিয়া সত্যেন দেখিল, বৃদ্ধা তদবস্থায় বারান্দায় পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের ভিতর বিন্তির অন্বেষণ করিল, তথায় সে নাই—দেখিল, শুধু মৃত্তিকা-স্তূপ। বুঝিল, বুড়ী মেজে খুঁড়িয়া ঘরটিকে বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

সে দিকে বিন্তির দেখা না পাইয়া সত্যেন উঠানে আসিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে দেখিল, যে স্থানে বিন্তিকে নির্য্যাতন করিয়া সন্ধ্যার সময় ফেলিয়া গিয়াছিল, সেই স্থানেই সে পড়িয়া রহিয়াছে। সত্যেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সত্যেন ভাবিল, বিন্তি হয় ত মরিয়া গিয়াছে ; তাহার মাথায় খুবই লাগিয়াছিল। অনুশোচনায় সত্যেনের অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, মাথা কুটিয়া সে আত্মহত্যা করে।

বিন্তির সন্নিকটে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া সত্যেন কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল, "বিন্তি!" কোন উত্তর নাই। তখন সে হাতের বোঝা নামাইয়া বিন্তির পাশে বসিল এবং তাহার দেহ ক্রোড়ের উপর উঠাইয়া লইয়া তাহাকে অনেক আদর করিল, সস্নেহে অনেক ডাকিল। কিন্তু উত্তর পাইল না। তখন কহিল, "বিন্তি, আমাকে ক্ষমা কর, আর কখন তোকে বকব না, মারব না।" কখন বলিল,—"তুই না হয় আমাকে মেরে শোধ নে," কখন বলিল,—"আমি যে তোকে আমার ছোট বোনের মত ভালবাসি, তাই তোকে বকি-ঝকি।" অবশেষে বলিল, "তুই একবার বল, তুই বেঁচে আছিস, আমি যে এ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না।"

বিন্তি নড়িয়া উঠিল।

"তুই বেঁচে আছিস, দিদি!" বলিয়া সত্যেন উচ্ছ্বাসভরে তাহার মুখচুম্বন করিল। বালিকার দেহ সত্যেনের বাহু-মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মুখখানি তুলিয়া সত্যেন দেখিল, মৃতের ভাব তাহার মুখে একটুও নাই।

৬

পরদিন প্রভাতে সত্যেন বৈদ্য লইয়া আয়ির গৃহে উপস্থিত। বৈদ্য সনাতন প্রথা অনুসারে রোগীর নাড়ী টিপিল, জিব দেখিল, পেটে থাবড় মারিল। অবশেষে গম্ভীরবদনে শাস্ত্র-বচন আওড়াইল—"প্রবলা নাড়ী—"

সত্যেন কহিল, "ও-সব এখন মুলতুবী থাক—বাড়ী গিয়ে যা' হয় বল্‌বেন।"

"তবে এখন আমাকে করতে হবে কি?"

"বুড়ীর গঙ্গাযাত্রা।"

বৈদ্য ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া সত্যেনের পানে চাহিয়া রহিল। সত্যেন জিজ্ঞাসা করিল, "অবস্থাটা কি রকম বুঝছেন? গঙ্গাযাত্রা করতে হবে কি?"

"গঙ্গা আছেন আমাদের দেহের ভিতর যমুনা-সরস্বতীকে নিয়ে; অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা—"

"কি জ্বালা! দেখছি, আজকাল সকলেই ধর্ম্মবক্তা হয়ে উঠেছে! বলি, বুড়ী আজকালের ভিতর মরবে কি?"

"আমার ঔষধ সেবন করলে মৃতও জীবিত হয়।"

"তা হ'লে আপনি শীগ্‌গীর জার্ম্মাণী চ'লে যান, সেখানে মাটীর নীচে অনেক মড়া শুয়ে আছে।"

"কি জানেন, ঘর ছেড়ে আমি কোথাও নড়তে পারি না।"

"আহা, জগতের কি ক্ষতিটাই হ'ল! এখন বুড়ীকে মরা-বাঁচান ঔষধ দেবেন কি?"

"দেব বৈ কি, দেব বলেই ত সঙ্গে ক'রে এনেছি। এতে সব রোগ সারে—কলেরা, যক্ষ্মা, হাঁপানি, বহুমূত্র—"

"এখন টাকা নিয়ে দয়া ক'রে বিদায় হ'ন।"

বলিয়া সত্যেন পকেটে হাত দিল। বিন্তি তখন সরিয়া আসিয়া কহিল, "কাল রাতে যে টাকা কয়টা ফেলে গিছলে।"

বলিয়া টাকা কয়টা সত্যেনকে দিতে উদ্যত হইল। সত্যেন বিস্মিত-নয়নে বিন্তির পানে চাহিয়া রহিল; দেখিল, এক রাত্রির মধ্যে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—এক রাত্রির মধ্যে বালিকা কৈশোর অতিক্রম করিয়াছে। সত্যেন ক্ষণকাল তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তুই আমার সামনে থেকে দূর হ!"

বালিকার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি সহসা অন্ধকার হইল, সে সঙ্কোচের সহিত দূরে সরিয়া গেল। বৈদ্য বিদায়কালে বলিয়া গেল, "রোগীকে দুধ আর খই ছাড়া আর কিছু খেতে দেবেন না।"

সত্যেন কহিল, "কৃতার্থ হলাম। এখন আমি দুধ খইয়ের সন্ধানে ছুটি। ভালা আপদে পড়েছি।"

বালিকা সঙ্কোচের সহিত কহিল, "আমি এনে দিচ্ছি।"

"তুই কোথা পাবি? গরু কি এ দেশে আছে? যা' দু' দশটা আছে, তারা দুধ দেওয়া দূরে থাক্‌, গোবরও দেয় না। কি ভাগ্যি সুইজারল্যাণ্ড দেশ হ'তে টিনের কৌটয় দুধ আসছে, নইলে আজ ভারত দুধ না খেয়ে মারা যেত।"

"আমি একটু চেষ্টা দেখি।"

"না না, তোকে এই কাঠফাটা রোদে বেরুতে হবে না—আমি এখুনি যোগাড় ক'রে আন্‌ছি।"

সত্যেন প্রস্থান করিল। তাহার ফিরিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। সে গিয়াছিল সেই মুমূর্ষু দম্পতির গৃহে। তাহাদের অন্ন দিয়াছে, চাল-ডাল দিয়াছে, কয়েকটা টাকা দিয়াছে।

তাহাদের কথাবার্ত্তায় সত্যেন বুঝিয়াছিল, তাহারা ভদ্র গৃহস্থ! তাই তাহাদের বেশী কিছু না বলিয়া টাকা দিবার

সময় শুধু বলিয়াছিল, সে তাদের কেনা গোলাম নয় যে, রোজ রোজ তাঁদের বোঝা ব'য়ে নিয়ে আসবে।

আশ্রির কুটীরে আসিয়া সত্যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল; ছাতাটা মাটীতে ফেলিয়া জামা খুলিয়া ফেলিল এবং এক বৃক্ষতলে ধূলার উপর শুইয়া পড়িল। বিন্তি কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না—অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একখানা পাখা কোথাও পাইল না, এমন একটা শয্যা পাইল না, যাহা বিছাইয়া দিতে পারে। এমন একটা পাত্র নাই—যাহাতে করিয়া জল দিতে পারে। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে অনন্যোপায় হইয়া আমগাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া আনিল, জল দ্বারা ধৌত করিল, পরে সত্যেনের পাশে আসিয়া ভয়ে ভয়ে বীজন করিতে লাগিল। সত্যেন কহিল, "আ গেল যা, আমাকে ভিজিয়ে মারলে!—দূর হ'!"

বালিকা অপ্রতিভ হইয়া দূরে সরিয়া গেল। সত্যেন কহিল, "রাগ কর্‌লি, বিন্তি? এত মনে করি, তোকে বক্‌ব না, কিন্তু কথা বলবার সময় সব ওলট-পালট হ'য়ে যায়। লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, রাগ করিস নে।"

"আমি ত রাগ করি নি।"

"তবে আমাকে একটু বাতাস কর্—আমার বেশ লাগ্‌ছিল।"

বালিকার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—সে সত্যেনকে বাতাস করিতে বসিল। সত্যেন কহিল, "তোর হাতে গয়না নেই কেন?"

বালিকা একটু হাসিল মাত্র।

"তা' গরীব হ'লেও কাচের চুড়ি ত পরতে পারতিস।"

"সে সব যে বিলিতি—বাবা পরতে দিতেন না।"

"তবু কি শুধু হাতে থাক্‌বি? হাত দুটো বড্ড বিশ্রী দেখাচ্ছে।"

বালিকা উত্তর করিল না। সত্যেন কহিল, "এখন আমি যাই—বুড়ীকে দেখিস—দরকার হ'লে আমাকে খবর দিবি। তুই ত আমার বাসা চিনিস্—কি মেয়ে বাপু তুই!" সত্যেন প্রস্থান করিল।

৭

সত্যেন পরদিন আবার আসিল। তখন অপরাহ্ণ। সত্যেন দেখিল, বিন্তির দুই হাতে গালার চুড়ি। তাহার মনে হইল, বিন্তি যেন কত গহনা পরিয়াছে। সত্যেন পুনঃ পুনঃ বিন্তির পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বিন্তি লজ্জায় হাত ঢাকিল। সত্যেন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা পেলি, বিন্তি?"

"বালুরঘাট বাজারে।"

"সে ত অনেক দূরে—তুই গেলি কখন্? আচ্ছা মেয়ে ত তুই?"

বিন্তির অধরে মৃদু হাসি, অন্তরে আনন্দরাশি,—তাহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। সে যে সমস্ত দিন অনশনে থাকিয়া প্রখর রৌদ্র মাথায় ধরিয়া সুদূর বালুরঘাট হইতে এই চুড়ি কয়গাছি কিনিয়া আনিয়াছে, তাহার সে শ্রম সার্থক হইয়াছে জানিয়া তাহার বিপুল আনন্দ।

সত্যেন কি ভাবিল, জানি না, কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তার পরদিন আবার আসিল; বুড়ী ভাল হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি সত্যেন প্রত্যহ আসিতে লাগিল। একদা বেলা আড়াই প্রহরের সময় সত্যেন আসিয়া ডাকিল, "বিন্তি!"

বিন্তি কাছে আসিয়া সলজ্জবদনে দাঁড়াইল। আমগাছতলায় সত্যেন বসিয়া পড়িল। বড় ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিল। খদ্দরের মোটা জামাটা গাছের ডালে ঝুলাইয়া কহিল, "বিন্তি, আজ বড় কষ্ট হয়েছে—অনেক ঘুরেছি।"

"এখনও খাওয়া হয় নি?"

"না।"

বিন্তির মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খান নি?"

"জুটো বুড়ো বুড়ী ছেলে-মেয়ে নিয়ে খেৎরা গাঁয়ে উপোস ক'রে পড়েছিল, তাই—তাই—"

"নিজের ভাত বুঝি তাদের দিয়ে এসেছেন?"

"কে কাকে ভাত দিতে পারে, বিন্তি? দেবার কর্ত্তা এক জন, মানুষের শক্তি একটুও নাই।"

"আমি দু'টো ভাত চড়িয়ে দেব?"

"তোর হাঁড়িতে?"

"হাঁ।"

"তুই কি আমার জাত মারবি?"

"জাত যাবে না।"

"কেমন ক'রে তা জান্‌লি? আমার পরিচয় তুই ত সব জানিস—"

"জেনে শুনেই বলছি, জাত যাবে না।"

সত্যেন বিস্ময়াভিহত-নয়নে বালিকার পানে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কি এ দেশে, বিস্তি?"

"না। আমাদের বাড়ী নদে জেলায়, এখানে আমার মামার বাড়ী।"

"তোমার মামা কোথায়?"

"তিনি আপনার চোখের সামনে—"

"ওঃ, তিনি! তোমার মামীকে ত দেখলাম না।"

"তাঁকে আমিও দেখি নি। মা, দাদা ও আমি মামার কাছে কিছু দিন ছিলাম।"

"আর তোমার বাবা?"

"সে কথা পরে হবে—এখন ভাত চড়িয়ে দি।"

বলিয়া বালিকা ছুটিয়া গেল চুলা ধরাইতে। নদী হইতে হাঁড়ি ধুইয়া আনিয়া ভাত চড়াইল। দুইটা বেগুন পোড়াইয়া নুণ লঙ্কা আনিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করিয়া শালপাতায় ভাত বাড়িয়া দিল। আহার সম্পন্ন করিয়া সত্যেন কহিল, "আজ বড় তৃপ্তি হ'ল, বিস্তি।"

বিস্তি হয় ত ভাবিল, তাহার জন্ম আজ সার্থক হইল।

সত্যেন হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া বৃক্ষতলে আবার বসিল। কিছুকাল উভয়ে নীরব। অবশেষে সত্যেন বলিল, "তোমাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছিলাম, বিস্তি।"

"বলুন।"

"আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি।"

বালিকা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কিছু বলিল না, সত্যেন পুনরায় কহিল, "তুমি আমাদের দেশে যাবে, বিস্তি?"

"আপনার শরীর খারাপ হয়েছে, দেশে যাওয়াই ভাল।"

"সে মতামত তোকে জিজ্ঞাসা করি নি; মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই যাচ্ছি।"

"আবার এ দেশে আসবেন কি?"

"কি করতে আসব? তোদের কাঠ হাঁড়ি বইবার জন্যে?"

বিস্তি নিরুত্তর রহিল। সত্যেন আপন মনে কহিল, "হয় ত আবার আসতে হবে।"

"কেন?"

"কি জানি কেন? হয় ত তোমাকে—তোমাদের দেখতে আবার আসব।"

বিস্তি নীরব। সত্যেন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কে আছে বিস্তি, যার কাছে তোমাকে রেখে যেতে পারি?"

"কে আছে না আছে, আপনি ত জানেন।"

"তোমার বাপের কথা ত কিছু বল নি?"

"সে আর কি বলব—"

"তা হ'লে কার কাছে তোমাকে রেখে যাই?"

"সে ভাবনা আপনাকে করতে হবে না।"

"সেই ভাবনাই যে আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে। এত লোক ম'লো, তুই যদি তাদের সঙ্গী হতিস, তা হ'লে আজ আমাকে এ চিন্তায় পড়্‌তে হ'ত না।"

"যার মরণ কামনা করেন, তার জন্যে আবার ভাবনা কি?"

"তোকে যমের হাতে দিতে পারি, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে পারি না। তাই বল্‌ছিলাম, আমার সঙ্গে দেশে যাবি?"

বিস্তি সহসা উত্তর করিল না—একটু ভাবিল; পরে কহিল, "না।"

"কেন বিস্তি?"

"সেখানে যাবার দরকার কি? এখানে আমি বেশ থাক্‌ব।"

"এখানে কার কাছে থাক্‌বি? বুড়ী রাখতে চায় না, বল্‌ল, ছোট জাত ঘরে রাখব না। আচ্ছা বিস্তি, তুই কি জাত?"

"কায়স্থ।"

"আমারই জাত! তবে আর ছোট কিসে? আমি বুড়ীকে বলি গে।"

"না, আপনাকে আর বল্‌তে হবে না।"

"কিন্তু তোকে একা ফেলে রেখে যাই কি ক'রে? ভাইটাই যদি থাক্‌ত!"

"কত লোক ত একাই রয়েছে।"

"তাদের কথা ছেড়ে দে।"

"কেন, আমি কি তাদের মধ্যে এক জন নই?"

"না, নও; আমাকে বেশী বকিও না। বল, আমার সঙ্গে যাবে কি না?"

"কেন আমাকে নিয়ে গিয়ে বিব্রত হবেন ?"

"বিব্রত ! তা' ঠিক বলতে পারি না। আমার সোনার প্রতিমা গৌরী দিদি ত তোকে বুকে ক'রে নেবেন। মা বাবাও রাগ করবেন না ; ভয় যা' দাদাকে—সে আমাকে দেখ্‌তে পারে না, আমার সব কাযেই দোষ ধরে। তা তোকে ঘরে নিয়ে গেলে কি দোষই বা হবে ? বাড়ীতে ত অনেক মেয়েছেলে দাসদাসী আছে—"

"আমি যাব না।"

"আচ্ছা বিন্তি, এক কায করা যাক,—তুই দু'চার দিন এখানে থাক্ ; আমি বাড়ী গিয়ে মাকে সব কথা বলি, তিনি অনুমতি দিলে আমি ফিরে এসে তোকে নিয়ে যাব।"

"সে যা' হয় পরে হবে, এখন আপনি যাচ্ছেন কবে ?"

"আজ রাতে।"

বিন্তির মুখখানি সাদা হইয়া গেল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "সকালে কোন গাড়ী নেই ?"

"কেন ?"

"চোর-ডাকাতের ভয় হয়েছে, এতটা পথ রাতে—"

"পথ ত মোটে তিন মাইল, তার ভিতর চোর-ডাকাত আবার কোথা ?"

"খেতে না পেয়ে কেউ কেউ চুরি-ডাকাতি ক'রে খাচ্ছে।"

"তুই কেমন ক'রে তা' জান্‌লি ?

"চৌকীদারের মুখে শুনেছি।"

"তোকে বুঝি সে বলতে এসেছিল ?"

"সে আমার মামার কৃষাণ ছিল, তাই মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নেয়।"

"তোর মামার বুঝি চাকর ছিল ?"

"এক সময়ে ছিল।"

"তোর কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয়, তুই ছোট ঘরের মেয়ে ন'স—লেখা-পড়াও কিছু জানিস্। তোর নাম কি ?"

"বিন্তি।"

"আহা, তোর বাবা কি নাম দিয়েছিল ?"

"বিদ্যুৎপ্রভা ?"

"হুঁ, বুঝেছি।"

বলিয়া সত্যেন নীরব রহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, "আমি এখন যাই, রোদ প'ড়ে এসেছে।"

সত্যেন প্রস্থান করিল।

৮

রাত্রি এক প্রহর হইতে না হইতেই সত্যেন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার দ্রব্যাদি অল্পই ছিল, একটা সুটকেস্ আর একটা বিছানা (হোল্ড অল)। কিন্তু কে তাহা লইয়া যায় ? কুলী খুঁজিল, পাওয়া গেল না। তখন সত্যেন নির্ব্বিকার-চিত্তে বিছানাটা ঘাড়ে করিয়া সুটকেসটা হাতে ঝুলাইয়া লইল। আশ্রম ছাড়িয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে সত্যেন অনুভব করিল, তাহার ঘাড়ের বোঝা কে টানিতেছে। ফিরিয়া দেখিল, বিন্তি। আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সত্যেন কহিল, "তুই কোথা হ'তে এসে উপস্থিত হ'লি, বিন্তি ?"

"আমি সন্ধ্যে হ'তে এখানেই আছি।"

"কেন বিদ্যুৎ ?"

"আমার নাম বিন্তি।"

"আচ্ছা, আপাততঃ তুমি বিন্তিই রইলে। বিছানাটা তুমি কেড়ে নিচ্ছ কেন ?"

"আমি নিয়ে যাই।"

"তুমি কোথা যাবে ? ষ্টেশনে ? না, তোমার গিয়ে কায নেই।"

"কেন ?"

"তোমার কষ্ট হবে।"

"এমন জ্যোছনা রাতে এইটুকু পথ যেতে আবার কষ্ট ! আপনি বিছানা ছেড়ে দিন্।"

"এই পথে একা ফিরবে কেমন ক'রে ?"

"কত লোক গাড়ী হ'তে নামবে, আমি তাদের সঙ্গে চ'লে আসব।"

"তবে চল্।"

বলিয়া সত্যেন বিছানা ছাড়িয়া দিল ; পরক্ষণেই আবার তাহা টানিয়া লইয়া কহিল, "বিছানাটা নিয়ে যাব না—এখানেই থাক।"

"রেখে যাবেন কেন ?"

"হয় ত আবার আসতে হবে।"

"আবার এখানে কেন ?"

"হয় ত তোমাকে নিতে আসতে হবে।"

"না, দরকার নেই।"

"সে পরামর্শ তোমার কাছে নেব না।"

"এলে আমার দেখা পাবেন না।"

"ইস্!"

"চৌকীদার বল্‌ছিল, কোথা যেতে হবে।"

"ও সব বাজে কথা রাখ, আমি চার পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরব ; না ফিরি, তুমি আমার বিছানা নিও।"

বলিয়া সত্যেন ফিরিল ; এবং বিছানাটা আশ্রমে রাখিয়া আসিয়া কহিল, "আরে তোমাকে যেতে হবে না বিন্তি ; ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বেশ যেতে পারব।"

"ঝুলিয়ে নিন্ বা কাঁধে নিন, আমাকে সঙ্গে যেতে হবে।"

"আমাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাবি না কি?"

"পথে ভয় আছে—আমাকে যেতেই হবে।"

সত্যেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; কহিল, "তুমি বুঝি আমার বডি-গার্ড হয়ে যেতে চাও?"

বিন্তি অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তবু ত আমরা দু'জন হব।"

"তুই আবার একটা 'জন' না কি রে! বেশ, তোর তলওয়ারখানা নিয়েছিস ত?"

"তলওয়ার! সেখানা আপনি আমাকে তরকারি কুটতে দিয়েছিলেন, সেই ছোরা?"

"শুধু তরকারি কুটতে নয়, আত্মরক্ষা করতে।"

"এনেছি।"

"তবে আর আমাদের ভয় কি? চল্—"

উভয়ে পথ চলিতে লাগিল। সত্যেন অগ্রে, বালিকা পশ্চাতে। মাতৃপ্রাণ যুবক তাহার মায়ের গল্প বলিতে বলিতে চলিল। এমন করুণাময়ী জননী জগতে আর হয় না, ইহা বালিকাকে বুঝাইবার নিমিত্ত কত আখ্যায়িকার অবতারণা করিল। বিন্তির মন কিন্তু সে দিকে ছিল না। দুই ব্যক্তি তাহাদের পশ্চাৎ আসিতেছিল, বিন্তি ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাদেরই দেখিতেছিল। যখন তাহারা অনেকটা নিকটে আসিল, তখন বিন্তি তাহাদের ভাল করিয়া দেখিল, এক জনকে চিনিতে পারিল বলিয়া তাহার মনে হইল। আকাশে চাঁদ পৃথিবী প্লাবিত করিতেছিল। চন্দ্র পূর্ণ না হইলেও আকাশের নির্ম্মলতা হেতু জ্যোৎস্না পরিষ্কার। তদালোকে অদূরবর্ত্তী মনুষ্য চিনিয়া উঠা কঠিন নয়। যে দুই ব্যক্তি অনুসরণ করিতেছিল, তাহাদের বদনের কিয়দংশ বস্ত্রাচ্ছন্ন। দুই জনেরই হাতে লাঠি। লাঠি দীর্ঘ না হইলেও স্থূল। বিন্তির বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল।

পশ্চাদনুসরণকারী ব্যক্তিদ্বয় উন্মুক্ত স্থান ছাড়িয়া পথ-পার্শ্বে সরিয়া গেল। তথায় স্থানে স্থানে বৃক্ষাদি ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। বিন্তি তাহা বুঝিল। বুঝিয়া ভাবিল, তাহারা যদি এই সুযোগে রেল-ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর না হইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা হইলে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু সত্যেন কি ফিরিতে সম্মত হইবে? সত্যেনের নিকট বিন্তি এ প্রস্তাব করিবে কি না চিন্তা করিতেছে, এমন সময় সত্যেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ পাশ ও পাশ কি দেখছ, বিন্তি?"

"দু'জন লোক আমাদের পিছনে আসছিল।"

"কৈ, কাউকে ত দেখছি না।"

"তারা এখন পিছনে নেই, জঙ্গলের আড়ালে কোথাও আছে।"

"ডাকাত ব'লে সন্দেহ হয় না কি?"

"হ্যাঁ।"

"কি ক'রে তা বুঝলি?"

"এখনই আপনিও তা বুঝবেন। এখন উল্টা পথে গেলে হয় না?"

"উল্টা পথে কি তারা যেতে পারে না? তোর কোন ভয় নেই।"

"ছোরাখানা নিন।"

"দরকার নেই, তুই রাখ।"

বিন্তি কহিল, "আমাকে ত তারা মারতে আসছে না—গরীবের খোঁজ কেউ রাখে না।"

যে স্থানটায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে, সে স্থানে জ্যোৎস্নালোক তেমন স্পষ্ট নয়,—বৃক্ষশাখা দুই পার্শ্ব হইতে আসিয়া পথের উপর চন্দ্রাতপ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই স্থানে, এই অন্ধকারাচ্ছাদিত পথাংশে আসিয়া পড়িবামাত্র বিন্তির মন আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

৯

আশঙ্কার যথেষ্ট কারণও ছিল। দুই চারি পা অগ্রসর হইতে না হইতেই শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-শব্দ শ্রুত হইল ; শব্দটা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল। সত্যেন বুঝিল, শত্রু আগতপ্রায়।

তখন সে ঝটিতি বিস্তিকে টানিয়া লইয়া এক বৃক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইল। আততায়ীর দৃষ্টি যে সত্যেন এড়াইতে পারিল, তাহা মনে হইল না। দস্যুদ্বয়ের মধ্যে এক জন অগ্রসর হইয়া সত্যেনকে মারিতে লাঠি উঠাইল। সত্যেন কৌশলে সরিয়া দাঁড়াইতে লাঠি পড়িল বৃক্ষদেহে; সত্যেন সেই অবসরে আততায়ীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাম হস্তে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল এবং স্কুলে বক্সিং যাহা শিখিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় দক্ষিণ হস্তে দিল। আততায়ী ধরাশায়ী হইল।

এ দিকে দ্বিতীয় দস্যু সত্যেনের পশ্চাতে চুপি চুপি আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্তি তাহা লক্ষ্য করিয়া দস্যুর সমীপস্থ হইল; মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "ছোট দাদা!"

দস্যু চমকিয়া কহিল, "কে, তুই? তুই আজও বেঁচে আছিস?"

"ছিঃ দাদা! তোমার এই বৃত্তি!"

"তুই স'রে দাঁড়া—" বলিয়া দ্বিতীয় দস্যু বিস্তিকে একটা ধাক্কা মারিল। বিস্তি ভূতলে পড়িয়া গেল; পড়িয়া গিয়া এক মুষ্টি ধূলি লইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দস্যুর চক্ষুমধ্যে সজোরে তাহা নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ক্ষমা কর, দাদা।"

দস্যুর হস্ত হইতে লাঠি পড়িয়া গেল; সে হস্তে চক্ষু রগড়াইল। চক্ষুর শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সত্যেন এক হাতে তাহার গলা ধরিয়া দ্বিতীয় হস্ত উঠাইল দস্যুকে মারিতে।

বিস্তি ব্যগ্রভাবে কহিল, "মারবেন না—দয়া করুন।"

সত্যেন রুক্ষভাবে কহিল, "নিশ্চয়ই মারব—এরা কি তোমাকে দয়া করতে এসেছিল?"

সত্যেন প্রচণ্ড ঘুসি উঠাইল—দস্যুর দক্ষিণ বাহুমূল লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু ঘুসি পড়িল দস্যুর অঙ্গে নয়, বিস্তির মস্তকোপরি। বিস্তি ঝটিকাচ্ছিন্ন পদ্মের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। সত্যেন স্তম্ভিত হইল। দস্যু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বিস্তির ভূলুণ্ঠিত দেহ পানে চাহিয়া রহিল।

দস্যু পলাইল না; বিস্তির মস্তক অঙ্কোপরি উঠাইয়া লইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুই আমার জন্যে প্রাণ দিলি, দিদি!"

সত্যেন তখন ব্যাপারটা কি বুঝিল। যখন দেখিল, বিস্তি নড়িতেছে না, তখন সত্যেন ব্যাকুল হইয়া বিস্তিকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিল। উত্তর নাই। দুঃখে অনুতাপে সত্যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, দস্যু কহিল, "আপনি চেঁচামেচি করলে ত কোন ফল হবে না—নদীর ধারে প্রভাকে নিয়ে গিয়ে মুখে চোখে জল দিলে হয় ত জ্ঞান হ'তে পারে।"

"চল, চল; কোথা নদী?"

সত্যেন বিস্তিকে বুকে উঠাইয়া লইল এবং নদীর দিকে ছুটিল; দস্যু পথ দেখাইয়া আগে আগে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। নদী বেশী দূরে নয়, সত্যেন অচিরে বিস্তির দেহ কূলের ধারে আনিয়া বালুকার উপর শোয়াইল এবং মুখে চোখে জলসেচন করিতে লাগিল। দস্যু সারদা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, "না! আর বাঁচান গেল না—"

সত্যেন পাগলের মত কহিল, "বাঁচবে—নিশ্চয় বাঁচবে। আর এক দিন আমি মেরেছিলাম, সে দিন বিস্তি বেঁচেছিল, আজকেও বাঁচবে। আমাকে ফেলে সে কি মরতে পারে? —বাঁচবে, বাঁচবে—বাঁচতেই হবে।"

বিস্তি সত্যই বাঁচিল। চাহিল, নড়িল, কিন্তু কথা বলিতে পারিল না। সত্যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিস্তিকে বহু আদর করিল; কহিল, "তোমাকে ফেলে আমি চ'লে যাচ্ছিলাম, বিস্তি, সেই পাপে ভগবান্ আমাকে এই শাস্তি দিলেন। আর তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না।"

সারদা তরুণবয়স্ক—বিস্তির চেয়ে কিছু বড়। সে সরিয়া আসিয়া বিস্তির মস্তক স্পর্শ করিল, কহিল, "আজ হ'তে প্রভা, দস্যু-বৃত্তি আর করব না—তোমাকে স্পর্শ ক'রে শপথ করছি।"

সারদা চলিয়া যাইতেছিল, সত্যেন তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "গাছতলায় আমার সুটকেশ প'ড়ে আছে, তুমি সেইটে নিয়ে কাল সকালে আমার সঙ্গে আশ্রমে দেখা করবে। তোমাকে কোন অভাবে না পড়তে হয়, তার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

সারদা প্রস্থান করিল। সত্যেন তখন বিস্তিকে কহিল, "আর তোকে কখন মারব না, কখন বক্‌ব না—তুই আমাকে খুব সাজা দিয়েছিস্। এখন দু'টো কথা ক' বিস্তি।"

বিস্তি একটু হাসিল। পূর্ণ জ্যোৎস্না বিস্তির মুখের উপর পড়িয়াছিল, সত্যেন দেখিল, বিস্তি বড় সুন্দর। সে যে এত

সুন্দর, সত্যেন কখন তা' ভাবে নাই। তার মুখ যেন চাঁদের চেয়েও সুন্দর, তার হাসি যেন বিদ্যুতের চেয়েও দীপ্ত। সত্যেন মুগ্ধনেত্রে বিস্তির পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, এমন মেয়ে যে রাজার ঘরেও নাই, কিন্তু—কিন্তু এ যে দস্যু-ভগ্নী।

বিস্তি অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমি উঠে বসব।"

"আর একটু পরে, এখনও তুমি বড় দুর্ব্বল।"

বিস্তি শুইয়া রহিল। সত্যেন তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, "তোমাকে যত দেখছি, প্রভা, ততই মনে হচ্ছে, তুমি বেশ ভদ্রঘরের মেয়ে।"

বিস্তি একটু হাসিয়া কহিল, "আমার নামটা ভুল করবেন না।"

"সে বলেছিল। সে কি তোমার আপন ভাই?"

"হ্যা।"

সত্যেন নীরবে বসিয়া রহিল। দৃষ্টি এবার বিস্তির মুখপ্রতি নহে—দৃষ্টি এবার দূরে। আকাশের গায় যেখানে একটি নক্ষত্র একবার জ্বলিতেছে, একবার নিবিতেছে, সত্যেনের দৃষ্টি সেইখানে। বিস্তি কহিল, "এখনও চেষ্টা করলে গাড়ী ধরতে পারা যায়—আপনি আর দেরী করবেন না।"

সে কথার উত্তর না দিয়া সত্যেন কহিল, "তোমার ভাই ডাকাত!"

বিস্তি কহিল, "খেতে না পেয়ে দাদা না কি এই—"

"তুমি কেমন ক'রে তা জান্‌লে?"

"চৌকীদারের মুখে শুনেছি।"

সত্যেন উত্তর করিল না; অনেকক্ষণ পরে কহিল, "তা হোক, ডাকাত হোক আর যাই হোক, বিস্তি, আমাদের বাড়ী যাবে?"

বিস্তি কহিল, "আপনি ষ্টেশনে যান, এর পরে আর গাড়ী পাবেন না।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাও ত যাব, নইলে এখানেই থেকে যাব।"

বিস্তি উত্তর করিল না;—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার হৃদয় আনন্দ-ভরা; কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে একটু দুশ্চিন্তাও ছিল। সে কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

সত্যেন কহিল, "ভাবছি, বাবাকে লিখে দি এখানে আসতে।"

"না না; তাঁদের কষ্ট দেবেন না; বরং আমি—"

"তুমি যাবে, প্রভা?"

"হ্যাঁ।"

সত্যেনের মুখ আনন্দে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তবে চল বিস্তি, আজ আমরা আশ্রমে ফিরিয়া যাই, গাড়ী ত আজ পাওয়া যাবে না।"

১০

বিস্তিকে বুড়ীর ঘরে রাখিয়া সত্যেন একা আশ্রমে ফিরিল, ফিরিয়া দেখিল, তাহার দাদা মজলিস করিয়া বসিয়াছে, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। সত্যেন প্রথমটা আশ্চর্য্য বোধ করিল, আশ্রমে সিগারেট ত কেহ খায় না। তার পর তাহার দাদার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিল, কোন্ মহৎ ব্যক্তির পদার্পণ এ আশ্রমে হইয়াছে। মহা আনন্দিত হইয়া সত্যেন কহিল, "কে, দাদা এসেছ?"

ব্রজেন স্তম্ভিত হইল। ক্ষণকাল সত্যেনের মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তুই যে চ'লে গেছিস শুনলুম!"

সত্যেন হাসিয়া কহিল, "মনে হ'ল তুমি আসবে, তাই ফিরে—"

"ভুলেও যদি কখন একটা সত্যি কথা বলে!"

"সত্যির ভাণ্ডার যদি আমি শূন্য করি, তা হ'লে তুমি পাবে কোথা? সময়ে অসময়ে তোমাকে ত দুই একটা সত্যি বল্‌তে হবে।"

"তুই একটা গাধা। মাকে এত দিন চিঠি লিখিস নি কেন? তোকে বাড়ী যেতে লিখ্‌লেন, তাও গেলি নে—"

"আমি যদি বাড়ী যেতাম, তা হ'লে ত তুমি এ দেশে আসতে না। তোমার একটা নূতন দেশ দেখা হ'ল।"

"লক্ষ্মীছাড়া দেশ! ষ্টেশনে নেমে একখানা মোটর বা ঘোড়-গাড়ী কিছুই পাওয়া গেল না; বরফ বা লেমনেড—"

"তা হ'লে দেখ দাদা, কেমন নূতন দেশ।"

"মার যেমন কাণ্ড! ব্যস্ত হয়ে অমনি আমাকে পাঠান হ'ল। তা' তুই চিঠিপত্র লিখিস নে কেন?"

"আমি যে খাম পোষ্টকার্ড বয়কট করেছি—"

"তুই একটা আস্ত বাঁদর; কথায় তোকে পারবার যো নেই।"

"এখন তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?"

"তোর মত পাঁচটাকে খাওয়াতে পারি, এত খাবার সঙ্গে এখনও আছে। খাবি ?"

"নিশ্চয়ই খাব—মা আমার জন্যে পাঠিয়েছেন।"

"শুন্‌লুম, তুই না খেয়ে খেয়ে মরতে বসেছিস—নিজের ভাত পরকে নিত্যই দিয়ে আসতিস—"

"তোমাকে এ কথা কে বল্লে? এই সন্ন্যাসীরা ? তুমি কি মনে কর দাদা, সন্ন্যাসীরা কখন সত্যি কথা বলেন ?"

এক জন সন্ন্যাসী চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সত্যেন, তুমি আমাদের মিথ্যাবাদী বল্‌ছ ?"

সত্যেন উত্তর করিল, "আপনি কি বল্‌তে চান্, আমি আহার করি ?"

"তবে কে আহার করে ?"

"সন্ন্যাসী হয়েছেন, এটুকুও জানেন না, কে আহার করে ? আহার করেন ব্রহ্ম।

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥'

যমুনা-কূলে দুর্ব্বাসা গোপীদের কি বলেছিলেন, তা' বুঝি জানেন না? কিছুই জানেন না, বোঝেন না, অথচ অভিমানটুকু পূরামাত্রায় বজায় রেখেছেন।"

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। অতঃপর সকলে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন। পাশাপাশি শুইয়া সত্যেন তাহার দাদাকে বলিল, "দাদা, বড় মুস্কিলে পড়েছি—তোমাকে রক্ষা করতে হবে।"

"তুই যেখানে যাবি, সেখানেই মুস্কিল। কি হয়েছে, বল্।"

সত্যেন অকপটে বিন্তি-ঘটিত সমস্ত কথা বলিল। একটুও মিথ্যা বলিল না। ব্রজেনও তাহা বুঝিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি তাকে বিয়ে করতে চাস ?"

"তুমি যদি অনুমতি কর—"

"আমি অনুমতি দিলেই ত হবে না—বাবা মা।—"

"তুমি যদি অনুমতি দাও, বাবা মা কোন আপত্তি করবেন না।"

"কাল সকালে আমি মেয়েটিকে দেখ্‌ব। তুই দূর থেকে তাকে দেখিয়ে দিয়ে স'রে পড়বি।"

"আচ্ছা—এখন ঘুমুই।"

কিন্তু সত্যেন ঘুমাইল না; শেষ রাত্রিতে চুপি চুপি উঠিয়া আশ্রম ত্যাগ করিল এবং বিন্তিকে চুপি চুপি কিছু উপদেশ দিয়া সূর্য্য উঠিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। কেহ কিছু জানিল না।

১১

বেলা আটটায় শয্যা ত্যাগ করিয়া এক ঘণ্টা পরে ব্রজেন বুড়ীর কুটীরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অপূর্ব্ব বেশ। কালা পাড় সিমলার ধুতির উপর এক গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় টেরির উপর গেরুয়া পাগড়ী, পায়ে লপেটা জুতা। বুড়ী তখন দাওয়ায় বসিয়া গৃহকার্য্য সম্বন্ধে বিন্তিকে উপদেশ দিতেছিল। বিন্তি আপন মনে প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিয়া যাইতেছিল।

ব্রজেন দূর হইতে বিন্তিকে দেখিল। ক্রমে নিকটে আসিল; অবশেষে প্রাঙ্গণমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। বুড়ী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কহিল, "বাবা, আমরাই খেতে পাই না, তা' তোমাকে ভিক্ষা দেব কি? আর কোথাও যাও, বাবা।"

"দূর বুড়ী, আমি কি তোর কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি!"

"ভাল ভাল, আমি বলিচি না কি! তা' তুমি চাইবে কেন, বাবা! তোমরাই ত খাইয়ে বেড়াচ্ছ। তা' কি জন্যে এসেছ ?"

"তোদের এখানে পাঠা পাওয়া যায় ?"

"আর কি বাবা দেশে পাঠা আছে ?"

"কেন, সব কি তোদের মত পাঠী হয়ে গেছে ?"

ইত্যবসরে বিন্তি ঝাঁটা রাখিয়া হাত ধুইল এবং তাহার কাচা কাপড়খানা পাট করিয়া দাওয়ার এক স্থানে পাতিয়া দিল। ব্রজেন কহিল, "তোরা ছোট জাত, তোদের কাপড় ছুঁলে আমার জাত থাকবে না।"

বিন্তি নত-মুখে কহিল, "শুনেছি, সন্ন্যাসীরা জাতি-বিচার করেন না।"

ব্রজেন বসিল; কহিল, "তুই যে খুব কথা শিখেছিস দেখ্‌ছি।"

বিন্তি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ব্রজেনকে একটা প্রণাম করিল। ব্রজেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যে আমাকে বড় প্রণাম করলি ?"

"সন্ন্যাসী যে প্রণম্য।"

"তুই লেখাপড়া জানিস্ না কি ? প্রণম্য ! ওরে বাপ্ রে।"

বিন্তি নীরবে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। ব্রজেন কহিল, "ওরে মেয়ে, তোর নাম কি ?"

বিন্তি একটু ভাবিয়া উত্তর করিল, "প্রভা।"

"এই ত চেহারা, নাম আবার প্রভা ! যাক্, এখন তুই বল্ দেখি, পাঠা কোথা পাওয়া যায় ?"

"নিকটের ঐ গ্রামখানায় পাওয়া যেতে পারে।"

"তবে যাই, খুঁজে দেখি গে।"

"আপনি পাবেন না, অনর্থক এই কষ্ট পাবেন ; আমি খুঁজে এনে—"

"আমি কোথা থাকি, তুই জানিস ?"

"আপনি ব'লে দিলেই জান্‌তে পারব।"

"তুই যে বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারিস ! তুই মুচি না ডোম ?"

বিন্তি সে কথার কোন উত্তর করিল না। ব্রজেন তখন বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে বুড়ী, প্রভা তোর কে হয় ?"

বুড়ী রুক্ষভাবে উত্তর করিল, "ও আবার আমার কে হবে ? ও হ'ল এক জাত, আমি হলুম এক জাত। দেখ্‌ছ না হাঁড়ি, চুলো সব আলাদা। পোড়া ভগবান্ কি আমার কেউ রেখেছে !"

"ভগবানের খুবই অন্যায়, সে কথা আমি স্বীকার করি। এখন মেয়েটা তোর কাছে এল কি ক'রে ?"

"সে কথা ওকেই জিজ্ঞাসা কর না, আমাকে বকাও কেন ?"

ব্রজেন হাসিয়া উঠিল। বুঝিল, বুড়ীকে কিছু দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাহার মেজাজটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। সত্যেন বুড়ীকে দুইটা টাকা দিয়া কহিল, "বুড়ী, তুই কাপড় কিনে পরিস্।"

বুড়ীর কঠিন মেজাজ মুহূর্ত্তে গলিয়া গেল। কহিল, "তা দেবে বৈ কি বাবা ; জালা জালা ট্যাকা দিচ্ছে, আমার দিকে একটা কলসীও ফেলে দেয় নি—এত মাটী তুল্‌লুম—"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি তোর ঘরের মেঝে দেখে। তা' তুই এখন থাকিস কোথা ?"

"এই দাওয়ায় প'ড়ে থাকি।"

"বুঝে দেখ, ভগবান্‌টা কি একচোখো ; তোকে টাকা ত দিলেই না, আবার নিরাশ্রয় করলে।"

ইত্যবসরে বিন্তি একটা পাতায় করিয়া চারখানি বাতাসা ও এক গ্লাস জল আনিল। ব্রজেন তাহা দেখিয়া অবাক্। বিন্তি জল ও বাতাসা রাখিয়া একটু দূরে সরিয়া গেল। ব্রজেন চীৎকার করিয়া কহিল, "তুই কি মনে করেছিস, তোর হাতে আমি জল খাব ? কি আস্পর্দ্ধা তোর !"

ধীরভাবে নতমুখে বিন্তি কহিল,—"বড় গরম, যদি তেষ্টা—"

"তেষ্টাই যদি পেয়ে থাকে, তাই ব'লে তোর ছোঁয়া জল—"

"সন্ন্যাসীরা ত খেয়ে থাকেন।"

ব্রজেন তাহার ভ্রম বুঝিল। উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, "তুই কি জাত, প্রভা ?"

"কায়স্থ।"

"আমি মনে করেছিলাম ডোম। তোর বাড়ী কোথা ?"

"মীরপুরে।"

"ন'দে জেলার মীরপুরে ? বটে ! সে যে আমার জানা যায়গা। তার পর তোর বাপের নাম কি বল্ দেখি।"

"হরিচরণ মিত্র।"

"যাকে ডাকাতে মেরেছিল ?"

"হাঁ ; আপনি কি ক'রে জান্‌লেন ?"

"তুমি কি বরদা মিত্রের বোন্ ?"

প্রভা বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "হ্যাঁ।"

ব্রজেন চিন্তামগ্ন হইল। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা' তুমি এখানে কেন এলে, প্রভা ? দেশে যে তোমার মস্ত বাড়ী, জমীজমা, তেজারতি।"

"ডাকাতের ভয়ে মা আমাদের নিয়ে মামার বাড়ীতে পালিয়ে এলেন—"

"আর ত ভয় করবার কিছু ছিল না। শুনেছিলাম, তোমার বাবা ও দাদাকে মেরে, তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ ক'রে ডাকাতরা পালিয়েছিল। লুঠ করবার মত আর ত কিছু রেখে যায় নি, তবে ভয় ক'রে পালিয়ে এলে কেন ?"

ডাকাতরা কেউ কেউ ধরা পড়েছিল ; তাদের সনাক্ত করবার জন্যে থানায় আমাদের ডাক পড়েছিল। এক জন ডাকাত আমাদের শাসিয়ে গেল, যদি আমরা সনাক্ত করি, তা হ'লে আমাদের বাকি ক'জনকে কেটে ফেলবে। তাই মা ভয় পেয়ে আমাদের নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে এলেন।"

"তুমি আর কে ?"

"আমার ছোট দাদা সারদা।"

"সে কোথা ?"

"এই দেশেই কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।"

"সে ত বালক, কল্‌কাতায় বরদা বাবুর কাছে থেকে পড়াশুনা করত, আমি তাকে কতবার দেখেছি।"

প্রভা স্তব্ধ হইল। উভয়েই চিন্তামগ্ন। ক্ষণপরে ব্রজেন কহিল, "আমি তোমাদের কত খোঁজ করেছি, প্রভা—"

"কেন ?"

"কেন, তা ত তোমাকে বোঝাতে পারব না, প্রভা। তোমাকে কি ক'রে বোঝাব, তোমার দাদার নিকট আমি কতটা ঋণী! আমি যখন স্কুলে পড়ি, কলেজে পড়ি, তখন তাঁর কাছেই পড়েছি। বই আমার শত্রু ছিল, তিনি তা'কে মিত্র ক'রে ছেড়ে দিলেন। বাপের তিরস্কার, শিক্ষকের লাঞ্ছনা কিছুতেই আমার মনকে বাজে গল্পের বই হ'তে পাঠ্যপুস্তকে নিয়ে যেতে পারে নি ; কিন্তু তিনি আমার মত গাধাকেও মানুষ ক'রে তুললেন। মন্দ অভ্যাস ছাড়ালেন, পাশ করালেন, বিনয়নম্রভাবে কথা কইতে, বাপমাকে ভক্তি করতে, ভাইকে ভালবাসতে শেখালেন। তাঁর নিকট আমি মহাঋণে আবদ্ধ।"

প্রভা যতই ব্রজেনের কথা শুনিতে লাগিল, তাহার হৃদয় ততই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, সে গোড়া হইতেই জানিত, সত্যেনের দাদা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু সে বুঝিতে দেয় নাই যে, ব্রজেনকে সে চিনিয়াছে। যখন বুঝিল যে, ব্রজেনের স্নেহের উপর তাহার কিছু দাবী আছে, তখন সে সাহস করিয়া কহিল, "শুনেছি, সন্ন্যাসীদের পূর্ব্ব-জীবনের পরিচয় দিতে নাই।"

"তুমি ত কম মেয়ে নও! সত্যেনের উপযুক্তই বটে। তোমার কাছে লুকিয়ে আর কি হবে,—আমি সন্ন্যাসী নই, সত্যেনের দাদা।"

সত্যেন পথের ধারে একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া ছিল ; অগ্রসর হইয়া কহিল, "দাদা আমাকে ডাকছ ?"

"আচ্ছা ছেলে যা' হোক তুই! ভগবান্ কি তোকে একটুও বুদ্ধি দেন নি!"

"তোমাকে দিতে দিতেই যে তাঁর হাত খালি হয়ে গেল, কাযেই আমার ভাগ্যে শূন্যি।"

"তুই কি ব'লে প্রভাকে একখানা মোটা কাপড় পরিয়ে রেখেছিস ?"

"দাদা, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়—"

"থাম্, তুই জানিস নে প্রভা কে। বরদা মাষ্টারকে মনে আছে ত? প্রভা তারই বোন—"

"বল কি দাদা ? তা হ'লে ত আমাদের পাল্‌টি ঘর।"

"ওরে গাধা, তুই এত দিনে যে পরিচয় জান্‌তে পারিস নি, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তা' বার ক'রে নিলুম। এখন তুই এক কায কর—"

"হুকুম কর।"

"তুই প্রভার ভাই সারদাকে চিনিস ?"

"খুব চিনি ; সে এখন আশ্রমে ব'সে তোমার ভুক্তাবশিষ্ট সন্দেশের সদ্ব্যবহার করছে। চমৎকার ছেলে! নিজে না খেয়ে পাড়ায় পাড়ায় লোক খাইয়ে বেড়াচ্ছে।"

"বটে! তা' হবে না কেন, কা'র ভাই? এখন তুই এক কায কর। সারদা ও প্রভাকে নিয়ে আজই তুই মীরপুরে চলে যা' ; আমি কলকাতা হ'তে দরওয়ান গোমস্তা টাকা-কড়ি পাঠিয়ে দেব। বাড়ীটা বেশ ক'রে মেরামত ক'রে নিবি। সব ঠিক-ঠাক হ'লে আমাকে জানাবি, আমি বাবা মাকে নিয়ে বউকে আশীর্ব্বাদ করতে যাব—"

সত্যেন দাদার চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, "সত্যই দাদা আমি বুদ্ধিহীন,—ভাবতাম কি না তুমি আমায় ভালবাস না—"

"যা যা, ফাজলামি করিস নে। তুমিও যে প্রণাম ক'রছ, প্রভা! তুমিও কি ওই রকম একটা কিছু মনে করছো না কি ? যাক্, এখন তোমরা আজই স'রে পড়—"

"আর, দাদা, তুমি ?"

"আমি আজ আর না। দেখি একটা পাঁঠা পাওয়া যায় কি না—"

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৭

রাত্রিতে হিমাদ্রি পুষ্পিতাকে বলিল, "কাল থেকে একটু একটু সব দেখা-শুনা যাক্—কি বল ?"

পুষ্পিতা বলিল, "নিশ্চয়ই, সে আর জিজ্ঞাসা করছ কি ?"

হিমাদ্রি বলিল, "সারনাথ, হিন্দু ইউনিভারসিটি, ওপারের রামনগর—এ সব ত দেখা হয়ে গেছে। সব মন্দির আর দেবদেবী দেখা হয় নি। এবার তাই দেখা যাক। তোমার আপত্তি নেই ত ?"

পুষ্পিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার আপত্তি হবে কেন ?"

হিমাদ্রি বলিল, "তুমি বেশ বড় ব্রাহ্মের মেয়ে। সংস্কারে হয় ত বাধতে পারে।"

পুষ্পিতা বলিল, "না, তা বাধবে না।"

মনে মনে বলিল, "যা এক বাধত, তোমার ভালবাসায় তা ঘুচেছে।"

হিমাদ্রি বলিল, "হয় ত তোমার মনে 'কিন্তু' হ'তে পারে, সে জন্য আমি বল্‌তে পারছিলাম না।"

পুষ্পিতা অভিমান করিয়া বলিল, "তুমি দেখতে চাও, এ কথা বল্লে আমি মন্দিরে তোমার সঙ্গে যেতাম না, এ কথা তুমি ভাবলে ! পৃথিবীতে এমন কোন যায়গা আছে —যেখানে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি নে ?"

হিমাদ্রি লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমি বল্‌লে বা গেলে তুমি যাবে, তা জানতেম ; কিন্তু মনে হয় ত একটু বাধত। আমি তাই ভেবেছিলাম।"

পুষ্পিতা বলিল, "সেও তোমার ভুল। মানুষের ধরা-বাঁধা ধর্ম্মমত বড় হবে মানুষের কাছে, আর হৃদয়টা তুচ্ছ হয়ে যাবে ? এই যে হাজার হাজার নর-নারী ভক্তিতে বিগলিত হয়ে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' ব'লে পাষাণের উপর লুটিয়ে পড়ছে, চোখ বেয়ে ভক্তি-অশ্রু ঝরছে, মুখে এক অপার্থিব জ্যোতি ফুটে উঠছে, এর কি একটা দাম নেই ? আর হাজার হাজার বছরের পুঞ্জীভূত ভক্তি যদি পায়ের ধুলার উপর পড়ে ত ধুলাও দেবতা হয়ে যায়, এ আমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি।"

হিমাদ্রি বলিল, "আমার বিশ্বাস, হিন্দু-ধর্ম্মে ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে সত্যিকার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, মিছামিছি এ দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটে। হিন্দুরা সুবিধার জন্য একটা symbol রাখেন, ব্রাহ্মরা তা চান না। হিন্দুরা যখন নারায়ণ-শিলার কাছে মাথা নীচু করেন, তখন তাঁরা মনে ভাবেন সেই একই ঈশ্বরকে—যাঁকে ব্রাহ্ম ডাকছেন। এতে ত কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুর প্রণাম মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে তাঁরই কাছে পৌছায়—যাঁকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম উপাসনা করছেন। এ মূর্ত্তির ভাবটা মানুষের মজ্জাগত। নইলে ব্রাহ্মরা মন্দির গড়তো না, খ্রীষ্টানরা গির্জ্জা, মুসলমানরা মসজিদ তৈয়েরী ক'রে সেখানে উপাসনা করতেন না। তাঁরা সেখানে উপাসনা করেন ব'লে কি মনে করেন,—ভগবান্ ঐ মন্দির, গির্জ্জা বা মস্‌জিদ ছাড়া কোনখানে নেই ?"

পুষ্পিতা বলিল, "আমারও ঠিক ঐ কথা মনে হয়। আর সত্য কথা বলতে গেলে আমি এ বিশ্বনাথের মন্দির, এই গঙ্গা, এই ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করতে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি।"

হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

পুষ্পিতা কিছু উত্তর দিল না ; চুপ করিয়া রহিল।

হিমাদ্রি আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"বল, কেন ভালবাস ?"

এবার পুষ্পিতা বলিল, "আমি ভালবাসি কেন, তা বল্‌ব না।"

হিমাদ্রি অনুনয়ের সুরে বলিল, "না, বল, বল লক্ষ্মীটি !"

পুষ্পিতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমায় ভালবাসি, তাই !"

আর কিছু বলিয়া পুষ্পিতা কথাটাকে সরল করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা লজ্জা করিয়া হিমাদ্রির বুকে মুখ লুকাইল।

হিমাদ্রি বড় তৃপ্তির সহিত বলিল, "আমি তা' জানি !"

পুষ্পিতা বলিল, "তবে তুমি কেন জিজ্ঞাসা করলে ?"

হিমাদ্রি পুষ্পিতাকে আদর করিয়া বলিল, "এ মুখে কথাটি শুনতে বড় মিষ্টি লাগে, তাই !"

পুষ্পিতা বলিল, "পরীক্ষার জন্য নয় ?"

হিমাদ্রি উত্তর দিল, "না, নিশ্চয়ই নয়।" তার পর বলিল, "হ্যা দেখ, তা হ'লে এক কায করা যাক্ না কেন!"

পুষ্পিতা বলিল, "কি কায বল।"

হিমাদ্রি বলিল, "যে কয়টি কাশীর বিখ্যাত ঘাট আছে, এক এক দিন এক এক ঘাটে দুজনে একসঙ্গে মাকে ব'লে যোড়ে স্নান করা যাবে। আর বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করা যাবে—যেন কখন 'বিযোড়া' না হই।"

পুষ্পিতা সানন্দে বলিল, "বেশ হবে! কাল থেকেই তা হ'লে আরম্ভ করবে ত?"

হিমাদ্রি বলিল, "নিশ্চয়ই!"

পরদিন হইতে দুই জনে মিলিয়া সকালে উঠিয়া দেবতা-দর্শন করিয়া বেড়াইল। তার পর এক এক দিন এক এক ঘাটে একসঙ্গে নামিয়া স্নান করিতে লাগিল। সমস্ত দিনের জন্য নৌকা ভাড়া করিয়া দ্বিপ্রহরে নৌকা করিয়া নদীর উপর বেড়াইল; কখন কাশীর বাহিরে পর্য্যন্ত চলিয়া গেল, তার পর ফিরিল। কখন পরপারে নৌকা লাগাইয়া বালুকার উপর পাশাপাশি নীরবে বসিয়া রহিল। কখন বা হাত ধরাধরি করিয়া অনেক দূর হাঁটিয়া আসিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকায় পার হইয়া মায়ের কাছে ফিরিল।

সন্ধ্যার পর মায়ের কাছে বসিয়া কোথায় কোথায় গিয়াছিল, কোথায় কি দেখিল, কোন্ ঘাটে স্নান করিয়াছিল, সে সময় কে কি বলিয়াছিল ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার বলা হইত। বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিয়া আনন্দে হাসিতেন ও মনে মনে বলিতেন,—"আহা, বাছারা এমনি সুখেই—এমনি মনের আনন্দেই যেন চিরদিন কাটায়।"

ক্রমে এক সপ্তাহ ফুরাইয়া আসিল। কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার দিন কাছে আসিল।

হিমাদ্রি এক দিন বলিল,—"এবার তোমায় ছেড়ে যেতে বড় মন কেমন করছে কেন, মা?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন,—"অন্যবার এসে ২।৩ দিন থেকেই চ'লে যাস্। এবার এসে ৭।৮ দিন হয়ে গেছে, তাই।"

হিমাদ্রি বলিল, "তাই হবে হয় ত। অনেক কায বাকি আছে—নইলে এবার বড় ইচ্ছে করছে, আর কিছু দিন থেকে যাই।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "তা কায মিটিয়ে আবার একবার দু'জনে আসিস।"

যাই, যাই—করিয়া আরও সাত দিন থাকার পর হিমাদ্রি ও পুষ্পিতা এক দিন সন্ধ্যাবেলা মায়ের কাছ হইতে সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইল।

সে দিন সমস্ত রাত্রি বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে শ্রাবণের ধারা বহিল।

১৮

বেলা দ্বিপ্রহর। নরেনের মাতা কি ভাবিয়া পুষ্পিতার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন,—"মা, তুমি আমাকে চেন না, তবে পরিচয় দিলে চিনতে পারবে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

পুষ্পিতা তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইল।

বিধবা বলিলেন,—"মা, তুমি সতী, লক্ষ্মী। সতীলক্ষ্মীকে অপমান করলে কারও ভাল হয় না। আমি আমার হতভাগ্য ছেলের হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

পুষ্পিতা লজ্জিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি—"

বিধবা, পুষ্পিতার মুখের অসমাপ্ত কথাটি শেষ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, আমি সেই হতভাগার মা। আমি বুড়ো হয়েছি—তোমার মা'র বয়সী হব। আমার অনুরোধ, আমার ছেলেকে ক্ষমা করো, মা।"

পুষ্পিতা বলিল, "ও সব কথা আর কেন তুলছেন? আমার স্বামী যখন একদিনকার পুরানো বন্ধু বলিয়া ও-কথা ছেড়ে দিয়েছেন, আমিও সেই সঙ্গে ও-কথা ছেড়ে দিয়েছি।"

বিধবা বলিলেন, "মা! মা! শুধু ছেড়ে দিলে ত যথেষ্ট হবে না। ছেড়ে দেওয়া মানে শাস্তির জন্য ঈশ্বরের উপর ভার দেওয়া। তুমি যদি মন থেকে ওকে ক্ষমা কর, তবেই ওর মঙ্গল হবে। নইলে ওকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আর ভগবানের হাতেও যে শাস্তি পাবে, সে শাস্তি বড় ভয়ানক হবে। সে শাস্তি থেকে তুমি একে রক্ষা কর।"

পুষ্পিতা বলিল, "আমাকে তা হ'লে কি করতে বলেন?"

বিধবা বলিলেন, "তুমি মন থেকে ওকে মার্জ্জনা কর, শুধু এইটুকু আমি চাই। তোমাকে বলতে হবে না মা—আমি খুব জানি, এ অপরাধ মন থেকে মার্জ্জনা করা কত

হিমাদ্রি উত্তর দিল, "না, নিশ্চয়ই নয়।" তার পর বলিল, "হ্যা দেখ, তা হ'লে এক কায করা যাক্ না কেন!"

পুষ্পিতা বলিল, "কি কায বল।"

হিমাদ্রি বলিল, "যে কয়টি কাশীর বিখ্যাত ঘাট আছে, এক এক দিন এক এক ঘাটে দুজনে একসঙ্গে মাকে ব'লে যোড়ে স্নান করা যাবে। আর বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করা যাবে—যেন কখন 'বিযোড়া' না হই।"

পুষ্পিতা সানন্দে বলিল, "বেশ হবে! কাল থেকেই তা হ'লে আরম্ভ করবে ত?"

হিমাদ্রি বলিল, "নিশ্চয়ই!"

পরদিন হইতে দুই জনে মিলিয়া সকালে উঠিয়া দেবতা-দর্শন করিয়া বেড়াইল। তার পর এক এক দিন এক এক ঘাটে একসঙ্গে নামিয়া স্নান করিতে লাগিল। সমস্ত দিনের জন্য নৌকা ভাড়া করিয়া দ্বিপ্রহরে নৌকা করিয়া নদীর উপর বেড়াইল; কখন কাশীর বাহিরে পর্য্যন্ত চলিয়া গেল, তার পর ফিরিল। কখন পরপারে নৌকা লাগাইয়া বালুকার উপর পাশাপাশি নীরবে বসিয়া রহিল। কখন বা হাত ধরাধরি করিয়া অনেক দূর হাঁটিয়া আসিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকায় পার হইয়া মায়ের কাছে ফিরিল।

সন্ধ্যার পর মায়ের কাছে বসিয়া কোথায় কোথায় গিয়াছিল, কোথায় কি দেখিল, কোন্ ঘাটে স্নান করিয়াছিল, সে সময় কে কি বলিয়াছিল ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার বলা হইত। বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিয়া আনন্দে হাসিতেন ও মনে মনে বলিতেন,—"আহা, বাছারা এমনি সুখেই—এমনি মনের আনন্দেই যেন চিরদিন কাটায়।"

ক্রমে এক সপ্তাহ ফুরাইয়া আসিল। কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার দিন কাছে আসিল।

হিমাদ্রি এক দিন বলিল,—"এবার তোমায় ছেড়ে যেতে বড় মন কেমন করছে কেন, মা?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন,—"অন্যবার এসে ২।৩ দিন থেকেই চ'লে যাস্। এবার এসে ৭।৮ দিন হয়ে গেছে, তাই।"

হিমাদ্রি বলিল, "তাই হবে হয় ত। অনেক কায বাকি আছে—নইলে এবার বড় ইচ্ছে করছে, আর কিছু দিন থেকে যাই।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "তা কায মিটিয়ে আবার একবার দু'জনে আসিস।"

যাই, যাই—করিয়া আরও সাত দিন থাকার পর হিমাদ্রি ও পুষ্পিতা এক দিন সন্ধ্যাবেলা মায়ের কাছ হইতে সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইল।

সে দিন সমস্ত রাত্রি বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে শ্রাবণের ধারা বহিল।

১৮

বেলা দ্বিপ্রহর। নরেনের মাতা কি ভাবিয়া পুষ্পিতার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন,—"মা, তুমি আমাকে চেন না, তবে পরিচয় দিলে চিনতে পারবে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

পুষ্পিতা তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইল।

বিধবা বলিলেন,—"মা, তুমি সতী, লক্ষ্মী। সতীলক্ষ্মীকে অপমান করলে কারও ভাল হয় না। আমি আমার হতভাগ্য ছেলের হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি"

পুষ্পিতা লজ্জিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি—"

বিধবা, পুষ্পিতার মুখের অসমাপ্ত কথাটি শেষ করিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, আমি সেই হতভাগার মা। আমি বুড়ো হয়েছি—তোমার মা'র বয়সী হব। আমার অনুরোধ, আমার ছেলেকে ক্ষমা করো, মা।"

পুষ্পিতা বলিল, "ও সব কথা আর কেন তুলছেন? আমার স্বামী যখন একদিনকার পুরানো বন্ধু বলিয়া ও-কথা ছেড়ে দিয়েছেন, আমিও সেই সঙ্গে ও-কথা ছেড়ে দিয়েছি।"

বিধবা বলিলেন, "মা! মা! শুধু ছেড়ে দিলে ত যথেষ্ট হবে না। ছেড়ে দেওয়া মানে শাস্তির জন্য ঈশ্বরের উপর ভার দেওয়া। তুমি যদি মন থেকে ওকে ক্ষমা কর, তবেই ওর মঙ্গল হবে। নইলে ওকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আর ভগবানের হাতেও যে শাস্তি পাবে, সে শাস্তি বড় ভয়ানক হবে। সে শাস্তি থেকে তুমি একে রক্ষা কর।"

পুষ্পিতা বলিল, "আমাকে তা হ'লে কি করতে বলেন?"

বিধবা বলিলেন, "তুমি মন থেকে ওকে মার্জ্জনা কর, শুধু এইটুকু আমি চাই। তোমাকে বলতে হবে না মা—আমি খুব জানি, এ অপরাধ মন থেকে মার্জ্জনা করা কত

কঠিন। সে জন্য আমাদের কথা একটু তোমাকে বলি, তা হ'লে হয় ত আমাদের কথা ভেবে তাকে ক্ষমা করা একটু সহজ হবে।"

পুষ্পিতা চুপ করিয়া রহিল। বিধবা বলিয়া গেলেন, "ছেলে আমার সাধারণ শিক্ষা পেয়েছে, বাহিরে ভদ্রতাও বেশ জানে, অন্ততঃ জান্‌ত। কিন্তু বাড়ীতে তার ব্যবহার তুমি কল্পনা কর্‌তে পারবে না। সে কথা বল্‌তেও লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। বাড়ীতে কোন দিন তার মুখে আমরা মিষ্ট কথা শুনি নি। বৌমাকে ত' কোন দিন দু'চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌ত না। রেঁধে-বেড়ে ব'সে থাক্‌ত—গভীর রাতে এসে কোন দিন খেত, কোন দিন খেত না। যে রাত্রে খেত না, বৌমাও প্রায় অনাহার থাকত। ঘরে গেলে তাড়িয়ে দিত। হাজার তাড়ালেও আমার অনুরোধে বৌমা আবার যেত। কোন রাত্রে ঘরের মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়েছে, সে একবার ফিরেও চায় নি। এক এক দিন রেগে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে দুয়ার বন্ধ ক'রে দিত। বৌমা আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে। সে অপমান, অত্যাচার সয়েও দারুণ শীতের রাত্রেও দুয়ারের গোড়ায় মাথা রেখে সারা-রাত কাটিয়ে দিত। সকালে উঠে আমার কাছে আস্‌ত। এ অত্যাচারের একটা কথাও বল্‌ত না। এক দিন জোরে দুয়ার বন্ধ করার শব্দ শুনে আমার এ রকম সন্দেহ হয়। অনেক রাত্রে উঠে দেখ্‌তে এসে দেখি, বাদল শীতের রাতে বন্ধ দুয়ারের কাছে মাথা রেখে আঁচলখানি গায়ে দিয়ে মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এ সব অত্যাচারের কথা এই জন্য আজ বল্‌ছি মা, যে, আজ সে অত্যাচারের শেষ হয়েছে। তোমার মত সতী নারীকে অপমান কর্‌তে এসে অপমানিত হয়ে গিয়ে সেই রাত্রেই তার মনের পরিবর্ত্তন হয়। তা'কে বিচলিত দেখে বৌমা তার সমস্ত অত্যাচার ভুলে গিয়ে সারারাত তার সেবা করে। সেই থেকে বৌমাকে সে চিন্‌তে পেরেছে। বৌমার দুঃখ এত-দিন পরে ঘুচেছে—স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। এখন তুমি মা বৌমাকে আশীর্ব্বাদ কর, তার স্বামীকে ক্ষমা কর, যেন আর তাকে দুঃখ পেতে না হয়।"

পুষ্পিতা বিবাহ হওয়া অবধি স্বামীর পরিপূর্ণ ভালবাসাই পাইয়া আসিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত স্বামীর নিকট হইতে বিন্দুমাত্রও দুঃখ পায় নাই। তাই স্বামীর কাছে অনাদৃতা ও উপেক্ষিতা নারীর কথা শুনিয়া তাহার নারীচিত্ত বিচলিত হইল। কি অসম্ভব সহিষ্ণুতা থাকিলে দুঃখ মুখ বুজিয়া সহিতে পারে, ইহা ভাবিয়া সেই নারীর প্রতি পুষ্পিতার গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইল। সে বলিল, "আপনার বৌমায়ের যে দুঃখ দূর হয়েছে, এতে সত্যই আমি সুখী হয়েছি· আমার মনে যে রাগ বা দুঃখ ছিল, আমি তা মন থেকে দূর কর্‌লাম। আপনি অনর্থক উদ্বিগ্ন হবেন না।"

বিধবা, পুষ্পিতাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"মা, তুমি আজ আমাকে বাঁচালে। আমার মনে সে কি উদ্বেগ ছিল, তা আর তোমাকে কি বল্‌ব। চিরকাল যেন স্বামীর ভালবাসায় সৌভাগ্যবতী থেকো, মা।"

আরও দুই একটি কথাবার্ত্তা কহিয়া বিধবা উঠিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রের মাতা চলিয়া যাইবার একটু পরেই হিমাদ্রি বাড়ী ফিরিল। হিমাদ্রি সাধারণতঃ বেলা ৩ টায় ফেরে। তাহাকে শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া পুষ্পিতার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মুখপানে চাহিবামাত্র দেখিল, মুখখানি ক্লিষ্ট, শুষ্ক। ব্যস্ত হইয়া স্বামীর পাশে আসিয়া পুষ্পিতা কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"মুখখানি এমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভাল আছে ত?"

পুষ্পিতার ব্যস্ততা দেখিয়া হিমাদ্রি একবার মৃদু হাসিয়া বলিল,—"ভয় পেও না, শরীর ভালই আছে। শুধু মুখের এইখানটায় একটা ব্রণ হয়েছে। বেদনা কর্‌ছিল, তাই একটু আগেই চ'লে এলেম। আর তুমি একা আছ।"

পুষ্পিতা চাহিয়া দেখিল,—"নাকের বাম দিকে একটি ছোট ব্রণ হইয়াছে এবং তাহার চারিদিকে খানিকটা স্থান লাল হইয়া ঈষৎ ফুলিয়াছে।

দেখিবামাত্র পুষ্পিতা ভয় পাইয়া বলিল,—"বড় খারাপ যায়গায় ব্রণ হয়েছে। হাত লাগিও না। দেখি, জ্বর হয় নি ত?"

বলিয়া গায়ে হাত দিতেই পুষ্পিতা চমকিয়া উঠিল। গা বেশ গরম হইয়াছে। বলিল,—"বেশ মানুষ ত—এই জ্বর গায়ে এতক্ষণ কি ব'লে আফিসে ছিলে? শোও দিকি, আগে একটু টিনচার আইডিন লাগিয়ে দিই।"

স্বামীকে শোয়াইয়া আলমারী হইতে টিনচার আইও-ডাইনের শিশি লইয়া তুলির দ্বারা মুখের লাল অংশটুকুর

উপর বেশ করিয়া লাগাইয়া দিল। তার পর স্থির হইয়া স্বামীর কাছে বসিল। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও সে ডাক্তারের কাছে সংবাদ পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ডাক্তার আসিলেন। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"যায়গা খারাপ; সাবধানে থাকবেন। ইরিসিপ্লাসের সন্দেহ আছে। যাই হোক, সাবধানে থাকাই ভাল।" বলিয়া লাগাইবার ঔষধ লিখিয়া দিয়া ও সেঁক দিবার ব্যবস্থা দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

পুষ্পিতা সঙ্গে সঙ্গে একটু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু, ভয়ের কারণ নেই ত' ?" এমন কাতরতার সহিত পুষ্পিতা কথাটা জিজ্ঞাসা করিল যে,ডাক্তারকে বলিতে হইল,—"এতখানি ভয় পাবেন না, বিশেষ ভয়ের কারণ কিছু নেই। সকালেই আমি আবার আসব।"

ডাক্তার অভয় দিলেও পুষ্পিতা বুঝিল, ভয়ের কারণ কিছু আছে। ডাক্তার চলিয়া গেলে সে চিন্তান্বিত-মুখে স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিল।

হিমাদ্রি পুষ্পিতার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি বড্ড ভাবিত হয়েছ। এত ভাবনার কিছু কারণ হয় নি ত'।"

পুষ্পিতা হাঁ বা না কিছু বলিল না।

রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এক রকম কাটিয়া গেল। তাহার পর হইতে যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। পাছে পুষ্পিতা বেশী উদ্বিগ্ন হয়, সেজন্য হিমাদ্রি যন্ত্রণাসূচক কোন শব্দ করিল না। কিন্তু মুখের আরও খানিকটা অংশ ফুলিয়া উঠিতে দেখিয়া পুষ্পিতা তখনই পিতা-মাতাকে সংবাদ দিতে চাহিল। হিমাদ্রি অনেক করিয়া পুষ্পিতাকে তাহা হইতে নিরত্ত করিল। পুষ্পিতার হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখিয়া, যখন যন্ত্রণা খুব বাড়িতেছিল, তখন হাতখানি জোরে চাপিয়া ধরিয়া জাগরণের মধ্যে দুই জনেরই রাত্রি কাটিয়া গেল।

সকাল হইতেই পুষ্পিতা ডাক্তারকে ও পিতাকে এক সঙ্গে সংবাদ পাঠাইল। বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল, যেন এখনই তাঁহারা আসেন। সংবাদ পাইবামাত্র ডাক্তার আসিলেন। পুষ্পিতার পিতা-মাতা একটু ব্যস্ত হইয়া আসিয়া পড়িলেন।

ডাক্তার রোগীর মুখ দেখিয়া ভীত হইলেন। দেখিলেন, এক রাত্রির মধ্যে রোগ বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহা যে ইরিসিপ্লাস, তাহাতে আর তখন কোন সন্দেহ রহিল না। সুন্দরীমোহন একটু অনুযোগ করিয়া কহিলেন, সে রাত্রিতেই তাঁহাদিগকে খবর দেওয়া উচিত ছিল। ডাক্তারকেও বলিলেন, রাত্রিতে তিনি আর একবার দেখিতে আসিলেই ভাল হইত। তার পর ডাক্তারের মত করিয়া সহরের দুই জন শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে তৎক্ষণাৎ আনান হইল। রোগ যে কঠিন, এ বিষয়ে সকলেই একমত হইলেন। এ রকম শক্তধরণের ইরিসিপ্লাস সচরাচর দেখা যায় না। পুষ্পিতা একটিবারের জন্যও কিছুতেই স্বামীর কাছ-ছাড়া হইল না।

অপরাহ্নে আর একবার ডাক্তাররা আসিতে হিমাদ্রি সকলের অসাক্ষাতে ডাক্তারকে বলিল—"আমার বাঁচবার আশা যদি না থাকে বা খুব কম থাকে, আমাকে সে কথাটি বল্‌তে ইতস্ততঃ করবেন না। আমি কিছুতেই ভয় পাব না। যদি তাই হয়, আমার এক বন্ধুকে তার দেওয়া প্রয়োজন।"

তৎক্ষণাৎ সরোজের কাছে সুন্দরীমোহনের জবানী টেলিগ্রাম গেল—"অবিলম্বে অবশ্য চলিয়া এস, হিমাদ্রি অত্যন্ত পীড়িত।"

সারারাত্রি হিমাদ্রি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল। কোন ঔষধেই—কোন ব্যবস্থাতেই রোগের বা যন্ত্রণার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। "সরোজ কখন আসবে, ঐ বুঝি সরোজ এল—দেখ ত বুঝি সরোজ ডাক্‌ছে" এই সব উদ্বিগ্ন—কথাবার্ত্তা ও অগাধ চিন্তারাশির মধ্যে দ্বিতীয় রাত্রি প্রভাত হইল।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সরোজ অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আসিয়া পৌঁছিল!

এত যন্ত্রণার মধ্যেও সরোজকে দেখিবামাত্র ম্লানমুখে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। মুখে বলিল—"এস, তখনি বলেছিলাম না, তোমাকে টেনে আন্‌বোই। আর যেতে পারছ না।"

সরোজ বন্ধুর একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিল।

১৯

পরদিন রাত্রি যত গভীর হইতে চলিল, হিমাদ্রির জীবনের আশা ততই ক্ষীণ হইয়া উঠিল। চিকিৎসক সকলে একত্র হইয়া স্থির করিলেন—চিকিৎসার যাহা সাধ্য, সব করা

হইয়াছে; তৎসত্ত্বেও রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে জীবনের কোন আশাই তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না। রাত্রিকালেই তাঁহারা গোপনে সুন্দরীমোহন ও সরোজের কাছে এই মত প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন

পরদিন প্রভাতে হিমাদ্রি আপনা হইতেই সরোজকে বলিল, "ভাই, সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা দরকার। শীঘ্র ২।১ জন বিশিষ্ট লোককে ডাক।" বাড়ীর কাছেই এক জন পরিচিত জজ ছিলেন, দুই জন উকীল ও সুন্দরীমোহন—ইঁহাদের সম্মুখে উইল প্রস্তুত হইল। সরোজ ও পুষ্পিতা হিমাদ্রির ইচ্ছানুসারে সেখানে রহিল না। উইলে লেখা হইল, গ্রন্থাগারের সমগ্র আয়-ব্যয় বাদে অনুমান ২৫০০০ টাকা সমান চারি ভাগে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত হইবে:—১ ভাগ পুষ্পিতা, ১ ভাগ বিষ্ণুপ্রিয়া, ১ ভাগ সরোজ আর ১ ভাগ নারীরক্ষা-সমিতির হইবে। যদি নারীরক্ষা-সমিতি উঠিয়া যায় বা ভালভাবে কায না করেন, তবে এই ভাগ পুষ্পিতা দেবী নারীরক্ষাকল্পে ব্যবহার করিবেন। গ্রন্থালয়ের কার্য্য তাহার বন্ধু ও পুষ্পিতা দেবী করিবেন। ইহা ব্যতীত নগদ অর্থ ও ইমারতাদি যাহা থাকিল, সমস্ত তাহার স্ত্রী পুষ্পিতা দেবী পাইবেন এবং সম্পত্তি দান-বিক্রয়ের সমস্ত অধিকার পুষ্পিতা দেবীর রহিল। পুষ্পিতা দেবী যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তাহা হইলে এই উইল বজায় রহিবে। আমি তাঁহাকে বিবাহ করিবার অনুরোধ করিয়া যাইব।"

উইলের Executor রহিলেন হিমাদ্রির শ্বশুর সুন্দরীমোহন ও তাঁহার পিতার এক জন পুরাতন বন্ধু। তার পর সুন্দরীমোহনকে গোপনে হিমাদ্রি একটি কথা বলিল। সুন্দরীমোহন যখন হিমাদ্রির কক্ষ ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার দুইটি চক্ষু অশ্রুসিক্ত, হৃদয়ে অপূর্ব্ব বিস্ময়। হিমাদ্রি জামাতা হইলেও অন্তরে অন্তরে তাহার গভীর হিন্দুভাব, এ জন্য এক এক সময় তাঁহার উপর বিরুদ্ধভাব আসিত। আজ তাহার মুখে যে কথা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। খুব বড় ব্রাহ্মও মৃত্যুর সময় এ কথা বলিয়া যাইতে পারেন না। কথাটা হিমাদ্রি গোপন রাখিতে বলিয়াছিল, সে জন্য তিনি সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না।

উইল হইয়া গেলে হিমাদ্রি একটু প্রফুল্ল হইল। হিমাদ্রি বলিল,—"সরোজ আর পুষ্পিতা, তোমাদের দুজনের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।" হিমাদ্রির মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে আর সকলে উঠিয়া গেলেন। পুষ্পিতা ও সরোজ দুইধারে দুই জন হিমাদ্রির মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। হিমাদ্রি দুই জনের হাত দুই হাতে ধরিয়া অতি ক্লিষ্ট ও মৃদু স্বরে বলিল,"আমার আর সময় বেশী নাই। তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বিধির বিধান মাথা পেতে নিতে হবে। আমার শেষ সান্ত্বনা যে, জীবনে যোগ্য স্ত্রী ও যোগ্য বন্ধু আমি লাভ করেছি। তোমাদের গোটা কতক কথা ব'লে যাব। আমার প্রার্থনা, তোমরা আমার কথায় বাধা দিও না। আর যদি তোমাদের অমত না হয়, আমার শেষ কথাটি রেখ।"

এতখানি কথা বলিয়া হিমাদ্রি একটু স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর পুষ্পিতার পানে চাহিয়া বলিল,—"মৃত্যুর ছবি আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে। সে ছবি করুণ হলেও মধুর। তাতে কেবল একটি ব্যথা আছে—সে ব্যথা বড় গভীর। সে তোমার ম্লান মুখের স্মৃতি। তুমি কত দুঃখ পাবে—কে তোমায় দেখ্‌বে? কে তোমায় রক্ষা করবে? কে তোমার অশ্রু মুছাবে, এই আমার দারুণ কষ্ট—দারুণ চিন্তা। তাই তোমাকে আমি একটি অনুরোধ ক'রে যাব। তোমার যদি সন্তান থাকত, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতাম। এমন কি তোমার রহিল—যা'র দিকে চেয়ে তুমি এই গভীর দুঃখ, এই স্মৃতির ব্যথা সহ্য করবে—আমি কেবল তাই ভাব্‌ছি। তোমার ভালবাসা আমার সারাটি জীবন ধন্য করেছে; আমার আত্মা তৃপ্তি পেয়েছে। কিন্তু যাবার আগে আমি তোমাকে এমন একটি আশ্রয় দিয়ে যেতে চাই—সেখান তুমি কোন দুঃখ, কোন ব্যথা পাবে না। আমার দেওয়া এ আশ্রয় তুমি গ্রহণ কোরো। তুমি জান, বিধবা-বিবাহে আমার সম্পূর্ণ মত। আমার একান্ত ইচ্ছা ও শেষ অনুরোধ, আমার মৃত্যুর পর সরোজকে তুমি বিবাহ কোরো।"

গৃহমধ্যে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইলে বোধ হয় পুষ্পিতা ও সরোজ এত বিস্মিত হইত না। পুষ্পিতা সাশ্রুনেত্রে ব্যগ্র হইয়া প্রতিবাদের কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, হিমাদ্রি অতি কষ্টে হাত তুলিয়া নিষেধ করিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "এই আমার শেষ প্রার্থনা—আমার

শেষক্ষণটি অবাধ্যতায় ম্লান করো না।" বন্ধুর পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা, পুষ্পিতাকে বিবাহ কোরো ও তাকে ব্যথা-দুঃখ হ'তে রক্ষা করো।"

তার পর একবার চক্ষু মুদিয়া বলিল, "আমার আর এক দুঃখ, আমার দুঃখিনী মায়ের চিন্তা। কিন্তু তাঁর দুঃখ যে সান্ত্বনার—চিন্তারও অতীত।" তাহার মুদিত নেত্র বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সেই বিশাল বক্ষ এক-বার দুইবার দুলিয়া উঠিল। তার পর চিরতরে নিস্তব্ধ হইল। সেই মুদিত চক্ষু দুইটি আর ত উন্মীলিত হইল না।

পুষ্পিতা আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া হিমাদ্রির বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। সরোজ জলভরা দৃষ্টিতে জীবনে যে দুইটি নর-নারীকে সে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিত, তাহাদের পানে গভীর দুঃখ ও স্নেহভরে চাহিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

জাগরণী

(গান)

সানায়ে মধুর বোধন বেজেছে ঘুমায়ে থেক না আর।
শঙ্কাহরণ শঙ্খ বাজাও, সাজাও কুটীরদ্বার॥
ওগো—বনের বিহগগণ
জাগি—গাও মার আবাহন,
রচ'—স্নান-শুচি চারু কেদার কানন কুসুম অর্ঘ্যভার॥

যত—বাপী দীঘিকা হ্রদ
আজি—শোভাও হৃদয়-তট,
নব—নীরময় নদীনদ
ভর'—শুভ মৃন্ময়-ঘট।
বহ—তরী ভরি থরে থরে
পূজা—উপচার ঘরে ঘরে,
রচ'—দেবীর তোরণ মণ্ডিতে সিত মরাল বলাকা-হার॥

জাগি—জবাবধূগণ আজ
আঁকো—আলতা রাতুল পায়,
হাসি—বর্ষণ কর লাজ
আজি—শিউলিরা আঙিনায়।
জাগো—কমলকুমুদ-বালা
আজি—সাজাও পূজার ডালা।
হরি—চন্দন-বন-সুন্দরি আনো শীতল গন্ধসার॥

রচ'—চন্দ্রতারকাগণ
মণি-খচিত চন্দ্রাতপ,
জাগো—অলিকুল অগণন
কর—বিজয়মন্ত্র জপ।
যত—ভক্ত আনত-শির
গাও—জয়গান জননীর
পুনঃ—নিষ্ঠার শুভ আরতি আলোকে ঘুচাও অন্ধকার॥

শ্রীকালিদাস রায়

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

১

মাহেশের রথযাত্রা। বিরাট জনতা, অগণিত নরমুণ্ডের সারি, আশেপাশে চতুর্দ্দিকে অগণ্য বিপণি-শ্রেণী। মেয়ে-পুরুষের অসম্ভব ভীড়। শান্তিরক্ষকগণ নিজেদের কর্ত্তব্য করিতে না পারিয়া অযথা গোলমাল করিতেছে। কংগ্রেস দলের স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যাজ আঁটিয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে। পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ভগবদ্দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় চাহিয়া আছে, রূপলুব্ধ পুরুষ স্ত্রীলোকদিগের পানে চাহিয়াই বুঝি জীবনের চরম উৎকর্ষসাধন করিতেছে। চোর, গাঁটকাটা, পকেটকাটা যে যাহার সন্ধানে ঘুরিতেছে।

রথ দেখা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ আমার কোনও কালেই ছিল না—কেবলমাত্র বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে অনর্থক ভিড়ে মাথা ধরাইতে আসিয়াছিলাম। অজয়, অরুণ দিব্য ঘুরিতেছিল, কিন্তু এই দারুণ ভীড়ে আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল, আর কেবলই তাহাদিগকে বলিতেছিলাম, "আচ্ছা হুজুগে তোরা, সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে কেন টেনে আন্‌লি বল্ ত?" তাহারা সে কথা কাণে না তুলিয়া নির্ব্বিবাদে বেড়াইতেছিল। অরুণ পকেট ভর্ত্তি করিয়া চীনের বাদাম লইয়া একবার আমায় ও একবার অজয়কে দিতেছিল।

রথের টান আরম্ভ হইল। চাহিয়া দেখিলাম, বহু উচ্চে রথের শীর্ষদেশে বিরাট সৌম্য দারুব্রহ্মমূর্ত্তি। হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতিত্ব চিরদিনই করিয়া আসিয়াছি, সশ্রদ্ধভাবে মাথা নত করিলাম। পুনরায় দৃষ্টি ঊর্দ্ধে তুলিয়া যুক্তকরে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিবার প্রয়াস করিতেছি—মনে হইল, বামহস্তের অনামিকায় যে অঙ্গুরীয়টি আছে, তাহাতে টান পড়িতেছে। চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, কেহ কাড়িয়া লইতেছে না, একটি কিশোরীর আলুলায়িত কুন্তলের কিয়দংশ অঙ্গুরীয়টির সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, সে যতই চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার আকুল কুন্তলে ততই টান পড়িতেছে। কয়েকবার বাধা পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভীড়ের কষ্টে তাহার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল আয়ত নেত্রে যেন ক্লান্তির জড়তা মাখা রহিয়াছে। ঘন কুঞ্চিত কেশরাশিতে পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া গিয়াছে। আর কিছু দেখিবার অবসর হইল না, অঙ্গুরীয় হইতে চুলগুলি খুলিয়া দিতেছি, হঠাৎ ভীড়ের ধাক্কায় মেয়েটি প্রায় আমার গাত্রের উপর আসিয়া পড়িল—তাহার হাত ধরিয়া আর একটি ছোট মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল—ধাক্কায় সেও হাত ছাড়াইয়া একটু দূরে গিয়া পড়িল। ভীতিব্যাকুল-কণ্ঠে কিশোরী বলিয়া উঠিল, "মানু, এই যে রে আমি, হাত ধর।"

ছোট মেয়েটি ভীড়ের নিষ্পেষণে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, কষ্টে সরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, বাবা, ঠাকুর্দাকে ত দেখতে পাচ্ছি না।"

তেমনই ভীত স্বরে কিশোরীটি বলিল, "তাই না কি রে, তবে কি হবে?" বলিয়াই পরমুহূর্ত্তে আমার পানে চাহিল।

আমি ততক্ষণে অঙ্গুরীয় হইতে চুলগুলি ছাড়াইয়াছি। তাহার কাতর ভীতিপূর্ণ স্বর শুনিয়া বলিলাম, "আপনার

সঙ্গীদের পাচ্ছেন না বুঝি ? আচ্ছা, এই দিক্‌টায় স'রে এসে দাঁড়ান, আমি দেখছি খুঁজে—উঃ ! যা ভীড় !"

কিশোরী সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই ছোট মেয়েটি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি, কি হবে—বাবা, ঠাকুমা কোথায় গেলেন ?"

অন্তরে যে কিশোরীটিও ভীত হইতেছে, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল। তবু কনিষ্ঠাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছিল, "দাঁড়াও, দেখি না, বাবা আসবেন।"

আমিও ততক্ষণে অজয়-অরুণকে ডাকিয়া সব বলিলাম। বিপদ্‌গ্রস্তকে উদ্ধার করিতে আমার বন্ধুরা চিরদিনই উৎসাহী ছিল। তাহারাও বলিল, 'খোঁজ করিতেছি।'

ছোট মেয়েটি সহসা জনতার পানে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "দিদি, ঐ যে বাবা।"

আমিও তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিলাম, "কোন্‌টি, আমায় চিনিয়ে দিন ত, আমি ডেকে আনছি।" আমার কথার অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ অবস্থায়ই তাহারা উভয়ে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে চশমা চোখে সুন্দর মত।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপনারা এইখানে দাঁড়ান, আমি ওঁকে ডেকে আনছি।"

ভদ্রলোক প্রৌঢ়। বেশ শ্রী-যুক্ত তাঁহার চেহারা। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দুই জনেই তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। কিশোরীটি বলিল, "আমার এমন ভয় করছিল, কি বলব বাবা, যা ভীড়, মানু ত কেঁদেই ফেলেছিল।" তাহার পর আমার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল, "এই ইনি তোমাকে খুঁজে দিয়েছেন, বাবা। খুব রথ দেখা হয়েছে, এখন বাড়ী চল।"

ভদ্রলোকও কন্যা দুইটিকে ফিরাইয়া পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের প্রতি চাহিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন। দুই এক কথায় জানিলাম, কলিকাতায় থাকেন, দুইটি কন্যা ও মাকে লইয়া রথ দেখিতে আসিয়াছিলেন। এ ঝোঁক নাকি তাঁহার ছোট মেয়ে মানসীর। মাতৃহারা কন্যা বলিয়া তিনি তাহাদের সকল আবদারই পূর্ণ করিয়া থাকেন ইত্যাদি। এক দিন আমাদের যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ধন্যবাদের সহিত বলিলাম, চেষ্টা করিব।

তাহার পর ভদ্রলোক কন্যা দুইটির হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল মা অতসী মানসী, এবার বাড়ী যাই। ঠাকুমাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

ভদ্রলোক আমাদের নিকট বিদায় লইলেন। যাইবার সময় অতসী একবার তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল। তার পর মধুর ভঙ্গীতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে কতখানি ব্যাপার হইয়া গেল।

অরুণ পাশে ছিল। এক ঠেলা দিয়া বলিল, "কি, স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করছিস্ না কি ? বড্ড দুঃখ হচ্ছে না রে, ভদ্রলোক নিয়ে চলে গেল ? তা যাই বল অঞ্জন, আজকের যাত্রাটা খুব ভাল—তুই ত আসছিলি না, ভাগ্যি জোর ক'রে টেনে আনলুম—"

বাধা দিয়া অজয় বলিল, "তোর মনে আছে, অরুণ, আসবার সময় রঞ্জনদা' কি বলেছিলেন ? বল্লেন—'তোমরা তিন জন হচ্ছ ত্র্যহস্পর্শ, আবার তিন জনের নামের গোড়ায় 'অ' আছে—যেখানে যাবে, একটা অঘটন-সংঘটন ক'রে আসবেই, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি।' তা তাই ঠিক হয়েছে—তবে আমরা উপকার ছাড়া অপকার করি নি, এটা ঠিক, কি বল ?"

অরুণ পুনরায় আমায় এক ধাক্কা দিয়া বলিল, "কি গো, এখানে দাঁড়িয়ে ধ্যান করেই কাটিয়ে দেবে না কি ? না রথের দিকে চেয়ে জগন্নাথকে বলবে, দাও ঠাকুর আমার—"

বাধা দিয়া বিরক্তস্বরে বলিলাম, "কি গাড়োয়ানী ইয়ারকী শিখেছিস, অরুণ ! চল, রথ দেখা হয়েছে ত' বাড়ী ফের।"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখখানা ভারী করিয়া অরুণ বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় হয়েছে—রথ দেখাও হয়েছে, কলা বেচাও হয়েছে, কাযেই এখন বাড়ী না ফিরে উপায় কি ? চল রে অজয় ফেরা যাক্—অঞ্জন ত—"

পিঠে এক চড় মারিয়া ধমক দিয়া কহিলাম, "আবার ?"

তাহাদিগকে চোখ রাঙ্গাইলে কি হইবে, বাস্তবিকই সমস্ত পথ—ট্রেণ—এমন কি, বাড়ী আসিয়াও নিস্তার নাই। কেবলই মনে পড়িতেছিল কিশোরী অতসীর সেই শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীমণ্ডিত উজ্জ্বল মুখখানি।

২

মাস দুই পরের ঘটনা। সে দিন ছিল রবিবার। বাড়ীর ভিতরকার রোয়াকে বসিয়া একখানা ডাক্তারী বইএর পাতা উল্টাইতেছিলাম। পার্শ্বে বসিয়া মা ও বৌদিদি গল্প করিতেছিলেন। এমনই সময় অরুণ আসিয়া মায়ের পায়ের কাছটিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "খেতে দাও না মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

স্নেহস্বরে মা বলিলেন,"আয়, বোস বাবা, যাও ত বৌমা, অরুণের জন্য খাবার নিয়ে এসো। কোথা গেছলি রে?"

বাধা দিয়া পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া বলিলাম, "ওর আবার যাওয়া-টাওয়া কি আছে—পেটুক মানুষ, দিনরাত গোগ্রাসে গিলতে পারলেই ভাল হয়।"

নির্ব্বিকারভাবে অরুণ বলিল, "হ্যাঁ, ঠিক!" তাহার পরই উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল,"বৌদি গো, খাবার আনতে গিয়ে কি বুড়ো হয়ে গেলে না কি? আমি তোমাদের অঞ্জন নয় যে, ক্ষিদে পেলে চুপ ক'রে ব'সে থাকব।"

বিরক্তস্বরে বলিলাম, "দেখ অরুণ, গাধার মত চেঁচাস নি, বাপ রে, বাড়ীটা ফাটিয়ে দিলি।"

অরুণ সে কথার উত্তর দিবার প্রয়োজন মনে না করিয়া নির্ব্বিবাদে আহার করিতে লাগিল। মা বলিলেন, "আজ তোদের দাদার সঙ্গে যা না, সেই মেয়েটি দেখে আয়। রঞ্জন বলছিল. আজ রবিবার, আজ সেই মেয়েটি দেখতে যাবে। তোরা যাবি ত যা না।"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখখানা ভারী করিয়া অরুণ বলিল, "ক্ষেপেছ মা, কার জন্য মেয়ে দেখবে?" বলিয়া আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ হতভাগার জন্য? হ্যাঁ, তবেই হয়েছে। ও যদি এখন বিয়ে করে, তবে আমায় কুকুর ব'লে ডেকো।"

বিস্ময়ে জননী বলিলেন, "কেন রে অরুণ?"

"আহা, তুমি জান না মা, ও লেখাপড়া শেষ না ক'রে বিয়ে করবে না—এই আর কি।" তাহার পর সকলের অলক্ষিতে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাস্য করিল।

অরুণ ছিল আমার সহোদরের অধিক—জননী বোধ হয়, আমাদের দুই ভ্রাতা অপেক্ষা তাহাকে স্নেহ করিতেন। সেও ছিল মাতৃহারা, তাই আমার জননীকেই মায়ের ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। এ বাড়ীতে ছিল তাহার অবাধ গতি। আমাকে সে এত ভালবাসিত যে, বোধ করি, আমার জন্য সে মৃত্যুকেও তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করিত। বন্ধুত্বের চরম আদর্শ বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

মা রাগিয়া বলিলেন, "তোরা বাপু আজকালকার ছেলে—যদি বুড়ো-বুড়ীর কথা রাখিস। যেমন তুই বিয়ের নামে সটান না করেই আছিস, ও হয়েছে ঠিক তেমনি—যা ভাল বুঝিস, কর গে যা, আমি রঞ্জনকে এখন কি বলব?"

আমি বলিলাম, "তোমায় বলতে হবে না। আমিই দাদাকে বুঝিয়ে দেব, তোমার ভয় নেই। এখন মানুষ বিয়ে করে? তোমরা বিয়ে ছাড়া আর কিছু জান না—না?"

মা তেমনই ভাবে বলিলেন, "যা তোদের ইচ্ছা, কর গে যা।" বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

অরুণ আমার নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, "এক যায়গায় যাবি?" বলিলাম, "কোথায়?" অরুণ বলিল, "সেই অতসীর বাবার সঙ্গে দেখা হলো। তোর কথা বার বার ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, বল্লেন, এক দিন এলেন না? অতসীও প্রায়ই বলে।—ভদ্রলোক কিন্তু আমায় অনেক ক'রে বলেছেন, অঞ্জন যাবি ত চল—গেলে এমন ক্ষতি কি? কি বলিস?"

কি বলিব, কিছু স্থির করিতে পারিতেছিলাম না—মনের চঞ্চলতা পাছে অরুণের নিকট ধরা পড়িয়া যায়, সেই ভয়ে বলিলাম, "না, থাক গে, কি হবে?"

অরুণ বলিল, "আর পেটে ক্ষিদে মুখে লাজের প্রয়োজন কি? চল না বাপু, ইচ্ছাটা ষোল আনা, আবার ন্যাকামী হচ্ছে, আমি কিছু বুঝতে পারি না—আর আমাকেও তুই লুকোতে চাস না কি?"

কি বলিব? মৃদুহাস্যের সহিত বলিলাম, "চল তা হ'লে যাই।"

অতসীদের বাড়ী আসিলাম। বন্ধ দরজার কড়া নাড়িতেই মানসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "ও-মা, আপনারা—আসুন, আসুন,বাবা ভিতরে আছেন।"

অতসীর বাবা আসিয়া যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। অবস্থা ভাল নহে। সওদাগরী অফিসে চাকুরী উপজীবিকা। কোন এক পল্লীগ্রামে পৈতৃকবাড়ী। বৃদ্ধা মাতা

সেইখানেই প্রায় থাকেন—কলিকাতায় অতসী মানসীকে লইয়া তাঁহাকে থাকিতে হয়; স্ত্রী জীবিতকালে তিনিও থাকিতেন। উপস্থিত তাঁহারা কয় জন আছেন। ভদ্রলোকের নাম রমানাথ বসু—বেশ সরলপ্রকৃতির লোক। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিলাম। অতসী ও মানসী সমানই বসিয়াছিল। আসিবার সময় রমানাথ বাবু বলিলেন, "আবার এক দিন আসবেন।" আর অতসী—আবার সেই উজ্জ্বল চক্ষুর স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি! লাভ করিয়া আসিলাম, শুধু সেই দৃষ্টি।

৩

হঠাৎ সে দিন মনের মধ্যে কিরূপ চঞ্চলতা অনুভব করিয়া সেই আংটী বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলাম। সে দিন রথ দেখিয়া আসিয়াই আংটীটা খুলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। কি জানি, সে দিনের সেই ব্যাপারের পর আমার কাছে সেই আংটীটার মূল্য যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, অতসীর মাথার এক-গাছি কুঞ্চিত কেশ আংটীর পাথরের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আনন্দে আমার চিত্ত ভরিয়া গেল। কিন্তু এ কয় মাসের মধ্যে ত একবারও আমার দৃষ্টি পড়ে নাই। কি সঞ্চয় করিলাম, জানি না, কিন্তু তখনই কৃপণের ধনের মত আংটীটি যত্ন সহকারে চাবির ভিতর তুলিয়া রাখিলাম।

পরীক্ষা সন্নিকট। বই লইয়া বসিয়াছি। কিন্তু পুস্তকের পাতা খুলিয়া রাখিয়া জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছি—অতীতের সেই মধুর ক্ষণটি। সুনীল আকাশের বক্ষে মেঘ-রূপসীদের হাট বসিয়াছিল। দিবাকরের শেষ সোনালি আলোকটুকু বিশ্বের বুকের উপর পড়িয়া বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আকাশের কোণে ঐ যে দুইটি বড় উজ্জ্বল নক্ষত্র অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, তাহারই প্রতি চাহিয়া মনে হইতেছিল, এ যেন রূপান্তরিত অতসীর সেই স্নিগ্ধ চোখ দুইটি। সে যে অতীতের কথা কহে, যেন প্রাণের অব্যক্ত জ্বালার উপর সান্ত্বনার স্পর্শ বুলাইয়া দেয়।

সুন্দর? না, অতসী ত খুব সুন্দরী নহে; উজ্জ্বল শ্যামশ্রীর মাঝে যে কমনীয়তা ছিল, তাহা বুঝি অনেক গৌরবর্ণাদের ভিতর নাই।

অতসীদের বাড়ীতে আরও কয়েক দিন গিয়াছিলাম। তাহার পর প্রায় মাস দুয়েক খবর জানিতাম না। অরুণ মাঝে মাঝে বলিত, "আজ রমানাথ বাবুর সহিত দেখা হইল, তোর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন" ইত্যাদি। আমি বেশী যাইতে চাহিতাম না, তাহার প্রধান কারণ, বেশ বুঝিতে পারিতাম, অতসী তাহাদের দরিদ্রতার জন্য ভয়ানক কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। তাহাকে লজ্জা দিবার জন্য যাইয়া কি করিব? আমার মনের কথা অরুণ ছাড়া আর কেহই জানিত না, আর জানিবেই বা কে? রথের এ ব্যাপার বাড়ীর অজ্ঞাত ছিল।

ঝড়ো হাওয়ার মত চঞ্চলভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অরুণ বলিল, "জানিস অঞ্জন, মাত্র দুদিনের জ্বরে রমানাথ বাবু কাল মারা গেছেন।"

সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় অতটা চমকিত হইতাম না—অরুণের কথা শুনিয়া আমার যেন সংজ্ঞাহীনের মত অবস্থা হইয়াছিল। নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে আমি অরুণের মুখের প্রতি চাহিয়াছিলাম। অরুণ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "অতসীদের অবস্থা বুঝতেই পারছিস? আমি এইমাত্র সেখান থেকে আসছি। ওরা ত বড্ড অধীর হয়ে পড়েছে। রমানাথবাবুর মা দেশ থেকে এসেছেন। মাথার উপর এক জন অভিভাবক নেই, যা করছে সব প্রতিবেশীরা। দেখলুম, রমানাথ বাবুর সৌজন্যে সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতো। অতসীর ঠাকুমা বল্লেন, আজই রাত্রে তাঁরা দেশে চ'লে যাবেন—এখানে থাকবার আর তাঁদের উপায় নেই। দেশে তবু পৈতৃক ভিটে আছে।"

আমার বাক্‌শক্তি যেন ছিল না। মূকের মত শুধু নিস্পলক-নয়নে অরুণের প্রতি চাহিয়া ছিলাম।

আমার গায়ে হাত রাখিয়া অরুণ শান্ত স্বরে বলিল, "কি করবি? একবার দেখা করা উচিত নয়? আজই চ'লে যাবে—কি বলিস, চল একবার।"

স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিলাম, "কি ক'রে দেখা করবো, অরুণ? তার সে করুণ মুখ আমি দেখতে পারবো না।"

অরুণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাও কি হয় রে,

চল একবার দেখা ক'রে আসবি। ওঠ, তারা রাত্রেই চ'লে যাবে।"

চলিলাম অরুণের সঙ্গে। সেই বাড়ীটার কাছে আসিতেই অতসীর ঠাকুরমার বুকভাঙ্গা স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। বলিলাম, "না অরুণ, আমি যেতে পারবো না—তুই যা ভাই।"

আমার হাতটাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া অরুণ বলিল, "সে হয় না, ছিঃ—চল একবার।"

আমাদের দেখিয়া অতসীর ঠাকুরমা দ্বিগুণভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। মানসী ঘরের মেঝেয় লুটাইতেছিল আর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছিল। আর অতসী?—চোখে এক বিন্দু অশ্রু নাই, তাহার স্তব্ধ গম্ভীর মুখ বুঝি অজস্র বেদনায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। সেই দৃষ্টি, কিন্তু আজ তাহাতে সে উন্মাদনা ছিল না, এ যেন মৃতের মত শূন্য-দৃষ্টি। নীরবে বসিয়াছিল—যেন মূর্ত্তিমতী বিষাদপ্রতিমা!

কি বলিব, কি সান্ত্বনা আছে? মানসীকে তুলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া আমারই যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইতেছিল। অতসীর ঠাকুরমাকে অনেক বুঝাইয়া অরুণ তাঁহাকে কিছু শান্ত করিল। তাহার পর সেই তাঁহাদের যাইবার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ট্রেণে তুলিয়া দিতে চলিল; আমাকেও ছাড়িল না। গাড়ী ছাড়িবার সময় মানসী যা কান্না কাঁদিল, তাহা দেখিয়া বাস্তবিক পাষাণও বিগলিত হয়। অতসী জোর করিয়া যে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতেছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। অরুণ বার বার করিয়া তাঁহাদের বলিয়া দিল, মাঝে মাঝে খবর দিতে এবং সুবিধা অসুবিধা সকল খবর জানাইতে।

ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িতেই চমকিয়া অতসী আমার প্রতি চাহিল। শেষ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, শুভ্র মুক্তার মত দুই ফোঁটা অশ্রু অতসীর গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল—শেষ মুহূর্ত্তে সে আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। মাত্র কয়টি কথা—"আর বোধ হয় দেখা হবে না, সব দোষ ক্ষমা করবেন—"

তাহার বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। যত দূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম, অতসী ট্রেণের জানালায় মুখ বাড়াইয়া আছে—সেই অশ্রুপূর্ণ নেত্র যেন কত দিনের কত মর্ম্মব্যথার কথা বলিয়া যাইতেছে। আমার অজ্ঞাতে কখন্ আমার চোখেও এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়াছিল, জানি না। স্তব্ধভাবে শুধু শূন্য লাইনের পানে চাহিয়াছিলাম। অরুণ আসিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "চোখটা মোছ, অঞ্জন—চল, বাড়ী যাই।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় নিজেকে লুটাইয়া দিলাম। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল। স্বদেশে ফিরিয়া প্রবাসী তাহার বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেরূপ করিয়া তাহার হারান রতন খুঁজিয়া বেড়ায়, আমি তেমনই আমার বিগত স্মৃতির স্তূপের ভিতর অতসীদের মুখগুলি খুঁজিতে লাগিলাম। আজ রাত্রিতে সেই সব অনেক দিনের অনেক কথা ঐ স্তূপের ভিতর এক একটি রত্নের মত কুড়াইয়া সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। এ সঞ্চয়ে কি নির্ম্মল অনাবিল্ আনন্দ—আবার কি বিরাট দুঃখ!

শরতের জ্যোৎস্না-রাত্রি। এই নিস্তব্ধ নীরব রাত্রিতে একাই জাগিয়া আছি, জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিতেছি, যত দূর দৃষ্টি যায়, জ্যোৎস্না-ভরা তন্দ্রাহত রাত্রি। সকল বাড়ীই প্রায় নিস্তব্ধ, কেবল ঐ যে অনতিদূরে বাড়ীটা, তথায় তখনও কিসের উৎসব চলিতেছে। আলোকে উদ্ভাসিত বাড়ীটা তখনও কোলাহলে মুখরিত হইয়া আছে। রাত্রির নাট্যশালায় নট-নটীরা যেন আমার ঘুম কাড়িয়া লইতেছে, স্মৃতি যেন নটী ও মন যেন নটের অভিনয় করিতেছে। মনের বনে স্মৃতির কুঁড়িগুলি স্বতই ফুটিয়া উঠিতেছে আর সবেমাত্র ফুটিয়া-ওঠা সৌরভে মনকে মুগ্ধ ও মোহিত করিয়া ফেলিতেছে। আমিও সেই সৌরভে ক্রমশঃ তন্দ্রাসক্ত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি কত, তখন ঠিক জানি না। আধ-ঘুম-ঘোরে বুঝি স্মৃতির স্বপ্নরাজ্যে গিয়া পৌঁছিলাম; কিন্তু সে ক্ষণিক; তখনই তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অস্পষ্টভাবে কাণে সঙ্গীত-ধ্বনি আসিতে লাগিল। মনের বোঝা যেন আরও ভারী হইয়া উঠিল। খোলা বাতায়নের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। সেই বাড়ীটা হইতেই সঙ্গীতের শব্দ আসিতেছে। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। গায়িকা তখন বেহাগে সুর ধরিয়া সুললিত স্বরে গাহিতেছে—

"বিদায়ক্ষণে আঁখির পানে কি করুণ তার চাওয়া।
আঁখি বলে ভুল নাক ওগো মোদের সব দেওয়া সব নেওয়া॥"

৪

দীর্ঘ দুই বৎসর কালের কোলে লীন হইয়া গিয়াছে। অতসীদের সংবাদ এখন আর জানি না। তাহারা যাইবার পর কয়েক মাস অরুণ আমার জন্যই তাহাদের সংবাদ অতিকষ্টে যোগাড় করিত; কিন্তু পল্লীগ্রামে ইহা লইয়া বহু আন্দোলন হওয়ায় সে পথ বন্ধ হইয়াছে। কথাচ্ছলে অরুণ দুই এক দিন অতসীর সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। তাহারা আমাদের স্বজাতি, সুতরাং সামাজিক দিক্ দিয়া বিবাহে কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, যদি বিবাহ করি, তাহা হইলে অতসীকেই করিব, নচেৎ চিরকৌমার্য্যগ্রহণই আমার ব্রত। অরুণ বলিয়াছিল, "কোন্ কালে তুমি বিয়ে করবে ব'লে পাড়াগাঁয়ে বাস ক'রে অতসীর ঠাকুমা ত তাকে বড় ক'রে রাখতে পারছে না। তা হ'লে শীঘ্র করা দরকার।" বলিয়াছিলাম, "তাঁহাদের কথা দিও—আমি যখন বিবাহ করিব, তখন যতই বড় হোক, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। আমি ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া বিবাহ করিব, কাযেই ইহার অন্যথা হইতে পারে না।"

তাহাদিগকে অরুণ তাহাই বলিয়াছিল। তাহার পর হঠাৎ অরুণের ভয়ানক অসুখ করিল। প্রায় দুই মাসকাল রোগভোগের পর অরুণ রোগমুক্ত হইয়া যখন তাহাদের সন্ধান লইতে গেল, তখন জানিল, তাহাদের সংবাদ কেহ জানে না। অবিবাহিতা, অরক্ষণীয়া, অনূঢ়া কন্যা লইয়া পল্লীগ্রামে বাস অসম্ভব হওয়াতে, বৃদ্ধা পৌত্রী দুইটি লইয়া কোথায় গিয়াছেন। অরুণ তাহার পরও বহু অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু কোনও সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কিন্তু তবুও সে হতাশ হয় নাই।

আমার সম্বল সেই বিরাট স্মৃতির বোঝা বুকের মাঝে জগদ্দল পাথরের মত জমাট হইয়া আছে, আর আছে সেই অঙ্গুরীয়তে জড়ান একগাছি কুঞ্চিত কেশ। কোন কোন সময় মনে হইত, ভগবান্ স্মৃতির মত বিস্মৃতিকে যদি সহজলভ্য করিয়া দিতেন! কিন্তু মানুষের কি ভুল, তাহা হইলে কি অমাবস্যা-পূর্ণিমার প্রভেদ হইত? পূর্ণিমার স্নিগ্ধ রজতধারাই পৃথিবীকে সিক্ত করিত। এ প্রশ্নও মনে আসে, তথাপি মানুষ ত? মানুষমাত্রেই সুখটাকে কামনা করে, দুঃখটাকে কে আর ইচ্ছা করিয়া বরণ করে?

কয় দিন খুব বৃষ্টি-বাদলের পর আজ সকালের আকাশে সূর্য্যের আলোক নির্ম্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিশু যেমন দোলায় শুইয়া অকারণ আনন্দে হাত-পা ছুড়িয়া কলহাস্য আরম্ভ করে, তেমনই আশ-পাশের গাছ-পালাগুলি তাহাদের ডাল-পালাগুলি দোলাইয়া আকাশের পানে চাহিয়া কেবলই ঝিলমিল করিয়া উঠিতেছে। রক্তজবার রং-ছোপান ঊষার প্রথম আলো সবেমাত্র পূব-আকাশের ধারে পাড় বুনিয়া দিতেছিল। গাছের সবুজ পাতাও যেন মনের সুখে কাঁপিতে কাঁপিতে মধুর সুরে গানে যোগ দিয়াছে। আকাশে, বাতাসে, পৃথিবীতে কেমন একটা শান্তিভরা আনন্দের আভাস; কিন্তু এই শান্তিভরা পৃথিবীর মাঝে কি আমিই একা দুর্ব্বহ ব্যথার বোঝা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? কেন এমন হয়, ইহার মীমাংসা কি কেহ কোনও দিন করিয়াছে?

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে চক্ষু চাপিয়া ধরিল। জোর করিয়া ছাড়াইয়া দেখি অজয় এবং তাহার পশ্চাতে অরুণ। হাসিয়া কহিলাম, "কি ব্যাপার?" সহাস্যমুখে অজয় বলিল, "কি খাওয়াবি বল?" তেমনি ভাবে বলিলাম, "কেন বল ত, কি হয়েছে? হঠাৎ সকালবেলাই তোদের ক্ষিদে পেয়ে গেল কেন?"

অরুণ অজয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল "ও কি বলবে রে অজয়, চল না রজনীদার কাছে আর মার কাছে" বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল!

ব্যাপার বুঝিলাম, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছি। মা তাহাদের বলিলেন, "বেশ ত অজয়, তোদের যা ইচ্ছা খা, বাবা; কিন্তু এই অঞ্জন আর অরুণের আইবুড় নাম খণ্ডন ক'রে দেওয়ার ভার তোর।" বৌদিও যোগ দিয়া কহিলেন, "ঠিক, ঠিক জানেন ঠাকুরপো, এইবার এই কলির ভীষ্ম দুটির একটু ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না।'

অজয় বলিল, "হাঁ, সেই কথাই ত ছিল। এইবার ত অঞ্জন বিয়ে করবে, আর তা হলেই অরুণও করবে। তা সে ত এখনই হচ্ছে না, এখন আমাদের ব্যবস্থা করুন, তার পর ওদের ব্যবস্থা আমি করছি।"

অসহায়ভাবে অরুণের পানে চাহিলাম। তাহার

সহাস্য মুখ যেন বলিতেছিল, 'আমি থাকিতে তোর কোনও ভয় নাই।

অরুণ বৌদিকে বলিল, "খাওয়া ত আছেই বৌদি, অনেক দিন আপনার গান শোনা হয় নি। দিনরাত কলেজ-প্রফেসারের কর্কশ কণ্ঠ শুনে কাণটা ভারী জ্বালা করছে। এখন একটু মিষ্ট কণ্ঠের গান শুনিয়ে দিন দেখি।"

উহাদের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। নিজকক্ষে গিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলাম। এইবার আর কি করিয়া দাদার কথা এড়াইব? কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা অটল! অরুণ ভিন্ন কেহই আমার সাহায্য করিবে না। কি উপায়ে মায়ের ও দাদার কথা কাটাইব, সেই চিন্তাই আমার ভয়ানক হইয়া উঠিল। ইহার অপেক্ষা যদি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় কিছু শান্তি পাইতাম। না, আর ভাবিতেও পারি না, যাহা হয় অরুণ করিবে।

হঠাৎ কাণে আসিল বৌদির মিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীতের শেষ কয়টি লাইন—

"আর ত হলো না দেখা
এ জীবনে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে,—
মধু যামিনী রে।"

আমার মনের প্রতিধ্বনি লইয়া কি এই গানটি রচিত? বৌদিদি কি আমার অন্তরের গোপন ব্যথার আভাস পাইয়াছেন?

৫

মাকে বলিলাম, "চল মা, বেড়াতে যাবে?"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?" বলিলাম, "যেখানে হোক্—কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, যেখানে হোক। এমন কি, বিলেত যেতে চাও, তাও নিয়ে যেতে পারি। চল, যাবে?"

হাসিয়া মা বলিলেন, "দূর পাগ্‌লা, বিলেত কে যাবে? আগ্রাটা আমার দেখা হয় নি, তাজমহলটা দেখে চল দিন কতক কাশী বেড়িয়ে আসি। ফাল্গুন মাসের আগে কিন্তু বাড়ী ফিরতে হবে। রঞ্জন বল্‌ছিল, ২রা ফাল্গুন তোমার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে।"

আবার সেই দিন? এ কি শুভদিন না মৃত্যুর দিন?

যাক্, যে কয় দিন চলে চলুক। বলিলাম, "সে যা হয় হবে, চল ত এখন।"

মা বলিলেন, "তুই আমি আর কে? অরুণ না গেলে তোমার দ্বারা আমার কিচ্ছু হবে না।"

হাসিয়া বলিলাম, "সে কি মনে করেছ, আমাদের ছেড়ে দেবে, নিজে যাবে না? আর সে না গেলে বিদেশে তোমার হাঙ্গামা কে পোয়াবে?"

আজ কয় দিন আগ্রায় আসিয়াছি। সুন্দর প্রভাত শরৎকালের প্রসন্ন মূর্ত্তি যেন অকারণ পুলকিত করিয়া তুলিতেছিল। শিবের জটা ছাপাইয়া গঙ্গা যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। পৃথিবী আজ মাথা নত করিয়া তাঁহার অশ্রু-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলিয়া দিয়াছে; আকাশের কোন তরুণ দেবতা হাসিমুখে তাহার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জল, স্থল, শূন্যতল আজ একটি জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! মাত্র জাগ্রত প্রভাতের কর্ম্ম-কোলাহল উঠিতেছে। ঐ দূরে তাজমহল। সম্রাট্ শাজাহানের অপূর্ব্ব প্রেমের নিদর্শন। প্রভাত-সূর্য্যের মৃদু আলোক মর্ম্মর-দেহের উপর পড়িয়া কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! কবির লেখা একটা ছত্র মনে পড়িয়া গেল—

"তাজমহলের পাথর দেখেছ দেখিয়াছ তার প্রাণ
অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরেতে শাজাহান।"

এখানে আসিয়া কিছু শান্তি পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্যে। প্রাণের অভাব যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়াই আছে।

অরুণ আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিল,—"আচ্ছা ভাবুক হয়েছিস তুই, অঞ্জন, চল—মা ডাকছেন—আজই ডেরাডাণ্ডা তুলতে হবে। মা'র আর ভাল লাগছে না—তিনি এখন কাশী যেতে চান। কি বলিস তুই?"

হাসি পাইল—'কাণার আবার দিন-রাত'—বল্লুম, "যা খুসী, চল, যেখানে যাবে।"

কাশী আসিলাম। কোথাও শান্তি পাই না—বিরাট বোঝা বুকের মধ্যে লইয়া দিন কাটিতে লাগিল।

হঠাৎ সে দিন কাছে বসিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হ্যাঁ রে অঞ্জন, কিছু খেতে পারিস না কেন? রোজই দেখি, পাতে সব প'ড়ে থাকে—শরীরও শুকিয়ে উঠ্ছে, কেন বল দেখি? বাইরে এসেও শরীর সারছে না কেন, কি হয়েছে? অরুণেরও ঐ দশা, ভাল ক'রে খায় না, তবু ওর একটু স্ফূর্ত্তি আছে। আমাকে এখানে ওখানে নিয়ে যায়। তোর যে তাও নেই। সকালে বিকালে ঐ দশাশ্বমেধের ঘাটে ব'সে থাকিস, আর কোথাও নড়িসও না। কি হলো তোর? অরুণ, তুই জানিস ত তোদের কি হয়েছে, বল না?"

অন্নের গ্রাস মুখে তুলিয়া অরুণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আমার কি হবে, কিছু না ত? ওর বোধ হয় বিয়ের নামে ভয় হয়ে গেছে, তাই শুকিয়ে উঠছে। তাই না রে?"

আমি তেমনই ভাবে উত্তর দিলাম, "বাজে বকিস না অরুণ। মা'র যেমন কথা! রোগা যে কোথায় হলাম, দেখতে পাই না।"

মাকে কি বলিব, কি ভীষণ স্মৃতির চিতা বুকের ভিতর অহরহঃ জ্বলিতেছে। তাহা ভিন্ন অতসীদের আশা দিয়া কত বড় সর্ব্বনাশ করিয়াছি। এই চিন্তাই আমার কাল হইয়াছিল। এই ভাঙ্গা শরীর ও বেদনাভারাক্রান্ত উদাসীন মন লইয়া কি প্রকারে স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইব?

মা বলিলেন, "তবে না হয় বাপু থেকে কায নেই, বাড়ী ফিরে চল।"

সবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "না মা, এখন যাওয়া হয় না, তুমি যদি একান্তই যাও ত অরুণ তোমায় রেখে আসবে। আমি এখন যাব না।"

মা বলিলেন, "আমার জন্য ত বলছি না, তোমার জন্যই বলছি। না যাও, সে ত ভাল—আমার বিশ্বনাথ দেখাটা তবু হচ্ছে।"

সে দিন প্রভাতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর বসিয়া অপর পারের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলাম। দূরে বেণীমাধবের ধ্বজা অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া যাইতেছে, দূরে সন্ন্যাসীর দল হর হর ব্যোম শব্দে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে। সম্মুখে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কলকল ধ্বনিতে ছুটিয়া চলিতেছেন।

হঠাৎ স্নানার্থীদের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, একটি মেয়ে সিক্ত-বস্ত্রে দ্রুতপদে সোপান অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। মনে হইল—মানসী না? ঠিক তাহারই মত মুখ; কিন্তু সে ত অত বড় নহে! কিন্তু ভুল তখনই ভাঙ্গিল। কত দিনের অদর্শন, এখন সে ত অতবড় হইবার মতই হইয়াছে। পুনর্ব্বার আর চাহিতে পারিলাম না। একে স্ত্রীলোক, তার উপর যদি সে না হয়। সকলে কি ভাবিবে, নির্লজ্জের মত স্ত্রীলোকের পানে চাহিব? কিন্তু আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিবার শক্তি রহিল না, বুকের ভিতর দ্রুতস্পন্দন আরম্ভ হইল, সর্ব্বশরীরে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ হইতে লাগিল, বাড়ী আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরেই মা অরুণের সহিত বিশ্বনাথদেবের মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইলেন, অরুণকেও যেন আজ কিছু বেশী প্রফুল্ল বলিয়া মনে হইতেছিল। অরুণ আসিয়া বলিল, "জানিস অঞ্জন, আর তোকে আটকে রাখতে পারলুম না। মা কোনও কথা শুনবেন না, ২রা ফাল্গুন তোর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। আমি আর কি বলব বল?"

মনটা কেমন দমিয়া গেল, অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "কি করবো বল, অতসীদের যে কথা দিয়ে রেখেছি?"

অরুণ বলিল, "আর কাটাবার উপায় নেই, ভাই। অতসী কি আজও অবিবাহিতা আছে মনে করিস?"

অরুণ আজ এ কি কথা বলিল? এত দিন ধরিয়া সেই ত আমায় বাধা দিয়াছে, আমার সহায়তা করিয়াছে; কিন্তু সেই-ই আজ আমার বিবাহে উদ্যোগী? আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনশীল জগৎ! সেই অরুণ আজ এ কি কথা কহে? কোনও জ্ঞানী লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, কঠিন পাথরের গায়ে আঁচড় কাটিলে কালের যাদুস্পর্শে ক্রমশঃ তাহা বিলীন হইয়া যায়—আর পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষের বুকের আঁচড় কি কখনও চিরকাল থাকে? থাকে না। এই প্রশ্ন লইয়া তাঁহার সহিত কতই না তর্ক করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়, আজ যে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। অদৃষ্ট-নিয়ন্তার যাহা লিখন, তাহা হইবেই, কি করিব আমি? ভাবিয়াছিলাম, অস্পষ্টভাবে মানসীকে দেখিয়াছি, তাহা অরুণকে বলিব; কিন্তু তাহার আজিকার কথায় আর এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না।

মা কাশী ত্যাগ করিবার প্রসঙ্গ তুলিতেই বলিলাম, "তুমি যাও মা, আমি আরও কিছু দিন থাকবো। ২রা

পৌঁছলেই হলো ত?" ভাবিয়াছিলাম, মা চলিয়া গেলে চিঠিতে জানাইব, এখন বিবাহ করিতে পারিব না।

কিন্তু মা গম্ভীরভাবে আদেশের স্বরে বলিলেন, "সে হয় না অঞ্জন, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। বিয়ে এখন বন্ধ রইল, আজ চিঠি এসেছে। রঞ্জনের অসুখ করেছে, বৌমাও নাকি বাড়ী নেই, তোমাকে যেতে হবে।"

বিবাহ বন্ধ হইবে!—যাক্, তবু একটু সান্ত্বনা পাইলাম—বলিলাম, "বেশ চল, দাদার অসুখ বল নি ত আগে!"

ক্রমে বিদায়ের দিন আসিল—কিসের মোহে কি এক অদৃশ্য আকর্ষণের প্রভাবে সে দিন দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম—যদি কাহারও দেখা পাই। কিন্তু হায়, আমার আশাবারি মরীচিকায় পরিণত হইল।

বাড়ী আসিয়াই অজয়ের এক চিঠি পাইলাম। অজয় লিখিয়াছে--

"ভাই অঞ্জন!

অনেক দূরে—তোদের নিকট হ'তে বহুদূরে সুদূরপথে সাগরপারে চলেছি। অরুণের চিঠিতে শুনেছিলাম, খুব শীগ্‌গির তোর বিয়ে হবে, কিন্তু তুই নাকি রাজি নয়। কেন বল ত? যা হয়ে গেছে, তাই নিয়ে এখনও পাগলামী করছিস, ভাই? তুই শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ বিচারশক্তিসম্পন্ন, তোর এরকম ভাব দেখ্‌লে কি মনে হয়, বল দেখি?

জাহ্নবীর নির্ম্মল পূত সলিল যেমন কূলস্থ ঊষর ক্ষেত্র সিক্ত ও উর্ব্বর ক'রে দেয়—উপলে প্রতিহত হ'লে যথাস্থানে ফিরে আসে, সেইরূপ নারীহৃদয়নিঃসৃত বিমল স্নেহ, প্রেম ও প্রীতি স্বতঃই মানুষের মনের ক্ষেত্রকে সিক্ত ক'রে দেয়—সংসার-উদ্যানকে সুদৃশ্য ক'রে রাখে। কিন্তু সেই জলধারা কঠিন পাথরে প্রতিহত হ'লে জলকণা সৃষ্টি করে। তাতে পাশের জমীকে কিছু সিক্ত ক'রে দেয়—ব্যর্থ জীবনকে আংশিক সফলতা দেয়—ইহা ধ্রুব সত্য। যাক্, এ সব দার্শনিকের তত্ত্বকথা। সাংসারিক জীব আমরা, দুটো কাযের কথা ব'লে ছুটী নিই।

আমার স্থূল বুদ্ধিতে এইটুকু ধারণা হয়েছে, মানুষ যেমন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, নিজের মনকে সংযত রাখতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া যায় না, ভাই। আর এক কথা, হিন্দুর বিয়ে শুধু সামাজিক বন্ধন নয়—জন্মজন্মান্তরের একটা সুদৃঢ় বন্ধন একসঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। সুতরাং জন্মজন্মান্তরের যে সঙ্গিনী, সেই এই জীবনের সঙ্গিনী হবে। দাম্পত্য-জীবন সুখময় হবে না, এ কথা তোর মুখ হ'তে শুনলে—বলব—কেন হবে না? হিন্দু গৃহের সহধর্ম্মিণী সকল অবস্থাতেই স্বামীর অনুগামী হয়। এর বিপরীত দৃষ্টান্ত কদাচিৎ ঘটে। তারা নারী-জাতি—ক্ষমার মূর্ত্তি। নারী স্নেহময়ী, সে কথা কি নূতন ক'রে ব'লে দিতে হবে?

শেষকালে আমার বক্তব্য এই যে, ও সব পাগলামী ছেড়ে নবজীবনের পথ-চলা সুরু করো।

কবে দেশে ফিরবো, জানি না। যখন ফিরবো, তখন তোর পাশে আর এক জনকে দেখবো ত নিশ্চয়? আবার তত দিনে হয় ত তাঁর কোলেও চাঁদের একটু কণা কিম্বা হীরের একটু টুকরো খসে প'ড়ে তোর প্রণয়-কলহের মিলনের সেতু রচনা করছে। আমার কল্পনা যেন বাস্তবে পরিণত হয়। অরুণ ও তুই আমার অকৃত্রিম ভালবাসা জানিস। ইতি

ইতি তোর অজয়।"

চিঠি পড়া শেষ করিয়া ভাবিলাম, অজয়, তুমি কি বুঝিবে? জীবনারম্ভের প্রথমেই যাহাকে বরণ করিয়াছি, কে জানিত, আজ জীবনের মধ্যপথে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে? অরুণের উপরও আজ কেমন বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আবাল্য বন্ধু, সেও আজ আমার বিরুদ্ধ!

৬

প্রভাতে নহবতের ভৈরবী সুরের সঙ্গে ঘুম ভাঙতেই জানিলাম, আজ আমার বিবাহ। বৌদি আসিয়া বলিলেন, "ওগো ভীষ্ম ঠাকুর, ওঠো, আজ আর ঘুম নয়।"

কি বলিব? তাহাদের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় কায করিয়া যাইতেছিলাম। এত লোকের মাঝে কিন্তু অরুণকে একবারও দেখিতে পাইলাম না। কেবলমাত্র একবার কাণে আসিল, মা দাদাকে বলিতেছেন, "আজ একটা বিয়ে, আবার তরশু একটা কেন ঠিক করলি, রঞ্জন? দুদিন পেছিয়ে দিলে হতো।"

তিন দিন পরে আবার কাহার বিবাহ? কে জানে! যাহার হয় হউক। আমার বলিদান ত আজ সম্পূর্ণ হউক।

শুভদৃষ্টির সময় সকলের অনুরোধেও নতদৃষ্টি তুলিতে

পারিলাম না। তাহাতে কিন্তু বিবাহ আট্‌কাইল না—নির্ব্বিঘ্নে সকল কর্ম্ম সমাপন হইয়া গেল।

পরদিন বাসিবিবাহের কার্য্য যথাবৎ সম্পন্ন করিয়া নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। বাটীর প্রাঙ্গণে ঢুকিবামাত্র দেখি, সহাস্যমুখে অরুণ দাঁড়াইয়া আছে। কাল একবারমাত্র বিবাহবাড়ীতে চকিতের মত তাহাকে দেখিয়াছি, তাহার পর আর পাত্তাই পাই নাই। আমার বিবাহে সে এরূপ করিবে, তাহা ভাবিতে পারি নাই। ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তাহার দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম।

কিছু ভাল লাগিতেছিল না। কি ভাবিয়াছিলাম—কি হইল? এই আনন্দ-কোলাহলমুখরিত বাটী; কিন্তু আমার প্রাণে বিষাদের কাল-মেঘ, অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারের ন্যায় ঘিরিয়াছিল।

* * * *

দোল-পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারা আকাশের কোল হইতে নিঃশব্দে গলিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছিল। বসন্তের উতলা সমীর মনকে প্রসন্ন করিতে পারিল না।

ফুলশয্যা। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, চন্দ্রালোকে কক্ষ ভরিয়া গিয়াছে, পুষ্পের সুবাসিত গন্ধে প্রাণে পবিত্রতা আনিয়া দিতেছে। অদূরে ঐ যে বিছানার উপর শয়ন করিয়া—ইনিই আমার নবজীবনের সঙ্গিনী। এখন ত ইঁহাকে উপেক্ষা করিবার অধিকার নাই।

রাত্রি দুই প্রহর হইয়া গিয়াছিল। শয্যার নিকট গিয়া দেখিলাম—নববধূ উপধানে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মস্তকের অবগুণ্ঠন খসিয়া গিয়াছে। কণ্ঠের পুষ্পমাল্য তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। চন্দ্রালোক গবাক্ষ-পথ দিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল।

চমকিয়া উঠিলাম—নিজের অজ্ঞাতে মুখ হইতে বাহির হইল—"এ কি অতসী! কি আশ্চর্য্য!"

আমার কণ্ঠস্বরে নববধূ ত্রস্তে উঠিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে অরুণের কণ্ঠস্বর শুনিলাম—"যেই হোক—কিন্তু অরুণ ভারী খারাপ লোক—যার জন্য কাশী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে কথাই বন্ধ হয়ে গেছে—ভাল কথা। যাক আর বেশী জ্বালাতন করলে মুখ দেখাই পাপ হবে হয় ত।"

গভীর পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল—আর বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিতেছিল।

অতসীর কাছে জেরা করিয়া জানিলাম, কাশীতে তাহাদের সহিত অরুণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারই কার্য্য-কৌশলে আমাকে নববধূর পরিচয় না জানাইয়া এই অঘটনসংঘটিত হইয়াছে। মা, দাদা সবই জানিতেন এবং আরও একটি খবর—মানসীর সহিত কাল অরুণের বিবাহ। সেটা অবশ্য মায়ের কথা মত। পুলককম্পিত-হৃদয়ে অতসীকে বহুদিনের সঞ্চিত বাক্যস্রোতে ভাসাইতে লাগিলাম। অতসী কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরা, ধীরা, গম্ভীরা, কেবল তাহার বিশাল আয়ত নেত্র আমার সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া যাইতেছিল।

বাহিরের ঘর হইতে তখন অরুণ ও অন্যান্য বন্ধুদের বিচিত্র কণ্ঠের গীতলহরী কাণে আসিতেছিল—

'জয় প্রজাপতি সুন্দর তুমি
অঘটনসংঘটনকারী।
সুমেরু কুমেরু পার মিলাইতে—
কি ছার অচেনা দুইটি বাড়ী।
বাড়ী ভ'রে গেছে লুচির গন্ধে
পুরবাসিগণ মগ্ন আনন্দে
সবার আননে মধুর ছন্দে
উছলিছে হাসি-বারি।'

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

এক বৎসর

১

তাহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল এক দিন ট্রেণের মধ্যে। আজ হঠাৎ নিজের গ্রামের মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া, অক্ষয় বিস্ময়ে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল; কহিল,—"এ কি! আপনি যে! এ দিকে কোথায় এসেছিলেন?"

তিনি সচকিতে ফিরিয়া দেখিয়া কহিলেন,—"এই যে, আপনি? এই গাঁয়েই আপনার বাড়ী? আমি একটি মেয়ে দেখতে এসেছিলাম, আপনাদের এই পাশের গ্রাম নবগ্রামে। আছেন ভাল? আপনাদের কোন্ বাড়ী?"

অক্ষয় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল, আদর-অভ্যর্থনা করিল এবং সে বেলাটা থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার জন্য আহারাদির যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইল।

লোকটির নাম রামগতি রায়। ব্রাহ্মণ, হুগলী জেলার এই দিকেই কোন গ্রামে তাঁহার বাটী। কিন্তু তিনি গ্রামে থাকেন না। বহুদিন হইল, গ্রামের বাস তুলিয়া দিয়া, সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। নিজের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিলেন,—"ত্রিশ বচ্ছর পর্য্যন্ত দেশে থেকে উৎসন্ন যেতে বসেছিলুম আর কি! এই বচ্ছর দশ বারো হ'ল, এখান থেকে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে তবে ত বেঁচেছি। বাস করবার স্থান বটে। এক পা হাঁটতে হবে না, একটু ধুলো-বালি নেই, খাবার জিনিষ অজস্র; ভাদ্র মাসে কমলা খাও, আশ্বিন মাসে আম খাও, কার্ত্তিক মাসে পটল খাও। তার পর আমোদ-প্রমোদের চূড়ান্ত ব্যবস্থা, থিয়েটার দেখ, বায়স্কোপ দেখ, ফুটবল, ঘোড়দৌড়, সভা-সমিতি, মিটিং; আর পয়সার ছড়াছড়ি—হরির লুঠ ব্যাপার, কুড়োতে পারলেই হ'ল।—অমরাবতী—অমরাবতী!"

অক্ষয় কহিল,—"সবই ত ভাল, কিন্তু এই—এইটে আসবে কোত্থেকে" বলিয়া বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী আঙুলের সংযোগে কি একটা সঙ্কেত করিল।

রামগতি কহিলেন,—"কলকাতা হ'ল পয়সার যায়গা। সেখানে পয়সা হবে না ত কি হবে আমার এই জঙ্গল আর ধানক্ষেতের মধ্যে?"

এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বহু আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ হইল এবং তাহার ফলে দরিদ্র অক্ষয় একরূপ স্থির করিয়াই ফেলিল যে, ভাদ্রমাসটা কাটিলেই সে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে এবং পল্লীজীবনের এই দুঃখ, কষ্ট ও দীনতার অন্ত করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া অর্থার্জ্জন দ্বারা সে অমরাবতীর সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিবে।

একটি একটি করিয়া ভাদ্রমাসের শেষ কয়টা দিনও কাটিয়া গেল। আকাশের রংয়ে ও বাতাসের স্পর্শে শরৎ তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল সোনালী রূপটি ছড়াইয়া দিল। দুঃখের দীর্ঘ অশ্রুবর্ষণের পর যেন অজানা কাহারও সান্ত্বনা পাইয়া ধরিত্রীর সর্ব্বাঙ্গে অনির্ব্বচনীয় পুলক লাগিয়া গেল।

গ্রামেতেই পূজা। বারোয়ারীর দুর্গোৎসব। গাঁয়ের লোক এক বৎসরের দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অশান্তি ভুলিয়া গিয়া আসন্ন পূজার আনন্দে অন্তর ভরাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় মহা-উৎসব। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী-দরিদ্র, সুস্থ-অসুস্থ, সকলেরই অন্তরে আশা, উৎসাহ, আনন্দ; মুখে সকলেরই হাসি।

কিন্তু অক্ষয়ের মুখের হাসির অন্তরালে এ সময়টা দুশ্চিন্তার একটা ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। ঘরে তাহার অন্ন নাই, হাতে তাহার অর্থ নাই। কারণ, গাঁয়ের জমীদারী সেরেস্তার যে কাযটুকু সে করিত, কয় মাস হইল, সে কাযটি তাহার গিয়াছে। টাকা-কড়ির গোলমাল লইয়াই ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল। সংসারে যেমন তাহার অন্য কোন পরিজনও ছিল না, তেমনই বিষয়-সম্পত্তিও তাহার কিছুই ছিল না, তাই উদরান্নের জন্য ইতিমধ্যে কয়েকবার সে গাঁ ছাড়িয়া কলিকাতায় বা অন্য কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গাঁ ছাড়িয়া যাওয়া তাহার হয় নাই। গাঁয়ের মাটী এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের বাঁধন

দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, গাঁ-ছাড়া হইয়া যাইতে সে পারে নাই।

কিন্তু কলিকাতার কথা সে জানে—ভাল করিয়াই জানে। তাই কখন মনে ভাবে, সেখানে যদি একবেলা আধপেট ভরিয়া খাইয়াও তাহার দিন কাটে, তাহাতেও তৃপ্তি, তাহাতেও সুখ। গ্রামের ঘোষেদের বাড়ীর নগেন, রাজেন, রায়েদের সুকুমার, ও পাড়ার দুর্লভ,—এরা যখন কলিকাতা হইতে বাড়ী আসে, অক্ষয় তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মনে মনে ভাবে, এদের মত সৌভাগ্য যদি তার হয়! সত্যি, কি সুখে লোকে গাঁয়ের মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকে! নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া যারা, তাদের ভাগ্যেই এই জল-কাদা, বন-জঙ্গল, বাঁশবাগান, আর তেপান্তরের মাঠ!

সে দিন অক্ষয় এই সব কথাই ভাবিতে ভাবিতে বারোয়ারীতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সকালবেলা, সেখানে প্রতিমার গায়ে রং দেওয়া হইতেছিল আর পাড়ার যত ছেলে-মেয়ে সেইখানে জমা হইয়া পোটোকে ঘিরিয়া একটা মহা হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিয়াছিল। কেষ্টকে বলিতেছে, "হ্যাঁ পোটো দাদা, সিঙ্গীর ল্যাজে রং দিলে না?" গিরে বলিল,—"এ কি গো! মা দুর্গার কপাল দিয়ে যে রং গড়িয়ে পড়ছে!" মুখুয্যেদের রাণী কহিল,—"ওগো, আমার এই খুরিতে একটু রাঙ্গা রং দাও না, আমার পুতুলের বৌয়ের পায়ে আলতা পরাব।"

অক্ষয় একটু দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে পটুয়া তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—"চক্কোত্তি মশাই, এবার রংয়ের দামটাম সব চ'ড়ে গেছে, এবার কিন্তু একটু বিবেচনা করতে হবে।" অক্ষয় যাইতে যাইতে কহিল,—"এবার আর আমার সঙ্গে পুজোর কোন সম্পর্ক নেই, হরি। এবার বারোয়ারীর ম্যানেজার হচ্ছে জ্ঞানবাবু। জ্ঞানবাবুকে বোলো।"

কথাটা তাই বটে। অক্ষয়ের সহিত এবার বারোয়ারীর পূজার কোন সম্পর্ক নাই। তাহার কারণ, গেলবারের টাকা হইতে নাকি অক্ষয় কি-সব গোলমাল করিয়াছে। গেলবারের তহবিল তাহার কাছেই ছিল। অক্ষয় সকলের সহিত ইহা লইয়া ঝগড়া করিয়াছে, বলিয়াছে, "আমি কি চোর? এতই যদি অবিশ্বাস, তা' হ'লে আর পুজোর ব্যাপারে আমি থাকবো না, আমাকে কেউ আর ডেকো-টেকো না।" গোলমাল যে কিছু করিয়াছিল, সে কথাটা মিথ্যা নহে। তবুও বারোয়ারীর কর্ত্তারা তাহাকেই পাণ্ডা হইবার জন্য সাধাসাধি করিয়াছিল, কিন্তু অক্ষয় রাগে হউক, অভিমানে হউক, এবার সে পূজার কোন কথাতেই ছিল না। তবে শেষের দিকে সে স্থির করিয়াছিল যে, ইহার পর আর একবার যদি উহারা বলিতে আসে, তখন না হয় তহবিল আবার হাতে লওয়া যাইবে। কিন্তু আর কেহ এ কথা বলিতে আসে নাই, সুতরাং অভিমান তাহার চরমেই উঠিয়াছিল এবং তাহারই ঝোঁকে পটুয়াকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "ম্যানেজার হচ্ছেন এবার জ্ঞানবাবু, যাও, তাঁর কাছে যাও।—ছাগল দিয়ে কি যব মাড়ানো হয়, হরি? আজ বাদে কাল পূজো, এখনও পর্য্যন্ত পূজার 'পূ'-য়ের যোগাড়ও হয় নি! খরচের ফর্দ্দখানা পর্য্যন্ত এখনও বাবুরা ক'রে উঠতে পারেন নি! এ কি আর অক্ষয় চক্কোত্তি যে, কলে কায চালিয়ে দেবে!"

ষষ্ঠীর দিন পূজাতলায় আগমনীর বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ঢোল ও কাঁসির শব্দ তাহার মনকে খুবই চঞ্চল করিয়া তুলিল। তথায় যাইবার জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছা হইলেও সে বাটী হইতে বাহির হইল না। সমস্ত দিন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সে নানারূপ ভাবিতে লাগিল এবং ভাবিয়া ইহাই ঠিক করিল যে, সে আর গ্রামে কিছুতেই থাকিবে না। মহামায়ার পূজা যেন তাহাকে দেখিতে না হয়। আগামী কল্য প্রত্যুষেই সে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে এবং আর কখনও সে গাঁয়ের মাটী মাড়াইবে না।

করিলও তাই। পরদিন অতিপ্রত্যুষে সে তাহার বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া কলিকাতা যাইবার উদ্দেশে ষ্টেশনের পথে যাত্রা করিল।

২

এক মাস হইল, অক্ষয় কলিকাতায় আসিয়াছে। আড়াই টাকা ঘরের ভাড়া ও দুই আনা টেক্স, মোট দু' টাকা, দশ আনাতে মাণিকতলার এক বস্তির মধ্যে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া সে থাকে। নিকটেই একটি হোটেল আছে। সেইখান হইতে দু'বেলা সে খাইয়া

আসে। তিন পয়সার ভাত, এক পয়সার দাল, তুই পয়সার মাছের ঝোল—এই ছয় পয়সার ভিতরেই তাহার এক বেলাকার খাওয়া হয়। কোন দিন ইহার উপর এক পয়সার ভাজা বা এক পয়সার অম্বল।

বাটী হইতে একখানা মোহর সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। মোহরখানি তাহার ঘরে লক্ষ্মীর হাঁড়ির লক্ষ্মীর ধানের ভিতর তাহার পিতামহের আমল হইতে রক্ষিত ছিল। অক্ষয় কাপড়ে ঘষিয়া তাহার সিঁদূরের দাগ তুলিয়া ফেলিয়া মাণিকতলার বাজারের এক পোদ্দারের দোকানে বিক্রয় করিয়াছিল। তাহাই বিক্রয় করিয়া এই এক মাস তাহার খরচ চলিতেছে। হাতে আর যৎসামান্যই আছে। টানাটানি করিয়া তাহাতে না হয় আরও একটা মাস কোন রকমে চলিতে পারে। কিন্তু তাহার পর? এর জন্য দুর্ভাবনার তাহার অন্ত নাই।

অবশ্য চুপ করিয়াও সে বসিয়া নাই। প্রথম প্রথম কয়েক দিন সে আফিস-আদালতের দিকে খুব ঘুরিয়াছিল, কিন্তু কোন সুবিধা করিতে পারে নাই, পরন্তু এইটাই বুঝিয়াছিল যে, টপ্ করিয়া বাহির হইতে আসিয়া বিনা সুপারিসে কলিকাতায় কোন কায যোগাড় করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

এক দিন সে খবর পাইল যে, নিকটে একটি বাড়ীতে ছোট ছোট ২।১টি ছেলেকে তুই বেলা পড়াইবার জন্য এক জন মাষ্টারের দরকার। অক্ষয় সেখানে গিয়া দেখা করিল। মাষ্টার এক জন চাই বটে, কিন্তু ছেলে ২।১টি নয়। ছয় হইতে নয় বৎসর বয়সের তিনটি ছেলে ও তুইটি মেয়ে। তুই বেলাই পড়াইতে হইবে। মাহিনা ছয় টাকা।

এত দিনের এত চেষ্টার পর এই কাযটি তাহার জুটিয়া গেল। সে মনে মনে নিরুৎসাহ না হইয়া ভবিষ্যতের আশায় তাহার বর্ত্তমান চাকুরীতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তুই বেলা ছেলে পড়াইয়া, বাকী সময়টা সে ইতস্ততঃ চারিদিকেই ইহা অপেক্ষা কোন ভাল কাযের, অভাবপক্ষে কোন ভাল টুইশানির সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার জন্য 'দৈনিক বসুমতী,' 'ষ্টেট্স্‌ম্যান্,' 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি পত্রিকার 'ওয়ানটেড্' কলমগুলিও সে কোন দিনই দেখিতে ভুলিত না। ইহা ছাড়া বাড়ীর দেওয়ালে, ল্যাম্পপোষ্টে, পার্কের প্রাচীরগাত্রে যে সব কাগজ আঁটা থাকিত, সেগুলির প্রায় কোনখানিই তাহার চক্ষু এড়াইত না। একই কাগজ হয় ত পনের দিন ধরিয়া রোজই পড়িতেছে। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় প্রত্যহই সে মনে করে যে, আজ হয় ত কোন নূতন খবর কোন না কোন স্থানে দেখিতে পাইবে, কিন্তু নূতন হয় ত পায়, তবে তাহা টুইশানির নয়—বাড়ী ভাড়ার। অক্ষয় যাহা চায়, তাহা আর পায় না। সে আশ্চর্য্য হয় যে, শতকরা নিরেনব্বইখানা কাগজেই বাড়ী ভাড়ার কথা। তা' ছাড়া যদি আর কিছু থাকে ত "For sale"এর ভূমিকা দিয়া কোন কিছু বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

এক মাস পরে হঠাৎ এক দিন একটা ল্যাম্পপোষ্টে তাহার অভীপ্সিত কাগজ আঁটা দেখিতে পাইল—"গৃহশিক্ষক চাই। বেতন পনেরো টাকা।" আনন্দে তাহার মন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু—কিন্তু আসল জিনিষটাই যে নাই। ঠিকানাটা যে কে ছিঁড়িয়া দিয়াছে? একটুও কি বোঝা যায় না?—না, বেশ ভাল করিয়াই ছিঁড়িয়া দিয়াছে। মনটা তাহার খারাপ হইয়া গেল। পরের ল্যাম্পপোষ্টটার কাছে গেল। তাহাতেও ঐ একই কাগজ আঁটা রহিয়াছে বটে, কিন্তু ঠিকানার দুর্দ্দশাও ঐ এক। অক্ষয় আরও অগ্রসর হইল। পর পর যতগুলি ল্যাম্পপোষ্টে সে "গৃহশিক্ষক চাই" দেখিতে পাইল, সকলগুলিরই ঠিকানা নিয়মমত বেশ সুন্দর করিয়া ছিঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তবুও অক্ষয় দমিবার পাত্র নহে। সে পুনরায় প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্ট ভাল করিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, ঠিকানার কোন সূত্র—কোন একটিমাত্র অক্ষর যদি পড়িতে পারা যায়। একটি কাগজে "৩" টুকু সে পাইল। আর একখানিতে 'পার রোড'টুকু কোনরকমে পড়িতে পারিল। ইহা হইতেই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং ষ্ট্রীট ডাইরেক্টরী খুঁজিয়া সে রাস্তাটির নাম আন্দাজে ধরিয়া ফেলিল যে, উহা গড়পার রোডই হইবে। গড়পার না হইয়া জুনিপার রোড হওয়া অসম্ভব। কারণ, জুনিপার রোড্ বালীগঞ্জে। বালীগঞ্জের লোক তাহাদের সীমানা ছাড়াইয়া এ অঞ্চলে কাগজ আঁটিতে যে আসিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং 'পার'এর আগে যে 'গড়' ছিল, ইহা বেশই বুঝিতে পারা যাইতেছে। শুধু ৩ হইতে বাটীর সঠিক নম্বরটি

অক্ষয়ের জানিবার কোনই উপায় ছিল না। উহা ৩ হইতে পারে, ৩০ হইতে পারে, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ ইত্যাদি হইয়া ৩৯ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তবে ১৩ বা ২৩ বা ৪৩ ইত্যাদি যে হইবে না, তাহা সে বুঝিল। কেন না, ৩ এর পর হইতেই ছেঁড়া হইয়াছে, আগে হইতে নহে। তাহার পর তিন শতের কোঠা ত হইতেই পারে না, কারণ, গড়পার রোডে অত সংখ্যা বাড়ী নাই। অক্ষয় স্থির করিল যে, ৩ নং বাটী এবং ৩০ হইতে ৩৯ নং, মোট এই ১১ খানি বাড়ীর প্রত্যেক বাড়ীতে যাইয়াই তাহাকে খোঁজ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

করিলও তাই। একে একে সব বাড়ীতে যাইয়া সে বলিতে লাগিল,—"বিজ্ঞাপনে দেখলুম, আপনাদের এক জন মাষ্টার চাই।"

৩৭ নং বাটীটি বহু পুরাতন। ভগ্ন অবস্থা। তাহারই ছোট বৈঠকখানা-ঘরের মেজের উপর একখানা ছেঁড়া কম্বলের উপর বসিয়া একটি ১৩।১৪ বৎসরের মেয়ে পড়িতেছিল—

'আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।'

অক্ষয় এক পা এক পা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

"এ বাড়ীতে কি এক জন মাষ্টার দরকার, কাগজ মেরে দেওয়া হয়েছে?" মেয়েটি মুখ তুলিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, বাবাই দিয়েছে। দাঁড়ান, বাবাকে ডেকে আনছি।" মিনিট দুই তিন পরে মেয়েটির পিতা দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন এবং চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"এ কি? আপনি অক্ষয় বাবু?"

অক্ষয় রামগতি বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া, কি বলিবে, কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামগতি বাবু কহিলেন,—"কলকাতায় তা হ'লে চ'লে এসেছেন দেখছি যে। বেশ বেশ। আজকালকার দিনে পাড়াগাঁয়ে কি আর প'ড়ে থাকতে আছে? এইখানে কোথাও একটু থাকবার সুবিধে ক'রে নিন্; নিয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে চলুন দেখি, এক বছরের ভেতর অবস্থা ফিরে যাবে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিন আজকাল নয়। জানেন ত? কলিতে ধর্ম্ম নিয়ে আঁকড়ে থাকা মানেই দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে প'ড়ে হাবুডুবু খাওয়া, সেটা বুঝেছেন ত? সুতরাং——"

একটি ঘণ্টা ধরিয়া রামগতি অক্ষয়ের সহিত কথা কহিল। তাহার ফলে অক্ষয় রামগতির স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারিল। রামগতি কহিল,—"আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা থেকেই কেমন ভালবাসা জন্মে গেছে, তাই সব কথা খুলেই বললুম। আসল কথা—বোকা-হাবার দিন আর নেই; একটু চালাক-চোস্ত হওয়া দরকার। এই দেখুন, মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে; খরচ করতেও পারব না, একটা গাঁজাখোর, গুলিখোরের হাতেও ধ'রে দিতে পারবো না। তাই কেমন ফন্দি করেছি বলুন দেখি? পনর টাকা মাইনে কথা লিখে দিয়েছি। যত সব কলেজের ছেলের দল এসে ভীড় করবে এখন। তার মধ্যে থেকে পছন্দমত একটিকে বাহাল করব। তা'তে শেষ পর্য্যন্ত কি হবে জানেন ত? এক ঢিলে সব পাখী মারব। মেয়েটার পড়াশুনা চলতে থাকবে। মাইনে ত দিতেই হবে না, বরং ওদিক্ থেকে কিছু কিছু আসবারও কথা। শেষকালে সেইটিকেই জামাই ক'রে—হাঃ হাঃ হাঃ।"

রামগতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

অক্ষয়ও নেহাৎ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নহে। তাহা হইলেও রামগতির তুলনায় সে কত ছোট, তাহা সে উপলব্ধি করিল এবং আর এক দিন আসিয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে স্বীকার করিয়া সে-দিনের মত বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া সে অতিমাত্রায় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল—রামগতির অমরাবতীর সুখৈশ্বর্য্যের নমুনা যাহা আজ মাসাধিককাল সে ভোগ করিতেছে, ইহা যদি তাহার ভাগ্যে অক্ষয় হইয়াই থাকে, তাহা হইলেই—

আর সে ভাবিতে পারিল না।

৩

ছয় মাসকাল নানারূপ দুঃখ-কষ্টের ভিতর কাটাইবার পর মাস দুই হইল অক্ষয় এক মুদীর দোকানে একটি কর্ম্ম পাইয়াছে। এই ছয় মাসের মধ্যে এমন দিন তাহার অনেক গিয়াছে, যে দিন তাহার দু'টি অন্নও জুটে নাই; একখানি বস্ত্রাভাবে হয় ত বা ঘর হইতে বাহির পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। তাহার সেই সব

দিনে বাসার কেহ তাহার কোন খোঁজও লয় নাই। তাই, ঘরে বসিয়া অনেক দিন অনেক সময় সে ভাবিত যে, গ্রামে থাকিলে এমনটা তাহার কখনই হইত না। বত্রিশ বৎসর তাহার গ্রামে কাটিয়াছে, ইহার মধ্যে একটি দিনও তাহার অন্নাভাবে কাটে নাই। অসুখ-বিসুখের সময় পাড়ার সকলে বুক দিয়া আসিয়া করিয়া গিয়াছে; দুঃখে সান্ত্বনা দিয়াছে; ব্যথায় সহানুভূতি জানাইয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে স্থির করিত, আর কিছুদিন সে দেখিবে, তার পর রামগতিবাবুর এই অমরাবতীর মায়া ত্যাগ করিয়া সে তাহার বনে-জঙ্গলে ঘেরা, জল-কাদায় ভরা গাঁয়ের কোলে আবার ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু আজ দুই মাস হইল, মুদীখানার দোকানের এই চাকুরীটি তাহার হইয়াছে। কথা হইয়াছে, এখানে তাহাকে ছয় মাস পেটভাতায় থাকিতে হইবে, তাহার পর মাহিনার বন্দোবস্ত হইবে। ছয় মাসের দুই মাস কাটিয়াছে, আরও চারি মাস এইরূপে তাহাকে কাটাইতে হইবে। কিন্তু শুধু পেটভাতায় যে এক জনের চলিতে পারে না, দুই বেলা দু'টি ভাত ছাড়া প্রত্যহ দু'এক আনা যে আরও আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা অক্ষয়ের মনিবও বুঝিত, অক্ষয়ও বুঝিত। তাই অক্ষয়ের মনিব রাখালদাস দত্ত সর্ব্বদাই তাহার উপর এমন কড়া নজর রাখিত—যাহাতে করিয়া সে দোকানের কেনা-বেচার পয়সা হইতে একটি আধলাও কোন রকমে লইতে না পারে। অক্ষয়ও প্রত্যহ দু'চার পয়সা কি করিয়া সরাইতে পারে, তাহার জন্য নিত্যই উপায় উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট থাকিত।

আষাঢ় মাস। অপরাহ্লকাল। পরের দিন রথ। দোকানে খরিদ্দারের ভীড় নাই। উবু হইয়া, দুই হাঁটু উঁচু করিয়া অক্ষয় চুপ করিয়া তাহার বসিবার বড় চৌকি-খানির উপর বসিয়া আছে। অদূরেই একটা ছোট তক্তাপোষের উপর খাতাপত্র এবং বাক্স সম্মুখে লইয়া মনিব রাখালদাস খতিয়ানে হিসাব উঠাইতেছে। হঠাৎ আকাশে মেঘ করিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। পূর্ব্ব-দিক্ হইতে একটা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা আর্দ্রবাতাস বহিয়া গেল। অক্ষয় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।—কাল রথযাত্রা। কলিকাতায় কিছুই জানিবার উপায় নাই। এখানকার সব দিনই সমান, একঘেয়ে, কোন বৈচিত্র্যই নাই। খালি মাঘমাসে সরস্বতীপূজার সময় পাড়ায় কয়েকটা ঠাকুর দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে উৎসবের ভিতর যেন প্রাণ ছিল না। যেন প্রতিমার ভিতর দেবতাই ছিল না। আমাদের ওখানে সরকারবাড়ী যে সরস্বতী-পূজা হয়, সে কি ব্যাপার! সেই পূজা আর এই পূজা! ধ্যেৎ!—পাশের গাঁ কার্ত্তিকপুরে কাল কি ধুমই হইবে। আশ-পাশে ৪০।৫০ খানা গাঁ ভেঙ্গে চৌধুরীদের রথ দেখতে আসবে। মনে করেছিলুম, এবার রথে তেলেভাজার এক-খানা দোকান দেবো, কিছুই হ'ল না। ভাল ছিপ একগাছা কেনবার দরকার ছিল, কার্ত্তিকপুরের রথের অপেক্ষাতেই ছিলুম, তাও আর হ'ল না।'—অক্ষয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া গভীর একটা নিশ্বাস বাহির হইল।

একটু পরেই ধূমপান করিবার উদ্দেশ্যে সে তাহার বসিবার চৌকীর পাশের গামলা হইতে এক ছিলিম তামাক লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটি তুলিয়া লইয়া দোকানঘরের বাহিরে আসিল। পার্শ্বে এক-রত্তি একটু যায়গা নোংরা হইয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া কলিকার গুল ঝাড়িবার উদ্দেশে উবু হইয়া বসিতেই কাহার মৃদু পদশব্দে ফিরিয়া দেখিল—তাহার একেবারে ঠিক পশ্চাতেই রাখালদাস তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রাখালদাস কহিল,—"ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

"একটু তামাক খাব—তাই——"

"তাই গুল ঝাড়তে এসেছ? কতবার তামাক খাও শুনি? দেখি তামাকটা।" বলিয়াই রাখালদাস ক্ষিপ্রতার সহিত অক্ষয়ের হাত হইতে এক রকম জোর করিয়াই তামাকের ডেলাটা লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মধ্য হইতে একটি সিকি বাহির হইয়া পড়িল।

অক্ষয়ের মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। রাখালদাস কহিল,—"দোকানের চৌকীতে আর বোসো না, পুলিসে খবরটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি।" সেইখানকার এক স্থানের খানিকটা আলগা মাটীর উপর রাখালদাসের নজর পড়িল। মাটীগুলি একটু সরাইয়া ফেলিতেই অপর একটি দুয়ানি সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

ক্রোধে রাখালদাসের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল-

না। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শুধু দুইটি গলাধাক্কা দিয়া অক্ষয়কে দোকানের বাহির করিয়া দিল।

অক্ষয় কোনমতে টাল সামলাইয়া রাস্তার মাঝখানে আসিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে নিজের বাসার অভিমুখে প্রস্থান করিল।

৪

পথে আসিতে আসিতে এক স্থানে অনেক লোকের ভীড় দেখিয়া অক্ষয় সেই দিকে অগ্রসর হইল। ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, রামগতির হাতে হাতকড়া লাগাইয়া তা'পটি পুলিস প্রহরী তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অক্ষয়ের সহিত রামগতির চোখোচোখি হইবামাত্র রামগতি মুখ ফিরাইয়া লইল। অক্ষয় দেখিল, তাহার মুখে কোনরূপ সঙ্কোচ, আশঙ্কা বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই। উপস্থিত দর্শকগণকে জিজ্ঞাসা করিল, অক্ষয় টুকরা টুকরা খবর যাহা জানিতে পারিল, তাহা একসঙ্গে জোড়া দিলে কথাটা এইরূপ দাঁড়ায়।—রামগতির এক দাসী ছিল। সে জাতিতে কৈবর্ত্ত। তাহার একটি ২০।২২ বৎসরের ছেলে ছিল। রামগতি তাহাকে আপন পুত্র পরিচয়ে এক ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছে ও বর-পণস্বরূপ সেই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তিন শত পচিশ টাকা নগদ লইয়াছে।

অক্ষয় আর সেখানে না দাঁড়াইয়া, বাসার অভিমুখে অগ্রসর হইল। আজ তাহার মনের উপর চারিদিক্ হইতে যেন প্রবল আঘাত আসিতে লাগিল। দেহ-মনে আজ সে অতিমাত্রায় ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল; আজ যেন তাহার চলিবার শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। অমরাবতীর সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। মাণিকতলার পোল পার হইয়া, খালের পাড়ের উপর একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে গিয়া সে বসিয়া পড়িল।

তখনও সূর্য্যাস্তের বিলম্ব ছিল।

ও-পারে—দূরে—তেলের ও ময়দার কলের বড় বড় চিমনীগুলি দিয়া অনবরত ধোঁয়া উড়িতেছে। এ-পারে করাত-কল ছাড়াইয়া পর পর কয়েকটি পাটের গুদাম। তাহার সম্মুখের রাস্তায় গরু ও মহিষের অসংখ্য গাড়ী সারা পথটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গাড়োয়ানদের মধ্যে কিসের একটা 'কমিটী' চলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের কোমরে চামড়ার চাবুক গোঁজা রহিয়াছে। করাত-কলের এ-পাশে একটা উড়িয়ার মুড়ি, চালভাজা, পিঁয়াজ-ফুলুরি, ছাতু ও তেলে-ভাজা জিলাপী প্রভৃতির দোকান। সেখানে লম্বা লাঠি হাতে এক কাবুলী একখানা ছোট চৌকীর উপর বসিয়া উড়িয়াটির দিকে চাহিয়া কি-সব বলিতেছে ও বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মাটীর উপর সজোরে তাহার সেই লাঠি ঠুকিতেছে। বোধ হয়, উড়িয়াটি কাবুলীর নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, তাই মাটীর উপর মহাজনের এই লাঠির আস্ফালন, তাহার পাওনা সুদের তাগাদা বলিয়াই বিবেচনা হয়।

বসিয়া বসিয়া অক্ষয় নানা রকম ভাবিতে লাগিল।

'এখানকার মানুষের দেহ বুঝি হাড়ে-মাসে গড়া নয়। লোহা-লক্কড় দিয়ে তৈরী। দেহে রক্ত বয় না,—কলের তেল ভরা, তাই কলের মতই দিবা-রাত্রি চলে। একটু মাধুর্য্য নেই, একটু বৈচিত্র্য নেই, একটু রস নেই, একটু কোমলতা নেই। এখানে মানুষ নেই, মাটী নেই, জল নেই, হাওয়া নেই। এ যেন একটা শুষ্ক, অপরিচ্ছন্ন, হট্টগোলের যায়গা। বায়ুহীন, প্রাণহীন, মমতাহীন। সমস্ত সহরটা যেন বাঙ্গালা দেশের একটা প্রকাণ্ড হাট। হাটের গোলমালের মধ্যে মানুষ কি ক'রে থাকে? গাঁ ছেড়ে আর কত দিন এই হাটতলাতে তাকে থাকতে হবে? বছর ঘুরে আসতে চল্‌লো। কিন্তু—কিন্তু—'

হঠাৎ ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। অক্ষয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া ভিজিতে ভিজিতে অনতিদূরের একটি পাকা-বাড়ীর রোয়াকের উপর গিয়া উঠিল। বাড়ীটি দুই ভাগে বিভক্ত। দুই ভাগে দুই ঘর ভাড়াটিয়া। এক দিকের বৈঠকখানায় কয়েকটি বাবু মিলিয়া হার্ম্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা সংযোগে গান করিতেছিল। ও-পাশের অংশের অন্দর হইতে ঠিক সেই সময়ে স্ত্রী-কণ্ঠের উচ্চ ক্রন্দনের রোল উঠিল। মিনিট দুয়ের পরেই একটি মৃতদেহ হরিবোল ধ্বনির সহিত ভিতর হইতে বাহিরে আনা হইল। পাশের বৈঠকখানায় সঙ্গীতালোচনা সামান্য কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া আবার সমভাবেই চলিতে লাগিল। ইহাদের কীর্ত্তনের ঢংয়ের টপ্পা 'আমি তোমার প্রেমের কৃষ্ণ, তুমি আমার রাধা—— ওরে বল্ হরিবোল'-এর সঙ্গে

শ্মশান-যাত্রীদের 'হরিবোল' ধ্বনি মিশিয়া গিয়া একাকার হইতে লাগিল। বৃষ্টি তখন থামিয়া আসিয়াছিল।

অক্ষয়ের মনের মধ্যে যে বিষ জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন এখন ফেনাইয়া তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

বাসায় যখন আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। নিঃশব্দে সে তাহার ঘরের তালা খুলিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে সে আর হোটেলে খাইতে গেল না। ভাল লাগে না। সেই একঘেয়ে তিন পয়সার ভাত, এক পয়সার দাল, দু'পয়সার ঝোল, এক পয়সার ভাজা। তাহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছে। এ-সব কিছুই আর তাহার ভাল লাগিতেছে না। প্রায় বছর ঘুরিয়া আসিতে চলিল, তবু এখানকার কোন কিছুই তাহার মনের উপর এক বিন্দু রেখাপাত করিতে পারিল না। দীর্ঘদিনের মেলা-মেশাতেও এখানকার সহিত তাহার কোনই পরিচয় ঘটিল না।

অনাহারে ভাবিতে ভাবিতে এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন একটু বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া, দরজার খিল খুলিতেই সে দেখিল, উঠানে পুলিসের লোক ভরিয়া গিয়াছে এবং ওদিক্‌কার ঘরের কালীচরণ হাতকড়া-বাঁধা হাত তুলিয়া তাহার দিকে দেখাইয়া দারোগাকে বলিতেছে, ——"ঐ!"

হঠাৎ এই ব্যাপারটায় অক্ষয় থতমত খাইয়া গেল এবং এ সম্বন্ধে কিছু ভাবিবার পূর্ব্বেই পুলিসের এক জন কনেষ্টবল অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

৫

ব্যাপারটা একটা চুরি-সংক্রান্ত। কতকগুলি চোরাই মাল কালীচরণের ঘর হইতে বাহির হয়। কালীচরণ নিজেকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে পুলিসের কাছে বলে যে, সে কিছুই জানে না, জিনিষগুলি অক্ষয় তাহার ঘরে রাখিয়া দিয়াছিল।

বস্তুতপক্ষে অক্ষয় ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। কিন্তু এ ব্যাপারের সহিত তাহার নাম জড়িত হওয়াতে, পুলিস তাহাকে ছাড়িল না। কালীচরণের সহিত তাহাকেও চালান দিল। অক্ষয়ের হাতে এক কপর্দ্দকেরও সংস্থান ছিল না। সুতরাং আপন পক্ষসমর্থন করিবার জন্য সে কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিল না। অধিকন্তু তাহার মুদীখানাদোকানের মনিব সেই রাখালদাস তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্যদান করিল। সুতরাং, নির্দ্দোষ হইলেও প্রমাণের অভাবে তাহার অব্যাহতিলাভ ঘটিল না। কালীচরণের অবশ্য গুরু শাস্তি হইল। সেই সঙ্গে সাহায্যকারী বলিয়া তাহারও আড়াই মাস জেল হইল।

আড়াই মাস পরে যে দিন প্রভাতে আলিপুরের জেল হইতে সে বাহির হইল, সে দিন পূজার সপ্তমী।

হাতে পয়সা নাই, দেহে বল নাই, মনে শান্তি নাই। মাণিকতলার বাসায় সে আর যাইবে না। তাহার জামা, কাপড়, বিছানা? চুলায় যাউক! সে এক পা এক পা করিয়া ভবানীপুরের দিকে অগ্রসর হইল। কোথায় এখন সে একটু আশ্রয় পায়? আশ্রয়, আর দু'টি ভাত? শুধু আজকার দিনের জন্য। কালকার ভাবনা সে আজ আর করিতে চায় না। শুধু—শুধু আজ!

একটি বাটীর সম্মুখের রোয়াকের উপর কয়েকটি বাবু বসিয়া পরস্পর হাসি-তামাসা, গল্প করিতেছিল। এক জন কহিলেন,—"ইলিসমাছের কি আমদানীটাই হয়েছে!"

আর এক জন কহিলেন,—"ও দিকে লোভ কোরো না হে মন্মথ, জিনিষটি যেমন মুখরোচক, তেমনই পেট গরম করবার গুরুমশাই।"

"আচ্ছা, ভগবানের কি উল্টো বিচার! অত গভীর জলের ভেতর থাকে, ও খেলে হয় পেট গরম; আর ত্রিশূন্যে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে থাকে ডাবের কাঁদি,—তিনি হলেন কি না ঠাণ্ডা!—ও মশাই! মাছটা কত হ'ল?"

বাজার হইতে একটি লোক হাতে একটা ইলিস ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। লোকটি কহিল,—"ছ'আনা, মশাই। দামের কথা বলতে বলতে মুখ ব্যথা হয়ে গেল। এইটুকুর ভেতর কত লোক যে জিজ্ঞাসা করলে!"

তখন বাবু কয়টির মধ্যে ইলিস সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল এবং আলোচনান্তে এই তথ্যটিই প্রকাশ পাইল যে, বাজার হইতে অন্য মাছ হাতে করিয়া ঝুলাইয়া আনা হউক, সে দিকে কেহ লক্ষ্যও করিবে না বা কোন প্রশ্নও করিবে না। কিন্তু একটা ইলিস হাতে ঝুলাইয়া আনিলেই হাজার লোক তাহার দাম জিজ্ঞাসা করিবে।

"আচ্ছা, মন্মথ, তোমায় পাঁচ টাকা দোবো, তুমি যদি—"

মন্মথ কহিল,—"আমি যদি কি—বল ?"

"বাজার থেকে একটা ইলিস কিনে আনবে। হাতে ঝুলিয়ে আনবে অবশ্য। কিন্তু কেউ তোমায় দামের কথা জিজ্ঞাসা করবে না।"

মন্মথ বলিল,—"অসম্ভব।"

ঠিক এমনই সময়ে অক্ষয় সম্মুখে দিয়া যাইতেছিল; ভাবিতেছিল,—"একটু আশ্রয়, দু'টি ভাত!" সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বাবুদের কাছে আসিয়া কহিল,—"দেবেন পাঁচ টাকা।"

বাবুরা রাজী হইল। এই স্থির হইল যে, তাঁহাদেরই এক জন অক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। মাছটি প্রকাশ্যভাবে হাতে ঝুলাইয়া আনিতে হইবে, অথচ একটি লোকও ডাকিয়া দামের কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।

অক্ষয় খানিক একটু কি ভাবিয়া স্বীকার করিল। পাঁচটা টাকা! পাঁচটা টাকা! পাঁচটা টাকাতে এখন তাহার অনেক উপকার হইবে!

তাহার হাতে মাছের দাম দেওয়া হইল। সঙ্গে মন্মথকে পাঠান হইল। বাজারে গিয়া অক্ষয় খুব বড় দেখিয়া একটা ইলিস কিনিল। তার পর সেটা হাতে ঝুলাইয়া ক্রন্দনের ছলে চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল।—"ওরে বাপধন্ রে! ওরে তুই কোথা গেলি রে বাবা! ওরে তোকে ছেড়ে কি ক'রে আমার দুঃখের দিন কাটবে রে—রে—রে—রে!"

সারাপথ ঐরূপ একইভাবে সে চীৎকার করিতে করিতে আসিল: কেহ তাহার মাছের দিকে তাকাইল না। কেহ তাহাকে দামের কথা জিজ্ঞাসা করিল না। রাস্তার দুই পার্শ্বের লোক বিস্ময়ে ও ঔৎসুক্যের সহিত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

বাজী জিত হইল।

অক্ষয়কে তারিপ করিয়া বাবুরা বাজীর টাকা দিয়া কহিলেন,—"বাহাদুরী আছে বটে তোমার। তা এত বড় মাছটা যখন তোমার হাত দিয়েই এলো, তখন এরই দু'চারখানা ভাজা দিয়ে দু'টি ভাত আজ আমাদের এখানে খেয়ে যেতে হচ্ছে হে তোমায়। পুজোর প্রথম দিনটায় একটু আমোদ আহ্লাদ—"

—"আজ কি প্রথম পুজো? সপ্তমী?"

"হ্যাঁ।"

অক্ষয় আর দাঁড়াইল না। টাকা পাঁচটা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং বড় রাস্তায় আসিয়া হাওড়ার বাসে উঠিয়া পড়িল।

* * *

শেষ ঘণ্টা দিয়া, বেলা ১১টা ১৪ মিনিটের বর্দ্ধমান লোক্যাল ধীরে ধীরে হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম্ ত্যাগ করিল।

অক্ষয় যোড়হাত মাথায় ঠেকাইয়া মনে মনে নিবেদন জানাইল—"মা গো, আজকের দিনেই অভিমান ক'রে গাঁ ছেড়ে চ'লে এসেছিলুম, আজকের দিনেই আবার গাঁয়ের কোলে ফিরে যাচ্ছি। এক বছর ধ'রে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভাল করেই করলুম। গাঁ ছেড়ে চ'লে আসার সেই পাপের যেন এইখানেই শেষ হয়, জননি!"

সেই অবস্থায় সে যেন স্পষ্টই দেখিল, তাহার মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে, জগজ্জননী দশভুজার করুণার মূর্ত্তিখানি অপূর্ব্ব হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে।

তাহার শীর্ণ মুখের উপর গভীর প্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

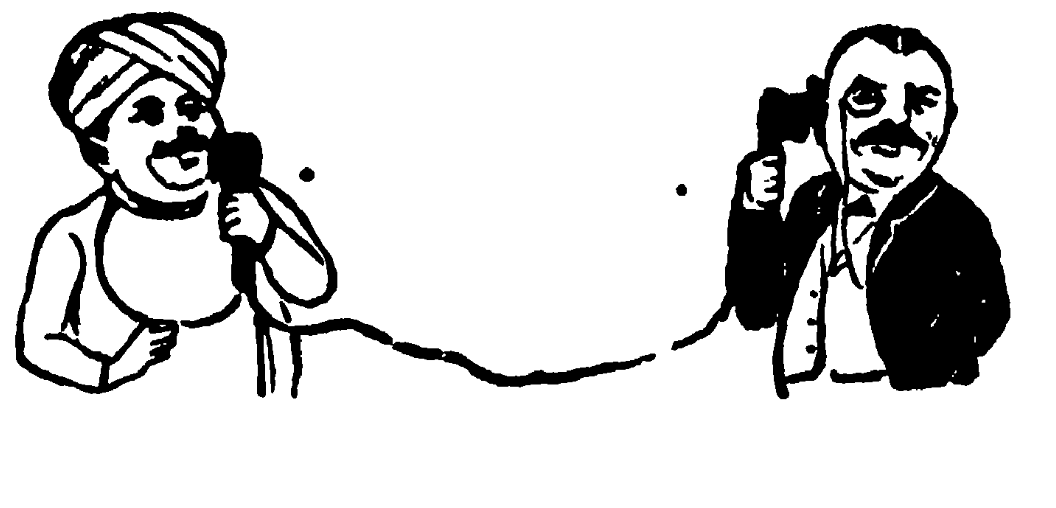

কনে-দেখা

পরীক্ষা-সমুদ্র পাড়ি দিয়া দেশে ফিরিলাম। পুস্তকের স্তূপ ফেলিয়া মুক্তপ্রকৃতির অবাধ আলিঙ্গন লাভের জন্য পল্লীতে চলিলাম। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। শৈশবের আনন্দ-স্মৃতির রেশ মনে এখনও জাগে। দেশ-জননীর হরিৎ-শোভা, পত্রল বনস্পতির মাধুর্য্য, শস্যশ্যাম ক্ষেত্রের উদারতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করিল। আমি মনের আনন্দে নূতন এক সঞ্জীবনী সুধায় বিভোর হইয়া রহিলাম। কিন্তু মনে বিমলতৃপ্তিতে বাধা পড়িতে লাগিল। প্রেম ও প্রীতির আকর বলিয়া যাহাকে সসম্ভ্রম নমস্কার করিয়াছিলাম, সেই পল্লীমাতার বক্ষে কেবলই মাধুর্য্য নাই, দলাদলি, কুসংস্কার, নীচতার গ্লানি সেই মাধুর্য্যকে ডুবাইয়া রাজত্ব করিতেছে। কল্পনায় যে রসমধুর আলেখ্য গড়িতেছিলাম, বাস্তবে তাহা মিলিল না, কাযেই বিরস হইয়া পড়িলাম।

সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পল্লীর উন্নতি করিবার আয়োজন করিব, কিন্তু মনে মনে মিল হয় না, কোথায় যেন ব্যবধান রহিয়া যায়, কাব্য-পড়া মন আর সংসার-চলা মনের মাঝে আকাশপাতাল তফাৎ রহিয়া যায়।

সরল সহজ কেহ নহে, সংসারে মনের কথা কেহ বলিতে চাহে না, সবাই মুখে এক, মনে আর, কাযেই নিরাশ হইয়া উঠিতেছিলাম। সে দিন সুরেশের চিঠি পাইলাম, সুরেশ তাজ দেখিতে চলিয়াছে, সঙ্গী হইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছে।

ঠাকুরমা আসিয়া বলিলেন, "ভাই, এইবার বে-থা কর, আমাদের মন জুড়োক।"

রহস্য করিয়া বলিলাম, "তুমি থাকতে আর কেন?"

"আমাদের এ পাকা-চুল কি আর মনে ধরবে? এখন রাঙ্গা বউয়ের রাঙ্গা মুখের জন্যই পাগল হয়ে উঠেছ, তাকে পেলে কি আর বুড়ী-হাবড়ার কথা মনে রইবে?"

"না ঠাকুরমা, আমি বিয়ে করব না।"

"ও-কথা ত সবাই বলে, দাদা। কিন্তু কয় জনে কথা রাখতে পারে? আর সবাই যদি সন্ন্যাসী হয়, তা হ'লে সংসারের উপায় হবে কি?"

আমি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলাম। গর্ব্বোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলাম, "সে কেমন ক'রে বুঝবে তুমি, বুড়ী! যে দেশে যে ঘরে এক জন সত্যকার ব্রহ্মচারী জন্মে, সে দেশ ধন্য হয়ে যায়, সে গৃহ উজ্জ্বল হয়ে যায়! ঠাকুরমা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন বংশের মুখোজ্জ্বল করতে পারি। ভারতবর্ষের সনাতন ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শ লোপ পেয়েছে, তাকে আমি আমার জীবনে সার্থক করতে চাই।"

বুড়ী ঠাকুরমার পক্ষে আমার বক্তৃতা হজম করা মুস্কিল। তিনি শুধু মৃদুহাস্যে বলিলেন, "এ বক্তিমে আমি বুঝব কেমন ক'রে? নাত-বৌ এলে তাকে বলিস, আর সে মেয়েটিও শুনেছি বিদ্যায় সরস্বতী। রায়গ্রামের নগেন মাষ্টারের নাম শুনিস নি? তারই মেয়ে, মা-হারা ঐ এক মেয়েকে তার বাপ লেখাপড়া শিখিয়ে পণ্ডিত ক'রে তুলেছে।"

নগেন মাষ্টারের নাম আমাদের দেশে আর কে শোনে নাই? না দেখিলেও বিশ্রুতকীর্ত্তি এই শিক্ষকের কথায় মাথা নত হইয়া পড়ে। আদর্শচরিত্র এমন এক জন শিক্ষক আমাদের জেলায় আর নাই। তাঁহার ছাত্ররা চরিত্র-লাবণ্যে, দক্ষতায় সর্ব্বত্রই গুরুর সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছে। কল্পনায় এই শক্তিসম্পন্ন শিক্ষকের মাতৃহারা কন্যার ছবি মনে আঁকিতেছিলাম।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া ঠাকুরমা বলিলেন- "খালি যে লেখাপড়ায় ভাল, তা নয়, ওর চেহারাও তেমনই জগদ্ধাত্রীর মত, দুধে-আলতা রং, চুলগুলি পা-বেয়ে পড়ছে, মুখখানা ফুটে যেন পদ্মফুলের সৌরভ বার হচ্ছে; না, ভাই, অমত করিস নে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠাকুরমা, তুমি রূপকথা বলছ না ত? পদ্মগন্ধ বেরোয়, এমন মেয়ে ত তোমার রূপ-কথার রং-মহালে মেলে, রক্ত-মাংসের মানুষের মাঝে তাদের দেখা পাওয়া যাবে কেমন ক'রে?"

রূপকথায় ঠাকুরমার অদ্বিতীয় দখল। বুড়ীকে ঠকানো শক্ত। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তুই অবিশ্বাস করিস ত দেখেই আয় না। গল-কমলের মত তার ঠোঁট দেখলে তুই যদি না ভুলে যাস্, তা হ'লে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "না ঠাকুরমা! তুমি দিব্যি দিও না, আমায় বাঁচতে দেও। ক্ষীরসাগরের তীরে তোমার কুঁচবরণ কন্যে জয় করতে যাওয়ার পক্ষিরাজ ঘোড়া আমার নাই—আর ময়ূরপঙ্খী নৌকোও নেই। কাযেই আমায় তুমি খালাস দেও। তোমার ঘটকালির পুরস্কার-স্বরূপ না হয় আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার কোলে শুয়ে ছোট-কালের ছড়া শুনব'খন।"

বুড়ী তখনকার মত বিদায় হইলেন। তাহার পর মা অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া কন্যা দেখিতে বলিলেন। মা জানাইলেন, বাবা কথা দিয়াছেন, আমি মেয়ে দেখিতে যাইব। তাই নগেনবাবু ছুটী লইয়া বাড়ী আসিতেছেন। দেখিলাম, ব্যাপার জটিল হইয়া উঠিতেছে। মন পলায়ন করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

বৌদিকে সে দিন সন্ধ্যায় বলিলাম, "বৌদি, আমি তাজ দেখতে চল্লুম, মাকে ব'লে দিও।"

"সে কি ঠাকুরপো! তাজের পাথরে যে রূপ, সে কি সুষমার রূপের কাছে দাঁড়াতে পারে! সুষমাকে দেখে তার পর তাজে মন যায় ত যেও।"

আমি বলিলাম, "না বৌদি, তোমাদের বর্ণনা শুনে ভয় হচ্ছে। দেশসেবার পথ আমার পথ, ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে দুঃখী ভাই-বোনের কাযে আমি জীবন সমর্পণ করব।"

বৌদি মুচকি হাসিয়া বলিবেন, "ঠাকুরপো, বৈরাগ্যের বুলী বেশী আউড়ে হাসিও না। তোমায় শিবঠাকুরও তপস্যায় বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন।"

"আমি শিবঠাকুর নই, তাই ভরসা। মাকে বলা হবে না, তুমি বলো, সুরেশের সঙ্গে তাজ দেখতে গিয়েছি।"

বৌদি ড্রয়ার খুলিয়া একখানি ফটো বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "যাবে যাও, বারণ করছি না, কিন্তু পথের পাথেয়স্বরূপ এই ছবিখানি নিয়ে যাও। তাজ বড় কি ভালবাসার টান বড়, তার পরখ হবে।"

আমি কৌতুক করিয়া বলিলাম, "না বৌদি! আমার পরে ক্রুদ্ধ হয়ো না, তোমাদের স্নেহের নাগপাশ যে সকলের চেয়ে বড় অস্ত্র, এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মানছি। সতীর তপস্যা যদি থাকে, তবে সদাশিবের ঘুম নিশ্চয়ই ভাঙ্গবে। কি বল?"

বৌদি প্রসন্নমুখে বলিলেন, "সে গর্ব্ব করি বৈ কি, ঠাকুরপো! যেখানেই যাও, পালিয়ে বেড়িয়ে নিষ্কৃতি পাবে না। যে সতী তপস্যা করছে, সে তোমার পথরোধ করবেই করবে।"

২

একরকম পলায়ন করিয়াই চলিলাম। রাত্রিশেষে নৌকাযোগে খুলনায় চলিলাম। ভৈরবের তরঙ্গোচ্ছল বক্ষে ছোট ডিঙ্গী নাচিতে নাচিতে চলিল। পূর্ব্বাশার দ্বারে আলোর প্রথম আভাস তারাগুলিকে ম্লান করিয়া ধরিয়াছে। দূরে খুলনা সহরের ষ্টীমারের আলোকগুলি দীপমালার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল।

আলোছায়ার এই সম্মিলনে মন উদাস হইয়া পড়িল। বৌদির দেওয়া ফটোখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া টর্চ্চলাইট জ্বালিয়া দেখিতে বসিলাম। মুখখানি সত্যই জ্যোতির্ম্ময়। যে ছবি তুলিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই নিপুণ শিল্পী। হাসি-ঢল-ঢল মুখখানি দেখিলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে। বীণাবাদিনী সরস্বতীর মত মেয়েটির হাতে এসরাজ ছিল, মুগ্ধচিত্তে বার বার আলোকচিত্রখানি দেখিতে লাগিলাম।

নারীর লাবণ্য যে বিধাতার সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি, এ কথা কাব্যে ও গানে পড়িয়াছি; কিন্তু কোন দিনই তাহা অনুভব করি নাই। আজ যেন অজ্ঞাত এক মোহের মত সুবেশা কন্যাটির মুখ আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের মত নীরস কবিও বলিয়াছেন—

"A dancing shape, an im age gay
To haunt, to startle and to way-lay

এই তরুণীর মধুর ছবিও চমৎকৃত করিয়া আমায় বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। মাঝি বলিল, "বাবু, ক'নে ভিড়ামু?"

বলিলাম, "এক নম্বর ঘাট।"

না, ভূতের মত যে চিন্তা চাপিয়া বসিতেছে, তাহাকে তাড়াইতে হইবে। লোভ ও মোহের হাতে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিব না।

প্রত্যূষের আলো-অন্ধকারের মাঝে দিগ্বলয়লীন দূরগ্রামলক্ষ্মীর চরণে প্রণতি জানাইলাম। মনে অকস্মাৎ বেদনা জাগিয়া উঠিল। প্রিয়জনের প্রীতি-নিবেদনা ভরা

হৃদয়ের কথা মনে পড়িল, উন্মনাভাবে ষ্টেশনে গিয়া একখানি ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

যে কামরায় উঠিলাম, তাহাতে বেশী লোক ছিল না। আমি সহযাত্রীদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া উদাসমনে আলোকিতপ্রায় আকাশের নর্ম্মলীলা দেখিতে লাগিলাম।

খানিক পরে প্রশ্ন আসিল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

ফিরিয়া দেখিলাম, সহযাত্রী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রশ্ন করিয়াছেন। কামরাতে মাত্র দুই জন লোক, সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং একটি ষোল সতেরো বৎসরের তরুণী। আমি উত্তর দিলাম, "আপাততঃ কলকাতায় যাচ্ছি।"

"কোত্থেকে আসছেন?"

"এই কাছেই জয়পুরে আমার বাড়ী?"

আমার উত্তরে অপ্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সহযাত্রী পরিচয়ের পালা বেশী দূর টানিয়া নামধাম ও কার্য্যের খবর লইতে যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন।

ভদ্রলোক খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, "আপনি জয়পুরের ভবেশ সেনকে চেনেন?"

এ ত আমারই নাম! ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি চিনিতে পারি নাই ভাবিয়া বলিলেন, "রমেশ বাবুর ছেলে, ভবেশ এবার এম-এ পাশ করেছে।"

সন্দেহের তিলার্দ্ধ অবকাশ রহিল না; কিন্তু অনর্থক পরিচয় দিবার ইচ্ছা হইল না। শুধু বলিলাম, "চিনি বৈ কি।"

ভদ্রলোক আবার নীরব হইলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, দুধারের তরুশ্রেণীর মাঝ দিয়া গাড়ী চলিল। ভদ্রলোক আবার বলিলেন, "আমার এই মেয়েটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ করছি, বাবা! হবে কি না, ভগবান্ জানেন।" বলিয়া ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

পরে ধীরস্বরে ভাবগদ্গদ অস্পষ্টতায় বলিলেন, "মা-হারা মেয়ে, বড় মায়া হয়।"

বক্তার করুণ স্বর আমার মনকে আর্দ্র করিয়া তুলিল। আমি কন্যার পানে চাহিলাম। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোক বাতায়নের ফাঁকে তাহার চুলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কালো চুলের পাশে চম্পকবর্ণ আননখানি সত্যই অনিন্দ্য লাবণ্যে প্রতিভাত হইতেছিল। আমি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম।

মনে হইল, এ মুখ যেন কোথাও দেখিয়াছি। লাবণ্য-ললিত সেই মুখখানি উদীয়মান যৌবনকান্তিতে ভাস্বর—মনে হইল, যেন কত দিনের পরিচিত। হঠাৎ ফটোর কথা মনে পড়িল। প্রভাতের আলো-ছায়ায় যে ছবি মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, এ তাহারই মুখ। আমি মুহূর্ত্তেই বুঝিলাম, সে সুষমা, নগেন মাষ্টারের মেয়ে।

বৌদির কথা মনে পড়িল। সতীর তপস্যা কি এমন করিয়া আমায় ফাঁদে ফেলিবে? যাহার জন্য পলায়ন, এমন অভাবিতরূপে সে আমায় দেখা দিবে, এ কথা ভাবি নাই। স্বভাবসুষমার যেন এক স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, নারীর সুষমায় বোধ হয় আকর্ষণ আরও বেশী। আমি অনিচ্ছুক-চিত্তেও চাহিয়া রহিলাম। সুষমা সত্যই সুষমাময়ী।

গাড়ী বসিয়া থাকে না। হাট, ঘাট, মাঠ ছাড়াইয়া, বন-জঙ্গল তাড়াইয়া সে ছুটিয়া চলিল! গাড়ী দৌলতপুরের কলেজের কাছাকাছি পৌঁছিল, সুষমা বাহির হইতে মুখ ফিরাইয়া তাহার পিতাকে প্রশ্ন করিল, "বাবা, এই ত দৌলতপুর কলেজ?"

"হ্যাঁ মা?"

"এক দিন দেখতে আসবে, বাবা? লর্ড রোণাল্ডসের 'হাট অব্ আর্য্যাবর্ত্ত' নামক বইয়ে খুব প্রশংসা বেরিয়েছে।"

আমার লোলুপ দৃষ্টিতে বোধ হয়, সঙ্কুচিত হইয়া সুষমা বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

নগেনবাবু বলিলেন, "শুনলে ত, বাবা, মাষ্টারের মেয়ে, লেখাপড়া শিখেছে, যার ঘরে যাবে, তার ঘর আলো করবে। শুধু কি বই পড়েছে, আমার সংসারটা ঐ বজায় রেখেছে। আত্মভোলা বাপকে ওই-ই বাঁচিয়ে রেখেছে।"

প্রশংসমান পিতার তৃপ্তি আমাতেও সংক্রমিত হইল। আমি সমবেদনা জানাইবার জন্য বলিলাম, "না, আপনার মেয়ে রূপ-গুণে লক্ষ্মীর মতন, এর বিয়ের জন্য আপনার ভাবনা করতে হবে না।"

"তুমি ত বলছ বাবা, কিন্তু ছেলেমানুষ তুমি, এখনও ত সংসারে বস নি। সংসারে খাঁটীর চেয়ে মেকি চলে বেশী।"

ছেলেমানুষ শুনিয়া নিজেকে খুসী মনে করিলাম না, কিন্তু প্রৌঢ়ের বাক্যে আঘাত ছিল না, তাই সান্ত্বনার বিষয়।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া নগেনবাবু বলিলেন,—"তুমি ভবেশকে চেন বলেছ, সে কেমন ছেলে, বাবা?"

মহা ফাঁপরে পড়িলাম। পরিচয় না দিয়া মুস্কিলে পড়িয়াছি। একবার মনে হইল, নিজের পরিচয় দিয়া বলি, 'আমিই ভবেশ, জ্যোতিঃশিখারূপিণী আপনার কন্যার পাণি-লাভে আমি কৃতার্থই হব।' কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচ আমাকে আত্মপরিচয় দিতে নিবৃত্ত করিল। আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, "খারাপ বলবার কিছুই জানি নে, তবে আপনি দেখে শুনে নেবেন।"

"সে ত নিতেই হবে। শকুন্তলা পড়েছ কি, বাবা? বনলালিতা শকুন্তলার পালক পিতা তপস্বী কণ্ব পর্য্যন্ত কন্যা-বিয়োগ-বিধুর হয়ে বিলাপ করেছেন, আর আমরা ত কোন্ ছার। মা-হারা এই মেয়েটি আমার নয়ন-মণি, একে ত জলে ফেলে দিতে পারিনে।"

আমি নিরুত্তর হইয়া স্নেহাতুরচিত্ত পিতার বাণী শুনিতেছিলাম। দৌলতপুর ছাড়াইয়া গাড়ী ডাকাতের বিলের পাশ দিয়া চলিতেছিল। আমি সেই বিস্তৃত প্রান্তরের দিগন্ত-বিস্তারের পানে চাহিয়া রহিলাম। বিস্তারের মাঝে বোধ হয় একটি অসীম আনন্দ আছে। আমাদের আবেষ্টন সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র পরিসর, তাই ক্ষুদ্রতার মাঝে আমরা হাঁপাইয়া উঠি। মুক্ত প্রান্তরের বিপুল প্রসার তাই আমাদিগকে খুসী করিয়া তুলে।

ফুলতলায় গাড়ী পৌঁছিল। কোনও কালে ফুলের তলা ছিল কি না, জানি না, বর্ত্তমানে কাঁঠালের দুই-চারিটি গাছ ষ্টেশনকে ছায়া-শীতল করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে দৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের দৈন্যও বাড়িয়া চলিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আর ফুলের চর্চ্চা দেখি না।

নগেনবাবু বলিলেন, "বাবা! সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস আছে কি?"

"আজ্ঞে না, আমি চা-টা খাই নে।"

"সে ত খুব ভাল কথা। মাষ্টার মানুষ, আমি তোমরা নব্যযুবকচয় চায়ের বিষ-পেয়ালায় চুমুক দেও না, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হ'তে পারে? আর খুলনার লোক তোমরা, আচার্য্য রায় যে চা-পানকে বিষ-পান ব'লে গলা ভাঙ্গছেন, অপরে শুনুক আর না শুনুক, খুলনার ছেলেদের শোনা উচিত—"

বক্তৃতায় ইন্ধন যোগান ঠিক নহে। তাই বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনি খাঁটী কথাই বলেছেন।"

"খাঁটী কথা ব'লে খাঁটী, সেবার ত আমাদের স্কুলে প্রাইজ দেওয়া হবে। খেলার পারিতোষিক বিতরণ, কেরাণী বাবু চায়ের পেয়ালা কিনে এনেছেন। একটি ছোকরা পেয়ালাগুলি দেখে ব'লে উঠল, 'স্কুল থেকে চার পেয়ালা পুরস্কার দেওয়া হবে, এর চেয়ে আর কেলেঙ্কারি কি হ'তে পারে?' তার কথায় আমাদের চমক ভাঙ্গল। তা নয়, সকালে কিছু জলযোগ কর? মা, খাবার বের কর ত।"

ছোট গাড়ীতে আমরা তিনটি প্রাণী। সুষমা পিতার আদেশ শুনিয়া ফিরিয়া বসিল। তাহার পর বেঞ্চের তলা হইতে টিপিন-ক্যারিয়ার হইতে খাবার দুইখানি প্লেটে সাজাইয়া একখানি তাহার বাবাকে দিল, অপরখানি আমাকে দিল।

প্লেটে সন্দেশ, কিসমিস, কমলা লেবু ও চিনি-মাখা বাদাম ছিল। নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিলাম। ডিউরি সাহেবের No breakfast plan মানিয়া সকালে খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তরুণীর লাজমধুর কম্পিত হস্তের অর্ঘ্যকে ফিরাইবার শক্তি ছিল না। নগেনবাবু বলিলেন, "খাও বাবা! খাও, বাজারের কিছুই এতে নাই, এ সন্দেশ আমার মায়ের হাতেরই।"

সন্দেশের আমি পরম ভক্ত। মাছ-মাংস খাই না, তাহার বদলে সন্দেশ খাই। কিন্তু সে দিন যেমন তৃপ্তির সহিত ট্রেণে সন্দেশ খাইয়াছিলাম, জীবনে আর কখনও তেমন খাই নাই। নগেনবাবু কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! বাবুকে আর কিছু সন্দেশ দাও।"

আমি বলিলাম, "না, না, সে কি হয়, অনেক খেয়েছি।" সুষমা কথা কহিল না। অধর-কোণে দুষ্ট হাসি চাপিয়া সে আমার পাতে গোটা চারেক সন্দেশ দিয়া দিল। সুচতুরা পরিবেষিকা হয় ত আমার লোভের কথা ধরিয়া ফেলিয়াছিল। আহারের মাঝে মানুষের হৃদ্যতা জন্মে। অনেক সময় ভাবি, হিন্দু-সমাজে যত্র তত্র আহার করিতে যে

নিষেধ আছে, তাহার মূল হয় ত এইখানে। যাহার নুণ খাই, তাহার প্রতি কৃতঘ্ন না হইয়া পারি না।

সন্দেশ সবে শেষ করিয়া প্লেট নামাইতে যাইতেছি, এমন সময় সুষমা আর দুইটি সন্দেশ লইয়া বলিল, "নিন্ এ দুটোও খেয়ে ফেলুন।"

অসঙ্কোচ আলাপ। মিষ্ট লাগিল। কিন্তু আমারই ভাবী বধূ অপরিচিতের সহিত এমন ঘনিষ্ঠতার সহিত আলাপ করে জানিয়া ক্ষোভ হইল। পরক্ষণেই মনে হইল, এ কি বৃথা জল্পনা। আমি ত আর বিবাহ করিতেছি না!

তরুণীর আদেশ অবশ্য-প্রতিপাল্য, নহিলে বীরধর্ম্ম বজায় থাকে না। তাহার পর নগেনবাবু বলিলেন, "খেয়ে ফেল, বাবা। আহারে অরুচি ঠিক নয়।"

আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, "খাচ্ছি, কিন্তু ওঁর জন্য বোধ হয় কিছু রইল না।"

"তার জন্য ভাবনা মিছে, আমাদের দেশের মেয়েরা অন্নপূর্ণার মত। নিজে না খেয়ে পরকে খাওয়ানো ওদের মজ্জাগত দোষ।" এই বলিয়া সরলপ্রাণ মাষ্টার মহাশয় হাসিতে লাগিলেন।

এ কথা আমার প্রাণে লাগিল। এই ক্ষুদ্র জীবনে ঘরে ও বাহিরে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরিকাদের এই কল্যাণ-হস্তের পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহাদের সেই স্নেহগরিমাময়ী মূর্ত্তিকে নমস্কার না করিয়া পারি না।

আহারশেষে আলাপ জমিল। অপরিচয়ের যেটুকু আড়াল ছিল, সেটুকুও শেষ হইয়া গেল। পথে চলার সময় মানুষের মনে যেন কেমন এক প্রসারতা জাগে, প্রতিদিনের জড়তা ও সঙ্কীর্ণতা পথের অনিশ্চিত মাধুর্য্যের মাঝে দূর হইয়া যায়, মানুষে মানুষে তাই সহজ প্রীতির বন্ধন জাগে।

গাড়ী চলিতেছিল, তাল, গুবাক, নারিকেলের বন ছাড়াইয়া, শস্যশ্যামল মাঠ পার হইয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। তাহারই চলার তালে তালে কথাও চলিল, নানা বিষয়ে আলাপ হইতে লাগিল।

পিতার নিকট পরিচয় পাইলাম, তাঁহার কন্যা কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখিয়া থাকে। পিতার আদেশে সুষমা অবশেষে তাহার রচিত কবিতা পড়িয়া শুনাইল।

জীবনে কবিতাটা কখনও বরদাস্ত হইত না। যে সব বন্ধু কবিতা লেখে, তাহাদের চিরকাল গালি দিয়াছি, কাগজ, কালি-কলম নষ্ট করে বলিয়া বক্তৃতা দিয়াছি।

বাঙ্গালী জাতি এমনই ভাবপ্রবণ, তাহার উপর ন্যাকামি যতই বাড়িবে, আমরা ততই ডুবিব, এ কথা আমার বক্তৃতায় বহুবার বলিয়াছি। সুষমার লেখার সজীবতা ও নূতনত্ব আমাকে কিন্তু মুগ্ধ করিল। মাসিকের পাতায় মাসে মাসে যে সব রাবিশ সম্পাদকরা নির্ব্বিচারে ছাপান, সুষমার রচিত কবিতা সেরূপ অর্থহীন ধ্বনি-সমষ্টির কবিতা নহে। শক্তিময়ী নারীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাষা কবিতায় ওতপ্রোত।

চিরকাল য়ুরোপের দিকে আমার মন। য়ুরোপের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, ভারতবর্ষে তাহারই প্রতিষ্ঠার জন্য কত যত্ন ও কত আয়াস স্বীকার করিয়াছি।

সুষমার লেখায় ঠিক উল্টা সুর। নারী নামক একটি কবিতায় সে নারীকে অভয়-শঙ্খ বাজাইয়া ডাকিতেছে, হে ভগিনি, উঠ, জাগ। দীনতার শতেক লাঞ্ছনা ফেলিয়া অমরত্বের মাঝে জাগিয়া উঠ। ভারতের নারী অমৃতের অধিকার চাহিয়াছিল, সেই অধিকার আজিও দীপ্তিমান হউক। ছন্দচ্ছটায় জ্বালাময়ী কবিতা আমার কথায় খারাপ হইয়া গেল বোধ হয়, কিন্তু কি করিব, ক্ষণ-শ্রুত কবিতা মুখস্থ বলি, এ বিদ্যা আমার নাই। সুষমার ভাব-দীপ্ত মুখে দিব্যভাতি বহিয়া চলিল। আমি মুগ্ধচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ট্রেণ রূপদিয়া ষ্টেশন ছাড়িল। নগেনবাবু যশোহরে নামিবেন, কাযেই জিনিসপত্র গুছাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুষমা কবিতার খাতা বন্ধ করিয়া পিতাকে সাহায্য করিতে বসিল।

সময় যে তাড়াতাড়ি বহিয়া যায়, সে দিন তাহা আমি ভালভাবেই অনুভব করিলাম। যশোহরে গাড়ী পৌঁছিল, খাবারওয়ালা হাঁকিল, 'চাই সরভাজা বাবু, চাই সরপুরিয়া।'

সরভাজার দিকে আজ আর লক্ষ্য ছিল না। নগেন-বাবুকে নামিতে সাহায্য করিলাম, নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, ক্ষণ-পরিচিত এই সহচরদের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মনের ইচ্ছা, জ্যোতির্ম্ময়ী সুষমা হয় ত একবার ফিরিয়া চাহিবে। সে ফিরিয়া চাহিল না। জিনিসপত্র গুণিতেই সে ব্যস্ত—এই

অপরিচিত পান্থের জন্য তাহার মনের কোনও কোণে কোন রেখা কি পড়ে নাই? কে জানে? রেলগতি-জাত বাতাসে মুখে ঠাণ্ডা লাগিতেছিল। শূন্যকক্ষে উদাসপ্রাণে বসিয়া পড়িলাম।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া তাজ দেখিবার উৎসাহ রহিল না। সুরেশকে অসুখের অজুহাতে বিদায় দিলাম। বৌদির কথাই ফলিল। শয়নে ও স্বপনে সুষমার মুখ মনে পড়িতে লাগিল।

অকাল-বসন্তের সঞ্চরণে ধরণী যেন পুলকিত। বিশ্ব যেন মধুময় হইয়া দেখা দিয়াছে। দর্শন ও ধর্ম্মচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া কাব্য লইয়া বসিলাম। কাব্যালাপ করি আর যখন শ্রান্তি হয়, অলিন্দে দাঁড়াইয়া জনস্রোতের ভঙ্গী দেখি। মন অকারণ পুলকে পুলকিত হইয়া উঠে। কবির মত আমারও মনে হয়,—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।

বাড়ী হইতে তাড়া আসিল, বাবা লিখিলেন, কায আছে, তাড়াতাড়ি এস।

সঙ্কল্প ও প্রেমে দ্বন্দ্ব জাগিল। একক এই সংসারের অরণ্যে ছুটিয়া চলিতে মন চাহিল না। চিরকৌমার্য্যের জন্য এত দিন মনের মাঝে যে যুক্তির প্রাসাদ গড়িয়াছিলাম, ধীরে ধীরে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

অবশেষে লজ্জা ভাঙ্গিয়া বৌদিকে চিঠি লিখিলাম।

'বৌদি!

ঠাকুরমা যাকে পছন্দ করেন, তাকেই আমার জীবন-সঙ্গিনী ক'রে নেব। গুরুজনের মনে ব্যথা দিতে চাই না, তোমাদের যে দিন মত হয়, সেই দিনই বিয়ের দিন ঠিক ক'রে ফেলিও, আমার অপেক্ষায় প্রয়োজন নেই।'

বৌদি চিঠি পাইয়া সম্ভবতঃ খুসী হইলেন। বাড়ীর বাঞ্ছিত আশা ফলবতী হইল।

তার পর শুভদিনে শুভলগ্নে সুষমাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করিয়া লইলাম। শ্বশুর মহাশয় ট্রেণের পান্থকে জামাই বলিয়া চিনিতে পারিলেন কি না, জানি না। আত্মভোলা মানুষ, হয় ত চেনেন নাই।

শুভদৃষ্টির সময় সুষমার অব্যক্ত হাসিতে বুঝিলাম, সে আমায় চিনিয়া ফেলিয়াছে।

ফুল-শয্যার রাত্রিতে কুটুম্বিনীগণ চলিয়া গেলে বৌদি সুষমাকে বলিলেন, "তোর ভাই ভাগ্যি ভাল, ঠাকুর-পোকে নিয়ে কি যে নাজেহাল হ'তে হয়েছে, তা আর বলব কি?"

সুষমা ব্রীড়ামধুরভাষে প্রশ্ন করিল, "কেন বৌদি?"

"সে আর বলব কি, ঠাকুরপো ত বিয়ের কথা শুনে পলায়ন করলে, আমরা ত একরকম নিরাশ হয়ে গিয়েছিলুম।"

"তার পর?"

"কেমন ক'রে যে শেষে মত ফিরল, তা ভগবান্ই জানেন। তবে বোধ হয়, তোর ফটোর কোনও যাদু ছিল, যে দিন ঠাকুরপো তাজের রূপমহালে চ'লে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে বিদায় নিতে এল, আমি শুধু তোর ছবিখানি ঠাকুরপোর হাতে দিয়ে দিয়েছিলুম।"

ফাল্গুনের চন্দ্রপুলকিত যামিনী, পুষ্পগন্ধে বিভোর কক্ষ, দুইটি তরুণীর এই বিশ্রম্ভালাপ আমি পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম।

সুষমা সমস্ত ফাঁস করিয়া দিবে ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। বৌদি বলিলেন, "যাই হোক্ ভাই; ছবি যে যাদু করেছে, আসল যে তার চেয়ে লক্ষগুণ বশীকরণ করবে, সে আমি ঠিক জানি। তা না হ'লে আজকালকার ছেলে—বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বিয়েতে মত দিয়ে ফেলে?"

আমার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিলাম। সুষমা বলিতেছিল, "আমি কি যাদু জানব বৌদি—তবে—"

"তবে তোমায় দয়া ক'রে বিয়ে করেছি, এই বলতে চাও?"

সুষমা মাথার আঁচল একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। বৌদি সুষমার হইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিলেন, "দয়া নয় ঠাকুরপো, এ রতন অত সহজে মেলে না, সাধন ক'রে নিতে হয়, বহু ভাগ্যে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "বৌদি, তোমার বক্তৃতা দাদার হয় ত ভাল লাগবে, দাদার কাছে না হয় সাধনমন্ত্রের পাঠ নেওয়া যাবে।"

"তা নেবে বৈ কি, গুণধর দাদার ভাই ত।"

দাদাকে বন্ধুরা স্ত্রৈণ বলিয়া ক্ষেপায়, কিন্তু বৌদি চির-কালই বলেন যে, তিনি দাদার মনে স্থান পান নাই।

সুষমা দাঁড়াইয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, "যা বলেছ দিদি। উনিও কম সাধু পুরুষ নন—"

নিরুপায় বিহ্বলতায় হতাশ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। এমন সময় দৈববাণীর মত ঠাকুরমার কণ্ঠ শুনা গেল, "বড় বৌমা! ওদের আর জাগিয়ে রেখো না।"

বৌদি বিদায় লইলেন। বাতির নীলালোকে দুইজনে শয্যায় বসিয়া রহিলাম—এক ধারে সুন্দরী সজ্জিতা ব্রীড়াবনতমুখী সুষমা, অপর দিকে প্রথম-প্রণয়মুগ্ধ স্বামী। যুগ-যুগান্তর যদি এমনই করিয়া কাটিয়া যায়, তথাপি ক্ষতি নাই।

খানিক পরে সুষমার পাণি-যুগল ধরিয়া তাহাকে কাছে আনিয়া আবেশভরে বলিলাম, "সে দিনকার ট্রেণের কথা কাকেও বলবে না, লক্ষ্মি? তুমি আমার অদেখা কনে—অপরিচিতার মত চির-মধুর তুমি।"

সুষমা কথা কহিল না, ভাবাবেশে শুধু আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া এলাইয়া রহিল।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম, এ, বি, এল)

আমার গ্রাম

সকল দেশের চেয়ে মধুর নয়ন-অভিরাম,
সে যে আমার গ্রামখানি রে সে যে আমার গ্রাম।

সামনে তাহার বইছে নদী পিছন পানে মাঠ,
বাঁকের মুখে শ্মশান খোলা দক্ষিণে তার হাট।
চারধারে তার বাগবাগিচা শোভন ফুলে ফলে,
রক্ত ও শ্বেত পদ্ম ভাসে নিথর বিলের জলে।
রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশী নিত্য মাঠের কোলে,
ধানের ক্ষেতের দোলন দেখে নয়ন দুটি ভোলে।
আঁকাবাঁকা পথটি ঢাকা শ্যামল বীথিকায়,
গাঁয়ের ঝি বৌ সে পথ দিয়ে গাঙের ঘাটে যায়।
নূতন বৌ-এর গুঁজরীপরা আলতারঙীন পায়,
ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুরগুলি মৃদুল সুরে গায়।
সেথা, কতুই গাছে চড়ুই থাকে বরুই-ডালে টিয়ে,
বাঁশের ঝাড়ে ঘুঘু ডাকে নিখাদে সুর দিয়ে।
খঞ্জনেরা নৃত্য করে প'ড়ো ভিটের পরে,
'কুটুম কুটুম' কুটুম পাখী ডাকে কুটুম তরে
'বউ কথা কও বউ কথা কও' নিলাজ পাখী বলে
হাঁসগুলি সব দলে দলে ভাসে ডোবার জলে
সেথা—জলতরঙ্গ বাজায় নদী পাপিয়া গান গায়
ঠুকুর ঠুকুর কাঠ-ঠোকরা 'রেলার' বোল বাজায়
জোছনা সেথা লুটিয়ে পড়ে ফুলপল্লবদলে,
ভ'রে ওঠে নৈশ বায়ু পুষ্প-পরিমলে।
ঝিঁঝির বীণায় ঝিঁঝিট রাগে সুরের নিঝর-ঝরে,
তারারা সব সে সুর শোনে বসি নীলাম্বরে।
বেতের ঝোপে কেয়ার বনে বাবলাগাছের 'পরে,
জোনাকীদের দীপালি হয় সারাটি রাত ধ'রে।
সেথা—শরৎ আসে টুপুর টুপুর শিউল নূপুর পায়,
পরীরা সব মুক্তা ছড়ায় দূর্ব্বাদলের গায়।
সোনার রোদে বিল তটিনী ঝিল করে ঝিলমিল,
নীল আকাশের বক্ষে ওড়ে লক্ষ্যহারা চিল।
ফাগুন দিনে কানন সেথা সাজে হাজার ফুলে,
দখিণ হাওয়া আতরদাণীর ঢাকনাটি দেয় খুলে।
বিহগ-দলের জলসা চলে কুঞ্জে অনুক্ষণ,
মাঝে মাঝে কোকিল ধরে জমকাল কীর্ত্তন।
কদম কেয়া ঝিঙের ফুলে বর্ষা সাজায় ডালা,
কেঁপে কেঁপে শীত বুড়ীও গাথে গাঁদার মালা।
মধুর রসের ঝরণা ঝরে খেজুরগাছের বুকে,
সরষে কলাই ফুল সবাতে মৌমাছি গায় সুখে।
সরল মহৎ আজও তাহার অধিক মানুষগুলি,
দেয়নি তাদের কপট ক'রে সভ্যতা ঝকমারী।
নাইক তাদের কেশের বাহার বেশের পরিপাটী,
মাজাঘষা নয়কো কথা কিন্তু মানুষ খাটি।
সুখ-দুঃখের সঙ্গী তারা সবাই পরস্পর,
সারাটি গ্রাম এক পরিবার পৃথক্ শুধুই ঘর।
ধন্য হলাম জন্মে আমি শ্যামল কোলে তার,
শেষের দিনে পাই যেন রে কোলটুকু সে মার।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ভুল-ভাঙ্গা

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইল। দেখা গেল, কুমারী সুরভি মিত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছে। সুশীল কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, "এই ত চাই মা! মধ্যে যদি অসুখটা না অমন ক'রে হ'তো, তা হ'লে ফার্ষ্ট বা সেকেণ্ড হ'তে পারতিস্! খবর নিয়েছি, দশ জনের মধ্যে তোর নাম আছে।"

আনন্দদীপ্ত-মুখে বিমলা কহিলেন,—"শুধু মুখে আমোদ কল্লে চলে না; পাঁচ জনকে খাওয়াতে হবে।"

আনন্দ যখন অন্তরের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে, চিত্ত তখন বেশী উদার হইয়া পড়ে। সাগ্রহে সুশীল কহিলেন, "খাওয়াব ত নিশ্চয়। সুরকে একটা উপহার দিতে হবে। কি দিই বল দিকি?"

বিমলা কহিলেন, "কি চাই, ওকেই জিজ্ঞেস কর। কলেজে যাবে, একটা রিষ্ট-ওয়াচ্ আমার মনে হয় ভাল!"

সুশীল পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার যা ভাল মনে হয়, আমি ওকে তাই দেব। কারণ, তোমার কথাটাই ওর কাছে সব চেয়ে বড়!"

কন্যা-গর্ব্বে বিমলার অন্তর ভরিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কবে আত্ম-কুটুম্বকে ওর পাশের ভোজ দেবে, তাই আমায় বল!"

আনন্দ জিনিষটা মানুষ একা ভোগ করিতে পারে না। প্রিয়জনকে তাহার অংশ না দিলে অন্তর তৃপ্ত হয় না। বিমলার অন্তরটা তাই আত্মীয়-বান্ধবের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

সুশীল কহিলেন, "সামনের রবিবার! কিন্তু সুর সবাইকে রেঁধে খাওয়াবে।"

বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলিয়া বিমলা কহিলেন, "অবাক্ কল্লে, না হয় না-ই কেউ খাবে। বাছা আমার এই গরমে কি সর্দ্দি-গর্ম্মিতে মরবে?"

সুরভি জনকের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "না বাবা! আমিই রাঁধতে পারব! মা, তুমি দেখিয়ে দিও।"

শরতের সোনালী আলো আকাশের বুকে ঝলমল করিয়া উঠিলে যেমন মধুর দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, সুশীলের মুখে আনন্দের দীপ্তি তেমনই ভাবে রঞ্জিত হইল। দুহিতা যে শুধু বাণী-কন্যা থাকিবে, অন্নপূর্ণার আসনখানি সে গ্রহণ করিবে না—ইহা তাঁহার ভাল লাগিত না।

নির্দ্দিষ্ট রবিবারে আত্মীয়-কুটুম্বদিগের পরিপাটী ভোজ সমাপ্ত হইল এবং পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া সুরভির মাসীমা নির্ম্মলা একটা কথা তুলিলেন। ভগিনীপতির পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "জামাইবাবু! মূলাজোড়ের বোসেদের অবস্থাটা জানেন ত? ছেলেটিও কার্ত্তিকের মত, বল ত চেষ্টা করি।"

সুশীল কহিলেন,—"ছেলে কার্ত্তিক হোক, আর তার বাবার কুবের ভাঁড়ারী হোক, সুরভির বিয়ে এখন আমি দেব না—যত দিন না ও বি-এ পাশ করে।"

নির্ম্মলা কহিলেন,—"মানে? এই সতের, তার সঙ্গে চার জুড়ে একুশ পার ক'রে বুড়ী হলে?" সহোদরার পানে চাহিয়া নির্ম্মলা কহিলেন, "এই বাড়ন্ত গড়নের মেয়েকে এখন আরও চার বছর টাঙিয়ে রাখ্‌তে চাও দিদি?"

বিমলা একবার স্বামীর পানে, একবার কন্যার পানে চাহিলেন। ইতিপূর্ব্বে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যদিও স্বামীর সহিত একমত ছিলেন, তথাপি সহোদরার কাছে সে কথাটা স্বীকার করিতে ওষ্ঠে কেমন বাধিয়া গেল! বিশেষতঃ মূলাজোড়ের বিখ্যাত বসুদের সহিত কুটুম্বিতা করা যে সহজসাধ্য নহে, তাহাও মনে জাগিয়া উঠিল। ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—"ভাই, ভবিতব্য।"

জননীর উত্তরে সুরভির মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

নির্ম্মলা কহিলেন, "আমার মামা-শাশুড়ীর হীরে-মুক্তো ত তুমি কতবার দেখছ নিজের চোখে, দিদি? দেবে আর কাকে! বিধবা মানুষ, ঐ একটা বউ-ই সব পাবে।"

সন্তানের অঙ্গে হীরা-মুক্তা দেখিলে মাতৃপ্রাণ যতখানি আনন্দিত হয়, এতখানি তৃপ্তি নিজের অঙ্গে তুলিয়াও সে পায় না। বিমলার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন,—"তা সত্যি! হ্যাঁ রে নিমু! অরুণ কি আই-এ পড়ছে?"

সুশীল বিরক্তকণ্ঠে কহিলেন, "পড়ছে কি রকম! এক্‌জামিন দেয়নি এ বছর?"

"—কি ক'রে দেবে বলুন? মা'এর হাঁপানি বাড়ল,

তাকে নিয়ে পুরী চ'লে গেল। বল্লে, এক্‌জামিন আগে না মা আগে? আমার কি বাবা আছেন?"

সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে বিমলা কহিলেন,—"আহা!"

সুশীল হাসিয়া কহিলেন, "নিমু! মূলাজোড়ে খুব আম হয়েছে না?"

সুরভি কহিল,—"চারদিকে হ'লে পয়সা লাগে! মূলাজোড়ে হ'লে অম্‌নি আসে।"

নিৰ্ম্মলা কহিলেন, "আঙ্গুর-ফল টেক বলে যত ব্যাখ্যাই করিস! এ বছর আমার ঘরে আম এসেছে কম ক'রে পাঁচ ছ হাজার।"

সুশীল কহিলেন, "শরৎ বাবু ত এখন ওঁদের এষ্টেটেই আছেন?"

নিৰ্ম্মলা উত্তর দিলেন, "তা ভিন্ন আর যাবেন কোথা? রায়েরা পাঁচ'শ ক'রে দিয়ে ডেকেছিল। মামী-শাশুড়ী বল্লেন, তুমি যেতে পাবে না; অরুকে ফেলে! তবে আমি তোমার ক্ষতি করব না! আমি তোমায় ছ'শ ক'রে দেব।"

বিমলা সগর্ব্বে কহিলেন,—"শরতের মত বিষয়বুদ্ধি ক'জনের আছে? এম্‌'এ, বি'এল ত অনেকেই পাশ কচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধি সকলের সমান কি?"

* * * *

দিনগুলি বেশ সহজ ও সানন্দ গতিতেই বহিয়া যাইতেছিল। সুশীল কন্যাকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। নিত্য তিনি অফিস যাইবার পথে ট্রামে করিয়া কন্যাকে কলেজের দ্বারে নামাইয়া দিয়া যান। অফিস হইতে ফিরিয়া কন্যার সহিত কলেজের গল্পেই তাঁহার বিশ্রামসময়টা আরামে ভরিয়া উঠে। বিমলা আসিয়া সে গল্পে যোগদান করেন। তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটার বাহিরে যে কর্ম্মচঞ্চল সুবৃহৎ জগৎটা চলিতেছে, তাহার সংবাদ তিনি সুরভির মুখ হইতে পাইয়া কন্যার শিক্ষাগর্ব্বে মাতৃ-হৃদয় গৌরবে ভরিয়া উঠিত।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা বোধ করি ভয়ানক পরশ্রীকাতর! তিনি মানুষের সুখ সমভাবে বজায় রাখিতে পারেন না। যখনই দেখেন, তাহা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, অমনই ভাটার টান দিতে আরম্ভ করেন।

সুশীলের বারো বৎসরের চাকরীর নিবিড় শিকড়টা যে মাটীতে বসে নাই, তাহা বুঝা গেল—যে দিন রিডাক্‌সনের হাঙ্গামে তাঁহার নামটাও কাটা পড়িল।

বিমলার মুখ দিয়া সব কথার আগে বাহির হইল, "বিয়ের যুগ্যি মেয়ে গলায়!"

সুরভি মৃদু হাসিয়া কহিল,—"বিয়েটা যদি না করি, মা?"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া মা কহিলেন,—"পড়ার খরচ ত কম নয়! হাতীর খরচ জুটবে কি ক'রে? বিয়ে না ক'রে করবে কি?"

"—কেন জুটবে না? আমার পড়ার খরচ আমি জোটাব। টিউসনী করব।"

সময় কাহারও মুখ চাহিয়া এক পল দাঁড়াইয়া থাকে না। অভাব ও দুর্ভাবনা প্রেতের মতই মাথা তুলিয়া সংসারটা সন্ত্রস্ত করিতে লাগিল, এবং তাহার তপ্ত নিশ্বাসে ক্ষুদ্র সংসারের শিশু হইতে গৃহস্বামী অবধি শুকাইয়া উঠিল। দিন আর চলে না। বাড়ী ভাড়া তিন মাসের জমিয়া গেল। সুরভি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হাসি-মুখে পিতাকে আসিয়া সংবাদ দিল। সুশীলের মুখে নিভিয়া যাওয়া আনন্দের আলোটা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! উজ্জ্বলমুখে তিনি কহিলেন, "এই ত চাই, মা! আই'এতেও স্কলারশিপ্‌ নিস্‌! আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে।"

বিমলা কথা কহিলেন না। ক্ষণ পরে কহিলেন,—"যা ত সুরী! ময়দাগুলো চট্‌ ক'রে মেখে ফেল, ছেলেরা কাঁদছে।"

জননীর মুখের পানে চকিতে চাহিয়া সুরভি ভাঁড়ারের দিকে অগ্রসর হইল, জননী ভয়ানক চম্‌কিয়া উঠিলেন। বিমলা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওগো বাছা! হাত যোড় করি, তুমি ময়দা মেখ না। ঐ অনাচারেই লক্ষ্মী ছেড়ে গেলেন।"

সুশীল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"ও ত কাপড় বদল করেছে?"

মুখ বাঁকাইয়া বিমল কহিলেন,—"ছাই করেছে! ভেতরের সেমিজ বদল করেছে? মেম সাহেব মেয়ে যে তোমার সাত পুরুষের সঙ্গে বাইরে ঘুরে এল।"

সুশীল বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"তোমার মুখ বড্ড কড়া হচ্ছে আজকাল!"

বিমলার আজ রাগ হইবার কারণও ছিল। সকালে টাকার জন্য গয়লা দুধ বন্ধ করিবে বলিয়া যখন শাসাইতেছিল, সেই সময়ে সুরভি আসিয়া তাহার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল।

মুখ তুলিয়া টাকাটা কিসের জিজ্ঞাসা করিয়াই বিমলা দেখিতে পাইলেন, কন্যার হাতে দুইখানি পুস্তক ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তাহা যে সদ্যক্রীত, বিমলা তাহা বুঝিতে পারিলেন।

মায়ের কাছে জিজ্ঞাসিত হইয়া সুরভি কহিল,—"মাইনে পেয়েছিলুম! কলেজের মাইনে রেখে এই পাঁচটা টাকা বাঁচল, তোমায় দিলুম!"

বিমলা কহিলেন, "ও বই দু'খানা কিসের?"

জননীর অপ্রসন্ন দৃষ্টির পানে চাহিয়া সুরভি কহিল,—"এই বই দু'খানার জন্য বড্ড ক্ষতি হচ্ছিল, মা! ক্লাসে পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। আমি এমাসে দাম দেব না।"

বিমলা কহিলেন, "দিলেই পারতে! আমি ত মানা করি নি।"

"এক জোড়া যে কাপড় কিনতে হলো! কলেজে পাঁচ জনের সঙ্গে বসতে হয়! একটু ভদ্রভাবে—"

সুরভির কথাটা আর সমাপ্ত হইল না। বারুদস্তূপে অগ্নিনিক্ষেপের ন্যায় বিমলা ভয়ানক মূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"স্বার্থসর্ব্বস্ব মেয়ে, নিজের নিয়েই থেক তুমি! চাই না তোমার টাকা" বলিয়া ঝনাৎ করিয়া টাকা কয়টা ফেলিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আনতমুখে ক্ষোদিত মূর্ত্তির মতই সুরভি দাঁড়াইয়া রহিল! বলিবার তাহার কিছুই নাই। প্রতিপদবিক্ষেপে জননীর চোখে সে এমন অপরাধী হইয়া দাঁড়ায়? অথচ দোষ যে তাহার কোন্‌খানে, সে তাহা কিছুই খুঁজিয়া পায় না। অত্যন্ত আবশ্যক খরচ ব্যতীত একটি কপর্দ্দকও সে নষ্ট করে না। সহপাঠীদের কাছে এজন্য অনেক কথাই শুনিতে হয়। তথাপি জননীর রোষমূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার প্রতি প্রসন্ন হয় না।

সুরভির বুকের মাঝে একটা দুঃসাহস মাথা তুলিতে চেষ্টা করিত। অকারণ ভর্ৎসনাগুলার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মনে হইত, হোষ্টেলে থাকিয়া সুরভি নিজের পড়ার খরচ নিজে চালাইয়া দিবে।

কিন্তু জ্বালাময় বর্ত্তমানের পশ্চাতে যে শান্তিময় অতীতটা ছিল, তাহার পানে চাহিয়া সুরভির দুঃসাহস সমাধি লাভ করিত।

বিমলাই স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া তাহাকে অতি বালিকাকালে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার সময় বলিয়াছিলেন, "ছেলেমেয়ের মধ্যে তফাত আমি হ'তে দেব না।"

* * * *

দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। দাস-জীবনের অবকাশ সুশীলের ভাগ্যে আর ঘটিল না। অবশেষে বিমলার গায়ের অলঙ্কার কয়খানি লইয়া, 'স্বদেশী বস্ত্রালয়' নাম দিয়া সুশীল খদ্দরের দোকান খুলিয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

সুরভিও আই-এ পাশ করিল। দেখা গেল, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। পড়ার ব্যয়ভার সে নিজের উপার্জ্জনেই চালাইত। তাই পড়া ছাড়িবার জন্য বিমলা আর একদফা গোলযোগ বাধাইতে পারিলেন না।

ভগিনীপতির কাপড়ের দোকান হইয়াছে শুনিয়া নির্ম্মলা একবারে হাজার টাকার কাপড়ের ফরমাস পাঠাইয়া দিলেন।

সুশীল অবাক্ হইয়া পত্নীকে কহিলেন,—"নির্ম্মলা এত শাড়ী-ধুতি লয়ে কি করবে?"

বিমলা কহিলেন,—"সে আবার কি করবে! এ কি তার জিনিষ? বোসেদের নিশ্চয়! ও মামী-শাশুড়ীকে দোকানের কথা বলেছে, আর শরৎই ত ম্যানেজার।"

সুশীল কহিলেন,—"তিনি বিধবা মানুষ! এত ধুতি-শাড়ী নিয়ে কি করবেন? ছেলে ত মোটে একটি, এত কাপড়—"

বাধা দিয়া বিমলা কহিলেন,—"শুধু নিজেদের জন্যে কি? পাঁচ জনকে দেবে। সামনে পূজো! বোসগিন্নীর শুনতে পাই খুব দানধ্যান আছে। নিমু ত বলেছিল, সুরীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি? ছেলে ত নয়, যেন কার্ত্তিক!"

চিন্তান্বিত-নেত্রে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া সুশীল কহিলেন, "কিন্তু লেখাপড়ায় যে একবারে—"

ঝাঁঝিয়া বিমলা কহিলেন,—"এখন সেই লেখাপড়ার কথা বলছ? তুমি ত এম্‌-এ পাশ করেছ। কিন্তু কি ফল? একটা খদ্দরের দোকান খুলেছ, চলে কি না চলে।

যতটা টাকা খরচ, তার অর্দ্ধেকটা উঠ্‌ছে না। আর শরৎ তোমার মত পাশ করা নয়। সে মাস গেলে দু'শ টাকা আন্‌ছে। ৫।৬ হাজার টাকা খরচ ক'রে মেয়ের বিয়ে দিলে। তুমি ৫।৬ টাকাও খরচ করতে পারবে না।"

"—কিন্তু পাশ করায় তবু ত একটা মনের তৃপ্তি আছে ?"

"—নিশ্চয়! তুমি পণ্ডিত ব'লে আমার মনের কত তৃপ্তি, তোমার মেয়ে বছর বছর পাশ কচ্ছে ব'লে আমার কত সুখ! আর নিমুর স্বামী মুখ্যু! তার মেয়ে কথামালা বৈ জানে না! তাই তার চোখের জলও শুকায় না! মুখেও হাসি ফোটে না!"

সুশীল চুপ করিয়া রহিলেন। পত্নীর মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপের বিরুদ্ধে উত্তর কিছুই ছিল না। দরিদ্রতার উৎপীড়নে উৎক্ষিপ্ত চিত্ত হইতে বিমলার যত অভিযোগ অনুযোগ বাহির হইত, তাহার একটিকেও উপেক্ষা করা চলে কি ?

স্বামীর অবনত দৃষ্টি ও গম্ভীর মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিমলা নিজের বাণীর রূঢ়তাটুকু বুঝিতে পারিয়া মনে মনে আহত হইলেন। দুঃখের জ্বালায় উগ্র মেজাজ যে কর্কশ মূর্ত্তি গ্রহণ করে! হঠাৎ যখন তাহারই উপর নিজের দৃষ্টি পতিত হয়, তখন আর বেদনার সীমা থাকে না। অনুতাপ চোখের জল ডাকিয়া আনে। বিমলা স্বামীর নিকট সরিয়া গিয়া তাঁহার জানুর উপর হাত রাখিয়া কহিলেন,—"আমায় মাপ কর!" দুই নেত্র তাঁহার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

পত্নীর এই মিনতিভরা স্পর্শে সুশীল ভয়ানক চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। বিমলার অশ্রুম্লান নয়নের পানে চাহিয়া তাঁহার বুকে একটা উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল! স্ত্রীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"তুমি ত সত্যি কথাই বলেছ, বিলু।"

অনেক দিন পরে সুশীল পত্নীর হাত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া কথা কহিলেন।

চোখের জল মুছিয়া বিমলা কহিলেন,—"আমি কি ইচ্ছে ক'রে রাগ করি? আমার জ্বালা তোমরা বুঝতে পার না। নিমু বল্লে, তরুণকে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে লোকে সুন্দরী মেয়ে গছাতে চাইছে! তোমরা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ। তোমার মেয়ে পাশ ক'রে কি করবে, হয় স্কুলের মাষ্টারী, না হয় দাইগিরী বা ডাক্তারী, নয় ত সভা-সমিতি ক'রে জেলে যাবে। এমনই ত একটা কিছু ?"

সুশীল কহিলেন, "উচ্চ শিক্ষার গৌরব নেই ?"

"যদি অন্নের জোগাড় থাকে, তবেই আছে। দুটি অন্নের জন্য যখন মানুষ হাহাকার করে, তখন কাব্য-কবিতা, বিজ্ঞান, দর্শন কিছু তৃপ্তি দিতে পারে না। দরিদ্রতা ভগবানের অভিসম্পাত। তা'তে যে একবার পড়েছে, সে স্নেহ, মায়া, দয়া, ধর্ম্ম, নীতি, ভক্তি সব হারায়! জগতে পেটের জন্যে মানুষ কি না করে বল ?"

সুশীল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। পত্নীর কথাগুলি তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়া মাথায় একটা নূতন চিন্তাকে ডাকিয়া আনিতেছিল।

*　　*　　*　　*

মর্ম্মর-মণ্ডিত কক্ষতলে শুইয়া দময়ন্তী বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন। অরুণ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

পুত্রকে দেখিয়া দময়ন্তী হাত হইতে কাগজখানি নামাইয়া বলিলেন, "কি খবর ?"

অরুণ একটু হাসিয়া জননীর মাথার তাকিয়াটার অংশ লইয়া শুইয়া পড়িল।

পূর্ণ গতিতেই বিজলী পাখা মাথার উপর ঘুরিতেছিল। তাহার পানে চাহিয়া অরুণ কহিল, "ইস্, যা গরম! ফ্যানের হাওয়া যেন, মা, আগুন!"

দময়ন্তী কহিলেন, "যা বলছিস বাপু! জানলা-দরজা তবু দশটা বাজলেই আমি বন্ধ ক'রে দিই।"

"—চল না—মা! দিনকতক দার্জ্জিলিং।"

দময়ন্তী হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন,—"একেবারে বৌমাকে নিয়ে যাব।"

"—বৌমা? বৌদি যাবেন না কি ?"

দময়ন্তী হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"নির্ম্মলা কেন? তার বোন্‌ঝি আমার বৌমা হবে। মেয়েটির চোখ দুটি ঠিক যেন আমার"—দময়ন্তী থামিয়া গেলেন। তাঁহার মুখের হাসিটিও নিভিয়া গেল।

অরুণ কহিল,—"কে, বৌদির সেই দুটো পাশ করা বোন্‌ঝি ?"

"—হ্যাঁ, ঐ ত ওর বোনের একটিমাত্র মেয়ে। আমার,

অনেক দিনের সাধ, একটি বিদ্বান্ বৌ ঘরে আনি। তা সরস্বতীই আমি আনছি।"

বিপন্নের মত মুখভঙ্গী করিয়া অরুণ কহিল,—"মা, তোমার সরস্বতীর হাঁস হ'তে আমি কিন্তু মোটেই রাজী হ'তে পাচ্ছি না।"

পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া দময়ন্তী আবার হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "বাঁদর ছেলে! আমি কি তোকে হাঁস হ'তে বলেছি? তুই তার নারায়ণ হবি।"

"নারায়ণ হব কি হাঁস হব, সে বিষয়ে সন্দেহ, মা!"

"সন্দেহ কেন?" পুত্রের পানে দময়ন্তী চাহিলেন।

"সন্দেহ কেন? আমি তিন তিনবার আইয়ের বেড়াতে আছাড় খেলাম! আর সে টপ্-টপ্ ক'রে উত্‌রে গেল। সে আমায় মান্‌বে কেন? যা বল্‌ব, অমনি বল্‌বে, হাঁসের মত প্যাক্ প্যাক ক'রো না, বোঝ কি?"

দময়ন্তী চটিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—"তুই বলছিস কি? বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে স্বামীকে শ্রদ্ধা করবে না, নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির অহঙ্কারে? এ কখন হ'তে পারে?"

"কেন হ'তে পারে না? কালিদাসের বৌ কি ক'রে স্বামীকে লাথি মেরেছিল? আমার কপালেও তাই লেখা আছে দেখছি।"

পুত্র কৌতুক করিতেছে মনে করিয়া দময়ন্তী হাসিলেন; কহিলেন, "তুইও না হয় তেমনই ক'রে সরস্বতীর সাধনা করবি!" তার পর সস্নেহে কহিলেন, "দূর পাগল, স্বামীর স্নেহ-ভালবাসা-দরদের উপরই স্ত্রীর শ্রদ্ধা দাঁড়িয়ে থাকে। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীর সেখানে কোন মর্য্যাদা নেই।"

অরুণ কহিল, "স্বামী না, আসামী, মা!"

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া দময়ন্তী কহিলেন,—"যা, যা, কেবল তোর ফাজ্‌লামি! আমাকে বকান? স্বামীকে উনি আসামী বানাতে এলেন!"

যাইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়াই অরুণ কহিল, "বানাব কি আমি? বানাবেন যিনি আসবেন, তিনি। তাই বলি মা! চট্‌পট্ চল, আমরা দার্জ্জিলিং স'রে পড়ি। শরৎদাকে বল, এখন বিয়ে দেব না।"

ছিলাকাটা ধনুকের মত এক নিমেষে দময়ন্তী সোজা হইয়া বসিলেন, উজ্জ্বল-নেত্রে পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন, "আমার মতের কোন দামই নেই? এইটুকু কি এই বুড়ো বয়সে বুঝতে হবে? আর পাঁচ জনকে বোঝাতে হবে?"

অরুণের ওষ্ঠে একটা উত্তর আসিয়াছিল, কিন্তু জননীর মুখের পানে চাহিতেই সেটা আর বাহির হইল না।

অরুণ নিঃশব্দে মাথা নত করিয়া রহিল। সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণীকে জীবনসঙ্গিনী করিবার সৌভাগ্য-স্বপ্ন অবিবাহিত যুবকমাত্রেই দেখিতে ভালবাসে, এবং সেই মানসীর ধ্যানেই চিত্ত তাহাদের ভরিয়া উঠে। কিন্তু দুঃস্বপ্নের স্মৃতির বিষণ্ণতার মত অরুণের মুখে একটা চিন্তার ছায়াপাত হইল। এই মেয়েটির যশোগাথা ও প্রতিভার গল্প শরৎদাদার মারফৎ অরুণ অনেক কিছু জানিত। তাহার তুলনায় নিজেকে অনেকখানি ক্ষুদ্র ভাবিলেও অরুণ তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা এই গুণবতী বিদুষীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিত। কিন্তু আজ যখন সেই তরুণীর সহিত নিজের বিবাহের কথাটা সে জানিতে পারিল, তখন আনন্দের পরিবর্ত্তে তাহার সারা অন্তর আতঙ্কে ভরিয়া উঠিল! এতখানি অসামঞ্জস্যভরা মিলন তাহাদের জীবনকে সুখ ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিবে কি?

* * * *

আশীর্ব্বাদী অলঙ্কারটা বাক্স-সমেত তাচ্ছীল্যভরে বিছানার উপর নিক্ষেপ করিয়া সুরভি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। বিমলা কহিলেন,—"সুর! আজ আর মেয়ে পড়াতে যাস নি!"

দরজার উপর দাঁড়াইয়া সুরভি কহিল,—"তথাস্তু!" কন্যার কণ্ঠস্বরে তাহার অন্তরের ক্রোধ স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে বুঝিয়া বিমলা আর সাড়া দিলেন না। চাহিয়া দেখিলেন, মেয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল।

সুরভি ছাদে আসিয়া পাচীলটার ধারে দাঁড়াইল। পিঞ্জরাবদ্ধ নূতন বিহঙ্গ তাহার নিষ্ঠুর কারাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টায় ব্যর্থ ও প্রতিহত হইয়া শ্রান্তদৃষ্টিতে যেমন মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া স্বচ্ছন্দবিহারী বিমানচারীদিগকে নিরীক্ষণ করে, তেমনই ভাবে দুই চোখের ক্লান্তদৃষ্টি মেলিয়া সুরভি সম্মুখের পথ ও পথচারীদিগকে দেখিতে লাগিল। কর্ম্ম-চঞ্চল বিশ্বমানবের দ্রুতগতি কত আকারে সেখানে বহিয়া যাইতেছে! আজ উহার সহিত সুরভির সকল সম্বন্ধ জননীর কঠোর আদেশে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে! কলেজের

বই হাতে ট্রাম, বাস ধরিতে আর এ জীবনে তাহাকে ছুটিতে হইবে না। তাহার উৎসাহভরা ছাত্রী-জীবনটা নিঃশেষে সমাপ্ত হইয়া গেল! সুরভির দুই চোখে অশ্রু ভরিয়া উঠিল।

আদেশটাকে যখন অন্তর বার বার অত্যাচার নামে অভিহিত করে, মনের মাঝে তখন একটা বিদ্রোহের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। পিতা-মাতার উপর অকস্মাৎ সুরভির চিত্ত ভয়ানক বিমুখ হইয়া বসিল! যূপকাষ্ঠ-সমীপে নীত জীবের মত পরের স্বার্থকে বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে নিজেকে সে নিঃসহায়ভাবে যূপকাষ্ঠে উৎসর্গ করিতে পারিবে না। সুস্পষ্ট ভাষায় সে জানাইয়া দিবে, এ বিবাহ সে করিবে না। ইহাতে যদি এ গৃহের সঙ্গে তাহার বন্ধনচ্ছেদ হয়, তাহাও সহ্য করিবে। তথাপি সমস্ত চিত্ত যাহার নামে বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে, তাহার গলায় সে বরমাল্য দিবে না। যাহাকে জীবনে কোন দিন সে ভালবাসিতে পারিবে না, তাহার স্ত্রী সে হইবে না।

সুরভি দ্রুতপদে নামিয়া আসিল। পিতামাতাকে সে একই স্থানে দেখিতে পাইল। সুশীল পত্নীকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলেন, "মানুষ তপস্যা ক'রে সুরর মত মেয়ে পায়। এই যে বিয়ে করবে না, এত অনিচ্ছা! যেই বুঝালুম, এ আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আর সে একটি কথা কইলে না। আর এই যে আমাদের উপর ওর অচলা ভক্তি, এতেই যে মঙ্গল হবে।"

বিমলা কহিলেন,—"মা কালী মুখ রেখেছেন! ওর ঐ বাঁকা মন দেখে আমার যা ভয় হয়েছিল, কোন অঘরে বর বাছবে, ডাগর মেয়ে, বাধা দিতে পারব না। ঠাকুরের পায়ে অনুক্ষণ বলতুম, সুরকে আমাদের অবাধ্য কর না।"

সুরভির উত্তেজনা-রক্তিম মুখখানা নিমেষে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। পিতামাতার সব কথাই তাহার কাণে আসিয়াছিল।

কন্যাকে দেখিতে পাইয়া সুশীল কহিলেন, "সুর, আজ পড়াতে যাস্ নি, মা!"

বিমলা কহিলেন, "আমি ওকে মানা করেছি, ও কত বড় ঘরের বৌ হবে। তাদের ত একটা মান-সম্ভ্রম আছে। কি জানি, কার মুখে কি শুনবে। চার হাত এক হয়ে গেলে বাঁচি।"

সুশীল নিরুত্তর দুহিতার বিষাদমাখা মুখের পানে চাহিয়া তাহাকে আনন্দ দিবার ইচ্ছায় কহিলেন,—"সুর, তোমার বন্ধুদের নেমন্তন্ন ক'রো, মা!"

সুরভি সাড়া দিল না। যাহা বলিতে আসিয়াছিল, পিতামাতার এই কথাগুলির পর তাহা কিছুতেই আর ওষ্ঠের বাহিরে আসিল না; একটা দুর্নিবার সঙ্কোচ তাহার দুই ওষ্ঠাধরকে চাপিয়া ধরিল।

বিমলা কহিলেন,—"দাঁড়িয়ে কেন, মা! বোস না, বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবার আলাদা কার্ড হবে ত? তুই নিজে গিয়ে দেখে কিনে আনবি, না উনি আনবেন?"

জননীর এতখানি জিজ্ঞাসের একটা কিছু উত্তর দিতে হয় বলিয়াই সুরভি কথা কহিল; বিকৃতকণ্ঠে কহিল,—"অত বাজে খরচের কি দরকার?"

বিমলা অবাক্ হইয়া কহিলেন,—"বিয়ের এ সব হ'ল উৎসবের অলঙ্কার।"

"অঙ্গহীনের অলঙ্কার! কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন!" গভীর ঘৃণায় এই কথা কটা বলিয়া সুরভি ফিরিতে উদ্যত হইতেই বিমলা ভয়ানক রাগিয়া কহিয়া উঠিলেন,—"অত ভাল নয়! সুরি, অত ভাল নয়!"

সুরভি ফিরিয়া দাঁড়াইল। জননীর কারণ অকারণে যত তিরস্কার—সবই সে নিঃশব্দে দীর্ঘদিন সহিয়া আসিতেছিল, শুধু মা'এর অন্তরের জ্বালাটা বুঝিয়া। কিন্তু আধারের তুলনায় আধেয়টা যখন বড় হইয়া উঠে, তখনই আধার ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিক্তকণ্ঠে সে কহিল, "আমি তা জানি, মা, তাই বলি, ল্যাঠা যেমন ক'রে পার চুকাও, তোমরাও বাঁচ! আমিও বাঁচি!" সুরভি কাঁদিয়া ফেলিল।

সহজে সে কাঁদে না, তাহার চোখে অকস্মাৎ অশ্রুধারা দেখিলে বাক্‌শক্তি লুপ্ত হয়। বিমলা কোন কথা না কহিয়া অপরাধীর মত কুণ্ঠিতমুখে নিজের হাতের কাযে মন দিলেন। সুশীল উঠিয়া কন্যার হাত ধরিলেন,—"সুর, আমার ঘরে চল, মা!"

নিজের ঘরে আসিয়া শান্ত কণ্ঠে সুশীল কহিলেন,—"সুর, ভুল বুঝিস নি, মা! গোটাকতক পাশ কত্তে না পাল্লে মানুষ মানুষ নয়,—এ ধারণা মন হ'তে মুছে দে। আমি অরুণকে দেখেছি—তুই মনে করিস নি, তার পয়সা

দেখে আমি ভুলেছি। আমি বুঝেছি, সে এক জন মানুষ। তার অন্তর আছে।”

সুরভি কহিল,—“আমি ত বলি নি, সে একটা জানোয়ার! কিন্তু বাবা, তুমি যে বল্‌ছ, তার পয়সা দেখে তুমি ভোল নি! পয়সা না থাকলে তুমি আমায় তাদের ঘরে দিতে?” সুরভি স্থির দৃষ্টিতে পিতার পানে চাহিল।

অপ্রতিভ না হইয়া সুশীল সহজ কণ্ঠে কহিলেন,—“না, তা দিতুম না। দরিদ্রতার কত জ্বালা, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, তা জান না। তোমরা আবেগে চল্‌তে চাও। জেনো, মানুষের যত কিছু সদ্‌বৃত্তি থাকে, যাকে তোমরা মনুষ্যত্ব ব'লে বড়াই কর, এ সব অভাব-রাক্ষসীই খেয়ে ফেলে।”

সুশীল একটু থামিয়া কহিলেন,—“তাই যেখানে বিপুল ঐশ্বর্য্য, সেইখানে তোমায় দিচ্ছি। আর এটুকু বুঝে দিচ্ছি, ঐ ঐশ্বর্য্য তার হাতে থাকবে। অলক্ষ্মী তার কাঁধে ভর করতে পাবে না। তাই তাকে মানুষ বলছি, শরতের কাছ হ'তে তার ছোট-বড় খুঁটিনাটি নিয়ে আমি বিচার করেছি। তাই নিশ্চিত ক'রে বলছি, তোমার এ ভুল ভাঙ্গবে।”

*　　*　　*　　*

আলোক-উজ্জ্বল সুরম্য শয়নকক্ষে একখানি সোফার উপর অরুণ শুইয়াছিল। হাতে একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস। দৃষ্টি তাহাতে স্থাপিত, কিন্তু মনটা যে আদৌ গ্রন্থের পাতায় সংশ্লিষ্ট ছিল না, তাহার মুখের পানে চাহিলেই তাহা বুঝা যায়। আরও বুঝা যায়, জানালার বাহিরে আকাশের নীলাভাটুকু ঢাকিয়া যে কালো মেঘখানি দাঁড়াইয়া আছে, ঠিক তাঁহারই মত একটা চিন্তার মেঘ অরুণের সুন্দরতম মুখখানি জুড়িয়া থম্‌থম্ করিতেছে।

ছয়টা মাস হইল, অরুণের বিবাহ হইয়াছে। নব-বিবাহিতের বুকজোড়া আকাঙ্ক্ষা অনুরাগ লইয়া সে সুরভির মনস্তুষ্টি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু শিক্ষিতা পত্নী নিপুণ কৌশলে তাহার সহিত এমন একটা দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিত, যাহাতে অরুণের মনে হইতেছিল, তাহার দাম্পত্য-জীবনটা একটা প্রবলতম দুঃখের আকর হইবে।

দময়ন্তী বধূকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন। অতীতের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার ব্যথাতুর চিত্ত যে অনুক্ষণ এমনইতর একটি মেয়েকে বুকের কাছে, হাতের কাছে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিত! তাই সুরভির প্রতি দময়ন্তীর দৃষ্টি স্নেহান্ধ ছিল। আর জননীর অন্তরের সকল ক্ষোভ, বেদনা অরুণ জানিত বলিয়া এ বিবাহে অনিচ্ছা থাকিলেও অসম্মতির জেদটা সে তুলিতে পারে নাই।

সুরভি দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। হাতে তাহার রূপার ডিবায় ভরা সাজা পাণ। বাম বাহুতে জড়ান বেলফুলের গড়ে মালা। তাহারই সুগন্ধে চকিত হইয়া অরুণ পত্নীর পানে তাকাইল। মেঘের ফাঁকে চাঁদের দীপ্তির মত একটা আনন্দের আভা তাহার মুখে দেখা দিল।

সুরভি কিন্তু স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই ডিবাটা ঠক্ করিয়া খাটের পাশে টিপয়াটার উপর রাখিল। অরুণ পাণ খাইতে ভালবাসিত এবং খাইতও অতিরিক্ত। দময়ন্তী নিজ হাতে তাহা সাজিয়া দিতেন। সুরভি আসার পর হইতে সে কাযটা তিনি সুরভির হাতে দিয়াছিলেন এবং তাঁহারই শিক্ষা ও আদেশমত শুইতে আসিবার সময় সুরভিকে পাণের ডিবা হাতে করিয়া আসিতে হইত। অন্তরে অনিচ্ছা থাকিলেও শাশুড়ীর সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিতে সে পারিত না, তাই মুখটাকে অপ্রসন্ন করিয়াই এ কাযটা সে সমাধা করিত।

অরুণ সুরভির পানে চাহিয়াছিল, তাহাকে শয্যার উপর উঠিতে উদ্যতা দেখিয়া কহিল,—“সুরভি, দুটো পাণ দাও ত!”

সুরভি ফিরিয়া আসিয়া পাণের ডিবাটা স্বামীর সোফার উপর বসাইয়া দিয়া প্রস্থানমুখী হইতেই অরুণ কহিল, “তোমার কি বড্ড ঘুম পাচ্ছে, সুর?”

গম্ভীর-কণ্ঠে সুরভি কহিল,—“কেন, তোমার কি কোন দরকার আছে?”

দরকার? অরুণের সুন্দরতম মুখখানির উপর একটা বেদনার ছায়াপাত হইল, সুগঠিত ওষ্ঠাধরের উপর অতি ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

চোখে অনেক কিছু পড়িলেও মন যেমন না থাকিলে বুঝা যায় না, তেমনই স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেও তাহার আহত কণ্ঠস্বর, ম্লান হাসি, ব্যথিত দৃষ্টি কিছুই সুরভি বুঝিতে পারিল না। তাই তাহার আয়ত নেত্রকোণে বিরক্তির চিহ্নই ফুটিয়া উঠিল।

মন্দিরের ঘাটে

বসুমতী চিত্র-বিভাগ]

[শিল্পী—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক।

ছায়া

বসুমতী চিত্র-বিভাগ]   [শিল্পী—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক।

স্ত্রীর মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া অরুণ কহিল, "না, তুমি শোও গে!" মায়ের একটিমাত্র সন্তান সে! স্বভাবতঃই সে অভিমানী ছিল। কাঙ্গালের মত হাত পাতিয়া সে কোন কিছু চাহিতে পারিত না; তা সে হাজার দুষ্প্রাপ্য লোভনীয় হউক না কেন!

সুরভি বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। বাহুতে জড়ান মালা দুই ছড়া খুলিয়া সে টেবলের উপর তাচ্ছীল্যভরে ফেলিয়া দিল। অরুণ ফুল অত্যন্ত ভালবাসিত। গ্রীষ্মকালে বেলফুলের মালা তাহার বিশেষ প্রিয় এবং লোভনীয় ছিল! চকিতে একবার পুষ্পমাল্যের পানে চাহিয়া সুরভিকে সে জিজ্ঞাসা করিল,—"মালী কি সন্ধ্যেবেলা বাগান হ'তে এসেছিল?"

"—না, গোবিন্দা এনেছে। মা তাকে কিনে আনতে বলেছিলেন।"

"ওঃ!" বলিয়া তাহারই ফাঁকে একটা রুদ্ধ নিশ্বাসকে ত্যাগ করিয়া অরুণ বইখানা হাতে তুলিয়া লইল। স্নেহময়ী জননী কতখানি আশা লইয়া বধূর হাতে তরুণ বয়সের যত কিছু লোভনীয়—মালা, পাণ, গন্ধ কত কি গুছাইয়া দেন। যাহার জন্য এত, সে যে তাহার এতটুকুও ভোগ করে না, হয় ত জননী তাহা জানেন না। অনাদরে পুষ্পমাল্য শুকায়! সাজা পাণ বাসী হয়। গোলাপজলের বোতল এক পাশে পড়িয়া থাকে!

সুরভি গায়ে সুজনীটা ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিয়া কহিল, —"তুমি শোবে না?"

"একটু দেরী আছে। বইটা শেষ হয়ে এল, বেশ লিখেছে!"

"বাঙ্গালা নভেলে কি এমন ছাই তুমি খুঁজে পাও? আমি তো পড়তেই পারি না।"

* * * *

অতি আকস্মিক দময়ন্তীকে তাঁহার সাধের সংসারটাকে ফেলিয়া এক অজানা লোকে যাত্রা করিতে হইল। অরুণকে দুইটি কথা বলিয়া উপদেশ দিবার অবসর অবধিও তিনি পাইলেন না।

মায়ের স্নেহপক্ষপুট-হারা অরুণের দিনগুলি দুঃসহ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। জননীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে, অরুণ দেশভ্রমণে বাহির হইতে চাহিল!

শরৎ আপত্তি তুলিলেন, কহিলেন,—"তুমি এখন সংসারের কর্ত্তা হয়েছ। এত তাড়াতাড়ি তোমার কোথাও যাওয়া উচিত নয়।"

"—কিন্তু এ বাড়ীটাকে যে আমি আর এক দণ্ড সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছি না, শরৎদা!"

অরুণের আর্দ্র নেত্রপ্রান্তে ও ভগ্ন কণ্ঠস্বরে একটা অব্যক্ত বেদনা এমন নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠিল যে, শরৎ চমকিত হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিলেন। শুধু মাতৃহারা চিত্তের শোকের জ্বালা ত এ নহে। যৌবনস্ফীত বুকে তীব্র নৈরাশ্যমাখা অন্তর্দাহ আছে বলিয়া শরতের সন্দেহ হইল।

শরৎ পত্নীকে গিয়া কহিলেন,—"সুরভি অরুণের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে, কিছু জান?"

ব্যবহার? বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া নির্ম্মলা কহিলেন,—"তা আমি কি ক'রে বুঝব?"

বিরক্ত মুখে শরৎ কহিলেন,—"তোমরা মেয়েমানুষ, তোমরা যদি এটুকু না বুঝতে পার ত আমি পুরুষমানুষ বাইরে থেকে বুঝতে যাব?"

নির্ম্মলা প্রশ্ন করিলেন,—"কেন, অরুণ তোমায় কিছু বলেছে?"

শরৎ কহিলেন,—"সে যদি আমায় বলবে, তবে তোমায় জিজ্ঞেস করব কেন? নিজের বিবাহিত জীবনের দুঃখ সহজে কি কেউ পরের কাছে স্বীকার করে? এর লজ্জা কতখানি, তা জান?"

নির্ম্মলা কহিলেন,—"আচ্ছা, আমি সুরিকে জিজ্ঞেস করব, অরুণের সঙ্গে তার কি রকম বনছে?"

শরৎ কহিলেন,—"তুমি জিজ্ঞেস করবামাত্র সে তোমায় মন খুলে সব বলতে বসবে বিশ্বাস কর? যতই সে তোমাকে ভালবাসুক, এতটুকু আত্মমর্য্যাদা যার আছে, সে অপরের কাছে স্বামীর নিন্দা করতে পারে না। জান, চাঁদের গায়ে থুথু দেবার চেষ্টা কল্লে থুথুটা পড়ে কোথায়?"

"আচ্ছা, মাসীমা ত সুরভিকে খুব ভালবাসতেন!" এই কথা বলিয়া নির্ম্মলা স্বামীর পানে চাহিলেন।

চিন্তিত-মুখে শরৎ কহিলেন,—"তা ত বাসতেনই, তবে তাঁর বুড়ীর মুখের সঙ্গে সুরর মুখ-চোখের একটা মিল ছিল, তাই তিনি সুরভিকে চেয়েছিলেন জান ত!"

নির্ম্মলা কহিলেন,—"আচ্ছা, আজ এ রকম কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন? বোধ হয়, তুমি কিছু বুঝেছ?"

"—হ্যাঁ, তা একটু যেন বুঝেছি। আজ হঠাৎ অরুণের পানে চেয়ে মনে হ'ল, সে যেন একটুও সুখী নয়। শুধু মায়ের শোক নয়, একটা প্রকাণ্ড ব্যথা যেন তাকে জড়িয়ে আছে। জান ত এ বিয়েতে অরুণের মত ছিল না। আমাদের জেদেই এটা ঘটল। তাই ভয় হ'ল—ওরা ছোট নয় যে, দু'জনকে বুঝিয়ে, ধমক-চমক দিয়ে, মতের মিল করিয়ে মনের মিল করিয়ে দেব। ওদের যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, বাইরের কথা ওরা কাণে নেবে না। নিজেদের ভিতর যদি কোন মনোমালিন্য ঘটে, তা মেটান দুঃসাধ্য হবে।"

* * * *

সমুদ্রতীরবর্ত্তী একখানি বাড়ীর খোলা বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে অরুণ শুইয়াছিল। সম্মুখেই অকূল সমুদ্রের অস্থির তাণ্ডব। সুরভি তখন বেড়াইয়া ফিরে নাই।

স্বামি-স্ত্রী একসঙ্গে সমুদ্র-স্নান করিতে যাইবে, তাই সুরভির অপেক্ষায় অরুণ বসিয়াছিল। মনটা সেই অবসরের ফাঁকে ফাঁকে আদি-অন্তহীন অনেক চিন্তাই করিতেছিল—যাহার আরম্ভ বা সমাপ্তি কোথায়, কিছুই অরুণ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। পুরীতে আসিবার সময়ে অরুণ সুরভিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সুরভির পুরী আসিতে ইচ্ছা আছে কি না? অরুণ অবশ্য তাহাকে অনুরোধ করিতেছে না।

সুরভি তৎক্ষণাৎ কহিয়াছিল, "ইচ্ছে-অনিচ্ছে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। যেতে আমি বাধ্য।"

বিস্মিত অরুণ কহিয়াছিল, "বাধ্য কিসে?"

মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। অকুণ্ঠিতকণ্ঠে উত্তর হইল, "তোমার স্ত্রী ব'লে। তুমি যে দেশ-বিদেশে নিজের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবে, আর আমি একলা থেকে সকলের সহানুভূতি কুড়াব! সে আমি পারব না। সম্ভ্রমজ্ঞান আমারও আছে।"

কথাটা অরুণকে বিঁধিল, কিন্তু প্রতিবাদ বা প্রতিঘাত করা তাহার স্বভাব ছিল না বলিয়াই নিরুত্তর ওষ্ঠপ্রান্ত একটুখানি শুধু স্ফুরিত হইল। রুদ্ধ অন্তরের সীমাহীন বেদনাকে এমনই করিয়াই সে নিজের মাঝে গোপন রাখিত। কিন্তু সে যখন একা থাকিত, মনের দুঃখ তাহাকে বড় কঠিনভাবে চাপিয়া ধরিত। আজিও ধরিয়াছিল। অরুণ নিজের দাম্পত্য-জীবনের বেদনার পরিমাপ করিতে গিয়া অনেক ছন্নছাড়া অবান্তর চিন্তাকেও ডাকিয়া আনিতেছিল। ঊর্ণনাভের জালের মত চিন্তার জটিলতা তাহার মনকে সহস্র বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

সুরভি আসিয়া কহিল, "চান করতে যাও নি?"

পত্নীর মুখ শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে কি ম্লান হইয়া উঠিয়াছে? সে সুরভির দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি যে চান না ক'রেই বেরিয়েছিলে!"

আমি ভোরবেলা বেড়াতে গিছলুম। ফিরতে যে এত দেরী হবে, জানব কি ক'রে? পথে জ্যোৎস্নাদের সঙ্গে দেখা, তারা হিড় হিড় ক'রে টান্‌তে টান্‌তে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল। বাড়ী ত হেথা নয়—সেই চক্রতীর্থ।"

পত্নীর এতখানি পরিচয়ের উত্তরে অরুণ বলিল, "ওঃ!" তার পর সে কহিল, "তা হ'লে আজ তুমি নাইবে না?"

"অবাক কল্লে! নাইব না, এ হ'তে পারে? তবে আজ বাথরুমে তোলা জলে সেটা হবে। যা বালি তেতেছে, আর যেতে পারব না।"

—"তবে আমি চল্লুম" বলিয়া অরুণ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরভি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সমুদ্রে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ! নারায়ণ স্বামী অনেকক্ষণ আমার জন্যে ব'সে আছে।"

স্নানের পোষাক পরিতে অরুণ চলিয়া গেল।

কাল-রঙ্গের সমুদ্র-স্নানের পোষাকের উপর একখানি সুবৃহৎ তোয়ালে জড়াইয়া অরুণ নিজের সুন্দর সুগঠিত পেশীবহুল দেহখানি আবৃত করিয়া ঘণ্টা দুই পরে গৃহে ফিরিয়া আসিল! কুঞ্চিত চুলগুলি সিক্ত হইয়া সুগৌর ললাটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার সিঁড়িতে পা দিয়াই সে দেখিতে পাইল, তাহার পরিত্যক্ত চেয়ারখানি দখল করিয়া এক তরুণী অর্দ্ধশায়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আর পাশের হাতার উপর তাহার পত্নী বসিয়া! সদ্যঃস্নানের পর এলোচুলের রাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া নিজের অর্দ্ধেকখানি দেহ সুরভি তরুণীর অঙ্গের উপর হেলাইয়া দিয়াছে। একটা হাসি-গল্পের উচ্ছ্বাস বহিয়া যাইতেছে।

অরুণকে দেখিয়া দুই নারীমূর্ত্তি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল।

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরপদবিক্ষেপে বারান্দাটাকে অতিক্রম করিয়া অরুণ কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। দরজাটা বন্ধ করিবার সময়ে সে শুনিতে পাইল, তরুণী তাহার সখীকে প্রশ্ন করিতেছেন, "ইনিই তোর স্বামী? মিষ্টার বোস?"

হাস্যজড়িত কণ্ঠে পত্নী উত্তর করিল, "হ্যাঁ, উনি সে সৌভাগ্য লাভ করেছেন বটে!"

সখী হাসিয়া কহিল, "তুই জিতিছিস্।"

* * * *

অরুণরঞ্জিত মুখে স্বামীর পানে চাহিয়া রুষ্টকণ্ঠে সুরভি কহিল, "এটা কি ভাল হ'ল?"

নির্ব্বিকারচিত্তে উদাসীনের মত অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্‌টা?"

তীব্রকণ্ঠে সুরভি কহিল, "কোন্‌টা! তাও তোমায় ব'লে দিতে হবে?" তাহার পর তাচ্ছীল্যভরে ওষ্ঠ বাঁকাইয়া কঠিন বিদ্রূপের সুরে কহিল, "হ্যাঁ, এ সব বিষয়ে তোমায় একটু বুঝিয়ে বলা উচিত।"

মৃদু হাসিয়া অরুণ কহিল, "আমিও ত তাই বলি।"

স্বামীর আরক্ত ওষ্ঠাধরের মৃদু হাসির রেখাটা তীব্রতম অবহেলা, নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্য বলিয়াই সুরভির মনে হইল। প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার সমস্ত অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। তাহার জিহ্বা বিষ ছড়াইতে ইতস্ততঃ করিল না। তিক্তকণ্ঠে সে কহিল, "নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম কি ক'রে বজায় রাখতে হয়, তা জান্‌বে কি ক'রে? বুঝবেই বা কি ক'রে? চাষারা নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তুই-তোকারি ক'রে কথা কয়, কথায় কথায় বাঁশ হাতে মারতে আসে; আবার হাসে, গল্প করে। তারা অনায়াসে মারতে বা হাসতে পারে, তার কারণ, মা সরস্বতী ত কোন দিন তাদের পানে চেয়ে দেখেন নি। কিন্তু কোন সভ্য সমাজের লোক কি তা পারে?"

সুরভি স্বামীর দিকে চাহিল। কিন্তু সেই শান্ত সুন্দর মুখখানির উপর অন্তরের কোন ছায়াই ত প্রতিফলিত হইল না। ধীরকণ্ঠে অরুণ কহিল, "তা হ'লে এ নিয়ে আমাকে আর তুমি কোন দোষারোপ করতে পার না। জান ত সরস্বতী কোন দিনই আমাকে দয়া করেন নি।"

প্রচণ্ড আক্রোশ লইয়া মানুষ যখন ভৎর্সনা আরম্ভ করে, তখন ভৎর্সিতের মুখের চেহারায়, দৃষ্টিতে বা কণ্ঠের স্বরে যদি একটা বেদনার সাড়া কি লজ্জার আভাস দেখিতে না পায় ত ভৎর্সনাকারীর ক্রোধ সীমা-হারা হইয়া পড়ে। স্বামীকে দুই চারিটি মিঠে-কড়া বুলিতে তাহার আজিকার ক্রটিটাই সুরভি বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। সে অরুণকে মর্ম্মাহত করিয়া কিছু বলিবার সঙ্কল্প লইয়া আসে নাই। কিন্তু বিশ্বে যেমন অনেক কায আছে—যাহার আরম্ভটা শুধু মানুষ করিতে পারে, বিস্তার হয় সে নিজের খেয়ালে, সেখানে আর মানুষের হাত চলে না, তেমনই মানুষের মুখ দিয়া ক্রোধের মাথায় কলহের বাণী যখন বাহির হয়, সে যে তখন কতখানি বিষ লইয়া বাহির হয়, বক্তা তখন নিজেই জানিতে পারে না।

সুরভি তাহার কলেজের সহপাঠিনী সখী জ্যোৎস্না এবং য়ুরোপপ্রত্যাগত সুশিক্ষিত জ্যোৎস্নার দাদা সমীরকে বৈকালে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সংবাদটা সে যথাসময়ে স্বামীর গোচর করিতেও ভুলে নাই। কিন্তু ঘড়ীতে তিনটা বাজিবার পূর্ব্বেই অরুণ হঠাৎ জরুরী কায আছে বলিয়া ট্যাক্সি করিয়া সেই যে অন্তর্দ্ধান হইল, রাত্রি দশটা বাজিবার পূর্ব্বে সে গৃহে ফিরিল না।

জ্যোৎস্না সমীরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, অরুণ বাবু কোথায়?

সুরভি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সমীর তাহার হইয়াই ভগিনীকে বলিয়াছিল,—"কোন জরুরী কাযে নিশ্চয় তিনি কোথাও আটক পড়েছেন।" কথাটা যে সে সুরভির আরক্ত মুখখানা দেখিয়াই বলিয়াছিল, তাহা জ্যোৎস্নার বুঝিতে বাকী ছিল না। সে শুধু সখীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটুখানি হাসিয়াছিল, এবং তাহার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা ছিল, তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া সুরভির ললাট ঘামিয়া উঠিয়াছিল।

সুরভি সমীরকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, তাহার শাশুড়ীর নামে পুরীতে কিছু দেবত্র করা প্রয়োজন। তাই তাহার স্বামী সেই ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত আছেন।

উত্তরে সমীর হাসিয়া বলিয়াছিল যে, বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট যে কিরূপ ভীষণ, তাহা সে বেশ বুঝে। তাই সে ঐ ব্যাপারটাকে সকল সময় এড়াইয়া চলে। কলেজের প্রোফেসারী উহার তুলনায় খুব সোজা। মিষ্টার বসু বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তি পান নাই, এ জন্য সে দুঃখিত।

ধীরে ধীরে ছোট, বড়, মাঝারি গল্প ও হাস্য-পরিহাসের অবকাশে সুরভিদের চায়ের মজলিসের আনন্দটা জমিয়া উঠিয়াছিল। তথাপি সুরভির প্রতীক্ষিত নেত্র-যুগল নীলাম্বুর দিক্ হইতে ফিরিয়া বাহিরের রাস্তাটার উপর মাঝে মাঝে পতিত হইতেছিল,—একটি পরিচিত মূর্ত্তিকে দেখিবার আশায়। হাসির তুফান হইতে কাণ দুইটি একটা পরিচিত পদধ্বনি শুনিবার জন্য চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুরভির জীবনে এমন করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করা এই প্রথম। বন্ধুর দৃষ্টিতে নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে আজ যেমন স্বামীকে পাশে পাইবার ব্যাকুলতার সীমা ছিল না, তেমনই তাহা ব্যর্থ হওয়ায় রোষে চিত্ত তাহার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

সেই ব্যর্থতার স্মৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া আজ স্বামীর সহিত আলোচনাকালে ফাটিয়া বাহির হইল। বিশেষতঃ স্বামীর প্রত্যুত্তরগুলি তাহার অন্তরে যেন বৃশ্চিকদংশনের জ্বালার সঞ্চার করিল। যন্ত্রণার আতিশয্যে সে অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল, "দোষ তোমার নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের, আর আমার অভিভাবকদের,—নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে যারা আমায় বলি দিয়েছে।"

* * * *

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপটা এমন কমিয়া গিয়াছিল যে, দেখিলে মনে হইত, বুঝি বা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেটা একবারে বন্ধ হয় নাই। তবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া সাধারণ আলোচনা বন্ধই হইয়াছিল।

সে দিন কথায় কথায় জ্যোৎস্না বলিয়া ফেলিল, "কৈ সুরভি, অরুণ বাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলি নি? তোর বুঝি ভয় হয়?"

সুরভি কহিল, "ভয় না ঘোড়ার ডিম। তবে তোর এত তার সঙ্গে মেশবার জেদ কেন বল ত?"

কথাটা সে রহস্য করিবার ইচ্ছা লইয়া বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু যে আকারে কথাটা বাহির হইয়া গেল, তাহাতে সুরভির নিজের মুখখানি অবধি আরক্ত হইয়া উঠিল।

সুরভির সেই অপ্রতিভ দৃষ্টি ও রক্তিম মুখখানির পানে চাহিয়া জ্যোৎস্না খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল,—"চাঁদের অনেকগুলা স্ত্রী আছে না রে? কিন্তু ভাই, রোহিণীর একলা চাঁদই ছিল ব'লে জানতুম।"

আঘাত করিলেই প্রতিঘাত ফিরিয়া আসে। সুরভি মনের কুণ্ঠা দমন করিয়া কহিল, "এখন কি জান্লি?"

"জানতুম, পুরুষদের যদি থাকে, মেয়েদের বা থাকবে না কেন?"

সুরভি কহিল,—"থাক্ জ্যোৎস্না, তোকেই আমি না হয় গুরু কল্লুম।"

জ্যোৎস্না হাসিতে হাসিতে কহিল, "শুধু গুরু কল্লে হবে না, দক্ষিণা দিতে হবে, মশাই!"

—"আচ্ছা, একলব্যের মত দক্ষিণা দিয়ে নিজেকে না হয় গুরুর চেয়ে বড় ক'রে তুলব।"

"বেশ, দেখা যাবে কতখানি সৎসাহস আছে।"

সমীর বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। সুরভিকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, "আপনার দরোয়ান ট্যাক্সি আনবে কি না জিজ্ঞেস কোচ্ছে, মিসেস বোস।"

সুরভি চমকিয়া উঠিল। ঘড়ীর পানে চাহিয়া দেখিল, রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। লজ্জিত-কণ্ঠে কহিল, "ওঃ, রাতটা খেয়ালই করিনি।"

জ্যোৎস্না কহিল,—"এমন চাঁদিনী রাতি তুই ট্যাক্সি চড়বি—দূর অকবি!"

চাঁদের আলোয় সমুদ্রের জল আবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎসস্বরূপ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সুরভি কহিল—"না, ট্যাক্সি চাই না। আমি হেঁটেই যাব সমুদ্রের ধার দিয়ে।"

সুরভি উঠিয়া দাঁড়াইয়া "কানাই সিং" বলিতেই সমীর কহিল,—"মিসেস বোস, অনুগ্রহ ক'রে আপনার সঙ্গে আমায় যাবার অনুমতি দেবেন? আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে গেলে আমি আনন্দিত হব।"

চকিতে একবার জ্যোৎস্নার মুখের পানে চাহিয়া সুরভি কহিল, "বেশ ত, চলুন না।"

সারাটা পথ সুরভির ঠিক পাশে পাশেই সমীর যাইতেছিল। চাঁদের আলোয় দুইজনকার ছায়া একদিকেই পড়িতেছিল। দুইজনকার মুখেই কথা নাই। একটা ভাবের আবেশে উভয়েই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সুরভির মনে জাগিতেছিল অতীতের স্মৃতি। সে যেন জন্মান্তরের কাহিনী। আই এস-সি ক্লাসের ছাত্রী সে আর জ্যোৎস্না। সমীর তখন এম, এস-সির ষষ্ঠ বার্ষিকে পড়িতেছে! তাহার নিত্য

কায ছিল, সুরভি ও জ্যোৎস্নাকে গৃহে পৌছাইয়া দেওয়া। এই ব্যাপার লইয়া সহপাঠীদিগের কাছ হইতে কত বিদ্রূপ-পরিহাস সমীরকে পরিপাক করিতে হইত, কিন্তু কর্ম্মে বিচ্যুত সে একটি দিনও হইত না। তাহাদের পিতার মোটর আসিত, কিন্তু সুরভি তাহাতে উঠিবে না বলিয়া সুরভির সঙ্গটুকু পাইবার জন্য তাহারা দুইটি ভাই-বোনে ট্রাম বা বা বাসের কষ্ট হাসিমুখে অবাধে সহিয়া যাইত।

সমীরের মনে হইতেছিল, আজ অনুমতি লইয়া সে সুরভির সহিত পথ চলিবার অধিকার সামান্য সময়ের জন্য পাইয়াছে। কিন্তু এমন এক দিন তাহার জীবনে আসিয়াছিল, যখন নিত্য এই কাযটা করিতে সে পাইত। আর সেই পথ চলার দিনে কল্পনা করিত, এই তরুণীর সঙ্গে জীবনের সমস্ত পথটাই অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত থাকিয়া চলিবার দাবী করিবে।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উভয়ে থামিল। সমীর সুরভির দিকে চাহিয়া কহিল, "ভেতরে যাব? মিঃ বোস আছেন কি?"

"আছেন তিনি নিশ্চিত। কিন্তু আপনাকে আর কষ্ট ক'রে ভেতরে আসবার আবশ্যক হবে না।"

সুরভির কণ্ঠস্বর শুনিয়া সমীর চমকিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাঁদের আলোয় দেখিতে পাইল, সুরভির নয়নে দুই বিন্দু জল টল টল করিতেছে।

সমীর বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া সুরভির অত্যন্ত নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল। বর্ত্তমান অকস্মাৎ তাহার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। অতীতের অভ্যাস অনুসারে সে বলিয়া উঠিল, "সুর, লক্ষ্মীটি! আমায় বল, তুমি সুখী কি না?"

সমীর খপ্ করিয়া সুরভির হাতটা ধরিয়া ফেলিল। তাহার দুই চোখে গভীর যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সুরভি হাত ছাড়াইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই খট্ করিয়া উপরের দরজা খুলিয়া গেল। কক্ষের উজ্জ্বল আলোকের একটা ঝলক আসিয়া সুরভি ও সমীরের গায়ের উপর ছড়াইয়া পড়িল। উভয়ের চকিত দৃষ্টিপথে কক্ষ-অভ্যন্তরের মনুষ্যমূর্ত্তি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। তাহার দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মূর্ত্তি সরিয়া গেল।

*　*　*　*

অনেকক্ষণ বিছানায় পড়িয়া কাঁদিয়া মুখ-চোখ ফুলাইয়া অবশেষে এক সময়ে সুরভি চোখ মুছিল। অনেকক্ষণ অশ্রুপাতের পর তাহার মাথার ভিতর একটা যন্ত্রণা হইতেছিল। চোখে মুখে জল দিবার জন্য সুরভি উঠিয়া বসিতেই দেখিতে পাইল, সম্মুখে চেয়ারে স্বামী উপবিষ্ট। ঈষৎ অবনত হইয়া গালে একখানি হাত রাখিয়া তিনি যেন একটা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সুরভি নিজেকে সংবরণ করিল না, করিবার চেষ্টাও করিল না; এই গভীর রাত্রি অবধি স্বামীর জাগরণের অর্থটা শুধু তাহার নিকট কঠিন কৈফিয়ৎ গ্রহণের প্রতীক্ষা, ইহাই মনের মাঝে নিশ্চিত করিয়া বুঝিয়া সুরভির অন্তরটিও কঠিন হইয়া উঠিল।

গেলাসের জলে মুখ-চোখ ধুইয়া সুরভি আবার তাহার পরিত্যক্ত বিছানাটার উপর আসিয়া বসিল। আজ তাহার ভাল-মন্দের একটা চরমতম মীমাংসা হইয়া যাইবে।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কক্ষের নীরবতা ভাঙ্গিল না। সেই মৌনতা মৃত্যু-বিচারার্থীর অস্থির মুহূর্ত্তগুলির মতই সুরভির নিকট যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঘড়ীতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। শীতল বাতাস মুক্ত জানালার পথে ছুটিয়া আসিয়া এই বিনিদ্র নর-নারীর তপ্ত মাথা শীতল করিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিল।

অরুণ মুখ তুলিল। মানুষের মন যখন অপরের উপর দ্বেষশূন্য হইয়া নিজের দুঃখের জন্য নিজেকেই একমাত্র দায়ী করে, তখন তাহার ব্যথিত চোখ-মুখের উপর এমন একটা করুণা ফুটিয়া উঠে—যাহা অতি ক্রোধী অন্তরকেও নিমেষে অভিভূত করিয়া ফেলে। স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া সুরভি চমকিয়া উঠিল। নিজের অভিমান ও উত্তেজনার মধ্য দিয়া এতক্ষণ দৃষ্টি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই আবদ্ধ ছিল।

অরুণ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "সুর! আমি জানতুম, আমার কাছে তুমি সুখী হ'তে পারবে না। তাই আমি গোড়া হ'তে এ বিবাহে আপত্তি করেছিলাম।"

স্বামীর মতই ধীরে ধীরে সুরভি কহিল, "কেন তুমি জানতে, সুখী হ'তে পারবে না? নিজের অতৃপ্তির কথা জানতে পার; কিন্তু অপরের কথা তা'কে দেখবার বা জানবার আগে কি ক'রে নিশ্চিত হয়েছিলে?"

"কি ক'রে হয়েছিলাম?" অরুণ একটু থামিয়া

কহিল, "তার কারণ, তুমি যে শিক্ষা পেয়েছ, যে সংস্কারের মধ্যে বেড়ে উঠেছ, তার কোনটাই আমার মধ্যে ছিল না। আর শিক্ষা ও সংস্কার মানুষের সাথে মানুষের পৃথক গণ্ডী টেনে দেয়। তাই মনে হয়েছিল, তুমি আমার কাছে তৃপ্তি পাবে না।"

সুরভি কহিল, "তুমি শিক্ষা-সংস্কারের কথা বলছ? সে দিন তোমায় বলেছিলাম, জ্যোৎস্নার দাদা য়ুরোপ থেকে শিক্ষা পেয়ে এসেছে। কিন্তু সে কথাটা ধ'রে তুমি যদি খোঁটা দিয়ে কিছু বল ত আমি বলবো, মানুষকে রাগিয়ে দিয়ে যা তার বলবার ইচ্ছা ছিল না, সেই কথা তার মুখ হ'তে বার ক'রে নিয়ে যে শাসন করতে আসে—"

বাধা দিয়া অরুণ আহতকণ্ঠে কহিল, "শাসন! আমি তোমায় শাসন করেছি, সুরভি? তুমিই বল, শাসনের কোন পরিচয় কোন দিন আমার কাছে পেয়েছ কি?"

সুরভিকে কে যেন কঠিন আঘাত করিল। স্বামীর কণ্ঠস্বরে যে দুঃসহ বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সবটুকুই আজ সুরভির কাছে ধরা পড়িল। একটা গুরু অপরাধের বোঝা যেন তাহার মাথাটাকে নত করিয়া দিল। দৃষ্টি ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

সুরভির বিবর্ণ, ব্যথাহত মুখখানির পানে চাহিয়া অরুণ কহিল, "আমি কোন অভিযোগ-অনুযোগ কচ্ছি না, সুরভি! আমি বলছি, আমি পাষাণ নই! তোমার দুঃখটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তোমায় বিয়ে করা ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না বলেই তোমায় বিয়ে কল্লুম।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া সুরভি কহিল, "উপায় ছিল না?"

"—হ্যাঁ, উপায় ছিল না। আমার এক ছোট বোন্ ছিল। তাকে কোলে নিয়েই মা বাবাকে হারিয়েছিলেন। সে বাবার বড্ড আদুরে ছিল। আর চেহারাতে আমি যেমন মায়ের ছাপ পেয়েছিলুম, সে তেমনই পেয়েছিল বাবার ছাপ। আর তুমি ত জান, আমি মাকে কত ভালবাসতুম।"

সুরভি দুই চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর মেলিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল। মাথা হেলাইয়া অরুণ কহিল, "সে ম্যাট্রিক একজামিন দিয়েছিল. তুমি যে বছর পরীক্ষা দেও, সেই বছর তার ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ হওয়ার খবরটা যখন গেজেটে বার হলো, সেটা আমাদের বুকে শক্তিশেলের মত বাজলো। রানু তখন বাবার কাছে। মা যেন পাগলের মত হয়ে গেলেন। তোমার মুখের সঙ্গে রানুর মুখের অনেকটা মিল আছে, বিশেষ তোমার চোখ দেখলেই তাকে মনে পড়ে। শরৎদার বাড়ী মা তোমায় দেখেছিলেন। শরৎদা মাকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্যই তোমাকে বৌ করতে বল্লেন। মারও খুব ইচ্ছা হলো—শেষে সেটা জেদে দাঁড়াল। হারান রানুকে যেন তোমার মাঝেই পাবেন।"

অরুণের কণ্ঠস্বর ভার হইয়া আসিতেছিল। জড়িত কণ্ঠে সে কহিল, "সুর, মার জন্যই আমি স্বার্থপর হয়ে তোমায় এনেছিলুম। তা না হ'লে তোমায় পাবার যোগ্যতা নেই, আমি জানতুম। আমি—" বুকের মাঝে একটা অপার উচ্ছ্বাস অরুণের কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করিয়া দিল।

সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। অসমাপ্ত কথাগুলির অন্তরাল হইতে মর্ম্মাহত শোকের বেদনা সুরভির স্পন্দিত হৃদয়কে ব্যথাতুর করিয়া তুলিল—অশ্রুধারা তাহার দুই চোখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। স্বামীর শান্ত ব্যবহার—সংযমসুন্দর মূর্ত্তি অকস্মাৎ সুরভির মনের মাঝে একটা বিপরীত চিন্তার তরঙ্গ বহাইয়া দিল।

সমীরের কথা সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শুধু সুরভির চোখের জল দেখিয়া তাহাকে পর-স্ত্রী জানিয়াও সমীর কতখানি আত্মহারা হইয়াছিল, তাহার হাত ধরিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। আর তাহার স্বামী! সুরভির উপর অনুক্ষণ সকল দাবী করিবার অধিকার সত্ত্বেও সুরভির কোন আচরণেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি নিমেষের জন্য ঘটে না!

অরুণের অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্বতা যেন সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়া নিদ্রিতা রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিল। সুরভির মোহগ্রস্ত নারীচিত্তের চৈতন্য অকস্মাৎ বিপুল শক্তি লইয়া জাগিয়া উঠিল। সুরভির মনে হইল, যত লোকের সহিত সে পরিচিত হইয়াছে ও যাহাদের কথা-কাহিনী কাণে শুনিয়াছে, তাহাদের সকলের বহু ঊর্দ্ধে অরুণের স্থান। তাই সে সহজে ক্রোধ করিতে পারে না। শুধু তাহাদের দুর্ব্বলতা-ভরা মান-অভিমানের পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

নিজের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতায় স্বামীর মহত্ত্বকে কল্পনায় আনিতে না পারিয়া নিজের অপরাধের বোঝাটিকে শুধু ভারী করিয়া রাখিয়াছিল। পিতার কথাটা হঠাৎ আশীর্ব্বাদ-বাণীর মতই সুরভির মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'সুরভি, তোমার এ ভুল ভাঙ্গবে।'

পূর্ব্ব-গগনে রাত্রির বিলীনপ্রায় অন্ধকার রূপপরিবর্ত্তন করিয়া ঊষার আলোককে আহ্বান করিতেছিল। তাহার পানে চাহিয়া সুরভি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার শিক্ষাভিমানী অন্তর-মাঝে নারীচিত্ত বেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া নিরন্তর মাথা কুটিত। আজ তাহার প্রতিষ্ঠার দিন আসিয়াছে। পূজ্যকে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে না পারিলে যে নিজের কাছে এবং অপরের দৃষ্টিতে প্রতি মুহূর্ত্তে কত ক্ষুদ্র হইতে হয়, আজ সে শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে দেয় না অর্পণ করিতে পারার মত দুর্ভাগ্য জগতে আর কিছুই নাই।

সুরভি স্বামীর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রু-বিগলিত কণ্ঠে কহিল,—"অপরাধের অন্ত নেই। তবু তোমার যোগ্য ক'রে তোমার কাছে টেনে নাও।"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

প্রিয়তমা

যার আশে আমি, রয়েছি বসিয়া
সে এল নাক' জীবনে,
যে নারী আসিল, সে শুধু ভরিল,
মোর বুক, গুরু বেদনে :

প্রেমের পিয়াসী, হৃদয় আমার,
কেঁদে কেঁদে ফিরে ভুবনে
বুক ভাঙ্গা মোর, দীর্ঘ নিশ্বাস্—
মিলায় গগনে, পবনে !
কেহ না আসিয়া, রূপের ঝলকে,
করিল আমারে অন্ধ,
কেহ বা অলক বহিয়া আনিল,
মন্দার-ফুল-গন্ধ !
কেহ বা জড়াল, কণ্ঠে আদরে,
মৃণাল-বাহুবল্লরী,
কেহ্ বা খেলাল, নয়নে তাহার
শত বিদ্যুৎ-লহরী !

ওরা এসেছিল, ভুলাতে আমায়,
ক্ষণিকের সুখ-বিলাসে,
ফেলে যেতে মোরে, মরু প্রান্তরে
কণ্ঠ আকুল পিয়াসে !
শিঞ্জনী তার আজিও বাজেনি
আমার হৃদয়কুঞ্জে
চাহনি যাহার, দিতে পারে লাজ
নীল উৎপলপুঞ্জে,
মর্ত্ত্য উঠিবে অমরা হইয়া
যাহার অধর-পরশে,
সঞ্চিত সুধা, পান করি' যার
চিত্ত ভরিবে হরষে !

যাহার কোমল, পাণির পীড়ন
আমারে করিবে মত্ত
যার কণ্ঠের বীণা-ঝঙ্কারে,
সকলি হইবে সত্য !

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (এম এ বি এল)।

ত্রয়োদশ প্রবাহ

মৃতের পুনর্জ্জীবন

মিঃ লকের অবস্থা তখন দারুণ সঙ্কটজনক, তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার বিপদের গভীরতা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভূ-বিবরের যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টা করাই সঙ্গত মনে করিলেন।

তিনি সেই অন্ধকারে শবাধারটি হাতড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, যদি তিনি তাহার ডালা হইতে সেই তক্তার কিয়দংশ খুলিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে তাহা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন। মিঃ লক শবাধারের ডালায় হাত দিতেই কি একটা শীতল জিনিষের স্পর্শে বিস্মিতভাবে হাত টানিয়া লইলেন; জিনিষটা কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি কৌতূহলভরে পুনর্ব্বার তাহা স্পর্শ করিলেন এবং তাহার উপর হাত বুলাইয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা 'অটোমেটিক পিস্তল!' সৈনিকরা তাঁহার ব্যবহারের জন্যই পিস্তলটি সেখানে রাখিয়া গিয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল।

মিঃ লক মনে মনে বলিলেন, "উহাদের অনুগ্রহে অস্ত্র ত পাইলাম, এখন যদি একটা ম্যাচ-বাক্স পাইতাম—'

পুনর্ব্বার অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে তিনি অস্ফুট হর্ষধ্বনি করিলেন; এবার যে জিনিষটি তাঁহার হাতে ঠেকিল, তাহা ম্যাচ্-বাক্স না হইলেও তাহা তাঁহার কাযে লাগিবে, ইহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। সেই জিনিষটি তাঁহারই বিজলী-বাতি। তিনি যখন প্রথমে কিল্লার ভিতর নীত হইয়াছিলেন, সেই সময় তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রিগো ও তাহার সহযোগীরা তাঁহাকে কিল্লার বাহিরে লইয়া যাইবার ইচ্ছা সফল করিতে না পারায় সেই স্থানে তাঁহার শবাধারের উপর ঐ দুইটি জিনিষ রাখিয়া গিয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল, তিনি শবাধার হইতে বাহির হইয়া ইহা সংগ্রহ করিতে পারিলে উপকৃত হইবেন।

মিঃ লক তাঁহার বিজলী-বাতির 'সুইচ্' টিপিয়া আলো করিলেন, সেই আলোকে তিনি একটি সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলেন, তাহার এক প্রান্ত ইট, খোয়া ও মাটী দিয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। অন্য প্রান্ত খোলা ছিল; কিন্তু তাহা বাঁকিয়া অন্ধকারে কোথায় মিশিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার ধারণা হইল, তাহা ভূগর্ভস্থ গুপ্তপথ; শত শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রমজীবীরা সবল হস্তে পাহাড় কাটিয়া বহু পরিশ্রমে সেই পথটি প্রস্তুত করিয়াছিল।

মিঃ লক কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না, তিনি কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সৈনিকরা যে দিক্ দিয়া বাহিরে গিয়াছিল, গুড়ি মারিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলেন।

সেই পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া ঊর্দ্ধে না উঠিয়া ক্রমশঃ

নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছিল। মিঃ লক চলিতে চলিতে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে কর্দ্দমাক্ত জলের উপর দিয়া চলিতে হইতেছিল। চলিতে চলিতে তিনি সেই পথের ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, প্রস্তর ভেদ করিয়া দুই ধারে কতকগুলি সুকর যেন মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; সেগুলি সঙ্কীর্ণ টনেলের মুখ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। আরও কিছু দূর চলিয়া তিনি সেই স্থানটি কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন। উহা বহুদিনের পুরাতন একটি পয়ঃপ্রণালী। যে নদী কিল্লার প্রাচীরের বহির্দ্দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, এক সময় সেই নদীর একটি শাখা, শত্রু কর্ত্তৃক কিল্লা অবরুদ্ধ হইলে, কিল্লার অধিবাসিগণের জলকষ্ট-নিবারণের উদ্দেশ্যে এই পথে প্রবাহিত করা হইয়াছিল।

মিঃ লক বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার এই অনুমান সত্য হইলে সমুদ্রের দিকে একটা পথ উন্মুক্ত থাকাই সম্ভবপর।

ঐরূপ কোন পথ দেখিতে পাইবার আশায় মিঃ লক উৎসাহভরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার গন্তব্য পথ ক্রমশঃ দুর্গম হইয়া উঠিল। সুড়ঙ্গের ছাদের উচ্চতা ধীরে ধীরে হ্রাস হইতে লাগিল, জলের গভীরতাও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে বায়ু-প্রবাহ নির্ম্মলতর বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি হইল। এতদ্ভিন্ন, এক একবার বাতাসের এরূপ এক একটা দম্কা আসিতে লাগিল যে, তাঁহার মনে হইল, তিনি সুড়ঙ্গ-মুখের নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন।

মিঃ লককে উভয় হস্ত ও জানুর উপর ভর দিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে হইল। কারণ, মাথা তুলিলেই সেই সুড়ঙ্গের অনুচ্চ ছাদে তাঁহার মস্তক আহত হইবার আশঙ্কা ছিল। এই ভাবে চলিবার সময় তাঁহার মস্তকের ঊর্দ্ধদেশ হইতে আলগা পাথর ও মাটীর চাপ তাঁহার আশে-পাশে খসিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে তিনি একটি কোণে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থ খিলানের অগ্রভাগে মুক্ত আকাশ দেখিতে পাইলেন।

সেই সুড়ঙ্গ-দ্বারের অদূরে বন্দর। মিঃ লক সমুদ্রতটে রৌদ্রে শুষ্কপ্রায় কর্দ্দমরাশির উপর উপস্থিত হইলেন। সেই স্থান হইতে বন্দরস্থিত জাহাজগুলি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের দীপালোক তাঁহার নিকট মুক্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ক্রুডারের জাহাজ কালিম্পো প্রায় অর্দ্ধ-মাইল দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সুড়ঙ্গের বাহিরে কিল্লার যে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের নিকট কোন প্রহরী পাহারা দিতেছিল কি না, দেখিবার জন্য মিঃ লক মাথা বাড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কোন শান্ত্রী বা প্রহরী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তিনি তাঁহার পিস্তল ও বিজলী-বাতি পকেটে ফেলিয়া সমুদ্রতীরে দৌড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া চেষ্টায় বিরত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, অতঃপর সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না বটে, কিন্তু কাপ্তেন বয়েল ও তাঁহার কন্যাকে তিনি কি উপায়ে রক্ষা করিবেন? তিনি তাঁহা-দিগকে কি পিশাচপ্রকৃতি কলভেটির কবলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবেন? তাঁহাদের উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করিবেন না? নিজের প্রাণ রক্ষা করাই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এই দূরদেশে আসিয়া জীবন বিপন্ন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাঁহার মনে হইল, যদি তিনি বিপন্ন বন্দিদ্বয়ের উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করেন, তাহা হইলে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিবেন না, তাঁহার সুনাম নষ্ট হইবে এবং চিরজীবন তাঁহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।

মিঃ লক অবিলম্বে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল, সৈনিকরা যে পথে সেই ভূগর্ভ হইতে কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথটি তিনি দেখিতে পান নাই বা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবারও চেষ্টা করেন নাই। এইবার তিনি সেই পথটি আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এজন্য তাঁহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না। সেই সুড়ঙ্গমুখের প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে তিনি একটি সঙ্কীর্ণ গুপ্তপথ দেখিতে পাইলেন; সেই পথটি কয়েক খণ্ড আলগা প্রস্তর-স্তূপের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই পথ হইতে পিচ্ছিল ও বন্ধুর প্রস্তর-সোপান ঊর্দ্ধে প্রসারিত ছিল; সেই সোপানশ্রেণী গিরিপাদমূলস্থ প্রস্তরস্তূপ ক্ষোদিত করিয়া

নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিঃ লক সেই সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণীর সাহায্যে অতি সতর্কভাবে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে উঠিতে উঠিতে তিনি ক্রমান্বয়ে ত্রিশটি সোপান অতিক্রম করিয়া একটি পথ দেখিতে পাইলেন, তাহা নিম্নস্থিত গুহাপথের প্রায় অনুরূপ। কিন্তু তাহা শুষ্ক, খট্‌খটে। তাহার উভয় পার্শ্বে নিরেট প্রস্তরের গাঁথনী। মিঃ লক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মাথা তুলিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সময় তিনি একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন। সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যের কণ্ঠস্বর এই প্রথম তাঁহার কর্ণগোচর হইল। শব্দটা শুনিয়াই তিনি হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বক্ষের স্পন্দন যেন সহসা স্তম্ভিত হইল!

সেই শব্দ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ; তাহা রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত আর্ত্তস্বর বলিয়াই তাঁহার মনে হইল, যেন কোন অসহায়া নারী কাহারও কঠোর উৎপীড়নের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মিঃ লকের দন্তের সহিত দন্তের সংঘর্ষণ হইল। তাঁহার ধারণা হইল, সয়তান কলভেটি বয়েল-দুহিতার প্রতি পৈশাচিক নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছিল; সেই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারায় সেই কোমলহৃদয়া তরুণীর বক্ষঃ-পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ভেদী হাহাকার নিঃসারিত হইতেছিল। সেই বালিকার পীড়নের কথা স্মরণ করিয়া মিঃ লকের দেহের শোণিত উত্তপ্ত হইল, তিনি ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, নিজের অসহায় অবস্থার কথা তিনি বিস্মৃত হইলেন।

সেই আর্ত্তনাদ কর্ণগোচর হওয়ায় মিঃ লক কোন্ দিকে যাইবেন, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—সেই শব্দটা তাঁহার বামদিক্ হইতে আসিতে-ছিল, এবং তাহা অধিক দূরেও নহে। তিনি বিজলী-বাতির আলোক পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত করিয়া সতর্কভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

কিছু দূরে ঊর্দ্ধস্থিত দেওয়ালে একটি লাল আলোকের শিখা স্পন্দিত হইতে দেখিয়া মিঃ লক সেই আলোকশিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি দ্রুতবেগে কয়েক গজ অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইলেন—সেই আলোক-রশ্মি একটি সঙ্কীর্ণ গোলাকার মুকর হইতে বাহির হইতেছিল; সেই মুকরটি পথের প্রান্তবর্ত্তী দেওয়ালের গায়ে লম্বিত হইল। সেই সময় একাধিক মনুষ্যেরও মিশ্রকণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সেই সঙ্গে কলভেটির তীব্র কণ্ঠস্বরও তিনি শুনিতে পাইলেন। ক্রোধে ও উত্তেজনায় তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল।

চতুর্দ্দশ প্রবাহ

অকূল পাথারে

অদূরে একটি খিলান ছিল। মিঃ লক চিন্তাকুল-চিত্তে সেই খিলানের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় উত্তেজিত মন সংযত করিলেন, তাহার পর সেই খিলানের ভিতর মুখ বাড়াইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। একটি অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি সেই খিলানের কয়েক গজ দূরে সমুচ্চ স্থূল পাষাণ-স্তম্ভশ্রেণী-পরিবেষ্টিত একটি বৃহৎ মণ্ডপ দেখিতে পাইলেন, তাহার উচ্চ ছাদ ঐ সকল বিশাল স্তম্ভের ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত। মণ্ডপের দেওয়ালের স্থানে স্থানে যে সকল মশাল জ্বলিতেছিল, তাহা হইতে প্রচুর ধূম উদ্গত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল। সেই মণ্ডপের দুইটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভের সহিত একটি পুরুষ ও দ্বিতীয় স্তম্ভে একটি রমণী মুখোমুখী হইয়া রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহা-দিগকে দেখিয়াই মিঃ লক চিনিতে পারিলেন—তাঁহাদের এক জন কাপ্তেন বয়েল, রমণীটি তাঁহারই সুন্দরী কন্যা। সেনাপতি কলভেটি তাঁহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে কাপ্তেন বয়েলের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিঃ লক দেখিলেন, কলভেটি উত্তেজিতভাবে কাপ্তেন বয়েলের সম্মুখে সরিয়া গিয়া তাঁহার মুখে প্রচণ্ডবেগে এক ঘুসি মারিল, সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ওরে কুকুর, তুই কি আশা করিয়াছিস্, আমি তোর মুখ দিয়া কথা বাহির করিতে পারিব না? তবে কি তোকে কথা বলাইবার জন্য আমাকে শেষ উপায়—অতি কঠোর পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে?"

কাপ্তেন বয়েলের হস্ত-পদ স্তম্ভের সহিত আবদ্ধ। তিনি অসহায়, আত্মরক্ষায় অসমর্থ; সেই অবস্থায় কল-ভেটির ঘুসি খাইয়া তিনি তাহাকে এই অত্যাচারের প্রতিফল

দিতে পারিলেন না ; তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ লগুড়াহত ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কলভেটির মুখের উপর অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তোর মত হীনবংশীয় ইতর 'নিগারকে' কোন কথা বলা অপেক্ষা এই স্থানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা শতগুণ অধিক শ্রেয়স্কর মনে করি। ওরে বর্ব্বর, তুই আমাকে কি ভয় দেখাইতেছিস্?"

কলভেটি চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি হীন-বংশীয় ইতর নিগার! আমি বর্ব্বর! তুই আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই ভাবে আমার অপমান করিতে সাহস করিতেছিস্?"—সে ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া কাপ্তেন বয়েলের মুখে আর এক ঘুসি মারিল। তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তুই মনে করিয়াছিস্ কি শয়তান! আমি তোর দেহের প্রত্যেক অস্থি প্রথমে চূর্ণ করিব, তাহার পর তীক্ষ্ণ-ধার ছোরার ডগা আগুনে লাল করিয়া পোড়াইয়া তদ্দ্বারা তোর দেহের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব।"

মিঃ লক জানিতেন, কাপ্তেন বয়েল পাটানিয়ানদের বিপুল ধন-সম্পত্তি ও বহু মূল্যবান্ রত্নালঙ্কার অপহরণ করিয়া তাহাদের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন, সেই অপকর্ম্মের সমর্থন করিবার উপায় ছিল না ; কিন্তু তিনি যেরূপ নির্ভীকচিত্তে কলভেটির দুর্ব্ব্যবহার ও পীড়ন সহ্য করিয়া তেজস্বিতার পরিচয় দিতেছিলেন, শত অত্যাচারেও বীরের ন্যায় অকম্পিত-হৃদয়ে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহার এইরূপ হৃদয়-বলের তিনি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কাপ্তেনের চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, কলভেটির দৃষ্টির সম্মুখে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কুচিত হইলেন না।

কিন্তু কাপ্তেন বয়েলের কন্যার অবস্থা তখন কিরূপ? মিঃ লক সেই খিলানের অন্তরাল হইতে তরুণীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার হাত দুইখানি মাথার উপর তুলিয়া স্তম্ভের সহিত রজ্জুবদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহার সুন্দর মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ, যেন বিকসিত কমলিনী শুষ্ক। মিঃ লক ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ হইতে উঠিয়া আসিবার সময় তাহার যে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়াছিলেন, কি কঠোর পীড়নে তরুণীর কণ্ঠ হইতে সেই আর্ত্তধ্বনি নির্গত হইয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

কলভেটি এইবার সেই তরুণীর সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কোমল স্বরে কথা বলিলেও তাহা যে কপট শিষ্টাচার, ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ লক অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কলভেটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, কণ্ঠস্বরে মধুবর্ষণ করিয়া বলিল, "সিনোরিটা, তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হইব, তাহা ভাবিতেও আমার হৃৎকম্প হইতেছে ; সেই ব্যবহার তোমার অসহ্য হইবে ভাবিয়া আমি এখনই তোমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া রাখিতেছি। তোমার পিতা আমাদের রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পত্তি ও মহামূল্য হীরকরত্নাদি কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিতে অসম্মত, অধিক কি, সে যে আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইবে, এই প্রস্তাবেও তাহাকে সম্মত করাইতে পারিলাম না। এ জন্য তোমাকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। নারীর প্রতি পীড়ন আমি বীরের কার্য্য বলিয়া মনে করি না, কিন্তু আমাকে বাধ্য হইয়া ঐরূপ করিতে হইবে। ইহা লজ্জার কথা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?"

কলভেটি যুবতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে মিঃ লক সেই স্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন, যুবতীর হস্তদ্বয় একটি কপি-কলে আবদ্ধ ছিল, সেই কপি-কলটি ইচ্ছানুযায়ী আংটার সাহায্যে স্তম্ভের ঊর্দ্ধে তুলিয়া আততায়ীরা তাহার হাতের বাঁধন দৃঢ়রূপে আঁটিয়া দিতে পারিত। কলভেটি সেই কপি-কলের রজ্জু স্পর্শ করিল। তাহার চক্ষু পৈশাচিক আনন্দে উজ্জ্বল হইল।

কলভেটি কাপ্তেন বয়েলের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "কাপ্তেন, এখনও তোমার গুপ্তকথা প্রকাশ কর।"

কাপ্তেন বয়েল নির্ব্বাক্। তিনি অতিকষ্টে অশ্রু দমন করিয়া বিহ্বলনেত্রে একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর মুখ ফিরাইলেন। তাহা দেখিয়া কলভেটি কপি-কলের রজ্জুটি ঈষৎ বেগে আকর্ষণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীর হাত দুইখানি ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইল, এবং ফাঁসের দড়ি তাহার সুকোমল প্রকোষ্ঠদ্বয়ে সবেগে আঁটিয়া বসিল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে মিঃ লকের বক্ষঃস্থল যেন সুতীক্ষ্ণ শরে বিদীর্ণ হইল। তিনি আর আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া সেই খিলানের সম্মুখে বিদ্যুদ্বেগে

অগ্রসর হইলেন এবং কলভেটির মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করিলেন। তাঁহার হাতের পিস্তল মেঘমন্দ্র-স্বরে গর্জ্জন করিল এবং সেই ধ্বনিতে সুপ্রশস্ত মণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইল। পিস্তল-মুখ হইতে যে আলোকপ্রভা বিকীর্ণ হইল, তাহাতে তাঁহার চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য ধাঁধিয়া যাওয়ায় মিঃ লক সম্মুখের দৃশ্য দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু সেই শ্রবণভেদী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যুবতীর কণ্ঠ হইতে বিস্ময় ও হর্ষমিশ্রিত একটা শব্দ উদ্গত হইল এবং কলভেটি প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মিঃ লক কলভেটির মস্তক লক্ষ্য করিয়াই গুলীবর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার সময় তাঁহার হাত ঈষৎ কম্পিত হওয়ায় পিস্তলের গুলী কলভেটির মাথার এক চুল উপর দিয়া চলিয়া গেল এবং যুবতীর হাতের ঊর্দ্ধস্থিত কপি-কলের বন্ধন-রজ্জু দ্বিখণ্ডিত করিয়া অদূরবর্ত্তী পাষাণস্তম্ভে প্রতিহত হইল।

পিস্তলের ধূমরাশি অপসারিত হইলে মিঃ লক যুবতীর রজ্জুবদ্ধ হস্তদ্বয় তাহার বক্ষঃস্থলে সংস্থাপিত দেখিলেন; কলভেটি আতঙ্ক-বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার উভয় চক্ষু অক্ষিকোটর হইতে ভাঁটার মত ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল।

মিঃ লক তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার পিস্তল তুলিলেন; তাহা দেখিয়া কলভেটি প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া অদূরবর্ত্তী স্তম্ভের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "ভূত! ভূত! সেই গোয়েন্দাটা মরিয়া ভূত হইয়াছে; প্রতিহিংসার বশে আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে! আমাকে হত্যা না করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিবে না; কি উপায়ে ভূতের কবল হইতে রক্ষা পাইব?"

কলভেটি সেই মণ্ডপের দেওয়ালের নিকট পলায়ন করিল এবং একটি দ্বার খুলিয়া তাহার দেহরক্ষী সৈন্যগণকে আহ্বান করিল।

কলভেটির আর্ত্তনাদ শুনিয়া এক দল সৈন্য সেই দ্বার দিয়া সবেগে মণ্ডপে প্রবেশ করিল। তাহারা পূর্ব্বেই পিস্তলের গর্জ্জন শুনিতে পাইয়াছিল।

কলভেটি তাহাদিগকে দেখিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "ভূত, গোয়েন্দা লক মরিয়া ভূত হইয়া আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে, তাহার পিস্তলের গুলীতে আমি মরিয়াছিলাম আর কি; অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছি। তোমরা শীঘ্র গিয়া ভূতটাকে তাড়াইয়া দাও, ভূতের আক্রমণ হইতে আমাকে রক্ষা কর। যাও, আর বিলম্ব করিও না।"

কলভেটির আদেশে দশ পনের জন সৈনিক যুবক পূর্ব্বোক্ত খিলানের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা সকলেই সশস্ত্র।

মিঃ লক মনে করিলেন, তিনি পলায়ন না করিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই কলভেটির সৈন্যগণের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিবেন, যতক্ষণ তাঁহার হাতের অটোমেটিক পিস্তলে টোটা থাকিবে, ততক্ষণ শত্রুবধ করিবেন; কিন্তু তিনি সেই সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন, সে রিগো—যাহার অদ্ভুত চাতুর্য্যে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। রিগোর পশ্চাতে তিনি তাহার সহকর্ম্মী সৈনিকগণকে দেখিতে পাইলেন, তাহারা সকলেই রিগোর সহিত তাঁহার প্রাণরক্ষার ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিল।

মিঃ লক পিস্তল নামাইয়া খিলানের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

কলভেটির আদেশে রিগো সদলে সেই খিলানের নিকট অগ্রসর হইল। রিগো সকলের অগ্রে ছিল; সে মিঃ লককে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল।

রিগো তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ভূত মহাশয়, শীঘ্র অদৃশ্য হও; এই স্থান ত্যাগ কর।"—তাহার পর সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "সিনর, আপনি এখানে কেন আসিয়াছেন? শীঘ্র—এই মুহূর্ত্তে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করুন।"

রিগো মিঃ লকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তাহার হাতের সঙীন প্রসারিত করিল, তাহা দেখিয়া মিঃ লক পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িলেন। রিগোও মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার সঙ্গীরা তখন কিছু দূরে ছিল দেখিয়া মিঃ লককে মৃদুস্বরে বলিল, "সিনর, আপনি বন্দরে পলায়ন করুন, সেখানে আশ্রয় পাইবেন; আমার এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে আপনার জীবনরক্ষার আশা নাই। এই শেষবার আপনাকে সতর্ক করিলাম, সিনর।"—সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "চলিয়া যাও

ভূত! শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ কর। এখানে তোমার জারি-জুরি খাটিবে না।"

মিঃ লক তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তিনি রিগোকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি পলায়ন করিলে কাপ্তেন ও তাঁহার কন্যার কি দশা হইবে?"

রিগো অস্ফুটস্বরে বলিল, "সে কথা চিন্তা করিয়া লাভ নাই; কারণ, আপনি এখন এখানে তাহাদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবেন না। আপনি সম্মুখে অগ্রসর হইবামাত্র আমরা আপনাকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে বাধ্য হইব। সেনাপতির আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না। এখন আপনি পলায়ন করুন, পরে সুযোগ পাইলে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিব। সিনর, আর আপনি বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র প্রস্থান করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহাদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিব।"

মিঃ লক তাহাকে আরও কোন কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তিনি কয়েক জন সশস্ত্র সৈনিককে সেই খিলানের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার অপরিচিত। তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য যাহারা রিগোর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদের এক জনকেও তিনি সেই দলে দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে অপেক্ষা করিলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবে। সুতরাং পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করাই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন; প্রাণরক্ষা হইলে ভবিষ্যতে তিনি বন্দিযুগলের উদ্ধারের সুযোগ পাইবেন—ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ লক ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ হইতে যে পথে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথেই পলায়ন করিলেন। তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে তাঁহার অনুসরণকারী ফিরিয়া গিয়া তাহাদের সেনাপতি কলভেটিকে জানাইল, তাহারা ভূতটাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিবে না।

তাহাদের কথা শুনিয়া কলভেটি আশ্বস্ত হইল। সে ললাটের ঘর্ম্মধারা অপসারিত করিয়া ম্লানমুখে ব্যাকুলস্বরে বলিল, "সত্যই তোমরা তাহাকে তাড়াইতে পারিয়াছ? সে চলিয়া গিয়াছে? আর আমাকে হত্যা করিতে আসিবে না ত?"

রিগো আতঙ্কাভিভূত সেনাপতিকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "না, সেনাপতি! সে আর এখানে আসিবে না; সে কিল্লা হইতে প্রস্থান করিয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন।"

কলভেটি এই সংবাদে স্বস্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু তাহার হাত তখনও কাঁপিতে লাগিল। সে কম্পিতহস্তে দ্বারের হাতল ধরিয়া, কক্ষান্তরে প্রস্থানোদ্যত হইয়া রিগোকে বলিল, "ভূতটাকে তাড়াইয়া দিয়া খুব ভাল কায করিয়াছ। ইংলেজ জাতটাই শয়তানের জাত, তাহারা ভেল্কির সাহায্যে অনেক অস্বাভাবিক কায করিতে পারে। হাঁ, তাহারা শয়তান, যেখানে যত ইংলেজ আছে—সব বেটা শয়তান। কোন কায তাহাদের অসাধ্য নহে। আজ ইংলেজ-ভূতের হাতে মরিয়াছিলাম আর কি! গোয়েন্দাটাকে গুলী মারিয়া সাবাড় করিলাম, সে ভূত হইয়া উৎপাত করিতে আসিল? ভূতের প্রতিহিংসা কি ভয়ানক!"

কলভেটি বিভিন্ন কক্ষ অতিক্রম করিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। তাহার পর কাফেতে প্রবেশ করিয়া দেহ ও মন প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সুরাপান আরম্ভ করিল। কয়েক গ্লাস মদ্যপানের পর তাহার দেহের জড়তা দূর হইল এবং আতঙ্ক পরিহার করিতে সমর্থ হইল। তখন সে মনে মনে 'ইংলেজ ভূতের' আকস্মিক আবির্ভাবের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু ভূতটা ছায়াদেহে না আসিয়া রক্তমাংসের দেহ লইয়া কিরূপে তাহার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং পিস্তল লইয়া কিরূপে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। ভূত কি ধাতুময় পিস্তল ব্যবহার করিতে পারে? ভূতের হাতের পিস্তলের গুলী তাহার মাথার চুলের ডগা ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছিল—তাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ভূত পিস্তলটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না।

মিঃ লক নির্ব্বিঘ্নে বন্দরে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেখানে আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আমেরিকান জাহাজ কালিম্পোতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য লাফাইয়া পড়িলেন। বন্দর হইতে কিছুদূরে কালিম্পো জাহাজ জল-গর্ভে নঙ্গর করিয়াছিল, তাহার তিনি ডেকের আলোক দেখিতে পাইলেন এবং সাঁতার দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন।

মিঃ লক সন্তরণে সুদক্ষ ছিলেন, এ জন্য তাঁহার আশা

হইল, তিনি সাঁতার দিয়া অল্প সময়েই কালিম্পোর কিনারায় উপস্থিত হইতে পারিবেন। কিন্তু সেই স্থানে জলের স্রোত কিরূপ প্রখর, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি দীর্ঘকাল সন্তরণের পরও জাহাজের নিকট অগ্রসর হইতে না পারায় বিস্মিত হইলেন।

মিঃ লক দীর্ঘকালের সন্তরণে ক্লান্ত হইলেন, কিন্তু জাহাজ যেখানে ছিল, সেই স্থানেই রহিল। তাহার নিকট অগ্রসর হইতে না পারায় তাঁহার মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। তিনি মাথা ফিরাইয়া অদূরবর্ত্তী দুর্গশিখর নৈশাকাশে ছায়াচিত্রের ন্যায় প্রতিফলিত দেখিলেন। তাহা এক ইঞ্চিও দূরে সরিয়া গেল না।

মিঃ লক অধিকতর বেগে সাঁতার কাটিতে কাটিতে বলিলেন, "এ কি হইল? প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, তথাপি অগ্রসর হইতে পারিতেছি না কেন?"

তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—সমুদ্রের তটরেখা দূরে সরিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জাহাজের দিকে তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই! মিঃ লক সন্তরণে বিরত হইয়া জলের ভিতর সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্রোতের বেগে কোন্ দিকে নীত হইতেছিলেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন।

এবার তিনি বুঝিতে পারিলেন, সমুদ্রের স্রোতে তিনি তটভূমির সমান্তরালভাবে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। সেই স্রোতের বেগ প্রতিহত করিয়া জাহাজের নিকট উপস্থিত হওয়া তাঁহার অসাধ্য, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সে দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। তাঁহাকে মুক্ত সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে হইবে। তিনি আত্মরক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

[ক্রমশঃ।

নেন্দ্রকুমার রায়।

খেয়া-ঘাটে

ওরে ও খেয়ার নেয়ে,
সন্ধ্যা ঘনায় নদী-কিনারায় তোর পানে চেয়ে চেয়ে।
হাজার হাজার কতই মানুষ নিত্য করিস্ পার,
কে যায় কে আসে মুখপানে চেয়ে দেখিস্ না একবার।
কোন্ কাজে কেবা চলেছে ওপারে, কি ভাবনা কার মনে,
কে হারাল নিধি, কে বা তরে নদী তাহারি অন্বেষণে।
কেউ কাঁদে, কেউ হাসিঢেউ তুলে কেউ ধরে নায়ে গান,
পশে না ও কাণে, শুধুই শুনিস্ তটিনীর কলতান!
আমির-ফকির হুজুর-মজুর তরিস্ নিত্য নায়,
শিবিকাসমেত কত নববধূ, দৃক্‌পাত নাহি তায়।
চিরদিন তরে কেহ বা চলেছে, তোর তাতে কি রে নেয়ে?
খেয়া-ঘাটে কারা হায় হায় করে দেখিস্ না তা ত চেয়ে।

ওরে ও নির্ব্বিকার,
তোরই মত হায় হবে বুঝি ভব-নদীর কর্ণধার।
তাঁরই সব ধারা ধর্ম্ম ধরণ তুই পেয়েছিস্ ভাই,
তাঁরি কথা স্মরি এই দিনশেষে তোর পানে যত চাই।
সমুখের নদী হারায় অবধি বারিধির রূপ ধ'রে।
ওপারের রেখা যায় নাক দেখা কুহেলিতে যায় ভ'রে।
নাচে মহাকাল উর্ম্মিকরাল গরজি আত্মহারা,
নিখিল গগন আঁধারে মগন একটিও নাই তারা।
একটি তরণী জাগে তার পরে, অরুণ কেতন ওড়ে,
ক্ষণে দেখা যায়, উর্ম্মিশৈলে ক্ষণে যায় ঢাকা প'ড়ে।
ভয়ে ভাবনায় চিত্ত আমার কাঁপে যেন প্রজাপতি,
এক সান্ত্বনা, মিথ্যা ভাবনা সকলেরই এক গতি।

শ্রীকালিদাস রায়

বাল্য-প্রণয়

১

গোড়ার কথাটুকু সংক্ষেপে না বলিলে নয়! সে কথায় বিশেষ বৈচিত্র্য নাই, শতকরা নব্বুইটা গল্পে-উপন্যাসে তেমন রোমান্সের ভিয়ান্ আমরা নিত্য দেখিতেছি, হয়তো সেগুলা হইতেই এটুকু ধার করা! তবু আমরা জানি, ঘটনা সত্য; কাজেই সে-কথা বলায় দ্বিধার কোনো কারণ দেখি না।

অর্থাৎ তারাকুমারের সহিত শ্রীমতী হেমনলিনীর গভীর প্রণয় জন্মিয়াছিল। এ প্রণয়ের মুখপাতে তারাকুমারের বয়স ছিল বারো, এবং হেমনলিনীর সাত। কি করিয়া এ প্রণয় ঘটিল, এবং কি ধারায় বাড়িয়া উঠিল, তার ইতিহাস বলা প্রয়োজন। নচেৎ এ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের হয়তো সন্দেহ জন্মিতে পারে!

হেমনলিনীর বাপ মহেন্দ্র বাবু ডেপুটী। বারাশতে থাকিতে হেমনলিনীর মা মারা যান; হেমনলিনী তখন চার বছরের মেয়ে। শোকটা সহিয়া আসিবার পূর্ব্বেই মহেন্দ্র বাবুর বদলির হুকুম আসে, একদম বরিশালে। হেমনলিনীর দিদিমা অর্থাৎ মহেন্দ্র বাবুর শাশুড়ী শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী চোখের জল মুছিয়া জামাইকে জানাইলেন, তার এই ছোট্ট স্মৃতিটুকু! এটুকুকে অত দূরে রাখিয়া তিনি বাঁচিতে পারিবেন না! তা ছাড়া নূতন ঠাঁই, মহেন্দ্র বাবু একা—একরত্তি মেয়ের ঝামেলা সহা তাঁর পোষাইবে না। মহেন্দ্র বাবু সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, বরিশাল নূতন জায়গা—তার জিয়োগ্রাফি তাঁর অজ্ঞাত। এ ক্ষেত্রে···

কাজেই হেমনলিনী দিদিমার সঙ্গে কলিকাতায় আসিল, এবং মহেন্দ্র বাবু বরিশালে চলিয়া গেলেন।

বিধবা রাজলক্ষ্মীর একটি মাত্র পুত্র বেঙ্গল পুলিশে চাকুরি লইয়া জলপাইগুড়ির ওদিকে সস্ত্রীক বাস করিতেছিল। মস্ত বাড়ী খালি পড়িয়া থাকে, তাই নীচের তলাটা তিনি ভাড়া দিয়াছেন। এ অংশে ভাড়াটিয়া ছিলেন তারাকুমারের পিতা। হেমনলিনীর বয়স যখন পাঁচ বছর—তারাকুমাররা তখন এই বাড়ীর নীচের তলায় বাস করিতে আসে।

তারাকুমার বাপ-মায়ের কোলের ছেলে। তার আদর ও আব্দারের মাত্রা ছিল একটু বেশী। তাই তার অনেক খেলনা—লুডো, পিংপং, রেশগেম, ব্লো-ফুটবল; শিশুপাঠ্য গল্পের বইও অসংখ্য। অর্থাৎ সে যখন যা চাহিত, বাপ-মা তখনই তা কিনিয়া দিতেন। এ-ক্ষেত্রে হেমনলিনী যে তার খেলার সহচরী হইয়া উঠিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই!

এখন প্রণয়-সূচনার কথা বলি। তারাকুমার ছাদে ঘুঁড়ি উড়াইত, হেম ধরাই দিত। তারাকুমার সূতায় মাঞ্জা দিত, হেমনলিনী ফাই-ফরমাশ খাটিয়া যতটুকু সাধ্য তারাকুমারের সাহায্য করিত। তারাকুমারের বড় দাদা ছিল হালের সাহিত্যিক। রোমান্সগল্প লিখিয়া বিশিষ্ট সমাজে সে নাম কিনিয়াছে। তার রচিত কল্পলোকের নর-নারী অতি-সাধারণ কাজ-কর্ম্মে পরস্পরের এমন অন্তরঙ্গ হইত যে, তাদের কাহিনী পড়িয়া নিরীহ পাঠক-পাঠিকার বুক নিশ্বাসের বোঝায় ভরিয়া উঠিত। এবং আচার-চুরি, ঘুঁড়ি ওড়ানো, নালার জলে কঞ্চির ছিপ ফেলিয়া বসিয়া থাকার মধ্যে বালক-বালিকা বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করিত···

কিন্তু এ সাহিত্যালোচনার প্রয়োজন নাই। বড়দার লেখা গল্প তারাকুমার ছাদের কোণে বসিয়া গোপনে পড়িত, এবং তার কিশোর-চিত্ত সে-সব লেখা পড়িয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া মায়ালোকে ধাবিত হইত। সে লোকে হোম-টাস্ক নাই, বকুনি নাই, দায়িত্ব নাই···কিছু না—শুধু স্বপ্ন, শুধু আনন্দ আর আরাম!

সেদিন ছাদের কোণে বসিয়া সে বড়দার লেখা "বুক-সাহারা" গল্প পড়িতেছিল। ঘুঁড়ি-লাটাই পড়িয়া আছে, হেমনলিনীর দুধ খাওয়া হয় নাই—দুধ গরম হইতেছে, জুড়াইলে দুধ খাইয়া সে ছাদে আসিবে,—মল্লিকদের ড্রাইভারের ছেলে ইশমাইলকে নগদ এক টাকা দিয়া তারাকুমার আজ সূতায় লক্ষ্ণৌ মাঞ্জা দিয়াছে, সন্তোষের ঘুঁড়ির সহিত কষিয়া প্যাঁচ লড়িবে! হেমনলিনী আসিলেই হয়, ততক্ষণে এই গল্পটা···

'বুক-সাহারার' নায়িকা লালিমা তখন উদাস মনে পুকুরের চাতালে বসিয়াছিল। নায়ক পল্লব ও-পারে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া লালিমার পানে নির্নিমেষ

নেত্রে চাহিয়া আছে—তার সাহারা-বুকের আশে-পাশে ওয়েসিসের শ্যামল তৃণ-কিশলয় গজাইয়া উঠিতেছে···

ঠিক এমনি সময়ে ছাদে আসিয়া হেম ডাকিল,—তারুদা···

চমকিয়া তারাকুমার চাহিয়া দেখে, ওদিককার বড় কদম গাছের আড়াল হইতে অস্ত-সূর্য্যের কয়েকটা রক্ত-রশ্মি হেমের মুখে পড়িয়া কি শ্রীই ফুটাইয়াছে। তারাকুমারের মনে হইল, ও হেম নয়, লালিমা! এই 'বুক-সাহারা'র লালিমা! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তারাকুমার হেমের পানে চাহিয়া রহিল।

হেম কাছে আসিল, কহিল,—এই নাও কচুরি—দিদিমা তৈরী করেচে।···

হাত বাড়াইয়া হেম কচুরি লইল। তারাকুমারের কিন্তু কচুরিতে আজ লোভ নাই। এই রোমান্সের আব-হাওয়ায় দুনিয়ার যত কিছু পদার্থ আজ তার অতি তুচ্ছ মনে হইতে ছিল! বিহ্বল দৃষ্টিতে সে হেমের পানে চাহিয়া ডাকিল,—এসো

হেম কাছে আসিল,—তারাকুমার হেমকে পাশে বসাইল।

হেম কহিল,- তোমার কচুরি, তারুদা।

মৃদু হাসিয়া তারাকুমার কচুরি লইল, লইয়া হেমকে কহিল,—তুমি খাও···

হেম অবাক! তারাকুমার কহিল,—তুমি খেলেই আমার খাওয়া হবে।

এমন কথা হেম তার জীবনে শুনে নাই। সে-বিস্ময় বোধ করিল। এবং এমনি বিস্ময়-বিমূঢ়তার মধ্যে তারা-কুমার কচুরির একাংশ ভাঙ্গিয়া হেমের মুখে গুঁজিয়া দিল, দিয়া কহিল,—তুমি খাও হেম···

তার স্বর স্খলিত, কম্পিত! মুখে কচুরির পরশ লাগিতে হেমের বিস্ময় কাটিল। সে কহিল,—বা রে, আমি খেয়েচি। এ কচুরি তোমার যে···হেম হাসিয়া উঠিল।

তারাকুমার কহিল,—আমার! আচ্ছা, এবার খাই··· তারাকুমার কচুরি মুখে দিল।

অতনু এমনি করিয়া কিশোর তারাকুমারের মাথাটি চর্ব্বণ করিল।

তার পর হইতে হেমের জন্য লজেঞ্জেস-সংগ্রহ, পুতুল কেনা, মামুলি ধরণে গাছ হইতে পেয়ারা পাড়িয়া দেওয়া—অর্থাৎ খিদ্‌মত খাটার তার অন্ত রহিল না!

এবং আরো দু'বছর পরে সহসা সে কবিতা লেখা ধরিল। বাণী দেবী কেন যে কৌতুক করিয়া তার হাতে মরালের পুচ্ছটি তুলিয়া দিলেন, তিনি জানেন! তারা-কুমারের ভাবের অভাব ঘটিল না। মাসিকপত্রের কল্যাণে 'তোমার তরে নিশি জাগিয়া কাটে' 'তোমায় দেখেচি কি চোখে সজনি,' 'তুমি লো আমার নয়ন-তারা' প্রভৃতি মাসিকে-প্রকাশিত প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি ভাঙ্গিয়া জুড়িয়া তারাকুমার কবিতা লিখিতে সুরু করিল। ভালো বাঁধানো খাতায় কবিতাগুলি টুকিয়া সে লুকাইয়া রাখে; চুপি চুপি হেমকে ছাদে ডাকিয়া লইয়া গিয়া সে-কবিতা পড়িয়া তাকে শুনায়।

সে-দিন সে পাঁচটা কবিতা লিখিয়াছিল। তারি একটা হেমকে শুনাইতে বসিল,—

হেমনলিনী হেমনলিনী
একটি কথা আজো বলি নি।
আজ যদি তা বলতে আসি,
মুখে তোমার ফুটবে হাসি?
তুমি ভাবী লক্ষ্মী মেয়ে,
কেউ ভালো নয় তোমার চেয়ে।
দেখতে যেমন ফর্শা, মরি,
বুদ্ধি তেমন চমৎকারই!
ভালোবাসি খুব তোমারে,
পদ্য লিখি তোমার তরে।

কবিতা পড়িয়া হেম ভারী খুশী হইল। তার নামে পদ্য! হেমনলিনী! বাঃ! এই পদ্য, তার উপর খুব ভালো জলছবি তারুদা তাকে দিয়াছে, বড় বড় ঘোড়সওয়ার—খাশা ছবি! কাজেই তারাকুমার যখন কবিতা-পাঠান্তে প্রশ্ন করিল,—ভালো লাগলো?

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ঘাড় নাড়িয়া হেম কহিল,—খুব···

তার পর ছোট-খাট ঘটনার মধ্যে এইটুকু উল্লেখযোগ্য যে, তারাকুমারের পিতার কঠিন শাসন সত্ত্বেও তারাকুমার এগ্‌জামিনে পাঁচ জনের নীচে দাঁড়াইল। এ পর্য্যন্ত সে ফার্ষ্ট হইত। বাপ চোখ রাঙাইলেন, ঘুঁড়ি, লাটাই,—সব আব্দার বন্ধ···

তারাকুমার প্রমাদ গণিল। ওগুলা বন্ধ হইলে কিসের জোরে হেমনলিনীর মনটুকুকে আয়ত্ত রাখিবে! কাজেই

কবিতার সঙ্গে ক্লাসের পড়ার দিকে ঝোঁক রাখিতে হইল এবং অদৃষ্টগুণে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সে একটা স্কলারশিপও পাইল।

কলেজে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমের উপহারে বৈচিত্র্য ঘটিল। নব-প্রকাশিত কাব্য-উপন্যাস তারাকুমার মাঝে মাঝে কিনিয়া আনে; তার উপর সে নিজে গল্প লেখা ধরিয়াছে, উপন্যাসও বাদ দেয় নাই। এবং তার লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস হালের বহু মাসিকপত্রে ছাপিয়া বাহির হয়।

সাহিত্য-সেবার অন্তরালে ভাগ্যে পিতার কঠিন মনোযোগ ছিল, তাই এক দিন বি, এ পাশ করিয়া তারাকুমার গিয়া পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে ভর্তি হইল। তার বয়স তখন একুশ বছর; এবং হেমের বয়স ষোল।

২

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, বাল্য-প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে। সত্য না হইলে বঙ্কিমচন্দ্র ছাপার অক্ষরে এ-কথা কখনই লিখিয়া যাইতেন না!

মহাপুরুষের বাণী—একালের ছেলে বলিয়া তারাকুমার বঙ্কিমচন্দ্রকে না মানিলেও এ-বাণীর মর্ম্মান্তিক বেদনা হাড়ে হাড়ে বুঝিল।

শ্রাবণ মাস। দুপুর বেলা। রবিবার। সারা আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। খোলা জানালার ধারে বসিয়া তারাকুমার কাগজে এক গল্পের প্লট ফাঁদিয়া বসিয়াছিল।

হেম আসিয়া ডাকিল,—তারুদা···

তারাকুমার চমকিয়া উঠিল। তার গল্পের নায়িকা সারিকা তখন কলমের মুখ হইতে সবে মাত্র বাহির হইয়া নায়ককে ডাকিতেছে,—তৃপ্তিদা···

তারাকুমার মুখ তুলিয়া চাহিল,—হেম সাজিয়া আসিয়াছে। সাজিলেও মুখখানি বিষাদে মলিন—ঠিক ঐ বাহিরের আকাশের মত!

তারাকুমার কহিল,—কি বলচো হেম?

হেম কহিল,—আমি এখান থেকে এখনি চলে যাচ্ছি।

বাহিরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সত্যই মেঘের ডাক? না, তারাকুমারের বুকের আর্ত্ত ক্রন্দন? বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া তারাকুমার কহিল,—কোথায় যাচ্ছো? নেমন্তন্ন?

হেম কহিল,—না।···বাবা ঢাকায় বদলি হয়েচে। এই মাত্র এসেচে। বসবার সময় নেই। বাবার সঙ্গে যেতে হবে। আমার এক কাকা আছেন—বেলেঘাটায় থাকেন। এখন তাঁর ওখানে চলেছি। তার পর সেখান থেকে ঢাকা।

—কবে ফিরবে?

—এখন আর বোধ হয় ফেরা হবে না। বড় হয়েচি। বাবা বলছিল, বিয়ে দিতে হবে। তার উপর মামা বাবুর অসুখ—দিদিমাও এই সঙ্গে জলপাইগুড়ি চলেছে। বাড়ী চাবি-বন্ধ থাকবে।

কালো মেঘের বুক চিরিয়া আগুনের শিখা ছুটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ···বুঝি পৃথিবীখানা ফাঁশিয়া চুরমার হ'ল!

তারাকুমারের মুখে কথা ফুটিল না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হেম কহিল,—দিদিমা কাঁদচে। কিন্তু ধরে রাখতে পারে না তো! তাই বিদায় নিতে এলুম···যে-সব কাগজে তোমার লেখা ছাপা হয়, আমায় সেগুলোর গ্রাহক করে দিয়ো। এই নাও টাকা···

ভাঁজ-করা একখানা দশ টাকার নোট সে তারাকুমারের সামনে ফেলিয়া দিল। তারাকুমার সে নোট স্পর্শ করিল না।

হেম কহিল,—তোমার এ কাগজগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি।···চিঠি দিয়ো। হেমের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

তারাকুমারের চোখের সামনে জাগ্রত জীবন্ত জগৎ পাষাণে পরিণত হইতেছিল!

হেম কহিল,—সময় নেই। আসি···

তারাকুমারের মনে হইল, তার জীবনটাই চলিয়া যাইতেছে! সে ক্ষেপিয়া উঠিল, দাঁড়াইয়া হেমের হাত ধরিয়া ডাকিল—হেম···

ছোট্ট কথা! সে কথায় সারা মন যেন দেহের খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসে! কিন্তু সময় নাই! প্রাণের গোপন কথা এখনি বলা চাই! নহিলে···

খুব বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তারাকুমার কহিল,—কিন্তু আমরা যে কত স্বপ্ন দেখতুম হেম! আমাদের এ নীরব ভালোবাসা···

হেম কহিল,—আমিও তোমায় ভালোবাসি, তারুদা··

তারাকুমারের চোখের কোণে জলের দুটি বড় ফোঁটা। তারাকুমার কহিল,—দু'জনের জীবন অশ্রুর সাগরেই ভাসবে, হেম! তুমি পরের হবে! তোমার বাবাকে বলো···

হেম কহিল,—এখনি বলা চলে না। তবে গিয়ে বলবো। তুমি তা বলে লেখা বন্ধ করো না! কাগজে ছাপিয়ো। যেখানে থাকি, পড়বো। আর···আর···তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো।···বৈরাগ্য নয়!···এক দিন দেখা হবেই। ফিরে আমি আসবো···

এক সঙ্গে এতগুলা কথা বলিয়া হেম শ্রান্ত হইয়া পড়িল!

তারাকুমার কহিল,—নিশ্চয় করবো। সারা জীবন যদি আমার অধীর প্রতীক্ষায় কাটে, তবু···তবু···

দোতলা হইতে দিদিমা ডাকিলেন,—হেম···

হেম কহিল,—দিদিমা ডাকচে। আসি।···বিদায় দাও···

অশ্রুর বাষ্পে দুনিয়া আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সে বাষ্পে তারাকুমারের অস্তিত্ব বুঝি ঢাকিয়া যায়!

বাষ্পার্দ্র স্বরে তারাকুমার কহিল,—বিদায়! কিন্তু একটা কিছু দিয়ে যাও হেম, যা আমার প্রতীক্ষার পথে সম্বল হবে! পাথেয়··

কথাগুলা সে মাসিক পত্রে পড়িয়াছে, প্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী চরণচাঁদ বিশ্বাসের লেখা গল্পে!···গল্পের শেষাংশটুকু তার মনে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া উঠিল···হেমের অধর-পাত্র হইতে অমৃত পাইবার লোভে তারাকুমারের উদ্যত অধর···

হেম কিন্তু বুঝিল না। তার মনে জাগিতেছিল, আর একটা গল্পের কথা—মথুর বক্সীর লেখা "চৈতী বিদায়"। সে গল্পের নায়িকার মত তাড়াতাড়ি খোঁপা হইতে একটা কাটা খুলিয়া সে তারাকুমারের হাতে দিল, কহিল,—রাখো। ছোট্ট স্মৃতি···এই মাথার কাঁটা···

—কাটার যাতনা দিয়ে গেলে, হেম!

—এ কাটার যাতনা তোমার একার নয়, তারুদা··· এ-যাতনা আমাকেও পেতে হবে!

বাহিরে দিদিমা আবার ডাকিল—ও হেম··

হেম দুলিল, তার পর নড়িল···তারাকুমার তার হাত ছাড়িতে চায় না! জানলার ওধারে একটু খোলা জায়গা। সে জায়গায় একটা পেয়ারা গাছ। গাছের ডালে একটা শালিক—আসন্ন বর্ষণের আশঙ্কায় চুপ-চাপ বসিয়া আছে।

হেম কহিল,—যদি বাঁচি, তোমার কাছে আসবো, তোমার হৃদয়-ভাগিনী হয়ে···আর যদি বাবার মত না হয়, মরবো। মরে ঐ···ঐ পাখী হয়ে তোমার জানলায় এসে বসবো, তারুদা···সত্যি!

হেমের ঠোঁট কাঁপিল, চোখের কোণে জল ঠেলিয়া আসিল।

তারাকুমারের শরীর স্পন্দনহীন—সে চোখ বুজিল। হাত হইতে হেমের হাত খসিয়া সরিয়া গেল। সে···

তার পর চোখ মেলিয়া তারাকুমার দেখে, হেম নাই—চলিয়া গিয়াছে! ছুটিয়া সে বাহিরে আসিল।

ট্যাক্সি চলিয়া গিয়াছে। হেমের দিদিমা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিয়া ভৃত্যকে বলিতেছেন,—ঘর-দোর বন্ধ কর্। করে আমায় দাশুর ওখানে নিয়ে চ। ঐখান থেকে ষ্টেশনে যাবো।

তারাকুমার পথে আসিয়া দাঁড়াইল। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আকাশ ছিঁড়িয়া মত্ত ঐরাবতের শুঁড় ফাঁপাইয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল, সঙ্গে সঙ্গে অশনির কি তীব্র হুঙ্কার!

ঘরে ঢুকিয়া তারাকুমার জানালার ধারে বসিল। জলের ঝাটে সারা অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে, সেদিকে তার খেয়াল নাই! তার মনে হইতেছিল, এত বড় কঠিন আঘাত··· এ-আঘাত বিশ্বের গায়েও বাজিয়াছে! তাই সহিতে না পারিয়া আকাশ ঐ মরণ-রোল তুলিয়াছে!

সারা রাত ধরিয়া প্রকৃতির এই মত্ত মাতন চলিল। তারাকুমারের আহার নাই, নিদ্রা নাই! কিসের জন্যই বা! প্রাণ? তার প্রাণ কি আর আছে!···

তবু প্রকৃতির বিধান···জানলায় মাথা রাখিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল···

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, আকাশ পরিষ্কার—সদ্যস্নাত প্রকৃতির শান্ত ভাব! তারাকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতে গিয়া দেখে, তারি একটু দূরে ঝঞ্ঝাহত ছোট একটা পাখী মেঝেয় লুটাইয়া আছে···

সে চমকিয়া উঠিল—এ যে একটা শালিক পাখী! শালিকই! নিমেষে হেমের কথা মনে জাগিল—যদি মরি, ঐ পাখী হইয়া···

তাই, তাই···তবে তাই?···

সযত্নে পাখীটিকে সে বুকে তুলিয়া ধরিল। এখনো ছোট্ট প্রাণটুকু, এই যে বুকে স্পন্দন…

সে পাখীর পরিচর্য্যায় মাতিল—গরম ফ্লানেলে সেঁক দিল—ঠোঁটে দুধ ঢালিয়া দিল…

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শালিক ডানা নাড়িল। আঃ, বাঁচিয়াছে! বাঁচিয়াছে!

বাজার হইতে ভালো খাঁচা আনাইয়া শালিককে খাঁচায় পুরিয়া সেই খাঁচা বুকে চাপিয়া তারাকুমার উচ্ছ্বসিত মৃদু স্বরে ডাকিল,—হেম…হেম…

বাহিরের স্নিগ্ধ বাতাস দেহে আরামের পরশ বুলাইতেছিল।…

তিন দিন পরে সকালে খবরের কাগজ খুলিয়া তারাকুমার দেখে—এ কি…

সে-রাত্রের ভীষণ ঝড়ে পদ্মার বুকে জাহাজ ডুবিয়াছে। জাহাজে বহু যাত্রী ছিল,—ইংরাজ, বাঙালী, ভাটিয়া। কে বাঁচিল, কে মরিল, এখনও তালিকা মিলে নাই!

তারাকুমার শিহরিয়া উঠিল; খাঁচার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পাকা কলা খাইয়া শালিক তখন কিচির-মিচির শব্দে মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছে! তারাকুমার ডাকিল—হেম…

পাখী জবাব দিল না।

তারাকুমার আবার ডাকিল,—হেম…শুনচো?

শালিক শুনিল না।

তারাকুমার কহিল,—তোমাকে নিয়েই আমি থাকবো হেম। কবিতা লিখে তোমায় শোনাবো, গল্প লিখে শোনাবো। তুমি শুধু আমার পানে চেয়ে থেকো। কথা তো কইবে না, তবু তোমার ঐ চোখের দৃষ্টি…সে আমার পরম সম্পদ!

শালিক কি বুঝিল, সেই জানে। খাঁচার কাঠিতে ঠোঁট ঘষিয়া সে তারাকুমারের পানে ফিরিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল।

তারাকুমার খাঁচার কাঠিতে অধর রাখিয়া চুম্বন করিল,—সেই বিদায়-ক্ষণের অধীর আবেগ! তারাকুমার কহিল,—বিদায়-বেলার সে চুমা নাও, নাও হেম…

শালিক তখনো খাঁচার গায়ে ঠোঁট ঘষিতেছিল!

৩

পাঁচ বছর কাটিয়া গিয়াছে। তারাকুমার হেমের কথা রক্ষা করিয়াছে,—গল্প ও কবিতা মাসিকে নিয়মিত ছাপাইতেছে; —বিবাহ করে নাই—হেমের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে। বাড়ীতে টিঁকিতে পারে নাই, বিবাহের জন্য নব-নব পাত্রী আনিয়া নিত্য জ্বালাতন! পাশ করিয়া তাই কুষ্টিয়ার স্কুলে হেড মাষ্টারী করিতেছে।

মিষ্টার রায় আসিয়াছিলেন, কন্যার পাণিদান করিতে, পিছনে ছিল মস্ত প্রলোভন, বিলাত-পাঠানোর প্রস্তাব,—তারাকুমার ঐ শালিক পাখীর পানে চাহিয়া সে লোভ দমন করিয়াছে। তবু জ্বালা! অনুরোধ, মিনতির অশ্রু, শেষে তীব্র রোষ-বহ্নি!

সকলের উপর বিরক্ত হইয়া সে এই মাষ্টারী চাকুরি লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে! বাঁচিয়াছে। সারা দুপুর ছেলে পড়াইয়া সে তার এই নিভৃত কুটীরটিতে ফিরিয়া আসে। কবিতা লেখে, গল্প লেখে—এ সব লেখা হেম দেখিবে না, তবু লেখে। হেম বলিয়া গিয়াছিল, শেষ কথা—সেই বিদায়-বেলায়—লেখা ছাড়িয়ো না—মাসিকে লেখা ছাপাইয়ো। যেখানে আমি থাকি, সে-লেখা পড়িব! লিখিয়া সে-লেখা তারাকুমার শালিককে শুনায়। শালিক কখনো গভীর মনোযোগে তার পানে চাহিয়া নিস্পন্দ বসিয়া থাকে, কখনো বা অধীর চাঞ্চল্যে খাঁচার মধ্যে ডানা ঝটপটিয়া মরে!

তার জীবনের এ করুণ কাহিনী কেহ জানে না! নিভৃতে থাকে, গৃহকোটরের মায়ায় আচ্ছন্ন! ছেলেরা বলে, হেড মাষ্টার মশায় কৃপণ! বন্ধুর দল বলে, পাগল! যারা এ দলের বাহিরে, তারা বলে, Cynic, misanthrope…অহঙ্কারে কারো সঙ্গে মিশতে চায় না!

কথাগুলা তারাকুমারের কাণে যায়। সে শালিকের কাছে মৃদু স্বরে বলে,—শুনচো হেম, লোকে কি বলে তোমার জন্য…

তাই দুই চোখ ছলছলিয়া আসে। শালিকটির পানে চাহিয়া সে গুম্‌ হইয়া থাকে। শালিকের নামই দিয়াছে, হেম!

শালিকের যত্নের সীমা নাই। কাঠির খাঁচা আজ রূপার খাঁচার রূপ ধরিয়াছে। রৌপ্য পাত্রে ভোজ্য, রৌপ্য পেয়ালায় পানীয়…শালিকের কণ্ঠে সোনার একটু সরু হার!

রবিবার। দুপুরবেলায় খাটে বসিয়া সে 'আত্ম-জীবনী' লিখিতেছিল। সামনে খাটের ছৎরীতে ঝুলানো শালিকের খাঁচা। সহসা হো-হো হাসির সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল, অবনী।

অবনী তার বাল্য-সুহৃদ; বি, এ পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পড়িয়াছিল। কবিতার সে ধার ধারিত না। লেখাপড়া আর খেলা-ধূলা লইয়া থাকিত। এখন ডেপুটি।

সহসা অবনীকে সম্মুখে দেখিয়া তারাকুমার চমকিয়া খাতা বন্ধ করিল।

অবনী কহিল,—কিসের segregation হে! এ যে, রীতিমত interned কয়েদীর মত বাস করচো! স্বেচ্ছায় এ কারা-বরণের অর্থ?

তারাকুমার কহিল,—এমনি! লেখাপড়া নিয়ে থাকি···

অবনী কহিল,—তপস্যা!···কিন্তু তোমার ঢের বেশী শক্তি ছিল যে! এই ছেলে-পড়ানোতেই সে শক্তি নিঃশেষ করচো!

তারাকুমার কহিল,—কাজটা মন্দ?

—তা নয়। তবে অপর হস্তে এ কাজের ভার ন্যস্ত থাকলে ছেলেদের কোনো ক্ষতি হতো না! এবং এমন কুণো স্বভাব নিয়ে ছেলেদের মানে বলে দেওয়ার উপর আর কোনো বিশেষ উপকারও তো করতে পারচো না! না নিজের—না দেশের! এতে ফল?

তারাকুমার কোনো জবাব দিল না।

অবনী কহিল,—তোমাদের বাড়ীতে গেছলুম, কুষ্টিয়ায় বদলি হয়ে আসবার মুখে। আজ দু'দিন এখানে এসেচি। স্কুলের বেয়ারাকে ধরে এখানে উপস্থিত হয়েচি। এসেচি সপরিবারে। দারুণ সমারোহ। কেউ ছাড়লো না—বলে, বড় নদীর ধারে কুষ্টিয়া,—ভারী চমৎকার দৃশ্য···

অবনী হাসিল। পরক্ষণে খাঁচার পানে নজর পড়িল। খাঁচাটা পাড়িয়া অবনী কহিল,—বা রে! ওহো! একটি শালিক পাখী! বুড়ো শালিক! এ তো মজার খেয়াল! শালিক পুষেচো! peculiar বটে! তাকে রূপার খাঁচায় রেখেচো! এর ফটো নিয়ে বিলাতী ম্যাগাজিনে পাঠালে নগদ এক গিনি রোজগার হয় যে!···এঁ্যা।

শালিক ঘুমাইতেছিল। এই সময়টায় তার কেমন ঝিম্ আসে! আজো তাই আসিয়াছে! এবং অভ্যাস-মত সে ঘুমাইতেছিল। অবনীর টানাটানিতে জাগিয়া উঠিল···ভয় পাইয়া!

তারাকুমার পাখীর এ-ভাব লক্ষ্য করিল। তার প্রাণে বেদনা বোধ হইল। সে কহিল,—খাঁচা রাখো। বেচারী ঘুমিয়েছিল···

খাঁচা হাতে লইয়া তারাকুমার সেটি যথাস্থানে রক্ষা করিল।

অবনী কহিল,—Mrs কোথায়? সঙ্গে আনো নি?

তারাকুমার কোনো মতে নিশ্বাস রোধ করিয়া কহিল—বিবাহ করি নি···

—করো নি! সে কি! তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অবনী কহিল,—কাব্য বৃথা হলো যে!···কারণ? Calf-love?···

আবার বেদনা! তারাকুমার চুপ করিয়া রহিল।

অবনী কহিল,—কি লিখছিলে?···যাই লেখো, দেখতে চাইবো না। তবে দেখা হলো···বাল্য-বন্ধু তো,নিমন্ত্রণ করচি, সন্ধ্যাবেলায় আমার ওখানে এসো! মা বলে দেছেন, ধরে নিয়ে যেতে। বললেন, তারু এখানে আছে, দিন মন্দ কাটবে না রে—তার বৌ,ছেলে-পিলে!···সত্যি, মা অবাক হয়ে যাবে তুমি বিয়ে করো নি শুনলে।···তা বাজে কথা যাক,আসচো তো সন্ধ্যাবেলায়? আরে, solitary fly তো—চিন্তা কিসের! ফিরে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, জবাবদিহি নেই! আছো বেশ! ও দিল্লীকা লাড্ড যা বলে, ঠিক! আরাম আছে, তবে জ্বালাও! এই যে আমি···তা সত্য কথা বলবো, ভারী প্রেমময়ী পত্নী! তবে প্রেমের প্রবল স্রোতে এক এক সময় দম কেমন বন্ধ হয়ে আসে!···আর স্বাধীনতা বস্তু যে কি, বিয়ে হয়ে ইস্তক ভুলে গেছি!···কি তোমাদের কবি বলে গেছেন হে? সেই যে ছেলেবেলায় কাব্য-কুসুমে পড়েছিলুম, একটা লাইন আজো মনে আছে—স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!···হাঃ হাঃ হাঃ···

তারাকুমার স্তম্ভিত দৃষ্টিতে অবনীর পানে চাহিয়া রহিল। তার মুখে কথা ফুটিল না। কি বলিবে? কথা কি আর আছে, অবনী যেন দুনিয়ার সব কথা লুঠ করিয়াছে! এমনি অনর্গল যা-তা সে বকিয়া চলিল···যে, তারাকুমারের অবসর মিলিল না, কোনো ফাঁকে দুটা কথা গুঁজিয়া দেয়!

সন্ধ্যার সময় তাকে যাইতে হইল। অবনী ছাড়িবার পাত্র নয়, তার উপর মার নাম করিয়াছে।

মা বলিলেন,—বাঁচলুম বাবা শুনে যে, তুমি এখানে আছো। অবু নতুন দেশের লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলো। বললে, পদ্মা দেখবে, মেঘনা দেখবে।···তা একা আছো, শুনলুম। বিয়ে করো নি? এত লেখাপড়া শিখে এ কি খেয়াল হলো! তার উপর শুনি, খুব বই লিখচো! বৌমা বলে, ভূতি বলে···ওদের পড়তে দিয়ো···

অবনী ডাকিল,—ভূতি···

ভূতি অবনীর বোন্, ষোড়শী, রূপসী। অবনী ডাকিতে ভূতি আসিল, যেন ফাগুনের হাওয়া! তেমনি লঘু, তেমনি স্বচ্ছ! হাসিতে সারা অবয়ব ঝলমল্ করিতেছে!

হাসিয়া অবনী কহিল,—এই তোদের কবিবর তারা-কুমার রে। কবি-সম্বর্দ্ধনা কর্, কোনো অর্ঘ্য না জোটে, চায়ের পেয়ালা দিয়ে অন্ততঃ!

তারাকুমার কোনো মতে মাথা তুলিল। ভূতি তখন এক ঝলক হাসি ছড়াইয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইতেছে।

অবনী কহিল,—তারুর এক অদ্ভুত খেয়াল দেখে এলুম মা। ও একটা শালিক পুষেচে! তাকে রেখেচে রূপোর খাঁচায়। রূপোর পাত্রে সোনার গুঁড়ো খাওয়াচ্ছে। রূপোর পেয়ালায় জল! অথচ আমাকে একটা এনামেলের পাত্র ভরে একটু চা দিলে না!

মা হাসিলেন, কহিলেন,—সত্যি?···

তারাকুমারের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এ তার দুর্ব্বলতা, শালিকের সম্বন্ধে কোনো কথা সহিতে পারে না। বাড়ীতে থাকিতে ঐ পাখী লইয়া বহু বিদ্রূপ উঠিত। সে বিদ্রূপ সহিতে না পারিয়া বাড়ী ছাড়িয়াছে। এখানেও···

কিন্তু এ লইয়া তর্কে কথা পাছে বাড়ে, তাই সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।···

অনেক কথা হইল। চা আসিল, সেই সঙ্গে গরম নিম্‌কি। অবনীর স্ত্রী সরলা সদ্য ভাজিয়া দিয়াছে।

মা বলিলেন,—এ কিছু হলো না, বাবা। কাল রাত্রে এখানে এসে খাবে, মাংস-টাংস আনাবো।

তারাকুমার কহিল,—আমি মাংস খাই না।

—মাংস খাও না! এই বয়স···!

অবনী কহিল,—অথচ এক দিন তারু ছিল মাংসর যম। ওকে আমরা বাঘের মত carnivorous বলতুম···

ভূতি সেইখানে বসিয়াছিল, বসিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে কবি তারাকুমারকে লক্ষ্য করিতেছিল! মাসিক-পত্র খুলিলেই দেখে, তারাকুমারের গল্প, তারাকুমারের কবিতা! ভালো লেখা···

অবনী কহিল,—কথা ক'—আলাপ কর্, ভূতি···

ভূতি হাসিয়া চোখ নামাইল।

অবনী কহিল,—ভূতি আমায় বলে, এত ভাব পাও কোথা থেকে! আজই তোমার ওখান থেকে ফেরবার পর আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, সত্যি দাদা, এত idea পান কি করে?

তারাকুমার লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিল।···

অবনী কহিল,—দু'জনকেই সলজ্জ দেখচি যে বাঃ! কবিও যেমন, ভক্তও তেমনি!

মা কহিলেন,—তোর গান একটা শুনিয়ে দে, ভূতি···

অবনী কহিল,—একটা অভিনন্দনের গান···বুঝলি!

গান কিন্তু শুনা হইল না। আটটা বাজে, শালিককে এ সময় খাবার দিবার কথা। বেচারী! তারাকুমার উঠিয়া পড়িল, কহিল,—আজ উঠি মা। কাজ আছে।

মা বলিলেন, কাল এসো বাবা, নিশ্চয়। নেমন্তন্ন রইলো। যেন ডাকতে পাঠাতে না হয়!

তারাকুমার উঠিয়া জুতায় পা ঢুকাইতেছিল, কহিল—না। ডাকতে যেতে হবে না।

অবনী কহিল,—সাতটার মধ্যে আসা চাই। আটটায় আমাদের ডিনার।

ভূতি এবার কথা কহিল; হাসিয়া বলিল,—ওঃ, একেবারে সাহেব-বাড়ী!

তার স্বরে এতটুকু জড়তা নাই···ভারী মিঠা! তারা-কুমারের মন্দ লাগিল না।

৪

দু'দিনে অবনী মাতাইয়া তুলিল। তারাকুমারের জো কি, চুপ-চাপ ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে! অবনী একা নয়—সঙ্গে তার স্ত্রী সরলা এবং ঐ বোন ভূতি।

ভোরে আসিয়া অবনী তার দ্বারে দাঁড়ায়, বলে,—ওরা ready হে! চলে এসো।

আসিতে হয়! নিরুপায়! তার পর ক'জনে মিলিয়া গড়াইয়ের তীর ধরিয়া বহু দূর ঘুরিয়া বেড়াইয়া আসে। সন্ধ্যাতেও তাই। রাত্রে নিমন্ত্রণের ঘটা···নিত্য!

রাত্রে তারাকুমারের উনুন জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। সে বলে,—রোজ রোজ কেন এ-সব করেন, মা···

মা বলেন,—শোনো কথা! ছেলে মার কাছে খাবে, এতে নূতনত্ব কি দেখলে!

এ কথার উপর কথা চলে না। এমন স্নেহ!

ভূতির লজ্জা কতক ভাঙ্গিয়াছে। তারাকুমারের সঙ্গে সে সাহিত্যের কথা কয়; বালির চরে বসিয়া গানও তাকে গাহিতে হয়। অবনীর যা স্বভাব, লজ্জা রাখিবার উপায় ছিল না!

সে দিন অবনীর ঘরে তারাকুমার বসিয়া আছে। ঘরে একটা ফোল্ডিং অর্গান। টেবিলের উপর মোটা বাঁধানো খাতা—গায়ে সোনার জলে নাম লেখা শ্রীমণিমালা দেবী। মণিমালা ভূতির নাম, এটুকু স্পষ্ট কেহ না বলিলেও তারাকুমার বুঝিয়াছে।

অবনী ডাকিল,—ভূতি···

ভূতি কহিল,—যাই···

সে আসিল,—হাতে চায়ের পেয়ালা।

অবনী কহিল,—ওর নামে একটা গান বাঁধো তো, তারু। যখনি ডাকো—আসবে। হাতে কিন্তু চায়ের পেয়ালা!

তারাকুমার হাসিল,—ভূতিও হাসি চাপিতে পারিল না।

হাসিয়া ভূতি কহিল,—খাও তো দিব্যি!

—তা খাই! তবে আমিই গান বাঁধি। কি বলিস্! কি রে সে গানটা? প্রায়ই শুনি···বলিয়া অবনী ভাবিতে লাগিল; একটু পরে কহিল,—হয়েচে। আচ্ছা, শোনো তো তারু, কেমন হয়—যদি লিখি,

সকল সময়ে তুমি চায়ের পেয়ালা হাতে ধারিণী,
ভগিনী মণিমালে, আনো থালে
গরম শিঙাড়া সুপকারিণী!

হাসিয়া ভূতি কহিল,—চুপ করো দাদা। তারাকুমার বাবু লজ্জা পেয়ে শেষে কবিতা লেখা ছেড়ে দেবেন!

অবনী কহিল,—বটে! এমন লিপি-চাতুর্য্য! না! তা হলে চুপ করতে হলো। বন্ধুত্ব আমি খোয়াতে চাই না আর্টের খাতিরেও! অতএব, আমরা চা পান করি, তুমি সেই আসরে সঙ্গীত-ধারা বর্ষণ করো।

ভূতিকে গাহিতে হইল। সে গাহিল,—

আমি কি বলে করিব নিবেদন
আমার হৃদয়-প্রাণ-মন।···

অবনী হাসিয়া তারাকুমারের পানে চাহিল···তারাকুমারের মুখ আনত। গান থামিলে অবনী কহিল—এই গানটির পক্ষে আসর আপাততঃ সুষ্ঠু—না রে?

চপল হাস্যের একটু তরঙ্গ তুলিয়া ভূতি কহিল—যাও! যা ভাবচো, এ গান তা নয় গো!···রবিবাবুর ব্রহ্মসঙ্গীত।

চায়ের পেয়ালা রাখিয়া অবনী কহিল,—ওরে, ব্রহ্ম হলেন একমেবাদ্বিতীয়ং এবং নারীর পরম ব্রহ্ম হলো স্বামী। সেই স্বামীই একমেবাদ্বিতীয়ং। তাঁর উপর আর দ্বিতীয় ব্রহ্ম নারীর নেই!

অবনী হো-হো করিয়া হাসিল। ভূতি রাগিয়া ঘুরিয়া চেয়ার ঠেলিয়া—যাওঃ···বলিয়া সলজ্জ ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে সে-কক্ষ ত্যাগ করিল।

অবনী কহিল—মার পাগলামি সুরু হয়েচে কাল থেকে। কি বলেন, জানো, তারু?

তারাকুমার কোনো মতে চোখ তুলিয়া অবনীর পানে চাহিল।

অবনী কহিল—মা বলছিলেন, তারুকে ধর্,—ধরে ভূতিকে তার হাতে গছিয়ে দে! অর্থাৎ কন্যাদায় মহাদায় কি না। মা বলে, কুষ্টিয়ায় নাহলে আসবো কেন? এ ভবিতব্য! আমি বলছিলুম,—তারু এ্যাদ্দিন বিয়ে করেনি—হঠাৎ কেন আজ বিয়ে করবে? মা জবাব দিলে, বিয়ে যারা করেনি, তারাই হলো বিয়ের যোগ্য পাত্র! আর তারা বিয়ে করেনি বলেই বিয়ে করবার সুযোগ তারা হারায় নি! আমি তবু বললুম—তোমার মেয়ে লেখাপড়া শিখেচে—ওর ambition high—ও এই পাড়াগাঁয়ের একটা নিরীহ মাষ্টারকে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন?

তারাকুমার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নত করিল। অবনী তার পানে চাহিয়া রহিল। তার কোর্টের চাপরাশী দুটা ইলিশ মাছ হাতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। অবনী কহিল—এখানে কেন? বাড়ীর ভিতরে দি'গে যা···

চাপরাশী চলিয়া গেল। অবনী কহিল,—কি বলো? মার কোনো আশা…

আবার একটা নিশ্বাস। নিশ্বাস ফেলিয়া তারাকুমার কহিলেন,—আমায় মাপ করো অবু…বিয়ে আমি করবো না।

অবনীর কৌতূহলের সীমা নাই! ভূতি এমন মেয়ে… তার সঙ্গে আলাপে তার পরিচয় আজো পায় নাই যে তারা-কুমারের বৈরাগ্য ঘুচিবে না? কেন এ বৈরাগ্য? অবনী কহিল,—কারণ জানতে পারি?

তারাকুমার কহিল—কারণ আবার কি! আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও বিবাহ করেন নি। যে ব্রত গ্রহণ করেচি…

অবনী অট্টহাস্যে একেবারে যেন ফাটিয়া পড়িল! সে কহিল—থামো, থামো…তোমার মুখে 'ব্রত'-কথা সাজে না। না পরো খদ্দর, না দাও লেকচার! লেখো তো প্রেমের কবিতা, প্রেমের গল্প। হুঁঃ! প্রেমের ভারে মন ভরপুর…এ যেন সেই ভূতের মুখে রাম-নাম!…

পাশের ঘরের দ্বারে ক্যাঁচ করিয়া একটা শব্দ—না! মফঃস্বলের বাড়ীর দ্বার-জানলাগুলার এই বড় দোষ—তাদের কোনো গাম্ভীর্য্য নাই! দ্বার লক্ষ্য করিয়া অবনী চাহিয়া দেখিল—পর্দ্দার আড়ালে একটা শাড়ীর পাড়। পাড়টা চলিয়া যাইতেছিল। ও পাড়- ঠিক ভূতির শাড়ী!…

অবনী কহিল,—দেখচো? ভূতির আপত্তি নেই। একালের মেয়ে কি না, ভারী চাপা…তা হলে কি হবে, নভেল পড়ে, কবিতা পড়ে—দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। বোধ হয়, তোমার অভিমতটুকু…

তারাকুমারের মুখে রক্ত-স্রোত ছলাৎ করিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে একটা নিশ্বাস। সেটাকে সবলে রুখিয়া তারা-কুমার বাহিরের দিকে চাহিল।…অবনী চুপ।

হাসিয়া মা কহিলেন—তারুর তো আজ ছুটী। চাপ-রাশি জুটো ইলিশমাছ দিয়ে গেল। আজ বাবা, এবেলায় এইখানেই খাও।

অবনী ডাকিল,—মা…

মা তার পানে চাহিলেন।

অবনী কহিল,—মিছে বন্ধনের আশা মনে জাগাচ্ছো মা! তারু বিয়ে করবে না…

মা কহিলেন,—আচ্ছা, সে আমি দেখবো'খন। ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করবো।…বিয়ে করবে না! কেন করবে না, শুনি? এই বয়স—অমন বাউণ্ডুলে হয়ে থাকবে! না, না, তা হবে না…যতক্ষণ আমরা আছি…তা হতে দেবো না। না থাকতুম, তা হলে পরে কথা ছিল। ও-সব পাগলামি ছাড়ো, বাবা। আমার যে কন্যাদায়! কোথায় পাত্র পাবো?

তারাকুমারের যাওয়া হইল না। স্নান, আহার—এই-খানেই সারিতে হইল, মা ছাড়িলেন না।…

আহারাদির পর গল্প, গান। তারাকুমারের ভালো লাগিলেও থাকিয়া থাকিয়া কেমন অস্থিরতা! ছুটীর দিনে এ সময় সে খাঁচা পাড়িয়া বসে, নির্নিমেষ নয়নে শালিকের পানে চাহিয়া থাকে; তার খেলা, তার চঞ্চল আনন্দ লক্ষ্য করে; কবিতা লেখে, লিখিয়া খাঁচার পাখীকে সে-কবিতা পড়িয়া শুনায়…

আজ-কাল সে কাজে নিত্য ব্যাঘাত। বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে, সে উপায় নাই, অবনী গিয়া তাড়া দেয়! সে উঠিয়া আসে। শালিকের পরিচয় দিতে পারে না—তার বুকের অতি-গোপন বেদনা তাহা হইলে পরিহাসের তীক্ষ্ণ তীরে বিঁধিয়া জর্জ্জর হইবে!

তবু জোর করিয়া সে গৃহে ফিরিল। বেলা তখন পাঁচটা বাজে। অবনী কহিল,—এগোও। আমরা সদলে গিয়ে হানা দিচ্ছি। আজ নৌকো রেখেচি, ওপারে যাবো। রাত্রে জ্যোৎস্না আছে…grand হবে।

গৃহে ফিরিয়া তারাকুমার দেখে, খাঁচার মধ্যে পাখী মলিন মুখে বসিয়া আছে। খাবার পায় নাই। ঠিক! তারাকুমারের বুকে যেন ছুরি বিঁধিল! সে ডাকিল,—হেম…

পাখী তেমনি চুপ।

তারাকুমার কহিল,—আমায় ক্ষমা করো হেম…এ অপরাধ আর ঘটবে না…

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অবনী আসিয়া হাজির। তারাকুমার তখনো পাখীর খাঁচা পাড়িয়া বসিয়া আছে।

অবনী ডাকিল,—ওরে ভূতি, আয় রে…দেখে যা!

ভূতি আসিল। তারাকুমার ততক্ষণে মনকে দৃঢ় করিয়া লইয়াছে। না, কিসের লজ্জা!

অবনী কহিল,—এই ছাখ্‌ ভূতি, তোর কবিবরের

ধ্যানী মূর্ত্তি। তোদের এ-কালের কাব্য-শাস্ত্রে পাপিয়া হলো কাব্যে উৎস! সেকালে ছিল ময়ূর। কিন্তু কবি তারাকুমার সে সব বাতিল করে তাদের জায়গায় বসিয়েচে ঐ শালিককে!

হাসি-ভরা চোখ—ভূতি কহিল,—সত্যি!…ওমা, তাই তো! এ কি তারু বাবু, শালিক পুষেচেন এত যত্নে!… আবার রূপোর খাঁচা! বাঃ!—ভারী মজা তো! ভূতি আগাইয়া আসিল, খাঁচায় হাত দিবা মাত্র তারাকুমার কহিল,—থাক্…

ভূতি অবাক! সে কহিল, –নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো ইতিহাস আছে? না? কোনো দুর্দ্দিনের ঝড়ে হয় তো…

ভূতি তারাকুমারের পানে চাহিয়া কথাটা বলিল। তারাকুমারের মুখে যে মলিন ছায়া দেখিল, তাহাতে তার কথা বাধিয়া গেল। বিমূঢ়ের মত নিস্পন্দ সে দাঁড়াইয়া রহিল।

তারাকুমারের হাত ধরিয়া অবনী তাকে তুলিল, কহিল,—এসো। না হলে খাঁচা খুলে তোমার শালিককে উড়িয়ে দেবো! সত্যি…

এ কি অশান্তি!…কিন্তু এরা তো বুঝিবে না—তারাকুমারকে অগত্যা উঠিতে হইল।…

সেই বালুর চর…নৌকায় চড়িয়া ওপারে গিয়া নামা হইল।

অবনী কহিল,—তোরা এগো ভূতি! তোর বৌদির মাথা ধরেচে, একটু শুশ্রূষা করি। তার পর আমরা যাচ্ছি।

ভূতি কহিল,—সত্যি বৌদি?

দুই হাতে দুই রগ টিপিয়া বৌদি কহিল,—রোদ্দুরটা কেমন চড়াং করে লাগলো…

ভূতি কহিল,—রগ টিপে দি?…

বৌদি কহিল,—না, না…তোমরা এগোও—দেরী করো না। আমরা এখনি আসচি।

ভূতি কহিল,—আচ্ছা…

ভিতরে একটা ষড় ছিল, ভূতি তাহা বোঝে নাই। মুক্ত চরে অবাধ মুক্তি! ছুটিবার জন্য তার আগ্রহ প্রচুর। সে কহিল,—আসুন তারু বাবু…

তারাকুমারকে আসিতে হইল। অস্ত-সূর্য্যের রক্তচ্ছটা। সারা চর সে ছটায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। সেই রাঙা আলোয় কিশোরী ভূতির লাবণ্য-শ্রী…

তারাকুমার কহিল,—চলুন…

চরের উপর দিয়া দু'জনে চলিল—ভূতির কি আনন্দ! মনের আনন্দে কখন সে গান ধরিয়া দিয়াছে,—তারাকুমারের বুকে সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার ভিড়। সে ভিড় একটু সরিলে সহসা তারাকুমার শুনিল, ভূতি গাহিতেছে—

আমায় একটুখানি বসতে দিয়ো কাছে,
শুধু ক্ষণেক তরে—

চমৎকার! তারাকুমার কহিল,—এ গান…তাই তো… বসে গাইবেন? ভারী ভালো লাগচে!

সুরের নেশায় ভূতি বিহ্বল। সে বসিল, বসিয়া গাহিতে লাগিল।

এ সুরে তারাকুমারের সারা দুনিয়া, তার রূপার খাঁচা, শালিক—সব কোথায় উবিয়া গেল…

তারাকুমার নির্নিমেষ নেত্রে ভূতির পানে চাহিয়া—নদীর ছোট ঢেউগুলা পর্য্যন্ত কি এক বিহ্বলতায় বুক ভরিয়া তন্দ্রাতুরের মত কূলে লুটাইয়া পড়িতেছে…ধূ-ধূ মুক্ত প্রান্তর…

তারাকুমারের মনে হইল, সারা দুনিয়ায় কি আর কেহ নাই? শুধু সে, আর ভূতি, আর এই গানের সুর!… সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার চেতনা ঐ সুরের গায়ে ঢুলিয়া পড়িতেছিল।

সহসা অবনীর কণ্ঠস্বরে চেতনা ফিরিল। অবনী কহিল,—Pure romance! বাঃ!

ভূতিরও চমক ভাঙ্গিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৌদি আসিয়া কহিলেন,—কি রে, প্রণয়-নিবেদন হলো!

—যাও—বলিয়া ভূতি একটা ঘুরপাক খাইয়া দূরে সরিয়া গেল, যেন সলজ্জ হাসির বিদ্যুৎ-শিখা!

বৌদি কহিলেন,—এ'ও ব্রহ্মসঙ্গীত—না?

ভূতি জবাব দিল না। তার চোখে হাসি আর কৌতুক ঝিক্‌মিক্ করিতেছে!

অবনী কহিল,—এই ভূতির ভার তোমায় নিতে হবে, তারু…

তারাকুমারের বুকের মধ্যেও এমনি একটা কথা… ভূতির ঐ গান—আমায় একটুখানি বসতে দিয়ো কাছে—আহা! একাকিনী সঙ্গহীনা!… পর-মুহূর্ত্তে বুকে তীক্ষ্ণ

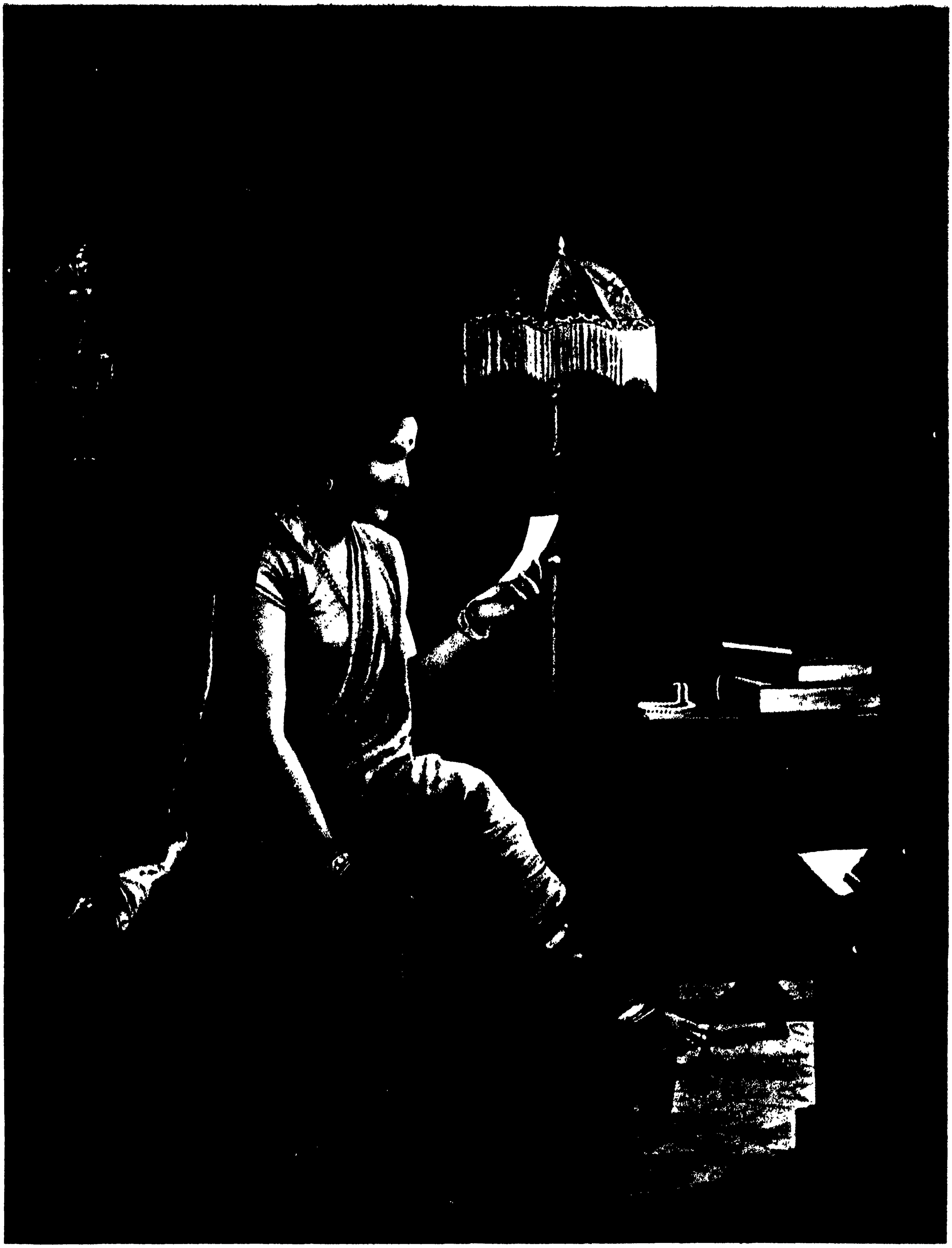

স্মৃতি

বসুমতী-চিত্রবিভাগ] [শিল্পী—মিষ্টার টমাস।

ছুরির পরশ! না—না—এতখানি হীন সে হইতে পারে না—হইবে না! জীবন যদি শূন্য হইয়া থাকে তো এমনি শূন্যই সে থাকুক, কাহাকেও আনিয়া সে শূন্যতা সে পূর্ণ করিতে পারে না—পারিবে না!

তারাকুমার কহিল,—তা হয় না অবু…

সে উঠিল, উঠিয়া এক দিকে চলিয়া গেল।

৫

পরের দিন কিসের ছুটী ছিল। ডুপুরবেলা। নিজেকে আজ জোর করিয়া তারাকুমার এই ঘরে বন্ধ রাখিয়াছে… খাঁচার পাখী আজ নীরব, তার আনন্দ নাই, খেলা নাই—কেমন নিঝুম ভাব। পাখী কি ভাবিতেছে? কোনো বেদনা পাইয়াছে?…

বাহিরে মিষ্ট স্বর—তারু বাবু…

ভূতি! ভূতি আসিল। তার হাতে একরাশ তৃণ-গুচ্ছ, বনের ফল। ভূতি কহিল,—আজ বেড়াতে গেছলুম মার সঙ্গে সেই মন্দিরে…বেশ রাঙা রাঙা ফল দেখলুম। পাখী খাবে বলে এনেচি…

পাখীর উপর ভূতির এমন দরদ! তারাকুমার কোনো কথা কহিল না।

ভূতি কহিল,—দাদা মফঃস্বলে গেছে একটা তদারকে। বৌদি মনমরা হয়ে পড়ে আছে।…দাদার ফিরতে দু'তিন দিন দেরী হবে।

খাঁচার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া ফলগুলা সে খাঁচার মধ্যে গুঁজিয়া দিল, দিয়া কহিল—খা—

পাখী খাইল না।

ভূতি কহিল,—কোথাকার লক্ষ্মীছাড়া পাখী! বনের ফলে রুচি নেই! কাট্‌লেট খেতে শিখেচিস বুঝি! আ মলো যা! খা—খা—খা, বলচি।

পাখী খাইল না—ভূতি রাগিয়া দুটা খোঁচা দিল। খাঁচার মধ্যে ডানা-ঝটপটানির শব্দ!

তারাকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল। এ কি—ইহার নাম দরদ! রাগে ভূতির হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে সরাইয়া তারাকুমার কহিল,—কি হচ্ছে! ওকে এ পীড়ন কেন? সরুন…

হাতটা সে জোরেই চাপিয়া ছিল। ভূতির দুই চোখে জল। বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে ভূতি কহিল,—আমায় মারলেন আপনি!

ভূতির সে-কথা তারাকুমারের কাণে গেল না। তেমনি তীব্র স্বরে তারাকুমার কহিল,…চলে যান…

ভূতি কহিল,—আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন!

তারাকুমার কোনো কথা কহিল না, খাঁচা হাতে ভূতির পানে চাহিল। দৃষ্টিতে আগুনের কণা।

অভিমানে ফুলিয়া ভূতি কহিল—লক্ষ্মীছাড়া পাখী! ওঃ—আদর দেখে বাঁচি না! ফল খাওয়াতে গেলুম, তা খাওয়া হলো না! ভারী গ্যাদা হয়েচে!

তারাকুমার বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে ভূতির পানে চাহিল। সজোরে আঙুল মট্‌কাইয়া ভূতি কহিল—মর্, মর্ লক্ষ্মীছাড়া পাখী—এক্ষুনি মর্!

তারাকুমারের চোখে বিরক্তির জ্বালা! ভূতি কথাটা বলিয়া মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না—ছুটিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তারাকুমার থ!…

পাখী এমন নিঃশব্দ কেন? তার সে চাঞ্চল্য কোথায় গেল? কি এমন ঘটিয়াছে…

বুকে একটা চিন্তা সাপের মত ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল! তাই…? তারাকুমার বুঝিল, তার মনে দুবার লোভ জাগিয়াছিল…নিমেষের জন্য! চরে বসিয়া ভূতি সেই গান গাহিতেছিল—অস্ত রবির সেই রক্ত কিরণ…ভূতির লাবণ্য-শ্রী…মনে তার লোভ জাগিয়াছিল বৈ কি।

তারাকুমার নিশ্বাস ফেলিয়া খাঁচার পানে চাহিয়া কহিল না, না শোনো প্রেম, সে ক্ষণিক মোহ—ভুল বুঝে অভিমান করো না…

রাত্রে বসিয়া সে কবিতা লিখিল—পাখীর অভিমান ভাঙ্গাইবার জন্য মিনতির ধারা!…

সহসা দ্বারে খুট্‌ করিয়া একটা শব্দ! তারাকুমার ফিরিয়া চাহিল। কেহ নাই!…তারাকুমার কবিতা লিখিতে লাগিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে তারাকুমার উঠিয়া দেখে, মেঝেয় একখানা ভাঁজ করা কাগজ…চিঠির মত! তারাকুমার তুলিয়া পড়িল—চিঠিই! লেখা আছে…

আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আর কখনও এমন আচরণ করিব না।

নাম নাই। কি অপরাধ তারো কোনো বিবরণ নাই!…

তারাকুমার চিন্তা করিতে লাগিল। ঠিক! এ চিঠি ভূতির! অক্ষরগুলা মেয়েলি ছাঁদের!…সে মৃদু হাসিল।

খাঁচার পানে নজর পড়িতে সে হাসি তখনি মিলাইল! খাঁচায় পাখী কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তবে কি…?

তাই। প্রাণহীন দেহ! শালিক মরিয়াছে।…

দুনিয়ার উপর রাগে অভিমানে তারাকুমার ফুলিয়া উঠিল…খাঁচা খুলিয়া শালিককে বাহির করিয়া বুকে চাপিয়া তারাকুমার চক্ষু মুদিল। তার দুই চোখে জলের ধারা।

তারাকুমার ছুটী লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। ফিরিল দু'দিন পরে—পাখীর দেহকে খাড়া করিয়া…সেই রূপার খাঁচায় মরা পাখীর দেহ সে সযত্নে রক্ষা করিল।

তারপর…তারাকুমার আর কোথাও যায় না। অবনী আসিল। ভূতি আসিল। অবনীর স্ত্রীও। সকলে ডাকিল—এসো! তারাকুমার কহিল—না…

মা কহিলেন- আমার বড় সাধ বাবা—আমার ভূতিকে…

বাষ্পাদ্র কণ্ঠে তারাকুমার কহিল- আমায় মাপ করুন, মা…

মা কহিলেন- কিন্তু কেন বাবা? তোমার এই বয়সে…

প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস ভেদ করিয়া তারাকুমারের কণ্ঠে সেই এক সুর ফুটিল, -না, না…

বাতিক? পাগলামি? নিশ্চয় তাই!

তারাকুমার কহিল দুনিয়ায় এ-পাগলামিতে কার কি ক্ষতি হবে, অবু!

অবনী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল--Nonsense!

তারাকুমার জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।…

শোকের তপস্যা? তাই! ধূর্জ্জটীর সেই তপস্যার মত! তারাকুমার কবিতা লেখা ছাড়িয়াছে- শুধু স্কুলে ছেলে পড়ায়, ফিরিয়া মাথার শিয়রে খাঁচা রাখিয়া তার পানে চাহিয়া থাকে! কি ভাবে—সেই জানে! ভাবিয়া কি হইবে, সেটুকু আজো জানে নাই!

… … … …

সেদিন শনিবার। সন্ধ্যা হয়-হয়। তারাকুমার বিছানায় তেমনি পড়িয়া আছে- খাঁচার পানে তেমনি চাহিয়া… দীর্ঘ কয় বছরের স্মৃতি বুকের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে! সেই ঘুড়ির মাঞ্জা, লজেঞ্জেস কেনা, কচুরি খাওয়া…তারপর শ্রাবণের সজল সন্ধ্যায় সেই অশ্রু-জড়িত বিদায়-বাণী…হেমের সেই প্রতিশ্রুতি! সে আসিয়াছিল…যেমন বলিয়া গিয়াছিল …পাখীর বেশে আসিয়াছিল…বুকের উপর! তারাকুমার বুকে তাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই!…

হেমের দোষ? না। দোষ তারাকুমারের!…তার মনে সেই রূপের মোহ, ভূতিকে হৃদয়ে পাইবার হীন বাসনা!… তারাকুমারের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।…

সহসা কার কণ্ঠস্বর—তারুদা…

এ কি! এ…এ যে!…তারাকুমার চোখ মুছিয়া খাঁচার পানে চাহিল, পাখীর নিস্পন্দ দেহ! ··স্বপ্নলোক হইতে তবে কি…

আবার সেই কণ্ঠস্বর,—তারুদা…

না, ভুল নয়! তারাকুমার দ্বারের দিকে চাহিল, শাড়ী-পরা নারী-মূর্ত্তি!…

তারাকুমারের শরীরে রোমাঞ্চ! সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মূর্ত্তি ঘরে প্রবেশ করিল, কহিল,—ঘর যে অন্ধকার! আলো কোথায়? জ্বালো··

যন্ত্রের মত তারাকুমার আলো জ্বালিল। এ কি, এ যে হাঁ, কোনো ভুল নাই, হেম!…তার সেই হেম, এমন দিব্য রূপশ্রীতে সমুজ্জ্বল!…সাগর-মন্থনে লক্ষ্মী আসিয়া যেন সামনে দাঁড়াইয়াছেন!

তারাকুমারের বিস্ময়ের সীমা নাই! তার ধ্যান, তার চিন্তা…এমন জাগ্রত জীবন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া সত্যই…

মূর্ত্তি কহিল, তা হলে সত্যি…এখানেই আছো!… এটা কি? মরা পাখী!…

তারাকুমার হাত বাড়াইল, মায়াবিনী?… ছায়ার শরীর? মায়া? না, সত্যই…

হাসিয়া হেম কহিল,—হাত বাড়াচ্ছো যে!…তার মানে?

তারাকুমার কহিল,—তুমি হেম?

—হাঁা।

—আমার অশ্রু তোমায় টেনে এনেচে!…

হেম হাসিল, কহিল,—এ-বয়সেও তোমার কাব্য-রোগ যায় নি, তারুদা!

তারাকুমার কহিল,—যত্নের ত্রুটি করি নি, হেম। তুমি যেমন কথা রেখেচো, শালিকের মূর্ত্তি ধরে আসবে বলেছিলে, এবং এসেছিলে, আমিও তেমনি তোমার সেই মূর্ত্তি বুকে ধরে সব ত্যাগ করে নির্জ্জনে এসেচি…

—শালিক !

খাঁচার দিকে দেখাইয়া তারাকুমার কহিল,—ঐ যে··· তবু চলে গেলে ! এটুকুও তোমার সইলো না ···

হেম কহিল,—কি বলচো তারুদা ! শালিক ! শালিকের মূর্ত্তি ! এ কথার মানে ?

—ভুলে গেছ ! সেই যে যাবার বেলায় বলেছিলে···

বাষ্পার্দ্র স্বরে তারাকুমার অতীতের কাহিনী খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া হেম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, কহিল,—তুমি পাগল, সত্য পাগল···তারুদা ! কাব্য-লোকে তোমার জন্ম নেওয়া উচিত ছিল ! কথার কথা বলেছিলুম, তাবলে সত্যি শালিক পাখী হয়ে জন্মাবো ! থামো···থামো। তা কখনো হয় ? না, হতে পারে ?

চেতনা ফিরিতেছিল। তারাকুমার কহিল,—তাহলে তুমি বেঁচে আছো ! সে রাত্রের জল-ঝড়ে···

হেম কহিল,—আমরা সে রাত্রে গোয়ালন্দেই ছিলুম। ষ্টীমারে উঠিনি। বাবার সাহস হয় নি বেরুতে···

পুলকে তারাকুমারের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—তাহলে তুমি আজ দুর্লভ নও, হেম ! আমার এত দিনের নীরব সাধনা, আমার এ তপস্যা তবে···

হেম কহিল,—এ-সব কি বলচো !

তারাকুমার বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, তার দৃষ্টিতে এক-রাশ প্রশ্ন !···

হেম কহিল,—আমার স্বামী ব্যারিষ্টার—কুষ্টিয়ায় একটা মকর্দ্দমায় এসেছিলেন। তোমাদের বাড়ী এক দিন গেছলুম, শুনলুম, তুমি কুষ্টিয়াতে আছো।···তাই এঁর সঙ্গে এসেছিলুম, তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো বলে। এসে অবধি এমন মাথা ধরেছিল, ডাকবাঙলায় পড়েছিলুম, মাথা তুলতে পারি নি। এখন স্বামী ফিরচেন। তাই তাঁকে বলে একবার দেখা করতে এলুম। আজ আর সময় নেই···ওঁর মকর্দ্দমার তারিখ পড়ে গেল। আবার ওঁকে আসতে হবে। সেদিনও আমি ওঁর সঙ্গে আসবো। এসে তোমার গৃহে দু'জনে অতিথি হবো। সামনের শনিবারে, বুঝলে ! এঁর সঙ্গে আলাপ করো। বেশ লোক। আনন্দ পাবে ! আজ তবে চলি, তারুদা। সামনের শনিবারে আসচি··· নিশ্চয়। কথা রইলো—পাকা কথা !

তারাকুমার যেন কাঠের পুতুল ! তেমনি নিস্পন্দ ! হেম চলিয়া গেল।···

বাহিরে একখানা গাড়ীর শব্দ !

তারাকুমার বাহিরে আসিল। গাড়ী ঐ চলিয়া যাইতেছে। আর এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। সে সন্ধ্যাতেও গাড়ী এমনি চলিয়া গিয়াছিল !···

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট,—তারাকুমারের চেতনা ফিরিল। এ সে কি করিয়াছে ! কার ধ্যানে লোকালয় ছাড়িয়া, সব ছাড়িয়া বল্মীক-স্তূপে নিজের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া পাগল সাজিয়াছে !

অবনীর কথা মনে পড়িল,—ভূতির কথা, অবনীর মার কথা !

তারাকুমার সেই মুহূর্ত্তে ছুটিল—অবনীর গৃহে। স্তব্ধ গৃহ। সামনে পথে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া। তারাকুমার ভিতরে গেল। অবনী···? ঐ যে অবনী !

মহা-পরাক্রমে ষ্ট্রাপ টানিয়া অবনী একটা বিছানার মোট বাঁধিতেছে।

তারাকুমারকে দেখিয়া অবনী কহিল,—ভালোই হলো। যাবার সময় চিঠিখানা দিয়ে যাবো ভাবছিলুম। তার দরকার হলো না···

—চিঠি !···কিসের চিঠি ?

অবনী কহিল,—ভূতির বিয়ে। কাল। পাত্রটি ভালো। হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট,বাপের বেশ পয়সা আছে। ভূতিরা চলে গেছে, আমি আটকে ছিলুম। সোমবার থেকে তিন দিনের ছুটী নিয়েচি···বিয়ের কাজ সেরে ফিরবো। মা বলে গেছেন, তোমার যাওয়া চাইই। বুঝলে ? কাল সকালে ষ্টার্ট করো। সোমবার ফিরে স্কুল করতে পারবে। ভূতির বিয়ে। তুমি না গেলে···

আর যাওয়া ! ভূতির জন্যই সে আসিয়াছিল। মার প্রস্তাব···আজ শিরোধার্য্য করিবে বলিয়া ! কিন্তু···

সারা দুনিয়া পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে হইতে যত আলো···

তারাকুমার কোনো কথা কহিল না—টলিতে টলিতে বাড়ীর বাহির হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বামুনডাঙ্গার মাঠ

শিকারে গিয়াছিলাম আমি, রজত আর প্রভাত। রজত আমার বন্ধু এবং ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। কি একটা ছুটী উপলক্ষে সে আমার এখানে আসিয়া শিকারে যাইবার জন্য ধরিয়া বসিল; সুতরাং 'না' বলিতে পারিলাম না। ইদানীং দেখা-সাক্ষাৎ আমাদের সচরাচর ঘটিয়া উঠে না, বৎসরে একবার যদি কেহ কাহারও কাছে গিয়া পড়ি, সেই ঢের। তাই দুই জনে একসঙ্গে বনে জঙ্গলে দুই এক দিন কাটাইতে পারিব, ইহার অপেক্ষা লোভনীয় প্রস্তাব আর ছিল না। যখন সংসারের পথ জটিল হয় নাই, আকাশের আলো এবং বৃষ্টির জল যখন আমাদের কাছে ভয়ের না হইয়া পরম রমণীয় ছিল, তখনকার দিনে ঘুঘু এবং হরিয়েল শিকার করিবার জন্য আমরা গুরুজনদের ফাঁকি দিয়া কলেজে গরহাজির হইয়া কত কাণ্ডই যে করিয়াছি, আজ তাহা ভাবিতে গেলে নিজের কাছেই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জীবনযাত্রার পথ আমার যতই অসরল হইয়া উঠুক, অতীতটা আমার মনের মধ্যে মরে নাই, ঘুমাইয়া ছিল মাত্র। রজত আসিয়া একটু ধাক্কা দিতেই উহা সজাগ এবং সোজা হইয়া উঠিল। জিনের থলে ভরিয়া খাবার, টোটা এবং ছর্‌রা লওয়া হইল, বড় বড় দুইটা ফ্লাস্ক ভরিয়া জল লওয়া হইল; বুটজুতা এবং বর্ষাতি, টর্চ এবং বন্দুক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যত কিছু জিনিষপত্র লইয়া একদা বৈশাখের প্রত্যূষে আমরা মৃগয়ায় বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার কম্মস্থলের বন্ধু প্রভাত রায়ও সঙ্গ লইতে ভুলিল না।

কিছু দূর আমাদের নৌকায় করিয়া যাইতে হইবে।

প্রভাত-আকাশের নীচে, সঙ্কীর্ণ নদীর বুকে আমরা যখন নৌকায় উঠিলাম, তখন আকাশে এতটুকু মেঘের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু ঘণ্টা দুই কাটিবার পর চারিদিক্ হইতে পিঙ্গলবর্ণের মেঘ আসিয়া মাথার উপর জড় হইতে লাগিল, দুই পারের তরুশ্রেণী এই দিনমানেই ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিল এবং মাথার উপর নীড়াভিমুখী পাখীদের ছুটাছুটির আর অন্ত রহিল না।

রজত বলিল, "দুর্ভাগ্য একেই বলে, হয় ত এরই নাম বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। কিন্তু ফিরে যেতে রাজী নই, বন্ধু, নৌকা যদি ডোবে, সেও মন্দ হবে না।"

নদীর জল যেরূপ গভীর, তাহাতে নৌকা ডুবিলে বিশেষ ভয়ের কিছু নাই জানিতাম, কিন্তু জল যদি সত্যই আসে এবং ঝড়ও ক্রমশঃ ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলে শিকারে লাভ কি রকম দাঁড়াইবে, তাহা লইয়া রজতের সহিত তর্ক করিতে পারিতাম; কিন্তু তর্কে তাহার হাকিমী মেজাজ আরও অশান্ত হইয়া উঠিবে; তাই নৌকা প্রতিকূল বাতাসে নদীর বুক চিরিয়া মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সকলেই আশা করিতেছিলাম, বৃষ্টি আর নামিবে না, ঝড়েই এই দুর্য্যোগের অবসান ঘটিবে। কিন্তু নৌকা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে আকাশের বুক ছাপাইয়া প্রবল বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল।

মাঝি বলিল, এই ভাবে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব, বৃষ্টির গাঢ় পর্দ্দায় সম্মুখভাগ একবারে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে।

মাঝি বলিল, "কতদূর যাবে কর্ত্তারা, তাই আগে শুনি, নইলে এই লগি তুললাম।"

রজতের চাকর গিয়া নৌকা ঠিক করিয়াছিল, কোথায় গন্তব্যস্থল, কিছুই মাঝিকে বলা হয় নাই এবং মাঝিও হাকিমের চাকরকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করে নাই।

মাঝির প্রশ্নের উত্তরে রজত কহিল, "বামুনডাঙ্গার জঙ্গলে যাব আমরা, এখন থেকে তোর ব্যস্ত হ'লে চলবে কেন? সে ত এখনও ক্রোশ দুই, কি বলিস?"

মাঝির বয়স হইয়াছে, তার চুলগুলির সবই প্রায় সাদা। রজতের মুখে বামুনডাঙ্গার মাঠের নাম শুনিয়া তাহার নিষ্প্রভ নয়নযুগলে ক্ষণকালের জন্য চমক খেলিয়া গেল। বিস্মিত-কণ্ঠে মাঝি বলিল, "সেখানে যাবে! সে যে বড় ভয়ানক যায়গা।"

যায়গাটা ভয়ানক, তাহা আমার জানা ছিল, অর্থাৎ লোকমুখে এই জঙ্গলটির সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম।

রজত বলিল, "ভয়ানক যায়গা! কি রকম ভয়ানক শুনি?"

মাঝি আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনিও শোন নি বুঝি?"

বলিলাম, "শুনেছি অনেক কথাই, কিন্তু কিছুই বিশ্বাস হয় নি। বুঝলে রজত, এখানকার লোকে বলে যে, বামুন-ডাঙ্গার জঙ্গলে রাত্রিতে গিয়ে কাউকে আর ফিরে আসতে হয় নি। রাত্রিতে সেখানে না কি প্রেতের দল নরমুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলে!"

রজত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, "বল কি, এ যে রীতিমত ভৌতিক উপন্যাস! বল হে বুড়ো, তোমার বামুনডাঙ্গার গল্পই খানিক শুনি!"

রজতের হাসি এবং আমার অবিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া বুড়া রতন মাঝি তখন চটিয়া উঠিয়াছে। গল্প বলিবার কোন চেষ্টা না করিয়াই সে আপন-মনে নদীর উচ্ছৃঙ্খল জলে লগি ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু রজতের কৌতূহল তখন অধীর হইয়া উঠিয়াছে; রতনের দিকে চাহিয়া রজত বলিল, "নৌকাখানা না হয় খানিক ধারেই ভিড়োও, তোমার গল্প আমাকে শুনতেই হবে। ভয় নেই তোমার, বৃষ্টি বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।"

হাকিম যখন এতখানি নরম হইয়াছেন, তখন রতনের পক্ষে বামুনডাঙ্গার গল্প না বলিলে আর চলে না, উপরন্তু লাভ—এই বৃষ্টির মধ্যে তাহাকে আর নৌকা বাহিতে হইবে না।

নৌকা তীরে ভিড়িল।

প্রভাত তাহার ফ্লাস্কে করিয়া যে চা-টুকু আনিয়াছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করা গেল। তার পর বুড়া রতন মাঝি আরম্ভ করিল বামুনডাঙ্গার কাহিনী। বলিতে বলিতে বেশ অনুমান করিতে পারিলাম,—তাহার সমস্ত শরীর ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে; হাতের পেশীগুলি অসম্ভব উত্তেজনায় কঠিন হইয়া পড়িতেছে। তাহার কণ্ঠের আবেগে ভাষার দৈন্য এবং গ্রাম্য প্রকাশভঙ্গীর ত্রুটি কোথায় তলাইয়া গেল এবং ক্ষণকালের জন্য আমাদের সকলেরই যেন মনে হইল, বামুনডাঙ্গার সেই ভীষণ জঙ্গল তাহার বিচিত্র বিস্ময় ও আতঙ্ক লইয়া একবারে আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মাঝির কথায় নহে, নিজের ভাষায় রতনের মুখের কাহিনীকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়:—

বামুনডাঙ্গার জঙ্গল চিরকাল না কি এমন ছিল না। আজ সেখানে নিবিড় অরণ্য শাখা-প্রশাখা মেলিয়া সূর্য্যের আলোর প্রবেশপথ অবরোধ করিয়াছে, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সেখানে শুধু ঘর-বাড়ী নহে, সভ্যতা এবং সমৃদ্ধির সকল পরিচয়ই ছিল।

বামুনডাঙ্গার ভূস্বামী শিবেন্দ্রনারায়ণের প্রতাপ ও দম্ভ, ঐশ্বর্য্য এবং খ্যাতি প্রবাদবাক্যের মত নর-নারীর মুখে মুখে ঘুরিত। তাঁহার হস্তিশালা ছিল না, অশ্বশালা ছিল না, সৈনিকদল ও বন্দুক ছিল না; তবু প্রতাপের দিক্ দিয়া তিনি না কি সে কালের কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। বামুনডাঙ্গার জঙ্গলের পাশ দিয়া সঙ্কীর্ণ একটি খাল আজও বহিয়া যাইতে দেখা যায়। খালটির জল অধিকাংশ স্থানেই শুকাইয়া গিয়াছে এবং তাহার এক পাশে নিবিড় অরণ্য ও অপর পাশে বহুদূরবিস্তৃত ধূসর মাঠ ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু শিবেন্দ্রনারায়ণের নাম যখন এই অঞ্চলের প্রতি ঘরে উচ্চারিত হইত, ইহার যৌবন-জল-স্রোতে যখন এমন দৈন্য ঘটে নাই, তখন ইহার দুই তীরে বাঁধা থাকিত সারি সারি বজরা, অগণ্য নৌকা। খালটির নাম ছিল "রূপসী"। আজও তাহার সেই নামই আছে, কিন্তু রূপ নাই এবং যাহাদের লইয়া এই নামের উৎপত্তি, তাহাদের কে কোন্ লোকে গিয়াছে, তাহারই বা সন্ধান কে রাখে?

রূপসীর বুকে প্রতি রাত্রিতে দীপ-সমারোহ হইত; দুই তীরের বজরাগুলি হইতে নারী-কণ্ঠের গীতধারা রূপসীর জলকে চঞ্চল করিয়া তুলিত, রমণীদের বেণী রচনা-কালে কেশধূপবাস চারি পাশের বাতাসকে সুরার মত সুরভিত করিয়া তুলিত;—কত দিক্ ও দেশের রমণীদের আনিয়া এই বজরাগুলিতে স্থান দেওয়া হইত, তাহা বুড়া রতন মাঝির পক্ষে হিসাব করিয়া বলা কঠিন।

শিবেন্দ্রনারায়ণ বিবাহ করেন নাই এবং বিবাহ না করিয়া কি ভাবে তাঁহার দিন কাটিত, তাহার একটু আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। শিবেন্দ্রনারায়ণকে যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছে, তাহাদের মতে, অতখানি কদাকার মানুষ না কি সচরাচর দেখা যায় না। আকৃতির দৈর্ঘ্য তাঁহার আড়াই হাতের বেশী ছিল না, কিন্তু মাংস ও মেদের বাহুল্য সেই ক্ষুদ্র শরীরকে অনেকখানি ভারী করিয়া তুলিয়াছিল।

সামান্য একটু অন্ধকারে তাঁহার দেহের বর্ণ আর বুঝিবার উপায় ছিল না এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের বস্তু ছিল তাঁহার মুখ। বাল্যকালে গুটিকায় তাঁহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া যায় এবং নাকের খানিকটা যায় বসিয়া; অবশিষ্ট চক্ষু তাঁহার ঠিকই ছিল, কিন্তু উহার দিকে তাকাইয়া থাকিবার ক্ষমতা তাঁহার অত্যন্ত নিকটাত্মীয়েরও ছিল না। দৈব তাঁহার একটি চক্ষুর জ্যোতি কাড়িয়া লইয়া আর একটি চক্ষুকে যেন অতিরিক্ত প্রখর করিয়া দিয়াছিল। নিজের আকৃতির কদর্য্যতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, কেহ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিলে শিবেন্দ্রের মনে হইত, নিশ্চয়ই সে তাঁহার বিচিত্র মুখভঙ্গী দেখিয়া হাসিতেছে; কেহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে শিবেন্দ্রের খাস চাকর আসিয়া তাহাকে বাহিরের পথ দেখাইয়া দিতে বিলম্ব করিত না!

স্বাভাবিক জীবন ও সমাজের সহিত শিবেন্দ্রের যোগ ছিল অত্যন্ত অল্প। প্রকৃতি তাঁহার উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, যেন তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতি রাত্রিতে তাঁহার কামনার আগুনে একটি করিয়া নূতন দেহ উৎসর্গ করা হইত; সুরার স্রোত তাহাতে আহুতি ঢালিত; চাটুকারদের স্তুতিবাক্য এবং মত্ত-কণ্ঠের সঙ্গীতে হইত সেই লালসা-যজ্ঞের মন্ত্রপাঠ!

এমনই করিয়া বহু রজনীর উৎসবে যাহারা আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হইত, শিবেন্দ্রনারায়ণের মত তাহারাও থাকিত সমাজ-সংসারের বাহিরে এক একটি বজরায় বন্দিনী হইয়া। এক একটি বজরা ছিল এক একটি বিলাস-কক্ষ;—বহুমূল্য গালিচা, রেশমী কাপড়ের আস্তরণমণ্ডিত উপধান, বিচিত্র বর্ণের সুরাপাত্র, কোন কিছুরই অভাব সেগুলির মধ্যে ছিল না। কয়েক জন করিয়া পাইক একটি একটি বজরা পাহারা দিত, কোন রকমেই তাহাদের পলায়নের পথ ছিল না। এমন করিয়া বহুদিন গেল। কিন্তু প্রতাপ যত বেশী হউক, অত্যাচারের মাত্রা যত উগ্র হউক, চাকা এক দিন ঘুরিয়া গেল।

উপদ্রব সহিয়া সহিয়া প্রজারা একদিন মোরিয়া হইয়া উঠিল।

শিবেন্দ্রনারায়ণের এক জন বিশ্বস্ত মোসাহেব আসিয়া গোপনে সংবাদ দিল, দেশের ছেলে-বুড়ো একবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদেরই এক জন না কি অমাবস্যার রাত্রিতে কোন্ এক জাগ্রত দেবতার কাছে গিয়া শপথ করিয়াছে যে, তিন দিনের মধ্যে অত্যাচারীর রক্ত তাহারা দেখিবেই।

সংবাদ শুনিয়া শিবেন্দ্রনারায়ণের কুৎসিত মুখ নিশ্চয়ই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এবার তাঁহার মনে যে নিষ্ঠুর কল্পনা দেখা দিল, বীভৎসতার দিক্ দিয়া উহা তাঁহার আকৃতি অপেক্ষা ভয়ানক। তিন দিন শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল, তাঁহার বাটীর আর সকলকে দেশান্তরে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রকাণ্ড তিন-মহল বাড়ীতে তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে বিদায় দেওয়া হইল বটে, কিন্তু যে লাঞ্ছিত-যৌবনা রমণীর দল ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে রূপসীর বুক অভিশপ্ত করিয়া তুলিত—তাহাদের মুক্তি মিলিল না; শুধু মুক্তি মিলিল না নহে, তাহাদের স্থান দেওয়া হইল একেবারে বাটীর ভিতর। তার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া সুর ও সুরায়, নূপুরশিঞ্জন ও স্খলিত কণ্ঠের চীৎকারে প্রকাণ্ড অট্টালিকা মুখরিত হইয়া রহিল এবং এমনই করিয়াই এক সময় সূর্য্য অস্ত গেল, রজনীর অন্ধকার দিক্-বিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

রাত্রি একটু গভীর হইলে রমণীদের আবার নিজের নিজের বজরায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং তাহার ঘণ্টাখানেক পরেই দেখা গেল, বামুনডাঙ্গার প্রান্তদেশকে রক্তাক্ত করিয়া দশ বারোখানি বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই আগুন এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ীতে ছড়াইয়া পড়িল; বৈশাখী রাত্রির উতলা বাতাসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমগ্র বামুনডাঙ্গা ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। শিবেন্দ্রনারায়ণের প্রকাণ্ড অট্টালিকাতেও আগুন লাগিল এবং এক সময়ে দেখা গেল, রূপসীর বুকে বজরাগুলিও জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে দিন বামুনডাঙ্গার পথে পথে আশ্রয়-হারা নর-নারীর কি অসহায় করুণ চীৎকার! কত মানুষ মরিল, কত গরু বাছুর পুড়িয়া ছাই হইল, কত শিশু মাতৃস্তন্যের স্বাদ মুখে লইয়া ঘুমে চোখ বুজিয়াছিল—তাহাদের সে ঘুম ভাঙ্গিবার অবসর আর আসিল না; কত লোক সেই রাত্রিতে শেষবার গ্রামের দিকে চাহিয়া যাহা কিছু পারিল, সঙ্গে লইয়া দেশান্তরে ছুটিয়া পলাইল;

বন্দিনী নারীর দল বজরার মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া একসময় রূপসীর জলেই দীর্ঘদিনের জ্বালা শান্ত করিল।

শুনা যায়, বামুনডাঙ্গার দিক্‌প্রান্ত আলো করিয়া যখন আগুনের আভা দেখা দিয়াছে, ছাদের উপর শিবেন্দ্রনারায়ণ তখন তম্বুরা বাজাইয়া দীপক রাগের আলাপ করিতেছিলেন, কিন্তু তার পর তাঁহার কি হইল, তিনি কোথায় গেলেন, সে রহস্যের মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার বিরাট বাসভবন সেই রাত্রিতেই ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরের দিন তাঁহার আত্মীয়স্বজন আসিয়া বহু অনুসন্ধানেও সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হইতে তাঁহার কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পায় নাই।

সেই রাত্রিই বামুনডাঙ্গার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের চরম রাত্রি। তার পর শিবেন্দ্রনারায়ণের বংশের কেহ আর সেখানে বাস করেন নাই। যাহারা পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের কেহ ফিরিয়া আসে নাই। সেই অত্যাচারে ভস্মস্তূপের উপর দিনের পর দিন গাছ ও আগাছা জন্মিয়াছে, মানুষের বদলে পশু আর পাখীরা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে এবং এমনই করিয়া আজ সেখানে নিবিড় অরণ্য আর জীর্ণ ইটের রাশি ছাড়া আর কিছুই নাই!

এমন ঘটনা আরও অনেক যায়গাতেই ঘটিয়াছে এবং ঘটে। ইহাতে বিস্মিত হইবার বা ভয় পাইবার কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই রাত্রির ভয়াবহ ঘটনার কিছু দিন পরেই শুনা গেল, একদা নিশীথে এক ব্যক্তি পথ হারাইয়া বামুনডাঙ্গার সেই রূপসী খালের ধারে গিয়া পড়ে এবং দেখিতে পায় যে, খর্ব্বাকার, বিকৃতদর্শন একটা লোক সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে, সেই বন-জঙ্গলের ভিতর একাকী প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

লোক বলিল, পাগল জমীদারটা মরিয়া ভূত হইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে তিনি যে সব কায করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আর যেখানেই যান, স্বর্গে যে তাঁহার স্থান হইবে না, এ কথা সকলেই বিশ্বাস করিত। সুতরাং জমীদারের প্রেতদেহ পরিগ্রহ করিবার খবরটা বাতাসের মুখে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ক্রমে বামুনডাঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়া এত রকমের এত কাহিনীর সৃষ্টি হইল যে, সেগুলি বিশ্বাস করিতে গেলে বলিতে হয় যে, বামুনডাঙ্গা এই বাঙ্গালা দেশেরই একটা স্থান নহে, উহা প্রেতলোকের একটা অংশ।

রতন মাঝিই ত তাহার ঠাকুরদাদার মুখে শুনিয়াছে—এক বর্ষাকালে পথ ভুলিয়া একখানি নৌকা সদ্যোবিবাহিত বর ও কন্যা লইয়া ভুলক্রমে রূপসীর খালে আসিয়া পড়ে এবং নৌকা খালে প্রবেশ করিতেই কোথা হইতে প্রবল ঘূর্ণীবায়ু পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া নিমেষের মধ্যে পাল ছিঁড়িয়া, নৌকা উল্টাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আকাশে তখন মেঘের লেশ ছিল না, ঝড়-বৃষ্টির সময়ও সেটা নহে। এই ঘটনাটি যে বামুনডাঙ্গার দেহহীন, অদ্ভুত কতকগুলি অধিবাসীর কাণ্ড, তাহা রতনের ঠাকুরদাদাও বিশ্বাস করিতেন এবং রতনও করে।

কথা শেষ হইলে রতন খানিক স্তব্ধ থাকিয়া উত্তেজনা শান্ত করিয়া লইল; তাহার পর বলিল, "এই জন্যেই কেউ কোন কালে ওই অলক্ষুণে মাঠের ত্রিসীমানায় যায় না। বুড়োর কথায় যদি বিশ্বাস থাকে বাবু, তা হ'লে আপনাদের বলি, সেখানে যাবেন না।"

কিন্তু বুড়ার কথায় রজত বিশ্বাস করে নাই, আমিও না।

রজত বলিল, "তোমার ভয় নেই, রতন, আমরা অন্ধকার হবার আগেই ফিরে আসব। যখন বেরিয়েছি, তখন ফিরে যাওয়াটা ভাল হয় না। তোমাকে ভাল রকম বখশিস করব, চালিয়ে চল।"

হাকিমের কথা অমান্য করিবার সাহস না থাকাতেই হউক বা মোটা বখশিসের লোভেই হউক, রতন শেষ পর্য্যন্ত রাজী হইয়া গেল।

আকাশের জল এবং ঝড়ের বেগও তখন কমিয়া আসিয়াছে।

নদী-তীর হইতে আমাদের প্রায় দেড় মাইল হাঁটিয়া যাইতে হইবে; নহিলে এই দিক্‌টায় কেবল তৃণশূন্য, বন্ধ্যা মাঠ। রতন নৌকা ভিড়াইয়া সেইখানেই রহিল, আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

চিরকাল দেখিয়াছি, রজতের ঝোঁক যে দিকে পড়ে, কিছুতেই তাহাকে উহা হইতে বিচ্যুত করা যায় না। ইঞ্জিনিয়ারি পড়িতে গিয়া রজত কলেজে আসিয়া ফিলজফির তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছিল এবং সকলের ঘোর আশঙ্কা সত্ত্বেও সম্মানের সহিত পরীক্ষা-সমুদ্র পার হইয়াছিল। এম্-এ

পাশ করিয়া দিনকতক সে এম, এস-সি ক্লাসে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ এক দিন শুনা গেল, সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দিবে বলিয়া সে বিলাত যাইবার পাসপোর্ট সংগ্রহ করিয়াছে। এবার শিকারে আসিয়াও প্রতিপদে রজত সেই খেয়ালের পরিচয় দিতে লাগিল। বনের মধ্যে আসিয়া যখন হরিয়েল দূরে থাকুক, একটা ঘুঘুর সন্ধান পর্য্যন্ত মিলিল না, তখন রজত বলিল,—"চল, উত্তরদিকে যাওয়া যাক ; সেখানে এক আধটা পাখী হয় ত মিলতে পারে।"

উত্তরদিক ধরিয়া তিন ক্রোশ যাওয়া হইল, কিন্তু কোথায় কি ! এমনই করিয়া, অনর্থক হায়রাণ হইয়া তিন জনে যখন নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা আর নাই, তরুশ্রেণীর আড়ালে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে এবং অন্ধকার নামিতে দেখিয়া বুড়া রতন মাঝি হাকিমের মেজাজের কথা বিস্মৃত হইয়া, মোটা বখশিসের আশা ত্যাগ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছে !

পরস্পরের প্রতি নির্ব্বোধের মত চাহিয়া তিন জনে কতক্ষণ সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার নদীতটে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রভাত বলিল, "ছোট মেয়েটার জ্বর দেখে এসেছিলাম, মনটা বড় চঞ্চল। এমন যে হবে, তা কে জান্‌ত !"

আমিও বিশেষ প্রসন্ন হই নাই এবং আমার অস্থির-মতি, দুঃসাহসিক হাকিম বন্ধুর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখে আনন্দের কোন পরিচয়ই নাই। মানুষের বসতিহীন নদীতীর, চারিদিক্ সকালের বৃষ্টিতে কর্দ্দমাক্ত, উল্লাস-বোধের কোন কারণও বোধ করি ছিল না। রজতকে দেখিয়া মনে হইল, রতন মাঝিকে এই সময় হাতের কাছে পাইলে হরিয়ালের বদলে তাহাকেই সে বুঝি গুলী করিয়া মারিত। কিন্তু সে এতক্ষণ বাড়ী গিয়া নিরুপদ্রবে ঘুমাইতেছে ; সুতরাং আমাদের এখন লোকালয়ের সন্ধান না করিলেই নহে !

কতক্ষণ যে পথ চলিয়াছিলাম, এত কাল পরে তাহা আর ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই, কিন্তু মনে আছে— চলিতে চলিতে পায়ে অসহ্য বেদনা বোধ করিয়াছিলাম এবং অন্ধকারের মধ্যে বন্য লতাপাতা, কাঁটার ঝোপঝাড় ঠেলিতে ঠেলিতে পায়ের নীচে দিয়া বহু প্রকার জীব নানাপ্রকার সাড়াশব্দ করিয়া সরিয়া গিয়াছিল।—কোথাও বা সাপ, কোথাও নেউল এবং কোথাও রাত্রিচর শৃগাল। কিন্তু এ সব তুচ্ছ বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় তখন আমাদের নহে, আমরা শুধু অগ্রসর হইয়া চলিলাম।

টর্চ্চের আলোয় বন-পথ মধ্যে মধ্যে আলোকিত হইয়া উঠিতেছে—পরক্ষণেই আবার সব অন্ধকার এবং সে অন্ধকার যেন পূর্ব্বের অপেক্ষা গাঢ় ! যাইতে যাইতে মনে হইয়াছিল, আমরা যেন রূপকথার সেই তিন বন্ধু—মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র এবং রাজপুত্র, অন্ধকারের মধ্যে যাহারা একদা কোন্ ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে বাহির হইয়া, পথ হারাইয়া তিন জনে তিন দিকে চলিয়া গিয়াছিল ; তাহার পর কত বিপদ, কত দৈবদুর্ব্বিপাকের অবসানে তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের আশঙ্কা হইতেছিল, কেহ কাহাকেও হারাইয়া না ফেলি। কিন্তু হারাইতে কাহাকেও হয় নাই—বোধ হয়, কোন নিদ্রিতা তরুণী রাজ-বালার নিদ্রা ভাঙ্গাইবার সম্ভাবনা আমাদের ছিল না বলিয়া।

এমনই করিয়া চলিতে চলিতে এক সময় মনে হইল, আমরা এক বিরাট ধ্বংসস্তূপের নিকট আসিয়া পড়িয়াছি।

পায়ে এখন আর সকল স্থানে কাদা লাগিতেছিল না, মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইটের উপর পা পড়িয়া যাইতেছিল।

প্রভাত কহিল, "এইবার বোধ হয় লোকালয়ের কাছা-কাছি এসে পড়েছি হে—টর্চ্চগুলি জ্বালো দেখি।"

দুইজনের টর্চ্চের আলো পরমুহূর্ত্তে আমাদের সম্মুখের পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। দেখিলাম—চারি-দিকে ঘন বন ; বনের বড় বড় গাছগুলি উদ্ধত স্পর্দ্ধায় মাথা ঠেলা দিয়া বহু উর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং তাহাদের ভিড়ের ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক বোধ করি প্রবেশের পথই পায় না। বনের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি বাড়ীর কঙ্কাল ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে—কোথাও বা দুইটা থাম, কোথাও বা এক রাশ ইট, এমনই চারিদিকে ! জনমানব সম্প্রতি এখানে বাস করিয়াছে, এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

প্রভাতকে বলিলাম, "খুব শীগ্‌গির এখানে লোকালয় আবিষ্কার করতে পারা যাবে ব'লে ত মনে হয় না। সম্ভবতঃ এটা পুরাকালের কোন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ—"

প্রভাত বলিল, "তোমার অনুমান নিতান্ত ভুল নয়,

আমরা বোধ হয়, রূপসীর খালের কাছে এসে পড়েছি—ওটা বোধ হয় সেই পাগলা জমীদারের বাড়ী—আগুন লেগে এক দিন যেটা পুড়ে গিয়েছিল।"

হঠাৎ কোন কথা বলিতে পারিলাম না। আজ সকাল হইতে যে বামুনডাঙ্গার মাঠ ও উহার বহু বিচিত্র কাহিনী আমার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পাকেচক্রে ঠিক তাহারই সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম! অথচ, দিনের বেলা কত কষ্টেই না রজতকে এই স্থানে আসা হইতে নিরস্ত করিয়াছিলাম।

প্রভাত বলিল, "এখানে অপেক্ষা করা আদৌ যুক্তিযুক্ত হ'বে না, চল, এগিয়ে যাওয়া যাক্।" তাহার কণ্ঠে স্পষ্ট শঙ্কার সুর বাজিল।

কিন্তু রজতকে থামাইবে কে!

উৎসাহ-প্রদীপ্ত কণ্ঠে রজত বলিল, "বল কি প্রভাত! এত বড় একটা রহস্যের দ্বারে এসে ফিরে যাব—আজকের য়্যাড্‌ভেঞ্চারটা অসমাপ্ত রেখে!—আজ রাত্রিতে আমরা এইখানে থাক্‌ব।"

প্রভাত কহিল, "কোথায় থাকবে এখানে? যায়গা কৈ?"

রজত বলিল, "যায়গা ঢের রয়েছে, খুঁজে নিলেই হবে—ঐ ভাঙ্গা বারান্দাগুলোর নীচে বা যেখানে হোক্।"

এই ধ্বংসপুরীর মধ্যে রাত্রিযাপনের আকাঙ্ক্ষা যে আমারও ঠিক ছিল, এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু সেই রহস্যময় স্থান ও তাহার অদ্ভুত পরিবেষ্টনী যেন মনের মধ্যে অগোচরে এক ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছিল, তাই জোর করিয়া রজতের প্রস্তাবে 'না'ও বলিতে পারিলাম না।

টর্চ্চের আলো ফেলিয়া শয়নের উপযোগী স্থান অন্বেষণ চলিতে লাগিল।

এখানে-সেখানে যে ইষ্টকস্তূপগুলি পড়িয়া আছে, তাহার উপর আগাছা গজাইয়াছে; শিবেন্দ্রনারায়ণের প্রকাণ্ড অট্টালিকার যে অংশগুলি বহুদিনের ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র সহ্য করিয়া তখনও দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার উপর অশ্বত্থের চারা উঠিয়াছে, পুরু শ্যাওলা জমিয়াছে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রকাণ্ড একটা শেয়াল সেখানে তাহার কোন ভোজ্য বস্তু লইয়া ব্যস্ত ছিল, আমাদের অনধিকার-প্রবেশে বিরক্ত হইয়া সে একবার চীৎকার করিয়া উঠিল, তার পর অন্ধকারের মধ্যেই কোন্ দিকে চলিয়া গেল।

খানিকটা অগ্রসর হইতে বুঝিলাম, এই স্থানটা এককালে মর্ম্মরমণ্ডিত ছিল; আগুনের উত্তাপে সেই মর্ম্মরখণ্ডগুলি পরে ফাটিয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর উপরে উঠিবার সিঁড়িটার খানিকটা তখনও বাহাল ছিল, কিন্তু রজতকে বহু চেষ্টায় উপরে উঠিতে নিরস্ত করিলাম এবং নীচেই শয়নের ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। সাপে যদি না কামড়ায়, তাহা হইলে আজ রাত্রিপ্রভাত হইলে বাড়ী ফিরিবার কথা চিন্তা করা যাইবে।

ক্লান্ত প্রভাত অল্পকালের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাকিম-বন্ধু রজত ক্যাম্বিসের থলিয়া মাথায় দিয়াছে এবং থলিয়া হইতে একটি মোমবাতি বাহির করিয়া মাথার কাছে জ্বালিয়া রাখিয়াছে। ছ'পেন্স সিরিজের রোমাঞ্চকর ইংরাজী উপন্যাস কোথাও যাইতে হইলে সে সঙ্গে লইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একখানা বই লইয়া এই রাত্রিতে সে পড়িতে সুরু করিয়াছে।

কেবল ঘুম আসিতেছে না আমার; রজতের কাছ হইতে একটা বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ উহার প্রতি মনোযোগপ্রদান সম্ভব হইল না। ক্যাম্বিসের থলিয়া মাথায় দিয়া আমি নিঃশব্দে উপরের আকাশের দিকে চাহিয়া আছি। আকাশ তারায় তারায় ভরিয়া গিয়াছে—কৃষ্ণপক্ষের রাত, তাই তারাগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে পড়িতেছিল—রতনমাঝি-বর্ণিত এই বামুনডাঙ্গার বিচিত্র কাহিনী। এই সেই স্বেচ্ছাচারী জমীদারের বিলাসের লীলাক্ষেত্র। এক দিন এখানে মানুষের হৃদয়, সম্ভ্রম ও সতীত্বের উপর কি অত্যাচারই না চলিয়াছিল। আজ সেইখানেই আমি শুইয়া আছি। এক দিন এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার ঘরে ঘরে বিলাসিনীদের বিদ্যুৎ-তীব্র কটাক্ষ ঝলসিয়া উঠিত; ঐশ্বর্য্যের পায়ে, উৎপীড়নের ভয়ে রমণীদের যৌবন বিক্রয় করিতে হইত—উপভোগ-শেষে তাহাদের বিদায় করিয়া দেওয়া হইত—রূপসীর জলের উপর সজ্জিত বজরার বুকে। আজ তাহারা নাই। শিবেন্দ্র-নারায়ণও নাই। এই অট্টালিকার মধ্যে আগুনে পুড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কি না, জানি না, হয় ত হয় নাই; কিন্তু আজ তিনি নাই। এই জরাজীর্ণ ইষ্টকস্তূপ ছাড়া তাঁহার কোন পরিচয়ই আজ পৃথিবীতে নাই। হঠাৎ মনে হইল, আমি যেন পুরাতন রোমের এক বিলাস-কক্ষের

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি! আমার চারিদিকে সুন্দরীদের হাস্য-কলরোল, গোলাপ-ফুলের রাশি রাশি গুচ্ছ; সাদা ফুলের মালা দিয়া তরুণীরা তাহাদের সোনালী চুলের কবরী সাজাইয়াছে। কাহারও হাতে বীণা, কাহারও হাতে ধূপাধার। সম্মুখে ফোয়ারা হইতে সুগন্ধি জল উঠিয়া মর্ম্মর-মণ্ডিত সোপানগুলির উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। অদূরে সুন্দরীপরিবৃত সম্রাট, বল্লমধারী সৈনিকদল তাঁহার পার্শ্বরক্ষা করিতেছে!—দেখিতে দেখিতে সে সব কোথায় মিলাইয়া গেল। মনে হইল, সেই বিলাস-কক্ষ হঠাৎ পুরাতন হইয়া গিয়াছে, সেখানে আর সুন্দরীদের সুকোমল চরণস্পর্শ মিলে না, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ ঘুরিয়া বেড়ায়; দালানের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামগুলি নিশীথ-আকাশের তলে দাঁড়াইয়া শুধু অতীত কালের স্বপ্ন দেখে!

পাগল হইয়া গেলাম না কি! কোথায় সুদূর রোমের বিচিত্র বিলাস-নিকেতন, আর কোথায় বামুনডাঙ্গার মাঠের প্রান্তে এই ভাঙ্গা অট্টালিকা!

রঞ্জতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া দেখি, আমি যতক্ষণ চোখ বুজিয়া রোমের ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তাহার মধ্যে মোমবাতিটা কখন্ নিভিয়া গিয়াছে এবং বুকের উপর রোমাঞ্চকর উপন্যাসখানি রাখিয়া রঞ্জত নিদ্রায় নিশ্চেতন!

চারিদিকে শুধু গাঢ়, ছিদ্রহীন অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হইল, যে রমণীরা এক দিন এই অট্টালিকার কক্ষে জীবনের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী বিলাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারা যেন ইষ্টকস্তূপগুলির মধ্যে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে, আমি তাহাদের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছি!

রঞ্জতকে ডাকিতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না।

চারিদিকে কি বিচিত্র স্তব্ধতা!

যে পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতে মনে হইল, কে যেন হাতছানি দিয়া আমাকে ডাকিতেছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, এক নারীমূর্ত্তি—ক্ষীণ দেহখানি জ্যোৎস্নার মত শুভ্র বস্ত্রে আবৃত।

উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিলাম; কিন্তু রমণীমূর্ত্তি ততক্ষণে সেখান হইতে নামিয়া মাঠে পা দিয়াছে।

বলিলাম, "কোথায় চলেছ? আমাকেই বা কোথায় যেতে হবে?"

"বামুনডাঙ্গার মাঠে। রূপসীর ধারে। চল না।"

বলিলাম, "চল।"

তার পর সেই অগ্রগামিনী নারী-মূর্ত্তির সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা মাঠ পার হইয়া আসিলাম, একটি খালের ধারে। খালটি সঙ্কীর্ণ এবং তাহার দুই ধারে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।

রমণী-মূর্ত্তি খালের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, "এইখানে—"

বলিলাম, "কি হয়েছিল, এখানে?"

কিন্তু প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া রমণী হঠাৎ কাঁদিতে সুরু করিল এবং তাহার সেই ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে নিস্তব্ধ মাঠ ও রাত্রি যেন চমকিয়া উঠিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছিল এখানে?"

ক্রন্দনের বেগ একটু শান্ত করিয়া রমণী জবাব দিল, "একদিন এই খালের ধারে সারি সারি নৌকা বাঁধা থাকত—"

"সে কথা আমি জানি। কি হয়েছিল তাই বল।"

"এই নৌকোগুলির একটিতে তারা আমার মেয়েকে আটকে রেখেছিল। আমার একটিমাত্র মেয়ে—দুধে-আলতায় রং, হরিণের মত ডাগর দুটি চোখ।"

"কি করল তারা তোমার মেয়েকে?"

"শ্বশুরবাড়ী থেকে সবে এসেছে—এমন সময় জমীদারের পাইক-পেয়াদা এসে তাকে বেঁধে নিয়ে গেল। চোখের সামনে দেখলাম, সাহস ক'রে একটি কথা বলতে পারলাম না। তার পর এক দিন সেই নৌকোতেই তার সর্ব্বনাশ হ'ল।"—আবার তাহার কান্নার করুণ রব নিশীথ-রাত্রিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

বলিলাম, "আমার সময় নেই, শীগ্‌গির শেষ কর তোমার কথা। আমায় বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে হবে।"

রমণী বলিল, "এমনই কত মা তার মেয়ে খুইয়েছে, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু শুধু সর্ব্বনাশ করেই ত থামল না, ওরা ওকে পুড়িয়ে মারলে বাবা—পুড়িয়ে মারলে! এক দিন রাত্রিতে সারি সারি বজরা-নৌকোয় আগুন জ্ব'লে উঠল, কত মায়ের কত অভাগী মেয়ে সেগুলির মধ্যে পুড়ে মরল। সে আগুন আজও জ্বলছে; দেখবে?"

সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, রূপসীর বুকে সারি সারি বজরায় আগুন লাগিয়াছে, ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে যাহারা জরীর কায-করা মখমলের পাদুকা ও রঙীন পেশোয়াজ পরিয়া এবং চোখে সুর্ম্মা আঁকিয়া নিজেদের যৌবনের ডালা সাজাইয়া জমীদারের মনোরঞ্জন করিতেছিল, তাহাদের বিকট আর্ত্তনাদে চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে! পোড়া মাংসের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"থাম, থাম!"

*　　*　　*　　*

গায়ে ধাক্কা দিয়া রজত বলিল, "কি হয়েছে? চীৎকার কিসের?"

চোখ চাহিয়া দেখিলাম, রূপসীর বুকে বজরায় আগুন লাগে নাই; আমি সেই ভাঙ্গা অট্টালিকার মধ্যেই রজত ও প্রভাতের পাশে শুইয়া আছি। আমার চীৎকার শুনিয়া মোমবাতিটা জ্বালিতে রজত ভুলে নাই।

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতি

কালের বিষাণে বাজে অহরহ বিলয়-গীতা,
তারে অবহেলি খেলা কর কে গো অ-পরাজিতা?
কবরীতে রবি-চন্দ্র-তারায়
মরণ মারণ-মন্ত্র হারায়
লোকে লোকে হাসি উঠে উচ্ছ্বাসি অপরিমিতা,
কে হাসিছ তুমি চিরবিজয়িনী অ-পরাজিতা?

চিকুরে নিখিল নিশার তিমির কাজল-মায়া,
নয়নে ঘনায় মেঘ-করুণায় স্নিগ্ধছায়া।
বজ্রের গুরু গর্জ্জন-গান
আঁখি ইঙ্গিতে কর হতমান,
তড়িদাভরণে দীপ্ত তোমার জলদকায়া,
নয়নে তোমার কাজল মেঘের সজল ছায়া:

নিরবধি কাল বিপুলা ধরণী চেতনহারা,
চৌদিক ঘিরে মৃত্যু-শীতল অন্ধ কারা,
স্পন্দন-হীন নিঃসাড় বুক
স্তব্ধ, কঠিন, অচেতন, মূক,—
তপন-দীপ্তি নিভে নিভে আসে বিকারে সারা,
নীহারিকা-বেগ থেমে আসে ঘেরে মৃত্যু-কারা।

লোল-আবরণ শিথিল মাংস ঝুলিয়া পড়ে
দুয়ারে মরণ, দুনয়নে তাই সলিল ঝরে:
জ'মে থাকে জল শীর্ণ কপোলে
বিশাল বারিধি গড়িয়া সে তোলে;
ব্যথা-বিবর্ণ সারামুখ তার কথা না সরে,
জীবন-বিরহে মৌন-ব্যথায় অশ্রু ঝরে।

সৌর কিরণ বৃথা সেধে যায়, ঘনায় নিশি,
বর্ষা-বাদল সমবেদনায় আঁধারে দিশি।
মৃত্যু-দুয়ারবর্ত্তিনী, হায়,
শূন্য নয়নে তারি পানে চায়,
শেষ নিশ্বাসে ঋর বায়ুবেগ রয়েছে মিশি,
মরণ-বাদল নয়নে ঘনায় আঁধার দিশি।

*　　*　　*　　*

বল যাদুকরী, কি মায়াদণ্ড পরশ-ছলে
বিন্দু পরাণ দিলে তুমি দান সিন্ধুজলে?
ভ'রে গেল বুক স্পন্দনে তার
সঞ্জীবনীর ছন্দে এবার,
রক্ত-কণায় জীবনোৎসব দীপ্তি জ্বলে,
রক্ত-বীজের শক্তি দিলে কি সিন্ধুজলে?

সেই হ'তে আজো স্থবিরা ধরণী—মরি যে লাজে,
রূপ, রস, গান, গন্ধে নিয়ত নবীনা সাজে।
বক্ষ ঢেকেছে হরিত-চ্ছদে,
ঝরে ক্ষীরধারা নদী' হ্রদনদে,
জনপদ-মণি উলসিছে হার-কাঞ্চীমাঝে;
বর্ণ-কুসুম আভরণ পরি নবীনা সাজে।

জীবন-উৎস-উৎসব ছায় সকল ভিতে,
পারেনি কালের লোলুপ রসনা লেহিয়া নিতে।
যুগ যুগ ধরি শত চেষ্টায়,
পরাহত কাল ফিরে ফিরে যায়—
উজ্জ্বল ধরণী কি মহা আলোক, গন্ধে গীতে,
পারে নি ত কাল নিঃশেষে আলো নিভায়ে দিতে

বল মায়াময়ি, বল মোরে বল ক্রীড়ন-শীলা,
যুগে যুগে তব এ কি বিচিত্র-সৃষ্টিলীলা?
লোকে লোকে তব খেলাঘর ছায়—
কালের মারণ-মন্ত্র হারায়,
ভাঙ্গা-গড়া লয়ে এ কি এ রঙ্গ, হে রঙ্গিলা,
কাল সনে, কালি, একি বিচিত্র খেলার লীলা!

শ্রীজগৎমোহন সেন (বি. এস, সি, বি, এল্)।

মায়ের প্রাণ

১

গৌরের মার গৌর সাত দিনের জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িল। গ্রামের একমাত্র ডাক্তার ধরণী বাবু। পাশের গাঁয়ে রোগী দেখিয়া ডাক্তার এই পথে ফিরিতেছিলেন, গৌরের মা দেখিতে পাইয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল।

গৌরের মা নিঃস্ব বিধবা। প্রতিবাসীদের দরজায় চাহিয়া-চিন্তিয়া এবং বাড়ীর শাক-পাতা, ফল-মূল বিক্রয় করিয়া দিন কাটাইয়া থাকে। সে ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বাবা-ঠাকুর! টাকা-পয়সা আমার কিছু নেই। দীনদুঃখী মানুষ আমি, কৃপা ক'রে আমার গৌরকে তুমি বাঁচাও।"

দাওয়ার একপাশে খুঁটায় বাঁধা হৃষ্টপুষ্ট একটি নধরকান্তি ছাগশিশু মাটীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। ডাক্তার লোলুপ-দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়াছিলেন। অকস্মাৎ করুণায় বিগলিত হইয়া কহিলেন, "তোকে আর বল্‌তে হবে কেন? গরীব-দুঃখীকে দাতব্য করেই ত ধরণী ডাক্তার আজন্মকাল আসছে। ওষুধ আমি দিচ্ছি, দেবও দরকার হ'লে। তবে ঐ ছাগলটাকে এখুনি সরিয়ে ফেলতে হবে কিন্তু। ওর গন্ধে ত ওষুধের ফল হবে না, বাছা! এ যে একেবারে আমেরিকার থেকে আনানো ওষুধ।"

বিন্দুর পিসী পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। পিসী ও গৌরের মা প্রায় সমস্বরে কহিল, "ঐ আমবাগানে পাঁটা আমরা রেখে দিচ্ছি, বাবা। বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসতে পাবে না ও।"

ডাক্তার ঘন ঘন শিরঃসঞ্চালন করিতে করিতে কহিলেন, "না—না—সে হয় না। যা হোক একটা জীব ত বটে। শেষে কি মানুষের ভোগে না লেগে শেয়াল-কুকুরের পেটে যাবে! সেও ত ভাল কথা নয়।" বলিয়া গভীর চিন্তার পর এই দুরূহ সমস্যার তিনি মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "দে তুই ওটাকে,—ও আমার বাড়ীতেই পাঠিয়ে দে, বাছা! আর ধরতে গেলে শুধু হাতে ওষুধ নিলে ফলও হয় না। ঐ তোর ওষুধের দাম হয়ে গেল।"

উমাচরণ ঔষধের শিশি লইয়া প্রাঙ্গণের উপর দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "যা দেখি চরণ, পাঁঠাটাকে পৌঁছে দিয়ে আয় আমার বাড়ী।"

গৌরের মা ছুটিয়া গিয়া ছাগশিশুটিকে তুলিয়া লইয়া কহিল, "না—ও থাক, বাবা।" বলিয়াই দুই বাহুবেষ্টনে বুকের ভিতর তাহাকে চাপিয়া রাখিল।

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "থাকবে কেন, তাই শুনি?"

গৌরের মা কোন জবাবই করিল না। সে নিঃশব্দে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন, "দিবি না, এই ত তোর কথা? আর আমি বিনা পয়সায় রাজপুত্তুরকে তোমার ব'সে ব'সে ওষুধগুলো আমার গেলাব! তেমনই আহাম্মুখই পেয়েছ আমাকে!" বলিয়াই ক্রোধভরে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

গৌরের মার আচরণে বিন্দুর পিসীও বিরক্ত হইয়াছিল। রুষ্টমুখে কহিল, "এখন ছেলের চিকিচ্ছের কি হবে?"

গৌরের মা ইহারও কোন কূল-কিনারা করিয়া উঠিতে পারিল না। ডাক্তার ডাকিবার অর্থের সংস্থান তাহার নাই। অথচ পুত্রাধিক প্রিয় এই ছাগ-শিশুটিকে যে সে কেমন করিয়া মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিবে, ইহারই নিদারুণ দুর্ভাবনায় সে নিরুপায়ের মত চাহিয়া রহিল।

পিসীর সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি রুষ্ট-মুখে বাহির হইবার সময় কহিলেন, "ঢের দেখেছি বাছা, কিন্তু ছাগল-পাটার এমন সোহাগ কখনও দেখি নি!"

গৌরের মার আর হিতাহিতজ্ঞান রহিল না। রুগ্ন পুত্রের চিন্তায় সে অস্থির হইয়াছিল। এখন পিসীর এই উক্তিতে সে ক্রোধ, ক্ষোভ ও মর্ম্মজ্বালায় ছাগশিশুটিকে দুম করিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তুই মর,—মর,—মর! এত যন্ত্রণা আর আমার সয় না। তোর জন্যই ত লোকের কাছে আজ কথা শুনতে হলো?" বলিতে বলিতে উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে গৃহকোণে গিয়া সে বসিয়া রহিল। এই ছাগ-বৎসটিকে সে নিজের গর্ভজাত সন্তানের মতই স্নেহ করিয়া থাকে। মাতৃহারা এই জীবটিকে অনেক দুঃখে কষ্টেই এত বড় সে করিয়া তুলিয়াছে। কেমন করিয়া তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, ইহার জননী মৃত্যুর সময় তাহারই করে সন্তানটিকে সঁপিয়া দিয়া, তবে সে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। তাহাকেই এখন অপরের হস্তে তুলিয়া দিবার কল্পনায় গৌরের মার সমস্ত দেহ যেন কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল।

এ দিকে রুগ্ন পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া ত্রাসে ও দুর্ভাবনায় কি যে সে করিবে, তাহার কোন কূল-কিনারাই সে করিয়া উঠিতে পারিল না।

প্রাঙ্গণস্থিত তুলসী-তলায় উপুড় হইয়া পড়িয়া সে মাথা কুটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! গরীব-দুঃখীর তুমিই ভরসা! তুমিই ব'লে দাও ঠাকুর, আমি কেমন ক'রে ওকে আজ বিদায় ক'রে দেব? ও যে আমার গচ্ছিত ধন।" ইহার পর সে তুলসীতলার মাটী আনিয়া পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে লাগাইয়া দিল। ছোট ছোট বড়ী করিয়া তুলসীর সত্ত দিয়া পুত্রকে পান করাইয়া কহিতে লাগিল, "এই আমার হরি ঠাকুরের অষুধ। গরীবের অসুখ এতেই ভাল হয়ে যাবে।"

ছাগ-শিশুটি এক পাশে নিৰ্জ্জীবের মত পড়িয়াছিল। গৌরের মা তাহাকে অপরিসীম স্নেহে বুকে তুলিয়া লইল। সে যে ছাগ-বৎসটির মৃত্যুর কথা মুখ দিয়া বাহির করিয়াছিল, এখন নিজেরই সেই উচ্চারিত কথা কয়টা গুরুভার পাষাণের মত তাহার বুকে চাপিয়া তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সে কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিতে লাগিল, "মায়ের মুখের গাল-মন্দতে সন্তানের কিছু অমঙ্গল হয় না। হরি ঠাকুর সে কথা বেশ জানেন।"

কিন্তু তবুও সে নিজেকে কোনমতেই শান্ত করিতে পারিল না। একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় বক্ষঃস্থল তাহার দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সে পাটাটিকে সযত্নে বক্ষে চাপিয়া তুলসীতলায় আসিয়া "হরি-বল, হরি-বল," বলিয়া কত যে ঝাড়-ফুঁক আর কত যে আবেদন-নিবেদন ঠাকুরের চরণে জানাইতে লাগিল, তাহার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

২

কোন রকমে আরও চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল; কিন্তু তার পর আর কাটিতে চাহিল না। গৌর একবারে যায় যায় হইয়া পড়িল।

প্রতিবাসীরা আসিয়া যাহার যাহা খুসী অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পিসী আজ মুখ খুলিয়া দিলেন, "এখন ছাগল-পাটার সোহাগ কোথায় থাকল? একটা কিছু ভাল মন্দ না হ'লে তোর ত জ্ঞান হবে না।"

পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া আজ আর গৌরের মা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার বুকের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র একটি আমবাগানের পরেই গ্রামের বিশালাক্ষীর মন্দির। গৌরের মা ছুটিয়া আসিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল

এ একটা নূতন রকমের তামাসা। গাঁয়ের লোক ভিড় করিয়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল। পুরোহিত পূজা মানসিক করিবার জন্য বারবার তাড়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় তাহাকে দিয়া যাহা বলাইলেন, গৌরের মা তাহাই অকপটে আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল। "হে মা কালী!—হে মা দুর্গা! আমি পাঁঠা দিয়ে ষোড়শোপচারে তোমার পূজো দেব। আমার ছেলেটিকে তুমি রক্ষা কর, মা!"

ইহার পর সেই যে গৌরের মা মরণোন্মুখ পুত্রকে কোলে করিয়া মন্দির-সংলগ্ন বিল্ববৃক্ষতলে বসিয়া রহিল, ঠিক তেমনই ভাবে তিন দিন তিন রাত্রি ঠায় এক ভাবে সে বসিয়া কাটাইয়া দিল। এক বিন্দু জল তাহাকে কেহ স্পর্শ করাইতে পারিল না।

দলে দলে লোক আসিয়া তামাসা দেখিয়া যাইতে লাগিল। ভদ্র সজ্জন যাহারা, তাহারা বিজ্ঞের মতই মাথা নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন, "ছোট লোক এমনি করেই ত মরে! ও ছুটোই এবার শেষ হবে দেখছি।" কিন্তু চতুর্থ দিবসে এই ছোট জাতের কন্যা যখন কালের করাল কবল হইতে সত্য সত্যই তাহার পুত্রকে মুক্ত করিয়া ঘরে ফিরিল, তখন পুরুষ-নারী, ভদ্র-অভদ্র সকলেরই বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

মাসখানেকের ভিতর গৌর ক্রমশঃ সুস্থ-সবল হইয়া কাযকর্ম্ম আরম্ভ করিল। কিন্তু পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া মাতার এতটুকু আনন্দ তাহাতে বাড়িল না। বরঞ্চ ক্রমশঃ তাহার মুখ মলিন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। এক দিন রুগ্ন পুত্রকে রক্ষা করিতে যে মানস-পূজার প্রার্থনা সে দেবীর চরণে নিবেদন করিয়াছিল, এখন সেই কথা স্মরণ হইলে মাথার ভিতর তাহার দপ্-দপ্ করিয়া উঠিতে থাকে। গৃহ-কর্ম্ম করিতে সে আজকাল অন্যমনস্ক হইয়া কত কি যেন ভাবিতে বসিয়া যায়। আবার এক এক দিন ছাগ-শিশুটির গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে তাহাকে গৌরের মা অভিষিক্ত করিতে থাকে।

আজ অপরাহ্নে পঞ্চুর মাসী বেড়াইতে আসিয়াছিল। অজ্ঞাতে সে গৌরের মার সেই অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ব্যথার স্থানটিতে নাড়া দিয়া বসিল। কহিল, "ছোট বউ, আর দেরী করিস নে? মা বিশালাক্ষীর পূজোর ব্যবস্থা ক'রে দে, বাছা!"

গৌরের মার বুকের ভিতর দ্রুতস্পন্দন আরম্ভ হইল; পাছে ছাগ-শিশুকে উপলক্ষ করিয়া কিছু একটা বলিয়া বসে, এই আশঙ্কায় সে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে যাইতেছিল। কিন্তু পঞ্চুর মাসী পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলিল, "বলা ত কিছু যায় না? পূজো না পেয়ে মার রাগ হতেও ত পারে? আর পাঁটা যখন বাড়ীতেই তোর রয়েছে। বলির ব্যবস্থা ক'রে ও ল্যাঠা তুই চুকিয়ে ফ্যাল।"

গৌরের মা একবারে চেঁচাইয়া উঠিয়া কহিল, "চুপ কর, মাসী! তুমি বাড়ী যাও, আমার ঢের কায আছে?"

ছাগ-শিশুটি প্রাঙ্গণের এক পাশে পড়িয়াছিল। ছুটিয়া গিয়া তাহাকে একবারে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া গৌরের মা কহিতে লাগিল, "ভয় কি, বাবা, তোর! কিচ্ছু ভয় নেই গোপাল আমার! বলুক না ওরা যা খুসী! আমি ত রয়েছি। কে কি করবে?" কিন্তু অন্তর্য্যামীই কেবল জানিয়া রাখিলেন, কতখানি ব্যাকুল হইয়াই এই নিষ্কলুষ মাতৃহৃদয় ক্ষুদ্র পশুকে সান্ত্বনা দিবার ছলে নিজেকেই সংযত করিতে লাগিল।

মন্দিরের পূজারী ব্রতপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পাড়ায় গিয়াছিলেন। ফিরিবার মুখে গৌরের মাকে দেখিয়া প্রভু একবারে রুদ্রমূর্ত্তিতে খাড়া হইয়া গেলেন। ডাকিয়া আনিয়া মানস পূজার বিলম্বের জন্য তাহাকে অশেষরূপ ভীতি প্রদর্শন করাইয়া পরিশেষে স্পষ্ট করিয়াই তিনি শুনাইয়া দিলেন, পূজার ব্যবস্থা সত্বর না করিলে পুত্রের তাহার অপঘাত-মৃত্যু যে অনিবার্য্য, এই দৃশ্যটি তিনি নাকি দিব্য দৃষ্টিতেই দেখিতে পাইতেছেন।

গৌরের মা ঠিক বাজপড়া মানুষের মত দাঁড়াইয়া রহিল। নিদারুণ ত্রাসে ও দুশ্চিন্তায় কাঁদিতেও তাহার আজ সাহসে কুলাইল না।—পুরোহিত পুনশ্চ সতর্ক করিয়া দিয়া বিদায় হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গৌর জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইল।

সে মাঠে কায করিতে গিয়াছিল, কাস্তেখানা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "মা রে! চল্ কাঁথাখানা পেড়ে দিবি শীগ্গির আমার জ্বর লেগেছে রে, মা!"

গৌরের মা আর দাঁড়াইতে পারিল না। পুরোহিতের উচ্চারিত বাক্যগুলি তাহার দুই কর্ণে তখনও সমানভাবেই বাজিতেছিল। পুত্রের রোগক্লিষ্ট মুখের পানে তাকাইয়াই

সে এক বুকফাটা চীৎকার করিয়া সেইখানেই সে মাথায় হাত দিয়া একবারে বসিয়া পড়িল।

৩

ছাগশিশুটিকে আদর করিয়া গৌরের মা নাম রাখিয়াছিল রামু। পরদিন পুত্রকে ডাকিয়া সে কহিল, "গৌর রে! রামুকে আজ তার মার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।"

গৌর তাহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিত। কহিল, "ভাই আবার কবে ফিরে আসবে, মা?" এই ভাই সম্বোধন গৌরের মা তাহার পুত্রের মুখে অষ্টপ্রহর শুনিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ এই শব্দটাই তাহার বুকের ভিতর প্রচণ্ড ঝড় তুলিয়া দিল। বাহিরে সে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, "রামু আমার আর ফিরবে না," বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু সে আর পারিল না। দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহরে গৌরের মা তাহার রামচন্দ্রকে নূতন ঘাস আনিয়া খাওয়াইল। মুঠা মুঠা করিয়া কলাইয়ের ভুষী ছাগ-শিশুর মুখের ভিতর গুঁজিয়া দিতে দিতে কহিল, "আমার হাতে আর তুই খাস্‌নে, রামু। তোকে যে আমি বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছি রে, বাবা।" বলিয়াই সেখানে ধূলা-বালির উপর সে একবারে লুটাইয়া পড়িল।

মাতা-পুত্রে ছাগশিশুটি লইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে প্রচুর বাদ্যোদ্যমের সহিত ভগবানের সৃষ্ট একটি জীব মানুষের কৃপায় খড়্গের এক আঘাতে স্বর্গে চলিয়া গেল। পূজার্থিগণ মহোল্লাসে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। গৌরের মা এক অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "রামুকে আমার এই যদি করে? এখন আমার উপায়?" বলিয়াই সে এমন ভীত ব্যথিত নেত্রে নিঃসহায়ের মত চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল যে, বালক গৌর পর্য্যন্ত মায়ের অবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। গৌর কি বুঝিল, সে কথা তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন। সে ক্ষিপ্র হস্তে ছাগবৎসটিকে বুকে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

এতবড় অনাচার কেহ কখনও দেখে নাই। সমস্ত লোক একবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। পুরোহিত নিজে আসিয়া ছাগ-শিশুটি ফিরাইয়া আনিবার জন্য গৌরের মাকে পীড়াপীড়ি, শেষ পর্য্যন্ত কঠিন ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন। উন্মত্ত জনতা গালি-গালাজ করিতে লাগিল। গৌরের মা সেই-খানে লুটাইয়া পড়িয়া আকুল হইয়া কহিতে লাগিল, "মায়ের পূজো দেবার জন্যই ত এনেছিলাম। কিন্তু বুকের মধ্যে যে মা আছে, সে যে কিছুতেই হাতে তুলে দিতে দিল না। আমি এখন কার কথা শুনি?"

ইহার পর কত লোক কত ভাবেই তাহাকে বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু ঐ এক উক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় বাক্য কেহ তাহার মুখ হইতে খসাইতে পারিল না।

পুরোহিত মহাশয় আর বরদাস্ত করিতে পারিলেন না; রুদ্রমূর্ত্তিতে ভিতরে গিয়া ফুল-পাতা আনিয়া বর্ষণ করিতে করিতে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন।

মধু ভট্টাচার্য্য নধর জন্তুটির লোভে এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, আশাভঙ্গের নিদারুণ মনস্তাপে তিনি একবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। তিনি দ্রুতপদে নীচে আসিয়া গৌরের মাকে ঠেলিতে ঠেলিতে মন্দিরের সীমানা হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

কুটীর-প্রাঙ্গণে পা দিয়াই গৌরের মা দেখিল, ছাগ-শিশুটিকে কাড়িয়া লইবার জন্য ইতিমধ্যেই মধু লোক-লস্কর লইয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘোরাঘুরি করিতেছে। ত্রাসে ও দুর্ভাবনায় গৌরের মা চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

গৌর কুটীরের এক নিভৃত কোণে লুকাইয়াছিল। জননীকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "মা রে, ভাল যায়গায় রেখে এসেছি।"

গাঁয়ের দীনু মল্লিক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁহার সুনাম আছে। গৌর তাঁহারই নাম উল্লেখ করিয়া কহিল, "মল্লিক মশায় সব কথা শুনে তাঁর পাকা ঘরে একেবারে ভাইকে আমার রেখে দিয়েছে। কারও সেখানে আর ঘেঁসবার যোটি নেই।"

এতক্ষণে গৌরের মার মলিন মুখের উপর স্নিগ্ধ হাস্যের রেখাপাত হইল। পুরোহিতের অত বড় অভিসম্পাত, একমাত্র সন্তানের অমঙ্গল, এ সকল কিছুই তাহার আর মনে পড়িল না। তাহার রামু যে মায়ের কৃপায় আশ্রয় পাইয়াছে, ইহারই আনন্দে সে উদ্দেশে দেবীর চরণে বার বার প্রণাম করিতে লাগিল।

৪

মল্লিকবাড়ী শারদীয়া দুর্গাপূজা। বলির বাজনা তখন বাজিতেছিল। ছাগশিশুটি দেখিয়া সকলেই অতিশয় খুসী। কর্ত্তার পুণ্যপ্রভাবে এবং পরিতোষরূপে ব্রাহ্মণভোজন করাইবার সদিচ্ছা বশতঃই যে এই নধর-কান্তি জীবটিকে গৃহস্বামী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এ কথাও তাঁহারা একবাক্যে প্রকাশ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা বিনয়নম্রবচনে সকলকেই আপ্যায়িত করিয়া ভক্তিগদগদ-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "সকলই ঐ ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। আমি কেবল নিমিত্তমাত্র।"

ঢাক, ঢোল ও কাসরের বিপুল বাদ্যধ্বনিতে সমস্ত বাড়ী তখন প্রকম্পিত। সকলেই হাস্যোজ্জ্বল-মুখে বলিদান দেখিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পুরোহিত মহাশয় মন্ত্রপূত বারি সেচন করত পশুদেহকে পবিত্র করিয়া দিলেন। 'জয় মা জগদ্ধাত্রী' রবে সমস্ত বাড়ী তখন মুখরিত। নিরীহ নিঃসহায় জীব বোধ করি জীবন-ভিক্ষার মানসে, ব্যর্থ আর্ত্তনাদ ক্ষীণ কণ্ঠে বাহির করিতে লাগিল। ঘাতকের উদ্যত খড়্গ সূর্য্যকিরণে ঝলসিয়া উঠিয়াই নিঃসহায় জীবটিকে দ্বিখণ্ডিত করিতে যাইতেছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গোরের মা "মা দুর্গা! বাছারে আমার রক্ষা কর, মা!" বলিয়া বুক-ফাটা এক আর্ত্তনাদ তুলিয়াই বিদ্যুদ্‌বেগে উদ্যত প্রহরণের সম্মুখে আসিয়া মাথা পাতিয়া দাঁড়াইল। মুখে শব্দ নাই। অসাড় নিস্পন্দ দেহ। শুধু তাহার চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া দেবীর শ্রীপাদপদ্মের উপর গিয়া স্থির হইয়া রহিল। আর সেই বিস্ফারিত নয়নের ভিতর দিয়া মাতৃহৃদয়ের অপার স্নেহ-করুণা গলিয়া জল হইয়া তাহার দুই গণ্ড দিয়া হু হু করিয়া নামিয়া তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল।

এমন করুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই। অনেকেরই চক্ষুপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল।

পট্টবস্ত্রপরিহিত শুদ্ধাচারী আশ্রিত-বৎসল মল্লিক মহাশয় নিমীলিত-নয়নে ভক্তিগদ-গদ-কণ্ঠে স্তোত্রপাঠে তখন নিমগ্ন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ উন্মীলিত হইল মাত্র। পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা হরি! এই ম্লেচ্ছ স্ত্রীলোকটাকে সরিয়ে দিতে হবে যে, বলিদানের বিলম্ব হ'লে ওদিকে ব্রাহ্মণভোজন যে সময়ে হবে না, বাবা।"

অকস্মাৎ জনতা সরিয়া দাঁড়াইল। মল্লিক-গৃহিণী স্বয়ং আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি নিষেধ ক'রে দাও! দেখ্‌তে পাচ্ছ না, মায়ের প্রাণ যে বুক ফেটে বেরিয়ে গেল?"

কর্ত্তা কঠোর দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিলেন।

গৃহিণী দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "মা নিজেই যে তাঁর সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন, আমি মা—আমি যে সইতে পারছি না। বুক যে আমার ফেটে যাচ্ছে! আমি এমন কায করতে তোমাকে দেব না।"

এ সকল অনুরোধ উপরোধ বৃথা। কর্ত্তা কাণেও তুলিলেন না। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া পুনশ্চ আদেশ করিলেন, "হরি, তুমি কর্‌ছ কি? ঐ স্ত্রীলোকটাকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে বাড়ীর বার ক'রে দিয়ে এস।"

ইতিমধ্যেই বাড়ীর ভিতর ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। ঝি ছুটিয়া আসিয়া চেঁচাইয়া পড়িল, "মা, শীগ্‌গির উপরে আসুন! খোকার দুধ গলায় আটকে কেমন হ'য়ে পড়েছে।"

ডাক্তারের কাছে লোক ছুটিতেছিল। গৃহিণী ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "কাকেও ডাকবার প্রয়োজন নেই। যাকে ডাকতে হবে, তাকেই আমি ডাকছি।" বলিয়াই ধীরে ধীরে ছাগশিশুটি গোরের মার কোলের উপর উঠাইয়া দিয়া কহিলেন, "এইবার তোর সন্তানটিকে বুকে কর, মা।"

গোরের মার বিবর্ণ মুখখানি ধীরে ধীরে এক অপার্থিব উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে ছাগশিশুটিকে লইয়া পূজাপ্রাঙ্গণ নির্ব্বিঘ্নে ত্যাগ করিল।

পুরোহিত মহাশয় গৃহস্বামীর কল্যাণকামনায় তখন তার-স্বরে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

সহসা একদল তরুণের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"জয় মা!"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

"লেডিজ্ রিষ্ট্-ওয়াচ্"

এক

একটি পরিচ্ছন্ন বোর্ডিং-হাউসের তেতলায় একখানিমাত্র ঘর। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ ছাদ; রুজ্ রুজ্ চারটা জানালা; ঘরের মেঝেতে মার্ব্বল্ শ্ল্যাব্; চারিদিকে জাপানী পর্দ্দা; সাম্না-সাম্নি দু'খানা সিনারির পেন্সিল্-স্কেচ্। ঘরটি প্রশস্ত। এক কোণে অয়েল-ক্লথ-আঁটা টি-পয়ের উপর দুধের মত সাদা টি-সেট্; আর এক কোণে একটি ছোট রাইটিং-টেব্লের উপর একটা পোর্টেব্ল টাইপ-রাইটার, ছাপানো চিঠির প্যাড—কার্ব্বণ পেপার—কপি শীট্—পিন্-কুশন—গাম্-পট্—একবারে একটি ছোটখাটো রেগুলার্ অফিস্! আর এক দিকে একটা বেতের শেল্ফে দু'তিন রকমের খবরের কাগজ। ঘরের অন্যান্য আসবাব-ও ঘরের মালিকের সৌখীন রুচির পরিচায়ক। লতিন বোস্ একটা খবরের কাগজের একশো টাকা মাইনের নাইট্-সাব্-এডিটার্। দেশে পনেরটি করিয়া টাকা পাঠাইলেই সে এক মাসের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারে। সুতরাং বাকী পঁচাশী টাকা, রাত্রিতে নাইট্-সাব্-এডিটারীর আটঘণ্টা ও দিবানিদ্রার চার ঘণ্টা বাদ দিয়া, দিনের বাকী বারো ঘণ্টার সে একচ্ছত্র সম্রাট্!

চাকরী ছাড়া কায সে আরও অনেক কিছুই করে। সকালবেলায় যে ক'খানা খবরের কাগজ আসে, অখণ্ড মনোযোগের সহিত সে তাহাদের 'ওয়াণ্টেড্', 'ম্যাট্রিমোনিয়াল্' প্রভৃতি কলমগুলো শেষ করে। তার পর চাকর আসিয়া চা-টোষ্ট দিয়া যায়। গড়্-গড়ায় সুগন্ধি গয়ার তামাক পুড়াইয়া সে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগায়। ক্রমশঃ তাহার চিন্তা রঙ্গীন হইয়া উঠে এবং কখনও পদ্যে, কখনও গদ্যে সেই চিন্তাগুলি রূপ পাইয়া যথাসময়ে মাসিক পত্রিকার অঙ্কে স্থান লাভ করে।

লতিন বোসের বয়স সাতাশ। জীবনে নিশ্চয়ই একটা রোমান্স ঘটিবে, এই দৃঢ় আশার বশবর্ত্তী হইয়া সে আজিও বিবাহ করে নাই। কিন্তু আশা না কি মরীচিকার মত মায়াবিনী। সুতরাং জলের ছবি দেখিতে দেখিতেই সে 'সাহারা' 'গোবী' পার হইয়া আসিতেছে! কিন্তু সাহারাও শেষ আছে। সেই জন্যই বোধ হয় 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের' ট্যাঙ্কের ধারে সে একদা একটি 'লেডিজ্ রিষ্ট-ওয়াচ্' কুড়াইয়া পাইল!

কবি লতিন বোস্ সেটি হাতে করিয়া মনে মনে ভাবিল, —এ ত শুধু রিষ্ট্-ওয়াচ্ নয়! এ যেন একটি মধুর কাব্য! ইহাতে বার্ণ্স-এর জ্বালা, শেলীর স্বপ্ন, বায়রণের আবেগ, সমস্তই আছে! এক কথায় লতিন ইন্স্পায়ার্ড্ হইয়া পথ চলিতে লাগিল!

দুই

সে দিন সন্ধ্যায় লতিনের টাইপ্-রাইটার আধঘণ্টা ধরিয়া খটাখট্ করিল; রাত্রিতে তাহার আফিসের সাইকেল-পিয়ন প্রত্যেক খবরের কাগজের নামে, বিলি করিবার জন্য একখানি করিয়া চিঠি পাইল।

পরের দিন সকালে বোর্ডিং-এর তেতলার ঘরটা ধূম্র-প্রাচুর্য্যে আগ্নেয়গিরিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিকশিত পদ্মফুলের মত স্নিগ্ধ মুখে লতিন লক্ষ্য করিল, প্রত্যেক খবরের কাগজেই নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হইয়াছে:—

লেডিজ্ রিস্ট্-ওয়াচ্!

কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে!

যাঁহার ঘড়ী, তিনি ১২।বি চিন্তামণি লেনে সকাল ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে আসিয়া প্রমাণ দিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

১২বি চিন্তামণি লেনে লতিনের বন্ধু অচিন্ত্য থাকে। সে দিনের বেলায় মেটিয়াব্রুজের একটা অফিসে সাড়ে তেত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি সারিয়া, সন্ধ্যার পর চিৎপুর রোডের নব-সংস্থাপিত একটা টকি-হাউসের ছ'টার ও ন'টার শো-তে টিকিট বিক্রী করে। যাহাকে ভাল বাসিত, তাহার সহিত বিবাহ না হওয়ায় সে লতিনকে দিয়া কয়েকবার হা-হুতাশ-ভরা কয়েকটা কবিতা লিখাইয়া কাগজে ছাপাইয়াছিল। তাহাতে তাহার কি সুবিধা হইয়াছিল, সে খবর আমরা রাখি না; কিন্তু সেই হইতে লতিনের জন্য সে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিত। সুতরাং লতিন যখন বলিল—"ভাই, তোমার বৈঠকখানাটা আমায় দিন কতক সকালে ব্যবহার করবার জন্যে দিতে পার?" তখন

অচিন্ত্য নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিল। কেবল সঙ্কুচিতভাবে সে স্মরণ করাইয়া দিল যে, তাহার বৈঠকখানাটা বৈঠকখানা নামের অপমান; ছোট্ট একখানা কুঠারী, আলো নাই, বাতাস নাই, তাহাতে কি লতিনের মত সৌখীন লোক পাঁচ মিনিটও বসিতে পারিবে?—ইত্যাদি।

লতিন বলিল, "সে সব ঠিক ক'রে নেবো'খন।"

বাসি মাছের ঝাল দিয়া টাট্‌কা আলুভাতে-ভাত সাড়ে সাতটার মধ্যে গো-গ্রাসে গিলিয়া অচিন্ত্যকে মেটিয়াব্রুজে ন'টার সময় এ্যাটেন্‌ডেন্স দিতে হয়। সুতরাং পরদিন বায়োস্কোপের টিকিট বিক্রয় সারিয়া সে যখন রাত্রি এগারোটার সময় ছ' পয়সা চার-পয়সার 'ভোজনালয়ে' আহারান্তে সেই 'কম্বাইণ্ড্' বেড্-রুম্-বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল, তখন সন্দেহ হইতে লাগিল যে, ঘরখানি সেই তাহারই 'ঘন তমসাবৃত' কুঠরী কি না? ঘরখানিতে লাইট আসিয়াছে, ফ্যান্ আসিয়াছে, আর আসিয়াছে দুইটি সুন্দর চেয়ার ও একখানি ছোট টেবিল।

তিন

লতিনের হাতের সোনার ঘড়াটায় ন'টা বাজিয়া সাঁইত্রিশ মিনিট হইয়াছে; অচিন্ত্য অনেকক্ষণ অফিস্ গিয়াছে; আগের দুই দিনের মতই বুঝি আজিকার দিনটাও কাটিয়া যায়! সতৃষ্ণ নয়নে লতিন জানালার দিকে চাহিয়া! হঠাৎ দুইটি গরাদের উপর দুইখানি হাত, একটু পরেই একটি নেড়া মাথা ও তাহার পশ্চাতে একটি পুরুষ্ট টিকি দেখা দিল। লতিন গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে বাবা তুমি?" ঘড়-ঘড়ে গলায় উত্তর আসিল, "বাবু, বারর-বি নম্বর এই বাড়ী অছি?" "হ্যাঁ বাবা, অছি—তাতে কি হয়েছে?" "মোর মুনিব দেখা করিবাকু আউছন্তি।" লতিন বলিল, "হ্যাঁ, এইটেই বারর-বি, যা, তোর দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয়।"

* * * *

লতিন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—একটি ব্রীড়াকুণ্ঠিতা তরুণী গাড়ার ভিতর হইতে সাগ্রহে চাকরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দুই হাতে দুইখানি উজ্জ্বল সরু বালা। বাম হাতে যেখানটায় রিষ্ট ওয়াচ বাঁধা থাকিত, সেখানটায় একটি অস্পষ্ট ষ্ট্র্যাপের দাগ। পরনে মেঘ-ডুম্বুর সাড়ী! কালো চুলের এলায়িত বেণী, না, বেণী নয়—এলো খোঁপা। পায়ে জরী দেওয়া নাগ্‌রা,—না স্যাণ্ডেল্—লতিনের পাদুকা-নির্ণয় করা আর হইল না। সেই ওড্র-কুলোদ্ভব ভৃত্যের পশ্চাতে পশ্চাতে যিনি আসিলেন, তাঁহার না ছিল বেণী, না ছিল এলো খোঁপা, না ছিল পরনে মেঘ-ডুম্বুর সাড়ী!—গায়ে একটা আধ-ময়লা তালি-মারা জিনের কোট, পরনে একখানি মোটা সাড়ে ন'-হাতি, চরণে এক-জোড়া হুড্-বার্ণিশের সাইড্‌স্প্রিং দেওয়া জুতা, ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, কুঞ্চিত ললাট, বছর পঞ্চান্নর একটি বৃদ্ধ লতিনের সামনের চেয়ারটিতে অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই বসিয়া পড়িলেন। চোখ দু'টি মিট-মিট করিয়া একবার এ-পকেট একবার ও-পকেট হাৎড়াইয়া পোর্সিলেন-এর মত পুরু কাচের চশ্‌মা কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে লতিনকে সম্বোধন করিয়া আগন্তুক বলিলেন,—"বাবা, তুমিই কি রিষ্ট ওয়াচের বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলে?"

লতিনের চোখের সম্মুখে ঘরখানা দুলিয়া উঠিল, টেবিল—চেয়ার—লাইট্-ফ্যান্ নাগর-দোলার মত ঘুরিতে লাগিল, ঘর সাজাইবার টাকা পঞ্চাশটা বৃত্তাকারে নৃত্য করিতে লাগিল;—আকাশ-কুসুমগুলি হঠাৎ কে যেন আঁকৃশী দিয়া মাটীতে পাড়িল!

আশাবাদী লতিন বৃদ্ধকে দেখিয়াও হতাশ হয় নাই। ভাবিয়াছিল, এ হয় ত অচিন্ত্যের কোনও আত্মীয় হইবে, অথবা অন্য কোনও কাযে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়া থাকিবে। কিন্তু একবারে লেডিজ রিষ্ট-ওয়াচটারই খোঁজ! এবং এই কুৎসিত কদাকার বৃদ্ধ! শুষ্কমুখে লতিন বলিল, (সে তখনও আশা ছাড়ে নাই) "হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনটা আমিই দিয়েছিলাম; তা রিষ্ট্-ওয়াচটা কি আপনার কোন আত্মীয়ার?" বলিয়া, শক্ত অপারেশনের পূর্ব্বে ফলাফলের জন্য উৎকণ্ঠিত লোক যেমন ভাবে তাকাইয়া থাকে, লতিন সেই ভাবে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

টেবিলের উপর মাথাটা আর একটু বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আগন্তুক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আমি জিনিষ-পত্র বাঁধা রেখে টাকা ধার দিয়ে থাকি। এই আমার ব্যবসা, (লতিন মনে মনে বলিল,—তা চেহারা দেখেই বুঝেছি।) আজ মাস দেড়েক হ'ল বারোটি টাকার বদলে ঐ ঘড়ীটা এক জন বাঁধা রেখে গেছে। আজ পর্য্যন্ত না এল ঘড়ীটা নিতে, না দিয়ে গেল টাকার

সুদ। ভবানীপুরের একটা ঠিকানা দিয়ে গেছে, মিথ্যে কি না, জানি না; 'মিড্-ডে' ফেয়ারে চারটে পয়সা নগদ খরচ ক'রে—সেই কালীঘাট, মশাই! ঘুরে ঘুরে মিড্-ডে ফেয়ারের সময় উৎরে গেল, সন্ধ্যে হ'য়ে এল, ঠিকানা আর খুঁজে পেলুম না; ভাবলুম, চারটে পয়সা ত গেছেই, আরও ছ'টা কেন যায়, তার চেয়ে হেঁটেই বাড়ী ফিরি। কিন্তু মশাই, আর কি সে বয়েস আছে যে, হেঁটে কালীঘাট-শ্যামবাজার করবো? মাঝখানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একটু জিরিয়ে নিতে গেলুম, তাতে পায়ের ব্যথা গেল আরও বেড়ে—সেই ট্রামে উঠতে হ'ল। বুড়ো মানুষ, কখন্ কোথায়, আর কি ক'রে যে ঘড়ীটা হারালুম, জানতেও পারি নি। খেয়াল হ'ল—একেবারে ধর্ম্মতলার মোড়ে। কণ্ডাক্টার যখন টিকিটের পয়সা চাইলে···" আরও কতক্ষণ এইভাবে চলিত, কে জানে, লতিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল "আচ্ছা, ঠিকানাটা আমায় দিন, আর আপনার সুদে-আসলে যে টাকাটা পাওনা হয়েছে, নিন্। ঘড়ীটা নিয়ে, যাঁর ঘড়ী, আমি নিজেই তাঁকে খুঁজে বের ক'রে দিয়ে আসবো।"

"আঃ, বাঁচালে বাবা!"

বৃদ্ধের ঠিকানাটা পর্য্যন্ত লতিন জানিয়া লইতে ভুলিয়া গেল! রোমান্সের আশায় তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

চার

আজ ক'দিন ধরিয়া লতিন সেই বৃদ্ধের দেওয়া ঠিকানার খোঁজে ভবানীপুরের নূতন রাস্তাগুলি চষিয়া বেড়াইয়াছে। শেষে তাহার উদ্যম সফল হইল। কম্পিত-বক্ষে নম্বর মিলাইয়া লইয়া কড়া নাড়িতেই বামাকণ্ঠে উত্তর আসিল, "কা'কে চাই?" লতিন বলিল, "একবার দরজাটা খুলবেন? বিশেষ দরকার আছে।" সিঁড়ি দিয়া চটাপট্ নামিবার শব্দ আসিতে লাগিল। লতিনের মনে আর একবার ভাসিয়া উঠিল,—এলো খোঁপা, মেঘ-ডুম্বুর সাড়ী ও বাম্মীজ্ স্যাণ্ডেল্—। দূর্ ছাই! সে আর কিছুই ভাবিবে না, যদি আবার হতাশ হইতে হয়! কিন্তু এবার ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হইল। যিনি দরজা খুলিয়া দেখা দিলেন, তিনি কবি লতিন বোসের মানসীর মত না হইলেও তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইবার যোগ্যা।

রোমাঞ্চিত লতিন কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "হেমদাবাবু কি এখানে থাকেন?" লতিনের উৎকণ্ঠিত আগ্রহের ভাব দেখিয়া তরুণীটি কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ছিলেন বটে, তবে আমরা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গেছেন।" আরও একটু অপেক্ষা করিয়া তরুণীটি যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন। দরজার বাহিরে পড়িয়া রহিল আমাদের কবি লতিন বোস্, এবং তাহার বিভ্রান্ত চোখের সম্মুখবর্ত্তী টলমলায়মান বিশ্বজগৎ!

তখন লতিন বোস্, তাহার বন্ধু এইচ্, কে, দে, -"ওয়াচ্ মেকার্স্ এ্যাণ্ড্ জুয়েলার্সের" দোকানে পদার্পণ করিল। কিন্তু এইচ্, কে, দে, ওরুফে, হরিকুমার দে সমস্ত ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বলিল, "লতিন বাবু, এ ঘড়ীটা কি করতে এনেছেন? কেস্টা ত গিল্ট-করা রোল্ড্-গোল্ডের, আর কেসের ভেতরটা ত একেবারে ফাঁপা!"

লতিন্ আর বৃথা রোমান্সের জন্য অপেক্ষা না করিয়া পরবর্ত্তী ফাল্গুনেই বিবাহ করিয়া ফেলিল।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

চতুরে চতুরে

কোন বড় সহরে বৈকালবেলা অনুমান ৫টার সময় জহুরী-পটীর একখানি বড় দোকানের সম্মুখে একখানা বড় মোটর এসে দাঁড়াল। মোটর থেকে নামলেন এক বাবু, দিব্য হৃষ্টপুষ্ট বপু, রং শ্যামবর্ণর চেয়ে এক পোঁচ নিরেস, সাদা কোটের উপর মোটা গোটের মত চেন, আর কার্ণিসের মত গোঁফ, তার উপর টাকা রাখলে পড়ে না। দোকানদার খোট্টা, কি সিন্ধী, কি কাঠিয়াওয়ারী কে জানে! রকমসই খরিদদার দেখে সেলাম ক'রে বল্‌লে, কি হুকুম?

বাবু কিছু ভারী মানুষ কি না, একখানা চেয়ারে ব'সে হাঁপ ছাড়লেন। একটু জিরিয়ে বল্‌লেন, কিছু গহনা, কিছু ঝুটো জহরাত চাই।

—কি কি রকম?

—এই মেয়েদের গলার হার আর মাথার টায়েরা আর ব্রেসলেট—ভাল জড়োয়া—আর আংটী ভাল থাকলে নিজের জন্য ৬ একটা নিতে পারি। আর আলগা পাথর কিছু দেখাও।

—সব হীরার?

—না, সব হীরা কেন? কিছু ভাল চুণি যদি থাকে, পোখরাজ হ'ল,—পছন্দ হয় কি না, দেখলে বুঝতে পারব। কিছু বেশী মাল নেবার ইচ্ছে আছে।

বাবুর চোখ বেশ বড় বড়, দোকানের চার দিকে দেখছিলেন। দোকানদারের ইসারায় দোকানের দু' তিন জন লোক দু' একটা গ্লাসকেস খুলে বাবুর সামনে গ্লাস-কেসের উপর অনেক রকম গহনা, আংটী আর পাথর সাজিয়ে রাখলে। বাবু সেগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, দোকানের লোকের নজর সেই দিকেই ছিল।

এমন সময় চার জন গোফদাড়ী-কামানো ছিপছিপে লোক দোকানে ঢুকেই মুখে মুখস এঁটে দিলে। একছুটে, গায়ে আঁটা পাঞ্জাবী, মুখে একটি কথা নেই, কলের মত চারজন চার দিকে গেল। বাবু আর দোকানের লোকেরা চেয়ে দেখে, চার দিক্ থেকে চারটে পিস্তলের নল তাদের বুকের দিকে লক্ষ্য করা। এক জন ডাকাত বল্‌লে—জোরে নয়, কিন্তু শাণিত ছুরীর মত কথার ধার—কোন শব্দ করো না, পালাবার চেষ্টা করো না, গুলী বুকে পিঠে সমান লাগে, বরং পিঠে বেশী লাগে।

আর এক জন ডাকাত এই ব্যক্তির হাতে নিজের পিস্তল দিয়ে একটা থলি বাহির করলে। হীরা-জহরাত, গহনা-গাঁটি যা কিছু বাহিরে সাজান ছিল, নিমেষের মধ্যে থলির ভিতর পুরে ফেল্‌লে। তার পর তামাসা ক'রে আঙ্গুল দিয়ে বাবুর পেটে এক খোঁচা!

বাবু বললেন, হ্যাঁ, আমি কি করেছি?

—কিছু না, তুমি উঠে আমাদের সঙ্গে এস।

বাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। ঢোক গিলে বললেন, আমি ত দোকানের কেউ নই।

—ওগো, তা জানি। তোমার গোঁফ-জোড়া বড় জবর, শীকারি জাতের হবে। ওঠ!

শেষ কথাটার কঠিন স্বর শুনে বাবু তাড়াতাড়ি উঠলেন। ডাকাত ব্যঙ্গ ক'রে দোকানদারকে বললে, এঁকে চেন না? ইনি শিয়াল গায়ের রাজা, এই সব মালের দাম তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন। বাবুকে ঠেলে বাহির করে মোটরের ভিতর পুরলে। তারা চার জনও সেই সঙ্গে উঠে পড়ল।

সব শুদ্ধ তিন মিনিটের বেশী সময় লাগে নি। দোকানদার আর তার লোকরা ভয়ে কাঠ, এইবার ছুটে বেরিয়ে এল,—ওরে, সব লুটে নিলে রে! সব লুটে নিলে!

তাদের চীৎকার শুনে পথের লোক মোটরের দিকে ছুটে এল। ডুম্! অমনি লোক থেমে গেল।

ফাঁকা আওয়াজ। মোটর ভোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল।

২

দোকান থেকে থানা তিন রশি তফাৎ। দেখতে দেখতে দোকানের ভিতরে বাহিরে পুলিস গিস্‌গিস্ করতে লাগল মোটর দেখতে কি রকম, দোকানদারকে জিজ্ঞাসা ক'রে ইন্সপেক্টর চারিদিকে টেলিফোন করলেন—সেই রকম মোটর দেখতে পেলে যেন ধরা হয়। রাস্তায় যেখানে মোটর দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে একখানা রুমাল পাওয়া গেল, তার এক কোণে কালো সুতা দিয়ে ছোরা চিহ্ন করা।

দোকানের ভিতর কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

ইন্সপেক্টর চেয়ারে হেলান দিয়ে, চুরুট ধরিয়ে, নোটবুক আর পেন্সিল হাতে রিপোর্ট লিখতে আরম্ভ করলেন।

সামনে দোকানদার আর তার লোকেরা দাঁড়িয়ে, আশে-পাশে পুলিসের লোক।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, ডাকাত কয় জন?

—চার জন।

—দেখতে কি রকম?

—মুখ ত দেখি নি, মুখে মুখস পরা। চার জনই এক-হারা, চার জনেরই হাতে পিস্তল, গায় আঁটা পাঞ্জাবী, মালকোঁচা মারা ধুতি, বয়স বোধ হয় বড় বেশী নয়।

—কতক্ষণ ছিল?

—এল আর গেল। যেমনি তাদের কায হয়ে গেল, তখনি চ'লে গেল।

—গ্লাস-কেস ভাঙ্গলে, না তোমরা খুলে দিলে?

—গ্লাস-কেস ত খোলাই ছিল, যে বাবুটি গহনা কিনতে এসেছিলেন, তাঁর সাম্‌নে মাল সাজান ছিল।—

—সে বাবু কোথায়?

—তাঁকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে।

—আঃ—নবীন!

ইন্সপেক্টরের পিছনে এক জন অল্পবয়স্ক পুলিসের কর্ম্মচারী দাঁড়িয়েছিল। বলবান্ পুরুষ, মুখ খুব ধারাল, চক্ষু তীক্ষ্ণ। সামনে এসে দাঁড়াল।

ইন্সপেক্টর বললেন, নবীন, কি মনে হয়? বাবু কে?

—হুজুর, টোপ মনে হয়। ছিপ ছিল ছোকরাদের হাতে, যেই মাছ খেয়েছে, অমনি গেঁথেছে।

দোকানদার আর তার লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। দোকানদার ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবুটিও কি ওদের দলের লোক?

—তোমাদের কি মনে হয়?

—কেমন ক'রে জানব, সাহেব? বেশ বড় মানুষের মতন, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, অতবড় মোটর, ডাকাতদের দেখে ভয় পেলে, তারা তাকে ঠেলা দিয়ে জোর ক'রে নিয়ে গেল। ওদের সঙ্গে ষড় আছে কি ক'রে জানব?

—ডাকাতীর সঙ্গে একটু আধটু থিয়েটারও হয়। সিনেমায় দেখ নি?

—সাহেব, এখন আমার কোন বুদ্ধিই আসছে না। বিশ পচিশ হাজার টাকার মাল লোপাট হয়ে গেল!

—মালের ফর্দ্দ লিখে নেব। বাবুটি দেখতে কি রকম?

—ময়লা, মোটা, বেশ ফিটফাট কাপড়-চোপড়, মুখ গোলগাল, প্রকাণ্ড গোঁফ, টেরীকাটা চুল, মাথায় আমার মত, বেশী লম্বা নয়। দেখে মনে হ'ল, সহরের বাবু নয়, বাইরের কোন জমীদার হবে।"

নবীন চিবিয়ে চিবিয়ে, কেমন একটা সুর ক'রে বললে, শিয়াল-গাঁয়ের রাজা?

দোকানদার চমকে উঠল, সে কি, আপনি কেমন ক'রে জানলেন? এক জন ডাকাতও ঠিক ঐ কথা বলেছিল। আপনি কি ওদের জানেন?

নবীন হাসতে লাগল, ওদের জাতটা জানি, ভারী কুলীন। তোমার এখানে যারা এসেছিল, তারা কি মেল, তা জানি নে। ওদের বুলির মধ্যে ঐ একটা। শিয়াল ধূর্ত্ত কি না, ওরা তাই শিয়ালের রাজা।

ইন্সপেক্টর উরুৎ চাপড়ে হাসতে লাগলেন। ঠিক বাৎ! নবীন ওদের বুলি জানে। ওদের দলে ছিল কি না।

নবীন ভুরু কুঁচকে চুপ ক'রে রইল।

এমনতর আরও কয়েকবার হয়েছিল। দিন নেই, দুপুর নেই, সকাল-সন্ধ্যা নেই, কখন্ কোথায় ডাকাতী হয় তার কিছু ঠিক ছিল না। কোথায় তালগাছে চিল চুপ ক'রে ব'সে থাকে, কারুর হাত থেকে খাবারের ঠোঙা, কারুর মাথা থেকে মাছের ল্যাজা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। কখন্ কার দোকানে, কার ঘরে ডাকাত পড়ে, তার ঠিক ছিল না। আর এ ডাকাতীতে কোন গোলমাল নেই, ঘাঁটীর পাক নেই, একেবারে সাড়াশব্দ নেই। পাশের বাড়ীর কি দোকানের লোক টের পাবার আগেই কায সাবাড়। বড় জোর ভয় দেখাবার জন্য কখন পিস্তলের দু একটা আওয়াজ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ ঘায়েল হয় নি। ভয়ে লোক সব তটস্থ।

৩

মোটর-ফোটরের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। নম্বর কেউ দেখে নি, বং কেউ কেউ দেখেছিল। একটা গ্যারাজে পুরে রং নম্বর বদলাতে কতক্ষণ?

থানায় ফিরে ইন্‌স্‌পেক্টর নবীনকে নিজের ঘরে ডাক্‌লেন, বল্‌লেন, উপর থেকে কি রকম সব কড়া চিঠি আসে, দেখেছ ত? এবার একটা কিছু কিনারা না করতে পারলে মুস্কিলে পড়্‌ব।

নবীনের গোঁফের অল্প আদ্‌রা দেখা দিয়েছিল। তাইতে হাত বুলিয়ে বল্‌লে, আমাকে ওরা কেউ কেউ জানে, আমি প্রকাশ্য ভাবে কিছু করতে গেলেই আমাকে আগে সাবাড় করবে। তাতে ভয় পাই নে, কিন্তু আমাকে সরালে আপনাদের কাযের কি সুবিধে হবে?

—সেই জন্য ত বাইরে তোমাকে কোথাও যেতে দিই নে, তোমার কাছ থেকে যা জানতে পারা গিয়েছে, তারির সন্ধান নেওয়া যাচ্ছে।

—আমি যে ও দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, তার কারণ, আমি যা মনে করেছিলাম, তা নয়। ভাবতাম, বুঝি একটা বড় কিছু উদ্দেশ্য আছে। তার পর দেখলাম, শুধু লুঠপাট আর ফুর্ত্তি করা। ওতে আমি নেই। আমি নিজে কখন কিছু করি নি। ভাবগতিক দেখে স'রে পড়েছি। কিন্তু এ রকম মগের মুল্লুক ক'রে তুল্‌লে ত চোখে দেখা যায় না। এবার আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

ইন্‌স্‌পেক্টর আগ্রহের সহিত বল্‌লেন, তোমার কোন আশঙ্কা নেই ত? তুমি যদি নিজে বিপদে পড়, কিংবা ওরা তোমাকে খুন করে, তা হ'লে প্রকাশ্যভাবে তোমার কিছু না করাই ভাল। তার চেয়ে বরং তুমি গোপনে যদি কিছু সন্ধান পাও, তা হ'লে যা করবার আমরাই করব, তোমাকে এর ভিতর জড়াতে চাই নে। তুমি নিরাপদে থাকলে আমাদের অনেক কায হবে।

নবীন একটু হেসে বললে, আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি কেবল গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ালে চল্‌বে কেন? আগুন নিয়ে খেলা করলে হাত পুড়ে যাবার ভয় থাকেই। আমি যদি কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টায় থাকি, সেটা কাপুরুষের কায। সাধ্যমত সাবধান থাকব, কিন্তু আমাকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। এই যে লোকটা জমীদার বাবু সেজে এসেছিল, তার নাগাল পেলে একটা মস্ত কায হয়।

—তা হ'লে তোমার ধারণা, সে ব্যক্তি এর মধ্যে আছে?

—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তার কৌশলেই ত দোকানদার সব জহরাত বের করেছিল, তাই ডাকাতদের কায চটপট হয়ে গেল। তা নইলে গ্লাসকেস খুলতে, মাল খুঁজতে দেরী হ'ত। ওর চেহারার বর্ণনা যে রকম শুনলেন, যথার্থ সে দেখতে কখনই সে রকম নয়, ঐ রকম সেজে এসেছিল—যাতে সহজে এর পর ধরা না পড়ে।

—হাঁ, হাঁ, তার গোঁফ জোড়ার কিছু কেরামত আছে। খুব ঝাঁকড়া কলমের চারার মতন।

—আরও কিছু কারিগরি থাকবে। দোকানে সে যে রকম সেজে গিয়েছিল, তার সহজ মূর্ত্তি মোটেই সে রকম নয়।

—তুমি কি করবে, কিছু ভেবেছ? আমি বলি, তমিজ খাঁকে সঙ্গে নাও, সে খুব জাশু। বরং বলবন্ত সিং ও তোমার সঙ্গে থাকুক, সে খুব জোয়ান আর ভারী কায়ের লোক। পদে পদে আশঙ্কার কারণ হবে।

—প্রথমে আমাকে একা চেষ্টা করতে দিন, আমার সঙ্গে অপর লোক থাকলে সব ফেঁসে যেতে পারে। আপনি ছাড়া এখন আর কারুর কিছু জানাবার আবশ্যক নেই। আমাকে মাসখানেক ছুটী দিন, আমি যেন দেশে যাচ্ছি। কিছু জানতে পারলে কি করা উচিত, স্থির করা যাবে।

—তুমি যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর; কিন্তু আমি যেন সর্ব্বদা খবর পাই। খুব সাবধান থাকবে। এ দিকে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

—সেটা খুব দরকার। আপনারা একটা খুব হই-চই ক'রে তুলবেন। আমি যেন নির্লিপ্ত, ছুটীতে রয়েছি।

থানায় ও থানার বাহিরে সকলে জানলে, নবীন এক মাসের ছুটী নিয়ে দেশে গিয়েছে।

৪

সহর তোলপাড় হয়ে উঠল। চারিদিকে খানাতল্লাসী, চারিদিকে ধরপাকড়। যে দিকে দেখ, পুলিসের লাল-পাগড়ী আর কালো কোট-পরা সার্জ্জন। কোথায় শেষ রাত্রিতে পুলিসের বাঁশী বেজে ওঠে, আর পাড়ার লোক শশব্যস্ত হয়ে জানালার পাখি খুলে দেখে। যাদের ধ'রে নিয়ে যায়, তাদের দিনকতক পরে ছেড়ে দেয়, আবার আর কতকগুলা লোককে ধরে। যে সব দোকানে দামী মাল থাকে, তার সামনে দিনরাত পুলিসের কড়া পাহারা।

এক দিন ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁর ঘরে ব'সে রয়েছেন, এমন সময় খবর এল, এক জন মুসলমান মৌলবী তাঁর সঙ্গে

দেখা করতে চায়। মৌলবী সাহেবের ডাক পড়ল! ইন্সপেক্টর দেখলেন, এক জন লম্বা-চৌড়া পুরুষ, কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ী, ঘন ভ্রূ, মাথায় বড় বড় চুল, তার উপর লাল তুর্কী টুপী, হাতে তস্‌বী, ঢিলে পায়জামার উপর লম্বা কালো আলখাল্লা। এসে বললে, তসলীম, সাহেব।

ইন্সপেক্টর তাকে বসতে ব'লে বললেন, মৌলবী সাহেব, কি মনে ক'রে ?

মৌলবী সাহেবের হাতে তস্‌বী ফিরিতেছিল। বললে, সাহেব, আপনারা না কি ডাকাতের দলের তল্লাস করছেন ? দিন চার হ'ল, আমি মক্কা সারীফ থেকে ফিরেছি, এসে দেখলাম, সহরে বড় সোরগোল। কিছু সন্ধান দিতে পারলে আপনারা কিছু ইনাম দেন ?

—পাকা সন্ধান হ'লে দিয়ে থাকি। কিন্তু আপনি ত এখানে নতুন এসেছেন ; দেখছি, আপনি মৌলবী, চোর-ডাকাতের আপনি কি খবর রাখেন ?

—পীরদের মেহেরবাণীতে আমাদের অনেক রকম বিদ্যা আছে, অনেক সন্ধান আমরা বলতে পারি।

সাহেব হেসে উঠলেন, বললেন, কেরামৎ-টেরামৎ আমরা মানি নে। এই কথা বলবার জন্য তুমি আমার কাছে এসেছ ?

মৌলবী সাহেবের কণ্ঠস্বর হঠাৎ বদলে গেল। বললে, তা হ'লে আমাকে আপনি চিনতে পারেন নি !

ইন্সপেক্টর অবাক্। এ যে নবীন! তিনি ত কিছুই চিনতে পারেন নি। বললেন, তোমার এ সাজে আমি তোমাকে মোটেই চিনতে পারি নি। তুমি কি এখন এই রকম সেজে বেড়াও ? কিছু খবর পেয়েছ ?

—আপনার এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি, আপনি যখন চিনতে পারলেন না, তখন অপরেও না পারতে পারে। এই আমার এক বেশ, আরও অন্য রকম আছে। সন্ধান যা পেয়েছি, এখনও বলবার মতন কিছু নয়। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি। এই যে হই-চই হচ্ছে, এটা দিন কতক স্থগিত রাখতে হবে।

—তাতে তোমার কিছু সুবিধে হবে ?

—খুব সুবিধে হবে। আপনারা একটু এলাকাড়া দিলে ওরাও একটু গাফিল হবে। আমি পাকা রকম কিছু জানতে পারলেই আপনাকে খবর দেব আর তখন সহায়তার আবশ্যক হবে।—

বেশ কথা। আমি আমাদের গোলমাল বন্ধ ক'রে দিচ্ছি ; এর পর তুমি যে রকম বলবে, সেই রকম করা যাবে।

নবীন যখন চ'লে গেল, তখন থানার সকলে তাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এক জন জমাদার তামাসা ক'রে বললে, বড় জবর মৌলবী সাহেব! সাহেবকে কি কলমা পড়াতে এসেছিল ?

৫

সহরের এক প্রান্তে ইতর লোকের পাড়া। খোলার ঘরই বেশী, মাঝে মাঝে পুরানো কয়েকটা কোঠা-বাড়ী আছে। চারিদিকে অসংখ্য গলি, বাঁকাচোরা পথ, নানা রকম আবর্জ্জনায় ভরা। পথে কপ্‌নী-আঁটা ধুলামাখা ছেলেরা খেলা করছে, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা পথে দাঁড়িয়ে কোঁদল করছে। পুরুষেরা যায়গায় যায়গায় জড় হয়ে তাস কি জুয়া খেলছে।

এক স্থানে একটা পাকা বাড়ী। বালি খ'সে গিয়েছে, ইটে নোণা ধরেছে, কিন্তু দরজা-জানালা খুব শক্ত। চার দিকে সরু সরু অন্ধকার গলি। বাড়ী দোতলা, উপরে নীচে সাত আটটা ঘর। উপরের একটা ঘরে এক জন লোক একটা পাখি অল্প খুলে তার কাছে ব'সেছিল, সেখান থেকে সব দেখা যায়। নীচের একটা মাঝের ঘরে পাঁচ ছয় জন লোক ব'সে কথা কইছিল। চাপা গলায় কথা, পাশের ঘর থেকে ভাল শুনা যায় না।

সে পাড়ায় যেমন লোকেদের বেশ, এদেরও সেই রকম। ময়লা ছেঁড়া কাপড়-চোপড়, গায় খড়ি উঠচে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, গোঁফ দাড়ী অপরিষ্কার। আর সকলে রোগা, কেবল এক জন বেশ মোটাসোটা, সরু সরু কয়েক গাছা গোঁফ, মাথার মাঝখানে টাক।

যারা রোগা, তাদের মধ্যে এক জন বলছিল, মালগুলা চালান করবার ত কোন উপায় দেখছি নে ! যে গোলমাল আরম্ভ করেছে, এখন ভয়ে কেউ নিতে চায় না। সেগুলায় ছাতা পড়তে আরম্ভ হয়েছে। আমাদের টাকা চাই, ওসব নিয়ে আমরা কি করব ?

মোটা ব্যক্তি বল্‌লে, আমাকে ত এ পর্য্যন্ত তোমরা সব মাল দেখাও নি। ভাগ ত সব সমান সমান করতে হবে।

আর এক জন একটু গরম হয়ে বল্‌লে, তুমি আমাদের সমান ভাগ পাবে কোন্‌ হিসাবে? তোমার ভয় ছিল কিসের? ধরা পড়লে আমরা শালারাই যেতাম, তোমার কিছুই হ'ত না।

মোটা লোকটা চ'টে উঠ্‌ল। বল্‌লে, আমার জন্যই ত অত মাল তোমরা পেলে। লোহার সিন্দুক ভেঙ্গে সব বের করতে কত সময় লাগ্‌ত, জান? কানাচ-গোড়ায় পুলিস, মনে নেই?

এক জন বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, থাম, থাম। এরি মধ্যে নিজেদের মধ্যে বিবাদ? বলাই, তুমি সমান ভাগ পাবে, মাল আমার জিম্মায় আছে। কিন্তু সেগুলা পার করতে না পারলে কিছুই করা যায় না।

এই ব্যক্তি সর্দ্দার। এর কথার উপর কেউ কথা কইতে সাহস করিল না।

বলাই বল্‌লে, ছিরু পোদ্দারের কাছে গিয়েছিলে?

—সে এখন নিতে সাহস করছে না; বলছে, মাসকতক যাক। তোমাকে সব দেখাব। তোমার জানা কোন বিশ্বাসী লোক আছে?

—আছে, কিন্তু বড় সাবধানে কথা পাড়তে হবে। হাতে হাতে টাকা পেলে তবে মাল ছাড়া যায়।

—তা নইলে ত বাটপাড়ি হয়ে যাবে।

সর্দ্দারের নাম গোকুল। সে সকলকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, তোমরা যদি আপোষের মধ্যে এ রকম চটাচটি কর, তা হ'লে সব ফেঁসে যাবে। আমরা সকলেই এর ভিতর আছি, সকলেই সমান ভাগ পাবে। বলাইয়ের ভাগ কম হবে কেন? আর ভাগ করব আমি, তোমাদের সে কথায় দরকার কি?

গোকুলকে তারা সকলে চিনত। রাগলে রক্ষে নেই। তার কথার উপর আর কেউ কথা কইল না।

গোকুল বললে, এখন সব স'রে পড়। বলাইকে সঙ্গে ক'রে আমি মালগুলো পার করার একটা উপায় করি। টাকা পেলেই ভাগ ক'রে দেব।

সকলে একসঙ্গে গেল না। একে একে বেরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গলিতে চ'লে গেল, কেবল গোকুল আর বলাই একসঙ্গে গেল। তারা দুই জন হন হন করে' একটা গলিতে ঢুকল। গলির মোড়ে একটা লোক তাদের দিকে পিছন ক'রে পথের ধারে বসেছিল। ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়, গায় মাথায় ধুলা। আপনার মনে বিড়বিড় ক'রে কি বকছিল।

তাকে দেখে গোকুল বললে, কোত্থেকে একটা পাগল এসে জুটেছে।

বলাই বললে, ওদের আবার জোটাজুটি কি? যেখানে ইচ্ছে গেলেই হ'ল। মারধর করলে পাগলা-গারদে পুরবে।

তাদের কথা শুনে পাগলা উঠে দাঁড়াল। হাত পেতে বললে, ক্ষিদে পেয়েছে, পয়সা দাও।

মাথার চুল জটার মতন, চোখে শূন্য দৃষ্টি, গোঁফ-দাড়া অপরিষ্কার, গায় খড়ি উঠছে।

গোকুল হেসে উঠল, বললে, ক্ষিদের বেলা খুব টনটনে জ্ঞান। এই নে—ব'লে তাকে একটা পয়সা ফেলে দিলে।

খানিক দূর গিয়ে আর একটা গলিতে প্রবেশ ক'রে গোকুল আর বলাই একটা ছোট বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। গোকুল দরজায় কয়েকবার ঘা দিল। আঘাতে সঙ্কেত ছিল। ভিতর থেকে কে এক জন দরজা খুলে দিয়ে সোঁ ক'রে চ'লে গেল। বলাইকে একটা ছোট ঘরে বসিয়ে গোকুল কোথা থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স নিয়ে এল। বাক্স খুলে বললে, তুমি মাল দেখ নি বলছিলে, এই দেখ।

দোকান লুটে তারা যা কিছু পেয়েছিল, সব সেই বাক্সে ছিল। গোকুল বললে, কত পাওয়া যাবে?

বলাই বললে, তা কেমন ক'রে বলব? যা দাম, তার সিকি পেলে আমাদের ভাগ্যি। এত দিন ত কেউ নিতেই চায় না, এখন গোলমাল কমেছে, এইবার একবার ছিরুকে চেষ্টা ক'রে দেখা যাক।

—তুমি একা যাবে?

—না, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমি একলা গেলে তোমরা আমাকে সন্দেহ করবে যে, ছিরুর সঙ্গে ষড় ক'রে আমি কিছু আলাদা পাব।

দুজনে পরামর্শ ক'রে স্থির করলে, সেই দিন সন্ধ্যার পর ছিরু পোদ্দারের সঙ্গে দেখা করবে।

৬

যে পাগলকে গোকুল একটা পয়সা ফেলে দিয়ে গেল, তার দিকে তারা আর ফিরে দেখে নি। দেখলে একটু

কবি-প্রিয়া

বসুমতী-চিত্রবিভাগ]   [শিল্পী—চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশ্চর্য্য হ'ত। পাগল চট ক'রে আড়ালে গিয়ে ছেঁড়া কাপড়ের ভিতর থেকে পরিষ্কার জামা, ধুতি, জুতো বের ক'রে পরলে; চিরুণী দিয়ে চুল, দাড়ী, গোঁফ আঁচড়ে পরিষ্কার করলে। তার পর অলক্ষ্যে গোকুল আর বলাইয়ের পিছনে চলল। তারা যে বাড়ীতে ঢুকল, দূর থেকে সেটা লক্ষ্য ক'রে আর এক দিকে চ'লে গেল।

সন্ধ্যার পর গোকুল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। তার খানিক পরেই এক জন ফকীর মুস্কিল আসানের চেরাগ হাতে গোকুলের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল। বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই এক জন স্ত্রীলোক দরজা খুলে ফকীরকে একটা পয়সা দিতে এল। ফকীর বাঁ হাতে লণ্ঠন তুলে ধরলে, ডান হাতে একখানা রুমাল। রুমালের কোণে কালো সূতা দিয়ে ছোরা আঁকা।

স্ত্রীলোক যুবতী। তার হাতের পয়সা হাতেই রইল। রুমাল দেখে ভয় পেয়ে সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে, এ রুমাল তুমি কোথায় পেলে?

ফকীর বললে, আমিও ঐ দলে। তা না হ'লে এ রুমাল কোথা থেকে পাব?

—তা হ'লে তোমার এ সাজ কেন?

—এ রকম সেজে না এলে তুমি আমার সুমুখে বেরুতে না। তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

—কি কথা?

—এরা যে টাকা-কড়ি পায়, তোমাকে কিছু দেয়?

—কি আর দেবে? আমাকে কিছুই দেয় না। আমার কি কিছু কিনতে সাধ যায় না?

—আমিও তাই ভেবেছিলাম। এই ধর।

ফকীর ত্রিশটা টাকা যুবতীর হাতে দিল। প্রথমে যুবতী পিছুল, বললে, তোমার টাকা আমি নেব কেন?

—আমার কিসের টাকা? এ টাকা তোমার ভাগের। আমি ওদের কিছু না ব'লে রেখে দিয়েছিলাম।

—যদি ওরা টের পায়?

—তুমি কিংবা আমি না বললে কেমন ক'রে টের পাবে? আমাকে দিয়ে কোন কথা প্রকাশ হবে না। তুমি বললে তোমারই বিপদ।

—আমি কেন বলতে গেলাম? ব'লে যুবতী টাকা কটা নিলে।

ফকীর বললে, দেখ, ওরা আরও টাকা পেয়েছে, তোমাকে হয় ত কিছু দেবে না। কিছু মাল হয় ত এই বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছে। কোথায় রাখে জান?

যুবতী বললে, আমি কিছু জানি নে, আমাকে কিছু বলে না। আমি যদি কোথাও খুঁজি, তা হ'লে টের পেলে আমার হাড় ভেঙ্গে দেবে।

—ওরা ঐ রকম, প্রাণে দয়ামায়া নেই। আমি একবার খুঁজে দেখব?

—আর সেই সময় ওরা যদি এসে পড়ে? তা হ'লে আমাদের দু জনকেই মেরে ফেলবে। তুমি আর এখানে দাঁড়িও না, কখন্ এসে পড়বে, তার ঠিক নেই।

যুবতী বাড়ীর ভিতর গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। ফকীর সুর ক'রে মুস্কিল-আসান হাঁকতে হাঁকতে চ'লে গেল।

ও দিকে গোকুল আর বলাই ভদ্রলোকের বেশে ছিরু পোদ্দারের দোকানে গেল। দোকানে আর কেউ ছিল না। ছিরু মোটাগোটা লোক, দোকানে ব'সে উল্টেপাল্টে খাতা দেখছিল। তাদের দেখে বললে, এই যে বলাই বাবু, কি মনে ক'রে? আপনার সঙ্গে ইনি কে?

বলাই বড় বড় দাঁত বের ক'রে বললে, ইনিও বেপারী, আমার ভাগীদার। এখনে বাজার কি রকম? কিছু মালটাল নেবে?

ছিরু বললে, বাবু, বাজার ত বড় মন্দা, এখন একটু ভাল হয়েছে। অল্পস্বল্প মাল নিতে পারি। সঙ্গে কিছু আছে না কি?

গোকুল কাপড়ের ভিতর থেকে দু'চারখানা জড়োয়া অলঙ্কার বের করলে। বললে, সব আনি নি। বল ত এর পর সব নিয়ে আসব।

ছিরুর চক্ষু লোভে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু মনের ভাব চেপে বললে, আজকাল যে বাজার হয়েছে, মাল চালান দেওয়াই শক্ত। তা হলেও সব মাল দেখলে একটা কিছু ঠিক ক'রে বলতে পারি।

গোকুল বললে, এগুলোর জন্য কত দিতে পার?

ছিরু অলঙ্কার হাতে ক'রে নেড়ে চেড়ে দেখলে। বললে, এর আর কত হবে? সব ভেঙ্গে চুরে আলাদা আলাদা ক'রে আর কোথাও পাঠাতে হবে। এখানে

এর কিছুই চলবে না। খুজরো খুজরো বেচলে কি আর পাওয়া যাবে? এগুলোর জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি। কিন্তু সমস্ত মাল না দেখলে আমি কিছু নেব না।

বলাই বললে, কি বল তুমি? পঞ্চাশ টাকা? এক-খানার দাম পাঁচ শো টাকা হবে।

ছিরু একটু রুক্ষভাবে বললে, বাবু, বাজারে একবার যাচাই করিয়ে দেখুন না।

বলাই দ'মে গেল, বললে, তুমি চটচ কেন? একটু বিবেচনা কর। তুমি ত জান, আমরা আর কারুর কাছে যাই নে।

ছিরু নরম হয়ে বললে, সব মাল নিয়ে আসবেন, তখন দেখা যাবে। গলা খুব খাটো ক'রে বলেল, আমার কথাও আপনাদের ভাবতে হয়। আমার হাতে হাতকড়ি পড়লে কে আমাকে রক্ষে করবে?

গোকুল আর বলাই আর কোন কথা না ব'লে উঠে গেল।

রাস্তার মোড়ে ধামাবগলে এক জন হাকছিল, বোঁটা কাটা বেল ফুল—বেল ফু—ই—ল!

তার পাশে দাঁড়িয়ে দুজন খোট্টা গল্প করছিল।

বলাই আর গোকুলকে দেখে ফুলওয়ালা এক ছড়া গড়ে মালা তুলে ধরলে, বললে, বাবু, বেলফুল।

গোকুল হাত নাড়া দিয়ে দিয়ে বলাইয়ের সঙ্গে চ'লে গেল। তারা কেমন ক'রে জানবে যে পাগল, মুস্কিল-আসান ফকীর আর বেলফুলের ফেরিওয়ালা একই লোক!

৭

নবীন ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা ক'রে বললে, মাছ জালে পড়েছে। এখন গুটোলেই হ'ল।

ইন্সপেক্টর আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন, বল কি? তাদের সন্ধান পেয়েচ?

—দলের সর্দ্দার আর যে জমীদার সেজেছিল, তাদের দেখেছি। সর্দ্দারের বাড়ী জানি। তারা কোথায় জড় হয়ে পরামর্শ করে, তাও জানি। ছিরু পোদ্দার ওদের কাছ থেকে লুঠের মাল নেয়। আপনি ইচ্ছে করলেই ওদের হাতেনাতে ধরতে পারবেন। আমার থাকা দরকার, না আমার না গেলেও চলবে?

—তোমার যাবার কোন আবশ্যক নেই; কেন না, তুমি এর ভিতর আছ জানতে পারলে ওদের দলের কেউ না কেউ তোমাকে খুন করবে। তা হ'লে এর পর আর আমরা তোমার সাহায্য পাব না। আমাকে সব সন্ধান ব'লে দাও, তা হ'লেই আমি সব ঠিক ক'রে নেব।

গোকুলের বাড়ী কোথায়, কোন্ বাড়ীতে তার দল জড় হয়, নবীন বললে। পকেট থেকে সেই রুমাল খানা বের ক'রে ইন্সপেক্টরের হাতে দিল। বললে, এখানা দেখালে ওদের মধ্যে কেউ সব কথা প্রকাশ ক'রে দিতে পারে। আজ সন্ধ্যার পর ছিরু পোদ্দারের দোকান, সর্দ্দারের বাড়ী আর ওরা যেখানে জুটে পরামর্শ করে, আর টাকা ভাগ করে, এই তিনটে যায়গা একসঙ্গে ঘেরাও করা উচিত। সর্দ্দারের বাড়ীতে এক জন স্ত্রীলোক আছে। সে দলের কথা জানে, কিন্তু আর বিশেষ কিছু জানে না। তাকে আমি চিহ্ন-করা ত্রিশটে টাকা দিয়েছি, তার কাছে পাওয়া যাবে।

ইন্সপেক্টর অবাক্ হয়ে বললেন, তাকে তুমি টাকা দিলে কি রকম ক'রে?

নবীন হেসে বললে, মুস্কিল-আসান ফকীর সেজে।

সন্ধ্যার পর গোকুল আর বলাই ছিরুর দোকানে গেল। ডাকাতীর মাল গোকুল একটা ছোট পুঁটুলিতে বেঁধে কাপড়ের ভিতর নিয়েছিল। দলের লোকের সঙ্গে কথা ছিল, তারা সেই পুরানো বাড়ীতে অপেক্ষা করবে, গোকুল বলাই ফিরে এসে যা টাকা পায়—ভাগ ক'রে দেবে।

ছিরু পোদ্দার দোকানে বসেছিল। গোকুল আর বলাই এসে তার কাছে বস্‌ল। ছিরু বললে, কৈ, মাল দেখি।

গোকুল পুঁটুলী খুলে সব অলঙ্কার বের করলে। ছিরু এক একটা হাতে ক'রে দেখতে লাগল।

কোথাও কিছু নেই, দশ বিশ জন পাহারাওয়ালা নিমেষের মধ্যে দোকান ঘিরে ফেললে। কারুর পোষাক পরা ছিল না। বলবন্ত সিং আর তমিজ খাঁ লাফিয়ে দোকানে উঠে তিন জনের হাতে হাতকড়ি দিয়ে দিলে। গহনা সমস্ত ছড়ানো ছিল। বলবন্ত সিং গোকুলের পকেট থেকে একটা পিস্তল পেলে। আর দু'জনের কাছে কোন অস্ত্র ছিল না।

পিছন থেকে হেলতে দুলতে গালভরা হাসি মুখে

ইন্সপেক্টর সাহেব এলেন। বলবন্ত সিং তাঁর হাতে পিস্তল দিয়ে, গোকুলকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে, এটা এর কাছে পাওয়া গিয়েছে।

ইন্সপেক্টর বল্‌লেন, এই সর্দ্দার। পিস্তল ভরা ছিল, খুলে কার্ত্তুজগুলা বের ক'রে নিলেন। বলাইয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, তুমি শেয়াল-গাঁয়ের জমীদার না?

তিন আসামীর মুখে কোন কথা নেই। যার দোকানে ডাকাতী হয়েছিল, তারও ডাক পড়েছিল, সেও এসে উপস্থিত হ'ল। অলঙ্কার দেখে বল্‌লে, এ-সব আমার দোকানের মাল।

ইন্সপেক্টর আঙ্গুল দিয়ে বলাইকে দেখিয়ে বল্‌লেন, জমীদার বাবুকে চিনতে পার?

গাড়ী ক'রে আসামীদের থানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। একটু পরেই সেই স্ত্রীলোককে পুলিস গ্রেপ্তার ক'রে আনলে। সে গোকুলকে দেখে বল্‌লে, আমি তোকে বারবার বলতাম, এ কায ছেড়ে দে, আমার কথা কাণে তুলিস নি। সেই মুস্কিল-আসান ফকীর সব্বনাশের গোড়া!

গোকুল বল্‌লে, কি বলছিস তুই? কোন্ ফকীর, তাকে কোথায় দেখলি?

স্ত্রীলোকটি কোন উত্তর দেবার আগেই ইন্সপেক্টরের হুকুমে তাকে টেনে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

দলের অন্য ডাকাতরাও গ্রেপ্তার হয়ে এল। ইন্সপেক্টর সব কয় জনকে আলাদা আলাদা রাখতে বললেন।

যে ঘরে গোকুলকে রাখা হয়েছিল, ইন্সপেক্টর প্রথমে সেই ঘরে গেলেন। বললেন, এখন সব কথা আমাকে খুলে বল, তা হ'লে তোমার কম সাজা হবে। আমরা ত সব জেনেছি, আর কথা লুকোলে কি ফল?

গোকুল স্থিরভাবে ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে চেয়ে বললে, তোমরা যদি সব জান, তা হ'লে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে কি হবে? আমি কিছু জানি নে।

—ও কথা সকলেই বলে। তার পর একটু ঠাণ্ডা করলে অন্য নরম কথা কয়।

—তাই ক'রে দেখ। আমার কাছ থেকে কোন কথা পাবে না।

ইন্সপেক্টর সেই রুমালখানা বের ক'রে গোকুলকে দেখালেন, বল্‌লেন, এখানা চিনতে পার?

গোকুল বল্‌লে, তোমার রুমাল আমি কেমন ক'রে চিনব?

তার পর ইন্সপেক্টর বলাইয়ের কাছে গেলেন। তাকে বল্‌লেন, তোমার জমিদারীর কিছু খবর আমাকে বলবে? বললে তোমারই লাভ। তুমি ওদের সঙ্গে বিপদে পড় কেন?

বলাইয়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে বললে, দোহাই সাহেব, আমার কোন অপরাধ নেই। ওরাই আমাকে এর মধ্যে জড়িয়েছে। আমি কিছু করি নি।

—আমিও তাই ভেবেছিলাম, ব'লে ইন্সপেক্টর তাকে রুমাল দেখালেন। রুমালের চিহ্ন দেখিয়ে বললেন, এখানা তোমার—না ওদের কারুর?

বলাই ঘেমে উঠল, বললে, ওদের কারুর হবে, জোর ক'রে আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে থাকবে।

ইন্সপেক্টর বলাইয়ের কথায় সায় দিয়ে বললেন, ঠিক কথা। তোমার বিশেষ কোন দোষ নেই, ওরাই তোমাকে জড়িয়েছে। তুমি যা জান, সব যদি সত্যি বল, তা হ'লে খালাস পাবে।

বলাই বললে, আমি সব সত্যি বলব। সাহেব, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে রেহাই দাও।

সাহেব বলাইয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, বললেন, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সব কথা আমাকে বল।

বলাই সব কথা ব'লে ফেল্‌লে। ইন্সপেক্টরের হুকুমে রাত্রিতে তার খাবারের উত্তম আয়োজন হ'ল।

আদালতে বিচারের সময় বলাই সরকারী পক্ষের সাক্ষী হ'ল। নবীনকে আদালতে কেউ দেখতে পায় নি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

নব্য-সাহিত্যের রূপশিখা

বসুমতী চিত্র-বিভাগ] [শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

শিহ্লন আদিত্য

(চরিত্র চিত্র)

অধ্যাপক শিহ্লন আদিত্য (প্রাকৃত শৈলেন দত্ত) একসময় গর্ব্ব করিতেন, তিনি আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যবংশ-সম্ভূত। এই জন্যই “দত্ত” বানান করিতেন ‘দত্য’। বলিতেন, কালে যেমন গাছের পাতা খসে, তেমনি “আদিত্য” শব্দের আকার-ইকার, দুই লোপ পেয়েছে। এক জন প্রতিবাদ করিলেন, দৈত্য = দত্য।

বাদল পড়িতেছিল—এম্,—এ,—জেড্—ই—মেজ্—মানে গোলকধাঁধা। মে মানে গোলক, জেড্ মানে ধাঁধা।

পিতৃহীন বাদল বিপত্নীক অধ্যাপকের দূর-সম্পর্কীয়া শ্যালিকার পুত্র। অধ্যাপকের পত্নী যখন শেষ শয্যায়, কন্যা অনু তখন বালিকা। দুহিতাকে ভগিনীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনিও নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু বিপদে পড়িলেন বাদলের মা। বিধবা, বয়স প্রৌঢ়ত্বের দাবি লইয়া আসিলেও যৌবন এই শুদ্ধসত্বময়ী, সদাচার-পরায়ণা বাল-বিধবার মহলটি জবর দখল করিয়া রহিয়াছে। দূর-সম্পর্কীয় ভগিনীপতির বাড়ী—বড় ভয়, যদি পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়। বয়স্থা বিধবাকে অতি সন্তর্পণে থাকিতে হয়। কিন্তু এই সাদাসিধা, সদাশয়, সহৃদয় অধ্যাপককে সে কথা বুঝান যায় কেমন করিয়া!

সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিশ্বেশ্বরী এক দিন কথাটা পাড়িলেন। অধ্যাপক তখন আহারে বসিয়াছেন।

প্রোফেসর বলিলেন, আজ অম্বলটা যে হয়েছে, বিশু! কি চমৎকার রান্না তোমার! কি দিয়েছিলে?

বিশ্বেশ্বরী মনে মনে বলিলেন, আমার মাথা! প্রকাশ্যে বলিলেন, হরি বল! ওটা যে সুক্ত!

অ্যাঁ, সুক্ত! তাই না কি! আমি বলি, তাই ত! সুক্ত এমন মিষ্টি হ’ল কি ক’রে! ভাবলুম, বিশুর হাত। তেতোকে যদি মিষ্টি না করবে, তবে আর রান্না কি! বাঃ, চমৎকার!

তা হ’ক্, ভাই, এবার আমার যাবার বন্দোবস্তটা ক’রে দাও!

অধ্যাপকের হাত থামিয়া গেল। কোথা?

দেশে।

দেশে? অধ্যাপক ঘন দুধের বাটিতে ভাতের পরিবর্ত্তে বেগুন-ভাজা ফেলিয়া দিলেন।

আ-হা-হা, করলে কি? ওটা যে বেগুন-ভাজা।

হ্যাঁ, তাই না কি! বেগুন-ভাজা! তাই ত, করলুম কি?

বিশ্বেশ্বরীর চোখে জল আসিল। এই অসহায় শিশুকে ছেড়ে যেতে হবে! বলিলেন, কিছুই যে খাওয়া হ’ল না! আর একটু দুধ এনে দি?

দুধ? তা দাও।

অধ্যাপক হাত ধুইয়া পাণ মুখে দিলেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বরীও আজ না-ছোড়-বান্দা। বলিলেন, তা কি ঠিক করলে?

কিসের?

না-না, তুমি বুঝ্ছ না। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও।

পুনঃ পুনঃ বলিতে অধ্যাপকের হুঁস হইল। বলিলেন, কিন্তু অনুকে যে তোমায় মানুষ করতে হবে।

আমারই কি অসাধ, ভাই! কিন্তু—

ওর আর ‘কিন্তু’ নেই, বিশু! মানুষ করতে হবে ত ঠিক মানুষ করতে হবে।

ভাই, আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক।

কিন্তু অম্বল ত চমৎকার রাঁধ!

তুমি জ্বালালে! না, ভাই, আমায় দেশে পাঠিয়ে দাও।

প্রোফেসর হাঁকিলেন, বাদ্লা!

কি মেসো, বলিয়া বাদল ছুটিয়া আসিল। অধ্যাপক তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেশে যাবি?

বাদলের মুখ শুকাইল। বলিল, না মেসো।

ইহারও একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস ছিল। বাদলের গ্রামে কয়েক জন অপোগণ্ড বালক মিলিয়া একটি সখের যাত্রা প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামের রক্ষাকালী-পূজায় তাহার প্রথম

আসর। টাকা নাই, অথচ আমোদ চাই। পাড়ার বালকরা যা করে! দলের সহিত বন্দোবস্ত—একহাঁড়ী পাটার কালিয়া, এক ওড়া লুচি। দলপতি তাহা হস্তগত করিয়াই আখ্‌ড়ায় পাঠাইয়া দিল। পালা হইতেছে 'দুর্ব্বাসার পারণ।' অভিনয় একরকম চলিতে লাগিল—বই খুলিয়া যে যার ভূমিকা পাঠ করিয়া। তাও 'দুর্ব্বাসা'কে কখন বলে দরবেশ, 'রুচি'কে বলে লুচি, 'প্রকট'কে বলে পাটা, 'বলিয়া'কে বলে কালিয়া।

মুরুব্বি বলিলেন, ওহে, তোমরা গান জান না?

বাদল ছেলেটি বড় সপ্রতিভ। বলিল, খুব খুব।

তবে তাই দু'একখানা হ'ক।

বাদলের কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট। পাড়ার সকলে তাহা জানিতেন। গান শুনিবার জন্য আসর উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

দা-কাটা পাটের সুদীর্ঘ জটা-জূট, শ্মশ্রু-গুম্ফ-মণ্ডিত দুর্ব্বাসা আসরে পদার্পণ করিয়াই গান ধরিলেন—

"আমি কি প্রেম করিলাম প্রাণসখী—ফ্যাঁচ্।

পাটের সোঁয়া নাসিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহী সেনার ন্যায় অতি অশিষ্ট উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু বাদল চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। নাক ঘষিতে ঘষিতে দ্বিতীয় কলি ধরিল—

'যারে ভালবাসি'—ফ্যাঁচ্!

চারিদিকে হৈ হৈ রব উঠিল, পাল চাপা দে, পাল চাপা দে।

ন্যায়রত্ন বলিলেন, আরে, থামো, থামো:

শিরোমণি বলিলেন, না না, দিক পাল চাপা। গান করে কি প্রেম করলাম। তাও সহ্য হয়, কিন্তু দুর্ব্বাসা হাঁচে!

কেন হাঁচবে না! হাঁচি পেলেই হাঁচবে।

তোমার মত হতমূর্খ আর দু'টি নাই! পৌরাণিক চিত্র ত প্রদর্শন করতে হবে! অষ্টাদশ পুরাণ আমার বাড়ীতে আছে। তার একখণ্ড থেকে যদি বার করতে পার, ঋষি দুর্ব্বাসা কখন হেঁচেছিলেন, তা হ'লে আমার এই নস্যের শম্বুক ফেলে দেব!

আজ ফেলে দেবে, কাল আবার নূতন কাড়বে। আরে গণ্ডমূর্খ ষণ্ড! ঋষি হাঁচতেন—না, এমন কোথাও আছে?

আ মরি-মরি, বুদ্ধির বংশদণ্ড! বিদ্যার মানমণ্ড! ঋষি যে কায করেন নি, তা আবার লিখবে কি? মহাতপা মুনি কোপনস্বভাব ছিলেন, কথায় কথায় অভিসম্পাত দিতেন।

আর কিছু করতেন না? শৌচাচার, হস্ত-পদ-প্রক্ষালন প্রভৃতি?—

কিছু না, কিছু না। তিনি খালি উগ্র তপ করতেন, শাপ দিতেন আর পারণ ক'রে বেড়াতেন। সব হজম ক'রে ফেলতেন। শৌচাচার তাঁর আবশ্যক হ'ত না। সব জপে জপে সারতেন—যেমন জপের দশাংশ হোম।

আরে এটা কোথাকার ইল্লুতে!

কি বল্‌লি, বেল্লিক—ইত্যাদি।

এই 'বিষমে সমুপস্থিতে' সেদিনকার মত আসর ভঙ্গ হইয়া গেল। দুর্ব্বাসা ও শিষ্যবর্গ পারণ করিলেন আখড়ায় লুচি-পাঠা-দরবেশ।

বিশ্বেশ্বরী দেশে ফিরিবার প্রস্তাব করিয়া কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অধ্যাপক তখন একখানি পুস্তকে মগ্ন। বিশ্বেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কি বলছ?

অধ্যাপক কহিলেন, সমস্ত দৃশ্যজগৎ দীর্ঘ-প্রস্থ এবং উচ্চতা দ্বারা সীমাবিশিষ্ট। কেমন? Space কি না স্থান তিন dimension অর্থাৎ পরিমাণবিশিষ্ট। আশ্চর্য্য! অদ্ভুত, অদ্ভুত! আর্য্যরা বহু পূর্ব্বে ব'লে গেছেন, চতুর্ব্বর্গ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। মোক্ষটা জগতের বাইরে! বাঃ! কিন্তু এখন আবার চতুর্ব্বর্গের ওপর গেছে। ষড়বর্গ। এঁরা বলেন, দীর্ঘ, প্রস্থ, খাড়াই যেমন বস্তুর মাপ—অর্থাৎ ডাইমেন্সন্, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তেমনি কালের পরিমাণ। ঠিক, ঠিক! এ দিকেও cube, ওদিকেও cube, অর্থাৎ দুদিকেরই পরিমাণ ঘন। বাদল, তুই এটা বুঝেছিস্?

বাদল বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, খুব—খুব।

কি বল দিকি?

ঘন দুধ বলছ ত?

হা—হা! বাদল, তুই-ই সার বুঝেছিস!

বিশ্বেশ্বরী আর একবার বলিলেন, তা ভাই, আমাকে কবে দেশে পাঠাচ্ছ, বল?

প্রোফেসর কিছুক্ষণ তাঁহার মুখ চাহিয়া বলিলেন, ওঃ,

আশ্চর্য্য স্মরণ-শক্তি! এখনও সে কথা ভোল নি? তা বিশু, এ কথাটাও অমনি মনে রেখ—তোমার দেশে যাওয়া হবে না।

কেন?

ঐ ছবিখানাকে জিজ্ঞাসা কর। প্রোফেসর বিষণ্ননেত্রে মৃতা পত্নীর আলেখ্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, তোমাকে ব'লে গেছে, অণুকে মানুষ করতে। প্রোফেসরের চক্ষু সজল, কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ। বলিলেন, তুমি অণুকে মানুষ করবে, আমি বাদলকে মানুষ করব। কেমন রে বাদল, তুই মানুষ হচ্ছিস ত?

খুব—খুব।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, আহা, মানুষ যা হচ্ছে! সে দিন সুপুরি কোচাচ্ছিল। অণু এসে বললে, বাদল দাদা, আমার কাপড়খানা কুঁচিয়ে দাও না। বাপধন আমার কাপড়খানিকে কুচি কুচি ক'রে কুচিয়ে কতকগুলি চিল্‌তে এনে দিলেন! মানুষ হচ্ছে! আর এক দিন ডাকহরকরা আমার নামে একখানা চিঠি নিয়ে এল, বল্‌লে, চার পয়সা মাশুল লাগবে। বাদল তার সঙ্গে পেল্লায় ঝগড়া বাধিয়ে দিলে, বললে, কেন? পাড়াশুদ্ধ অমনি চিঠি বিলি ক'রে বেড়াও, আমার মা চার পয়সা দেবে কেন? সে বলে, এ চিঠি বেয়ারিং। ও বলে, বটে! ছেলে মানুষ মনে ক'রে ঠকিয়ে নেওয়া। বেয়ার মানে ভাল্লুক—আমি জানি নি? ভাল্লুক চিঠি লিখেছে?

অধ্যাপক বলিলেন, বাঃ! কি স্মরণশক্তি! হবে না, তোমার ছেলে! ঠিকই ত। বেয়ার মানে ভাল্লুক। কিন্তু আর একটাও হয়, বাদল। বেয়ার ক্রিয়াপদ—বহন করা।

বাদল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, ভারি ত বহন! মুটে একমণ দেড়মণ ভার আনে, চার পয়সা পায়। আর একখানা চিঠি কতটুকু ভারী, মেসো!

প্রোফেসর বলিলেন, দেখ, বিশু, কি বুদ্ধি, দেখ! ও এর পর রিসার্চ্চ করবে! আচ্ছা, বিশু! ওর নাম বাদল হ'ল কেন?

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, ও যখন জন্মায়, তখন বর্ষাকাল। সাত দিন ধ'রে অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে। ব্যথা নেই, শুলো নেই। দাওয়ায় ব'সে বাটনা বাটছি। ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি এল, ও পেট থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কি, ছাতি না নিয়ে? কখন এমন কায করিস নি, বাদল। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মারা যাবি।

বিশ্বেশ্বরী বুঝিলেন, অধ্যাপক অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। বাদল তাহার সেদিনকার পড়ার জাবর কাটিতে লাগিল—এম এ—জেড্—ই মেজ মানে গোলকধাঁধা।

অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলকধাঁধা কখন দেখেছিস, বাদল?

না, মেসো।

চ' দেখিয়ে আনি। অণু যাবে কি?

কিন্তু অণু সেই কাপড় কোঁচাবার পর হইতে বাদলের সঙ্গ করিতে অনিচ্ছুক।

অধ্যাপকের জানা ছিল, ডানদিক্ ধরিয়া গোলকধাঁধায় প্রবেশ করিতে হয় এবং ডাহিন দিকের পথ ধরিয়াই বাহির হইতে হইবে। সোজা কথা। সিঁথি সাতপুকুরের বাগানে তখন একটি গোলকধাঁধা ছিল। অধ্যাপক বাদলকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। ভিতরে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভগবান্ বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। ভিক্ষু বলিলেন, ত্রিরত্নই সকল শাস্ত্রের যাগ-যজ্ঞ-জপ-তপের সার।

বাদল বলিল, মেসো, বাড়ী চল, আর ঘুরতে পারিনি, পা ব্যথা করছে।

হায়, বাড়ী কোথা! সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়াও আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। আরও কিছুক্ষণ ঘুরিতে ঘুরিতে ধাঁধার কেন্দ্রস্থলের মন্দিরটি পাওয়া গেল। তিন জনেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, মন্দিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম।

ভিক্ষু বলিলেন, এইবার ওঠা যাক। আপনি বেরুবার পথ জানেন ত?

অধ্যাপক বলিলেন, খুব সোজা। ডানদিক ধ'রে গেলেই হবে!

কিন্তু আবার আধঘণ্টা ঘুরিবার পর সেই মন্দির!

প্রোফেসর বলিলেন, এ মন্দির কোথা থেকে এল?

ভিক্ষু বলিলেন, ওটা ত বরাবরই ঐখানে আছে।

কখন না। এত ঘোরা যাচ্ছে, থাকলে নিশ্চয়ই দেখা যেত।

বাদল বসিয়া পড়িল এবং হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভিক্ষু বলিলেন, অধ্যাপক, ত্রি-রত্ন স্মরণ কর। বল, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

তার পর আবার ঘোরা আরম্ভ। চলিতে চলিতে ভিক্ষু দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বলিলেন, আমরা বোধ হয় ঠিক্ চল্‌ছি না।

হাঁ, বরাবর ডান দিক ধ'রে যাচ্ছি।

ভিক্ষু বলিলেন, না।

অধ্যাপক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, না! কোন্‌টা আমার বাঁ হাত?

যে হাতে ছাতা।

বাঁ হাতে ছাতা নেওয়া আমার কোন পুরুষে অভ্যাস নেই।

ছাতা যে ডান থেকে বাঁ হাতে বদ্‌লালেন, মশাই।

তা হ'তে পারে। কিন্তু ঐটা আমার ডান হাত।

ঠিক্ উল্‌টো।

কি বিপদ! আমার হাত আমি জানি নি?

দেখ্‌ছি ত তাই। আপনার মাথা গুলিয়ে গেছে। এই মালী, পথ দেখিয়ে দে, বখশিশ পাবি।

বাদল গৃহে ফিরিয়া, মেজ কথাটি এমন করিয়া মসীলিপ্ত করিল যে, আর পড়া না যায়। ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয় হইবার পর, অধ্যাপক বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনায় গভীর অভিনিবেশ করিলেন। গবেষণা তাঁহার মজ্জাগত প্রবৃত্তি। ভিক্ষু তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন যে, বৌদ্ধদিগের ত্রিরত্ন পুরী-মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রারূপে বিরাজিত। রথযাত্রা বৌদ্ধোৎসব।

শারদীয়া মহাপূজা আসন্ন। প্রোফেসর স্থির করিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে আমার গবেষণার ফল প্রচার করিবার এই উপযুক্ত সময়। তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—

দুর্গোৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখিতে পাই যে, জগদ্ধাত্রী বল, কালী বল, সকল দেবতাই একা একা পূজা লইতে আসেন, কেবল গণেশজননীই সপরিবারে সমাগত হন। ইহার অবশ্যই অর্থ আছে। সে অর্থ আর কিছুই নহে—আর্য্যগণের অপূর্ব্ব মেধাবলে, অদ্ভুত কৌশলে বৌদ্ধ জাতক রূপকরূপে দুর্গা-প্রতিমায় প্রদর্শিত হইয়াছে। গৌরীতনয় গণপতি, যিনি সিদ্ধিদাতা, তিনিই প্রকৃতপক্ষে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ। ইনি শ্বেত হস্তীর আকার ধরিয়া জননী মায়াদেবীর গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। এই জন্যই গণেশের হস্তিমুণ্ড।

এই সময় শ্রোতাদের মধ্যে এক জন প্রতিবাদ করিল, হস্তিমূর্খও হ'তে পারে।

প্রোফেসর বলিলেন, তা যাই বলুন, দুর্গা কিন্তু বুদ্ধ-মাতা মায়াদেবী। কেন না, দুর্গার নামান্তর মহামায়া। সুতরাং সিদ্ধার্থজননী।

এক জন শ্রোতা বলিল, নিশ্চয়?

নিশ্চয়। এর চেয়ে নিশ্চয় আর কিছুই নেই।

মায়াদেবীর কি দশ হাত ছিল? যদি বলা যায়, ওগুলি হাত নয়—পা। আর সেই হিসাবে বলা যায়, দুর্গা অতিকায় মাকড়সা অথবা কাঁকড়ার প্রতীক।

অধ্যাপক বলিলেন, তা হ'তে পারে, কিন্তু কার্ত্তিক দেবদত্ত, আর ময়ূর মৌর্য্যবংশকে ইঙ্গিত করিতেছে। দেবদত্ত আর বোধিসত্ত্ব, দুই খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই—মৌর্য্যবংশ-সম্ভূত।

শ্রোতা।—তাই বংশের ঘাড়ে চেপে আছেন? তবে গণেশের মূষিক বাহন কেন?

অপর এক শ্রোতা বলিল, আমার বোধ হয়, গণেশ প্লেগরূপ মহামারীর প্রতীক। কেন না, প্লেগও ইঁদুর চ'ড়ে আসে। আর কার্ত্তিক ষড়ানন—লম্বা, চওড়া, ঢ্যাঙ্গা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—ষড়ানন স্থান-কালের এই পরিমাণও হ'তে পারে।

প্রোফেসর বলিলেন, তা হ'তে পারে। কিন্তু চোরা আর কেহই নয়, স্বয়ং মার।

তবে লক্ষ্মী-সরস্বতী কি?

প্রোফেসর সত্যবাদী ছিলেন এবং নিজের অক্ষমতা ত্রুটি স্বীকার করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। বলিলেন ঐ দুজন যে কে, তা আমি এখনও ঠিক করতে পারিনি. তবে, অবশ্যই ওঁরা কেউ হবেন!

শ্রোতা।—হবেন বৈ কি, বিলক্ষণ হবেন। সরস্বতী বোধ হয়, স্বয়ং রিসার্চ্ অর্থাৎ রস-চর্চ্চা।

তা হ'তে পারে। কিন্তু আর একটি কথার আভাস আমি দিতে চাই, তা হলেই আমার বক্তব্য শেষ। আপনারা জানেন, গণেশের স্ত্রী ছিলেন কলা-বৌ। এর অর্থ কি? ভাবার্থ শূন্য। আমরা কলা দেখাই। বুদ্ধও সংসারকে কলা দেখিয়েছেন।

শ্রোতা—মোচা নয়, অষ্টরম্ভা নয়, কাঁদি নয়, একেবারে গাছকে গাছ।

প্রোফেসর বলিলেন, তা হ'তে পারে। কিন্তু কলার অর্থ নির্ব্বাণ—শূন্য। আর আমার কিছু বক্তব্য নাই। আপনারা যে এতক্ষণ স্থিরভাবে, কোন প্রতিবাদ না ক'রে আমার বক্তব্য শুনলেন, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে চির-কৃতজ্ঞ।

শ্রোতা—কিন্তু একটা বাকি রইল। চালচিত্তিরটা কি?

প্রোফেসর বলিলেন, তাই ত, ওটার সম্বন্ধে আমি কোন গবেষণা করি নি।

শ্রোতা।—সার্, একটু ভেবে দেখবেন, 'চালচিত্তির,' বোধ হয়, পেটেন্ট্ ঔষধের বিজ্ঞাপন।

প্রোফেসর বলিলেন, ওঃ, তাই না কি! হা-হা-হা—

নিজের উপর এই বিদ্রূপবাণ বুক পাতিয়া লইয়া প্রোফেসর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

অধ্যাপকের যখন বিশেষ নাম-ডাক, সেই সময় তিনি 'টাকারি' তৈলের আবিষ্কর্ত্তাকে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন—"তৈলটি আমার পরীক্ষিত। বিশেষ উপকারী। ইহার ব্যবহারে মরুভূমির ন্যায় কেশ-শূন্য মস্তকে প্রচুর কেশোদ্গম হইয়াছে, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

প্রোফেসরের প্রশংসাপত্রের বিশেষ মূল্য ছিল এই যে, স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া তিনি কোন ঔষধেরই সুখ্যাতি করিতেন না। অতঃপর পেটেন্টের আবিষ্কর্ত্তৃগণ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিবার জন্য ডজন্ ডজন্ ঔষধ পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন—ভ্যালুপেয়েবল্—মূল্য দেয়—ডাকে—অবশ্য বিজ্ঞাপন সহ।

কেহ পাঠাইয়াছেন 'ম্যালেরিয়া কিলারিয়া' (malaria klleria) ম্যালেরিয়া নামক, অর্থাৎ বাড়ীর যেখানে মশকের আড্ডা, সেখানে একফোঁটা ফেলিয়া দিলে সর্ব্বাপদঃ শান্তি, ঔষধ খাইতে হইবে না।

এক জন 'বাধক-শোধক' পাঠাইয়া লিখিয়াছেন, বাধক বেদনার ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। অধ্যাপক স্বয়ং সেবন করিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক প্রশংসাপত্র দিলে ডজনে শিশি পিছু দ্বাদশ আনা হারে কমিশন্ দেওয়া যাইতে পারে।

টাকজগতে প্রশংসাপত্র প্রচারিত হইবার পর অধ্যাপকের বাড়ীতে টাকের এগ্‌জিবিসন্ মেলা বসিল। কাহারও মাথা-জোড়া টাক; কাহারও মাথার চারিদিকে চুলের ঝালর; কাহারও ব্রহ্মতালু একেবারে গোল-আলু। কেহ প্রোফেসরের চুল ধরিয়া টানে আর প্রশ্ন ক'রে, আলুতো গজায় নি ত, মশায়? টান্‌লে পরচুলার মত খসে আস্‌বে না? বৃথাই অধ্যাপক শপথ করেন, আমার টাক পড়ে নি, মশায়, আমার এক আত্মীয়ের।

তিনি কোথায়, মশায়? একবার দেখে যাই।

তিনি এখানে নাই।

ঠিকানাটা দিন না।

জানা নেই। শুনেছি যমের বাড়ী।

তার পর প্রশ্ন—তিনি পুণ্যবান্ ছিলেন, কি পাপাত্মা? অর্থাৎ টাকের ঔষধ মালিস করিতে করিতে যমের বাড়ী পাড়ি দিয়াছিলেন কি না। তার পর স্বর্গে গেছেন কি?

এ উপদ্রব যদি নিবৃত্ত হইল ত পত্র আসিতে লাগিল—সকলগুলি বেয়ারিং। কেহ জানিতে চাহিয়াছেন, কোন্ নির্দ্দিষ্ট তিথিতে অধ্যাপকের মাথায় কেশ গজাইতে সুরু করিয়াছিল এবং কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষেই সমভাবে চুল গজায় কি না? এক জন মাথার দিব্য দিয়া লিখিয়াছেন (বেয়ারিং), তাঁহার পুত্র ভুলক্রমে ঐ 'টাকারি' খানিক খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে পেটের ভিতর চুল গজাইবার সম্ভাবনা আছে কি না? দুই রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই দুশ্চিন্তায়।

সহৃদয় অধ্যাপক সকল বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করিতেন এবং উত্তরও দিতেন। অবশেষে বিশ্বেশ্বরী তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। ডাক-হরকরাকে বলিয়া দিলেন—বেয়ারিং চিঠি আর এনো না। অন্ততঃ আমাকে না দেখিয়ে বাবুকে দিয়ো না।

বেয়ারিং পত্র ফেরত যাইলে প্রেরকগণ একবাক্যে অধ্যাপককে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন—অভদ্র! কোথাকার ছোটলোক! প্রোফেসরি করে, সৌজন্য জানে না!

এ দিকে অধ্যাপক গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, তাকে, আলমারীতে বহু আকারে ও বর্ণ-বিশিষ্ট শিশি-শিশি পেটেন্ট্ ঔষধ সাজানো রহিয়াছে—সত্যই যেন চালচিত্তির! এগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিতে হইবে, কিন্তু অতরকম পীড়া পাই কোথা? দেখি, ডাক্তারদের সঙ্গে যুক্তি ক'রে যদি ইঞ্জেক্সন্ দিয়ে সরবরাহ করতে পারে। আপাততঃ আহারাদি করিয়া শয়ন করি। কাল সকালে যা হয় করা যাবে।

অধ্যাপকের নিত্য নিয়ম ছিল, শয়নের পূর্ব্বে পত্নীর আলেখ্যখানিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেন, নহিলে তাঁহার সুনিদ্রা হইত না। কিন্তু আজ দেখিতে দেখিতে সহসা তাঁহার নয়নযুগল জলে ভরিয়া উঠিল। হৃদয় কেবলই হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিল, কোথায় সে, কোথায় সে! অনেকক্ষণ পরে তাঁহার কাতর অশ্রু মুছাইয়া দিয়া শান্তিময়ী নিদ্রা তাঁহাকে অঙ্কে তুলিয়া লইলেন।

প্রোফেসর স্বপ্ন দেখিলেন, যেন 'শমন-দমন-দ্রুম' (সঞ্জীবনী-সুধা) সেবন করিয়া সহসা তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। নানাপ্যাথির চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার মৃতদেহটাকে পরীক্ষা করিতেছে। সকলেই তাঁহার বন্ধু—ফি নেন না। কেহ চোঙ লাগাইতেছে, কেহ নল। ওদিকে অণু, বিণু, বাদল চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, তিনি একটাও সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না। চুপ্ করিয়া খাটের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলিলেন, প্রোফেসর মরেছেন, নিঃশেষে মরেছেন।

বৃদ্ধতম চিকিৎসক একটু বিজ্ঞ হাসি হাসিয়া বলিলেন, সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? যখন আসা গেছে, একটা কিছু ত করতে হবে? আমার মতে একটা জোলাপ দেওয়া হোক। কবিরাজ মহাশয় কি বলেন?

কবিরাজ মাথা চালিয়া বলিলেন, উঁহুঃ, 'মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ।'

কনিষ্ঠতম এক জন উগ্রপ্রকৃতি ডাক্তার বলিলেন, ন চালয়েৎ! ন চালয়েৎ ও কি কারয়েৎ?

কবিরাজ এই বিদ্রূপবাক্যে একটু চটিয়া বলিলেন, আরে, বাপু, তোমাদের ত মড়া-চেরা হাত, ছুঁতে ছুঁতে অমনি কুঁপোকাৎ—চেরাচিরি, ফোঁড়াফুঁড়ি—

পার্শ্বস্থ হোমিয়োপ্যাথ্ বলিলেন, দেখুন, কব্‌রেজ মশায়, ঐ অ্যালোপ্যাথ্ বাবুদের দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা ক'ন! আপনার নিষ্ঠীবন-বৃষ্টির জন্য আমি কোট্ তৈরি করাইনি—হাঁ—স্পষ্টকথা বলব! অ্যালোপ্যাথ্‌দের গায় যত পারেন, থুথু দিন! যাদের ছেঁড়া কোট, ছেঁদা পকেট্।

উগ্রপ্রকৃতি বলিলেন, বড় লম্বা লম্বা কথা কও যে! আমাদের গা থুথু দেওয়ার যোগ্য! বটে! আমরা যদি থুথু দেবার যোগ্য হই, তা হ'লে তোমাদের গা কিসের যোগ্য, সেটা আর ভদ্রসমাজে খুলে বলব না।

বিজ্ঞতম বলিলেন, আহা, চট কেন? আপনি কি ঔষধ ব্যবস্থা করতে চান?

তা জানি নি, কিন্তু ডাক্তার হেরিং (নমস্কার) আবিষ্কার করেছেন। এ ত সদ্যমৃত, হেরিং বলেন, সপিণ্ডকরণের পিণ্ডের ওপর একটি ফোঁটা কি একটি গ্লবিউল ছাড়লে, যেখানেই থাক, ছুটে এসে গপাগপ পিণ্ড সাঁটবে।

কবিরাজ বলিলেন, আহা, এমন ঔষধ জানে না!

ফের আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা!

থুড়ি! কিন্তু কবিরাজ এমনি সজোরে 'থুড়ি' উচ্চারণ করিলেন যে, হোমিওপ্যাথের কোট ত বটেই, মুখ পর্য্যন্ত ভরিয়া গেল।

কোথা যান মশাই?

বাড়ী। ওঁর থুথুতে বিষ আছে। দুর্গন্ধ। আমার মুখ জ্বলছে। নুইস্যান্স (nuisance)!

কবিরাজ মহাশয়, আপনার ব্যবস্থাটা কি?

আমার ব্যবস্থা, অধ্যাপকের মুখাগ্নি ক'রে ওঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ দাহ করা।

বিজ্ঞতম বলিলেন, আমাদেরও তাই মত। তবে তার আগে একটা জোলাপ।

কবিরাজ বলিলেন, তা দিন। দেহ হালকা হ'লে বহন করবার সুবিধা।

বিজ্ঞতম বলিলেন, হাঁ। অধ্যাপক রিসার্চ্চ করতেন, নিদেন সেই হিসাবেও জোলাপ প্রয়োগ।

চিকিৎসকগণ প্রস্থান করিলে প্রোফেসর ভাবিতে

লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! মৃতদেহের উপর জোলাপ প্রয়োগ ক'রে রিসার্চ ! এ কায আর কখনও করব না।

সহসা কক্ষ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইল। অধ্যাপক চাহিয়া দেখিলেন, শয্যার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি দিব্য যৌবনসম্পন্না জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী তাঁহার পানে চাহিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতেছে !

প্রোফেসর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বিনু (তাঁহার মৃতা পত্নী) !

প্রগাঢ় অভিমানে প্রোফেসরের স্বর কাঁপিয়া উঠিল। বলিলেন, এত দিনে বুঝি মনে পড়ল !

বিনু সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, এস।

কোথায় ?

যেখানে আমি নিয়ে যাব।

অধ্যাপক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই দিব্যা পথ-প্রদর্শিকার অনুবর্ত্তী হইলেন।

দূরে দূরে—আলোকের পথ ধরিয়া উভয়েই এক সূর্য্য-কোটি-সমুজ্জ্বল, চন্দ্রকোটি-সুশীতল পুরে আসিয়া উপস্থিত।

প্রোফেসর প্রশ্ন করিলেন, এ কোথা ?

বিনু বলিল, এ ভাব-জগৎ।

তাই না কি ! এ কি সত্য ?

স্থূল জগতের চেয়েও সত্য। ঐ দেখ—মা।

বিস্মিত অধ্যাপক দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। দশভুজে দশ প্রহরণ-ধারিণী, সিংহবাহিনী, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী। দক্ষিণে লক্ষ্মী, গণপতি ; বামে ষড়ানন, সরস্বতী। প্রতিমা সজীব, হসিতাধরা। ত্রিলোক "জয় মা" বলিয়া ডাকিতেছে। করুণায় মায়ের ত্রিনেত্রে নীর, স্তনে ক্ষীর ঝরিতেছে এমন মা থাকিতে লোক মাটীর প্রতিমা পূজা করে !

মাটীর প্রতিমা নয়। মৃন্ময়ীর আধারে চিন্ময়ীর পূজা। এস বলি, জয় মা।

হৃদয় ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয় মা বলিতে অধ্যাপকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যেন নূতন জগতে নূতন মানুষ জাগিল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া অধ্যাপক শুনিলেন, বাদল গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাহিতেছে—

"আমার উমা এলো রে, দেখ গো রাণি নয়ন ভ'রে।
দশ ভুজ ধরি, আহা মরি মরি বিহরে সিংহ-উপরে॥"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

বন-দুর্গা

নাগেন্দ্র-বসনা দেবী, ধনুর্ব্বাণ হাতে
ত্রিনয়না মুক্তকেশী মুণ্ডমালা গলে,
দাঁড়াইয়া বনদেশে কানন-সভাতে
ডাকিনী যোগিনীগণ নত পদতলে,

মেঘ অভিরাম শ্যামা-পদ-কোকনদ,
ভক্তের ভরসা মা গো শাক্তের সম্বল
যোগমায়া দয়াময়ী ওপদ সম্পদ
শিবের হৃদয়-শোভা নব-নীলোৎপল।

সর্ব্ব কুল ইষ্টদেবী কুলকুণ্ডলিনী
যোগচক্রে ভোগচক্রে তব অধিষ্ঠান
নাহি জানি তন্ত্র মন্ত্র পাদপদ্ম চিনি
চরণ মুদিতা মাঝে দেও মোরে স্থান।

স্থির লক্ষ্য ধানুকিনী নিত্য সর্ব্বজয়া
যোগ জ্ঞানে নিত্য ভক্তি দাও মা অভয়া

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

জীবন-যজ্ঞ

১

আমার জন্মদিনটি বাবার কর্ম্ম-জীবনের একটি শুভসূচক স্মরণীয় দিনে পরিণত হয় বলিয়া পরমাদরে তিনি আমার নাম রাখিয়াছিলেন শুভদা। বাবা ছিলেন কলিকাতার কোন একটি নামী কলেজের অধ্যাপক। অবসরসময়ে বাবা গ্রন্থ-রচনাও করিতেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ যে দিন টেক্সট বুক কমিটী কর্তৃক উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইবার সংবাদ পাওয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে সত্তস্বত্বে প্রকাশকের নিকট হইতে একটা মোটা অঙ্কের টাকা বাবার হস্তগত হয়, সেই দিনই আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। আমার জন্মোৎসবে বাবা না কি এমন মুক্ত-হস্ত হইয়া প্রতিবেশী বালক-বালিকাদের ভূরিভোজ দিয়াছিলেন যে, তাহার আত্যন্তিকতায় অতিমাত্রায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাড়ীর অনেকে ও পাড়ার প্রায় প্রত্যেকে একবাক্যে এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, কুলীনের ঘরে কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে যে স্থলে ভূমিমাতা পর্য্যন্ত ঈষৎ নামিয়া যান, সে স্থলে কন্যার জন্মোৎসবে এতটা ঘটা শুধু যে বাড়াবাড়ি, তাহা নহে, খুবই অন্যায়; ইহাতে কন্যাকে চিরদুঃখিনী হইবার সুযোগ দেওয়া হয়।—বাবা না কি এই টিপ্পনী শুনিয়া হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন,—তা হ'লে বসুমাতার উচিত ছিল বসুধারা হয়ে প্রকাশ পাওয়া।

কন্যাপক্ষ হইতে এ সংসারে আমি প্রথম আবির্ভূতা হইলেও আমার জন্মের তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার সহোদর পঞ্চানন প্রথম সন্তানের প্রাপ্য প্রচুর আদর-আপ্যায়ন সংসারের আর সকলের নিকট হইতে এমন ভাবে আদায় করিয়া লইয়াছিল যে, তিন বৎসর পরে সহসা সেই সংসারে যখন কন্যা আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহার জন্য তথাকথিত আদর-আপ্যায়নের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সেই জন্যই বোধ হয়, অধ্যাপকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে ত্রুটি অবগত হইয়াই বাবা তাঁহার আদরের অকৃত্রিম আলোকধারায় নবজাত কন্যাকে অভিসিঞ্চিত করিয়াছিলেন।

অতীত শৈশবের যতটুকু স্মৃতি মনে পড়ে, তাহাতে ভাসিয়া উঠে বাবার সেই স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বসিত স্নেহ ও আদর,—নিজের ভাগ্যের জন্যই হউক বা বাবার উপার্জ্জনবৃদ্ধির জোরেই হউক, তাঁহার সংসারে অভাবের সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ কখনও পাই নাই; যে সাধ যখনই মনে জাগিয়াছে, বাবার প্রসাদে তখনই তাহা পূর্ণ হইয়াছে; অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি আলোড়িত করিলেও, এমন একটি দিনের কথাও মনে পড়ে না যে, বাবা কোনো দিন আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন বা আমার কোনও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিয়াছেন? আমার দাদা পঞ্চানন সকল বিষয়েই বড় হইলেও, শৈশব হইতেই বাবাকে সে ভয় করিত। ইচ্ছা থাকিলেও মুখ ফুটিয়া কখনও সে বাবার কাছে কিছুই চাহিতে পারিত না; আমি ছিলাম সকলের কাছে যতটা সপ্রতিভ ও তুখোড়, সে ছিল ততটা লাজুক ও মুখচোরা। আমার আব্দার ছিল যেমন বাবার কাছে, তাহারও যত কিছু আব্দার সবই আসিত আমার উপরে এবং তাহার হইয়া আমাকেই সে সমস্ত বাবার নিকট হইতে আদায় করিয়া তাহাকে দিতে হইত।

আমার এই নিত্যনূতন আব্দার ও নির্ব্বিচারে তাহার পূরণে বাবার প্রয়াস যখন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছিল, তখন তাহাতে প্রথম বাধা দেন আমার মা। সত্য কথা বলিতে কি, বাবাকে যতখানি ভালবাসিতাম, মাকে ঠিক সেই পরিমাণে ভয় করিতাম। আমার প্রতি বাবার ভালবাসার এতটা বাড়াবাড়ি মা মোটেই পছন্দ করিতেন না। যে কোনও বিষয়েই অতিরিক্ত কিছুই মার যেন চক্ষুঃশূল ছিল।

এক দিন কথায় কথায় মা বাবাকে শুনাইয়া দিলেন,—"এ রকম ক'রে মেয়েকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়ার মানে তারই ভবিষ্যৎ খোয়ার করা।"

বাবা একটু রুষ্ট হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন?"

মা বলিলেন,—"চাইবামাত্র পাওয়া, মেয়ের খুবই ভাগ্য, তা মানি; কিন্তু যদি বরাবর থেকে যায়;—দুদিন বাদে পরের বাড়ী যখন যেতে হবে, সেখানেও যদি এমন ভাগ্য বজায় থাকে নইলে তখনকার আপশোষ সারাজীবনে শেষ হবে না।"

বাবা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন,—"এমন উপায়ক্ষম পাত্রের হাতে আমি শুভাকে তুলে দেব, যে তার ভারবহনে অক্ষম হবে না—সমস্ত আব্দার তার রক্ষা করতে পারবে। এ তুমি দেখে নিও।"

আমার সম্বন্ধে মার এই সঙ্কীর্ণতা যেমন বাবার মনে ব্যথা দিত, আমাকেও তেমনই ক্লিষ্ট করিয়া তুলিত। অতঃপর আমার যাহা কিছু আব্দার, মার অগোচরে বাবাকে জানাইতাম এবং বাবাও মাকে লুকাইয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতেন। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছুই মার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না. এই গোপনতা তাঁহাকে অতিমাত্রায় পীড়া দিত ও সময়বিশেষে তিনি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠা পাইতেন না।—মার তখনকার রুক্ষ ব্যবহারে মন আমার বিরক্তিতে ভরিয়া গেলেও, আজ মনে হইতেছে, মার সেই সব অপ্রিয় স্পষ্ট কথাগুলি কত সত্য!

২

আমি যখন আট বৎসরে পড়িয়াছি, বাবার কর্ম্মজীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে এক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। যে কলেজে বাবা অধ্যাপনা করিতেন, তাহার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার বিয়োগব্যথা বাবাকে এতটা বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, আমাদের সংসারের উপরও যেন সেই শোকের ছায়া পড়িয়াছিল। অতঃপর যিনি কলেজের

কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন, তাঁহার সহিত বাবার মতানৈক্য ঘটিতে থাকে; অবস্থা শেষে এমন অপ্রিয়জনক হইয়া উঠে যে, বাবা ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই সাত দিনের নোটিশ দিয়া পদত্যাগ করেন। বাবার তখন খুবই নামডাক হইয়াছিল, কলেজের ছেলেরা বাবার অধ্যাপনার একান্ত পক্ষপাতী ছিল; পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার সম্বন্ধে বাবার নিকট কলেজ-কর্তৃপক্ষ হইতে অনুরোধও আসিয়াছিল, কিন্তু বাবা তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাড়ীতে সকলেই ও আত্মীয়স্বজন প্রত্যেকেই বাবার এই নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিয়া কত উপদেশই দিয়াছিলেন—অতবড় আয়জনক চাকুরীটি বজায় রাখিবার জন্য কত কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দৃঢ় মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

ঠিক এই সময় সহসা মা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন, বহু ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার ফলে যদিও তিনি রক্ষা পাইলেন, কিন্তু চিকিৎসকরা বলিয়া গেলেন যে, পশ্চিমের কোনও স্বাস্থ্যকর স্থলে যদি মাকে দীর্ঘকাল রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব, অন্যথায় পুনরায় তাঁহাকে রোগাক্রান্ত হইতে হইবে। চিকিৎসকের মন্তব্য সম্বন্ধে বাড়ীতে মাকে উপলক্ষ করিয়া প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তখন নানা অপ্রিয় আলোচনা চলিতে লাগিল। বাবা তখন উপায়হীন, সঞ্চিত অর্থ যাহা কিছু ছিল, মার চিকিৎসায় নিঃশেষিত হইয়া কিছু ঋণও হইয়াছিল। সুসময়ে সাংসারিক ব্যাপারে বাবা যখন বেপরোয়া মুক্তহস্ত ছিলেন, তখন বাড়ীর সকলের নিকট তাঁহার যে পরিমাণ আদর ছিল, আজ অসময়ে তাঁহাকে বিত্তহীন জানিয়া সেই বাড়ীতেই তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণ সকলের বিরাগ যেন আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। অথচ ইঁহাদের ভূসম্পত্তি যাহা ছিল, তাহাতে সাংসারিক সকল ব্যয়ই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতে পারিত।

বাবা সবই বুঝিতেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতেন না। কাজেই সকল বিষয়েই তাঁহার এই ঔদাসীন্য অনেকের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিয়াছিল। আশ্রিতাস্থানীয়া আত্মীয়ারাও তখন বাবার তাৎকালীন বেকার অবস্থার উপর কটাক্ষ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এই সূত্রে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যাইবার প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহারা যখন মাকে বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করিত, তাহা মার বুকে যতটা বাজিত,—শব্দভেদী শরের আঘাতের মত ততোধিক ব্যথায় বুঝি বাবাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিত!

কিন্তু বিনা প্রতিবাদে কথার আঘাত যাহারা বরণ করিয়া লয়, সকল ব্যথা যাহারা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হয়,—ব্যথাহারী বুঝি তাহাতে বিচলিত হইয়া তাহাদের সকল ব্যথা হরণ করিয়া লন। সত্যই এক দিন এমন ঘটনা ঘটিয়া গেল।

৩

সে দিনও বৈকালে মাকে ঘিরিয়া সুভাষিণী আত্মীয়াদের মজলিস বসিয়াছিল ও মার স্বাস্থ্য লইয়া নানারূপ আলোচনাই চলিতেছিল। বর্ষীয়সী এক পরমাত্মীয়া কথায় কথায় মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"সত্যি কথা বলতে কি বৌমা, তোমার বাছা, যত রোগ শুধু মনে! সেই যে ডাক্তারে বলেছে, পশ্চিমের হাওয়া না খেলে তুমি সারবে না, সেই কথাই মনে ঠিক দিয়ে ব'সে আছ, বাছা!"

সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন অমনই বলিয়া উঠিলেন,—"তবু যদি রাজুর আজ চাকরী-বাকরী কিছু থাকত!"

মার মুখ হইতে কিছু একটা উত্তর পাইবার আশায় সকলেই তাঁহার মুখের দিকে নানারূপ ভঙ্গীতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু মা নিরুত্তরে তাঁহার মুখখানি এমন উপেক্ষার সহিত অন্য দিকে ফিরাইয়া লইলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু আত্মীয়াদের মুখগুলিও ম্লান হইয়া গেল!

তবুও কথাগুলি তখনও আমার বুকের ভিতর যেন কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলাম,—"পশ্চিমে হাওয়া খেতে যাবার লোভে মা আমার রোগ আঁকড়ে প'ড়ে আছেন, এ খবরটুকু কে তোমাকে দিয়েছে, বাছা? আর, রোজ রোজ এই নিয়ে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন বল ত শুনি?"

আর যায় কোথায়?—চারিদিক্ হইতে হিতৈষিণীর দল তারস্বরে তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। মারমুখী হইয়া শুধু যে তাঁহারা আমার পিণ্ড চটকাইলেন, তাহা নহে, আমার মা বাবাও তাঁহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না।

মা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ডাকিলেন,—"শুভা!"

মার সে স্বরের শাসন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াও আমি বলিতে বাধ্য হইলাম,—"আমি ত তোমাদের ঘাড়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে আসি নি, তোমরাই মিছিমিছি মাকে খোঁটা দিয়ে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ! বাবা তোমাদের কোনো কিছুতেই নেই, তাঁকেও তোমরা যা ইচ্ছে তাই বলছ? কেন, তোমরা এ সব বলবে কেন?"

আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, রাগে, দুঃখে, অভিমানে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইলাম না। বাবার এক আত্মীয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে—বাবা-রে? একরত্তি মেয়ে, ওঁর দেখ না ঝাঁঝ কত! বলি,—বলব না কেন? দুশবার বলব, হাজারবার বলব! জানিস না—এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে রেখেছি তোর বাবাকে! ঘটা ক'রে যে মেগের চিকিচ্ছে করা হয়েছিল;—দে না এখন সেই টাকাগুলো ফেলে! লজ্জা করে না মুখ নেড়ে কথা কইতে? সোহাগী মেয়ে হয়েছেন বাপের;—যেন আর কারুর কখনো মেয়ে হয় নি;—এই মেয়ের আব্দার মেটাতেই ত ছোঁড়াটা সর্ব্বস্বান্ত হ'ল!"

মনে হইল, বসুমাতা তখনই যদি বিদীর্ণ হন, তাঁহার বুকে আশ্রয় লইয়া মুখ লুকাই! বাবার এই আত্মীয়াটির একসময় কি অসীম স্নেহযত্ন ছিল বাবার উপর! দেখিয়াছি, বাবা কলেজ হইতে আসিলে, ঝি-চাকরের হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া কাছে বসিয়া বাতাস করিতেন; বাবার মাথাটি যদি কোন দিন ধরিত, তাঁহার সেবার ঘটায় বাড়ী তিনি মাথায় করিয়া তুলিতেন! এখনও মনে পড়ে,—সম্বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, এঁরই এক বয়স্থা কন্যার বিবাহের সম্পূর্ণ ভার বাবাই লইয়াছিলেন। একখানি গ্রন্থের এডিসন বিক্রয় করিয়া, বিক্রয়লব্ধ পাঁচ শত টাকা এই আত্মীয়ার হাতে দিয়াছিলেন! কয়েক সপ্তাহের

কথা,—মার অসুখের সময় নিরুপায় হইয়াই বাবা ইঁহার নিকট একশো টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। আজ তারই এই খোঁটা! হায় রে অদৃষ্ট, হায় রে কৃতজ্ঞতা!—বড় দুঃখেই মনে মনে বলিয়াছিলাম—বসুমাতা দ্বিধা হও!

কিন্তু বসুমাতা দ্বিধা হইলেন না,—হঠাৎ বাবা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন মুটে,—মাথায় নানাবিধ আসবাবপত্র। ঘরের সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেল!

আমি ছুটিয়া গিয়া বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার কোলে মুখ লুকাইলাম। কে এক জন প্রশ্ন করিল,—"রাজু যে মুর্গীহাটা লুটে এনেছো দেখছি, ব্যাপার কি?"

বাবা তখন আদরে আমার পিঠ চাপড়াইতেছিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"এ সব পশ্চিম যাত্রার আয়োজন! শুভা মা, মুটেগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, চল, আমরা জিনিষগুলি গুছিয়ে রাখি—"

আমার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল; ছেলে মন—ঘরের সকলের মুখের দিকে জয়োদ্দৃপ্তকটাক্ষে চাহিয়া জিনিষগুলি গুছাইতে ছুটিলাম।

বাবার সেই আত্মীয়াটি একটু গম্ভীরভাবেই এবার প্রশ্ন করিলেন,—"ও, তা হ'লে বৌমাকে হাওয়া খেতে নিয়ে যাওয়াই ঠিক হয়ে গেল! কবে যাওয়া হবে শুনি?" বাবা উত্তর দিলেন—"কালই যাবার দিন স্থির করেছি।"

কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া তিনি বলিলেন,—যেখানেই যাও বাছা, আমার টাকাগুলোর হিল্লে ক'রে তবে যেন বাড়ী থেকে মান নিয়ে বেরোনো হয়, এ আমি ব'লে রাখছি।"

আমার পিঠের উপর কে যেন সপাসপ চাবুকের ঘা দিল! জিনিষ ফেলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম, বাবা পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া তাহা হইতে কয়েকখানি নোট গণিয়া সেই আত্মীয়ার হস্তে গুঁজিয়া দিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, অত বড় রূঢ় কথার উত্তরে একটি কথাও বাবার মুখ হইতে বাহির হইল না।

নোটগুলি মাদুরের উপর রাখিয়া বাবার সেই পরমাত্মীয়া এক একখানি করিয়া গণিতেছিলেন। সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে। আমি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—"বাবা, ভুলে কুড়িখানা নোট দিয়েছেন যে? একশো টাকা ত উনি পাবেন, দশখানা নোট ত হবে—সবই ত দশ টাকার—তবে—"

বাবা বলিলেন,—"ঠিক! দশ টাকার দশখানা নোট আমি খুবই প্রয়োজনের সময় নিয়েছিলাম, আজ তাই কুড়িখানাই ওঁকে দিয়েছি, মা!"

ঘরশুদ্ধ সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল! মা এই সময় মৃদুস্বরে বলিলেন,—"পিসীমা কাল টাকার জন্য খুবই কান্নাকাটি করছিলেন; মেয়ে-জামাইকে তত্ত্ব করবার জন্য ত্রিশটি টাকা যেমন ক'রে হোক দিতেই হবে ব'লে মাথা পর্যন্ত খুঁড়েছিলেন। আমি তাই তুগাছা চুড়ি বাঁধা দিয়ে ওঁকে কাল ত্রিশ টাকা দিয়েছিলাম—"

বাবা বলিলেন,—"ও, তাই না কি! কিন্তু আমি ত কিছুই এর শুনি নি। যাক্—তোমার চুড়ি আমি এখনি খালাস ক'রে আনছি। তবে, পিসীমাকে যা দিয়ে ফেলিছি, তা আর ফিরিয়ে নেব না; কেন না, অসময়ে উনি আমার যে উপকার করেছিলেন, তার তুলনায় এ কিছুই নয়!"

এই আমার বাবা! এমনই তাঁহার প্রকৃতি; আর আমি তাঁহারই কন্যা,—পদে পদে যে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিব, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ আছে কি?

৪

সম্বৎসরের হিসাবে বই বিক্রয়ের মোটা রকম টাকাই বাবা সে দিন পাইয়াছিলেন। প্রচুর টাকা হাতে থাকায় খুবই আড়ম্বরে আমাদের পশ্চিম-যাত্রার আয়োজন চলিয়াছিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন যখন শুনিলেন, শুধু দুই এক মাসের জন্য এ যাত্রা নহে, বাবা যুক্তপ্রদেশের রাজধানী প্রয়াগ নগরীতে তাঁহার কর্ম্মজীবন নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার অভিলাষী ও সেই সূত্রে সেখানেই স্থায়িভাবে অবস্থিতি করিবেন, তখন তাঁহারা যেমন ক্ষুব্ধ হইলেন, তেমনই ক্রুদ্ধও হইলেন এবং অদৃষ্টচক্রে তাঁহাদের ক্রোধের সবটুকু অংশই নির্ব্বিচারে আমার নিরপরাধা মায়ের উপরই পড়িল। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, মার একান্ত ইচ্ছাই বাবাকে সর্ব্ববিধ উন্নতিলাভের শীর্ষস্থান মহানগরী কলিকাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পশ্চিমে খোট্টার দেশে লইয়া চলিয়াছে! কিন্তু এ কথা তাঁহাদের কেহই একটিবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে, সহধর্ম্মিণীর স্বাস্থ্যের অনুরোধে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে কর্ত্তব্যের প্রেরণায় কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অপরিচিত প্রদেশে তাঁহার এই যে অভিযান, তাহাতে কতটা সাহস ও কতখানি সহানুভূতি বিজড়িত ছিল!

প্রয়াগের বাঙ্গালী-সমাজে বাবা সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে স্থায়িভাবে পাইয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে আনন্দের স্পন্দন হইয়াছিল। স্থানীয় কোন প্রসিদ্ধ কলেজে অধ্যাপনার জন্য বাবা আহূতও হইয়াছিলেন! কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া স্বাধীনভাবে পুস্তক-প্রকাশের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

আমাদের চক্ষুর উপর, দেখিতে দেখিতে কয়েক মাসের মধ্যেই বাবার ব্যবসায় এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল যে, তাহার খ্যাতি শুধু প্রয়াগে নহে—সমগ্র ভারতবর্ষেই বিস্তারিত হইয়া পড়ে। আমাদের বংশে ব্যবসায়ের ভিতর দিয়া লক্ষ্মীর সাধনা এই প্রথম এবং বাবা অসামান্য উদ্ভাবনীশক্তি ও সততার প্রভাবে সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম আমাদের সে কি উৎসাহ! ব্যবসায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা সকলেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। মনে আছে, মা নিজে পার্শ্বেলের বইগুলি গুছাইয়া দিতেন, আমরা মহোল্লাসে পার্শ্বেল বাঁধিতে বসিতাম। ব্যবসায়ের সূচনার সে স্মৃতি কি মধুর! বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে প্রকাণ্ড অফিস বসিয়া গেল,—বই ছাপিবার জন্য নিজস্ব ছাপাখানা খোলা হইল; ক্রমে শতাধিক কর্ম্মচারী বাবার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়টিকে অবলম্বন করিয়া প্রতিপালিত হইবার অবকাশ পাইল।

বাহিরে কাযের যেমন ঘটা পড়িয়া গেল,—বাড়ীর ভিতরে সংসারের উপরও সেই অনুপাতে আত্মীয়োৎসবের হিল্লোল বহিয়া চলিল। বাবার ব্যবসায়ে লক্ষ্মীলাভের কথা ইতোমধ্যেই

আত্মীয়-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল আত্মীয় বাবার পশ্চিম-যাত্রার সময় পশ্চিমে মেড়োদের প্রসঙ্গ তুলিয়া দোষ-কীর্ত্তনে শতমুখ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে ভগ্ন-স্বাস্থ্য সংস্কারের অজুহতে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্যকর স্থানের গুণ-কীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আত্মীয়, আত্মীয়ের আত্মীয়, তস্য আত্মীয়—যাঁহার যখন আবশ্যক হইয়াছে, অসঙ্কোচেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ও যত দিন ইচ্ছা অবস্থিতি করিয়াছেন,—তাহাতে এ পক্ষ হইতে যে কখনও তাঁহাদের কিছুমাত্র অসম্মান করা হইয়াছে, এমন কোন ঘটনাই আমার মনে পড়ে না। অভ্যাগতের অসম্মান ত দূরের কথা, তাঁহাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিবার কোনও অধিকার কাহারও ছিল না। এ বিষয়ে বাবার শাসন ছিল অতি কঠোর। আমার নিজের বেশভূষা, স্বাধীনতা, খরচ-পত্র সম্বন্ধে মা বরাবর অকরুণ থাকিলেও, অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনা, তাঁহাদের প্রতি আদর-আপ্যায়ন, সমানভাবে সকলের পরিচর্য্যা প্রভৃতি তাঁহার যেন সহজাত সংস্কারের মতই ছিল। কিন্তু, যে সকল আত্মীয় বা অভ্যাগত এখানে আসিয়াও কায়েমীভাবে আমাদের সংসারে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন, অন্য অভ্যাগতের উপস্থিতি তাঁহাদেরই চক্ষুতে যেন হুল ফুটাইয়া দিত! তাঁহারাই তখন সমবেদনার সুর তুলিয়া বলিতেন,—"এরকম ক'রে লুটে পুটে দশ জনে খেলে রাজার সংসারও যে ভুট হয়ে যায়, বৌমা! বাজু যেন চিরকালই ব্যোম ভোলানাথ, কিন্তু তোমার ত একটু আঁট-সাঁট করা দরকার!" সেইজন্যই বাবাকে বাধ্য হইয়া এক দিন তাঁহার শাসন এই মর্ম্মে সকলকে শুনাইয়া দিতে হইয়াছিল,—"আমার বাড়ীতে যিনিই আসবেন, তিনিই আমার অতিথি-ভগবান্; যথাসাধ্য আমি সপরিবারে তাঁর সেবা করব। কিন্তু আমার সংসারে থেকে যিনি তাঁর অপমান করবেন, আমি তাঁকে কিছুতেই ক্ষমা করব না,—এ কথা যেন সকলের মনে থাকে।"

৫

সংসারের মধ্যে আত্মীয়-অভ্যাগতের প্রাবল্য ও আফিসে কর্ম্মচারীদের বাহুল্য ব্যবসায়ের আয়টিকে যে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিতেছিল, বাবা তাহা বুঝিলেও, ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন। এ সম্বন্ধে কেহ তাঁহাকে কিছু বলিলে, তিনি উত্তর দিতেন,—"যে খায় চিনি, তাকে যোগান চিন্তামণি!—কারবার-সূত্রে এদের পোষণ করিবার ইচ্ছা যতক্ষণ আমার মনে বদ্ধমূল থাকবে, তিনিই আমার ইচ্ছা পূরণ করবেন; আবার এই ইচ্ছা যে দিন শিথিল হয়ে যাবে, আমার কারবারও ভেঙ্গে পড়বে।" দীর্ঘ সাতবর্ষব্যাপী একটানাস্রোতে ব্যবসায় চালাইয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাবা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন আমার বিবাহের চিন্তা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল।

আমার দাদা পঞ্চাননের শিক্ষা সম্বন্ধে বাবা যেরূপ যত্ন লইতেন, আমার সম্বন্ধেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; বরং বিবিধ চারুশিল্প-শিক্ষার সুযোগ আমাকে স্বতন্ত্রভাবেই দেওয়া হইয়াছিল। পনেরো বৎসর বয়সে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় আমি যেমন মোটামুটি শিক্ষা পাইয়াছিলাম, শিল্প, সঙ্গীত, চিকিৎসা ও রন্ধনাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিয়াছিলাম। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাদের বংশের একটা খ্যাতি ছিল। এ বংশে কালো কুৎসিত কোনও সন্তান কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। সুতরাং এ দিকেও আমার খ্যাতি অল্প ছিল না। বাবার তখন খুব নাম, তাঁহার ব্যবসায়েরও তেমনই প্রতিষ্ঠা; কাযেই অযাচিতভাবে কত সম্বন্ধই যে আসিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। কিন্তু এ সম্বন্ধে বাবা এত অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন যে, একটা না একটা খুঁৎ বাহির করিয়া তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিতেন। বাবা প্রায়ই অহঙ্কার করিয়া বলিতেন,—"শুভাকে আমি এমন ঘরে দেব, যেখানে গিয়ে সে বুঝতে না পারে যে, পরের বাড়ীতে এসেছে। এখানেও যেমন সর্ব্বক্ষণ অসঙ্কোচে হেসে খেলে বেড়ায়—যে সাধ যখন ওর মনে ওঠে, তাই পূর্ণ হয়ে যায়,—সেখানেও ঠিক এমনটি হবে, তা জেনে তবে আমি ওর সম্বন্ধ পাকা করব।"

বাবার কথায় মন তখন গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এখন মনে হয়, কি ভুলই বাবা তখন মনের মধ্যে পুষিয়াছিলেন! দৈনন্দিন সকল কার্য্যে বাবা আমার যে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান পরিচালকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন,—তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার বিবাহ-ব্যাপারেই তিনি তাঁহার নির্ব্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া নিজের ইচ্ছাকেই কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন!

সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে এক স্থানে আমার বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া গেল। ইহার একটু হেতুও ছিল। প্রথমতঃ পাত্র স্বয়ং অধ্যাপক। অধ্যাপনাই বাবার কর্ম্মজীবনের সূচনা, সুতরাং অধ্যাপক পাত্র যে তাঁহার একান্ত বাঞ্ছনীয় হইবে, ইহা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, পাত্রপক্ষ প্রবাসী-বাঙ্গালী; বহুদিন বঙ্গের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন। বাবার ধারণা, বঙ্গের বাহিরে বাসা বাঁধিলে মনের সঙ্কীর্ণতা সরিয়া যায়, সমাজগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার অবকাশ পায় না। তৃতীয়তঃ, পাত্রের পিতা ও মাতার অসাধারণ ভব্যতা, ভদ্রতা ও সহৃদয়তা। সম্বন্ধের সূচনায় বাবা যখন ভাবী বৈবাহিক ও বৈবাহিকাকে কন্যা দেখিতে ও সেই সূত্রে পরস্পর পরিচিত হইতে আমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহারা তাহাতে সানন্দে সম্মত হইয়া এক দিন আমাদের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের এই সৌজন্যে বাবা একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

তাঁহাদের তিনটি দিনের অবস্থিতি স্মরণীয় সুমধুর স্মৃতির মত আমাদের সংসারে যেন লিপ্ত হইয়া গেল! শ্বশুর যিনি হইবেন, তাঁহার চেহারার মনোহারিত্ব তাদৃশ না থাকিলেও কথা কহিবার ভঙ্গী ছিল এত চমৎকার যে, প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আর শাশুড়ী,—তিনি ত আমাকে দেখিয়া হাসিয়া একেবারে লুটোপুটি! তিনি যেন হাসিরাশির একটা উচ্ছ্বসিত উৎস! কথা কহিতে কহিতে হাসির দমকে কথা বন্ধ হইয়া যায়, বক্তব্য আর সমাপ্ত হইবার অবকাশ পায় না! যাইবার সময় আবার আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার কি কান্না! আমি তাঁহার নাকি জন্ম-জন্মান্তরের একান্ত ঘনিষ্ঠ কেহ ছিলাম, নতুবা আমাকে দেখিয়াই তিনি এতটা আকৃষ্ট হইবেন কেন এবং আমাকে ছাড়িয়া যাইতেই বা তাঁহার অন্তর কেন এতটা অধীর হইয়া উঠিবে!

দেনা-পাওনার কথাও সঙ্গে সঙ্গে পাকা হইয়া গেল। বাবা স্বেচ্ছায় যাহা যৌতুক দিবার অভিপ্রায় জানাইলেন, তাহাতেই তাঁহারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সম্ভবতঃ এতটা পাওনার আশা তাঁহারা করেন নাই। স্থির হইল, বাবা স্বয়ং কর্ম্মস্থানে গিয়া পাত্র দেখিয়া আসিবেন, তাহার পর বাসস্থানে গিয়া শুভাশীর্বাদ করিবেন।

আমার শাশুড়ীর সুখ্যাতিতে বাড়ীর সকলে শতমুখ হইলেও, মা কিন্তু ততটা প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে বাবার সহিত মার যে একটু কথান্তর না হইয়াছিল, তাহা নহে। বাবা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বেয়ানকে কেমন দেখলে ?"

মা বলিলেন, "আর সব ত ভালই দেখলাম ; কিন্তু কারণে অকারণে কথায়-কথায় তাঁর ঐ দমকা হাসিটা আমার মোটেই ভাল লাগে নি।"

বাবা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "অতিরিক্ত কিছুই কোনো দিনই যখন তোমার ভাল লাগে না, তাঁর এত হাসি-খুসীও যে তোমার ভাল লাগবে না, সে আমি আগেই জেনেছিলাম।"

মা উত্তর দিয়াছিলেন, "হাসবার কথা না উঠলেও, অকারণ অট্টহাসি অভিনেত্রীর পক্ষে উঁচুদরের কলাবিদ্যা হ'তে পারে, কিন্তু উপযুক্ত গৃহিণীর পক্ষে সেটা সুলক্ষণ নয় !"

শ্বশুর মজঃফরপুরে ওকালতী করেন। দুই পুরুষ ধরিয়া সেইখানেই তাঁহারা স্থায়ী অধিবাসী। ভাবী স্বামী লক্ষ্ণৌ কলেজে গণিতের অধ্যাপক,—সেই স্থানেই বাসা করিয়া আছেন।

বাবা লক্ষ্ণৌ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় মজঃফরপুর হইতে এক তার আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার মর্ম্ম এইরূপ :

'সহরে ভীষণ প্লেগের প্রকোপ দেখা দিয়াছে। তজ্জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ; যদি সম্ভব হয়, পাত্রকে ঐখানেই আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য করিবেন। আমরা বাসা ছাড়িয়া ময়দানে ক্যাম্পে চলিয়াছি।'

সেই দিনই বাবা লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন এবং পরদিনই তার করিয়া জানাইলেন,—'পাত্র দেখিয়া আশাতীত সন্তুষ্ট হইয়াছি। শুভক্ষণে আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে।'

বাড়ীতে ফিরিয়া উচ্ছ্বসিত উল্লাসে বাবা পাত্রের গুণগ্রাম, ব্যবহার, ভদ্রসন্তানের উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির কাহিনী বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করিতে বসিলেন।

বাবার স্বভাবের বিশেষত্বই ছিল, আহারে, ব্যবহারে, বাসস্থাননির্ব্বাচনে, সকল বিষয়েই এমন একটা বিশিষ্টতা রক্ষা করা—যাহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্যোতক হয়। ভাবী জামাতার প্রবাস-বাসে এই বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সহরের শ্রেষ্ঠ অংশে একখানি সুপরিচ্ছন্ন বাংলোয় পাচক ও পরিচারক প্রভৃতি রাখিয়া তাঁহার সুমার্জ্জিত জীবন-যাত্রা ও সুধী-সমাজে সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠা—বাবার অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

তত্রাচ সকলেই প্রস্তাব তুলিলেন, একবার মজঃফরপুরে গিয়া তাহাদের ঘর-বাড়ী ও হাল-চাল দেখিয়া আসা উচিত। কিন্তু শ্বশুরের প্রতি পত্রেই মজঃফরপুরে প্লেগের তাণ্ডবলীলা সম্বন্ধে যেরূপ সংবাদ আসিতেছিল, তাহাতে বাবার আর সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না,—বাবাকে পাঠাইবার জন্য যাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল, প্লেগের রুদ্রমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহারাই এখন তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। অগত্যা বাবাই বিবাহের দিন স্থির ক'রিয়া শ্বশুরকে সংবাদ দিলেন এবং প্রত্যুত্তরে তিনি তাহা মঞ্জুর করিয়া জানাইলেন যে, বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বেই তাঁহারা সদলবলে প্রয়াগে আসিবেন ও সেই সময় কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন।

মহাসমারোহে বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন চলিল। সে বিপুল ঘটার কথা শুধু আমি কেন, বোধ হয়, সহরের কেহই বিস্মৃত হন নাই। লোক কথায় বলে, মেয়ের বিয়ে এক রাত্রির উৎসব ; কিন্তু আমার মনে আছে, আমার বিবাহের উৎসব আগু-পেছু পূরা দুই মাস ধরিয়া চলিয়াছিল। যৌতুক ব্যতীত, উৎসব-ব্যাপারে বাবা যেরূপ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা এতটা আত্যন্তিক হইয়াছিল যে, পরিচিত-অপরিচিত অনেকের চক্ষুকেই ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

৬

তিন বৎসর পরের কথা।

বিবাহের তিন মাস পরে সেই যে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছি, সেই অবধি এখানেই আছি। আমাকে আদর দিয়া বাবা যে অপরাধ করিয়াছিলেন, স্বচ্ছল অবস্থার আবেষ্টনে সর্ব্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যতার মধ্য দিয়া আমাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া যে ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত আমাকে তিল তিল করিয়া করিতে হইতেছে।

পাকস্পর্শের সময় বাবা মজঃফরপুরে আসিয়া ইঁহাদের আবাস-ভবন ও তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া ক্ষুব্ধবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন,—"বেই মশাই, এই বাড়ীতে আপনি থাকেন ?"

শ্বশুর হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন,—"মক্কেলের বাড়ী, ভাড়া দিতে হয় না ;—পৈতৃক বাড়ী খুব একটা দাঁওয়ে বিক্রী ক'রে কলেজের কাছে খানিকটা যায়গা কিনে বাড়ী আরম্ভ করেছি। আপনি তা দেখে খুসী হবেন।"

আমার সঙ্গে যে ঝি আসিয়াছিল, সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কাহার কাছে না কি বলিয়া ফেলিয়াছিল,—"মা গো, এ বাড়ীতে দিদিমণি ঘর করবে কি ক'রে ? আমার বাবুর গাড়ী-ঘোড়াও যে এর চেয়ে ভাল ঘরে থাকে !"

সে সব কথার জবাব তখন তাঁহারা দেন নাই, কিন্তু মনের ভিতর সন্তর্পণে পুষিয়া রাখিয়াছিলেন যে আমার জন্যই, তাহা কে জানিত !

বিবাহের তিন মাস পরেই যখন শ্বশুর আমাকে আনিতে যান, বাবা তখন আপত্তি করিয়া বলেন,—"বেই মশাই, আমার ইচ্ছা এই যে, বাড়ীখানা তৈরী হয়ে গেলেই শুভাকে আপনি নিয়ে যান ; কেন না, বাজারের গায়ে ও-রকম বদ্ধ বাড়ীতে বাস করতে ওরা কখনো অভ্যস্ত নয় !"

শ্বশুর ঈষৎ হাসিয়া জবাব দেন,—"আমি কি তা বুঝি না বেই, যে, বৌমা এমন দরাজ বাড়ী থেকে আমার সেই ঘুপসী

ঘরে ঢুক্‌লে হাঁপিয়ে উঠবেন! তাই না ওঁকে লক্ষ্ণৌএ অপুর কাছেই নিয়ে যাবার সঙ্কল্প করেছি। আর আমিও শীগ্‌গির বাড়ীখানার ছাদটা তুলেই ভাড়া দিয়ে, ওখানকার পাট তুলে, লক্ষ্ণৌয়েই আস্তানা পাতব। অমন প্লেগের হুদ্দোয় আর প্রাণ হাতে ক'রে থাকতে মন চায় না। অপুরও একান্ত ইচ্ছা, ওখানকার বাস তুলে লক্ষ্ণৌএ বসবাস করা।"

শ্বশুর আমাকে লক্ষ্ণৌএ লইয়া যাইবেন শুনিয়া বাবা আর কোন আপত্তি করেন নাই; বরং তিনি সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। আমিও অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম এই ভাবিয়া যে, মজঃফরপুরের সেই গুদামঘরে আমাকে পুনরায় প্রবেশ করিতে হইবে না।

বাবা এবারও আমার সঙ্গে ঝি দিবেন শুনিয়া শ্বশুর আপত্তি করেন। কিন্তু বাবা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন যে, ঝির সমস্ত খরচপত্র বরাবর তিনিই বহন করিবেন; শুভার সুবিধা অসুবিধা সবই এই ঝি জানে, সেই জন্যই ইহাকে পাঠান হইতেছে।

যাত্রার সময় বাবা শ্বশুরের হাত দুইটি ধরিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়াছিলেন,—"শুভা আমার বড় আদরের মেয়ে বেই, কারু কাছে উঁচু কথাটি পর্য্যন্ত ও কখনো শোনে নি,—ভাবনা-চিন্তার ধার দিয়েও মা আমার যেতে পারে না, যায় না,—শুধু হাসি-খুসী আর শান্তি নিয়ে থাকতে ভালবাসে! আমার সংসার আঁধার ক'রে শুভা-মা আপনার সংসার আলো করতে চলেছে,—আপনারা ওকে, আমি যে চক্ষে দেখে এসেছি, সেই চক্ষেই দেখবেন, এই আমার ভিক্ষা।"

বাবার সেই মুখ এখনও মনে পড়ে,—দুই চক্ষুর অবিরল ধারা এখনও মানসনেত্রে সুস্পষ্ট ভাসে! আর মনে পড়ে শ্বশুরের সেই প্রতিশ্রুতি—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

লক্ষ্ণৌএ আসিয়া স্বামীর সুশ্রী বাংলোখানি দেখিয়া তখনকার বিষাদভরা অন্তরেও ঈষৎ একটু আনন্দের হিল্লোল উঠিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিতে স্বামীর মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে সমস্ত চিত্ত যেন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল! শুনিলাম,—শ্বশুরের আদেশ অনুসারে স্বামীকে এই বাংলো ছাড়িয়া দিয়া মেসে আশ্রয় লইতে হইবে এবং আমাকে পরদিন প্রত্যূষেই তিনি মজঃফরপুরে লইয়া যাইবেন। তিনি ইহাতে খুবই ব্যথিত, কিন্তু নিরুপায়: তাঁহার কোনও স্বাধীনতাই নাই।

আমার সঙ্গে যে ঝি আসিয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্ণৌ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারই হাতে বাবাকে এই মর্ম্মে এক পত্র দেওয়া হইয়াছিল,—'আপনার কন্যাকে এত দিন আপনি আপনার ইচ্ছানুসারে তৈয়ারী করিয়াছেন, এক্ষণে আমার কুলবধূকে আমাদের প্রয়োজনানুসারে গড়িয়া তুলিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের অবস্থা বা অবস্থিতি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ আপনার অনধিকারচর্চ্চামাত্র। বধূমাতাকে লক্ষ্ণৌ হইতে মজঃফরপুরের গারদঘরেই লইয়া যাওয়া হইতেছে। ইহাতে বিস্মিত বা নাসিকা সঙ্কুচিত করিবার কিছুই নাই; কেন না, বাঙ্গালী কুলবধূদের বাসস্থান বাংলো বা হৌস নয়,—বরং অন্তঃপুরের গারদই তাহাদের যোগ্যস্থান। অনাবশ্যক বিধায়, আপনার ঝিকে ফেরৎ পাঠাইলাম।'

শ্বশুরের এই পত্রাঘাত বাবা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। কেন না, ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবার শক্তি তাঁহার থাকিলেও, তিনি তাহার অপব্যবহার করেন নাই। পশ্চিমাঞ্চলে দীর্ঘকাল থাকিয়া অভিজ্ঞতাসূত্রে দেখিয়াছি, গৃহের কোনও ভাল দ্রব্য কৌশলে আয়ত্ত করিয়া বাঁদর যখন দুরধিগম্য স্থানে আশ্রয় লয়, গৃহস্বামী তখন একান্ত প্রিয় বস্তুটির খোয়ারের আশঙ্কায় ফলমিষ্টাদি উপঢৌকন দিয়া সেই নিতান্ত অপ্রিয় ও অপচয়কারী জীবটির সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রয়াস পান। বাবাও বোধ হয়, এই নীতি অবলম্বন করিয়া, আমার মুখ চাহিয়া সমস্ত অবমাননা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

সংসারে এমন লোকও দেখা যায়, অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত বা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও, যিনি হিংসাকে স্মরণ করেন না; বরং তাঁহার অনিষ্টকারী অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চাহিলে, তাহার সকল অন্যায়-ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া তাহাকে অকপটে মার্জ্জনা করেন। আবার এমন লোকও বিরল নহে, সামান্য কথার একটু খোঁচা, শূল-ব্যাধির চিরসাথী বেদনার মত যাঁহারা মনে পুষিয়া রাখেন, সেই প্রতিহিংসা তুষানলের মত তাঁহাদের জীবনের সুখশান্তি যেমন তাঁহাদের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে পুড়াইয়া দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে তেমনই পুড়িয়া খাক হইয়া যায়!

শ্বশুরালয়ে আসিয়াই শ্বশুর-শাশুড়ীর রোষের সেই তুষানলের যে জ্বালা অনুভব করিয়াছিলাম, এই তিন বৎসরে তাহাতে আমার সুখ-শান্তি স্বাস্থ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে। এই কাহিনীটুকু বলিবার জন্যই বুঝি প্রাণটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে!

৭

বিদ্যার অতি বিদ্যা যেমন তাহার গুণ হইয়াও দোষে পরিণত হইয়াছিল, আমার প্রতি স্বামীর অতি ভালবাসাও তেমনই আমার কপালে দুর্গতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজের রূপের খ্যাতি শৈশব হইতে যে পরিমাণ শুনিয়া আসিয়াছি, সে সম্বন্ধে স্বামীর রূপের অপ্রাচুর্য্য এক দিনের জন্যও আমার মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত করিবার অবকাশ পায় নাই, বরং স্বামীর বিদ্যা, বিনয়-নম্র ব্যবহার, চরিত্রের মাধুর্য্য, পিতামাতার প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও তাঁহার স্বাস্থ্যসুন্দর সবল মূর্ত্তি আমার তরুণ মনের উপর এমন একটা সম্ভ্রম ও সশ্রদ্ধ ভালবাসার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, আমারই মনে হইত - আমি বুঝি কোন অংশেই তাঁহার উপযুক্ত নই! কিন্তু যখন বুঝিলাম, তিনিও এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে সঙ্কুচিত, তখন আমার সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, শেষে প্রেমের সাম্রাজ্যে পরস্পরের সৌজন্যে সমানাধিকারবাদের ভিত্তির উপর যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ফলে আমাদের অকৃত্রিম ভালবাসা বুঝি মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল!

নারীর চক্ষুদুটি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, দৃষ্টি কিন্তু এত তীব্র ও সত্যনির্ণয়ে সদা অভ্যস্ত যে, প্রিয়জনের মর্ম্মবাণী সামান্য চেষ্টাতেই গ্রন্থের মত পড়িয়া আয়ত্ত করিতে পারে। যে দৃষ্টিতে আমি স্বামীর মনের সঙ্কোচ ধরিতে পারিয়াছিলাম, সেই দৃষ্টিতে

তাঁহার মা, সদ্যবিবাহিতা পত্নীর প্রতি পুত্রের এই অতিরিক্ত ভালবাসার সন্ধান পাইয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন।

সংসারে এমন মার সংখ্যাও অল্প নহে, যাঁহারা প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের পত্নী-বৎসলতায় প্রীত না হইয়া, ঈর্ষায় অভিভূত হইয়া পড়েন। যে পুত্র সাংসারিক সকল ব্যাপারেই মার অঞ্চল আশ্রয় করিয়া ফিরিত, সুখ-দুঃখ,আমোদ-উল্লাস, অভাব-অভিযোগ সকল বিষয়েই মার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত,—বিবাহের অব্যবহিত পরেই কোন্ অজ্ঞাত অপরিচিত বংশের এক পরের মেয়ের প্রতি সেই অনুগত পুত্রের একান্ত ঘনিষ্ঠতা ও আসক্তি এই শ্রেণীর মায়েদের মাতৃস্নেহামৃতের উৎসকে ঈর্ষাবিষে কলুষিত করিয়া যে গরল সৃষ্টি করে, তাহার সমস্তই সেই নিরপরাধ পরের মেয়ের উপর নানা উপায়ে বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যে পরের মেয়েটি নিজের জন্মগত গোত্র, বংশ, পিতামাতা, পরিজন ও আবাল্যপরিচিত বাসভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বিধি-নির্ব্বন্ধে তাঁহাদের অপরিচিত সংসারে কুলবধূর গৌরবটুকুমাত্র অবলম্বন করিয়া উপনীতা হইয়াছে, তাহার মর্ম্মব্যথা কতখানি, অতীতের স্মৃতিগুলি তাহার ক্ষুদ্র বুকখানির উপর অষ্টপ্রহর কত বেদনার তুফান তুলে, ত্যাগ তাহার কি মর্ম্মস্পর্শী,—এ সব চিন্তা করিবার অবসরটুকুও তাঁহারা পান না। আরও আশ্চর্য্য এইটুকু যে, এই মায়েরা ভুলিয়া যান—তাঁহাদের পূর্ব্বের কথা;—এক দিন এই সংসারে তাঁহারাও যখন কুলবধূ-রূপে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তখন ছিলেন এমনই পরের মেয়ে!

বাবা যখন তখন লোকজন পাঠাইয়া বা পার্শ্বেল করিয়া তত্ত্বতাবাস করিতেন, কিন্তু বিনিময়ে পাইতেন অন্তরভেদী উপহাস! এই সংসারে আসিয়া অবধি বাসনমাজা হইতে আরম্ভ করিয়া, মসলা-পেষা, রান্নাবান্না, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারই গ্রহণ করিয়াছিলাম,—কিন্তু তবু তাঁহাদের মন এক দিনের জন্যও পাই নাই। অথচ পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়ে—বাবার সংসারে গেলাসই হইতে জলটুকু পর্য্যন্ত ঢালিয়া কোনও দিন পান করি নাই! একটা সংসারের ভার কখনই স্কন্ধে পড়ে নাই,—পনেরো ষোলো বছরের মেয়ের পক্ষে সংসারের যাবতীয় কায সম্পন্ন করিতে ভুল বা ত্রুটি না হইয়া যায় না;-কিন্তু এক্ষেত্রেও মার্জ্জনা ছিল না বা ভুলটুকু সংশোধন করিয়া নিয়া মিষ্ট কথায় সুশিক্ষা দিবার বিধি ইঁহাদের ছিল না;—সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে খোঁটা দিয়া শ্লেষের যে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন, তাহাতে যেন সারা বুকখানি আমার ঝাঁঝরা হইয়া যাইত! মনের উপর এভাবে নিষ্ঠুর আঘাতের পরিবর্ত্তে, যদি তাঁহারা আমার দেহের উপর নির্ম্মম আঘাত করিতেন, তাহা বোধ হয় এতটা মর্ম্মন্তুদ হইত না!

একবার বাবা মোচা পাঠাইয়াছিলেন; তাহার ব্যঞ্জনে গরম মসলার পরিমাণ একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। আহারের সময় শ্বশুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াও নিবৃত্ত হন নাই; আচমনান্তে সহসা গলবস্ত্রে আমার সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া বলিলেন,—"দোহাই বৌমা, আমাদের রক্ষা কর বাছা; তোমার বাবা না হয় মোচাই পাঠিয়েছেন, কিন্তু তার জন্যে এ রকম বাদশাহী মসলা যোগাবার সামর্থ্য আমার নেই! আমি গরীব মানুষ!"

এরূপ অপূর্ব্ব তিরস্কার শুনিতে কখনও অভ্যস্ত ছিলাম না,—কাঠ হইয়া সে সময় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম, কি বলিব, কি করিব, সে বুদ্ধি তখন মনে আসে নাই। তাহাতেও শাশুড়ীর কি খোঁটা!—"বুড়ো মেয়ে, একটু আক্কেল নেই! শ্বশুর না হয় দুঃখে মাথা হেঁট করেছিলেন, তোমার কি উচিত ছিল না তাঁর পায়ে ধ'রে মাপ চাওয়া? বাবার বাড়ীতে শুধু বুঝি বড়মানষীই শিখেছিলে!"

শিশু-বয়স হইতেই মনের জোর এত বেশী আমার ছিল যে, কাহাকেও ভয় করিতাম না, অন্যায় কথা কাহারও সহ্য করিতে পারিতাম না, অন্যায় কিছু দেখিলে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না।-শ্বশুরবাড়ীতে আসিবার সময় মা আমাকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই ঘরে গৃহ-নারায়ণের সমক্ষে একটি অনুরোধ আজ তোমাকে করছি মা,—শ্বশুর-শাশুড়ীর কথার অবাধ্য যেন কখনও হয়ো না,—যত অন্যায়ই তাঁরা করুন, তবু তা সহ্য ক'রো,—মুখ তুলে জবাব দিয়ো না।"

মার উদ্দেশ্য বুঝিয়া, কিছুক্ষণ শালগ্রামরূপী নারায়ণের দিকে চাহিয়া মনে মনে শক্তি ভিক্ষা করি, তাহার পর তাঁহার পা-দুখানি ছুঁইয়া শপথ করিয়াছিলাম,—"নারায়ণ সাক্ষী, তোমার কথা একদিনের জন্যও ভুলব না,—তাঁরা আমাকে খুন ক'রে ফেল্লেও একটি কথাও কহিব না—এ তুমি জেনে রেখো, মা!"

দুই চক্ষু তখন জলে ভরিয়া গিয়াছিল; মাও আমার শেষের কথাগুলি শুনিয়া অতি কষ্টে উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি চাপিয়া আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন!

এই বলিয়া আজ মনকে প্রবোধ দিয়া শান্তি পাই যে, মার কাছে সে দিন যে শপথ করিয়াছিলাম, এক দিনের জন্যও তাহা হইতে ভ্রষ্টা হই নাই! কিন্তু মনের সেই প্রচণ্ড তেজ, সেই নির্ভীক প্রকৃতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হইবার সেই অদম্য স্পৃহা—আজ অন্তরের গারদে আবদ্ধ হইয়া সুপ্ত হইয়া আছে কিম্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহা জানি না, তবে তাহাদের আবাসস্থল এই দেহখানিও যে ক্রমশঃ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ও যে কোনও মুহূর্ত্তেই যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহাতে বুঝি সন্দেহের অবকাশ নাই!

শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতাম, ননদ ও দেবরদের নিকট হইতেও তাহার ব্যতিক্রম হইত না। তাহারা ছিল আমার সতর্ক প্রহরী। চিঠি আসিলে, 'সেন্সর-রূপী' এই প্রহরীদের হাত ফিরিয়া তবে আমার হাতে আসিত। চিঠি পাঠান সম্বন্ধেও এইরূপ সতর্কতা ছিল। ফলে চিঠি লেখা এক প্রকার বন্ধ করিয়াই দিয়াছিলাম।

স্বামী মাসের মধ্যে একটি দিনমাত্র আসিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। শ্বশুর তাঁহার লক্ষ্ণৌবাসী এক মক্কেলের বিষয়-সংক্রান্ত এমন একটি কার্য্যে তাঁহাকে জড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, অধ্যাপনার পর, সকালে সন্ধ্যায় নিত্যই তাঁহাকে তাহাতে লিপ্ত থাকিতে হইত। এজন্য সকল মাসে তাঁহার আসিবার অবকাশ ঘটিত না।

সেবার মজঃফরপুরে সহসা বসন্তরোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয়! এ সব বিষয়ে শ্বশুর ছিলেন যতটা সাবধানী, ভয় ও

দুর্ব্বলতা ছিল সেই পরিমাণে তাঁহার অত্যন্ত বেশী। অদৃষ্ট-ক্রমে আমি এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। একখানি অপরিষ্কার ও অপরিসর ঘরে বাড়ীর অব্যবহার্য্য জিনিষপত্র থাকিত, সেগুলি সরাইয়া লইয়া, সেই ঘরে আমার রোগশয্যা পড়িল। ঘরের ভিতর ভয়ে কেহ প্রবেশ করিত না,—বাহির হইতে সংবাদ লইয়া যাইত, শাশুড়ী অতি সন্তর্পণে একবার আসিয়া, শয্যা হইতে তফাতে থাকিয়া পথ্যাদি দিয়া যাইতেন। শুশ্রূষাবিহীন, ভীষণ রোগের সে যাতনার কথা স্মরণ হইলে, মরণের কোলের সান্নিধ্যে আসিয়াও আজ শিহরিয়া উঠিতে হয়!

স্বামী সংবাদ পাইয়া ছুটী লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আমার সেই ছোট ঘরখানির চৌকাঠ পর্য্যন্ত মাড়াইতে দেওয়া হয় নাই! সে দিন ছিল বৃহস্পতিবার,—তিনি অপরাহ্নে আসিয়াছিলেন; সেই রাত্রিতেই তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল!

এ সব কথা পরে শুনিয়াছিলাম। আমি তখন রোগের যাতনায় অচৈতন্য অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু মনে আছে আমার, সেই যন্ত্রণার মধ্যে কায়মনোপ্রাণে শুধু মাকে স্মরণ করিয়াছি! সে রোগ দেখিয়া সবাই সরিয়া যাইতেছে, আমার মা যদি আজ কাছে থাকিতেন, আমার এই রোগশয্যা আশ্রয় করিয়া কি শুশ্রূষাই না করিতেন! সেই আর্ত্ত অবস্থায় কায়মনপ্রাণে আকুল হইয়া কাঁদিতাম,—মা, আমাকে কোল দাও, অমৃতের পরশ দাও, মুক্তি দাও!

স্বামী সারা পথ কাঁদিতে কাঁদিতে বাসায় ফিরিয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হৃদয়বান্ পুত্র পিতা-মাতার ভ্রূকুটির শাসন অতিক্রম করিতে না পারিয়া, মৃত্যুশয্যাশায়িনী সহধর্ম্মিণীকে চোখের দেখা না দেখিয়াই কাপুরুষের মত ফিরিয়া গিয়াছিলেন,—এ অনুতাপ তাঁহার চিরসাথী হইয়া আছে, তাহা আমি মাত্র জানি;—তাঁহারও আশা উৎসাহ ধীরে ধীরে মুসড়াইয়া পড়িতেছে,—পিতামাতার প্রতি অপরিসীম ভক্তির উৎসও যে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে,—তাহা কি কেহ লক্ষ্য করিয়াছে?

আরও অবমাননা ও মনস্তাপ সহ্য করিবার ছিল, বুঝি সেই জন্যই সে যাত্রা মরি নাই। বাবাকে অতিসাধারণভাবে পত্রে সংবাদ দেওয়া হয়,—বধূমাতার বসন্ত হইয়াছে। সারিয়া উঠিবে, চিন্তার কোনও কারণ নাই।

বাবা পত্র পাইয়াই প্রি-পেড টেলিগ্রাম করেন। বসন্তের উপযুক্ত চিকিৎসক লইয়া তাঁহারা যাইবেন কি না জানিতে চান।

তাহাতেও কত উপহাস! কিন্তু উত্তর দেন, 'কোনও আবশ্যক নাই; কাহাকেও আসিতে হইবে না।'

৮

সবেমাত্র সারিয়া উঠিয়াছি। এখনও বল পাই নাই,—একটু আধটু উঠিয়া বেড়াই। এখনও আমার সংস্পর্শে বাড়ীর কাহাকেও আসতে দেওয়া হয় না। রোগের সময়কার কাপড়-চোপড়, বিছানা প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই, অপচয় এ সংসারে নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং সেই অবস্থায় আমাকেই সমস্ত কাচিয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

এই সময় এক পত্র আসিল—বাবার নিকট হইতে। বাবা লিখিয়াছেন,—তাঁহার কোনও বিশিষ্ট বন্ধু সপরিবারে দ্বারভাঙ্গায় যাইতেছেন। পথে তাঁহারা মজঃফরপুরে আমার শ্বশুরের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।

কোন্ দিন কোন্ গাড়ীতে তাঁহারা আসিবেন, অতিথিদের সংখ্যা প্রভৃতি সমস্তই পত্রে লেখা ছিল।

বাবার এই পত্র সে দিন শ্বশুরের চায়ের পিয়ালায় তুফান তুলিয়াছিল! অতিথির সৎকার এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি কখনও দেখি নাই। সুতরাং এতগুলি অতিথির আগমনের কথা, বিশেষতঃ বাবাই তাহাদের পাঠাইতেছেন বলিয়া, শ্বশুরের কি রাগ,—আমাকে শুনাইয়া কি রোষদিগ্ধ উচ্ছ্বাস!

কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম, অতিথিগুলি কাহারা! এত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও সেই রোগমথিত দেহযষ্টি যেন উল্লাসে নাচিয়া উঠিয়াছিল! তিন বৎসর পরে আবার দেখিবার আনন্দ! কিন্তু এখানে আসিয়া যদি—

শাশুড়ীকে বলিলাম,—"মা, বাবা মিছিমিছি রাগ করছেন,—যাঁরা আসছেন, আর কেউ নন,—আমার বাবা, মা, ভাই, বোন—"

শুনিয়া তাঁহারা কি ভাবিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু আর কোনও সমালোচনা শুনি নাই; বরং শ্বশুর তাঁহাদের জন্য উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই।

আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। তিন বৎসর পরে বাবা, মা, দাদা ও বোনেদের দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই। আমার চেহারা দেখিয়া, তাঁহারা তখন মূর্চ্ছা যান নাই সত্য,—কিন্তু বাবা, মা ও দাদার মুখগুলি যে কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও যেন চক্ষুর উপর ভাসিতেছে।

বাবা শুধু ভগ্নস্বরে বলিয়াছিলেন,—"এ কি আমাদের সেই শুভা,—না, তার কঙ্কাল!"

মনে পড়ে, তিন বৎসরের ভিতর ত্রিশবারেরও উপর বাবা আমাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। শ্বশুর প্রত্যেক বারেই দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছিলেন, এখন পাঠান হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের আদেশে আমাকে স্বহস্তে লিখিতে হইয়াছে,—বাবা, এখন আমার যাওয়া হইবে না; আপনি লইতে আসিবেন না।

সেই জন্যই বোধ হয়, বাবা এই ভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এবারও আমার যাওয়া হইল না। শ্বশুর ও শাশুড়ী যতদূর সম্ভব আদর-যত্ন ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া আমার যাওয়া সম্বন্ধে ফতোয়া দিলেন যে, গ্রীষ্মের ছুটীতে অপু বাড়ী আসিলে শ্বশুর আমাদের সকলকে লইয়া প্রয়াগে যাইবেন ও অন্ততঃ দুইটি মাস বাবার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।

বাবা ও মার সকল অনুরোধ ভাসিয়া গেল, উপেক্ষিত হইল, এমন কথা বলিতে পারিব না; এমন শিষ্টাচারের সহিত শ্বশুর ও শাশুড়ী বার বার একই কথা বলিয়া তাঁহাদের অনুরোধ খণ্ডন করেন যে, তাঁহাদিগকে অগত্যা মুখ বন্ধ করিতে হয়।

তিন দিন থাকিয়া, ব্যর্থমনোরথ হইয়া, তাঁহারা অশ্রুধারায়

আমাকে অভিষিক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন ! উঃ ! সেদিনকার বিদায়ের সেই স্মৃতি কি ভীষণ, কি ভয়াবহ !

৯

গ্রীষ্মের ছুটীর পূর্ব্বেই আমার শাশুড়ীর মা এখানে হাওয়া বদলাইতে আসিলেন। বোধ হয়, করুণানিদান ভগবান, তাঁহাকে আমারই কালস্বরূপ করিয়া এখানে আনিলেন ! তাঁহার দেহে তখন পারার ঘা বাহির হইয়াছিল। বিহারের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সেই ঘা ভীষণরূপে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার শুশ্রূষার ভার অগত্যা আমাকেই লইতে হয়। পাখার বাতাস পর্য্যন্ত তাঁহার সহ্য হইত না,—সর্ব্বাঙ্গের ঘায়ের উপর আমার রক্তশূন্য নিষ্প্রভ মুখখানি নামাইয়া দিবারাত্রির অধিকাংশই ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে হইত,—মুখের সেই মিষ্ট বাতাসে তবে তিনি তৃপ্তি পাইতেন, ঘুমাইতে পারিতেন !

এক দিন মধ্যাহ্নে বাড়ীর সকলেই যখন সুপ্ত, সেই সময় অতর্কিতভাবে স্বামী বাড়ীর ভিতর আসিয়া প্রথমেই এই দৃশ্য দেখিলেন। তখন একা আমি বিনিদ্র অবস্থায় দিদিশাশুড়ীর সর্ব্বাঙ্গের ক্ষতের উপর মুখ নামাইয়া ফুৎকার দিতেছিলাম। মনে আছে, সে দিন স্বামীর মূর্ত্তির কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিলাম ! কোনও কথা না কহিয়া, আমার হাতখানি ধরিয়া তুলিয়া তিনি আমাকে আমার ঘরে লইয়া গেলেন।

শাসন, পীড়ন ও অত্যাচারের যেমন একটা পরিমাণ আছে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতারও তেমনই একটা সীমা থাকে। পরিমাণ বা সীমা, মাত্রা ছাড়াইলেই বিপ্লব উপস্থিত হয়। আমি না জানাইলেও, শিক্ষিত স্বামী আমার সম্বন্ধে সমস্ত অত্যাচারের কাহিনীই কোনও সূত্রে জানিয়াছিলেন এবং অতর্কিতভাবে, ছুটীর কয়েকদিন পূর্ব্বেই অকস্মাৎ বাড়ীতে আসিয়া, আমার দেহের এই অবস্থায় আমার প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন।

যাহারা কখনও ক্রুদ্ধ হয় না বা ধৈর্য্য হারায় না,—তাহাদের অন্তরে ক্রোধ উপস্থিত হইলে, তাহা দুর্ব্বার হইয়া দাঁড়ায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। স্বামীর সে নূতন মূর্ত্তি আমাকে স্তব্ধ—স্তম্ভিত করিয়াছিল,—বাড়ীর সকলকেই তাহা ভয়-চকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

স্বামীর মুখে আজ এই প্রথম আদেশ শুনিলাম,—"পনেরো মিনিটের মধ্যে কাপড়-চোপড় প'রে প্রস্তুত হও,—আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

আমার শ্বশুর তখনও কাছারী হইতে ফিরেন নাই। শাশুড়ী, ননদ, দেবর প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। স্বামী ভক্তিভরে মার পদধূলি লইয়া বলিলেন,—"আর পারলুম না, মা, অপরাধ ক্ষমা ক'রো।—পরের মেয়েকে তোমার সংসারে কুলবধূ ক'রে এনে এক দিনের জন্যও তাকে আপনার করতে পার নি,—এই ত্রুটিতে ভগবানের বিধানে নিজের ছেলে তোমার আজ পর হয়ে চলেছে ! যে অন্যায় তোমরা করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে;—শুভা বাঁচবে না, একে দেখেই বুঝতে পারছি, তোমরাও যে বুঝছ না, তা নয়,—কিন্তু সারাজীবন ধ'রে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি !"

*   *   *   *

পরদিন ঠিক এমনই সময়ই প্রয়াগের বাড়ীতে হঠাৎ হুলস্থূল উপস্থিত হয়।

মা যখন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া আমার অবসন্ন দেহখানি বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, স্বামী তখন তাঁহার পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে বলিতেছিলেন,—"মা, আমি কশাই,—শিক্ষিত ভদ্র কশাই ! অগ্নি সাক্ষ্য ক'রে যাকে গ্রহণ করেছিলাম, রক্ষা করা দূরের কথা, তিন বৎসরে তিল তিল ক'রে তাকে মেরে—দেহখানা তোমাদের কাছে এনেছি ! আমি খুন করেছি,—আমাকে শাস্তি দাও !"

*   *   *   *

জীবনটুকু ধরিয়া রাখিবার জন্য ঘোরঘটায় চিকিৎসার যজ্ঞ চলিয়াছে ! স্বামী সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে,—সে শুশ্রূষার অন্ত নাই বাবা, মা, ভাই, বোন—শয্যার চারি ধারে !—বাবার ব্যবসায় বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—আমিই হয় ত তাহার উপলক্ষ,—কিন্তু তবুও মরণের কোল হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার কি প্রয়াস ! এক দিন হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম,—"কেন আমাকে এত আদর দিয়েছিলে, বাবা !"

মাকে এক দিন বলিয়াছিলাম,—"তুমি যখন খিটখিট করতে, তাতে মনে মনে রাগ হ'ত; এখন কিন্তু বুঝছি মা, তুমি কিছুই বাড়িয়ে বলতে না, সব সত্যি।"

আর এক দিন সহসা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে,—"কেন আমার বে দিয়েছিলে বাবা ? আমি ত এক দিনও এর জন্য ব্যস্ত হই নি !"

পরক্ষণে মনে আঘাত পাইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলাম,—"না, না, এ কথায় তুমি যেন দুঃখ ক'র না,—তোমার মত স্বামী পাওয়া সামান্য ভাগ্যের কথা নয়, তবে আমার সহ্য হ'ল না।"

উত্তর কে দিবে ? সকলেই তখন মুখ ফিরাইয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতেছিলেন !

*   *   *   *

রোগশয্যায় পড়িয়া ও, সকলের সতর্ক-দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, সকল সম্বিৎ সংযোগে, হৃদয়ের শোণিতটুকু দিয়া শুভা তাহার জীবন-যজ্ঞের কাহিনী লিখিয়া রাখিয়াছিল। পূর্ণাহুতির দিন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার এই স্মৃতিটুকু তাহার দুর্ভাগ্য স্বামীর হস্তে দিয়া বলিয়াছিল—"তোমাকে দিলাম; এই প্রথম, এই শেষ !"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাত্রা-বদল

১

ভাদ্রের এক অশুভদিনে নীহারবালা স্বামীর উপর রাগ করিয়া বৌবাজার হইতে শ্যামবাজারে তাহার ভগিনীর বাটী চলিয়া গেল। নবীন গুম্ হইয়া বসিয়া বসিয়া গোঁফে তা দিতে লাগিল।

এ রকমটা প্রায়ই ঘটে। মাসের মধ্যে দু'একবার স্বামি-স্ত্রীতে সামান্য কোন একটা কথা লইয়া অসামান্য একটা কলহের সৃষ্টি হয় এবং নীহার রাগ করিয়া তাহার একমাত্র গন্তব্যস্থান, শ্যামবাজারে ছোট ভগিনীর বাটী চলিয়া যায়, আর নবীন বৈঠকখানা-ঘরের রাস্তার দিকের জানালা খুলিয়া দিয়া, তাহারই ধারে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া, তাহার বিশাল গোঁফে তা দিতে থাকে।

সে দিনও এই সনাতন প্রথার ব্যতিক্রম হইল না।

তবে, নবীন এবার স্থির করিল যে, অন্য অন্য বারের মত এবার সত্যসত্যই গিয়া বড়বৌকে—অর্থাৎ নীহারকে—খোসামোদ করিয়া ফিরাইয়া আনা হইবে না;—কিছুতেই না। এবার একটু শক্ত হইতে হইবে এবং ভাল করিয়া বড়বৌকে শিক্ষা দিতে হইবে যে, কথায় কথায় এই রকম রাগ, অভিমান, ঝগড়া করিয়া নিত্য বোনের বাড়ী চলিয়া গেলে, হয় ত সেইখানেই তাহার স্থানটিকে স্থায়ী করিয়া লইতে হইবে। বড়বৌ বিহনেও এ-বাড়ীর কাযকর্ম্ম চলিয়া যাইবে এবং নবীনের তাহাতে কিছুই আসিবে-যাইবে না।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছিল। বৌবাজারের এই অপ্রশস্ত রাস্তাটায় লোক-চলাচলের সংখ্যা তত বেশী ছিল না। কেবল সামান্য দুই চারিজন পথিক ও কুল্‌পী বরফ আর পাঁঠার ঘুগ্‌নীর ফেরিওয়ালা। ক্বচিৎ এক-আধখানা ট্যাক্সির ঘড়-ঘড়ানী, বা মাল-বোঝাই মোষের গাড়ীর কেঁচ্-কেঁচানী।

সহসা নবীনের খোলা জানালার সম্মুখে একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল। নবীন জিজ্ঞাসা করিল—"কি চান?"

যাহাকে প্রশ্ন করা হইল, সে লোকটি বয়সে প্রৌঢ়,—অথবা প্রৌঢ়ত্বের সীমা সবেমাত্র অতিক্রম করিয়াছে। তথাপি শরীর তাহার কর্ম্মঠ এবং বলিষ্ঠ, পায়ে একটি পা-গেলা চটি জুতা। পরনের আধ-ময়লা ৯ হাত লালপাড় ধুতি-খানিকে জোর করিয়া হাঁটুর নীচে নামাইয়া পরিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা নামে নাই। গায়ের পিরাণটি সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত পৌছাইয়াছিল। পিরাণটি একবারে নূতন, ধোয়া লংক্লথের তৈয়ারী ধব্-ধব্ করিতেছে, এবং তাহার সম্মুখের অংশটায় লাল রংয়ের মিলের মার্কাটি অবিকৃতরূপে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। একদিক্‌কার কাঁধের উপর একখানি তাঁতের কোরা উড়ানী পাট-করা অবস্থায় ঝুলিতেছিল। এক হাতে একটি বাঁশের বাঁটের ছাতা। ছাতাটির কাপড়ের রং কোন এক সময় হয় ত কৃষ্ণই ছিল, এক্ষণে গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং তাহার ছিন্ন অংশগুলি ঢাকিবার জন্য তাহার উপর একখানি নয়ানসুকের সাদা কাপড় বসান হইয়াছে। অপর হাতে নেকড়ায় বাঁধা কতকগুলি কাগজপত্র।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল—"কি চান?"

"রাশু সরকার উকীল এই দিকে কোথায় উঠে এসেছে, আপনি বলতে পার?"

দ্বিতীয়বার তাহার আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া নবীন জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ উকীল? আশু সরকার?"

"হ্যাঁ গো, বাবু, রাশু সরকার! চেন না আপনি? আলিপুরের জজের ঘরের উকীল। পূর্ব্বে তোমার গিয়ে এই সারপিনটুনি লেনে বাসা ছিল।"

"সারপেনটাইন লেনের আশু সরকার? খুব চিনি। আমাদেরই ত জুনিয়র সে।" বলিতে বলিতে নবীন উঠিয়া গিয়া রাস্তার দিকের দরজা খুলিয়া দিল এবং লোকটিকে ভিতরে ডাকিয়া বসাইল।

অতঃপর বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহার শেষাংশটা এইরূপ—

"২৫ টাকার কথা আপনি যা বোলতেছ, সেটা একটু অনেহ্য হচ্ছে উকীল বাবু। আপনিই, তোমার গিয়ে, বিবেচনা ক'রে দেখ। কুড়িটি টাকা নিয়ে কাযটা আমার আপনি ক'রে দাও। রেপিডেপিটের খরচাটা আলাদা দেবো আর দিনের দিন, চার টাকা ক'রে আপনার ফী দেবো।

তার পর জিতিয়ে দিতে পারলে, বেশ পেট ভ'রে পরিতুষ্টি ক'রে এক দিন সন্দেশ খাইয়ে যাবো।"

নবীন এ অনুরোধ আর এড়াইতে পারিল না। বৃদ্ধ

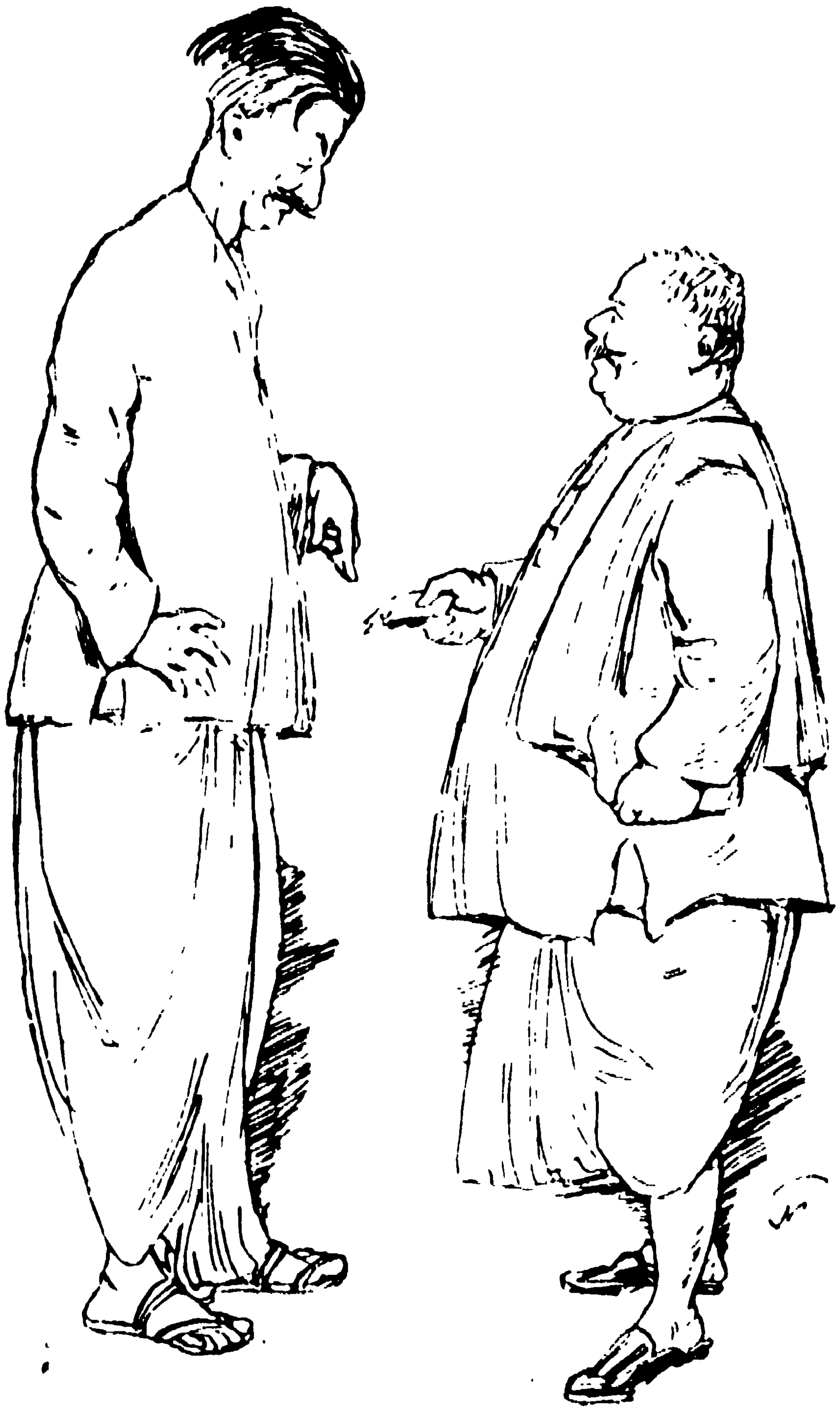

নবীন এ অনুরোধ আর এড়াইতে পারিল না

তাহার কাপড়ের খুঁটের গিরা খুলিয়া দশটাকার দুইখানি নোট তাহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল, তাহা সে আর ফিরাইতে পারিল না। নেকড়ায় বাঁধা কাগজগুলি এবং নোট দুইখানি হাতে লইয়া নবীন কহিল,—"তোমার ডেমি কোর্ট-ফি, মুহুরী আর পেস্কারকে দিতেই ত এ ক'টা টাকা ব্যয় হয়ে যাবে হে, আমার আরজী লেখার ফী তা হ'লে দিচ্ছ কই? আমার খাটুনীটা কি শুধু শুধুই যাবে! আর পাচটা টাকা পরশু নিয়ে এস। আরজী অবিশ্যি আমি কাল লিখে ঠিক ক'রে রাখবো এখন, তবে——"

"আর কিছুটি বোলো না আপনি, বাবু। এইতেই এখন খুসী হয়ে কাযটি আমার ক'রে দাও। তার পর ভবিষ্যতে যদি ভগবান্ দিন দেন, তা' হ'লে, ঐ যে বললুম,—আমাদের জয়নগরের, টাকায় আটটা ক'রে যে মোয়া, সেই মোয়া আর তোমাদের হেথাকার ঐ ভীম নাগের সন্দেশ, এ আপনি যত পার, পরিতুষ্ট হয়ে—"

অতঃপর আরও দুই একটি কথাবার্ত্তার পর মক্কেল যুধিষ্ঠির দলুই চলিয়া গেল এবং তাহার কিছু পরেই নবীন সদরে তালা বন্ধ করিয়া, শ্যামবাজারে ছোট শ্যালীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে বরাবর নীহারের সম্মুখে হাজির হইয়া, হাতযোড় করিয়া কহিল—"ক'রে থাকি অপরাধ, তোমার প্রেমপাশ দিয়া বাঁধ —দশটা টাকার জন্যে তোমার এত রাগ, বড়বৌ?" বলিয়া নীহারের পায়ের কাছে দুইখানি দশ টাকার নোট রাখিয়া দিল। নীহার কহিল—"রাগ হবার দোষটা কি শুনি—? বোশেখ মাসে কাল দেবো ব'লে টাকা দশটা আমার নিলে, আর এত দিনেও তা দেবার নামটি নেই! নিজে ত জীবনে একটা আধলা পর্য্যন্ত দাও নি, আর আমার টাকা এমনি ক'রে ফাঁকি দিয়ে নেবার তোমার মৎলব। কত কষ্ট ক'রে এ টাকা আমি জমিয়েছি: জান, এ আমার স্ত্রী-ধন!"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নবীন কহিল -"খুব জানি বড়বৌ, খুব জানি। আলিপুরের নামজাদা বেহারী উকীল হয়ে আর 'স্ত্রী-ধন' জানবো না?"

বিস্ময়ভরা চোখে নীহার স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নবীন কহিল,—"বুঝতে একটু বাধছে, না? চল, বাড়ী গিয়ে সব বলব এখন, তা হলেই বুঝবে। পরশুই আবার আমার মক্কেল শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের শুভাগমন হবে।" তার পর অনেক বুঝাইয়া, অনেক অনুনয়-বিনয় এবং খোসামোদ করিয়া, অনেক রাত্রিতে নবীন নীহারকে লইয়া তাহার বাসায় আসিল। আসিয়া কহিল—"আজ চৌদ্দ বছর বিয়ে হয়েছে, বড়বৌ, ঝগড়া-ঝাটি রাগা-রাগি দেখছি কিছুতেই আর কামাই নেই। যাত্রাটা একবার বদলাতে হবে।"

নীহার বুঝিতে না পারিয়া কহিল,—"তার মানে?"

"তার মানে, বিয়েটা সু-লগ্নে হয় ত আমাদের হয় নি। একটা ভাল দিনে, আর একবার—"

"আর একবার কি বিয়ে?"

"বিয়ে না হোক, অন্ততঃ দু'জনে নতুন ক'রে আর একবার মালা-বদল, শুভদৃষ্টি। সাত-পাকটাও আর একবার ভাল ক'রে দিতে হবে। অর্থাৎ, কোন কাযে কোথায় গিয়ে সুবিধে না হলে, যাত্রাটা বদলে আসতে হয়। আমাদেরও দেখছি, বিয়ের ব্যাপারে তাই হবে। রাজী আছ, বড়বৌ?"

নীহার মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল—"তোমার ও-সব ঢঙের কথা আমি বুঝি না। আমায় যে এবার পুজোয় চুড়ি গড়িয়ে দেবে বলেছিলে, তার কি করছ, বল।"

"যা বললুম, তা যদি এক দিন কর, তা হ'লে, যেখান থেকে পারি, তোমায় এক সেট চুড়ি গড়িয়ে দেবই দেব।"

"কি করব? ঐ শুভদৃষ্টি? এ সব ছেলেমানুষী তোমার ভালও লাগে! আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু আমায় চুড়ি দিলে তবে। ঘরের ভেতর লুকিয়ে ত?"

"লুকিয়ে নয় ত কি আর পাঁচ জনের সামনে?"

"আচ্ছা।"

"তা হ'লে, উঠে-পড়ে লেগে দেখি, কার সর্ব্বনাশ ক'রে উঠতে পারি।"

"আচ্ছা, এই জুচ্চুরী ব্যবসাটা ছাড়তে পার না? ভালভাবে—"

"ভালভাবে পারি না, বড়বৌ। অভ্যাসটা কেমন যেন রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। জুচ্চুরী না ক'রে পারি না। ও আমাকে করতেই হবে—অভাবেও বটে, অভ্যাসেও বটে। না করলে যেন ভাত হজম হয় না। এ যেন ঠিক বিল্বমঙ্গলের সেই ভিক্ষুকের অবস্থা।"

নীহার স্বামীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া, শুধু তাহার দিকে পলকশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল

২

সকাল আন্দাজ ন'টার সময়, নবীনের বাসার সম্মুখস্থ পথের উপর পাড়ার দশ-বারো জন লোক যাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে যুধিষ্ঠির দলুই। তাহার সে দিনের মত সেই বেশ-ভূষা, এক হাতে কোম্পানীর আমলের সেই ছাতাগাছটি, অন্য হাতে সেই নেকড়ায় বাঁধা কাগজ-পত্রের বাণ্ডিল।

কিছু আগে সে তাহার আরজীর জন্য পূর্ব্বকথামত নবীনের কাছে আসিয়াছিল এবং তাহাকে উপহার দিবার অভিপ্রায়ে একটি সের দুই আড়াই রুইমাছ আনিয়াছিল। নবীন মাছটি লইয়া, তাহার নেকড়ায় বাঁধা কাগজপত্রগুলি তাহার হাতে ফেরত দিয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিয়াছিল—"আরজী? আরজী কিসের?" তাহার পর উভয়ের মধ্যে আরও দু'একটি কথার পর, নবীন শেষকালে তাহাকে ঘর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহারও পরে ক্রমে ক্রমে পাড়ার পাঁচ জন জমায়েৎ হইয়া, তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া রং-বেরঙের প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া নবীন কহিল—"আরে, আপনারাও যেমনি, একটা ডাহা পাগলকে নিয়ে—। এই পাগলা! এ দিকে আয়, শুনি। তোর ঘর কোথায়?"

ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া যুধিষ্ঠির আগাইয়া আসিয়া কহিল,—"আপনি কি বল গো, বাবু? কুড়িটা টাকা নিলে, বললে যে, আরজি লিখে দোবো। আমি রাশু সরকারের ঠিকানা জিজ্ঞা——"

উপস্থিত কে এক জন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"রাশু সরকার শ্বশুরবাড়ী গেছে। এই পাগলা, তুই যাবি সেখানে?" দুই চারি জন ছেলেও সেখানে আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে হাততালি দিতে লাগিল। নবীন হাঁকিয়া কহিল—"ওহে মতি, ও সিদ্ধেশ্বর, পাগলকে নিয়ে আর ক্ষেপিও না। দাও ওকে পাড়া ছাড়িয়ে ঐ মোড় পার ক'রে।"

তখন উপস্থিত দর্শকরা যেন চাঁদা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ঠেলিতে ঠেলিতে মোড়ের দিকে লইয়া গেল।

ইহারই দিন পাঁচ সাত পরে এক দিন সকালবেলা নবীনকে হালসীর বাগানের পথে দেখা গেল। এ অঞ্চলটার চারিদিকেই তেলের কল। তাহারই একটাতে ঢুকিয়া পড়িয়া নবীন, গদীর বাবুর দিকে চাহিয়া কহিল—"শ'খানেক মণ সরষে আছে, দরকার হবে কি?"

কল-ওয়ালা বাবু নবীনকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিতে পারি, তবে দামটা একটু সুবিধে হওয়া চাই; কেন না, পুজোর বাজারে মাল কিনে আর টাকা আটকে রাখব না। নমুনা এনেছেন?"

"আজ্ঞে, এনেছি বৈ কি।"

পকেট হইতে নবীন কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া নমুনা দেখাইল।

"দরটা কত বলছেন ?"

"বাজার ত এখন স-ছ'টাকা, তবে আনা দু'চার কমেতেই মালটা ছাড়ব। কারণ, হঠাৎ একটা কাযের জন্য নগদ টাকাটার আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে। বাজার যে রকম টান, তাতে পূজো পর্য্যন্ত ধ'রে রাখতে পারলে, হয় ত পুরো সাত টাকাতেই বেচতে পারতুম। কিন্তু কি করব বলুন ; হঠাৎ একটা জরুরী—"

বিক্রেতার গরজ বুঝিতে পারিয়া, কল-বাবু মনে মনে দাও আঁটিতে লাগিলেন। তাহার পর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া উভয়ের মধ্যে দর কষা-কষি ও কথাবার্ত্তা হইবার পর, ৪৸৵০ হিসাবে দর সাব্যস্ত হইল এবং ইহাই স্থির হইল যে, সেই দিনই অপরাহ্ণে কলের সরকার ১৭ নং অক্রুর দত্ত লেনের গুদামঘরে নবীনের কাছে যাইবে এবং বস্তার মাল যদি ঠিক নমুনার সহিত এক হয়, তাহা হইলে সমস্ত টাকা সরকার সেইখানে নগদ দিয়া সেই দিনই মাল ডেলিভারি লইবে।

কলের মালিক পাকা লোক। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মালটা—চোরাই মাল। সুতরাং পাছে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত দেরী করিলে মালটা হাত-ছাড়া হয়, সে কারণ কহিলেন—"বিকেলে সরকারকে বোধ হয় পাঠাতে পারব না, অন্য একটা জরুরী কায আছে। আপনি বেলা ১টা ১৷৷টা নাগাৎ থাকবেন, ঐ সময় সরকার মশাই যাবেন। আপনার বাসাটা কত দূর ?"

"বাসা আমার হাটখোলায়। আমি তা হ'লে খাওয়া-দাওয়ার পরই গুদামে চ'লে আসবো।" বলিয়া নবীন বাবুটিকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

একটি মাড়োয়ারী তাগাদায় আসিয়াছিল। সে একধারে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আগ্রহের সহিত সমস্ত কথা শুনিতেছিল। সে-ও বুঝিতে পারিল যে, মালটা নিশ্চয়ই চোরাই। নহিলে ৬।০ আনার যায়গায় ৪৸৵০! গণ্ডা দুই পয়সা যদি এর ওপর বেশী দেওয়া যায়, আর একশ' মণ মালের সঙ্গে যদি মণ দশেক ভেজাল চালানো যায়, তা হ'লে পূজোর পর ৭৲ হিসাবে মালটা ছাড়লে শ' তিনেক টাকা যে এ থেকে ঘুরে আসবে, তার আর কোন ভুল নেই।

মাড়োয়ারীটি 'রাম রাম' বলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং জোরে পা চালাইয়া ভল্লুকপাড়ার মোড়ে আসিয়া নবীনকে ধরিল। নমস্কার করিয়া কহিল,—"আরে বাবুসাব যে বোম্বাই মেইল চলছেন ?" তার পর চলিতে চলিতে নবীনের পিঠে হাত দিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিল,—"আপনি বড় বোকা আছেন, বাবুসাব। আপনার মাল যে পাচ রূপেয়ামে বিক্রী হোবে। হামি এখনি নগদ রূপেয়া দিয়ে আপনার মাল নিয়ে লেবে। লেকেন, কথাটা প্রাইবেট্ রাখিয়ে দেবেন, এদের কাছে কিছু আর বলবেন না। আপনার জরুরী কিছু রোপেয়ার দরকার, হামার ভি সঁর্ষ্কা থোড়া দরকার আছে।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বড় রাস্তায় আসিয়া বাসে চাপিল এবং অক্রুর দত্ত লেনের সম্মুখে আসিয়া উভয়েই বাস হইতে নামিয়া পড়িল।

"বাবুসাবকা নামটি কি আছে ?"

"রামরতন পাল।"

১৭ নম্বর বাড়ীর বাহিরের দিকে একটি প্রশস্ত টীনের ঘর। নবীন পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দরজা খুলিল এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া মাড়োয়ারীকে দুই মণ হিসাবে ৫০ বস্তা মাল দেখাইয়া দিল। একটি ফুলুঙ্গীতে একটি বোমা রক্ষিত ছিল। নবীন তদ্দারা প্রায় সকল বস্তা হইতেই কিছু কিছু সরিষা বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। মাল দেখিয়া মাড়োয়ারীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিল—"বাবুসাব, ওজন কিস্তরফ হোবে ? আপনার এখানে ত কাঁটা-পাল্লা কুচ্ছু ভি নেই আছে।" নবীন কহিল—"আপনি একটা লরী যোগাড় ক'রে আনুন, আমি সামনের ঐ দোকান থেকে আপনাকে ওজন দিয়ে দেবো।"

এক ধারে দুইখানি লোহার চেয়ার ছিল। মাড়োয়ারীটি পকেট হইতে বিড়ি দিয়াশলাই বাহির করিয়া, তাহারই একখানিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল—"আধা ঘণ্টাকা অন্দর হামি লরী নিয়ে আসবে; আসুন এখন, একঠো বিড়ি ত খান। আপনার বাসার ঠিকানাটা কি আছে রামবাবু ?"

বিড়ি ধরাইতে গিয়া নবীনের দিয়াশলাই নিভিয়া গেল। বাক্সে আর কাঠি ছিল না। মাড়োয়ারীর মুখের

বিড়ি হইতে, নিজের মুখের বিড়িটি ধরাইতে ধরাইতে নবীন কহিল—"হাটখোলা, ৬নং মল্লিক ষ্ট্রীট।"

৩

বেলা প্রায় দেড়টার সময় পরিশ্রান্ত হইয়া, নবীন বাসায় পদার্পণ করিয়াই কাগজ-কলম লইয়া হিসাব করিতে বসিল—

জমা	খরচ	
৫০০৲	সরিষা ২৫ মণ ৬।০ হিঃ—১৫৬।০	
	ঝুরো মাটী, কাঁকর ইত্যাদি—১০৲	
	বস্তা—	৩৲
৫০০৲	কুলী, গাড়ী—	৬।০
১৮৪॥০	ঘর ভাড়া—	১২৲
৬১৫॥০		১৮৪॥০

হিসাব-শেষে কাগজের উপর হইতে মুখ তুলিতেই দেখিল, নীহার বিরক্তবদনে তাহার দিকে আসিতেছে। কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নবীন কহিল—"চুড়ির যোগাড়টা যে এত সহজে হয়ে যাবে বড়বৌ, তা ভাবি নি। এই ৫০ খানা নোট উপস্থিত ধর দেখি।"

বিরক্তির ভাবটা নীহারের মুখ হইতে মিলাইয়া গেল; কহিল—"২৫ মণ সরষে কোথা থেকে কিনে এনেছ, তারা দামের তাগাদা করতে এসেছিল।"

"আসবে, তা আমি জানি। বল্লে না কেন, যে নবীন বোস তেমন জোচ্চোর বাটপাড় নয় যে, কারুর একটা পয়সা ঠকিয়ে নিয়ে খাবে। ঐ তোমার যতুর ভায়ে গো। ওদের আড়ত থেকে সে দিন এনেছি।"

"২৫ মণ সরষে নিয়ে করলে কি?"

নীহারের হাতের নোটের তাড়াটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া নবীন কহিল—"করলুম ঐ। করলুম তোমার শ্রীহস্তের রুণু-রুণু ঠুন্-ঠুন্ সোনার একসেট চুড়ির ব্যবস্থা। এই আজ বিকেলে ওদের সরষের দাম ১৫৬।০ দিয়ে আসতে হবে। যাক্, দিয়ে-থুয়েও তিনশ'টা টাকা ত ঘরে এল। শ্রীহস্তের চুড়ির ব্যবস্থাটা অবিশ্যি হ'ল, কিন্তু এই রকম করতে করতে এক দিন ভাগ্যে আমার শ্রীঘরবাসেরও ব্যবস্থা যে হয়ে যাবে, সেটাও বুঝতে পারছি। তা আর কি করব বল। ঐ যে সে দিন তোমায় বললুম—অভাব আর অভ্যাস।"

নীহারের উৎসুক প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে নবীন সবিস্তারে সরিষা বিক্রীর কাহিনী বলিয়া শেষে কহিল—"ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। ৫০খানা বস্তাতে ১॥০ মণ অন্য জিনিষ নীচে দিয়ে আধ মণ ক'রে সরষে ওপর ওপর রাখা হয়েছিল। বস্তাগুলো বেশ ক'রে ঠেসে, মুখ সব সেলাই করা ছিল। ওপর থেকেই বোমা মেরে মাল দেখিয়েছি। মোট কথা, কোন সন্দেহ যাতে হ'তে পারে, তার ফাঁক রাখি নি। তবে যদি কিছু ফাঁক প'ড়ে থাকে ত সেটা খদ্দেরের বরাতের ফাঁকেই ঢেকে গেছে।"

মুহূর্ত্তখানেক থামিয়াই নবীন কহিল,—"কথাটা বুঝলে না বোধ হয়? অর্থাৎ বরাত যদি ঠকবার হয় ত চোখ থাকতেও কাণা হয়ে যায়। তা না হ'লে দেখ না কেন, কল-ওলারই ঘাড় ভাঙতে গেলুম। তাকে ঠেলে, ঘাড় এগিয়ে দিলে কি না—মুলজী চন্নরাম।"

সমস্ত শুনিয়া নীহার গালে হাত দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

দিন পাঁচ ছয় পরে এক দিন অপরাহ্ণে চুড়ি-সংক্রান্ত একটা কথা লইয়া নীহার নবীনের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া, চাকরকে দিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল এবং শ্যামবাজারে ভগিনীর বাসায় চলিয়া গেল। সে রাত্রিতে বাজারের খাবারে পেট ভরাইয়া পরদিন প্রাতে নবীন চিরাচরিত প্রথা অনুসারে নীহারকে আনিবার জন্য শ্যালীর বাসার উদ্দেশে বহির্গত হইল।

শ্যামবাজারের মোড়ে বাস হইতে নামিয়া কয়েক পা আসিতেই পিছন হইতে গম্ভীর গলায় কে ডাকিল—"বাবুসাব?"

নবীন ফিরিয়া দেখিল—মুলজী চন্নরাম।

চন্নরাম টপ করিয়া নবীনের হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিয়া এমন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, যেমন করিয়া মদন-ভস্মের সময় মহাদেব তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন।

নবীন কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া, অত্যন্ত সহজ সুরে কহিল,—"আপনি আমাকে বোধ হয় আর কোন লোক মনে ভেবেছেন।"

চন্নরাম কহিল—"আউর কোন লোক! অক্রুর দত্ত্‌কা গলি? শ' মণ সর্ষ্? পান শো রোপেয়া?"

"আপনি কি আমার ভাইয়ের কথা বলছেন? তাকে

আর আমাকে ঠিক একই রকম দেখতে। আমরা দুজনে যমজ ভাই। তার নাম রামরতন, আমার নাম শ্যামরতন। সে ঐ সর্ষে-টর্সের কি সব দালালী-টালালী করে বটে! আপনি তার সঙ্গে কিছু কার-কারবার করেছেন না কি? খবরদার, করবেন না—করবেন না, খুব সাবধান! তার মত জোচ্চোর দুনিয়ায় নেই। আমার সঙ্গে তাই তার কখনও-বনিবনাও-ই হলো না। আমি তার আপন ভাই হই, এক মার পেট থেকে একসঙ্গে জন্মেছি, আমার কি সর্ব্বনাশ সে করেছে জানেন?" পরমুহূর্ত্তেই হঠাৎ গলার স্বর অস্বাভাবিক বিকৃত করিয়া, উচ্চকণ্ঠে কহিল—"আমি তাকে ছাড়বো না, কিছুতেই ছাড়বো না। আমার পাঁচ হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে। আমি তাকে জেল না খাটাই ত আমার নাম শ্যামরতন পালই নয়, মাড়োয়ারী মশাই!"

উচ্চকণ্ঠের বিকৃত স্বরে রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া গেল, চন্দনরামের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল এবং নবীন তাহাকে

চন্দনরামের দৃঢ় মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল

তাহার যমজ ভাই সম্বন্ধে আর এক দফা উপদেশ দান করত কাঁধের চাদরখানা মাথায় জড়াইয়া, ধীরপদে গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইল।

মূলজী চন্দনরাম স্তব্ধ হইয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত যে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা আর নবীন দেখিল না।

৪

ভাদ্র মাস কাবার হইয়া আশ্বিন মাস পড়িল। মাসের মাঝামাঝি এবার পূজা। পূজার পূর্ব্বেই নীহারের চুড়ি গড়াইয়া দিতে হইবে। তার পর কাপড় ইত্যাদি কিছু কিনিবার আছে, বাড়ীভাড়া তিন মাসের বাকী পড়িয়াছে, চাকরের মাহিনা, মুদীর দোকানের দেনা। এ সব ছাড়া, পূজার বাজারে আরও কিছু 'খরচ-পত্র আছে।

দ্বিপ্রহরে নবীন বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া এই সব কথাই ভাবিতেছিল। সম্মুখের পথ দিয়া কাহাদের বাটীর এক ঝি হাতে একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি লইয়া বোধ হয় ডাক বাক্সে ফেলিয়া দিতে যাইতেছিল। নবীন তাহাকে ডাকিতেই সে ধীরে ধীরে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নবীন কহিল—"তুমি কাদের বাড়ী কায কর, মা লক্ষ্মি?"

"সেই গলির ভেতর একেবারে শেষদিকে নিমগাছওলা একতলা বাড়ী, আপনি জান কি? হরেকিষ্টো বাবু? বাবু নেই, গেল বছর মারা গ্যাছে।"

নবীন চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—"অ্যাঁ! মারা গেছেন! তাই আর দেখতে পাই না বটে। নইলে রোজই ত পথে-ঘাটে দু' চারবার ক'রে দেখা হ'ত।"

"তিনি ত হ্যাতায় থাকতো নাক। পশ্চিমে থাকতো, সেইখানেই মারা গেছে।"

"হ্যা গো, হ্যা। পশ্চিমের কথাই বলছি। রেলে চাকরী করতেন।"

"রেলেও নয়, তিনি ডাকঘরের বাবু ছিলো।"

"তা কি আর আমি জানি না? ঐ রেল-কোম্পানীরই ডাকঘর। চিঠি ফেলে দিতে যাচ্ছ বুঝি? পোষ্টকার্ডগুলো ছিল দু'পয়সা, হয়ে গেল তিন পয়সা। এই বুঝি নতুন

পোষ্টকার্ড,—দেখি মা।" বলিয়া ঝিএর হাত হইতে পোষ্টকার্ডখানি লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের লেখাটুকুও পড়িয়া ফেলিল।

ঝিয়ের হাত হইতে পোষ্ট-কার্ড লইয়া দেখিতে লাগিল

মামা, আমার পঞ্চাশটা টাকা আপনার কাছেই এখন থাক। কাহাকে দিয়া আনাইব? ওদিকে আপনার অসুখ, এ দিকে ভোলার আজ কয় দিন জ্বর। এখন টাকার দরকার নাই। তবে যদি ২।১ দিনের মধ্যে তেমন কোন দরকার হয় ত ভোলার যে নতুন মাষ্টারটি এসেছেন, তাঁকেই পাঠিয়ে দেবো। তিনি খুব ভাল লোক।'—ভাল লোক যে, তার আর সন্দেহ কি! নবীন বোস কারুর একটি আধলা পয়সা অধস্ম ক'রে নেবে না বাবা, তা হ'লে মহাপাতক হবে।—পঞ্চাশটে টাকা! নাঃ, এ ছাড়া যায় না। ভোলার নতুন মাষ্টারকে যেতেই হচ্ছে এক দিন এক দিন আর কি, কাল বাদ দিয়ে পরশু বুধবার দিনই শুভযাত্রা করতে হবে, নইলে পরে হয় ত সত্যিকারের 'ভোলার নতুন মাষ্টার'ই গিয়ে হাজির হবে।

বুধবার নবীন বেলা প্রায় ছইটার সময় কোন্নগর ষ্টেশনে নামিয়া শিবতলার সন্ধান করিয়া কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাটী প্রবেশ করিল। কালীবাবু বাহিরেরই একখানা ঘরে শয্যার উপর শুইয়াছিলেন: প্রায় মিনিট ১০।১২ ধরিয়া তাঁহার সহিত নবীনের কথাবার্ত্তা হইবার পর, নবীন দাঁড়াইয়া কহিল, "এই সাড়ে তিনটের ট্রেণখানাতেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। নিজেরও একটু বিশেষ কায আছে, তা' ছাড়া—"

"না—না, আপনাকে আর দেরী করাব না। টাকা পঞ্চাশটা আপনাকে দিয়ে দি। ভোলার ত জ্বর, চিঠিতে তার মা লিখেছে, আছে কেমন?"

"ক'দিনের পর আজ বোধ হয় রেমিসান হয়েছে। যা অত্যাচার অনিয়ম করে, জ্বর হবে না ত কি হবে বলুন।"

"পড়াশুনো কচ্ছে কেমন?"

"আমি ত সবে এই নতুন পড়াচ্ছি। তবে, দেখছি,

"হ্যাঁ গা, মা লক্ষ্মি, বলছি কি, আমায় একটি দিনরাতের ঝি দিতে পার? কিন্তু তোমার মত ভাল লোক হওয়া চাই। আছে সন্ধানে?"

"আচ্ছা বাবা, ঐ হরির মাকে একবার শুধিয়ে দেখি, যদি——"

"একবার তাই শুধিয়ে দেখো দেখি। আচ্ছা মা, চিঠিখানা ফেলে দিয়ে এস আগে, ডাক চ'লে যাবে।"

স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল।

নবীন ঘরের মধ্যে পাইচারী করিতে করিতে নিজের মনে বলিতে লাগিল,—'কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিবতলা, কোন্নগর, জেলা হুগলী। একটু কষ্ট ক'রে এক দিন গিয়ে পড়তে পারলে গোটা পঞ্চাশ টাকা হয়ে যায়। 'বড়

পড়া-শুনোয় নেহাৎ মন্দ নয়।—আচ্ছা, মৃণ্ময়ো মশাই, বালি এখান থেকে কতটা পথ হবে?"

"বালি? এই মাইলখানেকের ভেতর।—এই নিন তা হ'লে, গুণে নিন—৫ খানা নোট।"

"আজ্ঞে।"

"হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আসি তা হ'লে। প্রণাম। আপনার শরীরটা কেমন থাকে, মাঝে মাঝে খবরটা দিতে ব'লে দিয়েছেন।"

নবীন দ্রুতপদে উঠানে নামিয়া পড়িয়া, সদর খুলিয়া বাহিরের পথে আসিয়া পড়িল।

"মাষ্টার মশাই! মাষ্টার মশাই!"

ফিরিয়া আসিয়া নবীন কহিল—"আমাকে ডাকলেন কি?"

"হ্যাঁ। একটা সোনার আংটী আছে, অমনি নিয়ে যান ত। এটা আর আমার নিয়ে যেতে কোনবারই মনে আসে না। ওবার স্বশী—ভোলার মা এখানে ফেলে গিয়েছিল।"

নবীন আংটীটাকে যত্ন করিয়া রুমালের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া, আর একবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

৫

পূজার আর মধ্যে দশটি দিনমাত্র বাকী আছে। নীহারের চুড়ী গড়াইতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তবুও, অন্য কি একটা কথা লইয়া নবীনের সহিত নীহার এইমাত্র খুব খানিক ঝগড়া করিয়া, শয়নঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছে। এখনও শ্যামবাজারে ভগিনীর বাটী যায় নাই। নবীন দোকান হইতে দই, কলা, চিনি, চিঁড়া ইত্যাদি আনিয়া, সেইগুলি লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত ছিল। কারণ, কাল রাত্রিতে তাহার ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই।

বেলা ১১টা বাজিয়া গিয়াছিল। নবীন একটি প্রচণ্ড উদ্গার তুলিয়া তাহার ফলারকার্য্য শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঝন্ ঝন্ করিয়া শয়নঘরের খিল খুলিয়া নীহার আসল ও চাকরকে খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারই উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—"চাকরটাও বরাতগুণে জুটেছে ভাল। কোন্ যমের বাড়ী যে গেছেন, তা ত জানি না। এক-খানা ট্যাক্সি এনে দিক, আমি শ্যামবাজারে যাই।"

পিরাণ গায়ে দিতে দিতে নবীন কহিল,—"ব্যতিক্রম হবে, বড়বৌ, ব্যতিক্রম হবে। এবার আমার পালা। এবার তুমি থাক এখানে, আমি চল্লুম শ্যামবাজারে।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই নবীন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

তথায় পৌঁছিয়া দেখিল, তাহার শ্যালীপতি ভাই অমূল্য অত বেলায় আফিসে না গিয়া, বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, তখনও পর্য্যন্ত স্নানাহার করে নাই। কারণ

নবীন বলিল, এবার ব্যতিক্রম হবে

জিজ্ঞাসা করায়, অমূল্য কহিল—"দাদা, মহা মুস্কিলে পড়িছি। সাহেব বেটার কাণ্ড দেখ। আজ বাদে কাল পুজো, এ সময় আমার পাঠালে কি না তেপান্তরের দেশে। মনটা তাই বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, দাদা।"

মোট কথা, নবীন অমূল্যর দুঃখের কথা যাহা শুনিল, তাহা এই:—অমূল্যর সাহেব এক জন কন্ট্রাক্টার। সম্প্রতি ১০০ খাসি ছাগলের কোথা হইতে এক অর্ডার পাইয়াছে। স্কুকুর মণ্ডল নামে মেদিনীপুরের এক মুসলমান সাহেবের

কাছে কায করে। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ ছাগলের কন্‌ট্রাক্ট আসিয়াছিল। সেবার সুকুর মণ্ডল ৪৲ হিঃ তাহার দেশ থেকে ১০০শ ছাগল আনিয়া দিয়াছিল। এবারও সাহেব সুকুরকে এই ১০০ ছাগল কিনিয়া আনিবার ভার দিয়াছে। কিন্তু এবার বেশী দেরী করিয়া আনিলে চলিবে না। জরুরী অর্ডার। তাই সাহেবের হুকুম, সুকুরের সঙ্গে অমূল্যকেও যাইতে হইবে।

অমূল্য কহিল—"কি করি দাদা, বল! পূজোর সময়টা, কোথায় একটু বেড়াব-চেড়াব, আমোদ-আহ্লাদ করব, না কি ফ্যাঁসাদেই ফেললে আমাকে! সাহেবের আক্কেলটা একবার দেখ।"

নবীন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর কহিল,—"ছাগলের দাম-টাম, রাহা-খরচ, সব তোর হাতে দিয়ে দিয়েছে সাহেব?"

"হ্যাঁ। সুকুর মণ্ডলকে ৫০০ টাকা দিয়েছে।"

"মোড়ল লোকটা কেমন বল্‌ দেখি?"

"খুব ভাল লোক। সাহেবের ওপর ভেতর ভেতর কিন্তু ভারি চটা। পূজোর পর ও চাক্‌রী ছেড়ে দিবে। অবিশ্যি সাহেবকে এখনও কিছু বলে নি।"

"আচ্ছা, অমূল্য, পুজোর ঝোঁকটায় যদি আফিসে তোকে না যেতে হয় ত, ছাগল কিনতেও না যেতে হয়, তা হলেই তোর মনটা খুব খুসী হয়,—না? দিনরাত তা' হলে, বিধুর মুখের দিকে চেয়ে কাটাস? কেমন কি না? আচ্ছা, তাই হবে। আর এর ওপর যদি শ' খানেক টাকাও পেয়ে যাস্‌?—তোর সুকুর মণ্ডলের বাসাটা কোথায় বল্‌ দেখি?"

"এই বাগবাজার পোলের কাছে।"

"এখন গেলে দেখা হবে বলতে পারিস?"

"তা বোধ হয় হ'তে পারে।"

"চ, এখনই তার কাছে একবার যেতে হবে।"

অমূল্য কিছুই বুঝিল না। নবীনকে সঙ্গে করিয়া সে সুকুর মণ্ডলের বাসার উদ্দেশে বাহির হইল এবং অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যেই উভয়ে সুকুরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

অতঃপর তিন জনে প্রায় একঘণ্টাকাল ধরিয়া যে বিষয়ের পরামর্শ করিল, তাহার সূত্র ধরিয়া নবীন সুকুরকে কহিল,—"মোড়ল সাহেব, হাঁ ক'রে ব'সে থাকলে মুখে রসগোল্লা আপনি এসে পড়বে না। সোজা ব্যাপার। ছাগল কিনতে পাঠাচ্ছে। বেশ ত। ছাগল কেনা হ'ল। হলদী নদী পেরোতে হবে। পেরিয়ে এ পারে এসে বি. এন, আর এ ক'রে চালান। কিন্তু হলদী পেরুবার সময়েই যে ভীষণ ঝড়! নৌকো যে উল্টে গেল! ছাগলগুলো যে সব ভেসে গেল। তার আর আপনিই বা করবেন কি, আর মাঝি মাল্লারাই বা করবে কি? বুঝলেন না? বরঞ্চ, আপনারা হাবুডুবু খেয়ে, প্রাণ নিয়ে যে ফিরে এসেছেন, এতে আপনাদের খেসারতস্বরূপ কিছু কিছু সাহেবের দেওয়া উচিত।"

সুকুর কহিল,—"তা' হলে, সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবকে একখানা সেখান থেকে টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া দরকার।"

"নিশ্চয়ই। আগে ছাগল কেনা হোক, নৌকো বোঝাই হোক, ঝড় উঠুক, নৌকো ডুবুক,—তখন টেলিগ্রাম। অর্থাৎ,—তার মানে, দিন ৫।৭ পরে, এক দিন আপনাকে সেখানে যেতে হবে, ওই টেলিগ্রামখানা করবার জন্যে। এখন আপনারা দু'জনে খান, দান, ঘুমুন, মজা করুন। তবে বাড়ী ছেড়ে এ কটা দিন আর বাইরে কোথাও যেন যাবেন না।"

একটুখানি থামিয়া নবীন আবার কহিল—"টাকা ৫০০৲ এখন সাবধানে রেখে দিন। কায হাসিল হলেই ভাগাভাগি আর কি! তবে ভাগ্যের কথা যা বল্লুম মোড়ল সাহেব,—আপনার ১৫০, অমূল্যর ১০০, আর আমার ২৫০। কেমন, রাজী ত?"

মৃদু হাসিতে হাসিতে সুকুর সম্মতি জানাইয়া পরে কহিল,—"যদি সাহেব, মাঝি-মাল্লাদের কারও সাক্ষী চায়?"

"আহা-হা, নবীন বোসের কাছে সে-সবের অভাব হবে না। মাঝি-মাল্লা সাক্ষী-সাবুদ, সব এনে দোবো। তবে তাতে বিশ পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হবে। সেটা আমাদের সকলকেই ভাগাভাগি ক'রে দিতে হবে।"

ইহারই দিন আষ্টেক পরে সুকুর, সাহেবকে টেলিগ্রাম করিবার জন্য মেদিনীপুরের উদ্দেশে চলিয়া গেল এবং দুই দিন পরে নবীনের বাটী ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"কায ক্লিয়ার, দাদা।"

নবীন উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—"এখন বেলা

তিনটে বেজেছে। চল, অমূল্যকে সঙ্গে নিয়ে তোমার সাহেবের কাছে যাওয়া যাক। আর দেরী নয়।"

সুকুর বলিল—"আজ সপ্তমী পূজো, আজ আফিস বন্ধ। এখন তা হ'লে সাহেবের বাসায় গিয়েই দেখা করতে হয়।"

"তাই করতে হয় ত তাই চল গো সাহেব," বলিয়া আনন্দে ও উৎসাহে নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নিকটেই কোন এক বাড়ীতে পূজার আরতির বাজনা বাজিতেছিল। নীহার একাকী বারান্দায় বসিয়া তাহাই শুনিতেছে। নবীন সেই বেলা ৩টার সময় বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই। কিছুক্ষণ পরেই আরতির বাদ্য থামিয়া গেল। সেইখানে গলায় আঁচল জড়াইয়া নীহার মাটীতে মাথা স্পর্শ করিয়া মহামায়ার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

"বড় বৌ!"

নীহার মাথা তুলিয়া দেখিল, নবীন। নবীনের এক হাতে নীল কাগজে মোড়া সোনার চুড়ি কাগজের ফাঁকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, অপর হাতে একটা সোলার টোপর আর দুই ছড়া রঙ্গণ ফুলের গোড়ে মালা।

"বড় বৌ! আজ সপ্তমী পূজো। শুভদিন। আজ আমাদের যাত্রা-বদল করতে হবে।" একটা অপূর্ব্ব-উল্লাসের ঢেউ তাহার সর্ব্বাঙ্গে খেলিতেছিল। সে আনন্দে অধীর হইয়া একছড়া মালা নীহারের গলায় পরাইয়া দিল এবং একছড়া নিজের গলায় পরিল। তার পর টোপরটি মাথায় দিয়া কহিল,—"যাত্রা-বদল আজ করতেই হবে। বড় বৌ; কিছুতেই ছাড়বো না। এই নাও, তার আগে চুড়ি সেট্‌টা প'রে নাও। মা দুর্গা আজ থোক্ আড়াইশ' পাইয়ে দিয়েছেন।"

অতঃপর তাহার বহুদিনের প্রস্তাবিত যাত্রা-বদল-কার্য্য

এই নাও তার আগে চুড়ীর সেটটা

সু-সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে, উভয়ের মধ্যে পরমোল্লাসে মালা বদল, শুভ-দৃষ্টি ও সাত-পাক আদি চলিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে পূজা-বাড়ীর ঢোল-কাঁসির বাজনা বিপুল হর্ষের মধ্যে বাজিয়া উঠিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

কাব্য-দশভুজা

মানের সঙ্গে দিয়ে গোঁজামিল বিলাও মিলের মদ্য ;
নেশায় দিলের খুলে যাবে খিল, যা লিখিবে হ'বে পদ্য।
অর্থানর্থ ভয়ঙ্কর—
বলিয়া গেছেন শ্রীশঙ্কর ;
অতএব মোটা অভিধান গোটা নিয়ত তোমার বধ্য ;
অবাধ্য ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ, কর তিলে জলে সদ্য।

বাছিয়া বাছিয়া ছত্রের মাঝে বসাও এমন শব্দ,
অর্থ-লোলুপ ছাত্রের গুরু মানে খুঁজে হবে জব্দ ;
সঙ্গতি নাই, নাই আগা গোড়া,
আর্টের গাড়ী টানে খোঁড়া ঘোড়া,
রচনার চাল-চুলো নেই হেরে টুলো পণ্ডিত স্তব্ধ ;
হাঁ করিয়া তারা থাক্ না অবাক্ ধরিয়া হাজার অব্দ।

লাইনের শেষে এসে পড়ে যদি পতিত-পাবনী গঙ্গা,
ঘাবড়াও মৎ পুছো "কোথা তব অতীত লাবণি রংগা,
ভাবের সঙ্গে নাই থাক্ খাপ,
ডাবের অঙ্গে দিও কিং-খাপ,
মেরে এক্‌লাফ্ ডিঙ্গাও সাগর, গিরি কাঞ্চন-জঙ্ঘা,
কাব্যের হাঁটা পথে বড় কাঁটা চলে না রিক্স টঙ্গা!

লিখে যাও যদি সহজ ভাষায় ঢেকে রাখ উঁচু ভাবটা
কঠিন বর্ম্মে, তৃষিতের কাছে উঁচু গাছে যেন ডাবটা—
মনে হয় আর একটুকু হ'লে
ভরিবে মনের জঠরের খোলে,
খড়ের সঙ্গে মিশে ভুষি-খোলে পরিপাটী হবে জাবটা ;
ভাবটা কিন্তু আঁব-ডাব নয়, আটা ভরা পচা গাবটা॥

রচনা যে কবিজনের মনের সুখ দেখিবার আর্সী ;
বাঙ্গলা না জোটে আন ইংরেজী, আরবী, উর্দ্দু, ফার্সী,
কীর্ত্তন গান সঙ্গে গজল
কাজীর বিচারে হ'ল জলচল,
জেহাদ্ সহীদ্ লেখ করে জিদ্ ভাষারে করোনা 'মার্সি'
বাণীরে পরাও বোরখা ব্লাউজ কিম্বা রঙ্গিন 'জার্সি'।

যা খুসি লিখিও ক্রিটিকে বলিও, মুখ ভেঙ্গাইয়া "তোর কি ?"
বাঙ্গলা ভাষার লাটিম্ ঘোরাও কখনো পোড়াও চরকি।
দিয়ে জাফ্‌রাণী রঙিন ছন্দ
ঢাক আমিষের বোট্‌কা গন্ধ
পাঠকেরা সাধু পেয়ে আনন্দ তোমরাই শুধু চোর কি!
কাব্যে তোমরা জোলা ফিল্ডিং, টুর্গেনিভ ও গোর্কী!

অর্জ্জনে আর বর্জ্জনে কর, শব্দের পরিবর্ত্তন,
কভু জুড়ে দাও লাঙ্গুল তায়, কভু ল্যাজ কর কর্ত্তন,
যোগ বিয়োগের কদভ্যাস
না মানি পানিনি বেদব্যাস
উপন্যাসের 'উ'টি ছাঁট আর সজ্জনে করো 'সর্জ্জন ;'
নোংরা করিয়া পথ ঘাট পুনঃ রাঙা চোখে কর তর্জ্জন!

রসুন পেঁয়াজে কীর্ত্তন খোলে কার স্বরে সুপবিত্র,
জেরুজিলামের ক্যান্‌ভাসে আঁকা বৃন্দাবনের চিত্র ;
কুঞ্জকাননে ঘুরিতেছে ফ্যান্
মানিনী শ্রীমতী সোফায় শয়ান ;
খোল করতাল ফ্লুট অর্গান বাজে নানা বাদিত্র ;
পাউডার মাখা কৃষ্ণগাত্রে ফুটিয়াছে সাদা শিত্র।

এই বিদ্‌ঘুটে বেয়াড়া চিত্র আঁকিতে তোমরা ওস্তাদ্,
মডেল খুঁজিয়া পথে পথে ঘোর' বোষ্টম্ হ'তে বোগদাদ,
সাগরেতে নয় পুকুরেরই পাঁকে
মুক্তা তুলিতে নাম ঝাঁকে ঝাঁকে,
ভরাও কোঁচড় গুগলী শামুকে মুক্তাই শুধু যায় বাদ ;
পেট ভরা পচা ঘোল খেয়ে ভাবো পেয়েছ দুধের আস্বাদ!

কাজ নাই আর তোমাদের নিয়ে করিয়া ধ্বস্তা-ধ্বস্তি,
ক'রে ফেল প্যাক্ট প্রবীণেরও দলে মিলিবে অনেক দস্তী,
পিয়ারী অভয়া কিরণ কমল
শরতের রোদে করে ঝল্‌মল্ ;
দরদে সে ফুলে মাল্য গাঁথিয়া সাজাও সাধের বস্তী,
দশভুজা-গীতি এইখানে ইতি শাস্তি, শান্তি, স্বস্তি!

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ, বি, এল)।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মদান

ভারতবর্ষ সাধনার দেশ। এ দেশে যুগে যুগে সাধকের আবির্ভাব হইয়াছে। আত্মিক শক্তির বিকাশের চরমোৎকর্ষ ভারতেই বিশেষরূপে এ যাবৎ সম্ভব হইয়াছে, তাই যুগে যুগে ভারতের সাধক আত্মিক শক্তির বিকাশ দ্বারা—আত্মবলিদানের দ্বারা অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছেন। ভারতের ইহাই বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবনে জাতির মঙ্গলার্থে—নিপীড়িত ও বিপন্নের সাহায্যার্থে একাধিক ক্ষেত্রে আত্মনিবেদনের চরমোৎকর্ষ প্রদান করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দলিত প্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জন্য যে জ্বলন্ত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জগৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। ভারতেও জালিয়ানওয়ালার পর—রৌলট আইনের পর তিনি দেশবাসীকে দুঃখ-বিপদের পথে পরিচালিত করিয়া, অন্যায় ও অনাচারের প্রতীকারে আত্মনিবেদন করিতে প্রবুদ্ধ করিয়া নূতন মন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধনা বিফল হয় নাই, জগতের লোক তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে যুগপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী

বর্ত্তমানে বৃটিশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ভারত-শাসন-সংস্কারের সম্পর্কে যে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা মহাত্মা গান্ধী যারবেদা জেলে থাকিয়া অবগত হইয়াছিলেন। দূরদর্শী মহাত্মা গান্ধী উহার মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের সূচনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণ-সম্পর্কে তাঁহার সহিত প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবের পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল। তাহাতে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি হিন্দুদের মধ্যে উন্নত ও অনুন্নতদের ভিতর পার্থক্য রাখিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। এ সকল পত্রের কথা এত দিন ব্যক্ত হয় নাই। মহাত্মাজীর অনশনব্রতের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে সাধারণে উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী মহাত্মাজীকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, অনুন্নতদের স্বার্থ ও অধিকার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে কোন অবিচার হয়, তাহা সরকারের প্রার্থনীয় নহে; সেই স্বার্থের অনুকূলে যদি উন্নত ও অনুন্নতের মধ্যে কোন আপোষ বন্দোবস্ত করিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে সরকার তাঁহাকে সে সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। উন্নত ও অনুন্নত নামধেয় হিন্দুদের মধ্যে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনরূপ হিমালয়ের ব্যবধান সৃষ্টি করা একবার সম্ভব হইলে হিন্দু-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িবে, মহাত্মা গান্ধী এ কথা বুঝিয়াছিলেন। আজ এই স্বতন্ত্র স্বার্থ ও অধিকারের কল্যাণে হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খৃষ্টানের মধ্যে যে বিরোধের ব্যবধান উপস্থিত হইয়াছে এবং যে জন্য গণতন্ত্র ও জাতীয়তার পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে, সেই ব্যবধান

হিন্দু-সমাজের মধ্যে উত্তোলন করিবার সুযোগ প্রদান করিলে ভারতের অবস্থা কি হইবে, তাহা দূরদর্শী ভারতের মঙ্গলকামী মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে কি ?

মহাত্মাজী সেই হেতু জীবন পণ করিলেন, দধীচির মত দেহাস্থি দান করিয়া তিনি অন্যায়ের প্রতীকারে আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোটি কোটি ভারতবাসীর এবং অসংখ্য বিদেশীর ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র পুরুষশ্রেষ্ঠের জীবন-মরণ লইয়া খেলা, কিন্তু বৃটিশ সরকারও তাঁহাদের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না।

২০শে সেপ্টেম্বর ভারতের মুক্তির ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। ঐদিন মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশন-ব্রত আরম্ভ করিলেন। সমগ্র-ভারতের হিন্দু সমাজ বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তখন হিন্দু সমাজে যে চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হইল, তাহার দৃষ্টান্ত কোন দেশের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক, মানবের মঙ্গলকামী মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ—এ কি সহজ কথা ?

উন্নত অনুন্নত, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য,—হিন্দু যে যেখানে আছে, তাহারই হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। আকুমারী হিমাচল সমগ্র ভারতের দিকে দিকে উন্নত ও অনুন্নতদের সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। উন্নতদের ত কথাই নাই, অনুন্নতরাও একবাক্যে ঘোষণা করিলেন যে, "মহাত্মা গান্ধীই তাঁহাদের একমাত্র নেতা, তাঁহারা সকলেই মিশ্র নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী, হিন্দু সমাজের কাছ হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইবেন না।" সে কি মহান্ দৃশ্য !

সরকার মহাত্মাজীকে যারবেদা জেলের বাহিরে কোন বন্ধুগৃহে থাকিয়া হিন্দু নেতাদের সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ প্রদান করিলেন। কিন্তু মহাত্মাজী কোন মতে মুক্তি চাহিলেন না, তিনি জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জেলের ভিতরেই থাকি বা বাহিরে থাকি, আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ হইবে না। যতক্ষণ হিন্দু-নেতাদের মধ্যে আপোষ না হইবে, ততক্ষণ আমি ব্রতভঙ্গ করিব না।" জেলের মধ্যেই বৈঠক বসিল। দিগ্‌দিগন্ত হইতে উন্নত ও অনুন্নত হিন্দু-নেতারা মহাত্মাজীর সকাশে ছুটিয়া আসিলেন। চারিদিন পরামর্শ আলোচনার পর হিন্দু সমাজ মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ মত আপনাদের ঘর সামলাইয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। ডাক্তার সার তেজবাহাদুর সপ্রু মিলনের সর্ত্তের যে খসড়া প্রস্তুত করিলেন, তাহাই সংশোধিত আকারে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ভারতে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল !

তখন উন্নত অনুন্নত হিন্দু নেতাদের তরফ হইতে প্রধান মন্ত্রীর নিকট সেই খসড়া প্রেরিত হইল এবং কোটি কোটি কণ্ঠে নির্দ্ধারণ পরিবর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে মহাত্মাজীর অনশন-ব্রত ভঙ্গের উপায়-বিধান করিতে অনুরোধ করা হইল। প্রধান মন্ত্রী এই বিরাট জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া হিন্দু-মিলনের পথ বাধাশূন্য করিয়া দিলেন।

অসম্ভবও সম্ভব হইল। যুগ যুগ ধরিয়া যে ব্যবধান অলঙ্ঘ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল, এক বিরাট পুরুষের আত্মদানে মাত্র চারিদিনে তাহা অপসারিত হইল। এ বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব কবে কোথায় অনুভূত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।

কে এলে ?

স্বপন-মাঝে কে এলে তুমি আজ ?
নিশীথ রাতের নীরবতায়
　　পাগল-করা দখিণ-হাওয়ায়
স্মৃতির মত আপন হয়ে
　　ভুলালে সব কাজ।

কানে শুনি গানের বাণী
বাতাসে গায় আগমনী—
বনের পথে দেখি আমি
　　অভিসারের সাজ।
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী কে এলে তুমি আজ॥

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

দুর্গা-পূজা

শরতে বাঙ্গালায় দুর্গা-পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা কাহার পূজা? হিন্দু সেই দুর্গাদেবীর প্রতীকরূপে প্রতিমা গড়ে,—আর সেই প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তাহার উপাস্য দেবতাকে এই বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকে :—

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।

"মা গো! তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি! অতএব তুমিই এই বিশ্বের বীজস্বরূপা পরমা মায়া। হে দেবি,—এই চরাচর-বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তুমিই তাহাদিগের সমস্তকেই সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ, তুমি যদি প্রসন্ন হও, তাহা হইলে তুমিই এই মোহগর্ত্ত হইতে মুক্তির হেতুস্বরূপ হইয়া থাক।" তাহার পর আবার এই প্রতিমাকে প্রণতি পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন :—

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্।

অষ্টাদশ বিদ্যা উপনিষদাদি ব্রহ্মজ্ঞানোদ্দীপক শাস্ত্র অন্ধকার-নাশক। প্রদীপের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকার-নাশক বিবেক এবং আদি-বাক্য বেদ থাকিলেও আপনি ভিন্ন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এই নিবিড় অন্ধকারময় মমতাপূর্ণ গর্ত্তে (মহাবিলে) আর কে বার বার ঘুরাইতে সমর্থ হইয়া থাকেন? ইহার বিস্তৃত অর্থ এই যে, মনুষ্যগণ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নির্ম্মল বিবেকবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করিলেও, বেদাদি অধ্যয়ন করিলেও, তোমারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মমতাবুদ্ধি পরিহার করিতে সমর্থ হয় না, কাযেই তাহারা এই মোহান্ধকারময় সংসারচক্রে বারংবার পরিভ্রমণ করিতে থাকে। কিছুতেই এই মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ জীব স্বশক্তিতে এই মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারে না, তবে যদি তুমি কৃপা কর, তাহা হইলেই জীব মুক্তিলাভ করিতে পাবে। অর্থাৎ তোমারই কৃপা এই মায়াময় সংসার হইতে জীবের নিস্তার পাইবার একমাত্র হেতু।

এখন মনে স্বতঃই এক প্রশ্ন উদিত হয়, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই স্তব করা হইতেছে? ঐ স্তবেই এক স্থানে বলা হইয়াছে :—

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

তুমি সৃষ্টিকার্য্যে, পালনকার্য্যে এবং সংহারকার্য্যে শক্তি-রূপেই আত্মপ্রকাশ করিতেছ। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমো-গুণ তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে; তুমি ত্রিগুণময়ী ও সনাতনী। তোমাকে নমস্কার। সুতরাং এই পূজা শক্তিরই পূজা।

এই শক্তি কাহার শক্তি? হিন্দু কি জন্য তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে?

এ শক্তি পরমব্রহ্মেরই শক্তি। ব্রহ্মই এই বিশ্বের আদি-সত্তা। তিনি চৈতন্যস্বরূপ এবং অদ্বিতীয়। গোড়ায় তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাঁহার সত্তামাত্র আমরা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু তিনি কিরূপ, তাহা আমরা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিতে (Comprehead) পারি না। যিনি অসীম বা অনন্ত, তাঁহাকে সসীম বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করাই সম্ভবে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তিনি বাক্য এবং মনের অতীত। সেই পরব্রহ্মের যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, তখন তিনি তাঁহা হইতেই শক্তির আবির্ভাব করিয়া দিয়া-ছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য এইরূপ :—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা স্বতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।

ইহার অর্থ এই যে, "মাকড়সা পোকা যেমন অন্য কোন উপা-দানের বা নিমিত্তের সহায়তা ব্যতিরেকে স্বীয় দেহ হইতেই সূত্রাদি সৃষ্টি করে, ধরিত্রী যেমন নিজ দেহ হইতে উদ্ভিজ্জাদি বিকাশিত করিয়া থাকেন, মনুষ্যের দেহ হইতে যেমন কেশ ও লোম উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই পরব্রহ্ম আপনা হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ করিয়াছেন।" শাস্ত্র বলিতেছেন :—

ঊর্ণনাভাদ্ যথা তন্তুর্জায়তে চেতনাজ্জড়ঃ।
নিত্যপ্রবুদ্ধাৎ পুরুষাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিস্তথা।

অর্থাৎ মাকড়সা হইতে যেমন লূতাতন্তু জন্মে, সেইরূপ চৈতন্য হইতেই জড়বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেইরূপ নিত্যপ্রবুদ্ধ ব্রহ্মপুরুষ হইতে প্রকৃতি আবির্ভূত হইয়াছেন।

এই প্রকৃতির মূলেই শক্তি। শক্তি ব্রহ্ম হইতেই বাহির্গত। তবে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতে শক্তি (Energy) জড়। হিন্দুরা বলেন, শক্তিও চৈতন্যময়ী বা চৈতন্যরূপিণী। হিন্দু এই শক্তির পূজা করে কেন? পরব্রহ্ম হইতে যে শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই আদ্যাশক্তি। যিনি অনন্তের অংশ, তিনিও অনন্ত, সুতরাং মানুষ সেই অনন্ত শক্তিকেও ধারণা করিতে সমর্থ নহে। সেই আদ্যাশক্তি হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মা রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু সত্ত্বগুণ দ্বারা বিশ্ব প্রতিপালন করেন এবং শিব তমোগুণ দ্বারা সংহার-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহারা গুণময়ী প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া গুণময়। ব্রহ্মাতে রজোগুণের আধিক্য, বিষ্ণুতে সত্ত্বগুণের আধিক্য এবং শিবে তমোগুণের আধিক্য। প্রত্যেকেরই এক একটি শক্তি আছে, সেই শক্তির সহায়তায় তিনি স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিশ্বব্যাপারে শক্তিই সব। সকল শক্তিই আদ্যাশক্তি হইতে উদ্ভূত। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, ঐ সকল শক্তিকে পরিচ্ছন্ন-ভাবে কল্পনা করা যাইতে পারে। সেই জন্য সেই সকল শক্তিই মানবের ধ্যান-ধারণার মধ্যে আইসে। হিন্দু সেই পরিচ্ছন্ন শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই মহাশক্তির পূজা করিয়া থাকে।

মানুষ পদে পদে সাক্ষাৎভাবে শক্তির সহিত পরিচিত হইয়া থাকে। এই জগতে কোথায় শক্তি নাই, সর্ব্বত্রই ত শক্তির খেলা—শক্তির লীলা। প্রভঞ্জনের প্রমত্ত তাণ্ডবে, জলধির প্রবল তরঙ্গতাড়নে, বৈশ্বানরের প্রলয়-হুঙ্কারে, অশনির ভৈরব আরাবে, ধরিত্রীর সর্ব্বগ্রাসী কম্পনে যেমন শক্তির প্রচণ্ড প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গমে,

বৃক্ষলতা হইতে নবকিশলয়-বিকাশে, তরঙ্গিণীর তরলিত কলনাদে, বিহঙ্গের শ্রুতিমধুর কূজনে, মাতঙ্গের বৃংহণে, পতঙ্গের পক্ষসঞ্চালনেও শক্তির লীলা প্রকট দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তি নাই কোথায়? দিগ্‌দাহী মহামরুস্থলীতে, চিরতুহিনাবৃত মেরুপ্রদেশে, দুরারোহ পর্ব্বতকন্দরে, দুরবগাহ সাগরগর্ভে, সিংহশার্দ্দূলসমাকুল বনকান্তারে, আকাশে, বাতাসে, মহাশূন্যে সর্ব্বত্রই শক্তির খেলা! শক্তিহীন হইয়া কোন কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। জীবের সকল চেষ্টাই শক্তির অধীন। সুতরাং শক্তির সহিতই মানবের, বুদ্ধিমান্ জীবমাত্রেরই পরিচয় অবশ্যম্ভাবী। এই শক্তির ক্রোড়েই জীব আবির্ভূত এবং লালিত-পালিত। তাই হিন্দু এই শক্তিকেই জগজ্জননী বলিয়া পূজা করে। ধূম দেখিয়া যেমন অগ্নির অস্তিত্ব অনেক সময় অনুমান করা হয়, সেইরূপ এই শক্তি দেখিয়াই শক্তিমান ব্রহ্মের অনুমান করা হইয়া থাকে। সৃষ্টি দেখিয়াই ত স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। তাই শক্তিকে ধরিয়াই সর্ব্বশক্তিমানের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা পাইতে হয়। তান্ত্রিকেরা সেই জন্য বলিয়া থাকেন, বাবাকে পাইতে বা চিনিতে হইলে মায়ের কৃপা লাভ করিতে হয়। সেই মায়ের কৃপালাভার্থই শক্তির উপাসনা।

যেখানেই শক্তির প্রকাশ, সেইখানেই সেই শক্তিকে আবেষ্টন করিয়া শক্তির আরাধনা করা যাইতে পারে। জলে-স্থলে, অনলে-অনিলে, কেদারে-কান্তারে, আকাশে-বাতাসে যখন শক্তির বিকাশ, তখন উহার যে কোন কিছু ধরিয়াই শক্তির আরাধনা করা সম্ভবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দৈবী শক্তির বিশেষ বিকাশ হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে প্রকট শক্তিকে ধরিয়া মহাশক্তির আরাধনা করিলে সেই আরাধনা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে; মায়ের কৃপা শীঘ্র লাভ করা যায়। তাই মহাশক্তি যখন মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তখনকার সেই মূর্ত্তিই,—সেই দুর্গামূর্ত্তিই হিন্দু পূজা করিয়া থাকে। এই দুর্গামূর্ত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ বর্ণনা আছে:—

একদা মহিষাসুর প্রবল হইয়া দেবগণকে পরাজিত এবং ইন্দ্রত্ব লাভ করে। পাশব শক্তি প্রবল হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয়। পরাজিত দেবগণ তখন ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া বিষ্ণু এবং শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহিষাসুরের আচরণের কথা শুনিয়া বিষ্ণুর এবং শিবের ক্রোধ জন্মে। তখন তাহাদের দুই জনের বদন হইতে মহৎ তেজ আবির্ভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের দেহ হইতে তেজ নির্গত হইয়াছিল। তখন দেবতারা দেখিতে পাইলেন যে, সেই তেজোরাশি শিখা দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। অনন্তর সেই তেজঃ-সমূহ সম্মিলিত হইয়া এক নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সেই নারীমূর্ত্তিই দুর্গা। তিনি স্বীয় প্রভাবে মহিষাসুরকে বধ করিয়া দেবতাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিন্দু সেই নারীমূর্ত্তিরই পূজা করিয়া থাকেন। মহাশক্তি যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পশুবলকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন,—দুর্গা সেই মূর্ত্তিরই পূজা।

এখন আমি হিন্দুর পূজা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। অন্যান্য জাতির পূজা হইতে হিন্দুর পূজার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। হিন্দু যে দেবতার পূজা করে, সেই দেবতাকে তাহার প্রতিমায় যে কেবল প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা আকর্ষণ করে, তাহা নহে, অধিকন্তু একটা বিশিষ্ট ভাবের দ্বারাই সেই দেবতাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। একই দেবতার প্রতিমায় সকলে একই ভাবে তাঁহাদের ইষ্টদেবতাকে আকর্ষণ করেন না। অধিকারভেদে ভিন্ন ব্যক্তি একই প্রকারের দেবপ্রতিমায় বিভিন্ন ভাবে একই দেবতাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্য কি, তাহা অগ্রে বলা আবশ্যক। প্রথমে দেবতার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতেই হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাহাদের অধিকার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেই সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। যথা শাস্ত্র বলিতেছেন—"আদৌ সম্বন্ধসংস্কারঃ কর্ত্তব্যোঽতিপ্রযত্নতঃ।" অর্থাৎ গোড়ায় আরাধ্য দেবতার সহিত বিশেষ যত্ন সহকারে একটা সম্বন্ধসংস্কার বা সম্বন্ধবুদ্ধি স্থাপনা করিতে হইবে। অর্থাৎ পার্থিব ব্যাপারে আমাদের পরিবারমধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের যেরূপ এক একটা সম্বন্ধ আছে, ঠিক সেইরূপ, কোন একটা সম্বন্ধ আরাধ্য দেবতার সহিত পাতাইতে হয়। উহা অতীব যত্নের সহিত করিতে হয়, তাহার কারণ, সকলে একই ভাবে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। অধিকারভেদে, নিজ নিজ প্রকৃতিভেদে সে সম্বন্ধের ভিন্নতা ঘটে। কারণ, শাস্ত্র বলিতেছেন:—

স চ ষোঢ়া ভবেৎ রাজন্! মাতৃত্বাদিবিভেদতঃ।
মাতৃত্বং জনকত্বঞ্চ প্রভুত্বং সখিতা তথা।
কান্তভাবোঽপত্যভাব ইত্যেবং ষড়্‌বিধোমতঃ।
যস্মিন্ যেনাধিকঃ স্নেহো মাত্রাদিষ্বনুভূয়তে॥
স চ তেনৈব ভাবেন যোজয়েৎ পরদেবতাম্।
সদা তদ্ভাবনিয়তস্তদ্ধেতুপরিচিন্তকঃ॥
দৃঢ়ীকুর্য্যাৎ তথাভাবং যথাদৃষ্টসুতাদিষু।
এবং কুতোঽধিকারঃ স্যাৎ পূজায়াং নরপুঙ্গব॥
পূজা চ তৎ স্নেহভাবাৎ পরিচর্য্যাদিকা ক্রিয়া।

পূজকের সহিত আরাধ্য দেবতার মাতৃত্বাদিভেদে ছয় প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। যথা—মাতৃসম্বন্ধ, পিতৃসম্বন্ধ, প্রভুসম্বন্ধ, সখিতা-সম্বন্ধ, স্বামিসম্বন্ধ আর অপত্যসম্বন্ধ, এই ছয়টি সম্বন্ধ। এই ছয়টি সম্বন্ধমধ্যে যাঁহার প্রকৃতিতে যে ভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তিনি সেই ভাব লইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। অর্থাৎ যাঁহার মনে মাতৃভাব বা মাতৃভক্তি প্রবল, সেই সাধক তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে মাতৃভাবে সাধনা করিবেন; যাঁহার কন্যাভাব প্রবল, তিনি কন্যাভাবেই তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে পূজা করিবেন। স্ত্রী-দেবতাকে এই দুই ভাবেই পূজা করিতে হয়। পুরুষ-দেবতাকে পিতৃভাবে, প্রভুভাবে, স্বামিভাবে অথবা পুত্রভাবে পূজা করা বিধেয়। যাঁহার পিতৃভক্তি প্রবল, সেই সাধক পিতৃভাবে, যাঁহার প্রভুভক্তি প্রবল, সেই সাধক প্রভুভাবে, যাঁহার স্বামিভক্তি প্রবল, সেই সাধক স্বামিভাবে এবং যাঁহার পুত্রস্নেহ প্রবল, তিনি পুত্রভাবে তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে দেখিয়া সেই ভাবে তাঁহার পূজা বা সেবা করিবেন। যাঁহার মনে বা প্রকৃতিতে যে ভাব খুবই প্রবল, তিনি সেইভাবে সর্ব্বদা নিরত থাকিয়া এবং

সেই ভাবটির বিষয় বার বার চিন্তা করিয়া সন্তানদির প্রতি সেই ভাব সেরূপ প্রকাশ পায়, তাহা আরও দৃঢ় বা প্রবল করিয়া তুলিবেন। এই প্রকারে ভাববিশেষকে দৃঢ় করিলে তবে পূজায় অধিকার জন্মিবে। তখন সেইরূপ স্নেহভাবে এবং তদনুরূপ সেবার দ্বারা সাধক তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে পূজা করিবেন। প্রতিমায় বিভিন্ন সাধকের ভাবগত বৈষম্য হেতু একই প্রতিমায় অনেক সময় সকলের পূজা করা সমীচীন নহে।

দুর্গাদেবীকে সাধকগণ দুই ভাবে পূজা করিয়া থাকেন। কেহ মাতৃভাবে আর কেহ বা কন্যাভাবে দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন। উভয় পূজার মধ্যে ভাবগত পার্থক্য বিদ্যমান। সংসারে জননী সন্তানের জন্য কত কষ্ট করেন, কত যন্ত্রণা সহেন, তাহা মাতৃভক্তিসম্পন্ন পুত্র সকল সময়েই বুঝে। তাই তাহার হৃদয় মাতৃভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। সে মা-পাগলা ছেলে হইয়া দাঁড়ায়। মাকে খাওয়াইতে—মাকে পরাইতে পারিলেই সেই ছেলের যেমন সুখ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। সে ভাল বস্তু পাইলে মায়ের জন্যই তাহা সংগত করে। সেইরূপ যিনি মাতৃভাবে পর-দেবতার সাধনা করেন, তাঁহার মনে সদাই এই ভাব জাগ্রত থাকে যে, জগদম্বা আমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতে-ছেন। আমার প্রতি তাঁহার দয়া অসীম—স্নেহ অপার। তিনি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। তিনিই আমাকে সকল বিপদ—সকল দুঃখ—সকল আপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। তাঁহার এই অপার স্নেহের জন্য সংসারে আমি টিকিয়া আছি। অতএব পৃথিবীতে যাহা কিছু ভাল দ্রব্য আছে, আমি তাহাই এই পরা জননীকে নিবেদন করিয়া দিব এবং আমি প্রসাদরূপে তাঁহারই ভুক্তাবশেষ খাইব। সন্তান-রূপী ভক্তের তৃপ্তির জন্য দেবতাকে শয্যাদি দান প্রভৃতির ব্যবস্থা সেই জন্য বিহিত আছে। পার্থিব জননীর সেবা যে প্রকারে করিতে হয়, মাতৃভাবের সাধক সেই প্রকারেই দুর্গা-দেবীর সেবা করিয়া থাকেন। শিশু মায়ের নিকট যাইলে যেমন তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সে মাতৃভাব-সুধায় গলিয়া যায়, মাতৃ-ভাবের সাধক সেইরূপ তাঁহার পরদেবতার উপাসনাকালে সংসারের সকল জ্বালা ভুলিয়া ভক্তিরসে গলিয়া যান।

কিন্তু কন্যাভাবের সাধনা স্বতন্ত্ররূপ। যাহার কন্যার উপর মমতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তাহার হৃদয় যেমন কন্যাকে দেখিলে আনন্দে আপ্লুত হয়,—কন্যার জন্য সে যেমন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে—কন্যার আব্দার ও অত্যাচার সে যেমন অম্লান-বদনে সানন্দে সহ্য করে, কিসে কন্যা সুখী হইবে, সেই ভাবনাই যেমন সকল সময়ে ভাবিতে থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি কন্যা-ভাবের সাধক, সে সংসারের সকল জ্বালা, সকল দুঃখ, সকল প্রতিকূলতা সহ্য করিয়া আনন্দ সহকারে জগদম্বার সেবা ক[রিয়া] থাকে। তাহার সেবা নিঃস্বার্থ। মায়ের নিকট যেমন [কিছু] পাইয়াছে এবং পাইবে বলিয়া সন্তান প্রসূতির নিকট কৃত[জ্ঞ] থাকে,—কন্যার কাছে পিতা-মাতার তেমন কৃতজ্ঞ হই[বার] কোন কারণ জন্মে না। কন্যার সেবা কেবল বাৎসল[্যের] খাতিরে। প্রতিদান পাইবার আশা শূন্য সেবা। আত্মতৃ[প্তির] জন্য সেবা,—মন সেবা করিতে চাহে বলিয়া সেবা। কন্যা স্বা[মি-] গৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিলে পিতার কত আনন্দ। পি[তা-] মাতার যতদূর শক্তি, ততদূর ভাল ভাল জিনিস আনিয়া কন্যা[কে] দিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। আবার কন্যার স্বামিগৃহে যাই[বার] সময় সেই বিজয়ার দিন সে কালের প্রথায় কন্যা পাঠাইবার [সময়] পান্তাভাত কচুর শাক প্রভৃতি খাওয়াইয়া পাঠান হয়; গৃহক[র্ত্রী] কাঁদিয়া মাটী ভিজায়, আবার যাইবার সময় দুর্গার কাণে ক[হে] জননীর ন্যায় বলিয়া দেন, "আর কাঁদিসনে মা, আবার সম্ব[ৎসর] পরে তোরে আনিব।" এই কন্যাভাবের সাধনা বড়ই কঠি[ন]। মাতৃভাবের সাধক যেমন মায়ের নিকট আব্দার করিতে পারে[ন,] বর প্রার্থনা করিতে পারেন,—কন্যাভাবের সাধক তাহা [করিতে] পারেন না। তিনি জানেন যে, কন্যা তাঁহার সর্ব্বশক্তি-শালি[নী,] কিন্তু তথাপি কন্যার সেবাতেই তাঁহার অপার আনন্দ। কন্[যার] নিকট কিছু চাহিতে নাই; কর্ত্তব্যবোধে কন্যাকেই দিতে হ[য়।] সুতরাং ভাবরসের পার্থক্য কোথায়, পাঠক তাহা ভাবিয়া দেখু[ন।] মাতৃভাব ও কন্যাভাব উভয় ভাবই নিষ্কাম হইতে পারে—[কি]ন্তু কন্যাভাব স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও পরিণামের প্রতি দৃষ্টিহীন।

এই ভাব বাহ্য-পূজারই অঙ্গীভূত। সকল দেবতাকে সমা[ন] ভাবে পূজা করা যায় না। যথা—শিবকে কেবল পিতৃ-ভাবে, বালগোপালকে কেবল পুত্র-ভাবে পূজা করিতে হয়। এই[রূপ] কতকগুলি দেবতাকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব ধরিয়া পূ[জা] করিতে হয়। সকল দেবতার সকল ভাব ফুটাইয়া তোলা য[ায়] না। সে সকল বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে।

বাহ্যপূজায় প্রতিমা বা প্রতীকের প্রয়োজন। অধিকা[রী-] ভেদে সে প্রতিমারও তারতম্য আছে। যথা—

শালগ্রামে জলে বাঽপি প্রতিমায়াং ঘটে পটে।
যন্ত্রে বা যন্ত্রপুষ্পে বা লিঙ্গে বাঽপি প্রপূজয়েৎ ||
কুমার্য্যাং বাঽপি পীঠে বা মন্ত্রে বা কবচেঽপি বা।
গুরৌ বা গুরুশক্ত্যাম্বা পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ।

সাধকগণ শালগ্রামশিলায়, জলে, প্রতিমায়, প্রতিষ্ঠিত ঘ[টে,] পটে, যন্ত্রে, যন্ত্র-পুষ্পে, শিবলিঙ্গে, মহাপীঠ এবং উপপীঠাদিতে, ম[ন্ত্রে,] কবচে, গুরুতে অথবা গুরু-পত্নীতে দেবতাবুদ্ধি স্থাপনা করি[য়া] তাহাকেই অবলম্বন পূর্ব্বক উপহারাদির দ্বারা অর্চ্চনা করি[লে] ইহা বাহ্যপূজারই অঙ্গ।

এই বাহ্যপূজাই আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম সোপান।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।